

] ১৩৪৭ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

সচিত্র

মাসিক বসুমতী

১৯শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(১৩৪৭ সাল—কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট "বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে"

শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্র — পত্রাঙ্ক

বৈজ্ঞানিক চিত্রঃ—

বিভিন্ন দেশের নরনারী চিত্রঃ—

বৈদেশিক রাষ্ট্রনায়ক চিত্রঃ—

চিত্র — পত্রাঙ্ক

দৃশ্য চিত্রঃ—

সমাধি চিত্রঃ—

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক চিত্রসূচী





১৯শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৪৭ [১ম সংখ্যা

রাসযাত্রা

শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, তাহা শ্রাবণ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ" তিনি রসময়। রস দশ প্রকার। যথা—

শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র হাস্য-ভয়ানকাঃ।
করুণাদ্ভুত-শান্তাশ্চ বাৎসল্যঞ্চ রসা দশ ॥

১ শৃঙ্গার, ২ বীর, ৩ বীভৎস, ৪ রৌদ্র, ৫ হাস্য, ৬ ভয়ানক, ৭ করুণ, ৮ অদ্ভুত, ৯ শান্ত ও ১০ বাৎসল্য।

শৃঙ্গার রস মাধুর্য্যময় ও সকলের সমধিক প্রিয় বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রেই উহাকে সকল রসের আদিতে ধরা হইয়াছে; এই হেতু উহাকে আদিরসও বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের রসময়ত্বের পরিচয়ে একটি সুন্দর শ্লোক আছে। যথা—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥
(১০।৪৩।১৭)

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরামের সহিত কংসের ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া মল্লেরা জানিল ইনি বজ্র—৪ রৌদ্ররস। সাধারণ মনুষ্যেরা জানিল নরবর—৮ অদ্ভুত রস। স্ত্রীলোকেরা জানিল মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প—১ শৃঙ্গার রস। গোপেরা জানিল স্বজন (সজাতীয়)—৫ হাস্য রস। দুর্বৃত্ত রাজারা জানিল শাসনকর্ত্তা—২ বীর রস। দেবকী ও বসুদেব জানিলেন সন্তান—১০ বাৎসল্য রস। কংস জানিল মৃত্যু—৬ ভয়ানক রস। অজ্ঞ লোকেরা জানিল —বিরাট্ (বিকৃত অর্থাৎ ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি; বিকলং যথা স্যাৎ তথা রাজতে)—৩ বীভৎস রস। যোগীরা জানিলেন পরব্রহ্ম—৯ শান্ত রস। যাদবেরা জানিলেন—পরম দেবতা —৭ করুণ রস (এখানে ইহার অর্থ—করুণা; অর্শ-আদিত্বাৎ অস্ত্যর্থে অচ্ দয়াশীল)।

শ্রীকৃষ্ণলীলার সর্ব্বপ্রধান পরম উপাদেয় গ্রন্থ হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবত। উহাতে আপাত-দৃষ্টিতে অশ্লীলতাপূর্ণ দুইটি লীলা বর্ণিত হইয়াছে—গোপীদিগের বস্ত্রহরণ ও

তাহাদিগের সহিত রাসক্রীড়া। ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ ঐ দুইটি লীলার—বিশেষতঃ রাসলীলার—মাধুর্য্য স্বয়ং উপভোগ করিবার জন্য এবং সর্ব্বসাধারণকে উপভোগ করাইবার জন্য এত অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ভাবাবেশে মত্ত হইয়া উঁহাদের অতিরিক্ত স্বকপোলকল্পিত কলঙ্কভঞ্জন, নৌকাবিলাস প্রভৃতি এত নূতন লীলার অবতারণা করিয়াছেন যে, শুনিলে লোকের মন-প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠে। তদবলম্বনে যাত্রায়, থিয়েটারে, কবির ছড়ায়, কথকতায়, কীর্ত্তনে ও চিত্রাঙ্কনে আরও বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। ঐ সকলে রাধিকাকে পরকীয়া রূপের অধিক করিয়া বর্ণনা করিতে কেহ কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।—তিনি বৃন্দা, ললিতা, বিশাখাদি নিজ সখীগণের সনে কুঞ্জবনে গিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে অহোরাত্র বিহারেই মত্ত থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে যেন কেহ অভিভাবক ছিল না, তিনি যেন গুরুজনদিগকে গ্রাহ্যই করিতেন না, কাহারও শাসনের এবং লোকনিন্দার ভয়ও রাখিতেন না। তাঁহাদের সঙ্গে আবার এক বৃদ্ধা পূর্ণমাসী (পৌর্ণমাসা) জুটিয়া কত রঙ্গ-ভঙ্গই করিত। ইহাতে ভক্তগণের ভাব, ভক্তি ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইলেও রাস, দোল প্রভৃতি কৃষ্ণলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীরাধাকে দেখিতে না পাইলে ও যুগল-মিলনে রাধার পরিবর্ত্তে রুক্মিণী বা সত্যভামা থাকিলে তাঁহাদের তৃপ্তি না ঘটিলেও, ভগবানের নিন্দাই প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিধর্ম্মীরা তাঁহাকে মহা-লম্পট বলিয়া ঘোষণা করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি ও হিন্দু-বিদ্বেষের বৃদ্ধিই করিতেছে। যে বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া কত ঊর্দ্ধে তুলিয়াছেন, তিনি যে তাঁহাকে এত হেয় ও অধঃপাতিত করিবার জন্য ঐ দুইটি লীলা গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব? যে রাধাকে লইয়া এত মাতামাতি, শ্রীমদ্ভাগবতে সে রাধার নাম-গন্ধও নাই।

বৈষ্ণব-পণ্ডিতরা বলেন—ইষ্টদেবতা বলিয়া প্রকাশ্যে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই; কিন্তু গূঢ় ভাবে এক স্থানে করিয়াছেন। রাসলীলার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ একটি গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে, অন্য গোপীরা তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে জ্যোৎস্নালোকে এক স্থানে তাঁহার পদচিহ্নের সহিত রমণীর পদচিহ্ন দেখিয়া বলিয়াছিল—

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

এই গোপী নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়াছিল, তাই তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়াছেন।

সে গোপী কে? যে কৃষ্ণকে রাধনা (আরাধনা) করিয়াছে। যে রমণী কাহাকেও আরাধনা করে, তাহাকে রাধা বলা যায়—রাধ্+ণিচ্+অচ্+আপ =রাধা।

ইহাতে জিজ্ঞাস্য—রাধা কাহার ইষ্টদেবতা ছিলেন? গ্রন্থবক্তা শুকদেবের? না, গ্রন্থকর্ত্তা বেদব্যাসের? শুকদেব ত মাতৃগর্ভে থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া-ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে যাবজ্জীবন তাঁহার সে জ্ঞান অবিচ্যুতই ছিল। সুতরাং তাঁহার রাধামন্ত্রে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজনই ছিল না। তিনি পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্।
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্॥
(ভাগ, ২।১।৮,১০)

দ্বাপরের শেষে (শ্রীধর—দ্বাপরাদৌ দ্বাপর আদির্যস্য কালস্য তস্মিন্ দ্বাপরান্তে ইত্যর্থঃ) পিতা দ্বৈপায়নের নিকটে এই বেদোপম ভাগবত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছি। হে রাজর্ষে, তুমি মহাভাগবত বলিয়া, তাহাতে একাগ্রচিত্তে যে আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিব।

বেদব্যাস লোকহিতার্থ বেদবিভাগ, ব্রহ্মসূত্র, ব্যাস-সংহিতা, (ভাগবত ভিন্ন) ১৭খানি মহাপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি রচনা করিয়াও মনে শান্তি না পাইয়া বদরিকাশ্রমে বিষণ্ণবদনে বসিয়াছিলেন। নারদ আসিয়া বলিলেন—

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুকীর্ত্তিতঃ॥

তুমি ধর্ম্মাদি বিষয় যেরূপ সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়াছ,

বাসুদেবের মহিমা সেরূপ ভাবে কীর্ত্তন কর নাই (তাই তোমার মনে অশান্তি)।

বেদব্যাস নারদের এই কথায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্যক্ অবগত হইবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই তপস্যার ফলে—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
(ভাগবত, ১।৪।৭)

ভক্তিযোগ দ্বারা মন সম্পূর্ণ নির্ম্মল ও নিশ্চল হওয়ায় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার মায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন।

এখানে মায়া বলিতে যদি রাধাকেই ধরা যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়েই তাঁহার ইষ্টদেবতা। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রকাশ্যভাবে অসংখ্যবার বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না; রাধার নাম বলিতেই এত সঙ্কোচ ও অপরাধ বোধ হইল কেন?

এক্ষণে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। ঐ দুইটি লীলাকে অশ্লীলতা-দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য বহু পণ্ডিত উহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অনেকে গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া মূল ঘটনাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর, নীলকণ্ঠ, রামানুজ প্রভৃতি কুশাগ্রীয়বুদ্ধি মনীষিগণ গীতার ভাষ্য ও টীকা করিয়াছেন; তাঁহাদের কাহারও বুদ্ধিতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রবেশ করে নাই কেন, বুঝিতে পারিলাম না। আমার তাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধি না থাকায়, সে দুর্গম পথ পরিত্যাগ করিয়া সুগম পথেই চলিব—কেবল মূল শ্লোকেরই ব্যাখ্যা করিব। শ্রীধরস্বামীও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না করিয়াই বলিয়াছেন—কামরিপু চরিতার্থ করিবার জন্য রাসলীলা নহে, কাম জয় করিবার জন্যই ঐ লীলা। ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য রাসলীলার মধ্যে কয়েক স্থলে বেদব্যাসোক্ত শ্রীকৃষ্ণের কতিপয় বিশেষণ পদ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—আত্মারাম (যিনি আপনাতেই রত, স্ত্রীলোকে নহেন), আত্মরত আত্মরতি (ঐ অর্থ), সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ (মদনমোহন), আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ (যিনি কামভাবকে মনোমধ্যে সংযত রাখিয়াছিলেন—প্রকাশ পাইতে দেন নাই)।

বস্ত্রহরণ লীলা

রাসলীলারই উপোদ্ঘাত হইতেছে বস্ত্রহরণ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে বস্ত্রহরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম॥
(ইত্যাদি)

ব্রজকুমারীরা অগ্রহায়ণ মাসে হবিষ্য ভোজন করত কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিল।

তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া, পরস্পর সমবয়স্কা কুমারীদিগকে ডাকিয়া (রাত্রিবাস ছাড়িয়া) পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যাদি উপচার লইয়া, কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যমুনার ঘাটে যাইত। তীরে উপচারগুলি রাখিয়া, তীরের উপরে পরিধেয় বস্ত্রগুলি স্থাপন করিয়া, উলঙ্গ হইয়া স্নান সমাপনান্তে বস্ত্র পরিয়া, বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকায় কাত্যায়নী দেবীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত। তাহাদের প্রত্যেকেরই পূজার মন্ত্র ছিল—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

হে কত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে ঈশ্বরি, হে দেবি, তুমি কৃষ্ণকে আমার পতি করিয়া দাও, অর্থাৎ তাহারা এতৎ পাদ্যং—নমঃ কাত্যায়নি···তে নমঃ—নমঃ শ্রীকাত্যায়ন্যৈ নমঃ ইত্যাদিক্রমে সমস্ত উপচার নিবেদন করিয়া, ঐ মন্ত্রেই প্রণাম করিত।

এক মাস পূর্ণ হইলে কুমারীরা যখন পূর্ব্বোক্তরূপে স্নান করিতেছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ কতিপয় সখার সহিত অলক্ষিতে সেখানে উপস্থিত হইয়া বস্ত্রগুলি লইয়া নিকটস্থ কদম্ববৃক্ষে উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমাদের বস্ত্র তীরে নাই, আমার কাছে এই গাছের উপরে আছে। তোমরা স্নান করিয়া উঠিয়া একে একে বা সকলে মিলিয়া আসিয়া যাহার যে বস্ত্র, আমার নিকট হইতে চাহিয়া লও।" তাহারা এই কথা শুনিয়া, উপরে চাহিয়া দেখিয়া, সস্মিত বদনে পরস্পর মুখ-চাহাচাহি

করিয়া লজ্জায় সেই শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া কহিল—

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নো চেদ্ রাজ্ঞে ব্রুবাম হে॥

হে শ্যামসুন্দর, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, (স্ত্রীলোকের বস্ত্রহরণ করিলে অধর্ম্ম হয়; ইহা জান); আমরা তোমার দাসী; তুমি যাহা বলিবে, আমরা তাহাই করিব; আমাদের বস্ত্রগুলি দাও; নহিলে রাজাকে (গোপরাজ নন্দকে) বলিয়া দিব।

শ্রীধরস্বামীর মতে ঐ দলে ত্রিবিধ গোপী ছিল—কুমারী, যুবতী ও প্রৌঢ়া। কুমারীরা বলিয়াছিল—আমরা তোমার দাসী। যুবতীরা বলিয়াছিল—তুমি যা বলিবে, তাই করিব। প্রৌঢ়ারা বলিয়াছিল, (বস্ত্র না দিলে) রাজাকে বলিয়া দিব। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পাঁচ বছরের বালিকারা (পরে প্রতিপন্ন হইবে) ভোরে উঠিয়া যমুনায় স্নান করিতে যাইত বলিয়া, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতিপয় প্রৌঢ়া ও যুবতী তাহাদের সঙ্গে যাইত। তাহারা ব্রত করে নাই। যেহেতু, পূজার মন্ত্রে আছে, 'কৃষ্ণকে আমার পতি করিয়া দাও'। এখনকার মত সে-কালে যুবতী ও প্রৌঢ়া-বিবাহ প্রচলিত ছিল না। তাহাতে শাস্ত্রমতে মহাপাপ হয় এবং লোকনিন্দাও ঘটিয়া থাকে।

যাহারা ব্রত করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদেরই বস্ত্রহরণ করিতে আসিয়াছিলেন, প্রৌঢ়া ও যুবতীদিগের বস্ত্রহরণ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তবে সকলেই একত্র বস্ত্র রাখিয়াছিল বলিয়া গোপনে ও তাড়াতাড়িতে ছোট-বড় কাপড় বাছিবার অবসর পান নাই। চোরা-গাইএর সঙ্গে কপিলা-গাইএর বাঁধা-পড়ার ন্যায় কুমারীদিগের বস্ত্রের সহিত যুবতী ও প্রৌঢ়াদিগের বস্ত্রও অপহৃত হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন—কুমারীদিগকে বস্ত্র ফিরাইয়া দিয়া অবশিষ্ট বস্ত্র তীরে রাখিয়া যাইবেন; তিনি চলিয়া গেলে প্রৌঢ়া ও যুবতীরা আপন আপন বস্ত্র লইবে।

শ্রীকৃষ্ণ কুমারীদিগকেই (প্রৌঢ়া ও যুবতীদিগকে নহে) বলিয়াছিলেন—"তোমরা যদি আমার দাসী, আমি যা বোল্‌ব তাই যদি কোর্‌বে, তা হোলে আমি বোল্‌ছি, তোমরা উঠে এসে বস্ত্র নাও, নহিলে আমি কিছুতেই বস্ত্র দিব না। দাওগে রাজাকে বোলে, আমি রাজাকে ভয় করি না; তিনি আমার কি কোর্‌বেন?" কুমারীরা অগত্যা দুই হস্তে লজ্জাস্থান ঢাকিয়া বৃক্ষতলে গেল। কৃষ্ণ বলিলেন—"উলঙ্গ হোয়ে স্নান কোর্‌লে পাপ হয়। তার উপর তোমরা ব্রত কোর্‌ছ। এই অপরাধে কাত্যায়নী দেবী তোমাদের উপর অপ্রসন্না হয়েছেন। এক্ষণে মাথার উপর দুই হাত যোড় কোরে তাঁকে প্রণাম কোরে প্রসন্ন কর, ক্ষমা চাও।" কাত্যায়নী অপ্রসন্না হইয়াছেন শুনিয়া কুমারীরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া অবশ্য ভাবেই ঐরূপে প্রণাম করিল। শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদের বস্ত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।

তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ—কাত্যায়নী-ব্রতের ফল পাইয়াছ। এক্ষণে ব্রজে ফিরিয়া যাও। (তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছেন, উহারা গোপকন্যা; সুতরাং ধর্ম্মরক্ষার্থ অবতীর্ণ ভগবান্ উহাদিগকে বিবাহ করিতে পারেন না ভাবিয়া বলিলেন—আমাকে পতিরূপে পাইবে না, তবে) এইরূপ রাত্রিসমূহে (অর্থাৎ আগামী বৎসরে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হইতে কয়েক রাত্রি) আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে।

কুমারীরা কৃষ্ণকে পতি পাইবার জন্য কৃষ্ণের আরাধনা না করিয়া কাত্যায়নীর আরাধনা করিল কেন? এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে যে, যে কোনও কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউক, তাহার তদুপযুক্ত শক্তি না থাকিলে সে তাহা সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। যাহার তদুপযুক্ত শক্তি নাই, সে মহাশক্তির আরাধনা করিলে তদুপযুক্ত শক্তি লাভ করিতে পারে। এই জন্য সুরথ রাজা প্রবল শত্রুদিগকে জয় করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য মেধা মুনির উপদেশে মহাশক্তি দুর্গার আরাধনা করিয়াছিলেন। সমাধি বৈশ্যও জ্ঞানলাভের জন্য তদুপদেশেই মহাশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন ভীষণ ভারতযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে মহাশক্তি দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসে গমন করিবার পূর্ব্বে ধৌম্যের উপদেশে দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন।

স্যমন্তক মণি-হরণের অপকলঙ্ক দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বনে গিয়া জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তদধিষ্ঠিত পর্ব্বতের গুহায় একাকী প্রবিষ্ট হইয়া দ্বাদশ দিনেও বহির্গত না হওয়ায় বহিঃস্থ সৈন্যগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিলে বসুদেব, দেবকী, রুক্মিণী প্রভৃতি তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য মহামায়া দুর্গার উপাসনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই ব্রজকুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতি পাইবার জন্য কাত্যায়নী-ব্রত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মহাশক্তি অপর কেহ নহেন, তিনি ভগবানেরই অসাধারণী শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন; সুতরাং ভগবানের আরাধনায় ভগবতীরও আরাধনা হয় ও ভগবতীর আরাধনায় ভগবানেরও আরাধনা হইয়া থাকে এবং একের প্রতি বিদ্বেষে অন্যের প্রতিও বিদ্বেষ ঘটে। কিন্তু দেখা যায়, শাক্তেরা বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্বেষ না করিলেও বৈষ্ণবেরা প্রায়ই শাক্তদিগের প্রতি মহাবিদ্বেষ করিয়া থাকেন; এমন কি, শক্তিমূর্ত্তির নাম ও তদীয় পূজোপকরণের নামও মুখে আনেন না—দোয়াতের কালিকে 'সেহাই' বলেন, বিল্বপত্রকে 'তে-ফ্যাড়্কা পাতা' বলেন। বলিদানে ও ভোগে পাঁঠা কাটা ও কোটা হয় বলিয়া ঐ শব্দ দুইটা মুখে আনা মহাপাপ মনে করেন; তাই তরকারী প্রভৃতি স্থলেও 'বনানো' বলেন, ইত্যাদি। কিন্তু যে ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব গ্রন্থ বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাকে কণ্ঠহার করিয়াছিলেন, সেই ভাগবতেই ভগবান্ বলিয়াছেন—দেবতা প্রভৃতি সকল পদার্থই যখন আমার বিভূতি, তখন যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া আমায় পূজা করে, তাহার মন শান্তি পায় না। যথা—

দ্বিষতঃ পরকায়ং মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥

(৩।২৯।২৩)

তন্ত্রসারেও দেখা যায়, কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা। প্রমাণ দিয়াছেন—সর্ব্বেষাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। ইত্যাদি।

এখন বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজ-কুমারীদিগের বয়স কত, তাহাই আলোচ্য।

অগ্রহায়ণ মাসে বস্ত্রহরণের পর ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শক্রোত্থান (ইন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ) হয়। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ণ—দেবতাদিগের দিন। শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণায়ন—দেবতাদিগের রাত্রি। ইন্দ্র রাজা বলিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার জন্য তাঁহাদের রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরেই জাগরিত হয়েন। গোপেরা ঐ দিন হইতে সপ্তাহকাল ইন্দ্রযজ্ঞ করিত। ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভ করিয়া ইন্দ্র গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে গোপেরা ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া গোবর্দ্ধনযজ্ঞ করিয়াছিল। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া পবন ও মেঘগণকে আদেশ করিয়া বৃন্দাবনে প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত করাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শিলা-বৃষ্টিও হইয়াছিল। ঐ বৃষ্টির জলে এবং নদীসমূহের বন্যার জলে বৃন্দাবন নিমগ্ন হইল। গোপেরা ভীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তোমাদের ভয় নাই, আমি তোমা-দিগকে রক্ষা করিতেছি।" এই বলিয়া দুই হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া, বাম হস্তে উহা ছত্রাকারে ধরিয়া বলিলেন—"তোমরা সকলে স্ত্রীপুত্রাদি ও গোধনাদি দ্রব্যসামগ্রী লইয়া পর্ব্বতের তলস্থ গর্ত্তে প্রবেশ কর। আমার হস্ত হইতে পর্ব্বত পড়িয়া যাইবে, এ আশঙ্কা করিও না।" তাহারা সেইরূপই করিল। সপ্তাহান্তে ঝড়-বৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে, এবং নদীসমূহের জলও কমিয়া যাইলে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাহারা গর্ত্ত হইতে বাহির হইলে তিনি গর্ত্তমধ্যে পর্ব্বত স্থাপন করিলেন।—একটা বড় গাছ ঝড়ে উপড়াইয়া পড়িলে তাহার গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা কত উচ্চ হয়, সকলেই দেখিয়াছেন। একটা পাহাড় উপড়াইলে তাহার গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা কত উচ্চ হইয়াছিল, অনুমান করুন। এই জন্যই গর্ত্ত-মধ্যে জল-ঝড়-শিলাবৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে নাই।

প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য—গোবর্দ্ধন ধারণের প্রচলিত ছবি দেখিয়া অনেকের ধারণা, গোপেরা গোধনাদি লইয়া পর্ব্বতের বহু গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত তুলিয়া ধরিবার পরে ঐরূপ আদেশ করিলে তাহারা কিরূপে পর্ব্বতে উঠিল ও দ্রব্যসামগ্রী তুলিল? ভাগবতে আছে—

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ।
যথোপজোষং জুষত গিরিগর্ত্তং সগোধনাঃ॥
তথা নির্বিবিশুর্গর্ত্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ।
যথাবকাশং সধনাঃ সপ্রজাঃ সোপজীবিনঃ॥
নির্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ।
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ॥

গোবর্দ্ধন-ধারণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গোপেরা বলিয়াছিল—

ক সপ্তহায়নো বালঃ ক মহাদ্রিবিধারণম্।

কোথায় সাত বছরের বালক, আর কোথায় অত বড় পর্ব্বত ধারণ!

গৌণ ভাদ্রের (মুখ্য শ্রাবণের) কৃষ্ণাষ্টমীতে তাঁহার জন্ম। গোবর্দ্ধন ধারণের সময় তাঁহার বয়স ৭ বৎসর ২০ দিন। রাসের সময় ৭ বৎসর ২॥ মাস। তৎপূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসে বস্ত্রহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ৬ বৎসর প্রায় ৩ মাস। কুমারীরা তাঁহাকে পতি পাইবার কামনায় কাত্যায়নীব্রত গ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং তাহাদের বয়স তাঁহার অপেক্ষা অল্প। "কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং" পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক ও বালিকাকে কুমার ও কুমারী বলে। অতএব তাহাদের বয়স তখন পাঁচ বৎসরের অধিক ছিল না। কুমারের অন্য অর্থ—কার্ত্তিকেয়, রাজপুত্র, কোমল, অবিবাহিত। কার্ত্তিকেয়ের নাম কুমার বলিয়া প্রাচীনারা বলেন—কার্ত্তিক বিয়ে করেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রে কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রীর নাম ষষ্ঠী; এই জন্য যাহাদের সন্তান হয় না, তাহারা কার্ত্তিকেয়ব্রত করিয়া থাকে।

৬ বৎসরের বালক ৫ বৎসরের বালিকাদিগের—বিশেষতঃ যাহারা তাঁহাকে পতি পাইবার কামনায় ব্রত করিতেছিল তাহাদিগের—সহিত পরিহাস করিয়া বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহার পক্ষে দোষাবহ? লম্পটবাদীদিগকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

রাসলীলা।

দশম স্কন্ধের ২৯ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত ৫ অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রথম শ্লোক—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুমারীদিগের নিকটে প্রতিশ্রুত সেই সকল রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।—রম ধাতুর প্রধান অর্থ ক্রীড়া (রমু ক্রীড়ায়াং—ধাতুপাঠ)। যোগমায়াকে আশ্রয় করিবার উদ্দেশ্য—সর্ব্ব ঋতুর ফুল ফুটান, তজ্জন্য প্রথমেই শরৎকালেও মল্লিকা ফুল ফুটিয়াছিল; গন্ধমাল্যাদির আয়োজন; গোপীরা সারা রাত্রি বনে থাকিলেও তাহাদের পতিদের তাহা জানিতে না পারা; ইত্যাদি।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভি-রঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥

নবোদিত রক্তবর্ণ চন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া নিজ পত্নী লক্ষ্মী দেবীর কুঙ্কুমচূর্ণ-রঞ্জিত রক্তবর্ণ মুখখানি তাঁহার মনে পড়িয়াছিল; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ মনকে সংযত করিয়া বনভূমিকে কোমল চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত দেখিয়া (বাঁশী বাজাইয়া) কুটিলনয়নাদিগের মন হরণ করিবার জন্য মধুর স্বরে গান করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—তিনি প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুমারীদিগকে লইয়া রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহারা পঞ্চবর্ষ বালিকা, ভ্রূভঙ্গী ও নয়ন-কৌটিল্য করা তখনও শিক্ষা করে নাই। যুবতীরাই ঐ সব করিতে জানে; তাহাদিগের মন হরণ করিতে গেলেন কেন?

উত্তর—তিনি জানিতেন, যুবতী গোপীরা তাঁহার ত্রিভুবনসুন্দর রূপ দেখিয়া তাঁহাকে কামভাবে ভজনা করিতে অভিলাষিণী ছিল। একসঙ্গে রথ-দেখা ও কলা-বেচা দুই কাজই হইবে, এই অভিপ্রায়ে রাসে তাহাদিগের কামভাব বৃদ্ধি করিবার জন্যই একটি মন্ত্র গান করিয়াছিলেন। "অত্যুচ্চঃ পতনায়তে"* অতি 'বাড়' হইলে তাহাকে পড়িতেই হয়।

* এইরূপ পাঠই চিরপ্রচলিত। কিন্তু পণ্ডিতরা বলেন, 'পতনায়তে' ব্যাকরণ-শুদ্ধ নহে। কেন নহে, তাহা বুঝিলাম না।

মন্ত্র গুহ্যাতিগুহ্য বলিয়া ঐ শ্লোকের মধ্যে তাহা প্রকাশ্য ভাবে না বলিয়া গূঢ় ভাবেই রাখিয়াছেন—"কলং জগৌ বামদৃশাং মনোহরম্।" কল (অকার উচ্চারণার্থ) ক্ ল্ এই দুইটি বর্ণ। তাহারা কিরূপ ? বামদৃশা (সহার্থে তৃতীয়া), বামনেত্রযুক্ত, মাতৃকান্যাসে 'ইং নমো দক্ষিণ-নেত্রে, ঈং নমো বামনেত্রে' থাকায় দীর্ঘ-ঈকারযুক্ত, তাহাতে ক্লী হইল। আর কিরূপ ? অংমনোহরং ; অং বলিতে বিন্দু (অনুস্বার), "চন্দ্রমা মনসো জাতঃ" এই শ্রুতিতে পরমেশ্বরের মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি থাকায় কার্য্য ও কারণের অভেদ উপচারে মন বলিতে চন্দ্র, তদ্বিশিষ্ট, তাহা হইলে ক্লীঁ হইল। উহা কামবীজ। দেবতাদিগের দুই প্রকার মন্ত্র আছে—বীজমন্ত্র ও মূলমন্ত্র। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ বৃক্ষ হয়, সেইরূপ বীজমন্ত্র দ্বারা হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হওয়ায় হৃৎপদ্মে পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে ভগবান্ বিরাজিত হয়েন। মূলমন্ত্র দ্বারা সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥
(ইত্যাদি)

সেই কামোদ্দীপক গীত শ্রবণ করায় ব্রজবাসিনী যুবতী-দিগের চিত্ত কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যে স্থানে তাহাদের বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সেই স্থানে তাহারা উপস্থিত হইল। কে কিরূপ সাজে যাইতেছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। এত বেগে তাহারা গিয়াছিল যে, তাহাদের কর্ণের কুণ্ডল দোদুল্যমান হইতে লাগিল।

তাহাদের গমন কিরূপ ? যাহারা গাভী দোহন করিতেছিল, তাহারা তাহা সমাপ্ত না করিয়াই চলিল। যাহারা উনুনে দুধ ও হালুয়া চাপাইয়াছিল, তাহারা কড়া না নামাইয়াই ছুটিল। যাহারা পরিবেষণ করিতেছিল, তাহারা পাতে ডা'ল দিয়া ভাজা আনিতে গিয়াই চলিয়া গেল। যাহারা শিশুদিগকে দুধ খাওয়াইতেছিল, তাহারা ছেলেকে মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়াই প্রস্থান করিল। যাহারা স্বামীর পা-হাত টিপিয়া দিতেছিল, তাহারা সে কাজ ফেলিয়া রাখিয়াই পলাইল। যাহারা খাইতে বসিয়াছিল, তাহাদের আর খাওয়া হইল না। ইত্যাদি। ইহাতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়, ভগবান্‌কে পাইতে হইলে অথবা মন্দিরে তাঁহার বিগ্রহ দেখিতে যাইতে হইলে, সংসারের কাজে আর মন রাখিবে না, নিজের সাজ-সজ্জার দিকেও চাহিবে না। প্রবাদ আছে—এক বৃদ্ধা জগন্নাথ দর্শনার্থ পুরীযাত্রা করিয়া তাহার রোপিত পুঁই গাছের দশা কি হইবে ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছিল ; সেখানে গিয়া সে মন্দিরমধ্যে জগন্নাথ দেখিতে পায় নাই, কেবল পুঁই গাছই দেখিয়াছিল।

গোপীরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই রাত্রে এমন করিয়া ছুটিয়া আসিলে কেন ? ব্রজে কি কোনও অমঙ্গল ঘটিয়াছে ?" মুখে কোনও কথা নাই। "রাত্রে বনে কত হিংস্র জন্তু বিচরণ করে, স্ত্রীলোকদিগের এমন সময়ে এখানে থাকা উচিত নহে, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।" নড়ন-চড়ন নাই। "তোমাদের পতি, পিতা প্রভৃতি কত খুঁজিতেছেন, তাঁহাদের উদ্বেগ বৃদ্ধি করিও না।" এ কথায় কাণ নাই। "জ্যোৎস্নায় বনের শোভা দেখিতে কি আসিয়াছ ?' নিরুত্তর। "ভালবাস বলিয়া আমাকে কি দেখিতে আসিয়াছ ? দেখা ত হইল, এখন ফিরিয়া যাও।" সকলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। "অকপটে পতি-সেবা এবং বন্ধু ও সন্তানদিগের প্রতিপালনই স্ত্রীলোকদিগের পরম ধর্ম্ম। পতি দুশ্চরিত্র, হতভাগ্য, বৃদ্ধ, মূর্খ, রুগ্ন ও দরিদ্র হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা উচিত নহে। ব্যভিচারিণী হইলে অযশ, কলঙ্ক ও ভীষণ নরক ভোগ হয়।" ইত্যাদি।

ভগবানের এই সমস্ত অমৃতময়ী বাণী তাহাদের কর্ণ-কুহর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিকাশ করিলে তাহাদের আত্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইলে, তাহারা বলিল—

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

পততি ইতি পতনঃ, "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" (পাণিনি ৩।৩।১১৩) বলিয়া পত্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ল্যুট্ (অনট্), উহার অর্থ পতনপ্রবণ। পতন ইব আচরতি এই বাক্যে ক্যঙ্ প্রত্যয়ে পতনায়তে। পতনপ্রবণের ন্যায় আচরণ করে অর্থাৎ পড়িয়া যায়।

তুমি ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া পতি, পুত্র ও বন্ধুদিগের সেবাকে যে স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম বলিলে, আমরা বুঝিতেছি যে, তুমিই আমাদের সেই পতি, পুত্র ও বন্ধু। যেহেতু, তুমি সকল প্রাণীর যখন অত্যন্ত প্রিয়, তখন তুমি আত্মা—আত্মা-রূপে তাদের শরীরেও বিরাজ করিতেছ।

গোপীদিগের ইহা মুখস্থ কপটবাক্য নহে; বাস্তবিকই অন্তরস্থ ধ্রুব সত্য বাক্য। যে হেতু, তাহারা বেশ্যা ছিল না; তাহারা কুলবধূ, কুলকন্যা ও কুলকুমারী। কপট-বাক্য বলিলে তাহারা ত জানিত যে, তাহারা কাহারও অনুমতি লইয়া আসে নাই, কাহাকেও জানায়ও নাই। সুতরাং তাহাদের পতি, পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন এই রাত্রি অবশ্যই তাহাদিগকে খুঁজিতে আসিবে। আসিয়া এই সব রঙ্গ দেখিলে ক্রোধে মারিতে মারিতে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঘরে লইয়া যাইবে। সে ভয় তাহারা একবারও ত ভাবিল না।

লোকে আত্মাকে যত ভালবাসে, এত ভালবাসা আর কাহারও উপর পড়ে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার প্রথমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়াঃ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবন্তে। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।" ইত্যাদি।

পত্নী পতিকে যে ভালবাসে, তাহা পতির সুখ-কামনার জন্য নহে, আত্মার সুখ-কামনার জন্য—পতির সেবা করিলে নিজে আনন্দ পায় বলিয়া; পতির সুখ-কামনার জন্য হইলে, যাহার দুশ্চরিত্র পতি কুক্রিয়ায় আনন্দ অনুভব করে, তাহাকেও ভালবাসিত। পতি পত্নীকে যে ভালবাসে, তাহা পত্নীর সুখ-কামনার জন্য নহে, আত্মার সুখ-কামনার জন্য—পত্নীকে বসন-ভূষণে সজ্জিত দেখিলে নিজে আনন্দ পায় বলিয়া; পত্নীর সুখ-কামনার জন্য হইলে দ্বিচারিণী পত্নীকেও সে ভালবাসিত। মাতাপিতা পুত্রদিগকে যে ভালবাসে, তাহা পুত্রদিগের সুখ-কামনার জন্য নহে, আত্মার সুখ-কামনার জন্য—পুত্রদিগকে আদর-যত্ন করিলে নিজে আনন্দ পায় বলিয়া; পুত্রদিগের সুখ-কামনার জন্য হইলে দুশ্চরিত্র পুত্রদিগকেও তাঁহারা ভালবাসিতেন।

গোপীদিগের এই সব কথা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি সকলের অলক্ষিতে একটি গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সকল লীলাই লোক-শিক্ষার্থ। পুরুষ কামুক হইলে তাহাকে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় এবং 'নাই' পাইলে স্ত্রীলোক কিরূপ মাথায় উঠে, তাহাই দেখাইবার জন্য তিনি তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাহাকে সাজাইবার জন্য কোথায়ও পুষ্পচয়ন করিয়াছিলেন, পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধিবে বলিয়া কোথায়ও তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সে ভাবিল—আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়াই আমাকে অধিক ভালবাসেন, তাই নির্জ্জনে আনিয়াছেন। এই ভাবিয়া আদরে গলিয়া গিয়া বলিল—"আরও কত দূর নিয়ে যাবে? আমি আর চোল্‌তে পারূছি না, আমাকে কাঁধে কোরে নিয়ে চল।" কৃষ্ণ উবু হইয়া বসিয়া বলিলেন—"তবে ওঠ।" সে যেমন উঠিতে গেল, অমনি তিনি অন্তর্হিত হইলেন। সে সেইখানে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল।

রস ধাতু হইতে রাস শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রস ধাতুর অর্থ শব্দ করা অর্থাৎ চীৎকার করা, গান করা ইত্যাদি। গান করিতে হইলে নৃত্যও তাহার আনুষঙ্গিক। সুতরাং রাসে কেবল নৃত্য ও গীতই হইয়াছিল। ভাগবতের বর্ণনাও সেইরূপ। যথা—

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥

মেঘমণ্ডলে যেমন বিদ্যুৎ খেলে, সেইরূপ কৃষ্ণবধূরা অর্থাৎ গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিল। নৃত্যকালে তাহাদের তালে-তালে পা ফেলা, হস্তসঞ্চালন, মৃদু হাস্য, ভ্রূভঙ্গী, কটিদেশ ভগ্নবৎ, কুচদ্বয় ও তদাবরক বসন চঞ্চল, কর্ণের কুণ্ডল গণ্ডদেশে স্পৃষ্ট, মুখে স্বেদবিন্দু, কবরী ও কটিভূষণ দৃঢ়-গ্রন্থিযুক্ত দেখা

গিয়াছিল।—কৃষ্ণবধূ বলিতে কৃষ্ণের স্ত্রী নহে, যেহেতু, তিনি কোনও গোপীকেই বিবাহ করেন নাই। মেদিনীকোষে বধূ শব্দের অর্থ—"বধূঃ স্ত্রী সারিবৌষধো। স্নুষা-শটী-নবোঢ়াসু ভার্য্যা পৃক্কাঙ্গনাসু চ॥" এখানে অঙ্গনা, কৃষ্ণসম্বন্ধিনী অঙ্গনা—যে সকল রমণী কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা বাল্যকাল হইতেই নৃত্য-গীত শিক্ষা করিয়া থাকে, ঘাটে-বাটে ও গৃহে পুরুষ-দিগের সমক্ষে অশ্লীল গান করিতেও লজ্জা বোধ করে না, দেশচলন বলিয়া পুরুষরাও তাহাদিগকে নিন্দা করে না। কিন্তু গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে অশ্লীল গানও করে নাই, তাঁহার লীলাগানই করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে যত বয়সের যত গোপী, তত বয়সের তত মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদিগের সহিত নৃত্য-গীত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যে সকল গোপীর কাছেই আছেন, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই; সকলেই মনে করিয়াছিল, কেবল আমারই কাছে আছেন;—ইহাও যোগমায়ার প্রভাবে।

কৃষ্ণের সহিত নৃত্য-গীত করিতে করিতে তাহারা মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের গলা ধরিয়া, কোমর জড়াইয়া, বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া মুখে চর্ব্বিত তাম্বুল দিয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনাও ভাগবতে আছে। তাহাতেও দোষ ধরা যায় না। যেহেতু, গোপীরা তাঁহাকে আত্মা বলিয়াই ধারণা করিয়াছিল; সুতরাং তাঁহার দেহকে আত্মদেহই ভাবিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণও আত্মা-রূপে তাহাদের দেহে অধিষ্ঠিত থাকায় তাহাদের দেহ আত্মদেহই ভাবিয়াছিলেন। আপনি আপনার দেহের সর্ব্বস্থানই স্পর্শ করা যাইতে পারে।

পরন্তু রাসে কোনরূপ অশ্লীল কার্য্য হয় নাই—হইতে পারে নাই। যেহেতু, প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন ৭ বৎসর ২॥ মাস মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, (ভাগবতেরই বর্ণনা) পঞ্চম বৎসর বয়সে তিনি বৎস-চারণের ভার পাইয়া সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত উহাদিগকে চরাইতে যাইতেন। এক দিন তাঁহারা যখন বৎস-গুলিকে ছাড়িয়া দিয়া যমুনাতীরে ফলার করিতে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মা তাঁহার নূতন মহিমা দেখিবার ইচ্ছায় দূরগত বৎসগুলিকে হরণ করিয়া পর্ব্বতের গুহায় নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণের অন্বেষণ করিতে যাইলে বালকগুলিকেও হরণ করিয়া সেই গুহায় তদবস্থায় রাখিয়াছিলেন। ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত বালক ও সমস্ত বৎসগণের রূপ ধরিয়া এক বৎসর কাল বৎসচারণ করিয়াছিলেন এবং পুত্রবতী সমস্ত যুবতী ও প্রৌঢ়া গোপীদিগকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া তাহাদের স্তন পান করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ,—

······নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম॥
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোঽমলম্॥

তৎকালে শত শত বিমানে আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শনে উৎসুক হইয়া দেবতারা ও গন্ধর্ব্বেরা সস্ত্রীক ঐ সকল বিমানে অবস্থিত ছিলেন। দেবতারা দুন্দুভি বাজাইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে-ছিলেন, গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরাদিগের সহিত তাঁহার অকলঙ্ক যশ গান করিতেছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণের মধ্যে অগ্রে কাহাকে অর্ঘ্য দেওয়া হইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে, ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই দিতে বলায়, শিশুপাল ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের যথোচিত তিরস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যত নিন্দা হইতে পারে সমস্তই করিয়াছিল; যাহা নিন্দনীয় নহে, তাহাকেও নিন্দায় পরিণত করিয়াছিল; কিন্তু বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা দূষণীয় হইলে উহাদের উল্লেখ করিল না কেন? (মহা, সভা, ৩৭ অঃ)।

প্রশ্ন—বস্ত্রহরণে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা সম্বন্ধে কুমারীদিগকে বলিয়াছিলেন, "কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হইতে কয়েক রাত্রি" এবং রাসের প্রথম শ্লোকেও আছে "সেই সকল প্রতিশ্রুত রাত্রি" অথচ এক রাত্রেই উহা শেষ করিলেন কেন?

উত্তর—ঐ এক রাত্রির মধ্যেই অপর ৪ দিন, ৪ রাত্রি নিবিষ্ট ছিল। তাহার কারণ—

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ॥

শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া দেখিয়া দেব ও গন্ধর্ব্বগণের

স্ত্রীরা কামাতুর হইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং চন্দ্রও তারাগণের সহিত বিস্মিত হইয়াছিল।

বিস্ময় বশতঃ তাহারা আপন আপন গতি ভুলিয়া গিয়াছিল। যে যেখানে থাকিয়া দেখিতেছিল, ৪ দিন ও ৫ রাত্রি সেইখানেই ছিল। সে দিনকার রাত্রি যে এত বাড়িয়াছিল, যোগমায়ার প্রভাবে কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া কর্তৃক মোহিত হইয়া আপন আপন পত্নীদিগকে স্ব-স্ব পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিয়া তাঁহার প্রতি কেহ অসূয়া করে নাই।

ঋষিপুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়াছিলেন—অদ্যাবধি সপ্তম দিনে তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিবে। রাজা ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়া সদ্গতি পাইবার জন্য ঐ সাত দিন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র শুকদেবের নিকটে ভাগবত শুনিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণাদি হইতে জানা যায়, তিনি প্রথম দিনে হিরণ্যাক্ষ বধ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় দিনে ভরত রাজার চরিত্র পর্য্যন্ত, তৃতীয় দিনে সমুদ্রমন্থন পর্য্যন্ত, চতুর্থ দিনে শ্রীকৃষ্ণজন্ম পর্য্যন্ত, পঞ্চম দিনে রুক্মিণী-হরণ পর্য্যন্ত, ষষ্ঠ দিনে উদ্ধবসংবাদ পর্য্যন্ত এবং সপ্তম দিনে গ্রন্থসমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। (ঐরূপে ৭ দিনে সমগ্র ভাগবত শ্রবণকে পারায়ণ বলে)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তথাপি অজ্ঞজনগণের সংশয়-ভঞ্জনার্থ নিজে অজ্ঞ সাজিয়া শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ভগবান্ ধর্ম্মরক্ষার্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পরস্ত্রী লইয়া এরূপ বিহাররূপ অধর্ম্ম কার্য্য কেন করিয়াছিলেন? তাঁহার অনুকরণে সকলেই ত ঐরূপ করিতে পারে?" তদুত্তরে শুকদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"শক্তিমান্ পুরুষেরা কদাচিৎ কোনও অধর্ম্ম কার্য্য করিলে তাহাতে তাঁহাদের দোষস্পর্শ হয় না; যেমন অগ্নি সর্ব্ব-ভক্ষ হইলেও সদাই পবিত্র থাকে। যাহারা তাঁহাদের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাদের অগ্রে তাদৃশ শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দমন করিয়াছিলেন, দাবানল পান করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন; মহাদেব কালকূট বিষ পান করিয়াছিলেন। যাহারা হেলে দেখিয়া দশ হাত পিছাইয়া যায়, এক কণা আগুন গায়ে পড়িলে কাতর হয়, এক মণ জিনিস তুলিতে যাহাদের চক্ষু কপালে উঠে, এক ভরি আফিং খাইলে যাহাদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, তাহারা ঐ সকল কার্য্য করিতে অপারগ হইয়া কেবল যদি পরস্ত্রীর সহিত বিহার করিতে সাহস করে, তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যু ও দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন। ব্রহ্মার উক্তি—

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং বিভো॥

(ভাগ, ১১।৬।২৫)

তন্মধ্যে জন্মাবধি ১১ বৎসর মাত্র বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। শুকদেবের উক্তি—

ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বিবিভ্যতা।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ॥

(৩।২।২৬)

পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, ষষ্ঠ হইতে দশম বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, একাদশ হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর। অতএব কৈশোরের এক বৎসর মাত্র বৃন্দাবনে ছিলেন। তৎপরে কংসের ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া মথুরায় গিয়াছিলেন, আর বৃন্দাবনে ফিরেন নাই। কংসের প্রেরণায় রাম ও কৃষ্ণ যখন চাণূর ও মুষ্টিকের সহিত মল্ল-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন উপস্থিত রমণীগণ বলিয়াছিল—

ক্ব বজ্রসারসর্ব্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ।
ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ॥

বজ্রসারের ন্যায় কঠিনাঙ্গ ও পর্ব্বতাকৃতি মল্লদ্বয়ের সহিত এই দুইটি কিশোরবয়স্ক অপ্রাপ্তযৌবন বালককে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত করা এবং এরূপ অধর্ম্ম-যুদ্ধ দর্শন করাও উচিত নহে। (ক্ষত্রিয়দিগের দ্বাদশ বৎসর উপনয়নের মুখ্য কাল।) কংসবধের পরে মুখ্যকালেই তাঁহাদের উপনয়ন হইয়াছিল। যথা—

অথ শূরসুতো রাজন্ পুত্রয়োঃ সমকারয়ৎ।
পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্দ্বিজসংস্কৃতিম্॥

কংসবধের পর বসুদেব পুরোহিত গর্গ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা দুই পুত্রের যথাবিধি উপনয়ন-সংস্কার করাইয়াছিলেন।

সুতরাং একাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার পরস্ত্রীগমন ও রাধিকার মানভঞ্জনাদি নিতান্তই অসম্ভব। লম্পটবাদী-দিগকে জিজ্ঞাসা করি, ভাগবতে রাসলীলার যে বর্ণনা আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য-দোষের কোনও গন্ধ পাইলেন কি? শাস্ত্রগ্রন্থ না দেখিয়া, কেবল বাজে বই পড়িয়া, কীর্ত্তন ও কবির ছড়া শুনিয়া একটা অপসিদ্ধান্ত করাই কি সাধুতার, সৎপ্রবৃত্তির ও উদারতার পরিচায়ক?

শ্রীরাধা

কৃষ্ণোপনিষদে "শেষনাগোঽভবদ্রামঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্" বলিয়া বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, নন্দ, যশোদা, চাণূর, মুষ্টিক, কুবলয়াপীড়েরও নাম কথিত আছে; কিন্তু রাধার নাম নাই। মহাভারতে রাধার নাম নাই, তন্ত্রেও রাধার নাম নাই; থাকিলে তন্ত্রমতে কৃষ্ণপূজায় রাধার পূজাও প্রচলিত হইত। এইজন্য রাধাতত্ত্বকে আধুনিক বলিয়াই মনে হয়।

মহাপুরাণের মধ্যে কেবল পদ্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে রাধার নাম আছে। দেবীভাগবতে রাধার নাম আছে, এবং গর্গসংহিতাতেও রাধার নাম আছে।

পণ্ডিতমাত্রেই জানেন, প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক স্থান পাইয়াছে। পদ্মপুরাণে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের কথাও আছে, তখন উহাতেও বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের আবির্ভাব সুনিশ্চিত। যথা—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহসৌ মহীতলে।
ভাগীরথীতটে ভূম্নি ভবিষ্যতি সনাতনঃ॥

ইত্যাদি।

দেবীভাগবত যে নিতান্ত অর্ব্বাচীন, তাহা "ভাগবত-পুরাণে" আলোচনা করিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে রাধা রায়াণ ঘোষের (আয়ান ঘোষের) পত্নী—শ্রীকৃষ্ণের মাতুলানী। গর্গসংহিতার মতে রাধা শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা। যথা—

এক দিন অপরাহ্নে নন্দ স্বয়ং যমুনাতীরে গোচারণ করিতে গিয়াছিলেন। শিশু শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে মহাদুর্যোগ উপস্থিত হইল। তখন তিনি কৃষ্ণকে সাম্‌লাইবেন, কি গাভীদিগকে সাম্‌লাইবেন ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে রাধাকে যমুনার ঘাটে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "মেঘসমূহে আকাশ আবৃত হইয়াছে, তমালতরুসমূহের আভায় বনভূমিও অন্ধকারময়, রাত্রিও উপস্থিত, ছেলে বড় ভীরু; অতএব তুমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া আমাদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দাও।"

(রাধা কৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে বড়; কৃষ্ণ যখন কুমার, রাধা তখন কিশোরী)। নন্দের আদেশে কৃষ্ণকে লইয়া রাধা (সুগম পথ ধরিয়া যাইলে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া) বনের মধ্য দিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটা বৃক্ষের নিকটে কুঞ্জমধ্যে আলো জলিতেছে এবং বিবাহের আয়োজন করা রহিয়াছে। দেখিয়া বলিলেন, "এমন সময়ে কে এখানে এরূপ আয়োজন করিয়া গেল?" কৃষ্ণ বলিলেন, "আমার সহিত তোমার বিবাহ হইবে বলিয়া ব্রহ্মা এ-সব করিয়া গিয়াছেন; এখনই তিনি আসিয়া আমাদের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিবেন। এস, ঐ আসনে আমরা দু'জনে বসি।" তখনই ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিয়া স্তুতিনতি করিয়া প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ মাল্যচন্দন দ্বারা রাধাকে সাজাইতে বসিলেন। তার পর রাধাও কৃষ্ণকে সাজাইতে উদ্যত হইলে, দৈববাণী হইল, "এখন তোমাদের বিবাহমাত্র হইয়া রহিল, বিহারাদি কার্য্য এখন হইবে না, পরে অর্থাৎ গোলোকে যাইয়া হইবে, বিবাহবার্ত্তা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।" গোবর্দ্ধন ধারণের পর গোপেরা নন্দের নিকটে গিয়া বলিল, "কৃষ্ণ আপনার পুত্র নহে, অন্যের পুত্র আনিয়া আপন পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কারণ, আপনি ও যশোদা উভয়েই গৌরবর্ণ, আপনাদের পুত্র এত কালো হইল কেন? আপনি একখানা ভারী পাথর দু' হাতে ধরিয়া এক দণ্ডও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু কৃষ্ণ সাত বৎসরের বালক হইয়া অত বড় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উপড়াইয়া বাঁ হাতে ধরিয়া সপ্তাহ কাল দাঁড়াইয়া রহিল; ইহাতে আমরা বিস্মিত

হইয়াছি। সত্য করিয়া বলুন, কৃষ্ণ কাহার পুত্র ?” নন্দ বলিলেন, “কৃষ্ণ আমারই পুত্র বটে। উহার জন্মের পর গর্গ মুনি আসিলে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি রাম ও কৃষ্ণের নামকরণ করেন এবং বলেন, তোমার এই পুত্র নারায়ণের অংশে উৎপন্ন হইয়াছে, অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইও না। তজ্জন্য আমি গোবর্দ্ধন ধারণে বিস্ময় বোধ করি নাই।” গোপেরা বলিল, “আপনার বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হইল, গোপনে ‘নামকরণ’ করাইলেন, আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন না—খাওয়াইলেন না ; আমরা আপনাকে ‘এক-ঘরে’ করিব।” এই বলিয়া তাহারা বৃষভানুর নিকটে গিয়া বলিল, “নন্দকে ‘এক-ঘরে’ করিতে হইবে।”

“কি অপরাধে ?”

“তাঁহার পুত্রের নামকরণে আমাদের নিমন্ত্রণ করেন নাই।”

“সে জন্য ‘একঘরে’ করা যায় না, তাঁর যদি সকলকে খাওয়াইতে সঙ্গতি না থাকে।”

“তবে আপনাকে আমরা ‘এক-ঘরে’ করিব।”

“আমার কি অপরাধ ?”

“আপনার কন্যা বারো বছরের হইয়াছে, তথাপি আপনি তার বিবাহ দিচ্ছেন না।”

“আমি কেন বিবাহ দিই নাই শুন। রাধার বাল্যকালে গর্গ মুনি আসিয়াছিলেন। রাধার বিবাহের সম্বন্ধে তাঁকে গণিতে বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার কন্যা গোলোকেশ্বরী ; অন্যের সহিত উহার বিবাহ হইবে না। নন্দের পুত্র কৃষ্ণ গোলোকেশ্বর ; তাহার সহিত বিবাহ হইবে। কিন্তু তুমি বিবাহ দিতে পারিবে না, জানিতেও পারিবে না। ব্রহ্মা আসিয়া গোপনে বিবাহ দিয়া যাইবেন। এই জন্যই আমি উহার বিবাহের চেষ্টা করি নাই।”

“আপনার কন্যা যে গোলোকেশ্বরী, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। কেন না, আপনি পূর্ব্বে গরীব ছিলেন। ঐ কন্যার জন্ম হইবার পর হইতেই আপনি বড়-মানুষ হইয়াছেন। কৃষ্ণ যে গোলোকেশ্বর, তার প্রমাণ কি ?”

“গর্গ মুনির গণনাই আমার প্রমাণ। তোমরা যদি প্রমাণ জানিতে চাও, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, এখনই প্রমাণ দেখাইতেছি।”

এই বলিয়া বৃষভানু একশ’টা মুক্তায় গাথা একশ’ ছড়া মুক্তার মালা একটা ঝুড়িতে সাজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “এই মুক্তার মালা লইয়া নন্দের কাছে যাও। আমার নাম করিয়া তাঁহাকে বলিবে, আমাদের কুলপ্রথা এই যে, কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে হইলে অগ্রে বরকে যথাশক্তি উপহার পাঠাইতে হয়। বরকর্ত্তার সম্মতি হইলে তাহার দ্বিগুণ উপহার তখনই প্রেরিত লোকের দ্বারা কন্যার জন্য পাঠাইতে হয়। এখন আপনার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করুন।” ভৃত্য মালা লইয়া গিয়া একশ’ ছড়া গণিয়া নন্দকে বুঝাইয়া দিল এবং বৃষভানুর কথা শুনাইয়া বাহির-বাটীতে গিয়া বসিল। নন্দ পরামর্শ করিবার জন্য যশোদাকে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, “আমার ঘরে একটা মুক্তাও নাই, দু’শ’ ছড়া মুক্তার মালা কোথায় পাইব ? কি করি ?” যশোদা বলিলেন “তুমি ওকে বলিয়া দাও, কৃষ্ণ এখন ছেলে-মানুষ, এখন উহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিব না। বিবাহযোগ্য বয়স হইলে তখন যা হয় করা যাইবে। এখন এ মালা ফেরৎ দিতেছি। সেইরূপ বলিয়া ভৃত্যকে মালা বুঝাইয়া দিবার জন্য গণিতে গিয়া দেখেন, এক ছড়া মালা নাই। “এরই মধ্যে কি হইল ! ইহা ছেলেদের কর্ম্ম। তাদের মধ্যে কেহ আসিয়া লইয়া গিয়াছে।” বলরামকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমি খেলাইতেছিলাম, বাড়ীতে ত আসি নাই।” কৃষ্ণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই এক ছড়া মালা লইয়াছিস ?”

“হাঁ বাবা, লইয়াছি।”

“কেন লইলি ? কি করিলি ?”

“বাবা, আমরা ত বৈশ্য। বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি ও গোপালন। কিন্তু আমরা গোপালনই করিয়া থাকি, কৃষি করি না। তাই কৃষি করিবার ইচ্ছায় এক ছড়া মালা লইয়া উত্তর দিকের ঐ মাঠে ছড়াইয়া দিয়াছি।”

“ওরে বোকা ছেলে ! কোরেছিস কি ? মুক্তার কি গাছ হয় ? মুক্তা কি গাছে ফলে রে ! শীঘ্র চল্, কোথায় ফেলেছিস দেখাবি।” কৃষ্ণ নন্দকে সেই মাঠে

লইয়া গেলেন। নন্দ দেখিলেন, এক-শ'টা মুক্তার গাছ হইয়াছে, প্রত্যেক গাছে গোছা-গোছা মুক্তা ঝুলিতেছে। তখন তিনি এক-শত এক ছড়া মালার উপযুক্ত মুক্তা আনিয়া ভৃত্যকে গণিয়া বুঝাইয়া দিলেন (তৎপরেই সেই জমী হ্রদে পরিণত হইয়া মুক্তাসরোবর নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে)। ভৃত্য বৃষভানুর নিকটে আসিয়া গোপেদের সাক্ষাতে সকল কথা বলিলে, তাহারা বলিল, "এখন বিশ্বাস হইল, কৃষ্ণ গোলোকেশ্বরই বটেন।"

এ অবস্থায় বৃষভানু আয়াণ ঘোষের সহিত কেন রাধার বিবাহ দিবেন?

জয়দেব গোস্বামী গর্গসংহিতা অনুসারেই গীত-গোবিন্দের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। যথা—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় রাধাকৃষ্ণের বিহার ও রাধার মানভঞ্জন লিখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই।

'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রিকায় আমি গর্গসংহিতার মতে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নী লিখিয়াছিলাম বলিয়া বৈষ্ণবেরা আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরকীয়ার প্রতিই একান্ত আসক্তি বুঝিলাম।

পাঠক-পাঠিকাদিগের আরও বিরক্তি বর্দ্ধন না করিয়া এইখানেই প্রবন্ধের শেষ করিলাম। শেষে একটি প্রাচীন উদ্ভট শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদাসুতপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং
যেষামাভীরকন্যাপ্রিয়গুণকথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলাললিতগুণকথাসাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্—ধিক তান্—ধিগেতান্ কথয়তি নিতরাং
কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥

হরিসঙ্কীর্ত্তনে মৃদঙ্গ সর্ব্বক্ষণ "ধিক্ তান্—ধিক তান্—ধিগেতান্" এইরূপ শব্দ করিয়া থাকে। এইরূপ শব্দ করিয়া সে কি বলে? বলে যে, যে-সকল মনুষ্যের শ্রীযশোদা-নন্দনের পাদপদ্মে ভক্তি নাই, ধিক্ তান্—তাদিগে ধিক্, যাহাদের জিহ্বা শ্রীগোপীবল্লভের গুণকথাকথনে অনুরক্ত নহে, ধিক্ তান্—তাদিগে ধিক, যাহাদের কর্ণদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের ললিত লীলাকথা শুনিতে আদর করে না, ধিগ্ এতান্—এদিগেও ধিক!

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে

কার যে বরাতে কখন কি আছে কে পারে বন্ধু বল্‌তে?
সহসা হয় তো মাথায় পড়িল ইট এক—পথে চল্‌তে!
হয় তো সহসা কলার ছোপায়—
পিছলে পড়িয়া টাক ফেটে যায়;
হঠাৎ হয় তো পড়িল আগুন—লাগিল কাপড় জ্বল্‌তে!
কার যে বরাতে কখন কি আছে কে পারে বন্ধু বল্‌তে?

সাগরেতে নায় হাজারো ব্যক্তি—সেথায় কুমীর মস্ত
হয় তো সহসা ধরিল একেরে—পাতালে সে হ'ল ন্যস্ত!
নিরীহ ব্যক্তি ট্রেণে চেপে যায়,
সহসা লাগিল ঠোকাঠুকি হায়,
ভাগ্যের জোরে প্রাণ পেল যদি—হারালো দু'খানি হস্ত!
সাগরেতে নায় হাজারো ব্যক্তি—সেথায় কুমীর মস্ত!

খারাপ যেমন হতেছে তেমনি ভালোও দেখি তো চক্ষে;
তস্করও বুঝি সাধু ব'নে গেছে না জানি কবে অলক্ষ্যে!
কালকে যে ছিল পথের ফকির,
আজ সে শিখেছে হাজার ফিকির,
গাড়ীতে ভর্ত্তি টাকা ও খেতাব আসিছে তাহার কক্ষে।
খারাপ যেমন হতেছে তেমনি ভালোও দেখি তো চক্ষে!

কৌতুকময়—তাঁর লীলা জয় করা সে কাহার সাধ্য?
নিয়তির কাছে নল-নিশুম্ভ—সবাই যে ভাই বাধ্য!
কথা ছিল যার রাজা হইবার,
নিমেষে হইল ভণ্ড তাহার,
কেহ ওঠে আর কেহ পড়ে সবই তারি তো হাতের সল্‌তে
কার যে বরাতে কখন কি আছে কে পারে বন্ধু বল্‌তে?

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।



বিনাপণের মর্য্যাদা !

১

বৈশাখের সন্ধ্যা, সারা-দিন অসহ্য গুমোট গিয়াছে, এখন দক্ষিণ দিক্ হইতে স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে। চামেলী দোতালার ছাদে মাদুর পাতিয়া নতুন গানটি অভ্যাস করিতেছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি কলি পুনঃ পুনঃ গায়িতেছিল,—

"জীবনে জেগেছিল মধুমাস
রঙে-রাঙা হ'য়েছিল সকল আকাশ।"

তাহার মা ছাদের সংলগ্ন টিনের শেড্-দেওয়া ছোট রান্নাঘরে রুটি বেলিতে-বেলিতে মেয়ের গান শুনিতেছিলেন! চামেলী কহিল,—মা, ঠিক হচ্চে তো? কোথাও ভুল হয়নি?—মা কহিলেন, না, ভুল হয়নি, সুরটা ঠিকই, তবে আর একটু মিষ্টি ক'রে ভাবের আর একটু উচ্ছ্বাস দিয়ে গাইবার চেষ্টা কর। প্রাণ ঢেলে গাইতে না পারলে গানের অনেকখানিই ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

চামেলী মায়ের কথা শুনিয়া আরও ভাব দিয়া গায়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহার বাবা আফিস-ফেরতা এক বাণ্ডিল কাগজ বগলে তথায় উপস্থিত! চামেলী বাজনা এবং গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার হাত হইতে কাগজের তাড়াটি ঘরে লইয়া যাইবার জন্য গ্রহণ করিল। বাবা সাবধান করিয়া দিলেন,—দেখো মা, আফিসের জরুরী কাগজপত্র! হারায় না যেন একখানিও। আমার টেবিলের দেরাজে রাখোগে।

চামেলী যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে কাগজ রাখিতে গেল। তাহার মা রুটিবেলা রাখিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন,—তোমার আজ ফিরতে এত রাত হ'লো কেন গো? সেই কোন্ সকালে দু'টি ভাত তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে গুঁজে আফিসে ছুটেছো! আমি তখন থেকেই ভাবচি। এই ছাদেই ঠাণ্ডায় একটুখানি বোসো। এক পেয়ালা চা ক'রে দেব কি?

দাও।—শিবনাথ ক্লান্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মাদুরে বসিলেন। দরিদ্র-ঘরের স্বল্প কিন্তু সযত্নে সংরক্ষিত জলখাবারের রেকাবি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল; চামেলী তাহা আনিয়া তাঁহার সামনে ধরিল।

চা ও খাবার খাইয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ কহিলেন,—আজ নতুন গান কি শিখ্‌লি চামেলী? আমাকে শোনাবিনে?

কমলাদেবী কন্যাকে কহিলেন—তুই ততক্ষণ ওঁকে একটু গান-টান শোনা, তার মধ্যেই আমার রান্না শেষ হ'য়ে যাবে।

রাত্রির সমস্ত গৃহকর্ম্ম শেষ হইলে, শয়ন-কক্ষে বসিয়া শিবনাথের স্ত্রী কমলা নিজের জন্য মস্ত বড় করিয়া একটা পাণ সাজিতেছিল—সাজিতে সাজিতে কহিল,—আজ যেখানে যাবার কথা ছিল, সেখানে গিয়েছিলে না কি?

শিবনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"না যাইনি, আজ আফিসের কাজের ভীড়ে আর সময় হ'য়ে ওঠেনি কিন্তু গিয়ে যে কি লাভ হবে তা বুঝতে পারচিনে! আজ দু'মাস ধ'রে কত জায়গাতেই ঘুরলাম, বিনা-টাকায় কোথাও হয় না। তা-ও আবার সোজা টাকা নয়, কম্ ক'রেও অন্ততঃ চার-পাঁচ হাজার! কোথায় পাব অত টাকা? জানো তো সবই।

কমলা একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল,—কেন, টাকাই কি সব? আমার অমন মেয়ে, যেখান-সেখান থেকে একটা খুঁজে বার করুক দিকি? দেখতে সুন্দরী, তা'ছাড়া গান বাজনা, সেলাই, লেখাপড়া সব দিকেই সমান।

স্বামি-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল—তাহাদের একমাত্র কন্যা চামেলীর বিবাহের বিষয়ে। শিবনাথ অল্প বেতনে

কলিকাতায় কেরাণীগিরি করেন। ভদ্রভাবে থাকিয়া এই স্বল্প আয় হইতে কিছুই জমান যায় না ; তবু এই কয়েক বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় পোষ্টাপিসের খাতায় হাজার-খানেক টাকা জমিয়াছে। এদিকে শিবনাথের স্ত্রী কমলা দরিদ্রের ঘরণী হইলেও রীতিমত বিদুষী। আই-এ পাশ করিয়া বিবাহ হইয়াছিল ; বিবাহের পর স্বামীর কাছে পড়িয়া প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়া বি-এ পাশ করিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে সে গান, এস্রাজ শিখিয়াছিল ; এখনও তাহার চর্চ্চা ভোলে নাই, মেয়েটাকে সযত্নে তাহা শিখাইতেছে। চামেলী এ বছর প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়া পাশ করিয়াছে ; বাড়ীতে এখনও পড়িতেছে। আই-এ দিবে ইহাই তাহার আন্তরিক আশা।

অন্ধকারাচ্ছন্ন জানালা দিয়া শিবনাথ ততোধিক অন্ধকারাবৃত আকাশের পানে চাহিয়া ছিলেন ; একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন—আমিও আগে ভাবতুম, আমার এমন মেয়ে, তার বিয়ের জন্যে আবার টাকার ভাবনা কেন ? কিন্তু ঘা খেয়ে-খেয়ে সে কথা আর এখন ভাবতে পারচি কৈ ? আজ অবনীবাবু এক জায়গা থেকে একটি সম্বন্ধ এনেছেন। ছেলেটির অবস্থা মোটামুটি ভালো ; পাড়াগাঁয়ে চাষ-বাস আছে। এখানকার কলেজে বি-এ পড়ে। এবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে ল' পড়বে। তেমন কিছু চায় না, মেয়ে পছন্দ হ'লেই হ'লো।

কমলা নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—পাড়াগাঁয়ে বাড়ী ! না না, সেখানে আমি মেয়ে দোব না। ম্যালেরিয়া আছে, তা' ছাড়া যত অশিক্ষিত লোকের বাস ! অমার্জ্জিত বুনো জায়গা !

শিবনাথ কহিলেন,—কেন ছেলেটির জমিজমা আছে। নিজের বাড়ী আছে,—নিজের গোটা একটা বাড়ী ; আর তোমার কি আছে কমল ? ভাড়া-বাড়ী,—তা-ও তেতালার উপরে একটুকরো ফ্ল্যাট্ !

স্বামীর এ কথার উত্তরে কমলার শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। পুরান দিনের অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল ! প্রথম জীবনে তার কতই আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ছিল ! শিবনাথের যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি কলেজে এম-এ পড়েন। সামনে ছিল কত উচ্চ আশা ! রমণীয় সুদীর্ঘ পথ কল্পনালোকে কেমন সুরঞ্জিত ছিল ! আর আজ—?

তবু নিজেদের সেই সমস্ত ব্যর্থ আশা এবং বিফল স্বপ্ন একেবারে নিরর্থক হয় নাই, চামেলীর মধ্যে তাহা যেন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; নব ভাবে পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া। তাই কমলা তাহার এই মেয়েটিকে লইয়া কত স্বপ্ন দেখে ; আপন-মনে কতই ভাঙ্গাগড়া করে ! নিজের জীবনে যে সাধ মেটে নাই, যত আশা নিবিয়া গেছে, তাহাদের সমস্তগুলি দিয়া এক একটি করিয়া দীপ জ্বালিয়া মুগ্ধ মানস-চক্ষে চামেলীর ভবিষ্যৎ জীবনকে দীপান্বিত করিয়া তোলে।

ক্রমে রাত্রি বাড়িয়া উঠিল। কমলা আলো নিবাইয়া দিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতে করিতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় বলিল,—হঁ্যা, তোমাকে একটা কথা ব'লতে ভুলে গিয়েছিলাম। গায়ত্রীদি' বিশেষ-ক'রে ব'লে গেছেন—কাল সকালের দিকে তাঁর বাড়ী একবার যেতে। তাঁর মেয়ে সিপ্রাকে কাল পাকা-দেখতে আসবে। কাল ওঁর ওখানেই আমাদের নিমন্ত্রণ। তুমি তখন ছিলে না, আফিসে ছিলে, তোমাকে শুদ্ধ বার বার ক'রে যেতে ব'লে গেছেন।

শিবনাথ পাশ ফিরিয়া শুইয়া কহিলেন,—বেশ তো, যেয়ো তুমি ; আর চামেলীও যাবে। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন ? গরীব মানুষ, অত 'হাইসার্ক্‌লে' মেশবার অভ্যেস তো নেই।—তা' ছাড়া আফিসও আছে।

কমলা অনুযোগের সুরে কহিল,—ওরা বড়লোক আছে তা থাকুক না ; তাই ব'লে আমাদের তো আর ধ'রে গিলে খাচ্ছে না ! বরঞ্চ নিজে বাড়ী ব'য়ে-এসে হাতে ধ'রে কত ক'রে যেতে ব'লে গেল। অবশ্য না যাও, সে তোমার ইচ্ছে ; কিন্তু তাই ব'লে কাল রবিবারের দিনটাতে আর আফিসের তাড়ার অজুহাত দেখিয়ো না ! গায়ত্রীদি' ব'লছিলেন, রবিবার ব'লেই কাল সে পাকা-দেখার দিন ক'রেচেন। রবিবার ব'লে সকলেই আসতে পারবে ; আফিস সবারই বন্ধ।

গায়ত্রী কমলের খুড়তুতো বোন। এই কলিকাতা অঞ্চলেই সে প্রকাণ্ড সুরম্য অট্টালিকায় বাস করে। স্বামী এক জন নামকরা বড়লোক। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কমলা আবার কহিল,—যাদের অদৃষ্ট ভালো তাদের কি সবই ভালো ? গায়ত্রীদি' বলছিলেন, মেয়ের বিয়েতে

একটি পয়সা পণ লাগছে না ; অথচ এমন ভাল পাত্রও সচরাচর মেলে না ! বিধি সদয় হ'লে সব দিকেই সুবিধে হয়।

শিবনাথ ঔৎসুক্যভরে কহিলেন,—কি ব'ললে, এক-পয়সাও পণ লাগবে না ? কমলা সায় দিল, হ্যাঁ, মেয়ের মা তাই তো বার বার ক'রে ব'লে গেলেন। চল না কাল। তুমি কুনো স্বভাবের লোক, কোথাও বেরোতে চাও না, কারও সঙ্গে মিশতে চাও না। অমন ক'রে থাকলে কি আর মেয়ের জন্যে ভাল পাত্র জোটানো যায় ?

বিনাপণের ব্যাপার শুনিয়া শিবনাথ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সম্মতি জানাইয়া বলিলেন—বেশ, গায়ত্রীদি'র নিমন্ত্রণ রাখিতে তিনিও যাইবেন।—আর তিনি আপত্তি করিলেন না।

২

কলিকাতার যে অঞ্চলে অভিজাত-সম্প্রদায়ের বাস, সেই অঞ্চলেই গায়ত্রী দেবীর স্বামী বিজয়নাথের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সকাল হইতে মোটরের ভীড় লাগিয়াছে, দ্বারের কাছে দেশীয় প্রথায় নহবত বাজিতেছে। গায়ত্রীদি' মৃদু হাসিয়া কমলার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—ওটা ওরিয়েণ্টাল ব্যাপার! আমাদের আর্টিষ্ট নকুল বাবুর মাথাতেই প্রথমে এই নহবতের মৌলিক পরিকল্পনাটির উদয় হয়, সে জন্য তাঁকে অগণ্য ধন্যবাদ।

নকুল বাবু কাছাকাছি ঘুরিতেছিলেন ; শুনিতে পাইয়া ওরিয়েণ্টাল ধরণে হেঁ-হেঁ করিয়া প্রাণখোলা মৌলিক হাসি হাসিলেন। কমলা সবেমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। চামেলী সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে কেহ বড়-একটা আমোল দিল না। এ সভায় সে নিজেকে ঠিক মানাইয়া লইতে পারিতেছিল না। এক জায়গায় গুটি-তিন-চার তরুণী একত্র বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিল। তাহাদের নিকটস্থ হইয়াছিল বলিয়া কথাবার্ত্তার যে দুই-একটা প্রক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ তাহার কাণে আসিতেছিল, তাহাতেই চামেলী সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রচুর হাসি এবং চতুরতর কটাক্ষ, অপরিমিত ভ্রূভঙ্গী, এবং অজস্র মুখভঙ্গী করিয়া তাহারা যে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিল, তাহা চামেলীর কাছে বিশেষ মার্জ্জিত বা মধুর হৃদয়ের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল না। এত দিন এই উচ্চ সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষিতা নরনারীর সহিত মিশিবার কোন সুযোগই সে পায় নাই। পায় নাই বলিয়া যে কোন ক্ষতি হইয়াছে, আজ তাহাদের খুব নিকটে দাঁড়াইয়া সে কথা তাহার মনে হইল না।

সিপ্রা একবার ভদ্রতা করিয়া কহিল,—বোসো না ভাই! দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন ?

চামেলী সঙ্কুচিত হইয়া নিকটস্থ একখানা কৌচে বসিল। সবুজ কাপড়পরা একটি তরুণী হাতের সুচিত্রিত জাপানী হাল্কা হাত-পাখাখানা দিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর গায়ে একটা ঠোকর দিয়া কহিল,—মণির আজকাল কপাল ভালো, অশোক বাবুর ঘন-ঘন দেখা পাওয়া যাবে তার বাড়ীতে গেলে।

মণি শ্লেষ করিয়া কহিল,—কেউ তো আর ধ'রে রাখে না তাকে। যেখানে তার ভালো লাগে সেইখানেই যায়।

সিপ্রা মৃদু হাসিয়া কহিল,—ভালো লাগাবার আর্ট জানা চাই ; শিখিয়ে দাও না ভাই আমাদের।

বেলা বলিল,—সে আর্ট শিখতে বেশ-খানিক সময় লাগে। অত সোজা নয় সিপ্রাদি! মণির টয়লেট্-টেবিলের সামনে কখনো দাঁড়িয়েছেন ? তা'হলেই বুঝতে পারবেন আমার কথাটা।

প্রত্যুত্তরে হাতের পাখাটা দিয়া মণি বেলাকে কৃত্রিম কোপের সহিত ঠোকর মারিল, এবং তাহার সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও এ কথা শুনিয়া চামেলী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

চিত্রা এই দলের মধ্যে রাশভারি এবং বিদুষী। কি একটা নারী-প্রগতিমূলক কাগজের সে সম্পাদিকা। সে রুমাল দিয়া চশমাটা একবার মুছিয়া-লইয়া কহিল,—কি সিপ্রা, এ মাসে তোমার যে একটা প্রবন্ধ দেবার কথা ছিল, তার কত দূর ?

মণি ঠাট্টা করিয়া বলিল,—হ্যাঁ, ও আর প্রবন্ধ লিখেছে ! বিয়ের আনন্দেই একেবারে মশগুল্! এবারে পুরুষদের চরণের দাসী হ'তে চ'ললো, এখন ওর লেখার সে ধার, ষ্টাইলের সেই তেজস্বিতা আর থাকবে না কি ?

সিপ্রা ফোঁস করিয়া বলিল,—সব্বাইকে নিজের মত ভেবো না। আমাদের বিয়ে মানে বাঁদীগিরি নয়,

পার্টনারশীপ। সমান অধিকার, সমান দাবী। আর বিয়ে ক'রেচি বলেই যে, ভবিষ্যতে পুরুষদের অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু লিখবো না—তা-ও সত্য নয়। আপনার প্রবন্ধ ঠিক সময়েই পাবেন চিত্রাদি! এই ক'দিন 'এন্‌গেজড্' থাকাতে হ'য়ে ওঠেনি।

গৃহের অপরাংশে কমলা তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে বলিতেছিল,—তোমার কিছুই তো পণ লাগেনি ভাই গায়ত্রীদি', নয়? আজকালকার দিনে এমনটি কিন্তু আর দেখা যায় না।

গায়ত্রী তখন আর এক জন মহিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল,—গয়নাগুলো সব হীরেরই দিলুম। ওঁরা বলে পাঠিয়েছিলেন কি না, যা দেবেন কম ক'রেই দেবেন, কিন্তু হীরেরই যেন হয় সব ক'টা।

কমলা বোকার মত প্রশ্ন করিল,—তবে যে তুমি ব'ললে, গায়ত্রীদি', ওঁরা কিছুই নেননি?

উপস্থিত মহিলাটি অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিসেস্ ভৌমিক বলিলেন,—নেননি তো সত্যই কিছু। ওঁদের যেমন ছেলে, ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা গুণে নিতে পারতেন যে! কিন্তু তাই ব'লে সমাজে নিজেদের একটা মান-সম্ভ্রম আছে তো? ওঁদের বাড়ীর বৌ যে হ'য়েচে, সে হীরে-ছাড়া কিছু পরেনি কখনো। সেটুকু বজায় রাখতে হবে তো।

গায়ত্রী সগর্ব্বে কহিলেন,—সে কথা একশো বার! আমারও শুধু ঐ হীরের স্যুটটাতেই হাজার-পঁচিশেক লেগে গেল! তা'ছাড়া এখনও ফার্ণিচার, রূপোর টি-সেট, সোনার গোলাপ-পাশ, আর ফ্লাওয়ার-ভাস্, আংটি, ঘড়ি—সমস্তই বাকী। মেয়েদের কাপড়-কেনা—রং ম্যাচ ক'রে—সে-ও এক বিরাট পর্ব্ব! তা' এতে মিসেস্ মল্লিক আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেচেন। তাঁর 'টেষ্ট' অনুসারে 'সিলেক্ট' না করলে এত সুন্দর জিনিষ নিজের চেষ্টায় বোধ হয় আমি জোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারতুম না।

সমাগত মেয়েরা কেহ কেহ কাপড় দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। কমলা অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল! তাহার গায়ত্রীদি'র কথা শুনিয়া প্রথমে মনের অতি সঙ্গোপনে আশার যে ক্ষীণ রশ্মিটি প্রভা বিকাশ করিয়াছিল, মুহূর্ত্তেই তাহা নির্ব্বাপিত হইল। প্রথমে সে মনে মনে এইরূপই আশা করিতেছিল যে, বিণাপণে যদি গায়ত্রীদের সমাজে বিবাহ হয়, তবে সেখানে যাওয়া-আসা মেলা-মেশা করিতে করিতে চামেলীরও হয় তো এক দিন...... কিন্তু আশার সেই নব কিশলয় দেখিতে-দেখিতে শুকাইয়া গেল—গায়ত্রীর মুখে বিরাট ফর্দ্দ শুনিয়া।

গায়ত্রী মিসেস্ ভৌমিকের হাতে আলমারির চাবি দিয়া বলিলেন,—আপনি দয়া ক'রে কাপড়-চোপড়গুলো দেখান এঁদের। সে এক বিরাট ব্যাপার! ভালো ক'রে দেখাতে অন্ততঃ একটি ঘণ্টা সময় লাগবে। আমার আবার ওদিকের সমস্ত কাজই বাকী এখনও। আশীর্ব্বাদের সময় হয়ে এলো, বেশী দেরী নেইও আর।

দুয়ারের কাছে গায়ত্রীর স্বামী ডাকিলেন,—শুনে যাও একবার। ওঁরা ফার্ণিচার-ডিলারকে পাঠিয়ে দিয়েচেন। এই কোম্পানীই চিরকাল ধ'রে ওঁদের জিনিষপত্র দিয়ে আসছে, সবই জানে-শোনে ওরা। কিছু আর নতুন ক'রে বোঝাতে হবে না।

গায়ত্রী মস্ত একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—যাক, বাঁচলাম। ফার্ণিচারগুলোর একটা কিনারা হওয়ায় এতক্ষণে স্বস্তি পাওয়া গেল।

গায়ত্রীর স্বামী বলিলেন,—ওরা ক্যাটালগ নিয়ে এসেচে। তোমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তার পরে যথাসময়ে ঠিক জিনিষ নিজেরাই প্যাক ক'রে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবে। একটা ড্রইংরুম আর বেড-রুমের সরঞ্জাম,—পিয়ানো-শুদ্ধ প্রায় হাজার-তিন সাড়ে তিন পড়বে আর কি!

গায়ত্রী তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন,—টাকার জন্যে কিছু যায়-আসে না। ভালো জিনিষ দিতে বোলো।

গায়ত্রীর স্বামী বলিলেন,—বেয়াই পাঠিয়ে দিয়েচেন, তাঁদেরই বাড়ীতে ফার্ণিচার সরবরাহ করে যারা বরাবর—তাদেরই; সুতরাং জিনিষ যে ভালো হবেই, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থেকো।

মিসেস্ ভৌমিক প্রকাণ্ড আলমারি খুলিয়া কাপড়ের একটি দোকান সাজাইয়া বসিয়াছিলেন! মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া নানারূপ মন্তব্য করিতেছিল।—যোগিয়া রংয়ের জর্জ্জেটটা বেশ নূতন ধরণের হইয়াছে।—

মুর্শিদাবাদী ও হাল্কা বেনারসীর রং এবং জমিও চমৎকার! অন্যূন শ'-খানেক কাপড়-জামার স্তূপে পরিবেষ্টিত হইয়া মেয়েরা এইভাবে বিরাট সমালোচনা জুড়িয়া দিয়াছিল।

গায়ত্রী কহিলেন,—বেয়াই যে যে কাপড়ের ফর্দ্দ দিয়েছিলেন ও তাঁদের বরাবর কেনা হয় যে সব দোকানে—তাদের নাম বলে দিয়েছিলেন, সেই হিসাবেই কেনা হ'য়েচে। হ'লে হবে কি, সায়েবি দোকানগুলোতে বাপ্পু—জিনিষের বেজায় দাম নেয়! তবে ওদের একটা নাম-ডাক আছে কি না, সেই অনুসারে বাঁধা দোকানও আছে।

অনেক বেলায় নিমন্ত্রণ সারিয়া কমলা শিবনাথ ও চামেলী সহ ফিরিয়া আসিতেছিল। কমলা ভাবিতেছিল, বেয়াই গয়নার দোকান, কাপড়ের দোকান, এবং ফার্ণিচারের দোকান বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া কেমন বিনাপণে ছেলের বিয়ে দিতেছেন—এ এক অদ্ভুত সমস্যা! অথচ লোকের মুখে-মুখে ঐ একই কথা! আহা, এমন হীরের টুকরো ছেলে, বিনাপণে বিয়ে হচ্ছে! গায়ত্রীর কপাল-জোর! শিবনাথ ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন, বিনাপণের বিয়ে কেমন দেখে এলে?

কমলা অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, চমকিত হইয়া কহিল,—হ্যাঁ, দেখে এলাম। চমৎকার! দেখ, কাল তুমি ঐ যে ছেলেটির কথা ব'লছিলে, বি-এ পড়ে, গ্রামে সঙ্গতি আছে, বাড়ী আছে—তাদেরই সঙ্গে দেখা ক'রে বিয়ের ঠিক-ঠাক ক'রে ফেল।

শ্রী আশালতা সিংহ।

প্রক্ষিপ্ত

রামায়ণ মহাভারতে পুরাণে আমরা লভেছি ঠাঁই,
গা ঢেলেছি মোরা মহাসাগরেতে কোনই কামনা নাই।
ভাস, ভবভূতি, কবি কালিদাস,
বাল্মীকি ব্যাস সাথে করি বাস,
আমরা হা'ঘরে মহতের দ্বারে পড়িয়া থাকিতে চাই।

আমরা লোষ্ট্রে পাড়িবারে চাই কল্পতরুর ফল,
পথহারা ক্ষীণ মরালেরা পাই মানসসরের জল।
করি আনন্দে আমরা ক'জন,
দেবতার সাথে পংক্তি-ভোজন,
কুরু পাণ্ডব সভায় আমরা সূত-পুত্রের দল।

সাগর-ঝিনুক অমৃতের কণা লেগেছে মোদের গায়,
বালীর পিণ্ড রাজা দশরথ হাত পেতে নিতে চায়।
মোরা উদ্ভট, মোরা অদ্ভুত,
অমৃতের সরে দীন বুদ্বুদ,
পারিজাত-হারে নীহারবিন্দু জমাট বাঁধিয়া যায়।

হয় ত আমরা হূণ কি তাতার অথবা আমরা গ্রীক,
আর্য্যেরি সাথে মিশিয়া গিয়াছি গোত্রের নাহি ঠিক।
মোরা বিক্রম, চন্দ্রগুপ্ত
বিরাটের মাঝে হ'য়েছি লুপ্ত,
অক্ষয় বটে বনমল্লিকা আমোদিত করি দিক।

দেব-বালিকার ভাসানো প্রদীপ কাল-সাগরের জলে,
জয়া বিজয়ার ছুড়ে-দেওয়া ফুল ষোড়শীর কুন্তলে,
কৌস্তুভ গায়ে মোরা চন্দন,
একই দেবতা, এক বন্দন,
কনকের সাথে কনক ধান্য কমলার অঞ্চলে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ইতিহাসের অনুসরণ

প্রাচীন ভারতের নৌ-বল

যত দিন যাইতেছে এবং যতই অনুসন্ধানলব্ধ বস্তুর আলোক দিকে দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, ততই পৃথিবীর বহু স্থানে প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কি ভাবে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহার স্ফুটতর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইতেছে। মানুষমাত্রই যেমন ভ্রম-প্রমাদের অধীন, সেইরূপ সে কোন না কোন সূত্রে কুসংস্কারের অধীন। মানুষ সেই নিয়তি পরিহার করিতে পারে না। এডমণ্ড বার্ক যথার্থই বলিয়াছেন যে, কুসংস্কারের প্রভাব পরিহার করিতে পারিব—এই ধারণাই মানুষের একটা কুসংস্কার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন যে, ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর কুত্রাপি সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হয় নাই। সেই জন্য তাঁহারা হিন্দুদিগের সভ্যতা যে কত প্রাচীন, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ঐতিহাসিক টেলর (Taylor) "প্রাচীন ইতিহাস" নামক গ্রন্থে মিশরের সভ্যতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "প্রাচীন মিশরের অধিবাসীবর্গের বর্ণ ছিল পিঙ্গল বা বাদামী। কিন্তু তাহাদের পুরোহিত এবং যোদ্ধজাতির বর্ণ ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক শুভ্র। তাঁহাদের বর্ণের এই বিমলতা তাঁহাদিগকে ভিন্ন গোষ্ঠীয় লোক বলিয়া চিহ্নিত করিত। ঐ শাসক জাতিরা মেরো (Mero) অঞ্চল হইতে নীল নদ বহিয়া আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাই মিশরীয় জাতিকে একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম এবং শাসন-পদ্ধতি দিয়াছিলেন। সেই সভ্যতাই অতি প্রাচীন কালে নীল নদের তীরবর্ত্তী ভূভাগে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই এখন নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অনেকেরই অনুমান এইরূপ যে, প্রাচীন মিশরীয় জাতি সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুদিগের নিকট হইতে সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। উভয় জাতির প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য ও বিস্ময়কর ঐক্য ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানে কখন নৌ-বহর ছিল না, সুতরাং ঐ দেশ হইতে অধিক লোক কি করিয়া মিশরে আসিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।" —ইত্যাদি (১)। মিষ্টার টেলর যে কেন এই সিদ্ধান্ত করিলেন তাহা বুঝা যায় না। কারণ, প্রকৃতই হিন্দুস্থানের বহু জাতির বিশাল নৌ-বহর ছিল। যে সময় হিন্দুজাতির ইতিহাসের আলোকের ক্ষীণ জ্যোতি লক্ষিত হয়, সেই সময়ে তাহাদের যে নৌ-বহর ছিল, ইদানীং তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মিলিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে, পুরাবস্তুতে, চিত্রে এবং প্রাচীন মুদ্রায় তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান; এবং এখন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আফ্রিকার পূর্ব্বস্থিত সকোট্রা (Socotra) দ্বীপে অতি প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের উপনিবেশ ছিল সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নাই। মিশরের পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন রক্ষিত-শবের সহিত ঢাকাই মসলিন নীল দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র, এবং তেঁতুল কাষ্ঠ সংরক্ষিত ছিল ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে কি মনে হয় না যে, ভারতের সহিত মিশরের স্মরণাতীত কাল হইতে বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল? স্থলপথে যে ঐরূপ দূরদেশে ঐ সকল বস্তু প্রচুর পরিমাণে নীত হইত, ইহা সম্ভবপর নহে। সমগ্র আফগান রাজ্য, পারস্য, ইরাক, এবং উত্তর-আরব দেশ অতিক্রম করিয়া স্থলপথে মিশরে পণ্য লইয়া যাওয়া সহজ ছিল না; এবং ঐ সকল দেশে তখন নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নও ছিল। বিপ্লব ও বিদ্রোহ তখন লাগিয়াই থাকিত; পথ-ঘাটও ভাল ছিল না। সুতরাং অধিক পরিমাণে পণ্য ভারত হইতে তথায় প্রেরিত হইবার উপায় ছিল না; অথচ ঐ সকল ভারতীয় পণ্য মিশরে যে প্রচুর পরিমাণে যাইত, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

ঋগ্বেদ হিন্দুর প্রাচীনতম গ্রন্থ। ইহার ন্যায় প্রাচীন সাহিত্য পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই। য়ুরোপীয়রা অনুমান করেন, উহা প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত; কিন্তু স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদ অন্ততঃ

---

(১) Taylor's Ancient History—Egypt Sec. I

সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে; এবং ঋগ্বেদের বহু স্থানেই হিন্দুদিগের সমুদ্রপথে বাণিজ্য-যাত্রার উল্লেখ আছে। এই ঋগ্বেদেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজর্ষি তুগ্র তাঁহার পুত্র ভুজ্যকে দূরবর্ত্তী সাগর-মধ্যস্থ একটি দ্বীপ জয় করিবার জন্য নৌকাযোগে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রমধ্যে ভুজ্যের নৌবহর নিমজ্জিত হইলে অন্য সকলে ডুবিয়া মরে। ভুজ্য জলে ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছিলেন; এমন সময় অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের শত দাঁড়যুক্ত তরণীতে তুলিয়া লইয়াছিলেন (২)। ঐ গ্রন্থের অন্যত্র লিখিত আছে যে, বণিকরা লোভাকৃষ্ট হইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য নৌকাযোগে পণ্য পাঠায় (৩)। আর এক স্থানে লিখিত আছে যে, বণিকগণ লোভাধিক্য বশতঃ সমুদ্রের সর্ব্বত্র পণ্যবাহী জাহাজ পাঠাইত (৪)। ঋগ্বেদে বশিষ্ট এবং বরুণের সমুদ্র-বিহারের কাহিনীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে (৫)। ঋগ্বেদে এইরূপ বহু স্থানেই সমুদ্রযাত্রার কথা উল্লেখ দেখা যায়।

মহাভারতে সভা-পর্ব্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব সাগর-পথে যাইয়া সমুদ্র-মধ্যস্থ অনেক দ্বীপ জয় করিয়া স্থানীয় ম্লেচ্ছদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন (৬)। যতুগৃহ-দাহের পর পাণ্ডবগণ একখানি সর্ব্ব-বাতসহ, যন্ত্রযুক্ত, এবং পতাকিনী নৌকারোহণে স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। রামায়ণেও সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে বানরদিগকে যবন দ্বীপে, সুবর্ণ দ্বীপে ও রজত দ্বীপে যাইতে বলিয়াছিলেন। এই যবন দ্বীপ এবং সুবর্ণ দ্বীপ কোথায়? আধুনিক কালে অনেকের অনুমান যবন দ্বীপ যব দ্বীপ বা জাভা, এবং সুবর্ণ দ্বীপ সুমাত্রা (৭)। উহা মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। রজত দ্বীপ সেলিবীজ। রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায়, নিষাদরাজ গুহক ভরতকে বাধা-দানের জন্য পাঁচ শত নৌকায় শত শত কৈবর্ত্ত যুবককে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছিলেন (৮)। এইরূপ নৌবাহিনী লইয়াই পুরাকালে বাঙ্গালার অধিবাসীরা অসীম বীরত্বের সহিত দিগ্বিজয় করিবার জন্য আগত রঘুরাজকে বাধা দিয়াছিলেন।

কেবলমাত্র বেদে, মহাভারতে, রামায়ণেই যে প্রাচীন ভারতবাসীর নৌ-বহরের এবং সমুদ্র-যাত্রার কাহিনী দেখা যায়, ইহাই নহে, প্রাচীন ভারতের পালি এবং দ্রাবিড়ি সাহিত্যেও উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সিলভান লেভী শঙ্খ-জাতক হইতে বুদ্ধদেবের যে সকল পূর্ব্বজন্মের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে অতি প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা সমুদ্র-পথে যাতায়াত করিতেন—তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বলিতেছেন যে, অতি পুরাকালে বারাণসী ধামের নাম ছিল মল্লিনী। যে সময়ে ব্রহ্মদত্ত মল্লিনীর রাজা ছিলেন, সেই সময়ে সেই মহানগরীতে শঙ্খ নামে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ব্রাহ্মণ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ইনিই ছিলেন বুদ্ধদেব—বোধিসত্ত্বরূপে। অতএব উহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালের বহু পূর্ব্বের কথা। এই শঙ্খ নামধেয় ব্রাহ্মণের তরী সমুদ্রমধ্যে বিদীর্ণ হওয়ায় তিনি অকূল সাগরে পতিত হইয়াছিলেন। সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মণিমেখলা তাঁহাকে সেই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। এই শঙ্খই কয়েক জন্ম পরে বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন। মহাজনক-জাতকে কথিত আছে, মহাজনক বিদেহ (মিথিলা) দেশের রাজা ছিলেন। তিনি পরবর্ত্তী জন্মে বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন। জনক (জানকীর পালক পিতা) অতি প্রাচীন যুগের লোক। তিনিও জাহাজ লইয়া সাগরে গমন করিলে তাঁহার তরী ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তাঁহাকে সাত দিন ধরিয়া অকূল সাগরে ভাসিয়া যাইতে হইয়াছিল। পরে সমুদ্রের রাণী তাঁহাকে সাধু-পুরুষ জানিতে পারিয়া মিথিলায় লইয়া আসিয়াছিলেন। এই সকল জাতক-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা সমুদ্র-বক্ষে তরী ভগ্ন হওয়ায় বিপন্ন হইতেন, তাঁহারা মাখন এবং চিনি খাইয়া, এবং এক প্রকার তৈলসিক্ত আঁট-পরিচ্ছদ পরিয়া সাগরে ঝাঁপ দিতেন। ঐ পরিচ্ছদের গুণে তাঁহাদের দেহে জল বসিত না, এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের দেহ জলে ডুবিয়াও যাইত না। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে সমুদ্রযাত্রার জন্য বহু উন্নত ব্যবস্থার প্রচলন

(২) ঋগ্বেদ ১।১১২।৬ এবং ১।১১৬।৩৭ ঐ ১১৭।১৪-১৫ ইত্যাদি—
(৩) ঐ ২।৪৮।৩
(৪) ঐ ১।৫৬।২
(৫) ঐ ৭।৮৮।৩
(৬) মহাভারত সভাপর্ব্ব ৩১ অধ্যায়
(৭) রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ৪৫।৩০
(৮) অযোধ্যা কাণ্ড ৮৪।৭৮

ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যেও সুদূর সাগরে ভ্রমণের কথার উল্লেখ আছে। সরস্বতীর বরপুত্র আপুত্র সাগর-বক্ষস্থিত সুদূর সারকম অর্থাৎ জাভা দ্বীপে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া তথায় অন্ন-বিতরণের জন্য অর্ণবপোতে যাত্রা করেন। তাঁহার গমনকালে সমুদ্র-বক্ষে ঝড় উঠিলে জাহাজখানি মণিপল্লবম নামক দ্বীপে (সুমাত্রা) এক দিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছিল। তামিল সাহিত্যে এইরূপ অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু গল্পগুলি ঐতিহাসিক হিসাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কারণ, তাহাতে কতকগুলি অতিপ্রাকৃত ঘটনার বর্ণনা আছে। কিন্তু ভারতবাসীরা যে বৌদ্ধ-যুগের বহু পূর্ব্বেও সমুদ্র-যাত্রা করিতেন, এবং ভারতের যে নৌ-বহর ছিল—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ঐ সকল কাহিনী হইতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বেও এ দেশের পণ্য সুদূর পশ্চিম দেশে নীত হইত—তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া গিয়াছে। ডক্টর সাইস্ (Dr. Sayce) এসিরিয়া (অসুরীয় ?) দেশের প্রত্নতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি এবং এই সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যে সময়ে সম্মিলিত ব্যাবিলো-নীয়ার রাজা উর বাগাস্ (Ur Bagas) চাল্‌ডিয়ার উর নগরীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্ট-জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সহিত জলপথে ব্যাবিলনের বাণিজ্য চলিত। উর নগরীর ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে অতি বৃহৎ ভারতীয় সেগুণ কাঠ পাওয়া গিয়াছে। নেবু কাড্‌নেজারের (Nebu Chadnezzar) রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে এক জাতীয় ভারতীয় দেবদারুর প্রকাণ্ড কড়িকাঠ পাওয়া গিয়াছে,—ঐ দেবদারু ভারত ভিন্ন অন্যত্র জন্মে না। এরূপ বিশাল কড়িকাঠ শকট-যোগে স্থলপথে লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। উর নগর (Ur)-স্থিত সোম-মন্দিরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে টেলর (Taylor) ঐরূপ দুইটি ভারতীয় শালকাঠের কড়ি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যে মন্দিরে ঐ কড়িকাঠ ছিল, সেই মন্দির নেবু কাড্‌নেজার এবং নাবোনিডাস (Nabonidus) রাজা প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পুন-সংস্কৃত করিয়াছিলেন। যদি সংস্কার-কালেও তথায় ঐ কড়ি স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই প্রায় ৬ শতাব্দী-পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ঐ কাঠ ভারত হইতে জলপথে তথায় নীত হইয়াছিল। অনেকের ইহাই অনুমান যে, ঐ বিশেষ জাতীয় শালকাঠের কড়ি মালাবার উপকূল হইতে তথায় নীত হইয়াছিল। তাঁহাদের ঐরূপ অনুমানের কারণ এই যে, ভারতের আর কুত্রাপি সাগর-তীরে ঐরূপ কড়ি পাওয়া যায় না। ডক্টর সাইস এবং মিষ্টার হিউইট বলেন, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই জলপথে ভারতের সহিত ব্যাবিলনের বাণিজ্য চলিত। প্রথমোক্ত পণ্ডিতের মতে খৃষ্ট-জন্মের ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতের সহিত ব্যাবিলোনিয়ায় বাণিজ্য চলিয়া আসিয়াছিল। মিষ্টার জে, কেনেডি (J. Kennedy) বলেন, ৭ শতাব্দী-পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ব্যাবিলনের সহিত ভারতের জলপথে বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মিষ্টার কেনেডির এ ধারণা বিচারসহ নহে। অবশ্য, ভুল বলিতে যাওয়া অত্যন্ত অহমিকা ও স্পর্দ্ধার পরিচায়ক। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে ভারতীয় বণিকেরা অর্থলোভে সাগর-পথে বাণিজ্য করিতে যায় এ কথার স্পষ্টই উল্লেখ আছে (৭)। এখন বেদের বয়স লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সহিত ভারতীয় পণ্ডিতদিগের মতের প্রায় মিল হয় না। কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলক নাক্ষত্রিক গণনার দ্বারা উহার যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে ৭ শতাব্দী-পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভারতের সহিত ব্যাবিলো নিয়ার বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল,—ইহার নির্ভরযোগ্য-প্রমাণ বর্ত্তমান। ঐ সকল স্থানে প্রাপ্ত ভারতীয় বস্তুই উহার অকাট্য প্রমাণ বলা যাইতে পারে। বাণিজ্যার্থ সমুদ্র-যাত্রার কথা পুরাণেরও বহু স্থলেই আছে। বরাহ-পুরাণে সাগরপথে বাণিজ্যকারী গোকর্ণ নামক কোন বণিকের কথা আছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে "আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে"—ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে পোতভগ্ন হইয়া মহার্ণবে নিমগ্ন কোন বণিকের উল্লেখ আছে; তবে এই সকল পুরাণের এবং কালিদাসের

(৭) ঋগ্বেদ সংহিতা ২।৪৮।৩ এবং ১।৫৬।২

কাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। 'যুক্তিকল্পতরু' নামক গ্রন্থে বিবিধ প্রকার জলযান বা নৌকা-গঠনের বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু এই গ্রন্থখানি কোন্ সময়ে বিরচিত, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না। গ্রন্থখানির রচয়িতা মহারাজ শ্রীভোজ। এই ভোজ রাজা কোন্ ভোজ রাজা? কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল সিরিজে 'যুক্তিকল্পতরু'র যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ধর-রাজ্যাধিপতি প্রমারবংশীয় ভোজরাজ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অনেকটা আনুমানিক। ঋগ্বেদের কাল হইতে ভোজ নামক অনেক নৃপতি ভারতের নানা স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার মধ্যে ইনি যে কোন্ ভোজরাজ—তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থ অনেকটা আধুনিক—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু গ্রন্থখানির রচনা-ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের মনে হয়, উহা প্রাচীন। উহাতে যে নৌকা-নির্ম্মাণের কথা আছে, তাহাও প্রাচীন কালের। উহাতে 'অগ্রমন্দিরা' নামক একপ্রকার নৌকার কথা বলা হইয়াছে। উহা দীর্ঘ প্রবাসের জন্য, দূরদেশে যাত্রার জন্য, যুদ্ধের জন্য, আর ঘনাত্যয় কালে ব্যবহারের জন্যই নির্ম্মিত হইত। "চির প্রবাস যাত্রায়াং রণকালে ঘনাত্যয়ে।" ইহাতে কতকটা সপ্রমাণ হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর নৌকা নির্ম্মিত হইত।

অতি প্রাচীন মনুসংহিতাতে জলাকীর্ণ স্থানে নৌযুদ্ধ করিবার কথা আছে (৭।১৯২)। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় কথিত আছে যে, লোক অধিক লাভের নিমিত্ত প্রাণধন-বিনাশ-শঙ্কাসঙ্কুল সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে। প্রাচীন বৌধায়নধর্ম্মসূত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে ধনলোভে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল (বৌধ সূ ২।২।২)। অধ্যাপক বুলুহার বলেন, অতি প্রাচীন দুইখানি ধর্ম্মসূত্রে সমুদ্রযাত্রার কথা স্পষ্ট ভাষাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৌধায়ন এ কথাও বলিয়াছেন যে, উত্তর অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ পশম বিক্রয়, মদ্যপান, অস্ত্রের ব্যবসায় এবং সমুদ্র-যাত্রা প্রভৃতি অপকর্ম্ম করিয়া থাকে (বৌধায়ন ১।২।৪—বুলুহারের অনুবাদ)। মনুতে সমুদ্র-যাত্রা এবং সমুদ্রগামী নৌকার উপর কর ধার্য্য করিবার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

ইহার পর ঐতিহাসিক যুগ অর্থাৎ পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ যে সময়ের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া থাকেন, সেই যুগে ভারতে নৌবাহিনী এবং বাণিজ্যবহর কিরূপ ছিল, এখন তাহারই বিচার করা আবশ্যক। নেবু কাড্নেজার এবং নাবোনিডাস বুদ্ধদেবের একটু পরবর্ত্তীকালের লোক। ইঁহাদের আমলে ভারতে যে প্রবল বাণিজ্য-জাহাজ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ভারতের বাণিজ্য-জাহাজ ছিল, তাহার প্রমাণ গ্রীকরাই দিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁহার যে বড় নৌ-বহর ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌটিল্য বা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক লোক। সেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার বিবিধ সমর বিভাগের মধ্যে রণতরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এক জন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে নাবধ্যক্ষ বলা হইত। মেগাস্থিনিসও বলিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের সামরিক কার্য্য ছয়টি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হইত। তন্মধ্যে নৌ-বিভাগের কার্য্য গুরু। 'হিংস্রিকা' বা জলদস্যুদিগের জাহাজ ধরিয়া তাহা বিধ্বস্ত করা এবং পত্তনে (port town) শুল্ক আদায় করা নৌ-বিভাগের কার্য্য ছিল (অর্থশাস্ত্র ২।২৮ অধ্যায়)। নাবধ্যক্ষের কার্য্য অত্যন্ত গুরু ছিল, সেই জন্য তাঁহার আরও পাঁচ জন সহকারী থাকিতেন। যে সকল জাহাজ শত্রুর রাজ্যে যাইত এবং যে সকল জাহাজ পণ্য-পত্তনের নিয়ম লঙ্ঘন করিত, তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিবার নিয়ম ছিল। সুতরাং চন্দ্রগুপ্তের তরী যে অনেক ছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। চন্দ্রগুপ্তের বিশাল নৌ-বাহিনী সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অশোকের প্রথম শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তাম্রপর্ণীর (সিংহল) সহিত এবং মিশর, সিরিয়া, সাইরেণ (সাইরেণসিয়ার রাজধানী) ম্যাসিডোনিয়া, এবং এপিয়াসের রাজগণের সহিত অশোকের রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিল। ডক্টর ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন, এত দূরদেশের সহিত

রাজনীতিক সম্বন্ধের অস্তিত্ব সমুদ্রগামী জাহাজের এবং সেনা-দলের অস্তিত্বই সূচনা করে (১০)।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা উপস্থিত হইবার পর হইতেই মৌর্য্যরাজগণের রণতরী-বাহিনীরও অবনতি ঘটিতে থাকে; কিন্তু তাহা হইলেও ভারতীয় রণতরীর বিলোপ হয় নাই। অন্ধ্ররাজ্যের কতকগুলি পুরাতন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দুই মাস্তুলযুক্ত জাহাজের চিত্র মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই মুদ্রা কাহার আমলের তাহা লইয়া মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ বলেন, উহা পুলুমেরীর রাজত্বকালের; আবার ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি বলেন যে, উহা যজ্ঞশ্রী রাজার আমলের। অধ্যাপক রাপ্‌সন (Rapson) অন্ধ্রদেশীয় মুদ্রা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত। তাঁহার মতে উহা রাজা পুলুমেরীর মুদ্রা। রাজা পুলুমেরী কর্ত্তৃক টোণ্ডামণ্ডল বিজয়ের পরই ঐ মুদ্রা প্রস্তুত হয়। তিনি রণতরী লইয়া ঐ অঞ্চল জয় করিতে গিয়াছিলেন। এলাহাবাদের প্রশস্তি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, সিংহলে এবং অন্যান্য বহু দ্বীপে গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। গুপ্তরাজগণের আমলে যে তাঁহাদের বিপুল রণতরী-বাহিনী ছিল, তাহা অধুনাপ্রাপ্ত অনেক পুরাতন লেখমালা হইতেই সপ্রমাণ হয়। ইহার পরবর্ত্তী কালেও ভারতে বিপুল নৌ-বাহিনী ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

বঙ্গদেশেও অতি পুরাকাল হইতে নৌ-বাহিনী ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় সাড়ে ৫ শত, ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে বিজয় সিংহ নামক বাঙ্গালার এক জন রাজপুত্র ৭ শত অনুচরসহ সিংহল দ্বীপে গমন করিয়া ঐ দ্বীপটি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ৭ শত সৈন্য, গজ, অশ্ব এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যাইবার জন্য যে রণতরীর প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঐ সময়েও বঙ্গদেশে যে আর্য্য জাতির বাস ছিল,—ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ, বিজয়বাহু নামটি আর্য্য নাম। শুনা যায়, বিজয়বাহুর পিতার নাম সিংহবাহু। এ নামটিও আর্য্য নাম। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস "মহাবংশে" এবং অন্যান্য ইতিহাসে বিজয়বাহু কর্ত্তৃক সিংহল-বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। বাঙ্গালার ঐ সময়ের ইতিহাস পাওয়া যায় না। বিজয়বাহুর কৌলিক উপাধি ছিল সিংহ। সেই হেতু বিজয়বাহু লঙ্কা-দ্বীপ জয় করিয়া উহার নাম রাখিয়াছিলেন সিংহল। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, সকল পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক এবং তাঁহাদের মতানুবর্ত্তীরা যে বলেন,—বাঙ্গালা অল্পদিন পূর্ব্বে আর্য্য জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল, সেই মত ভ্রান্ত। বাঙ্গালাবাসী আর্য্য জাতি নৌ-বলেই বলবান ছিলেন,—ইহা কবি কালিদাস প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রঘু রাজার দিগ্বিজয় উপলক্ষে বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নৌ-বলে বাঙ্গালী জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবল ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ৫১৩ বৎসর পরেও বাঙ্গালায় যে পোতাশ্রয় এবং জাহাজখানা বা জাহাজ-নির্ম্মাণের স্থান (harbour এবং dock yard) ছিল, অধুনাপ্রাপ্ত ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসনে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। উহাতে যে 'নাবাতা', 'ক্ষেণী' শব্দ আছে, তাহার অর্থ—পোতাশ্রয় এবং পোতনির্ম্মাণের স্থান (নৌ+আতা=নাবাতা। ক্ষেণী শব্দ ক্ষয়ণ=পোতাশ্রয় বুঝায়; ইহা ডক্টর হর্ণেলের ব্যাখ্যা) পাল-রাজগণের আমলের যে সকল তাম্রশাসন এবং শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও বাঙ্গালায় নৌ-বাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার প্রতিবেশী কামরূপ এবং আসামবাসীরাও নৌ-যুদ্ধে বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। কত কাল হইতে ইঁহারা নৌশক্তির পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে নৌ-বল গঠন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহা বিখ্যাত চীনা-পর্য্যটক হুয়েন সাং কর্ত্তৃক বর্ণিত বিবরণ হইতেই বুঝা যায়। এই চীনা-পরিব্রাজক বলিয়াছেন, ভাস্কর বর্ম্মার জাহাজের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। বৈদ্যদেব আসামের ভিঙ্গদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি কামরূপের রণতরীর বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন পঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশের অনেক রণতরী

(১০) Edicts of Asoka Introduction p. viii.

ছিল। তিনি নিয়ারকসের নেতৃত্বে যে সকল নৌযোগে তাঁহার সৈন্যগণকে স্বদেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ভারত হইতে সংগৃহীত, এবং ভারতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের তীরভুক্ত অধিবাসীদের দলের বহু লোক সমুদ্রগামী তরীর সাহায্যে সাগরমধ্যে জলদস্যুগিরি করিত। উহারা সাগর-পারস্থিত অন্য দেশে নামিয়া লুঠ-পাট করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। পারস্য সম্রাটদিগের সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহাদের উপদ্রব কিছু অধিক ছিল। ষ্ট্রাবো (Strabo) এবং এরিয়ান (Arrian)-লিখিত বিবরণ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, উহাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া পারসিকরা টাইগ্রিস্ নদীতে যাহাতে অধিক দূর পর্য্যন্ত নৌকা লইয়া যাইতে না পারা যায়, সেজন্য নদীগর্ভে পাথর ফেলিয়া রাখিয়াছিল (১১)। রবার্টসন বলেন, ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্যই টাইগ্রিস্ নদীগর্ভে পারসিকরা পাথর ফেলিয়াছিল। তাঁহারা সাগরতীরে কোন প্রসিদ্ধ সহরের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সে কথা সত্য নহে। অন্যান্য ঐতিহাসিকদিগের মতে ভারতীয় জলদস্যুদিগের ভয়ে তাঁহারা ঐ কার্য্য করেন নাই। সিন্ধুদেশের জলদস্যু-দিগের উৎপাত-ফলে অল হাজাজ কর্ত্তৃক সিন্ধুদেশ আক্রান্ত হইয়াছিল। উহাই ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ। দাহিরের পুত্র হুল্লিশা হাট আলি শর্কিতে মুসলমানদিগের সহিত নৌ-যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রণতরীগুলি বিপথে চালিত হওয়ায় তিনি যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দী হইয়াছিলেন।

এই সকল দেখিয়া বিশেষভাবে বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে বহু রাজ্যে নৌবাহিনী ছিল। এত প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা এই সত্য অস্বীকার করেন, তাঁহাদের ঐরূপ অস্বীকৃতির অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে। সে কারণ নিশ্চিতই ঐতিহাসিক কারণ নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

(১১) Strabo, Geography xvi 7; Arrian vii 7. Elliot History of India vol. I. p. 512 foot note, and Robertson's Disquisition p. 160.

কালোর আলো

কালো ব'লে দূরে ঠেলেছিনু ব'লে,
অভিমানে তাই আছ কি স'রে?
ব্যাকুল এ হিয়া আকুলিয়া খুঁজি—
ফিরে আসে পুন চিত্তপুরে।

বিরাট গগন নীল দিয়ে ঢাকা,
বিশ্বজননী আমার কালো।
শ্যাম নটবর চতুর, চটুল,
সে যে গোপিকার হৃদয়-আলো;

অন্ত যাহার নাহি পায় নর,
জ্ঞানের গরিমা না পায় দেখা।
ত্রিগুণ সায়রে গভীর যা কিছু,
কালোর আঁধারে রহে যে ঢাকা।

থাক' দূরে তাহে কোনো ক্ষতি নাই,
দীনার অর্ঘ্য রাখিয়ো বুকে;
জননীর স্নেহ রূপে নহে বাঁধা
অন্তঃসলিলা বহে যে চুপে।

অপরিচিতা।



ভ্রম-সংশোধন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)



৯

সাধারণতঃ রাত্রিতে মহেশচন্দ্র জামাতাকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসিতেন। সেই সময় তথায় পারিবারিক সম্মিলন হইত, বলা যায়—নারায়ণী, সুমতি, সরমা সকলেই তথায় সমবেত হইতেন। যে দিন সুধীর চলিয়া গেল, সেই দিন যথাকালে ভৃত্য আসিয়া মহেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, জামাই বাবু বাড়ীতে নাই, সে কি তাঁহার আহারের আয়োজন করিবে? স্নান, আহার, কায সম্বন্ধে মহেশচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময় রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিলেন—"সব ঠিক কর। সুধীর এখনই এসে পড়বে।" পনের মিনিট পরে ভৃত্য আসিয়া বলিল, জামাই বাবু আইসেন নাই। তাঁহার আহার্য্য দিতে বলিয়া মহেশচন্দ্র ভাবিলেন, সুধীর কোথায় গেল? বায়স্কোপ, থিয়েটার—এ সকল সুধীর দেখিতে যাইত না; সে কেবল মাতা, ভ্রাতাকে বা ভগিনী-ভগিনীপতিকে দেখিতে যাইত—কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে না বলিয়া যাইত না এবং কখন ফিরিতে এত বিলম্ব করিত না।

আহার করিতে বসিয়া মহেশচন্দ্র মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুধীর কোথায় গেল?"

নারায়ণী বলিলেন, "তা' কেহ বলতে পারে না।"

"গাড়ী ফিরে এসেছে?"

"না। সে গাড়ী নিয়ে যায়নি।"

"তবে নিশ্চয় প্রভানাথ এসেছিল, তা'র সঙ্গে গেছে। মা, তুমি যে সাভায় এঞ্জিনিয়ার বাবুর ছেলের আমাদের বাসায় এলে বাড়ী ফিরতে আগ্রহ দেখে বলতে—'খাই-দাই ভুলি না—তত্ত্বকথা ছাড়ি না,' সুধীরেরও তেমনই, যত কাযই কেন থাকুক না, তা'র মধ্যে অবসর ক'রে মা'কে দেখতে যা'বেই। আজ যে কায করেছে, তা' আর কেহ হ'লে তিন দিনে শেষ করতে পারত না। কি ছেলে!"

"তুমি ত জান, মা ছেলেমেয়ে-অন্ত প্রাণ। বাপেরও তা'ই ছিল। ছেলেমেয়ে ডাকলে বাবা বা মা কেহ 'বাবা!' আর 'মা!' ছাড়া উত্তর দিতে কখন শুনে নাই।"

"আমার বোধ হয়, প্রভানাথ এসেছিলেন—তাঁ'র সঙ্গে গেছে।"

"কিন্তু না ব'লে ত যায় না। আসতে যেতে প্রণাম করে—বারণ করলেও শুনে না।"

"হয়ত সময় পায়নি। এখনই এসে পড়বে।"

আলোচনা যতই অগ্রসর হইতেছিল, এক জনের পক্ষে তাহা তত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছিল। যে আশঙ্কা কাহারও কল্পনায় স্থান পায় নাই, তাহাই সরমার মনে উদিত হইয়াছিল। তাহার বিশ্বাস—সুধীর রাগ করিয়া গিয়াছে। যদি সে ফিরিয়া না

নারায়ণী ও সুমতি বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন—তাহার পর মনে করিলেন—সুধীর সে দিন আর আসিবে না। তথাপি তাঁহারা তাহার জন্য আহার্য্য গুছাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন।

যদি কখন সুধীর কোন কাযে মাতার নিকট থাকিত, তবে নারায়ণী রাত্রিকালে সরমার কাছে থাকিতেন। আজও তাহাই হইল। তিনি শয়ন করিয়া সরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুধীর কি তোকেও ব'লে যাবার সময় পায়নি—কোথায় গেল?"

সরমা বিরক্তভাবে বলিল, "না।"

নারায়ণী যেন কতকটা আপনার মনে আপনি বলিলেন, "তাই ত—এখন তোরা কিছু মানিস না, আজ সংক্রান্তি, মুখের খাবার প'ড়ে রইল। আমি মহেশকে মনে ক'রে দিই নি, শুনলে ওর মন খারাপ হ'ত।"

সরমা কোন কথা বলিল না, কিন্তু অঙ্গে সহসা কোন তপ্ত দ্রব্যের স্পর্শে যেমন হয়, তাহার মনে তেমনই হইল—"সংক্রান্তি!" সে জানিত, সংক্রান্তির দিন পিতামহী কোন ভৃত্যকেও বাড়ী যাইতে দিতেন না—"পক্ষান্তে নিষ্ফলা যাত্রা মাসান্তে মরণং ধ্রুবম্।" "মুখের ভাত প'ড়ে রইল"—পিতামহীর এই কথায় তাহার মনে পড়িয়া গেল, সুধীর যখন চলিয়া যায় তখন ভৃত্য (নিশ্চয়ই তাহার আদেশে) তাহার পানের জন্য জল আনিয়াছিল, সে তাহাও পান করে নাই।

মধ্যরাত্রিতে পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া নারায়ণীকে শয্যায় দেখিয়া বলিল, "বড়মা, বাবা কই?"

নারায়ণী বলিলেন, "তোমার ঠাকমা'র কাছে গেছেন।"

"কেন?"

"কাল আসবেন।"

তাহার পর শিশু নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল—শিশু যখন প্রশ্ন করে, তখন তাহার শেষ হইতে চাহে না।

মহেশচন্দ্র একাধিক বার বন্ধু মহাশয়ের গৃহে টেলিফোন দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুধীরই সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। আজ নারায়ণীর মনে হইল, তথায় টেলিফোন না থাকায় কি অসুবিধাই হইল! সে রাত্রিতে তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না—নানা দুশ্চিন্তা তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি যখন স্নান করিতে গমন করিলেন, তখন তাঁহার দাসী বামা আসিয়া বলিল, "মা, একটা কথা বলব?" বামা অপ্রয়োজনে এত অধিক কথা কহিত যে, আজ সে একটা কথা বলিবার জন্য অনুমতি চাহিলে নারায়ণীর হাস্যোদ্রেক হইল। তিনি বলিলেন, "বল।"

বামা বলিল, "জামাই বাবু দিদিমণির সঙ্গে কথা-কাটাকাটির পর চ'লে গেছেন।"

"তোকে কে বললে ?"

তখন সে যাহা বলিল, তাহাতে প্রকাশ পাইল, যে ভৃত্য সুধীরের আদেশে তাহার জন্য শীতল জল লইয়া গিয়াছিল, সে ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল; সুধীর হাতমুখ ধুইতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া তৃষ্ণার সময় জল পান পর্য্যন্ত না করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভৃত্য রাত্রিতে বৃদ্ধ ভৃত্যকে—কি হইয়াছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা জানিয়াছে; ভৃত্য মহলের আলোচনাফল দাসী-মহলে আসিলে দাসীরা তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছে; আর দুই বা ততোঽধিক স্ত্রীলোক যখন কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্তা হয়, তখন কে তাহাদিগের রসনার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে ?

শুনিয়া নারায়ণীর দুর্ভাবনার অন্ত রহিল না। তিনি কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে স্নান করিতে গমন করিলেন। স্নানান্তে তিনি—অভ্যাস মত পূজার সব আয়োজন করিয়া—ফুল সাজাইয়া, চন্দন ঘষিয়া লইয়া পূজায় বসিলেন। পূজা শেষ করিয়া ইষ্টদেবতাকে প্রণাম-কালে, তিনি বিশেষ ভাবে সুধীরের ও সরমার মঙ্গল-প্রার্থনা জানাইলেন।

পূজার পর তিনি পুত্রবধূকে সকল কথা জানাইলেন। তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কাতর ভাবে বলিলেন, "মা, কি হ'বে?" এমনই একটা ঘটনার আশঙ্কা উভয়েরই ছিল।

আজ উভয়েরই প্রথম ভাবনা হইল—মহেশচন্দ্রকে কিরূপে এ কথা জানাইবেন? তিনি রুষ্ট হইবেন, তাহাই আশঙ্কার একমাত্র কারণ নহে; তিনি কিরূপ ব্যথিত হইবেন, তাহাই আতঙ্কের কারণ।

নারায়ণী বৃদ্ধ ভৃত্যকে ডাকাইয়া পূর্ব্বদিন কি ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেন। সে প্রথমে স্বীয় দোষ গোপন করিবার চেষ্টাই করিল বটে, কিন্তু সেই সময় সত্যব্রত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সে-ই বলিয়া দিল, ভৃত্য তাহাকে বলিয়াছিল, সে বড় হইলে চুরুট "খাইবে।" নারায়ণী রুষ্ট হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "তোমার এত বড় সাহস যে মিথ্যা কথা বল—আবার জামাই বাবুর নামে দিদিমণির কাছে নালিশ করতে যাও। এ বাড়ীতে তোমার অন্নজল শেষ হয়েছে!"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

সুমতি বলিলেন, "মা, ওকে বকলে কি হ'বে? যা'র ব্যবহারে ওর সুধীরের কথায় আবার নালিশ করবার সাহস হয়েছে, দোষ তা'র। কি শিক্ষাই হয়েছে।" তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সত্যব্রত নারায়ণীর ক্রোধ-বিকাশে ও পিতামহীর ক্রন্দনে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল; তাহার পর ধীরে ধীরে নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বড়মা, বাবা কোথায়?"

নারায়ণী সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি সরকারকে ডাকাইয়া বসু মহাশয়ের গৃহে যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন।

সরকার ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সুধীর গতকল্য বাড়ীতেই ফিরিয়াছিল, কিন্তু প্রাতে চলিয়া গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে, সে যে স্থানে যাইতেছে তথায় যাইয়া সংবাদ দিবে।

ততক্ষণে মহেশচন্দ্র বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি প্রাতে স্নান করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন—বেড়াইতে যাইয়া তিনি যে যে স্থানে কায হইতেছে, সে সব পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেন।

গৃহে ফিরিয়া যান হইতে অবতরণ করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুধীর কি আসিয়াছেন?"

দ্বারবান বলিল, "না"। সঙ্গে সঙ্গে সে রোলটপ টেবলের চাবী দিয়া বলিল, সুধীর পূর্ব্বদিন যাইবার সময় আজ তাঁহাকে দিবার জন্য তাহাকে চাবীটি দিয়া গিয়াছিল।

চাবী লইয়া মহেশচন্দ্র তাঁহার আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন—চাবী ঘুরাইয়া টেবলের ডালাটি তুলিয়া দিলেন। এই টেবল তিনিই ব্যবহার করিতেন; কিন্তু দুই বৎসরের অধিক কাল সুধীর কায বুঝিয়া লইবার পর ইহা তাহাকে ব্যবহার করিতে দিয়া—অর্থাৎ ইহার ব্যবহারভার তাহাকে দিয়া তিনি কতকটা অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি লক্ষ্য রাখিতেন—পাছে সুধীরের অনভিজ্ঞতায় কোন ভুল হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বুঝিয়াছিলেন, সুধীর কায এমন আয়ত্ত করিয়াছে যে, তাঁহার আর লক্ষ্য রাখিবারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে তাঁহাকে সব কাযের বিবয় জানাইত এবং সব হিসাব দেখাইত।

তিনি টেবল খুলিয়া দেখিলেন, সুধীর সে দিনের ও পরবর্ত্তী দুই দিনের কাযের তালিকা ও টাকার হিসাব লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ইহাই তাহার কাযের রীতি ছিল।

মহেশচন্দ্র ভাবিলেন, সুধীরের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হয়, তবুও কাযের কোন ক্ষতি হইবে না।

তিনি ভাবিলেন, সে আসিল না কেন?

এই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, নারায়ণী তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

তিনি যাইতেছেন বলিয়া যে সব কাগজে স্বাক্ষর দান করিবার ছিল, সেগুলির কতকগুলিতে স্বাক্ষর দিয়া আফিস-ঘর ত্যাগ করিলেন। ততক্ষণে ওভারসিয়ার, কেরাণী প্রভৃতি আসিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে কায বুঝাইয়া দিয়াছেন।

১০

সুধীর যখন তাহার গৃহে আসিতেছিল, তখনই সে বুঝিয়াছিল, তাহার তথায় থাকিবার সৌভাগ্য হইবে না। তাহার কারণ, প্রথম—মহেশচন্দ্র আসিয়া তাহাকে সঙ্গে যাইতে বলিলে সে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না, দ্বিতীয়—দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহার গৃহে স্থিতি পল্লীতে কৌতূহলতীক্ষ্ণ আলোচনার বিষয় হইবে।

সে ট্যাক্সীতে আসিয়াছিল; সেই জন্য তাহার মোটরের হর্ণে অভ্যস্ত ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার আগমন বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সে ট্যাক্সীর ভাড়া মিটাইবার সময়—কত ভাড়া জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার কণ্ঠস্বর পাইয়া তাহার পালিত কুকুরটি সানন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে আসিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিয়া আনন্দব্যঞ্জক ডাক ডাকিলে তাহা শুনিয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রও ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর সে আবার ছুটিয়া যাইয়া পিতামহীকে সংবাদ দিয়াছিল,—কাকাবাবু আসিয়াছেন।

শুনিয়া মা যখন আসিলেন, ততক্ষণে সুধীর সুধীরের বসিবার

হয়ে দাদার পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়াছে। মা আসিলেই সুধীর উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজই কি যা'বি?"

সুধীর বলিল, "না, মা, আর যা'ব না।"

পুত্রের কথা অপেক্ষা তাহার কণ্ঠস্বরে কাতরতার অভিব্যক্তিতে মা অধিক বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, বাবা?"

"মা, যদি কিছুই না হয়ে থাকে, তবুও কি মা'র কোলে ফিরে এসে আমি সেখানে স্থান পা'ব না?"

"তোর কি সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ হয়েছে, সুধীর?"

"না, মা, তা' হয়নি। তুমি দুঃখ করেছ, বাবা আমাদের তোমার কাছে রেখে চ'লে যাবার পর হ'তে তোমার ছেলেমেয়ে কেহ কখন তোমার কাছে কোন আব্দার করেনি। আজ মনে কর, আমি একটা অন্যায় আব্দারই করছি। তোমাকে তা'ও পূর্ণ করতে হ'বে।"

মা কান্দিতে কান্দিতে পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। মা'র কাছে সন্তান শিশু।

সুধীরের মনে হইল, মাথার মধ্যে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইতেছে। সে মুখ তুলিয়া মা'কে বলিল, "মা, আমি জানি, তুমি আমার অপরাধও ক্ষমা করবে। কিন্তু,মা, যিনি বেঁচে থাকলে মহেশ বাবুর অনুরোধ কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না, তোমরা এই কথা বলাতেই আমি মহেশ বাবুর প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিনি, তাঁ'র কাছে সে ক্ষমা চাহিতে পারলাম না এ-ই আমার বড় দুঃখ।" তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল। দীর্ঘ দিনের সংযমদমিত বেদনা আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল।

মা তখনও কান্দিতেছিলেন। তিনি পুত্রকে সান্ত্বনা দিলেন, "বাবা, তোরা ত জানিস, আমিও তোদের তাঁ'র মত ভালবাসতে পারিনি। তিনি তোর কোন কাযে রুষ্ট হ'তে পারেন না।"

সুধীর একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল, "মা, মহেশ বাবু বলেছিলেন, বাবার পৌত্র—তাঁ'র দৌহিত্র বাবার সাহায্যে তাঁ'র সংগৃহীত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'বে—এই তাঁ'র বিশেষ ইচ্ছা। সে তাঁ'র সে ইচ্ছা পূর্ণ করুক—আমি—তা'র বাবা—এই আশীর্ব্বাদ তা'কে করছি। তুমিও আশীর্ব্বাদ কর, সে সৎ ও সুস্থ থেকে তাঁ'র সে ইচ্ছা পূর্ণ করুক। আমি গরিবের ছেলে, আমার সম্পত্তির লোভ যেন না হয়। যদি কখন তা'র কোন প্রয়োজন হয়, তা'র বাবা, তা'র জ্যেঠা বুকের রক্ত দিয়ে তা'র কল্যাণ সাধন করবে।"

কিরূপ অবস্থায় সুধীর এইরূপ চঞ্চল হইতে পারে—কিরূপ ঘটনায় পর্ব্বত আন্দোলিত হয় তাহা মা-ও বুঝিলেন—সুধীরও বুঝিল। তাঁহারা সুধীরকে সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিলেন না।

সে রাত্রিতে মা ঘুমাইতে পারিলেন না—নানা অস্পষ্ট আশঙ্কায় তাঁহার মন চঞ্চল হইতে লাগিল। তিনি স্বামীর কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন—তিনি জীবিত থাকিলে আজ এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নিশ্চয়ই করিতে পারিতেন। তিনি যে স্থানেই কেন থাকুক না, যে সন্তানদিগকে প্রাণাধিক মনে করিতেন, আশীর্ব্বাদের দ্বারা কি তাহাদিগের সকল অমঙ্গল দূর করিবেন না? তিনি দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এ বিপদ যেন বালার্ককিরণে অন্ধকারের মত দূর হইয়া যায়।

প্রত্যূষে তিনি স্নান শেষ করিয়া আসিয়াই শুনিলেন, সুধীর তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিতেছে, সে কি তাহার সহিত বেড়াইতে যাইবে?

মা যখন তাহার নিকটে আসিলেন, তখন ছায়াও তথায় আসিয়াছে।

ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো, একটু দেরী করুন, আমি ওর মুখ-হাত-পা ধু'য়ে দিচ্ছি।"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "সে হ'বে না। তুমি কি মনে কর, ওর আর কেহ নাই যে, ওর মুখ-হাত-পা ধু'য়ে দিতে পারে?"

মা বলিলেন, "কোথায় যাবি, বাবা?"

সুধীরও আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে যে দুই কারণে তখন বাড়ীতে থাকিবে না স্থির করিয়াছিল, তাহা বলিল; তাহার পর বলিল, সে প্রভানাথের কাছে যাইবে; চিত্রাকে দেখিয়া প্রভানাথের সহিত গোটা-কতক কথা বলিয়া সেই দিনই বাহিরে যাইবে—কোথায় যাইবে তাহা প্রভানাথকে বলিয়া যাইবে।

সে যাহা বলিল, তাহাই করিল। মা'কে ও দাদাকে প্রণাম করিয়া—কুকুরটাকে আদর করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

প্রভানাথকে সে তাহার সঙ্কল্পের কথা বলিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার স্থির হয়ে পরামর্শ করবার আছে। আমি আজই পলাব—যদি দার্জ্জিলিং যাই, তুমি দুই তিন দিনের মধ্যে যেতে পারবে?"

চিত্রা শুনিয়া বলিল, "পারতেই হ'বে।"

প্রভানাথ বলিল, "এখনও সময় আছে, আমি সব কাযের ব্যবস্থা ক'রে আজ তোমার সঙ্গেই যা'ব। কারণ, দিন পাঁচেক পরে কতকগুলা কায পড়বে।"

সে চিত্রাকে বলিল, "আমার জিনিষ সব গুছিয়ে দাও। সব দু' দফা দিও—কাপড়, জামা, কম্বল সব—সুধীর ত কিছুই আনে নাই।"

সুধীর ভগিনীকে বলিল, "দিদি, মা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছেন; তুই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আজ এক বার তাঁ'র কাছে যাস।"

স্থির হইল, প্রভানাথ তখনই বাহির হইয়া যাইয়া সব কাযের ব্যবস্থা করিয়া আসিবে; আহার করিয়া সব জিনিষ লইয়া সুধীর যাইয়া ষ্টেশনে "ওয়েটিং-রুমে" তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে, উভয়েই দার্জ্জিলিং যাইবে।

প্রভানাথ চিত্রাকে বলিল, যদিও সুধীরের ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য অসাধারণ, তবুও আঘাতের ফল একটু দূর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে একক ছাড়িয়া না দেওয়াই ভাল। সে তাহার সঙ্গেই যাইবে। সে আরও বলিল, চিত্রা যেন পিত্রালয়ে যাইয়া এ সংবাদ দেয় এবং সুধীরকে শনিবারে যাইতে বলে—তিন জন পরামর্শ করিবে; ইতোমধ্যে কলিকাতায় যাহা হয়, সে সংবাদও তাহারা সুধীরের নিকট পাইবে এবং তাহাও জানা প্রয়োজন।

সুধীর মনে করিল, মহেশচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া যাওয়া তাহার কর্ত্তব্য। সে প্রভানাথের গৃহ হইতে পত্র লিখিয়া প্রভানাথের কর্ম্মচারীকে তাহা মধ্যাহ্নের পর যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতে বলিল।

আহারের পরই সুধীর বাহির হইল ; ভয়—পাছে বিলম্ব হইলে মহেশচন্দ্র আসিয়া পড়েন।

১১

নারায়ণীর আহ্বানে মহেশচন্দ্র তাঁহার নিকট আসিলেন এবং আসিয়াই বলিলেন, "সুধীর কাল যাবার সময় টেবলের চাবী দ্বারবানের কাছে রেখে—আমাকে দিতে ব'লে গেছেন। ব্যাপারটা কি হ'ল, বুঝতে পারছি না।"

"সেই কথা বলবার জন্যই তোমাকে ডেকেছি।"

তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া মহেশচন্দ্রের বসিবার জন্য একখানি চেয়ার দিতে বলিলেন এবং সে চেয়ার লইয়া আসিলে তাহাকে যাইতে বলিলেন। তাহার পর তিনি পূর্ব্বদিনের ঘটনার বিবরণ যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, জানাইলেন। মহেশচন্দ্র যেন প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া সেই অপ্রত্যাশিত বিবরণ শুনিলেন—নারায়ণীর কথা শেষ হইলেও কয় মিনিট তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না, তাহার পর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে সুমতি ও সরমা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

মহেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইবার পর ভৃত্য আসিয়া বলিল, তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত।

মহেশচন্দ্র যে কক্ষে আহার করিতেন, সেই কক্ষে গমন করিলেন। নারায়ণী সঙ্গে গমন করিলেন।

মহেশচন্দ্র আহার করিতে বসিলেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ যে আহার্য্য গ্রহণ করিতেন, তাহার অর্দ্ধাংশও আহার করিতে পারিলেন না। নারায়ণী পুত্রকে কখন এত চিন্তাকুল—এত চঞ্চল দেখেন নাই।

সত্যব্রত নিদ্রা-ভঙ্গের পর হইতে বহু বার পিতার সন্ধান করিয়াছে; সে আসিয়া নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বড়মা, বাবা কই ?"

মহেশচন্দ্র বলিলেন, "চল, দাদু, আমরা তা'কে আন্‌তে যা'ব।"

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এখনই যা'বে ?"

"প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হ'বে। কতকগুলা স্বাক্ষর করবার—চিঠিগুলা দে'খে উত্তর দেবার আছে। সুধীর কাযটা যে অনেক বাড়িয়েছেন। তুমি যা'বে ?"

"হাঁ।"

"তবে তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে লও।"

নারায়ণী তাড়াতাড়িই শেষ করিয়া লইলেন। তিনি পুত্রবধূর ও সরমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং দাসী আসিয়া যখন জানাইল, তাঁহার রন্ধনশালার উনানে অগ্নি জ্বালিত হইয়াছে, তখন তাহাকে বলিলেন, "আঁচ নামিয়ে দাও, আমি আজ রাঁধব না।"

সুমতি বলিলেন, "খা'বেন না ?"

নারায়ণী বলিলেন, "না, মা। আজ আর রাঁধতে পারব না।" তাহার পর যেন অন্যমনস্কভাবেই তিনি চিন্তাকুলভাবে বলিলেন, "মহেশ খেতে পারলে না। ওকে এমন চিন্তিত আমি কখন দেখি নাই।"

সুমতি তাড়াতাড়ি যাইয়া গরদের কাপড় পরিধান করিয়া—গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শাশুড়ীর জন্য ফল ছাড়াইয়া—ফল, মিষ্ট ও দুগ্ধ দিলেন।

নারায়ণী বলিলেন, "এত আয়োজন কেন ?" তিনি অধিকাংশ আহার্য্য পাত্রান্তরে রাখিয়া কিছু আহার করিলেন।

বেলা একটার সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মহেশচন্দ্র বাহিরে যাইবেন—মা'কে আর খোকা বাবুকে যাইতে বলিয়াছেন।

নারায়ণী সত্যব্রতকে সঙ্গে লইয়া দেবতা স্মরণ করিয়া পুত্রের সহিত বন্ধু মহাশয়ের গৃহাভিমুখগামী হইলেন।

মহেশচন্দ্রের মুখে দারুণ উদ্বেগের বিকাশ। তিনি জীবনে কোন কাযে পরাজয় লাভ করেন নাই—এ বার কি তাঁহার পরাজয় হইবে ? এ পরাজয় যে সর্ব্বনাশ!

গাড়ী গৃহদ্বারে উপনীত হইলে ভৃত্য যাইয়া মা'কে সংবাদ দিল—ছোটদাদা বাবুর শ্বশুর, তাঁহার মাতা ও ছোটদাদা বাবুর পুত্র আসিয়াছেন।

নারায়ণীর পূর্ব্বেই ছায়া আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সত্যব্রতকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায় ?"

ছায়া বলিল, "বেড়াতে গেছেন।"

"আসবেন ?"

"হাঁ।"

ছায়া তাহাকে অন্য কথায় ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুধীরের মাতা আসিয়া নারায়ণীকে প্রণাম করিলে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, সুধীর কোথায় ?"

মা বলিলেন, "কাল সন্ধ্যার সময় হঠাৎ এসেছিল। আজ সকালেই চলে গেছে।"

"কোথায় গেল ?"

"তা' বললে না।"

"তুমি জিজ্ঞাসা কর নাই ?"

"না, মা। তা'র ভাব দেখে আমি যেমন কি হয়েছে, তা'ও জিজ্ঞাসা করি নাই, তেমনই আজ সকালে যখন সে বলল, কোথায় যা'বে তাহা আমাদিগকে এখন বলবে না, তখন আমিও আর জানতে জিদ করি নাই।"

"নিজের কথা কিছুই বলে নাই ?"

"না।"

সুধীরের আগমন হইতে তাহার গমন পর্য্যন্ত সে যাহা বলিয়াছিল, মা যথাসম্ভব সে সবই বলিলেন—বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলেন।

নারায়ণীও কাঁদিতে লাগিলেন।

সত্যব্রত ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "সকলেই কাঁদে কেন ?"

ছায়া সে প্রশ্নের কি উত্তর দিবে ?

মা যে পুত্রকে তাহার কার্য্যের কারণও জিজ্ঞাসা করেন নাই, তাহাতে মহেশচন্দ্রের মনে তাঁহার প্রতি যেমন শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল, তেমনই তাঁহার কথা শুনিয়া সুধীরের সম্বন্ধে তাঁহার প্রশংসা আরও বর্দ্ধিত হইল। সে অনিচ্ছায় হইলেও কি ভাবে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

নারায়ণী সুধীরের মাতাকে বলিলেন, "বৌমা, কি হয়েছে,

তা' ঠিক আমরাও বুঝতে পারি নাই—সেই জন্তই কি করব তা'ও বুঝতে পারছি না। তুমি সুধীরকে বলবে—যদি সরমা কোন অপরাধ করে থাকে, তবে আমি তা'র হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি—সে আমাকে ক্ষমা না ক'রে পারবে না।"

মা বলিলেন, "মা, ও কথা আপনি বলবেন না। আপনি ক্ষমা চাইলে সুধীরের অকল্যাণ হ'বে। সে গুরুজনের কথার অবাধ্য হয় না। এ বিবাহে সে প্রথমে একরূপ আপত্তিই করেছিল; কিন্তু যিনি থাকলে আজ হয়ত এমন হ'ত না, তিনি বেঁচে থাকলে ঠাকুর-পোর কথায় অসম্মত হ'তে পারতেন না—এই কথাতেই সে আর আপত্তি করেনি।"

"তোমার ছেলেদের মত ছেলে লাখে একটি দেখা যায় না, মা। সুধীর এলেই তুমি আমাকে সংবাদ দিও।"

"তা' দেব।"

মহেশচন্দ্র এত ক্ষণ কোন কথা বলেন নাই, এইবার বলিলেন, "সুধীর যদি পারে কাল যেন এক বার আমার সঙ্গে দেখা করে।"

তাহার পর তাঁহারা গমনের উত্যোগ করিলেন।

নারায়ণী ছায়াকে বলিলেন, "মা, সতুকে একটু মিষ্টি এনে দাও।"

সুধীরের পুত্রকন্তা সত্যব্রতের জন্ত আপনাদিগের খেলানার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ আনিয়া দিল। মা তাহাকে লইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আবার কবে আসবে ?"

সত্যব্রত বলিল, "বাবার সঙ্গে আসব।"

যাইবার পথে মহেশচন্দ্র প্রভানাথের গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় যখন শুনিলেন, প্রভানাথ সুধীরের সঙ্গে গিয়াছে, তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। মনের বর্ত্তমান অবস্থায় সুধীর একা যাইলে তাহাতে যে আশঙ্কার কারণ ছিল—তাহাই তিনি এত ক্ষণ মনে করিতেছিলেন।

মহেশচন্দ্র প্রভানাথের গৃহ হইতে আসিয়া গাড়ীতে বসিলে নারায়ণী যেন অন্তমনস্কভাবে বলিলেন, "সবই আমাদের অদৃষ্ট!" বলিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া মহেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। অদৃষ্ট! তিনি কোন দিন পুরুষকার ব্যতীত কিছু স্বীকার করেন নাই। আজ তাঁহার মনে হইল, তিনি স্বীকার না করিলেও যে অনেক ব্যাপার ঘটিতে পারে—তাহার প্রমাণ তিনি আজই পাইয়াছেন—তেমনই কি অদৃষ্ট আছে ? তাহার পর—যদি অদৃষ্ট থাকে, তবে এত দিন সে তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া এই বার কি সে অনুগ্রহে তাঁহাকে বঞ্চিত করিল ?

গৃহে আসিয়া তিনি সুধীরের পত্র পাইলেন :—

প্রণামান্তে নিবেদন,

আপনি আমাকে যে কাযের ভার দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম, আমি তাহার উপযুক্ত নহি। তাহা বুঝিবার পর আর সে কাযের ভার লইয়া থাকা যেমন আত্মপ্রবঞ্চনা—তেমনই আপনার মত স্নেহশীল অভিভাবকের সহিত অন্তায় ব্যবহার—সুতরাং অপরাধ। তাই আমি সে কাযের ভার ত্যাগ করিলাম। সে জন্য আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমরা দুই ভ্রাতা পিতৃহীন হইবার পর হইতে আপনি যে স্নেহে আমা-দিগের অভিভাবকত্ব করিয়াছেন, সেই স্নেহে নির্ভর করিয়া আশা করিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনাকে অসুবিধায় ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম, সে জন্য এবং আসিবার সময় যে আপনা-দিগকে প্রণাম করিয়া আসি নাই, সে জন্য আমার অপরাধও ক্ষমা করিবেন। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। কাযের হিসাব ও অন্যান্য কাগজ যথাস্থানে আছে।

প্রণত

সুধীর

মহেশচন্দ্র পত্রখানি পাঠ করিলেন। যে অবসাদ তাঁহাকে অভিভূত করিল, তাঁহার মনে হইল, তিনি আর কখন তাহা অনুভব করেন নাই। তিনি কায সম্বন্ধেও আপনার ভুল বুঝিলেন। কাযের জন্ত কাযে যে আনন্দ থাকে, তাহা স্থায়ী হয় না। কোন চিত্রকর আপনার চিত্র দেখিয়া আনন্দ লাভের জন্তই চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না; কোন স্থপতি তাহার কৃত মূর্ত্তির দর্শন-তৃপ্তির জন্ত কায করিতে পারে না; তাহাদিগের কার্য্যের প্রেরণা—তাহাদিগের ভাবে ভাবিত কোন বা কোন কোন দর্শক সে সকল দেখিয়া তাহারা ঐ কাযে যে আনন্দ লাভ করিয়াছে, সেই আনন্দই পাইবে। তিনি দরিদ্রের সন্তান, প্রথমে যে কাযেই অখণ্ড মনোযোগ দিয়াছিলেন, তাহা দারিদ্র্য জয় করিয়া অভাব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ত। তাহার পর তাঁহার উদ্দেশ্যের বিস্তার সাধিত হইয়াছিল—অভাব আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না জানিয়াও যে তিনি কায করিয়া গিয়াছেন—অথচ কাযকে ভার বলিয়া মনে করেন নাই, সে কেবল কাযের অভ্যাসে ও আনন্দেই নহে। আজও যে তিনি কায ত্যাগ করিতে পারেন নাই তাহার যে কারণ এত দিন তিনিও, তাহার অস্পষ্টতা হেতু, বুঝিতে পারেন নাই, তাহা সুধীরের মাতাকে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—তাঁহার দৌহিত্র তাঁহার অর্জ্জিত ও সঞ্চিত সম্পত্তি লাভ করিবে—এই আশা ও কল্পনা তাঁহার পক্ষে আনন্দের কারণ ছিল। সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতেছিল—সে আশা ফলবতী হইতেছিল। সেই সময় এই অতর্কিত ঘটনার সংঘটন। মানুষের সকল কার্য্যের পূর্ণতার উপর যে বজ্রগর্ভ মেঘ যে কোন মুহূর্ত্তে বজ্রাঘাত করিয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিতে পারে, তাহা তিনি এত দিন ভাবেন নাই—কিন্তু আজ তাহাই অনুভব করিলেন। সেই অনুভূতিও তাঁহাকে দারুণ অবসাদগ্রস্ত করিল। যিনি জীবনে কখন কোন কাযে বিফল-প্রযত্ন হয়েন নাই, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে হতাশ হওয়া যে কিরূপ বেদনার কারণ, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না।

১২

চিত্রার নিকট প্রভানাথের প্রেরিত সংবাদ পাইয়া সুধীর আর শনিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল না। কারণ, সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। সে কলেজে ছুটী লইয়া পরদিনই যাত্রা করিল। তাহারা কোথায় উঠিবে, তাহা প্রভানাথ বলিয়া গিয়াছিল।

দার্জ্জিলিং-এ তিন জন পরামর্শ করিল। সুধীর বলিল, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে চিন্তা করিয়া স্থির করা যাইবে, আপাততঃ বর্ত্তমানের ব্যবস্থা করা যাউক। সে বলিল, সে হুগলী কলেজে ছয় মাসের জন্য অধ্যাপকের পদ পাইতে পারে;

তাহার প্রস্তাব, সে সেই পদ গ্রহণ করুক এবং তাহারা সকলে তথায় গমন করুক।

সুধীর বলিল, "দাদা, সরকারী কলেজে চাকরী তুমি পূর্ব্বেও পেতে পারতে—লও নাই; কারণ, সরকারী চাকরীর বিধিনিষেধ আমাদের রাজনীতিক মতের পক্ষে বাধা হ'তে পারে। আজ তুমি আমার জন্যই সে চাকরী নেবে?"

সুধীর দৃঢ়ভাবে বলিল, "হাঁ। তুমি আমার ছোট ভাই—তোমার সম্বন্ধে আমার কি কোন কর্ত্তব্য নাই? আমি স্থায়ী চাকরী নিচ্ছি না। বর্ত্তমানে দেশে এমন কোন রাজনীতিক অবস্থা দেখা যাচ্ছে না যে, সে জন্য কোন অসুবিধা হ'তে পারে।"

"কিন্তু তোমার সরকারী চাকরী না নেবার কি আর একটা কারণ ছিল না?"

"ছিল। বাবা যে বাড়ী করেছিলেন—আর যে বাড়ীতে তাঁ'র মৃত্যু হয়ে'ছিল, সে বাড়ী ছাড়তে মা'র কষ্ট হ'বে, তিনি না বললেও আমরা এই অনুমান ক'রেছিলাম। কিন্তু সে কথা যখন হয়েছিল, তখন আজ যে কথা উঠ্ছে, সে কথা উঠেনি। তখন কলিকাতা হইতে দূরে গেলে, তুমিও দূরে পড়তে! সদাসর্ব্বদা—ইচ্ছামত আসতে পারতে না। এখন আমরা দু'জনেই তাঁ'র কাছে থাকব। প্রথম দিনকয়েক চিত্রাও যাবে।"

প্রভানাথ হাসিয়া বলিল, "এ যে 'ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়!' আমাকে আবার হুগলী আর ঘর করা'বে কেন?"

তিন জন আলোচনা করিয়া আপাততঃ সুধীরের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা করাই স্থির করিল। সুধীর ও প্রভানাথ উভয়েরই বিশ্বাস হইল—ব্যবস্থা অস্থায়ী হইবে। যে কয় মাস এই ব্যবস্থা থাকিবে, সে কয় মাস বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য ও দ্বারবান বাড়ীতে থাকিবে।

অনন্যোপায় হইয়া সুধীর এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিল এবং আবশ্যক আয়োজন করিবার জন্য সুধীর কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

সুধীর চলিয়া যাইবার পর প্রভানাথ সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করবে—ভেবেছ?"

সুধীর বলিল, "ভাবছি, আবার আইন পড়ব।"

"আবার কেঁচে গণ্ডুষ করবে? ক' বৎসর এত পরিশ্রম ক'রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করলে, তা' ব্যর্থ হ'বে?"

"কিন্তু উপায় কি?"

"আমি ভাবছি, তুমি যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও, তবে কেমন হয়?"

সুধীর ভাবিতে লাগিল। সুধীর বলিল, "আমার দাদা-মহাশয় বলতেন, সেকালে দাশরথি রায়ের পাঁচালী গান হ'ত—দাশরথি বলতেন, 'আমি যদি ছড়া বাঁধি, তিনু যদি গাহে, আর সন্ন্যাসী যদি বাজায়—তবে কে আঁচলে পয়সা নিয়ে যায় দেখি।' তিনু তাঁ'র ভাই, আর সন্ন্যাসী বেহালা বাজাতেন। তখন স্ত্রীলোকরা আঁচলে পয়সা বেঁধে গান শুনতে আসতেন, গান ভাল লাগলে—পয়সা 'পেলা' দিতেন। তেমনই আমরা শালা-ভগিনীপতি এক সঙ্গে জুটলে পুকুর পর্য্যন্ত চুরী হয়ে যা'বে।"

সুধীর তাহার পর বলিল, "দাদা কলিকাতায় ফি'রে আসবেন—আমার সে ইচ্ছা নাই।"

"কেন? তুমি কি ভাব, মেঘ হ'লে আর সূর্য্যের কিরণ তখন দেখা যা'বে না? স্বপ্নেও মনে ক'র না, সরমার মনে অনুতাপ তা'র প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করবে না। আগুনে না পুড়ালে সোণার ময়লা দূর হয় না—মানুষেরও তেমনই মধ্যে মধ্যে অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন হয়। মহেশ বাবুর ঐ কায তোমাকেই করতে হ'বে—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি।"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "ব্যবসায় বহর বাড়ছে না কি? দৈবজ্ঞ হ'লে কবে?"

"তোমার জন্য—এই ক' দিন হ'ল, তা' হয়েছি। আমার মত দৈবজ্ঞরা 'ভৃগুর' নাগাল পা'ন না—বর্ত্তমান দেখে আন্দাজে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।"

"বর্ত্তমানে কি দেখলে?"

"জান না—ইংরেজীতে একটা কথা আছে; সন্তানই মা'র নোঙ্গর—সে নোঙ্গর থাকতে মা'র পক্ষে 'নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু।' ছেলের জন্যই সরমার পরিবর্ত্তন হ'বে—গর্ব্ব চূর্ণ হ'বে। তুমি কি মনে কর, তোমার ছেলে তুমি বিলিয়ে দিতে পার? সতুর উপর মা'র, বড় বাবুর, চিত্রার—সকলেরই অধিকার আছে—আমাদের অধিকার আমরা ছাড়ব না। আমরা তোমার মত কাপুরুষ নহি। ও বানের জলে ভেসে আসেনি—ও মহেশ বাবুর দৌহিত্রই নহে—ও বসু মহাশয়ের পৌত্র।"

দেহের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও কোমল সেই অংশে আঘাত যেমন অত্যধিক বেদনাদায়ক হয়, তেমনই মনের যে স্থানে দৌর্ব্বল্য অধিক সেই স্থানে আঘাত মানুষকে চঞ্চল করে। প্রভানাথের কথায় সুধীরের তাহাই হইল। পুত্রের প্রতি তাহার স্নেহ অধিকই ছিল এবং সে মহেশচন্দ্রের গৃহ হইতে চলিয়া আসিবার পর পুত্রের কথা সর্ব্বদাই তাহার মনে হইত। পিতার অপরিসীম স্নেহে বঞ্চিত—সুধীর তাঁহার অপত্যস্নেহ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল এবং পুত্রকে সে কত যত্নে "মানুষ করিতে" চেষ্টা করিত, তাহা তাহার মহেশচন্দ্রের গৃহত্যাগের কারণেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল।

সুধীর আর কিছু বলিল না—সে ভাবিতে লাগিল।

কাযের জন্য সুধীরের গমনের দুই দিন পরেই প্রভানাথকে দার্জ্জিলিং হইতে যাইতে হইল।

প্রভানাথ যাইবার পর সুধীরের ভাবিবার অবসর আরও বৃদ্ধি পাইল। সে ভাবিতে লাগিল, সে আপনি সুখী হইতে পারিল না—সে জন্য সে কাতর নহে; কিন্তু তাহার জন্য যে মা গৃহত্যাগ করিয়া যাইবেন, ভ্রাতা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কায করিতেছেন—এই সব তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল।

তিন দিন পরে সুধীর লিখিল, সে হুগলী কলেজে অধ্যাপকের কায লইয়াছে—কর্ম্মস্থানে গঙ্গার তীরে একটি গৃহও ভাড়া করা হইয়াছে—আবশ্যক দ্রব্যাদি তথায় পাঠান হইতেছে; সে আসিয়া সেই দিনই তথায় যাইতে পারে।

পত্র পাইয়া সুধীর যাত্রা করিল।

এ দিকে প্রভানাথ ও সুধীর যাইয়া মহেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহারা যে ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা বলিল। সুধীর বলিল, "মা আপনাকে এ সব জানাতে বলেছেন।"

মহেশচন্দ্র বলিলেন, "সুধীর এলে আমাকে সংবাদ দিও।"

প্রভানাথ বলিল, "আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি একটা কথা বলব?"

? বল।"

"আমার মনে হয়, এখন সুধীরকে কোন কথা না বলাই ভাল। যে স্বভাবতঃ স্থির ও ধীর, সে যদি বিক্ষুব্ধ হয়, তবে আবার স্থির হ'তে বিলম্ব হয়। কালেই সে বিক্ষোভ দূর হয়। অবশ্য আপনার কাছে আমরা ছেলেমানুষ। আপনি যদি বলেন, আমরা আপনাকে সংবাদ দেব। সে আপনার কথা অবহেলা করবে না; কিন্তু যদি করে, আমাদের সে দুঃখ রাখবার আর স্থান থাকবে না।"

মহেশচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তা'ই হ'বে।"

সুধীর বলিল, "মা, প্রভানাথ, আমি—আমরা সুধীরকে বুঝাব, তা'র যে ভুল হ'তে পারে না এমন নহে। আপনি ঠাকুরমা'কে বলবেন, তিনি যেন সুযোগ ও অবসর বুঝে সরমাকে বুঝান—সে যদি ভুল করে থাকে, স্বামীর কাছে তা' স্বীকার করায় কোন বাধা থাকতে পারে না; আর সুধীর যদি ভুল ক'রে থাকে, তবে তাঁকেই তা'কে ক্ষমা করতে হ'বে—তা'তে তাঁ'রই অধিকার।"

সুধীর সত্যব্রতের জন্য খেলানা প্রভৃতি আনিয়াছিল; তাহাকে আনাইতে বলিল।

ভৃত্য যাইয়া যখন বলিল, সুধীর ও প্রভানাথ আসিয়াছেন এবং সত্যব্রতকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন, তখন নারায়ণী তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তাহারা যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য সত্যব্রতকে লইয়া আসিলে সুধীর তাহাকে আপনার অঙ্কে বসাইয়া আদর করিল—তাহার জন্য আনীত দ্রব্যগুলি তাহাকে দিল।

সরমা পার্শ্বের কক্ষে ছিল। সত্যব্রত তথায় যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, জেঠাবাবু অনেক জিনিষ দিচ্ছেন। নেব?"

সরমা, "নাও," বলিলে সে সেগুলি আনিতে গেল।

সুধীর তাহাদিগের যাইবার ব্যবস্থার কথা বলিল; তাহার পর সে আসিবার পূর্ব্বে মহেশচন্দ্রকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই নিবেদন করিল।

পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে সরমা সে সব কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। সে আরও শুনিল, প্রণাম করিয়া যাইবার সময় প্রভানাথ নারায়ণীকে বলিয়া গেল, "আপনি ভাল ক'রে বুঝাবেন—যত দিন যা'বে তত ব্যবধান পড়বে—জিনিষটা জটিল হ'বে। নদীতে চড়া এক বার পড়লে, তা' বেড়েই যায়।"

সুধীর সত্যব্রতকে ডাকিল এবং সে আসিলে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া যাইয়া মহেশচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তাহাকে তাঁহার কাছে দিল।

সুধীর ও প্রভানাথ চলিয়া গেল।

১৩

সুধীর চলিয়া যাইবার পর প্রথমে সরমার বড় রাগ হইল—সে রাগ সে আপনি ব্যতীত আর সকলের উপর। প্রথম রাগ সুধীরের উপর—এমন কি হইয়াছে, যে তাহার জন্য এত "ঢলাঢলি" করা? সে আপনার কোন অপরাধ দেখিতে পাইল না—সব অপরাধ সুধীরের। সামান্য একটা চাকরের ব্যবহার লইয়া কথান্তর, তাহা লইয়া তিলে তাল করা কি শিক্ষিত মানুষের শিক্ষার উপযোগী কায? তাহার পর রাগ পিতামহীর উপর—এত "কান্নাকাটি" কিসের জন্য? যেন মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! তিনিই ত ব্যাপারটাকে—পরকলার মধ্য দিয়া দৃষ্ট জিনিষের মত বড় ভাবিয়া এত কাণ্ড করিলেন! বৃদ্ধ হইলে বুঝি এমনই হয়! তাহার পর তাহার রাগ মাতার উপর—তিনি ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত না করিয়া যেন দেখিতেই জানেন না! আর তিনি উঠিতে বসিতে তাহাকে যে বাক্যযন্ত্রণা দিচ্ছেন, অন্য সময় হইলে সে তাহা কখনই সহ্য করিত না—প্রতীকার করিত। কিন্তু যাঁহাকে বলিলেই প্রতীকার হইত, তিনিও সকলের প্রভাবে প্রভাবিত হইলেন! সেই জন্য তাহার রাগ পিতার উপর। তবে সে ক্ষেত্রে ক্রোধের সঙ্গে অভিমান মিশ্রিত ছিল। তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ—আহারে যেন রুচি নাই, কোন কাযে যেন মনোযোগ নাই! যিনি দ্বারে বা জানালায় এতটুকু ধূলা সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি এখন মেঝের মর্ম্মর প্রস্তরে দাগও যেন দেখিয়াও দেখিতে পায়েন না! আর তাহার রাগ পুত্রের উপর—সে যেন আর সে ছেলে নাই! দারুণ বসন্ত-রোগে যেমন সন্তানের আকৃতি এমনই পরিবর্ত্তিত হয় যে, মাতাও সন্তানকে দেখিলে চিনিতে পারেন না, তেমনই মানসিক পরিবর্ত্তনের ফলে সত্যব্রত যেন আর সে সত্যব্রত ছিল না। যে বয়সে প্রফুল্লভাব ও চাঞ্চল্য স্বাভাবিক, সেই বয়সে বিমর্ষভাবের ও গাম্ভীর্য্যের অস্বাভাবিক সমাবেশ তাহাকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। সরমা ভাবিত, এটুকু ছেলে—উহার অত বাড়াবাড়ি!

অল্প দিনেই সরমার ভাবের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল—যেন "সারানী ভাঁটায়" নদীর জল সরিয়া যাইতে লাগিল। পুত্রকে উপলক্ষ করিয়াই সে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল।

এক দিন সে শুনিল, নারায়ণী মহেশচন্দ্রকে বলিতেছেন, "মহেশ, ছেলেটাকে লক্ষ্য করছ?"

মহেশচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ।"

"দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে—মুখে হাসি নাই, চুপ ক'রে বসে থাকতেই যেন ভালবাসে। বাপের মত 'চাপা' হয়েছে—কোন কথা 'ফুটে' না। তুমি এক বার ডাক্তারকে আসতে বল। যে রকম হচ্ছে, তা'তে একটু অসুখ হ'লে বিপদ ঘটবে।"

মহেশচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা।"

নারায়ণী বলিলেন, "মেয়েকে কোন কথা বলা বৃথা—যেন কিছুতেই চৈতন্য নাই। লোক বলে, ছেলেকে আদর দিতে নাই, তা'কে খেটে খা'বার মত করতে হয়। আমি বলি, ছেলে ত নিজের কায নিজে বেছে নেবে—মেয়েকে আদর দিলেই বেশী বিপদ—তা'র ভাগ্য পরের হাতে। বৌমা'কে কিছু বল্‌লে তিনি কেবল কাঁদেন—বাছা যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।"

ডাক্তার আসিলেন; বলিলেন, কোন রোগ নাই, কিন্তু দুর্ব্বল। তিনি দীর্ঘ প্রেশক্রিপশন লিখিলেন এবং খাবারের একটা ততোধিক দীর্ঘ "চার্ট" করিয়া দিলেন। নারায়ণী ও সুমতি পরামর্শ করিয়া ঔষধ ও পথ্য প্রদানের ভার সরমাকে দিলেন।

পিতামহীর কথায় ও ডাক্তারের ঔষধ-পথ্যের ফর্দ্দে, সরমার মনে শঙ্কার উদয় হইল। অথচ ঔষধে ও পথ্যে পুত্রের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না; তাহার কারণ, অসুখ দেহে নহে—মনে।

চিন্তার গতি-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরমার মনের কঠোর ভাব

কোমল হইয়া আসিল। যে কর্ত্তব্যে—মা'র কর্ত্তব্যে সে গুরুত্বারোপ করে নাই, এখন সে তাহার গুরুত্ব অনুভব করিল—নারীর বৈশিষ্ট্য সে আর উপেক্ষা করিতে পারিল না।

পিতার ব্যবহারের স্বরূপ সে তখন উপলব্ধি করিল—তিনি কখন বিচলিত হয়েন নাই, কিন্তু এ বার তিনিই বিচলিত হইয়াছেন। সে তাহার জন্য এবং তাঁহার সেই ভাবেই তাহার অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সে পিতার জন্যও চিন্তিত হইল। সে-ই তাঁহার পীড়ার কারণ।

ইহার পর পিতামহীর ও মাতার উপর তাহার ক্রোধ দূর হইতে বিলম্ব হইল না। তাঁহারা তাহার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছেন—সে-ই তাঁহাদিগের স্নেহের একমাত্র অবলম্বন।

নারায়ণী সরমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতেন। এক দিন শেষ রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি শুনিলেন, সরমা মৃদুস্বরে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ঘুম হচ্ছে না, সতু?" সত্যব্রত বলিল, "হবে, মা।" তাহার পর সে বলিল, "মা, বাবা কি নাই?" যে দিন সে তাহার পিতৃগৃহে নারায়ণী, তাহার পিতামহী, ছায়া— সকলকে কান্দিতে দেখিয়াছিল, সেই দিন হইতে যেন কোন অভাব, আশঙ্কা ও সন্দেহ তাহার শিশু-মন পীড়িত করিতেছিল। তাহার কথায় তাহাই বিকাশ পাইল। সরমা বলিল, "ও কথা বলতে নাই, সতু।—" সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার কথা বলতে নাই?" সরমা সে কথার কোন উত্তর দিল না—পুত্রকে বুকে টানিয়া লইল। নারায়ণীর মনে হইল, সে কান্দিতেছিল। তিনি কোন কথা বলিলেন না। পরদিন তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সরমার উপাধানে অশ্রুর চিহ্ন। তিনি মনে করিলেন, সুলক্ষণ।

সেই অশ্রুতে সুধীরের প্রতি সরমার রাগ নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু তখনও অভিমানের তাপ দূর হইল না। সে সুধীরের কথা স্মরণ করিল, "সুধীর যদি ভুল ক'রে থাকে, তবে তাঁকেই তা'কে ক্ষমা করতে হ'বে—তা'তে তাঁরই অধিকার।" কিন্তু সে যদি ভুল করিয়া থাকে, তবে তাহাকে ক্ষমা করা—তাহাকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দেওয়াই কি সুধীরের অধিকার নহে। সে অধিকার সুধীর কেন ত্যাগ করিল? সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, সে কি তাহার কাযে কখন সুধীরকে মনে করিবার অবকাশ দিয়াছে—সে তাহার সেই অধিকার স্বীকার করিবে? তবুও সে অভিমান হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত না। সে মনে করিত, সে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে—সত্যব্রত ত কোন অপরাধ করে নাই! বাস্তবিক ভালবাসা যখন পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা অভিমান-মুক্ত হয় না। সে অনুমানও করিতে পারিত না—পুত্রের জন্য সুধীরের মনে কত উৎকণ্ঠা, কত স্নেহ, কত ভাবনা ছিল।

যখন সরমা এই সকল ভাবিত, তখন সঙ্গে সঙ্গে যাইবার সময় প্রভানাথের কথা তাহার মনে পড়িত—"যত দিন যা'বে, তত ব্যবধান বাড়বে—জিনিষটা জটিল হ'বে। নদীতে চড়া এক বার পড়লে তা' বেড়েই যায়।" তাহা আশঙ্কার কারণ। কিন্তু সে কি করিবে—কি করিতে পারে?

মাসান্তে এক দিন সুধীর মহেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত—নারায়ণীকে ও সুমতিকেও প্রণাম করিয়া যাইত; যখনই আসিত, সত্যব্রতের জন্য নানা দ্রব্য লইয়া আসিত। সে সত্যব্রতকে জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা, আমার সঙ্গে যা'বে?" সে কি বলিলেন, না জানায়, সত্যব্রত কোন উত্তর দিতে পারিত না। কিন্তু সরমার মনে হইত, সুধীর তাহাকে এক বার লইয়া যাইলে ব্যবধান দূর হইবার উপায় হয়ত হইত।

প্রভানাথ সুধীরের তুলনায় অধিক আসিত এবং তাহার নিকট সকলে সব সংবাদ পাইতেন।

এইরূপে চারি মাস কাটিয়া গেল—দুশ্চিন্তায় ও আশঙ্কায় কাটিল। নারায়ণী মহেশচন্দ্রকে বলিলেন, তিনি কি এক বার হুগলীতে যাইবেন? মহেশচন্দ্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, প্রভানাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিবেন। নারায়ণী বলিলেন, "সামনে জামাই-ষষ্ঠী—তোমাতে আর আমাতে সুধীরকে আসতে ব'লে আসব. সে কখন 'না' বলতে পারবে না। সে তেমন ছেলে নহে।"

১৪

অমঙ্গলের প্রতীক শকুন যখন আকাশে উড়িতে থাকে, তখন তাহার বিস্তারিত পক্ষের ছায়া যেমন ভূমিতে পতিত হয়, তেমনই যে রোগের ছায়া—গঙ্গার কূলে যে গৃহে সুধীর ছিল সেই গৃহের উপর পতিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে নিবিড় হইয়া যেন মৃত্যুর ছায়ার রূপ ধারণ করিতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ—চিত্রার শাশুড়ী আসিয়া সুধীরের পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া গিয়াছেন—গৃহে কেহ উচ্চ কণ্ঠে কথা বলেন না—চিত্রা আসিয়া রহিয়াছে, প্রভানাথও কখন কখন অল্প সময়ের জন্য সে গৃহ ত্যাগ করে—দুই জন ডাক্তার পর্য্যায়ক্রমে রোগীর নিকট থাকেন—পরামর্শের জন্য অন্য ডাক্তার আনা হইতেছে।

পক্ষকাল পূর্ব্বে সুধীরের জ্বর হইয়াছিল—তখন কেহই সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগদান করেন নাই। সেই জ্বর হইতে ক্রমে উগ্র মেনিনজাইটিশ প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বদিন মস্তক-সঞ্চালন অত্যন্ত অধিক হয় ও রোগীর চেতনালোপ হয়। মেরুদণ্ডে ছিদ্র করিয়া সঞ্চিত তরল পদার্থ বাহির করিয়া দিবার পর জ্ঞান আর ফিরে নাই বটে, কিন্তু চাঞ্চল্য হ্রাস পাইয়াছে—রোগীও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তাররা কোন আশাই দিতে পারিতেছেন না। কলিকাতা হইতে পরামর্শ দিবার জন্য যে ডাক্তার আসিয়াছেন, তিনি রোগীর কক্ষে গিয়াছেন।

গঙ্গার দিকে বাড়ীর যে বারান্দা তাহাতে দাঁড়াইয়া ছায়া ও চিত্রা একটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল।

ছায়া বলিল, "তুমি মত দাও—আমি সরমাকে পত্র লিখে পাঠাই।"

চিত্রা ভাবিতে লাগিল।

ছায়া বলিল, "যা'ই কেন হয়ে থাকুক না—আমরা এ সময় তা'কে সংবাদ না দিয়ে কেমন ক'রে থাকব? তা'র কর্ত্তব্য সে বিবেচনা করবে।"

চিত্রা বলিল, "আমি বারণ করতে পারি না, ছায়া।"

ছায়া তখন প্রভানাথকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, সে সরমাকে এক বার সংবাদ দিবে। শুনিয়া প্রভানাথ মনে করিল, এই ত স্ত্রীলোকের মনোভাব। সে বলিল, "তুমি পত্র লিখে রাখ, আমি ডাক্তারের মোটরেই লোক পাঠাব।" সে ডাক্তারের কাছে রোগীর সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে গেল।

ডাক্তার বলিলেন, তাঁহার বলিবার আর কিছুই নাই—কোন লক্ষণই ভাল নহে, কেবল "নাড়ী"তে এখনও কোনরূপ বিকৃতি দেখা যাইতেছে না—হৃদ্‌যন্ত্র যথারীতি কায করিতেছে।

ডাক্তারের মোটরে প্রভানাথের এক জন দ্বারবান ছায়ার পত্র লইয়া কলিকাতায় গেল।

প্রভানাথের দ্বারবান যখন মহেশচন্দ্রের গৃহে উপনীত হইল, তখন মহেশচন্দ্র আহার করিতে বসিয়াছেন।

এক জন ভৃত্য পত্র লইয়া যাইয়া বলিল, এক জন দ্বারবান দিদিমণির জন্য পত্র লইয়া আসিয়াছে। সে বলিতেছে, পত্র এখনই তাঁহাকে দিতে হইবে। শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন, সরমার পত্র! তাহার কোন পত্র আসিত না—কে লিখিবে? সরমা পত্রখানি লইয়া দেখিল, খামের উপর কেবল তাহার নাম লিখিত "সরমা"; হস্তাক্ষর তাহার অপরিচিত। সে খাম ছিঁড়িয়া পত্র পাঠ করিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—হস্ত হইতে পত্র হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া গেল।

সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। নারায়ণী যাইয়া পত্রখানি কুড়াইয়া লইলেন এবং তাহা মহেশচন্দ্রকে দিলেন। পত্রে লিখিত :—

সরমা,—

আজ পনের দিন ঠাকুরপোর জ্বর—মেনিনজাইটিশ; চৈতন্য নাই। ডাক্তার আর কোন আশা দিতে পারিতেছেন না। হয়ত তুমি এক বার দেখিতে চাহিবে মনে করিয়া তোমাকে সংবাদ দিতেছি। যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, পত্র পাঠ হুগলীতে আসিবে —আর যদি আসা না হয়, দ্বারবানকে ছাড়িয়া দিবে—সে চলিয়া আসিবে।

আমার আর লিখিবার সময় নাই; দেখিতে চাহিলে তোমারও বিলম্ব করিবার সময় নাই।

ছায়া

পত্র পাঠ করিয়া মহেশচন্দ্র উঠিলেন এবং হস্ত ও মুখ প্রক্ষালিত করিতে যাইবার সময় ভৃত্যকে বলিলেন, সে দ্বারবানকে অপেক্ষা করিতে ও ড্রাইভারকে বড় গাড়ী বাহির করিতে বলুক।

নারায়ণী বলিলেন, "আমি যা'ব।"

সুমতি বলিলেন, "আমিও যা'ব।"

মহেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরমা?"

নারায়ণী বলিলেন, "যা'বে।"

"তবে সব চল"—বলিয়া মহেশচন্দ্র আপনার শয়ন কক্ষে যাইয়া লৌহের আলমারী খুলিয়া এক গুচ্ছ কারেন্সী নোট লইয়া নামিয়া আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চরণ কম্পিত হইতেছিল। দ্বারবানের নিকট সুধীরের বাসায় যাইবার পথ জানিয়া লইয়া—কাগজে তাহা অঙ্কিত করিয়া তিনি তাঁহার এক জন কর্ম্মচারীকে তাহা দিয়া তিন জন ডাক্তারের নাম করিয়া বলিলেন, "টেলিফোন ক'রে যাঁ'কে যাঁ'কে পাও—নিয়ে তুমি একখানা বা দু'খানা গাড়ী নিয়ে এই স্থানে যা'বে—দেরী করবে না। সুধীরের মেনিন্‌জাইটিশ। আমরা সকলে চল্‌লাম।"

সকলকে লইয়া মোটর-যান যাত্রা করিল। সকলেরই মনে দারুণ আশঙ্কা—না জানি যাইয়া কি দেখিবেন! সকলেরই মনে হইতে লাগিল, পথ কি এত দীর্ঘ! সরমার মনে হইতে লাগিল, পথ যেন শেষ হয় না! সে পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল—তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া নারায়ণী তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "বিপদে ধৈর্য্য হারাতে নাই; ভগবানকে ডাক—তিনিই বিপদ-বারণ।"

সরমা তাহাই করিল। যে পিতামহীর ও মাতার পূজার্চ্চনায় কখন শ্রদ্ধানত হয় নাই, আজ আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা তাহার মস্তক নত করিয়াছিল। কিন্তু অভ্যাসের ও অনুশীলনের অভাব হেতু সে মনঃসংযোগ করিতে পারিল না—তাহার চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হইতে লাগিল।

যে পথ দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহার শেষ হইল; যান সুধীরের অধিকৃত গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল।

১৫

ছায়া সরমার আগমন-প্রতীক্ষায় পুনঃ পুনঃ বাহিরের দিকে চাহিতেছিল; যান আসিলেই সে ই অগ্রসর হইয়া গেল।

সকলে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুধীরের মাতা পুত্রের শয্যাপার্শ্বে ছিলেন—সংজ্ঞাশূন্য পুত্রের মুখে বিন্দু বিন্দু দেবতার চরণামৃত দিতেছিলেন। গৃহে আর সকলের তুলনায় তিনিই স্থির—দেবতার উপর নির্ভর করিয়া আছেন। চিত্রা যাইয়া তাঁহাকে সরমা প্রভৃতির আগমন-সংবাদ দিল। তিনি তাহাকে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে বলিলেন; তাহার পর, কি ভাবিয়া, চিত্রাকে তাঁহার আসনে বসিতে বলিয়া এক বার স্বয়ং তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলেন। তিনি নারায়ণীকে প্রণাম করিলেন এবং সরমা তাঁহাকে প্রণাম করিলে বলিলেন, "মা, তুমি এলে কিন্তু যে সময় এলে সে সময় তোমাকে 'এস' বলবার অবকাশও আমার নাই!" নারায়ণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বৌমা, তুমি আজ ওর সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আশীর্ব্বাদ কর—ওর সর্ব্বস্ব সম্ভোগ করার সৌভাগ্য যেন ওর হয়।"

মা বলিলেন, "সে ছাড়া আর কোন আশীর্ব্বাদ ত আজ আমার করবার নাই, মা।" তিনি সরমাকে বলিলেন, "তুমি আসবে আশা করিতে পারি নাই—নহিলে পূর্ব্বেই তোমাকে আসতে বলতাম।"

"আমি যাই, মা"—বলিয়া তিনি পুত্রের নিকটে যাইয়া বসিলেন।

মহেশচন্দ্র ও নারায়ণী দ্বারের নিকট হইতে চাহিয়া সুধীরকে দেখিলেন। ডাক্তাররা কক্ষে অধিক লোক গতায়াত নিষেধ করিয়াছেন। নারায়ণী পুত্রের মস্তকের নিকটে বসিয়া আছেন। এক পার্শ্বে এক জন চিকিৎসক, আর এক পার্শ্বে সুবীর—ডাক্তার দুই জন পর্য্যায়ক্রমে এবং সুবীর ও প্রভানাথ পর্য্যায়ক্রমে থাকেন। ঘরের এক পার্শ্বে সুধীরের পালিত কুকুরটি শুইয়া—প্রভুর দিকে চাহিয়া আছে—তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে; আজ দুই দিন কেহ তাহাকে সে কক্ষের বাহিরে লইতে বা আহার করাইতে পারে নাই।

কক্ষান্তরে মহেশচন্দ্র, নারায়ণী, সুমতি ও সরমা প্রভানাথের নিকট রোগের ও রোগীর অবস্থার বিষয় শুনিতে লাগিলেন। ছায়া

সত্যব্রতকে বারান্দায় লইয়া গিয়াছিল ; ডাক্তাররা বালকবালিকাদিগকে সে গৃহে না রাখিতেই উপদেশ দিয়াছেন।

সুমতি প্রভানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তাররা কি কোন আশাই দেন না ?"

প্রভানাথ উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দু' দিন পূর্ব্বেও আশা দিতে পেরেছিলেন।"

কাহারও মুখে আর বাক্যস্ফুরণ হইল না।

সেই সময়—সত্যব্রতকে চিত্রার নিকট রাখিয়া ছায়া সেই কক্ষে আসিল এবং নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরমা, আপনাদের খাওয়া হয় নাই ?" নারায়ণী বড়ই কাঁদিতেছিলেন ; সুমতি বলিলেন, "সে জন্য ব্যস্ত হইও না, মা। ভগবান যদি সময় আর মুখ দেন, তবে সে কথা।"

ছায়া তাঁহাদিগের আহার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য চিত্রার সহিত তাহা পরামর্শ করিতে যাইতেছিল—পশ্চাদ্দিকে কাহার স্পর্শে ফিরিয়া দেখিল—সরমা। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, সরমা ?"

সরমা অপরাধী যেমন কুণ্ঠিতভাবে অনুগ্রহ চাহে, তেমনই ভাবে বলিল, "আপনিই সকলের আগে আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন, তাই সাহস ক'রে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমি কি এক বার দেখতে পা'ব না ?"

ছায়ার হৃদয় সরমার প্রতি দয়ায় পূর্ণ হইয়া গেল ; সে বলিল, "তুমি দেখবে বলেই ত আমি দিদির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তোমাকে সংবাদ দিয়েছি। চল—কিন্তু মন দৃঢ় কর, রোগীর কাছে ধৈর্য্য হারিও না। মা'কে দেখে ধৈর্য্য ধরতে শিখ। আজ দু' দিন তাঁর আহার নিদ্রা কিছুই নাই।"

ছায়া শাশুড়ীর আর একটি সংস্কারগত বিশ্বাসের কথা জানিত না—মা'র কাছে থাকিলে যমও সন্তানকে স্পর্শ করিতে পারেন না।

ছায়া সরমাকে রোগীর কক্ষে লইয়া গেল। কক্ষের এক পার্শ্ব হইতে এক বার কুক্কুরটির বিরক্তিজনক মৃদু রব শুনা গেল—কিন্তু ছায়া তাহার দিকে চাহিতেই সে আর কোন শব্দ করিল না।

সরমা রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিল—এই কি তাহার স্বামীর অবশেষ ? মুখে মৃত্যুর কালিমা, নয়ন মুদিত, চৈতন্য নাই—রোগ-লক্ষণ মস্তক-কম্পনেই কেবল জীবনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সে যে স্থানে সুধীর চেয়ারে বসিয়া ছিল, তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল—সেই স্থানেই হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িল।

দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করিয়া ছায়া নত হইয়া মৃদুস্বরে সরমাকে বলিল, "চল।"

সরমা কাতরভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি একটু এখানে থাকি।"

ছায়া "না" বলিতে পারিল না। সে একখানি চেয়ার আনিয়া দিল—কিন্তু সরমা যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই রহিল—এক দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রাম-ক্ষেত্র সুধীরকে দেখিতে লাগিল।

নারায়ণী প্রভৃতির আহারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিত্রার সহিত পরামর্শ করিতে ছায়া চলিয়া গেল।

মহেশচন্দ্র অস্থির হইয়া কলিকাতা হইতে যে সব ডাক্তার আসিবেন, তাঁহাদিগের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময় একখানি মোটর আসিল। বসু মহাশয়ের গৃহ-পুরোহিত তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। কয় দিন মা কালীর মন্দিরে চণ্ডীপাঠের ও পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পূজা শেষ করিয়া পুরোহিত চরণামৃত ও প্রসাদী নির্ম্মাল্য লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রোগীর কক্ষে যাইলে মা উঠিয়া প্রণাম করিয়া প্রথমে নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিলেন, পুত্রের মস্তকে তাহা স্পর্শ করাইয়া—সাবধানে উপাধানতলে রক্ষা করিলেন—অতি সন্তর্পণে তাহা রাখিলেন, যেন উপাধান কম্পিতও না হয়। তাহার পর তিনি চরণামৃত লইয়া সুধীরের মুণ্ডিত মস্তকে, মুদিত চক্ষুর পল্লবে ও ললাটে দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া মুখে দিলেন। চিত্রা আসিয়া পুরোহিত মহাশয়কে লইয়া গেল—তাঁহার রন্ধনের সব ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল।

সরমা লক্ষ্য করিল, মা কিরূপ বিশ্বাস সহকারে সুধীরের শুশ্রূষা করিতেছেন। সে লক্ষ্য করিল, সুধীর কি ভাবে রোগশয্যা-পার্শ্বে বসিয়া আছে। সে ছায়ার ও চিত্রার মুখে উৎকণ্ঠার বিকাশ স্মরণ করিল। আপনার প্রতি তাহার মনে ধিক্কার জন্মিতে লাগিল। সে কি সুধীরের কেহই নহে যে, তাহার রোগে সেবার অধিকারও পায় নাই—এখনও সে অধিকার গ্রহণ করিতে পারিতেছে না! সে সেই অধিকার গ্রহণ করিবার অবসর পাইবে কি ? সে সৌভাগ্য তাহার হইবে কি ? তাহার মনে পুঞ্জীভূত বেদনা আশঙ্কার তাড়নায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যেন আর আপনার বেদনার বিকাশ রোধ করিতে পারিতেছিল না। ছায়ার উপদেশ স্মরণ করিয়া সে অতি কষ্টে মন দৃঢ় করিল। কিন্তু তাহাতে বেদনা আরও বর্দ্ধিত হইল।

অল্প-সময়-মধ্যে কলিকাতা হইতে দুই জন ডাক্তার আসিলেন।

১৬

আগন্তুক ডাক্তার দুই জন যথারীতি রোগীকে পরীক্ষা করিলেন এবং রোগীর অবস্থার বিবরণ পাঠ করিলেন। তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন, চিকিৎসা যেরূপ হইতেছে, তাহাতে পরিবর্ত্তন করিবার কিছুই নাই।

মহেশচন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগীর অব্যাহতি লাভের কোন আশাই কি নাই ?—তখন তাঁহারা বলিলেন, আশার একমাত্র কারণ, নাড়ীর গতি ; এই অবস্থায়ও যে নাড়ীর গতি স্বাভাবিক—অতি দ্রুতও নহে, আবার অনিয়মিতও নহে, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু নাড়ীর এই ভাব যদি পরিবর্ত্তিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, যে কোন মুহূর্ত্তে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইবে।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর ছায়া ও চিত্রা যখন নারায়ণী প্রভৃতির আহারের জন্য জিদ করিতে লাগিল এবং ছায়া সরমা'কে আনিবার জন্য রোগীর কক্ষে গেল, তখন পরিচর্য্যারত ডাক্তার শঙ্কিতভাবে বলিলেন, শুটের গুঁড়া আর গরম জলপূর্ণ বোতল অবিলম্বে আনিতে হইবে—দেহের তাপ অতি দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। ডাক্তাররা এই সম্ভাবনায় জন্য প্রস্তুত ছিলেন। চিত্রা দ্রুত যাইয়া ছায়াকে বোতলে জল পুরিবার কথা বলিয়া শুটের গুঁড়া লইয়া আসিল এবং বোতলগুলি আনিতে আবার চলিয়া গেল। তাহার যাইবার সময় সুধীর তাহাকে বলিল, "তোমরা এক জন এস—পায়ের তলায় শুটের গুঁড়া ঘসতে হ'বে।"

চিত্রা ও ছায়া বোতলগুলি লইয়া আসিয়া দেখিল, সরমা উঠিয়া রোগীর পদতলে চেয়ার লইয়া যাইয়া বসিয়া—সুধীর ও ডাক্তার যেমন তাহার দুই হাতে গুঁড়া ঘসিয়া দিতেছেন তেমনই—সুধীরের

তলে শুঁড়ো ঘসিয়া দিতেছে। তাহারা রোগীর শয্যায় যথাস্থানে বোতলগুলি রক্ষা করিয়া শঙ্কাচঞ্চল হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কাটিল—তাহার মধ্যে দ্বিতীয় ডাক্তার কয় বার রোগীর দেহের তাপ পরীক্ষা করিলেন—অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সরমাও বুঝিল, যে পদতল শীতল ও যেন সিক্ত বোধ হইয়াছিল, তাহার সিক্তভাব দূর হইয়াছে, তাহা আর সেরূপ শীতল নহে।

"টাল" কাটিল।

এই সময়েও মা স্থির ভাবে পুত্রের ললাটে চরণামৃত মাখাইয়া দিতেছিলেন। বাহিরের কোন ব্যাপার যেন তাঁহার মন স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না।

রোগীর এই অতিরিক্ত শঙ্কাজনক অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর ছায়ার ও চিত্রার জিদে সরমাকে উঠিতে হইল। সে আহার করিতে বসিল বটে, কিন্তু খাইতে পারিল না বলিলেও হয়। উঠিয়া সে—আর কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, রোগীর কক্ষে যাইয়া পূর্ব্বেরই মত বসিল। যে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সুধীরের জীবনের ক্ষীণ আশা ক্ষীণতর হইয়া—যেন নিঃশেষ হইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, সেই অর্দ্ধ ঘণ্টায় তাহার মনে অননুভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল—কখন সে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং কখনই বা তাহা শেষ হইয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সুধীরের চরণে আর শুটের গুঁড়া মালিস করিবার প্রয়োজন ছিল না—গরম জলের বোতলগুলিও শয্যা হইতে সরান হইয়াছিল। সরমা রোগীর পদতলে হাত বুলাইতে লাগিল। রোগীর অনুভূতি ছিল না; কিন্তু তাহার অনুভূতি তৃপ্তিপ্রদ।

যখন প্রভানাথ আসিয়া রোগীর পার্শ্বে সুবীরের স্থান গ্রহণ করিল, তখন সুবীর যাইয়া হস্ত প্রক্ষালিত করিয়া মহেশচন্দ্রের নিকটে গেল। সে মহেশচন্দ্রকে বলিল, ডাক্তাররা তাহার পুত্র-কন্তাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে বলায় প্রভানাথের মাতা তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন—সত্যব্রতকেও লইয়া যাইলে ভাল হয়।

সে কথা শুনিয়া নারায়ণী সুমতিকে এবং সুমতি নারায়ণীকে তাহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে বলিতে লাগিলেন। কাহারও এই অবস্থায় স্থান ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না।

যখন কে যাইবেন সেই বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল, সেই সময় ছায়া আসিয়া চিত্রাকে সংবাদ দিল কয় দিন পরে আজ কুকুরটি একটু দুগ্ধ পান করিয়াছে। এ কয় দিন তাহারা প্রতিদিন কয় বার তাহাকে আহার করাইবার জন্ত আহার্য্য ও দুগ্ধ দিত, সে তাহাতে মুখ দিত না। চিত্রার মুখে একটু আনন্দ-দীপ্তি দেখা দিল। তাহার শাশুড়ী বলিয়াছিলেন, পালিত পশুরা বিপদ বুঝিতে পারে। তবে কি সে বুঝিয়াছে, বিপদের অবসান হইতেছে? মানুষ কত সামান্ত ভিত্তির উপর আশার হর্ম্ম্য রচনা করে!

সত্যব্রত চিত্রাকে বলিল, "পিসীমা, এক বার মা'র কাছে যা'ব।"

চিত্রা তাহাকে সরমার নিকট লইয়া যাইলে সে সরমাকে কি বলিল। সরমা বলিল, "আচ্ছা—পিসীমা'কে বল।"

চিত্রা তাহাকে সে কি বলিবে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তাহার জ্যেঠাবাবু তাহাকে কলিকাতায় যাইতে বলিতেছেন—সে যাইবে না। সে চিত্রার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি থাকব; পিসীমা।"

চিত্রা তাহাকে লইয়া কক্ষ ত্যাগ করিল এবং যাইয়া বলিল, সে যাইতে চাহিতেছে না।

সে দিন কাহারও যাওয়া হইল না—রোগীর অবস্থা-বিবেচনায় কাহারও যাইতে মন সরিল না।

দীর্ঘ রাত্রি কাটিল। রোগীর সাধারণ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল না।

প্রভাতে সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, কয় দিন পরে সুধীরের কুকুর এক বার তাহার কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া—গৃহবেষ্টন উদ্যানে ঘুরিয়া আবার কক্ষে ফিরিয়া গেল।

১৭

প্রভাতে জ্বর অন্ত দিনের তুলনায় কম দেখা গেল—শিরঃকম্পনও প্রায় অন্তর্হিত হইল। বড় আশায় সুবীর ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—অবস্থার কোনরূপ উন্নতি কি লক্ষিত হইতেছে না? তাঁহারা বলিলেন, জ্বর কমিয়াছে, তাহাই সুলক্ষণ; কিন্তু মস্তকের কম্পন-নিবৃত্তি যদি দৌর্ব্বল্য-বৃদ্ধির পরিচায়ক হয়, তবে তাহা সুলক্ষণ বলা যায় না; কিন্তু তাহা সাধারণ উন্নতির পরিচায়কও হইতে পারে।

মহেশচন্দ্র এক বার কলিকাতায় যাইয়া কাযের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আবার আসিলেন। ডাক্তার দুই জনও আসিলেন। তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন—মন্দের ভাল। নারায়ণী মনে করিলেন, সে-ও ভাল।

সে দিন নারায়ণীই সুধীরের মাতাকে এক বার উঠিয়া মুখে জল দিতে বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "মা, আপনিও আজ্ঞা করবেন না। আজ তিন দিন আমি আহ্নিকও করি নি—ঠাকুরকে মনে মনেই ডেকেছি। তিনি যদি কৃপা করেন, তবেই আমি উঠব; সুধীরের জ্বর ত্যাগ না হ'লে তা' পারব না।"

নারায়ণীও আর কিছু বলিলেন না।

সে দিন সেই ভাবেই কাটিল—কেবল জ্বর কম হইল; রোগী কিছুক্ষণ সুনিদ্রা সম্ভোগ করিল। পরদিন প্রত্যুষে থার্ম্মমিটারে তাপ দেখিয়া সুবীর ও ডাক্তার কেহই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, সেই জন্ত ডাক্তার আবার তাপ লইলেন এবং স্বয়ং দেখিয়া সুবীরের থার্ম্মমিটার গ্রহণ জন্ত প্রসারিত হস্তে তাহা দিলেন। সুবীর ভাল করিয়া দেখিল—তাহার পর ডাক্তারের দিকে চাহিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন আকাশে যে পুঞ্জীভূত মেঘ ছিল, তাহা সহসা সরিয়া গেল—আবার আকাশ রৌদ্রে আলোকিত হইল। সে অপ্রত্যাশিত আনন্দে কম্পিত কণ্ঠে মা'কে বলিল, "মা, জ্বর ছেড়ে গেছে।" মা শুনিলেন—তাহার পর দুই কর যুক্ত করিয়া উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম নিবেদন করিয়া সুধীরের উপাধানতল হইতে দেবতার নির্ম্মাল্য বাহির করিয়া পুত্রের মস্তকে রক্ষা করিয়া তাহা আবার উপাধানতলে রাখিলেন।

সরমাও যুক্ত কর ললাটে রক্ষা করিয়া প্রণাম করিল। এ বার সে মনের মধ্যে শ্রদ্ধাবুদ্ধির বিকাশ অনুভব করিল। তাহার পর সে আবার পূর্ব্ববৎ সুধীরের পদতলে হাত বুলাইতে লাগিল।

সুবীর আজ দ্রুতপদে সকলকে সংবাদ দিতে গেল। সুধীরের কুকুরটি লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাহার সঙ্গে গেল।

প্রভানাথ নারায়ণীকে বলিল, "ঠাকুরমা, আপনি এ বার মা'কে

এক বার তুলে নিয়ে আসুন। ক' দিন অনাহারে—অনিদ্রায় কেটেছে। তপস্যাই বটে!"

সে দ্বিতীয় ডাক্তারকে বলিল, "আপনি গিয়ে একটু বসুন।"

ছায়া সরমাকে আনিতে গেল—সে-ও গত রাত্রি হইতে আর উঠে নাই।

প্রভানাথ রোগীর কক্ষে—সুধীরের স্থানে—যাইতেছে, এমন সময় ছায়া সরমাকে লইয়া আসিল। সত্যব্রত চিত্রার কাছে ছিল। সে এক দিন যেমন সকলের ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, আজ তেমনই গৃহে সকলের ব্যবহারে অতর্কিত পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইল। মা'কে দেখিয়া সে পিসীমা'র নিকট হইতে মা'র কাছে গেল। সরমা তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল—সুখের আতিশয্যকালে যেমন দুঃখের আতিশয্যকালে তেমনি মা সন্তানকে বক্ষে লইতে চাহে—তাহাতে সুখের সময় যেমন সুখের পূর্ণতাবৃদ্ধি পায়; দুঃখের সময় তেমনই সান্ত্বনা ঘটে।

প্রভানাথ সত্যব্রতকে আদর করিয়া সুধীরকে বলিল, "দেখ, ছোটগিন্নী এসেছেন—এই শালার ছেলেও এসেছে—এর পরেও কি বিপদ থাকতে পারে।"

সুধীর বলিল, "এখন উত্তরোত্তর অবস্থার উন্নতি হয়—তবেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

প্রভানাথ বলিল, "তুমি কিছু ভেব না। সুধীরের কুকুরের ব্যবহার দেখে আমি নিশ্চিন্ত হচ্ছি।"

কুকুরটি তখন সুধীরের গাত্রে দুই পদ তুলিয়া দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল।

সুধীর চিত্রাকে বলিল, "চিত্রা, ওকে এখনই কিছু খেতে দাও। ক'দিন খায় নি—ঘর হ'তে নড়ে নি। কি রোগাই হয়েছে!"

প্রভানাথ রোগীর কক্ষে চলিয়া গেল। তখন সত্যব্রত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, পিসে-মশাই গালাগালি দিলেন কেন?"

সরমা বলিল, "গালাগালি দেন নি, সতু—আদর করেছেন।"

নারায়ণী শু'নয়া বলিলেন, "কেবল আদর নয়; ও আশীর্ব্বাদ মনে কর।"

তিনি সুধীরের মাতাকে এক বার রোগীর কক্ষ হইতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে তথায় গমন করিলেন।

মহেশচন্দ্র সকল বিষয় বাস্তব অবস্থার দিক হইতে বিবেচনা করিতেন। তিনি সুধীরকে বলিলেন, "তোমরা সকলে এ পর্য্যন্ত যে পরিশ্রম করেছ, তা' অসাধারণ। আশঙ্কার উত্তেজনাতেই তা' সম্ভব হয়েছে। এইবার—সে উত্তেজনার কারণ দূর হয়ে যাওয়ায়—সে পরিশ্রম আর করতে পারবে না, সে চেষ্টা যদি কর, তবে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হ'বে। আমি সেই জন্য বলি, দু' তিন জন শুশ্রূষাকারিণী নিযুক্ত করলে হয়।"

সুধীর বলিল, "আপনি যা' বললেন তা' খুবই ঠিক—কারণ, এখনও অন্ততঃ এক পক্ষকাল সমভাবে সেবা শুশ্রূষা না করলে—তা'তে কোন ত্রুটি হ'লে আবার বিপদ ঘটবে। কিন্তু ও ত হবে না।"

"কেন?"

"মা কিছুতেই ও প্রস্তাবে সম্মত হ'বেন না; আর—বলতেও কি—আমরাও "নার্শের" হাতে কাযের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না—হয়ত কোন ত্রুটি হবে; কারণ, তা'দের সেবা শুশ্রূষা যত নিপুণই কেন হ'ক না, তা' অর্থের বিনিময়ে পেতে হয়।"

মহেশচন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু তোমাদের শরীরে সহিবে?"

"কি করব, বলুন।"

"তবে ডাক্তার দু'জন যেমন আছেন, তেমনই থাকুন—আর বাড়ীর লোক এক জন ক'রে থাকলেই হ'বে।"

"মা থাকবেনই—আর এক জন থাকতে হ'বে।"

চিত্রা বলিল, "আমরাই ত সরমাকে লয়ে তিন জন—লোকের অভাব হ'বে না, কাকাবাবু।"

সুধীর বলিল, "প্রভানাথকে ছেড়ে দিতে হ'বে—নিজের কায ত নামমাত্র দেখছে।"

মহেশচন্দ্র বলিলেন, "তোমার কাকীমা ত থাকতে চাহিতেছেন।"

"আপনি যেমন ব্যবস্থা করবেন, তেমনই হ'বে।"

"ছেলেদের এ বার আনলে হয় না?"

"তা' হয়।"

পরদিন হইতে মহেশচন্দ্র ও নারায়ণী সকালে চলিয়া যাইতেন এবং মহেশচন্দ্র আবার যাইয়া অপরাহ্নে আসিয়া মাতাকে লইয়া যাইতেন—সুমতিও এক এক দিন যাইতেন।

প্রভানাথ বলিয়াছিল, "পাড়া-গাঁয় যা'রা যাত্রাগানের খুব ভক্ত তা'রা যেমন আসরে চাটাই পাতার সময় আসে, আর চাটাই তু'লে যায়—আমারও তা'ই, অসুখ বাড়লে এসেছি—ডাক্তাররা যখন বিদায় নেবেন, তখন যা'ব।" সে মধ্যাহ্নে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় কলিকাতায় থাকিত।

সুধীরের পুত্রকন্যারা এবং চিত্রার ছোট ছেলেটি আসিল। গৃহ আবার আনন্দে ও কলরবে প্রীতিসমুজ্জ্বল হইল। সত্যব্রত তাহাদিগের সহিত মিশিল।

চারি দিন পরে মনে হইল, সুধীরের বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে—কিন্তু তাহার লক্ষণ তত সুস্পষ্ট নহে।

পঞ্চম দিন মধ্যাহ্নে—সুধীর যখন তাহাকে ঔষধ পান করাইয়া আসিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিল, তখন সে দেখিল, কক্ষদ্বার হইতে সত্যব্রত ঘরে কি দেখিতেছে। সুধীর তাহাকে আসিতে ইঙ্গিত করিল এবং সে আসিলে তাহাকে ক্রোড়ে বসাইল। সুধীরের করতলে বহিরাবরণ উঠিয়া আসিতেছিল—সুধীর তাহার করতলে সুগন্ধ প্রলেপ মাখাইতেছিল। তাহা দেখিয়া সত্যব্রতও তাহাই করিতে লাগিল।

সুধীরের সংজ্ঞা সেই সময় ফিরিয়া আসিতেছিল। সে তাহার করতলে শিশুর কোমল ও ক্ষুদ্র অঙ্গুলীর স্পর্শ অনুভব করিল; এক বার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ডাকিল, "মা!"

নিরুদ্দিষ্ট পুত্র দীর্ঘকাল পরে গৃহে প্রবেশ করিয়া যদি মাতাকে ডাকে "মা!"—তবে তাহার জন্য উৎকণ্ঠিতা জননী যেমন আনন্দে চমকিয়া উঠেন, মা'র তেমনই হইল। তিনি আনন্দ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি, বাবা?"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"সতু।"

সুধীর এক বার পুত্রের দিকে চাহিল; তাহার পর নয়ন মুদ্রিত করিয়া হাতখানি তুলিবার চেষ্টা করিল; দৌর্ব্বল্যহেতু হাত কাঁপিতে লাগিল। ছেলেদের মাথায় হাত দিয়া আদর করা

…রের অভ্যাস ছিল। সুধীর তাহার হাতখানি তুলিয়া সত্যব্রতের মস্তকে স্থাপিত করিল। সত্যব্রত শয্যায় মুখ গুঁজিল—কত দিন সে পিতার নিকট আদর-বিকাশ লাভ করে নাই! সে কাঁদিতেছিল।

আজ—এত দিন পরে মা'র চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল। সে অশ্রু আনন্দের।

সুধীর সত্যব্রতের কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "সতু—বাবা, কাঁদতে নাই।"

সে সুধীরের হাতখানি তুলিয়া শয্যায় স্থাপিত করিল।

মুখ তুলিয়া সত্যব্রত সর্ব্বাগ্রে সরমার দিকে চাহিল।

সরমার দুই চক্ষু ছাপাইয়া তখন অশ্রু ঝরিতেছিল। তাহা আনন্দের, না দুঃখের?

সত্যব্রত জ্যেঠাবাবুর কাছ হইতে যাইয়া সরমার কাছে গেল। সে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলে সে মাতার সহিত সুধীরের পদতলে হস্ত বুলাইতে লাগিল।

সুধীর আর এক বার চাহিয়া দেখিল—এ বার তাহার দৃষ্টি পদতলে উপবিষ্টার উপর পতিত হইল। সে কি বুঝিতে পারিল—উপবিষ্টা কে?

১৮

সাত দিন অতিবাহিত হইল। ভাঁটার পর জোয়ারের জল যেমন নদীতে প্রবেশ করে, সুধীরের রোগদুর্ব্বল দেহে স্বাস্থ্যবল তেমনই প্রবেশ করিতেছে। অষ্টম দিন যাইবার সময় নারায়ণী সুধীরের মাতাকে বলিলেন, "বৌমা, কাল ষষ্ঠী—কাল আর আসব না। বাড়ীঘরও 'এক হাঁটু হয়ে' আছে।"

মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "সরমাকে কি নিয়ে যা'বেন? ওরও কষ্ট হচ্ছে—বিশ্রাম প্রয়োজন; আর সতুকে ত দেখ্‌তেই পারি না।"

নারায়ণী সরমার সম্বন্ধীয় কথায় যেন মনোযোগই দিলেন না; বলিলেন, "সতুকে দেখবার কোন ক্রটি হয়নি, মা—তোমার বড়বৌ আর মেয়ে—কি কাযেরই হয়েছে—কি পাকা গৃহিণী হয়েছে! শিক্ষা দিয়েছ বটে! তা'র পর ভাইবোনরা এসেছে—এখন ত আর কোন কথাই নাই। সরমাকেও শিক্ষা দিও।"

সরমা তথায় ছিল।

ছায়া ও চিত্রা যখন তাঁহাকে গাড়ীতে "তুলিয়া দিয়া" প্রণাম করিল, তখন তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "সরমাকে ছোট বোন ভেবে পা'র ধূলা দিও—যেন তোমাদের মত শিক্ষা পায়।"

সেই দিন অপরাহ্ণে সরমা ছায়াকে বলিল, "দিদি, আমি কি এখানে থাকতে পা'র না?"

ছায়া বিস্মিতভাবে বলিল, "কেন? কি হয়েছে?"

"মা ঠাকুরমা'কে বললেন—তিনি আমাকে নিয়ে যান; আমার কষ্ট হচ্ছে—সতুকে দেখা হচ্ছে না।" বলিতে বলিতে সরমার গলাটা "ধরিয়া আসিল"।

ছায়া বলিল, "তুমি কি মনে করেছ, মা রাগ করেছেন? ওঁর কি রাগ আছে? কখন ত দেখিনি। উনি সত্যই মনে করেছেন, তোমার কষ্ট হচ্ছে—মানুষের অনেক কষ্টই অভ্যাসের জন্য।"

"আমি কিন্তু যা'ব, না।"

এই সময় চিত্রা তথায় আসিল। সে বলিল, "দু' জনে কি বড়যন্ত্র হচ্ছে?"

ছায়া বলিল, "তা'তে তোমাকে দিয়ে কোন কায হ'বে না, দিদি। ঠাকুরজামাই বাবুকে দরকার।"

চিত্রা কপট কোপ প্রকাশ করিয়াছিল, "আমি বাড়ীর মেয়ে আমাকে দরকার নাই—দরকার তোমাদের ঠাকুরজামাই বাবুকে? আমাকে অপমান করা?"

তখন ছায়া সরমা যাহা বলিয়াছিল, তাহা বলিল। তাহা শুনিয়া চিত্রা বলিল, "তুমি ঠিকই বলেছ, ছায়া—এ সব পরামর্শে তোমাদের ঠাকুরজামাই বাবুই পাকা লোক।"

সরমা বলিল, "কি চমৎকার লোক!"

চিত্রা বলিল, "'ফষ্টিনষ্টি' করতে অমন দ্বিতীয়টি নাই। ছেলেদের সম্মুখেও ঐভাব। আর আমার শাশুড়ীও তেমনই—তিনি সমানে হাসেন।"

ছায়া বলিল, "তাঁ'র মত মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। এই ত অসুখ শুনেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলেন—সব ঝক্কি ঘাড়ে ক'রে নিলেন।"

"তবে দেখবে, খানিকটা গালাগালি খেতে হ'বে।"

"ঠাকুরজামাই বাবুর গালাগালি না খেলে পেট ভরে না।"

সকলেই হাসিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে প্রভানাথ কলিকাতা হইতে আসিয়াই শুনিল, ছায়া তাহাকে ডাকিয়াছে।

সে আসিয়া দেখিল, ছায়া, চিত্রা ও সরমা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে বলিল, "এ যে একেবারে ত্র্যহস্পর্শ! আমাকে তলব কেন?"

ছায়া তাহাকে সরমার কথা বলিলে সে বলিল, "ছোটগিন্নী যদি এ বাড়ী নিজের মনে ক'রে এ বাড়ী থেকে যেতে না চা'ন তবে কে ওঁকে তাড়াতে পারে?"

চিত্রা বলিল, "বিশেষ তুমি যদি সহায় হও।"

প্রভানাথ ছায়াকে বলিল, "আমার একটা কথার উত্তর দাও—এ বাড়ীতে বিয়ে ক'রে আমি কি চোরদায়ে ধরা পড়েছি?"

ছায়া বলিল, "কেন?"

"এই দেখ না—ছোটবাবু স্ত্রীর উপর রাগ ক'রে—দেশত্যাগী হ'বেন, আমাকে ঘর-সংসার—গিন্নী পর্য্যন্ত ছেড়ে সঙ্গে দৌড়তে হ'বে! ছোটগিন্নী তাঁ'র স্বামীর বাড়ী দু' দিন বেশী থাকবেন—আমাকে তা'র জন্য সুপারিশ করতে হ'বে!"

ছায়া হাসিয়া বলিল, "আপনি হচ্ছেন আমাদের—মুস্কিল-আসান।"

"হাঁ—কাযের সময় বেঁড়েকে চমধা বলতে হয়।"

সরমা ছায়াকে কি বলিল। ছায়া প্রভানাথকে বলিল, "সরমা বলছে, 'আপনি দু' দিন বেশী থাকবার কথা বলছেন কেন'?"

"সেই বুদ্ধি যদি ওঁর থাকবে, তবে আর আজ আমাকে ধ'রে বৈতরণী পার হ'তে হ'বে কেন? এ বাড়ীও ওঁর বাড়ী—বাপের-বাড়ীও ওঁর বাড়ী। সেখানে ঠাকুরমা, বাপ, মা—তাঁ'দের বুঝি দেখতে হ'বে না? যে রাঁধে সে বুঝি আর চুল বাঁধে না? আর মহেশ বাবুর অত বড় কায ওটা বুঝি ভাসিয়ে দিতে হ'বে? ছোট বাবু এত দিন যা শিখলেন—সে সবই ভস্মে ঘৃত ঢালা হ'তে দেওয়া

হ'বে না। ভাঙ্গা কঠিন নহে—গড়াই কঠিন কায। সে সব ব্যবস্থা হ'বে।"

চিত্রা বলিল, "পরের ব্যবস্থা পরে হ'বে—এখন সরমা যা' বলছে, তা'র কি করবে।"

"সে ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু তুমি কবে বাড়ী যা'বে বল ত ?"

"মা কি কিছু বলে দিয়েছেন ?"

"মা কেন বলবেন—আমি, মা'র ছেলে, আমিই বলছি। এ বাড়ীতে মানুষ থাকে ?"

চিত্রা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাড়ীর আবার কি অপরাধ হ'ল ?"

"দেখ না—এ বাড়ীর ছেলে বৌ সব সমান। ছোটবাবু এক জন —ভাত দেবার কেউ নন, কিল মারবার গোঁসাই,—কি বল গো ছোটগিন্নী ?"

সরমা দৃষ্টি নত করিল।

চিত্রা বলিল, "শুধু শুধু আমার ভাইয়ের দুর্নাম করছ কেন ?"

"শুধু শুধু ! নাক এমনি করে ছেঁচে দিয়েছেন যে, নাকে খৎ দিতে বলতে পারছি না। গুণ ত কত ! জান ত, উমার কাছে মহাদেবের সেই বর্ণনা—'বপুর্বিরূপাক্ষম'—চোখ দু'টা নয় তিনটা। আর ধনসম্পদ ? 'দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু' —পরবার একখানা কাপড়ও নাই।"

চিত্রা রাগের ভাণ করিয়া বলিল, "অনেক জন্ম তপস্যা করেছিল, তা'ই আমার ভাইয়ের গলায় মালা দিয়েছে।"

"ভাইটি একেবারে শিব ! জটায় যে সাপ আছে তা'র পরিচয় ছোটগিন্নী খুবই পেয়েছেন—তবে বিষ নাই কেবল কুলাপানা চক্র। ভাজ ত মহাদেবের গলায় মালা দিয়েছেন ; আর তুমি ? অনেক লোক শিব গড়তে যা' গড়ে তা'ই ?"

"কি ঝগড়াটে মানুষ !"

"এখনও শেষ হয়নি। বাঁশের চেয়ে কঞ্চী দড়—ছেলেটি আবার বলেছেন, আমি কেন গালাগালি দিয়েছি।"

সরমা বলিল, "ঠাকুরমা ত বলেছেন, সে গালাগালি নহে—আশীর্ব্বাদ।"

"তাঁ'র বুদ্ধির অভাব নাই। তোমার মত নহে। তিনি, বোধ হয়, দাদামশায়কে আঁচলের খুঁটে বেঁধে রেখেছিলেন।"

ছায়া বলিল, "আর বৌদের অপরাধ ?"

প্রভানাথ বলিল, "দু'টি বৌ আছেন—অথচ আমি এক কাপ চা এখনও পেলাম না !"

প্রভানাথ আসিলেই বাড়ীর ছেলেরা সব তাহার কাছে আসিত। সুধীরের বড় ছেলে বলিল, "পিসে-মশায়, আমি এখখুনি চা আনছি।"

প্রভানাথ স্নিগ্ধভাবে বলিল, "তোকে যেতে হবে না, বাবা। তুই যে বলেছিস, তা'তেই আমার তৃপ্তি হয়েছে। মা তোদের জন্য আজ খাবার পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, ক'দিন কাছে থেকে ছেলেগুলা আমাকে মায়ায় এমন জড়িয়েছে ! কবে যা'বি ?"

ছায়া রঙ্গ করিয়া আপনার নাক আর কাণ মলিয়া বলিল, "আমার অপরাধ হয়েছে। আমি চা এনে তবে অন্য কথা বলব।"

"আবার কথা কি ? কথা ত সব হয়েই গেল। আমি মা'কে বলব—রোগীর সেবার ভার ছোটগিন্নীর হাতে দিন। এখন ছোটগিন্নীকে নাক আর কাণ মলতে হ'বে,—আর এমন ভুল করবেন না। এমনভাবে যেন রোগীর সেবা করেন যে, সুধীরের মনে যদি এখনও একটু অন্ধকার থাকে, তবে তা' দূর হয়ে যা'বে। তা'হ'লে সে-ই তার ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হ'বে ; বুঝবে—ভুল সে-ও কম করে নাই। সর্ব্বদা যেন মনে রাখেন—রোগী অল্পে অসন্তুষ্ট হয়—রাগ করে।"

ছায়া যাইয়া প্রভানাথের জন্য চা ও খাবার আনিল—খাবার প্রভানাথের মাতাই পাঠাইয়াছিলেন। চা ও খাবার দিয়া সে প্রভানাথকে বলিল, "এই জন্যই ত বলি, আপনি আমাদের মুস্কিল-আসান।"

প্রভানাথ চিত্রাকে বলিল, "তোমার বড় ভাজটির নাম এ বার পরিবর্ত্তন করতে হ'বে।"

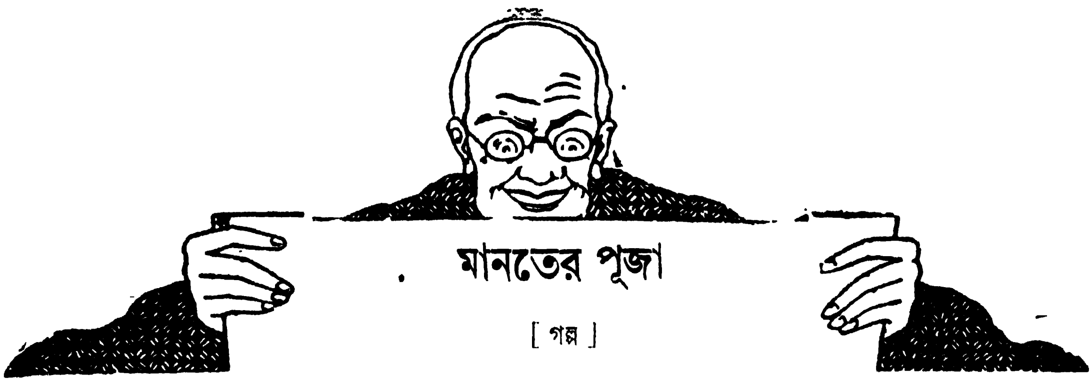
ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"ছোটগিন্নীর ব্যাপারে তুমি যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছ, তা'তে তোমাকে আর ছায়া বলা চলবে না—তুমি কায়া। তুমি মা'র নাম রাখতে পারবে।"

ছায়া লজ্জায় মুখ নত করিল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।





মানতের পূজা

[গল্প]

১

ধীরে ধীরে মধুর বাতাস বহিতেছিল ; জ্যোৎস্না-প্লাবিত দাওয়ায় বসিয়া সৃষ্টিধর নিশ্চিন্তভাবে হুঁকা টানিতেছিল। সেই সময় সংসারের কাজ সারিয়া, সোণামণি পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া, হাত নাড়িয়া বলিল, "খাস্ নিব্‌ভাব্‌নায় ব'স্যা ব'স্যা তামুক ফুঁক্‌তে নেগেচো, যতো জ্বালা আমার !"

তামাকের ধোঁয়াটে নেশায় সৃষ্টিধরের একটু ঝিমুনি আসিয়াছিল। স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে উত্তাপের আঁচ পাইয়া একবার সে মুখ তুলিয়া চক্ষু মেলিল ; স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল বটে, কিন্তু কিছুই বলিল না। দাওয়ার কিনারায় সরিয়া-গিয়া সোণামণি তখন মুখ বাড়াইয়া উঠানে এক ধ্যাবড়া পানের পিক ফেলিল, এবং হাতের ফিঁচায় তাম্বুলরস-রঞ্জিত মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "বড়-যে কিছু ব'ল্‌তিছো না! কও তো, তোমার মতলোবডা কি—তাই শুনি !"

তামাক টানিতে টানিতেই সৃষ্টিধর বলিল, "কিসির মতলোব শুন্‌তি চাইচো ?"

ঘরের একটা খুঁটীতে ঠেস দিয়া মাটীতেই চাপিয়া-বসিয়া সোণামণি বলিল, "কিসির মতলোব ? য্যানো আকাশ থেকে পোড়লে! ব'ল্‌তিছি—বসন্তোপুরি মার ঠাঁই পূজো দেওনের কতা! পূজোডা কি দিতি হবে ?—না সে মতলোব নেই ?"

খুব জোরে হুঁকায় একটা টান দিয়া, এক-মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া সৃষ্টিধর বলিল, "পূজো দিতি হবে না,—বোলতেছে কেডা ? মার ঠাঁই মানোসা ক'রেছো—পূজো না দিয়ে কি পার আছে ? এ কি তুশ্চু কতা ?"

সোণামণি বলিল, "তবে চট্ করা্য দিয়ে ফ্যালো। মানোসা করা্য পূজো ফেলে রাকা,—মা না ক'রুন, কিসি কি হ'য় কে জানে ? দুপুরির স্বপোনের কতা মনে পোড়লে য্যান্‌ও বুকির মধ্যি ঢিপ্-ঢিপ্ ক'ত্তে নাগে !"

হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া সৃষ্টিধর আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করিল, দুপুরির স্বপোনের কতা ! সে আবার কি ? সব কতা খুল্যা কও তো শুনি।"

আঙ্গুলের মাথায় যে চুণ ছিল, তাহার খানিকটা দাঁতের আগায় চাঁচিয়া লইয়া, বাকি চুণটুকু খুঁটীর গায়ে মুছিতে মুছিতে সোণামণি বলিল, "দিনোমানের স্বপোন—বলে, প্রেকাশ ক'রতি নাই। তবে তুমি হোচ্চ স্বোয়ামী, আর কতা হচ্চে ঠাকুর-দ্যাবতার, না ব'ল্লি তো তোমার হুঁস হবে না,—তাই বোল্‌তি হচ্ছে, বলি শোন। খাওয়া-দাওয়ার পাট্ চুকিয়ে-বুকিয়ে দুপুর ব্যালা এট্টু গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম্, শুয়ে মায়ের বাড়ী যাবার কতা ভাব্‌তি-ভাব্‌তি কখোন ঘুমিয়ে পড়িচি,—ঘুমের ঘোরে স্বপোন্ দেখ্যা চট্-করা্য ঘুমডা গ্যালো ভেঙে ! জেগে উটে দেকি—সর্ব্বোগায় কাঁটা দিয়ে উটেচে। ঘামে পন্নের কাপোড় ভিজে জব্-জব্ ক'ত্তেছে।"

সৃষ্টিধর এ কথা শুনিয়া কোন প্রশ্ন করিল না। চুপ-চাপ্ বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে হুঁকা টানিতে লাগিল। মায়ের উদ্দেশে ভক্তিভরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া সোণামণি বলিতে লাগিল, "স্বপোনে দেখা দিয়ে মা পূজো দিতি আদেশ কল্লেন। তা'র পর মনডা বড্ডই খারাপ হোলো, তাই চোললাম বামুনদির ঠাঁই। সব কতা শুন্যা, তিনি গা'ল্-মন্দো যা দেবার সবই তো দিলেন ; শেষে ব'ল্লেন, দেবঋণ ফেলে-রা'কতি নেই রে, সোণা! তোর ওপোর মায়ের কিরপা বড্ড জিয়াদা কি না, তাই তোকে স্বপোনে দেখা দিয়ে মা পূজো চেয়েছেন্।'—তোমার নাম ক'রে বল্লেন, 'ওরে ব'লে-ক'য়ে তাড়াতাড়ি' মায়ের

পুজোডা দিয়ে ফ্যাল। দেরী ক'রলে শেসটা ভালো-মোন্দ কিছু যদি হ'য়ে পড়ে'—এ কতা শেষ হলি বোল্‌লেন, শা-পাড়ার কেডা মানোসা ক'রে না কি পুজো দেই-নি, তাই মায়ের কোপে পোড়ে তারা নিব্বংশো হ'য়ে গেচে, —ঝাড়ে-বংশে সাবাড়!—কতাডা শুন্যা অব্‌দি ভয়ে কেঁপে মরতেছি!"

তামাক পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল, সৃষ্টিধর হুঁকাটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিল, কিন্তু সোণামণির স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

সোণামণি বলিল, "বামুনদির কতা শুন্যা এস্তোক্ কিছু ভালো-লা'গ্‌তিছি না। পূজোডা দিতি না পারলি আর নিশ্চিন্তি হ'তি পা'ত্তিছি-নে। এই ফাগুনির মদ্যিই দিয়ে ফেল্‌তি হবে।"

সৃষ্টিধর বলিল, "এ মাসে আর দিন কু'তায় কওতো! আজ হোলো গিয়ে মাসের তেইশে। চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, উন্‌তিরিশ,—এ মাস আবার য়্যাক্‌দিন ক'মেছে; আছে তো মোটে এই ছ'টা দিন। এর মধ্যি কি ক'রে হয় বলো তো!"

হিসাব করিয়া সোণামণি বলিল, "ক্যানো হবে না? আজ গে হ'লো রোব্‌বার্। কাল্ সোম্, পরশু মোঙ্গোল্, ও-দিন তো বারের পূজো। তাপরে হোলো বুদ্, বিস্যুৎ, শুক্কুর, শ'ন। শ'ন্‌বারে হোলো গিয়ে সংকেরান্‌তি।"

সৃষ্টিধর বলিল, "শ'ন্ মোঙ্গোল্ বার্ আছে তো বটে, কিন্তু পূজো ব'ল্লিই তো পূজো হয় না। খরচ-পত্তোরের টাকা তো যোগাড় করা চাই! হাতে এদিকে য়্যাট্টাও পয়সা নেই!"

গলার সুর এক পর্দ্দা চড়াইয়া সোণামণি বলিল, "পূজো দেবার কতা বল্লিই, দেখিচি খরচার কতা তুলে তাতে বাগ্‌ড়া দ্যাও! খোকার ব্যারাম হয়েলো গিয়ে ও-বচ্ছোর মাঘ মাসে; দেকৃতি দেকৃতি দু'টি বছোর পেরিয়ে গ্যালো! দু'বছর ধ'রে তাগাদা দিচ্ছি, ক্যাবোলই বলো —পয়সা নেই! দু'বছোরের মদ্যি তোমার পয়সার যোগাড় হ'লো না—এ য়্যাট্টা কতা?—পূজোর পাঁটা ঘ'রে মজুত, ভোগের ষোলো আনা তো তুলাই আছে। তবে আর খরচাডা কি?"

সৃষ্টিধর বলিল, "পাঁটা আর ভোগ হলিই পূজো হ'য়ে গ্যালো বুঝি? শরোতের ওজোন-মাপিক বাতোসা লুট্ মানোত নেই?"

সোণামণি বলিল, "হ'লোই বা! তার দাম আর কতো পড়্‌বা? ঐ তো য়্যাক্-রত্তি ছেলে!"

সৃষ্টিধর বলিল, "আধমোণ তো হবেই, ওজোন হ'লিই দেক্‌তে পাবা, য়্যাক-আধ সের জ্যায়দাই হবে! তা যদি আধমোণই ধরো—তো পিরায় ন'টাকার বাতোসা নাগবি। সাত আনা কর্‌যা বাতোসার স্যার। তার ওপোর ধরো পূজোর দক্ষিণে, ঢাকীর মুজরো, যাওয়া-আসার খরচা,—কুড়ি টাকা না হোক, পনোরডা টাকার কম এ ধাক্কা সামলানো যাবে না!"

মুখ বাড়াইয়া পানের ছিবড়াগুলা উঠানে নিক্ষেপ করিয়া সোণামণি বলিল, "তোমার যতো বাজে কতা; মায়ের পূজো দিতি নাকি পনোরো-কুড়ি টাকা নাগে! অতো টাকা নাগলি নোকে পূজো দিতি যেতো? এই তো গ্যালো-মোঙ্গলবারে পেঁচোর পিসী পূজো দিয়ে এলো। তার কতো খরচ প'ড়েছে? চা'ট্টে টাকাও নাগেনি। তোমার কেবল ছুতো বৈ তো নয়! তা আমি তোমাকে খোলাখুলি ব'লে দিচ্ছি, কাল বাদ পরশু হোলো গিয়ে বারের পূজো। পরশুই পূজো দিতি যাতি হবে। কা'ল পূরো য়্যাট্টা দিন আছে তো, যোগাড়-যাগাড় যা কত্তি হয়—কালই কো'রে ফ্যালো।"

সৃষ্টিধর বলিল, "তুমি তো ব'লে খালাস্! একদিনি অতো টাকার যোগাড় করা বুজি সোজা কতা?"

সোণামণি বলিল, "সোজা কি শক্তো, সে তুমি বোজোগে, ধার-কজ্জো যা হয় ক'রো; পূজো আমি ঐ দিন দেবই।"

সৃষ্টিধর বলিল, "য়্যাক আধ্ টাকা হ'লি হাওলাৎ-বরাতের চেষ্টা ক'রে দ্যাক্‌তাম। অতো টাকা—!

সোণামণি বলিল, "আশু মিত্তিরির কাছে কাগোজ নিকে দ্যাওগে—নয় তো ধান ব্যাচো।"

সৃষ্টিধর বলিল, "ধান না হয় ব্যাচ্‌লাম,—তার পর?"

সোণামণি বলিল, "তার পর আবার কি? খোরাকী কুলোবে না? না কুলোয় তকোন্ দ্যাকা যাবে। পরশু গিয়ে পূজোডা তো দিয়ে আসি।"

সৃষ্টিধরকে নির্ব্বাক দেখিয়া সোণামণি বলিল, "কতা ব'লৃতেছো না যে! ভা'বতেচো কি?"

সৃষ্টিধর বলিল, "চটু কর্যা ধানগুলো ব্যাচবো,—তাই ভাবতেচি। দেগে-শুনে টাকার জোগাড় করা আসচে শনুবারে পূজো দিলি হয়! মন্দি কড়া দিন বৈ তো নয়।"

ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়া, সোণামণি বলিল, "না, শ'নুবারে হবে না; শ'নুবারে হ'লো সংকেরান্তি। শ'নুবারের কতা শু'নে বামুনদি বল্লে, সে হোলো সংকেরান্তি—দোমেসে দিন; সে দিনে পুজো দেওয়া ঠিক নয়।—শ'নুবারে-ট'নুবারে হ'বে না, পরশুই দেওয়া ঠিক্। ঠাকুর-দেব্‌তার ধার কি না—তা ফেলে রেখে শেষটা কি হ'তি কি হ'বে!"

মানতের পূজা ফেলিয়া-রাখায় দেবতার কোপে পড়িয়া শা'-পাড়ার কে এক জন নির্ব্বংশ হইয়াছিল, গ্রামের অনেকেরই মুখে সৃষ্টিধর সে কথা বহুবার শুনিয়াছে; তাই সোণামণির মত তাহারও মনে হইল—দেবতার কাছে পূজা মানত করিয়া দীর্ঘকাল তাহা ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। সোণামণির প্রস্তাব অনুসারে মঙ্গলবারেই পূজা দিতে যাইবার জন্য অবশেষে তাহাকে রাজী হইতে হইল।

নৌকানির্ম্মাণে সুদক্ষ বলিয়া গ্রামে সৃষ্টিধরের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল—পসারও ছিল বিলক্ষণ। তাই সকালে উঠিয়াই অনেকখানি আশা লইয়া সৃষ্টিধর জেলেপাড়ায় গিয়াছিল—যদি নৌকা-নির্ম্মাণের ভার লইয়া কাহারও নিকট হইতে অগ্রিম দাদন হিসাবে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। কেহই তাহাকে আগাম টাকা দিতে সম্মত হইল না। টাকা-সংগ্রহের জন্য অগত্যা সে ধান বিক্রয় করাই কর্ত্তব্য মনে করিল, এবং জেলেপাড়া হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় ধান্যের ক্রেতা আবদুল ব্যাপারীকে ডাকিয়া আনিল।

২

বসন্তপুরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কালী বড় 'জাগ্রত দেবতা', কেবল বসন্তপুরের ও আশ-পাশের ক'খানি গ্রামের নয়, দূর-দূরান্তরের লোকেরও ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। এ জন্য বিপদে পড়িলে এ অঞ্চলের লোক মায়ের পূজা মানত করে, এবং বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলে বসন্তপুরে আসিয়া মায়ের পূজা দিয়া যায়। সুতরাং মায়ের কৃপায় তাঁহার সেবাইতগণের সুখের সীমা নাই, তাহারা নিশ্চিন্ত মনে বারো মাস 'ঘি খায় দুধে আঁচায়!'

শনি এবং মঙ্গলবার, বারের পূজার দিনই সাধারণতঃ পূজার্থীর সমাগম হয়; তবে, ফাল্গুন, চৈত্র এই দুই মাসেই জনসমারোহ অধিক হইয়া থাকে। কারণ, এ সময়ে আবহাওয়া ভাল থাকে, এবং পল্লীবাসীদের ঘরে রবিশস্য সঞ্চিত হওয়ায় পূজার ব্যয়ের জন্য তাহাদিগকে ভাবিতে হয় না।

ফাল্গুন মাসের শেষ মঙ্গলবারে নানা গ্রাম হইতে বহু লোক পূজা দিতে আসিয়াছিল। কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণ, আশ-পাশ, সম্মুখস্থ হাটতলা জনসমাগমে গম-গম করিতেছিল।

স্ত্রী-পুত্রের সহিত সৃষ্টিধরও পূজা দিতে আসিয়াছিল। সোণামণির আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রতিবেশিনী বামুনদিদিও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কালীবাড়ী হইতে রশি-দুই দূরে 'পদ্মপুকুরের' পাড়ে কয়েক দল পূজার্থী বিশ্রাম করিতেছিল। সেই স্থানে সকলকে বসাইয়া রাখিয়া সন্ধান লইবার জন্য সৃষ্টিধর একবার কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইল।

হাটতলায় চার-পাঁচখানি ময়রার দোকান। বারের দিন মায়ের পূজার জন্য সকল দোকানে সন্দেশ প্রভৃতি ভালই বিক্রয় হয়। এই সকল দোকানের মধ্যে তিনকড়ি নাপিতের দোকানখানিই সবচেয়ে বড়। তাহার বিক্রয়ও অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক।

তিনকড়ি পাকা ব্যবসাদার। সে জানে যে, বেশ-ভূষায় ও আড়ম্বরে ধর্ম্মের ভাণ করিতে পারিলে পূজার্থীরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। এই জন্য বারের পূজার দিন সে গেরুয়া বসন পরিয়া গলায় রুদ্রাক্ষের মোটা মালা ঝুলায়,—কপালে খুব মোটা করিয়া সিঁদুরের ফোঁটা ধারণ করে, এবং মা-কালীর পটখানি টাট্‌কা ফুলের মালায় সজ্জিত করিয়া ধূপ-ধূনার গন্ধে পূজার্থীগণকে তাহার দোকানে আকর্ষণ করে।

খরিদ্দারদের বসিবার জন্য দোকানের সম্মুখে খুঁটী

করিয়া দিয়াছিল। রৌদ্রনিবারণের উদ্দেশ্যে 'বারের' দিন একখানি চট্ চাঁদোয়ার মত খাটাইয়া দিত। খরিদ্দার আসিলে মিষ্টকথায় অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে বসিতে বলিত। তামাক সাজিয়া দিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিত।

ভোগ বিক্রয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনকড়ি মায়ের চরণে প্রণাম করিবার অছিলায়, ঘন ঘন কালীবাড়ী ঘুরিয়া আসিত। অপরিচিত নূতন পূজার্থীর সহিত যাচিয়া আলাপ করিত, এবং মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তাহার কাছে ভোগের মিষ্টান্ন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিত।

অভ্যাসমত নূতন খরিদ্দারের সন্ধানে কালীবাড়ী গিয়া তিনকড়ি সৃষ্টিধরকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সহাস্য মিষ্ট আলাপে মুগ্ধ করিয়া, তাহাকে দোকানে লইয়া আসিল। পুত্রকে ডাকিয়া সাগ্রহে বলিল, "নিতাই! এনারে ব'স্‌তি ছ্যাও; তামাক সাজো।"

অসম্ভব ভীড়। বাহিরের বাঁশের বেঞ্চে গাদাগাদি— ঠাসাঠাসি করিয়া বহু লোক বসিয়াছিল। চৌকী, পিঁড়ি, মাদুর, চেটাই ইত্যাদি যাহা কিছু তাহার ঘরে ছিল, পূজার্থীরা আসিয়া পূর্ব্বেই সব দখল করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং কোন আসন খালি না থাকায় নিতাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া একখানি কাঠের বারকোশ বাহির করিয়া, তাহাই উপুড় করিয়া সৃষ্টিধরকে বসিতে দিল।

সৃষ্টিধরকে বসাইয়া তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল,— "আপনার নিবেস?"

সৃষ্টিধর বলিল, "শাপুর, কালিগঞ্জোর—"

তিনকড়ি বলিল, "আর ব'ল্‌তি হবে না; মোহনপুর, বাগবাড়ী, কাউগাছি, বেলতলা, শাপুর—"

সায় দিয়া সৃষ্টিধর বলিল, "হ্যাঁ,—ঐ শাপুর।"

তিনকড়ি বলিল, "সাতপোতা, বেম্মোড্যাঙ্গা, গাঙনে, তাল-পুকুর,—বলুন না, ওদিক্‌কার কোন্ গাঁ না চিনি? শাপুরির কোন্ পাড়ায় বাড়ী?"

সৃষ্টিধর বলিল, "শা-পাড়ায়।"

তিনকড়ি বলিল, "বেজো শা, বৈকুণ্ঠো শা—"

সৃষ্টিধর বলিল, "আমাদের জ্ঞাতগুষ্টি, বৈকুণ্ঠো শা সম্পর্কে আমারই খুড়ো।"

ঘরে যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের দলের এক জন বলিল, "দোকানীর দেক্‌তিছি, সারা দুনিয়ার লোকের সাথে চেনা পর্চ্চায়!"

কালীর পটের দিকে তাকাইয়া জোড়-হাত কপালে ছোঁয়াইয়া গদগদ স্বরে তিনকড়ি বলিল, "মায়ের কির্পা! ছিচরোণ আছ্রয় ক'রে প'ড়ে আছি, তাই তোমাদ্দের পাঁচজোনের সাথে জানাশুনো, আলাপ পর্চ্চায় হয়।"

নিতাই তামাক সাজিয়া কলিকাটি সৃষ্টিধরের হাতে দিতে যাইতেছিল, দেখিয়া গলার সুর বদলাইয়া তিনকড়ি বলিল, "এট্টু কলার পাতা ছিঁড়ে এনে ছ্যাও নিতাই! শা-মশায় নল ক'রে নিন্।—হ্যাঁ, লুটির বাতোসা কতোডা নাগ্‌বি ব'ল্‌তিছিলেন? একুশ সের—আর কতো?"

কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে সৃষ্টিধর বলিল, "একুশ সের আড়াই ছটাক।"

নিতাই কলার পাতা আনিয়া সৃষ্টিধরের হাতে দিল। তিনকড়ি বলিল, "মেটেডা ছ্যাকোতো নিতাই! শা-মশায়রি একুশ সের আড়াই ছটাক বাতোসা দিতি হবে। আরো খদ্দের আছে। কুলোবে তো? নয়্‌তো খোলা চাপিয়ে ছ্যাও।"

কলার পাতার নল পাকাইতে পাকাইতে সৃষ্টিধর বলিল, "আমার আর যোলো আনার ভোগ লাগ্‌বি।"

ঘাড় কাৎ করিয়া তিনকড়ি বলিল, "তা হবে ওখোন্। মায়ের ভোগ! সরেশ সন্দেশই তৈয়েরী আছে।"

মেঘনাদ কামার দোকানের সাম্‌নে আসিয়া হাঁকিয়া বলিল, "পূজো দেবা কারা? যাও, নাম নিকিয়ে এসো।"

দোকানের ভিতর হইতে তিনকড়ি প্রশ্ন করিল, "আজ আদায় কার হাতে মেঘনাদ! সেজ বাবুর না?"

"সেজ-বাবুর" বলিয়া মেঘনাদ চলিয়া যাইতেছিল; হঠাৎ ঘরের ভিতর নজর পড়ায়, হুড়-মুড় করিয়া ঢুকিয়া— সৃষ্টিধরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "দেকি কল্কেডা, চট্ ক'রে য়্যাক্-টান দিয়ে যাই।"—সে কলিকার পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

খুব জোরে একটা দম মারিয়া এক দমেই কল্কের আগুন দপ্ করিয়া জ্বালাইয়া নাক-মুখ দিয়া বিসুবিয়সের মত ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মেঘনাদ বলিল, "লোক সব ছড়িয়ে র'য়েছে। ডেকে জড়ো ক'রে নিয়ে যাই।"

দ্বিতীয় দম কষিয়া 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ' অসার

কলিকাটি সৃষ্টিধরকে ফিরাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া গেল। তিনকড়ি বলিল, "তাহ'লি, তামাক খেয়ে যান্ শা-মশায়, নাম নিকিয়ে আসুন্।"

সৃষ্টিধর বলিল, "পুজো দিতি গেলি নাম নিখৃতি হবে নাকি ?"

মাথা নাড়িয়া, মুখভঙ্গি করিয়া তিনকড়ি বলিল, "হঁ্যা, নিজের নাম, গেরামের নাম নিকিয়ে আগাম দক্ষিণে জমা দিতি হবে।"

সৃষ্টিধর বলিল, "দক্ষিণের কোনো বাঁধা নিয়োম-টিয়োম আছে নাকি ? না—"

উত্তরে লম্বা একটা "হুঁ" দিয়া তিনকড়ি বলিল, "ভোগের সিকি দক্ষিণে, আপনার যোলো আনা ভোগ তো ? আপনার দক্ষিণে লাগ্‌বে গিয়ে চা'র আনা।—পাঁটা আছে ?"

সৃষ্টিধর বলিল, "হঁ্যা, আছে।"

তিনকড়ি বলিল, "পাঁটার দক্ষিণে সাড়ে আট আনা। চুল নোখ্ দিলি য়্যাক আনা। ধূনো-পোড়ানো দু' আনা, বুকির রক্তো—"

সৃষ্টিধর বলিল, "আর কিছু নেই। ভোগ আর পাঁটা।"

তিনকড়ি বলিল, "আর এই লুট্! তা লুটির কোনো বাঁধাধরা দক্ষিণে নেই। চা'র আনা, ছ' আনা, টাকা, পাঁচসিকে, যার য্যামোন ক্ষ্যামোতা—দ্যায়। তবে বাতোসার আদ্দেক ভাগ অদিক্রি বাবুদের।"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সৃষ্টিধর বলিল, "আদ্দেক্ ভাগ !"

তিনকড়ি বলিল, "হঁ্যা, তাই ন্যান তেনারা, তাঁদের খেয়াল !"

কলিকায় কিছু ছিল না ; দম দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কলিকাটি অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া, সৃষ্টিধর উঠিয়া বলিল, "ভোগ, বাতোসা ঠিক থাকে য্যানো !"

পাশে মাথা হেলাইয়া তিনকড়ি বলিল, "আচ্ছা !" তাহার পর খুব মোলায়েম সুরে থামিয়া থামিয়া বলিল, "কিছু দিয়ে যাবেন না শা-মশায় ! —দু'-য়্যাক টাকা যা হয় !"

সৃষ্টিধর বলিল, "বায়না ?"

জিভ কাটিয়া তিনকড়ি বলিল, "বায়না-ফায়না নয়, চিনিতি বোধ হচ্ছে অকুলোন্ পড়্‌বে তাই—"

কোঁচার খুঁট খুলিয়া দেখিয়া সৃষ্টিধর বলিল, "ভাঙ্গা-ভাঙ্গটো কই ! এই য়্যাট্টা টাকা, আর রেজ্‌গি-পয়সায় টাকাটেক কি আঠারো আনা হ'তি পারে। এ দেবো না ; দক্ষিণে জমা দিতে হবে ত, যদি লোটের টাকা সেখানে না পাই ?"

তিনকড়ি বলিল, "ক'টাকার লোট্,—দশ টাক্কার ?"

সৃষ্টিধর বলিল, "না, পাঁচ টাকার।"

তিনকড়ি বলিল, "পাঁচটা টাকাই দিন না ; দশ টাকার কাছাকাছিই তো মাল হবে।"

অল্পমাত্র সময়ের পরিচয়। আগাম টাকা দিতে সৃষ্টিধর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহার ভাব বুঝিয়া, ঠোঁট বাঁকাইয়া মৃদু হাসিয়া তিনকড়ি বলিল, "টাকা দিতি শা-মশায় ভরসা পাচ্ছেন না : ভাব্‌তিছেন্ হয় তো মেরে দেবো !—তিরিশ বচ্ছোরের ওপোর দোকান। কেউ ব'ল্‌তি পারে, য়্যাট্টা আদ্‌লা কারোর্ মেরিছি ! ছেলেদের তাই বলি, 'ভিক্ষে ক'রে খাও, সেও ভালো, য়্যাট্টা কাণা কড়ি কারুরি ঠকায়ো না,'—যাক্, শা-মশার যকোন্ সন্দো হচ্ছে—"

তিনকড়ির মন্তব্যে অপ্রতিভ হইয়া সৃষ্টিধর বলিল, "না, তা নয়, আমি ভাব্‌তেছিলাম, য়্যাক্-সঙ্গেই সব দিয়ে দেবো। তা চিনি কিন্‌তি হবে ব'ল্‌তেছেন—"

গলা খাদে নামাইয়া, মিষ্ট করিয়া তিনকড়ি বলিল, "তাইতিই তো চাচ্ছি।—নিতাই ! খাতার কানিতি শা-মশার নামে পাঁচ টাকা জমা ক'রে ন্যাও।—শা-মশার নামডা কি ?"

"সৃষ্টিধর শা" বলিয়া একখানি পাঁচ টাকার নোট সৃষ্টিধর তিনকড়ির হাতে দিল। খাতা খুলিয়া নিতাই লিখিতে সুরু করিলে সৃষ্টিধর বলিল, "দরের বিষয় কিছু বিবেচোনা ক'ত্তি হবে, এতোডা মাল নিচ্ছি !"

তিনকড়ি বলিল, "দরের কতা তো ব'ল্লাম্, পনোরো টাকা চোদ্দ আনা দরে চিনি কিনে, সের সাত আনার কমে কেউ দিতি পার্বা না। আমার বস্তা বস্তা চিনি আসে, তাই মোণকরা আট্ আনা কমে দিচ্ছি, সতেরো টাকা—"

সৃষ্টিধর বলিল, "সতোরো টাকা হলি একুশ সের আড়াই ছটাকের দামডা কতো হচ্ছে ?"

তিনকড়ি বলিল, "পাঁচ টাকা আপনার জমা রৈলো,

আপনি যান্, নাম নিকিয়ে আসুন, মাল মাপানো হোক। হিঁসেব হবে তখোন্।"

আধ ঘণ্টা পরে দোকানের পাশে রাস্তার উপর গোল-মাল শুনিয়া ও ভীড় জমিতে দেখিয়া, ব্যাপার কি জানিবার জন্য দোকানের ঝাঁপের বেড়ার ফাঁকে তিনকড়ি মুখ বাড়াইল। তাহার দিকে নজর পড়িতেই ভীড় ঠেলিয়া, সৃষ্টিধর আগাইয়া আসিয়া বলিল, "দেকুনদিনি ব্যাপার! ঢাকে-ঢোলে পূজো দেবো এই আমার মানোসা। আমার ঢাকী-ঢুলী সাথে র'য়েছে। তা এ লোকটা তাদ্দের বাজাতি দেবে না! বলে, 'আমি বাজাবো'—এ কি রকোম্ কতা হ্য ?"

মৃদু হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটাইয়া তিনকড়ি তাহাকে বলিল, "একেনকার এই নিয়োম শা-মশায়! কেনা হচ্ছে মায়ের বাড়ীর ঢাকী। বাজানোর দরকার হ'লি ওই বাজায়। বাইরির ঢাকী মায়ের বাড়ীর সীমেনার মদ্যি বাজাতি পায় না।"

তিনকড়ির পোষকতায় কেনারাম ঢাকী অগ্রসর হইয়া বলিল, "কৈলাম মায়ের বাড়ী বাজানো আমার জেন্মা। তা শুনেও উনি জেদ্ ক'ত্তিছেন্।"

সৃষ্টিধর বলিল, "ঢাকী না নিয়ে আস্তাম তো কতা ছিলো না; ঢাকী-ঢুলী এনে ফেলিচি। তারা বাজাতি পাঁবা না, এ কি রকোম কতা!"

মুরুব্বীর মত গম্ভীর ভাবে তিনকড়ি বলিল, "আপুনি ঢাকী নিয়ে-আলি কি হবে শা-মশায়! মায়ের বাড়ীর নিয়োম্, যার যা কাজ ধরা আছে, তারে দিয়ে তাই করাতি হবে। মার পূজো করেন হালদার মশায়, আপনি পুরুত আনলি, তেনারে পূজো কত্তি দিতো? মেঘনাদ পাঁটা কাটে, আপনি যদি বলেন, 'আমার নোক দিয়ে কোপ্ করাবো', তাকি ওরা কত্তি দেবে?"

তিনকড়ির যুক্তি শুনিয়া তাহার উক্তির প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া সৃষ্টিধর চুপ করিয়া রহিল। তাড়া দিয়া কেনা বলিল, "চট্ ক'রে চলেন, পূজোর সোময় হ'লো। আমাকে গিয়ে বাজাতি হবে।"

সৃষ্টিধর বলিল, "তোমারে আবার দিতি হবে কতো?"

কেনা বলিল, "যা ধরা আছে, আপ্নার কাচ্ তে জিয়দা নেবো? ছ' আনা রেট।"

অসন্তোষের সহিত সৃষ্টিধর বলিল, "তাই তো, দোকোর ক'রে ঢাকীর খরচা!"

শুনিয়া তিনকড়ি বলিল, "তা আর কর্বেন কি? ছ' আনা পয়সা লাগ্ বে। মায়ের পূজো দিতি এয়েছেন্। সামান্যোর জন্যি খুঁতখুঁত কর্বেন্ না। এ তো আর অসোৎ কাজে যাচ্ছে না!"

মন্দিরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সত্বর অগ্রসর হইবার জন্য সৃষ্টিধরকে তাড়া দিয়া কেনা ঢাকে ঘা দিল।

মন্দির-প্রাঙ্গণের একধারে পূজার্থীদিগের বিশ্রামের জন্য চারি দিক খোলা একখানি মস্ত চালাঘর ছিল। বলির জন্য স্নান করানোর পর পাঁঠাগুলি এই চালারই কয়েকটি খুঁটাতে বাঁধা ছিল। সেজ বাবুকে সঙ্গে লইয়া মেঘনাদ ছাগলগুলি গণিয়া খাতায় লিখিত সংখ্যার সহিত মিলাইতেছিল। কবে কে নাকি দক্ষিণা জমা না দিয়া, ফাঁকি দিয়া পাঁঠা বলি দেওয়াইয়াছিল! সেই হইতে ফাঁকি দিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে বলির পূর্ব্বে পাঁঠাগুলি গণিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গণিতে গণিতে থামিয়া সৃষ্টিধরের আনীত পাঁঠাটি দেখাইয়া মেঘনাদ হাঁকিল, "এ পাঁটা কার?"

সৃষ্টিধর নিকটেই ছিল। তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মেঘনাদ বলিল, "তোমার পাঁটা?"

উপর নীচে মাথা ঠুকিয়া সৃষ্টিধর বলিল, "হাঁ—"

মেঘনাদ গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিল, "নাম, গ্রাম?"

সৃষ্টিধর বলিল, "ছিষ্টিধর শা, গ্রাম শাপুর।"

সেজ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া মেঘনাদ বলিল, "খাতা দেখেন্ তো—শাপুরির ছিষ্টিধর শা পাঁটার দক্ষিণে কতো জমা দেছে।"

খাতা দেখিয়া সৃষ্টিধরের নাম খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেজ বাবু বলিলেন, "তেরো নম্বর, সৃষ্টিধর শাহা, শাহাপুর, ভোগের দক্ষিণে চার আনা, পাঁটা একটা,—দক্ষিণে সাড়ে আট আনা।"

সৃষ্টিধরের দিকে ফিরিয়া মেঘনাদ বলিল, "জিয়াদা নাগ্ বে শা-জী!"

সৃষ্টিধর বলিল, "ক্যানো?" সাড়ে আট আনা দিছি, যা নিয়োম,—আবার জ্যায়দা নাগ্ বে ক্যানো?"

মাতব্বরি চালে হাত-মুখ নাড়িয়া মেঘনাদ বলিল,

"নাগ্‌বে জ্যায়দা,—ভারি পাটা! পাঁটার হাড়িকাটে হবে না; ভেড়ার হাঁড়িকাটে কোপ ক'ত্তি হবে!"

সৃষ্টিধর বলিল, "তার জন্যি জ্যায়দা দিতে হবে?"

মেঘনাদ বলিল, "হ্যাঁ, ভেড়ার দক্ষিণে লাগবে, চৌদ্দ সিকে।"

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে সৃষ্টিধর বলিল, "অন্যায় কতা।"

মেঘনাদ বলিল, "ন্যায়-অন্যায় বুঝিনে, যা নাগ্‌বে বল্লাম্। নয় তো বলি হবে না, খোলসা কতা।"

সৃষ্টিধরকে খোলসা কথা শুনাইয়া দিয়া বাকী পাঁঠাগুলির গণনা শেষ করিয়া সেজ বাবুর সহিত মেঘনাদ প্রস্থান করিল।

কি করিবে, সৃষ্টিধর দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। এই ব্যাপার লইয়া পূজার্থীদিগের মধ্যে আলোচনা সুরু হইল। এক জন বলিল, "ভারি ব'লে তার পাঁটা তো আর ভেড়া নয়, তবে জ্যাযদা লাগবে ক্যানো?"

উত্তরে অপর এক জন বলিল, "তা বলে কেডা? আমার জোড়া পাঁটা মানোসা; সাড়ে আট আনা ক'রে সতোরো আনা দক্ষিণে দেলাম্। তা জোড়া-বলি দিতি দেলে না। য়্যাটা সেজেবাবু বাড়ী পাঠালেন্। ঢের বলাবলি কল্লাম্। শোন্‌লেন্ না। তা কর্ব্বো কি!—ভাব্‌না ক'রে কি কর্ব্বা? তোমার চোদ্দসিকে লাগ্‌বে।"

প্রবীণ গোছের এক জন লোক পরামর্শ দিয়া বলিল, "ও কোনো কাজের কতা নয় সেজেবাবুরি ধরো গে।"

শ্যালকের শুভাগমন সংবাদ জানাইয়া, অন্ততঃ চা'রটি পাঁঠার মুড়ি দেওয়া হয়, এবিষয়ে রোকায় অনুরোধ জানাইয়া থানার দারোগা বাবু এক জন কনষ্টেবল পাঠাইয়াছিলেন। প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেজ বাবু তাহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন। প্রবীণের যুক্তিমত সৃষ্টিধর গিয়া তাঁহাকে ধরিল। কিন্তু বৃথা ধরা! নিয়মের দোহাই পাড়িয়া তিনি বলিলেন, "পাঁটার হাঁড়িকাঠে যদি বলি দেওয়া চলে, তবে সাড়ে আট আনা—যা জমা দেছো তাতেই হবে, আর তা না হ'লে, চোদ্দসিকে লাগ্‌বে।"

সৃষ্টিধরের মুখে সেজ বাবুর রায় শুনিয়া ভরসা দিয়া সোণামণি বলিল, "জ্যাদা লাগ্‌বে না। পাঁটার হাঁড়িকাটে কোপ্ হবে না ক্যানো, খুব হবে। দেড়-ব'ছুরে বাচ্চা!"

কিন্তু বলির সময় চা'র পাঁচ জনে মিলিয়া, ঠাসিয়া ঠাসিয়া, সজোরে চাপিয়া-চুপিয়াও হাঁড়িকাঠের ফাঁকে সোণামণির 'দেড়-বছুরে বাচ্চার' গলা কিছুতেই গলাইতে পারিল না। ঠেলা-ঠুলিতে হাঁড়িকাঠের অপরিসর বেষ্টনীর চাপে, দম আটকাইয়া পাঁঠা মরে আর কি! দেখিয়া পুরোহিত হালদার-মহাশয় ছুটিয়া আসিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মায়ের সামনে নিশংসো জীবহত্যা! মহাপাতকের ভয় নেই, য়্যাঁ! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, হাঁড়িকাঠ থেকে তোল আগে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠাটাকে মুক্তি দিবার জন্য নিজেই তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সমবেত সকলেই প্রায় এই ব্যাপারে সৃষ্টিধরের নিন্দা করিতে লাগিল। পূজা দিতে আসিয়া এরূপ মহাপাতকের কার্য্য করা, ছি ছি! অধিকারী বাবুদের ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া এক জন বলিল, "হাড়িকাট ক'রে রেকেছে দেকোচো—মুণ্ড গলে না। জ্যাযদা পয়সা নেবার মতলোব্ বুঝ্‌লে কি না—!"

আর এক জন বলিল, "অন্যায় জুলুম, সাতসিকের পাঁটা নয়, তার চোদ্দসিকে দক্ষিণে!"

আগের লোকটি সৃষ্টিধরকে যুক্তি দিল, "তুমি য়্যাক কাজ করো দাদা! বলি না দিয়ে মায়ের নামে পাঁটা ছেড়ে দ্যাও।"

ঘটনাচক্রে পড়িয়া প্রায় সকলের কাছেই তিরস্কৃত হইয়া, অপ্রতিভ সৃষ্টিধর কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিল না, দু'-চার আনা বেশী হইলেও যাহা হয় করা যাইত। কিন্তু সাড়ে আট আনার স্থলে একেবারে সাড়ে তিন টাকা! অন্যায় অসঙ্গত দাবী, এত বেশী দিতে তাহার মন সরিতেছিল না। তাই লোকটি যখন তাহাকে, বলি না দিয়া পাঁঠাটি মায়ের নামে ছাড়িয়া দিতে বলিল, তখন সমস্যা সমাধানের সূত্র পাইয়া অনেক উৎসাহের সঙ্গেই সে প্রশ্ন করিল, "তা চ'লবে?"

পূর্ব্ব-কথার সমর্থনে বেশ জোর করিয়া তাহার পরামর্শদাতা বলিল, "চ'লবে না ক্যানো? খুব চ'লবে। গলায় খাঁড়া ছোঁয়ায়ে ছেড়ে দ্যাও।"

অধিকতর উৎসাহে সৃষ্টিধর বলিল, "তা যদি হয়, সেই ভালো।"

কিন্তু তাহার উৎসাহ অচিরেই ঘুচিয়া গেল। পাঁঠাটি

ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব সোণামণি অনুমোদন করিল না, বামুনদিদিও সমর্থন করিলেন না।

পাঁঠার দক্ষিণা দু'টাকা সাড়ে পনের আনা অতিরিক্ত লাগায় তিনকড়ির দোকানে বাতাসার দাম মিটাইবার সময় সৃষ্টিধরের পৌনে আট আনা অকুলান পড়িল। তিনকড়ির ভক্তজনোচিত বেশভূষা এবং হাবভাব দেখিয়া, তাহার হাসির ঝিলিক মিশানো মিষ্ট-মধুর মোলায়েম কথা শুনিয়া, প্রথম হইতেই তাহাকে বেশ ভাল লোক বলিয়াই সৃষ্টিধরের ধারণা হইয়াছিল। সামান্য কিছু বাকীর জন্য অনুরোধ করিলে উহা সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে—এ সন্দেহ তাহার মনে স্থান পায় নাই; কিন্তু বাকির জন্য বলিতেই ঘাড় নাড়িয়া তিনকড়ি অসম্মতি জানাইয়া বলিল, "না শা-মশায়! বাকি-বকেয়ায় কাজ নেই, পনি আট আনার পয়সা আপনার পরিবারের কাছে দেকুন না।"

সৃষ্টিধর বলিল, "তার কাছে কিছুই নেই।"

গম্ভীর হইয়া তিনকড়ি বলিল, "তাহ'লি কম ক'রে নিতি হয়,—নিতাই, পণি আট আনার বাতোসা তুলে ন্যাও।—ন্যাকসের, আর হবে আধ্‌পো—আটারো ছটাক।"

সৃষ্টিধর দেখিল, মহা বিপদ! সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "রও দেকি! কাট্‌লি হচ্ছে কি ক'রে! শরোতের ওজোন্ একুশ সের আড়াই ছটাক। তার কম হলি হবে না।"

তাড়া দিয়া নিতাই বলিল, "কি কর্ব্বেন্, ব'লে ফেলুন্ চট্ ক'রে। আপনাকে নিয়ে তামাম দিন আমার পড়ে থাকলি চ'লবে?"

তিনকড়ি পুত্রকে বলিল, "তোমারে যা বল্লাম্, তাই করো নিতাই। আটারো ছটাক বাতোসা কেটে ন্যাও। খদ্দের সব দাঁড়িয়ে—ওই ছেঁড়া ভেজাল্ নিয়ে এই কি মাথা-ঘামানোর সোময়!"

নিতাইকে পিতার আদেশ পালনে উদ্যত দেখিয়া সৃষ্টিধর তাহার গায়ের চাদরখানি খুলিয়া নিতাইয়ের হাতে দিয়া তিনকড়িকে বলিল, "বাকি যখোন্ রাখবেন না, তখোন, এই চাদোরখানাই জামিন রেকে দিন্। ক' গণ্ডাই বা পয়সা?"

ভ্রু কুঁচ্‌কাইয়া তিনকড়ি বলিল, "পুরোনো—জোলার তাঁতের বস্তাপচা চাদোর! ওর আর দাম কি?"

প্রতিবাদ করিয়া সৃষ্টিধর বলিল, "পুরোনো? মাঘ-ফাগুন মাত্তোর দু'টো মাস মাঝে মিশেলে গায়ে দোওয়া হ'য়েছে। দাম নিয়েলো একটাকা ছ' আনা।"

তিনকড়ি বলিল, "ঐ আদময়লা চাদোর ছাড়া আর কিছু কাছে নেই? সোণার আংটি, কি সোণার মাদুলী?"

তিনকড়ির রুক্ষ কথায়, ও রূঢ় ব্যবহারে সৃষ্টিধর তাহার উপর হাড়ে চটিয়া গেল। রুদ্ধ রোষে, ব্যথা-ভরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "পূজো দিতি এইচি, সঙ্গে কোরে কি হীরে-মুক্তার গয়না আনবো? চাদোরখানা দোছোট ক'রে এইচি। এখান রেকে দিতি হয় দিন, নয় তো আর কি কর্ব্বো! নেহাৎ কারে প'ড়িচি, তাই পোনে-আট গোণ্ডা পয়সার জন্যি গায়ের চাদোর খুলে দিতি হ'লো—একি কম দুখ্যুর কতা?"

তিনকড়িকে অগত্যা সৃষ্টিধরের প্রস্তাবেই রাজী হইতে হইল।

ধামা চেঙ্গারি পুরিয়া সৃষ্টিধরকে বাতাসা আনিতে দেখিয়া সেজ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকি লুট হবে?"

মন্দিরের রকে মোট নামাইয়া সৃষ্টিধর বলিল, "আজ্ঞে।"

সেজ বাবু প্রশ্ন করিলেন, "কতোখানি বাতাসা?"

হাতযোড় করিয়া, সৃষ্টিধর বিনীত ভাবে বলিল, "আজ্ঞে, একুশ সের আড়াই ছটাক। ছেলের ওজনে লুট মানোসা—"

খাতা বাহির করিয়া খুলিতে খুলিতে সেজ বাবু বলিলেন, "তোমার নাম হ'লো গিয়ে—?"

সৃষ্টিধর বলিল, "সৃষ্টিধর শা। গ্রাম—"

খাতা দেখিয়া সেজ বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, তেরো নম্বোর, তা কই; লুটের দক্ষিণে জমা নেই তো?"

দক্ষিণার কথা শুনিয়া সৃষ্টিধরের বুক কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে ভয়ে সে বলিল, "আজ্ঞে লুটির দক্ষিণে তো ধরা-বাঁধা নেই, যার যা ক্ষ্যামোতা—"

তাড়া দিয়া সেজ বাবু বলিলেন, "তা জমা দাওনি কেন?"

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সৃষ্টিধর বলিল, "তকোন্ অতো খ্যাল্ হয়নি। আপনারা—"

বাধা দিয়া সেজ বাবু বলিলেন, "যাক্ যাক্, কি দেবে দাও, জমা ক'রে নিই।"

লিখিবার জন্য সেজ বাবু পেন্সিল বাগাইয়া ধরিলেন। দেখিয়া সৃষ্টিধর শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলেও তো নিস্তার নাই! কাজেই নিজের নিঃসম্বল অবস্থার কথা জানাইয়া, কাতরভাবে দায় হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিল।

সেজ বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তুমি তো দেখছি ভারী ফ্যাসাদে লোক হে! পাঁটার দক্ষিণে নিয়ে একবারে দোকানদারী জুড়েছিলে, আবার এখন—"

হালদার মহাশয় এতক্ষণ নীরব থাকিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। সেজ বাবুর কথার মাঝেই সৃষ্টিধরকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশের ভঙ্গীতে বলিলেন, "ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যয় ক'ত্তে কুণ্ঠিত হ'চ্ছো! বোঝ না বাপু! এই হ'চ্ছে সার্থক ব্যয়। দক্ষিণা দিতে অমত ক'চ্ছো কেন? দক্ষিণা ব্যতীত যে সর্ব্বকার্য্যই অসিদ্ধ!"

রকের উপর দরজার ধার ঘেঁসিয়া-বসিয়া বামুনদিদি মালা ঘুরাইতেছিলেন। হাত তুলিয়া মালাটি কপালে ছোঁয়াইয়া হালদার মহাশয়ের কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর মশায় যতাত্তো কতাই ব'লেছেন ছিষ্টি! দক্ষিণে না দিলি কাম্যোসিদ্ধি হয় না; যা হয় কিছু দে।"

"য়্যাট্টা পয়সা নেই বামুনদি! থাকলি কি আর গায়ের চাদোর বাঁদা দিয়ে লুটির বাতোসা আনতি হয়?"—বলিতে বলিতে দুঃখে-কষ্টে তাহার কণ্ঠরোধ হইল। চোখে জল ঝরিতে লাগিল। বামুনদিদি সহানুভূতিভরে বলিলেন, "দুখ্যু ক'রে কি ক'র্ব্বি ছিষ্টি! য়্যাক্‌দিন এসে চাদোর-খানা খালাস ক'রে নিস্। এখন তো লুটের দক্ষিণে কিছু—"

কথা বলিতে গিয়া কান্না ঠেলিয়া আসিতেছিল: অতি কষ্টে সামলাইয়া সৃষ্টিধর বলিল, "ব'লতেছেন বামুনদি! কিন্তু দেবো কোৎ থেকে? এট্টা কাণাকড়িও কাছে নেই!

বামুনদিদি সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "চাট্টে পয়সা আমার কাছে আছে, তাই দিয়ে এ ধাক্কা সাম্‌লানো যাক।"

পয়সা চারিটি সেজ বাবুর সামনে রকের উপর রাখিয়া বামুনদিদি বাবুটিকে বলিলেন, "বুড়ো মানুষ, বামুনের মেয়ে আমি, আমার কতাডা রাকো বাবা, এই নিয়েই সন্তোষ হও!"

চাপ্ দিয়া আর বেশী সুবিধা হইবে না বুঝিয়া—সেজ বাবু অগত্যা নিরস্ত হইলেন, পয়সা চারিটি তুলিয়া-লইয়া বলিলেন, "বামুনের মেয়ের কথা তো ঠ্যালা যায় না, না হ'লে—যাক্,—এক কাজ ক'রো হালদার! দক্ষিণে বাবদ্ ওর ভাগ থেকে টাকাটাকের বাতাসা ঢেলে নিও। নগদে তো পাওনাটা আদায় হ'ল না।"

লুটের অবশেষ সের আড়াই বাতাসা ও যৎকিঞ্চিৎ ভোগের প্রসাদ ধামার ভিতর রাখিয়া, গামছা-ঢাকা দিয়া, এবং ঝুলাইয়া লইবার জন্য মুণ্ডহীন পাঁঠার চা'র পা রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহারই পাশে রাখিয়া, সৃষ্টিধর বামুনদিদি ও সোণামণির সহিত—মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এক পাক ঘুরিয়া হঠাৎ সে থামিয়া বলিল, "থাক্‌গে বামুনদি'! পেদক্ষিণিতে আর কাজ নেই, যাওয়া যাক!"

বামুনদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, "ক্যানো রে! মাত্তোর য়্যাক পাক্ হ'লো। সাতবার পেদক্ষিণ করাই নিয়োম্। অভাবে তিনবার,—না হ'লি ফল হয় না।"

করুণকণ্ঠে সৃষ্টিধর বলিল, "না হোক্ গে। একুনি আবার দক্ষিণের দাবী কোরে চাপ দেবে! দেবো কোথা থেকে?"

শুনিয়া মৃদু হাসিয়া, অভয় দিয়া বামুনদিদি বলিলেন, "দক্ষিণে লাগবে না রে! তুই আয়।"

সৃষ্টিধর কোন রকমে প্রদক্ষিণ-পর্ব্ব শেষ করিয়া, বামুনদিদি ও সোণামণিকে অনুসরণ করিতে বলিয়া কালীবাড়ী ত্যাগ করিল। ধামাটি ঘাড়ে তুলিয়া-লইয়া, পাঁটার ধড়টি হাতে ঝুলাইয়া, লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া সে চলিতেছিল, হঠাৎ পিছনে বামুনদিদির ডাক শুনিয়া তাহাকে থামিতে হইল। ফিরিয়া চাহিতেই তাহার নজরে পড়িল বামুনদিদি ও সোণামণিকে ঘিরিয়া একটা ছোট-খাট ভীড় জমিয়াছে! তবে কি সে যাহা সন্দেহ করিয়াছিল তাহাই ঘটিয়াছে? প্রদক্ষিণের দক্ষিণার জন্য তাঁহাদের উপর জুলুম আরম্ভ হইয়াছে?—এখন উপায়! সে যে একেবারেই রিক্তহস্ত!

বামুনদিদি ডাকের উপর ডাক দিতেছিলেন, ভীড়ও ক্রমেই বাড়িতেছিল—দেখিয়া সৃষ্টিধরকে ফিরিতে হইল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া বামুনদিদি ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন, "এইছিস্ ছিষ্টি! ছ্যাক, শরোতের মা কি কাণ্ডো বাধিয়ে ব'সেছে! কার মুখি বুঝি শুনেছে, হাঁড়িকাটের গোড়ার মাটি ধরে রাকলি আপোদ্-বিপদ ঘটে না, তাই য্যাক্-দলা মাটি নিয়েছে। আর যাবা কুতায়? ঐ মিন্সে ব'লচে, 'পয়সা দ্যাও।—এক্কেবারে নাছোড়!' য্যাক ছিটে মাটি নিয়েছে তার জন্যিও পয়সা,—অবাক্ কাণ্ডো!"

ব্যথাভরা ধরা-গলায় সৃষ্টিধর বলিল, "একেন্‌কার কুটোগাছটারও দাম চোদ্দসিকে! আজগের য্যাটাদিনি কম ভোগটা ভোগ্‌লাম! ঢাকী নিয়ে আলাম, তা তারে বাজাতি দেলে না, ছ' আনা পয়সা জলে গ্যালো। পাটাডা মোটা ব'লে ধাপ্পা দিয়ে তিন-তিনটে টাকা খাড় ধ'রে আদায় ক'রলে!"

সৃষ্টিধরের কথা শুনিয়া জনতার ভিতর হইতে এক জন বলিল, "ব'ল্‌বো কি! পাঁচ সিকে ফুল-কাড়ানোর দক্ষিণে দিলাম্। পয়লা দফায় ফল প'লো না; ঠাকুরম'শায় বল্লেন, 'খুঁত হ'য়েছে, জরিমানা লাগ্‌বি!' দিলাম আর পাঁচ সিকে, কর্ব্বো কি?"

ভীড়ের ভিতর হইতে মেঘনাদ বীরদর্পে হুঙ্কার দিল।

কলহের সূচনা দেখিয়া সৃষ্টিধরকে থামাইয়া সান্ত্বনা দিয়া বামুনদিদি বলিলেন, "মার পূজোয় জ্যায়দা গেছে ব'লে দুখ্যু করিস্‌নে ছিষ্টি! মা যদি মুখ তুলে চান্,—বিশ্‌গুণ্ পাইয়ে দেবেন্।"

বামুনদিদি থামিতেই, ভীড়ের পিছন হইতে দুরমনের মতো চেহারার এক বাঙ্গারাম সৃষ্টিধরের সাম্‌নে আসিয়া বাজখাঁই আওয়াজে বলিল, "চা'র গোণ্ডা পয়সা বের করো এখুনি। বলির থানের মাটি নিলি ওর চা'র আনা ক'রে দক্ষিণে ধরা আছে। মায়ের বাড়ী যে ঝাঁট্ দ্যায়, বলির যায়গায় জল-গোবোর দ্যায়,—এ তারই পাওনা।"

বামুনদিদি বলিলেন, "তোর্ কাছে তো পয়সা নেই; তা হ'লি কি কর্ব্বি ছিষ্টি?"

সৃষ্টিধর বলিল, "কর্ব্বো আর কি? যেকেন্‌কার মাটি সেকেনে—"

সৃষ্টিধর কথা শেষ না করিলেও তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া সোণামণি অকল্যাণের ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। বামুনদিদি তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ও-রকোম্ কতা ব'ল্‌তি নেই ছিষ্টি! মা অসন্তোষ হন্।"

ব্যথা-ব্যাকুল কণ্ঠে সৃষ্টিধর বলিল, "ব'ল্‌তেছেন্ তো বামুন্‌দি'! কিন্তু তা' ছাড়া উপায় কি? কাছে তো কিচ্ছু নেই, তা হ'লি গাম্‌ছা প'রে, কাপোড়খানা খুলে দিয়ে বাড়ী যাতি হয়!"

বাঙ্গা বলিল, "চা'র্ গোণ্ডা পয়সা কাছে নেই, এ কি এট্টা কতা!"

বামুনদিদি বলিলেন, "সত্যিই নেই, থা'ক্‌লি সামান্যোর জন্যি কি মার থানে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ায়?"

এক জন মুরুব্বি বলিল, "তবে সেরখানিক্ বাতোসা আদায় কো'রে নে বাঙ্গা।"

গামছা পাতিয়া বাঙ্গা বলিল, "তাই দাও গো মশায়!"

"বাড়ীর জন্যি সামান্যো পেসাদ নিয়ে যাবো, তা-ও তোমরা দেবা না।"—বলিয়া ক্ষোভে-দুঃখে ধামা উপুড় করিয়া বাতাসা, প্রসাদ সবই বাঙ্গার গামছায় ঢালিয়া দিয়া বাঙ্গাকল্পতরু সৃষ্টিধর হন্-হন্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে বামুনদিদি বলিলেন, "ছিষ্টি রাগ ক'রে সব ঢেলে দিলে; বাড়ীর জন্যি য্যাক্-কুচিও রাক্‌লে না!"

সোণামণি বলিল, "রাগ হ'লো গিয়ে আমার পরে। ঐ যে আমি হাতে ক'রে মাটি তু'লে নিছি।—তা হোক্-গে রাগ; আমার মানোত তো দেওয়া হ'লো।"

কিন্তু সৃষ্টিধর তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, সে তখন মা-কালীর নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছিল,—"মা, যারা তোমার সেবার ভার নিয়ে এমনই ক'রে তোমার ভক্তদের সর্ব্বস্ব লুট ক'চ্ছে, তাদের এ অত্যাচার দেখেও তুমি দেখ্‌ছো না? এর প্রতিকার করো মা, করুণাময়ী!"

শ্রীনিশিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

পুষ্প-মোহিতা

(গল্প)



তাহার মালতীমালা নাম রাখা ভুল হইয়াছিল। সে মালা না হইয়া মালিনী হইল। নিজেদের শয়নগৃহ-সংলগ্ন এক-টুকরা পতিত জমিতে মালতীর স্বহস্ত-রচিত পুষ্পোদ্যান। চারিদিকে ফণি-মনসার কণ্টকাকীর্ণ দুর্ভেদ্য বেড়া; মাঝ-খানে সারি সারি পুষ্পিত কুসুম-তরু। উদ্যানের জমি উর্ব্বর, প্রস্ফুটিত পুষ্পদামে সুশোভিত তরুগুলি সতেজ, তাহাদের শাখা-পল্লবে শ্যামল-শ্রী উদ্ভাসিত।

বাগানের একপ্রান্তে শৈবালাচ্ছন্ন জলাশয়। মালতী কলসী ভরিয়া জল আনিয়া বৃক্ষমূলে সিঞ্চন করিতেছিল। এমন সময় অরু আসিয়া বলিল, "বৌদিদি, দাদা এসেছেন। তুমি তাঁকে জল খেতে দাও-গে, তোমার বাকি গাছগুলোতে আমিই জল দিয়ে দিচ্ছি।"

মালতী ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "আজ এরই মধ্যে ফিরলেন? এখনো তো সন্ধ্যে হয়-নি। সবগুলো গাছে জল দেওয়া হ'লো না। তুমি এত-বড় কলসী ভ'রে জল আনতে পারবে না অরু! ছেলে-মানুষ কি না!"

বারো বছরের ছেলে ছেলেমানুষ!—এই অপবাদে লজ্জিত হইয়া অরু উত্তর দিল, "আমি এখন তো অনেক বড় হ'য়েছি বৌদিদি, তাহ'লে জগার মাকে তুমি জল দিতে পাঠিয়ে দিও। বাড়ীতে ঝি থাকতে তুমি এত জল ঢালো কেন? তোমার কি কম কষ্ট হয়?"

"কষ্ট! না ভাই, এতে আমার কষ্ট হয় না, আনন্দই হয়। যাদের এত ভালবাসি, তাদের কাজ নিজের হাতে না করলে আমার ভাল লাগে না। এখন থাক্, তোমাকে আর জল দিতে হবে না। রাতে ফিরে এসে আমিই দেব।"

"না বৌদিদি, রাতে তুমি বাগানে ঢুকো না। হাস্না-হানার ফুলে গাছ ভ'রে গেছে। ও-বাড়ীর শঙ্কুদা বলে—হেনার গন্ধে সাপ আসে।"

"সাপ এলেও ফুলের গন্ধে বিভোর হ'য়ে থাকে; কারুকে ছোবল দিতে মাথা তোলে না। তুমি তো জানো না অরু, সকলে ঘুমুলে আমি রোজ রাতে বাগানে আসি। না এলে আমার ঘুম হয় না; থাকতে পারি না।"

"আচ্ছা বৌদি, তুমি গাছ এত ভালবাসো কেন? সব চেয়ে তোমার বেশী আদরের পাত্র ঐ গন্ধরাজ!"

"যে ফুলের রাজা, গন্ধের রাজা, তাকে ভাল না বেসে বাসবো কাকে? তুমিও তো কত কি ভালবাস অরু, কেন বাস জিজ্ঞাসা করলে কি বলতে পার? আমিও তেমনি গাছ ভালবাসি,—কেন বাসি, জানি না।"

"না জানলে; এখন চল। দাদা রাগ করবেন। কই, এখনো তো তুমি খোঁপায় গন্ধরাজ প'রোনি? চট্-পট্ প'রে নাও, আমি তুলে দেই!"

মালতী ব্যস্তভাবে বলিল, "না ভাই, তুমি পারবে না, কি তুলতে কি তুলে ফেলবে! যে ফুল সকাল বেলা ঝরে যাবে, আমি বেছে বেছে সেইগুলো তুলি; তাজা ফুল তুলতে বড্ড মায়া হয়।"

বলিতে বলিতে মালতী ফুলভারে অবনত গন্ধরাজ গাছের তলায় অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার অলকে কুসুম দেওয়া শেষ হইল না। অকস্মাৎ স্বামী হিরণের অতর্কিত আবির্ভাবে মালতীর হস্ত হইতে ফুল খসিয়া পড়িল।

হিরণ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রুক্ষস্বরে কহিল, "তোমার মালিনীগিরি এখনো শেষ হয়নি? এক ঘণ্টার ওপর এসেছি, না পাই এক গেলাস জল, না পাই দু'টো পান। লতু শ্বশুরবাড়ী যাবার পরে আমার হ'য়েছে জ্বালা! মা বসেছেন জপে, ইনি বসেছেন ফুলের ধ্যানে! গাছ-পালা-গুলো হ'য়েছে আপদ, ইচ্ছা হয়, একটানে সব উপড়িয়ে ফেলে আপদের শান্তি করি।"

রাগে দিশাহারা হইয়া হিরণ সত্য সত্যই সামনের

দোলায়মান গন্ধরাজের ছোট একটি কুসুমিত শাখা মড়-মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

যে গাছের ফুল অরু তুলিতে চাহিয়াও পারে নাই, যাহা মালতীর প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর, সেই গাছের অঙ্গহানিতে মালতী ভগ্নশাখাটি বক্ষে চাপিয়া-ধরিয়া, শরবিদ্ধা বিহঙ্গীর মত ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

* * * *

রাগে, দুঃখে হঠাৎ অধীর হইলেও রাগী বলিয়া হিরণের দুর্নাম ছিল না। সে রূপবান ও বিদ্বান। তাহাদের বাস-গ্রাম হইতে মাইল-সাতেক দূরবর্ত্তী কোনও গ্রামের ক্ষুদ্র জমিদারের সম্পত্তির ম্যানেজারী করিয়া সে জীবিকার্জ্জন করিত, কিন্তু সংসারে তাহার শান্তি ছিল না। তাহার পিতা হরিদাস গোস্বামী সংসারের প্রতি অনাসক্ত—উদাসীন ছিলেন; তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল বৈরাগী-বৈষ্ণবের আখড়ায় কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়াছেন; বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহার আসক্তি নাই। বিভিন্ন গ্রামের কীর্ত্তনের আড্ডায় তাঁহার সময় কাটে। পক্ষান্তে, মাসান্তে হঠাৎ কোন দিন গৃহে উপস্থিত হইলেও অধিক কাল সেখানে থাকিতে পারেন না। হরিনামের আকর্ষণে আবার তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হয়।

হিরণের মা শ্যামমোহিনী স্বামীর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন না করিলেও তাঁহাকে প্রকৃত সংসারী বলা চলে না। তিনি গৃহে থাকিয়াই সাধন-ভজনে রত আছেন। হাতে জপের মালা এবং মুখে—"নাম পূজ, নাম ভজ, নাম কর সার, কলিযুগে নাম বিনা গতি নাই আর"—এই ধ্বনি। একমাত্র কন্যা ললিতা বিবাহিতা, সে স্বামিগৃহে থাকে। ছোট ছেলে অরুর দিন কাটে শিক্ষালয়ে ও বন্ধুদের মজলিসে।

বেচারা হিরণ কর্ম্মশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া শ্রান্তি দূর করিবে, এমন একটু সুযোগ পায় না। তরুণী পত্নীর নিত্য অবহেলায় তাহার তরুণ হৃদয় বেদনায় টন্-টন্ করে; সেই বেদনার তীব্রতা সে ভুলিতে পারে না।

মাত্র বছর-দুই হইল মালতীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। নববধূর স্নিগ্ধ কমনীয় মূর্ত্তি, ভাবে বিহ্বল আঁখি-দু'টি নিরীক্ষণ করিয়া হিরণের হৃদয় আশায়, আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু তাহার হৃদয়ভরা আশার আকাশ-কুসুম আকাশে বিলীন হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। দেখিতে দেখিতে দুইটি তরুণ-হৃদয়ের মাঝখানে গাছের পর গাছের সারি গজাইয়া উঠিল, এবং শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিল। হিরণ স্ত্রীকে পাইয়াও সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইতে পারিল না।

মালতী শৈশবে মাতৃহীনা। তাহার পিতা উদ্যানের তত্ত্বাবধান কার্য্যে জীবিকার্জ্জন করিতেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন—পেশাদার উদ্যানপালক। তাই বাল্যকাল হইতেই মালতীর হৃদয়ের প্রতি-পর্দ্দায় যে বৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহার শ্বশুরালয়ে আসিবার পর তাহা যেন অঙ্কুরিত হইয়া শাখা-পল্লবরাশি বিস্তার করিয়াছিল; তাই বৃক্ষের মোহ সে কাটাইতে পারে নাই।

এরূপ প্রবৃত্তির সহিত হিরণের পরিচয় ছিল না। সে সাধারণ মানুষ; সাধারণ লোকের মতই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। ভোরের পাখী ডাকিতে না ডাকিতে শয্যাত্যাগ করিয়া তাহাকে সাত মাইল পথ পাড়ি-দিয়া জমিদারের কাছারীতে হাজিরা দিতে হইত। সেইখানেই তাহার মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থা ছিল। দৈনন্দিন কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যায় সে গৃহে ফিরিত। কোন কোন দিন কাজের চাপে তাহার গৃহে ফিরিতে রাত্রি হইয়া যাইত; কিন্তু কি কৃষ্ণপক্ষের নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর বিভীষিকা, কি ঘনঘোর বর্ষার অশ্রান্ত বর্ষণ, কোন বাধাবিঘ্নেই তাহার গতিরোধ হইত না।

হিরণ মালতীর জন্য ব্যাকুল; স্ত্রীর সুকোমল সুন্দর মুখখানি দেখিবার লোভে তাহার চিত্ত লুব্ধ-ভ্রমরের মত তাহাকে বেষ্টন করিয়া গুঞ্জন করিত। কিন্তু সে-দিকে মালতীর লক্ষ্য ছিল না। তাহার প্রাণ-মন আকুল, উন্মুখ হইয়া পড়িয়া থাকিত পত্রে-পুষ্পে,—কখনও বা তৃষিতা চাতকিনীর মত মেঘের সন্ধানে সুদূর নীলাম্বর-প্রান্তে।

স্বামীর আগমনে মালতী প্রফুল্ল হয় না। স্বামীর আদরে-সোহাগে তাহার অধরে হাসির বিজলীচ্ছটা বিকশিত হয় না। স্বামীর রহস্যালাপে তাহার পাথরের মত সুদৃঢ় মুখের একটি রেখা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হয় না! কেবল এক সময় তাহাকে পুলকিত দেখা যায়—সে বর্ষার মেঘমেদুর দিনে রিমিঝিমি বর্ষণে। বারিধৌতা লতিকার মত সে ভিজিয়া-ভিজিয়া, আনন্দে অধীর হইয়া বিভিন্ন

তরুতলে ছুটাছুট করিয়া গুন্-গুন্ স্বরে গান গায়—"ও মালতি, ও মল্লিকা, তুই ফুটবি সখী কবে?"

বৃষ্টি থামিয়া গেলে ক্ষান্তবর্ষণ আকাশের মত মালতী আবার শান্ত গাম্ভীর্য্যের আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখে। না থাকে তাহার উল্লাস, না থাকে তাহার উচ্ছ্বাস!

হিরণ নীরবে লক্ষ্য করে, নীরবে গুমরিয়া মরে। তাহার বহু দিনের চাপা আগুন আজ সহসা মৃদু বায়ু-স্পর্শে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। নতুবা হিরণ ভ্রমেও স্ত্রীকে অপ্রিয় কথা কহে না, তাহার প্রতি রূঢ় আচরণ করে না।

যাহা হইয়া গেল, সে জন্য অনুতপ্ত হইয়া হিরণ চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—কেহ কোথাও নাই। তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অরু পলায়ন করিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

হিরণ সরিয়া-গিয়া মালতীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল,"মালা, গাছ-তলায় প'ড়ে এমন ক'রে আর কেঁদো না। সত্যি, আমার অন্যায় হ'য়েছে, আর কখনো তোমার গাছে হাত দেব না। এবারের মত তুমি আমাকে মাফ্ কর। দুঃখ কোরো না লক্ষি! ক'দিনের ভেতরেই আবার তোমার গাছে নতুন ডাল গজাবে। তাতেও যদি তোমার মনের আক্ষেপ থাকে, তাহ'লে আমি তোমাকে কালকেই আর একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ এনে দেব।"

হিরণের বৃথা আশ্বাস, বৃথা চেষ্টা! মালতী তাহার হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া তেমনই কাঁদিতে লাগিল।

মালতীর অবিরল অশ্রুজলে হিরণের হৃদয় আর্দ্র হইল। সে যথার্থ তাহাকে ভালবাসিত। ভালবাসার গভীরতায় অনেক আঘাত সহিয়াছে। কিন্তু আজ প্রিয় সম্বোধনে অনুনয়-বিনয়ে কোনই ফল হইল না। মালতী না কহিল একটি কথা, না তুলিল চক্ষু।

জপ-তপ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই শ্যামমোহিনী তখনই পুত্র ও বধূর সন্ধানে বাগানে উপস্থিত হইলেন। অরুর নিকটে তিনি সমস্তই শুনিয়াছিলেন। সন্ধ্যার ঘোর কাটিয়া চন্দ্রালোকে তখন মুক্ত প্রকৃতি হাসিতেছে। প্রস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে ধরাশয্যায় বধূ ও তাহার পাশে অপরাধী পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনোমন্দিরে চির-কিশোর কিশোরীর মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের চিরমধুর চিত্র ফুটিয়া উঠিল।

তিনি সকৌতুকে ডাকিলেন, "হিরণ, তোরা এত রাত অবধি এখানে কি করুছিস্? ওমা, এ কি কাণ্ড! বৌমা মাটিতে প'ড়ে কেন? রাগ ক'রতে হয়, ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সেটা করলেই হ'তো?..এ সময় সন্ধ্যার পর বাইরে থাকতে নেই। দু'দিন পরে ছেলের মা হবে, এখনও কি এত অবুঝ হ'লে চলে?"

হিরণ জানিত না। আজ মায়ের মুখে প্রথম শুনিল। মা জপপরায়ণা হইলেও এ-সব দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

হিরণের চিত্তদাহ নিমেষে জুড়াইয়া গেল। জয়ের আনন্দে, গর্ব্বে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সে ভাবিল, এই-বার তাহার প্রিয়ার পুষ্পপ্রীতি, তরুপালন কোথায় থাকে, দেখা যাইবে। বনবিহঙ্গিনীর পায়ে শিকল পড়িবে—অরণ্যের হরিণী মায়াজালে আবদ্ধ হইবে! যে নারীর মধ্যে পতিপ্রেম বিকশিত না হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সন্তান-স্নেহ তাহার সুপ্তি-ঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে পূর্ণতায় টানিয়া আনিবে।

কথাটা মালতীর হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হইল না। চমকিয়া সে উঠিয়া বসিল। তাহার মাথায় চন্দ্রতারকা-ভূষিত আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল! এ সম্ভাবনা সে স্বপ্নেও কামনা করে নাই। তাহার বাল্যজীবন যে পরিবেষ্টনের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে, তাহার বাহিরে পা দিয়া আজও সে হৃদয়কে শান্ত করিতে পারে নাই। পিতার আদেশে তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে, সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইতেছে; কিন্তু ইহার মধ্যে হৃদয়ের প্রেরণা নাই।

বাপ মেয়ের প্রকৃতি জানিতেন। তাই মেয়ের সহিত তিনি এক রাশি ফুলগাছ দিয়াছিলেন। সেই গাছগুলি অবলম্বন করিয়া মালতী কোনরূপে জীবন যাপন করিতেছে। এ অবস্থায় এ আবার কি অভাবনীয় পরি-বর্ত্তনের সূচনা?—সে আর ভাবিতে পারিল না। আস্তে আস্তে বাগান হইতে বাহির হইয়া গেল।

অরুকে স্কুলের পড়া বলিয়া দিয়া হিরণ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইল। মালতী মেঝেয় পৃথক্ বিছানা পাতিয়া ইহারই মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছে! অভি-মানিনীর দুর্জ্জয় অভিমানে হিরণ মনে মনে কৌতুক

অনুভব করিতে লাগিল। স্নেহে প্রেমে বিগলিত হৃদয়ে হিরণ পত্নীর মুখের নিকটে মুখ নত করিয়া কহিল, "মালা, মালিনী, এখনো শান্ত হ'তে পাল্লে না? লঘু পাপে আর কত গুরু দণ্ড দেবে? চল, উঠে আমার বিছানায় চল, সেখানে যে শাস্তি দিতে চাও, আমি মাথা পেতে নেব।"

মালতী স্বামীকে একটা ধাক্কা দিয়া অকস্মাৎ গর্জ্জিয়া উঠিল, "তুমি সরে যাও, আমার কাছে এস না। আমাকে ছুঁয়ো না। কথা না শুনলে, আমি এখানে থাকবো না। বাবার কাছে চ'লে যাব। এত দিন ত যেতাম; কেবল আমার গাছের জন্যে পারিনি।"

হিরণ তাহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। এই কি তাহার বড় আদরের—বড় স্নেহের মালা? বিধাতা তাহা-দিগকে যে বাঁধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহার অপেক্ষাও কি ঐ সকল বৃক্ষের বন্ধন দৃঢ়তর? হিরণের পৌরুষগর্ব্বে আঘাত লাগিল। সে ধীর, গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "তোমাকে চ'লে যেতে হবে না মালা! আমি কথা দিচ্ছি—আর কখনো তোমার অনিচ্ছায় তোমাকে স্পর্শ করবো না—বিরক্ত করবো না। আমার চেয়ে—পৃথিবীর সকলের চেয়ে ঐ সব গাছের প্রতি তোমার প্রীতি অক্ষয় হোক। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও।"

বলিতে বলিতে হিরণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শয্যায় আশ্রয় লইল। কিন্তু সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী তাঁহার কোমল করপদ্মখানি একবারও হিরণের চক্ষুপল্লবে বুলাইলেন না।

চিন্তার পর চিন্তাতরঙ্গে হিরণ ভাসিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল—মহলে যাইবার কথা। মালতীকে ছাড়িয়া তাহার দূরে যাওয়া কষ্টকর বলিয়াই সে নানারূপ ওজর-আপত্তি করিয়া দিনটা পিছাইয়া দিয়াছে। হিরণ স্থির করিল, আর বিলম্ব না করিয়া এই সুযোগে সে মহলের কাজ সারিয়া আসিবে। মালতীকে একটু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বিচ্ছেদ ভিন্ন অবিচ্ছিন্ন মিলনের মূল্য বুঝিতে পারা যায় না।

* * * *

পরের দিন ভোর হইতে না হইতে হিরণের যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। শ্যামমোহিনী সবিস্ময়ে কহিলেন, "কৈ, মহলে যাবার কথা তো এত দিন একবারও বলিসনি? কর্ত্তা থাকেন বাইরে বাইরে। তুই কাছে না থাকলে আমার জপ-তপ ঠিকমত হয় না। অরুটা হ'য়েছে বার-মুখো। বৌমা গাছ-পালা নিয়েই পাগল। এ সময় যে সাবধানে থাকা দরকার তা ও শুনবে না। তুই কবে ফিরবি হিরণ?"

হিরণ কার্য্যরতা মালতীর পানে আড়চোখে চাহিয়া উত্তর করিল, "ফেরার কথা এখনি তো ব'লতে পারি নে মা! কাজ বুঝে ফেরা না ফেরা! তোমার অসুবিধা হ'লে ললিতাকে আনিয়ে নিয়ো।"

"পরে তাকে আনতেই হবে। এত আগে থেকে সে কি এসে থাক্‌তে পারবে? বৌমার এই তিন মাস যায়। এখনো দেরী আছে। তুই চট্ ক'রে কাজ সেরেই চলে আসিস। বেশী দেরী করিস নে।"

"কাজের জন্যে যাচ্ছি মা! কাজ সারতে দু'-চার মাসও কেটে যেতে পারে। আমার জন্যে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ঠিক সময়ে টাকা পাঠিয়ে দেব। তোমার জপ-তপের, আর এক জনের গাছপালার সেবা-যত্নের কোনই ত্রুটি হবে না।"—বলিয়া হিরণ আশা-পূর্ণনেত্রে মালতীর মুখের দিকে তাকাইল; কিন্তু স্থির সমুদ্রে না আছে চাঞ্চল্য, না আছে তরঙ্গ-ভঙ্গ।

মায়ের পদধূলি মাথায় লইয়া হিরণ ক্ষুণ্ণমনে গৃহত্যাগ করিল।

* * * *

দুই চারি মাস ত দূরের কথা, মালতীকে মাত্র এক সপ্তাহ দেখিতে না পাইয়াই হিরণ অস্থির হইল! কোথায় গেল রাগ, কোথায় গেল তাহার সেই প্রচণ্ড অভিমান! বিচ্ছেদের অনলে পুড়িয়া তাহার তেজটুকু পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইল। হিরণ ভুলিয়া গেল মালতীকে কি বলিয়া আসিয়া-ছিল, মালতী তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল।

এক মাসের কাজ তাড়াতাড়ি সাত দিনেই শেষ করিয়া নীড়াভিমুখী বিহঙ্গের মত হিরণ গৃহে ফিরিল। মালতীকে চমকিত—পুলকিত করিবার প্রত্যাশায় তাহার আগমন-সংবাদ বাড়ীর কাহাকেও পূর্ব্বে জানাইল না।

সে-দিন তিথিটা ছিল ঝুলন-পূর্ণিমা। সন্ধ্যায় মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিয়াছিল। স্থানীয় রথতলায় শ্যাম-মোহিনী ঝুলন দেখিতে গিয়াছিলেন। পাড়ার কয়েকটি সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া অরু মহানন্দে লুডো খেলিতেছিল।



"আছ ও তনু-আবরণে শ্রীচরণ ম্লান
ঘরে ও বাহিরে থাক লুকায়ে,
হৃদয়মাঝে মম দেবতা মনোরম

কার্ত্তিক, ১৩৪৭ |

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস

হিরণ নিঃশব্দে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

মালতী বাতায়নে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জানালার নীচে সদ্য-বিকশিত কুসুমরাশির কি সমারোহ! মালতীর অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে। কাল কেশে এক থোকা গন্ধরাজ হাসিতেছে! কর্ণমূলে দুলিতেছে চম্পক-কলি। গলায় কুন্দফুলের মালা। নীল শাড়ীখানি তাহার গৌর তনু বেষ্টন করিয়া সেই রূপরাশি ঢাকিবার বৃথা চেষ্টায় যেন শ্লথ, চঞ্চল!

হিরণের সমগ্র প্রাণ-মন মন্ত্রমুগ্ধবৎ মালতীর দিকে ধাবিত হইল। তাহার মনে হইল, জগতে কোথাও বাধা নাই; বন্ধন নাই। তাহার চিরন্তনী কিশোরী প্রিয়া অভিসারের বেশে সাজিয়া আজ যেন তাহার বাহু-বন্ধনে ধরা দিতে আসিয়াছে।

হিরণ বিহ্বল কণ্ঠে ডাকিল, "মালা, তোমাকে আর আমার পথ চেয়ে থাক্‌তে হবে না। আমি এসেছি।"

মালতী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, হিরণ তাহার পাশে। সে তৎক্ষণাৎ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

হিরণের অন্তর হইতে পলকে অদৃশ্য হইল—ঝুলন-রজনীর মদির-বিহ্বলতা, বর্ষা-বায়ুর সজল আমন্ত্রণ, মিলনের সুমধুর গুঞ্জনধ্বনি।

রাত্রি অধিক হইলে শ্যামমোহিনী ঘরে ফিরিয়া ছেলেকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিলেন। ছেলে অসুখের ছুতায় বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। এক বার উঠিল না, কাহারো সহিত কথাও কহিল না। অনাহারে, অনিদ্রায় হিরণের দুঃখের রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল।

প্রভাতে দুঃসহ হৃদয়-ভার লইয়া, পরাজয়ের ক্ষোভ, লজ্জা বহন করিয়া হিরণ গন্ধরাজ ফুলগাছের নিকট উপনীত হইল। বর্ষার বারিধারায় স্নাত বাগানটি তখন শ্যামল শোভায় হাসিতেছে। সবুজ পাতার কোলে শুভ্র, সুন্দর ফুলগুলি হর্ষে ঝল্‌-মল্‌ করিতেছে।

চারি দিকে চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে হিরণের দৃষ্টিপথে পড়িল—গন্ধরাজের ঘন পল্লবে লুক্কায়িত কেশে-জড়ানো একখণ্ড কাগজ।

কৌতূহলী হিরণ চুলের বন্ধন মুক্ত করিয়া কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"হৃদয়ের রাজা আমার!

তোমার আঘাত আজও আমি সহিতে পারিতেছি না, আমার বুকে কাঁটা হইয়া যেন বিঁধিয়া আছে। আমার ভালবাসা তোমাকে কেমন করিয়া জানাইব? ইচ্ছা হয় লতা হইয়া তোমাতে জড়াইয়া থাকি, ফুল হইয়া তোমার পূজা করি, বৃষ্টিধারারূপে তোমাকে অভিসিক্ত করি। কিন্তু মনের সাধ মনেই থাকে, পূর্ণ হয় না। তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে, রাত্রে বলিব; এখন সে সব কথা বলিবার সময় নয়। ইতি—

আত্মনিবেদিতা

লতিকা"

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে হিরণের হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। প্রভাতের আলোকে জ্যোতির্ম্ময় বিশ্ব ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। এ হস্তাক্ষর মালতীর। মালতী প্রেম-নিবেদন করিয়াছে কাহাকে? হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার সে কাহাকে খুলিয়া দিয়াছে? যাহার জন্য তাহার এই ব্যাকুলতা—সে কে? সে কোথা হইতে আসিল? হিরণ মূর্খ, মহামূর্খ! তাই এত দিন সে সন্দেহ করে নাই, সন্ধান লয় নাই। পূর্ব্বরজনীতে তাহার অভিসারের বেশ দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পারে নাই।

হিরণ স্তব্ধ হইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। ঘরে যাইতে ইচ্ছা হইল না; স্ত্রীকে চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহা প্রবৃত্তি হইল না। দুঃখে, ঘৃণায়, অপমানে তাহার মন বৈরাগ্যে পূর্ণ হইল।

শ্যামমোহিনী সাজি-হস্তে পূজার ফুল তুলিতে আসিয়া শঙ্কিত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিরণ, তোর কি হ'য়েছে? এখানে এমন ক'রে ব'সে আছিস্ কেন? চোখ-মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন? অসুখ ক'রেছে? চল, বিছানায় শু'তে চল। অরু এখনই ডাক্তার ডেকে আনুক?"

হিরণ আত্মসংবরণ করিয়া বিষাদের হাসি হাসিল, বলিল, "না মা, অসুখ করেনি; তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমাকে এক্ষুণি আবার মহলে যেতে হবে। কাজ ফেলে রেখে তোমাদের এক বার দেখতে এসেছিলাম।"

মা উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, "তুই কি ব'লছিস হিরণ?

তোর যে অসুখ ক'রেছে,—ভয়ানক অসুখ, তা আমি বুঝতে পেরেছি। ক'দিন পরে ফিরে এসে রাতে কিছু খেলি-নে, প'ড়ে রইলি। এখন ব'লছিস, মহলে যাবি। তা হবে না বাবা, আমি তোকে যেতে দেব না।"

"কি যে বল মা, তার ঠিক নেই। আমার কিছু হয়নি, বেশ আছি। আমার জন্যে তুমি ভেব না। এক্ষুণি আমাকে রওনা হ'তেই হ'বে। আজ যাব ব'লে আমার জিনিষপত্র সবই কাছারীতে রেখে এসেছি। আমার দেরী করবার যো নেই, এখনি চল্লাম।"

বলিতে বলিতে হিরণ ঝড়ের মত বেগে বাহিরে চলিয়া গেল।

* * * *

দুই মাস অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিরণ আর বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই। মাঝে মাঝে অক্রুর পত্রে সে বাড়ীর সংবাদ জানিতে পারে। ললিতা আসিয়াছে, সকলে ভাল আছে। ইহার বেশী হিরণ জানিতে চাহে না; জানিবার আগ্রহও নাই। নিজের অশান্ত চিত্তকে সর্ব্বক্ষণ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া সে স্ত্রীকে ভুলিয়া থাকিবারই চেষ্টা করে। স্ত্রীর বিষময় স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে চাহে, কিন্তু পারে না। মালতীর সরল, সুন্দর মুখচ্ছবি, ভাব-বিহ্বল করুণ আঁখি সর্ব্বক্ষণ তাহার মানস-চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে উন্মনা করে। মালতীকে বিপথগামিনী ভাবিতে হিরণ মনে ব্যথা পায়। আজকাল তাহার মনে এই সংশয় জাগিয়াছে যে, কাগজে নামহীন কয়েক ছত্র লেখা দেখিয়া তাহার এ ভাবে গৃহত্যাগ করা হয় ত সঙ্গত হয় নাই। বিনা প্রমাণে কেবল সন্দেহে নির্ভর করা নিতান্ত ছেলেমানুষের কাজ! হিরণের মনে হয়—এ সম্বন্ধে মালতীকে সকল কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কাপুরুষের মত পলাইয়া আসা অন্যায় হইয়াছে। সত্যই যদি মালতী তাহাকে না চাহে, ভালবাসিতে না পারে, তবে তাহা লইয়া হিরণের আক্ষেপ করিবার কি আছে?

এইরূপ নানা চিন্তায় ধীর-মন্থর গতিতে হিরণের নিরানন্দ, ব্যর্থ-জীবনের দিনগুলি কাটিতেছিল। এমন সময়, বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত অক্রুর চিঠি আসিল—মালতী বাঁচিয়া নাই! সকলের নিষেধসত্ত্বেও গাছের জন্য গোপনে ঘাট হইতে জল আনিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া সে জ্ঞান হারাইয়াছিল; লুপ্ত জ্ঞান আর ফিরিয়া আসে নাই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে!

হিরণ অভিভূত হইয়া পড়িল। এরূপ অসময়ে মালতী কি যাইতে পারে? সে নিকটে ছিল না বলিয়াই কি তাহার মালতীমালাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই? মুহ্যমান হিরণ অনুচ্চ স্বরে ডাকিতে লাগিল, "মালা, মালতি, মালিনি!"

সেই দিনই হিরণ প্রবাসের পালা সাঙ্গ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

ছেলের সাড়া পাইয়া মা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, "তুই ফিরে এলি হিরণ! আমার বৌমা কোথা? তাকে ফিরিয়ে আন্ বাবা? মা আমার গাছ-গাছ ক'রেই প্রাণ দিলে! আর কেউ গাছের যত্ন ক'রলে তার মন উঠতো না, লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজেই গাছের সেবা না করলে তার তৃপ্তি হতো না। গাছগুলোই বাছার কাল হ'য়েছিল। গাছের জন্যেই সংসারে মন দিতে পারেনি, কাউকে ভালবাসতেও পারেনি।"

ললিতা হিরণের হাত ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অক্রু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে সরিয়া গেল। হিরণ নির্ব্বাক, পাথর হইয়া বসিয়া রহিল। চারিদিকে মালতীর শত চিহ্ন দেদীপ্যমান। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এত আয়োজন, এত আড়ম্বর, সে-ই কেবল নাই! যে যাইবার, সে হঠাৎ চলিয়া যায়, তাহার স্মৃতির সকল অবলম্বনই পড়িয়া থাকে।

হিরণ ঘরে স্থির থাকিতে পারিল না। ললিতাকে লইয়া বাগানে উপনীত হইল। এই কয় দিনেই আগাছা ও জঙ্গল বাড়িয়া বাগান যেন একান্ত শ্রীহীন হইয়াছে। বৃক্ষমূল শুষ্ক, ঝরাপাতা বায়ু-প্রবাহে সর্-সর্ শব্দ করিতেছে।

হিরণ গন্ধরাজ গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। সেই ভগ্ন-কাণ্ডের গায়ে ছোট একটি শাখা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহারই কোলে কয়েকটি কচি সবুজ পাতা বায়ুহিল্লোলে কাঁপিতেছে, দুলিতেছে।

হিরণ নীরবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা

তাহার স্মৃতির দ্বার খুলিয়া গেল। মনে পড়িল সেই কাল সন্ধ্যা। ক্ষণিকের ক্রোধ, ক্রোধের পরিণাম! কি হইতে কি যেন হইয়া গেল; অমৃতে গরল উঠিল!

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ললিতা ধীরে ধীরে ডাকিল, "দাদা, তুমি অমন চুপটি ক'রে প'ড়ে থেকো না। তোমার দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়! যে থাকার নয়, তাকে বেঁধে রাখলেও রাখা যায় না। দিনরাত আগ্‌লে রেখেও ত রাখ্‌তে পারলাম না। বৌদি আসলে আমাদের ছিল না; ছিল গাছের। গাছের জন্যই প্রাণ দিয়েছে। সামান্য ফুলগাছকে মানুষ যে এত ভালবাস্‌তে পারে, তা জানতাম না। ওর গাছের ভালবাসায় সকলে হেসেছে। উনিই (স্বামী) শুধু হাসেননি। ব'লেছিলেন, ও একটা ব্যারাম—'পার্‌ভার্‌সন্।' ছেলেবেলা থেকে একা একা মানুষ হ'য়েছিল। মা ছিলেন না, বাপও থাকতেন গাছপালা নিয়ে মত্ত হ'য়ে। তাই বৌদির গাছ-পালাই হ'য়েছিল বন্ধু। গাছের সাথে গল্প হ'তো, মান-অভিমান হ'তো। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক পাগ্‌লামী ধীরে ধীরে বৌদির ভেতরে বেড়ে উঠেছিল। উনি ব'লছিলেন, "ছেলে হ'লে এ রোগ বোধ হয় থাক্‌বে না, সেরে যাবে।"

ললিতার স্বামী বড় ডাক্তার। ডাক্তারের অভিমত শুনিয়া হিরণ চকিত হইয়া কহিল, "গাছের সাথে মান-অভিমান হ'তো, গল্প হ'তো, আমি ত তা জানতাম না লতু? ভাবতাম, ও বুঝি বাগানের নেশা, এম্‌নি একটা খেয়াল!"

"না দাদা এম্‌নি নয়, ওইটাই হ'য়েছিল বৌদির পাগলামী! আশ্চর্য্য, তুমি কি টের পাওনি? গন্ধরাজ গাছের সঙ্গে ও 'প্রিয়তম' সম্বন্ধ পাতিয়েছিল। রোজ রাতে একখানা ক'রে চিঠি লিখে গাছের ডালের মধ্যে গুঁজে রাখতো। সকালবেলা ঘরে নিয়ে-গিয়ে সে চিঠি পুড়িয়ে ফেল্‌তো। এই গাছের জন্যেই তোমাকেও সে তেমন ভালবাসতে পারেনি দাদা!"

"না পারুক লতু, তবু সে যে শুধু ফুলই ভালবেসে ফুলের জীবন নিয়ে গেছে, এই আমার এত দুঃখের ভেতরেও সান্ত্বনা।"

বলিতে বলিতে হিরণের চক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

যমুনা

হৃদয়-যমুনা উজানে বহিয়া যায়
সাথে নিয়ে যায় কত অতীতের বাণী
কত কথা নাহি জানি।
কত ছায়া দেখি তার নিরমল জলে
পুলকে উছলি ঢেউ চলে ছল ছলে,
মৃদু মৃদু সুরে কত কথা যায় বলে,
শুধু করে কাণাকাণি।

আশার সাগর উথলিয়া উঠে মনে
পুলকের দ্বারে কে আঘাত ক'রে যায়,
প্রিয়জন-ছবি ভাসে মনে ক্ষণে ক্ষণে
উৎসুক আঁখি সুদূরের পানে চায়।
স্নেহের পরশে দুয়ার খুলিয়া যায়
নাহি রয় মনে কোন বাধা-ব্যবধান,
সকলেরে ডেকে আপনার ক'রে লয়
দু'দিনের তরে সার্থক করি প্রাণ।
কোন্ অমা-রাতে জলেতে শিহর জাগে
মনের যমুনা ভয়েতে আপনহারা—
কোন্ শ্যাম পাশে আকুলি অভয় মাগে
আশার আকাশে নাহি পায় শুকতারা।

বিষাদের মেঘ গুমরি গরজে গগনে
নিবিড় আঁধারে চমকে বিজলী সঘনে,
নিঃশেষ করি সব ক্রোধানল শেষে—
ধরণীতে নামে স্নেহের করুণা-ধারা।
কভু দ্বার খুলি প্রিয়জন-পথ চায়,
বিফলেতে যায় পুরণিমা তিথি কত,
কেহ আসে নাকো, ডাক দিয়ে নাহি যায়,
বলে না তো কেহ সান্ত্বন-বাণী যত!
শুধু একা বসে আশ্বাস নাহি পায়
কেঁদে কেঁদে হয় সারা,
তবু আকাশেতে একা চাঁদ জেগে রয়,
গাহে পাখি সাথী-হারা।

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়।

পদকর্তা গোবিন্দদাস

শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগের বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের গৌরব-স্বরূপ পদকর্তা গোবিন্দদাসের রচিত পদমাধুর্য্য ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনারম্ভের পূর্ব্বে তাঁহার জীবনীপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন মনে করি। শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগে গোবিন্দ-নামধারী কোনও ব্যক্তির যে বাঙ্গালা বা মিথিলায় থাকা অসম্ভব ছিল, বা অন্য কেহ পদাবলী রচনা করিতে সক্ষম ছিলেন না, এরূপ অনুমানের কোন কারণ নাই। শ্রীচৈতন্যের অনুচর নবদ্বীপবাসী গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তির কথা জানিতে পারা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কুলীন গ্রামনিবাসী গোবিন্দ ঘোষ নামক আর এক গোবিন্দেরও সন্ধান মিলিয়াছে। দীনেশবাবু (স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন) গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক এক গোবিন্দের সন্ধান দিয়াছেন, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গোবিন্দ আচার্য্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; উৎকলনিবাসী আর এক গোবিন্দও দেখা দিয়াছেন; এবং সুলেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কেবলমাত্র যে মৈথিল কবি গোবিন্দদাসেরই উদ্ধারসাধন করিয়াছেন এরূপ নহে, শেষ-পর্য্যন্ত গবেষণার শীলমোহর দিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বজনপ্রিয় পদকর্তা বুধুরীনিবাসী গোবিন্দদাস কবিরাজকেও মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, রসের পূজারী গোবিন্দদাস প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য অসহ্য বোধে বঙ্গজননীর শ্যামাঞ্চলচ্ছায়ায় পুনর্ব্বার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস বলিতে নরোত্তম-বিলাস, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহে যাঁহাকে বুঝাইয়াছে, আমরাও এখানে তাঁহাকেই মানিয়া লইব। তবে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের যুক্তিসমূহের উত্তরে পদকল্পতরুর সুযোগ্য সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যে সকল প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা আলোচনার যোগ্য। নগেন্দ্রবাবু বলেন—

১। ইনি (গোবিন্দদাস) বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী—কারণ মিথিলার কুলজীতে ইঁহার নাম আছে। ইনি গোবিন্দঠাকুর, জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইঁহার নাম গোবিন্দ দাস ঝা বা ওঝা, ইঁহার উপাধি "কবিরাজ।"

২। ইঁহার পদে গৌরচন্দ্রিকা নাই, রামের বন্দনা আছে।

৩। ইঁহার ভাষা বিদ্যাপতির ভাষা অপেক্ষা জটিল এবং বাঙ্গালার পদকর্তা গোবিন্দদাসের ভাষা হইতে ইঁহার ভাষার অনেক প্রভেদ দেখা যায়।

৪। মিথিলায় সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার কুড়ি-বাইশটি শুদ্ধ পদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিশুদ্ধ পদগুলি নগেন্দ্রবাবু মিথিলার কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে পাইয়াছেন, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। বাঙ্গালার গোবিন্দের পদ কোন ছাত্রকর্ত্তৃক মিথিলায় নীত হইয়া পরে সেখানে মৈথিল ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, এই অনুমান সত্য হইতে পারে, এবং ইহা অসঙ্গত মনে করিবার কারণ নাই। যদি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদগুলি আমাদের এ দেশে আসিয়া বাঙ্গালীর কাব্যোদ্যানে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে ব্রজবুলিতে রচিত গোবিন্দ কবিরাজের পদগুলির কুড়ি-বাইশটি মিথিলায় বিরাজিত থাকিয়া কবিত্ব-সৌরভে মৈথিলী সাহিত্য-উপবন আমোদিত করিলে তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ মূলতঃ যখন ঐ পদগুলির ভাষার (ব্রজবুলির) সহিত মৈথিলি ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়; আমরা বাঙ্গালায় গোবিন্দদাসের প্রায় তিন-চারি শত পদ পাইয়াছি, এবং এই পদগুলি ও তাহাদের পদকর্তার উল্লেখ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই বর্ত্তমান আছে। অধুনা আবিষ্কৃত কুড়ি-বাইশটি মৈথিল পদ পাইয়াই কি গোবিন্দদাস ঝা মিথিলার কবি এই সিদ্ধান্ত অকাট্য বলিয়া কৃতনিশ্চয় হওয়া সঙ্গত? মিথিলায় গোবিন্দ নামক এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন সত্য, তবে তিনি সংস্কৃত ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করিতেন, এবং তাঁহার নামের শেষে তিনি "দাস" বা "কবিরাজ" পদবী কোথাও ব্যবহার করেন নাই।

যেমন—"কহ গোবিন্দকরজোনি
বিনয় প্রভু মানিয়…" ইত্যাদি।

'পদকল্পতরু'তে সতীশবাবু বলেন—"আমরা শিবসিংহ সরোজ, Maithili Cherotomathy প্রভৃতি মিথিলার ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে কোনো গোবিন্দের উল্লেখ পাই না। মিথিলার কেহ নামের শেষে "দাস" ভনিতাযুক্ত করিতেন না। গোবিন্দদাস তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ছিল এরূপ তর্কও করা চলে না, কারণ তাহা হইলে কোথাও নিশ্চয় ঐরূপ পাওয়া যাইত।"

নগেন্দ্রবাবু যে "ঠাকুরের" প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে আমাদের বক্তব্য এই যে, একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহই যে "ঠাকুর" লিখিতেন না, এরূপ হইতে পারে না। মধ্যযুগের বৈষ্ণব-দিগের রচনা লক্ষ্য করিলেই নগেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইতেন যে, বহু ব্রাহ্মণেতর পদকর্তা "ঠাকুর" শব্দ ব্যবহার করিতেন। কায়স্থ-কুলোদ্ভব নরোত্তমকে আমরা সর্ব্বস্থানে "নরোত্তম ঠাকুর" নামে অভিহিত হইতে দেখিয়া আসিতেছি, "ঠাকুর" নরহরির "ঠাকুর" আখ্যা পাইয়াছি; তাঁহারা ব্রাহ্মণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা কি সঙ্গত হইবে? বৈষ্ণব পদকর্তারা যে শ্রীরামের বন্দনা লিখিতে পারিবেন না, বা তাঁহাদের শ্রীরামকে অবজ্ঞার চোখেই দেখিতে হইবে, এরূপ অনুমানের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। বরং ইহাই ত আমাদের ধারণা যে, বৈষ্ণবগণের মতে রাম কেবল-মাত্র নরদেহধারী নৃপতি নহেন, তিনি অংশ অবতার। রামের বন্দনা লিখিয়াছেন বলিয়া যে বাঙ্গালী গোবিন্দদাসকে মিথিলা গিয়া বসবাস করিতে হইবে, এবং গোবিন্দদাসের পদে "নরসিংহ" আছে বলিয়াই যে তাঁহাকে পরদেশীয় পূর্ব্ববর্তী রাজার গুণকীর্ত্তন করিতে হইবে, এই অভিমতের মূলে আমরা কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাই না। নৃসিংহ নামে যে বাঙ্গালায় এক জন পদকর্তা থাকিতে পারেন, এ কথা নগেন্দ্রবাবুর অবশ্য স্মরণ না-ও থাকিতে পারে। নগেন্দ্রবাবু ১৩৩১ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'বসুমতী'তে "বাঙ্গালার গীতিকাব্য—

বৈষ্ণবকাব্য" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহাতে পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই বলিতেছেন—"মিথিলার কবি গোবিন্দদাস ঝাকে বাদ দিয়া ঐ নামে কয়েক জন বৈষ্ণব কবি ছিলেন। * * * * কোন্ গোবিন্দদাস তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে উৎকৃষ্ট পদের অনেকগুলি যে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। গৌরচন্দ্রিকায় গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত যত পদ আছে, কোনটিরই ভাষা 'মিথিলার কবি গোবিন্দদাস ঝার অনুরূপ বা তুল্য নহে।" অন্য স্থলে আবার লিখিতেছেন—"অথচ এক জন বাঙ্গালী গোবিন্দদাস যে বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট পদসমূহ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পদাবলীতেই রহিয়াছে।"

উপরোক্ত উক্তিগুলি হইতে নগেন্দ্রবাবু নিজেই প্রমাণ করিলেন, গোবিন্দদাস গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনা করিয়াছেন এবং তাহার ভাষা বিদ্যাপতির ভাষা অপেক্ষা জটিল নহে। গৌরচন্দ্রিকার রচনা যে সহজগম্য, সরল ও সাধারণের উপযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, ইহা ভাষা ও ছন্দের বরপুত্র গোবিন্দদাস জানিতেন, এবং অসাধারণ ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সরল ও অনাড়ম্বর রচনার পাশে ছন্দঝঙ্কৃত ও শব্দবিন্যাসিত বিচিত্র রচনা দেখিয়া আমাদের সন্দেহ জাগিতে পারে, তবে শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য্য, বীরচন্দ্র প্রভু প্রভৃতি কবিকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, এবং পদকর্ত্তা গোকুলদাস, শ্রীদাম প্রভৃতি সুকৃতি কীর্ত্তনীয়াগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বৈষ্ণবসমাজে গোবিন্দের পদাবলী গীত হইত। খেতুরীর মহোৎসবেও গোবিন্দদাস তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহার পদাবলীও উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল।

জীবনী

কয়েক জন বৈষ্ণব ঐতিহাসিকের মতে গোবিন্দদাস ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন, গোবিন্দদাস ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্যে" লিখিয়াছেন, গোবিন্দদাস খুব সম্ভবতঃ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন—"আমরা কর্ণানন্দে দেখিতে পাই, যখন শ্রীনিবাসাচার্য্য রাজা বীরহাম্বীরকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া জাজিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন গোবিন্দদাস এক জন যুবকমাত্র। এই ঘটনা যদি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে গোবিন্দদাসের জন্মকাল ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের পরেই ধরিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত। বৈষ্ণবদিগের মতে গোবিন্দদাস ১৬১২ খৃষ্টাব্দে দেহলীলা সম্বরণ করেন। দীনেশবাবুর মতে এ বিষয়েও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। যাহা হউক, গোবিন্দদাস কুমারনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ডনিবাসী দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করেন। চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যভক্ত ছিলেন ইনি এক জন চিকিৎসক ছিলেন। গোবিন্দদাসের ভ্রাতা রামচন্দ্র এক জন সুচিকিৎসক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। "ভক্তমালে আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

গোবিন্দদাসের বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের অলৌকিক ঘটনাটি সত্যই সুন্দর। কঠিন গ্রহণী রোগ হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্যের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া নিজের শাক্তধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ৪০ বৎসর বয়সে গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং ভাবাবেশে

"ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দে রে"

শ্লোকটি পাঠ করিলেন। গুরুর নিকট অসামান্য জ্ঞানী পণ্ডিত গোবিন্দদাস ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পদরচনা করিবার অনুমতি চাহিলেন। তখন শ্রীনিবাসাচার্য্য বলিয়াছিলেন—"মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ যেরূপ চৈতন্যদেবের জীবনী লইয়া বহু মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ রাধা-কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা-বিষয়ক পদ রচনা কর।" গোবিন্দদাস সংস্কৃতে 'সঙ্গীতমাধব' নামক নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামক কাব্য রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণবিষয়ে পদরচনায় যে ভাষার আশ্রয় তিনি গ্রহণ করিলেন বা গড়িয়া তুলিলেন, উহা সত্যই তাহার প্রতিভার অনুরূপ। ব্রজবুলির স্রষ্টা না হইলেও ব্রজবুলি রচনা যে গোবিন্দদাসের সুনিপুণ রসতুলিকায় সর্ব্বোচ্চ মহিমা লাভ করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ-মন মাতাইতে সক্ষম হইয়াছিল, আজ তিন-চারি শতাব্দী অতীত হইলেও বাঙ্গালী তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। বিদ্যাপতির রচনাভঙ্গী গোবিন্দদাসকে মুগ্ধ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণের পথে অন্তরায় হয় নাই। বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি যে মৈথিল কবির নিকট ঋণী, এ কথাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। গোবিন্দদাস সম্বন্ধে বল্লভদাসের একটি মাত্র পদ হইতে আমরা গোবিন্দের প্রতিভা ও জীবনীর বহু বিষয় জানিতে পারি;—

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।
অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ
পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিলা পূরণ॥
এমন সুন্দর তাহা আচার্য্যরত্ন শুনি যাহা
চমৎকার ভাবে মনে মনে।
তাই গুরু মহানন্দে 'কবিরাজ' শ্রীগোবিন্দে
উপাধিটি করিলা প্রদানে।"

"ভক্তিরত্নাকরে"র প্রথম তরঙ্গেও আমরা দেখিতে পাই,—

"শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যাঁর গীতামৃত পানে।

"সম্প্রতি যং শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনাময়স্বীয়গীতানি প্রস্তাপিতামি পূর্ব্বমাপ যানি, তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তাবত্তামহে, পুনরপি নূতন তত্তদাশয়া মুহুরতৃপ্তিঞ্চ লভামহে।"

মহাপ্রভু-পরবর্ত্তী যুগে গোবিন্দদাসকে "কবিরাজশ্রেষ্ঠ" উপাধিতে নিঃসন্দেহে ভূষিত করা যাইতে পারে। গোবিন্দ কবিরাজের গৌরলীলা-বিষয়ক পদগুলি অপেক্ষা, ব্রজলীলার পদগুলিতে কবি-প্রতিভার অধিক স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শেষ বয়সে যখন গোবিন্দদাস ও রামচন্দ্র-কবিরাজ পৈত্রিক গ্রাম 'কুমারনগরে' ফিরিয়া যান, তখন তথাকার বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্তগণ তাঁহাদের প্রতি অসদাচরণ করেন। ইহাতে দুঃখিত অন্তরে গোবিন্দদাস পদ্মাপারস্থিত 'তেলীয়া-বুধুরী' গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া শেষ-জীবন তথায় অতিবাহিত করেন।

এইবার আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিচার করিতে চেষ্টা করিব—উহা বাঙ্গালার চিরপরিচিত ব্রজবুলির পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের কি না। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দদাসের ভাষা বিদ্যাপতির ভাষা অপেক্ষা জটিল।" অপর স্থলে ব্রজবুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—"মিথিলা ও বাঙ্গালার ভাষা মিলাইয়া ব্রজবুলির সৃষ্টি, এ কথা অপ্রামাণ্য। যে ভাষার নাম বিদ্যাপতি "অবহঠ্‌ঠ" দিয়াছিলেন, তাহাই পদাবলীর ভাষা, আমরা যাহাকে ব্রজবুলি বলি তাহা অবিমিশ্র মিথিলা ভাষা।" অপর স্থলে বলিয়াছেন—"বাঙালী বৈষ্ণবযাত্রী ব্রজপুরীতে গিয়া ব্রজবুলি শিখিয়া আসিয়া থাকিবেন এ কথা অমূলক কল্পনা।" (বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৩০)। নগেনবাবু যাহাই বলুন না কেন, অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ সুকুমার সেন ব্রজবুলির উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য।

ভাষার দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিদ্যাপতির অবিকৃত পদগুলির ভাষা মৈথিলী রীতিসিদ্ধ। কিন্তু গোবিন্দদাসের ভাষা দীর্ঘ সমাসযুক্ত হইলেও, উহাতে তাহার স্বকল্পিত বহু 'উদ্ভট' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দিক দিয়া নগেনবাবু গোবিন্দদাসের ভাষাকে জটিল বলিলে আমাদের আপত্তি করিবার কারণ নাই সত্য, কিন্তু গোবিন্দদাসের পদাবলীতে গৃহীত মিশ্রিত সুমধুর, সৃষ্ট-ব্যাকরণদুষ্ট, কৃত্রিম ভাষাকে মৈথিলী ভাষা বলিয়া চালাইবার প্রয়াসকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না, গোবিন্দদাস যদি মিথিলারই কবি হইবেন এবং বিদ্যাপতির অনুকরণে পদাবলী রচনা করিবেন, তাহা হইলে শুদ্ধমৈথিলী ভাষায় পদরচনা না করিয়া ব্রজবুলির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কেন? গোবিন্দদাসের বহু পদে আমরা রূপগোস্বামিকৃত সংস্কৃত শ্লোকের তাৎপর্য্যের অনুবাদ দেখিতে পাই। তাঁহার পদাবলীর দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলে বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, উহাতে 'সখী ও সেবার' ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

কবিত্ব ও কৃতিত্ব

গোবিন্দদাস যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা যেরূপ সত্য, তাহার যুগটিও যে কাব্যপ্রতিভা-বিকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, সে কথাও তদ্রূপ স্বীকার্য্য। মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমভক্তিধর্ম্মের প্লাবনে যখন বাঙ্গালার ভাবপ্রবণ জনহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, কবি গোবিন্দদাস তখন তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলী সৃষ্টি করিতে সুরু করিয়াছেন। বিরহোন্মাদ প্রেমতন্ময় ভাববিমুগ্ধ মহাপ্রভুর ছবিখানি গোবিন্দদাসের কাব্যে শ্রীরাধার আলেখ্যের ভিতর দিয়া যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের দুই জন কবিকে গোবিন্দদাস আদর্শ হিসাবে ধরিয়া লইয়াছেন। মনোরাজ্যের পরিদর্শক ভাবুক চণ্ডীদাস, বহির্জ্জগতের চিত্রকর বিদ্যাপতি উভয়েই আসিয়া গোবিন্দদাসের মাঝে আপন আপন বৈশিষ্ট্য বিলাইয়া দিয়াছেন। এক দিকে বিদ্যাপতির প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য মিলনের সুখ ও বিরহের দুঃখ; অন্য দিকে চণ্ডীদাসের প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক, প্রেমের ধ্যানস্তব্ধতা গোবিন্দদাসের কবিতায় স্থান পাইয়াছে। গোবিন্দদাসের ভাবরাজ্যে—একাধারে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গলীলা ও প্রেমের বিহ্বলতা প্রেমের অশ্রুতেই নিঃশেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দদাসের দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যাপতির অনুকরণে কেবলমাত্র শ্রীমতীর বাহিরের রূপটিকে ফুটাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিরহিণী রাধিকার অন্তরের চির অতৃপ্ত মিলনাকাঙ্ক্ষারও রূপ দিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশ এক দিন গোবিন্দদাসের মধুর পদাবলীর ঝঙ্কারে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে মহাপ্রভু যেরূপ রস সংগ্রহ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতেন, পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব ভক্তগণও সেইরূপ গোবিন্দদাসের পদাবলীর রসে ডুবিয়া আত্মভোলা হইয়া যাইতেন। বাঙ্গালী কবি রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রসলীলা যে ভাষায়, যে ছন্দে, যে ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা বঙ্গবাণীর মন্দিরে কালের বিচিত্র প্রবাহের তালে তালে নিত্য নিয়ত ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও ব্রজবুলির সুমধুর শব্দঝঙ্কারে, অনুপ্রাস শ্লেষাদি বিভিন্ন অলঙ্কার প্রয়োগনৈপুণ্যে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব অতুলনীয়।

'গোবিন্দদাসের পদাবলী' নামক যে সকল পুরাতন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বহু স্থলে পদ-সজ্জায় রস বৈষম্য দৃষ্ট হয়। গোবিন্দদাসের পদে অলঙ্কার জটিলতার জন্য উহার অর্থ ও পাঠনির্দ্ধারণে যেরূপ গোলযোগ ঘটে, তাহা সাধারণ পদকর্ত্তাদের কাহারও পদে বড় একটা ঘটে না। স্বর্গীয় কালিদাস নাথ মহাশয়ের সংগৃহীত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী'—(পূর্ব্বভাগ) তাঁহার (নাথ মহাশয়ের) বৈষ্ণবসাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

গোবিন্দদাস যে কেবল বিদ্যাপতির পদপূরণ করিয়াছেন তাহাই নহে, গোবিন্দদাসের পদগুলি একটু মনোনিবেশ সহকারে দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, বহু স্থলে বিদ্যাপতির অনুকরণেও পদরচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির—

"যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহা তাঁহা সরুরুহ ভরই।"

এই পদটির অনুকরণে গোবিন্দদাস "যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু জ্যোতি" পদটি রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির "কামিনী করই সিনানে" পদটির অনুকরণে গোবিন্দদাস তাঁহার "সহচরী মেলি চলল বর-রঙ্গিণী কালিন্দী করই সিনান" পদটি খুব সম্ভবতঃ রচনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া গোবিন্দদাস বহু স্থলে বিদ্যাপতির ভাব, ভাষা

ও ছন্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু অনুকরণ বলিলে গোবিন্দদাসের উপর অবিচারই করা হইবে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রভাবও যে গোবিন্দদাসের রচনায় রহিয়া গিয়াছে, এ কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চণ্ডীদাস উচ্চাঙ্গের ভাবতন্ময় কবি। রাধা বিরহের মাঝেও যেমন মিলনের আস্বাদ পাইতেছেন, মিলনের মাঝেও তেমনি বিরহের বেদনা অনুভব করিতেছেন। চণ্ডীদাসের একটি পদে আমরা দেখিতে পাই, বিরহিণী শ্রীমতী স্বপ্নের ভিতর প্রিয়তমের মিলন-সুখ অনুভব করিতেছেন। অপর পদে আমরা দেখিতে পাই—সেই প্রাণকান্তের বাহুবেষ্টনের ভিতর রহিয়াও বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মিলনে বিরহানুভব করিতেছেন—"দুহুঁ কোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" গোবিন্দদাসের পদাবলীতে আমরা অনুরূপ একটি পদ পাইতেছি—

"কোড়ে রহিতে দুহুঁ মানয় দূর
ভিন ভিন অর দুহুঁ দুহুঁ মনঝুর।"

অপর একটি পদে আমরা চণ্ডীদাসের "মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব" ও "জনমে জনমে জীবনে মরণে, প্রাণনাথ হয়ো তুমি" এই দুইটি প্রসিদ্ধ পদের ভাব-ঐক্য দেখিতে পাই। এখানেও গোবিন্দদাসের রাধা সখীগণকে বলিতেছেন—

"মাধব মাধব স্মরি নিচয়ে মরিব
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার
বিধি পায়ে মাঙ্গ মুই এই বর সার ॥"

চণ্ডীদাসের ভাবসম্মিলনের পদের সহিত আমরা গোবিন্দদাসের অনেক স্থলেই মিল দেখিতে পাই।

অভিসার

যে শ্রেণীর পদ রচনা করিয়া গোবিন্দদাস পদকর্ত্তা সমাজে অমর হইয়া রহিয়াছেন, বিভিন্ন রসপর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে দেখা যায়, ইহার অধিকাংশই অভিসারের।

অভিসার আবার দুই প্রকার হইতে পারে। এক হইতেছে নায়িকার নির্দ্দেশিত স্থানে নায়কের গমন, অপরটি ইহার বিপরীত। প্রচলিত অভিসারের পদাবলীর অধিকাংশগুলিতেই নায়ক-নির্দ্দেশিত স্থানে নায়িকার গমনই দেখা যায়। উজ্জ্বলনীলমণিতে জ্যোৎস্নাভিসারিকা ও তমোভিসারিকা উভয় প্রকার অভিসারিকার উল্লেখ আছে। জ্যোৎস্নাভিসার বর্ণনায় দেখিতে পাই—বিশাখা শ্রীরাধাকে কহিতেছেন—"অদ্য পূর্ণশশধর উদিত, বৃন্দা-বিপিনে সান্দ্রাকৌমুদী বিস্তার করিতেছেন দেখিয়া ব্রজপতিনন্দন উচ্চ স্থানে আরোহণপূর্ব্বক ত্বদীয় অভিসারবর্ত্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন, অতএব তুমি স্বীয় অঙ্গে সকর্পূর চন্দন লেপন ও শুভ্রবর্ণ পট্টবসন পরিধানপূর্ব্বক তদীয় পথে চারুচরণারবিন্দ সন্ধান অর্থাৎ অভিসার-পথে গমন করিতেছ না কেন?"... ইত্যাদি। এই প্রকার তমোভিসার, দিবাভিসার প্রভৃতি বিভিন্ন অভিসারের উল্লেখ রহিয়াছে। গোবিন্দদাসের কবিতায় এই অভিসারের ব্যাকুলতা যাহা অনুরাগের অনিবার্য্য পরিণাম,—অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দ নিজে সখীভাবে আজীবন রসময়ের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাই অভিসারোৎকণ্ঠার প্রতিটি পদের মাঝ দিয়া দুস্তর পথের অভিসারিকা শ্রীমতীর কম্পিত হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীমতীর নির্ব্বোধ সখীদের পার্থিব বাধাবিঘ্নকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়া বিরহিণী শ্রীমতীর অন্তরের কথা উপলব্ধি করিয়া দরদী কবি বলিতে পারিয়াছিলেন,—

"সখী মঝু পরিথন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥

ব্রজগোপীদের অভিসার, পার্থিব জগতকে অপার্থিব লোকে, রূপলোককে অরূপলোকের আকর্ষণের প্রকাশ অভিসারেরই কথা। এ রূপের প্রতি রূপের অনুরাগ নয়—রূপাতীতের দুর্ল্লঙ্ঘ্য আকর্ষণ, তাই বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'অভিসারে'র পদগুলির রসমর্য্যাদাও অনেক উচ্চে।

গোবিন্দদাস বিভিন্ন কালোচিত অভিসারের যে সমস্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমতীর রূপসজ্জার চিত্রটি তাহার বর্ণনা-চাতুর্য্যের মাঝ দিয়া মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাকরোজ্জ্বল নিশিতে শ্রীমতী শ্যামাভিসারে গমন করিতেছেন—কুন্দফুলে কালো কবরী আবৃত করিয়াছেন, গলদেশে মোতির হার দোলাইয়াছেন, সমগ্র দেহে শ্বেত চন্দন বিলেপন করিয়াছেন—

"ধবল বিভূষণ অম্বর ধরই
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই।"

গুরুজনের দৃষ্টি এড়াইয়া শ্রীমতী গিয়া তাহার প্রাণবল্লভের সাথে মিলিতা হইলেন।

কৃষ্ণপক্ষে শ্রীমতী চলিয়াছেন,—বর অঙ্গে সুনীল শাড়ী পরিধান করিয়াছেন, নীল মৃগমদে তনু আবরিত করিয়াছেন, নীলকান্ত মণির হার উচ্চ বক্ষে দোলাইয়াছেন—শেষ পর্য্যন্ত শ্যাম-অনুরাগে কবি শ্রীরাধার গৌরবর্ণকে পর্য্যন্ত শ্যাম করিয়া তুলিলেন।

"হরি সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি'
নব অনুরাগে গোরী ভেলি শ্যামরী
কুহু-যামিনী ভয় ভাগি।
নীল অলকাকুল অলিকোহি লোলিত
নীল তিমিরে চলু গেই।
নীল নলিনী জনু শ্যাম সিন্ধু রসে
লখই না পারই কোই।"

অপর স্থানে আমরা শ্রীমতীর বর্ষাভিসারের যে রূপটি পাই, তাহাও অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে—সেখানে শ্রীমতী যেন বর্ষার ছন্দে ছন্দে, প্রেমের নূপুরনিক্বণে, চরণের একটি একটি পদবিক্ষেপ করিয়াছেন—

"মেঘ যামিনী চললি কামিনী
পহিরহি নীল নিচোলরে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম সায়ক
ছোড়ি মঞ্জীর লোলরে।"

অপর স্থলে দেখিতেছি, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রে শ্রীমতী সখীদের সকল আপত্তি, সকল পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া পরমবাঞ্ছিতের দর্শন আশায় বুক বাঁধিয়া ছুটিয়াছেন—

"ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝন ঝন শব্দ কুলিশ ঝন ঝান।
ঘর মাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এ সব বিঘিন বিথার।
চড়ব মনোরথে সারথি কাম।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ধাম।"

গোবিন্দদাসের অভিসারের একটি পদের তুলনা কি বাঙ্গালা সাহিত্য, কি ভারতীয় সাহিত্য, অন্য যে কোন সাহিত্যেও যে দুর্লভ, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রিয়তমের তীব্র আকর্ষণে বিরহিণীর উদ্বেল হৃদয়ের ব্যাকুলতা গোবিন্দদাস প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাসের অভিসারের পদগুলি বাদ দিয়া—অন্য পদাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাই, রসে লেখনী ডুবাইয়া তিনি চিত্রের উপর যে কয়টি টান দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিতেই যেন শত শত রূপকমল ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধার রূপবর্ণনা করিতে গিয়া যেখানে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

"মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে।
চলে বা না চলে ধনী রস অবলম্বে।
তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে।
কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে।
তহি শ্রমে বিরাজই ঘাম বিন্দু বিন্দু।
মুকুতাভূষিতা জনু পুনমিক ইন্দু।"

সেখানে মাত্র এই দুইটি পদ পাঠ করিয়াই আমাদের মানস-নয়নে নব অনুরাগিণী নিখিল সোহাগিনী পঞ্চম রাগিণী রূপিণী শ্রীমতীর একটি অভিনব অপরূপ দীপ্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রতিভাত হয়।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনায়ও আমরা গোবিন্দদাসের কবিত্ব-শক্তির, রচনা-চাতুর্য্যের ও প্রকাশভঙ্গীর একটি বিশেষ রূপ দেখিতে পাই।

গোবিন্দদাসের কতকগুলি পদে আমরা উচ্চাঙ্গের ভাবধারার বিকাশ দেখিতে পাই না সত্য, তবে সেগুলির যে আপন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

গোবিন্দদাস মিলনের ছবিগুলিও যথেষ্ট বিবেচনা, অন্তর্দৃষ্টি ও নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস কৃষ্ণের শ্রীরাধিকার প্রতি একান্ত অনুরাগ যে একটি মাত্র পদেই প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাহা এই পদটি হইতেই পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন—

"হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মুছই
কুঙ্কুমে তনু পুণ মাজি।
অলকা তিলকা দেই সীথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি।"

গোবিন্দদাসের বহু পদে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীরাধাকে পাইবার জন্যও কানুর সাধনা চলিয়াছে। দ্বিপ্রহরে সিনানের পথের বালুকা উত্তপ্ত হইবে, চলিতে শ্রীমতীর শ্রীচরণে ব্যথা বাজিবে, তাই নাগর—"তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানী"। তাহে ভক্ষণ করিয়া শ্রীমতী দাঁড়াইয়াছেন, কানু গিয়া হাত পাতিলেন, লজ্জায় শ্রীমতী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন পদচিহ্নতলে শ্রীকৃষ্ণ লুটাইয়া পড়িলেন। অপর একটি পদে দেখিতে পাই, যমুনায় যাইবার পথে শ্রীমতী কর্ত্তৃক অঙ্কিত পদচিহ্নগুলি রসরাজ গভীর আগ্রহের সহিত চুম্বন করিতেছেন। গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমকে যে কত ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মাত্র একটি পদ হইতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়—

"হৃদয় মন্দিরে, কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরেহুঁ দূরে রহু ভাগি।"

পরিশিষ্ট

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর গ্রন্থকর্ত্তা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদের পদরসসার, পদরত্নাকর, প্রাচীন পুঁথি, বাঁকুড়ার হস্ত-লিখিত পুঁথি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে ৬৮টি অপ্রকাশিত পদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে আমরা গোবিন্দদাসের বিভিন্ন রসপর্য্যায়ের পদ দেখিতে পাই। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে, প্রচলিত গোবিন্দদাসের পদাবলীর মধ্যে মহাপ্রভুর পার্ষদ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর দুই-চারিটি পদ মিশিয়া গিয়াছে। তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থে গোবিন্দদাস ভণিতার বহু সন্দেহজনক পদের স্থান দেন নাই। সেগুলি ভাষা ও কবিত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে কোন বিষয়েই গোবিন্দদাসের পদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যাহা হউক, অভিসারের পদগুলি লইয়া যখন প্রবন্ধে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি, তখন সতীশ বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত দিবা অভিসারের ও নিশা-অভিসারের পদ দুইটি হইতে এখানে কিয়দংশ উল্লেখ করিব—

(তুড়ী)

"দিনমণি কিরণ মলিন মুখমণ্ডল
ঘামে তিলক বহি গেল।
কোমল চরণ তপত পথ বালুক
আতপ দহন সম ভেল।
হেরইতে শ্যামর চন্দ।
কোরে ত গোরি গোরি-মুখ-মোছও
বসন ঢুলায়ত মন্দ।" ধ্রু

পদটির ভণিতায় রহিয়াছে—"গোরি শ্যাম দুহুঁ করত কুতূহলি কহতহি গোবিন্দদাস।"—(অঃ পঃ রত্নাবলী, পৃঃ—২৪)

পদটির রচনাভঙ্গী, ভাষার লালিত্য যে গোবিন্দদাসের তাহা একবার পাঠেই অভিজ্ঞ পাঠকের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। অপর পদটি নিশাভিসারের বলিয়া সতীশ বাবু তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন। নায়িকা নিশার আঁধারে অভিসারে বহির্গত হন বলিয়াই, বোধ হয়, পদটিকে নিশাভিসারের পদ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। পদটি 'পদরসসার' হইতে গৃহীত। আমরা কিন্তু এই পদে নিশার কোনরূপ সন্ধান বা বর্ণনা পাই না।

(কামোদ)

"শ্যাম অভিসারে চললি সুন্দরি ধনি
নব নব রঙ্গিণী সাথে।
বাম শ্রবণমূলে শতদল পঙ্কজ
কাম জয় ফুলধনু হাথে।
ভালহি সিন্দুর ভানু কিরণ জনু
তঁহি চারু চন্দন বিন্দু
মুখ হেরি লাজসে সায়রে লুকায়ল
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল ইন্দু।"—ইত্যাদি।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সমস্ত পদটি আর এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। ভণিতায় দেখিতে পাই—

"দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ চিত পুলকিত
বলিহারি গোবিন্দদাসে।"

পদটির ভাষা, ছন্দ, ঝঙ্কার ও অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারের উপর দৃষ্টিপাত করিলে পদটি কোন্ গোবিন্দদাসের, তাহা আর ভাবিয়া দেখিতে হয় না। ইহা ভিন্ন সাধারণ অভিসারের ৪টি পদ সতীশবাবু এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদগুলি সত্যই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হইয়াছে।

(১)

"অলস তেজি উঠত যদু রায়।
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
প্রাতহি দোহন করত যদু চান্দ।
তুরিতহি দেয়ল দোহন ছান্দ।
সজন উপেখি চলল বরকাণ।
নূপুরের নাদে জাগয়ে পাঁচ বাণ।
নিকটই গোঠ মিলল যদু রায়।
গোবিন্দদাস মটকি লই যায়।"

(২)

(বেলাবরি)

"প্রাতহি কুঞ্জে কয়ল পয়াণ।
গোধন দোহন করতহি কান।
সুন্দর অরুণ শ্যামরু চন্দ।
দোহন ধেনু করত বহু ছন্দ।
দোহন গরজত শব্দ গভীর।
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর।
গোরস ধার চুয়ায়ত অঙ্গ।
তমালে বেড়ল যেন মোতিম রঙ্গ।
মটকি মটকি ভরি রাখত চারি।
গোবিন্দদাস কহে যাও বলিহারি।"

পদ দুইটির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি, কবি কেবল রূপ-বর্ণনায়, বিরহ-বর্ণনায়, মিলন বা অভিসার বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন না; গোবিন্দদাস ধেনু দোহন বর্ণনায় বা গোষ্ঠ-বর্ণনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মাত্র এই দুইটি পদের ভিতর দিয়া শ্যামসুকোমল নন্দদুলালের গোদোহনের যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সত্যই উপভোগ্য। গোদোহন-কালীন যে গম্ভীর নিনাদটি দুগ্ধপাত্র হইতে উত্থিত হয়, তাহাও যেন পদটি পাঠের পর পাঠকের কাণে বাজিতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র।

শাশ্বতী

হে শাশ্বতী, হে চির সান্ত্বনা,
পৃথ্বীর প্রয়াণ-পথে চিরন্তন অর্ঘ্য-বিরচনা
এখনো হ'ল না সারা
কখনো হবে না জানি
যত শেষ তত হবে সুরু
পথিকের বক্ষ দুরু-দুরু
তুমিই জুড়াবে জানি
এ অভিনন্দন-বাণী
বিরচিয়া গাঁথিনু বন্দনা।
অজেয় বিজয় করি
চির পরিচয়ে শৃঙ্খলিয়া—
গোধূলি-মিলন-লগ্নে
বিভাবরীরূপে এস প্রিয়া
তিমিরের কৃষ্ণ-রেখা
গৌর তনু চৈল সাটী-তটে
হৈম কান্তি লাবণ্যের
আপনারে সসঙ্কোচে রটে।
নক্ষত্র নিথর হল সুনিশ্চল তারকা'র তারা
নিষ্পলক চেয়ে রয় মীনাক্ষীর মত পক্ষ্মহারা;
দৃষ্টি নাই,—নাহিক বিদ্যুৎ
নিভেছে চক্ষের প্রাণ
অন্তর্গূঢ় চেতনা অদ্ভুত!
হানো প্রাণ,
দানো স্পর্শ-সাড়া
মরণের প্রেতাধ্যাস
দূর কর অঙ্গে দিয়া নাড়া;
স্মৃতি দিয়া—প্রীতি দিয়া
জীবনের অঙ্গে অঙ্গে বুলাইয়া করুণার কণা
সঞ্চারিয়া কর দান
অবিচ্ছেদ অনির্ব্বাণ
মানবের প্রাণ নীরাজনা
হে শাশ্বতী,
অরুন্ধতী
চিরন্তন প্রাণের সান্ত্বনা।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (এম-এ, বি-এস-সি, এম-বি, ডি-টি-এম্)



নক্সা-কাটা জার্সি-স্যুট

শীত পড়তে আর বেশী দেরী নেই, যাঁরা সুগৃহিণী ছেলে-মেয়েদের শীতবস্ত্রের সমাধান তাঁরা এখন থেকেই করে রাখেন। তাঁদের সুবিধা হবে ভেবে এ-মাসে এই উট-চিত্রিত জার্সি-স্যুট-এর নির্দ্দেশ দেওয়া হলো।

এটী তৈরী করতে আট আউন্স উল লাগবে। ৭ আউন্স সাদা উল (৪-প্লাই); ১ আউন্স, যে-কোন রঙের (৪-প্লাই) উল; ১০ নং এক জোড়া ষ্টীলের কাঁটা; ছোট একটা ক্রুশের কাঁটা; ½ গজ সরু ইলাষ্টিক; আর পাতলা দুটো ঝিনুকের কিম্বা সেলুলয়েডের বোতাম।

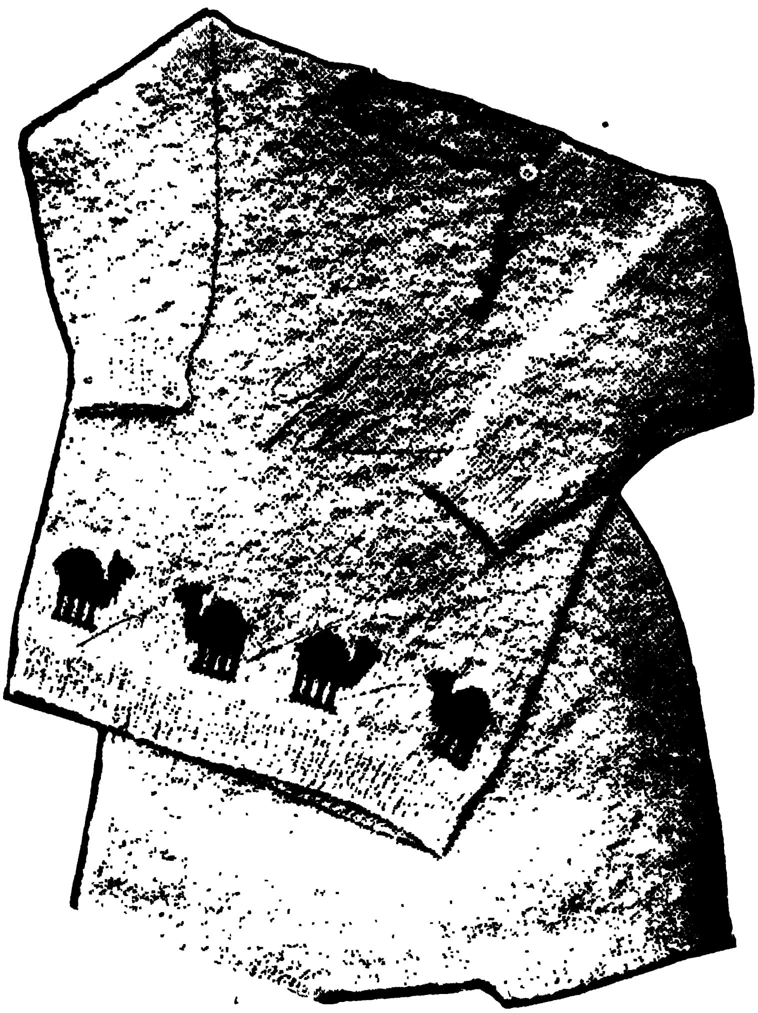
আগের বছরের মতো কতকগুলো সংক্ষেপোক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সোঃ=সোজা; উঃ=উল্টো; সোঃ ভাবে দুটো ঘর তোলা=কাঁটার মুখ সোজা ঘর তোলার মতো রেখে সামনে উল দিয়ে একটা ঘর থেকে দুটো ঘর তুলে নেবেন। উঃ ভাবে দুটো ঘর তোলা=কাঁটার মুখ উল্টো ঘর তোলার সময়ের মতো রেখে উলটাকে ডানদিকে দিয়ে, তার পর কাঁটার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ঘর তুললেই একটা ঘরে দুটো ঘর হবে। এছাড়া সাঃ উঃ=সাদা উল; রঃ উঃ =রঙীন উল। ঘঃ বঃ=ঘর বন্ধ করুন।

ওপরের এবং নীচের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী করলে স্যুটটির মাপ হবে—জার্সির ঝুল (কাঁধ থেকে কোমরের তলা পর্য্যন্ত) ১৪ ইঞ্চি; ছাতি ২২ ইঞ্চি; পুট হাতা ৮ ইঞ্চি। প্যাণ্টের ঝুল=৮; পায়ের ঘের=১০ ইঞ্চি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, কাঁটা এবং উলের (প্লাই অথবা খেই-এর) তারতম্য-অনুসারে মাপের তারতম্য ঘটবে। এইবার বোনা আরম্ভ করুন:—

সমস্ত জার্সিটা নি-জোড ভাবে তৈরী হয় (৪ নং ছবির নক্সা দেখুন)। তাই (পিছন-দিককার) কোমর থেকে কাজ আরম্ভ করুন। প্রথমে ৮৪টি ঘর তুলে, ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে ১৪ লাইন বুনে যান। তার পর চার লাইন ষ্টকিং-ওয়েব (stocking-web) প্যাটার্ণে, অর্থাৎ মোজা-বোনার প্যাটার্ণে বুনুন। [মোজা বোনার প্যাটার্ণ বোধ হয় সকলেই জানেন! এক লাইন সোজা, এক লাইন উল্টো এইভাবে বুনে যেতে হয়; তবে একটা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, দুটো দিক যেন দু'রকম হয়, আর সেই দুটো-দিকের সোজা দিকটা (বিনুনি-ধরণের লম্বা টানা টানা বোনাটা, যেমন মোজায় দেখতে পাওয়া যায়) যেন সামনের দিকে থাকে।]

এইবার যে রঙীন গোলাটা আছে, সেটা জুড়তে হবে এবং নির্দ্দেশ-অনুযায়ী একই লাইনে কতকগুলি ঘর সাদা উলে বুনতে হবে, আবার কতকগুলি বা রঙীন উলে। ১৯শ লাইন—আগাগোড়া সোজা বোনা দিতে হবে। তবে *৫ ঘর সাঃ উঃ, ৮ ঘর রঃ উঃ, ১৬ ঘর সাঃ উঃ, ৮ ঘর রঃ উঃ, ৫ ঘর সাঃ উঃ; * থেকে রিপিট করবেন একবার। ২০ লাইন—আগাগোড়া উল্টো। *৫টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১৮টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ৫টা সাঃ উঃ, * থেকে একবার রিপিট করুন। ২১ লাইন—আগাগোড়া সোজা বুনবেন। * ৫টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ,

১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১৮টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ৫টা সাঃ উঃ, * থেকে একবার রিপিট করুন। ২২ লাইন ২০ লাইনের মতো। ২৩ লাইন—২১ লাইনের মতো। ২৪ লাইন—আগাগোড়া উল্টো বোনা। * ৫টা সাঃ উঃ, ৯টা রঃ উঃ, ১৪টা সাঃ উঃ, ৯টা রঃ উঃ, ৫টা সাঃ উঃ, * থেকে একবার রিপিট করুন। ২৫ লাইন—আগাগোড়া সোজা বুনবেন ২৪ লাইনের-নির্দ্দেশ অনুযায়ী, কিন্তু উল বদলাবেন। ২৬ লাইন—আগাগোড়া উল্টো বোনা; * ৫টা সাঃ উঃ, ১০টা রঃ উঃ, ১২টা সাঃ উঃ, ১০টা রঃ উঃ, ৫টা সাঃ উঃ।* ২৭ লাইন—আগাগোড়া সোজা বোনা, তবে উল বদলানোর নির্দ্দেশ ২৬ লাইন-অনুযায়ী। ২৮ লাইন—আগাগোড়া উল্টো বোনা দেবেন; * ৪টে সাঃ উঃ, ৮টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ২টো রঃ উঃ, ১২টা সাঃ উঃ, ২টো রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ৮টা রঃ উঃ, ৪টে সাঃ উঃ, * থেকে একবার রিপিট করুন। ২৯ লাইন—আগাগোড়া সোজা বোনা। * ৫টা সাঃ উঃ, ৭টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ৩টে রঃ উঃ, ১০টা সাঃ উঃ, ৩টে রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ৭টা রঃ উঃ, ৫টা সাঃ উঃ, * থেকে একবার রিপিট করুন। ৩০ লাইন—আগা- গোড়া উল্টো বুনবেন; * ৬টা সাঃ উঃ, ৫টা রঃ উঃ, ২টো সাঃ উঃ, ৪টে রঃ উঃ, ৮টা সাঃ উঃ, ৪টে রঃ উঃ, ২টো সাঃ উঃ, ৫টা রঃ উঃ, ৬টা সাঃ উঃ, * থেকে একবার রিপিট করুন। ৩১ লাইন—আগাগোড়া সোজা। * ৭টা সাঃ উঃ, ৩টে রঃ উঃ, ৩টে সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ২টো রঃ উঃ, ৮টা সাঃ উঃ, ২টো রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ৩টে সাঃ উঃ, ৩টে রঃ উঃ ৭টা সাঃ উঃ, * থেকে একবার রিপিট করুন। ৩২, লাইন—সব উল্‌টো বোনা। * ১৩টা সাঃ উঃ, ২টো রঃ উঃ, ১২টা সাঃ উঃ, ২টো রঃ উঃ, ১৩টা সাঃ উঃ, * থেকে একবার রিপিট করুন। এই-বার থেকে রঙীন উলটা আর ব্যবহার করতে হবে না, কেন না আমাদের উট তো তৈরী হয়ে গেছে। সাদা উলে ৪ লাইন ষ্টকিং-ওয়েব প্যাটার্ণে বুনুন। ** ৩৭ লাইন—৪টে সোঃ, তার পর ৪টে উঃ, ৪টে সোজা প্যাটার্ণে লাইনের শেষ অবধি করে যান। ৩৮ লাইন—৪টে উঃ, তার পর ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ প্যাটার্ণে লাইন শেষ করুন। ৩৯ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। ৪০ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ৪১ লাইন—৩৮ ল

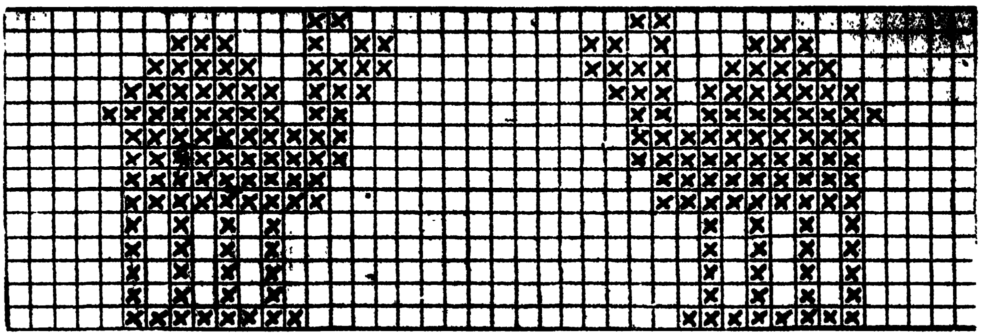


পুরা স্যুট

মতো। ৪২ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। ৪৩ লাইন—৪১ লাইনের মতো। ৪৪ লাইন—৪২ লাইনের মতো। * *

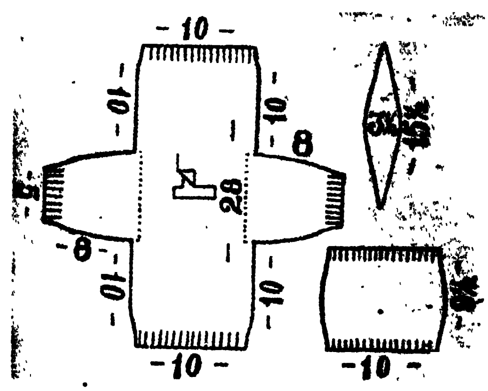
এইবার * * (অর্থাৎ ৩৭ লাইন) থেকে * * ৪৪ লাইন অবধি পুরো আট লাইন সাতবার রিপিট করুন। তারপর ৩৭ লাইন আর ৩৮ লাইনটি ক্রমান্বয়ে দু'বার রিপিট করুন। ১০৫ লাইন—৪টে ঘর বন্ধ করে ফেলুন, তারপর ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ প্যাটার্ণে লাইনের শেষ অবধি বুনে যান। ১০৬ লাইন—৪টে ঘঃ বঃ তার পর ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ প্যাটার্ণে শেষ অবধি করুন (৭৬ ঘর রইলো কাঠিতে)। ১০৭ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। ১০৮ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ১০৯ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ১১০ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। ১১১ লাইন—১০৯ লাইনের মতো। ১১২ লাইন—১১০ লাইনের মতো। * * অর্থাৎ ৩৭ লাইন থেকে ৪৪ লাইন অবধি পুরো আট লাইনের প্যাটার্ণটি ক্রমান্বয়ে ৪বার রিপিট করুন। ১৪৫ লাইন—৪টে সোঃ, ৪টে উঃ প্যাটার্ণে ২৪টি ঘর বুনে অন্য একটি কাঁটায় রেখে দিন ডানদিককার কাঁধ বোনবার জন্য; তার পর গলার ফাঁদ তৈরী করুন ২৮টি ঘর ফেলে দিয়ে বাকী ২৪টি ঘর ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ, প্যাটার্ণে করুন। এর পরের তিন লাইন করে যান, ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ প্যাটার্ণে। তার পরের চার লাইন—৪টে সোঃ, ৪টে উঃ প্যাটার্ণে করবেন। ১৫৩ লাইন—৪টে ঘর তুলে নিন। সেই চারটে ঘর সোজা বুনে, ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ প্যাটার্ণে বুনে যান শেষ অবধি (২৮টি ঘর হুলো কাঠিতে)। ১৫৪ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ১৫৫ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। ১৫৬ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ১৫৭ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ১৫৮ লাইন—৩৭ লাইনের মতো।

১৫৯ লাইন—১৫৭ লাইনের মতো। ১৬০ লাইন—১৫৮ লাইনের মতো। * * (অর্থাৎ ৩৭ লাইন) থেকে * * (অর্থাৎ ৪৪ লাইন) অবধি পুরো আট লাইন তিনবার ক্রমান্বয়ে রিপিট করুন। এইবার বাঁ-দিকের



উটের নক্সা

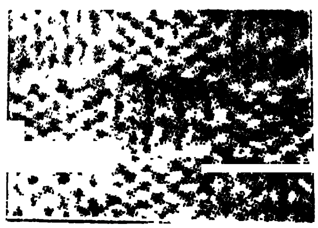
ঘরগুলো অন্য একটা কাঁটায় তুলে রেখে, ডান কাঁধের জন্য আলাদা-করে-রাখা ঘরগুলো কাঁটায় তুলে নিয়ে, গলার দিক থেকে উল জুড়ে কাজ আরম্ভ করুন। প্রথম তিন লাইন—৪টে সোঃ, ৪টে উঃ প্যাটার্ণে করে যান। তার পরের চার লাইন—৪টে উঃ, ৪টে সোঃ



স্যুটের ছক্

প্যাটার্ণে ক্রমান্বয়ে করে যান। ১৫৩ লাইন—৪টে সোঃ, ৪টে উঃ ক্রমান্বয়ে বুনে যান। ১৫৪ লাইন—২৮টি ঘর তুলে নিন, তাদের প্রথম চারটি ঘর উল্টো বুনে, ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ প্যাটার্ণে শেষ অবধি করে যান। (৫২টি ঘর হুলো)। ১৫৫ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। ১৫৬ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ১৫৭ লাইন—৩৮ লাইনের

মতো। ১৫৮ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। ১৫৯ লাইন—১৫৭ লাইনের মতো। ১৬০ লাইন—১৫৮ লাইনের মতো। এবার * * (অর্থাৎ ৩৭ লাইন) থেকে * * (৪৪ লাইন) অবধি পুরো আট লাইন ক্রমন্বয়ে তিনবার রিপিট করুন। ১৮৫ লাইন—৪টে ঘর তুলুন, তার পর ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ প্যাটার্ণে ৬ বার (অর্থাৎ ৪৮টি ঘর বুনে যান), ৪টে উঃ ; এইবার বাকী চারটে ঘর একটা সেফ্‌টি-পিনে তুলে রাখুন ; বাঁ-দিকের ঘরগুলো বাড়তি-কাঁটা থেকে খালি-কাঁটায় তুলে নিন, সেফ্‌টি-পিনের মুখ খুলে সেটি বাঁ-দিকের কাঁটার মুখোমুখি ভাবে ধরুন। এখন সেফ্‌টি-পিনের একটা ঘর আর কাঁটার একটা ঘর এই দুটো ঘর একসঙ্গে নিয়ে একটা ঘর তুলুন (অর্থাৎ একটা করে ঘর ফেলে দিন)। সেফ্‌টি-পিনের



বোনার সাইজ

চারটে ঘর বোনা হয়ে গেলে বাকী ২৪টা ঘর ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ প্যাটার্ণে বুনুন। এখন কাঁটায় ৮০টি ঘর হলো। ১৮৬ লাইন—৪টে ঘর তুলে সেই চারটে ঘর সোজা বুনুন তার পর ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ প্যাটার্ণে বাকী ঘরগুলো বুনে যান। ১৮৭ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ১৮৮ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। * * (৩৭ লাইন) থেকে * * (৪৪ লাইন) অবধি পুরো আট লাইন—আটবার রিপিট করুন, ক্রমান্বয়ে। চার লাইন বুনুন ষ্টকিং-ওয়েব প্যাটার্ণে। এইবার ৩২ লাইন থেকে ১৯ লাইন অবধি রঙীন উল জুড়ে বুনে যান। কেন না, এবারেও তো আবার উটের সার তৈরী করা চাই। তবে এবার বোনবার সময় ৩২, ৩১, ৩০, ২৯, ২৮ ইত্যাদি ভাবে ১৯ লাইন অবধি নির্দ্দেশোক্তি মেনে যেতে হবে। কেন না, এবার উটের মাথা থেকে নক্সা আরম্ভ করতে হবে। একটা কথা মনে রাখবেন, প্রথম বারে যে লাইনগুলো আগাগোড়া সোজা বুনেছেন, সেগুলি এবারে আগাগোড়া উল্টো বুনবেন ; এবং যে লাইনগুলো আগাগোড়া উল্টো বুনেছেন, সেগুলো এবারে আগাগোড়া সোজা বুনতে হবে ; অর্থাৎ উল্টো নিয়মে। কিন্তু এ নির্দ্দেশ কেবলমাত্র ৩২ লাইন থেকে ১৯ লাইন বোনবার জন্য। উটগুলো তৈরী হয়ে গেলে রঙীন উলটি আলাদা করে রাখুন (অবশ্য যদি আর কিছু অবশিষ্ট থাকে)। তার পর চার লাইন ষ্টকিং-ওয়েব প্যাটার্ণে, এবং বাকী চৌদ্দ লাইন ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে। এইবার ঘর বন্ধ করুন। জার্সির গায়ের অংশ এবারে তৈরী হলো। এখন হাত তৈরী করতে হবে।

হাত

(দুটোই এক নির্দ্দেশে বুনতে হবে)

উল জুড়ে হাতের ফাঁদ থেকে বোনাটার সোজা দিকে ৬৮টা ঘর তুলে নিন। ২য় লাইন—৪টে উল্টো, তার পর * ৪টে সোজা, ৪টে উল্টো—এই ভাবে * (তারা) থেকে রিপিট করে যান শেষ অবধি। ৩য় লাইন—সোজা ৪টে *, উঃ ৪টে, সোঃ ৪টে— * থেকে শেষ অবধি রিপিট করে যান। চতুর্থ লাইন—২য় লাইনের মতো। ৫ম লাইন—উল্টো করে ২টো ঘর একসঙ্গে বুনে নিন, উল্টো ২টো, * সোঃ ৪টে, উঃ ৪টে, * থেকে রিপিট করুন। তবে শেষের ৮টা ঘর এই নিয়মে করুন, ৪টে সোজা, ২টো উল্টো, উল্টো করে দুটো ঘর এক সঙ্গে। ৬ষ্ঠ লাইন—৩টে সোঃ ; * উল্টো ৪টে, সোজা ৪টে * থেকে রিপিট করুন, তবে সাতটা ঘর বাকী রাখবেন, সে সাতটা ঘর বুনুন—উঃ ৪টে, সোঃ ৩টে। ৭ম লাইন—উঃ ৩টে, * সোঃ ৪টে, উঃ ৪টে ; * থেকে রিপিট করুন ; তবে শেষের সাতটা ঘর বুনবেন—সোঃ ৪টে, উঃ ৩টে। ৮ম লাইন—৬ষ্ঠ লাইনের মতো। ৯ম লাইন—৭ম লাইনের মতো। ১০ম লাইন—৬ষ্ঠ লাইনের মতো। ১১শ লাইন—সোজা করে দুটো ঘর এক সঙ্গে ; ১টা সোঃ * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ ; * থেকে রিপিট করুন। তবে শেষ সাতটা ঘর বুনুন—৪টে উঃ, ১টা সোঃ, সোজা করে দুটো ঘর এক সঙ্গে। ১২শ লাইন—২টো উঃ, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ * থেকে রিপিট করুন, শেষ ছ'টা ঘর বাকী থাকতে বুনুন—৪টো সো, ২টো উঃ। ১৩শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ১৪শ লাইন—২টো সোঃ, * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ, * থেকে রিপিট করুন, শেষের ছ'টা

বুনুন—৪টে উঃ, ২টো সোঃ। ১৫শ লাইন—১৩শ লাইনের মতো। ১৬শ লাইন—১৪শ লাইনের মতো। ১৭শ লাইন—২টো ঘর (সোজাভাবে) একসঙ্গে, * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ, * থেকে রিপিট করুন; তবে শেষের ৬টা ঘর বুনুন—৪টে উঃ, সোজা ভাবে দুটো ঘর একসঙ্গে। ১৮শ লাইন ১টা উঃ, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ, * থেকে রিপিট করুন, তবে শেষের ৫টা ঘর করুন—৪টা সোঃ, ১টা উঃ। ১৯ লাইন—১টা সোঃ, * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ, * থেকে রিপিট করুন, তবে শেষের ৫টা ঘর করুন—৪টে উঃ, ১টা সোঃ। ২০শ ও ২১শ লাইন—১৮শ লাইনের মতো। ২২শ লাইন—১৯শ লাইনের মতো। ২৩শ লাইন—সোজা ভাবে দুটো একসঙ্গে, ৩টে সোঃ, * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ * থেকে রিপিট করুন, তবে শেষের ৯টা ঘর বুনুন—৪টে উঃ, ৩টে সোঃ, সোজা ভাবে দুটো ঘর একসঙ্গে। ২৪শ লাইন—২য় লাইনের মতো। ২৫শ লাইন—৩য় লাইনের মতো। ২৬শ লাইন—২য় লাইনের মতো। ২৭শ লাইন—৩য় লাইনের মতো। ২৮শ লাইন—২য় লাইনের মতো। ২৯শ লাইন—২টো ঘর সোজা ভাবে একসঙ্গে, ২টো সোঃ, * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ, * থেকে রিপিট করুন; তবে শেষের ৮টা ঘর বুনুন—৪টে উঃ, ২টো সোঃ, ২টো সোজাভাবে একসঙ্গে। ৩০শ লাইন—৭ম লাইনের মতো। ৩১শ লাইন—৬ষ্ঠ লাইনের মতো। ৩২শ লাইন—৭ম লাইনের মতো। ৩৩শ লাইন—৭ম লাইনের মতো। ৩৪শ লাইন —৬ষ্ঠ লাইনের মতো। ৩৫শ লাইন—দুটো ঘর উল্টো ভাবে একসঙ্গে, ১টা উঃ, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ, * থেকে রিপিট করুন, তবে শেষের ৭টা ঘর বুনুন—৪টে সোঃ, ১টা উঃ, ২টো ঘর উল্টো ভাবে একসঙ্গে। ৩৬শ লাইন —১৪শ লাইনের মতো। ৩৭শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ৩৮শ লাইন—১৪শ লাইনের মতো। ৩৯শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ৪০শ লাইন—১৪শ লাইনের মতো। ৪১শ লাইন—দুটো ঘর উল্টো ভাবে একসঙ্গে, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ; * থেকে রিপিট করুন, তবে শেষের ৬টা ঘর বুনুন এই ভাবে—৪টে সোঃ, ২টো উল্টোভাবে একসঙ্গে। ৪২শ লাইন—১৯শ লাইনের মতো। ৪৩শ লাইন—১৮শ লাইনের মতো। ৪৪শ লাইন—১৯শ লাইনের মতো। ৪৫শ লাইন—১৯শ লাইনের মতো। ৪৬শ লাইন—১৮শ লাইনের মতো। ৪৭শ লাইন—উল্টোভাবে দুটো ঘর একসঙ্গে, ৩টে উঃ, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ, * থেকে রিপিট করে যান, তবে শেষে ৯টা ঘর বুনুন ৪টো সোঃ, ৩টে উঃ, ২টো ঘর উল্টো ভাবে একসঙ্গে। ৪৮শ লাইন—৩য় লাইনের মতো। ৪৯শ লাইন—৩য় লাইনের মতো। ৫০শ লাইন —২য় লাইনের মতো। ৫১শ লাইন—৩য় লাইনের মতো। ৫২শ লাইন—২য় লাইনের মতো। এইবারে ৫ম লাইন থেকে ২৪শ লাইনের শেষ অবধি রিপিট করে যান। ৪৪টা ঘর বাকী রইলো। তাদের নিয়ে ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে ১৪ লাইন বুনুন। এইবার ঘর বন্ধ করুন।

প্যাণ্ট

(দুটো পা এক-নির্দ্দেশে বুনতে হবে)

কোমর থেকে আরম্ভ করুন। প্রথমে ৮৪টা ঘর তুলে দু'লাইন ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে করুন। তারপর ৩য় লাইন—* ১টা সোঃ, ১টা উঃ, ১টা সোঃ, ১টা উঃ, ১টা সোঃ, সোজা ভাবে দুটো একসঙ্গে। * থেকে রিপিট করে যান শেষ অবধি। এর পরের ৭ লাইন ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনুন। * * ১১শ লাইন—৪টে সোঃ, * ৪টে উঃ, ৮টে সোঃ; * থেকে রিপিট করে যান। ১২শ লাইন—৪টে উঃ, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ, * থেকে রিপিট করে যান। ১৩শ লাইন—১১শ লাইনের মতো। ১৪শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ১৫শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ১৬শ লাইন—১১শ লাইনের মতো। ১৭শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ১৮শ লাইন—১১শ লাইনের মতো। * * (অর্থাৎ ১১শ লাইন) থেকে * * ১৮শ লাইনের শেষ অবধি পুরো ৮ লাইন ৮ বার রিপিট করুন।

তার পর ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে আট লাইন বুনুন। এইবার সব ঘর বন্ধ করুন। এতক্ষণে যে টুকরোটা তৈরী হলো, এটা একটা দিকের পা। ঠিক এমনি একটি টুকরো তৈরী করতে হবে আর একটি পা-এর জন্যে। দুটি পা জোড়া হবে। এর পরে যে তিনকোণা পট্টিটি (গাসেট—gusset) তৈরী করবেন, সেটির দু'পাশে দু'পা জুড়তে হবে।

গাসেট

ছুটো ঘর তুলুন। ১ম লাইন—২টো সোঃ। ২য় লাইন—২টো উঃ। ৩য় লাইন—১টা ঘরে (উল সামনে দিয়ে) ছুটো ঘর তুলুন। এইভাবে ৪টে ঘর হলো। ৪র্থ লাইন—৪টে উল্‌টো। ৫ম লাইন—১টা সোঃ, তার পরের ছুটো ঘরে চারটে ঘর তুলুন, ১টা সোঃ। ৬ষ্ঠ লাইন—৬টা উল্‌টো। * এর পরের ছ' লাইন সোজা বোনার প্যাটার্ণে (ষ্টকিং-ওয়েব) অর্থাৎ এক লাইন সোজা, এক লাইন উল্‌টো প্যাটার্ণে করুন। তবে সোজা দিকটা যেন সামনে থাকে।

১৩শ লাইন—১টা সোঃ, ১টা ঘরে ছুটো ঘর তুলুন, তারপরে সব সোজা করে যান; শেষে ছুটো ঘর থাকতে ১টা ঘরে ছুটো ঘর তুলুন, বাকী ঘরটা সোজা বুনুন।

১৪শ লাইন—সব উল্‌টো। তারপর * (৭ম লাইন্ থেকে) * ১৪শ লাইন অবধি পুরো ছ' লাইন আটবার রিপিট করুন। ২৪টা ঘর হলো। আবার চার লাইন ষ্টকিং-ওয়েব (মোজা বোনার প্যাটার্ণে) বুনুন। * * ৮৩ লাইন—১টা সোঃ, ২টো একসঙ্গে সোজাভাবে; তারপর সব সোজা বুনুন। শেষের তিনটে ঘর কিন্তু এইভাবে বুনুন—ছুটো ঘর একসঙ্গে, ১টা সোঃ। ৮৪ লাইন—সব উল্‌টো। তারপর ছ লাইন ষ্টকিং-ওয়েবে বুনুন। * *

* * (৮৩শ লাইন) থেকে * * (৯০ লাইন) অবধি আটবার রিপিট করুন (৬টা ঘর বাকী রইলো)। ১৫৫ লাইন—১টা সোঃ, ছুটো সোজা ভাবে একসঙ্গে, ছুটো সোজা ভাবে একসঙ্গে, ১টা সোঃ। ১৫৬ লাইন—৪টে উঃ। ১৫৭ লাইন—ছুটো সোজাভাবে একসঙ্গে, ছুটো সোজা ভাবে একসঙ্গে। ১৫৮ লাইন—ছুটো উঃ। ১৫৯ লাইন—২টো সোঃ। ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

জীবন-সন্ধ্যা

চোখ ফেটে মোর অশ্রু আসে,
ঘনায় পথে আঁধার-রাশি
বাজলো বেলা-শেষের বাঁশী।
ডাহুক-ডাকা নিরালা-সাঁঝ,
হাত-ছানিতে ডাকছে যে আজ,
ডাকছে মোরে অস্তাচলের
ধূসর বন-বীথি।

যৌবনেরি মথুরা কই কোথায় হাসি-গান?
'ভাণ্ডীর' বন নাই রে আমার নাই সে ব্রজধাম।
কোথায় গেল সঙ্গীরা সব,
মনের বেণু আজকে নীরব,
একে একেই নিব্‌ছে যে দীপ, হায় কি কালের রীতি?

সন্ধ্যা আসে, হিমেল্ হাওয়ায় কাঁপছে বাঁধের জল,
আলো-ছায়ার দুলছে ছ'কুল, নিথর তমাল-তল।
নামছে জীবন-বিভাবরী,
নাই রে আমার পারের কড়ি,
আসবে কখন খেয়ার তরী তাই ভাবি যে নিতি।

আমার 'কুমুদ' আমার 'কমল' আমার প্রাণের ভাই,
মন বলে হায় তাদের কাছেই আজকে বিদায় চাই,
হয় ত জীবন-সন্ধ্যা আমার,—
সফল হবে মিলবে আবার,
প্রেমের রাজার পীযূষধারা অসীম প্রাণের প্রীতি

হয় ত আবার আমার ক্ষেতেই ফল্‌বে ফুলের-ফসল,
হেথায় কাঁটা বিধ্‌ল বটে, সেথায় সোনার কমল,—
তুলব আমি আপন-হাতে,
নন্দনেরি বাগিচাতে—
ফুটেই রবে ফুল হ'য়ে মোর এই জীবনের স্মৃতি।

কাদের নওয়াজ।

বিজ্ঞান-জগৎ

দ্বার-পথের রন্ধ্র

কে আসিয়া দ্বারে কখন্ করাঘাত করিল—হয় তো তার সঙ্গে দেখা করিতে চাহি না! অথচ করাঘাত শুনিয়া দ্বার খুলিলেই সে আসিয়া উদয় হইবে, চক্ষুলজ্জায় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাকে ঘরে বসাইতে হইবে —এমন দুঃসহ ব্যাপার কার জীবনে না ঘটে? এ দুঃসহ



আগে দেখুন, কে আসিয়াছে!

বিপত্তি-নাশের উপায় মিলিয়াছে। একটি বিশেষ রন্ধ্র-যন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। বাড়ীর দ্বারে যেমন দ্বার ঘণ্টা বা door-bell রাখা হয়, তেমনি ভাবে দ্বারে এ রন্ধ্র-যন্ত্র সংলগ্ন করা যায়। এ দ্বার-রন্ধ্র-যন্ত্রযোগে ভিতর হইতে দেখিয়া লইবেন, দ্বারে কে আসিয়াছে এবং সে লোকটি কাম্য জন, না, বর্জ্জনীয়? দেখিয়া নিঃশব্দে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

চকিত-চিত্র

আমেরিকার এক স্পোর্টস-প্রতিযোগিতায় মাশাচুসেটসের টেক্‌নলজি ইনষ্টিটিউটের প্রোফেসর হ্যারল্ড এজার্টন সাঁতার-প্রতিযোগিনীদের



জলে ঝাঁপ

সাঁতার-উদ্যোগের ছবি তুলিয়াছেন। এক সেকেণ্ডের লক্ষতম-অংশ মাত্র সময়ের এক্‌সপোজারে তিনি যে-ছবি তুলিয়াছেন, তার প্রতিলিপি দেখুন!

ফিতা কাচুন! টাই কাচুন!

মেয়েদের মাথার ফিতা, বাবুদের গলার টাই, মোজা, রুমাল প্রভৃতি কাচিবার এক সহজ উপায়ের কথা বলিতেছি। খুব-চওড়া একটি বড় বোতলের মধ্যে সাবান-জল বা অনুরূপ পরিষ্কার করার উপযোগী দ্রাবক ভরিয়া সেই বোতলের মধ্যে ফিতা, টাই, রুমাল, মোজা প্রভৃতি পুরিয়া দিন; দিয়া বোতলটি বন্ধ করুন। বন্ধ করিয়া সবলে বোতলটিকে নানা ভাবে ঝাঁকানি

দিন্; তার পর টাই প্রভৃতি বাহির করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া শুকাইবার জন্য বাতাসে মেলিয়া দিন। অল্প-পরিশ্রমে ফিতা, টাই



টাই ফিতা কাচা

মোজা, রুমাল কাচা হইবে; আছাড় দিবার প্রয়োজন হইবে না। শুকাইয়া গেলে ঈষৎ নরম-আঁচে ইস্ত্রী করিয়া লইলেই খাশা হইবে।

—

গাছের আসর

যে-গাছের কাণ্ডের দিকে পত্র-পল্লবের জঞ্জাল নাই, সে-গাছের কাণ্ড চিরিয়া কেমন আসর রচনা করা হইয়াছে, নীচের ছবিতে



গাছের আসর

দেখুন। তক্তার প্লাটফর্ম্ম, চারিধারে মজবুত রেলিং এবং উঠিবার জন্য কাঠের সিঁড়ি—খোলা বাতাসে এ আসর সব দিক্ দিয়া জমিবে ভালো!

পুঁতির উপর সোনালি পালিশ

নীচে এই যে রূপসীর ছবি দেখিতেছেন, রূপসীর কণ্ঠে ঐ যে কণ্ঠমাল্য—ও-কণ্ঠমাল্য পুঁতির তৈয়ারী। পুঁতিতে সোনালি পালিশ-করা। গলায় দিলে মনে হইবে, সোনার দড়ি-হার গলায়



দড়া-হার।

দিয়াছেন! রাসায়নিক বিশেষ দ্রাবক-সাহায্যে পুঁতি, ঝিনুক, কাচ, মায় কাঠের মালাকেও এমনি সোনালি বর্ণে রঞ্জিত করা যায়। এ সোনালি ছোপ ঘামে-জলে মুছিবে না।

—

ফাউণ্টেন্-পেন্

হংসপুচ্ছের পেন্ বা নিব্-ওয়ালা ষ্টীল-পেনের রেওয়াজ এ যুগে আর দেখা যায় না। সকলেই এখন ফাউণ্টেন পেন ব্যবহার করিতেছেন। ব্যবহার করিলেও এ-পেনের যত্ন জানি না বলিয়া পেন বড় শীঘ্র খারাপ হয়। ফাউণ্টেন-পেনের বিভিন্ন অংশ মায় কালির রবার-থলিটি পর্য্যন্ত মাসে দু'বার সাফ করিয়া লওয়া উচিত। শুধু-জলে সাফ করিলে চলিবে না। সম্প্রতি এক-রকম রাসায়নিক কম্পাউণ্ড বাহির হইয়াছে; ঈষদুষ্ণ জলে সেই কম্পাউণ্ড মিশাইয়া যে-দ্রাবক তৈয়ারী হইবে, সেই দ্রাবকে ফাউণ্টেন-পেন ভিজাইয়া সাফ করিতে হইবে। এ কম্পাউণ্ডে মাসে দু'বার পেন পরিষ্কার করিয়া লইলে একটি ফাউণ্টেন-পেন লইয়া ত্রিশ-চল্লিশ



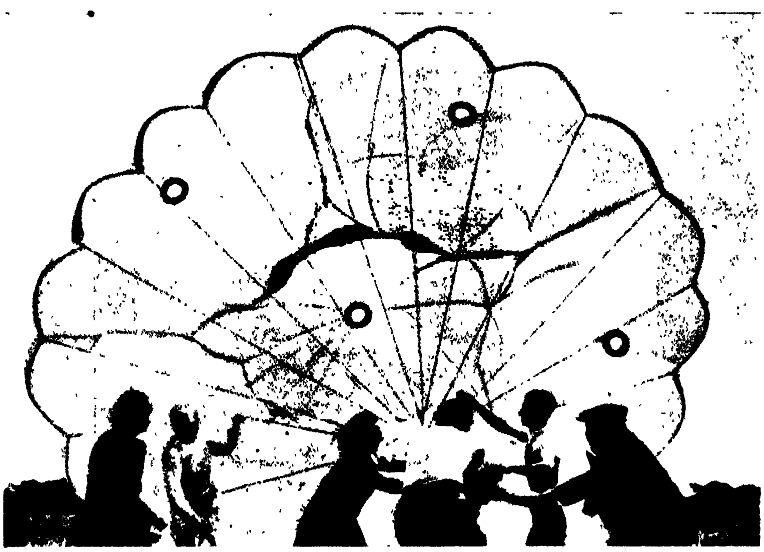
পেন্ সাফ করা

বৎসর অনায়াসে কাটাইতে পারিবেন। এ দ্রাবক-কম্পাউণ্ড এ দেশে এখনো বোধ হয় আসে নাই!

—

ওড়া-পথে ধাত্রী

এ-যুদ্ধে কোথায় কি বিপত্তি ঘটিবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই! কোথায় কে চোট্ খাইয়া কোন্ দুর্গম গিরি বনে পড়িয়া রহিল, তার সেবা পরিচর্য্যা কি করিয়া হয়? এজন্ত বিমানপোতের প্যারাশুট-সাহায্যে সর্ব্বত্র যাহাতে নামিতে পারেন, তাই নার্শদিগকে প্যারাশুট-অবরোহণ-বিদ্যায় রীতিমত পটু করিয়া তোলা হইয়াছে। প্যারাশুট ধরিয়া শূন্যপথে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে এ কাজে কতখানি পটুতা লাভ হইল, শিক্ষা-মন্দিরে তার বিশেষ পরীক্ষা লওয়া হয়। এই সঙ্গে তিনখানি ছবি দেওয়া হইল। একখানি ছবিতে দেখিবেন, প্যারাশুট-যোগে নার্শ ভূমিতে নামিয়া কি করিয়া নিজেকে মুক্ত করিবেন, তাহা দেখানো হইতেছে; অপর দু'খানি ছবিতে দেখিবেন নার্শ যন্ত্র-ঔষধাদি-সমেত ওঠা-নামা অভ্যাস করিতেছেন।



প্যারাশুট্ ছাড়িয়া মাটীতে নামা



ঔষধাদি-সমেত



প্যারাশুট-শিক্ষা

—

কণ্ঠ-সাধনা

কণ্ঠ সাধনা করিতে হইলে ফুশফুশকে শক্ত-সমর্থ করিতে হয়



বেলুনে গলা-সাধা

ফুশফুশ শক্ত-সমর্থ হইলে গান গাহিবার সময় দম বন্ধ হইবে না, কফ ধরিবে না ; যেমন খুশী কণ্ঠকে উচ্চ গ্রামে চড়াইতে ও নিম্ন গ্রামে নামাইতে পারিবেন। ফুশফুশের এই ব্যায়াম-সাধনের জন্য নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী হিল্ডা বার্ক কি করেন, জানেন? চারটি, ছ'টি, আটটি খেলার-বেলুন ফুৎকারে ফাঁপাইয়া শ্বাস-সাধনা করেন। এ ব্যায়ামে ফুশফুশ শুধু শক্ত সমর্থ হয় না—কণ্ঠস্বর মিষ্ট এবং সমৃদ্ধ হয়। এ ব্যায়ামে তিনি প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছেন।

স্বাস্থ্য-মুখোশ

খনিতে, কল-কারখানায় বা পাটের গুদামে যাঁদের কাজ করিতে হয়, কাজ করিবার সময় নিশ্বাসের সঙ্গে নাসা-পথ দিয়া তাঁদের দেহমধ্যে



স্বাস্থ্য-মুখোশ

ধুলা, পাটের আঁশ প্রভৃতি প্রবেশ করে। ইহার ফলে হাঁপানি, যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের উৎপত্তি ঘটে। বাতাসে বহু রোগের বীজাণু উড়িতেছে। নানা ভাবে এ সব বীজাণু আমাদের দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহকে অসুস্থ, বিকল ও বিনষ্ট করিয়া দেয়। ইহার প্রতিকার-কল্পে মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা এক-রকম প্রতিরোধ-মুখোশ তৈয়ারী করিয়াছেন। এ মুখোশ মুখে আঁটিয়া কাজ করিতে কোনোরূপ অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে হয় না; অথচ ধুলা, আবর্জ্জনা ও রোগ-বীজাণুর হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া দেহ যন্ত্রটিকে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ রাখা যাইবে।

লোহার ফুশফুশ-যন্ত্র

ইনফ্যানটাইল্ পক্ষাঘাত (paralysis) রোগের জন্য অনেকে আজীবন শ্বাস কষ্ট ভোগ করেন। সে-কষ্ট এমন যে, থাকিয়া থাকিয়া প্রাণ-সংশয় ঘটে! সম্প্রতি লৌহ-নির্ম্মিত হালকা এক-রকম ফুশফুশ-যন্ত্র



লোহার শ্বাস-যন্ত্র

(iron-lung) তৈয়ারী হইয়াছে। যন্ত্রটি দেখিতে ফায়ার ব্রিগেডিয়ারের বর্ম্মাবরণের মতো। কোমরে ও বগলের কাছে রবারের ব্যাণ্ড দিয়া এ বর্ম্ম গেঞ্জির মতো গায়ে আঁটিলে শ্বাস-গ্রহণে এতটুকু কষ্ট হয় না; স্বচ্ছন্দভাবে শ্বাস গ্রহণ করা চলে।



ষোড়শ পর্ব্ব

হানা ফার্গস্ বন্দিনী

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

সেই নির্ব্বাসিত জার্ম্মাণ নাবিকটার ভবিষ্যতের জন্য আমার বা মেরীর আর কোন উৎকণ্ঠা রহিল না ; কারণ কাপ্তেন ভন রথভেন তাহাকে রুইস্ দ্বীপ হইতে 'ইউ'-বোটে তুলিয়া-লইয়া স্বদেশে গিয়াছিল, এ বিষয়ে আমাদের অণু-মাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহার পর হানা ফার্গস্ হঠাৎ আমাদের দ্বীপে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিবে—এ আশঙ্কাও আমাদের মনে স্থান পাইল না। কারণ কয়েক দিন পূর্ব্বে যে ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত তাহার নিবৃত্তির কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইল না। আমরা জানিতাম, ঝড়-বৃষ্টির বিরাম না হইলে হানা ফার্গস্ বড়-দেশ ত্যাগ করিতে সাহস করিবে না ; সুতরাং তাহার সম্বন্ধেও আপাততঃ আমরা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল, এবং আকাশ পরিষ্কার হইল। তখন এক দিন আমস্ আমাকে সঙ্গে লইয়া তাহার নৌকায় রুইস্ দ্বীপে যাত্রা করিল। যে জার্ম্মাণ নাবিকটাকে সেখানে সে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল—তাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য আমস্ যে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা তাহার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

যথাসময়ে রুইস্ দ্বীপের পার্ব্বত্য-তটে আমসের বোট ভিড়িলে আমস্ আমাকে তাহার বোটে বসাইয়া-রাখিয়া দ্বীপে নামিয়া গেল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা পরেই সে হতাশ ভাবে তাহার বোটের নিকট ফিরিয়া আসিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, তাহার মুখ অত্যন্ত মলিন, এবং তাহার ভাল চক্ষুটিতে দারুণ উৎকণ্ঠা প্রতিফলিত।

আমস্ তাহার নৌকায় উঠিয়া-বসিয়া ভগ্নস্বরে আমাকে বলিল, "সেই জার্ম্মাণটাকে ত দ্বীপের কোনও অংশে দেখিতে পাইলাম না। সে অদৃশ্য হইয়াছে! ক্ষুধাতৃষ্ণায় যদি তাহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে তাহার মৃতদেহ ত পড়িয়া থাকিত ; কিন্তু তাহার মৃতদেহেরও সন্ধান পাইলাম না! কোথায় গেল সে? অদ্ভুত কাণ্ড!"—তাহার কণ্ঠস্বর উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল।

আমি তাহার কথা শুনিয়া গভীর বিস্ময়ভরে বলিলাম, "দ্বীপ হইতে সে অদৃশ্য হইয়াছে? তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলে না?—আশ্চর্য্য বটে!"—সৌভাগ্যক্রমে আমি আমার মনোভাব গোপন করিতে পারিলাম। প্রকৃত রহস্য যে আমার অজ্ঞাত নহে, আমার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমস্ তাহা বুঝিতে পারিল না।

যাহা হউক, এই ব্যাপারে সে যে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল, তাহার আচরণেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। সেই দিন রাত্রিকালে সে তাহার পাকশালায় দীর্ঘকাল অধীর ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিলাম; যেন কোনও দিকে সে চিন্তা-সমুদ্রের কূল দেখিতে পাইতেছিল না!

আমস্ দীর্ঘকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, এবং গম্ভীর স্বরে বলিল, "তুমি আর ওখানে অলস ভাবে বসিয়া থাকিও না, ওঠ; উঠিয়া এখনই সাগর-কূলে যাও। আজ আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, সমুদ্র স্থির; আমার মনে হইতেছে, ক্রষ্টারম্যান আজই তাহার 'ইউ'-বোটে এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। গত দুই দিন হইতে তাহার এখানে আসিবার কথা, তাহার না আসিবার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না; সে

নিয়ম-বাঁধিয়া কায করে, কিন্তু এবার তাহার কি হইল—তাহা অনুমান করা কঠিন; যদি তাহার 'ইউ'-বোট না ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে এই রাত্রেই সে এখানে আসিয়া পড়িবে।"

আমি জার্ম্মাণ কাপ্তেন ক্লষ্টারম্যানকে ভালই জানিতাম। সে প্রকাণ্ড জোয়ান নাজী, অত্যন্ত রুক্ষভাষী, এবং কঠোর-প্রকৃতি। আমি জানিতাম, যদি সে তাহার 'ইউ'-বোটে আসিয়া পড়ে, এবং সমুদ্র-বেলা হইতে আমাদের সাড়া পাইতে একটু বিলম্ব হয়, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া সে হাঙ্গামা বাধাইতে পারে! এই জন্য আমি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি গরম-পোষাকে সজ্জিত হইলাম, এবং দ্বারের পশ্চাদ্বর্ত্তী 'হুক' হইতে লণ্ঠনটা নামাইয়া-লইয়া গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমাকে গমনোদ্যত দেখিয়া মেরীও গরম-কোটটা পরিয়া-লইয়া আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

আমরা উভয়ে সমুদ্র-বেলায় উপস্থিত হইয়া একটা উচ্চ ঢিবির উপর পাশাপাশি বসিয়া পড়িলাম।

আমরা কিছু কাল সেখানে বসিয়া রহিলাম। মেরী নির্ব্বাক্ ভাবে চারি দিকে চাহিতেছিল। সে হঠাৎ আমার হাতখানা টানিয়া-লইয়া তাহা সজোরে টিপিয়া ধরিল; তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ঐ দিকে চাহিয়া দেখ, পিটার!"

মেরী নির্নিমেষ নেত্রে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিল। তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল! কারণ, আমি পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে সমুদ্রবক্ষস্থ একখানি বৃহৎ ডিঙ্গী সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইলাম। তাহার মাস্তুলে বৃহৎ পাল প্রসারিত; পাল ফুলাইয়া ডিঙ্গীখানা কূলের দিকেই আসিতেছিল।

মেরী রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "হানা ফার্গসের ডিঙ্গী! হানা আসিতেছে পিটার!"

মেরীর অনুমান সত্য। সেই ডিঙ্গীতে হানা ফার্গস্ আমাদের দ্বীপে আসিতেছিল।

আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম, সেই স্থানটিতে পাহাড়ের ছায়া পড়ায় আমাদের দেহ সেই ছায়ায় ঢাকা ছিল; সুতরাং আমরা হানা ফার্গসের অদৃশ্য থাকিয়া দেখিতে পাইলাম—সে সমুদ্র-কূলে ডিঙ্গী ভিড়াইয়া পাল নামাইয়া ফেলিল; তাহার পর ডিঙ্গীর নঙ্গরটি দুই হাতে ধরিয়া সমুদ্রকূলস্থ বালুকা-স্তূপের উপর দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইল। তাহার দেহ ম্যাকিন্‌টোসে আবৃত, এবং চন্দ্রালোকে তাহার আকৃতি অতি ভীষণ দেখাইতেছিল। সে মাথা তুলিয়া দৃঢ়পদে চলিতেছিল। তাহার মুখ গম্ভীর, এবং চক্ষুতে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট। তাহার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। আমি মৃদু স্বরে মেরীকে বলিলাম, "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

মেরী বলিল, "এখন আমি কি করিব, তাহা স্থির করিয়া ফেলিয়াছি, পিটার!"

মেরী আমার হাত ছাড়িয়া-দিয়া সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল, এবং হানা সাগর-বেলায় বালুকারাশির উপর যে স্থানে তাহার নৌকার নঙ্গর প্রোথিত করিতেছিল—সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

মেরীকে একাকিনী সেই দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি নারীর নিকট যাইতে দেখিয়া আমার একটু দুশ্চিন্তা হইল; তাহাকে ঐ ভাবে যাইতে দেওয়া সঙ্গত নহে ভাবিয়া, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিলাম।

আমি কিছু দূরে থাকিতেই মেরীর গম্ভীর স্বর শুনিতে পাইলাম। সে হানার সম্মুখীন হইয়া উত্তেজিত স্বরে তাহাকে বলিল, "এখানে তুমি কি চাও?"

মেরীর কথা শুনিয়া হানা ফার্গস্ তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রালোকে দেখিলাম—তাহার মুখকান্তি অতি ভীষণ হইয়াছে।

হানা মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "কে ও, রূপসী ছুক্‌রী! তুমি আসিয়াছ? সারা অঙ্গে রূপ যে উছলিয়া পড়িতেছে!"

মেরী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "তুমি কি চাও? কি মতলবে এখানে আসিয়াছ?"

হানা ফার্গস্ শুষ্ক হাসিয়া নীরস স্বরে বলিল, "এখানে গোপনে কি কাণ্ড চলিতেছে, তাহাই আবিষ্কার করিতে আসিয়াছি। আমি আরও জানিতে চাই—আমার ভাই কোথায়? তাহার সন্ধান না পাই, তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাইব—এ আশা আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই।"

হানার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—সে বিশেষ-কিছু না জানিলেও কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া ঐ সকল কথা বলিল; কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মেরী নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেরীকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া হানা মৃদু হাসিয়া নীরস স্বরে পুনর্ব্বার বলিল, "আমার কথা শুনিয়া তোমার যে কণ্ঠরোধ হইল সুন্দরী! দেখ, তুমি আমাকে যেরূপ নির্ব্বোধ বলিয়া ঠাহর করিয়াছ—আমি সত্যই সেরূপ নির্ব্বোধ নহি। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি—এই 'ব্ল্যাক গল ফার্ম্মে' কি একটা রহস্যপূর্ণ খেলা চলিতেছে! সেই রহস্যটা কি, তাহার আগা-গোড়া আমি আবিষ্কার করিব। বুঝিয়াছ? সকল বিষয়ই আমাকে জানিতে হইবে। আমাকে প্রতারিত করিবে—সে সাধ্য তোমাদের নাই সুন্দরী!"

তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া উঠিল; এবং তাহার কণ্ঠোচ্চারিত প্রত্যেক শব্দে নিদারুণ ঘৃণা ও অবজ্ঞা পরিস্ফুট হইল। সে আরও যে সকল কথা বলিল, তাহা অশ্লীল গালাগালিতে পূর্ণ।

কিন্তু মেরী তাহার কোন কথার প্রতিবাদ করিল না, তাহার সহিত তর্ক করিতে মেরীর ঘৃণা হইল; হানার মুখের দিকে আর না চাহিয়া নিস্তব্ধ ভাবে সে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ গম্ভীর, প্রদীপ্ত নেত্রে ঘৃণা প্রতিফলিত।

অবশেষে সে বিচলিত স্বরে আমাকে বলিল, "পিটার!"—সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল।

আমি তাহার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চাহিলাম। যে দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল—তাহা দেখিয়া আমার যেন শ্বাসরোধ হইল! আমি সেই দিকে চাহিয়া চন্দ্র-কিরণোদ্ভাসিত সমুদ্র-বক্ষে একটি আলোক দেখিতে পাইলাম; সেই আলোক অতি তীব্র, সুলোহিত। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া শুভ্র চন্দ্রালোকে একখানি 'ইউ'-বোটে'র বিভিন্ন অংশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। সেই সুলোহিত আলোকশিখাটি 'ইউ'-বোটেরই আলোক।

বুঝিতে পারিলাম,—উহা 'ইউ'-বোটেরই সাঙ্কেতিক আলোক!

মেরী আমাকে বলিল, "উহাকে লণ্ঠনের সাঙ্কেতিক আলোক দেখাও পিটার! 'ইউ'-বোটের কাপ্তেন আমাদের সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছে।"

এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি, মেরীর তাহা সুবিদিত; কিন্তু মেরীর কথা শুনিয়া আমি অস্ফুট স্বরে বলিলাম, "তুমি ত আমাকে লণ্ঠন তুলিয়া সাঙ্কেতিক আলোক দেখাইতে বলিতেছ, মেরী! কিন্তু হানা ফার্গস্ ঐখানে দাঁড়াইয়া আছে। সে এখানে উপস্থিত থাকিতে 'ইউ'-বোটের নাবিকগণকে এখানে আসিতে ইঙ্গিত করা পাগলামি ভিন্ন আর কি?"

মেরী এ-কথা শুনিয়াও দৃঢ় স্বরে পুনর্ব্বার বলিল, "উহাকে সাঙ্কেতিক আলোক দেখাও পিটার!"

এ কথার পর আমি আর তাহার প্রতিবাদ না করিয়া বালুকারাশির উপর বসিয়া-পড়িয়া হরিকেন লণ্ঠনের বাতি জ্বালাইয়া লইলাম, এবং লণ্ঠনটা হাতে লইয়া উচু করিয়া তুলিয়া ধরিলাম; পরে যথানিয়মে তাহা কয়েকবার আন্দোলিত করিলাম। তাহার পর আমি সরিয়া গিয়া মেরীর পাশে দাঁড়াইলাম। মেরী তখন হানা ফার্গসের সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল। হানা ফার্গস্ আমাদের সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। সে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহার বিস্ফারিত চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমুদ্র-বক্ষস্থিত 'ইউ'-বোটের দিকে প্রসারিত।

আমি 'ইউ'-বোটের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ মসীবিন্দুর ন্যায় কি পদার্থ 'ইউ'-বোটের পাশ হইতে সাগর-বেলার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; কয়েক মিনিট পরে বুঝিতে পারিলাম, উহা 'ইউ'-বোটের একখানি ডিঙ্গী। তাহা ঝুপ্-ঝুপ্ শব্দে দাঁড় ফেলিয়া ক্রমশঃ সমুদ্র-তটের অভিমুখে আসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া হানা ফার্গস্ বুঝিতে পারিল, উহা সাগর-বেলার কোন্ স্থানে ভিড়িবে। তদনুসারে হানা সরিয়া গিয়া সেই স্থানটিতে উপস্থিত হইল, এবং ডিঙ্গীখানির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার ভাব-ভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ লক্ষিত হইল না।

ডিঙ্গীখানি কয়েক মিনিট পরে তীরে ভিড়িলে দুই জন নাবিক ডিঙ্গী হইতে তীরে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার মাথা ধরিয়া রহিল। তখন লেদার-জ্যাকেটপরিহিত কাপ্তেন ক্রষ্টারম্যান ডিঙ্গী হইতে সমুদ্রকূলে অবতরণ করিল।

কাপ্তেনকে ডিঙ্গী হইতে নামিতে দেখিয়া অদূরবর্ত্তিনী হানা গভীর বিস্ময়ে উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য! ইহারা যে জার্ম্মাণ!"

দীর্ঘদেহ গম্ভীর-প্রকৃতি কাপ্তেন ক্রষ্টারম্যান হানার মন্তব্য শুনিতে পাইল। সে পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হানার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর মেরীর ও আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীরস স্বরে বলিল, "এই স্ত্রীলোকটা কে?"

কিন্তু মেরী বা আমি কাপ্তেনের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই হানা ফার্গস্ তীব্র দৃষ্টিতে মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমরা এই খেলা খেলিতেছ? এই খেলা কত দিন হইতে চলিতেছে? তা বেশ, উপকূলের বৃটিশ প্রহরীগণের এ সকল কথা জানিতে বিলম্ব হইবে না।"—তাহার চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

কথা কয়টি বলিয়া হানা সেখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইল না; সে আমাকে তাহার সম্মুখস্থ পথ হইতে অপসারিত করিবার জন্য আমার কাঁধে সজোরে এক ধাক্কা দিল। সেই ধাক্কায় আমি পড়িতে পড়িতে কোন-রকমে সামলাইয়া লইলাম; কিন্তু সে আমার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিল না। সে তাহার নৌকা লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।—সে তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিবে—ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। আমরা সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম!

হানাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মেরী ব্যাকুল ভাবে কাপ্তেন ক্রষ্টারম্যানের হাত ধরিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "শীঘ্র উহাকে ধরুন, কাপ্তেন, পলাইতে দিবেন না। এই স্ত্রীলোকটা বাঘিনীর মত ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক; ও বড়-দেশ হইতে আসিয়াছে, বৃটিশ সরকারের গুপ্তচর। ও কি বলিয়া গেল, তাহা শুনিয়াছেন ত?"

মেরীর কথা শুনিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন ক্রষ্টারম্যান হানার মতলব বুঝিতে পারিয়াছিল; সুতরাং তাহাকে মেরীর অনুরোধের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইল না। সে তাহার অনুচরদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "ঐ স্ত্রীলোকটাকে শীঘ্র পাক্‌ড়াও। উহাকে ধরিয়া আমার কাছে হাজির কর।"

তাহার আদেশ শুনিয়া বিশালকায় বলবান নাজী নাবিকদ্বয় হানা ফার্গস্‌কে ধরিবার জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। হানা তাহার বোটের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই নাবিকদ্বয়ের হাতে পড়িল। সে তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। তাহার আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। দুই জন বলবান নাজী নাবিকের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করা তাহার অসাধ্য হইল। তাহারা তাহাকে টানিতে টানিতে কাপ্তেনের নিকট লইয়া আসিল। হানা পরিশ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল; কিন্তু মুক্তিলাভের চেষ্টায় বিরত হইল না।

কাপ্তেন ক্রষ্টারম্যান মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন ইহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিব?"

মেরী বিচলিত স্বরে বলিল, "আপাততঃ উহাকে আমাদের পাকশালায় লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

কাপ্তেন বলিল, "বেশ তাহাই হউক; পরে যাহা সঙ্গত মনে হইবে—সেইরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।"

সপ্তদশ পর্ব্ব

আমস্ ক্রোবির লাঞ্ছনা

হানা ফার্গস্ আমসের পাকশালায় নীত হইল। আমি মেরীকে সঙ্গে লইয়া নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম। আমসের পাকশালায় প্রবেশ করিয়া হানা আর বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, বা একটিও কথা বলিল না। তাহাকে গম্ভীর ভাবে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়া আমার মনে হইল, ভাগ্যে যাহা আছে ঘটিবে ভাবিয়া সে চিন্তা ত্যাগ করিয়াছে; কারণ, তাহার নিষ্কৃতি-লাভের সকল পথ রুদ্ধ। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, সে যে বন্দিনী, এ কথা যেন সে ভুলিয়া গিয়াছিল!

আমরা পাকশালায় প্রবেশ করিয়া আমস্ ক্রোবিকে টেবলের নিকট দণ্ডায়মান দেখিলাম। সে আতঙ্কাভিভূত হইয়া প্রথমে হানার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর জার্ম্মাণগুলিকে তাহার পাহারায় নিযুক্ত দেখিয়া তাহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার

মনে হইল, মানুষের তেমন হতাশ ভাব—তেমন কাতর মুখচ্ছবি আমি জীবনে আর কখন দেখি নাই! একটি কথা মাত্র তাহার মুখ হইতে নিঃসারিত হইল। সে ভগ্ন স্বরে বলিল, "আর আমার রক্ষা নাই; ইংরেজরা এবার আমাকে গুলী করিয়া মারিবে।"

তাহার কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

কাপ্তেন ক্রুষ্টারম্যান আমসের মন্তব্য শুনিয়া তাহাকে বলিল, "আমারও সেইরূপই মনে হইতেছে। আমরা এই স্ত্রীলোকটিকে সমুদ্রতটে দেখিতে পাওয়ায় ধরিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছি। সে কিরূপে সেখানে আসিয়াছিল, কেনই বা আসিয়াছিল, তাহা তোমার মেয়ের জানা থাকিতে পারে; মেরীকে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সকল কথা বোধ হয় জানিতে পারা যাইবে।"

আমস্ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মেরীর মুখের দিকে চাহিলে মেরী হানার আবির্ভাব-সংক্রান্ত সকল কথাই প্রকাশ করিল। হানার সহিত তাহার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহার কিছুই গোপন করিল না।

আমস্ অধীর ভাবে মেরীর কথা শুনিয়া হানার মুখের দিকে চাহিল; তাহার ভাল চক্ষুটি হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতে লাগিল! সে হানাকে লক্ষ্য করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি এই ভাবে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছিলে! তোমার ভাই সম্বন্ধে সকল বিষয়ের সন্ধান লইয়াও তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার নাই। তোমার দুর্ভাগ্য যে, এই শেষ বার এখানে আসিয়া তুমি ধরা পড়িয়া গিয়াছ। তুমি দেশে ফিরিয়া যাইবে—এ আশা ত্যাগ কর।"

হানা ফার্গস্ আমসের কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিল; তাহার পর তাহার মুখ হইতে যেন ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল! সে তীব্র স্বরে বলিল, "ওরে স্বদেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক নরপশু! এইবার আমি জানিতে পারিয়াছি, আমার ভাইএর ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল! সে তোর এখানে আসিলে—"

আমস্ হানার কথায় বাধা দিয়া, সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি কচু জানিতে পারিয়াছ! আমি পূর্ব্বেও তোমাকে বলিয়াছি—তোমার ভাই কোনও দিন এই দ্বীপে আসে নাই। আমরা কোন দিন তাহাকে এখানে দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাহা বিশ্বাস না করিয়া তুমি এখানে গোপনে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছ! উত্তম; তোমার ভাগ্যে কি আছে—শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে। আমরা যাহাতে বিপন্ন না হই, সেজন্য তোমাকে লইয়া কি করা যাইবে, তাহা স্থির করিতে বিলম্ব হইবে না।"

তাহার পর সে কাপ্তেন ক্রুষ্টারম্যানকে বলিল, "ইহাকে লইয়া কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাই; তুমি আমার সঙ্গে একবার বাহিরে যাইবে?"

তাহারা উভয়ে পাকশালার বাহিরে গিয়া পরামর্শে যাহা স্থির করিল, সে সকল কথা আমস্ আমার ও মেরীর নিকট পরে প্রকাশ করিয়াছিল। লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগান কি অবস্থায় আলান ফার্গস্‌কে গুলী করিয়া মারিয়াছিল; ফার্গস্‌কে দেশে ফিরিতে না দেখিয়া তাহার ভগিনী হানা তাহার সন্ধানে পুনঃ পুনঃ আমাদের দ্বীপে আসিতেছিল বটে, কিন্তু এই শেষ বার আসিয়া সে জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোট-সংক্রান্ত সকল গুপ্ত-রহস্য জানিতে পারিয়াছে। আমস্ কাপ্তেন ক্রুষ্টারম্যানকে এই সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে তাহার উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

যাহা হউক, পরামর্শ শেষ হইলে উভয়ে পাকশালায় ফিরিয়া আসিল। আমি আমসের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখে ভীষণ প্রতিহিংসার সঙ্কল্প পরিস্ফুট দেখিলাম।

আমস্ হানা ফার্গসের মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তোমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা আমরা স্থির করিয়াছি।—তোমাকে জার্ম্মাণীতে লইয়া গিয়া আটক রাখা হইবে; কিন্তু পলায়নের চেষ্টা করিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে—এ কথা তুমি ভুলিও না!"

আমসের কথা শুনিয়া হানা কোন কথা বলিল না; কিন্তু তাহার চক্ষুতে ভীষণ হিংস্রভাব প্রতিফলিত হইল। সে ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।

আমস্ তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া বলিল, "হাঁ,

জার্ম্মাণীতেই তুমি প্রেরিত হইবে। এই জার্ম্মাণ কাপ্তেনই তোমাকে তাঁহার বোটে তুলিয়া-লইয়া স্বদেশে যাইবেন। উনি এখানে উঁহার বোটের খোরাক লইতে আসিয়াছেন। তুমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়া কিছু কাল পূর্ব্বে উঁহাকে উঁহার বোটের ডিঙ্গী হইতে সাগর-তটে নামিতে দেখিয়াছ, এবং উনি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন, কিছু কাল পরে তাহাও জানিতে পারিতে। এ অবস্থায় যদি তুমি ধরা না পড়িয়া নির্ব্বিঘ্নে বড়-দেশে পলায়নের সুযোগ পাইতে, তাহা হইলে এখানকার সকল রহস্যই উপকূলস্থ বৃটিশ প্রহরীদের নিকট প্রকাশ করিতে; এবং আমি শুনিয়াছি, এ সকল কথা তুমি তাহাদের নিকট প্রকাশ করিবে—মেরীকে ইহাও বলিয়াছিলে। উপকূলের বৃটিশ প্রহরীরা ইহা জানিতে পারিলে আমাদের ঘরবাড়ী কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তোপে উড়াইয়া দিবে, এবং স্বদেশ-দ্রোহী ও শত্রুপক্ষের সাহায্যকারী বলিয়া আমাকেও গুলী করিয়া হত্যা করিবে। এইজন্যই তুমি যাহাতে আর বড়-দেশে ফিরিতে না পার—আমাদিগকে তাহারই উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। ইহার একমাত্র উপায় তোমাকে জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করা। সেখানে কোন বন্দীশিবিরে তোমাকে আটক রাখা হইবে। যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে আটক থাকিতে হইবে। জার্ম্মাণ 'গেষ্টাপো' তোমার ভার গ্রহণ করিবে। তোমার অসংযত জিহ্বা দ্বারা আমরা বিপন্ন না হই, এজন্য তোমার সম্বন্ধে এইরূপই ব্যবস্থা করিতে হইল।"

হানা ফার্গস্ সক্রোধে বলিল, "ওরে নরপশু! যে ভাবে তুই আমার ভাইকে নির্ব্বাক্ করিয়াছিস্, সেই ভাবেই আমাকেও নির্ব্বাক্ করিবার জন্য তুই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিস্ঃ কিন্তু আমি জানিতে চাই—সে কোথায়? তাহাকে হত্যা করিয়াছিস্, না তাহাকেও এই ভাবে জার্ম্মাণীতে পাঠাইয়াছিস্?"

আমস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহার একটাও করা হয় নাই। সে কোন দিন আমাদের এই দ্বীপে আসে নাই, এ কথা আমি একাধিক বার বলিয়াছি। সেই একই কথা আর কত বার তোমাকে বলিতে হইবে?"

হানা ফার্গস্ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি তোমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হাজার দু'হাজার বার ও-কথা আমাকে বলিলেও আমি তাহা বিশ্বাস করিব না। তুমি তোমার নাজী বন্ধুদের সহযোগে তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছ—এবং তাহার মৃতদেহ সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—ইহাই সত্য কথা। এই অপরাধের জন্য তোমার ফাঁসি হইবে—ইহা তুমি জানিয়া রাখ। তুমি আশা করিও না—তোমার এই স্বদেশদ্রোহিতা, তোমার বিশ্বাসঘাতকতা আমি প্রকাশ করিতে না পারিলেও চিরদিন গোপন থাকিবে।"

হানার কথা শুনিয়া আমস্ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; কিন্তু তাহার সেই শুষ্ক হাস্যে আতঙ্ক পরিস্ফুট হইল।

হাসি বন্ধ করিয়া আমস্ বলিল, "তুমি ভাবিতেছ—তুমি যেমন তোমার নিরুদ্দিষ্ট ভাইয়ের সন্ধানে এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছ—সেইরূপ তোমার সন্ধানেও তোমার আত্মীয়-স্বজন বড়-দেশ হইতে এখানে আসিবে। কিন্তু তুমি স্থির জানিও, তাহারা এখানে আসিয়া কিছুই জানিতে পারিবে না। কারণ, কাপ্তেন ক্লষ্টারম্যান তোমাকে লইয়া জার্ম্মাণীতে যাত্রা করিবার সময় তোমার বোটখানিও সঙ্গে লইয়া বড়-দেশের কাছাকাছি গিয়া তাহা ছাড়িয়া দিবেন; তখন তাহা আরোহিহীন অবস্থায় সমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে। তোমার দেশের লোক তাহা দেখিয়া মনে করিবে—তুমি তোমার বোট হইতে কোন-রকমে সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়াছ। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা তাহারা কোন দিন জানিতে পারিবে না।"

অতঃপর আমস্ কাপ্তেন ক্লষ্টারম্যানকে বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমার বোটের খোরাক তাহাতে তুলিয়া দিয়া আসি।"

আমস্ কাপ্তেন-সহ হানাকে লইয়া সমুদ্রকূলে চলিয়া গেল, এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে কাপ্তেনের 'ইউ'-বোট তাহার গন্তব্য-পথে যাত্রা করিল। হানা ফার্গস্ বন্দিনী হইয়া তাহার সঙ্গে চলিল। হানা 'ইউ'-বোটে উঠিয়া, মুক্তিলাভের জন্য আর কোন চেষ্টা করিল না; কারণ, সে বুঝিতে পারিয়াছিল—তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। তাহারা প্রস্থান করিলে আমস্ তাহার পাকশালায় প্রত্যাগমন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া

মনে হইল, হানাকে জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সে প্রফুল্লতা ও উৎসাহ গোপন করিতে পারিল না।

আমস্ আমাদের সম্মুখে আসিয়া উভয় হস্ত পরস্পর ঘর্ষণ করিতে করিতে উৎসাহভরে বলিল, "দজ্জাল মাগীর সম্বন্ধে ঠিক ব্যবস্থাই করা হইয়াছে; আর সে আমাদিগকে বিরক্ত করিতে পারিবে না; তাহার ভয়ে আর আমাকে উৎকণ্ঠায় কাল কাটাইতে হইবে না।"

মেরী বলিল, "তাহা হইলেও তুমি অত নিশ্চিন্ত হইও না বাবা!"

আমস্ তাহার তামাকের কালো পাইপটা বাহির করিয়া তাহাতে তামাক ভরিতে ভরিতে বলিল, "নিশ্চিন্ত হইব না—তার মানে? সে চলিয়া গিয়াছে—তবে আর কাহাকে ভয়? আমি যে জার্ম্মাণ নাবিকটাকে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিয়াছি—তাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, তাহা যদি ঠিক জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার সকল দুশ্চিন্তার অবসান হইত: আমি সত্যই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতে পারিতাম।"

সেই নির্ব্বাসিত জার্ম্মাণ নাবিকের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল, আমস্ তাহা জানিতে না পারায় তাহার যে দুশ্চিন্তা হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা হ্রাস হইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে সেই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা সে ভুলিয়া গেল। নিজের কার্য্য-নৈপুণ্যে তাহার যে বিশ্বাস ছিল—সেই বিশ্বাস অবশেষে ফিরিয়া আসিল।

হানা ফার্গস জার্ম্মাণীতে প্রেরিত হইবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে এক দিন রাত্রিকালে আমসের 'ব্ল্যাক-গল ফার্ম্মে' এক জন জার্ম্মাণ আসিয়া পড়িলেন। আমস্ সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল—তিনি জার্ম্মাণ নৌবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীগণের অন্যতম। স্বদেশে তাঁহার পদ-গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অসাধারণ।

এই কর্ম্মচারী যখন আমাদের দ্বীপে অবতরণ করিলেন—সেই সময় আমি সাগর-বেলায় পাহারায় ছিলাম। তিনি আমার অদূরে 'ইউ'-বোটের একখানা ডিঙ্গী ভিড়াইয়া তাহা হইতে নামিয়া আসিলেন। যে 'ইউ'-বোটে তিনি আসিয়াছিলেন, তাহা আইরিস সাগর দিয়া উইলহেম্‌সাভেনে প্রত্যাগমন করিতেছিল; তাঁহাকে আমাদের দ্বীপে নামাইবার জন্যই সেখানে তাহা অল্প সময়ের জন্য থামিয়াছিল।

লোকটিকে আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। তাঁহার দেহ সুদীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ; আভিজাত্য-গৌরব তাঁহার চোখে-মুখে পরিস্ফুট। তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত তেজস্বী ও দাম্ভিক বলিয়াই আমার ধারণা হইল। দুই জন নাবিক তাঁহার ব্যবহার্য্য দ্রব্যপূর্ণ ব্যাগ লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। তিনি 'ইউ'-বোটের পরিচালক কাপ্তেন ভন স্কনারের সঙ্গে আমসের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

এই আগন্তুকটি কে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া এবং তাঁহার বাগাড়ম্বরে বিস্মিত হইয়া আমি একটু দূরে থাকিয়া সেই দলের অনুসরণ করিলাম। তাঁহারা সকলে আমসের পাকশালায় প্রবেশ করিলে আমি সকলের শেষে সেখানে উপস্থিত হইলাম।

মেরী সার্টের আস্তিন গুটাইয়া, টেবলের নিকট দাঁড়াইয়া আমাদের সান্ধ্য-ভোজনে ব্যবহৃত ডিস্‌গুলি ধুইতেছিল। আমস্ অগ্নি-কুণ্ডের অদূরে তাহার চেয়ারে বসিয়া ধূমপানের আয়োজন করিতেছিল। সে কাপ্তেন ভন স্কনারকে দেখিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাপ্তেন স্কনার পাকশালায় প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "গুড্ ইভ্‌নিং, ক্রোবি!"—তাহার পর তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ইনি জার্ম্মাণ নৌ-বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী—লেফ্‌টেনাণ্ট কাউণ্ট আগষ্ট জোলার্ণ। ইনি এখানকার কাজ-কর্ম্ম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখানকার কাজ শেষ করিয়া ইনি তিন দিন পরে জার্ম্মাণীতে ফিরিবেন, ইঁহাকে লইয়া-যাইবার জন্য একখানি 'ইউ'-বোট এখানে প্রেরিত হইবে।"

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া আমস্ কাউণ্টকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ললাট স্পর্শ করিল; এবং হাসিবার ভঙ্গিতে দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আনন্দিত হইলাম কাউণ্ট! আপনি এখানকার কাজ-কর্ম্ম পরিদর্শন করিয়া কোন কার্য্যের ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারিবেন না—এ বিষয়ে আমি আপনাকে—"

আমসের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাউণ্ট তাহাতে

বাধা দিয়া বলিলেন, "সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া আমি শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিব।"

কাউণ্ট জোলার্ণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার মনে হইল, এরূপ দম্ভপূর্ণ নীরস কণ্ঠস্বর আর কখন আমার কর্ণগোচর হয় নাই!—তিনি তৎক্ষণাৎ কাপ্তেন স্কুনারের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "স্কুনার, আমি আর অধিক কাল তোমাকে এখানে আটক করিয়া রাখিব না; আশা করি, তুমি নিরাপদে দেশে পৌঁছিতে পারিবে।"

ভন স্কুনার বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়!"

অতঃপর সে নাজী-প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জার্ম্মাণ নাবিকদ্বয়ের সহিত সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

কাপ্তেন স্কুনার প্রস্থান করিলে আমস্ তাহার চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া কাউণ্টকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তাহা হইলে আপনি এখানকার কাজ-কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেই আসিয়াছেন?"—সে পকেট হইতে পাইপটা বাহির করিয়া, তাহাতেই দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া বলিল, "শুনিলাম, আপনি জার্ম্মাণীর এক জন কাউণ্ট। জার্ম্মাণীর কাউণ্ট কিরূপ লোক, তাহা আমার ঠিক জানা নাই, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিব বলিয়া আশা হইতেছে। আর আমি যে কি রকম কাযের লোক, আশা করি, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া আপনিও তাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনাকে প্রথমেই জানাইয়া রাখিতেছি—যে সকল ফাঁকিদার, ফাজিল-চালাক লোক আপনি সর্ব্বদাই আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিতে পান—যদি আপনি আমাকে সেই প্রকৃতির একটা অসার—"

কাউণ্ট তাহার কথায় বাধা দিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, "থামো; আগে ওঠো, শীঘ্র উঠিয়া দাঁড়াও!"

কাউণ্ট জোলার্ণের এই আদেশ যেন চাবুকের মত আমসের পিঠে পড়িল! এরূপ উদ্ধত আদেশ আমস্ পূর্ব্বে কোন দিন কাহারও মুখে উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছিল কি না সন্দেহের বিষয়। কিন্তু কাউণ্টের এই কঠোর আদেশ শুনিয়া আমস্ এরূপ চমকাইয়া উঠিল যে, তাহার হাতের পাইপটা হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে মাটীতে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

কিন্তু আমস্ কাউণ্টের আদেশ পালন না করিয়া বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি বলিলে?"

কাউণ্ট বলিলেন, "আমার আদেশ,—শীঘ্র উঠিয়া দাঁড়াও!"

কাউণ্টের সুগম্ভীর দৃপ্ত কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমস্ মুসড়িয়া গেল; কিন্তু সে তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, "কেন? আমার অপরাধটা কি? ওঃ!"

কাউণ্ট জোলার্ণ ভ্রূভঙ্গি করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "তোমার বেয়াদপি আমি সহ্য করিব না। যতক্ষণ তুমি আমার সম্মুখে থাকিবে, ততক্ষণ তোমাকে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে; আমার আদেশ না পাইলে তুমি নিজের ইচ্ছায় আমার সম্মুখে বসিবে না।"

আমস্ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া বলিল, "ক্রীতদাসের মত?"

কাউণ্ট জোলার্ণ তাহার প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "তুমি ইহাও জানিয়া রাখ যে, যখন আমার সহিত তুমি কথা কহিবে, তখন আমার পদোচিত সম্মান বজায় রাখিয়া, তোমার যাহা বলিবার থাকে তাহা বলিবে। আমি যে কয় দিন এখানে থাকিব, সেই কয় দিন তোমার যেন স্মরণ থাকে, আমি জার্ম্মাণ নৌ-বিভাগের এক জন সম্মানভাজন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী; তাঁহার প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা সাধারণের কর্ত্তব্য, আমার প্রতি সেইরূপ সম্মান প্রদর্শনে তুমি কদাচ অবহেলা করিবে না।—আমার কথা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ?"

আমস্ অস্ফুট স্বরে বলিল, "বুঝিলাম মহাশয়!"

কাউণ্ট বলিলেন, "উত্তম। এখন আমার সঙ্গে চল—তোমার শূয়ারের খোঁয়াড়টা একবার দেখিয়া আসি।"

আমস্ বিস্মিত ভাবে বলিল, "শূয়ারের খোঁয়াড়? সে আবার কি?"

কাউণ্ট বলিলেন, "তুমি যেখানে বাস কর, সেই স্থানটাকেই শূয়ারের খোঁয়াড় বলিয়াছি। আমাকে কয়েক দিন এখানে থাকিতে হইবে; এজন্য আমাকে একটি ঘর বাছিয়া লইতে হইবে।"

আমস্ সদর্পে বলিল, "আমি যদি এখানে বাস করিতে

পারি, তাহা হইলে আপনারও বাসের অসুবিধা হইবে না। আমার বাড়ীতে এই ঘর ভিন্ন দোতালায় আরও দুইটি বাসের ঘর আছে। তাহাদের একটিতে আমি বাস করি, অন্য ঘরটি খালি পড়িয়া আছে। আপনাদেরই অন্য একখানা 'ইউ'-বোটের পরিচালক—লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন্ আমার কোন ইংরেজ অতিথিকে সেই কক্ষে গুলী করিয়া হত্যা করিবার পর হইতে কেহই সেই কক্ষে বাস করে না। আপনি মিষ্টার, আপনাদের সেই লেফ্‌টেনাণ্ট-টার কীর্ত্তির কথা কিছু শুনিয়াছেন কি? সে এখানে আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া খুব বীরত্ব ফলাইয়া গিয়াছিল!"

আমসের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ পরিস্ফুট হইল; তাহা লক্ষ্য করিয়া আমার আশঙ্কা হইল, উদ্ধত কাউণ্ট জোলার্ণের চাবুক হয় ত তখনই তাহার পিঠে পড়িবে!

কিন্তু তাহার সৌভাগ্যক্রমে কাউণ্ট জোলার্ণ তাহার বিদ্রূপ গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন, "হাঁ, সে কথা আমি শুনিয়াছি।"

আমস্ উৎসাহভরে বলিল, "হ্যাগেন্ বড়ই নোংরা কায করিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে আমার অস্বস্তির সীমা ছিল না। আমাকে বড়ই সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। হ্যাগেন্ যে সেই কক্ষে বাস করিতেছিল—ফার্গস্ তাহা জানিত না; কিন্তু সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ফার্গস্ তাহাকে দেখিতে পাইল, সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাগেনের রিভলবারের গুলী ছুটিল। সেই এক গুলীতেই ফার্গস্ দ্বারের কাছে পড়িয়া অক্কা লাভ করিল। কিন্তু যদি সে না মরিয়া কোন কৌশলে পলায়ন করিতে পারিত, তাহা হইলে এত দিন আমারও ইহলীলা সাঙ্গ হইত, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের আড্ডাও ইংরেজের তোপে উড়িয়া যাইত।—এ সকল কথা এখন থাক। আপনি আমার সঙ্গে দোতালায় যাইলে সেই ঘরটি আপনাকে দেখাইতে পারি।"

অতঃপর আমস্ একটা বাতি ধরাইয়া-লইয়া পাকশালা ত্যাগ করিল, এবং কাউণ্ট জোলার্ণকে সঙ্গে লইয়া কাঠের জীর্ণ সিঁড় দিয়া দোতালায় উঠিল। কাউণ্ট জোলার্ণ দোতালার কক্ষ পরীক্ষা করিয়া আমসের নিকট কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; তবে সেই কক্ষ দেখিয়া তিনি যে নিরাশ হইবেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না।

কিছু কাল পরে কাউণ্ট জোলার্ণ আমসের সহিত পাকশালার প্রত্যাগমন করিলেন। কাউণ্ট জোলার্ণ শয়ন-কক্ষ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম। তিনি আমসকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিলেন, "ঐ ঘরে কি মানুষ বাস করিতে পারে? ঐ নোংরা গর্ত্তে আমার কুকুরকে বাস করিতে দেওয়াও তাহার পক্ষে অপমান-জনক! কাল তুমি ঐ ঘরের ভিতর যত দূর সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে।"

আমস্ বলিল, "তা বেশ; আপনি যে ছেলেটিকে দেখিতেছেন, উহার নাম পিটার,—ও আপনার আদেশানুযায়ী সকল কায শেষ করিবে।"

কাউণ্ট জোলার্ণ গরম হইয়া বলিলেন, "না, ও করিবে না: আমার আদেশানুযায়ী ঐ কায তুমিই করিবে। তোমাকে স্বহস্তে উহা করিতে হইবে। ও-ঘর তুমি নিজেই ঐরূপ নোংরা করিয়া রাখিয়াছ; তোমার নিজের গলদ তুমিই সাফ্ করিবে।"

আমস্ সক্রোধে বলিল, "আমাকেই করিতে হইবে? আপনি কোন্ অধিকারে আমাকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন?"

কাউণ্ট রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আমি তোমার সহিত তর্ক করিতে চাহি না। এ কায তোমাকেই করিতে হইবে।"

আমস্ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "আমি স্বহস্তে ঝাঁটা ধরিয়া ঘরের মেঝে পরিষ্কার করিব এ আপনার অত্যন্ত অসঙ্গত অনুরোধ!"

কাউণ্ট বলিলেন, "অনুরোধ? না, আমি তোমাকে এ কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছি না, ইহা আমার আদেশ।"

আমস্ নির্ব্বাক্ ভাবে কাউণ্ট জোলার্ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রোধে অপমানে তাহার মুখ আরক্তিম হইল, এবং তাহার ভাল চোখ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসারিত হইতে লাগিল।

কাউণ্ট অতঃপর আমার ও মেরীর মুখের দিকে

চাহিয়া বলিলেন, "আমার জিনিসপত্রগুলি দোতালায় লইয়া গিয়া আমার ঘরে রাখিয়া দাও।"

আমস্ কাউণ্টের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না, উহারা এখন যাইতে পারিবে না। পিটারকে এখন সমুদ্র-কূলে যাইতে হইবে; কারণ, কোন 'ইউ'-বোট আসিলে তাহাকে আলো দেখাইয়া সাড়া দেওয়াই উহার প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনে কখনও অবহেলা করা হয় না মিষ্টার, এ কথা আপনি জানিয়া রাখুন।"

কাউণ্ট বলিলেন, "তুমি প্রত্যেক কর্ত্তব্য কি ভাবে পালন কর, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। তুমি কি ভাবে তোমার কর্ত্তব্যগুলি পালন করিয়া আসিতেছ, তাহা আমি সহজেই জানিতে পারিব। তুমিই এখন সমুদ্রতীরে গমন করিবে, এবং পিটার যতক্ষণ সেখানে যাইতে না পারে—ততক্ষণ সেখানে থাকিবে।"

আমস্ আপত্তির স্বরে বলিল, "কিন্তু আমি এখন—"

কাউণ্ট তাহার কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমি তোমার কোন আপত্তি শুনিতে চাহি না। এই মুহূর্ত্তেই তুমি সমুদ্র-কূলে যাও,—ওঠো!"—তিনি দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

আমস্ কাউণ্ট জোলার্ণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, এবং পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, লণ্ঠনটি হাতে লইয়া আপন মনে বক্-বক্ করিতে করিতে পাকশালা ত্যাগ করিল। তাহার অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়! [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বন্যা আনো

আমার রুদ্ধ হৃদয়-দুয়ারে—আঘাত হানো;
পাষাণ-কারার ভাঙিয়া আগল—বন্যা আনো।
কান্নায় কান্নায় উছলিত মোর পরাণ-মন,—
বাঁধনে জড়ায়ে—কাঁদিছে নীরবে অনুক্ষণ।
হৃদয়-দুয়ার অন্ধ হ'য়েছে—আঘাত হানো;
আলোর জোয়ারে ভেসে এসে তুমি—বন্যা আনো।

অনেক কথা ও অনেক গানের রুদ্ধ নদী;
স্রোত পাবে কোথা সাগরের ডাক না শোনে যদি?
অনেক রূপের বর্ণে-গন্ধে পরাণ মোর,
পরিপূর হ'য়ে ঘুমায়ে রয়েছে আবেশে ঘোর।
রুদ্ধ কথার ঘুম ভেঙে দিতে—আঘাত হানো;
সকল বাঁধন মুছে ফেলে দাও—বন্যা আনো।

অনেক আঘাত ব্যর্থ হ'য়েছে—আঘাত করি';
এতোটুকু তবু কাঁপেনি দ্বার ওঠেনি নড়ি'।
থির জীবনের করুণ হতাশা বেদনা মানি,
কেঁপেছে কেবল শঙ্কিত ভীরু হৃদয়খানি।
মম সাধনার প্রিয়তম তুমি—আঘাত হানো;
ব্যর্থ আঘাতে আঘাত হানিয়া—বন্যা আনো।

তোমার স্বপ্নে পূর্ণ আমার—সকল প্রাণ।
তোমার রূপের জ্যোতিতে জড়ানো কথা ও গান।
পৃথিবীর শত দুঃখ-বেদনা ভুলের মত—
ভুলে যাই আমি পরমানন্দে বিষাদ যত।
পাষাণ হৃদয়ে রুদ্ধ তটিনী—আঘাত হানো;
তোমার রূপের আলোক-ধারায়—বন্যা আনো।

শ্রীঅমরেশ দত্ত।



অবসাদ-জড়তায়

দেহ-মন সারাক্ষণ অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছে—কাজে উৎসাহ নাই, ইচ্ছা নাই, দেহ-মন যেন ঝিমাইয়া আছে—এমন অবস্থা ঘটিলে বুঝিবেন—কোষ্ঠবদ্ধতার ফল। কোষ্ঠ-বদ্ধতার ফলে মানবদেহ সর্ব্বরোগের নিগ্রহে-উপদ্রবে জর্জ্জরিত হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা-নিবারণের একমাত্র উপায়, ব্যায়ামে দেহযন্ত্রটিকে সচল ও সক্রিয় রাখা। ঘর-কন্নার কাজ করিলেই ব্যায়ামের ফল মিলিবে না। তাহা মিলিলে সুগৃহিণীদের দেহ আজ মেদে-মাংসে স্থূল বর্ত্তুল আকারে কদর্য্য বা অক্ষম হইত না!

আলস্যের ফলে যেমন কোষ্ঠবদ্ধতার উৎপত্তি হয়, তেমনি আবার ভালো-মন্দ না বাছিয়া নির্বিচারে যা-তা খাইলেও কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটে! কোন্ খাদ্য বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন—পর্য্যাপ্ত ফল ও তরী-তরকারী খাওয়া! কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য যাঁরা নানা উপসর্গ ভোগ করেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা আশী জনের ব্যাধি খাদ্য-নিয়ন্ত্রণে এবং ব্যায়ামে নিশ্চয় সারিবে!

চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়ানোর ভঙ্গী যদি সঠিক না হয়, তাহা হইলেও কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিবে। আমাদের দেহ-যন্ত্রটি এমন ভাবে গঠিত যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে যদি যথোচিত চালনা না করি, চলা-ফেরা না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকি, তাহা হইলে স্বাস্থ্য খারাপ হইবে এবং দেহের গঠন বিকৃত ও কদর্য্য হইবে। কাটারি, সাবল, হাতা, বেড়ি—এ-সব যদি ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখি, তাহা হইলে তাহাতে যেমন মরীচা ধরে, মোটর-গাড়ী না চালাইয়া যদি গেরাজে বন্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে তারা যেমন বিকল ও অচল হয়, তেমনি দেহ-যন্ত্রটিকে না খাটাইলে তাহাও মরীচা ধরিয়া বিকল-অচল হইবে!

কোষ্ঠবদ্ধতায় জোলাপ খাওয়া আর বিষ খাওয়া প্রায় একই কথা! সুস্থ অবস্থায় আমরা যে-খাদ্য গ্রহণ করি, তাহার সম্পূর্ণ পরিপাক ঘটিয়া তাহা হইতে আবর্জ্জনা-নিষ্কাশনে সময় লাগে ৩৬ হইতে ৪৮ ঘণ্টা। জোলাপ খাইলে পাকস্থলীর সূক্ষ্ম ঝিল্লীগুলি আহত হয়;—পীড়িত হয়। নিত্য জোলাপ-গ্রহণে পাকস্থলী অসুস্থ হইয়া পড়ে; এজন্য জোলাপ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ভাত-ডাল লুচি-রুটি যথেষ্ট খান, আপত্তি নাই; কিন্তু তার সঙ্গে নিয়ম করিয়া প্রত্যহ প্রচুর ফল ও তরী-তরকারী খাইবেন। তাহা হইলে কোষ্ঠবদ্ধতায় কোনো কালে ভুগিতে হইবে না!

কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণতা এবং অগ্নিমান্দ্য; এবং তার ফলে শরীর সর্ব্ব-ব্যাধির লীলাভূমি হইয়া সাংঘাতিক পরিণাম ঘটিতে বিলম্ব হইবে না। মেয়েদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, সংসারের দু'চারিটা কাজ করিলেই ব্যায়াম-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল! এ বিশ্বাস ভিত্তি-হীন। ব্যায়ামের অর্থ, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পরিচালনা। আহার এবং ব্যায়াম-বিধি পালন করিয়া চলুন, কোষ্ঠবদ্ধতা বা অজীর্ণতা-হেতু অসুস্থতা ঘটিবে না—দেহ মেদে-মাংসে ভরিয়া কদর্য্য বা দেহের গঠন বিকৃত হইবে না!

কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অজীর্ণতায় মানুষের মেজাজ বিগড়াইয়া যায়, নিদ্রা হয় না, দেহ-মন অবসাদে ভরিয়া থাকে। পেট ভরিয়া খাওয়া-দাওয়া করিব অথচ ব্যায়াম করিব না,—ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অজীর্ণতাকে বরণ করা অনিবার্য্য!

সকালে-সন্ধ্যায় খানিকটা বেড়াইয়া আসা ভালো। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত—সকল সময়ে বেড়ানোর অভ্যাস রাখিলে জোলাপ লইবার কোনো প্রয়োজন জীবনে হইবে না।

আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে নানা কারণে নিত্য-দিন সকালে-সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হওয়া হয় তো সম্ভব হইবে না। বেড়াইতে যাওয়ার সুবিধা যাঁদের

নাই, তাঁরা নিত্য-দিন প্রাতে উঠিয়া খোলা বাতাসে গভীর-ভাবে শ্বাস গ্রহণ করিবেন। তাহাতে অজীর্ণতার

১। চিৎ হইয়া শোওয়া

প্রতিকার হইবে। এই সঙ্গে কয়েকটি সহজ ব্যায়াম-বিধি পালন করা কর্ত্তব্য।

১। মেঝেয় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন (১নং ছবি)। তার পর চট্ করিয়া উঠিয়া বসুন; বসিয়া দু'হাতে দুই হাঁটু



২। হাঁটু ধরুন

(২নং ছবির ভঙ্গীতে) ধরুন। দু' হাঁটু ধরিয়া তখনি মেঝেয় চিৎ হইয়া শুইয়া ডাহিনে-বাঁয়ে গড়াগড়ি দিন। আট-দশ বার গড়াগড়ি দিবেন; গড়াগড়ি দিয়া আবার উঠিয়া বসুন। গড়াগড়ি দিবার সময় এবং বসিবার সময় হাঁটু ধরিয়া থাকিবেন, কদাচ ছাড়িবেন না।

২। এবার উঠিয়া দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকুন। দুই হাত পিছনে ৩নং ছবির ভঙ্গীতে মুষ্টিবদ্ধ থাকিবে। এইভাবে দাঁড়াইয়া ডান দিকে দেহ বাঁকাইয়া চার বার দেহখানিকে ঘুরাইতে হইবে, তার পর বাঁ-দিকে



৩। দু'হাতে মুঠি

চার বার। এ ব্যায়ামে লিভারের ক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে।

৩। এবার মাথার উপর দুই দিকে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়ান। যতখানি উর্দ্ধে তোলা সম্ভব, দুই হাত তুলিবেন। তার পর দুই পা প্রসারিত করিয়া ৪নং ছবির মতো দুই হাত এক করিয়া পায়ের ফাঁক দিয়া পিছন-দিকে দু'হাত প্রসারিত করিয়া দিন। যতক্ষণ পারেন, এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, এবং জোরে-জোরে নিশ্বাস লইবেন। ঝুঁকিয়া পায়ের ফাঁক দিয়া পিছন-দিকে হাত প্রসারিত করিবার সময় শ্বাস ত্যাগ করিবেন। ছ'বার এ ব্যায়াম করা চাই।

৪। এবার ৫নং ছবির মতো ডান পায়ে



৪। দুই হাত এক করিয়া

দাঁড়াইয়া হাঁটুর কাছ দুমড়াইয়া ডান পা তুলুন। ডান পা তুলিতে হইবে বুকের কাছ পর্য্যন্ত। দুই হাত প্রসারিত থাকিবে। এবার লাফ দিয়া ডান পায়ে দাঁড়াইয়া বাঁ পা তুলুন বুকের কাছ পর্য্যন্ত! প্রথমে মৃদু তালে ছয় বার লাফ দিবেন; তার পর দ্রুত তালে লাফ দিতে হইবে। বিশ বার পঁচিশ বার এইরূপ লম্ফ-লীলা করা চাই। এ-ব্যায়ামে দেহের গঠন ভালো থাকিবে; মেদ-মাংস জমিয়া জঘন-দেশ ভারী হইবে না।

৫। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া যত জোরে পারেন,



৫। হাঁটু দুমড়াইয়া

নিশ্বাস গ্রহণ করুন। পরিপূর্ণ নিশ্বাস গ্রহণ করিবেন; করিয়া তার পর তাহা ত্যাগ করুন। এ শ্বাস-ব্যায়ামে তলপেটের পেশী সুস্থ থাকিবে এবং কোষ্ঠবদ্ধতার আশঙ্কা এতটুকু থাকিবে না!

জানিয়া রাখুন

অনেক সময় না জানিয়া আমরা এমন কতকগুলি কদভ্যাসের দাস করি যে, তার ফলে শ্রী-সৌন্দর্য্য

মাটী হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া মুখের শ্রী-সৌন্দর্য্য এ কদভ্যাসের ফলে ঝরিয়া যায়। না জানিয়া মুখে-চোখে এমন ভঙ্গী আমরা প্রকটিত করিয়া তুলি, আয়নায় সে-ভঙ্গী দেখিলে নিশ্চয় শিহরিয়া উঠিব! এমন কয়েকটি কদভ্যাসের কথা আজ বলিতেছি। যদি মুখশ্রী অটুট রাখিতে চান, তাহা হইলে প্রাণপণে এ-সব কদভ্যাস ত্যাগ করিবেন।

সেলাই করিতে করিতে হাতের কাছে কাঁচি না থাকিলে অনেকে দাঁত দিয়া সেলাইয়ের সুতা কাটিয়া ফেলেন। এটি দারুণ কদভ্যাস। দাঁত দিয়া সুতা কাটিবার সময় কপালে কোঁচ পড়ে। নিত্য-দিন এ অভ্যাসের ফলে কোঁচ পড়িয়া কপালে অকাল-বার্দ্ধক্যের রেখা ঘনীভূত হইয়া মুখশ্রী মলিন করিয়া দেয়। তার উপর দাঁতে সুতা কাটার দরুণ দাঁতের অস্বাস্থ্য ঘটে মনে রাখিবেন।

তার পর সংসারের কাজকর্ম্মে সারাদিন দারুণ ব্যস্ত আছি, কেহ হয় তো আসিলেন—তাড়াতাড়ি তখন মাথার অবিন্যস্ত কেশগুলাতে চিরুণী লাগাইয়া আঁচড়াইয়া লই। এভাবে চিরুণী-চালনার সময় মাথার উপর এতটুকু মায়া-দয়া থাকে না! এ যেন মাথায় চিরুণী চালানো নয়, ঝোপে-ঝাপে কোদাল টানা! এমন করিয়া মাথায় চিরুণী চালাইলে চুলের গোড়ায় বেশ আঘাত লাগে; তার ফলে চুল উঠিয়া মাথায় টাক পড়ে! মাথা-আঁচড়ানোর কাজে ধৈর্য্য এবং যত্ন চাই। মাথার কেশ এতটুকু অযত্ন সহিতে পারে না, এ কথা মনে রাখিবেন।

মুখে পাউডার মাখিবার সময় অনেকে মুখ-চোখ নানা ভাবে বিকৃত করেন; তাহাতে মুখ-চোখের গড়ন বিকৃত হয়।

অনেকের আবার কেমন বদ স্বভাব, যখন-তখন আঙুল দিয়া নাকের ডগা চাপিয়া থাকেন। এ কদভ্যাসে নাকের ডগা থ্যাব্ড়াইয়া যায়। অলক্ষ্য এই সব মুখভঙ্গীর জন্য গালে-মুখে কোঁচ পড়িয়া মুখের সৌন্দর্য্য-হানি ঘটে।

হাতে টাইট চুড়ি-বালা আঁটিলে কি বিপত্তি ঘটে, জানেন? হাতে ব্যথা বাজিলে সে চুড়ি-বালা টানাটানি করিতে হয়। তখন ঠোঁট ফোলে, মুখ বিকৃত হয়। এজন্য ঠোঁট ঝুলিয়া পড়ে, ঠোঁট পুরু হয়; এবং আরো নানা ভাবে ঠোঁটের গড়ন বদলাইয়া বিকৃত হইয়া যায়। টাইট জামা-জুতা বা গহনা কদাচ পরিবেন না। দারুণ ভাবে কষিয়া কোমরে গ্রন্থি দিয়া কদাচ শাড়ী-বডিশ্ বা কোট-প্যাণ্ট পরিবেন না। চলিতে-ফিরিতে বসিতে-দাঁড়াইতে দেহের কোথাও যদি চাড় পড়ে বা ব্যথা বাজে, তাহা হইলে দেহের গঠনে বিকৃতি ঘটিবে এবং দেহশ্রী ক্ষুণ্ণ হইবে, জানিবেন।

নখ খাওয়া, চোখ মিটমিট করা—এগুলা দেখিতে শুধু অশোভন বা কদর্য্য নয়, এ সব কদভ্যাসে সৌন্দর্য্যশ্রী রীতিমত আহত হয়। যদি চান সৌন্দর্য্যশ্রী মলিন হইবে না, তাহা হইলে দেহকে সর্ব্বদা সহজ ও স্বচ্ছন্দ রাখিতে হইবে!

বৈপরীত্য

হারালে একটি তারা কিবা তায় ক্ষতি?
ক্ষণেক না হবে ম্লান জগতের জ্যোতি।
শুকালে একটি তৃণ, উষরের শ্বাস
কভু নাহি করে ক্ষীণ শ্যামল সুহাস!

একটি বিহগ মূক যদি রয় ভ্রমে—
প্রভাতের কোলাহল কিছু তায় কমে?
আনে শুধু মানবের চির-দুখ ডাকি'—
লুকানো অতীতে এক জীবনের ফাঁকি!

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়



কয়লা-শিল্পের সঙ্কট

পাথুরিয়া কয়লা একটি মূল উপাদান। গৃহস্থের রন্ধনশালা হইতে বিশ্বকর্ম্মার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মশালায় ইহার প্রয়োজন যেমন অধিক, সেইরূপ অপরিহার্য্য। এই উপাদান ব্যতীত বহু শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন অসম্ভব। বাষ্পীয়যন্ত্র, বাষ্পীয়পোত ও বাষ্পীয়যান পরিচালনার মূল উপাদান পাথুরিয়া কয়লা। আলকাতরা এবং সহরাঞ্চলে যে গ্যাসের আলো জ্বলে, তাহাদেরও মূলে এই উপাদান। পাথুরিয়া কয়লা কল-কারখানার প্রাণ-স্বরূপ।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ফলে ভারতে বহু শিল্পের প্রসার, এবং চীনে রপ্তানী বৃদ্ধি হেতু পাথুরিয়া কয়লার উৎপাদন বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন ঘটিয়াছিল, গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে—২৮,৩৪৭,৯০৭ টন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের উৎপাদন অপেক্ষা ৩৩ মিলিয়ন (নিযুত) টন অধিক। গত বৎসরের উৎপাদন অঙ্ক —২৭,৬৬২,৭৮৮ টন, এবং বর্ত্তমান ইংরেজী বর্ষের প্রথম ছয় মাসের আনুমানিক উৎপাদন—১৪,০০০,০০০ টন।

পাথুরিয়া কয়লার স্বাভাবিক চাহিদা ২৩ মিলিয়ন টন। সুতরাং গত তিন বৎসর চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন হইয়াছে অনেক অধিক। আর্থিক হিসাবে ইহার ফল হইয়াছে মূল্য-সঙ্কোচ। নিম্নে গত বিংশতি বর্ষের উৎপাদন ব্যয়, রপ্তানী, আমদানী এবং খনি-খাতমুখের গড়-মূল্যের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল,—

সাল	সমগ্র ভারতের উৎপাদন (হাজার টন)	ব্যয় সরবরাহ (হাজার টন)	খনি-খাতমুখে টন প্রতি গড় মূল্য	ভারতীয় কয়লার বৈদেশিক রপ্তানী (হাজার টন)	বৈদেশিক কয়লার ভারতে আমদানী (হাজার টন)
১৯১৯	২২,৬২৮	২২,১১৯	৪৷০	৫০৮	৪৮
১৯২০	১৭,৯৬২	১৬,৭৩৭	৫৵০	১,২২৪	৩৯
১৯২১	১৯,৩০২	১৯,০২৭	৬৸০	২৭৫	১,০০০
১৯২২	১৯,০১০	১৮,৯৫৩	৭৷৵০	৭৭	১,২২০
১৯২৩	১৯,৬১৬	১৯,৫২০	৭৷৶০	১৩৬	৬২৪
১৯২৪	২১,১৭৪	২০,৯৬৭	৭/০	২০৬	৪৬৩
১৯২৫	২০,৯০৪	২০ ৬৮৮	৬/০	২১৬	৪৮৩
১৯২৬	২০,৯৯৯	২০,৩০১	৪৸/০	৬১৭	১৯৩
১৯২৭	২২,০৮২	২১,৫০৬	৪৷/০	৫৭৬	২৪৩
১৯২৮	২২,৫৪২	২১ ৯১৬	৩৸৶০	৬২৬	২১০
১৯২৯	২৩,৪১৮	২২,৬৯২	৩৸/০	৭২৬	২১৮
১৯৩০	২৩,৮০৩	২৩ ৩৪১	৩৸৵০	৮৬১	২১৭
১৯৩১	২১,৭০৬	২১,২৭৫	৩৸/০	৪৪১	৮৮
১৯৩২	২০,১৫৩	১৯ ৬৩৩	৩৷৵০	৫১৯	৪৭
১৯৩৩	১৯,৭৮৯	১৯,৩০২	৩৵০	৪২৬	৬৭
১৯৩৪	২২,০৫৭	২১,৭২৭	২৸৵০	৩৩০	৭২
১৯৩৫	২৩,০১৬	২২,৭৯৯	২৸/০	২১৭	৭৭
১৯৩৬	২২,৬১০	২১ ৯৩৯	২৸০	৬৭১	২৮
১৯৩৭	২৫,০৩৬	২৪,০৪৩	৩৵০	৯৯২	৬১
১৯৩৮	২৮,৩৪২	২৬,৯৯৯	৩৸০	১,৩৪৩	৪৬

কেহ কেহ এই উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধিকে শিল্পের সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া স্বীকার করেন না। অবশ্য, এই সকল ব্যক্তি উৎপাদক-শ্রেণীভুক্ত। তাঁহাদের অভিযোগ এই যে, যদিও বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের প্রারম্ভ কাল হইতে, যুদ্ধানুসঙ্গিক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও, যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হেতু, পাথুরিয়া কয়লার চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি ইহার মূল্য তদনুপাতে বর্দ্ধিত হয় নাই। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে, এই বর্দ্ধিত চাহিদা কয়লার মূল্য হ্রাস হইতে দেয় নাই মাত্র; তদপেক্ষা অধিক কিছুই করে নাই।

উৎপাদকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্ত্তমান মূল্য-হার আদৌ লাভজনক নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই-চারি আনা মূল্য-বৃদ্ধিকে বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করা যায় না; কারণ, কয়েকটি অতি আধুনিক আইনের ফলে, শ্রমিক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধি এবং কয়লার খনির নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার ও সাজ-সরঞ্জামের দ্রুত মূল্য-বৃদ্ধি হেতু উৎপাদনের ব্যয় কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, কয়লা-শিল্পের যে স্বাভাবিক মন্দা, তাহা চাহিদা-বৃদ্ধি সত্ত্বেও, সমভাবে অব্যাহত রহিয়াছে।

এবম্বিধ অবস্থার হেতু এই যে, ভারতের বর্ত্তমান সম্ভাব্য উৎপাদন শক্তি, সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন, ২৮ মিলিয়ন টন অপেক্ষা অনেক অধিক এবং ৩৩।৩৪ মিলিয়ন টনের নিকটবর্ত্তী। আশঙ্কা এই যে, যুদ্ধের অবসানের পরে, নিয়মাতিরিক্ত চাহিদা-বৃদ্ধি ঘটিলেও, বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে—১৯১৯ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যেরূপ মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, সেরূপ মূল্যবৃদ্ধি সম্ভব হইবে না। সাময়িক ক্ষণস্থায়ী মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে; কিন্তু এইরূপ তেজী অবস্থার অদূর পশ্চাতে যে অবশ্যম্ভাবী মূল্য-হ্রাসরূপ প্রতিক্রিয়া আসিবে, তাহার ফল শিল্পের পক্ষে সমূহ ক্ষতিজনক হইবে।

উপরোদ্ধৃত তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, কয়লার সমগ্র ভারত-গড়-মূল্য নিম্নমুখী হইয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে টনপ্রতি সর্ব্বনিম্ন মূল্য ২৸০ আনায় পৌছিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে, যখন কয়লার চাহিদা কয়লা ব্যবসায়ের ইতিহাসের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, তখন প্রতি টনের গড়-মূল্য হইয়াছিল মাত্র ৩৸০ আনা। এই মূল্য যে

কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা এই শিল্পের সহিত যাঁহার সামান্য মাত্রও সংস্রব আছে, অতি সহজেই তাঁহার বোধগম্য হইবে।

খনি হইতে কয়লার উত্তোলন আর পূর্ব্বের ন্যায় সহজ-সাধ্য নহে। নব নব বিধি-ব্যবস্থার ফলে এবং শ্রমিকদিগের মজুরী বৃদ্ধিহেতু উৎপাদনের ব্যয় ক্রম-বর্দ্ধমান হইয়াছে। অন্যপক্ষে, গত এবং বর্ত্তমান বর্ষের গড়-মূল্য এখনও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের গড়-মূল্য অপেক্ষা কম। সুতরাং শিল্পের পরিস্থিতি পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের কয়লার মূল্য, পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনি, সর্ব্বাপেক্ষা কম। এইরূপ মূল্যাবনতি শিল্পের পক্ষে অনিষ্টকর; কারণ, মূল্যের অনুপাতে উৎপাদনের ব্যয় লঘু করিয়া খনির মালিকগণ আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে বাধ্য। ফলে যেরূপ সতর্কতা এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে কয়লার অপচয় ঘটে না, সেরূপ যত্ন ও চেষ্টার অভাব অপরিহার্য্য হয়। কয়লার উৎস অনন্ত নহে, সুতরাং প্রত্যেক ব্যবহারোপযোগী কয়লা-খণ্ডকে রক্ষা করিবার আন্তরিক চেষ্টার প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, এই কয়লার সরবরাহের উপর শিল্পের জীবন নির্ভর করিতেছে।

খনি-মালিকের ব্যয়-সঙ্কোচ প্রচেষ্টার ফলে শ্রমিক ও কর্ম্মচারী-দিগের আয়ের স্বল্পতা ঘটে; কর্ম্মীদিগের নিরাপত্তার নিমিত্ত যে সকল উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহারও ব্যত্যয় ঘটে; ভাবী বিপদ নিবারণ করিবার নিমিত্ত ব্যয়সাধ্য কোন প্রতিকার সম্ভব হয় না; খনির উন্নতি প্রতিহত হয়, এবং সম্পদ ও সম্পত্তির ভবিষ্যৎ ক্ষুণ্ণ হয়। উচ্চ শ্রেণীর কয়লা উত্তোলন করিয়া, অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্য লাভ করিবার আশায়, নিম্ন শ্রেণীর কয়লার প্রতি উপযুক্ত মনোযোগের অভাবে নিকৃষ্ট, অথচ কোন না কোন প্রকারে ব্যবহারোপযোগী, কয়লার অত্যধিক অপচয় ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে রাজকর প্রদানের ব্যাঘাত ঘটে, এবং অন্যান্য দায়িত্বের অযথা বিলম্বিত নির্ব্বাহ, অথবা আংশিক, কিংবা সম্পূর্ণ, প্রত্যাখ্যানের ফলে, মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এবং স্থলবিশেষে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। মূলধন আকৃষ্ট করিবার পথেও বিঘ্ন ঘটে।

এই সকল বাধা-বিপত্তি দূর করিবার নিমিত্ত কয়লা-শিল্প সংশ্লিষ্ট সমিতি সকল আইন দ্বারা উৎপাদন হ্রাস করিয়া মূল্যের হার উচ্চ রাখিবার জন্য একাধিক বার সরকারে প্রার্থনা জানাইয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। শাসন-তন্ত্র কোন বিশিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী হইয়া ক্রেতা ও কয়লার প্রতি নির্ভরশীল শিল্পের অসুবিধার প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

কয়লার খনির মালিকদিগের অভিযোগ এই যে, ভারতে কয়লার মূল্য অন্যান্য দেশের মূল্যের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। এরূপ মূল্য-পার্থক্য স্বাভাবিক; কারণ, ভারত রত্ন-প্রসূ হইলেও, মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা, শ্রেণী-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নিঃস্ব। অন্যান্য দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন—তাহাদের তুলনায় ভারতের শিল্প সমূহ অদ্যাপিও শৈশবের ভূমিকায় আপনাদের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টামাত্রে রত। সুতরাং গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, জাপান ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল বিধি-নিষেধের প্রয়োগ ও প্রবর্ত্তন সমীচীন ও সম্ভব, আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে তাহা সম্ভব নয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নিকৃষ্ট অবস্থাও এখন বিদ্যমান নাই; সুতরাং মুষ্টিমেয় ধনিক ও শ্রমিকের নিমিত্ত শাসন-প্রণালী শত সহস্র ক্রেতাও উদ্যমশীল অনুন্নত শিল্পের ক্ষীণ অভ্যুদয়ের পথে নূতন বিঘ্ন উপস্থাপিত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ও বিহারের প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র কর্ত্তৃক এই প্রচেষ্টা সমর্থিত হইয়াছিল—তাহাদের আয়-সঙ্কোচের প্রতিবিধান হেতু। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তির বিবেচ্য বিষয় প্রাদেশিক পরি-বেষ্টনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নহে,—তাঁহাদের দৃষ্টি স্বভাবতঃই সুদূর-প্রসারিত।

শিল্পের উদ্দেশ্য কি? দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন। দেশের উন্নতি দেশবাসীর অর্থ ও সামর্থ্যের প্রতি নির্ভরশীল। সুতরাং "দশের" উন্নতিই আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূলসূত্র। বহু জনের হিতসাধনের জন্য যদি সংখ্যাল্পের ক্ষতিও হয়, সে ক্ষতি সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয়।

কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে মূল্যবৃদ্ধি ব্যতীতও শিল্পের উন্নতি সম্ভব; এবং সেই সম্ভাবনা খনির স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকবর্গের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত। প্রথমতঃ, মূল নীতি ও রীতির ঐক্য; দ্বিতীয়তঃ, কার্য্য-প্রণালীর শৃঙ্খলা; তৃতীয়তঃ, অযথা অপচয় নিবারণ; চতুর্থতঃ, অনুসন্ধান এবং অনুশীলন দ্বারা কয়লার বিস্তৃত ভাবে নব-নব ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবন; পঞ্চমতঃ, বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত এবং সর্ব্বশেষে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ও অধঃস্তন শ্রমিকের অপরিসীম বৈষম্যের ন্যায়ানুগত সামঞ্জস্য সংসাধন।

কয়লা-শিল্পে, বর্ত্তমানে, তিনটি প্রভাব ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আছে—ভারতীয় খনিজ সমিতি, (Indian Mining Association) ভারতীয় খনিজ সমবায় (Indian Mining Federation) এবং ভারতীয় খনি-মালিক সমিতি (Indian Colliary Owners' Association)। প্রথমোক্তটি মুখ্যতঃ শ্বেতাঙ্গ সঙ্ঘ। এই ত্রিধর্ম্মান্বিত সমিতিত্রয়ের মূল ও মুখ্য নীতি ও রীতি ত্রিধা বিভক্ত। এই ত্রি-সমিতির অভিসন্ধি, অর্থাৎ উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় ও উপায় অভিন্ন-মুখী হওয়া প্রয়োজন। বর্ণধর্ম্ম বিভিন্নতা প্রযুক্ত কিছু কিছু স্বার্থ-সজ্ঘর্ষ অনিবার্য্য; কিন্তু তাহাতে মূল নীতি ও রীতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব নহে।

মূল নীতি ও রীতির ঐক্য সংস্থাপিত হইলে কয়লা-শিল্পে শৃঙ্খলার বিধান (organisation) সহজসাধ্য হইবে। সকলে একযোগে কার্য্য করিলে, উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ, স্থিতিশীল মূল্যমান নির্দ্ধারণ এবং বিক্রয় ব্যবস্থা অচিরেই অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

গুণ ও মূল্যানুযায়ী উৎপাদন ও সরবরাহ-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে অন্যায় প্রতিযোগিতা-সম্ভূত বিদ্বেষ-বহ্নি অচিরাৎ নির্ব্বাপিত হইবে, এবং অসমঞ্জস সুযোগ লাভ হেতু এই অমূল্য মূল উপাদানের অযথা অপচয় নিবারিত হইবে। অপচয় করিলে অভাব অনিবার্য্য। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের এই ভূগর্ভস্থ সম্পদ্ পর্য্যাপ্ত,—অপর্য্যাপ্ত নহে। অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের এই বিশিষ্ট সম্পদ্ নিঃশেষিত হইয়া যাইতে পারে।

অপচয় নিবারণকল্পে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের কয়লা-উদ্ধারণ সমিতির (Coal Mining Committee) সুপারিশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র কতকগুলি আবশ্যকীয় বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। খনির অভ্যন্তরে কয়লা সাজাইবার এবং শ্রমিকদিগের বিপদ্-আপদ্ নিবারণ করিবার সুসঙ্গত বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

একটি সজ্জীকরণ বৈঠকেরও (Stowing Board) সৃষ্টি হইয়াছে। কয়লার নূতন নূতন ব্যবহারের উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন-কল্পেও সরকার যত্নশীল হইয়াছেন। যুদ্ধবশতঃ পরিস্থিতি উদ্বুদ্ধ চৈতন্য-বশতঃ দিন দিন নানা শিল্পের সংস্কার ও সম্প্রসারণ সংঘটিত হই-তেছে এবং ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা-মূলক সুক্ষ্মানুসন্ধান প্রতিষ্ঠানের (Board of Scientific and Industrial Research) আবির্ভাব অত্যন্ত অনুকূল ও আশাপ্রদ। কয়লাশিল্পের নির্ব্বন্ধশীল অত্যাবশ্যক দাবী এই যে,—ভারতীয় কয়লাকে ইন্ধনোপযোগী করিবার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা (A comprehensive scheme of fuel research)। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় বৈঠকের গবেষণা-মূলক অনুসন্ধান অনুশীলনের ফলে যদি ভারতীয় কয়লাকে ইন্ধন (fuel)-রূপে অধিকতর ব্যবহারোপযোগী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কয়লা-শিল্পের একটি মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে। এই প্রচেষ্টার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সরকার যে প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পরিপুষ্টি কয়লা-শিল্পের উক্ত সমিতিত্রয়ের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে। স্বল্প তাপে অঙ্গারীকরণ (Low-temparature carbonisation) এবং দ্রবীকরণ (Hydrogenation) হেতু বিশেষ গবেষণামূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রকার অপচয় নিবারণ পূর্ব্বক, উৎকর্ষের অপকর্ষ সাধন না করিয়া কয়লা-শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ নিয়ন্ত্রণই (Rationalisation) ইহার মুক্তির একমাত্র উপায়।

আইনের নিগড়ে উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিলে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফল কখনই স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না। বরং এই প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া কুফল প্রসব করে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার আইন প্রণয়নে অসম্মতি জানাইয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা সমীচীন। সরকারের আশঙ্কা ছিল, আইনের দ্বারা উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিলে, খনির মালিকগণ অপচয় নিবারণে সচেষ্ট নাও হইতে পারেন, এবং শিল্পের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উপস্থিত লাভের লোভও সম্বরণ করিতে অসমর্থ অথবা অনিচ্ছুক হইতে পারেন। এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে।

সুতরাং রাজদ্বারে আইনের প্রার্থী না হইয়া খনির মালিকগণ, অর্থাৎ সমিতিত্রয় যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শিল্পের সমুন্নয়নকল্পে একাভিসন্ধিতে সমবেত শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেই সঙ্কটের অবসান হয়। আমরা যে তালিকা দিয়াছি, তাহা লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হইবে যে, কয়লার উৎপাদন ও প্রয়োজন প্রায় তুল্য; সুতরাং সমিতিত্রয় একযোগে যদি বর্ণ ও ধর্ম্ম-বৈষম্য বিস্মৃত হইয়া অসঙ্কোচে অপচয়-বর্জ্জিত উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলেই মূল্য-মানের স্থৈর্য্য সম্পাদন সহজ হইতে পারে; এজন্য সরকারী সাহায্য নিষ্প্রয়োজন।

কয়লা-খনি-মালিকগণের এক গুরু অভিযোগ এই যে, রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধা লক্ষ্য করা দূরে থাক, নিজেদের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে স্ব স্ব খনি হইতে সুলভে কয়লা নিষ্কাষণ করিয়া ভারতের কয়লা ব্যবসায়কে পঙ্গু ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছেন। আমরা এই অভিযোগের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যদি কোন গৃহস্থ নিজের প্রয়োজনের নিমিত্ত গৃহপ্রাঙ্গণে শাক-সব্জী উৎপন্ন করিয়া হাটবাজার হইতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় না করে, অথবা বাজার হইতে মৎস্য ক্রয় না করিয়া গৃহ-সন্নিধানে পুষ্করিণী খনন করাইয়া সাংসারিক প্রয়োজনের নিমিত্ত মৎস্যের চাষ করে, তাহা হইলে শাক-সব্জী অথবা মৎস্য-ব্যবসায়ীর সেই গৃহস্থের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ থাকিতে পারে? রেলওয়ে খনি হইতে ২-৫ মিলিয়ন টন পরিমাণে কয়লা উদ্ধৃত হয় মাত্র। রেলওয়েই কয়লার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রেতা। তাহারা এখনও ভারতোৎপন্ন কয়লার শতকরা ত্রিশ ভাগেরও অধিক কয়লা খরিদ করে। রেলওয়ের নিকট কয়লা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত খনির মালিকদিগের মধ্যে মূল্য সম্বন্ধে আত্মঘাতী নীতি অনুসৃত হয়। অধিক পরিমাণে মাল সরবরাহ করিবার লোভে, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, ক্রম-নিম্ন (sliding scale) অথবা সর্ব্বনিম্ন হারে দর দিয়া তাঁহারা চুক্তি (order) সংগ্রহ করেন। এ দোষ কাহার?

রেলওয়ে সম্বন্ধে খনির মালিকদের আর একটি অভিযোগ এই যে, গত দুই বৎসর রেলপথের আয় অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও রেল-কর্ত্তৃপক্ষ খনি-মালিকদিগের তীব্র আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কয়লার চালানের উপর অতিরিক্ত মাশুল শতকরা সাড়ে বারো হইতে পনেরো ভাগ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ অভিযোগ সমীচীন, এবং ইহার প্রতিকার প্রয়োজন। এক জন সুপ্রসিদ্ধ খনি-মালিক সম্প্রতি প্রস্তাব করিয়া-ছেন যে, বর্ত্তমান সমিতিত্রয়ের একযোগে একটি যৌথ-প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা কর্ত্তব্য। এই প্রতিষ্ঠান ভারতোৎপন্ন সমুদায় কয়লা ক্রয় করিয়া লইবে, এবং চাহিদা অনুযায়ী একটি যুক্তিসঙ্গত হারে সকল ক্রেতার নিকট ঐ প্রতিষ্ঠান-নিযুক্ত বিক্রেতার দ্বারা কয়লা বিক্রয় করিবে। তাহা হইলে তাঁহারা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনও সহজে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন। আকস্মিক অতিরিক্ত চাহিদার নিমিত্ত কিছু উদ্বৃত্ত মাল রাখিবারও ব্যবস্থা হইবে।

খনির মালিকদিগের স্বার্থের দিক হইতে এ প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বেচারা ক্রেতাদের পক্ষে এই একচেটিয়া আধিপত্য কিরূপ ফল প্রদান করিবে, তাহাও বিবেচ্য।

সমস্ত উৎপন্ন মাল ক্রয় করিবার নিমিত্ত যদি খনি-মালিকগণ ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলে আপোষে একযোগে ঐক্যাবলম্বন পূর্ব্বক অপচয়হীন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধা কি? বরং সেই প্রচেষ্টা সহজ ও সুলভ হইবে।

শিল্প-বাণিজ্য সাহায্যে অর্থ-সামর্থ্য এবং অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান দ্বারা উন্নতি ব্যতীত স্বরাজ নাই। সঙ্কীর্ণ স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত সুবিধা পরিহার পূর্ব্বক যাহাতে সমষ্টিগত স্বার্থ পুষ্ট ও সম্যকরূপে সংরক্ষিত হয়, তৎপ্রতি ধনিক ও শ্রমিক উভয়েরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।



গল্পদাদুর বৈঠক

এ দিন বৈঠক বসিতেই ছেলে-মেয়েরা সকলেই একসঙ্গে গল্পদাদুর পানে চাহিয়া আবদার ধরিল—সে দিনের কথা যেন মনে থাকে দাদু, সে দিন বলেছিলেন—আসছে বৈঠকেই এ-গল্প শেষ হবে।—হবে ত?

দাদু তখন গড়গড়ার নল ফুড়ুক-ফুড়ুক টানিয়া মুখ হইতে ধোঁয়া ছাড়িতেছিলেন; নলটি নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—হাঁ, কথাটা ভুলিনি, মনে আছে; আজ তোমরা বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই বাড়ী যাবে। সন্ধ্যাবেলা শাঁকের আওয়াজ শুনে আজ আর মন দুঃখে ভ'রে উঠবে না।

দাদু তখন গল্প আরম্ভ করিলেন।

রাজকন্যা সন্ধ্যের সময় পক্ষিরাণী আর হীরেমনটিকে নিয়ে এ-মহল থেকে চ'লে গেলেন; তার খানিক পরেই রাজা-পেটেল তার ছোকরা চাকরটাকে পাঠালে মন্ত্রী কৃষ্ণ সিং আর প্রসাদ সিংকে ডেকে আনতে। তাঁরা আসতেই রাজা পেটেল সব কথা তাঁদের কাছে বললো।—রাজকন্যার সঙ্গে তার যে সব কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল—হীরেমন পাখী, পক্ষিরাণী, আর ব্যাধের আনা সেই মরা তোতাপাখীটা নিয়ে,—এক একটি ক'রে তা সমস্তই শুনিয়ে সে বল্‌লো—এখন কি করা যায় বলুন।

মন্ত্রীরা ত নিশ্চিন্ত মনেই বাড়ী গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন—তাঁদের জিদই পাকে-প্রকারে বজায় থেকে গেলো; এখন বিয়েটা হ'লেই তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু রাজা পেটেলের মুখে হঠাৎ এই সব নতুন খবর শুনে, ভয়ে দুশ্চিন্তায় তাঁদের দুই চক্ষু কপালে উঠলো।

কৃষ্ণ সিংহের পাটোয়ারী বুদ্ধি; বিপদে তিনি খেই হারান না। রাজা-পেটেলকে ব'ললেন—ভাবনা কি? তুমি ত মস্ত গণৎকার, গ'ণে দেখ-না ব্যাপারখানা কি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদ সিং বলে উঠলেন,—ঠিক কথা, আমরা এ কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলুম! আর দেরী নয়, খড়ি নিয়ে বসে যাও, গ'ণে দেখ—যার দেহটা দখল ক'রে তুমি রাজা হ'য়ে বাহাদুরী দেখাচ্ছো, তার আত্মাটা এখন কার দেহের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে।

রাজা-পেটেল বললো—আমার সন্দেহ হচ্ছে, ঐ হীরেমন পাখীটার দেহের ভেতরই সে প্রবেশ ক'রেছে।

কৃষ্ণ সিং বললেন,—বেশ ত, গ'ণেই দেখ-না; হাতে পাঁজী, কোন্ বার—তা নিয়ে তর্কের কি দরকার?

রাজা পেটেল তখন গ'ণতে বসলো। কষ্টি পাথরের একখানা চৌকি সেই ঘরে অনেকখানি যায়গা জুড়ে প'ড়ে ছিল; তার ওপরেই চ'ললো গণনার তোড়।—আঁকের পর আঁকে খড়ির সাদা দাগে অত-বড় পাথরখানা ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ভরে গেলো,—কিন্তু কিছুতেই রাজা-পেটেল খুঁজে পেলো না—রাজার আত্মা কোথায় লুকিয়ে আছে,—হীরেমনের সেই পালকঢাকা দেহটির ভেতরে, না আর কোনো যায়গায়! শেষে হাতের খড়িখানা ছুড়ে ফেলে-দিয়ে সে ব'লে-উঠলো,—হ'ল না; এত চেষ্টাতেও খুঁজে পেলুম না, আর পাবোও না এ জন্মে!

দুই মন্ত্রীই একসঙ্গে চার চোখ পাকিয়ে তার পানে চেয়ে ব'লে উঠলেন,—ও কথার মানে?

রাজা-পেটেল ব'ললো,—মানে এই, যে সিদ্ধপুরুষ এই গণনা বিদ্যাটি আমাকে শিখিয়েছিলেন, তিনি সতর্ক ক'রবার জন্যে ব'লে-দিয়েছিলেন, দেহ-মন অশুদ্ধ হ'লে এ বিদ্যা ফলবে না; সবই গুলিয়ে যাবে। এখন তাই তো হয়েছে দেখছি; আমার বিদ্যে সব গুলিয়ে গেছে—তাই গ'ণতে পারলুম না। এখন কি করা যায় বলুন।

মন্ত্রীরা তখন মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন,—তাই ত! তা'লে এখন উপায়? ঐ হীরেমনটা যদি সত্যিই রাজা হয়?

রাজা-পেটেল বললো,—আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? ব্যাধ যে মরা-তোতাটা এনেছে, ঐটি নিশ্চয়ই সেই তোতা—যার জন্যে আমরা এত কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছি। সেও মাথা খেলিয়ে এই চাল চেলেছে—তোতার দেহ থেকে বেরিয়ে কোন রকমে হীরেমনের দেহের ভেতরে সেঁধিয়েছে। নইলে আমাকে দেখেই অমন ক'রে শাসায়? নিশ্চয়ই ওর ভেতরে র'য়ে-গেছে রাজা দীপঙ্কর; এখন আপনারা যেমন ক'রেই পারেন—ঐ হীরেমনটাকে রাতারাতি নিকেশ ক'রে ফেলুন। নিশ্চিন্ত হওয়া যাক।

কৃষ্ণ সিং বললেন,—তাকে নিকেশ করা তো এখন সোজা নয়; যেখানে সে আছে—সেখানে কারও চালবাজী চলবে না; সে বড়ই কঠিন ঠাঁই!

প্রসাদ সিং বললেন—ঐ ব্যাধটাকে আগে হাত করতে হবে। আমার মনে হয়, সে অনেক খবর দিতে পারবে।

রাজা-পেটেল বললো,—কিন্তু রাজকন্যা তাকে নজরবন্দী ক'রে রেখেছেন। পাখী-মারার শাস্তি তাকে নাকি নিতে হবে। রাজকন্যা পক্ষিরাণীকে নিয়ে তার অপরাধের বিচার করবেন।

কৃষ্ণ সিং বললেন,—তার আগেই আমরা তার সঙ্গে দেখা করবো।—তার পর তিনি প্রসাদ সিংকে বললেন,—এসো, আমরা ব্যাধের সঙ্গে আগে বোঝা-পড়া করি; তার পর অন্য ব্যবস্থা, অর্থাৎ কেমন ক'রে ঐ হীরেমনটাকে সরাতে পারি, তার উপায় স্থির করা যাবে।

রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—আবার ফিরছেন ত?

কৃষ্ণ সিং বললেন,—নিশ্চয়ই; তুমি কিন্তু ঘুমিও না যেন, জেগে থেকো। আমরা ফিরবই, এক ঘণ্টা হোক, দু'ঘণ্টা হোক, আর পাঁচ ঘণ্টাই হোক—রাত পোহাবার আগেই ফিরবো, আর এর একটা হেস্ত-নেস্ত ক'রবই করবো।

প্রসাদ সিং বললেন,—তুমি যদি ঠিক থাক, কার সাধ্য তোমাকে ঠকায়? রাজার দেহ সাক্ষী দেবে—রাজা তুমিই। পাখীর কথার কি দাম? হ্যাঁ, তবে সন্দেহ যখন হ'য়েছে, পাখীটাকে সরানো চাই-ই।—বলেই দু'জনে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অতিথিশালার যে-ঘরে ব্যাধের-পো সমস্ত দিনের পর রাজভোগ খেয়ে দিব্যি পরিষ্কার বিছানায় কাড় হ'য়ে শুয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিলো, দুই মন্ত্রী এলেন সেই ঘরের সামনে। তাঁরা দেখলেন, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, বড় বড় দুটো কড়ায় মজবুত একটা তালা লাগানো। কিন্তু দরজার কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে, আর সাদা বিছানার ওপর কুচকুচে কালো চেহারার একটা লোক শুয়ে আছে।

রাজার দুই মাতব্বর মন্ত্রীকে তত রাতে অতিথিশালায় নজরবন্দী ব্যাধের ঘরটির সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেই, বেঁটে-রকম একটি ছোট ছেলে ছুটে এসে, হেঁট হ'য়ে তাঁদের গড় ক'রে মুখখানি তুলে দাঁড়ালো। তার চোখদু'টি যেন জিজ্ঞাসা ক'রছিল—কি চাই আপনাদের মশায়?

মন্ত্রী কৃষ্ণ সিং বললেন,—বিকেলে যে ব্যাধ একটা মরা পাখী নিয়ে এখানে এসেছিল, তাকে বোধ হয় এই ঘরেই রাখা হ'য়েছে।

ছেলেটি হাত দু'খানি জোড় ক'রে খুব নম্র স্বরে বললো—আজ্ঞে হাঁ, আমার জিম্মাতেই তাকে রাখা হ'য়েছে।

প্রসাদ সিং বললেন,—এই লোকটাকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার দরকার হ'য়েছে। তাই এত রাত্তিরে আমরা এখানে এসেছি। তুমি দরজার তালাটি খুলে দাও বাবা!—কি মিষ্টি তাঁর কথা, যেন রসগোল্লা!

হাতদু'টি তেমনই জোড় ক'রে নম্র স্বরে ছেলেটি বললো—বেশ ত, আপনারা একটু বসুন; আমি এক-দৌড়ে গিয়ে রাজকন্যার হুকুমটা নিয়ে আসি।

কথাগুলো ব'লেই সে অন্দরের দিকে তীরের মতো বেগে ছুটে চললো। দুই মন্ত্রী তার দিকে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন, ছেলেটিকে তাঁরা কোন কথা আর বলবারও সময় পেলেন না। ঘরের সামনেই বসবার আসন ছিল, কিন্তু তাঁরা সেখানে বসলেন না।

খানিক পরে ছেলেটি তেমনই ছুটতে ছুটতে এসে ব'ললো—তাই ত, এখন কি করি বলুন দেখি? রাজকন্যে তাঁর ঘরে নাক ডাকিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছেন; অথচ তিনিই ব'লে রেখেছেন—'খবরদার! আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ও-ঘরের তালাটি কখনো কাউকে খুলে দেবে না—তা যিনিই আসুন বা দুয়ার খুলতে বলুন!'

মন্ত্রী কৃষ্ণ সিং বললেন—তোমার কোন ভয় নেই, দরজা তুমি খুলে দাও বাবা! আমি তোমাকে তালা খুলতে বলেছি—এ কথা শুনলে রাজকন্যা কিছুই বলবেন না।

ছেলেটি এ কথার কোন উত্তর দিল না, মুখখানা নামিয়ে মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলো, দেখে মন্ত্রী প্রসাদ সিং জামার ভেতর থেকে একটি মোহর বের ক'রে বললেন,—দেখ বাবা, ঐ ব্যাধটার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে; আমরা ত আর রাজকন্যের হুকুমের আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনে। তার চেয়ে এক কাষ কর,—এই মোহরটি তুমি নিয়ে রাখ, মিঠাই কিনে খেও। সুড়-সুড় ক'রে দরজার তালাটি খুলে দাও ত, কেউ এ-কথা জানতে পারবে না; আর জানলেও তোমাকে সে জন্যে গাল খেতে হবে না।

মোহরটি দেখে লোভে ছেলেটার চোখ-দুটো যেন চক্-চক্ ক'রে উঠ্‌লো। চিলে যেমন খাবারের ঠোঙ্গার ওপর ছোঁ মেরে খাবার তুলে নেয়, ঠিক তেমনি ক'রেই ছেলেটি মন্ত্রী প্রসাদ সিংয়ের হাত থেকে মোহরটি তুলে নিল; একগাল হেসে সে বললো—বাঃ, বেশ! আপনাকে আর কিছুই বলতে হবে না; আমি এখুনি তালা খুলে দিচ্ছি। সোণার টাকা চোখেই দেখিছি, হাতে কখন পাইনি। আপনাদের দয়ায় সেই মোহর পেয়েছি হাতে, দরজাটা কি আর খুলে না দিয়ে পারি? না হয় রাজকন্যের কাছে দুটো বকুনিই খাবো, কিন্তু মোহরটা ত আমার ভোগে লাগবে।

মন্ত্রী কৃষ্ণ সিং বললেন—বকুনিই বা খাবে কেন? নাই বা জানালে রাজকন্যাকে এ-কথা। এত রাত্তিরে এ-দিকে আর কেউ ত নেই; তুমি যে দোর খুলে দিয়েছ, কি ক'রে তিনি তা টের পাবেন? তোমাকে বকুনি থেকে বাঁচাতে আমরা না হয় কথাটা চেপেই যাবো।

ছেলেটি এক-মুখ হেসে অমনি ব'লে-উঠলো,—সত্যি? বাহাঃ! তাহ'লে আর আমার ভাবনা? আসুন—আপনারা, আমি দোর খুলে দিচ্ছি।

সাজানো ঘরে নরম তুল্‌তুলে ধব্‌ধবে বিছানায় শুয়ে ব্যাধের-পো'র ঘুম হচ্ছিল না, শুয়ে শুয়ে সে কত-কি ভাবছিল; এমন সময় দোর-খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হোমরা-চোমরা দু'টি মানুষকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে ব'সলো। ভয়ে তার মুখখানা তখন শুকিয়ে গেছে।

মন্ত্রী প্রসাদ সিং জিজ্ঞাসা করলেন—তুমিই ত সেই মরা তোতা পাখী বেচতে এনেছিলে?

ব্যাধ বিছানা থেকে নেমে হেঁট হ'য়ে প্রণাম ক'রে ব'ললো—আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্ম্মাবতার,—আমিই সেই ব্যাধ।

মন্ত্রী কৃষ্ণ সিং বললেন—এখন আগাগোড়া সব কথা আমাদের কাছে খুলে বল ত ওস্তাদ! কি ক'রে পাখীটাকে পেয়েছিলে, কোথায় এ-পাখী ছিল, আর কার হাতে কেমন ক'রে সেটা শিঙে ফুকলো,—কিছু না লুকিয়ে সব খুলে বলো।

ব্যাধের বুকের ভেতরটা ঢিপ-ঢিপ ক'রে উঠলো। তোতার ব্যাপারটা গোড়া থেকেই সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়লো রাজকন্যার হুকুম—'কারও কাছে তুমি এ-সব বলতে পাবে না', এমন কি, রাজা নিজে যদি জিজ্ঞাসা করেন—তবুও চেপে যাবে।' কথাগুলো যেন চাবুকের মত পিঠে প'ড়ে তাকে সতর্ক ক'রলো। সে তখন মনটিকে বেশ শক্ত ক'রে বললো,—আমার কোন কসুর হয়নি ধর্ম্মাবতার! আমার হাতেও পাখীটা মারা পড়েনি। ঢ্যাঁড়া শুনেই রাতারাতি বনের ধারে জাল পাতি। এক পাল তোতা সে জালে প'ড়েছিল, কিন্তু ধরবার আগেই ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ ক'রে আর সবগুলোই উড়ে পালালো, শুধু একটি পড়লো ধরা। তাকে খাঁচায় পুরে রাজবাড়ীতে আনছিলুম। আমি ত জানতুম, জ্যান্ত তোতাই আমার খাঁচায় আছে; কিন্তু আমার বরাতের দোষে পথেই

সে অক্কা পেলো। কি করি, লোভটা আর ছাড়তে না পেরে সেই মরা তোতাই বেচতে আনি। ভেবেছিলুম, হয় ত কিছু মিলবে; কিন্তু শেষকালে এমন উ‍ড়ো ফ্যাসাদে পড়তে হবে, তা জানলে কি আর এ-পথ মাড়াই? বরাত—বরাত!—বলেই ব্যাধের-পো ছু'হাতে কপাল চাপড়াতে লাগলো।

দুই মন্ত্রী মিলে তাকে অনেক জেরা করলেন; কিন্তু ব্যাধ এমন ন্যাকা সেজে জেরার জবাব দিতে লাগলো যে, একটিও কাযের কথা তার মুখ থেকে তাঁরা বার করতে পারলেন না।

পাহারাদার ছেলেটি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিলো। মন্ত্রীদের জেরা শেষ হ'লে সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো,—দরজা কি এবার বন্ধ করবো? অনেক রাত হ'য়ে গেছে কি না!

মন্ত্রীরা কিছু না ব'লে গম্ভীর হ'য়েই সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ছেলেটি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তালায় চাবি দিতে লাগলো। এ-দিকে দুই মন্ত্রীর মধ্যেও চুপি-চুপি একটা পরামর্শ হ'য়ে গেল।

ছেলেটি চাবি বন্ধ ক'রে মন্ত্রীদের সামনে এগিয়ে এসে বেশ মিনতির সুরে বললো—এখন আপনাদের হাতেই সব; যদি চেপে যান ভালই, আর যদি ব'লে দেন—আমার লাঞ্ছনায় তখন হয় ত শ্যাল-কুকুর কাঁদবে। রাজকন্যের যা মেজাজ, ক্ষণেক তুষ্ট, ক্ষণেক রুষ্ট, আমার অদেষ্টে যে কি আছে, ভগবানই জানেন।

প্রসাদ সিং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দেশ কোথায় খোকা?

ছেলেটি উত্তর দিলো—আরায়। ভিন মুলুকের রাজার এলাকা সেটা।

প্রসাদ সিং বললেন,—রাতারাতি বড়লোক হ'তে চাও খোকা?

ছেলেটি অবাক হ'য়ে মন্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে রইলো, উত্তর দিতে পারলো না। প্রসাদ সিং এবার কথাটা একটু সোজা ক'রে বললেন,—কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারোনি; যা বলছি, তা বেশ-ক'রে মন দিয়ে শোনো। একটা কায যদি এই রাতারাতি তুমি করতে পারো, আমরা তোমাকে এত টাকা শিরোপা দেব যে, আর তোমাকে রাজকন্যার মন জুগিয়ে চাকরী ক'রে খেতে হবে না, আরায় ফিরে গিয়ে বড়মানুষী-চালে সারা জীবনটা কাটাতে পারবে।

ছেলেটার চোখ দুটো লোভে আবার তেমনই চক্-চক্ ক'রে উঠলো। মনের আনন্দ আর চাপতে না পেরে সে ব'লে-উঠলো—একটা মোহর পেয়েই মন আমার বদ্‌লে গেছে; মনে হচ্ছে—নকরী কি ঝকমারীর কায; কত সাধই মনে জাগছে! তা দেখুন, ঠিক এই রকম আর দশটি মোহর যদি আপনাদের কাছে পাই, তবে এমন কোন কায নাই যা আমি করতে গররাজি হবো—মানুষ খুন করতেও আমার আপত্তি হবে না—যদি ধরা না পড়ি।

প্রসাদ সিং একটু হেসে তাড়াতাড়ি বললেন,—না, না, মানুষ খুন তোমাকে করতে হবে না, আমরা তোমাকে অতটা বেপরোয়া হ'তে বলি-নে;—আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটা পাখী, সেটাকে যদি খুন করতে পারো—

মন্ত্রীর কথা শেষ না-হ'তেই দুই চোখ কপালে তুলে সে ব'লে-উঠলো—ও-বাবা, তবেই সেরেছে! এ রাজ্যে যে পাখী খুন করলেও সাজা নিতে হয়; দেখছেন না—ঐ ব্যাধটাকে কেমন নজরবন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছে। তবু ত সে নিজের হাতে খুন করেনি তার তোতাকে। পাখীকে খুন করলে রাজকন্যে কি আর আমাকে আস্ত রাখবেন? দু'টুকরো ক'রে কেটে ফেলবেন রাগে'! যে রাগী মেয়ে—বাপ্‌রে!

মন্ত্রী বললেন—তোমার নাগাল পেলে ত! আর কেমন ক'রেই বা টের পাবেন তিনি—যে তুমিই তাঁর পাখীকে মেরেছ? আমাদের কথা-মত যদি কায কর, কাক-চিলেও জানতে পারবে না; মাঝ-থেকে তুমি বড়মানুষ হয়ে যাবে হে! দশ মোহর কি ব'লছ? ও ত থোড়াই; এত মোহর তোমাকে দেওয়া যাবে যে, তুমি দু'হাতে অমন কত দশ মোহর এক দিনেই উড়িয়ে দিতে পারবে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে ছেলেটার চোখ দুটো যেন পরম আনন্দে নেচে নেচে উঠছিল, মুখখানায় তার হাসি আর ধরছিল না। তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর কাছটিতে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলো—আগে বলুন ত, কি করতে হবে? রাজকন্যের বিস্তর পাখী কি না, কোন্‌টাকে রাতারাতি সাবাড় করতে হবে?

মন্ত্রী প্রসাদ সিং চার দিকে চেয়ে—আশে পাশে কেউ নেই দেখে চাপা-গলায় ব'ললেন,—আজ বিকেলে পক্ষিরাণী যে পাখীটাকে এনেছে—

চোখ-দুটো বড় ক'রে ছেলেটি ব'লে উঠলো,—ঐ হীরেমন পাখীটাকে?

প্রসাদ সিং বললেন,—চুপ, আস্তে। ঐ হীরেমনটি হচ্ছে এ রাজ্যের দুষমন; রাজকন্যাকে লুকিয়ে তাকে মারতে হবে। মারবার এমন ফন্দী তোমাকে ব'লে দেব—এক লহমায় কাযটা শেষ হ'য়ে যাবে, কেউ টের পাবে না। এসো—কাণে কাণে কায়দাটুকু শিখিয়ে দিই।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ছেলেটির কাঁধের কাছে মুখখানা নামালেন; ছেলেটিও ফন্দীটা শোনবার জন্যে কাণ খাড়া ক'রে রৈল।

রাজা-পেটেল তার সাজানো-গোছানো মস্ত বড় শোবার ঘর-খানার ভেতর এ-মুড়ো থেকে সে-মুড়ো পর্য্যন্ত অনবরত পাইচারী ক'রে বেড়াচ্ছিল, আর—চলতে চলতে এক একবার থমকে দাঁড়িয়ে কত কথাই ভাবছিল; ঘরের মাঝখানে হাতীর দাঁতের এক চমৎকার পালঙ্কের ওপর এক হাত পুরু আর দুধের মত সাদা ধবধবে বিছানাটি খালি পড়ে' রয়েছে, রাজা-পেটেলের তা ছোঁবারও ফুরসৎ হয়নি। হঠাৎ রাজবাড়ীর পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং শব্দে তিনটে বেজে গেল; শব্দগুলো মনে মনে গুণেই রাজা-পেটেল চমকিয়ে হঠাৎ দরজার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে দোরের সম্মুখে টাঙ্গানো সোনার ঝালর-দেওয়া পরদাখানা দুলে উঠলো, আর তা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন দুই মাতব্বর মন্ত্রী—কৃষ্ণ সিং আর প্রসাদ সিং।

রাজা-পেটেল এঁদেরই প্রতীক্ষা করছিলো। সে চেয়ে দেখলো—দু'জনেরই মুখে হাসি, চোখের দৃষ্টি যেন আগেই জানাচ্ছে—ভয় নেই, কায হাসিল ক'রেই এসেছি।

রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—তাহ'লে খবর বোধ হয় ভাল?

কৃষ্ণ সিং বললেন,—এই মাথার বুদ্ধি এত-বড় রাজ্যটাকে চালাচ্ছে, একটা মেয়ের বুদ্ধিকে আর অচল করতে পারবে না?

প্রসাদ সিং হাসি-মুখে বললেন,—এই বুদ্ধির দমকে হীরেমনের দম একদম বন্ধ হ'য়েছে।

কথাটা শুনেই আহ্লাদে রাজা পেটেলের দমবন্ধ হবার জো

আর কি! তার পর সে জিজ্ঞাসা করলো,—কি ক'রে সেটা সম্ভব হ'ল ?

কৃষ্ণ সিং জানালেন,—যার শিল যার নোড়া—তারই ভেঙেছি দাঁতের গোড়া।—এই ভাবেই কায শেষ করা হ'য়েছে।

প্রসাদ সিং বললেন,—রাজকন্তার অনুগত বিশ্বাসী লোক দিয়েই পাখীটাকে বিষ খাওয়ানো হ'য়েছে। অক্কা পেয়েছে, এ খবর নিয়ে তবে এখানে এসেছি। রাজকন্তা এই মাত্র জেনেছেন; এখন শোক চলছে। তোমার কথাই ঠিক; যে সব কথা শুনলুম, রাজা দীপঙ্কর ওর ভেতরেই সেঁধিয়েছিল। আজ তার সব লীলাই সাঙ্গ হ'ল। এখনই তুমি সে খবর পাবে। তুমি এখন বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে পড়ে' থাকো। আমাদের এখন এখানে থাকা ঠিক হবে না! টাকা দিয়ে অনেকের মুখ বন্ধ করতে হ'য়েছে। সবার ওপর ঐ খুনে-ছোকরাটা একটা মস্ত আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; সেটাকেও বিস্তিপত্তর গোঁকাতে হবে এই রাত্তিরেই;—এ কাণ্ডের ঐ হচ্ছে এখন একমাত্র খোঁচ, ওটাকে না ভাঙ্গলে নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। কাল সব শুনো, এখন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো।—কথা শেষ ক'রে দুই মন্ত্রী স'রে পড়লেন।

এ-মহলে যতগুলো পাহারাদার ও তাদের উপরওয়ালা ছিল, মন্ত্রীরা টাকা দিয়ে আগেই তাদের সকলকে হাত ক'রেছিলেন।

রাজা-পেটেল এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিছানার ওপর দেহটা এলিয়ে দিলো। দেহের ভেতরের মনটা তার এবার আনন্দে যেন নেচে উঠলো; আর সেই নাচের গমকে ফস্ ক'রে ভেসে উঠলো পাশাপাশি দু'টি পরীর মতন সুন্দরী কন্তার রূপ! একটি হচ্ছে—রাজকন্তা, অন্যটি পক্ষিরাণী। রাজকন্তা ত তার মুঠোর ভেতরেই আসে-আসে হ'য়েছে; এখন পক্ষিরাণীকেও অন্য হাতের মুঠোর ভেতর আনতে তার মনটি যেন হঠাৎ উসখুস্ করতে লাগলো। এই মেয়েটিকে তার ভারি ভালো লেগেছিল; মনটি সে-সময় মুসড়ে ছিল ব'লেই মুখে কিছু বলেনি সে, কিন্তু তার মনের ভেতরে যে সাধটি তাল-গোল পাকাচ্ছিল—তার অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেউ তা জানতে পারেনি।

পক্ষিরাণীর কথা ভাবতে ভাবতে রাজা-পেটেলের চোখের পাতা ঘুমের হাওয়ায় যেন জড়িয়ে এলো, ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে পক্ষিরাণীও যেন পরীর মতন পাখা মেলে স্বপ্নের বাতাসে ভর দিয়ে রাজা-পেটেলের মনের ভেতরে উড়ে এলো। রাজা-পেটেলের মনে হ'ল—তারও যেন দু'টি পাখা গজিয়েছে, কিন্তু পক্ষিরাণী এমনি দুষ্টু যে, পাখাদু'টি ধ'রে রেখেছে জোর ক'রে, কিছুতেই তাকে উড়তে দেবে না! রাজা-পেটেল যতই মিনতি ক'রে বলে—'ছেড়ে দাও, পক্ষিরাণী, ছেড়ে দাও আমাকে!' পক্ষিরাণী ততোধিক শক্ত হ'য়ে দুষ্টুমীর হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে বলে—'উহুঁ, তা হবে না; ছাড়া তুমি পাবে না, আমার কাছেই চিরবন্দী হ'য়ে থাকবে।'

উঠুন, উঠুন—কত ঘুমুচ্ছেন!—নরম হাতের পরশের সঙ্গে পরিচিত গলার সুমিষ্ট স্বরের আমেজে রাজা-পেটেলের এমন সুখের ঘুমটি হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। দুই চোখ রগড়ে সামনে ভালো ক'রে চাইতেই মুখখানা তার হাসিতে ভরে উঠলো; ধড়মড় ক'রে উঠে বসেই সে বললো—ভারী আশ্চয্যি তো! এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে আপনারই সঙ্গে যে আলাপ করছিলুম! চোখ-মেলেই দেখছি—এখানেও আপনি, একবারে সশরীরে সামনে হাজির!

চোখে-মুখে কৌতুকের ভঙ্গী ফুটিয়ে পক্ষিরাণী বললো,—কি ভাগ্যি আমার! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমারই সঙ্গে আপনি আলাপ করছিলেন? কিন্তু দেখবেন, রাজকন্তের কাছে যেন ফস্ ক'রে কথাটা ফাঁস ক'রে ফেলবেন না, তাহ'লে তিনি হয় ত মানে বসবেন।

রাজা-পেটেল মুখখানা গম্ভীর ক'রে বললো,—রাজকন্তার কথা আর বলবেন না! আগে ভালয় ভালয় বিয়েটা ত হয়ে যাক্, তার পর দেখ্ বো তিনি কত মুরোদের রাজকন্তা, আর আমি কি রকম মরদ রাজা—

আড়-চোখে এই মানুষটার মুখের নিষ্ঠুর ভঙ্গীটা লক্ষ্য ক'রে পক্ষিরাণী বললো—কি আলাপটা করছিলেন আমার সঙ্গে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, বলুন না—শুনি!

রাজা-পেটেল পক্ষিরাণীর মুখের দিকে বেহায়ার মতন তাকিয়ে থেকে বললো—সে ভারি মজার স্বপ্ন! আপনি যেন আমাকে জোর ক'রে ধরে রেখেছেন, কিছুতেই ছাড়বেন না; যত বলি—ছাড়ুন, আপনিও অমনি মাথা নেড়ে বলেন—'উঁহু, আপনি আমার চিরবন্দী।'—বলেই রাজা-পেটেল হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। তার পর পক্ষিরাণীর পানে এক নজরে চেয়ে বললো—এ স্বপ্ন যদি সত্যি হয়?

পক্ষিরাণী একটা নিশ্বাস ফেলে বললো—কিন্তু হবার যে উপায় নেই রাজা! দু' দুটো বাধা—

চমকে-উঠে রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—কেন, কেন? কিসের বাধা?

পক্ষিরাণী মুখখানি মলিন ক'রে বললো—শোনেননি? রাজকন্তের হীরেমন কাল রাত্তিরে পটল তুলেছে। তার শোকে তিনি পাগল! আমি সেইজন্তেই তো তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাকতে এসেছি।

মনের আহ্লাদটুকু চেপে রেখে মুখে দুঃখের ভাবটুকু আনবার চেষ্টা করতে করতে রাজা-পেটেল ব'ললো—বলেন কি! হীরেমনটা হঠাৎ ম'রে গেছে? আহা হা—অমন খাসা বচনবাগীশ পাখী—

পক্ষিরাণী বললো—ব্যাপার যা দেখছি, হয় ত বিয়েটা আপনাদের আরও পেছিয়ে যাবে। কাযেই এটা একটা বাধা ছাড়া আর কি?

রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—বাধা বলছেন কেন বলুন ত?

পক্ষিরাণী বললো—বাধা নয়? রাজকন্তের সঙ্গে আগে বিয়ে না হ'লে ত আর আমার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা উঠতে পারে না। তা-ছাড়া, আমাকে বিয়ে করতে হ'লে আপনাকেও একটা পরীক্ষে দিতে হবে। সে-ও একটা মস্ত বাধা যে!

চোখের পাতাগুলো কুঁচকে রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—পরীক্ষেটা আবার কিসের?

পক্ষিরাণী বললো—রাজকন্তের কাছে শুনিছি, আপনি নাকি নিজের দেহ থেকে বেরিয়ে মড়ার দেহে ঢুকে তাকে বাঁচাতে পারেন! এই পরীক্ষে দিয়েই তো রাজকন্তেকে জয় ক'রেছেন। এখন আমাকে জয় করতে হ'লেও এই পরীক্ষেই আপনাকে দিতে হবে। আমি ত এ-কথা বিশ্বাসই করিনি; কিন্তু রাজকন্তে বলেছেন—ও-কথা সত্যি। তাই সেই কথা শুনে পর্য্যন্ত পরীক্ষেটা নেবার জন্তে আমার মনটা উসখুস্ করছে।

রাজা-পেটেল বললো—আপনি যা শুনেছেন তা মিছে নয়।

মড়ার দেহে ঢুকে আমি তাকে বাঁচাতে পারি; কিন্তু আমি সেই দেহ থেকে বেরিয়ে এলেই সে, যে মড়া—সেই মড়াই থাকবে।

পক্ষিরাণী বললো—তা থাকুক গে! আপনি যে এটা পারেন, এত বড় একটা বিদ্যের আপনি জাহাজ, শুধু সেইটুকুই আমি দেখ্‌তে চাই। আপনি যদি সত্যিই এ পরীক্ষেয় জিতে যান, তাহ'লে—

পক্ষিরাণী কথা শেষ না ক'রেই তার চোখ দুটোর এক অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে রাজা-পেটেলের মুখের দিকে তাকালো। রাজা-পেটেল সেই দৃষ্টিতে যেন কেমন বিহ্বল হ'য়ে গেল; তার পর বললো—আচ্ছা, আমি রাজী। কিন্তু কথা রইলো—আমার স্বপ্ন মিছে হ'তে দেবে না।

মুচকি হেসে পক্ষিরাণী বললো—ভোরের স্বপ্ন কি কখনো মিছে হয় রাজামশায়!—আমি কথা দিচ্ছি, কিছুতেই আপনাকে কাছ-ছাড়া করব না, চিরবন্দী ক'রেই রাখবো। স্বপ্ন আপনার ফলবে—ফলবে—ফলবে।

রাজা-পেটেল বললো,—তাহ'লে এজন্তে মড়া একটা চাই তো, তার যোগাড় করতে হবে।

পক্ষিরাণী বললো—একটা মড়ার যোগাড় করা আর এমন শক্ত কি? রাজকন্তের অত-বড় চিড়িয়াখানা, নিত্যই ত একটা না একটা জানোয়ার মরছে।

রাজা-পেটেল এবার চমকে-উঠে বললো—তা বলে রাজকন্তার ঐ সাধের মরা হীরেমনের দেহের ভেতর আমি ঢুকবো না—এ-কথা কিন্তু আগেই ব'লে রাখছি।

পক্ষিরাণী বললো—না গো মশায়, তার দরকার হবে না; আমি কি বোকা?—হীরেমনের সে গালি-গালাজ আপনি এখনো ভুলতে পারেন-নি, তা কি আমি জানি না? আমি এমন পরীক্ষের যোগাড় করেছি, যাতে সাপও মরবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না। রাজকন্তের সামনেই পরীক্ষেটা হবে, আর আমাদের বাঁধাবাঁধির কথাটাও অমনি—বুঝছেন?

রাজা-পেটেল হাঁ ক'রে এই মুখরা মেয়েটির পানে চেয়ে রইলো। রাজ্য, রাজকন্যা—সমস্তই তার সামনে থেকে যেন সরে গেছে—শুধু ভাসছে এই অদ্ভুত মেয়েটি—পক্ষিরাণী!—তার পানে চেয়েই আমতা-আমতা ক'রে রাজা-পেটেল বললো—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, পক্ষিরাণী!

পক্ষিরাণী অমনি খপ ক'রে রাজা-পেটেলের হাতখানি ধরে মৃদুমন্দ একটি টান দিয়ে, চোখের কালো কালো তারা দু'টি ঘুরিয়ে বললো—বুঝিয়ে দেবো রাজকন্তের সামনে, এখন চলুন ত!

রাজা-পেটেল মুখটি বন্ধ ক'রে চললো পক্ষিরাণীর সঙ্গে;—যেন কাচপোকা তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে চললো।

রাজকন্যা তার ঘরেই বসেছিল। আজ তার মুখে হাসি নেই, চোখের পাতাগুলি যেন ভিজে, সুন্দর ঠোঁঠদু'টি বিরস, দৃষ্টি উদাস। ঘরের মাঝে বেনারসীর পরদাটা গুটানো রয়েছে, আর সোনার দাঁড়ে হীরেমনের মৃতদেহটা দুলছে। রাজকন্যার কোলের ওপর শুয়ে প্রকাণ্ড একটা মদ্দা বেজি তার গলার হারছড়াটি নিয়ে খেলা করছে। খানিক তফাতেই ব্যাধের সেই খাঁচা; তার ভেতরে তোতা পাখীর মৃতদেহটা কাত হ'য়ে পড়ে আছে।

পক্ষিরাণীর সঙ্গে রাজা-পেটেল ঘরে ঢুকতেই রাজকন্যা বললো—আসুন, আপনার মনস্কামনাই সিদ্ধ হয়েছে;—হীরেমন পালিয়ে গেছে আপনার ভয়ে। ঐ দেখুন, তার মরা শরীর দাঁড়ে ঝুলছে।

রাজা-পেটেল মুখখানা ভার ক'রে বললো—আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'য়েছে—এ-কথা বলবার হেতুটা কি?

রাজকন্যা বললো—আপনাকে প্রথমে দেখেই সে রুখে উঠেছিল, মন্দ বলেছিল; আপনি তাতে খুব রেগেছিলেন। কিন্তু আসলে ওটা যে পাখী, শেখানো বুলিই বলে—সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন আপনি।

রাজকন্যার মুখে এ-কথা শুনে রাজা-পেটেল যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলো। রাজকন্যার পানে শুধু একটিবার চেয়ে আস্তে আস্তে পাশের একটি সোফার ওপর হেলান দিয়ে সে বসে পড়লো, কোন উত্তর আর দিলো না।

রাজকন্যা আড়চোখে চকিতের মত তার দিকে চেয়ে মুখের ভাবটুকু আরও একটু গম্ভীর ক'রে বললো—কাল রাত দুপুর পর্য্যন্ত বেচারা বেশ ভালোই ছিল, তার পর কি যে হ'ল, কিছুই বুঝতে পারলুম না!

রাজা-পেটেল এবার বললো—ওর মরার শোকটা দেখছি আপনার খুবই লেগেছে। আপনি হয় ত বিশ্বাস করবেন না—আমিও মনে দারুণ ব্যথা পেয়েছি। রাগ? পাখীর কথায়? না, পাখীর কথায় আমি রাগিনি, রাগতে পারি নে।

রাজকন্যা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললো—আর একটি দিনও যদি বেচারা বেঁচে থাকতো!

রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—তাহ'লে কি হ'ত?

রাজকন্যা বললো—কাল রাত্তিরে ঠিক মানুষের মতন পষ্ট কথায় আমাকে বললো—'আমার অনেক কথাই বলবার আছে, কাল রাজসভায় সবার সামনেই তা বলবো; শুনে সভাশুদ্ধ সব লোক অবাক হ'য়ে যাবে।'—সে কথা আর সে বলতে পেলে না, আমাদেরও তা শোনা হ'ল না।

রাজা-পেটেলের বুকের ভেতর কথাগুলো যেন হাতুড়ীর ঘা মারলো! মনে মনে সে শিউরে উঠে ভাবলো—ভাগ্যি, বুদ্ধি খাটিয়ে আগেই ওটাকে নিকেশ করা গেছে; নইলে রাজসভায় সবই ত ফাঁস ক'রে দিত! সর্ব্বনাশ হ'ত।

পক্ষিরাণীর কথায় তার চমক ভাঙলো। হাত দু'খানি জোড় ক'রে সে তখন রাজকন্যাকে বলছিল,—আমার এত সাধের উপহারটি আনা বিফল হ'ল রাজকন্যা! আমার যা আফশোস্ হচ্ছে—

রাজকন্যা বললো—তোমার কি দোষ বোন! তুমি ত চেষ্টার কসুর করনি! এমন পাখী আমাকে দিয়েছিলে, জীবনে যার জোড়া দেখিনি। পাখী মানুষের মতন কথা কয়,—তুমিই তা প্রথম দেখালে। এখন তুমিই বল, আমি তোমাকে কি দিয়ে খুসী করি?

পক্ষিরাণী আবার হাত-দু'টি জোড় ক'রে বললো—আমি যা চাইব, তা কি আপনি প্রাণ ধ'রে আমাকে দিতে পারবেন রাজকুমারী?

রাজকন্যা বললো—খুব পারবো, বল, কি তুমি চাও?

পক্ষিরাণী একটুখানি কি ভেবে রাজা-পেটেলের দিকে তার চাঁপার কলির মত আঙুলটি বাড়িয়ে ফস্ ক'রে বলে বসলো—আমি চাই ওঁকেই!

বিস্ময়ে চোখ-মুখ বিকৃত ক'রে রাজকন্যা বললো—এ্যাঁ—কি ব'ললে ? রাজাকে চাও তুমি ?

পক্ষিরাণী বললো—আগে তাহ'লে আমার কথাটা শুনুন রাজকুমারী! আপনার মতন আমিও একটা পণ ক'রে মরেছি যে! আপনার রাজার অদ্ভুত বিদ্যের কথা শুনে ইস্তক আমি কি যেন হ'য়ে গেছি! কিন্তু নিজের চোখে না দেখা পর্য্যন্ত সে কথা বিশ্বাস ক'রতে পারিনি। রাজাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে তিনি বললেন—সত্যি। কিন্তু এখনো আমি বিশ্বাস ক'রতে পাচ্ছিনে রাজকন্যা! ব্যাধের ঐ মরা পাখীটা খাঁচার ভেতরেই ত ম'রে প'ড়ে আছে; উনি যদি ওর মৃতদেহে ঢুকে ওঁর সেই অদ্ভুত বিদ্যেটির পরীক্ষে দিতে পারেন,—তাহ'লে আমিও যদি ওঁকেই চাই, বলুন—আপনি তাতে আপত্তি করবেন না—রাগ করবেন না—বাধা দেবেন না ?

রাজকন্যা দিব্যি প্রসন্ন মনেই বললো—বেশ, তাই হবে। আমি তাতে খুসীই হব, রাগ করবো না, আপত্তি ক'রে বাধাও দেব না।

খিল-খিল ক'রে হেসে, আর দুই হাতে তালি দিয়ে এবার পক্ষিরাণী রাজা পেটেলের দিকে চেয়ে বললো—বুঝলে ত এখন হাঁদারাম, দেখলে ত মেয়ে-বুদ্ধির দৌড়,—এখন তোমার বিদ্যের দৌড়টা দেখিয়ে বাজি মাত করো!

রাজা-পেটেল গম্ভীর হ'য়ে বললো—তবে দেখো।—কথার সঙ্গেই সে সোফার সীটে ঠেস দিয়ে ব'সলো, মনে হ'ল যেন ঘুমিয়ে পড়লো। ওদিকে খাঁচার ভেতরে মরা তোতা পাখীটাও যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে, ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে খাঁচার ডাণ্ডিটার উপর ব'সলো,—তার পর দিব্যি মানুষের মত স্বরে ব'লে উঠলো,—বিশ্বাস ত এখন হ'ল!

রাজকন্যাও অমনি ধড়-মড় ক'রে এমন জোরে উঠে দাঁড়ালো যে, তার কোলের ওপর শুয়ে যে বেজিটা এতক্ষণ দিব্যি স্ফুর্ত্তিতে খেলা ক'রছিল—তার মৃতদেহটা গড়িয়ে মেঝের ওপরে ছিটকে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে সোফার ঘুমন্ত দেহটাও সজাগ হ'য়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর স্বরে বলে-উঠলো,—আমার দেহে এবার আমি ফিরে এসেছি রাজকন্যা!

খাঁচার ভেতরে বদ্ধ তোতা পাখীটাও চোখ-মুখ খিঁচিয়ে কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—মিথ্যেবাদী—বজ্জাতী—কারসাজী!

পক্ষিরাণীও অমনি ছুটে-গিয়ে দু'হাতে তোতার খাঁচাটা তুলে-ধ'রে বললো—কে মিথ্যেবাদী ? কার কারসাজী ? আমার ?—মিথ্যে-কথা; নিশ্চয়ই আমি কথা রেখেছি। আমার কথাও রইলো, আর তোমার স্বপ্নও ফললো,—পক্ষিরাণী কিছুতেই তোমাকে কাছ-ছাড়া করবে না, চিরবন্দী ক'রেই রাখবে। এখন রাজকন্যের হুকুম—

রাজকন্যা হাসিমুখে বললেন,—তুমি ওটাকে নিতে পারো, আমি খুসী হ'য়েই তোমায় ওটা দান কল্লুম।

রাজা দীপঙ্কর বললো—দুঃখের কথা, পেটেল তার দেহটা নিজের হাতেই কেটে টুকরো-টুকরো ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। থাকলে, তাকে আনিয়ে আনন্দ করা যেত।

পক্ষিরাণী তোতার খাঁচাটি দুলিয়ে বললো,—এখন এই তোতাই আমাদের আনন্দ দেবে। মাঝে মাঝে আমরা পাখীর মুখে মানুষের ভাষা শুনবো!

আসল ব্যাপারটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। এ-সব তিনটি প্রাণীর বুদ্ধির ফল; মন্ত্রীদের চক্রান্তে—রাজা দীপঙ্করের আত্মা হীরেমনের দেহ থেকে একটা সদ্য-মরা বেজীর দেহে আশ্রয় নিয়েছিল।

যে বেঁটে খাটো ছেলেটি দুই দিগগজ মন্ত্রীকে নিয়ে খেলিয়েছিল, সে এই সময় আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে রাজার পায়ের কাছে মাথাটি নুইয়ে ব'ললো—মন্ত্রী মশায়রা ছেলেটাকে ভুলিয়ে ভেবেছিলেন, মস্ত চাল চেলেছেন; কিন্তু নিজেরাই মাত হ'য়ে লজ্জায় বিষ গিলেছেন।

রাজকন্যা বললো—এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। পাপের শাস্তি এমনি ক'রেই পেতে হয়।

রাজা দু' হাতে ছেলেটাকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে বললেন—লোভের ফাঁদে পড়নি বলেই তুমি রাজার কোলে উঠলে; তোমার সব ভারই আমি নিলুম!

রাজকন্যা তখন ব্যাধকেও ডেকে তার হাজার টাকার তোড়াটির সঙ্গে আর একটি ঐ রকম তোড়া দিয়ে বললো, তোমাকে ঐ তোতাটির খবরদারী করতে হবে। এর জন্যে তুমি মোটা মাইনে পাবে, তোমার কোন কষ্ট আর থাকবে না।

সখীরা এই সময় ছুটে এসে খবর দিলো—বাঙ্গালা থেকে বুড়ো রাজা পাত্র-মিত্র, লোক-জন নিয়ে ছেলের কাছে এসেছেন।

রাজকন্যা তার পটলচেরা চোখ দুটি মেলে রাজার পানে চেয়ে বললো—কত কষ্টই তুমি পেয়েছ!

রাজা দীপঙ্কর তার হাত দু'খানি ধ'রে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন,—আমার সব কষ্টই ঘুচে গেছে তোমাকে পেয়ে।

পক্ষিরাণী অমনি তাড়াতাড়ি কোথা থেকে একটা শাঁখ এনে পোঁ ক'রে দিলে বাজিয়ে,—সখীরাও সঙ্গে সঙ্গে হুলু দিয়ে উঠলো।

মন্দিরেও এই সময় সন্ধ্যার শাঁখ বেজে উঠতেই গল্পদাদা বললেন—এর পর কি হ'ল বুঝতেই পারছ; সেটা তোমরাই ভেবে নিও। গল্প আমার শেষ হ'ল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকৃতির পরিচয়

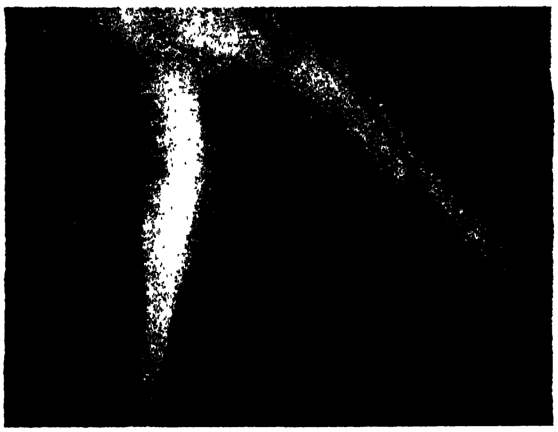
গাছ-পালার প্রাণ আছে; গাছ-পালাও মানুষের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে,—এ কথা সত্য।

কিন্তু কি করিয়া গাছ-পালা শ্বাস-প্রশ্বাস লয় ?

বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রশ্নের সঠিক সমাধান করিয়াছেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রোফেসর পার্শি স্মিথ এই তত্ত্বের নানা অনুসন্ধানে প্রথম প্রবৃত্ত হন। দেওয়ালের গায়ে মাছি বসিতে দেখিয়া সিনেমা-ক্যামেরায় সে মাছির নানা ভঙ্গীর বহু চিত্র তিনি গ্রহণ করেন। তার পর সে ছবি ছাপিয়া বেশ শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ-যন্ত্রযোগে প্রত্যেকখানি ছবির পর্য্যালোচনা করেন এবং এই পর্য্যালোচনার ফলে কীট-পতঙ্গ ও গাছ-পালার বহু গোপন তথ্যাবিষ্কারে তিনি সমর্থ হইয়াছেন!

প্রজাপতি উড়িতেছে, বাতাসের দোলায় গাছের ছোট ফুল দুলিতেছে—এ সবের ছবিও তিনি ক্যামেরায় তুলিয়াছেন। প্রজাপতি পাখা নাড়িয়া কি ভাবে ওড়ে, ফুলের কুঁড়ি কি করিয়া ধীরে-ধীরে দল মেলিয়া ফুটিয়া ওঠে,—তার ধারা-পর্য্যায় স্মিথ সাহেবের ছবিতে সুস্পষ্ট রেখায় ধরা পড়িয়াছে; এবং ত্রিশ বৎসরের সাধনার গৃহে যে চিত্রশালা তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, সে চিত্রশালাকে আজ সত্যই প্রকৃতির বিরাট কারখানা বলিয়া মনে হয়! মাকড়শা কি করিয়া তন্তু নিষ্কাশিত করিয়া জাল বোনে, তার ক্রম-পর্য্যায়ও স্মিথের ছবিতে আঁকা আছে! চারা-গাছ কি করিয়া মাথা তুলিয়া বড় হয়, মাছের ডিম ফাটিয়া



১। শিকড়ের গায়ে মিহি রেখা

কি করিয়া মৎস্য-শিশুর আবির্ভাব ঘটে, সিনেমা-চিত্রে স্মিথ সে রহস্য কাহারো নয়নান্তরালে রাখেন নাই! এ চিত্রশালা আজ পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

প্রকৃতি-সাধনায় তাঁর নিষ্ঠা অপরিসীম। গভীর রাত্রে তীব্র আলোক-রশ্মিপাতে ক্যামেরা লইয়া তিনি লতা-পাতা, পুষ্প-পল্লবের ছবি তুলিয়া বেড়াইতেছেন,—ছোট একটি কীটের পানে চাহিয়া ধ্যান-তন্ময় হইয়া আছেন—এ দৃশ্য নিত্য দেখা যায়; এবং এ ব্রত-সাধনে তাঁর পত্নী প্রধান সহায়!

স্মিথ সাহেব বলেন, ত্রিশ-বৎসরের সাধনায় আমি লক্ষ্য করিয়াছি, বড় হইতে কোনো কোনো গাছের সময় লাগে দু'বৎসর, তিন বৎসর, দশ বৎসর! আবার কোনো গাছ দু'এক মাসেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। কাজেই গাছ-পালার পরিচয় গ্রহণ করিতে আমাকে অসাধারণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইয়াছে। একটি গাছের ছবি আজ তুলিলাম, কাল তুলিলাম,—এমনি ভাবে দু'বৎসর চার-বৎসর ধরিয়া নিত্য দিন এক-একটি গাছের ছবি তুলিতে হইয়াছে। সব ছবি ফিল্ম-ক্যামেরায় তুলিয়াছি। এ জন্য কোনো ছবি দৈর্ঘ্যে হয় তো দশ-বারো হাজার ফুট হইয়াছে। ছবি তুলিয়া পর্দ্দায় সে ছবি ফেলিয়া বার-বার দেখিয়া তবে তার অন্তরের রহস্য জানিতে

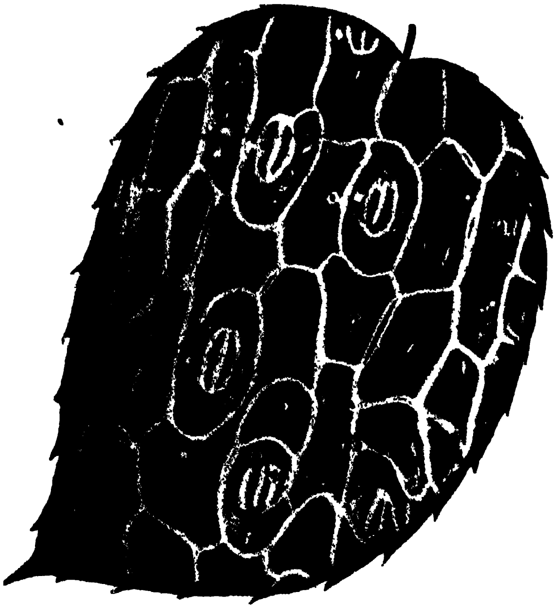


২। লালা-রস

পারিয়াছি এবং এমনি করিয়া প্রকৃতির ঘরের চাবি খুলিয়া আজ আমি সে-ঘরের অনেক গোপন রহস্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছি।

খেলার ছলে অনেক সময় আমরা চারা-গাছ উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলি। ভাবি, তুচ্ছ একটা গাছ! ফেলিয়া দিলে কি-বা ক্ষতি! কি-বা তাহাতে অনিষ্ট হইবে! কিন্তু এ তত্ত্ব জানিয়া আজ বুঝিয়াছি, চারা উপড়ানো নিষ্ঠুরতা। দূর্ব্বাদলকে পায়ে মাড়াইয়া পিষিয়া মারি, সে প্রাণ

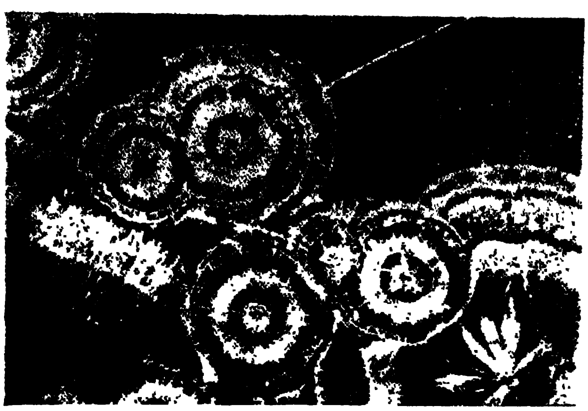
জীব-হত্যার মতো নৃশংস আচরণ! চারা গাছ, বড় গাছ দূর্ব্বাঘাস—এ সবের শিকড়ে কত জটিলতা! এ সব অবোলা তৃণপত্র যাহাতে বাঁচিয়া বাড়িয়া উঠিয়া নিজেদের



৩। গাছের পাতা

জন্মকে সার্থক করিতে পারে, সেজন্য বিধাতা কি বিপুল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, গাছ-পালাকে কত রকমে সাহায্য করিয়াছেন, দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

স্মিথ সাহেবের তোলা শিকড়ের ছবি দেখিলে বুঝিতে



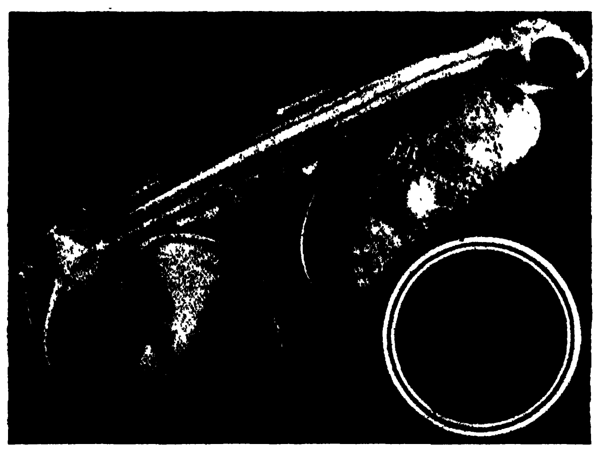
৪। চিনির স্ফটিক দানা

পারি, চর্ম্মচক্ষে শিকড়কে যতই সহজ মসৃণ দেখি, আসলে শিকড় তেমন সহজ মসৃণ নয়। ১নং ছবিতে দেখিবে, শিকড়ের গায়ে আগাগোড়া কেশ-রাশির মতো অজস্র মিহি-রেখা। এগুলির সাহায্যে গাছ-পালা মাটী হইতে আর্দ্রতা ও জীবন-রস সংগ্রহ করে। তার পর ২নং ছবির পানে চাহিয়া ছাখো, দীর্ঘ শিকড়ের নীচে শুভ্র ঐ যে কতকগুলি গোলক-বিন্দু, ওগুলি লালা-রস। রসালো জেলির মতো এ-রস শিকড়ে লাগিয়া থাকে—



৫। ভ্যানিলা-দানা

শিকড়কে আর্দ্র রাখে। মানুষের দেহে যেমন রক্তকোষ আছে, এগুলি তেমনি গাছের 'রক্ত-কোষ'! ইহারি জোরে গাছ-পালা জীবন্ত থাকে। কলকব্জা সচল রাখিতে হইলে তাহাতে যেমন তৈল (lub icant) দিতে হয়, নহিলে কলকব্জায় 'জাম' ধরে, কলকব্জা অচল হয়—



৬। ডিম ফাটিয়া মৎস্য-শিশু

এই কোষ-নিহিত লালা-রসে অভিষিক্ত থাকে বলিয়া মাটীর বুক ফুঁড়িয়া শিকড় বহু নিম্নে পথ করিয়া নামিয়া যাইবার সময় শিকড়ের গা অক্ষত থাকে, নিরাময় থাকে।

গাছ-পালা উপড়াইয়া ফেলিলে শিকড় হইতে এ লালা-রস ঝরিয়া যায়। ২নং ছবিতে সাদা-কালোর যে বর্ণাভাস দেখিতেছ, কালো আভাসটুকু শিকড়; কালোর গায়ে ঐ যে শুভ্র আভা, ও-আভাটুকু শিকড়ের গায়ে-মেশা লালা-রস।

৩ নম্বর ছবি দেখিয়াছ? ৬টি গাছের পাতা। পাতাটিকে খুব বর্দ্ধিত-আকারে দেখানো হইয়াছে। পাঁতার গায়ে ঐ যে সাদা-সাদা রেখা—ওগুলি রন্ধ্ররেখা। এগুলি নিত্যক্ষণ খুলিতেছে, বুজিতেছে। চর্ম্মচক্ষে এ ব্যাপার দেখা যায় না এবং এই রন্ধ্রের খোলা-বোজায় গাছ শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করে। নিশ্বাসে গাছপালা কার্বন-ডায়ক্সাইড বাষ্প গ্রহণ করে। এ



৭। ট্রাউট-শিশুর আবির্ভাব

বাষ্প গ্রহণ না করিলে গাছ-পালা বাঁচে না, বাঁচিতে পারে না।

৪নং ছবিতে ফুলের মতো আলপনার যে শুভ্র রেখা, ওগুলি চিনির দানা!

৫নং ছবিতে ভ্যানিলা-সারের স্ফটিক-দানা—যেন একঝাড় চারাগাছ!

স্মিথ সাহেব তাঁর ক্যামেরায় এ-সব ছবি তুলিয়াছেন।

৬নং ছবিখানি কিসের, বলিতে পারো? ভাবিতেছ, বাদ্যযন্ত্র? না, বাদ্যযন্ত্র নয়। ডিম হইতে মৎস্য-শিশুর আবির্ভাবের ছবি!

৭নং ছবি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন শিকড় ফাটিয়া লতাগুল্ম উঠিয়াছে! আসলে কিন্তু লতা বা শিকড়ের ছবি এ নয়। একরাশ ট্রাউট-মাছের ডিম ফাটিয়া ট্রাউট-শিশুর উদয়-ছবি!

স্মিথ সাহেবের নৈষ্ঠিক সাধনায় প্রকৃতির অজ্ঞাত মহলের লক্ষ দরজা আজ উন্মুক্ত হইয়াছে এবং সে খোলা দ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া মানুষ আজ প্রকৃতির গোপন রহস্য জানিতে সমর্থ হইয়াছে।

আতস-বাজি

এই কার্ত্তিক মাসে কালীপূজার রাত্রে বাজি পুড়াইবার ধূম আজ এ-যুগে শুধু যে অব্যাহত আছে তা নয়, সে-ধূম



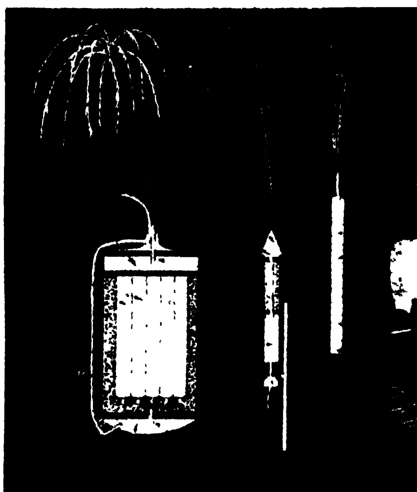
বারুদ-বাগী বাজিকর

আরো বাড়িয়াছে। তার কারণ, আতস-বাজিতে এখন শিল্প-কলার মোহন-স্পর্শ আসিয়া মিশিয়াছে!

ছেলেবেলায় আমরা ভুঁই-পটকা, চীনা-পটকা, তুবড়ি, হাউই, তারা, বোমা, চর্কী—এই সব বাজি পাইলেই আনন্দে বিভোর হইতাম! কদম-ঝাড় এবং রকমারি অস্ত্র ভালো বাজির সমারোহ যা দেখিতাম, তা সেই কাশীপুরে পূজার সময় যে রামলীলা হইত, সেই রামলীলার উৎসবে। সে সময় ধনাঢ্য-সৌখীন গৃহেও রকমারি বাজির সমারোহ দেখা যাইত; এবং ফরমাশ দিয়া রকমারি বাজি যা পোড়ানো হইত, তা ধনী-ঘরে বিবাহের প্রোসেশনে।

এখন এ যুগে ছোট-বড় সকল ঘরেই আতস-বাজির বহর অনেকখানি বাড়িয়াছে। রোমান ক্যাণ্ডেল্, রকমারি রকেট—এমনি নানা বাজি সুলভে এবং অজস্র পরিমাণে বাজারে আজ কিনিতে পাওয়া যায়।

যত দূর মনে পড়ে, আমাদের দেশে আতস-বাজির প্রথম সমারোহ দেখিয়াছিলাম আমাদের বাল্যকালে বর্ত্তমান-সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের পিতামহ সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক-উৎসবে। সে সময় য়ুরোপীয় অনুষ্ঠানে বিলাতী বাজিকর ব্রকের বাজিতে প্রথম আমরা আলোর রেখায় দুর্গ, রণ-তরী, সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি ফুটিতে দেখিয়াছিলাম। সে সময়ে কলিকাতার চীনা-সমাজও সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকে উৎসব করিবার জন্য ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যে রকমারি বাজি পুড়াইয়াছিল, সে বাজি দেখিতে রাত্রি কাটিয়া গিয়াছিল! সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাঠে গিয়া দেখি বাঁশ ও বাঁখারির ঝাড় বাঁধিয়া কয়েকটি ছোট বেড়া রচিয়া রাখিয়াছে; তার পর রাত্রে দেখি, সেই সব বাঁশ-বাঁখারির ঝাড়ে আগুন দিবা-মাত্র সেই বাঁশ-বাঁখারি বাঁধন কাটিয়া তালগাছের মতো দীর্ঘ-আকারে অজস্র ডালপালা মেলিয়া দিল! সে ডালপালায় লাল, নীল, বেগুনি—নানা রঙের আলোর ফুল ফুটিতে লাগিল; তার পর সেই সব ফুল আবার সশব্দে ফাটিয়া আলোয়-আলোয় অজস্র লতা-পাতা ফুল-ফলের ফুলঝুরি রচিয়া তুলিল! মনে আছে, রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেলেও চীনাদের সে বাজি শেষ হইবার কোনো আশা দেখা যায় নাই!



রকমারি বারুদে রকমারি ফুলঝুরি

সে-দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আতস-বাজির রাজ্যে নিত্য নূতন কি উৎকর্ষই না সাধিত হইয়াছে! আতস-বাজি তৈয়ারীর অর্থ এখন আর বারুদ-ঠাশার কশরতি বা কেরামতি নয়! তাহাতে আজ শিল্পীর যে-প্রতিভা ফুটিতেছে, দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়!

আতস-বাজির শিল্পীদের মধ্যে সব-চেয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন নিউ ইয়র্কের শ্রীযুত ডাফিল্ড। তিনি বলেন, যে-কোনো রকম ফটোগ্রাফ আমাকে আনিয়া দিন, আতস-বাজিতে আলোর অক্ষরে নিখুঁতভাবে আমি সে ফটো ফুটাইয়া তুলিব (anything you show me in photographs, I can reproduce them in fire-works); এবং হাতে হাতে তিনি এ-কথার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁর



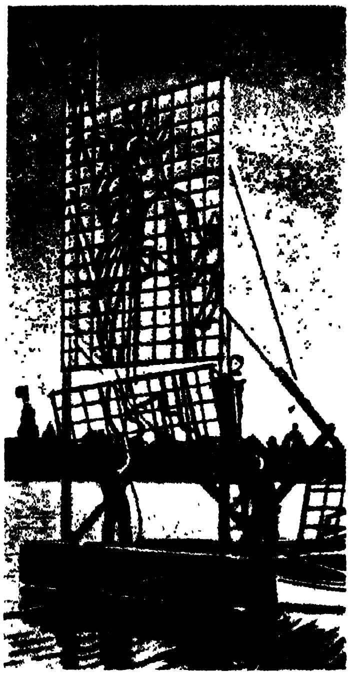
জাহাজ-বাজির বারুদ-মশাল



ফুল-কাটা রকেট

পটুতা দেখিয়া ডাফিল্ড সাহেবকে অনেকে আতস-বাজির নাট্যকার 'Dramatist in fire-works' আখ্যা দিয়াছেন।

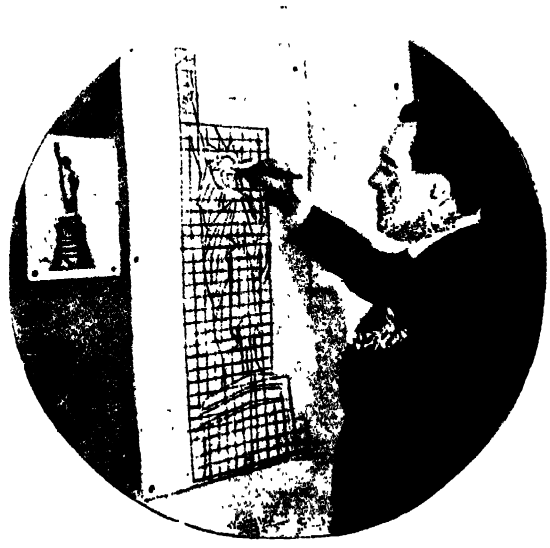
নিউ ইয়র্কে সম্প্রতি যে বিরাট বিশ্ব-প্রদর্শনী বসিয়াছিল, সে-মেলায় রকমারি আতস-বাজি দেখিয়া দর্শকের দল বিমুগ্ধ বিহ্বল হইয়াছিলেন। ১৭০ রকম বাজি পুড়িয়াছিল; সে-বাজির ওজন ছিল ২০০ টন। আতস-বাজিতে আলোর একটি হ্রদ দেখানো হইয়াছিল; হ্রদটি লম্বে-প্রস্থে ছিল এক হাজার ফুট। হ্রদের বুকে আতস-বাজির আলোর রেখায় প্রায় ২০০ বোট, নৌকা, ষ্টীমার এবং মোটর-লঞ্চ ফুটিয়াছিল। সে হ্রদের বুকে আবার রণ-তরী ছিল। সে রণ-তরী হইতে মুহুর্মুহু কামান দাগা হইয়াছিল। তাছাড়া জলের বুকে রকমারি আরো কত বাজি হইয়াছিল,—রঙীন আলোর লহর; রোমান ক্যাণ্ডেল; নানা রঙের আলোর ফুল-পাতা, লতা-গুল্ম এবং রূপালি ও সোনালি নির্ঝর-ধারা! বায়ু-বোমা ফুটিয়া ছিল,—সেগুলা ফাটিয়া অজস্র আলোর ফুল আকাশে এক-হাজার ফুট ঊর্দ্ধে হুশ-হুশ শব্দে উঠিয়া গেল; গিয়া আকাশ-পথে সেই প্রত্যেকটি ফুল আবার সশব্দে ফাটিয়া কৃষ্ণ ধূমে মিলাইয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল! এ বোমার আলোর ধারায় কি শুধু ফুলের ঝাড় ছিল? তা নয়! ক্রীশানথীমামের ঝাড় ছিল, অজস্র নক্ষত্র ছিল, সাপ ছিল, ঝাউ-পাতার ঝালর ছিল, মাছ ছিল! আকাশের পটে আলোর লেখায় যে-ছবি ফুটিয়াছিল, তার আর তুলনা নাই! এ-বাজি দেখিয়া সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন—



বাজির আলোয় যে-মূর্ত্তি ফুটিবে, তার কাঠামো

These bombs are master-pieces of the pyro-technic's art.

আতস-বাজিতে এই যে রকমারি রঙ ফলানো—বিবিধ ধাতব-লবণের সহিত পোটাশিয়াম পারক্লোরেট এবং আরো বিবিধ অক্সিডাইজিং রাসায়নিক সামগ্রী মিশাইয়া এ-রঙ ফলানো হয়। ষ্ট্রনটিয়াম-লবণে হয় লাল আলো; বেরিয়ামে সবুজ; সোডিয়ামে হরিদ্রা; ম্যাগনেশিয়াম এবং এ্যালুমিনিয়ামে সাদা; এবং প্যারিস-গ্রীণে নীল রঙের আলো। ডাফিল্ডের বাজিগুলির মধ্যে সব-চেয়ে চমকপ্রদ হইয়াছিল—আলো-হ্রদের বুকে আলোর রেখায় রচা জর্জ্জ ওয়াশিংটনের এক বিরাট প্রতিমূর্ত্তি! এ বাজি ফাটিয়া



কাঠামো-রচনা

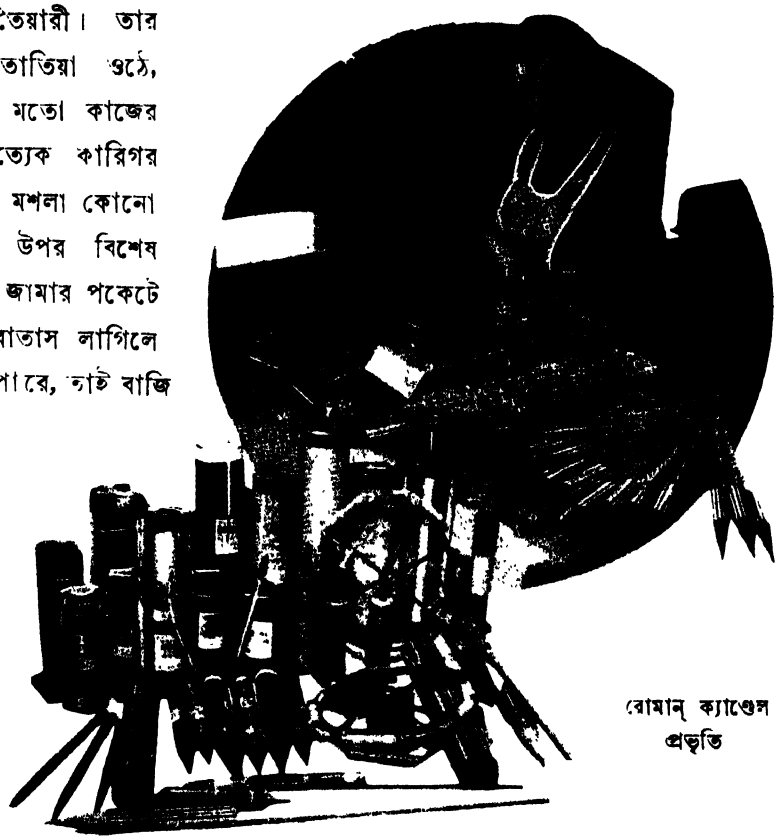
মূর্ত্তির মাথায়-গায়ে অজস্র আলোর নক্ষত্র ঝরিয়া পড়িয়াছিল! সে এক অপরূপ দৃশ্য! তার উপর এ-কালের সকল সামগ্রী—সাবমেরিন, রণ-তরী, এ্যাম্বুলান্স, দুর্গ, নায়েগ্রা-প্রপাত—এ-সবের কোনোটি আর ডাফিল্ড সাহেব আতস-বাজির আলোর লহরে ফুটাইতে বাকী রাখেন নাই!

কত কারিগর লাগাইয়া সতর্কভাবে এ-সব বাজি তৈয়ারী করা হয়, শুনিলে বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না! বারুদ লইয়া যত-কিছু কাজ দিনের বেলায় করা হয়। রাত্রে পাছে আলোর কণা বা তাপ লাগিয়া বিপত্তি ঘটে, এজন্য রাত্রে বাজি তৈয়ারী করা হয় না। যে-সব পাত্র এ-কাজের জন্য ব্যবহার

করা হয়, সেগুলি কাঠ বা পিতলের তৈয়ারী। তার কারণ, বারুদ ঠাশিতে অন্য ধাতু যদি তাতিয়া ওঠে, বিপদ ঘটিতে পারে! আধ ঘণ্টার মতো কাজের উপযোগী বারুদ ও মশলা লইয়া প্রত্যেক কারিগর কাজ করে। ইহার চেয়ে বেশী বারুদ বা মশলা কোনো কারিগরকে দেওয়া হয় না। তার উপর বিশেষ পাত্রে ভিন্ন খোলা হাতে বা রুমালে বা জামার পকেটে করিয়া বারুদ বহিতে দেওয়া হয় না। বাতাস লাগিলে কোনো-কোনো বারুদ জ্বলিয়া উঠিতে পারে, তাই বাজি তৈয়ারীর জন্য ছোট ছোট স্বতন্ত্র ঘর আছে। নানা ঘরে নানা রকমের বারুদ লইয়া কাজ চলে।

বিষযোগ ঘটিতে পারে, এমন ধাতের বিভিন্ন বারুদ বা মশলা মিশাইবার সময় সতর্কতার সীমা থাকে না!

আমাদের দেশে আতস-বাজি তৈয়ারী করিবার জন্য ছেলেমেয়েদের অনুরাগ খুব বেশী। এ অনুরাগ ভালো। তবে কালী-পূজার সময় এই বাজি তৈয়ারী করিতে গিয়া অসতর্কতার ফলে প্রতি বৎসর কত না বিপত্তি ঘটে! যারা বাজি তৈয়ারী করে, তাহাদিগকে খুব বেশী সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়। বাজি তৈয়ারী করিতে বসিয়া তোমাদের প্রতিভা ডাফিল্ড সাহেবের মতো দিব্য-বিকশিত হোক, এই আশায় ডাফিল্ড সাহেবের আতস-বাজি তৈয়ারীর কথা এবং সেই সঙ্গে কয়েকখানি ছবি এই দেওয়ালীর দিনে তোমাদের হাতে উপহার দিলাম।



রোমান্ ক্যাণ্ডেল প্রভৃতি

রকমারি বাজি

পারের মায়া

ওপারে শ্যামল ছোট গ্রামখানি হরণ করেছে মন,
সারাদিন ধরে' পাখীরা শোনায় হারানো দিনের বাণী।
ছায়া-ঘন বনে বিটপী-কুসুম করে কত কাণাকাণি!
সাধ হয় মোর বৃদ্ধ বটের সাথে করি আলাপন।

আকাশের নীলে মিলে গেছে শত শঙ্খচিলের পাখা,
বাঁধা-ঘাটে কাঁদে ভগ্ন সোপান বক্ষে বেদনা বাজে;
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে ছোট ছোট ঢেউ নদী-কিনারার কাছে।
জনহীন পথ গ্রামের ভিতরে চলে গেছে আঁকাবাঁকা।

উদাস হাওয়ায় নুয়ে' নুয়ে' পড়ে পথের ঝুমকো-লতা,
আসে নাকো মাঠে খেলা করিবারে ছেলেরা আগের মত,
আসে না বধূরা গাগরী ভরিতে বাঁধাঘাটে অবিরত,
মুখোমুখি হয়ে' কহে নাকো কেহ দুঃখ-সুখের কথা।

ডোঙ্গার উপরে লগি বেয়ে বেয়ে চলেছি গাঁয়ের পানে,
নাহি দেখা যায় একটি কুটীর পট-ভূমিকার পরে—
বেলা প'ড়ে আসে, সারি সারি ঝোপ শিহরিছে বায়ুভরে,
রাখালের বাঁশী বাউলের গান পশে নাকো মোর কাণে।

বুঝিতে পারি না কেন যে আমার নয়নে অশ্রু নামে।
বিগত যুগের স্মৃতি-সম্পদ খুঁজিতে চ'লেছি গ্রামে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।



৩

কয়েক দিন পরের কথা।

নৈশ-ভোজনের পর সকলে বসিয়া গল্পালাপ করিতেছেন। মিসেস্ গ্রেহামই প্রথমে নিনার কথা তুলিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "নিনাকে নিয়ে আপনারা কি উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে এসেছিলেন ?"

মিসেস্ সিংহ। ওর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়—এইরূপই ইচ্ছা ছিল।

মিসেস্ গ্রেহাম। আমার জানতে আগ্রহ হয়—আপনারা কি ব্রাহ্ম ?

মিসেস্ সিংহ। না আমরা হিন্দুই আছি; আমাদের ইংলণ্ডে আসতে দেখে আপনি বোধ হয় মনে ক'রেছেন আমরা ব্রাহ্ম, কিন্তু আজকাল বাঙ্গালী হিন্দুদের অনেকেই সমুদ্রপারে যাচ্ছেন; এ বিষয়ে হিন্দু সমাজ এ-কালে যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করছে।

মিসেস্ গ্রেহাম। তা বটে; কিন্তু হিন্দুর ঘরে এত-বড় অনূঢ়া মেয়ে এ-কালে তো বেশী দেখা যায় না! এক শেলীকে দেখছি, আর দেখছি আপনার নিনাকে।

মিসেস্ সিংহ। ঠিক মনের মতন বর পাইনি কি না, তাই নিনার বিয়ে এখনও দিতে পারিনি;—ইচ্ছা আছে, এইবার শীতকালেই ওর বিয়েটা দিয়ে ফেলব। উপার্জ্জনক্ষম বিলাত-ফেরত ছেলেরই সন্ধান করছি।

মিসেস্ গ্রেহাম। সে রকম অবিবাহিত ছেলে তো এই জাহাজেই একটি আছে; মানে—মিষ্টার দত্ত, ছেলেটিকে তো বেশ ভালই মনে হয়···

নিনা এতক্ষণ বসিয়া সুযোগ খুঁজিতেছিল—কি করিয়া তাহার বিবাহের প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িবে। মিসেস্ গ্রেহামের কথা শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মিষ্টার ডাট্ চিরকুমার। তা ছাড়া, তাঁর যে মেজাজ! কোনও মেয়ে স্বেচ্ছায় তাঁকে বিয়ে করতে চাইবে, এমন তো মনে হয় না।"

মিসেস্ গ্রেহাম বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তাই না কি? আমি তো দেখি, ছেলেটি ভারি নম্র, আর তার মেজাজও বেশ ঠাণ্ডা।"

প্রসঙ্গটা এইভাবে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মিসেস্ সিংহ প্রমাদ গণিলেন; নিনাকে সুনীলের কথা লইয়া আলোচনা করিতে দিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। তিনি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বলিলেন, "সুনীলের কথা নিয়ে আলোচনা না করাই আমি ভাল মনে করি।"

এই সান্ধ্য-মজলিসে সুনীলের ও হিন্দুকুমারীদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইতেই শেফালী সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। বিনয় বাবুর স্ত্রী সেই সুযোগে তাঁহার নারীসুলভ কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য মিসেস্ গ্রেহামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন, শেলী মেয়েটিও গোঁড়া হিন্দু; তবু এত দিনেও ওর বিয়ে হয়নি যে ?"

মিসেস্ গ্রেহাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বড় শক্ত প্রশ্ন করেছেন! শেলী বলে, বিয়ে ও করবে না। ও আরও বলে, আপনাদের দেশে গ্রামের জনসাধারণ বিনা-চিকিৎসায় দলে দলে মারা পড়ে; বিশেষতঃ ও-দেশের স্ত্রীলোকরা রোগে ভুগে মরবে, তবু পুরুষ-ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাবে না! এ তাদের অসঙ্গত লজ্জা, না কুসংস্কার—তা আমি বুঝে উঠতে পারিনে।"

মিসেস্ সিংহ। ও-কথা কতকটা সত্য বটে, কিন্তু এই সমস্যায় শেলী কি করবে—মানে সে কি করতে পারে ?

মিসেস্ গ্রেহাম্ বলিলেন, "ও কিছু করতে পারবে—

এই আশাতেই তো ডাক্তারী শিখেছিল; আর সেই জন্যই ইংলণ্ডে এসে ডাক্তারী-শিক্ষা শেষ ক'রেছে। ওর ইচ্ছা, এইবার বাঙ্গালা দেশের কোনও গ্রামে গিয়ে বস্‌বে, এবং সেই অঞ্চলের গরীবদের বিনা-পয়সায় চিকিৎসা কর্‌বে।"

এই সকল সংবাদে মিসেস্ সিংহের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। শেফালীর নম্র স্বভাবে অল্প দিনেই তাঁহারা তাহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন: বিশেষতঃ, সে পিতৃমাতৃহীনা, এই সংবাদে তাহার প্রতি করুণায় ও সমবেদনায় তাঁহাদের হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল। সে ডাক্তার হইয়া চিরকুমারী থাকিবে, সে এত রূপবতী ও গুণবতী, তথাপি বিবাহ করিবে না, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়াই তাঁহাদের মনে হইল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "উহার উদ্দেশ্য খুবই মহৎ সন্দেহ নাই; কিন্তু এমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হবে না, এ যেন বিশ্বাস হয় না। ওর তো ঐ-রকম মত; কিন্তু ওর অভিভাবকরা কি বলেন?"

মিসেস্ গ্রেহাম। তা' তো জানি না। বছর-দুই আগে যখন আমরা দেশে আসি, আমাদের বন্ধু ডাক্তার ঘোষ আমাদের হাতে ওর ভার দিয়েছিলেন। এই দু'বছরে ওর স্বভাব-চরিত্রের পরিচয় পেয়ে আমরা এমন মুগ্ধ হ'য়েছি যে, আমার মনে হয়, শেলী কোন দিন যদি বিয়ে করে, তাহ'লে তার স্বামী আপনাকে পরম ভাগ্যবান ব'লেই মনে ক'রবে। ইংলণ্ডে অনেক ছেলেই ওকে বিয়ে কর্‌বার জন্য ভারী আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছিল; তা কেউ ওর কাছে এক বিন্দু উৎসাহ পায়নি: কাউকে ও আমল দিত না; প্রকৃত ব্যাপার যে কি, কিছুই বুঝতে পারিনে! এক-এক বার সন্দেহ হয়, হয় তো ব্যর্থ-প্রণয়ই এর মূল। কিন্তু আমার ধারণা, যুবকরা কখনই ওকে অবিবাহিত থাকতে দেবে না; ওর মত রূপবতী গুণবতীকে বিবাহ করতে কা'র না আগ্রহ হবে?

এ সকল কথা শুনিয়া নিনা বলিল, "শেলীদি'র রূপ-গুণের তুলনা নেই; কিন্তু যদি সুনীলদা'কে সে আকৃষ্ট করতে পারে, তবেই বুঝবো, সত্যিই তার ক্ষমতা অসাধারণ।"

মিসেস্ গ্রেহাম ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু ছেলেদের মন আকৃষ্ট কর্‌বার কোনও চেষ্টাই তো শেলীর নেই! পরীক্ষা করতে হ'লে যুবকদেরই করতে হবে। সুনীল যদি এ জন্য চেষ্টা করে, আর কৃতকার্য্য হয়, তাহ'লে তাকে আমি অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব; মনে করব, সে সত্যই ভাগ্যবান।"

এই সকল আলোচনার পর তাঁহাদের মজ্‌লিস্ ভাঙ্গিয়া গেল; এবং সকলেই স্ব স্ব কেবিনে প্রবেশ করিলেন। সিংহ সাহেব শয়ন করিতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "দেখ, এত দিন আমরা মিছে কাযেই ঘুরে মলুম! নিনাটার মনের এক কোণেও সুনীলের প্রতি প্রণয় জাগেনি, আর সুনীলেরও তাই। নিনা সুনীলের কাছে থাকবার সুযোগ পাবে মনে ক'রেই একটা বছর আমরা বিলাতে কাটালুম। সুনীলের মনের মতন হ'য়েই গড়ে-উঠবে, এই আশায় নিনাকে সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে শিক্ষা দিলুম; কিন্তু এখন দেখ্‌চি, সবই বিফল হ'ল! সুনীল যদি নিনাকে বিয়ে না করে তো কি যে হবে, কিছুই বুঝতে পারছি নে! এ-কালের ছেলেরা শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করতে চায় বটে, কিন্তু মেয়েদের এতখানি আধুনিক ভাবে শিক্ষিতা দেখলে অনেকেই ভড়্‌কে যায় ব'লে আমার মনে হচ্ছে।"

মিসেস্ সিংহ। তুমি বৃথা ভয় পাচ্ছ! তোমার পরম বন্ধুটিকে তুমি কি চেন না? মিঃ দত্ত যে রকম কড়া মেজাজের লোক, তা'তে তাঁর তাড়ায় সুনীলের কোনও আপত্তি টিক্‌বে ব'লে তো মনে হয় না।

বিনয় বাবু। কি ছেলেমানুষের মতো কথা বলো তুমি! তোমার ঐ অনুমান সত্য হ'লে এত দিনেও তিনি সুনীলের মত করাতে পারেননি কেন? সুনীলের স্বভাব নম্র বটে, কিন্তু তার জেদ্ অসাধারণ! বাপের এত টাকা, অভাব কিছুই নেই, তবু সে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের জন্য চাকরী জুটিয়ে নিলে। কে জানে, সে লুকিয়ে বিয়ে করেছে, কি কাউকে ভালবেসেছে কি না।

মিসেস্ সিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমার ঐ রকম অনুমান সত্য ব'লে মনে হয় না। আমার ভয় হয়, ঐ শেলীটাকে শেষে সে আত্মসমর্পণ ক'রে না বসে! ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি, সে যেন শেলীর কাছে কাছে ঘুরতেই ভালবাসে!"

বিনয় বাবু স্ত্রীর উক্তির সমর্থন করিয়া বলিলেন, "শুধু

কি তাই? আমিও বেশ বুঝতে পারি, শেলীকে কাছে পেলে সে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে; আর শেলী তার কাছে না থাকলে তাকে ভারী অন্যমনস্ক দেখা যায়, সে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে। সুনীলের এই রকম ভাবভঙ্গি আমার বড় ভাল মনে হয় না; অন্ততঃ তা' আমাদের সঙ্কল্পের অনুকূল নয়!"

মিসেস্ সিংহ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বীরেন বাবু কোন মতেই শেলীকে বৌ করবেন না। যত বড় সুন্দরীই সে হোক, কোথাকার কে তার নেই ঠিক: পশ্চিমাঞ্চলের একটা সাধারণ ডাক্তারের মেয়েকে বউ ক'রে ঘরে আনবেন—তেমন লোক তিনি নন্। তিনিও কম জেদী না কি?"

বিনয় বাবু অন্য কথা ভাবিলেন: তিনি বলিলেন, "শুধু রূপ-গুণই তো নয়, ওদের সঙ্গতিও যথেষ্ট আছে ব'লেই মনে হয়। তা' না থাকলে কি শিক্ষার জন্য মেয়েটা দু'বছর বিলাতে থাকতে পারতো? না, দেশে ফিরে বিনা-পয়সায় গরীবদের চিকিৎসা করবে ব'লে সঙ্কল্প স্থির করতে পারতো? ঐ সঙ্গে আভিজাত্যও আছে ব'লেই আমার মনে হয়! সন্ধান নিয়ে হয় তো কোন দিক দিয়েই ওকে উপেক্ষা করা চলবে না।"

মিসেস্ সিংহ স্বামীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি যে হবে, কি ক'রে বলি? তা যাই হোক, আমি কিন্তু সহজে হা'ল ছাড়ছিনে; সুনীলকে জামাই করি, এ আমার অনেক দিনের সাধ। নিনার কি যে বুদ্ধি! সুনীলের সঙ্গে কেবল ছেলেমানুষী আর ফুক্কুড়ী ক'রেই আমোদ পায়!"

বিনয় সিংহ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে বরং ভালই। নিনা তাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করবে, আর সুনীল তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে তার অসহ্য হবে; মেয়েটার জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। সে বড় দুশ্চিন্তার বিষয়! এই জন্যই আমি চাই, সুনীলের আগে মত হোক।"

৪

ভারত মহাসাগর প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে; তাহার দিগন্তব্যাপী বিশাল বক্ষে সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার চিহ্নমাত্র আর বর্ত্তমান নাই। কিন্তু দশ দিন পূর্ব্বে সুনীলচন্দ্রের বক্ষে চিন্তা-তরঙ্গের যে ভীষণ আন্দোলন ও আলোড়নের সূচনা হইয়াছে, এখনও তাহা প্রশমিত হয় নাই; তাহা শান্ত ও সংযত হওয়া দূরের কথা—দিনে দিনে তাহার বেগ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে অধিকতর অশান্ত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে! শেষের কয়েকটি বৎসর তাহার নিস্পৃহ জীবন আনন্দ-সমুদ্ভাসিত না হইলেও তাহার শান্তির অভাব হয় নাই। মধ্যে মধ্যে পিতামাতার পীড়াপীড়িতে, আর একঘেয়ে অনুরোধে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে বিবাহ-প্রসঙ্গের আলোচনায় লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু পরিণীতা পত্নী জীবিত থাকিতে সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে না—তাহার এই সুদৃঢ় সংকল্প ক্রমেই যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল; কারণ, ইহা যৌবনেরই ধর্ম্ম—মানব-প্রকৃতির সংস্কার। সে কিশোর বয়স হইতে আনন্দময়ী নিনার সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিল; তাহার উপর প্রাপ্ত-যৌবনা তরুণী নিনার উদারতা, মধুর ব্যবহার, চরিত্রগত কোমলতা ও সরলতা ক্রমশঃ তাহার মনে স্নেহের আকর্ষণ প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সকল কারণেই সুনীলচন্দ্র পিতা-মাতাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য নিনাকে বিবাহ করিবে, এইরূপ মনোভাবকে কতকটা প্রশ্রয় দান করিয়াছিল। জীবনে সে কখন প্রকৃত প্রণয়ের আস্বাদন লাভ করিতে পারে নাই, সুতরাং নিনাকে জীবনসঙ্গিনী-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গিবিহীন মরুময় কর্ম্মজীবন হয় তো মাধুর্য্যমণ্ডিত হইবে, এই আশাও মধ্যে মধ্যে তাহার হৃদয়াকাশে কৃষ্ণ-কাদম্বিনীর বক্ষ-বিরাজিত সৌদামিনীচ্ছটার ন্যায় আলোক-লেখার বিকাশ করিত। কিন্তু মার্শেই বন্দরে এক নিমেষে তাহার সকল সঙ্কল্প ওলট-পালট হইয়া গেল! সুনীলচন্দ্র সহসা সেই অজ্ঞাত-কুলশীলাকে তাহার মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া বসিল।

শেলীকে প্রথম দেখার পর হইতেই সুনীলের মনে কি ব্যাকুলতা, কি আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রকৃত প্রেমিক ভিন্ন অন্য কেহ তাহা ধারণা করিতে পারিবে না। দিবা-রাত্রি ধ্যানে-জ্ঞানে তাহার একমাত্র চিন্তা, কি করিয়া সে এই তরুণীর পরিচয় সংগ্রহ করিবে। সুনীল জানিত, পরিচয়ের বিশেষ কোন মূল্য নাই; সে ইহাও জানিত যে, কয় দিন পরে বিরহের স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই তাহার সম্বল থাকিবে না; সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী বেদনাই তাহার

শেষ অবলম্বন! তথাপি তাহার প্রাণ কোনও বাধা মানিল না। ক্রমে সুনীল শেলীর পরিচয় পাইল, তাহার সহিত আলাপও হইল; কিন্তু তাহাতে কেবল তাহার তৃষাই বাড়িল। অমৃত-সাগরের কূলে আসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া সেই অমৃত পান করিবার অধিকার তাহার নাই; তাহার প্রেমতৃষ্ণা লক্ষ গুণ বর্দ্ধিত হইল। প্রাণ চায়, কর্ত্তব্য ও ভয় দূর করিয়া এই অমৃতস্রোতে সে ভাসিয়া যায়, কিন্তু তাহার মন প্রহরীস্বরূপ হইয়া পিতামাতার আজ্ঞা, এবং ধর্ম্ম ও সমাজের দাবীর কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নিরপরাধা বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া প্রণয়-সুখ লালসা-স্রোতে কি সুনীল ভাসিয়া যাইবে? কর্ত্তব্য কঠোর বলিয়া কি সে কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইবে? এত দিন স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে তাহার সাহস হয় নাই সত্য, কিন্তু শেষে কি জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সেই পথ সে ত্যাগ করিবে? কে জানে, সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া প্রণয়ের সুখ পাইবে কি না, কিন্তু আজ সে শেলী ভিন্ন জীবন সুখ-শান্তিহীন, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রপ্রতপ্ত শুষ্ক মরুতুল্য মনে করিতেছে। এখন সেই স্ত্রীকে আনিয়া তাহার প্রাপ্য ভালবাসা তাহাকে দিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আর তাহার নাই। শেলীই এখন তাহার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথম প্রেমের প্রচণ্ড আবেগ সুনীলকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

সুনীল চিন্তাকুল চিত্তে নির্জ্জন ডেকের এক প্রান্তে বসিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে উদাস দৃষ্টিতে এক দিকে চাহিয়া আছে—এমন সময় নিনা তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "সুনীলদা', তোমার হ'ল কি বল তো। অসুখ-টসুখ করেছে না কি?"

সুনীল নিনার এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিল, বিরক্তির স্রোত তাহার মনে বহিয়া গেল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া সে সংযত স্বরেই বলিল, "না, ও-সব কিছু নয়।"

নিনা আব্দারের সুরে বলিল, "সে আমি শুনছিনে; কি হ'য়েছে, আমাকে ব'লতেই হবে।"

সুনীল। তোমাকে ব'লে কি ফল? তুমি তো আর তার প্রতিকার করতে পারবে না।

নিনা। রোগটা কি, তা না জেনে কোন ডাক্তারই তা'র প্রতিকার করতে পারে না। আপাততঃ তোমার রোগের প্রধান লক্ষণ দেখছি—থামকা চ'টে ওঠা! একা থেকে থেকে তোমার মেজাজ বড্ড খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে; এর একমাত্র ঔষধ—একটি জীবনসঙ্গিনী গ্রহণ। আমি ব্যবস্থা দিচ্ছি—তুমি শীঘ্র বিয়ে ক'রে ফেল। নৈলে তোমার অবস্থা হবে—'যথারণ্যং তথা গৃহম্।'—নীতি উপদেশ আমার এক-আধটু পড়া আছে।

নিনার সরস বাক্যস্রোতে সুনীলের বিরক্তি ভাসিয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল, "আমার মত বুড়োকে কোন্ তরুণী বিয়ে করবে? আর জানই তো, বিয়ের জন্য পাগলামি একটুও আমার নেই।"

নিনা। অর্থাৎ বিয়ে-পাগলা বুড়োর দলে তুমি ভিড়তে চাও না; তবে যদি শেলীদি'কে পাও—সে আলাদা কথা, অর্থাৎ বর্জ্জিতবিধি! কেমন, এ-কথা ঠিক কি না?

সুনীল শিহরিয়া চারি দিকে চাহিল; তাহার পর কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "ও কি বলছো? সব তাতেই তোমার ফক্কুড়ি! শেলী যদি ও-কথা শুনতে পায় তো কি মনে করবে বল দেখি! সে কি কোনও দিন সে ভাব দেখিয়েছে? এ-সব কথা কা'রও মনে জেগেছে জানলে, হয় তো আমার সঙ্গে মিশতেই তা'র সঙ্কোচ হবে।"

নিনা হাতে তালি দিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; উল্লাসভরে বলিল, "এবার ধরা প'ড়ে গেছ দাদা! তোমার এ রোগের লক্ষণ আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি; এখন আর লুকিয়ে কি হবে?"

সুনীল কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখ ভার করিয়া বলিল, "কি আমার ডাক্তার রে! মুখ দেখেই রোগ ধ'রে ফেল্লেন।"

নিনা। অমন ক'রে একলা ব'সে চাঁদের পানে চেয়ে থাকলে, আর আমোদ-প্রমোদ সব ত্যাগ ক'রে শেলীদি'র সঙ্গে আলাপে মশ্‌গুল হ'য়ে থাক্‌লে, কে না বুঝতে পারে? কথায় বলে, যেখানে ব্যথা—সেখানে হাত!

সুনীল তাহাকে জেরা আরম্ভ করিয়া বলিল, "এই তো সে-দিন তুমিই বল্লে, আমি চিরকুমার।"

নিনা। তা হোক্; আর আমায় ছেঁদো কথায় ভোলাতে পারছ না কিন্তু।

সুনীল। যা' খুসী ভাবো গিয়ে যাও; তবে আমার অনুরোধ, তোমার এই ডাক্তারী বিদ্যেটা আর বেশী ফলিও না। শেলীকে তোমার খেয়াল-মতো কিছু বলতে যেও না। সে বড় বিশ্রী হবে, এটা মনে রেখো।

নিনা। আচ্ছা, ঠাট্টা থাক; একটা কাযের কথা বলি শোন, হেসে উড়িয়ে দিও না। আমার মনে হয়, শেলীদিকে বিয়ে করলে তুমি সত্যিই সুখী হ'তে পারবে। তোমরা দু'জনে যখনই এক সঙ্গে বেড়াও, তখনই আমার মনে হয়—যেমন চেহারায় তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে, তেমনই তোমাদের দু'জনের মনের মিলও যেন তোমাদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে। সত্যি, তোমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করবার শক্তি কতকটা লোহা আর চুম্বকের শক্তির মতনই।

সুনীল। চমৎকার ঘটকালি করতে শিখেছ! আমাকে না হয় ব্যাধিগ্রস্ত দেখ্‌লে, কিন্তু শেলী যে বিয়ে করতে চায়, এর লক্ষণটা দেখ্‌লে কোথায়? শুনেছ তো, তার জীবনের সঙ্কল্পের কথা? আমার মধ্যে এমন কি অসাধারণত্ব আছে বল, যা'র আকর্ষণে সে এত-বড় মহৎ সঙ্কল্প ছেড়ে আমাকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে?"

নিনা প্রগল্‌ভতা ত্যাগ করিয়া চিন্তিত ভাবে বলিল, "শেলীদির কিছুই বোঝা যায় না, সত্যি! যখনই তা'কে তোমার কাছে দেখি, মনে হয়, তুমি চেষ্টা ক'রলেই তা'কে নিজের মতে ফিরাতে পার,—কিন্তু আমার এ ধারণার কারণ জিজ্ঞেসা করলে তা তোমাকে বলতে পারব না।"

সুনীল শুষ্ক হাস্যে বলিল, "শেলী তোমায় ভালবাসে কি না, তাই আমার প্রতিও একটু করুণা প্রকাশ করে।"

নিনা এবার মুরুব্বির ভঙ্গিতে বলিল, "ছেলেমানুষী করো না। আমি বলি, তুমি চেষ্টা ক'রে দ্যাখো। একা থেকে এ-ভাবে তোমার জীবনটা নষ্ট করা ভাল হচ্ছে না। আর তো ক'দিন পরেই বোম্বে পৌঁছে যাবে; তখন আর শেলীকে পাবে কোথায়? এরই মধ্যে একটা ঠিক ক'রে ফেল।"

কথা শেষ করিয়া নিনা সুনীলকে ডেকের আমোদ-প্রমোদের আড্ডায় লইয়া গেল। সেই রাত্রে সুনীল শয়ন করিয়া একটা বিষয়ে কতকটা স্বস্তিবোধ করিল। বহু দিন হইতেই সিংহ সাহেবরা ও তা'র পিতা-মাতা নিনার সহিত তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সে মত দিতেছে না। ইহা সে বিষম সমস্যা বলিয়াই মনে করিতেছিল। যদিও তাহার মনের কোণে নিনার প্রতি স্নেহ ছাড়া অন্য কোনও ভাব ছিল না, তথাপি তাহার অনেক বারই ভয় হইয়াছে, পাছে নিনার মনে তাহার প্রতি প্রণয়ের উদ্রেক হয়। আজ সে বুঝিতে পারিল, তাহার সে ভয় অমূলক; নিনা তাহাকে দাদার মতই দেখে। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া সুনীল নিশ্চিন্ত হইল। সে স্থির করিল, এইবার বাড়ী ফিরিয়া সে তাহার পিতা-মাতাকে জানাইবে, তাহাদের পরস্পরের বিবাহ হওয়া অসম্ভব। যদি তাহাকে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম পালন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণীতা পত্নীকে বরণ করিয়া সে গৃহে আনিবে; আর যদি হৃদয়ের কামনা পূর্ণ করিতে হয়, তবে শেলীকে লাভ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; তাহার হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে শেলী ভিন্ন অন্য কাহারও স্থান ছিল না।

৫

অর্ণবপোতে সমুদ্রযাত্রার শেষ-রাত্রি সমাগত। পরদিন প্রভাতে জাহাজ বোম্বাই-বন্দরে ভিড়িবে। ডেকের উপর আজ যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে; যুবক-যুবতীরা নৃত্যানন্দে বিহ্বল। প্রবীণ-প্রবীণারা তরুণ ও তরুণী আরোহীদের যৌবনের এই লীলা-রঙ্গ সন্দর্শনে প্রথম যৌবনের মধুর স্মৃতি উপভোগ করিতেছেন। বাঙ্গালী আরোহীরা সকলেই সেখানে উপস্থিত, কেবল শেফালীই সে দলে নাই। ডেকের নিভৃত পূর্ব্ব-অংশে চন্দ্রালোকে একাকিনী বসিয়া শেফালী বিহ্বল চিত্তে কয়েক দিন পূর্ব্বের ঘটনাবলীর আলোচনা করিতেছে। তাহার ব্যর্থ-জীবন সার্থক করিতে সে কত পরিশ্রম করিয়াছে; তাহার অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে—আর্ত্তের ও পীড়িতের সেবায়। তাহার সেই বিবাহের অভিনয় ও শ্বশ্রূকুলের অবজ্ঞা সে ভুলিতে চাহে; প্রণয়-সুখ যখন তাহার ভাগ্যে নাই, তখন কেন এই প্রলোভন, কেনই বা আশার এই কুহক-লীলা? এত দিন তো স্বামী তাহার শুধু অতীতের স্মৃতির ন্যায় কল্পনালোকে বিরাজিত ছিল; তখন আত্মাভিমান ছিল, কিন্তু তৃষা ছিল না। উপেক্ষিতার

সে ছিল, কিন্তু এখন যে সে বাঞ্ছিতাও বটে ;—সত্য তাহার স্বামী তাহাকে স্ত্রী বলিয়া জানে না, কিন্তু জানিলে গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ না করিতেও পারে ; কিন্তু তাহার ব্যবহারে ও মনের ভাবে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে শেফালীকে ভালবাসে। নিয়তির এ কি কঠোর উপহাস ! যে স্বামীর পদসেবাই তাহার প্রাণের কামনা, যাহার রূপ ও গুণে সে আজ মুগ্ধ, তাহাকেই আজ পরপুরুষের মত দূরে রাখিতে হইতেছে ! শেফালী ছাত্রজীবনে বহু যুবকের সহিত পরিচিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার মনের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে নাই ; সুনীলকে দেখিয়া-অবধি কেন তাহার প্রাণ বুদ্ধি-বিবেকের সীমা লঙ্ঘন করিয়া এমন উচাটন হইয়া উঠিয়াছে ? কোথায় আজ তাহার কুলাভিমান, কোথায় বা সেই তেজস্বিনী বালিকার সুদৃঢ় সঙ্কল্প ? এই প্রণয়ের জাগরণে তাহাকে কি চিরদুঃখিনী হইতে হইবে ?

আর সুনীলও অদ্ভুত লোক ! সে যদি শেফালীকে গ্রহণ না করিবে, তবে এত দিনেও আবার বিবাহ করিল না কেন ? নিনার মত রূপবতী, গুণবতী তরুণীকে সে সহজেই পাইতে পারে, তথাপি সে কর্ম্মস্থানে কেন নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করে ? আর সে সদা-প্রফুল্লা সুরসিকা নিনার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াই বা কেন গম্ভীরপ্রকৃতি শেলীর সাহচর্য্যের পক্ষপাতী ? শেলী তো কোনও দিন তাহাকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই ; তবে কেন তাহার এই আগ্রহ ? প্রত্যহ প্রত্যুষে শেলীর অনুসন্ধানে ডেকে আসিয়া নিভৃতে কেন তাহার সহিত মিশিবার চেষ্টা ? প্রভাতেই তো তাহাকে শেলীর নিকট বিদায় লইতে হইবে। তাহার পর কি হইবে ? এই চির বিদায়ের পর শেলীর মধুর স্মৃতিই কি তাহার অবশিষ্ট জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইবে ?

নৃত্যগীতের মধ্যে সুনীল অন্যমনস্ক; এত লোকের মধ্যে থাকিয়াও তাহার সকলই শূন্য মনে হইতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিল, কোথাও সে তাহার মানস-প্রতিমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। সকলেই সেখানে আছে, কেবল শেলীই নাই। অল্পক্ষণ পরে এই সুখ আমোদ-প্রমোদ সুনীলের অসহ্য হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া গেল—শেলীর সন্ধানে। অস্ফুট চন্দ্রালোকে সাশ্রুনয়না নতমুখী শেফালীর সন্ধান মিলিল। সেখানে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সুনীল ব্যথিত হইল। সে ভাবিল, যে এত সুন্দরী, তাহার এইরূপ মনক্ষোভের কারণ কি ? তাহার জীবনে কি কোন শোকের ইতিহাস আছে ? তাহার ব্যথার ব্যথী কি কেহই নাই ? কেহ কি তাহার সুপ্ত জীবনে নব জাগরণ দিতে পারে না ? কয়েক মিনিট দূর হইতে শেলীর দিকে চাহিয়া-থাকিয়া সুনীল তাহার নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "মিস্ মিত্র !"

সচকিত ভাবে শেলী মুখ তুলিয়া বলিল, "আপনি ? আপনি এখানে এলেন যে ? নাচ তো এখনও চল্‌ছে, তবে সেখান থেকে কি জন্য উঠে এলেন ?"

কম্পিত স্বরে সুনীল উত্তর দিল, "আমরা সকলে আপনাকে খুঁজছিলুম; আপনারই খোঁজে এসেছি। আপনি একলা দাঁড়িয়ে—ও কি, কাঁদছেন ?"

শেলী কিঞ্চিৎ চকিত ভাবে বলিল, "না, কাঁদিনি তো। স্থির সমুদ্রে চন্দ্রালোকের অপূর্ব্ব শোভা দেখে আনন্দে বোধ হয় চোখে জল এসেছিল ! সমুদ্রের এই শান্তরূপ আমার বড় ভালো লাগে,—কি গভীর, অথচ কত শান্ত !"

সুনীল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "আমার আর নাচ ভাল লাগ্‌ল না। এমন সুন্দর চাঁদের আলো, স্নিগ্ধ আকাশ, স্থির সমুদ্র,—এ দৃশ্য ছেড়ে আর আমি ও-দিকে যাব না। আপনার আপত্তি না থাকলে এখানেই খানিক থাকতে চাই।"

শেফালী নীরব রহিল। সে কি বলিবে? সুনীল তাহার স্বামী, কয় দিন পূর্ব্বে তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইয়া এত দিন পরে সে অন্তরে তাহাকে নূতন করিয়া বরণ করিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে ; কিন্তু যদি তাহাকে অপমানিত হইতে হয় ! সে স্থির করিল, তাহার বংশের অমর্য্যাদা সে করিবে না।

কয়েক মিনিট কেহই কোন কথা বলিল না। তাহার পর সুনীলই প্রথমে বলিল, "এই জাহাজে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কেটেছে।"

শেলী কোন উত্তর দিল না, সে নির্ব্বাক্। সুনীল আবার বলিল, "মিস্ মিত্র, আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখ্‌বেন ?"

শেলী শিহরিয়া উঠিল ; এ কি মরীচিকা, না জীবনে

বসন্তের প্রথম আভাস ?—সে কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি অনুরোধ আপনার ?"

সুনীল কোমল স্বরে বলিল, "আপনার ঠিকানাটা আমাকে দেবেন কি ? মানে—যেখানে আপনি থাকবেন ?"

শেলী এক মুহূর্ত্তে মানসিক দুর্ব্বলতা দমন করিয়া কহিল, "আমার ঠিকানা নিয়ে কি লাভ ? আমি কখন্ কোথায় থাকি, তার তো স্থির নেই।"

সুনীল অনুনয়ের সঙ্গে বলিল, "যদি আপনার অনুমতি পাই তো আপনি দেশে ফিরে যেখানেই থাকুন, আমি আবার দেখা কর্‌ব আপনার সঙ্গে। এটা সত্যিই আমার আন্তরিক কামনা।"

শেলী একটু বিপন্ন হইয়া বলিল, "বাংলা দেশের কোন দুর্গম পল্লীগ্রামে আমাকে থাকতে হবে ; সেখানে যাওয়ার কষ্ট কেন আপনি সহ্য করবেন ?"

সুনীল মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "হ'লই বা দুর্গম পল্লী-গ্রাম, সে তো মানুষের অগম্য স্থান নয় ; আশা করি, আমাকে বঞ্চিত ক'রবেন না।"

শেলী কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "আমার সন্ধান আগ্রায় ডাক্তার ঘোষের কাছে সব সময়েই পাবেন ; কিন্তু তা'তে আপনার কি লাভ হবে ? আমাদের জীবনের ধারা ভিন্নমুখী—তা তো আপনি জানেন।"

সুনীল ও-কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "আগ্রায় কি আপনি যাবেন ?"

শেলী মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া বলিল, "হাঁ, দেশে ফিরবার আগে প্রথমে একবার আগ্রা ও এলাহাবাদ ঘু'রে যাব। আর প্রতি বৎসরই অল্প কয়েক দিনের জন্য এক-এক বার আগ্রায় আমাকে যেতেই হবে।"

সুনীল। আগ্রায় ডাঃ ঘোষের ওখানে যাবেন, তিনি কি আপনার কোন আত্মীয় ?

শেলী মুখ তুলিয়া বলিল, "তিনি পরম হিতৈষী ; বাবার তিনি পরম বন্ধু ছিলেন।"

সুনীল নোট-বহি বাহির করিয়া ডাঃ ঘোষের ঠিকানাটি লিখিয়া লইয়া শেলীকে আবার জেরা করিল, "আর এলাহাবাদ যাবেন বল্‌লেন, সেখানে কে আছে ?"

শেলী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দাদার কাছে যাওয়ার দরকার হবে।"

কথাটা বলিয়াই শেফালীর মনে হইল—উহা সুনীলের নিকট প্রকাশ করা ভাল হইল না। তাহার আশঙ্কা হইল, কথায় কথায় তাহার দাদার নাম প্রকাশ হইলে তাহার সকল সতর্কতাই বিফল হইবে। তাই কথাটা গোপন করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "দাদা ও বৌদি' আমায় বড্ডই ভালবাসেন, কিন্তু আমি আমার জীবনের ব্রত ত্যাগ ক'রে তাঁদের তো গলগ্রহ হ'তে পারবো না। তবু তাঁদের সঙ্গে এত দিন পরে একবার দেখা করাই উচিত ; দেশে ফিরেছি, না গেলে তাঁদের মনে বড়ই কষ্ট হবে। আর আপনাকেও তো কল্‌কাতায় যেতে হবে—আপনার মা-বাপের সঙ্গে দেখা করতে ?"

সুনীল হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, আমি সোজা টুণ্ডলায় চ'লে যাব ; টুণ্ডলাই আমার কর্ম্মস্থান কি না।"

শেলী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "সে কি ? এত-দিন পরে দেশে ফিরলেন, আপনার মা-বাবা আপনাকে দেখবার জন্য কি খুব ব্যস্ত হবেন না ? আপনি দেশে ফিরে তাঁদের সঙ্গে দেখা না ক'রলে তাঁরা মর্ম্মাহত হবেন যে !"

সুনীল মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমিও তাঁদের দেখবার জন্য যে কম ব্যাকুল, তা' নয় ; কিন্তু যে কারণেই হোক, তাঁদের সঙ্গে দেখা করি, এতটুকু সাহস আমি সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারিনি।—অবিশ্যি, এটা আমার পরম দুর্ভাগ্যই বল্‌তে হবে।"

শেলী এ-কথা শুনিয়া কি ভাবিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার সুমধুর হাস্যধ্বনি সুনীলের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিল। সহসা যেন তাহার মনের সংযমের বাধা টুটিয়া গেল ; সে আবেগভরে বলিল, "কি মিষ্টি আপনার হাসি ! আপনার এমন প্রাণখোলা মধুর হাসি এ পর্য্যন্ত আর কোনও দিন শুনিনি। আমার মনে হ'চ্ছে, যাঁর হাসি এমন মিষ্টি, তিনি কি কারণে সব সময় গম্ভীর হ'য়ে থাকেন ? আপনার সঙ্গীদের মনে আনন্দদানের জন্য আপনার সর্ব্বদা হাসাই উচিত।"

লজ্জায় শেলীর মুখ আরক্তিম হইল ; কিন্তু সে সুনীলের বাক্য-স্রোতে বাধা দিয়া বলিল, "থাক্, থাক্, —তোষামোদে আপনি যে মস্ত ওস্তাদ, তা বেশ বুঝতে

পেরেছি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, আপনি গম্ভীর প্রকৃতি স্বাধীনচেতা পুরুষ। এখন আপনার এই বালক-সুলভ স্বভাবের পরিচয় পেয়ে,—বাপ-মাকে আপনি এত ভয় করেন তা শু'নে না হেসে কি থাকা যায়? এমন কি অন্যায় কায আপনি ক'রেছেন যে, ভয়ে তাঁদের কাছ-থেকে দূরে পালিয়ে থাকাই দরকার মনে ক'রছেন?"

সুনীল একটু ভাবিয়া বলিল, "ইচ্ছা হয় সব কথাই আপনাকে খু'লে বলি, ব'লে মনের ভার পাতলা করি; কিন্তু সে সব কথা আপনাকে যে ব'লবার নয়! যদি কোন দিন সম্ভব হয়, তো আপনাকে সব কথাই বলব, আর বলবার জন্যে—যত দূরেই থাকি, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা ক'রব। আমি সত্যিই মাঝে মাঝে নিতান্ত প্রগল্ভ বালকের মতোই ব্যবহার করি; ভগবান আমাকে চরিত্রের দৃঢ়তা দেন, মনে বল ও সাহস দেন, এইটুকু আমি তাঁর কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা ক'রছি। কর্ত্তব্য পালনে আমি অকুণ্ঠিত সাহস পাই, এইটাই আমার একান্ত কামনা।"

সুনীল আর কোন কথাই বলিতে পারিল না; তাহার কণ্ঠরোধ হইল; কাতর নয়নে সে চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রশান্ত জলধি-বক্ষে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

তাহার মনোভাবের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া শেফালী ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখনই তাহার প্রাণাধিক প্রিয়তমের নিকট নিজের পরিচয় দিতে তাহার আগ্রহ—আকিঞ্চন প্রবল হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই আবার অভিমান আসিয়া তাহার এই সঙ্কল্পের পথ রুদ্ধ করিল। বিবাহ-রাত্রিতে স্বামীর সেই বিরাগভরা কঠোর ব্যবহার, তাহার অবজ্ঞাপূর্ণ প্রত্যাখ্যানের সুস্পষ্ট কথাগুলি তখনই স্মরণ হইল, এবং তাহা সুতীক্ষ্ণ কণ্টকের মতো তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিল। সে একবার ভাবিল, হয় তো কর্ত্তব্য-পথ বলিতে সুনীল নিনাকে বিবাহ করিবার কথাই বুঝিয়াছে।—সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছে, সুনীলের পিতা-মাতার একান্ত ইচ্ছা, নিনার সহিত তাহাকে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

সুনীল মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "বহু বৎসর ধ'রেই এই সাহসটুকু আমি কামনা ক'রেছি; কিন্তু কর্ত্তব্যপালনের সাহস এখন পর্য্যন্ত আমি সঞ্চয় ক'রতে পারিনি। তার ওপর ভগবান আমায় আবার এই নূতন সমস্যায় ফেলেছেন; জানি না, কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে এবং কখনো সম্ভব হবে কি না।"

এ-কথা শুনিয়া শেফালী হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। তবে কি সুনীল তাহার পরিণীতা পত্নীরই প্রতি তাহার কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত করিল? সেই জন্যই কি এত দিন ধরিয়া সে বিবাহ না করিয়া সুখ-শান্তিহীন, কঠোর, নিসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছে? এই জন্যই কি সে নিনার মত রূপে-গুণে অলঙ্কৃতা বাঞ্ছিতারও পাণিগ্রহণে সম্মত হইতে পারে নাই? তাহার এই নূতন সমস্যা কি শেলীরই প্রতি তাহার প্রণয়-সঞ্চার? তাহার এই চিন্তার কারণ যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শেফালীর এখন কর্ত্তব্য কি? শেলীর অজ্ঞাতসারেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে তড়িত-প্রবাহের ন্যায় যেন আনন্দ-শিহরণ অনুভূত হইল। তাহার প্রস্ফুটিত কমলদল তুল্য মুখমণ্ডল গভীর আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

শেলীর মুখের এই অপরূপ কান্তি আর এক জন দেখিতে পাইল;—সে নিনা। নিনা যে অল্পকাল পূর্ব্বে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা শেলী বা সুনীল লক্ষ্য করে নাই। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; একটু অগ্রসর হইয়া হাসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি? তোমরা দু'জনে মুখোমুখী হ'য়ে কল্প-লোকে ভ্রমণ ক'রছ না কি? পাঁচ মিনিট কাল ঠায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু তোমাদের কা'রও সে-দিকে খেয়াল নেই! সুনীলদা', এইবার কর্ত্তব্য-পালনটা তাড়াতাড়ি ক'রেই ফেল না। এই মধুর চাঁদিনী রজনীতে, সমুদ্রের বুকে এই জাহাজেই প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হ'য়ে যাক। শেলীদি', তোমাকে 'বউদি' ব'লে ডাকতে পারি? আমার দাদাটির অবস্থা তো ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক দেখ্‌ছি—প্রেমের খ্যাপলা-জালে একদম আটক! কবি ব'লেছেন—'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে? গরব সব হায়, কখন টুটে যায়, সলিল ব'য়ে যায় নয়নে।'—প্রেমের খেলা এমনই খেয়ালী বটে!"

শেফালী নিনাকে তৎক্ষণাৎ বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া সস্নেহে বলিল, "আচ্ছা পাগলী দেখছি তো! এক নিশ্বাসে

এত কথা ব'লতে তোমার হাঁপ লাগেনি? আর তোমার কল্পনাও খুব উর্ব্বর বটে, এই অল্প সময়েই অনেক-কিছু আবাদ ক'রে ফেলেছে!"

সুনীল নিনার মুখের দিকে চাহিয়া নীরস স্বরে বলিল, "নিনা, সব সময় তোমার ঠাট্টা! তোমার ও-রকম রঙ্গ আমার ভাল লাগে না। তুমি যা ভাবছো, তা কিন্তু নয়। জাহাজের সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করা তো দোষের নয়, দোষ তোমার চোখের।"

নিনা হাসিয়া বলিল, "অত চটছো কেন, দাদা? আমি কি না এলুম তোমাদের সঙ্গে মিশে একটু আনন্দ করতে, আর তুমি অরসিকের মত রেগেই টং! আমি তো আর ঘাস খেয়ে এত-বড়টা হইনি, কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আমার ঘটে আছে বৈ কি! তা আমি আসায় তোমাদের প্রেমালাপে যদি ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে, তবে আমি না হয় খ'সে প'ড়ছি। কি বল, শেলীদি'?"

শেফালী নিনাকে সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমারও কি দাদার ওপর ও-রকম অভিমান করা উচিত? হয় তো ওঁর মনটা এখন ভাল নেই; কি যেন উনি ভাবছেন। এস, আমরা এই চাঁদের আলোয় ব'সে গল্প করি, আজকার এই রাত্রিটুকু আনন্দে কাটাই। আমাদের সমুদ্রযাত্রার আজই তো শেষ, এ-জীবনে আর আমাদের দেখা হবে কি না, কে জানে?"

নিনা ব্যগ্রভাবে শেফালীর মুখ চাপিয়া-ধরিয়া আগ্রহ-ভরে বলিল, "দেখ শেলীদি', ও-কথাটি আর একটিবারও মুখে এনো না, ভাই! কিছু দিন বেঁচে থাকলে তোমাতে আমাতে আবার দেখা হবেই। তুমি যেখানে থাক, আর আমি যখন যেখানেই থাকি,—বছরে বেশী না হোক, একবারও তোমার সঙ্গে দেখা করব দিদি! আমি যাকে ভালবাসি, তাকে কখনও ভুলিনে; ছিনে-জোঁকের মতন তাকে ধ'রে থাকি, ছাড়িনে।—আকাশে সূর্য্য, আর সরোবরে পদ্ম, লক্ষ যোজন দূরে থাকলেও তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে; আর আমরা দু'জনে থাকবো তো বাঙ্গালা দেশেই।"

শেফালী হাসিয়া বলিল, "কথাগুলা তোমার ভাই খুবই মিষ্টি লাগ্‌ল; কিন্তু সংসারের ব্যবস্থা চিরদিন এক-রকম থাকে না। তুমি তো আর চিরদিনই এ-রকম স্বাধীন থাক্‌বে না, তোমার বিয়ে হবেই; তার পর তোমার বর যদি এই নগণ্য লেডী-ডাক্তারটাকে তাঁর বাড়ীতে ঢুক্‌তে না দেন, তখন?"

নিনা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে সব হবে-টবে না; তা' ক'রলে ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে অনর্থ ঘটাবো না? নিজের ঘরে আমি যখন গিন্নী হ'ব, তখন তোমাকে তো আমার বাড়ীতে এনেই আটক ক'রে রাখ্‌ব; সেই বাঁধন কেটে তুমি চ'লে যাবে—তার জো কি? কারও বাধা আমি মান্‌ব না, কক্ষনো না।"

শেফালী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। তখন হয় তো ব'লে ব'সবে, 'এ আপদ কোথা থেকে এসে জুটলো, বিদেয় হ'লে বাঁচি'!"

সুনীল এতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে উভয়ের আলাপ শুনিতেছিল, এবং মন সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নিনা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া স্বপক্ষে যে সকল কথা বলিল, তাহা শুনিয়া সুনীল বলিল, "এ তো তোমার এক-তরফা মন্তব্য হ'ল, নিনা! ধর, যদি মিস্ মিত্রেরই বিয়ে হ'য়ে যায়, আর ওঁর স্বামী-রত্নটি যদি ওঁকে মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষুর আড়াল করতে না চান, তাহ'লে তখন কি করবে তুমি? তাঁর ওপর তোমার তো আবদার খাটবে না।"

নিনা আবদারের সুরে বলিল, "ইস্, ছাড়বেন না বৈ কি! আমি তাহ'লে তাঁর সঙ্গে হাতাহাতি ক'র্‌ব না? শেলীদি'! আমি ভাই এখন থেকেই ব'লে রাখছি, কা'রও কোন বাধা আমি মান্‌ব না; তুমি কিন্তু তাঁকে আগে থেকেই সাবধান ক'রে দিও—তা তিনি যিনিই হোন।"

শেলী আবার খল-খল করিয়া মধুর হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই ভাই, আমার আর বিয়ে হবে না। বিয়ে আর আমি ক'রব না—এ তুমি ঠিক জেনে রাখ, নিনা!"

নিনা এই 'আর'এর মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অবিশ্বাসের সুরে বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বিয়ে তোমার হবে না, তা তুমি জেনে রেখেছ! দেখো, ঠিক একটি বচ্ছরের মধ্যেই তোমার বর এসে তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে, আর বল্‌বে—'দেহি মে পদপল্লবমুদারং'—এ কথা আমি বলে দিচ্ছি।"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "উঃ, মস্ত গণৎকার-ঠাকরুণ, সে-কালের সেই খনা আর কি!"

এইরূপ হাস্য-পরিহাসে অল্পকাল পূর্ব্বের সেই বিষাদের মেঘ কাটিয়া গেল। শয়ন-কাল পর্য্যন্ত তিন জনের সহর্ষ আলাপের আর বিরাম ঘটিল না।

সেই রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে নিনা শেলীর কামরায় প্রবেশ করিল, এবং বিদায়কালে শেলীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার দুই গালে চুম্বন দান করিয়া গদগদ স্বরে বলিল, "শেলীদি,' তুমি সুনীলদা'কে প্রত্যাখ্যান করনি তো? ওকে আমি আর কোনও দিন এতখানি বিচলিত দেখিনি! আমার কিন্তু বিশ্বাস, ও তোমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব ক'রেছিল। সত্যি কথা বল আমায়—লক্ষ্মীটি! জান্‌তে আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছে—সত্যি।"

শেলী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি সত্যিই একটি আস্ত পাগল, এতে আর আমার ভুল নেই! তোমার দাদা কোন্ ঘরের ছেলে, তা তো আর আমার জান্‌তে বাকি নেই; আমার মত গেঁয়ো লেডী-ডাক্তারকে বিয়ে করা তাঁর কি মানাবে, না পোষাবে? আর তাঁর বাবা-মা—তাঁরাই বা তাতে রাজী হবেন কেন? তোমার দাদার মনের এক প্রান্তেও এ-কথা স্থান পায়নি—এ-কথা আমি খুব জোর ক'রেই বল্‌তে পারি, নিনা! আর আমিও তো সংকল্প করেছি যে, আর আমি বিয়ে ক'রব না; কারণ আমার পক্ষে তা যে একবারেই অসম্ভব, ভাই! আমার বিয়ের কথা তুমি তোমার মন থেকে মুছে ফেল। বিশেষতঃ, তোমার দাদার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় খুব সম্ভব এইখানেই চিরদিনের মত শেষ।"—শেলী অতি কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া রাখিল।

নিনা অবিশ্বাসের সুরে বলিল, "দেখ শেলীদি', যত বিজ্ঞই তুমি হও, এ বিষয়টা আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশী বুঝি। তুমি নিজেকে যতই নগণ্য ব'লে পরিচিত কর, তোমার চেহারায়, তোমার চাল-চলন ও ব্যবহারে সম্ভ্রান্ত বংশের ছাপ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে। এই লেডী-ডাক্তারীটা তোমার একটা বাহ্যিক খোলস মাত্র, এ-কথা আমি বেশ ভালই জানি। তুমি তোমার প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে রাখবার জন্য যতই চেষ্টা কর, আমাকে তুমি প্রতারিত করতে পারবে না। তোমার আত্মগোপনের বাহ্যিক খোলসটা সকলকে বিস্মিত ক'রে এক দিন খ'সে পড়বে—এ বিষয়ে আমার একরত্তিও সন্দেহ নেই।"

শেলী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "নিনা, তুমি কি জান না, অনেক সময় পাকা জহুরীরও ভুল হয়,—পাকা জহুরীও নকলকে আসল ব'লেই জাহির করে।"

নিনা মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "ও-কথা সত্য হ'তে পারে; আমি কিন্তু ঠিক জানি—আমার ভুল হয়নি। দেশে ফিরে তোমার আসল পরিচয় আমি ঠিক বা'র করব—এ তুমি জেনে রাখো।"

শেলী মুখভার করিয়া বলিল, "কেন? বিনা-পরিচয়ে কি আমাকে মানতে চাও না? সেই জন্যই কি সঙ্গিনী ক'রবার আগে আমার কুল-শীলের খবর চাও—সেইটাই কি তোমার কাছে বড় হ'ল?"

নিনা সোহাগভরে শেলীর গালে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "কি যে বল তুমি! তা তুমি যেই হও, আর যাই হও, চিরদিনই তুমি আমার আদরের দিদি; এ-জীবনে আর তোমাকে ছাড়বো না, তা তো ব'লেই রেখেছি। আসল পরিচয় তোমার আগেও চাইনি, পরেও চাইনে।"

শেফালী এ-কথা শুনিয়া আশ্বস্তা হইল; সে তাহার আত্মপরিচয় গোপন করিয়া জীবন যাপন করিবে, এ সঙ্কল্প সে ত্যাগ করে নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনীলিমা দেবী।



গ্রন্থ-সমালোচনা

ভবদেব-পদ্ধতি

বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক মহাশয়গণ কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতির ভট্ট গুণবিষ্ণুর টীকারই সম্পূর্ণ পক্ষপাতী জানিয়া মৎসম্পাদিত ভবদেব-পদ্ধতির প্রথম সংস্করণে আমি ঐ টীকাই দিয়াছিলাম এবং পুস্তক লেখার সঙ্গে-সঙ্গেই মুদ্রণকার্য্যও আরম্ভ করাইয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃই দেখিলাম, উহাতে অনেক গোলযোগ। তখন কতকগুলা ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িতেও পারিলাম না। যেন তেন প্রকারেণ গোঁজা-মিল দিয়া পুস্তক বাহির করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত বাহির করিতে হইয়াছিল এবং তখন শরীরও নিতান্ত অসুস্থ ছিল বলিয়া তাহাতেও ঐরূপই থাকিয়া গিয়াছে।

গুণবিষ্ণুর টীকা অনেকেই ছাপাইয়াছেন। সম্প্রতি স্কটিশ্ চার্চ্চ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য এম্-এ কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ মহোদয় নানা পুস্তক আলোড়নপূর্ব্বক অতি বিশুদ্ধ ভাবেই উহা সম্পাদন করিয়াছেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে উহা প্রকাশিতও হইয়াছে। উহাতে 'ক' এই সংক্ষিপ্ত নাম দিয়া আমার ভবদেব-পদ্ধতির বহুতর ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি তাঁহার পুস্তকের সংক্ষিপ্ত নাম 'দু' রাখিলাম।

ভট্টনারায়ণের সম্পূর্ণ ভাষ্য সহ গোভিলগৃহ্যসূত্র এত কাল পাওয়া যায় নাই। স্মার্ত্তশিরোমণি স্মৃতিতত্ত্বকার রঘুনন্দনের সংস্কারতত্ত্বেই ভট্টভাষ্যের কিছু কিছু অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম-এ বাগ্‌চি ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ তন্ত্ররত্ন শাস্ত্রী মহোদয় সম্পূর্ণ ভট্টনারায়ণ-ভাষ্য সহ গোভিল গৃহ্যসূত্র সযত্নে সম্পাদন করিয়াছেন। উহা সংস্কৃতগ্রন্থমালার ১৭ নং পুস্তক। উহার পাদটীকাতেও আমার প্রতি কটাক্ষপাত আছে। আমি উহার সংক্ষিপ্ত নাম 'ন' রাখিলাম।

(ক) দু-পুস্তকের উপক্রমণিকায় আমার পুস্তক সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

Though a little less than half of Gunavisnu's commentary Ch Mbh finds place in the work, the numerous emendations freely made by the editor without the support of any manuscript, and the equally unwarranted rejection of passages have detracted very much from the value of the edition.

(খ) প্রাস্তাবিক নিবেদনে লিখিত হইয়াছে—উত্তরবিবাহ-কর্ম্মান্তে অনুমতিবিনিযুক্তে "অন্নং প্রাণস্য পড়্‌বিংশস্তেন বধ্নামি ত্বাসৌ" ইতি মন্ত্রে পরিপাঠিতং বন্ধনার্থকং "পড়্‌বিংশ" পদং শ্রীমচ্ছ্যামাচরণকবিরত্নমহোদয় সম্পাদিতায়ামস্মাভিঃ "ক" ইতি সংক্ষিপ্তনাম্না সঙ্কেতিতায়াং (প্রথমাঙ্কনাবৃত্তৌ ৭৯ পৃঃ, দ্বিতীয়াঙ্কবৃত্তৌ ১১২ পৃঃ, রত্নপ্রভায়াঞ্চ ২৫১ পৃঃ) "ষড়্‌বিংশ"ত্বেন পরিণতং "পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতিরিক্ত" ইত্যেবংরূপয়া ব্যাখ্যয়া সংযোজিতঞ্চ দৃশ্যতে। শ্রীমৎসীতানাথসিদ্ধান্তবাগীশ-শরচ্চন্দ্রকাব্যব্যাকরণতীর্থ-মহোদয়াভ্যাং সম্পাদিতে পুরোহিতপ্রদীপে (১ম খণ্ডে ৭৪ পৃঃ) পুনস্তদেব পদং "পঙ্‌ক্তিংশ"রূপেণ পঠিতম্। মহামহোপাধ্যায়শ্রীমৎ-পরমেশ্বরঝামহোদয়সংশোধিতে অস্মাভির্ম্ম ইতি সংক্ষিপ্তনাম্না সঙ্কেতিতে ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে তস্যৈব পদস্য "পড়্‌বিংশ" ইতি পাঠস্বীকৃত্যা "পচেরচঃ পরো বিশঃ ডুম্ ছন্দসীতি ডুমাগমঃ নিপাতনাদ্ বর্গান্তঃ" ইতি ভাষ্যগ্রন্থো মুদ্রাপিতঃ। মন্ত্রস্যৈতস্যাকর-ভূতে মন্ত্রব্রাহ্মণে অস্মৎসংগৃহীতেষু ত্রিষ্বাদর্শপুস্তকেষু চ পড়্‌বিংশ ইত্যেব পাঠঃ পর্য্যলক্ষ্যত। ইত্যস্মাভিরত্র স এব পাঠো গৃহীতঃ।

(গ) সমাবর্ত্তনে "গন্ধর্ব্বোঽস্যুপাব। উপ মামব।" ইহাই মন্ত্র ব্রাহ্মণের পাঠ। গুণবিষ্ণুর টীকাধৃত পাঠ "গন্ধর্ব্বোঽস্যুপ মা অব।" 'মা অব' স্থলে অসন্ধি থাকায় আমি মনে করিয়াছিলাম—লিপিকর বা মুদ্রাকরাদির প্রমাদে মন্ত্রের ও গুণবিষ্ণুর টীকার পাঠ কিয়দংশে পতিত হইয়াছে। এজন্য মদীয় পুস্তকে মন্ত্রব্রাহ্মণের পাঠই ধরিয়া গুণবিষ্ণুটীকার মধ্যে পতিত অংশে সায়ণভাষ্য দিয়াছি। এই অপরাধে ন-পুস্তকের পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—বিদ্যাবারিধিস্ত আকরগ্রন্থপাঠমেব মূলে সন্নিবেশ্য তদনুসারিণীং গুণবিষ্ণুটীকাং রচয়াম্বভূবেতি তস্য সাহসমেব ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে তাদৃশপাঠানুপলব্ধে-রিতি দ্রষ্টব্যং সুধীভিঃ। ঈদৃশৈরেব রচনাকুশলৈঃ প্রকৃতো গ্রন্থপাঠঃ প্রচ্ছাদ্যতে ইত্যেতদ্ দুর্দ্দৈবং শাস্ত্রগ্রন্থানামিতি।"

এক্ষণে উল্লিখিত উভয় পুস্তকের আলোচনার সহিত স্বীয় পুস্তকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(১) ভবদেব কুশণ্ডিকায় লিখিয়াছেন—"উপর্য্যধঃস্থিতদক্ষিণ-বামমুষ্টিভ্যাং ফলপুষ্পকুশান্ গৃহীত্বা বিরূপাক্ষজপং কুর্য্যাৎ। পরমেষ্ঠী ঋষিঃ রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরোঁ। মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে। বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জি...।

অথ যদি কাম্যকর্ম্মার্থং কুশণ্ডিকা ক্রিয়তে, তদা প্রথমমঞ্জলিং বদ্ধা ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ…তানি প্রপদ্যে, তানি মামবন্তু। ইতি জপ্ত্বা পশ্চাৎ বিরূপাক্ষজপং কুর্য্যাৎ।" তপশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রের সংজ্ঞা প্রপদ। ভবদেব বিরূপাক্ষ মন্ত্রেরই ঋষ্যাদি ধরিয়াছেন, তপশ্চ মন্ত্রের ঋষ্যাদি ধরেন নাই। ঋষ্যাদি ব্যতিরেকেও মন্ত্রপাঠ প্রচলিত আছে; যথা—সঙ্কল্পসূক্ত, শ্রাদ্ধমন্ত্র, নবগ্রহমন্ত্র ইত্যাদি।

হু-পুস্তকে তপশ্চ ইত্যাদি এবং বিরূপাক্ষোঽসি ইত্যাদি দুইটি মন্ত্র একত্র ধৃত হইয়াছে। ভাষ্য—"যজুরিদম্ পরমেষ্ঠী ঋষিঃ রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ।" ইত্যাদি। টিপ্পণী —"মৈ-ক-পুস্তকয়োঃ প্রপদমন্ত্রস্যান্ত ভূরিত্যারভ্য প্রপদ্য ইত্যন্তো মন্ত্রভাগো অনন্তরপঠিতস্য বিরূপাক্ষমন্ত্রস্যাদিমতয়া গৃহীতো দৃশ্যতে।"

ন-পুস্তকের ভট্টভাষ্যেও এইরূপ; যথা—তপশ্চেত্যাদিকং প্রপদং জপিত্বা…বিরূপাক্ষোঽসীত্যাদিকং।বৈরূপাক্ষমারভ্যোচ্ছ্বসেৎ (৪।৫।৮)।

বক্তব্য—'মন্ত্রভাগো অনন্তর' ইহা শুদ্ধিপত্রে ধৃত হয় নাই। গুণবিষ্ণুটীকা দেখিয়া পণ্ডিত, অপণ্ডিত সকলেই কাম্যকর্ম্ম করিবার সময়ে অগ্রে "পরমেষ্ঠী ঋষিঃ" ইত্যাদি বলিয়া তার পর তপশ্চ ও বিরূপাক্ষমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন এবং ভবদেবের প্রকৃত পাঠকে অনেক স্থলে বিকৃতও করিয়াছেন। তপশ্চ মন্ত্রের রুদ্ররূপ অগ্নি ত দূরের কথা, কোনও অগ্নিই দেবতা নহেন। "দেবতা মন্ত্রবাক্যাভিধেয়া" যে মন্ত্রবাক্যের যাহা অভিধেয় (বাচ্য), তাহাই সেই মন্ত্রের দেবতা। অতএব তপশ্চ মন্ত্রের দেবতা তপঃ তেজঃ শ্রদ্ধা ইত্যাদি। "তানি প্রপদ্যে, তানি মামবন্তু" এই অংশে শরণাগতি ও প্রার্থনা উভয়ই আছে; কিন্তু "ভূর্ভুবঃস্বরোঁ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে" এই অংশে কেবল শরণাগতিই আছে, প্রার্থনা নাই; ইহাতে প্রক্রমভঙ্গ দোষ ঘটে। স্মার্ত্ত পণ্ডিত মাত্রেই জানেন—রঘুনন্দন ভট্টভাষ্যকেই সমধিক প্রমাণ মানিয়া সংস্কারতত্ত্বে বহু স্থলে সরলা (গোভিল গৃহ্যসূত্রের প্রাচীন টীকা) ও ভবদেবভট্টের উক্তিকে হেয় বলিয়াছেন। সেই রঘুনন্দন এখানে ভবদেবের উক্তি ভট্টভাষ্যেরই সম্মত হওয়ায় তাহাকে হেয় না বলিয়া লিখিয়াছেন—"চতুর্থপ্রপাঠকস্য পঞ্চমকণ্ডিকায়াং গোভিলঃ—বৈরূপাক্ষং পুরস্তাদ্ধোমানামিতি। বিরূপাক্ষ-শব্দো বিদ্যতে অত্রেতি বৈরূপাক্ষঃ ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরোঁমিত্যাদিকো মন্ত্রঃ।"

(২) হু-পুস্তকে বিরূপাক্ষ মন্ত্রের ভাষ্য—"তথা চ স্মৃতিঃ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ ইতি।" টিপ্পণী—মৈ-ক তথাচ শ্রুতিঃ।

বক্তব্য—'সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ" শুদ্ধিপত্রে নাই। ঐ বচনটি গোভিলপুত্রকৃত-গৃহ্যাসংগ্রহোক্ত বলিয়া স্মৃতিই বটে; কিন্তু গুণবিষ্ণু-পুটীকায় প্রকৃত পাঠ "তথা চ শ্রুতিঃ।" সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং সংশোধন করিয়া "স্মৃতিঃ" লিখিয়াছেন। যেহেতু, রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বে হোমপ্রকরণে গৃহ্যাসংগ্রহ হইতে কর্ম্মবিশেষে অগ্নির বিশেষ নাম উদ্ধৃত করিয়া পরে লিখিয়াছেন—"বিশেষনামাজ্ঞানে গুণবিষ্ণুধৃতা স্মৃতিঃ—সর্ব্বতঃপাণিপাদান্ত…। গুণবিষ্ণুনা তু শ্রুতিরিতি কৃত্বা সর্ব্বতঃপানিপাদান্ত ইতি লিখিতম্।"

(৩) ভবদেব প্রায়শ্চিত্তহোমে শাট্যায়নহোম ধরায় রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—"ভবদেবভট্টোক্ত-প্রায়শ্চিত্তাত্মক-শাট্যায়নহোমো নিষ্প্রমাণঃ ভট্টনারায়ণৈর্গোভিলভাষ্যে (১।৮।১৮) তদপ্রমাণীকৃতত্বাৎ।" কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী শাট্যায়নের উক্ত হোমের ৯টি মন্ত্রের মধ্যে ৪টি মন্ত্র তৈত্তিরীয় আরণ্যকের; তৈত্তিরীয় আরণ্যকই নারায়ণোপনিষদ্ নামে পৃথক্ গ্রন্থ। ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম মন্ত্র কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের; তন্মধ্যে ৫ম মন্ত্রটি সামবেদেও আছে, কিন্তু উত্তরার্দ্ধ অন্যরূপ। ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্র সামবেদেও অবিকলই আছে। ৮ম মন্ত্র তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের; সামবেদেও আছে, কিন্তু প্রথম চরণটি অন্যরূপ। ৯ম মন্ত্রটি কেবল ঋগ্বেদে ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে আছে। ১ম হইতে ৮ম পর্য্যন্ত প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা অগ্নি; সায়ণ-ভাষ্যেও তাহাই আছে।

হু-পুস্তকে ১ম হইতে ৮ম পর্য্যন্ত মন্ত্রের দেবতা ভিন্ন ভিন্ন। ২য় মন্ত্রের পাঠ—"পাহি নো বিশ্ব বেদসে।" ভাষ্য—বৈশ্বদেব্যং যজুঃ। হে 'বিশ্ব' বিশ্বে দেবাঃ 'বেদসে' বেদসঃ অসাঙ্গযজ্ঞজনিত-পাপসমুদ্ভূতায়া বেদনায়াঃ সকাশাৎ 'নঃ পাহি'। বিশ্ব ইতি সামান্যাপেক্ষয়া একবচনম্। বেদসে ইতি বিদ বেদনাখ্যাননিবাসেষু "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্" চতুর্থী পূর্ব্ববৎ (পঞ্চম্যর্থে)।

বক্তব্য—দেবতা অর্থে বৈশ্বদেব হয়, বৈশ্বদেব্য হয় না। পাণিনীয় ধাতুপাঠে "বিদ চেতনাখ্যাননিবাসেষু" আছে; 'বেদনা' কোথা হইতে পাইলেন? সায়ণ—"বিশ্ববেদাঃ; বিশ্ববেদসে কৃৎস্নজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থম্।" বিশ্ববেদাঃ অগ্নির নাম; যথা সংক্ষিপ্তসারে "বিশ্বপূর্ব্বাদ্বিদিভুজেরগ্নৌ। (অস্ প্রত্যয়ঃ) বিশ্ববেদাঃ বিশ্বভোজাঃ অগ্নিঃ।"

(৪) হু-পুস্তকে ৪র্থ মন্ত্র—"সব্যং পাহি শতক্রতো।" ভাষ্য—"হে শতক্রতো" 'সব্যং' সব্যো যাগঃ তত্র ভবং ফলং 'পাহি' বিগুণেঽপি যজ্ঞে যথোক্তফলদো ভব।' ন-পুস্তকের পাদটীকাতেও এইরূপ মন্ত্র ও ঐরূপ ব্যাখ্যা।

বক্তব্য—তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, সুতরাং নারায়ণোপনিষদেও "সর্ব্বং পাহি শতক্রতো।" সায়ণ—শতসংখ্যাকাঃ ক্রতবো যজ্ঞাঃ যেন অগ্নিনা নিষ্পাদ্যন্তে সোঽয়ং শতক্রতুঃ, হে শতক্রতো, সর্ব্বং জ্ঞানসাধনং গুরুশাস্ত্রাদিকং পাহি।" 'শতক্রতু' ইন্দ্রেরই প্রসিদ্ধ নাম। হু-পুস্তকের ভাষ্যে ও ন-পুস্তকের পাদটীকায় উহার কোনও ব্যুৎপত্তি নাই; সুতরাং তাঁহাদিগের মতে উহা ইন্দ্রেরই সম্বোধন। 'সব্যং' পাঠ কোন্ বেদে আছে?

(৫) হু-পুস্তকে ও ন-পুস্তকের পাদটীকায় ৫ম মন্ত্রের পাঠ সম্পূর্ণ সামবেদের।

(৬) ৭ম মন্ত্রের পাঠ সামবেদে "সহ রয্যা।" হু-পুস্তকে "সহর্জ্জা।" ন-পুস্তকের পাদটীকায় সহর্জ্জা ধরিয়া, সামবেদের পাঠ "সহ রয্যা" লিখিত হইয়াছে। সহর্জ্জা পাঠ কোন্ বেদের?

(৭) নবগ্রহহোমে "বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন" মন্ত্রটি ঋগ্বেদে, শুক্লযজুর্ব্বেদে ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে আছে। সর্ব্বত্রই মন্ত্রের তৃতীয় চরণটি "প্রভঞ্জন্ৎসেনাঃ প্রমৃণো যুধা" সায়ণ ও মহীধর—"সেনাঃ দৈত্যানাং সৈন্যানি প্রভঞ্জন্ বিমৃদ্নন্" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। প্রভঞ্জন্-সেনাঃ স্থলে সন্ধি করিলে সকারের আদিতে বিকল্পে ধুট্ (ধ্) আগম এবং স পরে থাকায় ধ্ স্থানে ৎ।

হু-পুস্তকে "প্রভঞ্জংসেনাঃ" ভাষ্য—প্রভঞ্জতাং বিমর্দ্দং কুর্ব্বতাং দৈত্যানাং সেনাঃ।" প্রভঞ্জংসেনাঃ কোন্ বেদের পাঠ?

(৮) শেষ বারের অগ্নিপর্য্যুক্ষণের মন্ত্র—"অদিতেঽনুমংস্থাঃ। অনুমতেঽনুমংস্থাঃ।"

হু-পুস্তকে—"অদিতে অথমংস্থাঃ। অনুমতে অবমংস্থাঃ।" ন-পুস্তকের পাদটীকাতেও এইরূপ।

বক্তব্য—অকারের লোপ না হইবার সূত্র কি ?

(৯) শান্তিমন্ত্র—কয়া ন। কস্ত্বা। অভী যু ণঃ। স্বস্তি ন। এই ৪টি মন্ত্রকেই সকলে শান্তিমন্ত্র বলিয়া জানেন। উহাদের আদিতে ভবদেবপদ্ধতির প্রচলিত বিকৃত পাঠ —"মহাবামদেব্য ঋষিঃ বিরাড্ গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ইহাতে সকলেই বুঝিয়াছেন—উহা ৪টি মন্ত্রেরই ঋষ্যাদি।

ভ-পুস্তকে ভাষ্য—"গায়ত্র্যস্তিস্রঃ [ত্রিষ্টুবেকা] ইন্দ্রদেবতাকাঃ শান্তিকর্ম্মণি বিনিযুক্তাঃ মহাবামদেবদৃষ্টাঃ।" টিপ্পণী—ভ—মৈ—গায়ত্র্যশ্চতস্রঃ। ন-পুস্তকের পাদটীকায়—"বামদেব্যমন্ত্রাস্ত—কয়া ন···। কস্ত্বা···। অভী যু ণঃ···। স্বস্তি ন···।"

বক্তব্য—কেবল ভ—মৈ কেন ? গুণবিষ্ণু টীকার সমস্ত পুস্তকেই, সম্পাদক মহাশয়ের সংগৃহীত সমস্ত আদর্শ পুস্তকেও "গায়ত্র্যশ্চতস্রঃ" আছে ; সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া যে ঐরূপ পাঠ করিয়াছেন, তাহা 'ব্রুকেট্' চিহ্ন দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। মহাবামদেব্য বা মহাবামদেব নামে কোনও ঋষি ছিলেন না। কাত্যায়নের সর্ব্বানুক্রমণীতে কোনও মন্ত্রেরই ঋষি মহাবামদেব্য বা মহাবামদেব নাই। তাহাতে প্রথম ৩টি মন্ত্রের ঋষি বামদেব। 'বামদেবেন দৃষ্টং সাম' এই বাক্যে "বামদেবাড্ ড্যড্ড্যৌ" (৪।২।৯) সূত্র দ্বারা ড্যৎ বা ড্য প্রত্যয়ে বামদেব্য হয়। অতএব 'বামদেব্য' পদটি ঐ সামত্রয়ের বিশেষণ। এইজন্য গোভিল বলিয়াছেন—"অপবৃত্তে কর্ম্মণি বামদেব্যগানং শান্ত্যর্থম্।" ছন্দোগপরিশিষ্টে আছে "অন্তে চ বামদেব্যস্য গানমিত্যথবা ত্রিধা।" তদনুসারে ভবদেবও লিখিয়াছেন—"শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্য-গানান্তং সর্ব্বকর্ম্মসাধারণমুদীচ্যং কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্।" গানের প্রকার-ভেদে বামদেব্য গানই মহাবামদেব্য হইয়া থাকে। উক্ত মন্ত্রত্রয়ের কোনওটারই বিরাট্ গায়ত্রী ছন্দঃ নহে। প্রথমটার শুদ্ধা গায়ত্রী, দ্বিতীয়টার নিচৃৎ গায়ত্রী, তৃতীয়টার পাদনিচৃৎ গায়ত্রী। ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্রের ছন্দঃ দৈবী গায়ত্রী হইলেও সন্ধ্যাপদ্ধতি-কারেরা যেমন কেবল গায়ত্রী বলিয়াছেন, সেইরূপ উক্ত ৩টি মন্ত্রেরও প্রকারভেদের উল্লেখ না করিয়া কেবল গায়ত্রী ছন্দঃ বলা যাইতে পারে। পরন্তু "স্বস্তি ন" মন্ত্রের ঋষি রাহূগণ গোতম (মহাবাম-দেব্য, মহাবামদেব বা বামদেব নহেন); ছন্দঃ বিরাট্স্থানা ত্রিষ্টুপ্ (গায়ত্রী নহে); দেবতা বিশ্বেদেবাঃ (ইন্দ্র নহেন); বিনিয়োগ স্বস্তিবাচনে (শান্তিকর্ম্মে নহে)। গোভিল না বলিলেও ভবদেব জয়ন্তস্বামীর বচন অনুসারে ঋষ্যাদির উল্লেখ না করিয়াই "স্বস্তি ন" মন্ত্রটি ধরিয়াছেন। জয়ন্তস্বামীর বচন যথা—"স্বস্তিবাচনমন্ত্রৈষ্টং সর্ব্বদাভ্যুদয়িককর্ম্মণাম্। আদাবন্তে প্রয়োক্তব্যমিতি মন্ত্রবিদাং মতম্॥" ভ-পুস্তকে "স্বস্তি ন" মন্ত্রেরও দেবতা ইন্দ্র বুঝিয়া ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—'নঃ' অস্মাকম্ 'ইন্দ্রঃ' 'স্বস্তি' শান্তিং 'দধাতু'। কিম্ভূতঃ ? বৃদ্ধশ্রবাঃ' বৃদ্ধাকাকারী ; তথা পূষা, 'বিশ্ববেদাঃ' সর্ব্বজ্ঞঃ। তথা তার্ক্ষ্যঃ, অরিষ্টনেমিঃ' অব্যাহত-গতিপ্রসরাঃ। তথা বৃহস্পতিঃ। 'স্বস্তি নঃ দধাতু'। ভাষ্যকার 'কিম্ভূতঃ ?' বলিয়া যেরূপ পুনঃ পুনঃ 'তথা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে পূষা বিশ্ববেদাঃ ও 'তার্ক্ষ্যঃ অরিষ্টনেমিঃ' মিশ্র বিশেষণ এবং তন্মধ্যে প্রথম দুইটি নিরর্থকই বুঝায় (মানুষ-টানুষ, গরু টরু, চাষা-ভুষা ইত্যাদি স্থলে অন্তপদের ন্যায়); সম্পাদক মহাশয় পৃথক্ পদ বুঝাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে 'কমা' চিহ্ন দিয়াছেন। ইন্দ্রকে বুঝাইবার জন্য 'তার্ক্ষ্য' পদের ব্যুৎপত্তি করা ভাষ্যকারেরই উচিত ছিল না কি ? ভাষ্যের অর্থ বুঝিবার জন্য যাঁহারা অভিধান ঘাঁটিবেন, তাঁহারা নানার্থ মেদিনীকোষে দেখিতে পাইবেন—"তার্ক্ষ্যোঽশ্বশালয়োঃ। গরুড়াগ্রজে সুপর্ণে পুংসি ক্লীবে রসাঞ্জনে॥" ইহাদের কোনটাই ত ইন্দ্রকে বুঝায় না।

(১০) বিবাহে কটপাদপ্রবর্ত্তনে বধূর পাঠ্যমন্ত্র মন্ত্রব্রাহ্মণে এই-রূপ—"প্র মে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্।" তদনুসারে গোভিলসূত্র—পশ্চাদগ্নেঃ সংবেষ্টিতং কটমেবং-জাতীয়ং বাহন্যৎ পদা প্রবর্ত্তয়ন্তীং বাচয়েৎ—প্র মে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতামিতি। গৃহ্যাসংগ্রহে—"পদা প্রপন্থ পন্থানং পতিযানং সং-জপেদ্বধূঃ। বরো বাহত্র জপেন্মন্ত্র-মা কটান্তাদিতি স্থিতেঃ।" সায়ণ—'মে' মম 'পতিযানঃ' পত্যা সহ যায়তে অনেন ইতি পতিযানঃ 'পন্থাঃ' মার্গঃ 'শিবা' শিবঃ কল্যাণকরঃ, 'অরিষ্টা' অরিষ্টঃ বিঘ্নশূন্যশ্চ 'প্রকল্পতাং' সম্পদ্যতাম্। যেন পথা অহং 'পতিলোকং' পতিকুলং 'গমেয়ং' গচ্ছেয়ম্।

ভ-পুস্তকে—"প্র মে পতি যা নঃ পন্থাঃ কল্পতাম্। শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্॥" ভাষ্য— 'নঃ' অস্মাকং পতিঃ 'মে' মদর্থং 'পন্থাঃ' পন্থানং 'প্রকল্পতাং' প্রকরোতু। 'যা' যেন পথা অহং 'শিবা' সুখাবহা 'অরিষ্টা' অহিংসিতা 'পতিলোকং' পতিকুলং 'গমেয়ং' গচ্ছামি। ন-পুস্তকের গোভিলসূত্রে—"প্র মে পতি যা নঃ পন্থাঃ কল্পতাম্।" উহার পাদটীকায় ঐরূপ পাঠ এবং ব্যাখ্যাও ভ-পুস্তকের ন্যায়।

বক্তব্য—মন্ত্রটি বধূ একা বলিবে, তবে 'নঃ পতি' আমাদের পতি, বলিবে কেন ? 'যা' (যে পথ দিয়া) পদটি প্রথম বাক্যের অন্তর্গত, দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়ার সহিত তাহার অন্বয় করা কি দূষণীয় নহে ? কৢপ ধাতু অকর্ম্মক, উহার অর্থ 'করোতু' কিরূপে হইল ? বধূ আপনাকে অনর্থক সুখাবহা (সুখজনিকা) বলিবে কি জন্য ? তা ছাড়া শিব শব্দের অর্থ কি সুখ ? প্রথমে 'নঃ পতি' (আমাদের পতি) বহুবচনে বলিয়া, পরে 'অহং 'গমেয়ং' (আমি যাইব) একবচনে বলিবে কেন ? 'গমেয়ং' আশীর্লিঙের পদ, তাহার প্রতিশব্দ 'গচ্ছামি' লটের পদ কিরূপে হইতে পারে ? বরের বাড়ী যাতায়াতের পথ কি থাকে না ? তাহাকে কি উড়া জাহাজে বিবাহ করিতে যাইতে হয় ? আহা, সে বেচারাকে বধূ লইয়া বাড়ী যাই-বার জন্য কোদাল, কুড়ুল, ঝুড়ি লইয়া পথ প্রস্তুত করিতে যাইতে হইবে ! মন্ত্রব্রাহ্মণের ও গৃহ্যাসংগ্রহের বিরুদ্ধ মন্ত্র যাহাতে আছে, তাহা কি প্রকৃত গোভিলসূত্র ? "প্র মে পতি যা নঃ পন্থাঃ" এরূপ পাঠ কোন্ বেদে আছে ?

(১১) লজ্জা বশতঃ বধূ যদি ঐ মন্ত্র না পড়ে, তাহা হইলে পতিই দুইটি পদের পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ মন্ত্রটি এইরূপে পড়িবে—প্রাস্যাঃ পতিযানঃ পন্থাঃ······গম্যাঃ।

ভ-পুস্তকে—প্রাস্যাঃ পতি যা নঃ পন্থা······ গম্যাঃ।" ন-পুস্তকের গোভিলসূত্রেও ঐরূপ পাঠ। উহার পাদটীকাতেও ঐরূপ পাঠ ও ঐরূপই ব্যাখ্যা।

বক্তব্য—পূর্ব্ববৎ মন্ত্রব্রাহ্মণ ও গৃহ্যাসংগ্রহ-বিরুদ্ধ পাঠই কি গোভিল ধরিয়াছেন ? তাহা হইলে মন্ত্রের অর্থ হয় এইরূপ—আমাদের পতি ইহার পথ প্রস্তুত করুক, যে পথে, হে কন্যে, তুমি পতিগৃহে যাইবে॥

বক্তব্য—পতিদের পতি কোন্ জন ? সে কোন্ গরজে কন্যার পতিগৃহে যাইবার পথ প্রস্তুত করিয়া দিবে ? "প্রাস্যাঃ পতি র্যা নঃ পন্থাঃ" এরূপ পাঠ কোন্ বেদে আছে ?

(১২) সপ্তপদীগমনে—"সপ্ত সপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।" প্রথম সংস্করণে প্রুফ্ দেখিবার ত্রুটিতে 'হোত্রাভ্যো' পদটি মূলে ছিল না, টীকায় ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে মূলেও আছে। দুর্গামোহন বাবু দ্বিতীয় সংস্করণও দেখিয়াছেন (খ)। তথাপি তিনি ১ম সংস্করণের ঐ ভুলটি প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হন নাই।

(১৩) ভোজনহোমের একটি মন্ত্রে পড়্‌বিংশ স্থলে আমি ষড়্‌বিংশ করিয়াছি। তাহা তিনি উপক্রমণিকায় ধরিয়াছেন (খ)। ঐরূপ করিবার কারণ এই যে, ভাষ্যকারেরা ঐ অদ্ভুত পদের অর্থ 'বন্ধন' লিখিয়াছেন, কিন্তু ব্যুৎপত্তি লেখেন নাই বলিয়া আমার সংশয় হইয়াছিল যে, আমার আদর্শ মন্ত্রব্রাহ্মণ-পুস্তকে বহু মুদ্রাকর-প্রমাদের ন্যায় এখানেও ষ স্থানে প হইয়াছে। কেবল আমার নহে, অনেকেরই যে ঐরূপ সংশয় হইয়াছে, তাহা সম্পাদক মহাশয় উপক্রমণিকায় দেখাইয়াছেন। তজ্জন্য ঐ স্থানে কেহ পড়্‌ত্রিংশ, কেহ পড়্‌বিংশ করিয়া যথেচ্ছ ব্যুৎপত্তিও করিয়াছেন। আমি ঐরূপ করিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলাম না। উহার প্রকৃত পাঠ ও ব্যুৎপত্তি জানিবার জন্য বহু অনুসন্ধান করিয়া উভয়ই অবগত হইয়া দুর্গামোহন বাবুর সম্পাদিত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য বাহির হইবার বহু পূর্ব্বেই সায়ণভাষ্য সহ ভবদেব-পদ্ধতির তৃতীয় সংস্করণের জন্য কপি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। সম্প্রতি উহা ছাপা হইতেছে এবং অতিশীঘ্র বাহির করিবার জন্য ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় যে, পুনঃ পুনঃ 'পড়্‌বিংশ' অকারান্ত লিখিয়াছেন, তাহা নহে; উহা অসৃভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। এইজন্যই ভাষ্যকারেরা উহার অর্থ 'বন্ধঃ' না লিখিয়া 'বন্ধনং' লিখিয়াছেন।

(১৪) উপনয়নে ব্রহ্মচর্য্যব্রতারম্ভের ৫টি মন্ত্র আছে। মন্ত্রব্রাহ্মণে তাহাদের পাঠ—"অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তৎ তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যাস-মিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি।" ইত্যাদি।

দু পুস্তকে—"তেনর্দ্ধ্যা সামদমহমনৃতাৎ।"

বক্তব্য—মন্ত্রব্রাহ্মণে যেরূপ পাঠ আছে, ভবদেব সেইরূপই ধরিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যও সেইরূপই ভাষ্য করিয়াছেন। গুণবিষ্ণু কোন্ বেদে তাঁহার লিখিত পাঠ পাইয়াছেন ?

(১৫) সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপনের ৫টি মন্ত্র মন্ত্রব্রাহ্মণে নাই। গোভিলসূত্রে হইতেছে—"সর্ব্বত্রাচারিষং তদশকং তেনারাৎসমুপাগামিতি।" উহার অর্থ—পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপঞ্চকে যেখানে চরিষ্যামি (লৃট্) আছে, সেখানে অচারিষং (লুঙ্) বলিবে। এইরূপ যেখানে তচ্ছকেয়ং (আশীর্লিঙ্) আছে, সেখানে তদশকং (লুঙ্)। যেখানে ঋধ্যাসং (ঋধ আশীর্লিঙ্ যাসম্) আছে, সেখানে অরাৎসং (রাধ্ লুঙ্ অম্)। যেখানে উপৈমি (লট্) আছে, সেখানে উপাগাম্ (লুঙ্ অম্)। তাহা হইলে মন্ত্রগুলি এইরূপ হইবে—"অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তৎ তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎস-মিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাম্।" ইত্যাদি। শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখাতেও এইরূপ দুইটি মন্ত্র আছে; যথা—(আরম্ভে) "অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্। ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি।" (১।৫)। (সমাপনে) "অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তদশকং তন্মে রাধীদমহং য এবাস্মি সোঽস্মি।" (২।২৮)।

দু-পুস্তকে—"অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তৎ তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎং সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাম্।" এরূপ পাঠ কোন্ বেদে আছে ?

(১৬) আমার পুস্তকে যে যে স্থলে গুণবিষ্ণুভাষ্যবিরুদ্ধ আকর-গ্রন্থের পাঠ আছে এবং গুণবিষ্ণুর ভাষ্য যে যে স্থলে আকরগ্রন্থের বিরুদ্ধ, দুর্গামোহন বাবু তত্তৎস্থলে টিপ্পণী করিয়াছেন—"আকরগ্রন্থে মুদ্রাপিতঃ পাঠঃ।" ইহার ভাবার্থ—যাঁহারা সায়ণভাষ্য সহ বেদ ছাপাইয়াছেন, তাঁহাদের সবই ভুল। হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে এবং গুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে যেরূপ পাঠ আছে, তাহাই ঠিক।

বক্তব্য—সায়ণাচার্য্য কি হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক না দেখিয়া ভাষ্য লিখিয়াছেন ? তাঁহার সময়ে ত ছাপাখানা ছিল না। তিনি কি তবে ভবিষ্যদ্দৃষ্টিশক্তিপ্রভাবে মুদ্রাপয়িষ্যমাণ পুস্তকের পাঠ দেখিয়াই ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন ?

কেবল এই ১৬টি মাত্র স্থল নহে, আরও বহুতর স্থলে দু-পুস্তকে আমার ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল স্থলের উল্লেখ করিতে আমি অসমর্থ। রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া শেষে বলিয়াছিলেন—

> মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
> শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া।

আমারও সেই কথা। ন-পুস্তকের পাদটীকায় যাহা লিখিত হইয়াছে (গ), তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে পড়িয়াছিল—

"আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী।"

ন-পুস্তক-সম্পাদক মহাশয়ও একস্থলে (১) গুণবিষ্ণুর লিখিত অংশ তুলিয়া ভট্টভাষ্যের পাঠ, এবং দুই স্থলে (১০।১১) গুণবিষ্ণুর কল্পিত পাঠ তুলিয়া গোভিলসূত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। পাদ-টীকাকার মহাশয়ও বহু স্থলে গুণবিষ্ণুর কল্পিত পাঠ ধরিয়া বেদোক্ত পাঠ বলিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সুতরাং তাঁহারা নিজেও ত আমার ন্যায় সাহস দেখাইয়াছেন এবং গ্রন্থের প্রকৃত পাঠকে প্রচ্ছাদিত করিয়াছেন।

(১৭) উপনয়নে "সমিধমাধেহি" ইত্যাদি স্থলে ন পুস্তকের পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—"ব্রহ্মচারিণামুক্তচতুষ্টয়প্রতিজ্ঞাস্ত আ সমাবর্ত্তনাৎ সমিধাধানং বিহিতং দিবানিদ্রা চ নিষিদ্ধা। তদুক্তমন্ত্র দিবানিদ্রাদৌ ন দোষঃ। অতএব বৈদ্যকেষু পঠ্যতে মধ্যাহ্নে শীতলে স্বপ্যাগ্নিষ্ণি বাতহিমাশ্রিতে ইতি। পরং সমন্ত্রকগণ্ডূষজলপানং সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম চ যাবজ্জীবমেব কর্ত্তব্যমিতি। তদুক্তং কাশীখণ্ডে" ইত্যাদি।

বক্তব্য—'দিবানিদ্রাদৌ' এই আদিপদে প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্‌টাকে ধরিতে হইবে, সমিধাধানকে কি ? তিনি "কর্ম্ম কুরু" ইহাতে 'কর্ম্ম' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—গুরুশুশ্রূষাদি ও অধ্যয়নাদি, এই দুই প্রকার মাত্র। এখন অপ্রাসঙ্গিক অভিনব অর্থ টানিয়া আনিয়া প্রমাণসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন কেন ?

ইদানীন্তন দ্বিজবালকদিগের সদ্যঃ সমাবর্ত্তন হওয়ায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, গুরুশুশ্রূষা ও বেদাধ্যয়ন অনাবশ্যক বলিয়া আমিই আশ্বলায়ন

গৃহ্যসূত্রবৃত্তি ও পারস্করগৃহ্যসূত্রের হরিহরভাষ্য দেখিয়া কর্ম্ম শব্দের অর্থ সন্ধ্যাবন্দনাদি লিখিয়া, অন্যান্য বিষয়ের সহিত ৬০ বৎসর পূর্ব্বে "বিষম সমস্যা"য় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তার পর ১৩২৩ সালে ভবদেবপদ্ধতিতেও উহা দিয়াছিলাম। তন্মধ্যে সন্ধ্যার যাবজ্জীবন কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শাতাতপের ৬টি শ্লোকের মধ্যে তৃতীয় শ্লোকটিমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তাহার চতুর্থ চরণ "স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।" ন-পুস্তকের পাদটীকায় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন ন্যায়-সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় উহার অর্থসঙ্গতি করিতে না পারিয়া উহার পরিবর্ত্তে "স শঠোঽব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ" করিয়াছেন। স্বয়ং শাতাতপসংহিতা দেখিলে উঁহার অর্থসঙ্গতি অনায়াসেই করিতে পারিতেন। যাহা হউক, তাঁহারা আমার ভ্রমপ্রদর্শন ও নিন্দা করায় আমি উপকৃত হইয়া তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞই রহিলাম।

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের সম্পাদিত ছান্দোগ্যমন্ত্র-ভাষ্যে (গুণবিষ্ণু টীকায়) বেদবিরুদ্ধ ও গোভিলগৃহ্যসূত্রবিরুদ্ধ আরও বহুতর মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে কতিপয়মাত্র প্রদর্শন করিতেছি। প্রথম পাঠগুলি বেদোক্ত এবং ড্যাশের পরবর্ত্তী পাঠগুলি তাঁহার পুস্তকস্থ জানিবেন।

[বিবাহে] দুহা উত্তরা—দুহামুত্তরা। আসনেঽচ্ছিদ্রাঃ—আসনে অচ্ছিদ্রাঃ। মা রাদ্ধি—মা ঋদ্ধি। প্র নু বোচং—প্র ণু বোচং। মা যোষ্ঠাঃ—মায়োষ্ঠাঃ। শীলেষু যক্ত পাতকং—শীলে চ যচ্চ পাতকং। শল্মলিং—শাল্মলিং। বহতুং কৃণুষ—বহন্তুং কৃণুষ। যাঽপুত্র্যা—যা অপুত্র্যা। যাঽপশব্যা—যা অপশব্যা। [নামকরণে] অহোরাত্রে—অহোরাত্রৌ। [অন্নপ্রাশনে] প্রপ্র দাতারং তারিষ—প্রদাতারং তার্ষ। [উপনয়নে] মমগস্মহি—মমগন্মহি। অগ্নিষ্টে—অগ্নিস্তে। অভূর ইদন্তে—অহুর ইদন্তে। ব্রহ্মচার্য্যস্যসৌ—ব্রহ্মচার্য্যসৌ। সুশ্রবঃ সুশ্রবসং—সুশ্রব সুশ্রবসং। এবমহং সুশ্রবঃ—এবমহং সুশ্রব। [সমাবর্ত্তনে] যে অপ্স্বন্ত—যেঽপ্স্বন্ত। মসৃখো—মনৌকো। তান্নং সৃজামি—তান্ সৃজামি। যেনাপায়ৃষতং—যেনাপানৃশতং। নেত্রৌ স্থঃ—নেত্রে স্থঃ। গন্ধর্ব্বোঽস্যুপাব, উপ মানব—গন্ধর্ব্বোঽমুপ মা অব। [সন্ধ্যায়] শমু নঃ—শমনঃ। যদ্রাত্রিয়া পাপমকারিষং—যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং। রাত্রিস্তদবলুম্পতু—অহস্তদবলুম্পতু। যং কিঞ্চ—যং কিঞ্চিং। ইদমহং মামমৃতযোনৌ—ইদমহমমৃতযোনৌ। সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি—সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যং—যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ। মামাপোঽসতাঞ্চ—মামাপো অসতাঞ্চ। যদহ্না পাপমকারিষং—যদহ্না পাপমকার্ষং। অহস্তদবলুম্পতু—রাত্রিস্তদব-লুম্পতু। যং কিঞ্চ—যং কিঞ্চিং। ইদমহং মামমৃতযোনৌ—ইদমহমমৃতযোনৌ। সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি—সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি। জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপ ঋষিঃ—..কাশ্যপ ঋষিঃ। স নঃ পর্ষদতি—স নঃ পরিষদতি। ঊর্দ্ধরেতং—ঊর্দ্ধলিঙ্গং। বিশ্বরূপায়—বিশ্বরূপং। [ব্রহ্মযজ্ঞে] অগ্নিমীডে—অগ্নিমীলে। নি হোতা—নিহোতা। শন্নো দেবীঃ… অথর্ব্ববেদাদিমন্ত্রোঽয়ং পিপ্পলাদদৃষ্টঃ, বরুণদৈবতঃ, ছন্দো গায়ত্রী, "শন্নো ভবন্তু" ইত্যত্র "আপো ভবন্তু" ইতি পঠিতে, ব্যাখ্যানমুক্তং গ্রহহোমে ; (বক্তব্য) ঐ মন্ত্রটি অথর্ব্ববেদের আদি মন্ত্র নহে ; উহার পিপ্পলাদ ঋষি নহেন, বরুণও দেবতা নহেন ; কেবল শন্নো ভবন্তু স্থলে 'আপো ভবন্তু' পাঠ করিলে "শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু" হয়, তাহাই হইবে কি ? [পার্ব্বণশ্রাদ্ধে] যে অন্তরিক্ষে য উপ—যে অন্তরিক্ষে উপ। তেঽবন্ত্বস্মান্—তে অবন্তস্মান্। ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতেঽমৃতং—ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং। মধু বাতা—মধুবাতা। অক্ষন্নমী মন্ত্রের গুণবিষ্ণুধৃত অবৈদিক পাঠ—"অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রান্ বিষ্ঠয়া মতী যো জান্ বিন্দ্রতে হরী।" (ঐ পুস্তক দষ্টব্য) ; সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া বেদোক্ত পাঠই ধরিয়াছেন, কিন্তু অনবধানতা বশতঃ ভাষ্যের দুই স্থলে সংশোধন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যথা—'অবপ্রিয়াঃ' অবস্তি তর্পয়ন্তি যানি হবীংষি তানি প্রিয়াণি যেষাং তে ; 'যঃ' যে পিতরঃ। আ মা বাজস্য…আ মা গন্তাং পিতরামাতরা চা মা সোমো অমৃত-ত্বেন গম্যাঃ (মাধ্যন্দিন শাখা) ; …আ মা গতং পিতরামাতরা যুবমা মা সোমোঽমৃতত্বায় গম্যাং (কাণ্ব শাখা) ;—দুর্গামোহন বাবু 'আ মা গন্তাং'ই রাখিয়াছেন। বহু দেয়ঞ্চ নো অস্ত—বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি। [একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে] পিতৃল্লোকান্—পিতৃন্ লোকান্। পবিত্রাসি বৈষ্ণবী—পবিত্রমসি বৈষ্ণব্যম্। এহি পিতঃ সোম্য— …সৌম্য।

এইরূপ অবৈদিক ও গোভিলগৃহ্যসূত্রবিরুদ্ধ, ভাষ্যকারের স্বকপোল-কল্পিত মন্ত্রে কর্ম্ম করিলে তাহা সফল হয়, কি পণ্ড হয়, ইহা সুধীগণের বিবেচ্য।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন-বিদ্যাবারিধি।

তোমার পূজা

যেখানে ব্যথায় উঠিছে গড়িয়া
　　অশ্রুর সরোবর,
সেথা ফুটে তব পূজার পদ্ম
　　সুন্দর মনোহর।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

বৈষ্ণবমত-বিবেক

। পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

দুঃখী কৃষ্ণদাসের জীবনকথা একটু রহস্যময়। শ্রীগৌরিদাস পণ্ডিত সখ্যভাবের উপাসক। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে তিনি ব্রজের সুবল সখা। সখা হইলেও মধুর ভাবের বা কান্তাভাবের রহস্য সকলই তাঁহার গোচরীভূত। 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে সুবল সখার যে চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, প্রিয়াগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে প্রণয়-কলহ করিয়া চলিয়া যান, তবে সুবল তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া নানা উপায়ে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করেন, এবং সখার নিকট ফিরাইয়া আনেন।

শ্রীল গৌরিদাস পণ্ডিতের শাখাসমূহের কয়েকটি শাখায় মধুর রসের ভজন প্রথা বিদ্যমান। শ্রীল হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরও শ্রীল গৌরিদাসের অন্তরঙ্গ-সেবায় দীক্ষিত। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবের নিকট 'উজ্জ্বলনীলমণি'-প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দুঃখী কৃষ্ণদাসের শ্রীরূপানুগা ভজনপদ্ধতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মিল। "স্বভক্তগণকে শুদ্ধা ভজনপদ্ধতি" শিক্ষা দেওয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারের অন্য উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যদেব "অনর্পিতচারী" শুদ্ধ প্রীতিরস দান করিতেই ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল গৌরিদাস-শিষ্য হৃদয়ানন্দ হৃদয়ের অতি নিভৃতে এই ভাব গোপন রাখিতেন। এইজন্য তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবকে লিখিলেন, "আমার শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণদাসকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; ইহার মনের যে অভিলাষ, তাহা তুমি সর্ব্বভাবে পূর্ণ করিও।"—দুঃখী কৃষ্ণদাসকেও তিনি লিখিলেন, "শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার দোসর।" কৃষ্ণদাস এই সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন, এবং শ্রীজীবকে ও হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরকে একই তত্ত্বের দুইটি বহির্ব্বিকাশরূপে দর্শন করিতেন। তিনি সখীভাবে নিকুঞ্জ ও সেবালাভে অভিলাষী হইয়া এক দিন শ্রীজীবের নিকট তাঁহার হৃদয়ের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন।

শ্রীজীব পরমার্থ-পথে যাহা চরম সত্য, অনুগত শিষ্যকে তাহাতে বঞ্চিত রাখা কিছুতেই উচিত বলিয়া মনে করিলেন না। কৃষ্ণদাস যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি তাহারই সদুত্তর দিতেন। এই ভাবে মধুর ভাবের সেবাপ্রাপ্তিই যে জীবের সর্ব্বশেষ সার্থকতা, তাহা তিনি অকপটে দুঃখী কৃষ্ণদাসের নিকট ব্যক্ত করিলেন। সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিচার করিয়া কৃষ্ণদাসের যে প্রত্যয় হইয়াছিল, শ্রীজীব গোস্বামীর কথায় সে প্রত্যয় সুদৃঢ় হইল। তখন তিনি জীবের নিকট হইতে যুগলকিশোরের নিত্যলীলা-স্মরণ পদ্ধতির সংবাদ লইলেন। শুধু অন্তরে চিন্তাতেই নহে—বাহিরেও তিনি রাসস্থলীর কুঞ্জে সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগের সেবা গ্রহণ করিলেন। শ্যামানন্দপ্রকাশ বলিতেছেন :—

"রাধা-কৃষ্ণ রাসলীলা শুনে রাত্রিদিনে।
সেই-সব মধুর বস্তু ক'রে আস্বাদনে।
মধুরে বাড়িল লোভ অন্য চেষ্টা নাই।
কুঞ্জ-সেবা করি রহে শ্যামানন্দ গোঁসাই।
শ্রীবৃন্দাবনের কনক কুঞ্জের সন্নিধানে।
নিত্য ঝাঁট দেন সেবা করেন বিহানে।"

এই ভাবে এক দিন দুঃখী কৃষ্ণদাস 'ঝাড়ু দিবার' সেবা-কার্য্য করিতে করিতে প্রাণোন্মাদক ভাবের উত্তেজনায় অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। শ্রীজীব বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাসকে না দেখিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া, কৃষ্ণদাসকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া কুটীরে লইয়া আসিলেন। অনেক সন্তর্পণের পর কৃষ্ণদাসের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। শ্রীজীব এতাদৃশ মর্ম্মী শিষ্যকে আর কোনওরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না।

স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহও সুবর্ণে পরিণত হইয়া থাকে। শ্রীজীবের কৃপানিষেকে দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যসেবায় অধিকারী হইয়া শ্যামানন্দে পরিণত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

ভক্তিরাজ্যের পরীক্ষা

শ্রীরূপ গোস্বামী—শ্রীল নারদপঞ্চরাত্র হইতে উত্তমা ভক্তির যে লক্ষণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"

অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরকে অনুকূল ভাবে অন্যাভিলাষ-বিরহিত হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত ভাবে সেবনকে ভক্তি নামে অভিহিত করা হয়।" সেবন সর্ব্বোপাধিরহিত হইলেই নির্ম্মল হইয়া থাকে। এইরূপ নির্ম্মল সেবন ভক্তির মূল-লক্ষ্য। এইরূপ নির্ম্মল ভক্তির সাধনে সাধকের শ্রীভগবৎপ্রীতি ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। এই জন্য নিরুপাধি ভক্তির রাজ্যে—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, উপাধির গন্ধ থাকিলে চলিতেই পারে না। উপাসনার রাজ্যে অনুভূতি বা সাধ্য বস্তুর কৃপা-প্রাপ্তিই সাধককে আচার্য্য-পদবীতে উন্নীত করিয়া থাকে। সর্ব্ব-ভারতে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত নিরুপাধি প্রেম-ভক্তির মহিমা-প্রচারের জন্য উপযুক্ত আচার্য্যের প্রয়োজন। শ্রীজীব সেইরূপ উপযুক্ত আচার্য্যগণের আগমনেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীভগবান এইরূপ আচার্য্য-পদবীর উপযুক্ত সাধন-বল-সম্পন্ন তিনটি মহাত্মাকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে এক দিকে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পারদর্শী করিয়া অন্য দিকে সাধনবলে বলীয়ান্ করিয়া লইতে হইবে। আচার ও প্রচার—এই দুই বিষয়ে

তুল্যরূপে দক্ষ না হইলে তাঁহাদিগকে আচার্য্য-পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যদেব গুণকেই প্রধান-রূপে বরণ করায়, শ্রীল-রঘুনাথ দাস গোস্বামী কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও যেমন তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামি-রূপে বৃত হইয়াছিলেন, যবন জাতির অন্তর্ভূত হরিদাস ঠাকুর যেমন নামসঙ্কীর্ত্তনের মূল আচার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, বৈদ্যবংশোদ্ভূত হইলেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরা যেমন শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি বৈষ্ণবগণের নিত্যস্মরণীয় গ্রন্থের প্রণেতা আচার্য্যরূপে বৃত হইয়াছেন, শ্রীজীব কায়স্থকুল-সম্ভূত পরম ভক্তিমান চিরকুমার নরোত্তম দাসকে ও সদ্‌গোপকুল-সম্ভূত শ্যামানন্দকেও—জাতি নির্ব্বিশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহারা শুধু ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়নেই কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন নাই, সাধনবলেও বলীয়ান্—ইহা দেখাইবার জন্যই তিনি ইঁহাদের ভক্তিসাধনার পরীক্ষার আয়োজন করিলেন।

দুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম 'শ্যামানন্দ' হওয়ায়, এবং তিনি নূপুরাকৃতি তিলক ধারণ করায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে একটু আলোচনার কারণ ঘটল। শ্যামানন্দ শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য, এবং হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ ভক্ত শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল গৌরিদাস পণ্ডিতের প্রিয়তম শিষ্য। আবার হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যদেবের পরমপ্রিয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে, বিশেষতঃ, গৌড়বঙ্গ ও উৎকলে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর বৈষ্ণবগণের বিশেষ সম্মানভাজন। গৌরিদাস পণ্ডিত সখ্যভাবের উপাসক—ব্রজধামের সুবল সখার অবতার বলিয়া প্রখ্যাত। কালনায়—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রিয়সখা শ্রীল গৌরিদাস পণ্ডিতের মহিমার ও প্রভাবের অন্ত নাই। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়ে এক দিন একখানি নৌকা বাহিয়া গঙ্গাপথে আসিয়া সেই নৌকা বাহিবার "বৈঠা"খানি জীবকে নামপ্রেম দান করিয়া ভবনদী উত্তীর্ণ করাইবার জন্যই দান করেন। ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয় বা হৃদয়ানন্দকে তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া-আনিয়া তাঁহাকে নিজের উপযুক্ত শিষ্যরূপে সর্ব্ববিষয়ে—শাস্ত্র ও সাধনায় সুশিক্ষিত করেন। একদা একটি মহোৎসব উপলক্ষ করিয়া ইনি ইঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে যে কৃপা করেন, তাহার ফলে—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহ হৃদয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। তদবধি ইনি "হৃদয়চৈতন্য" এই গুরুদত্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই গৌরিদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীযুক্তা বসুধা দেবীকে ও শ্রীযুক্তা জাহ্নবী দেবীকে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন। শ্রীল গৌরিদাস পণ্ডিতের এই সুবিখ্যাত শিষ্যের নাম সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত। এখন ইঁহারই শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীজীবের কৃপায় "শ্যামানন্দ" নামে বিখ্যাত হইলেন। ইহাতে গুরু ত্যাগ করিয়া শ্রীজীবের নিকট তিনি পুনরায় দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন—এইরূপ সন্দেহের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অম্বিকা-কালনায় শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের নিকট এ সংবাদ প্রচারিত হইল। তিনিও বলিলেন—

"মহাপ্রভু হেন কর্ম্ম কভু নাহি করে।
গুরু ছাড়ি গুরু করে না শুনি সংসারে।"
—(শ্যামানন্দ-প্রকাশ)।

তবে অসম্প্রদায়ী অবৈষ্ণব গুরু হইলে—সে গুরু ত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগুরু-গ্রহণের কথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-প্রমুখ বৈষ্ণব-স্মৃতিনিবন্ধে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীল গৌরিদাস পণ্ডিত ঠাকুরের পরিবার কি অবৈষ্ণব ও অসম্প্রদায়ী?

প্রকৃতঃ, নিজের জন্য না হইলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের বিশুদ্ধ আদর্শে পাছে মালিন্য স্পর্শ করে, এই জন্য হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরকে চিন্তিত হইতে হইল। তিনি প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে লোক মারফৎ শ্রীজীবের নিকট পত্র পাঠাইলেন;—শ্রীজীব তাহার যে উত্তর দিলেন, তাহাতে সংশয় আরও বাড়িয়া উঠিল। শ্রীজীবের পত্রোত্তরে হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর জানিতে পারিলেন যে, "তিনিই নাকি স্বপ্নাবেশে কৃষ্ণদাসকে কৃপা করিয়াছেন।" এই সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর কয়েক জন শিষ্যের ও ভক্তের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলে শ্রীজীব পরম সমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া উপযুক্ত বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীজীব ব্রজধামের সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, শ্রীরাসস্থলীতে এক বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। তথায় সমাগত মোহান্তগণ শ্যামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণদাস, তুমি কাহার সেবক? তোমার গুরুদত্ত 'কৃষ্ণদাস' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া তোমার নাম শ্যামানন্দ হইল কেন? তোমার তিলক-চিহ্নের পরিবর্ত্তনেরই বা কারণ কি?"

শ্যামানন্দ শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুর ও শ্রীজীবকে প্রণাম করিয়া, সমগ্র বৈষ্ণব মোহান্তমণ্ডলীর চরণ-বন্দনা পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"এ অধম জন্মে জন্মে শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের দাসানুদাস, তিনিই স্বপ্নযোগে এই নাম-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।"

তখন মোহান্তগণ তাঁহাকে এই কথা সপ্রমাণ করিতে বলিলেন। তিনি যে ভাবে তাহা প্রতিপন্ন করিলেন, তাহা এরূপ অলৌকিক ব্যাপার যে, বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত সমাজ তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন; বিশেষতঃ, আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ, এজন্য আমরা তাহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

সিদ্ধ ভক্তগণের তিন প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। শ্রীল চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল মহাপ্রভুর এই তিন প্রকার অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই তিন দশার নাম—অন্তর্দ্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা। যখন ভক্ত নিত্যলীলায় সিদ্ধদেহে উপনীত হইয়া তাঁহার অভীষ্টদেবের নিত্যলীলা দর্শন করেন ও সিদ্ধদেহে অভীষ্টদেবের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তখন তাঁহার বাহ্যদেহে চৈতন্যের কোনও লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না। এই অবস্থার নাম অন্তর্দ্দশা। অতঃপর ভক্ত যখন এই অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া—বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের দিকে চিত্তকে উন্মুখ করেন—সেই অবস্থার নাম অর্দ্ধ-বাহ্যদশা। তখন নিত্য-লীলা দর্শনের স্মৃতি ভাষায় প্রকাশ হইতে থাকে—তাৎকালিক ভাষায় তাহার যে বর্ণনা হয়, তাহা "প্রলাপ" নামে অভিহিত

হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভুর এই 'প্রলাপ' তাঁহার গ্রন্থরত্নে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার পর যখন ভক্তের চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে 'বাহ্যদশা' নামে অভিহিত করা হয়। বাহ্যদশায় ভক্ত ব্যবহারিক জগতের ব্যবহারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্য লাভ করেন। শ্রীভাগবতের টীকায় বাকের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—এই চারি অবস্থায় শ্রীধরস্বামিপাদ প্রকারান্তরে ঐ অবস্থাগুলিরই বিচার করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, অতঃপর শ্যামানন্দ মোহান্তগণের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—"শ্রীল গৌরিদাস পণ্ডিত ঠাকুর আমার গুরুদেব শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে কৃপা করিয়াছেন। যদি আমি সত্য সত্যই ইঁহাদের ভৃত্য হই—তবে এই নাম ও তিলক ধুইয়া মুছিয়া দিলেও কিছুতেই তাহা অদৃশ্য হইবে না, বরং উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে।"

তখন মোহান্তগণের আদেশে শ্যামানন্দ ঠাকুর সকলের সম্মুখে উপবেশন করিলে, শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুর স্বহস্তে তাঁহার ললাটের তিলক ও বক্ষোদেশে লিখিত 'শ্যামানন্দ' নাম ধৌত করিয়া দিলেন। শ্যামানন্দ তখন তন্ময় চিত্তে শ্রীল গৌরিদাস পণ্ডিত ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার ললাটে অঙ্কিত নূপুরাকৃতি তিলক ও বক্ষোদেশে লিখিত 'শ্যামানন্দ' নাম পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতররূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এইরূপে নাম ও তিলক যত বার ধৌত করা হইল, তত বারই উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া ভক্তগণ সকলেই প্রেমানন্দভরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং শ্যামানন্দও বিনীতভাবে হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের শ্রীচরণযুগলে পতিত হইলেন। শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুর প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বুকে টানিয়া লইলেন। তখন মোহান্তগণ সকলেই শ্যামানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তিবলের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্যামানন্দও শ্রীজীবের আদেশ লইয়া হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এইখানেই পরীক্ষার শেষ হইল না। "শ্যামানন্দ-প্রকাশে" বর্ণিত আছে যে, উহার পরদিনই শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুর শ্যামানন্দ ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ শ্রীব্রজপরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। রাসোৎসবের দিনে তাঁহারা রাসস্থলীতে সমাগত হইলে শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় দেখিতে পাইলেন যে, সখীগণের সহিত শ্রীশ্রীরাধা ও শ্যামসুন্দর রাসমণ্ডলে নৃত্য করিতেছেন; ইহা দেখিয়া শ্যামানন্দ ঠাকুর আত্মবিস্মৃত হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিয়া গোপাঙ্গনাগণের ন্যায় নাচিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাব দেখিয়া সখ্যভাবে সিদ্ধ শ্রীল হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর শ্যামানন্দ যে সখ্যভাব ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে শ্যামানন্দ যখন তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন, তখন ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি যখন শ্রীকৃষ্ণের সখার ভাব ত্যাগ করিয়া, গোপীভাবে নিরত হইয়া গোপীর লক্ষণ ধারণ করিয়াছ, তখন আর তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি?"

শ্যামানন্দ নিতান্ত বিনীত ভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,—"প্রভো! স্বয়ং শ্রীল পণ্ডিত ঠাকুরও ত' শ্রীরাধারাণীর ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অনুক্ষণ শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবস্থান, এবং শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন দর্শন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। কখনও কুঞ্জমধ্যে তিনিই (সুবল সখা) শ্রীরাধিকার বেশ ধারণ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার সহবাসেই আমার এই ভাবের উদ্গম হইয়াছে।" হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর ইহা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্তনেত্রে বলিলেন,—"আমি কখনই পণ্ডিত ঠাকুরের নিকট এরূপ কথা শুনি নাই। অতএব তুমি গোপীভাব ত্যাগ করিয়া সখ্যভাবেরই আচরণ কর।" শ্যামানন্দ এ কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ঠাকুরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া-পড়িয়া বলিলেন,—"প্রভো! কৃপাপ্রাপ্ত ভাব-সাধ্য আমি কি প্রকারে ত্যাগ করিব? ইহার অপেক্ষা দেহ ত্যাগ করাও যে আমার পক্ষে সুসাধ্য। অতএব আমাকে এরূপ আদেশ করিবেন না।" এই কথা শুনিয়া হৃদয়ানন্দ ঠাকুর নিদারুণ ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া শ্যামানন্দের পৃষ্ঠে এরূপ প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন যে, শ্যামানন্দের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল;—কিন্তু শ্যামানন্দ তাহাতে বিন্দুমাত্র বেদনা বোধ না করিয়া "শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইল" বলিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের শ্রীচরণে পতিত হইয়া অতি বিনীত ভাবে কহিলেন,—"প্রভো! আপনার ত' অনেক পুত্র, তাহার পরে না হয় একটি কন্যা সন্তানই হইল—ইহা ভাবিয়া এই শরণাগত দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, শ্যামানন্দকে কোলে লইয়া বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রহার করিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দ বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীজীবের নিকট গমন করিলেন। রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন! তিনি দেখিলেন, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। তাঁহার শুভ্র উত্তরীয় শোণিত রঞ্জিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। শ্রীল হৃদয়চৈতন্য বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"আমার এ অবস্থা তোমার কৃপাতেই হইয়াছে। শ্যামানন্দ আমার আত্মা; তুমি প্রহারে তাহার অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছ; সেই ব্যথা আমারই অঙ্গে বাজিয়াছে, এবং তাহাতে আমার দেহ হইতে রক্তপাত হইয়া আমার বসন সিক্ত হইয়াছে।"

তখন হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর অত্যন্ত কাতর হইয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে ভক্তবৎসল দয়াময়, শ্যামানন্দ যে আপনার স্বরূপ, ইহা জানিতাম না। ভক্ত যে ভগবানের অভিন্ন তনু, তাহা আজ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। কিন্তু হে নাথ! আমি ভক্তদ্রোহী, আমার কোনওরূপে নিস্তার নাই। কিন্তু আপনার এ অবতার ত' করুণা বিতরণের জন্য—আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।" শ্রীচৈতন্যদেব তখন প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—"আমার স্থানে অপরাধ হইলে আমি তাহা ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু আমার ভক্তের নিকট অপরাধ করিলে তাহা ক্ষমা করিবার সাধ্য আমার নাই। অতএব তুমি শ্যামানন্দকে প্রসন্ন করিয়া দ্বাদশ দিনব্যাপী মহোৎসব কর—তাহাতে তোমার এ অপরাধের ক্ষালন হইবে।"

৮ হৃদয়ানন্দ ঠাকুর এই স্বপ্নদর্শনে বিচলিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর আর তাঁহার নিদ্রা হইল না। যতটুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল, এই কথার আলোচনায় কাটাইয়া দিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে যাবতীয় বৈষ্ণব মোহান্তগণকে সংবাদ দিয়া আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ ভিক্ষা করিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, যখন শ্যামানন্দ সম্বন্ধে অন্যান্য সমস্ত স্বপ্নই সার্থক প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন এ ব্যাপারেও অন্যথা হইবে না। অতএব শ্যামানন্দের তুষ্টিবিধান পুরঃসর দ্বাদশ মহোৎসব অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিলেন।

শ্যামানন্দ এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মোহান্তগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"এ ব্যাপারে আমিই দোষী;—আমার প্রভু শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের কোনও দোষ নাই; অতএব আপনারা কৃপা করিয়া আমাকেই এই দ্বাদশ মহোৎসব সম্পন্ন করিবার অনুমতি প্রদান করুন।" শ্রীগুরুদেবের মর্য্যাদা এই ভাবে রক্ষা করিয়া সকল অপরাধের বোঝা স্বেচ্ছায় স্বীয় মস্তকে তুলিয়া-লওয়ায় বৈষ্ণবসমাজের সকলেই শ্যামানন্দকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দভরে স্বয়ং মহোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজমণ্ডলের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইহাতে বিস্মিত হইলেন। সকলেই শ্রীজীবের ও শ্যামানন্দের অলৌকিক ভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। মথুরার বণিক্ ও শেঠ মহাশয়গণ শ্রীরূপ-সনাতনের ও শ্রীজীবের পরম ভক্ত—তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাবে সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন। শ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকটে দীনাতিদীন শ্রীজীবই ব্রজমণ্ডলের একমাত্র নেতা। তাঁহার একটিমাত্র আদেশ—সার্ব্বভৌম সম্রাটের আদেশ অপেক্ষাও অধিকতর সমাদরের যোগ্য। তাঁহার বিন্দুমাত্র সেবা করিতে পারিলে তাঁহারা "ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইলাম" বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের বড়ই দুঃখ যে, তাঁহারা এইরূপে সেবা করিবার শুভ অবসর প্রাপ্ত হন না। আজ সেই শুভ অবসর উপস্থিত দেখিয়া মথুরার ধনীশ্রেষ্ঠ বণিক ও শেঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজমণ্ডলের অতিদীন ব্রজবাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেকে ভারে ভারে, কেহ গোশকট পূর্ণ করিয়া, কেহ বা নিজেই উৎসবের দ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিতে লাগিলেন। এতই দ্রব্যসম্ভার আসিল যে, তাহার দ্বারা দ্বাদশ দিন ত' দূরের কথা, মাস ভরিয়া মহামহোৎসব চলিতে পারে। ব্রজমণ্ডলের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের গৃহস্থ ও উদাসীন ভক্তমণ্ডলী মিলিত হইয়া, যাঁহার যে কার্য্য ভাগ করিয়া লইলেন। এক দিকে পর্ব্বতপ্রমাণ ভক্ষ্যরাশি, অন্য দিকে শাস্ত্রব্যাখ্যা, কীর্ত্তন ও সাধুসমাগম।—যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহার তুলনা মিলে না।

উৎসব শেষ হইলে শ্যামানন্দ হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার নিকটই অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রকারে গুরুদেবের আনুগত্য করিয়া তিনি গুরুদেবের পরম প্রীতিভাজন হইলেন। অবশেষে শ্রীল হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে সশিষ্যে গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন—তখন শ্যামানন্দ ঠাকুর তাঁহাদের সহিত বহু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেন। অবশেষে হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর বহু প্রকারে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ফিরাইয়া দিলেন; শ্রীজীবের নিকট অধ্যয়ন শেষ করিয়া পরে তাঁহাকে গৌড়ে আসিতে আদেশ করিলেন। শ্যামানন্দ শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবের চরণতলে সমাগত হইলেন।

শ্রীরূপসনাতনাদি ছয় গোস্বামীই শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মের আচার-প্রচারের সর্ব্বপ্রধান গুরু। এইজন্যই শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা যে শুদ্ধা মাধুর্য্যগর্ভা সাধনপদ্ধতির প্রচার করেন, তাহাই 'শ্রীরূপানুগা' সাধনপদ্ধতি নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এই পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরের দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভু সেই আদর্শ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের নিষ্কিঞ্চন গোস্বামিগণের জগদ্গুরুত্ব খ্যাপন করিলেন। মহা প্রতিভাশালী শ্রীজীবই এই প্রতিষ্ঠা মহাযজ্ঞের মূল পুরোহিত—ইহা দ্বারাই তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের ভবিষ্যৎ মীমাংসা করিয়া দিয়া যান।

শ্রীল নরোত্তমের দীক্ষালাভের ব্যাপারও এক মহা-পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নরোত্তম আকৌমার ব্রহ্মচারী, সুদৃঢ়সংকল্প শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দীক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস কি প্রকারে 'আচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত হইলেন এবং নরোত্তম কি প্রকারে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন—তাহা প্রেমভক্তির রাজ্যে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের এক পরমৌদার্য্যময় মহানুভবতার প্রমাণ।

সে-কালে ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য, উপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী এই সকল পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক উপাধি অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণই গুরুর নিকট লাভ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি এই দুইটি উপাধিই মাত্র প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে বা তাহার পরবর্ত্তীকালে শিরোমণি, তর্কালঙ্কার প্রভৃতি উপাধিও অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। সে কালে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নিজেরা সে উপাধি ব্যবহার করিতেন না। তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী ও দেশের লোকরাই তাঁহাদিগকে এই সম্ভ্রমবাচক উপাধিতে অভিহিত করিতেন। এই ত গেল সাধারণ সমাজের কথা—ইহার উপর দীনাতিদীন—তৃণাপেক্ষা সুনীচ হওয়াই যাঁহারা জীবনের আদর্শরূপে কামনা করিতেন—সেই বৈষ্ণবসমাজে 'উপাধি' সর্ব্বভাবেই পরিত্যক্ত ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। অসীম পাণ্ডিত্যসিন্ধু শ্রীরূপ গোস্বামী নিজেকে "বরাকরূপঃ" বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অতুলনীয় প্রতিভাবান, ভক্তি, বিনয় ও পাণ্ডিত্যের মহার্ণবস্বরূপ শ্রীজীব নিজের পরিচয় দিয়াছেন—'জীবক' বা 'অতিক্ষুদ্র জীব।' তাঁহারা নিজেরা ছিলেন সর্ব্বত্যাগী অকিঞ্চন বৈষ্ণব—লোকে তাঁহাদিগকে গোস্বামী বা গোসাঞি নাম দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ভ্রমক্রমেও 'গোস্বামী' উপাধি গ্রহণ করেন নাই। শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বরচিত পদে "শ্রীনিবাস দাস" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। 'নরোত্তম ঠাকুর' নরোত্তম দাস নামে গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন—শ্যামানন্দ স্বরচিত পদে "দুঃখিনী" বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তবুও জনসমাজ ইঁহাদিগের গুরুদত্ত উপাধিতে ইঁহাদিগকে অভিহিত করিয়া ধন্য হইত।

শ্রীনিবাস যখন শ্রীজীবের নিকট "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন শ্রীজীব সাধন-জগতে শ্রীনিবাসের অন্তর্দৃষ্টি

কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহা দেখিবার জন্য "উজ্জ্বলনীলমণির" একটি শ্লোক লইয়া আলোচনা করেন। শ্লোকটি এই—

সখি! রোপিতো দ্বিপত্রঃ শতপত্রাখ্যেন যো ব্রজদ্বারি।
সোহয়ং কদম্বভিত্তঃ ফুল্লো বল্লভবধূস্তুদতি॥
—(উদ্দীপনবিভাব—উঃ নীঃ)

অনুবাদ—হে সখি! যে কদম্ব বৃক্ষের চারাটির দুইটি পত্র উদ্গত হইবার সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদ্বারে রোপন করিয়াছিলেন, সেই শতপত্রাখ্য কদম্ববৃক্ষের চারাটি এখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দভরে প্রফুল্ল হইয়া গোপবধূগণের দুঃখ উৎপাদন করিতেছে।

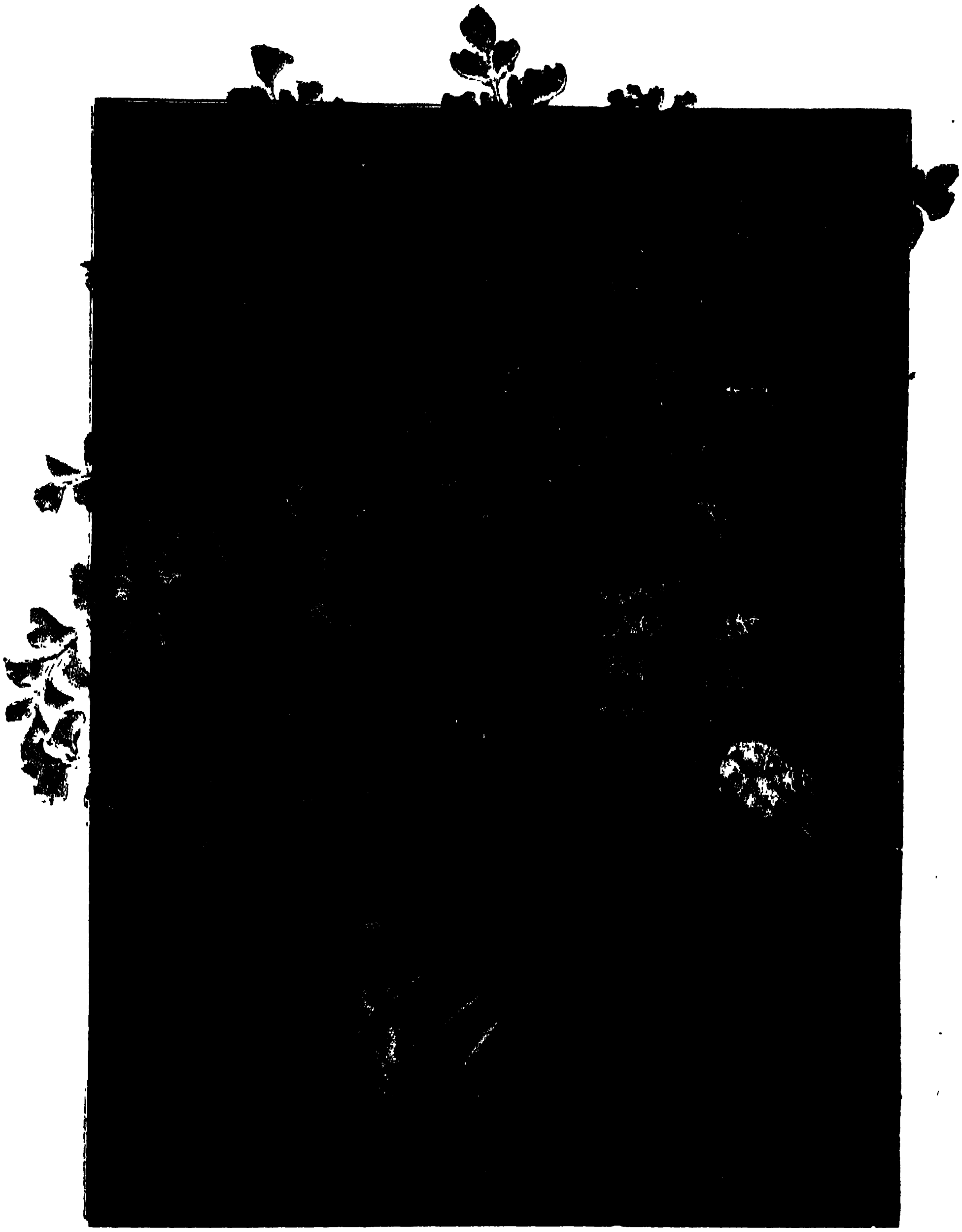
শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিয়াছেন—এই কদম্ববৃক্ষের বর্ণনাটি সেই সময়ের। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনের প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণের জন্যই শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীবৃন্দাবনের তরুলতা পত্র-পুষ্প যেন পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে, হ্রদের জল শুকাইয়া গিয়াছে, হ্রদের কমল-পুষ্পগুলিও শুষ্ক,—অধিক কি, শ্রীবৃন্দাদেবী নানা ফুলে যে বিলাসকুঞ্জ সজ্জিত করিয়াছিলেন—তাহাও শুকাইয়া গিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের পশু, পক্ষী ও মানব সকলেরই প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ,—তাঁহার অভাবে ব্রজ-জনেরা যে বাঁচিয়াছিল—সে শুধু শ্রীযোগমায়া দেবীর অঘটনঘটনপটিয়সী লীলার মহিমায়। এইরূপ সুতীব্র শ্রীকৃষ্ণবিরহে তরুণ কদম্ববৃক্ষ কিরূপে প্রফুল্লভাবে বিরাজ করিতেছিল? ইহাই এই শ্লোকটির অন্তর্নিহিত সমস্যা। শ্রীনিবাস ইহার উত্তরে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে এই কদম্ববৃক্ষটি রোপন করিয়াছিলেন,—ইহাকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই; এইজন্য এই বৃক্ষটির কথা সর্ব্বদা তাঁহার মনে পড়ায়—এই বৃক্ষটির প্রফুল্লভাব দেখা গিয়াছিল। শ্রীনিবাসের এই উত্তরে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভক্তিভাবের গূঢ় বিকাশ দেখিয়া শ্রীজীব তাঁহাকে "আচার্য্য" উপাধিতে ভূষিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিবাস শ্রীজীবের আদেশে তাঁহার সম্মুখে ব্রজবাসী ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করাইয়াও নিজের আচার্য্য পদবী লাভের যোগ্যতার পরিচয় দিয়া শ্রীজীবকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। এই প্রকার নানা-কার্য্যে শ্রীনিবাসের ভক্তিরসের অনুভবের গভীরতা দেখিয়া শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে ভক্তি-ধর্ম্ম আচার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীব্রজমণ্ডলের গোস্বামী ও মোহান্তদিগের সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীনিবাস আচার্য্যকে "আচার্য্য" উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি শ্রীনিবাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে "আচার্য্য"রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

'শ্রীভক্তিরত্নাকর' নরোত্তমের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

নরোত্তম-চেষ্টা দেখি প্রভু লোকনাথ।
দীক্ষামন্ত্র দিয়া সুখে কৈল আত্মসাত॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি সবে কৃপা কৈল।
শ্রীজীব গোস্বামী পাঠারম্ভ করাইল॥
অল্পদিনে বহু শাস্ত্র হৈল অধ্যয়ন।
দেখি হেন শক্তি প্রশংসয়ে সর্ব্বজন॥
অন্তের দুর্গম ঐছে প্রকাশে আশয়।
শ্রীজীব গোস্বামীর সদা হর্ষ অতিশয়॥
সর্ব্বত্রেই সবার লইয়া অনুমতি।
নরোত্তমে দিলেন "শ্রীমহাশয়" খ্যাতি॥
বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সবাকার।
শ্রীজীবের স্নেহ কত নারি বর্ণিবার॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রেমের ভাজন।
শ্রীজীবের যেন দুই বাহু দুই জন॥
—ভঃ রঃ, ৪র্থ রঙ্গ, ১৪৭ পৃঃ; (বঃ সঃ)

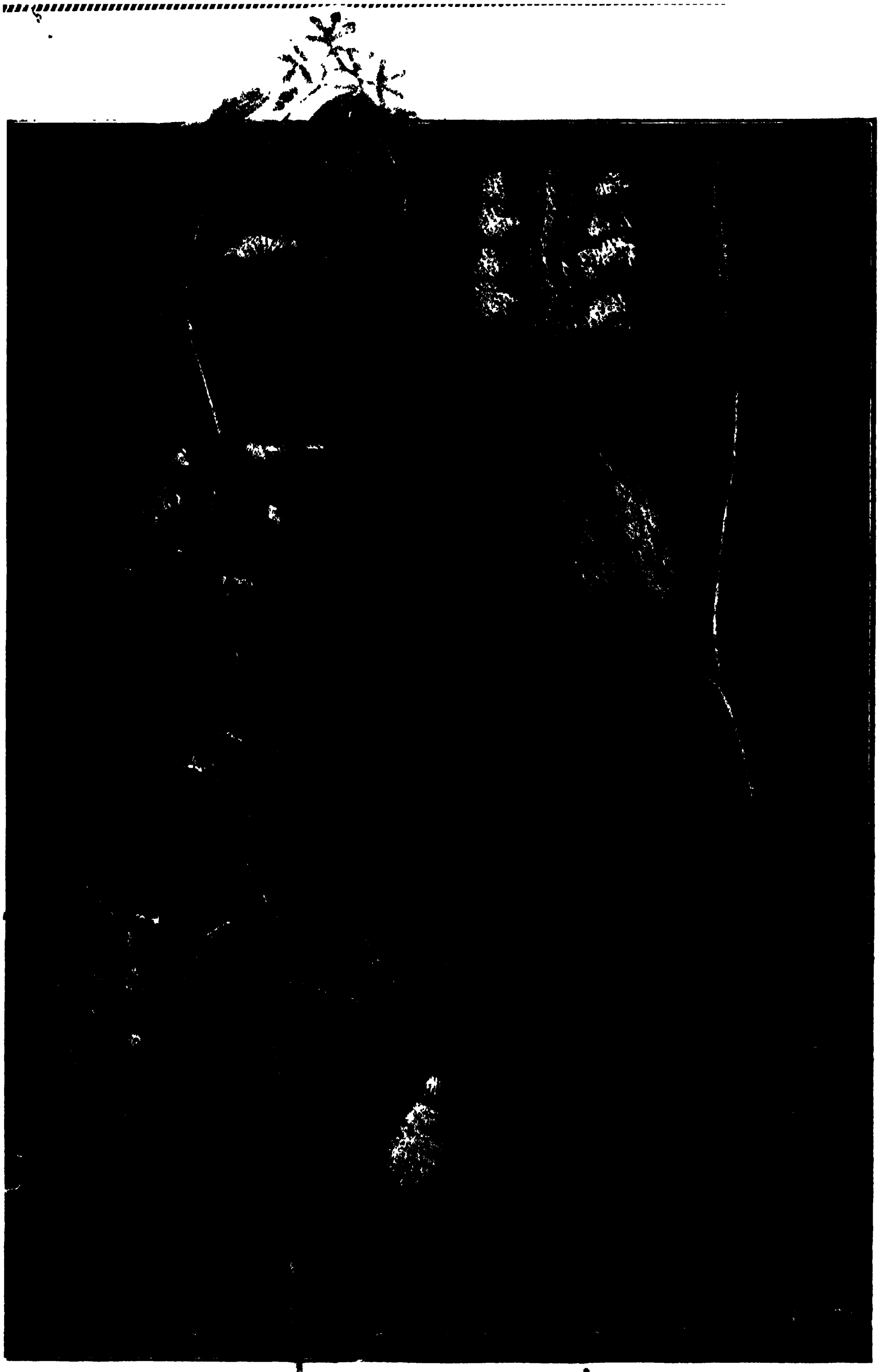
কিন্তু 'প্রেমবিলাস' বলিতেছেন, নরোত্তমকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি প্রদত্ত হয়। বস্তুতঃ, পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ নরোত্তমকে "ঠাকুর মহাশয়" নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন। নরোত্তম কি প্রকারে "ঠাকুর মহাশয়" হইলেন, তদ্বিষয়ে 'প্রেমবিলাসে' একটি উপাখ্যানও প্রদত্ত হইয়াছে। নরোত্তম একদা কুঞ্জে বসিয়া শ্রীগুরূপদিষ্ট প্রণালীতে লীলাস্মরণ করিতে করিতে নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থানে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময় শ্রীরাধিকা কুঞ্জমধ্যে আসিয়া কহিলেন—"গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে মানস সেবাতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। তোমার মানস-সেবার নিষ্ঠা দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ আমার কুঞ্জে আগমন করিয়া ক্ষীর সেবা করিয়া থাকেন; সেই জন্য আমার সখীগণ দুগ্ধ আবর্ত্তন করিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তুমি চম্পকলতার কুঞ্জে থাকিয়া দুগ্ধ-আবর্ত্তনরূপ নিত্যসেবা গ্রহণ কর। অদ্য হইতে তোমার নাম "চম্পকমঞ্জরী" হইল। নরোত্তম স্বপ্নপ্রায় এই ব্যাপার দেখিয়া চৈতন্যলাভ পুরঃসর ভাবিলেন, শ্রীরাধিকার এই আদেশ হইলেও আমার গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত কোনও স্বাতন্ত্র্য আচরণ করা উচিত নহে। অনন্তর তিনি শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই ব্যাপার নিবেদন করিলেন। গোস্বামীজি এই কথা শুনিয়া পরম স্নেহভরে নরোত্তমকে বলিলেন,—"নরোত্তম! তুমি পরম ভাগ্যবান, তাই তুমি কিশোরীজির সাক্ষাৎকৃপাদেশে তাঁহার সেবা প্রাপ্ত হইয়াছ; অদ্য হইতেই তুমি ঐ প্রকারে মানস-সেবায় প্রবৃত্ত হও।" গুরুদেবের আদেশে নরোত্তম এই প্রকারে মানস-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিন নরোত্তম অন্তর্দ্দশায় মানস-সেবায় দুগ্ধ-আবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে দুগ্ধ উথলিয়া উঠিল,—দুধ পড়িয়া-যাইতেছে দেখিয়া তিনি হস্ত দ্বারা উহা নিবারণ করিতে গেলে হাত পুড়িয়া গেল—তথাপি সেবার উৎকণ্ঠায় সেই অত্যুষ্ণ দুগ্ধ-পাত্র চুল্লী হইতে নামাইয়া রাখিলেন। কিছুকাল পরে বাহ্যদশায় ব্যবহারিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বাহ্য শরীরেও তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি পুড়িয়া গিয়াছে। কোনওরূপে গাত্রবস্ত্রে হাত ঢাকিয়া, তিনি প্রত্যহ যে সময়ে গুরুদেবের নিকট যাইতেন, সেই সময়ে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরম প্রেমিক করুণাসাগর ত্রিলোকনাথ গোস্বামী শিষ্যের এই ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং দীনতার খনি লোকনাথ প্রভু ইহাতে নিজের কৃতিত্বের সম্ভাবনামাত্র মুছিয়া ফেলিবার জন্য বলিলেন, "শ্রীজীবের কৃপাফলে তোমার স্মরণ মননের এইরূপ ফললাভ হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামীও নরোত্তমের এই প্রকার ভজননিষ্ঠা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "ঠাকুর মহাশয়" এই নাম প্রদান করিলেন। তদবধি নরোত্তম 'ঠাকুর মহাশয়' নামে বিখ্যাত হইলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি এল)।



কিশোরীর কেশ-গুচ্ছ

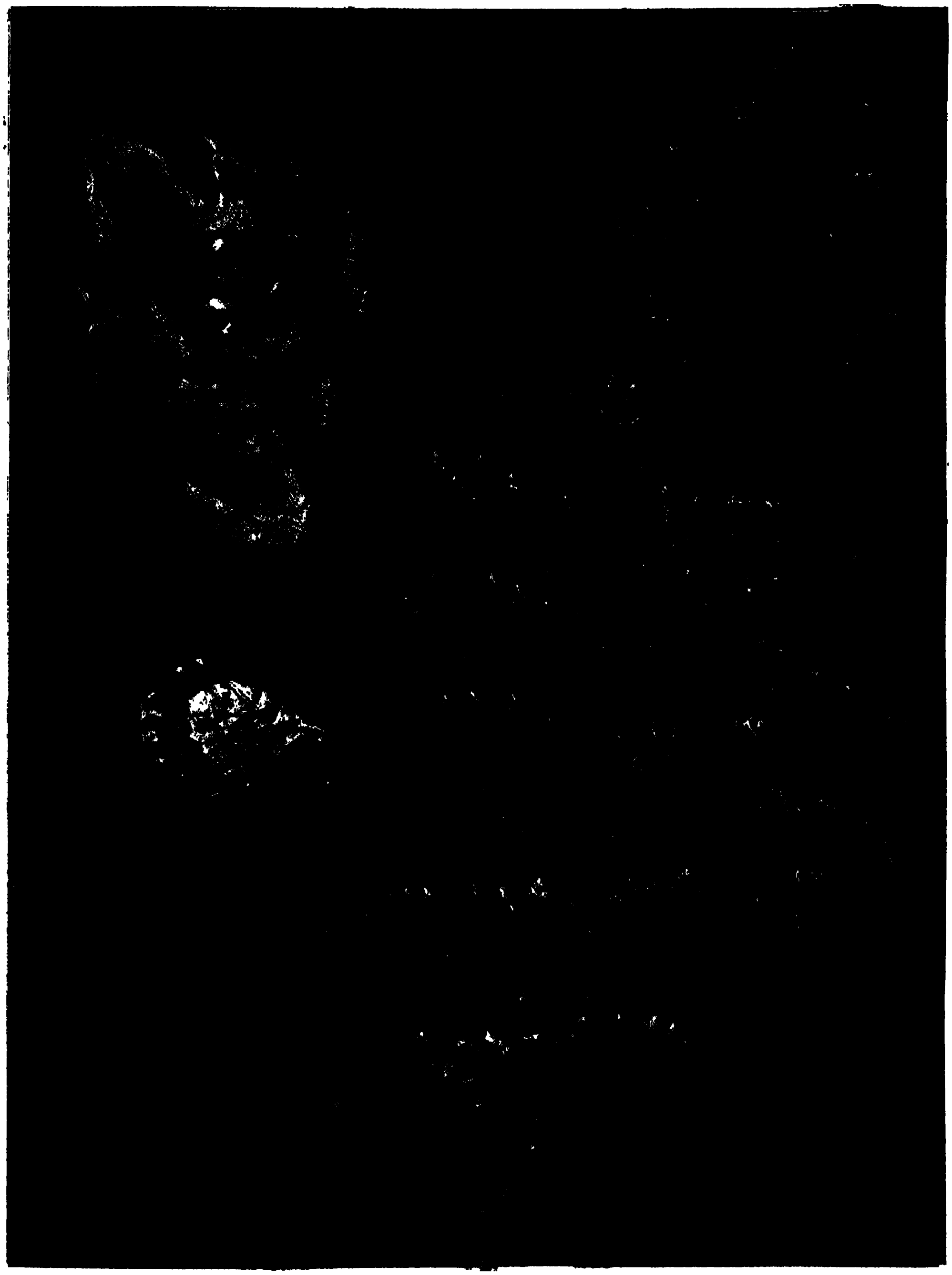
সবুজের উপর কি যে আমাদের মায়া ! এ মায়া জন্ম-গত ! . ভালোবাসে ; বইয়ের পাতায়-পাতায় রকমারি লতা-
তাই ছেলেমেয়েরা কচি-সবুজ লতা-পাতা লইয়া খেলিতে পাতা গুঁজিয়া সবুজ-প্রীতির পরিচয় দেয় ।



সর্প-জিহ্বা

ছেলে-বয়সের এই সবুজ-প্রীতি বড়-বয়সে সবুজ গাছ-পালার উপর প্রসারিত হয়। তাহারি ফলে

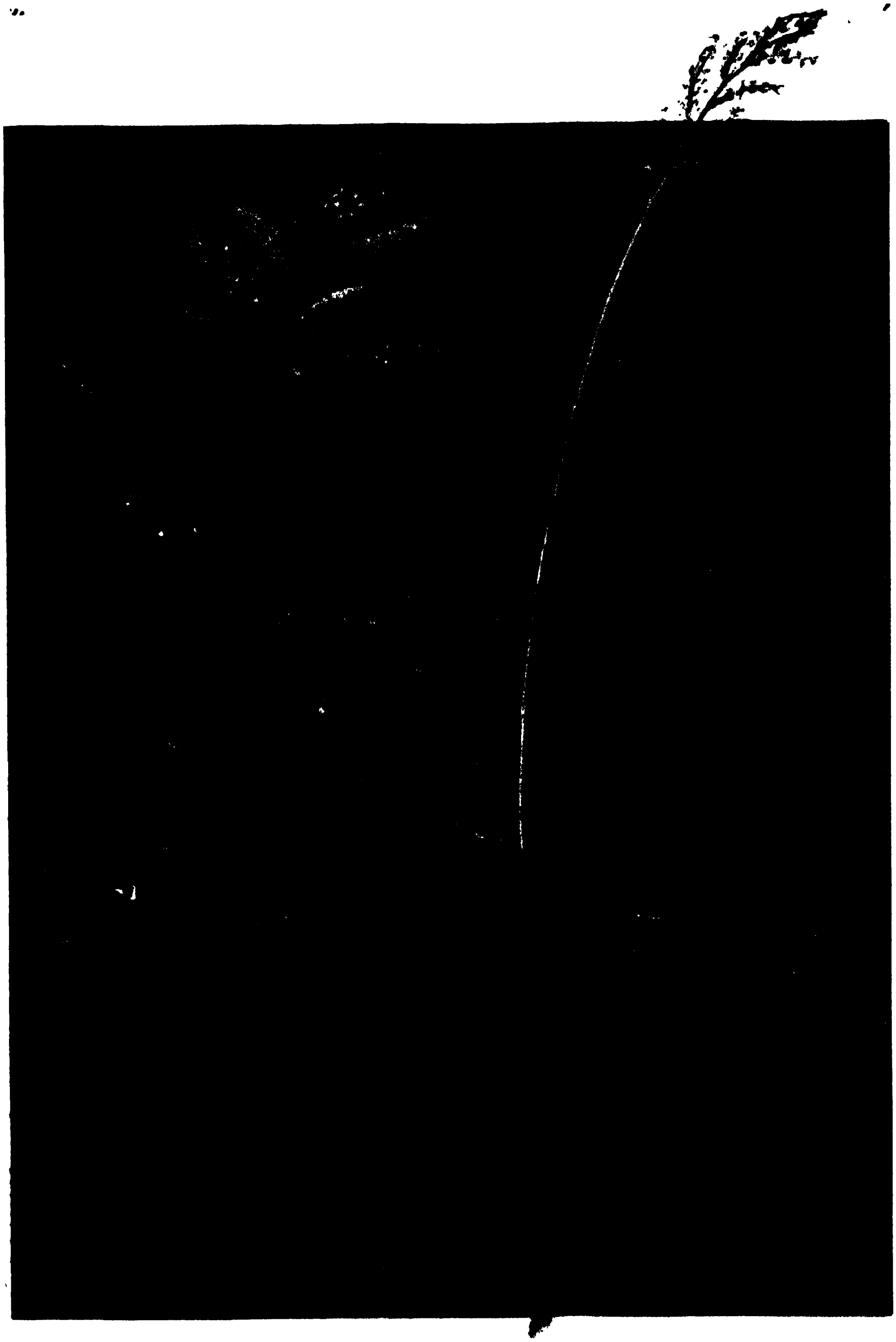
আমরা বাগান রচনা করি, বাড়ীর উঠানে মাটী না পাইলে টবে করিয়া পাম ও পাতা-বাহার



কমন্-উড　　(খুব সাধারণ ফার্ণ)

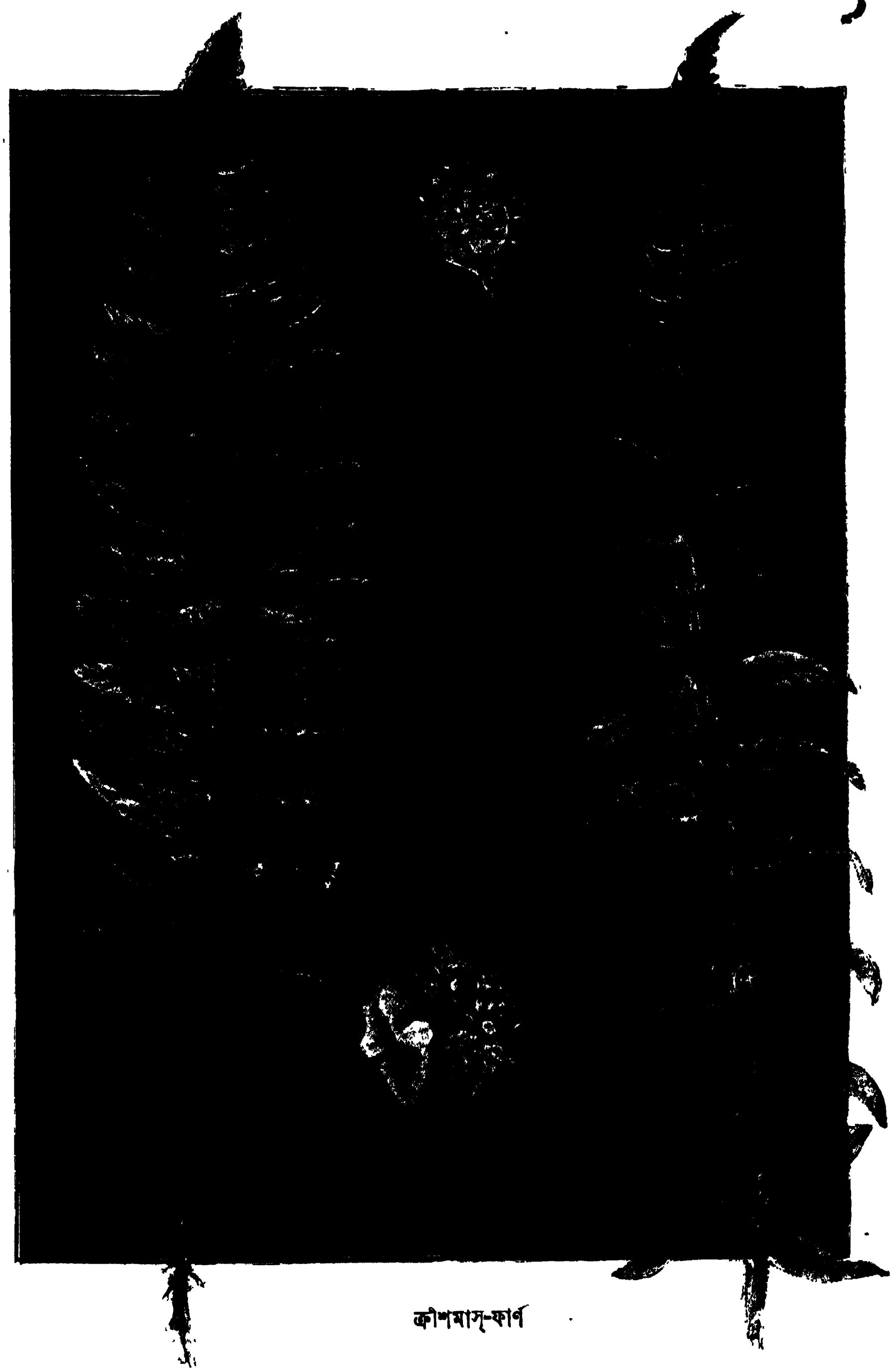
ফুল-বাহার গাছ-পালা পুঁতিয়া নয়ন-মনের আনন্দ সাধন করি।

যাদের এ-প্রীতি বেশী, তাঁরা শুধু দেশের গাছ-পালা লইয়া খুশী থাকিতে পারেন না; দেশ-বিদেশের নয়ন



র‍্যাট্‌ল্‌-স্নেক্ ফার্ণ

বিমোহন গাছ-পালা আনিয়া সে-সবের সমাদর করেন। এ-সমাদর শুধু ফল-গাছেই আবদ্ধ থাকে না; যে-গাছে কোনো কালে ফুল ফোটে না, শুধু পাতার বাহার, সে গাছের উপরও প্রসারিত হয়। এবং এই অনুরাগের



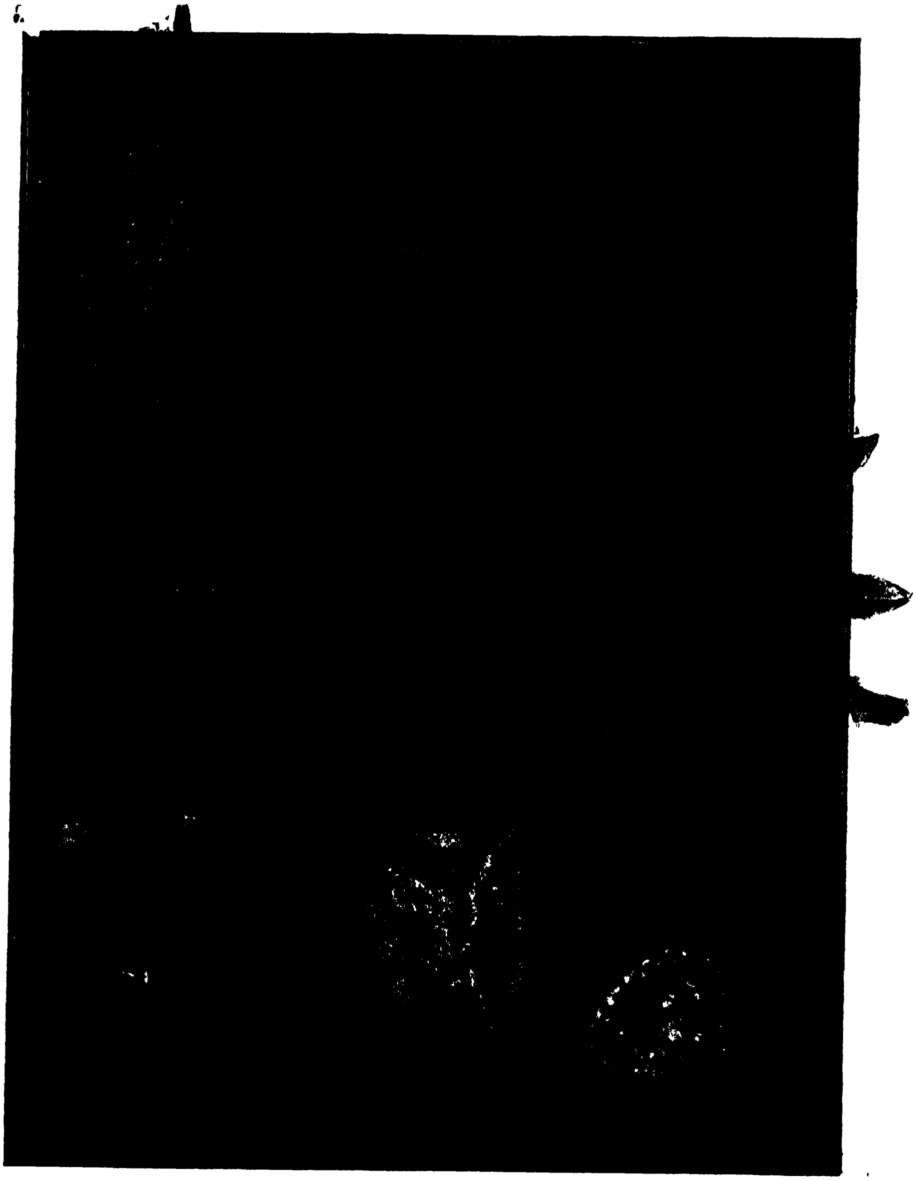
ক্রীশমাস্-ফার্ণ

বশে মানুষ বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া পাতা-বাহার নানা রকমের গাছপালা খুঁজিয়া আনিয়া বাড়ীর ও বাগানের শোভা-বর্দ্ধন করে।

বনে এক-জাতের গাছ মেলে, তার নাম Ferns, এ-সব গাছের পাতায় শুধু রকমারি বাহার; এবং সে পাতার বর্ণ চির-সবুজ। তাই এই ফার্ণের লালনে সৌখীন নর-নারীর যত্ন ও আদরের আজ সীমা দেখি না।

'ফার্ণ' কথার বাঙলা-প্রতিশব্দ পত্রাঙ্গ। অর্থাৎ এ-গাছের দেহ পত্রে পত্রময় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না!

ফার্ণে যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি মাধুরী! কবি-দার্শনিক

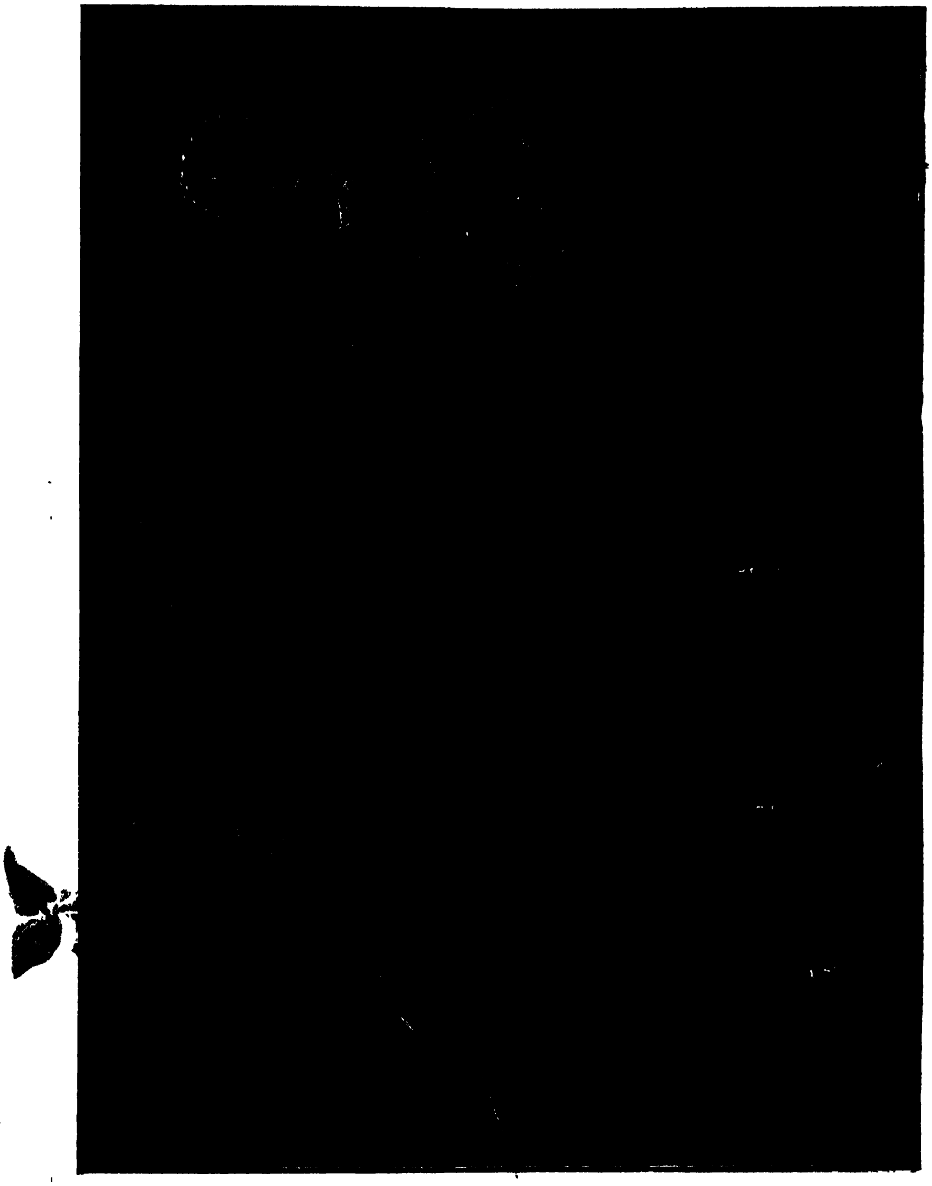


লজ্জাবতী

হইতে সুরু করিয়া অকবি অতি-সাধারণ লোকও ফার্ণের রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। 'ফার্ণ' যেন বিরাম-আরামের প্রতিচ্ছবি! দেখিলে দেহ-মনের শ্রান্তি নিমেষে ঘুচিয়া যায়।

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন,—Truly, in beauty of leaf they are unsurpassed. ফার্ণের পাতায় বাহারের তুলনা নাই! কে যেন সকল দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া অতি-যত্নে এ-সব পত্র-পল্লব রচনা করিয়াছে!

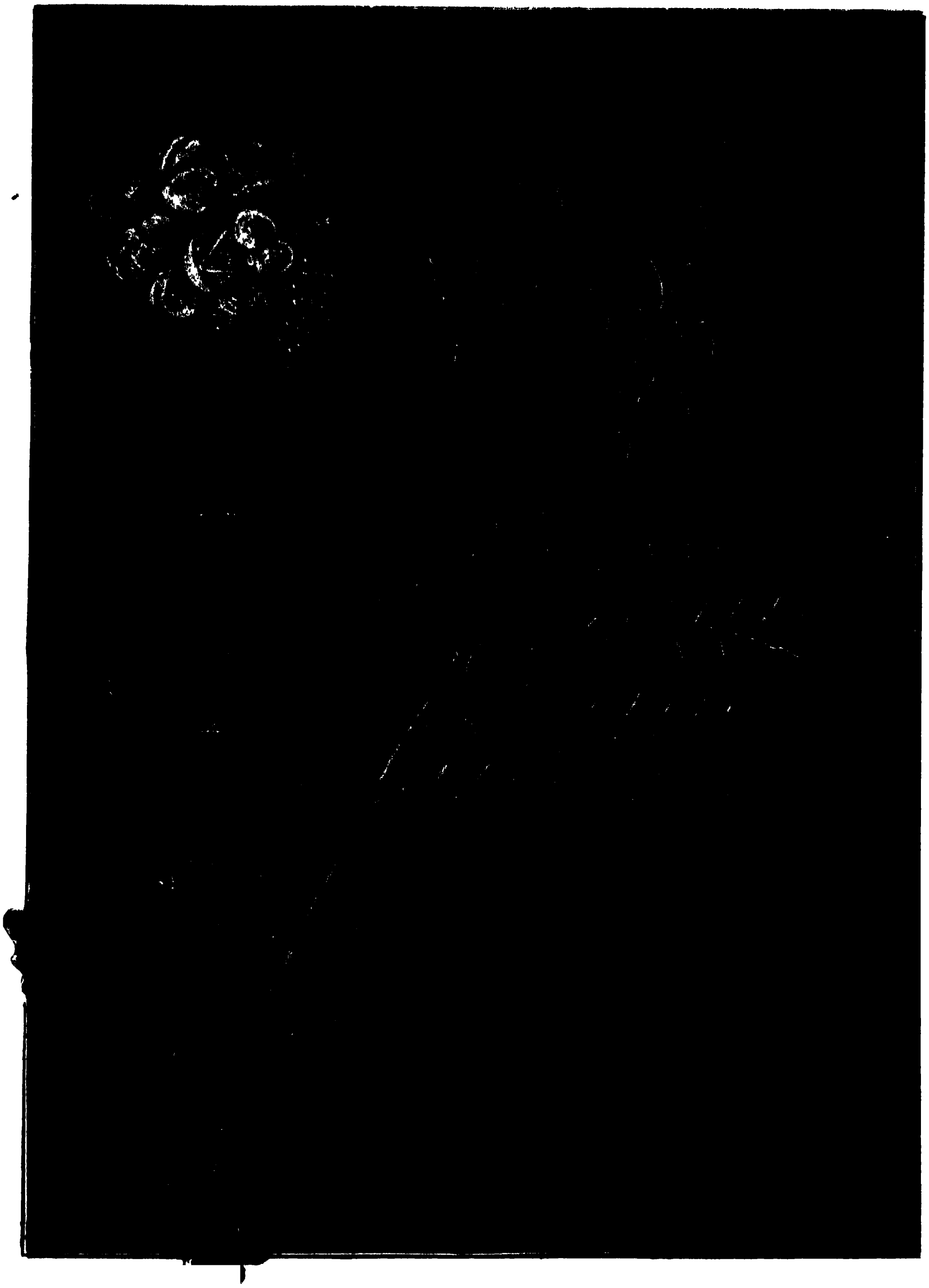
ফার্ণের পাতার গড়ন অনেকটা পাখীর পালকের মতো। 'ফার্ণ' কথাটির উৎপত্তি লাটিন Pinna কথা হইতে। পিনার আসল অর্থ, পালক। ফার্ণের পাতার গড়নে পালকের গড়ন-সাদৃশ্য দেখিবেন। উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে তাই fern-like কথাটি পত্র-পল্লবের পালক-ভাব



বুঝাইতে ব্যবহার করা হয় (to signify a feathery quality of the foliage suggestive of ferns —the highest group among the flowerless plants.)।

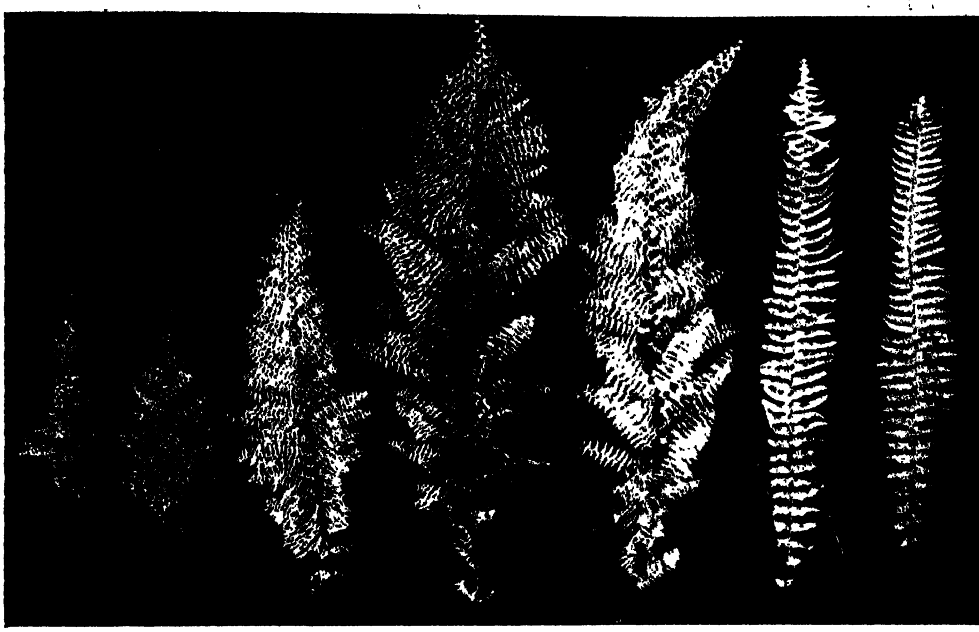
ফার্ণে কদাচ ফুল ফোটে না। ফার্ণের মতো দেখিতে কোনো গাছে যদি ফুল ফুটিতে দেখেন, তাহা হইলে জানিবেন, শাস্ত্র-মতে সেগুলি ফার্ণ নয়। বিদেশী সুইট ফার্ণ নামে এক-জাতের পুষ্প-তরু দেখিতে অবিকল ফার্ণের মতো ; কিন্তু সেগুলি ফার্ণ নয়। সেগুলি উদ্ভিদ্-শাস্ত্রের মতে 'বে-বেরি' জাতীয় পুষ্প-তরু।

ঠাণ্ডা ও গরম দেশ—দু' দেশের মাটীতেই ফার্ণের জন্ম হয়। দেশ-ভেদে তাদের আকারে-প্রকারে বহু প্রভেদ দেখা যায়। ঘন বনে যেমন ফার্ণ জন্মায়, তেমনি আবার পাহাড়ে-পর্ব্বতে বা তুষার-প্রদেশে জন্ম লইতেও



ইন্‌টারাপ্‌টেড্‌-ফার্ণ

তার কোনো বাধা ঘটে না। ফার্ণ-সম্বন্ধে এ-যাবৎ এত রকমের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন হইয়াছে যে, ফার্ণের জাতি-গোষ্ঠীর সঠিক পরিচয়-নির্দ্ধারণে সুধী-সমাজে আজ এতটুকু গলদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই। ফার্ণের আনু-পূর্ব্বিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞেরা বলেন, ফার্ণের জন্ম হয় মনুষ্য বা জীব-জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে।



তলোয়ার-ফার্ণ—ফ্লোরিডা



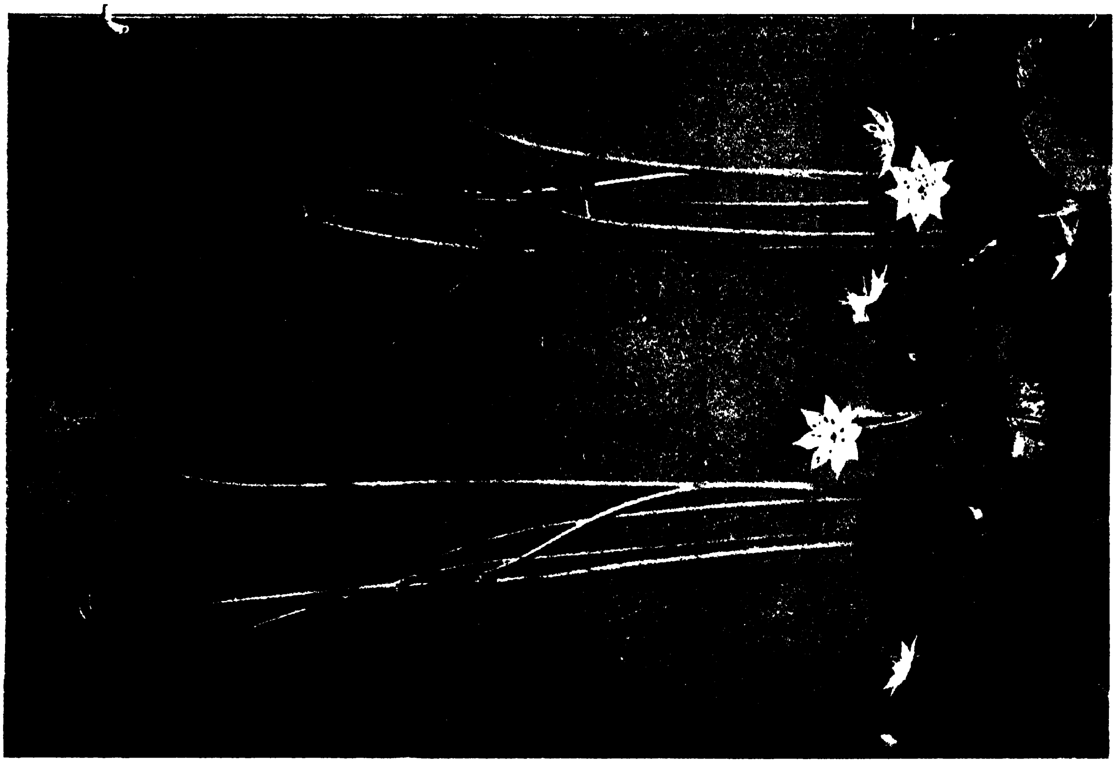
গাছের ডালে "বিহঙ্গ-নীড়"-ফার্ণ—ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ

খর্নি হইতে আজ আমরা যে কয়লা পাইতেছি, এ কয়লা সেই আদি-যুগের ফার্ণের পাষাণ-রূপ।

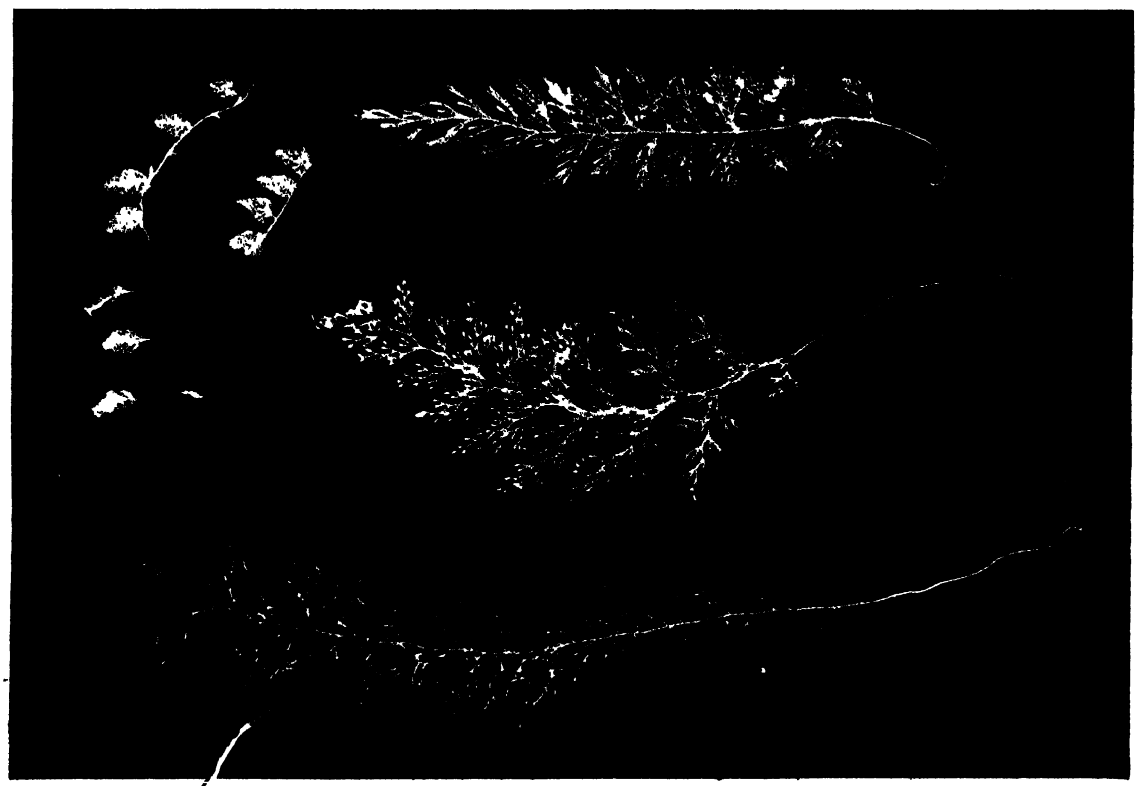
আজ পর্য্যন্ত আট-হাজার জাতের ফার্ণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই আট-হাজার ফার্ণের মধ্যে আছে বারোটি প্রধান শ্রেণী বা জাতি; এবং ১৭৫টি উপ-শ্রেণী বা পরিবার। ফার্ণের গোত্র-কাহিনী রোমান্সের মতো সরস এবং উপভোগ্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফার্ণের সঙ্গেই মানুষের পরিচয় কিছু বেশী। য়ুরোপের বহু প্রদেশের ফার্ণের পরিচয় আজ পর্য্যন্ত নর-সমাজে অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। উত্তর-আমেরিকায়—শুধু মেক্সিকোর উত্তর-সীমা পর্য্যন্ত প্রায়

অর্থাৎ এই ফার্ণই পৃথিবীর বিরাট উদ্ভিদের অন্যতম আদি-পুরুষ—They were among the first and the simplest of the larger land-plants.

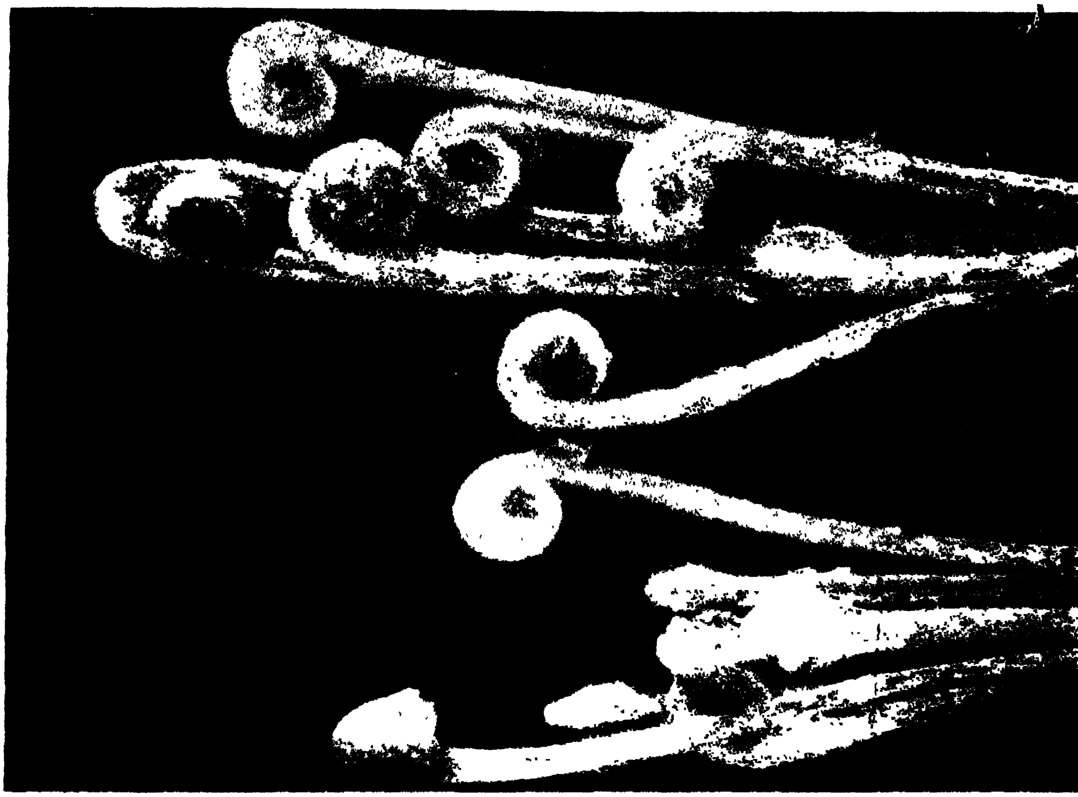
২৫০ জাতের ফার্ণের পরিচয় মিলিয়াছে এবং উদ্ভিদ-তত্ত্বজ্ঞেরা এখনো নিত্য নব-নব কত ফার্ণ যে আবিষ্কার করিতেছেন, তার আর সংখ্যা নাই



ফুলের বনে মেয়েল ফার্ণ



ফার্ণ নয়—যেন মিহি রেশম।



বাজনা নয়—সিনামন-ফার্ণ।

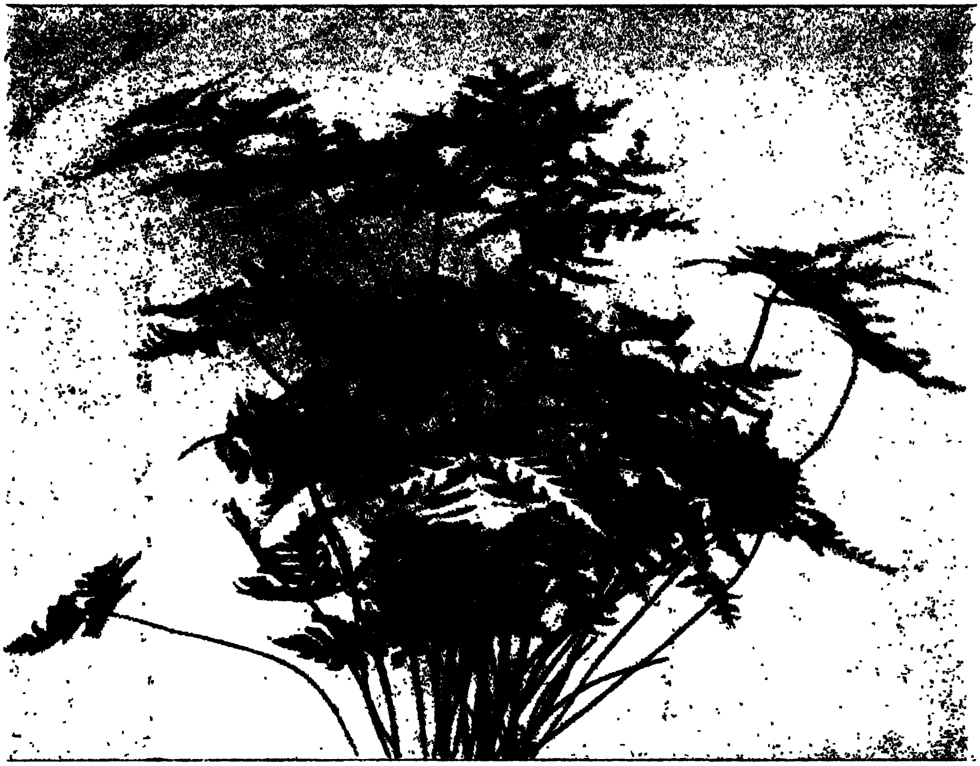


ফার্ণ-কুঞ্জ—হাওয়াই দ্বীপে

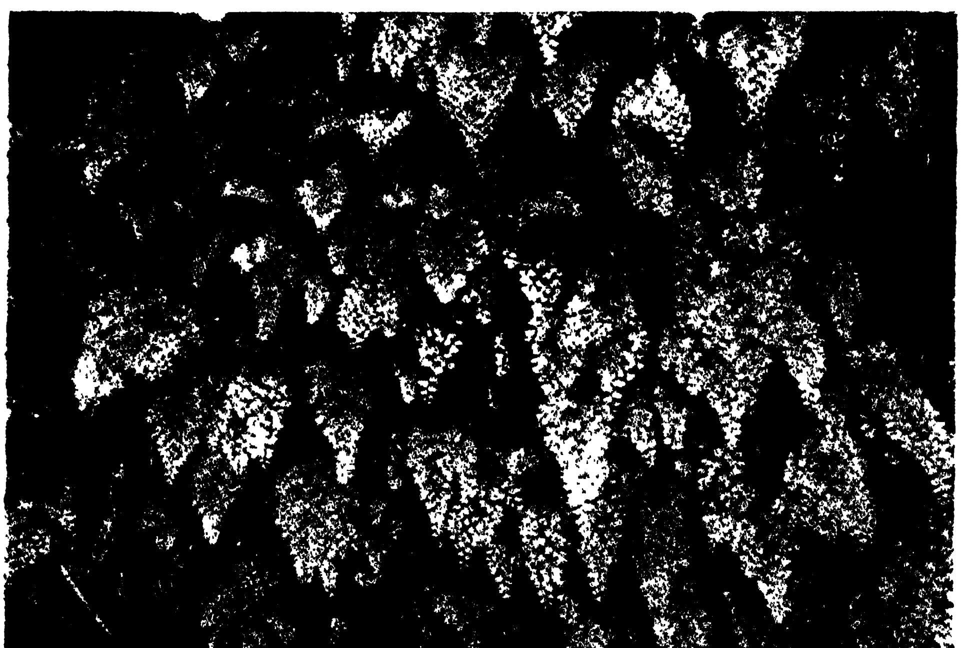
মাটীতে শিকড় ধরিয়াই যে শুধু ফার্ণের জন্ম, তা নয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং ব্রহ্মদেশে বড় বড় গাছের মাথায়-ডালে পাতায়-পাতায় নাগালের উর্দ্ধে নানা রকমের ফার্ণ অজস্রভাবে জন্মিতে দেখা যায়।

ফার্ণ-সংগ্রহ অনেকের কাছে রীতিমত নেশা বা বাতিকের মতো! এই ফার্ণ সংগ্রহ করিতে কত লোক দুর্গম বনে-জঙ্গলে গিরি-পর্ব্বতে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁদের সে-বিচরণ কতক যেমন সফল হইতেছে, তেমনি এই ফার্ণ সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেকে আবার কঠিন ব্যাধিতে, হিংস্র-পশুর মুখে অথবা অপঘাতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন!

জামেকা দ্বীপে ফার্ণ প্রচুর অজস্র



মরুর বুকে এ ফার্ণ জন্মায়



'কিশোরী-কেশ' ফার্ণ—ফ্লোরিডা

ভাবে জন্মায়। এখান হইতে প্রায় ৫০০ বিভিন্ন জাতের ফার্ণ আনিয়া য়ুরোপে-আমেরিকায় তাদের ফশল ফলানো হইয়াছে। মেক্সিকো হইতে চিলি পর্য্যন্ত এই সমগ্র প্রদেশ ঢুঁড়িয়া সন্ধানী বিশেষজ্ঞের দল হাজার-

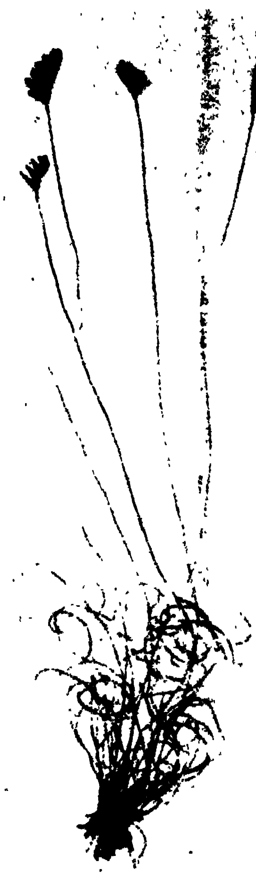


ফার্ণ-গাছ—যবদ্বীপ

হাজার জাতের ফার্ণ আনিয়া য়ুরোপ-আমেরিকার মাটীতে পুঁতিয়া মাটীর বুক সবুজ-শ্রীতে কাস্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন।

ফ্লোরিডার ফার্ণগুলির আকৃতি-প্রকৃতিতে বহু-বৈচিত্র্য দেখা যায়। এখানে এক-জাতের ফার্ণ আছে, তার নাম জুতার-ফিতা ফার্ণ। তাল গাছের পত্রগুচ্ছকে অবলম্বন করিয়া এ ফার্ণ জন্মায়; এবং ফিতার মতো হাজার-হাজার ফার্ণের ঝাড় ঝুলিতে থাকে।

আর-এক জাতের ফার্ণ আছে, তার নাম Hand-fern বা হাত ফার্ণ! এ ফার্ণ এবং এ্যাডার্স-টঙ বা সর্প-জিহ্বা ফার্ণ —এই দু' জাতের ফার্ণ আমেরিকার পূর্ব্বাঞ্চল ছাড়া আর



'কুঞ্চিত-তৃণ' ফার্ণ

কোথাও দেখা যায় না। কেন,—বিশেষজ্ঞেরা আজো তার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই।

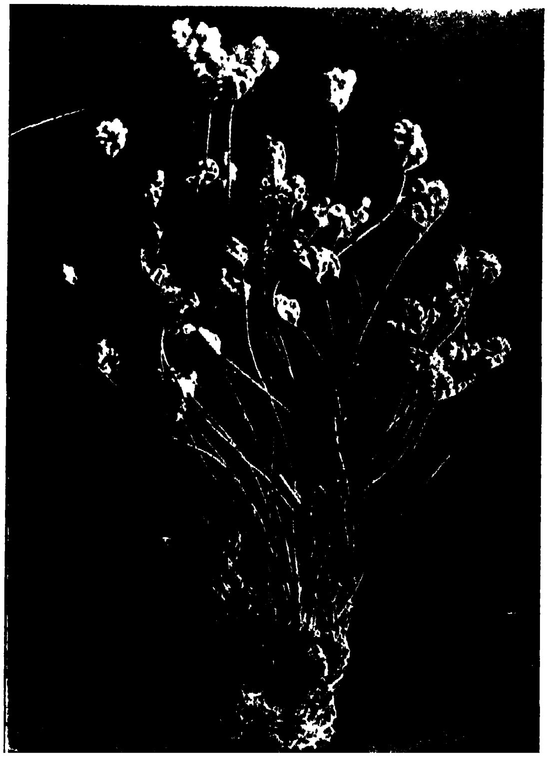
ফ্লোরিডায় মেড্‌নহেয়ার বা কিশোরীর কেশগুচ্ছ বলিয়া এক-জাতের 'ফার্ণ' জন্মায়। এ ফার্ণ দু' জাতের। এক রকমের নাম, রতিদেবীর কেশ-গুচ্ছ। এগুলির মাধুরী অপূর্ব্ব। ফ্লোরিডায় এবং আমেরিকায় এ ফার্ণের দেখা মিলিবে। আর এক জাতের নাম, বাটাডোশ্‌ ফার্ণ।

এগুলি খুব সাধারণ-জাতের ফার্ণ। সকল দেশের পথে-ঘাটে যত্র-তত্র অজস্র ভাবে এ ফার্ণ জন্মিতে দেখা যায়।

নিউ-জার্শি প্রদেশে দেবদারু গাছের গায়ে এক-জাতের ফার্ণ জন্মায়, তার নাম কুঞ্চিত তৃণ বা curly grass. এ ফার্ণ ঘাসের মতো। নিউ-জার্শির দেবদারু কুঞ্জ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোথাও এ ফার্ণের দেখা মিলিবে না।

ফার্ণের জন্ম-কাহিনী বেশ রহস্যময়। মাটীর নাম-গন্ধ নাই এমন রুক্ষ যে-পাহাড়, সে-পাহাড়ের পাষাণ-দেহ ফুঁড়িয়াও ফার্ণ উঠিয়াছে, এ দৃশ্য বিরল নয়! তবে এ ফার্ণে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। এ ফার্ণে পত্রগুচ্ছের নীচের দিকটা মোমের মতো নরম এবং আর্দ্র; অথচ পাতার উপরের দিক দেখিতে রুক্ষ এবং শুষ্ক। পাতার দু' পিঠের এ পার্থক্যর জন্য বাহার যা খোলে, চমৎকার! বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই আর্দ্রতা-হেতু ইহাদের অজস্রতা যেমন অবাধ, পরমায়ু তেমনি দীর্ঘ হয়।

বালুময় মরু-প্রান্তরেও ফার্ণ জন্মায়। মরুর ফার্ণ এবং রুক্ষ-গিরির ফার্ণ—এ-দু'য়ের বিশেষত্ব এই যে, দারুণ গ্রীষ্মে ও প্রখর রৌদ্রতাপে এ-সব ফার্ণের পত্র-পল্লব মুদিত-চক্ষুর মতো দল গুটাইয়া থাকে; বৃষ্টি-বাদলায় বা রাত্রে ঠাণ্ডা পড়িলে সে পত্র-পল্লব আবার দল মেলিয়া বুক ফুলাইয়া শোভা-মাধুরীতে জাগিয়া ওঠে।



উষর-প্রান্তরের ফার্ণ



মৃগ-জিহ্বা ফার্ণ (বড় বিরল)



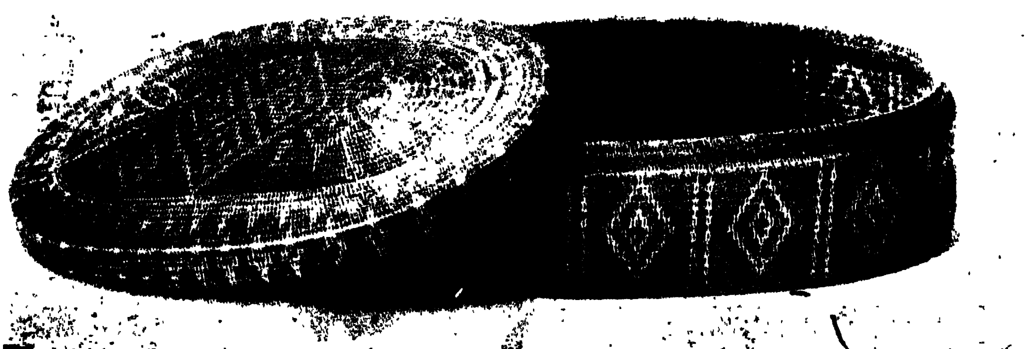
লেডি ফার্ণ—ফুলের বনে জন্মায়

এ ফার্ণ অজস্রভাবে জন্মায়। দেখিলে মনে হইবে, শৈবাল-দল! আসলে কিন্তু এগুলি শৈবাল নয়—ফার্ণ!

বৃষ্টির জল বুকে ধরিয়া রাখিবে, ফার্ণের সে শক্তি বা সুযোগ আদৌ নাই! কুয়াশা-বাষ্পটুকু ধরিয়া রাখিবার মতো সামর্থ্য যে-ফার্ণের নাই, সেও দীর্ঘজীবী হয়; সেও দল মেলিয়া শোভা-মাধুরীতে ভরিয়া ওঠে। ইহার কারণ, ফার্ণের পাতায় শিরার মতো যে-রেখা দেখা যায়, বায়ু হইতে বাষ্প সংগ্রহ করিয়া সেই রেখাই ফার্ণকে সরস ও জীবন্ত রাখে।

সব-চেয়ে বড় আকারের যে-ফার্ণ, তার নাম Cyatheaceae। পোর্টোরিকো, হাওয়াই এবং ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জ ভিন্ন আর কোথাও এ ফার্ণ জন্মায় না। এ ফার্ণ মাথায় বাড়ে তালগাছের মতো; অর্থাৎ বিশ হইতে আশি ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়; শাখাপ্রশাখা আদৌ নাই, কাণ্ড হয় তালগাছের মতো। অষ্ট্রেলিয়াতেও

সব-চেয়ে ছোট জাতের ফার্ণ দেখা গিয়াছে কেন্‌টাকি প্রদেশে গিরি-নির্ঝরের কোলে। শৈবালের গায়ে ঘেঁষ দিয়া এ ফার্ণ মাথা তোলে! ভিজা বেলে-পাথরের গায়েও



লতানে ফার্ণে বোনা প্যাটারি (শ্যাম দেশ)

বড় বড় ফার্ণ জন্মায়। অষ্ট্রেলিয়ানরা এ-জাতের ফার্ণকে বলে ফার্ণ-গাছ (Fern trees)।

ইংলণ্ডের বোটানিক্যাল উদ্যানে ফার্ণের লালন-সম্বন্ধে বিশেষ সুব্যবস্থা আছে। দেশ-বিদেশ হইতে সেখানে প্রায় দু' হাজার বিভিন্ন জাতের ফার্ণ আনিয়া সেই সব ফার্ণকে লালন ও রক্ষা করিবার জন্য কোনো টিকে কাচের, কোনো-টিকে বা তৃণ-খচিত ঘরে রাখা হইয়াছে। ফার্ণের ধাত বুঝিয়া কোনো ঘরে তাপ রাখা হইতেছে ৪৫ ডিগ্রী, কোনো ঘরে ৫০, কোনো ঘরে ৬০, আবার কোনো ঘরে বা ৭৫ ডিগ্রী। রক্ষা-কল্পে এ সব ফার্ণের আদি-জন্ম-ভূমির জল-বাতাসের অনুরূপ জল-বাতাসের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। যে-ফার্ণ রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে জন্মায়, সে-ফার্ণকে পাথরে-রচা নকল পাহাড়ে রাখা হইয়াছে; যে-ফার্ণ নির্ঝর-শৈবালে জন্মায়, তাকে রাখা হইয়াছে নকল ঝর্ণার শৈবাল-শয়নে! আবার যে-সব ফার্ণ ছায়ায় বাঁচে, তাদের রাখা হইয়াছে বিশেষভাবে তৈয়ারী ছায়াস্নিগ্ধ ঘরে।

এখানকার শিবপুরের বোটানিক্যাল উদ্যানেও ফার্ণের কুঞ্জ-গৃহটি দেখিবার মতো।

প্রাচীন যুগে এই সব ফার্ণ নানা ব্যাধিতে ওষধি লতারূপে ব্যবহার করা হইত। ফার্ণের পাতা হইতে প্রাচীন মিশরে, গ্রীসে এবং আমেরিকায় বিবিধ পানীয় রচিত হইত। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসী-সমাজে ক' রকমের ফার্ণ এখনো মিষ্ট রসের সৃষ্টিকল্পে



গাছ-ফার্ণ—অষ্ট্রেলিয়া

প্রচুর ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। হাওয়াই দ্বীপে বৃক্ষ-ফার্ণে গেঁড় জন্মায়। সেখানকার অধিবাসীরা আলুর মতো এ গেঁড় খায়। গাছ-ফার্ণে টেলিগ্রাফ-পোষ্টের কাজ চলিতেছে। খুব দীর্ঘজীবী এবং মজবুত বলিয়া এ-সব ফার্ণ-পোষ্ট সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ থাকে না।

যবদ্বীপে সুদীর্ঘ যে ফার্ণ-গাছ জন্মায়, সে গাছ কাটিয়া তাহাতে সিগার-কেশ ও টুপি তৈয়ারী হয়; শ্যাম-প্রদেশে গাছ-ফার্ণের ছাল ও লতানে ফার্ণ দিয়া ঝুড়ি-প্যাঁটারি তৈয়ারী হয়। এ সব প্যাঁটারি-ঝুড়িতে তারা নানা রকমের নক্সার কাজ

করে। পাশ্চাত্য সৌখীন-সমাজে সে সব চুপড়ি-ঝুড়ির আদরের সীমা নাই!

ঘর সাজাইবার জন্য তিন রকম ফার্ণের আদর সব-চেয়ে বেশী। এক রকমের ফার্ণ ১। ক্রীশ্‌মাস বা বড়দিন ফার্ণ; ২। কমন-উড-ফার্ণ বা সাধারণ গাছ্-ফার্ণ; এবং ৩। সিনামন বা দালচিনি ফার্ণ। যাঁরা ফুলের ব্যবসা করেন, তাঁদের কাছে এ তিন রকম ফার্ণের প্রয়োজন খুব বেশী। তার কারণ, বোকে তোড়া বা বটন্‌হোল রচিবার সময় এই তিন রকমের ফার্ণ দিয়াই তাঁরা তোড়া, বটনহোল্ ও বোকে বাঁধেন। এ তিন রকমের ফার্ণ রেশমী-সুতার মতো বেশ মিহি; এবং এ-সব ফার্ণের গায়ে ফুলের বাহার খোলে চমৎকার! এ তিন জাতের ফার্ণ প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায়।

ফার্ণের একটি বিশেষ গুণ—সে মরণ-জয়ী। ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, রৌদ্র-তাপে বা আঘাতে ফার্ণ মরিতে জানে না!

অনেকের ফার্ণ-প্রীতি এত বেশী যে, তাঁরা ফার্ণ জমান। জমাইবার জন্য ফার্ণ আনিয়া তাকে পুঁতিতে হইবে, এমন বিধি নাই। ফার্ণ আনিয়া ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া দিন, বইয়ের পাতায় গুঁজিয়া রাখুন,—দশ বৎসর, বিশ বৎসর, চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরেও সে-পাতার বর্ণ জ্বলিয়া যাইবে না; জীর্ণ হইয়া সে-পাতা চূর্ণ হইবে না। ফার্ণের এই যে জান্, এমন জান্ উদ্ভিদ-রাজ্যে আর কোনো গাছপালার নাই!

এবার আমরা কয়েকটি বিশেষ-জাতের ফার্ণের পরিচয় দিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

১। র‍্যাট্‌ল্-সাপ (Rattle-snake) ফার্ণ! এ-ফার্ণ দেখিতে ফুলন্ত-গাছের মতো। উত্তর-আমেরিকায় এ-ফার্ণ অজস্র ভাবে জন্মায়। এ-ফার্ণে মঞ্জরীর উদ্ভব হয়। তখন চেহারা হয় দেখিতে সাপের মতো। মঞ্জরীর



কানন-পথে সাধারণ ফার্ণ

বর্ণ কাল্‌চে-হরিদ্রা—সেগুলি দেখিতে আধার-পুটের মতো। এ-পুটের মধ্যে গন্ধক-রঙের গুটি বা দানা থাকে।

২। সর্প-জিহ্বা ফার্ণ (Adder's Tongue)! এ ফার্ণের পাতা দেখিতে অনেকটা আলুর পাতার মতো। জন্ম উত্তর-আমেরিকায়।

৩। ইন্‌টারাপ্‌টেড্ ফার্ণ!—জন্ম এশিয়ায় এবং আমেরিকায়।

৪। কিশোরীর কেশ (Maiden-hair)। এ ফার্ণের জন্ম মেক্সিকোয় এবং এশিয়ায়। স্তবকে স্তবকে পাতা-গুলিকে দেখায় যেন কিশোরীর কেশগুচ্ছ!

৫। কমন-উড্ ফার্ণ। বোকে বা বটন্‌হোল্ রচিতে এ ফার্ণের ব্যবহার প্রশস্ত। জন্ম উত্তর-আমেরিকায় এবং এশিয়ায়।

৬। ক্রীশ্‌মাস ফার্ণ! অপর নাম Dagger fern বা ছোরাছুরি-ফার্ণ। সকল দেশেই অজস্রভাবে জন্মায়। এ ফার্ণের পাতায় রঙের বাহার খুব নয়ন-বিমোহন।

৭। Sensitive বা লজ্জাবতী লতা।

৮। চলন্ত বা walking fern! এ ফার্ণের বিশেষত্ব—ইহার পাতার ডগায় মূল গজায়। সেই মূল হইতে আবার নূতন ফার্ণের সৃষ্টি হয়। এ-ফার্ণের পাতা চির-সবুজ। জরাজীর্ণ হইলেও পাতার সে সবুজশ্রী কখনো লোপ পায় না।

নারী-প্রশস্তি

তোমারে হেরেছি শরৎ-প্রভাতে
শুভ্র শেফালি-ফুলের মত।
চরণে ধ্বনিত মঞ্জু নূপুর
নয়ন দু'খানি সরমে নত।

অতনু-বিজয়ী তনু দেহ-লতা,
নিশীথ-নিবিড় কেশের রাশি।
রূপের মাঝারে অরূপ-প্রতিমা—
ভুবন-ভুলানো মধুর হাসি।

অন্তঃসলিলা শুনেছি ফল্গু—
তুমি কি তাহার মূরতি নব?
অথবা বিভূতি-ভূষিত-বহ্নি
না জানি কেমন স্বরূপ তব!

সৃষ্টির আদি প্রভাত হইতে
বন্দনা তব গেয়েছে কবি।
পূজেছে প্রেমিক প্রণয়-কুসুমে
শিল্পী এঁকেছে তোমার ছবি।

গৃহে গৃহে তুমি 'যশোদা'-জননী
'গোপাল'-শিশুরে লইয়া কোলে
কোথাও শাসিছ, কোথাও হাসিছ,
রোষ-ভরে,—কভু কৌতূহলে!

ইঙ্গিতে তব লভিয়া প্রেরণা
না জানি সে কোন্ সম্মোহনে
বিদ্যুতে নর বাঁধিবারে চায়—
যদিও বজ্র নিষেধ হানে।

কর্ম্মযোগের কঠোর সাধন,
তুমি যে সেথায় দীক্ষা-গুরু!
তব করুণার কম বারি-পাতে
ফলপ্রসূ কত সাহারা-মরু

হাসিয়া, শাসিয়া যে-ভালোবাসিয়া
প্রেমের অমরা সৃজিছ তুমি,
বর্ণনাতীত সে-কাহিনী, তাই
আনত শীর্ষে তোমারে নমি।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)।



(উপন্যাস)

১৮

বীণার হাসি-খুশী কোথায় ভাসিয়া গেল···

তবু তাকে হাসিতে হইল, কথা কহিতে হইল। কিন্তু সে হাসি, সে কথার সঙ্গে প্রাণের যোগ রহিল না। অক্ষম অভিনেতা যেমন নাটকের কথা মুখস্থ করিয়া গ্রামোফোন-রেকর্ডের মতো সে-কথা উদ্গীরণ করিয়া যায়, বীণার এ কথা, এ হাসি ঠিক সেই রেকর্ডের মতো প্রাণহীন।

কিরণ বলিল,—তোমার কি হলো সলিল? হাসছো, কথা কইছো···কিন্তু যেন আর-এক মানুষ!

বীণার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে বলিল,—মাথাটা হঠাৎ কেমন ধরে উঠলো···

প্রতিমা ও নন্দরাণীর মা কাছে বসিয়া খাওয়াইতেছিলেন; বীণার এ কথা প্রতিমার কানে গেল। তিনি বলিলেন,—মাথা ধরেছে?

অপ্রতিভ কণ্ঠে কোনো মতে বীণা বলিল,—একটু···

প্রতিমা বলিলেন,—এখনো সম্পূর্ণ সারতে পারোনি মা! তা এক কাজ করো, খাও—খেয়ে তিন জনে একটু পায়চারি করো। বাতাসে মাথা-ধরা সেরে যাবে। তা ছাড়া সন্ধ্যা হলো, আমরা এখনি ফিরবো।

বীণা উঠিতে চায় না! মনের মধ্যে যেন অন্ধকারের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে! সে অন্ধকারে ছায়া-মূর্ত্তির মতো কত দৈত্য, কত প্রেত হুহুঙ্কার করিতেছে! তারা যেন বলিতেছে, একবার যখন আমাদের খর্পরে পড়িয়াছ, পড়িয়া আমাদের গণ্ডীতে পা দিয়াছ, তখন কত দুর্ভোগ সহিতে হইবে, তার কি আর হিসাব আছে!

বীণা ভাবিতেছিল, ইহার চেয়ে কাশীতে বেশ ছিল! কেন যে এমন সাধ হইয়াছিল···এমন অদ্ভুত খেয়াল···

সেই শ্রীপতি কলিকাতায় আসিয়া উঠিয়াছে! নিশ্চয় তাহারি সন্ধানে! বীণা জানে, শ্রীপতি কেমন লোক! গল্পে-উপন্যাসে পড়িয়াছে villain! আগে ভাবিত, মানুষ না কি অমন কখনো হয়? ও-সব মিথ্যা কল্পনা! লেখক-দের বাড়াবাড়ি করা স্বভাব, তাই এমন সব লোকের কথা তাঁরা গল্পে লেখেন! কিন্তু শ্রীপতি···আগাগোড়া যে ভাবে বিব্রত করিয়া আসিতেছে, গল্প-উপন্যাসের কোনো villain তার সিকির-সিকি করিতে জানে না!

কিরণ বলিল,—সলিলা কিচ্ছু খেলে না মা···

নন্দরাণী বলিল,—আইস-ক্রীমটা খাও ভাই···

বীণা বলিল,—সত্যি, পারছি না···

প্রতিমা বলিল,—না খেতে চায়, ওকে জেদ করো না মা। সত্যি, মাথা ধরলে এক-এক জনের শরীরের যে-অবস্থা হয়, আমি নিজে ঐ-দলের···জানি তো!

তিন জনে উঠিল। কিরণ বলিল,—কোন্ দিকে যাবে? বাইরের দিকে?

বীণা শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—না, না···ও-দিকে ভারী ভিড়···তার চেয়ে এ-দিকে···ঐ সব গাছপালা···

—বেশ···

তিন জনে ঘুরিতে বাহির হইল। নন্দরাণী বলিল—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হবার আগে কলকাতার লোক কোথায় গিয়ে নিশ্বাস ফেলতো, সত্যি ভাই, মাঝে মাঝে আমি সে-কথা ভাবি।

কিরণ বলিল,—বাবা বল্লেন, তোদের কলকাতা

তো চমৎকার হয়েছে রে···আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতা যা ছিল···গড়ের মাঠ ছাড়া এমন একটু জায়গা ছিল না যেখানে গিয়ে মানুষ হাঁফ ছাড়তে পারে। এখন তোদের আমলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেক, ষ্টাণ্ড! বাবা বলেন, তখনকার ইডেন গার্ডেনে ব্যাণ্ড-ষ্টাণ্ডের সামনে ধুতি-চাদর পরে যাওয়া বারণ ছিল! কত দিকে কত বিধি-নিষেধ যে ছিল ওঁদের ছেলেবেলায়! বাবার কাছে সে-কালের কলকাতার গল্প শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাই! ভাবি, আমাদের এ কলকাতা···সে-কলকাতা বাঙালীর কাছে ছিল যেন সাউথ-আফ্রিকার কেনিয়া। গোরারা পথে বেরুলে বাঙালী-ভদ্রলোক তাদের কাছ থেকে দেড়শো হাত দূরে সরে যেতো···পাছে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়!

হাসিয়া নন্দরাণী বলিল—সত্যি?

কিরণ বলিল—বাবার কাছে শুনি। বাবাকে মাঝে-মাঝে আমরা ধরি, ধরে বলি, তোমাদের সে-কালের কলকাতার রূপকথা বলো বাবা···বাবা বলেন।

এ-কথায় বীণার মন নাই। তার মন ভরিয়া শ্রীপতি সেই হ্যাপি-বয়ের কাঠি-চোষা মূর্ত্তি লইয়া বসিয়া আছে! সে মনে আর কোনো-কিছু প্রবেশ করিবে, তার ঠাঁই নাই!

ফিরিবার সময় কাঁটা হইয়া বীণা চলিল সকলের পিছনে। সকলের আড়ালে নিজেকে রাখিয়া বাহিরে আসিল। বাগান, দীঘি, গাড়ী-ঘোড়া, মানুষ-জন ছাড়িয়া দুই চোখের দৃষ্টি গাছতলায় সেই সাপের সন্ধানে আকুল, অধীর!···ঐ সে গাছ-তলা···ও গাছ-তলায় ঐ সে-বেঞ্চ··

কিন্তু বেঞ্চে সে নাই!···মনের উপর দিয়া যেন এক-ঝলক বসন্ত-বাতাস বহিয়া গেল।

এবার গাড়ীতে উঠিবার পালা···তার পূর্ব্বে নূতন-সখিত্বের আবেগ-প্রীতির কত দীর্ঘশ্বাস যে বিকীর্ণ হইল!

নন্দরাণী বলিল,—এক দিন এসো ভাই আমাদের বাড়ী বেড়াতে···

মুখে শুষ্ক হাসি···বীণা বলিল,—যাবো।

কিরণ বলিল—যাবে কি! আগে বিয়ে হোক···

নন্দরাণী বলিল—কেন, এখন্ যেতে দোষ আছে?

কিরণ বলিল—দোষ নেই। কিন্তু বিয়ে যদি না হয়, ভাব করে শেষে তোমার অভাবে পস্তাবো না কি? কি বলো ভাই সলিল?

নন্দরাণী কোনো কথা কহিল না··সরমের রক্ত-রাগে তার মুখ একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল।

প্রতিমা বলিলেন—ওকে ছেড়ে দে কিরণ। রাত হয়ে যাচ্ছে···

কিরণ বলিল—সেই তো দু'দিন বাদে বাড়ীতে নিয়ে যাবে মা···তার চেয়ে আমি বলি, আজই নিয়ে চলো না কেন!

প্রতিমা বলিলেন,—দিন-ক্ষণ দেখে নিয়ে যেতে হয় রে!

কিরণ বলিল—ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য আবার দিনক্ষণ দেখবে কি!···লক্ষ্মীর জন্য সব সময়ে ঘরের দোর খোলা থাকবে।

নন্দরাণীর মা বলিলেন—লক্ষ্মীপূজাও সব-বারে হয় না মা। লক্ষ্মীপূজার জন্য আলাদা তিথি-বার ঠিক আছে।

কিরণ বলিল,—আমরা এ-লক্ষ্মীকে জল-চৌকির উপর কলার পেটোয় বসিয়ে ধান দিয়ে পূজো করবো না তো!

নন্দরাণীর মা বলিলেন—দু'দিন সবুর করো মা··· ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের ঘরে ও যেন লক্ষ্মী হয়ে কলার পেটোটুকুতেই বসতে পায়···

প্রতিমা বলিল—আয় কিরণ, আর দেরী করিস নে···

কিরণ বলিল—আসি ভাই বৌদি। কত দোষ-ত্রুটি করেছি, সে-সব ক্ষমা করো···বুঝলে?

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল—আমার দোষ-ত্রুটিও তুমি ক্ষমা করো ·

বীণা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! ভয়ে সে কাঁটা হইয়া আছে! এখানে দাঁড়াইয়া এ-সব কথাবার্ত্তা তার ভালো লাগিতেছিল না! গাড়ীতে বসিয়া নিজেকে নিরাপদ করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়! শ্রীপতি যদি কাছাকাছি কোথাও থাকে?···হঠাৎ যদি আবার এখানে আসিয়া পড়ে?···

প্রতিক্ষণ এই চিন্তা! এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে রোমাঞ্চ···

কিরণ তাকে ছোট একটা ধাক্কা দিল, দিয়া বলিল—তুমি নীরব হয়ে রইলে যে সলিল! বৌদির সঙ্গে বিদায়-সম্ভাষণ করো। না হ'লে বাড়ী গিয়ে বৌদি ঠিক বলবে, সলিলা মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়নি!

সপ্রতিভ হইয়া বীণা চাহিল নন্দরাণীর দিকে। মৃদু কণ্ঠে কহিল,—আসি ভাই···

—আমিও আসি···

প্রতিমা আবার তাড়া দিল, বলিল—আয় রে কিরণ···সলিলার মাথা ধরেছে, শুনছিস্! তা'ছাড়া ওঁদেরো রাত হয়ে যাচ্ছে, আজকের মতো ছেড়ে দে! যাস বরং এক দিন ক'জনে মিলে লেকে কিম্বা বায়োস্কোপ দেখতে, কিম্বা শিবপুরের বাগানে···তখন প্রাণ খুলে আলাপ করিস!

কিরণ বলিল—সত্যি?

প্রতিমা বলিল—হ্যাঁ।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিগলিত হইয়া কিরণ বলিল—হ্যাঁ মা, সে বেশ হবে। সে-দিন দাদাকেও বরং সঙ্গে নেবো···আমাদের গাইড হবে। তাহ'লে নাঃ, সত্যি এবার আসি, ভাই বৌদি···

ও-বাড়ীতে বিবাহের কথাবার্ত্তা দিনে দিনে পুঞ্জিত ঘনীভূত হইয়া অবশেষে এক দিন পাকা হইয়া উঠিল। এবং বিবাহের আয়োজন সুরু হইয়া গেল।

সে আয়োজনের ঢেউ আসিয়া তারাচরণের গৃহকে রীতিমত আঘাত করিল। তারাচরণ রায়কে নানা পরামর্শের জন্য ও-বাড়ীতে ছুটিতে হয়। হিরণ্ময়, প্রতিমা, কিরণ—তারাও এ-বাড়ীতে নিত্যক্ষণ ছুটিয়া আসে।

কিরণ আসিয়া সলিলাকে ধরে, বলে—এসো ভাই, দাদাকে নিয়ে জু'তে যাবার ব্যবস্থা করেছি। একটা মস্ত চক্রান্ত করেছি···যাকে বলে, রীতিমত প্লট।

এ-বাড়ীর এই হাসি-কলরবের মধ্যে ডুব দিয়া বীণা তার মনের আশঙ্কা ও সংশয় ধুইয়া-মুছিয়া সাফ্ করিতে চায়।

বীণা বলিল—কি প্লট, শুনি?

কিরণ বলিল—কারো কাছে বলবে না, বলো? ঘুণাক্ষরে এতটুকু ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নয়?

বীণার মন কৌতূহলে ভরিয়া ওঠে। বীণা বলে—সত্যি বলবো না···

কিরণ বলিল—ও-দিকে বৌদিকে টেলিফোন্ করেছি, তোমার জন্য বড্ড মন কেমন করছে ভাই, তোমাকে ভারী দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে···তা আসবে একবার জুয়ে? আমি যাবো···সলিলাকে নিয়ে যাবো। বৌদি বলেছে, আচ্ছা।

কিরণ হাসিল।

বীণা বলিল—তার পর?

কিরণ বলিল—দাদা তো আমার এ ব্যবস্থার কথা জানে না—দাদাকে বলিনি। দাদাকে শুধু বলেছি,—চুপচাপ বসে শুধু বৌয়ের মুখ ধ্যান করছো···কাজকর্ম্ম নেই···চলো দিকিনি আমাদের নিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায়। দাদা বললে,—বেশ, চ।···দাদা জানে না যে, ও-দিকে বৌদিকে জুয়ে আসতে বলেছি···আবার বৌদিকেও বলিনি যে, দাদাকে নিয়ে দাদার সঙ্গে আমরা জুয়ে যাচ্ছি···

বীণা কোনো জবাব দিল না···নিষ্পলক নেত্রে শুধু কিরণের পানে চাহিয়া রহিল।

মনে হইতেছিল, কি সুখে আছে কিরণ! শুধু কিরণ কেন, কিরণের বাড়ীর দাসী-চাকরগুলা পর্য্যন্ত। নিজের মনে হাসি-গল্প করিতেছে···ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে···কোনো দিকে বাধা নাই, দ্বিধা নাই, সংশয় নাই, ভয় নাই! আর সে···?

এ সংশয়, এ ভয়ের ভার মাঝে মাঝে এমন ভারী হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসে যে, বীণা ভাবে, আর পারি না! ভাবে, তারাচরণের পায়ের উপরে পড়িয়া কাঁদিয়া সব কথা খুলিয়া বলি···সব অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাহিয়া বলি, আমি সলিলা নই, আমি বীণা! আমি চোর, আমি ঠক, আমি বঞ্চক···আমি···আমি···কিন্তু আমাকে তাড়াইয়া দিয়ো না! তোমার পায়ের নীচে আমার জন্য একটু নিরাপদ আশ্রয় রাখিয়া দিয়ো। পায়ের নীচে সে আশ্রয়টুকু ছাড়া আর আমি কিছু চাই না···কিছু না···তোমার ধন, তোমার দৌলত, তোমার শাড়ী-সেমিজ, গাড়ী···স্নেহও আমি চাই না! এ-সব চাহিবার দাবী আমার নাই! এ-সবের লোভও কখনো করিব না!···

তার বিরস মুখ, বাকহীন মূর্ত্তি দেখিয়া তারাচরণ তাকে বুকে টানিয়া লন, বলেন—মুখ এমন মলিন কেন দিদি? অসুখ করেনি তো?

কম্পিত কণ্ঠে বীণা জবাব দেয়—না···

—তবে?

বীণার দুই চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। তারাচরণের পানে সে চাহিয়া থাকে। মুখে কথা নাই···মনের দ্বারে সেই শ্রীপতি আসিয়া দাঁড়ায়···মাঠের ধারে বেঞ্চে বসিয়া হ্যাপি বয়ের কাঠি চুষিতেছে!

এখানে কোনোমতে হয় তো মনকে সে ঠিক করিয়া লইতে পারিত···কিন্তু কোথা হইতে যে লক্ষ্মীছাড়া শ্রীপতিটা দুষ্ট গ্রহের মতো তার পিছনে আসিয়া উদয় হইল!

১৯

মনের উপর রৌদ্র-মেঘের বিরাম রহিল না! এবং এই রৌদ্র-মেঘের অবিরাম ছন্দের মধ্য দিয়া এক দিন কিরণ আসিয়া সলিলাকে বলিল,—দাদার আজ পাকা-দেখা, সলিলা। সাত দিন পরে বিয়ে।

সলিলা শুনিল, কোনো কথা বলিল না।

কিরণ বলিল,—আমি তোমাকে নিতে এসেছি। দাদুর অনুমতি নিয়ে তবে এসেছি···

সলিলার বুকে মৃদু একটু কাঁপন! ও-বাড়ীর বিবাহ··· তার মানে, প্রচণ্ড ভিড়···কত-রকমের কত লোক কত দিক হইতে আসিয়া জমিবে!

ভিড়ের নামে সলিলার ভয় এখন এত বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে···

ছ'দিন কাটিয়া বিবাহের দিন আসিয়া দেখা দিল।

সকালের দিকে বীণা চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়াছিল। কিরণ ভালোবাসে, প্রতিমা ভালোবাসে, ও-বাড়ীতে তার কত আদর, বীণা বোঝে। বুঝিলে কি হইবে? ও-বাড়ীতে লোকের ভিড়···সে যেন ভয়ে আকুল হইয়া আছে! কে হয় তো এমন লোক আসিয়া উপস্থিত হইবে, বীণাকে দেখিয়া বলিয়া বসিবে, ওমা, তুমি না কাশীতে থাকিতে—সেই ক্ষীরোদাময়ীর বাড়ীতে?

এমন ঘটে নাই! এমন ঘটিতে পারে না বলিয়া কাশীর কথা এত দিন সে কল্পনাও করে নাই! কিন্তু সে-দিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে শ্রীপতিকে দেখিয়া অবধি এ ভয় মনকে এমন করিয়া তুলিয়াছে যে, এক দিনের জন্য সে সুস্থির হইতে পারে না!

দাক্ষায়ণী আসিয়া ডাকিলেন,—সলিলা···

সলিলা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—কেন পিশিমা?

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—ওমা, এখনো চুপচাপ বসে আছো! ওরা সব তৈরী হয়েছে। মামাবাবু বল্লেন, এক সঙ্গে তোমরা তিন জনে ও-বাড়ীতে যাবে···

কুণ্ঠিত স্বরে বীণা বলিল—আমি জানতুম না পিশিমা···

মুখ বাঁকাইয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন,—এর আবার জানান দিতে হবে না কি! কি যে ভাবো, বুঝিনে বাছা! তা, হ্যাঁ আমি এসেছিলুম তোমার বৌদির বেনারসী-শাড়ীখানা ময়লা হয়ে গেছে···আমি দেখিনি তাই কাচানো হয়নি। যেটি না দেখবো, সেটির আর কিছু হবে না! হুঁঃ! হ্যাঁ, তা ভালো কথা, তোমার একখানা বেনারসী ওকে দাও, বুঝলে! না হলে ঐ ময়লা শাড়ী পরে গেলে এ-বাড়ীর মান থাকবে না!

বীণা বলিল,—আমি বার করছি পিশিমা, যেখানা পছন্দ হয়···

দাক্ষায়ণী বলিলেন—যে পরবে, তাকেই বরং ডেকে দি। তোমরা হচ্ছো বাড়ীর মেয়ে—তোমরা সাদাসিধে শাড়ী পরে গেলে ক্ষতি হবে না···কিন্তু ও বৌ-মানুষ কি না, তাই, মানে,···

দাক্ষায়ণী গেলেন বৌমাকে ডাকিতে; বীণা তার দেরাজ খুলিল।

বৌমার পছন্দ ভালো···দেখিয়া-শুনিয়া সদ্য-কেনা দেড়শ' টাকা দামের পেঁয়াজী রঙের বেনারসী পছন্দ করিল। বীণা বলিল,—বেশ, এটাই নাও বৌদি···

বৌদি বলিল,—কিন্তু ব্লাউশ্? তোমার জামা কি আমার গায়ে হবে ছোট-ঠাকুরঝি?

বীণা বলিল,—গায়ে দিয়ে ভাখো···

গোটা দেরাজটা বৌদির চার্জ্জে দিয়া বীণা সরিয়া দাঁড়াইল।

বৌদি বলিল,—তুমি কিন্তু শীগ্‌গির নাও ভাই! আর কত দেরী করবে?

বীণা একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে কি সাধ করিয়া দেরী করিতেছে? কিরণ অত ভালোবাসে···তারো মন পড়িয়া আছে সেই কিরণের কাছে! প্রতিক্ষণে মন বলিতেছে, ছুটিয়া যাই, চলো! কিন্তু পা সরিতে চাহিতেছে না! কেন সরিতেছে না, তা যদি কাহাকেও আজ খুলিয়া বলিতে পারিত! হায় রে, তা পারে না, পারে না, পারে না···

তারাচরণ রায় আসিলেন, বলিলেন—শুনছো সলিলা-দিদিমণি ··

বীণা বলিল,—দাদু···

তারাচরণ বলিলেন,—কি হচ্ছে তোমাদের? তিন জনে মিলে শাড়ীর দোকান খুলে বসেছো···

বিরজা তাড়াতাড়ি বলিল,—বৌদিকে একখানা ভালো শাড়ী বেছে দিচ্ছে কি না···বললে, তিন জনে এক সঙ্গে যাচ্ছি এক-বাড়ী থেকে···

কথাটা শুনিয়া বীণা চমকিয়া উঠিল। এ-কথার অর্থ? বীণা যেন যাচিয়া ডাকিয়া আনিয়া শাড়ী দিতেছে—বিরজা এ কথা কেন বলিল?

কিন্তু তারাচরণ এ-কথায় যেমন খুশী হইলেন, তেমনি তাঁর মনের কোণে একটু বিরক্তি না ধরিল, এমন নয়! বীণার এতখানি বিবেচনা···পরের জন্য এমন ত্যাগ-স্বীকার! সে জন্য বীণার উপর খুশী হইলেন। বিরক্তির কারণ, বীণা ভালো, মুখে কথা নাই, তাই তার দেরাজ খুলিয়া ভালো শাড়ী-জামাগুলা তচনচ করিয়া দিবার কি ইহাদের প্রয়োজন ছিল?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—শীগ্‌গির করে নাও সব। ও-বাড়ী থেকে দু'বার তাগিদ এসেছিল···এখনি না গেলে দুর্জ্জয়ময়ীর বেশে কিরণময়ী এসে যে বাক্যবাণ ছুড়বে···কিরণকে জানো তো দিদি···

বীণা জানে, বীণাকে কিরণ কতখানি ভালোবাসে···

বীণা বলিল,—আমি এখনি তৈরী হয়ে নেবো দাদু·

তারাচরণ রায় বলিলেন,—হ্যাঁ, নাও।···কি পরে তুমি যাচ্ছো···আমাকে সে-সাজ দেখিয়ো। তাড়াতাড়ি চলে যেয়ো না, বুঝলে দিদি···

তার পর তিনি চাহিলেন বিরজার পানে; বলিলেন,—সলিলা গা ধুতে যাক্। তোরা দু'জনে ততক্ষণে ওর জামা-কাপড়গুলো দেরাজে তোল্···আমি দেখি।

বিরজা প্রমাদ গণিল। বৌদির শাড়ী-জামা বাছিতে আসিয়া সেই অবসরে সেও একখানা শাড়ী বাছিয়া লইয়াছে···নিজের শাড়ীর চেয়ে এ শাড়ী দামী; তার উপর কাজের বাড়ীতে কে জানে, সকড়ি লাগিতে পারে, কত বিভ্রাট ঘটিতে পারে! শাড়ী যদি নষ্ট হইয়া যায়? তার চেয়ে যদি কিছু ঘটে, বীণার শাড়ীর উপর দিয়াই ঘটিয়া যাক্!

ইহা ভাবিয়া দেরাজ হইতে শাড়ী-জামার স্তূপ বাহির করিয়া ডাঁই করিয়া তুলিয়াছে! এ-সব এমনি রাখিয়া সরিয়া পড়িবে, ভাবিয়াছিল! কোথা হইতে অকস্মাৎ তারাচরণ রায় আসিয়া এমন আদেশ দিলেন···একখানি-একখানি করিয়া এ-শাড়ী-জামা তুলিতে প্রাণ যে বাহির হইয়া যাইবে!

কিন্তু উপায় নাই।

এ-দিককার কাজ সারিয়া তিন জনের ও-বাড়ীতে যাইতে আরো আধ-ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তারাচরণ রায় দাঁড়াইয়া বীণার বেশভূষা দেখিলেন···এমন বেশ-ভূষায় সাজিলেও বীণার মনে সেই আতঙ্ক···এ-আতঙ্ক এ ক'দিনে তার মনে শিকড় গাড়িয়া ডালপালা মেলিয়া বাড়িয়া এমন কায়েমি ঠাঁই গ্রহণ করিয়াছে···

তার মলিন মুখ দেখিয়া তারাচরণ রায়ের মনে আঘাত লাগিল। মনের মধ্যে যেন সপ্তসিন্ধু উথলিয়া উঠিল! সব কাড়িয়া লইয়া দুঃখী-কাঙালকে ঘরে আনিয়া আজ তিনি মণির আসন পাতিয়া তাহাতে বসাইতে চান! যে-দিন তার সব ছিল···মা···বাপ···

দাক্ষায়ণী আসিয়া বলিলেন,—ব্যাপার কি? এখনো তোমাদের হলো না বাছা? ও-দিকে বর বেরুবার সময় হয়ে এলো যে! এসো, এসো···

তারাপদ রায়কে দেখিয়া বলিলেন,—মামাবাবু!

তারাপদ রায় বলিলেন—তুইও যাচ্ছিস নাকি দাক্ষে?

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—বৌ অনেক করে বলে' গেছে··· তুমি যাবে না মামাবাবু ?

তারাচরণ রায় বলিলেন—যাবো। তবে বরযাত্রী যাবো না···হিরণের ওখানে ঘুরে আসবো বৈ কি। তা তোরা এক সঙ্গেই যা···তোরা ও-বাড়ীতে গিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিলে সে-গাড়ীতে আমি যাবো ··

বর-বরযাত্রী বাহির হইয়া গেলে কিরণ বলিল—তোমার-আমার নেমন্তন্ন হয়েছে সলিলা···

নিমন্ত্রণ !

বীণা কহিল—কোথায় ?

কিরণ বলিল—কনের বাড়ীতে। দাদার শাশুড়ী অনেক করে' মাকে বলে' পাঠিয়েছেন···তা' ছাড়া আরো একটা জিনিষ দেখাচ্ছি···

বলিয়া কিরণ ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া আনিল। কহিল—পড়ে ছাখো···

বীণা চিঠি পড়িল।

এ চিঠি নন্দরাণী লিখিয়াছে···বিবাহের বধূ নিজে। নন্দরাণী লিখিয়াছে—

প্রিয়তমাসু

ভাই কিরণময়ী

লক্ষ্মী ভাই, তোমার সঙ্গে আজ থেকে যে-সম্পর্কই হোক, তুমি আমার বন্ধু। আগে থেকেই আমাদের এ বন্ধুত্ব হয়েছে। শুধু তুমি কেন, সলিলাও আমার বন্ধু। আমার বিয়েতে আমার ইচ্ছা, তোমরা তুই বন্ধুতে এখানে আসবে। তাই তোমাদের তুই বন্ধুকে আজকের এ-রাত্রে বিশেষ করে নেমন্তন্ন করছি। গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসবো, সে উপায় হবার জো নেই! শুধু সেই কারণে যেতে পারলুম না। চিঠি পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করছি। এ-চিঠিতে মনের কতখানি আগ্রহ ভালোবাসা পাঠাচ্ছি, যদি বুঝতে পারো, আমার বিশ্বাস, তাহ'লে তোমরা তু'জনে নিশ্চয় আসবে—কোনো বাধাকে বাধা বলে' মানবে না।

তুমি আর সলিলা আমার সত্যিকারের ভালোবাসা নিয়ো ভাই।

তোমাদের আদর-ভালোবাসার
নন্দরাণী।

চিঠি পড়িয়া বীণা কিরণের পানে চাহিল।

কিরণ বলিল—যাবে তো ? এমন করে লিখেছে ! না যাওয়া ভালো দেখায় না।

বীণা কোনো জবাব দিল না।

কিরণ বলিল—মাকে এ চিঠি দেখিয়েছি। চিঠি দেখে মা বলেছে,—যা !···তোমার যাওয়া ? দাত্ন দোতলায় আছেন···মা'র সঙ্গে কথা কইছেন। এ-চিঠি দেখিয়ে এখনি আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে আসছি···

অনুমতি আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তারাচরণ রায় আসিলেন, প্রতিমা আসিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—চমৎকার মেয়েটি··· বুঝলে মা! এই যে চিঠি লিখে এদের তু'জনকে নেমন্তন্ন করেছে, এ থেকে বুঝছি, মেয়েটি সত্যি-সত্যি ঘরের লক্ষ্মী হবার মতো···

প্রতিমা কহিলেন,—ওরা যাবে কাকা বাবু ? পাঁচ জনে যদি কিছু বলে যে, মেয়েরা বরযাত্রী এসেছে ?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—স্নেহকে কখনো অস্বীকার করো না মা। স্নেহের ব্যাপারে পাঁচ জনের কথা গ্রাহ্য করতে নেই। নিজের জীবন দিয়ে আমি সে-শিক্ষা পেয়েছি! স্নেহের চেয়ে বড় সম্বল মানুষের জগতে আর কিছু নেই! ওরা যাবে···নিশ্চয় যাবে। এর জন্য যদি কেউ কিছু বলে, তাতে কাণ দিয়ো না, মা।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি-পথে

কালো জলধরে গগনে হেরিলে মনে পড়ে ঘনশ্যাম ;
কৃষ্ণ কোকিল স্মৃতি-পথে আনে তোমার অমৃত নাম।
নিকষ-কৃষ্ণ ভোমরা তমাল,
গাছে কালো জাম মধুর রসাল,
শত রূপে শুধু তোমারে প্রকটে, নয়নের অভিরাম।

সব কাজ ভুলে, যমুনার কূলে, বসি আনমনে একা ;
কালো জলে রাধা, কালা-প্রেমে বাঁধা, পাই তো তোমার দেখা।
তোমারে নেহারি আঁখি-তারা-মাঝে,
আঁধার নিশীথে তব রূপ রাজে,
মধুরিমা-ভরা কিবা মনোহর অনুপম তব ঠাম।

শ্রীযামিনীমোহন কর (অধ্যাপক)।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

রণনীতির পরিবর্ত্তন—

য়ুরোপীয় যুদ্ধে রণনীতির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্ম্মস্থলে ছুরিকাঘাতের প্রয়াস সফল হইবার আশু সম্ভাবনা না দেখিয়া জার্ম্মাণ সেনানায়কগণ রণনীতির পরিবর্ত্তন সাধনে বাধ্য হইয়াছেন। হিট্লার মনে করিয়াছিলেন



বোমা-বর্ষণে বিরাট অগ্নিকাণ্ড

যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের "মাতৃভূমিকে" পর্য্যুদস্ত করিতে পারিলে সমগ্র সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করা সহজসাধ্য হইবে; বৃটিশ সরকার অন্যত্র স্থানান্তরিত হইলে সাম্রাজ্যের প্রতি ঐ সরকারের কর্তৃত্ব স্বভাবতঃ শিথিল হইয়া যাইবে। এই জন্য এত দিন প্রধানতঃ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধেই জার্ম্মাণীর সমর-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। বৃটেনের পরাজয় সঙ্ঘটন প্রভূত আয়াসসাধ্য হইলেও ইহাই বৃটিশ সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার সংক্ষিপ্ত পন্থা; তাই, এই প্রয়াসের সাফল্যের জন্য হিটলার যে কোন "মূল্য" প্রদানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সমগ্র শরৎকালের প্রাণপণ চেষ্টায় বৃটেন্-জয়ের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই; তাই জার্ম্মাণ সেনানায়কগণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অবহিত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন, তদনুসারে উদ্যোগ-আয়োজনও আরম্ভ হইয়াছে।

য়ুরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র—বিশেষতঃ ফ্রান্সকে আশাতীত অল্পকালের মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়া হিট্লারের এই আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, বৃটেন্ও অল্পকালের মধ্যে জার্ম্মাণীর আঘাতে



লণ্ডনে সেন্ট গাইলে বোমা বর্ষণের পর; এই স্থানে ক্রমওয়েলের বিবাহ হইয়াছিল এবং কবি মিল্টন সমাহিত হইয়াছিলেন—বোমার আঘাতে মিল্টনের প্রস্তরমূর্ত্তি ধূলিলুণ্ঠিত হইয়াছে

পর্য্যুদস্ত হইবে। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে বিমান-শক্তির গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; অন্তরীক্ষে যাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত, সে অজেয়। আধুনিক রণবিজ্ঞানের এই মূল সত্য উপলব্ধি করিয়া জার্ম্মাণ সেনানায়কগণ বৃটেনের বিমান-শক্তি ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বৃটেনের সমগ্র সমর-শক্তি যাহাতে মাতৃভূমির রক্ষায় নিয়োজিত হইতে না পারে—বিশেষতঃ বৃটিশ নৌবহর যাহাতে স্থানান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হয়, এই উদ্দেশ্যে হিট্লার মধ্য

প্রাচীতে ইটালীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। হিট্‌লারের আশা ছিল—এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালিত হইলে অনতিকালের মধ্যেই বৃটেনের আকাশে জার্ম্মাণীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তখন কোন শুভ মুহূর্ত্তে ইংলিস্ প্রণালী অতিক্রম করা জার্ম্মাণ বাহিনীর আর অসাধ্য হইবে না। বৃটেনের জনসাধারণ যাহাতে বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ-পরিচালনায় বিরোধিতা করে এবং ইংলিস্ প্রণালীর উত্তর তীরে অবতীর্ণ হইবার পর জার্ম্মাণ বাহিনীর অভীষ্ট যাহাতে সহজেই সিদ্ধ হয়, তদুদ্দেশ্যে বৃটেনের বেসামরিক অঞ্চলেও নির্ব্বিচারে বোমা বর্ষিত হইয়াছে।

হিট্‌লার ও তাঁহার সহযোগীদিগের শরৎকালীন প্রচেষ্টা সফল হয় নাই; অন্তরীক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৃটিশ বৈমানিকগণ আশাতীত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, বৃটিশ জনসাধারণের দৃঢ়তাও অতুলনীয়। রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—এই ভাবেই অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত আক্রমণ পরিচালনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বৃটেনের অন্তরীক্ষে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস বিফল হওয়ায় জার্ম্মাণী এখন মধ্য ও অদূর প্রাচীতে মনোযোগ প্রদান করিতেছে। শীত-কালে বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযান অসাধ্য হইলেও শীতকালই আফ্রিকা ও এশিয়ায় অভিযান পরিচালনের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযান পরিচালনের কল্পনা আপাততঃ পরিত্যক্ত হইলেও বৃটেন্‌কে লক্ষ্য করিয়া জার্ম্মাণী যে বিরাট সমরায়োজন করিয়াছে, তাহা পরিত্যক্ত হইবে না—নরওয়ের ষ্ট্যাভেঞ্জার হইতে ফ্রান্সের ব্রেষ্ট পর্য্যন্ত অঞ্চলে জার্ম্মাণীর যে "সঙ্গীন" বৃটেনের বিরুদ্ধে উদ্যত রহিয়াছে, উহা তদবস্থাতেই থাকিবে। বৃটিশ সরকার ও বৃটেনের জনসাধারণ যাহাতে স্বস্তির



বিমান হইতে মেসিন্ গান্ চালান হইতেছে

কেহ কেহ মনে করেন যে, জার্ম্মাণ বৈমানিকগণ বৃটেনের বিমানঘাঁটী ও বিমানের কারখানার প্রতি মনোযোগ প্রদান অপেক্ষা বেসামরিক লক্ষ্যের প্রতি অধিকতর অবহিত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদিগের বিফলতার অন্যতম কারণ। সে যাহা হউক, অন্তরীক্ষে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া জার্ম্মাণ বৈমানিকগণ সম্প্রতি তাঁহা-দিগের আক্রমণ-কৌশল পরিবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছেন; নূতন কৌশলে আক্রমণকালে তাঁহাদিগের অল্পসংখ্যক বিমান বিনষ্ট হইতেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের ও বৃটেনের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় সমান। জার্ম্মাণীর বিমান-আক্রমণের নূতন পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, উহার তড়িৎগতি (blitzkrieg) নিঃশ্বাস ফেলিতে না পারেন, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ রক্ষার আয়োজন যাহাতে অপরিবর্ত্তিত রাখিতে হয়, এবং জার্ম্মাণীর বিভিন্ন স্থানে বৃটিশ বিমান-আক্রমণের প্রাবল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তদুদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী এক দিকে যেমন তাহার সমরায়োজন হ্রাস করিবে না, তেমনই বৃটেনের প্রতি তাহার বিমান-আক্রমণও সমান ভাবেই চালাইতে থাকিবে। অনির্দ্দিষ্ট কাল অপ্রশমিত গতিতে বিমান আক্রমণ পরিচালন যাহাতে সম্ভব হয়, তদুদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণ বৈমানিকগণ হয় ত সম্প্রতি আক্রমণ পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া-ছেন। জার্ম্মাণী আশা করে, এই ভাবে বৃটেনের সমরায়োজনের বৃহত্তর অংশ যদি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে

আফ্রিকা ও এশিয়ার অভিযান অল্পকালের মধ্যেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

কূটনীতিক তৎপরতা—

জার্ম্মাণীর রণ-নীতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইবামাত্র প্রকাশ্যে ও যবনিকার অন্তরালে কূটনীতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। হিট্‌লার মুসোলিনির সহিত সাক্ষাৎ করেন; ফ্রান্সের বর্ত্তমান ভাগ্য-নিয়ন্তা মঃ লাভাল ও মার্শাল পিতেঁর সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; স্পেনের সীমান্তে গমন করিয়া জেনারল ফ্রাঙ্কোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। বল্‌কান্‌ অঞ্চলে কূটনীতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়; এথেন্স, যদি জার্ম্মাণী ও ইটালী ফ্রান্সের নৌ ও বিমানবহরের ব্যবহারের অধিকার লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত পশ্চিম এশিয়ার সীরিয়া, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী ফ্রান্সের কোন কোন স্থান এবং আফ্রিকার কোন কোন ফরাসী অঞ্চল যদি নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয় ঘাঁটীরূপে ব্যবহারের সুবিধা পায়, তাহা হইলে সহজেই বৃটিশ সাম্রাজ্যে আঘাত করা সম্ভব হইতে পারে। ফ্রান্সের পিতেঁ-সরকারের পক্ষে সহযোগিতার নামে জার্ম্মাণীকে এই সকল সুবিধা প্রদান অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ বৃটেনের অবরোধ ব্যবস্থায় ফ্রান্স বর্ত্তমানে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে। গত ২১শে অক্টোবর মিষ্টার চার্চ্চিল



শত্রুপক্ষের বিমান দৃষ্ট হওয়ায় বৃটিশ গোলন্দাজ সৈন্যের তৎপরতা

আঙ্কারা, বুকারেস্ত, সোফিয়া প্রভৃতি সর্ব্বত্র রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদিগের গতিবিধি ও গোপন আলোচনা চলিতে থাকে। এই সময় জার্ম্মাণ সৈন্য রুমানিয়ায় পৌঁছিতে আরম্ভ করে। আফ্রিকায় ইটালীয় বাহিনীর তৎপরতা অপ্রত্যাশিত ভাবে হ্রাস পায়।

হিট্‌লারের কূটনীতিক প্রচেষ্টার ফলাফল অপ্রকাশিত থাকিলেও সে বিষয়ে সঙ্গত অনুমান অসম্ভব নহে। ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তাদিগের সহিত হিট্‌লারের আলোচনা সম্পর্কে মার্শাল পিতেঁ যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা অস্পষ্ট। তিনি জার্ম্মাণীর সহিত ফ্রান্সের সহযোগিতার (collaboration) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সহযোগিতা কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা অনুমান-সাপেক্ষ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনের সময় ফরাসী জাতির নিকট আবেদন জানাইয়া এক বেতার-বক্তৃতা করিয়াছিলেন; সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে আমেরিকাস্থিত ফরাসী দূত মঃ হায় মন্তব্য করেন—If he had said something about the easing of the blockade for the benefit of French women and children that would touch the French people very much. মঃ হায়ের এই উক্তিতে অবরোধ-ব্যবস্থায় ফরাসী জাতির দুর্দ্দশা এবং বৃটেনের প্রতি ফরাসী জাতির মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। কাজেই বৃটেনের এই অবরোধ-ব্যবস্থা শিথিল হইবার আশায় পিতেঁ সরকারের পক্ষে জার্ম্মাণীর সমর প্রচেষ্টায় পরোক্ষে সহযোগিতা করা অসম্ভব নহে।

তাহার পর স্পেন। নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রতি স্পেনের

আত্মরক্তি সম্বন্ধে গত আশ্বিন মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। স্পেন ও তাহার ফ্যাসিষ্ট এক-নায়ক জার্ম্মাণী ও ইটালীর প্রভাবাধীন হইলেও এই রাষ্ট্রটি যুদ্ধে লিপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্পেনে সম্প্রতি কোন সামরিক আয়োজন লক্ষিত হয় নাই। স্পেনের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র-গুলিও বৃটিশ-বিরোধী প্রচারকার্য্যে লিপ্ত হয় নাই। তবে, স্পেন জার্ম্মাণীকে কতকগুলি সামরিক সুবিধা প্রদান করিতে পারে—সম্ভবতঃ ফ্রাঙ্কো-হিট্‌লার সাক্ষাৎকারে এই সম্পর্কিত ব্যবস্থাই হইয়াছে। স্পেন জার্ম্মাণ বাহিনীকে জিব্রল্টরে পৌঁছিবার সুবিধা দিতে পারে। তবে, তাহাতে স্পেনের নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হইবে, এবং দেশ সমরক্ষেত্রে পরিণত হইবে। কাজেই, জার্ম্মাণীকে এই সুবিধা দানে ইতস্ততঃ করা স্পেনের পক্ষে অসম্ভব নহে। তবে স্পেনীয়



বৃটেনের সুরক্ষিত পর্য্যবেক্ষণ-কক্ষ ;—এই কক্ষ হইতে সমুদ্র-বক্ষে শত্রুর অবস্থানক্ষেত্র লক্ষ্য করা হয় এবং তদনুসারে গোলন্দাজ সৈন্যকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়

সরকার স্পেনের, বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের এবং স্পেনীয় মরক্কোর কোন কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল জার্ম্মাণীকে ব্যবহার করিতে দিতে পারেন ; তাহার পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণী হয় ত উত্তর আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত কতক অঞ্চল স্পেনকে প্রদান করিবে। এই ব্যবস্থায় "সাপ মরিবে কিন্তু লাঠি ভাঙ্গিবে না"—জার্ম্মাণী ও ইটালী উপকৃত হইবে, কিন্তু স্পেনের নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হইবে না।

আফ্রিকা ও এশিয়ায় বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম ভূমধ্যসাগরকে নাজী-ফ্যাসিষ্ট হ্রদে পরিণত করা প্রয়োজন। স্পেন ও ফ্রান্স যদি এই বিষয়ে জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত সহযোগিতা করে, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অংশে নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য হইবে। স্পেনের আনুকূল্যে জিব্রল্টর প্রণালী-পথ বন্ধ করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে স্পেনীয় ও ফরাসী ঘাঁটাগুলি ব্যবহার করিয়া বৃটিশ নৌবহরকে বিপন্ন করা সম্ভব হইতে পারে। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অংশে ওরাণ, আলজেরিয়া, কর্সিকা, মার্সেলিস্ এবং টুলোঁয় ফ্রান্সের নৌ ও বিমানঘাঁটা আছে ; কার্ত্তাজেনায় স্পেনের একটি নৌঘাঁটা আছে ; ইটালীর পশ্চিম উপকূলে এবং সার্দ্দিনিয়ায় ইটালীর নিজস্ব কতকগুলি নৌ ও বিমান-ঘাঁটা আছে। এই সকল ঘাঁটা ব্যতীত জিব্রল্টরের অপর পারের সিউটা এবং বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জেও যদি ইটালী ও জার্ম্মাণী ঘাঁটা স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত



দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইংলণ্ডের নির্জ্জন উপকূলে শত্রুর জন্য প্রতীক্ষা

শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে একমাত্র জিব্রল্টর ব্যতীত বৃটেনের আর কোন ঘাঁটা নাই।

পশ্চিম-ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা হইবার পর ভূমধ্য-সাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ফ্রান্সের সহযোগিতায় ইটালী বৃটিশ নৌবাহিনীর অবরোধে সমর্থ হইতে পারে। সিসিলি ও ফরাসী-অধিকৃত টিউনিসের মধ্যবর্ত্তী প্যান্টেলেরিয়া দ্বীপটি ইটালীর অধিকারভুক্ত। ইটালী যদি ফরাসী অধিকৃত টিউনিসের উপকূলবর্ত্তী বিজার্টার নৌ ও বিমানঘাঁটা ব্যবহারের অধিকার পায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইটালীর দক্ষিণ উপকূল হইতে টিউনিস পর্য্যন্ত দুর্ভেদ্য "প্রাচীর" সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। এই সকল স্থান হইতে বৃটিশ অধিকৃত মাল্টার প্রতি প্রবলতর আক্রমণ চালিত হওয়াও সম্ভব।

তাহার পর পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর। এই অঞ্চলে উত্তরে গ্রীসের অবস্থানক্ষেত্র সামরিক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; দক্ষিণে মিশরের উপকূলেও প্রভুত্বপ্রয়াসী শক্তির অধিকার বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় একই সময় গ্রীসের সহিত কূটনৈতিক আলোচনা এবং মিশরে সামরিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। লিবিয়ায় ইটালীর বাহিনী মিশরের উপকূলে সিদিবারাণি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া উত্তর অঞ্চলের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

ইটালীর গ্রীস্ আক্রমণ—

কূটনৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রীস্কে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব না হওয়ায় ২৮শে অক্টোবর ইটালী তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। ইটালী গ্রীসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছে যে, গ্রীস্ তাহার সমুদ্রাংশ ও ঘাঁটী বৃটেন্‌কে ব্যবহার করিতে দিয়াছে। এই অভিযোগ যদি সত্য না ও হয়, তাহা হইলেও ইহা যে কোন সময় সত্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল। গ্রীস্ বৃটেনের অনুরক্ত; বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বৃটেন্ এবং ফ্রান্সের নিকট হইতে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীস নিরাপত্তার আশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিল; গ্রীস্ এখনও সে আশ্বাস ত্যাগ করে নাই। গ্রীসের অধিকৃত ক্রীট্, সেফালোনিয়া, কর্ফু প্রভৃতি দ্বীপ সামরিক সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রীট্ ঈজিয়ান্ সাগরের প্রহরীস্বরূপ; বৃটেন্ যদি ঐ দ্বীপ ব্যবহারের অধিকার পায়, তাহা হইলে ইটালীর সহিত ডোডেকেনীজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে।



শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য বৃটিশ সৈন্য আত্মরক্ষার স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে

কর্ফু ও সেফালোনিয়া অধিকারে সমর্থ হইলে বৃটিশ বিমানগুলি ইটালীর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইত; আয়োনিয়ান্ ও আড্রিয়াতিক সাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত। এইরূপ সামরিক গুরুত্ব-সম্পন্ন গ্রীসকে যদি স্বপক্ষে আনয়ন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে নাজী-ফ্যাসিষ্ট আধিপত্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে; তাই গ্রীসকে স্বপক্ষে আনয়নের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বিফল হইবার পরই ইটালী তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে দুর্ব্বল প্রতিবেশীর প্রতি প্রবলের আক্রমণের ফল যাহা হইয়াছে, এই আক্রমণের ফলও তাহাই হওয়া সম্ভব। বৃটেন্ গ্রীসের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে বটে; কিন্তু মধ্য ও অদূর প্রাচীর সমরায়োজন ক্ষুণ্ণ করিয়া গ্রীসের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ইটালীয় বাহিনীর প্রধান অংশ ঈজিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী স্যালোনিকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইটালীয় বাহিনী ঐ অঞ্চলে পৌছিলে স্থলপথে ঈজিয়ান্ সাগরের সহিত তাহাদিগের সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে। দক্ষিণে ক্রীট্ দ্বীপ যদি ইটালীর পক্ষে হস্তগত করা সম্ভব না-ও হয়, তাহা হইলেও স্যালোনিকা প্রাপ্তিতে ডোডেকেনীজের সহিত তাহার সংযোগ আর বিচ্ছিন্ন হইবে না। বস্তুতঃ, বৃটিশ বিমান ও নৌবহর যদি তৎপরতা অবলম্বন করে, তাহা হইলে ক্রীট দ্বীপ বৃটেনের অধিকারভুক্ত হওয়া হয় ত অসম্ভব নহে। অবশ্য, বৃটেনের মাল্টা, আলেক্‌জেন্দ্রিয়া ও সাইপ্রাসের ঘাঁটী হইতে ক্রীটের দূরত্ব অপেক্ষা ইটালীর বেন্‌ঘাজী, তবরুক্ ও ডোডেকেনীজের ঘাঁটী হইতে উহার দূরত্ব অল্প। ক্রীট্ যদি বা ইটালীর হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলেও গ্রীস্ রাজ্য এবং কর্ফু, সেফালোনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ যে ইটালীর কবল হইতে রক্ষা পাইবে না, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।



মোটর সাইকেলে আরূঢ় জার্ম্মাণ-বাহিনী

তবে, ক্রীট্ যদি বৃটেনের অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব হইবে না।

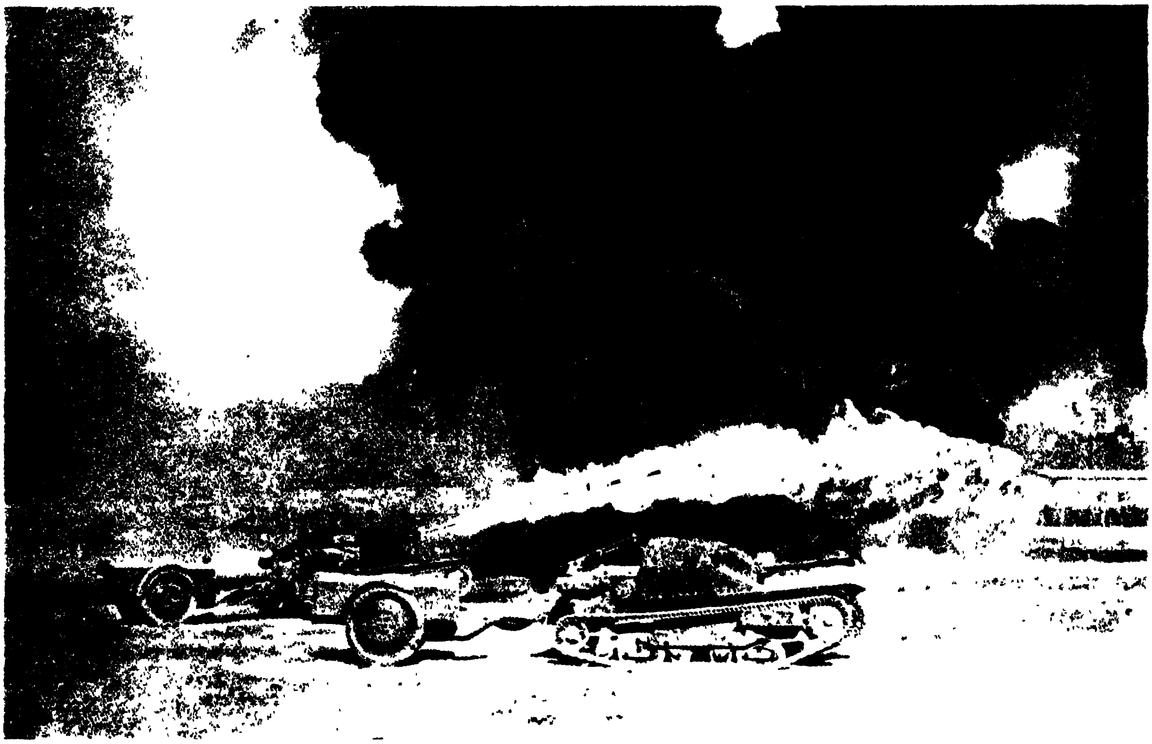
সপ্তাহকাল পূর্ব্বে ইটালী গ্রীস আক্রমণ করিলেও এই আক্রমণের প্রচণ্ডতা এখনও বৃদ্ধি পায় নাই। তিন মাস প্রস্তুত হইয়া ইটালী এই আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেও উহার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি না পাওয়া অর্থপূর্ণ। ইটালী হয় ত আশা করে যে, গ্রীস্ সত্বর আত্মসমর্পণ করিবে। জার্ম্মাণ-বাহিনীর গ্রীসে আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে।

ইটালীর গ্রীস আক্রমণে একমাত্র তুরস্ক ব্যতীত অন্য কোন বলকান্ রাষ্ট্র বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে নাই। গ্রীস্ ইটালীর অধিকৃত হইলে যুগোশ্লোভিয়া তিন দিকে ফ্যাসিষ্ট-শক্তি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবে; ইটালীর অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্ত বুলগেরিয়া ও তুরস্কের সহিত সংযুক্ত হইবে। ইহা ব্যতীত, স্যালোনিকা বন্দরটি যুগোশ্লোভিয়া ও বুলগেরিয়ার বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। অথচ যুগোশ্লোভিয়া ইটালীয়-গ্রীক্ সজ্ঘর্ষ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করে নাই; বুলগেরিয়া গ্রীস্‌কে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া

বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে, বুলগেরিয়ার রাজা বোরিস্ ঠিক এই সময় ডোব্রুজা প্রাপ্তির জন্য নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। বুল্গার সংবাদপত্রগুলি ইটালীর সমর্থক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। তুরস্ক ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ইনেউনু ঘোষণা করিয়াছেন—বৃটেন ও তুরস্ক একযোগে বলকানের অবস্থা লক্ষ্য করিতেছে; তুরস্ক বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলেও সে তাহার বন্ধুত্বের সম্মান করিবে; তাহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সে বিরত থাকিবে না। ১লা নভেম্বর তুর্কি জাতীয়-পরিষদে ঐরূপ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বদিন প্রেসিডেণ্ট ইনেউনু

মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির নিষ্ক্রিয়তা—

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রাথমিক আয়োজন স্বরূপ ভূমধ্যসাগরকে নাজী-ফ্যাসিষ্ট হ্রদে পরিণত করিবার যে প্রয়াস চলিতেছে, তাহা সফল করিবার জন্য ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলেও নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি ইটালীয় বাহিনী লইয়া মিশরের উপকূল-পথে সুয়েজের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইটালীর গ্রীস্ আক্রমণের ফলে বৃটেনের ভূমধ্যসাগরস্থিত নৌ ও বিমান বহরের বৃহত্তর অংশ



অগ্নিবর্ষী ইটালীয় ট্যাঙ্ক

মধ্য প্রাচীর বৃটিশ সামরিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সাক্ষাৎকার ও উল্লিখিত ঘোষণাবাণী হইতে মনে হয়, তুরস্ক কেবল নাজী-ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর পূর্ব্বাভিমুখী অভিযান প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত নহে, সে বৃটেনের সহিত সামরিক সহযোগিতার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে। গ্রীসের সাহায্যার্থ তুরস্ক যে অগ্রসর হয় নাই, ইহারও বিশেষ কারণ আছে। ইটালী হয় ত গ্রীস আক্রমণ করিয়া তুরস্ককে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতেছিল। তুরস্ক যদি গ্রীসে সৈন্য প্রেরণ করিয়া ইটালীয় বাহিনীর প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে হয় ত সেই সুযোগে জার্ম্মাণ বাহিনী বুলগেরিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া অস্ত্রবলে আনাটোলিয়া অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিত। তুরস্ক নিরপেক্ষ থাকায় ইটালীর সেই "চাল" নষ্ট হইল বলিয়াই অনুমান হয়।

উত্তরাঞ্চলে নিয়োজিত হইবার সময় মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির বাহিনী তাহাদিগের নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করিবে বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই। ইহাতেই মনে হয়, হয় ত পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরস্থিত বৃটিশ বিমান ও নৌবহরের উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রীসের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় নাই; অথবা স্পেন ও ফ্রান্সের সহযোগিতায় সমগ্র ভূমধ্যসাগরে নাজী-ফ্যাসিষ্ট তৎপরতার জন্যই মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ তৎপরতার সময় স্বভাবতঃ ইটালীয় বাহিনীর পক্ষে মিশরের উপকূলপথে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে।

অভিযান কোন্ দিকে ?—

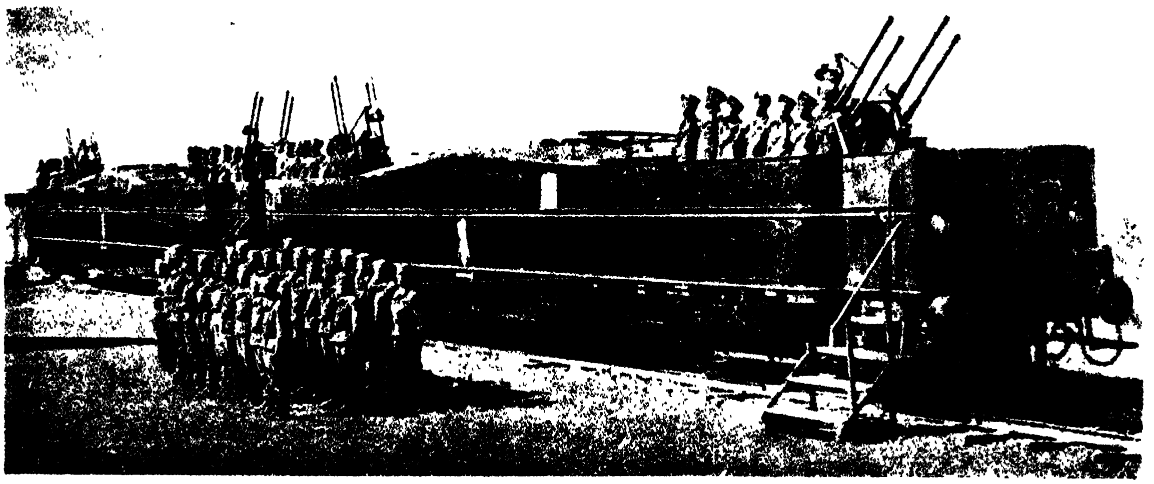
ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়, বোধ হয়, নিজদিগের মধ্যে কর্ত্তব্যভার বিভক্ত করিয়া লইবে।

জার্ম্মাণী সীরিয়াকে ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিয়া ইরাক ও প্যালেষ্টাইন্ অঞ্চলের তৈল-সম্পদে স্বীয় অধিকার বিস্তারের প্রয়াস পাইবে। পিতেঁ-হিট্লার আলোচনার ফলে জার্ম্মাণী সীরিয়াকে ব্যবহার করিবার অধিকার লাভ করিয়া থাকিতেও পারে।

এদিকে ইটালী সুয়েজ ও লোহিত সাগরের পথে তাহার পূর্ব্ব-আফ্রিকার অধিকৃত অঞ্চলের সহিত সংযোগসাধনে সচেষ্ট হইবে। পশ্চিম-এশিয়ার তৈলে ট্যাঙ্ক ও বিমান পূর্ণ করিয়া জার্ম্মাণ বাহিনী আরও পূর্ব্বে বৃটিশ-মুকুটমণি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবে কি না, তাহা অনুমান করা অসাধ্য। তবে, ইহা সত্য যে, পারস্য উপসাগরের তীর হইতে জার্ম্মাণ বিমান এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতে ইটালীর বিমান ও সাব্‌মেরিণ আরবসাগর মথিত করিতে চেষ্টা করিবে। ভারতবর্ষের সহিত বৃটেন্ এবং আফ্রিকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয় চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। বৃটেনের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাচ্য অংশের সংযোগ এবং বৃটেনের প্রাচ্য উপস্থিত হইয়া জলপথে সীরিয়ায় পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে কি না, তাহা বলা যায় না। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু না হওয়া পর্য্যন্ত সাইপ্রাসের পার্শ্ব দিয়া জলপথে সীরিয়ায় পৌঁছান সম্ভব নহে। কাজেই, ভূমধ্যসাগরের বক্ষে যুযুধান পক্ষদ্বয়ের শক্তিপরীক্ষার ফলের উপরই জলপথে জার্ম্মাণ বাহিনীর পশ্চিম-এশিয়ায় গমনের সুবিধা অসুবিধা নির্ভর করিতেছে।

ত্রিশক্তির চুক্তি—

গত ২৭শে সেপ্‌টেম্বর বার্লিণে জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে দশ বৎসরের জন্য এক রাজনীতিক ও সামরিক চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তিতে জাপান য়ুরোপের নব-ব্যবস্থায় জার্ম্মাণী ও ইটালীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে; পক্ষান্তরে, জার্ম্মাণী ও ইটালী এশিয়ার নব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জাপানের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। এই চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে, এখনও য়ুরোপীয় যুদ্ধে অথবা চীন-



হিট্‌লারের নিকট হইতে মুসোলিনী এই কামানসন্নিবিষ্ট রেল-শকটখানি উপহার পাইয়াছেন

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাই নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের আসন্ন অভিযানের প্রধান লক্ষ্য।

ভূমধ্যসাগরে যদি নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ইটালীর পক্ষে তাহার পূর্ব্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্যের সহিত জলপথের সংযোগ স্থাপন অসম্ভব হইবে না। কিন্তু জার্ম্মাণী কিরূপে সীরিয়ায় পৌঁছিবে, তাহাই প্রশ্ন। রুমানিয়ায় যে জার্ম্মাণ বাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া তাহারা গমনের সুবিধা পাইবে। ডোবরুজা পুনঃপ্রাপ্তিতে বুলগেরিয়া নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের অনুরক্ত হইয়াছে। মেসিডোনিয়ার মধ্য দিয়া ঈজিয়ান্ সাগরে পৌঁছিবার সুবিধার জন্য বুলগেরিয়া আকাঙ্ক্ষিত; তাহার এই আকাঙ্ক্ষাও নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুগণ হয় ত পূরণ করিবেন। বুলগেরিয়া অতিক্রম করিলে জার্ম্মাণ বাহিনী তুরস্কের সীমান্তে পৌঁছিবে। তুরস্ক যদি জার্ম্মাণ বাহিনীকে অগ্রসর হইতে দিত, তাহা হইলে তাহারা বস্‌ফোরাস্ প্রণালী অতিক্রম করিয়া আনাটোলিয়ার মধ্য দিয়া সহজেই সীরিয়ায় পৌঁছিতে পারিত। তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্ম্মাণ বাহিনীর অগ্রগতি অসম্ভব হইলে তাহারা গ্রীসে জাপান যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হয় নাই, এইরূপ কোন শক্তি যদি চুক্তিবদ্ধ কোন শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তাহা হইলে শক্তিত্রয় পরস্পরের সহিত রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও সামরিক সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবে। চুক্তিবদ্ধ শক্তিত্রয়ের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

এই চুক্তির প্রধান লক্ষ্য আমেরিকা ও বৃটেন্। বর্ত্তমান যুদ্ধে আমেরিকা সর্ব্বতোভাবে বৃটেন্‌কে সাহায্য করিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া জাপান যদি প্রসার লাভে সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে আমেরিকা স্বভাবতঃ তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য অধিকতর সচেষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে বৃটেনের মার্কিণী সাহায্য প্রাপ্তিতে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। এইভাবে সুদূর প্রাচীর প্রতি আমেরিকাকে অধিকতর অবহিত করিয়া জার্ম্মাণী ও ইটালী পরোক্ষে বৃটেনের সমর-প্রচেষ্টায় বিঘ্ন উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছে। ইহা ব্যতীত, জাপান নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের শীতকালীন অভিযানে পরোক্ষে সহযোগিতা করিতে পারে। ইতোমধ্যে সে ইন্দো-চীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইন্দো-চীনের অর্থনীতিক সম্পদ আহরণ তাহার অন্যতম

উদ্দেশ্য। শ্যাম জাপানের অনুরক্ত; শ্যাম ও ইন্দো-চীনকে স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহারের সুযোগ পাইলে জাপান ক্রমে ব্রহ্মদেশ ও সমগ্র মালয় উপদ্বীপের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইতে পারে। সর্ব্বোপরি, জাপান অষ্ট্রেলিয়ার সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট প্রাচ্য অংশের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে জাপানের পক্ষে ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপ দাবী করিয়া বৃটেনের সহিত শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব নহে। অবশ্য, তাহার পূর্ব্বে চীনের যুদ্ধের অবসান হওয়া প্রয়োজন।

ত্রিশক্তির চুক্তির ফলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইয়াছে চীন, আনন্দিত হইয়াছে সোভিয়েট রুশিয়া। জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষা দমন করিতে হইলে চীনকে বাঁচাইয়া রাখা এবং তাহার সমরশক্তি বৃদ্ধি করা যে কত প্রয়োজন, তাহা বৃটেন ও আমেরিকা আজ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। তাহারা আজ চীনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে, সোভিয়েট রুশিয়ার আনন্দের কারণ—এই চুক্তির ফলে জাপান ও আমেরিকার বিরোধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সমগ্র জগতের নাজী-ফ্যাসিষ্ট ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যদি আত্মঘাতী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং তখনও সোভিয়েট রুশিয়া যদি কৌশলে আপনার নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলেই সে কূটনীতিক্ষেত্রে বিরাট জয় লাভ করিবে। সোভিয়েট রুশিয়া আশা করে—পৃথিবীব্যাপী আত্মঘাতী সংগ্রামের ফলে যুযুধান শক্তিগুলি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তখন বিভিন্ন দেশে কমুনিষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব। অক্ষুন্ন-শক্তি সোভিয়েট রুশিয়ার সহযোগিতায় সেই সকল বিপ্লব যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বে কমুনিজম্ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হয়ত সফল হইবে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ত্রিশক্তির চুক্তি পূর্ব্বের কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তির ন্যায় সোভিয়েট-বিরোধী মিলন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সৌহৃদ্যের ফলে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে—ইটালী ও জার্ম্মাণী আর সোভিয়েট রুশিয়ার অঙ্গস্পর্শের কল্পনা করে না; জাপান এখন সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রসার লাভের জন্য সমুৎসুক।

ব্রহ্ম-চীন-পথ উন্মুক্ত—

জাপানের ইন্দো চীনে প্রবেশের পরই যখন ত্রিশক্তির চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখনই চীনে সমরোপকরণ প্রবেশের জন্য বৃটেন্ পুনরায় ব্রহ্ম চীন পথ উন্মুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করে। গত ১৭ই জুলাই তিন মাসের জন্য ঐ পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল; তিন মাস অতিক্রান্ত হইবার পর ১৭ই অক্টোবর পুনরায় ঐ পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ঐ পথে প্রচুর সমরোপকরণ চীন অভিমুখে রওনা হইয়াছে। চীনের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, ঐ সকল দ্রব্য কান্‌মিঙ্গে পৌঁছিয়াছে; পক্ষান্তরে জাপান বলিতেছে যে, ইন্দো-চীন হইতে প্রেরিত জাপানী বিমান ইউনান প্রদেশে মেকং নদীর সেতু ধ্বংস করিয়া সমরোপকরণের চীনে পৌঁছান অসম্ভব করিয়াছে। কাহার কথা সত্য, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হংকং ও ইন্দো-চীনের পথ অবরুদ্ধ হইবার পর ব্রহ্ম-চীন পথই চীনের প্রাণস্বরূপ। সে ঐ পথ রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেই। জাপানী বিমানের তৎপরতায় সাময়িক ভাবে ঐ পথ অবরুদ্ধ হইলেও স্থায়িভাবে উহা বন্ধ করা সম্ভব হইবে না।

ব্রহ্ম-চীন পথ সাময়িক ভাবে বন্ধ করিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভা উল্লেখযোগ্য কূটনীতিক সাফল্যলাভ করিয়াছেন। জাপানের দাবীতে সাময়িক ভাবে পশ্চাদপসরণ করিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভা সুদূর প্রাচীর ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আগ্রহান্বিত করিতে পারিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করিয়াছে যে, জাপানের ঔদ্ধত্যের ফলে তাহার সুদূর প্রাচীর স্বার্থ বিপন্ন; এখন তাঁহারা ঐ স্বার্থরক্ষার জন্য অত্যন্ত তৎপর হইয়াছেন। বৃটেন্ এখন তাহার সুদূর প্রাচীর স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব অনায়াসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতে পারিতেছে। সুদূর প্রাচী সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কত দূর উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা চীন হইতে প্রবাসী মার্কিণীদিগের স্বদেশে অপসারণের ব্যবস্থা হইতেই সুপরিস্ফুট। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই তৎপরতায় জাপানকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে।

সুদূর প্রাচীতে সন্ধির জনরব—

সম্প্রতি এই মর্ম্মে জনরব শুনা যাইতেছে যে, জাপান চীনের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য আগ্রহান্বিত। এই জনরবের মূলে সত্য থাকাই সম্ভব। জাপান এখন সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া এবং চীনের যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রসার লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্য জাপানের সুস্পষ্ট আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। চীনের সহিত মীমাংসা না হইলে সোভিয়েট-জাপান সৌহৃদ্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে; সোভিয়েট রুশিয়া চীনকে সাহায্য দানে বিরত হইতে সম্মত হয় নাই। ইহা ব্যতীত, চীনের পার্ব্বত্য অঞ্চলে শক্তিক্ষয় করা অপেক্ষা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রসার-লাভে সচেষ্ট হওয়া জাপানের পক্ষে অধিকতর লাভজনক। উত্তর চীন যদি তাহার অধিকারভুক্ত থাকে, তাহা হইলেই চীনের "মধু" সে পান করিতে পারিবে। সন্ধির জন্য আগ্রহান্বিত হইলেও জাপান ঐ অঞ্চল ত্যাগে কখন সম্মত হইবে না,—হইতে পারে না।

জাপান সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইলেও মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক্ জাপানের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। তিনি এখন বৈদেশিক সাহায্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; কাজেই, তিন বৎসর জাতির চরম-দুঃখভোগের পর আজ আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা যখন চীনের অনুকূল, তখন রাজ্যের অখণ্ডতা ক্ষুন্ন করিয়া তিনি জাপানের সহিত কেন সন্ধি করিবেন? এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমেরিকা ও বৃটেন্ চীনকে প্রচুর সাহায্য দান করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চীন-জাপান সন্ধি অসম্ভব করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে পারে; কারণ, জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান ঔদ্ধত্য দমনের জন্য চীনকে যুদ্ধে রত রাখাই একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীঅতুল দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

যুদ্ধের উদ্দেশ্য

বৃটিশ জাতি কি জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য কংগ্রেসের নেতারা বড়লাটকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই প্রশ্নের স্পষ্ট কোন উত্তর পান নাই। কংগ্রেসের কর্ত্তারা আশা করিয়াছিলেন,—বৃটিশ সরকার গণতন্ত্রের রক্ষার্থ স্বৈরতন্ত্রের বা নাজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, এই উত্তর পাইবেন; তাহা শুনিয়া কংগ্রেস বলিতেন, তাঁহারা এই যুদ্ধের অবসানে ভারতকে স্বাধীনতা দিবেন, এবং এদেশে খাঁটি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবেন—এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করুন। কিন্তু বৃটিশ সরকারের নিকট সেরূপ কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই; কাজেই কংগ্রেসের মনের আশা মনেই বিলীন হইয়াছিল। সম্প্রতি পার্লামেন্টে ভারতসচিব মিষ্টার আমেরী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বৃটেন কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতেছেন তাহা বিবৃত করিয়াছেন। ভারতসচিব বলিয়াছেন—"য়ুরোপের সর্ব্বত্র যাহাতে ন্যায়বিচারের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্মানের দৃষ্টিতে লক্ষিত হয়—তাহার জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি। কেবল তাহাই নহে। বড় জাতি এবং ছোট জাতি যাহাতে পাশাপাশি থাকিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে, এবং যাহাতে সর্ব্বত্র অরাজকতার স্থানে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাও আমাদের উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে আমাদের চেষ্টার দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করা এবং আমাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা য়ুরোপকে রক্ষা করাও আমাদের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য।"—মিঃ আমেরীর এই উক্তি হইতেই বুঝা যায় যে, বৃটেনের যুদ্ধ করিবার সমস্ত লক্ষ্যই য়ুরোপে নিবদ্ধ। এশিয়া তথা ভারত, আফ্রিকা এবং আমেরিকা সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। এক কথায়, তাঁহারা য়ুরোপীয় এবং শ্বেতাঙ্গ জাতির বিষয়ই ভাবিতেছেন,—এশিয়া এবং আফ্রিকার বর্ণী জাতির কথা তাঁহাদের মনে স্থান পাইতেছে না। মিষ্টার আমেরী ভারতসচিব; কিন্তু তাঁহার মুখে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন আশার কথাই নাই। তিনি মনে করেন, ভারত বৃটেনের সম্পত্তি; হিট্‌লারের আক্রমণ হইতে এই সম্পত্তি রক্ষা করাই তাঁহাদের কাজ। তিনি বলিয়াছেন, সুবিধা পাইলে হিট্‌লার ভারতবর্ষ এবং বৃটিশ-শাসিত আফ্রিকাও আক্রমণ করিতে পারেন। সে জন্য ভারতকে প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতবাসীর মনে যে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। ইহাতে ভারতবাসীর মনে কিরূপ অশান্তির সঞ্চার হইতেছে, ইহা তাঁহারা যে বুঝিতে পারিতেছেন—তাহা ভারতসচিবের বক্তৃতা পাঠে বুঝিবার উপায় আছে কি?

লোকগণনায় ভুল

লোকগণনায় যে ভুল হইতেছে, সে কথা আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত বিশেষ পরিশ্রম করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যানির্দ্দেশে ভুল হইয়াছে। এই ভুল গণনার ফলে মুসলমান-জনসংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা অধিক করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। অনেকে এইরূপও সন্দেহ করিতেছেন যে, ইহা ইচ্ছাকৃত ভ্রম। কারণ, যে সকল মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভাবে পূর্ণ, তাঁহাদের স্বার্থও মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য দেখাইবার দিকে। যাহারা এই কথা বলিতেছেন, তাঁহারা বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদিগকে অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করিবার জন্য তাহাদের সংখ্যা অধিক দেখানই আবশ্যক। এই অনুমান সত্য হইলে ইহা নিঃসন্দেহেই অত্যন্ত হীনতা-সূচক কার্য্যপদ্ধতি। সেই জন্য এবার যাহাতে লোকগণনা নির্ভুল হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, প্রত্যেক স্থানে দুই জন করিয়া গণক নিযুক্ত করিতে হইবে,—এক জন মুসলমান এবং আর এক জন অমুসলমান,—হিন্দু বা খৃষ্টান যাহাই

হউক। তাহা হইলে গণনা কতকটা নির্ভুল হইবার আশা ছিল; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। পরন্তু বাঙ্গালা প্রদেশের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে যে, মুসলমানরাই মুসলমান-গণনাকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, কিন্তু হিন্দুদিগের গণনার ভার কাহাদের হস্তে অর্পিত হইবে, তাহার কোনও নির্দ্দেশ পাওয়া যায় নাই। এজন্য অনেকের বিশ্বাস, বাঙ্গালার মুসলমান-দিগের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন করাই কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায়। আমরা কিন্তু এরূপ মনে করিতে পারিতেছি না। তবে যাহাতে লোকের মনে ঐরূপ সন্দেহ স্থান পাইতে না পারে, সেইরূপই ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। পত্রান্তরে প্রকাশ, মানুষ-গণনা এবার যাহাতে নির্ভুল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায় আদম সুমারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডাচের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কি ফল হইয়াছে, তাহা প্রকাশ নাই। ইহা ভিন্ন এবারকার গণনায় এরূপ আর একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহার ফলে গণনায় ভুল হইতে পারে। পূর্ব্বে গণনা-কারীরা গণনা করিবার নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে প্রত্যেক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সেই বাড়ীর লোকসংখ্যা গণনা করিয়া আসিতেন, শেষে চূড়ান্ত গণনার দিন কোন্ বাড়ীতে কয় জন লোক আছে, তাহা মিলাইয়া দেখিয়া তালিকা সংশোধন করা হইত। এবার শুনিতেছি, শেষ এক দিনে সেই এক সময়ে গণনা করা হইবে না। ইহার ফলে গণনায় বিশেষ ভুল থাকিয়া যাইতে পারে। আদম সুমারীর গণনায় ভুল হইলে অনেক বিষয়েই ভুল হইয়া যাইবে। কারণ, আদম সুমারের হিসাবে ভুল থাকিলে বার্ত্তিক ব্যাপারের অনেক সিদ্ধান্তই ভুল হওয়া অপরি-হার্য্য। সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইতেছেন কি না, তাহা এখন পর্য্যন্ত জনসাধারণ জানিতে পারে নাই; কিন্তু তাহা জানাইবার প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সিন্ধু প্রদেশে হিন্দু-দলন

নব-গঠিত সিন্ধু প্রদেশে কিরূপ ভীষণ অশান্তি আরম্ভ ও শাসন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। তথাকার সক্কর এবং শিকারপুর জিলায় এমন এক দিনও যাইতেছে না, যে দিন তাহার বিভিন্ন অংশে কোন না কোন হিন্দু আহত, নিহত, অথবা তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত না হইতেছে। বিশৃঙ্খলা এত দূর বিস্তারলাভ করিয়াছে যে, কোন কোন গ্রামের বহু হিন্দু অধিবাসী গ্রাম ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে মিষ্টার গান্ধীরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি মস্লেম লীগকেও এই বিষয়ের একটা মীমাংসা করিতে বলিয়াছেন। মস্লেম লীগ এই অবস্থার জন্য কতকটা দায়ী, এরূপ ধারণা ইহার মধ্যে অনেকেরই মনে স্থান পাইয়াছে। লীগ হিন্দুদিগের সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহেন বলিয়া এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ আছে কি না, নিরপেক্ষ-ভাবে তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। তবে তাহার কি ফল হইবে, তাহা বলা কঠিন। সম্প্রতি লীগের কার্য্যকরী সমিতি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে পারেন নাই, এরূপ লোক আছেন কি না জানি না। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এই অবস্থা সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হইয়া বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "এ দোষ হিন্দুদেরই! সিন্ধুতে অরাজকতা নাই। উহার প্রকৃত স্থান হিন্দু-সংবাদপত্রে এবং হিন্দু সংবাদদাতাদিগের মনের ভিতর। হিন্দুরাই আসল কথা চাপিয়া রাখিয়া কেবল অতিরঞ্জিত (অত্যুক্তিপূর্ণ?) সংবাদ প্রচার করিতেছে। তবে যদি কোথাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী ঐ দেশবাসী সংখ্যাল্প হিন্দুদিগের অবলম্বিত আচরণ এবং তাহাদের সভা-সমিতি। কারণ, উহাদের ব্যবহার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে।"

এই অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া সে-কালের কোন রাজ্যের রাজ-অমাত্যের 'মুষাবুদ্ধি গজক্ষয়ঃ' নামক সিদ্ধান্ত মনে পড়িল। অমাত্যশ্রেষ্ঠ রাজধানীতে অদৃষ্টপূর্ব্ব একটি বরাহের আবির্ভাবে—তাহা কোন্ জন্তু স্থির করিতে না পারিয়া, তাঁহার নাসিকা ও কর্ণের ছিদ্র হইতে তুলার ছিপি অপসারিত করিয়া বুদ্ধি বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন, হয় হাতী আহারাভাবে খর্ব্বকায় হইয়াছে—না হয়

ইন্দুর অতি-ভোজনে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া ঐ আকার লাভ করিয়াছে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না, লীগের কার্য্যকরী সমিতি সে বিষয়ে নিশ্চিত নহেন,—তবে তাহার কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিত! এ অদ্ভুত যুক্তি নহে? মিঃ গান্ধীর লেখার ভাবে প্রকাশ, ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে মুসলমান-দিগেরও অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সত্যই যদি সেইরূপ হইত, তাহা হইলে কি হিন্দুদের এই ভাবে নিহত হওয়া সম্ভব হইত? প্রতিদিনই তথায় খুন হইতেছে, মোহড়ী বিভাগের মীরপুরে এবং খানপুরে সম্প্রতি কয়েক জন হিন্দু নিহত হইয়াছে। অনেকে সেই জন্য এই অঞ্চলে সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সিন্ধু প্রাদেশিক মস্লেম লীগের সভাপতি সম্প্রতি তথাকার হিন্দু এবং মুসলমান নেতাদিগের এক সম্মেলনী সভা আহ্বান করিতে চাহিয়াছেন। তাহাতে কি বেদনায় বেলেস্তারার ব্যবস্থা হইবে? যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সিন্ধু দেশটি পাকা পাকিস্থানে পরিণত হইবার পূর্ব্বে এই সমস্যার সমাধান হইবে কি?

'প্রাচ্যগুচ্ছে'র পরামর্শ-পরিষদ

দিল্লী নগরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্য অধিকার-গুলির প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া পরামর্শ-পরিষদের অধি-বেশন হইয়াছে। এই সম্মিলনীতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, সিংহল, ভারত, রোডেসিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, পূর্ব্ব-আফ্রিকা, প্যালেষ্টাইন, এবং হংকংএর প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়া-ছেন। রজার কমিশনও গ্রেট বৃটেনের প্রতিনিধি হিসাবে ইহাতে উপস্থিত আছেন। ইহা ভিন্ন ভারত সরকারের মনোনীত কয়েক জন সদস্যও "চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওল-পরামাণিক"-বৎ মজলিসে সমাগত হইয়াছেন। বড় লাটের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য সার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ ভারতীয় সদস্যদিগের মুখপাত্র হিসাবে তত্র বিরাজমান। গত ৮ই কার্ত্তিক ভারতের বড় লাট এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের এলাকাভুক্ত রাষ্ট্রগুলি সৈন্য, অর্থ, এবং যুদ্ধের উপকরণাদি প্রেরণ করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। এবার যুদ্ধের উপকরণাদির প্রয়োজনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই জন্য সুয়েজ খালের পূর্ব্বস্থিত বৃটিশ রাজ্যগুলি কি ভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার অনুসন্ধানকল্পেই এই সম্মেলনের অধিবেশন।" এই মন্তব্যেই সম্মেলনের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। বড় লাট ভারতবর্ষকে অভিনন্দিত করিয়াছেন—অন্য কোন কারণে নহে—তাহার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। গ্রেট বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, তাঁহারা অস্ত্র-সরবরাহের জন্য একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে চাহেন। কেহ কেহ মনে করিতেছেন, যে সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব দেশেই অস্ত্রাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবেন। সম্মেলনের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এখন কার্য্য করিবার পালা। লর্ড লিন্‌লিথগো আরও বলিয়াছেন, "যুদ্ধের এবং শান্তির উভয় সময়েই তাঁহারা পরস্পর ব্যবস্থা পূর্ব্বক সুসম্বদ্ধ ভাবে শিল্পের সহযোগিতার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া থাকেন।"—কিন্তু ভারতবাসীরা এ কথা স্বীকার করিবে, সরকার তাহার পথ রাখিয়াছেন কি? বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় রেলওয়ের জন্য আবশ্যক অনেক দ্রব্যই এদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধের বিপদ কাটিলে সেই সকল দ্রব্য এদেশ হইতে লওয়া হইয়াছিল কি? রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ উহা আর গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে যেমন বিলাত হইতে ঐ সকল দ্রব্য আমদানী করিতেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে আবার বিলাত হইতেই উহা আমদানী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে এদেশের যে সকল কারখানা ঐ সকল দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহাদিগকে কি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই? এবার যাহাতে সেরূপ না হয়, সে জন্য দেশের কারখানাওয়ালাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করা সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া যদি এদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পরি-চালকবর্গ দাবী করেন, তবে কি তাহা অসঙ্গত হইবে?

বিসর্জ্জনে অন্তর্জ্জন

এবার বর্দ্ধমান সহরে বিজয়ার দিন, দশভুজা প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া ব্যাপারে বিষম বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। হিন্দুরা রাজপথ নির্ম্মাণের ও

তাহার সংস্কারসাধনের জন্য যথাযোগ্য অর্থব্যয় করিবে, এই হেতু রাজপথে তাহাদের কোন অধিকার থাকিবে, এরূপ আশা করা কি এ-কালে সঙ্গত? আজ কেবল বর্দ্ধমানে কেন, ভারতের অন্যান্য বহু স্থানে ইহার যে দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইতেছে,—সমগ্র ভারতে দুই দিন পরে যে তাহা দেখা দিবে না, ইহার নিশ্চয়তা কি? নিরঞ্জনের পর প্রতিমা কিছু কাল পূজামণ্ডপে ফেলিয়া রাখিয়া, বহু পরামর্শে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া, কয়েক দিন দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটাইয়া, ও বিস্তর সাধ্যসাধনার পর অবিহিত-ভাবে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। আবার কালী পূজা শেষ হইয়াছে; মা কালীর বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছে জানিতে পারি নাই। বিসর্জ্জন পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইলেও উহাতে যখন পদে পদে এত বাধা, তখন হিন্দুর উপায় কি? রাজপথে বাদ্যভাণ্ড সহকারে প্রতিমা লইয়া যাইলে পথের পার্শ্বস্থ মসজেদে যদি উপাসনা-নিরত ভক্তবৃন্দের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা পড়ে,—তাহা হইলে রাজপথ ত্যাগ করিয়া দূরে মসজেদ নির্ম্মাণ করাই সমীচীন, এবং ইহাই সম্ভবতঃ নিরপেক্ষ ব্যবস্থা; কিন্তু আজ এই সঙ্গত যুক্তি কে শুনিতেছে? এরূপ অবস্থায় হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য কি, তাহাই নিরূপণের যোগ্য। তবে দুর্দ্দিনে সকলেরই সংযতভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। বাঙ্গালা সরকারের হিন্দু সচিবরা যখন এ বিষয় সম্বন্ধে নির্ব্বিকার অথবা নিরুপায়, তখন তাঁহাদের মুখাপেক্ষা না করিয়া একটা নির্ব্বিরোধ পন্থা স্থির করা অপরিহার্য্য হইয়াছে।

গোরার অত্যাচার

ইদানীং ভারতে পূর্ব্বের ন্যায় আর গোরার গুণ্ডামীর কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। উহা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে এক ঝাঁক গোরা তাহাদের গন্তব্যপথে বোম্বাইএ নামিয়া অল্প কাল তথায় অবস্থিতি করিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই তাহারা কেবল যে ভীষণতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহাই নহে,—তাহারা এ-দেশীয় স্ত্রীলোকের অপমানও করিয়াছিল। একটা গোরা জনৈক গুজরাটী বালিকাকে রাজপথে ধরিয়া তাহার সহিত তাহাকে নাচিতে বাধ্য করিয়াছিল; আর একটা গোরা কোন উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীর উভয় গণ্ডদেশ এমনভাবে দংশন করিয়াছিল যে, তাহার গণ্ডের ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিয়াছিল। ইহা ভিন্ন গাড়ী-ওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালাদিগকেও উহারা নানাভাবে বিব্রত করিয়াছিল। বোম্বাইয়ের মেয়র এই বিষয়টি বোম্বাই-গবর্ণরের গোচর করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে বোম্বাই-লাটের সেক্রেটারী যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা ভারত-বাসীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ বা সম্মানজনক নহে। গান্ধীজীও ব্যাপারটা বড লাটের গোচর করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইল, তাহা প্রকাশ হইবে কি না অনুমান করা কঠিন। গান্ধীজী বিজ্ঞ ব্যক্তি, গত বিষয়ের জন্য হয় ত 'শোচনা' করিবেন না। গোরারা যুদ্ধস্থলে যাইতেছে বলিয়া কি তাহাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনাযোগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? সে-কালে ভ্রাতুষ্পুত্র ভাতের হাঁড়িতে মূত্রত্যাগ করিলে বিধবা পিসিমা সাদরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিয়াছিলেন, 'আহা, ছেলেমানুষ, বুদ্ধি হয়নি, করুক।'—কিন্তু এ নজির কি সর্ব্বত্রই চলে?

পাকিস্থান সংগঠন

ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থান—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব মস্লেম লীগই প্রথমে উত্থাপন করেন। এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এদেশের শাসনকর্ত্তাদেরও এই প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতি এবং তাহার কতকটা সমর্থনও আছে। ডাক্তার মুঞ্জের সহিত এ সম্বন্ধে লর্ড লিন্‌লিথগোর আলোচনা হইয়াছিল। ডাক্তার মুঞ্জে বড় লাটকে বলেন,—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব রক্ষিত হইবে, এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সরকারের কর্ত্তব্য। উত্তরে বড়লাট বলিয়াছেন, "হিন্দু-সভা এ বিষয়টি যে দিক্ দিয়া দেখিতেছেন, কর্তৃপক্ষ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন সত্য, কিন্তু পাকিস্থানের পরিকল্পনাটি একেবারে বাদ দেওয়া যায় না।"—ডাক্তার মুঞ্জেরই মুখ হইতে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি করাচি হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ—আগামী ২৫শে কার্ত্তিক দিল্লীতে মস্লেম লীগের শাসনতন্ত্র

সাব-কমিটীর যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে পাকিস্থানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া তাহা মিষ্টার জিন্নার সকাশে উপস্থাপিত করা হইবে। লীগের লাহোর বৈঠকে পাকিস্থানের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, উক্ত সাব-কমিটী তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করিবেন; তাহাতে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে স্থানান্তরিত করা হইবে না।

বেলুচিস্থান, সিন্ধু, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কতকটা অঞ্চল, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি জিলা, দুইটি জিলা ভিন্ন সমগ্র বাঙ্গালা, আসাম, হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, এবং মাদ্রাজের কিয়দংশ লইয়া এই পাকিস্থান রচিত হইবে। পাকিস্থানের সমস্ত অংশই স্বতন্ত্র থাকিবে বটে, কিন্তু তাহার সমস্তটাই এক স্বাধীন মস্লেম রাজ্যের শাসনাধীন রহিবে। ইহাতে মনে হইতেছে যে, বাঙ্গালার দুইটি জিলা ভিন্ন আর সকল জিলাই পাকিস্থানের জঠরে প্রবেশ করিয়া পরিপাক হইবে। বাঙ্গালার কোন্ কোন্ জিলা পাকিস্থানের পক্ষে দুষ্পাচ্য, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ লীগের সাব-কমিটী তাহা ঠিক করিবেন। বলা বাহুল্য, সকল মুসলমান এ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন না। এমন কি, অনেকেরই ইহাতে আপত্তি আছে। স্যর মহম্মদ ইয়াকুব সম্প্রতি বলিয়াছেন,—"মুসলমানদিগের আসল পাকিস্থান এখন যেরূপ বিপন্ন, বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে উহা সেরূপ বিপন্ন হয় নাই।" তিনি ঐ সকল আসল এবং পবিত্র পাকিস্থান রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে মুসলমানদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু মস্লেম লীগের উৎসাহী সদস্যগণ সে বিষয়ে অবহিত হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী সম্বন্ধে যেরূপ "না ঘরকা, না ঘাটকা" মত গ্রহণ করিয়াছেন, এই পাকিস্থান সম্বন্ধেও সেইরূপ মত গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, মস্লেম লীগ এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ সহকারে স্বীয় মত প্রচার কারতেছেন। কংগ্রেসের ব্যবহারকে মৌন সম্মতি বলা যাইতে পারে। সুতরাং পাকিস্থান প্রস্তাব শেষ কালে হয় ত গৃহীত হইতেও পারে। দেখা যাইতেছে যে, শাসকগণ আজকাল যুক্তি-তর্কের দিক্ দিয়া সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিতেছেন না। কংগ্রেসও এ বিষয়ে কোন কথা বলিতেছেন না।

রেলওয়ে কন্‌ফারেন্স

গত ৯ই কার্ত্তিক শনিবার দিল্লী নগরে রেলওয়ে সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেণ্ট মিষ্টার সি, এ, মুরহেড এবং ভারত সরকারের যান-বাহন বিভাগের সদস্য সার এণ্ড্রু ক্লো বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় রেলওয়ের কার্য্য-পরিচালনে যে সকল অসুবিধা ঘটিতেছে, প্রধানতঃ সেই কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই সমিতিতে রেলওয়েগুলির কার্য্যসূচী এবং কার্য্যনীতি স্থূলভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। এবার উপকূলিক জাহাজের অভাব হেতু রেলওয়েগুলিকে অনেক গুরুভার মালপত্র বহন করিতে হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, ইহাদিগকে বহুসংখ্যক যাত্রীও লইয়া যাইতে হইতেছে। সামরিক কার্য্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও বহন করিতে হইতেছে। রেলওয়েগুলি যথাবিহিতভাবে এই সকল কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হইতেছে, ইহাই তাঁহাদের যোগ্যতার পরিচায়ক। ইহাতে তাঁহাদের আয়ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

রেলওয়ের কর্ম্মশালায় সমর বিভাগের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিতে হইতেছে বলিয়া কতকটা অসুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু এই কার্য্য এই সঙ্কটকালে কর্ত্তব্যের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। এদেশে যদি রেলগাড়ী এবং রেলের ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার সুব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। এই সমিতির সভাপতি মিষ্টার মুরহেড বলিয়াছেন, সরকার শীঘ্রই এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতেছেন।—কিন্তু এই ব্যবস্থা পূর্ব্বে হইতেই করা উচিত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতে রেলগাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার উপাদানের এবং শ্রমিকেরও অভাব নাই। সুতরাং পূর্ব্বে চেষ্টা করিলেই এই অভাব পূর্ণ করা সুসাধ্য হইত। এখন চারিটি বৃহৎ কর্ম্মশালায় ঐ সকল মালগাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু উহারা আরও অধিক সংখ্যক মালগাড়ী প্রস্তুত করিতে পারে। এদেশের যাত্রীদিগের সুবিধার ব্যবস্থা কি করা হইতেছে, ইহাদের উক্তিতে তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। বিনা টিকিটে দুই-চারি জন লোক

রেলগাড়ীতে যাতায়াত করে, সে কথা ভারত সরকারের রেলওয়ে বিভাগের সদস্য উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা নিন্দনীয় বটে, কিন্তু ভারতবাসী যাত্রীরা যে তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া নানা লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া রেল-ট্রেণে ভ্রমণ করে,—সে সম্বন্ধে ইঁহারা সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ ছিলেন। বাসের এবং লরীর সহিত প্রতিযোগিতায় রেলওয়ের যথেষ্ট অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে; কিন্তু বাস এবং লরীর সহায়তায় রেলওয়েগুলির নানাভাবে সুবিধা হইতেছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহারা রেলপথ হইতে বহু দূরবর্ত্তী অঞ্চলের দ্রব্যাদি বহন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া আসে, এবং তাহা বহন করিয়া রেলওয়ে সমূহ লাভবান হয়—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় আছে? কিন্তু সে সম্বন্ধেও তাঁহারা নির্ব্বাক্ কেন?

বসু-কংগ্রেস বিরোধ

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। তিনি কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্য, এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে জনসাধারণের সুযোগ্য প্রতিনিধি—ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। তিনি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সহোদর। শ্রীযুত সুভাষ বাবুর সহিত কংগ্রেসের বিচ্ছেদ-কাহিনী সকলেরই বোধ হয় স্মরণ আছে। সুভাষ বাবুর সহিত কংগ্রেসের বিচ্ছেদের পরও শরৎ বাবু কংগ্রেসের সদস্য আছেন। ইহার পর বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের উপনির্ব্বাচন লইয়া নিখিল ভারতীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সহিত শরৎ বাবুর তথা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর মতভেদ ঘটে। শরৎ বাবু তাঁহার মনোনীত তিন জনকে সমর্থন করিতে থাকেন, কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ড এক জনকে বাদ দেন। এই ব্যাপার ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া বাঙ্গালার কংগ্রেসওয়ালাদিগের মধ্যে ঘোর বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। শরৎ বাবু কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়া কংগ্রেস শরৎ বাবুকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। এই ব্যাপার লইয়া এই দুঃসময়ে ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের দোষ দিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের বাঙ্গালা-বিদ্বেষের গন্ধ প্রখর হইয়াছে। বাঙ্গালার জনমত শরৎ বাবুর সমর্থন করিতেছে। শরৎ বাবু এই সঙ্কটকালে পরিষদ ত্যাগ করিলে বাঙ্গালার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে—এ বিষয়ে মতভেদ নাই। আমাদের বিশ্বাস, কংগ্রেসের ঔদ্ধত্যের নিকট বাঙ্গালা মস্তক অবনত করিবে না। এখন কি হয়, দেখা যাক।

কেন্দ্রীপরিষদে নূতন করের বিল

'বোঝার উপর শাকের আটি' বলিয়া একটা আছে; কিন্তু গত ১৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার কেন্দ্রী পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে ভারত সরকারের অর্থসদস্য সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ছয় কোটি টাকা নূতন কর স্থাপনের জন্য যে অতিরিক্ত ফাইনান্স বিল পেশ করিয়াছেন, তাহাকে বোঝার উপর আর একটা বোঝা না বলিয়া 'শাকের আটি' বলা কি সঙ্গত হইবে? অর্থসদস্য সার জেরেমি রাইসম্যান হিসাব দিয়াছেন—ব্যয়ের খাতে মোট সতের কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে, এবং তিন কোটি টাকা আয় কম হইয়াছে। এই কুড়ি কোটি টাকার মধ্যে গত বৎসরের উদ্বৃত্ত সাত কোটি টাকা বাদ দিলেও তের কোটি টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা। নূতন ট্যাক্সে পূরা বৎসরে ছয় কোটি টাকা আয় হইবে।

এই অতিরিক্ত অর্থবিলে সুপার-ট্যাক্স ও কর্পোরেশন-ট্যাক্স সহ সকল প্রকার আয়করের উপর কেন্দ্রী সরকারের প্রয়োজনে শতকরা ২৫ ভাগ অতিরিক্ত কর স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাতে পূরা বৎসরে পাঁচ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে, এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের জন্য যে কর ধার্য্য হইয়াছে, তাহা ১/২ ভাগ বর্দ্ধিত করা হইবে। বেতন ও ডিভিডেণ্ড হইতে যে পরিমাণ অর্থ কাটা হয়, তাহাও শতকরা ২৫ ভাগ বর্দ্ধিত হইবে।

ডাক-বিভাগের মাশুলও বর্দ্ধিত হইবে। এক আনা ডাক-টিকিটে যে পত্র যাইত, তাহার জন্য পাঁচ পয়সা মাশুল দিতে হইবে। বুক-প্যাকেটের প্রথম পাঁচ তোলায় আধ আনা মাশুল ছিল, তাহা বাড়িয়া আবার তিন পয়সা হইল। ব্রহ্মদেশে পাঠাইবার চিঠির মাশুল দুই আনা, এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে পাঠাইবার চিঠির মাশুল সাড়ে তিন আনা হইল। এতদ্ভিন্ন, টেলিগ্রামের মাশুলও বর্দ্ধিত হইল। প্রত্যেক (ভারতীয়) অর্ডিনারী টেলিগ্রামে এক আনা, এবং প্রত্যেক জরুরী টেলিগ্রামে দুই

আনা হিসাবে অতিরিক্ত কর লওয়া হইবে। ট্রাঙ্ক টেলিফোনের শুল্ক শতকরা দশ ভাগ বর্দ্ধিত হইল। এই সকল তিল কুড়াইয়া যে বেল হইবে,—তাহাতে এক কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে।

ডাকমাশুল বৃদ্ধি করায় দেশের দরিদ্র লোকের অর্থকষ্ট এই দুঃসময়ে আরও বর্দ্ধিত হইবে। বুক-প্যাকেটের মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব শুনিয়াও পূর্ব্বে আমরা বহুবার তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি; কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। সরকার অনেক অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাস করিয়া, যাঁহারা হাজার হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন—এই দুঃসময়ে তাঁহাদের বেতন শতকরা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে কমাইয়া এই আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের যাহাতে কষ্ট হয়, অসুবিধা হয়, আয় বৃদ্ধির জন্য সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া কি সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন? ইহার পর যদি দেশে সঙ্কট উপস্থিত হয়, এবং আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন সরকার আয় বৃদ্ধির জন্য আর কি উপায় অবলম্বন করিবেন? দেশের জনসাধারণের করদানের শক্তি কি নিঃশেষিত হয় নাই?

—

ভারতে সমরায়োজনের ব্যবস্থা

কেন্দ্রী পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতের সমর-প্রচেষ্টার বিবরণ বিবৃত করিবার সময় অর্থ-সদস্য সার জেরিমি রাইসম্যান বলিয়াছেন—প্রাথমিক ব্যবস্থারূপে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্র-সজ্জিত প্রায় ৫ লক্ষ সৈন্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার সৈন্যদলে সৈন্য-সংগ্রহ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতরক্ষার বহির্ব্যবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য ৬০ সহস্রাধিক সৈন্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকারে ১ লক্ষ লোক সৈন্যদলে গৃহীত হইয়াছে। তাহাদের অধিকাংশের সামরিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বের ৫ হাজার মোটর-যান বর্দ্ধিত হইয়া ৩০ হাজার হইয়াছে; আগামী বৎসর এই সংখ্যা দ্বিগুণ করা হইবে। সাঁজোয়া-গাড়ী নির্ম্মাণের অসুবিধা দূর করা হইয়াছে। প্রতি মাসে শত শত টন লৌহ-প্লেট নির্ম্মিত হইতেছে। আগামী বর্ষে ৩ হাজার সাঁজোয়া গাড়ী নির্ম্মিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভারতে সর্ব্বজাতীয় অস্ত্র ও রসদ বর্ত্তমান প্রয়োজনের হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে নির্ম্মিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন, ১০ কোটি রাউণ্ড ক্ষুদ্র অস্ত্রোপযোগী ও ৪ লক্ষ রাউণ্ড কামানের রসদ ইত্যাদি এবং বহু লক্ষ সামরিক পরিচ্ছদাদি ভারতের বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তিও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। মাইন উত্তোলনকারী বহুসংখ্যক জাহাজ, সাবমেরিণ, সন্ধানী টহলদারী জাহাজ ভারতের বন্দর ও পোতাশ্রয়-গুলির পাহারায় নিযুক্ত আছে। ভারতের পোতনির্ম্মাণোপযোগী কর্ম্মশালাগুলিতে বিশেষভাবে অস্ত্রসজ্জিত মাইন-উত্তোলনকারী জাহাজ ও টহলদারী জাহাজ নির্ম্মিত, এবং নৌ-সৈনিক ও নৌ-কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতের বিমানশক্তি বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা বিশেষভাবেই করা হইতেছে। বৎসরে ৩ শত পাইলট ও ২ সহস্র মেকানিককে শিক্ষাদানের চেষ্টা হইতেছে। অতি আধুনিক শ্রেণীর বিমানের জন্য বিমানাশ্রয়ের প্রসার-বৃদ্ধির আয়োজন চলিতেছে; ইমারৎ নির্ম্মাণ হইতেছে। শিক্ষাদানের জন্য বিস্তর বিমান বৃটেন হইতে আমদানী হইতেছে। ভারতেও বিমান-নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিমান-পরিচালনযোগ্য স্পিরিট, তৈল প্রভৃতি প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাবে অর্থসদস্য তাহার উপযোগিতার কথা ত শুনাইয়া দিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজনের সময় ভারত আত্মরক্ষায় কত দূর কৃতকার্য্য হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। এ জন্য টাকার অভাবের কথা শুনিতে না হইলেই মঙ্গল।

—

যুদ্ধে ভারত

সম্প্রতি মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা সার আর্থার হোপ বর্ত্তমান যুদ্ধে সাহায্যদান প্রসঙ্গে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, "যাঁহাদের বৃটিশ সরকারের সহিত হয় ত মতের বিরোধ আছে, তাঁহাদের সর্ব্বান্তঃকরণে এই যুদ্ধে ক্লিষ্ট বৃটেনকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত।" এ দেশের

জনসাধারণ গ্রেট বৃটেনের অধীন প্রজা, অতএব তাহাদের তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য,—স্যার আর্থার উঁহার হেতু-নির্দ্দেশে যদি এই কথা বলিতেন, তাহা হইলে কাহারও কোন কথা বলিবার ছিল না। কারণ, ভারতবাসী যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তখন তাহারা বৃটিশ জাতিকে এই যুদ্ধে সাহায্য করিতে বাধ্য; কিন্তু তিনি তাহা বলেন নাই। তিনি এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য-নির্দ্দেশে তাহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "এই যুদ্ধ ডেমক্রেসী বা গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমরা দেখিতে চাই যে, ভবিষ্যতে আমাদের সভ্য জাতিরূপে, ভারতেই হউক আর বৃটেনেই হউক, বাস করিবার অধিকার আছে।" বৃটিশ জাতি সম্বন্ধে এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর সম্বন্ধে কি এই কথা সরল ভাবে বলা যাইতে পারে?

ভারতসচিব মিষ্টার আমেরী ইঁহার পর যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহারা য়ুরোপে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশে অর্থাৎ এই ভারতের কুত্রাপি গণতন্ত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, গণতন্ত্রের লক্ষণই এই যে, যেখানে দেশীয় সরকার দেশের লোকের হিতার্থ এবং দেশের লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, সেইখানেই গণতন্ত্র বিরাজিত। এ দেশে কি তাহাই হয়? তাহা যদি না হয় এবং বৃটিশ সরকার যদি যুদ্ধান্তেও ভারতবাসীকে গণতন্ত্র দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিটুকুও দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিঘোষিত গণতন্ত্রের অনুকূলে ভারতবাসী আকৃষ্ট হইতে পারে না। যাহার যাহা নাই, এবং যাহা পাইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ থাকা কিরূপে সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে? মাদ্রাজ লাট বলেন, "আরও দুইটি কারণে ভারতবাসীর সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রেট বৃটেনের সহায়তা করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, আমরা অধিকারের জন্য যুদ্ধ করিতেছি। আমরা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছি। ধর্ম্ম বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে মত-প্রকাশে স্বাধীনতা দানের জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি।" লোকের অধিকার যাহাতে নাই,—তাহার মর্ম্ম তাহারা সাধারণতঃ বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহার উপর তাহাদের দরদ থাকিবারও কথা নয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত-প্রকাশে ভারতবাসীর কতকটা স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু অন্য বিষয়ে যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব, এ বিষয়ে মতভেদ আছে কি? তবে বাঙ্গালায় ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা একালে কতটুকু রক্ষিত হইতেছে, মাদ্রাজের নবাগত লাটের তাহা জানা না থাকিতে পারে। তাহা জানিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন নহে; দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। তবে তিনি শেষ কারণ যাহাতে পাইয়াছেন—তাহা অনেকটা সত্য বটে; হিট্‌লারের জয় হইলে "আমরাও যাইব, তোমরাও যাইবে।" এই উক্তি যে অত্যুক্তি, ইহা কে বলিবে? ধর্ম্ম এবং সংস্কার-রক্ষার স্বাধীনতা ভারতবাসী পছন্দ করে এবং চিরদিনই করিবে। সেজন্য ভারতবাসী নাজী-শাসন অপেক্ষা বৃটিশ-শাসনের অধিকতর পক্ষপাতী, ইহা তাহাদের অন্তরের কথা।

গান্ধীজীর তৃতীয় পন্থা

গান্ধীজীর পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন এবং দলবদ্ধ ভাবে আইনভঙ্গ আন্দোলন নিষ্ফল হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। দলবদ্ধ ভাবে আইনভঙ্গ আন্দোলনের ফলে বহু লোক জেলে গিয়াছিল, বহু পরিবারের কষ্ট হইয়াছিল, তাহা গান্ধীজী বুঝেন। সেই জন্য বোধ হয় তিনি এবার ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গান্ধীজী বলেন যে, সকলেরই মনোভাব ব্যক্ত করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে; সে অধিকার ক্ষুণ্ণ করা উচিত নহে। এই যুক্তি দেখাইয়া তিনি বড় লাটের নিকট যাহারা যুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী, তাহাদিগকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করিবার স্বাধীনতা চাহেন। বড় লাট সেরূপ স্বাধীনতা দেন নাই,—দিতে পারেন না, ইহা জানা কথা। এরূপ অবস্থায় গান্ধীজী ভিনোবা ভাবে নামক এক ব্যক্তিকে দিয়া ব্যক্তিগত-ভাবে আইন অমান্য করাইলেন। ফলে সেই ব্যক্তি বিনা-শ্রমে তিন মাসের জন্য জেলে আটক রহিল। আশা করি, এইখানেই এই আন্দোলনে পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে। কারণ, ইহাতে কোন সুফল ফলিবে না। আমরা এই ঘটনার সংবাদ মাত্র জানাইয়া রাখিলাম।

কেন্দ্রী পরিষদে সুভাষচন্দ্র

কেন্দ্রী পরিষদের সদস্য সূর্য্যকুমার সোম মহাশয়ের পরলোকগমনে সদস্যের পদ খালি হওয়ায় ঢাকা বিভাগের অমুসলমান কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রী পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত অঘোরবন্ধু গুহ মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিয়াছিলেন। ইঁহারা তিন জনই যোগ্য ব্যক্তি, এবং স্বদেশের নিষ্ঠাবান সেবক; কিন্তু দেশগৌরব শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু শেষ-মুহূর্ত্তে এই পদের প্রার্থী হওয়ায় তাঁহারা সকলেই সুভাষ বাবুর দাবীই অগ্রগণ্য মনে করিয়া স্বেচ্ছায় মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের সুবিবেচনা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। সুভাষচন্দ্র বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রী পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বড় লাট কর্ত্তৃক তাঁহার নির্ব্বাচন স্বীকৃত হইলেও সুভাষচন্দ্র এখন ভারত-রক্ষা আইনানুসারে হাজতে অবস্থিতি করিতেছেন, এ কারণে তিনি গত ৫ই নভেম্বর কেন্দ্রী পরিষদের হৈমন্তিক অধিবেশনের আরম্ভের দিন পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ডাকা হইলে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র আনন্দধ্বনি করেন। বড় লাটের বিশেষ আদেশ ভিন্ন সুভাষচন্দ্রকে অধিবেশনে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে—তাহার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশবাসীরা কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার নির্ব্বাচনেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেন্দ্রী পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব হিসাবে ইহাতে সুভাষচন্দ্রের যোগদানে বাধা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

মিঃ রুজভেল্ট পুনর্নির্ব্বাচিত

লণ্ডন হইতে প্রেরিত ৬ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ রুজভেল্ট তৃতীয় বার মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ উইল্‌কি পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। মিঃ রুজভেল্ট তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা অনেক অধিক ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন—ইহাই জানিতে পারা গিয়াছে। মিঃ রুজভেল্ট পর পর তিন বার মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়া এ বিষয়ে 'রেকর্ড' স্থাপন করিলেন। রুজভেল্টের এই জয়ের সংবাদে গ্রেট বৃটেনের সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসী আনন্দিত হইয়াছে; কারণ, তিনি পুনর্ব্বার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হওয়ায়, জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজ মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নিকট নানা ভাবে সাহায্য লাভের আশা করিতেছে। রুজভেল্ট এবার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "বিমান ও অন্য যে-কোন যুদ্ধোপকরণ দ্বারা বৃটেনকে সাহায্য করা হইবে, এবং প্রয়োজন হইলে গণতন্ত্রের শেষ আশ্রয়স্থল বৃটেনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধে যোগদানও করিব।"—কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী উইল্‌কি বৃটেনকে এ ভাবে সাহায্য দানের কথা বলিতে পারেন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন, "যুক্তরাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্যই আমরা য়ুরোপীয় যুদ্ধে জড়িত হইব না; তবে আমরা প্রচুর সমর-সম্ভার উৎপন্ন করিয়া বৃটেনের নিকট বিক্রয় করিব। আমেরিকা য়ুরোপীয় সমরে যোগদান করিলে প্রশান্ত মহাসাগরে ও সুদূর প্রাচ্য-ভূখণ্ডে জাপান কর্ত্তৃক মার্কিণের স্বার্থ বিপন্ন হইবে।"

সুতরাং মিঃ উইল্‌কি জয়লাভ করিলে বৃটিশ জাতি মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নিকট আশানুরূপ সাহায্য পাইতেন বলিয়া মনে হয় না। মিঃ রুজভেল্ট প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হওয়ায় মার্কিণ পররাষ্ট্র-নীতি বৃটেনের অনুকূল হইবে সন্দেহ নাই। এজন্য জার্ম্মাণ জাতি তাঁহার নির্ব্বাচনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়; কারণ, গ্রেট-বৃটেনকে মার্কিণ জাতির সাহায্যদানের মূল্য জার্ম্মাণ জাতির অজ্ঞাত নহে। যাহা হউক, বর্ত্তমান যুদ্ধ অতঃপর কোন্ পথে চলিবে, এবং গ্রেট বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নিকট প্রত্যক্ষতঃ ও পরোক্ষতঃ কিরূপ সহায়তা লাভ করে ও তাহার পরিণাম কি, সমগ্র সভ্য জগত তাহা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে সন্দেহ নাই। গ্রেট বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাজ্যের যথাযোগ্য সাহায্য পাইলে জার্ম্মাণী সন্ধির জন্য উৎসুক হইতেও পারে।

পণ্ডিত জওহরলালের কারাদণ্ড

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর সহিত কোন কোন বিষয়ের আলোচনার জন্য ওয়ার্দ্ধায় গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনের সময় গত ১৪ই কার্ত্তিক সায়ংকালে তাঁহাকে ছেওকি ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গোরক্ষপুর অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে পণ্ডিতজী যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই সকল বক্তৃতা-সম্পর্কেই তাঁহাকে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে ধরা হইয়াছিল। এলাহাবাদ ষ্টেশনের ১৫ মাইল দূরস্থ ছেওকি ষ্টেশনে জওহরলালজী ট্রেণ পরিবর্ত্তনের জন্য ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতেই পুলিশের এক জন ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যান। প্রথমে তাঁহাকে এলাহাবাদের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট উপস্থিত করা হয়। তাহার পর তাঁহাকে গোরক্ষপুরে লইয়া গিয়া তথায় জিলা-জেলের মধ্যে গত ৪ঠা নভেম্বর তাঁহার বিরুদ্ধে মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। তাঁহার দুই ভগিনী সেখানে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মামলার বিচারকালে পণ্ডিতজী বলেন, যাহা প্রমাণিত তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া সরকারী উকিল অযথা কষ্ট পাইয়াছেন। হাকিম বিচার শেষ করিয়াছেন; পণ্ডিতজীকে ৩ দফা অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেক দফায় এক বৎসর চারি মাস হিসাবে মোট চারি বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

পরমাচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন

বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি—ঋষিকল্প পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ৭৫ বৎসর বয়সে গত ২৫শে আশ্বিন শুক্রবার রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে বারাণসী-ধামের চৌষট্টি যোগিনী ঘাট হইতে অমৃতলোকে যাত্রা করিয়াছেন। ব্রহ্মলোক-যাত্রার বহু দিন পূর্ব্বেই পরম পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় মণিকর্ণিকার ব্রহ্মনালের চরণপাদুকায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইবার জন্য বারাণসী-কালেক্টারের অনুমতি-পত্র আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। শেষ-শয়নের জন্য দীর্ঘ কুশাসন প্রস্তুত করাইয়া—চিতা প্রজ্বলন জন্য দেশলায়ের পরিবর্ত্তে চকমকি—শোলা—নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজ শ্রাদ্ধের—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীদিগকে বিদায় দানের সুব্যবস্থা দিয়াছিলেন। দীর্ঘকালের রোগ-যন্ত্রণা তাঁহার তপস্যায় পরিণত হইয়াছিল। সেই সাধনার সিদ্ধিতে শরীরত্যাগের কয় দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মময়ী মায়ের সান্নিধ্য—তাঁহার স্নেহ-সুকোমল স্পর্শ অনুভব করিতেছিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে করিতে—সুপ্রসন্ন বদনে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, পূর্ণ সজ্ঞানে তিনি সানন্দে নশ্বর শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই হিন্দুর বাঞ্ছিত মৃত্যু—নির্ব্বাণ মুক্তি।

পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় বাঙ্গালার—তথা সমগ্র ভারতের অলঙ্কার—প্রতিভা-পাণ্ডিত্যের দীপ্ত জ্যোতিঃস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে সনাতনী হিন্দুসমাজের যে ক্ষতি হইল—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ ব্রাহ্মণের যে অভাব ঘটিল—পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার অন্ধ অনুসরণে ব্যস্ত বর্ত্তমান যুগে তাহা পূর্ণ হইবার আশা নাই।

২৪ পরগণার বিদ্যাসাধনার লীলানিকেতন—ভট্টপল্লী—ভাটপাড়ায় ১২৭৩ সালে তর্করত্ন মহাশয় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা স্বর্গীয় নন্দলাল বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জয়রাম ন্যায়ভূষণ—পরে স্বনামধন্য আচার্য্য শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া, ১২৯৩ সালে তর্করত্ন মহাশয় যোগেন্দ্রনাথ বসুর অনুরোধে 'বঙ্গবাসী'র শাস্ত্র-প্রচার কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদন করিয়া, বহু ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের উপস্কারের পরিষ্কার ও সাংখ্যদর্শনের পূর্ণিমাটীকা প্রণয়ন তাঁহার বিশিষ্ট দান। ১২৯৬ সালে তিনি স্বভবনে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদ্যার্থিগণকে জ্ঞান ও অন্নদানের ব্যবস্থা করেন। গিরিশচন্দ্র বসুর অনুরোধক্রমে কিছু দিন তিনি বঙ্গবাসী কলেজে অবৈতনিক সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-সময়ে সন্দেহক্রমে সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন—তিন দিন হাজতবাসকালে তিনি জলবিন্দু পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই।

তিনি ব্রাহ্মণসভার সভাপতি—একবার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি—সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদের—মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফণ্ডের নিয়ন্তা—জাতীয় শিল্প-পরিষদের সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। সরকার তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্মাননার জন্য 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করিলেও তিনি দরবারে সে সনদ আনিতে যান নাই; সরকারের প্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তি—'মহামহোপাধ্যায়ে'র পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন নাই। সরদা আইনের প্রতিবাদে তিনি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি বর্জ্জন করেন।

দক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্তিমান্ বেদান্ত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন ও সঙ্গলাভে তর্করত্ন মহাশয় ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ নবীন সন্ন্যাসীবৃন্দ যখন বরাহনগরে মঠ স্থাপন করিয়া সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন তর্করত্ন মহাশয় প্রায়ই মঠে গমন করিয়া তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন পদব্রজে বাঙ্গালা দেশ পরিভ্রমণে বাহির হইয়া, বাঙ্গালায় বেদ অনুশীলন প্রবর্ত্তনের জন্য ভট্টপল্লীতে উপনীত হন, তখন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে পরম সমাদরে স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন—প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে আহার্য্য সাজাইয়া আরত্রিক করিতেন। ভাটপাড়ায় বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শে ভট্টপল্লী-সংস্কৃত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে দেশগৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করার ফলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ-বেদান্ত অধ্যাপনার সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন।

তর্করত্ন মহাশয় পরে কাশীধামে গমন করিয়া স্বগৃহে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত বিদ্যার্থিগণের ন্যায়-বেদান্ত অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রায় দশ বৎসর বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক ভাবে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তর্করত্ন মহাশয়ের কাশীনিবাসে বহুবার আসিয়া তাঁহার সুপরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর ভারতমান্য

তর্করত্ন মহাশয় পাঁচ বৎসর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে ধর্ম্মোপদেশক হইতে পারিবেন না, তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই নিয়ম সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় তর্করত্ন মহাশয় কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

অস্পৃশ্যগণকে মন্দির-প্রবেশ অধিকার প্রদানের আইনের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন পরিচালন করেন। 'মাসিক বসুমতী'র অক্ষম সম্পাদকের একান্ত অনুরোধে—প্রযত্নে তর্করত্ন মহাশয় সদলে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের গৃহে গমন করিয়া, শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। সেই আশীর্ব্বাদের অনুপ্রেরণায় সার নৃপেন্দ্রনাথ ভারত সরকারের আইন-সদস্যরূপে এই ধর্ম্মধ্বংসকারী বিল নিরোধ করিয়া, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু সমাজের ধর্ম্মরক্ষা করিয়া ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

প্রধানতঃ তর্করত্ন মহাশয়ের প্রয়াসে গান্ধীজীর গুরুবায়ুর মন্দির-আন্দোলনও প্রতিহত হয়—গান্ধীজী অনশনে বিরত হন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আচার্য্য শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় যারবেদায় গান্ধীজীর সহিত তর্করত্ন মহাশয়ের তর্কযুদ্ধের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সেই আলোচনা-সভায় তর্করত্ন মহাশয়ের অবিসম্বাদী যুক্তিনৈপুণ্যে গান্ধীজীর যুক্তিসিদ্ধান্ত শতধা বিচ্ছিন্ন হয়। পুণার ধর্ম্মসম্মেলনে অশান্ত—উত্তেজিত জনতা তর্করত্ন মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতায় শান্ত—সম্মোহিত—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিল। সরকারী আদেশে ভবানীপুর ব্রিজিতলার শিবলিঙ্গ অপসারিত হইলে—প্রতিবাদকল্পে তর্করত্ন মহাশয় পণ্ডিতগণের অগ্রণী হইয়া লাটসাহেবের নিকট গমন করেন। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী সংস্কৃত বক্তৃতা শুনিয়া—আবেশ-বিহ্বল ভাব দেখিয়া লাটসাহেব মুগ্ধ হন এবং তৎক্ষণাৎ ব্রিজিতলায় শিবলিঙ্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করেন। বারাণসী ও ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ সম্মেলন তর্করত্ন মহাশয়ের নিয়ন্ত্রণে সফল হইয়াছিল—দেশে ব্রাহ্মণ-গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি বর্ণাশ্রম স্বরাজসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—দিল্লী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

শেষ-জীবনে কাশীবাসকালে তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার স্নেহাস্পদ 'বসুমতী'-স্বত্বাধিকারীর অনুনয়ে শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীর দুইটি খণ্ডের প্রাঞ্জল অনুবাদ ও সম্পাদন করেন। সেই অমূল্য সম্পদ বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরে তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মসূত্রের শক্তিভাষ্য প্রণয়নে আত্মনিবেদন করেন। রোগযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল ন্যায়প্রস্থান বেদান্তদর্শনের নহে—শ্রুতিপ্রস্থান উপনিষদ্‌রাজি—স্মৃতিপ্রস্থান শ্রীমদ্ভগবত-গীতারও শক্তিভাষ্য প্রণয়ন সমাপন করিয়া পূজ্যপাদ আচার্য্য তর্করত্ন মহাশয় শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মহনীয় চিন্তার দানে ধর্ম্মজগৎ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি যে শিবাবতার শঙ্কর—ভক্তাবতার রামানুজ—মাধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যের সমকক্ষ দার্শনিক—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। দীর্ঘ দিন বাঙ্গালী দার্শনিক পণ্ডিতের প্রতিভা-পাণ্ডিত্যে—নূতন চিন্তার দানে দর্শনশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয় নাই—তর্করত্ন মহাশয়ের জীবন-সাধনা তাই সার্থক হইয়াছে—গৌরব-জ্যোতি সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে প্রতিভাবতার বিভিন্ন আচার্য্য বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতের—বিশেষতঃ বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাক্তসম্প্রদায়ের উপজীব্য বেদান্ত-দর্শনের শক্তিভাষ্য প্রণয়নে কোন পণ্ডিত মহাশয়ই এ পর্য্যন্ত মনোযোগী হন নাই। তাই অনন্য-সাধারণ প্রতিভা ও মনীষার অধীশ্বর ভারত-পূজ্য তর্করত্ন মহাশয় ব্রহ্মসূত্র—গীতা—উপনিষদের ব্যাখ্যায় শক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া—শাক্তদর্শন প্রণয়নে বাঙ্গালী হিন্দুর মুক্তিলাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এজন্য ভাষার শক্তিতে তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন সম্ভবপর নহে।



সর্ব্বশাস্ত্র-পরমাচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল—সর্ব্বদা সদুপদেশ দানে উৎসাহিত করিতেন। ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কাহারও মনে কোন সংশয় হইলে—স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থায় কাহারও সন্দেহ হইলে তিনি স্বতঃ-প্রযত্নে তাঁহাদের সন্দেহ নিরসন করিতেন। কোন যুক্তি-তর্কের সাহায্যেই তাঁহার সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইত না। বিভিন্ন শাস্ত্রের শ্লোকরাশি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল—অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন,—এরূপ

অলৌকিক স্মৃতিশক্তি যোগী-ঋষির পক্ষেই সম্ভব। তিনি কোন কোটিপতির লক্ষ টাকার প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া সগর্ব্বে চির দারিদ্র্য বরণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবস্থা দেন নাই।

'মাসিক বসুমতী' তর্করত্ন মহাশয়ের অনুগ্রহ লাভে ধন্য হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রভাদীপ্ত প্রবন্ধে-নিবন্ধে 'মাসিক বসুমতী'র গৌরব সমুজ্জ্বল হইয়াছে। মুমূর্ষু অবস্থায়ও তিনি 'মাসিক বসুমতী'র কথা বিস্মৃত হন নাই। সেই অবস্থাতেও আশ্বিন-সংখ্যায় তিনি যে মাতৃস্তুতি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মনিবেদিত ভক্তিমাধুরী উদ্ভাসিত—ঋষি-প্রভা বিভাসিত। তাহার পরও নৃসিংহ-দেবকে স্মরণ করিয়া তিনি মুখে মুখে যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কাব্যজগতে তাহা অতুলনীয়। অল্প পরিসরে তর্করত্ন মহাশয়ের পুণ্যময় সুদীর্ঘ জীবন-সাধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন সম্ভব নহে। তাঁহার আশীর্ব্বাদে—তাঁহার সুপবিত্র জীবনযজ্ঞের জ্যোতিরশ্মিরেখার অনুসরণে পথভ্রান্ত বঙ্গবাসী আবার স্বধর্ম্মের পথে অবিচলিত দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ডঙ্কা নিনাদে জগদ্বাসীকে উদ্বোধিত করুক। তর্করত্ন মহাশয়ের চির জীবনের আশা সফল হউক।

পরলোকগত বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

গত ১৬ই আশ্বিন বুধবার প্রভাতে ৭টার সময় নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, এই সংবাদে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল, এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি এক রকম ভালই ছিলেন। সেই দিন প্রভাতে চা পান করিবার পর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

বরদাপ্রসন্নবাবু থিয়েটার, বায়োস্কোপ ও রেডিয়োর জন্য অনেক নাটক, প্রহসন ও গান রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অনেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং 'বসুমতী'র সহিত অনেক দিন তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার রচিত কোন কোন নাটক সাহিত্য-সমাজে প্রশংসিত হইয়াছিল। তিনি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন, এবং সাহিত্যসেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি ঢাকা জিলার বজ্রযোগিনী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবন কলিকাতাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল; আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ডাক্তার বারিদবরণ পরলোকে

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় গত ৯ই কার্ত্তিক শনিবার ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন শুনিয়া আমরা মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিয়াছি। ডাক্তার বারিদবরণের পিতা স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চন্দননগরের প্রতিষ্ঠাপন্ন অধিবাসী ছিলেন। বারিদবরণ চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজ হইতে



ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়

এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন, এবং ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেও তিনি পরে হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া হোমিও-প্যাথি মতে রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসায় তাঁহার এরূপ হাতযশ হইয়াছিল যে, যে সকল চিকিৎসক এক্ষণে হোমিও-প্যাথি মতে চিকিৎসায় রত আছেন, তিনি তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়গণের অন্যতম বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এ দেশের এক জন সুচিকিৎসকের অভাব হইল। তিনি মিষ্টভাষী এবং জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার সহৃদয়তার জন্য তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার পাঠানুরাগ প্রবল ছিল, এবং আজীবন তিনি ছাত্রের ন্যায় জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

তর্করত্ন মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে

১

গত আশ্বিনের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে বাঙ্গলার—শুধু বাঙ্গলার নয়—ভারতের আস্তিক সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকুলের অগ্রণী, সর্ব্বদর্শন-পরমাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন ৺কাশীধামে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। ইহাতে আস্তিক হিন্দু সম্প্রদায়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। গত কয়েক বৎসর তাঁহার সহিত নানা কারণে আমার সাক্ষাৎ বার্ত্তালাপাদি ব্যাপার দুর্ভাগ্যক্রমে বিরত ছিল; কিন্তু তাঁহার মহাপ্রয়াণের পূর্ব্ববর্ত্তী দিবসে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় যখন আমি শুনিলাম, তিনি আমার সহিত শেষ-দেখা করিবার জন্য আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার সেই মহাপ্রয়াণের শয্যায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য, শুধু দেখিবার জন্য নহে, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে সকল ব্যবহারে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছি, একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্যও পরদিন বেলা ৯টার সময় তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সে সময়ে তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছি, এবং দেখিয়া আমার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধাগৌরবপূর্ণ ভাবের উদয় হইয়াছিল, সাধারণ সমক্ষে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হওয়ায় আমি এখানে তাহার কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

তাঁহার সহিত আমার যে প্রকার নিকট-আত্মীয় সম্বন্ধ ছিল, তদনুসারে এ প্রকার কিছু লেখা বর্ত্তমান কালের নীতি অনুসারে সুসঙ্গত কি না, তাহা জনসাধারণ বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি আমার তৎকালীন মনের অবস্থা যদি হিন্দু সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ না করি, তবে আমার পক্ষে তাহা কর্ত্তব্যের ত্রুটি বলিয়াই আমার প্রতীত হয়, এবং আমার মনে হয়—সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাপ্রাণ লোকাতীত পুরুষশ্রেষ্ঠের যে জাজ্বল্যমান—সকলের শিক্ষাপ্রদ ব্রহ্মণ্যমূর্ত্তির অলৌকিক চিত্র তাঁহার মহাপ্রয়াণকালে আমার নয়নে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় বর্ত্তমান সময়ে আস্তিক হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য জ্ঞেয়; এই কারণেও আমি ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

গীতায় আছে :—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

বাল্যকাল হইতে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অনেকবারই গীতার এই পুণ্যশ্লোক পড়িয়াছি, কিন্তু এই শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য যে প্রত্যক্ষভাবে আমার সম্মুখে কখনও প্রকাশিত হইতে পারে, এরূপ আশা আমি পূর্ব্বে কখনও করি নাই; কিন্তু মহাপ্রয়াণের জন্য উদ্যত, বিবশাঙ্গ, অথচ সম্পূর্ণ চেতনা-সম্পন্ন তর্করত্ন মহাশয়কে মৃত্যুশয্যায় শয়ান দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত সেই সময়ের যথাসম্ভব কয়েকটি কথাবার্ত্তা কহিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, গীতার উক্ত শ্লোক যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার সম্মুখে বিরাজমান রহিয়াছে। মরণ আসিয়া সম্মুখে দাড়াইয়াছে—তখন তর্করত্ন মহাশয়ের এ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান, অথচ কোনও প্রকার ভয়ের, উদ্বেগের, বা বিকলতার কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না! তিনি তখন আমার হাতে হাত মিলাইয়া—ধীর, গম্ভীর ও ঈষদস্পষ্টস্বরে আমাকে বলিলেন, 'দেখ প্রমথ! আমি মরণের জন্য প্রস্তুত আছি। জগদম্বার চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি আমার উপরে, নীচে, আশে-পাশে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; জগদম্বার এমন করুণা আমি এ জীবনে আর কখনও অনুভব করি-নাই। আমার ভয় নাই, আমার কোনও উদ্বেগ নাই, আমার সর্ব্বদাই মনে হইতেছে—অপার্থিব আনন্দের সমুদ্র উদ্বেল হইয়া আমাকে গ্রাস করিতেছে। আমি ত চলিলাম, তুমি রহিলে, যতটুকু পার—সনাতন ধর্ম্মের মহনীয় পুণ্য আদর্শ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে—সে জন্য তুমি সামর্থ্যানুসারে চেষ্টা করিবে, ইহাই আমার তোমার কাছে শেষ নিবেদন।"

তাঁহার সহিত আরও কতকগুলি কথা হইয়াছিল, আরও হৃদয়-দ্রবকর কতকগুলি ব্যবহার হইয়াছিল; এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করা বর্ত্তমান সময়ে আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাৎকালিক বিবরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইল। আশা করি, শ্রদ্ধেয় আস্তিক সম্প্রদায় তাহা পাঠ করিয়া—তর্করত্ন মহাশয়-কি ছিলেন, তাঁহার তিরোভাবে আস্তিক হিন্দু-ভারতের কি

দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়া, —এখনও হিন্দুর আত্মরক্ষার জন্য কি করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে ভাল করিয়া ভাবিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

২

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কয়েক বৎসর ধরিয়া জ্বর, শূলবেদনা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া বড়ই কাতর ছিলেন। মধ্যে মধ্যে একটু ভাল থাকিলেও তাঁহাকে প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকিতে হইত; শেষে মৃত্যু ক্রমেই নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাপ্রয়াণের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি মানসসরোবরস্থ স্বকীয় বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া চৌষট্টী ঘাটের উপর অবস্থিত ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার একমাত্র আকুল আকাঙ্ক্ষা—হিন্দুর এই সুপবিত্র তীর্থে সুরধনীকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহারই তীরে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের পাদপদ্মে বিলীন হইয়া, মুক্তিক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী এমন কে আছেন, যিনি তর্করত্ন মহাশয়ের নাম শ্রবণ করেন নাই? তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম, শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, ঋষিবাক্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মণোচিত তেজঃ ও সাহস, ভগবদ্‌ভক্তি এবং তাঁহাতে একান্তভাবে নির্ভরতা, আস্তিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক নরনারীর চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিয়াছে। সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিত। যাঁহারা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেন না, তাঁহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার তুল্য প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

মৃত্যু নিকটে, কিন্তু মৃত্যুভয়হীন, রোগে ভুগিয়া দেহ অস্থিচর্ম্মসার, কিন্তু প্রায় দিবারাত্রিই পুঁথি লেখা চলিতেছে! নিজে লিখিতে যখন অসমর্থ হইলেন, তখনও মুখে বলিয়া যাইতেছেন, অপর কেহ লিখিয়া লইতেছে। এই দারুণ যন্ত্রণাদায়ক রোগশয্যায় পড়িয়া-থাকিয়াই তাঁহার অন্তিম জীবনে কয়েকখানি দুরূহ অমূল্য গ্রন্থ লিখিত হয়, কয়েকখানি মুদ্রিতও হয়। তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের শক্তিভাষ্য, গীতাশক্তিভাষ্য, উপনিষদের শক্তিভাষ্য, ও কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে তিনি যে সুন্দর সুন্দর অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোক অনর্গলভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ, নৃসিংহদেব সম্বন্ধে যে সকল শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়!—কোন্ শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া এরূপ দুর্ব্বল শরীরেও এমন সক্রিয় মন সর্ব্বদাই কার্য্যে রত ছিল, তাহা আমাদের মত শ্রদ্ধাবুদ্ধিবিহীন মানব কিরূপে ধারণা করিবে? শাস্ত্রের কত জটিল সমস্যা দিনের পর দিন সমাধান করিয়া বুধমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ হইতেছে—তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার শেষ মিলন বা অন্তিম বিদায়গ্রহণের দৃশ্য।

প্রতিবৎসরই ভট্টপল্লীস্থ ভবনে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। দেহে যত কাল শক্তি ছিল, তর্করত্ন মহাশয় তত দিন স্বয়ং মায়ের পূজা করিয়াছেন। তিনি যখন পূজা করিতে বসিতেন, তখন সেই মৃন্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ীরূপে প্রতিভাত হইত। তাঁহার নয়ন যুগলে দরদরিত অশ্রুধারা, ও ভক্তিভরে 'মা মা' রবে আকুল আহ্বান—চণ্ডীমণ্ডপে এক দিব্যভাবের সঞ্চার করিত; সে সময়ে অতিবড় পাষণ্ডের হৃদয়ও ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইত; সাত্ত্বিকভাবের বিকাশে সর্ব্বাঙ্গে পুলক ও নয়নে আনন্দাশ্রু দেখা দিত। যিনি তাহা না দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সে ভাবের অনুভব করা কদাচ সম্ভবপর নহে।

বর্ত্তমান বর্ষে মহাপূজার সময় পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে কি না, এই ভাবনায় সকলেই আকুল! মহালয়ার তিন দিন পূর্ব্বে তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীজীব ন্যায়তীর্থকে ডাকিয়া বলিলেন—"শ্রীজীব, তুমি ভাটপাড়ায় যাও, মায়ের পূজা সম্পন্ন কর; যিনি দয়া করিয়া এ দীনের গৃহে আসিয়াছেন, আর এত কাল যাঁহার অফুরন্ত করুণার ধারা আমার উপর অজস্রভাবে বর্ষিত হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই শেষরক্ষা করিবেন।" পিতার অনুমতি পাইয়া শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহামায়ার পূজার জন্য ভাটপাড়ায় যাত্রা করিলেন। নবমীর দিন কাশী হইতে 'তার' আসিল, 'পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকিলে সত্বর চলিয়া আইস।' বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে যাত্রা করিবেন কি না ভাবিয়া ন্যায়তীর্থ ইতস্তত করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুনরায় 'তার'

আসিল, "অবস্থা সঙ্গীন !" এই 'তার' পাইয়া তিনি সেই রাত্রিতেই কাশীযাত্রা করিয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, তখনও তর্করত্ন মহাশয় পূর্ণ সজ্ঞান। তিনি পুত্রের মুখে পূজা সুসম্পন্ন হওয়ার সংবাদ শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ, জগজ্জননী ভগবতীর অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া, এবং জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সকল বাধাই অপসারিত হইয়াছে বুঝিয়া, গভীর শান্তি ও অটল নির্ভরের ভাব তাঁহার মুখে পরিস্ফুট হইল; কিন্তু মনে হইল, একটি বিশেষ ত্রুটি জীবনে যেন রহিয়া গিয়াছে—যে জন্য প্রাণ তখনও বাহির হইতেছিল না। প্রিয় ভগিনীপতি ভারতবিশ্রুত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে যে শেষ-দেখা হয় নাই ! প্রায় ১৫ বৎসর কাল যাবৎ ধর্ম্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত ব্যবস্থা লইয়া উভয়ের মতভেদ, ফলতঃ, দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ !

আবাল্যসঙ্গী এই দুইটি হৃদয় যে গভীর প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ, উল্লিখিত বিরোধ সত্ত্বেও যে অকৃত্রিম প্রীতি এতকাল অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায়—উভয়ের হৃদয়ে সমভাবেই প্রবাহিত ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তর্করত্ন মহাশয়ের অন্তিমকালে এই দুই মহাপ্রাণ বন্ধুর মিলনের স্বর্গীয় দৃশ্য ! যে কয় জন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই দৃশ্য-সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় অনির্ব্বচনীয় মধুর রসে আপ্লুত হইয়াছিল। এ কথা শুনিতে রূপ-কথার মত, ইহা কেবল সাধনাপূত জীবনেই সম্ভবপর।

শ্রীজীব সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "একবার তোর পিসে-মহাশয়ের কাছে যা, এবং যদি তাঁর প্রতিকূল ভাব না থাকে, তাহ'লে এই শেষ সময়ে তিনি যেন একবার দেখা করেন।" এদিকে কখন কি হয় ভাবিয়া, এবং পথশ্রমজনিত ক্লান্তি প্রভৃতি কারণে 'একটু পরে যাইব' ভাবিয়া, ন্যায়তীর্থ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া এবং বহু লোকের সমাগমজনিত ব্যস্ততাবশতঃ অবকাশ পান নাই। এদিকে কখনও তিনি মাতৃরূপ-দর্শনে বিভোর, কখনও বা দু'-একটি কথা বলিতেছিলেন,—এই অবস্থায় তর্করত্ন মহাশয়ের সময় কাটিতেছিল। দিবাবসানের পূর্ব্বেই তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "কই ? তোর পিসে-মশায় কি এলেন না ?" ন্যায়তীর্থ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "আপনার কাছ ছেড়ে যেতে পারিনি, তা আমি এখনই যাচ্ছি।" তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "এখন তাঁর বেড়াবার সময়, গেলে হয় ত দেখা হবে না, সন্ধ্যার পর যা'স্।" রাত্রি সাড়ে ৮টার সময়েও শ্রীজীব যান নাই দেখিয়া বলিলেন, "এখনও তুই যাস্‌নি ?" তখনই ন্যায়তীর্থ ব্যস্তভাবে তর্কভূষণ মহাশয়ের শিবালয়স্থ গৃহে উপস্থিত হইয়া পিতৃ-আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। মিলনের যে ব্যাকুল আগ্রহ তর্কভূষণ মহাশয়ের হৃদয়ে এত কাল রুদ্ধ ছিল, আজ যেন তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি তখনই দেখা করিতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেও সকল দিক্ ভাবিয়া পরদিন প্রাতঃকালে যাওয়াই স্থির করিলেন। একাদশীর প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ বেলা হইলে তর্করত্ন মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই ? প্রমথ এল না ?"—শ্রীজীব বলিলেন, "তিনি পূজাপাঠ শেষ ক'রে আসবেন বলেছেন; তিনি এলেন ব'লে !" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই তর্কভূষণ মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তর্করত্ন মহাশয় ইহা জানিবামাত্র তাঁহাকে কাছে পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, মুমূর্ষু দেহে যেন নববলের সঞ্চার হইল ! ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আমার একেবারে কাছে এসে ব'স।" শ্রীজীবকে বলিলেন, "এত কাছে, তবু ত আমি মুখখানা দেখতে পাচ্ছি নে !" শ্রীজীব জল দিয়া চক্ষু ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন; তথাপি দেখিতে পাইলেন না। তখন আর একবার শ্রীজীব গব্যঘৃতের দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তর্করত্ন মহাশয় হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এইবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি; তুমি একবার আমাকে ভাল ক'রে জড়িয়ে ধর, তোমার বুকখানা আমার বুকের ওপর রাখ।" তর্করত্ন মহাশয় তর্কভূষণ মহাশয়কে এই কথা বলিয়া শ্রীজীবকে বলিলেন, "আমার হাতখানা তুলতে পারছি নে, একবার প্রমথর কাঁধের উপর উঠিয়ে দাও।" উভয়ের চক্ষেই জল ! সকলে নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক হইয়া দেখিতেছেন, "এ বাস্তব, না স্বপ্ন !" এ মিলনে উভয়ের কি পরিতৃপ্তি ! কত পুরাতন কথা, পূর্ব্বের স্মৃতি

উভয়ের মনকে আলোড়িত ও মথিত করিতে লাগিল; এবং ধীর শান্ত স্বরে একঘণ্টা কাল উভয়ের আলাপ চলিল। তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "জীবনে হয় ত অকারণে তোমার মনে কত ব্যথা দিয়েছি, আজ আমার প্রার্থনা—সে সকল তিক্ত স্মৃতি মন হ'তে একেবারে মুছে ফেল, আমাকে—আমাকে ক্ষমা কর।" তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "এখন আমি ব্যবহার-রাজ্যের পরপারে, সমাজ ও ধর্ম্মের জন্য তোমার মত পরম প্রিয়জনকেও দূরে রেখে-ছিলাম। তোমার সহিত আর এখন কিসের বিরোধ? জীবনে তোমার মনেও অনেক ক্লেশ দিয়েছি, তুমিও আমাকে ক্ষমা কর। আমি ত চ'ললাম—তুমি রইলে; যাতে বর্ত্তমান সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রকৃত ধর্ম্মপথে চালিত হয়, সে জন্য তোমার শক্তি প্রয়োগ ক'রবে। তোমারও বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু শক্তির অভাব হবে না। তুমি সম্মত হ'লে মৃত্যুকালে এ আমার পরম শান্তির কারণ হবে। আর এক কথা, আমার পুত্রেরা রৈল—তাদের প্রতি তোমার যেন পূর্ব্বের মত পুত্রবৎ স্নেহ থাকে।"

তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন—"তুমি যাবে কোথায়? আমি তোমাকে ঋষি ব'লে জানি, তোমাকে আবার ভারতে আসতে হবে। এই পথহারা ধর্ম্মহীন ভারতকে আবার সনাতন মুক্তিমার্গ তোমাকেই দেখাতে হবে। তোমার আবির্ভাবে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের দুর্দ্দশা ঘুচবে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও আসবার কামনা করি, সেবার তোমার বিরোধী রূপে নয়, তোমাকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করবার জন্য। আর তোমার পুত্রদের কথা ব'লছ—আজকালকার দিনে এমন পুত্ররত্ন খুব কম ভাগ্যবানই লাভ করতে সমর্থ হ'য়েছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, সকল দিক্ দিয়াই বর্ত্তমানে তারা আদর্শ-স্বরূপ। শ্রীজীব, সুজীব ও সঞ্জীব এবং বধূমাতারা সকলে মিলে এই দীর্ঘকাল যাবৎ দ্বিধা ও আলস্য বর্জ্জন ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে অকুণ্ঠিতচিত্তে ও পরিপাটীরূপে পিতৃসেবার যে মহনীয় আদর্শ দেখিয়েছে, তা' প্রত্যেক মানবের অনুকরণযোগ্য।"—তর্করত্ন মহাশয়ের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।। তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় এই কাশীধামে। মদীয় পরমারাধ্য পিতৃদেব যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তুমি তাঁর নিকট প'ড়বার জন্য এসেছিলে—তোমার সে আশা পূর্ণ হয়নি; কিন্তু প্রথম দর্শনেই তুমি আমার আপন হ'য়েছিলে। আজ আবার এই কাশীধামেই তোমার কাছে চিরবিদায় নিতে এসেছি। বাল্যকালের সে দিনের কথা কি তোমার মনে আছে? তোমাতে আমাতে প্রায় সর্ব্বদা একসঙ্গে বাস। এক দিন সারারাত্রি ভাটপাড়ার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গাতীরে ব'সে দু'জনে নানা কথাবার্ত্তায়, হাসিঠাট্টায় কাটাই। শেষ-রাত্রিতে যখন চৈতন্য হ'ল, তখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে গুরুজনদের বকুনি খাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য ব'লে মনে না হওয়ায়, গঙ্গার ঘাটেই গায়ের চাদর বিছিয়ে উভয়ে শুয়েছিলাম। প্রভাতে প্রাতঃস্নানের জন্য গ্রামের বয়োবৃদ্ধ অনেকেই ঘাটে উপস্থিত। আমাদের সেই অবস্থায় দেখে পূজ্যপাদ শ্রীধর ঠাকুর্দ্দা-মশায় খেদ করে ব'লেছিলেন, 'এই দুটো ছেলে একেবারেই ব'য়ে গেছে,—এদের আর কিছু হবার আশা নেই!' কেহ বা আমাদের সেই রকম প্রীতি দেখে ব'লেছিলেন, 'এরা স্ত্রীপুরুষ হলে নিশ্চয়ই বিবাহ হোত'।"

তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়া চলিলেন—"আজ বুঝি কথার শেষ নেই—দেখ তর্করত্ন! তুমি প্রায়ই বলতে (অবশ্য ঠাট্টা করে), আমাকে তোমার প্রণাম করা উচিত। বয়সে আমি তোমা অপেক্ষা কিছু ছোট হ'লেও যেহেতু তুমি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ ক'রেছ, সেই হেতু আমি তোমার গুরুজন, এবং প্রণম্য। কিন্তু তোমার সে কথায় আমি কোনও দিন মনোযোগ দিইনি; আজ আমি সত্যসত্যই তোমাকে প্রণাম ক'রছি—আদর্শ ব্রাহ্মণ ব'লে—ঋষি ব'লে।"—নয়নের জল দ্বিগুণ বহিল, হৃদয়ে হৃদয় স্পর্শ হইল, বাহুবন্ধন ক্ষণকালের জন্য সুদৃঢ় হইল,—পরক্ষণেই শিথিল হইয়া পড়িবার জন্য।

সেই দিন রাত্রি, অর্থাৎ গত ২৫শে আশ্বিন শুক্রবার রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় তর্করত্ন মহাশয় সজ্ঞানে কাশীলাভ করেন, এবং মণিকর্ণিকায় ব্রহ্ম-নালাতে তাঁহার পার্থিব দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শীতাগমে

[শিল্পী—ভিক্টর মিত্র



১৯শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ [২য় সংখ্যা

গীতার দার্শনিক রহস্য

(গীতোক্ত সাংখ্য-যোগ)

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদের ভিত্তিতে রচিত বেদান্তের অন্যতম প্রস্থান হইলেও উপনিষদের উপপাদন ও গীতার উপপাদনের মধ্যে যে বড় রকমের একটা প্রভেদ আছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। গীতা সমন্বয়সাধক মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বেদান্তজ্ঞানের ন্যায় সাংখ্যবিজ্ঞানও প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। যোগ-নিষ্ঠা, ভক্তিবাদ, বিশেষতঃ, মানবদেহধারী ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতিও প্রধান ভাবেই আলোচিত হইয়াছে এবং এই সকল আলোচনার দ্বারা গীতার একটা নিজস্ব রূপের বিকাশ হইয়াছে। উপনিষদ্ জ্ঞানপ্রধান। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ উপনিষদে সাংখ্য-প্রক্রিয়ার নামগন্ধও পাওয়া যায় না। মৈত্রী, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে অব্যক্ত, মহৎ প্রভৃতি সাংখ্য-দর্শনোক্ত পরিভাষার নাম শুনা যায় বটে, কিন্তু তাহার অর্থ উপনিষদে সাংখ্য-প্রক্রিয়া অনুসারে করা হয় নাই, বেদান্তের পদ্ধতিতেই করা হইয়াছে। গীতার আলোচনায় কিন্তু সাংখ্যকে একেবারে বাদ দেওয়া হয় নাই। অবশ্য সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত যেমনটি, তেমনটি গীতায় গৃহীত হয় নাই। গীতায় শেষ পর্য্যন্ত সাংখ্যজ্ঞানের উপর অদ্বৈত-বেদান্তের প্রাধান্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র নহে উহা আত্মরূপ পরব্রহ্মেরই দ্বিবিধ বিভাব। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিও পুরুষ, এই মহাদ্বৈতের অদ্বৈতে পর্য্যবসানই গীতায় ধ্বনিত হইয়াছে। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদ গীতায় অঙ্গীকৃত না হইলেও ত্রিগুণময়ী সাংখ্য-প্রকৃতি হইতে গুণোৎকর্ষের তারতম্য অনুসারে ব্যক্ত জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে—এই সম্বন্ধে সাংখ্য-সিদ্ধান্তই গীতায় গৃহীত হইয়াছে; সাংখ্যানুমোদিত ক্ষরাক্ষর বিচারই গীতায় বিবৃত হইয়াছে। নির্গুণ পুরুষ সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র, এই মতও গীতায় গৃহীত হইয়াছে। ফলে দেখা যায় যে, উপনিষদুক্ত অদ্বৈত-মতের সহিত দ্বৈতবাদী সাংখ্য-মতের সৃষ্টি-ক্রম প্রভৃতি যে সকল অংশে সাম্য থাকা সম্ভব, ঐ সমন্বয়ের দৃষ্টিতেই সাংখ্য-জ্ঞান ও বেদান্ত-জ্ঞান গীতায় আলোচিত হইয়াছে। গীতার ন্যায় মহাভারতের অধ্যাত্ম বিচারেও এইরূপ সমন্বয়ের আভাস পাওয়া যায়। ভক্তিবাদ সম্বন্ধেও গীতার উক্তির মৌলিকতা আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ভক্তিবাদ

অতি প্রাচীন। প্রাচীনতম উপনিষদে সগুণ উপাসনার যে উপদেশ আছে, তাহা হইতেই ক্রমে ভাবময়ী ভক্তি-গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছে। অব্যক্ত নির্গুণ নিরাকার পরমব্রহ্মের ধারণা করা কঠিন বলিয়া আকাশ, মনঃ, সূর্য্য, অগ্নি, যজ্ঞ প্রভৃতি প্রতীক তত্ত্বকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করার কথা প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃত বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রাচীন উপনিষদে যে সকল প্রতীকের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোথায়ও মনুষ্যদেহধারী পরমেশ্বরের প্রতীকের কথা বলা হয় নাই। পরবর্ত্তী উপনিষদে রুদ্র, শিব, বিষ্ণু, নারায়ণ, মহেশ্বর প্রভৃতির উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে (১)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরা ভক্তির কথা শুনা যায় (২)। বৃহদারণ্যকোক্ত যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর উপাসনার সহিত শ্বেতাশ্বতরোক্ত ভক্তিবাদের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, বৃহদারণ্যকোক্ত প্রতীক উপাসনায় উপাস্যের প্রতি উপাসকের যে অনুরক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া ভক্তিবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভক্তিবাদের সহিত অবতারবাদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। যজ্ঞরূপ উপাসনায় অবতারবাদের কোন স্পষ্ট বিকাশ নাই, সুতরাং সেখানে উপনিষদে ভক্তি শব্দের প্রয়োগ না করিয়া উপাসনা শব্দের প্রয়োগ করাই সঙ্গত মনে হয়। এই অবতারবাদ শ্বেতাশ্বতরে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সত্য, কিন্তু মহানারায়ণ, নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী, এবং গোপালতাপনী প্রভৃতি উপনিষদে অবতারবাদ ও ভক্তিবাদ যেমন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও তাহা এত স্পষ্ট নহে, কেন না, প্রথমতঃ, শ্বেতাশ্বতরের নির্দ্দেশই মহানারায়ণ প্রভৃতি হইতে অস্পষ্ট; দ্বিতীয়তঃ, রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি যে সকল দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা বৈদিক দেবতা, উহা দ্বারা মানবদেহধারী দেবতারই কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। মহানারায়ণ, নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী প্রভৃতির যে নির্দ্দেশ তাহাতে সংশয়ের কোনই অবকাশ নাই, সুতরাং বলিতে হয় যে, বৃহদারণ্যকে যাহা বীজরূপে বর্ত্তমান, ঐ বীজই শ্বেতাশ্বতর, মৈত্র্যুপনিষদে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়া মহানারায়ণ প্রভৃতি উপনিষদের ক্ষেত্রে সুবিশাল ভক্তি-বিটপীতে পরিণত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশে গীতার স্বাতন্ত্র্য অতি স্পষ্ট। গীতায় ভক্তি যে জ্ঞানেরই সুবাসিত রূপ, ইহা প্রতিপাদন করিয়া ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই ত গেল ভক্তিবাদের কথা, তার পর কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে গীতার বক্তব্য এই যে, মুক্তপুরুষের পক্ষে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি বা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম উপনিষদে গৌণ বলিয়া অভিহিত হইলেও কর্ম্মত্যাগ করা চলিবে না। সকাম কর্ম্ম অবশ্য কামনার বহ্নিতে আহুতি যোগায় বলিয়া তাহা জ্ঞানীর সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদন করে বলিয়া তাহা সর্ব্বদাই অনুষ্ঠেয়। ঈশাবাস্যোপনিষদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, "এ জগতে আমরণান্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শত বৎসর জীবিত থাকিতে চেষ্টা করিবে।"—কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। ঈশাঃ ১।১। ঐ কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে কামনা ত্যাগের কথাও পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যে সকল স্থলে শাস্ত্রে কর্ম্মত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, ঐ সকল স্থলে সকাম কর্ম্মত্যাগেরই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই, এ কথা স্পষ্ট বাক্যে গীতায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম-সূত্রকারও "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ" (ব্রঃসূঃ ৩।৪।২৬) এই সূত্রে জ্ঞানেও কর্ম্মের অপেক্ষা আছে, ইহাই সূত্রোক্ত "সর্ব্বাপেক্ষা" কথা দ্বারা সূচনা করিয়াছেন। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ "যোগনিষ্ঠা" বলিয়া গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মফলের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে তুল্যতা বোধই যোগ বলিয়া গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে—সমত্বং যোগ উচ্যতে। গীঃ ২।৪৮। কর্ম্মযোগে বুদ্ধির সমতা লাভ করিতে হইলে চিত্ত-নিরোধ ও সমাধি একান্ত আবশ্যক। এই হিসাবেই যোগকে গীতায় সাধনরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগসাধনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তকে কি ভাবে নিরোধ

১। মৈত্র্যুপনিষৎ ৭।৭, শ্বেতাশ্বতর ৫।১৩।

২। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩

করিতে পারা যায়, তাহা দেখান হইয়াছে। (গীঃ ৬।৩৫) চিত্ত-নিরোধের আবশ্যকতা প্রভৃতিও বর্ণিত হইয়াছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, গীতায় যে যোগের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা উপনিষদুক্ত প্রাচীন যোগমার্গ, পতঞ্জলি-কৃত যোগ-দর্শন নহে। পাতঞ্জল যোগদর্শন গীতার পরবর্তী। যে সময়ে গীতা রচিত হইয়াছিল, পাতঞ্জল-দর্শন তখনও স্বতন্ত্র দর্শন প্রস্থান হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করে নাই। এই জন্যই গীতোক্ত যোগরহস্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, পাতঞ্জল-সূত্র অপেক্ষা কঠ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ প্রভৃতির যোগ-দৃষ্টির সহিত গীতোক্ত দৃষ্টির সাম্য অধিক। নিষ্কাম কর্ম্মযোগই যোগ, ইহাই প্রাচীন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত গীতায় অনুসৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের তুলনায় পতঞ্জলির "চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ" (যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ পাতঞ্জল-সূঃ ১।১।১) যোগের আধুনিক অর্থ। সম্ভবতঃ পতঞ্জলির কাল হইতেই যোগ শব্দের ঐ অর্থ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

গীতোক্ত সাংখ্য-যোগ-রহস্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতায় কোথায়ও সাংখ্য-যোগকে এক করিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কোথায়ও বা পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে। এখন এই সাংখ্য-যোগ শব্দের অর্থ কি? সাংখ্য-দর্শন যোগ-দর্শন কি? গীতায় সাংখ্য শব্দের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে কপিল-কৃত সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন কথা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না। যদিও মহাভারতে স্পষ্টই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ দেখা যায়, কপিল আসুরিকে এবং আসুরি পঞ্চশিখকে ঐ বিদ্যাদান করেন, এইরূপে সাংখ্য-দার্শনিক-সম্প্রদায়ের কথাও মহাভারতে শুনা যায়। গীতায় 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ' বলিয়া কপিল মুনির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই কপিলই যে সাংখ্য-শাস্ত্রকার কপিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। তার পর, এই সিদ্ধ কপিলই সাংখ্যশাস্ত্রকার কপিল, এ কথা মানিয়া লইলেও গীতায় সাংখ্য শব্দে যে কপিলকৃত সাংখ্য-দর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। যোগ শব্দেও পতঞ্জলির যোগ-দর্শন গীতায় গৃহীত হইয়াছে, এমন কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২।৩৯ শ্লোকে) যে সাংখ্য-বুদ্ধি ও যোগ-বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাংখ্যবুদ্ধি বলিয়া সেখানে আত্ম-বিজ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। আত্মা অজড়, অমর, শোক-দুঃখাতীত, অপরিবর্ত্তনশীল ও অবাঙ্‌মনসগোচর। জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে পড়িয়া আত্মা বিভিন্ন কায়া পরিগ্রহ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু আত্মার ঐ কায়া পরিবর্ত্তন আমাদের বেশ পরিবর্ত্তনেরই মত। আমরা যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করি, আত্মাও সেইরূপ রোগ-জরা-জীর্ণ বিকল শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর পরিগ্রহ করিয়া থাকে (১)। আমার বেশ পরিবর্ত্তনে আমি পরিবর্ত্তিত হই না, যেই আমি, সেই আমিই থাকি, আত্মা ও কায়া পরিবর্ত্তনের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হন না,—যেই আত্মা, সেই আত্মাই থাকেন। নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অপরিবর্ত্তনীয় এই আত্মাই বিশ্বপ্রাণ, জগদাধার, সর্ব্বব্যাপী ও চিন্ময়। অজ, নিত্য, শাশ্বত এই আত্মবিজ্ঞানই গীতায় সাংখ্যবুদ্ধি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গীতার এই সাংখ্যবুদ্ধি শব্দের অর্থ বিবেক-জ্ঞান। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে স্পষ্টতঃ জ্ঞান-নিষ্ঠা বা জ্ঞান-যোগকেই সাংখ্য-যোগ বলা হইয়াছে এবং ঐরূপ বিবেক-জ্ঞান যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও "সাংখ্য" বলা হইয়াছে (গীতা ৫।৫)। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কপিলের সাংখ্যমত যাহারা অনুসরণ করিয়া থাকেন, কেবল তাঁহারাই "সাংখ্য" নহেন, যাহারা বেদান্তী বা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাহারাও গীতার মতে "সাংখ্য" পদবাচ্য। সাংখ্য শব্দ এখানে ব্যাপক অর্থেই লওয়া হইয়াছে। সাংখ্য বলিলে সমস্ত বিবেকশাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্রকেই বুঝায়। গীতায় কোথায়ও সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে সাংখ্যদর্শনের প্রয়োগ করা হইয়াছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন মনীষী মনে করেন যে, গীতার অন্ততঃ দুইটি প্রয়োগে "সাংখ্য" শব্দে কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশ শ্লোকে "অন্যে সাংখ্যেন যোগেন" বলিয়া যে সাংখ্য-যোগের উল্লেখ করা

১। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা ২।২২

হইয়াছে, তাহাতে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের "সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি" (১৮।৩৩ শ্লোক) বলিয়া যে "সাংখ্যের" নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা সাংখ্য-দর্শনেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষ্যকারও টীকাকারদিগের মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "সাংখ্যেন যোগেন" বলায় স্পষ্টতঃ সাংখ্যের সহিত যোগের অভেদ সূচনা করা হইয়াছে এবং সাংখ্যকে এখানে আত্মজ্ঞানের উপায় হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সাংখ্য শব্দে সাংখ্যদর্শন, যোগ শব্দে যোগদর্শন, এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় কি? আচার্য্য শঙ্কর তদীয় ভাষ্যে "সাংখ্য" কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আমার দৃশ্য, আমি ঐ গুণত্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, এবং গুণত্রয়ের যাহা কিছু ব্যাপার, আমি তাহারই দ্রষ্টা, আমি অবিনাশী অপরিণামী আত্মা, এইরূপ বুদ্ধিই সাংখ্যবুদ্ধি (১)। শঙ্করাচার্য্য যোগ শব্দের কোন তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন নাই। শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় যোগ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অষ্টাঙ্গ যোগ; সাংখ্য শব্দের অর্থ তাঁহার মতে শঙ্করাচার্য্যেরই অনুরূপ; প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে বিভিন্ন (বিলক্ষণ), এই আলোচনার নামই সাংখ্যজ্ঞান। অষ্টাঙ্গ যোগের বিবরণ পাতঞ্জল-দর্শনে এবং উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং শ্রীধরস্বামীর এই অর্থ হইতেও যোগ শব্দের অর্থ যে পাতঞ্জল-যোগ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সাংখ্য শব্দে সাংখ্য-দর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞান সূচনা করিলে ও কপিলোক্ত সাংখ্য-দর্শনই যে সাংখ্য শব্দের প্রতিপাদ্য, ইহাও নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। রামানুজের মতে সাংখ্যযোগ শব্দে এখানে জ্ঞান-যোগকেই বুঝায়, (সাংখ্যেন যোগেন জ্ঞানযোগেন, রামানুজভাষ্য) মধুসূদন সরস্বতীর মতে সাংখ্য-যোগ শব্দে স্পষ্টতঃ বেদান্ত-বেদ্য বিবেক-জ্ঞানকে বুঝায়, (বেদান্তবাক্যবিচারজন্যেন চিন্তনেন, মধুসূদনকৃত টীকা) অষ্টাদশ অধ্যায়ে "সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি" বলিয়া যে সাংখ্য শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাতে শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট বাক্যে সাংখ্য শব্দে বেদান্তকে বুঝিয়াছেন, (সাংখ্যং বেদান্তঃ শং ভাষ্য)। কৃতান্ত শব্দ তাঁহার মতে বেদান্তেরই বিশেষণ, বেদান্ত জ্ঞান উদিত হইলে সমস্ত কর্ম্মের অন্ত হইয়া যায় বলিয়া বেদান্তকে 'কৃতান্ত' বলা হইয়া থাকে। মধুসূদন সরস্বতী এখানে শঙ্করাচার্য্যের অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী সাংখ্য শব্দের এখানে দুই রকম ভাবেই অর্থ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম অর্থ আচার্য্য শঙ্করেরই অনুরূপ অর্থাৎ সাংখ্য শব্দের অর্থ বেদান্ত। দ্বিতীয় অর্থে তিনি আভাসে সাংখ্য শব্দে সাংখ্য-শাস্ত্রকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেই শাস্ত্রে পদার্থের পরিগণনা ও নির্ণয় আছে, সেই সাংখ্যশাস্ত্রই শ্রীধর স্বামীর মতে এখানে সাংখ্য শব্দে বুঝাইয়া থাকে (১)। যে সকল মনীষী গীতোক্ত সাংখ্য শব্দের সাংখ্যশাস্ত্র অর্থ করিতে চাহেন, তাঁহারা হয় তো শ্রীধর স্বামীর অর্থই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন। আমরা এই মতের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি আছে বলিয়া মনে করি না। আমাদের মতে গীতায় সাংখ্য শব্দ ব্যাপক তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। গীতায় কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের কোন উল্লেখ নাই, প্রাচীন উপনিষদুক্ত সাংখ্যমতই গীতার উপজীব্য। গীতোক্ত সাংখ্যদর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেও আমাদের এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়া থাকে।

গীতোক্ত সাংখ্যমতের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাংখ্যদর্শনোক্ত অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল ভূত এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে (২) এবং এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যে সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, তাহাও আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—(তানি এতানি সাংখ্যাশ্চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বানি আচক্ষতে। শং ভাষ্য গীঃ ১৩।৫)। অব্যক্ত শব্দের অর্থ কি?

১। সাংখ্যং নাম ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যাঃ অহং তেভ্যোঽন্যঃ তদ্ব্যাপার সাক্ষীভূতঃনিত্যোগুণবিলক্ষণ আত্মেতি চিন্তনমেব সাংখ্যো যোগঃ। শং ভাষ্য ১৩।২৪

১। সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানং বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বানি অস্মিন্নিতি সাংখ্যম্ কৃতোঽন্তোনির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব। শ্রীধরকৃত টীকা ১৮।৩৩

২। মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ। গীঃ ১৩।৬

যাহা ব্যক্ত বা প্রকাশিত নহে, তাহাই অব্যক্ত—এইরূপ ব্যাপক অর্থ ধরিলে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কেই অব্যক্ত বলিয়া ধরা যায়। চরক-সংহিতায় যে প্রাচীন সাংখ্যমত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ ব্যাপক অর্থ করিয়া অব্যক্ত শব্দ দ্বারাই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে গ্রহণ করা হইয়াছে। গীতায় অব্যক্ত শব্দে জড়বর্গের মূল কারণ প্রকৃতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে, আবার প্রলয়ের তামসী নিশায় সমস্তই অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায় (১)। গীতার এই উক্তি হইতে অব্যক্ত শব্দে যে জগজ্জননী প্রকৃতিকেই বুঝায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া গীতায় স্বতন্ত্র ভাবে পুরুষেরও নিরূপণ করা হইয়াছে—'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।' গীঃ ১৩।২০। এই পুরুষের স্বরূপ সাংখ্য-দর্শনে যে ভাবে নিরূপিত হইয়াছে, গীতায়ও সেই ভাবেই উক্ত হইয়াছে। গীতা বলেন যে, এই পুরুষ নিগুর্ণ, নির্লেপ, নির্ব্বিকার, স্বয়ং অকর্ত্তা উদাসীন সাক্ষিমাত্র। অতএব দেহে সংযুক্ত থাকিয়াও এই পুরুষ কিছুই করেন না, নির্লিপ্তই থাকিয়া যান (২)। সাংখ্যদর্শনের মতেও পুরুষ অনাদি, সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্যময়, নিত্য, নিগুর্ণ, নিরঞ্জন, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, নিষ্কল ও অপরিণামী (৩)। সাংখ্যোক্ত এই পুরুষের বর্ণনায় লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পুরুষকে নিগুর্ণ নির্লেপ বলিয়া আবার ক্ষেত্রজ্ঞ, দ্রষ্টা, ভোক্তা বলা হইয়াছে। এইরূপ উক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ নহে কি? নিগুর্ণ হইলে ঐ পুরুষ আবার দ্রষ্টা, ভোক্তা হন কিরূপে? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন যে, কর্ত্তৃত্ব যেরূপ প্রকৃতির স্বাভাবিক, ভোক্তৃত্ব সেইরূপ পুরুষের স্বাভাবিক। পুরুষ নিগুর্ণ, ইহার তাৎপর্য্য এই, সত্ত্বরজঃ ও তমো গুণের কোন সম্বন্ধ পুরুষে থাকিতে পারে না এবং নাই; পুরুষকে নিগুর্ণ বলায় পুরুষের গুণসম্বন্ধই সাংখ্য-মতে নিবারিত হইয়াছে, পুরুষের ভোক্তৃত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। ক্রিয়া সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের ধর্ম্ম, পুরুষে সত্ত্বরজস্তমো গুণ নাই, সুতরাং ক্রিয়াসম্বন্ধও নাই, কর্ত্তৃত্বও নাই। পুরুষ স্বভাবতঃ অকর্ত্তা, মিথ্যা অভিমান বশতঃই সে নিজকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও ভোক্তা, (পুরুষঃ সর্ব্বদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। গীতা ১৩।২০) এই মত গীতাও অনুমোদন করিয়াছেন (১)। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ও নিত্য, পার্থক্য এই যে, প্রকৃতি পরিণামিনী, পুরুষ অপরিণামী, কূটস্থ ও নির্লেপ। প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা বলিয়াই সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চ এই প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত। প্রকৃতিই সমস্ত ক্রিয়াশক্তির মূল। দেহেন্দ্রিয়াদির সমস্ত কার্য্যও প্রকৃতি হইতেই স্ফুরিত হইয়া থাকে। "আমি সুখী," "আমি দুঃখী" এইরূপে যে সুখ-দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে, তাহা অচেতন প্রকৃতির সম্ভব নাই বলিয়া ভোগ পুরুষেরই বুঝিতে হইবে। এই সুখ-দুঃখের ভোগই তো সংসার। ঐ সুখ-দুঃখ ভোক্তৃরূপে পুরুষও সংসারের যাত্রাপথে হেতু এবং সংসারী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সমস্ত কার্য্য-বর্গ এবং ঐ কার্য্যবর্গের কারণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, প্রকৃতি হইতেই বিকাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রকৃতিকেই কার্য্যকারণ সমূহের কর্ত্রী বলা হইয়া থাকে। কার্য্য-কারণ সমূহের কর্ত্রীরূপেই প্রকৃতিকে সংসারের কারণ বলা হয়। প্রকৃতি-পরিণাম এই বিবিধ ভোগ্যবস্তুর যদি কেহ উপভোক্তা না থাকে, তবে সংসার চলে কিরূপে? ভোগই তো সংসার। ইহার উত্তরেই গীতায় ভোক্তৃরূপে পুরুষকেও সংসারের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (২)। অবিকারী নিত্য নিরঞ্জন পুরুষের সুখ-দুঃখের ভোগরূপ সংসার সম্ভব হয় কিরূপে? আর অপরিণামী অজ পুরুষ সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করিতে যাইবেনই বা কেন? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ

১। অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ গীঃ ৮।১৮

২। অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। গীতা ১৩।৩২

৩। অত্রাহ কঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে—পুরুষঃ অনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতশ্চেতনোঽগুণো নিত্যো দ্রষ্টা ভোক্তাঽকর্ত্তা ক্ষেত্রবিদমলোঽপ্রসবধর্ম্মী। তত্ত্বসমাসবৃত্তি।

১। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩।২৭
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ গীতা ১৩।৩০

২। কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সর্ব্বদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। গীতা ১৩।২১

ইহারা উভয়েই অজ, অনাদি এবং সর্ব্বব্যাপী। ব্যাপিনী প্রকৃতির সহিত সর্ব্বব্যাপী পুরুষের ঘনিষ্ঠ যোগ স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। এই অনাদি প্রকৃতি সংযোগ বশতঃই পুরুষ স্বীয় চিন্ময় রূপ বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির গুণ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। গীতাও এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, "পুরুষ প্রকৃতিতে উপগত হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণসমূহ উপভোগ করেন। গুণসঙ্গই পুরুষের বিবিধ যোনিতে জন্মলাভের হেতু হইয়া থাকে (১)।" গীতার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ যে নানা জন্ম, নানা যোনি পরিভ্রমণ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে ঘুরিয়া মরে, গুণসঙ্গ বা বাসনাই তাহার একমাত্র মূল। এই বাসনার মূল কি? প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংসর্গ, এবং তাহার ফলে প্রকৃতিতে পুরুষের তাদাত্ম্যাভিমানই বাসনার মূল নিদান। পুরুষের এই সংসর্গকেই গীতার ভাষায় বলা হইয়াছে—পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতির উপভোগ। এই উপভোগ যখন শান্ত হয়, কামনার দুর্জ্জয় বহ্নিশিখাও তখন নির্ব্বাপিত হয়। এই অবস্থায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়, আপনাকে সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে নির্লিপ্ত বলিয়া বুঝিতে পারে। ঐ নির্লিপ্ত পুরুষ কোন কার্য্য করিলেও সেখানে তাহার কোনরূপ ফলাভিসন্ধি বা অভিমান না থাকায় ঐ কর্ম্মের ফল সুখ, দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং যোনি-ভ্রমণের কারণ কর্ম্ম-বীজও সঞ্চিত হইতে পারে না। পুরুষের এই নির্লিপ্ত ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা বলিয়াছেন যে, দেহ সংযুক্ত হইয়াও পুরুষ কিছু করেনও না, কিছুতে লিপ্তও হন না—'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি না লিপ্যতে।' গীতা ১৩।৩২। "পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" পুরুষ সমস্ত বিকারপ্রবাহে পতিত হইয়াও অবিকারী, নির্লেপ এবং কূটস্থ। পুরুষের এইরূপ স্বরূপবিজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, এবং এই জ্ঞানই দুঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্টতম উপায়। ইহার ফলেই পুরুষ মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করে। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান বা বিভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত প্রকৃতি ও জ্ঞানময় পুরুষ এই তিনটি বিভিন্ন তত্ত্বের ভেদ জ্ঞান দৃঢ় হইলে পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতাতেও ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের, প্রকৃতি এবং পুরুষের পার্থক্যজ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম।' গীতা ১৩।৩। গীতার মতে যাঁহারা জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ দেখিতে পান, এবং ভূত সমূহের প্রকৃতি ও মোক্ষের স্বরূপ বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই পরমপদ বা নির্ব্বাণ লাভ করেন (১)। জ্ঞানই মুক্তির সাধক, এ কথা গীতা স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ কি? ইহাই বিচার্য্য। গীতা বলিয়াছেন যে, এই শরীরই ক্ষেত্র এবং এই শরীরকে যিনি জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। সুখ-দুঃখরূপ ফল যে ভূমিতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র এবং ঐ শরীররূপ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকিয়া যিনি "অহং" মম এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন, সুখ-দুঃখ ফল ভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। এইরূপ অর্থে ভোগায়তন শরীরই ক্ষেত্র, এবং জীবই ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। কিন্তু গীতায় পরবর্ত্তী শ্লোকেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মাদি-স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল বিশ্ব-শরীরেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। এইরূপে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। গীতার এই উক্তিতে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে, কেন না, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ব্যতীত নিখিল শরীর-জ্ঞান জীবের সম্ভব হয় না, জীব তাহার নিজ শরীরকেই জানিতে পারে, পরের শরীরকে জানিবে কিরূপে? ক্ষেত্রজ্ঞং 'চ' এই চ-কার দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রও যে ভগবানেরই রূপ, ইহাই বুঝা যাইতেছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম ও পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকৃত, সুতরাং গীতার মতে পরমেশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলায় কোন বাধা নাই। কপিলকৃত সাংখ্য-শাস্ত্রে পরমেশ্বর স্বীকৃত হন নাই, বরং প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছেন। এই অবস্থায় কপিলানুমোদিত সাংখ্য-মতানুসারে ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিবার উপায় নাই, জীবই ক্ষেত্রজ্ঞ।

১। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু। গীতা ১৩।২২

১। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।
গীতা ১৩।৩৫

এই ক্ষেত্রজ্ঞ জীব প্রতি শরীরে বিভিন্ন। সাংখ্যদর্শন বহু পুরুষবাদ স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু এবং প্রত্যেক পুরুষই বিশ্বব্যাপী। এই বিশ্বব্যাপী অসংখ্য পুরুষের কল্পনা সকল সাংখ্যকারই সমর্থন করেন, তবে গৌড়পাদ তাঁহার ভাষ্যের এক স্থলে "পুমানপ্যেকঃ" বলিয়া অজ্ঞাত ভাবে এক-পুরুষবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন সত্য, তবে তাহা বর্ত্তমান সাংখ্যসিদ্ধান্ত নহে। হয় তো প্রাচীন সাংখ্যে প্রকৃতিও যেমন এক, পুরুষও সেইরূপ এক বলিয়াই মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। গীতোক্ত সাংখ্যমতেও এক-পুরুষবাদই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। গীতা পুরুষের বহুত্ব মানেন না। গীতা বলেন যে, একমাত্র সূর্য্য যেমন নিখিল বিশ্বকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ এক মাত্র পুরুষই সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে (১)। গীতার মতে ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজিত : এই অংশে গীতোক্ত সাংখ্য-মতের সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত কপিল-সাংখ্যমতের পার্থক্য সুস্পষ্ট, কেন না, সাংখ্যেরা এখানে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বলিতে ঈশ্বর বুঝেন না, জীব বুঝেন। জীব ও প্রকৃতি এই উভয়ের সংযোগে যে জৈব সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়, এখানে জীব যেমন ব্যষ্টিজীব, প্রকৃতিও সেইরূপ সমষ্টি প্রকৃতি নহে, অখণ্ড প্রকৃতির এক ভগ্নাংশ মাত্র। ব্যষ্টিজীব যখন বিবেক-জ্ঞান লাভ করে, তখন প্রকৃতির ঐ ভগ্নাংশেরই পরিণাম নিরুদ্ধ হয়, সমষ্টি প্রকৃতি বা অখণ্ড প্রকৃতির পরিণাম অক্ষুণ্ণই থাকে। এক অখণ্ড প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগের ফলে এই যে নিখিল বিশ্ব রচনা চলিতেছে, এখানে পুরুষ বলিতে সমষ্টি পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভকেই বুঝায়। এই হিরণ্যগর্ভই পুরুষোত্তম। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ঈশ্বর-বাদে সমুজ্জ্বল। পরমেশ্বরের বীক্ষণের ফলেই সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া প্রকৃতি-পরিণাম এই বিশ্বনাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন—"আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করিতেছে (২)।" পরমেশ্বরের এই অধ্যক্ষতা বা অধিষ্ঠানই প্রকৃতিতে পুরুষের গর্ভাধান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—প্রকৃতিতে আমি যে গর্ভ-আধান করি, তাহার ফলেই সমস্ত ভূত-জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। জগতে যে কিছু মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রকৃতিই তাহার যোনি, আর 'আমি তাহার বীজপ্রদ পিতা (১)। এই অব্যক্ত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকেই বলা হইয়াছে, ভগবানের দুরতিক্রমণীয় মায়া—'মম মায়া দুরত্যয়া।' এই প্রকৃতিই বিশ্বযোনি মহাশক্তি। ঈশ্বরের অধ্যক্ষতায় জগজ্জননী প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এ বিষয়ে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত গীতার সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সাংখ্যকারের মতে প্রকৃতি এই জগৎ সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। প্রকৃতি স্বভাবতঃ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদনের জন্য জগদাকারে পরিণত হইয়া থাকে। অচেতন প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন, "দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃই দধিরূপে পরিণত হয় : বৎসের পোষণের জন্য যেমন মাতৃস্তনে অচেতন দুগ্ধের ধারা প্রবাহিত হয় ; অচেতন জল যেমন লোকের উপকার সাধন করিবার জন্য বাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিও পুরুষের মোক্ষ-সাধনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।" চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই প্রকৃতির মহদাদিরূপে পরিণাম সিদ্ধ হয় (২)। প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃ-সিদ্ধ, এই সাংখ্যমত গীতা অনুমোদন করেন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এখানে গীতার মত ও সাংখ্যমত

১। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ গীতা।

২। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে ॥ গী ৯।১০

১। মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ গীতা ১৪।৩
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা। ১৪।৪

২। অচেতনস্যাপি প্রধানস্য প্রয়োজনবশেন প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। দৃষ্টঞ্চ অচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং পুরুষার্থায় প্রবর্ত্তমানং যথা বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থমচেতনং ক্ষীরং প্রবর্ত্ততে, যথা জলমচেতনং লোকোপকারায় প্রবর্ত্ততে, তথা, প্রকৃতিরচেতনাপি পুরুষবিমোক্ষায় প্রবৎস্যতি, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ সাংখ্যদর্শন।

যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তর নিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্যতে ব্রঃ সূঃ শাং ভাষ্য ২।২।৩—৫

তুলনা করিলে গীতার মতই যে উৎকৃষ্ট, তাহা প্রতিভাত হইবে। বাস্তবিকই কি অচেতন প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ পরিণাম সম্ভব? এখানে স্বতঃসিদ্ধ কথার অর্থ কি? প্রকৃতি তাহার পরিণামে কোনরূপ কারণই অপেক্ষা করে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা গেলে প্রকৃতির পরিণামকে স্বতঃসিদ্ধ বলা যায়। ইহাই কি সাংখ্যসিদ্ধান্ত? প্রকৃতির পরিণামের উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ এবং ঐ পরিণামের কারণ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ। চুম্বক যেমন নিজে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত না হইয়াও স্বীয় উপস্থিতি দ্বারাই লোহা আকর্ষণ করে, সেইরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষও নিজ সান্নিধ্য দ্বারা প্রকৃতির পরিণাম সাধন করেন। ইহাই প্রচলিত সাংখ্যসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বিচার করিলে প্রকৃতি পরিণামকে স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় কেমন করিয়া? তার পর, সৃষ্টির প্রতি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি যেমন উপাদান কারণ, সেইরূপ জীবের কর্ম্ম, অদৃষ্ট প্রভৃতিও যে নিমিত্ত কারণ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বিজ্ঞান ভিক্ষু তদীয় সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যে কর্ম্ম যে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। কর্ম্ম গুণময়ী সৃষ্টির উপাদান কারণ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতি অনাদি সমষ্টিজীবের কর্ম্ম যে নিমিত্ত কারণ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সৃষ্টির উদার প্রকৃতির ক্ষোভ বা পরিণাম হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা সৃষ্টির প্রতি কালও যে অন্যতম কারণ, তাহা বুঝা যায় (১)। সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্ত কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যসূত্রে (২।২৯) রাগ বা তৃষ্ণাকে সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্ত কারণ বলা হইয়াছে। এই তৃষ্ণাই কাম বা অবিবেক, ইহাই সৃষ্টির কারণ, ইহা প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য পঞ্চশিখও স্বীকার করিয়াছেন—"অবিবেকনিমিত্ত ইতি পঞ্চশিখঃ।" পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহারই ফলে সৃষ্টি হয়। "যেমন স্ত্রী-পুরুষের সহযোগে পুত্র উৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের সহযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে (১)।" উপরে প্রদর্শিত সাংখ্যমত আলোচনা করিলে প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহাই প্রমাণিত হয়। শঙ্করাচার্য্য তদীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" ইত্যাদি সূত্রে) প্রগাঢ় যুক্তির সাহায্যে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ পরিণামবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা এখানে প্রবন্ধবিস্তারের ভয়ে শঙ্করাচার্য্যের যুক্তির আলোচনা করিলাম না। অচেতন প্রকৃতি, চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে, এই ব্রহ্মসূত্রসিদ্ধান্তই "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" এই গীতা-বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমরাও ইহাই গীতোক্ত সাংখ্য-সৃষ্টির সিদ্ধান্ত বলিয়া পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই গীতোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনিই উপনিষদ্, ভাগবত প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান জন্য, এ কথা গীতার ন্যায় স্পষ্ট বাক্যে ভাগবতও স্বীকার করিয়াছেন। "কাল উপস্থিত হইলে পরম পুরুষ পরমাত্মা গুণময়ী মায়াতে পুরুষরূপে বীর্য্য আধান করিলেন, ফলে মহত্তত্ত্ব আবির্ভূত হইল (২)।" উপনিষদও ইহার অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি বা মায়ার সংস্পর্শে আসিলেই পুরুষের সিসৃক্ষা বা সৃজনী বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে এবং ঐ সৃজনী বৃত্তিবশতঃই পুরুষ নিজকে প্রকৃতির অধ্যক্ষতায় বহু নামে এবং বহু রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরম পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে বা জীবনীশক্তিরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন (৩)। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতিও সত্য, প্রকৃতি কার্য্য জগৎও সত্য, কার্য্যও সত্য, কারণও সত্য। মাটি হইতে যে ঘটের উৎপত্তি হয়, এখানে নূতন ঘট জন্মে না, ঘট

১। ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ সাংখ্যসূত্র ৩।১০। অত্র বিশেষ বচনাৎ সমষ্টি সৃষ্টিজীবানাং সাধারণৈঃ কর্ম্মভির্ভবতীত্যায়াতম্। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

কর্ম্মাকৃষ্টের্বানাদিতঃ সাঃ সূঃ ৩।৬২। যতঃ কর্ম্মানাদি অতঃ কর্ম্মভিরাকর্ষণাদপি প্রধানস্যাবশ্যকী ব্যবস্থিতা চ প্রবৃত্তিঃ। বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্য।

১। যথা স্ত্রীপুরুষসংযোগাৎ সুতোৎপত্তিস্তথা প্রধান পুরুষসংযোগাৎ সর্গস্য উৎপত্তিঃ। গৌড়পাদ ভাষ্য-কারিকা ২১।

২। কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্। ততোঽভবৎ মহত্তত্ত্বম্। ভাগবত ৩।৫।২৬

৩। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তৈত্তিরীয় ২।৬।১ অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি, ছান্দোগ্য ৬।৩।২

সূক্ষ্মরূপে মাটিতেই অবস্থিত ছিল, ঐ সূক্ষ্মরূপে কারণ-শরীরে বিদ্যমান ঘটের বর্ত্তমান স্থূল আকারে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইয়া থাকে মাত্র। অবিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না। অসৎ আকাশ-কুসুম কোন দিনই হয় নাই, হইবে না। যাহা সৎ, তাহা চিরদিন আছে এবং থাকিবে, ইহাই সাংখ্যোক্ত সৎকার্য্যবাদের মূল রহস্য। গীতা এই সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সদ্ বস্তুরও বিনাশ নাই, 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' ২।১৬। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এই উৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎই ছিল—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' ছাঃ ৬।১।১।

গীতা সাংখ্যোক্ত সদ্‌বাদ সমর্থন করিলেও সাংখ্যোক্ত দ্বৈতবাদ বা প্রকৃতি-পুরুষবাদই চরম তত্ত্ব, এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নাই। প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুই-ই সত্য, অজ ও নিত্য। এই দ্বৈতবাদই সাংখ্য-দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত। এই উভয়ের সমন্বয়ে যে এক অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার কোন আভাস নাই, কিন্তু গীতায় প্রকৃতি ও পুরুষ এই মহাদ্বৈতের অদ্বৈতে পর্য্যবসানই ধ্বনিত হইতেছে। গীতার মতে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ও পুরুষ বা জীব ভগবানেরই দ্বিবিধ বিভাব মাত্র। গীতায় প্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমার প্রকৃতি দুই প্রকার—পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটি আমার অপরা প্রকৃতি; এতদ্‌ব্যতীত জীব আমার পরা প্রকৃতি। জীব জগতের জীবন। জগতে অন্তঃপ্রবিষ্ট এই জীবরূপ পরা প্রকৃতিই জগৎ ধারণ করিয়া আছে। আমার এই জড় ও চেতন প্রকৃতি হইতেই সমস্ত ভূত-জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়নিদান, আমিই চরম তত্ত্ব, আমার উপরে আর কিছু তত্ত্ব নাই। মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই নিখিল বিশ্বই আমাতে অনুস্যূত রহিয়াছে (১)।

গীতার এই উক্তি অতি স্পষ্ট। ইহা হইতে জড়-প্রকৃতি ও জীব যে গীতার মতে ভগবানেরই বিভাব বা প্রকার-ভেদ (aspect), তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এই জড়-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতিকে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের ঊর্দ্ধে অবস্থিত এক পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তমের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ পুরুষোত্তমই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। ক্ষর ও অক্ষরের অতীত উত্তম তত্ত্ব বলিয়া উঁহাকে বলা হয় পুরুষোত্তম (১)। গীতার এই ক্ষর, অক্ষর পুরুষতত্ত্ব আলোচনা করিলে মনে হয় যে, চরাচর জগতে সর্ব্বত্র একপুরুষ-দৃষ্টিই গীতার যথার্থ রহস্য; এই রহস্য ব্যক্ত করিবার জন্যই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি সমস্ত ক্ষীয়মাণ জড়-প্রকৃতিকেই ক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে, আর, দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া দেহাদির বিকার যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেই জীবপ্রকৃতিকে অক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে (দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকার-তয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স ত্বক্ষর পুরুষ উচ্যতে বিবেকিভিঃ শ্রীধর-টীকা ১৫।১৬) এই ক্ষর প্রকৃতি বা অপরা প্রকৃতি, অক্ষর প্রকৃতি বা জীবপ্রকৃতি যাহার বিভাব, যিনি ক্ষর জগৎ ও অক্ষর পুরুষ বা জীবের অন্তরে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে শাসন করেন, যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর বা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব যাহার অবিশুদ্ধ রূপ সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মাই চরম তত্ত্ব। এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

১। ভূমিরাপোঽনলং বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়—।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।
মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিৎ নান্যদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। গীতা ৭।৫—৭

১। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।
যস্মাৎ ক্ষরাদতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
গীতা ১৫।১৬—১৮

শ্রুতিও গীতোক্ত পুরুষোত্তমবাদেরই সমর্থন করিয়া পরম পুরুষকে "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি," প্রধান-পুরুষেশ্বর প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া বলিয়াছেন যে, এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাই ক্ষর প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে শাসন করেন। এক অদ্বিতীয় দেবতাই উভয়ের প্রভু। এইরূপে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ এই মহাদ্বৈতের অদ্বৈতে পর্য্যবসান প্রদর্শন করাই গীতোক্ত সাংখ্য-রহস্য বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। গীতা এই দ্বৈতবাদকে চরম ও স্বতন্ত্র তত্ত্ব না বলিয়া পুরুষোত্তম পরতন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করায় দ্বৈতসাংখ্য ও অদ্বৈত-বেদান্তের সমন্বয় দৃষ্টিই গীতায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী (অধ্যাপক, এম-এ, পি, আর, এস্, পি, এইচ্, ডি, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)।

ব্যথার পূরবী

আজি দিনান্তে, পথের প্রান্তে, খুলি' জীবনের খাতা
একে একে তা'র, দেখি বার বার উনষাটখানি পাতা।
কিছু নাহি বুঝি, সব হিজি-বিজি, কালি-ঢালা আগা-গোড়া।
রংয়ের বাহার নাহিক তাহার, নহে তা' সোনায় মোড়া।
জানি নাক' কবে, খুলিল কি ভাবে, প্রথম পাতাটি তা'র;
শুধু মনে পড়ে, মাথার উপরে নিবিড় মেঘের ভার!
চির-শ্রাবণের আকাশে আমার শুধুই ঝরেছে ধারা।
কভু মধুমাস আসিয়া আমার দুয়ারে দেয়নি সাড়া।
কভু শরতের সোনালী আভাস তোলেনি হৃদয়ে ঢেউ;
ভুলাইতে ব্যথা, দু'টা ভাল কথা ভুলেও কহেনি কেউ।

সব-চেয়ে-বড় আপনার যা'রা আমারে ঘিরিয়া আছে,
সব-চেয়ে-বড় আঘাত আমারে তাহারাই হানিয়াছে!
যাহাদের তরে দিনু অকাতরে আপনারে বলিদান,
বিনিময়ে তা'রা দেয় মোরে শুধু জ্বালা আর অপমান।
ঘরে ও বাহিরে, যা'দের আদরে টানিয়াছি এই বুকে,
তারা'ই দিতেছে কঠিন আঘাত, তা'রাই আসিছে রুখে!
খর রবিতাপে পুড়ে যায় দেহ, ছুটে যাই দেখি ছায়া;
অমনি সে-ছায়া যায় যে সরিয়া, বুঝি তাহা মরু-মায়া!
যা'দের চাহিয়া নিজেরে ভুলেছি, চাহি নাই নিজ-পানে,
অশ্রু যা'দের দিয়াছি মুছা'য়ে, তা'রাই ভ্রূকুটি হানে!
কত যে সহেছি, কত সহিতেছি, কি আর কহিব আমি;
অন্তর-তলে যে আগুন জ্বলে, জানে অন্তরযামী।
লক্ষ্মীর কৃপা হারা'নু হেলায় ভারতীর পদ সেবি;
লক্ষ্মীছাড়ার পূজায় এদিকে প্রীত ন'ন বাগ্দেবী।
তটিনীর কূল ভাঙ্গে এক পারে, আর পারে গ'ড়ে ওঠে;
আমার কপালে ধরিল ভাঙ্গন দুই কূলে একজোটে!
কোন সঞ্চয় হোলো নাক' তাই, এক কড়া নাহি পুণ্য;
দিন গেল কাটি; কাঁধের ঝুলিটি র'য়ে গেল হায় শূন্য!
দুঃখের পুঁথি কেটেছে পোকায়, পাতাগুলি পড়ে খ'সে;
আজি অবেলায়, শতেক জ্বালায়, তা'ই নিয়ে আছি ব'সে।
ভাঙ্গা-চোরা দেহ, না আছে পাথেয়, সন্ধ্যা নামিয়া আসে।
কি করিয়া যা'ব বাকী পথটুকু ভাবিতেছি মহাত্রাসে!
যা'রা চ'লে যায়, তা'রা না তাকায়, একাকী পড়িয়া থাকি।
পারের পারানি নাহিক যাহার, কে নেবে তাহারে ডাকি!
কেহ নাহি মোর, কিছু নাহি মোর, বৃথা দিন গেল কাটি;
শূন্য ঝুলিটি বারে বারে হায় মিছা-মিছি শুধু ঘাঁটি!
হোয়েছে ভালই মোর কিছু নাই—সুখ-সম্পদ কোন।
খেয়া-ঘাটে গিয়া বলিব ডাকিয়া—পাটনি গো, শোন—শোন,
নাহি মোট-ঘাট, কোন ঝঞ্ঝাট, এতটুকু ঠাঁই দাও।
তরীতে তোমার লাগিবে না ভার, তুলে নাও—তুলে নাও।
তোমার খাতাটি দেখ যদি খুলে আমার হিসাব নিয়া,
দেখিবে গো স্বামী, সত্যই আমি অতি-বড় দেউলিয়া।
তবু যদি প্রভু, উঠে থাকে কভু, 'জমা' মোর এক 'পাই,'
সেই মূলধনে দাও গো চরণে—দাও এক রতি ঠাঁই।
ধরণীর ধূলা এসেছি মুছিয়া, তরণীতে পাছে লাগে।
তুলে নাও প্রভু, তুলে নাও মোরে, বড় ভয় প্রাণে জাগে।
মানবের বেশে দানবের দল ঘিরেছে আমায় আজ।
মরণ দানিয়া বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও হৃদয়-রাজ!

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।



৬

পরদিন প্রত্যূষেই তাঁহাদের জাহাজ বোম্বাই বন্দরে উপনীত হইলে সকলেই তীরে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুনীল মিষ্টার সিংহের আসবাব-পত্র সংগ্রহ করিয়া নিজের লগেজগুলির সঙ্গেই জাহাজ হইতে নামাইবার ব্যবস্থা করিল। তাহার পর শেলীকে সাহায্য করিতে চলিল; কিন্তু এ জন্য তাহার আগ্রহ-প্রকাশ নিষ্ফল হইল; কারণ, সে জানিতে পারিল, মিস্ মিত্র গ্রেহাম-দম্পতির সহিত পূর্ব্বেই নামিয়া গিয়াছে। অতঃপর সুনীল মিঃ সিংহকে সঙ্গে লইয়া শুল্ক-আফিসের গোলমাল চুকাইতে গেল। সেই অবসরে মিসেস্ সিংহ নিনা সহ শুল্ক-আফিসের বাহিরে আসিতেই শেফালীকে কিছু দূরে দেখিতে পাইলেন। নিনা তাহার সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া বলিল, "না ব'লে-ক'য়ে চুপে চুপে স'রে পড়াটা কোন্ দেশী ভদ্রতা? তোমার গাড়ী তো আমাদের গাড়ীর অনেক পরেই ছাড়্বে; তবে এত ব্যস্ত হওয়ার কারণ কি?"

শেলী মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, ব্যস্ত আর তেমন কি? জিনিস-পত্রগুলো নামিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা ক'রতে একটু আগেই আস্তে হ'য়েছিল। তা সে সব শেষ ক'রে আমি কি তোমাদের কাছে বিদায় না নিয়েই চ'লে যেতুম ভাই!"

নিনা কিন্তু তখনই শেফালীর নিকট হইতে তাহার আগ্রার ঠিকানাটি সংগ্রহ করিল। শেলীদের ট্যাক্সি ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইল। মিষ্টার সিংহ ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট শেলী পূর্ব্বরাত্রেই বিদায় লইয়াছিল; নিনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে আর তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে গেল না।

মাল-পত্র লইয়া সুনীল ও মিষ্টার সিংহ যথাসময়ে বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে সিংহ-পরিবারের জিনিস-পত্র গুছাইয়া দিয়া সুনীল নতমস্তকে মিঃ সিংহ ও তাঁহার পত্নীর পদস্পর্শ করিতেই মিষ্টার সিংহ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে না সুনীল?"

সুনীল নতমুখেই বলিল, "আজ্ঞে, আমি সোজা আমার কর্ম্মস্থানেই যাচ্ছি।"

মিঃ সিংহ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা কি সম্ভব হ'তে পারে? কত দিন পরে দেশে ফির্লে, আর মা-বাপের সঙ্গে দেখাটাও ক'র্বে না? তা'-ছাড়া, তোমার ওপর মস্ত একটা জরুরী সমস্যার মীমাংসার ভার আছে যে!"

তাঁহার অবশিষ্ট কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিনা অন্য দিক্ হইতে আসিয়া সুনীলের হাত ধরিয়া তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া গেল। সুনীল নিষ্কৃতি পাইয়া স্বস্তি বোধ করিল। যখন তাহারা সেখানে ফিরিয়া আসিল, তখন অন্য কোন কথার আলোচনার সময় ছিল না।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে মিষ্টার সিংহ বিচলিত স্বরে স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমার কথায় নির্ভর ক'রে বড়ই মুস্কিলে পড়লুম দেখ্ছি! তুমি তো এত কাল ধ'রে 'সুনীল—সুনীল' ক'রেই পাগল! কিন্তু দেখ্লে একবার তার কাণ্ডকারখানা?"

এই সময় নিনা সমস্ত ট্রেণখানা ঘুরিয়া দেখিবার জন্য সেই কামরা হইতে নামিয়া গেল। মিষ্টার সিংহ সেই সুযোগে বলিলেন, "ভাগ্যি রক্ষে যে, নিনাকে কোনও কথা এ পর্য্যন্ত বলা হয়নি।"

মিসেস্ সিংহ স্বামীকে কি উত্তর দিবেন, তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া

মিঃ সিংহ ঘা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওদের ও-ভাবে মেলামেশা করতে দিয়ে কি লাভ হ'ল ? এত দিন মেয়েটার বিয়ে না দিয়ে কেবল বৃথা আশায় থেকে সময় নষ্ট হ'ল অনেক ! বেলার যে বিয়ে দিয়েছি, পুরানো প্রথানুসারে কম বয়সে তার বিয়ে হ'য়েছে, তাতে সে কি অসুখী ? মিছি-মিছি নিনাকে এত বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো রেখে, তার মাথার ভেতর কতকগুলা উদ্ভট আধুনিক ধারণা ঢুকিয়ে দিয়ে—তার মস্তকটি বেশ পরিপাটিরূপেই চর্ব্বণ ক'রলে ! তুমি নিজেও কি অসুখী হ'য়েছ ? আমাদের উদ্বন্ধন তো সেই সনাতন চালেই সম্পন্ন হ'য়েছিল !"

মিসেস্ সিংহ স্বামীর সকল অভিযোগ নীরবেই শুনিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেবের জেরা শেষ হইলে ব্যারিষ্টার-গৃহিণী সংযত স্বরে বলিলেন, "দেখ, অত উত্তেজিত হ'য়ো না। হিন্দুর মেয়ে আমি, বিধিলিপি মানি ; ভাগ্যে যা আছে হবে, কলকাতায় ফিরে যা' ভাল মনে হয়—কো'র। আমার তো বিশ্বাস, দত্ত সাহেবকে বল্লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। সুনীল ও নিনায় তো বেশ ভাব হ'য়েছে, দেখা গেল। আমার মনে হয়, সুনীল তার বাবার কথা অগ্রাহ্য করবে না।"

মিষ্টার সিংহ কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাভরেই বলিলেন, "তুমি এ সব বিষয়ে নেহাৎ আনাড়ি ! মানুষের চরিত্র বুঝবার শক্তি তোমার নেই। সুনীল নিনাকে ভালবাসে সত্য, কিন্তু সে ভালবাসায় প্রণয়ের লেশমাত্র নাই ; নিনাকে ও ছোট বোনের মতো স্নেহ করে। সেই জন্যই মনে হচ্ছে, সে নিনাকে কিছুতেই বিয়ে করবে না। আরও মনে হয়—সুনীল আকৃষ্ট হ'য়েছে ঐ মিস্ মিত্রের প্রতি। মেয়েটি সব দিক্ দিয়েই শ্রেষ্ঠ ; তার সঙ্গে নিনার তুলনা করতে যাওয়া ভুল—তা সে যতই শিক্ষা পাক, আর রুচি তার যতই 'রিফাইণ্ড' হোক !"

মিসেস্ সিংহ উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, "রেখে দাও ও-সব ফাল্‌তো কথা ! আমার নিনা কিসে ঐ মেয়েটার চেয়ে কম, শুনি ? শেলীর অকাল গাম্ভীর্য্যে তা'র মুখের সব লাবণ্য লোপ পেয়েছে, আর আমার নিনার সদাই হাসিমুখ ! সে মুখ দেখে—যার চোখ আছে, সেই মুগ্ধ হয়। দেখনি, জাহাজে যুবকরা সকলে নিনার সঙ্গেই মিশতে চাইত ; শেলীর দিকে কেউ ঘেঁসতো কি ?"

মিষ্টার সিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "শেলীর কাছে একটু উৎসাহ পেলেই দেখতে প্রত্যেক যুবকই ওর দিকে ছুটতো। শেলীকে হঠাৎ বুঝতে পারা যায় না ; যা'ক, সে তর্কে আর কাজ নেই। ভেবে-চিন্তে যা' হোক করা যাবে এর পর।"

সুনীলকে রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আগ্রাগামী ট্রেণে উঠিতে দেখিয়া গ্রেহাম-দম্পতি যত বিস্মিত হইলেন, শেফালীকে ততোধিক বিস্মিত হইতে হইল। শেফালী শুনিয়াছিল—সুনীল তাহার কর্ম্মস্থান টুণ্ডলায় যাইবে ; কিন্তু সে যে সেই ট্রেণেই যাইবে পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও শেফালী ইহা ধারণা করিতে পারে নাই। একবার তাহার মনে হইল, সুনীলের সঙ্গে এক ট্রেণে না যাইলেই সে ভাল করিত ; বিদায়ের পালা সে তো পূর্ব্বেই শেষ করিয়াছিল। সেই বেদনাটাকে আর নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিতে তাহার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তাহার হৃদয় কি এক অব্যক্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইল ; ইহার কারণ তো তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

পথে যাহাতে গ্রেহাম-দম্পতির ও শেফালীর স্বাচ্ছন্দ্যের বিন্দুমাত্র অভাব না হয় সুনীল সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিল। বড় বড় ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে সে তাঁহাদের কামরায় উঠিয়া সংবাদ লইতে লাগিল ; খবর লইতে, এবং মধ্যে মধ্যে সরস গল্পে তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে তাহার যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষিত হইল।

ট্রেণ আগ্রা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইলে সুনীলই সহযাত্রিগণকে নামাইয়া-লইবার সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিল।

রমাপ্রসাদবাবু ও তাঁহার পুত্রকে সে কোন কাজে হাত দিতে দিল না। বিদায় গ্রহণের সময় সুনীলের কাতর নয়নে কত কথাই ফুটিয়া উঠিল ; কিন্তু কম্পিত ওষ্ঠে কিছুই ব্যক্ত হইল না। মিসেস্ গ্রেহাম রমাপ্রসাদবাবুর নিকট 'মিষ্টার দত্ত' বলিয়া সুনীলের পরিচয় দিলেন, এবং তাহার শিষ্টাচারের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। পরে ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার সময় রমাপ্রসাদবাবুকে কথায় কথায় বলিলেন,—"He is a very nice young man. Don't be surprised if you find him carrying away your girl some day."—কথাগুলি শুনিয়া

রমাপ্রসাদবাবুর মনে আতঙ্ক হইলেও কোন মন্তব্যই তিনি প্রকাশ করিলেন না; এবং শেফালীর সহিত সুনীলের আর যে দেখা হইবে—তাহা সম্ভব বলিয়াও তাঁহার মনে হইল না।

শেফালী আগ্রায় কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া রমাপ্রসাদবাবুকে বলিল, "এইবার আমি কনকপুর যাব, তবে এলাহাবাদে দাদার কাছে দিন পনের থেকে যাব। কনকপুরের হাসপাতাল আর গরীবদের ভার আমাকেই নিতে হবে। কনকপুরের সব আমাকেই দেখাশুনা করতে হবে দেখ্‌ছি,—দাদা তো তাঁর বৈজ্ঞানিক-গবেষণাতেই বিভোর, অন্য কোন কাজ দেখ্‌তে পারেন না;—কিন্তু সব ভার পরের উপর তো ফেলে রাখা চলে না। আমাদের দাদামণির কীর্ত্তিগুলি সবই যাতে বজায় থাকে, সে বিষয়ে আমাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে।"

রমাপ্রসাদবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমার কথাগুলি সঙ্গত বটে, কিন্তু তোমার মত তরুণীকে একা সেখানে পাঠাই কি ক'রে? আর সন্তোষ তো ও-প্রস্তাব কাণেই তুল্‌বে না। তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথাই হ'য়েছে। তোমার অভিপ্রায় তো জান্‌তুম; তাই গরমের সময় সন্তোষ আর আমি দু' মাস কনকপুরে থেকে সব দেখে-শুনে এসেছি। গ্রামের লোকগুলি তেমন সোজা নয়; তোমার সেখানে একা থাকা চল্‌বে না। তবে তোমার পিসিমা যদি তোমার কাছে থাকেন, তা' হলে কাজ চ'ল্‌তেও পারে।"

শেফালী ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "জ্যাঠামশায়, আপনি বল্‌ছেন কি? আপনারা এত কষ্ট ক'রে যে আমায় শিক্ষা দিলেন, সবই কি বৃথা হবে? বিলেত পর্য্যন্ত ঘুরে এলাম; আর নিজের দেশে এত বয়সেও নিজেকে সাম্‌লে চলা আমার অসাধ্য হবে? নিজের উপর এতখানি অবিশ্বাস আমার নেই।"

রমাপ্রসাদ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মা, তুমি পল্লী-সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জান না। পরচর্চ্চা ভিন্ন পল্লীগ্রামের লোকের যেন আর কোনও আলোচনার বিষয় নেই; কেবল পরের কথার আলোচনা আর দলাদলি তাদের সময় কাটাবার উপলক্ষ। বিশেষতঃ, পাড়াগেঁয়ে-মেয়েরা পরনিন্দা পেলে তার আলোচনাতেই আসর জমকায়, তেমন মিষ্টি আর কিছুই নয়! গ্রামে শিক্ষার প্রচারও যেমন কম, তার আদরেরও তেমনই অভাব।"

শেফালী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না জ্যেঠামশায়, গ্রামের লোক এ-কালে আর সে রকম নেই; কনকপুরের সকলেই আমাকে খুব ভালবাসে।"

রমাপ্রসাদ অবিশ্বাসভরে বলিলেন, "আমিও পাড়া-গাঁয়ের ছেলে মা! ভেবো না যে, পাড়াগাঁয়ের লোকের নিন্দায় আমি আনন্দ পাই। আমি অবসর পেলেই এখনও নিজের গ্রামে যাই। এই জন্যই গ্রামের জন-সাধারণের মনের সঙ্কীর্ণতার কথা ভালই জানি। তাদের গুণ অনেক; যাদের তারা আপনার জন মনে করে, তাদের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু যদি তাদের মনের মত না হও, তবে তারা নানা রকমে তোমার অনিষ্ট করবে, দুর্নাম প্রচার ত সামান্য বিষয়! দোষ-ত্রুটি পেলেই তা নিয়ে আন্দোলন করা, আর আত্মনির্ভরশীল তেজস্বী ব্যক্তিকে অপদস্থ ক'রেই তাদের আনন্দ!"

শেফালী তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া বলিল, "আমি তো কোনও অন্যায় কাজ করিনি, এবং ভবিষ্যতেও করব না—তখন আর আমার ভয় কি?"

রমাপ্রসাদ তথাপি বলিলেন, "তুমি তা বুঝতে পারবে না মা! আমরা যে ভাবে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করি, তারা ঠিক সে ভাবে তার বিচার করে না। তুমি বিলেত থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে এসেছ, এ শিক্ষা আমরা ভাল বলি, প্রশংসা করি; কিন্তু তারা বল্‌বে, স্ত্রীলোকের পক্ষে এ ভয়ানক লজ্জার বিষয়, ভয়ঙ্কর বেহায়াপনা! তুমি আর্ত্তের সেবার জন্য এত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছ; তা'ও নিন্দনীয় ব'লে তাদের মনে হ'তে পারে। অবশ্য, অন্তরে তারা স্বীকার করবে যে, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু মন্দ লোকের সংখ্যাই বেশী, তাদের দলে মিশে সকলেই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। মেয়েমানুষের বিলেতে যাওয়া, ডাক্তার হ'য়ে আসা, তারা এ সকলের সমর্থন কর্‌বে না; এমন কি, তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করাও তাদের অসাধ্য হবে না।"

শেফালী দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল, "আমার পল্লীবাসীদের অত হীন মনে করতে পারছিনি; আমাকে যে তারা সকলেই বড় ভালবাসে!"

রমাপ্রসাদ এ কথা শুনিয়াও নিরস্ত না হইয়া বলিলেন, “সে দিন কি আর আছে মা? তুমি তো জান, তোমার বিয়ে নিয়ে গ্রামে সে সময় কি রকম ঘোঁট হ’য়েছিল! তোমার দাদামণির ছিল—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; তাঁর সাহস, পরাক্রম ছিল সিংহের মত; তুলনায় আর সকলে ছিল যেন শেয়ালের দল! যত দিন তিনি ছিলেন, কেউ কোনও কথা বল্‌তে সাহস ক’রেনি। এখন ও-অঞ্চলের পল্লী-সমাজের মোড়ল হ’য়েছে রণেন্দ্র; তোমাদের সম্বন্ধে তা’র মনোভাব তো তোমার অজ্ঞাত নয়।—আর যা’র জোর বেশী, দেশের লোক তাকেই ভয় করে, তারই আদেশ পালন করে।”

শেফালী বিস্মিত ভাবে বলিল, “রণেন্দ্র দাদা কর্ত্তা হ’ল কি ক’রে? জ্ঞানেন্দ্র কাকা কি তবে বেঁচে নেই?”

রমাপ্রসাদ সকল সংবাদই জানিতেন; তিনি বলিলেন, “জ্ঞানেন্দ্রবাবু জীবিত আছেন বটে, কিন্তু তিনি এখন বাতে শয্যাগত, জীবন্মৃত; ভাল-মন্দ কোন কথাতেই তিনি থাকেন না। কাজেই রণেন্দ্র হ’য়েছে এখন ‘ভ্যাড়ার মধ্যে বাছুর পরামাণিক!’ তোমাদের দুই গ্রামের ভদ্রলোকমাত্রেই এখন রণেন্দ্রের কথা মেনে চল্‌বে। রণেন্দ্র যে তোমায় বিয়ে করতে পায়নি, সে অপমান কি সে ভুলেছে, ভেবেছো? তোমাদের অনিষ্ট কর্‌বার কোন সুযোগই সে ত্যাগ করবে না।”

শেফালী বলিল, “আপনি কি মনে করেন—জ্ঞানেন্দ্র কাকা এই রকম অন্যায়ের সমর্থন করবেন।”

রমাপ্রসাদ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, “না মা, আমি তা আদৌ বিশ্বাস করিনে। আমি জানি—তিনি ও তাঁর স্ত্রী ভারি অনুতপ্ত হ’য়েছেন, তাঁদের অনুতাপ আন্তরিক। এবার আমরা যখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, সেই সময় জ্ঞানেন্দ্র-বাবু সন্তোষকে ডাকিয়ে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা ক’রেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা, তোমার শ্বশুরকে তিনি সকল কথা জানিয়ে যা’তে তোমাকে তাঁরা নিয়ে যান, তার ব্যবস্থা করেন। তিনি তখন মুক্তকণ্ঠেই নিজের দোষ স্বীকার ক’রেছিলেন। এমন কি, তিনি এত দূর ব্যথিত হ’য়েছেন যে, তাঁর স্ত্রীকে তোমার শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দিতেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহের পরিচয় পেয়েছিলাম।”

এ কথা শুনিয়া শেফালীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে বলিয়া উঠিল, “বলেন কি জ্যাঠামশায়! জ্ঞানেন্দ্র কাকার মনের এত পরিবর্ত্তন হ’য়েছে? আমি জানি, তিনি আমার ছেলেবেলা থেকেই আমাকে খুব ভালবাসতেন। আপনার যখন এই রকম ধারণা, তখন আমার দুশ্চিন্তার আর কি কারণ থাক্‌তে পারে? এখন তিনি আমার অভিভাবক হ’তে পার্‌বেন না কি?”

রমাপ্রসাদ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না মা! জ্ঞানেন্দ্র-বাবু বুড়ো হ’য়েছেন; রণেন্দ্রের প্রবল জিদ, তার সঙ্গে তিনি পেরে উঠ্‌বেন কেন? রণেন্দ্রকে ঠিক চিনে উঠা তোমার অসাধ্য! মানুষের কোন সদ্‌গুণই সে পায়নি। সে ভয়ঙ্কর অসচ্চরিত্র, তার উপর দারুণ কুচক্রী। এমন কোন কুকর্ম্ম নেই, যা করতে তার কুণ্ঠা হবে। হয় তো কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হ’য়ে সে তোমাকে নির্য্যাতন করবে, এবং যখন তার সকল চেষ্টা বিফল হবে—তখন সে অগত্যা তোমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবে; এমন কি, তোমার কলঙ্ক রটিয়ে তোমার শ্বশুরবাড়ীতে চিঠি পাঠানোও তার অসাধ্য নয়! এখন তুমি দূরে আছো, তোমার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছে না; কিন্তু তুমি গ্রামে গিয়ে বস্‌লে, তার দুষ্প্রবৃত্তি কি রকম প্রবল হ’য়ে উঠ্‌বে, আর সে কি ভাবে তোমার সর্ব্বনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করবে—এ সব কথা চিন্তা ক’রে আমি বড়ই ভীত হ’য়েছি।”

শেফালী ব্যথিত চিত্তে বলিল, “তবে দাদুর হাস-পাতালের কি ব্যবস্থা হবে?”

রমাপ্রসাদ তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, “তার খুব ভাল ব্যবস্থাই আমরা ক’রে এসেছি মা। ভাল ডাক্তার ও লেডী ডাক্তার বসিয়ে এসেছি। গরীব লোক-সকল দেশেই তো অনুকম্পার যোগ্য; তুমি আমার বা সন্তোষের কাছে থেকে স্থানীয় দরিদ্র পরিবারগুলির সেবায় জীবন সার্থক করলেই বা ক্ষতি কি? তা’তেও আর্ত্তের সেবা ভালই হবে। আমার ইচ্ছা, তুমি দুস্থ ভদ্র-পরিবারদের দুঃখ-কষ্ট মোচনেরই চেষ্টা কর। আমার মনে হয়, দুঃখ-কষ্ট তা’দেরই সব চেয়ে বেশী; শত অভাবে কষ্ট পেলেও তারা সহজে কারো কাছে তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা জানাতে চায় না। তুমি তাদের চিকিৎসা

ক'রে, ঔষধ ও পথ্যের সুব্যবস্থা ক'রে—আর্ত্তের সেবা-জনিত কর্ত্তব্য পালন করতে পার্‌বে।"

শেফালী সহানুভূতি-ভরে বলিল, "আর পথের যত অনাথ, আর্ত্ত, ভিখারী,—তাদের কি কেউ দেখ্‌বে না ?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "দুঃখীদের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রতে আমি তো তোমায় নিষেধ করিনি মা! তা'দের সেবাও তুমি অনায়াসেই করতে পারবে। তাদের কিন্তু চিকিৎসার চেয়ে বেশী দরকার শিক্ষার। যদি তারা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাক্‌তে শেখে তো অনেক রোগ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে; আর তা'দের বাসের ঘরগুলিতে প্রচুর আলো ও বাতাস প্রবেশের সুব্যবস্থা হওয়া দরকার। অপরিষ্কৃত, বায়ুহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঁতা ঘরই যত রোগের বাস্তভিটা।"

শেফালী ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে এখন কিছু দিন সেই ব্যবস্থাই করা যাক।"

রমাপ্রসাদ সোৎসাহে বলিলেন, "বেশ, ও-সব ব্যবস্থা আমিই ক'রে দিতে পারবো। কিন্তু তুমি একা সব কাজ ক'রে উঠ্‌তে পারবে না; এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করতে ও পরামর্শ দিতে পারে, এ রকম লোক চাই। সে চেষ্টাও আমি করছি। তোমার উদ্দেশ্য বাহিরে প্রকাশ হ'লেই গরীবরা দলে দলে এসে জুটবে; তখন তোমার কাজের অন্ত থাক্‌বে না। বিনা-পয়সায় কে চিকিৎসা করে, আর করতে পারেই বা কয় জন ?"

শেফালী বলিল, "আর সব তো ঠিক হ'ল, কিন্তু আমি ভাবছি, জ্ঞানেন্দ্র কাকা গণ্ডগোল পাকিয়ে বস্‌বেন না তো? সত্যিই যদি তিনি কাকীমাকে আমার শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দেন, তা হ'লে আমি হয় ত বড্ড বিপদে প'ড়বো। বিশেষতঃ, আমার শ্বশুর-শাশুড়ী যদি মনে করেন, আমরাই প্রকারান্তরে সাধাসাধি করছি; তা হ'লে সে ভারী লজ্জার বিষয় হবে আমার পক্ষে।"

রমাপ্রসাদ তাহাকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য বলিলেন, "আমরা জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ ক'রে এসেছি; তিনিও ব'লেছেন, আমাদের না জানিয়ে বা আমাদের অমতে ও-রকম কোন কাজ ক'রবেন না।. কিন্তু আমার মনে হয় মা, জ্ঞানেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ হ'লে খুব ভালই হ'তো। তোমার শ্বশুর যখন বুঝতেন যে, তোমার প্রতি শত্রুতা ক'রে জ্ঞানেন্দ্রবাবু অনুতপ্ত; যখন জানতেন যে, বরপক্ষ তোমাদের বংশ-গৌরবের পরিচয় পেয়েও কেবল অর্থলোভেই তোমাদের বিপন্ন ক'রেছিল; যখন তিনি দেখতেন যে, শত্রুও তোমার গুণে মুগ্ধ হ'য়ে, নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত; তখন নিশ্চিতই তাঁর মনের পরিবর্ত্তন হ'ত। তাঁকে ঔদ্ধত্য ত্যাগ করতে হ'তো। তার পর তোমাদের মিলন হ'লে জ্ঞানেন্দ্রবাবুও তৃপ্তি লাভ ক'রতেন, আর সত্যই মনে হ'তো, এত দিনে ভ্রমসংশোধন হ'ল। কিন্তু সন্তোষ কিছুতেই এতে রাজী হ'ল না; অতি কঠিন তার পণ।"

শেফালী উৎসাহভরেই বলিল, "দাদা সঙ্গত কাজই ক'রেছেন। তিনি নিজের বংশের মর্য্যাদা সম্বন্ধে খুবই সচেতন।"

রমাপ্রসাদ তথাপি বলিলেন, "না মা, আমার আন্তরিক ইচ্ছা, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলি। তোমার মত মেয়ে যে একাকিনী অকূল সংসারসাগরে ভেসে বেড়াবে, এ চিন্তা সত্যই আমার অসহ্য! তোমার সব থাকতেও—সব থেকেই তুমি চিরজীবন বঞ্চিত হ'য়ে থাকবে,—এ দুঃখ রাখবার কি স্থান আছে মা! ও-দিকে সন্তোষ ব'লছিল, ছেলেটা এত দিনেও না কি বিয়ে করেনি। তুমিও কি সারাটি জীবন এমনি ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারবে ?"

শেফালি. দৃঢ় স্বরেই বলিল, "কেন পারব না? আমাদের দেশের কত বালবিধবা ভোগবিলাস ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসিনীর মত সারাজীবন অতিবাহিত করে। য়ুরোপে কত কুমারী কত মহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করে; বিবাহের চিন্তাই তাদের থাকে না, ভোগসুখেও তারা বীতস্পৃহ।—আমারও জীবনধারণের কোন উপলক্ষের অভাব হবে না।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি মা, তোমার জীবন যেন পবিত্র থাকে; কিন্তু মনে রেখো, মনে-প্রাণে পবিত্রভাবে চিরজীবন অতিবাহিত করা বড়ই শক্ত কাজ—অতি দুরূহ ব্রত।"

শেফালী অন্তরের সঙ্গে জগদীশ্বরের করুণা—সহায়তা প্রার্থনা করিল। তিনি তাহার মনে বল-সঞ্চার করেন, তাহাকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করেন—ইহাই সে মনে

মনে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল; এবং কিছু কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া রমাপ্রসাদবাবুকে জানাইল, দুই দিন পরেই সে দাদার সঙ্গে দেখা করিতে এলাহাবাদে যাইবে। সেখান হইতে শারদীয়া পূজায় তাহারা কনকপুর যাইবে, ও পরে সে আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে। আগ্রায় ফিরিয়া রমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে ঘুরিয়া সে কাজ শিখিবে।

যাত্রার দিন শেফালী রমাপ্রসাদবাবুকে বলিল, "আমার নামে কোন পত্রাদি এলে পাঠিয়ে দেবেন। আর যদি কোন ভদ্রলোক দেখা করতে আসেন তো ব'লে দেবেন, পূজার পর যেন তিনি এখানেই আসেন।"—শেষ কথাটি বলিতে শেফালীর মুখ লজ্জায় অরুণাভ হইল; তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল। তাহা লক্ষ্য করিয়া রমাপ্রসাদবাবু মনে মনে শঙ্কিত হইলেন।

তিনি ভাবিলেন, "কে এই ভদ্রলোক—যাহার কথা বলিতে শেফালীর মনের ভাব এইরূপ হইল? তিনি বলিলেন, "কার দেখা করতে আসবার সম্ভাবনা আছে, তার নামটা কি শুন্‌তে পাইনে মা?"

শেফালী কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "তিনি মিষ্টার দত্ত; যিনি জাহাজে আমাদের সঙ্গে দেশে ফিরেছিলেন।"

রমাপ্রসাদবাবু আগ্রহ গোপন করিয়া নিস্পৃহের ন্যায় বলিলেন, "তোমার সঙ্গে তাঁর কত দিনের আলাপ?"

শেফালী তাঁহার কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তার আভাস পাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "জ্যাঠামশায়, ভয় পাবেন না। আমি হিন্দুর মেয়ে, বিবাহিতা; আমার আত্মগৌরব—কুলগৌরব আমি ভুলিনি, ভুলতে পারিনে। ভুলিনি বলেই তো তাঁর কাছে আমাদের পরিচয় গোপন করতে আপনাকে অনুরোধ করছি।"

রমাপ্রসাদবাবু এবার আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি কে? কোথায় থাকে? কি করে?"

শেফালী বলিল, "তিনি টুণ্ডলায় থাকেন; বোধ হয়, রেলে ইঞ্জিনিয়ারী চাকরী করেন। তাঁর সঙ্গে জাহাজেই আলাপ হ'য়েছিল। আর কে—কি বল্‌ব? নাম আমার বলা চলে না,—কলিকাতার ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেবের ছেলে।"

রমাপ্রসাদবাবু ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে আগে বলোনি কেন মা? হায় হায়! তা হ'লে কি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিই?—সে কি তোমায় চিন্‌তে পারেনি?"

শেফালী নতমুখে বলিল, "না। আমি কোনও পরিচয় দিইনি; পরিচয়ে কেবল বলেছি, আমি আপনার সুহৃৎ-কন্যা। বংশের কথা বা দাদার কথা উঠ্‌লেই আমি অন্য কথা তুলে সে কথা চাপা দিতুম। তিনি অনেক বার জিজ্ঞাসা করলেও আমি কনকপুরের নাম বলিনি।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "মা শেলী, আমি তোমাকে এখন কোথাও যেতে দিচ্ছিনে; আমি সুনীলকে টুণ্ডলা থেকে এনে তার হাতে তোমাকে সমর্পণ ক'রব।"

শেফালী দৃঢ় স্বরে বলিল, "না জ্যাঠামশায়। সে কিছুতেই হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে কোনও চেষ্টা হ'লে আমার দাদুর স্বর্গীয় আত্মা চঞ্চল হবে, কুলমর্য্যাদা অটুট থাকবে না। আর আমি জানি, মিষ্টার দত্ত'র বাপ-মা একটি মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবেন—মনস্থ ক'রেছেন। সেও এই জাহাজেই এল,—ভারি চমৎকার মেয়েটি। আমি তার সুখের পথে কাঁটা হ'তে চাইনে। আর দাদাও এ ভাবে উপযাচিকা হ'য়ে আমাকে যেতে দিতে চাইবেন না, আমিও যাব না। যাওয়া অসম্ভব!"

রমাপ্রসাদ বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, "যদি তা'র আবার বিয়ে ঠিক হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তোমার সঙ্গে তার দেখা কর্‌বার কি উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে? মিসেস্ গ্রেহাম বলেছিলেন, তোমার প্রতি তার টান আছে।"

শেফালী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না; ও-সব কিছু নয়। জাহাজে পরিচয় হ'য়েছিল, আগ্রার এত কাছে আছেন, তাই ব'লেছিলেন, এ-দিকে এলে হয় তো দেখা ক'রে যাবেন। আপনি যেন সব গোলমাল ক'রে আমাকে সঙ্কটে ফেলবেন না।"

রমাপ্রসাদবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। আপাততঃ তিনিও সুনীলকে শেফালীর পরিচয় না দেওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তিনি আশা করিলেন, জগদীশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় তো কোনও দিন উভয়ের মিলন হইবেই,—চিরদুঃখিনী শেফালী সুখী হইবে; কিন্তু সুনীলের পিতা-মাতা আবার তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন—এই সংবাদে তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।



মানুষের মন

সংসারে দু'টি প্রাণী,—স্বামী অজিত, স্ত্রী সুনীলা।

পয়সা-কড়ি আছে। দাস-দাসী, রেডিয়ো, মোটর, টেলিফোন, টেনিশ, সিনেমা, থিয়েটার অর্থাৎ যা-যা থাকিলে এ-যুগে জীবন সচল হয়, অভিযোগ ওঠে না, তার সব আছে। নাই শুধু দু'জনের কোনো কাজ।

তবু সুনীলার মন যেন খাঁ-খাঁ করে! নিত্য সেই এক রুটীন! সকালে উঠিয়া স্বামীর সঙ্গে টেবিলে বসিয়া চা-টোষ্ট-পোচ; তার পর অজিত কোথায় বাহির হইয়া যায়; বাড়ীতে সুনীলার কাছে আসে রেবা, মলি, বিনীতা, অনিন্দ্যা। তাদের সঙ্গে বসিয়া খানিকটা হাসি-গল্প; তার পর সেই স্নান-আহার; দুপুরে একখানা বই লইয়া বসা! কোনো দিন টেলিফোনে শচীশ বলে,—শিবপুর যাবে? সুনীলা বলে,—উনি বেরিয়েছেন! কোনো দিন রেডিয়ো খুলিয়া সেই একঘেয়ে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। তার পর বৈকালের দিকে···

ছটা বাজে। আজ কারো দেখা নাই। অজিত দুপুরবেলায় বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনো ফেরে নাই। তার কি হইয়াছে, ক'দিন টিকি দেখা যায় না!

বারান্দায় বসিয়া সন্ত-কেনা একখানা নভেল লইয়া সুনীলা তার পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিয়াছে। সামনে টিপয়ের উপর আইস-ক্রীম, চকোলেটের বাক্স···

অজিত আসিল; কহিল,—বেরুবে?

সুনীলা কহিল,—কোথায়?

সিনেমায়। সব হাউসে নতুন ছবি।

—বিলিতি? না, দেশী?

—দেশী-বিলিতি···যা চাও!

খানিকটা নিশ্বাসের বাষ্প সুনীলার বুকে পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। সুনীলা বলিল,—তুমি যাচ্ছো?

অজিত কহিল,—হ্যাঁ। আমি যাচ্ছি রক্সিতে বাঙলা ছবি দেখতে। দেবদাসী অঞ্জলি।

সুনীলা বলিল,—বাঙলা ছবি দেখবার সখ আমার নেই।

অজিত সুনীলার পানে চাহিল।

সুনীলা বলিল,—সব একঘেয়ে গল্প! একটা মেয়ের পিছনে ছুটছে দু'জন জোয়ান পুরুষ, idiots! না হয় দু'জন পুরুষের পিছনে ছুটেছে একটা মেয়ে, fool!

অজিত কহিল,—And such is life · জীবনেও তাই ঘটছে!···যে আব-হাওয়া দেশে এসেছে···আমরা নিত্য নতুন চাই···

সুনীলা কোনো জবাব দিল না।

অজিত কহিল,—আমি যাই। স'ছটায় শো!

অজিত চলিয়া গেল। সুনীলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনের উপর অনেক কথা ভিড় করিয়া জমিল।

সুনীলার বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর···ক' বছরে কত দিক হইতে কত তরঙ্গ আসিয়া জীবনে লাগিয়াছে!

ডায়োসেশান্ হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সুনীলা গেল কলেজে পড়িতে। কলেজে প্রবেশ করার সঙ্গে মনের উপর নূতন পৃথিবীর উদয়! সোসাইটি···গ্ল্যামর···এ-সবের মোহ ধীরে-ধীরে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে···মেয়েকে বাপ একালের মতো করিয়া মানুষ করিবার জন্য কতখানি আকুল! মেয়ের লেখা-পড়ার খরচ জোগাইতে হইবে বলিয়া বাড়ীর বামুন

ছাড়াইয়া মা গিয়া হেঁশেলে ঢুকিলেন ; বাপ ট্রাম ছাড়িয়া হাঁটা-পথে অফিস-যাতায়াত সুরু করিলেন ! সব দিকে খরচ-বাঁচানোর বিপুল আয়োজন !

সুনীলাকে গান-শেখানোর জন্য মাষ্টার আসিল। কিস্তিবন্দীর সর্ত্তে বাপ আনিয়া দিলেন নূতন অর্গান···

তার পর একটি-দু'টি করিয়া বন্ধু-বান্ধবের আসা-যাওয়া ···গোপা। তার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়িত···ব্যারিষ্টার শচীনাথের কন্যা ; গোপার পিসতুতো দাদা অক্ষয়··· গান-বাজনায় ওস্তাদ···আরো কত জন···

তার পর অক্ষয়ের মোহ ! এক দিন স্পষ্ট ভাষায় অক্ষয় বলিল···

সুনীলা জবাব দিল না। তার মুখ-চোখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল !

বাপ সে-কথা শুনিলেন। বাপ বলিলেন—পাগল ! অক্ষয়ের না আছে টাকা-কড়ি···না কোনো ফিউচার ! গান-বাজনা করে···ওতে কি হবে ? মেয়েকে আমি যে-ভাবে গড়ে তুলছি, কোনো সিভিলিয়ান, কি ব্যারিষ্টার ···না হয় মডার্ণ যুগের কোনো জমিদারের ছেলে···

অক্ষয় তবু এ-বাড়ীতে আসিত···

তার পর বি-এ পড়িবার সময় কোথা হইতে রাজপুত্র অজিত আসিয়া দেখা দিল ! সুনীলা রূপসী, গান-বাজনায় তার খুব খ্যাতি, তার উপর বি-এ পড়িতেছে···

অজিত তাকে লুফিয়া লইল।

বাপের পয়সা লাগিল না। সুনীলা পাইল যোগ্য বর, বড় ঘর···বাপ যেমনটি চাহিয়াছিলেন !

অক্ষয় আজো বিবাহ করে নাই। বলে, পয়সা কোথায় ? কি দিয়া পুষিব ?

অক্ষয় গ্রামোফোনে গানের রেকর্ড দেয় ; রেডিয়োতে গান গায়···তাছাড়া দু'-চারিটা স্কুলে গানের মাষ্টারী করে ; ক'টা সিনেমা-কোম্পানিতে মিউজিক শেখায়।

সুনীলা নিশ্বাস ফেলিল। হাতের বই হাতে খোলা ···মন অতীতের স্মৃতি-রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে···

দু'দিন পরের কথা···

দুপুরবেলায় ছন্দা-রেবা-সাধনারা দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। নানা কথার সঙ্গে ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে আর যে-কথা বলিয়া গিয়াছে···

অর্থাৎ বিজু ফিল্ম্ কোম্পানির তোলা নূতন বাঙলা ছবি "দেবদাসী অঞ্জলি"তে অঞ্জলির ভূমিকায় নামিয়া কাঁকণ মজুমদার যে নৃত্যলীলা দেখাইয়াছে, সে লীলা দেখিয়া অনেকের মন একেবারে মশ্‌গুল—বিশেষ করিয়া অজিতের মন ! অজিতের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা আজ নিবিড়···কাঁকণের ওখানে প্রায় তার নিমন্ত্রণ···

তারা চলিয়া গেলে কথাটা লইয়া সুনীলা অনেক ভাবিল।···ভাবিল, অজিতের কি অপরাধ ! নাচ দেখিয়া যদি···

সুনীলার মন এত ছোট নয় যে, এ লইয়া মনে একটা বিশ্রী আবহাওয়া গড়িয়া তুলিবে !

বেলা সাড়ে পাঁচটা। অজিত এখনি বাড়ী আসিয়াছে। আসিয়াই বাথ-রুমে ঢুকিয়াছে স্নান করিতে।

টেলিফোন বাজিল।

সুনীলা ধরিল, বলিল,—হ্যালো···

—অজিত বাবু আছেন ?

—আছেন। আপনি ?

—আমি কাঁকণ মজুমদার···

কাণের উপরে যেন লক্ষ কামান দাগিল ! সুনীলার মন চকিতে আঁধারে আচ্ছন্ন হইল···সারা দেহ টলমল করিয়া উঠিল !

নিমেষের জন্য !

তখনি সুনীলা বলিল—তিনি স্নান করছেন। আপনি ধরে থাকুন···আমি খপর দিচ্ছি।

সুনীলা গিয়া বাথ-রুমের দ্বারে করাঘাত করিল

ভিতর হইতে প্রশ্ন,—কে ?

সুনীলা বলিল—আমি। তোমাকে টেলিফোনে ডাকছে···কাঁকণ মজুমদার।

উত্তর,—ও···যাচ্ছি···বলো, পাঁচ-মিনিট···

টেলিফোনের রিসিভার ধরিয়া অজিত কহিল— ইয়েস্···হ্যাঁ · আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি বেরুচ্ছি···

রিসিভার রাখিয়া অজিত চাহিল সুনীলার পানে। সুনীলা দাঁড়াইয়া ছিল একটু-দূরে···গম্ভীর মূর্ত্তি !

অজিত বলিল,—বিপিন মজুমদারের মেয়ে কাঁকণ মজুমদার। বিপিনবাবু ছিলেন সবজজ্। বেরিলীতে বাড়ী। কাঁকণ বি-এ পাশ করে ফিল্মে নামছেন! ওঁর সাত ভাই। বিপিনবাবু কিছু রেখে যেতে পারেননি···খুব অভাব। তাই !···কাঁকণের নাচ দেখবার জিনিষ !···

সুনীলা কোনো জবাব দিল না।

অজিত বলিল—বিজু কোম্পানির অবস্থা ভালো নয় ··কাঁকণের মাইনে জোগাতে পারছে না !···নভেলটি প্রোডিউসার্দের সঙ্গে কনট্রাক্ট হচ্ছে। নভেলটির প্রোপ্রাইটর হিমাংশু চৌধুরী আমার বন্ধু···আমি থেকে সে কনট্রাক্ট ঠিক হবে, তাই যেতে বলেছে।

অজিত বাহির হইয়া গেল···

সুনীলা আসিয়া বসিল ড্রয়িং-রুমে সোফায়।

সন্ধ্যা তখন পৃথিবীর বুকে কালো পর্দ্দা টানিয়া সব আলো ঢাকিয়া দিয়াছে !

মন বলিল, অভাব মিটাইবার জন্য এ শুধু কনট্রাক্ট করানো নয় ! তার সঙ্গে···

পুরুষের মন! চট্ করিয়া ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে যেমন ভরিয়া উঠিতে পারে, তেমনি আবার চট্ করিয়াই সব-কিছু সে ভুলিয়া যায়! সব-কিছু বিসর্জ্জন দিতে তার কোথাও বাধে না! নাচের মোহ···

এক দিন এই অজিতকে পাশে লইয়া সুনীলা বিভোর হইয়াছিল! শয়নে-স্বপনে অজিতকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না !···জাগরণে সর্ব্বক্ষণ অজিতকে পাশে-পাশে রাখিয়াও মন আরো কত কি চাহিত !

সেই অজিত ! সুনীলার মনে আজ কোনো বৈচিত্র্য, কোনো আবেশ রচনা করিতে পারে না !···সংসারে আর-পাঁচটা জিনিষ যেমন আছে, অজিতও তেমনি আছে! ···তার সে সরস আকর্ষণ···কোথায় আজ ?

অজিতের কাছে সুনীলাও আজ এমনি বিরস·· তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে !

সুনীলা ভাবিল, স্বামী আর স্ত্রী···কি লইয়া দু'জনের মন সারা জীবন সরস-বিচিত্র থাকে, কে জানে !

একটু পরে শৈল আসিল। তার সঙ্গে আসিল হৈমবতী।

সুনীলা বলিল,—হৈম ! ওঃ, কত যুগ পরে দেখা !

শৈল বলিল,—ওর শ্বশুর-বাড়ী সেই দুর্গাপুরে !

সুনীলা বলিল,—বিলেত থেকেও লোকে আসা-যাওয়া করে। দুর্গাপুর বিলেতের চেয়ে দূর নয় !

হৈমবতী বলিল,—তা নয়। সেখানে মস্ত সংসার —আমার আসা চলে না ভাই।

সুনীলা বলিল,—এমন গিন্নী হয়েছিস্ হৈম···

শৈল বলিল,—তা হয়েছে। এই তো দু'দিন এসেছে ! এর মধ্যে বুড়ো শাশুড়ী চিঠি লিখেছেন—বেশী দিন থেকো না বৌ-মা, আমার কিছু ভালো লাগছে না !

সুনীলা বলিল,—খুব সেকেলে···তোর শ্বশুর-বাড়ীর লোক-জন, না হৈম ?

হৈম বলিল,—পাড়া-গাঁ···হাজার হোক। কিন্তু সেকেলে বলছিস্ কি মনে করে ?

সুনীলা বলিল,—মানে, তোর অমন গান-বাজনার সখ ছিল ··এখন ছেড়ে দিয়েছিস্ নিশ্চয় ?

হৈম বলিল,—গান-বাজনার সময় পাই না ভাই···

সুনীলা বলিল,—তার চেয়ে বল্, গান গাইলে সেখানে সকলে বাইজী-বৌ বলে নিন্দা করবে !

হৈম বলিল,—তা নয় ভাই সুনীলা। আমার শাশুড়ী সময় পেলেই আমার গান শুনতে চান। গাই···

হাসিয়া সুনীলা বলিল,—রামপ্রসাদের গান নিশ্চয় ?

হৈমবতী বলিল,—না। রবিবাবুর গান···

শৈল বলিল,—যা ভাবছিস্ সুনীলা, তা নয়, সত্যি ! এখানে ও এলো জুতো পায়ে দিয়ে। ওর শাশুড়ী বলেন, —সহরে বরাবর থাকো বৌমা, পথে-ঘাটে বেরুবার সময় জুতো পায়ে দিয়ো। না হ'লে পায়ে লাগবে।

—সত্যি ?

বিস্মিত দৃষ্টিতে সুনীলা চাহিল হৈমবতীর পানে···

হৈমবতী বলিল,—তিনি বলেন, এখানে কোথায় জুতো পায়ে দিয়ে বেড়াবে! তা ছাড়া পাঁচ জনে কি চোখে দেখবে! মেয়েদের পায়ে জুতো দেখা তাদের অভ্যাস নেই ! ভাববে, বিবি-বৌ !

হৈম বলিতে লাগিল তার সংসারের কথা···তার

সুখের কথা! স্বামী এখনো তার জন্য ফুল আনিয়া উপহার দেয়! ভালো সাজে সাজাইয়া মুখের পানে দু' দণ্ড তাকাইয়া থাকে!···

এ-সব কথা কেমন-ধারা শুনাইল···যেন কবিতার কথা···গল্পের কথা! ভাবিল, হৈমর জীবনে এখনো এমন সরসতা আছে! স্বামীর প্রেমে, স্বামীর সোহাগ-বচনে হৈম বিমুগ্ধ!···আর সে?

সুনীলার মনে হইল, সে যেখানে আছে, সেখানে হাজার-পাওয়ারের ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্‌ জ্বলিতেছে! আলোর সে তীব্র জ্যোতিতে চোখ ঝলশিয়া যায়! আর হৈম? সে যেন প্রদীপ-হাতে উঠানের সেই তুলসীতলায় দাঁড়াইয়া আছে···চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সারা উঠান ভরিয়া গিয়াছে!

হৈম চলিয়া গেল রাত তখন আটটা। সুনীলার বুকে হৈম অনেকগুলা ঢেউ দিয়া গেল। সে ঢেউয়ের আঘাতে···

সুনীলা ভাবিতেছিল, হৈম! সুনীলার বাপের চেয়ে হৈমর বাপের অবস্থা ঢের-ভালো ছিল। হৈমর বাপ ছিলেন বড় উকিল···হৈম নিজে ছিল খুব সৌখীন মেয়ে। কলেজের ক্লাশে, গানে-গল্পে এই হৈম সোসাইটির স্বপ্ন দেখিত! সে-হৈম আজ সোসাইটির পাশেও স্থান পায় নাই···বাস করিতেছে নিরালা আঁধার-বনের কোণে কোন্ ছোট পল্লীগ্রামে···শাশুড়ী-স্বামী, দ্যাওর-ননদের সঙ্গে···ভিড়ের মধ্যে! আর সুনীলা···

তবু হৈমর মুখে আজো কি সহজ-সরল হাসি! হৈমর প্রাণের উপর কোনো দিক হইতে ভারী চাপ পড়ে নাই! শাইকোলজি মানিয়া হৈম নিশ্বাস ফেলে না! সদ্য-বিবাহিতা কিশোরীর মতো স্বামীর কথা বলিতে এখনো তার দু'চোখ সরসতায় আর্দ্র হইয়া ওঠে! লজ্জায় কথা জড়াইয়া যায়! আর সুনীলা···?

বুক ভরিয়া খুব-বড় একটা নিশ্বাস···

সুনীলার মনে হইল, সে একা! ঐশ্বর্য্য, দাস-দাসী, লোক-জন থাকিতেও সে নিঃসঙ্গ-লোকচারিণী! তার আশে-পাশে কেহ নাই!···

স্বামী অজিত?

লাস্য-কৌতুকে নাচিয়া বেড়াইতেছে!

মাথার উপর জ্যোৎস্নার সাগর! গভীর রাত্রি। বাড়ীর সকলে নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন। সুনীলা শুধু জাগিয়া বসিয়া আছে খোলা গাড়ী-বারান্দায়!

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

অজিত ফিরিল।

সুনীলা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

অজিত আসিয়া বলিল—এখনো ঘুমোওনি?

অজিতের মুখে-চোখে হাসির দীপ্তি!

সুনীলা বলিল,—না···

অজিত বলিল—বড্ড ঘুম পেয়েছে। শুয়ে পড়িগে···

সুনীলা বলিল—খাবে না?

অজিত কহিল,—না। নেমন্তন্ন ছিল।

একটা কথা···বিদ্যুতের শিখার মতো সুনীলার মনখানাকে বিঁধিয়া তাতাইয়া দিল!

সুনীলা বলিল—নেমন্তন্ন ছিল বোধ হয় সেই কাঁকণ মজুমদারের ওখানে?

অজিতের মুখে কে যেন পাথর ছুড়িয়া মারিল! অজিত কহিল—হ্যাঁ।

অজিত দাঁড়াইল না; গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরের দিন সকাল-বেলা।

চায়ের টেবিলে অজিত আর সুনীলা। কারো মুখে কথা নাই!

সুনীলা বলিল—তুমি এমন অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হয়ে থাকো কেন? তোমার মন যদি কাঁকণ মজুমদারকে চায়, তোমার পায়ের উপর কেঁদে পড়ে আমি বলবো, ওগো, আমার বুকের উপরে দাঁড়িয়ে এ-উৎসব তুমি করো না···তা তুমি ভেবো না!···তেমন শিক্ষা আমি পাইনি। জীবনকে মেলোড্রামা কিম্বা ফিল্মের গল্প বলে আমি কোনো দিন ভাবি না · ভাবতে পারবো না!

অপ্রভিতের মতো অজিত চাহিল সুনীলার পানে।

সুনীলা বলিল—তুমি যদি তাকে ভালোবাসো··· তোমার মন যদি তাতে খুশী থাকে, ভালো কথা!

অজিতের সর্ব্বাঙ্গ কেমন অবশ হইয়া আসিল··· বাহিরের কলরব-কোলাহল কাণে অস্পষ্ট হইয়া উঠিল!

সুনীলা কহিল—শুধু একটা কথা···পাঁচ জনে এসে আমায় ব্যঙ্গ করে যাবে, এমন কিছু করো না !

সুনীলা আর বলিতে পারিল না ; চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

অজিত কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল···যেন চেতনা নাই !

ঘরের এক-দিকে বড় খাঁচায় ছিল এক-রাশ ছোট পাখী, যখন চেতনা ফিরিল, তখন কাণে শুনিল সেই-পাখীরা কল-কাকলী সুরু করিয়াছে !

দুপুরবেলায় গাড়ী বাহির করাইয়া সুনীলা গাড়ীতে বসিল ; ড্রাইভারকে বলিল,—ভবানীপুর···

ভবানীপুরে থাকে অক্ষয়। সুনীলা সে বাড়ী চেনে।

ফ্ল্যাট-বাড়ীর দোতলার ঘর। অক্ষয় একা থাকে।

ঘরে বসিয়া অক্ষয় গানের সুর রচনা করিতেছিল।

সুনীলাকে দেখিয়া সে অবাক ! বলিল—নীলা ! ···তুমি হঠাৎ দীনের ভবনে !

সুনীলার গম্ভীর মূর্ত্তি ! গম্ভীর কণ্ঠে সুনীলা বলিল—কাব্য করতে আসিনি !

অক্ষয় বলিল—তা জানি। তবে হঠাৎ ?

সুনীলা বলিল—কাজ আছে।

—বলো।

সুনীলা বলিল—কাঁকণ মজুমদার বলে কে এক মস্ত আর্টিষ্ট এসে দেখা দেছে তোমাদের ফিল্ম-জগতে ?

অক্ষয় বলিল,—হ্যাঁ। বিপিন মজুমদার ছিলেন সব্-জজ। তাঁর মেয়ে কাঁকণ। কিন্তু হঠাৎ তার কথা ?

সুনীলা বলিল—ওঁর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে !··· কাঁকণের নামে উনি একেবারে মশ্‌গুল !

অক্ষয় বলিল—অজিত বাবু ?

—হ্যাঁ।

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুনীলা বলিল—ভেবো না, সেজন্য আমার বুকে অশ্রুর সাগর উথলে উঠছে ! তা নয়। তবে scandalকে আমার ভয় !

অক্ষয় বলিল—কথাটা চার দিকে প্রচার হয়েছে বটে ! আমি শুনেছি, কাঁকণকে নিয়ে অজিত বাবুর মোটর-ড্রাইভ। নতুন কোম্পানির সঙ্গে কাঁকণের কন্‌ট্রাক্ট হচ্ছে, তাতে অজিত বাবু দাঁড়াচ্ছেন কাঁকণ মজুমদারের গ্যারাণ্টর !···তাছাড়া নিত্য নতুন উপহার-উপঢৌকন ! অর্থাৎ সারাদিন দু'জনে একসঙ্গে আছেন। আমি অবশ্য দেখিনি···শোনা কথা ! অনেকে বলছে, কাঁকণকে উনি না কি বিবাহ করবেন !

সুনীলা এ-কথা শুনিল। গুম্ হইয়া রহিল।···তার পর একটা নিশ্বাস।

নিশ্বাস ফেলিয়া সুনীলা বলিল—হুঁ···

অক্ষয় চাহিল সুনীলার পানে।

সুনীলা ডাকিল—অক্ষয়···

অক্ষয় বলিল—বলো···

সুনীলা বলিল—আজই সকালে দর্প করে ওঁকে বলেছি, এর জন্য তোমার পায়ে ধরে আমি কাঁদবো—তা ভেবো না !··কথা তা নয়। আমি শুধু ভাবছি, পাঁচ জনে এসে হেসে দু'কথা শুনিয়ে যাবে ! তাছাড়া···

সুনীলা চুপ করিল।

অক্ষয় তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সুনীলা বলিল—আমি কারো মুখের পানে চাইতে পারবো না···

অক্ষয় হাসিল, বলিল—বুঝেছি। লোকে ভাববে, তোমার চেয়ে এমন superior being··মানে, তার মোহ এত বেশী যে, অজিতবাবু তোমাকে সাইডিংয়ে ফেলে বে-লাইনে চলেছেন !

সুনীলার মনেও এই কথাটা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে ! সোসাইটিতে তার পোজিশন্ আছে··· এমন রূপ, এমন গুণ···সে-রূপ-গুণ লইয়া তার জীবনে এমন সার্থকতা···সুনীলা জানে, পাঁচ জনে তার পানে কতখানি ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকায় !

অক্ষয় বলিল,—ভয় নেই সুনীলা। অজিতবাবুর এ দু'দিনের মোহ···glow, glamour দেখে মানুষের চমক লাগে না ? এ সেই চমক ! আতস-বাজির প্রচণ্ড আলো মানুষকে চমক দেয়···সে চমক ক্ষণেকের··· সে-আলোয় মানুষ বাস করতে পারে না ! বাস করবার জন্য মানুষ চায় স্নিগ্ধ আলো···যাতে চোখ ঝলশাবে না, অথচ আলোয় চারি দিক সুস্পষ্ট থাকবে।

সুনীলা চাহিল অক্ষয়ের পানে, কহিল,—তোমার কাছে এসেছি···কেউ জানে না। এসেছি এই জন্য। মানে···

কথাটা সে শেষ করিল না···অক্ষয়ের পানে চাহিল।

অক্ষয় তার পানেই চাহিয়া ছিল: তার দৃষ্টির সঙ্গে সুনীলার চোখের দৃষ্টি মিলিল।

অক্ষয় দেখিল, সুনীলার ও-দৃষ্টিতে সেই বিহ্বলতা ·· সেই সঙ্গে করুণ মিনতি! সুনীলা দেখিল, অক্ষয়ের দৃষ্টিতে চিরদিনকার সেই প্রীতি ··আবেগ!

অক্ষয় কহিল,—বলো···আমায় কি করতে হবে?

সুনীলা বলিল,—আমি এর শোধ নিতে পারি! উনি জানেন, তুমি আমায় ভালোবাসো! এখনো!··· এক দিন···

নিশ্বাসের বাষ্পে সুনীলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

অক্ষয় বলিল,—এক দিন···কি? বলো···

সুনীলা বলিল—তুমি বিয়ে করোনি···তাই নিয়ে উনি আমায় তামাসা করেন।···আমি এক দিন বলেছিলুম, তুমি যদি অবহেলা করো, আমার তবু এক জন থাকবে, যে আমায় ভালোবাসে! তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সে আমায় মাথায় করে রাখবে!

অক্ষয়ের মাথায় তীব্র রক্তস্রোত···

অক্ষয় বলিল,—এ কথা তুমি বলেছিলে?

—বলেছিলুম।···এক বার আমার মনেও হয়েছিল··· কিন্তু···

সুনীলার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। সুনীলা কহিল—পাঁচ জনে আমার পানে করুণার দৃষ্টিতে চাইবে···shocking!

অক্ষয় বলিল,—এ দায় থেকে তোমায় উদ্ধার করবো?

সুনীলা কহিল—তুমি ছাড়া এমন-জন আমার আর কেউ নেই, অক্ষয়। তাই আজ তোমায় মনে করে তোমার কাছে আমি এসেছি···

অক্ষয় হাসিল। বলিল,—ভালোই করেছো! আমি তোমায় রক্ষা করবো।

পরের দিন সকালবেলা।

অক্ষয় আসিল কাঁকণের গৃহে।

কাঁকণ কহিল—অক্ষয়বাবু!

অক্ষয় কহিল—আলাপ-পরিচয় করতে এলুম। নভেলটি প্রডিউসার্শে আমি মিউজিক শেখাবো···কাল সন্ধ্যায় কন্‌ট্রাক্ট সই করে এসেছি।

কাঁকণ বলিল,—সত্যি? বলেন কি! আপনি অবাক করে দিলেন অক্ষয়বাবু!···বাঁধা-কন্‌ট্রাক্টে কোথাও আপনি কাজ করতে চান্ না, আর···

অক্ষয় কহিল—ভাবলুম, এ-রকম দুর্জ্জয় গোঁ ভালো নয়! যখন ব্যবসা বলে এ-বিদ্যাকে অবলম্বন করেছি··· টাকা-দেনেওলা ব্যবসায়ীর কাছে অহঙ্কারকে বড় করে ধরলে এক দিন যদি পস্তাতে হয় শেষে···

কাঁকণ বলিল—খুব ভালো হলো! গানে আমি কাঁচা। কেউ আমার temperament বুঝে আমায় গান গাওয়াতে পারে না···সেজন্য আমার কতখানি দুঃখ!

অক্ষয় কহিল—আমি চেষ্টা করবো···কিন্তু সেজন্য ভালো করে আমাকে পরিচয় নিতে হবে আপনার মনের···

কাঁকণ কহিল—নিশ্চয়!

দু'দিনে অক্ষয় এমন সুরের ফাঁদ পাতিল···

অজিত আসে; আসিয়া বলে,—আজ কি কথা ছিল?

কাঁকণ একটা সুর বাজাইতেছিল, বলিল,—কি কথা?

অজিত বলিল,—ডায়মণ্ড-হার্ব্বার ট্রিপ···

কাঁকণ কহিল,—কিন্তু চারটের সময় অক্ষয়বাবু আসবেন ··পরশু থেকে সুটিং সুরু···

অজিত কহিল,—এ-সুর এ্যাদ্দিন কোথায় ছিল?

কাঁকণ বলিল,—না, না···এটাকে আজ দখল করতেই হবে। আমার ambition জানেন তো, to shine in ফিল্ম-ওয়ার্ল্ড!

অজিত বলিল,—কিন্তু যে-কথা আছে···আমার সঙ্গে আপনার···

হাসিয়া কাঁকণ কহিল,—এক দিন ডায়মণ্ড-হার্ব্বার না গেলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে?

মাসখানেক পরের কথা।

সুটিংয়ের পর তুহিন-নিলয়ে চায়ের আসর।

অক্ষয় বলিল,—অজিতকে তুমি বিয়ে করবে সত্যি? তার স্ত্রী রয়েছে···

কাঁকণ বলিল,—We are in love.

অক্ষয় বলিল,—Love! অজিত তোমাকে ভালোবাসে, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। এ ওর নেশা! চমক!···ওর স্ত্রী সুনীলার নেশাতেও এক দিন ও এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল। না হ'লে গরীবের ঘরের মেয়ে সুনীলা···ওর স্ত্রী হবে···সুনীলা তা স্বপ্নেও ভাবেনি কোনো দিন!

চায়ের পেয়ালা নামাইয়া কাঁকণ বলিল,—আপনি বিয়ে করেননি কেন অক্ষয়বাবু?···Any romance?

অক্ষয় বলিল,—যদি বলি, হ্যাঁ?

—সত্যি?

কাঁকণের দু'চোখে কৌতুকের শিখা!

অক্ষয় কহিল,—বিশ্বাস হয় না?···আমি গরীব··· আমার আবার রোমান্স!

—না, না। তা নয়।

—তবে? অক্ষয় বলিল,—তোমরা মেয়ে-জাতটা মানুষের কি দেখে ভোলো, ভুলে ভালোবাসো···বুঝতে পারি না! আমি এক জনকে ভালোবাসতুম। আমার পয়সা ছিল না, তাই সে আমাকে তাচ্ছিল্য করলে। তার বিয়ে হয়েছে খুব বড়-ঘরে। অগাধ ঐশ্বর্য্য। কিন্তু স্বামী? আমি জানি, স্বামি-স্ত্রীতে কোনো মতে তারা এক-বাড়ীতে বাস করছে। স্ত্রী তার বান্ধবীদের নিয়ে, সাজ-সজ্জা নিয়ে আছে; আর স্বামী ঘুরছে নব-নব রূপসীর রূপে মশ্‌গুল্ হয়ে!

কাঁকণ কোনো জবাব দিল না, অক্ষয়ের পানে চাহিয়া রহিল। দু'চোখে একাগ্র দৃষ্টি!

অক্ষয় বলিল,—এ বিয়ের প্রয়োজন? শাড়ী, গাড়ী, জুয়েলারি, আর সোসাইটিতে জাঁক-জমক, অহঙ্কার-গর্ব্ব! কেউ আমাকে ভালোবাসে না···আমি ভালোবাসবো এমন-জন আমার নেই···the very idea··· মনে হ'লে আমি শিউরে উঠি! বিয়ে না করি, তার অর্থ আছে। কিন্তু বিয়ে করবো···অথচ স্বামী পাবে না স্ত্রীকে, স্ত্রী পাবে না স্বামীকে···আমাদের দেশে এই যে অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় সুরু হয়েছে, এ নাটকের জুড়ি পৃথিবীর কোনো দেশে আর পাবো না, বোধ হয়! অজিতের স্ত্রী আছে···সে-স্ত্রীকে ফেলে সে ঘুরছে তোমার পিছনে! তোমাকে ও বলে, ভালোবাসে··· তুমি সে-কথা বিশ্বাস করো···আমাকে এ-কথা বিশ্বাস করতে হবে?

কাঁকণের সারা মনে কেমন আতঙ্ক···সে যেন কাঁটা!

অক্ষয় বলিল—তবু তুমি বিশ্বাস করবে! কারণ, অজিতকে অবিশ্বাস করলে তোমাকে হারাতে হবে অজিতের পরিচর্য্যা···তার মোটরে চড়ে ড্রাইভ, তার আবেগ-কম্পিত স্তুতি-বচন, তার এই দাস্য! এ-সবের মোহে যদি ভোলো, তা হ'লে ছাই লেখাপড়া শিখেছো! ঘরে স্ত্রী আছে···সুন্দরী স্ত্রী···মূর্খ্য নয়···সুহাসিনী, সুভাষিণী···সে-স্ত্রীকে ফেলে যে-স্বামী অন্য মেয়েকে বলে, ভালোবাসি···well, আমি মেয়ে-মানুষ হলে তেমন-লোককে ঘৃণা-ভরে সরিয়ে দিতুম···প্রশ্রয় দিতুম না··· কোনো দিন না!

কাঁকণের মনের আতঙ্ক একেবারে পাহাড়ের মতো তুঙ্গ হইয়া উঠিল।

দু'-এক সপ্তাহ পরে সিনেমা-সাপ্তাহিক-কাগজগুলায় খপর বাহির হইল···

> সুরশিল্পী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার রায়ের সঙ্গে আমাদের নূপুর-চারিণী নৃত্যময়ী রূপ রাণী কুমারী কাঁকণ মজুমদারের শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। বড় দিনের ছুটীতে দু'জনে হনিমুনে বাহির হইবেন। যোগ্যোন এমন যোগা-যোজনায় আর্টের মহল প্রজাপতির পাখার মতো বিচিত্র রমণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই!

সন্ধ্যার একটু আগে অজিত আসিয়া ডাকিল,—সুনীলা···

বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সুনীলা প্রসাধন করিতেছিল···

অজিত ঘরে আসিল।

আয়নার সামনে সুনীলা নিজের রূপরাশিকে যেন অজস্র-ধারে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে!

সে রূপ-রাশির সামনে অজিত বিস্ময়ে-মোহে··· বিমুগ্ধ! মৌন-মূক···

সুনীলা ফিরিয়া চাহিল; কহিল,—কিছু বলবে?

অজিত কাছে আসিল। সুনীলার গ্রীবা·· যেন মৃণাল! সে-গ্রীবা অজিত চুম্বনে অভিষিক্ত করিল।

সুনীলার দেহে-মনে শিহরণ! সুনীলা কহিল,—কি করো···আঃ!

অজিত বলিল,—জানো, তোমার সেই অক্ষয়···হুঁঃ, এত কাল বিয়ে করেননি। এখন করেছেন···

—সত্যি?

—হ্যাঁ। কাকে, জানো?

—কাকে?

—কাঁকণ মজুমদারকে। ফিল্ম-আর্টিষ্ট কাঁকণ!··· Scandalous! তাছাড়া কাঁকণকে কোন্ ভদ্রলোক বা বিয়ে করবে! হাজার হোক···

সুনীলার মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল!

অজিত বলিল,—আমার ওপর দিন-কতক কি রকম ভর করেছিল ঐ কাঁকণ! হুঁঃ···নেহাৎ আমি শক্ত ছেলে ···তা হ্যাঁ, ভালো কথা, ভাবছি দিন-কতকের জন্য বেড়াতে বেরুবো! দিল্লী···আগ্রা···যাবে?

—যাবো।

—পরশু যদি বেরুই?

—বেশ।

সন্ধ্যার সময় অক্ষয়ের বাড়ীর সামনে মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। মোটর হইতে নামিল সুনীলা।

অক্ষয় ছিল বাহিরের ঘরে। বলিল,—নীলা।

তার দু'চোখে আনন্দের দীপ্তি···

সুনীলা কহিল,—সত্যি, কি কেলেঙ্কারী করলে অক্ষয়! দেশে আর মেয়ে ছিল না? শেষে ঐ কাঁকণ মজুমদার!

অক্ষয়ের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! দু' চোখের সামনে আলো যেন দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল!

অক্ষয় কোনো কথা বলিল না।

সুনীলা বলিল,—ওঁর কাধেও দিনকতক ভর করেছিল তোমার ঐ কাঁকণ!···সাবধানে থেকো···শেষে যেন··· মানে, তোমার সে লাঞ্ছনা-অপমান, বেইজ্জতী আমাদেরো লাগবে! হাজার হোক···

অসহ্য! সেই সুনীলা···ফ্যাশনেবল্ সোসাইটির মাথার মণি! সে এমন ইতর!

রাগে অক্ষয়ের গা জ্বলিল। ভাবিল, বলে, খবর্দ্দার! কি করিয়া সে-রাগ সামলাইয়া চুপ করিয়া রহিল···

সুনীলা কহিল,—বৌ এই বাড়ীতেই আছে? বৌ দেখাবে না?

—না···

অক্ষয়ের স্বর বেশ কঠিন।

সুনীলা বলিল—কোথায় যাচ্ছো হনিমুন করতে?

অক্ষয় বলিল,—তুমি চলে যাও সুনীলা! আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করবে, এ-অধিকার তোমাকে কেউ দ্যায়নি!

সুনীলার দু'চোখে আগুনের শিখা! চোখের সে আগুন কথায় ছিটাইয়া সুনীলা বলিল,—ওঃ, ভয়ঙ্কর ভালোবাসা যে! এ ভালোবাসা ক'দিন থাকে, দেখবো!

কথাটা বলিয়া সুনীলা সদম্ভে চলিয়া গেল।

বাহিরে মোটর!···সশব্দে মোটর চলিয়া গেল।

কাঁকণ আসিল; বলিল,—কে এসেছিল?

—একটা স্ত্রীলোক···নেহাৎ হতভাগা! এক দিন আমার কাছে ভিখিরীর মতো এসে সাহায্য চেয়েছিল··· আমি তাকে কি সাহায্য না করেছি!

—তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল?

—না। ওর কথা শুনে মনে হলো না, সে-উপকারের কথা ওর মনে আছে!···ভয়ানক ইতর মন! এরা আবার শিক্ষা-সভ্যতার গর্ব্ব করে! ধিক্!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।



অষ্টাদশ পর্ব্ব

আমসের দন্তশূল !

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

কাউণ্ট জোলার্ণের আদেশে আমস্ সাগর-বেলায় প্রস্থান করিলে আমি মেরীকে সঙ্গে লইয়া দোতালায় উপস্থিত হইল'ম, এবং কাউণ্টের বাসের জন্য যে কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বাসোপযোগী করিবার জন্য পরিষ্কার করিতে লাগিলাম ; তাহার পর তাঁহার জিনিস-পত্রগুলি পাকশালা হইতে আনিয়া সেই কক্ষে গুছাইয়া রাখিলাম। হাতের কাজ শেষ হইলে আমরা পাক-শালায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া, কাউণ্ট আমাকে সমুদ্রকূলে গমন করিয়া আমসের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। আমি সেখানে গমন না করিলে পাহারা ছাড়িয়া আমসের বাড়ী ফিরিবার উপায় ছিল না।

আমি সমুদ্রকূলে গমন করিয়া আমস্কে একটি বালুকাস্তূপে উপবিষ্ট দেখিলাম,—সে একখান পাথরে ঠেস্ দিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল। তাহার তামাকের পুরাতন পাইপটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে ধূমপানের জন্য একটা নূতন পাইপ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল ; সে তাহাতে গুঁড়া তামাক সাজিয়া গম্ভীর ভাবে ধূমপান করিতেছিল। হরিকেন লণ্ঠনটা না জ্বালিয়া সে এক পাশে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। চতুর্দ্দিক তখন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

আমাকে আসিতে দেখিয়া আমস্ ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? তোমার এখানে আসিতে এত বিলম্ব হইবার কারণ কি ?"

আমার সেখানে আসিতে কি কারণে বিলম্ব হইল—তাহা তাহাকে জানাইলে সে বলিল, "সেই শয়তানটা তাহার বিছানায় শুইতে গিয়াছে কি ?"

আমি বলিলাম, "কাহার কথা বলিতেছ ?—কাউণ্ট জোলার্ণ ?—না, এখনও তিনি শয়ন করেন নাই।"

আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "সেই হতভাগা নাজীটা এখনও শুইতে যায় নাই ? তবে আমি এখন বাড়ী ফিরিতেছি না। সে শয়ন করিলে আমি বাড়ী যাইব। আমার মেজাজ এখন এতই খারাপ হইয়া আছে যে, তাহার সঙ্গে দেখা হইলে আমি হয় ত এ রকম কোন ব্যবহার করিয়া বসিব—যেজন্য পরে আমার অনুতাপ হইতে পারে।"

এই কথা বলিয়া আমস্ উন্মাদের মতো হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল ; তাহার পর বলিতে লাগিল, "রাস্কেলটা আমার সঙ্গে এ ভাবে আলাপ করিতেছিল—যেন আমি কীট-পতঙ্গের চেয়েও তুচ্ছ ! আমি ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের সকল আদেশ পালন করিতেছি ; কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতে সকল বিপদ মাথায় লইয়া নিত্য নিয়মিত ভাবে এই অপ্রীতিকর কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। সময় নাই, অসময় নাই, কি দিন, কি রাত্রি, সকল সময় প্রসন্ন মনে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি। তাহার এই পুরস্কার !—প্রতিদানে এই ইতর ব্যবহার !"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমস্ মুখ হইতে পাইপটা খুলিয়া হাতে লইল ; তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কিন্তু এইরূপ ব্যবহার আমি সহ্য করিব না। উহার ব্যবহার সত্যই আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যদি এই শয়তান এখানকার আড্ডা পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে সঙ্গে না লইয়াও একাকী তাহা পরীক্ষা করিতে পারে ; সেজন্য

আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার অপমান করিবার প্রয়োজন কি ? এ আমার নিজস্ব 'ব্ল্যাক-গল্ ফার্ম্ম',—জার্ম্মাণ নৌ-বারিক নহে, বেটা দুর্ম্মুখ নাজীটার কি তাহা বুঝিবার শক্তি নাই ?"

এই সকল কথা বলিয়া আমস্ সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর অন্ধকারের ভিতর দিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। আমি নির্ব্বাক্ ভাবে একাকী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া রহিলাম। সেই স্থানে আমাকে প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল।

প্রত্যুষে আমি শ্রান্ত দেহে ও অবসন্ন মনে বাড়ীর দিকে চলিলাম। আমি পাকশালায় প্রবেশ করিয়া, অগ্নিকুণ্ডের অদূরে আমার বিচালীর শয্যা প্রসারিত করিয়া তাহার উপর শয়ন করিলাম ; মুহূর্ত্ত পরেই আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমি চক্ষু মেলিতেই মেরীকে দেখিতে পাইলাম ; সে পোষাক পরিয়া ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

অতঃপর আমি উঠিয়া মেরীকে তাহার পাকশালার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলাম। মেরী কাউণ্ট জোলার্ণের আদেশ অনুসারে তাঁহার কামাইবার জন্য এক মগ্ জল গরম করিয়া রাখিয়াছিল। আমি সেই জল লইয়া দোতালায় চলিলাম।

মেরীর প্রাতর্ভোজন শেষ হইলে কাউণ্ট জোলার্ণ তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে নীচে নামিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার পরিধানে সামরিক পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে সাধারণ পরিচ্ছদ ছিল। সেই বেশেও তাঁহাকে চমৎকার মানাইতেছিল। এমন মাতব্বর, তেজস্বী লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না ; আমার পরিচিত জার্ম্মাণদের মধ্যে তাঁহারই মুখে অভিজাত্য-গৌরব পরিস্ফুট দেখিলাম।

কাউণ্ট মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা কোথায় ?"—তিনি একখান চেয়ার টানিয়া-লইয়া টেবলের কাছে বসিয়া পড়িলেন।

মেরী বলিল, "বাবা এখনও শুইয়া আছেন।"

কাউণ্ট আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি তাহার শয়ন-কক্ষে যাও, শীঘ্র তাহাকে ডাকিয়া আনো।"

আমি তৎক্ষণাৎ পাকশালা ত্যাগ করিয়া দোতলায় চলিলাম, এবং আমসের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিলাম।

আমস্ ভিতর হইতে গর্জ্জন করিল, "কে তুমি—দরজা গুঁতাইতেছ ?"

আমি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলাম, "আমি পিটার, তোমাকে ডাকিবার জন্য—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "শীঘ্র চলিয়া যাও। ও-ভাবে আমাকে বিরক্ত করিলে আমি উঠিয়া তোমার পিঠে বেত ভাঙ্গিব।"

কিন্তু তাহার আদেশে আমি পলায়ন না করিয়া বিনীত ভাবে বলিলাম, "আমি নিজের ইচ্ছায় আসি নাই ; কাউণ্ট জোলার্ণ তোমাকে ডাকিয়া দিতে বলিলেন, সেই জন্য তোমাকে বিরক্ত করিতে হইল।"

আমার উত্তর শুনিয়া আমস্ মুহূর্ত্ত কাল নির্ব্বাক্ রহিল ; তাহার পর আপন-মনে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার পর সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি তাহার কাছে ফিরিয়া-গিয়া তাহাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বল। সে নিজে খুব সকালে উঠিয়াছে বলিয়া আর সকলেও ঐ রকম সকালে উঠিবে, তাহার এরূপ আশা করা অনুচিত। অন্য সকলে তাহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য নহে। তুমি তাহাকে বলিতে পার—আমি এখন উঠিব না। যতক্ষণ আমার ইচ্ছা, আমি শুইয়া থাকিব। যখন আমার উঠিবার ইচ্ছা হইবে, তখন উঠিব, তাহার পূর্ব্বে উঠিব না। যাও—তাহাকে এ কথা জানাও।"

তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ তীব্র হইল। আমার কথায় সে বিরক্ত হইয়াছে—ইহা বুঝিয়াও আমি বলিলাম,—"কিন্তু—"

আমস্ আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আবার আমার কথার উপর কথা ! যদি এখনই চলিয়া না যাও—তাহা হইলে আমি উঠিয়া বেতের চোটে তোমার পিঠের চামড়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিব। পাজী, বদমা'স্,—নিকালো !"

আমস্ শীঘ্র উঠিবে না বুঝিয়া আমি নীচে নামিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিলাম।

আমাকে একাকী ফিরিতে দেখিয়া কাউণ্ট জোলার্ণ

আমার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কি হইল ?"

আমি বলিলাম, "আমসের কথা শুনিয়া মনে হইল, এখন তাড়াতাড়ি তাহার শয্যা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা নাই।"

কাউণ্ট নীরস স্বরে বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও—সে উঠিয়া-আসিতে অসম্মত ?"

আমি অনিচ্ছার সহিত বলিলাম, "তা—আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই বোধ হয় সত্য ; ইহা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?"

আমার কথা শুনিয়া কাউণ্ট জোলার্ণ আর কোন কথা বলিলেন না, তিনি চেয়ার ঠেলিয়া-ফেলিয়া হঠাৎ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; তাহার পর সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তিনি সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া আমসের শয়ন-কক্ষের রুদ্ধদ্বার এক ধাক্কায় খুলিয়া ফেলিলেন ; সেই শব্দ আমি পাকশালা হইতেই শুনিতে পাইলাম।

কাউণ্ট উত্তেজিত স্বরে ডাকিলেন, "ক্রোবি !"

আমস্ তাহার শয়ন-কক্ষের ভিতর হইতে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি এখানে কি চাও ? যাও, এই মুহূর্ত্তেই আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও। কে তোমাকে বিনা-এত্তেলায় আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে বলিয়াছে ? যাও, শীঘ্র চলিয়া যাও !—আমার কথা শুনিতে পাইয়াছ ?"

অপমানিত নাজী কাউণ্ট কঠোর স্বরে বলিলেন, "শয্যা হইতে উঠিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া নীচে যাইবার জন্য তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। হাঁ, পাঁচ মিনিট মাত্র—তাহার অধিক নহে।—আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

এই কথা বলিয়া কাউণ্ট সশব্দে নীচে নামিয়া আসিলেন, এবং পাকশালায় প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে প্রাতর্ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমস্ নীচে আসিতে যদি অধিক বিলম্ব করে, তবে তাহার কিরূপ ফল হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মেরী ও আমি উৎকর্ণ হইয়া স্তব্ধভাবে পাকশালায় বসিয়া রহিলাম। আমাদের মন নানা চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল। কাউণ্ট জোলার্ণ কিরূপ কঠোরপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত নাজী—তাহার কিছু কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। আমস্ তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তাহাকে দারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে—এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না।

যাহা হউক, আমস্ কি ভাবিল বলিতে পারি না ; কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই সে শয্যা ত্যাগ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। সিঁড়িতে তাহার ভারী বুটের শব্দ শুনিতে পাইলাম।

আমস্ যখন পাকশালায় প্রবেশ করিল—তখন তাহার বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না ! তাহার মাথার রুক্ষ চুলগুলি কপালের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ভাল চক্ষুটি ক্রোধে লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছিল ; তাহা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসারিত হইতেছিল। তাহার মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে কয়েক দিন ক্ষুর স্পর্শ না হওয়ায় তাহার মুখ অত্যন্ত কদাকার দেখাইতেছিল। তাহার কদর্য্য মুখভঙ্গি দেখিয়া আমাদেরই মন ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

আমস্ উত্তেজিত ভাবে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি আসিয়াছি ; আপনার কি বলিবার আছে, তাহা শুনিয়া আমি পুনর্ব্বার শয়ন করিতে যাইব। তাহার পর যতক্ষণ ইচ্ছা আমি শয্যায় পড়িয়া বিশ্রাম করিব। কাহারও আদেশে আমার শয্যাত্যাগের অভ্যাস নাই।—আমার কথা আপনি বুঝিতে পারিলেন ?"

আমস্ দৃঢ়পদে টেবলের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার পর পুনর্ব্বার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হাঁ, আপনার সঙ্গে বুঝাপড়া শেষ করিয়া আমি ফিরিয়া যাইব,—এই কথাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।"

তাহার কথা শুনিয়া কাউণ্ট জোলার্ণ সক্রোধে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে আসিয়াছ? সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত কি ভাবে আলাপ করিতে হয়, তাহা তুমি জান না ; কিন্তু যদি এই প্রকার অভদ্রভাবে আর একটিও কথা মুখ হইতে বাহির কর—আমার আদেশ পালনে গাফিলী কর—তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি, আমার সঙ্গে তোমাকে জার্ম্মাণীতে যাইতে হইবে। আমি তোমাকে জার্ম্মাণীতে লইয়া

গিয়া নৌ-সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করিব। তোমার এইরূপ অবাধ্যতা ও দম্ভের জন্য তোমাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে।"

আমস্ বলিল, "আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার আপনার অসাধ্য, কারণ আমি জার্ম্মাণ নহি।"

কাউন্ট জোলার্ণ সরোষে বলিলেন, "না, তুমি জার্ম্মাণ নহ; কিন্তু তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, তুমি জার্ম্মাণীর বেতনভোগী ভৃত্য, তুমি জার্ম্মাণীর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ। আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে, এবং তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। যদি তোমার কোন কার্য্যে বা ব্যবহারে আমাকে অসন্তুষ্ট হইতে হয় তাহা হইলে আমি তোমাকে জার্ম্মাণীতে লইয়া গিয়া ঐ ভাবে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করিব, ইহা তুমি নিঃসন্দেহে জানিয়া রাখ। যদি সেখানে নৌ-সামরিক আদালতের বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড না-ও হয়, তাহা হইলেও দীর্ঘকাল তোমাকে কোন কারা-শিবিরে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।"

এ কথা শুনিয়া আমস্ কোন কথা বলিতে পারিল না, তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, চক্ষুতে আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল।

আমস্ স্খলিত স্বরে বলিল, "আ—আমি কোন অন্যায় কথা বলি, আমার এ উদ্দেশ্য ছিল না; কিঞ্চিৎ আমোদের (fun) জন্যই আমি উহা বলিয়াছি। আমার চেহারা দেখিয়া আমাকে যতই নীরস বলিয়া আপনার ধারণা হউক, আমি সত্যই রসিক লোক। আপনাকে সেই রস বিতরণের একটু লোভ—"

কাউন্ট জোলার্ণ আমসের মুখের উপর অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তাহার কণ্ঠরোধ হইল। কাউন্ট মুহূর্ত্তকাল ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমার মতো নোংরা, অলস, ঘৃণিত জীব আমি আর কোথাও দেখি নাই! কত কাল পূর্ব্বে তুমি দাড়ি-গোঁফ কামাইয়াছিলে? কবে তুমি সাবান ও জল স্পর্শ করিয়াছিলে? না, তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিও না; আমি জানি, তুমি মিথ্যা কথা বলিবে। তোমার পরিচ্ছদের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। তোমার জ্যাকেট কি রকম নোংরা—তাহা কি তোমার বুঝিবার শক্তি আছে? উহাতে একটিও বোতাম নাই!—তোমার বুট, তোমারা জার্সি,—উহা পুড়াইয়া ফেলিবার যোগ্য! তুমি কাঁধ সোজা করিয়া আমার সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াও।"

আমস্ কাউন্টের আদেশ পালন করিলে কাউন্ট তাহার মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "গত রাত্রে আমি তোমাকে তোমার থাকিবার ঘর উত্তমরূপে ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সেই আদেশ পালন করিবার পূর্ব্বে তোমার দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। তোমার দিকে চাহিয়া-দেখিতেও আমার ঘৃণা হইতেছে। যাও, তুমি কামাইয়া স্নান কর, তাহার পর আমার সম্মুখে আসিও।"

আমস্ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "হাঁ, যাইতেছি মহাশয়!"—সে তৎক্ষণাৎ কাউন্ট জোলার্ণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল।

আমস্ কিছুকাল পরে কাউন্টের আদেশ পালন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে কাউন্ট বলিলেন, "হাঁ, এখন তোমাকে কতকটা ভদ্রলোকের মত দেখাইতেছে; এখন যাও, তোমার ঘর পরিষ্কার কর।"

আমস্ কাউন্টের আদেশ পালনের জন্য সারা দিন যেরূপ পরিশ্রম করিল, আমি ও মেরী তাহাকে আর কখন সেরূপ কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত হইতে দেখি নাই।

কাউন্ট জোলার্ণ সেই অবসরে 'ডেভিলস্ কেভে' প্রবেশ করিয়া, তৈল, পেট্রল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য সঞ্চিত ছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র দ্বীপের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে আমি পাহারা দেওয়ার জন্য সমুদ্র-বেলায় গমন করিলাম। সেখানে আমার চারি ঘণ্টা পাহারা দেওয়ার নিয়ম ছিল; সেই চারি ঘণ্টা অতীত হইলে আমসের সেখানে পাহারা দিতে আসিবার কথা ছিল; এজন্য আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কয়েক মিনিট পরে আমস্ আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সে দুই হাতে মুখ চাপিয়া-ধরিয়া 'উঃ, গেলাম, মরিলাম' শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল!

আমি বিচলিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে? ও-ভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছ কেন?"

আমস্ আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "সেই যে বদ্ লোকট বের্লিন হইতে আসিয়াছে—কাউণ্ট বলিয়া যে নিজের পরিচয় দিয়াছে, সে আমাকে দাঁত পরিষ্কার করিবার জন্য একটা টুথ-ব্রস দিয়াছিল; লোহার হুলের মতো সেই শক্ত ব্রস দিয়া দাঁত মাজিতে গিয়া আমার বিলকুল দাঁতের গোড়া জখম হইয়াছে, যন্ত্রণায় মুখ নাড়িতে পারিতেছি না! আমার দাঁতের শূলুনী কত দিনে আরাম হইবে কে জানে? উ-হুহু-ওঃ!"

আমস্ দাঁতের যন্ত্রণায় সমুদ্রতটে দাপাদাপি করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইলাম না। খাসা জব্দ হইতেছে!

আমস্ কাউণ্ট জোলার্ণকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে বলিল, "সারাদিন আমি কি কষ্ট পাইয়াছি—তাহা বলিবার নয়। আমার শরীরের সমস্ত হাড় ভয়ানক টাটাইতেছে। আমার দুই হাঁটু বেলেস্তাবা দেওয়ার মতো ফুলিয়া ঢাক হইয়াছে। এই হতভাগা জার্ম্মাণটার উপর আমার কি রকম ঘৃণা হইয়াছে—তাহা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। আমি কিরূপে উহাকে জব্দ করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি তোমাকে দুই-একটা কথা বলিব, তাহা তুমি মন দিয়া শোনো। এই জার্ম্মাণটা আমাকে বলিতেছিল—যদি আমি তাহার অবাধ্য হই, তাহা হইলে সে আমাকে জার্ম্মাণীতে লইয়া গিয়া সেখানে সামরিক আদালতে আমাকে অভিযুক্ত করিয়া শাস্তিদান করিবে; কিন্তু তাহার এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা—দমবাজি মাত্র!"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "কাউণ্ট এই কথা বলিয়া তোমাকে ভয় দেখাইয়াছেন?"

আমস্ বলিল, "হাঁ, সে না বলিলে আমি উহা জানিলাম কিরূপে? কিন্তু তাহার কথা মিথ্যা নয়? যদি সে আমাকে জার্ম্মাণীতে লইয়া যায়, তাহা হইলে কে তাহাদের এই আড্ডা চালাইবার ভার লইবে? জন-দুই জার্ম্মাণ নাবিক আসিয়া এই ভার লইবে? কিন্তু তাহা কি সম্ভব? মনে কর, সেই সময় যদি বড়-দেশ হইতে আমার পরিচিত দুই-এক জন জেলে এখানে আসিয়া পড়ে? ডোনাল্ডসনরা বা স্কাই-দ্বীপ হইতে কোন লোক হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা ব্ল্যাক-গল ফার্ম্মে আমস্ ক্রোবির পরিবর্ত্তে দুই-এক জন জার্ম্মাণ নাবিককে দেখিতে পাইলে কি মনে করিবে? এই সকল জার্ম্মাণ নাবিক ইংরেজী ভাষায় একটা কথাও বলিতে পারে না। তাহার পর ইংরেজ প্রহরীরা হঠাৎ এখানে আসিয়া পড়িলে তাহার কি ফল হইবে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ।"

আমি নির্ব্বাক্ ভাবে তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম; তাহার কথাগুলি যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, ইহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না।

আমস্ দুই গালে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিল, "আমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছ, সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্যই মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আমাকে এখান হইতে সরাইবার উপায় নাই; সেরূপ করিলে উহাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে—ইহা কি সেই দাম্ভিক জার্ম্মাণটা বুঝিতে পারে নাই? আমাকে বের্লিনে লইয়া যাইলে উহাদিগকে এই আড্ডা উঠাইয়া দিতে হইবে। জার্ম্মাণীর দণ্ড হিট্লার কখন সে কাজ করিবে না। আমি উহাকে এ সকল কথা বুঝাইয়া দিব। হাঁ, এ কাজ আমাকে অবিলম্বে করিতে হইবে, তুমি এখনই আমার সঙ্গে ঘরে চল।"

—

ঊনবিংশ পর্ব্ব

আমসের লাঞ্ছনা

আমস্ ক্রোবির ধারণা হইল, সে তাহার অকাট্য যুক্তির সাহায্যে কাউণ্ট জোলার্ণকে নির্ব্বাক্ করিতে পারিবে। এই জন্য সে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রকূল হইতে গৃহে ফিরিল; তাহার আদেশে আমাকেও তাহার অনুসরণ করিতে হইল। কাউণ্টের সহিত তাহার তর্ক-বিতর্কের কি ফল হয়, তাহা জানিবার জন্য আমারও কৌতূহল হইয়াছিল; সুতরাং আমি গভীর আগ্রহে আমসের পাকশালায় উপস্থিত হইলাম। কাউণ্ট জোলার্ণ তখন পাকশালায় বসিয়া মেরীর সহিত গল্প করিতেছিলেন। তিনি আমস্কে তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিতে দেখিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া

দাঁড়াইলেন, এবং তাহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "সমুদ্রতীরে হাজির থাকিয়া এখন তোমার সেখানে পাহারা দেওয়ার কথা ; এই কর্ত্তব্য পালন না করিয়া হঠাৎ তোমার বাড়ী ফিরিবার কারণ কি শ্রোবি !"

আমস্ রুক্ষ স্বরে বলিল, "আমার কর্ত্তব্যের জন্য আপনাকে মাথা ঘামাইতে হইবে না। আপনাকে আমার দুই-একটি কথা বলিবার আছে ; অত্যন্ত জরুরি কথা—তাহাই বলিতে আসিয়াছি।"

কাউণ্ট নীরস স্বরে বলিলেন, "কি এমন জরুরি কথা যে, তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া তাহাই বলিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলে ?"

আমস্ উত্তেজিত ভাবে কাউণ্টের সম্মুখে দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "কথা এই যে, আপনি—হুম্—তুমি একটি নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী,—আর আমি—"

আমসের মুখের অবশিষ্ট কথা তাহার মুখেই রহিল ! কাউণ্ট জোলার্ণ তাহার প্রায় এক হাত দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমসের মুখ হইতে ঐ কথা বাহির হইবামাত্র কাউণ্ট তাঁহার সুদৃঢ় হস্তের বজ্রমুষ্টি মুহূর্ত্তে উর্দ্ধে তুলিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাহার চুয়ালে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াই, ঘাড় ধরিয়া তাহাকে তুলার বস্তার মতো উর্দ্ধে তুলিলেন ; এবং অদূরবর্ত্তী দেওয়ালে এরূপ বেগে নিক্ষেপ করিলেন যে, আমস্ দেওয়ালে আহত হইয়া পাকশালার মেঝের সেই কোণে ছিট্‌কাইয়া পড়িল, ঘাড় কাত করিয়া পুনঃ পুনঃ খাবি খাইতে লাগিল !

কাউণ্ট জোলার্ণ অটল অচলের ন্যায় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আরক্ত নেত্রে তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ পাণ্ডুর বর্ণ, এবং দুর্দ্দমনীয় নিষ্ঠুরতা তাঁহার কুঞ্চিত অধরোষ্ঠে পরিস্ফুট !

আমস্ দুই-তিন মিনিট আড়ষ্ট দেহে পড়িয়া-থাকিয়া আঘাত-যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে করিতে ধীরে-ধীরে মাথা তুলিল ; কিন্তু চক্ষু মেলিয়া সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল, যেন সে নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল ! অবশেষে সে বুকে ভর দিয়া অদূরবর্ত্তী টেবলের নিকট উপস্থিত হইল, এবং টেবলের পায়া ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাউণ্টের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অতঃপর সে গাঢ় স্বরে বলিল, "তুমি আমাকে মারিয়াছ, আমি অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছি ; আমার সকল কথা না শুনিয়াই আচম্বিতে আমাকে প্রহার করিয়া যে বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছ—তাহা বীরত্ব বলিয়া কাহারও ভ্রম হইবে না। কিন্তু আমার যাহা বলিবার আছে—তাহা তোমাকে শুনিতে হইবে। তুমি আজ সকালে ভয় দেখাইবার জন্য আমাকে বলিয়াছিলে—যদি আমি তোমার আদেশ পালন না করি—তাহা হইলে আমাকে তুমি জার্ম্মাণীতে লইয়া গিয়া সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করিবে। কিন্তু ইহাকে ধাপ্পা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ? তুমি জান, ঐরূপ কার্য্য তোমার অসাধ্য ; তাহা তোমার করিবার শক্তি নাই—তা তুমি কাউণ্টই হও —আর যে-কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীই হও। তুমি এই কারণে আমাকে জার্ম্মাণীতে লইয়া যাইতে পার না যে, আমাকে জার্ম্মাণীতে নির্ব্বাসিত করিলে তোমাদের কোন কোন জার্ম্মাণ নাবিকের হস্তে এই আড্ডা পরিচালনের ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। সেই সময় আমার পরিচিত কোন কোন ইংরেজ স্থানান্তর হইতে আসিয়া যখন জানিতে চাহিবে, আমি কোথায় গিয়াছি—তখন তাহাদের অবস্থা কি হইবে ?—আমি সেই জার্ম্মাণ নাবিকদের কথা বলিতেছি।"

কাউণ্ট জোলার্ণ নীরস স্বরে বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও, এই অঞ্চলে তোমার পরিচিত এরূপ লোক আছে—যাহারা জানে, তুমি স্বদেশের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া 'ইউ'-বোট পরিচালনে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছ ?"

আমস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি সে কথা বলিতেছি না। এই আড্ডা হইতে জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোট-সমূহে খোরাক সরবরাহ করা হয়, এ সংবাদ কোন ইংরেজের জানা নাই। আমি নিজের স্বার্থের জন্য, আমার সর্ব্বনাশ না হয়—এই উদ্দেশ্যে এই সংবাদ গোপন রাখিয়াছি। বাহিরের কোন লোককে ইহা জানিতে দিই নাই। কিন্তু বাহিরের অনেক লোকই ত আমাকে জানে, তাহারা হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া যদি আমার পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণ নাবিকগণকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আমার সম্বন্ধে কি জানিতে

পারিবে ?—তখন সকল রহস্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে; তাহার কি ফল হইবে—ইহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না—তোমাকে সেরূপ নির্ব্বোধ বলিয়া ধারণা করিবার কোন কারণ আছে কি ?"

কাউণ্ট আমসের কথা শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এ তোমার ভুল ধারণা স্কোবি! ও সকল কথা আমি পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়াছি। যদি আমি তোমাকে দণ্ডিত করিবার জন্য জার্ম্মাণীতে লইয়া যাই, তাহা হইলে আমি তোমার কার্য্যের ভার কোন জার্ম্মাণ নাবিকের হস্তে অর্পণ করিব—এরূপ কল্পনা তুমি মুহূর্ত্তের জন্য মনে স্থান দিও না। যে সকল জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোট এই অঞ্চলে যাতায়াত করে—তাহাদের কাপ্তেনরা সকলেই এই আড্ডার কথা জানে, এবং 'ইউ'-বোট সমূহের খোরাক কোথায় সংগুপ্ত আছে—তাহাও তাহাদের সুবিদিত। সুতরাং তুমি এই দ্বীপ হইতে অপসারিত হইলে তোমার সহায়তা ভিন্নও তাহারা গুপ্তস্থান হইতে 'ইউ' বোটের খোরাক সংগ্রহ করিয়া কাজ চালাইতে পারিবে; তাহাদের কাহারও কোন অসুবিধা হইবে না।"

আমস্ বলিল, "কথাটা আমাকে জলের মত সরল করিয়া বুঝাইয়া দিলে! কিন্তু এই যুদ্ধ কত দিন চলিবে —তাহার নিশ্চয়তা নাই; তোমাদের 'ইউ'-বোটগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া সাগরে-সাগরে শত্রুজাহাজ ধ্বংস করিয়া বেড়াইবে, ইহা তোমাদের সমর-নীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু তুমি যে ব্যবস্থার কথা বলিলে—সেই ব্যবস্থায় কিছু দিন কাজ চলিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল তাহা চলিবে না—চলিতে পারে না। মনে কর, এক দিন কোন 'ইউ'-বোটের কাপ্তেন তাহার 'ইউ'-বোটের খোরাক সংগ্রহ করিতে এই দ্বীপে আসিয়া বৃটিশ প্রহরীগণকে এখানে অপেক্ষা করিতে দেখিল—তখন তাহাকে কি সঙ্কটে পড়িতে হইবে না ? সমুদ্রকূল হইতে সাঙ্কেতিক আলোক না দেখাইলে এই দ্বীপে অবতরণ করা কোন 'ইউ'-বোটের পক্ষেই নিরাপদ নহে।—আমার এই যুক্তি অকাট্য।"

কাউণ্ট জোলার্ণ বলিলেন, "হইতে পারে; কিন্তু তাহারও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা কঠিন নহে। এক সপ্তাহের মধ্যেই কেহ আসিয়া এই ভার গ্রহণ করিবে। তুমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ বলিয়াই মনে করিয়াছ—জার্ম্মাণ গোয়েন্দা বিভাগে এমন কোন কর্ম্মচারী নাই যে, এখানে আসিয়া তোমার ভাই বলিয়া অথবা অন্য কোন আত্মীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া এই আড্ডা পরিচালন করিতে অসমর্থ হইবে। আমাদের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এরূপ লোক ডজন-ডজন আছে—যাহারা ইংরেজের মতই ইংরেজী ভাষায় অনর্গল আলাপ করিতে পারে। এখানকার কাজ তাহারা অবলীলাক্রমে পরিচালিত করিতে পারিবে।"

কাউণ্ট জোলার্ণের মন্তব্য শুনিয়া আমস্ নির্ব্বাক ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিয়াছিল—সে জার্ম্মাণীতে নির্ব্বাসিত হইলে ব্ল্যাক-গল ফার্ম্মের কার্য্য পরিচালনের জন্য দুই-এক জন জার্ম্মাণ নাবিক এখানে প্রেরিত হইবে; তাহারা যে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না, এবং সে কাউণ্ট জোলার্ণের নিকট এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবারই চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কাউণ্ট জোলার্ণ অন্য প্রকার ব্যবস্থার কথা বলিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবেন —আমস্ তাহা অনুমান করিতে পারে নাই।

আমস্কে হতভম্ব ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কাউণ্ট জোলার্ণ তাহাকে কঠোর স্বরে আদেশ করিলেন, "আমার যাহা বলিবার ছিল—তাহা তোমাকে বলিয়াছি। অতঃপর আমার কর্ত্তব্য স্থির করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। আমার আর যাহা বলিবার আছে—তাহা তুমি পরে শুনিতে পাইবে; এখন সমুদ্রতীরে যাও, সেখানে তোমার পাহারায় থাকিবার প্রয়োজন আছে। পিটার তাহার কাজ শেষ করিয়া আসিয়াছে, এবার তোমার পালা; কিন্তু তোমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইলে তোমার অমঙ্গল হইবে।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



হুগলী জেলার ইতিহাস

২য় খণ্ড

(ভরশুটের অতীত কাহিনী)

ভূরিশ্রেষ্ঠ নামের উৎপত্তি—ভূরি (বহু) শ্রেষ্ঠী (বণিক্) অর্থাৎ যেখানে বহু বণিক বাস করে, সেই স্থানের নাম ভূরিশ্রেষ্ঠ; চলিত কথায় স্থানটি ভূরশুট নামে পরিচিত।

ভূরশুটের সীমা:—পূর্ব্বে ভাগীরথী, উত্তরে অজয় নদ, পশ্চিমে মানভূম, এবং দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদ ও তাহারই দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদ—ইহাই দক্ষিণ রাঢ়ের সীমা। ভূরশুট এই দক্ষিণ-রাঢ়ে অবস্থিত ছিল (১)। বর্ত্তমান হাওড়া জেলার আমতার নিকটস্থ পেঁড়ো-বসন্তপুর হইতে হুগলী জেলার পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য বিস্তৃত ছিল (২)। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পাণ্ডুদাস নামক রাজা দক্ষিণ-রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। তিনিই এই রাজ্যকে ভূরিসৃষ্টি বা ভূরিশ্রেষ্ঠী নামে অভিহিত করেন। বৈশেষিক-দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ন্যায়-কন্দলীর গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীধর আচার্য্য ভূরশুটের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার ঐ পুস্তকে তিনি নিজের ও ভূরশুটের এই পরিচয় দিয়াছেন:—

> "আসীদ্দক্ষিণ রাঢ়ে চং দ্বিজানাং ভূরিকর্ম্মণাম্।
> ভূরসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরশ্রেষ্ঠীজনাশ্রয়ঃ॥"
>
> —ত্র্যধিক দশোত্তর নবশত শকাব্দে ন্যায়কন্দলী-রচিতা।
> শ্রীপাণ্ডুদাস যাচিত ভট্ট শ্রীধরেণেয়ম্। (৩)

দক্ষিণরাঢ়ে ভূরসৃষ্টি গ্রামের ব্রাহ্মণগণ বহু সৎকর্ম্মবিশিষ্ট এবং এখানে বহু শ্রেষ্ঠী বা বণিকের বাস। ৯১৩ শকে (ইংরেজী ৯৯১ খৃঃ) রাজা পাণ্ডুদাসের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য শ্রীধর আচার্য্য ন্যায়কন্দলী গ্রন্থ রচনা করিলেন।

৯৯১ খৃষ্টাব্দে এই ভূরশুটনিবাসী বাঙ্গালী শ্রীধরই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন। ১০৯২ সালে কৃষ্ণমিশ্র যে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক লেখেন, তাহাতে ভূরশুটের ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধির ও জাত্যভিমানের প্রসঙ্গে অনেক কথার উল্লেখ আছে।

ভূরশুট গ্রামের নামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের একটি গাঞী ছিল। রাঢ়ীয় শ্রেণীর পঞ্চ গোত্রের মধ্যে কশ্যপ গোত্রে শুভ নামে এক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজা ভূরিসৃষ্টিকা বা ভূরিশ্রেষ্ঠীক গ্রাম দান করেন। তাহা হইতেই ভূরিগ্রামী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বল্লালসেনের প্রাদুর্ভাবে ভূরিগ্রামীর প্রাধান্য লোপ হয়। যেমন ভূরশুট হইতে ভূরিগ্রামের উৎপত্তি, তেমনি সিদ্ধল বা সিধলা হইতে সিদ্ধল গ্রামের উৎপত্তি। সিদ্ধল গ্রামের ভবদেব ভট্ট, উড়িষ্যার রাজা হরিবর্ম্মা দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই সিদ্ধল গ্রাম সাতগাঁ রাজ্যের বহির্ভাগে উত্তর-রাঢ়ে অবস্থিত। এক সময়ে ভূরশুট সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ছিল।

তারকেশ্বরের প্রায় ৩ ক্রোশ দক্ষিণে ও দামোদর নদের ন্যূনাধিক ১½ মাইল পূর্ব্বে "দিল আকাশ" নামক গ্রামখানি এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐ গ্রাম রোণ নদীর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। নদীটি এখনও বর্ত্তমান; কিন্তু এখন উহা "রোণের খাল" নামে পরিচিত। 'দিল আকাশের' পূর্ব্বে খুড়ীগ্রাম। বহুকাল পূর্ব্বে ঐ গ্রামে দুর্দ্দান্ত চণ্ডালগণ বাস করিত। "শনিয়া ধাঙড়" নামক পরাক্রান্ত বাগদী এই সকল চণ্ডালের রাজা ছিল। শনিয়া নরবলি দিবে বলিয়া একটি ব্রাহ্মণ-বালককে ধরিয়া-আনিয়া জানিতে পারে, ঐ বালকের বলি দেওয়ার উপযুক্ত বয়স হয় নাই; সুতরাং শনিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। ইহাতে ঐ বালকের প্রতি তাহার মনে স্নেহের সঞ্চার হয়, এজন্য তাহাকে আর বলি দেওয়া হইল না। ঐ বালকের নাম ছিল চতুরানন। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে চতুরানন রাজা শনিয়ার মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক চতুরানন স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিপালক শনিয়াকে পানোন্মত্ত অবস্থায় হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়া বসিলেন।

তারাদেবী নামে চতুরাননের একটিমাত্র কন্যা ছিল—ফুলিয়া-নিবাসী সদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তারাদেবীর বিবাহ হয়। চতুরাননের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সদানন্দ রাজা হইয়াছিলেন। সদানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হন। এই সদানন্দের বংশই পরে ভূরশুটরাজ-বংশ। কৃষ্ণচন্দ্র ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ্যলাভ করেন। এই কৃষ্ণচন্দ্রই খানাকুল কৃষ্ণনগরের ও জঙ্গীপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা।

এই সময়ে গৌড়াধিপতি রাজা গণেশের পুত্র চৈৎমল বা যদু মুসলমান হইয়া হিন্দু-পীড়ন আরম্ভ করেন, কিন্তু মণিলাল নামক সন্ন্যাসী চৈৎমল বা যদুকে সংযত করেন। ইহার পর যদুর

---

(১) সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা

(২) গৌড়ের ইতিহাস ১ম খণ্ড

(৩) Journal of Asiatic Society of Bengal 1912, P. 34.

হিন্দুবিদ্বেষ তিরোহিত হইয়াছিল। রাজা উদয়নারায়ণ উদয়নারায়ণপুর ও বর্ত্তমান হাওড়া জেলার শিবপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করেন। ভূরশুট রাজবংশের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সদানন্দ
|
কৃষ্ণচন্দ্র
|
দেবনারায়ণ
(১৩০৬ শক
হইতে ১৩৮৪
শক পর্য্যন্ত)
|
উদয়নারায়ণ
|
শিবনারায়ণ
|
রুদ্রনারায়ণ
(দ্বিতীয়া পত্নী
রাণী ভবশঙ্করী)
|
প্রতাপনারায়ণ
|
নরনারায়ণ
|
লক্ষ্মীনারায়ণ
(শেষ রাজা)
|
রূপনারায়ণ

ভূরশুট—রাজা রুদ্রনারায়ণ—কালাপাহাড়:—

কালাপাহাড় যদিও পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, তথাপি ভূরশুটের সহিত তাঁহার জীবনের বিচিত্র কাহিনীর ইতিহাসে বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় নিম্নে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস'-প্রণেতা বলেন, কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বাল্যকালে তাঁহার মাতা তাঁহাকে "রাজু" বলিয়া ডাকিতেন। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এই উক্তির সমর্থন করেন। কিন্তু 'হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস'-প্রণেতা বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম "রাজীবলোচন।" তাঁহার বাল্যকালের ডাক-নাম "রাজু" হইতেই "রাজীবলোচন" নাম ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাঁহার নাম যাহাই হউক, আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাঁহার "কালাপাহাড়" নামই ব্যবহার করিব।

কালাচাঁদের পিতা জগদানন্দ 'রায়' উপাধিধারী হইলেও—"একটাকিয়া" ভাদুড়ী-বংশজাত। বর্ত্তমান রাজসাহি, থানা মান্দা, বীরজাওনা গ্রামে বাস ছিল। কালাচাঁদ শ্রীপুর-(কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর—এখন কর্ম্মনাশা-গর্ভে বিলীন) নিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে তিনি গৌড়ের বাদশাহ সলিমান কররাণির নিকট চাকরির উমেদারীতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন।

সলিমান কররাণির কন্যার নাম দুলারি বিবি। তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর,—তখনও তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। কালাচাঁদ এক দিন মহানন্দায় স্নানান্তে স্তবপাঠ করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, সেই সময় দুলারি বিবি তাঁহাকে দেখিয়া এরূপ আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে 'খসম' করিবার জন্য বিবির 'দেল' হইল। কথিত আছে, এই সংবাদ শুনিয়া বাদশাহ কালাচাঁদকে এই বিবাহে সম্মত হইতে আদেশ করিলেন; কিন্তু কালাচাঁদ সম্মতি দান না করায় বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। যথাসময়ে কালাচাঁদ বধ্যভূমিতে নীত হইলে দুলারি বিবি সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ঘাতককে না কি অনুরোধ করিলেন—আগে তাঁহাকে বধ করিয়া পরে বাদশাহের আদেশ পালন করা হউক। কালাচাঁদ এই মহীয়সী মহিলার আত্মত্যাগের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। এই ভাবে তাঁহাদের পরিণয় হইল। 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস'-প্রণেতা ঘটনাটি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন,—সলিমান কররাণি রাজা রুদ্রনারায়ণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধি করিয়াছিলেন, এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ কালাচাঁদকে গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কালাচাঁদের গৌড়ে বাস করিবার সময় এক দিন বাদশাহের পশুশালা হইতে একটি ব্যাঘ্র বাহির হইয়া পড়ে। কালাচাঁদ বলে ও কৌশলে ব্যাঘ্রটি ধরিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে, তাঁহার শৌর্য্যে-বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া দুলারি বিবি তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর কালাচাঁদের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। সম্ভবতঃ এই শেষোক্ত বিবরণই নির্ভরের যোগ্য।

এই বিবাহের পর কালাচাঁদ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন; তৎকালে উড়িষ্যার হিন্দুরাজা হরিচন্দন দেব-ই হিন্দু সমাজের অধিনায়ক; এজন্য কালাচাঁদ হিন্দু সমাজে আশ্রয়লাভের জন্য তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু হরিচন্দন দেব যবনীপতিকে হিন্দু সমাজে গ্রহণের অনুমতি না দিয়া তাঁহাকে কঠোর তিরস্কার করিয়া বিতাড়িত করিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজও তাঁহাকে গ্রহণের অনুমতি দিলেন না। এই ভাবে তিরস্কৃত এবং হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া কালাচাঁদ প্রতিহিংসা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, হিন্দু দেব-দেবী ও হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিবার বাসনা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি "কালাপাহাড়" হইলেন।

কালাচাঁদ প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রথমে রাজা রুদ্রনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভূরশুটে গমন করেন। তিনি রাজা রুদ্রনারায়ণকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রাজা রুদ্রনারায়ণ মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, অবশেষে তিনি অঙ্গীকার করিলেন, রাজার রাজ্যসীমায় তিনি অত্যাচার-উৎপীড়ন করিবেন না। কিন্তু এই কাহিনীর কতখানি সত্য, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিধুভূষণ বাবুর মতে রাজীবলোচন রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতি-ভ্রাতা; কিন্তু এই উক্তি সত্য হইতে পারে না। কারণ, রুদ্রনারায়ণ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ—সদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বংশ; কিন্তু কালাচাঁদ (রাজীবলোচন) বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

সলিমান কররাণি পাঠান। তিনি আকবর সাহের সহিত সন্ধি করিয়া গৌড়ের অধিপতি হইয়াছিলেন। রাজা মুকুন্দদেব রুদ্রনারায়ণের বন্ধু ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পাঠানের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সলিমান ভূরশুট অধিকারের চেষ্টা করায় রাজা রুদ্রনারায়ণ ও উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব তাহাতে বাধা না দিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাজা রুদ্রনারায়ণ উড়িষ্যার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলে কালাচাঁদই উড়িষ্যার সৈন্য ও ভূরশুটের বাঙ্গালী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হইলেন। সপ্তগ্রামে হিন্দু সৈন্যের সহিত পাঠান সৈন্যের যে ভীষণ যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে সলিমানের শোচনীয় পরাজয় হইল। অতঃপর বারংবার যুদ্ধ করিয়াও সলিমান জয়লাভ করিতে না পারায় অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। রাজা রুদ্রনারায়ণ ও মুকুন্দদেব উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সলিমান সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া গৌড়ে প্রস্থান করিবার পর কালাচাঁদ দুলারিকে বিবাহ করিয়া মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কারণ, মুসলমান-দুহিতাকে বিবাহ করায় হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিবার জন্য তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতঃপর তিনি সলিমানের সেনাপতি হইয়া হিন্দুর দেবদেবী ও হিন্দুমন্দির ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন। কালাচাঁদের মুসলমানী নাম

'মহম্মদ ফর্ম্মুলি'। কিন্তু এই সময় হইতে তিনি হিন্দুর নিকট 'কালাপাহাড়' নামে পরিচিত হইলেন।

কালাপাহাড় পাঠানের সেনাপতিত্ব লাভ করিয়া পাঠান সৈন্যসহ উড়িষ্যা-যাত্রার আয়োজন করিলেন। ভূরশুটের ভিতর দিয়া গৌড় হইতে উড়িষ্যা যাইবার সোজা পথ ছিল। রাজা রুদ্রনারায়ণের নিকট তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া কালাচাঁদ অতি সংযত ভাবে সসৈন্যে ভূরশুট অতিক্রম করিলেন। ভূরশুট অতিক্রম করিবার সময় যে স্থানে তিনি শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটির নাম 'পাহাড়পুর'। ইহা তারকেশ্বরের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ভূরশুট অতিক্রম করিয়াই কালাচাঁদ কালাপাহাড়ী হাত দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব এই সময় বিদ্রোহী সামন্তরাজগণের বিপ্লবে নিহত হইয়াছিলেন; সুতরাং উড়িষ্যা ধ্বংস করা কালাপাহাড়ের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল। জগন্নাথ দেবের পাণ্ডারা জগন্নাথ দেবকে চিল্কা হ্রদের নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কালাপাহাড় তাহা জানিতে পারায় পুরুষোত্তম বিগ্রহ সংগ্রহ করেন এবং ত্রিবেণীতে পাঠাইয়া সেখানে তাহা ভস্মে পরিণত করিবার আদেশ দিলেন। কথিত আছে, হিন্দুরা উহা অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন, পাণ্ডারা ঐ অর্দ্ধদগ্ধ বিগ্রহ উড়িষ্যায় লইয়া গিয়া জগন্নাথ-মূর্ত্তি পুনঃ নির্ম্মাণ করেন। কেহ কেহ বলেন, জগন্নাথ-মূর্ত্তি অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় উড়িষ্যার সন্নিহিত সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; সমুদ্র-গর্ভ হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া জগন্নাথ-মূর্ত্তি পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল; সম্ভবতঃ এই কিংবদন্তীই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

রাজা রুদ্রনারায়ণ ও রাণী ভবশঙ্করী

রাজা রুদ্রনারায়ণের রাজত্বকালে ভূরশুট যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও গৌরবপূর্ণ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত ছিল, এবং ধনধান্যেরও প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইত। সেখানে বিহারী দত্ত নামক ধনাঢ্য গন্ধ-বণিকের একটি মোকাম ছিল। তাঁহার বাণিজ্য-ব্যবসায় সুমাত্রা, জাভা, ও বালীদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এ কথা আজ উপকথায় পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও বিহারী দুর্ভাগ্যক্রমে নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য সংসারের প্রতি আসক্তি না থাকায় তিনি আমতার নিকট কাটশাকড়ায় একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লক্ষ্মণসেনের "শক্তিপুর শাসনে" 'কাঠসঙ্গা' নামে কাটশাকড়ার উল্লেখ আছে। দামোদরতীর হইতে সোজা দশ মাইল দক্ষিণে, এবং সোনামুখী হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বাদসাহী রাস্তার পূর্ব্বধারে কাঠসঙ্গা অবস্থিত। এই রাস্তা যেখানে দামোদর অতিক্রম করিয়াছে, সেই স্থান হইতে কাঠসঙ্গার দূরত্ব ১২ মাইল। কাঠসঙ্গার মৌজা নম্বর ৩৫।* রুদ্রনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে, এই মন্দিরে যে সময়ে মহাসমারোহে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, সেই সময় সেখানে কোন দরিদ্র রমণীর শিশুপুত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছিল। পুত্রের ক্ষুন্নিবারণের আশায় স্ত্রীলোকটি প্রহরীর নিকট কিছু খাদ্য-সামগ্রী চাহিলে প্রহরী তাহাকে কঠোর স্বরে বলিল, "এখনও ব্রাহ্মণ-ভোজন হয় নাই, এখন খাবার মিলিবে না। তোর ছেলে এভাবে আমাদিগকে বিরক্ত করিলে উহাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিব।"—অবশেষে প্রহরী জননীর ক্রোড় হইতে রুদ্যমান শিশুটিকে ছিনাইয়া লইয়া, আছাড় মারিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইল। ইহাতে সেই জনতার ভিতর হইতে অসন্তোষপূর্ণ চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইলে, রাজা রুদ্রনারায়ণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি শিশুর মাতার নিকট তাহার রোদনের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং শিশুকে কোলে লইয়া ভাণ্ডারে প্রবেশ করিলেন, এবং আহারদানে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। শিশুর ভোজনকালে এক জন সন্ন্যাসী রাজার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভগবান তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। তিনি দরিদ্রের মুখ দিয়াই আহার্য্য গ্রহণ করেন। ঐ ক্ষুধিত শিশুর মুখ দিয়া তিনি ভোজন করিয়াছেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে তুমি পুত্রলাভ করিবে। তুমি পুনরায় বিবাহ কর; সেই পত্নীর গর্ভে তোমার পুত্র জন্মিবে।" সন্ন্যাসী এই বর প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরিণত বয়সে তাঁহার বিবাহ করা কি উচিত হইবে?

অতঃপর এক দিন তিনি নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে নদীতীরে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, একটি রূপসী তরুণী অশ্বে আরোহণ করিয়া হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার বর্শার সাহায্যে একটি ভীষণাকৃতি দুর্দ্দান্ত বন্যমহিষকে আক্রমণ করিয়াছে। উভয়ে ভীষণ যুদ্ধে রত। কিছুকাল যুদ্ধের পর মহিষটি নিহত হইল। এই অদ্ভুত দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি তীরে উঠিয়া যুবতীর পরিচয় লইলেন, এবং জানিতে পারিলেন, যুবতীর নাম ভবশঙ্করী, তাঁহার পিতার নাম দীননাথ চৌধুরী। এই যুবতীই রাজা রুদ্রনারায়ণের দ্বিতীয়া মহিষী রাণী ভবশঙ্করী।

দীননাথ চৌধুরী তাঁহারই রাজ্যের খ্যাতনামা যোদ্ধা ছিলেন। পুত্র না থাকায় কন্যাকেই তিনি শৈশবাবধি অস্ত্র-ব্যবহার, অশ্বচালনা প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার হস্তে তরবারি থাকিলে কেহই তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিত না। মহাশক্তি তাঁহার প্রতি প্রসন্না ছিলেন। ভবশঙ্করীর প্রতিজ্ঞা ছিল, যে বীরপুরুষ অসিযুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—রাজগুরুর আদেশে বিনা অসিযুদ্ধেই তাঁহাকে রাজা রুদ্রনারায়ণের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিতে হইল; তবে রাজা যে দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করিতেন না, তাহা তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছিল।

রাজা রুদ্রনারায়ণ কয়েক বৎসর পরে নাবালক পুত্র প্রতাপনারায়ণকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন; রাণী ভবশঙ্করীই নাবালক পুত্রের রক্ষার ও সুশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণ জীবিত থাকিতে পাঠানগণ কখনও মাথা তুলিতে পারে নাই। পাঠান সেনাপতি ওসমান যখন দেখিলেন, রুদ্রনারায়ণ পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র নাবালক, এবং স্ত্রীলোক রাজ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে, তখন পাঠান সেনাপতি সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া ভূরশুট আক্রমণের সঙ্কল্প

* সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৩৯ ভাগ, ২য় সংখ্যা।

করিলেন। বৈধব্য অবস্থায় রাণী ভবশঙ্করী কাটশাকড়ার শিব-মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মন্ত্রী দুর্লভরাম ও সেনাপতি চতুর্ভুজের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ইষ্ট-দেবতার আরাধনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

এই সময়ে ওসমান, সেনাপতি চতুর্ভুজের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসঘাতক চতুর্ভুজ ওসমানকে জানাইল, রাণী সন্ন্যাসীদের ভোজন করাইতে কাটশাকড়ার শিবমন্দিরে প্রত্যহ উপস্থিত থাকেন, এবং সেই স্থানে বাসও করেন; অতএব ঐ স্থানেই রাণীকে ধরিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ওসমান এই সংবাদ পাইয়া ১৪।১৫ জন মাত্র রণনিপুণ যোদ্ধাসহ হিন্দুবেশে আমতার বাজারে উপস্থিত হইলেন। ধূর্ত্ত শৃগাল সিংহীকে কৌশলে বন্দী করিবার প্রয়াসী। কিন্তু রাণীর গুপ্তচর পাঠান কুলকলঙ্কের এই ঘৃণিত অভিযান-বার্ত্তা রাণীর গোচর করিল। রাণী কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; সৈন্য-সমাবেশের জন্য সেনাপতি বা মন্ত্রীকেও আদেশ করিলেন না। এদিকে নৈশ-অন্ধকারে পাঠান সেনাপতি অনুচরবর্গ সহ রাণীকে বন্দী করিবার আশায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধাবিত হইল। রাণীর প্রহরিণীবর্গ মন্দিরের বহির্ভাগে সতর্কভাবে কর্ত্তব্যপালনে রত ছিল।

আততায়ী পাঠানগণের সহিত মুষ্টিমেয় প্রহরিণীগণের যুদ্ধ বাধিলে যোধবৃন্দের কোলাহলে, অস্ত্রের ঝনঝনায় ধ্যানমগ্না রাণীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া অসিহস্তে মন্দিরের বহির্ভাগে উপস্থিত হইলেন; তখন উভয় পক্ষে প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ চলিতেছিল। রাণী অবিচলিত চিত্তে নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে বীরাঙ্গনা দেহরক্ষিণীদের অসির আঘাতে ওসমানের অনুচরবর্গের অধিকাংশ নিহত হইল। ওসমান এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া রাজ্ঞীর তেজঃপূর্ণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাণী ওসমানের এইরূপ ভীরুতার পরিচয় পাইয়া তাহাকে সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইতে, অথবা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে আদেশ করিলেন। ওসমান রাণীর তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দুই জন মাত্র অনুচর জীবিত, তখন পলায়ন ভিন্ন প্রাণরক্ষার উপায় নাই। অগত্যা পলায়ন করিয়া তাহাকে প্রাণরক্ষা করিতে হইল। রাণীর নিকট জগৎ-সিংহজয়ী পাঠান সেনাপতি ওসমানের এই প্রথম পরাজয়।

রাণী ভবশঙ্করী স্বয়ং সৈনিকদিগকে যুদ্ধ-শিক্ষা দিতেন। তাঁহার দেহরক্ষীরা সকলেই নারী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে পুরুষ যেমন বীর ছিলেন, নারীও সেইরূপ বীরাঙ্গনা ছিলেন। তাঁহারা বীরপ্রসূ, বীরের জননী ছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে হিন্দু মহিলার বীরত্বের, সাহসের এই গৌরবময় কাহিনী আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন, কোন উপন্যাসেও তাহার স্থান হয় নাই।

ওসমানের দ্বিতীয় আক্রমণ

পাঠান সেনাপতি ওসমান এই ভাবে বিফলমনোরথ ও অবমানিত হইয়া পলায়ন করিবার পর নির্লজ্জের ন্যায় পুনর্ব্বার রাণীর সেনাপতি চতুর্ভুজের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। ওসমানের প্রথম আক্রমণের সময় চতুর্ভুজ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন; কিন্তু এবার তিনি ওসমানকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এবারে ওসমান পাঁচ শত সুশিক্ষিত সৈন্যসহ রাণীর বিরুদ্ধে গোপনে অভিযান করিল এবং সদলে নৈশ-অন্ধকারে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কথিত আছে, কোন ব্যাধ ঐ জঙ্গলে পক্ষী শিকার করিতে আসিয়া অরণ্যমধ্যে অশ্বের খুরচিহ্ন দেখিতে পায়। সে কৌতূহলভরে অগ্রসর হইয়া বহু সৈন্য-সমাবেশ লক্ষ্য করিল। সে অবিলম্বে নগরে কোতয়ালকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কোতয়াল সেনাপতিকে সংবাদ দিলে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি চতুর্ভুজ তাহাকে তাড়াইয়া দিল, বলিল, উহা মিথ্যা কথা। কিন্তু পাছে সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং রাণী সন্দেহ করেন, এই ভয়ে চতুর্ভুজ সৈন্যদলসহ খানাকুল অভিমুখে যাত্রা করিল। সৈন্যগণের অভাবে রাজধানী অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। মন্ত্রী গুপ্ত ষড়যন্ত্র বুঝিয়া রাণীকে সংবাদ পাঠাইলেন।

বাশুড়ীর কালীবাড়ী

রাণী ভবশঙ্করী বৈশাখী অমাবস্যায় বাশুড়ীর কালীবাড়ীতে পূর্ণাভিষেক জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন। রাণীর গুরু ও দুর্লভরাম গুপ্তচর-মুখে পাঠানের আক্রমণ-সংবাদ জানিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্ভুজের ষড়যন্ত্রও তাঁহার গোচর হইল। রাণীকে সংবাদ দেওয়া হইল, পাঠানেরা সেই রাত্রিতেই বাশুড়ী আক্রমণ করিবে। রাণী কিন্তু পূর্ণাভিষেকের সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। সুতরাং মন্ত্রী ও রাণীর গুরু পরামর্শ করিয়া ছাওলাপুরের দুর্গাধিপতিকে গুপ্তভাবে সৈন্য লইয়া বাশুড়ীতে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন, এবং চতুর্ভুজের বিশ্বাসঘাতকতা ও সৈন্যাপসারণ বৃত্তান্তও তাঁহাকে জানাইলেন। এই সেনাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া, চতুর্ভুজকে ধরিয়া আনিবার প্রার্থনা করিলে রাণী তাঁহাকে শান্ত করিয়া বুঝাইলেন, তখন ঐ কার্য্যের সময় নহে। চতুর্ভুজ ভাবিল, এইবার ওসমানের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে—তাহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে; কারণ, সকল সৈন্য তাহারই সঙ্গে ছিল, বিশেষতঃ বাশুড়ী অরক্ষিত। যাহা হউক, সেই অমাবস্যাতেই রাণীর পূর্ণাভিষেক হইল। অভিষেকান্তে রাণীর চেতনা বিলুপ্ত হইল। ওদিকে পাঠান সেনাপতি ওসমান নৈশ-অন্ধকারে দামোদর নদ উত্তীর্ণ হইয়া সসৈন্যে বাশুড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া বাশুড়ী-মন্দির আক্রমণ করিল। ছাওলাপুরের সেনাপতিও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া বাশুড়ীতে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মশালের আলোকে চারিদিক আলোকিত হইল—বাশুড়ীর মন্দির সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অস্ত্রের ঝনঝনায়, সৈন্যগণের বিকট চীৎকারে, অশ্বের খুরধ্বনিতে বহু দূর পর্য্যন্ত ঘন ঘন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে রাণীর মোহ ভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া বীরাঙ্গনার ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, এবং স্বয়ং সৈন্যচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। রাণীকে যোদ্ধৃবেশে সৈন্য-পরিচালনায় অগ্রসর দেখিয়া বাঙ্গালী সৈন্যমণ্ডলী ভীমবেগে পাঠানগণকে আক্রমণ করিল। রাণীর দেহরক্ষায় নিযুক্তা প্রহরিণীরা ও সৈন্যচমূ সবেগে তাঁহার অনুসরণ করিল। এই নারী-সৈন্যের সকলেরই কটিতটে সুশাণিত

অসি, হস্তে তীক্ষ্ণাগ্র শূল। তাহারা সকলেই অশ্বারোহিণী। রাজপুত বীরাঙ্গনাগণ মুসলমানের বিরুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এ ভাবে নারী-দেহরক্ষিণীবর্গে পরিবৃতা হইয়া তাঁহাদের কেহ কখনও শত্রুসৈন্য আক্রমণ করেন নাই। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসে উপেক্ষিত অপূর্ব্ব বিবরণ।

বাগুড়ীর যুদ্ধ

মুসলমানের সহিত যে সকল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই সুনিপুণ যোদ্ধা, নির্ভীক বীরপুরুষ। ওসমানের নেতৃত্বে পাঠান সেনাগণ "আল্লা হো আকবর" ধ্বনিতে গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া হিন্দু সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করিল। ওদিকে রাণীর সৈন্যগণও "জয় কালী" শব্দে পাঠান সৈন্যদের আক্রমণ করিল। ছাওলাপুরের দুর্গাধিপতি এক দিক্ আক্রমণ করিলেন, রাণীও তাঁহার দেহরক্ষিণী নারী-সৈন্য লইয়া অপর দিক্ আক্রমণ করিলেন, এবং মহাশক্তিদত্ত অসি লইয়া পাঠানের দুষ্প্রবেশ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাঠান সৈন্যগণ সেই বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইল। তাহারা রাণীর মুক্তকেশী, অসিধারিণী ভীমা মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হইল। বাঙ্গালী সৈন্য মহাবিক্রমে পাঠান ধ্বংস করিতে লাগিল। অবশেষে পাঠানগণের পরাজয় হইল। তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইল। ওসমান হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলেন। ভূরশুটে পাঠান সেনাপতি ওসমানের এই দ্বিতীয় পরাজয়। ইহার পর ওসমান আর কখনও ভূরশুট আক্রমণ করে নাই।

বাদশাহ আকবর, রাণী ভবশঙ্করীর বীরত্ব-কাহিনী অবগত হইয়া তাঁহাকে "রায়বাঘিনী" উপাধিতে ভূষিত করিয়া, বহুবিধ উপহার দানে তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি রাজা মানসিংহকে ভূরশুটে প্রেরণ করেন।

এই ত গেল রাজরাণীর বীরত্বের কাহিনী। ভূরশুটের সতী-লক্ষ্মীদের সম্বন্ধেও দুই-একটা কথার উল্লেখ না করিলে এই পবিত্র কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিবে।

বর্ত্তমান দুই-এক জন হিন্দুলেখক বলিয়াছেন, নারীজাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য সতীত্ব একটা বাঁধনমাত্র। একালে নারীত্বের তুলনায় সতীত্বের গৌরব সামান্য। বহু শিক্ষিতা হিন্দুনারীর আদর্শ এইরূপ উন্নত হইয়াছে! ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সহমরণ-প্রথা আইন দ্বারা রহিত হইলেও বহু দিন পর্য্যন্ত এই প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। আইনের কঠোরতা সত্ত্বেও অনেক সাধ্বী মহিলা স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত চিতানলে পুড়িয়া মরিতেন; তাঁহাদিগকে স্বার্থপর পুরুষ আত্মীয়গণ বলপূর্ব্বক পুড়াইয়া মারিত—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে; পরন্তু ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, স্বেচ্ছায় তাঁহারা দেহত্যাগ করিতেন। পুরাতন সংবাদপত্র হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সতীর আত্ম-বিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত ভূরশুটেতে বিরল নহে।

৫৮৫ সংখ্যা, ১৬ই বৈশাখ, ১২৩৮ সাল, ইং ১৮৩১—২৮ এপ্রিল, সমাচার-চন্দ্রিকা হইতে গৃহীত—

"১লা শ্রাবণের প্রকাশিত পতিপ্রাণ পত্নী"

সতীনিবারণ আইনের পর যে যে স্ত্রী সতী হন এবং সহগমন করিতে নিবারিতা হইয়া যাঁহারা প্রাণত্যাগ করেন।

জেলা হুগলীর ভূরশুট পরগণার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের ভগীরথ নন্দীর ৭ই আষাঢ় পরলোক হয়, ১৮ দিবস পরে তাঁহার স্ত্রীর কাল হয়।

"১২ই চৈত্র প্রকাশিত পতিপ্রাণ সতী"

জেলা বর্দ্ধমানের ভূরশুট পরগণার খেপু গ্রামের ৺রামমোহন ঘোষের ফাল্গুন মাসে মৃত্যু হয়, কয়েক দিবস পরে তাঁহার স্ত্রী প্রাণত্যাগ করে।

সহমরণ

আমাদিগের পরিচিত কোন বিশ্বস্ত লোকের পত্রের দ্বারা জানা গেল যে, ভূরশুট পরগণার রঘুনাথপুর গ্রামের রামদুলাল বাগ নামক এক ব্যক্তি উত্তররাঢ়ীয় কৈবর্ত্ত—তাহার বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ষট্টি বৎসর হইয়াছিল। কোন রোগোপলক্ষে গত ১৭ই ফাল্গুন রাত্রিতে তাহার পরলোকগমন হইলে করুণাময়ী নাম্নী তৎপত্নী সহগমনোন্মুখী হইয়া একটা আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া মৃত ব্যক্তির পাদদ্বয়ের নিকট বসিল; সে রজনী সকলে জাগরণে যাপন করিলে পরদিন মৃত ব্যক্তির পুত্র শ্রীরামজীবন বাগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ বাগ অত্যন্ত ভীত হইয়া গ্রামের মণ্ডলকে সংবাদ করিলে সে কহিল, এ ভয়ানক ব্যাপার বটে, মণ্ডল প্রভৃতি সতীকে অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত রাখিয়াছিল; যখন সতীপতির অর্দ্ধেক শরীর দাহ হইল, এমত সময়ে সাধ্বী অতি শীঘ্র সাহসপূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক আত্ম-দেহ দাহ করিলেন।

এই সকল সতী হিন্দু রমণীর গৌরব।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)।

মধ্যযুগে বাঙ্গালীর বিদ্যাশিক্ষা

(আলোচনা)

'মধ্যযুগ' বলিতে কোন্ যুগ বুঝায়, ইহা লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মতভেদ লক্ষিত হয়; কারণ, দেশভেদে ও কালভেদে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতি কোথাও দ্রুত, কোথাও অপেক্ষাকৃত মন্থর। এই জন্যই য়ুরোপের ও ভারতের 'মধ্যযুগ' যে একই সময়ে বর্ত্তমান ছিল, ইহা বলিবার উপায় নাই। য়ুরোপের 'মধ্যযুগ'কে কেহ কেহ অতীতের 'অন্ধকার যুগ' (Dark Age) বলিয়াই মনে করেন; অর্থাৎ এই যুগে সংস্কৃতির দিক্ দিয়া জাতির বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা দেখিয়া অনেকে মুসলমান রাজত্ব কালকে ভারতের 'মধ্যযুগ' বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। কেহ কেহ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বের পরবর্ত্তী কাল হইতে 'মধ্যযুগ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সংস্কৃতির ধারা লক্ষ্য করিয়া শেষোক্ত সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হইলেও, বাংলাদেশের শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে 'মধ্যযুগ' বলিতে এইরূপ নির্দ্ধারণ সঙ্গত বলিয়া ধারণা করা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারা বিচার করিয়া কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি রাজা গণেশের সময় (১৪১৪ খৃঃ অঃ) হইতে নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসনকাল পর্য্যন্ত 'মধ্যযুগ' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন

ইঁহাদের মতে 'মধ্যযুগ' পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। শেষ-সীমা সম্বন্ধে এ দেশের শিক্ষিত সমাজের মতভেদ না থাকিলেও আরম্ভকাল সম্বন্ধে মতান্তর লক্ষিত হয়। 'মধ্যযুগ' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যে কালকে বুঝিয়া থাকি, সেই কালের শিক্ষাদীক্ষার ধারা বিচার করিলে দেখিতে পাই, উহার উৎসমুখ বহু দূরে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে, সুদূরবর্ত্তী পালরাজগণের রাজত্বকাল হইতে এই একই ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই ধারাটি ব্রাহ্মণ্য বা পৌরাণিক ধর্ম্মের ধারা। অনেকে বলিতে পারেন—পালনৃপতিগণ বৌদ্ধযুগের লোক; কিন্তু আমরা জানি, গুপ্তসম্রাটগণের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। পালবংশীয়গণের সময়ে হিন্দুধর্ম্মের তরুণ অরুণ প্রদীপ্ত প্রভায় উদীয়মান এবং বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব-রবি তাহার প্রভাবের সায়াহ্নে অস্তাচল-চূড়াবলম্বী। এই নবোদিত হিন্দু-ধর্ম্মের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে পালরাজবংশের অভ্যুদয় কাল—অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দের শেষার্দ্ধ হইতে মধ্যযুগের আরম্ভকাল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, বাঙ্গালার শিক্ষার ইতিহাসে মধ্যযুগ বলিতে নবম শতাব্দীর প্রথম হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত গণ্য করা উচিত। তবে বুঝিবার সুবিধার জন্ত নয় শত বৎসরব্যাপী দীর্ঘ এই যুগকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

(১) বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ যুগ (২) পৌরাণিক যুগ ও (৩) বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যুগ। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা এই তিনটি যুগের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

এই মধ্যযুগে দেশের শাসনকর্ত্তা বিদ্যাশিক্ষায় পরম উৎসাহী ছিলেন, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দেশের সর্ব্বত্র পূজ্য বলিয়া সম্মানিত হইতেন। কিন্তু সেই সময়ে রাষ্ট্রের (State) উদ্ভব হয় নাই, গণশক্তিরও জাগরণ হয় নাই। এইজন্ত প্রজাসাধারণ সরকারের নিকট শিক্ষার অধিকারের দাবী করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যাহাকে আমরা এখন গণশিক্ষা (Mass Education) বলি, তাহার স্বরূপ তখন পৃথিবীর কোন দেশেই মানবচিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। য়ুরোপেও এই শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। সেই কালে রাজার খাসে শিক্ষাবিভাগ বলিয়া কোন বিভাগ ছিল না বটে, কিন্তু বিদ্যোৎসাহী নৃপতিগণ প্রজার মন হইতে অজ্ঞান-তিমির অপসারিত করিবার জন্ত বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেন। সে-কালের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের শিক্ষাদান নিত্যকর্ত্তব্যেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। কেবল যে বৌদ্ধ বা হিন্দুরাজগণই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এরূপ নহে, ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী হোসেন শাহ, নসরৎ শাহপ্রমুখ শাসনকর্ত্তারাও বিদ্যার সম্মান প্রদর্শন করিয়া শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন! তখন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার (Free Primary Education) ধুয়া উঠে নাই, কিন্তু সে-কালের জনসাধারণের শতকরা নিরানব্বই জন গণ্ডমূর্খ ছিল, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে ঠিক শতকরা কত জন নরনারীর অক্ষর পরিচয় ছিল, তাহার কোন তথ্য আজও সংগৃহীত করা সম্ভব হয় নাই বটে, কিন্তু শেষ ভাগের অবস্থা আমরা পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস আলোচনার ফলে সহজেই ধারণা করিতে পারি। এডাম, ওয়ার্ডপ্রমুখ য়ুরোপীয়গণের লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়—এ দেশে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বাঙ্গালার পুরুষদের মধ্যে ন্যূনকল্পে শতকরা ২০ জনের অক্ষর পরিচয় ছিল। মিঃ এডামের বিবৃত অভিমত হইতে জানিতে পারা যায়—বঙ্গদেশে সেই সময়ে এক লক্ষ পাঠশালা ছিল। বর্ত্তমান যুগে স্যার্ ফিলিপ হার্টগ উহা নিরবচ্ছিন্ন গঞ্জিকাধূম বলিয়া অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেও সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা অসম্ভব।

প্রাথমিক শিক্ষা

মধ্যযুগে বাঙ্গালাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কি না, এবং থাকিলে উহার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ অশোকের রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে ধারণা হয়, অশোকের রাজত্বকালে প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। অশোকের পরবর্ত্তীকালে সেই ব্যবস্থার অবনতি হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান হয় না; বরং বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'অক্ষরিকা' ক্রীড়ার উল্লেখ হইতে এইরূপই ধারণা হয় যে, শিশুদের অক্ষর পরিচয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধযুগে সর্ব্ব-সাধারণের জন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হওয়ায় শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল। ফলতঃ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে; তবে এই সকল বিদ্যালয় 'পাঠশালা' নামে অভিহিত হইত কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

প্রাচীন কালে কেবল ব্রাহ্মণগণেরই শিক্ষাদানের অধিকার ছিল; সুতরাং ব্রাহ্মণই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিতেন। পরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণেতর জাতিও শিক্ষা-দানের কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তবে, এ শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে; উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের অধিকার মধ্যযুগের শেষ ভাগেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। বঙ্গদেশে পাঠশালার শিক্ষকতা শেষ পর্য্যন্ত কায়স্থরাই একচেটিয়া করিয়াছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। পৌরাণিক যুগের প্রথমে যখন ব্রাহ্মণ পাঠশালায় শিক্ষাদান করিতেন, তখন ব্রাহ্মণেতর ছাত্রও পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতে যাইত; কিন্তু শুধু ব্রাহ্মণ ছাত্রেরই শাস্ত্রানুশীলনের অধিকার ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণসন্তান উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ত উৎসুক হইত, তাহারা পাঠশালায় গমন না করিয়া অল্প বয়স হইতে গৃহে বা নিকটবর্ত্তী টোলে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিত। বৈদ্যাদি জাতির সাংসারিক জ্ঞানের প্রয়োজন থাকায় ঐ সকল জাতির সন্তান-গণকে পাঠশালায় প্রেরণ করা অপরিহার্য্য মনে হইত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছাত্রদের নিকট পাঠশালার দ্বার বহু দিন পর্য্যন্ত রুদ্ধ ছিল। সে দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন—চৈতন্তদেব ও তাঁহার শিষ্যবর্গ।

সে-কালের পাঠশালাগুলি বিদ্যার 'আলয়' ছিল, বিদ্যা-বিপণি ছিল না। ছাত্রগণকে মাসিক বেতন বাবদ কিছুই দিতে হইত না; তবে রাজা ও প্রজা সকলেই বিদ্যাদাতাকে সাধ্যানুসারে আর্থিক সাহায্য করিতেন, এবং দেবোত্তর সম্পত্তি প্রভৃতি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ শিক্ষকের অন্নকষ্ট নিবারণ করিতেন। ছাত্রগণও নানা দ্রব্য-পূর্ণ সিধা দিয়া গুরুসেবার প্রাচীন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিত। কিন্তু সে দিন আর নাই; বিদ্যা এখন পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অনেক দুঃখেই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষককে "বিদ্যাবণিক্" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

আলোচ্য যুগের প্রথম ভাগে পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, লিখন, পঠন ও হিসাব—ইংরেজীতে সংক্ষেপে যাহাকে বলে, 'Three R's'। পঠনের ভাগ ছিল নামমাত্র, কারণ, মুদ্রিত পুস্তকের তখন অস্তিত্ব ছিল না। ভাষাশিক্ষাও বেশী দূর অগ্রসর হইত না, কারণ, যাহা ভাষা নামে এখন পরিচিত, তখন তাহার ভ্রূণাবস্থা। তখন ইহার অপর নাম 'পৈশাচী প্রাকৃত' বা 'ভাষা'। বৌদ্ধপণ্ডিতগণের কৃপায় এই ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হইতেছিল, এবং সেই জন্য ইহার উন্নতিও হইতেছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ বৌদ্ধ ধর্মের পতন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হইল। ব্রাহ্মণগণ না কি বিধান দিলেন—রামায়ণ-পুরাণাদি এই ভাষায় শ্রবণ করিলে রৌরব নরকে গমন অপরিহার্য্য হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের ফলে নরকে বাস উদার ব্যবস্থা বটে! কিন্তু এই অবস্থায় পাঠশালায় ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। পরবর্ত্তীকালে রামায়ণ-মহাভারতের বাঙ্গালা সংস্করণ হইলে পাঠশালার ছাত্রদের কিছু কিছু সুবিধা হইয়াছিল। মধ্যযুগের শেষ ভাগে পাঠশিক্ষার আরও উন্নতি হইয়াছিল; তবে মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে সে কালে পাঠশিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা ছিল না বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

পাঠশালার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল—লিপিকুশলতা। আধুনিক যুগের পাঠশালার গুরুমহাশয়গণও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। সে-কালে যখন এ দেশে কাগজ আমদানী হয় নাই বা দুর্লভ ছিল, তখন ভূমিতে, তালপাতায়, ও কদলীপত্রে লিখন অভ্যাস করিতে হইত। এখন যেমন ছোট ছোট ছেলেরা প্রথমেই পুস্তক হইতে বর্ণপরিচয় করিয়া পরে লিখিতে শিখে, সে-কালে অক্ষর পরিচয় হইত খড়ির সাহায্যে দাগা বুলাইয়া। 'হাতেখড়ি' কথাটিই ইহার প্রমাণ। এই পদ্ধতিটি আধুনিক শিক্ষকগণ হয় ত বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু ডাক্তার মন্তেসরী,—যিনি শিশুশিক্ষায় যুগান্তর আনিয়াছেন,—তিনিও এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। মন্তেসরী প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পঠনের পূর্ব্বে লিখন শিক্ষা দিলে তাহার ফল ভালই হয়।

গণিত বা গণনা শিক্ষা পাঠশালার ইতিহাসে প্রথম হইতেই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয়, শুধু গণনা শিক্ষার জন্যই লোকে এক সময় ছেলেদের পাঠশালায় পাঠাইত। প্রথমে কি প্রণালীতে গণিত শিক্ষা হইত, তাহা এখন ঠিক জানা যায় না। কিন্তু শুভঙ্করের 'আর্য্যা' রচিত হইবার পরবর্ত্তীকালে পাঠশালায় মৌখিক গণনা-পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালার পাঠশালায় শুভঙ্করী হিসাব শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে। একাধিক ইংরেজ শিক্ষাজীবী উচ্ছ্বসিত ভাষায় শুভঙ্করী শিক্ষা-প্রণালীর প্রশংসা করিয়াছেন। এই জন্যই বোধ হয় বহু দিন পরে আবার বাঙ্গালাদেশের বিদ্যালয়গুলিতে শুভঙ্করের আদর হইয়াছে।

উচ্চশিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা মধ্যযুগে ছিল না। ছিল শুধু প্রাথমিক শিক্ষা বা পাঠশালার শিক্ষা, আর ছিল উচ্চশিক্ষা বা টোল ও সঙ্ঘারামের শিক্ষা। এই দুই প্রকার শিক্ষার মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল না। টোল, চতুষ্পাঠীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—বিদ্যার্থীকে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, ব্যাকরণ, স্মৃতি, কাব্য, দর্শন প্রভৃতিতে পারদর্শী করা। বৌদ্ধবিহারে শিক্ষার্থীরাও ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন, চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতেন। তবে বেদাদি পাঠ না করিয়া তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে হইত। সুতরাং সঙ্ঘারামের শিক্ষাও যে উচ্চশিক্ষার পর্য্যায়ভুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে দেখা যায়, বাঙ্গালাদেশে উচ্চশিক্ষার দুইটি ধারা বর্ত্তমান ছিল, একটি বৌদ্ধ, আর একটি হিন্দু। তখনও বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক নির্ব্বাপিত হয় নাই; তখনও নালন্দা, উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলা অক্ষুণ্ণ ভাবে স্বমহিমা প্রচার করিতেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও পালরাজগণ বিহারের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। জগদ্দলবিহার এই সময়ের কীর্ত্তি। কিন্তু পালনৃপতিগণ বৌদ্ধভাবাপন্ন হইলেও হিন্দুধর্ম্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। এই কারণে দেশে টোল, চতুষ্পাঠীর আদর বাড়িতেছিল। ক্রমে দেখা গেল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতরে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। তাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল—তুর্কী-আক্রমণের পর। তুর্কী-আক্রমণে উদ্দণ্ডপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিহারগুলির ধ্বংসের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিক্ষা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল; এবং তাহাতে হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাও বাধা পাইল বটে, কিন্তু বিলুপ্ত হইল না। বৌদ্ধের সঙ্ঘারামগুলি লোপ পাইলেও, হিন্দুর টোলগুলির অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোক নির্ব্বাপিত হইবার পর হিন্দুর টোল মাথা তুলিতে লাগিল। ইহার ফলে ক্রমশঃ মিথিলা এবং পরে নবদ্বীপ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করিল। পরবর্ত্তী যুগে বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, ও ভট্টপল্লী উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতা বলেন, বাংলার টোলের শিক্ষাপদ্ধতিতে বৌদ্ধ-প্রভাব বর্ত্তমান। তাঁহার মতে—'the life lived till the other day in a Bengali tol must be an exact replica of the life lived in an earlier period in such places as the caves of Ajanta or Ellora.'—(Footfalls of Indian History, p. 245.) তবে তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, বৌদ্ধ-শিক্ষার ধারাও প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নিকট ঋণী।

টোলের শিক্ষা-প্রণালী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে সঙ্ঘারামগুলির শিক্ষাব্যবস্থার কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে। যাঁহারা উত্তর জীবনে শ্রমণ হইতেন, কেবল যে তাঁহারাই বিহারে শিক্ষালাভ করিতেন, এরূপ নহে; যে কোনও বৌদ্ধ-শিক্ষার্থীর সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল। এই সকল স্থানে বেদপাঠ হইত না বটে, কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণ বহু বৎসর ধরিয়া অধীত হইত। কেহ কেহ সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল কেবল ব্যাকরণেরই চর্চ্চা করিতেন! বৌদ্ধবিহারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চর্চ্চা হইত ন্যায়শাস্ত্রের। পরবর্ত্তী যুগের নৈয়ায়িকগণ বৌদ্ধদের নিকট এজন্য ঋণী ছিলেন। বাঙ্গালার গৌরব নব্যন্যায়ের উৎপত্তিস্থল বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের মধ্যেই খুঁজিতে হয়। ঐতিহাসিক মিঃ কী লিখিয়াছেন,—'Mediaeval Indian logic from A. D. 400 to 1200 was almost entirely in the hands of Jainas and Buddhists, and their books on the subject are very numerous.'—(Indian

Education in Ancient and Later Times. F. E. Keay. p 109.) অর্থাৎ '৪০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র জৈন ও বৌদ্ধদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, এবং তাঁহারা ঐ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।' ইহা হইতেই বুঝিতে পারি—টোলের শিক্ষা ও সঙ্ঘারামের শিক্ষার মধ্যে একটা সম্বন্ধ ছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পতনের পর হিন্দুদের মধ্যে যে শিক্ষার আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক বৈদিক ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইল 'পুরাণ' ধর্ম্মের উপর। এই যুগের শিক্ষা সেই জন্য পৌরাণিক শিক্ষা নামে অভিহিত হইতে পারে। পৌরাণিক শিক্ষার যুগে মিথিলা বাঙ্গালার হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এই মিথিলা নবদ্বীপ অপেক্ষাও প্রাচীন। বখ্‌তিয়ারের গৌড়-বিজয়ের বহু দিন পরেও মিথিলা স্বাধীন ছিল।

ন্যায় ও দর্শনের জন্য মিথিলা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালার বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতেই ন্যায়দর্শন কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। নবদ্বীপের খ্যাতি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে বারাণসীতে অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিত বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। তবে বারাণসী কোন দিনও মিথিলা বা নবদ্বীপের ন্যায় শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই।

মধ্যযুগের বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গৌরব নবদ্বীপ। ১০৬৩ খৃঃ অঃ সেনবংশীয় কোন নৃপতি এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২০৩ খৃঃ অঃ বখ্‌তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ জয় করেন; কিন্তু উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া ইহার সুনাম ও প্রতিষ্ঠা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে, এবং চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাবকালে ইহা যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। বাঙ্গালী স্বাধীনতা হারাইলেও নবদ্বীপের গৌরব নষ্ট হয় নাই। মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপের অবস্থা 'চৈতন্যভাগবতে' এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—

> 'নবদ্বীপের সমৃদ্ধি কে বর্ণিবারে পারে।
> এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
> ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
> সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥
> সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব্ব করে।
> বালকে হো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।'

নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন—বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, এবং 'নবদ্বীপচন্দ্র' শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব। ষোড়শ শতাব্দী নবদ্বীপের ইতিহাসে এক সুবর্ণ যুগ। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—এই সময়ে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া নবদ্বীপে শিক্ষালাভ করিত। ভাষার অতিরঞ্জন স্বীকার করিলেও এইরূপই প্রতীতি হয় যে, এখানে বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীর সমাগম হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ১১০০ জন ছাত্র এখানে বিদ্যালাভ করিত। তখন অধ্যাপক-সংখ্যা ছিল ১৫০। ১৬৮০ খৃঃ অঃ রাজা রুদ্রের সময় নবদ্বীপে ৪০০০ ছাত্র ও ৬০০ অধ্যাপকের অস্তিত্ব ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল—আড়াই শ'তে, এবং টোলের সংখ্যা তখন মাত্র ৩০টি।

যে নব্যন্যায় বাঙ্গালার গৌরব, তাহার জন্মস্থান এই নবদ্বীপ। এক সময় ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইয়াছিল—এই ন্যায়ের জন্যই। স্মৃতি ও ব্যাকরণের স্থান ছিল তাহার নিম্নে। সে-কালে অন্যত্র বহু দিন দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া বহু প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিতে এখানেই আসিতেন, অর্থাৎ নবদ্বীপ ছিল—সে-কালের 'পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট্ ডিপার্টমেণ্ট।' তবে সে কালের শিক্ষাপ্রণালী ছিল ভিন্ন প্রকার। নোট লিখাইয়া দিয়া বা অনর্গল বক্তৃতা করিয়া তখনকার দিনে অধ্যাপনার রেওয়াজ ছিল না। সে-কালের শিক্ষাপ্রণালী ছিল এইরূপ :—দুই জন অধ্যাপক দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের কোন জটিল সমস্যা লইয়া তর্ক করিতেন। ছাত্রগণকে তাঁহাদের সেই তর্ক শুনিয়া জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে হইত। বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ মনে হইলে শিষ্যরা অধ্যাপকগণকে প্রশ্ন করিতে পারিতেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-প্রণালীর মত ইহা প্রাণহীন ছিল না। নবদ্বীপের রাজারাও এক-এক সময় পারিষদবর্গসহ পণ্ডিতদের তর্ক শুনিতে আসিতেন, এবং তর্কে বিজয়ী পণ্ডিতকে যোগ্য পুরস্কারদানে সম্মানিত করিতেন।

প্রাচীন কালে শিষ্যের গুরুগৃহবাসের ন্যায় টোলের ছাত্রগণও প্রথম যুগে টোলেই বাস করিত, কিন্তু ক্রমশঃ সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। প্রথমে টোলে শুধু ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার ছিল। চৈতন্যদেবের সময় হইতে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হয়। তাই মুকুন্দ ও নরহরি সরকার বৈদ্যসন্তান হইয়াও নবদ্বীপের টোলে দর্শন পাঠ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তবে কায়স্থ বা অন্যান্য শ্রেণীর সৎশূদ্রেরও ন্যায় ও স্মৃতির টোলে প্রবেশাধিকার ছিল না। পরে বৈষ্ণবের টোলে সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্র শিক্ষালাভ করিতে পারিত। মধ্যযুগে টোলে সৎশূদ্রের প্রবেশাধিকার না থাকিলেও তাহাদের উচ্চশিক্ষা লাভের পথ মুক্ত ছিল। ধনবান্ সৎশূদ্র গৃহে পণ্ডিত রাখিয়া পুত্রগণকে সংস্কৃত কাব্য-ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করাইতেন। এই জন্য মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে দেখিতে পাই—শ্রীমন্ত 'বেণের' পুত্র হইয়াও অল্প বয়সে ভারবি, মাঘ ও কালিদাসের কাব্য অধ্যয়ন করিয়াছিল।

পারসী শিক্ষা

মধ্যযুগে প্রাথমিক শিক্ষার বাহন ছিল—মাতৃভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষা, এবং উচ্চশিক্ষার বাহন ছিল—সংস্কৃত। মুসলমান-বিজয়ের পর আর একটি ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহা পারসী। মুসলমানী শিক্ষার ইহাই প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রথমে মুসলমানদের মক্তবে ও মাদ্রাসায় ইহার স্থান ছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন ইহা আদালতের ভাষায় (Court-language) পরিণত হইল—তখন হিন্দুদের পক্ষেও ইহা শিক্ষা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

বাদশাহ সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে হিন্দুরা সর্ব্বপ্রথম পারসী শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হয়। সকলেই জানেন—হিন্দী ও পারসী ভাষার সংমিশ্রণে উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি। যে সকল হিন্দু তখন পারসী শিখিতেন—রাজদরবারে উচ্চপদলাভই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত। হিন্দুদের মধ্যে পারসী শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হয়—বাদশাহ আকবরের রাজত্বে। ইহার কারণ, আকবরের উদার-নীতির ফলে উচ্চ রাজকার্য্যের দ্বার হিন্দুদের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছিল। রাজা টোডরমল্ল পারসী শিক্ষা-বিস্তারে আকবরকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনিই নিয়ম করেন—সমস্ত সরকারী হিসাবপত্র পারসী ভাষায় রাখিতে হইবে। উচ্চ

পদের আশায় মধ্যযুগের শেষ ভাগে কায়স্থসন্তানগণ সংস্কৃত অপেক্ষা পারসীরই অধিকতর পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা মক্তবে যাইতেন না, কোন মুসলমান মৌলভীর বাড়ীতে গিয়া পারসী শিখিতেন। কোন কোন ব্রাহ্মণপুত্রও রাজকার্য্যের লোভে পারসী শিখিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের পিতৃকুলে পারসী শিক্ষার রেওয়াজ ছিল।

স্ত্রীশিক্ষা

মধ্যযুগকে স্ত্রীশিক্ষার 'অন্ধকার যুগ' মনে করিলে ভুল হইবে। উচ্চশিক্ষা স্ত্রীজাতির অধিকাংশেরই ভাগ্যে ঘটিত না সত্য, কিন্তু সাধারণ শিক্ষা অনেক বালিকাই পাইত। বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে ভিক্ষুণীরা উচ্চশিক্ষা পাইতেন, তাহার প্রমাণ থেরীগাথাগুলি। মধ্যযুগের পল্লীগীতিতেও স্ত্রীশিক্ষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি গীতিকথা হইতে জানা যায় যে, সময় সময় অপেক্ষাকৃত বয়স্কা বালিকারাও পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিত। গবেষণার ফলে মধ্যযুগের বহু মহিলা-কবির নাম এ-কালে আবিষ্কৃত হইতেছে। চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী ও দ্রবময়ীর কথা হইতে সে-কালের স্ত্রীশিক্ষার আভাস পাওয়া যায়। বৈষ্ণবসমাজেও বিদুষী নারীর বিশেষ অভাব ছিল না। সেরূপ অভাব ঘটিলে মাধুরীদাস বৈষ্ণবপদ-রচয়িত্রী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন না। হটী বিদ্যালঙ্কার বাঙ্গালার বিদুষীগণের অলঙ্কার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; তাঁহার অনেক শিষ্য-শিষ্যা ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর স্ত্রীশিক্ষার কিছু প্রমাণ পাই—মুকুন্দরামের কাব্যে। কবিকঙ্কনের খুল্লনা বেণের মেয়ে হইয়াও লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন; সুতরাং মধ্যযুগে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা আমরা যতখানি শোচনীয় মনে করি, তাহা সেরূপ শোচনীয় ছিল না—এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ (এম-এ, বি-টি)।

পতিতার বিচার

প্রচার-মন্দিরে আসি' প্রভু যিশু মৃদু হাসি'
ধর্ম্মকথা কহেন সকলে,
শিষ্যগণ এক মনে অমৃতের বাণী শুনে
ভাসে সবে নয়নের জলে।

হেন কালে ব্যভিচারী কলঙ্কিনী এক নারী
ল'য়ে আসে ক্রুদ্ধ জনগণ,
নীতিবিৎ কতিপয় ধর্ম্মধ্বজী মহাশয়
প্রভু-পদে করে নিবেদন:—

"ব্যভিচারী পতিতার কর প্রভু সুবিচার
সমাজের মঙ্গলকারণ,
শাস্ত্রের বিধান এই ব্যভিচার করে যেই
লোষ্ট্রাঘাতে তাহার মরণ।"

যিশু মহাপ্রভু ক'ন— "তোমাদের যেই জন
মনে-প্রাণে পবিত্র নিষ্পাপ,
করিয়া সে লোষ্ট্রাঘাত কর এর দেহপাত
দূরে যা'ক ধরার ত্রিতাপ!"

প্রভুর আদেশ শুনি' অন্তরে প্রমাদ গণি'
একে একে চ'লে গেল সবে।

অপমান লাজ-ভয়ে নারী সঙ্কুচিতা হয়ে
রহে সেথা দাঁড়ায়ে নীরবে।
প্রভু যিশু ক্ষণ-পরে কহিলেন স্নেহভরে—
"অভাগিনী কলঙ্কিনী নারী!

তব তনু-মন-প্রাণ পরমপিতার দান,
তোমারে কি শাস্তি দিতে পারি?

তোমার ঐ দেহ মাঝে ভগবান্ সদা রাজে;
অপরাধ ক্ষমিনু তোমার,
পূত তব দেহখানি পবিত্র মন্দির জানি'
কলুষিত করিও না আর।"

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)



অদৃষ্টের অভিশাপ

১

লিলি দরিদ্রের ঘরে জন্মিলেও তাহার রূপের খ্যাতি ছিল; সম্ভবতঃ এই জন্যই সে সম্পত্তিশালিনী নিঃসন্তান মাসিমার স্নেহ আকর্ষণ করিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে আশৈশব প্রতিপালিত হইতেছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে সে পনের বৎসরে পড়িতেই মাসিমার মৃত্যু হইল, এবং তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই মেসোমহাশয় পাকা চুলে টোপর পরিয়া, পুনরায় বিবাহ করিয়া এক ধাড়ী বৌ ঘরে আনিলেন। কাজেই এত দিনের আশ্রয় হারাইয়া দীর্ঘকাল পরে লিলিকে তাহার অপরিচিত পিতৃগৃহেই ফিরিয়া আসিতে হইল।

লিলির পিতা হরগোবিন্দ সেন গ্রাম্য-স্কুলে মাষ্টারী করিয়া কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, এত বড় অনূঢ়া কন্যা আচম্বিতে গলায় পড়ায় তাঁহাকে বিষম বিপন্ন হইতে হইল; কিন্তু উপায় ত কিছু নাই, কাজেই মনের ক্ষোভ দমন করিয়া তিনি পাত্র-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে পাত্র একটি মিলিল; সে তাহার ভাগ্য এবং অটল পুরুষকারে নির্ভর করিয়া যৎ-সামান্য মূলধনে কলিকাতায় ছোট্ট একখানি দোকান খুলিয়াছিল, এবং দেশে তাহার বিধবা মাতা স্বামীর বাস্তুভিটায় কুঁড়ে আগলাইতেছিলেন। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার।

পাত্র স্বয়ং লিলিকে দেখিতে আসিল। সেই রূপমুগ্ধ যুবক লিলিকে এতই ভাল বাসিয়াছিল যে, একটি হরিতকী লইয়াই পরবর্ত্তী লগ্নে তাহাকে বিবাহ করিবার দিন স্থির করিয়া গেল। হরগোবিন্দবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন।

গায়ে-হলুদের দুই দিন পূর্ব্বে লিলি প্রতিবেশী হরিশ রায়ের শিউলীগাছ-তলায় ফুল কুড়াইতে গিয়া হঠাৎ একটি যুবকের সম্মুখে পড়িল; যুবকটি তখন সেই গাছ-তলায় দাঁড়াইয়া ছিল। স্নিগ্ধ প্রভাতের মধুর সৌন্দর্য্যে তখন চারিদিক পূর্ণ; তন্বী তরুণী মূর্ত্তিমতী উষার মত অপরূপ সৌন্দর্য্যে যুবককে মুগ্ধ করিল। সে বাক্‌শক্তি হারাইয়া শুধু এই সজীব, নির্ম্মল আলেখ্যের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার তৃষার্ত্ত দৃষ্টিপাতে লিলি একটু বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল; সে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া কহিল, "কত মেয়ে ত এখানে ফুল নিতে আসে, তোমায় ত কোন দিন দেখিনি? তুমি কোথায় থাক?"

লিলি পূর্ব্বে কলিকাতায় থাকিয়া স্কুলে পড়িত, এবং খুব বেশী পর্দ্দানশীনও ছিল না; কাজেই লজ্জায় বিহ্বল না হইয়া একটু মৌন থাকিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "আমাদের বাড়ী কাছেই।"

"কাছেই? তোমার বাবার নাম কি? তোমারই বা নাম কি?"

"বাবার নাম হরগোবিন্দ সেন। আমার নাম লিলি।" —বলিয়া সে গমনোদ্যতা হইল।

যুবক হরিশ রায়ের ধনী আত্মীয়ের পুত্র সুকুমার; একটা পারিবারিক উৎসবে সে হরিশ রায়ের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সে বলিল, "হরগোবিন্দ সেনের মেয়ে তুমি? তোমারই ত বিয়ে তবে?"

লিলি নতমুখে পলায়নের চেষ্টা করিল; কিন্তু অশিষ্ট সুকুমার তাহার পথরোধ করিয়া কহিল, "শুনেছি, পাত্রটা খুবই গরীব?" কথাটা বলিয়া সে লিলির দিকে আর একটু সরিয়া গিয়া কহিল, "আমার দিকে চেয়ে দেখ দেখি লিলি, আমায় তোমার পছন্দ হয়? আমিও অবিবাহিত। আমার টাকা-কড়ির অভাব নেই, প্রচুরও বলা যায়।—তুমি আমায় বিয়ে করবে?"

লিলি মুখ আরক্তিম করিয়া কহিল, "পথ ছাড়ুন বাড়ী যাই। ছিঃ, কেউ দেখতে পায় যদি ?"

সুকুমার এবার লিলির হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, এবং তাহার চিবুক ধরিয়া মুখখানি উচু করিল। লিলি তখন সবলে আপনাকে মুক্ত করিয়া অত্যন্ত বিচলিত চিত্তে গৃহে ফিরিল।

ইহার পরদিনই গ্রামশুদ্ধ লোক সবিস্ময়ে শুনিল, সুকুমার বিনাপণে লিলিকে বিবাহ করিতেছে। গ্রামের লোক হরগোবিন্দ মাষ্টারের সৌভাগ্যে হিংসায় জ্বলিতে লাগিল, এবং ধাড়ি মেয়ে ঘরে রাখিলে যে কেমন করিয়া ছেলেদের মাথা খাওয়া যায়, তাহার আলোচনায় গ্রামের বিভিন্ন আড্ডা মুখরিত করিয়া তুলিল।

সুকুমারের পিতা পাটের দালালী করিয়া প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া যান। সুকুমার সম্প্রতি সাবালক হইয়া তাহা দুই হাতে উড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িয়া অবশেষে নাম কাটাইয়া সে সম্প্রতি 'কাপ্তেন' হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেজন্য তাহার বিবাহে বাধা ঘটিল না; শুভদিনে সুকুমারের হাতে লিলিকে সম্প্রদান করিয়া হরগোবিন্দবাবু আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

২

লিলি উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রেমিক স্বামীর সহিত কলিকাতায় আসিলে প্রথম দুই-চারি মাস তাহার খুব আনন্দেই কাটিল; কিন্তু ইহার পর সুকুমারের নূতনের মোহ কাটিলে সে তাহার পূর্ব্ব ইয়ার ও মোসাহেবদের দলে মিশিয়া কাপ্তেনী আরম্ভ করিল।

লিলি তরুণী হইলেও চতুরা; তাহার সন্দেহ হওয়ায় সে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "আজকাল ফিরতে তোমার এত রাত হয় কেন? কি খাও তুমি? মুখে এমন বিশ্রী গন্ধ, ছিঃ!"

সুকুমার ভয়ানক চটিয়া-উঠিয়া বলিল, "সকল কথার হিসেব চাইবার তুমি কে? তোমাকে যে বিয়ে করেছি—এই তোমার বাপের ভাগ্যি! আমি কি তোমার বাপের চাকর?"

এত বড় রূঢ় কথা শুনিয়া লিলিও জ্বলিয়া উঠিল, রুদ্ধ-রোষের সহিত কহিল, "বাবার নাম নিয়ে খোঁটা দেওয়ার তোমার দরকার কি? তিনি গরীব হ'লেও তোমার গুরুজন তো?"

সুকুমার পত্নীর ঔদ্ধত্যে ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং জুতা খুলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। তাহার পর কঠোর স্বরে কহিল, "ভারী গুরুজন! আমার এই পায়ে তোমায় দিয়ে তোমার বাবার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হ'য়ে গেছে, তা কোন দিন ভেবে দেখেছ? তেজ দেখাতে আসো আমাকে? গরীবের মেয়ে—ম'রতে ঘর নিকিয়ে, বাসন মেজে, আর উনুনে ফুঁ-পেড়ে,—তা নয়, পায়ের ওপর পা দিয়ে নিশ্চিন্তি মনে পিণ্ডি গিলচো; তাই অত তেজ হ'য়েছে!"

প্রহারের যাতনা লিলির যত না হইল, অপমানের বেদনা তাহার দ্বিগুণ হইল। উত্তেজিত স্বরে সে বলিল, "তোমার এই ধন-দৌলতের চেয়ে তা'তেই আমি শান্তি পেতাম।" হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। একটু পরেই সুকুমার বাহিরে চলিয়া গেল। লিলি সন্ধান লইয়া জানিল, বন্ধুবান্ধব ও বসন্ত বাইজীকে লইয়া সে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে স্ফূর্ত্তি করিতে গিয়াছে।

লিলি স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। স্বামী ফিরিয়া আসিলে সে কি দৃশ্য দেখিতে পাইবে—তাহা কল্পনা করিয়া ঘৃণা ও আতঙ্কে বারম্বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, এবং এই মনুষ্যত্ববর্জ্জিত, কদাচারী, ঘৃণিত নরপশুটাকে লইয়া তাহাকে আজীবন দগ্ধ হইতে হইবে ভাবিয়া ক্ষোভে ও মনের কষ্টে তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল।

গভীর রাত্রে সুকুমার ফিরিয়া আসিল; তখন তাহার ঘোর মত্তাবস্থা। বিতৃষ্ণায় লিলির সারা-চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল; তবু কর্ত্তব্যানুরোধে সে আসিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সুকুমার তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "মেরা বিবিজান, একটু নাচ না ভাই!" দুর্গন্ধে লিলির অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিতেছিল; তড়িদ্বেগে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, "আচ্ছা তুমি শোও, আমি নাচব তোমাকে শুইয়ে।"

সুকুমার টলিতে টলিতে উঠিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কে শোবে?...আমি? কক্ষনো নয়। বাইজী সম্মুখে

যার, সে শোবে শয্যায় ?—রে দুত, তোর এ আব্দার 'শুনি' ইচ্ছি মরিবারে !" পরক্ষণেই সে গান ধরিল, "শ্যামলিয়া বাট রোকেরে ম্যয় ক্যেয়সে যাঁউ যমুনা ?"

ক্রোধে ক্ষোভে লিলির বুক ফাটিয়া যাইতেছিল ; কোন মতে চোখের জল চাপিয়া সে বলিল, "হচ্ছে কি ? ঝি-চাকর সকলে দেখছে, আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি।" —কোন মতে সুকুমারকে শান্ত করিয়া সে ঘুমাইলে লিলি দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

অনেক বেলায় সুকুমার 'খোঁয়ারী ভাঙ্গিয়া' উঠিল ; লিলির দিকে অর্দ্ধমুদিত চক্ষে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমায় রাতে শেকল দিয়ে গিছলে কেন ?"—কণ্ঠস্বর ভয়ানক উগ্র।

লিলি আশা করিয়াছিল, সুকুমার এক বার অন্ততঃ মৌখিক লজ্জাও প্রকাশ করিবে, কিন্তু বিপরীত ব্যবহার দেখিয়া সে বিস্মিত হইল ; বলিল, "ও কথা তোমায় কে বললে ?"

সুকুমার গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল, "পাজি, ছোটলোক, বজ্জাত ! আমার বাড়ী ব'সে তুমি আমার ওপর অত্যাচার করবে, আর আমি তা' জানতে পারব না ? আমার ওপর 'কর্ত্তাত্তি ফলাতে' আসো তুমি কোন্ সাহসে ? তোমার অধিকার কি ?"

লিলি সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, "তা ত' বটেই ! অধিকার আর কি ? বড়লোকের গোয়ালে গরু থাকে, আস্তাবলে ঘোড়া থাকে, ঘরে দামী আসবাব-পত্র থাকে, তেমনি স্ত্রীও থাকে ; তার বেশী অধিকার বড়-লোকের স্ত্রীর নেই।" সে ঘর হইতে চলিয়া গেল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল, আর কোন দিন কিছু বলিবে না। স্বামীর যথেচ্ছাচারে বাধা দিবার অধিকার যদি তাহার না থাকে, তবে যাচিয়া অপমানিত হইবার প্রয়োজন কি ?

৩

সুকুমার যেন কতকটা লিলির উপর আক্রোশেই বিলাসের স্রোতে আরও বেশী করিয়া গা ঢালিয়া দিল। লিলি তাহার প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না, সুকুমারকে ও পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু বলা বাহুল্য, তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

ইহার পর আজ বাগান, কাল গাড়ী, পরশু একখান বাড়ী, এমনি করিয়া তাহার সম্পত্তিগুলি একে একে বিক্রয় হইতে লাগিল। অর্থাভাবে সুকুমার জুয়া ধরিল। তাহার বিলাসিতায় যাহা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও উড়িয়া যাইতে লাগিল। অভাবের দুশ্চিন্তা ভুলিবার জন্য সুকুমার দিবারাত্রি বোতল-বোতল মদ চালাইতে আরম্ভ করিল, এবং এই অত্যাচার সহ্য না হওয়ায় অবশেষে সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইল।—'শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্ !'

এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অপব্যয়ে বিশেষ কিছু রক্ষা পায় নাই ; শেষে যাহা কিছু সম্বল ছিল, লিলি সর্ব্বস্বপণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বামীর চিকিৎসা চালাইতে লাগিল। দেড় বৎসর কৃতান্তের সহিত অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়া, যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহা সমস্তই ব্যয় করিয়া লিলি যে দিন স্বামীকে মৃত্যুদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিল, সে দিন বাস-ভবনখানি এবং লিলির হাতের চুড়ী কয়গাছা-ছাড়া তৃতীয় সম্বল বলিতে কিছুই রহিল না। সুকুমার সুস্থ হইল বটে, কিন্তু দক্ষিণ হাতখানি পঙ্গু হইয়া গেল।

লিলি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া বলিল, "বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে, চল না হয় বাবার কাছে থাকি ?" সুকুমার উত্তর দিল, "তোমার ইচ্ছে হয় যেতে পার। আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না। মরতে হয় এখানেই মরব। স্ত্রী সুদিনের সঙ্গিনী—তা' আমার বেশ জানা আছে।"

ইহার পর লিলি আর কিছু বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। হাতের মূল্যবান চুড়ী ক'গাছা বিক্রয় করিয়া কয়েক মাস চলিল ; কিন্তু আর ত চলে না। কয়েক দিন পরে একখানি সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন হঠাৎ লিলির নজরে পড়িল। সেটি এই ;—

"একটি অশিক্ষিতা বঙ্গমহিলার জন্য শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। ইংরেজী, বাংলা, সেলাই ও গান-বাজনা শিখাইতে হইবে। বেতন যোগ্যতানুসারে দেওয়া হইবে। ভদ্র গৃহস্থ-ঘরের নিঃসন্তান বিপন্না রমণীর

আবেদন সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে। আবেদনকারিণী—নং বক্সের ঠিকানায় পত্র লিখুন।"

লিলি বিজ্ঞাপনটা অনেক বার পড়িল, শেষে স্বামীর কাছে লইয়া গেল।

সুকুমার তখন অতীতের প্রমোদ-সঙ্গিনীদের চিত্রপূর্ণ এল্‌বাম দেখিতেছিল; লিলি সেখানে প্রবেশ করিলে প্রশ্ন করিল "কি ব্যাপার? উহা হয় কি পদার্থ?"—কণ্ঠস্বর বিদ্রূপপূর্ণ!

লিলি বিজ্ঞাপনটা দেখাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সুকুমার তাহা পড়িয়া বলিল, "তুমিই করবে এ কাজ?"

লিলি চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা' ছাড়া উপায় কি? বাঁচতে হবে ত?"

সুকুমার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "তাই ব'লে তুমি চাকরী করতে যাবে? আমার স্ত্রী করবে পরের চাকরী, ওঃ!"

এমন কণ্ঠস্বর লিলি কোনও দিন শোনে নাই। সে ব্যথিত স্নেহভরে স্বামীর অবশ দক্ষিণ হস্ত কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, "নইলে তোমায় কি খাওয়াব? আর যে কোন সম্বলই নেই।"

সুকুমার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিল, শেষে কাতর স্বরে কহিল, "তাই কর তবে।"

৪

লিলি সেই দিনই দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। তিন-চার দিন পরে সে উত্তর পাইল,—'আগামী রবিবার বেলা পাঁচটার মধ্যে বিজ্ঞাপনদাতার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইবে।'

সুকুমার পাশের বাড়ীর একটি ছেলেকে ডাকিয়া লিলির সঙ্গে পাঠাইয়া দিল। নম্বর দেখিয়া বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল। লিলির পরিচয় শুনিয়া একটি দাসী তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। লিলি তখন ভাবিতেছিল, এই দাসীর সহিত তাহার পার্থক্য কতটুকু? দাসী তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলের যে কক্ষের সম্মুখে আসিল—তাহার দ্বারে একখানা সবুজ পর্দ্দা প্রসারিত ছিল। দাসী দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল, "বৌমা, বেরিয়ে এসো গো!"

পর্দ্দা সরাইয়া একটি তরুণী বাহিরে আসিল। তাহার রং কালো, কিন্তু মুখখানা সুশ্রী এবং হাসিমাখা; তরুণী ক্ষীণাঙ্গী। বয়স সতের কি আঠার—তার বেশী নয়।

লিলি নতমুখে নমস্কার করিল। মেয়েটি তাহার হাত ধরিয়া পাশের ঘরে আনিয়া বসাইল; তাহার পর মৃদু হাসিয়া কহিল, "দোষ নেবেন না ভাই, জান্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে—আপনিই কি লিলি গুপ্ত?"

লিলি নতমুখেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। কি ভাবে লিলি এই মেয়েটির সহিত আলাপ আরম্ভ করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। একটু নীরব থাকিয়া সে প্রশ্ন করিল, "পড়বেন কি আপনিই?"—মেয়েটির নাম রাধিকা; সে বলিল, "হাঁ; আমার স্বামী মুখ-হাত ধুয়ে আসছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবেন। এক্ষুনি আসছেন তিনি।"

লিলি আবার একটু থামিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গেই কথা কইলে—কি চলবে না?"

রাধিকা লিলির সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তা' আপনি যখন ওঁর সামনে বেরুতে চান না, তখন আমিই আপনার হ'য়ে কথা কইব। কি বলেন?"

লিলি ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি কি প'ড়বেন? আমি ত খুব বেশী লেখাপড়া জানি-নে, ম্যাট্রিক পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছিলুম।"

রাধিকা সহাস্যে কহিল, "আমি কথামালা পর্য্যন্ত প'ড়েছিলাম; উনি মাষ্টারী ক'রে চরিতাবলীখানা শেষ করিয়েছেন।"

পাশের ঘরে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে উঠিয়া গেল, এবং কিছুকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ওঁকে সব কথা বলেছি। উনি জান্‌তে চান, মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে পেলে আপনার পোষাবে কি?"

লিলি বুঝিল, তাহাকে বিপন্ন জানিয়া এই দয়ালু দম্পতি তাহার যোগ্যতা অপেক্ষা অধিক বেতনে তাহাকে কাজে নিযুক্ত করিতে চায়। সে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া চাকরী গ্রহণ করিতে সম্মত হইল।

রাধিকা একটু ভাবিয়া বলিল, "শ্যামবাজারে আপনার বাড়ী না? শ্যামবাজার থেকে বকুলবাগান অনেকটা পথ; আপনি কি ট্রামে আসবেন?"—কথাটা বলিতে সে যে ক্ষুব্ধ হইল, লিলি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল।

লিলি নয়ন অবনত করিল, এ কথাটা সে পূর্ব্বে ভাবে

নাই। এমন দিন গিয়াছে, যখন সে নিজের 'ড্যামলার কারে' ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে; আর আজ অসংখ্য পুরুষের ভীড় ঠেলিয়া তাহাকে তাহাদের সঙ্গে ট্রামে যাতায়াত করিতে হইবে! তাহার এই বাইশ বৎসরের প্রস্ফুটিত যৌবনের লাবণ্য-বিকশিত দেহ কত কুলোকের আলোচনার বিষয় হইবে। এ কথা ভাবিতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল। পাশের ঘর হইতে গৃহস্বামী তাহাদের আলোচনা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "কেন রাধা, আমাদের 'উইপেট'খানাই তো প্রত্যহ ওঁকে আন্‌তে ও রেখে আসতে পারবে। ট্রামে একা যাতায়াত করা ওঁর উচিত হবে না।"

রাধিকা উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তা হ'লে কাল থেকেই আসছেন ত? বারোটায় মোটর পাঠাব।"—লিলি তাহার সরলতায় মুগ্ধ হইল; নিরাশার নিবিড় অন্ধকারে সে আলোকের ক্ষীণপ্রভা দেখিতে পাইল।

লিলি বাড়ী ফিরিলে সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল—তোমার চাকরীর?"

লিলির নিকট সকল কথা শুনিয়া সুকুমার সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, "বউটির বয়স সতের আঠার'র মধ্যে; তা হ'লে তার স্বামীর বয়স ত্রিশের বেশী না হওয়াই সম্ভব।—কত হবে মনে হ'ল?"

লিলি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আমি ত তাঁকে দেখিনি। তিনি অন্য ঘরে ছিলেন কি না।"

সুকুমার অর্দ্ধ স্বগত ভাবে বলিল, "ওই ত্রিশের মধ্যেই, বেশ···ষোল কলাই পূর্ণ।···তার বৌটি দেখতে কেমন?—তোমার ছাত্রী গো!"

লিলি ঠোঁঠ উল্টাইয়া কহিল, "খুব কালো।—তা হ'লে ওখানে কি চাকরী করব না?"

সুকুমার জিহ্বা ও তালুর সংযোগে অস্ফুট শব্দ করিয়া বলিল, "আমার এখন যা অবস্থা, তাতে তুমি যে-কোন উপায়ে দু'পয়সা রোজগার ক'রে আমায় খাওয়ালেই আমি বাঁচি! ভাল-মন্দ বাচ-বিচার ক'রবার আমার আর দরকার নেই। যে তোমায় বেশী টাকায় রাখবে—সে-ই আমার বন্ধু।"

তাহার কদর্য্য ইঙ্গিত শুনিয়া লিলির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সন্দিগ্ধচেতা কটুভাষীর সহিত তর্ক করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে চলিল।

৫

দিন সাত-আট পরের কথা।

লিলি রাধাকে পড়াইতেছিল। পড়ায় রাধিকার আদৌ আগ্রহ নাই; সে বই ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমার আর পড়তে ভাল লাগে না দিদি!"

লিলি বলিল, "তবে অঙ্ক নিয়ে বসুন।"

"অঙ্ক আমার মাথায় ঢোকে না। তুমি বরং একটা গান গাও; পরশু যে গান গেয়েছিলে—"

"তার চেয়ে আপনি একটু গান শিখলে হ'ত না?"

"হাঁ, হোত বৈ কি! গাধার মতো গলা নিয়ে এই ভর দুপুরে চেঁচাই, আর ধোপারা দড়ি নিয়ে ছুটে আসুক!"—বলিয়া সে লিলির কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল, এবং বালিকার মত তাহাকে দু'হাতে জড়াইয়া-ধরিয়া আব্‌দারের সুরে কহিল, "একটু গল্প কর না ভাই! দেখ দিদি, তুমি যদি আমায় 'আপনি' বলবে, তা হ'লে কিন্তু মজা দেখাব—তা ব'লে দিচ্ছি।—তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ভাই? বাবার নাম কি?"

লিলি অগত্যা গল্পই করিতে লাগিল; বলিল, "আমার বাপের বাড়ী মজিলপুরে। বাবার নাম হরগোবিন্দ সেন। তোমার বাপের বাড়ী কোথায়? এখানে ত বাসা; দেশের বাড়ী কোথায়?"

রাধিকা বলিল, "আমার বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী সবই তোমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের কাছে।—বাপের বাড়ী কল্যাণপুর, শ্বশুরবাড়ী নাজরায়। সেখানে আমাদের এখন আর কেউ নেই।"

নাজরার কথা শুনিয়া লিলি প্রশ্ন করিল, "তোমার শ্বশুরের নাম কি?"

রাধিকা বানান করিয়া বলিল। শুনিয়া লিলি পাষাণ হইয়া গেল! এই মনীশই সেই পাত্র—যাহার সহিত লিলির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়! এই দীর্ঘ কালেও লিলি কোন কথাই বিস্মৃত হয় নাই।

"রাধা!"

এই সম্বোধন শুনিয়া লিলি হঠাৎ চমকিয়া উঠিল।

সে মুখ তুলিতেই সম্মুখে দেখিল, রূপবান যুবক, রাধার স্বামী মনীশ! মনীশের দেহ দীর্ঘ, কৃশ হইলেও বলিষ্ঠ,—যেন একগাছি পাকা বাঁশের সুদৃঢ় সুদৃশ্য লাঠি! তাহার অমল শুভ্র ললাটের উপর স্থানভ্রষ্ট কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ বিশৃঙ্খল ভাবে লুটাইতেছিল; তাহার নিম্নে চিত্রিতবৎ ভ্রূতলে উজ্জ্বল শোভন মনোহর চক্ষু দু'টি জল-জল করিতেছিল। ঘন পত্রাবরণের ভিতর হইতে তাহার দীপ্তি কিছু তীব্র বলিয়া লিলির মনে হইল। মনীশের সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া প্রশান্ত মাধুর্য্য যেন হিল্লোলিত হইতেছিল; ঠিক যেন একটি নবপল্লবিত দেবদারু তরু তাহার সকল সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়া লিলির সম্মুখে সমুপস্থিত!

এই মনীশ?…এত সুন্দর…এত তরুণ…এত মনোরম?…

মনীশও চিত্রার্পিতের মত লিলির মুখ-পানে চাহিয়াছিল। কবির কাছে কল্পনার মত, চিত্রকরের সম্মুখে তাহার আদর্শের মত—নিরাভরণা এই উদ্ভিন্নযৌবনা তন্বী তরুণী তাহার চিত্তকে তন্দ্রালস করিয়া তুলিল। লিলি রাধাকে সরাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল, এবং সম্বিৎ পাইয়া মনীশও সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। রাধিকা উচ্চ হাসিতে যেন প্রায় ফাটিয়া পড়িয়া সেই সঙ্গেই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং পাশের ঘরে গিয়া তাহার স্বামীকে বলিল, "কি গো। ও কি বাঘ না সাপ, পালিয়ে এলে যে বড়?"

"তুমি ইয়ে,—মানে দুষ্টু, শোন।" বলিয়া মনীশ তাহাকে টানিয়া আনিয়া পাশে বসাইল।

রাধিকা বলিল, "বেশ ত তুমি! আমি এখানে বসে থাকি, আর দিদি ওখানে একা বসে, থাকুক! আজ এমন সময়ে এলে যে?"

"বড় মাথা ধরেছে। আচ্ছা যাও, ওঁকে বাড়ী পাঠিয়ে এখানে এসো। আমি শুয়ে থাকছি।"

রাধিকা ও-ঘরে গিয়া দেখিল, লিলি চাদর গায়ে দিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। সে রাধিকাকে বলিল, "এখন তা হ'লে আমার ছুটী ত?"

রাধিকা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল; ঘাড় হেলাইয়া সম্মতি জানাইল।

মোটরে উঠিয়া বসিয়া-পড়িয়া লিলি চোখ বুজিল। এই বাড়ী-ঘর, এই দাসদাসী, এত ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বোপরি ঐরূপ ভালবাসার আধার স্বামী—সবই ত তাহার হইত; শুধু সাজান বাগানে ঝোড়ো-হাওয়ার মত সুকুমার আসিয়া সব লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিয়াছে! যেখানে সে রাণীর আসন পাইত, আজ সেখানে সে দয়ার ভিখারিণী, মাত্র পঞ্চাশটি মুদ্রার পরিচারিকা!…

নিজের নিত্য অভাব, নিত্য অনটনপূর্ণ সংসারের সহিত সে রাধিকার সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ সংসারের তুলনা করিল। নিজের সর্ব্বদা-কটুভাষী স্বামীর সহিত রাধিকার স্নেহশীল, পত্নীবৎসল স্বামীর তুলনা—সে ইচ্ছাপূর্ব্বক না করিলেও তাহার অজ্ঞাতেই মনে উদয় হইল। দীর্ঘনিঃশ্বাস পতনের সঙ্গে তাহার মনে হইল, যে কিছু সুখ-সম্পদ বিধাতা তাহার জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, রাধিকা তাহার সেই অধিকার সমস্তই যেন চুরি করিয়া ভোগ করিতেছে!

লিলি গৃহে প্রবেশ করিতেই ঘরে পানীয় জল না রাখিয়া যাওয়ার অপরাধে সুকুমার তাহাকে গালাগালি আরম্ভ করিল। এ সব লিলির গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু আজ ক্ষুব্ধ মনের উপর এগুলো অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইল। চকিতের জন্য তাহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—তাহার জীর্ণ ভগ্ন পিতৃগৃহের একাংশ, মনীশ বিবাহ করিবার আশায় তাহাকে দেখিতে গিয়া যেখানে বসিয়া আগ্রহভরে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে দিনের সেই পুরাতন স্মৃতিটি আজ কৃপণের ধনের মত লিলির যেন একান্ত আকাঙ্ক্ষিত সম্বল হইয়া উঠিল।

৬

লিলি চলিয়া গেলে রাধিকা ঘরে আসিয়া দেখিল, মনীশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখিলেই বুঝিত, সে অতীতকে হাতড়াইয়া কি একটা হারাণ জিনিস খুঁজিতেছে। লিলিকে দেখিয়া অবধি তাহার মনে হইতেছিল, পূর্ব্বে সে ইহাকে কোথাও দেখিয়াছে, কিন্তু কোথায় এবং কি সূত্রে, তাহা কিছুতেই স্মরণ হইতেছিল না। রাধিকা একটি ছোট কিল উচাইয়া স্বামীর নাকে মৃদু আঘাত করিয়া কহিল, "ইস্! ভাবা হ'চ্ছে কি?"

মনীশ তাহার হাতখানি ধরিয়া কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল, "উনি চ'লে গেছেন?"—রাধিকা "হাঁ" বলিয়া, এ-কথা সে-কথার পর লিলির পরিচয় জানাইল।

মনীশ চমকিয়া উঠিয়া রাধিকার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "হরগোবিন্দ সেনের মেয়ে লিলি?"

রাধিকা একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "তুমি চেন না কি?"

কোন্ ঘটনা উপলক্ষে সে লিলির পরিচয় পাইয়াছিল, মনীশ স্ত্রীর নিকট তাহা প্রকাশ করিল না; শুধু চাপা ক্ষোভের সহিত কহিল, "উনি বনিয়াদী ঘরের বৌ; ও-অঞ্চলে সকলেই ওঁদের চেনে।"

পরদিন লিলি আসিলে রাধিকা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল: বলিল, "তোমার ভগিনীপতি হন উনি, তুমি ওঁর সঙ্গে কথা কবে না কেন শুনি? উনি তোমায় চেনেন ব'ললেন যে!"

লিলির মুখ নিষ্প্রভ হইয়া গেল; অস্ফুট স্বরে সে কহিল, "কেন তুমি ওঁকে ব'ললে? ছি ছি, ভারী অন্যায়!"

"অন্যায় বৈ কি! আমি ওঁকে ধরে আনছি।" বলিয়া রাধিকা ত্বরিত-পদে উঠিয়া গেল।

লিলি আপত্তি করিবার অবকাশ পাইল না; তাহার বুকের রক্ত হিম-শীতল হইয়া উঠিতেছিল! কি করিয়া সে মুখ তুলিয়া মনীশের মুখের পানে চাহিবে?...

চোখের পলক ফেলিবার পূর্ব্বেই অনিচ্ছুক স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে রাধা সেই ঘরে ঢুকিল, এবং লিলির মুখ খুলিয়া দিয়া কহিল, "যদি তুমি কথা না কও, তা হ'লে বুঝব, আমায় তুমি পর ভাবো। ভয়ানক দুঃখ পাবো—তা' ব'লে রাখছি।"

লিলি তথাপি নতমুখে বসিয়া রহিল।

রাধিকা অজ্ঞ; কিন্তু মনীশ তাহার বিপন্ন অবস্থার কারণ উপলব্ধি করিয়া দয়ার্দ্রকণ্ঠে কহিল, "আমি আপনাকে এ-ভাবে কষ্ট দিতে চাই না; কিন্তু রাধাকে দেখছেন ত? ঝি-চাকরের সামনে টানাটানি করতে লাগল ব'লে দায়ে প'ড়ে আসতে হ'ল। ছিঃ রাধা! কেন ওঁকে এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছ? বড় বিরক্ত করছো ওঁকে!"

আর ত নীরব থাকা চলে না; কাজেই লিলি মৃদু স্বরে কহিল, "না, না, বিরক্ত কি? আপনি বসুন।" তাহার ব্যবহারে আড়ষ্ট ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া মনীশ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তাই তাহার কুণ্ঠা দূর করিবার অভিপ্রায়ে হাসিমুখে কহিল, "আপনি যদি কষ্ট না পান, তা হ'লে আমার দিক থেকে ত ষোল আনাই লাভ! রাধার দিদি নেই, আমি তাই এ যত্নে বঞ্চিত ছিলাম, সে আক্ষেপ দূরে গেল।"

লিলি ম্লান হাসিয়া কহিল, "এ অভাগিনীকে আপনারা দু'জনেই যে আত্মীয় ব'লে স্বীকার করতে চাইছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য।"

মনীশ কাতর নেত্রে লিলির দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল বহু পুরাতন স্মৃতি,—যে দিন সে প্রথম যৌবনে মুগ্ধ নেত্রে লিলিকে দেখিয়াছিল, তাহাকে লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া বিবাহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল।

৮

পাঁচ-ছয় মাস পরের কথা।

পূজার উপহারের জন্য মনীশ অলঙ্কারের ক্যাটালগ দেখিয়া রাধিকার গহনা গড়িতে দিবার প্রস্তাব করিতেছিল। উভয়ে মিলিয়া প্যাটার্ণ পছন্দ করিতে লাগিল। পছন্দ হইলে রাধিকা সঙ্কুচিত ভাবে স্বামীকে বলিল, "একটা কথা বলব?"

মনীশ সস্নেহে তাহার মুখখানি উঁচু করিয়া তুলিয়া-ধরিয়া কহিল, "এত সঙ্কোচ কেন রাধা, বল না।"

রাধা বাধ-বাধ স্বরে বলিল, "দিদির হাতে শুধু দু'-গাছা ক'রে কাচের চুড়ী আছে। এক জোড়া রুলী গড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

মনীশ কহিল, "রুলী কেন? চুড়ী, হার,—যা তোমার ইচ্ছে হয় দাও না রাধু! আমি কি তোমায় বারণ করেছি? কিন্তু তুমি দিলেও উনি তা নেবেন কি?"

রাধিকা একমুখ হাসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে ও পারে? আমি ঠিক পরিয়ে দেব দেখো!"

লিলির নিরাভরণ অঙ্গ মণি-মুক্তার অলঙ্কারে সাজাইতে মনীশের অন্তর অনুক্ষণ ব্যাকুল হইত; তথাপি বর্ত্তমানে উহা উচ্চারণ করা পর্য্যন্ত অসম্ভব বলিয়া সে গোপনে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "মেয়েদের গহনা

মেয়েরাই বোঝে ভাল ; আমার মতের অপেক্ষা না রেখে তুমি যা ইচ্ছা দাও। কি দেবে শুনি ?"

রাধিকা উৎসাহ পাইয়া বলিল, "এক জোড়া চুড়ী আর একটা সরু হার,—কেমন ?"

মনীশ ঔদাসীন্যের সহিত কহিল, "বেশ ত।"—কিন্তু মনে হইল, রাধিকা এতটুকু দিয়াই সন্তুষ্ট হইল কেন ? তাহার পর অলঙ্কার গড়িয়া আসিলে রাধিকা এক দিন লিলিকে দেখাইয়া বলিল, "পরিয়ে দাও দিদি !"

লিলি পরাইয়া দিয়া তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিল, "চিরসুখী হও বোন !"

এবার রাধিকা বস্ত্রাঞ্চল খুলিয়া একটা মোড়ক বাহির করিয়া লিলির একখানা হাত ধরিতেই সে সবিস্ময়ে কহিল, "ও কি ! চুড়ী কার ?"

"তোমার। এক সঙ্গে দু' বোনে গয়না পরব ব'লে গড়িয়েছি ভাই—"

লিলির মুখ এ-কথা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিল ; ধীর স্বরে সে কহিল, "পাশের মোড়াটায় কি ?"

তাহার মুখভাব দেখিয়া রাধিকা ভড়কাইয়া গেল ; কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "এক ছড়া হার।"

"ও-সব তুলে রেখে এস।"

"কেন দিদি ?"—তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ।

"আমি পরব না।"

"আমি যে তোমার জন্য বড় পছন্দ ক'রে গড়িয়েছি ভাই !"—রাধিকা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কণ্ঠস্বর বেদনাপূর্ণ।

"অন্যায় করেছ ; আমায় আগে জানালে আমি তোমায় নিষেধ করতুম।"

গৃহে ফিরিয়া মনীশ সকল কথা শুনিল। কেন যে লিলি বেতন ব্যতীত তাহাদের দেওয়া সামান্য বস্তুটুকুও লয় না, মনীশ তাহা ভাল করিয়াই বুঝিত ; যেখানে লিলি সংসারের অধীশ্বরী হইত, সেখানে আজ সে দয়ার দান লইবে,—এবং তাহাও আবার রাধিকার হাত দিয়া ? ...রাধিকা তাহার যাহা হরণ করিয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে কি ওই দুই-একখানা তুচ্ছ গহনায় ?...

মনীশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "বিশ্বনিয়ন্তা ! যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা আশাতীত, তাহাতেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা দাও কেন ? এ কি তোমার নিষ্ঠুর অমোঘ বিধান প্রভু ?..."

সে ভাবিল, লিলি তাহার অনায়াসলভ্য ছিল, তবু সে বিধাতার কোন্ নিষ্ঠুর বিধানে তাহার সান্নিধ্য হইতে অন্তর্হিত হইল ? কিন্তু সে ক্ষতি মনীশ ভোলে নাই, শুধু চাপা পড়িয়াছিল ; আর সেই লিলিই সর্ব্বস্ব হারাইয়া এক দিন নিয়তি-পরিচালিত হইয়া ভিক্ষার ঝুলি লইয়া তাহারই দুয়ারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইল ! আজ সমাজ-সংস্কার, লোক-লজ্জা, সমস্ত বাধা ডিঙ্গাইয়া লিলিকে আপনার করিয়া লইবার জন্য তাহার শান্ত শোণিত-কেন্দ্রে অকস্মাৎ এ কি মরণোন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে ? ...মনীশ অসীম বেদনার সহিত ভাবিত, তাহার এই বিপুল সম্পদ যদি পূর্ব্বে থাকিত, তবে কি সে লিলিকে হারাইত ?...চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী সেই ত তাহার কাছে ধরা দিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে পাওয়ার অর্দ্ধেক আনন্দ যেন লিলির অভাবে অপূর্ণ !

দ্বিতীয় দিনে লিলি আসিলে মনীশ ক্ষুব্ধ অভিমানের সহিত কহিল, "কাল আপনি আমাদের দু'জনকেই বড় ব্যথা দিয়েছেন লীলা দেবী।...আমরা কি আপনার এতই পর ? কোন স্নেহের দাবী কি আমরা করতে পারি না ?"

গলার স্বরটা যে ঠিক অনুযোগের নয়, তার চেয়েও যেন কিছু বেশী—এই রকমই লিলির মনে হইল ; কিন্তু সে সংযত হইয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "মনীশ বাবু, আপনারা ব্যথিত হবেন জানি আমি ; কিন্তু একটু ভেবে দেখলে আপনারা আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।"—বলিয়া একটু মৌন থাকিয়া সে কহিল, "এক সময়. আমারও সুদিন ছিল : অনেক বহুমূল্য গহনা আমি প'রেছি। আজ আমার সব গেছে—আত্মসম্মানটুকু ছাড়া। · আপনাদের দেওয়া গহনা প'রে আমার স্বামীর সামনে কি ক'রে দাঁড়াতে পারি বলুন ত ?"—মনীশের মুখের পানে চাহিয়া লিলি থামিয়া গেল ; রাধিকার অপেক্ষাও তাহার মুখ অধিক ব্যথিত, বেদনাক্লিষ্ট।

সেই বেদনাতুর মুখখানি লিলির হৃদয়ের মাঝে দিন দিন অনুক্ষণ পীড়া দিতে লাগিল। তবু লিলি এই একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিল যে, সে মনীশের দান গ্রহণের

অদম্য লোভকেও দমন করিয়াছে। মনীশের দেওয়া তুচ্ছ উপহারও তাহার পক্ষে অমূল্য বস্তু, তাহাও সে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছে!

৮

আরও কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছিল।

মনীশের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সে ব্যবসায়ী মানুষ; তার নিজের বেশ বড় আফিস ছিল, পূর্ব্বে সে এগারটা—পাঁচটা আফিস করিত, কিন্তু সম্প্রতি সে ইচ্ছানুরূপ আফিসে যাতায়াত করিতে লাগিল; অর্দ্ধেক দিন আফিস কামাই করিত। কিন্তু তাহার এই অমনোযোগের ফলে প্রচুর ক্ষতি হইতে লাগিল; কর্ম্মচারীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু মনীশ তাহাতে দৃক্‌পাত করিল না। বাড়ীতেও মহা অশান্তি চলিতে লাগিল; মনীশ সর্ব্বদা বিরক্ত, সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া রাধিকার সহিত কলহ করিত, তাহাকে তিরস্কারও করিত; কোন কোন দিন অনাহারেই আফিসে বাহির হইত।

ব্যাপার দেখিয়া লিলি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার কারণানুসন্ধান করা যাহার সর্ব্বাগ্রে উচিত, সে কিছুই করিল না; শুধু অকারণে লাঞ্ছিত হইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

এক দিন লিলি আসিয়া দেখিল, রাধিকা অত্যন্ত শুষ্কমুখে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। লিলি তাহার পাশে বসিয়া সস্নেহে কহিল, "কি হয়েছে রাধা?"

রাধিকা অঞ্চলে সিক্ত চক্ষু মুছিয়া কহিল, "আজ ভাই মিছামিছি রাগ ক'রে, না খেয়ে আফিসে চলে গেল।"—একটু নীরব থাকিয়া কহিল, "পুরুষ জাতটা বড়ই নির্দ্দয়, নয় দিদি!"

লিলি তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "ঠিক বলেছিস রাধা! আমায় যদি কেউ পুরুষ-চরিত বর্ণনা করতে ব'লে, তা হ'লে আমি বলি, এরা সত্যিই আগুন! দূর থেকে বড় সুন্দর, দেখলে বুকে ক'রে রাখতেই ইচ্ছে করে। একটু কাছে যাও, তার অল্প তাতটাও মিষ্টি লাগবে; কিন্তু আরও কাছে পাবার লোভে যদি বুকে নিয়েছ—অমনি মরেছ! দয়া-ধর্ম্ম এরা জানে না, পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে, তার পর আর ফিরেও চাবে না! তবু এ অভাগা জাতকে বুকে করাই যে নারীর স্বভাব!"

মনীশ আসিয়া সহাস্যে দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। সে এইমাত্র আসিয়াছে—এখনও কাপড় ছাড়ে নাই।

লিলি আবার বলিল, "কিন্তু ওদের নইলেও যে চলে না। সংসারের প্রত্যেক পদেই যে ওদের চাই! জানি পুড়ে মরব, তবু ত দূরে রাখা যায় না! কিন্তু প্রদীপ ও পতঙ্গের উপমা ত চিরদিন অমর হ'য়ে আছে!"

সহসা রাধিকার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া মনীশ কহিল, "তুমি এখনও খাওনি রাধা? যাও, খেয়ে এস—"

রাধা কহিল, "তুমি?"

"আমি খেয়েছি। সত্যি বলছি। যাও, আর দেরী কোর না, বেলা প'ড়ে এলো।"

রাধিকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া গেল।

খোলা জানালা দিয়া রৌদ্রদীপ্ত আকাশের পানে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া মনীশ বলিল, "আমি শুনেছি সব। পুরুষের সম্বন্ধে আপনি যা বললেন, এ কি আপনার মনের কথা? আপনি কি নিজে এ ভাবে পুড়েছেন?"

তাহার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, যাহাতে লিলি চমকিয়া মুখ তুলিয়া মনীশের মুখের দিকে চাহিল, কি দেখিল সেই জানে; কিন্তু সে সসঙ্কোচে দৃষ্টি নত করিল।

মনীশ ক্ষণকাল বোধ হয় উত্তরেরই প্রত্যাশা করিল; তাহার পর কহিল, "কিন্তু প্রদীপ ও পতঙ্গের উপমা যে প্রত্যক্ষ সত্য, তা ত আমি নিজেকে দিয়েই স্পষ্ট দেখছি। প্রদীপ ত বেশ নির্ব্বাত-নিষ্কম্প আছে, কিন্তু পতঙ্গ যে অনেক কাল আগেই দগ্ধ হ'য়ে গেছে!"

লিলির সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল; আবেগরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "এ কি বলছেন আপনি?"

অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে মনীশ কহিল, "আমায় বাধা দেবেন না। এক বার পর-স্ত্রীলুব্ধ নির্লজ্জ হ'য়ে আমার মনের আগুন ব্যক্ত করতে দিন?...ঈশ্বরের নিষ্ঠুর পাশা-খেলার দানে আজ আপনি পরস্ত্রী; কিন্তু এক দিন আমারই কাছে আসবার জন্য আপনি দু'হাত বাড়িয়েছিলেন, এবং আমিও প্রাণের সমস্ত আগ্রহ, একাগ্রতা ঢেলে-দিয়েই আপনাকে বরণ করতে চেয়েছিলুম,—মাঝ থেকে কেন

যে সব ওলট-পালট হ'য়ে গেল, তা আপনার জানা থাক্‌তে পারে।"

নিস্তব্ধ কক্ষের মাঝে তাহার ব্যথিত করুণ স্বর কাঁপিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। একটু নীরব থাকিয়া সে পুনরায় ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "সে দিন আপনার রূপটাকেই ভালবেসেছিলুম, আপনাকে নয়; কিন্তু নিয়তির কঠোর ইঙ্গিতে আপনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হ'ল। এবার রূপ নয়, আপনার আভ্যন্তরীণ স্বর্গীয় পদার্থ কৌস্তভের মতো মন আমায় মুগ্ধ—অভিভূত ক'রলে!"

"মনীশবাবু, মনীশবাবু!…"

"এখন শুধু জানতে চাই, আমার এ মৌন অর্ঘ্য আপনার কাছ-পর্য্যন্ত পৌছেছে কি না? আমার এ নিঃশব্দ নিবেদন আপনার অন্তর স্পর্শ ক'রেছে কি না?"

মুহূর্ত্তের জন্য লিলির নিকট অতীত ভবিষ্যৎ মুছিয়া গেল; সারা বিশ্ব হরিৎ হইয়া উঠিল,—দুই কর্ণবিবর ভরিয়া স্বর্গীয় ঝঙ্কার বহিল। কিন্তু সে নিমিষের জন্য; পরক্ষণেই লিলি আত্মস্থা হইয়া কহিল, "এ-কথা আপনার আমাকে বলা উচিত নয়, এবং তার উত্তর যাই হোক, আমি দেব না।…কিন্তু এর পর আমার আর এ-বাড়ীতে আসাও অনুচিত। কাল থেকে আমি আর আসব না।"

মুহূর্ত্তের মধ্যেই মনীশ সজাগ হইয়া যুক্তকরে কহিল "আমার দুঃসাহস ক্ষমা করুন। আমার ওপর দয়া ক'রে এই অপ্রিয় ঘটনাটা বিস্মৃত হ'ন।…রাধাকে কি বলব আমি?"

লিলি বলিল, "রাধাকে ব্যথিত করবেন না, সে অত্যন্ত সরলা,—" বলিয়া সে দাতে ঠোঁট চাপিয়া বলিল, "বলবেন, হাঁ বলবেন—তার অনুপস্থিতিতে আমি আপনাকে প্রলুব্ধ করেছিলুম।"

উল্টা! মনীশ কাতর কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

লিলি চাদরটা গায়ে জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; দুয়ারের বাহিরে আসিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া স্তব্ধ নির্ব্বাক্ মনীশের দিকে তাহার তৃষিত চক্ষুদু'টি নিবদ্ধ করিল, তাহার পরই নিঃশব্দে নামিয়া গেল।

৯

চার বৎসর পরের কথা।

মনীশ আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিল, সহসা টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া শুনিল, মাড়োয়ারী হস্পিট্যাল হইতে তাহাকে ডাকিতেছে। লিলি নাম্নী কোন রোগিণী তাহার সহিত অন্তিম-সাক্ষাৎ করিতে চায়—শুনিয়া মনীশ স্তব্ধ হইয়া গেল। এত দিন পরে পাষাণী তাহাকে ডাকিল কি না অন্তিমকালে!

পরক্ষণেই সে মাড়োয়ারী হস্পিট্যালে যাত্রা করিল। সমস্ত পথ সে শুধু ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিল, যেন শেষ দেখা হয়।

সেখানে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিল, পাঁচ দিন পূর্ব্বে কে বা কাহারা অনাথা বলিয়া উহাকে হাসপাতালে রাখিয়া গিয়াছে।

মনীশ ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আর কি বাঁচান যায় না উহাকে?" অত্যন্ত ব্যাকুল স্বর!

বন্ধুস্থানীয় অধ্যক্ষ অপাঙ্গে তাহার দিকে চাহিয়া, একটু হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যে বড় কাতর হ'লেন দেখ্‌ছি! উনি কে? প্রথম যৌবনের কোন কিছু—"

মনীশ সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিল, "বাঁচান যায় না? কি রোগ—"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "রোগ কিছুই নয়; অনাহারে পাকস্থলী শুকিয়ে গেছে। সন্ধ্যে কাটবে না।"

মনীশ ভূতাবিষ্টের মত আড়ষ্ট ভাবে রোগীর কক্ষে চলিল।

পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই সে চমকিয়া উঠিল,—এই কি সেই রূপের ডালি লিলি?…এ যে জরাজীর্ণ কঙ্কালমাত্র!…অনাহারে লিলি এমন হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে?……

আপনাকে কথঞ্চিৎ সম্বৃত করিয়া মনীশ লিলির শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "লিলি!"—

লিলি স্তিমিত দৃষ্টি মেলিল; নির্জ্জীবতায় তাহার চোখের দৃষ্টি পর্য্যন্ত ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে! মনীশের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিবার পর সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "তুমি এসেছ!"—তাহার শীর্ণ কপোল বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিল।

"লিলি, লিলি,—এ কি করলে তুমি!" মনীশ লিলির

শীর্ণ হাতখানা চোখের উপর চাপিয়া ধরিতেই তাহা রুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল।

বহুক্ষণ নীরবে কাটিয়া যাইবার পর মনীশ প্রশ্ন করিল, "তোমার স্বামী—তাঁর বাড়ী—"

লিলি মৃদুকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই,—মনীশের বাড়ীর চাকরী যাওয়ার সংবাদ শুনিয়াই সুকুমার হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিতে যায়, এবং তাহাতে তাহার মাথার শিরা ছিঁড়িয়া মৃত্যু হয়। বাড়ীখানা সুকুমারের জনৈক 'সুহৃদ' জাল দলিলের সাহায্যে গ্রাস করে। নিরাশ্রয় হইয়া লিলি পিত্রালয়ে গেল। পিতা পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছিলেন; বিধবা মাতা নিজের ও কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের যোগ্য অর্থের অভাবে মনের কষ্টে জলে ডুবিয়া চিন্তার দায় হইতে মুক্তিলাভ করেন।

এত দূর শুনিয়া মনীশ কাতর কণ্ঠে কহিল, "তখনও আমায় জানালে না কেন?—তার পর?"

লিলি আড়ষ্ট স্বরে কহিল, "এক গৃহস্থের বাড়ী চাকরাণী-গিরি চাকরী নিয়েছিলুম; তবে একটু উঁচুদরের ঝি-গিরি।" বলিয়া সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর বলিল, "যত দিন খাটতে পেরেছি, তত দিন সেখানেই ছিলুম, অক্ষম দেখে শেষে তারা এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। চার বছর আমি পেট ভ'রে খাইনি মনীশ!"—বলিয়া সে মনীশের বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিল।

মনীশ কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠে কহিল, "এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে আজ শেষমুহূর্ত্তে আমায় ডেকে—"

অশ্রুসজল চক্ষে মনীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের কথা শেষ হইল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া চলিল। অকস্মাৎ নীরবতা ভাঙ্গিয়া লিলি বলিল, "একটু জল দাও, ওঃ, বড় কষ্ট!" সে মনীশের হাতখানা প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিল।

মনীশ তাড়াতাড়ি একটু জল দিয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "লিলি, লিলি!"......

বার-কয়েক লিলির বিবর্ণ ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, আঁখিপল্লব দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল; তাহার পরই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে শান্ত হইয়া গেল।

ধরিত্রীর বুকে তখন শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সেই সান্ধ্য অন্ধকার মনীশের চক্ষুতে তামসী নিশীথিনীর সূচিভেদ্য অন্ধকার অপেক্ষাও নিবিড়,—অসীম বলিয়াই প্রতিভাত হইল।

শ্রীমায়াদেবী বসু।

কুফল

স্রষ্টা-মানব, শিল্পী ও কৃতী, আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক,
সুফল ফলিতে তারা দিল যত কুফল ফলিল তার অধিক!
ছিল না জীবনে এতো আড়ম্বর,
এতো ঘনীভূত বালাইয়ের স্তর,
সৃষ্টির নব সম্ভারে বৃথা বেড়ে গেল প্রয়োজন,
বাঁচা মরা সে তো প'ড়ে আছে আজো তবু শত বন্ধন!

জ্ঞান লভি' লভি' সভ্য জগৎ হয়ে গেল জ্ঞানহারা,
বাণীর প্রসাদে বীণা হ'ল খর, বহে অশান্তি-ধারা!
কে চেয়েছে সুখে মেঘ-জাল বোনা—
আকাশের বুকে করি আনাগোনা,
আজ হানা দিতে কে করিবে মানা, কুফল ফলিল যত!
বৃথা প্রয়োজনে আহ্বান করি আপদ বেড়েছে শত!

খলের কবলে সুধা হ'লো বিষ নিশ্বাস বিষময়,
গরল উগারি অমৃতে মিশায়ে দিল শুধু পরিচয়
সভ্যতা নামে সবটুকু ছল,
ক্ষতির অঙ্ক বাড়িছে কেবল,
লাভ ষোল আনা ছিল' এর চেয়ে সনাতনী ফিরে পাওয়া!
বন্য জীবন সেও ছিল ভালো প্রকৃতির সাথে ধাওয়া!

শ্রীকমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ, বি-কম্)।



ওলন্দাজ উপনিবেশের শিল্প-বাণিজ্য

য়ুরোপের যুদ্ধ আর এখন য়ুরোপের সীমায় আবদ্ধ নাই; ইহা আফ্রিকা মহাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে, এবং সম্প্রতি ত্রিশক্তি-চুক্তির পর সুদূর প্রাচীও এই মহাযুদ্ধে বিজড়িত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জাপান পূর্ব্ব-এসিয়ায় যে New order-এর প্রতিষ্ঠার সংকল্প অবিরত কোদণ্ড-টঙ্কারে জগতে বিঘোষিত করিতেছে, তাহাতে বৃটেন ও আমেরিকাকে শঙ্কান্বিত হইতে হইয়াছে। প্রাচ্যে ইহাদিগের উপনিবেশ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট স্বার্থ বিপুল। কিন্তু এই দুইটি শ্বেতজাতি ব্যতীত অন্য দুইটি শ্বেতজাতির স্বার্থও পূর্ব্ব-এসিয়ায় সামান্য নহে,—তাহারা হইতেছে ফরাসী ও ওলন্দাজ। ভাগ্যবিড়ম্বনাবশতঃ তাহারা জাপানের উদ্দেশ্য প্রতিরোধ করিবার কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে না পারিলেও একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। চীনের উপর আক্রমণ আরও তীব্রতর ভাবে চালাইতে পারিবে বলিয়া জাপান ইতিমধ্যেই ফরাসী ইন্দোচীনে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অবস্থাভিজ্ঞ অনেক লোক মনে করেন যে, ইহা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও জাপানের এইরূপ অগ্রগতির মূল প্রেরণা হইতেছে—তাহার বহুকাল-পোষিত দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণেরই অভিলাষ। ইন্দোচীন ও শ্যামের ভিতর দিয়া জাপান যদি সমুদ্রতীরে উপনীত হইতে পারে, তাহা হইলে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড—সকলেরই উপনিবেশ সমূহ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। মোটের উপর তুলনা করিলে দেখা যায়, এই সকল উপনিবেশের মধ্যে হল্যাণ্ডের উপনিবেশের গুরুত্বই অধিক। সেই জন্য ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ্ বা পূর্ব্ব-এসিয়ায় অবস্থিত ওলন্দাজ উপনিবেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে প্রকাশিত হইল।

মালয়-দ্বীপপুঞ্জ

মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণস্থিত মালয়-দ্বীপপুঞ্জই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ দ্বীপ-সমাবেশ। এই দ্বীপপুঞ্জে বহুসংখ্যক বৃহৎ দ্বীপ আছে। প্রাচীন কালে এই অঞ্চল মহাচীনের প্রভাবাধীন ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ নাবিক ম্যাগেলানের ভূপরিভ্রমণের কিছু কাল পর হইতেই এই সকল উর্ব্বর ও রমণীয় দ্বীপে য়ুরোপীয় জাতি সমূহের দৃষ্টি নিপতিত হয়, এবং দ্বীপগুলি অধিকারের জন্য তাহারা পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করে; তাহার ফলে অতীতে একাধিকবার যুদ্ধবিগ্রহও হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময় মালয় ও তৎসন্নিহিত (প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশ-দ্বারে অবস্থিত) দ্বীপ সমূহে তিনটি শ্বেতাঙ্গ জাতি প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে—বৃটিশ, আমেরিকান ও ডাচ্। শ্যাম রাজ্যের দক্ষিণস্থ মালয় উপদ্বীপের অধিকাংশ (ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টস, ফেডারেটেড্ ও গণ-ফেডারেটেড্ মালয় ষ্টেটস্) এবং বোর্ণিও ও নিউগিনির কতকাংশ বৃটিশ শাসনাধীন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত। অনেকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ ব্যতীত যব দ্বীপ, সিলিবিস্, সুমাত্রা এবং বোর্ণিও ও নিউগিনির কিয়দংশ লইয়া ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ্ নামক ওলন্দাজ উপনিবেশ সংগঠিত।

ওলন্দাজগণের অধিকারভুক্ত দ্বীপ সমূহের মধ্যে কতকগুলি নগণ্য হইলেও অন্য কয়েকটির প্রাকৃতিক সম্পদ অতুলনীয়। বিশেষতঃ, গত দুই শতাব্দীব্যাপী অক্লান্ত বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টায় ওলন্দাজগণ ইহাদিগকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। খনিজ, প্রাণিজ, ও উদ্ভিজ্জ—সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদনেই ইহারা এত দূর উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে যে, আধুনিক জগতে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজ্ একটি প্রধান প্রাচ্য বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। খনিজ তৈল, পাম্ তৈল (নারিকেল তৈলজাতীয়), রবার, কুইনাইন, শর্করা প্রভৃতির জন্য অনেক জাতিই আজ হল্যাণ্ডের মুখাপেক্ষী। বস্তুতঃ, এই প্রাচ্য রাজ্যখণ্ডের জন্যই হল্যাণ্ড জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি-সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সামরিক ব্যতীত ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যে কত অধিক, তাহা উক্ত উপনিবেশ সম্বন্ধে নিম্নপ্রদত্ত স্থূল পরিচয় হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। ওলন্দাজাধিকৃত দ্বীপগুলির মোট আয়তন প্রায় ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার বর্গ-মাইল; এবং জনসংখ্যা ৬ কোটি ৭ লক্ষেরও অধিক।

যব দ্বীপ

অন্যান্য ওলন্দাজ দ্বীপ-অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও যবদ্বীপের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য অনেক অধিক। কারণ, পূর্ব্ব-এসিয়ার ওলন্দাজ রাজ্যের অধিবাসিগণের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক যব দ্বীপে বাস করে। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যব দ্বীপে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান। অধিবাসিগণ নিরীহপ্রকৃতি; অধিকাংশ লোক গ্রামেই বাস করে। যাতায়াতের জন্য ডাচ সরকার-নির্ম্মিত রেল ও ট্রাম-পথই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। নদীর কর্দ্দমাক্ত তীর ও প্রচণ্ড স্রোত নদীপথে ভ্রমণের প্রধান অন্তরায়।

আগ্নেয়গিরি-উৎক্ষিপ্ত লাভা-প্রবাহসম্ভূত যব দ্বীপের মাটী অত্যন্ত উর্ব্বর। সেই জন্য এই দেশে এক দিকে স্বভাবজ তরুলতাদির পুষ্টি যেমন সতেজ ও দ্রুত, কর্ষিত-ফসলের উৎপাদনের হারও সেইরূপ অধিক। বন্য উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট বাঁশ, সেগুন, পাইন,

আবলুস্, অগুরু প্রভৃতি নানাবিধ দামী কাষ্ঠকর বৃক্ষ বর্তমান। ওলন্দাজ সরকারের প্রচেষ্টায় অনেক নূতন ফসলও সাফল্যের সহিত উৎপাদিত হইতেছে; তন্মধ্যে সিঙ্কোনা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় সমকালেই ভারতে ও যবদ্বীপে সিঙ্কোনার চাষ আরম্ভ হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ব্বাচন, প্রজনন ও পালন করিয়া চাষে এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, যব দ্বীপ এখন কুইনাইন উৎপাদনে সমগ্র জগতের বাজারে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কুইনাইন প্রস্তুতের প্রধান কারখানা ব্যাণ্ডোয়েঙ্কে অবস্থিত। বিরাট বাগিচা সমূহে ইক্ষু, চা, কফি, রবার, কোকো, কোকা-নারিকেল প্রভৃতিও বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। মশলা ও গন্ধতৈলও এই দ্বীপের বহির্ব্বাণিজ্যের অন্যতম পণ্য।

ডাচ্ বৈজ্ঞানিকগণ অন্য দেশ হইতে আনীত ফসলকে যব দ্বীপের জলবায়ু ও মৃত্তিকাসহ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে গীদে অঞ্চলে একটি সুবিস্তৃত-পরীক্ষা-ক্ষেত্র ও পালনাগার স্থাপিত হইয়াছে। বুইটেনজর্গের প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তাত্ত্বিক উদ্যান হইতেও এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়।

যব দ্বীপে দুই শতাধিক জাতীয় পক্ষী দেখা যায়। বনে-জঙ্গলে বাঘ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, হরিণ, শূকর প্রভৃতির অভাব নাই। এখানকার বাঘ নরভুক নহে; নদীতে ও উপকূলস্থ সমুদ্রে যথাক্রমে কুম্ভীর ও এক জাতীয় তিমি পাওয়া যায়। বিষধর ও অন্যান্য জাতীয় সর্পও প্রচুর। যব দ্বীপবাসীরা সর্প-ভক্ষণে অভ্যস্ত। সর্প ও অন্যান্য সরীসৃপের বিচিত্র বর্ণের চর্ম্ম আধুনিক সময়ে নানা দেশে রপ্তানি হইতেছে। শুটকি মাছ ও সামুদ্রিক শামুক (ত্রিপ্যাং) নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহে চালান যায়। জান্তব তৈল ও চর্ব্বির ব্যবসায়ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। যব দ্বীপের 'বাটিক' নামক বহু বর্ণে শোভিত মনোমুগ্ধকর বস্ত্র উক্ত দেশের অন্তর্জ্জাত চারুশিল্পের নিদর্শন। 'ক্রিশ' (কিরিচ) নামে অভিহিত নক্সা-করা মালয় তরবারিও অনেক বৈদেশিক পর্য্যটকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে।

সুমাত্রা ও বোর্ণিও

সুমাত্রা দ্বীপ মালয় উপদ্বীপ ও যব দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার বর্গফল ১৬৫০০০ মাইল। জনসংখ্যা ৭০ লক্ষের উপর; অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্য; সুদূর মধ্যভাগে দুই-একটি নরভুক জাতি বাস করে। নদী সমূহের কিয়দংশ জলযান চলাচলের যোগ্য। উদ্ভিদ্‌সমষ্টি যব দ্বীপ অপেক্ষাও বিশাল ও বিচিত্রতর। পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ পুষ্পপ্রসবী গাছ—Rafflesia arnoldii এই দেশেই দৃষ্ট হয়। এই বিরাট ফুলের ব্যাস ২ হইতে ২১০ হাত। দ্বীপে বহুবিধ প্রাণীও আছে; তাহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে বনমানুষ বা ওরাং-ওটাং; সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপের গভীর অরণ্যমধ্যেই ইহারা বাস করে। শিকারীর উপদ্রবে ইহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

চন্দন, আবলুস্, গুপারি, নারিকেল, খদির (চাকা), পিপুল, রঞ্জন-উৎপাদক দামার ও লবান প্রভৃতি গাছ স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এই দ্বীপে চা, রবার, এলাচি প্রভৃতির বাগিচা বহু সংখ্যায় স্থাপিত হইয়াছে, এবং দ্বীপে জনবসতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বোর্ণিও বৃহৎ দ্বীপ; ইহার বর্গফল ২৯০,০০০ মাইল। বৃটিশ অধিকৃত অংশ উত্তর দিকে অবস্থিত। উহা সমস্ত দ্বীপের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ; অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ওলন্দাজ শাসনাধীন; এই অংশের জনসংখ্যা ২১ লক্ষ ১৪ হাজার।* জনসমষ্টি দায়াক, মালয়, নেগ্রিটো, বুগি ও চীনা জাতিসমূহ দ্বারা গঠিত। দায়াকরা পূর্ব্বে অতীব ভীষণপ্রকৃতি ছিল; এখন অনেকটা শান্তস্বভাব হইয়াছে। সমুদ্রতীরবাসী দায়াকগণ মৎস্য শিকারে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। সাম্পিটান নামক ৮ ফুট দীর্ঘ ফুঁকনল (Blow pipe) শিকারের প্রধান যন্ত্র। ইহা দ্বারা ২৫ ফুট দূর পর্য্যন্ত বেগে তীর নিক্ষেপ করিয়া মৎস্য বিদ্ধ করা যায়। জলে কাসমারী ফল ফেলিয়া মৎস্যকে অজ্ঞান করিতেও দেখা যায়। বড় বড় খুঁটির উপর দায়াকরা গৃহ নির্ম্মাণ করে। দুর্গম অঞ্চলে ইহারা বড় বড় গাছ কাটিয়া ও তৎসমুদয় মাটীর উপর পাশাপাশি শায়িত করিয়া রাস্তা তৈয়ারী করে।

দ্বীপের অভ্যন্তরে নিবিড় অরণ্যরাজি বিরাজিত। অন্তর্জ্জাত উদ্ভিদ্ সমূহের মধ্যে আবলুস্, চন্দন, কর্পূর, দারুচিনি ও নানাবিধ রঞ্জন-উৎপাদক বৃক্ষাদিই প্রধান। বোর্ণিও ও সুমাত্রার যে তরু হইতে কর্পূর পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ কর্পূরতরু Cinnamomum Camphora হইতে স্বতন্ত্র। ইহার নাম Dryobalanops aromatica এবং ইহা প্রধানতঃ উত্তর বোর্ণিও, উত্তর-পশ্চিম সুমাত্রা ও লাবুয়ান নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে উৎপন্ন হয়। এই স্বভাবজ কর্পূর বৃক্ষকাণ্ডের ভিতর কঠিন অবস্থায় জমিয়া থাকিতে দেখা যায়। এক প্রকার কীট গর্ত্ত করিয়া কাণ্ডের ভিতর বায়ু-প্রবেশের পথ করিয়া দেয়; তাহাতেই কর্পূর জমাট বাঁধে। যে সকল গাছ উক্ত প্রকার কীটাক্রান্ত না হয়, সে সকল গাছে কর্পূর তরল অবস্থাতেই (Camphor oil) থাকিয়া যায়। এই কর্পূরের নাম Borneo Camphor;—ভারতের বাজারে ইহা 'ভীমসেনী কর্পূর' নামে পরিচিত।

প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ্জ সম্পদ অপেক্ষা বোর্ণিওস্থ খনিজ সম্পদই অধিকতর মূল্যবান। এখানকার বহু বিস্তৃত তৈল-খনি সমূহ ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজকে জগতের অন্যতম মোটর তৈল (Motor fuel)-উৎপাদন-কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে। বালিক পাপুয়ানই ডাচ্ সেল তৈল (Dutch Shell Oil) রপ্তানির প্রধান বন্দর। শুনা যায়, এই স্থান হইতে জাপানের আবশ্যকীয় ইন্ধন-তৈলের শতকরা ৪০ ভাগ সরবরাহ করিবার চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত অনেকগুলি খনি পূর্ণমাত্রায় তৈল উৎপাদন করিতেছে না। ভবিষ্যতে ডাচ্ সেল তৈল যে পৃথিবীর তৈলের বাজারে আরও অধিক প্রসার লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই দ্বীপে তৈল ব্যতীত অন্য কতকগুলি মূল্যবান পদার্থেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যথা—কয়লা, স্বর্ণ, হীরক, রৌপ্য, সীসা, তামা, এন্টিমনি, দস্তা, বিসমাথ্, প্লাটিনাম, পারা ও আর্সেনিক। এইগুলি নিষ্কাশনের কার্য্য যুদ্ধের পূর্ব্বেই অল্পবিস্তর চলিতেছিল। এখন যুদ্ধোপকরণোপযোগী খনিজ দ্রব্যেই সবিশেষ মনোনিবেশ করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ, বোর্ণিও এবং সুমাত্রা এই দুইটি দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদ বিপুল। তাহার সামান্য অংশ মাত্রই এ পর্য্যন্ত ব্যবহারে আসিয়াছে।

সমুদ্রতীর হইতে অধিক দূরে অবস্থিত কয়েকটি অঞ্চল এখনও পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত। ভবিষ্যতে যে জাতি এই সকল দ্বীপের অধিকারী হইবে, তাহাদের পক্ষে দ্বীপগুলি প্রচুর ধনাগমের আকর হইয়া উঠিবে।

সিলিবিস্ ও অন্যান্য দ্বীপ

আয়তন হিসাবে সিলিবিসের স্থান বোর্ণিওর নীচেই। ইহার বর্গফল ৭৩,১৬০ মাইল। লোকসংখ্যা ৩২ লক্ষ ৮ হাজার। দ্বীপের মধ্য-ভাগ পর্ব্বতসঙ্কুল। সিলিবিস দ্বীপেও নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়; কিন্তু অন্যান্য দ্বীপের তুলনায় এখানে খনির কার্য্য অল্পই চলিতেছে। চতুর্দ্দিকে ঘন-সন্নিবিষ্ট বনরাজির মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় তালবর্গীয় (Palmaceae) বৃক্ষ, দারুচিনি, জায়ফল, লবঙ্গ, বেত ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। রবার, কফি, নারিকেল প্রভৃতির চাষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। সাগুদানার গাছও এই দ্বীপে প্রচুর। প্রকৃত সাগুদানা Metroxylon Rumphii-নামক তাল-বর্গীয় বৃক্ষ হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমবর্গীয় অন্যান্য বৃক্ষ হইতেও ব্যবসায়িগণ শ্বেতসার সংগ্রহ করিয়া সাগুদানা প্রস্তুত করে। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ কাটিলে উহার অভ্যন্তর হইতে যে পরিমাণ শ্বেতসার পাওয়া যায়, তাহা একটি ক্ষুদ্র পরিবারের ছয় মাসের খাদ্যের পক্ষে যথেষ্ট। প্রাণীজ পদার্থের মধ্যে সিলিবিস্ দ্বীপ হইতে চামড়া, শুষ্ক মাছ, ও কচ্ছপের খোলা বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

মলক্কা দ্বীপপুঞ্জ ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি সুদৃশ্য দ্বীপের সমষ্টি। দামার রজন এ স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বাবজান্ দ্বীপে একটি গাছে, এমন কি, ৫ সের পরিমিত রজন নিঃসৃত হইয়া কাণ্ডে সঞ্চিত থাকে। সাগুদানা ও কাজুপট তৈলও রপ্তানির অন্যতম দ্রব্য। এই দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপে মুক্তাও পাওয়া যায়। পরদেশী (Bird of paradise) নামক প্রসিদ্ধ পক্ষীর মূল্যবান পালক নানা দ্বীপ হইতে সংগৃহীত হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সীসাই এই সকল দ্বীপের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

আম্বোয়ানা দ্বীপ এক সময়ে লবঙ্গের জন্য বিখ্যাত ছিল; এখন জাঞ্জিবার প্রভৃতি অন্যান্য স্থলে প্রচুর লবঙ্গ উৎপাদিত হওয়ায় এই দ্বীপের লবঙ্গ ব্যবসায় কমিয়া গিয়াছে; নারিকেল দ্বারা সেই অভাব পূরণ হইতেছে। বান্দা দ্বীপ জায়ফল ও জৈত্রি উৎপাদনের বৃহৎ কেন্দ্র। এখান হইতে বৎসরে অন্যূন ৬ লক্ষ মণ জায়ফল, ১॥ লক্ষ মণ জৈত্রি রপ্তানি হয়।

নিউগিনি দ্বীপের কতক অংশ ওলন্দাজ-শাসনাধীন। এই বৃহৎ দ্বীপের আয়তন ৩ লক্ষ বর্গ মাইলেরও অধিক। এই দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদও প্রচুর, কিন্তু তাহার সঠিক বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই। বহির্ব্বাণিজ্যের দ্রব্যাদির মধ্যে নানাবিধ কাষ্ঠ, রবার, নারিকেল শাঁস, কোকো, কফি ও মুক্তাই প্রধান।

বাণিজ্য-ব্যবসায়

উপরোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজের প্রধান দ্বীপগুলি নানা প্রকার ব্যবহারিক দ্রব্যে পরিপূর্ণ। সমগ্র ওলন্দাজ উপনিবেশের সর্ব্বপ্রকার উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্যের পরিমাণ যে বিপুল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ওলন্দাজ সরকারের উপনিবেশ বিভাগ এই সকল দ্বীপের বাণিজ্য-দ্রব্যের হিসাব প্রকাশ করেন, কিন্তু ইংরেজীতে সব সময় তাহার অনুবাদ পাওয়া যায় না। কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুট (Imperial Institute)এর বুলেটিনে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রধান দ্রব্যাদির উৎপাদন বা রপ্তানির তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

নাম	পরিমাণ (টন হিঃ)
ইক্ষু শর্করা	১৮,৪২,০০০
রবার	১,৩৯,৭৪৬
কফি	৫৭,৩৪০
কোকোয়া ফল	১,১৪৭
কোকা পাতা	১,৫০০
চা	৪৮,৮০০
তামাক (পত্র ও পত্রাংশ)	৫২,৬৪০
পাম তৈল	৩০৪৭
নারিকেল শাঁস	৬৩,০০০
শিমুল বীজ	২১,০০০
তিল	১,২০০
চিনাবাদাম	১৩,৭০০
রেড়ী বীজ	১,০০০
শিশাল শন	১,৪০০
সিঙ্কোনা বল্কল	৬,৯০০
কুইনাইন	৫৫৩,০০০ পাউণ্ড
সয়াশীম	৭,৫০০
গোলমরিচ (শ্বেত ও কৃষ্ণ)	১০,[illegible]০০
গুপারি	৭,৮০০
জায়ফল	৩০০
সাইট্রোনেলা তৈল	৪৮০

বলা দরকার যে, উপরোক্ত তালিকা বিগত দশকের অঙ্কাদি হইতে সঙ্কলিত। তাহার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় সকল দ্রব্যেরই উৎপাদন ও রপ্তানি বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য ফসলের মধ্যে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজে ধান্য, ভুট্টা, লাল আলু, শিমুল আলু প্রভৃতির বহু বিস্তৃত চাষ হয়। কুইনাইন উৎপাদনে যব দ্বীপ জগতে যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাপক ভাবে চাষ। সিঙ্কোনা চাষের জন্য অন্যূন ১৩৮টি বাগিচা রচিয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে উক্ত বাগিচা সমূহের মোট জমির পরিমাণ ছিল—১৪,১৬৫ বাওয়া (১ বাওয়া= ২৪৭১·একর=১৪১৩ বিঘা); এখন চাষের পরিসর আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাকৃতিক অবস্থা সমূহের সুবিধা গ্রহণে ওলন্দাজগণের কৃতিত্ব অসাধারণ। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে অনেক মূল্যবান তরুলতা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে; কিন্তু সেইরূপ স্বভাবজ ফসল সংগ্রহ করিয়াই ওলন্দাজগণ সন্তুষ্ট নহেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া বহু ফসলের উৎকর্ষ সাধন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-যুক্ত নূতন নূতন ফসল প্রবর্ত্তিত করিয়া উপনিবেশের আয়বৃদ্ধির উপায় আবিষ্কারে ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিকগণ নিয়ত রত আছেন। তাহার ফলও বৎসরের পর বৎসর ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজের আর্থিক ক্রমোন্নতিতে পরিস্ফুট হইতেছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

হিংস্র প্রতিবেশী

(শিকার-কাহিনী)

সিরোল রাজসাহী জিলার সদরের এক প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র পল্লী। বহু কাল পূর্ব্বে এই পল্লী সমৃদ্ধ থাকিলেও পরে ইহা বিধ্বস্ত হইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও সিরোল দুর্গম অরণ্যে সমাবৃত ছিল। সেই অরণ্যে তখন দুইটি বহু পুরাতন সমৃদ্ধ পরিবারের বিস্তীর্ণ বাসভবন ছিল; একটির নাম ছিল—সিরোলের 'বাবু-বাড়ী', অন্যটি সিরোলের 'রাজবাড়ী'; 'বাবু' নবাবী আমোলের খেতাব। এ-কালে যেমন 'রাজা'র নীচে 'রায় বাহাদুর', সে-কালে সেইরূপ 'রাজা'র নীচেই 'বাবু' খেতাবের সম্মান ছিল। কিন্তু সে দিন আর নাই; আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এই উভয় পরিবারেরই দুরবস্থা, এবং তাঁহাদের বাসভবনেরও ভগ্নাবস্থা। তাহার পর ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে সেই প্রাচীন 'বাবু-বাড়ী'—বহু দূরব্যাপী জীর্ণ দ্বিতল অট্টালিকাশ্রেণী বিধ্বস্ত হইয়া সমভূমি হইয়াছিল, এবং 'রাজবাড়ী'ও শ্রীভ্রষ্ট,—ধ্বংসোন্মুখ। তাহার পর বহু ব্যয়ে সেই বিধ্বস্ত অট্টালিকা-সমূহের জীর্ণসংস্কার করিবেন, সেই প্রাচীন বাসভবনের অধিকারিগণের আর্থিক অবস্থা সেরূপ সচ্ছল ছিল না।

এই সকল বিধ্বস্ত অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে যে দুর্গম অরণ্য ছিল, সেই অরণ্যে ভীষণাকার বহু ব্যাঘ্র নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিত; এজন্য শিকারীরা মধ্যে মধ্যে সিরোলের অরণ্যে ব্যাঘ্র শিকার করিতে আসিতেন। সিরোলে যে দুই-চারি ঘর সাধারণ গৃহস্থ বাস করিত, বাঘের ভয়ে তাহারা সূর্য্যাস্তের পর আর ঘরের বাহিরে আসিতে সাহস করিত না; তাহাদের পালিত পশু—ছাগল, ভেড়া, গরু-বাছুরগুলিকে রাত্রিকালে খোঁয়াড়ের ভিতর হইতেই বাঘে ধরিয়া লইয়া যাইত। অবশেষে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের রাজসাহী-শাখা আমনুরা ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে সিরোলের জঙ্গলরাশি অপসারিত হইয়াছিল, এবং এজন্য ব্যাঘ্রের উপদ্রবও হ্রাস পাইয়াছিল; কিন্তু এই রেলপথ যখন নির্ম্মিত হয়, তখনও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঘ লাইনের নিকট দিবাভাগেই ঘুরিয়া বেড়াইত! সেই সময়ের এক দিনের কথা আমার স্মরণ আছে, এবং সে কথা মনে হইলে এখনও বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠে! সেই দিন আমার মাতা ও স্ত্রী আমাকে অনুরোধ করিলেন—আমাদের পল্লীপ্রান্তে রেলের লাইন কি ভাবে পাতা হইতেছে, এবং রেল-লাইন কোন্ দিক দিয়া যাইতেছে—তাহা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে হইবে। আমি জানিতাম, তখনও লাইনের ধারে দিবা-ভাগেই বাঘ বাহির হয়; তথাপি তাঁহাদের আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারায়, সেই অপরাহ্ণে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সঙ্কীর্ণ নির্জ্জন আরণ্য পথ অতিক্রম করিয়া অদূরবর্ত্তী রেল-লাইনের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই লাইনের অল্প দূরেই আমার ইটখোলায় ইট নির্ম্মিত হইতেছিল। আমরা সেই ইটখোলায় দাড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। স্বল্পলোহিত তপন-কিরণে তখনও চতুর্দ্দিক আলোকিত; সূর্য্য সমুচ্চ বৃক্ষচূড়ার অন্তরালে পশ্চিম গগন-প্রান্তে অস্তগমন করিতেছিল। সহসা একটা বোট্‌কা গন্ধ আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল! কয়েক মিনিট পরেই দেখি, বড় বন-বিড়ালের মত দুইটি ব্যাঘ্রশাবক খেলা করিতে করিতে ইটখোলায় প্রবেশ করিয়া আমাদেরই সম্মুখে উপস্থিত! ব্যাঘ্র-মাতা হয় ত শাবকদ্বয়ের সহিত আসিয়া অদূরে কোথাও প্রতীক্ষা করিতেছে ভাবিয়া আমরা ভীত হইলাম; এবং আর সেখানে না দাঁড়াইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেই ব্যাঘ্রশাবকদ্বয় নাচিতে নাচিতে আমাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিব, দাঁড়াইয়া তাহাই

ভাবিতেছি—সহসা দেখিলাম, ভীষণদর্শন প্রকাণ্ড বাঘিনী অস্ফুট গর্জ্জন করিতে করিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ইটখোলায় প্রবেশ করিল, এবং আমাদের প্রায় কুড়ি হাত দূরে থাবা পাতিয়া বসিয়া-পড়িয়া, অগ্নিময় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ লাঙ্গুল ঈষৎ আন্দোলিত করিতে করিতে গোঁ-গোঁ শব্দে শাবকদ্বয়কে যেন আহ্বান করিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার মনে হইল, আমরা তাহার শাবক চুরি করিতে আসিয়াছি ভাবিয়া বাঘিনীটা ক্রুদ্ধ হইয়াছে,—তখনই আমাদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত!

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে আমার মাতা ও স্ত্রীর মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। আমি কি করিব—কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পলায়ন করিতেও সাহস হইল না; সর্ব্বাঙ্গ তখন আড়ষ্ট। যাহা হউক, মাতাকে অদূরে উপবিষ্ট দেখিয়া শাবক-দুইটি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আর আমাদের অনুসরণের চেষ্টা না করিয়া দ্রুতবেগে তাহাদের মাতার নিকট ফিরিয়া গেল, ও তাহার চারি পাশে লাফাইয়া খেলা করিতে লাগিল। শাবকদ্বয়কে নিকটে ফিরিতে দেখিয়া বাঘিনী আর সেখানে অপেক্ষা করিল না; সে আমাদিগকে আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া শাবকদ্বয়সহ অবিলম্বেই ইটখোলা ত্যাগ করিল, এবং রেল-লাইনের পার্শ্বস্থ অরণ্যে অদৃশ্য হইল।

কিন্তু তখনও ভয়ে আমাদের পা উঠিতেছিল না; বাঘিনীটার মুখ এত বড় যে, সে মুখব্যাদান করিলে মানুষের মাথা অনায়াসে তাহার মুখবিবরে প্রবেশ করিতে পারিত, এবং মনুষ্য শোণিতের স্বাদ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা থাকিলে তাহার কবল হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইতাম না। কিন্তু কি জানি, বাঘিনীটা হঠাৎ যদি ফিরিয়া আসে, ভাবিয়া আমরা অসহায় ভাবে চারি দিকে চাহিতেই ইটখোলার অদূরে এক জন লোকের দেখা পাইলাম। সে নিকটে আসিলে চিনিলাম, যাহারা আমার ইট প্রস্তুত করিতেছিল—তাহাদেরই দলের মজুর। তাহাকে আমাদের বিপদের কথা জানাইলে—সে বিস্মিত না হইয়া বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "বাঘ ত দিনে-দুপুরে হামেসাই এখানে ঘুরে বেড়ায়! বাঘিনীটার হয় তো সন্দো হ'য়েছিল, আপনারা ওর বাচ্চা ধরতে এসেছেন। সে যে আপনাদের ঘা'ল করেনি—এ আপনাদের নিহাৎ বরাতের জোর! বাচ্চা দুটো আরো খানিকক্ষোণ আপনাদের কাছে ঘুরাঘুরি ক'রলে—ওডা ঠিক আপনাদের ওপর লেফ দিয়ে গর্দ্দান কেমড়িয়ে ধ'রতো।" যাহা হউক, লোকটা আমার অনুরোধে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমার বাড়ীর দিকে চলিতে চলিতে বলিল, "ফিরবার সময় মাদীডে যদি আমারই ঘাড়ে লেফিয়ে পড়ে তো ফ্যাসাদে প'ড়বো; বলা তো যায় না। বনে-ঝাড়ে এক-এক দিন ভারী জবোর 'হেতের' নজরে পড়ে। গরু-বাছুর মেরে পৈলট্ট ক'রলো।"

বাঘ যে আমাদের বাড়ীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহার অন্য প্রমাণও ছিল। এক দিন আমার মা (তখনও সন্ধ্যা হয় নাই) উঠানের ইঁদারায় রজ্জুবদ্ধ বালতি নামাইয়া জল তুলিতেছিলেন; সেই সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুরটা পূর্ব্ব ধারের একতালার ছাদের দিকে উর্দ্ধমুখে চাহিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে ও লাফাইতে লাগিল। মা প্রথমে তাহার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেন নাই; কিন্তু ইঁদারার জলে বালতি ডুবাইয়া তাঁহার জানিতে কৌতূহল হইল—কুকুরটা কি জন্য ও-রকম লম্ফ-ঝম্ফ করিয়া চীৎকার করিতেছে? কোন অপরিচিত লোক, কি পাড়ার কাহারও গরু-বাছুর বাড়ীতে আসিলে সে ঐরূপ করিত। মা তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া একতালার ছাদের দিকে চাহিতেই দেখিলেন—সেই বৃহৎ কুকুরটার তিন গুণ আকারের প্রকাণ্ড একটা বাঘ একতালার ছাদের উপর কার্ণিস্ ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে! তাহার লক্ষ্য ঐ কুকুরটা; কিন্তু কি ভাবিয়া সে বাড়ীর আঙ্গিনার ভিতর লাফাইয়া-পড়িয়া কুকুরটাকে আক্রমণ করিল না, তাহা সে-ই জানিত। মা বাঘটাকে দেখিয়া বালতি-দড়ি সব ইঁদারার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া 'বৌমা, বাঘে খেলে!' বলিয়া মুহূর্ত্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন! আমার স্ত্রী ঘরের বারান্দায় ছিলেন; তিনিও ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিলেও তৎক্ষণাৎ 'যঃ পলায়তি স জীবতি' নীতির অনুসরণ করিলেন। আমি কাছারী-বাড়ী হইতে অন্দরে আসিয়া এই ঘটনার কথা জানিতে পারিলাম। বাঘ তখন অদৃশ্য হইয়াছিল। সে একতালার ছাদে বাখারী উঠিয়া আসিয়াছিল—তাহার পশ্চাতে ইট ও রাবিশের স্তূপ

উচু হইয়া পড়িয়া ছিল; দীর্ঘকাল তাহা অপসারিত না হওয়ায় তাহারই উপর দিয়া বাঘটা কুকুরের লোভে ছাদে উঠিয়াছিল।

আমার সেই কুকুরটি সাহসী ও বেশ শিক্ষিত ছিল; তাহার ভয়ে কোন চোর আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিত না। দিবসে সে বাঁধা থাকিত, সন্ধ্যার পর তাহার গলার শিকল খুলিয়া দিতাম; সারা রাত্রি সে বাড়ীর আঙ্গিনার ভিতর ঘুরিয়া পাহারা দিত। কিন্তু আর এক দিন রাত্রিকালে বাঘ আসিয়া আমার কুকুরটিকে ধরিয়া লইয়া গেল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেও তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি নাই।

কুকুরটিকে হারাইয়া আমার বড় দুঃখ হইল; এমন প্রভুভক্ত কুকুর আর পাইব বলিয়া আশা করিতে পারিলাম না। মনে হইল, কুকুর গিয়াছে—এবার বাঘ আমার গরুর গোয়ালে প্রবেশ করিয়া গরু-বাছুর মারিবে। বাঘটাকে আর না মারিলে চলে না; কিন্তু বাঘ ত একটা নয়! এমন হিংস্র প্রতিবেশী লইয়া কি করিয়া এই বনে বাস করিব?

কি উপায় করিব ভাবিতেছি, এমন সময় এক দিন আমার প্রতিবেশী উজীর সেখ আমার কাছারিতে আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বাবু, আমার 'সব্বোনাশ' হ'য়েছে; গ্যালো চোতে এক কুড়ি-বারো ট্যাকা দিয়ে যে কুলে দাম্ড়াটা কিনেলাম, নাঙ্গল বলেন, গাড়ী বলেন—এমন টান্তো! এক-হাঁটু কাদার মদ্দি হ'তি বিশ মোণ বুজাই গাড়ী দুই ঝুলে টান্যে তুলেচে; আমার সেই বলদ কাল রেতের ব্যালা মাঠে চরতে বেরিয়ে আর ঘুরে এলো না। আজ দেখি, বোনির ধারে তারে বাঘে মেরেচে! এ বাবু, আমার পুত্তুর-শোগ, আপনার ত বোন্দুক আছে, বাঘটাকে মারেন বাবু, নৈলে সিরোলে যে বাস করাই দায়!"

আমি সহানুভূতিভরে বলিলাম, "তোমার গাড়ীর বলদ মারলো, আমারও ক্ষতি বড় কম করেনি; আমার কুকুরটাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে সেবায় লাগিয়েছে। চল, দেখে আসি, কি ভাবে তোমার বলদ মেরেছে। কুমার বাহাদুরকেও সঙ্গে নিয়ে যাই; আমরা এক সঙ্গেই শিকার করি কি না।"

সিরোলের 'কুমার' আমার প্রতিবেশী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; কারণ, আমার বাড়ী হইতে সিরোলের রাজবাড়ীর দূরত্ব অধিক নহে। বৈষয়িক অবস্থা মন্দ হওয়ায় 'কুমার' বলিলে তিনি লজ্জিত হইতেন; এজন্য আমরা তাঁহাকে 'রায়জি' বলিতাম। আমরা উভয়ে একত্র বহু বার ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছি; এজন্য এই ব্যাপারে তাঁহাকে সঙ্গে লওয়াই সঙ্গত মনে করিলাম।

রায়জি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন। উজীরের সঙ্গে অদূরবর্ত্তী অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, অরণ্যমধ্যে একটি পরিষ্কৃত স্থানে বলদটার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, বাঘ বলদটাকে স্থানান্তরে হত্যা করিয়া সেখানে টানিয়া আনিয়াছিল। দেখিলাম, তাহার গলা ফুটা করিয়া রক্তপান করিয়াছে, এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগের কোমল অংশটা ছিঁড়িয়া খাইয়াছে; দেহের অন্যান্য অংশ অক্ষত। বুঝিতে পারিলাম, বাঘ সময়ান্তরে আসিয়া ভক্ষণ করিবে, এজন্য মড়িটা সেখানে রাখিয়া গিয়াছে।

আমরা তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য স্থির করিলাম। শকুনের দল আসিয়া মৃতদেহটি বিকৃত করিতে বা দূরে টানিয়া লইয়া যাইতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে প্রায় চারি হাত দীর্ঘ একটি বংশদণ্ড সেই স্থানে পুতিয়া, মৃত বলদটার চারি পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া সেই বংশদণ্ডে বাঁধিয়া রাখা হইল। বাঁশের সেই গোঁজটার প্রায় আড়াই হাত মাটীর ভিতর থাকিল; সুতরাং বাঘটা কোন সময় সেখানে আসিয়া মৃতদেহটি স্থানান্তরিত করিবে—তাহার উপায় রহিল না। অতঃপর আমরা গাছের কতকগুলি ডাল কাটাইয়া তদ্দ্বারা মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিলাম। এই সকল কাজ শেষ করিয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

বেলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমরা উভয় শিকারী এক একটি বন্দুক ও কয়েকটি অতিরিক্ত কার্ত্তুজসহ বলদের মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইলাম। গাছের ডাল-পালায় মৃতদেহটি আবৃত থাকায় তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। আমরা সেই সকল ডাল-পালা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, অদূরে যে সকল বড় গাছ ছিল, তাহার দুইটিতে দু'জনে উঠিয়া বসিলাম। ভাবিলাম, যদি সন্ধ্যার পূর্ব্বে মড়ির নিকট বাঘ আসে, তাহা হইলেই তাহাকে গুলী করা সম্ভব হইবে; নতুবা

রাত্রিকালে সেই গভীর অরণ্যে গাছে বসিয়া বাঘের প্রতীক্ষা করা সঙ্গত হইবে না; বিশেষতঃ, সারা রাত্রি গাছের ডালে বসিয়া-থাকাও সম্ভব নহে। বাঘটা হঠাৎ যে বলদটাকে দূরে টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহারও উপায় ছিল না; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বলদটার চারি পা সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া, দড়িটা শক্ত করিয়া সেই খুঁটার সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। বৃক্ষে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সেই বন্ধন এবং খুঁটাটি পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিলাম। আমরা উভয়ে খুঁটাটি ধরিয়া যথাসাধ্য বলপ্রয়োগে টানাটানি করিয়া একটুও নড়াইতে পারিলাম না।

রাজসাহী মশার আতিশয্যের জন্য বিখ্যাত। সেই অরণ্যের ভিতর দিবাবসানেও মশকের সঙ্গীতধ্বনির বিরাম ছিল না; কিন্তু আমরা মশক-দংশন সহ্য করিয়াই গাছে বসিয়া রহিলাম। কিছু কাল পরে সূর্য্যাস্ত হইল, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অন্ধকারে সেই বনভূমি আচ্ছন্নপ্রায় হইল। সন্ধ্যা-সমাগমের পূর্ব্বে বাঘ না আসিলে আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইবে ভাবিয়া আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অধীর হইতে লাগিলাম; কারণ, অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলী করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু আমাদিগকে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হইল না; আমরা বৃক্ষে আরোহণ করিবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে, এবং সেই বনভূমি সান্ধ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বেই—অরণ্যমধ্যস্থ শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মস্-মস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। সেই শব্দ শুনিয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম; সত্যই কি উহা ব্যাঘ্রের পদশব্দ? কয়েক মিনিট পরেই সকল সন্দেহ দূর হইল; দেখিলাম, একটি ভীষণাকৃতি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র অরণ্যের অন্তরাল হইতে বলদের মৃতদেহের নিকট লাফাইয়া পড়িল। ঐরূপ বৃহৎ ব্যাঘ্র এ অঞ্চলে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে!

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও তেমন নিবিড় হয় নাই; আলো-অন্ধকারের সেই মিলন সময়ে দেখিলাম—বাঘটা বলদের মৃতদেহের কাছে বসিয়া, মাথা কাত্ করিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া-ধরিয়া তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। আমার হাতের বন্দুক হাতেই রহিল! আমার শিকারী বন্ধুটিও অন্য বৃক্ষশাখায় বসিয়া ব্যাঘ্রের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতেছিলেন; সেই অবস্থায় আমরা তাহাকে গুলী করিবার অব্যর্থ সুযোগ না পাওয়ায় সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। গুলী করিয়া যদি তাহাকে হত্যা করিতে না পারি, এবং সে যদি আহত অবস্থায় পলায়ন করে, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে বুঝিয়া আমাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল; কিন্তু এক-এক মিনিট এক-এক ঘণ্টার ন্যায় দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃত বলদটার পদচতুষ্টয় দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া সেই রজ্জু বাঁশের খুঁটাতে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। বাঘটা বলদের ঘাড় কামড়াইয়া-ধরিয়া টানাটানি করিয়াও যখন তাহাকে সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারিল না, তখন সে সেই বাঁশের গোঁজের দিকে চাহিয়া বোধ হয় বুঝিতে পারিল, কি কারণে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে! এবার সেই খুঁটার দিকে চাহিয়া সে তাহার অগ্রভাগ কামড়াইয়া ধরিল, এবং ঘাড় বাঁকাইয়া উপরের দিকে এমন একটা হ্যাঁচ্কা টান দিল যে, সেই টানেই সুদীর্ঘ খুঁটাটা মাটীর ভিতর হইতে উপড়াইয়া আসিল!

বাঘটার শক্তির পরিচয় পাইয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! যাহা হউক, খুঁটাটা ঐ ভাবে উৎপাটন করিতে বাঘটার বোধ হয় কিঞ্চিৎ পরিশ্রম হইয়াছিল, এ জন্য উহা উপ্ড়াইয়া-তুলিয়া সে মড়ির পাশে বসিয়া দুই একবার হাঁপাইল। সেই সময় সে একবার মাথা তুলিতেই আমি তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া 'দড়াম্' শব্দে গুলী বর্ষণ করিলাম। সেই অব্যর্থ গুলীতে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইল। গুলী খাইয়াই বাঘটা ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া শূন্যে একটা লাফ দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাটীতে শুইয়া পড়িল; আর তাহার কোন সাড়া-শব্দ পাইলাম না।

আমার শিকারী বন্ধু অন্য পার্শ্বের বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া বাঘের অন্তিম বিক্রম লক্ষ্য করিতেছিলেন। বাঘ আহত অবস্থায় হঠাৎ উঠিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনিও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ গুলী বর্ষণ করিলেন; কিন্তু তাহার প্রয়োজন ছিল না, আমার গুলীতেই তাহার মস্তিষ্ক চূর্ণ হইয়াছিল।

আমরা বৃক্ষ হইতে নামিয়া অরণ্যের বাহিরে আসিতেই কতকগুলি গ্রামবাসীকে অরণ্যের দিকে যাইতে দেখিলাম। উপর্য্যুপরি দুই বার বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বাঘ মরিয়াছে ভাবিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিল। তাহারা নিহত বলদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, বাঘ মরিয়া পড়িয়া আছে। চারি জন গ্রামবাসী বাঘের চারি পা রজ্জুবদ্ধ করিয়া, তাহাকে বাঁশে ঝুলাইয়া আমার বাড়ীতে লইয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

বাঘটাকে দেখিয়া মা বলিলেন, ইঁদারায় জল তুলিবার সময় সে দিন তিনি একতালার ছাদের কার্ণিশের নিকট যে 'দস্তি'কে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়াছিলেন, এ সেই 'ওরেবৎ'টাই বটে!—কিন্তু হঠাৎ এক বার দেখিয়া গোরা-বারিকের অর্দ্ধদিগম্বর কোনও ন্যাংটা-গোরা ও বনের বাঘ—এই উভয়কে সনাক্ত করা আমাদের পক্ষে সমান কঠিন! সিরোলের ব্যাঘ্র-বারিকে সে সময় বিস্তর বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্য সপরিবারে বাস করিত; কোন্‌টি কুকুরের লোভে আমার ঘরের ছাদে আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

এ বহু দিনের কথা। তখন আমার যৌবন কাল, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু আমার সেই যৌবন কালের ব্যাঘ্র-সঙ্কুল সিরোল এ-কালে আর নাই। সে অরণ্যও আর নাই। রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায় সে-কালের সুবিশাল দুর্ভেদ্য অরণ্য অপসারিত হইয়াছে। দুই পাশে জঙ্গল কাটিয়া রেল-ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছে; পথে সর্ব্বদা লোক এবং যানবাহন চলিতেছে। ষ্টেশনের দিকে সহর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে; বন কাটিয়া নগর বসিতেছে। রেল-ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যসঙ্কুল স্থানে এখন আমরা প্রজাপত্তন করিতেছি। বাঘের দলও দূরে পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু এখনও কোন কোন দিন রাত্রি কালে আমার গৃহসংলগ্ন পুষ্করিণীর পাড়ে আম-বাগানের ভিতব ব্যাঘ্রের গর্জ্জন-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়;—মনে হয়, গৃহস্থ-পল্লীসন্নিহিত লোভনীয় অরণ্য হইতে বহু দূরে নির্ব্বাসিত হওয়ায় এক-এক বার তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-অধিকারের সীমায় আসিয়া অতীত সুখের কথা ভাবিয়া আর্ত্তস্বরে আক্ষেপ করিতেছে!

শ্রীভবানীচরণ বাবু।

প্রথম চুম্বন

সুন্দর তুমি এসেছিলে নব সাজে
পরিপূর্ণ ক'রে প্রাণের পিয়ালাখানি,—
স্বপন-বিভল নিরালা নিশুতি মাঝে
খুলেছিলে তার সরমের আবরণী—

গোলাপী-সুরার উচ্ছল হাসিরাশি
মুরছি পড়িল তব অধরের কোণে;
হিয়া-মাঝে মোর কে যেন বাজালো বাঁশী,
রে মধুপ মধু পান করো মধু-বনে;

আকাশের শশী সেই সুরে দিল সাড়া
নব অনুরাগে কুমুদিনীদলে চুমি;
লঘু সমীরণ কিশলয়ে দিল নাড়া—
কুসুমিত হ'ল নির্জ্জলা মরুভূমি।

নব যৌবন-কামনা সে কভু নহে—
সে যে পদ্মার স্রোত নিত্য নূতন বহে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার (এম-বি)।

বিজ্ঞান-জগৎ

এ কাগজ আগুনে পোড়ে না

বৈজ্ঞানিক মিকশ্চারে কাগজকে আজ এমন চমৎকার তৈয়ারী করা হইয়াছে যে, আগুনের শিখায় ধরিলে এ কাগজ আদৌ পুড়িবে না। এ কাগজ অদাহ্য। এ কাগজের ঠোঙায় জল রাখিয়া জল



কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা

গরম করা হইতেছে। তার উপর এ কাগজে লিখিলে বা এ কাগজে বই ছাপিলে ঘাম লাগিয়া কাগজ চুপসাইয়া যাইবে না; বা তাহা বিশ্রী ও দাগী হইবে না। আজ এ-যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের জন্য এ কাগজ তৈয়ারী হইয়াছে।

——

সিগারেট-বিলাস

আমেরিকার প্রান্তর-পথে বা বিজন সমুদ্র-তীরে কোনো সিগারেট-সেবী হয় তো সিগারেট জ্বালিবার জন্য দেশলাই চান, অথচ কাছে দেশলাই নাই বা এমন লোকজন কাছে নাই—যাঁর কাছে দেশলাই চাহিবেন! বিজন-পথচারী সিগারেট-সেবীর দুঃখ বুঝিয়া সেখানকার মিউনিসিপালিটি পথে প্রান্তরে এবং বিজন সমুদ্র কূলে পোষ্ট-বক্সের মতো অগ্নিশিখাদায়িনী নারী-পুত্তলি-মূর্ত্তি রচিয়া



চুমার আগুন

রাখিয়াছেন। এই মারী-পুত্তলির অধরে আছে ব্যাটারিযুক্ত সিগারেট-জ্বালিকা। নারী-পুত্তলির অধরের এই জ্বালিকাগ্রভাগে সিগারেটের অগ্রভাগ সংলগ্ন করিয়া আলিঙ্গনের ভঙ্গীতে নারী-পুত্তলিকে ধরিয়া তার পিঠে বোতাম টিপিলেই অধর জ্বালিকার অগ্নিশিখা দেখা দিবে; এবং চুম্বন-লীলার ছলে সিগারেট জ্বালিয়া বিলাস-সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন!

——

কার্ডবোর্ডে কারিগরি

এক পীশ ফ্ল্যাট কার্ডবোর্ড। সে কার্ডবোর্ডকে ভাঁজে-ভাঁজে সিকি-ইঞ্চি করিতে পারেন? এ কাজ দুঃসাধ্য, অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।



কার্ডবোর্ডের কেরামতি

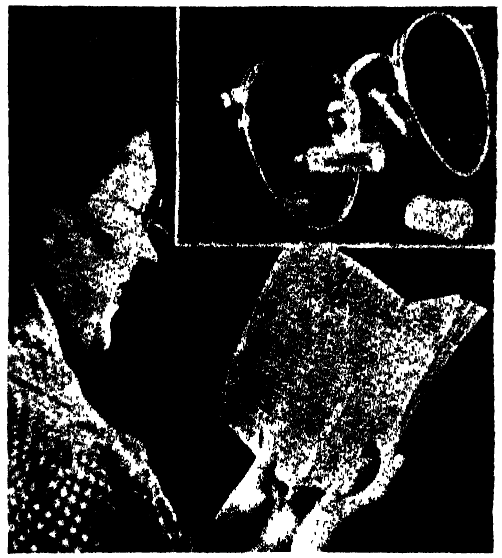


এ-সব এক-পীশ্‌ কার্ডে তৈয়ারী

কিন্তু এই অসম্ভবকে আজ সম্ভব করিয়াছেন নিউ ইয়র্কের লঙ্‌ আইল্যাণ্ড-সিটির অধিবাসী শ্রীযুক্ত রিচার্ড পেজ। তিনি এক জন এঞ্জিনীয়ার। যন্ত্রকৌশলে চাপ দিয়া কার্ডবোর্ডকে শত-ভাঁজ করিয়া তিনি আজ নানা আসবাব-পত্র তৈয়ারী করিতেছেন। কার্ডবোর্ডের এ-সব আসবাবপত্র শুধু যে গৃহসজ্জা বা প্রয়োজন সাধন করে, তা নয়; এ আসবাব-পত্র-মারফৎ বিজ্ঞাপনী-প্রচারে তিনি যুগান্তর আনিয়াছেন। তাঁর হাতের কাজের কয়েকটি মাত্র নমুনা পাশের ছবিতে দেখুন।

অণুবীক্ষণ-চশমা

রোগে, দৌর্ব্বল্যে, বয়স-দোষে অনেকের চোখের দৃষ্টি-শক্তি এমন ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে, সে-চোখে চশমা আঁটিয়াও তাঁরা চোখে কিছু দেখিতে পান না।



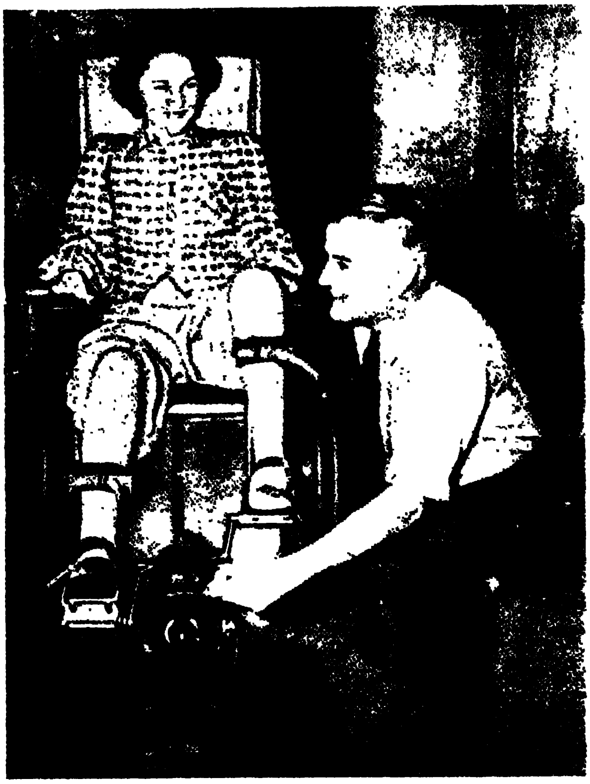
অন্ধের দৃষ্টি

এমন ক্ষীণ যাঁদের দৃষ্টিশক্তি, তাঁদের দৃষ্টিদানকল্পে মার্কিণ চক্ষু-চিকিৎসক উইলশন অণুবীক্ষণ-চশমা তৈয়ারী

করিয়াছেন। এ চশমার লেন্স খুব ছোট। অণুবীক্ষণের আদর্শে সে লেন্স নির্ম্মিত। লেন্সের উপর অভিনব অতি-ক্ষুদ্র অণুবীক্ষণ সংলগ্ন আছে। তার লেন্সের শক্তি এত বেশী যে, অন্ধও এই অণুবীক্ষণ-চশমা চোখে আঁটিয়া বইয়ের অক্ষর দেখিতে পাইবেন বলিলে কথাটা অত্যুক্তি হইবে না!

পক্ষাঘাতে আরাম

লশ্ এঞ্জেলেশে নানা ভাবে প্রায় ৭৮ বার ব্যর্থকাম হইয়া অবশেষে দুই বৈজ্ঞানিক সহোদর পক্ষাঘাত-রোগ-আরোগ্য-কল্পে এক রকম ব্যায়াম-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক প্রবাহযোগে



বাত-সারানো যন্ত্র

চলে। এ যন্ত্রে দু'টি পাদানি এবং হাতদানি আছে। পক্ষাঘাত রোগে যাঁদের হাত বা পা অসাড়, অচল, তাঁদের হাতে ও পায়ে ষ্ট্রাপ বাঁধিয়া এ যন্ত্রের হাতদানিতে বা পাদানিতে তাঁদের হাত ও পা রাখিয়া যন্ত্রযোগে তাঁদের হাতে-পায়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া হাত ও পায়ের ব্যায়াম-সাধন স্বচ্ছন্দভাবে নির্ব্বাহিত হয়। এ ব্যায়ামে বাত ও পক্ষাঘাত সারিতেছে!

কাজী-বর্ষাতি

বর্ষাতি-কোট গায়ে আঁটিলে বৃষ্টির জলসেক হইতে পরিত্রাণ-লাভ হয় সত্য; কিন্তু ভারী বলিয়া বর্ষাতি-কোট গায়ে আঁটিয়া জলবৃষ্টিতে থাকিয়া কোনো রকম পরিশ্রমের কাজ বা খেলাধূলা করা চলে না। সম্প্রতি রেশমের চেয়েও হালকা এবং মিহি বর্ষাতি-কোট-পেণ্টুলেন



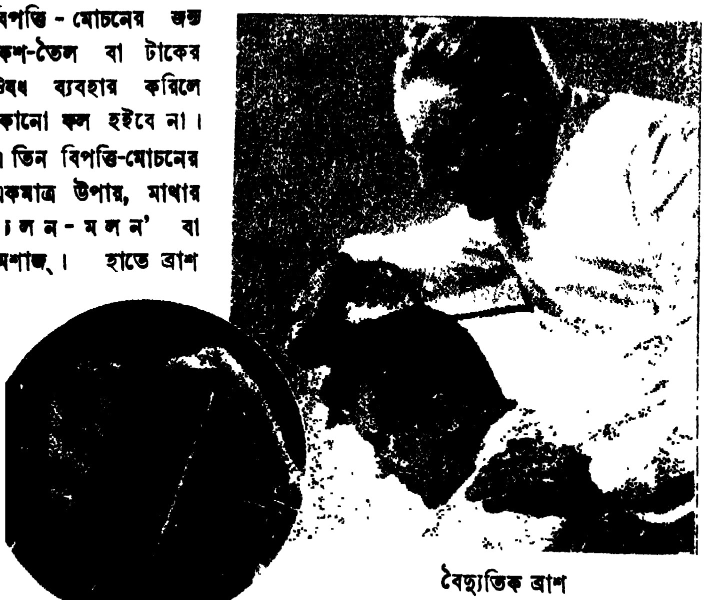
নতুন বর্ষাতি

তৈয়ারী হইয়াছে। এ কোট-পেণ্টুলেন আঁটিয়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়া খেলাধূলা, দৌড়বাজি বা যে-কোনো কাজ করুন, অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে হইবে না।

কেশ-পরিচর্য্যা

মাথার চুল পাৎলা হওয়া, মাথায় টাক পড়া, অল্প-বয়সে মাথার চুলে পাক ধরা—এ-সব উপসর্গ মাথার অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। এ তিন

বিপত্তি-মোচনের জন্য কেশ-তৈল বা টাকের ঔষধ ব্যবহার করিলে কোনো ফল হইবে না। এ তিন বিপত্তি-মোচনের একমাত্র উপায়, মাথার 'দলন-মলন' বা মেশাজ্। হাতে ব্রাশ



বৈদ্যুতিক ব্রাশ

ধরিয়া মাথার পরিচর্য্যা তেমন যুৎসই হয় না বলিয়া সম্প্রতি মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত একরকম ব্রাশ তৈয়ারী করিয়াছেন। প্লাগে আঁটিয়া এ ব্রাশ মাথায় ধরুন, এ ব্রাশ মিনিটে ৫০০০ স্পন্দন তুলিবে। পনেরো মিনিট কাল হাতে ব্রাশ ধরিয়া সবলে মাথা আঁচড়াইলে যে-ফল মিলিবে না, এ ব্রাশে এক-মিনিটে তার বেশী ফল পাইবেন। সেফ্‌টি-ক্ষুরের মতো এ ব্রাশকে মুড়িয়া বাক্সবন্দী করিয়া রাখা চলে। এ ব্রাশে মাথার কেশ ক্লেদ-মুক্ত হয়; এবং মাথার শিরা-উপশিরা এ ব্রাশের ঘর্ষণ-মর্দ্দনে অসুস্থ হইতে পারে না বলিয়া এ ব্রাশ-ব্যবহারে মাথার কেশ ঘন থাকে, পাকে না; এবং মাথায় টাক পড়ে না।

বোমা-বিদ্যা

বোমা ফেলার কলপ্রয়তি শিখিবার জন্য কালিফোর্ণিয়ার সেনা-বিভাগে নূতন রকমের ব্যবস্থা হইয়াছে। দোতলা, তিন-তলার সমান উঁচু এক বিচিত্র ত্রিচক্র-যান রচিয়া তার উপর বসেন বিমানপোত-বিভাগের পাইলট; পাইলটের পাশে বসেন বোমা-বিদ্যা-শিক্ষার্থী সৈনিক। বিস্তীর্ণ মাঠে 'লক্ষ্য' (target) রাখা হয়; এবং ত্রিচক্র-যান চলিবার সময় শিক্ষার্থীকে বোমা ফেলিয়া সে-লক্ষ্য অভ্রান্তভাবে ভেদ করিতে হয়। লক্ষ্যটুকু দূর হইতে দেখিয়া রাখিতে হয়, কারণ, বোমা ফেলিবার সময় এ-লক্ষ্য চোখে দেখা যাইবে না। আগে হইতে প্রত্যক্ষ-করা-লক্ষ্যে—অনুমানে নির্ভর করিয়া বোমা নিক্ষেপ করা চাই। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, এ রীতিতে যেমন হাতে-কলমে এবং অভ্রান্তভাবে বোমা-নিক্ষেপে পটুতা লাভ করা যায়, এমন আর অন্য কোন রীতিতে হয় না।



বোমা-বিদ্যার প্র্যাক্‌টিকাল্ ক্লাশ

টেলিভিশন-টেলিফোন

নিউ ইয়র্কের বিশ্ব-প্রদর্শনীতে সম্প্রতি সেখানকার জেনারেল মোটর্স কোম্পানি টেলিভিশন-টেলিফোন যন্ত্র দেখাইয়াছিলেন। টেলিফোন-যন্ত্রের সহিত তাঁরা একটি সুবহ টেলিভিশন-ট্রান্সমিটার যন্ত্র আঁটিয়া এতদুভয়ের মধ্যে বারো ইঞ্চি ব্যবধানে মোটা পর্দ্দা ফেলিয়া দেন। পর্দ্দার এ দিকে এক জন ধরিলেন রিসিভার এবং অপর দিকে আর

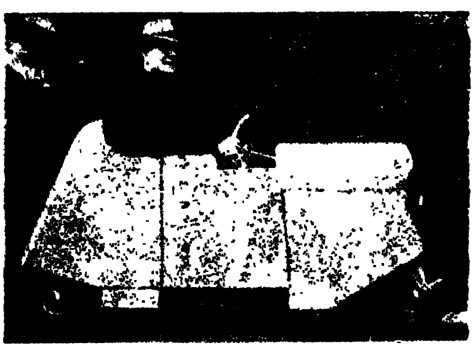


টেলিফোন-টেলিভিশন্

এক জন টেলিভিশনে কথা কহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দার দু' পিঠে ফুটিল দু'জনের ছবি। জেনারেল মোটর্স কোম্পানি আশার বাণী শুনাইয়াছেন, এই টেলিফোন-টেলিভিশন যন্ত্র দু'-এক বৎসরের মধ্যে সকলের উপভোগ্য করিয়া তাঁরা বাজারে বাহির করিতে পারিবেন।

চেয়ার-গাড়ী

দুর্ব্বল স্থবির বা অশক্ত বৃদ্ধেরা আপনা হইতে গাড়ীতে চড়িয়া পথে একটু-আধটু যাহাতে বিচরণ করিতে পারেন, এজন্য দু'ঘোড়ার শক্তি-



চেয়ার-গাড়ী

সামর্থ্য-সম্পন্ন মোটর-এঞ্জিনযুক্ত চেয়ার-যান প্রস্তুত হইয়াছে। এক গ্যালন পেট্রোলে এ-গাড়ী ১০০ মাইল পথ চলিবে; ষ্টীয়ারিং হুইল সাহায্যে গাড়ী চলিবে এবং এ-গাড়ী চালানো খুব সহজ। তার উপর এ-গাড়ী বিশ মাইল রেটে চলে বলিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ।

পর্দ্দায় ফুলদানী

ঘরের দ্বারে-জানলায় যে-পর্দ্দা খাটান, সে-পর্দ্দার খাঁজে-খাঁজে



পর্দ্দা-ফুলদানী

ফুলদানী রচিয়া তোলা কঠিন নয়! উপরের ছবি দেখুন—পর্দ্দার মাঝে-মাঝে ভাঁজ করিয়া পকেট রচনা করা হইয়াছে।

নেগেটিভের স্বাস্থ্য-রক্ষা

সম্প্রতি এক রকম রাসায়নিক-দ্রাবক তৈয়ারী হইয়াছে। সে দ্রাবকে নরম কাপড় ভিজাইয়া সেই ভিজা কাপড়খানি ফটো-নেগেটিভের গায়ে মৃদু ভাবে ঘষিয়া দিলে নেগেটিভের দেহ এমন হইবে যে,



নেগেটিভের প্রাণ

তাহাতে কস্মিনকালে নখের দাগ, আঁচড় বা আঙুলের ছাপ লাগিয়া নেগেটিভ খারাপ হইবে না; ফিল্ম নেগেটিভ দুমড়াইয়া বা কুঁকড়াইয়া যাইবে না; এবং নেগেটিভের পরমায়ু-হ্রাস বা তার বিনাশ ঘটিবে না।

সজীবদর্শন বা প্রত্যক্ষদর্শন

ঈশ্বর—জীবাত্মা—জগৎ এই তিনের অস্তিত্ব ও সম্পর্ক লইয়াই দর্শনশাস্ত্রের যত আলোচনা। দর্শন হউক বা না হউক, প্রত্যেকেই অন্ততঃ শ্রবণ ও মনন দ্বারা (মনে মনে বিচার দ্বারা) এই তিনের অস্তিত্ব ও সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা ব্যক্তিগত মত পোষণ করে। এ জগতে প্রত্যেকেই দার্শনিক। প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারা যতই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, দর্শনশাস্ত্রও ততই উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে থাকে। তবে চিন্তাধারা প্রণালীবদ্ধ ভাবে পরিচালনা করিতে গেলে, চিত্তের স্থৈর্য্য ও প্রতিভার প্রয়োজন। যে যতটুকু ধারণা করিতে পারে, তাহার চিন্তা সেই পর্য্যন্ত উঠিয়া বলে যে, ইহার উর্দ্ধে আর কিছুই নাই। এই-ই শেষ। অসভ্য উলঙ্গ জাতি বৃক্ষের মধ্যে তাহার ঈশ্বরকে স্থাপিত করিয়া পূজা করে। তাহার শ্রবণ-মননের সাহায্যে বৃক্ষকেই আশ্রয় করিয়া তাহার দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা করে। জগতের প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব দর্শন আছে। নিজে জানিয়াই হউক বা পরের মুখে শুনিয়াই হউক, প্রত্যেকেই একটা বিশিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া চলে, এবং এই বৈশিষ্ট্যই জাতির বন্ধনের আভ্যন্তরীণ সূত্র।

জাতিগঠন সাধারণতঃ এই দার্শনিক মতের উপর নির্ভর করে। হিন্দু ধর্ম্মের জাতিগঠনের কথা এখন বাদ দিলাম। আধুনিক জগতে এই পদ্ধতি অবলম্বনেই জাতি সকল সংগঠিত হইয়া থাকে। হিটলার যে দেশ-জয়ের যুক্তি দিয়াছেন, তাহাও এই দার্শনিক মতের উপর নির্ভর করিয়া। যে জাতির শিক্ষা, দীক্ষা, ধারণা ও দার্শনিক মত এক ধারায় চলে, হিট্‌লার সেই জাতিকে এক রাইখের অধীনে দেখিতে চাহেন। মুসলমানগণের জাতিগঠনও সেই ভাবেই।

একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। স্ত্রীলোককে পিতা-মাতা ত্যাগ করিয়া অপরিচিত একটি পুরুষকে স্বামিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই আশ্রয়ে থাকিতে হয়। তাহার চিত্তের আসক্তি তাহাকে স্বার্থের আশ্রয় গ্রহণ করাইয়া সব ভুলাইয়া দেয়। ঠিক সেইরূপ নিজের দেশ, নিজের ভাই-বোন সব ভুলিয়া গিয়া একই দর্শনের সেবকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া স্বদেশদ্রোহী ও স্বজনদ্রোহী হইয়া থাকে। মূলে হইল এই দর্শন। তাহাদের নূতন চিত্তক্ষেত্র এক।

গতানুগতিকের দলেই জগতের হাজারকরা ৯৯৯ জন লোক চলিয়া থাকে। সম্পাদকের মন্তব্য ব্যতীত যেমন স্বাধীন মত কদাচিৎ কেহ পোষণ করিয়া থাকে, তেমনই চলতি মনের সমর্থন করিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ মানব তদনুসারে স্বীয় মতের গঠন করে ও চলিয়া থাকে। রাইনল্যাণ্ডে সবাই টুপী নাড়িয়া হিটলারের নায়কত্ব চাহিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে চিন্তা করিয়া ভাল-মন্দ বিচার করিয়া মতস্থির কে কয় জন করিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। গতানুগতিকতাই জগতের মূল নীতি। আদি পিতা আদম যে ভাবে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়াছিল, আমরা আজ পর্য্যন্ত ঠিক সেই ভাবে ঈভের আকর্ষণে সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিতেছি ও ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। যিশুখৃষ্ট যে ভাবে পোষাক পরিধান করিয়া শিক্ষা দিতেন, পোপাদি যাজকগণ এখনও সেই পোষাকই পরিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যিশুর প্রকৃত ভাব যে কি পরিমাণে বর্ত্তমান, তাহা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা কঠিন নহে। বশিষ্ঠদেব যে ভাবে সন্ধ্যা করিতেন, ব্রাহ্মণগণ সেই ভাবেই অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা মন্ত্র আওড়াইয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা কি কারণে হীনবল? প্রত্যেকের কার্য্যপদ্ধতি হইতে বুঝা যায় যে, গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ঠাট বজায় রাখিয়া চলা হইতেছে। প্রকৃত পদার্থের বিষয় ধারণাই নাই, তাহাকে উপলব্ধি করা ত দূরের কথা!

আর উপায়ই বা কি? বিষয়সেবী জীব জীবনব্যাপী যে চিন্তায় মগ্ন রহিল, তাহাতেই তাহার সিদ্ধিলাভ হইল। মনের দৈন্য ঢাকিবার জন্যই তাহার এই ধর্ম্মালোচনার

প্রয়াস। দেহ যখন বিকল হইতে থাকে, তখনই মনের দৈন্য ধরা পড়ে এবং মানুষ নিজের প্রকৃতির অনুরূপ ক্ষেত্র সন্ধান করিয়া লয়। নিজের চিন্তা বা বিচার করিয়া বুঝিবার মত অবসর ও ক্ষমতা উভয়েরই অভাব হইয়া থাকে।

প্রতিভা কদাচিৎ দেখা যায়। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, যিশু, বহু শতাব্দীতে এক জন জন্মগ্রহণ করেন। স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে তাঁহাদিগকে উপদেশাদি পরিবেশন করিতে হয়। রাজা অশোক রাজার ভাবের বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব রাজত্ব ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ শক্তির আবেশে তাঁহারা ভরপূর হইয়া জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা অতিমানব ও মানুষের শক্তির বাহিরের পদার্থের অধিকারী হইয়া নিজেরা কৃতার্থ হন। উদারচিত্ত অবতারগণ শুধু নিজেরাই তৃপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহারা সকলের জন্য—সর্ব্বপ্রকার লোকের জন্য পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অক্ষম জীব নিজেদের শক্তিহীনতা-হেতু সেই পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। যে স্তরে আমরা বাস করি, সে স্তর হইতে অত উচ্চের চিন্তা করাও অসম্ভব। তাই আমরা মহাজন-দর্শিত প্রকৃষ্ট পন্থারই অনুসরণ করি।

অবতারগণ তপস্যার বলে ঈশ্বরের আদেশ ও উপদেশ লাভ করেন। কেহ কেহ ঈশ্বরের পুত্র। সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিতেন। সাধারণের পক্ষে এ সমস্ত ব্যাপার যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। তাই কেহ বা এ সমস্ত অলীক মনে করেন, আর কেহ বা ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া, ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে যুক্তির বাহিরের পদার্থের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে কথঞ্চিৎ শিক্ষিতচিত্ত রাজী হয় না। ইহাতে নাস্তিকের সংখ্যা বাড়িতেছে। তাহারা ঠিক নাস্তিকও নয়, আস্তিকও নয়। তাহারা বলে, দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে পারিলে সবই মানি, সবই বিশ্বাস করি। কিন্তু ধর্ম্ম-জগতে সকলেই শিশু। চিত্তের স্থৈর্য্য না জন্মিলে উচ্চচিন্তা আসে না, এবং মনের শিক্ষা না হইলে ঈশ্বরাদির ধারণা ত দূরের কথা, গণিতের সামান্য একটা সমস্যার সমাধান করাই সম্ভব হয় না। মানুষের চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—সে অজানার দিকে ছুটিতে চায়। এই অজানারে পাওয়ার জন্য সেই আদমের যুগ হইতে তাহার যে সাধনা চলিতেছে, তাহার কখনও বিরাম হইবে না। তাই সে বর্ত্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। অজানার মধ্যে সে খোঁজে তৃপ্তি, তাহার পরম প্রিয়ের সন্ধান। যদিও অজানারে জানাতেই জ্ঞানের প্রসার, তথাপি অজানার পশ্চাতে যদি জানার স্থিরাসন না থাকে, তাহা হইলে সে অগ্রসর হইতেই পারে না। এই স্থিরাসন আছে বলিয়াই প্রাকৃতিক দর্শন, সামাজিক দর্শন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন মানুষের চিত্তের ক্ষুধা মিটাইয়া তাহাকে তাহাদের পশ্চাতে ছুটাইতেছে। দিনের পর দিন মানুষ নিত্য নূতনের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইতেছে, এবং আরও নূতনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইতেছে।

শরীরের অধিনায়ক মন। মানুষ শরীরের ক্ষুধা মিটাইয়াই শুধু তৃপ্ত হইতে পারে না বলিয়া তাহার এই আধ্যাত্মিক অভিযান। প্রকৃতির জগতে প্রত্যেক জিনিষই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া যায়। সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বস্তুও মানুষের বুদ্ধির নিকট ধরা দিতেছে। প্রকৃতির নিকট হইতে তাহার এই প্রাপ্তিতে এবং আধ্যাত্মিক জগতে স্থূল ইন্দ্রিয়ের গতির সম্ভাবনা না থাকায়ও তাহার জ্ঞানের অপ্রাপ্তিতে মানুষ স্বতঃই বাহ্য পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা মানুষকে এই সসীম জগতের কালদেশ পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে তৃপ্ত থাকিতে দেয় না। তাই তাহাকে অসীমের সন্ধানে অনন্তের পশ্চাতে চলিতে হয়।

মনের সাহায্যেই তাহাকে সমস্ত জগতের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়ের খবর লইতে হইবে। সে ত শুধু মনের কাছেই সকল খবর পায়। চোখ দেখে যখন মন দেখে। মন যখন যে বিষয়ে স্থির হয়, তখনই সে সেই বিষয়ের জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। মনের স্থিরতাই জ্ঞান-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। মনের অস্থিরতা মানুষকে জ্ঞানের পথে ছুটায়, আবার জ্ঞেয় পদার্থে অভিনিবেশ দ্বারা মন স্থির হইলে জ্ঞানলাভ হয়—আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়।

বাহ্য পদার্থ মনকে যখন তৃপ্ত করিতে পারে না, তখন মনকে একটা স্থিরাসন করিয়া লইয়া আভ্যন্তরিক জগতে অসীম ও অনন্তের সন্ধানে যাইতে হয়।

প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ জগতের একটা, না একটাকে স্থিরাসন করিয়া লইয়া এই আন্তর জগতে অসীমের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

জগৎ তাঁহার সৃষ্টি। এইরূপ অসংখ্য জগতের অস্তিত্ব তাঁহাতে সম্ভব। এই ভাবের উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরে স্রষ্টৃত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। এক ক্ষুদ্র মন যখন এত বড় বড় বিষয়ের ধারণা করিতে পারে, তখন এই বিশ্বমানবের মনসমষ্টি কত মহান্, কত বিরাট্। তাই তিনি বিশ্বাত্মা।

এইরূপে একটা না একটা পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান হইয়া মহাপুরুষগণ তাঁহাদের চিত্তের ক্ষুধা মিটাইয়াছেন। কেহ বিচারমার্গ অবলম্বনে নেতি-নেতি করিয়া তাঁহাতে গিয়া ইতি দিয়াছেন—কেহ বা যোগমার্গাবলম্বনে সমাধিস্থ হইয়া অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন—কেহ বা তাঁহার করুণার কথা স্মরণ করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। মোটের উপর একটা সূত্র অবলম্বন করিয়া তবেই তাহার অনুকূলে মনের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছেন। যিনি মধ্যপথে মনের ছলনায় ভুলিয়া পথিপার্শ্বস্থ শোভায় আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেইখানেই রহিয়া গিয়াছেন। ঊর্দ্ধের খবর তাঁহার কাছে আর পৌঁছায় নাই।

সকল মহারথীই একটা না একটা পন্থা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরই হউক আর প্রকৃতিই হউক, এক জনকে আদর্শ রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। চিত্তের অবস্থা অনুসারে ফললাভের তারতম্য হইয়াছে। তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন কি না, তাহার ঠিক নাই, কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী সেবকগণ তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কথোপকথন পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়া ভক্ত সংগ্রহ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। সকল মহাপুরুষই বলেন, শাস্ত্রের অনুশাসন—আমার ভিতর দিয়া প্রকাশিত ঈশ্বরের বাণী। আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবেই ঈশ্বরের তুষ্টি হইবে।

এখানে তাঁহারা সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া এক জন স্রষ্টা ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়া লয়েন। কিন্তু সেই ঈশ্বরকে কেহ দেখিয়াছে বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের স্বরূপের বর্ণনাতেও যে বিভিন্ন মতের উল্লেখ আছে, তাহাতে কোনও প্রবুদ্ধ-চিত্ত নির্ভর করিতে পারে না। জীবিত লোকের কেহই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখে নাই। অথচ অতীতে তিনি দেখা দিয়াছেন, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত ধর্ম্মমত চলিয়া আসিতেছে। একটা কিছু অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া তাই সকলে ধর্ম্মকে আশ্রয় করে; প্রকৃত তথ্যলাভে যে কয় জন কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন।

এই সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান হইয়া ফরাসী দর্শনের প্রবর্ত্তক ডেকার্টিস (Descartes) বলিয়াছেন যে, চিন্তাধারা আরম্ভ হইতেছে নিজেকে লইয়া। সবই অস্বীকার করা যায়, কিন্তু আমি আছি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি (Cogito ergo Sum)।—তিনি এই মতবাদ লইয়া কতক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বাস্তব সত্তার উপর ভিত্তি করিয়া তবে মানসিক বিজ্ঞানের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে তিনিই এই বাস্তবদর্শনের প্রবর্ত্তক।

এই বাস্তবদর্শন বা প্রত্যক্ষদর্শন চরম বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে বেদান্তদর্শনে। বেদান্তদর্শন বেদের সার হইলেও কোনও কিছু বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় নাই। যে জ্ঞানই লাভ করা যাউক না কেন, বিচার করিয়া ও উপলব্ধি করিয়া তবেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অনুভব করিয়াই তবে সত্যের প্রকাশ করিতে হইবে।

অনেকে বলিতে পারেন, আপ্তবাক্য প্রমাণমূলক এবং তাহারই উপর এই দর্শন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেই আপ্তবাক্যও বিনা বিচারে কাহাকেও গ্রহণ করিতে বলা হয় নাই। মানুষের বিচারশক্তি মন্থন করিয়া যে সত্য লাভ করা যায়—মানুষ প্রজ্ঞাবলে যে তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, সেই তত্ত্বই গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণই এই দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

এই দর্শন ঈশ্বর বা অলৌকিক কোনও পদার্থের অস্তিত্বকে ধরিয়া-লইয়া তবে স্বীয় মতবাদ রচনা করে নাই। এই দর্শন দেখাইয়া, শুনাইয়া, বুঝাইয়া, উদাহরণ দিয়া, মনের মধ্যে গাঁথিয়া দিয়া তবেই প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছে। ঈশ্বর বলিয়াছেন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কথা ইহাতে নাই। আবার যুক্তিগুলিও কঠিন ভাষার আবরণে আবৃত রাখিতে কখনও চেষ্টা

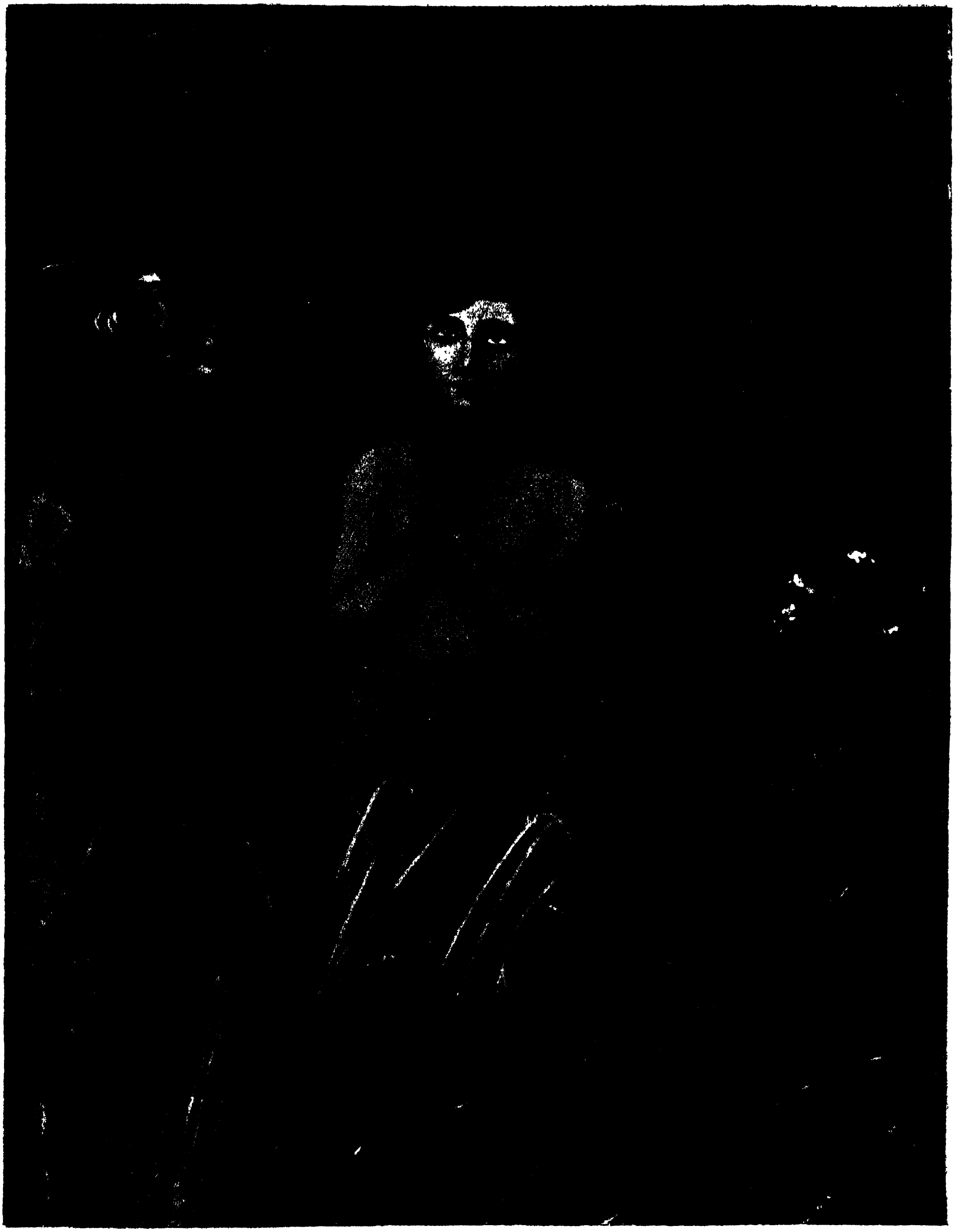
করে নাই। পিতা পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়া একাদিক্রমে বহু প্রকারে বহু উদাহরণের সাহায্যে প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করাইয়া পুত্রকে কৃতার্থ করিতেন। পুত্রও যতক্ষণ না নিজে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ উপদেশ পাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। শেষে সত্যলাভ করিয়া, 'এইবার আমি ঠিক জানিলাম' বলিয়া জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইতেন। এই প্রকার আখ্যায়িকা বেদান্তদর্শনের সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

ব্যাসদেব সূত্রাকারে এই দর্শনের প্রণালীবদ্ধ একটি মতবাদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ও বহু ভাষ্যকার প্রতিভার তারতম্য অনুসারে এই দর্শনের মতবাদকে যুক্তিতর্ক সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সকলেই তাঁহার নিজের রঙ্গিন চশমার সাহায্যে এক এক প্রকারে এই দর্শনের আকৃতি দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সব ছাড়িয়া ইহার মূল তত্ত্ব জানিতে হইলে উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

'তুমি' আর 'আমি' এই দুই বাক্যের পার্থক্য লইয়াই প্রথম যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন আচার্য্য শঙ্কর। জগতে আছে মাত্র বিষয়ী ও বিষয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, আমি ও তুমি। দেহের কথা ধরিলেও দেখা যায় যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহাকে আমি আমার সত্তা বলিয়া মনে করি, তাহা নষ্ট হইয়া গেলেও আমার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং দেহটিও 'আমি' নহি। আমার দেহ। দেহও 'তুমি'র মধ্যে পড়ে। এই দেহকে অবলম্বন করিয়া যে আছে, সে-ই হইতেছে আমি। এই 'আমি'র উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যক্ষদর্শন বেদান্তের উৎপত্তি। প্রথমতঃ এই 'আমি'র বিষয় আলোচনা করিয়া দেখান যায় যে, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বন্ধু, এমন কি এই দেহ পর্য্যন্তও একটা অভিমান দ্বারা আচ্ছন্ন আছে এবং সেই অভিমানটিই 'আমি' হইয়া রহিয়াছি। আমি অভিমানকে আশ্রয় করিয়া আমার জগৎ সৃষ্টি করিয়া একটা জগৎ-জোড়া 'আমি' হইয়া বসিয়া আছি। এই 'আমি'র কোনওখানে একটু ত্রুটি হইলেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই। অথচ সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেলেও আমার কিছুই ধ্বংস হয় না। এই ভাবে বিচার করিয়া উপনিষদ দেখাইয়াছেন যে, দৃশ্যমান জগতে যত কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা আমি নহি, অথচ 'আমি' ছাড়া আর কিছুই নাই। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে দেখান হইয়াছে যে—যে আমি এতটুকু হইয়া আছি, সেই আমিই সর্ব্বাত্মা। বুঝিতে পারা যায় না, এ কেমন হেঁয়ালি। উপনিষদের ঋষি অমনি উপাখ্যানের সাহায্যে দেখাইয়াছেন। ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দন প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মের উপদেশ পাইলেন। সুররাজ ক্রমাগত তিন বারেও ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বার বার দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তবে প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রজাপতি নখ, চুল প্রভৃতির ব্যবধানের দ্বারা দেখাইলেন যে, দেহের পরিবর্ত্তনেও যে পরিবর্ত্তিত হয় না, সেই হইতেছে আত্মা। কিন্তু প্রতর্দ্দন উহা বুঝিতে না পারিয়া দেহকেই আত্মা ভাবিয়া—দেহের উপাসনা করাকেই ব্রহ্মোপাসনা—এই বুঝিলেন। মিশরের মমি-উপাসকগণ, বোধ হয়, প্রতর্দ্দনেরই বংশধর। দেবরাজ বিচার করিয়া দেখিলেন যে, নখ, চুল না থাকিলেও আমার পরিবর্ত্তন হয় না। এই ভাবে কয়েক বার বিভিন্ন প্রকারের উপদেশ পাইয়া তিনি বুঝিলেন যে, যে সূত্র সকলের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে—অথচ যাহার পরিবর্ত্তন নাই, সেই সূত্রই আত্মা।

শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা দেখাইলেন যে, যেমন বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রাদির মধ্যে একই লৌহ রহিয়াছে, বিবিধ প্রকার অলঙ্কারের মধ্যে যেমন একই স্বর্ণ রহিয়াছে, তেমনি একই বিরাট আত্মা যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, সে সর্ব্বত্র সমান ভাবে বর্ত্তমান আছে। তত্ত্বমসি—সেই আত্মাই তুমি। জগৎকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই দর্শন লৌহ বা স্বর্ণের বিবিধ অবস্থায় যে নাম ও রূপ রহিয়াছে, সেইরূপ সমস্ত পদার্থই নাম, রূপের বিভিন্নতা দ্বারা জগৎ-রূপে সাজিয়া আছে। প্রকৃত পক্ষে একই আত্মা সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইয়া আছেন।

ব্রহ্ম অর্থ বৃহৎ। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তিনি সব। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই দর্শন কোনও অননুভূত পদার্থের কল্পনা করে নাই। তোমার, আমার, জগতের সমস্ত বিভিন্নতা বাদ দিলে যে সত্তার সর্ব্বত্র উপলব্ধি হয়, তাহাই ব্রহ্ম। সুতরাং জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতীত অপর কোন বস্তুর সত্তাকে স্থান না দেওয়ায় এই দর্শন সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য, সমস্ত বিচারসহ, এবং



ধ্রুব

[শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

সর্ব্ববাদিসম্মত। নিজেই নিজের শক্তিকে পরিচালনা করিয়া সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

এই দর্শন যে মতবাদের প্রচার করিতেছে, তাহাতে বাদ-বিসংবাদ নাই। বাদীই নাই, বিবাদী কোথায় থাকিতে পারে? ভাল-মন্দের প্রশ্নই এখানে নাই। বিচারের মাপকাঠী নিজে, বিচারক নিজে, আসামীও নিজে, ফরিয়াদীও নিজে। নিজে কি, নিজেই বিচার করিয়া দেখ। বিচারের ফলে যেখানে পৌঁছিবে, সেই পর্য্যন্তই তোমার গতি। কাহাকেও দোষ দেওয়ার কিছুই নাই। নিজেই নিজের জন্য দায়ী। কত দূর অগ্রসর হইলে, না পিছিয়ে গেলে, কিছুই তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না। স্থির হইয়া চিন্তা কর, তবেই তোমার অবস্থা ঠিকমত বুঝিতে পারিবে।

জগৎ সম্বন্ধেও তুমিই বিচার করিয়া দেখ যে, যাহা দেখ, তাহা ঠিক কি না? উপনিষদের উপাখ্যানগুলির সাহায্য লও, এবং বুঝিতে চেষ্টা কর যে, তোমার বিচার ঠিক হইতেছে কি না? প্রত্যেকেই নিজের কাছে ধরা দিতে বাধ্য। মন্দিরে, মস্‌জিদে বা গির্জ্জায় ভগবানকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার যো নাই। ধরা পড়িতেই হইবে।

এই মতবাদের উপলব্ধির জন্য মন্দির লাগে না—উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন নাই। হৃদয়-মন্দিরে ভজনা কর বিশ্বেশ্বর বিশ্বব্যাপীকে। সেখানে গেলে বিশ্বই থাকে না। ব্রহ্মের উপাসনা করে ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই অর্পণ হয় ব্রহ্ম হবির। ব্রহ্মই আহুতি দেয় ব্রহ্মাগ্নিতে। ব্রহ্মেই গতি, ব্রহ্মের এই ফললাভ। নির্ব্বাণেই শান্তি। জ্বলনই নির্ব্বাণের কারণ। শান্তি—শান্তি—শান্তি।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রাতের কথা

রাতের বাতাস মৃদু নিশ্বাস ছাড়িয়া বহিছে ধীরে,
বুঝি বা রাতের বেদনা লইয়া ফিরে।
দিবসের শেষে ডুবিল যে-সব গভীর আঁধার দহে'
বাতাসের দূত তাদের বারতা বহে।
ধরণীর বুকে হায়,
বারতা বহিয়া রাতের বাতাস কাহারে খুঁজিয়া যায়?
পথে নাই পথচারী,
মনের দুঃখ মনেতে রহিয়া হ'য়ে ওঠে আরো ভারী।
কে কোথায় জেগে রয়?
পুঞ্জিত যত গোপন বারতা কার কাছে সে বা কয়?

রাতের বাতাস দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বহিয়া যায়,
তাহার বেদনা বুঝিবে না কেহ হায়!
বন্ধু ভাবিয়া হৃদয়ের কথা তরুর কাছে সে কয়,
তরুও তখন নীরবে ঘুমায়ে রয়।
পৃথিবীতে কেহ নাই,
বেদনার বোঝা রাখিবার তার নাই যে গো কোন ঠাঁই।
তখন অসহ দুঃখে,
প্রতি রাতে তার লিখে যায় কথা অসীম আকাশ-বুকে।
সে বাণী গোপনে রয়,
আকাশের বুক তাই এত কালো—এত রহস্যময়!

শ্রীরবিদাস সাহা রায়।

পরাজয়



১

অধ্যাপক প্রশান্ত কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত : সহসা পত্নী রিণা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—"রোজই বল্‌ব মনে করি, কিন্তু আজ আর না বল্‌লে চল্‌ছে না।"

প্রশান্ত সেই কক্ষের দেয়ালে সংরক্ষিত বড় ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন আমার কোন কথা শুন্‌বার সময় হবে না! আর এটা কথা ব'লবার সময় নয়।"

রিণা ঝঙ্কার দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "রাতে ভাইপোর পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাক, তখন শুন্‌বার অবসর হয় না; সকালে কলেজের তাড়া।—তা হ'লে দেখ্‌ছি, আমার আর বলা হয় না।"

রিণা একখান চেয়ারে ঝুপ্‌ করিয়া বসিয়া-পড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "তোমার এই চারটি শ' টাকা রোজগারে এত বড় সংসার প্রতিপালন করা—কার সাধ্য তা বল্‌তে পারো?"

প্রশান্ত রিণার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "যত দিন চাকুরী ছিল, সংসারে দিয়েছেন, এখন চাকুরী নেই—দেবেন কোথা থেকে?"

রিণা বলিল, "কিন্তু আর একটা চাকরীর জন্য চেষ্টাও ত করেন না। ছেলে-মেয়েই তাঁর সাতটি পুষ্যি—আজকালকার যুদ্ধের এই দুর্মূল্যের বাজারে···চলে কি ক'রে?"

প্রশান্ত বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, 'টাইটা' ঠিক বাঁধা হইল কি না দেখিতেছিল। অন্যান্য দিন রিণাই তাহার 'টাই' বাঁধিয়া দিত; আজ তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া প্রশান্ত এ কাজে তাহার সাহায্য চাহিল না।

প্রশান্ত বলিল, "আর এক যুদ্ধের সময় আমি ছোট ছিলাম, দাদাই কত কষ্টে আমাকে মানুষ ক'রেছিলেন; আর এবার তিনি সপরিবারে কি না খেয়ে মর্‌বেন, এই কথা বল্‌তে চাও?"

রিণা ক্রোধভরে বলিল, "কেন, তাঁরা দেশের বাড়ীতে গিয়ে ত থাক্‌তে পারেন। তোমারও ত দু'টি ছেলেমেয়ে। মেয়েকে তিনি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিন। ছেলেকে চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করতে বলুন।"

প্রশান্ত রিণার কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

দাদা বিজয়ের পাঁচ পুত্র, ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবিনয় 'আই-এ' দিবে। প্রথমা কন্যা লীনা ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে।

প্রশান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিনয়কে লেখাপড়া শিখাইতেছে, ইহাতেই রিণার বুকে ঈর্ষ্যার আগুন জ্বলিতেছে।

বিজয়ের স্ত্রী সুরমা পল্লীগ্রামের মেয়ে। স্বভাবটি নম্র; স্বামীর চাকুরী যাওয়াতে ছোট জা'য়ের অত্যাচার নীরবে সহিয়া যাইতেছিল। ইহাতে রিণার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতেছিল না। সে এক্ষণে কি কৌশলে ইহাদের তাড়াইবে, তাহারই ফন্দী খুঁজিতেছিল।

স্বামীর চাকুরী যাওয়াতে সুরমা উড়িয়া পাচকটিকে বিদায় দিয়া নিজেই দুই বেলা রান্না করিতেছে। একটি মাত্র দাসী আছে; সে রিণার ছেলেমেয়ে লইয়াই ব্যস্ত। কাজেই সুরমার এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই।

রিণা সহরের শিক্ষিতা মেয়ে—আধুনিকা। সে অত ঝক্কি পোহাইবে কেন? তাহার ইচ্ছা—উহাদের পৃথক্ করিয়া দিয়া সে সংসারের কর্ত্রী হইয়া বসিবে; বড় জা'কে আমোল দিবে না। কিন্তু নির্ব্বোধ প্রশান্ত তাহার এই সাধু সঙ্কল্প বুঝিতে পারিতেছে না! এই জন্যই রিণার সকল আক্রোশ বড় জা'য়ের উপর।

দারুণ শীতের প্রত্যুষে উঠিয়া বড়বৌ রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া যথাসময়ে স্কুল-কলেজের ভাত দিবে, আর রান্নাঘর হইতে বাহির হইবে বেলা দু'টায়।—তাহার এই প্রাণপণ পরিশ্রমও সুশিক্ষিতা রিণার নিকট তুচ্ছ; নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য

২

পরদিবস প্রশান্ত আহারে বসিয়া বলিল, "বৌদি',·· দাদা কি কোন কাজের চেষ্টা ক'রছেন? শুনছি, আমি একা না কি পেরে উঠ্‌ছি না—এত বড় সংসারের ভার!"

সুরমা প্রশান্তকে পরিবেশন করিতে করিতে চমকিয়া উঠিল। প্রশান্তের মুখ হইতে যে এ-রকম কথা বাহির হইবে, সুরমা পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাইয়াছিল—রিণার কয়েক দিনের ব্যবহারে।

সুরমা বলিল, "দুই-এক যায়গায় চেষ্টা কচ্ছেন বৈ কি! যুদ্ধের বাজার কি না, বলছিলেন—কোথাও তেমন সুবিধে হ'য়ে উঠ্‌ছে না; আর, হিন্দুরা না কি চাকুরী পাবেও না।"

রিণা কোন দিন প্রশান্তের আহারের সময় নীচে নামে না। বোধ হয় ঐ কথাগুলি শুনিবার জন্যই সে দিন ছেলের দুধ লইবার অছিলায় সে নীচে আসিয়াছিল।

প্রশান্তের কথা শুনিয়া রিণা বলিল, "উনি ত নবাব খাঞ্জা খাঁ নন যে, গোষ্ঠীশুদ্ধ পুষ্‌তে পারবেন!"

প্রশান্ত রিণার কথাগুলি শুনিয়া একটু জোর পাইল; বলিল, "ছেলের জন্মতিথিতে কিছু খরচ আছে। আমার প্রফেসর বন্ধুদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করতে হবে।—এ দিকে আবার তোমার ছেলে-মেয়ের পরীক্ষার ফি···"

রিণা দ্বিতলের সিঁড়ির দিকে আসিতে আসিতে ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল, "নিত্যি নেই, ন্যায় কে?—নিত্য রোগী দেখে কে? মেয়ের পড়া ছাড়িয়ে দাও। ছেলে কোথাও কাজকর্ম্মের চেষ্টা করুক।"

সুরমার কণ্ঠে কথা সরিল না। ইহার কয়েক মিনিট পরে সে যখন দুধের বাটিটা প্রশান্তের পাতের কাছে রাখিয়া দিল, তখন তাহার সজল চক্ষু হইতে এক ফোঁটা অশ্রু হঠাৎ প্রশান্তের হাতের উপর পড়িল। সুরমা ইহা জানিতে পারে নাই; কিন্তু প্রশান্ত কিছু কাল গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

সে দিন কলেজের ছাত্রদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না! প্রফেসর মহাশয় অনবরত অসংলগ্ন কথা বলিয়া যাইতেছিলেন; যেন তিনি ঘোর অন্যমনস্ক!

কলেজ হইতে বাড়ী আসিয়া, বিজয়কে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরিতে দেখিয়া প্রশান্ত রুদ্ধচিত্তে খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া-থাকিয়া বলিল, "এত রোদ্দুরে কোথায় গিয়েছিলে দাদা?"

বিজয় কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "একটা কাজের চেষ্টায় ক-দিন থেকে হাঁটা-হাঁটি করচি কি না; কিন্তু কোন সুবিধে ক'রে উঠতে পারছিনে।"

প্রশান্ত খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমার কি কোন-কিছুর অভাব হচ্ছে? আর কে তোমাকে এই দুপুরে রোদে চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে ব'লেছে? এই দুপুরে রোদে আর তুমি ঘুরে বেড়িও না দাদা!"

—"তুই আর কত পেরে উঠবি ভাই?···তবু যদি মাসে ত্রিশটে টাকাও আনতে পারি···" বিজয়ের কণ্ঠস্বর বেদনাপূর্ণ।

বিজয়ের কথা শেষ না হইতেই প্রশান্ত কিঞ্চিৎ উপেক্ষাভরে বলিল, "মাসে ত্রিশ টাকায় আমার কিছুই সাশ্রয় হবে না। তার জন্যে এই কাঠ-ফাটা রোদে হয়রাণ হ'য়ে লোকের—"

বিজয় বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু ছেলে-মেয়ের পরীক্ষার ফি, তাদের পড়ার খরচ—এ সবই ত আছে।"

প্রশান্ত বিচলিত স্বরে বলিল, "তোমার ছেলে মেয়ের পড়ার খরচ তা ব'লে কখনও কি আটকিয়েছে,—না—ছেলের পরীক্ষার ফি—দিতে এখনই আটকাবে?"

বিজয় বলিল, "থাক-এখন ও সব কথা। এখন জল-টল খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ' ভাই!"

রাত্রিতে প্রশান্ত শয়ন করিলে রিণা ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই বিদ্যে নিয়ে তুমি 'প্রোপেসারি' কর—এই বড় তাজ্জবের কথা! তোমার দুঃখ এ-জন্মেও যাবে না। যে পুরুষ স্ত্রীর কথা না শোনে—সে আবার মানুষ? ও-বেলা তুমি আর এমন কি কথা বলেছো? সেই কথা লাগানোতেই ত তোমার দাদা অত রদ্দুরে কাজের চেষ্টায় বেরিয়েছিলেন। বাবাঃ, সে কি খোঁটা! বলা হলো—'দেওরের মুখ নাড়া খেয়ে আর ক-দিন চালানো যাবে'?"

রিণার কথায় যে অত্যুক্তি ছিল, প্রশান্ত ইহা বুঝিতে পারিল। সে বিরক্তি সহকারে বলিল, "একটু ঘুমোতে

দাও—রাত হ'য়েছে। ও-সব বচন এখন মুলতুবি রাখলেও ক্ষতি নেই।"

রিণা আপন-মনে খানিকক্ষণ 'গজর-গজর' করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

৩

দুই বৎসর পরের কথা।

বিজয়ের ভাগ্যে আর চাকুরী জুটিল না। এত দিন এত চেষ্টা করিয়াও সামান্য কুড়ি টাকার একটা চাকুরীও সে মিলাইতে পারিল না।

সংসার ঠিক একই ভাবে চলিয়া যাইতেছে; আলো-ছায়ার খেলার বিরাম নাই।

এবার প্রশান্তের কন্যার জন্ম-তিথির উৎসব হইবে। রিণা হীরার আংটির ফরমাস করিয়াছে,—প্রশান্তকে তাহা কিনিয়া দিতেই হইবে।

রিণা এই উপলক্ষে তাহার পিত্রালয়ে নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠাইল, এবং দুই-এক জন আত্মীয়া ও বান্ধবীকেও নিমন্ত্রণ করিল।

জন্মতিথির ঠিক পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে প্রশান্ত তাহার ঘরের ভিতর বহুক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। রিণার নিকট কথাগুলি প্রকাশ করিতে তাহার কিঞ্চিৎ কুণ্ঠা হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহা তাহাকে তখন না বলিলে পরদিন হয় ত সকলের নিকট তাহাকে অপদস্থ হইতে হইবে। বিশেষতঃ, রিণার প্রকৃতি তাহার অজ্ঞাত নহে।

প্রশান্ত সেই কক্ষে পায়চারী করিতে করিতে সহসা চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া বলিল, "আমি মনে কচ্ছি···কাল এক সঙ্গে দুই কাজই শেষ করবো। সুরেশের পৈতেটাও না দিলে আর ভাল দেখাচ্ছে না।"

আসন্ন ঝড়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে আকাশের অবস্থা যেরূপ ভীষণ হয়, রিণার মুখমণ্ডল তাহার অপেক্ষাও ভীষণ গম্ভীর হইল। রিণার সকল সঙ্কল্পই ইহাদের দ্বারা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহার কোন আশা পূর্ণ হয় না; ইহাই হইল তাহার ভীষণ ক্রোধের কারণ। রিণা ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ফোঁস করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার মনের ভাবটা কি খোলসা ক'রে বল তো শুনি আমি।"

প্রশান্ত বিচলিত স্বরে বলিল, "মনের ভাব আর কি? তুমি শিক্ষিতা হ'য়েও সংসারের খরচ সামলিয়ে চ'লতে পার না, সে দোষ কি আমার? ছেলেটার পৈতে ত দিতেই হবে; আর যদি এক খরচেই দুই কাজ হ'য়ে যায়, তাতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে?"

রিণা ঝাঁঝের সহিত বলিল, "সে কাজ পরে করলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো না। আর কালীঘাটে গিয়ে পৈতে দিয়ে আনলে খরচও বেশী লাগে না। তুমি আমাকে তোমার দুশ্‌মন ব'লেই মনে করো—তা কি আর আমি জানিনে?"

প্রশান্ত একটু নরম সুরেই বলিল, "তুমি এটুকু বুঝলে না! তোমার মেয়ের জন্মতিথির যা উৎসব সবই হবে; লোকও বিস্তর নেমন্তন্ন করা হ'য়েছে। ঐ সঙ্গে ঐ ঝঞ্ঝাটটা মিটিয়ে ফেলতে কোন মুস্কিল নেই।"

রিণা এবার তাহার শাণিত অস্ত্র কোষমুক্ত করিল; হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "আগে জানলে আমি মা-বাবাকে নেমন্তন্নের কার্ড পাঠাতুম না কক্ষনো। তাঁরা কোন দিন ধারণাও করতে পারেননি যে, আমার হাত-পা বেঁধে কি ভাবে আমাকে মাঝ-দরিয়ায় নিক্ষেপ্ ক'রেছেন! ওঃ, এত লাঞ্ছনাও আমার ভাগ্যে ছিল! মা বসুন্ধরা দ্বিধা হ'লে আমি—"

কিন্তু বসুন্ধরা দ্বিধা হইবার পূর্ব্বেই প্রশান্ত নির্ব্বাক্ ভাবে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মেয়ের জন্মতিথির উৎসব ও ভাসুরপোর উপনয়ন উপলক্ষে রিণার পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন।

রিণার মাতা জামাতার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া ভয়ঙ্কর চটিয়া উঠিলেন।

সুরেশের অঙ্গুলীতে মূল্যবান অঙ্গুরী, পরিধানে গরদের জোড়—উপনয়নের কোন উপকরণের বা অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় নাই। প্রশান্তের কন্যার জন্য হীরা-বসানো আংটি কেনা হয় নাই, এ জন্য রিণা নবক্রীত অঙ্গুরীটি কন্যার আঙ্গুলে পরায় নাই।

রিণার পিতা-মাতা অবিলম্বে কন্যার সদ্গতির একটা ব্যবস্থা না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করা সঙ্গত মনে করিলেন না।

নিমন্ত্রিতদের আহার সমাধা হইলে প্রশান্ত তাহার

ঘরে প্রবেশ করিল। তখন মা ও মেয়েতে মহোৎসাহে পরামর্শ চলিতেছিল।

প্রশান্ত একটু শঙ্কাকুল চিত্তেই ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আজই কি আপনাদের বাড়ীতে না গেলে হ'ত না?"

প্রশান্তের শাশুড়ী মাথা কাত করিয়া যতখানি সাধ্য তীব্র বিষ ঢালিয়া বলিলেন, "থাক্‌তে আর দিচ্ছ কই বাবা! আমি ভেবেছিলুম, সুপাত্রে পড়েছে—মেয়েটা আমার খাসা সুখেই থাক্‌বে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আমার সেটা ভুল ধারণা!"

সেই কক্ষে প্রবেশের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে প্রশান্ত যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিল।

শ্বশুর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহাকে বলিলেন, "এ সব কি দেখ্‌ছি! জান ত আজকালকার বাজার,··· এত ধূমধাম কর্‌বারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তোমার ভাইপোর উপনয়নের কথা আমি বল্‌ছি-নে। গীরার জন্ম-তিথি উপলক্ষেই বা এত খরচপত্র করা কেন? একে এতগুলি কুপোষ্য প্রতিপালন কর্‌তে হচ্ছে,—তারা তোমার ঘাড়ে চেপে খাসা গুছিয়ে নিচ্ছে;—আর তুমি দিল-দরিয়া হ'য়ে দু'হাতে টাকা উড়োচ্ছো! ভবিষ্যতের কথা ভাব্‌তে হয় বাবাজি!—বিয়ে-থাওয়া ক'রেছো, দু' ছেলের বাপ,—আরও যে না হবে, তাও ত নয়।"

শ্বশুর মহাশয়ের অতগুলি উপদেশ এক সঙ্গে শুনিয়া প্রশান্তের মনের গতি কিরূপ হইল, তাহা অন্যের বুঝিবার উপায় রহিল না।

প্রশান্ত বলিল, "কি কর্‌বো বলুন! আমাকেই ত সব কর্ত্তে হচ্ছে। তা ছাড়া উপায় কি?"

এবার শাশুড়ী বাঁকা মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "তুমি সব ঘাড়ে নিয়েছো বলেই ত তোমাকে কর্‌তে হচ্ছে। কথায় বলে, 'ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই!' সে কথা কি তোমার মনে আছে?"

প্রশান্ত তর্ক এড়াইবার জন্য বলিল, "ঠিক ব'লেছেন, আমি গোড়ায় অতটা বুঝ্‌তে পারিনি। এবার আমার চৈতন্য হ'ল; আপনাদের মত হিতৈষী আমার আর কে আছে এ বিশ্বসংসারে?"

প্রশান্তের কথাগুলি শাশুড়ীর মনের মত হইল। উপদেশ নিষ্ফল হয় নাই বুঝিয়া তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন, —"মেয়েও ত' বড় হ'য়েছে। পার তোমাকেই কর্ত্তে হবে।···কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আস্‌বে না।"

কথাগুলি শুনিয়া প্রশান্ত মাথা চুলকাইতে লাগিল; এবং একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আমাদের গাঁয়েই দেখে-শুনে ওর বিয়ে দিতে হবে।"

শ্বশুর বলিলেন, "তোমাকে দেখবার কেউ নেই, কিন্তু তাদের দেখবার জন্য তুমি আছ ব'লেই তারা হাত-পা গুটিয়েছে। তা যাই হোক, এখন থেকে ভাবতে শেখ বাবাজি! আমার চুল পেকে গেল সংসার টান্‌তে টান্‌তে; তুমি ত ছেলে মানুষ। বুড়োর কথাগুলো স্মরণ রেখো।"

রিণা নিতান্ত ভালমানুষের মত মা-বাপের কথাগুলি শুনিতে লাগিল; তাহার বড়ই মধুর মনে হইল। বড় ভাই কি শ্বশুরের চেয়ে আপন? ভুল! উত্তমার্দ্ধ স্ত্রীর পূজনীয় পিতাঠাকুর অপেক্ষা গুরুতর গুরুজন আর কে?

প্রশান্ত যখন সেই কক্ষের বাহিরে আসিল, তখন সুরমা ও বিজয় পুত্রকন্যা সহ প্রসন্ন মনে আলাপ করিতে-ছিল। তাহাদের সম্মুখে আসিয়া প্রশান্ত কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "তোমাদের জন্যে আমার সবই গেল শুন্‌ছি! অবশেষে আমাকে না কি ভিক্ষার ঝুলি সম্বল ক'রে ঘুরতে হবে—এই বিশ্বমাঝে!"

মুহূর্ত্তে সকলের হাসিমুখ ম্লান হইয়া গেল। বিজয় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিল, "পৈতের জন্যে এত বেশী খরচ কর্‌বার কি দরকার ছিল ভাই!"

প্রশান্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তা বল্‌লে কি হয়? সবই যে তোমাদের চাই। আমার প্রচণ্ড চৈতন্য হ'য়েছে। কাল থেকে তোমাদের সংসার বুঝে নিও।"

প্রশান্ত শয়ন-কক্ষে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। রিণা বহু দিন পরে পরম আগ্রহভরে প্রশান্তকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "ভেবেছেন ওঁরা, দেওর টাকার কুমীর—যত ইচ্ছে শুষে নিই। আলাদা হ'য়ে এখন সংসার চালিয়ে দেখুন—কত ধানে কত চাল!"

রিণার পিতা-মাতা ইহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। প্রশান্তের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া রিণা পুনরায় বলিল,—"দেখ্‌লে ত, তোমাকে একবার খেতে বল্লে? কেমন বিবেচনা দেখ!"

প্রশান্তের চক্ষু তখন নিদ্রাজড়িত, তথাপি সাগ্রহে সে বলিল, "বৌদি অনেকক্ষণ আমাকে ও দাদাকে এক সঙ্গে খাইয়েছেন। তুমি ত কোন দিন আমায় খেতে দাও না; অকর্ম্মার ধাড়ী! কেবল পরের কাজের খুঁত ধরো,—খবরের কাগজের সম্পাদকগুলার মতো।"

রিণা বক্রমুখে বলিল,—"তা জান্‌লে আর ও কথা ব'লতে না; জান না ত—আমি তোমাকে পরিবেশন কর্ত্তে গেলে, দিদি অম্‌নি বলে ওঠে—'থাক্ থাক্, আমি দিচ্ছি, তুমি বুঝে দিতে পার্‌বে না। তার একটু মাছ-তরকারী বেশী লাগে'—কত যেন দরদ!"

প্রশান্ত তৃপ্তিপূর্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বৌদি'র হাতেই ত মানুষ হ'য়েছি; আমার খাওয়ার সম্বন্ধে বৌদি' যতটা বোঝে—এমন আর কে বুঝবে? বৌদি'ই ত তোমাকে রান্না শিখালো; এখন তোমার গুরুমারা বিদ্যে হ'য়েছে!"

রিণা কথাটার মোড় ফিরাইয়া বলিল, "তুমি তাহ'লে বড্ড জানো! ভালো ভালো পেটির মাছগুলো সবই ভাসুর আর তার ছেলে-মেয়েদের জন্যে রেখে দেয়। তুমি বাজারের খরচ কি কম দাও?"

প্রশান্ত তিক্তস্বরে বলিল, "উপদেশ থাক্, তুমি চুপ কর; শরীরটা ভাল লাগ্‌ছে না। তুমি যাও, খেয়ে এস।"

রিণা বলিল, "আমার খাওয়া মায়ের সঙ্গে ঢের আগেই হ'য়ে গিয়েছে।"

প্রশান্ত বলিল, "বৌদি'র খাওয়া বোধ হয় এখনও হয়নি। তুমি তাঁকে দিয়ে এস।"

রিণা প্রশান্তকে চিনিত; প্রশান্ত একটুতেই নরম হইয়া যায়। এই বুদ্ধিহীন অস্থিরমতি স্বামীকে সে কোনও প্রকারে কায়দায় আনিতে পারিতেছিল না; এ জন্য তাহার নারী-জীবনে প্রচণ্ড ধিক্কার জন্মিয়াছিল। এত কৌশল, অভিনয় সবই বৃথা!

রিণা বলিল, "তাকে আর বল্‌তে হবে না। কোন্ সকালে সে খেয়ে নিয়েছে। নিজের পেটের দরকার সে ভালই বোঝে!"

প্রশান্ত ত্রস্তভাবে শয্যাত্যাগ করিয়া বিজয়ের শয়ন-কক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল, দ্বারের অর্গল বন্ধ।

পরের দিনের কথা।

রিণা প্রত্যূষে উঠিতে পারিত না; বেলা আটটার পর শয্যাত্যাগ করিত। কর্ম্মের বাড়ী, অধিক রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিল, সে জন্য পরদিন উঠিতে তাহার আরও খানিক বেলা হইল। সুরমার তখন প্রায় অর্দ্ধেক রান্না শেষ হইয়াছে; পুত্র-কন্যারা স্নান করিয়া আহারে বসিয়াছে। প্রশান্ত স্নান করিতেছিল।

রিণা ভাবিয়াছিল, বড়বৌ পৃথকভাবে রান্না করিবে। কিন্তু প্রশান্তকে স্নান করিতে দেখিয়া রিণা অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া স্নানের ঘরের সম্মুখে গিয়া বলিল, "এ কি রকম দেখছি? কাল কি ব'লেছিলে—আমার মা-বাবার সামনে?"

প্রশান্ত ক্রোধভরে বলিল, "এক জন বেলা ন-টা পর্য্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোক, আর সকলে না খেয়ে কলেজে-স্কুলে যাক।"

রিণা বলিল, "ভদ্রলোকের এক কথা; কিন্তু এখানে সবই উল্টো!"

সে ক্রোধভরে একেবারে রান্না-ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। একটু ভাবিয়া ঝড়ের মতো বেগে বলিল, "ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি; কিন্তু এমন নিঘিন্নে, নাতখোয়ারী মেয়েমানুষ আমি জীবনে দেখিনি!"

সুরমা ছোট জায়ের কঠোর তিরস্কার আমোলে না আনিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "তুমি রাঁধতে এলে আমি কি আসতুম? আমি না এলে ঠাকুরপো কি কলেজের ভাত পেতো? না খেয়ে কলেজে যাবে—সেটা ভাল মনে হয়নি।"

"না হয়—না খেয়েই যেতো। তোমাকে সে কথা ভাবতে ত বলেনি কেউ। ভারী দরদ! স্পষ্ট বল্‌লেই হয়—নিজের ছেলে-মেয়ে স্কুল-কলেজে যাবে, সেই জন্যেই সকালে রাঁধবার এত তাড়া।"

সুরমা এ কথারও প্রতিবাদ না করায় রিণা গজ্‌গজ্ করিতে করিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে প্রশান্ত আহারে বসিলে সুরমা বলিল, "কাল থেকে যা জুটবে তাই খাবে ওরা। আর এত গঞ্জনায় ভাত মুখে তুলতে ইচ্ছা হয় না। ছোটবৌ আমাকে যা-না-তা' ব'লে বকে গেল!"

প্রশান্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল, "বল্‌বে না? একশ' বার বল্‌বে! তার গায়ের জ্বালায় বলে। তোমাদের হিংসেয় সে কি কম জ্বল্‌ছে? তার সংসার—সে কোথায় কর্ত্তৃত্ব কর্‌বে, না তাকে পরাজয় স্বীকার ক'রে নীচু হ'য়ে থাক্‌তে হ'য়েছে! এতে গায়ে জ্বালা ধরে না?"

প্রশান্ত আহার শেষে হাত-মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, "দাদা একটা কাজের চেষ্টাও কর্‌ছেন না, তাঁর ত বিবেচনা করা উচিত।"

দুপুরে বিজয় আহারে বসিলে সুরমা বলিল, "দেখ, একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা কর। ঠাকুরপো ত জবাব দিয়েছে। ও-বেলা আলাদা হ'য়ে রাঁধবার হুকুম দিয়েছে।"

বিজয় ভাতগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। ভাল করিয়া তাহার খাওয়া হইল না।

সুরমা রিণাকে আহারের জন্য ডাকিল। রিণা ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল, সে নিজেই বাড়িয়া লইবে।

সুরমা সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া রান্নাঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া যখন দ্বিতলে উঠিল, তখন বিজয় একটা ছাতা হাতে করিয়া নীচে নামিতেছিল।

সুরমা বলিল, "এই খেয়ে উঠলে, একটু জিরিয়ে বেরুলে হ'ত না?"

বিজয় বলিল, "এক জায়গায় একটা কাজের ঠিক হচ্ছে, দেখি কি হয়।"

৩

বিকালে স্কুল-কলেজের ছুটী হইলে বিজয়ের ছোট-ছোট পুত্র-কন্যা জলখাবারের জন্য আবদার করিল; সুরমা অসুখের ভাণ করিয়া নীরব রহিল। শুষ্কমুখে তাহারা খেলা করিতে চলিয়া গেল।

রিণা প্রশান্তের বৈকালিক জলখাবার, ও পুত্র-কন্যার জলখাবার দাসীকে দিয়া দ্বিতলে পাঠাইয়া রান্না চাপাইল। প্রশান্ত তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াই কি ভাবিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রিণা উপরে গিয়া দেখিল, টেবিলের উপর প্রশান্তের জলখাবার পড়িয়া আছে; খাবারগুলিতে হাতও পড়ে নাই।

* * * *

বিজয়ের ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকুরী হইয়াছে। সুরমা পৃথক্‌ভাবে রাঁধিয়া স্বামী-পুত্রদের খাইতে দিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তাহার নিস্তার নাই। রিণা প্রত্যেক বিষয়ে একটা না একটা খুঁত ধরিয়া তাহার কলহের পেশা বজায় রাখিল।

প্রশান্তের কন্যা মীরা সুরমার কাছে খাইবার জন্য আবদার করিত। রিণা তাহার দাসীকে দিয়া তাহাকে অন্য কোথাও সরাইয়া দিত।

একই রান্নাঘরে দুই পরিবারের রান্না হইয়াছে। প্রশান্ত আহারে বসিয়াছে। রিণা পরিবেশন করিতে করিতে বলিল, "একটা ঠাকুরের ব্যবস্থা কর।"

প্রশান্ত শ্লেষভরে বলিল, "বৌদি' এতগুলি লোকের রান্না একাই কর্‌তেন,—তাঁর কোন দিনও ঠাকুরের দরকার হয়নি। আর দুটো লোকের রান্না, তাও একখানার বেশী দু'খানা তরকারী হয় না, কাজেই ঠাকুর না হ'লে কি ক'রে চলে?"

রিণা ঝাঁঝিয়া বলিল, "আমরা পাড়াগাঁয়ের বাঁদী-ক্লাশের মেয়ে নই যে—রান্নায় ঝানু হব।"

শুনিয়া সুরমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সুরমা তাহার দেবরটির মনোভাব পুরাদস্তুর জানিত। আহারের সময় সে নিজে পরিবেশন না করিলে তাহার তৃপ্তি হইত না। সুরমা খানিক ইতস্ততঃ করিয়া মাছের ঝোলের বাটিটা প্রশান্তের পাতের কাছে রাখিয়া আসিল।

প্রশান্ত সুরমার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাদের বাজার থেকে তুমি আনাজ-তরকারী নিলেই পার্‌তে। তোমার হেঁসেল থেকে দিলে তোমাদের কুলোবে না বৌদি'!"

সুরমা ভারী গলায় বলিল, "কুলোবে, তুমি খাও।"

প্রশান্ত আহার শেষ করিয়া বলিল, "গয়লা তোমাদের দুধ দিয়েছে?"

সুরমা বলিল, "দুধ কি হবে ঠাকুরপো! আমার কোলে ত কচি-কাচা নেই!"...

প্রশান্ত তাহার মনের কষ্ট বুঝিয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

* * * *

দুই মাস পরের কথা।

সে দিন কলেজ হইতে প্রশান্ত আসিয়া রিণাকে বলিল, "লীনার বিয়ের ঠিক কর্‌লুম। এবার তোমার

মাকে তিন-চার দিন আগে থেকে আন্‌তে হবে। কারণ বৌদি' ত তেমন পাকা গিন্নী ন'ন ?···কি বল ?"

রিণা বলিল, "তোমার ভাইঝির বিয়েতে আমার মা এসে কি করবেন ?"

প্রশান্ত সহজ স্বরে বলিল, "ভাইঝির বিয়ে দিচ্ছে কে ? আমাকেই ত সব কর্‌তে হচ্ছে। যাতে কাজটা নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়, সেটা ত করা দরকার।"

রিণা বলিল, "কত দিতে হবে ! পাত্র কেমন ?"

প্রশান্ত বলিল, "পাড়াগাঁয়ের ছেলে, চাষ-আবাদ আছে। বেশী কিছু দিতে হবে না। টাকা শ' চারেকের মধ্যেই সব হ'য়ে যাবে। তুমি কাল লীনার হাতের চুড়ীর মাপ্‌টা ভাল ক'রে নিও। বৌদি' বুঝ্‌তে পার্‌বে না।"

রিণা বলিল, "যা সোণার দর হ'য়েছে ! তুমি তামার পাতের উপর গ'ড়্‌তে দিও। কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না।"

প্রশান্ত বলিল, "তাই হবে; তা' ছাড়া কি নিরেট দেওয়া পোষায় ?"

বিজয় ও সুরমা বড়ই অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিল। লীনা সুন্দরী ও শিক্ষিতা, আর সে যাইতেছে কোন্ সুদূর পল্লীগ্রামে ! সুরমা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সবই ভাগ্য ! আস্তাকুড়ের ধোঁয়া স্বর্গে যায় না। তা নইলে পাকা-দেখার সময় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না।"

বিজয় বলিল, "তা—না নিয়ে যাক। লীনাকে বিয়ের দিনই পাকা দেখবে। মন খারাপ করো না, স্মরণ রেখো, ঈশ্বর মঙ্গলময়।"

রিণা অন্তরাল হইতে ইহাদের কথাগুলি শুনিয়া বলিল, "যা করছে, তাই যথেষ্ট। এতখানিই বা কে করে ? তোমাদের জন্যে এবার থেকে ডাকাতি করুক !"

সে দিন কলেজে যাইবার সময় প্রশান্ত সুরমাকে বলিল, "বৌদি', বিকেলের দিকে একটু সকাল ক'রে রান্না চাপিও। আমি যে রায় বাহাদুরের ছেলেকে পড়াই—সে আস্‌বে। তার জন্যে একটু জল-খাবারের যোগাড় করো।"

সুরমা রন্ধন-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল; দেবরের কথাগুলি কাণে যাইতেই বলিল, "উনি বল্‌ছিলেন—দেশের সেই পাত্রটির কথা। ছেলেটি বি-এ পড়ে, কল্‌কাতাতেই আছে।"

সুরমা ভাবিল, মেয়েটি শিক্ষিতা—শিক্ষিত পাত্রের হাতে পড়িলেই সুখী হইবে।

প্রশান্ত রুক্ষ স্বরে বলিল, "তা ত জানি। তোমরা আমাকে কি মনে কর ? কোন রাজা-বাদ্‌সা-গোচের লোক ব'লে ঠাউরিয়ে রেখেছ ? পাকা-দেখে এলুম; এখন নূতন কথা ! তোমাদের যা খুসী কর, আমি জানি না।"—বলিয়া প্রশান্ত বাহিরে চলিয়া গেল।

পুনরায় একত্র রন্ধন-কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় রিণা সুরমার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিল। সুরমা দেবরের কথায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সকলের আহার শেষ হইলে মনের কষ্টে সে না খাইয়াই দ্বিতলে চলিল।

বিকালে একটি সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবক প্রশান্তের সহিত তাহাদের বাড়ীতে আসিলে, প্রশান্ত তাহাকে সযত্নে নিজের কক্ষে বসাইয়া সুরমার সন্ধানে চলিল। সে দেখিল, রান্নাঘর অন্ধকার; কোনও আয়োজন নাই !

রিণাকে সম্মুখে দেখিয়া প্রশান্ত বলিল, "বৌদি' কোথায় ?"

রিণা গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি অত খোঁজ রাখি-নে; আর তার দরকারই বা কি ?"

প্রশান্ত রিণার 'মিলিটারী' মেজাজ দেখিয়া সুরমার কক্ষে প্রবেশ করিল, বলিল, "এ কি বৌদি', তুমি এখনও শুয়ে রয়েছো ?"—পরে সুরমার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে কহিল, "কিছু খাওনি বুঝি ? আচ্ছা, তোমরা যে রাগ কর,—রাগ কর কার উপর ? আমার ত কারও উপর রাগ ক'রবার উপায় নেই ! এখন দেখছি, সব চেয়ে বেশী বিপদ আমার ! নাও, উঠে খেয়ে নাও; ছেলেটাকে বসিয়ে রেখে এসেছি। বড়লোকের ছেলে, কতক্ষণ একলাটি ব'সে থাকবে ?"

প্রশান্ত এবার লীনার খোঁজে গেল। লীনা তখন কি একটা সেলাই লইয়া ব্যস্ত ছিল। প্রশান্ত দেখিল, লীনা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশেই বসিয়া আছে।

ঝি উনানে আঁচ দিয়া ময়দা মাখিতে সুরু করিয়াছে। রিণা তাহার ঘরের দরজার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে দেখিল, একটি সুশ্রী যুবক তাহারই ঘরের ভিতর বসিয়া একখানি পুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

বিস্মিতা রিণা প্রশান্তকে বলিল, "ছেলেটি কে ?"

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল, "বুঝতে পাচ্ছ না ! যে ছেলেটির কথা এক দিন তোমাকে ব'লেছিলুম,—সেই রায় বাহাদুরের ছেলে। আমাকে 'কাকাবাবু' ব'লে ডাকে—অতি সরলপ্রকৃতি।—তুমি বৌদি'কে একটু সাহায্য করবে ?"

রিণা অভিমানের সুরে বলিল, "উনি কচ্ছেন করুন। কেন, আমাকে বল্লে কি করতুম না ?"

প্রশান্ত আর তথায় দাঁড়াইতে সাহস করিল না; কলহপ্রিয়া রিণা এখনই কি একটা ছুতো ধরিয়া বচসা আরম্ভ করিবে !

প্রশান্ত রান্না-ঘরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কই, সব তৈয়েরী হ'ল ?"

সুরমা একটা শ্বেত-পাথরের বাটিতে ক্ষীর ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "হ্যাঁ, হ'য়েছে; কিন্তু এখন দিয়ে আসবে কে ?"

প্রশান্ত লীনাকে ডাকিয়া বলিল, "খাবারের ডিস, আর ফলের ডিস নিয়ে আমার সঙ্গে চল্।"

লীনা মুখ কাচু-মাচু করিয়া বলিল, "আমিই দিয়ে আসব ? তার চেয়ে সুরেশ যাক না।"

প্রশান্ত রাগিয়া-উঠিয়া বলিল,—"আমি বল্‌ছি, তবু তোর আপত্তি ?"

রিণা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। লীনা ঐ নবাগত যুবককে খাবার দিতে গেল, ইহার কারণ কি ?

খানিক পরে সেই আগন্তুক যুবকসহ প্রশান্ত বাটীর বাহিরে গেল।

ক্রমে বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। রিণার মাতা পুরাদস্তুর কর্ত্তৃত্বের ভার লইয়াছিলেন। বিবাহের জন্য প্রচুর দ্রব্যাদির আয়োজন দেখিয়া—রিণার মাতা বলিলেন, "আয়োজন যা দেখ্‌ছি বাবা, এতে হাজারের ওপর লোক খাওয়ান যায় !"

প্রশান্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমার বন্ধু-বান্ধব—বরযাত্রী নিয়ে শ'-চারেক লোক হবে।"

বিবাহের সভা সুচারুরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সুরমা বিষণ্ণ মুখে সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বর পঞ্চাশখানি মোটরে বরযাত্রীসহ প্রশান্তের বাড়ীর বহির্দ্বারে সমাগত হইল। কন্যাপক্ষের লোক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন।

ক্ষণপরেই লীনার পাকা-দেখা হইয়া গেল। নারী-মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। একটি বৌ বলিল,—"নেক্‌লেসে খুব দামী হীরা বসানো আছে।"

রিণা ও তাহার মাতার মুখ অসম্ভব-রকম গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাঁহারা ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে নীচে নামিয়া আসিলেন,—সভাস্থলে দৃষ্টিপাত করিতেই রিণা চমকিয়া উঠিল। বর তাহার চেনা বলিয়া মনে হইল। কি আশ্চর্য্য, সেই রায় বাহাদুরের পুত্র !—রিণার মাথা ঘুরিয়া গেল।

গোধূলি-লগ্নে বিবাহ। কনে আনিবার সাড়া পড়িয়া গেল। প্রশান্ত ব্যস্তভাবে রিণাকে বলিল, "স্ত্রী-আচারের সময় হ'ল। তোমরা সকলে তৈয়েরী হ'য়ে নাও।"

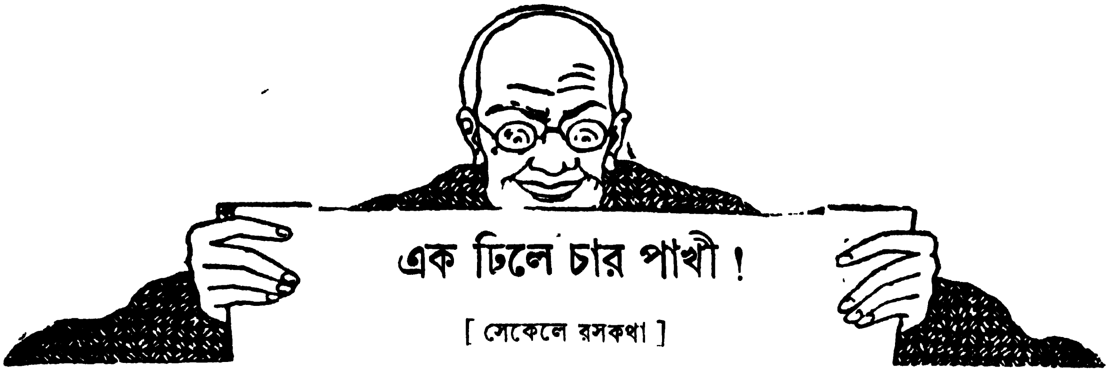
রিণা কোন কথা বলিল না।

পরক্ষণে প্রশান্ত একখানি রূপার থালায় কতকগুলি নোট ও টাকা সভাস্থলে রায় বাহাদুরের কাছে আনিয়া তাহা গণিতে বসিল। সকলে সবিস্ময়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক,—শুনিয়া রিণার মুখ দুঃখে অভিমানে শুকাইয়া চুণ হইয়া গেল !

এ সংসারে জয়ের মাল্য যে সুরমাই কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে—রিণা এত দিনে তাহা বুঝিতে পারিল। সে পরাজয় স্বীকার করিয়া, তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। নির্ব্বোধ প্রশান্ত তাহাকে প্রতিদিন ঠকাইয়া-আসিয়া, তাহার মাতৃস্থানীয়া বৌদিদিকে তাহার চেয়ে বড় করিল ! এ দুঃখের কি সীমা আছে ?

শ্রীপ্রেমলতা দেবী।



এক ঢিলে চার পাখী !

[সেকেলে রসকথা]

১

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের কাহিনী।

কোনও গ্রামের ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক দুইটি ব্রাহ্মণ যুবক পরস্পরের পরম বন্ধু ছিল। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিল, তাহারা এমন গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিবে, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহারা সেরূপ গুরু পাইল না। তখন তাহারা উভয়েই ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। কিছু দিন পরে কার্ত্তিকেয় প্রসন্ন হইয়া উভয়কেই স্বপ্নে বলিলেন, "পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ নামে এক পণ্ডিত আছেন। তাঁহার নিকটে তোমরা সকল বিদ্যাই শিখিতে পারিবে।"—অতঃপর দুই বন্ধুই পরমানন্দে শুভদিনে পাটলিপুত্র নগরে যাত্রা করিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নগর ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিলে শেষে একটি ভদ্রলোক বলিলেন, "বর্ষ নামে এক জন ব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু তিনি পণ্ডিত নহেন;—তিনি মহামূর্খ, মহা-নির্ব্বোধ!"—তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় তাঁর বাড়ী ম'শায়!" তিনি বলিলেন, "এই রাস্তা ধরিয়া পূর্ব্বমুখে যাইলে, কিছু দূরে বাঁ দিকে একটা গলি পাইবে; সেই গলিতে ঢুকিয়া, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সে-ই তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিবে।"

তাহারা সেই গলিতে প্রবেশ করিয়া একটা খোলার বাড়ীর দ্বারদেশে একটি সধবা প্রৌঢ়া রমণীকে দাঁড়াইয়া-থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বর্ষ পণ্ডিতের বাড়ী কোন্‌টা?"—তিনি বলিলেন, "তাঁর কাছে কি দরকার?" তাহারা বলিল, "আমরা তাঁর কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" প্রৌঢ়া বলিলেন, "এইটিই তাঁর বাড়ী; কিন্তু তিনি ত পণ্ডিত ন'ন বাবা! তিনি মহামূর্খ, তার উপর মহানির্ব্বোধ! আমার দেবর এই নগরের রাজার সভাপণ্ডিত। তিনি কিছু কিছু সাহায্য করেন, তাই দু'-বেলা আমাদের দু'মুঠা আহার জোটে। তোমরা নাম ভুল করিয়াছ, বাবা! উপকর্ষ না বলিয়া, ঐ নাম করিতেছ!" তাহারা বলিল,—"না মা, নাম ভুল হয় নাই; যিনি তাঁহার নাম বলিয়া দিয়াছেন, তিনিও ভুল করিবার পাত্র নহেন। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করিব। তিনি কি বাড়ীতে আছেন? যদি থাকেন, দয়া করিয়া একবার ডাকিয়া দিবেন কি?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তিনি বাড়ীতেই আছেন। বাহিরে যাইলে লোকে ঠাট্টা করিয়া নানা কথা কহে বলিয়া তিনি আর বাড়ীর বাহিরে যান না; সর্ব্বক্ষণ ঘরের কোণেই বসিয়া থাকেন। যাও না বাবা, ঐ ঘরে। আমি তরকারি-ওয়ালীদের নিকট তরি-তরকারী কিনিবার জন্ত এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

তাহারা নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমরা? কি চাও?"

বন্ধুদ্বয় ভূমিতে বসিয়া বলিল, "এক গুরুর নিকটেই সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। বহু অনুসন্ধান করিয়াও সেরূপ পণ্ডিত না পাওয়ায় আমরা কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা করিয়াছিলাম। তিনি স্বপ্নে আপনার নাম ও ধাম বলিয়া দিয়াছেন; তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

বর্ষ পণ্ডিত বলিলেন, "দেখ বাবা, আমি মূর্খ ও নির্ব্বোধ বলিয়া সকলেই আমাকে ঠকায়; বাড়ীর বাহির হইলেই সকলে ঠাট্টা করে। ছেলেরা আমার নামে ছড়া বাঁধিয়াছে—'বর্ষ বর্ষ বর্ষ, তোমার নাইকো কেন হর্ষ, মুখ কেন বিমর্ষ? তোমার মাথায় আর্কফলা, তোমার বুদ্ধিটি কাঁচকলা!' অধিক কি, গিন্নীও কত তিরস্কার করিয়া থাকেন। মনের দুঃখে আমিও কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকেও স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন—'যদি একটি শ্রুতিধর ছাত্রকে পড়াইতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত হইবে, তুমি মস্ত বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিবে।'—তোমরা সেইরূপ একটি বালক যদি সংগ্রহ করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগকে পড়াইতে পারি।"

তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেইরূপ বালকের সন্ধানে চলিল। নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া এক দিন সায়ংকালে তাহারা কোন গ্রামে এক প্রৌঢ়া রমণীকে তাঁহার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহাকে সবিনয়ে বলিল, "মা, আমরা বিদেশী। এই রাত্রিতে থাকিবার জন্ত আপনার আশ্রয়-ভিক্ষা করিতেছি।"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "এস বাবা, বাড়ীর মধ্যে।"—এই বলিয়া মেটে-ঘরের দাওয়ায় কম্বল পাতিয়া তিনি তাহাদিগকে বসিতে দিলেন; প্রদীপ জ্বালিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি ব্রাহ্মণের বিধবা। একটি ছোট পুত্র মাত্র লইয়া এখানে বাস করি। বড়ই গরীব আমি—অতিথি-সৎকারের শক্তি ত আমার নাই। আমার এই ত্রুটি তোমরা উপেক্ষা করিও।"

তাহারা ছেলে ধরিতেই বাহির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণীর ছেলে আছে শুনিয়া বলিল, "মা, আমাদের জন্ত আপনার এত কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। আপনি দয়া করিয়া আশ্রয় দিলেন, ইহাতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা আহার করিতেও চাহি না। দয়া করিয়া আমাদিগকে পুষ্করিণী দেখাইয়া দিন, আমরা পা-হাত ধুইয়া সায়ংসন্ধ্যা করিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তা কি হয় বাবা? তোমরা ব্রাহ্মণ, অতিথি, আমার বাড়ীতে আসিয়া উপবাসী থাকিলে আমার পাপ হইবে, ছেলেরও অকল্যাণ ঘটিবে। ঘরে যৎসামান্ত যাহা আছে, তাহাই আহার করিবে।"—ব্রাহ্মণী অতঃপর তাহাদিগকে পুষ্করিণী দেখাইয়া দিলেন।

তাহারা সন্ধ্যা করিয়া ফিরিয়া আসিলে, ব্রাহ্মণী ঘরে-প্রস্তুত কিঞ্চিৎ চিনির-পুলী উভয়কে জল খাইতে দিলেন।

জল খাইয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, আপনার ছেলের কি নাম? বয়স কত? সে কোথায়?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"তাহার নাম কাত্যায়ন। সে ভারি দুরন্ত; ভাল জিনিসটি না হইলে খায় না, মন্দ জিনিসে তাহার রুচি নাই, সে তাহা ফেলিয়া-রাখিয়া রাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই জন্ম তিনি তাহাকে 'বররুচি' বলিয়া ডাকিতেন। সে পাঁচ বৎসরে পড়িয়াছে। ঐ যে গান শুনিতে পাইতেছ; নন্দ নামক একটি যুবক ঐ গান গায়িতেছে। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে নন্দ প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে গান শুনাইত। তিনি ওর গান শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। দুই বৎসর বিধবা হইয়াছি; ও সেই সময় হইতে আর এ বাড়ীতে আসে না। ওর গান শুনিলে তাঁহাকে মনে পড়ায় আমার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে থাকে। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই নন্দ গান করিতেছে। বররুচি খেলা করিয়া অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বাড়ীতে আসিয়া বলিল, 'নন্দ দা অনেক দিন আমাদের বাড়ীতে আসেনি; আমি তার গান শুনে আসি মা!'—আমি বলিলাম, 'সন্ধ্যা হ'ল, এর পর তুই অন্ধকারে একা কি ক'রে আসবি?'—সে আমার কথা শুনিল না, ছুটিয়া চলিয়া গেল; তাই আমি সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলাম।"

বলিতে বলিতেই বররুচি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। অপরিচিত যুবকদ্বয়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া সে মাকে বলিল, "নন্দ দা কেমন ক'রে বাজাচ্ছে আর গাইছে, শুনবে মা?"—এ কথা বলিয়াই দুই হাতে দুই উরুত বাজাইতে বাজাইতে সে গায়িতে আরম্ভ করিল,—

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম কেবলং।
কলৌ নাস্তি কলৌ নাস্তি অন্যদপি সম্বলং॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম কেবলং॥
সত্যযুগে ছিল ধ্যান, ত্রেতাতে যজ্ঞবিধান,
দ্বাপরে সেবানুষ্ঠান,
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনং বলং॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম কেবলং॥'

গানটি সুদীর্ঘ; তাহার আদ্যোপান্ত নিখুঁত ভাবে গায়িয়া বররুচি বলিল, "বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে মা! খাবার দেবে চল।"—মাতা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। বররুচি জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা কারা মা?" মা বলিলেন, "ওঁরা অতিথি। বাড়ীতে অতিথি এলে তাঁদিগে গুরুঠাকুরের মত ভক্তি ক'র্‌তে হয়, থাক্‌বার জায়গা দিতে হয়, আদর-যত্ন ক'র্‌তে হয়, খাওয়াতে হয়। না ক'র্‌লে পাপ হয়, অকল্যাণ হয়; বুঝলি?"

—বররুচি বলিল, "বুঝেছি মা!"

দুই বন্ধুতে বলাবলি করিতে লাগিল, "এই ছেলেটিই শ্রুতিধর! পাঁচ বছরের ছেলে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখে-শুনে এসে ঠিক তালে-তালে বাজাতে লাগ্‌ল! অত বড় গানটা শুনেই মুখস্থ ক'রে, ঠিক সুরে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ক'রে কেমন গাইলে!"

ব্রাহ্মণী বালককে খাওয়াইয়া, আঁচাইয়া দিয়া, হাত-মুখ মুছাইয়া ঘরে শোয়াইয়া, পুনর্ব্বার অতিথিদের জন্ম পাক করিতে বসিলেন। পাক সমাপন হইলে, স্থান করিয়া, তাহাদিগকে পরিতৃপ্তরূপে আহার করাইলেন। আহারান্তে তাহারা বলিল, "মা! আপনার কাছে আমাদের একটা প্রার্থনা আছে।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "কি বাবা, বল।"

তাহারা বলিল—"আমরা একই গুরুর নিকট সমস্ত বিদ্যা শিখিবার জন্ম উৎসুক হইয়া, বহু অনুসন্ধানেও সেরূপ গুরু না পাওয়ায় কার্ত্তিকের আরাধনা করি। তিনি আমাদের দুই জনকেই স্বপ্নে বলিলেন, পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ নামে পণ্ডিত আছেন, তাঁর কাছে সকল বিদ্যা শিখিতে পারিবে। আমরা তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'আমি মহামূর্খ বলিয়া, আমিও কার্ত্তিকের আরাধনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকেও স্বপ্নে বলেন—একটি শ্রুতিধর বালককে পড়াইতে আরম্ভ করিলে তোমার সকল বিদ্যা আয়ত্ত হইবে, তুমি মহাপণ্ডিত হইবে। তোমরা যদি একটি শ্রুতিধর বালক আনিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে শিক্ষাদান করিতে পারি।'—তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা নানা দেশে ঘুরিয়াছি। কোথায়ও শ্রুতিধর বালক পাই নাই। আপনার ছেলেটিই শ্রুতিধর। দয়া করিয়া উহাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন, মা! ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তিনি খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। আমার ইচ্ছা, উহাকেও সেইরূপ পণ্ডিত করিব। কিন্তু বাবা, ও নিতান্ত শিশু; কোথায় যাইবে? কি করিয়া হাঁটিবে? কি খাইবে? কাহার কাছে শুইবে? সেই ভাবনাতেই যে মন বড় ব্যাকুল হইতেছে।"

যুবকদ্বয় বলিল, "মা! আপনাকে আমরা মা ব'লেছি। ওকে ছোট ভাই ব'লেই মনে করি। আমরা ওকে কোলে-কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব, খুব আদর-যত্ন ক'র্‌ব, নিজেদের কাছে খাওয়াব, শোয়াব। আপনার জন্যে ওর মন কেমন ক'র্‌লে নিয়ে আস্‌ব—আপনার পা ছুঁয়ে দিব্য কর্‌ছি। আমাদের এ প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌তেই হবে।"—ব্রাহ্মণী তাহাদের কাতরতা দেখিয়া আর কোনও আপত্তি করিতে পারিলেন না। সম্মতি দিতেই হইল; পরদিন তাহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া আসিলে, ব্রাহ্মণী বররুচিকে কিছু খাওয়াইয়া কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া তাহাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন, "বাবা, এঁরা তোমার দাদা, এঁদের সঙ্গে প'ড়্‌তে যাও। যখন যা দরকার হবে, ওঁদিকে জানাবে। মন দিয়া পড়া-শুনা ক'র্‌বে।"

তাহারা ব্রাহ্মণীর পদধূলি লইয়া বররুচিকে কোলে করিয়া পাটলিপুত্রে চলিল। ব্রাহ্মণীর দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। যথাকালে বর্ষ পণ্ডিতের নিকট পৌঁছিলে তিনি উপবর্ষকে ডাকাইয়া তাঁহার উপদেশানুসারে শুভদিনে নিজেই বররুচির "বিদ্যারম্ভ" করাইলেন। তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিতেই দেবতার বরে তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-জনিত খ্যাতি দিগ্দেশে প্রচারিত হইল। ক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার নিকট বহু ছাত্রের সমাগম হইল। উপবর্ষ রাজাকে বলিয়া তাঁহার যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং টোল-বাড়ীও নির্ম্মাণ করাইলেন।

২

ছাত্রদিগের মধ্যে পাণিনিও ছিলেন। তিনি স্থূলবুদ্ধি ছিলেন বলিয়া বররুচি তাঁহাকে সর্ব্বদাই উপহাস ও অপমান করিত। তিনি বিষণ্ণবদনে কালযাপন করিতেন। এক দিন গুরুপত্নী তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা পাণিনি, তুমি কিছু দিনের ছুটি লইয়া কাশী যাও। সেখানে বিশ্বনাথের আরাধনা করিলে, তাঁহার বরে তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে পারিবে। তখন আর কেহই তোমাকে অশ্রদ্ধা বা উপহাস করিতে পারিবে না।"

পাণিনি সেই দিনই রাত্রি-শেষে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া কাশীযাত্রা করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া, প্রাতে গঙ্গা-স্নান করিয়া, বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া পূজা ও প্রণাম করিলেন। তার পর মণিকর্ণিকায় গিয়া চক্রতীর্থের চতুষ্পার্শ্বস্থ বনের মধ্যে বিল্ববৃক্ষ মূলে বসিয়া, রুদ্রাক্ষমালায় ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যল্প দিনের মধ্যেই ভগবান্ বিশ্বনাথ সদয় হইয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর সূত্র দান করিলেন।

পাণিনি ঐ চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর-সূত্র অবলম্বনে অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। ব্যাকরণ রচনা সমাপ্ত হইলে তিনি পুনর্ব্বার পাটলিপুত্রে আসিয়া গুরু ও গুরুপত্নীর চরণে প্রণাম করিলেন। বররুচি প্রভৃতি সমস্ত ছাত্রই পাণিনিকে সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ইতঃপূর্ব্বে গুরুগৃহেই গর্ভাষ্টমে বররুচির উপনয়ন হইয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন ২৪ বৎসর, তখন এক দিন উপবর্ষ আসিয়া বর্ষকে বলিলেন, "দাদা, আমার কন্যা সুরুচির বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে, একটি সৎপাত্রের আবশ্যক। আপনার ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কে?"

বর্ষ বলিলেন, "সর্ব্বোৎকৃষ্ট বররুচি।"

উপবর্ষ বলিলেন, "আপনার অনুমতি হয় ত তাহার সঙ্গেই সুরুচির বিবাহ দিই।"

বর্ষ বলিলেন, "স্বচ্ছন্দেই দিতে পার।"

শুভদিনে শুভ লগ্নে সুরুচির সহিত বররুচির শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই বিবাহে রাজা বররুচিকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা যৌতুক দিয়াছিলেন। বররুচি পাটলিপুত্রেই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া পত্নীসহ বাস করিতে লাগিলেন। একটি বিশ্বস্তা প্রৌঢ়া দাসীও রাখিয়া দিলেন।

এখন পাণিনির সহিত বিচারে বররুচিই পরাজিত হইয়া লজ্জিত হইতে লাগিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, পাণিনি কাশীতে গিয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়া এরূপ অসাধারণ বিদ্বান্ হইয়াছেন। বিশ্বেশ্বরের বরে অধিকতর বিদ্বান্ হইবার অভিপ্রায়ে বররুচিও কাশী-গমনের সঙ্কল্প করিলেন। সুরুচিকে বলিলেন, "আমি অধিকতর বিদ্বান্ হইবার জন্য বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিতে কাশী যাইব। তুমি সাবধানে থাকিবে। বাড়ীতে দুইটি মাত্র অবলা স্ত্রীলোক থাকিবে বলিয়া, আমার নিকট যে আট শত মোহর ছিল, তাহা বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে ভরসা হইল না; এজন্য গঙ্গারাম বণিকের কাছে তাহা গচ্ছিত রাখিয়াছি। লোকটি বড়ই নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক। আমাকে অত্যন্ত ভক্তি করে সে। তাহাকে বলিয়াছি, তোমার যখন যত টাকার দরকার হইবে, দাসীকে তাহার নিকট পাঠাইলেই সে তাহা দিবে।"

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বররুচি কাশীতে গমন করিলেন। সুরুচি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া, দাসীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেন, তাহার পর স্বামীর সিদ্ধিলাভ কামনায় শিবপূজায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতেন।

৩

তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যে গঙ্গাস্নানার্থী যুবকগণের অনেকেই মুগ্ধ হইত। এক দিন তিনি স্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন, রাজার ছোট মন্ত্রী তখন স্নান করিতে যাইতেছিলেন। নির্জ্জন পথে সুরুচিকে একাকিনী চলিতে দেখিয়া ছোট মন্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, "আমি রাজার ছোট মন্ত্রী। তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। রতিপতি তাঁহার পুষ্পশরে আমাকে বিদ্ধ করিয়াছেন; প্রাণ আমার আনচান করিতেছে। ধৈর্য ধরিতে নারি আর। এ জন্য আমার কামনা, তোমার বাড়ীতে গিয়া আমি আমোদ-আহ্লাদ করি। এক দিন পিছু-পিছু গিয়া তোমার বাড়ীও দেখিয়া আসিয়াছি।—তুমি কি বল?"

সুরুচি ভাবিলেন, "যদি ক্রোধ প্রকাশ করি বা অস্বীকার করি, তাহা হইলে ইনি আমার অনিষ্ট করিতে পারেন।"—এই ভাবিয়া তিনি মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের বাড়ীতে যাইবেন, এ ত আমার পরম সৌভাগ্য! তবে কি না, প্রত্যহ যাতায়াত করিলে লোক জানা-জানিতে দু'জনেরই কলঙ্ক ঘটিবে; মুখ দেখান ভার হইবে। আপনি ত জানেন, মকর-সংক্রান্তির দিন এখানে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত 'ভাগীরথী-মেলা' হয়। সে রাত্রে সহরে জনপ্রাণীও থাকে না। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া স্নান করিয়া, গঙ্গা-মাতার পূজা দিয়া প্রসাদ খাইয়া, সারারাত্রি উৎসব-আমোদ করিয়া, অরুণোদয়ে স্নান-শেষে বাড়ীতে ফেরে।—দয়া করিয়া সেই দিন সন্ধ্যার পর যাইবেন।"

মন্ত্রী আনন্দিত হইয়া স্নান করিতে চলিলেন।

পরদিন সেই সময়েই রাজার প্রৌঢ়বয়স্ক পুরোহিত আপন পরিচয় দিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করিলে, সুরুচি ঐ সকল কথা বলিয়া ঐ রাত্রেই এক প্রহরের সময় তাঁহাকেও যাইতে বলিলেন। তার পরদিন নগর-রক্ষক আত্মপরিচয় দিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করিলে, সুরুচি তাঁহাকেও ঐ রাত্রেই দ্বিপ্রহরের সময় যাইতে বলিলেন। স্বামীর কল্যাণ-কামনায় পৌষী পূর্ণিমায় বারশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ইচ্ছায়, পূর্ব্ব-দিন গঙ্গারাম বণিকের নিকট হইতে পনেরটি টাকা চাহিয়া আনিবার জন্য দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। গঙ্গারাম বলিল, "তোমার হাতে টাকা দিব না; বৈকালে আমি নিজে গিয়া তাঁর হাতে দিয়া আসিব।"—সে বৈকালে আসিয়া সুরুচির নিকট উপস্থিত হইয়া ঐরূপ কুৎসিত প্রস্তাব করিয়া বলিল, "তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তা হ'লে আমি এক পয়সাও দিব না। আমার নামে নালিস ক'রলে, আমি ব'লব—বররুচি আমার কাছে কিছুই গচ্ছিত রেখে যাননি। তোমার ত কেহ সাক্ষী নেই; তুমি আমার কি ক'রবে?"

সুরুচি প্রমাদ গণিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সমস্ত কথা বলিয়া মকর-সংক্রান্তির রাত্রে তৃতীয় প্রহরের প্রথমেই তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে আসিতে বলিলেন।

বণিক্ বলিল, "সেই দিনেই টাকা আনিব। এখন তুমি ধার-কর্জ্জ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন চালাও।"

সুরুচি বেণের নিকট সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া, মায়ের নিকট হইতে ত্রিশ টাকা ধার করিয়া আনিবার জন্য দাসীকে পাঠাইলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-ভোজনে অর্দ্ধেক টাকা খরচ করিয়া, দাসীর সহিত পরামর্শের পর তাহাকে কিঞ্চিৎ গোপনীয় উপদেশ দিয়া, ছুতোর-মিস্ত্রী ডাকাইয়া বৃহদাকার একটা গাছ-সিন্দুক প্রস্তুত করাইলেন। তাহার গায়ের চারি দিকেই ৩।৪টা করিয়া বড় বড় ছিদ্র করাইয়া উহা সদর-ঘরের মধ্যে বসাইলেন। তার পর অত্যন্ত গাঢ় তেল-কালিতে খানিক আতর মিশাইয়া সেই কালিদ্বারা চারিটি বড় বোতল পূর্ণ করিলেন। চারিখানা ময়লা ন্যাক্ড়াও যোগাড় করিয়া রাখিলেন। তদ্ভিন্ন বড় বড় চারি কলসী কূয়ার জল তুলাইয়া রাখিলেন। আর একখানা পীঁড়িও পাতিয়া রাখা হইল।

মকর-সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যাকালে সদর-দরজায় খিল আঁটিয়া দাসী ভিতরে বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে ছোট-মন্ত্রী আসিয়া রুদ্ধ দ্বারের কড়া নাড়িল। দাসী দ্বার খুলিলে মন্ত্রী ভিতরে প্রবেশ করিতেই দাসী দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাকে বলিল, "আপনি এসেচো বাবা, একটা কথা বলি শোন। আমার মা-ঠাওরাণটির এই বয়েসই বেজাই ছুচি-বাই! উনি গঙ্গাচ্চান ক'রে, চামাররা রাস্তায় ঝাড়ু দেয়, সেই রাস্তা দিয়ে আস্তে হয় ব'লে, বাড়ীতে এসেই পাৎকো-তলায় বসে। মাথা থেকে পা অব্দি সব্বো অঙ্গে গোবর মাখে। আমি পাৎকোর জল তুলে তেনার গায়ে-মাথায় ঢেলে দিই। এই রকমে শুদ্দু হ'য়ে তবে ঘরে-দোরে ওঠে; আপনিও তো সেই রাস্তা দিয়েই এসেচ। আপনি তেল মেখে চান না ক'ল্লে অন্দরে যাবার হুকুম নেই। এই ঘরের মদ্দি গন্ধ-তেল, জল, আপনার তরে রাখা হ'য়েছে।"

মন্ত্রী বলিলেন, "চল তবে ঘরের মধ্যে।" ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "আলো নেই ঘরে? বড্ড অন্ধকার যে!"

দাসী বলিল, "বাবা-ঠাওর কাশী যাওয়া অব্দি এ ঘর তো আর খোলা হয়নি। আজ সাঁজের বেলা আলো জ্বালতে এসে লণ্ঠনে যেমন তেল ঢেলেচি বাবা, অমনি ছর্-ছর্ ক'রে সব তেল প'ড়্তি নাগলো। লণ্ঠনের তলা ফেঁসে গেছে। শুধু তেল মাখা আর চান করা বৈ তো নয়, আলোরই বা দরকার কি? (ন্যাকড়াখানা হাতে দিয়া) এই গামছাখানা প'রে আপনার পোষাক ছেড়ে ঐ ধারের আল্নায় রেখে—এই পীঁড়িতে ব'সো বাবা!"

মন্ত্রী বসিলে দাসী সেই গন্ধ-তেলের একটা বোতল বাহির করিয়া তাঁহাকে তেল মাখাইতে বসিল। এক বোতল তেলকালি ঘষিয়া ঘষিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইতে প্রায় এক প্রহর কাটিল। তার পর এক কলসী জল আনিয়া মন্ত্রীবরের মাথায় ঢালিয়া দিল।

মন্ত্রী বলিলেন, "উঃ, বাবা রে গেছি! এই শীতের রাতে এত ঠাণ্ডা জল! জলটুকু যদি গরম ক'রে রাখ্তে বাছা!"

দাসী বলিল, "গরম ক'র্তে গেছ্লুম বাবা! মা-ঠাওরণ ব'ল্লে, গরম জলে চান ক'ল্লে কি শুদ্দু হওয়া যায়? কাঁচা জলে চান ক'র্তে হয়।"

এমন সময় রাজার পুরোহিত আসিয়া কড়া নাড়িলেন।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কড়া নাড়ে ঝি?"

দাসী ব্যস্তভাবে কহিল, "রাজার পুরুত-ঠাওর।"

মন্ত্রী বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ওঁকেও আস্তে বলা হ'য়েছে?"

দাসী বলিল, "উনি তো অনেক দিন হ'তে পিত্যই আসে বাবা! আজ কি নতুন আসচেন?"

মন্ত্রী কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তাই তো! ভালো মুস্কিল! এখন লুকোই কোথায়?"

দাসী বলিল, "লুকোবার তো জায়গা নেই বাবা! ঐ খালি সিন্দুকটা প'ড়ে আছেন, ওর মদ্দিই ঢুকে পড়ো,—আর উপায় কি? আমি ডালাখান তুলে ধ'র্চি।"

মন্ত্রী সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক ধারে বসিয়া, দুই হাঁটু দু'হাতে ধরিয়া থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। দাসী ডালা বন্ধ করিয়া সদর-দরজা খুলিয়া দিল। রাজ-পুরোহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, দাসী তাঁহাকেও ঐ সব কথা বলিয়া ঐরূপে তেল মাখাইয়া মাথায় জল ঢালিবে, সেই সময় সহর-কোতোয়াল আসিয়া কড়া নাড়িল! নিরুপায় পুরোহিত লুকাইতে চাহিলে দাসী গাছ-সিন্দুকের ডালা তুলিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতে বলিল। তিনি ঢুকিয়া, আর এক জন কে বসিয়া আছে, বুঝিতে পারিয়া—একটু তফাতে উবু হইয়া বসিয়া দারুণ শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। সহর-কোতোয়ালকে স্নান করাইতে করাইতেই গঙ্গারাম বেণের আবির্ভাব! সে কড়া নাড়িলে সহর-কোতোয়ালও দাসীর কথায় গাছ-সিন্দুকে ঢুকিয়া, দুই ধারে দুই জন বসিয়া আছে বুঝিতে পারায়, মাঝখানে উবু হইয়া বসিয়া ভয়ে ও শীতে কাঁপিতে লাগিল।

বণিক্কে যখন তেল মাখান হইতেছিল, তখন সুরুচি বাহিরে আসিয়া সদর-ঘরের দ্বারের শিকল আঁটিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার টাকা আনিয়াছেন?"

বণিক্ বলিল, "আজ আনা হয় নাই। কা'ল আনিয়া দিব।"

সুরুচি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্বামী আপনার কাছে কত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন?"

বণিক্ বলিল, "আট শ' মোহর।"

সুরুচি, "ঠিক আট শ' মোহর? না, আরও কিছু বেশী? সত্য কথা বলুন।"

বণিক্, "ঠিকই আট শ' মোহর, তার বেশী নয়;—আমি কখনও মিথ্যা কথা কহি না।"

সুরুচি, "ঠিকই আট শ' মোহর?"

বণিক্, "হাঁ, ঠিকই আট শ' মোহর।"—সুরুচি শিকল খুলিয়া দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দাসী বণিক্কে স্নান করাইয়া বলিল, "সোঁ কাপড়ে, সোঁ চুলে সদর-দরজা খুলে উপরে চেয়ে দেখ্বে গণেশের মূর্ত্তি আছেন। তেনাকে পেন্নাম ক'রে যোড় হাতে জানাও, 'বাবা সিদ্দিদাতা গণেশ, আমি যে কাজে এসেছি বাবা, তা সিদ্দি কর, তোমায় জোড়া ইঁদুর দিয়ে পুজো দেব।" বণিক্ যখন ঐরূপ বলিতেছিল, তখন দাসী সদর-দরজা বন্ধ করিয়াছিল। বণিক্ বলিল, "দরজা খোল গো! আমি বাহিরে রইলাম, তুমি দরজা বন্ধ ক'র্লে কেন?"

দাসী বলিল, "চোখের মাথা খেয়ে দেখ্তে পাচ্ছিস-নে—গঙ্গাতীর থেকে সব মানুষ ফিরে আস্ছে, ভোর হ'য়েছে? এমন সময় ভদ্দর লোকের বাড়ীতে পর-পুরুষ ঢোকে?"—বণিক্ তখন আপনার অঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখে সর্ব্বাঙ্গে কালিমাখা!

লোক-জনের ভীড় ক্রমেই বাড়িতেছে—দেখিয়া সে নিজের বাড়ীর দিকে দৌড়াইতে লাগিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বাড়ীর সদর-দরজার কড়া নাড়িতেই তাহার স্ত্রী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বণিক্ বাড়ীতে ঢুকিয়া বলিল, "পাওনা টাকার তাগাদায় গিয়ে এক বদমায়েস খাতকের হাতে আমার এই লাঞ্ছনা! সব কথা পরে ব'লব, এখন আমার গায়ের কালি তুলে দাও।"

বেণে-বৌ এক বালতি জল, খানিকটা খইল, তিন-চারিটা নারিকেল-ছোবড়ার নুড়ো আনিয়া পাতকো-তলায় বসিয়া আগে তাহার মুখের কালি তুলিতে লাগিল। বণিক্ বলিল, "আস্তে ঘ'ষো গো! উঃ, জলে ম'লাম! ছাল-চামড়া বিনিয়ে যাচ্ছে যে!"

বেণে-বৌ বলিল, "আলকাতরার মতো চটচটে কালি মেখে এসেছ, গায়ে কায়েমী হ'য়ে ব'সেছে কি না! নুড়ো দিয়ে জোরে জোরে না ঘষ্‌লে ও রং উঠবে?"

ও-দিকে দাসী গাছ-সিন্দুকের তালা বন্ধ করিয়া, সদর দরজায় তালা দিয়া, সুরুচির সঙ্গে রাজবাড়ী চলিল। সুরুচি খিড়্‌কির পথে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি সভাপণ্ডিতের কন্যা, রাজা রাণীর সুপরিচিতা। রাণীর সঙ্গে দেখা হইলে রাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা সুরুচি, এত ভোরে কি দরকারে এসেছ?"

সুরুচি বলিলেন, "বড় বিপদে প'ড়েই এমন সময় এসেছি রাণী-মা! মহারাজ উঠলে তাঁর কাছেই সব কথা ব'ল্‌ব, আপনিও শুনবেন।"

রাজা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিপদ, মা সুরুচি?"

সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ! আমার স্বামী কাশী গেছেন শুনেছেন ত? আপনার দেওয়া সেই হাজার মোহরের মধ্যে খরচ বাদে যে আট শ' মোহর ছিল, যাবার সময় গঙ্গারাম বেণের কাছে তা গচ্ছিত রেখে যান। গত পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্মণভোজন করাব ব'লে পনর টাকা চেয়ে আন্‌বার জন্য দাসীকে পাঠিয়েছিলাম। সে ব'লেছে, তার কাছে তিনি এক পয়সাও গচ্ছিত রেখে যাননি। তাই মহারাজ, আপনার কাছে এসেছি, আপনি বিচার ক'রে আমার টাকাগুলির উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।"

রাজা বলিলেন, "রাজসভার পাশে স্ত্রীলোকদের বস্‌বার জন্য চিক্-ফেলা যে ঘর আছে, তুমি দাসীকে সঙ্গে নিয়ে সেই ঘরে ব'সো-গে। রাজসভায় দরবারে ব'সে তোমার নালিশ শুনবো, এবং বিচার করবো।"

সুরুচি রাজার কথায় সেই ঘরে গিয়া বসিলেন।

রাজা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে বসিলে সুরুচির কি অভিযোগ জিজ্ঞাসা করা হইল। সুরুচি চিকের অন্তরাল হইতে বলিলেন, "মহারাজ! আমার নাম শ্রীমতী সুরুচি দেবী, আমার পিতার নাম শ্রীযুক্ত উপবর্ষ পণ্ডিত, আমার স্বামীর নাম দাসী বলিবে"—দাসী বলিল, 'আমার মনিবের নাম বররুচি শর্ম্মা,'—রাজ-দরবারে আমার নালিশ এই যে, আমার স্বামী কাশী যাইবার সময় গঙ্গারাম বণিকের কাছে আট শ' মোহর গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন। সে এখন তাহা স্বীকার করিতেছে না। আমি সেই টাকার জন্য মহারাজের নিকট বিচারপ্রার্থিনী।"

গঙ্গারাম বণিককে অবিলম্বে রাজসভায় হাজির করিবার আদেশ হইল। এক জন বরকন্দাজ গঙ্গারামের বাড়ীতে গিয়া বলিল, "আমি রাজসভার বরকন্দাজ। এখনই রাজসভায় তোমার তলব হ'য়েছে, জল্‌দি চলো।"

তখন সবেমাত্র গঙ্গারামের মুখের কালিটা তোলা হইয়াছিল। গঙ্গারাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানা ফরসা কাপড় এমন ভাবে কোঁচা লুটাইয়া পরিল যে, পা পর্য্যন্ত ঢাকা পড়িল। একটা বেনিয়ান্ গায়ে দিয়া তার উপর শীতবস্ত্র জড়াইল, এবং হাত দুইটা শীতবস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

রাজসভায় উপস্থিত হইতেই তাহাকে কাঠ-গড়ায় পুরিয়া "হলফ্" পড়ান হইলে দ্বিতীয় মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বররুচিকে জান?"

গঙ্গা—"হাঁ হুজুর, জানি।"

মন্ত্রী—"তিনি কাশী যাবার সময় তোমার কাছে আট শ' মোহর গচ্ছিত রেখে গেছেন?"

গঙ্গা—"না হুজুর! এক পয়সাও গচ্ছিত রেখে যাননি।"

প্রধান মন্ত্রী—"সুরুচি! তোমার সাক্ষী কে?"

সুরুচি—"হুজুর! তিনি গোপনে রেখে গেছেন; কোনও মানুষ ত সাক্ষী নাই; তবে—সাক্ষী আছেন দেবতারা।"

প্রধান মন্ত্রী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবতারা সাক্ষী কি রকম? তাঁরা কি তোমার জন্য রাজসভায় এসে সাক্ষ্য দিবেন?"

সুরুচি বলিলেন, "আমার স্বামী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতার ঘটস্থাপনা ক'রে প্রত্যহ পূজা ক'র্‌তেন। তাঁরা ঘটে অধিষ্ঠান ক'রে তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন। আমার সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা ক'ন। তিনি কাশী যাবার সময় তিনটি ঘট একটা গাছ-সিন্দুকে পূরে তালা বন্ধ ক'রে গেছেন। সেই গাছ-সিন্দুকটা রাজসভায় আন্‌লে তাঁরা আমার কথার উত্তর দিবেন।"

দেবতারা সাক্ষ্য দিবেন, এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য সভাস্থ সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। রাজা বরকন্দাজকে আদেশ করিলেন, "চারি জন মুটে সঙ্গে ক'রে এখনই বররুচির বাড়ীতে গিয়ে সেই সিন্দুকটা নিয়ে এসো।'

সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ! চারি জনের কর্ম্ম নয়; অন্ততঃ আট-দশ জন পাঠান। তিন দেবতা ভর ক'রেছেন, ভারী কি কম?"

রাজার আদেশে দশ জন মুটে লইয়া বরকন্দাজ সুরুচির বাড়ী চলিল। সুরুচির দাসীও সদর-দরজার তালা খুলিয়া গাছ-সিন্দুকটা দেখাইয়া দিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে চলিল।

সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ! সিন্দুকটা বসাবার জন্য রাজসভার একধারে গঙ্গাজল দিয়া স্থান পরিষ্কার করাতে আজ্ঞা হোক।"

রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ করা হইল। সিন্দুকটা আনিয়া সেই স্থানে রাখা হইলে প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "সুরুচি! তোমার সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন কর।"

সুরুচি হাত-যোড় করিয়া বলিলেন, "হে ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর! আপনারা আমার কথার উত্তর দিন, না দিলে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার মত এই রাজ-সভায় আপনাদের ঘট বাহির করিয়া সকলের সমক্ষে ভাঙ্গিয়া ফেলিব। আমার স্বামী গঙ্গারাম বণিকের নিকট আট শ' মোহর গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন। হে ব্রহ্মা! আপনি জানেন?"

সিন্দুকের ভিতর হইতে উত্তর হইল—"হুঁ"।

"হে বিষ্ণু! আপনি জানেন?"

উত্তর—"হুঁ"।

"হে মহেশ্বর! আপনি জানেন?"

ভিন্ন কণ্ঠে উত্তর—"হুঁ"।

উত্তর শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। রাজা বলিলেন, "কি রকম দেবতা, দেখ্‌বার জন্ত আমাদের কৌতূহল হ'চ্ছে; সুরুচি! সিন্দুকের চাবি দাও।" সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ! তিনি চাবি আমাকে দিয়া যাননি; কোথায় রেখেছেন, তাও ব'লে যাননি।"

রাজা বলিলেন, "তবে সিন্দুকের তালা ভাঙ্গাই?"

সুরুচি বলিলেন, "মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।"

রাজার আদেশে তালা ভাঙ্গিয়া ডালা খোলা হইলে, সকলেই দেখিলেন,—ঘট নহে, দেবতা নহে, ভূতের মতো কালো তিন ব্যক্তি নতমুখে সিন্দুকের ভিতর উপবিষ্ট! তখনই তাহাদিগকে বাহির করিয়া সভায় দাঁড়-করান হইল। সকলে দেখিলেন, তাহাদের আপাদ-মস্তক কালি-মাখা, পরিধানে ময়লা ফাক্‌ড়া!

রাজা বলিলেন, "কে এরা? মুখের কালি ধুইয়া দাও।"

মুখের কালি অপসারিত হইলে, রাজা বলিলেন, "ছোট মন্ত্রী! আমি ভেবেছিলাম, তোমার শরীর হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় আজ তুমি রাজসভায় অনুপস্থিত! সহর-কোটাল! তুমি কি বররুচির বাড়ীতে রাত্রিকালে সিন্দুকের ভিতর বিশ্রাম ক'রেই নগর-রক্ষা করছিলে? পুরুত মশায়! বররুচি কি আপনাকে ঘটপূজার ভার দিয়া গেছেন, তাই সিন্দুকে আসন গ্রহণ ক'রেছিলেন?"

সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ! বেণের গায়েও তেলকালি মাখান হ'য়েছিল। ওঁদের চারি জনের কাপড়-চোপড়ও আমাদের বৈঠক-খানায় আছে।"

তখনই গঙ্গারামের গাত্রাবরণ অপসারিত হইলে সকলেই দেখিলেন, তাহারও সর্ব্বাঙ্গে কালি! কেবল মুখটাই পরিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু কাণের কাছে ও মাথার চুলের ভিতর তখনও কালির বাহার বর্ত্তমান!

রাজা তখন আদেশ দিলেন, "গঙ্গারাম বণিকের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইল। তাহার অর্দ্ধেক সুরুচির প্রাপ্য। ছোট-মন্ত্রী, রাজপুরোহিত ও সহর-কোতোয়ালকে এই অবস্থায় উল্টা গাধায় চড়াইয়া ঢাক বাজাইতে বাজাইতে সহরের সকল রাস্তায় ঘুরাইয়া সহর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হউক। উহাদের মধ্যে যে কেহ এই রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করিবে, সে ১২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবে।"

তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল। তার পর রাজা সুরুচিকে বলিলেন, "মা সুরুচি! তুমি যেরূপ কৌশলে আপন সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছ, তজ্জন্ত আমার নিকট হইতে হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার পাইবে। যত দিন তোমার স্বামী ফিরিয়া না আসেন, তত দিন সরকার হইতেই তোমার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। স্ত্রীলোকের সতীত্বই পরম ধর্ম্ম।—কোকিলানাং স্বরোরূপং, নারীরূপং পতিব্রতম্‌। বিদ্যারূপং কুরূপানাং, ক্ষমারূপং তপস্বিনাম্‌।"

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

মৌন

যান্ত্রিক জাগো জাগো উন্মন যৌবন-ছন্দে,—
ছিন্ন করিয়া দাও আঁখিপুটে তন্দ্রার বন্ধ,—
অন্তর ভ'রি তোল জাগ্রত দীপ্ত-আনন্দে,
মর্ম্ম-কমল হ'তে বিথারিছে রূপ-রস-গন্ধ!
অরুণের বর্ণাভা লয়ে ও কি বিকশিছে মুক্তি,
আলোকের উল্লাসে পূর্ণিত নভোনীল সিন্ধু,
মুক্তা কি বাহিরিল বিদারিয়া আপনার শুক্তি,
কৃষ্ণা-আমার বুকে প্রভাসিল পূর্ণিমা ইন্দু!

বিশ্বের বেদনায় টলমলি' উঠিয়াছে স্বর্গ,
ঝরে' প'ড়ে পারিজাত শিশিরের অশ্রুতে সিক্ত,
লক্ষ্মীরে পাসরিয়া দুর্ভাগা কাঁদে সুরবর্গ,
কল্প ও মন্দার দাবহত নিঃশেষ রিক্ত!
স্বর্গ-বীণায় আর বাজে নাকো মূর্চ্ছনা মন্দ,—
মন্দাকিনীর জলে নাহি আর উচ্ছল নৃত্য,
আজি হায় ইন্দিরা জলধির কারাগার বন্ধ,
অপহৃত নিমেষেই অমরার বৈভব-বিত্ত!

দুঃখেরে মন্থিয়া ত্রিভুবন-অন্তর-লক্ষ্মী,—
উঠিলেন উদ্‌ভাসি কম-করে মঙ্গল-শঙ্খ,
করুণা-কিরণ-স্নাত কজ্জল কালো দু'টি অক্ষি
বিদূরিয়া পদপাতে দৈন্ত ও মৃত্যু আতঙ্ক!
বন্ধু, তোমার তরে তাঁর করে নাহি বরমাল্য,
ঝরিবে না শীর্ষেতে সুকোমল করুণার দৃষ্টি,
তুমি চির দুর্ভাগা,—রুদ্রের চির-প্রতিপাল্য,
তোমাদেরি দুঃখের বনিয়াদে গড়ি' ওঠে সৃষ্টি!

বিকশিবে নন্দন, জ্যোৎস্না সে শিশিরের কুঞ্জে,—
মানুষ ভুলিয়া যাবে বেদনার গত-ইতিবৃত্ত,—
যৌবন-উল্লাস ছড়াইবে নব নব পুঞ্জে
লক্ষ্মীর অবদানে পূর্ণিবে বিশ্বের চিত্ত।
ভুঞ্জিবে নব-যুগ তোমাদেরি' সাধনার মূল্য,—
তোমরা রহিবে শুধু বিলুপ্ত বিস্মৃতি মর্ম্মে,
তোমাদের অঞ্জলি চিরদিন রহিবে অতুল্য
জীবনের পথচারী চলো আজ মৃত্যুর ধর্ম্মে।

শ্রীকালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীজীব শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিনটি প্রতিভাবান্ ভজনপরায়ণ ছাত্র হাতে পাইয়া যথাযোগ্য যত্নসহকারে ইঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র, সিদ্ধান্তশাস্ত্র, বৈষ্ণবস্মৃতি, রসশাস্ত্র এবং স্বরচিত ও শ্রীরূপসনাতন-প্রণীত যাবতীয় গ্রন্থাবলী সুচারুরূপে অধ্যয়ন করাইলেন। শ্রীমদনগোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডে থাকিয়াই এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"—শুন কৃষ্ণদাস।
নরোত্তমদাসে হইল কৃপার প্রকাশ।
যে করিল গুরুসেবা যে ভজনরীতি।
তাহাতেই এই সাক্ষী দেখিল সংপ্রতি।
গুরুকৃপা সাধন করিলে হেন হয়।
শ্রীরূপের গ্রন্থে বাক্য আছয়ে নির্ণয়।

—প্রেমবিলাস, ১২ বিলাস।

এইরূপ অপূর্ব্বভাবে তিনটি অন্তরঙ্গ শিষ্যকে সর্ব্বপ্রকারে সুশিক্ষিত করাইয়া, তাঁহাদিগকে নিজে ও নিজ-নিজ গুরু এবং শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত পার্ষদ-ভক্তবর্গ দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীজীব তাঁহাদিগকে এক-একটি সজীব ভক্তি-মহাবিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন। এইবার তাঁহাদিগের দ্বারা তিনি গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে—শ্রীচৈতন্যদেব যে অসমোর্দ্ধ প্রেমমাধুর্য্যগর্ভ ভাগবতধর্ম্ম জীবের কল্যাণের জন্য দান করিয়া গিয়াছিলেন—তাহা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অধিকারীমাত্রকেই দান করিবার জন্য শ্রীব্রজধামহইতে প্রেরণের শুভসংকল্প করিলেন।

শ্রীজীব ইঁহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে পাঠাইবার পূর্ব্বে একবার শ্রীব্রজমণ্ডলের যাবতীয় লীলাস্থল দেখাইবার অভিলাষ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত মর্ম্মী লীলারসজ্ঞ প্রবীন ভক্ত, শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গী রাঘবপণ্ডিত গোস্বামীও ঐ সময়ে ব্রজমণ্ডলের যাবতীয় লীলাস্থলী দর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। শ্রীজীব এই পরম-ভক্ত গোস্বামীর সহিত ইঁহাদিগকে ব্রজমণ্ডলের যাবতীয় লীলাস্থল দর্শনে পাঠাইলেন। শ্রীল রাঘবপণ্ডিত গোস্বামী দক্ষিণাপথবাসী ব্রাহ্মণ। ইনি এক দিকে যেমন পণ্ডিত ও বিচক্ষণ, অন্য দিকে সেইরূপ প্রেমিক ভক্ত। ইনি সর্ব্বদা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট থাকিয়া ভজন করিতেন। "ভক্তিরত্নপ্রকাশ" নামক একখানি গ্রন্থ ইঁহারই বিরচিত। ইঁহারা এই নিরপেক্ষ স্নিগ্ধপ্রাণ ভক্তের সহিত ব্রজমণ্ডলের যাবতীয় তীর্থ দর্শন করিলেন, এবং ইনি প্রত্যেক তীর্থের লীলার কথা ইঁহাদিগকে পরমাদরে বুঝাইয়া দিলেন। বহু স্থানেই ইঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের বিশেষ বিশেষ রহস্যলীলার অনুভব করিয়াও ধন্য হইলেন। যে যে তীর্থস্থলে শ্রীরূপ-সনাতন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুপবিত্র জীবনের নানাপ্রকার অলৌকিক অবদানের দ্বারা যে যে লীলাস্থল পরিচিহ্নিত ছিল—তাহা দেখিয়া এবং সেই সমস্ত আখ্যান শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব ভক্তি-বৈচিত্র্যে ইঁহারা পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীরূপ সনাতনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া ইঁহারা বুঝিলেন যে, কিরূপ শক্তিশালী মহাভক্তের উপযুক্ত হস্তে শ্রীচৈতন্যদেব এই সকল কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। ইঁহারা সমগ্র ব্রজমণ্ডলের লীলাস্থল দর্শনানন্তর শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী—প্রমুখ ভক্তগণের যোগ্যতা ও অসাধারণ সামর্থ্যের কথা আলোচনা করিয়া ব্রজমণ্ডল হইতে ভক্তিগ্রন্থ ও যাবতীয় গোস্বামী-রচিত গ্রন্থ ইঁহাদিগের সহিত গৌড়দেশে পাঠাইবার সংকল্পের কথা প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য, সকলেই এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দান করিলেন।

নবম অধ্যায়

গ্রন্থ-লুণ্ঠন ও শাস্ত্র-প্রচার

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অলৌকিক কৃপায় শক্তিলাভ করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র হইতে যে সকল অমূল্য তত্ত্ব আহরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, শ্রীজীব গোস্বামী তাহা ভক্তসমাজে বিতরণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সাহায্যে সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, শ্রীজীব এরূপ আশা করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি এই তিনটি ব্রহ্মচারী ছাত্রকে 'আচার্য্য' পদবী প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে ভক্তিধর্ম্ম ও গোস্বামি-শাস্ত্রবাণী প্রচারের ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীরূপ-সনাতনের তিরোভাবের পর শ্রীজীবই তাঁহাদের উদ্দিষ্ট শ্রীভগবৎ-সেবাপথে কায়মনোবাক্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব ভক্তগণের রক্ষক ও পালন-কর্ত্তারূপে পরিণত হইলেন। শ্রীল মদনমোহন, শ্রীল গোবিন্দদেব, শ্রীল গোপীনাথ ও শ্রীল রাধাদামোদর এই পরম ধর্ম্মে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে এই কার্য্যের যোগ্য করিয়া তুলিলেন। তখন যে ভাবে ভক্তি-গ্রন্থরত্নাবলী শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ে প্রেরণ করিতে হইবে,—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপসনাতনের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া, শ্রীজীবের উপরই তাহার আদ্যোপান্ত বন্দোবস্তের ভার পড়িল। শ্রীবৃন্দাবনে তখন ভজন-রসিক বহু বৈষ্ণব বাস করিতেছিলেন। সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, বর্ষাঋতু হইতে চারি মাস একই স্থানে যাপন করিয়া থাকেন। এই সময় এইরূপে শ্রীভগবৎকীর্ত্তন-প্রধান যে ব্রত ভক্ত সন্ন্যাসিগণ বা বৈষ্ণবগণ পালন করিয়া থাকেন—তাহাকে 'চাতুর্ম্মাস্য ব্রত' কহে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের শেষ মাস কার্ত্তিক মাস—বৈষ্ণবমাত্রেরই নিয়ম-পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-সেবার ও শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনের মাস; এই জন্য এই মাস নিয়ম-সেবার মাস নামে অভিহিত। শ্রীবৃন্দাবনে ও

শ্রীপুরীধামে বৈষ্ণবগণ এখনও নিষ্ঠা সহকারে নিয়মসেবা ব্রত পালন করিয়া থাকেন।*

কার্ত্তিক মাসের এই নিয়মসেবা শেষ হইলে শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনে কয়েক দিবস-ব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করিলেন, এবং চৌরাশি-ক্রোশ বিস্তৃত ব্রজমণ্ডলের যাবতীয় বৈষ্ণব ও মোহান্তগণকে শ্রীবৃন্দাবনে আনয়ন করিলেন। ঐ মহোৎসবকালে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের সম্মুখেই শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্য সম্বন্ধে বলিলেন,—

"বহুশ্রমে সর্ব্বশাস্ত্র পড়াইল ইঁহারে।
সবে মিলি কৃপা কর ইঁহার উপরে।
আমার প্রভুর শক্তি হয় ইঁহা প্রতি।
শ্রীভট্ট গোসাঞি ইঁহারে কৃপা কৈল অতি।"

—প্রেঃ বিঃ—১২শ বিলাস।

অতঃপর তিনি শ্রীনিবাসের শাস্ত্রাধ্যয়নের ইতিবৃত্ত, তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমা, তাঁহার নিষ্ঠা—এই সকল বিস্তৃতভাবে বৈষ্ণবসমাজে বিবৃত করিয়া—তাঁহার "আচার্য্য" উপাধি লাভের কথা বলিলেন। অতঃপর শ্রীজীব নরোত্তমের মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর কৃপাপ্রাপ্তির আখ্যান বিবৃত করিলেন। শ্রীল নরোত্তমকে শ্রীজীব কেন "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি দান করিয়া শ্রীনিবাসের সহিত বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়া, শ্রীল নরোত্তমের প্রতি বৈষ্ণব সমাজের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। শ্রীজীব ইহার পরে শ্যামানন্দকে বৈষ্ণবগণের নিকট উপস্থিত করিলেন। যখন শ্রীজীব এই সুন্দর যুবকের গুণাবলী বর্ণনা করিলেন, তখন সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ আত্মহারা হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন; এবং এই তিন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যুবকের দ্বারা যে জগতের মহামঙ্গল সাধিত হইবে, ইহা জানিয়া সকলেই শ্রীগোবিন্দদেবের নিকট ইঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীজীবের এই কার্য্যে পরমাগ্রহে সকলে সম্মতি দান করিবার পর শ্রীজীব মথুরা নগরে তাঁহার বা শ্রীরূপ-সনাতনের যে সকল অনুরাগী সেবক ছিলেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং সমগ্র জগতের পক্ষে এই গ্রন্থাবলীর প্রচার যে পরম কল্যাণপ্রদ, ইহা বুঝিয়াই তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ-প্রেরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার আদেশ দান করিলেন।

সঙ্কল্পিত শুভদিনে, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব মোহান্তই শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী যাবতীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী চারিটি পেটিকায় আবদ্ধ ও একটি সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করিয়া মোমজামা দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিলেন। ঐ গ্রন্থ-সম্পুটে অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রন্থ—বিশেষতঃ, শ্রীভাষ্য, মাধ্বভাষ্য-প্রমুখ ব্রহ্মসূত্রের যাবতীয় বৈষ্ণব ভাষ্য এবং ক্রমদীপিকা, নৃসিংহ-পরিচর্য্যাপ্রমুখ অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ, নানাবিধ টীকাসমেত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রমুখ পুরাতন গ্রন্থসমূহ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের টীকা সমেত উপনিষদাবলী, 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপ্রমুখ গ্রন্থাবলী বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর, শ্রীরূপ গোস্বামীর, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর, ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর যাবতীয় গ্রন্থ, শ্রীজীবের ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের যে গ্রন্থ তখন পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল—সেই সকল গ্রন্থও এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বলা বাহুল্য, গ্রন্থসংখ্যা এইরূপ অধিক ছিল বলিয়াই তাহা বহনের জন্য দুইখানি গো-শকটের প্রয়োজন হইল।

দুইখানি গো-শকট (পঞ্চদশ জন) সশস্ত্র প্রহরিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীগোবিন্দ-মন্দির হইতে যাত্রা করিল। অতঃপর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি সহকারে শকটদ্বয় মথুরাভিমুখে চালিত হইল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম, আলিঙ্গনাদি করিয়া গৌড়ে যাত্রা করিলেন। শ্রীজীব, শ্রীল রাঘব-পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজপ্রমুখ কয়েক জন ভক্ত শ্রীনিবাসাদির সহিত মথুরায় আসিলেন। মথুরায় রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে গ্রন্থপূর্ণ শকট লইয়া তাঁহারা গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীজীব মথুরার মহাজনগণের দ্বারা রাজকীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সহিত আরও কিছু দূর গমন করিয়া শ্রীজীব, রাঘবপণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিদায় গ্রহণ করিলেন; এবং সকলকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, তাঁহার প্রেমধর্ম্ম ও তদীয় অভিন্নবপু ভক্ত গোস্বামীদিগের গ্রন্থ প্রচারের আদেশ দান করিলেন। পরমধীর শ্রীজীব গোস্বামীর এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে "নরোত্তমবিলাসে" বর্ণিত আছে,—

"শ্রীজীব গোস্বামী কোটি সমুদ্র গম্ভীর।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল-চিত্ত—বাহে মহাধীর।"—২য় বিলাস।

গ্রন্থপূর্ণ শকটসহ ইঁহারা মথুরার রাজপথ দিয়া এটোয়া হইতে মারিখণ্ডের বনপথে চলিলেন। এখানে অনেক নীলাচল-যাত্রী তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইল। এই পথেই শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত তিনটি মহাপ্রাণ যুবক সর্ব্বত্যাগী গোস্বামীদিগের গ্রন্থরূপী মহাশক্তি সংগ্রহ করিয়া, সেই পথেই গৌড়দেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে তাঁহারা পঞ্চকোট পর্য্যন্ত আসিয়া ক্রমে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিলেন।

মহাপরাক্রান্ত মল্লরাজ বীর হাম্বির তখন বিষ্ণুপুর রাজ্যের অধীশ্বর। বহু বীর-সৈন্যে ও বৃহৎ বৃহৎ কামানে তাঁহার রাজধানী সুরক্ষিত। কথিত আছে, তিনি সৈন্যদল সাহায্যে ধনবানদিগের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কয়েক জন মহাজন বহু ধনরত্নপূর্ণ সিন্দুক গোশকট সাহায্যে গৌড়দেশে লইয়া যাইতেছেন, এই সংবাদ বীর হাম্বিরের কর্ণগোচর হইলে, দৈবজ্ঞের গণনায় ইহা সমর্থিত হইল। তখন রাজা এই মহাজনগণের গোযানের পশ্চাতে চর নিযুক্ত করিলেন। গোশকট ক্রমে রঘুনাথপুর-সন্নিহিত মালিয়াড়ায় উপস্থিত হইলে রাজা জানিতে পারিলেন, এই সকল মহাজনগণ গোযানসহ ঐ স্থানের এক ভৌমিকের ভবনে রাত্রিযাপন করিবেন; এবং তাঁহাদের সঙ্গে ১৫ জন সশস্ত্র রক্ষী আছে। বীর হাম্বির দুই শত সুশিক্ষিত সৈন্য পাঠাইয়া আদেশ করিলেন, কাহারও প্রাণহানি না করিয়া সমস্ত ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিতে হইবে। গাড়ী গোপালপুরে

* কার্ত্তিক মাসের ব্রতোপবাসবিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ষোড়শ বিলাসে দ্রষ্টব্য।

পৌঁছিলে সকলে সেখানেই রাত্রিবাস করিবার সংকল্প করিলেন। দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে কৃষ্ণ-কথার আলোচনা করিয়া পথশ্রান্তিবশতঃ ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।—সেই সময় রাজপ্রেরিত সৈন্যদল সিন্দুক ধনরত্ন পূর্ণ মনে করিয়া, কাহারও প্রাণহানি না করিয়া লুঠিয়া রাজধানীতে লইয়া গেল। সিন্দুকটি খুলিয়া পরীক্ষা না করিয়াই তাহারা উহা একেবারে রাজা বীর হাম্বিরের সকাশে উপস্থিত করিল।

শ্রীভগবান অতি অলৌকিক উপায়ে তাঁহার প্রিয় শ্রীরূপসনাতনের ও শ্রীজীবের অভিলাষ পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ কত দিনে গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে পৌঁছিবেন, কত দিনে ভক্তগণকে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের অধ্যাপনা আরম্ভ হইবে, কোন্ সৌভাগ্যবান্ ধনী কত দিনে ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারের জন্ম উপযুক্ত চতুষ্পাঠী স্থাপনের সহায়তায় অগ্রসর হইবেন—গ্রন্থরাজি লইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিবার পরই তিন জনে এই প্রকার নানা কথার আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থপ্রচারে এই বিলম্ব পরমকৌতুকী মহাপ্রভুর কি সহ্য হইতে পারে? তাই তিনি বিষ্ণুপুরকে গ্রন্থপ্রচারের প্রথম কেন্দ্র নির্ব্বাচন করাইয়া বিষ্ণুপুরাধিপতিকে কৃতার্থ করিবার জন্যই তাঁহার দ্বারা এই অমূল্য-রত্নরাজি লুণ্ঠন করাইলেন। লীলাময়ের লীলা কি দুর্ব্বোধ্য!

গ্রন্থরাজি লুণ্ঠিত হওয়ায় শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ কিরূপ ব্যথিত হইলেন তাহা কেবল অনুভবযোগ্য। তাঁহাদের চিরপোষিত আশালতার মূল যেন সহসা উৎপাটিত হইয়া গেল—তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনা যেন ব্যর্থ হইল! ভক্তিরত্নাকর এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

নরোত্তম কহে—আমি প্রাণ তেয়াগিব।
শ্যামানন্দ কহে—এই অনলে পশিব॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের মনে হইল যাহা।
কহিতে বিদরে হিয়া—কি কহিব তাহা॥ —৭ম তরঙ্গ।

অহো, কি মর্ম্মভেদী উচ্ছাস! কিন্তু শ্রীজীব প্রবীণ শ্রীনিবাসের হস্তেই সকল ভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনিও অধীর হইলে ইঁহাদিগকে কি করিয়া শান্ত করিবেন? এইজন্যই তিনি নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে নানা মধুর উপদেশে প্রবোধ দান করিয়া খেতুরীতে পাঠাইলেন; এবং কয়েক জন প্রহরীকে এই সংবাদ সহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। গো-শকট ও অন্যান্য সঙ্গী-প্রহরীদিগকে এক স্থানে রাখিয়া তিনি একাকী গ্রন্থের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

যিনি অন্তর্যামিরূপে বীর হাম্বিরের হৃদয়ে থাকিয়া গ্রন্থাপহরণের প্রেরণা দিয়াছিলেন—তাঁহারই প্রেরণায় কৃষ্ণবল্লভ নামক এক জন পবিত্রচরিত্র ভক্ত ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয় হইল। শ্রীনিবাসের অপূর্ব্ব মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃষ্ণবল্লভ অচিরেই তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীনিবাস দেউলিগ্রামে কৃষ্ণবল্লভের বাসগৃহে আসিয়া অবস্থান করিলেন; তিনি তাঁহারই নিকট জানিতে পারিলেন, বীর হাম্বিরের রাজসভায় ভাগবত পাঠ হইতেছে। শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় ভাগবত পাঠ শুনিতে গেলেন। প্রেমবিলাসকার বলিতেছেন—প্রথম দিন গোপনে কৃষ্ণবল্লভের সহিত রাজসভায় যাইয়া ভাগবত পাঠ শুনিয়া আসিলেন; কিন্তু ব্যাস নামক যে ব্রাহ্মণটি ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, তিনি শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকা পড়েন নাই, সুতরাং তিনি যেভাবে নিজের ইচ্ছামত ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, শ্রীনিবাস তাহা শুনিয়া সুখ পাইলেন না। পরদিন রাজ-সভায় ভাগবত-পাঠ শুনিয়া বলিলেন,—

"ব্যাস-ভাবিত এই গ্রন্থ ভাগবত।
শ্রীধর স্বামীর টীকা আছয়ে সম্মত॥
কিবা বাখানহ ইহা বুঝনে না যায়।
ইহার অর্থ নাহি হয় পণ্ডিত-প্রতিভায়॥"

প্রেমবিলাস। ১৩শ বিলাস।

পরদিন ব্যাস ভাগবত-ব্যাখ্যা করিবার সময়ে শ্রীধরের অসম্মত ব্যাখ্যা করিয়া বসিলেন। শ্রীনিবাস তাহা দেখাইয়া দিলে—

"পণ্ডিত কহে মহারাজ! ভাগবতের অর্থ।
আমা বিনা বাখানয়ে কাহার সামর্থ্য॥
কোথাকার ক্ষুদ্র বিপ্র, মধ্যে কহ কথা।
কিবা বাখানিবে তুমি, আমি বৈসে এথা॥"—প্রেমবিলাস। ঐ।

অতঃপর রাজাও সাগ্রহে শ্রীনিবাসকে শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে বলিলে শ্রীনিবাস আচার্য্যগণের পদ স্মরণ করিয়া ভক্তিপূত চিত্তে শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া স্বয়ং রাজা, রাজ-পণ্ডিত ও রাজ-সভাস্থ সকল শ্রোতাই চমৎকৃত হইলেন।

রাজা বীর হাম্বির ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, রাজগুরু ব্যাস চক্রবর্ত্তী, সকলেই শ্রীনিবাসের আকৃতি ও প্রকৃতি, পাণ্ডিত্য ও সদাচার দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীনিবাস ধীরে ধীরে আত্ম-পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক গ্রন্থলুণ্ঠনের বিষয় বিবৃত করিলেন। বিষ্ণুপুররাজ অনুতপ্ত হইয়া যে, গ্রন্থগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন তাহাই নহে, পরন্তু সপরিবার তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজ ঐশ্বর্য্য ও রাজ্য তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিবাস খেতুরীতে গ্রন্থপ্রাপ্তির শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, এবং যে শকটদ্বয় গ্রন্থ আনিয়াছিল, সেই শকটদ্বয় শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, ও শ্রীগোপীনাথের জন্য রাজপ্রদত্ত উপহারে পূর্ণ করিয়া অস্ত্রধারী রক্ষিগণের সহিত গ্রন্থপ্রাপ্তির ও বিষ্ণুপুর রাজের মতি-পরিবর্ত্তনের সংবাদসহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর-রাজকে, রাণীকে, রাজপুরোহিতকে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিলেন, এবং রাজপুরোহিত ব্যাস চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণবল্লভকে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। রাজসভায় প্রতিদিন শ্রীভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র আলোচিত হইতে লাগিল।—ক্রমে বিষ্ণুপুরের বহুলোক ভক্তিপথের পথিক হইল—অধিক কি, বিষ্ণুপুররাজ্য অনতিবিলম্বে যেন হরিভক্তি-প্রবাহে পরিপ্লাবিত হইল।*

---

* প্রেমবিলাসের ত্রয়োদশবিলাসে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণুপুরে গ্রন্থাপহরণের সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মবিসর্জ্জন করেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, প্রেমবিলাসের বিবরণ বিশেষ সাবধানতা সহকারে পরীক্ষা না করিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ, শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তি-রত্নাকর বা নরোত্তমবিলাসের সহিত মত-বিরোধের স্থলে প্রেমবিলাসের বর্ণনা আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরমশ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ৺ সতীশচন্দ্র মিত্র

এদিকে নরোত্তম ও শ্যামানন্দ খেতুরীতে আসিলে নরোত্তমের বৃদ্ধ পিতামাতা তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন, এবং নরোত্তম রাজ্য ত্যাগ করায় তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ রায় রাজা হইলেন। তিনিও নরোত্তমের পদে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ভক্তিধর্ম্মের প্রচারের জন্ম তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়োজিত করিলেন। নরোত্তমকে দেখিয়া, তাঁহার মুখে কীর্ত্তিত শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার অভিনব প্রণালীতে তাল-লয়বদ্ধ গরাণহাটি কীর্ত্তন-সুধাপান করিয়া দলে দলে লোক তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল।

অতঃপর নরোত্তম বিবিধ উপহারের সহিত শ্রীল শ্যামানন্দকে কালনায় শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন। সে স্থানে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া শ্যামানন্দ উৎকলে পিতামাতার নিকট গমন করেন। শ্রীজীবের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া শ্যামানন্দ উৎকলে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বহু পণ্ডিত ও ধনী ব্যক্তিকে ভক্তি-পথে আনয়ন করেন। ফলতঃ, শ্রীনিবাসের, নরোত্তমের ও শ্যামানন্দের আগমনে গৌড়দেশে, বঙ্গদেশে, আসাম ও উৎকলে যে প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিপাদিত প্রেম-ধর্ম্ম, গোস্বামি-শাস্ত্র ও গোস্বামিসিদ্ধান্ত প্রচার হইতে লাগিল, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীল ভক্তি-রত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, শ্যামানন্দপ্রকাশ ও রসিকমঙ্গল—এই কয়খানি গ্রন্থে আংশিক ভাবে মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ অতি দুর্ভাগ্য। মনুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, এক সময়ে তীর্থযাত্রা ব্যতীত বঙ্গদেশে আগমনে পাতিত্য ঘটিত। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাবে বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের গৌরবেই বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছিল। উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের বহু তীর্থক্ষেত্র বহু সাধু-সন্ন্যাসীর জন্মস্থান; কিন্তু বঙ্গদেশ বা গৌড়মণ্ডল সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিত। বঙ্গদেশে নবদ্বীপধাম ভিন্ন অন্য কোথাও বিপুলভাবে যাত্রি-সমাগম হয় না,—আর সেই সকল যাত্রীরও অধিকাংশই পূর্ব্ব-বঙ্গ ও মণিপুরবাসী। কিন্তু তীর্থদর্শন উপলক্ষে বাঙ্গালাদেশের বহু অর্থ প্রতিবর্ষেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ব্যয়িত হয়। বঙ্গদেশের বহুস্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বহু মোহান্তগণের পাটবাড়ী এখনও বর্ত্তমান। বঙ্গের ও উৎকলের এই গৌরবের মূলই মহাপ্রাণ শ্রীজীব গোস্বামী। তাঁহারই চেষ্টায় শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের লীলাস্থলরূপেই গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের বহু স্থল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের তীর্থভূমি। শ্রীজীব যতদিন বিদ্যমান ছিলেন, ততদিন তাঁহার চেষ্টায় শ্রীবৃন্দাবনে বাঙ্গালীর মর্য্যাদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের জগৎপাবনী লীলায় বহু ভক্ত আত্মহারা হইয়া ডুবিয়াছিলেন—তাঁহারা এই লীলার মর্য্যাদা নিজেরাই বুঝিয়াছিলেন—প্রেমে বিহ্বল হইয়া অপরকে বুঝাইতে পারেন নাই; এখন শ্রীজীবের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীনিবাস, শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরই সেই লীলার ও লীলাতীর্থ গৌড়মণ্ডল ভূমির মহিমা সকলকেই বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর উদাত্ত কণ্ঠে গাহিলেন,—

"গৌরাঙ্গের দু'টি পদ, যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গগুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী।
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মনে,
সে চায় ব্রজেন্দ্র-সুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যে বা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।"

শ্রীল নরোত্তমই সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যে বা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস।"

ইহার পূর্ব্বে গৌড়মণ্ডলকে সর্ব্বজনারাধ্য তীর্থরূপে আর কেহ ঘোষণা করিতে পারেন নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

বি, এ মহাশয়ের মত ঐতিহাসিক ব্যক্তিও প্রেমবিলাসের এই বৃত্তান্ত গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৪৯৬ বা ১৪৯৭ শকে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ কোনওরূপে ১৫০৩ শকের পূর্ব্বে শেষ হয় নাই। অতএব এই সময়ে কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব ঘটিলে গ্রন্থ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। পরন্তু শ্রীনরোত্তমবিলাসের নবম বিলাসে ও ভক্তিরত্নাকরের একাদশ তরঙ্গের বর্ণনায় শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীজাহ্নবা দেবীর শ্রীবৃন্দাবনে গমনের বর্ণনা আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিবার ও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের খেতুরী আগমনের পরে সুপ্রসিদ্ধ খেতুরীর মহোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীজাহ্নবা দেবী খেতুরীর মহোৎসবের পরে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন শুনিয়া অতিক্ষীণ দেহ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে আসিতে না পারিয়া ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। শ্রীজাহ্নবা দেবী যখন শ্রীজীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তথায় কথাপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীজীবের নবরচিত গ্রন্থ "শ্রীগোপালবিরুদাবলীর" প্রশংসা করেন। এই সময়ের কিঞ্চিৎ পরে শ্রীজাহ্নবা দেবী শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভক্তিরত্নাকরে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে কবিরাজ গোস্বামী দাস গোস্বামীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীজাহ্নবা দেবী যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিতেছেন, তখন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দ কবিরাজকে আলিঙ্গন করিতেছেন, ইহাও ভক্তিরত্নাকরে দেখা যায়। ভক্তিরত্নাকরে চতুর্দ্দশ তরঙ্গে শ্রীজীব যখন গোবিন্দ কবিরাজকে পত্র দিতেছেন, তখন সেই পত্রের মধ্যেও শ্রীজীব গোবিন্দ কবিরাজকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নমস্কার জানাইতেছেন। যদুনন্দনের কর্ণানন্দেও প্রেমবিলাসের এই কথার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। অতএব এই সময়ে কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাবের কথা আদৌ প্রমাণসহ নহে।

পাটের কথা

আজ মধ্য এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই ঘাটে-মাঠে পাটের কথা; তাহার কারণ স্বপ্রকাশ। বর্ত্তমান কালে পাটই বাঙ্গালার প্রধান ক্ষেত্রজ ও শ্রেষ্ঠ পণ্য। কিন্তু বাঙ্গালার কৃষকরা অধিক লাভের আশায় এবার অত্যন্ত অধিক জমিতে পাট বপন করিয়াছে। বাঙ্গালা সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন ব্যবস্থাই এবার করেন নাই। এই কার্য্যে তাঁহারা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন—এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। তাঁহাদের বুদ্ধির বিশেষ অভাব সূচিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, পাট এমন একটি পণ্য যে, অতি সামান্ত কারণেই উহার মূল্যের অতিশয় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। উহার চাহিদারও কিছু স্থিরতা নাই। শস্যাদি চালান দিবার এবং রক্ষা করিবার পক্ষে পাটের থলিয়া যেরূপ উপযোগী, তেমন উপযোগী অন্য কোন অনুকল্প অংশু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায় ইহার বিক্রয় অবাধে চলিলেও ইদানীং ইহার চাহিদা বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। মার্কিণমুলুকে পূর্ব্বাপেক্ষা কম পাট কাটিতেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম সাত মাসে প্রশান্তমহাসাগর-তীরস্থ দেশগুলি বাদ দিয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, ঐ বৎসর মার্কিণে ৩৮ কোটি ১০ লক্ষ গজ পাটের জিনিষ কাটিয়াছিল। উহার পূর্ব্ব-বৎসর কাটিয়াছিল ৫১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ; মার্কিণ যুক্তরাজ্য ও অন্য কয়েকটি দেশে কত গাঁইট পাট গত পাঁচ বৎসরে চালান গিয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল,—*

দেশের নাম	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
মার্কিণ	৩২০,০০০	৪৮০,০০০	৬১৫,০০০	৩৬৫,০০০	২৭০,০০০
স্পেন	২৬০,০০০	২৮০,০০০	১৫,০০০	—	৩৫,০০০
হল্যাণ্ড	৮৫,০০০	৪৫,০০০	৪৫,০০০	৪০,০০০	২০,০০০
ইটালী	৪৩০,০০০	২৩৫,০০০	৫৪০,০০০	৩৬৫,০০০	২৪৫,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	১৩০,০০০	১৬৫,০০০	২০০,০০০	২৬৫,০০০	১৮৫,০০০
জাপান	১২৫,০০০	১৪০,০০০	১৭৫,০০০	১২৫,০০০	১৪০,০০০
অন্যান্য প্রাচ্য বন্দরে	১০০,০০০	১৪০,০০০	১১০,০০০	৭০,০০০	৮০,০০০
জার্ম্মাণী	৯৯০,০০০	৯১০,০০০	৯৭০,০০০	৮১৫,০০০	৮৭০,০০০
ফ্রান্স	৪৪০,০০০	৪০৫,০০০	৪৭০,০০০	৩৪০,০০০	৪২৫,০০০

সকল দেশের হিসাব এস্থলে উদ্ধৃত না হইলেও সর্ব্বত্রই পাটের চাহিদা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধের সম্ভাবনায় ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই গ্রেট-বৃটেনে এবং ফ্রান্সে অধিক পাট রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থায় নির্ভর করিয়া বিচার চলিতে পারে না।

পাটের চাহিদার কোন স্থিরতা নাই। উহার হ্রাস-বৃদ্ধি খাম-খেয়ালী ভাবেই ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ, পাটের কতকগুলি অনুকল্প পণ্য উহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ইহার ফলে আমাদের, বিশেষতঃ, বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার যে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিতেছে, তাহাতে দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না; কারণ, পাটই এখন বাঙ্গালী জাতির ধনার্জ্জনের প্রধান উপায়। গত এক শতাব্দীর অধিক কাল হইতে শিল্পপ্রধান বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান হওয়ায় যে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, সংপ্রতি কৃষির প্রসার এবং বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তার-হেতু অধিক অর্থাগম হওয়ায় এ পর্য্যন্ত তাহার তীব্রতা তেমন বেশী মনে হয় নাই। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডী নগরে প্রথমে পাটের আমদানী হয়। তৎপূর্ব্বে পাটের বিশেষ আদর ছিল না; অধিক কি, য়ুরোপে উহার নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু পাটের আদরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার দরও চড়িতে লাগিল। পাটের প্রধান বিশেষত্ব—বাঙ্গালা, আসাম এবং বিহারের দুই-একটি স্থান ভিন্ন আর কোথাও ইহার আবাদ সন্তোষপ্রদ নহে। পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্রের পলি-পড়া চর-জমিতে উহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অথচ সর্ব্বত্রই পাটের প্রয়োজন। কাজেই ইহাকে বাঙ্গালার লক্ষ্মীস্বরূপ পণ্য বলা যাইতে পারে। এখন এই পাটের চাহিদা যদি হ্রাস পায়, অথবা উহার দর

* মিঃ উইগিলস ওয়ার্থের বক্তৃতার প্রদত্ত হিসাব হইতে গৃহীত।

যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইবে। উহার চাহিদা যাহাতে হ্রাস পায়, সে জন্য চেষ্টাও যে না হইতেছে, এ কথা বলা যায় না।

চাহিদার অধিক পাট উৎপন্ন করিলে উহার মূল্যও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইবেই। প্রধানতঃ কলওয়ালারা উহার খরিদ্দার। তাহারা গুদামে পাট সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং ফসল অধিক হইয়াছে বুঝিতে পারিলে মাল ক্রয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না; এই জন্যই পাটের দর কমিয়া যায়। পাট কখন ১৮ টাকা মণ, আবার কখন আড়াই টাকা মণও বিক্রয় হইয়া থাকে। মূল্যের এরূপ তারতম্য অন্য কোন পণ্যেরই হয় না। কয়েক মাস পূর্ব্বে যে পাট ১৭ টাকা মণ বিকাইয়াছে, আজ মফস্বলে সেই পাট সাড়ে তিন টাকাতেও কিনিবার ক্রেতার অভাব। পল্লীগ্রামের কোন কোন স্থানে গুটি পাট আড়াই টাকা হইতে এগার সিকা মণ বিকাইতেছে, আর দেশী পাট ৩ টাকা ৯ আনা হইতে ৩ টাকা বার আনা দরে বিকাইতেছে। ঐ দরে পাট বেচিলে কৃষকের খরচাই উঠে না, লাভ হওয়া দূরের কথা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এবার পাট অধিক উৎপাদিত হওয়ায় তাহার আদর নাই; কেহই কিনিতেছে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই পাট বিক্রয় করিয়া ৭০ কোটি হইতে ৯০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত ভারতের আয় হইয়াছিল। ফলতঃ বাঙ্গালায় অধিক পাট জন্মে বলিয়া বাঙ্গালীরই অধিক লাভ হইয়াছিল। প্রত্যেক বাঙ্গালীর গড়ে প্রায় ১২ হইতে ১৪ টাকা অধিক আয় হইয়াছিল। এখন পাটের দর অতিশয় নামিয়া যাওয়ায় কেবল যে চাষী মহলেই হাহাকার উঠিয়াছে এরূপ নহে, সকল সম্প্রদায়কেই সেই আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে।

গত বৎসর পাট বুনিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ এক ইস্তাহার জারী করিয়া বলিয়াছিলেন, এবার কেহ ১২ টাকা মণের কম দরে পাট কিনিতে বা বেচিতে পারিবে না; অর্থাৎ যে গুটি-পাট এখন মফস্বলে আড়াই টাকা এগার সিকা মণ বিকাইতেছে, তাহাও ১২ টাকা না হয় মফস্বলে এগার টাকা মণ বেচিতে হইবে, ইহাই হইয়াছিল সচিব দলের অর্থাৎ সরকারী ফতোয়া। কিন্তু বাঙ্গালার অব্যবসায়ী সচিবরা যদি ভাল পাট ৬০ টাকা মূল্যে লইবেন বলিয়া ঘোষণা না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা বেপরোয়া হইয়া এত বেশী জমিতে পাট বুনিত না। এবার এখনও যুদ্ধ চলিতেছে; কিন্তু এবারকার যুদ্ধ পরিখাতেও হইতেছে না, এবং পাটের বস্তারও তেমন প্রয়োজন হইতেছে না বলিয়াই তাহাদের ধারণা ছিল; কাজেই পাটের অত্যধিক চাহিদা নাই। তবে ইতিমধ্যে দুই কোটি বালির বস্তার ফরমাস হইয়াছে, তাহাতে পাটের মূল্যের কি তারতম্য হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য সাগরপথ বিঘ্নবহুল হওয়াতে এবং অন্য কারণে জাহাজের অভাব হওয়ায় সাগরপথে পাট স্থানে স্থানে অল্প চালান যাইতেছে। সুতরাং এবার অদূর ভবিষ্যতে যে পাটের মূল্য নিশ্চিতই বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে,—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এদিকে মণ-করা পৌণে তিন টাকা দরে গুটি-পাট বেচিয়া, এবং পৌনে ৪ টাকা মূল্যে দেশী পাট বেচিয়া চাষীদের মূলেই লোকসান হইতেছে।

সাধারণতঃ বাঙ্গালায় প্রায় ২ লক্ষ টন (এক টন প্রায় সওয়া ২৭ মণ) করিয়া পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পাট উৎপাদন-কার্য্যে ১ লক্ষ চাষী নিযুক্ত আছে। ইহা ভিন্ন দালালী, যাচনদারী, মালবহনকারী, আড়ৎদারী প্রভৃতি কার্য্যেও বহু লোক নিযুক্ত থাকে। ভারতে যত পাট উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৯০ ভাগ বাঙ্গালায় জন্মে। গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাঁইট পর্য্যন্ত পাট উৎপন্ন হইত; সরকারী নিয়ন্ত্রণ-চেষ্টার ফলে উহা কমিয়া প্রায় অর্দ্ধেক—৬০ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাতেও পাটের মূল্য পূর্ব্ব অবস্থায় থাকে নাই। উহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং এজন্য সাবধান হওয়া উচিত। বার্ত্তিক-নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অদূরদর্শীর ন্যায় খেয়াল অনুযায়ী কাজ করিলে তাহার ফল মন্দ হইবেই। পণ্যের মূল্য প্রধানতঃ যোগান এবং টানের উপর নির্ভর করে। শত বৎসর পূর্ব্বে পাট উপেক্ষিত পণ্যই ছিল; উহার মূল্য প্রতি মণ বোধ হয় দুই টাকা আড়াই টাকাই ছিল। কিন্তু তখন এ দেশের লোকের যে সামান্য শিল্প-বাণিজ্য ছিল, তাহাতে তখন পাটের চাহিদা ছিল না বলিয়া লোকে বিশেষ কষ্টবোধ করিত না। তাহার পর এক দিকে শিল্প যেমন হ্রাস পাইয়াছে, অন্য দিকে আবাদী জমির পরিসর

বৃদ্ধি এবং রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির ফলে কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে লোকে সেই কষ্টের তীব্রতা অনুভব করে নাই। এই রপ্তানী বাণিজ্য-পণ্যের মধ্যে পাটই সর্ব্বপ্রধান। পাটের দর মণ-করা তিন টাকা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পনের-ষোল টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সেই জন্য কেবল পাট বেচিয়াই বাঙ্গালার লোক প্রতি বৎসর ৬০—৬২ কোটি টাকা পর্য্যন্ত পাইয়াছিল। ইদানীং সকল কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা এবং মূল্য বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু অন্যান্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় পাটের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর সেই পাটের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছেই, পরন্তু বাঙ্গালার আর্থিক পরিস্থিতির অনেক ওলট-পালট ঘটিয়াছে। এবার ঠিক কি পরিমাণ পাট জন্মিয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। কারণ, এবার যে পরিমাণ জমিতে যত পাটের চাষ হইয়াছিল, জলের অভাবে সেই সমস্ত পাট কাটা হয় নাই। সরকারের প্রকাশিত পাট-ফলনের পূর্ব্বাভাষ সকল সময় নির্ভুল হয় না। মিষ্টার উইগিল-ওয়ার্থ (Wiggle'worth) বিলাতে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের পূর্ব্বে এ দেশে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাঁইট বা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ মণ পাট জন্মিত। এবার এ দেশে পাটের উৎপত্তি যদি ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পাটের ফলন এবার ঐরূপই হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালায় যে পাট জন্মিয়াছে, তাহার পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি মণ ধরা যাইতে পারে। ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে কলিকাতার পাটের বাজারের হিসাবে প্রকাশ, উৎকৃষ্ট ১নং তৈয়ারী গাঁইটের মূল্য ছিল ৩২ টাকা ৪ আনা; কিন্তু রপ্তানী-কারকরা ঐ দিন কোন পাট খরিদ করেন নাই। অর্থাৎ খুব ভাল গাঁইট-বন্দী পাট ৬ টাকা চারি আনা মণ বেচিতে চাহিলেও তাহার খরিদদার মিলে নাই। এখন পাকা গাঁইটবন্দী পাট যদি মণকরা ৬ টাকা ৪ আনায় বিকায়, তাহা হইতে চাষী কত পায়? তাহা কলিকাতায় লইয়া যাইবার এবং গাঁইটবন্দী করিবার খরচ ত আছেই; সুদূর অঞ্চলস্থ চাষী মণকরা সাড়ে ৫ টাকার অধিক মূল্য কিছুতেই পাইবে না। গত বৎসরও চাষীরা এই সময় উহার দ্বিগুণ মূল্য পাইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় সাধারণ গুটি-পাট যে আড়াই টাকা তিন টাকা মণ মফস্বলে বিকাইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। এত অল্প মূল্যে বাজারে বেচিবার লোক আছে, কিনিবার লোক আদৌ নাই। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে গুটি-পাটের মূল্য ত মণ-করা ৭ টাকা সাড়ে ১৩ আনা বিকাইয়াছিল। ১ মণ পাট উৎপাদন করিতে কৃষকের খোরাকী সমেত খুব কম করিয়া ধরিলেও সাড়ে চারি টাকা খরচাই পড়ে। কাজেই এবার কৃষকদিগকে আসলেই লোকসান দিতে হইতেছে; অর্থাৎ তাহাদের পাট উৎপন্ন করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা তাহারা পাইতেছে না;—তাহাদিগকে তাহা অপেক্ষা মণকরা ১।০ পাঁচ সিকা দেড় টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। এখন এবার যদি ৫৪ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষকদিগের ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি হইবে বলিয়াই মনে হয়। এখন যদি ১০ লক্ষ লোক এই পাট উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক রায়তকে প্রায় ৬ টাকা করিয়া গড়ে আসলে লোকসান দিতে হইবে। এই দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা বড় কম ক্ষতি নহে। বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ এবং গবর্ণরও বলিতেছেন যে, এবারকার যুদ্ধে কেবল বিমানাক্রমণ হইতেছে,—স্থলে অধিক যুদ্ধ হয় নাই। সেই জন্য যুদ্ধে পাটের তেমন টান হইতেছে না। কিন্তু গ্রেট বৃটেনের যেরূপ পরিস্থিতি, তাহাতে এবার বিমান যুদ্ধই অধিক হইবেই – ইহা জানা কথা। অশিক্ষিত চাষীরা তাহা বুঝে নাই, সেই জন্য তাহাদিগকে ঐ ক্ষতি সহিতে হইয়াছে। যে দেশের বুদ্ধিমন্ত সচিবরাও ইহা বুঝেন নাই, সে দেশের নির্ব্বোধ ও অশিক্ষিত সাধারণ চাষীরা যে তাহা বুঝিবে না,—ইহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? সার জন হার্ব্বাট এ দেশে নূতন আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি ব্যাপারটা যদি না বুঝিয়া থাকেন, সে জন্য তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া অসঙ্গত।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা মোটের উপর মন্দ বলা যায় না। সত্য বটে, য়ুরোপীয় মহাদেশে এ দেশের পণ্য অধিক চালান যাইতেছে না,—কিন্তু অন্য দিক দিয়া তাহা কতকটা পোষাইয়া যাইতেছে।

গ্রেট বৃটেন এবং বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় পণ্য অধিক চালান যাইতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় শতকরা ১০২ টাকা হিসাবে, কানাডায় শতকরা ৯০ টাকা হারে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় শতকরা ৮০ টাকা হারে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে গণিব্যাগ বা বস্তার রপ্তানীই অধিক হইয়াছে। আমেরিকার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে এবার ভারত হইতে প্রায় দশ কোটি টাকার পণ্য অধিক চালান গিয়াছে, তন্মধ্যে মার্কিণের সহিত বাণিজ্যে ভারত শতকরা ৮৩ ভাগ পণ্য বেশী চালান দিয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, এই যুদ্ধ মিটিয়া গেলে ঐ সকল দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী কমিবে কি না? অধিকন্তু পাটের চাহিদা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে কি না? যুদ্ধের পর য়ুরোপীয়েরা যখন বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ভারতীয় বাণিজ্য কিছু কমিবেই। তাহার পর পাটের রপ্তানী ক্রমশঃ কমিবে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে। কয়েক বৎসর ধরিয়া পাটের রপ্তানী কমিয়া আসিতেছে, ইহা বাণিজ্যের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল,—

খৃষ্টাব্দ	কত টন চালান গিয়াছে	উহার মূল্য কত				
১৯২৭—২৮	১৭, ৭৬, ৬৩২	৮৪	কোটি	২২	লক্ষ	টাকা
১৯২৮—২৯	১৮, ০১, ৩৫৭	৮৯	"	২৫	"	"
১৯২৯—৩০	১৭, ৬৪, ৮৩৯	৭৯	"	১০	"	"
১৯৩০—৩১	১৩, ৮৬, ৩৫৪	৪৪	"	৭৮	"	"
১৯৩১—৩২	১২, ৪১, ৬৩৫	৩৩	"	১৪	"	"
১৯৩২—৩৩	১২, ৪২, ৮০১	৩১	"	৪৪	"	"
১৯৩৩—৩৪	১৪, ২০, ৩২১	৩১	"	৬০	"	"
১৯৩৪—৩৫	১৪, ৩৭, ১৯২	৩২	"	৩৪	"	"

উপরের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিদেশে ক্রমশঃ পাট এবং পাট হইতে প্রস্তুত পণ্যের চালান কম হইয়া আসিতেছে। আবার মূল্যের দিক্ দিয়াও পাট বেচিয়া ভারতের আয় দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। আট বৎসরে প্রায় ৫১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পাট অর্থাৎ প্রায় ৫২ কোটি টাকা ভারতে কম আমদানী হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের, বিশেষতঃ, বাঙ্গালার আয় অত্যন্ত কমিতেছে। কলিকাতা হইতে যত পণ্য বিদেশে চালান যায়, তাহার অর্দ্ধেক (শতকরা ৫০ ভাগ) পাট এবং পাটজাত পণ্য। ইহার রপ্তানী হ্রাস পাইলে ভারত সরকারের শুল্ক-খাতে রাজস্ব কম পড়িবে, এবং কৃষকদিগের বাড়া-ভাতে বালি পড়িবে। এখন কথা হইতেছে যে, সরকার দুই-এক বৎসর না হয় কোনও গতিকে পাটের রপ্তানী কিছু বৃদ্ধি করিতেও পারেন, কিন্তু চিরকাল তাহা পারিবেন না। শণ, সিসল (Sisal) প্রভৃতি অংশুগুলি পাটের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। ইহাদের প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ বাড়িবে কি না, তাহা বুঝা কঠিন; কারণ, শণ, সিসল প্রভৃতি গুণে পাটের সমকক্ষ নহে। কিন্তু কাগজের বস্তার চাহিদা নানা দিক দিয়াই বাড়িতেছে। ফলতঃ অবস্থা দেখিয়া শঙ্কা হইতেছে যে, পাট বাবদ বাঙ্গালার আয় আরও কমিবে। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্ব হইতে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। এখন কি উপায়ে সাবধান হইতে হইবে, এবং ঐ ক্ষতির পূরণ করিতে পারা সম্ভব হইবে, তাহা সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে পৌণে ৯৭ কোটি টাকার পাট এবং পাটজাত পণ্য বিদেশে চালান গিয়াছিল। সে হিসাবে ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে পাট ও পাটজাত পণ্য বেচিয়া ভারতীয় কৃষক ও পাট-কলওয়ালা তাহার তিন ভাগের এক ভাগ টাকা পাইয়াছিল। ইদানীং আরও অল্প টাকা পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। কৃষির দিক্ দিয়া কতটুকু ক্ষতি পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাও যেমন দেখিতে হইবে, তেমনই শিল্পের প্রসার-সাধন দ্বারা সেই ক্ষতি বিশেষ ভাবে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্প, শর্করাশিল্প প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিতে পারিলে সেই ক্ষতি কতক পরিমাণেও পূরণ করা সম্ভব হইবে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগেরও অবহিত হওয়া আবশ্যক। যদি সময় থাকিতে এই বিষয়ে বাঙ্গালীরা অবহিত না হন,—তাহা হইলে অচিরে বাঙ্গালার ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে। পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়াতে কেবল কৃষকসম্প্রদায়ের দারুণ ক্ষতি হয় নাই, মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে এবং এ কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে আর নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।



মিসেস্ ব্যানার্জ্জি

১

হেড মাষ্টার সূর্য্যবাবু যখন স্কুলের সেক্রেটারীর সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, তখন সেক্রেটারী মতিলালবাবু শ্লথভাবে তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া, গড়গড়ার সুদীর্ঘ নলের মুখ চুম্বন করিয়া ধূমপানে রত। তিনি একটু সোজা হইয়া বসিয়া ঈষৎ শিরঃসঞ্চালনে প্রত্যভিবাদন জানাইলেন; তাহার পর স্মিতমুখে সূর্য্যবাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আসুন আসুন মাষ্টার মশায়, বড্ড জরুরি খবর আছে, বলছি—বসুন।"

ফরাসের এক পাশে উঠিয়া-বসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, "তা হ'লে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল! তিনি এসে preside করতে পারবেন—ঐ তারিখে?"

"আরে সে তো পারবেনই, বন্দোবস্তটা তো এক রকম ঠিকই ছিল। তবে ব'লেছিলেন একটা খবর নিতে, আমরা কার্ড "ইস্যু" করবার আগে—হঠাৎ জরুরী কোনও কাজে যদি তাঁকে বাইরেই যেতে হয়—"

"ওঃ, তা হ'লে বাধা কিছু হবে না? তিনি আস্তে পারবেন!"

"সে সব কিছু হবে না হে, সে সব কিছু হবে না। সব ঠিক আছে। তবে সেই জরুরি খবরটা হচ্ছে এই—হাঁ, কি মনে হয় বলুন দিকিন! মাষ্টারীবুদ্ধির দৌড়টা একবার দেখাই যাক্!"

একটু হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, "মনে আর কি ক'রতে পারি? মাষ্টারীবুদ্ধি যে অতি ভোঁতা, তা' সবাই তো জানে। তবে ম্যাজিষ্ট্রেট এসে preside ক'রবেন, এর ওপরেও যদি জরুরি খবর আর কিছু থাকে সেটা—সেটা এই হ'তে পারে—মানে, নামজাদা কোনও লেডী এসে প্রাইজগুলি ছেলেদের হাতে তুলে দেবেন।"

"হা! হাঃ হাঃ! কে ব'লে মাষ্টারীবুদ্ধি ভোঁতা? একেবারে ক্ষুরধার যে! হাঁ, ঠিক ধ'রেছেন মাষ্টার মশায়! মস্ত নামজাদা এক জন লেডী এসেই প্রাইজগুলি হাতে ক'রে দেবেন। তা বলুন-দিকি, এই মহিয়সী মহিলাটি কে?"

সূর্য্যবাবু সহাস্যে কহিলেন, "নেহাৎ গ্রাম্য স্কুল-মাষ্টার, দৃষ্টিটা অত উঁচুতে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে না। বুদ্ধিটা—তা সে যেমনই থাক, মানসিক উদ্ভাবন-কল্পনায় চেষ্টা বৃথা। প্রয়োজনও এমন-কিছু দেখছি না। তা সোজা ব'লেই ফেলুন না, ইনি কে?"

"মিসেস্ ব্যানার্জ্জি।"

"মি—সে—স্ ব্যা—না—র্জ্জি!"

"মিসেস্ এম অর্থাৎ মায়া ব্যানার্জ্জি এম-এ, ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ অব স্কুলস্।"

"ওঃ!"

"নাম অবিশ্যি শুনেছেন। এডুকেশনিষ্ট (educationist) কে না শুনেছে? বড় এক জন স্কলার—ইংলিশে ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ, ক'লকেতায় আগে প্রফেসর ছিলেন—কোন কলেজে— তা তো—"

"বিদ্যাসাগর কলেজে। তবে এম-এ তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস নন, সেকেণ্ড ক্লাস।"

"বটে! তা হ'লে তো বেশ জানেন তাঁকে দেখছি। আলাপ পরিচয় কিছু—"

"আলাপ পরিচয়—কি আর থাকবে? তবে—তবে—দেখেছি তাঁকে ক'লকেতায়—"

"সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ, অথচ অত বড় একটা প্রফেসরও হ'য়েছিলেন! আর আপনি ফার্ষ্ট-ক্লাস এম-এ—ক' বছরের সিনিয়রও নিশ্চয়ই হবেন।"

"হুঁ।" বলিয়া তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিয়া থামিলেন।

"আর ক'রছেন কি না এসে এই গ্রাম্য স্কুলে মাষ্টারী!"

একটু হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, "তা আর কি করি বলুন? দিনকাল যা প'ড়েছে—"

"কিন্তু উনি তো সেকেণ্ড ক্লাস—প্রফেসরীতে ফার্ষ্ট ক্লাস পেলে সেকেণ্ড ক্লাস?—তবে কি না উনি লেডী—"

"হাঁ, ওঁরা একটা preference পাবেনই; আবার যদি লেডী প্রফেসর কেউ চান—সেকেণ্ড ক্লাসও নিতে হবে, ফার্ষ্ট ক্লাস যদি একান্তই দুর্লভ হয়!"

"হাঁ, তা বটে। কিন্তু আপনি কোন প্রফেসরীতে কোনও কলেজে যাননি! ক'লকেতায় তো ছিলেনও—"

চাপা একটি নিশ্বাসের সঙ্গে ম্লান মৃদু একটু হাসিও সূর্য্যবাবুর মুখে ফুটিল; কহিলেন, "যাইনি—মানে পাইনি। ক'লকেতায় কোনও কলেজে ইংরেজীর প্রফেসরী তখন খালিই হয়নি।"

"কিন্তু বাইরেও তো অনেক কলেজ আছে।"

"আছে। প্রফেসরীও ভাল একটা কলেজে পেয়েছিলাম—"

"বটে! তা কি ক'রে ফস্‌কালো?"

"ছেড়ে এসেছিলাম ক'লকেতায় থাকব ব'লে, ভেবেছিলাম, প্রফেসরী কোনও কলেজে একটা পাবই, কিন্তু জুটল না।"

"কিন্তু আপনি দরখাস্ত ক'রেছিলেন, তাতে তো এ সব কথা কিছু ছিল না?"

"না। ওটা আর দিইনি। মনে হ'ল, গ্রাম্য স্কুলের হেড মাষ্টারীর পক্ষে ওটা একটা qualification হবে না, বরং disqualificationই হবে। দুই-একটা স্কুলে দরখাস্তে ওটার উল্লেখ

ক'রে ঠেকেছি। কর্ত্তৃপক্ষ মনে ক'রেছেন, ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ, অত বড় কলেজে প্রফেসরী ক'রেছে। গ্রাম্য কোনও ইস্কুলে গিয়ে থাকবে না বেশী দিন। কাজ একটা হাতে নেই ব'লেই আপাততঃ যাচ্ছে, আবার পেলেই ছেড়ে পালাবে।"

"হুঁ।" আমরা তো জানতামই না কিছু, তবে এ আলোচনা অবিশ্যি কিছু হ'য়েছিল; আপনাকে হ'য় তো রাখা যাবে না বেশী দিন—"

হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, "কিন্তু র'য়ে গেলাম তো এই দু'-তিনটে বছর; সুতরাং ভাবনা আপনাদের কিছু নেই, যদি রাখতেই চান আমাকে।"

মতিলালবাবুও একটু হাসিয়া উত্তরে কহিলেন, "রাখতে আপনাকে চাই না?—বলেন কি মাষ্টার মশায়! আপনার মত এমন যোগ্য লোক কোথায় আর পাব? স্কুলটি আপনার হাতে স'পে দিয়ে এক দম নিশ্চিন্ত হ'য়ে র'য়েছি। এখন রাখতে ক'দ্দিন আপনাকে পারব—এই যা কিছু ভাবনার আছে।"

"কিছু ভাবনা নেই মতিলালবাবু! যাচ্ছি আর কোন্ চুলোয় আজই? যাব—যদ্দিনে হ'ক শেষে সেই চুলোতেই!"

"থাক এ সব কথা এখন। সে চুলোতে সবাইকেই এক দিন যেতে হবে। তবে কি না অশুভস্য কালহরণম্—যদ্দিন জিয়িয়ে থাকা যায়, সেই ভাল।"

"হাঁ, অতিদুঃখীও কেউ বড় চায় না—সেটা এগিয়ে আসুক। ভারটা যতই অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌ক, ডাক শুনে যম এসে সাম্‌নে দাঁড়ালে ব'ল্‌বে, ভারটা আবার মাথায় তুলে দেও।"

"থাক্ ও সব ফিলোসফী এখন মাষ্টার মশায়! আমাদের ভাবতে হ'চ্ছে একটা fitting reception ওঁকে কি ক'রে দিতে পারি।"

"সেটা—ভাল যা মনে করেন ক'রবেন। আমি সাধ্যমত সাহায্য আপনাদের ক'রব।"

"সাহায্য! কেবল সাহায্য কি বলছেন মাষ্টার মশায়! আপনাকে সবই ক'র্‌তে হবে।"

"হুঁ—"

"তাই মনে হচ্ছিল মাষ্টার মশায় আর একটি মিসেস্ ব্যানার্জ্জি যদি আপনার এখানে থাকৃতেন তো ভাবতাম না, কারণ লেডীর অভ্যর্থনা—ও সব লেডীরাই করতে পারেন ভাল।"

সূর্য্যবাবু একটু হাসিলেন—কহিলেন, "তা লেডী, আপনাদের এ গাঁয়েও ঢের আছেন। এই ধরুন না আপনার বাড়ীতে—"

"আর রেখে দিন, রেখে দিন মাষ্টার মশায়! এঁরা সব মেয়েমানুষ, লেডী কেউ নয়। সুতরাং মিসেস্ ব্যানার্জ্জি দ্বারা যা হ'তে পারতো মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, আপনাকেই সেটা ক'রতে হবে।"

"হুঁ—তা আমাদের তো দিন দশেক দেরি আছে। উনি—"

"Inspection tourএ বেরিয়েছেন, ব'ল্লেন, আর ক'টা যায়গা ঘুরে সময়মত সহরে এসে পৌছুবেন।"

ক্ষণকাল কি ভাবিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, "তা বেশ, আস্‌ছেন, যা দরকার হয় করা যাবে। অভ্যর্থনা—তা বিশেষভাবে আর কি করা যেতে পারে, বুঝ্‌তে পারছি না। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবও আস্‌ছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে তো ওঁর জন্তে আলাদা একটা কিছু করা যায় না। এক চা আর কিছু খাবার-টাবারের বন্দোবস্ত,—তা উনি তো পর্দ্দানশীন নন, আর জাত-বিচারও বোধ হয় করেন না। ইস্কুলের একটা ঘরেই দু'জনের জন্তে যা হয় ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যেতে পারে।"

মতিলালবাবু কহিলেন, "ভাবছি কি জানেন, এক জন বাঙ্গালী মহিলা—উচ্চপদস্থা—আস্‌ছেন—বাঙ্গালীর এই গ্রামে, মেয়েদের দিয়ে একটা অভ্যর্থনা-সঙ্গীত, একটা অভিনন্দন, আর কেবল একটুকরা খাবার দিয়ে বিদায় না ক'রে, কোনও বাড়ীতে সন্ধ্যের পর ভাল ক'রে একটু খাইয়ে-দাইয়ে দেবার বন্দোবস্ত যদি করা যেত—"

"হ্যাঁ, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত—সে আপনাদের বাড়ীতে, কি আর যেখানে হয় ক'রতে পারেন—যদি রাত অবধি থেকে খেয়ে যেতে উনি রাজি হন। তবে অভিনন্দন আর অভ্যর্থনা-সঙ্গীত—সেগুলো এই পুরস্কারবিতরণের সভায় ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে কেবল তাঁর সম্মান প্রদর্শনের জন্ত পৃথকভাবে করা শোভন হবে কি না, ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে।"

"তা বটে—তা বটে! তবে দুই-এক ঘণ্টা আগে যদি আসতে পারেন, তবে তাঁর অভ্যর্থনার জন্ত একটা সভা তখন-তখনই স্থাপন ক'রে নেওয়া যেতে পারে। হাঁ, এই ঠিক হবে! খাসা প্ল্যানটা মাথায় এল বটে! কি বলেন মাষ্টার মশায়?"

"হাঁ, সেটা—করা যেতে পারে বটে, তবে কি না, এখানে সেটা না ক'রে আপনাদের বালিকা-বিস্তালয়ে—সেটাও তো তাঁকে নিয়ে দেখান উচিত—যদি যান—আপনি সেখানেই অভ্যর্থনাটা—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, খাসা suggestionটা দিয়েছেন মাষ্টার মশায়! তাই করা যাবে। বালিকা-বিস্তালয়ের নাম ক'রে গিয়ে ধ'রে-প'ড়লে এড়াতে পারবেন না। আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।"

সূর্য্যবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমি কি ক'রে যাব মতি-বাবু! সেই দিনেই তিনি এসে ওখানে পৌছুবেন। এদিককার বন্দোবস্ত সব আমাকেই তো ঠিক ক'রে রাখ্‌তে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট আস্‌ছেন, মিসেস্ ব্যানার্জ্জিও আস্‌ছেন—একটা কেলেঙ্কারী শেষে না হয়।"

"তা বটে, বটে! তবে বালিকা-বিস্তালয়ে যা কিছু বন্দোবস্ত ক'রতে হয়, আপনিই সব ক'রে দেবেন। কিন্তু ডেকে আন্‌ছি, তাঁর পদের যোগ্য অভ্যর্থনা হওয়া চাই। তার ভার আপনাকেই নিতে হবে।"

"নেওয়া যাবে।"

আচ্ছা তা হ'লে লেগে যান, আজ থেকেই। প্যাণ্ডালও ওখানে ক'রতে হবে।"

"হাঁ, তা হ'লে উঠি এখন। নমস্কার!"

"আসুন তবে, নমস্কার!"

২

সূর্য্যবাবুর তেমন একটা উৎসাহ উদ্যম কিছু দেখা গেল না, অজুহাতও অবশ্য ছিল; স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভার সুব্যবস্থা চেষ্টা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদির সময় ছাত্রদের প্রস্তুত করা। শরীরও তখন না কি কিছু অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেক্রেটারী মতিলালবাবু অগত্যা বালিকা-বিস্তালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের সহায়তায় মিসেস্ ব্যানার্জ্জির যথাসম্ভব যোগ্য সম্বর্দ্ধনার বন্দোবস্ত সবই করিয়া ফেলিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিন আসিয়া পড়িল। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় স্কুলের

পুরস্কার-বিতরণ সভার সময় স্থির হইয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয়ে সম্বর্দ্ধনা-সভার সময় স্থির হয় বেলা তিনটায়। গ্রামটি ছিল জেলার সদর হইতে নদীতটে দশ মাইল দূরে; নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে দুই-তিন মাইলের মধ্যেই। গরুর গাড়ী আর দুই একখানা অতি জীর্ণ ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়; গ্রামবাসীরা গ্রাম্য পথে তাহাতেই ষ্টেশনে যাতায়াত করে। কিন্তু এ সব পথে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে কিছুতেই আনা চলে না। বন্দোবস্ত হইয়াছিল ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার লঞ্চে আসিবেন; সেক্রেটারী মহাশয় নিজে এবং গ্রামবাসী সহরের এক জন উকিল একখানি মোটর-বোট ভাড়া করিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে লইয়া আসিবেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের পর সময়মত স্কুলের প্রাঙ্গণের সম্মুখে মধুর নহবৎ-বাদ্য-মুখর সুসজ্জিত তোরণদ্বারে উভয়েই এক সঙ্গে সমাগত ও সম্বর্দ্ধিত হইবেন।

যথাসময়ে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি আসিয়া পৌঁছিলেন; বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁহার সম্বর্দ্ধনাও যথারীতি ও যথাসম্ভব সমারোহেই সম্পন্ন হইল। সেক্রেটারী মতিলালবাবু তো ছিলেনই; হাই স্কুলের পক্ষ হইতেও শিক্ষক কেহ কেহ সেখানে গেলেন। কিন্তু সূর্য্যবাবু নিজে গেলেন না, স্কুল-প্রাঙ্গণের তোরণদ্বারে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে তিনি প্রথম সম্বর্দ্ধনা করিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জি উভয়ে এক সঙ্গেই স্কুলের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার এই নূতন নহে। সূর্য্যবাবু তাঁহাকে সেলাম জানাইয়া যুক্তকরে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে নমস্কার করিলেন। সেক্রেটারী মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ইনি আমাদের হেডমাষ্টার বাবু সূর্য্যকুমার ব্যানার্জ্জি এম এ।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি একটু শির নত করিলেন। মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না; প্রতি-নমস্কারও করিলেন না। সকলেই কেমন যেন একটু বিস্মিত হইলেন। যাহা হউক, সভামণ্ডপে গিয়া সকলে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। দুইটি ললনা কর্ত্তৃক মাল্য-দানের পর আবাহন-সঙ্গীত আরম্ভ হইল। এইরূপ সব সভার উপযোগী গীত-রচনায় ও তাহার সুর-যোজনায় হেড মাষ্টার বিশেষ দক্ষ ছিলেন। নির্ব্বাচিত এইরূপ একটি গানই সমস্বরে কয়েকটি বালক আরম্ভ করিল। হঠাৎ মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কেমন যেন অবসন্ন ভাবে টেবিলের উপরে মাথাটি রাখিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট চমকিয়া চাহিলেন, সঙ্গীত বন্ধ হইল; ত্রস্তব্যস্ত ভাবে সেক্রেটারী নিকটে আসিয়া কহিলেন, "আপনি কি বিশেষ অসুস্থ বোধ করছেন মিসেস্ ব্যানার্জ্জি? লোকের ভীড়, বড্ড গরমও হয়ে উঠেছে—"

একটু উঁচু হইয়া হাতের উপরে মাথাটি রাখিয়া ম্লান মৃদু স্বরে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কহিলেন, "না না, ও-সব কিছু নয়। তবে—তবে —ক'দিন ঘোরাফেরা করছি খুব—হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল—ও এক্ষুনি ভাল হ'য়ে যাবে—আপনারা কাজ বন্ধ করবেন না। একটু—একটুখানি বাইরে যেতে পারলে ভাল হ'ত। নিরেলা একটা ঘর যদি—"

"হাঁ হাঁ—নিশ্চয়ই। হাঁ, সূর্য্যবাবু—"

সূর্য্যবাবু সহকারী এক জন শিক্ষককে কহিলেন, "ওঁকে লাইব্রেরী ঘরটায় নিয়ে যান বিনয়বাবু! দপ্তরীকে ব'লে দিন, চট ক'রে আমার ঘর থেকে বিছানাটা এনে টেবিলের উপরে বিছিয়ে দিক। আর কিছু জল আর একখানা পাখাও—কাউকে বলুন নিয়ে আসুক। মিস্ ঘোষও (বালিকা বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষয়িত্রী) দয়া ক'রে উঠে গিয়ে কাছে একটু বসুন। আশা করি, এখুনি উনি ভাল হ'য়ে উঠবেন—"

মিস্ ঘোষ আসিয়া হাতখানি ধরিলে মিসেস ব্যানার্জ্জি ধীরে ধীরে উঠিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মাফ ক'রবেন মিষ্টার টমসন, কাজ বন্ধ ক'রবেন না। সঙ্গীত হোক, আর রিপোর্টটাও বরং পড়া হ'ক; এরি ভেতর একটু সুস্থ হ'য়ে বোধ হয় আমি ফিরে আসতে পারব।"—বলিয়া শিক্ষয়িত্রী মিস্ ঘোষের হাত ধরিয়া সভা-মণ্ডপ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। বিনয়বাবুও দপ্তরীকে লইয়া গিয়া বন্দোবস্ত যাহা সব প্রয়োজন করিয়া দিয়া আসিলেন। আবার সঙ্গীত হইল, হেড মাষ্টার রিপোর্ট পড়িলেন, ছাত্রদের আবৃত্তি আরম্ভ হইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তখন মিস্ ঘোষের সঙ্গে ফিরিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে বেশ ধীর ভাবেই মিসেস্ ব্যানার্জ্জি পুরস্কারগুলি ছাত্রদের হাতে তুলিয়া দিলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদের সংক্ষিপ্ত দুই-একটি বক্তৃতার পর মিসেস্ ব্যানার্জ্জি উঠিয়া লিখিত একটু সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তার পর ম্যাজিষ্ট্রেট উঠিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তখন এক টুকরা কাগজে কি লিখিয়া হেড মাষ্টারের হাতে দিলেন। হেড মাষ্টার পড়িয়া কাগজখানি নিঃশব্দে পকেটে রাখিলেন, কোনও-রূপ সাড়াও দিলেন না, উত্তরেও কিছু লিখিয়া জানাইলেন না। যাহারা তাহা লক্ষ্য করিল, তাহারা একটু বিস্মিতই হইল। কি উনি জানাইলেন অথবা জানিতে চাহিলেন? হয় তো রিপোর্টটা উনি শোনেন নাই, তাই দেখিবেন বলিয়া চাহিয়াছেন। কিন্তু হেড মাষ্টারের উত্তরে জানান উচিত ছিল—সভার পর পাঠাইয়া দিবেন, অথবা তাঁহার হাতেই দিয়া দিবেন। তখনও তো দিয়া দিলে পারিতেন। এটা কেমন যেন একটু অশিষ্ট ব্যবহার বলিয়াই কাহারও কাহারও মনে হইল।

সভার কাজ হইয়া গেল, সকলে বাহির হইলেন। হেড মাষ্টার ও অন্যান্য কেহ কেহ সঙ্গে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার লঞ্চে তুলিয়া দিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দিকে ফিরিয়া যুক্তকরে মতিবাবু নিবেদন করিলেন, "তা হ'লে এখন দয়া ক'রে একটিবার চলুন, গরীবের কুটীরে পায়ের ধুলো দেবেন—এই যে পাল্কী এসেছে—"

ম্লান একটু হাসিয়া মৃদু স্বরে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে দেখছেন তো, শরীরটা হঠাৎ কেমন অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছে। তা যদি মাফ ক'রতে পারেন—"

"আজ্ঞে, ক্লেশ আপনাকে কিছু দিতে চাই না। তবে বাড়ীর আর পাড়ার মেয়েরা সব পথ চেয়ে রয়েছেন, একটিবার দর্শন লাভ ক'রবেন, মুখের দুটো কথা শুনবেন—"

"ও, আচ্ছা, চলুন তবে," বলিয়া পাল্কীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তা পাল্কী আবার কেন? আপনাদের সঙ্গে হেঁটেই তো বেশ যেতে পারব।"

যুক্তকরে মতিবাবু কহিলেন, "আজ্ঞে না না, শরীর অসুস্থ, পথও নেহাৎ কম নয়—পাল্কী এসেছে, ওতেই উঠুন।"

নিকটেই নদীতীর। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার লঞ্চে উঠিতেছেন; হেড মাষ্টার প্রভৃতি আরও অনেক লোক সেখানে দাঁড়াইয়া। সে দিকে একবার চাহিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি পাল্কীতে উঠিলেন।

৩

পরদিন ছুটি ছিল; বেলা প্রায় দশটার সময় সেক্রেটারী ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন; হেড মাষ্টার তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়াছেন। মতিবাবু সগর্ব্ব উল্লাসে তাঁহার গৃহে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির ন্যায় দেশবরেণ্যা মহিয়সী মহিলার দর্শনদানের সকল ঘটনা সবিস্তার বিবৃত করিতেছেন।

দপ্তরী তখন উদ্দিপরা একটি বেয়ারাকে লইয়া আসিল,—বেয়ারা একখানি পত্র সূর্য্যবাবুর হাতে দিল।—বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মতিবাবু কহিলেন, "এ যে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বেয়ারা! কি, কি লিখেছেন তিনি?"

"দেখুন।"

পত্রখানি সূর্য্যবাবু মতিবাবুর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন; পড়িয়া মতিবাবু কহিলেন, "আপনাকে গিয়ে একটিবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে অনুরোধ ক'রেছেন, আজ বিকেলে।—তাই তো! কেন—কি ব্যাপার বলুন তো?"

একটু হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, "কি ক'রে ব'লব—যাই, দেখি, কি বলেন।"

"কাল সভায় দেখ্‌লাম, এক টুকরা কাগজে কি লিখে আপনার হাতে দিলেন—"

"হাঁ। সেটা—সেটা—এই জানিয়ে দিলেন, শরীর অসুস্থ, ম্যাজিষ্ট্রেটের বক্তৃতার পর সভাটা যেন আর বেশীক্ষণ চালান না হয়—"

"ও, কিন্তু—কিন্তু—আমার ধন্যবাদের বক্তৃতা হ'ল, ছেলেদের শেষ গানটাও হ'ল; সময় তো কম লাগল না তাতে। আপনি তাঁর কথাটা—"

"কত আর সময় লেগেছে? ওগুলোও তো না হ'লে নয়।"

"আবার গিয়ে দেখা ক'র্‌তেও লিখেছেন। ভাবছি, আমাদের এমন কোনও ত্রুটি হ'য়েছে কি না, যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন।"

একটু হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, "ত্রুটি যে কি হ'য়েছে, তা বুঝ্‌তে তো পারছিনি কিছু। আর তা কিছু হ'লে গাল দিতে আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে আপনার কাছেই সেটা জানিয়ে যেতেন, না হয় Visitors' Book তো পাঠান হ'য়েছে, তাতেই লিখে রেখে যেতেন।"

"তা বটে, তা বটে! তবে ডেকে পাঠালেন—"

"কে জানে? হয় তো—হয় তো এই ইস্কুলটার কাজকর্ম্ম দেখে, কি যে রিপোর্টটা পাঠিয়েছেন, তাই প'ড়ে, হয় তো মনে হ'য়েছে, আমার মত এক জন হেড মাষ্টার আর হয় না! হাঃ হাঃ-হাঃ, উঠি তবে এখন।"

"হাঁ, ঐ চিঠির একটা উত্তর—"

"ও! হাঁ, একখানা চিঠির কাগজ আর একখানা খাম—"

সেক্রেটারী নিজেই উঠিয়া খুব ভাল একটা ডাক-কাগজের প্যাড ও তাহারই উপযোগী পুরু একখানি খাম আনিয়া দিলেন।

হেড মাষ্টার লিখিয়া দিলেন, বৈকালে ৫টা হইতে ৫টার মধ্যে তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

৪

সহরের ডাক-বাংলোয় মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ছিলেন। বৈকালে সূর্য্যবাবু গিয়া এত্তলা দিলেন। বেয়ারা আসিয়া মেম সাহেবের সেলাম জানাইল; সূর্য্যবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ব'স।"

নিঃশব্দে সূর্য্যবাবু সম্মুখের একখানি আসনে বসিলেন। নতমুখে কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া মিসেস ব্যানার্জ্জি কহিলেন, "তুমি শেষে এই স্কুলে এসে চাকরী নিয়েছ?"

"হাঁ।"

"কিছুই আমি জান্‌তাম না!"

"তা হবে।"

"ঘুণাক্ষরেও যদি একটু জান্‌তে পারতাম, ওখানে যেতাম না। গিয়ে—গিয়ে যে অবস্থায় প'ড়লাম—কি ক'রে যে সামলে উঠতে পারলাম, তা বুঝতেই পারছিনি—"

সূর্য্যবাবু নীরব।

অতি আয়াসে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কহিলেন, "তুমি তো জান্‌তে যে, আমার ওখানে যাবার বন্দোবস্ত হ'য়েছে?"

"জান্‌তাম।"

"একটু খবর যদি আমাকে দিতে—"

"ওঁরা বন্দোবস্ত ক'রে গিয়েছেন, আমি চাকর মাত্র—interfere (হস্তক্ষেপ) ক'রতে চাইনি। আমার যা কর্ত্তব্য হ'তে পারে, তাই পালন ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছি।"

"তা ক'রেছ, ক'র্‌তেও পেরেছ। তা তুমি পুরুষমানুষ, সব পার। কিন্তু আমি—আমি মেয়েমানুষ মাত্র।"

সূর্য্যবাবু উত্তর করিলেন, "পুরুষের মত এ-সব কাজে এলে পুরুষের মতই শক্ত হওয়া দরকার।"

"কিন্তু হঠাৎ ও-ভাবে ওখানে তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ—এটা—এটা—পুরুষ হ'লেও তুমি বোধ হয় সামলাতে পার্‌তে না।"

"জানি না।"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া মিসেস ব্যানার্জ্জি কহিলেন, "তা এখানে এই চাকরী নিয়ে কেন এলে?"

"কি ক'রব? এর চাইতে ভাল জায়গায় ভাল কোনও চাকরী আর তো পেলাম না।"

"এত তাড়াই বা কি ছিল? চেষ্টা ক'রছিলে, ক'র্‌তে—দেখ্‌তে—ভাল কাজ সময়মত অবিশ্যি জুটত।"

"সে সময় কবে হ'ত, হ'তই কি না এ জীবনে, তা জানি না। বৃথা আর বড় আশায় কত ঘুরব? তাই অগত্যা শেষে যা পেলাম, তাই নিয়ে চলে এলাম। দেখলাম, এর চাইতে ভাল কিছু আর জুটছেই না।"

"কিন্তু চলে তো যাচ্ছিল।"

"যাচ্ছিল তোমার। আমার যাচ্ছিল না। স্ত্রীর অন্নদাস হ'য়ে যে চলা—সেটাকে কোনও পুরুষের পক্ষে চ'লে-যাওয়া বলা যায় না।"

"অন্নদাস! অন্নদাস কিসে বল্‌তে পার? আমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের রোজগারের টাকা খেয়ে তোমাদের সংসার করি, আমরাও তা হ'লে তোমাদের অন্নদাসী!"

সূর্য্যবাবু কহিলেন, "স্বামীর রোজগারে প্রতিপালিত হবার একটা দাবী স্ত্রীদের আছে। স্বামিগৃহের গৃহিণী তারা, গৃহিণীর যা কিছু কাজ, সেই টাকা নিজেদের হাতে খরচ ক'রেই তাদের তা চালাতে হয়। পুরুষরা টাকা রোজগার ক'রে এনে দিতে পারে, সংসার চালাতে নিজেরা কেউ পারে না। সেটা স্ত্রীদেরই চালাতে হয়।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি উত্তর করিলেন, "সেই সংসার চালান মানে তো পেটে দু'টি খেয়ে দাসীর কাজ করা। রান্না-বান্না, জল তোলা, বাসন-মাজা—"

"রোজগার অল্প হ'লে কাজেই এগুলো ক'র্‌তে হয়। বেশী রোজগার যারা ক'র্‌তে পারে—চাকর-চাকরাণী, পাকের বামুন রেখে রাণীর হালে তাদের স্ত্রীরা থাকে। কেবল এদের কাজগুলো তাদের দেখ্‌তে হয়। যে চাকরী আমি কোর্‌ছিলাম পশ্চিমের সেই কলেজে, মোটা মাইনে ছিল, আরও বাড়ত, ঠিক তেমনি এক জন গৃহিণী হ'য়েই আমার পাশে সোনার সংসারেই তুমি থাক্‌তে পারতে। কিন্তু তুমি গেলে না, আমাকেই শেষে চাকরী ছেড়ে আস্‌তে হ'ল।"

গভীর একটি নিশ্বাস সূর্য্যবাবু চাপিয়া গেলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কহিলেন, "তা অমন একটা কাজ তখন পেলাম, সরকারী চাকরী—টাকার দিক দিয়েই বল, শিক্ষার গৌরবের দিক দিয়েই বল, যার পর নাই লোভনীয়া; মেয়েমানুষও তার শক্তির একটা সার্থকতা চায়। বাইরে এত বড একটা কর্ম্মক্ষেত্র পেলে তা ছেড়েও সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতরে যে তাকে গুটিয়ে থাকতেই হবে, এ দাবী বোধ হয় কেউ করতে পারে না—"

"সংসারই যদি একটা থাকে—বিবাহিতা আর সন্তানের মাতা নারীমাত্রের তা আছে—তার কাজগুলোও তাকে চালিয়ে নিতে হবে। তুমি যে চাকরী নিয়েছিলে, যখন-তখন বাইরে বাইরে তো 'টুরে' বেরোতে হ'ত, সেটা তোমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়েই উঠ্‌ল। দায়টা গিয়ে পড়ল আমার ওপর—যখন চাকরী ছেড়ে তোমার সংসারে এসে ব'সলাম।"

"তা এ সব কাজে দরকার সত্য, পুরুষরা যদি সাহায্য কিছু করে আর করবার মত অবসরও যদি হয়, কি এমন আপত্তির কারণই বা থাকতে পারে?"

"কিছু সাহায্য দরকারমত সাধারণ গৃহস্থ পুরুষ সবারই ক'রতে হয়, ক'রেও থাকে। সে দরকার হয়, স্ত্রীরা যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, কি সংসার খুব বড় হ'য়ে উঠ্‌লে, একা যদি সব দিক সামলাতে না পারে। কিন্তু সব দায়টা কোনও পুরুষ নিতে পারে না, যেমন না কি আমাকে নিতে হ'য়েছিল—চাকরী ছেড়ে আসবার পর। সম্বন্ধটাই তখন উল্টে গেল! তুমি হ'লে বাইরের কাজে টাকা রোজগারের কর্ত্তা, আর আমি হ'লাম—সেই টাকায় তোমার সংসারের গৃহিণী!"

বেশ একটু যেন লজ্জা পাইয়া আনত মুখে মিসেস ব্যানার্জ্জি উত্তর করিলেন, "ও কথা কেন ব'লছ? চাকরী ছেড়ে যখন এসেছিলে —এই আশা ক'রেই তো এসেছিলে—এখানেই আবার ভাল একটা চাকরী কোনও কলেজে পাবে।"

"হাঁ, আশা একটা ছিল বই কি! তবে এ আকাঙ্ক্ষাটাও ছিল, তেমন চাকরী একটা সহজে না-ও পেতে পারি; কারণ, জানতাম, পুরুষের চাকরীর বাজারে ভিড় বড় বেশী। তবু এলাম, এটাও মনে হ'ল, আমরা স্বামি-স্ত্রী এক হ'য়ে এক যায়গায় এক সংসারেই থাকব বলে। স্বামি-স্ত্রী দু' জনে দু' যায়গায় চাকরী করবে, দূরে দূরে আলাদা আলাদা থাক্‌বে, সেটা বিবাহিত জীবনের একটা বিড়ম্বনা মাত্র!"

"সে তো ঠিক কথাই। সেটা সত্যিকার স্বামি-স্ত্রী কেউ পারেও না। তাই না তোমাকে অত ক'রে বার বার লিখ্‌লাম।"

"আমিও পারলাম না। তাই শেষে চ'লে এলাম। কিন্তু একত্রে যে থাকতে হবে, সে বিবেচনাটা কেবল স্বামীকেই ক'রতে হবে, আর তার জন্য আর যা কিছু দরকার, তাও কেবল স্বামীকেই ক'রতে হবে, স্ত্রীর কোনও দায় নেই, বিবেচনা নেই, এটাও তো হ'তে পারে না। একত্র থাকব? এখানে এসে চাকরী আর পেলাম না, দেখ্‌লাম একত্র থাকতে হ'লে তোমার অন্নদাস হ'য়ে তোমার সংসারে গৃহস্থালী ক'রে, ছেলেপিলেদের মা হ'য়েই জীবনটা কাটাতে হবে! আর চাকরী একটা পেলেই বা কি? তুমি সরকারী চাকরী কর, আজ ক'লকাতায় আছ, কাল ঢাকায়, পরশু চাটগাঁয়—কবে কোথায় বদলী হয়ে যাবে, ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে অমনি গিয়ে সেখানেও আমি একটা চাকরী পাব, এমন তো হ'তে পারে না। কাজেই একত্রে থাকার মানেই হচ্ছে, তোমারই অন্নদাস হ'য়ে, তোমারই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফিরতে হবে, আর যেখানে যাবে, তোমার গৃহস্থালী গুছিয়ে ব'সতে হবে, সেটা—সেটা ব্যাটাছেলে কারও ধাতে বরদাস্ত হয় না,—সত্যি যদি সে ব্যাটাছেলেই হয়।"

নীরবে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কিয়ৎকাল কি ভাবিলেন, শেষে গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ ক'রিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "তা এ ভাবে ছেড়ে যাবার আগে এ-সব কথার একটা আলোচনাও যদি আমার সঙ্গে ক'র্‌তে—"

"কি হ'ত? অত বড় চাকরী আর পদ-গৌরবের মায়া ছেড়ে আমার সংসারের গৃহিণী হ'য়ে থাকতে তুমি রাজি হ'তে! আর একটা সংসার প্রতিষ্ঠা ক'র্‌ব—সে সামর্থ্যই বা আমার তখন কোথায়? তবু ছিলাম,—আশায় ছিলাম, যদি কোনও সুবিধে ক'র্‌তে পারি। কিন্তু দেখ্‌লাম, সুবিধে আর কিছু হবে না। হ'লেই বা কি? হয় তো যেমন আমার একটা সুবিধে হবে, অমনি তোমার বদলীর হুকুম হবে,—দূরে আর কোথাও। আবার দাবী ক'র্‌বে, চাকরী ছেড়ে আমার সঙ্গে চল। আর মেজাজও তোমার তখন যা হ'য়ে উঠেছিল। ছোট-খাটো সব সাংসারিক ব্যাপারেও এমন সব কথা-ও আমাকে শুনতে হ'ত—"

"গৃহিণীরা স্বামীকে অমন কত কথা বলে থাকে।"

"চাকরে স্বামীরাই তা সইতে পারে। কারণ, তারাই তাদের ভর্ত্তা, স্ত্রী তার গৃহিণী আর ভার্য্যা মাত্র। তা সে যাক, ও সব কথা আর না তোলাই ভাল। যখন বুঝ্‌লাম একত্র থাকা বরাবর আর সম্ভব নয়,—তুমি বদলী হ'য়ে কোথাও গেলেই আলাদা আবার হ'তেই হবে—যদি স্বাধীন আমি থাকতে চাই—"

"সে যখন হ'ত, তখন না হয় একটা পরামর্শ ক'রে কর্ত্তব্য একটা স্থির করা যেত। কিন্তু হঠাৎ কিছু না ব'লে-ক'য়ে একদম তুমি পালিয়ে গেলে—ক'টা বছর একটু খবর পর্য্যন্ত দেওনি! মনেও হয়নি, কি ভাবে আমি দিনের পর দিনগুলো কাটিয়েছি! আমার

কথা না হয় কিছু নাই ভেবেছ, কিন্তু ছেলে-মেয়েগুলো, তারাও তো তোমার—"

বলিতে বলিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি থামিয়া গেলেন। সূর্য্যবাবুরও চক্ষে জল আসিল। ক্ষণকাল মুখ ফিরাইয়া কাশিয়া কহিলেন, "তাদের খবর নিতাম, খবর সর্ব্বদা পেতাম। ক'ল্‌কেতায় আমার এক বন্ধুর সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছিলাম।"

মুখ তুলিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি চাহিলেন, কহিলেন, "মাসে মাসে টাকা কি তিনিই পাঠাতেন?"

"হ্যাঁ।"

"কত মাইনে তুমি এখন পাও?"

"আশী টাকা মাসে।"

"তা থেকে চল্লিশ টাকা ক'রে মাসে মাসে পাঠাও! কি ক'রে তোমার চলে।"

"যাচ্ছে তো চলে। গ্রামে একটা লোক থাকি, কতই আর খরচ লাগে।"

"এ টাকাই বা পাঠাও কেন? ওদের তো না খাইয়ে আমি রাখি না।"

"অতি স্বচ্ছন্দেই ওদের রাখছ জানি। তবে ওদের দরুণ এ দায়টা প্রধানতঃ আমারই বটে। কেবল তোমার ঘাড়ে ফেলে রাখ্‌তে চাইনি।"

"যাক্, এসব তর্ক-বিতর্ক এখন মিছে। যা হবার হ'য়ে গেছে। তা এখন কি ক'র্‌বে তুমি?"

"কি আর ক'র্‌ব? যা ক'র্‌ছি তাই?"

"আর আমি—"

"যা ক'রছ, তাই ক'রবে। কি আর ক'র্‌তে পার?"

"তা হ'লে এই ভাবে আলাদা-আলাদা থেকেই জীবনটা আমাদের কাটাতে হবে?"

"দু'জনকেই চাকরী ক'রে যদি খেতে হয় তো কাজেই হবে।"

"চাকরী এক যায়গায়ও দু'জনে করা যায়! অনেকে ক'রেও থাকে। আমি বলি, তুমি আবার ক'লকেতায় চল, ওখানেই চাকরীর চেষ্টা কর, না হয়—না হয় আলাদা কোথাও থেকেই ক'র্‌বে—"

"কি খেয়ে কোথায় থাকব? মাসে মাসে মেসের খরচটা যোগাতে হবে তো তোমাকে? তার পর চাকরী আর একটা পাব, তারই বা নিশ্চয়তা কি? ভিড় আমাদের দিন দিন বাড়ছে,—বড় বেশীই বেড়ে উঠ্‌ছে। শেষে হয় তো গ্রাম্য স্কুলেও এই মাইনের একটা হেড মাষ্টারী আর জুটবে না। আর চাকরী ওখানে একটা জুটলেই বা একত্র থাকবার সম্ভাবনা কি আছে?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জির মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। কিয়ৎকাল চাহিয়া থাকিয়া কম্পিত স্বরে শেষে কহিলেন, "তা হ'লে—তা হ'লে এ বিচ্ছেদ আমাদের দূর হবার নয়!"

সূর্য্যবাবু উত্তর করিলেন, "হ'তে পারে—যদি এমন কোনও বড় চাকরী আমি কোথাও পাই, আর তখন আমার সংসারের গৃহিণীর পদে আকৃষ্ট ক'রে তোমাকে আন্‌তে পারি—তবে। কিন্তু তার কোনও দূর সম্ভাবনাও দেখ্‌ছি না।"

চক্ষে জল আসিল। অতি আয়াসে আত্মসম্বরণ করিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কহিলেন, "আর আমি যদি এখুনি চাকরী ছেড়ে এই গ্রামে তোমার এই সংসারেরই গৃহিণী হ'তে প্রস্তুত হই?"

হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, "পাগল হ'য়েছ মায়া? তাও কখন সম্ভব? তুমি চাইলেও এই গ্রামে এত হীন ক'রে আজ তোমাকে নিয়ে রাখ্‌তে আমি রাজি নই।"

"একটা—একটা ভুল ক'রেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত জীবন ভ'রে এম্‌নি ক'রতে হবে?"

"এমন অনেক ভুল মানুষ করে, তার ফল সারাটি জীবনেও কেউ আর শোধরাতে পারে না। ভুল তুমি যেমন ক'রেছিলে, আমিও ক'রেছিলাম। মনে হ'চ্ছে, সত্যিই তুমি দুঃখ পাচ্ছ, তবে জেনো, আমিও কম পাচ্ছি না। তবে কি ক'রব? এ ভার ব'য়েই জীবন কাটাতে হবে।—আচ্ছা, তা হ'লে উঠি এবার মায়া।"

"যাবে। সত্যি যাবে? এখুনি যাবে?"

"কি করব! যেতে তো হবেই। মিছে আর কেন? কথা আর নতুন কিছু নেই। আমারও গাড়ীর সময় হ'য়ে এল।"

"কবে আবার দেখা হবে?"

দেখা আর এ অবস্থায় না হওয়াই ভাল। তবে ক'লকেতায় যদি যাই, দেখা করবার চেষ্টা করব।"—বলিয়াই সূর্য্য বাবু বাহির হইয়া আসিলেন।

হায়, এই শিক্ষিত স্বামী, ও এই তাঁহার শিক্ষিতা স্ত্রী!

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ।

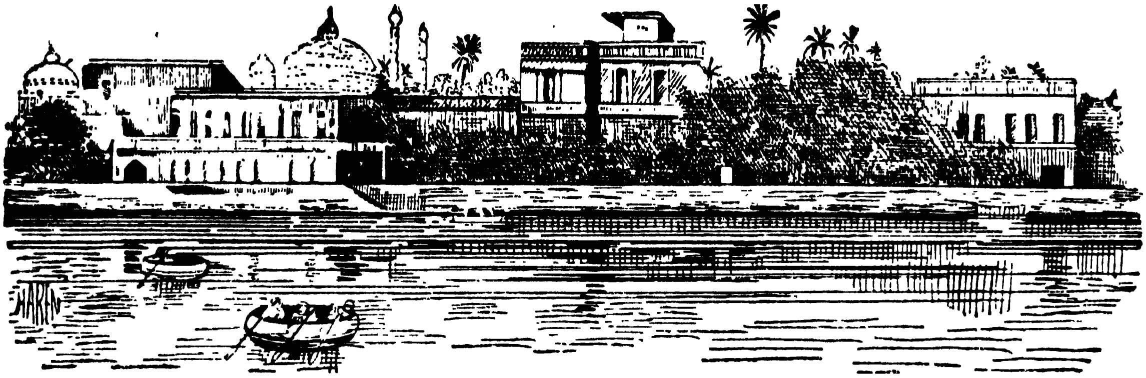
রাজকন্যা ও দরিদ্রকন্যা

রাজকন্যা রহিয়াছে মুখ ভার করি,
নূতন মুক্তার মালা নিজ কণ্ঠে পরি'—

নিখুঁত হয়নি তার মালার গড়ন,
রাজকন্যা তাই আজি, বিষাদিত-মন।
ও-দিকে দরিদ্রকন্যা, কুঁচের মালায়,
তুষ্ট হ'য়ে গর্ব্ব-ভরে সবারে দেখায়।

কুঁচের মালার কাছে মুক্তার মালিকা,
যেন আজি মূল্যহীন—নাহি জ্যোতি-শিখা।
মুক্তা কি মনের মুক্তি কভু দিতে পারে,
তুষ্ট মানসের কাছে রাজারাও হারে।

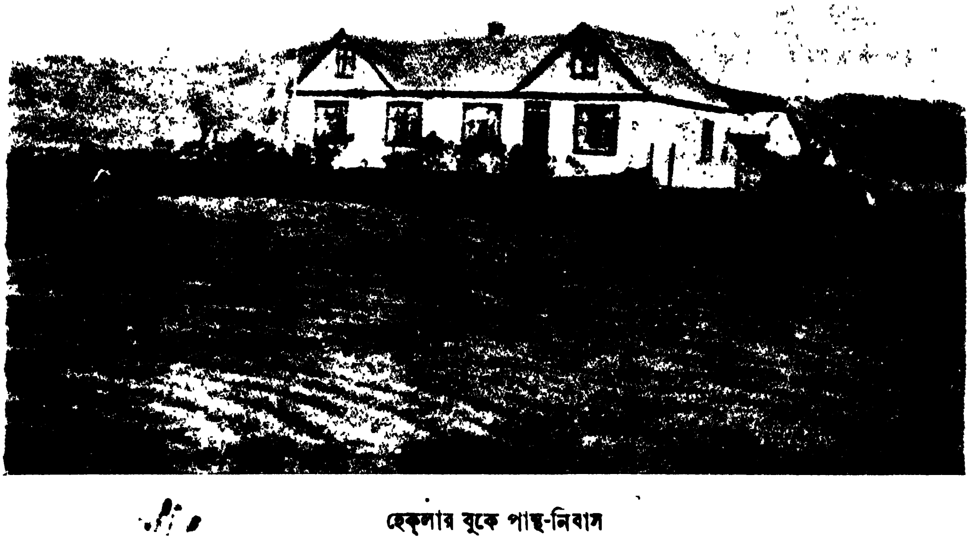
শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত।



আইস্‌-ল্যাণ্ড

তুষারের দেশ—তুষারিকা বা আইস-ল্যাণ্ড! নাম শুনিলে মনে হয়, সারা দেশ তুষারে ঢাকিয়া আছে! পথ-ঘাট, মাঠ-বাট, ঘর-বাড়ী, দীঘি-নদী, সবুজ গাছপালা, তৃণ-শস্য, ফল-ফুল—এ-সবের চিহ্নও বুঝি নাই! চারিদিকে শুধু তুষার আর তুষার!

আইস-ল্যাণ্ড দ্বীপটি আসলে কিন্তু তেমন নয়! গ্রীণল্যাণ্ডের তুষার-প্রান্তরের গা ঘেঁষিয়া উত্তর-মেরুর তোরণ-পথে অবস্থিত হইলেও আইস-ল্যাণ্ড সবুজ-শ্রীতে বিমণ্ডিত; এবং য়ুরোপ-আমেরিকার মতো আইস-ল্যাণ্ডের পথে-ঘাটে লোকজনের তেমনি ভিড়! ঘর-বাড়ী প্রচুর—সে-সব বাড়ী-ঘরে হাসি-গল্প-গানের উচ্ছ্বাস-সমারোহ তেমনি চলিয়াছে! যাঁরা আইস-ল্যাণ্ড এবং গ্রীণল্যাণ্ড দু' জায়গাতেই গিয়াছেন, তাঁরা বলেন, আইস-ল্যাণ্ডের এ-নামকরণে মস্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে! আইস-ল্যাণ্ডের নাম গ্রীণল্যাণ্ড এবং গ্রীণল্যাণ্ডের নাম আইস-ল্যাণ্ড রাখিলেই নামকরণ সার্থক হইত



হেক্‌লার বুকে পান্থ-নিবাস

আইস-ল্যাণ্ড আগ্নেয়-গিরির দেশ। তবে আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতে কোনো দিনই আইস-ল্যাণ্ডের বিশেষ কোনো অনিষ্ট হয় নাই। অতীত যুগে এ-সব আগ্নেয়গিরি কিরূপ অগ্নিক্রীড়া করিয়াছিল, আজো এ-দ্বীপের বুক জুড়িয়া তার বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। নয়ন-বিমোহন বৈচিত্র্য থাকিলেও অন্য প্রদেশের মতো আইস-ল্যাণ্ডে বন-জঙ্গল, বড় বড় ক্ষেত-মাঠ, ফল-ফুলের বড় বাগিচা বা আবাদী জমির তেমন ঘনঘটা দেখা যায় না।

বহু প্রাচীন যুগে আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে সাগর-বক্ষ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এ-দ্বীপের জন্ম! এখানকার বিরাট বিপুল আগ্নেয়-গিরির নাম হেক্‌লা। সে-কালে

হেক্‌লা যখন অগ্নি-মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিত, তখন ঘটিত দারুণ ভূমিকম্প এবং প্রলয়-ঝড়। সে ঝড়ে, সে ভূমিকম্পে কত প্রাণ যে ধ্বংস পাইয়াছে, তার আর সীমা-পরিসীমা নাই! এখনো সেখানে ভূমিকম্প হয়—প্রায় হয়; তবে এ-ভূমিকম্প সংহারের তেমন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করে না।

এখানে ভূমিকম্পের বেগ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সবচেয়ে তীব্র হইয়াছিল। সে ভূমিকম্পে ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর; সেই সঙ্গে লাভ যা হইয়াছে, সে লাভের তুলনায় এ-ক্ষতিকে তুচ্ছ বলিলে অন্যায় হইবে না! এ ভূমিকম্পে আইস-ল্যাণ্ডে বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণের (Great Geyser) সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রস্রবণ-সৃষ্টির পূর্ব্বে আইস-ল্যাণ্ডে ছোটখাট অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল—কিন্তু সেগুলি ছিল নির্ঝরের মতো! এই উষ্ণ প্রস্রবণটি দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে-সব ছোটখাট প্রস্রবণগুলি আবার সজীব এবং জলধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; তাছাড়া ছোটখাট আরো বহু প্রস্রবণের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই প্রস্রবণগুলির জন্য আইস-ল্যাণ্ডের নানা স্থান এমন অপূর্ব্ব কৌশলে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, তার কোনোটি হইয়াছে নিসর্গ-রচিত বন্দর; কোনো স্থান বা দুর্গম-দুর্গ। বহু স্থানে আরো বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া সমগ্র প্রদেশটি নানা ভাবে মানব-সমাজের কল্যাণকর হইয়া উঠিয়াছে। এ-সব বন্দরের মধ্যে রেইকজাবিক বন্দরের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

আইস-ল্যাণ্ডের পথ-ঘাট তেমন স্বচ্ছন্দ-সুগম নয়; এজন্য বহির্জগতের সঙ্গে নিত্য-নিয়মিত খবর-বার্ত্তা রাখা অসম্ভব। আভ্যন্তরীণ নগর এবং গ্রামগুলির মধ্যে খবর-বার্ত্তা রাখিতে অনেকখানি সময় লাগে। চিঠিপত্র সকলের ঘরে বিলি হয় না। ডাক-হরকরা এক-এক মহল্লার চিঠি-পত্রাদি সেই মহল্লার বড় কোনো কৃষি-ফার্ম্মে রাখিয়া যায়; লোক আসিয়া সেই সব ফার্ম্ম হইতে সে-সব চিঠিপত্র লইয়া যায়।


হেক্‌লা-যাত্রীর বিশ্রাম

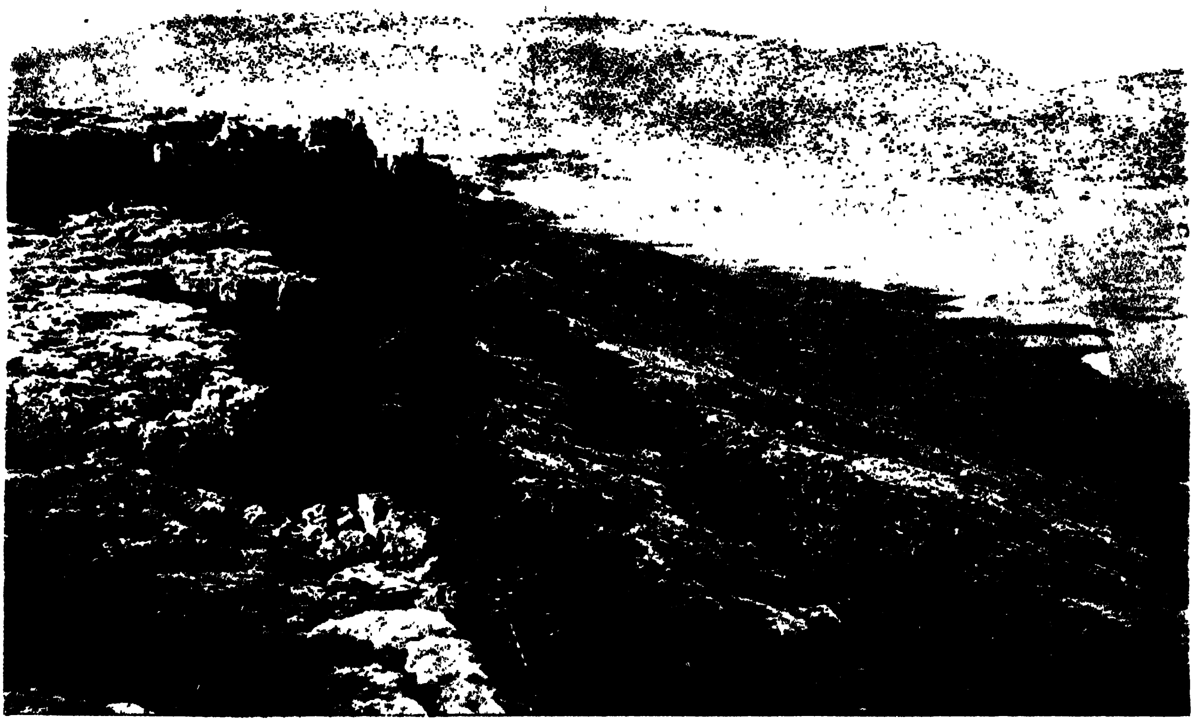
পথের দুর্গমতার জন্য বাহিরের লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশার সুবিধা আদৌ নাই; এজন্য এখানকার অধিবাসীরা অতিথি পাইলে অতিথির আদর-যত্ন করিতে প্রাণ একেবারে ঢালিয়া দেয়!

আমরা যে-ঘরে শয়ন করি, সে-ঘরকে বলি থাকিবার ঘর (living room)। আইস-ল্যাণ্ডে এই শয়ন-ঘরকে বলা হয় বাথ-রুম। কেন এ নাম, তার একটু ইতিহাস আছে।

আইস-ল্যাণ্ড পূর্ব্বে ছিল জ্ঞানীর দেশ; সাধুর দেশ। এই সব জ্ঞানীর নাম saga। প্রাচীন কালে এ-দ্বীপ বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে Viking নামে এক দল উত্তুরে (Northern) জাতি



থিংভেলার উপত্যকা—এইখানে হাজার বৎসর ধরিয়া শাসন-সভার অধিবেশন হয়



পাহাড়ের কোলে লোকালয়



কাপড় কাচা



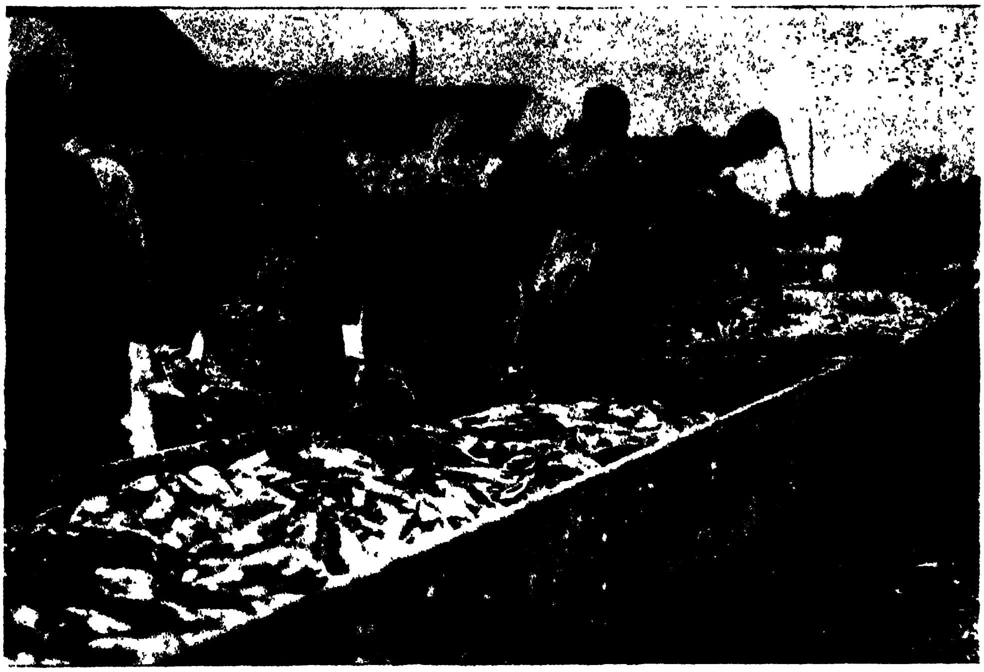
সাবেকী-বেশে আধুনিকা



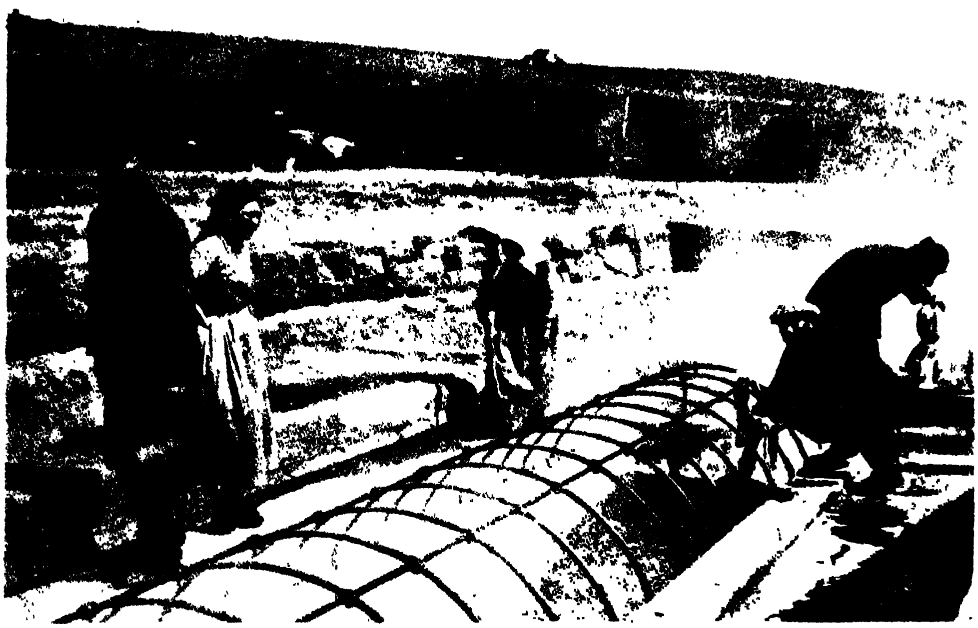
হাল-ফ্যাশনে



চিরন্তনী-বেশভূষায়



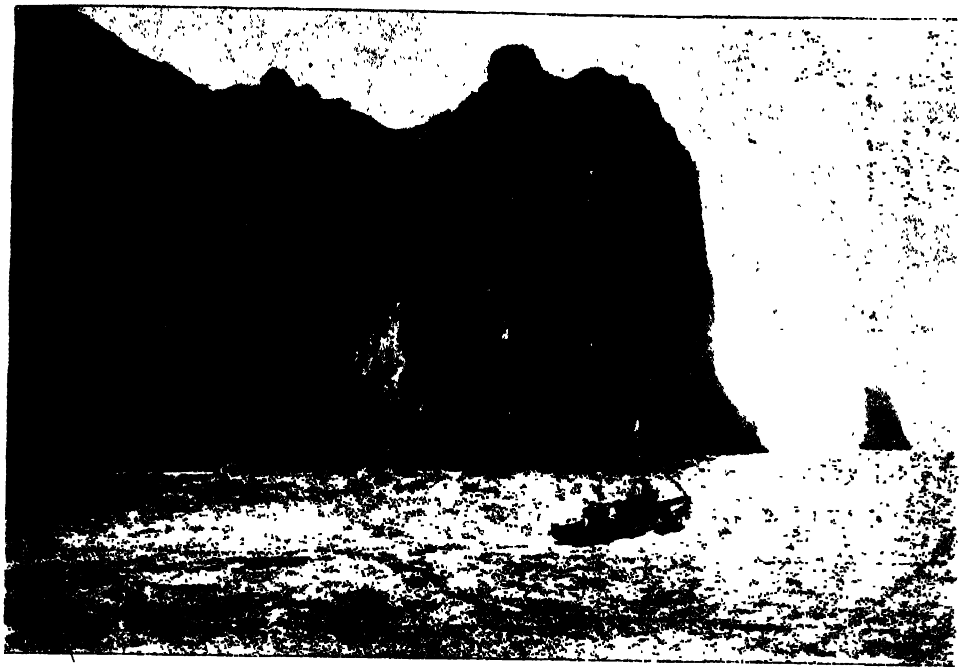
হেরিং-মাছের মরশুম



গরম-জলে নানা কাজ

এখানে আসিয়া লুঠ-পাট করিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। ভাইকিংরা অত্যন্ত প্রমোদ-প্রয়াসী ছিল; আরাম-বিলাসে দিনাতিপাত করিত। শীতের জন্য গরম জল ছাড়া ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করিত না। পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল বলিয়া সকলে প্রত্যহ বহুবার স্নান করিত। এ জন্য বাড়ীর মধ্যে স্নানের ঘরটিই ছিল বাসের ঘর, অর্থাৎ বৈঠক-খানা! প্রত্যেক গৃহের মেঝে জুড়িয়া স্নানের জলের প্রকাণ্ড চৌবাচ্ছা নির্ম্মিত হইত।

শীতের দেশ বলিয়া জল খুব ঠাণ্ডা; সে জলকে আরামপ্রদ করিবার জন্য বড়-বড় পাথরকে আগুনে দারুণ ভাবে তাতাইয়া চৌবাচ্ছার জলে ফেলা হইত। বনের গাছ কাটিয়া স্তূপাকার করিয়া সেই সব কাঠ পুড়াইয়া এই আগুন জ্বালা হইত। কাঠ পুড়াইতে পুড়াইতে ক্রমে বন-জঙ্গল নিষ্পাদপ হইয়া গেল; কিন্তু শয়ন-ঘরের সে বাথ-রুম আজো তেমনি আরামের ও বাসের ঘর রহিয়া গিয়াছে!



মাছের নৌকা



পাহাড়-পথ

মিউনিসিপ্যালিটি হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক শক্তিযোগে এখানকার প্রস্রবণগুলির জল লইয়া জ্বালানির প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে মেয়েদের কাপড়-চোপড় কাচা, ঘর-কন্নার কাজ —সবই এই প্রস্রবণের জলে সংসাধিত হইয়া থাকে। ইলেক্‌ট্রিসিটি বা বৈদ্যুতিক প্রবাহের ব্যবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রম-শিল্পে এখন প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

ব্যবসা বলিতে এখানে মেষের ব্যবসা; চাষ-বাস এবং মাছের ব্যবসা। মাছের এখানে সীজন্‌ (season) বা সময় আছে। বছরে সব সময় প্রচুর মাছ মিলে না। মাছের সময় আসিলে সামর্থ্য-মতো দেশ-শুদ্ধ লোক সমুদ্রে গিয়া মাছ-ধরার কাজে মাতিয়া ওঠে।

এখন এই সব প্রস্রবণের জলের জন্য জ্বালানি-কাঠের প্রয়োজন এখানে আদৌ অনুভূত হয় না।

এই গরম জলের কল্যাণে আইস-ল্যাণ্ডের বহু

বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তা মিলিয়াছে বলিয়া আইস-ল্যাণ্ডে এখন কল-কারখানারও সৃষ্টি হইয়াছে।



কাজে চলে

আইস-ল্যাণ্ডের দক্ষিণদিকে আছে ভেষ্টমানেইজার দ্বীপ। শুধু এই মাছের ব্যবসা হইতে এখানে বছরে প্রায় দশ লাখ ডলার-মুদ্রা আমদানি হয়। এ দ্বীপটিতে তিন হাজার লোকের বাস। বছরে দু'বার এখানে হয় মাছের সীজন্। একবার শীতের গোড়ায়, আর একবার বসন্ত কালে। সে সময়ে নানা দেশ হইতে বহু লোক এখানে মাছ ধরিতে আসে। মাছ ধরিয়া এসব মাছকে সাফ্ করিতে হয়। সে কৌশল শুধু এ-দ্বীপের অধিবাসীরাই জানে। সাফ করিবার ফলে মাছ দীর্ঘকাল তাজা থাকে। এ-দ্বীপের বহু অধিবাসী শুধু মাছ সাফ করিয়া (cleansing) ঘণ্টায় দু'-চার ডলার রোজগার করে।



ঘোড়ার পিঠে নদী পার

আইস-ল্যাণ্ডে বহু গিরি-পর্ব্বত আছে। এ-সব গিরির বক্ষে বহু সামুদ্রিক পাখীর বাস। এই সব পাখী ও পাখীর ডিম সংগ্রহ করিয়া সেই ডিম এবং পাখী বেচিয়া অনেকে বহু অর্থ উপার্জ্জন করে। এই সব পাখী ও পাখীর ডিম সংগ্রহ করা বড় কঠিন। পাহাড়ের চূড়ায় দড়ির ফাঁশ আট্কাইয়া সেই দড়ি ধরিয়া পাহাড়ে চড়িলে তবেই ডিম ও পাখীর নাগাল মিলে।

এখানকার হাঁসের বুকে যে মিহি পালক গজায়, সে পালক জাহাজে ভরিয়া য়ুরোপের বহু সহরে চালান যায় এবং বিলাসী-মহলে বেশ চড়া দামে সে পালক বিক্রয় হয়।

কাকাতুয়ার মতো এক-জাতের সামুদ্রিক পাখী আছে, তার নাম পাফিন্। এ-পাখা তেমন উড়িতে পারে না, কাজেই ধরা সহজ। এ-পাখীর পালক



রেইকজাবিক-সহর

বেশ চড়া দামে য়ুরোপে-আমেরিকায় বিক্রয় হয় এবং এ-পাখীর মাংস? একবার সে-মাংসের স্বাদ পাইলে জীবনে না কি তাহা ভুলা যায় না!



এ-প্রস্রবণের জলে বৈদ্যুতিক-শক্তির বোধন

আইস্‌-ল্যাণ্ড বহুকাল ধরিয়া ডেনমার্কের অধীন ছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্ক সে অধীনতা-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া আইস-ল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দিয়া তাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়াছে। আজ আইস্‌-ল্যাণ্ডবাসীরা নিজেদের দেশের শাসন-পালন-কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহ করিতেছে।

এখানকার প্রধান সহর রেইকজাবিক। এখানকার বাড়ী-ঘর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। নিত্য ভূমিকম্প হয় বলিয়া বাড়ী-ঘর কাঠ দিয়া নির্ম্মিত হয়। কোনো বাড়ী সমতল ভূমে—কোনো বাড়ী বা পাহাড়ের উপর। বাড়ীতে যদি আগুন লাগে, এজন্য বাড়ীর জানলায় তারের দড়ি কুণ্ডলীকৃত করিয়া বাঁধা থাকে; আগুন লাগিলে এই তারের দড়ি ধরিয়া লোকজন নীচে নামিয়া নিরাপদে সমতল-ভূমে পলায়ন করিতে পারে।

হেকলা আগ্নেয়-গিরির বিরাট দেহ আজ আর অগ্নিচক্রের খেলায় মাতে না! সে দেহ পড়িয়া আছে নির্বিষ, নির্লিপ্তের মতো! বিদেশীরা এ আগ্নেয়-গিরিতে বেড়াইতে আসেন। পাহাড়ের গায়ে দু'-তিনটি পান্থ-নিবাস আছে। সেখানে ব্যবস্থা যা আছে, তাহাতে বিদেশীদের কোনোরূপ অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আইস্‌-ল্যাণ্ডের পথ-ঘাট তেমন স্বচ্ছন্দ-সুগম নয়। সে কথায় এমন মনে করিবেন না যে,

সর্ব্বত্র খানা-খোন্দল টপ্‌কাইয়া পাথর ডিঙ্গাইয়া পথ চলিতে হয়! রেইকজাবিক, রুটাজোর্দ্দার, হেস্তর, হোলতাস্তাদির, সিকলিবেয়ার প্রভৃতি সহরে পাকা রাস্তা আছে। সে রাস্তা প্রায় ৪০।৫০ বৎসর মাত্র তৈয়ারী হইয়াছে। এ পথে মোটর-লরি এবং মোটর-গাড়ী চলে। পাকা রাস্তার পরিমাণ সর্ব্ব-সমেত প্রায় ৫৫০ মাইল হইবে। অন্য পথ-ঘাটে চলিবার জন্য টাটু-ঘোড়া একমাত্র বাহন। এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা ঘোড়ায় চড়িতে পটু। ঘোড়ায় চড়িয়াই চলার কাজ সারিতে হয়। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে ছোট-ছোট অসংখ্য পর্ব্বত এবং নদী পার হইতে হয়। এ সব নদীর জল কোথাও বেশী গভীর নয়। কাজেই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া এ সব নদী অনায়াসে পার হওয়া যায়। যে-সব গভীর নদী আছে; সেগুলি নৌকায় চড়িয়া পার হইতে হয়। এখন এই সব গভীর নদীতে বিদেশী স্কুনার, মোটর-বোট ও ছোটখাট ষ্টীমারের আমদানি হইয়াছে। মোট-ঘাট, বেসাতি-পশরা—এ সবও ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া বহা হয়। মরুর বুকে মরু-যাত্রীর সহায় যেমন উট, এখানকার অধিবাসীদের ঘোড়া ঠিক তেমনি সহায়।

শ্রীমতী ইশোবেল হাচিশন নামে এক জন ধনাঢ্য মার্কিন-মহিলা আইস্‌ল্যাণ্ড-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সেখানকার যে-পরিচয় তিনি লিখিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য।

তিনি লিখিয়াছেন—আইস্‌-ল্যাণ্ডের ভীমকান্ত সৌন্দর্য্য-মাধুরী দেখিবার জন্য আমি আট দিন একাদিক্রমে টাটু-ঘোড়ায় চড়িয়া এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। রাত্রে শুধু বিশ্রাম করিতাম। প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিক্রমণ সুরু হইত; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে পরিক্রমণের বিরাম থাকিত না। এখানকার রৌদ্র-মেঘের লীলা-খেলা ভুলিবার নয়! রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিতেছে, সহসা মেঘে ও কুয়াশায় চারিদিক ভরিয়া গেল—হয় তো এক-পশলা ঝির-ঝিরে বৃষ্টি, নয় দিগন্ত



কৃষিজীবীরা

ব্যাপিয়া রঙে রঙিন রামধনুর বিকাশ! এমনি রৌদ্র-মেঘের লীলা-মাধুরীতে বিমুগ্ধ মন লইয়া গলোশে-প্রপাতের সামনে এক দিন আসিয়া দাঁড়াইলাম। সে জল-ধারায় সাবানের অজস্র ফেনা—সে ফেনার ছোট-বড় বুদ্‌বুদে রঙের কি অপরূপ বাহার!

এখানে তেমন ঘন বন-জঙ্গল নাই— তবু যেদিকে চাই, দেখি শ্যামলশ্রীতে চারিদিক ভরিয়া আছে! মাটীর বুকে, পাহাড়ের বুকে নানা রঙে রঙীন অজস্র পাহাড়ী ফুল ফুটিয়া আছে। আল্লস্‌ ও আল্লসের কাছাকাছি পাহাড়ী জমিতে যে-সব ফুল ফোটে, এখানেও ঠিক তেমনি ফুল!

সে ফুলের যেমন অজস্রতা, তেমনি মাধুরী। পাখীও এখানে অজস্র!

এখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই খুব সদালাপী এবং অমায়িক; অতিথি পাইলে তাকে মাথায় করিয়া রাখে। এক দিন এক পাহাড়ী পান্থ-নিবাসে আমাকে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল। এক-পেয়ালা দুগ্ধ পান করিয়া জানলার ধারে বসিয়া আছি—ঘরে আলো নাই। ভৃত্য গিয়াছিল নীচেকার গ্রামে বাতির সন্ধানে। এমন সময় দেখি, একটি স্ত্রীলোক পাহাড় বহিয়া নামিয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া সে জানলার কাছে আসিল, বলিল—অন্ধকারে বসিয়া আছো কেন? বলিলাম—ভৃত্য বাতি আনিতে গিয়াছে। এ কথা শুনিয়া তখনি নিজের পশরা হইতে ন্যাকড়া বাহির করিয়া মশাল তৈয়ারী করিল; মশাল জ্বালিয়া হাসিয়া সে বলিল—Good lamp! (দিব্যি বাতি!) তার পর বলিল—বিছানা আনিয়াছ? বলিলাম—না। তার নিকটে ছিল কাঁথা ও কম্বল। সেই কাঁথা ও কম্বল বিছাইয়া সে আমার শয্যা রচনা করিয়া দিল। বলিল—বিদেশী লোক রাত্রে শীতে কষ্ট পাইবে! কাল সকালে আসিয়া আমি আমার কাঁথা-কম্বল লইয়া যাইব।

তার পর প্রশ্ন করিল—আর কিছু চাই?

মনে হইল বলি, তোমাকে চাই। রাত্রে যদি এখানে থাকো, গল্প করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিব।

কিন্তু সে-কথা বলিলাম না।

রাত্রে তার দেওয়া কম্বলের শয্যায় আরামে ঘুমাইলাম। পরের দিন সকালে সে আসিল। সঙ্গে আনিল এক পেয়ালা দুধ এবং সামুদ্রিক পাখীর দু'টি ডিম। পান্থ-নিবাসের অতিথির সেবা করিয়া সে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিল। আর আমার তৃপ্তি? ভাষায় তা জানানো যায় না!...



তরণী তরঙ্গে

এখানে মেয়ে-পুরুষে কোনো পার্থক্য দেখি নাই। ক্ষেতে মেয়ে-পুরুষ এক-সঙ্গে কাজ করিতেছে। মেয়েরা সংসারের কাজে যেমন পটু, বাহিরের কাজেও তেমনি। মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ, বলিতে গেলে, মেয়েরাই করে, তাদের কার্য্য-তৎপরতায় সারা দেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেশটিকে নিসর্গ যেমন রকমারি সাজে সজ্জিত করিয়াছে—এখানকার লোকজনও তেমনি নিসর্গের সে-সজ্জার সঙ্গে তাল রাখিয়া ঘর-বাড়ী পথ-ঘাট চমৎকার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে। মেয়েরা বেশ সুশ্রী এবং লজ্জাশীলা। বেশভূষায় পারিপাট্য ও বর্ণশ্রী সাধনের দিকে প্রবল মনোযোগ। বেশভূষায় য়ুরোপীয় বা মার্কিন ফ্যাশনের বাহুল্য দেখি নাই—নিজেদের সনাতন বেশ-ভূষায় সামান্য একটু কাটছাঁট করিয়া লইয়াছে। সে কাটছাঁটে শোভনতা বা কমনীয়তা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। মহিলাটি দু'-চারিটি ইংরেজী কথা জানেন। তাঁর স্বামী বেশ পণ্ডিত। ভালো ইংরেজী জানেন। তাঁর ঘরে ছোট লাইব্রেরীটিতে সেক্সপীয়র, ডিকেন্স, সার অলিভার লজ,

এবং শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি গ্রন্থ দেখিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি অবশ্য ইংরেজী অনুবাদ। মহিলার স্বামী বলিলেন, এ বইগুলি পড়িয়া তিনি বহু আনন্দ পান!



গল্‌ফশ্‌-প্রপাত

এখানে জীবনযাত্রার প্রণালী বেশ জটিল এবং কঠিন। সমস্যাও এখানে অনেক। সকল অসুবিধা, সকল কষ্ট সহিয়াও এখানকার লোক এই-দ্বীপেই আজীবন বাস করেন; বিলাস বা পয়সার লোভে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া থাকিবার দিকে কাহারো রুচি বা বাসনা দেখা যায় না! দেশের গর্ব্ব-গৌরবে সকলের মন ভরিয়া আছে।

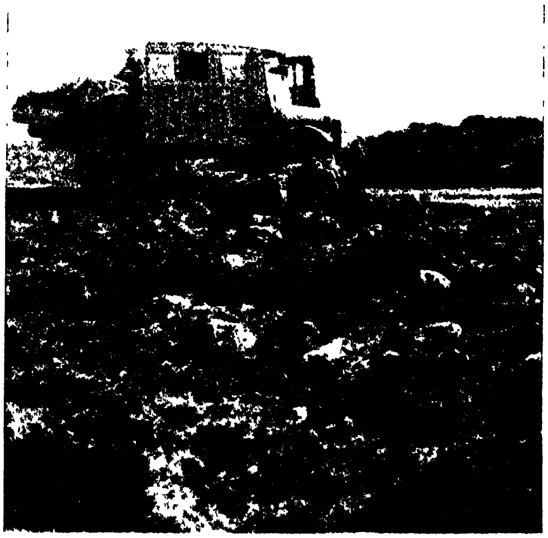


কড্‌-মাছের আড়ং

এখানকার অধিবাসীদের স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তা সর্ব্ব-জাতির অনুকরণযোগ্য! ইহাদের স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে অন্য জাতির স্বদেশপ্রেমের পার্থক্য আছে। এ সম্বন্ধে য়ুরোপে-আমেরিকায় একটি কাহিনী খুব বেশী রকম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এক

জন তরুণ আইস-ল্যাণ্ডার কানাডায় গিয়াছিলেন। অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—কোন জাতের লোক তুমি? কোন্ মহাদেশ হইতে তুমি আসিয়াছ? উত্তরে তরুণ বলিয়াছিলেন,—আমি তোমাদের কোনো মহাদেশ হইতে আসি নাই। আমি আইস-ল্যাণ্ডার।

অতি প্রাচীন যুগে য়ুরোপ-আমেরিকা যখন অশিক্ষিত বর্ব্বরের বাসভূমি ছিল, তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কাহারো



দুর্গম পথে মোটর-লরি

সাহায্য না লইয়া আইস-ল্যাণ্ডবাসীরা জ্ঞানে-সংস্কৃতিতে গৌরবের আসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁদের সে শিক্ষা-সংস্কৃতির রেশ আজো মিলাইয়া যায় নাই! এখানকার অধিবাসীরা জগতের অন্য সব সুশিক্ষিত সুধী অধিবাসীর মতো প্রখ্যাত পাণ্ডিত্য লাভ না করিলেও সাধারণ-জ্ঞান, সহজ-বুদ্ধি এবং সাহিত্যরসানুভূতিতে এ-জাতির বৈশিষ্ট্য আজো সকল জাতির শ্রদ্ধার সামগ্রী।

আইস-ল্যাণ্ডের সাগা-সাহিত্য কবিত্ব-সম্পদে সমৃদ্ধ। আইস-ল্যাণ্ডের পল্লী-গীতির বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্যের তুলনা নাই!

রাজনীতির ক্ষেত্রে আইস-ল্যাণ্ডই নারী-জাতির সাম্য স্বীকার করিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীকে সর্ব্ব-প্রথম ভোটাধিকার দান করিয়াছে। নারীর মর্য্যাদা এখানে এমন যে, বিবাহ হইলেও নারীকে তার পিতৃদত্ত নাম বা গোত্র-পরিচয় ত্যাগ করিয়া স্বামীর নাম, স্বামীর গোত্র গ্রহণ করিতে হয় না; নারী পিতৃদত্ত নামগোত্র রক্ষা করেন।

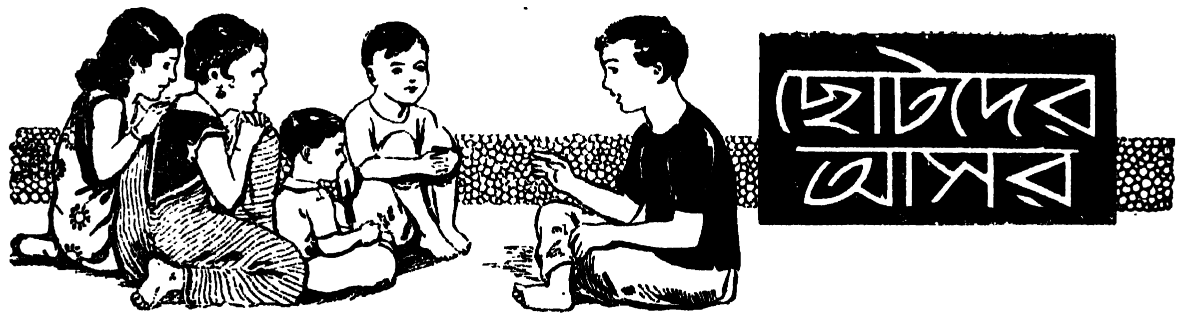
১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আইস-ল্যাণ্ড তার এক-সহস্রতম জন্ম-বার্ষিকী-উৎসব সম্পাদন করিয়াছে। সে সময় যে জাতীয়-সঙ্গীত বিরচিত হইয়াছিল, সে-সঙ্গীত বিদেশীর কাছে নিজেদের গৌরব-ঘোষণায় মুখর নয়! তাহাতে



ক্ষেতের কাজে মেয়ে-পুরুষ

অহঙ্কারের বিন্দু-বাষ্প দেখা যায় নাই! সেখানকার পথে-ঘাটে সর্ব্বজনের কণ্ঠে আজ এই গানটি নিত্য ধ্বনিত হইতেছে। সে-গান,—

দেবতা মোদের মাতৃ-ভূমির,
পিতৃ ভূমির দেবতা!
আমরা তোমার বন্দনা-গান গাহি!
তোমার সূর্য্যরশ্মি মোদের প্রাণ!
তুমি মহা-কাল—আদি ও অন্ত নাহি!
হাজার বরষ—হাজার মোদের কাছে;
কাল-মহীরুহে একটি কুসুম-কলি—
তোমারে পূজিতে তোমারে জানাতে নতি
জাগিছে হাসিছে ঝরিয়া যেতেছে চলি!
হাজার বরষ মোদের তুষার-দেশে—
হাজার বরষ এই তুহিনের ভূমে—
কাল-মহীরুহে ছোট্ট কুসুম-কলি
জাগিছে ঝরিছে তোমারি চরণ চুমে!



নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

(রূপকথা)

ছোট্ট মেয়ে লীনা। কতই বা তার বয়স? বড়-জোর নয় কি দশ বছর; কিন্তু এই বয়সেই কি তার প্রতাপ! সমবয়সী মেয়েদের ত কথাই নেই, ছেলেরাও তার ভয়ে আড়ষ্ট; অতি-বড় দুষ্ট ছেলেও লীনাকে ঘাঁটাতে চায় না। কারও এক বিন্দু বেয়াদপি সে সহ্য করে না। এমন কি, এই একরত্তি মেয়েটির সঙ্গে তকরার ক'রতেও কারও সাহস হয় না। তারা জানে—লীনাই তাদের দলের চাঁই, লীনাকে তাদের মানা চাই-ই।

তোমরা হয় ত ভাবছ—লীনারা খুব বড় লোক, তাদের অনেক পয়সা, বিস্তর লোকজন তাদের তাঁবেদারী করে;—তাই লীনার এত প্রতাপ, সবাই তাকে অত মানে, ভয় করে। কিন্তু এ সব অনুমান সত্য নয়। ছোট্ট একখানি কুঁড়ে ঘরে খুব গরীবের মতোই লীনারা বাস করে। তার মাথার ওপরে এক মা, আর অভিভাবকের মত এক সাধু ছাড়া আর কেউ নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'টি বেলা মা ও মেয়েকে খাটতে হয়; সেই খাটুনির পয়সায় কোন রকমে তাদের দিন চলে।

লীনার মায়ের যে সামান্য সম্বল ছিল, তা দিয়ে লীনা হাট থেকে তুলো কিনে এনে মাকে দেয়; মা ঘরে ব'সে তা দিয়ে চরকায় সুতো কাটেন। সেই সুতোর বাণ্ডিল ঘাড়ে ক'রে লীনাকে আবার হাটে যেতে হয়—ব্যাপারী-দের কাছে তা বেচবার জন্যে। সুতো বেচে ও তুলো কিনে যে পয়সা বাঁচে, তাতেই কষ্টে-সৃষ্টে এদের দিন চলে যায়।

কিন্তু মা ও মেয়ের চেহারা আর আচার-ব্যবহার দেখলে মনে হয়, এত কষ্টে এ-ভাবে সংসার চালানো যেন তাদের সঙ্গে খাপ খায় না। যেন খুব বড় সংসার চালালেই এদের মানায়। মা'র বয়স একটু বেশী হ'লেও, এখনো মনে হয়—দেহখানি তাঁর যেন কাঁচা সোনায় গড়া। গায়ের রঙটির মতই আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর তাঁর মুখ-চোখ, নাক—এমন কি, মুখের কথাটি পর্য্যন্ত! মেয়েকেও যেন বিধাতাপুরুষ মায়ের রূপগুলি সবই ঢেলে দিয়েছেন। কেবল একটি জিনিস মেয়েটি মায়ের চেয়ে বেশী পেয়েছে; সেটি হচ্ছে তেজ। মায়ের মুখখানি সদাই মলিন; মনটিও তাঁর এতই নরম যে, কেউ কখন তাঁকে রাগতে দেখেনি; উঁচু কথাটি পর্য্যন্ত কেউ কোন দিন তাঁর মুখে শোনেনি! মনে কষ্ট হ'লে সকলকে লুকিয়ে তিনি আঁচলে চক্ষু মোছেন; কেউ অন্যায় কিছু করলে বা তাঁর মনে আঘাত দিলে নিঃশব্দে তা সহ্য করেন।

লীলা কিন্তু এ-সবের ধার দিয়েও যায় না। মায়ের এই নরম গুণগুলি সে কিন্তু মোটেই পায়নি; হয় ত বিধাতা-পুরুষ ইচ্ছা ক'রেই এ বিষয়ে একটু কারচুপি ক'রেছেন। তাতে লীনার মেজাজটি হ'য়েছে মায়ের মেজাজের ঠিক উল্‌টো। কেউ যদি কোন রকম কটুকথা তাকে বলে, বা মিছিমিছি তাকে বকে, মুখটি বুজে তা সহ্য করবার মেয়েই সে নয়; সুদে-আসলে তখনি তার শোধ তুলে তবে ছাড়ে! এক-রত্তি মেয়ে হ'লে কি হয়? তার শরীরের শক্তি দেখে সমবয়সী মেয়েরা বলে—ও ক্ষুদে-পালোয়ান! আর তার মনের জোর দেখে বিধাতাপুরুষও বোধ হয় মনে মনে হাসেন। যারা এই মেয়েটিকে জব্দ করতে গিয়ে নাকালের একশেষ হয়, তারা বলে—মেয়েটা যাদু জানে, ওর চোখদুটোর চাহনিতে এমন কিছু আছে—যার জন্যে জন্তু মানুষ সবাই কাবু হ'য়ে পড়ে! মায়ের ইচ্ছা, মেয়ে ঝগড়াঝাঁটি না ক'রে চুপচাপ দিন কাটাক; কিন্তু মেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলে—সে আমি পারব না, আমাকে আমার স্বভাব ছাড়তে বোলো না মা!

সহর থেকে অনেক দূরে বন-জঙ্গল আর পাহাড়ে-ঘেরা গ্রামখানির নাম পাহাড়পুরী। এ গ্রামে মেয়েদের বাসই বেশী; চাঁপা ফুলের মতো তাদের গায়ের রঙ, তাই বাইরের লোক এই গ্রামখানিকে বলে—পরীর পুরী। লীনার মা ঝর্ণারাণী এই পাহাড়পুরীর মেয়ে। তিনি ছিলেন, এ অঞ্চলের রূপসী-শিরোমণি। বাংলার কোন রাজ্যের রাজা এই পাহাড়ে শিকার করতে এসে, ঝর্ণা-রাণীর অপরূপ রূপ দেখে, তাঁকে বিয়ে করবার জন্যে ব্যাকুল হ'লেন। ঝর্ণারাণীর বাবা ছিলেন ভয়ঙ্কর জেদী মানুষ। তিনি আসাম প্রদেশের অহম্-রাজের বংশ-ধর, রাজ-সিংহাসনে তাঁর দাবী ছিল; কিন্তু রাজার অমতে তিনি পাহাড়পুরীর এই গরীব গৃহস্থের মেয়েকে বিয়ে করায় সর্ব্বস্বান্ত হ'লেন। শেষে তিনি রাজ-প্রাসাদ ও রাজমুকুটের আশা ত্যাগ ক'রে পাহাড়পুরীতে এসেই বাস করেন। ঝর্ণারাণীই তাঁর এক মাত্র সন্তান। কিন্তু তার পাঁচ বছর বয়সে তার মা পা-পিছলিয়ে পাহাড় থেকে খদে প'ড়ে মারা যান। ঝর্ণারাণী বাপের স্নেহে-যত্নেই বড় হয়। তার পর বাংলাদেশের রাজা ঝর্ণা-রাণীকে দেখে যখন বিয়ে করতে চাইলেন, তখন তার বাপের মনে এই ভেবে আনন্দ হ'ল যে, তাঁর দুঃখে বিধাতার দয়া হওয়ায়, আসামের চেয়ে সব দিক দিয়ে বড় যে বাংলা, সেই দেশের রাজাকে ডেকে এনেছেন, তাঁর মেয়ের দুঃখ দূর ক'রবার জন্য। হাসি-মুখেই তিনি মেয়েকে রাজার হাতে তুলে দিলেন।

ঝর্ণারাণীকে নিয়ে রাজা বাংলায় চ'লে গেলেন। মেয়েকে বিদায় দিয়ে তার বাপের মন ভেঙ্গে পড়ল। এই মেয়েটিই ছিল তাঁর এক মাত্র অবলম্বন: এখন কি নিয়ে তিনি পাহাড়পুরীতে প'ড়ে থাকেন? এই সময় এক সাধুর শুভাগমন হ'ল তাঁর বাড়ীতে। সাধুর বিভূতি দেখে তিনি মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন; সাধুও তাঁর ভক্তিতে তুষ্ট হ'য়ে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। পর্ণকুটীরখানি সাধুর আশ্রম হ'য়ে দাঁড়ালো। ঝর্ণার মায়ের নামে সাধু তার নাম রাখলেন—পূর্ণাশ্রম।

এর পাঁচ বছর পরে এক দিন সকালে ফুলের মত ফুটফুটে একটি খুকীকে কোলে নিয়ে একটি তরুণী বিধবা এসে দাঁড়ালেন এই আশ্রমের দোরে: বন্ধ দরজায় ধা দিয়ে কান্নার সুরে ডাকলেন—বাবা!

খুট ক'রে দরোজাটি খুলে তার দু'পাটি কপাটের ওপর হাত দু'খানি রেখে, ঋষির মত যে সাধুপুরুষটি দেখা দিলেন, তাঁর মুখের পানে চাইতেই মেয়েটির সকল দুঃখ-কষ্ট যেন এক নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল; মনে হ'ল—যেন তাঁর বাপের স্নেহমাখা মুখখানা এই ঋষিতুল্য মানুষটির মুখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুখখানি তুলে মেয়েটি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমার বাবা কোথায়?

মেয়েটির কথার উত্তর না দিয়ে সাধু তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তুমিই ত ঝর্ণারাণী—বাংলা থেকে পালিয়ে এসেছ? ভালই ক'রেছ মা, ঘরে এসো!

বিধবা কাঁদ-কাঁদ স্বরে এবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন—বাবাকে দেখছি না কেন? তিনি কোথায়?

সাধু তাঁর ডান হাতখানি আকাশের দিকে তুলে ব'ললেন—তিনি ঐখানে।—সেখান থেকেই তোমাকে দেখছেন।

কথাটা শুনেই সেই তরুণী বিধবা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, দেহটাও তাঁর এলিয়ে প'ড়ল; কোলের খুকীটি প'ড়ে যায় দেখে সাধুটি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ধরে ফেলে, কোলের মেয়েটিকে নিজের কোলে নিয়ে ব'ললেন—ছি মা, স্থির হও! সময় হ'তেই বাবা তোমার চলে গেছেন; আর আমি যে তোমাদেরই পথ চেয়ে বসে আছি। আমাকে পর ভেব না মা! আমি তোমার বাবার গুরু, আর তোমার মেয়েটির দাদু।

তোমরাও বোধ হয়, এবার বুঝতে পেরেছ, ঐ ছোট্ট খুকীটিই হচ্ছে লীনা, আর তাকে যিনি কোলে ক'রে দরোজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই ঝর্ণারাণী।

পাঁচ বছর আগে এই ঝর্ণাই রাজরাণী সেজে রাজার সঙ্গে চতুর্দ্দোলায় চড়ে, কত দুর্গম পথ পার হ'য়ে বাংলার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন; সঙ্গে ছিল কত লোক-জন। সারা পথের লোক পাহাড়ে-মেয়ের সৌভাগ্য দেখে অবাক হ'য়েছিল;—আর আজ সেই ঝর্ণারাণীই এক-কাপড়ে, পায়ে হেঁটে এক বছরের মেয়েটিকে বুকে ক'রে, পাহাড়পুরের সেই কুঁড়ে ঘরখানিতেই আশ্রয় নিতে ফিরে এলেন। একেই বলে বিধিলিপি!

রাজা যত দিন বেঁচে ছিলেন, ঝর্ণার আদরের সীমা ছিল না; রাজা তাকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। কিন্তু রাজার আর একটি রাণী ছিলেন। সেই রাণীর নাম ছিল অঙ্গনা। অঙ্গনার বাবা ছিলেন রাজার এক মন্ত্রী। রাজা-কিন্তু অঙ্গনার চেয়ে ঝর্ণারাণীকেই বেশী ভালবাসতেন। তার কারণ, ঝর্ণার মনটি ছিল বড় নরম, আর ভারী সরল, কিন্তু অঙ্গনা ছিলেন যেমন অহঙ্কারী তেমনি কুচক্রী। ঝর্ণারাণী সতীন অঙ্গনাকে নিজের বোনটির মতোই ভালবাসতেন, তাঁর মনে এতটুকু হিংসাও কোন দিন স্থান পায়নি; কিন্তু ঝর্ণার হিংসায় অঙ্গনা সর্ব্বদা যেন জ্বলে মরতেন। তিনি কেবলই ছল খুঁজে বেড়াতেন, কি ক'রে ঝর্ণাকে তাড়িয়ে রাজাকে তাঁর বশে রাখ্‌বেন। রাজা কিন্তু ঝর্ণারাণীকেই পাটরাণী ক'রে অঙ্গনাকে আরো চটিয়ে দিলেন। তার পর এক দিনের ব্যবধানে ঝর্ণারাণীর আর অঙ্গনার একটি ক'রে মেয়ে হ'ল। ঝর্ণার মেয়েটির জন্ম এক দিন আগে হওয়ায় রাজ্যের নিয়ম অনুসারে জ্যেষ্ঠার মর্য্যাদা তাকেই দেওয়া হ'ল। ভবিষ্যৎ ভেবে আঁতুড়-ঘরেই রাণী অঙ্গনার মনে বিষাদ ঘনিয়ে এল। যদি রাজার কোন পুত্রসন্তান না হয়, তা হ'লে তাঁর সতীনের এই মেয়ে—এক দিনের বড় ব'লেই সিংহাসন পাবে,—এই চিন্তায় তিনি অস্থির হ'য়ে উঠলেন। দু'টি মেয়েই কিন্তু আশ্চর্য্য রকমের সুন্দরী, আর দু'জনের মুখের আদলও একই রকমের! দুই রাজকন্যার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্যের জন্য রাজবাড়ীর সকলেরই এমনি ধোঁকা লাগতে লাগ্‌ল যে, কোন্ মেয়েটি কার, কেউ সহজে তা ঠিক করতে পারত না! ঝর্ণারাণী আদর ক'রে তাঁর মেয়েটির নাম রাখেন—লীনা; আর অঙ্গনার বাবা রাজার মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মা তাঁর নাতনীটির নাম রাখেন—নীলা। কিন্তু কোন্‌টি লীনা আর কোনটিই বা নীলা, রাজা ও দুই রাণী ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারত না। মেয়ে দু'টির গলার স্বর পর্য্যন্ত একই রকমের; তফাতের মধ্যে এইটুকু ধরা যেত—ঝর্ণারাণীর মেয়ে লীনা হ'য়েছিল ভারী শান্ত, আর অঙ্গনার মেয়ে নীলার স্বভাব তেমনি দুরন্ত।

বছর-দুই পরে সুস্থ সবল রাজা হঠাৎ এক দিন এমনি অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লেন যে, আর তাঁকে উঠে বসতে হ'ল না রাজপুরী আঁধার ক'রে, প্রজাদের হাহাকারে ডুবিয়ে, রাণী ও রাজকন্যাদের ছেড়ে তিনি পরলোকে প্রস্থান ক'রলেন। ফলে লীনাকে নিয়ে পাটরাণী ঝর্ণা পড়লেন অকূল পাথারে। অঙ্গনার বাবা শ্রীগোপাল শর্ম্মা রাজপুরুষদের সাহায্যে তাঁর মেয়েকেই রাজ-সিংহাসনে বসালেন। ঝর্ণারাণীর সম্বন্ধে সকলকে জানিয়ে দিলেন—সে পাহাড়ীদের মেয়ে; রাজা তাকে বিয়ে করেননি, ধরে এনে তাঁর প্রাসাদে রেখেছিলেন। সে এখন রাণী অঙ্গনার বাঁদীগিরি করবে, তা' ছাড়া তার গতি নাই!

স্বামীর শোকে অভাগিনী ঝর্ণার বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল, তার ওপর এই মর্ম্মভেদী কথা শুনে তাঁর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল! এ বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের কোন পথই তিনি দেখতে পেলেন না। এই অবস্থায় আর একটা সাংঘাতিক খবর পেয়ে তিনি ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হ'লেন। তাঁর এক বিশ্বাসী দাসী চুপি-চুপি তাঁকে খবর দিলে—দুই রাণীর মেয়ে দু'টির চেহারা এক-রকম ব'লে, পাছে পরে কোন গোল বাধে, তাই লীনাকে খুন করাই ঠিক হ'য়েছে! মায়ের প্রাণ—এ কথা শুনে কি আর স্থির থাকতে পারে? তখনই তিনি মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললেন, মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্যে সব ছেড়ে-ছুড়ে তিনি তাকে নিয়ে পালাবেন; তার পর তাঁদের ভাগ্যে যা থাকে হবে। তিনি তাড়াতাড়ি গোপনে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলেন। দামী-দামী যে সব গয়না, কাপড়-চোপড়, ধনরত্ন তাঁর নিজের ছিল, সে সমস্তই তাঁর সেই বিশ্বাসী দাসীর হাতে তুলে দিয়ে ব'ললেন—এ সব তুমি নাও, যা করতে হয় কর, আমি কিছুই চাই না, শুধু মেয়েটিকে নিয়ে এ পুরী থেকে চুপি-চুপি পালাতে চাই।—দাসী সেই সব ধন-রত্নের জোরে রাতা-রাতি ঝর্ণারাণীকে মেয়ের সঙ্গে সকলকে লুকিয়ে সরিয়ে দিলে। রাজরাণী অনাথিনীর মত রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। তার পর কোলের মেয়েকে নিয়ে অশেষ কষ্ট আর আপদ-বিপদের ভেতর দিয়ে কি ক'রে যে, পাহাড়পুরীতে এসে পৌছাতে পারলেন, তা শুধু তিনিই জানেন। কিন্তু এমনি তাঁর পোড়া অদৃষ্ট যে, পাহাড়পুরীতে এসেই শুনলেন, বাবাও তাঁর স্বর্গে চ'লে গেছেন; সংসারে তাঁর আপনার ব'লতে আর কেউ নেই!

এই সময় এই সাধুপুরুষ যেন তাঁর মুখ চেয়েই

ব'সেছিলেন। পিতৃশোকের ধাক্কাটা একটু সামলে নিয়েই ঝর্ণারাণী বুঝতে পারলেন, যে সাধুপুরুষের আশ্রয় তিনি লাভ ক'রেছেন, তিনি অন্তর্য্যামী; আর তাঁর কথা থেকেই ঝর্ণারাণী তা জানতে পারলেন। তখন এই সিদ্ধ তপস্বীর পায়ের কাছে লুটিয়ে-প'ড়ে তিনি ব'ললেন—আমার লীনাকে আপনার হাতেই সঁপে দিলুম। রাজার মেয়ে ও, কিন্তু আজ অদৃষ্টের ফেরে সর্ব্বহারা! ওর কেউ নেই, এখন ভরসা শুধু আপনিই, বাবা!

সাধু ঝর্ণারাণীকে আশ্বাস দিয়ে ব'ললেন—ভরসা ভগবান। তুমি ভেব না মা! আমি সবই জানি। তোমার লীনাকে মানুষ করবার ভার ভগবানই আমার হাতে অর্পণ ক'রেছেন; সে ভার নিলুম আমি।

সেই থেকে বিধবা রাজরাণী ঝর্ণা সন্ন্যাসিনীর মতো এই আশ্রমেরই একপাশে ছোট্ট একখানি কুঁড়ে-ঘরে এসে লীনাকে নিয়ে বাস ক'রছেন। আর সেই দিন থেকেই সাধু নিয়েছেন লীনাকে মানুষ ক'রে দেওয়ার ভার। দুই বছরের ভেতরেই মেয়ের চালচলন দেখে মায়ের ত একবারে চক্ষুস্থির! রাজবাড়ীতে থাকতে যে-মেয়ে ছিল ভারী ঠাণ্ডা—যার কোন রকম দুরন্তপনা ছিল না, রাজপুরীর সবাই ব'লতো—তাই ত, কি ঠাণ্ডা মেয়ে এই রাণীর,—কিন্তু দু'টি বছরের ভেতরে এই সাধুটির হাতে প'ড়ে তাঁর অমন শান্ত মেয়ে কি দুরন্তই হ'য়েছে!—কে ব'লবে, এইটিই আগেকার সেই ঠাণ্ডা মেয়েটি? ঝর্ণারাণী যাকে কাপড়ের পুঁটলিটির মতো কত বন-জঙ্গল পাহাড় পার হ'য়ে, তেপান্তর মাঠের ভেতর দিয়ে এই লম্বা পথ ভেঙ্গে ব'য়ে এনেছেন, একটি টুঁ-শব্দও যার মুখ থেকে বেরুইনি কোনও দিন,—সেই মেয়ের দুরন্তপনা দেখে ঝর্ণারাণী এক দিন সাধুর পানে চেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—বাবা, এ কি আমার সেই লীনা? এ রকম দুষ্টু কি ক'রে হ'ল?

সাধু একটু হেসে বললেন—এরই যে দরকার হ'য়েছে মা! এখনই কি দেখছো? দুষ্টুমীতে এই ত সবে ওর হাতে-খড়ি! আর একটু বড় হোক, তখন দেখবে তোমার লীনার কাণ্ড!

মা আর কি ব'লবেন? তিনি সাধুর কথা শুনে চুপ ক'রেই রইলেন। সাধুর হাতেই যখন মেয়েকে মানুষ ক'রবার জন্যে তুলে দিয়েছেন, তখন ত আর বলতে পারেন না—আমার মেয়েকে যেন দুরন্তপনা শেখাবেন না, বাবা!—তা-ছাড়া, ছেলে-মেয়েকে মানুষ করার মানে ত আর শুধু খাইয়ে-পরিয়ে বড় ক'রে তোলা নয়—তাদের খেলা-ধূলা, পড়া-শুনা, লোকের সঙ্গে মেলা-মেশার ধারা—এ সবও ত শেখাতে হবে! কাজেই ঝর্ণারাণী সাধুর ওপরেই মেয়ের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাই উচিত মনে ক'রলেন।

সাধু লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েকে কি যে শেখান, তা তিনিই জানেন; কিন্তু দিনের পর দিন মেয়েটির প্রতাপ বাড়তেই লাগলো। তিন বছরের মেয়ের দৌড়-ঝাঁপ দেখে আর তার মুখে তেজের কথা শুনে সকলেরই তাক লেগে গিয়েছিল; আরও দু'বছর যেতেই মেয়েটির অদ্ভুত ক্ষমতা সারা পাহাড়পুরীটাকেই বিস্মিত ক'রে তুল্‌ল!

এক দিন হ'য়েছে কি শোন:—লীনা সাধু-দাদুটির জন্যে পাহাড়ে ফুল তুলতে গিয়েছে, হাতে আছে তার ছোট একটি ফুলের সাজী; সঙ্গে আর কেউ নেই, সে একাই একটি একটি ক'রে লাল করবী ফুল তুলছে, আর তার হাতে-ঝোলান সাজীতে রাখছে, এমন সময় 'হিস্ হিস্' শব্দ ক'রে নীল রঙের একটা পাহাড়ে সাপ সোজা হ'য়ে একবারে লীনার মুখখানির সামনে ফণা তুলে দাঁড়ালো! লীনা জানতো, এই জাতের সাপগুলো ভারি শঠ, মানুষের চোখের ওপর এদের বড্ড লোভ; তাই তাড়িয়ে-ধ'রে চোখে মারে ছোবল! লীনা কিন্তু তার মুখখানার এত কাছে এত বড় সাংঘাতিক সাপটাকে ফণা তুলে দাঁড়াতে দেখেও এতটুকু ভয় পেলে না; শুধু সে জোর গলায়—এইও, সবুর!—এই কথাটি ব'লেই তার বড় বড় চোখ দুটো পাকিয়ে সাপটার পানে তাকালো। কি তার সেই চাহনির তেজ! মনে হ'ল, বুঝি তার চোখের তারা-দুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে, আর তাদের ভেতর থেকে আগুনের হল্‌কা ছিট্‌কে বেরুচ্ছে! সাপের চোখ দুটো বুঝি তাতে ঝলসে গেল; কেন না, একটু পরেই তার কুলোপানা চওড়া ফণাটা আস্তে আস্তে কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে গেল। আর যাবে কোথায়? অমনি লীনা সাঁ ক'রে তার হাতখানা চালিয়ে সাপের সেই কোঁকড়ানো মাথাটা মুঠোয়

ভেতরে চেপে ধরলো ; আর সেই পাহাড়ের গায়ে পাঁচ বছরের এই মেয়েটির সঙ্গে অত-বড় দুর্দ্দান্ত পাহাড়ে সাপটার রীতিমত লড়াই আরম্ভ হ'ল। মুখ ছাড়িয়ে নিতে না পেরে সাপটা তখন তার ল্যাজের দিক দিয়ে মেয়েটির দেহ পাকে পাকে জড়াতে লা'গল। এদিকে পাড়ার সঙ্গীর দল দূর থেকে পাহাড়ের ওপরে লীনাকে দেখতে পেয়ে তার কাছেই ছুটে আসছিল। কাছে এসেই তারা দেখলে এই কাণ্ড! লীনা সাপের মাথাটা জোর ক'রে চেপে ধ'রে আছে, আর সাপটা তার দড়ার মতো লম্বা সবল দেহ দিয়ে লীনার সর্ব্বাঙ্গ জড়াচ্ছে।

দেখেই ত তাদের চক্ষুস্থির! একটু পরেই তারা হে-চৈ সুরু ক'রে দিলে; জন-দুই ছেলে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটলো লীনার মাকে খবর দিতে—'ওগো, শীগ্‌গীর এসো লীনার মা! তোমার লীনাকে সাপে খেয়ে ফেললে।'

মা তা শুনেই ভারী ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ছুটে এলেন। ঝর্ণারাণীর চীৎকার শুনে সাধুও তাঁর আশ্রম থেকে বেরু-লেন। কিন্তু পাহাড়ের সেই জায়গাটিতে এসেই তাঁরা সকলে চু'চোখ কপালে তুলে কি দেখলেন শুনবে?—লীনা একটুও না দমে, কিম্বা সাপের মাথাটা মুঠো থেকে না খুলে, সেই হাতখানি মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাপের জড়ানো দেহটা নিজের দেহ থেকে খুলছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজটি শেষ ক'রেই সাপটাকে যখন সে তফাতে ছুড়ে ফেলে-দিলে, তখন সাপটা হাড়গোড়ভাঙ্গা 'দ'য়ের মতন নির্জ্জীব হয়ে প'ড়েছে, পালাবার শক্তিটুকুও তার তখন নেই!

মা ছুটে এসে মেয়েকে কোলে ক'রে ব'ললেন—কি সর্ব্বনেশে মেয়ে তুই! সাপের সঙ্গে এমনি ক'রে লড়াই করলি?

লীনা এক-মুখ হেসে জবাব দিলে—আমার দোষ কি? আমি ত ফুল তুলছিলুম, কেন ও হতভাগা আমাকে কামড়াতে এলো?

মা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—যদি সত্যিই কামড়াতো, কি করতিস্?

মেয়ে তার বড় বড় চোখ দু'টি ঘুরিয়ে অমনি ব'লে উঠলো—ইস্! কামড়ানো অতোই সোজা কি না? আমার চোখ নেই!

কথাটা মা ঠিক বুঝতে পারলেন না, মেয়ে চোখের কথা ব'ললে কেন? সাধু এই সময় কাছে এসে দাঁড়াতেই ঝর্ণারাণী তাঁর পানে চাইলেন। সাধু ব'ললেন—লীনা ঠিকই বলেছে মা! এই বয়সেই ও চাইতে শিখেছে। প্রত্যেক জীবের চোখে একটা আশ্চর্য্য রকমের আলো আছে। সেই আলোটি যে জ্বালতে জানে—সবই সে দেখতে পায়; জন্তু-জানোয়ারই বলো, আর চোর-ডাকাতই বলো—কেউ তার সামনে মাথা তুল্‌তে পারে না।

সাধুর কথা আর সকলে অবাক হ'য়েই শুনলে, কিন্তু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা কেউ ক'রলে না। সাধুও কৌশল ক'রে কথাটা ঐখানেই চাপা দিলেন; কিন্তু সেই দিন থেকে লীনার শক্তির পরিচয় পেয়ে পাহাড়পুরীর ছেলে-মেয়েরা লীনাকেই তাদের দলের সর্দ্দারণী ব'লে মেনে নিলে।

সেই সময় থেকে নানা ভাবে এই রকম প্রতাপ আর সাহসের পরিচয় দিয়ে লীনা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। তার পানে চাইলেই মনে হয়—যেন কাঁচা সোনায় নির্ম্মিত একটি জীবন্ত প্রতিমা। চেহারায় যেমন তার কোন খুঁৎ নেই, মানুষের জীবনে যা যা দরকার, চেষ্টা ক'রে যেগুলো আয়ত্ত করতে হয়, লীনার তার কোনটির অভাব নেই। কথাবার্ত্তায় তর্ক-বিতর্কে সে হঠে না, দৌড়-ঝাঁপে সে সকলের শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্যভেদে কার সাধ্য তাকে আঁটে? সাঁতারে কেউ তাকে কোন দিন হারাতে পারেনি। লীনার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে এসে পাহাড়পুরীর সব ছেলেকেই হার মানতে হ'য়েছে; সেই দলের কয়েকটা দুর্দ্দান্ত ছেলের হাতের আঙ্গুল লীনা তার কব্জির চাপে জন্মের মত পঙ্গু ক'রে দিয়েছে। কিন্তু এ সব শিক্ষা লীনা যে কখন পেয়েছে, আর এই বয়সেই কেমন ক'রে সে সব বিষয়ে এত বড় ওস্তাদ হ'য়ে উঠেছে—তা কেউ জানে না। সাধু যে তাকে নিজের হাতে সব দিক দিয়ে পাকা-পোক্ত ক'রে তোলবার জন্যে গোড়া থেকে শিক্ষা দিয়ে আসছেন, সে খবর কারও জানা ছিল না; এবং লীনাও তার শিক্ষার কথা কাউকে জানাতো না। মেয়েটি এ-সব বিষয়ে ভারি পাকা! কোন কথা নিয়ে তর্ক

আরম্ভ হ'লে তার মুখে কথার খই ফুটলেও সমবয়সীদের সঙ্গে মিলে-মিশে খেলা-ধূলার সময় ঘরের কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয় না। মনের কথা চেপে রাখবার অভ্যাসটুকুও সে তার সাধু-দাদুর কাছেই পেয়ে এসেছে।

জ্ঞান হ'য়ে অবধি লীনা শুনে আসছে, তার বাপ নেই; জ্ঞান হওয়ার আগেই সে পিতৃহীন হওয়ায় এই সাধুই তাকে দাদুর মত যত্নে পালন ক'রছেন। এ কথাও সে লোকের মুখে শুনেছিল, তার বাবা ছিলেন মস্ত রাজা, রাজবাড়ীতে সে জন্মেছিল; কিন্তু এমনি তার দুর্ভাগ্য যে, সুখের মুখ সে দেখতে পেলে না,—সব হারিয়ে মায়ের সঙ্গে সেই কুঁড়ে-ঘরে আস্তে হ'য়েছে।—কথাগুলো শুনে তার মনটি ভারী মুসড়ে গিয়েছিল। সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না—সত্যিই যদি সে রাজার মেয়ে, তা হ'লে কেন তাদের এমন দুর্দ্দশা হোল।

এক দিন সে সাধু-দাদুর কাছে কথাটা পাড়লে; মুখখানা ভার ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—হাঁ দাদু, সত্যিই আমি রাজার মেয়ে? আমার বাবা ছিলেন কি সত্যই কোন রাজা, আমার মা ছিলেন তাঁর রাণী? তবে আমাদের এ দশা কেন? কেনই বা মাকে এত কষ্ট করতে হয়? আর আমিই বা কেন সুতো কেটে কাঁধে ব'য়ে হাটে-বাজারে তা বিক্রী করতে যাই?

লীনার মুখে এই সব কথা শুনে সাধুর মুখখানা সে-দিন এমনই গম্ভীর হ'য়েছিল যে, লীনা আর কোন দিন তাঁর সে-রকম মুখ দেখেনি। সেই দিন সাধু এই মেয়েটিকে যে-সব কথা ব'ললেন, আর যে-রকম ক'রে তার দুটো কাণের ভেতর ছিপি এঁটে দিলেন—লীনা কোন দিন তা ভোলেনি, আর সে-ছিপি খুলতে কোন দিন সে চেষ্টাও করেনি।

সাধু সে-দিন লীনাকে এই ব'লে বোঝালেন—আগেকার কথা সব ভুলে যাও, শুধু একটা কথা মনে রাখো দিদি—জ্ঞান হ'য়ে অবধি যা দেখছো, সেটা নির্ঘাত সত্যি। তোমার মায়ের কষ্ট, তোমার কষ্ট, এ ত সবই দেখা যাচ্ছে। এ কষ্ট তোমাকে ঘুচোতে হবে। গায়ের জোরে, বুদ্ধির জোরে, মনের বলে একটা মস্ত রাজ্যের সিংহাসনে তোমাকে ব'সতে হবে। পরের কথায় কাণ দেবে না। কোন কথা বুঝতে না পারলে আমাকে বলবে, আমি তোমার মনের ভার নামিয়ে দেব। আর ঠিক সময়ে আমি তোমাকে সবই বুঝিয়ে ব'লব।

লীনা মুখখানি নীচু করে ব'লল—তাই হবে দাদু! আমি আর কারও কথায় কাণ দেব না; দুটো কাণেই ছিপি এঁটে দিলুম।

সেই থেকে বছরের পর বছর চলে গেছে, কিন্তু আর কোন দিন সাধু-দাদু লীনার কাজে এমন কোন কসুর পাননি, যাতে তাকে আবার সতর্ক করবার দরকার হয়। সাধুও ভুলে যাননি যে, এক দিন লীনাকে তাদের অতীত সব কথা নিজের মুখেই বলতে হবে।

লীনার বয়স বারো বছর পূর্ণ হ'তেই এক দিন সাধু-দাদু তাকে তাঁর কাছটিতে বসিয়ে আগেকার সমস্ত কথা একটি একটি ক'রে শুনিয়ে দিলেন। তার দাদুর কথা, দিদিমার কথা, মায়ের ছেলেবেলাকার কথা, বাংলাদেশের রাজার কথা, রাণী হ'য়ে তার মায়ের যে সৌভাগ্য হয়েছিল, রাণীর সতীন মনে মনে কি ভাবে তাঁকে হিংসা ক'রত; তার, আর নীলার জন্মকথা, রাজার অকালমৃত্যু, তার ফলে নীলার দাদুর চক্রান্ত, তার পর লীনাকে বাঁচাবার জন্যে কি ক'রে তার মা পাহাড়পুরীতে পালিয়ে আসেন—সবই তাকে শুনিয়ে দিলেন।

এবার লীনার চোখ দুটো যেন ধক্-ধক্ ক'রে জ্বলে উঠলো। বুকখানা ফুলিয়ে ঘাড়টি বাঁকা ক'রে সে জোর গলায় ব'লল—আমি এর শোধ নেব দাদু!

দাদু ব'ললেন—হাঁা, দিদি, এই জন্যেই তোমাকে আমি নিজের হাতে গ'ড়ে তুলেছি। এইবার ভাব দিদি, তোমার মা ছিলেন রাজরাণী, তুমি রাজকন্যা, রাজার প্রাসাদে তুমি ভূমিষ্ট হয়েছ, অন্যায় ক'রে দুষ্টরা তোমাদের ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রছে। দারুণ কষ্টের ভেতর দিয়ে তুমি মানুষ হয়েছ, শিক্ষা পেয়েছ, শক্তি পেয়েছ,—বুঝতেও পেরেছ সব। এইবার তোমাকে প্রস্তুত হ'তে হবে।

লীনা গুরুর পায়ের গোড়ায় মাথা রেখে ব'ললে—আশীর্ব্বাদ করুন দাদু, মা'র কষ্ট যেন ঘুচোতে পারি। আমার বাবার সিংহাসনে আমি বসাব আমার দুঃখিনী সর্ব্বহারা মাকে!

ওদিকে লীনারই মত চেহারা নিয়ে লীনার বোন নীলা

বাংলার রাজপ্রাসাদে থেকে কি রকম শিক্ষা পেয়েছিল, কি ভাবে তাদের সুখের দিন চলেছে, তার পর দুই বোনের অদৃষ্ট কোন্ পথে চল্‌তে সুরু ক'রলে—সে কাহিনী আগামী বার তোমরা শুনতে পাবে।

—গল্পদাদু।

হঠাৎ যদি

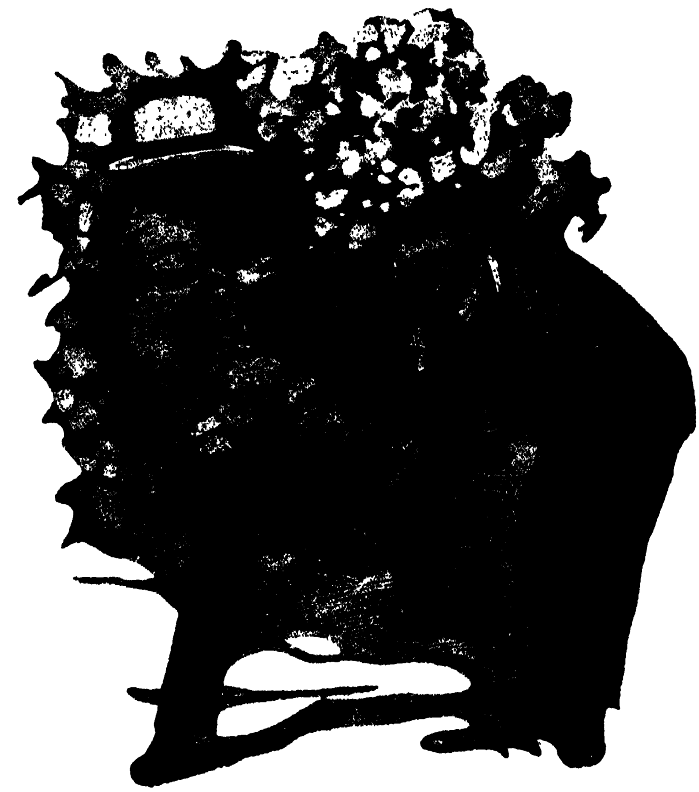
বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—এর চেয়ে বড় সত্য কথা আর নাই! শৃগালের বুদ্ধি-কৌশলের কাছে দুরন্ত পশুরাজ এবং পরাক্রান্ত গজরাজের পরাজয়ের বহু কাহিনী তোমরা নানা বইয়ে পড়িয়াছ, নিশ্চয়! আজ আমরা মানুষের বুদ্ধি-কৌশলের কথা বলিতেছি।

আজ পথে চলিবার সময় সে-কালের মতো সামনে দস্যু-সর্দ্দার আসিয়া হঠাৎ হানা না দিলেও নির্জ্জন পথে-ঘাটে গুণ্ডা-বদমায়েসের অতর্কিত আক্রমণ যে ঘটে না, এমন নয়! লাঠি বা রিভলভার হাতে লইয়া আমরা পথ চলি না। কাজেই এমন অতর্কিত আক্রমণে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিব?

পথে চলিয়াছ, বাঁকের আড়ালে বদমায়েস লোক ওৎ পাতিয়া আছে, যেমন তুমি মোড়ে আসিবে, অমনি আক্রমণে তোমাকে বিধ্বস্ত করিবে। বদমায়েসের অস্তিত্ব বা মনোভাব তুমি জানো না—তোমার হাতে না আছে একগাছা লাঠি বা ছড়ি বা ছাতা! বলো তো, মোড়ের মাথায় আসিবামাত্র হঠাৎ যদি সে তোমায় আক্রমণ করে, কি করিয়া তুমি সে-আক্রমণ রোধ করিয়া নিজেকে বাঁচাইবে?

আচম্‌কা এমন আক্রমণে দুর্বৃত্তের তলপেটে সজোরে ঘুষি মারিবে; কিম্বা সুবিধা থাকিলে জুতাশুদ্ধ জোর-লাথি! এ ঘুষিতে বা এ লাথিতে দুর্বৃত্ত যত বড় জোয়ান-ই হোক, তাকে ভূতলশায়ী হইতেই হইবে। একটা কথা মনে রাখিয়ো, যে আক্রমণ করিবে, ঘুষি বা লাথি খাইবার কল্পনা সে করে নাই, কাজেই এ অবস্থায় এইটিই আত্মরক্ষার মোক্ষম্ উপায়।

তোমার হাতে যদি ছাতা থাকে, তাহা হইলে জানিবে, তোমার হাতে মহা-অস্ত্র আছে! ছাতা এ-অবস্থায় আত্মরক্ষার অমোঘ উপায়। তবে ছাতাটিকে লাঠির মতো ধরিয়া ব্যবহার করিতে বা দুর্বৃত্তকে মারিতে যাইয়ো না। মোড়া-ছাতার জোর খুব কম; ছাতা ধরিয়া দুর্বৃত্তের মুখে বা পেটে সজোরে খোঁচা দিবে! চিবুকের নীচে যদি খোঁচা মারিতে পারো, আরো ভালো!



হাঁটুর গুঁতায় বিপত্তি-মোচন

তার পর লাঠি—বাবু-লাঠি হোক, মোটা-লাঠি হোক—লাঠি মারিয়া আক্রমণ-রোধের বিশেষ বিধি আছে। সে-বিধি,—

১। লাঠির খোঁচা মারিতে হইবে শত্রুর চিবুকের নীচে।

২। লাঠির হাতলের দিক দিয়া (পরের পৃষ্ঠার ছবি)




গলায় লাঠি

ছাতার খোঁচা



শপাং বেণ্ট্



ছাতার রকমফের



খোঁচার আর-এক ধারা



পায়ে লাঠির ভাণ্ডল

মুখে সবেগে আঘাত। লাঠিকে একটু কাৎ করিয়া এ-আঘাত দিতে হইবে।

৩। লাঠির হাণ্ডেল দিয়া দুর্বৃত্তের হাঁটু ঘিরিয়া জোরে হ্যাচ্‌কা-টান্‌। যত-বড় জোয়ান দুর্বৃত্ত হোক,

এ-টানে তাকে ধরাশায়ী হইতেই হইবে! আক্রমণ করিয়া দুর্বৃত্ত যদি তোমাকে চাপিয়া আঘাত করে, এমন বে-কায়দায় নিজের দাঁতগুলির সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিয়ো না—শত্রুর দেহে যেখানে পারো, সজোরে একেবারে মরণ-কামড় দিয়ো।

চপেটাঘাত প্রায়ই নিষ্ফল হয়; কারণ, দুর্বৃত্তদের লোহার মতো দেহে কঠিন চপেটাঘাত পুষ্প-বর্ষণের মতো লঘু হইয়া বাজে। ঘুষি—বজ্র-মুষ্টির ঘুষি আশু ফলপ্রদ।

হুইলটি যেন হাতের নাগালে থাকে! যারা মোটর-যাত্রীকে আক্রমণ করে, পথে তারা গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া বা মোষের গাড়ী খাড়া করিয়া আগে হইতেই পথ বন্ধ করিয়া রাখে। পথিমধ্যে দূর হইতে যদি এমন বাধা ছাখো, আক্রমণের আশঙ্কা বুঝিয়া সতর্ক হইবে। বাধা দেখিয়া মোটর থামাইবামাত্র এ-সব দুর্বৃত্ত ঝোপ-ঝাপের গোপন অন্তরাল হইতে আসিয়া আক্রমণ করে। বিলাতে এ-ঘটনা প্রায় নিত্যকার ব্যাপার। আমাদের দেশেও আমরা যেমন



তলপেটে গুঁতা



তবে ঘুষি মারিতে হইবে শত্রুর পেটে, নাকে, রগে। যদি মুখের নাগাল না পাও, তাহা হইলে তল-পেটে ঘুষি মারিবে। সেফ্‌টী-পিন, টাই-পিন—শত্রুর অঙ্গে আমূল বিঁধিয়া দিবার সুযোগ পাইলে তার সদ্ব্যবহারে কদাচ কাল-বিলম্ব করিবে না। হাতের আঙুলে নখ থাকিলে সেই-নখে বিঁধিয়াও পথে অনেকে এ-সব শত্রুর আক্রমণ বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছেন। অস্ত্র-হিসাবে আমাদের এই হাতের নখগুলি তুচ্ছ নয়!

নির্জ্জন জঙ্গল-পথে মোটর-যাত্রীকে এখনো মাঝে মাঝে দুর্বৃত্তের হাতে চোট্‌ খাইতে হয়। জঙ্গল-পথে মোটর চালাইবার সময় হুঁশিয়ার থাকা কর্ত্তব্য—ষ্টীয়ারিং

ছোট বাক্সে ঘুষি বাঁচে

বহু বিলাতী আচার আমদানি করিয়া সে সব আচারকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছি, আমাদের দেশের দুর্বৃত্তদের মধ্যেও অনেকে তেমনি এই বিলাতী দুর্বৃত্ততার আমদানি করিয়াছে। এ-জন্য নির্জ্জন বন-পথে মোটর-যাত্রীর উচিত, হুঁশিয়ারভাবে মোটর-পরিচালনা। গাড়ীতে লাঠি রাখা উচিত। ষ্টীয়ারিং-হুইল, ক্যামেরা-ষ্ট্যাণ্ড, কাঁচের শিশি—এগুলাও অস্ত্রহিসাবে সে সময় চমৎকার! কোমরের বেল্ট এ-যাত্রায় চমৎকার অস্ত্র!

মোটর-যাত্রীর উচিত, গাড়ীতে খানিকটা তার রাখা। আকস্মিক আক্রমণে তার দিয়া কৌশলে যদি দুর্বৃত্তকে একবার ঘিরিতে পারা যায়, তার পর তারের ফাঁশ টানিলে মরণ-যাতনা সহিয়া দুর্বৃত্ত পলায়নের পথ খুঁজিবে!

আত্মরক্ষার কয়েকটি মাত্র উপায়ের কথা আমরা মোটামুটি বলিলাম। অন্য উপায়? ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।

তবে একটি কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়ো, হঠাৎ যদি কোনো দুর্বৃত্ত এ-ভাবে আক্রমণ করে, বুদ্ধি যেন ভয়ে লোপ না পায়! বুদ্ধি হারাইলে কৌশল করিবে কিসের জোরে?

শক্তি-পরীক্ষা

জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিব, বিদ্যা শিখিয়া পণ্ডিত না হইলেও কৃতিত্বে অনেকে অসাধারণত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। নেপোলিয়ন, সিসিল রোড্স্—ইহাঁরা দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন না; তবু যে-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, বহু পণ্ডিতের ভাগ্যে সে কীর্ত্তির সিকিও জোটে না! বহু ক্ষেত্রে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদীর গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়!

কেন এমন হয়? লেখাপড়ায় যার মাথা খেলে না, মন খেলে না, কি করিয়া তার মাথা ও মন এতখানি শক্তির পরিচয় দেয়?

এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বহু অনুশীলন করিয়াছেন। তাঁরা বলেন, এক জন যে-কাজ করিয়াছেন, অন্য জনের পক্ষে সে-কাজ দুঃসাধ্য বা অসম্ভব হইবার কোনো কারণ থাকিতে পারে না।

এ অনুশীলনের ফলে জানা গিয়াছে, আমাদের সকলের শক্তি বা মন এক দিক দিয়া একই পথে বিকাশ লাভ করে না। অঙ্কে কারো মাথা খোলে; কারো মাথা খোলে কলকব্জা তৈরী করার দিকে; আবার কারো মাথা খোলে গান-বাজনায় বা ললিত-কলায়।

কার কোন্ দিকে মাথা খুলিবে, আগে হইতে বুঝিয়া তাকে যদি কিশোর-বয়স হইতে সেই দিকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তার শক্তি বা প্রতিভার বিকাশ অসাধারণ হইতে পারে।

বিশু লেখাপড়ায় অমনোযোগী; ক্লাশে কোনো দিন সে পড়া বলিতে পারে না, তার জন্য নিত্য বকুনি খায়, মার খায়, নীল-ডাউন হয়—অর্থাৎ ক্লাশে তার শাস্তির আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। অথচ বিশু হয় তো চমৎকার গান গায়, ছবি আঁকে; কিম্বা কাদা-মাটী লইয়া আশ্চর্য্য নিখুঁৎভাবে নানা রকমের মূর্ত্তি গড়িতে পারে! কিম্বা যন্ত্রপাতির সূক্ষ্ম কারিগরি বুঝিতে সে ওস্তাদ! বিশুর এ শক্তির দিকে না চাহিয়া বিশুর মা-বাপ যদি তার পিছনে দু'-তিন জন টিউটর রাখিয়া রুটিন বাঁধিয়া তাকে বইয়ের পাতায় গুঁজিয়া বিদ্যা গিলাইতে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে ঘষিয়া-মাজিয়া বড়-জোর সে না হয় একটা পাশ করিবে! তার পর? যেদিকে তার শক্তি, সেদিকটা বন্ধ হইয়া একদা হয় তো কোনো মার্চ্চেণ্ট-অফিসের দ্বারে গিয়া কেরাণীগিরির উমেদারী করিবে। ফলে তার ইহ-জন্মটা মাটী হইয়া যাইবে!

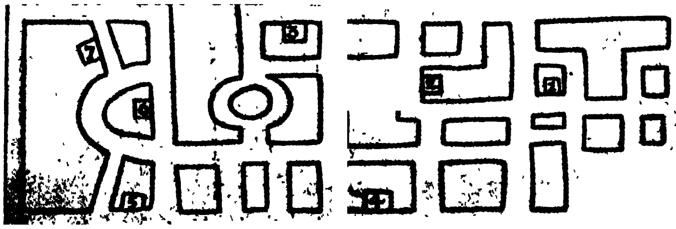
বৈজ্ঞানিক সাধনায় বিশেষজ্ঞেরা আজ ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক শক্তির মাপ কষিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁরা বলেন, শক্তির পরীক্ষা করিয়া মাপ কষিয়া ছেলেমেয়েকে ঠিক ভাবে চালনা করো, দেখিবে, সে ছেলেমেয়ে কৃতী হইয়া ধন-মান লাভ করিয়া কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য গড়িয়া তুলিবে।

আমাদের নিত্যকার জীবনে দেখিতে পাই—ধরো, একটা গল্প পড়া হইল! এক জন ছেলে তার সূক্ষ্ম মর্ম্মটুকু চট্ করিয়া বুঝিল; আবার অন্য ছেলে গল্প শুনিয়া তার কিছুই বুঝিল না! মোটর-গাড়ী কি করিয়া চলে—বুঝাইয়া দিলে চট্ করিয়া শ্যাম সে কৌশল বুঝিয়া লয়; গোপাল কিন্তু শতবার বলিলেও তাহা বুঝিতে পারে না, হাঁ করিয়া মুখের পানে তাকাইয়া থাকে! আবার ভাষাতত্ত্ব ধরো, গোপাল চট্ করিয়া রাজ্যের 'এটিমলোজি' আওড়াইয়া যাইবে, শ্যাম তখন হাঁ করিয়া মূঢ়ের মতো মুখের পানে চাহিয়া থাকিবে!

কোন্ ছেলের কি শক্তি,—বৈজ্ঞানিকের দল পরীক্ষায় আজ তাহা নির্ণয় করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তাঁদের পরীক্ষার দুই-চারিটা প্রণালীর কথা বলিতেছি। সে

প্রণালী অবলম্বন করিয়া তোমরাও অনায়াসে নিজেদের এবং বন্ধু-বান্ধবের মনন-শক্তির পরীক্ষা লইতে পারো।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। ধরো, তোমাদের বন্ধু শৈলেশ পূজার ছুটীতে হাজারিবাগে গিয়াছে। হাজারিবাগ হইতে সে চিঠি লিখিল, "এক দিন পাহাড়ে চড়িয়া-

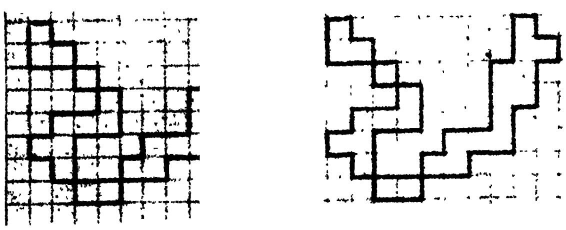


১। বাড়ী-গাড়ী-গেরাজ

ছিলাম। নামিবার সময় কি করিয়া বেটক্করে পড়িয়া গিয়া একখানা হাত ভাঙ্গিয়াছি।"

ব্যস্, এইটুকু! বলো তো, শৈলেশ পড়িয়া কোন্ হাত ভাঙ্গিয়াছে?

অনেকেই এক-নিমেষে উত্তর দিবে—বাঁ হাত! কারণ, ডান হাত ভাঙ্গিলে শৈলেশ চি



২। একটি ছাঁদ

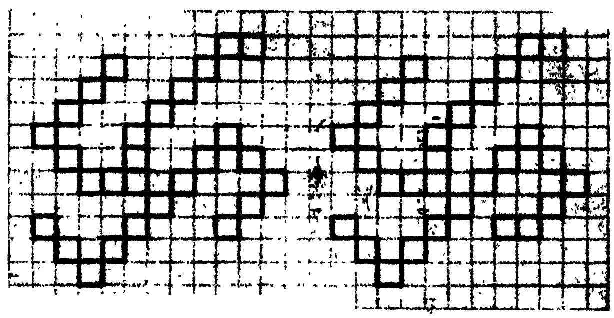
লিখিতে পারিত না। অনুমানে নির্ভর করিয়া এই যে উত্তরটুকু দিলে, এ উত্তরে সহজ-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

এটি গেল খুব সহজ প্রশ্ন। এখন দু'-একটি কঠিন প্রশ্নের কথা তুলিতেছি।

১ নং ছবি দেখিতেছ—'×' চিহ্নটির অর্থ মোটর-গাড়ী; গাড়ীটি আছে গেরাজের মধ্যে। গেরাজ হইতে এ-গাড়ী বাহির করিয়া ডান-দিককার পথ দিয়া চালাইয়া লইয়া যাও। এমন ভাবে চালাইতে হইবে, গাড়ী যেন ১, ২, ৩ বা অন্য সংখ্যাবিশিষ্ট বাড়ীগুলির পাশ দিয়া যায়। বাঁ-দিক ছাড়িয়া গাড়ী একদম্ ডান দিকে চালাইতে পারিবে না; আবার বাড়ীগুলির প্রত্যেকটি থাকিবে তোমার গাড়ীর বাঁ-দিকে।

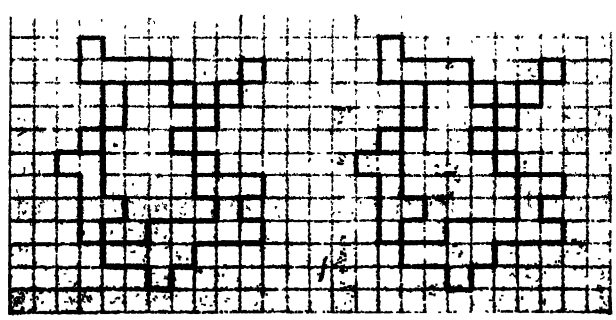
কাগজে রেখা টানিয়া গাড়ী-গেরাজ আঁকিয়া ছবির নির্দ্দেশ-মতো বাড়ীতে পরখ করিয়া দ্যাখো! যে যত শীঘ্র এ-কাজে সাফল্য লাভ করিবে, জানিয়ো, তার বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ!

তার পর দ্যাখো ২, ৩ আর ৪ নং ছবি। প্রত্যেকটি ঘরে দু'টি করিয়া প্যাটার্ণ বা ছাঁদ আছে। প্রতি প্যাটার্ণ-জোড়ায় অল্প-বিস্তর পার্থক্য



৩। আর-একটি ছাঁদ

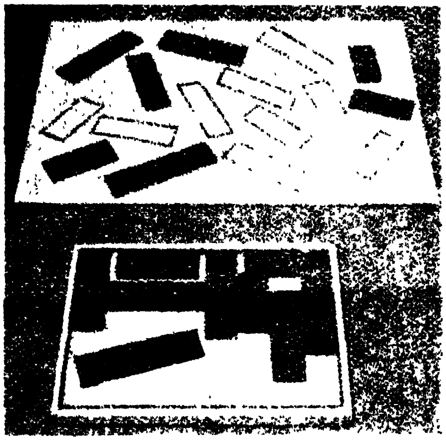
আছে। চট্ করিয়া দশ সেকেণ্ডের মধ্যে বলিয়া দাও, কি এবং কোথায় সে পার্থক্য! বলিতে দশ সেকেণ্ডের চেয়ে বেশী সময় লাগিলে হার হইল, জানিবে।



৪। আর একটি

এবার ৫ ও ৬ নম্বর ছবি দ্যাখো। এ পরীক্ষার জন্য একখানি ট্রে চাই, আর চাই ষোল-খানি কার্ডবোর্ডের টুকরা। টুকরাগুলি ছবির টুকরার আকারে কাটিয়া লইতে হইবে। এবার যদি তোমাদের বলি, কার্ডবোর্ডের টুকরাগুলি ট্রেতে

তুলিয়া রাখো। যে-সব ছেলের প্রকৃতি অলস বা এলোমেলো, কাজে ছাঁদ রাখিবার দিকে যাদের লক্ষ্য নাই, কোনো মতে কাজ সারিতে পারিলেই হইল, সে-সব ছেলে, দেখিয়ো, কার্ডবোর্ড রাখিবে ঐ ৫ নম্বর ছবিতে উপর-দিকে যেমন করিয়া টুকরাগুলা রাখা



৫। আনাড়ির হাত

হইয়াছে, তেমনি ভাবে; তাদের চেয়ে যারা একটু ধীর এবং বুদ্ধি-কৌশল দেখাইতে পটু, তারা রাখিবে ৫ নম্বর ছবির নীচের দিককার ভঙ্গীতে। যে-সব ছেলের মন আর্টের দিকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার দিকে যাদের



৬। বাঁদিকে পটুতার নিদর্শন

সহজ লক্ষ্য আছে, তারা রাখিবে ৬নং ছবির বাঁ-দিককার সজ্জা-ভঙ্গীর ছাঁদে। জানিয়ো, শেষোক্ত দলের ছেলে-মেয়েরা শিল্পকর্ম্মে পটুতা লাভ করিবে।

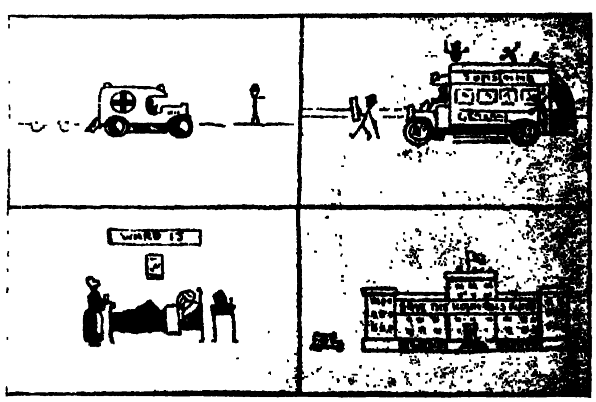
কে কত শীঘ্র কাজ করিতে পারো, যদি তার পরীক্ষা লইতে চাও ৭নং ছবিখানি ছাখো। টেবিলের উপর ছ'সারে কতকগুলি 'ডাঁটি' দেখিতেছ, আর দেখিতেছ কতকগুলা আঙুস্ত্রা (thimbles)। কে কত শীঘ্র ঐ ডাঁটির মাথায় আঙুস্ত্রাগুলি বসাইতে পারো,—ছাখো তো! যার দেরী হইবে, সে অকর্ম্মা; যে চট্ করিয়া পারিবে, সে কুশলী।

এবার বুদ্ধি-পরীক্ষার আর একটি পর্ব্ব বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করি। ৮নং ছবিখানি ছাখো। একটিতে আছে এম্বুলান্স গাড়ী; আর একখানিতে আছে দোতলা-বাস; তৃতীয় ছবিতে আছে



৭। আঙুস্ত্রা ও ডাঁটি

হাসপাতালে রোগীর শয্যা; চতুর্থ ছবিতে হাসপাতাল-বাড়ী। এ চারখানি ছবি এলোমেলোভাবে সাজানো



৮। ছবিতে গল্প

আছে। সঠিক ভাবে সাজাইতে পারিলে এ চার-খানি ছবিতে ছোট একটি গল্প মিলিবে! ছবিগুলি

দেখিয়া পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে বলিয়া দাও, কোন্ ছবির পর কোন্ ছবি বসিবে। পাঁচ সেকেণ্ডে যদি বলিতে না পারো, তাহা হইলে তুমি ফেল!

বই পড়ার নিয়ম

তোমাদের মধ্যে যারা বই পড়তে ভালোবাসো, তাদের পক্ষে জীবন কোনো দিন দুর্ব্বহ-ভার বলে মনে হবে না। কারণ, বইয়ের মতো বন্ধু মানুষের আর নেই! দুঃখে-শোকে সান্ত্বনা দিতে, কাজের সময় উৎসাহ বা শক্তি জোগাতে বইয়ের শক্তি অসাধারণ। অবশ্য যা-তা বইয়ের কথা বলছি না,—ভালো বইয়ের কথা বলছি। ভালো বই কাকে বলে, সে কথা আর-এক দিন বলবো। বই যাদের ভালো লাগে না, আজ শুধু তাদের উদ্দেশ করে ক'টি কথা বলতে চাই।

প্রথম, তোমাদের মধ্যে যারা ছেলে, তাদের কাজ, স্কুলের পড়া তৈরী করা। মেয়েদের মধ্যে স্কুলের পড়ার উপর অনেককে ঘরের পাঁচটা কাজ করতে হয়—ছোট ভাইবোনদের দেখা-শুনা, সংসারের কাজে মাকে ও দিদিদের সাহায্য করা। তবে যত কাজই করো, স্কুলের বইয়ের বাহিরে আরো যে-সব বই আছে, এ-বই সকলেরই পড়া প্রয়োজন। জগতের কোথায় কি ঘট্‌ছে,—তা ছাড়া বিজ্ঞানে, সাহিত্যে কত নতুন নতুন কথা নিত্য প্রচারিত হচ্ছে, এ সবের সঙ্গে পরিচয় না হ'লে মানুষের মন প্রসারিত হয় না, মন ছোট থেকে যায়; মানুষে আর পশুতে তফাৎ থাকে না!

বাইরের বইয়ে যাদের মন বসে না, তারা প্রথমে এক কাজ করো। প্রত্যহ খপরের কাগজ পড়া অভ্যাস করো। দেশ-বিদেশের খপর পড়বার সময়—পারো যদি একখানি ম্যাপ আর অভিধান কাছে রেখো। তা হ'লে কাগজ-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপ দেখে বহু দেশ-বিদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং নতুন নতুন অনেক কথা শিখতে পারবে। জগতে কোনো শিক্ষা নিষ্ফল হয় না, এ-কথা সব সময়ে মনে রাখবে। খপরের কাগজ যদি নিত্য-দিন পড়ো, তা হ'লে সকল-দিককার সকল পরিচয় তোমাদের নখদর্পণে থাকবে।

তার পর মাসিক-পত্র। তবে এগুলি পড়বার আগে একটু বাছ-বিচার করা দরকার। বাড়ীতে মা-বাবা কিম্বা দাদা-দিদিদের জিজ্ঞাসা করো, তাঁরা তোমাদের উপযোগী মাসিক-পত্রাদি বেছে দিতে পারবেন। সেই সব মাসিকপত্র পড়বে।

পড়ার অভ্যাস করতে হ'লে কতকগুলি নিয়ম মানা চাই। সে নিয়মগুলির কথা বলি,—

১। যে রকম জিনিষ পড়তে ভালো লাগে, আগে সেই রকম বই বা লেখা পড়তে আরম্ভ করো। যে-সব নতুন তত্ত্ব জানতে চাও, আগে সেই-সব পড়ো—তার পরে পড়ো সেই সব কথা, যে-সব কথা জানা উচিত। যে-সব লেখা পড়তে রুচি হয় না, তা পড়বার চেষ্টা করলে পড়া-ব্যাপার পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে! সকলের পক্ষে রুচি বদলানো সম্ভব নয়। তবে রুচি-বদলানোতে যে-শক্তির প্রয়োজন, সে শক্তি-সাধনায় উপকার আছে, সন্দেহ নেই।

২। ইতিহাস ভূগোল পড়ো। নিজের দেশের পুরাণ-ইতিহাস সযত্নে পড়া চাই। একসঙ্গে অনেকগুলি বই পড়বার চেষ্টা করো না। যা পড়বে, ধীরে ধীরে পড়ো। পড়ে সব বোঝা চাই। না হ'লে পড়ে কোনো লাভ নেই।

৩। বাড়ীতে একখানি ভালো ডিক্সনারী আর ভালো এ্যাটলাশ থাকা চাই। কোনো নতুন কথার সঙ্গে পরিচয় হ'লে যদি তার মানে না জানো, তখনি ডিক্সনারী খুলে মানে দেখবে। সে-কথার মানে কাকেও জিজ্ঞাসা করে জানতে যেয়ো না। ডিক্সনারী থেকে মানে দেখায় লাভ হবে এই যে, একটি নতুন কথার সঙ্গে আরো দু'-দশটা নতুন কথা শিখতে পারবে।

মানে না জেনে কোনো কথা ছেড়ে দিয়ো না। মন তাতে চিরদিন পঙ্গু দুর্ব্বল থাকবে, মূর্খতা কোনো দিন ঘুচবে না।

বাইরের বই পড়বার জন্য একটা সময় নির্দ্দিষ্ট রুটিনে বেঁধে রাখবে। শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য খেলাধুলার যেমন প্রয়োজন, মনের স্বাস্থ্যের জন্য স্কুলের পড়ার উপরে বাইরের বই পড়ার প্রয়োজনও ঠিক ততখানি।

যে-বই ভালো লাগবে, পয়সার সামর্থ্য থাকলে সে

বই কিনেবে। বই কিনে ছোট একটি লাইব্রেরী যদি গড়ে তুলতে পারো, তা হ'লে জেনো, জীবনে মস্ত বন্ধু পেলে! উপকার ছাড়া এ-বন্ধু কোনো দিন এতটুকু অপকার করবে না; মনে এক-তিল আঘাত দেবে না।

যে-বই পড়া দরকার, শুধু সেই বই কিনবে। তবে পড়বার আগে বোঝা যাবে না তো, কোন্ বই ভালো এবং কেনবার যোগ্য! কাজেই কেনবার সময় যাঁদের মতের উপর বিশ্বাস আছে, তাঁদের মত নিয়ে বই কিনবে। এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন,—One book read is worth a dozen books looked at দশখানি বইয়ের পাতা উল্টে যে-ফল পাবে না, একখানি বই পড়লে তার চেয়ে অনেক বেশী উপকার পাবে! এ কথাটি মনে রেখো।

বই কেনবার সময় নতুন সংস্করণ দেখে বই কিনো। ইতিহাস, ভ্রমণ-কাহিনী, সহজ বিজ্ঞানের বই, এ্যাড-ভেঞ্চার, দেশ-বিদেশের কাহিনী—এ বইয়ের স্থান আর-সব বইয়ের উপরে! তার পর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক। তবে ছেলে-বয়সে নাটক-উপন্যাস না পড়লে ক্ষতি নেই। কারণ, সে-সব বইয়ে মনস্তত্ত্বের যে-সব জটিল কথা আছে, সংসার এবং লোকজনের যে-পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে—জীবনের সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না হ'লে নাটক-নভেল পড়ে সে-সবের মর্ম্ম ঠিক বুঝতে পারবে না; নাটক-নভেলের যে দিকটা খেলো এবং রসালো, তার ছোঁয়াচ লেগে মনে অস্বাস্থ্যের সঞ্চার হতে পারে!

সে-কালে আমাদের দেশে দেখেছি, ছেলেমেয়েরা রামায়ণ-মহাভারত পড়ে' প্রায় তা কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলতো। এ যুগে অনেক ছেলেমেয়ের ও-দু'খানি বইয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই, দেখি। এর চেয়ে বিসদৃশ ব্যাপার কল্পনা করা যায় না! রামায়ণ-মহাভারত পড়তেই হবে আর-সব বই পড়বার আগে। তাতে শুধু নীতি-শিক্ষা হবে, তা নয়; এদেশের প্রাণের তত্ত্ব—ও-দুখানি বই পড়লে বুঝতে পারবে। কথা আছে—'যা নেই (মহা) ভারতে, তা নেই ভারতে!' রামায়ণ-মহাভারত পড়া থাকলে বড় হয়ে বুঝতে পারবে, নানা জটিল মনস্তত্ত্ব, ঘরোয়া প্রীতি-বিরোধ, কূট রাজনীতি—এ-সবের সমস্ত তত্ত্ব আমাদের ঐ রামায়ণ-মহাভারতে লেখা আছে।

অনেকের বাড়ীতে লাইব্রেরী আছে, জানি। কিন্তু লাইব্রেরী থাকা এক; আর সে লাইব্রেরীর বই পড়া আর-এক জিনিষ। বাড়ীতে ভালো কুয়ো আছে—সে কুয়ো নিত্যদিন চোখে দেখি, কিন্তু সে-কুয়োর ভালো জল যদি পান না করি, তা হ'লে কুয়ো রেখে কি লাভ? সে-কালের মা-দিদিমা, পিশিমা-ঠাকুমা'রা নিত্য সন্ধ্যায় বসে গল্প বলতেন। রাজার গল্প, রাজকন্যার গল্প। সে-গল্প শুনে ছেলে-মেয়ের মন কল্পনাকুশল হতো, তারা চিন্তা করতে শিখতো। আজ অনেক বাড়ীতে গল্পের সে-পাট উঠে গেছে! সে জন্য আজকাল ছেলেমেয়ের মন মরুভূমির মতো নীরস রুক্ষ হচ্ছে—ছেলে-মেয়ের মনে কল্পনার ফানুশ দোলে না, তাদের মন বাস্তব গণ্ডী ছেড়ে কল্পনা-লোকে বিচরণ করতে পারে না! দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নেই। বাড়ীতে আবার সেই গল্পের আসর বসাতে হবে; সে-গল্প শুনে ছেলে-মেয়ের মন কল্পনা-কুশল হবে।

পূর্ণকাম

মোক্ষপদে লক্ষ্য যার,
উপলক্ষ এ সংসার—
নহে নিঃস্ব; সারা বিশ্ব
শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তার।

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ।

ভীষণ-দর্শন সামুদ্রিক মৎস্য

(প্রাণিতত্ত্ব)

'রাক্ষুসে-রাই' নামক সামুদ্রিক মৎস্য অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন অংশের অধিবাসীর নিকট 'শয়তান-রাই' নামেও পরিচিত। বলা বাহুল্য, আমাদের পশ্চিম-বঙ্গে বাটা-জাতীয় যে সুস্বাদু মৎস্য 'রাই-কোড়' বা পল্লী-অঞ্চলে 'রাই-খয়রা' নামে অভিহিত, তাহার সহিত এই 'রাক্ষুসে-রাই'এর জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করিতে হইলে ভূ-বিবরবাসী নেংটি ইঁদুরও হাতীকে তাহার জ্ঞাতি বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারে; উভয়েই স্থলচর এবং চতুষ্পদ।

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশে যে সকল প্রবাল-সাগর (Coral-seas) বর্ত্তমান, সেই সকল সাগরে অতীব ভীষণ-দর্শন ও অদ্ভুতাকৃতি বহু প্রকার সামুদ্রিক জীব লক্ষিত হয়, তাহাদের মধ্যে 'রাক্ষুসে-রাই' সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে সাধারণতঃ উপকূল-সন্নিহিত পার্ব্বত্য দ্বীপের প্রান্তবর্ত্তী মগ্ন-গিরিকন্দরে বাস করিতে দেখা যায়; কিন্তু প্রাণিবিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইহাদের সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কোন জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই সকল রাক্ষুসে-রাইএর দেহ যেরূপ বিশাল, আকৃতিও সেইরূপ ভয়াবহ বলিয়া, জনসাধারণের ধারণা—ইহারা অত্যন্ত হিংস্র এবং মানবের মহাশত্রু; কিন্তু এই ধারণার মূলে কোন সত্য নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহারা অত্যন্ত নিরীহ জীব; তবে শিকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার জন্য ইহারা যে শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা অতীব বিস্ময়কর।

রাক্ষুসে-রাইএর আকার প্রায় চতুষ্কোণ; ইহার মস্তক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু উদর তুষার-শুভ্র। ইহার আকৃতির বৈচিত্র্য এই যে, ইহার দেহের বিস্তার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রশস্ততর। ইহার দুই পাশে যে দুইখানি পাখ্‌না আছে, দেহের তুলনায় তাহাদের আকার অনেক বৃহৎ, এবং তাহা বিশালকায় বাদুড়ের পক্ষযুগলের অনুরূপ।

রাক্ষুসে-রাইএর চক্ষু অতি বৃহৎ—তাহার ব্যাস প্রায় দুই ইঞ্চি। মাথা চ্যাপ্‌টা। ইহার মুখের দুই পার্শ্বে দুইটি দাঁড়া আছে, তাহা স্ক্রুর ন্যায় পাক-বিশিষ্ট; এবং আঠারো ইঞ্চি হইতে দুই ফিট দীর্ঘ। এতদ্ভিন্ন, ইহার পশ্চাতে হস্তীর লাঙ্গুলের ন্যায় যে লেজ আছে, তাহাও প্রায় চারি হাত দীর্ঘ।

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশের সমুদ্রেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার রাক্ষুসে রাই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহের বিস্তার প্রায় পনেরো হাত, এবং হা-মুখের দৈর্ঘ্য কখন



সামুদ্রিক রাক্ষুসে-রাই মৎস্য

কখন এক গজেরও অধিক হইয়া থাকে। হা-মুখের বিস্তার দুই ফিট। ইহারা মুখ-ব্যাদান করিলে দাঁত দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু সতর্কভাবে পরীক্ষা করিলে নীচের মাড়িতে সহস্রাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতল দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা পাতলা ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। কিন্তু উপরের মাড়িতে একটিও দাঁত নাই! ইহাদের দাঁত খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণের জন্য ব্যবহৃত হয় না; সুতরাং এই দন্তশ্রেণীর উপযোগিতা কি, প্রাণিতত্ত্ববিৎগণ এখন পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। আট ফিট পরিধির একটি শিশু-রাক্ষুসের দন্তশ্রেণী অনুবীক্ষণের সাহায্যে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছিল, তাহা সংখ্যায় চারি হাজার!

রাক্ষুসে-রাই অন্যান্য মৎস্য বা কুম্ভীরের ন্যায় ডিম পাড়ে না, ইহারা শাবক প্রসব করে! ইহাদিগকে শিকার করিতে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক কার্য্য। কারণ, শিকারীরা যে বোটে ইহাদিগকে শিকার করিতে যায়, ইহারা সময়ে সময়ে সেই বোট-পর্য্যন্ত উল্টাইয়া দিয়া থাকে, এবং শিকারী সমেত বিসর্জ্জন হইয়া যায়! অল্প দিন পূর্ব্বে উত্তর-অষ্ট্রেলিয়ার তিন জন মৎস্যজীবী একখানি বোটের সাহায্যে একটি বিরাটদেহ রাক্ষুসে-রাই টেঁটা (harpoon) দিয়া গাঁথিলে, রাক্ষুসেটা এক গুঁতায় বোট উল্টাইয়া ফেলিয়া শিকারীত্রয়কে সমুদ্রগর্ভে সমাহিত করিয়াছিল!

ইহাদের দেহের শক্তি অসাধারণ, এবং ইহারা আক্রান্ত হইয়া যে প্রবল বেগে ছুটিতে থাকে, কেবল শুনিয়া তাহা ধারণা করা যায় না। কোন কোন রাক্ষুসে-রাই এইরূপ বেগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া যে সকল বোট টানিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের ওজন ইহাদের দেহের ওজন অপেক্ষা বহু গুণ অধিক। কখন কখন টেঁটাবিদ্ধ রাক্ষুসে-রাই শিকারীদের বোট টানিয়া লইয়া গিয়া কোন কোন প্রবাল-গিরির সংঘর্ষণে চূর্ণ করিতে উদ্যত হওয়ায় শিকারীরা আত্মরক্ষার জন্য টেঁটা-সংলগ্ন রজ্জু বোট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

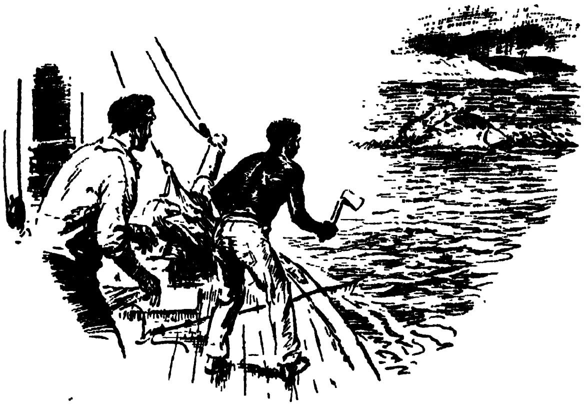
মিষ্টার ই, কে, প্যাটারসন নামক এক জন শিকারী পত্রান্তরে লিখিয়াছেন, "কিছু দিন পূর্ব্বে আমি এক দল শিকারীর সঙ্গে রাক্ষুসে-রাই শিকার করিতে যাই; আমরা যে রাক্ষুসে-রাইটাকে দেখিতে পাইলাম, তাহার দেহের বেড় অন্যূন কুড়ি ফুট! এই বিকটাকার জলজন্তুটা অতি ধীরে জলের উপর সাঁতার দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এবং তাহার বিশালাকার পাখ্‌নাদ্বয় মধ্যে মধ্যে জলের ভিতর ভীষণ বেগে আন্দোলিত হওয়ায় সাগরের জলরাশি উচ্ছ্বলিত ও আলোড়িত হইতেছিল।

"আমাদের বোট জানোয়ারটার নিকট নীত হইলেও সে তাহা গ্রাহ্য করিল না। বোটে হ্যারি নামক এক জন ডুবুরি ছিল; সে টেঁটা দ্বারা তাহার দেহ বিদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সেই টেঁটার পশ্চাদ্বর্ত্তী কড়ায় যে সুদৃঢ় রজ্জু আবদ্ধ ছিল, তাহা দুই শত ফুট দীর্ঘ। হ্যারি বোটখানার কিনারায় দাঁড়াইয়া, রাক্ষুসে-রাইটার প্রায় দশ ফুট দূর হইতে তাহার পিঠ লক্ষ্য করিয়া সবেগে টেঁটা নিক্ষেপ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়া টেঁটার কড়া-সংলগ্ন রজ্জু দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

"টেঁটা রাক্ষুসে-রাইটার পৃষ্ঠে গভীর ভাবে বিদ্ধ হইলেও সে দুই-তিন সেকেণ্ড নড়িল না; কিন্তু তাহার পরেই সে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাহার পাখ্‌নাদ্বয়ের আঘাতে জলরাশি এরূপ আলোড়িত করিল যে, বহু দূর লইয়া সমুদ্রজল ফেনিলোচ্ছ্বসিত হইল; তাহার পর টেঁটা লইয়া এরূপ বেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল যে, সেই আকর্ষণে বোটখানি বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিল। টেঁটায় আবদ্ধ রজ্জু টন্‌-টন্‌ শব্দ করিয়া সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

"হ্যারি সেই রজ্জু সামলাইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি তাহার শেষ মুড়াটা বোটের ডেকের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। রাক্ষুসে-রাইটা এক টনেরও অধিক ভারী বোট মোচার খোলার মতন অনায়াসে একটি প্রবাল-শৈলের দিকে এরূপ প্রচণ্ড বেগে টানিয়া লইয়া চলিল যে, আমাদের আশঙ্কা হইল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহা সেই প্রবাল-শৈলের সংঘর্ষণে শতখণ্ডে চূর্ণ হইবে!

"বোটের মাঝি সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল, 'টেঁটার দড়ি এই মুহূর্ত্তেই কাটিয়া দাও, নতুবা বোটখানি পাহাড়ে



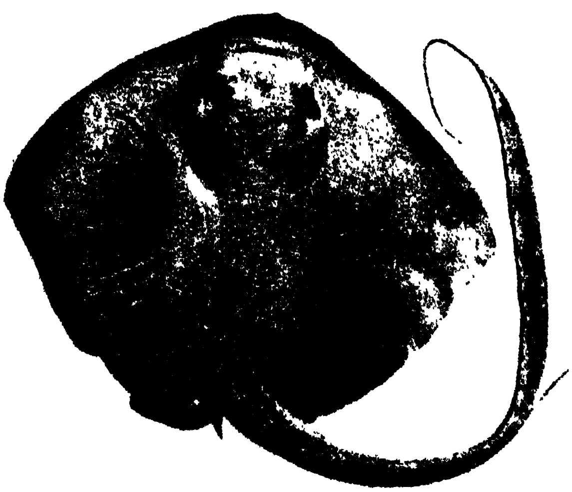
টেঁটার রজ্জু কাটিতেছে

আছড়াইয়া-পড়িয়া চূর্ণ হইবে, আমরা সকলেই ডুবিয়া মরিব।'—হ্যারি অগত্যা একখানি কুঠার লইয়া দড়িটা কাটিয়া দিল। রাক্ষুসে-রাইটা মুহূর্ত্ত মধ্যে একটি প্রবাল-শৈলের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া এরূপ বেগে তাহাতে তাহার পিঠ ঘষিতে লাগিল যে, টেঁটা বাঁকিয়া-চুরিয়া তাহার

পিঠ হইতে খসিয়া পড়িল। তাহার পর সে সাঁতার দিয়া সেই প্রবাল-শৈলের অন্য দিকে চলিয়া গেল।"

এই সকল রাক্ষসে-রাই স্বেচ্ছায় মানুষের কোন ক্ষতি না করিলেও বা হিংসার পরিচয় না দিলেও, অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশের সমুদ্রে অন্য এক জাতীয় ভীষণাকার জলজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের সম্বন্ধে এ-কথা খাটে না। এই অদ্ভুতাকৃতি জলজন্তু গো-লেজা (cow-tail) রাই নামে পরিচিত। ইহাদের লাঙ্গুল অত্যন্ত সাংঘাতিক অস্ত্র!

গো-লেজা রাইএর আকৃতি রাক্ষসে-রাইএর আকৃতির অনুরূপ হইলেও ইহাদের মাথা ও লেজের



সামুদ্রিক গো-লেজা রাই মৎস্য

আকার ভিন্ন প্রকার। ইহাদের লেজ দেখিতে অনেকটা গরুর লেজের অনুরূপ; কিন্তু ইহাদের লেজ সুতীক্ষ্ণ কণ্টকরাশি দ্বারা আবৃত। এই সকল কণ্টকে বঁড়সীর মতো তীক্ষ্ণধার 'আল' আছে। ইহাদের লেজ সমগ্র দেহ অপেক্ষা দীর্ঘ; তাহা কখন কখন আট নয় ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদের লেজের গোড়া স্থূলকায় ব্যক্তির বাহুমূলের ন্যায় স্থূল। লেজের উপরিভাগ কতকগুলি বৃহৎ কণ্টকে আবৃত। এই সকল কণ্টকের আঘাতে মনুষ্য-দেহে যে ক্ষত হয়, তাহা সাধারণতঃ বিষাক্ত হইয়া থাকে; সময়ে সময়ে ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয়, নতুবা সমগ্র দেহের শোণিত বিষাক্ত হইতে পারে।

এই সকল গো-লেজা রাই যখন মগ্ন-শৈলের নিকট সমুদ্র-বক্ষে ভাসিতে থাকে, সেই সময় তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চল থাকিলে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না; মনে হয়, তাহা মগ্ন-শৈলেরই একটি অংশ। কিন্তু কোন কারণে শান্তিভঙ্গ হইলে গো-লেজা রাই তাহার পাখ্‌না জোড়াটা এরূপ প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত করে যে, চারি পার্শ্বস্থ বালি-কাদা প্রভৃতি আলোড়িত হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত সমুদ্র-জল ঘোলা হইয়া যায়। তাহার পর তাহার সাংঘাতিক লাঙ্গুলের আস্ফালন এরূপ বিপজ্জনক হইয়া থাকে যে, যদি কোন দুর্ভাগা শিকারী তাহার লাঙ্গুলের নিকট আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে লাঙ্গুলের কণ্টকাঘাতে তাহাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে মিঃ প্যাটারসন লিখিয়াছেন, "একবার আমরা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির মধ্যস্থ টরেস্ প্রণালীতে একটি বিশালকায় গো-লেজা রাই টেঁটা দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম। আমরা অতি কষ্টে তাহাকে আমাদের বোটে টানিয়া তুলিলে, সে বোটের উপর ভীষণ ধস্তাধস্তি আরম্ভ করিল। আমাদের বোটের পরিচালকের মুখ তাহার লেজের আঘাত হইতে এক চুলের জন্য বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার লেজ বোটের এক পার্শ্বে সবেগে আছড়াইয়া পড়িতেই, লেজের সুতীক্ষ্ণ কণ্টকগুলি বোটের তক্তায় প্রায় দুই ইঞ্চি বিঁধিয়া তাহা ফুটা হইয়া গেল!

গো-লেজা রাইএর লেজের কাঁটাগুলির অগ্রভাগ কেবল তীক্ষ্ণ নহে, তাহার সূক্ষ্ম আলগুলি উল্টা দিকে বাঁকা; এজন্য এই সকল কণ্টক কাহারও দেহে বিদ্ধ হইলে টানিয়া খুলিতে পারা যায় না; তাহা ক্ষতস্থান হইতে বাহির করিতে হইলে ছুরীর ডগা দিয়া ক্ষত প্রশস্ত করিতে হয়, এজন্য আহত ব্যক্তির যন্ত্রণা দুঃসহ হইয়া উঠে। এই সকল কণ্টকের অগ্রভাগে বিষ না থাকিলেও প্রত্যেক কণ্টকের গোড়ায় এক একটি ক্ষুদ্র থলি আছে, তাহা অতিশয় তীব্র বিষে পরিপূর্ণ। কণ্টকের ভিতর কেশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকায় সেই বিষ কণ্টকাগ্র দিয়া ক্ষতের ভিতর সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই বিষ কোন সমুদ্রচর প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে সেই প্রাণীর আকস্মিক মৃত্যু অপরিহার্য্য হইলেও, উহা নরশোণিতে মিশ্রিত হইবার অব্যবহিত পরে যদি

সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়—তাহা হইলে সেই আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইতে পারে; তবে তাড়াতাড়ি প্রতিষেধের ব্যবস্থা করা উচিত। এই কার্য্যে বিলম্ব হইলে আহত মনুষ্যের প্রাণ-রক্ষার জন্য ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা সমগ্র দেহ বিষাক্ত হইয়া থাকে। এই ভাবে দেহ-শোণিত বিষাক্ত হওয়ায় অনেক শিকারীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।

টরেস্ প্রণালী এবং উত্তর-অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা গো-লেজা রাই শিকার করিলে তাহারা উহাদের লেজের কণ্টকগুলি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখে; এবং তাহা মৎস্য-শিকারের জন্য ব্যবহৃত বর্শার অগ্রভাগে গাঁথিয়া তাহার সাহায্যে মৎস্য শিকার করে। এই সকল কাঁটার তীক্ষ্ণাগ্র হুল বৃহৎ মৎস্যের দেহে বিদ্ধ হইলে আহত মৎস্য মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিতে পারে না; তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলচর পশু-শিকারেও এই সকল বর্শা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে-কালে স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা গো-লেজা রাই-এর লেজের কণ্টক তাহাদের তীরে ব্যবহার করিত, এবং এই সকল কণ্টকের অগ্রভাগে তীব্র বিষ মাখাইয়া সেই বাণ দ্বারা শত্রুনিপাত করিত। শ্বেতাঙ্গ আততায়ীগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহারা অনেক সময় এই সকল বাণ ব্যবহার করিত।

গো-লেজা রাইএর সংখ্যা এ-কালে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, বিশেষ চেষ্টা না করিলে তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তবে এ-কালেও যে সকল ডুবুরী মুক্তার সন্ধানে বিবস্ত্র দেহে সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করে, তাহারা কখন কখন গো-লেজা রাই কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু সমুদ্রে নামিবার সময় তাহারা অজ্ঞাতসারে ইহাদের শান্তিভঙ্গ না করিলে গো-লেজা রাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডুবুরীদিগকে আক্রমণ করে না।

বসুমতীর বসুধারা

রবির প্রাণের বসুধারা
ধরায় করে সালঙ্কারা,
ছড়িয়ে পড়ে ঊষার করে
সাতটি রঙের প্রভা।

রবির গানের বসুধারার
দুলে কিবা সাতনরী হার
বিশ্ববাণীর গ্রীবায়, বাচায়
বক্ষ-তটের শোভা।

হিমাচলের তুষার গলা
বসুধারা কলোচ্ছলা,
সপ্তনদীর স্নেহে ভারত-
মর্ম্ম-শীতল রাখে।

হিমকরের চিরন্তনী
বসুধারার আলিম্পনী
গড়িয়ে পড়ে অরণ্যানীর
পাতার ফাঁকে ফাঁকে;

সরস্বতীর তন্ত্রী হ'তে
সাতটি সুরের কলস্রোতে
বসুধারা গড়িয়ে পড়ে
কল্পতরুর 'পরি।

গড়িয়ে পড়ে বাণীর প্রীতি
কাব্য, কথা, নাট্য, গীতি,
রস-বিচার, তত্ত্ব, নীতির
সাতটি ধারা ধরি'।

শ্রীকালিদাস রায়।



ঘুম-পাড়ানিয়া

দেহকে সুস্থ-সবল এবং সুশ্রী-সুন্দর রাখিতে হইলে ব্যায়াম ও আহারের যেমন প্রয়োজন, নিদ্রারও তেমনি প্রয়োজন আছে। আহারের অনিয়মে দেহ যেমন অসুস্থ হয়, দেহের শ্রীসৌন্দর্য্য বিমলিন হয়, তেমনি নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিলে কিম্বা অতি-নিদ্রা বা অল্পনিদ্রা বা অনিদ্রায় দেহ অসুস্থ হয়—দেহের সৌন্দর্য্যশ্রী মলিন হয়, বিলুপ্ত হয়। এজন্য ব্যায়াম ও আহারের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার বিধি-নিয়ম যথারীতি মানিয়া চলা কর্ত্তব্য।

সংসারে আমাদের শান্তি-সুখে নিত্য ব্যাঘাত ঘটে। তার ফলে মনের উপর পীড়ন-অত্যাচারের সীমা থাকে না। মন ভালো না থাকিলে দেহ ভালো থাকে না; এবং দেহ-মনের অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিলে যেমন ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, আহারে রুচি থাকে না,—তেমনি নিদ্রাও চোখের ধারে ঘেঁষ দিতে চায় না! দুঃখে-শোকে যে-অবসাদ, এবং উল্লাস-আনন্দের আতিশয্যে যে-উত্তেজনা, তার ফলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে।

এ-উপসর্গ সংসারে নিত্যই প্রায় লাগিয়া আছে! একটা-না-একটা উপসর্গ! হয় টাকার অভাবে উদ্বেগ—ছেলেমেয়ের বা স্বামি-স্ত্রীর কঠিন পীড়া, না হয় মামলা-মকর্দ্দমা! এ-সবের উর্দ্ধলোকে বিচরণ করিয়া চলিবার সৌভাগ্য বড় বেশী লোকের ঘটে না। গভীর রাত্রি—সকলে নিদ্রা-সুখে নিমগ্ন, আমি একা বিনিদ্র বিভাবরী যাপন করিতেছি—ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া চলিয়াছে—রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরে-বাহিরে বিচিত্র শব্দ-তরঙ্গের উদয়-বিলয় ঘটিতেছে—আর আমি চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া আছি! চোখে ঘুমের ছায়াপাতের চিহ্ন নাই! মাথা দপ্‌দপ্‌ করিতেছে—রগ টন্‌টন্‌ করিতেছে—সমস্ত দেহ ভেদ করিয়া একটা দারুণ জ্বালা—এ ব্যাপারে একটি রাত্রে মানুষের চেহারা কি হইয়া যায়, কে না দেখিয়াছেন?

কাজেই নিদ্রার বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া চাই। রাত্রে শয়নের এক-ঘণ্টা পূর্ব্বে কোনো রকম উত্তেজক বা অবসাদ-জনক চিন্তা লইয়া মস্তিষ্ককে পীড়িত করিবেন না; রাগারাগি, বকাবকি বা আগামী-কল্য সংসার কি করিয়া চলিবে,—ছেলেমেয়ের অসুখ সারিবে, না, বাড়িবে—এমনি চিন্তা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। শয়নের পূর্ব্বে মনে সুখ-আশার স্বপ্ন জাগাইয়া তুলুন; হাস্যে-গল্পে শয়নের পূর্ব্ব-ক্ষণ অতিবাহিত করুন। যত দুঃখ, যত অভাব থাকুক, ভাবনা-চিন্তায় যখন তাহা ঘুচিবে না, তখন সে-দুশ্চিন্তা মাথায় বহিয়া নিদ্রাকে কেন নির্ব্বাসনে পাঠাই! রোগ বলুন, শোক বলুন, দারিদ্র্য বা অভাব-অভিযোগ বলুন, দেহ-মন ভালো থাকিলে তবেই সেগুলার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাদের বিলোপ-সাধনে আমরা সমর্থ হতে পারিব। দেহ-মন যখন দুশ্চিন্তায় কাতর, তখন তার সঙ্গে অনিদ্রার সংযোগ ঘটিলে দেহ-মনের কোনো-কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না। কাজেই নিদ্রার প্রয়োজন যে খুব বেশী, সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

তার উপর সৌন্দর্য্য-শ্রী। এক দিন যদি বেশী রাত্রি জাগিয়া কাজ-কর্ম্ম, গল্প-গুজব, হাসি-গান আমোদ-আহ্লাদ করিয়া কাটান, পরের দিন দেখিবেন, চোখের কোলে কালির রেখা পড়িয়াছে, দু'চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে, মুখ মলিন রুক্ষ হইয়াছে। দেখিবেন, ফুল্ল-নলিনী একটি রাত্রেই ম্লান-মলিন! সুতরাং নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাত্রি-জাগরণ—দেহশ্রীকে মলিন বিলুপ্ত করিতে এত-বড় শত্রু আর নাই!

আমোদ-আহ্লাদের কথা বলিলাম এই জন্য যে, রোগ-শোকের ক্লেশ-যাতনায় দেহ-মন এমনিতেই অসুস্থ

মলিন হয়; আমোদ-আহ্লাদে মন সরস থাকে, তবুও একটি রাত্রির অনিদ্রায় শ্রীসৌন্দর্য্য কতখানি ম্লান হয়, মলিন হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য।

দেহকে সুশ্রী ছাঁদে গড়িবার জন্য যে ব্যায়াম-বিধি পালন করিতে হয়, নিদ্রার জন্যও তেমনি আলাদা ব্যায়াম-বিধি আছে। সে বিধি মানিয়া চলিলে নিদ্রা-সুখে যেমন বঞ্চিত হইবেন না, তেমনি এ-ব্যায়ামে দেহশ্রী এবং দেহের গঠন সুছাঁদে গড়িয়া দেহকে সুকুমার-সুন্দর করিয়া তুলিবে।

এ ব্যায়াম-বিধি খুব সহজ এবং সরল। সংসারের নানা কাজে আমাদের দেশের মেয়েদের প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। নিদ্রার ব্যায়াম-বিধি মানিয়া চলিলে শ্রান্তি ঘুচিয়া দেহে-মনে তাঁরা আরাম পাইবেন; তার উপর বিছানায় শয়নমাত্র নিদ্রা আসিয়া দু'চোখে মায়ার তুলি বুলাইয়া দিবে! নিদ্রার জন্য কোনো প্রয়াস করিতে হইবে না—রাত্রে নিত্য ঠিক সময়টিতে দেখিবেন, ঘুমে দু'চোখ আচ্ছন্ন হইবে!

তাছাড়া বাড়ীতে যাঁদের বাট্‌না বাটিতে হয়, রান্না-বান্না করিতে হয়, আরো পাঁচটা কায়িক-শ্রমের কাজ করিতে হয়, দেখিবেন, এ-ব্যায়ামে পেশীগুলির বিরাম-আরাম ঘটিবে কতখানি! দাঁড়াইয়া, বাঁকিয়া-চুরিয়া বা আসনপিড়ি হইয়া বসিয়া যতক্ষণ যত কাজই করুন, এ-ব্যায়ামে সকল ক্লান্তির বিরাম ঘটিবে! কোনো রাত্রেই অনিদ্রার অশান্তি-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। এ ব্যায়ামের নাম ঘুম-পাড়ানিয়া। দিনের কাজকর্ম্ম চুকিলে নিত্য এ ব্যায়াম করিতে হইবে।

১। মেঝেয় সিধা-খাড়া ভাবে দাঁড়ান। দুই পায়ের গোড়ালিতে গোড়ালিতে ঠেকিয়া থাকিবে। তার পর ১নং ছবির ভঙ্গীতে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া দুই হাত শুধু দুলান। পাঁচ মিনিট হাত দুলাইতে হইবে। এ দোলন-ব্যায়ামে মেয়েদের কর্ম্মক্লান্ত দু' হাতের সকল ক্লান্তির অপনোদন হইবে।

২। হামা দিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে ঘরের মেঝেয় পাঁচ মিনিট-কাল বিচরণ করুন। হামা দিবার সময় ডান হাত ও ডান পা এক-সঙ্গে নাড়িবেন; তার পর বাঁ হাতের সঙ্গে বাঁ পা নাড়িবেন। এই নিয়মটুকু মানিয়া চলিবেন। এ-ব্যায়ামে পেশীর ক্লান্তি ও অবসাদ-জড়তা সারিবে।



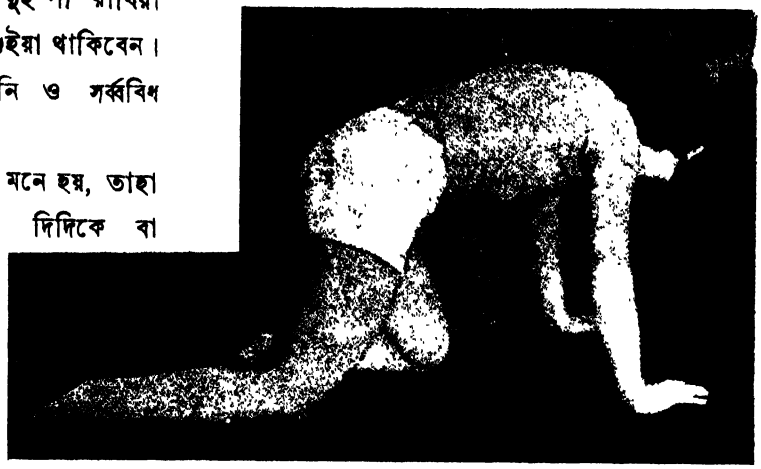
১। এমনিভাবে দাঁড়াইয়া হাত দুলান

৩। একখানি তোয়ালে বহু ভাঁজ করিয়া সেখানিকে 'রোল' বা গোল-ভাবে পাকাইয়া লউন। তার পর আবার তাহা খুলিয়া মেলিয়া লইতে হইবে; তার পর আবার সেখানিকে ভাঁজ করিয়া গোল করিয়া পাকান। দশ-বারো বার ভাঁজ করিবেন। খুলিবেন; আবার

ভাঁজ করিবেন। এ-ব্যায়ামে হাতের আঙুলগুলির জড়তা ঘুচিবে।

৪। পা দু'খানির ক্লান্তি-মোচনের জন্য ঐ তোয়ালে-খানি মেঝেয় বা শক্ত বিছানায় (গদি বা তোষকের উপর নয়) ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া সেই ভাঁজ-করা তোয়ালের উপর ৪নং ছবির ভঙ্গীতে দুই পা রাখিয়া শুইয়া থাকুন। প্রায় পনেরো মিনিট শুইয়া থাকিবেন। ইহাতে পায়ের কটকটানি, ঝন্‌ঝনানি ও সর্ব্ববিধ অস্বাচ্ছন্দ্য লোপ পাইবে।

৫। নানা কারণে দেহ যদি ভার মনে হয়, তাহা হইলে সিধাভাবে দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া দিদিকে বা ছোট বোন্‌কে বা বাড়ীর অপর কাহাকেও বলুন, ৫নং ছবির ভঙ্গীতে আপনার একখানি করিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া কনুই হইতে সমস্ত হাতখানি ধীরে ধীরে তিনি ডলিয়া দিবেন। এমনি ভাবে দুই হাতের পরিচর্য্যা করুন; অস্বাচ্ছন্দ্য ও ক্লান্তি ঘুচিবে।



২। হামা দিন্

৬। অনেক সময় ঘাড় যেন কাঠের মতো শক্ত বোধ হয়; ঘাড়ে ব্যথা ধরে, ঘাড় টন্‌টন্ করে। এই উপসর্গে গোল-ভাঁজ-করা তোয়ালেখানি ৬নং ছবির ভঙ্গীতে ঘাড়ের নীচে রাখিয়া অর্থাৎ তোয়ালের উপর ঘাড় রাখিয়া শুইয়া পড়ুন। মাথা রাখিবেন, তোয়ালের একেবারে প্রান্তভাগে।



৩। তোয়ালে ভাঁজ করা

৭। পায়ের ভার-বোধ বা অস্বাচ্ছন্দ্য সারাইবার জন্য ৭নং ছবির ভঙ্গীতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন। বাড়ীর আর-কাহাকেও বলুন, আপনার পা দু'খানি তুলিয়া ধরিয়া উঠাইবেন-নামাইবেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোড়ালির ঊর্দ্ধভাগটুকু (৭নং ছবিতে যে-ভাবে পায়ের যে-জায়গা হাতে-ধরা দেখানো হইয়াছে) ডলিয়া দিবেন। দশ মিনিট-কাল এ-ব্যায়াম করিবেন। এ-ব্যায়ামে পায়ের সব অস্বাচ্ছন্দ্য সারিবে।

এ কয়টি ব্যায়ামকে নিদ্রার ভজন-সাধন-বিধি বলা চলে। এ-ব্যায়ামে বিনিদ্র রজনীর যাতনা কোনো কালে ভোগ করিবেন না!



৪। শ্রান্ত চরণের উপাধান

সাজ-সজ্জা

সাজসজ্জা বা প্রসাধন করার রীতি নারী-সমাজে চলিয়া আসিতেছে সেই আদি-যুগ হইতে। এ রীতির অন্তরালে আদি-যুগে ছিল সৃষ্টি-রক্ষার ইঙ্গিত। মোহন বেশে সাজিয়া নারী পুরুষের চিত্তাকর্ষণ করিত; তার ফলে জীব-জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কাজ অব্যাহত ছিল।

আদি-যুগে নারীর এ-প্রসাধনে পুরুষের চিত্তাকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা যতখানি ছিল, এ যুগে সমাজ-বন্ধনের নানা সুব্যবস্থায় সে-প্রয়োজনীয়তা ততখানি আর নাই! কিন্তু প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও নারীর বেশভূষা-প্রীতির

মাত্রা যে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ প্রসাধন-প্রীতির প্রসার আমরা আরো বেশী দেখিতে চাই। এ প্রসাধন-প্রীতির ফলে সংসার রমণীয় হইবে, কান্তিদীপ্তিতে ভরিয়া থাকিবে। সৌন্দর্য্য চিরদিন



৫। ঘাড়ের নীচে তোয়ালে



৬। হাত ডলা



৭। পায়ের পরিচর্য্যা

উপাসনার সামগ্রী। সংসার সুন্দর হইলে মানুষের মনও সুন্দর হইবে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, বেশ-ভূষার বিধি-নিয়ম-গুলি সকলে জানেন না বলিয়া একই বেশ-ভূষায় কোনো

নারীকে আমরা দেখি, মহিমময়ী লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো, আবার কাহাকেও বা দেখি, জড়ভরত সং! যাঁদের সং দেখি, বেশ-ভূষায় তাঁদের বিমূঢ়তাই তাহার কারণ। এ জন্য যাঁকে যে-বেশে যে-ভূষণে মানায়, তাঁকে সেই রকম বেশ-ভূষা করিতে হইবে। লেডি চ্যাটার্জ্জীর মতো বেশ-ভূষা করিলে শ্রীমতী ঘোষাল-জায়াকে হয় তো ভালো দেখাইবে না; তেমনি শ্রীমতী ঘোষাল-জায়ার সহজ-সরল বেশে-ভূষায় লেডি চ্যাটার্জ্জীকে হয় তো দেখাইবে কুশ্রী কুৎসিত! নারী-সমাজকে তাই বেশ-ভূষায় সঠিক সামঞ্জস্য-বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাহাকে কি বেশ-ভূষায় মানাইবে, তার সঠিক হিসাব কষিয়া দেওয়া চলে না। আপনাদের আয়নাই সে-কথা বলিয়া দিবে।

গায়ের বর্ণ, দেহের ঋজুতা বা স্থূলতা, মুখের গোল বা লম্বা গড়ন, কেশের দৈর্ঘ্য বা বিরলতা, কপালের গড়ন, গ্রীবার গড়ন—অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ গড়ন বুঝিয়া কোন্ রঙের শাড়ী, কোন্ রঙের ব্লাউশ্ কার অঙ্গে মানাইবে, কার অঙ্গে দৃষ্টিকটু হইবে; চুল তুলিয়া বা কপালের উপর চুল নামাইয়া খোঁপা বাঁধিলে কার মুখ মানাইবে; 'ভী' গলা ব্লাউশ বা 'গোল'-গলা ব্লাউশ, ছু'টির মধ্যে কোন্‌টিতে ভালো দেখাইবে—এ সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বেশ-ভূষা করিতে হইবে! নহিলে শ্রীমন্ত বাবুর কালো-কোলো স্ত্রী শ্রীমতী জগদম্বা দেবী যদি পিঙ্ক রঙের শাড়ী পারেন, কালো মুখে পাউডার ছড়ান, তাহা হইলে তাঁকে বিশ্রী ভিন্ন সুশ্রী দেখাইবে না! এদিকে শ্রীমতী জগদম্বা যদি সচেতন না হন, তাহা হইলে তাঁর বেশ-ভূষা হইবে হাস্যাস্পদ!

বয়স-হিসাবেও বেশে-ভূষায় পার্থক্য বিধান করা চাই! চল্লিশ বৎসর বয়সের প্রৌঢ়া যদি বেশ-ভূষায় সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন, তাহা হইলে ও-বয়সেও তিনি নারী-সমাজে মধ্যমণির দীপ্তি বিকশিত করিয়া তুলিবেন। তাঁর পাশে আধুনিকা মিস রেবা রায়কে বিমলিন দেখাইবে!

ফটোগ্রাফ তুলাইবার সময় মেয়ে-সমাজে বেশ-ভূষায় এবং চেহারায় এমন উৎকটতা প্রকটিত করিতে দেখা যায়, যে ফটোর নারীকে আসল-নারী বলিয়া চেনা যায় না! ফটোর নারীকে আসল-নারীর চেয়ে কুশ্রী দেখায়!

ফটো তুলাইবার সময় মুখে-চোখে বেশী পাউডার মাখিবেন না; চোখে কাজল-রেখা টানিতে চান, সে রেখা যেন খুব মিহি সূক্ষ্ম হয়! রুজ বা রঙ আদৌ মাখিবেন না। মাখিলে ফটোর মুখের সঙ্গে আসল-মুখের কোনো সাদৃশ্য থাকিবে না। লিপষ্টিক কদাচ ব্যবহার করিবেন না। মাথার কেশ পূর্ব্বে সাবান-জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবেন; ফটো তুলিবার পূর্ব্বে মাথার কেশ সযত্নে ব্রাস করিয়া লইবেন; তার পর খোঁপা বাঁধুন বা কেশ প্রলম্বিত রাখুন, ক্ষতি নাই! ধোয়া-মাজা কেশে ফটোয় বাহার খুলিবে; তেলা-কেশে, ভিজা-কেশে কদাচ ফটো তুলাইবেন না।

মাথার কেশ-প্রসাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখি। মাথায় নিত্য ব্রাশ চালাইবেন। বলিবেন, পুরুষ-মানুষের মতো? উত্তরে বলিতেছি, হাঁ। ব্রাশ দিয়া মাথার কেশকে ফাঁপাইয়া তুলিবেন; তার পর কেশ-গুলিকে আলুতোভাবে কপালের উপরে-উপরে নামাইয়া তবে চুল বাঁধিবেন। কাণের উপর দিয়া চুলগুলিকে তুলিয়া দিবেন। কাণের খানিকটা মাত্র খোলা থাকিবে। কাণের উপর দিক একটুখানি যেন কেশে ঢাকা থাকে, দেখিবেন। যাঁদের কপাল বড় বা উঁচু, তাঁরা এক গুচ্ছ কেশ ঝুলাইয়া কপালের উপর ফেলিবেন।

মাথায় মরা-মাষের জন্য অনেককে বহু দুর্ভোগ সহিতে হয়। মাথায় ঘাম হইলে সে-ঘাম শুকাইয়া এই মরা-মাষের উৎপত্তি হয়। মরা-মাষের উপসর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাহিলে দিনে তিন-চারিবার ঈষদুষ্ণ সাবানজলে মাথা ধুইতে হইবে; তার পর ভোঁতা বা মোটা-দাড়া চিরুণী দিয়া বেশ জোরে-জোরে ঘষিয়া চুল আঁচড়াইবেন। তার পর মাথায় আবার সাবান ঘষিয়া ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইবেন। এবার মাথা মুছিয়া মাথায় অল্প লেবুর রস ঘষিয়া-ঘষিয়া মাখিবেন। তার পর আবার ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইয়া ফেলুন। ছু'বেলা মাথায় ব্রাশ চালাইয়া চুল আঁচড়াইবেন। যে ব্রাশের দাড়া বা bristles বেশ দীর্ঘ ও কঠিন, এমন ব্রাশ দিয়া মাথা আঁচড়াইতে হইবে। দিন-পনেরোর পরিচর্য্যায় মরা-মাষ সারিবে। তবে আবার না মরা-মাষ হয়, এজন্য কেশের পরিচর্য্যা বন্ধ করিলে চলিবে না—পরিচর্য্যার মাত্রা শুধু কমাইয়া দিবেন।



রম্‌পার

গতবারের স্যুটটি ছিল সাত-আট বছরের ছেলের জন্য। এবারে যে রম্পার-এর নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এটি নেহাৎ দুগ্ধপোষ্যদের জন্য। এটি এখনই বুনে ফেল্‌তে পারলে খুব সময়োপযোগী হবে, কেন না, আরো ঠাণ্ডা পড়লে ছোটদের ঠাণ্ডা-লাগার হাত থেকে নিরাময় রাখার পক্ষে এটির প্রয়োজন হয় তো থাকবে না!

রম্‌পারটি নির্দ্দেশ-অনুযায়ী-মাপের করতে উল লাগবে চার আউন্স। তিন আউন্স সাদা (থ্রি-প্লাই বা তিন থেইয়ের পশম); আর এক আউন্স নীল (থ্রি-প্লাই)। চোদ্দ নম্বরের একটি ক্রুশের কাঁটা; এক-জোড়া আট নম্বরের বোনার কাঁটা; আর পাতলা ঝিনুকের বা সাদা সেলুলয়েডের ছ'টা বোতাম।

জামাটির মাপ হবে ঝুল (কাঁধ থেকে পায়ের ঘের অবধি)—১৬½ ইঞ্চি; ছাতি—২০ ইঞ্চি; হাতের ঝুল (নীচের দিকে না মুড়ে)—১০ ইঞ্চি।

এখন যে-সব সংক্ষেপোক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলির যথাযথ টীকা দিয়ে আসল কথা আরম্ভ করবো।

সোঃ=সোজা; উঃ=উল্টো; কেঃ সোঃ=কেবল সোজা বুনে যেতে হবে; রিঃ=রিপিট করতে হবে (অর্থাৎ একই জিনিষ আবার বুনতে হবে); এঃ সঃ= দুটো ঘর এক সঙ্গে নিয়ে একটা ঘর তুলতে হবে। সাঃ উঃ=সামনে উল দিয়ে একটা ঘরের জায়গায় দুটো ঘর তুলতে হবে; ষ্টঃ ষ্টিঃ=ষ্টকিং ষ্টিচ বা মোজা বোনার প্যাটার্ণ; মঃ ষ্টিঃ=মস্ ষ্টিচ, বা সাবুদানা প্যাটার্ণ (অর্থাৎ ১টা সোঃ ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনতে হবে, কিন্তু শেষের ঘরটি যাতে শেষ, তাতেই আবার আরম্ভ করতে হবে তার পরের কাঁটা); ঘঃ কঃ=ঘর কমানো; ঘঃ বাঃ=ঘর বাড়ানো।

পিঠের দিক

[তলার দিক থেকে কাজ আরম্ভ করতে হবে। সাদা উলে কুড়িটি ঘর তুলুন, তার পর চার লাইন বুনুন ষ্টঃ ষ্টিঃ। তার পর ৫ম লাইন থেকে প্রত্যেক লাইনের শেষে ৫টি করে ঘর তুলে যান, যতক্ষণ না কাঠিতে ১০০টি ঘর হয়। তার পরও কিন্তু ষ্টঃ ষ্টিঃ-এ বুনে যেতে হবে যতক্ষণ না ১১½ ইঞ্চি বোনা হয়। এইবার এক লাইন সোজা বুনে তার পরের লাইন থেকে হাতের ফাঁদ তৈরী সুরু হবে। দুটো ঘর উল্টো ভাবে এঃ সঃ, ৩টে উঃ, * থেকে রিঃ করে যান শেষ-অবধি। এখন তা হ'লে কাঠিতে ৮০টি ঘর রইলো।]

এইবার ১টা সোঃ ১টা উঃ প্যাটার্ণে দু' লাইন বুনুন। তবে প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় দু'টি করে ঘর বন্ধ করবেন। ৩য় লাইনের গোড়ায় এবং শেষে একটি করে ঘর কমাতে হবে। ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনে যান এবার—৩ ইঞ্চি, ঘর না কমিয়ে। তার পর (রম্পারটির সোজা দিকে) ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে ২৬টি ঘর বুনে যান; পরের ২২টি ঘর বন্ধ করে ফেলুন, তার পর বাকি ২৬টি ঘর বুনুন ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে। ঘরগুলো দুটো কাঠিতে ভাগ হয়ে গেল; এখন প্রতি কাঠির গলার দিকের লাইন আরম্ভ করার প্রথমেই ১টি করে ঘঃ কঃ—যতক্ষণ না ২৬টি ঘর কমে ২০টিতে দাঁড়ায়। এবার ঘর বন্ধ করে ফেলুন। (দু' দিককার কাঁধ একই ভাবে বুনবেন।)

সামনের দিক

এ-দিকটি অবিকল পিঠের দিকের [ ] ব্রাকেট-ভুক্ত নির্দ্দেশ-অনুসারে বোনা হবে—হাতের ফাঁদ করবার আগে পর্য্যন্ত যেভাবে বোনা হয়েছে। তা হ'লে আমরা কাঠিতে পাচ্ছি ৮০টি ঘর।

হাতের ঘের—এবার ১টা সো:, ১টা উ: প্যাটার্ণে বুনতে হবে। প্রথম লাইনটা সমান বুনে (সোজা দিকে) আরম্ভ করতে হবে দ্বিতীয় লাইন। প্রথমেই ১টি ঘর বন্ধ করতে হবে, তার পর ৩৫টি ঘর ১টা সো:, ১টা উ: প্যাটার্ণে, ৪টি ম: ষ্টি:, তার পর বাকী ৪০টি ঘর অন্য একটা কাঠিতে তুলে রেখে—৩য় লাইন বুনতে হবে —৪টে ম: ষ্টি:, ৩৫টা ঘর ১টা সো:, ১টা উ: প্যাটার্ণে। ২য় ৩য় লাইন একবার রি: করুন।

এখন বোতামের ঘর করুন নীচের নির্দ্দেশ-অনুসারে—

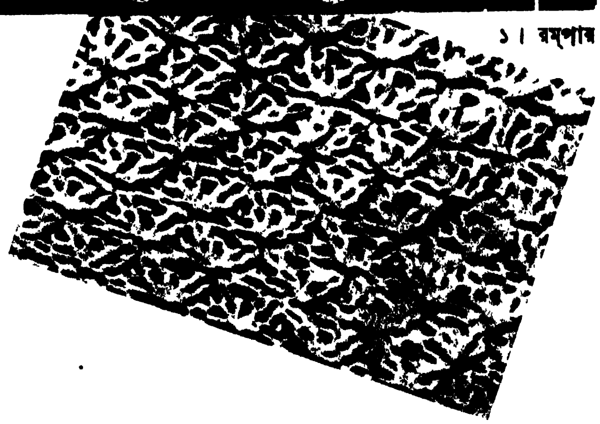
প্রথম ৩৫টি ঘর ১টা সো:, ১টা উ: প্যাটার্ণে বুনুন, তার পর ১টা ম: ষ্টি:, ১টা উ: সা:, ১টা এ: স:, ১টা ম: ষ্টি:। এখন ২য় আর ৩য় লাইন রি: করে যান, যতক্ষণ না (অর্থাৎ যেখান থেকে প্রথম ঘর কমানো আরম্ভ হয়েছিল) তিন ইঞ্চি বোনা হয়। এবার আর একটি বোতামের ঘর করুন আগের নির্দ্দেশ-অনুসারে। ২য় ৩য় লাইন একবার রি: করে গলাটি আরম্ভ করুন :—

প্রথমেই ১৬টি ঘর বন্ধ করুন, তার পর গলার দিকে ১টি করে ঘর বন্ধ করে যান প্রত্যেক ২য় লাইনের গোড়ায়। এই ভাবে বুনে যখন কাঠিতে ২০টি মাত্র ঘর বাকী থাকবে, তখন ঘর বন্ধ করে ফেলুন। এখন যে ৪০টি ঘর আর-একটি কাঠিতে রেখেছিলেন, সেগুলি ঠিক ওপরের নির্দ্দেশ-অনুসারে বুনে যান। কেবল বোতাম ঘর তোলার লাইনগুলোয় ৪টি ঘর চার রকম ভাবে না বুনে ৪টিই ম: ষ্টি: বুনবেন।

এখন সামনে-পিঠে দু' দিকেরই অংশ বোনা হলো! এবার হাত বুনতে হবে। অবশ্য ইচ্ছা করলে হাত না বুনতেও পারেন। তা হলে কিন্তু হাতের ঘেরটিতে ক্রুশ দিয়ে দু' লাইন চেন-ষ্টিচ করে দিতে হবে।



১। রম্পার



২। স্মকিং

হাত (দুটোই এক-রকম)

হাতের কব্জির দিক থেকে আরম্ভ। ৪০টি ঘর তুলুন সাদা উল দিয়ে। ২ ইঞ্চি বুনুন—২টো সো, ২টো উ:

প্যাটার্ণে। তার পর ষ্ট: ষ্টি: বুনতে হবে আগাগোড়া, তবে প্রতি আট লাইন অন্তর লাইনের দু'ধারে ২টি ঘর বাড়াতে হবে। এই ভাবে ঘর বাড়িয়ে যান, যতক্ষণ না ঘর বেড়ে সংখ্যায় ৫০টি দাঁড়ায়। তার পর কিন্তু আর ঘর না বাড়িয়ে বুনে যান, আরম্ভ করার পর যতক্ষণ না ১০ ইঞ্চি বোনা হয়। এখন প্রত্যেক লাইনের প্রথমে ১টি করে ঘর কমিয়ে যান; কাঠিতে যখন ৩৪টি ঘর থাকবে, তখন ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

কলার

নীল উলে ৩০টি ঘর তুলুন। ১ম লাইন—মঃ ষ্টিঃ। ২য় লাইন আরম্ভে এবং শেষে ১টি করে ঘর তুলুন, সমস্ত লাইনটি বুনুন মঃ ষ্টিঃ। এর পরের প্রত্যেকটি লাইন ২য় লাইনের মতো বুনুন। যখন কাঠিতে ৪৮টি ঘর হবে, তখন ঘর বন্ধ করে ফেলবেন। ঠিক এমনি ভাবেই আর-একটি টুকরো তৈরী করুন।

বেল্ট

নীল উলে ৬টি ঘর তুলুন। ১৯ ইঞ্চি বুনে যান মঃ ষ্টিঃ। এইবার এক লাইন অন্তর ১টি করে ঘর কমান; এ-সব মঃ ষ্টিঃ-তে করবেন কিন্তু। এই ভাবে যখন কাঠিতে ২টি মাত্র ঘর থাকবে, তখন সে দু'টি এঃ সঃ করে উলটুকু অবশিষ্ট ঘরটির মধ্যে দিয়ে এনে টেনে নিন।

রম্পারের সামনে যে স্মকিং করা আছে, সেটি কি ভাবে করা হয়েছে খানিকটা আন্দাজ পাবেন বোধ হয় ২নং ছবি দেখে। কার্পেটের ছাঁচে নীল উল পরিয়ে নিন। এখন বুকের বাঁ দিকটায় আগে কাজ করুন। কাঁধ থেকে স্মকিং আরম্ভ করুন। এ লাইনটি বোনা হয়েছে ১টি সোঃ, ১টি উঃ প্যাটার্ণে। এখন ছুঁচ আর উল দিয়ে প্রতি উঃ ঘরের দু'পাশে যে দু'টি সোজা ঘর আছে, তাদের এক সঙ্গে সেলাই করে দিন। অর্থাৎ ২টি করে সোজা ঘর একত্র সেলাই করে যান। তার পর আগের ৩টি লাইন ছেড়ে ৪র্থ লাইনে কাজ করুন। কিন্তু এবারে সব প্রথমের সোজা ঘরটি ছেড়ে দ্বিতীয় ঘর থেকে কাজ আরম্ভ করবেন। অর্থাৎ আবার ২টো সোজা ঘর এক সঙ্গে জুড়ে নিন ছুঁচ আর উল দিয়ে। এবারে বোধ হয় বুঝতে পারছেন, একটি করে কোণ তৈরী হলো। কোণটির নীচে আর একটি কোণ করলেই বরফি-কাটা নক্সার লাইন তৈরী হবে। কিন্তু তা করতে আর বিশেষ কিছু করতে হবে না। কেবল আগের দু'টি লাইন ক্রমাগত রিঃ করে যেতে হবে। এই ভাবে ১২ লাইন স্মকিং তৈরী হ'লে—ডানদিককার বুকটিতে ঠিক একই নিয়মে কাজ করুন। পিঠের দিকেও এই একই নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন।

এখন রম্পারের প্রত্যেকটি অংশই তৈরী হয়ে গেছে। এইবার এর টুকরোগুলোর ওপর অল্প-ভিজে একটি কাপড় চাপা দিয়ে ইস্ত্রি চালিয়ে নিন। তার পর এক-এক করে সব টুকরোগুলো যথাস্থানে জুড়ে নিন। এখন কলারটির ধারিতে নীল উল দিয়ে এবং ক্রুশ দিয়ে এক লাইন চেন তৈরী করে নিন। দুটো পায়ের ঘেরেও ৪ লাইন করে চেন বুনে নিন নীল উলে। এছাড়া বেল্টটা আটকে রাখবার জন্য কোমরের দু'ধারে দুটো লুপ করে নিন। এখন বুক এবং পায়ের দিকে ২টি এবং ৩টি বোতাম বসিয়ে নিলেই দেখবেন, হুবহু ছবির রম্পারের মতো কিম্বা তার চাইতেও ভালো দেখতে হয়েছে—যেটি বুনলেন।

উক্তি

নারীর উক্তি :—

সব চেয়ে পাই ব্যথা তার কাছে আমি
আপনারে নিঃস্ব ক'রে ভালবাসি যারে,
দুঃখ মোর এই !

পুরুষের উক্তি :—

ব্যথা-রূপে নিত্য আমি পেয়ে তারে বুকে
কত সুখী হই জেনে ভোলেনি কো মোরে—
দুঃখ এতে নেই !

শ্রীলক্ষ্মী বিশ্বাস।

ইতিহাসের অনুসরণে

হায়দার আলির নৌ-বাহিনী

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহীশূর রাজ্যে হায়দার আলি খাঁ বা হায়দার শা নামক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষটির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম জীবনের বিশেষ কোন কথা জানিবার উপায় নাই; এবং যাহা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাও নির্ভরযোগ্য নহে। হায়দার আলির পিতা নাদিম খাঁ দশ-হাজারী মনসবদার, অর্থাৎ দশ সহস্র সৈন্যের পরিচালক ছিলেন। বাঙ্গালোর দিবান্নালী-দুর্গে হায়দার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র দুর্গটি কোলার ও অস্কোটা অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। নাদিম খাঁ এই ক্ষুদ্র দুর্গটি, এবং উহার অধিকারভুক্ত স্থানগুলি নিজাম-উল-মল্কের নিকট জায়গীরস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। হায়দার আলি আরব দেশের কোরৈশী-বংশ সম্ভূত বলিয়া দাবী করিতেন। কর্ণেল উইল্‌ক্স (Wilks) লিখিয়াছেন,—হায়দার আলির পূর্ব্বপুরুষরা পঞ্চনদের উত্তর দিক হইতে দক্ষিণাপথে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভিক্ষালব্ধ অন্নে ইঁহাদিগকে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিতে হইত। কর্ণেল উইল্‌ক্স লিখিয়াছেন, তাঁহার ইতিহাসের উপাদান তিনি দেশীয়দিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল কথা নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাস-লেখক হিউ মারে কর্ণেল উইল্‌ক্সের প্রদত্ত বিবরণে নির্ভর করিয়া লিখিয়াছিলেন, হায়দার আলির পিতার নাম ছিল ফতে মহম্মদ। তিনি এরূপ নিঃস্ব ছিলেন যে, অন্যের দয়ায় নির্ভর করিয়া প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন। ইনি বহু কষ্টে প্রথমে মহীশূররাজের সৈন্যদলে প্রবেশ করেন; কিন্তু অবশেষে ফৌজদারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি দুই বার বিবাহ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর কোন সন্তানাদি ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে দুইটি পুত্রসন্তানের জন্ম হইয়াছিল। মারে বলেন, এই পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠটির নাম সাবাজ, এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নামই হায়দার। বিখ্যাত ঐতিহাসিক থর্ণটন তাঁহার ইতিহাসে হায়দার আলির পিতার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামের উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন, হায়দার আলি ফরাসীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া ইংরেজ-দিগের বিরুদ্ধাচরণ করায়, তাঁহার সম্বন্ধে সমসাময়িক ইংরেজ লেখকগণের বর্ণিত বিবরণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। কিন্তু এম, এম, ডি, এল, টি নামক লেখক হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের যে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা টিপু সুলতানের পুত্র প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন; সেই জন্য তাহা অধিকতর নির্ভর-যোগ্য বলিয়াই মনে হয়। এই লেখকের মতে হায়দার আলির পিতার নাম নাদিম খাঁ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ইস্মাইল। এই লেখকটি ফরাসী, এবং মোগল সাম্রাজ্যের জনৈক সেনানায়ক ছিলেন। ইঁহার লিখিত বিবরণই প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়। ফরাসীরা তাঁহার মিত্র হায়দার আলি সম্বন্ধে অনেক সংবাদ অবগত ছিলেন। এই জন্যই এই ফরাসী-লেখকের গ্রন্থ হইতে হায়দার আলির পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম, এবং বংশ-পরিচয় এখানে প্রকাশ করা হইল।

যে সময় হায়দার আলির বয়স সাত বৎসর মাত্র, সেই সময়ে তাঁহার পিতা নাদিম যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব শত্রু-কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হায়দারের জননী পুত্রদ্বয়সহ তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। হায়দার অতঃপর এই মাতুলের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইলেও বিন্দুমাত্র বিদ্যার্জ্জন করিতে পারেন নাই। ২৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি না কি কিছুই করেন নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন—তিনি লাম্পট্যে এবং শিকারেই ঐ বয়স পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার না কি বিন্দুমাত্র দায়িত্বজ্ঞান ছিল না। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিকের একটি গুণ এই যে, তাঁহারা যাঁহাদের প্রতিকূল, তাঁহাদের নিন্দাবাদে অত্যন্ত দক্ষতা প্রদর্শন করেন! হায়দার ২৭ বৎসর বয়সে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন; কিন্তু ঐ কার্য্যে

তিনি দ্রুত উন্নতি-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি মহীশূরের হিন্দু নরপতির সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া অসাধারণ যোগ্যতা-বলে কিছুকাল মধ্যেই মহীশূর রাজ্যের অন্যতম শাসনকর্ত্তার পদ অধিকার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনকাহিনী বিচিত্র হইলেও নিষ্কলঙ্ক ছিল না। তবে সিংহাসন অধিকারের পর তাঁহার চরিত্রের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং প্রজাবর্গের সকল অভাব-অভিযোগের কথা শ্রবণ করিতেন; এবং তাঁহার জ্ঞান এবং বিশ্বাসমতে যাহা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইত, সেই ভাবেই তিনি অপরাধীর বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এ স্থলে হায়দারের একটি বিচারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে, তাহা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলি কোইম্বাটুরে ছিলেন; সেই সময় এক দিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় তিনি অনুচরবর্গসহ ভ্রমণে বাহির হন। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মানা একটি প্রৌঢ়া রমণী মাটীতে লুটাইয়া-পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"আমি বিচার চাহি!" হায়দার তৎক্ষণাৎ তাঁহার শকটের গতিরোধ করিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার নিকট উঠিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। রমণী নিকটে আসিলে, তিনি তাহাকে তাহার কি প্রার্থনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটি কাতরভাবে বলিল, "হুজুর, আমার একটিমাত্র কন্যা; আগা মহম্মদ তাহাকে আমার নিকট হইতে বলপ্রকাশে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।" হায়দার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগা মহম্মদ মাসাধিক পূর্ব্বে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে; এত দিন তোমার অভিযোগ না করিবার কারণ কি?" স্ত্রীলোকটি কহিল, "হুজুরের দরবারে আমি অনেকবারই আবেদন করিয়াছি; কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। আমার দরখাস্ত আমি হায়দার শা'র হাতে দিয়াছিলাম।"—এই হায়দার শা' অভিযোগকারিদিগের দরখাস্ত নবাবের নিকট পেশ করিত, এবং তাহাদিগকে নবাবের নিকট লইয়া যাইত। সে সরকারের অন্যতম পদস্থ কর্ম্মচারী ছিল। সে আহ্বানমাত্র হায়দার আলির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"এই নারী ও উহার কন্যা উভয়েই বারাঙ্গনা। ইহারা অত্যন্ত হীনভাবে জীবনযাপন করে। উহার প্রার্থনা হুজুরের শ্রবণের অযোগ্য।"—নবাব এই জবাব শুনিয়াই রাজপ্রাসাদে গাড়ী ফিরাইতে বলিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে প্রাসাদে গমন করিতে আদেশ করিলেন। নবাব-দরবারের সকল আমলাই এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হায়দার শা' নবাব-সরকারের সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল; কিন্তু কেহই তাহার অনুকূলে নবাবকে কোন অনুরোধ করিতে সাহস করিল না। অবশেষে য়ুরোপীয় সেনাপতি নবাবকে তাহার অনুকূলে অনুরোধ করিলে হায়দার আলি বলিয়াছিলেন,—"আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। প্রজা যে আবেদন করিবে, তাহা রাজার গোচর না করা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। শক্তিহীন এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি যাহাতে ন্যায়বিচার প্রাপ্ত হয়, শক্তিমান নৃপতির তাহা দেখা কর্ত্তব্য। ভগবান রাজাকেই দুর্ব্বল প্রজার একমাত্র রক্ষক করিয়াছেন; এরূপ অবস্থায় যে নৃপতি প্রজার প্রতি অত্যাচারে উদাসীন থাকেন, এবং অত্যাচারীর প্রতি দণ্ডবিধান না করেন, তিনি প্রজার প্রীতিলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।" তিনি তখন সাধারণের দৃশ্যভূমিতে হায়দার শা'কে স্থাপন করিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুই শত বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। এই আদেশ অবিলম্বেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার শরীররক্ষী হাব্‌সী অশ্বারোহী সেনাপতিকে আদেশ দিয়াছিলেন, সে সেই নারীকে সঙ্গে লইয়া আগা মহম্মদের বাসগ্রামে যাইবে; যদি তথায় তাহার কন্যাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে যেন প্রত্যর্পণ করা হয়, এবং রক্ষী যেন আগা মহম্মদের ছিন্ন-মস্তক লইয়া আসে। বলা বাহুল্য, হাব্‌সী-সর্দ্দার আগা মহম্মদের অবরোধে সেই যুবতীকে পাওয়ায় আগা মহম্মদের ছিন্ন-মুণ্ড আনিয়া হায়দার আলিকে প্রদর্শন করিয়াছিল। অথচ আগা মহম্মদ সুলতান হায়দার আলি খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। সে পঁচিশ বৎসরকাল হায়দার আলির পেশকারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নবাব তাহাকে বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রভৃতি উপহার দিয়াছিলেন। যে সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে সময়ে আগা মহম্মদের বয়স ৬০ বৎসর। সে ঐ যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার মাতার

অসম্মতিতে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। হায়দার আলি বলিতেন, "যে ব্যক্তি নারী ধর্ষণ করে, কোরাণের বিধান এই যে, তাহাকে বধ-দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে।" এ-কালের মুসলমানগণের এ কথা স্মরণ রাখিবার যোগ্য। এই দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে—হায়দার আলির প্রিয়পাত্রগণ অপরাধ করিলে, তিনি তাহাদিগকেও দণ্ড-দান করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দু-মুসলমান সকলের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতেন। তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতার সাহায্যে মহীশূরের হিন্দু নরপতিকে বন্দী করিলেও সাধারণ লোক তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরূপ হয় নাই।

হায়দার আলি ইংরেজদিগের প্রবল শত্রু ছিলেন। তিনি ফরাসীদিগের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরেজদিগের সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন। স্থলে তাঁহার সৈন্যবল প্রবল ছিল; কিন্তু তীক্ষ্ণদর্শী হায়দার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রবল নৌবাহিনী ভিন্ন তাঁহার পক্ষে সাগরতীরস্থ স্থানগুলি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং তিনি একটি প্রবল নৌবাহিনী গঠন করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য তাঁহার সৈনিকদিগকে ফরাসীদিগের নেতৃত্বে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। ইংরেজ জাতি সাগরে বিশেষ বলবান ছিলেন। পর্ত্তুগীজরাও তাঁহাদের নৌবহরের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেন। পেশোয়ারেরও নিজস্ব এক রণতরী-বাহিনী ছিল। মালাবার উপকূল অঞ্চল জয় করিবার ফলে তথাকার প্রসিদ্ধ বন্দরগুলি হায়দার আলির অধীনে আসিয়াছিল। ঐ সকল বন্দর ইংরেজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য হায়দার আলি (তখন 'হায়দার নায়েক' নামে পরিচিত) ক্ষিপ্রতার সহিত একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উপযুক্ত কারিকর এবং পোত-নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধার-কের অভাবে নৌবাহিনী গঠন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়াছিল। বিশেষতঃ, নৌবাহিনী পরিচালন-কার্য্যে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীও তাঁহার ছিল না। কর্ণেল উইলক্স একবার মাত্র তাঁহার নৌবাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। কাপ্তেন লো বরং হায়দার আলির নৌবল সম্বন্ধে তদপেক্ষা বিস্তৃততর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন পর্ত্তুগীজদিগের লিখিত বিবরণ হইতেও হায়দারের নৌবল-সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। কাপ্তেন লো তাঁহার "ভারতীয় রণতরীর ইতিহাস"* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার তাঁহাদের এক-বহর রণপোত, চারি শত সৈন্য, এবং বহুসংখ্যক সিপাহী হায়দার আলির অধিকারভুক্ত মালাবার উপকূল অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই উদ্যম সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। এই অভিযানকারী পোতসমূহ ওনোরের সান্নিধ্যে অর্থাৎ হোনাবারে হায়দার আলির নৌ-নির্ম্মাণ স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিল। হায়দার আলি নৌবাহিনী-পরিচালনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আলি বে (লতিফ আলি বেগ ?) নামক এক ব্যক্তিকে প্রধান অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিনায়ক আলি বেকে এই পদে নিযুক্ত করায় নবাবের নৌ-বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, আক্রমণকারী ইংরেজ নৌবাহিনী নিকটস্থ হইবামাত্র হায়দার আলির নৌবাহিনী হইতে দুইখানি জাহাজ, দুইখানি ত্রিমাস্তল-বিশিষ্ট যুদ্ধ-জাহাজ (Grab), এবং দশখানি গ্যালিভাট শ্রেণীর জাহাজ আক্রমণকারীদিগের দলে যোগদান করে; সুতরাং ইংরেজরা একপ্রকার বিনাযুদ্ধেই ওনোর এবং ওনোর নদীর মোহনা-সন্নিহিত সুদৃঢ় কিল্লাসহ দ্বীপটি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, হায়দারের পক্ষে ঐ নৌবাহিনী থাকায় বরং তাঁহার ক্ষতিই হইয়াছিল। কারণ, স্থল-যুদ্ধে নবাব সুদক্ষ ও রণকুশল সেনাদলের সাহায্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেও জলে তাঁহার নিজের জাহাজই শত্রুপক্ষকে সাহায্য করিয়াছিল। ইংরেজের জাহাজ ওনোর জয় করিয়া ম্যাঙ্গালোরে প্রস্থান করে। হায়দার আলি তাঁহার নৌ-বাহিনীর পরিচালনায় অশিক্ষিত আলি বেকে উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহার কারণ, তিনি য়ুরোপীয়-দিগকে বিশ্বাস করিতেন না। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

* Low's History of the Indian Navy vol. I.

আরম্ভ হইলেই উহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদিগের দলে যোগদান করিত।

যাহা হউক, এই ব্যাপারে হায়দার আলি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেও বিন্দুমাত্র ভগ্নোদ্যম বা নিরুৎসাহ হন নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি দ্বিগুণ তৎপরতার সহিত তাঁহার নৌ-বাহিনী পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক কোনও পর্ত্তুগীজ একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, উইল্‌ক্স এবং লো তাঁহার নৌ-বাহিনী যেরূপ হীনবল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা সেরূপ দুর্ব্বল ছিল না। এই পর্ত্তুগীজ পত্রলেখক লিখিয়াছেন, হায়দার আলি খাঁর নৌ-বাহিনী এ ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে যে, উহা য়ুরোপীয়দিগের শঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "আপাততঃ আমরা হায়দার আলিকে জলদস্যু নামে অভিহিত করিলেও তাঁহার নৌ-বাহিনী যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে তিনি জলপথে শীঘ্রই প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া জলযুদ্ধে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার অনুকূল হইলে তিনি হয় ত আমাদিগের সর্ব্বনাশ-সাধনে সমর্থ হইবেন।" এই সময়ে হায়দার আলির নৌ-বহরে ত্রিশখানি রণতরী, এবং বহুসংখ্যক সৈন্য-সমন্বিত মালবাহী জাহাজ ছিল। এক জন ইংরেজ এবং কয়েক জন য়ুরোপীয় তাহা পরিচালিত করিতেন।

উইল্‌ক্স এবং লো এই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেন নাই। হায়দার আলির নৌ-বিভাগের য়ুরোপীয় পরিচালক যে ইংরেজ ছিলেন, এ কথা ঐ দুই জন ইংরেজ ইতিহাস-লেখক কোন স্থানে প্রকাশ করেন নাই,—ইহা উক্ত পর্ত্তুগীজ লেখকের বর্ণিত বিবরণ হইতেই জানিতে পারা যায়। যে সময়ে দক্ষিণাপথে ইংরেজে ও ফরাসীতে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় কোন ইংরেজ নৌ-যোদ্ধা ইংরেজের বৈরী হায়দার আলির নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসাধ্য। হায়দারের নৌ-বাহিনীর য়ুরোপীয় অধ্যক্ষ এবং তাঁহার সহকারী য়ুরোপীয়রা কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন, ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণ তাহা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা যে কত দিন পর্য্যন্ত হায়দার আলির নৌ-বিভাগের পরিচালন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ওনোরের নৌযুদ্ধে যে সকল জাহাজ হায়দার আলির পক্ষ ত্যাগ করিয়া বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ইংরেজ-নৌ-বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের অধ্যক্ষগণ কোন্ দেশের লোক ছিল, ইতিহাস-লেখক কাপ্তেন লো সে সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ নীরব। কর্ণেল উইল্‌ক্সও ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ লেখকটি হায়দার আলির নৌ-বিভাগের যে অধ্যক্ষের কথা বলিয়াছেন, তিনি ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হায়দারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তবে এ কথা সত্য যে, এই সময়ে ভারতবাসীরা যে সকল য়ুরোপীয়কে নিজের অধীনে সামরিক-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই, য়ুরোপীয়দিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে য়ুরোপীয়দিগের পক্ষেই যোগদান করিতেন; এই ভাবে অন্নদাতা প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিতেন না! দৌলতরাও সিন্ধিয়ার কতকগুলি সামরিক কর্ম্মচারী ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে; তবে ঐ সকল বিশ্বাসঘাতক য়ুরোপীয়ের সকলেই ইংরেজ ছিলেন না।

জোস্ পেড্রো দে কোমারা (Jose Pedro de Comara) নামক পর্ত্তুগীজ-লেখক ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এক পত্রে লিখিয়াছেন, জোজ আজেলার্স নামক কোন ওলন্দাজের নেতৃত্বে হায়দার আলি ভাটকল (Bhatkal) বন্দরে নূতন এক দল শক্তিশালী নৌ-বাহিনী সংগঠনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, হায়দার আলি স্থল-যুদ্ধে যেরূপ অজেয় হইবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, জলযুদ্ধেও সেইরূপ প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই জন্য তিনি দক্ষিণ উপকূলে বহু রণতরী প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার আটখানি তিন মাস্তলযুক্ত যুদ্ধজাহাজ ছিল। প্রত্যেক জাহাজে ২৮টি হইতে ৪০টি করিয়া কামান ছিল। ইহা ভিন্ন তিনি আরও ৮খানি ক্ষুদ্রতর তরী (Palas) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহা সাগরে সাগরে বিচরণ করিত। আরও লিখিত হইয়াছিল, "সম্প্রতি তিনি এক প্রস্থ অজেয় রণতরী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ওনোরের নিকট—অঙ্গেদ্বীপের নিকট তাঁহার নৌ-বহর নির্ম্মাণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" যে ওলন্দাজের হস্তে নবাব হায়দার আলি এই রণতরী-নির্ম্মাণের ভার দিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে জাহাজ নির্ম্মাণের এক জন মিস্ত্রী মাত্র ছিল। অথচ সে হায়দার আলিকে বলে, সে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার! এই ব্যক্তি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন বৎসরের মধ্যে হায়দার আলিকে একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী নির্ম্মাণ করিয়া দিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল। জোস পেড্রো বলিয়াছেন, "বিশেষজ্ঞ কারিকরের অভাবে তিন বৎসরের মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।" উহা সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণই ছিল। ইহার পর অন্য একখানি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়,—হায়দার আলি কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যস্থিত অঞ্চল বা দোয়াব দখল করিবার পর দেখা গিয়াছিল যে, তিনি ভাটকলের নিকট যে পোতাশ্রয় প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাহার কার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। তাহার কারণ, উক্ত পর্ত্তুগীজ পত্র-লেখকের মতে, ঐ স্থানের সাগরের খাড়ি পোতাশ্রয় নির্ম্মাণের অনুকূল ছিল না; অধিকন্তু, যে সকল ব্যক্তি ঐ কার্য্য-পরিদর্শনের ভার লইয়াছিলেন, তাঁহাদের ত্রুটিতে ঐ কার্য্যে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিতেছিল। এই পত্রখানি ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লিখিত হইয়াছিল। ইহার পর হায়দার আলি আর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না।

হায়দার আলির মৃত্যুর পূর্ব্বে ইংরেজরা কি ভাবে তাঁহার বর্দ্ধনশীল নৌ-শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহা কাপ্তেন লো'র প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। তাহাতে প্রকাশ, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ভারতের পশ্চিম-ঔপকূলিক নৌ-বাহিনীর পরিচালন-কার্য্যে নিযুক্ত সার এডোয়ার্ড হিউজেস্ কর্ত্তৃক হায়দারের রণতরীগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ঐ সময় হায়দার আলির সহিত ইংরেজদিগের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ইংরেজের ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ সার এডোয়ার্ড হিউজেস্ তাঁহার সমগ্র রণতরী-বহর সহ ম্যাঙ্গালোরের অদূরবর্ত্তী সাগর-বক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, ঐ স্থানে হায়দার আলির নৌবিভাগীয় অস্ত্রাগার ও পোতাশ্রয় ছিল। সার এডোয়ার্ড দেখিতে পাইলেন, জাহাজ নোঙ্গর করিয়া রাখিবার আগড়ায় দুইখানি জাহাজ, একখানি বড় তিন মাস্তলের জাহাজ (Grab), তিনখানি দুই মাস্তলধারী পোত, এবং অনেকগুলি ছোট ছোট জাহাজ নোঙ্গর করিয়া ছিল। ঐ জাহাজগুলির মাস্তলে নবাব হায়দার আলির পতাকা উড়িতেছিল। সার এডোয়ার্ড উহা দেখিয়াই থামিলেন; এবং যখন দেখিলেন, সেগুলি শক্তিশালী এবং সশস্ত্র রণতরী, তখন তিনি তাহাদের যত দূর সম্ভব নিকটবর্ত্তী হইয়া নোঙ্গর করিলেন। অতঃপর তিনি বোম্বাই রণতরী বিভাগের দুইখানি যুদ্ধ-জাহাজের আশ্রয়ে থাকিয়া ঐ জাহাজগুলিকে বিধ্বস্ত করিতে আদেশ করিলেন। ইংরেজ নৌ-সৈন্যগণ তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষিপ্রতার সহিত ঐ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়, এবং দুই ঘণ্টার মধ্যেই বিপক্ষের দুইখানি বৃহৎ জাহাজ দগ্ধ ও বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হয়। উহাদের মধ্যে একখানি জাহাজে ২৮টি কামান, এবং অন্যখানিতে ২৬টি কামান ছিল। একখানা ছোট রণতরীতে ১২টি কামান ছিল; সেখানি পাছে শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়, এই আশঙ্কায় নবাবের অনুচরবর্গই সেখানি দগ্ধ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল। আর একখানি দশ-কামানযুক্ত ছোট জাহাজ দড়ি কাটিয়া সাগরের দিকে বাহির হইবার চেষ্টা করিলে সেখানিও ইংরেজের আয়ত্তে আসিয়াছিল। তৃতীয় ক্ষুদ্র রণতরীখানিকে অন্যান্য ছোট নৌকার সহিত তীরের দিকে চাপিয়া পড়িতে বাধ্য করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, মাঝারী রণতরীখানি তাহার সমস্ত ভারী জিনিষগুলি ফেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়াছিল।"* ইহাই লো-প্রদত্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইংরেজের আকস্মিক আক্রমণেই হায়দার আলির নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে হায়দার আলির নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত হয়, এবং ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে দুশ্চিকিৎস্য কর্কটরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

কর্ণেল কার্ক প্যাট্রিক লিখিয়াছেন,—হায়দার আলি নৌ-বাহিনীর গঠনে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই।

* Low's History of Indian Navy vol. I p. 178.



প্রভাতী· াদ

কিন্তু পর্ত্তুগীজদিগের প্রদত্ত বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারা যায়, ঐ উক্তি সত্য নহে। হায়দার বুঝিতেন,—নৌ-বাহিনী ব্যতীত তাঁহার পক্ষে ইংরেজদিগকে সম্পূর্ণ বাধা দেওয়া সম্ভব হইবে না। সেই জন্য তিনি নৌ-বাহিনী গঠনে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার পক্ষে অসুবিধাও অনেক ছিল। য়ুরোপীয়দিগের সমকক্ষ নৌ-বহর প্রস্তুত করিতে হইলে য়ুরোপীয় ইঞ্জিনিয়ার ও কারিকরের প্রয়োজন; কিন্তু তিনি তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবে তিনি ফরাসীদিগের নিকট হইতে ঐরূপ বিশেষজ্ঞ কারিকর কেন যে গ্রহণ করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ, ঐরূপ বিশেষজ্ঞ ফরাসী তখন এ দেশে অধিক আসিত না। তিনি জানিতেন, তাঁহার আমলে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা তরী-নির্ম্মাণে সুদক্ষ; তিনি প্রথম এক জন ইংরেজকেই ইহার অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। কিন্তু কি কারণে তিনি আর কোন ইংরেজকে ঐ পদ প্রদান করেন নাই, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। যাহা হউক, নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও হায়দার আলি এমন একটি প্রবল নৌ-বাহিনী প্রস্তুত করিতেছিলেন যে, তাহার জন্য ইংরেজ এবং ওলন্দাজ এই উভয় জাতিকেই শঙ্কিত হইতে হইয়াছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সার এডোয়ার্ড হিউজেস্ তাঁহার রণতরী-বহর সহসা বিধ্বস্ত করিবার পর তিনি আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু অনেকে বলেন যে, তাঁহার বয়স কত হইয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। কোন ফরাসী-লেখক বলিয়াছেন, তাঁহার পরিজন-বর্গের বিশ্বাস, তিনি ৮২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি ৪৪ বৎসর বয়সে প্রথমে সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তিনি ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

শীত আসে

শীত আসে আর হিম আসে ওই ঠাণ্ডা হিমালয় হ'তে,
শীত আসে আর পত্র ঝরে গহন বনের শয্যাতে;
শীত আসে আর মৃত্তিকা সে সঙ্কুচিত লজ্জাতে,
শীত আসে আর পুষ্প মরে আড়ষ্টতার ভয় হ'তে!

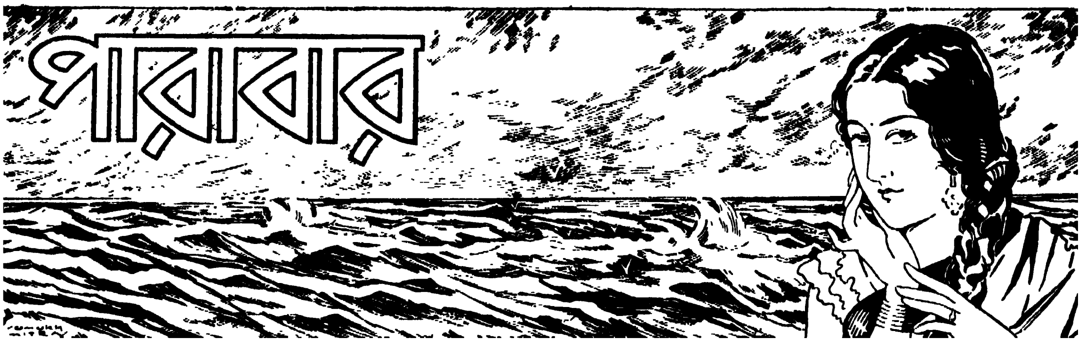
ধূসরতার সৃষ্টি বুঝি রাক্ষসী-শীত জয় করে,
কুজ্ঝটিকা-কয়লা এবং ধূলায় সমাকীর্ণ সে;
মোমের মতো দীপ্তিহারা চন্দ্র হ'ল শীর্ণ যে;
শীত আসে আর রুক্ষতা তার সজলতা ক্ষয় করে!

কোথায় প্রজাপতির নাচন?—কুঞ্জ কাঁদে শূন্যতায়,
তুষার ঝরে মৃত্যু সম, রিক্ত ধরার ক্ষেত্রেতে;—
মাঘের বায়ু বাঘেরও আয়ু ভাঙ্‌ছে যেন বেত্রেতে;
রৌদ্র-তাপে মূর্চ্ছাহত উঠ্‌ছে নদে বাষ্প হায়!

শীত আসে আর হিম আসে ওই বরফ-সাগর সব চুয়ে,
দন্তে তাহার তীক্ষ্ণ কি বিষ ক্ষুরের মতো রক্ষিত;
ক্ষুদ্র বেলা গড়িয়ে চলে, কুলায় কাঁপে পক্ষী তো!
পীত-গোধূলি কখন মরে খেজুর-বনের ধার ছুঁয়ে!

প্রেতের মতো শীত আসে ওই তীক্ষ্ণ টানের দিন ধরি,—
সজ্‌নে ঝরে—সুপারী গাছ কাঁপছে করুণ মন্তরে;
কিসের ব্যথা—কোন্ হাহাকার ঝিল্লী-স্বরের অন্তরে;
বন্ধ্যা ধরা বিবর্ণতার নিঃশ্বাসে কার যায় ভরি!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়



২০

বিবাহের পর ও-বাড়ীতে বাসরের আমোদ।

বধূ নন্দরাণী ডাকিল—মা···

মা বলিলেন,—কেন?

নন্দরাণী বলিল—তোমার কুটুম-বাড়ীর ছ'টি মেয়ে এসেছে, মনে রেখো। বিয়ে দেখলেই তাদের পেট ভরবে না! তুমি বসে থেকে তাদের খাইয়ো···ভিড়ের মধ্যে ওদের গুঁজে দিয়ো না যেন!

মা বলিলেন,—না রে, তোরা তিন জনে একসঙ্গে বসে খাবি। সে-ব্যবস্থা আমি কি না করেছি?

তিন জনে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতেছিল। আহারের সঙ্গে হাসি-গল্প···

হঠাৎ কিরণ চাহিল নন্দরাণীর মায়ের পানে, বলিল,—এ কি রকম হলো মাসিমা! কনেকে তো আজ বরের সঙ্গে বাসরে এক-পাতে খেতে হয়। আমাদের চিরকালের সে-রীতি ত্যাগ করলেন কি বলে?

মা হাসিলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

ঠাকু'মা-সম্পর্কীয়া এক জন বিধবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—লোক দেখিয়ে নন্দরাণী আজ খেলে না গো! এর পর থেকে তাই খাবে। আজ তোমাদের কৃতার্থ করে দিচ্ছে আর কি! তোমরা আর ওকে পাশাপাশি আসনে বসে একসঙ্গে খাবার জন্যে পাবে না কি?

কিরণ চাহিল নন্দরাণীর পানে, কহিল—তাই না কি বৌদি? কিন্তু শাস্ত্রে-পুরাণে এমন কথা লেখা নেই! লেখা আছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ এনে মায়ের অন্নেই টান পড়ে। ননদের অন্নর কথা কৈ, কোনো পুরাণে পড়িনি, বা এমন গল্প কোনো দিদিমা-ঠাকু'মার মুখেও শুনিনি কোনো দিন!

বীণা যেন লুচি-তরকারী লইয়া খেলা করিতেছে···

নন্দরাণীর মা বলিলেন—তুমি কিছু খাচ্ছো না কেন মা?···লজ্জা করছে বুঝি?

কিরণ কহিল—লজ্জা কিসের সলিলা? খাও···

মৃদু স্বরে বীণা বলিল—খাচ্ছি···

নন্দরাণীর মাসিমা-সম্পর্কীয়া আর-একটি মহিলা বলিলেন—এইটি বুঝি তারাচরণবাবুর নাত্‌নী?

নন্দরাণীর মা বলিলেন,—হ্যাঁ···

মাসিমা বলিলেন,—বরাত বটে! তারাচরণবাবুর এ সুবুদ্ধি যদি আর ক' বছর আগে হতো! আহা, তা হ'লে ছেলে দুঃখ পেয়ে যেতো না···বৌ-চারুও সুখের মুখ দেখতো! তাই ভাবি, মেয়েটির মায়ের কথা! বিয়ে করে যেন চোর হয়ে ছিল বেচারী!···আমি জানতুম কি না তাকে! স্বামীর অত ভালোবাসা···মুখখানি মলিন করে বলতো, আমার জন্য উনি দারিদ্র্য-দুঃখ মাথায় নেছেন। এ-দুঃখ কখনো যাবে না আমার!

তিনি বীণার পানে চাহিলেন; বলিলেন—তোমার মার নাম ছিল চারু···না?

বীণার বুকখানা ধড়াশ করিয়া উঠিল। আবার ঐ কথা!

কোনো মতে মাথা নাড়িয়া বীণা বলিল,—হ্যাঁ।

মাসিমা বলিলেন,—ভাগলপুরে আমরা ক' বছর ছিলুম যে! উনি তখন ভাগলপুরের মুন্সেফ। আমরা থাকতুম খঞ্জরপুরে। আমাদের বাঙ্‌লার পাশে ছোট্ট দোতলা বাড়ী···সেই বাড়ীতে থাকতেন বিদ্যানাথবাবু। ওখান-কার কলেজে প্রোফেশরি করতেন। চারু ছিল সেই বিদ্যানাথ বাবুর বোন।···তখন তার বয়স হবে

সতেরো আঠারো বছর···যেমন লেখাপড়া জানতো, তেমনি চমৎকার গান গাইতে পারতো। চমৎকার মেয়ে! হঠাৎ হলো বিশ্বনাথবাবুর বসন্ত—সাত দিনের দিন ভদ্রলোক মারা গেলেন। সলিলার বাবা সন্তোষবাবু তাঁর কি সেবাই না করেছিলেন! বিশ্বনাথবাবু মারা যাবার পর সংসার অচল হলো। তখন এই সলিলার বাবা সন্তোষবাবুই সে-সংসারকে আপনার করে বাঁচিয়ে রাখলেন!···কি চমৎকার মানুষ ছিলেন এই সন্তোষবাবু··

এ-কথায় আনন্দ-উৎসবের আলো যেন ম্লান হইয়া গেল!

নন্দরাণী বলিল,—সলিলার মুখ কি ওর মার মতো হয়েছে মাসিমা?

মাসিমা চাহিলেন বীণার পানে। ভয়ে লজ্জায় বীণার মাথা যেন পাতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে! সে ঘামিয়া একশা···

মাসিমা বলিলেন,—মুখখানি তোলো তো মা, দেখি।

মুখ কি তোলা যায়! অপরাধের কালিতে মুখ ভরিয়া আছে! অথচ মুখ না তুলিলে নয়!

অতি-কষ্টে বীণা মুখ তুলিল।

মাসিমা অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিলেন, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—না এ-মুখ দেখে কে বলবে, সেই মায়ের মেয়ে! মায়ের মুখখানি ছিল যেন প্রতিমার মতো! মাথায় থোলো-থোলো কোঁকড়া চুল··· চোখ দু'টি টানা-টানা···যেন হরিণের চোখ!···তবে মায়ের চেয়ে মেয়ের রঙে জেল্লার জোর আছে···চারু ছিল শ্যামবর্ণ!·

কিরণ বলিল,—বিয়েতে আপনি গেছলেন মাসিমা? ···সন্তোষ কাকার যখন বিয়ে হয়···

মাসিমা বলিলেন,—গেছলুম বৈ কি!···আমরা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দি···আমি বরণ করেছিলুম। আচ্ছা সলিলা, তোমার দিদিমাকে তুমি ছাখোনি? না?

বীণার মুখে জবাব নাই!

মাসিমা বলিলেন,—কি করেই বা দেখবে? চারুর বিয়ের আট মাস পরেই তিনি মারা যান। তার পর সলিলার মাকে নিয়ে সন্তোষবাবু কাশীর কলেজে প্রোফেসারি নিয়ে চলে গেলেন।···বিয়ের আগে তারাচরণবাবু লোক পাঠিয়ে ছিলেন—বিয়ে যাতে না হয়—ছেলেকে বারণ করে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্ম! নিজে চিঠি লিখেছিলেন—ত্যজ্যপুত্র করবেন বলে শাসিয়ে! খুব রাগ করেছিলেন। ভাগলপুরে এ-কথা নিয়ে একেবারে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল!

বীণার খাওয়া মাথায় উঠিল!···ভয়ে তার যা হইতেছিল···

তার সে স্তম্ভিত ভাব লক্ষ্য করিয়া নন্দরাণীর মা বলিলেন,—তোর এ-সব কথা এখন রাখ ভাই শিবানী,··· মেয়ের মন দুঃখে-ব্যথায় ভরে কি রকম হয়ে গেল, ছাখ্ দিকিনি!··না মা, তুমি খাও!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাসিমা বলিলেন,—সে-দিন যখন শুনলুম, তারাচরণবাবুর সুবুদ্ধি হয়েছে···মা-বাপ-হারা নাত্‌নিটিকে ঘরে এনেছেন, নাত্‌নি বলে বুকে নেছেন,—শুনে আমার তখন কি আহ্লাদ যে হলো! মাকে জানতুম কি না! চমৎকার মানুষ ছিল সলিলার মা, আহা! শ্বশুরের আদর-যত্ন যদি পেতো! অজস্র দুঃখ-কষ্ট ভোগ করলেও মুখখানি হাসিতে ভরে থাকতো সব সময়ে। সকলকে কত দরদ-যত্ন! মনখানি ছিল স্নেহের সমুদ্দুর! সেই মায়ের মেয়ে ভগবান ভালো করুন!

এত দরদ···এত প্রার্থনা···

বীণার বুকের মধ্যে তবু আগুন জ্বলিতেছে!··· সলিলার মায়ের কথা মনে হইতেছিল! সে-বুকে স্নেহের কি সমুদ্র ছিল, বীণাও তা জানে! নহিলে বীণার আজ অস্তিত্ব থাকিত না!

তাঁর সে স্নেহের খুব প্রতিদান বীণা দিতে বসিয়াছে! ···পুণ্যবতী সাধ্বী সতী চারুলতা···তাঁর পাশে বীণার মা অতসী?···এখানে আজ তার এত আদর··সকলে তাকে এত স্নেহ করেন, এমন ভালোবাসেন! ঘুণাক্ষরে যদি এঁরা জানিতে পারেন, সে সলিলা নয়, বীণা!·· শুধু তাই, এ-বীণা কি-মায়ের মেয়ে! যদি শোনেন, তার মা অতসী এক দিন···

ঐ শ্রীপতি···

হায় রে, সব ভুলিয়া মানুষের মতো বাঁচিবে ভাবিয়া কি দুঃসাহসে ভর করিয়া বীণা এখানে আসিয়াছে! স্বপ্নে

ভাবে নাই, এখানে এত দিক দিয়া তার এ দুঃসাহসিকতার, তার এ সুগভীর প্রতারণা-অভিসন্ধির রহস্য-ভেদের এমন বিপুল ইঙ্গিত এ-বাড়ীতেও এই মাসিমার হাতে আছে! কথায়-কথায় মাসিমা যদি চারুলতা দেবীর সম্বন্ধে, সন্তোষবাবুর সম্বন্ধে আরো পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন? বীণা তার কি জবাব দিবে? তাঁদের কতটুকু কথা—সে তার কি জানে! এঁরা তাদের কথা জানেন অনেক-বেশী!···

মনে-মনে ঠাকুর-দেবতাদের ডাকিয়া বীণা বলিল,—কোনো মতে এ সঙ্কটে উদ্ধার করো, ঠাকুর! এখান হইতে কোনো মতে নিরাপদে আমায় বাহির করিয়া দাও! এত আদর, এত ভালোবাসা আমার কেন সহিবে? এ ভালোবাসা, এ আদর আমাকে নয়! এ আদর সলিলাকে! এ ভালোবাসা সলিলার জন্য! চোর সাজিয়া আদর-ভালোবাসা আদায় করাও এমন কঠিন, তা সে জানিত না!

নিত্য-দিন নব-নব উপসর্গ ··

সে-দিন কতখানি সুখ, কতখানি আনন্দের মাঝখানে ঐ শ্রীপতি আসিয়া দেখা দিয়াছে! সে আতঙ্ক মনের উপর জমাট বাঁধিয়া আছে···এখনো মিলাইবার অবসর মিলে নাই! ইহারি মধ্যে এখানে আবার এ কি আজ নূতন উপসর্গ!

ভয়ে সে কাঁটা হইয়া গেল! কে জানে, কাল সকালে কোথা হইতে আবার নূতন কি উপসর্গ আসিয়া দেখা দিবে!

কেন সে এখানে আসিয়াছিল?

ক্ষীরোদাময়ী তাকে অনাদর করেন নাই ··অবহেলা করেন নাই। নিজের ছেলেদের সঙ্গে সমান-আসন দিয়া তাকে নিজের মেয়ের মতোই দেখিতেন। তার মাকে লইয়া শ্রীপতির যে সব পীড়ন-অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, সে পীড়ন সহিবার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল? যাচিয়া এতখানি অত্যাচার পরের জন্য কেহ সহে না! সহিতে পারে না!

সেই ক্ষীরোদাময়ীর স্নেহ ভুলিয়া, দুশ্চিন্তার পাথরে তাঁর মনটাকে পিষিয়া-ছেঁচিয়া চোরের মতো সে পলাইয়া আসিয়াছে! এতখানি অকৃতজ্ঞতা···ভগবান তার শাস্তি দিবেন না, এ কখনো সম্ভব?

বীণা ভাবিতেছিল, আর নয়! চোর সাজিয়া যদি বা দিন কাটানো সম্ভব হয়···সে-চৌর্য্য ধরা পড়িলে যে-লাঞ্ছনা ···সে লাঞ্ছনার মতো দুর্ভোগ আর নাই!···

ভাবিল, ঘটনাচক্র যে-ভাবে ঘুরিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে দু'-এক দিনের পর তার চৌর্য্য যদি ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে বীণা তাহাতে বিন্দু-মাত্র আশ্চর্য্য হইবে না!

সে দুর্ভোগ ঘটিবার পূর্ব্বে এখান হইতে পালানো যদি সম্ভব হয়!

কিন্তু কোথায় যাইবে? এখানে এ সহর···সে চেনে না···জানে না!···কাশী তার চেনা জায়গা!

কাশীতেই যাইবে!

ক্ষীরোদাময়ীর কাছে?

তাই! গিয়া তাঁর পায়ের উপর পড়িয়া বলিবে, বড় লোভ হইয়াছিল···তাই গিয়াছিলাম, মাসিমা!··· আর কখনো যাইব না! তোমার পায়ে পড়িয়া থাকিব ···যত দিন তুমি পায়ে রাখিবে!

সেই ঠিক···

এখানে এই নন্দরাণী ··কিরণ···কিরণের মা প্রতিমা দেবী · বাবা হিরণ্ময়···এঁরা তার কোনো অনিষ্ট করেন নাই! ইঁহাদের সঙ্গে এ প্রতারণা করিবার তার প্রয়োজন ছিল না! সাধ করিয়া ইঁহাদের সে প্রতারিত করিতে আসে নাই! কিন্তু এ-কথা কে বিশ্বাস করিবে? কে বুঝিবে, কি ঘটনা-চক্রে…

এ ঘটনা···ইহাও বীণাই সৃষ্ট করিয়াছে···এঁরা সৃষ্টি করেন নাই! তার উপর ঐ বৃদ্ধ তারাচরণ রায়···

সন্তোষ মামা···চারুলতা দেবী সলিলা···তাঁদের প্রতি তারাচরণ রায় যত রূঢ় আচরণ করুন, বীণার উনি কোনো ক্ষতি, কোনো অনিষ্ট করেন নাই! উঁহার সঙ্গে এ ছলনা, এত-বড় প্রতারণা কি বলিয়া বীণা করিতে আসিল? উঁহার বুকের উপর যে-আসনে উনি বীণাকে বসাইয়াছেন···ওঁর এই অগাধ ঐশ্বর্য্য ··এ সব উনি বীণাকেই দিবেন। এ প্রতারণায় বীণা কত লোককে ঠকাইয়া তাদের কত-কি ছিনাইয়া লইতেছে! এ প্রতারণায় বঞ্চিত হইবেন প্রথমেই ঐ দাক্ষায়ণী দেবী··· দাক্ষায়ণী দেবীর মেয়ে বিরজা···তাঁর ছেলে···

মাথার মধ্যে দপ-দপ করিতে লাগিল। চারি দিককার কল-কোলাহল, উৎসব-রব সব মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বীণার চেতনাও যেন লুপ্তপ্রায়! সে কি করিতেছে …কি করিবে, খেয়াল নাই, হুঁশ নাই!

কিরণের কথায় হুঁশ হইল। কিরণ বলিল—ঘুমে পাতের উপর ঢুলে পড়ছো যে সলিলা! ওঠো, আঁচিয়ে বিছানায় একটু গড়িয়ে নাও না হয়…

নন্দরাণীর মা বলিলেন,—রাত্রে এইখানেই থাকো মা। এত ঘুম পাচ্ছে…

কিরণ বলিল—দাদু ভাববেন…

নন্দরাণীর মা বলিলেন,—তাঁকে খপর পাঠিয়ে দেবো। তুমিও থাকো কিরণ… সলিলাও থাকবে। খানিকটা ঘুমিয়ে নিলেই ওর এ-ভাব কেটে যাবে'খন …কি বলো মা? শুধু ঘুম পাচ্ছে? না, শরীর অসুস্থ বোধ করছো?

কম্পিত কণ্ঠে বীণা বলিল—বড্ড মাথা ধরেছে…

নন্দরাণী বলিল—তা হ'লে শুয়ে পড়ো'গে…

নন্দরাণীর মা বলিলেন—আমার ঘরে ভিড় নেই। ও-ঘরে কাকেও যেতে দেবো না। আমার ঘরে আমার বিছানায় তুমি শোবে চলো মা। বাড়ী যদি যেতে হয়, বেশ, একটু ঘুমোও…ঘুমুলে মাথাটা যদি ছাড়ে, শরীর সুস্থ বোধ করো, তা হ'লে যেয়ো। আজকের দিনে ফিরতে বেশী রাত হ'লে দাদু ভাববেন না…কেমন?

২১

পরের দিন সকালে বধূ-বরণ দেখিতে বীণা আর ও-বাড়ীতে গেল না। তার মন ভরিয়া যে-আতঙ্ক…

রাত্রি বলিয়া নিজের মনকে কোনো রকমে কাল লুকাইয়া রাখিয়াছিল! তার হীনতা… তার ছলনা কারো চোখে ধরা পড়ে নাই! কিন্তু আজ যদি এ দিনের আলোয়…

কে জানে, কোথা হইতে কারা সব আত্মীয়-জন বা অন্য পাঁচ রকমের লোক আসিয়া হাজির হইবে…মস্ত ভিড়! সে ভিড়ে কারো চোখে তার এ মিথ্যা বেশ, মিথ্যা পরিচয়, তার সব মিথ্যা যদি ধরা পড়িয়া বিপর্য্যয় গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া তোলে? রাত্রে কাল তার চোখে ঘুমের ছায়া আসিয়া দেখা দেয় নাই! যে-দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটিয়াছে…

সকালে দাদু আসিয়া তার পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন,—এ কি চেহারা দিদি! অসুখ করেনি তো?

—না…

তারাচরণ রায় একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বীণার কপালে হাত রাখিয়া দেখিলেন, বলিলেন, —অনেক রাত্তির অবধি জাগা…এর মধ্যে উঠলে কেন, দিদি? আর-একটু ঘুমোও…

—না…

উঠিয়া মুখ-হাত ধুইবার পর হইতে কেবলি মনে হইতেছে, এ-ভাবে এখানে থাকা চলে না! থাকা উচিত নয়!…ধরা পড়ার কথা নয়! মানুষকে ঠকাইয়া তার টাকা-পয়সা আদায় করা তাহাতে যে-অপরাধ, যতখানি পাপ হয়, এ-ভাবে প্রতারণা করিয়া স্নেহ-আদর আদায় করাতেও তেমনি অপরাধ, ঠিক ততখানি পাপ…

তাই সে স্থির করিয়াছে, তারাচরণকে সব কথা লিখিয়া এ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিবে। তার পর চলিয়া যাইবে। কাশীতে নয়! কোথায় যাইবে, জানে না, তবে এখানে আর থাকিবে না…

না…না…থাকিবে না।

চিঠিতে ভালো করিয়া বুঝাইয়া লিখিবে যে, ধন-ঐশ্বর্য্যের লোভে সলিলা সাজিয়া সে এখানে আসে নাই। সে আসিয়াছিল স্নেহের কাঙাল হইয়া। সেই সঙ্গে এ-ইচ্ছাও মনে ছিল…তারাচরণ রায়ের যে-পরিচয় সন্তোষ-বাবুর কাছে ও চারুলতা দেবীর কাছে এক দিন শুনিয়াছে, শুনিয়া অবধি তার ইচ্ছা হইত, তাঁর স্নেহাতুর হৃদয়ের শূন্যতা সে যদি একটুও পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে…

তখন ভাবে নাই, স্নেহের এ-পিপাসা মিটাইতে গেলে কত দিক দিয়া কতখানি বিরোধ, কতখানি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়…আর-পাঁচ জনকে কতখানি বঞ্চনায় নিক্ষেপ করিতে হয়! তার উপর স্নেহের ধারা…সে-ধারা রক্ত-মাংসের সম্পর্ক-খাত ধরিয়া যেমন সাবলীল সহজ ভাবে

প্রবাহিত হয়, এমন ভাবে নিঃসম্পর্কীয়তার খাত ধরিয়া বহিতে গেলে কত বিরোধ, কত দ্বন্দ্ব, কত দিকে কত কোলাহলের যে সৃষ্টি হয়!

সে তা জানিত না···জানিলে কখনো এমন করিয়া এ-ইচ্ছা লইয়া···

ও-বাড়ীতে বধূ লইয়া বর আসিতেছে···লোক আসিয়া বার-বার তাগিদ দিয়া গিয়াছে—সলিলা দিদিমণি এসো!

বীণা জবাব দিয়াছে—শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে···

এ-কথা না শুনিয়া কিরণ নিজে আসিল। ডাকিল,—সলিলা···

খোলা জানলার পাশে বসিয়া বীণা আকাশের পানে চাহিয়াছিল···আকাশের গায়ে পেঁজা-তুলার মতো অসংখ্য ছোট মেঘ। হালকা স্বচ্ছ মেঘের রাশি···রৌদ্র-কিরণে মনে হইতেছিল যেন নানা রঙের প্রলেপ! বাতাসের ভরে সেগুলা ছুটাছুটী করিয়া ফিরিতেছে।

মেঘের পানে চাহিয়া বীণা ভাবিতেছিল, সে যদি হঠাৎ আজ ওমনি মেঘ হইয়া এখানকার লোক-জন, বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া আকাশে গিয়া উঠিতে পারিত···

সে চলিয়া গেলে এখানে কারো বুকের কোনো-খানে একটুও দাগ পড়ে কি না, আকাশে বসিয়া দেখিত!···

তার উপর এই যে মায়া···

এ-মায়া মনে জমিয়া কতখানি প্রসারিত হইয়াছে! তারাচরণ রায়কে সত্যই মনে হয়, যেন কত আপন-জন ···বুঝি, এত আপন পৃথিবীতে আর কেহ নাই! বীণাকে তিনি এত ভালোবাসেন···

মনে হইতেছিল, সে সলিলা নয়; সে বীণা···এ-কথা জানিতে পারিলে তখন উনি কি করিবেন? বকিয়া মারিয়া বীণাকে নির্ব্বাসন দিবেন? না, সুগভীর স্নেহের একটি কণা···

কিরণ আসিয়া বলিল,—বেশ লোক তুমি সলিলা! বৌ ও-দিকে এলো বলে···বাবা কখন বেরিয়ে গেছেন বৌ আনতে, বর আনতে! আর তুমি এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো!···নাও, তাড়াতাড়ি সেজে নাও···

দু'চোখে করুণ মিনতি···বীণা বলিল,—আমার বড্ড মাথা ধরেছে, ভাই।

কিরণ বলিল,—সত্যি? কিন্তু···

বীণা বলিল,—একটু সুস্থ হলেই আমি যাবো।

কিরণ কোনো জবাব দিল না···নিরুপায় দৃষ্টিতে বীণার পানে চাহিয়া রহিল।

দাক্ষায়ণী দেবী আসিলেন, বলিলেন,—এ কি সলিলা! এখনো বসে আছো!···বিরজা, বৌমা ওরা কখন তৈরী হয়েছে!

কিরণ বলিল—সলিলার শরীরটা ভালো নয়, পিশিমা!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—ও···তা হ'লে কি করে ও যাবে? চলো মা কিরণ, আর দেরী করে না। ও-দিকে বৌ আসবার সময় হয়েছে···

নিশ্বাস ফেলিয়া কিরণ বীণার পানে চাহিল, কহিল—বৌ এলে একটু পরে আবার আমি আসবো। তুমি একটা ওষুধ-বিষুধ খাও বরং···বুঝলে সলিলা। আমি দাদুকে বলে যাচ্ছি।···এ-সময়ে অসুখ করলে চলবে না, ভাই। তুমি অসুখ করে এ-বাড়ীতে পড়ে থাকলে বিয়ের আদ্ধেক আমোদ মাটী হয়ে যাবে।

কিরণ চলিয়া গেল। দাক্ষায়ণী দেবীও সেই সঙ্গে···

বীণা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল···তার পর কি মনে হইল, টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া মোটা একখানা রাইটিং-প্যাড বাহির করিয়া লিখিতে বসিল···নিজের প্রতারণার কাহিনী। লিখিল—

শ্রীচরণ-কমলেষু
দাদু···

কিন্তু কি লিখিবে? কোন্‌খান হইতে এ-কাহিনী সুরু করিবে? মা-অতসীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী?···কিন্তু মা···মায়ের কলঙ্ক-কাহিনী·· মেয়ে হইয়া লিখিবে? ছি!

দু'চোখ জলে ভরিয়া আসিল; এবং চোখের ঘন-বাষ্পের আবরণে বাহিরের পৃথিবী ধুইয়া ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল!

ও-বাড়ীর ফুলশয্যার রাত্রে একা এ-বাড়ীতে কিন্তু পড়িয়া থাকা সম্ভব হইল না। কিরণ আসিয়া নিজের হাতে সাজাইয়া-গুছাইয়া বীণাকে লইয়া গেল।

বীণাকে যাইতে হইল। সে গেল যেন বিচিত্র সাজ-পোষাক-পরা কাঁচের পুতুল! প্রাণ যেন বুকের কোটর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

সেখানকার আনন্দ-উৎসবে নিজেকে সে সকলের আড়ালে মৌনতার আবরণে ঢাকিয়া রাখিল···

নন্দরাণী বলিল—কি হয়েছে ভাই?···এমন মলিন মুখ···

মুখে ম্লান হাসি···বীণা বলিল—শরীরটা ভালো নেই।

কিরণ বলিল,—সত্যি সলিলা···খুব কষ্ট হচ্ছে?

বীণা ছোট্ট জবাব দিল। বলিল,—না···

গান-বাজনা···হাসি-গল্প···কত লোক-জন···কত আসা-যাওয়া···যেন আলো-আঁধারের চমক্ বহিয়া চলিয়াছে!

বীণা যেন ও-সবের বাহিরে আর-এক জগতে বসিয়া লহরের লীলা-রহস্য দেখিতেছে! ও-জগতের সহিত তার যেন কোনো যোগ নাই! সে যেন ও-জগৎ-ছাড়া জীব! তার জগতে সে আছে একা···তার জগতে তার আশে-পাশে কেহ নাই···কিছু নাই!

পরের দিন এক কাণ্ড ঘটিল।

বেলা তখন বারোটা···

কিরণ আসিয়া তারাচরণ রায়কে ডাকিল,—দাদু···

তারাচরণ রায় খাইতে বসিয়াছেন···সামনে বসিয়া বীণা। দাক্ষায়ণী দেবীও সে ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—কি দিদি? সলিলাকে নিতে এসেছো?

কিরণ বলিল,—না। ঘটকালী করতে এসেছি!

—তার মানে?

—সলিলার সম্বন্ধ এনেছি। বিয়ে দিলে কি ঘটকালী পাবো, বলো দাদু··

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাকে আমার অদেয় কি আছে···বলো? তোমার গলায় মালা দেবো··· তাতে হবে?

হাসির উচ্ছ্বাসে মুখ ভরিয়া কিরণ বলিল,—নিশ্চয়। তবে সে মালা হবে মুক্তোর মালা। আর তার এক-একটি মুক্তো হবে ডিমের মত বড়!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তাই হবে দিদি···

কিরণ বলিল,—নতুন বৌদি এসেছে। এই বৌদির পিশ্‌তুতো ভাই···বুঝলে দাদু! ছেলে বিলেত থেকে এ্যাকাউণ্টান্সি পাশ করে এসেছে। এ্যাসিষ্টাণ্ট এ্যাকাউন্‌টাণ্ট জেনারেলের চাকরি পেয়েছে। বৌদির পিশিমা সে-দিন সলিলাকে দেখেছেন কি না···দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। কাল রাত্রে মার সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল। আমি শুনে ফেলেছি। ওঁরা লোক পাঠাবেন কাল-পরশুর মধ্যে। আমি তাই আগে থেকে প্রজাপতির দূত হয়ে এসেছি। এ ঘটকালীর claim কিন্তু আমার!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—নিশ্চয়। তুমি আগে তোমার ক্লেম ফাইল করে গেলে যখন···

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—দাঁড়া। বিয়ে বললেই কি বিয়ে হয়! কোষ্ঠী আছে···রাশিচক্র আছে। সে সব মিলুক!

উচ্ছ্বসিত ভাষায় কিরণ বলিল,—সে সব মিলবে, পিশিমা···এত ভালো ছেলে! সলিলার সঙ্গে সব মিলবে, নিশ্চয়! তার পর কিরণ চাহিল বীণার পানে; বলিল,—তোমার কাছ থেকেও কি আদায় করি, তখন দেখো। জানলে দাদু, বর দেখতে যেন রাজপুত্তুর। বিলেত থেকে এলেও বাঙালী আছে ট্যাঁশ্ হয়নি! আর বরের কি নাম, জানো?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—কি নাম?

কিরণ বলিল,—স্বর্ণদ্যুতি রায়।

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—ও কি নাম রে, বাবা! কবিরাজী ওষুধেরই এমন নাম হয়, শুনেছি! কি নাম বললি?

কিরণ বলিল,—স্বর্ণদ্যুতি রায়···

তার পর কিরণ বীণার পানে চাহিল, বলিল,—নামটা বেশ নতুন-রকমের, না দাদু? আর খাশা মিল হবে··· সলিলা আর স্বর্ণদ্যুতি! শুনছো সলিলা, এ নাম জপ করো আজ থেকে···বুঝলে!

বীণার মুখে হাসি নাই, কথা নাই! বীণা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

সম্প্রতি ইটালীয়-গ্রীক্ সঙ্ঘর্ষের অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলীর প্রতি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। বৃটেন্ ও জার্ম্মাণী অথবা বৃটেন্ ও ইটালীর প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের গুরুত্ব পূর্ব্বে কিছু কাল অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়াছিল। সম্প্রতি বৃটিশ সৈন্য সিদিবারাণি হইতে ইটালীয়দিগকে বিতাড়িত করায় ঐ অঞ্চলের যুদ্ধের কিঞ্চিৎ গুরুত্ব উপলব্ধি হইতেছে।

গ্রীক্-ইটালীয় সঙ্ঘর্ষ—

প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বে ইটালী কর্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইয়াছে। আক্রমণের প্রারম্ভ হইতেই ইটালীয়দিগের বিক্রম প্রকাশ পায় নাই। ইহাতে প্রথমে কেহ কেহ মনে করেন যে, ইটালী হয় ত সত্বর গ্রীসের আত্মসমর্পণ আশা করিতেছিল। ইটালী যদি সেইরূপ আশা করিয়াও থাকে, তাহা হইলে উহা ব্যর্থ হইবার পরও ইটালীয় বাহিনীর বিক্রম লক্ষিত হয় নাই। বরং গ্রীক্ সৈন্য বরাবরই ইটালীয়দিগকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করিয়াছে;—তিন সপ্তাহ যুদ্ধের পরই তাহারা ইটালীয়দিগকে গ্রীস হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়, এবং আল্‌বেনিয়ায় শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে আরম্ভ করে। ইতোমধ্যে উত্তর-আল্‌বেনিয়ায় করিজা অধিকার করিয়া গ্রীক্‌বাহিনী এল্‌বাসান্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে; দক্ষিণে স্যান্টি কোয়ারান্টা তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, ইটালীয় সৈন্য আর্জ্জিরোক্যাস্ট্রো ত্যাগ করিয়াছে।

গ্রীস কর্তৃক আক্রমণকারী ইটালীর এই পরাজয়ে বিশ্বের প্রত্যেক নিরপেক্ষ দর্শক আনন্দিত হইয়াছেন; কিন্তু ক্ষুদ্র গ্রীস কর্তৃক একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তির এইরূপ শোচনীয় পরাজয় তাঁহাদিগকেও বিস্মিত করিয়াছে। ইহা সত্য যে, গ্রীস কেবল স্বীয় বিক্রমেই ইটালীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় নাই; বস্তুতঃ, ইটালীর পর্য্যাপ্ত শক্তি গ্রীসের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয় নাই। গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযানে ইটালীর এই আগ্রহের অভাব অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বটে! গ্রীসকে আক্রমণ করিয়া ইটালী যদি পরোক্ষে মধ্য ও অদূর প্রাচীতে বৃটেনের সামরিক ব্যবস্থা বিক্ষিপ্ত করিতে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সে অভিসন্ধি বহু পূর্ব্বেই ব্যর্থ হইয়াছে; ইহার জন্য এত বিলম্বের প্রয়োজন ছিল না। কোন কোন বল্‌কান-রাষ্ট্রকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা গ্রীস আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইলে সে উদ্দেশ্যও এত দিনে বিফল হইয়াছে; গ্রীসের কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া নাজী-ফ্যাসিষ্ট রোষের সম্মুখীন হয় নাই। কাজেই, ইটালী কেন তাহার সামরিক মর্য্যাদা এইভাবে বিনষ্ট হইতে দিতেছে, তাহা বুঝা দুষ্কর। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, জার্ম্মাণীর মিত্রশক্তি ইটালীর সামরিক মর্য্যাদা এইভাবে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও নাজী নেতৃবৃন্দ নিরুদ্বেগ!

সম্প্রতি ইটালীর প্রধান সেনাপতি মার্শাল ব্যাডগলিও এবং আরও কয়েক জন বিশিষ্ট সামরিক কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিয়াছেন। সামরিক বিভাগে এই পরিবর্ত্তন হয় ত গ্রীক-অভিযানের সহিত সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত নহে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, আল্‌বেনিয়ায় ইটালীয় সৈন্যের দুরবস্থা নিবারণের উদ্দেশ্যে সেখানে রণ-দক্ষ "ব্ল্যাকসার্ট" যোদ্ধা প্রেরিত হইতেছে—dispatch of picked Blackshirt fighters in an attempt to stop the rot in Albania. এই "ব্ল্যাকসার্ট"-বাহিনীকে প্রেরণের আবশ্যকতা এত দিন উপলব্ধ হয় নাই; সামরিক কর্ম্মচারীদিগের পদত্যাগের পর আল্‌বেনিয়ার দুরবস্থা নিবারণ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা হইতে হয় ত ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট দল ও সামরিক কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক বিদ্বেষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রীসের যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া ইটালীর সামরিক বিভাগের উপর ফ্যাসিষ্ট দলের আধিপত্য স্থাপনের জন্য যবনিকার অন্তরালে হয় ত হীন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। খুব সম্ভব, মার্শাল ব্যাডগলিও গ্রীস্-অভিযানে ফ্যাসিষ্ট দলের সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত ছিলেন; হয় ত তাঁহার স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতাও ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ফ্যাসিষ্ট কর্তৃপক্ষ হয় ত ইচ্ছা করিয়া গ্রীসে ইটালীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় উদাসীন ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন; জার্ম্মাণী হয় ত তাঁহাদিগের নির্দ্দেশেই নিরুদ্বেগ ছিল। যদি ফ্যাসিষ্ট দলের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষাই গ্রীসে ও আল্‌বেনিয়ায় ইটালীয় বাহিনীর পরাজয়ের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে এখন যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ইটালীর সামরিক কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা উত্তমরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং তাহার ফলে বিশিষ্ট সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে। এখন ফ্যাসিষ্ট দলের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গ্রীস্ অভিযান সম্পর্কে ইটালীর ঔদাসীন্য আর সম্ভব হইবে না।

একমাত্র দলগত বিরোধের জন্য যে ইটালীর সামরিক মর্য্যাদা এইভাবে বিপন্ন করা হইয়াছে, ইহা অসম্ভব মনে হইতে পারে। কিন্তু একনায়ক-শাসিত দেশে এইরূপ অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, ইটালীতে দেশের জনমত অখণ্ড ভাবে ফ্যাসিষ্ট নেতৃবৃন্দের অনুগত নহে; রাজার প্রতি এবং ফ্যাসিষ্ট দলের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি জনমতের আনুগত্য উপেক্ষণীয় নহে। কাজেই, প্রবীণ সমর-নায়কদিগের অপসারণের জন্য ফ্যাসিষ্ট দল বিরাট ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইটালী লিপ্ত হইবার কিছু কাল পরেই লিবিয়ায় যখন রহস্যজনকভাবে মার্শাল বাল্‌বোর মৃত্যু ঘটে, তখনও সন্দেহ করা হইয়াছিল যে, সামরিক বিভাগে ফ্যাসিষ্ট দলের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে হয় ত কৌশলে মার্শাল বাল্‌বোকে অপসারিত করা হইয়াছে।

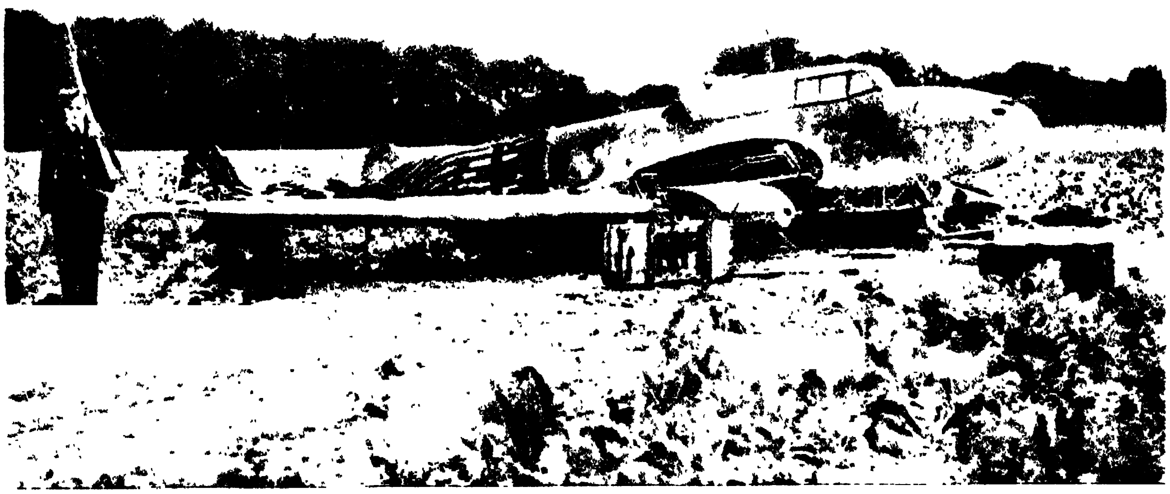
ইটালীর বাহিনী গ্রীসের নিকট পরাজিত হইলেও ইটালীর সকল আশা নির্ম্মূল হইয়াছে, এইরূপ মনে করিবার কারণ এখনও ঘটে নাই। সামরিক বিভাগ সম্বন্ধে ফ্যাসিষ্ট দলের ষড়যন্ত্র সফল হইবার পর গ্রীক্-বাহিনী পরাজিত করিতে যে বিলম্ব হইবে না—এই স্থির বিশ্বাসেই হয় ত, ইটালীর সামরিক মর্য্যাদা বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও, ফ্যাসিষ্ট দল এত দিন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে নাই। ইটালীয়-গ্রীক্

সঙ্ঘর্ষের সুযোগে ক্রীট দ্বীপের নৌ ও বিমানঘাঁটি অধিকার করিয়া বৃটেন্ পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে শক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐ দ্বীপে বৃটেনের আধিপত্য-বিস্তার ইটালী কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিত না। হয় ত এই জন্যই ইটালী প্রথমে অভিযোগ করিয়াছিল যে, গ্রীসের নৌ ও বিমানঘাঁটি বৃটেনের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছিল। ঈজিয়ান্ সাগরেও বৃটেনের প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছে; ঐ সাগরের ডোডেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জের সহিত ইটালীর সংযোগ এখন বিচ্ছিন্ন। ফ্যাসিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ হয় ত মনে করেন যে, ঈজিয়ান্ সাগরের উপকূলে নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ডোডে-কেনিজের সহিত পুনরায় সংযোগ স্থাপনে বিলম্ব হইবে না।

জার্ম্মাণী গ্রীক্-ইটালীয় সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হইবে কি না, এই প্রশ্ন অনেকের মন আন্দোলিত করিতেছে। যত দূর মনে হয়, যুগোশ্লোভিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া গ্রীসকে আক্রমণ করা জার্ম্মাণীর পক্ষে অসম্ভব নহে। ইটালীর সামরিক বিভাগে ফ্যাসিষ্ট দলের

সম্ভোগ করিতেছিল। হাঙ্গেরি বহু পূর্ব্ব হইতেই নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের অনুরক্ত, সে কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিল; সম্প্রতি জার্ম্মাণী ও ইটালীর অনুগ্রহেই সে ট্রান্সীলভেনিয়া প্রদেশের বিশাল অংশ লাভ করিয়াছে। রুমানিয়ার রাজা ক্যারলের সিংহাসন-ত্যাগের পর হইতে ঐ দেশে নাজী-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ঐ রাষ্ট্রটি এখন জার্ম্মাণীর একটি প্রদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্লোভাকিয়াকে জার্ম্মাণী তাহার নিজের প্রয়োজনেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ভূতপূর্ব্ব চেকোশ্লোভোকিয়া রাষ্ট্রের এই অংশকে সে পূর্ব্ব সীমান্তের একটি প্রহরী-রাষ্ট্ররূপে (Buffer State) জিয়াইয়া রাখিয়াছে। কাজেই এই তিনটি রাষ্ট্রকে নব-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করায় জার্ম্মাণী যেমন কোন নূতন সুবিধা লাভ করে নাই, তেমনই আন্তর্জ্জাতিক-ক্ষেত্রেও ইহাতে তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় নাই।

জার্ম্মাণী যখন নব-ব্যবস্থার প্রসারে প্রবৃত্ত হয়, তখন মনে



এইরূপ বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণকালে ভূপতিত হইয়াছে

আধিপত্যের অভাবই হয় ত এত দিন জার্ম্মাণীকে গ্রীক্-ইটালীয় সঙ্ঘর্ষ হইতে দূরে রাখিয়াছিল। বর্ত্তমানে সে অসুবিধা যখন তিরোহিত হইল, তখন জার্ম্মাণীর পক্ষে তাহার মিত্রশক্তি ইটালীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ, যুগোশ্লোভিয়ার সুর এখন ক্রমেই জার্ম্মাণীর অনুকূল হইতেছে। সম্প্রতি হাঙ্গেরি ও যুগোশ্লোভিয়ার সম্বন্ধের যে উন্নতি-লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, জার্ম্মাণীর গোপন হস্ত নিশ্চয়ই কার্য্য করিতেছে।

জার্ম্মাণীর কূটনীতিক তৎপরতা—

জার্ম্মাণীর তৎপরতা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—সামরিক এবং কূটনীতিক। কূটনীতিক্ষেত্রে হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও শ্লোভাকিয়াকে জার্ম্মাণী তাহার তথাকথিত নব-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। এই তিনটি রাষ্ট্র জার্ম্মাণীর নব-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সে কোন নূতন সুবিধা লাভ করে নাই—কারণ, এই সকল রাষ্ট্রকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহারের অধিকার জার্ম্মাণী পূর্ব্ব হইতেই

হইয়াছিল যে, বুলগেরিয়াও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং এই ভাবে তুরস্কের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া জার্ম্মাণী ঐ রাষ্ট্রটিকে স্বদলে আনয়নের জন্য প্রয়াস পাইবে। বুলগেরিয়া নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের অনুগত; সে আশা করে যে, তাহার ঈজিয়ান সাগরে প্রবেশ-পথ লাভের আকাঙ্ক্ষা ঐ দুইটি রাষ্ট্রকে তোষামোদ করিলেই পূরণ হইবে। কাজেই জার্ম্মাণীর নব ব্যবস্থায় বুলগেরিয়ার প্রবেশ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জার্ম্মাণী দেখিল যে, তুরস্কের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া ঐ রাষ্ট্রকে পরোক্ষে "চাপ" দিলে কোন কাজ হইবে না, বরং উহাতে অসুবিধারই সৃষ্টি হইবে; কারণ হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও শ্লোভাকিয়া নব-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবামাত্র তুরস্ক দার্দ্দানেলিজ অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া জানাইয়া দিয়াছিল যে, সে জার্ম্মাণীর আক্রমণমূলক প্রয়াস প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তুরস্কের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই জার্ম্মাণী তাহার নব-ব্যবস্থার প্রসারে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই; ভন প্যাপেন আঙ্কারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

তুরস্ককে আশ্বাস দিয়াছেন—Germany has no intention of waging a Balkan campaign and no intention of attacking Turkey. জার্ম্মাণী বর্ত্তমানে তুরস্ককে স্বপক্ষে আনয়নের জন্য—বিশেষতঃ, দার্দ্দানেলিজের পথে পশ্চিম-এশিয়ায় প্রবেশের সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে—তুর্কি সরকারের সহিত গভীর কূটনৈতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই আলোচনা যাহাতে শান্তিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে চালিত হইতে পারে, সেই জন্য জার্ম্মাণী ইচ্ছা করিয়াই বুলগেরিয়াকে এখন তাহার নব-ব্যবস্থার বাহিরে রাখিতেছে; গ্রীক-ইটালীয় সঙ্ঘর্ষে জার্ম্মাণী এত দিন যে অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার অন্যতম কারণও বোধ হয় ইহাই।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তিতে জার্ম্মাণী তাহার নব-ব্যবস্থা বুলগেরিয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত করিতে সাহসী হয় নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উহার ফল সুদূর-প্রসারী হইবে। সোভিয়েট রুশিয়া যদি বুলগেরিয়াকে জার্ম্মাণীর প্রভাবমুক্ত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তুরস্কের পথে জার্ম্মাণ-বাহিনীর পশ্চিম-এশিয়ায় প্রবেশ সে নিশ্চয়ই উদাসীন ভাবে লক্ষ্য করিবে না। বুলগেরিয়া অপেক্ষা দার্দ্দানেলিজ ও বস্‌ফোরাস প্রণালী জার্ম্মাণীর প্রভাবমুক্ত রাখাই সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়। কাজেই সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মতবিরোধের ফলেই জার্ম্মাণী যদি বুলগেরিয়ায় প্রভাব বিস্তারে ক্ষান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পশ্চিম-এশিয়ায় গমনের সমগ্র পরিকল্পনাই ত্যাগ করিতে হইবে। গ্রীক-ইটালীয় সঙ্ঘর্ষ-ফলে এখন পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে—বিশেষতঃ, ঈজিয়ান সাগরে বৃটেনের প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে গ্রীকদিগকে পরাভূত করিয়া স্যালোনিকা পর্য্যন্ত নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব বিস্তার যদি সম্ভবও হয়, তাহা হইলেও জল-পথে পশ্চিম-এশিয়ায় পৌঁছিবার প্রয়াস বিফল হইবে।

বার্লিনে মলটভ—

বার্লিনে মঃ মলটভের সহিত দুই দিনব্যাপী আলোচনা জার্ম্মাণীর আর একটি কূটনৈতিক প্রয়াস। মঃ মলটভ একাধারে রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র-সচিব; তাঁহার পক্ষে বার্লিনে আগমন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতঃপূর্ব্বে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী কখনও কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশান্তরে গমন করেন নাই। মঃ মলটভের সহিত ৩২ জন রুশ-বিশেষজ্ঞ বার্লিনে আসিয়াছিলেন; মঃ মলটভ দুই দিন পরেই মস্কৌএ প্রত্যাবর্ত্তন করেন, রুশ-বিশেষজ্ঞগণ বার্লিনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকেন। বার্লিনে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, মঃ মলটভের বার্লিন আগমনের প্রথম উদ্দেশ্য—জার্ম্মাণী ও ইটালী এবং পরে জাপানের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার মিলনের ক্ষেত্র স্থির করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—সোভিয়েট জার্ম্মাণ চুক্তির ভিত্তিতে আরও ব্যাপক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা। ইহা ব্যতীত, সোভিয়েট-জার্ম্মাণ মৈত্রী-বন্ধন যে শিথিল হয় নাই, তাহা প্রমাণ করাও নাকি মলটভের বার্লিনে আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।



বৃটেনের কোন স্থানে এই ভূগর্ভস্থ আশ্রয়-স্থলের প্রধান প্রবেশ-দ্বার বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে—একটি অপরিসর সুড়ঙ্গ দিয়া স্ত্রীলোকটি নিষ্ক্রান্ত হইতেছে

জার্ম্মাণীর সরকারী বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত মঃ মলটভের বার্লিনে আগমনের কারণ সম্বন্ধে অন্য বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে এ সম্বন্ধে বহু সম্ভব এবং অসম্ভব গবেষণার কথা রটিয়াছে। যত দূর মনে হয়, মঃ মলটভ প্রধানতঃ দুইটি কারণে বার্লিনে গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, ত্রিশক্তির চুক্তির ফলে অথবা জার্ম্মাণ-বাহিনীর রুমানিয়ায় প্রবেশে সোভিয়েট-জার্ম্মাণ মৈত্রী-বন্ধন যে শিথিল হয় নাই, ইহা সমগ্র বিশ্বের সমক্ষে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজনীয়তা জার্ম্মাণী উপলব্ধি করিতেছিল; সোভিয়েট ও জার্ম্মাণীর সম্ভাবিত মনোমালিন্য সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারকার্য্যের ফলে জার্ম্মাণীর কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় হয় ত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সরকারের বিজ্ঞপ্তিতেও এই কারণটি স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, বর্ত্তমানে রুশিয়ার সহিত বৃটেনের বিশেষ সদ্ভাব চলিতেছে না। দানিয়ুব কমিশনে রুশিয়া যোগ দেওয়ায় বৃটেন সন্তুষ্ট হয় নাই। বাল্টিক অঞ্চলের যে কয়েকটি রাষ্ট্র সম্প্রতি সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বৃটেনে গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ডার সম্পর্কে এখনও মীমাংসা হয় নাই। কাজেই রুশ সরকারের পক্ষেও সোভিয়েট-জার্ম্মাণ মিলনের দৃঢ়তা জানাইয়া পরোক্ষে বৃটেনকে কূটনৈতিক "চাপ" দিবার উদ্দেশ্যে মঃ মলটভকে বার্লিনে প্রেরণ করা সম্ভব। এই দুইটি কারণ ব্যতীত, অন্য কোন কারণে একাধারে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলটভের বার্লিনে আসিবার প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক নহে—সকল প্রকার প্রয়োজনীয় আলোচনাই রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির মারফৎ চলিতে পারিত। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে পোল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড, বাল্টিক

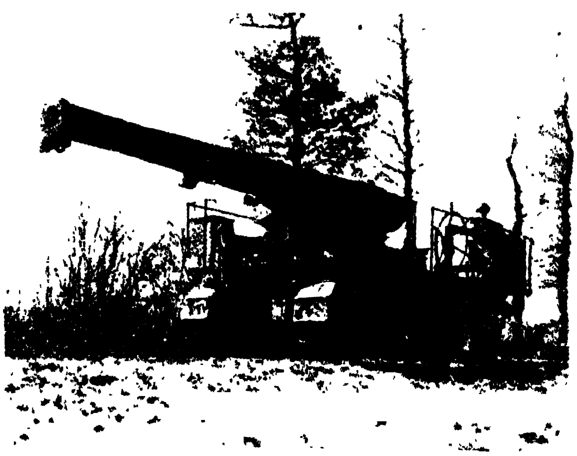
রাষ্ট্রসমূহ, বেসারেবিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে; কিন্তু সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রীর বার্লিনে আগমনের প্রয়োজন হয় নাই। অবশ্য মঃ মলটভ কেবল আনুষ্ঠানিক ভাবে বার্লিন পরিদর্শন করিয়াই প্রত্যাবর্তন করেন নাই। তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্থনৈতিক আলোচনা সম্পর্কে বলা যায়, এই বিষয়ে জার্ম্মাণীর পক্ষে যেমন সোভিয়েট রুশিয়াকে প্রয়োজন, তেমনই রুশিয়ার পক্ষেও জার্ম্মাণীকে প্রয়োজন। সুদীর্ঘ সংগ্রাম-পরিচালনে নিয়মিত ভাবে কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হওয়া জার্ম্মাণীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন; পক্ষান্তরে, যুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক বিষয়ে উপকৃত হইতে সোভিয়েট রুশিয়া অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। তাহার পর, রাজনীতিক্ষেত্রে দার্দ্দানেলিজ ও সুদূর প্রাচীর সম্পর্কে মঃ মলটভের সহিত আলোচনা হওয়াও সম্ভব।

মঃ মলটভ মস্কোএ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর স্পেনের পররাষ্ট্র-সচিব সীনর সুনারের সহিত নাজী নেতৃবৃন্দের আর একবার আলোচনা হয়। এই আলোচনার মর্ম্ম জানা যায় নাই। তবে, সম্প্রতি মার্কিন নৌসচিব কর্ণেল নক্স এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, স্পেনে এক ডিভিসন জার্ম্মাণ সৈন্য বেসামরিক পরিচ্ছদে অবস্থান করিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে জিব্রাল্টর—এমন কি, দক্ষিণ আফ্রিকাও বিপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। স্পেন সম্পর্কে ইতঃপূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতী'তে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্পেনকে যে কোন সময়ে জার্ম্মাণী স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারে; জার্ম্মাণী যদি আফ্রিকায় গমনের সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্পেন কখনও তাহার অন্তরায় হইবে না। সম্প্রতি জিব্রাল্টরের অপর পারে টেঞ্জিয়ারে স্পেনের সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সহিত জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ সমর-পরিকল্পনার সংযোগ থাকা অসম্ভব নহে।

জার্ম্মাণীর সামরিক প্রচেষ্টা—

জার্ম্মাণী এখনও বৃটেনে যথেচ্ছ বোমা-বর্ষণ করিতেছে; সম্প্রতি কভেন্‌ট্রীতে বোমা-বর্ষণের ফলে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বৃটেনের পক্ষ হইতেও জার্ম্মাণীর বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষিত হইতেছে। শ্রমশিল্প কেন্দ্র, বন্দর প্রভৃতি বোমা-বর্ষণে বিধ্বস্ত করিবার জন্য জার্ম্মাণী এখন অধিকতর তৎপর হইয়াছে। এই সময় সমুদ্রবক্ষে জার্ম্মাণীর সাবমেরিণ অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করিতেছে। হিটলার নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, বৃটেনকে অবরোধ করিবার প্রয়াস আরও প্রবল হইবে। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণী এখন এই বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বৃটেনের শ্রমশিল্প পঙ্গু করিবার কার্য্যে তাহার বিমানগুলি প্রবলভাবে নিয়োজিত হইতেছে, সমুদ্রবক্ষে জার্ম্মাণীর সাবমেরিণগুলিও তৎপর হইয়াছে; ইহা ব্যতীত জার্ম্মাণীর রণপোত দক্ষিণ আটলান্টিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—দক্ষিণ আমেরিকার সহিত বৃটেনের বাণিজ্য-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাই জার্ম্মাণ রণপোতের উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি ফরাসী উপকূলের জার্ম্মাণ কামানগুলি হইতে ডোভার অঞ্চলে প্রবলভাবে গোলা বর্ষিত হইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, জার্ম্মাণ-বাহিনীর পক্ষে শীতের কুয়াশায় আত্মগোপন করিয়া বৃটেনে অবতরণ করিতে সচেষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। এই উদ্দেশ্যেই ফরাসী উপকূলে জার্ম্মাণ কামানশ্রেণীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং কামানের সংখ্যাও না কি বর্দ্ধিত হইতেছে। বৃটিশ বিমানের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ সত্ত্বেও ফরাসী উপকূলের কামানশ্রেণীর বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ফরাসী উপকূলে এখন যে সকল কামান আছে, তাহাদের পাল্লা ২৮ মাইল; উহাদের গোলা ডোভার অঞ্চলে পতিত হইতে পারে। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণী ৭০ মাইল পাল্লার একটি কামান হইতে প্যারিসে গোলা বর্ষণ করিয়াছিল; লণ্ডনে গোলা-বর্ষণের উদ্দেশ্যে ঐ শ্রেণীর কামান না কি এখন জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত হইতেছে। গোলা বর্ষণরত কামানের সাহায্যে বৃটিশ-রণপোতকে দূরে রাখিয়া বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে সৈন্য অবতরণ করানই জার্ম্মাণীর বৃটেন্-আক্রমণ-পরিকল্পনার প্রধান কারণ। বৃটেনের আকাশে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া বৃটেনে সৈন্য অবতরণ করাইবার জন্য জার্ম্মাণী সমগ্র শরৎকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাহার



ফরাসী উপকূলের জার্ম্মাণ কামান;—ইহা সহজেই স্থানান্তরিত করা চলে

সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এখন বৃটেনের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাজেই, শরৎকালে উত্তম আবহাওয়ায় যাহা সম্ভব হয় নাই, প্রচণ্ড শীতে বৃটেন যখন আরও অধিক শক্তিশালী, তখন তাহা বিফল হইবার সম্ভাবনা আরও অধিক বলিয়াই মনে হয়।

লোরেন জার্ম্মাণীর অঙ্গীভূত—

সম্প্রতি জার্ম্মাণী ফ্রান্সের লোরেণ প্রদেশটি অধিকার করিয়াছে। এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আজ জার্ম্মাণী যখন বৃটেনের অবরোধ-ব্যবস্থার ফলে বিপন্ন, তখন সে যে এই খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল অধিকার করিতে প্রয়াসী হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে লোরেণ সর্ব্বপ্রথম ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান্ যুদ্ধে জার্ম্মাণী বিজয়ী হইয়া ঐ প্রদেশটি অধিকার করিয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের পর লোরেণ প্রদেশটি পুনরায় ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রদেশের শতকরা ৭০ জন জার্ম্মাণ-ভাষাভাষী; ৩০ জন ফরাসী ভাষায় কথা বলে। লোরেণ প্রদেশ অধিকার করিবার পূর্ব্বে অধিকাংশ ফরাসী অধিবাসী তথা হইতে ফ্রান্সে অপসারিত হইয়াছে।

আফ্রিকার যুদ্ধ—

সম্প্রতি আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনী সিদিবারাণি হইতে ইটালীয়-দিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। লিবিয়াস্থিত ইটালীয় বাহিনী গত ১৫ই সেপ্টেম্বর মিশরে প্রবেশ করে, এবং উপকূল-পথে ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়া সিদিবারাণি অধিকার করে। তদবধি গত তিন মাস ইটালীয় বাহিনী তথা হইতে আর পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইটালী গ্রীস আক্রমণ করিবার পর বৃটেনের আফ্রিকাস্থিত সমর-ব্যবস্থার কতকাংশ গ্রীসে নিয়োজিত হইলে সিদিবারাণি হইতে ইটালীয় বাহিনী পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা এত দিন তাহা করে নাই। ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর হইতে আফ্রিকার বৃটিশ বাহিনী কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত ছিল; বর্ত্তমানে তাহাদিগের যে প্রতি-আক্রমণ হইল, ইহার ফলে আফ্রিকার সামরিক ব্যবস্থার হয় ত আমূল পরিবর্ত্তন হইবে।

ওয়াঙ্গ-সরকার ও জাপান—

গত ১লা ডিসেম্বর জাপান নানকিংএ তাহার প্রভাবাধীনে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সহিত যথারীতি কূটনীতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে চীনের বিভীষণ ওয়াঙ্গ চেং-উইর নেতৃত্বে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তদবধি জাপান এই সরকারকে চীনের একমাত্র বৈধ সরকার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এত দিন তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ চিয়াং কাই সেকের প্রতি চীনাদিগের আনুগত্য অটল; আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে স্বার্থবান শক্তিগুলির নিকট চিয়াং-কাই-সেকের সরকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা অধিকতর। এখন জাপান উত্তর-চীনের এই সরকারকে একটি সংঘটিত ব্যবস্থার (F..it accompli) রূপ দিতে চাহিতেছে। হয় ত সে আশা করে, ইহার ফলে ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক-ক্ষেত্রে উহাকে স্বীকার করাইয়া লওয়া অসম্ভব হইবে না। আপাততঃ, খনিজ ও কৃষিজ সম্পদে উন্নত উত্তর-চীন শোষণের জন্ম ঐ অঞ্চলে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যক। জাপানের সহিত ওয়াঙ্গ-সরকারের যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে একটি কমিণ্টার্ণ-বিরোধী অনুচ্ছেদ সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। জাপান আশঙ্কা করে যে, ক্রমে চিয়াং-কাই-সেকের শাসনাধীন চীনা অঞ্চল রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। এই জন্ম সে পূর্ব্বাহ্নে ওয়াঙ্গ-সরকারের সহিত কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তি করিয়া রাখিল।

জাপান জানিত যে, তাহার প্রভাবাধীন ওয়াঙ্গ-সরকারকে আন্তর্জ্জাতিক-ক্ষেত্রে কেহ মানিয়া লইবে না। বস্তুতঃ, জাপানের তাঁবেদার মাঞ্চুকো-সরকার ব্যতীত অন্ত কেহ উহাকে মানিয়া লয়ও নাই। সোভিয়েট রুশিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে, ওয়াঙ্গ-সরকারের প্রতিষ্ঠায় চীন-সম্পর্কে তাহার নীতির পরিবর্ত্তন হয় নাই, অর্থাৎ সে চিয়াং-কাই-সেকের সরকারকেই চীনের বৈধ সরকার বলিয়া মানিয়া চলিবে, এবং জাপানের সহিত যুদ্ধে ঐ সরকারকে সে পূর্ব্বের ন্যায় সাহায্য করিবে। সম্প্রতি জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিষ্টার মাৎসুয়োকা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ওয়াঙ্গ-সরকারের সহিত জাপানের চুক্তি হওয়ায় সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনের জন্ম তাঁহাদিগের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, উহার সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার কোন সম্পর্ক নাই—চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার জন্ম ঐ চুক্তি করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণীও ওয়াঙ্গ সরকারকে মানিয়া লয় নাই—সে চিয়াং-কাই-সেকের সরকারকেই চীনের বৈধ সরকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। জাপানের মিত্র জার্ম্মাণীর এই কার্য্যে অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; জাপানের মঙ্গলের জন্যই জার্ম্মাণী ইহা করিতেছে। জাপান এখন আর পার্ব্বত্য অঞ্চলে মার্শাল চিয়াং-কাই-সেকের অনুসরণে ধাবিত হইতে আগ্রহান্বিত নহে, সে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে, হয় ত মালয় উপদ্বীপে অর্থনৈতিক প্রভাব—সম্ভব হইলে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের জন্ম আগ্রহান্বিত। কিন্তু চীনের ব্যাপারে মীমাংসা না হইলে তাহার পক্ষে অন্যত্র মনোযোগী হওয়া একরূপ অসম্ভব। জাপান সুস্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, বৃটেন অথবা আমেরিকার সহায়তায় চীনের ব্যাপারে মীমাংসা হইবার সুদূরবর্ত্তী আশাও আর নাই; বরং এই দুইটি শক্তি চীনকে যুদ্ধে রত রাখিয়া জাপানের অন্যত্র প্রসার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত করিতে চাহে। এই জন্ম জাপান এখন সোভিয়েট একনায়ক ষ্ট্যালিনের পদে তৈল-মর্দ্দন করিয়া চীনের ব্যাপারে মীমাংসা করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। জাপানকে যদি এই কার্য্যে সহায়তা করিতে হয়, তাহা হইলে চীনের চিয়াং-কাই-সেক সরকারের সহিত জার্ম্মাণীর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকা প্রয়োজন। জার্ম্মাণী যদি চিয়াং-কাই-সেকের সরকারের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করে, তাহা হইলে সে কখনও ভবিষ্যতে চীনের ব্যাপারের মীমাংসা তথা সোভিয়েট-জার্ম্মাণ সম্বন্ধের উন্নতি-সম্পর্কে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রিশক্তির চুক্তি হইবার পর হইতে জাপান ও সোভিয়েট রুশিয়ার সম্বন্ধের উন্নতি-সাধনের জন্ম জার্ম্মাণী যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

শ্যাম ও ইন্দোচীন-সঙ্ঘর্ষ—

সম্প্রতি শ্যাম ও ইন্দোচীনের সীমান্তে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিষ্টার মাৎসুয়োকা এই সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে জাপানের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জাপানের ইঙ্গিতেই শ্যামের পক্ষে ইন্দোচীনের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব। এই সীমান্তের সঙ্ঘর্ষ যদি ক্রমে ঐ দুইটি রাষ্ট্রের ব্যাপক যুদ্ধে পরিণত হয়, তাহা হইলে জাপান হয় ত শ্যামের পক্ষাবলম্বন করিয়া ক্রমে মালয় উপদ্বীপে প্রভুত্ব-বিস্তারে প্রয়াসী হইবে।

শ্রীঅতুল দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারত সচিবের বক্তৃতায় অসন্তোষ

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার বৃটিশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারত সচিব মিষ্টার আমেরী "ভারতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবাসীরা গত বারের যুদ্ধের ন্যায় সামরিক প্রচেষ্টা করিতেছে, সে কথা ভারত সচিব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার উক্তিতে এ দেশের কোন শ্রেণীর লোকই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। যাঁহারা কংগ্রেসের সদস্য এবং মতাবলম্বী, তাঁহারা ত সন্তুষ্ট হইতে পারেনই নাই, অধিকন্তু যে সকল রাজনীতিক-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কংগ্রেসের সহিত সকল বিষয়ে একমত নহেন, তাঁহারাও যে তাঁহার উক্তিতে অসন্তুষ্ট, এ ভাব তাঁহারা গোপন করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি অল্প দিন পূর্ব্বেও ভারত সরকারের আইন-সদস্য ছিলেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, তিনি কংগ্রেসের ন্যায় পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী করেন না; তিনি চাহেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। তিনি বলিয়াছেন, ভারত সচিব কংগ্রেসের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলিবেন না। তিনি কংগ্রেসের পক্ষেও ওকালতি করিতেছেন না; বরং তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেসের ভাব দেখিয়া তিনি নিরুৎসাহই হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার মনে হয়, এই সময় কংগ্রেসের পক্ষে যথাসাধ্য প্রচেষ্টার সমর্থন ঘটিলেই ভারতবাসীর অধিক কল্যাণ সাধিত হইত। ইহা অবশ্য তাঁহার ব্যক্তিগত মত। তাহা হইলেও তিনি এ কথা বলিয়াছেন যে, ভারত সচিব তাঁহার দেশবাসীকে এবং সাগরপারস্থ অন্যান্য দেশবাসীকে ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি যে ভাবে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহার দেশবাসীরা এবং অন্যান্য সকলে ভারতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভুল বুঝিবে। ভারত সচিবের বক্তৃতা পাঠে মনে হয় যে, ভারতের বর্ত্তমান অচল অবস্থার জন্য যেন কংগ্রেসই একমাত্র দায়ী; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ইহার জন্য মস্লেম লীগ বরং অধিক দায়ী। ভারত সচিব বলিয়াছেন, "মুসলমানদিগের মনের এই ভয়—প্রদেশগুলিকে নূতন করিয়া সজ্জিত এবং সম্মিলিত করিয়া উহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দিলে হয় ত নিরস্ত হইতে পারে, তবে কেন্দ্রী সরকারের দিক্ হইতে পররাষ্ট্রিক দেশরক্ষা এবং আর্থিক নীতির একতা-সাধনের জন্য যথাসম্ভব অল্প হস্তক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

সার নৃপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—এই কথাগুলি পাঠ করিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। কারণ, মিষ্টার জিন্না বারংবারই বলিয়াছেন, তিনি ডেমক্রেসী (অর্থাৎ গণশাসন) চাহেন না। সম্ভবতঃ, তিনি যদি পাকিস্থান-প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে না পারেন, তাহা হইলে মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে গণশাসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারেন। মিষ্টার জিন্না প্রকাশ্যে বলিয়াছেন,—কেবলমাত্র সামাজিক বা ধর্ম্ম বিষয়ে নহে, অন্য বিষয়েও যাহাতে হিন্দুরা মুসলমানদিগের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন,—তিনি তাহাই চাহেন। সার নৃপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—তিনি মিষ্টার জিন্নার কথার সমালোচনা করিতে চাহেন না; তবে তিনি বলেন যে, যদি প্রদেশগুলির ক্ষমতা অধিক বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের বৈরিভাব না কমিয়া বরং বর্দ্ধিতই হইবে; সুতরাং মিষ্টার আমেরীর কথামত উহার দ্বারা ভয়ের নিরসন হইবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। ভারতবাসীকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না,—এ কথা মিষ্টার আমেরী খুব দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,—কিন্তু মুসলমানদিগের ভাব এবং পাকিস্থান সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। মিষ্টার জিন্না উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা পাকিস্থান চাহেন; তবে যুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্থানের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে চাহেন না। কংগ্রেসও ত যুদ্ধের সময় পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রাপ্তির দাবী করিতেছেন না। মিষ্টার আমেরী স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয়

শাসন-যন্ত্রের সংগঠন ভারতবাসীরই কার্য্য; কিন্তু তাহার উপর তিনি যে অতিরিক্ত দফা চাপাইয়াছেন—তাহাই সর্ব্বনাশকর। সে দফাটি এই যে, প্রস্তাবিত গণতন্ত্রমূলক স্বায়ত্ত-শাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবার অধিকার থাকিবে না। ইনি আরও বলিয়াছেন, "এক পক্ষের উপর সমস্ত দোষের পশরা চাপান উচিত নহে। বৃটিশ জাতির সাহস ভুবনবিখ্যাত; মিষ্টার আমেরী যেরূপ নির্ভীকতার সহিত কংগ্রেসের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবীর নিন্দা করিয়াছেন, পাকিস্থান প্রস্তাবেরও সেইরূপ নির্ভীকতার সহিত নিন্দা করিলেই ঠিক কাজ করা হইত।"—ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক। অনেকে সন্দেহ করিতেছেন, পাকিস্থান-প্রস্তাব বোধ হয় ফরমাইসী ব্যাপার (Command performance)!

ভাওয়াল মামলার আপীল

এত দিন পরে হাইকোর্টে ভাওয়াল সন্ন্যাসী-কুমারের মামলার বিচার শেষ হইল। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাণী বিভাবতী হাইকোর্টে যে আপীল করিয়াছিলেন, তাহাতে তিন জন বিচারপতির দুই জন, বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, এবং বিচারপতি কষ্টেলো একমত হইয়া সিদ্ধান্ত করেন, সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের মধ্যম কুমার শ্রীযুত রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিনিই ভাওয়ালের রাজসম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী। বিচারপতি কষ্টেলো ছুটীতে বিলাতে থাকা-কালে এই মামলার রায় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; এ জন্য তাহা রায় বলিয়া গ্রাহ্য হইবে কি না, এই প্রশ্ন লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল। বিচারে স্থির হইয়াছে—বিচারপতি কষ্টেলো যখন ঐ মামলার বিষয় অন্য বিচারপতিদ্বয়ের সহিত যথাবিহিত আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং স্বপদস্থ থাকিয়া তাঁহার স্বাক্ষরিত রায় প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তাহা রায় বলিয়া গ্রাহ্য হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সুতরাং ঐ মামলা সম্বন্ধে যে একটু গোল উঠিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ঢাকার অতিরিক্ত জজ শ্রীযুত পান্নালাল বসুর রায়ই আপীলে বহাল রহিল। এখন মধ্যম কুমারের পত্নী রাণী বিভাবতী ইহার বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিবেন কি না, তাহা তাঁহার বিচক্ষণ পরামর্শদাতারা বলিতে পারেন; তবে তাঁহার উকীল প্রসঙ্গক্রমে হাইকোর্টের এজলাসে বলিয়াছিলেন, তাঁহার মক্কেলের আর অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই। এখন কার্য্যতঃ কি হইবে, বলা যায় না। এই মামলায় উভয় পক্ষেরই বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আপীল-বিচারের রায়ে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা এই মামলা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সংগ্রাম ও বৃটিশ পার্লামেণ্ট

বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা লইয়া বৃটিশ পার্লামেণ্ট এবং বৃটিশ জাতি এতই ব্যস্ত হইয়াছেন যে, অন্য কাজে মন দিতে পারিতেছেন না। এই যুদ্ধ-জনিত উদ্বেগও তাঁহাদের এত অধিক যে, ভারতীয় শাসনযন্ত্র-সংক্রান্ত কোন সমস্যার কথা তাঁহারা চিন্তা করিতেও অসমর্থ,—ইহা অনেক ইংরেজেরই মুখে শুনা যাইতেছে; এমন কি, কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের উদ্বোধন কালে এবার লর্ড লিন্‌লিথগো যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও ঐ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু কথাটা কি সত্য? বৃটিশ পার্লামেণ্ট যাহাই কিছু করিতেছেন, তাহা কেবলই যে যুদ্ধ-ব্যাপার সম্পর্কিত, এরূপ মনে করিবার উপায় নাই, আর তাহার দৃষ্টান্তের অভাব এই ভারতেও নাই। শাসন-সংস্কার আইনে ব্যবস্থিত ছিল যে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা একাধিক প্রদেশে বিস্তৃত, সে বিশ্ববিদ্যালয়-ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন প্রাদেশিক সরকার কোনরূপ আইন করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই যুদ্ধের সময়েই সেই ব্যবস্থার সংশোধন করিয়া-লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা-বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা এখন বাঙ্গালা এবং আসাম, এই দুই প্রদেশে বিস্তৃত। এই বিলখানি যদি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করা হইবে, এবং হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-শিখ-ব্রাহ্ম-জৈন প্রভৃতি অমুসলমান সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির এবং প্রগতির সঙ্কোচসাধন করা হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য, ভারতীয় শাসনসংস্কার-সম্পর্কিত এই ব্যবস্থার

সঙ্কোচসাধন করা হইয়াছে কি ইঙ্গ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের প্রয়োজনে? বর্ত্তমান জার্ম্মাণ যুদ্ধের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কি গূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা খর্ব্ব না করিলে এবং বঙ্গীয় অমুসলমান সম্প্রদায়ের মানস-প্রগতিতে বাধা না দিলে চলিত না? ব্যাপারটা সাধারণ বুদ্ধির আয়ত্তে আনে, কাহার সাধ্য?

রাজস্ব বিল দুই বার অগ্রাহ্য

ভারতের রাজস্ব সচিবের উপস্থাপিত রাজস্ব বিল (যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কর আদায়ের জন্য যে আইনের পাণ্ডুলিপিখানি) ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করা হইয়াছিল, তাহা গত ৩রা অগ্রহায়ণ ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইলে, তাহার পরদিনই বড়লাট উহা পাশ করিবার জন্য তাঁহার সুপারিশ সহ ব্যবস্থা-পরিষদে পুনঃপ্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত পরিষদ এই দ্বিতীয় বারও উহা পূর্ব্ববৎ অগ্রাহ্য করেন। বিলখানির পক্ষে প্রথম বারের ন্যায় দ্বিতীয় বারও ৫৩ ভোট, এবং বিপক্ষে ৫৫ ভোট হইয়াছিল। বিলখানির ভাগ্য যে এইরূপই হইবে, তাহা বোধ হয়, কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। যাহা হউক, বিলখানি যথানিয়মে বড়লাটের সার্টিফিকেটের জোরে পাশ হইবে, এবং দেশের লোককে নির্দ্ধারিত কর দিতে হইবে, এ বিষয়ে কাহারও কি সন্দেহ থাকিতে পারে? এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, মসলেম লীগের সদস্যগণ এই বিলখানির অনুকূলে বা প্রতিকূলে ভোট প্রদান করেন নাই। তাঁহাদের এই প্রকার তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথাই বলিতেছেন। কাহারও কাহারও অনুমান, তাঁহারা পাকিস্থানের প্রস্তাবটি পাকাপাকি করিয়া লইবার জন্য এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন; আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, এই বিল পাশ হইলে মুসলমানদিগকেও কর দিতে হইবে, সেই জন্য মুসলমান জনসাধারণ এই বিলের বিরোধী ছিলেন; লীগের সদস্যদিগের ভোটের বলে বিল কেন্দ্রী ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইলে কতকগুলি মুসলমান সম্ভবতঃ লীগের প্রতি বিমুখ হইতেন। লীগ যাঁহাদের প্রতিনিধি, তাঁহাদের অনেকে লীগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে লীগকে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে হইত না? এখন ত কর দিতেই হইবে, লীগ বলিতে পারে, বিলখানি পরিষদে তাঁহাদের আনুকূল্য লাভ করে নাই; বড়লাট সার্টিফিকেট বা স্বৈর-ক্ষমতাবলে এই বিল আইনে পরিণত করিয়াছেন। —তবে উভয় পক্ষেরই এ সকল কথা অনুমানমাত্র।

সে যাহাই হউক, বিলখানির যেরূপ গতি হওয়া উচিত, তাহাই হইয়াছে। কারণ, বৃটিশ সরকার এই যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সময় এ সম্বন্ধে ভারতবাসীর মতামত জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে এই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাও ভারতবাসীর নিকট প্রকাশ করেন নাই। এই যুদ্ধে ভারতের স্বার্থসিদ্ধি হইবে কি না এবং যদি হয়, তবে তাহার স্বরূপ কিরূপ হইবে, তাহাও ভারতবাসীর নিকট ব্যক্ত করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় খরচা প্রদানের জন্য ভারতবাসীর মত লইতে আসা গণতন্ত্রসম্মত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সেই জন্য যাঁহারা দেশবাসীর প্রতিনিধি, তাঁহারা এই বিলের অনুকূলে ভোট প্রদান করেন নাই। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের ৫ জন মাত্র বিলের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যাঁহারা বিলের অনুকূলে ভোট দেন নাই, তাঁহাদের মত এই যে, নির্দ্ধারিত করের সাহায্যে অর্থ আদায় না করিয়া এইরূপ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা-প্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করিয়া অর্থ সংগ্রহ করাই উচিত। অনেকে ঐ অর্থ দিতে সম্মত, তাহা শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন। রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন, এই যুদ্ধে বৃটেনের প্রতিদিন ১২ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, আর যুদ্ধ-বাবদ ভারতের প্রতিদিন ২০ লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় হইতেছে; অর্থাৎ বৃটিশ জাতি এই যুদ্ধে যত টাকা খরচ করিতেছে, ভারতবাসী তাহার ৬০ ভাগের এক ভাগ মাত্র খরচ করিতেছে। রাজস্ব-সচিবের এই উক্তি সত্য হইতে পারে,—কিন্তু গ্রেট বৃটেন শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া সমগ্র পৃথিবী হইতে খাঁটি রসটুকু সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে,—আর ভারতবাসী সর্ব্বহারা হইয়া এবং কৃষিমাত্র সম্বল করিয়া দিন দিন উৎকট দারিদ্র্যই বরণ করিতেছে। সুতরাং উভয় দেশের তুলনা করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদ্ভিন্ন, এই যুদ্ধে মোড়লী করিবার জন্য দায়ী কে? অথচ 'ম্যাও' ধরিবার সময়

ভারতবাসীর ডাক পড়িল! যাহা হউক, এই দুঃসময়ে আমাদের উপবাস করিয়াও বৃটেনকে অর্থ সাহায্য করা উচিত; কিন্তু সে দান স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা হয় কি?

কংগ্রেস-সদস্যগণের মুক্তির দাবী

গত ৭ই অগ্রহায়ণ লণ্ডন হইতে তারযোগে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া লীগ এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু-প্রমুখ কংগ্রেসের কারারুদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে অবিলম্বে মুক্তি দান করিতে হইবে। বিলাতের ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিষ্টার এলিন মড্ রয়ডেন, এবং কমন্স সভার সদস্য মিঃ এস, এস, সিলভারম্যান এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মেসার্স ভার্ণন বার্টনেট, গ্রেহাম হোয়াইট, হেনরী নেভিন্সন, এবং লর্ড লিষ্টওয়েল প্রভৃতি পার্লামেণ্টের সাত জন সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন। বহুৎ আচ্ছা! সে-কালে কমন্স সভায় ভারতের কথা আলোচনাকালে সদস্যদের ঘুম আসিত। একটা গল্প মনে পড়িল। লণ্ডনের কোন স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র-গণকে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেন, 'ভারত কি?' কেহ বলিল, 'গাধার মত জানোয়ার', কেহ বলিল, 'টাকার গাছ'; একটি ছেলে বলিল, 'ঘুম পাড়াইবার মন্ত্র!' শিক্ষক সন্ধান লইয়া জানিলেন, ছেলেটির বাপ কমন্স সভার সভ্য, সে পিতার সঙ্গে কমন্স সভায় গিয়া দেখিয়াছে—সেখানে ভারতের কথা উঠিলেই সকলে ঘুমাইতে আরম্ভ করেন। এ-কালে সভ্যরা ভারত-কথা শুনিয়া না ঘুমাইয়া অনেকেই ভারতের পক্ষ লইয়া বক্তৃতায় ক্ষুধা বৃদ্ধি করেন; ভারতের অবস্থা যেমন তেমনই থাকে! সুতরাং এ সম্বন্ধে মন্তব্য অনাবশ্যক।

বিমান-যুদ্ধ শিক্ষার আগ্রহ

বিমানের সাহায্যে আকাশ-যুদ্ধের কৌশল-শিক্ষার জন্য ভারতবাসীর যথেষ্ট আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে নিখিল ভারতের ৩ হাজার ২ শত ৯৭ জন যুবক এই সমর-কৌশল শিক্ষার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। এত দিনে প্রার্থীর সংখ্যা সম্ভবতঃ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ সকল আবেদন-কারীর মধ্যে ৮ শত ৬৭ জন পঞ্জাবের অধিবাসী; এবং ৪ শত ২২ জন বাঙ্গালী। প্রার্থীদের মধ্যে বাঙ্গালী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শারীরিক বল বা বিদ্যাবুদ্ধির কার্য্যে বাঙ্গালী কোন দিন পরাঙ্মুখ নহে; তথাপি বাঙ্গালী অসামরিক জাতি বলিয়া তাহাদের দুর্নাম-ঘোষণার ত্রুটি নাই; ইহার প্রকৃত কারণ কাহার অজ্ঞাত?

পাকিস্থানের প্রস্তাব কাহার আবিষ্কার?

পাকিস্থান-রচনার প্রস্তাব কাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে প্রথমে গজাইয়া উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত; তবে তিনি পীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ এই অদ্ভুত প্রস্তাবটি কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের স্কন্ধে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—মৌলানা আজাদই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই পরিকল্পনা জাহির করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই মৌলানা মহোদয় 'ইউনাইটেড প্রেসের' কোন প্রতিনিধির সহিত আলোচনায় এই উক্তির প্রতিবাদে বলিয়াছেন,—পাকিস্থান প্রস্তাবটি অনিষ্টকর, অসাধ্য, এবং কাজে লাগাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। উহা যতই অনিষ্টকর, এবং অকেজো হউক না কেন,—কর্ত্তার ইচ্ছায় বা খেয়ালে কার্য্য হওয়াই নিয়ম। মানুষ যে ফল লাভের ইচ্ছায় কোন একটা বিশেষ উপায় অবলম্বন করে,—সে উপায় অনেক সময় সেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে না। উপায় ভ্রান্ত হইলেই তাহা অত্যন্ত কুফল প্রসব করিয়া থাকে।

সিন্ধুপ্রদেশে অরাজকতা

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছি—সিন্ধুপ্রদেশে যে প্রকার অরাজকতা দৃঢ়মূল হইয়াছে, তাহা যে-কোন শাসকের পক্ষে ঘোর কলঙ্কসূচক, ইহাতে সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রভাবিত গুণ্ডার দল অকুতোভয়ে নিরীহ সমাজের লোকদিগকে হত্যা করিতেছে; অথচ

ঐ প্রদেশে শাসকদল রহিয়াছেন, সচিবমণ্ডলী আছেন, শাসনকর্তাও বর্ত্তমান, কিন্তু দীর্ঘকালেও এই গুণ্ডামীর দমন হইল না! নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতেই ঐ প্রদেশের এইরূপ দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক গুণ্ডামীর নিবৃত্তির উপায় নির্ণয় করিবার জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সিন্ধুপ্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। প্রকাশ, তিনি ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন সেই ব্যবস্থার কি ফল হয়, তাহা দেখিবার জন্য আজ সমগ্র সভ্য-সমাজ উদ্‌গ্রীব। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট মৌলানা মহাশয় বলিয়াছেন,—"সিন্ধু প্রদেশের বর্ত্তমান দোষ অপসারিত করিবার জন্য শক্তিশালী মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে যে সচিবসঙ্ঘ সংগঠিত হইয়াছে, তাহার ফলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমি আশা করি, অল্প দিনের মধ্যেই সিন্ধু প্রদেশটি অন্য সকল প্রদেশের সমকক্ষ হইতে পারিবে।"—মৌলানা সাহেব গাছে কাঁটালের মুচির আবির্ভাব দেখিয়াই গোঁফের আঠা ছাড়াইবার জন্য তেল খুঁজিতেছেন! আমাদের বিশ্বাস, কার্য্যফল দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করাই সঙ্গত। এই জঘন্য নারকীয় ষড়যন্ত্রের যাহারা দলপতি, তাহাদিগকে ধরিয়া যথাযোগ্য শাস্তি দিতে না পারিলে ইহার স্থায়ী প্রতিকারের আশা আছে কি? তাহা জানিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

—

চাকুরীতে সাম্প্রদায়িকতা

সার এণ্ড্রু ক্লো (Sir Andrew Clow) ভারত-সরকারের যান-বাহন বিভাগের সদস্য। গত ১২ই কার্ত্তিক নূতন দিল্লীতে রেলওয়ে সমিতির যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি সাম্প্রদায়িক হিসাবে কর্ম্মচারীদিগের পদোন্নতি করিবার ব্যবস্থার দোষের উল্লেখ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"আমি ইহা স্পষ্টই বুঝিতেছি, এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—এই সমিতির সকলেই আমার সহিত এক-মত হইবেন যে, অভিজ্ঞতাকে এবং যোগ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল সম্প্রদায় হিসাবে পদোন্নতির ব্যবস্থা করিলে তাহার ফল অতি ভীষণ হইবে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে ক্ষেত্রে পদস্থ ব্যক্তির প্রবীণতা (seniority) অনুসারে পদোন্নতির নিয়মিত ব্যবস্থা, সে ক্ষেত্রে যদি কোন প্রবীণ কর্ম্মচারী দেখিতে পায় যে, এক জন নবীন (junior) কর্ম্মচারী অন্য সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া উচ্চ পদ পাইল, এবং যে ক্ষেত্রে যোগ্যতর ব্যক্তিকে উলঙ্ঘন করিয়া অযোগ্য লোককে উচ্চ পদ প্রদান করা হইল, আমি তাহাদের কথাই বলিতেছি। ইহার ফল এই হইতেছে যে, আমরা যে সকল লোক পাইতেছি, তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোকের প্রতি যেরূপ সম্ভব, সেরূপ সদ্ব্যবহার করিতেছি না। এইরূপ হইলে চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক ভাব বৃদ্ধি পাইবে, এবং যে ক্ষেত্রে কর্ম্মচারীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সে ক্ষেত্রে কাজে দৃঢ় আনুগত্যের এবং সখ্য-বন্ধনের অভাব ঘটিবে।"

সার এণ্ড্রু ক্লোর কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। যদি কেবল সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতা (minimum qualification) দেখিয়া বা কার্য্যতঃ অন্য সম্প্রদায়ের সুযোগ্য লোককে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্য লোককে চাকুরী দেওয়া হয়, বা কোন কর্ম্মচারী সম্প্রদায়-বিশেষের লোক বলিয়াই তাহাকে অন্য সম্প্রদায়ের বহুদর্শী এবং যোগ্যতম লোককে উপেক্ষা করিয়া উচ্চতর পদ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যে আনুরক্তি থাকে না, পরস্পর একতা থাকে না,—এবং যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ-কর্ত্তাদিগের বিশেষ অনুগত হইত, তাহারা তাঁহাদের উপর বিরক্ত হয়। ইহা স্বাভাবিক। স্বভাবের এই গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। ইহাতে সাধারণের কার্য্যের ক্ষতি হয়, ব্যয়বাহুল্য ঘটে, এবং দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হয়। যে সম্প্রদায় অযথা অনুগৃহীত, সে সম্প্রদায় ক্ষুধিত গৃধ্রের ন্যায় অধিকতর অনুগ্রহের জন্য সোর-গোল করিতে থাকে; যে সম্প্রদায় উপেক্ষিত, তাহারা কাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে চাহে না। অথচ ইহাতে কোন প্রকার সুফল পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা ভেদনীতি সফল হইতে পারে,—কিন্তু ভেদনীতি যে কখনই কল্যাণপ্রদ হয় না, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

—

বরপণ-নিষেধক আইন

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বরপণ-নিষেধক আইনের এক পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বরপণ-প্রথা হিন্দু সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর, এবং অনিষ্টজনক। ইহা বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে, এবং ইহার ফলে অনেক বালিকা আত্মহত্যা করিয়াছে—ইত্যাদি। বরপণ-প্রথা বহু কাল হইতে এ দেশে প্রচলিত আছে, এ কথা সত্য নহে। ৭০ বৎসর পূর্ব্বেও ইহা ছিল না; তখন কুলীনের বরপণ ছিল ৭ টাকা, কোথাও বা ৯ টাকা। ইহা নূতন আমদানী। আমাদের বিশ্বাস, আইনের সাহায্যে এই সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারের কোন আশা নাই। পাণ্ডুলিপিখানিতে ব্যবস্থা হইয়াছে, যে ব্যক্তি ৫১ টাকার অধিক বরপণ দিবে এবং লইবে, তাহারা উভয়েই এই আইন অনুসারে দণ্ডিত হইবে। তবে কন্যার পিতামাতা অথবা অভিভাবক স্বেচ্ছায় কন্যাকে অলঙ্কার বা যৌতুক প্রদান করিলে তাহা বরপণ বলিয়া গণ্য হইবে না; এবং আইনের আমলে আসিবে না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, পাণ্ডুলিপিখানি আইনে পরিণত হইলে উহাতে কোন ফলই হইবে না। এই জন্যই এই নিষ্ফল আইনের সমর্থন করা যায় না। তবে এইরূপ আইন হইলে কন্যাকে তাহার বিবাহকালে যে অলঙ্কার দেওয়া হয়, তাহা স্ত্রীধনে পরিণত হইবে; উহাতে স্বামীর অধিকার থাকিবে না। স্ত্রীর পক্ষে এইটুকুই লাভ।

মানচিত্রে আতঙ্ক

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, এলাহাবাদে এবং পূণায় পুলিশ দোকান হইতে সাধারণ মানচিত্র কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। কেন? মানচিত্রের মধ্যে কি বিপ্লবের বীজ লুকাইয়া থাকে? এ উৎপাত অন্যত্রও ঘটিবে কি? ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানচিত্র হয় ত পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যভাবে অঙ্কিত হইবে; কিন্তু সেজন্য শ্বেতাঙ্গ-বিশেষের জুতাতঙ্ক ও ছত্রাতঙ্কের ন্যায় পুলিশের মানচিত্রাতঙ্কের কি কারণ ঘটিল, তাহা বুঝা যাইতেছে না!

নিখিল ভারতীয় মহিলা-সমিতি

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় নারী-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন এই সমিতি কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব এই, পৃথিবী-শুদ্ধ নারীরা যেন সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ-নিবারণ, এবং যাহাতে ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে আন্তর্জ্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তি হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করেন। কাগজে-কলমে প্রস্তাবটি অতীব মনোহর হইলেও কার্য্যে পরিণত করা কি সম্ভব? প্রথমতঃ, বিশ্ব-সংসারের সকল নারীই এক-মতাবলম্বিনী হইবেন, ইহা বিধাতাপুরুষও আশা করিতে সাহস করিবেন না। নারীরা সাধারণতঃ শান্তির পক্ষপাতিনী, এ কথা সত্য,—কিন্তু বিবাদের গন্ধে আনন্দ লাভ না করেন, সংসারে এরূপ নারীরও অভাব আছে কি? এই প্রসঙ্গে আজ মনে পড়িতেছে—বুয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন নারী প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন না, ইহার কারণ কি? 'Blackmail or War' নামক পুস্তিকাখানি নারীই রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইলে তাহার কি গতিরোধ করা যায়? নারীরাও কি পুরুষদিগকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করেন না? সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে এই প্রস্তাব প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

মহিলারা আরও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন,—বিবাহে বরপণ-গ্রহণ বন্ধ করিতে হইবে। অধুনা আইন করিয়াও তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বরপণের অভাবে বরের জননী ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক স্থলেই বধূকেও খোঁটা দিতে ছাড়েন না, দীর্ঘকাল তাহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইতে চাহেন না—ইহা কাহার অজ্ঞাত? আইন দ্বারা সমাজের সংস্কার-সাধনের চেষ্টার ফল কিরূপ হয়, সর্দ্দা-আইন পাশ হইবার পর তাহার প্রমাণের অভাব হইয়াছে কি? সর্দ্দা-আইনকে আরও বলবৎ করিবার ফলে সমাজে বিশেষ বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে

পারে। হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান কোন হিন্দু কোন মতেই হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছেদের সমর্থন করিতে পারিবেন না। এ সম্বন্ধে আর অধিক কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রগতির যুগে নারী-সমিতির এই সকল প্রস্তাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে 'যা হোক তা হোক বেশ' বলিয়া তাহাদের সমর্থন করিবার উপায় নাই। আমরা এই সকল প্রস্তাবে বর্ত্তমান বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের কল্যাণপ্রদ কিছুই দেখিতে পাইলাম না; তবে আমরা নিরাশ হইলেও তাঁহাদের উৎসাহের অভাব হইবে না; তাঁহারা এই ভাবে 'নূতন কিছু' করিবার জন্য সভায় সম্মিলিত হইবেনই।

—

কৃষ্ণনগরে হিন্দু-সভার অধিবেশন

এবার নদীয়া-কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় হিন্দু-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহা নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক শাখা। সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এই অধিবেশনের সভাপতি, এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সভাপতিত্বে এবং সদস্যগণের চেষ্টা-যত্নে সভার অধিবেশন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সভায় বহু লোকের সমাগমে অনেককেই স্থানাভাবে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

দশম প্রস্তাবে বঙ্গীয় সচিবমণ্ডলীর শাসন-নীতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু জনসাধারণের আদৌ মতভেদ নাই। বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের শাসনকালে সংখ্যাল্প হিন্দুদিগের প্রতি যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে সকল বাধা এবং অসুবিধা উদ্ভাবিত হইতেছে, সভাপতি মহাশয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই সভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা আপাততঃ বন্ধ রাখা হউক। এই হিন্দুসভায় বলা হইয়াছে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী সমগ্র হিন্দুদিগের আস্থা হারাইয়াছেন, এবং বর্ত্তমান-প্রচলিত শাসন-পদ্ধতি একেবারেই অচল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই প্রস্তাবটির প্রতি বাঙ্গালা প্রদেশের গভর্ণর সার জন আর্থার হারবার্টের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সমিতি দৃঢ়তার সহিত সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৃটিশজাতি দৃঢ়তার সহিত প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির একান্ত পক্ষপাতী; কিন্তু তাঁহারা এই গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির মূলসূত্র-বিরোধী ব্যবস্থার কেন এত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে হিন্দু-সভার সাফল্য কামনা করি।

—

ব্যক্তিগত আইন অমান্য

আইন-অমান্য আন্দোলন ক্রমশঃ সমগ্র ভারতেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। গান্ধীজীর এই ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলন প্রদেশ-বিশেষে সীমাবদ্ধ হয় নাই; সকল দেশেই ইহা বিস্তারলাভ করিয়াছে। গান্ধীজী কোন কোন নারীকে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করায় সাধারণের ধারণা হইয়াছিল, তিনি নারী-মাত্রকেই এ বিষয়ে নিরস্ত করিয়াছেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা; এ পর্য্যন্ত অনেক নারী গান্ধীজীর সম্মতিক্রমেই সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ফলেই সরকারী জেল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সচিব হইতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটীর সভ্য প্রভৃতিতে পূর্ণ হইতেছে; কিন্তু এখনও কয়েদী-স্রোতের বিরাম নাই। মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী, অন্যান্য প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীরা, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী প্রভৃতি মহিলারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। পঞ্জাবের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুত সম্পূরণ সিং ব্যক্তিগত আইন-অমান্য হেতু গ্রেপ্তার হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে তাঁহার এক আনা জরিমানা হইয়াছে; ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং তাহা প্রদান করিয়া সম্পূরণ সিংকে তাঁহার আন্তরিকতার অভাবের জন্য নিন্দা করিয়াছেন। গান্ধীজী তাঁহাকে না কি সত্যাগ্রহ করিতে অনুমতি দেন নাই। কলিকাতায় কোন কোন সত্যাগ্রহীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নাই; কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফলের কারণ বুঝিতে পারা যাইতেছে না। এই সমস্যায় গান্ধীজীর অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

ভবিষ্যতের ইতিহাস-লেখকগণ ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি কি ভাবে লিখিবেন, তাহা কি শাসকগণ ভাবিতেছেন? লর্ড লিন্‌লিথগো এবং বিলাতী মন্ত্রি-মণ্ডলীকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, এইরূপই আমাদের ধারণা। বর্ত্তমান সঙ্কটকালে ভারতের রাজনীতি-গগনের এই অবস্থা উপেক্ষণীয় নহে।

যুদ্ধের ব্যয়

পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধে গ্রেট বৃটেনের প্রতিদিন ৯০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২ কোটি টাকা হিসাবে ব্যয় হইতেছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, এখন গ্রেট বৃটেনের ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭ শত পাউণ্ড হিসাবে প্রত্যহ এই যুদ্ধের জন্য ব্যয় হইতেছে; অর্থাৎ প্রায় ১৬ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা প্রতিদিন তাঁহাদিগকে ব্যয় করিতে হইতেছে। এই ব্যয় ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। গ্রেট বৃটেনকে মার্কিণ হইতে যুদ্ধ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, এবং জাহাজ কিনিতে হইতেছে; সুতরাং বৃটেনের বহু অর্থ মার্কিণ জাতিরই উদর পূর্ণ করিতেছে। লর্ড লোথিয়ান বলিয়াছেন—বৃটেনের স্বুবর্ণ-সঞ্চয় এবং "সিকিউরিটি" প্রভৃতি সমস্তই প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। বৃটিশ সরকার মার্কিণের নিকট আবার ৬০খানি মালবাহী জাহাজের জন্য বায়না দিয়াছেন; ইহারও মূল্য অল্প হইবে না। সুতরাং বৃটিশ জাতিকে এ জন্য চিন্তিত হইতে হয় নাই, এ কথা বলা যায় না; কিন্তু যেরূপে হউক, তাঁহাদিগকে শেষ রক্ষা করিতেই হইবে। তাঁহাদের আশ্রিত বহু দেশ তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। ও-দিকে জার্ম্মাণী অনেকগুলি রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে শোষণ করায় অর্থসঙ্কটে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে, নতুবা এত দিন তাহাদের চক্ষু কপালে উঠিত!

চিকিৎসা-শিক্ষার সঙ্কোচ

বিগত অক্টোবর মাসে দিল্লী নগরে যে মেডিক্যাল কাউন্সিল বা চিকিৎসা-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সদস্যরা মেডিক্যাল স্কুলগুলি উঠাইয়া দিবার জন্য অথবা উহার শিক্ষার বিস্তার-সাধনের জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবটি কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে অর্থাভাবে বারো আনা লোক চিকিৎসকের সম্পূর্ণ এবং আবশ্যক সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে না। রোগীর অন্তিমকালে তাহারা অগত্যা ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়াও চিকিৎসক ডাকে। এরূপ অবস্থায় লোক যাহাতে সুলভে সুচিকিৎসক পায়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন। মেডিক্যাল স্কুলগুলি সেই অভাব পূর্ণ করিতেছে। বহু স্থলেই দেখা যায় যে, মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ চিকিৎসক অপেক্ষা মেডিক্যাল স্কুলের উত্তীর্ণ কোন কোন ডাক্তার চিকিৎসা-কার্য্যে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যে দেশে সুশিক্ষিত চিকিৎসকের অভাবে রোগী হাতুড়িয়ার হস্তে প্রাণ দেয়, সে দেশে মেডিক্যাল স্কুলগুলি বন্ধ করিবার পরামর্শ প্রদান কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। গত ৯ই অগ্রহায়ণ কলিকাতায় যে নিখিল বঙ্গীয় লাইসেন্সিয়েট ষ্টুডেণ্টের সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতেও উহার অনুরূপ প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছিল। আমরা চিকিৎসক এবং সম্ভাবিত চিকিৎসকদিগের ঐরূপ মনোবৃত্তি দেখিয়া দুঃখিত। এ দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অল্প। লোক নিঃস্ব; অতএব চিকিৎসার ব্যয় যত অল্প হয় ততই মঙ্গল।

ভারতে মুসলমান-সংখ্যা

ভারতে মুসলমানের সংখ্যা কত? যুক্ত-প্রদেশের একখানি সংবাদপত্রে কোন লেখক লিখিয়াছেন, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শুনা যাইত যে, ভারতে মুসলমানদিগের সংখ্যা ৭ কোটি। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মস্লেম লীগ ঘোষণা করেন—ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ৮ কোটি। তাঁহারা কোন্ হিসাবে নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেহ তাহা জানে না। তাহার পর-বৎসরেই বলা হইল, ভারতের মুসলমান-সংখ্যা ৯ কোটি! ভারতের মুসলমানদিগের এই সংখ্যা কি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে? আবার এবার আদম সুমারে বাঙ্গালার লোক-গণনা লইয়া নানা সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। ইহা যে সাম্প্রদায়িকতার অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



"পর' শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন-আবরণ"

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস



১৯শ বর্ষ] পৌষ, ১৩৪১ [৩য় সংখ্যা

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর*

(৩)

শ্রাবণ সংখ্যার 'মাসিক বসুমতীতে' ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মহর্ষি জৈমিনি নিরীশ্বরবাদের প্রচারক ছিলেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ও পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে আলোচনা করা যাইতেছে—জৈমিনিমতের বিভিন্ন দুইটি মুখ্য প্রস্থান—আচার্য্য কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্রের সম্প্রদায়ে নিরীশ্বরবাদের পোষক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

অধ্যাপক কীথ অবশ্য ইঁহাদিগের উভয়ের স্কন্ধেই নিরীশ্বরবাদের অভিযোগ চাপাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—'নিরীশ্বরবাদের পূর্ণ পরিণতি কুমারিল ও প্রভাকর উভয়ের মতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, আর ইহা কিছু অস্বাভাবিকও নহে'। (১) বস্তুতঃ কুমারিল ও প্রভাকর নিরীশ্বরবাদের সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে সমর্থক ছিলেন না, তাহার বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা মহোদয় তাঁহার 'প্রভাকর-মীমাংসা'-শীর্ষক সুচিন্তিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'কুমারিল এক সঙ্গে সমস্ত জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় স্বীকার করেন নাই'। ইহার প্রমাণস্বরূপে তিনি কুমারিল-কৃত 'শ্লোকবার্ত্তিকে'র চারিটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে ঝা মহোদয়ের অভিমত উদ্ধৃত হইল—

'কুমারিলের ঈশ্বর-সম্বন্ধে মতবাদ 'শ্লোকবার্ত্তিকে'র 'সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারে' দৃষ্ট হয়। তিনিও সমস্ত জগতের এক সঙ্গে (শ্লোক ১১৩) সৃষ্টি (শ্লোক ৪৭) ও প্রলয় (শ্লোক ৬৮) অস্বীকার করিয়াছেন। যে সকল কারণে সর্ব্বজ্ঞের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, সেই সকল যুক্তির

* এ সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ—'মাসিক বসুমতী', আষাঢ় ১৩৪১, ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ—'মাসিক বসুমতী', শ্রাবণ ১৩৪১—দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধগুলি রচনায় মদীয় আচার্য্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্য্য শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহোদয়ের উপদেশ ও মদীয় স্বর্গত পিতৃব্যদেব ডক্টর পশুপতিনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের Introduction to the Pūrva Mīmāmsā গ্রন্থ আমার প্রধান উপজীব্য।

(১) "The full development, however, of the doctrine (atheism) is, as usual, to be found in Prabhākara and Knmārila……"—Keith, Karma-mīmāmsā, p. 61.

উপর নির্ভর করিয়াই তিনি স্রষ্টারও অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন (শ্লোক ৪৭-৫৯, ১১৪-১১৭)'। (২)

এই প্রসঙ্গে ইহা বিচার করা একান্ত কর্ত্তব্য যে—কুমারিলের এই স্রষ্টৃনিষেধ-বাদ তাঁহার চরম অভিপ্রায়-সূচক, অথবা ইহা অন্য কোনরূপ গূঢ় উদ্দেশ্যমূলক প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝা যাইবে, কুমারিল 'সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারে' এই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন বলিয়া মনে হয়, ইহার মূলে একটি নিগূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে। তিনি ঈশ্বরের আত্যন্তিক নিষেধ কদাপি কুত্রাপি করেন নাই। তাঁহার আপাততঃ প্রতীয়মান স্রষ্টৃনিষেধের অন্তরালে যে গভীর অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাই নিম্নে পরিষ্কার করা যাইতেছে।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শনের অনুগামিগণ বিশ্বাস করেন যে, বেদ-রচনা বা বেদ-নিয়ন্ত্রণে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য আছে। কুমারিল মুখ্যতঃ ন্যায়-বৈশেষিকের এই মতবাদের খণ্ডনোদ্দেশ্যেই ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শনের যুক্তি-কল্পিত স্রষ্টার সম্ভাব-নিষেধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুমারিলের আশঙ্কা এই যে—যদি তিনি ন্যায়-বৈশেষিক মতের অনুসরণক্রমে স্বীকার করেন যে, জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান প্রমাণের দ্বারাই নিরূপিত হইতে পারে ও বেদকে নিত্য না বলিয়া ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত, তাহা হইলে বস্তুতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বই প্রমাণিত হইতে পারে না। সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহারের ১১৪ শ্লোকে তিনি যে উপমাটির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার উক্তি—"সর্ব্বজ্ঞবন্নিষেধ্যা চ স্রষ্টুঃ সম্ভাবকল্পনা।" 'সর্ব্বজ্ঞবৎ' (অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞের মত)—এই বাক্যাংশটি বিশেষ গভীরার্থক। উক্ত শ্লোকার্দ্ধের সরল বাঙ্গালা অর্থ—স্রষ্টার অস্তিত্ব-কল্পনা সর্ব্বজ্ঞের (অস্তিত্ব-নিরূপণের) ন্যায়ই নিষেধের যোগ্য। পার্থসারথি মিশ্র তাঁহার 'ন্যায়রত্নাকর'-নামক 'শ্লোকবার্ত্তিক'-ব্যাখ্যায় উক্ত শ্লোকের বিবরণ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যথা চ বুদ্ধাদেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং পুরুষত্বাদস্মদাদিবন্নিষিদ্ধম্, এবং প্রজাপতেরপি স্রষ্টৃত্বং নিষেধ্যম্"। (৩) অর্থাৎ—আমাদিগের ন্যায় বুদ্ধ প্রভৃতিও শরীরধারী পুরুষ ছিলেন। শরীর-পরিচ্ছেদ-হেতু আমাদিগের যখন সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্ভব নহে, তখন তদ্দৃষ্টান্তে পরিচ্ছিন্ন-শরীরধারী বুদ্ধাদির সর্ব্বজ্ঞত্বও সিদ্ধ হয় না। ঠিক এইরূপ যুক্তির সাহায্যে বলা যায় যে, প্রজাপতিও একজন বিগ্রহ-বিশিষ্ট পুরুষ; অতএব তাঁহার পক্ষেও জগতের স্রষ্টৃত্ব সম্ভব নহে। কারণ, প্রজাপতিকে একবার পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেই তাঁহার শরীর স্বীকার করিতে হইবে। শরীর স্বীকার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উৎপত্তি-নাশও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে স্বয়ং প্রজাপতিও আমাদিগেরই মত অনিত্য হইয়া পড়েন। আর আমাদিগের পক্ষে যখন জগৎসৃষ্টি সম্ভব নহে, তখন তদ্দৃষ্টান্তে প্রজাপতির পক্ষেও জগৎসৃষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে না। সংক্ষেপে বলিতে যাইলে দাঁড়ায় এই যে, পার্থসারথি বুঝাইতে চাহিয়াছেন—প্রজাপতির স্রষ্টৃত্ব যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত করা অসম্ভব—ইহাই কুমারিলের উক্তির নিগূঢ় অভিপ্রায়।

পার্থসারথির এই বিবৃতি কতটা যুক্তিসহ, তাহা সবিশেষ আলোচ্য। এ কথা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না যে,

(২) "Kumārila's views with regard to God are found in the S'lokavārtita, Sambandhākṣepaparihāra. He also denies the creation (s'loka 47) and dissolution (68) of the universe as a whole (113) : he bases his denial of the Creator on the same grounds as that of the 'omniscient person' (47-59, 114-117)."—Indian Thought, Vol. II, p. 262.

প্রমাণরূপে উল্লিখিত শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"প্রবৃত্তিঃ কথমাদ্যা চ জগতঃ সম্প্রতীয়তে।
শরীরাদের্বিনা চাস্য কথমিচ্ছাপি সর্জ্জনে" ॥ ৪৭ ॥
"প্রলয়েঽপি প্রমাণং নঃ সর্ব্বোচ্ছেদাত্মকে ন হি।
ন চ প্রয়োজনং তেন স্যাৎ প্রজাপতিকর্ম্মণা" ॥ ৬৮ ॥
"তস্মাদদ্যবদেবাত্র সর্গপ্রলয়কল্পনা।
সমস্তক্ষয়জন্মভ্যাং ন সিধ্যত্যপ্রমাণিকা ॥ ১১৩ ॥
সর্ব্বজ্ঞবন্নিষেধ্যা চ স্রষ্টুঃ সম্ভাবকল্পনা।
ন চ ধর্ম্মাদৃতে তস্য ভবেল্লোকাদ্বিশিষ্টতা ॥ ১১৪ ॥
ন চানুষ্ঠিতো ধর্ম্মো নানুষ্ঠানমৃতে মতেঃ।
ন চ বেদাদৃতে সা স্যাদ্বেদো ন চ পদাদিভিঃ ॥ ১১৫ ॥
তস্মাৎ প্রাগপি সর্ব্বেঽমী স্রষ্টুরাসন্ পদাদয়ঃ।
স্যাৎ তৎপূর্ব্বকতা চাস্য চৈতন্যাদস্মদাদিবৎ ॥ ১১৬ ॥
এবং যে যুক্তিভিঃ প্রাহুস্তেষাং দুর্ল্লভমুত্তরম্।
অস্মেষ্যো ব্যবহারোঽয়মনাদির্বেদবাদিভিঃ" ॥ ১১৭ ॥
—সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার।

(৩) ন্যায়রত্নাকর সহিত শ্লোকবার্ত্তিক, পৃঃ ৬৭৩, চৌখাম্বা সংস্করণ।

'সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারে'র উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পড়িলেই আপাততঃ মনে হয় যেন কুমারিল বলিতে চাহেন যে—ঈশ্বর (তা তিনি শরীরীই হউন আর অশরীর চৈতন্যমাত্র-স্বরূপই হউন) জগতের স্রষ্টা বা অধ্যক্ষ (পালয়িতা—কর্ম্মফলদাতা—নিয়ন্তা) কিছুই নহেন; আর সমগ্র জগতের এক সঙ্গে উৎপত্তি বা প্রলয়ও সম্ভব নহে। কিন্তু যদি ঐ শ্লোকগুলির প্রথম দৃষ্টিতে প্রতীয়মান অর্থটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া না থাকিয়া পূর্ব্বাপর প্রকরণের সহিত মিলাইয়া উহাদিগকে বিশ্লেষিত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ শ্লোকগুলির সাহায্যে কুমারিল মোটেই ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব উড়াইয়া দিতে চাহেন নাই; তিনি কেবল জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-কল্পনা অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা প্রয়োজন। কুমারিলের মূল শ্লোকার্দ্ধ—"সর্ব্বজ্ঞবন্নিষেধ্যা চ স্রষ্টুঃ সম্ভাবকল্পনা।" এ স্থলে নিষেধ্য কি? স্রষ্টা কখনই নিষেধ্য নহেন। কারণ, তাহা হইলে 'সর্ব্বজ্ঞবৎ' এই উপমাটি দিবার কোনই সার্থকতা থাকিত না; আর তাহা ছাড়া 'স্রষ্টুঃ' সম্ভাবকল্পনা নিষেধ্যা' এইরূপ বাক্যাংশ রচনা না করিয়া 'স্রষ্টা নিষেধ্যঃ' অথবা 'স্রষ্টুঃ সম্ভাবো নিষেধ্যঃ'—এইরূপ সোজাসুজি পদযোজনা করিলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইতে পারিত। তাহা হইলে বস্তুতঃ নিষেধ্য কি? উপরি-উদ্ধৃত বাক্যটির ঘটক পদগুলি বিশ্লেষিত করিলে দেখা যাইবে যে, নিষেধ্য হইতেছে 'কল্পনা' ('নিষেধ্যা স্রষ্টুঃ সম্ভাবকল্পনা')। এই 'কল্পনা' পদটির অর্থ হইতেছে 'অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে নিরূপণ'।

যাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা অবধারিত, অথবা শব্দ-প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধ বা সুসাধ্য, তাহাকে কল্পনার বিষয় বলা চলে না। কারণ, প্রত্যক্ষের বিষয় সর্ব্বদাই সিদ্ধ; শব্দ-প্রমাণের গোচরীভূত বস্তু কখনও সিদ্ধ কখনও বা সাধ্য (সাধ্য হইলেও উহা নির্দ্দোষরূপে সাধ্য)। আর কল্পনা বা অনুমানের বিষয় কেবল সাধ্য, অথচ উহাতে দোষ প্রবেশের সম্ভাবনাও কখন কখন থাকিতে পারে। (৪) প্রত্যক্ষ ও আগমের মধ্যে একটি পার্থক্য এই যে, প্রত্যক্ষ কেবল সিদ্ধ বস্তুবিষয়ক হইলেও শব্দ সিদ্ধ-সাধ্য উভয়-বিষয়ক হইতে পারে। অবশ্য যে স্থলে প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণ সিদ্ধ বস্তুকেই বিষয়ীভূত করে, সে স্থলেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্ট-সিদ্ধ বস্তু (যেমন ঘট-পটাদি) বিষয়ে প্রত্যক্ষেরই প্রাধান্য; শব্দ-প্রমাণ তাহার প্রতিকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলে প্রত্যক্ষানুসারে নেয়। (৫) পক্ষান্তরে, অদৃষ্ট-সিদ্ধ বস্তু (যেমন স্বর্গ, পরমেশ্বর প্রভৃতি) একমাত্র আগম বা শব্দ-প্রমাণের গোচর; তথায় প্রত্যক্ষের কোন অধিকারই নাই। আর যে যে স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা থাকে, অনুমান প্রমাণ (যুক্তি বা তর্ক) কেবল সেই সেই ক্ষেত্রেই প্রবৃত্ত হইতে পারে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, স্বর্গ, ঈশ্বর প্রভৃতি অদৃষ্ট-সাধ্য ও সিদ্ধ বস্তু বিষয়ে এই কারণেই প্রত্যক্ষ বা অনুমানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এ সকল বিষয়ে আগমই একমাত্র প্রমাণ। অতএব, স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুমান-প্রমাণ-গম্য হইতে পারে না—কেবল এই উদ্দেশ্যেই ভট্টপাদ স্রষ্টার অস্তিত্ব-কল্পনাকে হেয়-বোধে উহার নিষেধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্ব কখনও নিষেধ করেন নাই। শ্লোকবার্ত্তিকের উদ্ধৃত শ্লোকগুলির আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, কুমারিল ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব কখনও অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদিগের ন্যায় মানবের কল্পনা (অর্থাৎ অনুমান বা যুক্তিতর্ক) মাত্র দ্বারাই সিদ্ধ হইবার যোগ্য, সেরূপ ঈশ্বরকে তিনি জগৎ-কারণ বলিতে একেবারেই নারাজ। তাঁহার মতে, আমাদিগের কল্পনার উপর যাঁহার অস্তিত্ব-সিদ্ধি একান্তভাবে নির্ভর করে, তিনিই আবার জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা—ইহা অপেক্ষা অযৌক্তিক ও হাস্যকর মতবাদ আর কি থাকিতে পারে!

কুমারিল সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে 'সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহার' প্রকরণ রচনা করেন নাই। তাঁহার এ প্রকরণ রচনার মূলে আছে বেদের কৃতকত্ব-বাদ নিরাসের চেষ্টা। প্রাচীন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতাবলম্বিগণের অনেকেই প্রথমে কেবল অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর-সিদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ও পরে প্রচার করিয়াছেন যে, বেদ

(৪) "যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে"।—ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্র-কর্ত্তৃক (২।১।১১)।

(৫) এই জন্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—সহস্র শ্রুতিবাক্য বলেও একটি ঘট পটে রূপান্তরিত হইতে পারে না—"ন হ্যাগমাঃ সহস্রমপি ঘটং পটয়িতুমীশতে"—ভামতী, অধ্যাসভাষ্য।

(উক্তরূপ আনুমানিক) ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সৃষ্ট। (৬) কুমারিল বিশেষ প্রযত্নসহকারে এই জাতীয় মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই 'সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার' রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, বেদকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করা অপেক্ষা বরং মোটেই ঈশ্বর স্বীকার না করা ভাল; আর যে বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট, সেরূপ শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যও তিনি স্বীকার করিতে চাহেন নাই। অতএব, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারের ১১৪-১১৭ সংখ্যক শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা মহোদয় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে ভাট্টমতের স্বারসিক অনুবাদ নহে। যে সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার প্রকরণ বেদের পৌরুষেয়ত্ব বা কৃতকত্ব নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই রচিত, তাহার মধ্য হইতে সমগ্র জগতের সৃষ্টি-প্রলয় সম্বন্ধীয় মতবাদ কিরূপে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর।

পূর্ব্বোক্ত চারিটি শ্লোকের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, ভট্টপাদ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—

(১) বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। ইহা কোন পুরুষ-(মানব অথবা ঈশ্বর)-কর্ত্তৃকই সৃষ্ট নহে।

(২) ঈশ্বর যে জগৎস্রষ্টা সে বিষয়ে অপৌরুষেয় নিত্য বেদই একমাত্র প্রমাণ।

(৩) কেবল অনুমান-প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব কোনক্রমেই সাধিত হইতে পারে না।

শ্লোক চারিটির অর্থ বিশেষ অস্পষ্ট নহে। কেবল যত কিছু গোলমাল বাধিয়াছে ১১৪ শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধ লইয়া—"সর্ব্বজ্ঞবন্নিষেধ্যা চ স্রষ্টুঃ সম্ভাবকল্পনা"। ইহার আক্ষরিক বাঙ্গালা অর্থ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে—স্রষ্টার অস্তিত্ব-কল্পনা সর্ব্বজ্ঞের ন্যায়ই নিষেধার্হ। কথাটি আরও একটু তলাইয়া দেখা যাউক। যখন সর্ব্বজ্ঞ-(বুদ্ধ)-কর্ত্তৃক রচিত কোন গ্রন্থে দেখা যায় যে, তিনি আপনাকে আপনি 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তখন কেবল তাঁহার সেই উক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা যুক্তি-সঙ্গত হয় না। ঠিক সেইরূপ—যখন স্বীকার করা হয় যে, বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট, আর সেই বেদই বলেন যে ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা, তখন বেদের সেই উক্তি ন্যায়তঃ নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। (৭) যে ঈশ্বর মানবের কল্পনা-প্রসূত (অর্থাৎ যাঁহার অস্তিত্ব-সিদ্ধি কেবল পৌরুষেয় অনুমানের উপর নির্ভর করে), এমন ঈশ্বর-কর্ত্তৃক রচিত শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে ভট্টপাদ মোটেই রাজী নহেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ও জগৎস্রষ্টৃত্ব একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণ-গম্য, আর এই শ্রুতি নিত্য, স্বতন্ত্র ও অপৌরুষেয়। শ্রুতি যে কেবল মানব-রচিত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় তাহা নহে, পরন্তু ইহা ঈশ্বর-কর্ত্তৃকও রচিত নহে। (৮) ইহা কৃতকত্ব-দোষ-দুষ্ট নহে—ইহা নিত্য। ইহার অধিক কোন কথা কুমারিল উক্ত প্রকরণে বলিতে চাহেন নাই। অতএব, তিনি ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব স্বীকার করেন না—এরূপ অভিযোগ তাঁহার উপর আরোপ করিবার বিশেষ কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বরং ন্যায়-বৈশেষিক মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি স্থানে স্থানে এমন কিছু কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও জগৎ-কারণত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। আগামী প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

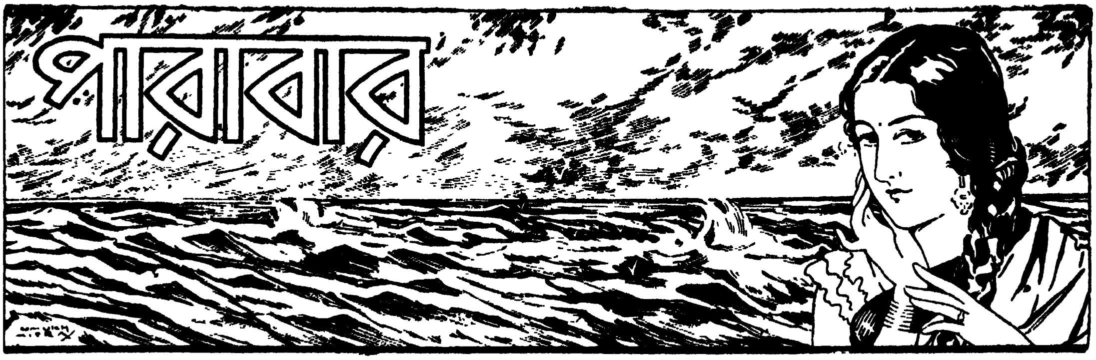
---

(৬) এইরূপ প্রক্রিয়ার দোষ উপলব্ধি করিয়া আচার্য্য উদয়ন উপাধ্যায় গঙ্গেশ প্রভৃতি পরবর্ত্তী যুগের নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বর-সাধক অনুমানের উপোদ্বলকরূপে শ্রুতিপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরকে বেদকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করায় এ প্রক্রিয়াও নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হয় নাই। ঈশ্বরসৃষ্ট শ্রুতি কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে ইতরে-তরাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়ে।

(৭) ভট্টপাদ উহা চোদনাসূত্রের বিবরণে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন— "নর্ত্তেতদাগমাৎ সিধ্যেন্ন চ তেনাগমো বিনা।
দৃষ্টান্তোঽপি ন তন্ন্যায্যো নৃষু কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে।"
—(চোদনাসূত্র, শ্লোকবার্ত্তিক, ১৪২ শ্লোক)

"ন হি মুক্তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বে তদাগমমন্তরেণান্যৎ প্রমাণমস্তি, অতঃ সর্ব্বজ্ঞপ্রণীতত্বে সিদ্ধে তদাগমস্য প্রমাণত্বং তৎপ্রামাণ্যে চ তৎসিদ্ধি-রিতীতরেতরাশ্রয়ম্। অশরীরস্য চ তাল্বাদিরহিতস্যাগমপ্রণয়নমপি কথমিতি ন বিদ্মঃ। শরীরযুক্তেন ত্বসর্ব্বজ্ঞেন প্রণীতস্য ন প্রামাণ্যং স্যাদিতি। যদি ত্বতত্ত্বেঽপি কশ্চিন্মুক্তঃ সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যেত ততোঽহমপি মুক্তঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি যুজ্যতে, ন তু তদস্তি।"—ন্যায়রত্নাকর।

(৮) নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন যে, বেদ মানবসৃষ্ট নহে, কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্ট বটে।



২২

বিধাতার হাতে বোধ হয় তেমন কাজ ছিল না, তাই মৃদু হাস্যে তিনি বীণার ভাগ্য-চক্র লইয়া তাহাতে দম্ দিয়া সেটিকে চালাইতে উদ্যত হইলেন !

ও-বাড়ীর বিবাহের গোলমাল থামিবামাত্র কিরণ আর নন্দরাণী দু' জনে মাতিয়া উঠিল—স্বর্ণদ্যুতির সঙ্গে বীণার বিবাহ-সূত্র বাঁধিয়া দিবার উদ্দেশ্যে। দু' পক্ষে পাত্র-পাত্রী দেখা চুকিল। কোষ্ঠীর যেমন বালাই ছিল না, তেমনি কোনো পক্ষেই মতান্তর ঘটিবার কারণ ছিল না। বর-পক্ষ পয়সার কথা মুখে উচ্চারণ করিল না; বোঝে, তারাচরণ রায়ের বিপুল সম্পত্তি এই পৌত্রীর সহিত তাদের কুলেই আসিয়া পৌঁছিবে! একমাত্র পৌত্রী—আর কোনো ভাগীদার নাই! তারাচরণ রায় দেখিলেন, ছেলেটি যেমন কৃতী; তেমনি নরম আর সহজ আচার-ব্যবহার !

সে-দিন খাইতে বসিয়া দাক্ষায়ণী দেবীর কাছে তারাচরণ কথাটা পাড়িলেন।

দাক্ষায়ণী কাছে বসিয়াছিলেন,—বীণাও ছিল সামনে।

তারাচরণ বলিলেন—এখনি বিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু ছেলেটি ভালো…অত করে ধরেছে…

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—বিয়ে তো দিতেই হবে। আজ দিলে দেবে, কাল দিলেও দেবে। ছেলে নয় যে ঘরে রাখবে! তা ছাড়া ডাগর মেয়ে…এর চেয়ে বুড়ো বয়সে বিয়ে দিলে লোকে বলবে কি !

তারাচরণ রায় বলিলেন,—হুঁ!…কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল, এমন পাত্র যদি পাই, যে এইখানেই আমাদের সঙ্গে থাকবে…

দাক্ষায়ণী দেবী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, কহিলেন—না, না…ঘর-জামাই! মাগো! সব সময় সরকার-গোমস্তার মতো চোর হয়ে থাকবে! মানুষের মতো মানুষ যে, সে কখনো ভেতুড়ে হয়ে থাকতে চায়?…লোকের কাছে পরিচয় দেবে কি? এই ভালো…বিয়ে করে বৌ নিয়ে চলে গেল…মাঝে মাঝে আসবে-যাবে…

বুকের যে-জায়গাটা বীণা ভরিয়া তুলিয়াছে, সে-জায়গাটা আবার তেমনি খালি হইয়া যাইবে, এ চিন্তা তারাচরণ রায়ের মনে কাটার মতো বিঁধিতেছিল! তিনি জানেন, পৌত্রী…ছেলে নয়, মেয়ে! পরের জন্যই মেয়েকে লোকে মানুষ করে! তাই বীণার বিবাহের চিন্তায় তিনি বুকে ব্যথা বোধ করিতেন!…পাঁচ জনের কাছে পাছে এ দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে, এজন্য ঘুণাক্ষরে মনের এ-কথা কারো কাছে কোনো দিন প্রকাশ করেন নাই,—বিবাহের কথায় হাঁ-হুঁ বলিয়া সায় দিয়াছেন! ভাবিয়াছিলেন, কহিতে কহিতে এ-কথা যদি এক দিন সহসা মন্থর হইয়া পড়ে, তিনি যেন মুক্তি পান! কিন্তু তাহা ঘটিল না!

তারাচরণ রায় বীণার পানে চাহিলেন। একান্ত সঙ্কোচভরে বীণা বসিয়া আছে…মুখে কথা নাই, চোখে হাসির আভাস নাই! যেন কতখানি অপরাধ করিয়াছে, এমন ভাব!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—পারবে দিদি আমায় ছেড়ে বরের কাছে থাকতে?

এ-কথায় বীণার সঙ্কোচ আরো বাড়িল। সে মাথা আরো নীচু করিল!

দাক্ষায়ণী দেবীর হাড় জ্বলিয়া গেল। আদিখ্যেতা! দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—তোমায় ক'দিন বা দেখছে ক'দিন বা পেয়েছে যে, তোমার কাছ থেকে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে থাকলে পৃথিবী অন্ধকার দেখবে?…সে বরং বলতে পারো বিরজাকে! সে-বারে সেই দিনাজপুর থেকে

সম্বন্ধ এসেছিল না? বিরজা গুম্ হয়ে রইলো…নাওয়া নেই, খাওয়া নেই…মেয়ে কি রকম যেন হয়ে গেল! খুব বকলুম…তখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, এ-বাড়ী ছেড়ে কোথাও আমি যাবো না, যেতে পারবো না…দাদুকে কে দেখবে? তখন তো ওই তোমার এটা-ওটা কাজ করতো—ফাই-ফরমাশ্ খাট্‌তো। চিরদিন তোমার কোলেই ও বড় হয়েছে! কথায় বলে, অপ্লে না নোয় বাঁশ,—বাঁশ করে টাঁশ-টাঁশ!…কচি বয়স থেকে সলিলা যদি তোমার কাছে থাকতো, তা হলে বটে, সলিলা তোমাকে ছেড়ে শ্বশুর-ঘর করতে যেতে কাঁদতো!…কি বলো সলিলা? আমার বাপু পষ্ট কথা…

স্পষ্ট হইলেও এ-কথা তারাচরণ রায়ের ভালো লাগিল না! তিনি বলিলেন,—বিরজার বিয়ের সম্বন্ধে তুমি চুপচাপ আছো বলেই আমি কোনো কথা কই না।…পাছে ভাবো, তাড়াতে চাই!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—কিন্তু তোমাকেই তো বিয়ে দিতে হবে। হাজার হোক, সলিলার চেয়ে বিরজা বয়সে বড়। বিরজার বিয়ের আগে সলিলার বিয়ে দিচ্ছ তুমি, পাঁচ জনে এতে এরি মধ্যে পাঁচটা কথা বলতে সুরু করেছে! আমি তাদের বলি, তোরা চুপ কর্ বাপু…বিরজা আমার মেয়ে…আমি আশ্রিতা বৈ নই! তারা বলে, এ-ছেলেটির সঙ্গে কর্ত্তাবাবু তো বিরজার বিয়ের কথা বলতে পারতেন! আমি তাদের বলি, বিরজাকে ওদের পছন্দ হবে কেন? জানে, সলিলার সঙ্গে বিয়ে দিলে ছেলে এক দিন এখানকার রাজ্য-ঐশ্বর্য্য পাবে…

কথাটা বাজের মতো মনে বাজিল…তাই কি?

মনকে তারাচরণ রায় চকিতে শাসন করিলেন। তাই যদি হয়…সত্য-কথা! এ সত্যকে তিনি চাপা দিয়া রাখিতে পারেন না! কিন্তু…এ কথায় দাক্ষায়ণীর মনে প্রচ্ছন্ন আক্রোশের যে হুল্…

তারাচরণ বলিলেন—বেশ, ঘটকদের ডেকে বলে দিই, বিরজার জন্য পাত্র আনুক। এঁদেরো বলি, বিরজা বড়…তার বিয়ে হলে তবে সলিলার বিয়ে দেবো…এঁরা দু'দিন সবুর করুন।

বীণাকে চট্ করিয়া পর-গৃহে বিদায় করিতে হইবে না, চিন্তায় তারাচরণ যেন একটু আরাম বোধ করিলেন!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—বিরজার বিয়ের হাঙ্গাম তো কিছু নেই। একটা ছেলে ধরে এনে তার হাতে ধরে দেওয়া…

তারাচরণ রায় বলিলেন—এ-কথার মানে?…আমার কাছে আছো…আমার আপন-জন…তোমাদের ভার যখন নিয়েছি, তখন দেখলে পারো, কি আমি করি…

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—আমি তা জানি। ঐ মেয়ের জন্যই আমার যা-কিছু ভাবনা। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমার আর ভাববার কিছু থাকে না!…তোমারো বয়স হচ্ছে…ভগবান না করুন, যে দুঃখ-কষ্ট মনে-মনে ভোগ করছো এত বছর ধরে', তোমার যদি কিছু হয়…মেয়েটার ইহ-জন্ম নষ্ট হয়ে যাবে! তাই আমার বলা!

তারাচরণ রায় বলিলেন—হুঁ, ভালো কথা মনে করিয়ে দেছো দক্ষ! মেয়ে-দুটোর বিয়ে দিলে আমারো ইহ-জন্মের কাজ শেষ হয়। ভালো কথা, তোমার শশিকান্তকে বলো, হেসেখেলে বেড়ালে আর চলবে না। তার আমি চাকরির ব্যবস্থা করছি। শশীকে বলো, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। একটা চাকরি আছে। ভালো চাকরি। মাসে এখন একশো টাকা করে পাবে; তার পর ভালো কাজ করতে পারলে উন্নতির আশা আছে।…এই বেলা সব নিজের-নিজের গুছিয়ে নিক্! আমিও সব গোছগাছ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চাই, বুঝলে?

দাক্ষায়ণী দেবী এ-কথার কোনো উত্তর দিলেন না,—একবার শুধু বীণার পানে চাহিলেন। বীণা যেন মাটী হইয়া মাটীতে মিশিয়া যাইতেছে!

তারাচরণ রায় বলিলেন—একটা নাৎনী…সত্যি, তার বিয়ে দিয়ে যে কটা দিন থাকি, ওদের ভালো!…আমি তো চিরদিন বাঁচবো বলে' এখানে আসিনি…

কথার শেষে তারাচরণ রায় মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তারপর ক্ষীরের বাটীতে ভাত ফেলিলেন।

বৈকালের দিকে বীণা নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সামনে খড়খড়ি খোলা। খোলা খড়খড়ি দিয়া বাহিরে অনেকখানি আকাশ দেখা যাইতেছে, বীণা সেই আকাশের পানে চাহিয়া আছে। তার মনের উপর যেন

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিয়াছে! মনে তেমনি কোলাহল, তেমনি অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা!

কিরণ আসিল, আসিয়া ডাকিল—সলিলা…

বীণা ফিরিয়া চাহিল।

কিরণ বলিল,—একলাটি ঘরের কোণে বসে আছো যে…

মুখে ম্লান হাসি…বীণা বলিল,—এমনি ··

কিরণ বলিল,—আমি এসেছিলুম তোমার দু'চারটে সেমিজ-ব্লাউশ নিতে। বৌদির পিশিমা লোক পাঠিয়েছেন,—বৌমার দু'-তিনটে সেমিজ-ব্লাউশ পাঠিয়ে দিয়ো বলে'। তৈরী করতে দেবেন কি না!

বীণা কোনো জবাব দিল না।

কিরণ বলিল,—দাদুর কাছে গিয়েছিলুম। দাদু রাজ্যের দলিল-পত্র খুলে বসেছেন। বললেন, সলিলাকে বলে চেয়ে নিয়ে যাও…

বীণার যেন চেতনা নাই! কথাগুলা সে শুনিল… কিরণ যেন তাকে এ-কথা বলিতেছে না, আর-কাকে বলিতেছে!

কিরণ বিস্ময়বোধ করিল, বলিল,—বাঃ! চুপ করে বসে রইলে যে! ওঠো…উঠে আলমারি খুলে বার করে দাও…

এ-কথায় বীণা যন্ত্র-চালিতের মতো উঠিল…উঠিয়া যন্ত্র-চালিতের মতোই চাবি দিয়া আলমারি খুলিল; খুলিয়া কিরণের পানে চাহিল…

কিরণ বলিল,—কি! পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে তবু!

এবার বীণা কথা কহিল,—কোনো মতে বলিল,—তুমি নাও ভাই…

কিরণ বলিল,—বেশ…

নানা প্যাটার্ণের ব্লাউশ-সেমিজ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া কিরণ কটা বাছিল; বাছিয়া বলিল,—মাপ ঠিক আছে তো?

মাথা নাড়িয়া বীণা জানাইল, হাঁ।

কিরণ বলিল,—দেরাজ বন্ধ করো…

বীণা আলমারি বন্ধ করিল।

কিরণ বীণার পানে চাহিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল; তার পর ডাকিল,—সলিলা…

বীণা চাহিল কিরণের পানে। চোখের দৃষ্টি যেন পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতো!

একটা কথা কিরণের মনে বিদ্যুতের শিখার মতো চকিতে জাগিয়া মিলাইয়া গেল।

কিরণ বলিল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? সত্যি জবাব দেবে?

বীণা শুধু নিশ্বাস ফেলিল।

কিরণ বলিল,—এ বিয়েয় তোমার অমত আছে?

বীণার দেহে-মনে কিরণ যেন কাঁটার চাবুক মারিয়াছে! বেদনায় বীণার দেহ-মন মুইয়া বাঁকিয়া দুমড়াইয়া কেমন যেন হইয়া গেল! তার মুখে কথা ফুটিল না।

কিরণ লক্ষ্য করিল বীণার মুখ কাগজের মত সাদা!

কেন?

ছোট এই 'কেন' প্রশ্নটুকুকে ঘিরিয়া কিরণের মনে অসংখ্য ঢেউ…

এত বয়স পর্য্যন্ত সলিলা কাশীতে পরাশ্রয়ে কোথায় পড়িয়াছিল…সেখানে এমন কোনো বন্ধু?…হয় তো দরদে-প্রীতিতে সলিলার মনে কুসুমরাশি ফুটাইয়া তুলিতেছিল…

দু'চোখের গভীর দৃষ্টিতে কিরণ অনেকক্ষণ বীণার পানে চাহিয়া রহিল। সে-দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া বীণা চোখ নামাইল।

ব্লাউশ-সেমিজগুলা বিছানার উপর রাখিয়া কিরণ বীণার হাত ধরিল, ডাকিল,—সলিলা…

বীণা আবার চাহিল কিরণের পানে…

কিরণ বলিল,—সত্যি বলো…আমায় তোমার বন্ধু বলে জেনো সলিলা। এমন বন্ধু,…যে-বন্ধু তোমার জন্য সকলকে অগ্রাহ্য করতে পারে…

বীণার বুকে মৃদু কাঁপন!

কিরণ বলিল,—এখানে বিয়ে করতে যদি তোমার এতটুকু আপত্তি থাকে, বলো…কেউ কারণ জানবে না। বিয়ে আমি বন্ধ করে দেবো।

বীণা এ-কথার জবাব দিল না। কি জবাব দিবে? তার মনের মধ্যে যা হইতেছিল…কথায় তা কাহাকেও বুঝানো যায় না!

কিরণ বলিল—আর-কাকেও পছন্দ করেছো বিয়ের জন্য?

বীণার সমস্ত মন ভরিয়া একটা আর্ত্ত ক্রন্দন···

বীণা বলিল,—না, না, তা নয়···

—তবে ?

বীণা ভাবিল, মনের এ-ভার সে আর বহিতে পারে না। চোরের মতো এমন করিয়া পরের সৌভাগ্য, পরের সম্পদ চুরি করিয়া···ওঃ !

সে একেবারে ছুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তার ছু'চোখের পিছনে জল !

সে-দৃশ্যে কিরণ অভিভূত হইল, বলিল—সন্তোষ কাকার জন্য মন কেমন করছে ?···না, যার জন্য···?

বীণার চোখে জল-ধারা তখন উচ্ছ্বসিত হইয়াছে !

বীণাকে কিরণ বুকে জড়াইয়া ধরিল। কাহারো মুখে কথা নাই।

বীণা যেন অকুলে কূল পাইয়াছে ! কিরণও দরদে গলিয়া বীণার দুঃখ যতখানি পারে, নিজের বুকে তাহা যেন অনুভব করিতেছে !

এমনি ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল···

হঠাৎ বীণার মনে হইল, এ সে কি করিতেছে ? তার চেয়ে কিরণকে সব কথা প্রকাশ করিয়া···

বলিলে···সকলের ঘৃণা-লাঞ্ছনা বহিয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, সত্য ! কিন্তু তারাচরণ রায় আজ যে-কথা বলিয়াছেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বীণাকে···এবং এই সম্পত্তির জন্যই রাজপুত্র-মন্ত্রিপুত্র আসিয়া আজ তার কণ্ঠে বরমাল্য দিতে উদ্যত হইয়াছে ! বীণা যদি এ-পরিচয়ে এ-বাড়ীতে না আসিত, তাহা হইলে তারাচরণ রায়ের সম্পত্তি পাইত ঐ দাক্ষায়ণী দেবীর ছেলেমেয়ে ! এবং তাহা হইলে হয় তো এ-রাজপুত্র বিরজার কণ্ঠ-ভূষার জন্য বরমাল্য লইয়া উদয় হইত !

বীণার মনে এই যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, এ দ্বন্দ্ব এক-নিমেষ বিরাম জানে না ! সব কথা সে খুলিয়া বলিতে চায়···কিন্তু তার কথা শুনিয়া যদি সকলে মনে করেন, বিষয়-সম্পত্তি, বিলাস-ঐশ্বর্য্যের লোভে কোথাকার এক ভিখারিণীর কন্যা বীণা···বীণা ঐশ্বর্য্য চায় না, সম্পদ চায় না···চায় শুধু নিরাপদ আশ্রয় ! কি করিয়া···কি করিয়া সে তাহা বুঝাইবে ? এমন যদি সম্ভব হয়···এ-বিবাহে স্বামীর উপর নিশ্চিন্ত-নির্ভর রাখিতে পারে···এমন নির্ভর যে সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি বুঝিবেন, বীণা কেন এ কাজ করিয়াছে···

বীণার ছু'চোখে জল···

কিরণ বলিল—কেঁদো না সলিলা। তোমার দুঃখ আমি বুঝি, কিন্তু দাদুর কথা ভাবো···ওঁর দুঃখ তোমার-আমার দুঃখের চেয়ে কত-বেশী !

সজল চোখে বীণা কিরণের পানে চাহিয়া রহিল।

কিরণ বলিল—অমন করে চেয়ে আছো যে ! একা থাকলে মন খুব খারাপ হবে, জানি। আমার সঙ্গে বরং আমাদের ওখানে চলো···বুঝলে ! আমার এ-কথায় 'না' বলো না, লক্ষ্মীটি।

বীণা কোনো জবাব দিল না।

কিরণ বলিল—যাবে ?

এত আদর, এমন ভালোবাসা···না বলা চলে না ! বীণা না বলিতে পারিল না, বলিল,—যাবো।

—এসো···

বীণাকে লইয়া কিরণ ফিরিল।

ফিরিবার সময় একবার তারাচরণের ঘরে উঁকি দিল। বলিল—সলিলাকে নিয়ে যাচ্ছি দাদু···

তারাচরণ বলিলেন—কোথায় ?

—আমাদের ওখানে।

তারাচরণ বলিলেন—তাই ভালো। আমি ভাব-লুম, বুঝি, তোমার সেই স্বর্ণদ্যুতির বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছো !

হাসিয়া কিরণ বলিল—বড্ড হিংসে হচ্ছে তার ওপর—না ? সলিলাকে সে এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে যেতে চায় !

তারাচরণ বলিলেন—হচ্ছে বৈ কি ! ছু'দিন আমার কাছে থাকবে, তা কারো সইছে না ! না তোমাদের, না তোমাদের সেই মিষ্টার স্বর্ণদ্যুতি সাহেবের !

কিরণ বলিল—সলিলারো সইছে না, না কি ?

এ-প্রশ্নে তারাচরণ রায় চাহিলেন বীণার পানে। বীণার মুখ মলিন···আনন্দের একটু কণাও ও-মুখে নাই ! দেখিয়া তারাচরণ কোনো কথা বলিলেন না ; চুপ করিয়া রহিলেন।

২৩

ঘটকদের অসাধ্য কাজ নাই! তারা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া হৈ-হৈ শব্দে পাঁচ-সাতটি পাত্র আনিয়া হাজির করিল। তাদের মধ্য হইতে তারাচরণ বাছিয়া ঠিক করিলেন সন্ত ডাক্তারী-পাশ-করা অরবিন্দকে। অরবিন্দ শুধু পাশই করিয়াছে! মুরুব্বি নাই যে চাকরি জোগাড় করিয়া দিবে! পয়সা নাই যে ডিসপেন্‌সারি খুলিয়া ব্যবসা সুরু করিবে।

তারাচরণ বলিলেন,—নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেবো। ডিসপেন্‌সারি খুলে বসো, বাপু। তার পর বিরজার ভাগ্য আর তোমার হাতযশ!

অরবিন্দর মা নাই, বাপ নাই, এক দাদা আছে। সে দাদা বর্ম্মায় চাকরি করে। কাজেই বিবাহের জন্য তার আয়োজন করিবার কিছু ছিল না। শুধু পাঁজি দেখিয়া একটা দিন স্থির করিলেই হয়···

তারাচরণ ভিতর-বাড়ীতে আসিয়া ডাকিলেন,—দক্ষ···

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—কেন?

তারাচরণ বলিলেন,—এই ছেলেটিকে পছন্দ করেছি। তৈরী ছেলে। এর পিছনে কাট-খড় খরচ করতে হবে না!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—তুমি যা ভালো মনে করবে, তাতে আমি কোনো কথা বলতে পারি? বিশেষ আমার কে আছে যে দেখবে!

কথার মধ্যে সেই প্রচ্ছন্ন হুল! তারাচরণ রায়ের মনে এ-হুল্ দাক্ষায়ণী দেবী অনেক ফুটাইয়াছেন; কাজেই এ-হুল তাঁকে আর বিঁধে না! তিনি বলিলেন,—আবার কি চাও? ডাক্তার-জামাই! এই যে তোমার শশিকান্ত—ডাক্তার হবার সামর্থ্য তার আছে? হুঁঃ, না ডাক্তার, না মোক্তার! শশীর জন্য কোন্ ব্যবস্থাটা করা হয়নি? তোমার জামাইকে পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিচ্ছি···তার উপর গহনাও কোন্ হাজার-দুত্তিনের না দেবো!···আবার কি চাও? বাজারে এ ছেলের দাম আছে—দশ-পনেরো হাজার হাঁকলে অনায়াসে তা পায়।···বিয়ের একটা দিন ঠিক করিয়ে ফ্যালো ভটচায্যি মশায়কে ডাকিয়ে এনে। দিন স্থির হলে আমায় জানিয়ো, ছেলেটিকে আমি খপর পাঠাবো। সে তৈরী হয়ে বসে আছে। যে-দিন বলবো, এসে বিয়ে করবে।

কথাটা বলিয়া তারাচরণ রায় দাঁড়াইলেন না, বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দাক্ষায়ণী দেবী গুম্ হইয়া রহিলেন। তাঁর মুখে যেন বৈশাখী মেঘের ভীষণ ছায়া!

শশিকান্ত আসিয়া ডাকিল,—মা···

দাক্ষায়ণী কথা কহিলেন না।

শশিকান্ত বলিল—চাকরিতে তো জয়েন করেছি, এ-দিকে বিপদ···

বিপদের কথায় দাক্ষায়ণী মুখ তুলিয়া ছেলের পানে চাহিলেন।

শশিকান্ত বলিল,—আমার সম্বন্ধীর বিয়ে দিন-আষ্টেক পরে। ও তো যাবে বলে' ক্ষেপেছে।

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—কে? বৌমা? তা বেশ, তোমার দাদুকে গিয়ে বলো। এ-দিকে বিরজার বিয়ের দিনও তিনি ঠিক করছেন···

শশিকান্ত বলিল,—সে তো এক রাত্তিরের ব্যাপার। ছেলের কেউ কোথাও নেই···নিঃশব্দে আসবে, এসে বিয়ে করে বৌ নিয়ে চলে যাবে। ব্যস্!

দাক্ষায়ণী দেবীর মনের মধ্যে যেন আগুনের সাগর ফুঁশিতেছিল!

তিনি বলিলেন,—তোমার যা-খুশী করো গে বাপু··· আমায় মিছে বলা! আমি যদি মায়ের মতো মা হতে পারতুম, টাকা-পয়সা দিতে পারতুম···তা হলে বটে অন্য কথা ছিল! আমি হলুম পর-ঘরী···পরের হাত-তোলায় বাস করছি।

শশিকান্ত দেখিল মায়ের যে মেজাজ···বলিল,—তা হলে আমি তাদের লিখে দিতে বলি, কেউ এসে যেন নিয়ে যায়···

শশিকান্ত চলিয়া যাইতেছিল···দাক্ষায়ণী বলিলেন,—এখানে ওঁর ননদের বিয়ে—তাতে থাকা উনি দরকার মনে করছেন না বুঝি?

শশিকান্ত বলিল,—সেখানে খটার বিয়ে···ওর ঐ একটি ভাই!

দাক্ষায়ণীর মনে হইল, পৃথিবীতে কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে…অকস্মাৎ! না হইলে তাঁকে এমন নিঃসহায় হইতে হইবে কেন? ছেলে-মেয়ে…যাদের জন্য তিনি জ্বলিয়া মরিতেছেন, দুনিয়ার অবিচার দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছেন…সে ছেলেমেয়েও তাঁর মুখ চাহিতে জানে না!

বিশ্ব-সংসারের উপর রাগ হইল। স্বর্গগত মা-বাপ, স্বর্গগত স্বামী…শ্বশুর-বাড়ীর নিঃস্বতা…এমন ভাগ্যও তিনি করিয়া ছিলেন! বিধবা আরো পাঁচ জনে হয়…কিন্তু তাঁর মতো এতখানি দুর্গতি তাদের মধ্যে কে ভোগ করিতেছে! হতভাগা স্বামী…স্বামীটা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত! বাঁচিয়া না থাকুক, পয়সা-কড়ি যদি রাখিয়া যাইত…

ও-দিকে আদরের পৌত্রীর বিবাহের জন্য কি সমারোহে আয়োজন চলিয়াছে! আর বিরজার বেলায় কোনো মতে নমো-নমো করিয়া কাজ সারা! বিরজা সত্যই কিছু ভাসিয়া আসে নাই!…ঐ সলিলা…কোথায় পাঁদাড়ে পড়িয়াছিল…তার সর্ব্বনাশ করিতে ধেড়ে-বয়সে এখানে আসিল টশ্ কুড়াইতে!…তারাচরণ রায়ের বা কি আক্কেল!…পারিতেন না উনি এই দামী ডাক্তার পাত্রের হাতে আদরের পৌত্রীকে সমর্পণ করিতে! নগদ পাঁচ হাজার টাকা! কেন, এই দামী ডাক্তার-পাত্রের হাতে সলিলাকে দিতে কি হইয়াছিল? তোমার বিষয়-সম্পত্তির মালিক হইয়া একটা ছোট ডিস্‌পেন্সারি কেন, মস্ত-গোটা হাসপাতাল বানাইতে পারিত যে!…তা নয়…

কিন্তু এ-তর্ক কার সঙ্গে করিবেন? এ পক্ষপাতিতার কথা কাকে বুঝাইয়া বলিবেন?

রাগে তিনি জ্বলিতে লাগিলেন। সে রাগ কথায় ফুটিল না। তার কারণ, কথায় ফুটিলে এমন চীৎকার তুলিবেন যে, তার ফলে হয় তো বা তারাচরণ রায় এ-বিবাহ ছাঁটিয়া নির্লিপ্ত নির্বিকার হইয়া উঠিবেন! যদি বা সাত-দেবতার দ্বার ধরিয়া এ-মতি হইয়াছে…

এখন কি আর সে তারাচরণ আছেন…আদরের নাৎনী আসিয়াছে! তাকে লইয়া মাতন চলিয়াছে! ভুলিয়া গিয়াছেন, দুঃখে-দুর্দ্দিনে এত-বড় সংসারটাকে মাথায় করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এই দাক্ষায়ণী বামনী!

মা'কে নিরুত্তর দেখিয়া শশিকান্ত চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার ঠিক আগে তারাচরণ রায় আসিয়া বীণার সঙ্গে দেখা করিলেন।

বীণা চুপচাপ বসিয়াছিল। তারাচরণ রায় বলিলেন, —একটা গান শুনতে এলুম দিদি…গাইবে?

তারাচরণের কণ্ঠ আর্দ্র…বীণার মন সে আর্দ্রতায় ভিজিয়া গেল। মনে হইল, অতি দুশ্চিন্তায় বীণা কাতর…তার মনে লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক বাসা বাঁধিয়া দংশনে তাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, সত্য! কিন্তু এই নিরীহ স্নেহ-পাগল বৃদ্ধ! তাঁর বুকে আর-এক রকমের যাতনা! সে যাতনা কতখানি তীব্র, বীণা তা জানে! তারাচরণকে সে চিনিয়াছে…তাকে পাইয়া তারাচরণ কত দিনের কত দুঃখ ভুলিয়াছেন, বীণা তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করে। উপলব্ধি করে বলিয়া কোনো দিন তাঁর পায়ের উপরে পড়িয়া মনের কপাট খুলিয়া বলিতে পারিল না, দাদু…আমি সলিলা নই…আমি বীণা!

বীণাকে নিরুত্তর দেখিয়া তারাচরণ রায় ইজিচেয়ারে বসিলেন, বলিলেন—কাছে এসো দিদি।

বীণা কাছে আসিল।

তারাচরণ রায় তাকে প্রায় বুকের উপরে টানিয়া লইলেন। বীণা তাঁর বুকে মুখ লুকাইল।

বীণার পিঠে হাত রাখিয়া তারাচরণ রায় সস্নেহে বলিলেন—দুঃখ করো না দিদি। মেয়ে-মানুষকে স্বামীর ঘরই করতে হয়…স্বামীর ঘরই তার নিজের ঘর। আজ তোমার মা-বাবা যদি বেঁচে থাকতো, তা হলে তারাও তোমার বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরেই তোমাকে পাঠিয়ে দিত। কাছে চিরদিন ধরে রাখতে পারতো না! আমাকেও তাই করতে হচ্ছে, দিদি। আমি একা থাকবো, কেউ আমার কাছে থাকবে না, এতে আমার কষ্ট হবে খুব।… কিন্তু এ কষ্ট সইতে হবে দিদি। আমার আগে আমার বাপ-ঠাকুর্দ্দা এমন দুঃখ সয়ে গেছেন…আমি সইবো…আবার তোমার যখন মেয়ে হবে, বিয়ে দিয়ে তাকে পরের ঘরে পাঠিয়ে তোমাকেও এমনি দুঃখ সইতে হবে ভাই। …এর জন্ত কাঁদে না…কাঁদতে নেই। যে-ঘরে তোমায় পাঠাচ্ছি, সেই ঘর আলো করে তুমি চিরদিন থাকো। তোমার মায়ের মতো সব গুণ তোমার হোক…শুধু তার

ভাগ্য তুমি পেয়ো না দিদি···ভগবানের কাছে কায়-মনে আমি এই প্রার্থনা করি ·

সুগভীর স্নেহের এ-কথা বীণার বুকে জমাট বেদনার স্তূপে আঘাত দিল। সে আঘাতে বেদনার স্তূপ ভাঙ্গিয়া অশ্রু-ধারায় ফাটিয়া বিগলিত হইল।

তারাচরণ রায় বীণার মাথায়-গায়ে হাত বুলাইলেন। অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন—তুমি যদি কথা না শোনো দিদি···তা হলে আমারো কান্না পাবে।

চোখ মুছিয়া মুখ তুলিয়া মলিন হাস্যে বীণা ডাকিল,—দাদু···

তারাচরণ রায় বলিলেন—দিদি···

বীণা বলিল—তার চেয়ে আমি যদি বরাবর তোমার কাছে থাকি ?

—বিয়ে করবে না ? বিয়ে না করে' ?

বীণা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

তারাচরণ রায় বলিলেন—তা কি হয় দিদি ?

—বিলেতে অনেক মেয়ে যে সারা-জীবন বিয়ে করে না।

তারাচরণ রায় হাসিলেন; বলিলেন—বিলেতের কথা আলাদা। এ তো বিলেত-দেশ নয় যে, তা হবে।

বীণা কোনো কথা কহিল না···চুপ করিয়া রহিল।

তারাচরণ রায় নিশ্বাস ফেলিলেন···তাঁর দু'চোখে মেঘের মলিন ছায়া !

বীণা ডাকিল—দাদু···

তারাচরণ রায় বীণার পানে চাহিলেন।

বীণা বলিল—ক'দিনে তুমি কেন আমায় এত ভালো-বাসলে দাদু ?

একটা নিশ্বাস ! তারাচরণ রায় সে-নিশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ভগবান এ ভালোবাসা বুকে দেছেন, দিদি। এ ভালোবাসা তিনি মা-বাপ, ঠাকুর্দ্দা-ঠাকুমা সবার বুকে দেছেন বলেই তাঁর সৃষ্টিধারা যুগ-যুগ ধরে' চলে আসছে ! না হলে পৃথিবীতে মানুষের আজ চিহ্ন থাকতো না !

বীণা এ-কথার জবাব দিল না। তার মনের মধ্যে একরাশ প্রশ্ন ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকাইতেছিল···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তুমি যে আমাকে এত ভালোবাসো ! তোমার মা, তোমার বাবা···তাদের আমি কত দুঃখ-কষ্ট দিয়েছি···তোমাকে এত দিন কষ্ট দিয়েছি··· তবু তুমি আমায় এত ভালোবাসো কেন, বলতে পারো ?

কথাটা বলিয়া তারাচরণ বীণার পানে চাহিয়া রহিলেন। বীণা চাহিয়াছিল খোলা খড়খড়ি দিয়া বাহিরে যে-আকাশ দেখা যাইতেছিল···সেই সঙ্গে ও-দিক-কার বারান্দায় যে ঝিলমিলি, ঝিলমিলির গায়ে দুটো পায়রা বসিয়া আছে, সে-সবের পানে ! দৃষ্টি সে-দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও মন কিন্তু···

বীণা ফিরিয়া চাহিল তারাচরণ রায়ের পানে, ডাকিল,—দাদু···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—দিদি···

বীণা কহিল,—আচ্ছা, আমি যদি সলিলা না হয়ে আর কেউ হই ?

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গ কেমন আতঙ্কে ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল···মাথা ঘুরিয়া গেল···দু'-চোখের সামনে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী ! কাণে শুধু ভাসিয়া আসিল তারাচরণ রায়ের কণ্ঠস্বর। তারাচরণ রায় বলিলেন,—তার মানে ?

বীণা কহিল—বলো না···ধরো···কেউ যদি এসে তোমায় বলে, আমি সলিলা নই···আমি আর-এক জনদের মেয়ে ! আমার মা নেই, বাপ নেই, পৃথিবীতে আপন-জন কেউ নেই···তোমার এখানে সলিলা সেজে এসে তোমার স্নেহ-ভালোবাসা চুরি করে আদায় করছি ? যদি সত্যি-সত্যি তাই হয় ? বলো না, যদি···

কথার শেষ-দিকে বীণার স্বর জড়াইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন সবলে বীণার কণ্ঠ চাপিয়া-চাপিয়া ধরিয়াছে ! কণ্ঠে কথা আর বাহির হইল না···

মাথা আরো ঘুরিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, ঘরটা যেন দুলিতেছে···ভূমিকম্পের বেগ !

বাহিরে গোধূলির ঐ স্নিগ্ধ আলোর উচ্ছ্বাসটুকু যেন নিবিয়া আসিতেছে ! চোখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করিয়া যেন সেই শ্রীপতির মুখ···সে-মুখে বিকট হাসির রেখা ! ভয়ে বীণা চক্ষু মুদিল।

তার পর···

চোখ মেলিয়া চাহিয়া বীণা দেখে, বিছানায় সে শুইয়া আছে···পাশে বসিয়া তারাচরণ রায়। তাঁর দু'-চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এখন ভালো বোধ করছো দিদি?

বীণা এবার ভালো করিয়া চাহিল। বলিল,—বিছানায় এলুম কখন, দাদু?

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—নিজে এসেছো কি! আমি এনে শুইয়ে দিয়েছি। মাথা ঘুরে আমার কোলে লুটিয়ে পড়লে···যত ডাকি, জবাব নেই! ···যে-ভয় হয়েছিল!

কুণ্ঠাভরে বীণা বলিল,—আর-কাকেও ডাকোনি তো দাদু?

—না।

আঃ! ডাকিলে সকলে কি মনে করিত? ভাবিত, মেয়েটা যেন কি! কথায়-কথায় কি কীর্ত্তিই করে!

বীণা উঠিয়া বসিল।

মনে পড়িল, যে-প্রশ্ন করিয়াছিল! মনে পড়িল, চোখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে শ্রীপতির মুখ···রূপকথার গল্পে ধোঁয়া হইতে যেমন দৈত্যের আবির্ভাব হয়, তেমনি! মনে-মনে হাসিল। এমন নিরাপদ নীড়ে বসিয়াও যদি এমন করিয়া এ-ভয় মনে জাগে, তাহা হইলে বাঁচা কেন!

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব পায় নাই! আবার প্রশ্ন করিবে?

বীণা চমকিয়া উঠিল!···না···থাক্!

বীণা বলিল,—আমি গান গাই, দাদু। তুমি গান শুনতে চাইলে!

তারাচরণ বলিলেন,—কষ্ট হবে না?

—না। তুমি ভাবছো, আমি অজ্ঞান হয়ে গেছলুম? তা নয়। দিন-রাত শুধু ভাবি কি না···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—আর ভেবো না। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, তোমার কোনো ভাবনার কারণ নেই, জেনো।

বীণা মাথা নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

তার পর সে উঠিয়া অর্গানের সামনে বসিল। বলিল,—কি গান গাইবো?

—যে-গান তোমার ইচ্ছা।···বিয়ে হয়ে গেলে আর তোমার গান শুনতে পাবো না তো···

বীণা কহিল,—আবার ঐ কথা। তা হলে আবার আমি ভাবতে বসবো।

—না দিদি, আর ভেবো না। তুমি গান গাও···

বীণা গাহিল,—

"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না,
(সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।)
কান্না-হাসির বাঁধন তারা সইলো না
(সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)
আমার প্রাণে গানের ভাষা
শিখবে তারা ছিল আশা,
উড়ে গেল, সকল কথা কইলো না।
(সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)"

চমৎকার গান···চমৎকার কণ্ঠ!

তারাচরণের মনের মধ্যে যেন সিন্ধু উথলিয়া উঠিল!

গান শেষ হইলে তারাচরণ রায় বলিলেন—তোমার নানা-রঙের দিন তোমার বুকে সোনার খাঁচায় চিরদিন থাকবে!···কিন্তু এ-দুঃখের গান কেন গাইলে, দিদি?

বীণা কহিল,—নতুন শিখেছি। বড্ড ভালো লেগেছে এ-গানটি···

—রবীন্দ্রনাথের গান?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এ-গানে খুশী হলুম না। আনন্দের গান শুনতে চাই আমি।

বীণা কহিল,—দুঃখের গান আমার বড ভালো লাগে দাদু···

—না···এবার একটা সুখের গান গাও দিকি··· রবীন্দ্রনাথ সে-গানও অনেক লিখেছেন।

বীণা কহিল—সুখের গান? আচ্ছা···

বীণা গাহিল—

আজ কি তাহার বারতা পেলো কিশলয়?
ওরা কার কথা কয় বনময়?
আকাশে আকাশে দূরে দূরে
সুরে-সুরে
কোন্ পথিকের গাহে জয়?···

তারাচরণ কহিলেন—বেশ, বেশ, বেশ গান দিদি। সেই পথিকের জয়-গান গাও···জয়···জয়···

বীণা গাহিতে লাগিল,—

চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লী-মুখর ঘন বনতলে…

এমন সময় দাক্ষায়ণী দেবী ঘরে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন—আমোদ-আহ্লাদ হচ্ছে, এ সময় বিরক্ত করবো?

কথা শুনিয়া বীণার কণ্ঠ নীরব…তারাচরণ চাহিলেন দাক্ষায়ণীর পানে।

দাক্ষায়ণী বলিলেন—তুমিই বলেছিলে, তাই ভটচায্যি মশায়কে ডাকিয়ে এনেছিলুম। এসে পাঁজি দেখে তিনি দিন ঠিক করেছেন…পঁচিশে আষাঢ়।

তারাচরণ কহিলেন,—পঁচিশে আষাঢ়! ও! আজ হলো ক' তারিখ?

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—আজ আষাঢ় মাসের আঠারো তারিখ।

—মাঝে সাত দিন বাকী! তা বেশ, ঐ তারিখই ঠিক রইলো। ছেলেটিকে আমি চিঠি লিখে জানাই।

দাক্ষায়ণী দেবী কহিলেন—তোমার ইচ্ছা…

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আবর্ত্তন

বিদেশী কবিতার ভাবাবলম্বনে

গোলাপ হ'য়ে প্রেমের কলি উঠিত যদি ফুটে'—
আমি হতেম তাহার কিশলয়,
মোদের জীবন একই সাথে উঠিত বিকশিয়া
দুখের রাতে, সুখের দিনে আলোয় তরঙ্গিয়া!
সর্ব্বহারা রিক্ত ধরায় শষ্প সমারোহে
শ্যামোল্লাসে ধূসর ব্যথাময়
গোলাপ হ'য়ে প্রেমের কলি উঠিত যদি ফুটে'—
আমি হতেম তাহার কিশলয়!

* * * *

আমি যদি নিতেম কায়া বাণীর রূপে রূপে
সুরের লীলা রচিত ভালবাসা,
একই সাথে একই গানে মিলিয়া যেতো দোঁহে,—
ওষ্ঠ মোদের মিলিত আসি পুলক-সমারোহে!
তৃষ্ণাহত চাতক যথা বাদল-ধারা পানে,
তৃপ্ত হতো—মিটিত চির-আশা!
আমি যদি নিতেম কায়া বাণীর রূপে রূপে
সুরের লীলা রচিত ভালবাসা!

জীবন হ'য়ে জাগিয়া তুমি উঠিতে যদি প্রিয়া,
মরণ আমি হতেম তব প্রেমে,
অরুণ-আলো হিমচ্ছায়া রহিত তবে মিশি,—
শীতের জরায় উঠিত মাতি মাধবী-মধুনিশি;
বনাঞ্চলে নবীন লীলা হাজার ফুলে-ফলে—
প্রাণের সাড়া আসিত সেথা নেমে,
জীবন হ'য়ে জাগিয়া তুমি উঠিতে যদি প্রিয়া,
মরণ আমি হতেম তব প্রেমে।

* * * *

আনন্দেরই রাণীর রূপে আসিতে যদি তুমি
ব্যথার রাজা হতেম আমি তবে!
গগন-পথে ছুটিয়া চলে প্রেমের তুরঙ্গম
দিতেম আমি মন্দ করি যাত্রা সে দুর্দ্দম—
বাতাস হ'তে শক্তি লুটি নিয়মে বাঁধি তারে
ওষ্ঠে দিতেম রশ্মি সগৌরবে—
আনন্দেরই রাণীর রূপে আসিতে যদি তুমি—
ব্যথার রাজা হতেম আমি তবে।

শ্রীকালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

প্রাচ্য-পুঞ্জের পরামর্শ-পরিষদ

গত ৮ই কার্ত্তিক শনিবার লর্ড লিন্‌লিথগো দিল্লী নগরে প্রাচ্য-পুঞ্জের পরামর্শ-পরিষদের উদ্বোধন করিয়াছিলেন—এ সংবাদ পাঠকগণের সুবিদিত। তাহার পর এই পরিষদের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, এই পরিষদের আপ্রাণ চেষ্টায়, না জানি, এ দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠার কতই সুবিধা ঘটিবে। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন এ দেশের জনসাধারণের মন নিবিড় নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হইতেছে। কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে অনুসন্ধানকার্য্য চালাইবার জন্য পরিষদ অনেকগুলি উপসমিতিতে বিভক্ত হইয়াছে। অল্প দিন পূর্ব্বে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, দিল্লীতেই পুনর্ব্বার এই পরিষদের পূর্ণ অধিবেশন হইয়াছিল; সেই অধিবেশনে সকল দেশের প্রতিনিধিদিগের নেতৃবর্গ ভারতে পরিষদের স্থলাভিষিক্ত একটি স্থায়ী সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সেই সমিতিই পরিষদের পক্ষ হইতে কার্য্য পরিচালিত করিবেন, এবং তাঁহাদের অবধারিত ক্ষেত্র মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ, পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা, এবং পণ্যোৎপাদনের নূতন উৎসগুলিকে যথাবিহিত ভাবে বিযুক্ত করিতে থাকিবেন। কমিটীর সম্পূর্ণ রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই,—তবে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, রিপোর্টে প্রকাশ, এই পরিষদের কাজ এখনও শেষ হয় নাই; কেবল উহাতে বলা হইয়াছে যে, রিপোর্ট দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। পরিষদ কেবল কি করা কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন, আর কোন্ দিকে কি ভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক,—তাহারও নির্দ্দেশ দান করিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহারা একটি স্থায়ী সমিতি রক্ষার পরামর্শ দিয়াছেন।

এই ত ব্যাপার! অন্ততঃ এইটুকু মাত্র বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে। পরামর্শ-সভা আর একটি সমিতির স্কন্ধে সকল ভার ন্যস্ত করিয়া আপনার কার্য্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন। ভারতবর্ষকে ক্রমশঃ শ্রমশিল্পের পথে অগ্রসর করিবার পরিকল্পনাটি, রেলপথের মন্থরগামী মালবাহী ট্রেণের মত আপাততঃ এক পাশে ফেলিয়া রাখা হইল। পরিষদ প্রকৃত পক্ষে এই কার্য্যের পরামর্শ দিয়াছেন, বা আদৌ কোন পরামর্শই দিয়াছেন কি না, তাহা এখন পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই; সুতরাং এই ব্যাপারে আমরা বিশেষ কোন আশা পোষণ করিতে পারিতেছি না, বরং আমরা কতকটা নিরাশই হইয়াছি।

বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ অনুমান কোনক্রমেই অসঙ্গত নহে যে, ভারত সরকার ভারতবাসীকে শ্রমশিল্পের পথে নিশ্চিত ভাবে পরিচালিত করিবার অনুকূলে কোন পরিকল্পনাই করেন নাই। সেরূপ কিছু করা হইলে নিশ্চিতই তাহা জানিতে পারা যাইত। বৃটিশ সরকার এ-কাল পর্য্যন্ত ভারতে যে শিল্প-বাণিজ্যনীতি পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে সাধারণের মনে এই সন্দেহই ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে যে, অনুকূল অবস্থা পাইলেও ভারত সরকার এ দেশে শ্রমশিল্প সুপ্রতিষ্ঠ করিবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন; বরং তাঁহারা ভারতবর্ষকে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে বা শিল্পজ পণ্যের উৎপত্তি-ক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য আগ্রহবান। তাঁহারা গ্রেটবৃটেনকে ধরিত্রীর কর্ম্মশালায় পরিণত করিতে চাহেন। সে জন্য তাঁহারা কাঁচা-মাল যোগাইবার উপযোগী বিপুল ক্ষেত্র স্বকীয় আয়ত্তের মধ্যে রাখা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করেন। স্বদেশকে বিশাল কামারশালা বা কারখানায় পরিণত করিতে হইলে ঐরূপ কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য্য, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্য বৃটিশ-পতাকা সর্ব্বত্র বৃটিশ-বাণিজ্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, বৃটিশ সরকার ভারতের বিস্তীর্ণ বনভূমির বিলোপসাধন করিয়া কৃষিক্ষেত্রের পত্তন করিয়াছেন। ভারতে যাহাতে বাণিজ্য-পণ্যের উৎপাদন অধিক হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন,—এবং বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য সকল প্রদেশেই সেচেরও সুব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ভারত হইতে কাঁচা-মাল রপ্তানী, এবং বৃটেন হইতে ভারতে শ্রমশিল্প আমদানীর সুব্যবস্থা করিতে গিয়া ৭ শত কোটি টাকা ব্যয়ে যে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কাজ চালাইবার জন্য একটি বোল্ট (bolt) বা নাট (nut) পর্য্যন্ত এ দেশে প্রস্তুত করিবার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই! অথচ বৃটিশ সরকার যে পূর্ব্বে কৃষির উন্নতিসাধন-কল্পেও অসাধারণ কিছু করিয়াছেন, সে কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। তবে অন্যান্য শ্রমশিল্প সম্বন্ধে তাঁহারা যতখানি ঔদাসীন্য প্রকটিত করিয়াছেন, কৃষি সম্বন্ধে ততখানি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই—এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতে টাটায় লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত থাকায় বিগত যুদ্ধের সময় রেলপথের জন্য অত্যাবশ্যক বিবিধ লৌহ-উপকরণ প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছিল; কিন্তু সকলেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইলে তাঁহারা ভারতীয় লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না! অথচ আমাদের স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহিত ও পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য কংগ্রেস সরকারকে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ১০ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত অনুরোধ করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে ফল বিশেষ কিছু হইয়াছিল বলিয়া দেশের লোক জানিতে পারিয়াছে কি?

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবেই য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। সকলেই জানেন, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সেই যুদ্ধের অবসান হয় নাই। সেই যুদ্ধে শিল্প-সম্পদহীন এবং কৃষিমাত্র সম্বল ভারতবাসী বৃটিশ জাতিকে যেরূপ সাহায্যদান ও উপকৃত করিয়াছিল, তাহা ইংরেজ জাতির অজ্ঞাত ছিল না। সেই যুদ্ধের সময়ে ভারতের পক্ষে শ্রমশিল্প-গঠনের শুভযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেই কংগ্রেস বৃটিশ সরকারকে সেই সুযোগে ভারতের শ্রম-শিল্প সংগঠনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

তাহার পর-বৎসর ভারত সরকারের প্রতিকূল নীতির ফলে ভারতের শ্রমশিল্প সংগঠনের পথে যে সকল বাধা উপস্থাপিত হইয়াছিল, কংগ্রেসকে সে দিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। যথা, সরকারের প্রতিকূল রাজস্ব-নীতি, মুদ্রা-নীতি, রেলওয়ের ভাড়ার হার প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যবস্থার জন্ম কংগ্রেসকে প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। সরকার এই সময় সাময়িক প্রয়োজনে ভারতে শ্রমশিল্প-সম্পর্কিত ব্যাপারের অনুসন্ধানকল্পে এক 'রয়াল কমিশন' সংগঠন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সরকার কমিশনের বিচার্য্য বিষয়ের তালিকায় সরকারী রাজস্বনীতি-সম্পর্কিত বিষয়টি বাদ দিতে বিস্মৃত হন নাই!

যাহা হউক, সরকারের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প উন্নতিপথে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা হইয়াছিল, ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের প্রসারে লাঙ্কাসায়ারের বস্ত্র-শিল্পের সঙ্কোচ সাধিত হইতে পারে; ভারতীয় কার্পাস-কলগুলি অধিকাংশই ভারতীয় মূলধনে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার লভ্যাংশ ভারতবাসীরই প্রাপ্য, লাঙ্কাসায়ারের তাঁতিরা ইহা যে সুনজরে দেখিবে, ইহা কেহই আশা করিতে পারেন নাই। সেই জন্য যুদ্ধবাবদ ব্যয়বৃদ্ধির অজুহাতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সরকার অন্য সকল পণ্যের আমদানী শুল্কের হার শতকরা সাড়ে ৫ টাকা হইতে সাড়ে ৭ টাকায় চড়াইয়া দিলেও কার্পাস-পণ্যের আমদানী-শুল্কের হার সেই সাবেক সাড়ে ৫ টাকাই রাখা হইল। সার উইলিয়ম মেয়ার সে সময় বলেন যে, সাম্রাজ্যের এই দুর্দ্দিনে ইহাতে আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না। অগত্যা ভারতবাসীরা এই অসঙ্গত প্রস্তাবে আপত্তি না করিয়া সুবোধ বালকের ন্যায় মুখ বুজিয়া রহিল। তাহার পর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার ভারতের পক্ষ হইতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড বা প্রায় দেড় শত কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেন। সেই ঋণের সুদ প্রভৃতি পৌনঃপুনিক খরচ মিটাইতে আর এক দফা করবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল। তখন ভারত সরকার আমদানী বস্ত্রের উপর ধার্য্য আমদানী-শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া সাড়ে সাত টাকা হারে ধার্য্য করিলেন। ভারতবাসীর পক্ষ হইতে তখন বলা হইয়াছিল, তাহারা ঐ দেড় শত কোটি টাকা প্রদান করিতে রাজী আছে, কিন্তু তাহাদের প্রধান দাবী এই যে, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপর যে স্বদেশী শুল্ক নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অপরিবর্ত্তিত রাখিতে হইবে। লাঙ্কাসায়ারের তাঁতির দল এই দাবীর কথা শুনিয়া বিষম কোলাহল আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু সেই সময়ের ভারত-সচিব মিষ্টার নেভিল চেম্বারলেন বিলাতী তাঁতিদের আবদারে কোনক্রমেই সম্মতি দান করেন নাই। লাঙ্কাসায়ারের তাঁতিরা তখন—বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেই দারুণ দুর্দ্দিনে আইরিশ জাতীয় দলের সাহায্যে বৃটিশ সরকারকে বিপর্য্যস্ত করিবার সঙ্কল্প করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নাই! কেবল অ্যাস্‌কুইথের উদারনীতিক দলের ভোটের জোরেই সে-বার বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিতাড়িত হইতে হয় নাই, তাঁহারা স্বপদস্থ থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এক শ্রেণীর ইংরেজ ভারতবাসীর শিল্পোন্নতি প্রচেষ্টার কিরূপ প্রতিকূল, এই ঘটনাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাহার উপর ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যে সময়ে ভারতে কোন শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটে, সেই সময়েই কতকগুলি পুঁজিওয়ালা য়ুরোপীয় মহাজন ভারতে আসিয়া শ্রম-শিল্পের কারখানা খুলিয়া বসে। তাহাদের মূলধন এবং অভিজ্ঞতার প্রতিযোগিতায় ভারতের অনভিজ্ঞ, দরিদ্র কারখানাওয়ালাদিগকে অকৃতকার্য্য হইতে হয়। তাহারা হাতে-হেতেরে প্রতিপন্ন করে—"তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া!"

এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। বৃটেনে ভারতীয় শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠার বিরোধী লোক অনেক আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৃটিশ সরকার এবং ভারত সরকার উভয়ের কেহই ভারতবাসীকে শ্রমশিল্প গঠনের পথে অগ্রসর হইতে দিতে এ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করেন নাই। এবার আবার এই যুদ্ধ উপলক্ষে ভারতের পক্ষে শ্রমশিল্প সংগঠনের সুযোগ উপস্থিত; কিন্তু সুযোগের সহিত অসুবিধাও যথেষ্ট আছে। সে দিন পণ্ডিত শ্রীযুত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ভারত সরকার অবিলম্বে ভারতে বিমান প্রস্তুতের একটি কারখানা, এবং মোটর-গাড়ী প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করুন। এ প্রস্তাবটি সকলেরই অনুমোদন লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সরকারী সরবরাহ-বিভাগের ডিরেক্টার-জেনারেল যে সুর ধরিয়াছিলেন, এবং ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব যে ভাবে তাঁহার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন, তাহা ঐ কার্য্যে সরকারের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়া কেহই মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ধুয়া এই যে, ঐ কাজ করিবার পথ যথেষ্ট বিঘ্নসঙ্কুল; এই হেতু সরকার এ বিষয়ে বিশেষ কোন সিদ্ধান্তই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহাতে দেশবাসীর উৎসাহের শিখা দপ্‌ করিয়া নিবিয়া গেল; কিন্তু বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো যেন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ধরণে ভারতবাসীকে আশ্বাস দিয়া বলেন, ভারতে শ্রমশিল্পের বিকাশসাধনের জন্য যাহা করা সম্ভব, তাহা সাধ্যানুসারেই করা হইতেছে।—কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কোন কর্ম্ম-পদ্ধতির নির্দ্দেশ দান করেন নাই। এখন কি আর ফাঁকা কথায় চিঁড়া ভিজান সম্ভব হইবে? অথচ যুদ্ধের জন্য সামরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার উৎপাদনের উপায় নির্দ্ধারণ করাই প্রাচ্য-পুঞ্জ পরিষদের মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু এই উপলক্ষে ভারতে খাঁটি স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, ইহা ভারতবাসীমাত্রেরই ধারণা হইয়াছিল। শেষে তাহা হইল কি? বরং এই সুযোগে বৃটিশ এবং অন্যান্য বিদেশী পুঁজিওয়ালারা ভারতে আসিয়া কল-কারখানা স্থাপনের সুযোগ লাভ করিতে পারে, এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে,—'ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের' দিল্লীস্থ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাই এত আশায় উৎফুল্ল হইবার পর এখন মনে হইতেছে, আমাদের আশা কোথায়?

ভারতে কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠার আশার কথা অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে ভারতে কতকগুলি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বিদেশ হইতে এখন সেই সকল পণ্যের আমদানী তত অধিক হইতেছে না। এখন এ দেশে সেই সকল পণ্য প্রস্তুত করা সম্ভব হইতে পারে। তবে উহা কার্য্যে পরিণত করিবার পথে কতকগুলি অসুবিধাও ঘটিয়াছে। য়ুরোপের বহু রাজ্য জার্ম্মাণীর নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় তথা হইতে অনেক মাল এ দেশে আমদানী হইতেছে না,—ইহাই একটা বিশেষ সুবিধা। আবার ঐ সকল পণ্য প্রস্তুত করিতে

হইলে বিদেশ হইতে উহার কতকগুলি উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়; এ দেশে উহা পাওয়া যায় না। সেগুলি পাইবারও বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে। শেষোক্ত অসুবিধার জন্যও গত ১৫ মাস মধ্যে ভারতীয় শ্রমশিল্প বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন, যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত অধিক হারে করধার্য্য হওয়াতে এবং মূলধনের অভাব ঘটাতেও অসুবিধা কম হইতেছে না। আর একটি কারণ, কতকগুলি বিশেষ শ্রমশিল্পের জন্য সেই সকল শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরও অভাব। ফলতঃ, এবার বহুবিধ কারণেই বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় ভারতীয় শ্রমশিল্পের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কষ্টিক সোডা, সোডা অ্যাস্, উৎকৃষ্ট লোহার চাদর প্রভৃতি। এইবারকার এই যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে,—বিশেষতঃ, গ্রেট বৃটেন, সুইডেন, জার্ম্মাণী, বেলজিয়াম, ইটালী, প্রভৃতি দেশ হইতে ১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের কলাইকরা বাসন এ দেশে আমদানী হইত। এখন উহার অধিকাংশ দেশই জার্ম্মাণীর করকবলিত; কাজেই ভারতে ঐ সকল দেশ হইতে কলাই-করা বাসন আসিতেছে না। কিন্তু ভারতে কলাইকরা বাসনের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শিল্প এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বৈদেশিক প্রতিযোগিতার জন্য ইহা বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এখন বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে বটে,—কিন্তু ভারতে ইহা প্রস্তুত করিবার বহু মাল-মসলারও অভাব আছে। ইহা প্রস্তুত করিবার জন্য যে ইস্পাতের চাদরের একান্ত প্রয়োজন, তাহা বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। এই ধরণের ইস্পাতের চাদর এ দেশে প্রস্তুত হয় না কেন, তাহা কে বলিবে? সম্ভবতঃ, উহা প্রস্তুতের ব্যয় অনেক অধিক। তাহা হইলেও উহা এ দেশে টাটা কোম্পানী প্রভৃতির কারখানায় প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইহা ভিন্ন অন্যান্য কতকগুলি মাল-মসলাও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। অধিকন্তু, কলাইকরা বাসন প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি রাসায়নিক উপকরণের প্রয়োজন; তাহাও এ দেশে মিলে না। প্রতি বৎসর দেড় কোটি টাকার কাচ-নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্য এ দেশে আমদানী হয়। তন্মধ্যে কেবল বাঙ্গালাতেই ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ঐ দ্রব্য আমদানী হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে সোডা অ্যাসের প্রয়োজন। উহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কাজেই বর্ত্তমান সময়ে ভারতে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতিসাধন এবং প্রসারসাধন করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ঐরূপ রবারের কাজে এবং অন্যান্য কতকগুলি জিনিষ প্রস্তুত করিবার উপকরণের অভাব অনুভূত হইতেছে। ঐ সকল প্রয়োজনীয় বস্তু এ দেশে উৎপন্ন করিবার জন্য শীঘ্রই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এজন্য চেষ্টা করিতে হইলে সরকারের সাহায্যপ্রাপ্তির প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, সরকার এই সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। সরকারের এই প্রকার উপেক্ষায় এ দেশের লোক অসন্তুষ্ট। অনেকের ধারণা, সরকার এ দেশে জাতীয়-শিল্প বা স্বদেশী-শিল্প গঠন করিতে অসম্মত।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এ দেশের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে যথাযোগ্যরূপে শ্রমশিল্প গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। যদি অধীন বা সহযোগী দেশের অধিবাসীদিগকে সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিনে ধন-জন দিয়া সাহায্য করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দেশকে সেইরূপ সাহায্য করিবার উপযোগী করিয়া গঠিত করা আবশ্যক। দরিদ্র কখনও বর্ত্তমান সময়ের বিপদে যথাযোগ্য অর্থ সাহায্য করিতে পারে না। নিতান্ত জোর করিয়া বা স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া দরিদ্রদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিলে তাহার পরিণাম কল্যাণপ্রদ হয় না; দেশের ভিতর একটা দুরন্ত অসন্তোষ জন্মে। সেই জন্য দেশের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেশে শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যুদ্ধ মিটিবার পর আর এরূপ সুবিধা পাওয়া যাইবে না। কারণ, তখন নানা দেশ হইতে ভারতে ভূরিপরিমাণে শ্রমশিল্পজাত পণ্যের আমদানী হইতে থাকিবে। তখন শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠার বা উহার উন্নতিসাধন এখন অপেক্ষা বিশেষ কষ্টকর হইবে; সেই জন্য এই দিকে দেশবাসীর অধিক অবহিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের শঙ্কা হইতেছে, এই যুদ্ধ শেষ হইলে আবার কতকগুলি বৃটিশ ঔপনিবেশিক এ দেশে কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের সার শোষণ করিতে পারে। তখন প্রকৃত স্বদেশী কারবার প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

আবছায়া

কল্পনা স্রোতে হাজার হাজার ফুল
নিত্য ভাসিয়া যায়
স্বপন বিলাসে নর্ম্ম-লীলায় তারা
কত কি কহিতে চায়।
কান পাতি যবে ব্যাকুল বাসনা লয়ে’
চির মৌনতা রাজে,—
লাল হ’য়ে যায় প্রাণের বলাকা মোর
আশাহতদের লাজে।

এলায়ে দেহটি অলস ঘুমেতে যবে
মায়ার সমাধি-তলে
সিন্ধু-শকুন ক্ষুধিত সাগর-বুকে
ভাসে দেখি দলে দলে;
দুঃসাহসেতে তাদেরে ধরিতে যাই
কুয়াশা ঘনায়ে আসে
বিরহ-বিধুরা ক্রুর নাগিনীর হায়,
অকরুণ নিশ্বাসে।

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ।

বহির্বাণিজ্যের বিপর্য্যয়

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের উভয় শাখার যুগ্ম অধিবেশনে (৪ঠা অগ্রহায়ণ) মহামান্য বড়লাট বাহাদুর তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক-পরিস্থিতি-সংক্রান্ত অভিভাষণে য়ুরোপের যুদ্ধের ফলে, আমাদের বহির্বাণিজ্যের যে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ এবং তৎপ্রতিকারকল্পে যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক অভিভাষণে বাণিজ্য-নীতির বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে, সুতরাং এই উল্লেখ ও ইঙ্গিত অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

য়ুরোপে যুদ্ধের ফলে ভারতের পক্ষে য়ুরোপের বাজার বন্ধ হইয়া যে জটিল ও কুটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, আমরা এখানে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

এক বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধের যে পরিস্থিতি ছিল, এখন তাহা নাই। সঙ্গে সঙ্গে, যুদ্ধারম্ভে শিল্প-বাণিজ্যের যে পরিস্থিতি ছিল, এখন তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখন যাহা প্রত্যাশা ছিল, এখন তাহা নিরাশায় বিলীন হইয়াছে। নিত্য-ব্যবহার্য্য অপরিহার্য্য দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যের আশঙ্কায় গৃহস্থ যেমন সন্ত্রস্ত হইয়াছিল, ব্যবসায়িমাত্রেই তেমনি পণ্যের উচ্চ মূল্যের সুখস্বপ্নে উৎফুল্ল হইয়াছিল। একের আতঙ্ক এবং অন্যের আকাঙ্ক্ষা উভয়ই অমূলক হইয়াছে।

বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের গতি প্রকৃতি যেমন বিগত মহাযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, বর্ত্তমান বিপ্লবের ফলাফলও তেমনি বিগত মহাযুদ্ধের ফলাফল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে। বিগত মহাযুদ্ধে ভারত নামে-মাত্র যুদ্ধমান্ দেশ ছিল, এবং মিত্রশক্তি-সমূহকে যথাসম্ভব যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়া বহু শিল্পের উদ্ধার ও উন্নতি সাধনপূর্ব্বক আর্থিক অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল। এবারেও ভারত সে সুযোগ হারায় নাই; কিন্তু গতবারে লাভের অঙ্কই অধিক ছিল। এবারে আয়ের সহিত ব্যয়ের অঙ্কের বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এবারে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভারতকে অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম এবং যুদ্ধোপকরণের ক্রমবর্দ্ধমান বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে। সুতরাং গতবারের তুলনায় আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

মূল্য-শাসনের আর প্রয়োজন নাই। কৃষিজাত দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য, নদীতে বান-বৃদ্ধির ন্যায় শিল্পসমূহের আকস্মিক অত্যুন্নতি এবং যুদ্ধসম্ভার সরবরাহ করিয়া অতিরিক্ত লাভের সুখস্বপ্ন একে একে দূরীভূত হইয়াছে। সমুদ্রপথে জাহাজ-চলাচলের দারুণ বাধা-বিপত্তিহেতু বহির্বাণিজ্যের আগম-নিগম নিরুদ্ধ হইয়াছে। ফলে দ্রব্যমূল্য যুদ্ধের প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধমুখীন হইয়া নিম্নগামী হইয়াছে। মজুত মালের পরিমাণ দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কোম্পানীর কাগজ এবং যৌথ-প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয়-বিক্রয়-বাট (Stock Exchange) বিকল হইয়াছে। বর্ত্তমানের ক্ষিপ্র রূপান্তর এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিস্তরে অবসাদের সঞ্চার করিয়া, অবসন্নতার সৃষ্টি করিয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্যের পরিকল্পনাকে জাতীয়তার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টাই এখন একমাত্র আত্মরক্ষার উপায়। কিন্তু সে পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের পরিচালক নহি, আমরা শিল্প-বাণিজ্য পরিকল্পনার স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত। আমাদের গতি-পথ অন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন; আমাদের স্বাতন্ত্র্য পরাধীনতার কঠিন নিগড়ে শৃঙ্খলিত—রুদ্ধবীর্য্য। জাতীয় শাসন-শক্তি, আজ যে পন্থার অনুসরণ করিলে বর্ত্তমানের বিপর্য্যয় ও ভবিষ্যতের বিভীষিকা বিদূরিত করিতে পারিত,—নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্র সে পথে পদ-সঞ্চালন করিতে বিমুখ; যে স্বাধীনতা থাকিলে আমরা আমাদের শিল্প-বাণিজ্যকে জাতীয় অভ্যুত্থানের অনুকূল করিয়া, কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্যবিধান-পূর্ব্বক, মিত্রশক্তিকে প্রভূত সাহায্য করিতে পারিতাম—সে স্বায়ত্ত-শাসনের আমরা অধিকারী নহি।

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিলে, প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আমাদের রপ্তানী-ব্যবসায়ের বিপর্য্যয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভারতের প্রাথমিক উৎপাদকদিগের ভাগ্য এই রপ্তানী ব্যবসায়ের সহিত নিবিড় ভাবে বিজড়িত। য়ুরোপে জার্ম্মাণী ও ইতালীর প্রবল অত্যাচার-অনাচারে ঐ মহাদেশের প্রায় সকল প্রধান প্রধান বিপণি ভারতের পক্ষে রুদ্ধ হইয়াছে। ইহা আজ সকলেরই বিদিত যে, য়ুরোপের বাজার সমূহ বন্ধ হওয়ার ফলে আমাদের ত্রিশ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে; অর্থাৎ ত্রিশ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমরা বিদেশে পাঠাইতে পারি নাই। স্বদেশে এই পণ্যের কাট্তির সুযোগ নাই। সুতরাং চাহিদার অতিরিক্ত মাল বাজারে মজুত। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল, দ্রব্যমূল্যের অযথা হ্রাস।

বহির্বাণিজ্যের এই সঙ্কোচন যে কেবল মূল্য হিসাবে অনিষ্টপ্রদ, তাহা নহে; উদ্বৃত্ত পণ্য হিসাবে, ক্ষতি আরও গুরুতর। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের তুলনায় মূল্যবৃদ্ধি আমলে আনিলেও স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, আমাদের বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি হ্রাস-মূল্যের নিদর্শন অপেক্ষা বহুল পরিমাণে গুরুতর। যত দিন যুদ্ধ চলিবে, তত দিন অবরুদ্ধ বাজারের কিঞ্চিৎ অংশের উদ্ধারসাধনও সম্ভব নহে। যুদ্ধাবসানেও তাহার সম্যক্ উদ্ধার অসম্ভব। কারণ, গতযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, যে-কোনও দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যাপক যুদ্ধের পরে সর্ব্বপ্রকার বাজারের গতি-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। আমদানীর আকর এবং রপ্তানীর ক্ষেত্র ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সকল দেশ কোন বিদেশী পণ্যের মুখাপেক্ষী থাকে, যুদ্ধের পরে তাহারা সেই পণ্যে আত্মনির্ভরশীল হয়; অথবা নূতন আমদানী-আকরের (Source of imports) সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। সুতরাং যুদ্ধের সময় রপ্তানিকারী দেশসমূহে যে উদ্বৃত্ত-পণ্য জমিয়া যায়, যুদ্ধের অবসানেও আর তাহার উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়া যায় না।

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। আমাদের রপ্তানী ব্যবসায় প্রধানতঃ কৃষিজ পণ্যে নিবদ্ধ। য়ুরোপের শিল্পপ্রধান দেশসমূহ আমাদের

দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল ক্রয় করে। অন্যত্র সে সকল মালের ক্রেতা বিরল। আমাদের দেশেও ঐ সকল মালের সম্যক্ কাটতির আশা নাই। কারণ, ঐ সকল কাঁচা মালকে পাকা মালে, অর্থাৎ পরিণত পণ্যে (Finished or manufactured goods) পরিবর্ত্তিত করা বর্ত্তমানে আমাদের সাধ্যাতীত। সুতরাং এই সকল বাজার হইতে বঞ্চিত হইয়া, আমাদের যে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ হওয়া অসম্ভব। এই ক্ষতির ফলে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এবং তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের ক্ষমতাও হ্রাস পাইয়াছে।

এই ক্ষতি পূরণ করিতে হইলে, আমাদিগকে সাম্রাজ্যান্তর্গত এবং য়ুরোপের বহির্ভূত, দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপন এবং সংবর্দ্ধন করিতে হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের দেশের মধ্যেও নূতন-নূতন শিল্পের সৃষ্টি এবং চলতি শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন; নতুবা যুদ্ধমান-জাতি পরিত্যক্ত আমাদের উদ্বৃত্ত কাঁচা-মালের সদ্গতি হওয়া অসম্ভব।

এই সূত্রে প্রভূত ক্রয়শক্তিসম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রের কথা স্বতঃই মনে হয়। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্রের চৈতন্ত উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার কিছু দিন পূর্ব্বে বাণিজ্য-বার্ত্তা বিভাগের পরিচালক ডাক্তার মীক্ এবং ভারত সরকারের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টা ডাক্তার গ্রেগরীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন—সেখানকার বাজারের আবহাওয়া এবং গতি-প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া, কিরূপে ভারতের সহিত ঐ বিশাল দেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক অধিকতর ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণেই এই চেষ্টা প্রযুক্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তার গ্রেগরী ফিরিয়া আসিয়াছেন সাম্রাজ্যান্তর্গত প্রাচ্য-দেশসমূহের (Eastern Group Conference) দিল্লী বৈঠকে যোগদান করিবার নিমিত্ত। তাঁহাদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের উদ্দেশ্য কতটুকু সার্থক হইয়াছে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পণ্য অধিকতর পরিমাণে লইবার কোন অথবা কতটুকু আশা দিয়াছেন, তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই। সংবাদপত্রের বিবরণাদি হইতে যতটুকু অনুমান করা যায়, তাহাতে আশান্বিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। ডাঃ গ্রেগরীর রিপোর্ট ভারত সরকারের বিবেচনাধীন।

বর্ত্তমান ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে এই অর্থ নৈতিক অভিযানের বিশেষ প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থায় অভিজ্ঞ কোন শিল্পাশ্রয়ী অথবা ব্যবসায়ীর এবং ভারতের বণিক সম্প্রদায়ের সহিত অগ্রে পরামর্শ না করিয়া এই অভিযান. প্রেরণের উপযোগিতা স্বীকার করা যায় না। সেরূপ করিলেও এই উদ্যম যে সাফল্যমণ্ডিত হইত, তাহাও বলা যায় না। কারণ, ভারতের ন্যায় আর্জে্ণ্টাইন্ এ ব্রেজিলও কৃষিপ্রধান দেশ। তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট-প্রতিবেশী, এবং চলতি মুদ্রার সুবিধাও তাহাদের সহিত প্রচুর; তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধ যতটুকু দৃঢ় ও বিস্তৃত করিতে পারা যায়, ততটুকুই আমাদের লাভ।

আমাদের নিকট-প্রতিবেশী জাপানের সহিত বাণিজ্য-বিস্তারের সুযোগ ও সুবিধা ছিল প্রচুর। কিন্তু বর্ত্তমানে জাপানে রপ্তানী বাণিজ্যের ব্যাপ্তির পরিসর বহুল পরিমাণে খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। জাপানের সহিত রপ্তানী-বাণিজ্য বিস্তারেরও এখন কিছু বিপদ আছে। এমন কোন পণ্য এখন প্রচুর পরিমাণে জাপানে পাঠান যায় না, যাহা জাপান হইতে পুনঃপ্রেরিত হইয়া যুদ্ধমান্ শত্রুপক্ষের হস্তগত হইতে পারে। এ বিপদ সমস্ত যুদ্ধ-নির্লিপ্ত দেশের সহিত বহির্বাণিজ্যে বিদ্যমান; পক্ষান্তরে, বহু দিন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে চীনের সহিত লিপ্ত থাকিয়া, জাপানের অর্থ-নৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। জাপান এখন পূর্ব্বের ন্যায় আমদানী পণ্যের মূল্য যোগাইতে পারিতেছে না।

আমাদের বহির্বাণিজ্য প্রসারের একমাত্র ক্ষেত্র এখন সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহ। যুদ্ধ পরিচালন-সৌকর্য্যের নিমিত্ত সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও সম্পর্ক এখন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। এই সৌহার্দ্দ্যের ফলে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের সহিত বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়া য়ুরোপের বাজার-বঞ্চনা-ঘটিত ক্ষতির কিছু পূরণ হইতে পারে। গত কয়েক মাসের বহির্বাণিজ্যের গতি লক্ষ্য করিলে এই সুযোগের সত্যতা ও সম্ভাবনা সহজেই উপলব্ধি হয়। এ কথাও এ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, যুধ্যমান্ শত্রুপক্ষীয় দেশসমূহের মধ্যে সম্প্রীতি ক্রমশঃ এরূপ দৃঢ় হইতেছে যে, যুদ্ধের অবসানে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি সংস্থাপিত হইলেও, ভারতের সহিত ঐ সকল দেশের বাণিজ্য পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ হইবে না।

চিন্তার বিষয়, ভারত সরকারের লক্ষ্য এই অবশ্যম্ভাবী পরিস্থিতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও দৃঢ়নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। যুদ্ধ-পরিচালনা পরিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার এরূপ ব্যাপৃত ও ব্যস্ত যে, এ-দিকে ঐকান্তিক মনোযোগ দেওয়াও তাঁহাদের পক্ষে এখন সম্ভবপর নহে। কিন্তু এ-দিকে অবস্থা ক্রমে হীন হইতে হীনতর হইতেছে, এবং সুযোগ ফুরাইলে তাহাকে পুনরায়ত্ত করা দুরূহ। এখনও একটি বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপক পরিকল্পনা বিরচিত হইলে ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা সুগম হইত। বলা বাহুল্য, ভারতের শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধি আমাদের দেশের পক্ষে যেমন উপকারী, বৃটেনের পক্ষেও তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সুতরাং যত অধিক পরিমাণে আমরা অনধিকৃত ও অনাবিষ্কৃত বাজারের দখল পাই, ততই মঙ্গল। কিন্তু তাহার নিমিত্ত যুক্তিপরিকল্পিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এইরূপ প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিতেও কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘ নয়টি মাস সময় লাগিয়াছিল!

এই শুভ উদ্দেশ্যে রপ্তানী-পরামর্শদাতা-পরিষদ (Export Advisory Council) গঠন, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা-বিস্তার সংকল্পে দূত প্রেরণ এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের বাণিজ্য-তত্ত্বিরকারক আমীন (Trade Commissioner) নিয়োগ অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু এই সকল শুভ অনুষ্ঠান যতক্ষণ কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ না হইতেছে, ততক্ষণ বিশেষ আশান্বিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না; সুখের বিষয়, রপ্তানী-পরামর্শ-দাতা-পরিষদের গত অধিবেশনে ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নতিবিধান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওলন্দাজ-অধিকৃত পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যান্য দেশে বাণিজ্য-তত্ত্বিরকারক আমীন-নিয়োগ এবং অষ্ট্রেলিয়ার সহিত একটি বাণিজ্য-চুক্তিবিষয়ক প্রশ্নাবলীর আলোচনা হইয়াছিল। এই সকল বিষয়ে সত্বর সুবন্দোবস্ত হইলে অচিরে সুফলের আশা করা যায়।

বহির্বাণিজ্যের আশু প্রসার-প্রয়াস ব্যতীত আমাদের কল্যাণ

নাই। যুদ্ধ-পরিস্থিতির ফলে রপ্তানী ব্যবসায়ে যে সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়াছে, তাহাতে কৃষিজ পণ্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। কৃষিজ পণ্যের রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে প্রাথমিক উৎপাদকদের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হইয়াছে; এবং যে পরিমাণে তাহাদের অর্থাগম কমিয়া গিয়াছে, সেই পরিমাণে তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে। বহির্বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ হওয়াতে পাটের দর অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, এবং চাষীদের অর্থাভাব ঘটিয়াছে। ফলে, তাহাদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতেছে। যে পরিমাণে মোট রপ্তানী কমিয়াছে, সেই পরিমাণে আমাদের দেশ দরিদ্র হইয়াছে। সুতরাং দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ রায়তদের সম্মুখে নিদারুণ অর্থ-কষ্ট এবং অভাব-অনাটন সমুপস্থিত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও বঙ্গীয় সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন; কিন্তু প্রতিকার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রথম উচ্ছ্বাসে সকলেই আশান্বিত হইয়াছিল যে, গত মহাযুদ্ধের সময়ে যেমন পণ্যের স্থায়ী মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতিপুঞ্জের আর্থিক স্বচ্ছলতা ঘটিয়াছিল, এবারেও তেমনটিই ঘটিবে, এবং সর্ব্বসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতার সহচররূপে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারও বর্দ্ধিত হইবে; আমাদের ক্রয়-শক্তিও অন্যান্য দেশের সাধারণ লোকের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। এক বৎসরের মধ্যেই সে আশা স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হইয়াছে। দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। দেশের লোকের অর্থ-কৃচ্ছ্রতা ঘটিয়াছে, ক্রয়শক্তি বহুল পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে, সুতরাং শিল্প-সম্প্রসারণের পথও রুদ্ধ হইয়াছে। বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং অতি প্রয়োজনীয় অথচ এ দেশে দুষ্প্রাপ্য কাঁচা-মাল আমদানীর অভাবে শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি অসম্ভব হইয়াছে। ফলে, ভবিষ্যৎ ভবিতব্যতার অনিশ্চয়তাহেতু অধুনা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মূলধনের মালিকগণের এখন "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা। শিল্প-সমুন্নয়নকল্পে সরকারের কোন সর্ব্বতোমুখী আশু কার্য্যকরী পরিকল্পনার অভাবে যুদ্ধ-শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের প্রসার ও অগ্রগতি প্রতিহত। অগ্রগতি প্রতিহত হইলে অবসাদ ও অবনতি অবশ্যম্ভাবী। কোন প্রকারে প্রচলিত শিল্প সমূহের অধোগতি রুদ্ধ করিয়া সাম্যাবস্থা সংরক্ষণহেতু সকল প্রযত্নই প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু শিল্পের আশুপ্রসার এবং প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বহির্বাণিজ্য বিপর্য্যয় হেতু উদ্বৃত্ত পণ্যের সদ্গতি সম্ভব নহে।

সুখের বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি একটি আমদানী-রপ্তানী সংগঠনের (Export Import Syndicate) পরিকল্পনা পরিপুষ্ট করিতেছেন। সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতর সংযোগ সংস্থাপন দ্বারা য়ুরোপের বাজার-বঞ্চিত ভারতীয় উদ্বৃত্ত কাঁচা-মালের যথাসম্ভব কাটতি-ব্যবস্থা এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য অথচ শিল্প-পরিচালন হেতু অত্যাবশ্যক, যে সকল মাল আমরা পূর্ব্বে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে আনিতাম, সেই সকল দ্রব্যসমূহের যতগুলি যে পরিমাণে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ হইতে আনয়ন করা সম্ভব, তাহার ব্যবস্থাও এই সংগঠন করিবেন। উৎপাদন হ্রাস করিয়া বাজার হইতে কিছু উদ্বৃত্ত মাল আটক রাখিয়া, এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া প্রধান প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যমানকে যুক্তিসঙ্গত ঊর্দ্ধে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা প্রযত্নপুরঃসর প্রবর্ত্তিত হইবে।

কিন্তু এ সকল সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। দেশের স্থায়ী কল্যাণ হেতু উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পের প্রসার এবং বহির্বাণিজ্যের বিস্তার প্রয়োজন। যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধের ফলাফল যেরূপ ঘটিবে, তাহারই উপর সে প্রচেষ্টা নির্ভর করিবে। স্বাবলম্বন এবং আত্ম প্রাচুর্য্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ ভিত্তি নিহিত। সেই দূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় শিল্প-তদন্ত সমিতির (Indian Industrial Commission) বহু দিন-উপেক্ষিত সুপারিশগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। এখন হইতেই তাহার অনুশীলনের প্রয়োজন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শতাব্দী

শতাব্দী তব ক্রূর অভিযান থামাও এবে।
অথবা ধরার ক্ষীণ স্পন্দন বিলীন হবে।

অসীম আকাশ করিয়াছ গ্রাস মেটাতে ক্ষুধা,
নিঃশেষে পান ক'রেছ যতেক রূপ ও সুধা।
ইস্পাত আর লোহা পাথরের স্তূপের মাঝে—
সঘনে তোমার অগ্রগতির বিষাণ বাজে।

ষড়যন্ত্র ও হীন স্বার্থের লুব্ধ আঁখি,
বন্ধু-স্বজন, প্রতিবেশিদের দিতেছে ফাঁকি।
তটিনীর মৃদু কুলু-কুলু ধ্বনি, বায়ুর গীতি,
আলোর ঝর্ণা, উন্নত-শির বনস্পতি—

যন্ত্র-দানব হাসে খল-খল এদের বুকে।
প্রলয় নাচন নাচে সভ্যতা-পিশাচ সুখে,
এখনো কি তব মেটেনি পিপাসা সর্ব্বগ্রাসী,
নরমেধ সৃজি হাসিছ কি তাই অট্টহাসি ?

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)



[তৃতীয় খণ্ড]

১

শারদীয়া পঞ্চমী। সুনীল আকাশে শরতের সূর্য্য উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে; নব শস্যরাশি তাহার কিরণধারা-সম্পাতে কাঞ্চনাভা ধারণ করিয়া কনকপুর নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। বিশেষতঃ, কনকপুর আজ আবার অভিনব সাজে সুসজ্জিত। গত দুই বৎসর যথানিয়মেই সেখানে জগজ্জননীর পূজা সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু শেফালীর অনুপস্থিতিতে মিত্র-ভবনের শারদীয় উৎসবে প্রাণের স্পন্দন ছিল না। এবার সেই স্বদেশহিতৈষিণী বিদুষী মহিলার পুনরাগমনে উৎসবের আয়োজনে নবোৎসাহ লক্ষিত হইতেছে; গ্রামের সর্ব্বত্র নব প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। সন্তোষ ও তাহার স্ত্রী যেন আনন্দ-স্রোতে ভাসিতেছে, এবং শেফালীর সহযোগে প্রত্যেক আয়োজনের তত্ত্বাবধান করিতেছে। দরিদ্রগণকে বিতরণের জন্য যে গাঁটবন্দী ধুতি ও সাড়ী কলিকাতা হইতে আনীত হইয়াছে, সেগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে গুছাইয়া রাখা হইতেছে; কিন্তু কেবল বস্ত্র দান করিয়াই শেফালী পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে না, আরও কিছু চাই, তাই সে সন্তোষকে বলিল, "দাদা, তোমার খোকা হ'লে তার ভাতে গ্রামের প্রত্যেক গরীব-দুঃখীকে ভাত ও জল খাবার বাসন দান ক'রতে হবে। তাদের প্রত্যেকের ঘরে এই শুভ অনুষ্ঠানের এক-একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকা দরকার।"

সন্তোষ হাসিয়া বলিল, "আমার অত পয়সা কোথায় শেফালী?"

শেফালী গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি কি ব'লেছি, সে সব তোমাকেই দিতে হবে, দাদা! আমাদের বংশের দুলালের মঙ্গল-কামনায় আমি কি এইটুকু ভারও নিতে পারবো না? আমি দেব থালা, আর তুমি দেবে এক-একটা ঘটী;—তা দেখে গ্রামের সকলে আমোদ ক'রে সেই পুরাণো ছড়াটা ব'লবে—'আ-দেখ্‌লের ঘটী হ'ল, জল খেতে খেতে বাচ্ছা ম'ল'!"

সন্তোষ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "বাঃ, আবার ঘটীর কথা ব'লছিস্ কেন? এ যে তোর ভয়ঙ্কর আব্‌দার!"

ভাই-বোনের এই সকল সরস আলোচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ নায়েব আসিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "বড় বিপদ, দাদাবাবু!"

সন্তোষ নায়েবের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিপদ! ব্যাপার কি মহেশবাবু?"

মহেশবাবু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, "পুরুতঠাকুর গ্রামের ও নিকটস্থ গ্রামগুলির ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন; তিনি ফিরে-এসে ব'ললেন, এক জনও তাঁর নেমন্তন্ন নিলে না! কেবল তাই নয়, তারা পুরুতঠাকুরকে ভয় দেখিয়েছে, তিনি যদি এ-বাড়ীতে পুজো করেন, তবে তাঁকে একঘরে হ'য়ে থাক্‌তে হবে। তিনি কেবল যে সমাজেই রহিত হ'বেন, এমন নয়; তাঁর ধোপা-নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ হবে! শুন্‌ছি না কি, সেই ভয়ে কেউ এ-বাড়ীতে পুজো করতে আসবে না।"

সন্তোষ ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? আমাদের অপরাধটা কি—যে, এত কঠোর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হ'ল?

মহেশবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "সে কথা মুখে আনতেও লজ্জা হয়, দাদাবাবু! রণেনবাবুর ষড়যন্ত্রই এর কারণ। তাঁর মোড়লীতেই এই ষড়যন্ত্রটা গজিয়ে উঠেছে!"

সন্তোষ বলিল, "তা বুঝা গেছে, কিন্তু কারণটা কি, তাই জান্‌তে চাচ্ছি।"

মহেশবাবু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে,—কথাটা বড়ই—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

সন্তোষ ঈষৎ বিচলিত স্বরে বলিল, "তা বল্‌তে কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন? কি হ'য়েছে খুলে বলুন; তা শুনলে আমার মূর্চ্ছা হবে, আপনি এরূপ আশঙ্কা ক'রবেন না।"

মহেশবাবু নতমস্তকে বলিলেন, "প্রচার করা হ'য়েছে —দিদিমণি বিলেতে এক ইংরেজ ডাক্তারের সঙ্গে বাস ক'রছিলেন; পরে তাঁকে বিয়ে ক'রে তাঁরই সঙ্গে এ দেশে এসে আগ্রায় সংসার পেতেছেন। দিদিমণি না কি রীতি-মত মেম-সায়েব হ'য়েছেন। লোক-ভুলানোর মতলবে দিনকতকের জন্যে দেশে এসে সাড়ী প'রেছেন। সকলে না কি খবর পেয়েছে, আগ্রায় তাঁদের কুঠীতে বিস্তর পোষা মুরগী চ'রে বেড়াচ্ছে। রোজ দু'-বেলা দু'-জোড়া তাঁর সেবায় লাগে! কাঁটা-চামচে সব রূপোর!"

এই মিথ্যা অপবাদের কথা শুনিয়া সন্তোষ ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইল; কিন্তু বহু চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "আমার বাড়ীর পূজায় কাউকে—জনপ্রাণীকেও চাই-নে। মহেশবাবু, আপনি এখনই সকলকে জানিয়ে দিন—যিনি স্বেচ্ছায় আমার বাড়ীতে না আসবেন, তাঁকে আমরা চাই-নে; আর প্রজাদেরও এই মর্ম্মে সংবাদ দেবেন যে, তাদের যদি একঘরে হ'বার ভয় থাকে—তবে আমার বাড়ীতে তাদেরও আসবার দরকার নেই। তারা এ কথাও জেনে রাখুক যে, আমার তরফ থেকে তার জন্য তাদের কোনও রকমে উৎপীড়িত হ'বার আশঙ্কা নেই। আর আমাদের পুরুতঠাকুরকেও ব'লে দেবেন যে, তাঁকে আমি বিপন্ন করতে চাইনে; তাঁর যা' প্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে, তা পুরো-পূরিই তিনি পাবেন। সকলের বিরক্তিভাজন হ'য়ে এ বাড়ীতে তাঁর পূজা করতে আসবার দরকার নেই।"

মহেশবাবু উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, "তবে পূজা কি হবে না?"

সন্তোষ বলিল, "কেন হবে না? আমাদের কনকপুর ভিন্ন কি এ বাঙ্গালা মুলুকে পুরুত নেই? না, অন্য কোথাও দুর্গোৎসব হয় না? কলকাতা ত মগের মুলুকে নয়; কলকাতা থেকে পুরুত আনিয়ে পূজার ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না। কলকাতার কোন পুরোহিত পল্লী-গ্রামের মোড়লদের দ্বারা এক-ঘরে হ'বার আশঙ্কায় মহামায়ার পূজা বন্ধ ক'রে পলায়ন করবে না, এ কথা সকলে বিশ্বাস করতে পারে।"

মহেশবাবুকে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সন্তোষ আরও বলিল, "যান, আর দাঁড়িয়ে-থেকে সময় নষ্ট করবেন না; এখনি গিয়ে সকলকে বলে দিন—আমি কারও সাহায্য চাই-ও না, কাউকে ভয় ক'রবারও কারণ নেই। মোড়লদের প্রতিকূলতায় পূজা আমার বন্ধ হবে না; এ বাড়ীতে মহামায়ার পূজা পণ্ডও কেউ করতে পারবে না।"

মহেশবাবু বহুদর্শী প্রবীণ কর্ম্মচারী; জীবনে অনেক ঠেকিয়া, নানা অসুবিধা সহ্য করায় সমাজকে তিনি ভয় করিতেন। এই জন্য ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "সকলকে একেবারে ছেঁটে ফেলে-দেওয়া কি ভাল হবে? বরং ভাল-রকম সামাজিক দিয়ে সকলকে বশীভূত করাই সঙ্গত।"

সন্তোষ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা কিছুতেই হবে না। আমি ঘুষ দিয়ে কাউকে বশ করতে চাইনে; আর তা'তে তো মিথ্যা অপবাদটা মেনেই নেওয়া হবে।"

সন্তোষের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নায়েব মহাশয় কুণ্ঠিত ভাবে প্রস্থান করিলে শেফালী আরক্তিম মুখখানি তুলিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল, "আমি না হয় আজই রাত্তিরে এখান থেকে চলে যাই; তা' হ'লে এ সব সামাজিক গোলমাল হয় ত সহজেই মিটে যাবে।"

সন্তোষ অভিমানোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি তোমার মুখে এ কথা শুনব মনে করিনি, বোন্! তোমার এত সুশিক্ষা, মনের বল, ও সৎসাহস—তার পরিণাম কি এই? মিথ্যা অপবাদের ভয়ে মাথা হেঁট ক'রতে হবে—কতকগুলো হামবড়া মূর্খের পায়ের কাছে? এর চেয়ে বেশী বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হ'তে পারে?"

শেফালী বিনীত ভাবে বলিল, "দাদা, ওরা অবুঝ, অজ্ঞান, ওদের মন সঙ্কীর্ণ; তাই ব'লে রাগের মাথায় একটা-কিছু করা তোমার পক্ষে শোভা পাবে না। তুমি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখ—নায়েব মশায়ের প্রস্তাবটা সঙ্গত কি না।"

সন্তোষ দৃঢ় স্বরে বলিল, "আমি না ভেবে কোনও কথা বলিনি। আমার যা সঙ্কল্প, তাই বলেছি; তা'র বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না। তোমার উপর কলঙ্কের এক বিন্দু আভাসও যা'তে পড়্‌তে পারে—তা আমার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। যারা তোমাকে চায় না, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না,—থাকতেও পারে না।"

সন্তোষকুমারের এই সংকল্পের কথা অতি অল্প সময়েই চারি দিকে প্রচারিত হইল ও তাহা স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। নানা লোক নানা ভাবে এই প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করিতে লাগিল।—কেহ বলিল, "ছোকরার বড়ই আস্পর্দ্ধা! কুল-পুরোহিত ত্যাগ ক'রে কলকাতা থেকে ভাড়াটে পুরুত এনে মায়ের পুজো! ব্রাহ্মণের শাপে নির্ব্বংশ হবে না?" —কেহ বা বলিল, "টাকার গরমে একেবারে কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত হ'য়ে প'ড়েছে! টাকার কাঁড়ি যদি ঘরে মজুত ছিল তো—বোন্‌টার বিয়ের সময় টাকা বা'র করতে বুকে ছড় গেল কেন? রণেনবাবুরা তখন মুখের মতো জুতো ক'ষে বসিয়ে-দিয়েছিলেন!"—আর এক জন এ কথায় সায় দিয়া সবেগে মাথা ও হাত নাড়িয়া বলিল, "দেখ না, বোনটাকে যে ঘরে বিয়ে দিয়েছে, তারাও ও-বউ ঘরে নিলে না। কলকাতার শিক্ষিত পরিবার কি না, ঠিক ব্যবহারই তারা কোরেছে।"—কেহ ভয়ে ভয়ে বলিল, "সন্তোষ-বাবু আমাদের দেশের রাজা, এমন প্রজাবৎসল জমিদার আজকাল সর্ব্বদা বড়-একটা দেখা যায় না। আর দিদি-মণির আচার-ব্যবহারে এতটুকুও বিবিয়ানা দেখা যাচ্ছে না,—তিনি যেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী,—যেমন রূপ, তেমনি গুণ! একমাত্র রণেনবাবুর কথায় নেচে তাঁদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা কি উচিত হচ্ছে?"—এ কথা শুনিয়া আর এক জন আকাশে গলা চড়াইয়া বলিল, "আরে রেখে দাও, ও সব ফালতো কথা! সন্তোষ ছোক্‌রা দেশের কাউকে মানুষ ব'লেই গ্রাহ্য করে না। আমাদের কাউকে একবার ডেকে, কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে একটা কথা-পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করলে? সকলের পরামর্শ নিয়ে চল্‌লে তার ভালই হ'তো—বোকারাম এটাও বুঝ্‌তে পারলে না হে!"

এক জন সনাতনপন্থী ধার্ম্মিক বৃদ্ধ বলিলেন, "ও-সব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু হিন্দুর মেয়ে কে কবে বিলেতে গেছে বল তো? তা দেশে ফিরে-এসে একটা প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত করলে না, পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা! এ সব অনাচার সহ্য ক'রতে হবে সমাজে বাস ক'রে? ঘোর কলি, ঘোর কলি! হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল—এই সব অকালকুষ্মাণ্ডের দোষে!"—

এইরূপ নানা প্রকার তর্ক-বিতর্কে পরিশ্রান্ত হইয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলী রণেন্দ্রবাবুর সন্ধানে চলিল। তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত সমাজরক্ষা-সংক্রান্ত কোনও কাজেই কাহারও অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না।

পরদিন প্রভাতে সন্তোষকুমার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখ-স্থিত আঙ্গিনায় চিন্তাকুলচিত্তে পাদচারণ করিতেছে—সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র ভাবে কাটাইয়াও তাহার চিন্তার বিরাম নাই। এই সামাজিক বিপ্লবে তাহাকে সুপরামর্শ দান বা পথ প্রদর্শন করিবে, তাহার এরূপ হিতৈষী কেহই নাই। রমাপ্রসাদবাবু সুদূর প্রবাসে; অথচ এই প্রকার জটিল সামাজিক সমস্যায় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আজ কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী অভয়াচরণ মিত্রের পৌত্র সামাজিক নির্য্যাতনের ভয়ে বংশের সম্ভ্রম নষ্ট করিবে?—ইহা অসম্ভব। রণেন্দ্র কি সমাজের এত-বড় মোড়ল হইয়াছে যে, সকলেই তাহার অন্যায় আদেশে পরিচালিত হইবে? এই প্রসিদ্ধ মিত্র-পরিবার গ্রামের জন্য, প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলের নিমিত্ত, স্থানীয় জন-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই তাহারা বিস্মৃত হইবে? এই সকল চিন্তায় আকুল হইয়া সন্তোষ চণ্ডীমণ্ডপ-প্রাঙ্গণে ঘুরাফেরা করিতেছে, সেই সময় অদূরে পাল্কীবাহক বেহারাদের কণ্ঠনিঃসৃত ঐকতানিক 'হিঁয়ো-হুম্, হিঁয়ো-হিঁয়ো হুম্' শব্দ শুনিয়া তাহার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। সচকিত ভাবে সে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, বাহকরা তাহার সম্মুখে যে পাল্কী নামাইল—স্বয়ং জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাহার মধ্যে প্রসারিত শয্যায় উপবিষ্ট!

সন্তোষ ব্যগ্র ভাবে পাল্কীর দ্বারে আসিয়া, বন্ধু মহাশয়কে ধরিয়া পাল্কী হইতে বাহির করিল; সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "এ কি! আপনি এখানে? এ-যে আমার স্বপ্নের অগোচর! এত কষ্ট ক'রে আপনার এখানে আস্‌বার

কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কোন আদেশ থাকলে, আমায় তো ডেকে-পাঠালেই হ'ত। আমি তৎক্ষণাৎ আপনার দ্বারস্থ হ'য়ে আপনার আদেশ পালন করতুম কাকা!"

বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রবাবু কোমল স্বরে বলিলেন, "তুমি গেলে কোনও কাজ হোত না বাবা! এই মনুষ্যত্ববর্জ্জিত, আত্মীয়দ্রোহী নরাধমকে তুমি চার-পাঁচ দিনের জন্য তোমার বাড়ীতে আশ্রয় দেবে কি? তুমি 'কাকা' ব'লে আমায় সম্বোধন করলে; কিন্তু আমি এই সম্মানের সম্পূর্ণ অযোগ্য বাবা! তোমাকে মুখ দেখাতেও আমার লজ্জা হয়!"

সন্তোষ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "এ কি কথা বল্‌ছেন? এ কথা ব'লে আমায় অপরাধী করবেন না; গুরুজন আপনি, আমার বাড়ীতে থাকবেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য; এজন্য আপনি আমার সম্মতি প্রতীক্ষা করায় আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হচ্ছি। আমার বাড়ী-ঘর সব আপনার নিজের ব'লেই মনে করা উচিত।"

এই সকল কথার আলোচনা হইতে-হইতেই সেই সুপ্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপ-প্রাঙ্গণে বহু লোকের সমাগম হইল! বর্ষাধিক কাল জ্ঞানেন্দ্রবাবু শয্যাগত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি কি উদ্দেশ্যে হঠাৎ গৃহত্যাগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার ও বহু দিনের পরম শত্রু মিত্র-পরিবারের বাড়ীর দিকে চলিয়াছেন—ইহা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়ায় গ্রামের অনেক ভদ্রলোকই তাঁহার পাল্কীর অনুসরণ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর ইচ্ছানুযায়ী সেই সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণেই সুবৃহৎ আরাম-কেদারা আনীত হইলে, তাহাতে তিনি উপবেশন করিয়া ক্লান্তদেহ প্রসারিত করিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া শেফালী তাড়াতাড়ি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া অতঃপর তাঁহার পথশ্রম-লাঘবের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

এই ঘটনার কয়েক মিনিট পরেই তাঁহার পুত্রত্রয় নিদাঘ-অপরাহ্নের মেঘের ন্যায় গম্ভীর মুখে সেই স্থানে উপস্থিত! জ্ঞানেন্দ্রবাবু কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রণেন্দ্র বলিল, "জানতে পারি কি, এ কি কাণ্ড? আপনার কি মাথা-খারাপ হ'য়েছে? কাউকে বলা-কওয়া নেই, বেহারা ডাকিয়ে পাল্কী-চেপে হঠাৎ এখানে এলেন কি মতলবে?"—রণেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে উৎকট পিতৃভক্তি উচ্ছ্বসিত!

জ্ঞানেন্দ্রবাবু রণেন্দ্রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া শেফালীকে বলিলেন, "মা-লক্ষ্মী, তোমার এই রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য কাকাটিকে নিয়ে তোমাদিগকে দিন-কয়েক একটু কষ্ট-ভোগ করতে হবে; কিন্তু সে জন্য মা, তুমি যে বিশেষ অসুবিধা বোধ করবে না বা বিরক্ত হবে না, তা আমার জানা আছে। ছেলেবেলা থেকে সেবাই যে তোমার পরম ধর্ম্ম—তা কি আর আমার অজ্ঞাত?"

শেফালী অবনত মুখে প্রশান্ত স্বরে বলিল, "আপনার সেবা ক'রতে আমাদের অসুবিধা হবে, এ চিন্তা আপনার মনে না-এলেই আমরা অধিক সুখী হ'তুম। আপনার মনের কোণেও এ চিন্তা স্থান পেলে আমি মনে বড়ই ব্যথা পাব কাকা!"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁহার পাকা-মাথা নাড়িয়া সোৎসাহে বলিলেন, "ভাল কথা, মা! তুমি নীচেয় এই দিকেরই কোনও একটা ঘরে আমার থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দাও। তা' হ'লে আমি দু'বেলা জগন্মাতার রাঙা চরণযুগল দেখতে পাব, আর সন্তোষের পূজার কাজে সহায়তাও কিছু কিছু করতে পারব। মহাশক্তি জগজ্জননী আমার এ রুগ্ন দেহে তাঁর সেবার জন্যে কিঞ্চিৎ শক্তি-সঞ্চার করবেন না কি? মায়ের কৃপাতেই পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে।"

শেফালীকে দেখিয়া প্রতিবেশীরা একটু দূরেই ছিলেন, জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলে জ্ঞানেন্দ্রবাবু সকলকে লক্ষ্য করিয়া অচঞ্চল-স্বরে বলিলেন, "আপনারা সকলে মিলে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা মা-শেফালীকে অপমানিত করবার জন্যে, আর সন্তোষকে সমাজচ্যুত করবার মতলবে একটি চক্রান্ত পাকিয়েছেন,—এ কথা হঠাৎ আমি কাল রাত্রে জানতে পেরেছি। বেশ, আপনাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; কিন্তু এ কথাও জান্‌বেন যে, সন্তোষের যদি জাত গিয়ে থাকে তো আমারও গিয়েছে। সন্তোষের বাড়ীর পূজায় যাঁরা আসবেন না, আমার বাড়ীর পূজাতেও তাঁদের যোগদানের প্রয়োজন নেই।—এ বাড়ীর পূজার ভার আমিই নিলুম।

সন্তোষের কুল-পুরোহিত চক্রান্তের ভয়ে এ বাড়ীতে পূজা ক'রতে অসম্মত হওয়ায় আমি স্থানান্তর থেকে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনতে লোক পাঠিয়েছি। ব্রাহ্মণের কোনও ক্ষতি আমরা করতে চাই নে। কোন্ মূর্খের প্ররোচনায় আপনারা এই হীন চক্রান্তে যোগ দিয়েছেন, তাও আমি জানি; বেশ, তা'কে নিয়েই আপনারা থাকুন।"

তাহার পর তিনি তাঁহার মধ্যম পুত্রকে বলিলেন, "জিতেন্, তোমরা এখন বাড়ী যাও, আমি এই ক'দিন এখান থেকে নড়চি-নে। তোমার মা'কে আমার অনুরোধ জানিয়ে ব'ল্বে, আমার বিশেষ ইচ্ছে, তিনি পূজার কয়েক দিন এই বাড়ীতেই আহারাদি করেন, আর মা-শেফালীকে পাশে বসিয়ে একসঙ্গে আহার করেন। তোমরা ছোট দুই ভাইও এখানেই খাবে, ও সন্তোষকে যত্ন ক'রে আমাদের বাড়ীতে খাওয়াবে। তোমার দাদার সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বল্ব না।"

সমবেত গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্! রণেন্দ্র বেত্রাহত কুকুরের ন্যায় অপমানিত হইয়া চলিয়া গেল। এই সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। দুই গ্রামের জমিদারের বিপক্ষে যাইবার সাহস কাহারও হইল না; সকলেই উভয় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, মায়ের পূজা যথাবিহিত ভাবে সুসম্পন্ন করিলেন। ব্রাহ্মণরাও স্ব-স্ব কর্ম্মে যোগ দিলেন, এবং সন্তোষের পুরোহিত নির্ভয়েই পূজা শেষ করিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু পূজার কয় দিন সন্তোষের বাড়ীতেই অবস্থিতি করিলেন। শেফালীর সেবায় ও যত্নে তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন। বস্তুতঃ, জ্ঞানেন্দ্রবাবু যত প্রীত হইলেন, তাঁহার অন্তরের ক্ষোভ ও অনুতাপ সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। ক্রোধপরবশ হইয়া তিনি এমন রূপবতী গুণবতী বালিকার কি সর্ব্বনাশের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি লজ্জায় ও মনস্তাপে বিচলিত হইলেন।

বিজয়া দশমীর দিন অপরাহ্নে জ্ঞানেন্দ্রবাবু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে শেফালীকে বলিলেন, "মা, এইবার আমি বাড়ী যাই; আজ আমার সেখানে থাকা দরকার। তোমরা তো আগ্রা চ'লে যাবে, আবার কবে সুবিধা হবে জানি না, তাই আমি বাড়ী ফিরবার আগে দুই একটা কথা ব'লে যাই। মা, তোমার কাছে আমি বড় অপরাধী; এ অপরাধের জন্যে আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না; এর প্রায়শ্চিত্তও নেই। জেনে-শুনে তোমার যে শত্রুতা আমি ক'রেছিলাম, জানি, তার প্রতীকার কিছুই নেই;—ভগবানও বোধ হয় আমাকে দয়ার পাত্র ব'লে মনে করবেন না।"

শেফালী বিচলিত স্বরে বলিল, "কাকাবাবু, আপনি ও-সব ভুলে যান। যা' কিছু হ'য়েছে, তা' সবই আমার কর্ম্মফলে, বিধাতার বিধানে;—মানুষের কি সাধ্য, বলুন? আর যা' সব হ'য়েছে, হয় তো তা মঙ্গলেরই জন্য। ভগবান চিরমঙ্গলময়। আর আপনারা আমার জন্য এত কাতর হ'য়েছেন কেন? আমার মনে কোনও আক্ষেপ নেই, দুঃখ নেই; আনন্দেরও অভাব নেই। সংসারী হলুম না ব'লে আপনাদের দুঃখ; কিন্তু গরীবদের নিয়ে আমি এমন সংসার গড়ে' তুলব যে, দেখবেন—আমার সুখ, আমার গৌরবও অপরের ঈর্ষার কারণ হবে।"

শেফালীর উক্তিতে জ্ঞানেন্দ্রবাবু কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। শেফালীর অন্তরে কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে নৈরাশ্য-ভরা যে একটা বেদনার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কথায় তিনি তাহার আভাস পাইলেন না। কথা কহিতে-কহিতে তাহার মুখে যে অসীম তৃষার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন না। তিনি শেফালীর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'আজ পাঁচ বৎসর ধ'রে আমি দয়াময়ের কাছে প্রাণ ভ'রে কেবল একটি প্রার্থনা করুছি; তিনি কি এতই নিষ্ঠুর যে, আমি পাপী ব'লে আমার সে প্রার্থনাটি তিনি পূর্ণ করুবেন না? তোমাকে তোমার স্বামীর সঙ্গে মিলিত না দেখে মরুলে আমি মৃত্যুকালে শান্তি লাভ ক'রতে পারব না মা!'

এই কথা বলিয়া তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন। সন্তোষ তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "পিতৃমাতৃহীন আমরা ভয় পেতুম যে, দেশে আমাদের অভিভাবক কেউ নেই; আজ আপনাকে পেয়ে আমাদের সে ভয় দূর হ'য়েছে।"—জ্ঞানেন্দ্রবাবু আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না; তাঁহার দুই চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু টল-টল করিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

পতঞ্জলি-বিরচিত ব্যাকরণ-মহাভাষ্য

পস্পশাহ্নিক—অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

৫

অর্থবাদ সম্বন্ধে আর একটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার বৃহদারণ্যক-ভাষ্য-বার্ত্তিকে অন্যভাবে অর্থবাদের তিন প্রকার বিভাগ দেখাইয়া গিয়াছেন। *

(১) যে স্থলে অন্য প্রমাণের সহিত অর্থবাদবাক্যের আপাততঃ বিরোধ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পর্য্যবসানে তাহা স্তুতিরূপে পরিণত হয়, সেই স্থলে সেই অর্থবাদ 'গুণবাদ' শব্দে অভিহিত হয়। "যজমানো বৈ প্রস্তরঃ" (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ৬।৭) এই স্থলে যজ্ঞের কর্ত্তা যে যজমান তাঁহার সহিত 'প্রস্তর' নামক কুশ-মুষ্টির † অভিন্নতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা 'প্রস্তর' নাম কুশ-মুষ্টির সহিত যজমানের ভিন্নতা সিদ্ধ আছে; অতএব "যজমানো বৈ প্রস্তরঃ" এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত যজমান এবং প্রস্তরের অভেদ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এস্থলে পর্য্যবসানে এই বিরোধ থাকে না। যজমান যেরূপ যাগক্রিয়ার নির্ব্বাহক, 'প্রস্তরে'রও সেইরূপ যাগক্রিয়া নির্ব্বাহে উপযোগিতা আছে। এইরূপে যজ্ঞের ফলস্বামী যজমানের সহিত 'প্রস্তরে'র তুল্যতা প্রতিপাদনের ফলে 'প্রস্তরে'র স্তুতি পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইজন্য এই অর্থবাদটি 'গুণবাদ'।

(২) যে অর্থবাদ কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ বস্তুকে প্রকাশ করে, সেই অর্থবাদ 'অনুবাদ' নামে অভিহিত হয়। "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" * (অগ্নি শীতের ঔষধ=বিনাশক) ইহা একটি অর্থবাদ-বাক্য। অগ্নির দ্বারা শীতের নিবৃত্তি হয়, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত; এই জন্য এই অর্থবাদ বাক্যটি লৌকিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ বস্তুকে প্রতিপাদন করিতেছে; অতএব ইহা 'অনুবাদ'।

"ইন্দ্রো হ যত্র বৃত্রায় বজ্রং প্রজহার, স প্রহৃতশ্চতুর্দ্ধাহভবৎ।" শতপথ ব্রাহ্মণ (১।২।২।১) ইহার অর্থ—ইন্দ্র যে সময় বৃত্রকে বজ্রের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, তখন সেই বজ্র বৃত্রের শরীরে প্রহৃত হইয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

এই অর্থবাদের সহিত অন্য কোন প্রমাণের বিরোধ নাই অথবা এই অর্থবাদে বর্ণিত বিষয় অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। অতএব এই অর্থবাদ 'ভূতার্থবাদ' শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য।

মহাভাষ্যকারের প্রদর্শিত "তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ" এই অর্থবাদকে এই 'ভূতার্থ-বাদে'র অন্তর্গত বলিতে পারা যায়।

---

* বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ।
—বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক—সম্বন্ধবার্ত্তিক ৫৬৭

† তত্র প্রকৃতীষ্টৌ চতস্রো দর্ভমুষ্টয়শ্ছিদ্যন্তে, প্রথমা দর্ভমুষ্টির্মন্ত্রৈঃ সংস্কৃতা বেদ্যাং জুহুর্যস্যাং নিধীয়তে, বিধৃতিসংজ্ঞকয়োরুদগগ্রয়োর্দর্ভয়োরুপরি যা চ প্রাগগ্রা স্থাপিতা ভবতি, সা 'প্রস্তর' ইত্যুচ্যতে।—শ্রৌতপদার্থনির্বচন—ইষ্টিপ্রকরণ ৮৭।

প্রকৃতি ইষ্টিতে (দর্শ ও পূর্ণমাস নামক যাগ-বিশেষে) চারি মুষ্টি কুশ ছেদন করা হয়; তাহার মধ্যে মন্ত্রপূত প্রথম কুশমুষ্টি 'প্রস্তর' শব্দে অভিহিত হয়। যজ্ঞের বেদির যে স্থানে 'জুহূ' নামক হোম-পাত্র স্থাপন করা হয়, সেই স্থান প্রথমে এই মন্ত্রপূত প্রথম কুশ-মুষ্টির দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপরে 'জুহূ'কে বিন্যস্ত করা হইয়া থাকে এবং 'বিধৃতি' নামক উত্তরাগ্র কুশদ্বয়—যাহা যাগবেদির উপরে বিন্যস্ত থাকে—তাহার উপরেও এই 'প্রস্তর নামক কুশ-মুষ্টিকে স্থাপন করা হয়। যাগের পরিসমাপ্তির কিছু পূর্ব্বে এই 'প্রস্তর'কে মন্ত্রের দ্বারা 'আহবনীয়' নামক অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে।

* কঃ স্বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিজ্জায়তে পুনঃ।
কিং স্বিদ্ধিমস্য ভেষজং কিং স্বিদাবপনং মহৎ।
সূর্য্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ।
—তৈত্তিরীয়সংহিতা ৭।৪।১৯

এই স্থলে দ্বিতীয় শ্লোকে যে চারিটি বাক্য আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই 'অনুবাদ'।

ব্যাখ্যা।—এক সময়ে অসুরগণ যুদ্ধে দেবতাদের নিকট পরাজিত হইয়া দেবতাদের পরাজয়ের উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে অসুররা দেবতাদের উদ্দেশে 'হে অরয়ঃ' 'হে অরয়ঃ' (হে 'শত্রুগণ' হে শত্রুগণ') এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে যাইয়া 'অরয়ঃ'এই শব্দের 'র' স্থানে 'ল' উচ্চারণ করে। যজ্ঞ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে এইরূপ অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগের ফলে অসুররা দেবতাদের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। এই জন্য ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছন অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করিবে না। অপশব্দ (অশুদ্ধ শব্দ) ম্লেচ্ছ; আমরা 'ম্লেচ্ছ' না হই, এই জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

"হেহলয়ঃ" এইরূপ প্রয়োগে কোন্ অংশে অশুদ্ধি-দোষ ঘটিয়াছে, এ বিষয়ে একটু বিচার করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'হে+অলয়' এই স্থলে হৈ হে প্রয়োগে হৈহয়োঃ" * এই সূত্র অনুসারে প্লুতস্বর হওয়া উচিত ছিল। প্লুতস্বর হইলে এ স্থলে সন্ধি হইয়া 'হেহলয়ঃ' এইরূপ হইত না, কিন্তু প্রকৃতিভাব † হইয়া 'হে অলয়ঃ' এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। এই প্লুত-প্রযুক্ত প্রকৃতিভাব না করায় এখানে অশুদ্ধি-দোষ ঘটিয়াছে।

অন্য পক্ষ ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, "অপ্লীৎপ্রেষণে পরস্য" চ (৮।২।৯২) এই সূত্রের মহাভাষ্যে বলা হইয়াছে, সমস্ত প্লুতই বিকল্পে হইয়া থাকে *। এ জন্য এ স্থলে প্লুতস্বর এবং প্লুত-প্রযুক্ত প্রকৃতিভাব না করায় কোন দোষ হয় নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, বীপ্সা অর্থে পদের দ্বিত্ব † হয়; এখানে "হেহলয়ঃ" এই পদসমুদায়াত্মক বাক্যের দ্বিত্ব করায় অশুদ্ধি-দোষ ঘটিয়াছে।

এখানে বীপ্সা অর্থে দ্বিত্ব করা হইয়াছে—ইহা অপর পক্ষ স্বীকার করেন নাই। এখানে বক্তার ইচ্ছানুসারে পদ-সমুদায়ের দুইবার উচ্চারণ করা হইয়াছে ‡। কোন সূত্র অনুসারে এখানে দ্বিত্ব হয় নাই। এখানে "অরয়ঃ" এই শব্দের অন্তর্গত 'র' স্থলে 'ল' উচ্চারণ করিয়া "অলয়ঃ" এইরূপ বিকৃতি ঘটান হইয়াছে অর্থাৎ 'অরি' শব্দটিকে 'অলি' শব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহাই এই বাক্যের অশুদ্ধি।

এই শেষোক্ত মতটিই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিবার যোগ্য

"ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্"—এই স্থলে 'ম্লেচ্ছ' শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থের সঙ্গতি হয় না। 'ম্লেচ্ছ' শব্দের দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ, একটি অর্থ—দেশ-বিশেষ §। অপর অর্থ মনুষ্য—জাতিবিশেষ ¶; এই দুই অর্থের যে কোন অর্থ

---

* "হৈ হে প্রয়োগে হৈহয়োঃ" ৮।২।৮৫।

"হৈ হে প্রয়োগে দূরাদ্ধূতে যদ্ বাক্যং বর্ত্ততে তত্র হৈহয়োরের প্লুতো ভবতি।" কাশিকা '—দূর হইতে সম্বোধনের নিমিত্ত যে বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, সেই বাক্যে যদি 'হৈ' অথবা 'হে' শব্দ থাকে তাহা হইলে সেই 'হৈ' এবং হে' শব্দের প্লুত হইবে। (অন্তের অর্থাৎ বাক্যের টি' ভাগের প্লুত হইবে না)। যেমন—'হে ৩ দেবদত্ত' এই বাক্যে 'হে' শব্দের প্লুত হয়; দেবদত্ত 'হৈ ৩' এই বাক্যে 'হৈ' শব্দের প্লুত হয়; এখানে প্লুত বুঝাইবার উদ্দেশে হে' এবং 'হৈ' শব্দের পরে '৩' এই অঙ্কটি যোগ করা হইয়াছে। প্লুত স্বরের তিন মাত্রা হওয়ার '৩' এই অঙ্কটি প্লুত বুঝাইবার উদ্দেশে স্বরের পরে ব্যবহৃত হয়।

† "প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্" ৬।১।১২৫। (কাশিকার মতে এই সূত্রে "নিত্যম্" এই শব্দটি নাই; মহাভাষ্যমতে এখানে 'নিত্যম্' এই শব্দটি আছে।)

ইহার অর্থ—অচ্ অর্থাৎ স্বর পরে থাকিলে প্লুতস্বর ও 'প্রগৃহ্য' সংজ্ঞক স্বরের প্রকৃতি ভাব হয়—সন্ধি হয় না।

* "সর্ব্বঃ প্লুতঃ সাহসমনিচ্ছতা বিভাষা বক্তব্যঃ"।—মহাভাষ্য। পম্পশায় উদ্দ্যোতে এবং প্রকৃতিভাবপ্রকরণের প্রৌঢ়মনোরমায় "বক্তব্যঃ" এই স্থলে "কর্ত্তব্যঃ" এইরূপ পাঠ আছে। ইহার অর্থ—যাঁহারা সাহস অর্থাৎ শাস্ত্রত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারাও সমস্ত প্লুতের বিকল্পে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহাতে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অতিক্রমপ্রযুক্ত দোষ হয় না।

† "নিত্যবীপ্সয়োঃ" (৮।১।৪)

"আভীক্ষ্ণ্যে বীপ্সায়াং চ দ্যোত্যে পদস্য দ্বির্বচনং স্যাৎ।—সিদ্ধান্তকৌমুদী—দ্বিরুক্ত-প্রক্রিয়া।—'পৌনঃপুন্য' এবং ব্যাপ্তি অর্থে পদের দ্বির্বচন হয়।"—"হেহলয়ঃ" এইটি পদ নহে, পদ-সমুদায়; এই জন্য এখানে এই সূত্র অনুসারে দ্বিত্ব হইতে পারে না।

‡ বাক্যের এইরূপ ঐচ্ছিক দ্বিত্ব "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২২) ইত্যাদিস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

§ কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥
—মনুসংহিতা ২।২৩

"প্রত্যন্তো ম্লেচ্ছদেশঃ স্যাৎ।"—অমরকোষ ভূমিবর্গ ৭
"চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
তং ম্লেচ্ছবিষয়ং প্রাহুঃ।"
—মহেশ্বরপ্রণীত অমরবিবেকটীকায় (ভূমিবর্গ ৭) উদ্ধৃত।

¶ "ভেদাঃ কিরাতশবরপুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।"
—অমরকোষ—শূদ্রবর্গ ২০

এখানে গৃহীত হইলে বাক্যার্থের সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। এই জন্য এস্থলে 'ম্লেচ্ছ' শব্দের প্রসিদ্ধি-লভ্য এই দুই অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার যোগার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। নিন্দার্থক 'ম্লেচ্ছ' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ে * নিষ্পন্ন যে 'ম্লেচ্ছ' শব্দ, তাহারই এখানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব এখানে ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ নিন্দ্য, দেশবিশেষ বা মনুষ্যজাতি-বিশেষ নহে। ব্যাকরণ-শাস্ত্র-পরিনিষ্পন্ন শব্দের উচ্চারণ না করিয়া যজ্ঞকর্ম্মে তাহার বিপরীত উচ্চারণ করিলে পাপ জন্মে; এইজন্য এই-রূপ অশুদ্ধ উচ্চারণের ফলে উচ্চারণকর্ত্তা নিন্দ্য হইয়া থাকেন †।

"তেঽসুরা হেঽলয়ো হেঽলয়ঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রচলিত কোন ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় না। মাধ্যন্দিনশাখার শতপথব্রাহ্মণে "হেঽলয়ো হেঽলয়ঃ" এইরূপ পাঠের পরি-বর্ত্তে "হেঽলবো হেঽলবঃ" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উপসংহারে "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো ন ম্লেচ্ছেৎ" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে 'অরয়ঃ' এই শব্দের 'র' স্থানে 'ল' করা হইয়াছে এবং 'য়' স্থানে 'ব' করা হইয়াছে—ইহাই অশুদ্ধি ‡।

মূল।—"দুষ্টঃ শব্দঃ।"

দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥ ইতি
দুষ্টাঞ্শব্দান্ মা প্রযুক্ষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। "দুষ্টঃ শব্দঃ।"

অনুবাদ।—'দুষ্টঃ শব্দঃ' (এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত করা হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে) (উদাত্তাদি) স্বর এবং (অকারাদি) বর্ণের (অন্যথা উচ্চারণের) নিমিত্ত (যে) শব্দ দুষ্ট (হয়, সে শব্দ) মিথ্যাপ্রযুক্ত (হওয়ায়) (উচ্চারণকর্ত্তার তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত যে অর্থ) সে অর্থকে প্রকাশ করেন না। সেই বাক্যরূপী বজ্র যজমানের (স্বয়ং যজ্ঞকর্ত্তার) হিংসা করিয়া থাকে। (তাহার উদাহরণ) যেমন 'ইন্দ্রশত্রু' (এই শব্দটি) (উদাত্তাদি) স্বরের (অন্যথা উচ্চারণের) নিমিত্ত (যে অপরাধ অর্থাৎ দোষ, সেই) অপরাধে যজ্ঞ-কর্ত্তার হিংসা করিয়াছিল (অর্থাৎ অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিয়াছিল।) আমরা দুষ্ট শব্দের প্রয়োগ না করি, এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য। 'দুষ্টঃ শব্দঃ' (এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হইল।)

ব্যাখ্যা।—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের প্রতি ইন্দ্র অসন্তুষ্ট ছিলেন; এই অসন্তোষের ফলে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করেন। ত্বষ্টা পুত্রবধে কুপিত হইয়া ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত বৃত্রনামক অন্য পুত্র উৎপাদন করার উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে "স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" এই বাক্যের দ্বারা আহুতি প্রদান করা হয়। এখানে 'শত্রু' শব্দ তাহার প্রসিদ্ধ অর্থ যে বিদ্বেষী, সে অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু এই শব্দটি যৌগিকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 'শদ্' ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া তাহার উত্তর ঔণাদিক 'ক্রুণ্' প্রত্যয় করিয়া 'শত্রু' শব্দ সিদ্ধ করা হইয়াছে; ণিজন্তের অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব অকারের স্থানে আকার হয়। এইজন্য এখানে 'শত্রু' এই প্রকার রূপ না হইয়া 'শাত্রু' এই প্রকার রূপ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু প্রজ্ঞাদিগণে (৫।৪।৩৮) 'শত্রু' এইরূপ অকারযুক্ত 'শত্রু' শব্দের পাঠ করা হইয়াছে; এইরূপ নিপাতনের *

---

* "অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্" (৩।৩।১৯) এই সূত্র অনুসারে এ স্থলে 'ঘঞ্' প্রত্যয় হয়।

এখানে 'ম্লেচ্ছ' শব্দ যৌগিক হওয়ায় সূত্রের অন্তর্গত "সংজ্ঞায়াম্" এই অংশের সহিত বিরোধের আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু এই সূত্রের মহাভাষ্যে "সংজ্ঞায়াম্" এই অংশ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া এরূপ আশঙ্কার এখানে অবকাশ নাই।

† "ম্লেচ্ছা নিন্দ্যাঃ। শাস্ত্র-বোধিত-বিপরীতানুষ্ঠানাদিতি ভাবঃ।" শব্দকৌস্তুভ। "ম্লেচ্ছা ইতি কর্ম্মণি ঘঞ্।"

—মহাভাষ্যপ্রদীপ।

"ননু ম্লেচ্ছো নাম পুরুষবিশেষো দেশবিশেষো বা স কথমপশব্দো-হত আহ—'ঘঞি'তি। নিন্দাবচনাদ্ ম্লেচ্ছধাতোরিতি ভাবঃ। নিন্দা চ শাস্ত্রবোধিত-বিপরীতোচ্চারণেন পাপসাধনত্বাৎ। এবং চ ম্লেচ্ছা ইত্যস্য নিন্দ্যা ইত্যর্থো ইতি দিক্।" —মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোত

‡ "ইদং ভাষ্যাদিষু প্রসিদ্ধং শ্রুতিপাঠমনুসৃত্য ব্যাখ্যাতম্। অয়ং চ পাঠঃ ক্বচিচ্ছাখায়ামন্বেষণীয়ঃ। মাধ্যন্দিনানাং শতপথব্রাহ্মণে তু 'হেলবো হেলব' ইতি বদন্ত ইতি পঠিত্বা তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো ন 'ম্লেচ্ছেদি'তি পঠ্যতে। তত্র যকার স্থানে বকারোঽপশব্দ ইতি স্পষ্টমেব।"—শব্দ-কৌস্তুভ।

* "নিপাতনং নামাস্তাদৃশে প্রয়োগে প্রাপ্তেঽন্যাদৃশপ্রয়োগ-করণম্"—পরিভাষেন্দুশেখর—১১৭ পরিভাষা।

—ব্যাকরণ শাস্ত্র অনুসারে যেরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত, সেরূপ প্রয়োগ না করিয়া আচার্য্যের অন্যপ্রকার প্রয়োগ করার নাম 'নিপাতন'। এখানে শাস্ত্র অনুসারে 'শাত্রু' এইরূপ প্রয়োগ হওয়া

ফলে 'শক্র' শব্দের সাধুত্ব হইয়াছে *। 'ইন্দ্রশক্র' এই শব্দে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলে ইহার অর্থ হয়—ইন্দ্রের ঘাতক ; তাহা হইলে "ইন্দ্রশক্রর্বর্দ্ধস্ব" এই বাক্যের এইরূপ অর্থ হয়—'ইন্দ্রের ঘাতক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও'। ত্বষ্টার এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত ছিল। ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইলে 'ইন্দ্রশক্র' শব্দটির অন্ত্যস্বর উদাত্ত হওয়া উচিত ছিল। ঋত্বিকের অনবধানতাবশতঃ এই শব্দটির উচ্চারণে দোষ ঘটিয়াছিল। তিনি এই শব্দটিকে অন্তোদাত্ত উচ্চারণ না করিয়া আদ্যুদাত্ত উচ্চারণ করিয়াছিলেন। 'ইন্দ্র' শব্দ ঔণাদিক রন্ প্রত্যয়ের+দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হয়। বহুব্রীহিসমাসে সেই আদিস্বর উদাত্ত থাকিয়া যায় এবং সমগ্র সমাস-পদের অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, এ স্থলে ঋত্বিক্ বহুব্রীহির যে স্বর, তাহারই প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 'ইন্দ্রশক্র' শব্দের অন্য অর্থ হইয়া গিয়াছিল—'ইন্দ্র যাহার ঘাতক, সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও'; এইরূপ বিপরীত অর্থের প্রতীতির ফলে ত্বষ্টার যজ্ঞের ফল অত্যন্তবিরুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন এমন পুত্র—যে পুত্র ইন্দ্রকে বধ করিবে, কিন্তু তাঁহার যজ্ঞের ফলে যে বৃত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, সে ইন্দ্রকে বধ করিতে পারে নাই, ইন্দ্রই তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠীতৎপুরুষের স্বরের প্রয়োগ না করিয়া, প্রমাদবশতঃ বহুব্রীহির স্বরের প্রয়োগ করার জন্য বাক্যের অর্থে যে বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল—সেই বৈপরীত্যের ফলে ত্বষ্টা তাঁহার যজ্ঞের অভীপ্সিত ফলে বঞ্চিত হইয়া বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানে শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে, তাহার ফলে অভীপ্সিত ফল হইতে বঞ্চিত হইব এবং অনভীপ্সিত ফলের ভাগী হইব। ব্যাকরণের জ্ঞান থাকিলেই অশুদ্ধ উচ্চারণের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে। অতএব অশুদ্ধ উচ্চারণের পরিহারের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।—'পাণিনীয়শিক্ষা'তেও * এই শ্লোকটি পঠিত আছে ; কিন্তু সেই স্থলে "দুষ্টঃ শব্দঃ" এই দুইটি শব্দের স্থানে "মন্ত্রো হীনঃ" এইরূপ পাঠ আছে। 'পাণিনীয়-শিক্ষা' হইতে ভাষ্যকার এই শ্লোকটি আহরণ করিয়াছেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অবিচার করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে যে 'পাণিনীয়শিক্ষা' প্রচলিত—ইহা পাণিনির রচিত নহে, অন্য কোন পণ্ডিত ইহার সঙ্কলন-কর্ত্তা ; তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আমি 'পাণিনীয়'মতানুসারে শিক্ষা বলিতেছি †। যিনি এই শিক্ষার সঙ্কলন-কর্ত্তা ‡ তিনি যে মহাভাষ্যকার অপেক্ষা পরবর্ত্তী, ইহা তাঁহার লেখার ভঙ্গী হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই শ্লোকটি 'পাণিনীয়-শিক্ষা' হইতে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে, ইহা মনে করা উচিত নয়। তবে এই শ্লোকটি পতঞ্জলি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষা-গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; বর্ত্তমান 'পাণিনীয়শিক্ষা'তেও এই শ্লোকটি পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষা-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শিক্ষা-গ্রন্থে এই

উচিত ছিল ; কিন্তু পাণিনি প্রজ্ঞাদিগণে 'শাক্র' এইরূপ পাঠ না করিয়া 'শক্র'শব্দে হ্রস্ব অকারের প্রয়োগ করিয়াছেন ; পাণিনির এইরূপ প্রয়োগ করার ফলে 'শাক্র' এইরূপ অশুদ্ধরূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং 'শক্র' এইরূপ শুদ্ধরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

* 'শম্' ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিলে—তাহার অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের দীর্ঘ স্থলে হ্রস্ব হইয়া যায় ("মিতাং হ্রস্বঃ" ৬।৪।৯২)। সুতরাং এই হ্রস্ব হওয়ার জন্য কোনরূপ প্রয়াস করিতে হয় না। নিজন্ত 'শম্' ধাতুর উত্তর ঔনাদিক 'ক্রুণ্' প্রত্যয় করিয়া, প্রজ্ঞাদিগণে 'শক্র' এইরূপ তকারযুক্ত পাঠের ফলে 'ম' স্থানে 'ত' আদেশ হইয়াছে—এরূপ স্বীকার করিলেও 'শক্র' শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু 'ত' আদেশও নিপাতনে হইয়াছে,—ইহা স্বীকার করিতে হইবে।+

ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্রকুব্রচুব্রক্ষুরখুরভদ্রোগ্রভেরভেলশুক্রশুক্লগৌরবপ্রেরামালাঃ। (উণাদি ২য় পাদ) রন্নন্তা উনবিংশতিঃ। ... ... 'ইদি' "ইন্দ্রঃ।"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

রন্ প্রত্যয়ের 'ন্'র ইৎ সংজ্ঞা হয় বলিয়া এই প্রত্যয়টি 'নিৎ'। ঞিদন্ত এবং নিদন্ত শব্দের আদি উদাত্ত হয়,—"ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্" (৬।১।১৯৭) "ঞিতি নিতি চ নিত্যমাদিরুদাত্তো ভবতি।" —কাশিকা। 'ইন্দ্র' শব্দটি নিৎ প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় ইহার আদিস্বর 'ইকার'টি উদাত্ত হয়।

* পাণিনীয়শিক্ষা—৫২।

† "অথশিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়মতং যথা।"—পাণিনীয়-শিক্ষা—১।

‡ 'পাণিনীয়শিক্ষা'তে যে সকল শ্লোক আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোক 'নারদীয়শিক্ষা' প্রভৃতি শিক্ষা-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য যিনি 'পাণিনীয়শিক্ষা'কে বর্ত্তমান আকার দিয়াছেন, তাঁহাকে রচয়িতা বা প্রণেতা না বলিয়া, সঙ্কলন-কর্ত্তা বলিলেই ভাল হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে বলিয়া এই প্রসঙ্গের বিস্তার করা হইল না।

শ্লোকটির "মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা" এইরূপ পাঠ থাকিলেও পতঞ্জলি তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন।

"ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব"—ইহার মন্ত্রত্ব নাই ; প্রামাণিক বেদজ্ঞগণের যে সকল বেদবাক্যে 'মন্ত্র' ব্যবহার পূর্ব্বপরম্পরা হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল বেদ-বাক্যকে মন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়। "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" অথবা "স্বাহেন্দ্র—শত্রুবর্দ্ধস্ব" ইহা বেদে পঠিত থাকিলেও, ইহা ত্বষ্টার কল্পিত বাক্যের অনুকরণরূপেই পঠিত আছে ; ইহাকে মন্ত্ররূপে পাঠ করা হয় নাই—ইহা বৈদিক শিষ্টসম্প্রদায়ে মন্ত্ররূপে পরিগৃহীত নহে ; এই কারণে এই বাক্যের মন্ত্রত্ব নাই ; অতএব এ স্থলে "মন্ত্রো হীনঃ" এইরূপ পাঠের সঙ্গতি নাই দেখিয়া ভাষ্যকার তাহার পরিবর্ত্তে "দুষ্টঃ শব্দঃ" এইরূপ পাঠ করিয়াছেন। শিক্ষাগ্রন্থে যদিও "মন্ত্রো হীনঃ" এইরূপ পাঠ আছে, তথাপি সে স্থলেও অর্থসঙ্গতির অনুরোধে 'মন্ত্র' শব্দের 'শব্দ' এই অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

কেবল মন্ত্র নহে,—অন্য শব্দও যদি স্বর-বর্ণ-দোষে দুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার যজ্ঞকর্ম্মে উচ্চারণ প্রত্যবায়ের কারণ হইবে—ইহা সূচিত করার উদ্দেশে এখানে "মন্ত্রোহীনঃ" এই পাঠ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে—এবং "দুষ্টঃ শব্দঃ" এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে—এইটুকু এখানকার সার কথা।

কেহ কেহ মনে করেন,—"স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" ইহা যে মন্ত্র নয়, ইহার কোন প্রমাণ নাই। যজ্ঞকর্ম্মে মন্ত্রের 'একশ্রুতি' * স্বর বিহিত আছে * ; এ স্থলে সেই 'একশ্রুতি' স্বরেরই উচ্চারণ করা উচিত ছিল ; তাহা না করিয়া 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দটির যে আদিস্বর উদাত্ত উচ্চারণ করা হইয়াছিল, ইহাই এ স্থলে 'স্বরাপরাধ'—স্বরদোষ †। এইরূপ দুষ্ট উচ্চারণের ফলেই ত্বষ্টার যজ্ঞের ফল বিপরীত হইয়াছিল।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট-প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন, উদাত্তাদি স্বরের প্রভাবে বেদেই অর্থ-বিশেষের প্রতীতি হয় ; তাঁহাদের এই কথার অভিপ্রায় বিচার করিলে দেখা যায়—বৈদিক সংস্কৃত ব্যতীত অন্য সংস্কৃতে উদাত্তাদি স্বরের জন্য অর্থের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য হয়, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। সুতরাং বৈদিক সংস্কৃত ব্যতীত অন্য সংস্কৃতে উদাত্তাদি স্বরের ব্যবহার হইতে পারে না, ইহাও তাঁহাদের অভিপ্রায় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পরন্তু আলঙ্কারিকদের এই সিদ্ধান্ত বৈয়াকরণসম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে বৈদিক প্রয়োগের জন্য যে সকল সূত্র রচনা করা হইয়াছে, সেই সকল সূত্রে বিশেষ ভাবে বেদের কথা উল্লিখিত আছে ‡ ; এমন কি, যে সকল বৈদিক প্রয়োগ কেবল বেদের মন্ত্র-ভাগ কিংবা কেবল ব্রাহ্মণ-ভাগেই হইয়া থাকে, সেই সকল প্রয়োগের সিদ্ধির জন্য যে সকল সূত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে 'মন্ত্র' অথবা 'ব্রাহ্মণ' শব্দের স্পষ্ট

* উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত,—ইহার প্রত্যেকটি স্বর পৃথগ্ ভাবে উচ্চারিত হয় ; যে স্থলে এইরূপ পৃথগ্ ভাবে উদাত্তাদির উচ্চারণ না করিয়া সামান্যভাবে অকারাদি বর্ণের উচ্চারণ করা হয়, সেইস্থলে 'একশ্রুতি' স্বর বুঝিতে হইবে।—"সা (একশ্রুতিঃ) চ স্বরাবিভাগঃ।"—ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি। এই 'একশ্রুতি'র অপর নাম 'প্রচয়'। কাত্যায়ন-প্রণীত 'শুক্লযজুঃপ্রতিশাখ্যে' 'একশ্রুতি' স্বরকে 'তান' স্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই 'একশ্রুতি'কে মহাভাষ্যকার 'স্বর-সর্ব্বনাম' এই শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন—"একশ্রুতিঃ স্বর-সর্ব্বনাম।"—মহাভাষ্য (৬।৪।১৭৪)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেখানে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত,—এই তিনটি স্বরের মধ্যে কোনো একটি স্বরকে পৃথগ্ ভাবে উচ্চারণ না করিয়া এবং তাহাদের বৈলক্ষণ্যের বিবক্ষা না করিয়া সামান্য ভাবে স্বরবর্ণের উচ্চারণ করা হয়, তাহাই 'একশ্রুতি'। এ বিষয়ে বিশেষ-জিজ্ঞাসুগণ উক্ত স্থলের মহাভাষ্য এবং কৈয়ট দেখিবেন।

* "যজ্ঞকর্ম্মণ্যজপন্যুঙ্খসামসু" (১।২।৩৪)
"যজ্ঞকর্ম্মণি মন্ত্র একশ্রুতিঃ স্যাজ্জপাদীন্ বর্জ্জয়িত্বা।"—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী—সাধারণস্বরপ্রকরণ।

† "যদি বা একশ্রুত্যভাবাদেবাত্র প্রত্যবায়ঃ।"
—পদমঞ্জরী ১।১
"কেচিত্তু একশ্রুতিপ্রসঙ্গেঽপ্যুদাত্তোচ্চারণাদেবেন্দ্রশত্রুপদে দুষ্টত্বমিত্যাহুঃ।—ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি ১।১

‡ "ইন্দ্রশত্রুরিত্যাদৌ বেদ এব ন কাব্যে স্বরো বিশেষ-প্রতীতিকৃৎ।"—কাব্যপ্রকাশ ২।১৯
"কাব্যমার্গে স্বরো ন গণ্যত ইতি চ নয়ে।"
—কাব্যপ্রকাশ ৯৮৪
"স্বরস্তু বেদ এব বিশেষকৃৎ, ন কাব্যে।"—সাহিত্যদর্পণ ২।২৬
ছন্দসি পুনর্ব্বোরেকবচনম্ ১।২।৬১ ; ছন্দসি সহঃ ৩।২।৬৩ নেত্বরাচ্ছন্দসি ৭।১।২৬, ইত্যাদি।

উল্লেখ আছে *। স্বরের মধ্যে যে সকল স্বর কেবল বেদেই হইয়া থাকে, তাহাদের জন্যও বিশেষ সূত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে †। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বেদ ব্যতীত লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় স্বরের ব্যবহার নাই, এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ‡।

এই প্রসঙ্গে এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। আমাদের বঙ্গদেশে যে বেদ-পাঠ করা হয়, তাহাতে উদাত্তাদি স্বরের যোগ না করিয়া সাধারণভাবে 'একশ্রুতি' স্বরের দ্বারাই পাঠ করা হয়। অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের এইরূপ বেদ-পাঠ শুদ্ধ নহে এবং এইরূপ পাঠ করায় শুভ ফলের পরিবর্ত্তে অশুভ ফলই হইয়া থাকে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন। বেদ-পাঠ 'উদাত্ত', 'অনুদাত্ত' ও 'স্বরিত' এই তিন স্বরের সহযোগে যেমন করা যাইতে পারে, সেইরূপ 'একশ্রুতি' স্বরের সহযোগেও করা যাইতে পারে; তাহাতে কোন দোষ হয় না §। তবে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, উদাত্তাদি-স্বরের সহযোগে বেদ পাঠে যে অধিক ফল হয়, একশ্রুতি স্বরের সহযোগে সেই অধিক ফল হয় না ¶। যজ্ঞকালে যে সকল মন্ত্র পঠিত হয়, মহর্ষি পাণিনি কতিপয় স্থল ব্যতীত তাহাতেও 'একশ্রুতি' স্বরের বিধান করিয়াছেন, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় ||। বঙ্গদেশে কি বৈদিক কি পৌরাণিক সকল মন্ত্রই ওঙ্কারযুক্তরূপে পঠিত হয়; এরূপ প্রণালী অন্য দেশে দেখা যায় না। এইরূপ ওঙ্কারযুক্তরূপে মন্ত্র-পাঠ করিলে মন্ত্রের উচ্চারণে যাহা কিছু ত্রুটি—যাহা কিছু বিচ্যুতি, তাহার পরিহার হয় *।

মূল।—"যদধীতম্।"

"যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥"

তস্মাদনর্থকং মাধিগীষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। 'যদধীতম্'।

অনুবাদ।—'যদধীতম্'। (এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত করা হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে) যাহা অধীত অর্থাৎ পঠিত হয় অথচ (উদাত্তাদি-স্বর-প্রমুখ ব্যাকরণ-শাস্ত্রীয় সংস্কারের জ্ঞান না থাকায় অথবা অর্থ-জ্ঞান না থাকায়) বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত না হইয়া কেবল পাঠের দ্বারা উচ্চারিত হয়, অগ্নির অসন্নিধানে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় সেইরূপ অধ্যয়ন নিষ্ফল হয়।

আমরা নিষ্ফল অধ্যয়ন না করি, এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যা।—শব্দের উদাত্তাদি স্বর এবং অন্যবিধ সংস্কারের জ্ঞান ব্যাকরণের দ্বারাই হইতে পারে; শব্দের অর্থজ্ঞানও ব্যাকরণের অধীন। এইজন্য যিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহার পক্ষে উদাত্তাদি-স্বর-প্রমুখ শব্দের সংস্কার জানা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ অর্থের পরিজ্ঞানও অসম্ভব। শব্দের সংস্কার জানিতে হইলে কিংবা অর্থজ্ঞান করিতে হইলে ব্যাকরণের অধ্যয়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অতএব নিষ্ফল অধ্যয়নের পরিহার করিতে যিনি ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে ব্যাকরণের অধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।—নিরুক্তে (১।২০) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন্ গ্রন্থ হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা জানা যায় না। এই শ্লোকের নিরুক্তে একটু পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভাষ্যে যে স্থলে 'যদধীতম্' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়,

* মন্ত্রে ঘসহ্বরণশবৃদহাদ্বৃচ্কৃগমিজনিভ্যো লেঃ ২।৪।৮০; মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ ৩।৩।৯৬; মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ ৬।৪।১৪১; ইত্যাদি। দ্বিতীয়া ব্রাহ্মণে ২।৩।৬০।

† আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি ৬।২।১১৯; বিভাষাচ্ছন্দসি ৬।২।১৬৪ পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্ ৬।২।১৯৯।

‡ "স্বরবিধৌ ছন্দোঽধিকারাভাবাৎ।"—শব্দকৌস্তুভ ১।১

"ন চ স্বরস্য বেদমাত্র বিষয়কত্বাত্তত্র (—লৌকিকে) তৎপ্রযুক্ত-গুণদোষয়োর্ন প্রসক্তিরিতি বাচ্যম্। তদ্বিধৌ ছন্দসীতি অনধিকারাৎ।" —ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি ১।১।

"এতেন ভাষায়াং স্বরো নাস্ত্যেবেতি ভ্রান্ত্যস্তঃ পরাস্তাঃ, স্বরবিধৌ ছন্দোঽধিকারাভাবাচ্চ।—লঘুশব্দেন্দুশেখর—সাধারণস্বর-প্রকরণ 'বিভাষাচ্ছন্দসি' সূত্র।

§ কাশিকা ১।২ ৩৬।

¶ লঘুশব্দেন্দুশেখর সাধারণস্বরপ্রকরণ—"বিভাষাচ্ছন্দসি" সূত্র।

|| "যজ্ঞকর্ম্মণ্যজপন্যূঙ্খসামসু" ১।২।৩৪

* যন্ন্যূনঞ্চাতিরিক্তং চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্।
যদমেধ্যমশুদ্ধং চ যাতযামং চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কার-প্রযুক্তেন সর্ব্বং চাবিকলং ভবেৎ।—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

নিরুক্তে সেই স্থলে 'যদ্‌গৃহীতম্' এইরূপ পাঠ আছে; তাহা হইলে নিরুক্ত অনুসারে এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের পাঠ এইরূপ পর্য্যবসিত হইতেছে;—

"যদ্‌গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।"*

ইহার অর্থ—যাহা শব্দমাত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং যাহার অর্থাংশ অপরিজ্ঞাত আছে, তাহা কেবল পাঠের দ্বারা উচ্চারিত হয়।

নিরুক্তে (১।২৩) এই শ্লোকের পূর্ব্বে

"তথাপি জ্ঞান-প্রশংসা ভবত্যজ্ঞাননিন্দা চ—
স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদ্
অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে
নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥ †"

ইহার অর্থ—শাস্ত্রে জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা আছে—

যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থে অনভিজ্ঞ থাকে, সেই স্থাণু অর্থাৎ শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় ব্যক্তি (এখানে শুষ্ক কাষ্ঠের স্তম্ভের ন্যায় ব্যক্তি) কেবলমাত্র ভারেরই বাহক; যিনি অর্থে অভিজ্ঞ, তিনি ইহলোকে সমস্ত কল্যাণের ভাগী হ'ন এবং জ্ঞানের প্রভাবে সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করিয়া পরলোকে স্বর্গের অধিকারী হ'ন।

এই বাক্যটি মহাভাষ্যকারের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুকূল হইলেও তিনি ইহা মহাভাষ্যে উদ্ধৃত করেন নাই। ইহার পরবর্ত্তী "যদ্‌গৃহীতম্" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাই তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। যে কথা এই "স্থাণুরয়ং" শ্লোকে দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝান হইয়াছে, সেই কথাই পরবর্ত্তী "যদ্‌গৃহীতম্" এই শ্লোকের দ্বারা কোনরূপ দৃষ্টান্তের অবতারণা না করিয়া সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে; এইজন্য ভাষ্যকার পরবর্ত্তী শ্লোকের প্রদর্শনই লাঘবের অনুরোধে সমীচীন মনে করিয়াছেন।

অর্থজ্ঞানরহিত বেদের যে অধ্যয়ন, তাহা নিষ্ফল—এই সিদ্ধান্তে নিরুক্তকার যাস্ক এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের 'মন্ত্র-লিঙ্গাধিকরণে' * অর্থের স্মারকরূপে যজ্ঞকর্ম্মে মন্ত্রের উপযোগ স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়,—যাহার অর্থজ্ঞান নাই, তাহার উচ্চারিত মন্ত্রের কোন ফল নাই, সেইরূপ ব্যক্তির উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিয়াও সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল।

কিন্তু এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় আছে। যে ব্রহ্মতেজের কামনা করে, সেইরূপ বালকের পঞ্চম বর্ষে উপনয়ন দেওয়ার বিধান শাস্ত্রে আছে†। পঞ্চম বর্ষের বালকের যদি উপনয়ন হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সন্ধ্যাবন্দনা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু পঞ্চম বর্ষের বালকের পক্ষে গায়ত্রী কিংবা সন্ধ্যাবন্দনার সমস্ত মন্ত্রের অর্থজ্ঞান সম্ভাবিত নহে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—যে সকল শাস্ত্রকার পঞ্চমবর্ষের বালকের উপনয়নের বিধি বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা অভিপ্রেত যে, এই উপনীত বালকের অর্থ-জ্ঞান না থাকিলেও গায়ত্রী কিংবা সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রের কেবল উচ্চারণের দ্বারাই সন্ধ্যাবন্দনার ফললাভ হইবে। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, অর্থজ্ঞান না থাকিলেও অবস্থা-বিশেষে মন্ত্রের উচ্চারণ সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয় না। তবে যাহার অর্থজ্ঞান আছে, তাহার মন্ত্রপাঠে বিশিষ্ট ফললাভ হইবে। নিরুক্তকার এবং মহাভাষ্য-কারের অভিপ্রায়ও এস্থলে এই ভাবেই ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত।

---

* "গৃহীতং শব্দতঃ, অবিজ্ঞাতং তু অর্থতঃ।"—শব্দকৌস্তুভ ১।১

"তত্র গৃহীতং শব্দতঃ, অবিজ্ঞাতমর্থত ইতি বোধ্যম্।—মহা-ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত ১।১

"গৃহীতং শব্দতঃ। অবিজ্ঞাতমর্থতঃ প্রকৃত্যাদিবিভাগেন চেত্যর্থঃ।—ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি ১।১

† এইরূপ একটি শ্লোক সুশ্রুতসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী, ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য, চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্ বহন্তি।"—

চন্দনভারের বাহক গর্দ্দভের যেরূপ ভারেরই জ্ঞান থাকে—চন্দনের কোন জ্ঞান থাকে না, এইরূপ যে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাহার অর্থে অনভিজ্ঞ থাকে, সে ব্যক্তি গর্দ্দভের ন্যায় কেবল বহন করে অর্থাৎ তাহার সে অধ্যয়ন কেবল বৃথা পরিশ্রম হয়, তাহার দ্বারা সেই ব্যক্তির কোন লাভ হয় না।

* পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন ১ম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ; ৩১—৫৩ সূত্র।

† "ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।

—মনুসংহিতা ২।৩৭

পূর্ব্বমীমাংসার মন্ত্রলিঙ্গাধিকরণে অর্থের স্মারকরূপে মন্ত্রের সার্থক্য স্বীকৃত হইলেও, স্থল-বিশেষে অর্থের প্রকাশ না করিলেও মন্ত্রের ব্যর্থতা অঙ্গীকৃত হয় নাই; অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মের জনকরূপেও স্থল-বিশেষে মন্ত্রের উপযোগ আছে, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে*। অতএব আমরা এ স্থলে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি যে, অর্থজ্ঞান না থাকিলেও মন্ত্রের উচ্চারণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না; তবে অর্থজ্ঞান থাকিলে মন্ত্রের উচ্চারণ হইতে যেরূপ প্রকৃষ্ট ফলের লাভ হয়,—যাহার অর্থজ্ঞান নাই—তাহার উচ্চারিত মন্ত্র সেইরূপ প্রকৃষ্ট ফলের সাধক হয় না।

মূল।—'যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে'

যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে
শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ।

অনুবাদ।—যে নিপুণ (ব্যক্তি) শব্দ প্রয়োগের সময়ে (অর্থ-) বিশেষে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করেন সেই বাগ্যোগবিদ্ পরলোকে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হ'ন, অপ-শব্দ অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দের দ্বারা দূষিত হ'ন।

ব্যাখ্যা।—ব্যাকরণে যে শব্দ যে অর্থে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির বিভাগের দ্বারা ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, সেই শব্দ সেই অর্থে সাধুশব্দ অর্থাৎ শুদ্ধ শব্দ; সেই অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ করিলে, ব্যাকরণ-ব্যুৎপাদিত হইলেও ব্যাকরণের অনভিমত সেই-রূপ অর্থে সেই শব্দ অপশব্দ অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দ। বর্ত্তমান কালে প্রথম পুরুষের এক বচনে 'ভবতি' শব্দ ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত হইয়াছে; 'ভবতী' এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তির এক বচনেও 'ভবতি' এই-রূপ ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এই ব্যাকরণ-সম্মত অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থে যদি 'ভবতি' এই শব্দটির প্রয়োগ করা হয়, তবে সেটি অপশব্দের মধ্যে পরিগণিত হইবে অর্থাৎ কেহ যদি 'ত্বং ভবসি' এইরূপ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে 'ত্বং ভবতি' এইরূপ প্রয়োগ করেন, তবে তাহা অশুদ্ধই হইবে।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

* ভাট্টদীপিকা—১ম অধ্যায়—২য় পাদ—৪র্থ অধিকরণ।

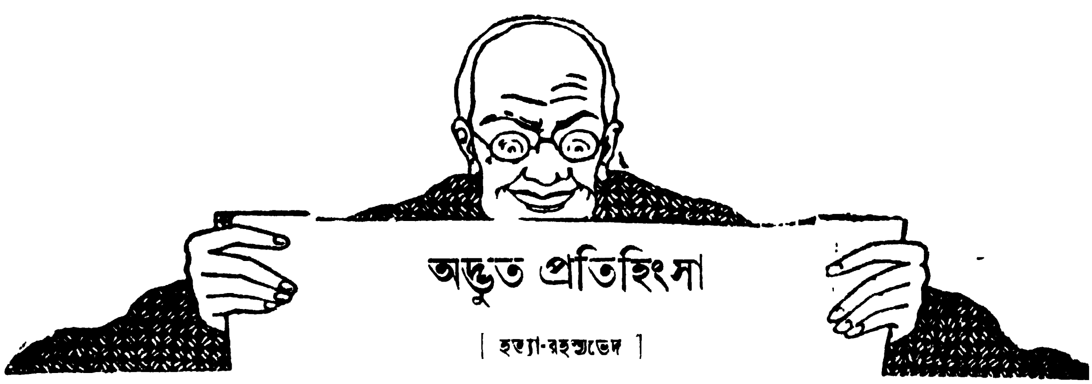
অদূরবর্ত্তিনী

আজকে যেন সব প্রাণময় পাষাণ-বুকে সংজ্ঞা জাগে,
ক'রছে সূচীভেদ্য আঁধার আবাহন-আভা কোন্ দিবাকে।
দীন চকোরের ক্ষীণ ডাকে হায়—
চাঁদের সুধা আজ উথলায়,
শুষ্ক তৃণের কাতরতায় জলদ-জালে টান যে লাগে।

সুফল বুঝি ফলবে আহা যুগের যুগের তপস্যারি,
গঙ্গা আজি নাম্‌বে ধরায় আভাস যে তার ওই নেহারি।
তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গ কেন
চঞ্চল আজ লাগ্‌ছে হেন,
অনাগত তরঙ্গেরি হিল্লোলে বুক দুল্‌ছে আগে?

আস্‌ছে কে ওই, হাস্‌ছে কে ওই, শুনি কাহার নূপুর-ধ্বনি
কাহার চরণ-পরশ পেয়ে ধন্য হবে এই অবনী?
দেবীর ভালে চন্দ্রলেখা
আঁধার ভেদি দিচ্ছে দেখা—
অভয় এবং আশীর্ব্বাদ ওই ঝরছে গ'লে অনুরাগে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।



অদ্ভুত প্রতিহিংসা

[হত্যা-রহস্যভেদ]

মিষ্টার এফ্. ডব্লু. গ্যালওয়ে কিছু দিন পূর্ব্বে বিহারের কোন জিলার পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তাঁহার এলাকাস্থিত কোন থানার ভারপ্রাপ্ত একটি মুসলমান দারোগা একটি হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার পাইয়াছিল। এই দারোগাটি হত্যাকাণ্ডের যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা এরূপ অকাট্য যে, সেই সকল প্রমাণে নির্ভর করিয়া জজ ও জুরীরা আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করিতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মিঃ গ্যালওয়ে স্বয়ং এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার গ্রহণ করিয়া যে ভাবে প্রকৃত অপরাধীর অপরাধ প্রতিপন্ন করেন, তাহা গোয়েন্দাগিরিতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয়সূচক। মিঃ গ্যালওয়ে সংপ্রতি লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় এই হত্যা-রহস্যভেদের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্য তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল। এই বিবরণে মিষ্টার গ্যালওয়ে নিজের ও পক্ষগণের নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, ঘটনার প্রত্যেক বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য, এবং তাঁহার কোন কথা অতিরঞ্জিতও নহে। এই বিবরণে তিনি থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে মহম্মদ আলি, এবং তাহার উপরওয়ালা পুলিশ-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টকে (অর্থাৎ নিজেকে) মিষ্টার রেনল্ডস্ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মিষ্টার গ্যালওয়ে লিখিয়াছেন, "রামপ্রসাদ নামক একটি লোক কোন গ্রামে বাস করিত। লোকটি বৃদ্ধ, এবং তাহার জীবন শান্তিতেই অতিবাহিত হইতেছিল; তাহার জীবনে কোন বৈচিত্র্য ছিল না, এবং তাহার কোন কার্য্যে কোন দিন গ্রামবাসীদের মনোযোগও আকৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সে হঠাৎ নিহত হওয়ায় তাহার হত্যাকাণ্ডে গ্রামে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল।

এই সময় গ্রামস্থ থানার কার্য্যভার যে দারোগার হস্তে ন্যস্ত ছিল, ধরিয়া লউন—তাহার নাম মহম্মদ আলি। সে তরুণ যুবক; কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দারোগা বলিয়া তাহার সুনাম থাকিলেও পুলিশের জটিল কার্য্যে তাহার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। যে সকল কর্ম্মচারী পুলিশ বিভাগের নিম্নতর পদে নিযুক্ত থাকিয়া যোগ্যতাবলে দারোগার পদে উন্নীত হয়, মহম্মদ আলি সেই শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল না; সে পুলিশ-ট্রেণিং স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া একেবারেই পুলিশের সাব-ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। এ জন্য পুলিশের কার্য্যের 'দাঁড়া-দস্তুর' (methods) তাহার জানা থাকিলেও কেতাবী-বিদ্যার বাহিরে হাতে-কলমে যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, এবং মনুষ্যচরিত্র অধ্যয়নের সুযোগও সে লাভ করিতে পারে নাই। এই জন্য তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা অনেক সময় নিজের খেয়ালেই চলিত, এবং তাহাকে যাহা বুঝাইয়া দিত, সে তাহার ত্রুটি ধরিতে পারিত না।

মহম্মদ আলি হাতে-কলমে কাজ করিতে গিয়া দেখিল—অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা বড় কঠিন ব্যাপার, এজন্য পদে পদে তাহার চেষ্টা বিফল হইত; এবং এই ভাবে সে অকৃতকার্য্য হওয়ায় তাহার এলাকায় অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল। ইহাতে সে নিরুৎসাহ হইলেও কিছু দিন পরে তাহার হাতে এরূপ একটি 'কেস' আসিল, যাহার তদন্ত-কার্য্যে সে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবে বলিয়াই আশা করিল, এবং উৎসাহের সহিত তদন্ত-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

এক দিন প্রভাতে গ্রাম্য চৌকিদার থানায় আসিয়া দারোগা মহম্মদ আলিকে সংবাদ দিল—রামপ্রসাদ নামক এক জন লোকের মৃতদেহ একটি কূপের ভিতর পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। সেই ব্যক্তি কূপে লাফাইয়া-পড়িয়া আত্মহত্যা করে নাই—ইহার প্রমাণ এই যে, তাহার মৃতদেহে আঘাত-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সে কূপের ভিতর কয়েক দিন পড়িয়া ছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কূপটি গ্রাম হইতে কিছু দূরে থাকায় গ্রামের লোক-জনকে প্রায়ই সেই কূপের জল ব্যবহার করিতে হইত না।

এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ আলি অবিলম্বে তদন্ত আরম্ভ করিল। তাহার পর সন্ধান করিতে করিতে সে যে সূত্র আবিষ্কার করিল, তাহা হইতে তাহার সন্দেহ হইল, সেই গ্রামেরই কোন লোক বৃদ্ধকে হত্যা করিয়াছিল। পুলিশের কার্য্যে মহম্মদ আলিরও গুপ্তচর ছিল। সেই গুপ্তচরের নিকট সে জানিতে পারিল—রামপ্রসাদের পরিবারবর্গের সহিত গ্রামস্থ আর এক জন লোকের দীর্ঘকাল হইতে প্রবল বিরোধ চলিতেছিল,—তাহার নাম ইমামবক্স।

সকল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইমামবক্স সম্বন্ধে দারোগার সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল। এক জন গ্রামবাসী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংবাদ দিল—প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে দুই জন অপরিচিত ব্যক্তিকে ইমামবক্সের ঘরে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। আর এক জন গ্রামবাসী দারোগার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল—সে এক দিন রাত্রিকালে তাহার শস্যক্ষেত্র হইতে বুনো শূয়োর তাড়াইবার জন্য মাঠে যাইবার সময় দেখিতে পায়—তিন জন লোক ইমামবক্সের বাড়ীর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; সেই তিন জনের এক জন যে স্বয়ং ইমামবক্স—ইহা সে হলপ করিয়া বলিতে পারে।

গ্রাম্য চৌকিদার যে অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, রাত্রিকালে সে না ঘুমাইয়া সারারাত্রি গ্রামের ভিতর চৌকি দিয়া বেড়ায়, ইহা প্রতিপন্ন

করিবার জন্য সে দারোগাকে জানাইল—সে পাহারায় বাহির হইয়া সেই তিন জন লোককেই দেখিতে পাইয়াছিল; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহারা মিশিয়া যাওয়ায়, সে দীর্ঘকাল তাহাদের উপর নজর রাখিতে পারে নাই। বিশেষতঃ, তখন পর্য্যন্ত কাহাকেও সন্দেহ করিবার কারণ না থাকায়, সে তাহাদিগকে চিনিবারও চেষ্টা করে নাই; তবে এখন তাহার মনে হইতেছে—তাহাদের এক জনকে সে খোঁড়াইতে দেখিয়াছিল; কিন্তু সে কে, তাহা কিরূপে বলিবে?—ইমামবক্স খোঁড়া ছিল—ইহা সকলেই জানিত।

চৌকিদারের কথা শুনিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার উপায় ছিল না; কিন্তু মহম্মদ আলি বুঝিতে পারিল—চৌকিদারের এই বিবৃতি তাহার সিদ্ধান্তের অনুকূল। এইজন্য সে কর্ত্তব্যানুরোধে ইমামবক্সের ঘর খানাতল্লাস করিল। অবশেষে সে ইমামবক্সের গোশালায় প্রবেশ করিয়া চালের দিকে চাহিতেই 'চালের বাতায়' একখানি লাঠী পাইল; লাঠীখানা রক্ত-মাখা! লাঠীখানি বেশ ভারী, এবং তাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত, তাহার মাথা পিত্তল-মণ্ডিত।

এই লাঠী পাওয়ায় দারোগার ধারণা হইল—ইমামবক্সই প্রকৃত অপরাধী; কারণ, গ্রামের পাঁচ-ছয় জন লোক সেই লাঠী দেখিয়া সনাক্ত করিল—উহা ইমামবক্সেরই লাঠী বটে। তাহারা সকলেই জানিত, সেই লাঠী ইমামবক্সের ভ্রমণের সঙ্গী। দারোগা এবার ইমামবক্সের অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সদরে চালান দিল। মহম্মদ আলি শোণিত-রঞ্জিত লাঠীখানা কাগজ দ্বারা মুড়িয়া সেই সঙ্গে সদরে পাঠাইয়া তাহার উপরওয়ালাকে অনুরোধ করিল—লাঠীখানাতে যদি অঙ্গুলি-চিহ্ন থাকে, তবে অঙ্গুলিচিহ্নের বিশেষজ্ঞ যেন তাহা পরীক্ষা করেন; এবং তাহাতে যে রক্ত লাগিয়াছিল, তাহা যেন রাসায়নিক পরীক্ষাগারের রসায়নবিৎ দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।—এই সকল কাজ শেষ করিয়া মহম্মদ আলি ঘটনার পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার তদন্ত-কার্য্য যে সম্পূর্ণ নিখুঁত হইয়াছিল, এবং ইমামবক্সের নিষ্কৃতিলাভের কোনও উপায় ছিল না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল।

যথাসময়ে রামপ্রসাদের শব-ব্যবচ্ছেদের 'রিপোর্ট' মহম্মদ আলির হস্তগত হইল। সেই রিপোর্ট পাঠে সে জানিতে পারিল—কোন ভারী ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। লাঠীতে যে অঙ্গুলি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইল, তাহা ইমামবক্সেরই অঙ্গুলি-চিহ্ন! সুতরাং ইমামবক্স যে-জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে তাহার মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা রহিল না। গ্রামের জনসাধারণ দারোগার সহিত একমত হইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—দায়রার বিচারে কি ফল হইবে, বিচারের পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।—ইমামবক্সের ফাঁসি হইবে—এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

এত-বড় একটা খুনের 'কিনারা' করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া সাব্-ইন্‌স্পেক্টর মহম্মদ আলির আনন্দের সীমা রহিল না; এই ভাবে আর দুই-একটা হত্যাকাণ্ডের অপরাধীকে ধরিয়া দিতে পারিলে তাহার প্রমোশন অপরিহার্য্য, এ বিষয়েও তাহার সন্দেহ রহিল না। আর কয়েক বৎসর এইরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে সে বহু 'সিনিয়র' দারোগাকে অতিক্রম করিয়া ইন্‌স্পেক্টর, এবং ইন্‌স্পেক্টর হইতে পুলিসের ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবে; পরে নববর্ষ-দিনের 'গেজেট' খুলিয়াই দেখিতে পাইবে—সরকার তাহাকে 'খাঁ বাহাদুর' খেতাবে বিভূষিত করিয়াছেন!—সে মনের সুখে আকাশে কেল্লা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। সে ইংরেজী ভাষা ভাল জানিত না; কিন্তু এত-বড় একটা তদন্ত-ব্যাপারে সে পুলিশের কর্তৃপক্ষকে তাহার ইংরেজি বিদ্যার দক্ষতায় চমৎকৃত করিবার জন্য তাহার মাতৃ-ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষায় শেষ-ডায়েরী লিখিয়া সদর-আফিসে পাঠাইয়া দিল।

জিলা পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ রেনল্ডস্ তাঁহার সদর-আফিসে ইমামবক্সের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় রত ছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই সকল প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার মুখ গম্ভীর ও ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তিনি সাব-ইন্‌স্পেক্টর মহম্মদ আলি-প্রেরিত রিপোর্ট পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া, তাঁহার তামাকের পাইপটা মুখ হইতে বাহির করিয়া টেবলের উপর নামাইয়া রাখিলেন এবং সাব-ইন্‌স্পেক্টরকে লক্ষ্য করিয়া 'গাধা' বলিয়া হুঙ্কার দিলেন।

পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট রেনল্ডস্ যে বৃহৎ জিলার শান্তি রক্ষার ভার পাইয়াছিলেন, সেই জিলায় খুন-জখম নিত্যই লাগিয়া থাকিত; অপরাধীসন্দেহে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইত, তিনি তাহাদিগকে বিচারার্থ চালান দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেন। আলোচ্য হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সম্বন্ধে তিনি যে সকল কাগজপত্র পাইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার কেরাণীকে ফেরত দিলেন বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কি আদেশ দিবেন—তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ইমামবক্সের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল—তাহা তাহার কিরূপ প্রতিকূল, ইহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু কিছুকাল চিন্তা করিয়া তাঁহার ধারণা হইল—এই সকল অকাট্য প্রমাণের অন্তরালে যে গভীর রহস্য সংগুপ্ত আছে—দারোগা মহম্মদ আলি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই; সংগৃহীত প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া সে ইমামবক্সকেই বৃদ্ধ রামপ্রসাদের হত্যাকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

এইরূপ চিন্তার পর রেনল্ডস্ সমগ্র 'ফাইল'টি পুনঃগ্রহণ করিয়া, তাহার আদ্যোপান্ত অত্যন্ত সতর্কভাবে আর একবার পাঠ করিলেন, এবং আসামীর বিরুদ্ধে আরোপিত প্রমাণগুলি কি ভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা মনে মনে আলোচনা করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—সাব-ইন্‌স্পেক্টর এই সকল প্রমাণে নির্ভর করিয়া প্রতারিত হইয়াছে; প্রকৃত রহস্যভেদ করিয়া সত্য নির্ণয় করা তাহার অসাধ্য হইয়াছিল।

রেনল্ডস্ সাব-ইন্‌স্পেক্টরের রিপোর্ট পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া তাঁহার কেরাণীকে উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'সাব-ইন্‌স্পেক্টরকে লিখিয়া দাও—তাহার প্রেরিত রিপোর্টে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সে ইংরেজীতে বিদ্যা না ফলাইয়া ভবিষ্যতে তাহার রিপোর্ট যেন উর্দ্দুতেই লিখিয়া পাঠায়। এই মামলা এক সপ্তাহের জন্য মুলতুবি রাখিতে আদালতকে অনুরোধ কর। ইতিমধ্যে আমি অথবা ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সরেজমিনে তদন্ত করিব, এবং সাক্ষীগুলিকে পরীক্ষা করিব। আমি আজ অপরাহ্নে 'ক্লাবে' যাইবার সময় জেলখানায় যাইব, এবং আসামী ইমামবক্স আত্মসমর্থনের জন্য কি বলিতে চাহে—তাহা শুনিয়া লইব।'

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট রেনল্ডস্‌ নির্দ্দিষ্ট সময়ে জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। আসামী ইমামবক্স তখন জেলখানার একটি নিভৃত কক্ষে পা গুটাইয়া বসিয়াছিল। অপরাহ্নের সূর্য্যালোক একটি বাতায়নের ভিতর দিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণ সমূহের গুরুত্ব ইমামবক্সের অজ্ঞাত ছিল না; এই জন্যই সে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল; ভাগ্যে যাহা আছে—ঘটিবে ভাবিয়া সে তখন সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট!

এই সময় পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেণ্ট রেনল্ডসের আদেশে কারা-কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে, ইমামবক্স উঠিয়া-দাঁড়াইয়া দ্বারপ্রান্তে জেলারকে, এবং তাঁহার কিছু দূরে এক জন 'সাহেব'কে দণ্ডায়মান দেখিল। সে তাঁহাদের উভয়কে সেলাম করিলে মিঃ রেনল্ডস্‌ জেলারকে বলিলেন, 'আমি কে, তাহা উহাকে জানাও। আমি উহাকে বাহিরের আঙ্গিনায় লইয়া যাইতে চাই। সেখানে আমি উহার সহিত কোন কোন কথার আলোচনা করিব; অন্য কেহ তাহা শুনিতে না পায়—এইরূপই আমার ইচ্ছা। আমার নিকট কোন দেহরক্ষী থাকিবে না বটে, কিন্তু সে জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই; আমার আত্মরক্ষার শক্তি আছে।'

ইমামবক্স পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্টকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কথাই বলিল না; সে আত্মসমর্থনেরও চেষ্টা করিল না। মিঃ রেনল্ডস্‌ বুঝিতে পারিলেন—পুলিশকে সে আদৌ বিশ্বাস করে না। তাহার মুখে অবজ্ঞার ভাবই পরিস্ফুট হইল। মিঃ রেনল্ডস্‌ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার সহিত সহানুভূতিভরে আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাকে নির্ব্বাক্‌ দেখিয়া বিন্দুমাত্র অসন্তোষ বা অধীরতা প্রকাশ না করিয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ানী মামলা করিয়াছিলে, সেই সকল মামলার নথিপত্র আমি পড়িয়া দেখিয়াছি। রামপ্রসাদের পরিবারবর্গকে তুমি দেখিতে পার না—আমার এই অনুমান কি সত্য নহে?'

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্টের প্রশ্ন শুনিয়া ইমামবক্স কোন কথাই বলিল না; সে নতমস্তকে নির্ব্বাক্‌ ভাবে দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল দিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল।

মিঃ রেনল্ডস্‌ তাহাকে নির্ব্বাক্‌ দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, 'তোমাদের শেষ মামলার বিচার ছয় মাস পূর্ব্বে শেষ হইয়াছে; হাকিম তোমার অনুকূলেই রায় দিয়াছিলেন। জলের দখলি-স্বত্ব তোমাতেই বর্ত্তিয়াছিল। রামপ্রসাদ যে তাহার পর তোমার বিরুদ্ধে মামলা চালাইবে, তাহার উপায় ছিল না। এ অবস্থায় এই নিরুপায় পরাজিত শত্রুর সহিত তোমার বিরোধ চালাইবার কি কারণ ছিল?'

ইমামবক্স মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, 'না, কোন কারণ ছিল না।'

মিঃ রেনল্ডস্‌ বলিলেন, 'দেখ ইমামবক্স, এ পর্য্যন্ত তুমি যে সকল মামলা চালাইয়াছ, প্রত্যেক মামলাতেই তুমি যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছ; বোকামি করিয়া কোন মামলা নষ্ট কর নাই; কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তুমি এ রকম নির্ব্বোধের মতো কাজ করিলে কেন? এই ব্যাপারে আমি তোমার বিন্দুমাত্র দূরদর্শিতার পরিচয় পাই নাই! লাঠীখানা যেখানে রাখিলে অতি সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়—সেখানে তাহা কি জন্য রাখিয়াছিলে? সেই লাঠী ত তোমারই, না তোমার নয়?'

ইমামবক্স বলিল, 'সাহেব, লাঠীখানা যে আমার, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। গ্রামের বিস্তর লোক জানে, ও লাঠী আমারই। কিন্তু আমার লাঠী হারাইয়াছিল, এ কথা বলিলে কে তাহা বিশ্বাস করিত?'

রেনল্ডস্‌ বিস্মিত ভাবে বলিলেন, 'তুমি বলিতেছ কি? মামলার ফলাফল যে ঐ লাঠীর উপরেই নির্ভর করিতেছে!'

ইমামবক্স বলিল, 'তা জানি সাহেব! দারোগা যখন আমার লাঠীর সন্ধান করে—তখন আমি তাহাকে জানাই—আমার লাঠীখান হারাইয়া গিয়াছে। এ কথা শুনিয়া দারোগা হাসিয়া বলিল, "তোমার লাঠী হারাইয়াছে বলিতেছ, ইহার প্রমাণ কোথায়?"—সত্যই তাহার প্রমাণ নাই। পরে বুঝিতে পারি—উহা কেহ চুরি করিয়াছিল। কিন্তু কে আমার কথা বিশ্বাস করিবে? আর এ কথা বলিয়াই বা ফল কি?'

রেনল্ডস্‌ বলিলেন, 'না, এ কথা বলিয়া কোন ফল নাই সত্য; কিন্তু তুমি মুখ তুলিয়া অসঙ্কোচে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার ঐ কথা বলিতে পারিবে? রামপ্রসাদ যে সময় মারা যায়—সে সময় লাঠীখানা তোমার দখলে ছিল না—এ কথা বলিতে তোমার সাহস হইবে কি?'

ইমামবক্স অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার এই আদেশ পালন করিল।

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট বলিলেন, 'উত্তম, এখন তুমি যাইতে পার। আমি নিজেই এই সকল ব্যাপারের তদন্ত করিব।'

অনন্তর ইমামবক্স তাঁহার ইঙ্গিতে প্রহরীকর্ত্তৃক কারাকক্ষে নীত হইল। রেনল্ডস্‌ সঙ্কল্প করিলেন—তাহার বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা প্রমাণ সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল—তিনি তাহার অসারতা প্রতিপন্ন করিবেন।

মিঃ রেনল্ডস্‌ পরদিন প্রভাতে অনুবীক্ষণের সাহায্যে (with a magnifying glass) লাঠীখানার প্রত্যেক অংশ সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর অঙ্গুলিচিহ্ন-পরীক্ষককে জেরা করিলেন। তিনি লাঠীতে একটি বিশেষ চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হওয়ায় তিনি আনন্দিত হইলেন। অঙ্গুলিচিহ্ন-পরীক্ষক তাঁহার উপদেশ শুনিয়া প্রস্থান করিল।

জিলা-পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সরেজমিনে তদন্তে আসিতেছেন শুনিয়া পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টর মহম্মদ আলির আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। সে হত্যাকাণ্ডের তদন্তে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা তাহার উপরওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাহার শ্রম সফল হইবে, ইহা সে পূর্ব্বে আশা করিতে পারে নাই। সে তাহার আফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া খাতা-পত্র সাজাইয়া রাখিল। 'পুলিশ সাহেব' তদন্তে আসিয়া কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি আবিষ্কার করিবেন—তাহার উপায় রহিল না।

দারোগা সাক্ষীগুলিকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে শিখাইয়া-পড়াইয়া ঠিক করিয়া রাখিল। কোন্‌ সাক্ষী কোন্‌ কথার পর কি বলিবে, তাহা তাহারা মুখস্থ করিয়া রাখিল। কিন্তু এত আয়োজন, পরিশ্রম,—সকলই বিফল হইল! পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেণ্ট তখন তদন্তে আসিলেন না। তিনি মামলা-সম্পর্কীয় সকল লোককে

কৌশলে গ্রাম হইতে সরাইয়া দিলেন, তাহার পর এক দিন হঠাৎ এক জন আর্দালী সঙ্গে লইয়া সরেজমিনে তদন্ত করিতে আসিলেন, এবং যে-ভাবে তদন্ত আরম্ভ করিলেন—তাহা সম্পূর্ণ নূতন, এবং দারোগার কল্পনাতীত!

গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেণ্টকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে একটিও অনাবশ্যক কথা বাহির হইল না। সকলেই বুঝিয়াছিল—অধিক কথা বলিলে হয় ত আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইবে; কিন্তু সাক্ষ্য দিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না। তাহাদিগকে স্বল্পভাষী দেখিয়া মিঃ রেনল্ডস্ খুসীই হইলেন।

অতঃপর মিঃ রেনল্ডস্ গ্রামবাসিগণকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন; গ্রামের বহু সাধারণ অধিবাসী ও বালক-বালিকারা কৌতূহলভরে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কূপটি বালুকাপূর্ণ মাঠের ভিতর অবস্থিত ছিল; একটি মেঠো-পথ দিয়া তাঁহাদিগকে সেই কূপের নিকট গমন করিতে হইল। সকলে কূপ হইতে কিছু দূরে থাকিতে মিঃ রেনল্ডস্ তাহাদিগকে সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কেহই কূপের নিকট যাইতে সাহস করিল না।

এবার রেনল্ডস্ তাঁহার আর্দ্দালীকে সঙ্গে লইয়া কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন; আর্দ্দালীর হাতে একটি ছোট পুঁটুলী ছিল। লোকগুলি দূরে দাঁড়াইয়া কৌতূহলভরে তাঁহাদের কাজ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

কূপের নিকট অনেকগুলি পদচিহ্ন ছিল, অধিকাংশই স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন বলিয়া মিঃ রেনল্ডসের ধারণা হইল। যে সকল পদচিহ্ন গ্রামের দিকে প্রসারিত ছিল, মিঃ রেনল্ডস্ সেগুলি লক্ষ্য না করিয়া, কূপ হইতে প্রায় এক শত গজ দূরে গমন করিয়া অর্দ্ধ-চক্রাকারে তাহা ঘুরিয়া দেখিলেন। সেখানে তিনি মানুষের চলিবার একটি পথ দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে থামিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং এক জন গ্রামবাসীকে আহ্বান করিয়া সেই পথের নিকট দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার আর্দ্দালীকে সঙ্গে লইয়া কি দেখিতে দেখিতে সেই পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি, গ্রাম-বাসীরা তাহা বুঝিতে না পারায় অস্ফুট স্বরে আলোচনা করিতে লাগিল।

যে স্থানে দশ-বার জন লোক দাঁড়াইয়াছিল, পুলিশ সুপারিন্-টেন্ডেণ্টের আর্দ্দালী সেই স্থানে আসিয়া দুইটি সঙ্কীর্ণ পথ সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত দেখিয়া উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল! কিছু দূরে মাটী অত্যন্ত কঠিন থাকায় সেখানে পথ অদৃশ্য হইলেও তাহার পর নরম জমি ছিল; এজন্য পথটি পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর হইল। এই পথে খালি-পায়ের চিহ্নগুলি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া গেল, এবং স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল—উভয় পথের ব্যবধানে যে সঙ্কীর্ণ স্থান ছিল—তাহার উপর দিয়া কোন ভারী দ্রব্য টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

রেনল্ডস্ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম—এখানে তাহার অতিরিক্ত কিছু দেখিতেছি! এখন তোমরা কাজে লাগিয়া যাও; আগুন জ্বাল, আমি জন-দুই ভদ্র-লোক ডাকিয়া আনি।'

অতঃপর রন্ধনোপযোগী একটি পাত্র আনীত হইলে পূর্ব্বোক্ত বাণ্ডিলে যে সকল দ্রব্য ছিল, তাহা সেই পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অগ্নির উত্তাপে তাহা তরল হইলে সেই তরল পদার্থ সুপরিস্ফুট পদচিহ্নগুলির উপর ঢালিয়া দেওয়া হইল। কিছু কাল পরে তাহা শীতল হইলে জমিয়া কঠিন হইল। কিন্তু তাহা কঠিন হইবার পূর্ব্বেই দুই জন সাক্ষীর স্বাক্ষরিত একখণ্ড কাগজ সেই পদার্থের উপরের অংশে বসাইয়া দেওয়া হইল। স্থায়ী প্রমাণরূপে সনাক্ত করিবার জন্যই এইরূপ করা হইল; অতঃপর তাহাদের উপর হইতে ময়লাগুলি ধুইয়া ফেলিয়া, সেই কঠিন পদার্থগুলি মাটী হইতে তুলিয়া-লইয়া সতর্কতা সহকারে ঢাকিয়া রাখা হইল। এই কার্য্য শেষ হইলে রেনল্ডস্ তাঁহার অশ্বে আরোহণ করিয়া থানায় চলিলেন। এবার তিনি স্থির করিলেন—সেই সকল পদচিহ্ন কাহাদের, তাহাই তিনি আবিষ্কার করিবেন। কাহারা যে সন্দেহের পাত্র, ইহা তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, মিঃ রেনল্ডস্ যখন সেখানে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বেই সকল কাজ শেষ করিবার জন্য রেনল্ডস্ ব্যগ্রভাবে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিলেন। মহম্মদ আলি তৎপূর্ব্বেই তাহার লোকগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল। রেনল্ডস্ তাহাদের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, এ বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ লক্ষিত হইল না।

রেনল্ডস্ দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাক্ষীরা এখনও এখানে হাজির আছে কি? উহাদিগকে ও-ভাবে আর দাঁড় করাইয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। এই মুহূর্ত্তেই এক জন কন্‌ষ্টেবলকে মোম ও রজন আনিবার জন্য বাজারে পাঠাও।'

তাঁহার আদেশ শুনিয়া সাব-ইন্‌স্পেক্টর গভীর বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া রেনল্ডস্ বলিলেন, 'আমার আদেশ তুমি শুনিতে পাইয়াছ কি? এক সের মোম, এবং এক সের রজন আনাইতে হইবে; কিন্তু কন্‌ষ্টেবলকে বলিয়া দাও, সে যেন বিভিন্ন দোকান হইতে তাহা ক্রয় করে। তাহাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতে বলিবে।'

মহম্মদ আলি এক জন কন্‌ষ্টেবলকে বাজারে পাঠাইবার জন্য ডাকিয়া-আনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাহেব মোম আর রজন লইয়া কি করিবেন?'

কন্‌ষ্টেবল বলিল, 'খোদা মালুম! সাহেব যদি নিজের ইচ্ছায় তাহা না বলেন, তাহা হইলে ও-কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা কি গোস্তাকি হইবে না?'—কন্‌ষ্টেবল তাড়াতাড়ি বাজারে চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে রেনল্ডস্ বারান্দার টেবলের নিকট বসিয়া-পড়িয়া রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে দারোগা মহম্মদ আলিকে বলিলেন, 'মহম্মদ আলি, তুমি তোমার ডায়েরিতে লিখিয়াছ, ইমামবক্সের বাড়ী খানাতল্লাসীর সময় তোমার নিকট আসামী স্বয়ং, দুই জন সাক্ষী, এবং চৌকিদার হাজির ছিল। সে সময় অন্য কোনও লোক সেখানে উপস্থিত ছিল কি?'

মহম্মদ আলি বলিল, 'হাঁ সাহেব, রামপ্রসাদের পুত্র প্রতাপ আমাদের সঙ্গে গিয়াছিল। ঐ যে—সে এখন ওখানে বসিয়া আছে।'—সে অদূরবর্ত্তী একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত করিল।

রেনল্ডস্ বলিলেন, 'খানাতল্লাসীর সময় সে কি সেই কার্য্যে কোন রকম সাহায্য করিয়াছিল ?'

মহম্মদ আলি তৎক্ষণাৎ বলিল, 'না সাহেব, খানাতল্লাস-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে সে যোগদান করে নাই। আমাদের সঙ্গে যে চৌকিদার ছিল, সে গোয়াল-ঘরের চালের এলোমেলো ভাবের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।'

রেনল্ডস্ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চৌকিদারের মুখের দিকে চাহিলেন।

চৌকিদার বলিল, 'হাঁ হুজুর, প্রতাপ আমার সঙ্গে এই সকল কথার আলোচনা করিতে করিতে গোয়াল-ঘরের চালের দিকে চাহিলে সেই দিকে আমারও নজর পড়িল।'

রেনল্ডস্ দারোগাকে বলিলেন, 'যে লাঠী পাওয়া গিয়াছিল, সেই লাঠী তুমি ভিন্ন আর কেহই হাত দিয়া স্পর্শ না করে—এ বিষয়ে তুমি কি সতর্ক ছিলে, মহম্মদ আলি ?'

মহম্মদ আলি বলিল, 'হাঁ সাহেব, ইহা আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি। আমি নিজের হাতে তাহা টানিয়া বাহির করি, এবং সেই সময় তাহাতে রক্তের দাগ দেখিতে পাই। তাহার পর সেই লাঠী আর কেহ স্পর্শ করে নাই।'

রেনল্ডস্ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'তুমি নিজের হাতে তাহা টানিয়া বাহির করিয়াছিলে বলিলে; লাঠীর মাথার দিকটা ধরিয়া টানিয়াছিলে, না সরু দিকটা ধরিয়াছিলে ? স্মরণ করিয়া ঠিক উত্তর দাও।'

মহম্মদ আলি ধাঁধায় পড়িয়া বলিল, 'লাঠীখানার পিতল চক্‌চক্ করিতেছিল—তাহাতেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। লাঠীর অবশিষ্ট অংশ ঢাকা ছিল। আমি তাহার দুই মুড়া হাত দিয়া ধরিয়াছিলাম; উহার মধ্যস্থল স্পর্শ করি নাই। উহা দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছিল, উহাতে অঙ্গুলি-চিহ্ন আছেই !'

রেনল্ডস্ বলিলেন, 'প্রতাপ কি করিল ? উহা কি আসামীরই লাঠী বলিয়া সনাক্ত করিল ?'

মহম্মদ আলি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, সে তাহা করে নাই, সাহেব! কিন্তু দুই জন সাক্ষীই, এবং যাহারা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল—তাহারাও সকলে জানিত—উহা ইমামবক্সেরই লাঠী। তা ছাড়া, বিশেষজ্ঞেরও রিপোর্ট আছে সার !'

পুলিশ-সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট তাহার কার্য্যতৎপরতায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া তাহার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের চিহ্ন লক্ষিত হইল। এই সকল অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও সাহেব কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছেন ? তাঁহার উদ্দেশ্যই বা কি ?—দারোগা নতমস্তকে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

রেনল্ডস্ দারোগাকে বলিলেন, 'এক বালতি সূক্ষ্ম বালি আনাইয়া তাহা এক ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটীতে ছড়াইয়া দাও। এখন আমি কোন সাক্ষীকে জেরা করিব না। উহাদের প্রত্যেকে কি সাক্ষ্য দিবে, তাহা তোমার ঠিক জানা আছে, মহম্মদ আলি! যাহারা লাঠী সনাক্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে, চৌকিদারকে এবং প্রতাপকে ঐ দল হইতে বাছিয়া লও। নামগুলি লিখিয়া সেই ভাবে পর পর উহাদিগকে দাঁড় করাও। অন্য সকলে তফাতে অপেক্ষা করিতে পারে।'

রেনল্ডসের আদেশ অনুসারে ছয় জন লোককে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্থাপন করা হইল। পুলিশ-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অতঃপর কি করিবেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। পুলিশের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা কিছু দূরে দাঁড়াইয়া রেনল্ডসের কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিল। রেনল্ডসের আদেশে যে বালিগুলি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল—সেই দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বালি আনিয়া ঐ ভাবে ছড়াইবার কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না। মিঃ রেনল্ডসের পকেট হইতে কাগজ-জড়ান পার্শেলটির এক অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই বা কোন্ কাজে লাগিবে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না।

কিন্তু তাহাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইল না; কারণ, অতঃপর এক জনের নাম ধরিয়া ডাক পড়িতেই উক্ত ছয় জনের এক জন সাড়া দিল। মিঃ রেনল্ডস্ তাহাকে প্রসারিত বালুকারাশির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার আদেশ করিলেন। সেই ব্যক্তি এই আদেশ পালন করিলে মিঃ রেনল্ডস্ উঠিয়া-গিয়া সেই ব্যক্তির পদচিহ্নের সহিত তাঁহার পকেটস্থিত পার্শেলের ছাঁচ সতর্ক ভাবে মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

এই কার্য্য শেষ হইলে মিঃ রেনল্ডস্ সেই সাক্ষীটিকে বিদায় দান করিয়া বালিগুলি সেই স্থান হইতে ঝাড়িয়া-ফেলিতে আদেশ করিলেন; প্রসারিত বালুকারাশি অপসারিত হইলে আবার বালি ছড়াইয়া দেওয়া হইল, এবং দ্বিতীয় সাক্ষীকে তাহার উপর দিয়া পূর্ব্ববৎ হাঁটিয়া যাইতে বলা হইল। সে এই আদেশ পালন করিলে তাহার পদচিহ্নও পূর্ব্ববৎ তাঁহার পকেটের ছাঁচের সহিত তিনি মিলাইয়া দেখিলেন।

অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তির পালা। সে ঐভাবে নূতন এক স্তর বালির উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যাইবার পর মিঃ রেনল্ডস্ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল সেই পদচিহ্নগুলি বিভিন্ন দিক হইতে সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার পকেটস্থিত পার্শেলের ছাঁচের সহিত মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি মাথা তুলিয়া দারোগা মহম্মদ আলির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তুমি এই সাক্ষীর অঙ্গুলীর ছাপ লইবে, মহম্মদ আলি! আমি উহার দুই হাতের সকল অঙ্গুলীরই ছাপ চাই।'

এ কথা শুনিয়া দারোগা গভীর বিস্ময়ে মুখ-ব্যাদান করিল। কিন্তু সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের আদেশের প্রতিবাদ করিবে, তাহার সেরূপ সাহস ছিল না; তাঁহার আদেশ পালন না করিয়া তাহার নিষ্কৃতি ছিল না। সে তাঁহার এই আদেশ পালন করিতে যাইবে—সেই সময় মিঃ রেনল্ডসের আর্দ্দালী কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, সে তাঁহার ইঙ্গিতে রন্ধনযোগ্য একটি হাঁড়ি লইয়া আসিল—এবং বাজার হইতে যাহা কিনিয়া আনা হইয়াছিল—তাহার বাণ্ডিল খুলিতে আরম্ভ করিল; তাহা পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে জ্বাল দিয়া তরল হইলে মিঃ রেনল্ডস্ স্বয়ং সেই উত্তপ্ত তরল পদার্থ তৃতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নের উপর ঢালিয়া দিলেন। যতক্ষণ তাহা শীতল না হইল—ততক্ষণ তিনি অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিলেন; শীতল হইলে বাদামী-রঙ্গের সেই পদার্থটি তুলিয়া লইলেন—তাহা তখন শক্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহার ধূলা-ময়লা ঝাড়িয়া-ফেলিয়া খানিক জল আনিতে আদেশ করিলেন। পাঁচ-সাত জন লোক জল আনিবার জন্য দৌড়াইয়া গেল।

কিন্তু মিঃ রেনল্ডসের পরীক্ষা তখনও শেষ হয় নাই। তিনি পুনর্ব্বার বালির স্তর মুছিয়া সেখানে নূতন বালি ছড়াইয়া তাহার

উপর দিয়া চতুর্থ সাক্ষীকে পরিচালিত করিলেন; কিন্তু অবিলম্বেই তাহাকে বিদায় দান করা হইল। অতঃপর পঞ্চম সাক্ষীর পালা আসিল। সে ঐ ভাবে বালুকা-স্তরের উপর দিয়া চলিয়া যাইবার পর প্রতাপই কেবল বাকি রহিল।

প্রতাপ ঐ ভাবে বালির উপর দিয়া চলিয়া যাইবার পর রেনল্ডস্ উৎসাহভরে সোজা হইয়া বসিয়া, তাহাকে ফিরিয়া-আসিতে আদেশ করিলেন। তখন মহম্মদ আলি তাহার আঙ্গুলের ছাপ লইবার জন্য তাহাকে টেবলের নিকট লইয়া গেল। অতঃপর তাহার পদচিহ্ন গ্রহণের জন্য মোম ও রজন পূর্ব্ববৎ অগ্নির উত্তাপে তরল করিয়া তাহার পদচিহ্নের উপর ঢালিয়া দেওয়া হইল।

এইবার মিঃ রেনল্ডস্ দারোগাকে বলিলেন, 'মহম্মদ আলি, তুমি তোমাদের স্কুলে অঙ্গুলি-চিহ্নসমূহ তুলনা করিতে শিখিয়াছিলে। তুমি অঙ্গুলীর যে সকল ছাপ লইয়াছ, এইগুলির সহিত তাহাদের তুলনা কর।'—এই কথা বলিয়া তিনি একখানি লেফাপার ভিতর হইতে অঙ্গুলি-চিহ্নিত কয়েকখানি ফটো বাহির করিয়া মহম্মদ আলির হস্তে প্রদান করিলেন। তাহার পর একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া ধূমপান করিতে করিতে কৌতূহলভরে দারোগার কাজ দেখিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট পরে মহম্মদ আলি রেনল্ডসের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল—তিনি দুইটি পদচিহ্নের ছাঁচ পাশে রাখিয়া অঙ্গুলি সরাইয়া ফেলিয়াছেন।

দারোগা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত বিব্রত ভাবে বলিল, 'আমার ভুল হইতে পারে সার! কারণ, আমি এ বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞ নহি। কিন্তু আমার ধারণা, আমি শেষ লোকটির যে সকল অঙ্গুলীর ছাপ লইয়াছি, তাহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলীর ছাপ এই ফটোর ছাপের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে।'

রেনল্ডস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ডান হাতের, না বাঁ হাতের অঙ্গুলীর ছাপ?'

দারোগা বলিল, 'ডান হাতের। কিন্তু আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি সার, হত্যাকাণ্ডের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ?'

রেনল্ডস্ তাহার এই প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, 'এখন পদচিহ্নের এই ছাঁচগুলি মিলাইয়া দেখ।"

মহম্মদ আলি তাহা মিলাইয়া দেখিয়া বলিল, "হাঁ, ঠিক একই রকম বটে; এমন কি, বুড়ো আঙ্গুলের নীচে যে কাটা দাগটি আছে, তাহা পর্য্যন্ত মিলিয়া গিয়াছে সার! আগাগোড়া মাপেরও কোন পার্থক্য নাই।"

রেনল্ডস্ বলিলেন, 'এই সাক্ষীর কি নাম দেখিয়া রাখ; কিন্তু এখন কোন কথা প্রকাশ করিও না। উহাদের প্রত্যেকেই এখানে আসুক, তখন আমি বলিব—তোমার নিকট কি গোপন করা হইয়াছে। ইমামবক্স যে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী নহে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি।'

দারোগা বলিল, 'কিন্তু আমি যথাযোগ্য সম্মান সহকারেই আপনাকে জানাইতেছি, তাহার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা অকাট্য; সেই প্রমাণ খণ্ডন করা হয় নাই সার!'

রেনল্ডস অবিচলিত স্বরে বলিলেন, 'কিন্তু তোমার মন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত আছে মহম্মদ আলি! আমার ধারণা ছিল—এ পর্য্যন্ত যাহা করা হইল, তাহার ফলে সত্যের আলোকে তোমার মত নির্ব্বোধকেও রহস্যের অন্ধকারে পথ দেখাইতে পারিবে। এখন তুমি একটু বুদ্ধি খরচ কর দেখি।'

অতঃপর মিঃ রেনল্ডস্ অন্য সকলের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে আদেশ করিলেন, 'রামপ্রসাদের পুত্র প্রতাপ, তুমি উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াও। তোমাকে আমার কোন কোন কথা বলিবার আছে। অন্য যাহারা এখানে হাজির আছে—তাহারাও আমার কথা শুনিতে পারে। কিন্তু আমার কথাগুলি বলিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি আর একটা ল্যাম্প চাই। তাহা উঁচু করিয়া ধরিতে হইবে, যেন আমি প্রতাপের মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।'

পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের আদেশ শুনিয়া প্রতাপ অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ল্যাম্পের আলোক তাহার মুখের উপর পড়িল, এবং সেই আলোকে তাহার পশ্চাৎস্থিত অন্যান্য লোকগুলিকেও দেখিতে পাওয়া গেল। এক জন কনষ্টেবল বারান্দার ধারে দাঁড়াইয়া, হরিকেন-লণ্ঠনটা প্রসারিত হস্তে উঁচু করিয়া ধরিয়া রহিল। দারোগা মহম্মদ আলি পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে বসিয়াছিল; তাহার মুখে ভয় ও দুশ্চিন্তা পরিস্ফুট। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা সে তখনও বুঝিতে পারে নাই!

রেনল্ডস্ তাঁহার মুখ হইতে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা বাহির করিয়া লইলেন। দর্শকগণ স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর রেনল্ডস্কে মুখ তুলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতে দেখিয়া ভয়ে সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, তাহাদের বুক কাঁপিতে লাগিল। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না; কিন্তু প্রত্যেকেরই আশঙ্কা হইল—তাহাকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হরিকেন-লণ্ঠনের অস্ফুট আলোকে অদূরে দণ্ডায়মান প্রত্যেক ব্যক্তির মুখ একে একে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার দৃষ্টি সোপানের উপর দণ্ডায়মান প্রতাপের মুখের উপর সন্নিবিষ্ট হইল।

রেনল্ডস্ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'প্রতাপ, যে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে—সে তোমার পিতা; এবং যে ব্যক্তি তোমার পিতার হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে, সে তোমার শত্রু, তোমাদের সমগ্র পরিবারেরই শত্রু; এ কথা কি সত্য নহে? তোমরা পরস্পরকে দীর্ঘকাল হইতে শত্রু-বোধে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছ। এই ঘৃণার কথা তোমাদের কাহারও অজ্ঞাত নহে। তোমরা যে সকল মামলা করিয়া আসিয়াছ, সেই সকল মামলার নথি-পত্রেও ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। জলের দখলি-স্বত্ব লইয়া যে মামলা হইয়াছিল, সেই মামলায় আদালতের বিচারে তোমাদের পরাজয় হইয়াছিল, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তুমি এবং তোমার আত্মীয়গণ সেই মামলার আপীলে কোন সুফলের আশা না থাকায় ইমামবক্সের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভের কি উপায় থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়াছিলে।

'সে গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তোমাদিগকে দেখিতে পাইলে তোমাদের পরাজয়ের জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, তোমাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিত; কিন্তু তোমরা ইহার প্রতিকারের কোন উপায়

স্থির করিতে পারিতে না, এবং পাছে তোমাদিগকে সন্দেহ করা হয়, এই ভয়ে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতে না। অবশেষে তোমরা ভাবিয়া দেখিলে—এখানকার থানার দারোগাটি অদূরদর্শী, ছোকরা কর্মচারী, তাহার চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করা সহজ হইবে। এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের বাড়ীতে তোমার যে বুড়া বাপ ছিল, তাহার অবস্থার কথা তোমার স্মরণ হইল; তুমি ভাবিয়া দেখিলে, অক্ষম বৃদ্ধ এখন আর লাঙ্গল বা গরুর গাড়ী চালাইতে পারে না, সে এখন সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য, এবং সংসারের ভারস্বরূপ। সে বসিয়া-বসিয়া উপার্জ্জিত অন্ন ধ্বংস করে; ইহা ভিন্ন তাহার অন্য কোন কাজ নাই! সুতরাং তাহার উপর তোমার দৃষ্টি পড়িল, এবং শয়তান আসিয়া তোমার স্কন্ধে ভর করায়—সেই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধকে কাজে লাগাইবার জন্য তোমার আগ্রহ হইল, শয়তান তোমার কাণে-কাণে বলিল—এই বুড়াকে সরাইয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই; তাহার দ্বারাই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

'কিন্তু এজন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে; সুতরাং তোমাকে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হইল। অবশেষে সেই সুযোগ আসিল; ইমামবক্সের লাঠিখানা চুরি করিবার সুবিধা হইল। এই লাঠী চুরি করিয়াও তোমাকে কাণ খাড়া করিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইল; কারণ, ইমামবক্স তাহার লাঠী চুরি যাওয়া সম্বন্ধে গ্রামের লোকদের কোন কথা বলে কি না, তাহা জানা প্রয়োজন বলিয়াই তোমার ধারণা হইল। লাঠী-চোর বলিয়া তোমাকে সন্দেহ করা হয় কি না, তাহা জানিবার জন্য তুমি উৎসুক হইবে—ইহা তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ইমামবক্স এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করায় তোমার আশা পূর্ণ হইল।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রেনল্ডস্ ক্ষণকালের জন্য নীরব হইলেন; প্রতাপ এ সকল কথা শুনিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় কনষ্টেবলটা হাত বদলাইয়া হরিকেন-লণ্ঠনটা অন্য হাতে লইল। মহম্মদ আলি অধীর ভাবে এক হাঁটু অন্য হাঁটুর উপর তুলিয়া বসিল। এইবার তাহার মনে হইতে লাগিল, তদন্ত কার্য্যে তাহাকে হয় ত প্রতারিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহার অনুকূলে অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান, তাহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

মহম্মদ আলি ভাবিল, সাহেব অনুমানে নির্ভর করিয়াই ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। অনুমান কখন প্রমাণের স্থান অধিকার করিতে পারে না; সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নাই বুঝিয়া, সে গাঁট হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখে অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। অন্যান্য লোকও ঐরূপই ভাবিতে লাগিল। মহম্মদ আলি আশ্বস্ত চিত্তে তাহাদের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু তাহাদের মুখ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহারা বুঝিয়াছিল, পুলিশ-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট দারোগা মহম্মদ আলি অপেক্ষা অনেক অধিক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং তিনি তাহা সপ্রমাণ করিবারই ব্যবস্থা করিতেছেন।

তাহাদের অনুমান শেষ হইবার পূর্ব্বেই রেনল্ডস্ প্রতাপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'প্রতাপ, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি যে, তুমি হিন্দু হইয়াও তোমার বৃদ্ধ পিতা রামপ্রসাদকে তাহার নিদ্রিত অবস্থায় লাঠী মারিয়া হত্যা করিতে কুণ্ঠাবোধ কর নাই! হাঁ, ঐ লাঠী দিয়াই তাহাকে হত্যা করিয়া তোমার কোন আত্মীয়ের সাহায্যে তাহার মৃতদেহ ঐ কূপের নিকট টানিয়া লইয়া গিয়াছিলে। বালির উপর তোমার পায়ের দাগ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তোমাদের শত্রুই যে তোমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে, ইহার উপযুক্ত প্রমাণের প্রয়োজন হইবে বুঝিয়া, তুমি তাহার সেই লাঠী তাহারই গোয়াল-ঘরের চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলে; তুমি জানিতে, তাহা সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। উহা যে তুমিই সেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, তাহার প্রমাণ এই যে, সেই লাঠীতে রক্তের দাগের ভিতর তোমার তুইটি অঙ্গুলীর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে!'

এবার দারোগা মহম্মদ আলি বিস্ময়ভরে একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রেনল্ডস্ তাহার বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিয়া, অঙ্গুলী-চিহ্নের ফটোর প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'এই অঙ্গুলী-চিহ্নেরই উপর সব নির্ভর করিতেছে; অঙ্গুলী-চিহ্নের বিশেষজ্ঞও উহা লক্ষ্য করে নাই; তোমাকে বেশী দোষী করিতে পারি না।'

অতঃপর রেনল্ডস্ প্রতাপকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'অপরাধী বলিয়া কাহাকে সন্দেহ করা হইবে—তাহা তুমি ভালই জানিতে; এ জন্য কাহারও বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগ করা তুমি আবশ্যক মনে কর নাই। যখন আসামীর বাড়ী খানাতল্লাস হয়, তখন তুমি সেখানে হাজির ছিলে, কারণ, তোমার আশঙ্কা হইয়াছিল—লাঠিখানা সকলের দৃষ্টি এড়াইতেও পারে। উহা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, তাহা তোমার কৌশলেই ধরা পড়িলেও তুমি এরূপ চতুর যে, লাঠীখান নিজে সনাক্ত কর নাই; গ্রামের সকলেই জানিত, উহা ইমামবক্সেরই লাঠী। কিন্তু অতিরিক্ত সতর্ক হইয়াই তুমি ভুল করিয়াছ। আমার বয়স নিতান্ত অল্প নয়, কিন্তু তোমার মত হীনপ্রবৃত্তির ইতর মানুষ জীবনে দেখি নাই,—নিজের বাপকে হত্যা করিবার জন্য লাঠী তুলিতে তোমার হাত হইতে লাঠী খসিয়া পড়িল না,—তোমার হাত আড়ষ্ট হইল না, ইহাই আশ্চর্য্য!'

রেনল্ডসের কথা শুনিয়া অন্যান্য লোক সেই পিতৃহন্তার ছায়া স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

রেনল্ডস্ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 'ওরে পিতৃহন্তা! তোর আর কি বলিবার থাকিতে পারে?'

দুই-বার প্রতাপের ওষ্ঠ কম্পিত হইল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না; অবশেষে সে হতাশ ভাবে বলিল, 'বাবা এ জন্য আমাকে অনুমতি দিয়াছিল।'

রেনল্ডস্ তাহার দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 'সে তাহাকে খুন করিবার জন্য তোমাকে অনুমতি দিয়াছিল? কি মিথ্যাবাদী!'

পিতৃহন্তা প্রতাপ চারি দিকে চাহিয়া, তাহার সাক্ষিগণকে ঘৃণায় তাহার সংস্রব ত্যাগ করিতে দেখিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, 'হাঁ, আমার বাপের আদেশ-পত্র আমার সঙ্গেই আছে। আমাদের মহাশত্রু ফাঁসিতে মরিবে, এই আশায় বাবা স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। তাহার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া তাহার আদেশ পালন করিয়াছি মাত্র। এই ফন্দী তাহার নিজেরই। এজন্য তাহার নিকট হইতে হুকুমনামা লিখিয়া-লইয়া আমি এ কাজ করিয়াছি। পিতৃ-আজ্ঞা কি করিয়া অগ্রাহ্য করি?'

এই কথা বলিয়া প্রতাপ তাহার পাকড়ির মুড়া হইতে একখান চিরকুট খুলিয়া তাহা রেনল্ডসের হস্তে অর্পণ করিল।

রেনল্ডস্ প্রতাপের পিতা রামপ্রসাদের স্বহস্ত-লিখিত সেই

অতিথি-সম্বর্দ্ধনা

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ টালিগঞ্জ অঞ্চলে একটা বাড়ী কিনেছেন। অনেকেই ত বাড়ী কিনছে বা তৈয়ার করাচ্ছে, কিন্তু প্রাইভেট-কলেজের অধ্যাপকের এই বাড়ী-কেনার মধ্যে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। পরিবারবর্গকে দেশে রেখে, মেসে থেকে, কত দিন এক বেলা না খেয়ে, গোটা-পাঁচেক ট্যুইশনী ক'রে টাকা জমিয়ে, কলকাতা সহরে বাড়ী কেনা, এ কি রীতিমত সাধনা নয়? সে যাই হোক, সিংহ মশায়ের বরাত ভালো। বাড়ী কেনবার মত টাকা তিনি জমাতে পেরেছেন। অনেকে আজীবন কাল চেষ্টা ক'রেও ভদ্রভাবে থাকা এবং খাওয়ার সংস্থান ক'রতে পারে না। তা' ছাড়া তিনি সুযোগও পেয়েছিলেন ভাল। "রেনি পার্কে"র কার্টার সাহেব যুদ্ধের জন্য হঠাৎ 'হোমে' চ'লে যাবার সময় নতুন বাঙলো আসবাবপত্রসহ নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করেন। যাকে বলে "লক, ষ্টক অ্যাণ্ড ব্যারেল।" আর আমাদের ভাগ্যবান্ দ্বিজেন সিংহ—"গট ইট ফর এ সঙ্গ।"

স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে যে-দিন তিনি সেই বাড়ীতে পদার্পণ ক'রলেন, গৃহপ্রবেশও বোধ হয় বলা যেতে পারে, সেই দিনই কোন-রকমে খবর পেয়ে কলেজের গুটি তিন-চার অধ্যাপক-বন্ধু সস্ত্রীক সেখানে গিয়ে হাজির। অমনি চায়ের ধূম প'ড়ে গেল। চাকর ভজুয়া তাড়াতাড়ি বাজার থেকে পাউরুটী নিয়ে এল; কিন্তু জ্যাম বা জেলী পাওয়া গেল না। দ্বিজেন বাবু স্ত্রীকে ব'ললেন, "দেখ, সাহেবের সব জিনিষই তো রয়েছে, একবার প্যান্ট্রীতে খোঁজ কর, কিছু-একটা মিলতে পারে।"—অতিথিদের ড্রইংরুমে বসিয়ে স্বামি-স্ত্রীতে মিলে এটা ফেলে ওটা হাঁটকে শেষে এক পাত্র জ্যাম আবিষ্কার করলেন। গিন্নী ব'ললেন, "যা হোক, মান ত বাঁচল।" তিনি দীর্ঘ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কর্ত্তা ব'ললেন—"তা না হয় হ'ল, কিন্তু কত কালের পুরোণো, কে জানে, যদি কারো অসুখ-বিসুখ হয়?" গিন্নী বাধা দিয়ে ব'ললেন—"তার জন্য ভাবনা কি? বটার কুকুর টেবীকে খাইয়ে পরখ করলেই ত হয়।" বটা অধ্যাপক সিংহের পুত্রের নাম। ভাল নাম বটকৃষ্ণ সিংহ। কর্ত্তা খুসী হ'য়ে ব'ললেন—"ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে, নইলে আমার যে কি দশা হোত—" ইত্যাদি মধুর আলাপ।

অতঃপর টেবীকে নিয়ে শ্রীমান্ বটকৃষ্ণের প্রবেশ; টেবীকে কিঞ্চিৎ মাংস প্রদান, আগ্রহ সহকারে তাহা ভক্ষণ করিতে করিতে টেবীর লাঙ্গুল আন্দোলন, এবং মরিবার অথবা শরীর অসুস্থ হইবার কোন লক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষিত না হওয়া; পরে টেবী-সহ বটার স্থানান্তরে প্রস্থান।

ড্রয়িংরুমে জ্যাম, রুটী, চা, এবং খোসগল্প দিব্যি চ'লছে, যাকে বলে আড্ডাটা পুরোমাত্রায় জমে উঠেছে—সেই সময় কাঁদতে কাঁদতে শ্রীমান্ বটকৃষ্ণের আবির্ভাব! তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন হোল, "কি ব্যাপার, কাঁদছিস কেন?"

"টেবী মরে গেছে।"

ব্যস্! কর্ত্তা-গিন্নীর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। হায় হায়, শেষে এতগুলো প্রাণী বেঘোরে মারা যাবে? বটাকে সেখান থেকে চ'লে যেতে ব'লে অধ্যাপক দ্বিজেন সিংহ অনুতপ্ত কণ্ঠে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে ব'ললেন। দেখতে দেখতে কারো পেট-ব্যথা, কারো মাথা-ঘোরা, কারো বমন ইত্যাদি আরম্ভ হ'য়ে গেল। ডাক্তার-বদ্দিতে বাড়ী ভ'রে গেল। ষ্টমাক-ওয়াশিং, পম্প, এনিমা—আরও কত কি! রাত বারোটা-নাগাদ সকলে অতি কষ্টে

বাড়ী ফিরলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জীকে ষ্ট্রেচারে ক'রে গাড়ীতে তুলতে হ'ল; এক জন ডাক্তার সঙ্গে গেলেন। অনেকগুলো টাকাই বেরিয়ে গেল। যাক্, কেউ যে মারা গেল না, তাই রক্ষে! তাঁদেরই জন্য এতগুলো প্রাণী মৃত্যু-মুখে প্রায় পতিত হ'য়েছিল আর কি!

ভোরে উঠেই মিষ্টার আর মিসেস্ সিংহ সকলের বাড়ী গিয়ে দেখে এলেন—কে কেমন আছেন। অনেকেরই অবস্থা তখনও খারাপ; তবে ভয়ের কোন কারণ ছিল না। বেলা ন'টার সময় বাড়ী ফিরতেই শ্রীমান্ বটার সঙ্গে তাঁদের দেখা। সবে সে ঘুম থেকে উঠেছে। বাপ-মাকে দেখে টেবীর শোকটা আবার নতুন ক'রে চেগে উঠল। ফুঁপিয়ে কেঁদে-ফেলে সে ব'ললে—"বাবা, টেবী কাল মারা গেছে।" দ্বিজেন বাবু তাকে কোলে তুলে-নিয়ে আদর ক'রে চোখ মুছিয়ে দিয়ে ব'ললেন—"আমি তোমায় আর একটা কুকুর কিনে দেব।—কি বল গা?"

গিন্নী ব'ললেন—"বটেই তো; আমাদের জন্যই তো সে বেচারার প্রাণ গেল।"

"হ্যাঁ রে বটা, কুকুরটা কি বমি ক'রে মারা গেল?"

শ্রীমান উত্তর দিলে—"না মা! আমি রাস্তায় বল ফেলেছিলুম, সে তাড়াতাড়ি তুলে-আনতে গিয়ে হঠাৎ বাস-চাপা প'ড়ে মরে গেল।"

দ্বিজেন বাবু রেগে কোল থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে ব'ললেন—"যা, পড়া নিয়ে বস্ গে। সব সময় কুকুর আর বল!"

বটা কিছুই ঠিক বুঝতে পারলে না, 'যঃ পলায়তি স জীবতি' পন্থা অবিলম্বে অবলম্বন ক'রলে।

কতকগুলো টাকা অনর্থক জলে পড়লো! কর্ত্তা-গিন্নী পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

গোধূলি

বেলা যে রে পড়ে এলো
দীর্ঘ হ'য়ে এলো তরু-ছায়া,
সময় যে নাহি আর কোথা ঘাট কোথা পার
চারি দিকে ঘেরা যেন আঁধারের মায়া।

ছিন্ন মোর বাসখানি,
থর-থর কাঁপে তনুতল;
নয়নে আঁধার ঘন, শুনি শুধু শন্-শন্
ও-পারেতে ঝাউ-বন কাঁদে অবিরল।

আজি মোর কিছু নাই,
সর্ব্ব শূন্য পথ-পাশে আমি;
আঁখি দু'টি ছল ছল বেদনার অশ্রুজল
কি যেন খুঁজিছে নিত্য মৌন স্তব্ধ নামি'।

কাঁদে পাখী দূর বনে,
ভেসে আসে সিক্ত ক্লান্ত সুর,
মরমের মর্ম্মস্থলে বিরহের শিখা জ্বলে
পাইতে তোমারে বন্ধু সুন্দর মধুর।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল



দম্পতি

বিবাহের ব্যাপারটাকে সুব্রত কি-জানি-কেন রীতিমত একটা সমস্যার মতো দেখিয়া আসিতেছিল। এ-সম্বন্ধে তার মনে কোথায় কি যে একটা বড়-রকমের 'কিন্তু' ছিল, তা' সে অতি-বড় অন্তরঙ্গের কাছেও প্রকাশ করিয়া বলিত না। শুধু নিজের মনেই সে এই রকম সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, ছোট ভাইটির বিবাহ দিয়া তাহাকেই সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, নিজে কোন দিন ও-সব ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে লইবে না।

কিন্তু সংসারী হইবার পূর্ব্বেই ছোট ভাই পন্টু এক দিন অকস্মাৎ সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল। শোকের প্রথম ধাক্কা সাম্‌লাইতে সুব্রতর অনেক দিন কাটিয়া গেল। পৈতৃক ব্যবসায়, বিষয়-সম্পত্তি, জমিদারী যথেষ্ট থাকিলেও সুব্রত কয়েক মাস ধরিয়া তার কোনো দিকেই নজর দিল না। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইল। নায়েব-গোমস্তা-কর্ম্মচারীরা চিঠি লিখিয়া বাবুর কোন জবাব পায় না। অনেক সময় চিঠি মালিকের সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসে। সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, হায়, এত বড় বংশের একমাত্র বংশধর এম্‌নি করিয়া সংসার ছাড়িয়া উদাসী হইয়া গেল! সেই সময় হঠাৎ এক দিন সুব্রত দেশে ফিরিল, তাহার সঙ্গে একটি অষ্টাদশী নববধূ!

পূরবীর বাবা আউদ্-রোহিলখণ্ড রেলে চাকরীর পর অবসর লইয়া এলাহাবাদে স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন। সেখানে যেমন করিয়াই হোক, সুব্রতর সঙ্গে পূরবীর আলাপ; তাহার পর প্রেম এবং বিবাহ। সুব্রত তাই যখন-তখন তাহাকে আদর করিয়া বলে, বাঙ্গালা দেশ থেকে এত দূরে তুমি যে এমন করে আমার দর্পচূর্ণ করবার সংকল্প করে ব'সেছিলে, তা কি ছাই একবার কল্পনাও করতে পেরেছিলুম!

পূরবী ছেলেমানুষের মত হাসিয়া বলে,—আচ্ছা সত্যিই তুমি কি বিয়ে করবে না বলে পণ করে ব'সে-ছিলে? ভারী দুষ্টু তো তুমি!

—কেন, দুষ্টুমীর কি পেয়েছ?

—সংসারের সক্কলেই বিয়ে করছে, আর তুমি কি এতো বড়ো পীর যে, বিয়ে করবে না?

সুব্রত হা-হা করিয়া হাসির রোল তুলিত। নূতন রাজ্যের নূতন এই আবহাওয়ার মধ্যে সে যেন আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িত।

সুব্রত ঠিক করিল, বধূকে লইয়া কলিকাতায় থাকিবে। গ্রামে আত্মীয়-স্বজন যাঁহারা আছেন, সকলেই তাহার বিবাহের সংবাদ পাইয়া বড়ই খুসী; তাঁহারা একান্ত অনুরোধ জানাইল, নববধূকে লইয়া একবার গ্রামের বাড়ীতে এসো। জ্ঞাতি-খুড়ামহাশয় লিখিয়াছেন, এখানে জাগ্রত কুল-দেবতা আছেন; বৌমাকে নিয়ে এসে এক-বার ভাল করে তাঁর পূজো দেওয়া উচিত—যাতে তাঁর আশীর্ব্বাদে চৌধুরী-বংশের দিন-দিন উন্নতি হয়।

কাশী হইতে পিসীমা কি-একটা মাদুলী পাঠাইয়া লিখিয়াছেন, বৌমাকে পরতে দিও এটি। আর একটি-বার এসে দু'জনে আমাকে দেখা দিয়ে যেও। নিতান্ত অথর্ব্ব হ'য়েছি বাবা, নইলে নিজেই যেতাম তোমাদের দেখ্‌তে।

সুব্রত কিন্তু এ-সব কিছুই করিল না। পিসীমার মাদুলীটা হাতে লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া পূরবী হাসিয়া বলে,—কিসের মাদুলী এটা—বল না গো! কি হয় এতে? ওটা হাতে বাঁধলে আমি বাঁচ্‌বো বুঝি অ-নে-ক কাল?

রসিকতার ঝোঁকে সুব্রতর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়,—ও মাদুলী পর্‌লে শীগ্‌গির তোমার একটি—

পূরবী মুখ বাঁকা করিয়া বলিয়া ওঠে—আঃ, কি অসভ্য তুমি !

সুব্রত ইজিচেয়ারে হেলিয়া-পড়িয়া জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে বলে,—আচ্ছা, তা না হ'লে আমাদের এই বাড়ী-ঘর বিষয়-আশয়, এ-সব কি বিশ্রী খাপ্‌ছাড়া লাগ্‌বে ভেবে দেখেছ কোন দিন ?

বলিতে-বলিতে সুব্রতর অন্তরের ভিতর কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতা নিবিড় হইয়া ওঠে। কথাটাকে পূরবী কি ভাবে গ্রহণ করিল, সেটুকু লক্ষ্য করিতেও সে ভুলিয়া যায়।

ইহার কয়েক দিন পরেই সুব্রতর নজরে পড়িল, পূরবী সেই ছোট্ট সোণার মাদুলীটি কোন্ সময় নিজের হাতে পরিয়াছে। সুব্রত অন্তরে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল। অবশ্য, পূরবী যে এটা কোনো-কিছু মনে করিয়াই পরিয়াছে, এ-কথা জোর করিয়া বলা চলে না। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, মাদুলীর প্রতি আকর্ষণ তাহার চিরন্তন সংস্কার, তা গুণ তার যা-ই কেন হোক্ না ! তবু, সুব্রতর মনে খুসির সীমা রহিল না।

পূরবী একা ; সুতরাং আজ-কাল কার্য্যগতিকে সুব্রতকে যেখানেই যাইতে হয়, পূরবীকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। সে-দিন নায়েবের নিকট হইতে তাগিদ আসিল, অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যও গ্রামে না আসিলেই নয়। সুব্রত মহা দুর্ভাবনায় পড়িল। কেন বলা যায় না, পূরবীকে স্বগ্রামে লইয়া যাইতে তার একেবারেই অনিচ্ছা। পূরবী কিন্তু বাঁকিয়া বসিয়াছে, কিছুতেই সে একা এখানে পড়িয়া থাকিবে না। তা ছাড়া, জীবনে সে কখনো পাড়াগাঁ দেখে নাই, এ-সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না।

সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে লইয়া যাইতেই হইল। কয়েকটা দিন নায়েব-গোমস্তার সঙ্গে মহলে-মহলে ঘুরিবার পর সুব্রত গ্রামের বাড়ীতে ফিরিল। পূরবীকে বলিল,—তোমার কেমন কষ্ট হচ্চে এখানে ? নিজের খেয়ালে যেমন লাফিয়ে এলে !

পূরবী মুখ ভার করিয়া বলিল,—এখানে এসে তুমি এমনি-করে সরে পড়্‌বে জান্‌লে কখ্‌খনো আমি আস্‌তুম না।—বলিতে-বলিতে হঠাৎ তার দু'টি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহা ঝর্-ঝর্ করিয়া গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

সুব্রত তাহাকে কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলিল,—আচ্ছা পাগল তো ! কালই তো আমরা ফিরে যাচ্ছি কল্‌কাতায় !

স্বামীর বুকে মাথা গুঁজিয়া পূরবী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল ; একটা কথাও বলিতে পারিল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া সুব্রত বলিল,—পাড়া-গাঁ তোমার কেমন লাগ্‌লো—কৈ বল্‌লে না তো ?

—ভালো নয়, একদম্ ভালো নয়। আমি ম'রে গেলেও আর সেখানে যাচ্ছিনে। তুমিও যেতে পাবে না—তা বলে রাখ্‌ছি

অন্য এক সময় সে স্বামীকে বলিল,—আচ্ছা, তোমার মায়ের সেই বড় ছবিখানা এখানে আনিয়ে নাও না কেন ? ভারী সুন্দর ছবি, আমার বড্ডই ভালো লাগ্‌লো ! খুব ছেলেবেলার ফটো তাঁর, নয় ? এই আমারই মতো বয়েসের হবে বুঝি ?

সুব্রত অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল,—তা হবে হয় তো।

পূরবী বলিল,—তোমার একদম্ মনে পড়ে না তাঁকে ? খুব ছোট্টটি ছিলে তুমি তখন, নয় ?

—হ্যাঁ, বোধ হয় ১০ দিন কি ১৫ দিন তখন আমার বয়েস।

পূরবী মাথাটা এক পাশে অনেকখানি হেলাইয়া বিজ্ঞের মতো বলিল,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি স-ব শুনিছি। তুলোর প্যাডের ওপর শুইয়ে তোমার পিসীমাই তোমাকে মানুষ ক'রেছিলেন। নয় ?

—হুঁ—বলিতে-বলিতে সুব্রত হাতের কাছের রেডিও-সেটের বোতামটা ঘুরাইয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মিশ্র-ভূপালীর খানিকটা মূর্চ্ছনা নির্ঝর-ধারার মত উৎসারিত হইয়া উঠিল।

সুব্রত বলিল,—ভারী চমৎকার গানটা তো ? দাও তো ঐ প্রোগ্রামটা, দেখি, কে গাইছে !...ওঃ, কুমারী উত্তরা বসু ! বেশ উঁচু দরের গাইয়ে বটে !

গান শেষ হইলে সুব্রত বলিল,—কেমন, ভালো লাগ্‌লো না?

—মন্দ নয়। আচ্ছা, ওদের বিয়ে হয়নি এখনো? এ কুমারীটির কত বয়স?

সুব্রত বলিল,—সেটা যদিও আমার জানা সম্ভব নয়, তবু ধরো না, বয়স বেশীই হয়েছে। বেশী বয়স পর্য্যন্ত অনেক মেয়েরই তো আজকাল বিয়ে হয় না। ওটা তোমার খুব খারাপ লাগে বুঝি?

পূরবী জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল,—একেবারেই না। বিয়ে হ'য়ে তো ভারী লাভ! তার চেয়ে মেয়েদের বিয়ে না করা বরং অনেক ভালো।

তাহার কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া সুব্রতর মনে হইল, কি-যেন একটা কথা বলিতে গিয়াও সে বলিতে পারিল না! অথচ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কথাটা যেন তাহাকে স্বস্তি দিতেছে না।

পরের দিন কিন্তু কুয়াশাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। সুব্রত নীচেকার ঘরে খাতাপত্র লইয়া একা বসিয়া কি-সব কাজ করিতেছিল, পূরবী ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমে সদরের দিকের দরজাটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিল; তার পর সরিয়া আসিয়া সুব্রতর চেয়ারের হাতার উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলিল,—আজ আমার গা-ছুঁয়ে তোমাকে একটা দিব্যি কর্‌তে হবে!

সুব্রত অবাক্ হইয়া গেল।

—দিব্যি! কিসের দিব্যি? হঠাৎ—কথাবার্ত্তা নেই, দিব্যি কর্‌তে হবে? কি দিব্যি কর্‌তে হবে শুনি?

ততক্ষণে পূরবী স্বামীর দু'খানা হাত দু' হাতে টানিয়া নিজের বুকের উপর খুব জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—আমাদের কোনো দিন ছেলেমেয়ে কোনো দিন আমাদের হবে না, বলো আমার গা ছুঁয়ে!

হাসিতে গিয়া সুব্রত হঠাৎ যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিল! বলিল,—তার মানে?

পূরবী জোর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল,—কিছুই যেন জানো না তুমি! এ-কথা তোমাদের গাঁয়ের সক্কলেই তো জানে গো! শুধু তোমার মা-ই তো নন্, বাবার যিনি মা ছিলেন, তিনিও তো মারা যান্ আঁতুড়েই! তার আগেও তোমাদের বংশের—

সুব্রত হঠাৎ বেশ জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—কে বলেছে তোমায় এ-সব আজগুবি কথা, বল তো? লোকের কি, একটা ছুতো পেলেই হ'লো! কে কবে কোথায় কি-জন্যে মারা গেছে, তার জন্যে বুঝি বংশের—

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি তো ভারী জানো! তোমাদের বংশের বড় ছেলের প্রথমকার বউ কেউ কখনো বেঁচেছে বল্‌তে পারো? প্রথম একটি ছেলে হ'লেই মরে গেছে সব্বাই।

সুব্রত হঠাৎ কি বলিবে খুঁজিয়া না-পাইয়া বলিল,—আমি কিন্তু ও-সব একেবারেই বিশ্বাস করিনে!

পূরবীর দু'টি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বলিল,—তা তো কর্‌বেই না গো! তুমি জানো, আমি মরে গেলেও তোমার ছেলেকে তুমি বাঁচিয়ে রাখ্‌বে যেমন করেই হোক্। আমাকে তুমি একদম ভালোবাসো না!

সুব্রত বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেল! মনে-মনে তার আপশোসের সীমা রহিল না—কেন সে পূরবীকে গ্রামের বিষাক্ত আবহাওয়ার ভিতর লইয়া গিয়াছিল! মহলের যা-হয় হইত, ইহার তুলনায় সে-ক্ষতির পরিমাণই বা কতটুকু!

পূরবী নীরবে কাঁদিতেছিল। সে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইতে গেল; পূরবী সে আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতেই বলিল,—আমি মরে গেলে তোমার আর ক্ষতি কি বল? আবার তো তুমি—

সুব্রত তাহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারে না। সে তার হাত ধরিয়া টানিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

স্বামীর মুখের প্রতিশ্রুতি শুনিয়া পূরবীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। হাসিতে-হাসিতে সে বলিল,—সত্যই আমার এম্‌নি ভয় করে! এই দেখ না, যে-দিন থেকে ঐ-সব কথা শুনিছি, সে-দিন থেকেই পিসীমার মাদুলীটা আমি খুলে রেখেছি।

সুব্রত বলিল,—আচ্ছা মুস্কিল তো! ও-মাদুলীটা পিসীমা যে কেন পাঠিয়েছেন, তা বুঝি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না! ওটা তোমার নিজেরই জন্যে। এই সন্দেহটা

মেয়েদের মনে এম্‌নি পাকা হ'য়ে গেছে যে, আমি বিয়ে ক'রেছি শুনে, ঐ ভয়টাই সব আগে মনে হ'য়েছে, তাই তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করেই তিনি এই মাদুলীটা পাঠিয়েছিলেন,—আর কিছু মনে করে নয়।

—তবে তুমি সে-দিন আমায় ও-কথা বল্‌লে যে বড়! এম্‌নি দুষ্টু তুমি!

এ-সংসারে সুখেরও যেমন কোনো নির্দ্দিষ্ট চেহারা নাই, তেমনই দুঃখেরও নাই। স্বামীর নিকট যে প্রতিশ্রুতিটুকু আদায় করিয়া পূরবী মনে একটা অপূর্ব্ব আরাম অনুভব করিয়াছিল, কয়েক দিনের মধ্যে সেইটাই কিন্তু তাহার দারুণ অশান্তির কারণ হইয়া উঠিল। সর্ব্বদাই তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার স্বামী যেন আজকাল একটু বেশী রকম গম্ভীর, আর অন্যমনস্ক থাকিতেই ভালবাসে! আগের মত হাসি-গল্পে সে যেন আর প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারে না। পূরবীর মনে হয়, সে নিশ্চয় তাহারই উপর রাগ করিয়াছে। নিশ্চয়ই তাই, নহিলে বাড়ীতে আর কে আছে যে—

এক দিন সে স্বামীকে বলিল,—তুমি আজকাল অমন করে থাকো কেন বল তো গো! আমার ওপর রাগ হয়েছে বুঝি?

বিস্মিত কণ্ঠে সুব্রত বলিল,—আমার রাগ হ'য়েছে? তা আবার তোমার ওপর? তুমি তো খাসা কল্পনা করতে শিখেছো!

—সত্যি করোনি রাগ? এই আমার গা ছুঁয়ে বল।

সুদৃঢ় বাহুবন্ধনের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সুব্রত তাহাকে বলিল,—না গো না, তোমার ওপর রাগ আমি করিনি—করিনি; কর্‌তে পার্‌বোও না কোনো দিন।

কিন্তু মুখের এই আশ্বাসটুকু প্রাতঃসূর্য্যালোকে কুয়াশার মত অদৃশ্য হইতে বিলম্ব হইল না।

সে-দিন কথায়-কথায় অনেক দিনের অনেক পুরাণো কথাই উঠিয়া পড়িয়াছিল। সুব্রত বলিল,—আমার জীবনের যে-কিছু জল্পনা-কল্পনা ওলোট্‌-পালোট করে দিয়ে চ'লে গেল পল্টু। কোনো দিন এ-কথা আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি যে, আমরা এক-মায়ের ছেলে ছিলুম না। সে আজ বেঁচে থাক্‌লে আমার জীবনের সবটুকু ধারাই যেতো বদ্‌লে। প্রয়াগ-তীর্থে শ্রীমতী পূরবীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগও কোনো দিন হ'তো না। সুতরাং আজকের এই চৈতালী পূর্ণিমাতে তোমার সঙ্গে বসে—

পূরবী চাপা অভিমানের সুরে বলিল,—বিয়ে করায় যখন তোমার এতই আপত্তি ছিল, তখন সে দুষ্কর্ম্ম করতে গেলেই বা কেন?

সুব্রত একটু ম্লান হাসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীর হইয়া বলিল,—কেন? তা কি করে বলবো বল! ভবঘুরের মত ঘুরে ঘুরে হঠাৎ এক দিন বুঝতে পারলুম, মানুষের মনের ভেতর মুক্তির জন্যে যেমন একাগ্রতা আছে, তেমনি বন্ধনের স্পৃহাও তার কম নেই। বাহিরের মুক্তি যেমন এক দিকে তাকে আকর্ষণ করছে, ছোট্ট একটি স্নেহনীড়ের মধুর বন্ধনও তাকে তেমনি ডাকছে। মানুষ নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণতা কোনো দিনই পায়নি—কোনো দিন পাবেও না পূরবী! তার পূর্ণতার অনেকখানি খোরাক সে সংগ্রহ করবে তার এই সঙ্কীর্ণতার নীড়টুকু থেকে; তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, এই সব বন্ধনের ভেতর থেকেই। এই রকমের একটা চেতনার ভেতর দিয়েই আমার জীবনে পূরবীর বাঁশী বাজলো,—তার সুরের মধ্যে ঘরে-ফেরার সঙ্কেতটুকু নিয়ে। তাই, পরিশ্রান্ত দেহে ঘুরে-ঘুরে আর ঘর না বেঁধে উপায় রইলো না।

পূরবী একটু নীরব থাকিয়া বলিল,—তা ছাড়া তোমাদের বংশের তুমিই যে একমাত্র ছেলে।

সুব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিতে-চাপিতে বলিল,—তা, পল্টু চলে যাবার পর তো আমিই হলুম একা! সত্যিই, এ-কথাও আমার কত দিন মনে হয়েছে, যেন আমার বংশের অতীত আত্মাগুলি আমার দিকে চেয়ে আছেন তাঁদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। এটাকে সংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারো পূরবী! কিন্তু এ ভয়ঙ্কর গভীর সংস্কার। হয় তো এই সংস্কারও আমার হাত ধরে টেনে এনে ক্রমে আমাকে সংসার-রচনায় বাধ্য করলে।

রাত্রে শয্যায় বিনিদ্র নয়নে পড়িয়া-থাকিয়া পূরবী স্বামীর ঐ কথাগুলো লইয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেছিল। ও-পাশে খাটের উপর সুব্রত গভীর নিদ্রায় অভিভূত। মাথার দিকের দেয়ালে ফিকে-নীল বেড-ল্যাম্প জ্বলিতেছে। সেই ঝাপসা আলোতে ঘরের

ভিতর একটা অবাস্তবের স্বপ্নচ্ছায়া! পূরবীর একবার ইচ্ছা হইল, স্বামীকে ডাকিয়া তোলে। উঠিয়া সে স্বামীর খাটের উপর গিয়া বসিল। স্বামীর ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া তাহার কিন্তু তাহাকে জাগাইতে ইচ্ছা হইল না। স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া-চাহিয়া আজ সন্ধ্যার কথাগুলি আবার একে-একে তার মনে পড়িতে লাগিল। সমস্ত কথাগুলির নীচে যে একটা অব্যক্ত অনুযোগ প্রচ্ছন্ন ছিল, পূরবী তাহা সুস্পষ্ট ধরিতে পারিয়াছে। বংশের একটি মাত্র ছেলে সে, এইখানেই এই বংশের যবনিকা পড়িবে না কি? এ-সব কথা ভাবিয়া স্বামীর মনে বেদনার অন্ত নাই, এবং তার জন্য সে নিশ্চয় পূরবীকেই দায়ী করিয়া রাখিয়াছে।

সামনের দেওয়ালে তাহার শাশুড়ীর ছোট একখানি ফটো ঝুলিতেছে। ঝাপসা নীল আলোতে ফটোর চেহারাটা অস্পষ্ট দেখাইলেও তাঁহার মুখখানি যেন সুস্পষ্ট তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। আর ভাসিয়া উঠিল, গ্রামের বাড়ীর সেই মস্ত বড় অয়েল-পেন্টিংখানা। সে-মুখ যেমন সুন্দর, তেমনি জ্যোতির্ম্ময়। যেন এক বিরাট ত্যাগের গরিমা তাঁর চোখে-মুখে জলিতেছে। যেন নিজেকে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াও তিনি তাঁহার সংসারকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। পূরবী তন্ময় হইয়া সেই ছবিখানির পানে চাহিয়া রহিল।

তার পর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

কিছু দিন হইল, পূরবীর অটুট স্বাস্থ্যে যেন ভাটার টান পড়িতে সুরু হইয়াছে। সুব্রত এত দিন লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু হঠাৎ সে-দিন নিদ্রিতা পত্নীর পানে চাহিয়া-চাহিয়া তাহার মনে হইল, পূরবী এই কয় দিনে অনেকখানি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দু'টি চোখের কোণে একটা কালির দাগ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কেন? পূরবীর কিছু অসুখ করিয়াছে কি?

পূরবীকে কোন কথা না বলিয়া সে এক দিন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়া পূরবীকে বলিল,—তুমি বড্ড রোগা হ'য়ে যাচ্ছ। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, এত দিন চোখেই পড়েনি। ডাক্তারকে তাই ডেকে নিয়ে এসেছি, একবার তৈয়েরী হ'য়ে নাও দেখি!

পূরবী হঠাৎ যেন রীতিমত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল; বলিল, কি অদ্ভুত মানুষ তুমি! কথাবার্ত্তা নেই, হঠাৎ ডাক্তার এনে হাজির! কিছু আমার হয়নি,—সত্যি কিছু না। তুমি ডাক্তারকে বিদেয় করে দাও—পায়ে পড়ি তোমার।

নিতান্ত অবাধ্য হইয়াই পূরবী আজ স্বামীর কথার ব্যতিক্রম করিল। অগত্যা ডাক্তারকে বিদায় করিতেই হইল।

কিন্তু বেশী দিন কাটিল না। স্বামীর উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তার স্থানে আনন্দের লহর তুলিয়া কথাটা এক দিন প্রকাশ করিয়া ফেলিল পূরবী নিজেই। সুব্রত স্ত্রীর মুখের পানে নির্ব্বাক্ ভাবে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সে-দৃষ্টির নীচে তাহার উচ্ছ্বসিত পুলকটুকু পূরবীর কাছে ধরা পড়িতে দেরী হইল না। অভিমানে পূরবীর বুকের ভিতরটা ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু অভিমান চাপিয়া রাখিয়া চোখে-মুখে হাসির রং ফলাইয়া বলিল,—আমি রোগা হচ্ছি দেখে তোমার খুব ভয় হ'য়েছিল, নয়? ভয় নেই গো! এই ধাক্কা সামলাবার আগে আমি কিছুতেই মর্‌বো না, তা দেখে নিও।

হাসির আবরণ দিয়া পূরবী যে কি করুণতম কথাটা বলিতে চায়, বুঝিয়াও সুব্রত কিছুই যেন বুঝিল না, মুখের এমনি একটা ভাব দেখাইল। কিন্তু, নিরালায় বসিয়া সে নিজের অন্তরকে বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিল। এই দুঃসহ আনন্দ-বার্ত্তাটুকু পাওয়ার পর কি-যে তার করা উচিত, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। নিজের আনন্দকে সে অস্বীকার করিতে পারে না। অথচ সেই আনন্দের পিছনকার বিভীষিকার চেহারাটাকে সে ভুলিতে চাহিলেও পূরবী নিজেও ভুলিবে না,—তাহাকেও ভুলিতে দিবে না। নিজের মনকে সুব্রত বারম্বার বলিতে থাকে—মিথ্যা—মিথ্যা, কত বড ভিত্তিহীন মিথ্যা যে এটা, তা' সে নিজে ভালো রকমই জানে। কিন্তু এই মিথ্যা আতঙ্কের কালো ছায়াটাকে পূরবীর অন্তর হইতে কেমন করিয়া সে নিঃশেষে মুছিয়া দিবে?

দিন যায়, স্বামিস্ত্রী উভয়ে যেন চেষ্টা করিয়াই সেই প্রসঙ্গটা এড়াইয়া চলে। অথচ ঐ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া দু'জনেরই দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। আজকাল পূরবী

প্রায় সর্ব্বক্ষণই সংসারের নানান্ কাজে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া রাখে! সুব্রত ভাবে, মন্দ কি! পাঁচ রকম ব্যাপারে নিজেকে যতটা জড়াইয়া রাখিতে পারে, ততই তো ভালো!

সে-দিন কি-একটা বিশেষ প্রয়োজনে পূরবী বৈঠক-খানা হইতে স্বামীকে বাড়ীর ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। দোতালায় শোবার-ঘরের পাশের ছোট ঘরখানি অ-দরকারী এলোমেলো জিনিসে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। আজ সে-ঘরে পা বাড়াইয়া সুব্রত অবাক্ হইল। সমস্ত ঘরখানি আগাগোড়া ঝাড়িয়া-মুছিয়া তক্‌তকে করা হইয়াছে। দেওয়াল-আলমারির কাচগুলি প্রায় সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহাতে নূতন কাচ শোভা পাইতেছে। আলমারির ভিতরে একসারি খেলনা; স্প্রিং-দেওয়া রেল-গাড়ী, মোটর, উড়োজাহাজ, ছোট-বড় রকম-রকম পুতুল। মেঝের এক পাশে একটি ঝক্‌ঝকে নূতন ঠেলাগাড়ী, এবং ট্রাই-সাইকেল। সুব্রত স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। পূরবী খিল্ খিল্ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল; পরে বলিল,—আমার হাতে যে-ক'টা টাকা ছিল, সব আমি তোমার ছেলের জন্যে খরচ করে ফেলেছি। আমায় তা দিও কিন্তু। আর আমার সেলাইয়ের কলটা খারাপ হ'য়ে গেছে, সেটা মেরামত করিয়ে দিতে হবে। ওর জন্যে কত কাজ যে আমার আট্‌কে আছে—

বলিতে-বলিতে সে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছাটি গলার উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া একটি ট্রাঙ্ক খুলিল। তার পর ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে একরাশ ছোট-ছোট রেশমী ও পশমী জামা বাহির করিয়া এক-একটি করিয়া স্বামীর সাম্‌নে খুলিয়া ধরিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সুব্রত বলিল,—এ-সব তুমি নিজেই তৈয়েরী ক'রেছ না কি পূরবী?

—নইলে বাজার থেকে কিনে এনেছি বুঝি? কিনে তো তুমিও দেবে। এগুলো—বলিয়া মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া আবার বলিল,—এ-সবই তোমাকে দেখিয়ে রাখ্‌ছি আজ! এর একটি জিনিসও যেন আমার নষ্ট না হয়। নষ্ট হ'লে স্বর্গে গিয়েও আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার্‌বো না।

কোন জবাবই সুব্রত সহসা খুঁজিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল,—আমার ওপর তোমাকে কোনো ভারই দিতে হবে না পূরবী! সে-ব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছি। সহরের সব-চেয়ে বড় ডাক্তার আর নার্সকে আমি—

পূরবী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়াছিল—অবোধ শিশুটির মতোই। শিশুরই মতো সরল অর্থহীন একটু হাসিতে তার ডান গালের নীচে সুন্দর একটু টোল্ পড়িয়াছিল। চোখ নামাইয়া বাক্সের ভিতর জামা-পোষাকগুলি তুলিতে-তুলিতে বলিল,—ডাক্তার তুমি আন্‌বে না, তাই আমি বলিছি বুঝি? কি রকম যে নিরেট তুমি হচ্ছো দিন-দিন—!

—তোমার কাণ্ড দেখে সত্যিই আমি বোকা ব'নে গেছি পূরবী! এ-ভাবে আরো কিছু দিন কাট্‌লে হয় তো বা সত্যিই পাগল হ'তে হবে আমায়!

হাসিয়া স্বামীর মুখের উপর মুখ তুলিয়া পূরবী বলিল,—তা হয় তো তুমি যাবেও। কিন্তু আচ্ছা, হ্যাঁ গো, পিসীমা তো তোমাকে মানুষ ক'রেছিলেন, কিন্তু তোমার তো কেউ নেই যে—

সুব্রত তাহার মুখের উপর হাত চাপিয়া বলিল,—নিষ্ঠুর তুমি পূরবী! ছেলে চুলোয় যাক্, আমি চাই তোমাকে! তুমিই—

পূরবী হঠাৎ স্বামীর হাতখানা ঝাঁকানি দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল,—আবার নিষ্ঠুর বলা হচ্ছে আমাকে! খবর্দ্দার বল্‌ছি, আর কখ্‌খনো যদি মুখে আন্‌বে ঐ অলক্ষণে কথা! যে আজ সত্যি-সত্যি আমাদেরই এক জন হ'য়ে গেছে, তার সম্বন্ধে কি করে বল্‌তে পার্‌লে ও-কথা, নিষ্ঠুর কোথাকার! তোমার মা যখন তোমায় এতটুকু রেখে চলে গিয়েছিলেন, তখন যদি বাবা ঐ-কথা বল্‌তেন, তখন কি হতো তোমার বল তো শুনি!

বলিয়া পূরবী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে যে উদ্‌গত অশ্রুর বিন্দুটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তা কিছুতেই গোপন রহিল না।

নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের নিষ্করুণ দিনগুলি যতই ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, সুব্রতর চাঞ্চল্য ততই বাড়িয়া উঠিল।

জাগ্রতে ও নিদ্রায় কত এলোমেলো কথাই পূরবীর যে মনে হয়! মনে হয়, এলাহাবাদে তাহাদের বাড়ীর কথা, মা-বাবা এবং ভাইবোন্‌গুলি। সেখান হইতে হঠাৎ এক দিন অজানা এক জনকে আশ্রয় করিয়া এখানে চলিয়া আসা। জীবনে এত বড় বিমূঢ়তা আর কি থাকিতে পারে? কেন যে মানুষ এত বড় ভুল করে! মনে হয়, কালই স্বামীর নিকট জিদ্ ধরিবে, তাহাকে এলাহাবাদে রাখিয়া আসিবার জন্য। কিন্তু তখনই আবার মনে হয়, সুব্রত হয় তো দুঃখ পাইবে। নিদারুণ অভিমানের মাঝেও নিরভিমান টানিয়া মনে-মনে বলে,—নাঃ, থাক্! দুঃখ সে কাহাকেও দিবে না। আত্মাহুতি সে দিতে আসিয়াছে, দিবেও নিতান্ত নিরুপদ্রবেই।

স্বপ্নে এক-এক দিন মনে হয়, তাহাকে যেন কে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। চীৎকার করিয়া সে কাঁদিতে চায়, পারে না। কে এক জন তাহার পাশে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করে। প্রথমটা ভাল নজর পড়ে না, তার পর দেখে, সুব্রত! কিন্তু, কি বিশ্রী বিকট তাহার মূর্ত্তি! কি কুৎসিত তাহার হাসি! ভয়ে পূরবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

ঠিক পাশেই নিদ্রামগ্ন স্বামীর মুখের উপর চোখ পড়ে। চোখ কিন্তু যেন সরিতে চায় না সে-মুখের উপর হইতে। একান্ত নির্ভরতায় সে তার মাথাটি চাপিয়া ধরে স্বামীর প্রশস্ত বুকের নীচে।...

সে-দিন এলাহাবাদ হইতে একখানা চিঠি আসিল সুব্রতর নামে। পূরবী চিঠিখানা একান্ত সাগ্রহে স্বামীর হাত হইতে টানিয়া লইয়া খুলিয়া পড়িতে গেল। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত পড়া হইল না। চিঠি হাত হইতে পড়িয়া গেল, সঙ্গে-সঙ্গে পূরবীও আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়িল।

হঠাৎ দিন-দুইয়ের জ্বরে পূরবীর মা'র মৃত্যু হইয়াছে; সেই নিদারুণ বার্ত্তা আসিয়াছিল ঐ পত্রখানিতে।

কিন্তু সুব্রত পরে বুঝিল, ওটা শুধু উপলক্ষ মাত্র। এই শোকের ধাক্কায় পূরবী শয্যা গ্রহণ করিল, এবং দুই দিন যাইতে-না-যাইতে প্রবল জ্বরে সংজ্ঞা হারাইল।

জ্বরের ঘোরে পূরবী কত কি-যে বলে, কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না। দু'খানি বিশীর্ণ পাণ্ডুর বাহু বাড়াইয়া সে কাহাকে যেন খুঁজিতে থাকে।

সুব্রত কাছে বসিয়া আছে, বরফের ব্যাগ মাথায় ধরিয়া। ও-পাশে নার্স, তার সামনে ডাক্তার। হঠাৎ এক সময় নির্নিমেষ বিহ্বল দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া পূরবী বলিল,—মা! মাকে ডেকে দাও না একবার! আমি মরে যাচ্ছি, আর সে বুঝি...মা গো মা, কি নিষ্ঠুর সকলে—কি দারুণ নিষ্ঠুর!

সুব্রত ডাকিল,—পূরবী!

আস্তে-আস্তে তার চোখের পাতা মুদিয়া আসিল। মনে হইল, পরম শান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িল বুঝি!

দুই দিন দুই রাত এমনি জ্বরের ঘোরে কাটিয়া গেল। দুই জন নার্সের হাতে রোগীর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া সুব্রত চুপ-চাপ উপরের ঘরে বসিয়া থাকে। মনে-মনে যে বিভীষিকাকে সে এত দিন জোর করিয়া অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল, সে আজ তাহার সমস্ত বীভৎসতা লইয়া তাহাকে স্তম্ভিত—আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পূরবীর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিবার ক্ষমতাটুকুও তাহার আর নাই।

মনে কত কথাই আসিতেছে। বিবাহ সে করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু সে পণ টিকিল না। নিয়তির সুনিশ্চিত অনুশাসন! যে নিদারুণ অভিশাপ এই চৌধুরী-বংশের বুকের উপর ডানা মেলিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে এড়াইবার জন্য তাহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। বিবাহ করিবার পরেও ভাবিয়াছিল, ও-কথাটা পূরবীকে কখনো জানিতে দিবে না, কিন্তু পূরবী জানিল। পূরবী যদি কিছুই না জানিত, তাহা হইলে আসলে কিছুই হয় তো ঘটিত না। নিরন্তর একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকিয়া-থাকিয়া—কিন্তু উপায় কি, অনিবার্য্যকে ঠেকাইয়া রাখিবে কে? ঠিক এই অনিবার্য্য নিয়তির চক্রে কোন্ সুদূর প্রবাস হইতে পূরবী আসিল তাহাদের এই অভিশপ্ত সংসারের ধ্বংসের মাঝে আত্মাহুতি দিবার জন্য। এ একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র নহে, পূরবীর অনিবার্য্য কঠোর নিয়তি!

হ্যাঁ, সুব্রত নিশ্চিত বুঝিয়াছে, পূরবী মরিবে। এই বংশের ভবিষ্যৎ বংশধরটিকে রাখিয়া তাহাকে মরিতেই হইবে, যেমন এক দিন তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার জননী। পিসীমা তাহাকে মানুষ করিয়া

তুলিয়াছেন কি অপরিসীম বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া। কিন্তু সুব্রত কেমন করিয়া বাঁচাইয়া তুলিবে পূরবীর শিশু-সন্তানটিকে ?

মনে পড়িল, ও-ঘরে পূরবীর সমাগত সন্তানের জন্য সেই অপূর্ব্ব আয়োজন। না, পূরবীর শেষ সাধনাকে সুব্রত অপূর্ণ রাখিবে না। যেমন করিয়া হোক্, দুর্ভাগা ছেলেটাকে সে বাঁচাইয়া তুলিবেই। অতঃপর ঐটুকুই হইবে সুব্রতর জীবনব্যাপী সাধনা।

ভাবিতে-ভাবিতে সুব্রতর মনে হইল, সারা জগতের ভিতর ঐ কঠোর কর্ত্তব্যসাধনটুকু তাহার জীবনের চরম এবং পরম সত্য। পূরবীর জীবনের উদ্দেশ্য যেমন শুধু সেই সন্তানকে পৃথিবীর বুকে আনিয়া দেওয়া, তাহার নিজের জীবনের উদ্দেশ্যও তেমনি তাহাকে এই পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তা ছাড়া তাহাদের জীবনের আর কোন মূল্য নাই। পূরবীর কর্ত্তব্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবং তাহার ব্রত সুরু হইতে চলিয়াছে।

ডাক্তার সুব্রতকে ডাকিয়া বলিলেন,—যে-রকম অবস্থা দেখ্‌ছি, তাতে শিশু আর প্রসূতি দু'জনেরই জীবন বিপন্ন। তবে আমাদের চেষ্টায় বড়-জোর এইটুকু সম্ভব হ'তে পারে যে, দু'জনের মধ্যে এক জনের আশা ছেড়ে দিয়ে অপরটিকে বাঁচিয়ে তোলা। যদি প্রসূতিকে বাঁচাতে হয়, শিশুর আশা ছাড়্‌তে হবে ; আর যদি শিশুকে চান্, তবে—

সুব্রত কাঠ হইয়া রহিল। কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ডাক্তার বলিলেন,—এ-কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করাও যে কত নিষ্ঠুর! কিন্তু না করলেও নয়।

সুব্রত বলিল,—আমি বলছি আপনাকে একটু পরেই। মিনিট পনেরো আমায় সময় দিন ভাববার !

তাহার ইচ্ছা হইল, একবার পূরবীর ঘরে গিয়া দেখিয়া আসে ; কিন্তু পা উঠিল না। সে বরাবর তিন তলার ছাদের উপর উঠিয়া গেল।

ভরা-শ্রাবণের অমাবস্যা। এইমাত্র খুব জোরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে গোটাকয়েক তারা দেখা দিয়াছে। বর্ষা-বিধ্বস্ত ধরিত্রী যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। শুধু তার নিশ্চেতন দেহের গভীর নিশ্বাসের শব্দটুকু মাত্র শোনা যাইতেছে। চারি দিকে মৃত্যুর কালো ছায়া যেন কাহার প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছে।

সুব্রতর মনে হইল, ঠিক এমনি এক বিভীষিকাময়ী রজনীতে সে-ও আসিয়াছিল তাহাদের অভিশপ্ত বংশের বর্ত্তিকাটুকু বহিয়া। আজ আবার ঠিক সেই অভিশাপের মধ্য দিয়া আসিতেছে তাহার ভবিষ্যৎ বংশধর। ডাক্তার বলিতেছে, পূরবীকে বাঁচাইতে হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হয়। অথচ সুব্রত নিজে তো বুঝিতেছে, পূরবীকে বাঁচাইতে পারে, এমন সাধ্য বুঝি স্বয়ং বিধাতারও নাই !

অতীত দুঃস্বপ্নের মত কত কথা ভীড় করিয়া আসে মনে ! কিন্তু উন্মত্তের মত সুব্রত সে-সব দু'হাত দিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয়। মিথ্যা—মিথ্যা ! মৃত্যু যখন দুয়ারে পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া, তখন মিথ্যা এই ভালবাসার অজুহাত ! ভালবাসা দিয়া পূরবীকে বাঁচানো যায় না,—অসম্ভব ! কিন্তু চেষ্টা করিলে হয় তো বাঁচানো যায় পূরবীর সন্তানটিকে। সে বাঁচিলে পূরবীর স্মৃতিটুকুও অন্ততঃ বাঁচিয়া থাকিবে।

পাশের বাড়ীতে এগারোটা বাজিয়া গেল। সুব্রতর যেন চমক্ ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। ডাক্তারকে সাম্‌নে দেখিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল,—ছেলেটাকে যদি বাঁচতে পারেন ডাক্তার বাবু, তারই চেষ্টা করুন ; অন্য চেষ্টা বৃথা।

আর এক মুহূর্ত্তও না দাঁড়াইয়া সে বরাবর বৈঠকখানায় আসিয়া পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া বসিল।

সারা রাত্রিটা সেই ভাবেই কাটিল। ভোরের দিকে কখন্ একটু টেব্‌লের উপর মাথা রাখিয়া সুব্রত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিতে নার্স খবর দিল, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলেটিকে বাঁচানো যায় নাই। পূরবী মিনিট-দশেক পূর্ব্বে একটা মরা ছেলে প্রসব করিয়াছে।

রুদ্ধনিশ্বাসে সুব্রত জিজ্ঞাসা করিল,—আর সে—

নার্স জানাইল,—অবিশ্যি, ইনি এখনো বেঁচে।—তবে—

আর কিছু নার্সও বলিল না, সুব্রতও শুনিবার জন্য

বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিল না। তেমনি জীবন-মরণের মাঝখান দিয়া সে-দিন এবং রাতটাও কাটিয়া গেল। সমস্ত দিনরাত্রির ভিতর সুব্রত একবারও উপরে উঠিতে পারিল না।

তার পর একটি-একটি করিয়া অনেকগুলি দিবস ও অনেকগুলি রজনী তাহাদের লোহার মত ভারী পা ফেলিয়া এই বাড়ীর বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেই চরণ-চিহ্ন বুঝি এ-বংশের ইতিহাসে কোনো দিন নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে না।

মাস-দুই পরে অকস্মাৎ এক দিন এ-বাড়ীর ঘর-দ্বার প্লাবিত করিয়া শরতের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার বন্যা বহিল। আকাশ হাসিল, এ-বাড়ীর সব-কিছুই হাসিল। কারণ, আজ এক জন্মান্তরের পরেই বুঝি এ-বাড়ীর গৃহিণীর মুখে হাসির ঝিলিক্ ফুটিয়াছে।

দোতালার বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারের উপর পাতলা নরম গদী পাতিয়া সুব্রত পূরবীকে শোয়াইয়া দিয়াছিল; এবং নিজে তাহারই পাশে একখানি চেয়ার টানিয়া-লইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহার অসুখের সময়কার কত-কি কাহিনী! পূরবীর কাছে এ-যেন নব-জীবনের অরুণালোকে গত জীবনের তমসাচ্ছন্ন স্বপ্ন-কথা!

ক্ষীণকণ্ঠে পূরবী বলিল,—নার্স সে-দিন বল্‌ছিল আমায় সব। বল্‌লে এম্‌নি অবস্থা দাঁড়ালো যে, এক জনকে বাঁচাতে গেলে আর এক জনের মায়া ছাড়্‌তে হয়।···তোমায় বুঝি বলেছিল ওরা তাই?

সুব্রতর মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া গেল সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত জ্যোৎস্না। চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল, সে-দিন ছাদের উপরকার সেই বিভীষিকাময়ী শ্রাবণ-রাত্রি! সে-রাত্রির সুব্রতকে আজ সে নিজেই যেন চিনিতে পারিল না। গলার ভিতরটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া আজ সে পূরবীকে বলিবে, সে-দিনের সমস্যাটার সে কি নির্ম্মম ভাবে সমাধান করিয়াছিল। সে যে নিজেই বিশ্বাস করিতে পারে না—

খুব মিষ্ট ফিকে একটুখানি হাসিয়া পূরবী বলিল,—ওরা বুঝি জিজ্ঞেস্ কর্‌লে তোমায়? আর তুমি কি বল্‌লে? বল্‌লে যে, আমাকেই চাও? সত্যি, বল না?

সুব্রত তাহার কপালের উপরকার কুঞ্চিত চুলের গুচ্ছটি নাড়িতে-নাড়িতে বলিল,—নইলে বল্‌বার আর কি ছিল পূরবী!

পূরবীর শীর্ণ কম্পিত ঠোঁট দু'খানির ফাঁকে শুধু অস্ফুট স্বরে বাহির হইল,—কি নিষ্ঠুর তুমি গো!

ধীরে ধীরে চোখ দু'টি তার মুদিয়া আসিল অপূর্ব্ব স্বপ্নাবেশে। সুগভীর স্বস্তির নিশ্বাস টানিয়া সুব্রত মনে-মনে বলিল,—সত্যিই চেয়েছিলুম আমি তাই পূরবী! সে রাত্রিটার সবটাই ছিল মিথ্যা, সবটাই ছিল নিষ্ঠুর বীভৎসতায় ভরা।

একখানি শীর্ণ হাত পূরবী তার স্বামীর দিকে বাড়াইয়া দিল। সুব্রত সেটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

রাজা ও সাধু

সর্ব্বত্যাগী সাধু এক বসিয়া শ্মশানে,
প্রশান্ত সহাস-দৃষ্টি, আছে আত্ম-ধ্যানে।
হেন কালে রাজা এক আসিয়া তথায়,
ত্যাগী-শ্রেষ্ঠ সাধু বলি, বাখানে তাঁহায়।
কহে সাধু, "মহারাজ, তুমি সর্ব্বত্যাগী,"
রাজা কহে, "কেন মোরে কর পাপভাগী।
ত্যাগের লক্ষণ কোথা, কহ দয়া ক'রে।"
সাধু কহে ব্যঙ্গ হাসি, "আমি যার তরে,
করিয়াছি সর্ব্বত্যাগ, সে পরম ধন,
অনায়াসে মহারাজ করেছ বর্জ্জন।"

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও অদ্বৈত-বেদান্ত

গীতোক্ত অদ্বয় দৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমতঃ গীতার "অব্যক্ত" 'ব্রহ্ম'তত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করা আবশ্যক। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু—জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন, জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই বিভাব বা মায়িক বিকাশ, ইহাই অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র। গীতায় বর্ণিত ব্রহ্মবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে অদ্বৈত-বেদান্তের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে গীতার মর্ম্ম কি, তাহা আমরা বিচার করিব এবং গীতোক্ত অদ্বৈতবাদ যে উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত, তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব। অব্যক্ত ও ব্রহ্ম এই দুইটি শব্দ গীতায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অব্যক্ত কথাটি সাধারণ অর্থে, যাহা ব্যক্ত নহে, তাহাই অব্যক্ত, এই অর্থেই পুরুষ ও প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। ভগবান্ জগদ্‌ব্যাপী স্বীয় মূর্ত্তিকেও অব্যক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদ-ব্যক্ত মূর্ত্তিনা—। অবাঙ্-মনস-গোচর নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্ম-বস্তুকেও অব্যক্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অবিকারী অচিন্ত্য আত্মাকেও অব্যক্ত বলিয়া গীতায় বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দে কোথায়ও বেদকে, কোথায়ও জগজ্জননী প্রকৃতিকে, কোথায়ও পরমেশ্বরকে, কোথায়ও বা পরব্রহ্ম তত্ত্বকে বুঝান হইয়াছে। পরব্রহ্মই যে পরমাত্মা এ কথা গীতায় স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, উপনিষদে আত্মার যে স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে আত্মা নিত্য, স্বপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ,চিৎস্বরূপ এই রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ংজ্যোতিঃ, চিন্ময়, সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ আত্মাকে গীতায় অব্যক্ত বলা হইল কিরূপে?—এই প্রশ্নে গীতার উত্তর এই যে, যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং স্থূল তাহাই ব্যক্ত। আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহে, জাগতিক বস্তুর ন্যায় স্থূলও নহে, এই জন্যই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাধার সর্ব্বান্তর্য্যামী আত্মাকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে উপনিষদের ব্রহ্মও অব্যক্ত। ব্রহ্মের কোন রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই; সুতরাং তাহা কোন মতেই চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে বলিয়া ব্রহ্ম অনুমেয়ও নহে, কেন না, যাহা বাহ্য প্রত্যক্ষের অতীত অচিন্ত্যতত্ত্ব, তাহার সম্বন্ধে অনুমানও করা চলে না। আত্মার যথার্থ স্বরূপ কি? ইহার উত্তরে গীতা বলেন যে, আত্মা আকাশের ন্যায় বিভু অচল, অটল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অবিকারী, স্বতন্ত্র এবং নির্লিপ্ত। আত্মার এই প্রকার স্বরূপদর্শন অনায়াস-সাধ্য নহে। কেন না, আত্মা স্বভাবতঃই দুর্ব্বিজ্ঞেয়, মায়া-যবনিকা ভেদ করিয়া আত্মার যথার্থ রূপ দর্শন করা মায়া-মুগ্ধ জীবের পক্ষে নিতান্তই দুরূহ: তার পর, এই আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন, এইরূপ উপদেষ্টাও দুর্লভ। আত্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ ঈশ্বরতুল্য গুরু লাভ করা বাস্তবিকই বড় সৌভাগ্যের কথা। যদি ভাগ্যবশে ঐরূপ সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তবুও শ্রুতির অগম্য, বাক্যের অগম্য, মনের অগম্য, বুদ্ধির অগম্য, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, আত্মতত্ত্ব গুরু শিষ্যকে বুঝাইয়া দিবেন কিরূপে? কারণ, ব্রহ্ম-স্বরূপ তো বলিয়া বুঝাইবার নহে। এই জন্যই গীতা আত্মা, আত্ম-দর্শন ও আত্মদর্শী এই তিনকেই পরম আশ্চর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, 'আত্মতত্ত্ব প্রথমতঃ শোনাই যায় না, শুনিলেও বুঝা যায় না। আত্মবিৎ বক্তাও আশ্চর্য্য, শ্রোতাও আশ্চর্য্য, জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য ১।' হে অর্জ্জুন, এই পরমাশ্চর্য্য আত্মাই আমি। তুমি "আত্মবান্" অর্থাৎ আত্মসমাহিত হও, তবেই তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, তোমার মধ্যে আমার বিকাশ হইবে,—তোমার জীবন-প্রবাহ অনন্ত জীবন-পারাবারে মিশিয়া পূর্ণতা লাভ করিবে। যিনি আত্মরতি, ও আত্মকাম, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা,

---

১। আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ। ২। ২
শ্রবণাদ্ বাপি বহুভির্য্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোহপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।
—কঠ।

তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার প্রভু নহে, তিনিই ইন্দ্রিয়গণের প্রভু; কাম ও কামনা তাঁহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না, সংসারিক সুখ-দুঃখ তাঁহার চিত্তকে উদ্বেলিত করে না, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দে ভরপূর। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কোনরূপ অজ্ঞান-বন্ধন থাকিতে পারে না, তাহার অজ্ঞানের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, মোহপাশ কাটিয়া গিয়াছে, সূর্য্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার থাকে না, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়েও সেইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার থাকিতে পারে না। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরিণামে আনন্দময় ব্রহ্মতেই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যান। গীতার ভাষায় ইহারই নাম "ব্রাহ্মী স্থিতি"। এই ব্রাহ্মী স্থিতি যিনি লাভ করেন, তিনিই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহাই গীতোক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মবাদের মূল কথা।

উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ বিভাবের কথা বলা হইয়াছে, গীতায়ও সেরূপ পরমাত্মা পরব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ বিভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। নির্গুণ পরব্রহ্মকে বলা হইয়াছে—অনাদি, অনন্ত, অজর, অমর, অক্ষয় ও সনাতন। গীতার মতে এই অক্ষর-ব্রহ্ম সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা সদসতের অতীত তত্ত্ব, —ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ—গী: ১।১৭। ইনিই অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে অবস্থিত জ্যোতির জ্যোতিঃ পরম জ্যোতিঃ।—জ্যোতিষামপি তজ্ জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে গী ৩।১৮। ইনিই বিশ্বপ্রাণ, জগদাধার, ভূত জগতের অন্তরেও তিনি, বাহিরেও তিনি, দূরেও তিনি, নিকটেও তিনি। জগতে বিভক্ত হইয়াও অবিভক্ত, ব্যক্ত হইয়া অব্যক্ত এই পরব্রহ্মই বিশ্বরূপে চরাচরে বিদ্যমান।

"সর্ব্বত্র চরণ কর, মুখ শিরঃ সর্ব্বস্থান,
শ্রবণ নয়ন লোকে, ব্যাপি সর্ব্ব অবস্থান।
যেন সর্ব্বেন্দ্রিয় যুত, সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত
নির্গুণ গুণের ভোক্তা অনাসক্ত সর্ব্বভৃৎ।" ১

শ্রুতিও এই বিরাট পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—তিনি সহস্র শিরঃ, সহস্র নয়ন ও সহস্র চরণ। তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং জগতের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যান নাই, জগতের বাহিরেও তিনি আছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যাহা কিছু সমস্তই সেই পুরুষ। "দ্যুলোক ইঁহার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য ইঁহার চক্ষুঃ, দিক্ ইঁহার কর্ণ, বেদ ইঁহার বাণী, বায়ু ইঁহার প্রাণ, বিশ্ব ইঁহার হৃদয়, পৃথিবী ইঁহার চরণ; ইনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা। সেই দ্যুতিময় দেবতা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে বাহুযুক্ত এবং পক্ষীকে পক্ষযুক্ত করিয়াছেন ১।" গীতাও এই শ্রুতির প্রতিধ্বনি করিয়া ভগবানের বিশ্বন্তর মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্ই বিশ্ব-আত্মা পরব্রহ্ম, পরম পবিত্র, জগদাধার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ শাশ্বত পুরুষ—ইনিই আদিদেব অজ ও বিভু ২। ইনিই আবার জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, গতি ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী ও শরণ-স্থান—গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। এইরূপে ভগবান্ অনন্তগুণময়। গুণ-ব্রহ্মের বর্ণনায় গীতা উচ্ছ্বসিত। সে বর্ণনা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। বেদ ও উপনিষদেও ভগবানের বিরাট ভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা গীতার মত এত সরস ও হৃদয়গ্রাহী নহে। এই বর্ণনায় গীতার ভাব-সম্পদের ন্যায় কাব্য-সম্পদ্ও পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ গীতা ধ্যান করিলে সে বর্ণনার সৌন্দর্য্য ভক্ত সাধকের মানস-নেত্রে প্রতিফলিত হয়। সত্যদ্রষ্টা অর্জ্জুন ভগবানের সেই অতুলনীয় রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, হে বিশ্বরূপ! তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই।

---

(১) সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরো মুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণ ভোক্তৃ চ॥
গীতা ১৩।১৪—১৫

১। (ক) সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম। ঋগ্‌বেদ পুরুষসূক্ত

(খ) অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
—মুণ্ডক ২।১।৪

(গ) বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখ বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ।
—শ্বেতাশ্বতর ৩।৩

২। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম॥
—গী ১০।১২।

"তুমিই অক্ষর, জ্ঞেয় পরতর,
তুমিই বিশ্বের পরম নিধান।
তুমিই অব্যয় নিত্য ধর্ম্মাশ্রয়
সনাতন তুমি পুরুষ-প্রধান॥"

তুমি বিশ্ববীজ, তোমা হইতেই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে, তোমাতেই অনুস্যূত রহিয়াছে, আবার কালে তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। তুমি জগতের কর্ত্তাও বটে, ভর্ত্তাও বটে, সংহর্ত্তাও বটে। তুমি অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রম ও অমিতপ্রভাব।

"তুমিই অমৃত তুমিই মৃত্যু
তুমি লোকপূজ্য তুমি গরীয়ান্।
অতুল প্রভাব! নাহি তিন লোকে
শ্রেষ্ঠ দূরে থাক তোমার সমান॥
তুমি বিশ্বব্যাপী, হে অনন্তরূপ,
তুমি জ্ঞাতা জ্ঞেয় ধাম সর্ব্বোত্তম।
বায়ু, যম, বহ্নি শশাঙ্ক, বরুণ,
পিতামহ পিতা প্রজাপতি আর।
সহস্র তোমায় নম নম নম,
নম নম তোমা নম বার বার॥
সম্মুখে পশ্চাতে নম নম নম
সর্ব্বদিকে সর্ব্ব! করি নমস্কার।" ১

গীতায় এইরূপে ভক্ত অর্জ্জুন শ্রীভগবানের বিভূতি বর্ণনা করিয়াছেন। গীতা ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল, সুতরাং বিশ্বপতি পরমেশ্বরের লীলা-রহস্য সবিস্তারে গীতায় বর্ণিত হইবে, ইহা তো স্বাভাবিক; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই ঈশ্বরবাদও সগুণ ব্রহ্মবাদকে অঙ্গীকার করিলে নির্গুণবাদ মিথ্যা হইয়া পড়ে না কি? সগুণ ঈশ্বরবাদী বৈদান্তিক আচার্য্য রামানুজ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে নির্গুণবাদের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন, পক্ষান্তরে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর সগুণ ব্রহ্মবাদকে মায়ার বিলাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপনিষৎ-সাহিত্যে ব্রহ্মের যে সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ বিভাব দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সগুণ বিভাব প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব নহে, উহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। পরব্রহ্ম যখন মায়াময় হন, তখন তাঁহাকে "মহেশ্বর" বলা হয়—মায়িনন্তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর। মায়া-ব্রহ্মের যবনিকা বা তিরস্করণী—এই তিরস্করণী দ্বারা আবৃত হইলেই ত্রিগুণময়ী মায়াকে আশ্রয় করিয়া স্বভাবতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হন এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন ১। সগুণ ভাবকে মায়িক বলিলে অবশ্য সগুণ ও নির্গুণ-বাদের উপপত্তি করা চলে, উপনিষদেও এই ভাবেই সগুণ-বাদের উপপত্তি করা হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে গীতার বক্তব্য কি, তাহা দ্রষ্টব্য। ঈশ্বরবাদ-মুখরিত গীতায় যতই বিস্তৃত ভাবে সগুণ ঈশ্বরবাদের বর্ণনা করা হউক না কেন, সগুণ পরমেশ্বরই চরম তত্ত্ব, এমন কথা গীতায় কোথায়ও বলা হয় নাই। তার পর, সগুণ ও নির্গুণ যখন একেরই দ্বিবিধ বিভাব, তখন ইহার মধ্যে বাস্তবিক যে কোন বিরোধ নাই, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ স্পষ্ট বাক্যেই "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ" বলিয়া ব্রহ্মের মূর্ত্ত সগুণ রূপ ও অমূর্ত্ত নির্গুণ রূপের পরিচয় দিয়াছেন। এই অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত রূপই পর ও অবর রূপে উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে; এই পর ও অবর রূপকে সমাহৃত করিয়াই ব্রহ্মকে এক কথায় "পরাবর" বলা হইয়াছে। উপনিষদের উক্তরূপ বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, যিনি বিশ্বাতিগ, তিনিই বিশ্বানুগ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্। এক অদ্বয় তত্ত্বই নানা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন—

বদন্তি যত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং তজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

ভাগবত ১।২।১১

১। ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।
গী ১১।১৮

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ।
গী ১১।৪৩

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
গী ১১।৩৯

১। নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম।
গৃহীত মায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ। ভাগবত ২।৬।২৯
আত্মমায়াং বশীকৃত্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম।
ভাগবত ৪।৭।৪৮

নির্গুণ ব্রহ্মেই লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে। সেই জন্যই ভূমাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন, "হে ভূমা, তুমিই সগুণ, তুমিই নির্গুণ, তুমিই সমস্ত, মন ও বুদ্ধির গোচর তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই ১। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুরূপ উপদেশই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমি নিজেই অমৃত অব্যয় নিত্য চিদানন্দময় নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মের ঘনীভূত ব্যক্ত রূপ, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমা ২; এই প্রতিমাই অমূর্ত্ত ব্রহ্মের মূর্ত্ত বিকাশ, নিরুপাধিক ব্রহ্মের সোপাধিক অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্মাও ভগবান্ বাসুদেবকে স্তুতি করিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন—"হে ভগবন্, তুমিই এক অদ্বিতীয় আত্মা, তুমিই পুরাণ পুরুষ সত্য স্বয়ংজ্যোতিঃ অনাদি অনন্ত নিত্য নিরঞ্জন সর্ব্বান্তর্য্যামী সদা পূর্ণ সুখস্বরূপ, তুমিই অদ্বয় নিরুপাধি অমৃতময় পরম ব্রহ্ম ৩।" ব্রহ্মের সোপাধিক মূর্ত্ত রূপকেও যিনি ঐকান্তিক ভক্তির সহিত সেবা করেন, তিনিও ব্রহ্মস্বরূপই প্রাপ্ত হন। নির্গুণ ও সগুণ মূলতঃ একই তত্ত্ব।

"অনন্ত সাগরের যে নিবাত, নিষ্কম্প, প্রশান্ত, নিথর অবস্থা, ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব; আর সমুদ্রের যে লহরীসঙ্কুল, বীচিবিক্ষুব্ধ ফেনিল তরঙ্গিত অবস্থা, ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ; একই ব্রহ্ম কখন সগুণ, কখন নির্গুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছে; পরব্রহ্ম মায়া-যবনিকার আবরণে সগুণ সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নির্গুণ নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে মহা সমুদ্রের এই দুই অবস্থা; পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মেরও ঐ দুই বিভাব। তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ কখন সঙ্কীর্ণ, সসীম ও সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার তিরস্করণী তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ পুনরায় অসীম, অনাবৃত ও অনন্ত হইতেছেন।" বিশ্বাতিগ পরম পুরুষ যিনি একাংশ মাত্রে সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, তিনি স্বীয় মায়া বা তিরস্করণী দ্বারা আবৃত হইয়াই বিশ্বানুগ সগুণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইহা পরম পুরুষের যথার্থ স্বরূপ না হইলেও অজ্ঞ ব্যক্তিরা চরম ও পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে না বলিয়া অব্যক্ত পরম পুরুষকেও ব্যক্তভাবাপন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে। মূঢ়ধী ব্যক্তিগণ পরম ভাব জানিতে পারে না। মায়াময় জগতে মায়ামুগ্ধ জীবের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি মায়ার ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন বলিয়া এই জীব ও জগতের অন্তরালে মায়ার অতীত যে অক্ষর অব্যয় পরম ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, বিভ্রান্ত জীব তাহা দেখিতে পায় না ১। যে মায়াবশে অব্যক্ত ভগবান্ ব্যক্তরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, সেই মায়াপাশ ছিন্ন করা অত্যন্ত দুরূহ—'মম মায়া দুরত্যয়া'। এই মায়া-যবনিকার অন্তরালে ভগবানের যে অব্যক্ত নিত্য চিন্ময় আনন্দঘন রূপ আছে, মূঢ়ধী ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না। এই মায়া সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, ত্রিগুণময়ী মায়ার প্রভাবেই সমস্ত জগৎ মোহিত। মায়ামুগ্ধজীব "আত্মানাত্ম" বিবেকবিহীন বলিয়াই জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারে না। জীবের দৃষ্টি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আবরণ আবৃত, এই জন্যই যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই গুণের বিকাশ, যিনি স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও গুণের অধিষ্ঠানরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌কে মূঢ় জীব দেখিতে পায় না, তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারে না—এবং তিনি যে

১। লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণক্রিয়াঃ। ভাগবত ৩।৭।১২
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্।
নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনো বচসানিরুক্তম্। ভাগবত ৭।৯।৪৮

২। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ। গীঃ ১৪।২৭

সগুণ ঈশ্বরকে অমৃত অব্যয় অক্ষর চিদানন্দঘন ও ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা করায় কেহ কেহ মনে করেন যে, সগুণ ব্রহ্মবাদই গীতার প্রতিপাদ্য। গীতা ঈশ্বরবাদে ভরপুর হইলেও পরমেশ্বরবাদই চরমতত্ত্ব, এমন কথা গীতায় কোথায়ও স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই, সুতরাং ঐরূপ মত আমরা সমর্থন করিতে পারি না।

৩। একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্র সুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ।

১। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। গীতা ৭।২৫।
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মামব্যয়মনুত্তমম্। গীতা ৭।২৪
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্। গীতা ৭।১৩

সর্ব্বজীবের আত্মারূপে জীবদেহে বিরাজ করিতেছেন, তাহাও উপলব্ধি করিতে পারে না, অর্থাৎ মায়া-দৃষ্টি সত্ত্বে ব্রহ্ম-দৃষ্টির উৎপন্ন হয় না, হইতে পারে না। এই জন্যই মায়া-গ্রন্থি ছিন্ন করা একান্ত আবশ্যক। এই দুস্তর মায়া-গ্রন্থি ছেদ করিতে পারে কে? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—যাহাদের বিবেক-দৃষ্টি মায়ার ধূলি-জালে সমাচ্ছন্ন, তাহারা প্রকৃত পথ দেখিতে পায় না। পাপকার্য্যেই তাহাদের রতি দেখা যায়। সংসার-ভোগের কুহকিনী আশায় তাঁহাদের মন চঞ্চল হয়। অজ্ঞানের ফল—দম্ভ, অভিমান প্রভৃতি তাঁহাদের চিত্তকে কলুষিত করে এবং দম্ভ ও অভিমানে কলুষিত চিত্তে আসুর-ভাবের উদয় হয়, দেবভাব স্থান পায় না। এইজন্য ঐ সকল পাপাসক্ত মূঢ়ধী নরাধমগণ ভগবানের শরণাপন্ন হয় না। ভগবানের কল্যাণ-আশীষও উহাদের উপর বার্ষত হয় না। পক্ষান্তরে, যাঁহারা অভিমান-অহঙ্কার দূরে ফেলিয়া একান্ত দীন ভাবে ভগবানের অভয় চরণে শরণ লন, ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁহাদিগেরই মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দেন—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'—৭।১৪।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী (অধ্যাপক)
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি।

যাত্রা

দিন বুঝি হ'য়ে এল শেষ—
মনে হয় একটি নিমেষ,
এনে দিল ভুলে যাওয়া জীবনের রথ।
হয় ত বা জানা ছিল পথ,
তবুও তোমার কুটীরের স্নিগ্ধ ছায়ে বসি,
পলকে ভুলিয়াছিনু আমি যে বিদেশী।
বিস্মৃতির ছলনার মোহে
বুঝি মোরা ভুলেছিনু দোঁহে—
ভরেছিলে বিদায়ের ডালা
ভেবেছিলে মিলনের মালা
বাঁধিবে বন্ধনে তার একটি ক্ষণেরে—
শুভ্র মোর গতিরে ঘেরিয়া
তোমার মিনতি যবে কহে উচ্ছ সিয়া
জীবনেরে কোথা যাবে ছাড়ি—
গিয়েছিনু হয় ত পাশরি
এবার ভাসাতে হ'বে তরী
দিতে হবে অনন্তের পাড়ি।
তাই মোর মুগ্ধ আঁখি-কোলে
উঠেছিল বুঝি টলমলে—দু'টি অশ্রুকণা।
মিথ্যা নয়, ভুলিয়া যেও না
তোমার কুন্তল-মূলে
জীবন-সরসী হ'তে দিয়েছিনু তুলে
ক্রন্দসীর অশ্রুনীরে ভেজা দু'টি কুবলয়।
মানিনি কো ক্ষয় ক্ষতি ভয়,
দেবতার ছিল যাহা ভুলি সেই ক্ষণে
দিনু তোমা অকারণে,
মুহূর্ত্তে বিলায়ে দিনু অনন্ত সঞ্চয়।
তুমি শুধু উঠেছিলে কাঁপি
আপনার দীনতারে ক্ষুব্ধ বুকে চাপি।
সন্ধ্যা নামে, স্তব্ধ নভে,
ভুলে যাও সে ক্ষণের ছবি
ও-পারের বেণুছায়ে
রাখালের ক্লান্ত সুর বাজায় পূরবী—
অনাগত কোন্ ক্ষণে,
তোমার মানসবনে ফুল হ'য়ে যদি কভু ফুটি,
দেবতার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে যেও না কো ছুটি—
তোমার ধ্যানের মাঝে
যদি কোন শান্তিহারা সাঁঝে
ছলনা করিতে আসে তস্কর পথিক
খুলে ফেলো রুদ্ধ আঁখি।
তোমার তপস্যাতলে ঘুমন্ত বালিকা
তুচ্ছ করি পাষাণের কৃপার কণিকা
বন্ধনের গলে যদি—সঁপে তার মুক্তির মালিকা
যুক্তি কোথা খুঁজে পাবে আর—
দেবতা গর্জ্জিবে রোষে—
সর্ব্বহারা হবি যে রে অভিশাপে তাঁর।
আঁধারে ভাসিতে হ'বে জানি
সন্ধ্যারতি হেথা হ'বে তাও সত্য মানি
ভয় নাই, তোমার প্রদীপ তবু
অকারণে চাহিব না কভু,—
শুধু, যা দিয়েছ তুমি ভুলি দেবতারে—
তাই নিয়ে ভেসে যাব,
জীবনের আলো-অন্ধকারে।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র।



বিংশ পর্ব্ব

বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

আমস্ ক্রোবি কাউণ্ট ভন জোলার্ণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার দুই দিন অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবেই কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল; তাহার মুখে অধিক কথা শুনিতে পাইলাম না। তাহার ঘরের ভিতর যে সকল ময়লা জমিয়াছিল, তাহা সে নিঃশব্দে পরিষ্কার করিলে কাউণ্ট জোলার্ণ তাহাকে ঘরের বাহিরের প্রাচীরগুলি চুণকাম করিতে আদেশ করিলেন। আমস্ বলিল, সেখানে চুণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই; এ অবস্থায় সে কিরূপে দেওয়ালগুলি চুণকাম করিবে? ঐ কার্য্য তাহার অসাধ্য। কিন্তু কাউণ্ট জোলার্ণ সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন; তিনি স্বয়ং চারি দিক খুঁজিতে খুঁজিতে গুদামের ভিতর একরাশি চুণ আবিষ্কার করিয়া আমস্কে তাহা দেখাইয়া দিলেন।

আমস্ কাউণ্টের প্রদীপ্ত চক্ষুর দিকে চাহিতে সাহস করিল না; সে নতমুখে মাথা চুলকাইয়া বলিল, "ওখানে চুণ আছে—ইহা আমার স্মরণ ছিল না।"—কাউণ্ট তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন কি না, জানি না; কিন্তু আমস্কে তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইল। ঘরের দেওয়ালগুলি সে স্বহস্তে চুণকাম করিল।

কাউণ্ট জোলার্ণ এইভাবে তিন দিন ব্ল্যাকগল ফার্ম্মে বাস করিয়া আমস্কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তৃতীয় দিন রাত্রিকালে একখানি 'ইউ'-বোটের আবির্ভাব হইল; স্থির ছিল, সেই 'ইউ'-বোট আসিলে তাহাতেই কাউণ্ট জোলার্ণ জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া যাইবেন।

এই 'ইউ'-বোটের চালক কাপ্তেন সারলাক যে সময় একখান ডিঙ্গী লইয়া সমুদ্র-তটে অবতরণ করিল, সেই সময় আমস্ সাগর-বেলায় পাহারায় নিযুক্ত ছিল। কাপ্তেন সারলাক ডিঙ্গী হইতে নামিয়া আমস্কে কাউণ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিল; কাউণ্ট জোলার্ণ আমসের পাকশালায় বিশ্রাম করিতেছেন শুনিয়া কাপ্তেন সারলাক একাকী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। কাউণ্ট পাকশালায় তখন কাপ্তেন সারলাকেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

কাপ্তেন সারলাক কয়েক মিনিট নিম্নস্বরে কাউণ্টের সহিত কি পরামর্শ করিল। তাহার পর কাউণ্ট মেরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার বাপের সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরি কথা আছে; কথাগুলি গোপনীয়। এইজন্য আমার ইচ্ছা, তুমি কাপ্তেন সারলাকের সঙ্গে তাহার 'ইউ'-বোটে যাও; আমরা যতক্ষণ দেশে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত না হই—ততক্ষণ তুমি সেখানেই অপেক্ষা করিবে।—আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?"

মেরী সবিস্ময়ে কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখান হইতে আমার চলিয়া যাওয়া কি খুব বেশী দরকার?"

কাউণ্ট জোলার্ণ বলিলেন, "হাঁ, খুব দরকার বলিয়াই তোমাকে ও-কথা বলিয়াছি।"

মেরী তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কিন্তু কাউণ্ট জোলার্ণের মত পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া গরম কোটে দেহ আবৃত করিয়া সে কাপ্তেন সারলাকের সহিত দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কাপ্তেন সারলাক পাকশালার দ্বারের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময় কাউণ্ট জোলার্ণ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সারলাক, তুমি এখানে ফিরিয়া আসিবার সময় ছয় জন নাবিক ও আমস্ ক্রোবিকে সঙ্গে আনিবে।"

কাপ্তেন সারলাক বলিল, "আপনার আদেশ স্মরণ থাকিবে মহাশয়!"—অনন্তর সে নাজী-প্রথায় কাউণ্টকে অভিবাদন করিয়া মেরী সহ দ্বারপ্রান্ত হইতে অদৃশ্য হইল।

কাপ্তেন সারলাক ও মেরীর প্রস্থানের পর পাকশালার দ্বার রুদ্ধ হইলে কাউণ্ট জোলার্ণ তাঁহার সিগারেট-কেশ বাহির করিয়া একটি সিগারেট মুখে গুঁজিলেন, এবং দিয়াশলাইয়ের কাঠী জ্বালিয়া তাহা ধরাইয়া-লইয়া অগ্নি-কুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ তখন এরূপ গম্ভীর ও মুখের ভাব এরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমসের কি ত্রুটি হইয়াছিল, এবং তাহাকে তাঁহার কি বলিবার ছিল—তাহা বুঝিতে না পারায় আমি বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম!

মিনিটের পর মিনিট ধীরে-ধীরে অতিবাহিত হইতে লাগিল; অবশেষে কাউণ্ট গম্ভীর ভাবে কি ভাবিতে ভাবিতে এবং ভারী বুটের ঠক্-ঠক্ শব্দ করিতে করিতে টেবলের নিকট আসিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ইহার দুই-এক মিনিট পরেই পাকশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; এবং কাপ্তেন সারলাক ছয় জন দীর্ঘদেহ, ভীমকান্তি নাজী নাবিক ও আমস্ সহ পাকশালায় প্রবেশ করিল।

আমস্ দ্বারের নিকট দাঁড়াইতেই কাউণ্ট জোলার্ণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "ক্রোবি, এখানে এসো।"

ক্রোবি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া টেবলের নিকট আসিয়া নীরস স্বরে বলিল, "আমাকে তোমার কি বলিবার আছে?"

কাউণ্ট আমসের মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হ্যান্স পিলসেন নামক কোন লোককে চেন তুমি?"

আমস্ সবেগে মাথা নাড়িয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "না, চিনি না; ঐ নামও কোন দিন শুনি নাই।"

কাউণ্ট বলিলেন, "আমি তোমাকে চিনাইয়া দিতেছি। কাপ্তেন ষ্টীনম্যানের বোট যখন এই আড্ডায় খোরাক লইতে আসিয়াছিল, সেই সময় এই নৌ-সৈনিক তাহার বোট পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া তোমার এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সময় পঁচিশ পাউণ্ড তাহার নিকট সঞ্চিত ছিল। সেই টাকা কোথায় তাহা তুমি জান; তথাপি তুমি কি এখনও বলিবে—তাহাকে চিনিতে না?"

কাউণ্টের কথা শুনিয়া আমস্ মস্তক অবনত করিল; ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, এবং দাঁতে দাঁত বাধিয়া ঠক্-ঠক্ শব্দ হইতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল—এই পলাতক নৌ-সৈনিক তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সে তাহার সঞ্চিত পঁচিশ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছিল, এবং তাহাকে বড়-দেশে রাখিয়া আসিবে, এইরূপ আশা দিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাহাকে নির্জ্জন পার্ব্বত্য দ্বীপে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিল, এ সকল সংবাদ কাউণ্ট জোলার্ণের অজ্ঞাত নহে! আমি এবং মেরী 'ইউ'-বোটের কাপ্তেনের নিকট এ কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম, আমস্ তাহা জানিত না; কিন্তু আমাদের নিকট সংবাদ পাইয়া একখানি 'ইউ'-বোটের কাপ্তেন সেই দ্বীপ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া জার্ম্মাণীতে লইয়া গিয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম।

পলাতক জার্ম্মাণটার কথা আমসের বিলক্ষণ স্মরণ ছিল; কিন্তু তাহা কাউণ্টের নিকট স্বীকার করিতে তাহার সাহস হইল না। সে মুখ বুজিয়া অবনত মস্তকে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কাউণ্ট জোলার্ণ তাহাকে নীরব দেখিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও; বোবার মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? তুমি তাহাকে চিনিতে?"

আমস্ ঢোক-গিলিয়া বাধ-বাধ স্বরে বলিল, "আ-আমি তা-তা-তাহাকে চি-চিনিতাম বটে; তা-তা এ খবর তু-তুমি কাহার নিকট জা-জানিতে পারিয়াছ? আ-আমি—"

কাউণ্ট তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "আমি যাহা পড়িতেছি—শোন।"

তিনি পকেট হইতে একখানি ভাঁজ-করা পুরু কাগজ বাহির করিলেন, এবং তাহার ভাঁজ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"ক্লীন রেঞ্জ"
৫ই ডিসেম্বর।

"টর্পেডো বিভাগের সৈনিক হ্যান্স পিলসেন শত্রু-পক্ষের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী জলপথে বোট হইতে পলায়নের

অপরাধে উইলহেম্‌সাভেনের নৌ-সামরিক আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়ায়, গত ৩রা ডিসেম্বর ক্লীনের 'রাইফেল-রেঞ্জে' এক দল রিজার্ভ সৈনিকের গুলীতে নিহত হইয়াছে।"

পাঠ-শেষে কাউণ্ট জোলার্ণ কাগজখানি পূর্ব্ববৎ ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন; তাহার পর তীব্রদৃষ্টিতে আমসের মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "সেই লোকটিকে মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহার নিকট হইতে তুমি যে পঁচিশ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছ, সে টাকা কোথায়?"

আমস্‌ আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "সে টাকা আমি তোমাদের জন্যই গচ্ছিত রাখিয়াছি। উদ্দেশ্য আমার ভালই ছিল। তা তোমরা কিরূপে সেই হতভাগাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলে?"

কাউণ্ট জোলার্ণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাহা তুমি কোন দিন জানিতে পারিবে না। জার্ম্মাণীর চক্ষু সর্ব্বত্র-ব্যাপী—এ-সংবাদ কি তোমার অজ্ঞাত? আমস্‌ ক্রোবি, এই অপকর্ম্মে তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা অতি কঠোর দণ্ডের যোগ্য। তোমাকে এই দণ্ডদানের জন্য, এবং ভবিষ্যতে তুমি আমাদের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না কর, এ বিষয়ে তোমাকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে; এখানে আসিয়া আমি তোমার কার্য্যপ্রণালী এ কয় দিন সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়াছি। এখন তোমাকে তোমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।"

অতঃপর কাউণ্ট জোলার্ণের আদেশে নাজী নাবিকরা আমসের পাকশালার পশ্চাদ্বর্ত্তী আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া তিন খণ্ড শক্ত কাঠ সংগ্রহ করিল, এবং ঐ তিনখানি কাঠ তেকাঠার আকারে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিল। নাজী নাবিকের দল আমসের পাকশালা হইতে তাহাকে টানিতে টানিতে সেই তেকাঠার নিকট লইয়া গেল, এবং সে বিকট চিৎকারে বাধা দান করিলেও তাহারা তাহাকে সেই 'টিকটিকি'র উপর ফেলিয়া, তাহার হাত-পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল।

নাজী নাবিকরা এইবার আমসের কটিদেশের পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া তাহাকে প্রায় বিবস্ত্র করিয়া ফেলিল। তাহার পর চর্ম্মনির্ম্মিত গ্রন্থিবিশিষ্ট কঠিন চাবুক দ্বারা সবেগে তাহার অঙ্গসেবা আরম্ভ করিল। প্রত্যেক বার আঘাতে তাহার অঙ্গের বিভিন্ন অংশ দড়ার ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া স্থানে স্থানে শোণিতরাশি উৎসারিত হইতে লাগিল। আমস্‌ সেই সুদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; কাউণ্ট জোলার্ণকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে লাগিল। কিন্তু নাজী নাবিকরা তাহার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া কাউণ্টের কঠোর আদেশ পালন করিল। আমি আমসের কষ্ট দেখিতে না পারিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলাম, এবং তাহার আর্ত্তনাদ অসহ্য হওয়ায় কাণে আঙ্গুল গুঁজিয়া এই কঠোর নির্য্যাতনের নিবৃত্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সেই রাত্রেই ভীষণপ্রকৃতি কাউণ্ট জোলার্ণ 'ইউ'-বোটে জার্ম্মাণীতে প্রস্থান করিলেন। আমস ক্রোবি ব্ল্যাকগল ফার্ম্মের পাকশালায় পড়িয়া-থাকিয়া আঘাত-যন্ত্রণায় হাঁপাইতে লাগিল। দীর্ঘকাল তাহার নড়িবার সামর্থ্য রহিল না। বেদনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ টাটাইতে লাগিল, এবং আঘাত-স্থানগুলি ভয়ানক ফুলিয়া উঠিল। বলিষ্ঠ নাজী নাবিকগুলা দেহের সকল শক্তিপ্রয়োগে তাহাকে চাবুক মারিয়াছিল; এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহাদের মনে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই।

যাহা হউক, আমসের আর্ত্তনাদ ঈষৎ হ্রাস হইলে আমি ও মেরী তাহাকে পাকশালার মেঝে হইতে তুলিয়া, ধরাধরি করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে লইয়া চলিলাম। ইহার পর কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে ধীরে ধীরে তাহার বেদনার উপশম হইল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাহার উঠিয়া চলিবার সামর্থ্য না হওয়ায় সে পাহারার জন্য সাগরকূলে যাইতে পারিল না। এজন্য আমি ও মেরী তাহার পরিবর্ত্তে সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত সাগর-বেলায় বসিয়া 'ইউ'-বোটের প্রতীক্ষায় পাহারা দিতে লাগিলাম।

পলাতক নৌ-সৈনিকটির প্রতি আমস্‌ যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, সে কথা তাহার শত্রুপক্ষের নিকট আমিই প্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলাম; এজন্য আমস্‌কে এই প্রকার কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইল। মনে মনে এ কথার আলোচনা করিয়া আমার মন অনুশোচনায় পূর্ণ

হইল। পলাতক নৌ-সৈনিকটির প্রাণরক্ষা হইলেও আমার সান্ত্বনা লাভের একটু উপায় থাকিত; কিন্তু জার্ম্মাণ-সরকার তাহাকে গুলী করিয়া মারিল, অথচ আমসেরও নির্য্যাতনের সীমা রহিল না! আমস্ আমার প্রতি যতই অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করুক, সে আমায় প্রতিপালক ও রক্ষক; অথচ আমি তাহার নির্য্যাতনের উপলক্ষ হইলাম!

মেরী সারা রাত্রি জাগিয়া সাগর-কূলে পাহারায় থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রীতিকর বলিয়া আমার মনে হইল। মেরীর পরিবর্ত্তে আমিই সারা রাত্রি পাহারায় থাকিবার সঙ্কল্প করিলাম। আমার তাহাতে বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না; কারণ, আমি প্রত্যহ দিবাভাগে দীর্ঘকাল ঘুমাইয়া লইতাম। কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়াও মেরীকে নিষ্কৃতি দান করিতে পারিলাম না। রাত্রিকালে আমি সমুদ্রকূলে পাহারা দিতে বসিলেই মেরী সেখানে উপস্থিত হইত, এবং আমার সঙ্গে জাগিয়া পাহারা দিত। আমরা সাগর-বেলায় বালুকার একটি স্তূপের উপর বসিয়া নিদ্রাহীন নেত্রে দীর্ঘরাত্রি অতিবাহিত করিতাম। কিন্তু সময় কাটাইতে আমাদের তেমন কষ্ট হইত না: কারণ, আমরা লেফ্‌টেনার্ট হ্যাগেন, নাজী জার্ম্মাণী, এই যুদ্ধে হিটলারের পরাজয় হইলে জার্ম্মাণীর অবস্থা কিরূপ হইবে, জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটের বোম্বেটেগিরি আর কত দিন চলিবে—ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে গল্প করিয়া শ্রান্তি-বোধ করিতাম না, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনাকষ্টেই অতিবাহিত হইত।

এক দিন রাত্রিকালে আমি একাকী সমুদ্রতটে বসিয়া পাহারা দিতে দিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষে চাহিয়া গাঢ় রক্তবর্ণ একটা আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলাম। উহা 'ইউ'-বোটের আলোক—ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি হরিকেন লণ্ঠনটা ঊর্দ্ধে তুলিয়া আন্দোলিত করিলাম। কিছু কাল পরে লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেন 'ইউ'-বোটের এক-খান ডিঙ্গী লইয়া তীরে আসিয়া নামিল।

লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেনকে আমার অদূরে ডিঙ্গী হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া আমি বালুকা-স্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে দেখিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট বলিল, "হালো পিটার! তুমি পাহারায় আছ দেখিতেছি, আমস্ কোথায়?"

আমি বলিলাম, "তাহার শরীর ভাল নাই, এজন্য সে পাহারায় আসিতে পারে নাই: কিন্তু কাজ ত বন্ধ থাকিতে পারে না, এজন্য এ সময় পাহারার পালা আমসের হইলেও তাহার কাজ আমাকেই করিতে হইতেছে।"

রথভেন বলিল, "আমসের শরীর ভাল নাই? এ যে তোমার মুখে নূতন কথা শুনিতেছি! লোহার মতো শক্ত তাহার দেহ; কোন দিন তাহাকে অসুস্থ দেখি নাই। তাহার অসুখটা কি?"

কথাটা রথভেনের নিকট প্রকাশ করিব কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। শেষে মনে হইল—তাহার নিকট সত্য কথা প্রকাশ করায় কোন ক্ষতি নাই; বিশেষতঃ, সংবাদটা তাহার নিকট গোপন থাকিবে না, আমি না বলিলেও মেরী তাহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিবে। এই জন্য আমস্ কাউণ্ট জোলার্ণের আদেশে কি কারণে চাবুক খাইয়াছে, এবং কঠোর প্রহারে তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেনের নিকট বিবৃত করিলাম। কোন কথা গোপন করিলাম না।

লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেন স্তব্ধবিস্ময়ে আমার সকল কথাই শ্রবণ করিল, সে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিল না। কিন্তু আমার কথা শেষ হইলে সে শিস্ দিয়া উঠিল, এবং উৎসাহভরে বলিল, "শয়তানটা তাহার বিশ্বাস-ঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করিয়াছে। কাউণ্ট জোলার্ণের ব্যবহারে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশে তাঁহাকে কে না জানে? জার্ম্মাণ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ লোক আর এক জনও আছেন কি না সন্দেহের বিষয়। তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ; এজন্য সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। জার্ম্মাণীর নৌ-বিভাগ তাঁহার কঠোর শাসনে সন্ত্রস্ত। যাহা হউক, চাবুকের আঘাতে বেচারা জর্জ্জরিত হইয়াছে শুনিয়া আমি দুঃখিত হইলাম।"

আমি বলিলাম, "আমস্ প্রথম হইতেই তাঁহাকে তাঁহার পদোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করে নাই বলিয়া তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন; তাহার উপর পলাতক জার্ম্মাণ নাবিকটার প্রতি যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সে তাহার সঞ্চিত টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহার

প্রমাণ পাইয়া তিনি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে অশিষ্ট ভাষায় আক্রমণ করিয়া আমস্ পূর্ব্বেও তাঁহার ঘুসি খাইয়াছিল; কিন্তু তথাপি তাহার শিক্ষা হয় নাই। তোমাদের প্রতি সে অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছে।"

লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেন হাসিয়া বলিল, "আমসের মতো অর্থলোলুপ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়! আমাদের ঘড়ি, চেন ও অঙ্গুরী সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে। টাকার জন্য সে সকল কুকর্ম্মই করিতে পারে। টাকার লোভেই সে স্বদেশ-দ্রোহিতা করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে; ইহাতে আমরা উপকৃত হইলেও তাহার এই ফিকির দীর্ঘকাল চলিবে না। তোমার ও মেরীর ভাগ্যে কি আছে ভাবিয়া আমার মন উদ্বেগে পূর্ণ হইয়াছে। যাহা হউক, মেরী এখন কোথায়?"

আমি বলিলাম, "আমি তাহাকে পাকশালায় দেখিয়া আসিয়াছি।"

লেফ্‌টেনাণ্ট বলিল, "আমি আমার 'ইউ'-বোটের খোরাক সংগ্রহ করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। আর এক কথা; আমার ভাই ও লেফ্‌টেনাণ্ট হাগেনের এখানে আসিবার কথা ছিল, তাঁহারা আসিয়াছিলেন কি?"

আমি বলিলাম, "না। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহারা এই দ্বীপে আসেন নাই।"

লেফ্‌টেনাণ্ট বলিল, "তাহা হইলে তাঁহারা আজকালের মধ্যেই এখানে আসিবেন। আমরা প্রায় একই সময়ে উইলহেম্‌সাভেন হইতে যাত্রা করিয়াছি; তাঁহাদের এখানে পৌঁছিতে আর অধিক বিলম্ব হইবার কথা নয়।"

যে সকল নাবিক তাহার ডিঙ্গী লইয়া সমুদ্রতটে আসিয়াছিল, তাহারা তখন পর্য্যন্ত ডিঙ্গী লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেন তাহাদিগকে আড্ডা হইতে 'ইউ'-বোটের খোরাক সংগ্রহ করিয়া বোটে লইয়া যাইতে আদেশ করিল। সেই রাত্রে আকাশ পরিষ্কার এবং সমুদ্র স্থির ছিল, বায়ুর বেগও প্রবল ছিল না; এই জন্য তাহাদের কার্য্য শেষ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না, এবং তাহাতে তাহারা কোনরূপ বাধাও পাইল না। তাহাদের আরব্ধ কার্য্য শেষ হইলে লেফ্‌টেনাণ্ট তাহাদিগকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমসের পাকশালায় চলিল। আমি তাহার অনুসরণে উদ্যত হইলে সে বলিল, "না পিটার, এখন তুমি বাড়ী ফিরিও না, তুমি আমার ডিঙ্গীর কাছে অপেক্ষা কর; আমার ভাই অথবা অন্য কেহ কোন বোটে হঠাৎ এখানে আসিয়া সাঙ্কেতিক আলো দেখাইতে পারে।"

লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেনের এ কথা সঙ্গত মনে করিয়া আমি তাহার সঙ্গে ঘরে যাইবার জন্য আর আগ্রহ প্রকাশ করিলাম না, তাহার ডিঙ্গীর নিকট বসিয়া রহিলাম। লেফ্‌টেনাণ্টের আদেশে 'ইউ'-বোটের যে দুই জন নাবিক ডিঙ্গীতে বসিয়াছিল, তাহারা লেফ্‌টেনাণ্টের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া নিম্নস্বরে আলাপ করিতে লাগিল; কিন্তু আমি তাহাদের কোন কথা বুঝিতে পারিলাম না।

কয়েক মিনিট পরে এক জন নাবিক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাউণ্ট জোলার্ণের আদেশে আমসকে চাবুক মারা হইয়াছিল বলিয়াছ, এ কথা কি সত্য?"

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেনকে আমসের শাস্তি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, নাবিকদ্বয় ডিঙ্গীতে বসিয়া তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি কোন কথা গোপন না করিয়া সকল কথাই প্রকাশ করিলাম। আমার কথা শুনিয়া এক জন নাবিক বলিল, "আমসের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।"—দ্বিতীয় নাবিক বলিল, "যে নাবিকটি তাহার 'ইউ'-বোট ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সে পরে ধরা পড়ায় নৌ-সামরিক আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পলায়নের জন্য তাহার দোষ দেওয়া যায় না। যুদ্ধে তাহার বিতৃষ্ণা হইয়াছিল, এবং সাবমেরিণে দীর্ঘকাল আটক থাকায় ধৈর্য্য ধারণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল; বিশেষতঃ, হিটলার দেশের সকল লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া তাহাদিগকে যেরূপ কঠোর শাসনে রাখিয়াছে, দেশের লোকগুলিকে নানা প্রকার অভাবের কষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য করিয়া বহুবিধ করভারে যে ভাবে তাহাদিগকে



প্রেমস্বপ্ন

শিল্পী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ আচার্য্য

নিষ্পেষিত করিতেছে, তাহাতে অনেকে যে হিটলারের অত্যাচারে ক্ষেপিয়া উঠিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। হিটলার তাহাদিগকে—জার্ম্মাণ জাতিকে বড় করিতে চাহে। সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদিগকে প্রাধান্য-দানের জন্য সে দেশে দেশে যে আগুন জ্বালিয়া তুলিয়াছে, সেই আগুনে যদি তাহাদের ধন-প্রাণ, সুখ-শান্তি পুড়িয়া ভস্ম হয়—অনাহারে তাহাদিগকে মরিতে হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সুখের আশা করিয়া লাভ কি?—জার্ম্মাণীর জনসাধারণের মনের ভাব এই নাবিকদ্বয়ের কথায় পরিস্ফুট হইল। কিন্তু তাহাদের মনের কষ্ট স্বদেশে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে, সেটুকু স্বাধীনতাও তাহাদের ছিল না। তাহাদের ঘরে-বাহিরে সর্ব্বত্র সরকারের গোয়েন্দা তাহাদের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছে; এজন্য ইংলণ্ডের সমুদ্রকূলে আসিয়া তাহারা প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিতে সাহসী হইয়াছিল।

তাহারা উভয়ে এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল, সহসা তাহাদের এক জন মাথা তুলিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রের দিকে চাহিল, এবং মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল, "কোনও শব্দ শুনিতে পাইতেছ? কাণ পাতিয়া শোন ত।"

নাবিকের কথা শুনিয়া আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে সমুদ্রের বিশাল বারি-বিস্তারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নাবিক-দ্বয়ও স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বহু দূর হইতে ঘস্-ঘস্ শব্দ আমাদের শ্রবণ-গোচর হইল; অত্যন্ত অস্ফুট শব্দ। সমুদ্র-বক্ষ হইতে নৈশবায়ু-প্রবাহে এই শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কিসের শব্দ, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

এক জন নাবিক উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কোনও জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ!"—নাবিকটি তৎক্ষণাৎ ডিঙ্গী হইতে জলের কিনারায় লাফাইয়া পড়িয়া আমার সম্মুখে আসিল, এবং আমার হাত ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, "সম্ভবতঃ ইংরেজের কোন পাহারার জাহাজ সমুদ্রে ঘুরিয়া পাহারা দিতে দিতে এই দিকে আসিতেছে; এখানে আমাদের বোটের সন্ধান পাইলেই সর্ব্বনাশ! তুমি দৌড়াইয়া বাড়ী যাও, লেফ্‌টেনাণ্টকে এ সংবাদ জানাইতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না। যাহা করিতে হয়—তাড়াতাড়ি এখানে আসিয়া তাহা তিনি করুন।"

বলা বাহুল্য, আমার আর কোন কথা শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। 'ইউ'-বোট আক্রান্ত হইলে আমাদেরও সর্ব্বনাশ ঘটিতে বিলম্ব হইবে না। উহা যে কোন বৃটিশ 'প্যাট্রল বোটে'র ইঞ্জিনের শব্দ, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমসের দুর্ব্বুদ্ধিতায় না জানি আমরা কি বিপদেই পড়িব—ভাবিয়া আমি রুদ্ধনিশ্বাসে বাড়ীর দিকে দৌড়াইতে লাগিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাকশালার দ্বারে উপস্থিত হইলাম, এবং রুদ্ধদ্বার খুলিয়া-ফেলিয়া দেখিতে পাইলাম—লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেন অগ্নি-কুণ্ডের অদূরে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে মেরীর সহিত গল্প করিতেছিল!

আমি ব্যাকুল স্বরে বলিলাম, "লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেন, সমুদ্রতট হইতে কিছু দূরে একখানা জাহাজের সাড়া পাওয়া গিয়াছে; ডিঙ্গীর নাবিকদের আশঙ্কা, উহা বৃটিশ প্যাট্রল-বোট। তাহাদের এই অনুমান সত্য হইলে—"

আমার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেন্ মেরীর মুখের দিকে আর ফিরিয়া না চাহিয়া ঝড়ের মত বেগে পাকশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া তাহার ডিঙ্গীর নিকট উপস্থিত হইল।

লেফ্‌টেনাণ্ট পাকশালা ত্যাগ করিলে আমিও দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম; কারণ, লেফ্‌টেনাণ্ট তাহার ডিঙ্গীর নিকট আসিয়া কি করে, তাহা দেখিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল। বিশেষতঃ, জাহাজখানি যদি সত্যই বৃটিশ 'প্যাট্রল-বোট' হয়, ও তাহা জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটখানির সন্ধান পায়—তাহা হইলে অতঃপর কি কাণ্ড ঘটে, তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হওয়াই আমার পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু আমি যথাসাধ্য দ্রুতবেগে দৌড়াইয়াও লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেনকে ধরিতে পারিলাম না। আমি সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া দেখি—লেফ্‌টেনাণ্ট তাহার ডিঙ্গীতে উঠিয়া এরূপ বেগে ডিঙ্গী চালাইতেছিল যে, তাহা সমুদ্রবক্ষে ভাসমান 'ইউ'-বোটের নিকটস্থ হইয়াছিল বলিয়াই আমার মনে হইল। আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রের কোন অংশে 'ইউ'-বোটখানি দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু

তাহা কি ইংরেজের জাহাজের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে?—আমি রুদ্ধনিশ্বাসে সমুদ্র-কূলে দাঁড়াইয়া রহিলাম; আমার বুকে যেন হাতুড়ী পড়িতে লাগিল!

আরও কয়েক মিনিট জাহাজের ইঞ্জিনের সেই ঘস্-ঘস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম; আমার মনে হইল, জাহাজ-খান দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের দ্বীপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল; কিন্তু তাহা আমাদের নিকটে আসিল না, তাহার ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া বায়ুপ্রবাহে মিশিয়া গেল।

আমি বুঝিতে পারিলাম, লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেন সেই জাহাজের ভয়ে 'ইউ'-বোট সহ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। সেই রাত্রে আর তাহার আবির্ভাবের সম্ভাবনা না থাকায় আমি সমুদ্রতট হইতে পাকশালায় ফিরিয়া আসিলাম।

মেরী পাকশালায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল: সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলে আমি বলিলাম, "জাহাজখানা চলিয়া গিয়াছে মেরী! সৌভাগ্যক্রমে তাহা আমাদের দ্বীপের নিকট আসে নাই।"—হঠাৎ লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেনের কথা স্মরণ হওয়ায় মেরীকে বলিলাম, "লেফ্‌টেনাণ্ট রথভেন আমাকে বলিয়া গিয়াছে—তাহার ভাই ও হ্যাগেন আজ রাত্রেই এখানে আসিতে পারে; তাহারা একত্র উইলহেম্‌স্‌হাভেন হইতে যাত্রা করিয়াছিল।"

মেরী বলিল, "সে কথা আমি শুনিয়াছি; রথভেন আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে এখনই সমুদ্র-কূলে আমার যাওয়া উচিত, কারণ, এই রাত্রেই তাহারা আসিয়া-পড়িতে পারে।"

মেরী বলিল, "হাঁ, যাওয়াই উচিত; কিন্তু তুমি কয়েক মিনিট অপেক্ষা কর, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

আমি মেরীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম; সে গরম কোটটা পরিয়া লইল। কয়েক মিনিট পরে আমরা সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া প্রভাতকাল পর্য্যন্ত সেখানে পাহারায় রহিলাম; কিন্তু সেই রাত্রে আর কোন 'ইউ'-বোট সেখানে আসিল না।

পূর্ব্ব আকাশ উষালোকে সুরঞ্জিত হইলে আমি হরিকেন লণ্ঠনটা তুলিয়া-লইয়া বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিতেছিলাম, সেই সময় মেরী হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল, "পিটার, ঐ দিকে চাহিয়া দেখ।"

আমি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া-দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিতেই সমুদ্রকূল হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে একখানি 'ইউ'-বোটের কোণাকৃতি 'টাউয়ারে' অরুণ-কিরণ প্রতি-ফলিত দেখিলাম; কয়েক মিনিট পরেই তাহার কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ ডেক সুস্পষ্টরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আমি সেই 'ইউ'-বোটের শ্বেতবর্ণ নম্বর চিনিতে পারায় মেরীকে বলিলাম, "উহা কাপ্তেন ভন রথভেনের বোটই বটে; হ্যাগেন ও কাপ্তেন রথভেন ঐ বোটে আসিতেছে।"

আরও কয়েক মিনিট পরে 'ইউ'-বোটের টাউয়ারের উপর কয়েক জন আরোহীকে দণ্ডায়মান দেখিলাম; তাহাদের মস্তক ও মুখের অধিকাংশ বস্ত্রাচ্ছাদিত। তাহারা সমুদ্র-বেলায় আমাদিগকে দণ্ডায়মান দেখিয়া রুমাল উড়াইয়া অভিবাদন করিল; আমরাও ঐ ভাবে প্রত্যভি-বাদন করিলাম। অতঃপর 'ইউ'-বোটখানি সমুদ্র-বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "উহারা ঐ ভাবে বোটের ভিতর বায়ু গ্রহণ করিতেছে; শীঘ্রই উহা সমুদ্র-গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিবে না। মেরী, আজ রাত্রে হ্যাগেনের সঙ্গে তোমার দেখা হইবে।"

মেরী উল্লাসভরে বলিল, "হাঁ, আজ রাত্রে তাহার সঙ্গে দেখা হইবে। চল, এখন বাড়ী ফিরিয়া যাই; প্রাতর্ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সন্ধ্যার পর হ্যাগেনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। আজ আমার সুপ্রভাত!"

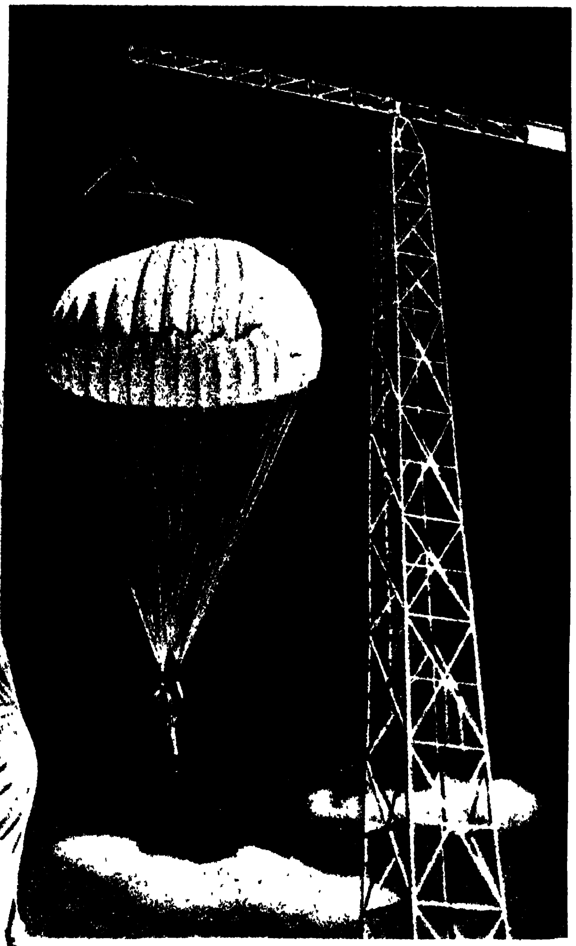
মেরী উৎসাহভরে বাড়ীর দিকে চলিল; আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু সেই জাহাজখানির ইঞ্জিনের শব্দ শুনিয়া আমার মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছিল; রাত্রিকালে হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কায় আমার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিজ্ঞান-জগৎ

প্যারাশুট-বাহিনী

জার্ম্মানির প্যারাশুট-বাহিনীর কার্য্য-তৎপরতা দেখিয়া আমেরিকার ফৌজ-বিভাগে এক দল প্যারাশুট-বাহিনীর (Parachute Troops) সৃষ্টি হইয়াছে। এ-দলে এখন আছেন দু'জন অধিনায়ক এবং আটচল্লিশ জন সেনা। ফোর্ট বেনিংয়ের ভলান্টিয়ার-দল হইতে এ-বাহিনীর সৃষ্টি। সম্প্রতি এ-দলের শিক্ষার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল শুভ ; কাজেই এখন হাজার-হাজার সেনাকে এই প্যারাশুট-বিদ্যা শিখানো হইবে, স্থির হইয়াছে। দলটি বিমান-পদাতিক নামে অভিহিত হইবে। এ দলের



ঢাকনির নীচে প্যারাশুট

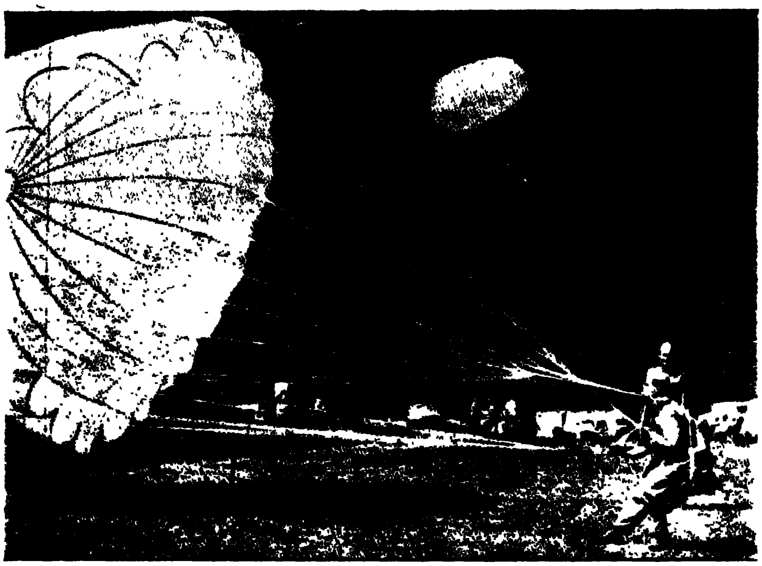


বর্ম্মাবরণ আঁটা

সেনাদের শিক্ষার জন্য হার্টস্-টাউনে ১২৫ ফুট উঁচু টাওয়ার নির্ম্মিত হইয়াছে ; টাওয়ারের সঙ্গে একটি ঢাকনি-খোল সংলগ্ন আছে। এই ঢাকনির নীচে প্যারাশুট রাখা হয়—ঢাকনির আচ্ছাদনের জন্য প্যারাশুটটি বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িবে নড়িবে, সে সম্ভাবনা নাই!

এ বিদ্যার প্রথম পর্ব্বে তার দিয়া সুরক্ষিত খোলা প্যারাশুট-সাহায্যে শিক্ষার্থীকে উচ্চ কোনো স্থান হইতে ঝাঁপ খাইতে হয়। ছাতার যেমন শিক এবং সেই শিকে ছাতা যেমন খোলা থাকে, প্যারাশুটও তেমনি ঐ তারের বন্ধনীতে খোলা থাকে ; কাজেই শিক্ষার্থীদের পক্ষে পড়িয়া হাত-পা ভাঙ্গিবার বিন্দুমাত্র

আশঙ্কা নাই। প্যারাশুটের তলদেশে বসিবার জন্য দোলনা বা আসন নাই; শিক্ষার্থীকে মজবুত এক-রকম বর্ম্মাবরণ পরানো হয়; সে-জন্ত প্যারাশুট ধরিয়া মাটীতে নামিলে আঘাত লাগিবে না, অথচ ভূমি-স্পর্শজনিত প্রথম যে তীব্র রকমের অনুভূতি, সেটুকুও নিরাপদে অভ্যাস হইবে। দ্বিতীয় পর্ব্বে শিক বা তার-বিহীন খোলা প্যারাশুটযোগে ভূমে অবতরণ-



মাটীতে নামিয়া প্যারাশুট হইতে বাতাস-ঝরানো

অভ্যাসের পালা। এ সময় বাতাসের গতি বুঝিয়া শিক্ষার্থী তাঁর প্যারাশুটটিকে এদিকে-ওদিকে যথেচ্ছ পরিচালনা করিতে পারেন। এ-পর্ব্বে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষক থাকেন; তিনি প্যারাশুট-চালনার হদিশ শিখাইয়া দেন। তৃতীয় বা শেষ পর্ব্বে মোড়া প্যারাশুট লইয়া অভ্যাসের পালা। শিক্ষার্থীকে এ সময়ে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যারাশুটটিকে খুলিয়া কায়দা-মাফিক চালনা করিতে হয়। পাছে বিঘ্ন ঘটে, এজন্ত সেফটী-তারের সাহায্যে তাঁকে অক্ষত দেহে মাটীতে নামাইবার ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ব্বে শিক্ষালাভের সময় প্যারাশুটের তলদেশে শিক্ষার্থীকে বসিতে হয়—বসিবার জন্য দোলনার মতো আসন বাঁধা আছে।

——

নিশীথে মোটর-চালনা

রাত্রে মোটর চালাইবার সময় গাড়ীর হেড-লাইট না জ্বালিলে চালকের গা প্রতি-পদে ছমছম করে। সহরের পথে আলো আছে—সে-জন্ত হেড-লাইট জ্বালিবার প্রয়োজন হয় না। হেড-লাইটের জ্যোতিতে সহরের পথে পথিক বা মোটর-চালকের চোখ ঝলসিয়া যায়, তাহাতে অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিতে পারে বলিয়া রাত্রে সহরের পথে মোটরে হেড-লাইট জ্বালা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং সে-অপরাধে আদালতে জরিমানার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সহরের বাহিরে হেড লাইট জ্বালা অত্যাবশ্যক। মোটর চালাইয়া শশীবাবু চলিয়াছেন উত্তর-মুখে—দক্ষিণ দিক হইতে রবিবাবু আসিতেছেন! দু'জনেই মোটরে হেড-লাইট জ্বালিয়াছেন। একের গাড়ীর হেড-লাইটের দীপ্তিতে অপরের চোখ ঝলসিয়া চোখে ধাঁধা লাগিবে; এজন্ত রাত্রে মোটর চালাইবার সময় ড্রাইভারের চোখে ব্যবহারের জন্ত তারের বুনানিযুক্ত জালি পরকলা তৈয়ারী হইয়াছে। চশমার ফ্রেমে এই জালি-পরকলা আঁটিয়া চোখে দিয়া গাড়ী চালান—চোখের উপর যে-আবরণ রচিত হইবে, তাহাতে পথ দেখিতে পাইবেন; অথচ অপরের



জালি-চশমা

গাড়ীর হেড-লাইটের তীব্র আলোয় চোখে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

——

মাটীর টব

মাটীর টবে ফুলের বা পাতা-বাহার গাছ পুঁতিয়া বসিবার বা শুইবার ঘরে সে টব রাখিতে অনেকে কেমন কুণ্ঠা বোধ করেন—কালো



মাটীর টবের মাটী ঢাকা

মাটীর 'নীচতা'র জন্য! তাঁরা যদি টবের গা পেইণ্ট করিয়া লন, তাহা হইলে মাটীর মাটিত্ব ঢাকা পড়িয়া টবে বাহার খুলিবে। টবে পেইণ্ট লাগাইলে টবের গা দিয়া জল চুঁইবে না, জল পড়িবে না!

——

গলা-কাচে ফুঁ

আমাদের এই সহর কলিকাতায় সিঁদুরিয়াপটী অঞ্চলে কাচ গলাইয়া সেই গলা কাচে ফুঁ দিয়া অশিক্ষিত দেশীয় কারিগরের দল একদা আতরের ফুকা শিশি, টেষ্ট-টিউব, চুঙ্গি-গ্লাশ তৈয়ারী করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত। বিজলী বাতির প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাদের হাতের চুঙ্গি-গ্লাশ দীপ-দানের উৎসবকে দীপ্তিসমৃদ্ধ করিত। সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময় দীপালী-উৎসবে তাদের হাতের হাজার-হাজার চুঙ্গি-গ্লাশে দীপ জালিয়া এই কলিকাতা সহরকে যে আলোর মালায় সাজানো হইয়াছিল, তাহাতে সকলের মন মুগ্ধ হইয়াছিল, পথ-ঘাট বিচিত্রোজ্জ্বল হইয়াছিল। এখন কাচের বড় বড় কারখানা হওয়ার জন্য তাদের হাতের বিচিত্র সৃষ্টি এই সব আতরের শিশি ও চুঙ্গি-গ্লাশ বাজারে আর দেখা যায় না। গলা কাচে ফুঁ দিয়া এই যে শিল্প-রচনা—এ কাজে আমেরিকা আজ বিশেষ রকম মুন্সিয়ানা দেখাইতেছে। সেখানে অনেকে কল-কারখানার তোয়াক্কা না রাখিয়া কাচে ফুঁ দিয়া বিচিত্র কৌশলে ঘর সাজাইবার জন্য নানা রকম পশু-পক্ষী, অন্য টুকিটাকি আস্‌বাব প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছেন। তাঁদের সৃষ্টি-কৌশলের একটু পরিচয় পাশের ক'খানি ছবিতে পাওয়া যাইবে।



কাচের নলে ফুঁ



গলা কাচে হরিণের গ্রীবা ও শিং



এবারে আস্ত হরিণ



ফুঁয়ের জোরে কাণ ও শিং

কাপড়ে ফটোগ্রাফ

ইংলণ্ডের বিশেষজ্ঞেরা ফটোগ্রাফের এমন উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন যে, তার ফলে রুমালে, বালিশের ওয়াড়ে, জামায়—অর্থাৎ যে কোনোরূপ বস্ত্রে প্রিয়জনের ফটোগ্রাফ সুস্পষ্টভাবে ডেভেলপ ও প্রিণ্ট করিয়া চিত্ত-তৃপ্তি-সাধনে সমর্থ হইবেন।



ওগো আমার প্রিয়

বয়া-ওভারকোট

এবারের এ-যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী-বিভাগ এক রকম জীবন-রক্ষক ওভারকোট তৈয়ারী করিয়াছে। সে ওভারকোটে এক সঙ্গে চারটি লোক জলের উপর অনায়াসে ভাসিয়া থাকিতে পারে। কোটটি

গ্যাবার্ডিন কাপড়ে তৈয়ারী। কোটের লাইনিং যে-উপাদানে তৈয়ারী, তাহা সোলার চেয়েও ছ'গুণ হাল্কা। উপাদানটি গরম; তাই এ কাপড় গায়ে থাকিলে জলের বুকে



কোট

গা হিম হইবে না, গরম থাকিবে। এ-কোট গায়ে থাকিলে স্বয়ং বরুণদেবও নরলোকের কোনো জীবকে জল-তলে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না !



কোট-গায়ে সাঁতার

ফল-কাটা ছুরি

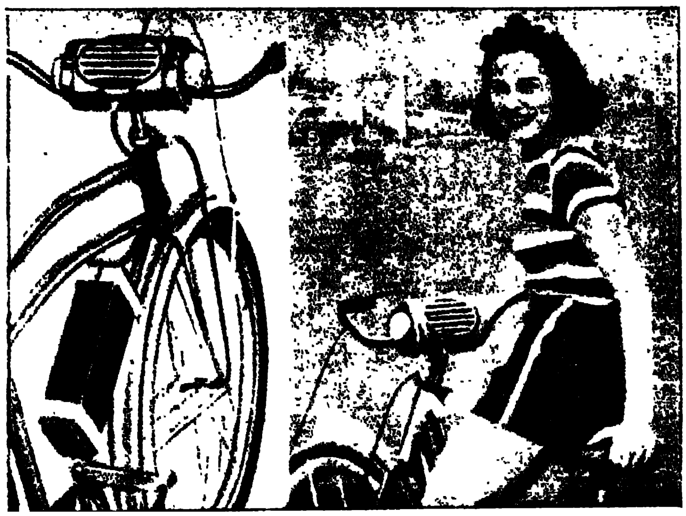
ফল কাটিবার জন্ত নূতন ধরণের এক রকম ছুরি তৈয়ারী হইয়াছে।



তিন-ফালি ফল

এ ছুরির গড়ন সম্পূর্ণ অন্ত রকমের। একবার এ ছুরি চালাইলে ফলমূল এক সঙ্গে তিন-ফালি করিয়া কাটা চলিবে। সব ফালি এক মাপের হইবে। তিনখানি করিয়া লম্বা ব্লেড ফ্রেমে আঁটিয়া এ ছুরির হইয়াছে

অতিক্ষুদ্র রেডিয়ো-যন্ত্র



বাইক্-বিহারিণীর সুর-যন্ত্র

বাড়ীতে রেডিয়ো-যন্ত্র রাখিয়াও অনেকে তৃপ্তি পান না; মোটর-গাড়ীতে রেডিয়ো-যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া বিচরণ-কালটুকুকে সুর সরস করিয়া তোলে! যাঁদের মোটর-গাড়ী নাই, বাইকে চড়িয়া পাড়ি সারিতে হয়, তাঁদের বিহার-ক্ষণটুকুকে সুর-সঙ্গীতময় করিয়া তুলিবার জন্য অতিক্ষুদ্র রেডিয়ো-যন্ত্র বিরচিত হইয়াছে। ছবিতে দেখিবেন, রিমের কাছে ব্যাটারি এবং হ্যাণ্ডেলের গায়ে রেডিয়ো-যন্ত্র। বাইকের হ্যাণ্ডেলে এ-যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া অনায়াসে রেডিয়ো-প্রোগ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন। এ যন্ত্রটি এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, সুইচ্ টিপিয়া সুর ও স্বরকে গুরু-লঘু-গ্রামে চড়াইতে-নামাইতে পারিবেন। এ যন্ত্রটির মাপ লম্বে সাড়ে চার, প্রস্থে স'তিন, এবং উচ্চতায় আট ইঞ্চি মাত্র।

ইতিহাসের অনুসরণে

আফগান রাজ্যের অতীত কথা

আফগান রাজ্য বা আফগানিস্থান অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে, হিন্দু জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল, সে কথা র‍্যাপসন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস-লেখকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। অনেকের মতে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলই আর্য্য মনীষিগণের কণ্ঠনিঃসৃত সুপবিত্র বেদগানে প্রতিধ্বনিত হইত; তবে ইহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য যে, আধুনিক কালে যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আফগানিস্থান নামে মানচিত্রে অঙ্কিত দেখা যায়, প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যে একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান আফগানিস্থান ইরাণের মালভূমি হইতে পূর্ব্ব দিকে সুলেমান গিরিরাজি, এবং উত্তর দিকে হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উহার বিস্তার ১ লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গ-মাইল। প্রাচীন কালে এই রাজ্যের বিস্তার এত অধিক ছিল না; এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড একই রাজার শাসনাধীনও ছিল না। এই অঞ্চলটি মরুস্থলীতে এবং শৈলশ্রেণীতে পরিপূর্ণ থাকায় এই অঞ্চলটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন রাজার শাসনাধীন ছিল। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সানুদেশে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং দুর্গম গিরিগুহায় ধূম-ধূসর যজ্ঞকুণ্ডের লুপ্তাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কথিত আছে। এই আফগান রাজ্যের পূর্ব্ব দিকেই আর্য্যনিবাসের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইস্তান (Seistan) এবং বেলুচিস্থানেও যে অতি প্রাচীন কালে আর্য্যনিবাস ছিল, তাহা মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণও স্বীকার করিয়াছেন। যে সময়ে ম্যাসিডনপতি আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে—অর্থাৎ কিছু কম আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে—এই অঞ্চল আর্য্যসভ্যতালোকে সমুজ্জ্বল ছিল। কত কাল ধরিয়া তথায় যে হিন্দুসভ্যতা বিরাজিত ছিল,—তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে, তাহার কিছু কিছু উল্লেখ যে না আছে, এরূপ নহে। রামায়ণে দেখিতে পাই, যে সময়ে রাজা রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন, সেই সময়েই কৈকয় প্রদেশের রাজা যুধাজিৎ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া রাজা রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কেকয় রাজ্য পঞ্জাবের বিপাশা নদীর পশ্চিম দিক হইতে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গন্ধর্ব্বদিগের অধিকার ছিল সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে। বিপাশার বর্ত্তমান নাম বিয়াস নদী। উহা শতদ্রু নদের করদ নদী। ইহার পশ্চিম দিকেই প্রাচীন কেকয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। গন্ধর্ব্বগণ সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরেই ছিল, পরে তাহার পূর্ব্ব তীরে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ রাজ্যটি বর্ত্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই অঞ্চলে গোধূম, ছোলা, জোয়ার প্রভৃতি শস্য প্রচুর উৎপন্ন হয়, এবং বেদানা, আঙ্গুর ও স্বচ্ছন্দ-বনজাত বৃক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই জন্য যুধাজিৎ এই রাজ্যটিকে ফলমূলে পরিশোভিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বরা সংখ্যায় তিন কোটি ছিল বলিয়া রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। তিন কোটি লোক কেবল যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই ছিল, এরূপ অনুমান হয় না; কারণ, এখন এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষের কিছু অধিক হইলেও সাড়ে ২৪ লক্ষেরও কম। সুতরাং এই গন্ধর্ব্ব রাজ্যটি কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উহা আফগান রাজ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ রামায়ণ-কথিত বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে নিতান্তই অসম্মত; কিন্তু যখন উহা প্রাচীন কাল হইতেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তখন উহা অবিশ্বাস করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

সেই স্মরণাতীত যুগের কোন প্রস্তর-ফলক বা তাম্র-শাসন প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ভরতের দ্বিতীয় পুত্রের নাম পুষ্কল। তাঁহার নাম অনুসারে যে মহানগরী স্থাপিত হইয়াছিল, গ্রীক ঐতিহাসিকরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গ্রীকরা পুষ্কলাবতীকে পিউখ্লায়োতি

(Peukhlaoty) নামে অভিহিত করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডার বিনাযুদ্ধে তক্ষশীলা অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পুষ্কলাবতী অধিকার করিবার সময় তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ-ফলে উহা আর অধিক দিন স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। পেশোয়ার রাজ্যও পুষ্কলের নাম বহন করিতেছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

এই পুষ্কলাবতী নগরীটি কোথায় ছিল? ইহা ছিল সিন্ধু নদের অপর তীরে, কাবুল নদীর সহিত সিন্ধু নদের সঙ্গম-স্থলে। কাবুল নদীর প্রাচীন নাম কুভা (Kubha), গোমল নদীর প্রাচীন নাম ছিল গোমতী। কুরুম্ উপত্যকার নাম ছিল ক্রমু। এখন প্রশ্ন এই, কেকয় রাজ্যটির বিস্তার কতখানি ছিল? অনেকেরই মতে ইহা বিপাশার পশ্চিম পার হইতে ইরাবতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভরতের মাতামহের নাম ছিল অশ্বপতি। তিনি ঐ ছোট রাজ্যটির অধিপতি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, কেকয়ী নামে ইরাণী ভাষার গন্ধ পাওয়া যায়! কিন্তু কেকয়ী ভরতের মাতার আসল নাম ছিল না; তিনি কেকয়-রাজের দুহিতা বলিয়াই তাঁহাকে কেকয়ী বলা হইত। কেকয়ীর পিতার নাম ছিল অশ্বপতি, তাঁহার ভ্রাতার নাম ছিল যুধাজিৎ বা যুবুধন, দাসীর নাম ছিল মন্থরা। এ সমস্তই আর্য্য নাম। কেকয় রাজ্যের পশ্চিম-উত্তর দিক হইতে গন্ধর্ব্বরা ঐ রাজ্যে আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। ভরত যখন কাবুল ও সিন্ধুর সঙ্গমস্থলে পুষ্কলের জন্য পুষ্কলাবতী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি গন্ধর্ব্বদিগকে আফগান-ভূমি পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এই পুষ্কলাবতী খাইবার গিরিসঙ্কটের অদূরবর্ত্তী, এবং পেশোয়ার হইতেও তাহা অধিক দূরবর্ত্তী নহে। ইহার পরই গান্ধার দেশ। উহা খাস আফগানিস্থানে। মিষ্টার সি. ভি. বৈদ্য তাঁহার 'Riddle of Ramayana' নামক গ্রন্থে অনুমান করিয়াছেন যে, ভরতের মাতামহ অশ্বপতির রাজ্য ছিল আফগানিস্থানে। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন আফগান রাজ্যে হিন্দুদিগের এবং বৌদ্ধদিগেরই বাস ছিল। কেবল আফগানিস্থানে নহে, পরন্তু সেইস্তান এবং বেলুচিস্থানেও আর্য্য-সভ্যতা দেদীপ্যমান ছিল। ইহা ম্যাক্‌ক্রিণ্ডেলের প্রদত্ত মেগাস্থেনিসের আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। তবে কেকয় রাজ্য যে আফগানিস্থানের ভিতর ছিল না,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লাসেন (Lassen)-প্রমুখ খ্যাতনামা ইতিহাসবেত্তারা বলিয়াছেন, সোফায়েটিস্ (Sophaetes) নামক যে রাজ্যটির কথা আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয় সম্পর্কে শুনা যায়, তাহাই ছিল অশ্বপতির কেকয় রাজ্য।

এই গন্ধর্ব্বগণ আধুনিক আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া কেকয় রাজ্যের প্রান্তভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। তবে গান্ধার দেশটাই গন্ধর্ব্বগণের বাসভূমি ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত-বিদ্যায় দক্ষ ছিল। তাহারা অনার্য্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। ভরত কর্ত্তৃক সীমাগু বিজয়ের পর দেখা যায় যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার-রাজনন্দিনী গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শ্বশুরের নাম ছিল সুবল; ইহা সম্পূর্ণ সংস্কৃত নাম। ভীম দুর্য্যোধনকে অনেক গালি দিয়াছিলেন,—কিন্তু দুর্য্যোধন অনার্য্যবংশজার পুত্র, এমন কথা কোথাও বলেন নাই। বরং গন্ধর্ব্বরা ধার্ম্মিক এবং দেবযোনিজ ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। গন্ধর্ব্ব অর্থে ধার্ম্মিকও বুঝায়। পরে গন্ধর্ব্বগণ সূর্য্যোপাসক হয়, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

রামায়ণে ভরত কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ব-বিজয়ের যে বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, এ কথা মনে করা অসঙ্গত। পক্ষান্তরে আফগান রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বহ্লিক (Balkh) অঞ্চলই বৈদিক যুগের বহ্লিক দেশ। উহা কাবুল এবং অক্সাস (Oxus) নদীর ব্যবধান-ভূমিতে অবস্থিত। গ্রীকরা এই স্থানকেই ব্যাক্‌ট্রিয়া বলিতেন। এই ব্যাক্‌ট্রিয়ার সভ্যতা প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া এবং নিনিভার সমসাময়িক ছিল, ইহাও য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বহ্লিক দেশের ভূগর্ভ হইতে হিন্দু যুগের এবং বৌদ্ধ যুগের অনেক পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইতেছে। সুতরাং সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ অঞ্চলে অতি প্রাচীন কালে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। অনেকেরই ধারণা, বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীরা ঐ দিক হইতেই ভারতে আসিয়াছিলেন। আফগান

রাজ্যে, সেইস্তানে, এবং বহ্লিক অঞ্চলে এমন অনেক স্থান আছে, যাহাদের নাম দেখিয়া সেগুলিকে বৈদিক বলিয়া বুঝা যায়। সেই জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যগণের পিতৃভূমি বহ্লিক অঞ্চল হইতে কাশ্যপ হ্রদ (Caspian Sea) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পৌরাণিক যুগে (রামায়ণ-মহাভারতের রচনাকালে) আফগান রাজ্যের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধার-রাজকুমারী সৌবলা বা গান্ধারীর উদ্বাহ-বন্ধন ভারতের সহিত আফগান রাজ্যের ঘনিষ্ঠতা সূচনা করে। তৎকালীন আফগান-রাজের নাম ছিল সুবল, এবং তাহার পুত্রের নাম ছিল শকুনি। মহাভারত-বিখ্যাত 'শকুনি মামা' ও তস্য পিতা গান্ধারপতি অশ্বপতি যে আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গন্ধর্ব্বরা পাশা খেলাতেও খুব পারদর্শী ছিল; ইহার প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্যেও বিদ্যমান: শকুনি মামা পাশা খেলাতেই যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া কুরুকুলধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য মতে যখন সন্দেহের কুহেলিকাবৃত কাব্য-সাহিত্যের যুগ হইতে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক যুগে উপনীত হওয়া যায়, আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণেই তাহার আরম্ভ। সে প্রায় সওয়া দুই হাজার বর্ষেরও অধিক পূর্ব্বের কথা। সে সময়ে বেলুচিস্থান, সেইস্তান, এবং আফগানিস্থানে হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং সূর্য্যোপাসকদিগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল; এ কথা গ্রীক-লেখকগণ বলিয়া গিয়াছেন। সে সময় মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সম্ভবতঃ, পারস্য হইতে অগ্নির উপাসকগণ ঐ অঞ্চলে আসিয়া প্রভাববিস্তার করিতেছিল। আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ঐ অঞ্চল বিজয়ের পরেই মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই সম্ভবতঃ, ঐ অঞ্চলে জৈন ধর্ম্ম কিছু উৎসাহ পাইয়াছিল। তাহার পরে অশোকের আমলে ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্য হিরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পতনের পরও এই অঞ্চলে হিন্দু-রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তুর্কীরাও ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মৌর্য্য-রাজগণের পতনের পর ঐ অঞ্চলে তুর্কীশাহী এবং হিন্দুশাহী শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল, এ কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দুশাহী অর্থে হিন্দু-বাদশাহী। হিন্দু-রাজগণের রাজধানী ছিল উন্ধ বা অহিন্দ নগরে। উহা এটকের আরও উত্তরে সিন্ধু নদীতীরে অবস্থিত ছিল। আর কাবুলে তুর্কীশাহী রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুষাণ-রাজগণের মধ্যে কুজুল কদফিসা আফগান রাজ্য এবং পঞ্চনদের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের শেষ গ্রীক রাজা কুজুল কদফিসা এক জন কর্ম্মচারীতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাহার পর চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন ভীম কদফিসা। তিনি ছিলেন শৈব। বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। ভীমই কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁহার মুদ্রায় শিবের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইঁহার পরই কণিষ্ক কুষাণ রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার আমল হইতে আফগান রাজ্য বহু কাল হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজগণের শাসনে ছিল। কণিষ্কই শকাব্দা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলেন যে, শক জাতি (Scythians) হিন্দু নহে। তাহারা য়ুরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে এবং এশিয়ার পশ্চিম অংশে বাস করিত। তাহারা হিন্দু ছিল না। কিন্তু হিন্দুদিগের মতে শক জাতি ক্ষত্রিয়, এবং হিন্দু ছিল। কুষাণ-বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল ভীম; এ নামটি সম্পূর্ণ হিন্দু নাম। এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও শকগণ বিদেশী ছিল, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। 'শীদিয়ান' শব্দের সহিত শক শব্দের ধ্বনিগত কতকটা সাম্য দেখিয়াই শকরা যে শীদীয় ছিল, ইহা অনুমান করা সঙ্গত নহে। আফগান রাজ্যেও কণিষ্কের বংশধরদিগকে হিন্দুশাহী রাজা বলা হইত। অথচ বৌদ্ধগণকে আফগান অঞ্চলের লোক হিন্দু বলিত। কণিষ্ক পরে শৈবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বলেন, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আফগান রাজ্যের লোকরা হয় অগ্নির উপাসক, না হয় বৌদ্ধ, না হয় হিন্দু ছিল।* ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ঐ অঞ্চলে কণিষ্কের পরও প্রায় আট-নয় শত বৎসর

* Encyclopedia of Islam p. 162.

কাল হিন্দু বা বৌদ্ধ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দু রাজা জয়চন্দ্রের পরাজয় পর্য্যন্ত আফগান রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে হিন্দু রাজ্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আফগান রাজ্যের শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন জয়পাল। তিনি সাবুক্তিগীন কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে আফগান্ রাজ্যে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। রাজা জয়পাল ব্রাহ্মণ ছিলেন।

এই সময় পর্য্যন্ত আফগান্ রাজ্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। গজনীর মামুদের সহিত উল্ উৎবী নামক তাঁহার যে লেখক আসিয়াছিলেন, তিনিই একাদশ শতাব্দীতে 'তারিখ-ই-যুমিনি' অভিধায় এই অঞ্চলের এক ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। অল্ বিরাণীও প্রসঙ্গতঃ আফগান জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে আফগানরা অত্যন্ত অসভ্য এবং বর্ব্বর জাতি। ইহারা দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তুর্কী-শাসকদিগকে ইহাদের সহিত অবিশ্রাম সংগ্রাম করিতে হইত। ইহারা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বা তাহার পরেই ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। ইহারা একটা মিশ্র জাতি বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। লংওয়ার্থ তেমসের মতে আফগানরা তুর্কি ইরাণিয়ান জাতি; আফগানরা কিন্তু সে কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা যেন-ই ইজ্রেলের (অর্থাৎ ইজ্রেলের সন্তানগণের) বংশধর। কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে, তাঁহারা ইজ্রেলের বংশধর—সুতরাং ইহুদী। কাবুলে এখনও অনেক হিন্দু আছেন। তাঁহারা ঐ রাজ্যের প্রাচীন হিন্দুদিগেরই বংশধর। আমীর সাবুক্তিগীনই প্রথমে আফগান জাতিকে তাঁহার সৈনিকদলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র খ্যাতনামা মহম্মদ ঘুরি বহুসংখ্যক আফগানকে তাঁহার সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তিরেলের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ যখন পরাজিত এবং নিহত হন, তখন বহুসংখ্যক আফগানই মহম্মদ ঘুরির অনুকূলে যুদ্ধ করিয়াছিল। শুনা যায়, পৃথ্বীরাজের সেনাদলেও কতকগুলি আফগান ছিল। তাহারা মুসলমান ছিল না। ইহার পর কিছু কাল আর আফগান জাতির কথা শুনা যায় নাই।

খৃষ্টীয় ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দীন বল্বন দিল্লী রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক মিন্‌-হাজ-ই সিরাজ তাঁহার 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বল্বন মেওয়াট এবং বটেহর প্রদেশের হিন্দুদিগকে দমন করিবার জন্য ৩ হাজার আফগানকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহারা অত্যন্ত কঠোরস্বভাব, এবং অসমসাহসিক লোক ছিল। আফগানরা তৈমুরের ভারত আক্রমণের সুযোগে ভারতে কতকটা সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। এই সকল আফগান সর্দ্দারের মধ্যে শেরশাহ স্থরই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আফগানরা ইহার পূর্ব্বে কোন সময়েই আফগান রাজ্যে তাহাদের কোনরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই।—ইহারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কোন কার্য্য করিতে বিশেষ অভ্যস্ত নহে। সেই জন্য ভারতে মুসলমান রাজত্বকালেও দিল্লীর বাদশাহগণ আফগান রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতেন। তাহার পর নাদির শাহের আক্রমণের ফলে দিল্লীর দুর্ব্বল বাদশাহ মহম্মদ শাহ নাদির শাহকে আফগান রাজ্য ছাড়িয়া দেন। নাদির শাহ নিহত হইবার পর তাঁহার অন্যতম অনুচর আহ্মদ শাহ আবদালি নামক জনৈক আফগান-সর্দ্দার আফগান রাজ্যের পূর্ব্বাংশ প্রাপ্ত হন। ইনিই প্রথমে আফগান রাজ্যে স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইঁহার খেতাব হইয়াছিল দুররি দৌরান। সেই জন্য তাঁহার নাম আহ্মদ শাহ আবদালির পরিবর্ত্তে আহ্মদ শাহ দুরাণি হইয়াছিল। এই আহ্মদ শাহ দুরাণিই ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি চূর্ণ করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও আফগান জাতি স্ব-শাসন উপভোগ করে নাই। তৎপূর্ব্বে আফগান জাতি কখনও পারস্যের, কখনও তুর্কীদের, এবং কখনও বা ভারতীয় রাজগণের অধীন ছিল। পরে আবার রণজিৎ সিংহ পেশোয়ার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো আফগানিস্থানের অধিপতি দোস্ত মহম্মদের সহিত সন্ধি করেন। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আফগানিস্থান স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।



বঙ্গদেশে কৃষিমূলক শিল্প

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা অল্প দুশ্চিন্তার বিষয় নহে। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বন করিলে ভারত স্বাবলম্বী ও অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হইতে পারে, তাহা এখন হইতেই নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। পূর্ব্বকালে দেশের অবস্থা যেরূপ থাক, বৃটিশ শাসনে আসিয়া এ দেশ ক্রমশঃ কৃষিপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। কাঁচা মাল রপ্তানি ও প্রস্তুতীকৃত দ্রব্য আমদানি কিছু কাল পূর্ব্ব-পর্য্যন্তও ভারতীয় বাণিজ্যের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন কিছু আরম্ভ হইয়াছে। বিগত দশকের, অর্থাৎ ১৯৩০-১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির বিবরণ পর্য্যালোচনা করিলে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়। ভারত আজকাল কেবল কাঁচা মালই রপ্তানি করে না; দেশ মধ্যে কাঁচা মালের সদ্ব্যবহারও আরম্ভ হইয়াছে। তন্তুমূলক শিল্পে (Textile Industry) এখন আমরা আত্মনির্ভরশীল হইতে সমর্থ হইয়াছি; ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প জগতের সম-শ্রেণীর বৃহৎ শিল্পের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; স্বকীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত শর্করাও ভারতীয় কল সমূহে উৎপাদিত হইতেছে; কাগজের জন্যও আমরা এখন আর সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী নহি;—এইরূপ দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশে কিছু দিন হইতে শিল্পের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতে নূতন শিল্পযুগের সূচনার এই শুভ মুহূর্ত্তে দেশের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক কথাই আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়। কংগ্রেসও এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছে। এ দেশে আধুনিক যুগোপযোগী শিল্প সমূহ যতই অধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই মঙ্গল; কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ভারত প্রায় ৪০ কোটি মানবের অধ্যুষিত একটি মহাদেশ-বিশেষ। এই বিরাট জনমণ্ডলীর ভরণপোষণার্থ কৃষিকার্য্যকে চিরকালই প্রথম স্থান দিতে হইবে। সেই জন্য শিল্পের মধ্যেও যেগুলি কৃষিজাত দ্রব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই-গুলিতেই অধিক মাত্রায় সাধারণের মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ যে-কোন পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। আবার শুধু শিল্প-পরিকল্পনা হইলেই চলিবে না; সঙ্গে সঙ্গে কৃষির প্রভূত উন্নতিসাধনের পরিকল্পনাও অপরিহার্য্য। কারণ, এ দেশে ধান্য, কার্পাস, ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান প্রধান ফসলের ফলন অন্যান্য উন্নতিশীল দেশ অপেক্ষা অনেক কম। এ দেশের কৃষি ও শিল্প পরস্পর বিজড়িত। কৃষক ও বণিক, উভয়েরই স্বার্থের সামঞ্জস্য রাখিয়া যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা হইতেই অধিকাংশ দেশবাসী উপকৃত হইবে। কৃষিমূলক শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ভারতের সকল প্রদেশেই সমান। আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার কথাই বলিতেছি। বঙ্গদেশ এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠায় কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে উহার প্রসারলাভের সম্ভাবনা কিরূপ, তাহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য।

ধান্য

ধান্যই বাঙ্গালার প্রধান শস্য; অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালায় ধানের জমির পরিমাণ অনেক অধিক। সমগ্র ভারতের মোট ধান-চাষের জমির শতকরা সাড়ে ২৬ ভাগ বাঙ্গালা দেশেই অবস্থিত। ধান হইতে চাউল উৎপাদন এখন এ দেশে একটি প্রধান শিল্পে পরিণত হইয়াছে। ছোট-বড় অনেক কলই সহর ও গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগে ইহা অপরিহার্য্য

হইলেও, চাউলের কল যে অবিমিশ্র কল্যাণপ্রদ—ইহা স্বীকার করা যায় না। এক দিকে এইরূপ কলের প্রবর্ত্তনে 'চেলুকী' নাম্নী এক শ্রেণীর গ্রাম্য দুঃস্থা স্ত্রীলোকের জীবিকার্জ্জনের উপায় রহিত হইয়াছে; অন্য দিকে যাহারা কল-ভাঙ্গা চাউল ব্যবহার করে, তাহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষিত হইতেছে। কলে-ছাঁটা সুমার্জ্জিত মসৃণ চাউলের মোহে পড়িয়া অনেক লোক অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে (Defeciency discases) আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে। ফলতঃ, অধিক মাত্রায় 'মাজা' চাউল বাঙ্গালার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের এতই হানিকর হইয়া উঠিয়াছে যে, Science Congress Association-এর বিগত বার্ষিক অধিবেশনে ভারতীয় পোষণতত্ত্বানুসন্ধানাগারের অধ্যক্ষ খাদ্যতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ ডক্টর আয়ক্রয়েড এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এরূপ চাউল প্রস্তুত ও বিক্রয় করা আইন-প্রণয়ন দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

কল দ্বারা ধান হইতে চাউল করা ব্যতীত এ দেশে ধান্যসংক্রান্ত অন্য শিল্পের প্রচলন নাই। কিন্তু এই প্রকার একাধিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। উদাহরণ-স্বরূপ এ-স্থলে দুইটি উল্লেখযোগ্য। ধান কাটিবার সময় নাড়ার গোড়ার দিকে খানিক বাদ দেওয়া হয়। তাহা কতকটা সারের কায করে বটে, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিয়া ধানের চাষ চলে না; বরং ঐভাবে পরিত্যক্ত অংশের অনুরূপ সদ্ব্যবহার লাভজনক হইতে পারে। অন্যান্য দেশে বিচালীর এই ভাবে পরিত্যক্ত অংশ হইতে Paste Board ও Straw Board প্রস্তুত হইতেছে। এগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও ইহাদের চাহিদা আছে; এবং বিদেশ হইতে এই শ্রেণীর দ্রব্যের আমদানিও অল্প নহে। গ্রাম্য-শিল্পরূপে ধান্যের গোড়া (নাড়া) হইতে প্যাকিং-কার্য্যের জন্য পিস্‌বোর্ড প্রস্তুত হইতে পারে।

ধান্য-সংক্রান্ত আর একটি শিল্প—ধান্যের কুঁড়া হইতে তৈল-নিষ্কাষণ। কলে বা ঢেঁকিতে চাউল ছাঁটিবার সময় তাহার আনুসঙ্গিক কুঁড়া প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণ তৈল আছে। চাউলের কুঁড়া দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়; এজন্য ইহার টাট্‌কা ব্যবহারই ফলপ্রদ। জাপানে সরকারী কৃষি ও শিল্প বিভাগের 'Rice Application Laboratory'তে দীর্ঘ-কালব্যাপী পরীক্ষার ফলে অল্প দিন পূর্ব্বে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কুঁড়াতে যে তৈল বর্ত্তমান, তাহার পরিমাণ শতকরা প্রায় ২২ ভাগ। এই তৈল সাবান ও ফটো-ফিল্ম প্রস্তুত, রেশম পরিষ্কার, রন্ধন ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারা যায়। এখন জাপান ও কোরিয়ায় কুঁড়ার তৈল উৎপাদনের জন্য ৩১৪টি কল স্থাপিত হইয়াছে, এবং উৎপাদিত তৈল টাকায় প্রায় ৪ সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, খৈল হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে উহার পশুখাদ্যরূপে মূল্য যেমন কমিয়া যায় না, কুঁড়ার সম্বন্ধেও উহা বলা যায়। কুঁড়ার তৈল বা Rice-Bran oil চীনা-বাদাম-তৈলের সম-প্রকৃতির, এবং উহা সমরূপ প্রসার লাভ করিবে বলিয়াই অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত।

পাট

পাট বঙ্গদেশের একচেটিয়া ফসল। পাট চাষে, ব্যবসায়ে ও শিল্পে অল্প দিন পূর্ব্বেও যথেষ্ট লাভ হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পাটের বাজারে কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত, তাহা এ দেশের জনসাধারণের অজ্ঞাত নহে। সম্প্রতি কেন্দ্রী-সরকার পাট, তুলা, চীনা-বাদাম ও গোধূমের বাজার-দরের কিরূপে উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা অনুসন্ধান করিতেছেন। তবে পাট সম্বন্ধে চাষ-নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন অন্য কোন আশু ফলপ্রদ উপায় লক্ষিত হইতেছে না। বিগত দশকে পাট-শিল্পের গতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক দিকে প্রস্তুতীকৃত মালের আমদানি যেমন কমিয়াছে, অন্য দিকে উক্ত শ্রেণীর পণ্যের রপ্তানিও তেমনি বাড়িয়াছে। ১৯৩২-৩৩ ও ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে আমদানি-করা পাট-জাত পণ্য সমূহের মূল্য যথাক্রমে ১৩-৪৬ ও ৯-১৭ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সমশ্রেণীর যে পরিমাণ মাল রপ্তানি হয়, তাহার মূল্য দাঁড়ায় ১৩-১৭ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশীয় পাট-শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ইহাও কিন্তু দ্রষ্টব্য যে, একাল-পর্য্যন্ত এই শিল্প নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতের গণ্ডীতেই আবদ্ধ রহিয়াছে—যথা—সূতা, দড়ি, থলে, চট, ক্যাম্বিস ইত্যাদি। শান্তির সময়ে পৃথিবীর নানা দেশে এই সকল দ্রব্য রপ্তানি করিয়া যথেষ্টই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে—যেমন বর্ত্তমান সময়ে—বাজারের বিপর্য্যয় বশতঃ এই সকল দ্রব্যের কাট্‌তির অন্তরায় ঘটায়, কৃষক ও কল-ওয়ালা, উভয় সম্প্রদায়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এক উপায়ে এইরূপ অবস্থার প্রতিকার হওয়া সম্ভব। পাট-কল-সমূহ যদি কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুত না করিয়া কম্বল, গায়ের চাদর, কৃত্রিম পশম, আলপাকা প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে এ দেশে ও বিদেশে ঐ সকল দ্রব্যের কাট্‌তি হওয়ায় সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভের উপায় হইতে পারে। বস্তুতঃ, এ দেশের পাট-কলগুলিতে এই প্রকার ব্যবস্থা থাকিলে বর্ত্তমান কালে পাটের সমস্যা এরূপ জটিল হইয়া উঠিত না।

তুলা

অতীত কালে যাহাই থাকুক, বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালায় তুলা চাষের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প; সমগ্র ভারতে ১,৪৪,৩৯,০০০ একর কার্পাস চাষের জমির মধ্যে বাঙ্গালায় মাত্র ৫৮,০০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়া থাকে, এবং তাহাও কেবল ৪টি জিলায় অর্থাৎ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বঙ্গদেশে তুলার চাষ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও কাপড়ের চাহিদা হ্রাস হয় নাই। ৫ কোটির অধিক-সংখ্যক বঙ্গবাসীর জন্য বৎসরে প্রায় ৯০ কোটি গজ বস্ত্রের প্রয়োজন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলা দেশে কার্পাস-শিল্পের সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা কত অধিক। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বে তুলার কারখানা-শিল্পের দিকে বাঙ্গালীর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তাহারা তাঁতজাত ও বিলাতী কাপড়ের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিত। বস্তুতঃ, বঙ্গদেশে প্রথম কাপড়ের কল স্বদেশী যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিলম্বে আরম্ভ হইলেও তুলার কারখানা-শিল্প এ প্রদেশে ক্ষিপ্রগতিতেই অগ্রসর হইতেছে। ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার কলগুলিতে ৯,৭৬,৮৯,২৬৩ গজ কাপড় নির্ম্মিত হইত; সেই স্থলে ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ২০,৬২,০৯,৩১২ গজ নির্ম্মিত হইয়াছে; অর্থাৎ ছয় বৎসরের মধ্যে বস্ত্রোৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১১১ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই প্রকার উন্নতি সন্দর্শনে উল্লসিত হইবার কারণ থাকিলেও এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালার বাজারে বৎসরে প্রায় ১৪ কোটি টাকার কার্পাসজাত দ্রব্য বিক্রয় হয়; তন্মধ্যে বর্ত্তমান কলগুলি সরবরাহ করিতেছে ন্যূনাধিক ৩ কোটি টাকার মাল!

বঙ্গদেশকে বস্ত্র-শিল্পে স্বাবলম্বী হইতে হইলে এখনও অনেক উদ্যম, অধ্যবসায় এবং অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন। এখন প্রায় ২৮টি কাপড়ের কলে কায চলিতেছে, এবং প্রায় ৫৮টি কল প্রতিষ্ঠার পর কার্য্যক্ষম হইবার জন্য বিভিন্ন স্তরে উপনীত হইয়াছে; কিন্তু যেরূপ দ্রুতগতিতে বাঙ্গালায় কাপড়ের কল রেজেষ্টারী হইতেছে, তদনুপাতে মূলধন সংগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

বাঙ্গালার তুলা-শিল্প উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও কাঁচা মাল সম্বন্ধে তাহার পরমুখাপেক্ষিতা হ্রাস হইতেছে না। তুলার উৎপাদন-কেন্দ্র সমূহ বঙ্গদেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত, এবং সেই সকল স্থান হইতে তুলার আমদানি অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। যে তুলা এ দেশে এখন উৎপন্ন হয়, তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই সকল কারণে বাঙ্গালা দেশেই উৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়নোপযোগী তুলার চাষের ব্যবস্থা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা বাঙ্গালায় উৎপন্ন হইতে পারে না, এই ধারণার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্তই অমূলক। পূর্ব্বকালে এরূপ তুলা এ দেশে যে যথেষ্ট পরিমাণেই উৎপন্ন হইত, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব নাই। সম্প্রতিও কতকগুলি পরীক্ষায় (যথা ঢাকেশ্বরী মিলের) উক্তরূপ তুলার চাষে আশানু-রূপ সাফল্যলাভের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। দীর্ঘ আঁশের তুলা কয়েকটি নির্ব্বাচিত কেন্দ্রে ধারাবাহিক ও ব্যাপক ভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা যত শীঘ্র করিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতি ও সরকারী কৃষি বিভাগ যুক্তভাবে যে পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে কার্পাস চাষ ও শিল্প, উভয়েরই প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, এরূপ আশা অসঙ্গত নহে।

ইক্ষু

বর্ত্তমান কালে ভারতে যে সকল নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তন্মধ্যে ইক্ষু-শর্করা শিল্পটি অনন্যসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতে যে পরিমাণ চিনির আমদানি হইয়াছিল, তাহার মূল্য ছিল ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে এই মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিদধিক সাড়ে ১৪ কোটি টাকায় নামিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতে ১৪ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। দেশের অভাব পূর্ণ করিয়াও ইহা হইতে সাড়ে ৩ লক্ষ টন উদ্‌বৃত্ত থাকিবে বলিয়াই অনুমান হয়।

ভারতীয় শর্করা-শিল্পে এখন যুক্তপ্রদেশ ও বিহারই শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। অন্য কোন প্রদেশ যাহাতে এই শিল্পে অগ্রসর হইতে অর্থাৎ প্রতিযোগিতা করিতে না পারে, তজ্জন্য বহুবিধ, এমন কি, প্রতিরোধক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইতেছে! ইহা কিন্তু অযৌক্তিক; কোন দ্রব্য সুলভে উৎপাদিত হওয়ার পক্ষে যে স্থলের প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল, সেই স্থলেই উহা সমধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বঙ্গদেশের জল, হাওয়া, ও মৃত্তিকায় ইক্ষু-ফসল উৎকৃষ্টরূপেই উৎপন্ন হয়। ফলনের তুলনা করিলে দেখা যায়, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে একর-প্রতি ১৫।১৬ টন ইক্ষু জন্মে; কিন্তু বঙ্গদেশে উহার উৎপাদনের মাত্রা সাধারণতঃ দ্বিগুণ; বাঙ্গালার কোন কোন অংশে একর-প্রতি ৪০ টন ইক্ষুও উৎপন্ন হইয়াছে। আবার শর্করার অনুপাতও বঙ্গদেশজাত ইক্ষুতে তুলনায় যে অধিক, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রতি-একরে উৎপন্ন ইক্ষুর গুড়ের পরিমাণ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে উক্ত পরিমাণ জমির ইক্ষু হইতে গুড় পাওয়া যায় যথাক্রমে ২৪৬০ এবং ২৭০০ পাউণ্ড; কিন্তু বঙ্গদেশে পাওয়া যায় ৪৬৪৩ পাউণ্ড। প্রসঙ্গতঃ, এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, গুড়ের জন্মস্থান এই বঙ্গদেশই; গৌড় হইতে গুড় শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই অনেকের ধারণা।

বঙ্গদেশে আপাততঃ প্রায় ১০টি চিনির কল কায করিতেছে; কিন্তু এ প্রদেশে শর্করা-শিল্প সম্প্রসারণের যথেষ্ট অবসর আছে, তাহা, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা ও আসামে বৎসরে ৫০ হইতে ৫৫ লক্ষ মণ চিনি ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে এখন প্রাদেশিক কলগুলিতে মাত্র কিঞ্চিদধিক ১৪ লক্ষ মণ চিনি প্রস্তুত হইতেছে। শুধু বাঙ্গালা ও তাহার প্রতিবেশী আসামের চিনির অভাব মোচন করিতেই এখনও ২০।২৫টি নূতন কল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে।

বলা বাহুল্য যে, ইক্ষু-শর্করা-শিল্প প্রসারের সহিত ইক্ষু-চাষের পরিমাণ বৃদ্ধিও অবশ্যপ্রয়োজনীয়। বঙ্গদেশে ইক্ষুচাষের উপযোগী জমির অভাব নাই; জলাভাব বশতঃ পশ্চিম-বঙ্গের ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কোন কোন জিলা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ব্যাপক ভাবে ইক্ষুরোপণের অসুবিধা থাকিলেও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জিলাতেই ব্যাপক ভাবে ইক্ষুচাষের ব্যবস্থা হইতে পারে।

শর্করা-শিল্পের অধিকতর প্রসারের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ এই যুক্তির অবতারণা করা হয় যে, এখনই প্রয়োজনাতিরিক্ত শর্করা ভারতে উৎপাদিত হইতেছে; উহার পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইলে শিল্পের ক্ষতি হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই যুক্তি অসার। চিনি উদ্‌বৃত্ত থাকিবার কারণ, মূল্যাধিক্য বশতঃ জনসাধারণ উহা কিনিতে পারে না। এ কথা কেহই বলিতে পারেন না যে, এ দেশে মাথা-পিছু চিনির ব্যবহার অন্যান্য সুসভ্য দেশের অনুরূপ। বস্তুতঃ, উহার ব্যবহার তুলনায় অনেক কম। উপযুক্ত অঞ্চলে ইক্ষুর চাষে এবং শর্করা উৎপাদনে অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শিত হইলে শর্করার মূল্য বর্ত্তমান মূল্য অপেক্ষা আরও হ্রাস করা যাইতে পারে। অন্য দিকে উদ্‌বৃত্ত শর্করা কাটাইবার স্বাভাবিক পথ রপ্তানি। ভারতের স্বার্থের দিকে World's Sugar Conventionএর দৃষ্টি নাই। এ বিষয়ে ভারত সরকার স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিলে রপ্তানির পথ উন্মুক্ত হইতে পারে, এবং ভারতীয় শর্করা-শিল্পও বহু গুণে বর্দ্ধিত হয়।

নারিকেল

নারিকেল বৃক্ষের প্রায় কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় না। ব্রুশ, সম্মার্জ্জনী প্রস্তুতের মোটা তন্তু, দড়ি-দড়া, মেজেতে বিছাইবার গালিচা, মাদুর, তৈল, সুরা, শর্করা, গৃহ-নির্ম্মাণের উপাদান, গ্যাস-শোষক কয়লা এবং সর্ব্বোপরি উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয়—এ সমস্ত একই এই মহোপকারী তরু হইতে সংগৃহীত হয়। বঙ্গদেশে নারিকেল বৃক্ষের প্রসার অল্প নহে ; মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, বাখরগঞ্জ, খুলনা, নোয়াখালি প্রভৃতি সাগর-সন্নিহিত জিলাসমূহে নারিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এক পয়সায় একটি ডাব অনেক স্থানেই কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের ন্যায় বাঙ্গালায় নারিকেলের সদ্ব্যবহার হইতেছে না। ব্যবসায় উদ্দেশ্যে উৎপাদন করিলে নারিকেল হইতে কিরূপ আয় হইতে পারে, নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। ১০০০ গাছের প্রত্যেকটিতে ন্যূনকল্পে ৪০টি হিসাবে ফল ধরিলেও ৪০,০০০ নারিকেল পাওয়া যায়। তাহা হইতে খোসা পাওয়া যায় প্রায় ২৪ টন (১ টন=২৭৷৷০ মণ), এবং উক্ত খোসা হইতে ৩ টন তন্তু বাহির হয়। এতদ্ভিন্ন, উক্ত সংখ্যক সুপুষ্ট নারিকেল হইতে প্রায় ১ টন শুষ্ক শাঁস পাওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা হইতে ১৫।১৬ মণ নারিকেল-তৈল নিষ্কাশিত হইতে পারে। নারিকেল-তৈলের খৈল অতি পুষ্টিদায়ক পশু-খাদ্য, এবং দেশে ও বিদেশে ইহার চাহিদাও অল্প নহে। কিন্তু বঙ্গদেশে এ সকল শিল্প এখনও সংগঠিত হয় নাই। এখন এ দেশে উৎপাদিত নারিকেলের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই ডাবরূপে ব্যবহৃত হয় ; অবশিষ্ট ৩০ ভাগ ঝুনা অবস্থায় পাওয়া যায়। ঝুনা নারিকেলের বেশীর ভাগই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় ; যে পরিমাণ নারিকেল হইতে নারিকেল-তৈল উৎপাদিত হয়, তাহা বোধ হয়, মোট ফসলের শতকরা ১০।১৫ ভাগের অধিক হইবে না। বিপুল পরিমাণ নারিকেল-খোসা পচিয়াই নষ্ট হয়, তাহার সামান্য অংশ মাত্রই জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। বিগত কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইলে দেশের যে প্রভূত উপকার হইবে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। শুষ্ক নারিকেল (Dessicated coconut) ও নারিকেল-তৈলজাত কৃত্রিম মাখনেরও বিদেশে যথেষ্ট চাহিদা আছে। এ সকল শিল্পের প্রতি এখন পর্য্যন্ত দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

তৈলবীজ

ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে তৈলবীজ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই শ্রেণীর ফসল রপ্তানির মাত্রাও কম নয়। জগতের বাজারে যে পরিমাণ তৈলবীজ রপ্তানি হয়, তাহার এক-চতুর্থাংশ ভারতোৎপন্ন। ২।১টি বীজ—যথা রেড়ী ও সোরগুঁজা, ভারতের একচেটিয়া ফসল। কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানে বড় বড় কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গদেশে তৈল-শিল্প কিয়ৎ পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হইলেও এ দেশে তৈলবীজের চাষ অন্য কয়েকটি প্রদেশ অপেক্ষা অল্প। দৃষ্টান্তস্বরূপ শর্ষপ ও রাইয়ের কথা বলিতে পারা যায়। যুক্তপ্রদেশে ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে ৩,৫৭,০০০ টন রাই ও শর্ষপ উৎপাদিত হয়, সে স্থলে বাঙ্গালায় উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ১,৮০,০০০ টন। কলিকাতার সরিষার তৈলের কলসমূহকে প্রধানতঃ অন্য প্রদেশের বীজের উপর নির্ভর করিতে হয়। এ দেশে শর্ষপ চাষের বিস্তার ও উহার তৈলমাত্রা (oil contents) বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বিশেষরূপেই বাঞ্ছনীয়। মধ্য-য়ুরোপে সর্ষপ তৈল হইতে কৃত্রিম মাখন প্রস্তুত হয়। তদ্রূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিলে দেশে ব্যবহৃত না হউক, বিদেশে কাটতির সম্ভাবনা আছে। বঙ্গদেশে তিসির চাষ অপেক্ষাকৃত কম ; কিন্তু কলিকাতাই তিসি-তৈল ও খৈল রপ্তানির প্রধান বন্দর। তিল ও রেড়ীও বঙ্গদেশে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু ব্যবসায়িক হিসাবে চীনা-বাদামের চাষ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চীনা-বাদাম স্বল্পায়াসেই হাল্‌কা বেলে-মাটীতে উৎপাদিত হইতে পারে, বঙ্গদেশে সেরূপ মাটীরও অভাব নাই। কিন্তু প্রভূত চাহিদা সত্ত্বেও এই তৈল উৎপাদনে বাঙ্গালা এখনও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে।

উপসংহারে কতিপয় অর্দ্ধবন্য তৈলবীজের উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এগুলির বীজ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা হইতে তৈল-নিষ্কাশন গ্রাম্য-শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর। ইহাদের বীজোৎপন্ন তৈল অন্যান্য ব্যবসায়িক তৈলের সমকক্ষ না হইলেও, বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য ইহাদের অল্প-বিস্তর চাহিদা আছে। মহুয়া বীজ এই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আহার্য্য তৈল ও অন্যান্য শিল্পের উপাদানরূপে মহুয়া তৈলের যথেষ্ট কাটতি আছে। রোহিতক, শিয়ালকাঁটা, হিজলী বাদাম, করঞ্জা, নিম, কুসুম ফল, চিরঞ্জি, পুন্নাগ, নাগকেশর প্রভৃতিও এই শ্রেণীভুক্ত। আধুনিক ক্ষুদ্রাকারের কলের ঘানির সাহায্যে উক্ত প্রকার বীজসমূহ হইতে তৈল-নিষ্কাষণ কুটীর-শিল্পরূপে উৎপাদনের স্থানে পরিচালিত হইতে পারে। বঙ্গদেশে যে সকল স্বভাবজ তৈল-বীজ পাওয়া যায়, তাহাদিগের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া অতীব প্রার্থনীয়। তৈল-বীজ রপ্তানী সমূহ ক্ষতিকর। কারণ, তাহাতে শুধু তৈলই যে দেশের বাহিরে চলিয়া যায়, এরূপ নহে; অধিকন্তু দেশ পশু-খাদ্য ও জমির সারেও বঞ্চিত হয়। তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ও দেশের মাটীর উর্ব্বরতা—উভয়েরই হানি হয়। সুখের বিষয়, বিগত দশকে তৈল-বীজ রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গিয়া দেশ-মধ্যে তৈল উৎপাদনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই অবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং উত্তরোত্তর ইহার উন্নতি হয়, দেশীয় তৈল-শিল্পের হিতান্বেষী সকল ব্যক্তিরই সে বিষয়ে অবহিত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

চির-ভাস্বর

বৃথাই ঘুরেছি আঁধারে
ঘুরে ঘুরে সারা রাতি।
মাঠে, ঘাটে, মঠে, দেউলে
হাতে লয়ে ক্ষীণ বাতি।
হারায়ে আলোর মাঝারে
তোমারে খুঁজি যে আঁধারে,
সকল রবির সবিতা
জ্বলজ্বল তব ভাতি।

থাক' না লুকায়ে গোপনে
বৃথা কেন খোঁজা তবে।
তেজ সংবরি ধেয়ানে
তুমি জাগ অনুভবে।
হে রবি, তোমারে হেরিতে,
বৃথা দীপ দিবা-নিশীথে
হারাই তোমার আলোকে
ঝলসে নয়ন পাঁতি।

শ্রীকালিদাস রায়



মনের চাবি

চাবি দেখলেই ব্যবহারিক জীবনে এর যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা' আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় না; আমাদের প্রায় সকলেরই ধারণা—বাক্সজাতীয় পদার্থে চাবি লাগানই এর একমাত্র কাজ। জিনিষ খোয়াবার ভয় যদি না থাকত, তবে আর অনর্থক কেউ কাজ বাড়াত না, এটা অত্যন্ত সত্যি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এই চাবি আমাদের অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। যে ভাবেই ভাবি না কেন—শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় নেই যে, চাবির অভাবে আমাদের কাজের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা; এমন কি, দৈনন্দিন জীবন চালাবার যে চাকা তা'ও অচল হওয়ার উপক্রম হয়। তাই মনে হয় যে, জিনিষ যত ছোট, যত তুচ্ছই হোক না কেন, সেই অনুপাতে তার মূল্য যে কমবে, এটা সত্য নয়;—ছোট্ট এক-টুকরো হীরে, তার দাম প্রকাণ্ড একটা লোহার বীমের চেয়ে অনেক বেশীর চেয়ে একটুও কম নয় নিশ্চয়ই। লোহার একটা চাবির দাম বড়-জোর দু'-তিন পয়সা; কিন্তু কাজের বেলা তার দাম ধ'রে কাজ আদায় করি না, বা স্বেচ্ছায় সেটা ফেলে দিই না। মনের চাবির অবশ্য এইভাবে বিচার করা যায় না; এ হ'ল সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির জিনিষ, এর সঙ্গে বাস্তবতার কোন সম্বন্ধই নেই। এ সত্ত্বেও মন-চাবিকে চাবির কোটায় আমরা না ফেলে পারি না।

অতি তুচ্ছ ও নগণ্য হ'লেও চাবির অভাবে আমাদের যে কত রকম অসুবিধা ভোগ কর'তে হয়, এখানে তার গোটাকত উদাহরণ দেওয়া যাক। সাংসারিক ব্যক্তিমাত্রেরই এই সব বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তবুও "অধিকন্তু ন দোষায়।"

রাত্রির অন্ধকার অপসারিত ক'রে, যবনিকার আড়াল থেকে দিনমণি তাঁর আলোক-সম্ভার নিয়ে যখন বেরিয়ে আসেন, আমরা ঘুমের মায়া কাটিয়ে তখনই চোখ মেলে তাকাই বাইরের দিকে। শুধু সূর্য্যের আলো দেখে প্রত্যয় হয় না, চট ক'রে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠবার সময় হ'লো কি না, সেটা যাচাই ক'রে দেখি। ঘড়ি হ'ল কর্ম্মজগতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তা। তাকে কেন্দ্র ক'রে আমরা আমাদের প্রতিদিনের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করি। ইনি আবার অতিমাত্রায় অভিমানী, প্রতিদিন একই সময়ে চাবি না দিলে, অভিমানে নির্ব্বাক্ হয়ে থাকেন। ফলে সময় ঠিক পাওয়া যায় না; স্কুল, কলেজ ও অফিসের ভাত ঠিক সময়টিতে দেয়া যায় না; তাড়াতাড়ি করতে হয়, আর সব 'ভেস্তে' যায় ও দ্বিগুণ খাটুনি খাটতে হয়। এক-কথায় প্রতিপদে ও প্রতিকাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ গেল এক রকমের অসুবিধা। আবার অন্য ভাবেও ঘড়ি তার ক্ষোভ প্রকাশ করে, যেমন প্রায়ই যদি চাবি দিতে ভুল হয়, অথবা এক-এক দিন এক-এক সময়ে চাবি দেয়া যায়, তবে ঘড়ি যায় বিগড়ে। তাকে কায়দায় আনতে হ'লে, স্থান পরিবর্ত্তন ও অর্থব্যয় অপরিহার্য্য। পাঠাও দোকানে, দাও টাকা, আন ফিরিয়ে; ঘড়ি তখন আবার যথানিয়মে কাজ দেবে। এই গেল ঘড়ির ব্যাপার।

ধরা যাক্ বাক্স, পেটারা ইত্যাদি। ট্রাঙ্ক, সিন্দুক, আলমারীতে চাবি না দিলে তহবিল তসরূপের ও সঞ্চিত দ্রব্য চুরি যাওয়ার রীতিমত আশঙ্কা আছে। তাই একটার উপর দুটো তালা লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়;

কখনও বা নানা অক্ষর দিয়ে চাবি তৈয়েরী করিয়ে তাকে আরও নিরাপদ করা হয়। চাবি যদি ঠিক না হয়, একের চাবি অন্যের গায়ে লাগান হয়, তবে বিপদ দেখা দেয় অন্য ভাবে। ভুল চাবি দিয়ে হঠাৎ হয় ত বন্ধ করা কি খোলা গেল, কিন্তু ফিরে তাকে খোলা বা বন্ধ করা আর হ'য়ে উঠে না। বিফল প্রয়াস ও পরিশ্রমের পর মিস্ত্রী ডাকিয়ে পয়সা খরচ ক'রে তাকে কার্য্যোপযোগী করতে হয়। সব চেয়ে গুরুতর জটিল ব্যাপার দাঁড়ায় তখনই, যখন ঠিকমত চাবি নিলেম, দেখে-শুনে চাবি লাগালেম, সাবধানে চাবিটা রেখেও দিলেম, কিন্তু যেই দরকার প'ড়ল, শত খোঁজাখুঁজি ক'রেও তখন তার সন্ধান পাওয়া গেল না। সম্ভব অসম্ভব সব স্থান অনুসন্ধান করা হলো; শেষে ছেলেদের বক্সিস কবুল করে খুঁজতে লাগিয়ে দেয়া হলো, কিন্তু লাভ বিশেষ কিছু হ'ল না। ফলে বাজার-হাট রইল বন্ধ, কাপড় বার করা হ'ল না, নোংরা পোষাকেই তাড়াতাড়ির জন্যে বেরিয়ে যেতে হ'ল; নিশ্চয়ই নিঃশব্দে নয়; স্ত্রীকে, ছেলেমেয়েকে যদৃচ্ছা কটু কথা ব'লে বেরিয়ে গেলেন বাড়ীর কর্ত্তা। স্ত্রীও গরম মাথায় ঝাল ঝাড়লেন ছেলেদের উপর, সামান্য দোষের জন্য তিরস্কার করলেন ঝি, চাকর ও রাঁধুনীকে। যদি তাঁকে নিজেই রান্না করতে হয়, তবে ডাল-তরকারীতে নুণের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন, দু'টি-একটি ব্যঞ্জন হয় ত বা একটু পুড়েও গেল, নয় ত হাতে লাগালেন ছ্যাঁকা—বহুক্ষণ ধরে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগলেন। লোক ডাকিয়ে বাক্স ভেঙ্গে বা অন্য চাবি দিয়ে বাক্স খোলাবার হাঙ্গামার পর হয় ত চাবি আত্মপ্রকাশ করলো। সামান্য চাবি এমনিতর বিশৃঙ্খলা সচরাচরই ঘটাচ্ছে—ঘটাবেও।

জল অপচয় ও ট্যাক্সের ভয়ে চাবি দিয়ে রাখা হ'ল কলে, কিন্তু কোথায় রেখেছি, মনে করতে পারছি না; মস্ত সাশ্রয় হ'ল—রাস্তার কল হ'ল সম্বল সেই বেলার মত। সেলাইয়ের কলের চাবি ঠিক জায়গায় না রেখে আজ এখানে, কাল ওখানে রাখ্ছি। তাড়াতাড়ির সময় এক দিন চাবি কোথায় রেখেছি, খুঁজেই পেলাম না; অগতির গতি সূচ-সুতোর শরণাপন্ন হ'তে হ'লো—এমনিতে কিন্তু পারতপক্ষে একে আমলই দেই না, এখন আদর করে কাজে লাগাই ও কার্য্য উদ্ধার করি। এই ত গেল আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনের চাবির তালিকা ও তা খোয়ানোর দুর্গতি। এই দুর্ভোগ অনেকেই ভুগেছেন; যারা ভোগেননি, ভবিষ্যতে তাঁদেরও যে ভুগতে হবে না, এমন কথা হলপ করে বলা শক্ত।

চাবি যখন হারায়, মানুষ তা টের পায় ও খোঁজে আতিপাঁতি ক'রে; না পেলেও খোঁজার বিরাম থাকে না। মনের চাবি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। একে হারালে জীবনের সুখ-শান্তি চিরতরে নষ্ট হয়, মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দেয়, খুঁজতে গেলে অশান্তির মাত্রা বেড়েই যায়। এই কলকাঠিটি লোকে যখন হারায়, তখন টের পায় না; কারণ, বিনা চাবিতেও মন পবনবেগে তার কাজ ক'রে যায়, নিজস্ব ক্ষতি কিছুই হয় না। মুস্কিল, অশান্তি যা কিছু দুর্ভোগ ভুগতে হয় তাকেই, যে অন্য এক জনের মনের চাবিটির সন্ধান করতে ব্যগ্র হয় ও চেষ্টা করে। যত দিন মনের মিল থাকে, জীবনচাকা মসৃণ-গতিতে চল্তে থাকে; এই চাবির অস্তিত্বের কথা মনেই হয় না, তাই খোঁজও পড়ে না, এবং হারাবার ভয়ও মনে জাগে না। যে দিন থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহ ও মতান্তর দেখা দেয় দুই পরমাত্মীয় ও নিকট-আত্মীয়দের ভেতর, তখনই বোঝা যায়, কল বিগড়েছে, চাবি ঠিক খেলছে না; ধীরে ধীরে তা' বিকলই হ'তে থাকে, এক দিন অবশেষে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ভাল বুঝে তখন যা কিছু করা যায়, তারই ফল দাঁড়ায় বিপরীত; সবটাতেই 'উল্টা বুঝলি রাম'—অবস্থা হয়; প্রতি পদে ভুল বোঝা এবং তা' শোধরাবার চেষ্টায় ধাওয়া-করা সত্ত্বেও দাম্পত্য-কলহ, পারিবারিক অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ সংসারে অহরহই ঘটছে। মনের চাবি যখন একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তখনই বুঝতে চাইলে বোঝা যায় যে, নিত্য নিত্য খিটিমিটি ও কলহের হেতু হ'ল মনের কলকাঠি হারান।

আমি এক জন ভুক্তভোগী; আপনাদের সময়ে সাবধান করে দিচ্ছি,—মনের মিল থাকার পর যখনই দেখবেন যে, তিনি আপনাদের তুচ্ছ মতভেদ ও অপ্রিয় বাক্য হেসে উড়িয়ে না দিয়ে প্রত্যুত্তর করছেন, এবং আপনিও তাঁর সব কথা ও কাজ বিনা-প্রতিবাদে ও প্রসন্ন মনে গ্রহণ

করতে পারছেন না, উপরন্তু নিজের কথার জের টেনে জয়ী হতে চাচ্ছেন—যুক্তি দেখিয়ে, নয় ত গরম গরম কথা শুনিয়ে, তখনি জানবেন যে, আপনি মনের চাবি হারিয়ে ফেলেছেন। সেই সময়ই যদি সাবধান হ'তে না পারেন প্রত্যেক কাজে ও কথায়, তবে পরিণাম হবে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, অনেক সময় দুর্ব্বিষহ।

মাতা ধরিত্রীর সঙ্গে মেয়েদের তুলনা করা হয়; আশা করা হয়, মেয়েরা হবেন সর্ব্বংসহা। সংসার শান্তিপূর্ণ করতে হ'লে মেয়েদের—তথা মায়েদের, যে ব্যবহারই পান না তাঁরা, নির্ব্বিবাদে সহে যাওয়াই তাঁদের উচিত। অন্যায় করা ও অন্যায় সহ্য উচিত নয় কোনক্রমেই। তবুও দেখা যায় যে, গৃহলক্ষ্মীরা যতই সহনশীলা হন, ততই গৃহে মঙ্গল আনতে পারেন। বাংলা দেশের মেয়েরা বুক ফাটলেও কোন দিন মুখ ফুটতে দেননি, আজও তার ব্যতিক্রম হ'লে অশান্তি দেখা দেবে নানা ভাবে। আত্মত্যাগ, ও নিজেকে বিলিয়ে অপরকে পুষ্ট করা ও হৃষ্ট করা মেয়েদের চিরন্তন কর্ত্তব্য। জগৎ প্রগতির পথে যতই এগিয়ে চলুক না কেন, যত দিন বিধিদত্ত বিধান মা হবার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা থাকবে মেয়েদের, তত দিন সংসারে বাস ক'রে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন ও প্রকৃতির অনুশাসন এদের মানতে হবে, এবং সব-কিছু বিশেষ ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য ক'রেও যেতে হবে। এই হ'ল বিধির বিধান; একে উল্টোতে গেলেই বিপত্তি। পুরুষ তার শক্তি ও পৌরুষ নিয়ে শীর্ষস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে—সমাজে। মুখে তারা যতই সমস্বাধীনতা প্রচার করুক, বড়াই করুক বা সদাশয়তাই দেখাক, স্বামী হিসাবে তারা যে বড়, তাদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে যে প্রাধান্য দিতে হবে, এই ধারণা এতই বদ্ধমূল ও সংস্কার-জাত যে, একে ভুলতে বা চাপা দিতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরাই পারেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে মেয়েরা যদি মাথা নীচু ক'রে না থাকেন, তবে ছোট বা বড় সংঘর্ষ অনিবার্য্য। বিয়ের আগে অনেক ছেলেই উচ্ছ্বাস দেখায়, আদর্শবাদ প্রচার করে, কিন্তু প্রার্থিতা আয়ত্তে এসে প'ড়লে আদর্শবাদের চিহ্নও আর খুঁজে পাবার উপায় থাকে না! স্বামী চিরকাল স্বামীই থাকবেন, স্ত্রীকে তাঁর অনুগত হ'তে হবে; নতুবা সাংসারিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুখের আশা দুরাশামাত্র, অথবা সুদূরপরাহত ব'লেই মনে হয়।

এই সব কথা যে প্রচারকের নীতিবাদ নয়, এর পিছনেও যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তার প্রমাণস্বরূপ এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেখাব।

কর্ত্তাটির সঙ্গে আমার আলাপ বহু বছর আগে—প্রায় এক যুগ হ'তে চল্‌ল। তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের পরিচিত বন্ধু ও হিতৈষী। সবে কলেজ থেকে অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে বেরিয়েছেন; ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত মিশুক, সুবোধ এবং শান্ত-শিষ্ট। তাঁর মনটি ছিল কল্পণাপ্রবণ; গান-বাজনায়, অঙ্কনে ও খেলায় বেশ দখল আছে; সবার উপর চেহারাখানাও মনোরম। মোট কথা, সব দিক্ দিয়েই শোভনীয় পাত্র; কিন্তু শুনতে পেতাম, বিয়ে তিনি করবেন না; তার কারণ সকলের অজ্ঞাত।

প্রথম যখন আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তখন আমি ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ি—বয়স ১৫।১৬; নিজেকে বেশ 'হাম্-বড়া' ব'লেই মনে করি। স্কুলের জগৎ এক দিকে যেমন সমস্ত মন অধিকার ক'রে থাকত স্কুল-খোলার দিনে, তেমনি অবসর-কালে দেশের কাজ করবার ঝোঁক ছিল—প্রবল। মন থাকে তখন ভাবপ্রবণ। যে আদর্শ মনের কোণে আসন পাতে, তাই তার খোরাক খুঁজতে বেরিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থান সম্বন্ধে মনকে উদাসীন ক'রে রাখে। ছাত্রী-সঙ্ঘ, মহিলা-সমিতি, ব্যায়াম-সমিতি ইত্যাদির হিড়িকে মেয়েমহল ছাড়াও যে পৃথিবীতে অন্য জগৎ আছে, এবং সময়ে মনও কেড়ে নিতে পারে, এমন ধারণা একেবারেই ছিল না। 'সোসাল সারভিস্' করা ও লেখাপড়া শিখে শিক্ষকতা করা—এই ছিল জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমার মনের ভাব ছিল তখন এইরূপ। কিন্তু আর এক জনের মনের ভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। আমাকে দেখেই তাঁর বহু দিনের বাঞ্ছিতা মানসী ব'লে ধারণা হ'ল। রূপের জৌলসে বোধ হয় চোখে লাগ্‌ল ধাঁধা!

তাই বুঝি যে ভাবেই দেখতেন, তাতেই উৎসারিত হ'য়ে উঠ্‌ত তাঁর কল্পনাতে রসের উৎস। পিকচার গ্যালারীতে কবে তিনি এক গোধূলি-রাণীর ছবি দেখেছিলেন, সেই ছবি জীবন্ত হ'য়ে হঠাৎ দেখা দিল সামান্যা একটি চঞ্চলা তরুণীর মূর্ত্তিতে! যৌবনে যাকে

মন অর্পণ করা যায়, তার থেকে আর মন সরিয়ে ফেলা যায় না ; বিশেষতঃ, সেই মন যদি হয় কল্পনাবিলাসী, সৌন্দর্য্যের পূজারী ও স্নেহপ্রবণ। যে বীজের অঙ্কুর দেখা দিল এই ভাবে, তা' দিনে দিনে শাখাপল্লবই বিস্তার করতে লাগল, কুসুমকোরকের কোন সম্ভাবনাও কিন্তু দেখা দিল না। মনের মণিকোঠায় কৃপণের ধনের মত সযত্নে তিনি এই প্রেমকে লুকিয়ে রাখলেন ; কারণ, তাঁর মতে মানসীকে প্রার্থনা করার যোগ্যতা না কি তাঁর ছিল না, এমন কি, সেই ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলে তা' ধৃষ্টতা ব'লে মনে করবার আশঙ্কাও না কি ছিল যথেষ্ট!

ইতিমধ্যে নানা ঘটনাপরম্পরায় তিনি হ'য়ে উঠলেন পরিবারের অতিশয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাড়ীর সকলের কাছে তিনি ছিলেন, অত্যন্ত সুবোধ ও সুশীল, গুণেরও সীমা ছিল না ; এর বেশী অন্য পরিচয় তাঁর ছিল না। ফলে, তাঁর মনের এই চাঞ্চল্যের খবর ছিল সকলের অজ্ঞাত। বি-এ পরীক্ষার আগে আমার প্রথম মনে হয়, এঁর অন্তরঙ্গতার ভেতর অন্য ভাব আছে, চোখ যেন কি বলতে চায়, স্পর্শের অনুভূতি সাধারণের চেয়ে ভিন্ন—একটু যেন দরদমাখান। একটু একটু সন্দেহ মনের কোণে উঁকিও দিত, কিন্তু পড়ার চাপে ও কলেজের হুজুগে কোন সন্দেহই মাথা তুলবার অবসর পেত না। যে সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল অতি সঙ্কোচে, তা' দৃঢ়ভিত্তি নিল এম-এ পরীক্ষার সময়। এই ধারণার কথা, সন্দেহের কথা প্রকাশের উপায় ছিল না ; কারণ, বিশাল সামাজিক বাধা ও বদ্ধমূল সংস্কারের প্রাচীর প্রবল ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল—আমাদের মাঝখানে। একে উপেক্ষা করবার মত সৎসাহস তখনও আমাদের মনে জাগেনি।

পরীক্ষাবসানে কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গেলাম, ফিরে এলাম বি-টি পড়তে। এই সময় যে সন্দেহ আমার মনেই ছিল, এক দিন আকস্মিক ভাবে তা' আত্মপ্রকাশ ক'রল। যে আশা তিনি সঙ্গোপনে অবরুদ্ধ রেখেছিলেন অন্তরের অন্তরালে, তাই এক দিন বাণী পেল, এবং মুক্তগতি নির্ঝরের মত প্রচণ্ড বেগে সকল বাধা ভাসিয়ে দিয়ে দয়িতের দিকে ধাবিত হ'ল। লোকনিন্দা, লোকলজ্জা—কোন ভয়ই আর প্রেমপ্রকাশকে বাধা দিতে পারল না। অপমান, লাঞ্ছনা, মনঃকষ্ট অনেক ভোগ করবার পর ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন। মিলনের পথ হ'ল সুগম। তখন আমি ছিলাম তাঁর মানসী, প্রেয়সী ও হৃদয়রাজ্যের রাণী ; কল্পরাজ্যে বিচরণ ক'রে আমি সংসারের কাঁটার খবর রাখতে পারিনি, ভাবতাম, জীবন-চাকা প্রেমের জোরে অবাধে মসৃণ ভাবেই চলে যাবে ; জীবনের কঠোর ও নগ্ন সত্য, সাংসারিক জটিলতা কখনই কোন আড়াল রচনা করতে পারবে না—আমাদের মাঝে। তখনকার দিন ছিল স্বপ্নময়, মধুময়, বাস্তবতা কপটতা সৃষ্টি করার কোন সুযোগ পায়নি। কোন দিন যে এই সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হ'তে পারে, তা চিন্তা করা দূরে থাক, কল্পনায়ও আসত না। বিয়ের মাসখানেক পরেই বাস্তবতায় নেমে প্রথম টের পেলাম, যা বলা যায়, কার্য্যতঃ তাই করা সম্ভব নয়। জীবন শুধু কল্পনা নয়, শুধু কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তাতে কাঁটার আঁচড়ও যেমন আছে, তেমনি কর্ত্তব্যের শৃঙ্খলও পদে পদে বাধা সৃষ্টি ক'রে জীবনের সুখ ও মনের শান্তি নষ্ট ক'রে থাকে। বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হ'লে যতটা ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অত্যাবশ্যক, আমার চরিত্রে তার বিন্দুমাত্রও নাই। তাই স্বভাবের ঔদ্ধত্যে ও অসহিষ্ণুতায় ঝড়-ঝাপ্টা প'ড়ত স্বামীর উপর, তিনি হাসিমুখে সবই সহ্য করতেন। কিন্তু সহ্য করারও একটা সীমা আছে, ক্রমে তিনিও অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন, ফলে কথা-কাটাকাটি, সময়ে সময়ে কথা প্রায় বন্ধই হয়ে যেত। এক জনের কথা ও ভাবধারা অন্যে ঠিক সেই ভাবে নিতেম না, ভুল বোঝবার পালা সুরু হ'ল, এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল—মনঃকষ্টও পেতে হ'ত। এখন বুঝি, মনের চাবি-হারানোর দরুণ এত মানসিক ক্লেশ পেতে হ'য়েছে। ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টির ফলে নিজের ত্রুটি বুঝতে পারলাম, এবং এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় যে সহিষ্ণুতা, তা-ও বোধগম্য হ'ল। প্রেমের বাঁধন প্রায়শঃই ছিন্ন হয় না সত্য, কিন্তু সংসারে চলতে হ'লে প্রেমই যে একমাত্র পাথেয় হ'তে পারে না—তা' বুঝতে পারলাম। জগৎ প্রগতির পথে যতই এগিয়ে যাক্ না কেন, মেয়েদের ধরিত্রীর মত ধৈর্য্যশালিনী না হ'তে পারলে সংসার সুখের হ'তে পারবে না, নানা প্রকার অশান্তি নানা রূপে দেখা দেবে।

দাম্পত্য-কলহের স্থায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্পকাল

স্থায়ী হয়, কিন্তু যত অল্প দিনই থাকুক না কেন, এর দাহন অত্যন্ত তীব্র। আমারও এইরূপ মানসিক ক্লেশের সময় আত্মবিচার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানের চিন্তানুশীলনে একটি সত্য প্রকট হ'য়েছে। চাবি হারানই, তা সে যার চাবিই হোক না কেন—অমঙ্গল ও অশান্তির আগমন সূচনা করে। বিয়ের পরই আমি স্যুটকেসের চাবি হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেই থেকে আমার একটা সংস্কার বদ্ধমূল হ'য়েছে যে, চাবি হারালে সকলেরই কথায় ও কাজে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। মনের চাবির কোন অস্তিত্ব নেই মানি, কিন্তু মনান্তর ও মতান্তরই জানিয়ে দেয় যে, মনেরও চাবি আছে। যত রকম চাবি আছে, তার ভেতর মনের চাবি হারিয়েই সব চেয়ে দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়। অন্যান্য চাবি হারালে ক্ষতি হয় সাময়িক ভাবে, এবং তা অর্থের উপর দিয়েই যায়; কিন্তু মনের কলকাঠিটি খোয়ালে জীবনব্যাপী অশান্তি দেখা দেয়, এবং মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা জীবনকে অবাধে পীড়ন করতে থাকে। সেই জন্যই মনে হয়, চাবি হারালেই সাবধান হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য। সময়ে সাবধান না হ'লে দুর্ভোগের আর অন্ত থাকে না।

শ্রীফুলবালা রায়।

উলের ব্লাউশ

শীতের দিনে নারী-সমাজে এখন পশমী ব্লাউশ-কোট গায়ে দেবার রীতি সচল হয়েছে। বাড়ীর মেয়েরা নিজেদের হাতে নানা ছাঁদের জাম্পার, সোয়েটার, ব্লাউশ প্রভৃতি তৈরী করছেন। এ ব্লাউশ-সোয়েটারের শ্রী-ছাঁদ যাতে ভালো হয়, সকলেই তা চান্‌। এ-মাসে তাই আমরা সুছাঁদের একটি ব্লাউশ-বোনার নির্দ্দেশ দিলুম।

এ-ব্লাউশটি লেশ-ষ্টিচ প্যাটার্ণের; দেখতে জটিল হলেও এটি বোনা খুব সহজ। এটি বুনতে যে-কোন রঙের ৬ আউন্স উল চাই (৪ প্লাই); আর সেই-সঙ্গে এক জোড়া ১২নং এবং এক জোড়া ৯নং কাঠি চাই। এ ছাড়া লাগবে ১২নং একটি ক্রুশের কাঁটা আর দু'টো কাঠের পুঁতি (wooden beads)।

নির্দ্দেশ-অনুযায়ী বুনলে এটির ঝুল হবে ১৬ ইঞ্চি, ছাতি ৩১ ইঞ্চি আর হাতের ঝুল সাড়ে ৫ ইঞ্চি। অবশ্য ইচ্ছা করলে হাতের ঝুল কমিয়ে নিতেও পারেন।



ব্লাউশ গায়ে

এর সংক্ষেপোক্তির সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। মামুলি সোঃ, উঃ, ধঃ কঃ, ধঃ বাঃ ছাড়া এতে আরো কয়েকটি উক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—এঃ সঃ= দুটি ঘর এক সঙ্গে নিয়ে একটি ঘর তোলা; ঘঃ তুঃ নিঃ =ঘরটি না বুনে তুলে নিন; নাঃ ঘঃ তুঃ=না-বোনা ঘরটির মধ্যে দিয়ে নির্দ্দিষ্ট ঘরটি তুলে নিন। উঃ সাঃ= উল সামনে দিয়ে একটা ঘরের জায়গায় দু'টো ঘর তুলে

নিন; ডিঃ সিঃ=ডবল্ ক্রুশ অর্থাৎ ক্রুশে করে একটি ঘরের জায়গায় দু'টি ঘর তুলে নিন।

সামনের দিক

১২নং কাঠিতে ৮৬টি ঘর তুলুন। ৩ ইঞ্চি ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনে যান। তার পর ৯নং কাঠি দিয়ে আসল প্যাটার্ণটি আরম্ভ করুন। ১ম লাইন—১টা সোঃ, * ১টা উঃ সাঃ, ১টা ঘঃ তুঃ নিঃ, ২টো ঘর এঃ সঃ; এখন এই ঘরটি নাঃ ঘঃ তুঃ নিন, ১টা উঃ সাঃ, ৩টে সোঃ। * থেকে লাইনের শেষ অবধি রিঃ করে যান। শেষের একটি ঘর



লেশ ষ্টিচ

সোঃ করুন। ২য় লাইন—সমস্ত উল্টো করুন। ৩য় লাইন—১টা সোঃ, * ৩টে সোঃ, ১টা উঃ সাঃ, ১টা ঘঃ তুঃ নিঃ, ২টো ঘর এঃ সঃ, এখন এই ঘরটি নাঃ ঘঃ তুঃ, ১টা উঃ সাঃ। * থেকে রিঃ করে যান। শেষের ঘরটি ১টা সোঃ করুন। ৪র্থ লাইন—সমস্ত ঘর উল্টো বুনুন।

এই চার লাইনে প্যাটার্ণটি সম্পূর্ণ হয়েছে। আগাগোড়া এই চার লাইনের প্যাটার্ণ রিঃ করে যান। এই ভাবে যখন এগারো ইঞ্চি বোনা হবে, তখন হাত দু'টির জন্য ঘর বাড়াতে হবে। (এ ব্লাউশের হাত-দু'টি আলাদা করে তৈরী করতে হবে না)।

এর পরের ৮ লাইনের আরম্ভে ৬টি করে ঘঃ বাঃ হবে এবং আগাগোড়া নির্দ্দিষ্ট প্যাটার্ণে বুনে যেতে হবে—নতুন-তোলা ঘরগুলি সমেত। এই ভাবে কাঠিতে ১৩৪টি ঘর হবে। এখন যথানিয়মে বুনে যান। হাতটি যখন চার ইঞ্চি বোনা হবে, তখন প্যাটার্ণের ৩য় লাইনটি অবধি বুনে এই ভাবে ৪র্থ লাইনটি বুনুন—৪৬টি ঘর উঃ, ৪২টি ঘর বন্ধ করে ফেলুন, ৪৬টি ঘর উঃ। দু'ধারের এই ৪৬টি করে ঘর দু'টো বাড়তি কাঠিতে রেখে দিন।

পিঠের দিক

এ-দিকটি অবিকল সামনের দিককার নির্দ্দেশ-অনুযায়ী বুনবেন। শেষ কালে যে ৪৬টি করে ঘর থাকবে, দু'ধারের সেগুলি দু'টো কাঠিতে তুলে নিন। এখন সামনের এক দিকের ঘরগুলি আর পিছনের ঠিক সেই দিকেরই ঘরগুলি এক সঙ্গে বুনে ফেলতে হবে। মানে, এ-কাঠি থেকে একটি ঘর নেবেন, আর ও-কাঠি থেকে একটি ঘর নেবেন। দু' কাঠি থেকে দু'টি ঘর নিয়ে ১২নং কাঠি দিয়ে দু'টি ঘর এঃ সঃ বুনে ফেলবেন। তার পর দু'টি ঘরের সমষ্টি এই ঘরটিকে এর পরের ঘরটির সঙ্গে একত্র বন্ধ করে ফেলবেন। এই ভাবে কাঁধ-দু'টি জোড়া হয়ে গেল। এখন হাতের ঘের থেকে ৭২টি ঘর তুলে নিয়ে ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে এক ইঞ্চি বুনুন। তার পর ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

এইবার দু'টি পাশ জুড়ে ফেলুন। ক্রুশ দিয়ে গলার চার লাইন ডিঃ সিঃ করুন। তার পর উলটি দু' হালি করে নিয়ে ক্রুশ দিয়ে দেড়-গজ আন্দাজ লম্বা একটি চেন বুনে নিন। উলের চেনটি গলার চারিদিকে ঘিরে দিন—যাতে করে ফিতের দু'ধারের দু'টি মুখ টানলেই গলায় কোঁচ পড়ে। সুতোটি যাতে খুলে না যায়, সেজন্য এর দুই মুখে কাঠের পুঁতি দু'টি পরিয়ে গিঁট দিয়ে দিন।

এইখানে একটা কথা বলি, এ ধরণের জালি-জালি প্যাটার্ণে তৈরী জিনিষ সাধারণ উলের জামার চেয়ে ঢিলে হয়, এ-কথা মনে রাখবেন।

সংবাদপত্রের জন্মকথা

(এ-দেশে ও বিদেশে)

বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য জগতে আজ সংবাদপত্রের স্থান কত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, তাহা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আত্মপ্রবুদ্ধ নরনারীর ব্যাপক রাষ্ট্রীয় চেতনা পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

রাষ্ট্রে, সমাজ ব্যবস্থায়, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, শিল্প-বাণিজ্যে, কৃষি ও অর্থনীতিতে—সুসভ্য মানবসমাজের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে সংবাদপত্রের উপযোগিতা অনন্যসাধারণ। পৃথিবীর দূরতম প্রদেশের সংবাদও কত অল্প সময়ে সংগৃহীত হইয়া সংবাদ-পিপাসু নর-নারীর কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য প্রতিদিন তাহাদিগের গৃহদ্বারে প্রচারিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। সংবাদপত্রই এ যুগে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে পারস্পরিক পরিচয়ের শৃঙ্খলে গ্রথিত করিয়া বিশ্বমানবতার সমুন্নত আদর্শে উন্নীত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সেইজন্য কেবলমাত্র কোন দেশ-বিশেষের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই নহে—সমগ্র বিশ্বের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রেও রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সম্পর্কিত বিষয়ে বৃহত্তর বিপ্লব-সাধনেরও ক্ষমতা সংবাদপত্রের আছে; প্রকৃতপক্ষে এই পুরাতন পৃথিবীকে ভাঙ্গিয়া নূতন ভিত্তিতে নূতন করিয়া গড়িয়া-তুলিবার স্পর্দ্ধা যদি কাহারও থাকে, তবে একমাত্র সংবাদপত্রই তাহার দাবী করিতে পারে। আপনাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া প্রতিনিয়ত যাঁহারা নীরবে দেশ ও জাতি-গঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এবং এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সেই আত্মভোলা সাধকের দল দেশে-দেশে যুগে-যুগে স্বদেশ-জননীর পুণ্য-পাদপীঠমূলে নিজের বুকের রক্ত অক্ষুন্নচিত্তে উৎসর্গ করিতেছেন। তাঁহাদিগের হস্তস্থিত আলোকবর্ত্তিকার উজ্জ্বল শিখায় নির্ভর করিয়া সমগ্র জাতি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাত্রিতে কণ্টক-সমাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথে দৃঢ়পদে জয়যাত্রায় অগ্রসর হইয়াছে। রাষ্ট্র ও সমাজগুরু সাংবাদিকগণ জাতির নমস্য।

আজিকার বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য দেশ বা জাতির কথা কল্পনা করাও যায় না, যে দেশ বা জাতির কোন প্রকার সংবাদপত্র নাই; কিন্তু এমন দিনও ছিল, যখন পৃথিবীতে সংবাদপত্রের কোন অস্তিত্বই ছিল না। বস্তুতঃ, সংবাদপত্রের —প্রকৃত রাজনৈতিক সংবাদপত্রের উৎপত্তি খুব অধিক দিনের ঘটনা নহে।

অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সিড্‌নে মর্ণিং হেরাল্ড' এক সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন,—

"পৃথিবীর প্রতি-দশখানি সংবাদপত্রের মধ্যে সাতখানি ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত, এ-কথায় ইংরেজগণ গর্ব্বানুভব করিতে পারেন; কিন্তু সংবাদপত্রের জন্মস্থান ইংলণ্ড নহে—সে বিষয়ে তাঁহাদিগের গর্ব্বানুভব করিবার কিছুই নাই।" কথাটা বিশেষ ভাবেই অনুধাবনযোগ্য।

বহু—বহু বৎসর পূর্ব্বে রোম নগরীতে দৈনন্দিন ঘটনাবলীসহ একখানি ক্ষুদ্রাকার প্রচার-পত্রিকা প্রকাশিত হইত বলিয়া জানা যায়। তাহার নাম ছিল—'Acta Diurna'। রোমে তখন প্রবলপ্রতাপ জুলিয়াস সীজারের 'ডিক্টেটরী' শাসন প্রবর্ত্তিত। সহরের কোন প্রকাশ্য স্থানে এই প্রচারপত্র লটকাইয়া রাখা হইত, এবং সম্ভবতঃ অল্প কয়েকখানি পত্র বিক্রয়ও হইত। ১১৯০ বৎসর পূর্ব্বে জুলিয়াস সীজার যখন এঞ্জেল স্যাক্সন ও জুটদিগের জন্মভূমি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার জন্য ডোভার অতিক্রম করেন, তখন সে সংবাদ এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

এই প্রচারপত্রে যে ভাবে সংবাদ প্রকাশিত হইত, তাহার ৩টি নমুনা নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল,—

(১) It thundered, and an oak was struck in that part of Mount Palatine called Summa Velia early in the afternoon.

(২) A fray happened in a tavern at the lower end of Banker Street, in which the keeper of the 'Hogin Armour' tavern was dangerously wounded.

(৩) Tertinius, the Aedile fined the butchers for selling meat which had not been inspected by the overseers of the markets.

তখন লিনোটাইপ মেসিনের বা কোন দৈনিক সংবাদপত্রের লক্ষাধিক সংখ্যা মুদ্রণের কথা লোকের কল্পনারও অগোচর ছিল। কাজেই পাঠক সংখ্যাও মুষ্টিমেয় ছিল। যাহাই হউক, জুলিয়াস সীজারের সঙ্গেই এই সংবাদপত্রখানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু উহা জগতের প্রথমতম সংবাদপত্র হইলেও পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদপত্র নহে। এই গৌরব রোমের নহে,—চীনের। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশে সিল্কের কাপড়ের উপর সংবাদ মুদ্রিত করিয়া যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত, আজিও তাহা সেই ভাবেই প্রকাশিত হইতেছে। চীন দেশ হইতে প্রকাশিত 'পিকিন্-গেজেট' পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদপত্র।

অনেকে—বিশেষতঃ য়ুরোপীয় সাংবাদিকরা—বলেন, সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার গৌরব জার্ম্মাণীর। বিনা-প্রমাণে ও বিনা-যুক্তিতে এই উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না; তবে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে সংবাদ-প্রচারপত্ররূপে এক প্রকার কাগজ বাহির হইত, ইহা সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তথায় এরূপ কোন অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া জানা যায় না—যাহাকে অনেকটা সংবাদপত্রের অনুরূপও বলা যাইতে পারে।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে ইজিনলফ্ এমেল নামক এক ব্যক্তি একখানি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করেন; উহার নাম—'ফ্রাঙ্কফার্টার জার্ণাল'। ইংলণ্ডে যে এ সময়ে কোন প্রকার সংবাদ-পরিবেশনমূলক পত্র ছিল না, তাহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত কথা। ন্যাথানিয়েল বাটার ও অন্যান্য কয়েক জন ব্যবসায়ী মিলিয়া লণ্ডনে সর্ব্বপ্রথম 'দি উইক্‌লি নিউজ' নামক একখানি কাগজ প্রকাশ করেন। উহা ১৬২২ খৃষ্টাব্দ বা সম-সাময়িক ঘটনা। জার্ম্মাণীর ও লণ্ডনের যে দুইখানি প্রচার-পত্রের নাম উল্লিখিত হইল—সংবাদ-পরিবেশন বা জনমতগঠন উহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। পণ্যদ্রব্যের প্রচারই উহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এবং উদ্যোক্তৃগণ সকলেই ছিলেন—ব্যবসায়ী।

ইহার পর ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে প্যারী সহরে যে সংবাদ-পত্রখানি প্রকাশিত হয়, তাহার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার ছিল। এই সংবাদপত্রখানিই পরে 'গেজেট দ্য ফ্রাঁস' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে, এবং রাজনীতিক রীচ্‌লুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারে ও প্রভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে।

বর্ত্তমানে সংবাদপত্রে 'লীডার' বা প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া যে মতামত প্রকাশ বা জনমত গঠনপ্রচেষ্টার রীতি লক্ষিত হয়, তাহার ইতিহাস খুব অধিক দিনের নহে। সুইফ্‌ট, ডিফো, বলিংব্রুক প্রভৃতি লেখক ও সাংবাদিকগণের সময় হইতেই ইহার আরম্ভ। এ স্থলে এ কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, প্রকৃত রাজনীতিক সংবাদপত্রের জন্মস্থান ফ্রান্স, এবং ফরাসী-বিপ্লবের সূত্রপাতের সময়েই তাহার আরম্ভ। বহু দিন পূর্ব্বে—ফরাসী-বিপ্লবের প্রারম্ভকালে কোন ফরাসী সাংবাদিক সংবাদিকগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে আদর্শের কথা বলিয়াছিলেন—আজিও তাহা প্রত্যেক নিষ্ঠাবান সংবাদপত্র-সেবীর আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত ও বিবৃত হইতেছে।

"Suffer yourself to be blamed, imprisoned, condemned—suffer yourself even to be hanged; but publish your opinions. It is not merely a right—it is a duty"—কি আন্তরিকতাপূর্ণ নির্ভীক উক্তি।

ফরাসী-বিপ্লব কেবল ফরাসী দেশেরই অন্তর্নিবিষ্ট বিপ্লব মাত্র নহে; উহা দ্বারা জগতের ভিত্তি বিকম্পিত, এবং পৃথিবীর সভ্যতার প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ফ্রান্সের সংবাদপত্রের জন্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা-প্রসঙ্গে আর একখানি সংবাদপত্রের নাম করাও অবশ্যকর্ত্তব্য। উহার নাম—'মার্কুরে দ্য ফ্রাঁস'। ইহাও ফ্রান্সের সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র। নরমপন্থী রাজনীতিকরাই ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; কিন্তু ক্রমে উহা দেশের তৎকালীন চরমপন্থী ও বিপ্লববাদী বুদ্ধিজীবিগণের হস্তে আসিয়া পড়ে, এবং ফ্রান্সের রাজনীতিক্ষেত্রে অসাধ্যসাধনের শক্তির উৎসরূপে পরিগণিত হয়।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশে রাজনীতিক সংবাদপত্রের জন্ম মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। ফরাসী-বিপ্লবের সময় হইতে, বিশেষ ভাবে উহার পরে—পৃথিবীর নরনারীর আদর্শবাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব সংঘটিত হয়। সংবাদ জানিবার ও জানাইবার কৌতূহল এই সময় হইতে সর্ব্বদেশেই জনসাধারণের মধ্যে অসাধারণভাবে বর্দ্ধিত হয়। কাজেই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং জনসমাজের এই স্বাভাবিক কৌতূহল লক্ষ্য করিয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরে এক জন লোক একটি ক্ষুদ্র—সংবাদপত্র নহে, সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন করেন। তাঁহার নাম এখন সমগ্র সভ্যজগতে সুপরিচিত ও সমাদৃত—তিনি জুলিয়াস রয়টার। তখন বার্ত্তা আদান-প্রদানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও উপকরণাদির কথা লোকের কল্পনাতীত ছিল। তথাপি তিনি সর্ব্বপ্রথম এই তথ্য আবিষ্কার ও এই সত্য প্রতিপাদন করেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় সংবাদপত্রকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ করিবার জন্য একটি ব্যাপক সংবাদসরবরাহ-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত। এই প্রস্তাব লইয়া তিনি যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া অধিকাংশ সাংবাদিকই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। সংবাদপত্র নাই, অথচ সংবাদ বিক্রয় করিবার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এই প্রথম প্রয়াস তথায় অবজ্ঞাত হয়। এমন কি, লণ্ডনের বিখ্যাত 'টাইমস' পত্রের সম্পাদকও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন! একমাত্র 'দি মর্ণিং এডভার্টাইজার' তাঁহাকে পরীক্ষামূলক ভাবে সুযোগ দান করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ক্রমশঃ একে-একে সকলেই তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে সম্মত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিলাতের সাংবাদিকগণ সকলেই প্রচারপত্র রচনা করিতেন। সংবাদপত্র-জগতে যাঁহাদিগের নাম অমর হইয়া আছে, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই এই প্রচারপত্রের লেখকরূপে জাতির হইয়াছিলেন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রথম সাময়িক প্রচার-পত্র প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সময় এক নূতন প্রচেষ্টা ক্রমশঃ সংবাদপত্র-জগতে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। বিদেশের সংবাদ সংগৃহীত হইয়া অনেক দিন পরে-পরে একত্র গ্রথিত ভাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এই সকল সংগ্রহ-পত্রিকার কিছু কিছু এখনও লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। 'মার্কিরিয়াস্ বৃটেনিকাস্' (২২শে আগষ্ট, ৬৮৩ খৃঃ) নামক সংবাদপত্র মাত্র ৪ বৎসর কাল জীবিত ছিল। তাহার পরে—ক্রমওয়েলের সময়—প্রধান সংবাদপত্ররূপে যে সংবাদপত্রদ্বয় বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহাদিগের নাম—'পলিটিকাস্' ও 'পাব্লিক ইণ্টেলিজেন্সার'। শেষোক্ত সংবাদপত্র ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রেটবৃটেনে সংবাদপত্রের জীবন কখনই নিরঙ্কুশ ছিল না। নানা বিপদ ও বাধা অতিক্রম করিয়া—সকল দেশের মতো সেখানেও সংবাদপত্র সমূহকে আত্মরক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। রাজকীয় রোষবহ্নিতে বহু সংবাদপত্র ভস্মীভূত হইয়াছে, বহু সাংবাদিক বিপন্ন হইয়াছেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে 'অক্সফোর্ড গেজেট' প্রকাশিত হয়; কিন্তু নানা কারণে বাধ্য হইয়াই উহাকে (২৪ সংখ্যা হইতে) নাম পরিবর্ত্তন করিতে হয়। উহাই পরে 'দি লণ্ডন গেজেট' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ডিফোকে রাজনীতিক মতবাদের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়; কিন্তু তিনি কারাপ্রকোষ্ঠ হইতেই তাঁহার বিখ্যাত 'রিভিউ' পত্রিকা প্রকাশ (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৭০৪ খৃঃ) করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহ স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে। সুলভে বহুল-প্রচারের জন্য 'ডেলি নিউজ' পত্রকে

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক পেনী মূল্যের কাগজে পরিণত করা হয়। আমাদের দেশে 'সুলভ সমাচার' ও 'পয়সা আকবর' এক দিন এই আদর্শেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সে পরের কথা; যাহা হউক, বিলাতে ক্রমে আরও বহু বিখ্যাত সংবাদপত্রের উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে অনেকগুলি এখন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্ররূপে সভ্য-জগতে সমাদৃত হইয়াছে।

বিদেশে সংবাদপত্রের জন্ম-ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা বিশেষ গবেষণাসাপেক্ষ। বর্ত্তমান নিবন্ধে সেই ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান-পথের ইঙ্গিতমাত্র করা হইল।

—অতঃপর এ দেশের কথা।

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের জন্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এ দেশে ইংরেজ-শাসন প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে কতিপয় বে-সরকারী য়ুরোপীয় ব্যক্তির উৎসাহেই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

অধ্যাত্মবাদের সূতিকাগার ভারতবর্ষ আত্মিক উন্নতির প্রতিই চিরদিন লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে। সেই জন্য আজ প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। আর্য্যজাতির অধ্যুষিত ভারতভূমি কখনই প্রচারের দিকে যথেষ্ট মনোযোগী হইবার অবসর গ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ, সেই জন্যই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অথবা সমাজ-ব্যবস্থামূলক সংবাদ-সরবরাহের জন্য কিংবা জনমত সংগঠনের নিমিত্ত কোন প্রকার সংবাদ-পত্র ভারতবর্ষে ছিল না। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ঐতিহাসিক যুগে হিন্দুরাজগণের রাজত্বেও রাজকীয় ঘোষণাদি প্রচারের জন্য কোন প্রকার সংবাদপত্রের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, এ কথা সত্য। তাহার পর মুসলমান-রাজত্ব-কালে বৈদেশিক পর্য্যটকগণের এবং সমসাময়িক হিন্দু ও মুসলমান রাজকর্ম্মচারিগণের লিখিত বিবরণ হইতে যে সকল রাজনৈতিক ও সমাজ-ব্যবস্থামূলক তথ্য অবগত হওয়া যায়, তাহার মধ্যেও সংবাদ-পত্রের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায় না। কাজেই এ কথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে ইংরেজ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর—প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক নহে—কয়েক জন উৎসাহী য়ুরোপীয় মনস্বী দ্বারাই এ দেশে সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে ভারতের ললাটে পরাজয়ের মসীচিহ্ন লিপ্ত হইবার পর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার গভর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ক্লাইভ এ দেশে ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্বের সূত্রপাত করিলেও ওয়ারেন হেষ্টিংসই তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এই সময়েই কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এ দেশে ইংরেজীভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানসম্পন্ন কেরাণী প্রভৃতির প্রয়োজন বিশেষ ভাবেই অনুভব করিলেও এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন ইংরেজ শাসকগণ এ দেশে সংবাদপত্র প্রচলনের প্রচেষ্টাকে প্রথম হইতেই অত্যন্ত 'সন্দেহে'র দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন; কেন না, ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার উইলিয়াম বোল্টস্ নামক য়ুরোপীয় ভদ্রলোক কলিকাতায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন দেখিয়া ক্রুদ্ধ ইংরেজ শাসকগণ তাঁহার প্রতি ভারত-ত্যাগের আদেশ প্রদান করিয়া বলেন, তাঁহাকে অবিলম্বে মাদ্রাজের পথে য়ুরোপে প্রস্থান করিতে হইবে। ইহার পর আরও কয়েক ব্যক্তি অনুরূপ ভাবে অনুরূপ চেষ্টা করায় সরকারের বিরোধিতায় অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

সত্যের কণ্ঠরোধ করিয়া রাখা সাময়িক ভাবে সম্ভব হইলেও স্থায়িভাবে তাহা সম্ভব নহে। সরকারের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও, এবং নানা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেমস্ অগাষ্টাস হিকী কলিকাতায় 'বেঙ্গল গেজেট' নামক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। উহাই এ দেশের প্রথম সংবাদপত্র। 'বেঙ্গল গেজেটে'র এইরূপ পরিচয় দেওয়া হয়,—

"A weekly political and commercial paper open to all parties, but influenced by none,"

অর্থাৎ—

এই রাজনীতি ও বাণিজ্য-বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি সকল দলেরই মুখপত্র,—কিন্তু কাহারও প্রভাবাধীন নহে।

সরকার প্রথমাবধিই ইহাকে 'সন্দেহে'র দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করেন। এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের দশ মাস পরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে সরকার এক আদেশ জারী করিয়া ডাক বিভাগের মারফৎ ইহার প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই আদেশের ফলে ইহার প্রচার ক্ষুণ্ণ হইলেও প্রকাশ বন্ধ হয় নাই। পর-বৎসর জুন মাসে ইহার সম্পাদক গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধ ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর নানা ভাবে চেষ্টার পর কর্ত্তৃপক্ষ এই সাপ্তাহিক পত্রখানির বিলোপসাধনে সমর্থ হন।

যে ইংরেজ জাতি স্বদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য চিরদিন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, ভারতবর্ষের সংবাদপত্র প্রবর্ত্তনের প্রথম প্রয়াসের প্রতি তাঁহাদিগের এই সহানুভূতিলেশহীন অনাচার এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিয়া তাঁহাদিগেরই সামঞ্জস্যহীন দ্বৈপায়ন-সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। অমর কবি মিলটনের 'এরিওপেজিটিকা' ইংরেজী সাহিত্যের গর্ব্ব—ইংরেজের গৌরব; কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত দেশের জন্য তাহার আদর্শ কল্পিত হয় নাই।

যাহাই হউক, 'বেঙ্গল গেজেটে'র প্রকাশ রহিত হইলেও এ দেশ হইতে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা নির্ম্মূল করা সম্ভব হয় নাই। অতঃপর 'বেঙ্গল জার্ণাল' ও 'ক্যালকাটা জার্ণাল' প্রকাশিত হয়। সরকারের কার্য্যের সমালোচনা করা প্রত্যেক সংবাদপত্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্য; কিন্তু চিরদিনই দেখা গিয়াছে, রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিচালক-বর্গ সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণুতা পোষণ ও প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ, যে রাষ্ট্র পরিচালকবর্গ জনমতের দ্বারা সমর্থিত নহেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর অসহিষ্ণুতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই দুইখানি সংবাদপত্রও তৎকালীন সরকারের কার্য্যাবলী তীব্রভাবে সমালোচনা করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন। ফলে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল জার্ণালে' প্রকাশিত রচনার জন্য উইলিয়াম ডুয়েনকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা জার্ণাল' প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদককেও গ্রেপ্তার করিয়া বিতাড়িত করা হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এই সংবাদপত্রের সম্পাদক মিষ্টার সিল্ক্ বাকিংহামকে বিতাড়িত করিবার পরই সরকার সংবাদপত্র-দলনের জন্য নানাবিধ কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক

হইবে না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে সংবাদপত্রের অধিকার-সঙ্কোচকারী এক আইনের খসড়া তৎকাল-প্রচলিত নিয়মানুসারে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে দাখিল করা হয়। এ দেশের জনমত তখন নিগৃহীত সংবাদপত্রগুলিরই সমর্থন করিতেছিল। বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায় তখন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং অধিকাংশ স্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আকৃষ্ট হইলেও রাজনীতিক চেতনা, ও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিসর্জ্জন করেন নাই। কাজেই প্রস্তাবিত আইনের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। এ কথা গৌরবের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশবাসীর পক্ষ হইতে শিক্ষিত বাঙ্গালী ৬ জন যুবক সেই প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেন; তাঁহাদের নাম—দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।—এ দেশ-প্রবাসী কোন য়ুরোপীয় এই প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। যাহা হউক, সরকার এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া প্রস্তাবিত আইন জারী করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই এ দেশবাসী "আবেদন আর নিবেদনের থালা বয়ে' বয়ে' নতশির।"

ভারতে জাতীয়তার ভাবধারা যে বাঙ্গালা দেশ হইতেই প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জাতিকে ঐক্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে এই সময় যে রাজনীতিক চিন্তাধারা ও দেশাত্মবোধের আদর্শ স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্তিলাভ করিতে থাকে। এই আদর্শ-প্রচারে সংবাদপত্রের দান যে সামান্য নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সময়ের সংবাদপত্রের কথাতেই এক জন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন,—

"Who could have foreseen that those cat-callings of bugle boys, practising their prentice pipes in some out-of-the-way angle of the ramparts were destined to grow into clear trumpet-notes which should arouse sleeping camps to great constitutional struggles, and sound the charge of political parties in battle ?..."

এই সকল ঘটনাই এ দেশে সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠার জন্ম-ইতিহাসের প্রথম দিকের ঘটনা। তাহার পর ক্রমশঃ বাঙ্গালী জাতি নানা কারণে ক্ষুণ্ণস্বার্থ হইয়া বহু প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম ও আন্দোলন আরম্ভ করে। সেই সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনকে সমর্থন এবং তাহার শক্তি বৃদ্ধি ও আদর্শ প্রচার জন্য বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সংবাদপত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য্যরূপেই অনুভূত হয়। তাঁহারা সংবাদপত্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস মেটকাফ বড়লাট হইয়া এ দেশে আসেন, এবং পূর্ব্ব হইতে নিগৃহীত ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত মুদ্রাযন্ত্রের বন্ধন-পাশ ছিন্ন করিয়া তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। বাঙ্গালী তাঁহার এই অনুষ্ঠান কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়াছিল, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরও স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য যখন চেষ্টা করা হইতেছিল, তখন শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনরীরা 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশ করেন। ইহাকেই বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত এই প্রদেশের প্রথম সংবাদপত্র বলা যায়। ইহার ভাষা, বা মুদ্রণের পদ্ধতি বা হরপের আদর্শ বর্ত্তমান যুগে যাদুঘরে সংরক্ষণের যোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যে সময় ইহা প্রকাশিত হয়, তখনকার যুগে ইহা পরম বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই অনুভূত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, গঙ্গাকিশোর (ধর ?) ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'বাঙ্গালা গেজেট'ই বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র। 'সমাচার-দর্পণ' ও 'বাঙ্গালা গেজেট' একই সময়ের কাগজ; কিন্তু শেষোক্ত পত্রের প্রথম প্রকাশের তারিখ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন' ১৮২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই (কেহ কেহ অনুমান করেন, সেপ্টেম্বর) মাসে প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই ৪ঠা ডিসেম্বর (?) তারিখে 'সম্বাদ-কৌমুদী' প্রকাশিত হয়। এই পত্রে রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা প্রবন্ধ লিখিতেন। সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদকামী বলিয়া রামমোহন রায়ের সহিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতভেদ হয়, এবং ভবানীচরণ 'সম্বাদ-কৌমুদী'র সংস্রব ত্যাগ করিয়া 'সমাচার-চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন (১৮২২ খৃঃ)।

বাঙ্গালার সহিত তৎকালে ফার্সী ভাষাতেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; কারণ, ফার্সী ভাষার চর্চায় সে সময় শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। দেওয়ান রামমোহন রায়ের 'মিরাৎ উল-আখবার' এবং কোন সওদাগরী আফিসের 'জাম-ই-জাহান নুমা' তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মার্টিন সাহেবের 'বেঙ্গল হেরাল্ড' বাঙ্গালা, ইংরেজী, নাগরী ও ফার্সী এই চারি ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত।

অতঃপর কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সম্বাদ-প্রভাকরে'র কথা। 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র ১২৩৭ সালের ২২শে মাঘের সংখ্যায় লিখিত হয়,—

"পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকর নামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার জল্পনা হইয়াছিল। সংপ্রতি গত ১৬ই মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে।"—কাজেই ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ তারিখে 'সম্বাদ-প্রভাকর' প্রকাশিত হয়, ইহা প্রামাণ্যসূত্রে অবগত হওয়া যায়। পাথুরিয়াঘাটার ৺যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে 'সংবাদ-প্রভাকর' দৈনিক-পত্রে পরিণত হয়। কিছুকাল পরে ইহার একটি মাসিক সংস্করণও হয়। সংবাদ ব্যতীত সাহিত্য ও জ্ঞানানুশীলনও প্রভাকরের লক্ষ্য ছিল। তৎকালীন বাঙ্গালী-সমাজের সর্ব্বাগ্রগণ্য সুধী ও লেখকগণ প্রভাকরে হাতেখড়ি দিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে' লিখিত হইয়াছে,—

"অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় কবিবর রঙ্গলাল, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু ও মনোমোহন, কাঙ্গাল হরিনাথ, সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথ প্রভৃতিও প্রভাকরের দপ্তরে শিক্ষানবীশ ও ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন।"—প্রভাকরই বাঙ্গালার প্রথম দৈনিক-পত্র। এই সময় আরও কয়েকখানি (যথা সম্বাদ-সুধাকর, সমাচার-সভারাজেন্দ্র, জ্ঞানান্বেষণ, সোমপ্রকাশ, সম্বাদ-সারসংগ্রহ, সুলভ সমাচার প্রভৃতি) সংবাদ ও সাহিত্য-পত্র আত্মপ্রকাশ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের জীবন-চরিতে' আর একখানি পত্রিকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

"প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব ও রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে 'সংবাদ-রত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।"

ইহার পরবর্ত্তী কালে হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু-পেট্রিয়ট', মনোমোহন ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নাম বরণীয়। 'অমৃতবাজার' প্রথম বাঙ্গালায় এবং পরে আংশিকরূপে ইংরেজীতে পরিচালিত হইত। দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদ-পত্র দমনের জন্য লর্ড লিটন যখন কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করেন, তখন সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র এক রাত্রির মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া পরদিন প্রভাতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র আদ্যোপান্ত ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়া সমগ্র ভারতে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল। 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় যখন নূতন ভাবে বাহির হয়, তখন তাহার বিবর্দ্ধিত প্রচারের ও প্রভাবের শক্তি সমগ্র দেশে অনুভূত হইয়াছিল। 'বঙ্গবাসী' তরুণ যুবক সম্প্রদায়ের, এবং 'সঞ্জীবনী' ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্রমে 'হিতবাদী' 'বসুমতী', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারকরূপে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

'বসুমতী'র প্রকাশ সম্বন্ধে এ কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের বহুল প্রচার ব্যতীত জনমত সংগঠিত—সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব নহে বুঝিয়া 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সৎসাহিত্যরাজি বিনামূল্যে, (পরে নামমাত্র মূল্যে) উপহাররূপে বিতরণ করিয়া—বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতি অনাস্থার যুগে সাপ্তাহিক 'বসুমতী' বাঙ্গালার গৃহে গৃহে সুপ্রচারের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি 'দৈনিক বসুমতী' প্রবর্ত্তন—প্রচার করেন।

এই সকল সংবাদপত্রের নামের সহিত বঙ্গ-জননীর বহু সুসন্তানের অমর নাম বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বহু বিখ্যাত দেশনায়ক ও সাংবাদিকের পুণ্যস্মৃতি আজিও বাঙ্গালীকে এই সকল সংবাদপত্রের নাম গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে প্ররোচিত করে। ইহাদিগের মধ্যে যে কয়খানি সংবাদপত্র এখনও জাতির অতীত গৌরবগর্ব্বময় বহু দিবসের বহু বিচিত্র স্মৃতিধ্বজা বহন করিয়া জাতির জন্য অনাগত ভবিষ্যতের যে পথ নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে ; তাহারা দেশ ও জাতির জাতীয় সম্পদ।

আজ পৃথিবীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার এবং রাজনীতিক নবাদর্শের প্রচার বিঘ্নশূন্য করিবার পুণ্যকর্ম্মে এবং জনসাধারণের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা রক্ষার গুরু-দায়িত্বে সংবাদ-পত্রের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিপদের কণ্টকসঙ্কুল বন্ধুর পন্থায় নিন্দা ও নির্য্যাতনেও আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা সহকারে সংবাদপত্রকে অগ্রসর হইতে হয়। কাজেই ইহার ইতিকথা জাতির স্মৃতিকথার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবেই বিজড়িত হইয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। বাঙ্গালীকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সে দুঃখের কারণ নিরসন করিতে হইবে, বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনায় অগ্রণী হইতে হইবে। জাতির অগ্রগতির ইতিহাসের সহিত তাহার সংবাদপত্রের জন্ম ও গতি-প্রগতির ইতিহাসও সুবিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতাও বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে।

শ্রীগঙ্গাপদ বসু।

চাষী

ভিক্ষার তরে একদা নগরে বুদ্ধ বাহির হ'ন,
দেখেন অদূরে এক গৃহদ্বারে সমবেত বহু জন,—
তণ্ডুল ধান ভূস্বামী দান করিছে ভাণ্ড ভরি' ;
প্রভু তা'র পাশে ভিক্ষার আশে দাঁড়ান পাত্র ধরি'।
ভিক্ষার্থীরে হেরি' ঘৃণা-ভরে কহিলেন ভূস্বামী—
"ভিক্ষুক যেই তারে নাহি দেই তণ্ডুলকণা আমি।
শস্যের মাঠে সারাদিন খাটে চাষবাস যা'রা করে
ভাণ্ডার-দ্বার মুক্ত আমার নিত্য তাদের তরে।
সন্ন্যাসী তুমি নাহি চষো ভূমি, শুধু পরান্নভোজী
অলস জীবন করিছ যাপন ধর্ম্মের নামে মজি'।"

শুনিয়া বচন তথাগত ক'ন—"আমিও যে চাষী, ভাই !
ভণ্ডামি করি' ভাণ্ডটি ভরি' ভিখ নিতে আসি নাই।
শুন, ভূস্বামি, চাষ করি আমি এই দেহ-ভূমি মম,
পাপ রিপুগণ করি বর্জ্জন জমির আগাছা সম।
সংযম বারি সিঞ্চন করি' চিত্ত-ভূমিতে মোর
ক্ষেত্র উষর করি উর্ব্বর সারাটি জীবন-ভোর।
শস্য যেমন করে কর্ত্তন ভূমি-কর্ষণকারী
শ্রেষ্ঠ ফসল নির্ব্বাণ-ফল লভি আমি দেহধারী।"
ভূস্বামী শুনি' অমিতাভ-বাণী ভাসে নয়নের জলে,
লভিয়া শিক্ষা লইল দীক্ষা নমি' তাঁর পদতলে !

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)।



দড়ি-লাফ

স্কিপিং বা দড়ি-ডিঙ্গানো খেলা! মেয়েদের অঙ্গ-গঠনের পক্ষে স্কিপিংয়ের মতো সহজ ব্যায়াম-পদ্ধতি আর নাই!

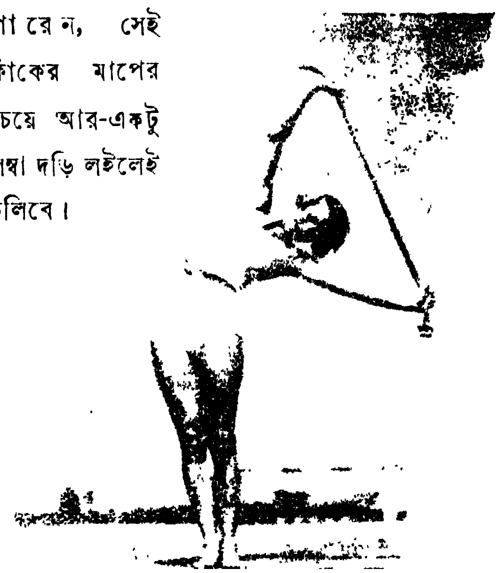
বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও আমরা দেখিয়াছি, সহরে ও পল্লীগ্রামে ছ'-সাত হইতে বারো-তেরো বৎসরের মেয়েরা দড়ি লইয়া নানা কৌশলে নানা ভাবে সেই দড়ি ডিঙ্গাইয়া খেলা করিতেন। এ শুধু খেলা নয়! এ খেলায় যে-ব্যায়াম, তাহা যেমন আয়াস-সাধ্য, তেমনি মেয়েদের সর্ব্বদেহ এ-ব্যায়ামে বেশ সুঠাম-ছন্দে গড়িয়া ওঠে! এ-ব্যায়াম বরাবর করিতে পারিলে যৌবন সহজে নারীর দেহ ছাড়িয়া ঝরিয়া পড়িবে না। এ ব্যায়ামে নারীর দেহ অপরূপ শ্রী-সৌন্দর্য্যে গড়িয়া উঠিবে,—কোথাও মেদ জমিবে না। গ্রীবা, বাহু, বক্ষ, চরণ, কোমর, পেট—সব বেশ সমঞ্জস-শ্রীতে বিভূষিত থাকিবে।



১। হাঁটু মুড়িয়া

এ-খেলায় যেমন পরিশ্রম, আনন্দ-কৌতুকও ঠিক সেই পরিমাণে মিলিবে। এ ব্যায়ামের জন্য অসাধারণ রকমের বা মূল্যবান দড়ির প্রয়োজন নাই; তবে নারিকেল-দড়ি হইলে চলিবে না। তাহাতে হাত ছড়িয়া যাইবে। এ ব্যায়ামের জন্য যে-দড়ি লইবেন, তাহা যেন মসৃণ হয়, মজবুত হয়। মজবুত হওয়ার প্রয়োজন, ব্যায়াম করিতে গেলে দড়ি ছিঁড়িয়া যাইবে না। দড়ির দু' প্রান্তে দুটি কাঠের হাতল লাগাইতে পারিলে ধরিবার পক্ষে অনেকখানি সুবিধা হইবে। তা' ছাড়া সূতায় পাকানো স্কিপিং-দড়ি বাজারে কিনিতে পাইবেন। দাম সামান্য।

দড়িটি লম্বে কতখানি হইবে, জানা প্রয়োজন। যিনি দড়ি লইয়া ব্যায়াম করিবেন, সোজা খাড়া দাঁড়াইয়া তিনি দু' হাত উর্দ্ধে তুলুন—দু' হাত যতখানি ফাঁক করিতে পারেন, সেই ফাঁকের মাপের চেয়ে আর-একটু লম্বা দড়ি লইলেই চলিবে।



২। বাঁ দিকে হেলা

ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এ-দড়ি কতখানি দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন।

দড়ি লইয়া প্রথমে ১ নং ছবির ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়িয়া দাঁড়ান। লম্ফ দিতে হইবে এমন ভঙ্গীতে দাঁড়াইবেন। দড়ি ডিঙ্গাইবার সময় এই ছবির ভঙ্গীতে দড়ি ধরিয়া হাঁটু মুড়িয়া তবে লাফ খাইতে হইবে।

দাঁড়াইয়া ২ নং ছবির ভঙ্গীতে দড়ি ধরিয়া একবার বাঁ দিকে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত হেলাইয়া দিবেন,—

তার পর ডান দিকে হেলাইবেন। একবার বাঁ দিকে, পরক্ষণে ডান দিকে বেশ ক্ষিপ্রবেগে দেহাংশ হেলাইতে হইবে।



৩। দড়ি-পায়ে ডান-পা তোলা



৫। দড়ি ডিঙ্গাইয়া লাফ

তার পর দুই হাতে দড়ি ধরিয়া তার মধ্যভাগে পায়ের ভর দিয়া ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে ডান পা তুলুন—যতখানি উঁচু করিয়া তুলিতে পারেন, তুলিবেন। এ-সময়ে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেহ-ভাগ পিছন দিকে হেলাইয়া দিবেন। এইভাবে ডান পা তুলিয়া দেহের উপরার্দ্ধ-ভাগ দশ-বারো বার জোরে-জোরে একবার পিছন দিকে এবং পরক্ষণে সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া দোল খাইবেন। তার পর বাঁ-পা এমনি করিয়া দড়িতে আটকাইয়া সামনে তুলিয়া আবার দশ-বারো বার এ-ব্যায়াম করিবেন।



৪। দু'হাত পিছনে

এবার ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাতে দড়ি ধরিয়া পিছন দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিন। তার পর কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেহ-ভাগ সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া দিবেন; এবং দড়ি-ধরা হাত সামনের দিকে তুলিয়া দেহাগ্রভাগ পিছন দিকে হেলাইবেন। একবার সামনে, পরক্ষণে পিছনে দেহাগ্রভাগ ঝুঁকাইয়া এ-ব্যায়াম করিবেন দশ-বার।



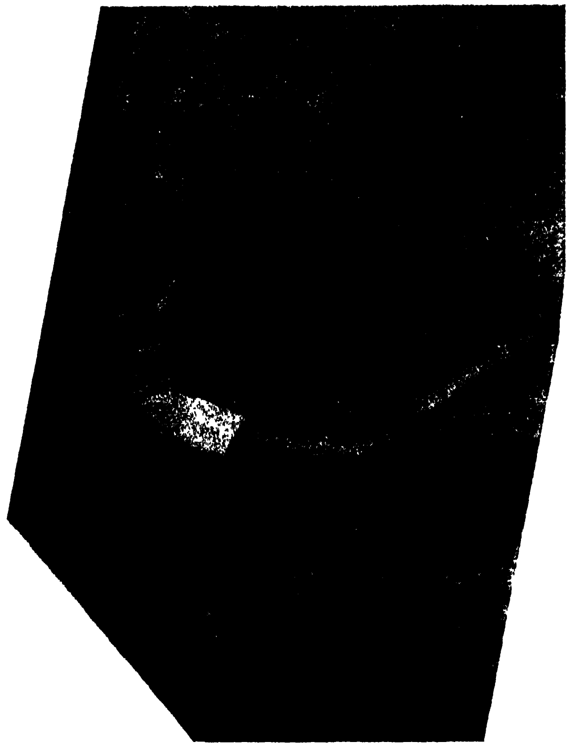
এবার জোরে-জোরে

তার পর ৫ নং ছবির ভঙ্গীতে এই দড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মাথা ও পা গলাইয়া ক্ষিপ্রবেগে লম্ফ দিতে হইবে। ষোল হইতে বিশ বার লাফ দিবেন।

এইবার দড়ির মধ্যভাগ পিছন দিকে পায়ে চাপিয়া অপর দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া ৬ নং ছবির ভঙ্গীতে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত পিছন দিকে হেলাইয়া দিন। এভাবে দড়ির এক প্রান্ত পায়ে চাপিয়া দেহকে একবার পিছনে, পরক্ষণে সামনের দিকে হেলাইতে



৬। পায়ে চাপিয়া দু'হাতে দড়ি ধরিয়া



৭। পা তুলিয়া

হইবে ; বেশ ক্ষিপ্র তালে অন্ততঃ বারো বার হেলাইতে হইবে।

তার পর বাঁ পায়ের আঙুলের কাছে দড়ির প্রান্ত লাগাইয়া ৭ নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ পা তুলিয়া দুই হাতে দড়ির অপর ভাগ ধরিয়া সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিতে হইবে ; এই ভাবে দড়িতে পা আটকাইয়া মৃদু তালে দেহাগ্রভাগ দুলাইতে হইবে। লাগামের মতো একবার বাঁ পায়ে, পরের বারে ডান পায়ে দড়ি আটকাইয়া এ-ব্যায়াম করা চাই। এ-ব্যায়াম ষোল বার করা চাই।

ব্যায়ামগুলি করিবার সময় ছবিতে যেমন দেখিতেছেন, দু' পা ঠিক সেই মতো রাখিবেন !

সুখের সন্ধানে

পৃথিবীতে সকলেই আমরা সুখের কামনা করি। স্বামী, ছেলে-মেয়ে, ঘর-সংসার, দেহ-মনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য—এ-সব যদি রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের সুখের আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইবে ! দেহ-মনের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের কথা আমরা নিত্য আলোচনা করিতেছি। সুখের সন্ধান কোথায় মিলিবে, সে সম্বন্ধে আজ একটু আলোচনা করিব।

কি করিলে সুখী হই, এ-প্রশ্ন আমাদের সকলের মনে অহর্নিশি জাগিয়া আছে ! সুখ কোথায়, কিসেই বা সুখ, সে সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব না জানিয়া আমরা সুখের আশায় আকুল হই বলিয়া সুখের মুখ-দেখা অনেকের ভাগ্যে ঘটে না !

আবার এ-কথাও ঠিক, দুঃখ না পাইলে সুখের দাম বুঝা যায় না,—সুখ কাহাকে বলে, তাহাও আমাদের অপরিজ্ঞাত থাকে। দুঃখ পাইলে অস্থির হইলে চলিবে না। সে দুঃখ কেন, কিসে সে-দুঃখ-মোচন হইবে, ধীরভাবে আলোচনা করিয়া যোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তবেই দুঃখ ঘুচিবে। নচেৎ দুঃখ পাইয়া পাগলের মতো ছুটাছুটি করিলে দুঃখ আমাদের কোনো দিন ঘুচিবে না !

টাকাতেই সুখ, এ-কথা মনে করা বাতুলতা! ধনের পাহাড়ে বহু ধনী বসিয়া আছেন—কিন্তু মনে সুখ নাই, এ-দৃশ্য সংসারে বিরল নয়! ধনীর সালঙ্কারা গৃহিণী—দাস-দাসী, বাড়ী-গাড়ীর মালিকানী লইয়াও কাঙালের চেয়ে ব্যথা-ভারে প্রপীড়িতা—দেখা যায়। অতএব ধনকে সুখের একমাত্র বাহন বলিয়া বিবেচনা করিলে ভুল করিবেন। দুঃখ পুষিয়া মন-ভারী করিয়া থাকিলে দেহখানি অচিরে নানা ব্যাধির শরে জর্জ্জরিত হইবে। এজন্য মহাজনের উপদেশ মানিতে হইবে। মহাজন বলিয়াছেন—যত দুঃখ পান, কদাচ নিরাশ হইবেন না। 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'—এ-কথার মতো দামী কথা আর নাই!

রোগ বা বিয়োগের বেদনায় যে-দুঃখ, সে-দুঃখ-মোচনের উপায় নাই, সত্য। তবু সে-রোগ বা বিয়োগ-ব্যথা দুর্লঙ্ঘ্য এবং অনতিক্রম্য জানিয়া মনকে যদি আমরা সবলে অন্য দিকে ফিরাইয়া লই, তাহা হইলে সে-দুঃখের গভীরতা যে কমিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই! ভালো-বাসার নৈরাশ্য বা বিচ্ছেদের ব্যথাও জোর করিয়া না ভুলিলে দুঃখ সার হইয়া থাকিবে!

সংসারে স্বামি-স্ত্রীতে যে অ-বনিবনা ঘটে, সে অ-বনিবনা কি সত্যই দূর করা যায় না? এ অ-বনিবনার দুঃখ কে না ভোগ করেন? একটু বিচার করিয়া মেজাজকে বশ করুন, স্বামি-স্ত্রী পরস্পরে মনকে একটু সহনশীল করুন, অ-বনিবনা ঘুচিয়া দু' মনে অনুরাগ গভীর হইবে!

ইজ্জৎ খোয়াইয়া স্বামীর চরণে দাসীর মতো লুটাইয়া থাকা—তাহাতে স্বামীর মনে গৌরবের আসন কায়েমি করা সে-যুগে সম্ভব থাকিলেও এ-যুগে সম্ভব হইবে না। স্ত্রীকে স্বামীর মনের মতো হইতে হইবে; স্বামীকে স্ত্রী নিজের মূল্য বুঝাইয়া দিবেন। প্রীতি, ভালোবাসা হয় সমানে-সমানে। দাস্য যেখানে একমাত্র সম্বল, সেখানে অনুকম্পা মিলে, ভালোবাসা মিলিতে পারে না। স্বামি স্ত্রীর সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক—অনুকম্পার সম্পর্ক নয়,—এ-কথা মনে রাখিলে স্বামীর মন-না-পাওয়ার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।

সংসারে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মন খুলিয়া মেলামেশা করিতে হইবে। শাসনে ভক্তি আদায় করা হয় তো সম্ভব, কিন্তু ভালোবাসা তাহাতে আদায় করা যাইবে না! ছেলেমেয়ের মন বুঝিয়া স্নেহে-মায়ায় যদি তাদের মানুষ করিতে পারেন, তবেই তারা বড় হইয়া মানিবে; নচেৎ তাচ্ছল্য করিবে। তখন সংসারে সুখ পাইবেন না—সংসার দুঃখময় হইবে। অতএব এ-দুঃখ যাহাতে না ঘটে, বুঝিয়া ছেলেমেয়ে মানুষ করিবেন। স্নেহে-মায়ায় মানুষ করার অর্থ, তাদের সব আব্দারকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। সে প্রশ্রয় দিলে ছেলেমেয়ে স্বেচ্ছাচারী স্বার্থপর হইবে, আপনাকে মানিবে না। না মানিলে আপনার দুঃখ-ভোগ ললাট-লিপির মতো দুর্লঙ্ঘ্য জানিবেন।

যদি সুখী হইতে চান, তাহা হইলে এই দ্বাদশটি বিধি মানিয়া চলিবেন।

১। সংসার কঠিন। এ সংসারে সকলের দাবী মানিয়া তবে নিজের দাবী পেশ করিবেন। কঠিন বাস্তব জগৎকে মানিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিতে হইবে; ভালো-বাসায় বুক ভরিয়া রাখিতে হইবে। অসত্য পরি-ত্যাগ করিয়া সত্যকে অবলম্বন করিয়া চলিবেন।

২। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কদাচ উদাসীন হইবেন না। নির্ম্মল বাতাস, পুষ্টিকর খাদ্য, সূর্য্যালোক এবং ব্যায়াম—ঔষধের চেয়ে অনেক ভালো, এ-কথা মনে রাখিবেন। পারত-পক্ষে ঔষধ খাইবেন না।

৩। মনকে বশে রাখিতে হইবে। ঘৃণা, হিংসা, অধৈর্য্য, ভয়, ক্রোধ—এ-সবের বাষ্প যেন মনে না জমিতে পারে, সতর্ক থাকিবেন। তাহা হইলে কোনো দুঃখে, কোনো রকম নৈরাশ্যে-ক্ষোভে এতটুকু আঘাত পাইবেন না।

৪। পুরুষের প্রধান কর্ত্তব্য—কাজ; রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য—ভালোবাসা। এ-কথা কদাচ ভুলিবেন না।

৫। মনকে সরস রাখিতে হইবে। হাসিতে শিখিবেন। গোমড়া-মুখ কদাচ নয়!

৬। কোনো কারণে ব্যথাভরে মন পীড়িত হইলে বা অসুখী বোধ করিলে, কাহারো কাছে সে দুঃখের কথা খুলিয়া বলিতে লজ্জা বা দ্বিধা করিবেন না। আর-একজনের দরদে-সান্ত্বনায় মনের ব্যথা অনেকখানি হাল্‌কা হয়।

৭। অর্থ এবং আহার-নিদ্রা-সাধনা ছাড়া একটা-না-একটা সখ যেন থাকে। সেলাই-বোনার কাজ, কবিতা বা গল্প-রচনা, ছবি আঁকা—এমনি একটা-না-একটা বিষয়ে মনকে জাগ্রত রাখা চাই। তাহাতে মনের ব্যথা অনেকখানি ঘুচিবে।

৮। একা থাকিবেন না। বন্ধু চাই। সামাজিকতায় মন সুস্থ থাকে; দুঃখ-ভার লঘু হয়।

৯। বয়স যতই বাড়ুক, তাহাতে কাতর হইবেন না। সকল বয়সেই মানুষ সুখাধিকারী হয়। সুখের সঙ্গে বয়সের এমন কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে—Every age has its compensation.

১০। আজ পয়সার অভাব হইয়াছে বলিয়া নৈরাশ্যে অভিভূত হইবেন না। আজ মেঘ, কাল রৌদ্র—এ-কথা মানুষের জীবনেও সত্য!

১১। যখন যে-অবস্থা ঘটিবে, তাহাতেই সুখী থাকিতে হইবে। হাঁকু-কাকু করিলে অতৃপ্তি বাড়িবে বৈ কমিবে না।

১২। অপরের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া নিজের সুখ ভোগ করিবেন। অপরকে যত খুশী করিবেন, নিজের মনের সুখ ঠিক সেই পরিমাণে বেশী করিয়া মিলিবে।

'আর পারি না', 'জীবন যেন অন্ধকারে ভরিয়া গেছে'—এমন কথা সূচ্যগ্র রেখাতেও মনে যেন উদয় না হয়!

ঝরা পাতার গান

সে-দিন রাতে শুনেছিলেম ঝরা পাতার গান,
শুনেছিলেম কেমন ক'রে কাঁদছে তাদের প্রাণ।
নিরালা এক নদীর ধারে
অজানা এক বনের পারে,
ছিলেম শুয়ে ঘাসের 'পরে—উঠছে নদীর তান,
এমন সময় শুনতে পেলেম ঝরা পাতার গান!

তখন সবে আকাশ-কোণে উঠেছে ক্ষীণ চাঁদ,
ছড়িয়ে দেছে দিক্‌বিদিকে রূপালী তা'র ফাঁদ।
মূর্চ্ছাহত কণ্ঠহারা
নীরব বনে নাই কো সাড়া,
কেবল কোথায় ঝর্ণাধারা বাজায় কল-তান্,
হেন কালে উঠলো কাঁপি' ঝরা পাতার গান!

বলছে তারা করুণ সুরে, ঝরছি মোরা ঝরছি গো,
জীবন মোদের হয়নি কো শেষ—মরছি, তবু মরছি গো!
শুনবে না কেউ মোদের কথা,
বুঝবে না কেউ মোদের ব্যথা,
কার তরে হায় আমরা মিছা করছি জীবন-দান!
গভীর সুরে উঠলো কাঁদি' ঝরা পাতার গান!

বিষাদ-ভরা নিশ্বাস ফেলি' শিউরে ওঠে বন,
শিউলি দিল অশ্রুরাশি ব্যথায় ভরা মন।
মেঘের আড়ে চাঁদ লুকালো
নিমেষে দিক্ আঁধার হলো,
ব্যথায় বিধুর রাত্রি দিল বাঁশীতে তার তান—
সেই বাঁশীতে শুনেছিলেম ঝরা পাতার গান!

শ্রীদুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী



পরিচালিকা

এক

একটা সেলাইয়ের কাজ হাতে লইয়া নীলা অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়াই রহিল ; সেলাই করিবার আগ্রহ তাহার একটুও দেখা গেল না। আজ তাহার কেবলই মনে হইতেছে, তাহার চেয়ে সুখী যেন সকলেই,—এমন কি, ঐ লক্ষ্যহীন আকাশের পাখীটাও, আর ঐ পাপড়ি-ছেঁড়া শ্বেত-করবীটুকুও।—বেদনা মানুষকে আক্রমণ করিলে সে এমনি মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

ঝি আসিয়া কহিল, মা, গা ধুতে যাবেন না ?

নীলার চমক ভাঙিল। কহিল, হাঁা, যাই।

বাথ-রুম্ হইতে বাহির হইয়া নীলা ছাদে আসিয়া বসিল। মোতির মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, কুটনো কুটবেন না ?

শ্রান্ত কণ্ঠে নীলা কহিল,—না ; আজ তোরাই কুটে নে। আমার মাদুর-বালিশ এখানে দিয়ে যা।

নীল আকাশে রজত-গোলক একটা রূপালী মোহের সৃষ্টি করিয়াছে। খণ্ড-খণ্ড শুভ্র লঘু মেঘপুঞ্জ বিক্ষিপ্ত ভাবে আকাশ-সাগরে সন্তরণ করিতেছে। নীলার মনে হইল, আজ তাহাকে অত্যন্ত অপমানিত হইতে হইয়াছে। সে-ব্যথা সে মনের নিভৃত অন্তরালে লুকাইয়া রাখিতে চায়, অপরে তাহারই আলোচনা করিয়া বাক্যের কশাঘাতে তাহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করে !

চারি বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর এ-পর্য্যন্ত সে পিত্রালয়ে গিয়াছে মাত্র একবার। তাহার পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ধনি-কন্যা সে, ধনীর ঘরেই তাহার বিবাহ হইয়াছে ; কিন্তু স্বামীটি মাতাল ! যে-মুহূর্ত্তে এ কথা সে জানিতে পারিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সকলেরই সঙ্গ এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে। তাহার মনে সর্ব্বদাই আতঙ্ক, কখন স্বামীর সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কথার আলোচনা আরম্ভ হয় ! সে জানে, তাহাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। সে অপমান তাহার অসহ্য। আজ দুপুরে পিসিমা কত কঠোর কথা শুনাইয়া গিয়াছেন—তাহার স্বামী মাতাল, দু'হাতে টাকা উড়ায়, কুস্থানে গিয়া পড়িয়া থাকে, মান-সম্ভ্রম সবই নষ্ট হইল—ইত্যাদি। সমবেদনায়, অশ্রুবর্ষণে ও সদুপদেশদানে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু আত্মগ্লানি ও অপমানে নীলার চিত্ত আজ বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত। কাহারও সহিত একটু কথা কহিতে তাহাকে যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়।

শুভ্র মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের কোন কোন অংশ দেখা যাইতেছে ; নীলার ক্রমাগতই মনে হইতেছে—একটা গাঢ় স্বচ্ছ নীলিমায় মহাশূন্য পরিব্যাপ্ত। তাহার নিম্নে পড়িয়া আছে—যত কিছু স্থূল পদার্থ লইয়া এই স্থাবর-জঙ্গমসঙ্কুল চরাচর—একখানা ছবির মত। নীলার মনে হইল—এই স্থূলের জগতে সব চেয়ে বেশী স্থূল তার মানুষগুলোই : কারণ, তাহারাই সব চেয়ে বেশী হতভাগ্য, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, এক ঘণ্টা পরে কি ঘটিবে, তাহা ধারণা করিতে পারে না। অকারণ সুখের হাত এড়াইতে পারে না, অকারণ দুঃখও সহ্য করিতে পারে না।

ভাবিতে ভাবিতে নীলার দুই চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল। সে তাহা মুছিবার চেষ্টা করিল না। তাহার দৃষ্টি তখন সেই দিগন্তব্যাপী নীলিমা অতিক্রম করিয়া কোন্ উদাস, অনাসক্ত সর্ব্বনিয়ন্তার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত।

দুই

—আচ্ছা, আজ তিন দিন না খেয়ে আছ কেন বল দেখি ! কি হ'য়েছে ?

প্রশ্নকর্ত্তা নীলার স্বামী মণীশ। নীলা আজ তিন দিন কেন যে জলস্পর্শও করে নাই, তাহা সে-ই জানে। স্ত্রীর এই বিচিত্র আচরণে মণীশ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। এই শান্ত, সহনশীলা, পবিত্র-হৃদয়া পত্নীকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভয় করে। আরও কতকগুলা কারণে সে নীলাকে ভালোও বাসে। মণীশ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, নীলার আত্মসম্মানজ্ঞান অসাধারণ। স্বামীকে চরিত্রহীন মাতাল জানিয়াও কোন দিন সে বিদ্রোহের সুর তুলে নাই, কোন অপ্রীতিকর মন্তব্যও প্রকাশ করে নাই। তাহার মন-পরীক্ষার জন্য রহস্যচ্ছলে মণীশ বলিয়াছে,—তোমার ভাগ্য এতই মন্দ যে, শেষে একটা জঘন্য অমানুষ স্বামী জুটল, না নীলা?—নীলা মাথা নাড়িয়া বলিয়াছে,—কৈ, আমি তো তা বুঝতে পারিনে। আমার স্বামী বাড়ীতে আমার কাছে তো ভালই, তবে বাড়ীর বাইরে তিনি কেমন, সে খোঁজে আমার কি দরকার?

নীলার উত্তর শুনিয়া মণীশকে মুগ্ধ হইতে হয়। মনে মনে সে লজ্জিত। এমন সুশীলা, গুণবতী স্ত্রীর সে নিতান্ত অযোগ্য স্বামী,—এ কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয় আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হয়; কিন্তু তবু সে বড় অসহায়, নেশার মোহ সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিল না।

মণীশ ব্যগ্রভাবে নীলার হাত চাপিয়া-ধরিয়া অনুযোগ-পূর্ণ স্বরে কহিল,—নীলা, লক্ষ্মীটি বল—কেন খাবে না? তুমি কি মৃত্যুপণ ক'রেছ?

নীলা মৃদু কণ্ঠে কহিল, যদি তা কোরেই থাকি, তাতে কার কি ক্ষতি? আমি তো তোমার সংসারে দরকারের বাইরে।

করুণ ভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া মণীশ কহিল,—কেন এ কথা ব'লছ নীলা? আমি তো কোন দিন তোমার অযত্ন করি-নি।

নীলা শান্ত কণ্ঠে কহিল,—অযত্ন কর না স্বীকার করি। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে শুধু যত্ন-পাওয়াটাই বড় জিনিষ নয়। নারী চায় যশ—শুধু নিজের নয়, স্বামীরও। মানুষের রক্ত-মাংসের দেহটা দীর্ঘস্থায়ী নয়; কিন্তু যশের দেহ এই নশ্বর পৃথিবীতেও অমর। সেই যশ যে হারিয়েছে, জীবন-ধারণ তার পক্ষে বিড়ম্বনা। ধনীদের কেউ কেউ অনেক সময় যশের দিকে ফিরেও চায় না, ভোগ-সুখটাই বেশী বোঝে। কিন্তু তাদের ধন নরকের পথের পাথেয় দিতেই ফুরিয়ে যায়। সমাজ তাদের জীবন ঘৃণার চোখে দেখে, এবং তাদের মৃত্যুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আরাম পায়। কিন্তু যে-ধনী নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নিয়ে সমাজের কল্যাণের জন্যে তার ধন-সম্পত্তি উৎসর্গ করে, সে জীবনে পায় মানব-সমাজের আশীর্ব্বাদ, আর মৃত্যুর পর লাভ করে অমরত্ব।

—আচ্ছা নীলা, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আজ থেকে আমি শুধু সমাজের হিতসাধনই ক'রব; তুমি যাতে সুখী হও, তাই হবে আমার জীবনের ব্রত।

নীলা হাসিল। মণীশের মনে হইল, এ হাসি যেন বিধাতার বজ্র অপেক্ষা নির্ম্মম, কঠোর। সে ধীর স্বরে আবার বলিতে লাগিল,—ওগো, শুধু সমাজের হিতের জন্যে দুটো রাজসিক কাজ ক'রলেই মানুষ বরেণ্য হয় না। ধনীরা ঝোঁকের মাথায়, কখন বা খ্যাতির লোভে দান-খয়রাত কোরে বাহবা লাভ করে; আবার ঝোঁকে প'ড়ে কত গর্হিত কাজও করে। কিন্তু যথার্থ সমাজ-হিতৈষী হোতে হ'লে চাই—সংযম, চরিত্রবল, সত্যনিষ্ঠা।

—বেশ, তাই হবে গো, অন্ততঃ প্রাণপণে চেষ্টা করব সেই-রকম হ'তে; অর্থাৎ সমাজের একটা আদর্শ জীব হ'বার জন্যে। তোমারই হাতে নিজেকে সমর্পণ করলুম, নীলা! যদি সম্ভব হয়, আমায় তুমি মানুষ কোরে তোল। কিন্তু তোমার মৃত্যু বা উপেক্ষা আমায় আরও দ্রুত অধঃপাতের পথেই টেনে নিয়ে যাবে, এটা ঠিক জেনে রেখ তুমি।

নীলা স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষণকাল স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—সত্যি বলছ তুমি? আমার হাতে তুমি নিজেকে সমর্পণ করলে আজ থেকে? এঁ্যা, ঠিক?

—হ্যাঁ, নীলা! তুমি বিশ্বাস কর, আমার কথার নড়-চড় হবে না।

—তবে চল, আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে তুমি একটা প্রতিজ্ঞা করবে।

—সে আবার কোথায়? কেন, আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস নেই?

নীলা স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার উপবাস-ক্লিষ্ট মুখখানা বিশুষ্ক, বিবর্ণ। মণীশ তাহার মুখের পানে

কিছুক্ষণ চাহিয়া-থাকিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। তাহার বিশৃঙ্খল, রুক্ষ কেশগুচ্ছে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল,—তুমি একটি আস্ত পাগল, অর্থাৎ উন্মাদিনী! লক্ষ্মীটি, খেতে বোস, আর আমার মনে কষ্ট দিও না। আমি সত্যিই বড় অনুতপ্ত; সাধু ভাষায় বল্‌ছি—অনুতাপানলে আমার হৃদয়কুঞ্জ প্রচণ্ড বেগে দগ্ধ হ'চ্ছে!

নীলা আপনাকে আলিঙ্গন-মুক্ত করিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল—যাও; ঠাট্টা!

মণীশ কহিল, না, ঠাট্টা নয়, সত্যি। এইবার খাবার আনতে বলি?

—না।

—না? তা হোলে তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না? উঃ, কি কষ্ট!

মণীশ ক্ষুব্ধ স্বরে এই কয়টি কথা বলিয়া কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। নীলার তখন দুই চোখ দিয়া অশ্রুর বান নামিয়াছে। সে বাষ্পাকুল কণ্ঠে কহিল,—বিশ্বাস করব না কেন? তবে এখনি তোমার অন্তরের অন্তস্তলে যে ভিত্তি স্থাপিত হোল, সেটা তেমন দৃঢ় না হোতেও পারে তো?

তাহার কথায় বাধা দিয়া মণীশ উত্তেজিত ভাবে কহিল,—আর যেখানে নিয়ে যেতে চাইছ, সেইখানে গিয়ে প্রতিজ্ঞা কোরে ফেল্‌লেই, সেই ভিত্তিটা বুঝি কংক্রীটের মতো শক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে?

তাহার কণ্ঠস্বরে শ্লেষের আমেজ সুপরিস্ফুট; কিন্তু নীলা তাহা উপেক্ষা করিয়াই কহিল,—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

তাহার কণ্ঠের অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় মণীশ বিস্মিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল—বেশ, তা হোলে কোথায় যেতে হবে—চল।

কিন্তু তাহার মুখে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল একটা অপ্রসন্নতার ছাপ।

তিন

আজকাল নীলার মানসিক অবস্থা অনেক ভাল। মণীশ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেছে।

মন ভাল থাকিলে কাজের উপর ঝোঁক পড়ে, কাজ করিবার ক্ষমতাও বাড়ে। নীলাকে এইবার নিত্য দেখা যায়—ঝাড়া মোছা, বোনা, সাজানো প্রভৃতি শ্রমসাপেক্ষ কাজে ভারী ব্যস্ত।

সে-দিন সকালে মণীশের বৈঠকখানা-ঘরে নীলা ঢুকিয়া দেখিল—চারি দিক্ যেমন অপরিষ্কার, তেমনি বিশৃঙ্খল; ক্ষুব্ধ মনে টেবিলটা সাফ করিয়া গুছাইতে-গুছাইতে নজর পড়িল পেপার-ওয়েট-চাপা একখানা খাম। খামখানার উপর শুধু স্বামীর নামটা মেয়েলি-ছাঁদে ইংরেজীতে লেখা। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নীলা দ্বিধাভরে একবার বাহিরে চাহিল, তাহার পরই মনে পড়িল, স্বামী নিজের চরিত্র-সংশোধনের ব্যাপারে তাহারই হস্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এ জন্য সে আর ইতস্ততঃ না করিয়া খামের ভিতর হইতে চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিল। ছোট চিঠি, মাথার কাছে সেই দিনেরই তারিখ। সে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়িল,—

"প্রিয় মণীশ, আজ সন্ধ্যায় আটটার সময় দেখা কোরো। ইডেন-গার্ডেন প্যাগোডার পেছনে একটা বেঞ্চে যেন দেখতে পাই। ক'দিন তোমার দেখা পাইনি; সাক্ষাতে সব শুনবে এবং শুনব—

তোমারই মলয়া।"

নীলা আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু আগেও তাহার গর্ব্ব ছিল—স্বামীর চরিত্র সে সংশোধন করিয়াছে। তাহার বুকের ভিতর তুমুল তুফান উঠিল; সে যেন দিশে-হারা হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যখন সে এই-রকম কোন বেদনাদায়ক ঘটনার সম্মুখীন হইত, তখন ধৈর্য্য হারাইত না। এই চিন্তাই তাহার মনে সব-চেয়ে বেশী যন্ত্রণাদায়ক যে, তাহার স্বামী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অপরাধী হইয়াছে। এ জন্য নিজেকেও সে অপরাধিনী বোধ করিতে লাগিল।

পত্রখানা যথাস্থানে রাখিয়া, চার-তলার ছাদের যে ঘরটি তাহার দুঃখে-ক্ষোভে একান্ত আশ্রয়, সে সেই ঘরটিতে উপস্থিত হইল। ঝক্‌ঝকে মার্ব্বেলের মেঝে, তাহার এক ধারে শুভ্র মর্ম্মর-বেদীর উপর সুদৃশ্য সুবর্ণ-পালঙ্কে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি। রজত-নির্ম্মিত দীপাধারে স্বর্ণ-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। ধূপ-ধুনার মধুর সৌরভে বায়ু-স্তর সুরভিত। দেওয়ালে দেব-দেবীর কয়েকখানা চিত্রপট প্রলম্বিত। রূপার রেকাবে প্রস্ফুটিত টাট্‌কা দুই ছড়া

ফুলের গোড়ে-মালা। স্বর্ণ-পালঙ্কের দুই পাশে মূল্যবান ফুলদানিতে সুগন্ধি ফুলের সুবৃহৎ তোড়া।

নীলা সেই যুগল-মূর্ত্তির সমুখে নতজানু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে কহিল,—প্রভু, আলো দাও; মোহের অন্ধকারে কর্ত্তব্যের পথ হারিয়েছি, আমায় পথ দেখাও!

তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা উৎসারিত হইয়া, বুঝি সেই প্রেমের দেবতার চরণে অর্ঘ্যরূপে অর্পিত হইল।

চার

রাত্রি তখন আটটা বাজিয়া কয়েক মিনিট অতীত হইয়াছে। একখানা সুদৃশ্য মোটর-কার নিঃশব্দে আসিয়া ইডেন্‌-গার্ডেনের বড় গেটের অদূরে আসিয়া থামিল।

—বীরেন, চুপি চুপি গিয়ে দেখে এস তো প্যাগোডার পিছনে কোন বেঞ্চিতে তোমার বাবু ব'সে আছেন কি না। দূর থেকে দেখেই চোলে আসবে। দেখো, তিনি যেন তোমাকে দেখতে না পান। শিগ্‌গির যাও, তুমি এসে খবর দিলে আমি যাব। ততক্ষণ আমি গাড়ী-তেই বোসে রইলুম।

বীরেন বিনীত ভাবে কহিল,—আপনাকে এখানে একলা রেখে যেতে ভয় হয় বৌদিদি! ফোর্টের গোরা-গুলোর ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তাদের কেউ কেউ এ-সময়ে হল্লা ক'রে এ-দিকে ঘুরে বেড়ায়। তাদের উৎপাতের কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়।

নীলা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল,—আচ্ছা, চল, আমিও তোমার সঙ্গেই যাই।

বীরেন মণীশের বিশ্বাসী সোফেয়ার। বাল্যকাল হইতে মণীশের পিতার কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। মণীশকে সে অগ্রজের মতই ভালবাসে ও মান্য করে, এবং নীলাকে মায়ের মতই শ্রদ্ধা করে। মণীশের চরিত্র-হীনতার জন্য সে আন্তরিক দুঃখিত।

মলয়ার আহ্বানে মণীশ যথাকালে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু বাড়ীর মোটর-কার লয় নাই। কারণ, বীরেনকে আজ বিশ্বাস করিতে তাহার ভরসা হয় নাই।

প্যাগোডার কিছু দূরে থাকিতেই বীরেন নীলাকে কহিল,—ঐ দেখুন, বৌদিদি, দাদা বাবু বেঞ্চে বোসে আছেন, তাঁর পাশে দেখছি একটি মহিলা!

নীলা আর একটু অগ্রসর হইয়াই স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বীরেনকে প্যাগোডার আড়ালে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া, সে ধীরপদে অগ্রসর হইল।

মলয়া তখন এক-মনে মণীশের সহিত কথা কহিতেছে এবং মণীশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া তাহা শুনিতেছে, তাই নীলা নিকটবর্ত্তিনী হইবার পূর্ব্বে তাহার আগমন ইহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

মণীশ হঠাৎ নীলাকে তাহাদের সন্নিকটে দেখিতে পাইয়া চমকাইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে কহিল,—এ কি! নীলা! এমন সময়ে তুমি এখানে?

হাস্যমুখে নীলা উত্তর দিল,—একটু হাওয়া খেতে। হঠাৎ নিভৃতে আবছায়ায় বোসে নিবিষ্ট মনে গল্প করছ দেখে কৌতূহলটা দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে উঠ্‌ল কি না, তাই জানতে এলুম, ব্যাপারখানা কি?

মণীশ আমতা-আমতা করিয়া কহিল,—এমন কিছু নয়, এই ইনি—

তাহাকে বাধা দিয়া মলয়া কহিল,—নমস্কার! আপনি বুঝি মণীশ বাবুর স্ত্রী? মণীশ বাবুকে খুব শাসনে রেখেছেন তো দেখতে পাচ্ছি!

তাহার তরল হাস্যধ্বনিতে নির্জ্জন উদ্যান প্রতিধ্বনিত হইল। সে বলিতে লাগিল,—আমি ওঁর অনেক দিনের পরিচিতা; এমন কি, আপনার সঙ্গে ওঁর বিয়ের ঢের আগে থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। আজ একটা বিশেষ দরকারে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

নীলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—যত কালেরই পরিচিতা হোন, আপনার পক্ষে এটা ভুলে যাওয়া একটুও উচিত নয় যে, আপনি তরুণী, আর উনিও তো বুড়ো হননি। বন্ধুত্বটা যখন এতই নিবিড়, দিনের বেলা স্বচ্ছন্দে সাধারণ ভাবে দেখা করতে পারতেন। বিশেষ আমি যখন আপনার বন্ধুপত্নী, আপনারই কি উচিত ছিল না, আমার সঙ্গেও পরিচিত হওয়া? নিজের বাড়ীতেও তো ওঁকে ডেকে পাঠাতে পারতেন। আপনার ব্যবহার যে সমর্থনযোগ্য নয়, ভদ্রমহিলারও উপযুক্ত নয়, এটা বুঝতে না পারার মতো আপনার বুদ্ধির অভাব আছে ব'লে তো মনে হয় না।

যাক্, আমি যাচ্ছি, নমস্কার! আপনারা কথা কন। হঠাৎ এসে পড়ে আপনাদের গোপনীয় আলাপে বাধা দিয়ে ফেলেছি, এজন্য আমি দুঃখিত, আমায় মাফ করবেন।

নীলা দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল। মণীশ ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল,—নীলা, শোন!—কিন্তু নীলা ফিরিল না।

পাঁচ

সকালে ভৃত্যের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাঙ্গিতেই বীরেন শুনিল, মণীশ তাহাকে তলপ করিয়াছে। শুনিয়াই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

বাল্যকাল হইতে মণীশের কাছে থাকিলেও সে যে ভৃত্য, এ কথা বীরেন কখনও ভুলে নাই। মণীশের আদেশ ছিল, তাহার বিনা-অনুমতিতে কাহারও দরকারে বাড়ীর গাড়ী সে বাহির করিতে পারিবে না। কিন্তু এই আদেশ তাহাকে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে অমান্য করিতে হইয়াছিল। তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, ইডেন-গার্ডেনে মণীশের সহিত সাক্ষাতের পর নীলা উত্তেজিত ভাবে গাড়ীতে ফিরিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থায় যখন আদেশ করে—শ্যামবাজার চল মাসিমার বাড়ী;—তখন সে আদেশও বীরেন পালন করিয়াছিল। ঘটনাচক্রে যে মণীশের স্বার্থের এতটা প্রতিকূল দাঁড়াইবে, তাহা সে অগ্রে বুঝিতে পারে নাই। এই জন্যই মণীশের আহ্বানে সে অধিকতর ভীত হইল।

যাহা হউক, চোখে-মুখে কয়েক ঝাপ্টা জল দিয়া মুখ মুছিতে-মুছিতে বীরেন ছুটিল বাড়ীর মধ্যে! মণীশ তখন তাহার শয়ন-ঘরে সিগারেট মুখে গুঁজিয়া একখানা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়ান। তাহার তখনকার চেহারা দেখিলে মনে হয়, তাহার উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে! বীরেনের পদশব্দে সে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—তোমাকে অনেকক্ষণ আগে ডেকে পাঠিয়েছি।

কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে বীরেন প্রমাদ গণিল।

মণীশ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—নীলা কোথায়?

বীরেন আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল,—কাল রাত্তিরে তিনি শ্যামবাজার গেছেন।

উত্তেজিত কণ্ঠে মণীশ কহিল, কে তাকে নিয়ে গেল? বীরেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে নীরব।

মণীশ পুনরায় উচ্চকণ্ঠে কহিল,—চুপ কোরে রইলে কেন? উত্তর দাও।

বীরেন বিনীত কণ্ঠে কহিল,—আজ্ঞে, বৌদিদির হুকুম তো কখনো অমান্য করতে পারিনি, তাই—

—কিন্তু আমার বিনা-অনুমতিতে কারো কোনো দরকারে গাড়ী বার করতে যে নিষেধ করেছি, এ কথা অগ্রাহ্য করবার কারণ কি?

—আজ্ঞে, আপনি তো তখন বাড়ী ছিলেন না; তাই বৌদিদিকে তখন আপনারই প্রতিনিধি ভেবে নিয়ে গিয়েছিলুম। আপনার আদেশ অগ্রাহ্য করি, সে ধৃষ্টতা আমার নেই।

মণীশ একটা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া ইজি-চেয়ারে হেলিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবে ধূমপান করিবার পর কহিল,—সে কবে ফিরে আসবে, সে কথা ব'লেছে?

—আজ্ঞে, তা তো কিছু বলেন-নি। শুধু ব'ললেন,—তুমি ফিরে যাও, আর বাড়ীর পুরুত-ঠাকুরকে দিয়ে রাধা-গোবিন্দজীর পূজো করিয়ো।

—ব্যস্! আর কিছু নয়?

বীরেন মাথা নাড়িয়া কহিল,—আজ্ঞে না। তবে আমি নিজে থেকে যখন জিজ্ঞাসা করলুম, আপনাকে কবে এসে নিয়ে যাব? তার উত্তরে ব'ললেন, তোমায় আসতে হবে না; যখন যাব, এখানকার মোটরেই যাব।

মণীশ অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট ছাই-দানিতে নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—তুমি গাড়ী নিয়ে এখনি সেখানে যাও, আমি চিঠি দিচ্ছি। তার সঙ্গে দেখা কোরে চিঠিটা দেবে; আর বলবে যে, আমি বলেছি, এখনি যেন ফিরে আসে।

ছয়

সে-দিন সকাল হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে—একঘেয়ে ঝর্-ঝর্ ঝর্-ঝর্ শব্দের বিরাম নাই। এত বৃষ্টিতে মন যেন আপনা হইতেই কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়ে।

গোল-বারান্দায় একখানি রকিং-চেয়ারে শুইয়া মণীশ বৃষ্টিপাত দেখিতেছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলার মত তাহার মনটাও যেন অসংখ্য ধারায় বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলই আছাড় খাইতেছে। সে বাল্যে মাতৃহারা এবং যৌবনের

প্রারম্ভেই পিতৃহারা হইয়াছিল। তাহার পর অভিভাবকহীন অবস্থাপন্ন যুবকের ভাগ্যে সচরাচর যাহা ঘটে—মণীশের ভাগ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যৌবনে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া তাহার চরিত্র কলুষিত হইল। কিন্তু সে অমানুষ নয়; নীলাকে বিবাহ করিয়া সে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিল। নীলার মধ্যে সে একটা পবিত্র মানসরঞ্জন আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। এখন সে উত্তমরূপেই বুঝিয়াছে—নীলাকে সে ভালবাসে।

কিন্তু আজ সে নীলার কাছে দুশ্চরিত্র, মাতাল। পবিত্রার কাছে তাহার অপবিত্র জীবনটা যেন অতিমাত্রায় দুর্ব্বহ, ঘৃণ্য, এবং জঘন্য। নীলার কল্যাণকর ঐকান্তিক অনুরোধে পড়িয়া দেবতার সম্মুখে দেব-নির্ম্মাল্য হাতে লইয়া সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, মোহের বশবর্ত্তী হইয়া সে তাহাও লঙ্ঘন করিয়াছে।

মণীশ কোন দিন দেব-দেবীকে বিশ্বাস করিতে শিখে নাই, বা ভক্তিতত্ত্বের পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করিবার আকর্ষণও কোন দিন অনুভব করে নাই। তবে হিন্দু-পরিবারে প্রতিপালিত হওয়ায় স্বাভাবিক সংস্কার-বশতঃ সে দেব-দেবী মানিত; এবং বোধ হয়, এইজন্যই স্ত্রীর অভাবজনিত তীব্র বেদনা তাহার চিত্তকে যেন রাধাকৃষ্ণের সেই যুগলমূর্ত্তির দিকে একটা অজ্ঞেয় আকর্ষণে টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত। সে বার-বার শিহরিয়া উঠিয়া মনে মনে বলিতেছে,—আমার অপরাধ কঠিন, প্রভু! আমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ পাপে লিপ্ত হ'য়েছি!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই সে হঠাৎ উঠিয়া বসিল। তাহার পর হল্-ঘরে প্রবেশ করিয়া কাহাকে ফোন করিয়া সাড়া লইল। কিয়ৎ কাল পদচারণ করিবার পর 'কলিং-বেল্‌টা' টিপিয়া রকিং-চেয়ারে আবার দেহ ঢালিয়া দিল। অবিলম্বে প্রত্যাশিত পদশব্দ কানে আসিতেই মাথা তুলিয়া কহিল,—কে, বীরেন?

বীরেন সম্মুখে আসিয়া কহিল,—আজ্ঞে, হাঁ।

—আমি এখুনি অতুলকে আসতে ফোন্ ক'রেছি। গাড়ী নিয়ে যাও, তাকে নিয়ে এস।

বীরেন চলিয়া গেলে মণীশের মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীটা যেন অবাস্তবের রঙ্গভূমি ছাড়া আর কিছু নয়—যেন সিনেমার স্ক্রীণ! বাস্তবের মূর্ত্তি লইয়া নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু সকলেই নিজ-নিজ পালা অভিনয় করে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে খুঁজিলে তাহারা প্রত্যেকে অবাস্তবেই বিলীন হয়

সাত

বীরেন অতুলকে মণীশের কাছে পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। অতুল মণীশের অকৃত্রিম বন্ধু হইলেও মণীশ এত দিন তাহাকে এড়াইয়াই চলিয়াছে। কারণ, অতুল সচ্চরিত্র, এবং স্পষ্ট-বক্তা; কিন্তু মণীশের নিঃস্বার্থ হিতৈষী। সে সম্মুখে আসিবামাত্র মণীশ আগ্রহপূর্ণ অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে কহিল,—এস, এস ভাই, অতুল! আজ তোমার সঙ্গ-সুখ একান্তই প্রার্থনীয় মনে হচ্ছে। চল, ঘরের মধ্যে গিয়ে বসা যাক্।

অতুল হাস্য-প্রফুল্ল মুখে কহিল,—কেন হে, হঠাৎ আমার সঙ্গ-সুখের লোভটা তোমার এত অসম্বরণীয় হয়ে উঠ্‌ল কেন?

মণীশ কহিল,—অনেক দিন তোমার গান শোনা হয়-নি। আজ আমায় গান শোনাও, ভাই, দয়া কোরে। আমি সত্যিই আজ দয়ার পাত্র। তুমি তো কত বার ব'লেছ, আমি এক দিন সকলের দয়ার পাত্র হবো। আজ সেই-দিন এসেছে; তাই তোমাকেই মনে পোড়ে গেল সকলের আগে। বিশ্বাস কর, ভাই, আমি একটুও মিথ্যে বা অতিরঞ্জিত কথা বলছিনে।

মুখের হাসি বজায় রাখিয়াই অতুল কহিল,—কেন, ব্যাপার কি যে, এর মধ্যে অমৃতে এতই অরুচি?

মণীশ ঘরের মধ্যে আসিয়াই একখানা কৌচে বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন, তাহা লক্ষ্য করিয়া অতুল চমকাইয়া উঠিল। সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কহিল,—কি হোল তোমার মণীশ? তোমার কি কোন অসুখ হ'য়েছে?

মণীশ মাথা নাড়িয়া কহিল,—না। আমি নিজের পাপে আজ গুণবতী স্ত্রীটিকে হারিয়েছি, অতুল! তাকে পেয়ে অবধি কখনো সুখী করতে পারিনি, শেষে সুখী করবো বোলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাও রাখতে পারিনি,—আমার এমনি দুর্ভাগ্য!

অতুল কহিল,—খুলে বল, ভাই। তোমার সব কথাই হেঁয়ালীর মতো বোধ হ'চ্ছে।

মণীশ ধীরভাবে তাহার দুর্ভাগ্যের সকল কথা জানাইয়া অবশেষে কহিল,—হ্যাঁ, স্বীকার করি, মলয়ার প্রতি এক কালে আমার মনে মোহের সঞ্চার হ'য়েছিল, কিন্তু সে মোহ অনেক আগেই ছুটে গেছে। তবে মলয়া মাঝে-মাঝে আমার কাছে অর্থ সাহায্য চায়—তার সাংসারিক অসচ্ছলতাই এর কারণ; আমি নিঃস্বার্থ ভাবেই তাকে সাহায্য করি।

—তা, এ কথা কি তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে কোন দিন প্রকাশ করনি?

—না ভাই, ভয়ে তাকে তা' বলতে পারিনি, কি জানি, যদি জেরার মুখে এমন কিছু বেরিয়ে যায়, যাতে সে বুঝতে পারে, এক সময়ে মলয়ার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাটা —ইয়ে—কি বলি—একটু সন্দেহজনক হ'য়েই দাঁড়িয়েছিল। তাই এবার অনেক দিন পরে সে যখন চিঠি লিখে ইডেন-গার্ডেনে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, তখন ভাবলুম, কথাটা চুপি চুপি শুনে আসাই ভাল। কিন্তু নীলা সেই-দিনই লাইব্রেরীতে ঢুকে মলয়ার সেই চিঠিখানা দেখতে পায়; আমি তখন তা জানতে পারলে কি আর এ বিভ্রাট ঘটে?

অতুল কহিল—তার পর তাঁকে আনতে গেছ্‌লে?

মণীশ কহিল, বীরেনের মারফৎ চিঠি দিয়ে তাকে আনবার জন্য গাড়ী পাঠাই; কিন্তু চিঠির উত্তর লিখে গাড়ী ফেরত দিয়েছে। তার পর ফোনে কথা বলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু শুনলুম, সে ওখানে নেই; কোথায় মেয়েদের একটা আশ্রম হয়েছে, সেইখানে গিয়ে জুটেছে।

সে উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া অতুলের সম্মুখে রাখিয়া কহিল, প'ড়ে দেখ।

অতুল লেফাপা হইতে পত্রখান বাহির করিয়া নিঃশব্দে পাঠ করিল।

"প্রিয়তম, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই লিখেছ, আশাভঙ্গের ব্যথা বুকে নিয়ে বড় কষ্টেই আমি চ'লে এসেছি। আমারই ভালবাসার বলে তোমার কাছে ফিরে যেতে লিখেছ। তা যেতুম আমি, যদি বুঝতুম, আমার বিশ্বাসের ভিত্তি বেশ শক্ত, অটল। কিন্তু এখন নিজের উপরেও আর আমার বিশ্বাস নেই। হয় তো তোমায় ভালবাসার খাতিরেই এক দিন আমাকে ফিরে যেতে হবে, এবং তোমার ক্ষমা লাভ করাও আমার পক্ষে হয় তো অসম্ভব হবে না; কিন্তু সে-দিন যে কবে আসবে, শীঘ্র আসবে, কি আমার সুখশান্তিহীন অসহায় জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে তোমাকে শেষ দেখা দেখবার জন্যে আসবে—তা জানিনে।

অযোগ্যা সেবিকা

নীলা।"

চিঠিখানা পড়িয়া, অতুল মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, মণীশ দেওয়ালের একখানা ছবির পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া স্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছে। সহানুভূতিভরে তাহাকে ডাকিতেই সে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, চিঠিটা পড়লে? তবে দাও, ওটা তুলে রাখি।—তাহার পর তাহা হাতে লইয়া নীরস হাস্যে কহিল,—আমার চিরস্মরণীয় শান্তির প্রতীক হয়ে রইল এ চিঠি, বুঝলে ভাই?

তার পর উভয়েই নিস্তব্ধ!

আট

গঙ্গা যেখানে ক্রমশঃ সরু হইয়া এক-ফালি চাঁদের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে, তাহারই পূর্ব্বদিকের কোলের কাছে একটি অবলাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা এক সহৃদয় ধনবান ব্যক্তি। নানা স্থানে তিনি এইরূপ আশ্রম ও ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া তাঁহার বিপুল অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

ঐ অবলাশ্রমটি এখন শতাধিক অনাথার আশ্রয়স্থল। এক জন প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনীর হস্তে তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার ভার ন্যস্ত আছে। মেয়েদের নৈতিক উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে এখানে শাস্ত্রানুমোদিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে; তদ্ভিন্ন, যাহাতে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব রুচি অনুযায়ী বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া স্বাবলম্বিনী হইতে পারে, তাহারও উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে।

অবলাশ্রমের চারি পাশে প্রশস্ত উদ্যান। এক পাশে সারি-সারি শয়ন-কক্ষ; আর এক দিকে পাকশালা ও ভাঁড়ার ঘর। সম্মুখে প্রকাণ্ড হল, সেই হলস্থিত বেদীতে উপবেশন করিয়া যোগিনী-মাতা আশ্রমবাসিনী নারী-দিগকে শিক্ষা দান করেন। হলের সম্মুখেই আর একটি হল্‌ শুভ্র মর্ম্মর-মণ্ডিত; তাহারই এক প্রান্তে রাধাশ্যাম

বিগ্রহ রজত পালঙ্কে বিরাজিত। পার্শ্ববর্ত্তী দরদালানে বিশ-ত্রিশটি মেয়ে হাসি-গল্প করিতে করিতে ফুলের সাজ রচনা করিতেছে, এবং তাহার আর এক পাশে কয়েকটি রমণী কুটনা কুটিতেছে।

শীতের অবসানে সবেমাত্র বসন্ত সমাগমের আভাস পাওয়া যাইতেছে। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। আজ সকাল হইতেই টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আপন শয়ন-কক্ষের জানালার ধারে নীলা একাকিনী বসিয়া আছে। কলনাদিনী গঙ্গাবক্ষে তাহার দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ। কত কি প্রশ্ন তাহার মনে জাগিতেছে! মানুষের পক্ষে কোন্‌টা বেশী শ্রেয়স্কর—সংসারাশ্রম, না সন্ন্যাসাশ্রম? জীবের চরম লক্ষ্য কি? সঙ্গে-সঙ্গে কেবলই তাহার মনে হইতেছে, গৃহে থাকিয়াও মানুষ সন্ন্যাসী হয়, আবার আশ্রমে থাকিয়াও গৃহী। এই যে আশ্রম, বৈরাগ্যের গৈরিক কেতন ইহারও ঊর্দ্ধে উড়াইয়া, তাহার নিম্নস্থ গৃহেই আশ্রয় লওয়া হয় নাই কি? এখানে কি নাই? রৌদ্র হইতে শীতল ছায়ায় যাইবার আগ্রহ, বৃষ্টিধারা হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুলতা, যশের কামনা, অপযশের ভয়—এখানে কাহার নাই?

ঝিম্‌-ঝিম্‌ করিয়া বৃষ্টি। দুগ্ধ-ধবল গঙ্গার বুকে ছোট-ছোট পাল তুলিয়া ডিঙ্গিগুলি নাচিয়া চলিয়াছে; বর্ষণ-সিক্ত কুঁড়িগুলি ধীরে-ধীরে ফুটিয়া-উঠিয়া প্রকৃতির সান্ধ্য প্রসাধনে যোগ দিয়াছে।—নীলার মানস-নয়নে ফুটিয়া উঠিল—তাহার একান্ত নিবিড় চারি বৎসরের সংসারের চিত্র। মনে পড়িল, চারি বৎসরের মধ্যে একটি দিনের জন্যও সে গৃহত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও বাস করে নাই।

—ও মা! ও নীলাদি, সন্ধ্যা-বন্দনার সময় হ'য়ে গেছে, আর তুমি এখনও এমন চুপটি কোরে বোসে আছ? চল।

নীলা চমকিয়া উঠিয়া দেখিল—আশ্রম-ভগিনী প্রতিভা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। সে লজ্জিত ভাবে কহিল,—তুমি যাও ভাই, আমি কাপড় বদ্‌লেই যাচ্ছি।

নীলা যখন মন্দিরে প্রবেশ করিল, তখন বন্দনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা মাতাজীর সুরে সুর মিলাইয়া গায়িতেছে—"অধরং মধুরং বদনং মধুরং—"

নয়

মণীশের শরীর ভাল নাই। আজ-কাল আর সে বিছানা হইতে উঠিতেই পারে না। তাহার গৃহ-চিকিৎসক ডক্টর রায় এত দিন চিকিৎসা করিয়াও বিশেষ ফল না পাওয়ায় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

কলিকাতাতেই মণীশের এক পিসিমা থাকেন। তাঁর ছেলেরা প্রত্যহই মণীশের খবর লইতে আসে। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ আরও খারাপ হইতেছে দেখিয়া তাহারা এক জন বিজ্ঞতর চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। শুশ্রূষার কোন প্রকার ত্রুটি না হয়, এজন্য দু'জন নার্সকেও তাহারা নিযুক্ত করিল—এক জন দিনে, আর এক জন রাত্রে থাকিবে।

মণীশের দেহ শীর্ণ ও লাবণ্যহীন। আজ-কাল বেশী কথা কহিবারও ক্ষমতা নাই। জাগ্রত অবস্থায় সে উদাস নয়নে চাহিয়া থাকে। রোগের অস্বস্তি আছে, কিন্তু রোগীর কাতরোক্তি নাই। বন্ধুরা দেখিতে আসিলে তাহার বিরক্তি ধরে। শুধু অতুল আসিলে মুখখানা প্রফুল্ল হয়। মাঝে-মাঝে অতুলকে গান গায়িতে বা বই পড়িয়া শুনাইতে বলে।

আরও মাসখানেক একই ভাবে অতীত হইলে চিকিৎসক মত প্রকাশ করিলেন যে, রোগী এইবার আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহার অল্প দিন পরেই মণীশ বীরেনকে ডাকিয়া কহিল,—নার্সদের এইবার ছুটী দাও, বীরেন।

বীরেন মৃদুকণ্ঠে কহিল,—আরও দিন-কয়েক রাখলে ভাল হয় না? এখনো তো আপনি সম্পূর্ণ সারেননি।

মণীশ কহিল,—সারতে যেটুকু বাকি আছে, তার জন্যে তোমরাই তো রয়েছ।

কথার শেষে নিষ্প্রভ নয়নে চাহিয়া সে একটু হাসিল। তাহার পর কহিল,—না, না, আর ওদের দরকার নেই। ডাক্তারের মত যাই হোক, আমি বেশ বুঝেছি, আমার বারো আনা অসুখ মনের। বুঝলে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—তাই আমি ভাবি, বীরেন, আমার চিরদিনের অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি হঠাৎ কে চুরি করলে? যত ভাবি, ততই অবাক হই।

বীরেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

নার্স দুই জনকে বিদায় দেওয়া হইলে বীরেন এবং পুরাতন ভৃত্য গোকুলই মণীশের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিল।

এক দিন সকালে মণীশকে ঔষধ ও পথ্য দিয়া বীরেন ডাক্তারকে রিপোর্ট দিতে চলিয়া গিয়াছে, সেই অবসরে সিঁড়িতে কাহারও পরিচিত পদশব্দ শুনিতে পাইয়া মণীশ উদ্‌গ্রীব হইয়া সহসা সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর পুনর্ব্বার উপাধানে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিল। সিঁড়ি দিয়া যে উঠিতেছিল, সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহা অনুভব করিয়াও মণীশ চক্ষু মুদিয়াই পড়িয়া রহিল। আগন্তুক ভাবিল, মণীশ ঘুমাইতেছে। সে তখন অতি সন্তর্পণে তাহার মাথার কাছে বসিয়া তাহার চুলের মধ্যে ধীরে-ধীরে অঙ্গুলী চালনা করিতে লাগিল।

মণীশ এইবার আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—কে? নীলা? আমি জানতুম, তুমি আসবে; তাই তোমারই আশা-পথ চেয়ে সেরে উঠবার জন্যে এত আকাঙ্ক্ষা, এত চেষ্টা। কি কোরে খবর পেলে, নীলা—মরণের পথে আমি এগিয়ে যেতে-যেতে তোমারই দর্শন-কাঙাল, তাই এ যাত্রা আর যাওয়া হ'লো না?

মণীশের ললাটে দুই ফোঁটা তপ্ত-অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অসীম তৃপ্তিভরে মণীশ কহিল,—আঃ! নীলা, তোমার কোলের উপর আমার মাথাটা তুলে নাও।

নীলা তাহাই করিলে, মণীশ উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—আর কখনো আমাকে এমন অসহায় ফেলে যাবে না তো, নীলা?

বাষ্পাকুল কণ্ঠে নীলা উত্তর দিল,—কেমন ক'রে যাব বল? তুমি যে আমায় কত শক্ত ক'রে বেঁধেছ, আগে তা' বুঝতে পারিনি তো, তাই গিয়েছিলুম।

মণীশ নীলার ডান হাতখানা বুকে চাপিয়া-ধরিয়া গাঢ় স্বরে কহিল,—আজ সেই গানটা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে নীলা! গাইতে পারবে?

—কোনটা?

সপ্রেম-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া নীলা আঁচল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিল।

মণীশ কহিল, সেই যে—

কত সে দূর বিরহ-লোক
পার হ'য়ে এলে, মম প্রিয়!

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়।

এবারও রহিনু ঋণী

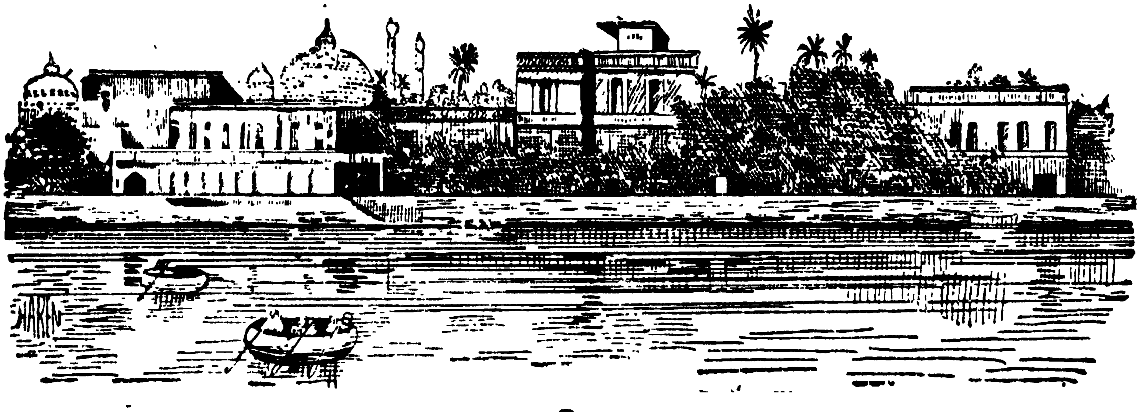
তোমার প্রেমের ঋণ চিরদিন রয়ে গেল বুকে,
কত যুগ-যুগান্তর বহিতেছি পরম কৌতুকে!
নয়নে ধরেছ তুমি—তোমার ও-রূপ-সুধামৃত,
সে-রূপ-মাধুরী আজো হৃদয়েতে রয়েছে সঞ্চিত!

মধুর ভাষায় তব অমৃত উছলি পরে ঝরি',
আমি যে নিয়েছি মোর হৃদয়ের শূন্য ভাণ্ড ভরি'!
কুন্তলে নেমেছে তব শাঙনের ঘন মেঘভার,
স্নিগ্ধ-শান্ত রূপে তার পূর্ণ হ'ল অন্তর আমার!

চরণ-অলক্তরাগে—গোলাপের রক্তরাগ ফুটি',
সকল অন্তর মোর তারি' তরে পড়েছিল লুটি',
অধর পরশে তব নিখিলের রসামৃত-ধারা,
কত ফুলে বিকশিত করিয়াছে অন্তর-সাহারা!

এ-বারও তোমার ঋণ পরিশোধ হ'ল নাকো তাই,
যুগ-যুগ ঋণভার বুকে ক'রে বহিয়া বেড়াই!

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এস (কবিশেখর)



বেথলিহাম

আমাদের যেমন বারাণসী, মুসলমানের যেমন মক্কা, খৃষ্টানের কাছে বেথলিহাম তেমনি পুণ্য-তীর্থ। যন্ত্র-যুগে মানুষের মন আজ পিষিয়া চূর্ণ হইয়া গেলেও বেথলিহামের নামে খাঁটি খৃষ্টান আজো মাথা নত করিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করে।

সহর-হিসাবে বেথলিহাম খুব ছোট; জেরুশালেম এবং হেব্রনের মধ্যে অবস্থিত। এখানকার পথ-ঘাট তেমন প্রশস্ত নয়। আঁকা-বাঁকা গলি-ঘুঁজির অন্ত নাই। সে সব গলি-ঘুঁজি আমাদের কাশী-গয়ার গলি-ঘুঁজির মতো পাথরে বাঁধানো। গলির ত্ব'পাশে হাজার দেড়-হাজার বৎসরের পুরানো বাড়ী-ঘর। এ-সব বাড়ীর দেওয়াল পাথরের তৈয়ারী; হাজার-হাজার বৎসর ধরিয়া গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার জল খাইয়া দেওয়ালের গা দেখিতে কালো ঝুলের মতো! অনেক বাগান আছে, বাগিচা আছে। আঙুরের ক্ষেত, জলপাইয়ের ক্ষেত,—ফল-ফুলের বাগান অজস্র। পথে-ঘাটে কলরব নাই, কোলাহল নাই।



বেথলিহামের বাড়ী-ঘর—পাথরের দেওয়াল; মাটীর ছাদ

এখানকার নর-নারী সভ্য-যুগের ব্যবসাদারী-বুদ্ধিতে পরিপক্কতা লাভ করে নাই। আচারে-ব্যবহারে-স্বভাবে-বেশে-ভূষায় তারা আছে আজো সেই আদি-কালের পল্লী-বাসীর মতো। বাইবেলে আমরা যে-সব নর-নারীর কথা পড়ি এবং বেথলিহামের পথে-ঘাটে আজ যে-সব নর-নারী বিচরণ করে, তাদের দেখিলে সেই বাইবেলে বর্ণিত নর-নারীর দেশের লোক ও বংশধর বলিয়া চিনিতে ভুল হইবে না!

বেথলিহাম সহরটি পাহাড়ের কোলে জেরুশালেমের উত্তরে অবস্থিত। নগরের বুক চিরিয়া দীর্ঘ পথ। এই পথ সোজা গিয়াছে এক দিকে জেরুশালেমে; আর-এক দিকে হেব্রনে। বেথলিহামে অনেক মুসলমানের বাস; তা ছাড়া সকলেই খৃষ্টান। খৃষ্টান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছ'-সাত হাজার। এখানকার খৃষ্টান অধিবাসীরা মনে-প্রাণে খৃষ্টান। তাঁদের মনে দ্বেষ-হিংসা নাই। তাঁরা যেমন সদালাপী এবং অমায়িক, তেমনি অতিথিপরায়ণ। মামলা-মকর্দ্দমা এখানকার খৃষ্টান-সমাজে অজানিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এখানে কোলাহল নাই এবং লোক-জন সাদাসিধা সরল ভাবে জীবনযাপন করে বলিয়া মনে করিবেন না, তারা অলস বা কর্ম্ম-বিমুখ, প্রমোদ-স্বপ্নে গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে! এখানে ধর্ম্ম বা পলিটিক্স লইয়া দলাদলি নাই, গণ্ডগোল নাই। সে-সবের দিকে কাহারো ঝোঁক নাই। সকলেই কাজ-কর্ম্ম লইয়া আছে। সে-জন্য শিল্প-কাজে এখানে বহু বৈচিত্র্য এবং উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

এখানকার পথ-ঘাটের গঠনে বৈচিত্র্য আছে। গলি-ঘুঁজি যেমন আছে, তেমনি কোথাও পথের মাঝে দোতলা-তিনতলার সমান উঁচু সোপানশ্রেণী; সে-সোপান অতিক্রম করুন, ও-দিকে আবার পথ। পাহাড়ী জায়গা বলিয়া পথ কোথাও উঠিয়াছে মাথার উপরে, আবার কোথাও পায়ের তলায় নামিয়া গিয়াছে।



চারণ-ভূমি

পথের ধারে-ধারে রকমারি দোকান। এ-সব দোকানে বসিয়া নানা শিল্পী নানা শিল্প রচনা করিতেছে। কেহ মালা গাঁথিতেছে; কেহ মাটী লইয়া বিচিত্র নক্সাদার তৈজসাদি তৈয়ারী করিতেছে; কেহ তাঁতে কাপড় বুনিতেছে; কেহ কাপড়ে নানা ছাঁদের নক্সা তুলিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী করিতেছে। সারি-সারি গহনার দোকান—কেহ গড়িতেছে হার, কেহ গড়িতেছে মাদুলি, কেহ বোতাম, কেহ বা নেকলেশ। দেশ-বিদেশ হইতে নিত্য এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা এ-সব বস্তু সমাদরে কেনে, কিনিয়া দেশে গিয়া প্রিয়জনদের উপহার দেয়।

পথের ধারে-ধারে দেবদেবীর অসংখ্য মন্দির আছে—মঠ আছে, আশ্রম আছে। মন্দিরে মেরি-মাতার মূর্ত্তি।

কোনো মূর্ত্তি পাথরে গড়া—কোনো মূর্ত্তি বা রৌপ্য-নির্ম্মিত। এক জন মার্কিণ পর্য্যটক পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। এ-গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন,—বেথলিহামের সঙ্গে ভারতের কাশীধামের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। অনেক সময় মনে হইয়াছে, ধর্ম্মের দিক দিয়া হিন্দুর সঙ্গে খৃষ্টানের পুণ্য-ভক্তির প্রকাশ-রীতিতে যেমন মিল দেখা যায়, এমন আর-কোনো ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায় না! কাশীতে এবং গয়ায় যেমন অজস্র মন্দির, মন্দিরের আশে-পাশে বহু দোকান, এবং সে দোকানে যেমন বিচিত্র শিল্প-সম্ভার, বেথলিহামেও ঠিক তেমন দেখিয়াছি। তিনটি পুণ্যতীর্থ দেখিলে মনে হয়, এ তিনটি তীর্থ যেন একই সূত্রে গাঁথা এক-বিধাতার সৃষ্টি!



শ্রীশ্রীমেরি-মূর্ত্তি

পুতুল-খেলনা তৈয়ারী করিয়া বেথলিহামের ছোটখাট এই সব শিল্পী যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাদের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহে কোনো অসুবিধা ঘটে না। তারা যেমন ভিক্ষাবৃত্তি জানে না, তেমনি বিদেশী যাত্রী পাইলে ঠকাইয়া দাঁও কসিবার প্রবৃত্তিও নাই! সংসার প্রতিপালন করিয়াও সকলে বেশ কিছু সঞ্চয় রাখিতে সমর্থ; তা ছাড়া এই শিল্প-কাজকে যুগযুগান্ত কাল অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়া এখান-কার অধিবাসীদের মনে যে স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মসম্মানবোধ দেখা যায়, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোথাও কোনো সমাজে দেখা যাইবে না। These industries have cultivated a sense of independence and self-respect in the natives of Bethleham.

বেথলিহামে কল-কারখানা নাই। দোকান-ঘর বা কারখানা যা আছে, তা ঐ বাড়ীর কোনো কামরায়। বাড়ীর লোক-জন এ-সব দোকানে কারিগরী করে। মাহিনা-করা কারি-গর নাই বলিলেও চলে। মেঝেয় বসিয়া দু'-চারিটা সাবেকী-যন্ত্র লইয়া কি বিচিত্র শিল্পই না ইহারা রচনা করিতেছে! কাজ চলিয়াছে অবিরাম। কাজ করিতে করিতে কেহ গান গাহিতেছে, কেহ পার্শ্বোপবিষ্ট ছেলেকে পড়া বলিয়া দিতেছে, কেহ বা ছেলেমেয়ের বিবাহের কথা পাকা করিতেছে! কাজ ঠিক চলিয়াছে—অথচ হাতের এ-কাজ বিশ্ব-সভায় প্রদর্শন করিলে লোকে কারিগরীর প্রশংসা ছাড়া নিন্দা করিতে পারিবে না!

এখানকার মেয়েরা রূপে-গুণে যেন লক্ষ্মী! সংসারের কাজ-কর্ম্ম আছে; সে কাজ-কর্ম্মের অন্তরালে অবসর মিলিলে একটা-না-একটা কাজে হাত দিবেন। আলস্য বা বিলাস তাঁরা জানেন না।

জন্ হোয়াইটিং নামে এক জন ইংরেজ লেখক বেথলিহাম দেখিয়া-আসিয়া একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন, এক দিন এক শিল্পীর গৃহে গিয়াছিলাম। আঠারো বৎসর বয়সের রূপসী তরুণী এ-বাড়ীর গৃহিণী। একটি



গহনার কারিগর

শিশু-সন্তানের জননী। মুক্তায় বিঁধ করিয়া সেই বিঁধে তার চালাইয়া রূপসী গৃহিণী মুক্তার মালা গাঁথিতেছিলেন। কাছে দোল্না; দোল্নায় শিশু শুইয়া আছে। জননী কাজ করিতেছে—মাঝে-মাঝে পরম-স্নেহে শিশুর পানে চাহিয়া হাসিতেছে—ছড়া গায়িয়া শিশুকে মনের আবেগ-ধারায় অভিসিঞ্চিত করিতেছে—আবার শিশু কাঁদিলে দোল্নায় মৃদু দোল্ দিতেছে। ঘরের আর-এক দিকে ছোট উনুনে হাঁড়ি চাপানো—রান্না হইতেছে। স্বামী ক্ষেতে গিয়াছে কাজ করিতে—ক্ষেত হইতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ফিরিবে,—ফিরিবামাত্র স্বামীকে অন্ন বাড়িয়া দিবে। এক সঙ্গে তিনটি কাজ করিতেছে—অথচ তার মুখে-চোখে যে হাসির লহর দেখিয়াছি, সে-হাসি সভ্য-যুগের বিলাসিনী-সমাজে কোনো দিন দেখি নাই!

এখানকার মুসলমান শিল্পীদের হাতে যে জপের মালা তৈয়ারী হয়, তার কলানৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইবেন। এক-রকম ফলের বীজ লইয়া তারা সে বীজে রঙ করে। এ বীজকে বলে মক্কা-ফলের বীচি। বীজগুলি



নকল-মুক্তার বোতাম তৈয়ারী

দেখিলে হাতীর দাঁতের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়! এ-বীজ রঙাইয়া সেই রাঙানো-বীজে মালা গাঁথে। সে-মালা মক্কা ও মদিনার বাজারে পুণ্যকামী মুসলমানের দল সাগ্রহে ক্রয় করেন।

বেথলিহামের গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের অবস্থা এখানকার মতো "দিন-আনা দিন-খাওয়া"-গোছের নয়। সকলেরই সঙ্গতি আছে। বিদেশের সহিত কাজ-কারবার করেন। অনেকে য়ুরোপ-আমেরিকায় গিয়া বাণিজ্য-সম্পর্ক এমন সুদৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত করিয়া আসিয়াছেন



বেথলিহামের পথে



গাগরী-স্কন্ধে

যে, সে কারবারের কল্যাণে দু'-তিন পুরুষ-যাবৎ প্রচুর সঙ্গতি-সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেকে ব্যবসায়-সম্পর্কে সারা জীবন আমেরিকায়-য়ুরোপে অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধ-বয়সে দেশে ফিরিয়াছেন—দেশের মাটীতে দেহরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে।

বেথলিহামে মুক্তার ব্যবসায়ের খুব বেশী পশার। তার পর কফি এবং মশলার ব্যবসায়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এখান হইতে য়ুরোপে ও আমেরিকায় প্রচুর কফি এবং মশলা চালান যায়। এ-কারবারের মালিক বিদেশী বণিক নয়, মালিক বেথ-লিহামবাসী।

এখানে প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতির রেশ আজো বেশ সজীব ভাবে বিদ্যমান দেখা যায়। ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে যাইবার সময় ছেলে-মেয়ে আজো গুরুজনদের পায়ে নতি জানাইয়া তাঁদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে। এ-রীতি দেখিয়া ওল্ড টেষ্টামেণ্টের সেই patriarchal blessings-এর ছবি চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে!

এখানকার পুরুষের পক্ষে বিদে-শিনী-বিবাহ এ-যুগেও খুব নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত। বেথলিহামবাসীরা আজ বিদেশে দোকান-কারবার ফাঁদিয়া সেখানে বাস করিতে গেলেও বিদেশকে 'ঘর' বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখেন নাই! বাড়ীর যে বড়, সে যায় বিদেশে ব্যবসা করিতে; তার পর ছোট ভাই-ভাইপোর মধ্যে বয়সে যে যেমন বাড়িয়া ওঠে, সে-হিসাবে তার ডাক পড়ে বিদেশের কারবারে। সে বিদেশে যায় এবং

সেখানে ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিলে যে-বড় এত কাল ব্যবসাদারীর জন্য বিদেশে ছিল, সে দেশে ফিরিয়া আসে। এমনি ভাবে বেথলিহামবাসীর বিদেশী কারবারের ধারা আজ দেড় শত দুই শত বৎসর ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

বড় যখন দেশে ফিরিয়া আসে, দেশে তখন উৎসবের সাড়া জাগে। জেরুশালেমের রেলষ্টেশনে আত্মীয়-বন্ধুরা গিয়া জড়ো হয় বড়কে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য। অভ্যর্থনার জন্য গান রচনা করা হয়; এবং সেই গান গায়িয়া মহা-ধূমধামে বড়কে ট্রেন



তরুণী জননী

হইতে নামাইয়া গৃহে আনা হয়। এখন মোটর-গাড়ীতে করিয়া আনা হয়। পূর্ব্বে যখন মোটর-গাড়ী ছিল না, তখন উটের পিঠে বসাইয়া আনা হইত। গানের সমারোহ এ-যুগেও উঠিয়া যায় নাই! তার পর বাড়ীতে ভোজের সমারোহ চলে—যেখানে যত আত্মীয়-বন্ধু আছে, এ-ভোজে সকলের নিমন্ত্রণ হয়। ভোজ-সমারোহ কোথাও চলে এক সপ্তাহ, কোথাও বা দু'-তিন সপ্তাহ ধরিয়া। কি গর্ব্বে, কি গৌরবে সকলে কৃতী আত্মীয়-বন্ধুর সমাদর করেন,—দেখিবার সামগ্রী!

বিবাহানুষ্ঠান বেথলিহামে একটি স্মরণীয় ব্যাপার। কাজে-কর্ম্মে মানুষ না হইলে পুরুষ আজ বিবাহ করিতে চায় না! কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয়, বাড়ীর বড় ছেলে বিদেশে ব্যবসা করিতে গেল; কাজের ব্যস্ততায় দশ-পনেরো বৎসর দেশে ফিরিতে পারিল না! তার পর এক দিন ছেলেকে ফিরিতে হইল—মা বা গুরুজনের কথায়। বাড়ীতে সকলে কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছেন—ছেলে আসিয়া তাকে বিবাহ করিবে। বিবাহের ব্যাপারে বেশীর-ভাগ সংসারে মা-বাপ-গুরুজনের বর-বধূ-নির্ব্বাচনে আজো গোলযোগ ঘটে না।



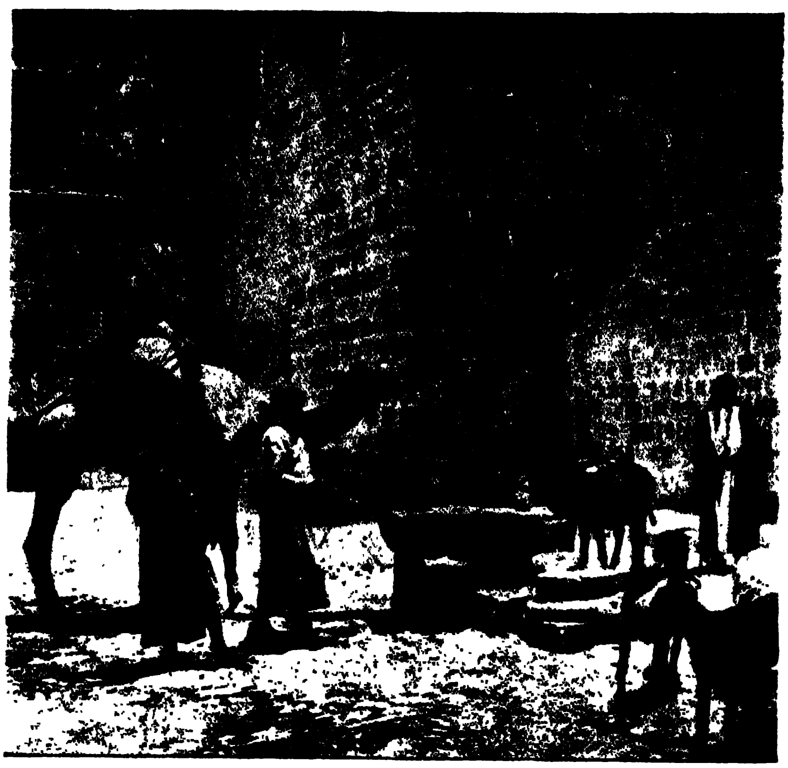
মুসলমান ব্যবসায়ী

বিবাহে আত্মীয়-বন্ধুদের সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। সকলকে ভোজ্যদানে, উপহার-দানে পরিতৃপ্ত করার ঘটা পড়িয়া যায়। কিন্তু শুভাশীর্ব্বাদাদি-জ্ঞাপন চলে প্রাচীন আরবী-ভাষায়। এ-ভাষার রেওয়াজ আজ পর্য্যন্ত শুধু আশীর্ব্বচনেই টিঁকিয়া আছে।

পুরুষ-মানুষের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে বেথলিহামে বাঁধা-ধরা কোনো বিধি নাই; কিন্তু মেয়েদের বিবাহ সকল গৃহেই প্রায় দশ-বারো-চৌদ্দ বৎসর বয়সে সম্পাদন করা হয়। বিবাহ-বেশে প্রাচ্য-রীতিতে বর্ণ ও দীপ্তির



রাচেলের সমাধি—খৃষ্টান, ইহুদী এবং মুশলিমের পুণ্যতীর্থ



কূয়া-তলা—এই কূপের সম্মুখস্থ গৃহে খৃষ্ট জন্মিয়াছিলেন

আড়ম্বর আছে প্রাচীন যুগের মতো। সাদা পোষাক পরাইয়া কন্যার বিবাহ —সে-ফ্যাশন আজো চলে নাই।

বিবাহের মতো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অনিমন্ত্রিত রবাহূত কেহ আসিয়া যদি প্রীতিভোজে বসিয়া যায়, তাহাকে তাড়াইতে নাই—এ রীতি বেথলিহাম-সমাজ এখনো মানিয়া চলিতেছে।

বিবাহানুষ্ঠানের জন্য গ্রামের পুরাতন চার্চ্চ—চার্চ্চ অফ্ দি নেটিভিটিতে বিবাহ দেওয়া—সকলে পরম কাম্য বলিয়া মনে করে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, যে-গৃহে যীশু জন্ম লইয়াছিলেন, এ চার্চ্চ সেই বাস্তু-জমির উপরে গঠিত হইয়াছে। এ চার্চ্চটি সম্রাট কনষ্টানটাইন কর্ত্তৃক ৩৩০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়; তার পর পঞ্চম শতাব্দীতে জাষ্টিনিয়ান ইহার সংস্কার-বিধান করেন। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের হিব্রু-অনুবাদক সেণ্ট জেরোমি এই চার্চ্চে বাস করিতেন। তার পর এ চার্চ্চ বহু সুখ-দুঃখ বিরোধ-দ্বন্দ্বের ঝড়-ঝাপটা সহিয়া আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে।

এ চার্চ্চের প্রবেশ-দ্বার এত ছোট যে, হেঁট হইয়া তবে মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এক জনের বেশী দু'জন এক সঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে না। কপাটটি লৌহ-নির্ম্মিত। লৌহদ্বার পার হইলে খিলানযুক্ত দালান বা নাট-মন্দির। বর ও বধূ আসিয়া এই দালানে দাঁড়ায়। অভিভাবকের দল মেরি-মাতার পূজা-নিবেদন করেন, তার পর পুরোহিত আসিয়া বর-বধূকে আশীর্ব্বাদ করেন।

এখানকার যে-সব প্রাচীন গৃহ

বহু-বহু বৎসরের বহু বিঘ্ন-বিপত্তি কাটাইয়া আজো বাঁচিয়া আছে, সেগুলির নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে বৈশিষ্ট্য আছে। বাড়ীর সদর-প্রবেশ-দ্বার ছোট। এ ঘর পার হইয়া খিলান-করা উঠান। প্রতি গৃহে এমনি উঠান আছে। উঠান ছাদে-ঢাকা; এবং ঘরগুলি এই উঠানের গায়ে-গায়ে নির্ম্মিত। এই উঠানে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া হয়, কাজ-কর্ম্ম করা হয়। এই দালানে বসিয়া সকলে সুখ-দুঃখের গল্প করেন। দালানের কোণে দোল্‌না খাটানো আছে; সে দোল্‌নায় খোকাখুকু শুইয়া ঘুমায়। উঠানের দেওয়ালে 'শিকা' ঝুলিতেছে; ঝুড়ি-চ্যাঙারি আছে। অর্থাৎ এই উঠানটি পরিবারের ভাঁড়ার ঘর, বসিবার ঘর, ভোজনালয়। সব কাজ এই উঠানে করা হয়। বাহিরের পুরুষ-মানুষের পক্ষে এ উঠানে প্রবেশ-অধিকার নাই। তাঁদের বসিবার জন্য বাহিরে টুল পাতা হয়—মাদুর বিছানো হয়।



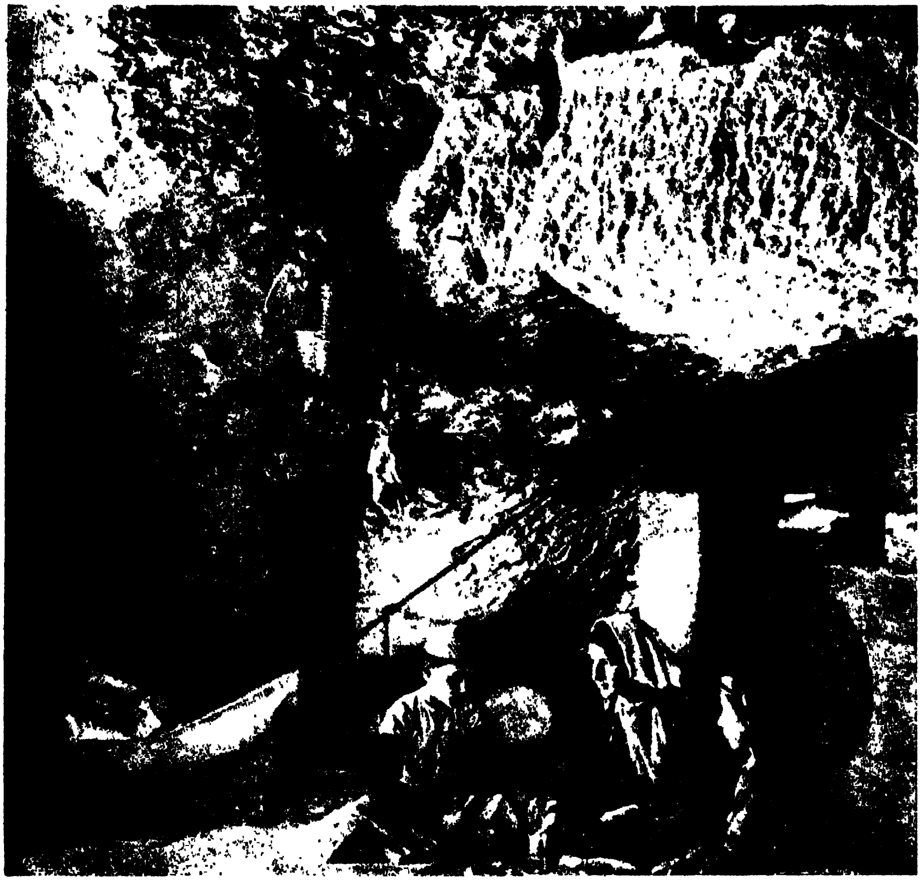
দূরে চার্চ্চ অফ দি নেটিভিটির চূড়া দেখা যায়

বেথলিহামবাসীরা নিজেদের কাজ-কর্ম্ম-বাণিজ্য-ব্যবসা ঘর-সংসার লইয়া দিনাতিপাত করেন। পুণ্যতীর্থ বলিয়া এখানে বিদেশী বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বড়দিনের সময় যাত্রীর ভিড় বিপুল হইয়া ওঠে। সে সময় জেরুশালেম হইতে বেথলিহাম পর্য্যন্ত সারা পথ জন-কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকে। গাধা ও উটের পিঠে চড়িয়া কত যাত্রী তীর্থ করিতে আসেন। বিলাস-ঐশ্বর্য্যের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁরা এ তীর্থের ধূলি মাথায় লন, অঙ্গে মাখেন।



চার্চ্চ অফ দি নেটিভিটির উপাসনা-ঘরে সূর্য্য-কিরণ

পাহাড়ের চূড়ায় আছে 'বেইট লাম' বা রুটি-ঘর (House of Bread)। যাত্রীরা দূর হইতে এই রুটি-ঘর দেখিবামাত্র আনন্দে জয়ধ্বনি তোলেন। মোগলসরাই ছাড়িয়া ট্রেণ গঙ্গার পুলে উঠিলে ও-পারে



গৃহস্থ-বাড়ী

বারাণসী-ধামের আভাস চোখে জাগিলে আমরা যেমন জয়ধ্বনি করি, এ জয়ধ্বনি ঠিক তারি মতো!

এই পাহাড়ের কোলে অতি-প্রাচীন একটি নির্ঝর-কূপ আছে। তার দু'টি মুখ। রোম-সম্রাটেরা এ কূপটি পাথরে বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এখন এই নির্ঝর হইতে জেরুশালেমে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। কূপের আশে-পাশে তৃণশস্য-শোভিত বনভূমি। সেখানে সকলে মেষ চরায়; উটের দল এই বনভূমিতে বিশ্রাম করে, কূপের জলে পিপাসা দূর করে। এ কূপের নাম মাগি কূপ (Well of the Magi).

এই কূপ সম্বন্ধে বাইবেল-গ্রন্থে মথি-লিখিত অধ্যায়ে একটি কাহিনী আছে। তিন জন সাধুকে রাজা হেরড প্রশ্ন করিয়াছিলেন, খৃষ্ট-জন্মের সূচনাপাতে কেন তাঁর মনে এত উদ্বেগ? সাধুত্রয় সে প্রশ্নের উত্তর-সমাধানের জন্য রাজাদেশে বেথলিহামে আসিতেছিলেন। রাত্রে তাঁরা এইখানে বিশ্রাম করেন। তাঁদের উটগুলি পিপাসার্ত্ত ছিল। তাদের এই কূপের জল পান করানো হয়। কূপ হইতে জল লইবার সময় সাধুরা কূপের জলে প্রদীপ্ত নক্ষত্র দেখিতে পান। এই নক্ষত্র খৃষ্টের দিব্য-জ্যোতিঃ!



দোতলা পথ

এই পাহাড়ের পরেই বেথলিহাম সুরু হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকে মুক্ত সমতল উপত্যকা পাহাড়ের প্রাচীরে ঘেরা। পশ্চিমে তুঙ্গ পর্ব্বত। পর্ব্বতের গায়ে থাকে-থাকে



খানা-ঘর

জলপাই, ডুমুর আর আঙ্গুরের ক্ষেত।

ফশলের মধ্যে যব এখানে প্রচুর জন্মায়; তা ছাড়া বার্লি, নানাবিধ দাউল; ফল ও তরী-তরকারীর ফশল প্রচুর ফলে।

বেথলিহামের পাহাড় হইতে পাশে জুডিয়ার মরু-প্রান্তর দেখা যায়, বাইবেলে এই মরুভূমিকে স্কেপ-গোটের মরু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তার পরেই ডেড শী। ডেড শী Sea-levelএর চেয়ে ১৩০০ ফুট নিম্নদেশে অবস্থিত। পাহাড়ের আড়ালে ডেড শী নিজেকে এমন গোপন রাখিয়াছে যে, তার চিহ্ন দেখা যায় না।

ডেড শীর অদুরে উত্তর দিকে জর্ডান উপত্যকা। এই উপত্যকার অঙ্গ ভেদ করিয়া শ্যামল বনানী-শ্রেণীর মধ্য দিয়া জর্ডান নদী বহিয়া চলিয়াছে। জর্ডানের পূর্ব্ব-তীরে নীলাভ মোয়াব পাহাড়।

বেথলিহাম হইতে যে-পথ হেব্রনে গিয়াছে, সেই পথের বাঁকে জেকবের পত্নী রাচেলের অনাড়ম্বর সমাধি আছে। রাচেলের সম্বন্ধে জেনেশিস, ৩৫ অধ্যায়ে লেখা আছে, "তাঁরা চলিলেন।······এফ্রাথা এখান হইতে বেশী দূরে নয়।·····রাচেল এইখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এবং এফ্রাথার পথে বেথলিহামে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়। জেকব সেই সমাধির উপর একটি প্রস্তরমাত্র রক্ষা করেন।"

এই সমাধি হইতে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার পথে পামার উপত্যকা। প্রত্যাশিত ভূমির (Promised Land) সন্ধানে বাহির হইয়া সাধুগণ (Patriarchs) এইখানে বিশ্রামের জন্য ছাউনি ফেলিয়াছিলেন।



মুসলমান-রমণী

বেথলিহামের সর্ব্বত্র পুণ্যস্মৃতির বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

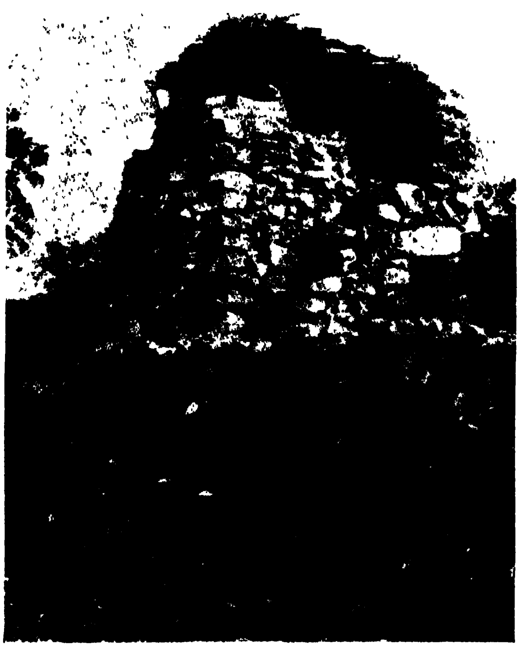


ক্ষেতের ফশল

খৃষ্টানে-মুসলমানে ধর্ম্ম লইয়া এখানে দ্বেষ-বিরোধ নাই, এ-কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বেশীর ভাগ লোক চাষবাস করে, মেষ চরায়। বেথলিহামের চারণ-ভূমি দেখিলে মনে হয়, এ যেন রাখালের দেশ! মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করিতেছে, মেষ চরাইতে বাহির হইয়াছে। ধান, খড় প্রভৃতি বহিবার জন্য এখানে বাহন ঐ উট!

ছেলে-মেয়ে—বেথলিহামবাসীর যেন নয়ন-মণি! বন্ধ্যা নারী এখানে অত্যন্ত দুর্ভাগিনী বলিয়া নিন্দিতা। বন্ধ্যার মুখ-দেখা পাপ, এমনি এখানকার অধিবাসীদের ধারণা।

শিশু জন্মিলে প্রথমেই তার সর্ব্বাঙ্গে বেশ করিয়া লবণ মাখানো হয়; তার পর শিশুর হাত-পা মুড়িয়া দেহের সঙ্গে নরম তুলা জড়াইয়া চওড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হয়! লবণ মাখাইয়া শিশুকে এমনি ভাবে বাঁধিয়া রাখা হয় সাত দিন; তার পর ছ'মাস তাকে লবণ মাখানো চলে। লবণ মাখাইলে দেহ খুব শক্ত-সমর্থ হয়—ইহাই ধারণা।



আঙুর-ক্ষেতের হৌজ

এখানকার দ্রাক্ষাক্ষেতগুলি দেখিবার বস্তু। প্রত্যেকটি ক্ষেতে বড় বড় হৌজ বা চৌবাচ্ছা নির্ম্মাণ করা হয়। চৌবাচ্ছাগুলি হয় খুব গভীর—প্রায় কূপের মতো। শীতকালে এখানে প্রচুর বারিপাত হয়; চৌবাচ্ছাগুলি তখন জলে পরিপূর্ণ হয়। গ্রীষ্মকালে এই জল কাজে লাগে। চৌবাচ্ছাগুলি পাহাড়ের বেলে-পাথর কাটিয়া বোতলের ছাঁদে রচনা করা হয়। কূপের মুখের দিকটা করা হয় বোতলের মুখের মতো সরু এবং তলার দিক প্রশস্ত। এ জল বরফের মতো শীতল। গ্রীষ্মের তপ্ত দিনে এ জল যেন অমৃত-সমান! কাহার কূপের জল কত শীতল, তাহা লইয়া পাড়ায়-পাড়ায় রীতিমত যেন রেষারেষি চলে। এক-একটি কূপের জল এমন ঠাণ্ডা যে, দারুণ গ্রীষ্মেও সে জল পান করিতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগে!



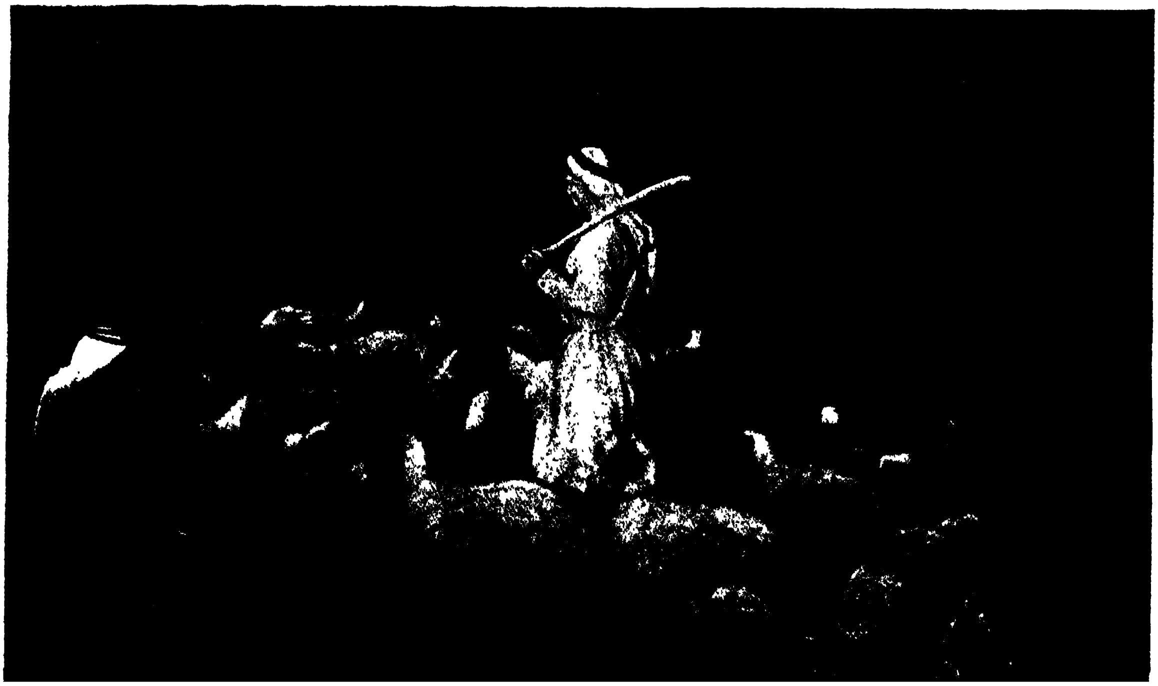
ক্ষেতের ফশল

বেথলিহাম প্রভৃতি গ্রাম-নগরগুলি বলিতে গেলে মরুর বুকে অবস্থিত। কাজেই এখানকার লোক এই শীতল জলের মর্ম্ম যেমন উপলব্ধি করে, এমন আর অন্য দেশের লোক করিতে পারে না! ডেভিডের কাহিনীতে তাঁর পিপাসা-প্রসঙ্গে কথিত আছে—ফিলিষ্টাইনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দারুণ শ্রান্ত পিপাসার্ত্ত ডেভিড মরুক্ষেত্রে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—কেহ যদি এ সময়ে আমাকে বেথলিহামের শীতল জল আনিয়া দিতে পারিত! (Oh, that one would give me drink of the water of the well of Bethleham !)

বেথলিহামের পৌরাণিক নাম ডেভিডের নগর (City of David)। এখানে জন্ম লইলেও ডেভিড কিন্তু বেথলিহামে দীর্ঘ দিন বাস করেন নাই। ডেভিড সামুয়েলের পিতার মেষ চরাইতেন। সামুয়েল তাঁকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করেন। রাজা হইয়া ডেভিড বেথলিহাম ত্যাগ করেন। রাজা সলের সঙ্গে ডেভিডের প্রথমে বেশ সৌহার্দ্দ্য ছিল; তার পর সল তাঁকে বিদ্বেষের চোখে দেখিলেন। বিদ্বেষের বশে ডেভিডকে তিনি ঘৃণ্যবৎ এঙ্গেদি ও ডেকোরার মরু-বক্ষে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। সলের মৃত্যুর পর ডেভিড হেব্রনে আসিয়া সাত বৎসর রাজত্ব করেন; তার পর তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন জেরুশালেমে।

ডেভিডের নামে নগরের নামকরণ হইলেও বেথলিহামে ডেভিডের নামে মন্দির বা মঠের একটু ক্ষুদ্র চিহ্নও নাই!

বড়দিনের সময় বেথলিহামে ভক্তির যে উৎসব চলে, তার তুলনা নাই! ১৯০০ বৎসরেও এ উৎসবে বিরাম ঘটে নাই। এ উৎসবের কোনো অনুষ্ঠানে এতটুকু অঙ্গহানি দেখা যায় না! অধিবাসীরা এ সময়ে সেই প্রাচীন যুগের সরল-চিত্ত রাখালী বেশে, রাখালী রীতিতে দারিদ্র্য বরণ করিয়া যীশুর নাম-গানে প্রাণ-মন উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয়। বড়দিনের অধিবাস-রজনীতে মেষপাল লইয়া ভক্তদল মাঠে-বাটে আসিয়া বসে প্রভু যীশুর উদয়-ক্ষণকে অভিনন্দিত করিতে! মাঠে-বাটে তাদের অধিবাস-নিশি অতিবাহিত হয়। পরদিন উষার আলোক-প্রকাশের সঙ্গে



বড়দিনের অধিবাস-রজনীতে

লুক-লিখিত বাণী উচ্চারণ করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করে। সে বাণী—এসো, এবার আমরা বেথলিহামে যাই—গিয়া প্রত্যাশিত উদয়-লীলা দেখি!

—Let us now go each unto Bethleham and see this thing which has come to pass. —(Luke II : 15.)

ফুল ও ছেলে

আমার বাড়ীর গাঁদাটাও ভালো, তোমার গোলাপ থাক্—
ওহে ধনী, তব দীনতা আমায় করিয়াছে নির্ব্বাক্!
অফিসে তোমার সাহেব তুষিতে বাগান উজাড় কর!
মোর ছোট মেয়ে সে-দিন সকালে শিউলি ক'রেছে জড়—
বন্ধ্যা তোমার গৃহিণী তাহারে ডাকিয়া বলেন, "খুকী,
বেশ প'ড়ে আছে গাছের তলায় কুড়িয়ো না ফুল উ কি?"

* * * * *

শিউলী গাছ ত শাল গাছসম জঙ্গল হয়ে আছে,
ভুলেও তোমরা কেহই কখনো যাও না তাহার কাছে।
মালঞ্চ-ভরা চম্পা চামেলী ম্যাগ্‌নোলিয়া ও গুল্
মোর মেয়েটারে মানা করা আছে ছোঁবে না গাছ কি ফুল—
পাহাড়-প্রমাণ শিউলি হইতে ছোট তা'র সাজিটায়
দুই মুঠা ফুল কুড়াইয়া আনে, মানা ক'রে দিলে তায়!
চাহি নাকো ফুল, ফুটুক্ এ-গৃহে নিত্য শিশুর হাসি!
বন্ধ্যা, তোমার গাছের ও-ফুল এক দিনে হয় বাসি!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।



তারকার কথা

(জ্যোতিষ-সংক্রান্ত আলোচনা)

নক্ষত্রমণ্ডল ও তারকার নামকরণ

মানুষের আদিম মনে জগতের প্রথম কল্পনা রচিত হয়েছে বিস্তৃত এক চত্বরে; তার দিগন্ত ঘিরে নীল স্ফটিকের দিগন্তবিস্তৃত খিলান, আকাশের দেবতা তার উপর থেকে জ্বেলে দিত দ্যুলোকস্থিত বিন্দু বিন্দু আলোকের দীপালী।

চন্দ্রালোকবিহীন অন্ধকারাবৃত নিশীথে নির্মেঘ গগন-পটে তারকার মেলা যে অপ্রত্যক্ষ বিশ্বের রহস্য নিয়ে আসে, আমাদের শাদা চোখ ও সাধারণ বুদ্ধি তা থেকে অন্তত একটা তথ্য সংগ্রহ করে,—তারকারা বিশৃঙ্খল ভাবে বিকীর্ণ দ্যুতিমান কণিকার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু; তাদের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অপরিবর্ত্তনীয়। তারকার জটলা যেন বিনি-সুতোয় গাঁথা মালার টুকরা আকাশ-গম্বুজের অভ্যন্তরে জ্যামিতিক রেখাচিত্রে বিচিত্র আকারে সংলগ্ন রয়েছে। প্রাচীন কালে এই সকল নক্ষত্র-চিত্রে নানারূপ পার্থিব সামগ্রীর প্রতীক কল্পনা করা হ'ত। মেষ, বৃষ, মিথুন, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন প্রভৃতি রাশি বা নক্ষত্রমণ্ডলের (constellation) নাম এর পরিচিত দৃষ্টান্ত। অনেক ক্ষেত্রে পৌরাণিক দেবতা, অসুর ও নায়ক-নায়িকাদের নামে নক্ষত্রমণ্ডলের নাম-করণ হ'য়েছে। বহুসংখ্যক নক্ষত্রমণ্ডলের সন্নিবেশকে কোন আখ্যায়িকার ঘটনাবলী অনুসারে এমন ভাবে বিবৃত করা হ'য়েছে যে, আকাশের নীচে পৃথিবীর ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্পকথার ছবিগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। পের্সিয়ুস্ ও অ্যাণ্ড্রোমিডার কাহিনী, সেফিউস্, ক্যাসেপিয়া অ্যাণ্ড্রোমিডা, পের্সিয়ুস্, পেগাসস্ ও সেটাস্ এই ছয়টি নক্ষত্রমণ্ডলকে বিবৃত করে।—সমুদ্রের মধ্যে এক পাহাড়ের গায়ে অ্যাণ্ড্রোমিডার প্রসারিত হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। সেফিউস্ ও ক্যাসেপিয়া তাকে নিকট থেকে দেখছেন, অথচ তাকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। ক্রুদ্ধ দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য তার পিতা সেফিউস্ নিজেই সন্তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রেছেন। অ্যাণ্ড্রো-মিডা অসামান্যা সুন্দরী, কিন্তু তার মা ক্যাসেপিয়া মেয়ের রূপের কথা নিয়ে বেশী গর্ব্ব করায় দেবতার কোপে এই বিপত্তি। ক্যাসেপিয়া উজ্জ্বল তারকা-সজ্জিত W আকারের সিংহাসনে ব'সে আছেন, আর লক্ষ্য ক'রছেন, দেবতাদের প্রেরিত জলদৈত্য সেটাস্, অ্যাণ্ডোমিডাকে গ্রাস ক'রতে আসছে। হঠাৎ পক্ষীরাজ ঘোড়া পেগাসস্ পের্সিয়ুসকে পিঠে নিয়ে উড়ে এল। পের্সিয়ুসের হাতে মেডুসা-রাক্ষসীর সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ডটি ঝুলছে। মেডুসার চোখ-দুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে, সে দৃষ্টি যার উপর পড়বে, সে-ই পাষাণে পরিণত হবে! পের্সিয়ুস্ পক্ষীরাজ ঘোড়া হ'তে এক লাফে নেমে পা দিয়ে ধূলো ছড়িয়ে দিলেন; সেই ধূলোয় একখণ্ড তারার মেঘ জমে উঠল,—সে মেঘ এখনও সেই একই ভাবে

বিরাজ করছে। তার পর মেঘের আড়াল থেকে মেডুসার মাথাটা সেটাসের সামনে এগিয়ে দিলেন; সে-দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করতেই সেটাস্ পাথরে পরিণত হ'ল। পের্সিয়ুস্ তখন অ্যাণ্ড্রোমিডাকে বন্ধনমুক্ত করলেন। সেটাস্ জলদৈত্যের পাশে মীন্, কুম্ভ ও এরিডানস্ নক্ষত্রমণ্ডল বিদ্যমান। এরিডানস্, আঁকা-বাঁকা নদী-রেখার অনুরূপ; এজন্য তাকে নদী ব'লে কল্পনা করা হ'য়েছে। উপকথার এই কয়টি নক্ষত্রমণ্ডল শরৎকালে আকাশের শোভা বর্দ্ধন করে। পশ্চিমাকাশে এদের অস্তগমনের পর পূর্ব্ব-গগনে কালপুরুষের উদয় হয়। তার কটিবন্ধে তিনটি উজ্জ্বল তারকা দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে। কালপুরুষের সঙ্গে আসে বড় কুকুর (Canis Major), ছোট কুকুর (Canis Minor), শশক (Lepus), একশৃঙ্গী (Monoceros) ও বৃষরাশি (Taurus)।

তারকামণ্ডলের নামকরণে, পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে একটা ঐতিহাসিক গল্পও প্রচলিত আছে। মিশরের রাজা তৃতীয় টলেমি যখন সিরিয়া-বিজয়ে অভিযান করেন, তাঁর সুকেশী স্ত্রী বের্নিসিস্ রাজার মঙ্গল প্রার্থনায় দেবতার নিকট নিজের সুন্দর চুলগুলি 'মানত' করেন। যথাকালে রাজা জয়ী হ'য়ে ফিরে এলে রাণী স্বহস্তে কর্ত্তিত আপনার কেশদাম পুরোহিতকে প্রদান করেন। কিন্তু রাজা এই ব্যাপারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন; কারণ, 'সুকেশিনী-শিরশোভা কেশের ছেদন' সে-কালে দৃষ্টিকটু বলিয়াই বিবেচিত হইত। পুরোহিত কিন্তু রাজাকে শান্ত করবার জন্য বলেন, রাণীর কেশরাশি ইতিমধ্যে স্বর্গধামে নীত হ'য়েছে। অনন্তর আকাশের এক নক্ষত্রমণ্ডলকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেন—পৃথিবীর সমস্ত লোক চিরকাল ধ'রে ঐখানে রাণীর কেশকলাপের সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে। বস্তুতঃ, সেই তারকামণ্ডলের আকৃতি কতকটা কেশ-গুচ্ছেরই অনুরূপ। বসন্তের সন্ধ্যায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের নিকট অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সেই বের্নিসিসের কেশগুচ্ছ (Coma Berenices) এখনও আপন স্বমহিমায় প্রদীপ্ত,—জ্বল-জ্বল করছে।

নক্ষত্রমণ্ডলগুলি প্রত্যেকে যেন আকাশনগরীর এক-একটি পথ; পথ সর্ব্বত্র সরল নয়, কোথাও বক্র, কোথাও সর্পিল গতি। আর তারকাপুঞ্জ সেই পথপ্রান্তবর্ত্তী হর্ম্ম্যরাজি। মহানগরীর কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহের সন্ধানের জন্য পথের নামের সঙ্গে তার নম্বরেরও উল্লেখ থাকে। যে সকল গৃহ প্রাসাদোপম, তাদের থাকে নিজস্ব নাম; নম্বরের চেয়ে সেটা বেশী পরিচিত। আকাশ-নগরীর তারকা-প্রাসাদ সমূহেরও নিজস্ব নাম আছে। লুব্ধক (Sirius), স্বাতী (Arcturus), ব্রহ্মহৃদয় (Capella), অভিজিৎ (Vega) প্রভৃতি তারকা-প্রাসাদগুলি খুব উজ্জ্বল আলোক-প্রদীপ্ত; এদের সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। ১৬০৩ অব্দে জে, বায়ার (J. Bayer) গ্রীক অক্ষরে তারকাকে নম্বর দ্বারা অভিহিত করবার রীতি প্রবর্ত্তন করেন। নক্ষত্রমণ্ডলে যে তারকাটি সর্ব্বপ্রধান, তার নামের আগে 'আল্ফা' অক্ষর বসে; মণ্ডলের দ্বিতীয় তারকাটিকে 'বিটা' অক্ষর দ্বারা পরিচিত করা হয়; এইরূপ ক্রমানুসারে গামা, ডেল্টা, এপসিলন্ প্রভৃতি গ্রীক অক্ষর দিয়ে তারকাগুলিকে চিহ্নিত করবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। সেই চিহ্নানুসারে লুব্ধকের নাম আল্ফা বড় কুকুর (L Canis Majoris), কারণ লুব্ধক, বড় কুকুর-মণ্ডলের সর্ব্বপ্রধান তারকা। লুব্ধককে চেনা খুবই সহজ; আকাশমণ্ডলে এর চেয়ে উজ্জ্বলতর তারকা লক্ষিত হয় না। বায়ার-প্রবর্ত্তিত গ্রীক অক্ষরের পরিবর্ত্তে ফ্লামষ্টিড্ (Flamsteed) তারকার সাংখ্যিক ঠিকানা প্রচলন করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে এমন বহু তারকাকে সাংখ্যিক নম্বরে চিহ্নিত করা হ'য়েছে, বায়ারের প্রচলিত রীতিতে যাদের কোনও নামকরণ হয়নি। অবশ্য, অনেক তারকার ঠিকানায় দুই রীতিরই প্রচলিত আছে। যথা—মঘার (Regulus) ঠিকানা হচ্ছে ৩২, সিংহমণ্ডল (32, Leonis) অথবা আল্ফা লিওনিস্ (L Leonis)। যে সকল তারকার দীপ্তি অতি ক্ষীণ, তাদের নক্ষত্রমণ্ডলের ঠিকানা থাকে না; কোনও জ্যোতিষির তারকা-তালিকায় তার যে ক্রমিক সংখ্যা লেখা আছে, তাকে সেই সংখ্যার সহিত সেই জ্যোতিষির নামসংযুক্ত ক'রে নির্দ্দেশ করা হয়। ব্রাড্লি ১৯৪০, অথবা গুরুম্ব্রিজ্ ২,২৩০, এই ধরণের তারকার দৃষ্টান্ত।

সমস্ত আকাশের মধ্যে অতিশয় উজ্জ্বল কুড়িটি তারকার নাম, নক্ষত্রমণ্ডলান্তর্গত নাম সহ পর-পৃষ্ঠায় লিখিত হইল।

তারকা	নক্ষত্রমণ্ডল	দূরত্ব—আলোক বর্ষ ১ আলোক বর্ষ = ৫৮৬৩ × ১০১২ মাইল	দীপন ক্ষমতা সৌর-দীপ্তির গুণিতক হিসাবে
লুব্ধক (Sirius)	L Canis Majoris	৮·৬	২৬·৩
অগস্ত্য (Canopus)	L Carinae	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
আলফা সেঞ্চুরী (Alpha Centura)	L Centuri	৪·৩	১·১
অভিজিৎ (Vega)	L Lyral	২৬	৫০
ব্রহ্মহৃদয় (Capella)	L Aurigal	৫২	১৮৫
স্বাতী (Arcturus)	L Bootis	৪১	১০০
বাণরাজা (Rigel)	B Orionis	৫০০	১৫০০
প্রভাস (Procyon)	L Canis Minoris	১০·৫	৫·৫
আকের্ণার (Archerner)	L Eridani	৭০	২০০
বিটা সেঞ্চুরী (Bita Centuri)	B Centuri	৩০০	৩০০০
শ্রবণা (Altair)	L Aquilae	১৬	৯·২
আর্দ্রা (Betelgeux)	L Orionis	২০০	১২০০
আলফা ক্রুশিস্ (Alpha Crucis)	L Crucis	২৩০	১৬০০
আল্ডিবারান্ (Aldebaron)	L Tauri	৫৭	৯০
পোলাক্স্ (Polux)	L Geminorum	৩২	২৮
চিত্রা (Spica)	L Viriginis	২৩০	১৫০০
জ্যেষ্ঠা (Antares)	L Scorpia	৫৮০	৪০০০
ফোমাল্হট (Fomalhaut)	L Picis Australis	২৪	১৩·৫
ডেনেব (Deneb)	L Cygni	৬০০ (?)	১০,০০০(?)
মঘা (Regulus)	L Leonis	৫৭	৭০

স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তারকামণ্ডলের কোনটি দপ্‌দপ্‌ করছে, কোনটি মিট্‌মিটে; আপেক্ষিক ব্যবধান ও সন্নিবেশ স্থির থাকলেও তারা পূর্ব্বাকাশ হ'তে ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে এগিয়ে যায়; নিজের মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবী ঘুরতে থাকে, এজন্য চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর তাদের উদয়াস্ত ঘটে। কিন্তু আকাশ-মেরুর উত্তর-কেন্দ্রে ধ্রুবতারা ও দক্ষিণ-কেন্দ্রে হ্যাড্‌লির অক্‌ট্যান্ট্‌ দু'টি স্থির বিন্দুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে; এরা উদয়াস্তহীন। মাঝে-মাঝে এমন কয়েকটি গগনবিহারী চোখে পড়ে, যাদের আলো কম্পনশীল নয়; তারা অবিরাম একই ধারায় কিরণ বিতরণ করে, তারকাপুঞ্জের আলেখ্য পশ্চাতে রেখে তারা এগিয়ে চলে। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে এবং রাত্রির কালভেদে বিভিন্ন রাশি ও নক্ষত্রের দৃশ্যপটে এগুলিকে অবতীর্ণ হ'তে দেখা যায়। তারকাদের সংখ্যার তুলনায় এরা নগণ্য; এদের নাম গ্রহ।

তারকার আলো কম্পনশীল কেন?

তারকার আলোর যে সূক্ষ্ম রশ্মি আমাদের চক্ষুতে প্রতিফলিত হয়, তাকে পৃথিবীর কয়েক মাইল পুরু বায়ুস্তর ভেদ ক'রে আসতে হয়। এই ভাবে আসবার সময় আলোক-রশ্মির আগমন-পথ বায়ুস্তরের মধ্যে বেঁকে যায়। রশ্মি কতটা বাঁকে, বায়ুর ঘনত্বের উপর তা নির্ভর করে। তাপমাত্রার সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য বায়ুর ঘনত্ব অবিরত পরিবর্ত্তিত হয়। কাজেই তারকার আলোকের এই তির্য্যগ্‌বর্ত্তনে (Refraction) সর্ব্বদাই চঞ্চলতা থাকে। বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের অস্থিরতা এমনও হ'য়ে থাকে, যাতে আলোর সূক্ষ্ম রশ্মির প্রান্তস্থিত বিপরীত দিকের তরঙ্গ বায়ুর বিভিন্ন প্রভাবশীল বেধ (effective thickness) ভেদ ক'রে আসে; এ-কারণে তারকার আলোকতরঙ্গ সবগুলি একসঙ্গে এসে জোটে না। হয় ত একটা আলোক-তরঙ্গশ্রেণী অপর শ্রেণীর তরঙ্গ অপেক্ষা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধ-পরিমাণ পথ পিছিয়ে পড়ল; যেখানে একটা তরঙ্গের চূড়া এসে লাগছে, সেখানে অপর তরঙ্গের খাদ গিয়ে মিশছে; ফলে দুইটি তরঙ্গ পরস্পর খণ্ডিত হয়ে আলোর বদলে অন্ধকার সৃষ্টি ক'রল। আলোর দুইটি তরঙ্গ এই ভাবে মিশে যে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়, তাকে 'আলোকের ব্যভিচার' (Interference of light) বলে। তারকার আলোতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ মেশানো থাকে; তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পার্থক্যই নানা রঙের অনুভূতি আনে। বহু রঙের আলোকতরঙ্গ যখন পরস্পরকে খণ্ডন করে, তখন তারকার আলোক কম্পনশীল প্রতীত হয়, এবং সেই কম্পিত আলোর মধ্যে নানা রকম রঙের আভাস পাওয়া যায়। তারকার আলোক-তরঙ্গের এই ব্যভিচার তার উৎসস্থানে হয় না, আমাদের চক্ষের মণির উপরেই এই ঘটনা ঘটে। আমাদের চক্ষে গ্রহগাত্রের দৃশ্যমান বৃত্তাকার ক্ষেত্র, তারকার বিন্দুতুল্য দৃশ্য অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ অধিকার করে। গ্রহের আলোকরশ্মি বেশী স্থান জুড়ে আসবার সময় তার তরঙ্গ সমূহ পরস্পর মিলিত হ'য়ে সর্ব্বত্র প্রায় সমান হ'বার সুযোগ পায়। এজন্য

গ্রহের আলো তারকার আলোর মতো কম্পনশীল দেখায় না।

গ্রহগাত্রে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় তাদের উজ্জ্বল দেখায়; কিন্তু তারকা স্বতঃদ্যুতিমান। সূর্য্য তারকাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত; সে একাই আমাদের পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে, অথচ অসংখ্য তারকা তা পারে না; এর কারণ, অপরাপর তারকার তুলনায় সূর্য্য পৃথিবীর সন্নিহিত। সূর্য্যের দূরত্ব ৯২,৯০০,০০০ মাইল; আর নিকটতম তারকা আল্‌ফা-সেঞ্চুরির দূরত্ব ২৫,৫০০,০০০,-০০০,০০০ মাইল বা প্রায় সওয়া ৪ আলোকবর্ষ। পাঠক এই দূরত্বের কোন ধারণা করতে পারলেন?

আলোকবর্ষ কি, তা অনেকের জানা থাকলেও সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হওয়া কঠিন। এক ঘণ্টার পথ ব'ললে যেমন মানুষ ঘণ্টায় যতখানি পথ হাঁটে বোঝায়, তেমনি এক আলোকবর্ষ বলতে বোঝায়, আলো বৎসরে যতটা পথ অতিক্রম করে। আলোর বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল, এই তীব্র বেগে চল্‌তে চল্‌তে আলোক-তরঙ্গ এক বৎসরে প্রায় ছয় লক্ষ কোটি মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। এক আলোকবর্ষের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর পরিধির প্রায় চব্বিশ কোটি গুণ। মাকড়সার জালের সূক্ষ্ম তন্তুর এক সের মাত্র পৃথিবীর কটিদেশ একবার বেষ্টন করবার পক্ষেই যথেষ্ট। কিন্তু পৃথিবী হ'তে আল্‌ফা-সেঞ্চুরি পর্য্যন্ত সংযোগ করতে হ'লে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মণ এইরূপ সূক্ষ্মতম তন্তু সংগ্রহ করতে হয়। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগ-বিশিষ্ট যান দিবা-রাত্রি অবিশ্রান্ত গতিতে চললে পৃথিবী হ'তে সূর্য্য পর্য্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম ক'রতে ১৭৭ বৎসর লাগে; আর সওয়া ৪ আলোকবর্ষের পথ অতিক্রম করতে তার পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হয়। এ থেকেই মুদিত নেত্রে এক নিশ্বাসেই অনুমান করা যায়, পৃথিবী হ'তে সূর্য্যের দূরত্বের তুলনায় নিকটতম তারকার মহাকর্ষ, তারকার গতি ও বস্তুত্ব কত অধিক দূরবর্ত্তী!

তারকা সমূহ মহাকাশের সুদূর-লোকে অবস্থান করায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও তাদের আকার নিরূপণ করা যায় না। বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পর্য্যবেক্ষণ করলেও সেগুলিকে আলোকের বিন্দুমাত্র মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীর কৌশল ও যন্ত্রতন্ত্র এই প্রকার ক্ষুদ্ররূপে প্রতীয়মান তারকা সমূহেরও বস্তুত্ব ও আয়তনের পরিচয় সংগ্রহ করেছে। তারকার বস্তুত্ব নিরূপণ যে সম্ভব হয়েছে, তার কারণ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় বস্তুর উপর বিশ্ব জুড়ে চলেছে মহাকর্ষ বলের লীলা। যখন দেখি, বিশ-ত্রিশ মণ ওজনের বস্তু কেউ টেনে তুলতে পারে না, লোহার গোলা ছুঁড়ে দিলে সরল পথে বেরিয়ে না গিয়ে মাটিতে এসে ঠেকে, মহাসমুদ্রের বুকে চিরকাল ধ'রে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, চন্দ্র অবিশ্রান্ত ভাবে পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরে বেড়ায়, তখন মহা-কর্ষের বলে আমরা বিশ্বাস করি। ল'ভেরিয়ে এবং আডাম্‌স্ ইউরাণাসের চলার পথের সামান্য ব্যতিক্রম দেখে নেপচুন্ আবিষ্কার করেন, পার্সিভাল্ লাওয়েল্ সারা-জীবন প্লুটোকে দেখতে না পেয়েও শুধু নেপচুনের কক্ষপথে চেয়ে তার অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হন,—এই মহাকর্ষ বলে দৃঢ়বিশ্বাসের ফলে। আইন্‌ষ্টাইন্ দেখিয়েছেন, মহামতি নিউটনের দেওয়া মহাকর্ষবিধির গাণিতিক বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত নয়, আর, মহাকর্ষের বল শিকলে-বাঁধা গাড়ীতে ইঞ্জিনের টানের মতো যান্ত্রিক বলমাত্র নয়। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনায় তাঁদের সে পার্থক্যের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এক সের চিনি ও এক সের কুইনীন্ উভয়কেই পৃথিবী সমান জোরে টানে, কারণ দুয়েরই ওজন (weight) এক; বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলতে গেলে উভয়ের বস্তুত্ব (mass) সমান। ওজন এবং বস্তুত্ব গণিতের হিসাবে এক হ'লেও এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য আছে। কোনও বস্তুকে পৃথিবী যত জোরে টানে, সেটি তার ভার বা ওজন, এবং তার অবয়বে যে পরিমাণ বস্তু আছে, তাকে বলা হয় বস্তুত্ব। বস্তুত্ব এক থেকেও জিনিষের ওজন বদলাতে পারে—পৃথিবীর কেন্দ্র হ'তে দূরত্বের তারতম্য হিসাবে। নিউটন দিব্য-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, বাগানের পতনশীল আপেল ফলের প্রতি পৃথিবীর অথবা পৃথিবীর প্রতি আপেল ফলের যেমন টান আছে, সেইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রের প্রতিও তার টান আছে। যার বস্তুত্ব বেশী, তার প্রতি মহাকর্ষের টান বেশী হয়, এক সের বস্তুর চেয়ে দুই সের বস্তুর উপর পৃথিবীর দ্বিগুণ টান হয়; দুইটি বস্তুর ব্যবধান যত বাড়ে, তাদের পরস্পরের টান ততোধিক কমে।

কিন্তু দূরত্ব যতই অধিক হোক, মহাকর্ষের টান ছিন্ন হয় না। বিশ্বের সমস্ত তারকাকে প্রভাবান্বিত না ক'রে সামান্য অঙ্গুলি-হেলন পর্য্যন্ত অসম্ভব।

সূর্য্য মহাকর্ষের বলে সৌর-পরিবারের প্রত্যেকের গতি নিয়ন্ত্রিত করছে; তারা যে কক্ষ ধ'রে পথ চলে, তা গণনায় ব'লে দেওয়া যায়। পৃথিবী চন্দ্রকে কি ভাবে টানে, তা ধরা পড়ে চন্দ্রের গতিতে; তাই থেকে হিসাব ক'রে পৃথিবীর ওজন বা বস্তুত্ব স্থির করা হয়েছে। গ্রহদের প্রত্যেকের গতিবিধি হ'তে হিসাব ক'রে জানা যায়, সূর্য্যের বস্তুত্ব পৃথিবীর ৩৩২,০০০ গুণ। তারকাদের বস্তুত্বও তাদের আপেক্ষিক গতি হ'তে নির্ণীত হয়।

তারকাদের প্রকৃত গতি সাধারণ-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না; কিন্তু বিভিন্ন বৎসরে গৃহীত তারকাদের আলোকচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কোন কোন আলোক-বিন্দুর পারস্পরিক দূরত্ব পূর্ব্বের চেয়ে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। ১৯১৪তে গৃহীত আলোকচিত্রে তারকাদের যে সন্নিবেশ ছিল, ১৯৪০এর আলোকচিত্রে তার সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হ'য়েছে। Blink Microscope যন্ত্রে পরীক্ষা করলে এই প্রভেদটা সহজে বোঝা যায়। কিরণচ্ছত্র যন্ত্রের সাহায্যে তারকার গতি-নির্ণয়ের আর একটি কৌশল আবিষ্কৃত হ'য়েছে। কোনও তারকার কিরণচ্ছত্রে যে সকল রেখাবলী দেখতে পাওয়া যায়, তারকার গতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্থিতিস্থান পরিবর্ত্তিত হয়। এ থেকে ব'লে দেওয়া যায়, কোন্ তারকা নিকটে আসছে, এবং কোন্ তারকা দূরে যাচ্ছে। উপরোক্ত দুই উপায়ের সমবায়ে তারকার গতি-বেগ ও গমনের অভিমুখ জানা গিয়েছে।

সহজ-দৃষ্টিতে মেঘমুক্ত আকাশে কিঞ্চিদধিক তিন হাজার তারকা লক্ষিত হয়। কিন্তু এখান থেকে আকাশকে সম্পূর্ণ দেখা যায় না; বাকী আধখানা আকাশ আমাদের অবস্থিতির বিপরীত গোলার্দ্ধে দিগন্ত-সীমার অন্তরালে আবৃত আছে; সেখানেও খালি-চোখে দৃশ্যমান্ তারকার সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র। কোন যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীমণ্ডল হ'তে সর্ব্বসমেত ৭,৬৪৭টি তারকা দেখতে পায়। কিন্তু ক্ষমতা-সম্পন্ন দূরবীক্ষণযন্ত্রের সহায়তায় বহু কোটি তারকা পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব। মানবচক্ষু অপেক্ষা ফটোগ্রাফির ক্যামেরা আরও অধিক সংখ্যক তারকার সন্ধান দেয়। মাউণ্ট উইল্‌সন্ মানমন্দিরে এক শত ইঞ্চি প্রতিফলকযুক্ত যে দূরবীক্ষণযন্ত্র আছে, তাতে ক্যামেরা খাটিয়ে দেড় শত কোটি তারকার ফটোগ্রাফ গৃহীত হ'তে পারে।

তারকারা সকলে একক থাকে না, অনেকে যুগলে অবস্থান করে; এরা পরস্পর চক্রাকার পথে আবর্ত্তনশীল। মহাকর্ষ বলের প্রভাবেই যুগল নক্ষত্রের একে অপরের সান্নিধ্য এড়াতে পারে না। এদের চক্রাকার নৃত্যগতি জ্যোতির্ষীকে তারকার ওজন বুঝে লওয়ার সুযোগ দান করে। এ পর্য্যন্ত বিশ হাজারের অধিক যুগল নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যুগল নক্ষত্র ব্যতীত ত্রয়ী ও চতুরংশিত নক্ষত্রের (Triplet & Quadruplet) সংখ্যা নিতান্ত বিরল নয়।

তারকাদের বস্তুত্ব পর্য্যালোচনায় জানা যায়, সূর্য্যের বস্তুত্ব তাদের প্রায় মাঝামাঝি। কোন কোন তারকার বস্তুত্ব সূর্য্যের শত গুণ। কিন্তু অধিকাংশ তারকা ওজনে সূর্য্যের দশ গুণের অধিক নয়। সূর্য্যাপেক্ষাও লঘুভার তারকার সন্ধান মেলে; লঘু তারকার পাঁচ-সাতটি একত্রে সূর্য্যের বস্তুত্বের সমান। সূর্য্যের বস্তুত্ব যদি মাঝারি আকারের মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে লঘু তারকাগুলি বালকের সহিত এবং গুরু তারকাগুলি স্থূলকায় মানুষের সহিত তুলনীয়।

তারকাদের আয়তন ও দীপ্তি

তারকাদের অবয়বের আয়তন নির্ণয় করতে গৌণ উপায়ের আশ্রয় নিতে হয়। মাইকেল্‌সনের ব্যতিচারমান যন্ত্রে (Michelson's Interferometer) কয়েকটি বৃহৎ তারকার ব্যাস নিরূপিত হয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ তারকার তেজের পরিমাপ হ'তে তাদের আয়তন গণনা করা হয়। ভূগাত্রের ১২,০০০ গুণ স্থান জুড়ে সূর্য্য হ'তে তেজোরাশি মহাকাশের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হচ্ছে। তার দীপ্তির তুলনায় অপর তারকাগুলি কত হীনপ্রভ মনে হয়; কিন্তু প্রদীপ নিকটের ভূমিকে যেরূপ আলোকিত করে, দূরবর্ত্তী স্থানকে সেরূপ করিতে পারে না। সূর্য্য পৃথিবী হ'তে যতখানি দূরে অবস্থান করছে, তাকে যদি তার চেয়ে দশ গুণ দূরে সরিয়ে দেওয়া যেত, তা হ'লে বর্ত্তমানের পাওয়া সূর্য্যের

আলোর শতাংশের একাংশমাত্র ভূলোক স্পর্শ করতো। সকল তারকার স্বকীয় দীপ্তি সমান হ'লে তারা কিরূপ উজ্জ্বল দেখাতো, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো তাদের দূরত্বের উপর; কিন্তু তারকায় তারকায় দীপ্তির প্রভেদ শুধু দূরত্বের জন্য দেখায় না; তাদের আলোক-দানের ক্ষমতায় পার্থক্যও এর অন্যতম কারণ। নয় কোটি উনত্রিশ লক্ষ মাইল দূর হ'তে সূর্য্যের যে আলোটুকু আমাদের কাছে আসে, ৩,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক প্রদীপ সূর্য্যের দূরত্বে জ্বললে তার সমান আলো পাওয়া যেতে পারে। সূর্য্য হ'তে পৃথিবীতে আলো আসতে আট মিনিট সময় লাগে, আর লুব্ধক হ'তে আলো আসে আট বৎসরে; অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল লুব্ধক তারকা সূর্য্যাপেক্ষা পঞ্চাশ লক্ষ গুণ দূরে আছে। লুব্ধক যদি সূর্য্যের সহিত স্থান-বিনিময় করতো, তা হ'লে পৃথিবীর হ্রদ, নদী, মহাসাগর অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুবৎ বিলুপ্ত হ'তো, মেরুপ্রদেশের হিম-আবরণ অপসৃত হ'তো, ধরিত্রীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব থাকতো না। লুব্ধকের একটি ক্ষীণদীপ্তি সহচর আছে। তার আলো এতই মৃদু যে, সেরূপ অযুত তারকা একত্র হ'লে লুব্ধকের দীপ্তির সমকক্ষ হ'তে পারে। সূর্য্যের স্থানে লুব্ধকের সহচর থাকলে পৃথিবীর সমস্ত জল জমে বরফ হ'য়ে যে'ত; বায়ু-মণ্ডল ঘনীভূত হয়ে ভূমির উপর তরল বায়ুর প্লাবন বইতো। লুব্ধকের দীপ্তি সূর্য্যের ২৮ গুণ, আর তার সহচরের দীপ্তি সূর্য্যের ৩৬০ অংশ। কিন্তু এমন তীব্র দীপ্তির তারকা আছে, যার কাছে লুব্ধকের দীপ্তি ম্লান দেখায়; আবার এমন ক্ষীণদীপ্তিরও তারকা আছে, যার কাছে লুব্ধকের দুর্ব্বল সহচরও নিজের তেজের গর্ব্ব করতে পারে। পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে, তারকাদের আলো প্রকৃতপক্ষে কম্পনশীল নয়। কিন্তু এক শ্রেণীর তারকা অনিয়ত দীপ্তিসম্পন্ন; একটা কালের ব্যবধানে তাদের আলো কমে বাড়ে। S. Doradus এইরূপ অনিয়তদীপ্তি তারকার (Variable Star) একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। যখন সে দীপ্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায়, তার দীপন-ক্ষমতা (candle power) পাঁচ লক্ষ সূর্য্যের সমান হয়। সূর্য্য সারা বৎসরে যতটা তেজ বিকিরণ করে, এস্ ডোরাডাস্ এক মিনিটেই তা ব্যয় ক'রছে। সূর্য্য হঠাৎ যদি এই তারকার মতো তেজস্বী হয়ে ওঠে, গাছপালা, জীবজন্তু সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সুজলা-সুফলা পৃথিবীর স্থানে থাকবে খালি বাষ্পের পিণ্ড। এ-পর্য্যন্ত যত নিস্তেজ তারকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, 'হ্বলফ্ ৩৫৯' তাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষীণদীপ্তি; এর দীপনক্ষমতা সূর্য্যের পঞ্চাশ হাজার ভাগের একাংশ। এই তারকাকে যদি অরণ্যচারী জোনাকীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সূর্য্য হবে পল্লী-অঙ্গনের তেলের প্রদীপ, আর এস্ ডোরাডাস্ ইঞ্জিনের সন্ধানী আলো (সার্চ্চ-লাইট)।

তারকার রঙ ও তাপমাত্রা

তারকারা নানা রঙের—লাল, নারাঙি, হলুদে, শাদা, নীলাভ, বেগুনে। তাপমাত্রার বিভিন্নতার জন্য এদের এই বর্ণ-বৈচিত্র্য। অত্যুত্তপ্ত চুল্লীর অগ্নিকুণ্ড হ'তে তোলা লৌহপিণ্ড প্রথমে শাদা দেখায়, বাইরের বাতাস লেগে ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত তার রঙ বদলায়; শাদা হ'তে হলুদে, তার পর রক্তবর্ণ, শেষে ঘোলাটে লাল হ'য়ে তার আলো নিবে যায়। অভিজ্ঞ ধাতুপ্রস্তুতকার চুল্লীর আগুনের রঙ দেখে মোটামুটি বলতে পারে, তার তাপ-মাত্রা কত। আগুনের রঙ দেখে তার যথার্থ তাপমাত্রা নির্দ্দেশ করতে পারে, এমন যন্ত্রও আজকাল পাওয়া যায়। তারকার আলোর রঙ তার তাপমাত্রার নিশানা। ঘোলাটে লাল তারকা সবচেয়ে কম গরম; তার তাপ-মাত্রা ১৪০০ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী। সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ তারকার গাত্রের তাপমাত্রা প্রায় ৪০,০০০ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী। তাপমাত্রার এই দুই সীমার মাঝে তারকারা বিভিন্ন তাপমাত্রায় অবস্থিত; এদের অনেকের উষ্ণাবস্থার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে মেলে না।

আলোকদানশীল তারকার পরিমণ্ডলবর্ত্তী পরমাণুরা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। যার তাপমাত্রা কম, তার পরমাণুরা নিরাসক্ত (neutral atom); তাপমাত্রা বেশী হ'লে পরমাণু হ'তে ইলেকট্রন্ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে—পরমাণুরা আয়নাইজ্‌ড্ হয়। যে তারকার তাপমাত্রা খুব বেশী নয়, আবার খুব কম নয়, অর্থাৎ মাঝামাঝি, তার মধ্যে আয়নাইজ্‌ড্ ও অনায়নাইজ্‌ড্ উভয় পরমাণুই বিদ্যমান। তারকাগাত্রের

পরমাণু হ'তে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে আনুকূল্য করে তার পরিমণ্ডলের ঘনত্ব। ঘনত্ব কম হ'লে পরমাণুদের মধ্যে সংঘর্ষ কম হয়, এবং স্বাধীন নিরসঙ্গ ইলেকট্রনের সহিত আয়নাইজ্‌ড্‌ পরমাণুর মিলনের সুযোগ কমে যায়। এজন্য কম ঘনত্ববিশিষ্ট তারকার কিরণচ্ছত্রে আয়নাইজ্‌ড্‌ পরমাণুজনিত রেখাবলী সবল আকার গ্রহণ করে, কিন্তু অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট তারকার কিরণচ্ছত্রে সেই রেখাসমূহ দুর্ব্বল থাকে। সূর্য্যের পরিমণ্ডলের উচ্চতর স্তরের ঘনত্ব নিম্নতর স্তরের ঘনত্ব অপেক্ষা কম; উচ্চতর স্তরে তাপমাত্রা কম হওয়া সত্ত্বেও সেখান থেকে পাওয়া আলোকের কিরণচ্ছত্রে আয়নাইজ্‌ড্‌ পরমাণুজনিত রেখাবলী নিম্নতর স্তরের তদ্রূপ রেখাবলী অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট ও তীব্র। কারণ, উচ্চতর স্তরের কম ঘনত্ব অধিক সংখ্যক পরমাণুর বিভজন-সংঘটনের সুযোগ দিয়েছে।

তারকাদের কিরণচ্ছত্রের বিভিন্ন রঙীন আলো অবলিপ্ত ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে নানা অণুপরমাণুর অস্তিত্ব ও অবস্থা নির্দ্দেশক যে রেখাবলীর সমাবেশ থাকে, তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে তারকাদের এক-একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হ'য়েছে। একই ধরণের কিরণচ্ছত্র প্রদানকারী দুইটি তারকার মধ্যে যার দীপ্তি বেশী, তার কিরণচ্ছত্রে আয়নাইজ্‌ড্‌ পরমাণুজনিত রেখাবলী অধিকতর তীব্র দেখা যায়। যে সকল তারকার দীপ্তি ও দূরত্ব জানা আছে, তাদের আয়নাইজ্‌ড্‌ ও নিরাসক্ত পরমাণুজনিত কিরণচ্ছত্রীয় রেখাবলীর সহিত দীপ্তির একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থির করা হ'য়েছে। তদনুসারে যে কোনও তারকার কিরণচ্ছত্রের ফটোগ্রাফ হ'তে কেবল বিশেষ নির্ব্বাচিত রেখাবলীর তীব্রতা মেপে তার দীপ্তি নির্ণয় করা যায়। এই উপায় অবলম্বনে প্রায় ছয় হাজার তারকার দীপ্তি অথবা দূরত্ব নিরূপিত হ'য়েছে।

যে তারকাদের কিরণচ্ছত্রের ধরণ এক রকম, তাদের 'গাত্রের উজ্জ্বলতা' (surface brightness) বা প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্র হ'তে নিঃসৃত তেজের পরিমাণ প্রায় এক। লাল তারকার গাত্রের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্র হ'তে যে পরিমাণ তেজ বিকীর্ণ হয়, উষ্ণতম তারকাগাত্রের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি হ'তে তার তিন লক্ষ গুণ শক্তি নিঃসৃত হয়। প্রথমটির গাত্রের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি হ'তে নিঃসৃত তেজ এক-একটা ছোট ডিঙি নৌকো চালাবার শক্তি দিতে পারে; আর শেষেরটির প্রতি বর্গ-ইঞ্চি গাত্রের তেজ এক-একটা বড় অর্ণবপোত পূর্ণ বেগে চালাতে পারে।

তারকার শক্তির উৎস

তারকাদের এই তেজ বা শক্তি কোথা হ'তে উৎসারিত হয়? সাধারণ 'পাওয়ার্-ষ্টেশনে' শক্তি উৎপন্ন করা হয় কয়লা পুড়িয়ে। সূর্য্য যে হারে তার তেজ বিকিরণ করে, সেই মাত্রায় শক্তি সরবরাহের জন্য যদি 'পাওয়ার্-ষ্টেশন' বসাতে হয়, তবে তার জন্য সর্ব্বদা প্রতি মিনিটে ত্রিশ লক্ষ কোটি টন কয়লা যোগাতে হবে। কয়লা পোড়ালে তার পরমাণুগুলো অপর প্রকার পরমাণুর সঙ্গে মিশে ভিন্ন আকারে সাজানো হয়ে যায়; কয়লার মধ্যে যতগুলি পরমাণু ছিল, তার একটিও ধ্বংস হয় না, কেবল তার রূপের পরিবর্ত্তন ঘটে। রেডিও অ্যাক্‌টিভ বস্তু যখন আপনা-আপনি ভেঙে গিয়ে শক্তি বিকিরণ করে, তখন তারও পরমাণু গঠনের কণিকাগুলি ধ্বংস হয় না। কিন্তু সূর্য্য ও তারকাদের বস্তুর পরমাণু সমূহ ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সেই ধ্বংসের ফলেই তাদের তেজের সৃষ্টি হচ্ছে। তারকায় এক্ষণে যে সকল পরমাণু রয়েছে, তার কতকগুলি পরক্ষণেই এক ঝলক তেজে পরিণত হ'ল। সূর্য্য এইভাবে প্রতি মিনিটে যে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন বা প্রতি দিন ছত্রিশ হাজার কোটি টন বস্তু ক্ষয় ক'রে ফেলছে, তেজরূপেই সেই বস্তু প্রকাশ পাচ্ছে। এই তেজের শক্তি কিরূপ—বলি; এক আউন্স্‌ বস্তু তেজে রূপান্তরিত হ'লে তার যে শক্তি, তার সাহায্যে সমগ্র বাঙলা দেশের কলকারখানা, যানবাহন, আলোক ও তাপ-সরবরাহের দৈনিক প্রয়োজন সিদ্ধ হ'তে পারে। এ থেকে অনুমান করা যায়, সূর্য্য প্রতিদিন কতখানি শক্তি বিকীর্ণ করে। অপরাপর তারকাতেও দীপনক্ষমতার অনুপাতে বস্তু ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে। তেজ-বিকিরণের ফলে তারকার ভার ক্রমশঃ লঘু হচ্ছে। যে তারকার ওজন অত্যন্ত কম, মোটের উপর বলা যায়, তার বয়স খুব বেশী। ওজনে যে সব চেয়ে ভারী, সেই তারকাই

নক্ষত্র-সমাজে সর্ব্বকনিষ্ঠ। লঘু তারকা অপেক্ষা ভারী তারকার দীপনক্ষমতাও তীব্রতর।

জ্যোতিষিগণ পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা-সাহায্যে জেনেছেন, এক-একটা তারকার বয়স নিতান্ত অল্প, অর্থাৎ অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ কোটি বৎসর মাত্র! কোটি কোটি বৎসরও হ'তে পারে। পঞ্চাশ লক্ষ কোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের বস্তুত্ব বর্ত্তমান সময়ের চেয়ে অনেক বেশী ছিল; দীপ্তিও ছিল বহু গুণ অধিক। কিন্তু সূর্য্যের অবয়বের মোট বস্তুত্বের অনুপাতে তার দৈনিক ক্ষয়ের পরিমাণ সামান্য। পৃথিবীর জন্মকাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত প্রায় দুই শত কোটি বৎসর অতীত হ'য়েছে; এর মধ্যে সূর্য্যের ওজন কমেছে মাত্র দশ হাজার ভাগের একাংশ বা ০'০০১%।

তারকাদের অনেকে আয়তনে পৃথক হ'লেও তাদের গাত্রের উজ্জ্বলতা (surface brightness) অভিন্ন। এক বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্র হ'তে যে পরিমাণ তেজ বিকীর্ণ হয়, সেইটিই তার গাত্রের উজ্জ্বলতার পরিমাপ। গাত্রের উজ্জ্বলতায় সমান, অথচ আয়তনে পৃথক, এমন দুইটি তারকার মধ্যে বৃহত্তর তারকা ক্ষুদ্রতরের চেয়ে পরিমাণে বেশী তেজ বিকিরণ করে। কোনও তারকার গাত্রের উজ্জ্বলতা এবং সমগ্র অবয়ব হ'তে বিকিরিত তেজের পরিমাণ জানা গেলে, গণনা দ্বারা তার আয়তন স্থির করা যায়। অধিকাংশ তারকার আয়তন এই উপায়েই নির্দ্ধারণ করা হ'য়েছে।

উজ্জ্বল তারকা ক্ষীণ তারকার চেয়ে আকারে বড়; কিন্তু তারকাদের ওজনে খুব বেশী প্রভেদ নেই। কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে, ক্ষীণ তারকা অপেক্ষা উজ্জ্বল তারকার মধ্যে বস্তুর নিবিড়তা অল্প। কোন কোন তারকার আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান, তাদের দশ লক্ষটা অনায়াসে সূর্য্যের কুক্ষিগত হ'তে পারে। আবার এমন তারকাও আছে, যারা সূর্য্যের চেয়ে আকারে অনেক বড়।

আর্দ্রা তারকার কেন্দ্রে যদি সূর্য্যের অবস্থান হয়, তবে পৃথিবীর কক্ষপথ তার অবয়বের সীমান্ত অতিক্রম করে না। জ্যেষ্ঠা তারকার ব্যাস আর্দ্রার দ্বিগুণ। ক্ষুদ্র তারকার আয়তন ধূলিকণার অনুপাতে কল্পনা করলে, সূর্য্যের আয়তন হয় মটর শুঁটীর একটি দানার মতো, এবং সেই অনুপাতে বৃহত্তর তারকার আয়তন হবে মোটর-গাড়ীর সমান। নীচের তালিকায় সাতটি তারকার রঙ, গায়ের তাপমাত্রা, দীপনক্ষমতা, বস্তুত্ব, ঘনত্ব ও ব্যাসের পরিমাপ দেওয়া গেল :—

তারকা	রঙ	গাত্রের তাপমাত্রা সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রী		বস্তুত্ব		ব্যাস মাইল হিসাবে
জ্যেষ্ঠা	লাল	৩,১০০		৩০	৩×১০⁻৭	৪৩০,০০০,০০০
আর্দ্রা	লাল	৩,১০০	১,২০০	১৫	৩×১০⁻৭	২১৮,০০০,০০০
স্বাতী	নারাঙি	৪,৩০০	১০০	৮	৩×১০⁻৪	২০
সূর্য্য	হলদে	৬,০০০	১	১	১'৪১	৮৬৬০,০০০
লুব্ধক	শাদা	১১,০০০	২৬	২'৪	০'৪২	১৫৬০,০০০
অগস্ত্য	শাদা	১১,০০০	৮০,০০০	১০০	১×১০⁻৪	৮৬,৬০০
মঘা	নীলাভ	১৬,০০০	১৮,০০০	৬০	২×১০⁻৩	২৫,৯৮০.০০

তারকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা

তারকাদের তাপমাত্রা দেহের বহির্ভাগের চেয়ে অভ্যন্তরে অধিক। সূর্য্যের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা দেড় কোটি (সেণ্টিগ্রেড্) ডিগ্রী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা চার কোটি ডিগ্রী ব'লে অনুমান করা হ'য়েছিল; সূক্ষ্মতর গবেষণা ফলে এখন তা দেড় কোটি ডিগ্রী ব'লে নির্দ্ধারিত হ'য়েছে। এত অধিক তাপমাত্রায় বস্তুর পরমাণু হ'তে ইলেকট্রনের খোলস অংশত খুলে যায়, এবং চূর্ণীকৃত পরমাণুসমষ্টি উপরিস্থ বস্তুর চাপে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে অবস্থান করে। গ্যাসীয় অবস্থায় থেকেও সূর্য্যকেন্দ্রের ঘনত্ব এই কারণে পার্থিব যে কোনও কঠিন বস্তুর চেয়ে অনেক বেশী। পৃথিবীর বস্তুকে যদি সূর্য্য-কেন্দ্রবর্ত্তী বস্তুর মতো ঠেসে রাখা যেত, তা হ'লে কয়েক টন কয়লা জামার পকেটে পুরে রাখাও অসম্ভব হ'ত না। কোন কোন তারকার অভ্যন্তর সূর্য্য-কেন্দ্রের তাপমাত্রা অপেক্ষা দশ-বিশ গুণ অধিক উত্তপ্ত। সে তাপমাত্রায় ইলেকট্রন্‌রা পরমাণুর বন্ধন হ'তে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ করে; সেখানে পরমাণু-চূর্ণের উপর চাপের প্রভাবে বস্তুর ঘনিষ্ঠতা সূর্য্যকেন্দ্রের চেয়ে নিবিড়তর হয়। ঘনত্ব অধিক ব'লে এই সকল তারকা আকারে ছোট, কিন্তু শক্তি-বিকিরণের প্রাচুর্য্যে তাদের আলোর রঙ শাদা।

শাদা বামন-তারকা

এদের গায়ের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্র হ'তে ২৫০ অশ্বশক্তির তেজ বেরিয়ে যায়। রঙ শাদা এবং আকারে ছোট ব'লে এদের নাম শাদা বামন (White Dwarf) লুব্ধকের সহচর, শাদা বামন-তারকার দৃষ্টান্ত।

সূর্য্যও তার সমশ্রেণীর মাঝারি আকারের তারকাপুঞ্জ সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এদের গুরুত্বের তারতম্যের ক্রমানুসারে সজ্জিত করলে রঙ এবং দীপনক্ষমতার ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়; সব চেয়ে গুরুভার তারকা নীলাভ-শাদা রঙের, তার চেয়ে কম ওজনের তারকাগুলি যথাক্রমে শাদা, হলদে, নারাঙি ও লাল; যাদের ওজন কম, তাদের দীপনক্ষমতাও অল্প। এইপ্রকার তারকাদের প্রধান-অনুক্রমিক-তারকা (Main Sequence Star) বলে।

প্রধান অনুক্রমিক তারকা

প্রধান অনুক্রমিক তারকা সমূহের অন্তরের উত্তাপ প্রায় এক রকম। যে সকল তারকার অভ্যন্তর এদের অপেক্ষা শীতলতর, তাদের কেন্দ্রগত-পরমাণুপুঞ্জ প্রায়শঃ অক্ষত দেহে অবস্থান করে; তাপমাত্রা কম হওয়ায় সাধারণতঃ তাদের অন্তরের পরমাণু হ'তে ইলেক্‌ট্রণের বিচ্ছেদ হয় না। বস্তু যতই ঘনসন্নিবিষ্ট হোক, ইলেক্‌ট্রন্ পরমাণুর সহিত আবদ্ধ অবস্থায় থাকলে পরমাণুরা কেউ কারও ইলেক্‌ট্রনের প্রদক্ষিণ-পথ অতিক্রম ক'রে অপরের এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না। দশ-বিশ লক্ষ সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রী উত্তাপ যাদের অন্তরে রয়েছে, এমন তারকার বাস্তব অবস্থা এই রকম। আর্দ্রা ও মীরা (Mira) তারকা এই শ্রেণীর। এরা ঘনত্বে কম, কিন্তু আকারে বড়; এত বড় যে, এক একটি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি—কোটি সূর্য্যের স্থান জুড়ে থাকে। আর্দ্রা আড়াই কোটি সূর্য্যের এবং তিন কোটি সূর্য্যের আয়তনের সমান। অধিক জায়গা জুড়ে আছে ব'লে, এদের দীপনক্ষমতাও প্রচণ্ড; কিন্তু বহির্দেহের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্র হ'তে নিঃসৃত তেজের পরিমাণ সামান্য—কোথাও অর্দ্ধ অশ্বশক্তি কোথাও বা তার কিছু বেশী। সূর্য্যগাত্রের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ৫০ অশ্বশক্তির তেজ বিকিরণ করে; প্রধান অনুক্রমিক-তারকাদের মধ্যে যার রঙ নীল, তার গায়ের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ৫০,০০০ অশ্বশক্তির তেজ বিতরণ করে।

লাল ও হলদে দানব-তারকা

আর্দ্রা, মীরা, জ্যেষ্ঠা ও তাদের সমজাতীয় তারকাদের অনেকের রঙ লাল, কারও বা হলদে। রঙের বিশেষত্ব এবং আকারের বিশালতার জন্য এদের লাল-দানব, ও পীত-দানব (Red and Yellow Giants) বলা হয়। লাল-দানব-তারকা মীরার একটি শাদা বামন সহচর আছে। মীরাকে প্রদক্ষিণরত সেই শাদা-বামনটির আকারের তুলনা দিতে হ'লে হস্তীর চারিদিকে আবর্ত্তনশীল মশকের উপমা দেওয়া চলে। যুগল নক্ষত্রের সহচরদ্বয় আকারে কতটা বিপরীত হ'তে পারে, মীরা ও তার সহচর তারকাই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

চঞ্চলদীপ্তি তারকা

দানব-তারকাদের অনেকে চঞ্চল-দীপ্তিসম্পন্ন। এদের দীপ্তির পরিবর্ত্তনশীলতার কাল একেবারে সুনির্দিষ্ট নয়—প্রায় তিন শত দিনের কাছাকাছি। ৩২০ হ'তে ৩৭০ দিনের মধ্যে মীরার দীপ্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। দীপ্তি যখন কম থাকে, তখন তার গায়ে টাইটেনিয়ম্-অক্‌সাইডের মেঘ ভেসে ওঠে। এ থেকে বোঝা যায়, তার গায়ের উত্তাপে কোন কোন রাসায়নিক যৌগিক নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

এ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বিভিন্ন প্রকার চঞ্চলদীপ্তি তারকার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। পের্সিয়ুস্ রাশিতে অ্যাল্‌গল্ নামে একটি তারকা আছে, তার আলো প্রায় উনষাট ঘণ্টা স্থির থাকে, তার'পর পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে তার দীপ্তি ক্রমশঃ ম্লান হয়ে, পরবর্ত্তী পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে ধীরে ধীরে আবার উজ্জ্বল হ'তে থাকে। এর দীপ্তির হ্রাসবৃদ্ধি কোনও আঙ্গিক কারণে নির্ভর করে না। অ্যাল্‌গল্ যুগল-নক্ষত্র। দুই সহচরে পরস্পর গ্রহণ-লাগানোর ফলে অ্যাল্‌গলের দীপ্তির এই হ্রাসবৃদ্ধি। এ ধরণের প্রায় দুই শত যুগল নক্ষত্র জ্যোতিষীর পর্য্যবেক্ষণ-সীমার অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে।

'নভা' তারকা

আর এক ধরণের তারকা আছে, যাদের আলো বহু যুগ পরে এক বার হঠাৎ জ্বলে উঠে, তার পর ধীরে ধীরে

ম্লান হয়ে যায়। এদের নাম 'নভা' (Nova); নভার অর্থ নতুন; কিন্তু নভা তারকাগুলি প্রকৃতপক্ষে পুরাতন। নভা একুইলে (Nova Aquilae) নামক তারকাটি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন হঠাৎ জ্বলে ওঠে; তার সাধারণ দীপ্তি আধ ঘণ্টার মধ্যে দেড় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে সূর্য্যের তিন লক্ষ গুণ দীপনক্ষমতা লাভ করেছিল। নভা একুইলে যখন জ্ব'লে উঠল, তখন দেখা গেল, একটি জ্যোতির্ম্ময় গ্যাসের আবরণ তার গা থেকে বেরিয়ে, কেন্দ্র হ'তে বহির্ম্মুখে ফুলতে ফুলতে ছুটে চলেছে; কিন্তু কিছু দিন পরে আলো স্তিমিত হওয়াতে সেটি আর লক্ষ্য করা গেল না। নভা তারকা জ্ব'লে ওঠার সময় তার শরীর ফুলতে থাকে প্রচণ্ড গতিতে; তার গ্যাসীয় গাত্র সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে বিস্ফারিত হয়। এই হঠাৎ বিস্ফারণ-ক্রিয়ার হেতু কি, তা আজও নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভব হয়নি। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, হয় ত সব তারকাই এক কালে নভা ছিল বা হবে। আমাদের সূর্য্যও হয় ত এমনি ভাবে আপন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন ক'রে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি ক'রেছে।

ডেল্‌টা সিফাই (Delta Cephei) নামে একটি চঞ্চল-দীপ্তি তারকা আছে, তার আলো ৫⅓ দিন অন্তর হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এর কিরণচ্ছত্র পরীক্ষা ক'রে জানা গিয়াছে, তারকাটির গাত্র, দীপ্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সময় বহির্ম্মুখে উঁচু হয়ে ওঠে, এবং দীপ্তি হ্রাস হওয়ার সময় অন্তর্ম্মুখে সঙ্কুচিত হ'য়ে নেমে যায়। ডেল্‌টা সিফাইয়ের সমধর্ম্মী আরও কতকগুলি তারকার দেখা পাওয়া যায়; তাদের সকলের দীপ্তির কম্পনকাল এক না হ'লেও, দীপনক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে সমান। ডেলটা সিফাইয়ের সমধর্ম্মী ব'লে এই সব তারকার নাম Cepheid variables বা সিফাইধর্ম্মী তারকা।

সিফাইধর্ম্মী তারকা

সিফাইধর্ম্মী তারকাদের গাত্রদেশ বারংবার উন্নত অবনত হয় কেন, তা নিয়ে অনেক গবেষণা হ'য়েছে; কিন্তু এখনও কোন নিখুঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই তারকার দীপ্তির কম্পন হ'তে এমন অনেক তথ্য সংগ্রহের সুবিধা পেয়েছেন, যা প্রকৃত অবিকম্পিত-দীপ্তি তারকার নিকট হ'তে পাওয়া যায় না। এই তারকাগুলি জ্যোতির্ব্বিদের পক্ষে আকাশসমুদ্রে আলোক-স্তম্ভের মতো; দীপ্তির কম্পনশীল নিশানা দিয়ে এরা নিজেদের দূরত্ব জানিয়ে দেয়।

গোলকীয় স্তবক

ধনু, বৃশ্চিক, ওফায়কস্ (Ophiuchus) রাশির মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বহুসংখ্যক সিফাইধর্ম্মী তারকা অপরাপর তারকাদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হ'য়ে স্তবকে স্তবকে জটলা করছে। স্তবকের আকার একত্র সঞ্চরণশীল মৌমাছির ঝাঁকের মতো গোলকীয়। প্রত্যেক তারকা যেন এক-একটি মধুমক্ষিকা—তারা ঝাঁকের কেন্দ্রের কাছে বেশী ঘেঁষাঘেঁসি ক'রে আছে, আর গোলকের বহিরঞ্চলে এদিকে-ওদিকে তাদের অল্প কয়েকটি ছড়িয়ে আছে। এই ধরণের তারকার ঝাঁকের নাম (Globular Cluster) গোলকীয় স্তবক। পাঁচ-ছয়টি গোলকীয় স্তবককে খালি-চোখে দেখতে পাওয়া যায়। স্তবকস্থিত সিফাইধর্ম্মী তারকার দূরত্বের মাপ ক'রে গোলকীয় স্তবকের দূরত্ব জানা গিয়াছে। সব চেয়ে নিকটতম স্তবকটির দূরত্ব ১৮,৪০০ আলোক-বর্ষ। যে অবস্থায় আমরা একে দেখতে পাই, তা প্রকৃতপক্ষে তার ১৮,৪০০ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থা। সে সময়ে পৃথিবীর মানুষ আদিম অসভ্য, বনচারী; কৃষিকার্য্য তখন তার অজ্ঞাত।

আলোক মিনিটে এক কোটি দশ লক্ষ মাইল বেগে চ'লে গোলকীয় স্তবকটির নিকট হ'তে পৃথিবীতে পৌছনর মধ্যে মানুষের ছয় শত বংশ-পরম্পরার জীবন-নাট্যের অভিনয় শেষ হ'ল; লিখিত হ'ল তার সভ্যতার কাহিনী, জাতীয় উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত। মনে রাখতে হবে, এই স্তবকটি নিকটতম। এক শত জ্ঞাত গোলকীয় স্তবকের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী, তার আলো পৃথিবীতে আসতে এক লক্ষ পঁচাশী হাজার বৎসর লাগে। এক-একটি গোলকীয় স্তবকের ব্যাস এক শত হ'তে দুই শত আলোক-বর্ষ; তার মধ্যে কোন কোনটিতে এক লক্ষের অধিক তারকা আছে। গোলকীয় স্তবক অপেক্ষা ছায়াপথ-বেষ্টিত আমাদের নক্ষত্রজগৎ (Galaxy) অধিক সংখ্যক তারকা-সমন্বিত ও বৃহত্তর। এই নক্ষত্রজগতই একটি ব্রহ্মাণ্ড।

শ্রীনীলরতন কর।



"অধর কি সুধাদানে রহিবে উন্মুখ,
পরিপূর্ণ বাণীর ভারে নিশ্চল নীরব ?"
[শিল্পী—মিষ্টার বিশ্বাস



বনবালা

[শিল্পী—শ্রীবি

প্রস্তাবিত বিক্রয়-কর

বাঙ্গালার সচিব দল বঙ্গদেশের উন্নতি-সাধনের অজুহাতে এক নূতন বিক্রয়-কর স্থাপনের আয়োজন বেশ পরিপক্ক করিয়া তুলিয়াছেন! এই বিষয়ের আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গত নবেম্বর মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে একটি 'বিল' পেশ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে রাজস্ব-সচিব মিঃ সারোয়ার্দী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে,—দেশের সংগঠনমূলক কার্য্যের প্রবর্ত্তন দ্বারা তাঁহারা এ দেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন,—তবে কি না, এই কার্য্যের প্রবল বাধা—অর্থাভাব। বোম্বাই, পঞ্জাব বা মাদ্রাজে শিক্ষার জন্য জনপ্রতি যে টাকা ব্যয় হয়, অর্থাভাবের জন্যই বাঙ্গালায় তাহার অর্দ্ধেকও ব্যয় করা যাইতেছে না। এমন কি, কৃষিবিভাগের জন্য প্রতি-বৎসর যে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন, তাহাও ব্যয় করা যাইতেছে না। অতএব নূতন কর স্থাপন ভিন্ন আর উপায় কি? এই জন্য বঙ্গদেশের দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের উপর একটি কর স্থাপন করিতে হইবে। অতএব বিক্রেয় দ্রব্যের উপর আপাততঃ শতকরা দুই টাকা হারে কর স্থাপন করা হইবে,—অবশ্য প্রয়োজন হইলে ঐ হার বাড়াইয়া শতকরা তিন টাকাও করা চলিবে। সাধারণতঃ যে সকল ব্যবসায়ী বৎসরে কুড়ি হাজার টাকার মাল বিক্রয় করে, তাহাদের উপরেই এই কর স্থাপন করা হইবে। ইহাতে ঐ সকল ব্যবসায়ী যাঁহাদিগের নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে শতকরা দুই টাকা হারে করের জন্য বর্দ্ধিত মূল্য কাটিয়া লইবেন; ইহাতে ক্রেতা-মাত্রকেই এই কর দিতে হইবে। বস্তুতঃ, কুটীরবাসী নিরন্ন কৃষক হইতে প্রাসাদবাসী কোটিপতি পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই অল্পাধিক পরিমাণে এই করভার বহন করিতে হইবে। তবে শিল্পীর নিকট যে কাঁচামাল বিক্রয় করা হইবে, তাহার উপর এবং চাউল, ডাল, লবণ, সর্ষপতৈল, গুড়, মাতগুড়, চিনি, পাঁউরুটি ও দুগ্ধের উপর এই কর ধার্য্য হইবে না। তদ্ভিন্ন, বৈদ্যুতিক শক্তি অথবা পেট্রল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের উপর কোনও বিশেষ কর নির্দ্ধারিত আছে, তাহার উপর এবং বঙ্গদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য বঙ্গদেশের বাহিরে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হইবে, তাহার উপরও এই কর ধার্য্য হইবে না।

এই নূতন কর স্থাপনের কথা শুনিয়া সর্ব্বাগ্রে একটা কথা মনে হয়, পক্ষীবিশেষ আকাশের অতি উর্দ্ধে উড়িলেও তাহাদের দৃষ্টিশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে, বহুদূরবর্ত্তী ভাগাড় অতি সহজেই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এই সচিব দলেরও দৃষ্টিশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে, কর স্থাপনের জন্য এরূপ একটি বিষয় তাঁহারা বাছিয়া লইয়াছেন, যাহার প্রভাব হইতে দেশবাসী কাহারও নিস্তার নাই। এই কর সম্বন্ধে যাহাতে সকলেরই একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে অতি সংক্ষেপে রাজস্ব-সচিবের বক্তৃতার সার-মর্ম্ম বিবৃত হইল। তথাপি প্রসঙ্গতঃ আইনের পাণ্ডুলিপি হইতে দুই-একটি কথার আলোচনা করিলে এই করের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুবিধা হইবে। আইনের পাণ্ডুলিপির পরিশিষ্টে যে তফ্‌শীল প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধকে এই করের কবল হইতে নিষ্কৃতি দান করা হইলেও দুগ্ধজাত বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের (Cream or other milk products) উপর এই কর স্থাপিত হইবে। অতএব ঘোল, ছানা, দধি, মাখন, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি দুগ্ধজাত দ্রব্য কিছুই বাদ পড়িবে না। কিন্তু মদ্যের উপর যাহাতে এই বিক্রয়-কর স্থাপন না করা হয়, সে বিষয়ে সচিবগণ বিজ্ঞোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। তফ্‌শীলের ৯ দফায় (beverages of all descriptions) মদ্য জাতীয় সমস্ত পানীয় দ্রব্যকেই বিক্রয়-করের এলাকা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া অপূর্ব্ব বিচারশক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে! মদ্যপায়ী বা মদ্যবিক্রেতাকে এই সুযোগ দানের অর্থ জনসাধারণ কি সত্যই দুর্ব্বোধ্য মনে করিবে?

রেজিষ্ট্রেশনের উপদ্রব

ইহার পর এই বিক্রয়-কর আইনের পাণ্ডুলিপির ৭ ধারার (১) উপধারায় আছে—

"যত দিন পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি এই আইন অনুসারে কর-ধার্য্যের যোগ্য, তত দিন কোনও বিক্রেতাই বিক্রেতা-হিসাবে তাহার নাম রেজেষ্ট্রী না করিয়া এবং আইনসঙ্গত রেজিষ্ট্রেশন-সার্টিফিকেট না রাখিয়া ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন না।"

এই উপধারা অনুসারে নাম রেজেষ্ট্রী না করিলে সেই ব্যবসায়ীর দুই হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং অবিরত এইরূপ অপরাধ করিতে থাকিলে যত দিন পর্য্যন্ত এই অপরাধ করা হইবে, তত দিন তাহাকে দৈনিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, যে-যে ব্যবসায়ী যে-যে দ্রব্যের ব্যবসা করিবেন, তাঁহাকে সেই-সেই দ্রব্যের জন্য নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া সার্টিফিকেট লইতে হইবে। যে দ্রব্যের সার্টিফিকেট নাই, সে দ্রব্য তাঁহার সার্টিফিকেটের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া যদি তিনি ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাকেও ঐরূপ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। অর্থাৎ সকল মাথা একই ক্ষুরে কামাইবার ব্যবস্থা!

রাজস্ব-সচিব এই সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, শুধু দোকানদারদিগকেই নহে, আমদানিকারক প্রত্যেক ব্যবসায়ী, শিল্পী, কণ্ট্রাক্টর—প্রত্যেককেই এই ভাবে নাম রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে। অতএব নাম-রেজেষ্ট্রী ব্যবসায়ী-মাত্রকে করিতেই হইবে। এই রেজিষ্ট্রেশন একবার করা হইলে তাহার মেয়াদ কত দিন,—মাস, বৎসর, কি জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত—তাহার কোনও উল্লেখ নাই, তাহা সরকারের 'খাস' বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং সরকার প্রতি-বৎসরেও ৭ ধারা অনুসারে নাম রেজেষ্ট্রী করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রতি-বৎসরই কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই যে রেজিষ্ট্রী-ফি বাবদ ব্যয় করিতে হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে কি? ঐ টাকার পরিমাণ কত হইবে, আইনের পাণ্ডুলিপিতে তাহারও উল্লেখ নাই। বরং আইনের পাণ্ডুলিপির ২২ ধারার ২ উপধারার (ঙ) দফায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—এ সম্বন্ধে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশের ভার সরকারের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে। কিন্তু এমন গুরু বিষয় এরূপ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে চাপিয়া রাখা কত দূর যুক্তিসঙ্গত?

এই কার্য্যপদ্ধতি আইনের পাণ্ডুলিপিতে বিবৃত না থাকায় এবং সরকার স্বেচ্ছানুযায়ী এ সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন—এই প্রকার ব্যবস্থা থাকায়, আইনটি সরকারের একটি 'ঘরোয়া' আইনেই পরিণত হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে না কি? যাঁহাদের কিঞ্চিৎ বিবেচনাশক্তি আছে, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, নাম-রেজেষ্ট্রী করিবার এই বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে আইনে সুনির্দ্দিষ্ট বিধান না থাকিলে ব্যবসায়িগণের অসুবিধা অনিবার্য্য, এবং প্রস্তাবিত আইনখানি এই ত্রুটির জন্য যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন?

কমিশনারের অপ্রতিহত ক্ষমতা

প্রস্তাবিত আইনে যিনি কমিশনার নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার হস্তে অপ্রতিহত ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও উপেক্ষাযোগ্য নহে। আইনের পাণ্ডুলিপির ১৬ ধারায় কেহ নাম-রেজেষ্ট্রী করিবার উপযুক্ত ব্যবসায়ী কি না, অথবা কোনও বিক্রেতা কনট্রাক্টর কি না, কিংবা কোনও বিশেষ দ্রব্য ক্রয় করিবার অধিকার ক্রেতার রেজেষ্ট্রেশন-সার্টিফিকেটে প্রদত্ত হইয়াছে কি না, তাহার একমাত্র বিচারকর্ত্তা হইবেন এই আইনানুসারে নিযুক্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী কমিশনার বাহাদুর। এতদ্ব্যতীত, এই আইন পরিচালনের উদ্দেশ্যে কর স্থাপনাদি ব্যাপারেও কমিশনারের ক্ষমতা অসীম,—তিনি যাহা স্থির করিবেন, তাঁহার সেই নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে প্রতিকার-প্রার্থী হইয়া অন্যের নিকট আপীল ত দূরের কথা, কোনও দেওয়ানী আদালতে সে সম্বন্ধে কোনও আপত্তি পর্য্যন্ত করা চলিবে না! আয়করের কমিশনারের নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধেও আপীল করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু এই বিক্রয়-করের কমিশনারের কার্য্য "সীজারের পত্নীর ন্যায়" সকল সন্দেহের অতীত। তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত, এবং তিনি যেন অভ্রান্ত! অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে কি?

আইনের পাণ্ডুলিপির সপ্তদশ ধারায় বলা হইয়াছে, "এই আইনানুসারে কর-ধার্য্য হইলে অথবা কমিশনার বা তাঁহার অধীনস্থ কোনও কর্ম্মচারী এই আইন বা ইহার কার্য্য-পরিচালনোদ্দেশ্যে রচিত নিয়মাবলী অনুসারে কোনও আদেশ প্রদান করিলে, এই আইন-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে ভিন্ন কোনও দেওয়ানী আদালতে তদ্বিষয়ে আপত্তি করা চলিবে না, অথবা ঐ প্রকার করধার্য্য করিবার বিরুদ্ধে বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনও আপীল বা পুনর্ব্বিবেচনা ও পুনর্ব্বিচারের জন্য দরখাস্ত করা চলিবে না।"—ইহা কি অপূর্ব্ব ব্যবস্থা নহে ?

উল্লিখিত ধারা অনুসারে এই কমিশনারের ক্ষমতা যে কি প্রকার অপ্রতিহত হইবে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সুতরাং হিসাব পরিদর্শন, হিসাব পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে খানাতল্লাস, করধার্য্য ইত্যাদি বিষয়ে—কমিশনারই অদ্বিতীয় নিয়ন্তা। এক-হস্তে এইরূপ বিরাট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিবার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ভারত সরকারের আয়কর বিধানেও লক্ষিত হয় না; কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে সচিবসঙ্ঘ এই বিস্ময়কর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

প্রস্তাবিত আইনের ১৯ ধারায় যে ৭ দফায় এই আইন ভঙ্গ করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। যথা—

(১) এই আইন অনুসারে নাম রেজেষ্ট্রী না করিয়া ব্যবসা পরিচালন;

(২) এই আইন অনুসারে হিসাব-নিকাশ দাখিল না করা বা অপ্রকৃত হিসাব দাখিল করা;

(৩) রেজিষ্ট্রেশন-সার্টিফিকেটে ক্রেতা যে যে দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স লইয়াছেন, সেই সকল দ্রব্য ব্যতীত যে সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ের লাইসেন্স তাঁহার নাই, সেই সকল দ্রব্যের লাইসেন্স আছে, এইরূপ মিথ্যা সংবাদের সাহায্যে মাল ক্রয় করা;

(৪) এই আইনের ১১ ধারায় যে প্রকারে ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব-রক্ষা করিবার বিধান আছে—তাহা ভঙ্গ করা;

(৫) কমিশনার হিসাবের খাতা দেখাইবার আদেশ দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ না দেখান;

(৬) কোনও কর্ম্মচারী ঐ উদ্দেশ্যে খানাতল্লাসী করিতে গেলে বা কোনও হিসাবের খাতা লইতে গেলে তাহাকে বাধা দেওয়া;

(৭) ব্যবসায়ের নাম পরিবর্ত্তন, স্থান পরিবর্ত্তন, বা প্রকৃতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যথাসময়ে কর্ত্তৃপক্ষকে না জানান।

উক্ত ৭ প্রকারের কোনও একটি আইন লঙ্ঘন করিলেই ঐ ব্যবসায়ী দুই হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারিবেন, এবং দণ্ড সত্ত্বেও যদি ঐ প্রকার অপরাধে তিনি বিরত না হন, তবে দৈনিক পঞ্চাশ টাকা হারে অর্থদণ্ড ভোগ করিতে থাকিবেন। তবে, এই সকল অপরাধের জন্য কোনও প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বা কোনও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচার হইবে। কমিশনার ইচ্ছা করিলে দুই হাজারের অনধিক টাকা লইয়া, বা অপরাধীকে যত কর দিতে হইত, তাহার দ্বিগুণের অনধিক অর্থ লইয়া এইরূপ মোকদ্দমা মিটাইয়া লইতে পারেন। এই ব্যাপারেও কমিশনারের হস্তে কি প্রকার বেপরোয়া ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহাও প্রণিধান করিয়া এই বিল যে বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত নহে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে ?

প্রস্তাবিত বিলের ২২ ধারার ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। বিক্রয়-কর ধার্য্যের জন্য অনুসন্ধানের ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারীরা কাহারও নিকট কোনও সংবাদ পাইলে, বা কোনও দলিলাদি পাইলে তাহা তাঁহারা এই ধারা অনুসারে গোপন রাখিতে বাধ্য। যদি উহা তাঁহারা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাদের ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে, এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে। অবশ্য, বিক্রয়-করের কমিশনারই করধার্য্য করিবার ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্ত্তৃপক্ষ—তাঁহার নির্দ্ধারণই শেষ নির্দ্ধারণ, তাঁহার আদেশের প্রতিকূলে আপীল নাই। কোনও ব্যবসায়ীর কোনও শত্রু কমিশনারকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া, বা জাল দলিল দেখাইয়া কোনওরূপে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া যদি তাহার উপর করধার্য্য করাইতে পারে, তবে তাহার আর প্রতিকার নাই। কারণ, এই ধারা অনুসারে বিভাগীয় এই সকল গুপ্ত সংবাদ শাস্তির ভয়ে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—

এবং কমিশনারের সিদ্ধান্তের উপরেও আর আপীল নাই। সুতরাং এ অবস্থায় নিরপরাধ ব্যবসায়ীর অকারণ অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের কোন আশাই নাই।

পুস্তক-ব্যবসায়ের বিপদ

ইংলণ্ডে বা য়ুরোপীর অন্যান্য সভ্য দেশে জ্ঞান-বিস্তারে কোনরূপ বাধা ঘটিতে না পারে, সে জন্য সে দেশের অধিবাসিবর্গ বিশেষ আগ্রহান্বিত। এই কারণে অন্য দেশ হইতে পুস্তকাদি আমদানি হইলে ঐ সকল দেশে তাহাদের উপর কোনওরূপ শুল্ক ধার্য্য হয় না। আমাদের দেশে কাগজ শিল্পের উন্নতিসাধনের অজুহাতে দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত না হইলেও এত দিন বিদেশাগত কাগজের উপর উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য্য হইয়া আসিতেছে। এই মহাযুদ্ধে নরওয়ে, সুইডেন-প্রমুখ দেশ হইতে কাগজ আমদানিতে বাধা হওয়ায় বিদেশাগত কাগজের মূল্য প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা জ্ঞান-বিস্তারের পথে যে কত দূর অসুবিধা ও বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের ধারণা করিবারও শক্তি নাই। কিন্তু অভিনব বিক্রয়-কর স্থাপিত হইলে কাগজের উপর আর এক দফা কর বসিয়া এক মুরগী তিনবার জবাই করিবার দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট হইবে। ফলে কাগজের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে। তাহার উপর এই কাগজ আবার যখন মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়-যোগ্য পুস্তকে পরিণত হইবে, তখন তাহার উপর আবার আর এক দফা বিক্রয়-কর বসিবে! সরকারী শাসন-যন্ত্রের বিরাট ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য সরকার ইতিপূর্ব্বে ডাকমাশুল, রেজিষ্টারী ফিঃ ও মনি-অর্ডারের ফিঃ অসম্ভব বর্দ্ধিত করিয়া সুলভ সাহিত্য-প্রচারে ও সার্ব্বজনীন শিক্ষা-বিস্তারের পথ রোধ করিয়াছেন। সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র, পুস্তকাদি—কোনও দ্রব্যই এই বিক্রয়-করের করাল কবল হইতে যে অব্যাহতি পাইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনাই আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গালায় শিক্ষার বিস্তার এতই অল্প যে, এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক বর্ণজ্ঞানহীন। তাহার পর এই ভাবে যদি একবার কাগজের উপর উচ্চ হারে শুল্ক ও সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র বা মুদ্রিত পুস্তকের উপর অসম্ভব উচ্চ হারে ডাকমাশুলের উপর পুনর্ব্বার বিক্রয়-কর বসাইয়া বঙ্গদেশের উন্নতিসাধন করা হয়, তবে এই তিন দফা করভারে দেশে জ্ঞানবিস্তারে যে কি বাধা উপস্থাপিত হইবে, তাহা বুঝিবার জন্য অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই! একেই এই যুদ্ধের সময় কাগজ ও মুদ্রণোপকরণের অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধি দেশের জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে—ইহার পর দেশের লোক, বিশেষতঃ, দরিদ্র ছাত্রগণ পুস্তকের বর্দ্ধিত মূল্যের গুরু ভারে অত্যন্ত প্রপীড়িত ও বিপন্ন হইবেই। বাঙ্গালা দেশে পুস্তক ব্যবসায়ের অবস্থা উন্নতিজনক নহে। পাঠ্য-পুস্তকের যে সকল ব্যবসায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয় করেন, তাঁহাদের একরূপ ক্রীত মূল্যেই ঐ সকল পাঠ্য-পুস্তক বিক্রয় করিতে হয়। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় স্বপ্রকাশিত পুস্তকে শতকরা এক বা দেড় টাকার অধিক কমিশন প্রায়ই পুস্তক-ব্যবসায়িগণকে দেন না। ইহার উপর যদি বিক্রয়-করের জন্য শতকরা দুই টাকা বা পরে তিন টাকা বিক্রয়-কর দিতে হয়, তবে পুস্তক ব্যবসায়িগণের পক্ষে ঐ সকল পুস্তক বিক্রয় করা সম্ভবপর হইবে না।

একেই ত ডাকমাশুল অসম্ভব বৃদ্ধির ফলে মফঃস্বলের ক্রেতাগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন; তাঁহারা ইচ্ছা থাকিলেও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি কিনিতে পারেন না। তাহার উপর, এই ভাবে যদি বিক্রয়-করের দৌরাত্ম্যের প্রবর্ত্তন হয়, তবে দেশে জ্ঞানবিস্তারে প্রভূত বাধা হইবে। অথচ উজীর সাহেব সগর্ব্বে ফতোয়া দিয়াছেন যে, এই বিক্রয়-করলব্ধ অর্থে দেশে শিক্ষা-বিস্তার ও প্রভূত উন্নতি সাধন করিবেন। দেশের উচ্চতর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে জ্ঞানবিস্তারের পথের এই বাধা অপসৃত করিবার জন্য পুস্তক-ব্যবসায়কে এই বিক্রয়-করের হস্ত হইতে অব্যাহতিদান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, কাগজের উপর যদি এক দফা বিক্রয়-কর বসে, তবে পুস্তক-ব্যবসায়ের উপর আবার করস্থাপন অত্যন্ত অসঙ্গত; তাহা কোনও ক্রমেই সমর্থিত হইতে পারে না। রাজস্বসচিব এই 'বিল' ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করিবার সময়ে বলিয়াছেন—

"It is not our intention to levy a tax on the sale of goods every time they change

ownership; our intention is to tax only one of these changes and for this reason we speak of the proposed tax as a one-point or single-point tax."

অর্থাৎ "প্রত্যেক বারই দ্রব্য বিক্রীত হইয়া হস্তান্তরিত হইলেই তাহার উপর কর ধার্য্য করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে একবার মাত্র কর ধার্য্য করাই আমাদের ইচ্ছা, এবং এই হেতুবাদে এই করকে 'এক-মুখান' কর শব্দে অভিহিত করা যাইতে পারে।"

রাজস্ব-সচিবের এই উক্তির প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করা অভিপ্রেত হইলে এ দেশে মুদ্রিত কোনও সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র, বা কোনওরূপ পুস্তক ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য্য করা আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, ঐ সকল সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র, বা পুস্তকের উপাদান—কাগজ, কালি বা মুদ্রণ দ্রব্যের উপর এক দফা কর আদায় করা হইবে, তাহাতে মতভেদ নাই; অতএব সে হিসাবেও সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র বা পুস্তক-বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

এই প্রকারে চামড়ার উপর যদি কর ধার্য্য হয়, তবে সেই চামড়ায় প্রস্তুত জুতার উপর কর ধার্য্য হইলে, অথবা তুলার উপর কর ধার্য্য হইলে, পুনর্ব্বার সুতার উপর এবং ঐ সূত্র-নির্ম্মিত শিল্পদ্রব্যের উপর আর একবার কর ধার্য্য হইলে তাহাতে একই দ্রব্যের আকৃতি পরিবর্ত্তনের সহিত কোথাও দুই বার, কোথাও বা তিন বার পর্য্যন্ত কর-ভার স্থাপিত হইবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেশের লোক এই প্রকার বিক্রয়-করের আইন প্রণয়নে আপত্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। এই আইনে জনসাধারণ পুনঃ পুনঃ কর-ভারে প্রপীড়িত হইবে।

দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা মহাযুদ্ধের জন্য ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে; ইহার উপর দুর্ভিক্ষ, পাটের মূল্যহ্রাস ইত্যাদি কারণে দেশে এখন নূতন কোনও কর স্থাপন করিলে দেশবাসীর কষ্ট সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিবে। এরূপ অবস্থায় এই কর ধার্য্য করা বর্ত্তমান সময়ে কোনওরূপে সঙ্গত নহে। গরু মারিয়া জুতা দানের নীতি সমর্থনযোগ্য নহে।

যদি নিতান্তই কর ধার্য্য করিবার অনিষ্টকারিতা বুঝিবার শক্তি বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের না থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ মন্দের ভাল হিসাবে সংবাদপত্র বা পুস্তক ব্যবসায়কে এই কর হইতে অব্যাহতি দান করা কি কারণে প্রয়োজন, তাহা আমরা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি।

কলিকাতার পুস্তক-প্রকাশক সমিতি এই করে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া ইতোমধ্যেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য বিক্রেতৃবর্গও ইহাতে আপত্তি করিয়াও গত ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় "হরতাল" করিয়াছেন।

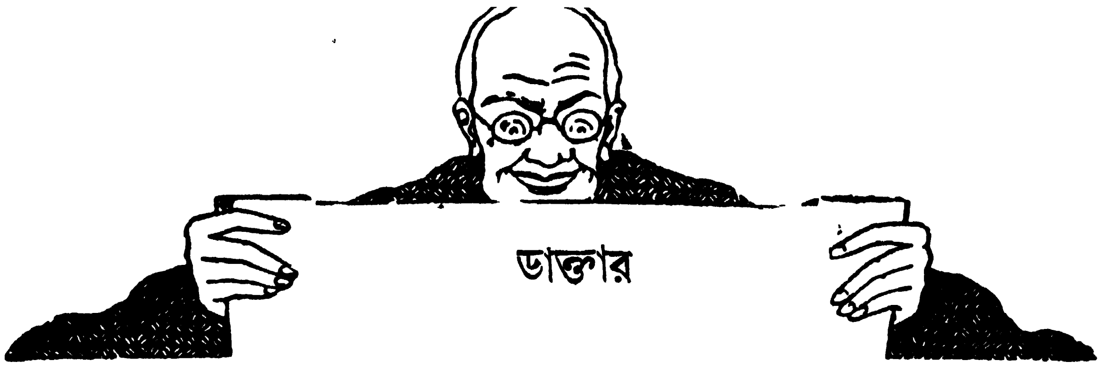
আমরা আশা করি, যেখানে কোনও কাঁচা মালের উপর কর ধার্য্য হইবে, সেখানে সেই দ্রব্যে প্রস্তুত শিল্পের উপর যাহাতে কর ধার্য্য না হয়, অন্ততঃ তাহার ব্যবস্থা হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল

অদৃষ্টরে লক্ষ্য করি কহে কর্ম্মফল,
"সংসারেতে দুঃখ তুমি বাড়াও কেবল!
কর্ম্মবীর তাই আমি চাই ভাঙ্গিবারে,
অমোঘ বিধান তব নিত্য অত্যাচারে।"
অদৃষ্ট হাসিয়া কহে, "বুঝিলাম সবই,
কিন্তু বীর, আমি শুধু তব প্রতিচ্ছবি!
তুমি যাহা ক'রে যাও অতি সঙ্গোপনে,
কেহ বা জানিল তাহা, কেহ নাহি জানে!
তারি ফলে মোর সৃষ্টি, রহি তব পিছে,
বিশ্বেরে জানাই আমি তুমি নহ মিছে!"

শ্রীনন্দ সেনগুপ্তা।



ডাক্তার

১

—ওঃ—

—আজ কি শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে ?

—ভাল লাগ্‌ছে না। ওঃ—

—ডাক্তারকে খবর দেবো ?

—নাঃ,—থাক্।

—ওগো আমার যে বড্ড ভয় করছে—

—আচ্ছা, তবে রামাবতারকে একবার পাঠিয়ে দেও।

চপলা দ্রুতগতি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পুরাতন হিন্দুস্থানী চাকর রামাবতারকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, 'বাবুর অসুখ বেড়েছে—হরেন ডাক্তারকে শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়।'

—'এখন যে ডাক্তার রুগী দেখেন। এখন কি তিনি আস্‌তে পারবেন ?'—চাকর বলিল।

গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন, 'সে কথায় তোর দরকার কি ? তুই তাঁকে আমার নাম করে বল্‌বি যে, এখনি আসা দরকার।'

রামাবতার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রস্থান করিল।

গিরীন্দ্র পোর্ট কমিশনার্সের অধীনে ভাল চাকরী করেন। হঠাৎ অল্পের অসুখ হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন। হরেন ডাক্তার পাড়ায় থাকেন, তাঁহাকেই ডাকা হইয়াছে। ডাক্তারের বয়স কম হইলেও হাতযশ আছে। অনেকেই ডাকে।

ডাক্তার রোগী দেখিলেন, দর্শনী নিলেন। বলিয়া গেলেন, কাল আবার আসিবেন। পরদিনও আসিলেন, তার পরদিনও। এইরূপে ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। ডাক্তার কোনও কোনও দিন হু'বেলা আসিতে লাগিলেন। তাঁহার ভিজিট দিতে হয় না।

—'গিরীন বাবু, আপনি ব্যস্ত হন কেন ? অসুখ সেরে গেলে আমার পারিশ্রমিক দেবেন। এখন ঐ নিয়ে ভাববার দরকার কি ?'

গিরীন বাবু বলিলেন—'আপনার দয়া অসীম।—বেশ তাই হবে।' পরিবারকে বলিয়া দিলেন, 'হিসেবটা রেখো। ডাক্তার না ডাক্‌তেও আসছেন যখন, তখন বোধ হয়, প্রত্যেক বার ভিজিট না দিলেও চল্‌বে। কি বল ?'

চপলা উত্তর করিল না। অঞ্চলের খুঁট পাকাইতে পাকাইতে পথ্য তৈয়ার করিতে গেল।

২

—'আজ আমার রাতে এখানে থাকা দরকার। মনে কোনও দ্বিধা করবেন না। আমি প্রাণপণে আপনার উপকার করবো।'—ডাক্তার চপলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।

রোগী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বড় ক্লান্ত। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হইতেছে না। ডাক্তার প্রাতে, অপরাহ্ণে, সন্ধ্যায় আসিয়া দেখিতেছেন। অনেক সময় নিজের ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিয়া খাওয়াইতেছেন। কিন্তু রোগ কমিতেছে না। বলিলে বলেন, 'রোগের কোর্স ত সে নেবেই। আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে না,—এইটে শুভগ্রহ বলতে হবে।'

ডাক্তার খুব যত্ন করিতেছেন; প্রতিবারে অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীকে পরীক্ষা করেন। গল্প করিয়া রোগীকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করেন। চপলা তরুণী, সে রোগের কিছু বুঝে না। কিন্তু ডাক্তারের ব্যবহারে মুগ্ধ। সে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, কখন্ হরেন ডাক্তার আসিবেন। তাঁহার গাড়ীর হর্ণ শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া থাকে,

এবং যতক্ষণ ডাক্তার থাকেন, ততক্ষণ সে স্বামীর অসুখের কথা, নিজের বিপদের কথা সব ভুলিয়া যায়।

আজ রোগীর অবস্থা বিশেষ খারাপ বলিয়া বোধ হইল। ডাক্তার বলিলেন, 'আমি রাত্রে আসিব, এবং সমস্ত রাত্রি থাকিব।'

চপলা চমকিয়া উঠিল। সে মাথার উপর হাত দিয়া ঘোমটা একটু নামাইয়া দিল। মুখে কিছু না বলিলেও ডাক্তার দেখিলেন যে, তাহার সহজ প্রফুল্ল মুখখানি যেন কালি হইয়া গেল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে গিরীন্দ্র বলিলেন, 'অসুখ ত কম্‌ছে না। আর কাউকে ডাকলে হতো না?'—

চপলা যন্ত্রের মত বলিল, 'ডাক্তার আসলে ব'লব। ওঁকে না জিজ্ঞেস করে' ডাকা ত যায় না।'—

গিরীন্দ্র, 'তা বটে!'—বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বেশী কথা বলিতে তাঁহার কষ্ট হইতেছিল। তিনি তবুও একটু থামিয়া বলিলেন, 'আমি এ অসুখ থেকে যে ভাল হবো—সে আশা নেই।'—

'কে বল্‌লো? তুমি নিশ্চয়ই ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে। ডাক্তার বলেছেন—'

—'ডাক্তার বলেছেন—' গিরীন্দ্র একটু হাসিতে চেষ্টা করিলেন।

৩

শীতকালের দীর্ঘ রাত্রি। ডাক্তার ৯টার সময় আসিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'এই সময়টা একটু ভয়ের—; তবে, বোধ হয়, কেটে যাবে!'

চপলা বলিল, 'আর কোনও বড় ডাক্তারকে ডাকা আবশ্যক মনে করেন?'

ডাক্তার ব্যস্তভাবে বলিলেন, 'না, না, সে দরকার হবে না। দেখবার আর কি আছে?—আমি ত খুব ভরসা করি যে, এর চেয়ে খারাপ হবে না।'

চপলা বল্‌লো, 'উনি বলছিলেন কি না—'

ডাক্তার বলিলেন, 'ওঃ! আপনি ত দেখ্‌ছেন, আমি কত পরিশ্রম করছি? এখন আর এক জন এসে' যশ নিয়ে যাবে—সে-টা কি ভাল দেখায়?'

রোগী পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিলেন। ডাক্তার তাঁহার সমস্ত মমতা সুরে মিশাইয়া বলিলেন, 'আপনার জন্যেই আমি আজ এখানে থাকবো বলে' এসেছি। এতেও কি আপনার দুশ্চিন্তা গেল না?'

ডাক্তারের চক্ষু চপলার চক্ষুর সহিত মিলিল। কৃতজ্ঞতায় তাহার বুক ভরিয়া গেল। সে ডাক্তারের লুব্ধ-দৃষ্টির বিনিময়ে তাহার কটাক্ষ-শর ত্যাগ করিল।

৪

—'একটু চা করে' দেব কি?' রাত্রি তখন ১২টা। ডাক্তার ঘুমের ঔষধ দিয়া রোগীকে ঘুম পাড়াইয়াছেন।

'আপনার হাতের চা? আমাকে জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক', বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন। চপলা চা তৈয়েরী করিয়া আনিল। ডাক্তার বলিলেন, 'রোগীর ঘরে খাব না।'

—'বেশ ত! আমার সঙ্গে আসুন।'

ডাক্তার চপলার অনুবর্ত্তী হইলেন। অন্য কক্ষে গিয়া একটা টিপয়ের উপর চা রাখিয়া চপলা একটা চেয়ার তাহার নিকটে স্থাপন করিল। ডাক্তার চা-পানে প্রবৃত্ত হইলেন।

—'কেমন দেখছেন এখন?'

—'বেশ ত ঘুমুচ্ছেন' বলিয়া ডাক্তার একটু মৃদু কাশিলেন।

—'তা ত দেখছি! কিন্তু নাড়ী?'—

—'নাড়ী মন্দ কি?—নাড়ী তেমন ভাল নয়! রোগীর ঘরে থাকবার কোনও দরকার হয় ত না হ'তেও পারে।' বলিয়া ডাক্তার চপলার চোখের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিলেন।

চপলার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিয়া বলিল, 'তবে আপনি এখনি কি বাড়ী যাবেন?'

—'না! তা কি হয়? আমি এসেছি—দেখুন, আপনার জন্যে—অর্থাৎ আপনি একলাটি হয় ত ভয় পাবেন, এ জন্যে আমি থাক্‌ব। তবে অন্য ঘরে থাকলেও হ'তে পারবে।'

—'বেশ, আপনার জন্য পাশের ঘরে ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি; একটু বিশ্রাম করবেন।'

ডাক্তার চা খাইয়া একবার রোগীর ঘরে গেলেন।

রোগী তখন বেশ ঘুমুচ্ছেন। তখন তিনি চপলাকে বলিলেন, 'আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন্। তার পরে আমি বিশ্রাম করতে যাব।'

—'না, না, ডাক্তার বাবু, আমি ঠিক বসে' থাকতে পারবো।'

ডাক্তার বলিলেন, 'আমি যত দূর বুঝতে পারছি, তাতে এ-দিকে কোনও ভয়ের কারণ নেই। শেষ-রাত্রিটা ভাল কাটবে কি না, বুঝতে পারছি-নে—

শেষোক্ত কথাগুলি ডাক্তার চপলার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন। তাহার উচ্ছৃঙ্খল অলকরাশি ডাক্তারের তপ্ত নিশ্বাসে দুলিয়া উঠিল।

ডাক্তার দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন, 'আমি বলছি, আপনি একটু গড়িয়ে আসুন।'

চপলা আর কথা কহিতে পারিল না। সে একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুইতে গেল।

একখানা ইজি-চেয়ারে শুইয়া সে স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, তাহার স্বামীর আত্মা হাওয়ায় ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার দুইটি করুণাভরা চক্ষু সে এই মর্ত্ত্যের দিকে ফিরাইয়া যেন তাহারই সন্ধান করিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া সে যেন হঠাৎ বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জন্য তাহার হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

চপলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, ডাক্তারের লোলুপ দুইটি চক্ষু। সে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। স্বামীর ঘরে গিয়া দেখিল, স্বামী যাতনায় ছটফট্ করিতেছেন। পাশে ইন্‌জেকশানের পিচকারী রহিয়াছে।

চপলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি, হলো কি? ডাক্তার বাবু, ইনজেকশান কেন?'

ডাক্তার সংক্ষেপে বলিলেন, 'হার্ট ফেল্ করছে।'

স্বামী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, 'বড় যন্ত্রণা!—জ্বলে যাচ্ছে।—উঃ!'

চপলা ইনজেকশানের স্থানটি দেখিল। তুলার ঢাকা সরাইয়া সেই ক্ষতস্থানে মুখ দিল ও কতকটা রক্ত চুষিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। কেন সে করিল, তাহা সে জানে না। কিন্তু রোগী যেন আরাম পাইল। রোগী একটু সাম-লাইলে চপলা বলিল, 'ডাক্তার বাবু, এইবার আপনি একটু শুয়ে নিন্-গে।'

ডাক্তার একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যন্ত্রচালিতের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গেলেন। চপলা তাঁহাকে সে ঘরে নিজেই পৌঁছিয়া দিল।

তার পরে সে ধীরে ধীরে বাহির-হইয়া গিয়া সন্তর্পণে দরজা ভেজাইয়া দিল।

ডাক্তার হঠাৎ উঠিয়া তাহার প্রায় পশ্চাতে পশ্চাতেই আসিলেন। কিন্তু দরজায় হাত দিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। দেখিলেন, দরজা বাহির হইতে রুদ্ধ!

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম-এ, অধ্যাপক, রায়বাহাদুর)।

পাতা-ঝরার ডাক

পাতা-ঝরার ডাক এসেছে ছায়ায় ঘেরা শীতের তপোবনে
ম্লান কুহেলির আড়াল হ'তে নিবিড় শ্যামল স্নেহেরি অঙ্গনে।
শুষ্ক যত বনের পাতা, শিথিল-তনু শাখার কোলে-কোলে,—
জীবন-সীমা পার হ'য়ে আজ শেষ-রাগিণীর পরশ-তালে দোলে।
ছড়িয়ে দিয়ে শাখার বাহু গভীর ধ্যানে দাঁড়িয়ে তরুগণ
শীতের তরে অর্ঘ্য সাজায় মাটীর থালায় পাতার আভরণ,
শিউলী-শাখা কাঁপিয়ে গেল হিমেল হাওয়া ধূসর-চেতনায়;
কোমল সুরে শুকনো পাতা ঝরিয়ে দিল আপন পাদচ্ছায়।
গাঁদার ঝোপে ফুল ফুটেছে রঙ্গীন-হাসি হাসছে উপহাসে;
অতসী আজ উঠল সেজে কনকবরণ হরিৎ ফুলের রাশে।
শীত এনেছে ওদের ডেকে, ফুলে ফুলে তারই আবাহন;
ওদের পরেই ভার পড়েছে সাজিয়ে দিতে শীতের তপোবন।
ভূষণহারা বিটপিদল সাজবে যবে বসন্ত-উৎসবে,—
অতসী আর গাঁদার কুসুম,—তাদের সেথা আসন নাহি রবে।
তাই বুঝি শীত আদর ক'রে ওদের ডেকে এনেছে এই বেলা;
এই জগতের নিখিল-সভায় কেনই ওরা সইবে অবহেলা?
বসন্তের ওই পূজারীদের তাই বুঝি শীত করল হতমান;
তাদের তরে র'য়েছে তো বসন্তেরি আনন্দ-আহ্বান।
আমার পরেও রাগ ক'রেছে ভুল করে আজ বসন্ত-বিদ্বেষী,
ভেবেছে সে মন বুঝি মোর ভালবাসে বসন্তরেই বেশী।
তাই চাহে সে আমার বুকেও ঝরিয়ে দিতে সবুজ পাতা যত;
জানে না তো শীতকে আমি ভয় করি না ওই তরুদের মত।
অমর কবি শেলী যে আজ বুক হ'তে মোর কইছে চেনা সুরে,
"শীত যদি গো এলোই, তবে বসন্ত কি রইতে পারে দূরে?"

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত।



নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

[রূপ-কথা]

দুই

লীনার মা যে লীনাকে নিয়ে বেঁচে আছেন, আর তাঁর বাপের গুরু সিদ্ধ সাধুটির আশ্রয় লাভ ক'রে কষ্টে-সৃষ্টে কোন রকমে দিন কাটিয়ে চ'লেছেন, এ খবর কিন্তু রাজবাড়ীতে লীনার মা'র সতীন বা তাঁর সেই ফন্দিবাজ বাপ মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মাটি মোটেই জানতেন না। তাঁরা জানতেন—লীনার মা লীনাকে নিয়ে রাজবাড়ী থেকে পালাবার সময় পথে ডাকাতের হাতে প'ড়ে খুন হ'য়েছিল। তারা জানেন, দুনিয়া থেকে তাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে।

খবরটা লোকের মুখে শুনেই তাঁরা বিশ্বাস ক'রে নেননি, বিশ্বাস ক'রবার মতো প্রমাণও পেয়েছিলেন। লীনার মা নিজের ধন-দৌলত, গয়না-গাঁটি, দামী কাপড়-চোপড় দু'হাতে বিলিয়ে দিয়ে যাদের সাহায্যে পালাবার পথটি খোলসা ক'রে নিয়েছিলেন, তারাই আসল ব্যাপারটা চেপে রাখবার জন্যে ডাকাতের হাতে এদের মৃত্যুর মিথ্যা খবরটি রটিয়েছিল। সেই সঙ্গে লীনার দাসী এমন কৌশলে লীনার মায়ের গায়ের কাপড়, আর লীনার ঘাগরাটি রক্তে লাল ক'রে রাজবাড়ীতে এনে দেখায় যে, তা দেখে খুনের ব্যাপারটি সত্যি ব'লেই সকলের বিশ্বাস হয়েছিল। মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মাও সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যময় প্রচার ক'রে দিলেন যে, রাজপুরীর ধন-দৌলত হাতিয়ে এই পাহাড়ী মাগীটা তার খুকীকে নিয়ে পালাচ্ছিল; পথে তাদের প্রাণ গিয়েছে; ডাকাতের হাতে তাদের পাপের শাস্তি ভগবান হাতে-হাতেই দিয়েছেন।

মন্ত্রীর যারা পেয়ারের লোক, খোসামুদের দল, তারা কথাটা শুনেই হাসি-মুখে বলেছিল—একেই বলে, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে! রাণীমাকে আর কষ্ট ক'রে সেই পাহাড়ে-মাগীটাকে তাড়াতে হ'ল না। সে ভালই হ'য়েছে।

কিন্তু রাজবাড়ীর আর রাজধানীর অনেক লোকই খবরটা শুনে শোকে-দুঃখে মুসড়ে প'ড়েছিল; কেন না, তারা জানতো—লীনার মা'ই ছিলেন রাজার পাটরাণী; তাঁকেই রাজা প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতেন, প্রজারাও তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ক'রতো।

কিন্তু রাতারাতি রাজার হঠাৎ মৃত্যু, আর তার পরেই তাঁর পাটরাণী ও রাজকন্যার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে এত বড় রাজ্যের ভেতরে একটি লোক ছাড়া আর কেউ সেই মন্ত্রীটিকে প্রশ্ন করতে সাহস করেনি। যিনি এই সাহসটুকু দেখিয়েছিলেন, তাঁর নাম সুসেন বৈদ্য। রাজা বেঁচে থাকতে রাজসভায় এঁর খ্যাতি ছিল সবার চেয়ে বেশী। রাজ্যের ভেতরে এঁর মত গুণী লোক আর একটিও খুঁজে পাওয়া যেত না। লোকটি মহাপণ্ডিত; চিকিৎসায় তাঁর হাতযশের জন্য লোকে বল্‌তো, ইনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। রোগীর চেহারা দেখেই, ইনি, তার কি রোগ ব'লে দিতে পারতেন—নাড়ী দেখা তো পরের কথা! তাঁর চেহারা দেখলেই মনে হয় যেন, সে-কালের কোন মুনি-ঋষি! লম্বা শাদা দাড়ি তাঁর বুক ঢেকে ফেলেছে, মাথার কোঁকড়ানো শাদা চুলগুলি লতিয়ে ঘাড়ে প'ড়েছে; বড় চোখ দুটোর ভেতর কালো তারা যেন আগুনের ভাঁটা! কাটা মানুষকে জোড়া দেবার যে কথাটা লোকে বলে, এঁর সম্বন্ধে সে কথা খাটে।

কিন্তু রাজ্যের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এক মরণাপন্ন রোগীর চিকিৎসা করতে ইনি যে-দিন রাজধানী ছেড়ে দূরে গেলেন, সেই রাত্তিরেই রাজা অসুখে প'ড়লেন। রাজা সে সময় ছোট রাণীর ঘরে ছিলেন; ছোট রাণী তখনি তাঁর বাপের কাছে এ খবর পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বাবা মন্ত্রী শ্রীগোপাল

শর্ম্মা এই খবর শুনবার জন্যই যেন অপেক্ষা ক'রছিলেন; তখনি তিনি দু'জন বদ্যি নিয়ে রাজবাড়ীতে ছুটে এলেন। তাঁরা রাজাকে তখনই ওষুধ দিলেন, ব'ললেন—ভয় নেই। রাজার কিন্তু তখন জ্ঞান ছিল না। কথাটা পাটরাণীরও কানে গেল; কিন্তু ছোট রাণীর মহলে আসবার পথে তাঁকে বাধা দেওয়া হ'ল। পাটরাণী তখনি রাজার এক বিশ্বাসী চাকরকে ডেকে চুপি-চুপি বললেন—গতিক ভাল বুঝছি নে বাবা! আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে; তুমি শীগ্‌গীর রাজবদ্যি সুসেনের বাড়ীতে যাও; তিনি কোথায় রোগী দেখতে গেছেন খবর নিয়ে—ঘোড়ায় চ'ড়ে সেইখানে গিয়ে এই বিপদের কথা তাঁকে জানাও; এই রাত্তিরেই তাঁকে আনা চাই।

রাণীর কথামত কাজটা চুপি-চুপিই করা হ'ল; কিন্তু রাজবৈদ্য সুসেন এত দূরস্থ গ্রামে রোগী দেখ্‌তে গিয়েছিলেন যে, খবর পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি রওনা হ'লেন বটে, কিন্তু আস্‌তে আস্‌তে পথেই রাতটুকু কেটে গেল। যখন রাজপুরীতে তিনি এসে পৌছলেন, তখন সবে ভোর হ'য়েছে। ও-দিকেও সব শেষ! রাজার মৃতদেহ খুব ঘটা ক'রে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য তখন আয়োজন চল্‌ছিল।

রাজবৈদ্য সুসেনকে দেখেই মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মা শিউরে উঠলেন। আর—রাজার বিবর্ণ মুখখানার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই রাজবৈদ্য সুসেন ব'লে উঠলেন, —রাজার দেহে যে বিষ ক্রিয়ার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে! ব্যাপার কি মন্ত্রি!

মুখ বাঁকা ক'রে মন্ত্রী ব'ল্‌লেন,—হ্যাঁ, রাজার দেহটাই বিষিয়ে গিয়েছিল কি না—তাতেই ওঁর মৃত্যু হ'য়েছে। মুখেও তাই বিষ-ক্রিয়ার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন।

সুসেন জিজ্ঞাসা করলেন,—রাতারাতিই রাজ-দেহ বিষিয়ে গেল কেমন ক'রে! তা কি সম্ভব হ'তে পারে?

মন্ত্রী এবার চোখ-দুটো পাকিয়ে ব'লে উঠলেন,—বদ্যি মশায়ের লজ্জা ক'রছে না, কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রতে? রাজ-সরকারের মাইনে খাচ্ছেন, অথচ দু' টাকা উপরি উপার্জ্জনের জন্য রাজধানী ছেড়ে বাইরে চ'লে গিয়েছিলেন! কার হুকুমে গিয়েছিলেন—শুনি?

কথাটা শুনেই সুসেন একেবারে 'থ'! রাজাও কোন দিন তাঁকে এমন ক'রে ধমকাননি, তিনি তাঁকে সম্মান ক'রে চলতেন; কোন দিনও তাঁর কৈফিয়ৎ চাননি। অনেক লোকের সামনে কথাটা উঠলো, তাই তিনি আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন,—কারুর হুকুম নিয়ে আমাকে কোন দিন চলতে হয়-নি। তবে বাইরে যে গিয়েছিলুম, সে রাজারই এক প্রজাকে মৃত্যু-মুখ থেকে বাঁচাতে; আর রাজাও তা জানতেন, এবং আমাকে যেতে নিষেধ করেননি। রুগীটিকে বাঁচিয়েই আমি ফিরে আসছি। কিন্তু আমার এই একটি রাত্রির অনুপস্থিতিতেই রাজা বেঘোরে মারা গেলেন, কেউ তাঁকে বাঁচাতে পারলো না! রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতেই আমাকে খবর দেওয়া হয়নি কেন?

শেষের প্রশ্নটা শুনেই মন্ত্রী রাগে জ্বলে উঠলেন। মুখখানা খিঁচিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললেন,—হ্যাঁ, রাজার চিকিৎসা বন্ধ রেখে ধন্বন্তরি ঠাকুরের সন্ধানে সারা রাজ্যটা তোলপাড় করাই আমাদের উচিত ছিল বটে! রাজার রাজ্যে ত আর কোন বদ্যি নেই! লজ্জা হ'লো না ও-কথা মুখে আন্‌তে?

সুসেন বল্‌লেন,—আছে ত অনেকেই, কিন্তু তাদের কেউ রাজাকে বাঁচাতে পারলে না কেন? রাজার দেহে উগ্র বিষের আমদানি কোথা থেকে হ'লো, কেউ তার সন্ধান ক'রেছিল? এমনও কি হ'তে পারে না যে, রাজাকে কেউ ইচ্ছে ক'রেই বিষ খাইয়েছে?

রাজবাড়ীর বিশাল প্রাঙ্গণে রাজার মৃতদেহ ঘিরে যারা শোকে আচ্ছন্ন হ'য়ে এতক্ষণ বিলাপ ক'রছিল, সুসেন বৈদ্যের এই কথা শু'নে তারা চমকে উঠলো। কি সর্ব্বনাশ! রাজবৈদ্য এ ব'ল্‌ছেন কি? এমন কি, মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মা পর্য্যন্ত এই কথায় নির্ব্বাক্! তাঁর মুখখানা হঠাৎ শুকিয়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। কেন, কে বলবে?

সুসেন এই সময় ব'ললেন,—রাজার দেহ আমি পরীক্ষা করব।—কথাটা বলেই তিনি রাজার মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেলেন; কিন্তু মন্ত্রী তখনি কেঁদো-বাঘের মতো তাঁর সামনে লাফিয়ে-পড়ে বাধা দিয়ে বল্‌লেন,—খবরদার, সরে দাঁড়ান—আমরা আপনাকে রাজার মৃতদেহ ছুঁতে দেব না।

শান্ত মুখখানা গম্ভীর ক'রে, বড় বড় জলন্ত চোখ দুটোর দৃষ্টি মন্ত্রীর ক্রুর মুখখানার ওপর স্থাপন ক'রে সুসেন দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—কেন, জান্‌তে পারি কি? রহস্যভেদ হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?

মন্ত্রী বললেন,—আপনি অনাচারী, অশুচি, অস্পৃশ্য, রাজার মৃতদেহ স্পর্শ ক'রবার অধিকার আপনার নেই।

এত বড় শক্ত কথা শু'নেও রাজবৈদ্য সুসেন রাগ ক'রলেন না, বিস্ময়ও প্রকাশ ক'রলেন না; শুধু একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে ব'ললেন,—আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তার ওপর চিকিৎসক। অনাচারী, অশুচি, ও অস্পৃশ্য আমি!—এ সকল প্রলাপোক্তির অর্থ কি?

মন্ত্রী হুঙ্কার দিয়ে উত্তেজিত স্বরে ব'ললেন,—আপনারই পেশার দোষে। যে অর্থলোভী চিকিৎসক পয়সার জন্যে মুচি-মুদ্দফরাসেরও বিছানায় ব'সতে কুণ্ঠিত নয়—তার আবার জাত? জ্যান্ত মানুষের কাছে বদ্যি হিসেবে আপনার পক্ষে সব দরজা খোলা, অবাধ আপনার প্রবেশাধিকার; কিন্তু সেই মানুষ ম'রলে তার ত্রিসীমাতেও আপনার যাওয়া নিষেধ, তা ছোঁয়া ত দূরের কথা! ব্রাহ্মণ হ'লেও হিন্দুর শাস্ত্রবিধি আপনি লঙ্ঘন ক'রতে পারেন না।

সুসেন বৈদ্য প্রতিবাদের সুরে ব'ললেন,—রাজা যত দিন বেঁচে ছিলেন, এ ব্যবস্থা দেননি কেন? তখন এ বিষয় সম্বন্ধে বোঝা-পড়া হ'তে পারতো।

মন্ত্রী ব'ললেন,—ব্যবস্থা বরাবরই আছে; এখন থেকে এই ব্যবস্থাই চলবে। আমরাই ব্যবস্থাপক।

মন্ত্রীর কথার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দলের সকলেই তাঁর প্রস্তাবের সমর্থন ক'রে ব'লে উঠলো,—মন্ত্রী-মশাই খাঁটি কথাই ব'লেছেন। রাজার দেহ নাই বা ছুঁলেন। যখন তিনি মারা গেছেন, তখন তাঁর দেহ নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেই বা কি লাভ? তাঁর দেহ পরীক্ষা ক'রে তাঁকে ত বাঁচাতে পারবেন না; তবে আর বাজে তর্কে বৃথা কেন সময় নষ্ট ক'রবেন?

কিন্তু এ সকল কথা শু'নেও সুসেন নিরস্ত হ'লেন না; তিনি ব'ললেন,—রাজার দেহ কিরূপে বিষাক্ত হওয়ায় তিনি মারা গেলেন, তা-ও তো জানা উচিত। আমার যখন সন্দেহ হচ্ছে, আমি পরীক্ষা ক'রে সে সন্দেহ ভঞ্জন করতে চাই। এ অধিকার আমার আছে, আমি যখন রাজার চিকিৎসক।

এ কথা শুনে মন্ত্রী দাঁত খিঁচিয়ে ব'ললেন,—আর আমি একে রাজার মন্ত্রী, তার ওপর তাঁর শ্বশুর—তাঁর ছোট রাণীর পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর, আমার 'ডবল' সম্মান। সুতরাং ভাল-মন্দর বিচার আমিই করব, তুমি কে হে, বাপু!—যাও, সরে পড়, শোকের সময় এ ভাবে আর বিরক্ত ক'রো না।

সুসেন বৈদ্য কিন্তু নিরস্ত হ'তে নারাজ। রাজার মৃতদেহটি দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, স্বাভাবিক ভাবে কোন রোগে তাঁর মৃত্যু হয়নি; নিশ্চয়ই তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হ'য়েছে। এর প্রতীকার তাঁকে করতেই হবে। তাই তিনি সকলকে লক্ষ্য ক'রে দৃঢ় স্বরে ব'ললেন,—আমি ব'লছি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি—রাজাকে বিষ খাইয়েই হত্যা করা হ'য়েছে। আমি এর প্রতীকার চাই, এই রাজহত্যার গুপ্ত-রহস্য আমি উদ্‌ঘাটন করতে চাই।

আগেই বলেছি, রাজার মৃতদেহ ঘিরে যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল—তাদের দলের প্রায় সকলেই এই শ্বশুর-মন্ত্রীটির হাতের লোক। রাজবাড়ীর অন্য যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, তারাও এই কুচক্রী মন্ত্রীকে ভয় ক'রতো, তাঁর আদেশ মেনে চ'লতো। কাজেই যার মনে যাই থাকুক, মন্ত্রীর ভয়ে এ-কথা শুনেও তারা টুঁ শব্দটিও ক'রল না।

মন্ত্রী এই সময় সুসেনের কথাটা অগ্রাহ্য ক'রে উড়িয়ে দিবার ভঙ্গিতে ব'ল্‌লেন,—এই বদ্যিটির মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে, তাই পাগলের মতো যা তা ব'লতে ওঁর লজ্জা হ'চ্ছে না, তোমরা ওঁর কথায় কান দিয়ো না।—দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, রাজার দেহ তুলে-নিয়ে সৎকার ক'রতে চল।

তখনই সাড়া প'ড়ে গেল।—স্তম্ভিত সুসেন বৈদ্যের চোখের ওপরেই রাজার মৃতদেহ নিয়ে বিরাট মিছিল চল্‌তে আরম্ভ ক'রল।

সুসেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে শ্মশানগামী প্রাণহীন রাজ-দেহের দিকে চেয়ে ব্যাকুল স্বরে ব'ল্‌লেন,—মহারাজ! রোগের কবল থেকে তোমাকে মুক্ত ক'রবার—তোমার

জীবন রক্ষা করবার ভার ছিল আমারই ওপর। কিন্তু রাজধানীতে আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ তোমার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। এ মৃত্যুর রহস্য আমাকে আবিষ্কার ক'রতেই হবে। আজ থেকে এই হ'ল আমার ব্রত। আমার প্রতিজ্ঞা, তোমার হত্যাকারীকে বা'র ক'রে আমি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রবই। তোমার বেতনভোগী ভৃত্য আমি, এ কর্ত্তব্য আমায় প্রাণপণে পালন ক'রতেই হবে, মহারাজ !

এর পরই মন্ত্রী তাঁর মেয়ের পক্ষ থেকে পাটরাণী ঝর্ণারাণীকে জব্দ করিবার জন্যে যে চক্রান্ত করেন, আর তা জানতে পেরে ঝর্ণারাণী সব ছেড়ে, শুধু মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্যে কি কৌশলে রাজপুরী থেকে পালিয়ে যান—সে-সব কথা তোমরা আগেই শুনেছ।

কিন্তু ঝর্ণারাণীর গায়ের রক্তমাখা চাদর, আর তাঁর মেয়ে লীনার ঘাগ্‌রাটি দেখিয়ে যখন মন্ত্রীর তরফ থেকে সকলকে জানানো হ'ল যে, তারা ডাকাতের হাতে খুন হ'য়েছে,—তখন এই সুসেন বৈদ্যই আবার তার প্রতিবাদ ক'রলেন। তিনি ব'ললেন—এ কথা সত্য হ'তে পারে না ; রাজার মৃত্যুর মতো এই কাণ্ডের ভেতরেও দুর্ভেদ্য রহস্য আছে, সন্দেহ নেই।

মন্ত্রী দেখলেন, আর সকলেই তাঁর কথা সত্য ব'লে মেনে নিচ্ছে, খালি এই লোকটাই লোকের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলে, তাঁকে অপদস্থ করবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা ক'রছে ! সুতরাং একে জব্দ না ক'রলে তাঁর কল্যাণ নেই—এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না।

রাজার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই এই মন্ত্রী হ'য়ে বসেছেন রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। বল-বুদ্ধির কলকাঠি সবই তাঁর মুঠোর মধ্যে। তাই রাজবৈদ্য সুসেনকে তাঁর চালে মাত হ'তে হ'ল। সেই যে রাজার শ্মশানযাত্রার সময় মন্ত্রী তাঁকে ব'লেছিলেন—তুমি অনাচারী, অশুচি, অস্পৃশ্য ! এই কথাগুলিই সুসেন বৈদ্যের কাল হ'য়ে দাঁড়ালো। মন্ত্রী জানতেন, নাড়ি-টেপা পেশাটির জোরে সুসেন বৈদ্য বিস্তর টাকা উপার্জ্জন ক'রতেন, আর রাজা পর্য্যন্ত তাঁকে গুরুর মতোই মানতেন, তাই—তাঁর স্বজাতি ব্রাহ্মণরা প্রকাশ্যে তাঁকে যতই শ্রদ্ধা দেখাক না কেন, মনে-মনে তাঁর হিংসা ক'রতো। এবার সুযোগ বুঝে—মন্ত্রী এই দিক দিয়ে এমনি কৌশলে কল-কাঠি টিপে দিলেন যে, ব্রাহ্মণরা এক-জোট হ'য়ে তাদের এই গুণী ও মানী স্বজাতীয় ভদ্রলোকটির পেশার দোষ ধ'রে, তাঁকে জব্দ করবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে পড়লো।

সুসেন বৈদ্যকে তারা জানালো,—আপনি আচারভ্রষ্ট হ'য়েছেন। বৈদ্য-বৃত্তি ব্রাহ্মণের নয়, এতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অমর্য্যাদা হয়। সমাজে থাকতে হ'লে আপনাকে এ বৃত্তি ত্যাগ ক'রতে হবে, আর এত দিন যে পাপ ক'রেছেন, তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আপনাকে শুদ্ধ হ'তে হবে।

চিকিৎসা-ব্যবসায় ব্রাহ্মণের পেশা নয় বটে, কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্রাহ্মণেরই সৃষ্ট। সুসেন বৈদ্য ব'ললেন,—আমি যে কাজে ব্রতী, এর চেয়ে বড় কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। মানুষকে আমি ব্যাধিমুক্ত করি, মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করি। ব্যাধির সঙ্গে-সঙ্গেই বৈদ্যের সৃষ্টি। মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বৈদ্যশাস্ত্র রচনা করেন। সৃষ্টির সূচনা থেকে ব্রাহ্মণই বৈদ্য,—ব্রাহ্মণরাই ক'রে আসছেন সকল ব্যাধিরই প্রতীকার ; আর আজ তোমরা ব'লছ, ব্রাহ্মণের পক্ষে সেটা অনাচার। আশ্চর্য্য বটে !

ব্রাহ্মণরা বললো,—মহর্ষিদের কথা আলাদা, তাঁরা ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। কলিযুগে এ সব খাটবে না। এখন আপনার সামনে দুই পথ। হয়—বৈদ্যবৃত্তি ছেড়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব্রাহ্মণ হোন, নতুবা আমাদের সংস্রব ত্যাগ ক'রে, ঐ পেশা নিয়েই থাকুন।

সুসেন ব'ললেন,—বেশ, আমি আমার পেশাকেই মেনে নিলুম। নিষ্ঠার সঙ্গে আমি বৈদ্যশাস্ত্র প'ড়েছি, বৈদ্য-বৃত্তির ভেতর দিয়েই আমি আমার জীবনের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সন্ধান পেয়েছি ; আজ তোমাদের দয়াতে এই বৃত্তিকে নিয়েই আমি একটা আলাদা জাত হ'য়ে যাচ্ছি। এত কাল বৈদ্য কথাটার মানে ছিল—বিদ্বান কিম্বা চিকিৎসক। আজ থেকে বৈদ্য ব'লতে বোঝাবে—বৈদ্য জাতি। আর আমি হচ্ছি—এই জাতের আদিপুরুষ।

রাজবৈদ্য সুব্রাহ্মণ সুসেন এই দিন থেকে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে বৈদ্য হ'লেন। শুধু বৈদ্য হ'য়েই সুসেন ক্ষান্ত হ'লেন না, প্রতিজ্ঞা ক'রলেন—এই বৈদ্যের প্রতাপে সমস্ত বাঙলাকে তিনি এক দিন স্তম্ভিত ক'রবেন।

এবার মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন! যে পাহাড়ে-মেয়েটিকে রাজ্যের সকলে পাটরাণী ব'লে জানতো, আর যার কোলের মেয়েটি তাঁর নাতনীর চেয়ে একটি মাত্র দিনের বড় ব'লে রাজার সিংহাসনে ব'সতো, রাজপুরীতে থাকলে যাদের নিয়ে গোল বাধবার একটা ভয় ছিল—তারা মানে-মানে পালাতে গিয়ে এমন জায়গায় প্রেরিত হ'য়েছে, যেখান থেকে আর তাদের ফিরে আসবার কোন আশাই নেই। তার পর—যে চালাক-চতুর রাজবৈদ্যটি তাঁর পিছনে লেগে তাঁকে বিপদে ফেল্‌তে পারতো, মাথা খেলিয়ে তাকেও তিনি মাত ক'রেছেন; এখন আর কে ঐ-সব ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আসবে? কাজেই তিনি এখন নিশ্চিন্ত হ'য়েই রাজকন্যা নীলাকে উপলক্ষ ক'রে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে বসলেন। তিনি এখন আর ঠিক মন্ত্রী নন, রাজ-প্রতিনিধি।

বাচ্চা মেয়ে নীলা একে ত রাজার মেয়ে, তার ওপরে সে-ই এখন রাজ্যের মালিক; তার সেবা, যত্ন, আদর, খাতির যে কত, সে ত তোমরা বুঝতেই পারছ! মাটিতে এখন তার পা-দু'খানি ফেলবারও জো নেই—হাজার চোখ প'ড়ে থাকে তার পানে। আর এই আদরিণী রাজকন্যাটি জ্ঞান হ'বার পর হ'তেই বুঝতে পেরেছে, তার কোনও অভাব নেই, সে যা' চাইবে, তাই পাবে। ছোটবেলা থেকেই সে দেখছে, তার মুখের একটি কথা শোনবার জন্যেই কত লোক কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে! তার মুখের কথা শুনলেই তারা হাঁটু-গেড়ে ব'সে জোড় হাত মাথায় তুলে বলে—আপনার কি হুকুম, রাজকন্যে?

তার ফল এই হ'ল যে, রাজা বেঁচে থাকতে যে মেয়ের দুরন্তপনা দেখে প্রাসাদসুদ্ধ সকলের তাক লেগে যেত, রাজার মৃত্যুর পর দাদুর অজস্র আদর-যত্নে সেই মেয়েটি এমনি অপদার্থ হ'য়ে উঠলো—যেন সে মোমের পুতুলটি!

মেয়ের এই সুখ দেখে রাণী অঙ্গনার মনে আনন্দ আর ধরে না! রাজা বেঁচে থাকতে তাঁর এই মেয়েটি যখন দুরন্তপনায় সবাইকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতো, আশে-পাশে যা চোখে প'ড়তো—তাই ফেলে, ভেঙ্গে-চুরে তছ্‌নছ্‌ করতো,—রাজা তখন তাঁর পাহাড়ে-রাণীর মেয়ে লীনাকে কোলে নিয়ে হাসতে হাসতে ব'লতেন—দেখ দেখি, এটি কেমন লক্ষ্মী! এ জানে—এক দিন একে সিংহাসনে ব'সতে হবে, তাই লক্ষ্মীছাড়ার মতো মাটিতে হুটোপুটি করতে এ রাজী নয়!

রাজার কথাগুলো তখন ছোট রাণীর গায়ে যেন কাঁটার মতো বিঁধতো! তিনি অমনি বাঘিনীর মত ছুটে গিয়ে দস্যি মেয়ের দুরন্তপনায় বাধা দিতেন; দুম-দাম ক'রে তার পিঠে কীল-চড় বসিয়ে চোখ পাকিয়ে ব'লতেন,—পোড়ারমুখী মেয়ে! কার কাছে এ-সব খেয়াল শিখিছিস্ বল্‌তো শুনি!

রাজা তখন বাধা দিয়ে ব'লতেন,—আহা ক'রছো কি? ছেলেমানুষ, ওর কি জ্ঞান-বুদ্ধি হ'য়েছে! দুরন্তপনা ওর স্বভাব, মারলে-ধরলে কি লীনার মতো সুশীলা হবে ভেবেছ?

কিন্তু সেই মেয়ে নীলার কি পরিবর্ত্তনই আজ হয়েছে! এখন সে নিজের দু'টি পায়ে তার ছোট দেহখানির ভার বইতেও নারাজ,—খেলা-ধূলা করা ত দূরের কথা। রাণী অঙ্গনা এক-একবার ভাবেন, রাজা যদি একটি দণ্ডের জন্যেও স্বর্গ থেকে নেমে আসেন এখানে, তিনি তাঁকে দেখিয়ে দেন তাঁর মেয়েটিকে; আর মুখখানা উঁচু ক'রে বলেন,—দেখছ তো, আমার বাবার হাতে প'ড়ে আমার সেই দুরন্ত মেয়ে নীলা এখন কি রকম শান্ত হ'য়েছে? তোমার সিংহাসনে তোমারি মতো কেমন ভারিক্কি হ'য়ে ব'সছে! তোমার লীনা যদি বেঁচে থাক্‌তো—পারত এমন ক'রে আমার নীলার মতো ব'সতে?

ছোট রাণীর বাবা শ্রীগোপাল শর্ম্মা নীলাকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলেন,—দেখছ ত মা, তোমার মেয়েকে কেমন মানুষ ক'রে তুলেছি? এর পর দেখবে—ওর ইসারা-তেই এত বড় রাজ্যটি চলবে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কেউ কথা কইতে পারবে না—এমনি হবে ও রাসভারী!

কিন্তু এই রাজকন্যাটিকে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে, তাতে সে শুধু নিজের দিকটাই ভাল ক'রে দেখে আসছে। সে জানে—সবারই ওপরে তার আসন, তার ওপরে কেউ নেই। এমন কি, তার দাদু, তার মা—এরাও তার হুকুমে চ'লবে। আর যারা তার পরিচর্য্যা করে, সদাসর্ব্বদা তাকে ঘিরে থাকে, তারা তো তার পোষা কুকুর, বিড়াল, গোরু, ঘোড়ারই সামিল।

অম্বা দাসী ঘুমাবার আগে রাজকন্যা নীলার পদসেবা ক'রতো। অম্বার হাত দু'খানি খুব নরম, আর পা-টেপবার ধরণটি বড় আরামের ছিল ব'লে, নীলা জানায়, সে যখন বিছানার শোবে, অম্বাই তার সেবা ক'রবে। অম্বা এতে যেন বর্ত্তে যায়; তার মনে আহ্লাদ আর ধরে না। খাওয়া-দাওয়ার পর রাজকন্যা বিছানায় শু'য়ে-পড়লেই অম্বা তার পেছনে এসে পা-দু'খানি কোলে নিয়ে বসতো; পদসেবা ক'রে তার ঘুম পাড়ায়।

এক দিন রাজকন্যা পদসেবায় একটু খুঁত পেয়ে একেবারে রেগেই আগুন!

দাসীটি নিজের কোলের ওপর পা-দু'খানি রেখে আস্তে আস্তে টিপে দিচ্ছিল। রাজকন্যা খপ্ ক'রে পা-দু'খানি তার কোল থেকে তুলে-নিয়েই সজোরে মারলে তার মুখে এক লাথি! 'মাগো'—ব'লে দাসীটি যাতনায় চেঁচিয়ে উঠলো। তখনি জানতে পারা গেল, এ দাসী অম্বা নয়! অম্বার অসুখ হওয়ায় তার বদলে অন্য একটি দাসী রাজকন্যার পদসেবা করতে এসেছিল।

রাজকন্যার রাগ আরো চড়ে গেল। অম্বার অসুখের কথা সব চালাকি! হুকুম হ'ল,—অম্বার ঘাড় ধ'রে টেনে আনো আমার কাছে, তার অসুখ আমি গুঁতোর চোটে সারিয়ে দিচ্ছি।

অম্বা দাসী মাথার অসুখে অস্থির হ'য়ে, তার ছোট্ট বিছানাটিতে প'ড়ে কাতরাচ্ছিল; সেই অবস্থায় তাকে রাজকন্যার সামনে টেনে আনা হ'ল। রাজকন্যা তার মুখের পানে একটিবার চেয়েই ব'লে উঠলো,—ঘরের দেয়ালে ওর মাথাটা তিনবার খুব জোরে ঠুকে দে, তা হ'লেই ওর মাথার অসুখ সেরে যাবে।

কথাটা শুনে সবাই যেন আকাশ থেকে প'ড়ল! সাত বছরের একটা মেয়ে—হলোই বা রাজকন্যা, এরাই একে দু'বছর বয়স থেকে কোলে-পিঠে নিয়ে মানুষ ক'রে এসেছে,—আজ কি না তারই মুখে এই নিষ্ঠুর কথা! মনে এতটুকু দরদ নেই! অসুখের জন্য পদসেবা করতে পারেনি, তার জন্যে এই কঠিন শাস্তি!

রাজকন্যা তার মাথাটি বালিসের ওপর থেকে উঁচু ক'রে দেখলো—তার দাসীরা সব খাটের সামনে কাঠ হয়ে' দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তার সেই হুকুম তামিল ক'রলো না। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো—চাঁপা দাসীর ওপরে।—অম্বার মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দেবার হুকুমটি সে তাকেই দিয়েছিল। রেশমী ঝালরের বাহার-দেওয়া, পাখীর পালকভরা মাথার বালিসটির নীচে পাণের সোণার ডিপেটি রাজকন্যার নজরে প'ড়তেই, সে খপ্ ক'রে সেটি তুলে নিয়ে, চাঁপার মাথায় সজোরে ছুড়ে মারলো। ডিপেটা গিয়ে লাগলো চাঁপার মুখে; সঙ্গে-সঙ্গে তার ঠোঁট কেটে দর-দর ক'রে রক্তের ধারা ছুটলো।—মুখে আঁচলটি চাপা দিয়ে চাঁপা হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

কিন্তু রাজকন্যা তাতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে চোখ-দুটো পাকিয়ে চাইলো শ্যামা দাসীর পানে।—তারই ওপর এবার হুকুম হ'ল,—অম্বার মাথাটা ঘরের দেয়ালে ঠুকে দে—জোরে জোরে তিনবার। দেরী করলে তোর কপালেও—

কিন্তু চাঁপার শাস্তি দেখে শ্যামার আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করতে সাহস হ'ল না। সে অম্বার মাথাটা দুই হাতে ধ'রে জোরে জোরে তিনবার তার পেছনের দেয়ালে ঠুকে দিলে!

আঘাত পেয়ে অম্বা উঠলো চীৎকার ক'রে, আর তার কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে রাজকন্যা নীলা গোলাপ ফুলের মতো তার সুন্দর মুখখানার ভেতর থেকে শাদা শাদা দাঁতগুলি বার ক'রে স্ফূর্ত্তিতে হেসে উঠলো, সঙ্গে-সঙ্গে ব'ললো, কেমন শাস্তি! মাথার অসুখ সারলো এখন?

সাত বছর বয়সেই যে-মেয়ের মেজাজ এমন বে-সায়েস্তা, এর পর তার সেই মেজাজ যে আরো কত উঁচুতে উঠেছিল, তা তোমরা সহজেই ধারণা করতে পারবে। আসছে বৈঠকে এর পরের সব কথা আমি বলবো। সে অনেক কথা, সে সব এখানেই আজ বন্ধ থাক।

—গল্প দাদু।

কাজের হদিশ

যে-কাজই আমরা করি না কেন, কাজ-হিসাবে প্রত্যেকটি কাজ করিবার বিশিষ্ট ধারা আছে। সে-ধারা মানিয়া না চলিলে এক জন যে-কাজ সহজে করিতে পারে, সেই কাজই অপরের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে!

লিখিতে বসিয়া কি ভাবে কলম ধরিব, তাহা জানা চাই; নহিলে আনাড়ির মতো কলম ধরিলে অক্ষর বা ছাঁদ খারাপ হইবে, লিখিতে সময় বেশী লাগিবে, না হয় লেখার লাইন বাঁকিয়া-চুরিয়া যাইবে।

শুধু লেখার বেলায় নয়, সব কাজের সম্বন্ধেই এ-কথা খাটে।

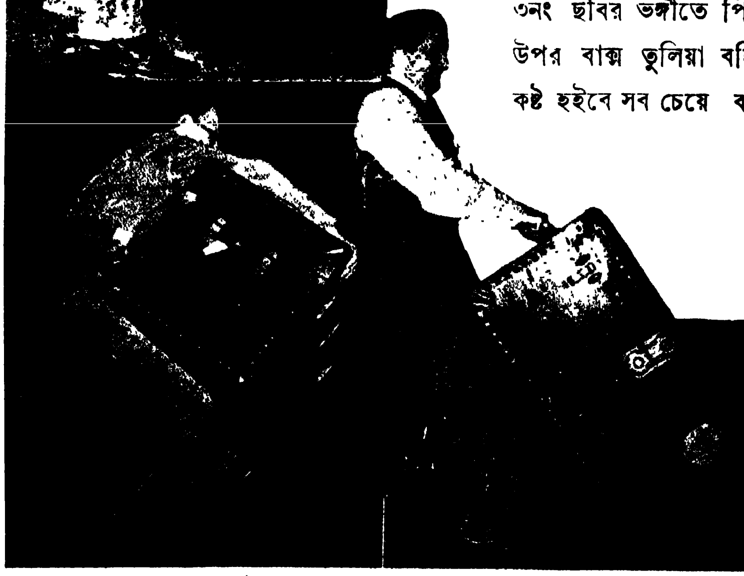
বাক্স-তোরঙ্গ বা লগেজ বহা—কেহ স্বচ্ছন্দে বহিতে পারে, আবার কেহ-বা সামান্য একটা স্যুটকেশ বহিতে হিমসিম খায়! দেওয়ালে বা প্যাকিং-বাক্সে পেরেক-আঁটা—কেহ চমৎকার টাইট-ভাবে পেরেক আঁটে, কেহ-বা পেরেক আঁটিতে গিয়া হাতুড়ির ঘায়ে আঙুল ছেঁচিয়া ফেলে, পেরেক'ও বাঁকিয়া-চুরিয়া বাহির হইয়া আসে,—দেওয়ালের গায়ে শত স্থান পেরেকের ঘায়ে চুণ-বালি খসিয়া বিশ্রী কদর্য্য হয়! এমন যে ঘটে, তার কারণ, কাজের হদিশ কেহ জানে, কেহ জানে না। যে জানে, কাজের নামে সে ভয় পায় না, তার হাতে কাজ সুসম্পন্ন হয়। আর সে-হদিশ যে জানে না, তার কাছে কাজ যেন বাঘ! তার কাজ কোনো দিন সফল বা সুন্দর হয় না। বল-খেলা বলো, চড়িভাতি বলো অর্থাৎ সকল ব্যাপারেই এ কথা খাটে। তোমাদের মধ্যে যারা বক্সিং দেখিয়াছ, কুস্তির প্যাঁচ দেখিয়াছ, নিশ্চয় তারা ওস্তাদ-খেলোয়াড়ের কৌশল দেখিয়া বিস্মিত বিমুগ্ধ হইয়াছ!

আমাদের নিত্যকার দু'-চারিটা কাজের হদিশের কথা বলিতেছি।

বড় বাক্স-তোরঙ্গ বহার কৌশলের কথা প্রথমে বলি। পর-পর যে-তিনখানি ছবি দেখিতেছ,—ভারী বড় একটা বাক্স বহার ছবি এক দিক তুলিয়া ধরিয়া হাঁটুর ভর দিয়া দু' হাতে বাক্স ধরিয়া ঐ যে টানাটানি! ইহাতে পিঠের জোরে এবং হাঁটুর পেশীর জোরে বাক্স বহিবার জন্য কষ্ট হইবে কম! এ ভাবে বাক্স না টানিয়া দু'হাতে বাক্স তুলিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে যদি পিঠ নুয়াইয়া সারা দেহ ও হাঁটুর উপর ভার-সমেত বাক্স বহি, তাহা হইলে দু'মিনিটে দম নিঃশেষ হইবে—বাক্স বহিতে জান বাহির হইয়া যাইবে। তিন রকম প্রণালীর মধ্যে কাপড়ে বাঁধিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে পিঠের উপর বাক্স তুলিয়া বহিলে কষ্ট হইবে সব চেয়ে কম!



৩। পিঠের উপর (এইটিই সেরা ধারা)



২। দু'হাতে তুলিয়া ১। বাক্স ধরিয়া টানাটানি

তার পর ৪ এবং ৫নং ছবি দ্যাখো। চারিটা স্যুটকেশ বহিতে হইবে। কি করিয়া বহিবে? ৪নং ছবির ভঙ্গীতে এক-হাতে একটি কেশ, অপর হাতে তিনটি লইয়া বহিতে গেলে দেহের ব্যালান্স থাকিবে না; দেহ এক দিকে হেলিয়া থাকিবে এবং এ-ভাবে দেহ হেলিয়া থাকিলে গায়ে ব্যথা হইবে, কষ্ট হইবে খুব বেশী এবং পাঁচ বার

বাক্স নামাইতে হইবে! এ-ভাবে চারটি স্যুটকেশ না বহিয়া ৫নং ছবির ভঙ্গীতে সমান-ভাগাভাগি ভাবে বহিলে



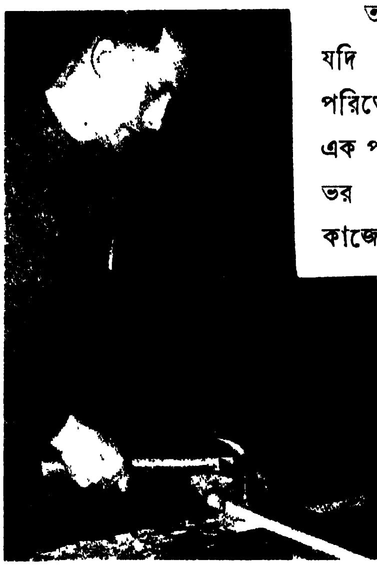
৪। এক-হাতে একটি



৫। দু'হাতে ভাগাভাগি

দেহের ব্যালান্স রক্ষা পাইবে, কষ্টও কম হইবে। এই ধরণটিই সঠিক ভঙ্গী জানিয়ো।

তার পর দাঁড়াইয়া যদি দু'-পায়ে মোজা পরিতে হয়, কি করিবে? এক পায়ের উপর দেহের ভর রাখা যায় না। কাজেই এক পা মেঝেয় রাখিয়া অপর পা তুলিয়া সে-পায়ে মোজা আঁটিবার চেষ্টা করিলে দেহের ব্যালান্স হারাইয়া টলিয়া পড়িবে। না



৬। ঠিক ধরা

পড়িলেও তাহাতে অস্বাচ্ছন্দ্যের সীমা থাকিবে না। তাহা না করিয়া এক-পা মেঝেয় রাখিয়া যে-পায়ে মোজা পরিবে, সে-পায়ের চেটো মেঝেয় রাখিয়া গোড়ালিটুকু মাত্র তুলিয়া মোজা পরিয়ো—তাহাতে দেহের সমতা রক্ষা পাইবে এবং সহজে ও স্বচ্ছন্দভাবে মোজা পরিতে পারিবে।

হাতুড়ি ধরিতে হইলে ৬নং ছবির ভঙ্গীতে হাতুড়ি ধরিয়ো। তাহাতে কব্জীতে জোর পাইবে,—হাতুড়ির আঘাত হইবে গুরুগম্ভীর ও সার্থক। ৭নং ছবির ভঙ্গীতে ধরিলে হাতুড়িকে কায়দা করিতে পারিবে না।

চেয়ারে বসা—তাহারো কৌশল জানা চাই। যখন চেয়ারে বসিবে, মাথা তুলিয়া সিধা-ভাবে বসিয়ো,—এ-ভাবে বসায় ক্লান্তি বোধ করিবে না। ঝুঁকিয়া বা বাঁকিয়া চেয়ারে বসিলে পিঠের মেরুদণ্ড ব্যথার ভরে টনটন্ করিবে, দেহে রক্ত-চলাচল-ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটিয়া পেশীগুলা দুমড়িয়া-মুচড়িয়া বেদনাতুর হইবে।

বাইসিক্ল্ চড়াতেও কৌশলের প্রয়োজন। হাঁটু

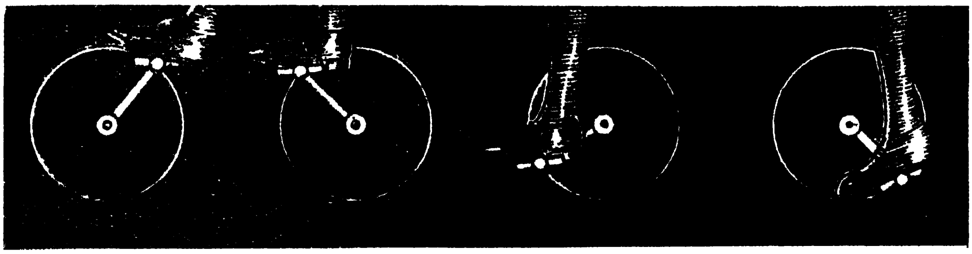


৭। ভুল হাতুড়ি ধরা

যত মোচড় পাইবে, বাইসিক্ল-চালনায় তত শ্রান্তি বোধ করিবে। তার পর বাইসিক্ল-চালনায় প্যাডলিংয়ের উপরেই দ্বিচক্র-গাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য। ৮নং ছবির

ভঙ্গীতে প্যাড্‌লে পা না রাখিয়া ৯নং ছবির ভঙ্গীতে পা রাখিয়া প্যাড্‌ল করিয়ো, দেখিবে, ছ'-সাত ঘণ্টা অবিরাম বাইসিক্‌ল্‌ চালাইলেও ক্লান্তি বোধ করিবে না—তার উপর সাইক্‌ল্‌ চলিবে দ্রুততর গতিতে!

যে-কোনো কাজই করো, দেহকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গীতে রক্ষা করিয়ো, তাহা হইলে কাজে কষ্ট বা



৮। এমন নয়   ৯। এমনি!

অস্বাচ্ছন্দ্য হইবে কম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক অবস্থানে সব কাজ কষ্টকর এবং দারুণ দুঃসাধ্য হয়, এ কথাটি সব সময়ে মনে রাখিয়ো।

— —

পলকে প্রলয়

এ্যাকসিডেণ্ট বা দৈব-দুর্ঘটনা—চক্ষের পলকে অকস্মাৎ এমন বহু ঘটনা ঘটে, যাহা নিবারণ করিবার কোনো উপায় থাকে না! অথচ এ দুর্ঘটনায় কাহারো চোট-জখম হইলে তার অব্যবহিত-পরের-ক্ষণটুকুর উপর মানুষের জীবন-মরণ অনেক-সময় নির্ভর করে! এই ক্ষণটুকুতে আমরা যদি যথারীতি কর্ত্তব্য করিতে না পারি, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!

পথে মোটর-এ্যাক্‌সিডেণ্ট কিম্বা খেলার মাঠে এ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটিলে কেহ যদি জখম হন্‌, তাহা হইলে তখান ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, দু'-চার মাইল বা দশ-বারো মাইলের মধ্যে ডাক্তার মেলে না! শ্বাসরোধ হইয়া কিম্বা দারুণ রক্তস্রাবে, কিম্বা সর্প-দংশন ঘটিলে বিষের ফলে অথবা আঘাত-জনিত 'শক্‌' (shock) বা সম্মোহে আহত ব্যক্তি মারা যাইতে পারেন। কাজেই এ অবস্থায় কি করিব?

মোটরের আঘাতে কারো চোট্‌-জখম হইলে আনাড়ির মতো তাঁকে টানা-তোলা করিতে নাই, তাহাতে বিপত্তি ঘটিতে পারে। হয় তো তাঁর বুকের পাঁজরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিম্বা গলার কোনো হাড় ভাঙ্গিয়াছে! এ অবস্থায় তাঁকে ঠাঁই-নাড়া না করিয়া যেখানে এ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটিয়াছে, সেইখানেই রাখিয়া ডাক্তার বা যাঁরা যথাযোগ্য পরিচর্য্যা জানেন, এমন কাহাকেও ডাকিয়া আনিবে!

গলার হাড় বা বুকের পাঁজরা ভাঙ্গিলে সে-অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে আনাড়ির মতো নাড়া-চাড়া করিলে নানা উপসর্গ ঘটিয়া তাঁর প্রাণনাশ ঘটিতে পারে; অথচ সতর্ক পরিচর্য্যায় এ-বিপত্তি অনায়াসে নিবারণ করা চলে।

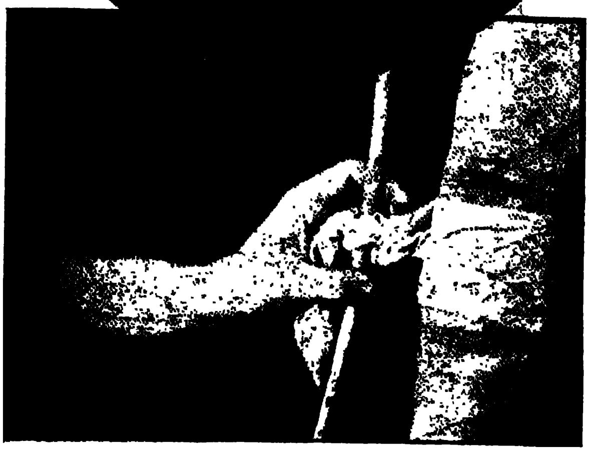
হাড়গোড়-ভাঙ্গার ফলে মানুষের মৃত্যু কিম্বা জখমী ব্যক্তি জন্মের মতো বিকলাঙ্গ হইতে পারে। এ জন্য আনাড়ি-হাতে জখমী ব্যক্তিকে টানা-হ্যাঁচড়া করা খুব অন্যায়। টানাটানিতে ভাঙ্গা হাড়ের কুচি লাগিয়া দেহের রক্তনলী (blood-vessels) ছিঁড়িয়া রক্তস্রাব ঘটিতে পারে; ক্ষত সেপ্‌টিক হইতে পারে; এবং তার ফলে হয় তো একটা অঙ্গ কাটিয়া বাদ (amputation) দিতে হয়! পাঁজরার ভাঙ্গা হাড়ের খোঁচায় ফুশফুশ-যন্ত্র ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, তার ফলে মৃত্যু সুনিশ্চিত! কোথায় হাড় ভাঙ্গিয়াছে, বুঝিবার উপায় যখন নাই, তখন পথে বা খেলার মাঠে কিম্বা অন্য জায়গায় এ্যাক্‌সিডেণ্টে কাহারো চোট্‌-জখম হইলে আনাড়ি-হাতে কদাচ তাঁকে টানা-তোলা করিয়ো না! সে-অবস্থায় তাঁকে যতখানি স্বচ্ছন্দ রাখিতে পারো, রাখিবে; তার বেশী আর-কিছু করিয়ো না!

হাড় ভাঙ্গিলে splint বা বাড় বাঁধিতে হয়। এ-কাজ বিশেষজ্ঞ ভিন্ন আর কাহারো করা উচিত নয়। বাঁধার ত্রুটিতে অনেকে পরে বিকলাঙ্গ হইতে দেখা গিয়াছে। এ জন্য এ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটিলে যোগ্য চিকিৎসকের

পরিচর্য্যা-লাভের পূর্ব্বে কি করা উচিত, ছোট বয়স হইতে তাহা শেখা প্রয়োজন। সে-সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি সাধারণ ক'টি কথা তোমাদের বলিয়া রাখি। কথাগুলি ভালো করিয়া বুঝিবে। এই প্রাথমিক বিধি জানা থাকিলে এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটিবার পরক্ষণেই যোগ্য সেবা-পরিচর্য্যায় আহত ব্যক্তিকে



১। হাতের রক্ত বন্ধ করা



২। টুর্ণিকেট-রীতি

শুধু যে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে সমর্থ হইবে, তা নয়; বহু ক্ষেত্রে তাদের প্রাণ-রক্ষা করিতে পারিবে।

দেহের কোনো জায়গার হাড় ভাঙ্গিলে তার পরিচর্য্যার জন্য যোগ্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য পাইতে যদি বিলম্ব হয়, তাহাতে তেমন অনিষ্ট হইবে না; কিন্তু আঘাতের ফলে যেখানে প্রচুর রক্তস্রাব ঘটিতেছে, সেখানে আশু-প্রতিকারের উপায় না করিলে ফল হইবে সাংঘাতিক!

শিরা-বন্ধনী কাটিয়া-ছিঁড়িয়া রক্তস্রাব ঘটিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে মানুষের মৃত্যু ঘটা বিচিত্র নয়! আহত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব ঘটিতেছে দেখিলে প্রথমেই হাতের চাপ দিয়া সে-রক্ত বন্ধ করিতে হইবে। যেখান দিয়া রক্ত পড়িতেছে, সেই জায়গা এবং যেখানে হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থান, এই দু'জায়গায় আঙুল দিয়া চাপিয়া থাকিবে বহুক্ষণ,—যতক্ষণ না রক্তস্রাব বন্ধ হয়! আমাদের দেহের ক'জায়গায় হাড়ের উপর দিয়া শিরা-উপশিরা বহিয়া গিয়াছে; এ শিরা-বন্ধনী কাটিলে যদি এ শিরা-বন্ধনীর অবস্থান নির্ণয় করিতে পারো, তাহা হইলে রক্তপড়া বন্ধ করা সহজ হইবে। সে-অবস্থান শিখিতে হইবে সচিত্র শরীর-তত্ত্বের বই পড়িয়া। এ্যাডভেঞ্চার এবং রূপকথার গল্প-কাহিনীর মতো এ-বই পড়িয়া আয়ত্ত করা প্রয়োজন। কারণ আত্মীয়-বন্ধু, সঙ্গী-সহচর-দিগের মধ্যে কার কবে এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটিবে, জানা নাই! এ বিদ্যা জানা থাকিলে এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটিলে বহু ক্ষেত্রে তাদের যে অকাল-মৃত্যু ঘটিবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই!

টুর্ণিকেট-রীতিতে (২নং ছবি ছাখো) দারুণ রক্তস্রাব চক্ষের নিমেষে বন্ধ করা যাইবে। রক্তস্রাব হইতেছে দেখিলে তখনি ক্ষতস্থানে কাপড় বা উড়ানি ছিঁড়িয়া কিম্বা রুমাল, মোজা অথবা তুলার প্যাড—অর্থাৎ নরম কোনো আচ্ছাদনী দিয়া বেশ চওড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। আঁট্ করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না; পনেরো মিনিট অন্তর এ-বাঁধন একবার করিয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া চাই, নহিলে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত-চলাচলের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিতে পারে। এ-ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া যোগ্য চিকিৎসক আনাইতে ভুলিয়ো না। আহতকে টানাটানি করিয়া এ-সময় চিকিৎসকের কাছে লইয়া না গিয়া আহতকে বিশ্রাম করিতে দিয়ো!

আঘাত-জনিত শক্ বা উত্তেজনা বড় ভয়ঙ্কর! দেহের হাড় ভাঙ্গিলে বা রক্ত-ক্ষরণ হইলে সে-শকে অনেক সময় মৃত্যু ঘটে। সে-শক্ নিবারণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়,

—কাজেই এ বিপদে মানুষ যেটুকু করিতে পারে, সেটুকু করিতে যেন কালক্ষেপ, গোলযোগ বা চেঁচামেচি না হয়,—সে সম্বন্ধে হুঁশিয়ার!

শকের লক্ষণ প্রকাশ পায় আহতের বিবর্ণতায় এবং মূর্চ্ছাতুর ভাবে! শকের জন্য কপালে এবং করতলে গভীর স্বেদ-সঞ্চার হয়; হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হইয়া আসে; এবং নাড়ীর গতি অতিশয় ক্ষিপ্র ও ক্ষীণ; এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়মিত হয়। অনেক সময় শীতকম্প ও বিবমিষা দেখা দেয়। চেতনা থাকিলেও রোগী কেমন আচ্ছন্নের মতো হইয়া পড়েন; তাঁর চিন্তাশক্তি লোপ পায়। তিনি কথা বলিতে পারেন না। 'কেমন আছো?' বার-বার জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর মেলে না! কিম্বা উত্তর যদি বা মেলে, সে-উত্তর হয় অতি-ক্ষীণ! রোগী বড়-জোর বলেন, 'দুর্ব্বল' কিম্বা 'শীত করিতেছে'।



৩। খপরের কাগজ দিয়া বাড় বাঁধা

এ-অবস্থা ঘটিলে রোগীকে গরম (warm) করা চাই। শাল, আলোয়ান, সুজনি, কম্বল, গরম জামা বা হাতের কাছে হাল্‌কা যে-কাপড় মিলিবে, তাহা দিয়া তখনি তাঁর দেহ বেশ ঢাকিয়া দিবে। সম্ভব হইলে গরম জলের বোতল লইয়া সেঁক দিবে। বোতল, ফ্লানেল কাছে না থাকিলে 'থান্‌-ইট' তাতাইয়া তার সেঁক দিবে। এ সময় গা ডলিয়া দিলে বিশেষ লাভ হইবে না। তা ছাড়া গা ডলিয়া দিতে গেলে গায়ের আচ্ছাদনী খুলিয়া দিতে হয়। সে-কাজ সম্পূর্ণ অনুচিত হইবে।

মস্তিষ্কে কিম্বা হৃদ্‌যন্ত্রে অপ্রচুর রক্ত-সঞ্চালনহেতু 'শক' হয়। এ জন্য আহতকে এ সময় ঠিক-ভাবে অবস্থিত রাখিবে। এ অবস্থায় রোগীকে লম্বালম্বি ভাবে শোয়াইয়া দিয়ো। মাথায় বালিশ দিয়ো না—মাথা নীচুতে রাখিয়া কোমর হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত উচু করিয়া রাখিবে। বুকে চোট্‌ না লাগিলে এ-অবস্থায় রোগীকে কখনো বসিয়া থাকিতে দিবে না। মাথায় চোট লাগিলে লম্বালম্বি ভাবে তাকে শোয়াইয়া রাখিবে—পা যেন উর্দ্ধে তোলা না থাকে।

আহতকে কিছু গরম দুধ খাইতে দিতে পারো' তবে না দিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, ষ্টিমুলাণ্টের চেয়ে এ-সময় দেহে উত্তাপ-দান ও দেহকে সঠিক ভাবে শায়িত রাখার প্রয়োজন অনেক-বেশী। এ সময় আধ-গ্লাস জলে এক-চামচ (চায়ের চামচ) অ্যারোমিটিক স্পিরিট অফ এ্যামোনিয়া পান করাইলে অনেক উপকার হইবে! দুধের চেয়ে গরম চা, গরম কফি উপকারী। চামচে



৪। এমনি করিয়া চেয়ারে বসাইয়া

করিয়া পান করাইবে; কিম্বা সামর্থ্য থাকিলে রোগী চুমুক দিয়া পান করিবেন। এক-চুমুকে নিঃশেষ পান করা নয়—ঢোকে-ঢোকে পান করাইয়ো। ব্রাণ্ডি কদাচ দিবে না; কারণ, ব্রাণ্ডির ফল অবসাদ-জনক (depressing).—Alcoholic drinks at such time are depressants not stimulants and should not be given. তবে রক্তক্ষরণ বন্ধ হইবার পূর্ব্বে কিম্বা রোগী যদি অচেতন থাকেন, তাহা হইলে কোনো পানীয় তাঁর মুখে দিবে না।

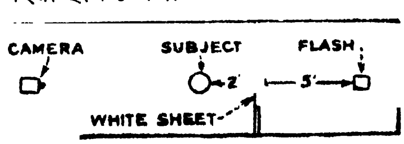
আহত ব্যক্তিকে বহিবার সময় পাঁজাকোলা করিয়া বহা উচিত নয়। পূর্ব্ব-পৃষ্ঠার ৪নং ছবির ভঙ্গিতে চেয়ারে বসাইয়া তাঁকে লইয়া যাইবে।

কেহ বিষপান করিলে তখনি চিকিৎসক ডাকিবে। পাকস্থলী ধোয়াইয়া এ বিষ নিষ্কাশিত করা প্রয়োজন। বিষ-নিষ্কাশনের জন্য রোগীকে সাবান-জল বা লবণ-জল কিম্বা দুধ, কফি বা সুপ পান করিতে দিবে। ইহাতেও যদি বমি না হয়, জল পান করাইয়া গলার বাহিরে শুড়শুড়ি দিবে। শুড়শুড়ি দিলে রোগীর বমি হইবে; সে-বমির সঙ্গে বিষ নিষ্কাশিত হইবেই। এ সময়ে তরল পানীয় প্রচুর পান করাইয়ো। তাহাতে বমি হইবে এবং বমি হইলে বিষ বাহির হইয়া যাইবে। এ পরিচর্য্যা করিলেও খুব-শীঘ্র চিকিৎসক আনাইবার ব্যবস্থায় যেন ক্রটি না হয়।

আমাদের ফুশ্ফুশ্-যন্ত্রটি যদি যথারীতি অক্সিজেন-বাষ্প পাম্প করিয়া দেহে পরিচালিত করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের শ্বাসরোধ (suffocation) ঘটে। গলায় দড়ি, বিষবাষ্প-গ্রহণ, জলে ডোবা, বৈদ্যুতিক শক্—এ সবে শ্বাসরোধ ঘটে। শ্বাসরোধ ঘটিলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-বহানো (artificial respiration) প্রয়োজন। এ জন্য চিকিৎসকের শরণ-গ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য। কারণ, এ বিদ্যা বই পড়িয়া শেখা যায় না।

চিত্র-চতুরিকা

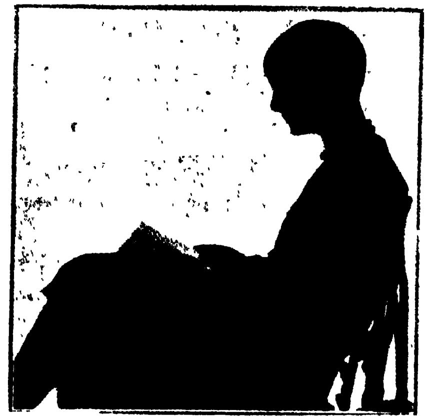
তোমাদের মধ্যে অনেকের ক্যামেরা আছে এবং সে ক্যামেরা লইয়া ছবি তোলার কাজে কেরামতি দেখাইবার



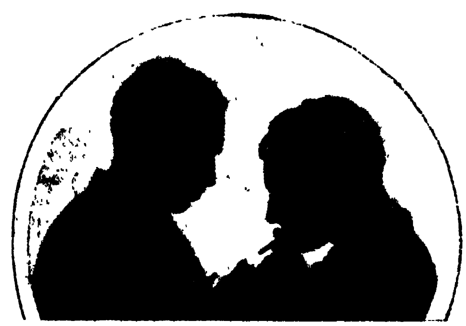
১। অবস্থান-নির্দ্দেশ

জন্য তোমরা আকুল! 'মাসিক-বসুমতী'র ১৩৪৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যায় ক্যামেরার কেরামতির কয়েকটি কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, আজ আবার কিছু নূতন-কথা বলিতেছি।

প্রথমেই ধরো সিলুয়েট-ছবি। ২নং ছবিতে যে-সিলুয়েট দেখিতেছ, এ-সিলুয়েট কি করিয়া তুলিবে? যাঁর ফটো তুলিবে, তাঁকে বসাও বড় একখানি পর্দ্দার দু' ফুট দূরে

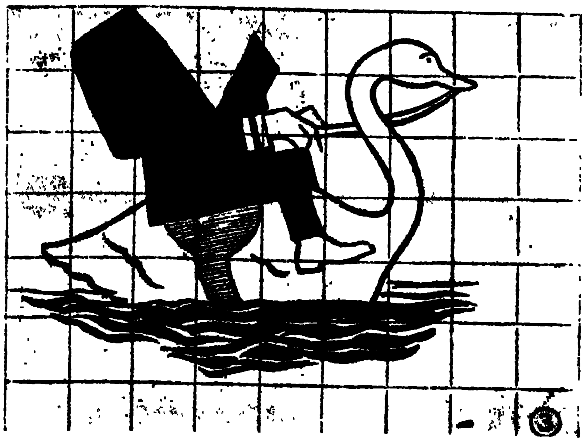

২। সিলুয়েট

সামনে। বিছানার চাদর খাশা পর্দ্দা হইবে। পর্দ্দার পাঁচ ফুট পিছনে রাখো ফ্ল্যাশ্-লাইট—আর যাঁর ছবি তুলিবে, তাঁর সামনের দিকে রাখো ক্যামেরা। যে-ঘরে ছবি তুলিতেছ, সে-ঘরটি অন্ধকার করিয়া দাও। কোথাও এতটুকু রন্ধ্র-পথ দিয়া যেন এক বিন্দু আলো এ-ঘরে না প্রবেশ


৩। আর একখানি সিলুয়েট

করে! যাঁর ছবি তুলিতেছ, তাঁকে এমন ভাবে বসাও যে, তাঁর মুখ সম্পূর্ণ "প্রোফাইলে" থাকিবে। চোখের পাতার ছায়াও যেন ক্যামেরায় আভাসে না দেখা যায়, এমন ভাবে বসাইতে হইবে। তার পর ক্যামেরার শাটার খুলিয়া পিছনকার ঐ আলো জ্বালিয়া দাও। আলো জ্বলিবামাত্র ক্যামেরার শাটার বন্ধ করো—ব্যস্! এবার ঘরের দ্বার-জানলা খুলিয়া দাও। তোমার

কাজ চুকিয়া গিয়াছে। ছবি ডেভেলপ আর প্রিণ্ট? মামুলি প্রথায় করো। ১নম্বরের রেখা-চিত্র দেখিলে ক্যামেরা ও পর্দ্দা প্রভৃতির অবস্থানের হদিশ পাইবে।



৪। আঁকিয়া লও



৫। আজব ছবি

তার পর কার্টুন বা আজব ছবি! প্রথমেই ৪নং ছবির মতো একখানি রঙ্গ-চিত্র আঁকিয়া লও। এটি ফটোর 'ফোর-গ্রাউণ্ড'। এ ছবির মূর্ত্তির ঘাড়ে মুখ ও মাথা থাকিবে না। গলার নীচে এই ছবি রাখিয়া (৬নং ছবির ভঙ্গীতে) ফটো তুলাও—৫নং ছবির মতে ফটো উঠিবে! এ-রকম কার্টুন-ফোর-গ্রাউণ্ড বাজারে অনেক কিনিতে পাওয়া যায়। কিম্বা এরূপ রঙ্গ-চিত্র ইণ্ডিয়া-ইঙ্ক দিয়া মোটা কাগজে আঁকিয়া লইতে পারো! এ ফটো তুলিবার সময় যাঁর ছবি তুলিতেছ, তাঁর পিছনে সাদা একখানি বিছানার চাদর খাটাইয়া দিয়ো।

পরপৃষ্ঠায় ১০নং ছবি দেখিতেছ—ভদ্রলোকটি কত বড় মাছ ধরিয়াছেন! এমন মাছ জলে মেলে? এ-ছবি তুলিতে হইলে ৪৭৫ পৃষ্ঠায় ১৩নং ছবির ভঙ্গীতে ছিপে মাছ গাঁথিয়া সেই ছিপ হাতে লইয়া দাঁড়াও। দাঁড়াইয়া তোমার ভাইকে বা বন্ধুকে বলো তোমার ছবি তুলিতে। ছিপ, মাছ এবং ক্যামেরার অবস্থান হইবে ঠিক এই ৫নং ছবির মতো! তার ফলে মাছ-হাতে তোমার যে-ছবি, সে-ছবি হইবে ঠিক ঐ ১০নং ছবির মতো।

পরপৃষ্ঠায় ৭নং ছবিখানি দেখিতেছ! বারো-হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো নয় কি? ছেলের



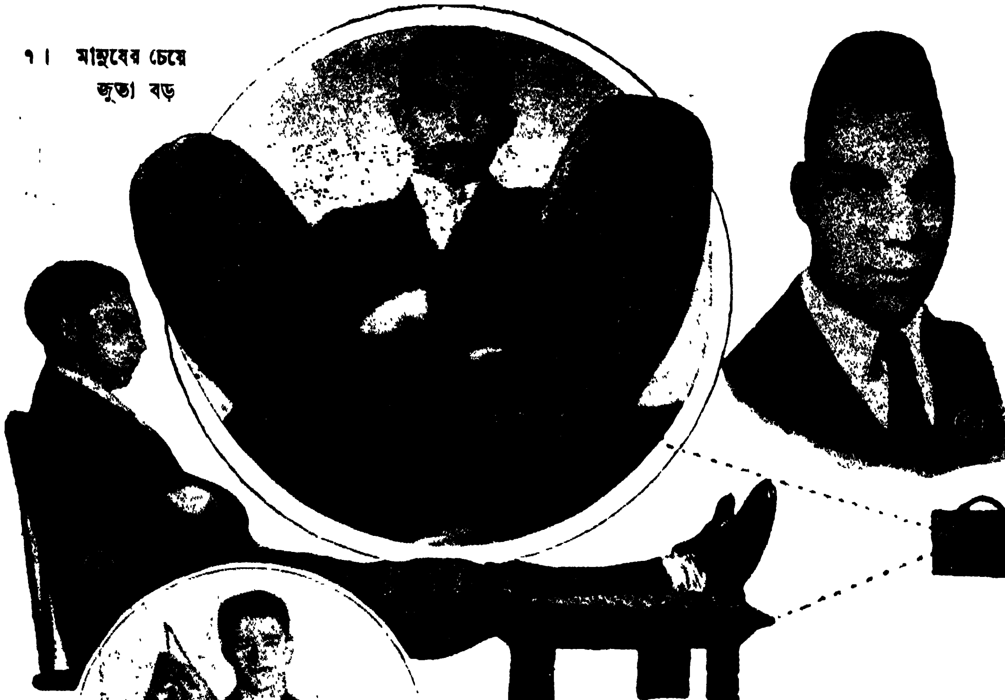
৬। ছবি লইয়া বসা

পায়ের জুতা-জোড়া ছেলেটির চেয়েও বড়! এ-ছবি তুলিতে হইলে যার ছবি তুলিবে, তাকে বসাও ঐ ৯নম্বর ছবির ভঙ্গীতে। একখানা চেয়ারে বসাইয়া খানিকটা দূরে একটা টুলের উপর দুই পা সে প্রসারিত করিয়া দিবে! এইবার সামনে ক্যামেরা লইয়া ফটো তোলো—৭নং ছবির মতো অতিকায়-জুতা-সমেত ফটো উঠিবে।

৮নং ফটোতে এ ভদ্রলোকটির মুখের এ কেমন গড়ন! তার পর ঐ ৪৭৫ পৃষ্ঠায় ১২নং ছবির মুখ? ফটোয় এমন মুখ কি করিয়া ফুটিল? এ ধরণের ফটো লইবার রীতি—যাঁর মুখ এমনি ভাবে ফটোয় গড়িতে চাও, তাঁর একখানি ফটোগ্রাফ লইয়া সে-ফটোগ্রাফখানির মুখ-ভাগটুকু হাত দিয়া চ্যাপ্টাইয়া-কুঁচ্কাইয়া-দুমড়াইয়া সেই চ্যাপ্টানো-তোব্ড়ানো মুখের ফটো তোলো—এমনি

মুখের ছবি পাইবে। অভ্যাসে ছবি দুমড়ানো-মুচড়ানোর কায়দা রপ্ত হইবে।

পরের পাতায় ১১নম্বর বোতলের গায়ে ঐ মেয়েটির ছবি! মেয়েটি নিশ্চয় বোতলের মধ্যে ঢোকে নাই! তবে কি করিয়া এমন ফটো হইল? ঘন-কালো পর্দ্দার সামনে দাঁড় করাইয়া মেয়েটির ফটো লওয়া হইয়াছে! ক্যামেরা ছিল মেয়েটির কাছ হইতে পনেরো ফুট দূরে। মেয়ের ফটো তুলিয়া তার পর মাপ কষিয়া একটি বোতলকে এমন ভাবে রাখিতে হইবে—যেন ঐ বোতলের মাঝামাঝি পূর্ব্ব-গৃহীত মেয়ের ছবি সঠিক প্রতিফলিত হয়। এবার কিশোরীর প্রতিচ্ছবি-সমেত ঐ প্লেটটি আর-একবার বোতলের সামনে এক্সপোজ করো! মাপজোপ কষিতে যদি ভুল না হয়, তাহা হইলে বোতল ও মেয়ে—দু'জনের প্রতিচ্ছবি ১১নং ছবির ভঙ্গীতে মিলিয়া-মিশিয়া এমনি অপরূপ ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইবে! বোতলের ফটো তুলিবার সময় এক্সপোজারের সময়টুকু বাড়াইতে হইবে। দু'-চারিবার অভ্যাস করিলেই এ-কাজ রপ্ত হইবে।



৭। মানুষের চেয়ে জুতা বড়

৮। এ কেমন মুখ!

৯। এমনি পা রাখিয়া ছবি তোলা



১০। কত বড় মাছ

ক্যামেরা লইয়া এ-কেরামতির কাজ—অভ্যাসে কত বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তার সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা চলে না!

মানুষ হওয়া

মানুষের মতো মানুষ হ'তে গেলে শুধু লেখাপড়ায় পাশ করলেই চলবে না! সকলে যাতে তোমাকে ভালোবাসেন,

তোমার সঙ্গ কামনা করেন, এমন ভাবে নিজেকে গড়ে তোলা চাই। অর্থাৎ সদালাপী, অমায়িক, নিরহঙ্কার, উদার এবং শিক্ষা-বিভূষিত হ'তে হবে। সমাজে পয়সা-কড়ির আদর আছে, সত্য। সকলের পক্ষে পয়সা-কড়ি প্রচুর ভাবে উপার্জ্জন করা সম্ভব না হ'তে পারে; কিন্তু মানুষ হবার জন্য যে গুণগুলির উল্লেখ করলুম, ও-সব গুণের অধিকারী হওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব। কি করে এ গুণগুলি আয়ত্ত হবে, বলি।

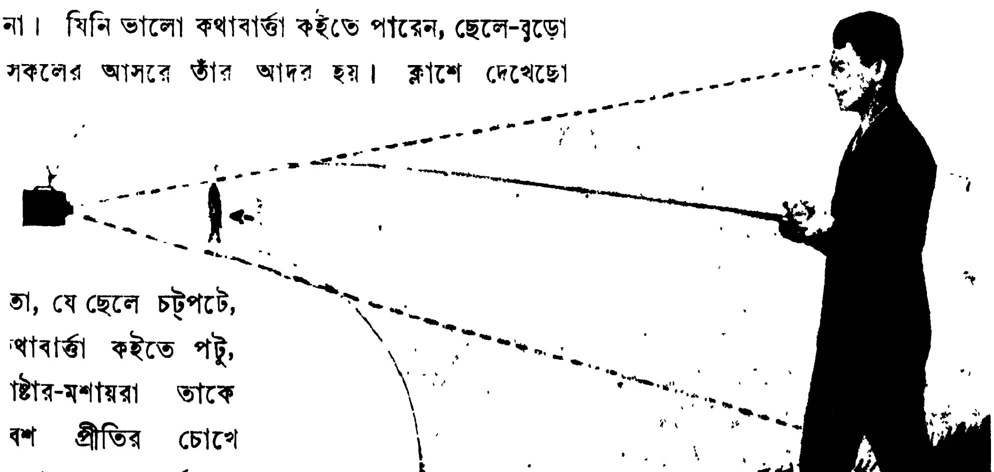
সদালাপী হবার কথা বলছি। স্কুলে পড়া-শুনার মধ্যে গল্প-সল্প করার অবসর মিলবে না। পড়াশুনার পর অবসর ঘটলে আলাপ-আলোচনার চর্চ্চা করতে হবে। বি-এ, এম-এ পাশ করে অনেকে তেমন কথা-বার্ত্তা কইতে পারেন না—গম্ভীর জড়ভরত হয়ে থাকেন। এমন লোককে কেউ ভালোবাসে না। যিনি ভালো কথাবার্ত্তা কইতে পারেন, ছেলে-বুড়ো সকলের আসরে তাঁর আদর হয়। ক্লাশে দেখেছো তা, যে ছেলে চট্‌পটে, 'থাবার্ত্তা কইতে পটু, াষ্টার-মশায়রা তাকে বশ প্রীতির চোখে দখেন। কথা-বার্ত্তা যা ইবে, সে কথা-বার্ত্তা যেন বয়সানুরূপ হয়; জ্যাঠামিতে পর্য্যবসিত না হয়! যখনই কথা কও, মন খুলে কথা কইবে। কথা-বার্ত্তায় অশোভনতা বা অভদ্রতা যেন কখনো না প্রকাশ পায়।



১১। বোতলের মধ্যে মেয়ে



১২। মুখের রকমফের



১৩। মাছের ছবি তোলা

কথাবার্ত্তায় পটু হ'তে পারলে দেখবে, মেজাজও কখনো কটু হবে না! বাক্যে এবং আচরণে রূঢ়তা বর্জ্জন করে চলতে হবে। অভ্যাসে এ গুণ সহজে আয়ত্ত হবে। মেজাজ খারাপ করে কটু কথা বলায় বাহাদুরি নেই—বাহাদুরি জেনো খারাপ-মেজাজ জাহির না করে আত্ম-সংযমে! কি করে কথাবার্ত্তায় পটুতা লাভ করা যায়, বলি। যা দেখেছো, যা শুনেছো—সে অভিজ্ঞতার বিবরণ নিখুঁত ভাবে দেবার চেষ্টা করবে। অতিরঞ্জন করো না—

অত্যুক্তি করো না—মিথ্যা বলো না। অতিরঞ্জন, অত্যুক্তি বা মিথ্যা-কথনে দুনিয়ায় হাস্যাস্পদ হ'তে হয়, এ কথা মনে রেখো। লোকে তাহ'লে চালিয়াৎ বলে ঘৃণা করবে।

কোনো বই প'ড়ে নতুন কিছু যদি শিখতে পারো, তার বৃত্তান্ত সহজ ভাষায় বলবার চেষ্টা করবে। ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে আসর বসিয়ে এ সব কথার আলাপ-আলোচনা করো। পথে বেড়াতে বেরিয়ে যা-কিছু দেখবে, তার ধারাবাহিক বৃত্তান্ত বিবৃত করো। তার পর বইয়ে-পড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা নিয়ে আলোচনা করবে। ভাই-বোন ও আত্মীয়-বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করো—

আকাশে সব-চেয়ে ঐ যে বড় তারাটি—ওর নাম কি ?

গাছে লোণা জল দিলে গাছ মরে যায় কেন ?

আমরা কেন হাঁচি ?

হাঁসের ডানা জলে ভেজে না কেন ?

এ সব কথার আলোচনায় সকলের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। তার পর নিত্য-দিন খপরের কাগজ পড়া চাই। পলিটিক্স সম্বন্ধে বাড়ীতে বাবা-মা জ্যাঠা-কাকা যে-সব আলোচনা করেন, তা শুনে পলিটিক্স সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবে; তাতে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে। দাদার কাছ থেকে খেলা-ধূলার রিপোর্ট শুনবে; দিদিদের কাছ থেকে রান্না-বান্না ও পোষাকের ফ্যাশন-বিবরণ সংগ্রহ করবে; মায়ের কাছ থেকে নিত্য কত কি শিখতে পারো! পত্র-পত্রিকাদিতে যে সব কার্টুন-ছবি ছাপা হয়, সেগুলি দেখবে, বুঝবে। ভালো কবিতা-গল্প পড়বে। ভালো কবিতা মুখস্থ করবে। এমনি ভাবে দেশ-বিদেশের বিচিত্র সংবাদ নিত্য-দিন ঠিক করে জানতে হবে। জানলে অনেক-কিছু শিখবে; এবং সে-সব কথা নিয়ে আসরের আলোচনাকে সরস, সুমধুর, সরল করে তুলতে পারবে। সরস কথা বলবার ভঙ্গী আয়ত্ত হ'লে আলাপে-আলোচনায় যে-পটুতা লাভ করবে, সারা জীবন তার জন্য সুখময় হবে।

দেশের কোন্ বড়লোক কবে জন্মেছিলেন বা মারা গেছেন, এ-সবের সাল-তারিখ যেন কণ্ঠস্থ থাকে! মহাপুরুষদের জীবন-চরিত পড়ে তাঁদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি আয়ত্ত করে রাখা চাই। তাহ'লে জগতে কারো কাছে কোনো তর্কে যেমন পরাস্ত হবে না, নিজের তেমনি পটুতায় পরিতৃপ্তি বোধ করবে।

মানুষ হ'তে হ'লে আর-একটি গুণ থাকা চাই। সে গুণ—কোনো-না-কোনো-রকম একটা সখ থাকা চাই। মাছ-ধরা, টিকিট-জমানো, পাখী-পোষা—এমনি কোনো সখ! বিখ্যাত দার্শনিক হাজলিট বলেন,—যে-লোকের কোনো-রকম সখ নেই, সে অপদার্থ!

খেলা-ধূলায় বিরাগী হ'লে চলবে না। মনের উপর বিরাট গাম্ভীর্য্যের পাথর চাপিয়ে রাখলে সে-পাথরের চাপে মনুষ্যত্ব চূর্ণ হয়ে যাবে—এ-কথা মনে রেখে মনকে সরস-সরল-সজীব রাখতে হবে।

ধন্যবাদ

তোমাদের এই উৎসবে সখি, ডাকোনি যে মোরে, ধন্যবাদ !
মানিনি দুঃখ, করিনি ভিক্ষা, ধরিনি মর্ম্মে অন্য সাধ।
যেথা এসেছিল বড় বড় রথী,
সেথায় যাওয়া কি নহে দুর্মতি ?
উঠেছিল যেথা মলি-চামেলির চাটুকারিতার জয়-নিনাদ,
তোমাদের সেই উৎসবে সখি, ডাকোনি যে মোরে, ধন্যবাদ !

হংসের মাঝে বকের সমান থাকিতাম আমি দীপ্তিহীন;
না জানি কখন কি কথা বলিয়া আখ্যা পেতাম অর্ব্বাচীন!
ও দ্বারে মোটর রহিত না খাড়া,—
সোফার দিত না গুম্‌ফেতে চাড়া;
আমারে দেখেই মহাগুণী জন হয় তো হ'তেন সুকঠিন!
হংসের মাঝে বকের সমান রহিতাম আমি দীপ্তিহীন!

নব্যারা দেখে হয় তো জলিত,—আরো তাহাদের জননীগণ!
কি জানি কখন কাহার কোপেতে ভস্ম হইত এ অভাজন!
কি যে সভ্যতা—কি যে মাধুরিমা,
কত সহনীয় ন্যাকামির সীমা—
না জানি কখন্ না বুঝিয়া হায়, করিতাম শেষে কি অপরাধ!
তোমাদের এই উৎসবে সখি, ডাকোনি যে মোরে, ধন্যবাদ !

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায়, বহুবিধ অনুমানে এবং সুলভ জনরব প্রচারে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আর একটি মাস অতিবাহিত হইয়াছে। প্রধানতঃ জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্বন্ধেই এই প্রতীক্ষা, অনুমান ও জনরব-প্রচার।

এক মাস পূর্ব্বে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটেনের সাফল্যের পর বহু কাল বার্দ্দিয়া অবরোধ করিয়া সম্প্রতি বৃটিশ বাহিনী উহা অধিকার করিয়াছে; আলবেনিয়ায় গ্রীক্ সৈন্যের অগ্রগতির দ্রুততা অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়াছে; অন্তরীক্ষে ও সমুদ্রবক্ষে জার্ম্মাণীর তৎপরতা সমভাবেই চলিতেছে; কূটনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর প্রয়াস এখনও শেষ হয় নাই। নিরপেক্ষ শক্তিগুলির মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় নাজী-ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সোভিয়েট রুশিয়ার মনোভাব আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং জাপানের সুর কিঞ্চিৎ নরম হইয়াছে।

উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধ—

ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃটিশ সৈন্যগণ অকস্মাৎ উত্তর-পশ্চিম মিশরে আক্রমণ করিয়া ইটালীয়দিগকে ঐ অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত করে। তাহার পর, বৃটিশ বাহিনী মিশরের সীমান্ত পার হইয়া লিবিয়ায় প্রবেশ করে, এবং সীমান্তের নিকটবর্ত্তী ইটালীর বার্দ্দিয়া দুর্গটি অবরোধ করে। এই দুর্গে প্রবল ভাবে আক্রমণ চালাইয়াও বৃটিশ বাহিনী তিন সপ্তাহের মধ্যে উহা অধিকারে সমর্থ হয় নাই। সম্প্রতি বার্দ্দিয়ার পতন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে বৃটিশ-বাহিনী পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে ইটালীর অন্যতম প্রধান নৌ-ঘাঁটী তব্রুক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে, বৃটিশ বাহিনী তব্রুকের ১৫ মাইল দূরে পৌছিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্যের সাফল্য-সম্পর্কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিল বলিয়াছেন যে, ইহা আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যের প্রথম শ্রেণীর বিজয়—"they constitute a victory which in this African war is of the first order." কেবল আফ্রিকায় কেন—বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর স্থলভাগে ইহাই বৃটিশ বাহিনীর সর্ব্বপ্রথম বিজয়লাভ। নরওয়ে, ডান্‌কার্ক, বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড এবং আফ্রিকার অন্যান্য রণক্ষেত্রেও এত দিন বৃটিশ সৈন্যের "সাফল্যজনক প্রত্যাবর্ত্তনের" কাহিনীই বিশ্ববাসী শ্রবণ করিয়াছে, এত দিন পুনঃ পুনঃ "সাফল্যজনক প্রত্যাবর্ত্তনের" ফলে বৃটিশ বাহিনীর যে সামরিক মর্য্যাদার হানি হইতেছিল, তাহা এইবার তাহাদিগের সাফল্যজনক অগ্রগতিতে পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বৃটেনের বিনষ্টপ্রায় সামরিক মর্য্যাদার পুনরুদ্ধারে ভারতীয় সৈন্যদল বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। লিবিয়ায় অতঃপর যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ হইবে, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, বৃটিশ বাহিনী যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে প্রতিরোধ করা ইটালীয়দিগের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। মিশর ও লিবিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা যদি অতিরঞ্জিত না হয়, তাহা হইলে ইটালী এই যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে। ইটালীর ৯৪ হাজার সৈন্য না কি বন্দী অথবা বিনষ্ট হইয়াছে, বহু সমরোপকরণ বৃটিশ বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে। এই অঞ্চলে আড়াই লক্ষ ইটালীয় সৈন্য ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। আড়াই লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৯৪ হাজার সৈন্যহানি নিশ্চয়ই দুষ্পূরণীয় ক্ষতি। বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি যদি এখন প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহারা ইতোমধ্যে যে বিজয়লাভ করিয়াছে, তাহার নৈতিক ও সামরিক মূল্য অসাধারণ।

ইটালীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে মিশরে প্রবেশ করিয়া, ব্যাপক আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আপনাকে উত্তমরূপে ঐ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, এবং ইটালী হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণের অবাধ সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছিলেন। সুদীর্ঘ তিন মাসে তিনি মিশরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ইটালী হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারেন নাই। এই জন্যই বিপুল সৈন্য লইয়া সম্মুখবর্ত্তী ৮০ মাইলব্যাপী বালুকারাশিতে প্রবেশ করিতে তিনি সাহসী হন নাই।

মার্শাল্ গ্রাৎসিয়ানিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে ইটালীর অসামর্থ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভূমধ্যসাগরে এখনও বৃটেনের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। গত ১৮ই নভেম্বর মুসোলিনী ফ্যাসিষ্ট দলের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—Italian Navy is protecting the lines of communication so efficiently that the British Navy has been unable to interrupt or even hamper them. মুসোলিনীর এই উক্তি যে অসার দম্ভের পরিচয় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, তাহা মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির নিষ্ক্রিয়তায় বুঝিতে পারা গিয়াছে। ইটালীর নৌবাহিনী যদি সত্যই সংযোগ রক্ষায় সমর্থ হইত, তাহা হইলে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি এত দিন—বিশেষতঃ ইটালীর গ্রীস্ আক্রমণের পর নিশ্চিতই সুয়েজ অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেন। খুব সম্ভব, ইটালীর সমরনায়কগণ আশা করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও দক্ষিণ তীরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাঁহারা ঐ অঞ্চলের জলভাগে বৃটিশ-প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করিবেন। তাঁহাদিগের পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রীসকে পরাভূত করিয়া ঈজিয়ান সাগরের তীর পর্য্যন্ত ইটালীর প্রভুত্ব বিস্তারের সম্ভাবনা আপাততঃ যেরূপ দূরীভূত হইয়াছে, সেইরূপ মিশর হইতে ইটালীয় বাহিনী বিতাড়িত হওয়ায় এলেক্‌জেন্ড্রিয়া ও সুয়েজ পর্য্যন্ত ইটালীর অধিকার বিস্তারের স্বপ্নও বিফল হইল। মিশরে ও লিবিয়ায় বৃটেনের সাফল্যের ফলে

এই সামরিক সুবিধা যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, সেইরূপ এই সাফল্যে বৃটিশ সৈন্যের বিনষ্টপ্রায় সামরিক মর্য্যাদার পুনরুদ্ধারও গুরুত্বহীন নহে। অবশ্য, অন্তরীক্ষে পাঁচ মাস কাল জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া বৃটেন্ ইতিঃপূর্ব্বে তাহার প্রতিরোধ-শক্তির যথেষ্টই পরিচয় দিয়াছিল।

লিবিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি যদি সত্বর প্রতিরুদ্ধ না হয়—তাহারা যদি ক্রমে ইটালীর নৌ-ঘাঁটি তব্রুক্ ও বেন্‌ঘাজী অধিকারে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে বৃটেন হয় ত একচ্ছত্র অধিকার লাভ করিবে। গ্রীক্-ইটালীয় সংঘর্ষের সুযোগে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীরে কতকগুলি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বৃটেনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইটালীতে ব্রিণ্ডিসি ও ট্যারাণ্টোর নৌ ও বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ চালিত হইতেছে। এদিকে ডোডেকেনিজ দ্বীপপুঞ্জের নৌ ও বিমানঘাঁটীর সহিত ইটালীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

গ্রীক্-ইটালীয় সঙ্ঘর্ষ—

আল্‌বেনিয়ায় গ্রীক্‌দিগের অগ্রগতির ক্ষিপ্রতা হ্রাস পাইয়াছে। গত এক মাসে দক্ষিণ অঞ্চলে খিমারা নামক স্থানটির অধিকারই তাহাদিগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য; ঐ অঞ্চলে তাহারা না কি ভেলোনার ২০ মাইল দূরে পৌঁছিয়াছে। উত্তর অঞ্চলে তাহারা এখনও এল্‌বাসান্ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এ-দিকে বৃটিশ ও ইটালীর বিমান বাহিনী পুনঃ পুনঃ বোমা বর্ষণ করিয়া ভেলোনা বন্দরের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। ভেলোনা, টেপেলিনি, ক্লিস্থরা প্রভৃতি স্থান যাহাতে ইটালীর হস্তচ্যুত না হয়, তদুদ্দেশ্যে ইটালী মধ্য-আলবেনিয়ায় সুদীর্ঘ দুর্গশ্রেণী রচনা করিতেছে।

গ্রীক্ সৈন্যের অগ্রগতি মন্থর হইবার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আবহাওয়ার অবস্থা তাহাদিগের অত্যন্ত প্রতিকূল—weather remains the worst enemy of the Allies. একমাত্র প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্যই যে গ্রীক্ বাহিনীর অগ্রগতি মন্থর হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা দুষ্কর। ফ্যাসিষ্ট শক্তির প্রতি প্রকৃতি দেবীর পক্ষপাতিত্ব করিবার কোন কারণ নাই; প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে উভয় পক্ষেরই সমান অসুবিধা ঘটিবার কথা। বস্তুতঃ, ইটালীয় বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা এক্ষণে দৃঢ় হইয়াছে। মধ্য-আল্‌বেনিয়ায় ইটালী যে ব্যূহশ্রেণী রচনার আয়োজন করিয়াছে, তৎসম্পর্কিত সংবাদে স্বীকার করা হইয়াছিল—ঐ আয়োজন হইতে এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, ইটালীর বর্ত্তমান রক্ষাব্যবস্থা বিনষ্ট হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ইটালীয় বাহিনী যে সম্প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি-আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাও স্বীকার করা হইয়াছে।

উত্তর আফ্রিকা ও আল্‌বেনিয়ায় ইটালীর শোচনীয় পরাজয়ে জার্ম্মাণীর পক্ষে নিরুদ্বেগ থাকা স্বাভাবিক নহে; ইটালী ও জার্ম্মাণীর সামরিক মর্য্যাদা এক্ষণে অবিচ্ছিন্ন। জার্ম্মাণী কি ভাবে ইটালীকে সাহায্য করিতে পারে, তাহাই প্রশ্ন। সম্প্রতি ইটালীর পক্ষ হইতে সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য কিছু জার্ম্মাণ বিমান ও বৈমানিক সৈন্য ইটালীতে পৌঁছিয়াছে। সম্ভবতঃ, বল্‌কান অঞ্চলে জটিলতা বৃদ্ধির আশঙ্কায় যুগোশ্লোভিয়া অথবা বুল্‌গেরিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীসকে আক্রমণের চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে যদি বৃটেনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে ইটালীতে আগত জার্ম্মাণ সৈন্যের দ্বারা ইটালী বিশেষ উপকৃত হইবে না। ইটালীর সহিত লিবিয়ার যে স্বাভাবিক সংযোগ ইতঃপূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা কয়েক জন জার্ম্মাণ বৈমানিকের চেষ্টাতেই পুনরায় স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ-প্রাধান্য ক্ষুন্ন করিতে হইলে তাহার জন্য ব্যাপক আয়োজন আবশ্যক। তাহার পর, ইটালী হইতে আলবেনিয়ার গ্রীক্ বাহিনীকে আঘাত করিবার চেষ্টাও সহজ হইবে না। বর্ত্তমানে আড্রিয়াতিক সাগরে বৃটিশ বিমানবহর বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে; কর্ফু, সেফালোনিয়া প্রভৃতি আড্রিয়াতিক সাগরের রক্ষি-দ্বীপগুলি হইতে বৃটিশ বিমান-



গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী জন্ মেটাক্সাস্

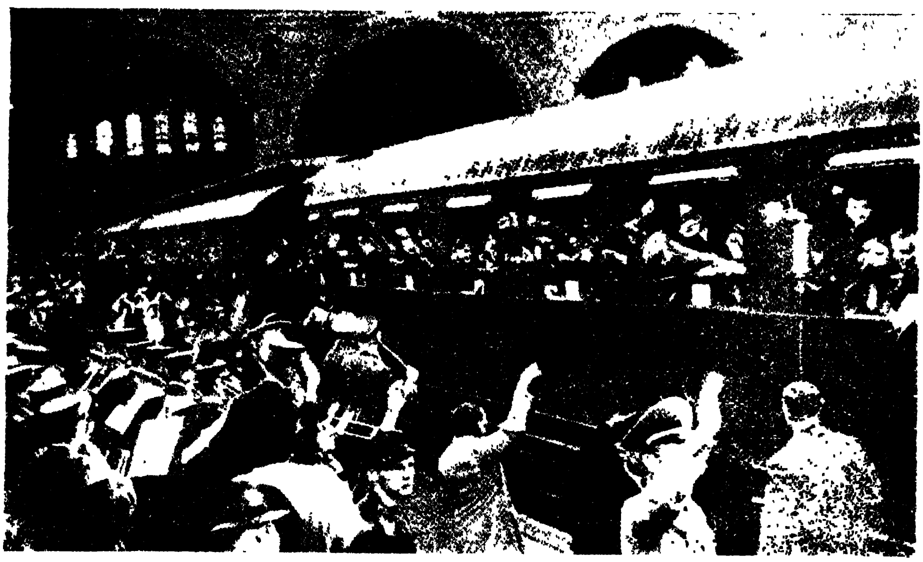
বহর অতি সহজে ইটালীয় ও জার্ম্মাণ বিমানগুলিকে বিশেষ ভাবে বাধা দিতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুই মাসের অধিক কাল যুদ্ধে গ্রীস্ যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে এই অঞ্চলে বৃটেনের বিশেষ সামরিক সুবিধা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণীর সহযোগিতায় অথবা ইটালীর নিজের বর্দ্ধিত প্রচেষ্টায় যুদ্ধের অবস্থা যদি গ্রীসের প্রতিকূলও হয়, তাহা হইলেও গ্রীক্‌দিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইবে। অবশ্য, ফ্রান্স ও স্পেনের সহযোগিতায় সমগ্র ভূমধ্যসাগরে যদি নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা চলে, তাহা হইলেই নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

জার্ম্মাণীর সামরিক তৎপরতা—

বৃটেনে জার্ম্মাণীর বিমান আক্রমণের প্রাবল্য সময় সময় হ্রাস পাইলেও, উহা একরূপ সমভাবেই চলিতেছে; এবং সম্প্রতি উহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মাণী এক্ষণে প্রধানতঃ বৃটেনের

শ্রমশিল্পকেন্দ্র এবং পোতাশ্রয়ের প্রতি বিমান আক্রমণ চালাইতেছে; কভেন্ট্রি, ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্ম্মিংহাম, শেফিল্ড, লিভারপুল ও কার্ডিফ্ তাহার প্রধান লক্ষ্যস্থল। লণ্ডনের বেসামরিক অঞ্চলে বোমা বর্ষণের প্রাবল্যও হ্রাস পায় নাই; সম্প্রতি সমগ্র লণ্ডন সহর জ্বালাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গৃহ অগ্নি-প্রজ্বালক বোমা-বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বৃটিশ বিমানবহরও জার্ম্মাণী এবং জার্ম্মাণ অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলে বিমান আক্রমণ চালাইয়াছে; খাস বার্লিন, ডুসেলডর্ফ, ব্রীমেন্, ম্যান্হীম্, লোরিয়েণ্ট ও বর্দ্দোর সাবমেরিণ-ঘাঁটী প্রভৃতি বৃটিশ বিমানের প্রধান লক্ষ্যস্থল। বৃটিশ বিমানবহর কিছু কাল হইতে জার্ম্মাণীতে ও জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে বিমান আক্রমণ চালাইলেও বৃটিশ সরকারের কোন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি এই আক্রমণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।



বৃটিশ বিমানের আক্রমণ-আশঙ্কায় বার্লিনের বেসামরিক অধিবাসিগণ স্থানান্তরিত হইতেছে

জার্ম্মাণী ও বৃটেনের বিমান আক্রমণের তুলনা করিলে জার্ম্মাণীর আক্রমণের গুরুত্বই বহুগুণ অধিক মনে হইবে, এবং তাহার বিশেষ কারণও আছে। বৃটেন এখনও সমর-সজ্জায় জার্ম্মাণীর সমকক্ষ হয় নাই। গত বৎসর এপ্রিল মাসে নরওয়ে হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হইবার পর যখন বৃটিশ মন্ত্রিসভার আমূল পরিবর্ত্তন হয়, তখন কমন্স সভায় আলোচনা-কালে মিষ্টার চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন—Our numerical defficiency in the air……has condemned us and will condemn us for sometime to come to a great deal of difficulty, suffering and danger…. সমর-সজ্জা সম্পর্কে বৃটেনের এই দৌর্ব্বল্য যে এখনও দূরীভূত হয় নাই, তাহা মিষ্টার চার্চ্চিল গত ১৯শে ডিসেম্বর কমন্স সভায় বক্তৃতাকালেই স্বীকার করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—"…we are still only a half-armed nation fighting a fully armed nation which has already passed the saturation point in its armament." অতঃপর তিনি বলেন যে, কোন দেশের শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হইলে তাহার জন্য অন্ততঃ তিন-চারি বৎসর সময় আবশ্যক; এই বিষয়ে জার্ম্মাণী চরম সীমায় পৌছিয়াছে, পক্ষান্তরে, বৃটেন মাত্র দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। মিষ্টার চার্চ্চিল আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদিগের চেষ্টার ফলে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে তাঁহারা যে সাহায্য লাভ করিতেছেন, তাহাতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের সমরসজ্জা সম্পূর্ণ হইবে।

বৃটেনের এই অর্দ্ধেক সমর-সজ্জার কিয়দংশ আফ্রিকাতেও নিয়োজিত হইয়াছে, বৃটিশ বিমানবহর আলবেনিয়াতেও যুদ্ধ করিতেছে। মধ্য ও অদূর-প্রাচীতে বহুসংখ্যক ঔপনিবেশিক সৈন্য সন্নিবেশিত হইলেও, এখনও সমরোপকরণ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সাহায্যদানের যোগ্যতা বৃটিশ উপনিবেশগুলি অর্জ্জন করে নাই। বৃটেনের এই স্বল্প সমরসজ্জার কিয়দংশ গৃহ-রক্ষা ব্যতীতও অন্যত্র নিয়োজিত; পক্ষান্তরে, জার্ম্মাণী তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া বৃটেন আক্রমণে প্রবৃত্ত। এইরূপ অবস্থায় জার্ম্মাণীর আক্রমণের প্রাবল্য অত্যধিক হওয়াই স্বাভাবিক; বস্তুতঃ, জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের তুলনায় বৃটেনের প্রতি-আক্রমণ নগণ্য।

এখন সমুদ্র-বক্ষেও অত্যন্ত তৎপর হইয়াছে; বৃটেনের শ্রমশিল্প-কেন্দ্র ও পোতাশ্রয়ে বোমা-বর্ষণ এবং সমুদ্রবক্ষে জার্ম্মাণ সাব্‌মেরিণ ও রণপোতের তৎপরতা লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, অর্থনীতিক্ষেত্রে বৃটেনকে পঙ্গু করাই জার্ম্মাণীর আশু লক্ষ্য। ইহা ব্যতীত, বৃটেন্ সম্প্রতি তাহার উপনিবেশগুলিতে সমরোপকরণের কারখানা স্থাপন করিয়াছে; কোন কোন উপনিবেশে সৈন্যগণ প্যারাশুটে অবতরণ প্রভৃতি আধুনিক যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করিতেছে। কাজেই, উপনিবেশগুলির সহিত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের স্বাভাবিক সংযোগ বিপন্ন হইলে জার্ম্মাণী সামরিক বিষয়েও সুবিধা লাভ করিতে পারে। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধ অপেক্ষা বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণী সমুদ্র-বক্ষে আক্রমণ পরিচালনের বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছে; ফ্রান্সের উত্তর ও পশ্চিম উপকূলের নৌঘাঁটীগুলি আজ তাহার অধিকারভুক্ত; পক্ষান্তরে, আয়ার রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার ফলে দক্ষিণ আয়র্ল্যাণ্ডের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী বৃটেনের হস্তচ্যুত। দক্ষিণ আমেরিকা, বারমুডা এবং আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সহিত বৃটেনের সামুদ্রিক সংযোগ বিপন্ন করিবার জন্য জার্ম্মাণী আজ পশ্চিম-ফ্রান্সের ব্রেষ্ট, লোরিয়েন্টে, সেণ্টনেজার ও বর্দ্দোর ঘাঁটী ব্যবহার করিতেছে।

পক্ষান্তরে, এই সমুদ্রপথের নিকটে বৃটেনের পেম্‌ব্রোক্‌ ডেভন্‌পোর্ট ও পোর্টল্যাণ্ড ব্যতীত অন্য কোন ঘাঁটী নাই—দক্ষিণ আয়র্ল্যাণ্ডের বেয়ারহ্যাভেন্‌ ও কোভ্‌ ঘাঁটী এবার তাহার হস্তচ্যুত। ক্যানাডার সহিত গ্লাসগোর সংযোগপথেও জার্ম্মাণ বিমানগুলি ফ্রান্স হইতে আক্রমণ চালাইতেছে। ইহা ব্যতীতও, জার্ম্মাণীর দুই-একখানি রণপোত আট্‌লাণ্টিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই প্রসঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরে জার্ম্মাণীর একখানি রণপোতের আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। ডিসেম্বর মাসের শেষে এই জাহাজখানি অষ্ট্রেলিয়ার নিকটে নরু নামক একটি দ্বীপে গোলাবর্ষণ করিয়াছে। জানুয়ারী মাসের প্রথমে নিউজীল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার ফ্রেজারের এক বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই জাহাজখানি গত কয়েক মাসে ৭ খানি বৃটিশ, ১ খানি ফরাসী ও ২ খানি নরোয়েজিয়ান্‌ জাহাজ নিমজ্জিত করিয়াছে। এই জাহাজখানি নিরীহ জাপানী বাণিজ্য-জাহাজরূপে আত্মগোপন করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে বিচরণ করিতেছে। সম্প্রতি এই জার্ম্মাণ জাহাজ হইতে ৫০০ বন্দীকে এমিরাউ দ্বীপে অবতরণ করান হইয়াছিল; তাহাদিগকে তথা হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। জার্ম্মাণী কিরূপে এই রণপোতখানি প্রশান্ত মহাসাগরে প্রেরণ করিল, এবং ঐ অঞ্চলে উহা কোথা হইতে কয়লা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছে, তাহা জানা যায় নাই। আক্রমণকারী জাহাজকে ধরিবার জন্য বৃটেনের পক্ষ হইতে ঐ অঞ্চলে কঠোর ভাবে জাহাজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে; কোন কোন স্থানে বৃটিশ ও ওলন্দাজ জাহাজগুলি মাইন স্থাপন করিয়াছে, জাহাজখানি যাহাতে অতর্কিতে কোন ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছে।



বার্লিনে বৃটিশ বিমানের অগ্নি-প্রজ্বালক বোমা-বর্ষণের পর

বিচ্ছিন্ন ভাবে এক বা একাধিক জাহাজের এই তৎপরতার সামরিক মূল্য অতি অল্পই; কিন্তু এই ভাবে শত্রুপক্ষের সামুদ্রিক বাণিজ্যে ও শত্রু-দেশের যাত্রিজাহাজের স্বাভাবিক গমনাগমনে সাময়িক ভাবে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করা সম্ভব। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারত মহাসাগরে 'এম্‌ডেনে'র উপদ্রবে জার্ম্মাণী কোন সামরিক সুবিধা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু দুই মাসের কম সময়ের মধ্যেই ঐ জার্ম্মাণ ক্রুজারখানি ৭০,০০০ টন্‌ বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং মাদ্রাজেও গোলাবর্ষণ করিয়াছিল।

সমুদ্রবক্ষে জার্ম্মাণীর তৎপরতা কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, বৃটেনের খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী লর্ড উল্‌টনের এক বক্তৃতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। ডিসেম্বর মাসের শেষে লর্ড উল্‌টন্‌ বৃটেনের গৃহকর্ত্রীদিগের উদ্দেশে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন, গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে খাদ্য-সরবরাহে অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা। তাঁহার কথা—

The enemy is making a direct attack on our food-ships and sinking a number of them. This is indeed a war in all its starkness against food by which we sustain life. This war against food supplies may grow in intensity as the months go on.

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে জার্ম্মাণীর প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালিত হইবার আশঙ্কা এখনও বিদূরিত হয় নাই। নরওয়ে হইতে বর্দ্দো পর্য্যন্ত অর্দ্ধবৃত্তাকার অঞ্চলে জার্ম্মাণীর বিরাট সমরায়োজন এখনও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ফরাসী উপকূল হইতে জার্ম্মাণীর কামানগুলি এখনও মধ্যে মধ্যে ডোভার অঞ্চলে অগ্নি-বর্ষণ করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রচণ্ড শীতে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যে বৃটেনে সৈন্য অবতরণ করানই জার্ম্মাণীর প্রধান উদ্দেশ্য; শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যেই সে ইচ্ছা করিয়া জার্ম্মাণ সৈন্যের গতিবিধি সম্বন্ধে নানারূপ জনরব প্রচার করিতেছে। অবশ্য, জার্ম্মাণীর সম্ভাবিত আক্রমণ সম্বন্ধে বৃটেন অত্যন্ত সজাগ। মিষ্টার চার্চ্চিল তাঁহার ১৯শে ডিসেম্বরের বক্তৃতায় বলিয়াছেন—The Winter season offers some advantages to an invader to counter-balance those which belong to the Summer season……It will be a disaster if anyone

suppose that the supreme mortal dangers are passed.

জার্ম্মাণীর কূটনৈতিক গতিবিধি—

জার্ম্মাণীর কূটনৈতিক গতিবিধি সম্বন্ধে বৈদেশিক সাংবাদিকগণ বহু গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল গবেষণার প্রধান কথা—ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর বিরোধ আসন্ন, সোভিয়েট-জার্ম্মাণ বিরোধও অদূরবর্ত্তী। ফরাসী জার্ম্মাণ মনোমালিন্য সম্পর্কিত গবেষণার মূল উৎস—ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফ্রান্সের সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ লাভালের পদচ্যুতি, এবং গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মুক্তিলাভ। জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ না কি মঃ লাভালকে মুক্তি দিবার জন্য ভিসি সরকারকে বাধ্য করিয়াছেন। এই ঘটনার পর এইরূপ আনুমানিক সংবাদও প্রচারিত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী ফ্রান্সের মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশপথ দাবী করিয়াছে, কিন্তু ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে সম্মত হন নাই, তাঁহারা জার্ম্মাণীকে এই মর্ম্মে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে অধিক চাপ দিলে তাঁহারা ফরাসী নৌ-বহর লইয়া আফ্রিকায় চলিয়া যাইবেন। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভিসি কর্ত্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে ফরাসী নৌ-বহর আফ্রিকায় স্থানান্তরিত করিতেছেন। সোভিয়েট জার্ম্মাণ মনোমালিন্য-সম্পর্কিত গবেষণার উৎস সম্ভবতঃ সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সমরাশঙ্কা। গত নভেম্বর মাসের প্রথমে মঃ ক্যালিনিন্ দৃঢ় কণ্ঠে সোভিয়েট রুশিয়ার নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে যেন তাঁহাদিগের এই নীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে বদ্ধমুষ্টি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১লা জানুয়ারী মঃ ষ্টালিন্ "রেড ষ্টার" পত্রে এক স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—The U. S. S. R, are confronted with the danger of military aggression. সম্ভবতঃ সোভিয়েট নেতার এই সমরাশঙ্কাকে ভিত্তি করিয়া সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে যে, লাও হইতে ওডেসা পর্য্যন্ত স্থানে নীষ্টার নদীর তীরে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে বিরাট সোভিয়েট বাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সোভিয়েট-জার্ম্মাণ মনোমালিন্যের অন্যতম কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, রুমানিয়ার "আয়রণ-গার্ড" দল কম্যুনিষ্টদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছে।

প্রথমে ফরাসী-জার্ম্মাণ মনোমালিন্য-সম্পর্কিত সংবাদটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। মঃ লাভালের পদচ্যুতি সম্পর্কে জার্ম্মাণীর সহিত ভিসি সরকারের গুরুতর মনোমালিন্যের কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা বুঝা দুষ্কর। মঃ লাভালের পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তিটি ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই মঃ ফ্লাঁদীঁর নাজী-অনুরক্তি সন্দেহের অতীত। কাজেই ফরাসী পররাষ্ট্র সচিবের পদে মঃ লাভালের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে জিদ্ করিয়া জার্ম্মাণী ফ্রান্সের সহিত অযথা বিরোধ ঘটাইবে কেন? রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা নীতির গুরুত্বই অধিক। আর ব্যক্তিত্বের দিক হইতে ইঁহারা দুই জনই ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী।

ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর যে এখন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আলোচনার বিষয়ে কোন কথাই প্রকাশিত হয় নাই—এই সম্পর্কিত সকল সংবাদই অনুমান-মূলক। নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয় যদি ফ্রান্সের নৌ-ঘাঁটী ও নৌ-বহর ব্যবহারের সুবিধা পায়, এবং স্পেনের সহযোগিতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা ভূমধ্যসাগরে কিরূপ বিপুল শক্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহা গত আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইটালীর



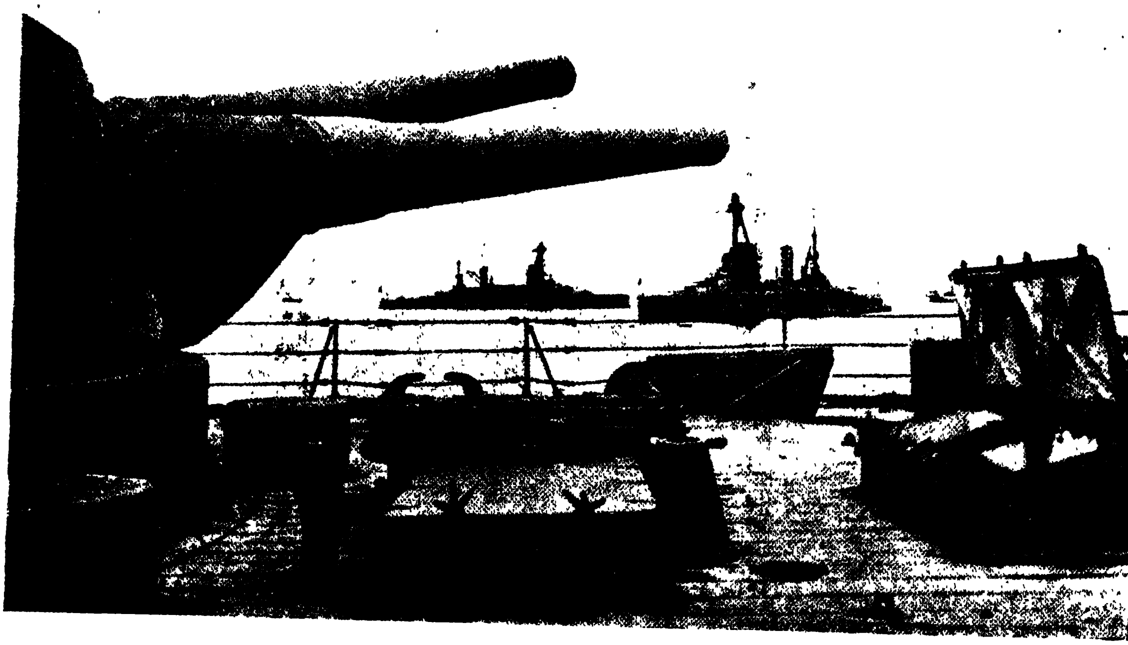
ফরাসী উপকূলস্থিত জার্ম্মাণ কামানগুলিকে প্রত্যুত্তর দানের জন্য বৃটেনের উপকূলে এই সকল কামান স্থাপন করা হইয়াছে

পরাজয়ে জার্ম্মাণীর উৎকণ্ঠিত হওয়া সম্ভব; ইটালীতে জার্ম্মাণ বৈমানিকের আগমনের সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ ভূমধ্যসাগরে নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইলে ইটালীকে তাহার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করা দুষ্কর। এই জন্যই বোধ হয় এখন ফরাসী জার্ম্মাণ আলোচনা সম্পর্কিত আনুমানিক সংবাদগুলিতে ফরাসী নৌ-ঘাটী ও নৌ বহরের প্রসঙ্গ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইতেছে।

উদ্ভূত অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর পক্ষে ফ্রান্সের নৌ-ঘাঁটী ও ফরাসী নৌ-বাহিনী দাবী করা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য এই দাবীতে সম্মত হইলে, এখনও ফ্রান্সের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাহা বিলুপ্ত হইবে। ফ্রান্স এই ভাবে আত্মবলিদানে সম্মত হইবে কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। বৃটেনের অর্থনীতিক অবরোধের জন্ম ফ্রান্স বর্ত্তমানে অত্যন্ত বিপন্ন। কাজেই এই অবরোধজনিত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় ফ্রান্সের পক্ষে জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ একান্ত অসম্ভব বিষয়ও নহে। অবশ্য মার্শাল পেতাঁ ফরাসী নৌ-বহর ও নৌ ঘাঁটীরূপী "হাতের গোলাম" দেখাইয়া জার্ম্মাণীর নিকট হইতে কতকগুলি সুবিধালাভের চেষ্টা করিতে পারেন।

কথা উল্লেখ করিয়া মার্শাল পেতাঁ পরোক্ষে বৃটেনের কথাই বলিয়াছেন। বৃটেন-সম্পর্কে ফরাসী এক-নায়কের এই বক্রোক্তি শ্রবণ করিলে ফরাসী-জার্ম্মাণ বিরোধ-সম্পর্কিত জনরব গুরুত্বহীন বলিয়া মনে হইবে। আবার ফ্রান্সের সমর-সচিব জেনারল হাংজিগার সীরিয়ার অধিবাসীদিগের উদ্দেশে বলিয়াছেন—Wounded France is not giving up. এই উক্তিকে জার্ম্মাণীর দাবী সম্পর্কে ফ্রান্সের দৃঢ়তার ইঙ্গিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ মনোমালিন্যের আশঙ্কা নিতান্ত গুরুত্বহীন বলিয়া মনে হয়। গত মহাযুদ্ধে চতুর্দ্দিকে শত্রু সৃষ্টি করিয়া কৈশর যে ভুল করিয়াছিলেন, পুনরায় সে ভুল যাহাতে না হয়, সে জন্ম হিটলার পররাষ্ট্রক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে-



বৃটেনে জার্ম্মাণ বাহিনীর অবতরণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্ম ইংলিশ প্রণালীতে এই সকল কামান-সজ্জিত রণপোত বিচরণ করিতেছে

ফ্রান্সের প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে দুই জন বিশিষ্ট ফরাসী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের যে উক্তি আমরা সম্প্রতি শ্রবণ করিয়াছি, তাহা পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। নববর্ষের বাণীতে মার্শাল পেতাঁ তাঁহার স্বদেশবাসীকে বলিয়াছেন—Do not listen to those who seek to exploit your miseries and to disunite the nation. এই সতর্কবাণী বৃটেন এবং বৃটেনের আশ্রিত জেনারল ডী গল্‌ ও "ফ্রী ফ্রান্স" প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাহার পর, তিনি আরও বলিয়াছেন—ফরাসী জাতির অনাহারে দিন কাটাইবার সময় আসিতেছে; যুদ্ধে তাহাদিগের শস্য নষ্ট হইয়াছে, অবরোধের ফলে তাহারা সমুদ্রপারের খাদ্যসামগ্রী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অবরোধের

ছেন। পক্ষান্তরে, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক সোভিয়েট রুশিয়ার প্রত্যক্ষ স্বার্থ বিপন্ন না হইলে রুশিয়ার পক্ষেও যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে, সোভিয়েট রুশিয়া অত্যন্ত সাবধান; বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক বিপর্য্যয়ের সময় কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাহাতে তাহার স্বার্থসম্পন্ন অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ না হয়, সেই জন্ম চতুর্দ্দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি রহিয়াছে। সোভিয়েট এক-নায়ক হয় ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই সমরাশঙ্কার কথা বলিয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব—

সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ৩০শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বৃটেনকে

সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণার তুল্য। এই বক্তৃতা পাঠে মনে হয়, বৃটেনকে যথাশক্তি সাহায্য-দানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যদি কাহারও বিরুদ্ধ-ভাব থাকে, তাহা হইলে তাহা দূর করিবার জন্ত বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অতঃপর, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ না বলিয়া বোধ হয়, বৃটেনের অনুকূলে "যুদ্ধ-বিরতি" জাতি বলাই অধিকতর সঙ্গত হইবে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন—In the military sense Britain and her Empire today are the spearhead of resistence to world conquest,… No Dictator, no combination of Dictators will weaken our determination to aid Britain by threats of how they will construe that determination

গণতান্ত্রিক সরকারের এই মনোভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্যদানের যে নূতন পরিকল্পনা কংগ্রেসে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থও বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজড়িত হইবে। ৬ই জানুয়ারী তিনি কংগ্রেসে এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জন্ত এইরূপ সমরোপকরণ প্রস্তুত করিবে, যাহার অধিকাংশ ভবিষ্যতে তাহার নিজের প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সকল উপকরণ তাহারা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিবে না; ঐ সকল উপকরণ যুদ্ধের পর তাহারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যর্পণ করিবে, অথবা উহার বিনিময়ে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদান করিবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইন এই মর্ম্মে সংশোধিত হইয়াছিল যে, যুযুধান শক্তিবর্গ "নগদ মূল্যে ও স্বকীয় দায়িত্বে" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিতে পারিবে। এই সর্ত্তেই বৃটেন্ এত দিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিতেছিল; কিন্তু সম্প্রতি বৃটেনের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, তাহাকে যদি ঋণ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সে আর অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিতে পারিবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বৃটেনকে ঋণদানে আপত্তির কারণ ছিল; গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটেন্ তাহার নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সে সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই। এই জন্তই একাধিক অধমর্ণের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা ফেরত না পাওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই মর্ম্মে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে, যে সকল রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই, তাহারা আর নূতন ঋণ পাইবে না। এই আইনই 'জনসন য়্যাক্ট' নামে অভিহিত; ইহা বাতিল না হইলে বৃটেনের পক্ষে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের নিকট হইতে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইত না। প্রেসিডেণ্ট রুজ ভেল্টের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে জনসন্ য়্যাক্ট প্রকারান্তরে বাতিল হইবে, এবং বৃটেনকে সাহায্যদান করা সম্ভব হইবে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে কূটনৈতিক বিষয়েও বৃটেন যথেষ্ট উপকৃত হইবে। নিরপেক্ষতা আইন যে ভাবে সংশোধিত হইয়াছিল, তাহাতে বৃটেনকে সাহায্য-দানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজড়িত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। "নগদ মূল্যে ও স্বকীয় দায়িত্বে" ক্রীত সমরোপকরণ বিনষ্ট হউক, বা শত্রু-হস্তেই পতিত হউক, তাহাতে মার্কিণী সরকার অথবা মার্কিণী ধনিকদিগের ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। উল্লিখিত সর্ত্তে যে শক্তি অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিয়াছে, সে যদি অন্তের নিকট পরাজিত হয়, তাহা হইলেও বিক্রেতা-রাষ্ট্রের উৎকণ্ঠার কারণ নাই। কিন্তু বহুমূল্য সমরোপকরণ ইজারা দিবার পর ইজারা-প্রদানকারীর পক্ষে নিরুদ্বেগ থাকা সম্ভব নহে। প্রেসি-ডেণ্ট রুজভেল্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি প্রচুর সমরোপকরণ বৃটেনকে ইজারা দেন, তাহা হইলে মার্কিণ সরকার নিজের স্বার্থেই ঐ উপকরণ যাহাতে বৃটেনের শত্রুর হস্তে পতিত না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইবেন। ইজারাদার বৃটেন যাহাতে পরাজিত না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও মার্কিণী সরকার ও মার্কিণী ধনিকের স্বার্থ হইবে।

শ্রীঅতুল দত্ত

আমি, আর ওরা

জানি না, তোমারে সুন্দরী বলে কি না,
তোমারে যাহারা দেখিয়াছে প্রিয়তমা;
মোর কাছে তুমি সুন্দরতমা, সখি!
মোর চোখে তুমি রূপময়ী অনুপমা।
জানি না, তোমারে সুচরিতা বলে কি না,
আর যা'রা সবে দেখেছে তোমারে লখি';
আমি জানি, তুমি সুচরিতা, মোহনীয়া;
মোর কাছে তুমি চির-মধুময়ী, সখি!
জানি না, তোমার সেবায় মুগ্ধ কি না,
তোমার হাতের সেবা যারা লভিয়াছে;—
মমতা-বিধুরা, আমি তো তোমারে জানি,—
কে বলে, তোমার সেবার তুলনা আছে?

তোমারে যাহারা জানিয়াছে, তা'রা সবে
জানি না, তোমায় স্নেহময়ী বলে কি না;—
আমি তো তোমার মন-প্রাণ জানিয়াছি—
স্নেহ-মমতায় নহ তুমি, নহ দীনা!
অতি সাধারণ তোমারে যাহারা বলে,
তাহারা সবাই তোমারে জেনেছে ভুল;—
আমি তো তোমারে চিনিয়াছি ভালো ক'রে—
আমি জানি, প্রিয়া, তোমার নাহি কো তুল্!
অশনি-কঠোরা, কুসুম-কোমলা তুমি,
দানে ও ক্ষমায় তুমি চির-অকৃপণা;
চরিত-বিজয় মহীয়সী তুমি নারি!
প্রেমের ধর্ম্মে মঙ্গলা, অতুলনা।

শ্রীকান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

সাময়িক প্রসঙ্গ

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ মহাকালের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে বিলীন হইয়াছে। একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য এই বর্ষ আলোচনার যোগ্য। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধই এই বৎসরটিকে মসীলিপ্ত করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষের প্রথম তিন মাস উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই; কিন্তু তাহার পরেই দুঃখের তমোময়ী নিশীথিনী যেন বিদ্যুৎ-গতিতে প্রায় সমগ্র য়ুরোপই আচ্ছন্ন করিয়াছে। ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিন্‌ল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া, যুগোশ্লাভেকিয়া, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মাণী, গ্রীস, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি সকল দেশেরই অধিবাসীবর্গের দীর্ঘশ্বাস শূন্যে বিলীন হইতেছে; সর্ব্বত্রই দরিদ্রের হাহাকার, অভাবগ্রস্তের আর্ত্তনাদ গগন-পবন মুখরিত করিতেছে। ফিন্‌ল্যাণ্ড রুষিয়ার করকবলিত। ইটালী যুদ্ধে নামিয়া দারুণ অভাবে জর্জ্জরিত। জার্ম্মাণী পোল্যাণ্ড-জয়ের চেষ্টার জন্য বৃটেনের প্রচণ্ড আক্রমণে সমরানলে দগ্ধ হইতেছে; স্বীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টায় গ্রেট বৃটেনকে দুর্ব্বার সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। ইহার পর-বৎসর এই সকল ব্যাপারের কিছু কিছু সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিলেও আলোচ্য বর্ষেই ইহার ব্যাপক ফল পরিলক্ষিত হইয়াছে। সেই জন্যই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ উহার বিষাদময় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে চিরদিন মসীলিপ্ত করিয়া রাখিবে। জার্ম্মাণীর আক্রমণে ইংলণ্ডের ক্ষতি নিতান্ত অল্প হয় নাই; গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের এরূপ ক্ষতি হইয়াছিল কি না সন্দেহ; কিন্তু ইংরেজ জাতি এখনও অটল রহিয়াছে। চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া হিট্‌লারের হৃদয় বিচলিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। হিট্‌লার গ্রেট বৃটেন আক্রমণের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই;—কখনও পারিবেন কি না, তাহা অনুমান করা মানব-কল্পনার অতীত। তবে ইংরেজকে সান্ত্বনা দানের জন্য তাঁহাদের অনুকূলে শুভাকাজ্ক্ষীরা যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, তাহা সফল হওয়া অবশ্যই প্রার্থনীয়।

এ-দিকে য়ুরোপের এই মহাদুঃখের তিমিরজাল পৃথিবীর সকল দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাণিজ্যের গতি রুদ্ধ হইতেছে, জ্ঞানের আলোক ক্রমশঃ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছে, মানবজাতির মনস্বিতা ক্ষীণ, এবং দানব-শক্তি দুর্ব্বার হইয়া উঠিতেছে; ইহা আশার কথা ভাবিয়া কেহই স্বস্তিবোধ করিতে পারিবেন না। এই হাহাকার কেবল য়ুরোপেই সীমাবদ্ধ নহে—ইহা কোন না কোন আকারে, এক মার্কিণ যুক্তরাজ্য ভিন্ন, অন্য সকল দেশেরই বায়ুমণ্ডলে অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সাগরতটেও উদ্বেগের তরঙ্গাঘাতের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—তাহা প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেণ্টের বক্তৃতায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

আমাদের এই ভারতেও দুঃখের এবং অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়া দেশবাসিগণকে বিশেষ ভাবে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। দুই দিন পূর্ব্বে যাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশে দায়িত্বপূর্ণ সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রেষ্ঠতম রাজপুরুষগণেরও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা স্বেচ্ছায় কারাগারের উচ্চ অবরোধের অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া দেশের ভাগ্যফল কি, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক! বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের 'স্পীকার', এমন কি, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত যখন স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়াছেন, সেই সময় এক প্রদেশের পরিষদের মুসলমান 'স্পীকার'কে খেতাব দানে উচ্চ কৃতার্থ করা হইল, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিশেষতঃ, কংগ্রেসের সভাপতিকে পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয় নাই। বাঙ্গালায় পাটের দর নামিয়া যাওয়ায় সর্ব্বসাধারণের দুঃখ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি রাজবিধি প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে শঙ্কা হইতেছে—এই সকল বিধি-প্রয়োগের ফলে সম্প্রদায়বিশেষ

নিষ্পিষ্ট হইয়া জড়ে পরিণত হইবে। বাঙ্গালায় যে মনীষা অল্প দিন পূর্ব্বেও তাহার উজ্জ্বল প্রভায় সমগ্র ভারতভূমিকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, এত দিন পরে তাহা যেন নির্ব্বাপিত হইবার আশঙ্কা এ দেশের সকলের চিত্তকেই অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্যই আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালার সর্ব্ব স্থান হইতে মর্ম্মভেদী হাহাকার সমুত্থিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে। সুদূর প্রাচীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে ভীষণ সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া চীনের বিভিন্ন প্রদেশ বিধ্বস্ত করিতেছে, দিগ্‌দাহী-দাবানলোত্থিত ধূমরাশির ন্যায় তাহা মানবজাতির, বিশেষতঃ, এসিয়াবাসীর ভাগ্য-গগন নৈরাশ্যের ধূমে আচ্ছন্ন করিতেছে। তাই মনে হইতেছে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ চিরকালই মানবজাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা মসীলিপ্ত করিয়া রাখিবে।

ইংরেজী ভাষা-সমিতি

৪ঠা পৌষ লক্ষ্ণৌ সহরে ইংরেজী ভাষা-সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা সার মরিস হ্যালেট এই সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। অন্যূন ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গ এই সমিতিতে যোগদান করেন। এই সমিতিটি নূতন। ভবিষ্যতে যুবকদিগের শিক্ষায় ইংরেজী ভাষার স্থান-নির্ণয় এই সমিতির অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। এই সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুত অমরনাথ ঝা মহাশয়ের অভিভাষণ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, খৃষ্টমাস পর্ব্বেই এত অধিক সভা-সমিতির অধিবেশন হয় যে, সাধারণে তাহার অনেকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে অবহিত হইতে পারে না; সুতরাং ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। অনেকে ভারতীয় শিক্ষায় ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষপাতী। অনেক চিন্তাশীল বহুদর্শী ব্যক্তির বিশ্বাস, ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মুখ্যস্থানে স্থাপন করিলে দেশীয় ভাষাকে পরোক্ষ ভাবে দুর্ব্বল করা হয়। এ অবস্থায় প্রতিভাশালী এবং চিন্তাশীল লেখকগণ তাঁহাদের চিন্তার ফল দেশীয় ভাষায় প্রকাশ না করিয়া ইংরেজী ভাষাতেই প্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম উপন্যাস লিখিয়াছিলেন ইংরেজী ভাষায়। মাইকেল মধুসূদন প্রথম কবিতা লেখেন ইংরেজীতে। এ-কালের শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, এবং সে-কালের অরু দত্ত, তরু দত্ত প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্য-কুঞ্জের নাইটিঙ্গেল বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে পরিচিতা হইতে পারেন,—কিন্তু বাঙ্গালার কাব্য-কুঞ্জে তাঁহাদের কুহু-তান কোনও দিন প্রতিধ্বনিত হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুকবি মনোমোহন ঘোষ, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষা-সম্পন্ন কবিগণের কবিত্বসৌরভে তাঁহাদের মাতৃভাষা বঞ্চিতা। গদ্য-সাহিত্যেও এইরূপ অনেক ইংরেজী লেখকের নাম করা যাইতে পারে। অধ্যাপক অমরনাথ ঝা-ও আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষাকে মুখ্য স্থলে স্থাপন-প্রথার সমর্থন করেন নাই। শিক্ষায় সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষাকে মুখ্য স্থান দিলে শিক্ষায় কৃত্রিমতা বর্দ্ধিত হয়, এবং শিক্ষার পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টায় অনেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। বঙ্কিম বাবু "হিন্দু হেরাল্ডের" সম্পাদক গিরীন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় সন্দর্ভ লিখিতে অনুরুদ্ধ হইলে, বাঙ্গালায় তাঁহার পত্রের জবাব দিয়া লিখিয়াছিলেন, "সমুদ্রে শিশির-সেক করিব না, নিজের যাহা আছে তাহা পরের ঘরে বিলাইয়া দিব না।"—কথাগুলি সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত।

সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগ

সম্প্রতি খুলনায় প্রাদেশিক মেডিক্যাল পরিষদের যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার সমবেত সদস্যদিগকে "সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের চাকুরিয়াদের পুনর্গঠন" সম্পর্কে একটি লিখিত প্রস্তাব বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটির ভিতর কিঞ্চিৎ চাতুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। শুনা যাইতেছে, বাঙ্গালা সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাবের বিষয় বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা শীঘ্রই না কি ঐ প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। এই প্রকার ব্যস্ততার কোন হেতু আছে কি না, তাহাই সাধারণের বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। ঐ ব্যাপারে উল্লেখ করা হইয়াছে, সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার মহাশয়ের প্রস্তাব এই যে, স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারীরা সকলেই

স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নিযুক্ত না হইয়া প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ অধীন হইবেন; অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারই তাঁহাদের ভাগ্য-বিধাতা হইবেন। এইরূপে তাঁহারা সচিবসঙ্ঘেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হইবেন। এই জন্যই আশঙ্কা হয়, সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সচিববৃন্দ এখন তাঁহাদের যে কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছেন,—স্বাস্থ্যবিভাগের এই কর্ম্মচারীবর্গ দ্বারাও তাঁহারা সেই কার্য্যসাধনের সুযোগ লাভ করিবেন। বিশেষতঃ, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-নির্ব্বাচনের সময় সমাগতপ্রায়; এ সময়ে বাঙ্গালার সচিবরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাচন-সম্পর্কিত অনেক কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতে পারিবেন। "ছাঁদন দড়ি গোদা-বেড়ি তুমি এখন কার?" উত্তর—"যার হাতে আছি, এখন আমি তার।" সুতরাং নির্ব্বাচন-কালে স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারীরা যদি 'যার হাতে আছেন তার' কাজ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ কি বিস্মিত হইবে? সুতরাং এত তাড়াতাড়ি 'শ্রাদ্ধ গড়াইবার' প্রয়োজন নাই কি?

পাটসমস্যা

বাঙ্গালার সর্ব্বকর্ম্মকুশল সচিবগণের সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বাঙ্গালার পাটের দর একেবারে ধুলায় লুটাইতেছে; এই ব্যাপারে সকলেই চিন্তিত। কারণ, ইহার সহিত সর্ব্বসাধারণেরই স্বার্থ বিজড়িত। মধ্যে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালা সরকার পাট ক্রয়ের জন্য ভারত সরকারের নিকট ৬ কোটি টাকা ঋণ লইবেন। কিন্তু সে প্রস্তাবটি কি মাঠে অর্থাৎ রাজধানীর প্রান্তরে মারা গেল? সম্প্রতি দিল্লীতে জুট-মিল্‌স এসোসিয়েশনের সদস্যদিগের সহিত প্রাদেশিক সরকার সমূহের এক পরামর্শ-বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে যে কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত হইয়াছে—এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই; তবে কলওয়ালারা এইরূপ সর্ত্তে পাট কিনিতে সম্মত হইয়াছেন যে, ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তাঁহারা সাড়ে ৩৭ লক্ষ গাঁইট পাট কিনিবেন। বর্ত্তমান বৎসরে অন্ততঃ ১ কোটি গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে; তন্মধ্যে কলওয়ালারা যদি সাড়ে ৩৭ লক্ষ গাঁইট পাট ক্রয় করেন, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ কি সুবিধা হইবে? ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অনেক অল্প পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইলেও তাহার পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ গাঁইট; এবার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পাট উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পাটের অর্দ্ধেকেরও কম—প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গাঁইট মাত্র যদি কলওয়ালারা চারি দফায় ক্রয় করেন, তাহাতে এ দেশের চাষীদের কোন লাভ হইবে না। কলওয়ালারা বাঁধা-দরে ঐ পাট কিনিবেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যে পাটের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ বস্তা প্রস্তুত করিবার 'পোড়েন' নাই, তাহাকে সর্ব্বনিম্ন পাট বলিয়াও গণ্য করা হইবে না। যাহাতে অন্ততঃ ঐরূপ আছে, তাহাকেই সর্ব্বনিম্ন পাট বলিয়া গণ্য করা হইবে। দেশী পাটের দর হইবে বড় জোর ৭ টাকা, সাড়ে ৭ টাকা মণ। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাটের দর কিছু অধিক হইবে। এক মণ পাট উৎপন্ন করিতে কৃষকদিগের গড়ে সাড়ে ৪ টাকা হইতে ৫ টাকা খরচাই পড়ে। ভাল পাট উৎপাদন করিতে আরও কিছু অধিক খরচা পড়িয়া থাকে। কাজেই এই দরে পাট বিক্রয় হইলে কৃষকরা কিরূপ লাভবান হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মোকামে পাট লইয়া যাইবার খরচা প্রভৃতিও আছে। সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তবে ভাল পাট কলওয়ালা-দিগের নিকট সাড়ে ৭ টাকা মণ বিক্রয় করিতে হইবে; সুতরাং কলওয়ালারা এই দিল্লী-পরিষদে বিশেষ কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। সচিববৃন্দ তাঁহাদের 'সাত চোঙার বুদ্ধি' এক করিয়া পাটের ফুঁপি ধরিয়া যতই টানাটানি করিতেছেন, পাটের গ্রন্থি ততই জটিল হইয়া উঠিতেছে। এখন দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়!

মাদুরায় হিন্দুসভা

বর্ত্তমান পৌষ মাসের ১৩ই তারিখে দক্ষিণাপথের মাদুরায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সভারকর ইহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তাঁহার প্রধান বক্তব্য—"সরকার যখন হিন্দুদিগকে

বিশেষ ভাবে সামরিক শিক্ষাদানের সুযোগ দিয়াছেন, তখন আমি আইন অমান্য আন্দোলনের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি না।"—এই স্থানেই কংগ্রেসের সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ। তাঁহার মূল কথা, হিন্দুদিগের সামরিক ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া সর্ব্ব-বিষয়েই বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, তাহাদিগকে বহিঃশত্রুর এবং অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। গান্ধীজীর 'অহিংসা ধর্ম্মে' তাঁহার আস্থা নাই; কারণ,



বীর বিনায়ক দামোদর সভারকর

তাঁহার মতে 'অহিংসা' সরকারকে হিন্দুদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে স্বীকার করাইতে এবং মোস্লেম লীগের 'গায়ে পড়িয়া' আক্রমণের প্রবৃত্তিকে প্রতিহত করিতে পারে না। অহিংসা-নীতিকে তিনি আত্মঘাতী-নীতি বলিয়া মনে করেন। তবে এ কথাও তিনি জানেন, হিংসার পথে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এ অবস্থায় তিনি কি করিবেন? পশুবলে যে দাবী স্বীকার করাইতে পারা যায় না, নৈতিক বলে এবং আত্মিক বলে তাহা স্বীকার করাইতে পারা যায়। ইহাই হিন্দুর শিক্ষা। কিন্তু নৈতিক বল অর্জ্জন করিতে কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনা চাই,—সেই আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে হইলে আত্মিক শক্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক আলোচনায় কোন লাভ নাই।

হিন্দু মহাসভার আপাততঃ লক্ষ্য—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনলাভ। এ বিষয়ে তাঁহারা কংগ্রেস এবং উদারনীতিক দলের মধ্যপন্থী। মিঃ সভারকর ভারতবর্ষকে শিল্পপ্রধান করিতে চাহেন। ভারতে বড়-বড় শিল্পের কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পণ্য উৎপাদনে বৈদেশিক শিল্পের প্রতিযোগিতা প্রতিহত করাই তাঁহার লক্ষ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশী শিল্পজাত পণ্যকে আমল না দেওয়ার জন্য উহা বর্জ্জন করাই বিধেয়। আদম-সুমারে যাহাতে ঠিক লোকগণনা করা হয়, হিন্দুদিগের সংখ্যা যাহাতে যথাযথ ভাবে লিখিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুসভার সভাপতি মহাশয় উদারনীতিকদিগের ন্যায় নাজীবাদ ও ফাসিষ্টবাদের প্রতি উগ্র বিদ্বেষ প্রকাশ না করিলেও নাজীবাদ ও ফাসিষ্টবাদের নিন্দাই করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, গ্রেট বৃটেনই হউক, আর জার্ম্মাণীই হউক, ফ্রান্সই হউক, আর ইটালীই হউক, এবং পোল্যাণ্ডই হউক অথবা হল্যাণ্ডই হউক, যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহই নীতিজ্ঞানের প্রভাবে অথবা গণশাসনপ্রীতির প্রণোদনে বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। যাহারা যুদ্ধে যোগদান করে নাই, সেই রুসিয়া ও মার্কিণও লোকহিতৈষণা অথবা গণতান্ত্রিকতার জন্য যুদ্ধে বিরত আছে, এরূপ নহে; সকলেই স্বার্থের জন্য,—আত্মপোষণের জন্য এই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, বা ইহা হইতে দূরে আছে। এ প্রসঙ্গ লইয়া বাদানুবাদ করা এখন বৃথা এবং অসঙ্গত। ইংলণ্ড যে নিঃস্বার্থ ভাবে অর্থাৎ কেবল ডেমোক্রেসীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, এ কথা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে কোন মতবাদে মসগুল না হইয়া, যাহাদের দ্বারা আমাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইবে, তাহাদেরই সহিত আমাদের সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু কাহার বা কাহাদের দ্বারা আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হইবে, তাহা কি প্রথমে বুঝিতে পারা যায়? সেই জন্য মিষ্ট কথায় কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে। তিনি বলেন, এই যুদ্ধে বৃটিশ জাতি

এ-ভাবে পরাজিত হইতে পারে না যে, জার্ম্মাণী তাহাদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ কাড়িয়া লইতে পারিবে। আর ইংরেজ জয়ী হইলেও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার রত্নটি পকেট হইতে বাহির করিয়া ভারতবাসীকে উপহার দিবে না।

যাহা হউক, তিনি বলিয়াছেন, ইংরেজ যদি এই যুদ্ধের পর এক বৎসরের মধ্যে আমাদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিবেন। ইনি পাকিস্থান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং হিন্দুদিগকে কংগ্রেসের অনুকূলে ভোট দিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইনি সমগ্র হিন্দুজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সকল হিন্দু সকল বিষয়েই যে একমত হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না; তবে তিনি সরল এবং স্বাধীন ভাবে তাঁহার মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন, এ জন্য তিনি সকলেরই প্রশংসার্হ।

নিখিল ব্রহ্ম-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

ব্রহ্মদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীরা বড়দিনের ছুটির সময় রেঙ্গুণ সহরে নিখিল ব্রহ্ম-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ, পি-আর-এস, সেই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের বিশেষ পরিশ্রমে এবং যথেষ্ট ত্যাগস্বীকারে আপনাদের কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য এই প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ ভারতের সান্নিধ্যেই অবস্থিত; এই দুই দেশের মধ্যে নিবিড় সংযোগ ছিল। ব্রহ্মদেশ ভারতের ধর্ম্ম দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল, কেবল ইহাই নহে, মন্দির-গঠনের স্থাপত্য, সাহিত্যিক ভাব, প্রশস্তি-লিখন প্রভৃতি দ্বারাও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রবাসী বঙ্গবাসীদিগের ব্রহ্মের সহিত বাঙ্গালায় ভাবের আদান-প্রদান করা আবশ্যক। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহা তাঁহারা ভুলিতে পারেন না। বিশেষতঃ, ভারতের সহিত ব্রহ্মের রাজনীতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় হৃদয়ের যোগসূত্র সুদৃঢ় হওয়াই উচিত, এবং সাহিত্যই প্রধান মিলন-সূত্র। আমরা এই সম্মিলনের সাফল্য কামনা করি।

বড়লাটের পুনরুক্তি

১লা পৌষ লর্ড লিন্‌লিথগো 'এসোসিয়েটেড্ চেম্বারস অব কমার্সে' বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, তিনি বিগত আগষ্ট মাসে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই দিবার নাই! ঐ সময়ে তিনি ভারতবাসীদিগকে কি রত্ন দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ত আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে তুষে ভারতবাসীরা তুষ্ট হইতে পারিতেছে না,—ইহাই কি ভারতবাসীর অপরাধ? ভারতে যে কয়টি রাজনীতিক দল আছে, তাহার মধ্যে উদারনীতিক দল অল্পেই সন্তুষ্ট হইতে রাজী। কিন্তু তাঁহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা কলিকাতায় উদারনীতিক সভার বার্ষিক অধিবেশনে বিবিধ বক্তার উক্তিতেই প্রকাশ; সুতরাং বড়লাট তুষ্ট করিবার মত কিছু দিতে চাহিয়াছেন, তাহা বলিবার উপায় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, কংগ্রেসের অনুষ্ঠিত সত্যাগ্রহ দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকেরও মনোভাব প্রতিফলিত করে না। তাঁহার এই মন্তব্য, কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁহার বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী এক বড়লাটের মন্তব্য—'মাইক্রস্কোপিক মাইনরিটী'রই প্রতিধ্বনি। কিন্তু বড়লাট যদি এইরূপই বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কি সত্যই ভুল বুঝেন নাই? উহা দেশের সর্ব্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলিত না করিতে পারে, কিন্তু বহু লোকেরই মনোভাব যে প্রতিবিম্বিত করে, তাহাতে সন্দেহ আছে কি? যাঁহারা কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশে সংখ্যাধিক প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন, যাঁহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত ৭টি প্রদেশের রাজনীতির কার্য্য ও শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের পশ্চাতে যে অধিক সংখ্যক সম-মতাবলম্বী লোক নাই,—এরূপ মনে করা কি দূরদর্শিতার পরিচায়ক?

বড়লাট বলিয়াছেন, গত ৮ই আগষ্ট তিনি যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা "সরল, অকপট এবং উদার মনোভাব-প্রসূত।"—এ-মনোভাব হয় ত সত্য; কিন্তু ভারতের কোন রাজনীতিক দল যখন সে দান গ্রহণ করিল না, তখন তাঁহাদের বুঝা উচিত ছিল—উহাতে এমন কোন ত্রুটি ছিল, যে জন্য কেহই উহা গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। আসল কথা, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্র এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, ফাঁকা কথায় তাহা ভিজাইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা যদি ইতোমধ্যে যুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলেও দেশের লোক তুষ্ট হইতে পারিত; কিন্তু তাঁহারা সেরূপ প্রতিশ্রুতি দিতেও প্রস্তুত নহেন। তবে লোক কি গ্রহণ করিবে? কংগ্রেসের সভাপতি বড়লাটের ঐ অভিভাষণ সম্বন্ধে এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের কয়েক জন পদস্থ সদস্যের বিজ্ঞতাপূর্ণ পত্রের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "উহাতে নূতন কিছুই নাই। কংগ্রেস সম্মানজনক সর্ত্তে সহযোগিতা করিবার প্রস্তাব করে; কিন্তু সরকার এ সম্বন্ধে আর কিছু বলেন নাই। সুতরাং কংগ্রেস বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থার পুনর্ব্বিবেচনা করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছেন না।"

— —

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের প্রতিবাদ

হকাই মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের প্রতিবাদকল্পে ৬ই পৌষ শনিবার হাজরা পার্কে যে বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা নানা কারণেই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিবাদ-সভায় প্রায় ১০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল, এবং বহু বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয় হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হইয়া এই সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় ৭ শত স্কুলের সম্পাদক, প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক, এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই বিলখানি বাঙ্গালায় কিরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতেই তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় বার্দ্ধক্য-জীর্ণ এবং ব্যাধিক্লিষ্ট দেহেও সুপবিত্র কর্ত্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সভাপতির দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং ন্যায়ের সমর্থক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রতিবাদ-সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে কঠিন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধ কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেও প্রতিপন্ন হইয়াছে—এই সভার উপযোগিতা কত অধিক।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতার গড়ের মাঠে সার এণ্ডরু স্কোবলের বিলের প্রতিবাদকল্পে এক



আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল;—উৎসাহ এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় এই সভা তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন বলিয়া মনে হয় নাই। বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলীর এই বিলখানির প্রতিকূলে দেশের লোকের যে বিক্ষোভ লক্ষিত হইতেছে,—এক বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে উদ্ভূত বিক্ষোভের সহিতই তাহার তুলনা চলিতে পারে।

এই বিরাট প্রতিবাদ-সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে যে সকল কথা বলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েক জন বক্তার

দুই-একটি বিশেষ উক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "এই বিলখানির উদ্দেশ্য, মনে হইতেছে—বাঙ্গালার শিক্ষাকে মুসলমানী-শিক্ষায় পরিণত করা, এবং আর্থিক দিক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পঙ্গু করা।" অধিকন্তু, "এই বিলখানি কৃতঘ্নতার মনোবৃত্তি লইয়া পরিকল্পিত হইয়াছে।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাঁহাদের অর্থে পুষ্ট, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্যই যেন এই পাণ্ডুলিপিখানি পরিকল্পিত হইয়াছে। সেই জন্য সার মন্মথনাথের এই উক্তি সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। এই বিলখানি যাঁহাদের পরিকল্পনা, তাঁহাদিগকে স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টের দোহাই দিতে দেখিয়া সার মন্মথনাথ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বিলখানিতে স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টের মূল নীতিই উপেক্ষিত হইয়াছে।

আচার্য্য সার পি, সি, রায়ের অভিভাষণটি দুর্ব্বল দেহে পাঠ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইবে বলিয়া, ডক্টর শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। আচার্য্য রায় বলিয়াছেন, "এই বিলখানি আদৌ শিক্ষা-সম্পর্কিত নহে,—ইহা রাজনীতিক এবং সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা মাত্র।" যিনি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল শিক্ষাদান-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য, এবং অত্যুক্তিবিহীন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙ্গালার স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের এবং শিক্ষাদানে ব্রতী ব্যক্তিগণের বংশ-পরম্পরার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য বাঙ্গালার সচিবগণের এই প্রচেষ্টা দেখিয়া আচার্য্যদেব বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এই বিলখানি আইনে পরিণত হইলে ভিতর এবং বাহির হইতে সরকারই ইহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন, বোর্ড তাহাদের প্রভুদিগের আদেশ ব্যতীত কোন নূতন কার্য্যের সূত্রপাত করিতে পারিবে না।"—তাঁহার এই উক্তি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই বিলখানির আলোচনা-প্রসঙ্গে আচার্য্য রায় বলিয়াছেন, "আমরা এখন অতি সঙ্কট অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেছি। আমাদের চারি দিক নিবিড় তিমির-জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের লোকের মন দারুণ বিষাদে নিমগ্ন হইতেছে। তবে এতগুলি প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি এখানে সমবেত হইয়াছেন—ইহা দেখিয়া আমার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে।"

আশুতোষ-হলে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি-প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সারগর্ভ বক্তৃতায় বলেন, "শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন করিলে তাহার ফল অতি ভয়ানক হইবে। ৫ হাজার বৎসর ধরিয়া এই ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীয় এবং প্রতীচীর শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণীর, রোমানদিগের, এবং মার্কিণের পুনরভ্যুদয়ে ও রোমা রোঁলার ও মেটার্ণিকের চিন্তার ভাবধারা ভারতীয় চিন্তা হইতেই গৃহীত হইয়াছে।"—আজ মাধ্যমিক শিক্ষা বিপর্য্যস্ত করিয়া সেই চিন্তার উৎস রুদ্ধ করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা প্রতিহত করিবার জন্য সমস্ত বাঙ্গালীর বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

উদারনীতিক-সঙ্ঘের অধিবেশন

গত ১৩ই পৌষ শনিবারে কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে উদারনীতিক সঙ্ঘের ২২তম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়; ১৫ই পৌষ উহার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। এক সময় এই উদারনীতিক দলই ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক দল ছিল; কিন্তু কালের সহিত সমান ভাবে পদক্ষেপ করিয়া চলিতে পারে নাই বলিয়া ইহাকে আজ রাজনীতি-ক্ষেত্রে অনেক পিছাইয়া পড়িতে হইয়াছে। এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ রাজনীতিক, সাহিত্যবিশারদ জন মর্লি বলিয়াছিলেন, 'উদারপন্থিগণকে পুনর্গঠিত কর (Rally the Moderates); তখন যদি বৃটিশ-কর্ত্তৃপক্ষ এই দলের দাবী পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতে এইরূপ অশান্তি উপস্থিত হইত না; বৃটিশ জাতিকেও ভারতের জন্য এত চিন্তিত হইতে হইত না। ভারত বৃটিশ জাতির নির্ভরযোগ্য সহায় হইয়া তাঁহাদিগকে এই সামরিক সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারিত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু সে সুযোগ ত্যাগ করিয়া বৃটিশ জাতি কত দূর বুদ্ধিমত্তার,

কিরূপ বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। যাহা হউক, সেই সাবেক উদারনীতিক দলের যাঁহারা এখনও অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারাই ভারত সভার সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের বার্ষিক সভার অধিবেশন শেষ করিয়াছেন। এবার উদারনীতিক সঙ্ঘের মিষ্টার ভি, এন, চন্দবরকর সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন; এবং



মিষ্টার ভি, এন, চন্দবরকর

লর্ড সিংহ অভ্যর্থনা সভার সভাপতি হইয়াছিলেন; উভয়েরই বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইঁহাদের উভয়ের মুখে একই কথা—আমরা ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ষ্ট্যাটুট-নির্দ্ধারিত স্বায়ত্ত-শাসন চাহি। আমরা বৃটিশ রাজ্যের পরিবার হইতে স্বতন্ত্র হইতে চাহি না; আমরা বৃটিশ জাতির সহিত সখ্যবদ্ধ হইয়া, সমাধিকারসম্পন্ন হইয়া থাকিতে চাহি। আজ বৃটিশ জাতি যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, সে যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ। অতএব এই যুদ্ধে যাহাতে বৃটিশ জাতির জয় হয়, তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য।

লর্ড সিংহ বাঙ্গালী, তিনি বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা বিশেষ ভাবেই অনুভব করেন; সেই জন্য বাঙ্গালার বেদনা তাঁহার বক্তৃতায় সুস্পষ্টরূপেই ধ্বনিত হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা যে, ভারতের শাসনযন্ত্রের প্রগতির বিষয় যে ভাবেই পরিকল্পিত হউক,—জাতির মধ্যে যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ এবং বিদ্বেষ স্থান না পায়, এবং প্রাবল্য লাভ না করে, সে দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উচিত। কথাগুলি যে সত্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন কি, যাঁহারা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া স্বার্থ-সাধনকল্পে সূত্রাকর্ষণে দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারাও কথাগুলির যাথার্থ্য অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন না। কেবল কতকগুলি লোক তুচ্ছ কারণ দেখাইয়া ইহার সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, এবং যথাসাধ্য করিতে থাকিবেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালায় যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, তাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের অধিকারের ন্যাসরক্ষক বা জিম্বাদার, এরূপ উদার মনোভাব প্রতিফলিত হইতেছে না। যোগ্যতা এবং চরিত্রবলের বনিয়াদের উপর শাসন-কার্য্য-সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না করিয়া জাতি, সম্প্রদায় এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের বনিয়াদের উপর উহা আইন-বলে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। এজন্য আমরা পশ্চাদাবর্ত্তন করিতেই বাধ্য হইতেছি; ইহার ফলে সমগ্র দেশে 'ইনকুইজিশানের' আমল উপস্থিত হইতেও পারে। ইনি আরও বলিয়াছেন, এই বিংশ শতাব্দী



লর্ড সিংহ

সাম্প্রদায়িক-নির্ব্বাচন রোয়েদাদের ন্যায় পশ্চাদবর্ত্তী ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তনের যুগ নহে, এবং ভারতবর্ষও ঐরূপ প্রতিকূল ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তনের ক্ষেত্র নহে। ইদানীং বাঙ্গালায় যে সকল প্রতিকূল বিধি প্রণীত হইয়াছে, লর্ড সিংহ তাহা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

মিষ্টার চন্দবরকর অন্য ভাবে বক্তৃতা করিয়াছেন। উদারনীতি কি, এবং তাহার দার্শনিক তত্ত্বই বা কিরূপ, তাহার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,"উদারনীতির মূলমন্ত্র এই যে, জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী, গোষ্ঠী বা দল যাহাতে সমগ্র দেশের প্রকৃত স্বার্থের উপরে যাইতে না পারে, তাহাই কর্ত্তব্য। সে দিন মিষ্টার আমেরী—'ভারতই সর্ব্বপ্রথম' এই ধূয়া ধরিয়াছেন। ইহার বহু দিন পূর্ব্বে পরলোকগত সার ফিরোজ সা মেটা কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমে ভারতবাসী,—আর যদি কিছু থাকে, তবে তাহার পশ্চাতে তাহাদের স্থান, জাতি হিসাবে ইহাই ভারতের শেষ অবলম্বন। ভারতে একতা স্থাপন এবং জাতীয়তার সংগঠনই উদারনীতির দ্বিতীয় দফা। যাহাতে সেই একতার অপহ্নব ঘটে, তাহা করিলেই বুঝিতে হইবে, আমাদিগকে চির পরাধীন করিয়া রাখিবার জন্য তাহা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সামাজিক জীবনে একটি মাত্র জাতীয়তা হইতে পারে। ইহার মূল একতা। ইহারই নাম ভারতীয় জাতীয়তা। ভারতে এখন যদি সে ভাব দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বহু দূর যাইতে হইবে না। মিণ্টোমর্লি-শাসনসংস্কারে যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই ইহার মূল কারণ।"—এ কথা যে সত্য, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহা যাঁহারা সরকারের সর্ব্বপ্রধান সমর্থক, সেই দলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথা। মিষ্টার চন্দবরকর তাঁহার অভিভাষণে আরও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,—"বৃটিশ সরকার সুদৃঢ় স্বরে বহুবার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিবেন, কিন্তু কত দিন পরে ভারতবাসী সেই অধিকার পাইবে, তাহা বলা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধ অবসানের পর যথাসম্ভব অল্প কালের মধ্যে ঐ অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে দুই বৎসরের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি পালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহার পর ভারতবাসীরা তাহাদের মুক্তির পথ আপনারা প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইতোমধ্যে বৃটিশ সরকারের ভারতে তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপক একটি মিশন প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ঐ মিশন ভারতের সহিত ইংলণ্ডের বন্ধুত্বের চুক্তি করিবেন। সেই সন্ধি আয়র্লণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধির হুবহু নকল না হউক, কতকটা ঐরূপ ভাবের হইবে।"—ইনি আরও বলিয়াছেন, "ভারতবাসীর সহিত ইংলণ্ডের শাসন-সমস্যার সমাধান সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। উহার সমাধান না হইলে অন্য সমস্যার সমাধান হইবে না।"—ইনি পাকিস্থান পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত উদারনীতিকদিগের যে যে বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহার কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য এইবার স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইল।

প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

১৩ই পৌষ শনিবার জামসেদপুরে বঙ্গীয় 'প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের' অধিবেশন হইয়াছিল, এবার এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, এবং টাটার কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, জে, গান্ধী মূলসভায় সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; তিনি বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞতাবশতঃ ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিবৃত করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন—অনুবাদ পাঠেই তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত পরিচিত। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলেন, বাঙ্গালা গ্রন্থ যাহাতে সকলে পড়ে, এবং বাঙ্গালার চিন্তার ভাবধারার সহিত অন্যান্য প্রদেশের লোক যাহাতে পরিচিত হইতে পারে, সে জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত; তবে তাঁহার উক্তির মধ্যে একটি বিশেষ কথা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "বাঙ্গালীরা সাহিত্য সম্বন্ধে যত দূর অবহিত, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে তদ্রূপ অবহিত নহেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সময় বাঙ্গালায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করিয়াছিল, সে সময় বাঙ্গালীরা শিল্প ও

বাণিজ্যে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করেন ; কিন্তু তাহার পর তাঁহারা কেরাণীগিরির মোহে আকৃষ্ট হইয়া শিল্প-বাণিজ্যের সেবা ত্যাগ করেন। আজ বাঙ্গালার পাট-



শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কল, কয়লার খনি প্রভৃতি প্রায় সকলই বৈদেশিকগণের হস্তগত, কার্পাস কল এবং চিনির কল বাঙ্গালীর অধিক নাই ; ইহার কারণ বাঙ্গালীর ধৈর্য্যের অভাব। তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ নাই। অধিকন্তু, উত্তেজনাজনক কার্য্যেই তাঁহারা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। সুদৃঢ় সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া মৌন-ভাবে তাঁহারা কার্য্যপরিচালনে অসমর্থ। যে সকল কার্য্য সংসাধনের জন্য লোক-নয়নের অন্তরালে জীবন উৎসর্গ করিয়া তাহাতেই নিরন্তর ব্রতী থাকিতে হয়, এবং অদম্য জিদের সহিত যাহাতে আসক্ত থাকিতে হয়, সেই সকল কার্য্যে বাঙ্গালীর মন বসে না। সার পি, সি, রায়ও এই কথা বলিয়াছেন।"—কথাগুলি সত্য হইলেও সাহিত্য-সম্মেলন এই সকল প্রসঙ্গের অবতারণার স্থান নহে। বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে অবাঙ্গালী সভাপতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলেও তিনি বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে কেবল যে বাঙ্গালীর ধমনীর স্পন্দনই প্রকাশ করে, এরূপ নহে, উহা অন্যান্য প্রদেশের লোকের হৃদয়ের স্পন্দনও প্রতিফলিত করে ; সেই জন্য আমি বলি—



টাটার জেনারল ম্যানেজার মিষ্টার জে, জে গান্ধী

বাঙ্গালীর সাহিত্যে যাহা গৌরবদ্যোতক, তাহা সমগ্র ভারতেরই গৌরবদ্যোতক।" এই সভায় শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতাটি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বিজ্ঞান-কংগ্রেস

এবার বারাণসীধামে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বৈঠক বসিয়াছিল। সার আর্দ্দেশীর দালাল তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটি চিন্তাশীলতাপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি কেবল বৈজ্ঞানিক নহেন, শিল্প-সেবাতেও তাঁহার দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধকালীন সুবিধা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্প প্রগতির পথে বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না কেন, সে সম্বন্ধে সার

আর্দ্দেশীর অতি সন্তর্পণে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক এবং শৈল্পিক অনুসন্ধান-সমিতির কথার আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছেন, এই বোর্ড প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; কারণ, উহা যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহা দ্রুত প্রগতি-সাধনের অনুকূল নহে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রী সরকারের একটি বিভাগের সহিত উহার সংস্রব রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগে ইহার কার্য্য-পরিচালনোপযোগী পর্য্যাপ্ত লোক নিয়োগ করা হয় নাই। এক কথায় সকল দিক হইতেই এই বোর্ডকে সরকার পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছেন। এই বোর্ডের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য সরকার প্রথমে কেবল ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য এই টাকার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। সরকারের লাল-ফিতার বন্ধনে আবদ্ধ শিল্প-সংক্রান্ত কার্য্য দ্রুত উন্নতিসাধনে কখনও সমর্থ হয় নাই। সার আর্দ্দেশীর আলিপুরের 'টেষ্ট-হাউস'কে জাতীয় ভৌতিক এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরিণত করিতে চাহেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, অনুকূল রাজনীতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হইলে শ্রমশিল্প কুত্রাপি উন্নতিলাভে সমর্থ হয় না। ভারতে শ্রমশিল্প যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে না, সে-জন্য সরকারী নীতি যে কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী—এ কথা তিনিও বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিযোগ কি কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে? নতুবা এ আক্ষেপ অরণ্যে রোদন মাত্র!

উষারাণী দেবীর কারাবরণ

সাঁওতাল-পরগণাস্থ ডুমকার ফরওয়ার্ড-ব্লকের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা উষারাণী মুখোপাধ্যায় ভারতরক্ষা আইনে ধৃত হইয়া কারাবাসিনী হইয়াছেন। ডুমকা-জেল হইতে তাঁহাকে হাজারিবাগ-জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী স্বাতী দেবী তাঁহার সঙ্গেই আছেন।

শ্রীযুক্তা উষারাণী ডুমকায় নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে রত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই সেখানে জনসাধারণের মধ্যে ফরওয়ার্ড-ব্লকের প্রতিষ্ঠা হয়; এবং তাঁহার আগ্রহের জন্যই ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুত হরিবিষ্ণু কামাথ আই, সি, এস চাকরি-ত্যাগের পর তাঁহাকে ডুমকার ফরওয়ার্ড-ব্লকের সভানেত্রীর পদ প্রদান করেন। তাঁহার দেশহিতব্রত প্রশংসনীয়।

পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য

কেন্দ্রী পরিষদের সদস্য পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া দিল্লীর আরউইন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু চিকিৎসায়



পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য

তাঁহার কোন উপকার হয় নাই। কিছু দিন রোগ ভোগ করিয়া ১৯শে পৌষ শুক্রবার রাত্রিকালে এই হাস-পাতালেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার মৃতদেহ তৎপর-দিন এলাহাবাদে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে যৌবন-সীমা অতিক্রম করেন নাই। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, এবং কেন্দ্রী-পরিষদে স্বদেশবাসীর স্বার্থ-সমর্থনের চেষ্টা করিতেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও খ্যাতনামা সাংবাদিক, মাতৃভাষার সেবায় আমাদের সহযোগী সুহৃদ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সংপ্রতি অশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্ম-স্থান বোম্বাই নগরে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন রহিত হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এই দুঃসংবাদে আমরা আত্মীয়-বিয়োগবেদনা অনুভব করিয়াছি। নগেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে



নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বঙ্গসাহিত্যের কত ক্ষতি হইল, যাঁহারা বহু দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গসাহিত্যের যে সকল নবীন লেখক সাহিত্য-সাধনায় সাফল্য লাভ করিয়া সুলেখক বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের বিস্তারম্ভের বহু পূর্ব্ব হইতেই নগেন্দ্রনাথ সুলেখক বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছিলেন, এবং তিনি বঙ্কিম-যুগের লেখকগণের সমসাময়িক না হইলেও শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর কর, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহ ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাপন্ন সেবকগণের সমসাময়িক ছিলেন ; তিনি সুদীর্ঘ জীবনে ইঁহাদের অনেকেরই অপেক্ষা দীর্ঘকাল মাতৃ-ভাষার সেবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃ-ভাষার ন্যায় ইংরেজী ভাষাতেও তাঁহার লিপিকুশলতা অসাধারণ ছিল, এবং তিনি এই শক্তির সম্যক সদ্ব্যব-হার করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের এরূপ প্রতিষ্ঠা-পন্ন পুরাতন কৃতী সেবকের জীবন-কথা আলোচনার যোগ্য।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিহারের মতিহারীতে নগেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মথুরানাথ গুপ্ত সব-জজ ছিলেন। তিনি প্রথমে ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন ; পরে ত্রিশ বৎসর বয়সে ইংরেজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়া এই ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া-ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ পিতার মধ্যম পুত্র। তিনি কলিকাতার কলেজে যখন অধ্যয়ন করেন, তখন পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। কিন্তু নগে

সংবাদপত্রের সেবায় আকৃষ্ট হওয়ায় সহসা একুশ-বাইশ বৎসর মাত্র বয়সে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থ করাচিতে উপস্থিত হইয়া 'ফিনিক্স' নামক সংবাদ-পত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে তিনি আট বৎসর কাল লিপ্ত থাকিবার পর, লাহোরে আসিয়া লাহোরের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'ট্রিবিউনের' সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। এই কার্য্যেও তিনি পাঁচ বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া দীর্ঘকাল পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি 'প্রভাত' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার গ্রে-ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিতেন ; গ্রে-ষ্ট্রীটের এক প্রান্তে তাঁহার বাড়ী, ও অন্য প্রান্তে তখন 'বসুমতী' আফিস ছিল। তাঁহার গৃহে সর্ব্বদাই খ্যাতনামা সাহিত্যিক-গণের সমাগম হইত। সাধারণের নিকট তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন ; এজন্য অনেকেই ভুল ধারণায় তাঁহাকে দাম্ভিক মনে করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার হৃদয় কোমল ছিল, এবং বন্ধুগণ তাঁহার সরস আলোচনায় মুগ্ধ হইতেন।

নগেন্দ্রনাথ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল' নামক একখানি সংবাদপত্রের ভার গ্রহণ করিয়া এক বৎসর পরে তাহার স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ হইতে 'লীডার' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিছু দিন পরে 'ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল' 'লীডারের' সহিত সম্মিলিত হইলে তিনি 'লীডার' পরিচালিত করিতে থাকেন; কিন্তু এই পত্রিকার পরিচালকবর্গের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি 'লীডারের' সংস্রব ত্যাগ করেন, এবং লাহোরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার 'ট্রিবিউনে' যোগদান করেন। তিন বৎসর পর তিনি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া কাশিমবাজার মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে তাঁহার রাজনীতি-কার্য্যে সহায়তা করেন, এবং অতঃপর 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন।

কিন্তু প্রবাসেই তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল; পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রবাসী হইতে হইল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সুপ্রসিদ্ধ টাটা কোম্পানীর তৈলকলের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিয়া বোম্বাই নগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। টাটারা পার্শী হইলেও গুজরাতি ও ইংরেজী ভাষায় 'প্রজামিত্র' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছিলেন; নগেন্দ্র বাবু টাটা কোম্পানীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া 'প্রজামিত্রে'র ইংরেজী অংশের সম্পাদন-ভার গ্রহণে দীর্ঘকালের সাহিত্য-সেবাব্রত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বোম্বাই সহরে পার্শীশ্রেষ্ঠ দাদাভাই নওরোজীর ঐরূপ দ্বিভাষার (ইংরেজী ও গুজরাতি) 'রাস্ত-গোফ্‌তার' নামক একখানি পত্রিকা ছিল, তাহাও তিনি সুচিন্তিত প্রবন্ধসম্ভারে সমৃদ্ধ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

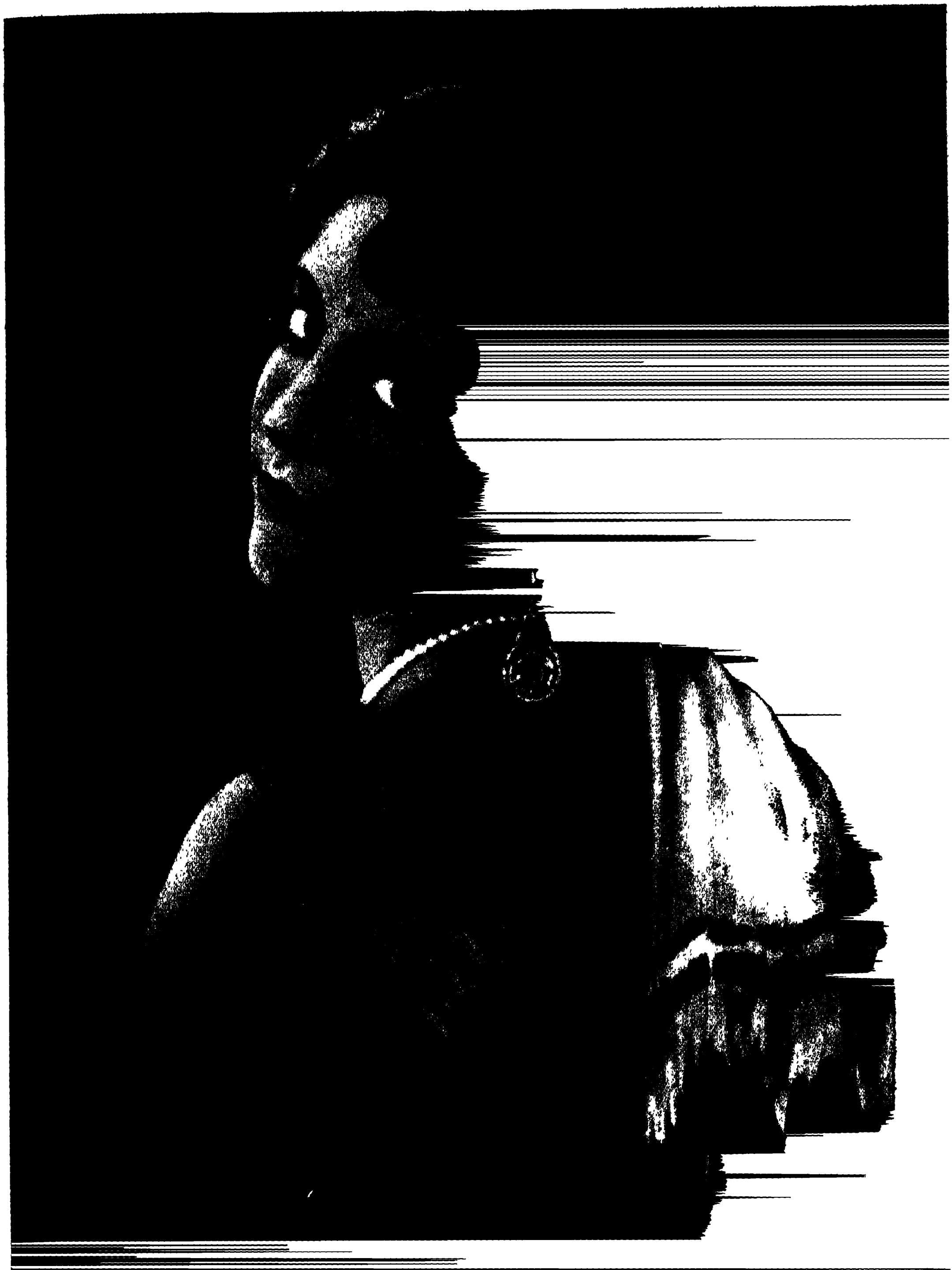
নগেন্দ্র বাবু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে টাটার কার্য্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশের অবসর পাইলেন। এই সময় তিনি 'মাসিক 'বসুমতী', 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি 'ভারতী' ও 'সাহিত্যে'ও গল্প লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'দুইবার' 'চুরি না বাহাদুরী' প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠ করিলে গল্পের যাদুকর প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি মনে পড়ে। তাঁহার রচনার ভাষা স্বচ্ছ, সরল, এবং সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত। কি সাহিত্যে, কি সংবাদপত্র-সম্পাদনে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সাহিত্যালোচনায় লিপ্ত ছিলেন, এবং তাহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার অর্ঘ্যরাজি 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শন লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র বাবুর তিন পুত্র ও চারি কন্যা; তাঁহার পত্নীও জীবিত আছেন। তাঁহাদের এই শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্ নগেন্দ্র বাবুর আত্মার কল্যাণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বারীন্দ্র সেনের শোচনীয় মৃত্যু

বারীন্দ্রনাথ সেন ফরিদপুর অঞ্চলের জমিদার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের অভিপ্রায়ে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। হিসাব-শিক্ষকের কার্য্যে তিনি সেখানে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগও পাইয়াছিলেন। তিনি সফল-মনোরথ হইয়া যথাসময়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন; কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ! ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি লণ্ডনের গাওয়ার ষ্ট্রীটস্থ ভারতীয় ছাত্রাবাসে জার্ম্মাণ-বিমান হইতে বর্ষিত বোমার আঘাতে নিহত হইয়াছেন। এক মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার জন্ম; আর এক মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার জীবনের অবসান! বারীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই অনেক সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহার শোকার্ত্ত পিতা-মাতাকে সান্ত্বনাদানের ভাষা নাই; ভগবান্ তাঁহাদের অন্তরে শান্তিদান করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



"হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধরো ; আনন্দ-আভায়
বড় বড় দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়—"

[শিল্পী—মিষ্টার টম্যা



১৯শ বর্ষ] মাঘ, ১৩৪৭ [৪র্থ সংখ্যা

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে স্থলবিশেষে প্রসঙ্গক্রমে দার্শনিক বিষয়ের চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়।

সূত্রকার পাণিনি এবং বার্ত্তিককার কাত্যায়নের পরে পতঞ্জলির আবির্ভাব। পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বৈয়াকরণগণের কোন দার্শনিক গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না; মহাভাষ্যের পূর্ব্বে "সংগ্রহ" নামে একখানি গ্রন্থ ছিল; সেই গ্রন্থের প্রণেতা ব্যাড়ি এবং সেই গ্রন্থ লক্ষশ্লোকাত্মক ছিল। পুণ্যরাজ বাক্যপদীয়ের টীকায়, কৈয়ট মহাভাষ্যপ্রদীপে ও নাগেশভট্ট মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোতে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১)। এই গ্রন্থে দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা ছিল। শব্দ নিত্য কি অনিত্য,—এই প্রকারের বিচার সে গ্রন্থে ছিল, ইহা আমরা মহাভাষ্য হইতে জানিতে পারি (২)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সে গ্রন্থে দার্শনিক বিচার ছিল। কিন্তু সেই গ্রন্থ বহু পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। মহাভারতের ন্যায় বিশাল সেই "সংগ্রহ", যে সময়ে বৈয়াকরণরা আলস্যবশতঃ অভ্যাস করিয়া রাখিতে অসমর্থ হইতেছিলেন, সেই সময়ে পতঞ্জলি বৈয়াকরণদের সুবিধার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষিপ্ত ভাবে সংগৃহীত করিয়া মহাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন (৩)।

---

(১) "ইহ পুরা পাণিনীয়েঽস্মিন্ ব্যাকরণে ব্যাড্যুপরচিতং শতসহস্রপরিমাণং সংগ্রহাভিধানং নিবন্ধনমাসীৎ।"—বাক্যপদীয় দ্বিতীয়কাণ্ড (৪৮৪ শ্লোক) পুণ্যরাজ টীকা। সংগ্রহে গ্রন্থবিশেষে।—মহাভাষ্যপ্রদীপ—পস্পশাহ্নিক। সংগ্রহো ব্যাড়িকৃতো লক্ষশ্লোক-সংখ্যাকো গ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধিঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত।

(২) কিং পুনর্নিত্যঃ শব্দ আহোস্বিৎ কার্য্যঃ। সংগ্রহে এতৎ প্রাধান্যেন পরীক্ষিতং নিত্যো বা স্যাৎ কার্য্যো বেতি।—মহাভাষ্য-পস্পশাহ্নিক।

(৩) প্রায়েণ সংক্ষেপরুচীনল্পবিদ্যাপরিগ্রহান্।
প্রাপ্য বৈয়াকরণান্ বৈ সংগ্রহেঽস্তমুপাগতে ॥
কৃতেঽথ পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।
সর্ব্বেষাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে ॥
—বাক্যপদীয় ২।৪৮৪,৪৮৫

"সংগ্রহ" গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা মহাভাষ্যকারের সময়ে বিলুপ্ত হইলেও, মহাভাষ্যকার সে গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাভাষ্যে আরও দুই স্থলে "সংগ্রহের" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়;—(১) পস্পশাহ্নিকে "সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে" এই কাত্যায়ন-বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি "সিদ্ধ" শব্দটিকে 'নিত্য' এই অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে প্রমাণরূপে "সংগ্রহে"র উল্লেখ করিয়াছেন:—"সংগ্রহে কার্য্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্মন্যামহে নিত্যপর্য্যায়বাচিনো

আমরা মহাভাষ্যে দার্শনিক বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা লক্ষ্য করিলেও সে গ্রন্থে দার্শনিক বিষয়ের প্রাধান্য দেখিতে পাই না ; তাহার কারণ, মহাভাষ্যকার শব্দের সাধনের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, সুতরাং দার্শনিক বিষয় তাঁহার আলোচ্যের মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। তথাপি তিনি প্রসঙ্গক্রমে যে সকল দার্শনিক তত্ত্বের সংক্ষিপ্তভাবে সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে বীজরূপে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কালে বৈয়াকরণগণের দার্শনিক মত পল্লবিত হইয়া বিশাল আকার ধারণ করিয়াছিল। মহাভাষ্যকারের পরবর্ত্তী কালে বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ে দার্শনিক আলোচনার যে বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহার নিদর্শন আমরা ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয়ে দেখিতে পাই। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি মহাভাষ্যের একখানি টীকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত কৈয়টোপাধ্যায় সেই ভর্ত্তৃহরি-রচিত টীকা অবলম্বন করিয়া মহাভাষ্যের "মহাভাষ্য-প্রদীপ" নামে টীকা প্রণয়ন করেন (৪)।

পাণিনির সূত্রগুলি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারি পাদে (=অংশে) বিভক্ত —ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন ; এই সূত্রের উপর, কাত্যায়ন আবশ্যকতা অনুসারে বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে প্রধানভাবে বার্ত্তিকব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেও সূত্রগুলির স্পষ্ট এবং যথার্থ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন (৫)। ভর্ত্তৃহরি সমগ্র মহাভাষ্যের টীকা

গ্রহণমিতি। ইহাপি তদেব।" (২) উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি (২।৩।৬৬) সূত্রের মহাভাষ্যে একটি বার্ত্তিকের উদাহরণে "সংগ্রহের" নাম উল্লিখিত হইয়াছে,—"শোভনা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ। শোভনা খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্য কৃতিঃ।" মহাভাষ্যে এইরূপ "সংগ্রহে"র উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, ভাষ্যকারের সময়ে "সংগ্রহে"র অধ্যয়নের বিলোপ ঘটিলেও, তাহার গৌরব পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয়ে জাগরূক ছিল।

বাল্মীকিরামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে সংগ্রহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :—

"অসৌ পুনর্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্
সূর্য্যোন্মুখঃ প্রষ্টুমনাঃ কপীন্দ্রঃ।
উদ্যদ্গিরেরস্তগিরিং জগাম
গ্রন্থং মহদ্ ধারয়ন্নপ্রমেয়ঃ॥
সসূত্রবৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং
সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ।
নহ্যস্য কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তি শাস্ত্রে
বৈশারদে ছন্দোগতৌ তথৈব।" ৮।১৪৪-৪৫

এই স্থলে বলা হইয়াছে যে, হনুমান্ সূর্য্যের নিকট "সংগ্রহ" সহিত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বাক্যপদীয়ের টীকাকার পুণ্যরাজ "সংগ্রহ" গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাক্যপদীয়ের ব্রহ্মকাণ্ডের ২৬ শ্লোকের টীকায় দুইবারে "সংগ্রহে"র তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সংগ্রহকারের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ফোটবাদিগণের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বলা হইয়াছে—বাক্যের অন্তর্গত পদের কোন অর্থ নাই ; বাক্যার্থের পর্য্যালোচনা করিয়া পদার্থের কল্পনা করা হয়, এই মাত্র। এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শনের উদ্দেশে "তদুক্তং সংগ্রহে" এই বলিয়া একটি শ্লোক প্রদর্শিত হইয়াছে ;—

"নহি কিঞ্চিৎ পদং নাম রূপেণ নিয়তং কচিৎ।
পদানামর্থরূপং চ বাক্যার্থাদেব জায়তে॥"

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোন পদের সহিত কোন অর্থের সম্বন্ধ নাই ; বাক্যার্থ হইতেই পদের অর্থ কল্পিত হয়।

ইহার পরে, এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই আরও দুইটি শ্লোক "সংগ্রহে"র নামে উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায় ;—

শব্দার্থয়োরসম্ভেদে ব্যবহারে পৃথক্ ক্রিয়া।
যতঃ শব্দার্থয়োস্তত্ত্বমেকং তৎ সমবস্থিতম্॥
সম্বন্ধস্য ন কর্ত্তাঽস্তি শব্দানাং লোকবেদয়োঃ।
শব্দৈরেব হি শব্দানাং সম্বন্ধঃ স্যাৎ কৃতঃ কথম্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ এবং অর্থের পারমার্থিক স্বরূপ একই ; কেবল ব্যাবহারিক অবস্থায় ইহাদের ভেদ করা হয়। বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ থাকায় শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি জন্মে,—সেই সম্বন্ধের কেহ কর্ত্তা নাই, অতএব এই সম্বন্ধ অনাদি। কোন ব্যক্তি যদি শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ করে, তবে সে অন্য কোন শব্দকে অবলম্বন করিয়া সে সম্বন্ধ করিবে। যে শব্দকে অবলম্বন করিয়া অন্য শব্দের সম্বন্ধ করা হইবে, সেই শব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধও অন্য শব্দকে অবলম্বন করিয়া করিতে হইবে। এইরূপে অনবস্থাদোষ ঘটায় শব্দের দ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ করা যাইতে পারে না, অতএব শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনাদি, ইহাই পর্য্যবসিত হইতেছে।

যে স্থলে অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশে 'ঘট' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, 'ঘট' শব্দ—এই অর্থেই 'ঘট' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, সে স্থলে একটি 'ঘট'শব্দ বাচক এবং অন্য 'ঘট' শব্দটি বাচ্য। এইরূপ দুইটি ঘট শব্দ পরস্পর বিভিন্ন দুইটি শব্দ হইলেও আকারের সাদৃশ্যবশতঃ অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—ইহা "সংগ্রহ"কার বলিয়াছেন—এ কথা পুণ্যরাজ একস্থলে বলিয়াছেন ;—"সংগ্রহকারস্তু অভিধেয়ং স্বরূপং নাভিধানতাং প্রতিপদ্যতে তত্ত্বভিধেয়মেব গোপিণ্ডাদিবৎ, তুল্যরূপতয়া অভিধানতামনাপন্নমপি সমুচ্চার্য্যমাণ-ত্বেনাবসীয়ত ইত্যাহ।"—বাক্যপদীয়টীকা ১।৬৫

(৪) তথাপি হরিবদ্ধেন সারেণ গ্রন্থসেতুনা।
ক্রমমাণঃ শনৈঃ পারং তস্য যাস্যামি পঙ্গুবৎ॥
—মহাভাষ্যপ্রদীপ-উপক্রম।

(৫) মহাভাষ্যে পাণিনির সকল সূত্র ব্যাখ্যাত হয় নাই ;

লিখিয়াছিলেন; তাহা না হইলে, কৈয়ট কেবল তাঁহার টীকাকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র মহাভাষ্যের ব্যাখ্যায় সমর্থ হইতেন না। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈন পণ্ডিত বর্দ্ধমান স্থরি "গণরত্নমহোদধি" নামক একখানি ব্যাকরণসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; সেই গ্রন্থে বিভিন্ন স্থত্রের অপেক্ষিত গণপাঠ প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান স্থরি স্বয়ং এই "গণরত্ন-মহোদধি"র একখানি টীকাও লিখিয়া গিয়াছেন। সেই টীকায় তিনি ভর্ত্তৃহরির পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—ভর্ত্তৃহরি বাক্যপদীয় এবং প্রকীর্ণকের প্রণেতা এবং মহাভাষ্যের তিনটি পাদের ব্যাখ্যাতা (৬)। বর্দ্ধমান স্থরির এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত মহাভাষ্যটীকার তিন পাদ মাত্র দেখিয়াছিলেন,—তাঁহার সময়ে এই মহাভাষ্যটীকার তিনটি পাদ মাত্র প্রচলিত ছিল।

এখানে একটি বিচার্য্য বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। অধ্যাপক ম্যাকডনেল তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কৈয়টের সময় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৭)। জৈন পণ্ডিত বর্দ্ধমান স্থরি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে "গণরত্ন-মহোদধি" রচনা করেন,—ইহা তিনি গ্রন্থশেষে লিখিত পদ্যে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—বিক্রমাদিত্য হইতে ১১৯৭ বর্ষ গত হইলে "গণরত্নমহোদধি" রচিত হইয়াছে (৮)। বিক্রমাদিত্যের অব্দের নাম সংবৎ। এই সংবৎ হইতে ৫৬ বৎসর বাদ দিলে খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ১১৯৭ হইতে ৫৬ বাদ দিলে ১১৪১ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি,—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গণরত্নমহোদধি রচিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ভর্ত্তৃহরির মহাভাষ্যটীকার তিন পাদ মাত্র প্রচলিত থাকিলে, তাহার পরের শতাব্দীতে ভর্ত্তৃহরির টীকার অবলম্বনে কৈয়টের মহাভাষ্য-প্রদীপ রচনা সম্ভাবিত হইতে পারে না। এই জন্য সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, অধ্যাপক ম্যাকডনেল কৈয়টের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সময় যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে ভর্ত্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণরূপে অপ্রাপ্য হইয়াছে। এই টীকার খণ্ডিত কিয়দংশ বার্লিন লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে, ইহা আমরা ডাক্তার কীলহর্ণের সম্পাদিত এবং বম্বে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মহাভাষ্য দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হইতে জানিতে পারি (৯)। কিছু দিন পূর্ব্বে এক জন পাঞ্জাবী পণ্ডিত একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রে ঘোষণা করেন, তিনি ভর্ত্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকার সম্পূর্ণ পুস্তক পাইয়াছেন। তিনি সেই পুস্তকের কিয়দংশ ধারাবাহিকভাবে একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেই গ্রন্থের রচনা-পদ্ধতি ও ভর্ত্তৃহরির অলৌকিক প্রতিভা এবং অসামান্য পাণ্ডিত্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, সেই গ্রন্থ যে ভর্ত্তৃহরির বিরচিত মহাভাষ্য-টীকা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ উপস্থিত হয়।

ভর্ত্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকা বহুদিন হইতে বিলুপ্ত হইলেও, তাহার স্মৃতি এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এই টীকার বিলোপ হওয়া সম্বন্ধে কাশীর প্রাচীন পণ্ডিত-সম্প্রদায়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। আমরা পরমপূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺ শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নকালে এই কিংবদন্তী এইরূপ শুনিয়াছি ;—

পতঞ্জলি যে স্থলে আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই, সে স্থলের ব্যাখ্যা করেন নাই।

(৬) ভর্ত্তৃহরির্বাক্যপদীয়প্রকীর্ণকয়োঃ কর্ত্তা মহাভাষ্যত্রিপাদ্যা ব্যাখ্যাতা চ।—বর্দ্ধমানস্থরিকৃত গণরত্নমহোদধি-ব্যাখ্যা—উপক্রম।

(৭) The Mahabhashya was commented on in seventh Century by Bhartrihari in his vakyapadiya......and by Kaiyata (probably thirteenth Century)—A History of Sanskrit Literature, (Macdonell) P. 431 (Fourth Edition.)

(৮) সপ্তনবত্যধিকেষেকাদশস্থ শতেষতীতেষু।
বর্ষাণাং বিক্রমতো গণরত্নমহোদধির্বিহিতঃ।

(৯) Of Bhartrihari's Commentary on the Mahabhashya no complete manuscript has yet been discovered, and for a knowledge of that work we therefore can only consult the fragments preserved in the Berlin Library.—The Vyakaraṇa-Mahabhashya vol. II. Preface, P. 12.

সম্প্রতি বার্লিন লাইব্রেরী হইতে এই খণ্ডিত টীকার ফটোগ্রাফ করাইয়া মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্ট্ লাইব্রেরীতে আনা হইয়াছে।

ভর্ত্তৃহরি অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি মহাভাষ্যের টীকা রচনা করিয়া তাহার শেষে এই শ্লোকটি সংযোজিত করেন ;—

অহো ভাষ্যমহো ভাষ্যমহো বয়মহো বয়ম্।
মামদৃষ্ট্বা গতঃ স্বর্গমকৃতার্থঃ পতঞ্জলিঃ॥

—মহাভাষ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ; আমিও অপূর্ব্ব মানুষ। আমাকে না দেখিয়া পতঞ্জলি অকৃতার্থ অবস্থায় স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরির এই শ্লোক, তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলী অতি গুরুতরভাবে গ্রহণ করিলেন। এই শ্লোকের দ্বারা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া, সেই সময়ের পণ্ডিতগণ একযোগে স্থির করিলেন, তাঁহারা ভর্ত্তৃহরির কোন গ্রন্থই প্রচারিত হইতে দিবেন না। সে সময় মুদ্রা-যন্ত্র না থাকায় গ্রন্থ-প্রচারের একমাত্র উপায় ছিল অধ্যাপনা ; পণ্ডিতগণ একযোগে ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতে অস্বীকার করিলেন। গ্রন্থ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রচলিত না হইলে অল্প দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক গতিতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে,—এই আশঙ্কায় ভর্ত্তৃহরি ব্যাকুল হইলেন এবং নিজের গর্ব্বিত উক্তির জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার গ্রন্থের প্রচারের জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। ইহাতে পণ্ডিতগণ অনেক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইলেও মহাভাষ্যের টীকাখানিকে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না ; ভর্ত্তৃহরির অপর গ্রন্থ বাক্যপদীয় অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রচলিত করিলেন। এইরূপে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় পরিগৃহীত না হওয়ায় ভর্ত্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকা বিলুপ্ত হইল।

এই কিংবদন্তীর কতটুকু সত্যতা আছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ভর্ত্তৃহরি অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার প্রণীত মহাভাষ্যের একখানি টীকা ছিল,—এ সংবাদ আমরা এই কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারি। এই কিংবদন্তীকে অবলম্বন করিয়া ভর্ত্তৃহরির মহাভাষ্যের বিলুপ্ত টীকার স্মৃতি এই সময় পর্য্যন্ত কাশ্মীর পণ্ডিত-সমাজে চলিয়া আসিতেছিল। পুণ্যরাজ তাঁহার প্রণীত বাক্যপদীয়ের দ্বিতীয় কাণ্ডের টীকায় অনেক স্থানে ভর্ত্তৃহরিকে 'টীকাকার' এই শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভর্ত্তৃহরি যে মহাভাষ্যের টীকাকার, তাহাই সূচিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকদের গ্রন্থে "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা" কার বাচস্পতি মিশ্রের উল্লেখ এই ভাবে 'টীকাকার' শব্দের দ্বারা করা হইয়াছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। (প্রামাণ্যবাদ-দীধিতি ও তাহার গাদাধরীর আরম্ভ ভাগ দ্রষ্টব্য।) আমাদের মনে হয়, ভর্ত্তৃহরির টীকার লোপ অন্য কারণে ঘটিয়াছে। কৈয়টের "মহাভাষ্য-প্রদীপ" ভর্ত্তৃহরির টীকাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থে ভর্ত্তৃহরির টীকার সার-সংগ্রহ ছিলই ; তাহার উপর স্থল-বিশেষে কৈয়ট নিজের উদ্ভাবিত নূতন কথাও লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্ত্তী গ্রন্থে কিছু না কিছু অধিক বিষয়ের সমাবেশ থাকা স্বাভাবিক। সে কালে প্রত্যেকখানি গ্রন্থ হাতে লিখিয়া রাখিতে হইত। কৈয়টের গ্রন্থখানিতে মহাভাষ্য বুঝিবার উপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত আছে মনে করিয়া, সেই গ্রন্থেরই অধ্যাপনা প্রচলিত করা হয়, ফলে ভর্ত্তৃহরির টীকার অধ্যাপনা বন্ধ হইয়া যায়। তখন অনাবশ্যক মনে হওয়ায় ভর্ত্তৃহরির টীকা লিখিয়া রাখার ব্যবস্থা রহিত হইয়া যায়। এই ভাবে ভর্ত্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকার বিলোপ ঘটে।

মহাভাষ্য-টীকা ব্যতীত ভর্ত্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু এখন ইহার সমগ্র অংশ পাওয়া যায় না ; ইহার কোন কোন অংশ লুপ্ত হইয়াছে, ইহা বাক্যপদীয়ের পুণ্যরাজ ও হেলারাজের প্রণীত টীকা পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায়।

এই বাক্যপদীয় তিন কাণ্ডে বিভক্ত ; প্রত্যেক কাণ্ডের বিভিন্ন নাম আছে ; প্রথম কাণ্ডের নাম ব্রহ্মকাণ্ড, দ্বিতীয় কাণ্ডের নাম বাক্যকাণ্ড, এবং তৃতীয় কাণ্ডের নাম প্রকীর্ণক। বাক্যপদীয় শব্দের অর্থ,—বাক্য এবং পদকে বিষয়রূপে অবলম্বন করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে,—সেই গ্রন্থ (১০)।

(১০) বাক্যপদে অধিকৃত্য কৃতং বাক্যপদীয়ম্।—শিশুক্রন্দযমসভদ্বন্দ্বেন্দ্রজননাদিভ্যশ্ছঃ ।—৪।৩।৮৮—দ্রষ্টব্য—মহামহোপাধ্যায় ৺গঙ্গাধর শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় কর্ত্তৃক 'লিখিত

জৈন পণ্ডিত বর্দ্ধমান সুরি বাক্যপদীয় ও প্রকীর্ণককে বিভিন্ন গ্রন্থরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি অযৌক্তিক নহে। "বাক্যপদীয়" এই নাম হইতে বুঝা যায়, এই গ্রন্থে বাক্য এবং পদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এইরূপ আলোচনা প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডেই প্রধানভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় কাণ্ডে দ্রব্য, গুণ, জাতি, ক্রিয়া এবং কারক প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা থাকায় এই তৃতীয় কাণ্ডের "প্রকীর্ণক" এই নাম সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'Benares Sanskrit series'এ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বাক্যপদীয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডের উপসংহারে কাশীর তাৎকালিক সুবিখ্যাত পণ্ডিত পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺গঙ্গাধর শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় লিখিয়াছেন, হস্তলিখিত তাঁহার আদর্শ পুস্তকে দ্বিতীয় কাণ্ডের সমাপ্তিতে "সমাপ্তা বাক্যপদীয়-কারিকা" এইরূপ লিখিত ছিল। অতএব দ্বিতীয় কাণ্ডেই বাক্যপদীয়ের সমাপ্তি হইয়াছে। তৃতীয় কাণ্ড একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, এরূপ ধরিয়া লইলে কোন দোষ ঘটে না।

ভর্ত্তৃহরির সময় সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ডাক্তার কীলহর্ণ তাঁহার সম্পাদিত মহাভাষ্যের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ভর্ত্তৃহরির সময় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১১)। অধ্যাপক ম্যাকডনেলও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন (১২)।

এই সিদ্ধান্ত নির্ব্বিচারে গ্রহণ করার পক্ষে বাধা আছে। অধ্যাপক ম্যাকডনেলের মতে "কাশিকা" বৃত্তির সময় প্রায় ৬৫০ খৃষ্টাব্দ (১৩)। এই কাশিকা বৃত্তিতে "বাক্যপদীয়ম্" এই শব্দটি উদাহরণরূপে উল্লিখিত আছে (১৪)। এই উদাহরণটির অর্থ যে গ্রন্থ-বিশেষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে সূত্রের দ্বারা "বাক্যপদীয়ম্" এই শব্দটি নিষ্পন্ন হয়, সে সূত্রটিতে "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে" (৫।৩।৮৭) এই সূত্রের অনুবৃত্তি আছে, সুতরাং গ্রন্থ অর্থে-ই এই উদাহরণটি প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। ভর্ত্তৃহরির সময় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ধরিলে "কাশিকা" বৃত্তি এবং বাক্যপদীয়, এই দুই খানি গ্রন্থ সম-সাময়িক হইয়া পড়ে। বাক্যপদীয় গ্রন্থ যে "কাশিকা"র সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই (৪।৩।৮৮) সূত্রের "কাশিকা" বৃত্তি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। যে সময়ে মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না, সকল পুস্তক হাতে লিখিয়া রাখিতে হইত, সেই সময়ের একখানি গ্রন্থ,—সে গ্রন্থ যতই উপাদেয় হউক না কেন,—তাহার প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই অতি-প্রসিদ্ধির আশা করা যায় না।

অধ্যাপক ম্যাকডনেল ভর্ত্তৃহরিসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবাদের ন্যায় কথা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি ভট্টিকাব্যের প্রণেতা, ইহা টীকাকারেরা লিখিলেও তাহার সম্ভব ও অসম্ভব সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিয়া না দেখা, ম্যাকডনেলের ন্যায় প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতের পক্ষে উচিত হয় নাই (১৫)। নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতক এই শতকত্রয়ের প্রণেতা বাক্যপদীয়-কার ভর্ত্তৃহরি, ইহাও ম্যাকডনেল অতি গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১৬); কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তাঁহার মনে আসে নাই। চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইৎসিং বৈদিক অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের প্রতি

বাক্যপদীয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডের উপসংহার (Benares Sanskrit Series, 1887 A. D.)

(১১) Thanks to Professor Max Muller's discoveries, we know now that he (=Bhartrihari) lived before the middle of 7th Century A. D.—Vyakarana Mahabhashya vol. II (Dr. Kielhorn) Preface, P. 12.

(১২) Bhartrihari lived in the first half of the seventh Century—A History of Sanskrit Literature (Mocdonell) 4th Edn. P. 340.

ভর্ত্তৃহরির মৃত্যু ৬৫১ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল, ইহাও ম্যাকডনেল উক্ত গ্রন্থের ৩২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

(১৩) About 650 A. D. was composed the first Complete Comm. on Panini, the Kashika vritti—Ditto P. 432.

(১৪) কাশিকা ৪।৩।৮৮

(১৫) দ্রষ্টব্য—A History of Sanskrit Literature P. 340.

(১৬) দ্রষ্টব্য—A History of Sanskrit Literature (Macdonell) P. 329.

একান্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও বেদের প্রতি পরমবিশ্বাসী আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির বহুবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রহণ এবং পরিত্যাগ সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস্য সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, তাহাও ম্যাকডনেল নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন।

এখানে সত্যের অনুরোধে আমাদের বলিতে হইতেছে, অধ্যাপক ম্যাকডনেলের কখনও বাক্যপদীয় গ্রন্থের অনুশীলন করিবার অবকাশ ঘটে নাই। তিনি যদি কখনও বাক্যপদীয় গ্রন্থখানি পর্য্যালোচনা করিতেন, তাহা হইলে, বাক্যপদীয়কে মহাভাষ্যের সিদ্ধান্তানুগামী স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে উল্লেখ না করিয়া মহাভাষ্যের টীকারূপে উল্লেখ করিতেন না। স্ফোটবাদ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও প্রাচীন গ্রন্থ (১৭); পরবর্ত্তী কালে মণ্ডন মিশ্র "স্ফোটসিদ্ধি" গ্রন্থে স্ফোটবাদের সমর্থন করিলেও, এই গ্রন্থখানি স্ফোটবাদের মৌলিক গ্রন্থ নহে; ভট্ট কুমারিল প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে যে দুর্দ্ধর্ষ যুক্তিজালের রচনা করিয়াছিলেন, এই স্ফোটসিদ্ধিগ্রন্থ প্রধানভাবে তাহারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। অধ্যাপক ম্যাকডনেলের স্ফোট সম্বন্ধে যথাযথ ধারণাই ছিল না। তিনি "স্ফোট" এই শব্দটিকেও বিকৃতরূপে "স্ফুট" (Sphuta) এই আকারে গ্রহণ করিয়াছেন (১৮)। মাননীয় অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন, "ভারতীয় বৈয়াকরণগণ মীমাংসাদর্শনের শব্দের নিত্যতাসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং "স্ফুট" (Sphuta) সম্বন্ধীয় যোগদর্শনের মতবাদকে দার্শনিক রীতিতে পরিপুষ্ট করিয়াছেন অর্থাৎ প্রত্যেকটি পদের মধ্যে অর্থ-প্রতীতির উপায়রূপে ইন্দ্রিয়ের অগোচর শাশ্বত এবং অন্তর্নিরূঢ় একটি মূলবস্তু স্বীকার করিয়াছেন (১৯)।"

কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় মীমাংসা ও যোগদর্শনের শব্দ-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত হইতে বৈয়াকরণগণের এই বিষয়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহার অনুধাবন করেন নাই। মীমাংসকগণ অকারাদি প্রত্যেক বর্ণকে নিত্য, ব্যাপক এবং এক বলিয়া স্বীকার করেন। উচ্চারণের দ্বারা এই নিত্য বর্ণের অভিব্যক্তি হয়; এই অভিব্যক্তির বিষয়ীভূত বর্ণসমুদয়কে পদ বলা হয় এবং এইরূপ পদসমূহকে বাক্য বলা হইয়া থাকে, ইহাই মীমাংসকগণের মত। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির মতে বাক্যে পদ-বিভাগ নাই এবং পদে বর্ণ-বিভাগ নাই। তাঁহার মতে বাক্য অখণ্ড (২০); সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৈয়াকরণরা শব্দের নিত্যতাবাদী হইলেও তাঁহাদের মতের সহিত মীমাংসকগণের মতের অত্যন্ত পার্থক্য আছে। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি এই অখণ্ড বাক্যকে অর্থ-প্রতীতির হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাঁহার মতে এই অখণ্ড শব্দ জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং এই শব্দব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। যোগদর্শনে 'স্ফোট' নামক অখণ্ড শব্দ স্বীকৃত হইলেও, তাহাকে জগতের মূল কারণরূপে স্বীকার করা হয় নাই; সুতরাং যোগদর্শনের মতের সহিতও বৈয়াকরণগণের স্ফোটসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের ঐক্য নাই।

অদ্বৈত-বেদান্তের দার্শনিক ধারার পারম্পর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আচার্য্য শঙ্করের পরম গুরু গৌড়পাদাচার্য্য যে অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(১৭) মহাভাষ্যে স্ফোটের উল্লেখমাত্র আছে; পতঞ্জলি স্ফোটের সমর্থনের জন্য কোনরূপ বিচারের অবতারণা করেন নাই;—এবং তর্হি স্ফোটঃ শব্দো ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ।...স্ফোটশ্চ তাবানেব ভবতি ধ্বনিকৃতা বৃদ্ধিঃ।

ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।
অল্পো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিদুভয়ং তৎ স্বভাবতঃ।
—মহাভাষ্য ১।১।৭০

"যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণিনাং সংপ্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ" মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকের এই উক্তিকেও মহাভাষ্যের টীকাকার কৈয়ট এবং বাক্যপদীয়ের টীকাকার পুণ্যরাজ স্ফোটের প্রতিপাদকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।—দ্রষ্টব্য, মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিকের মহাভাষ্যপ্রদীপ এবং বাক্যপদীয় দ্বিতীয় কাণ্ডের পুণ্যরাজকৃত ১—২ শ্লোকের টীকা।

(১৮) দ্রষ্টব্য—A History of Sanskrit Literature (Macdonell), P. 407.

(১৯) The Indian grammarians accepted the Mimansa dogma of the eternity of sound and philsophically developed the Yoga theory of the sphuta or the imperceptible and eternal element in every word as the vehicle of its sense.—A History of Sanskrit Literature (Macdonell), P. 407.

(২০) পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ন চ (বর্ণেষ্ববয়বা ইব)।
বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন।
বাক্যপদীয় ১।১৭

করিয়াছিলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সেই সিদ্ধান্তকে জন-সমাজে প্রচুরভাবে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে অদ্বৈত-বেদান্তের যে সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল, তাহাকে 'শঙ্কর-পূর্ব্ববেদান্ত' (Pre-Shankar-Vedanta) শব্দে অভিহিত করা হয়। আচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্ম-সিদ্ধি এই মতের অন্তিম গ্রন্থ, এ কথা বলিলে, বোধ হয় কোন দোষ হয় না। আচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয়ের সম্পাদকতায় মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের মূল গ্রন্থ উপনিষদ্ হইলেও, এই উপনিষদের ব্যাখ্যাভেদে সিদ্ধান্তভেদ ঘটিয়াছে। শঙ্কর-পূর্ব্ব-বেদান্তের আদি প্রবর্ত্তক কে ছিলেন, তাহা এ সময় নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। ইহার প্রবর্ত্তক যিনিই হ'ন না কেন, আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি যে এই শঙ্করপূর্ব্ববেদান্তের একজন প্রধান আচার্য্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ভট্ট নারায়ণকণ্ঠের প্রণীত 'শ্রীমৃগেন্দ্রাগম'-বৃত্তিতে অদ্বৈত-বেদান্তের মতের উল্লেখপ্রসঙ্গে ভর্ত্তৃহরিকে অদ্বৈত-বেদান্তের আচার্য্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (২১)। যে শব্দব্রহ্মবাদ ভর্ত্তৃহরির সম্মত, আচার্য্য মণ্ডন তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধির প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় সেই শব্দব্রহ্মবাদের সমর্থন করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই বিষয়ে ভর্ত্তৃহরির সহিত মণ্ডনের মতের ঐক্য আছে। শুধু ইহাই নহে, আচার্য্য মণ্ডন তাঁহার 'স্ফোটসিদ্ধি' গ্রন্থে ভর্ত্তৃহরির স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সমস্ত দার্শনিক যুক্তির তীব্র সমালোচনা করিয়া ভর্ত্তৃহরির মতের সমর্থন করিয়াছেন। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায়, অদ্বৈত-বেদান্তের আচার্য্য মণ্ডনমিশ্র ভর্ত্তৃহরির অনুগামী ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি 'শঙ্করপূর্ব্ববেদান্তের' সুপ্রাচীন ও প্রামাণিক আচার্য্য, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরির দার্শনিক সম্প্রদায় এক সময়ে এরূপ প্রবল ছিল যে, ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট, মীমাংসাবার্ত্তিক-কার কুমারিলভট্ট, অদ্বৈতবাদের প্রসিদ্ধ প্রবর্ত্তক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং তত্ত্বসংগ্রহকার শান্তরক্ষিত প্রভৃতি বৈদিক ও অবৈদিক দার্শনিকগণ নিজদের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে ভর্ত্তৃহরির মতের খণ্ডনের জন্য গুরুতর প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত বাক্যপদীয়ের যে অংশ এখন পাওয়া যাইতেছে (২২), তাহাতে ভর্ত্তৃহরির পূর্ব্ববর্ত্তী নানা প্রকার দার্শনিক মতের উল্লেখ আছে; যে সকল আচার্য্য এই সকল বিভিন্ন মতবাদের প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। মহাভাষ্যের পর হইতে ভর্ত্তৃহরির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকালের মধ্যে যে সকল দার্শনিক-চিন্তাশীল বৈয়াকরণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থে যে সকল দার্শনিক বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির একটা পূর্ব্বপারম্পর্য্য ছিল, ইহা সুনিশ্চিত। যে পরিপুষ্ট চিন্তার পরিচয় আমরা বাক্যপদীয়ে দেখিতে পাই, তাহার একটা ধারাবাহিক গতি স্বীকার না করিলে গুরুতর অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। এই জন্য মনে হয়, আমাদের সংস্কৃত-রত্নভাণ্ডারের অনেক রত্নই কালের কঠোর পীড়নে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

(২১) ভট্টনারায়ণকণ্ঠ-কৃত শ্রীমৃগেন্দ্রবৃত্তি ১।১১

(২২) আলঙ্কারিকগণের পরম প্রামাণিক মম্মট ভট্ট তাঁহার কাব্যপ্রকাশের কারিকাগুলি রচনা করিয়া, সেই সকল কারিকার উপর স্বয়ং বৃত্তি রচনা করিয়াছেন; এই বৃত্তি গদ্যে রচিত হইয়াছে। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরিও বাক্যপদীয়ের কারিকা রচনা করিয়া গদ্যে তাহার বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা বাক্যপদীয়-দ্বিতীয়-কাণ্ডের পুণ্যরাজপ্রণীত টীকা হইতে আমরা জানিতে পারি। বর্ত্তমান সময়ে ভর্ত্তৃহরি-কৃত এই 'বাক্যপদীয়-বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র 'বাক্যপদীয়'-কারিকাও এখন পাওয়া যায় না; এমন কি, তৃতীয়কাণ্ডের কারিকার মধ্যেও ভর্ত্তৃহরি-কৃত বহু কারিকার বিলোপ ঘটিয়াছে এবং তৃতীয়কাণ্ডেই হেলারাজ-কৃত বহু কারিকা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।



২

কোজাগর পূর্ণিমা। অপরাহ্ণ-সমাগমে শ্রান্ত তপন অস্তগমনোন্মুখ; তাহার সুলোহিত হিরণ্ময় প্রভা শুভ্র মর্ম্মরফলকে প্রতিফলিত হইয়া সম্রাট্ সাজাহানের অবিনশ্বর প্রেমের সুমহান স্মৃতিসৌধ তাজমহলকে যেন সুবর্ণ-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত তাজমহলের সেই রূপ, সেই অপূর্ব্ব শোভা, চিত্রপটে সংরক্ষণের জন্য একাগ্র-চিত্তে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতেছে—সন্তোষকুমারের স্ত্রী মঞ্জুলেখা। তাহার সঙ্গে আসিয়াছে মঞ্জুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দীপেন্দ্র, এবং ননদিনী শেফালী। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া দীপেন্দ্র শেফালীকে বলিল, "রোগীকে সামলাতে পার না, কি রকম ডাক্তার তুমি? বাবা বলে গেলেন, মঞ্জুর খানিক ঘুরে-ফিরে বেড়ান দরকার, তা ঘণ্টাখানেক ধ'রে কি যে এক ছবি নিয়ে বসেছে, উঠ্‌বার নামটি নেই!"

শেফালী বলিল, "ঠিক বলেছ, দীপুদা! মঞ্জু আমাকে একদম গ্রাহ্য করে না। বৌদি হয়েছে কি না, ভাবে, আমার কথা মান্‌বার দরকার নেই। আর আমাকেও একটু ভয়ে-ভয়ে চলতে হয় কি না, তাই বেশী কিছু বল্‌তে পারি-নে।"

শেফালীর কথা শুনিয়া মঞ্জু মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "আহা, ভয়ে উনি লুকোবার জন্যে পিঁপড়ের গর্ত্ত খোঁজেন! চিরকালই তো বৌরা ননদীর ভয়ে কেঁপে মরে; কবে আর কে ননদকে ভাজের ভয়ে কাঁপ্‌তে দেখেছে?"

শেফালী প্রতিবাদের সুরে বলিল, "জান তো শ্রীরাধাই নির্ভয়ে বলেছিল,—'ননদিনী বোলো নাগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে'! কিন্তু সে তর্ক থাক। এইবার আমার হুকুম তামিল কর দেখি; এখন আর হাত না চালিয়ে, উঠে-পড়ে আমাদের সঙ্গে পা চালাও,—খানিক বেড়ানো যাক। প্রতি-বছরের মত এবারেও এখানে অনেক বাঙ্গালী এসেছেন। চল, তাঁদের দেখা যাক, আর তাঁদের রকমারি সাজসজ্জাগুলাও দেখা যাবে।"

অগত্যা মঞ্জু চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম গাড়ীতে পাঠাইয়া চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দীপেন্দ্র তাহার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিল।

ভ্রাতা-ভগিনীতে এমন নিবিষ্ট চিত্তে গল্প করিতেছিল যে, শেফালী কখন্ তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, ইহা কেহই লক্ষ্য করে নাই! শেফালী অন্যমনস্ক ভাবে সমাধিসংলগ্ন উদ্যানের দ্বারের দিকে চাহিয়া যে দৃশ্য দেখিল, সে দিকে চাহিয়া সে সমাধির নিকট হইতে অন্য কোন দিকে যাইতে পারিল না। য়ুরোপীয়ের পরিচ্ছদধারী একটি প্রৌঢ় বাঙ্গালী একটি প্রৌঢ়াকে সঙ্গে লইয়া মমতাজ বেগমের সমাধির দিকে যে সময় অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় একটি তরুণ যুবক তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল। কে এই যুবক? তাহার আকৃতি ও চলনের ভঙ্গিতে কাহার স্মৃতি শেফালীর মনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে? শেফালী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহারা তাহার নিকটে আসিয়া পড়িলে সে বুঝিল, তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছে। যুবকটি সুনীল নহে, কিন্তু এই যুবকের আকার-প্রকার সুনীলের অনুরূপ বটে। শেফালীর অনুমান হইল—নবাগত যুবকটি সুনীলের কোনও নিকট-আত্মীয় হইতে পারে। কিন্তু এই অপরিচিত আগন্তুকগণকে দেখিয়া তাহার হৃদয়

কেন যে আশায় ও আনন্দে আন্দোলিত হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

আগন্তুকগণ তাজমহলের নিম্ন স্তরে সমাধিস্থলে গমন করিলেন। শেফালী তাঁহাদিগকে আর একবার দেখিবার আশায় সমাধিগৃহের দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দীপেন্দ্র ও মঞ্জু ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "তুমি এখানে ? চুপ ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবচো ?"

শেফালী সত্য কথাই বলিল, তবে একটু ঘুরাইয়া—বলিল, "মনে হ'ল, কয়েক জন চেনা লোক নীচের গোর-গুলি দেখ্‌তে গেলেন ; তাই দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা চল, আমি এখনই আস্‌চি।"

অল্প পরেই প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া বাহিরে আসিলেন, যুবকটি তখনও ভিতরে ছিল। শেফালী যেন কোন আলোকের প্রতীক্ষায় সেই অন্ধকারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিল।

হঠাৎ নারীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ হইল, "ওগো, আমায় শীঘ্র ধর। আমি যে বাঁচি-নে !"

শেফালী সভয়ে দেখিল, প্রৌঢ়া জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় শূন্যে বাহু প্রসারিত করিয়া অবলম্বন খুঁজিতেছেন ! তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া যান দেখিয়া শেফালী তাঁহার সম্মুখে লাফাইয়া-পড়িয়া দুই হাতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর সে সংজ্ঞাহীনা মহিলাটির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া, সেইখানেই বসিয়া-পড়িয়া তাঁহার মাথার কাপড় খুলিয়া দিল, এবং জামা-কাপড়ের বন্ধনাদি শিথিল করিল। সেই সময় দীপেন্দ্র ও মঞ্জুও সেই স্থানে আসিয়া পীড়িতার শুশ্রূষায় শেফালীকে সাহায্য করিতে লাগিল। শেফালীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও প্রকৃত অবস্থা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল।

এই আকস্মিক বিপদে প্রৌঢ়ার স্বামী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন, এবং ব্যাকুল ভাবে তাঁহার পুত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শেফালী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দীপুদা, মোটর নিয়ে ডাক্তার আন্‌তে যান্‌। ডাক্তার রমাপ্রসাদ বাবু আমার জ্যেঠা মশায়, তিনিই এ অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ; সংবাদ পেলেই তিনি এখানে এসে পড়বেন। তাঁর পরামর্শ ভিন্ন রোগীকে স্থানান্তরিত করা সঙ্গত মনে হয় না।"

প্রৌঢ় ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "তোমরা দয়া ক'রে সিভিল সার্জ্জন বা অন্য কোন ইংরেজ ডাক্তার আনবার ব্যবস্থা কর। এ-দেশী ডাক্তারদের উপর আমার তেমন শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নেই ; তারা বিশেষ কিছু জানে না, তাদের ওপর আমি নির্ভর ক'রতে পারবো না।"

সুশীল সেখানে আসিয়া পড়িলে শেফালী তাহাকে বলিল,—"আপনি দয়া ক'রে আমার দাদার সঙ্গে যান, ডাক্তারকে নিয়ে চলে আসবেন।" সে দীপেন্দ্রকে বলিল, "সিভিল সার্জ্জনকে বলবে যে, আমার মনে হয়, বেশী Blood pressureএর জন্যই এ-রকম হ'য়েছে, তিনি যেন সেই জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আসেন !"—সে বরফ এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঔষধও আনিতে বলিল।

প্রৌঢ় তাহার প্রস্তাব শুনিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "তোমার মতামত ডাক্তারকে জানাবার কি দরকার ? ছেলেমানুষ তুমি, যা বোঝ না—সে সম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চা না করাই উচিত নয় কি।"

দীপেন্দ্র তাঁহার অবশিষ্ট মন্তব্য শুনিয়া অপ্রসন্ন ভাবে বলিল, "আমার ভগিনী চিকিৎসা-কার্য্যে কোন ইংরেজ ডাক্তারের চেয়ে অপটু নয়, মশায় ! ও বিলাত থেকে ডাক্তারীর খুব ভাল ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছে, তা জানেন না ব'লেই—"

শেফালী তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "ও-সব কথা থাক, আর দেরী করো না, শীগ্‌গির যাও।"—দীপেন্দ্র অগত্যা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া সুশীলকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল।

তাহারা প্রস্থান করিলে প্রৌঢ় সাহেব বাবুটি চিন্তাকুল চিত্তে শেফালীকে বলিলেন, "এই আকস্মিক বিপদে আমি বড়ই বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলুম। আমরা কল্‌কাতার লোক, বিদেশে রোগ হ'লে বড্ডই ভয় পাই ; কর্ত্তব্য স্থির করতে না পেরে কি বল্‌তে কি বলেচি, তুমি কিছু মনে ক'রো না মা ! আর তুমি যে পাশকরা ডাক্তার, বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেচো, তা তো আমি জান্‌তুম না। তোমায় দেখে সে-রকম ধারণাই হয় না ; তা কি রকম বুঝ্‌চো তুমি ? ভয়ের কোন কারণ নেই তো ?"

শেফালী নতমুখে বলিল, "আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারচি। আপনি ব্যস্ত হবেন না ;

আপাততঃ আশঙ্কার কোন কারণ নেই বটে, তবে ওঁকে খুব সাবধানে রাখ্‌তে হবে।"

শেফালীর কথায় প্রৌঢ় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন; তাহার পর তিনি তাহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। শেফালী তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কত দিন আগ্রায় এসেচেন ?"

প্রৌঢ় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া কি ভাবিলেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু বলিলেন, "আমরা আজই সকালে টুণ্ডলা থেকে এখানে এসেচি। সিমলা থেকে ফিরবার পথে টুণ্ডলায় এসে আমার বড় ছেলের কাছে কয়েক দিন আছি। জ্যোৎস্নালোকে তাজ দেখবার আশায় আমরা সকলেই আজ এখানে এসেচি আমার বড় ছেলে, মেয়ে, আর একটি বন্ধুকন্যা বাসা থেকে এখনই এখানে এসে পড়্‌বে। আজই রাত্রে টুণ্ডলায় ফিরে যাবার ইচ্ছা আছে।"

শেফালী মুখ না তুলিয়াই বলিল, "তা কি ক'রে হবে বলুন ? রোগীকে বড়-জোর সহর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া চল্‌তে পারে; কিন্তু যত দূর সম্ভব, ওঁর নড়া-চড়া না করাই উচিত। এখন দিন-কতক আগ্রাতেই আপনাদের থাকা চাই। রোগিণীর অবস্থাই সর্ব্বপ্রথম বিবেচ্য।"

প্রৌঢ় বিব্রত ভাবে বলিলেন, "কিন্তু তার উপায় কি ?"

শেফালী মৃদু স্বরে বলিল, "উপায়ের অভাব হবে ব'লে তো মনে হয় না। মনে হচ্ছে—বাঙ্গালীর সংস্রব আপনি এড়াতে চান; এই জন্যই আপনার অসুবিধা। কিন্তু আপনি বোধ হয় বুঝ্‌তে পারবেন, এ-রকম রোগীকে হোটেলে রাখা সঙ্গত নয়; আর ওঁকে এখানকার হাস-পাতালে রাখতেও আমরা বল্‌তে পারিনে। তবে আপনি যদি এখানে বাঙ্গালীর বাড়ীতে কয়েক দিন থাকতে সম্মত হন, তা হ'লে আমরা তার ভাল ব্যবস্থাই করতে পারি। সেখানে থাকতে আপনাদের কোন অসুবিধা বা কষ্ট হবে না—এ আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি।"

বাঙ্গালী সাহেবটি এই প্রস্তাবে যেন কিঞ্চিৎ বিরক্তই হইলেন; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "আমার ছেলেরা আসুক তো, তার পর সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে।"

শেফালী চারি দিকে চাহিয়া একটু চঞ্চল হইয়া বলিল, "ডাক্তাররা এখনও এলেন না, ঔষধ-পত্রেরও কোন ব্যবস্থা হ'ল না। রোগীকে এই অবস্থায় বেশীক্ষণ রাখ্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না। জিনিষপত্রগুলা এসে পড়লে প্রাথমিক কর্ত্তব্য আমিই ক'রে ফেল্‌তে পারতুম।"

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গেই রমাপ্রসাদ বাবুর কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণগোচর হইল। তখনই মঞ্জু অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে রোগিণীর নিকট লইয়া আসিল। তিনি কিছুই জানিতেন না, কাজ শেষ করিয়া অবসর পাওয়ায় শেফালী ও মঞ্জুর সন্ধানে সেখানে আসিয়াছিলেন। তিনি সকল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং রোগীর পরীক্ষায় মনঃসংযোগ করিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে তিনি শেফালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগিণীর অবস্থা দেখে তুমি কি ব্যবস্থা করেচ মা শেলী ?"

রমাপ্রসাদ বাবু শেফালীর নিকট আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার সকল ব্যবস্থা ঠিকই হ'য়েচে।" তার পর তিনি রোগিণীর স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনাকে বেশ শক্ত হ'তে হবে, মশায়! ব্যাপার বিলক্ষণ সঙ্কটজনক বটে, তবে বিপদের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে। যন্ত্রাদি ও ঔষধ-পত্র এসে পড়লে ওঁর চেতনা সম্পাদন করা বোধ হয় তেমন কষ্টকর হবে না। ভগবানের অসীম করুণা, তাই ভাগ্যক্রমে মা শেলী এখানে এসে প'ড়েছিল। সকল ব্যবস্থাই মা আমার সঙ্গে-সঙ্গে ক'রে ফেলেচে। কিন্তু রোগীকে কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখা স্থির ক'রছেন ?"

কর্ত্তাটি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি কি আর স্থির ক'রব বলুন ? আমি ভাব্‌চি, ইংরেজদের কোন ভাল হোটেলে গিয়ে উঠ্‌লে ক্ষতি কি ?"

রমাপ্রসাদ বাবু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "এ কি কথা বল্‌চেন আপনি ? আপনি বাঙ্গালী, বিদেশে এসে বিপন্ন হ'য়েছেন; আর আমরা এখানে থাকতে আপনাকে হোটেলে আশ্রয় নিতে হবে ? আপনারা আমার বাড়ীতে চলুন, সেখানেই রোগীর চিকিৎসার ও পরিচর্য্যার সুব্যবস্থা হবে; আশা করি, আপনাদের তাতে কোনও রকম কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। আমরা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু ইংরেজদের চেয়ে লক্ষীছাড়ার মতো থাকি-নে।"

প্রৌঢ় মুখখানা হাঁড়ির মতো গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "সে কথা সত্য হতে পারে; কিন্তু আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আপনাদিগকে কোন অসুবিধায় ফেল্‌তে চাই-নে। বিশেষতঃ, অন্যের অনুগ্রহ গ্রহণের অভ্যাস বা প্রবৃত্তিও আমার নেই।"

রমাপ্রসাদ বাবু গভীর সহানুভূতিভরে বলিলেন, "এই সুদূর প্রবাসে আমাদের প্রবাস-ভবনে স্বজাতীয় অতিথির অভ্যর্থনায় ও সেবায় কি আনন্দ, তা উপভোগের শক্তিতে ভগবান আমাদিগকে বঞ্চিত করেন-নি মশায়! আমার বাড়ীতে আপনাদের বাসের সকল রকম সুবিধাই ক'রে দিতে পার্‌ব; কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রলেও অন্য কোথাও তা' সম্ভব হবে না; আর সে-রকম কোন ব্যবস্থায় আমিও তৃপ্তিলাভ ক'রতে পারব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমার ছেলে ফিরে এলেই তা'কে সব ঠিক ক'রে রাখ্‌বার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

প্রৌঢ় তাঁহার মুখের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে বলিলেন, "আপনিই বুঝি ডাক্তার রমাপ্রসাদ বাবু? আপনার সহৃদয়তা ও সৌজন্যে আমি মুগ্ধ; কিন্তু আপনি তো আমার পরিচয় পান-নি; আমার মত সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে বিপন্ন দেখে, কেবল বাঙ্গালী ব'লেই কি নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করচেন?"

রমাপ্রসাদ বাবুকে অগত্যা বলিতে হইল, "আপনি বাঙ্গালী, আমারই স্বদেশবাসী,—আপনার এই পরিচয়-টুকুই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? তবে আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত অতিথির পরিচয় পেলে যে, আলাপ-আলোচনার পথ সুগম হয়, সে-কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাহুল্য মাত্র।"

এরূপ আতিথ্য মিষ্টার দত্তর ধারণার অতীত। আজীবন কলিকাতার 'এরিষ্টোক্রাসী' ও 'ব্যারিষ্টোক্রাসী'র স্বার্থপরতার মধ্যে বাস করিয়া অপরিচিত আগন্তুককে উপযাচক হইয়া গৃহে স্থান দেওয়া তিনি সম্ভব বলিয়া কখনও মনে করেন নাই। আর তাঁহাদের মত ধনাঢ্য সমাজে তো কোন অপরিচিতকে কেহই গ্রহণীয় বলিয়াও মনে করেন না। ক্ষণকাল পরে মিষ্টার দত্ত বলিলেন, "আমার নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আমি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করি। আমার টুণ্ডলায় আসবার কারণ, আমার একটি ছেলে সেখানে ইঞ্জিনিয়ার। অনেক দিন আমরা তাকে দেখিনি তাই—"

পরিচয় শুনিয়া রমাপ্রসাদ বাবু উৎকণ্ঠিত চিত্তে শেফালীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তাহার মুখে দৃঢ় সঙ্কল্প পরিস্ফুট। তিনি শেফালীকে বলিলেন, "আমাদের guest-houseএ এঁদের থাকবার ব্যবস্থা করা যাক।"

শেফালী অবিচলিত স্বরে বলিল, "সেখানে ওঁদের কোনও অসুবিধা হবে না ব'লেই ত মনে হয়। মঞ্জুকে আপনার গাড়ীতে আগে পাঠিয়ে দিলে সে সব বিলি-ব্যবস্থা ক'রে রাখ্‌বে।"

বীরেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাবে কতকটা অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের এত বিব্রত করা কি উচিত হবে? বরং যদি সিভিল সার্জ্জন হাসপাতালে রাখবার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন—তাই 'ডিজায়ারেব্‌ল' ব'লে মনে হয়। এত রাত্রে বাড়ীতে থাক্‌বার জন্য নার্শ সংগ্রহ করা কঠিন হ'তে পারে। রোগীর পরিচর্য্যা বাড়ীতে তেমন ভাল হয় না, তা' জানি কি না।"

অতঃপর বীরেন্দ্র বাবুর পুত্রসহ সিভিল সার্জ্জন আসিয়া, রমাপ্রসাদ বাবুকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, "রমাপ্রসাদ বাবু পূর্ব্বেই চিকিৎসার ভার লইয়াছেন, তখন আমাকে ডাকিবার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। আপনারা উঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেন। আপনি সম্ভবতঃ জানেন না—উনি এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।"

যাহা হউক, সিভিল সার্জ্জন রমাপ্রসাদ বাবুর অনুরোধে পীড়িতার রোগ পরীক্ষা করিলেন এবং সকল কথা শুনিয়া মিষ্টার দত্তকে বলিলেন, "চিকিৎসা প্রথম হইতেই ঠিক হইয়াছে। আপনার স্ত্রী সঙ্কটের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন; কিন্তু এখন এক মাস তাহাকে আগ্রায় থাকিয়া স্বাস্থ্য-সঞ্চয় করিতে হইবে। যত দূর সম্ভব, উঁহাকে নড়া-চড়া করিতে না দেওয়াই প্রয়োজন। রমাপ্রসাদ বাবু রোগিণীকে নিজের বাড়ীতে উঁহার চিকিৎসাধীন রাখিতে চাহেন; ইহা অপেক্ষা সৎযুক্তি আর কি হইতে পারে? ...ল, তীক্ষ্ণ-

অগত্যা বীরেন্দ্র বাবুকে সেখানেই ...তে লাগিল।

হইতে হইল। তদনুসারে অতি সন্তর্পণে রোগিণীকে স্থানান্তরিত করা হইল। রমাপ্রসাদ বাবু শেফালীকে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

মঞ্জু পূর্ব্বে আসিয়া সকল ব্যবস্থাই শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহের ও বন্দোবস্তের পারিপাট্য দেখিয়া ধনাঢ্য ব্যারিষ্টার 'মিষ্টার ডাট'কেও বিস্মিত হইতে হইল; তিনি তাঁহার পত্নীর পরিধানের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত সজ্জিত দেখিলেন। উদ্যান-পরিবেষ্টিত অতিথিশালার একটি সুপ্রশস্ত শয়ন-কক্ষে এক জনের শয়ন-যোগ্য পালঙ্কে সুকোমল শুভ্র শয্যায় রোগিণীর শয়নের ব্যবস্থা। শেফালী ও মঞ্জু সযত্নে তাঁহার সিক্ত বসন খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া দিল। তখন দুই জন ডাক্তার ও শেফালী তাঁহার চিকিৎসায় রত হইলে দীপ্তেন ব্যারিষ্টার সাহেবকে পার্শ্ববর্ত্তী শয়ন-কক্ষে লইয়া গিয়া অতিথি-সৎকারের সুব্যবস্থা করিল। মধ্যে বিরামাগারের অন্য দিকে দুইটি শয়ন-কক্ষে সুনীল ও তাহার ভ্রাতার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উদ্যানের অপর পারে রমাপ্রসাদ বাবুর বাসভবনে নিনার ও প্রতিমার শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তাররা আসিয়া বীরেন্দ্র বাবুকে 'ঠাণ্ডা' করিলেন। সকল ব্যবস্থা শেষ হইলে শেলী অবসর পাইয়া নিনাকে বলিয়া আসিল, "আজ আমি তোমাদের কাছে বেশী আস্‌তে পার্‌ব না বটে, কিন্তু মঞ্জুর হাতে তোমাদের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌ব। তোমাদের যা' দরকার, সে জন্য ওকেই বল্‌বে।"

দীপ্তেন্দ্রের ও মঞ্জুর যত্ন ও আদরে বীরেন্দ্র বাবুদের সকলেই কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। অবশেষে রাত্রি সাড়ে ১০টায় ডাক্তাররা অভয় দিলে তাঁহাদের বিমর্ষ ভাব অন্তর্হিত হইল।

বীরেন্দ্র বাবুর আগ্রহে ও অনুরোধে রমাপ্রসাদ বাবু ও 'ডাক্তার সাহেব' উভয়েই আহারান্তে অতিথিশালায় রাত্রিবাস করিলেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে রহিল—রমাপ্রসাদ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অলকেন্দ্র ও শেফালী।

পরদিন প্রভাতে দত্ত-গৃহিণী চেতনা লাভ করিলে ও প্রতিমাকে সঙ্গে লইয়া সুনীল টুণ্ডলায় গিয়া নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিল। সিভিল ...শে সুনীলও কিছু দিনের ছুটী পাইল।

৩

পরদিন হইতে রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ীর সকলেই রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বীরেন্দ্র বাবুর শত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহারা নার্শ আনিতে দিলেন না। রমাপ্রসাদ বাবুর পত্নী বলিলেন, "পূজায় আমার ভরপুর সংসার থাকতে কি সেবার জন্য লোকের অভাবে নার্শ আনাতে হবে?"—তিনি স্বয়ং সকালে রোগীর কাছে থাকিতেন, দ্বিপ্রহরে থাকিত তাঁহার কন্যা মঞ্জু বা তাঁহার পুত্রবধূ। রাত্রির ভার শেফালী আর কাহারও হাতে দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না; সুতরাং রাত্রি ১০টা হইতে সকাল সাড়ে ৮টা পর্য্যন্ত সে স্বয়ং ঔষধ-পথ্যাদি ও সেবার সকল ভার গ্রহণ করিত। আর বীরেন বাবুর ইচ্ছানুসারে সুনীল ও সুশীল পালা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিত।

শেফালীর অবিশ্রান্ত সেবা, যত্ন ও পরিশ্রমেও সদা প্রফুল্ল-ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। শুধু রোগীর সেবানৈপুণ্যে নহে, দত্ত-পরিবারস্থ সকলেরই আদর-যত্নে শেফালী এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিল যে, সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া পড়িল।

সাধারণতঃ আমরা যাহাকে একগুঁয়ে ও উদ্ধত বলি, প্রতিষ্ঠাপন্ন জেদী ব্যারিষ্টার মিষ্টার দত্তের প্রকৃতিও সেইরূপ। তাঁহার মেজাজ এই বিপদে আরও 'গরম' হইয়া উঠিয়াছিল; এ জন্য তাঁহার পুত্রকন্যারা নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন তাঁহার সম্মুখে যাইতে চাহিত না। কেবল শেফালীই নম্র ব্যবহারে ও সুমিষ্ট "বাবা" সম্বোধনে তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়াছিল। এই প্রকার কর্ম্মপটু, বুদ্ধিমতী, অথচ এত ধীর ও শান্ত-প্রকৃতির মেয়ে যে বাঙ্গালী হিন্দুর পরিবারে থাকিতে পারে, তাহা মিষ্টার দত্ত পূর্ব্বে কোন দিন ধারণা করিতে পারেন নাই। তিনি অনেক সময় ভাবিতেন, কে এই সম্ভ্রান্তবংশীয়া, বিদুষী, অপরিণীতা তরুণী? তাহার পরিচয় জানিবার জন্য তাঁহার প্রচণ্ড কৌতূহল হইত; কিন্তু কাহারও সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার এই আগ্রহ পূর্ণ হইল না। এই অপূর্ব্ব রহস্যময়ীর কোন পরিচয়ই তিনি জানিতে পারিলেন না।

দত্ত-গৃহিণী শেফালীর পরিচর্য্যায় এতই মুগ্ধ ও তাহার পক্ষপাতিনী হইলেন যে, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে

ছাড়িতে চাহিতেন না। মাতৃহীনা শেফালী তাঁহার স্নেহ-কোমল ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, এবং স্নেহময়ী জননীকেই তাহার মনে পড়িত। তাহার মনে হইত, ভাগ্যদোষেই এমন মমতাময়ী মাতার আশ্রয় হইতে তাহাকে দূরে থাকিতে হইয়াছে। নিজের পিতৃকুলের গৌরব যদি সে ভুলিতে পারিত, তাহা হইলে এই নূতন মায়ের নির্ভরতাপূর্ণ শান্তিময় আশ্রয় আর তাহাকে ত্যাগ করিতে হইত না। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত তাহার শ্বশুর-পরিবার—কেবল তাহার রূপ-গুণকে নহে, তাহার পিতৃ-কুলের প্রাপ্য সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে বধূত্বে বরণ করিয়া গ্রহণ না করিবেন, তত দিন সে তাঁহাদের নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ করিবে না। কঠোর পরীক্ষার মধ্যে সে মুহূর্ত্তের জন্যও এই সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইল না।

কিন্তু সুনীলের অবস্থা কিরূপ ? সমুদ্রবক্ষে অর্দ্ধ-পরিস্ফুট প্রণয়ের জ্যোতিঃ এখন তাহার পিপাসু-নেত্রে স্ফুটতর হইয়া উঠিল। তাহার চাহনিতে যেন আত্মদানের আভাস শেফালীর নারীত্বের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত মিশ্রিত হইয়া অপরূপ ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। শেফালীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করিবার স্পৃহা যতই তাহার প্রবল হইতে লাগিল, আশা যেন ততই ক্ষীণতর হইয়া তাহাকে যন্ত্রণাহত, ব্যথিত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

সুশীল এবং প্রতিমাও তাহাদের শেলীদি'র এতই ভক্ত হইল যে, তাহার চরিত্রের আদর্শ পূজার যোগ্য বলিয়াই তাহাদের ধারণা হইল। তাহাদের যত আব্দার এই শেলীদি'র কাছে; এবং কি উপায়ে তাহাকে পরিতুষ্ট করিবে, অনুক্ষণ তাহারা তাহাই চিন্তা করিত। বিশেষতঃ, নিনার তো কথাই নাই,—অবসর পাইলেই সে তাহার জাহাজের সঙ্গিনী শেফালীর কাছে গিয়া বসিত। সে তো কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই—ঘটনাচক্রে প্রবাসে এ ভাবে তাহাদের মিলন হইবে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার সঙ্গ লাভ করিবে ?

কয়েক দিন পরে দত্তগৃহিণীর রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে মিষ্টার দত্ত শেলীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, আমার লোক-জন তো সব এসে পড়েচে ; কাল থেকে এখানেই আমাদের পাক-শাকের ব্যবস্থা ক'রে দাও। তোমার জ্যাঠা মশায়ের ওপর আর জুলুম ক'রতে আমার বড়ই সঙ্কোচ হচ্ছে, আর এত জুলুম অসঙ্গতও বটে। কিন্তু আমি তো তোমার বাবার ক্লাসে 'প্রমোসন' পেয়েচি,—সে অধিকার তুমিই আমায় দিয়েচ মা ! কাজেই আমার প্রবাসের এই সংসারের সকল ভার তোমাকে নিতে হবে ! প্রতিমা মায়ের আদুরে ছোট মেয়ে, এখনও সংসার করতে শেখেনি ; নিনা বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু বিদেশে ও-সব ঝক্কি সাম্‌লাতে পারবে না, তাই তোমাকেই এ কষ্টটুকু স্বীকার ক'রতে হবে। তোমার জ্যেঠাই-মার নিজেরই এক প্রকাণ্ড সংসার ; তাঁর পক্ষে আর একটা সংসারের সব দেখাশুনা করা সম্ভব হবে না, কাজেই, তুমি ছাড়া এ ভার আর কে নেবে বল ? এতে তোমার তেমন বেশী কষ্ট হবে না তো মা ?"

অন্তরের ব্যথা দমন করিয়া শেফালী বলিল, "ওতে আমার এক বিন্দুও কষ্ট নেই ; বরং আপনার সংসারের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে পারলে আমার কত আনন্দ হবে, তা পরমেশ্বরই জানেন। কিন্তু জ্যাঠা মশায় আপনার এ ব্যবস্থায় রাজী হবেন কি না সন্দেহ।"

বীরেন্দ্র বাবু দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন, "তাঁকে রাজী ক'রতেই হবে। তিনি আমাদের জন্যে যা ক'রছেন, অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়ের নিকটও এ-কালে তা' আশা করা যায় না ; অন্ততঃ আমার কোন আত্মীয় এই রকম বিপন্ন হ'লে তার জন্যে আমি এতখানি ত্যাগস্বীকার কর্ত্তে পারতুম না মা ! আমি একটু আত্মহিতৈষী ; এক দল অপরিচিত লোককে—তারা আমাদের স্বজাতি—বাঙ্গালী —এই খাতিরে নিজের বাড়ীতে রেখে রোগীর চিকিৎসা ও সেবার সকল ভার নিয়ে কে এত ঝঞ্ঝাট সহ্য করে বল ? তা'র উপর আরও জুলুম ক'রব ? আমি মানুষ তো ? আমার তা অসাধ্য মা !"

শেফালী শেষের কথাগুলির কিছুই শুনিল না। তাহার মন তখন অন্য চিন্তায় আন্দোলিত হইতেছিল। সে চিন্তা কি, আমাদের বুদ্ধিমতী পাঠিকা যদি তাহা না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃথা এত দূর পর্য্যন্ত এ সকল কথার আলোচনা করিয়াছি ! শেফালী তাহার প্রাপ্য ভার পাইল, কিন্তু তাহার শ্বশুরের পক্ষে যে ক্রটিটুকু রহিয়া গেল, তীক্ষ্ণ-ধার কণ্টকবৎ তাহাই তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে লাগিল।

পরদিন হইতে শেফালিকা তাহার শ্বশুরের প্রবাসের সংসারের কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিল। তাহার পরিশ্রমের অন্ত রহিল না। সংসারের ভার লইলেও রোগীর সেবার আংশিক দায়িত্ব সে ত্যাগ করিল না। এ সকল ভার সে সানন্দচিত্তে বহন করিলেও তাহার অন্তরের গুপ্ত ব্যথা মধ্যে-মধ্যে তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। ভাগ্যলক্ষ্মীর এই পরিহাস অতি কঠোর ও বিড়ম্বনাপূর্ণ বলিয়াই তাহার মনে হইতেছিল।

আত্মম্ভরী, দাম্ভিক বীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ক্রমশঃ আত্মত্যাগিনী সেবাপরায়ণা শেফালীর সম্পূর্ণ বশীভূত হইতে হইল। আহারাদি, এমন কি, অপরাহ্নে ভ্রমণ পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তাঁহাকে শেফালীর মুখাপেক্ষী হইতে দেখা গেল, যেন ইহাতেই তাঁহার আনন্দ! তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার পরিবর্ত্তে দিনগুলি শান্তিতে অতিবাহিত হইতে লাগিল। পরিবারের অন্য সকলেও সুখ-শান্তিতে কালযাপন করিতে লাগিল; কেবল সুনীলই বিনিদ্র-রজনী ও শান্তিহীন দিবসগুলি ব্যাকুল হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় যাপন করিতে লাগিল। তাহার যে কোনও অবলম্বন নাই! তাহার অতীতের স্মৃতি দুর্ব্বহ, ভবিষ্যৎ নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

* * * * *

দেখিতে দেখিতে আরও এক সপ্তাহ অতীত হইল। এই কয়েক দিনেই উভয় পরিবারের আত্মীয়তা ও প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হইল। নিনার ব্যবহারে মনে হইত, তাহার প্রিয়সখী শেলীদি'র আপনার লোকের কাছে তাহার সঙ্কুচিত হইবার যেন কোনও কারণ নাই। সে রমাপ্রসাদ বাবুর গৃহের সকলকেই আপনার করিয়া লইল। তাঁহারাও সকলে তাহার সরলতা ও প্রফুল্ল স্বভাবে মুগ্ধ হইলেন। তাহার স্বভাবে যে বালিকাসুলভ চপলতা ছিল, তাহা তাহার হৃদয়ের মাধুর্য্যেরই নিদর্শন, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ গভীর হইয়া উঠিল; কিন্তু নিনার এই মোহিনী শক্তি দীপ্তেনকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুগ্ধ করিল। নারীজাতির হৃদয় এত সরল, এত দূর অকপট হইতে পারে—ইহা যেন তাহার কল্পনার অতীত! সে চিরদিনই নারীর আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু নিনার আকর্ষণ প্রথম বসন্তের সুখস্পর্শ অনিল-হিল্লোলবৎ তাহার বড় মধুর—বড়ই উপভোগ্য মনে হইল। পিপাসাতুর মধুপ যেমন নব-প্রস্ফুটিত কুসুমদলের মাদকতাপূর্ণ সৌরভে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কবির ভাষায়, যেমন—

"বাঞ্ছা ঘোরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা মুদিত পদ্মের কাছে,"—

সে নিনার প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট হইল। নিনাকে অবলম্বন করিয়া তাহার হৃদয় নিনাময় হইল। নিনাও যেন দীপ্তেনের স্নিগ্ধ ভালবাসার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিল। এত দিন সে অনেক শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের পরিচয়ও পাইয়াছে, কিন্তু এরূপ আকর্ষণ সে আর কখনও অনুভব করে নাই। সুনীলকে সে চিরদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া আসিয়াছে, তাহার রূপ কখনও তাহার হৃদয় আকৃষ্ট মুগ্ধ করিতে পারে নাই; তাহার সান্নিধ্যে হৃদয়ের আলোড়ন সে কখনও অনুভব করে নাই। দীপ্তেন ও নিনা অবসর পাইলেই চুম্বকাকৃষ্ট লৌহবৎ পরস্পরের সান্নিধ্য-লাভের চেষ্টা করিত।

উভয়ের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া এক দিন রাত্রিকালে রমাপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, "এত দিনে হয় তো আমার মনের সাধ পূর্ণ হবে। ছেলেটা চার বৎসর একা দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অবসর-কালে তা'কে যে একটু যত্ন করবে, এমন কেউ নেই! সিভিলিয়ানদের প্রথম জীবনে অধিকাংশ স্থলেই নির্জ্জন বাস অপরিহার্য্য হ'য়ে ওঠে। সেই অবস্থায় কেবল সাধ্বী পত্নীই তাকে আনন্দ দিতে পারে।"

রমাপ্রসাদ বাবু ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিলেন, "সে তো বুঝলুম, কিন্তু তোমার ছেলে যে স্ত্রীলোকের দিকে ঘেঁস্‌তেই চায় না! কত ভাল-ভাল মেয়ে তো দেখালে, তার গোঁ ফিরলো কি? 'বিয়ে ক'রে কি হবে? বেশ তো আছি'—এই তো তার বুলি, সে কি তা ছেড়েছে?"

ঘোষজায়া বলিলেন, "এইবার সে-বুলি বদ্‌লাবে গো! দেখে নিও তুমি। দেখনি, নিনার জন্যে সে যেন পাগল? নিনা ত স্বজাতিরই মেয়ে,—সব রকমে আমাদের বৌ হ'বার উপযুক্ত। আমার মনে হয়, দীপু ওকে পেলে সুখী হবে।"

রমাপ্রসাদ বাবু এ কথার সমর্থনে বলিলেন, "তা আমিও লক্ষ্য করেচি! কিন্তু এ যে বামন হ'য়ে চাঁদ ধরতে যাওয়ার মতো হবে! আমি বরং মনে মনে প্রার্থনা করি, দীপু যেন ওর প্রতি আকৃষ্ট না হয়; নতুবা পরে আর কাকেও ওর মনে ধরবে না।"

ঘোষজায়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা যা-ই বল, আমার বড় সাধ—নিনাকেই বউ করি। মেয়েটিকে আমার বড্ড ভালো লেগেচে।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "সাধ কি আমারই হয় না? কিন্তু আমাদের মত ঘরে—কলকাতার বড়লোক মানুষ ওঁরা, মেয়ে দিতে কেন রাজী হবেন? তাঁদের চোখে আমরা মফস্বলের নেটিভ ডাক্তার বৈ ত নই, সুতরাং নগণ্য ব্যক্তি;—জজ বা বড় ব্যারিষ্টার হ'লে এক দিন বরং তা সম্ভব হ'তো।"

ঘোষজায়া বলিলেন, "তা আমার ছেলে তো সিভিলিয়ান, আর আমাদের অবস্থাও সত্যি-সত্যি অগ্রাহ্য করবার মতনও নয়।"

রমাপ্রসাদ এবার হাসিয়া বলিলেন, "ছেলের এখনকার বেতনে ঐ রকম বড়লোকের মেয়ের হাত-খরচাও কুলোবে না, তা ভেবে দেখেচ? আমি তো আর বেশী-কিছু দিতে পারব না যে, স্বচ্ছন্দে ওদের চ'লে যাবে।"

ঘোষজায়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, নিনা সে রকম মেয়ে নয়। তার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আমাদের ঘরে এসে অসুখী হবে ব'লে মনে হয় কি?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "ওর প্রকৃতি বেশ নম্র ব'লেই মনে হয়; সকল রকমেই মনের মতো বটে। কিন্তু নিনা যদি দীপুকে বিয়ে ক'রতে চায়ও, ওর বাপ-মা তাতে তো রাজী হবেন না। পাত্র হিসাবে সুনীল যে আরও অনেক ভাল।"

ঘোষজায়া বলিলেন, "সুনীলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হ'য়েচে না কি? সে রকম ভাব তো মোটেই দেখা যায় না।"

রমাপ্রসাদ—"বীরেন বাবু অনেক দিন থেকেই নিনাকে বৌ করবেন—ঠিক ক'রে রেখেচেন; কেবল সুনীলকে বাগে আনতে পারচেন না। মেয়েটারও যে সে দিকে বিশেষ ঝোঁক আছে—তা তো মনে হয় না। কিন্তু বীরেন বাবু সহজে নিনাকে হাত-ছাড়া করচেন না,—এ কথা আমায় তিনি ব'লেচেন।"

কিছুক্ষণ পরে রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন, "যা'ক ও কথা, আমি শেফালীর জন্যই বেশী চিন্তিত। তোমরা স্ত্রীলোক, এ-সব বিষয় তোমাদের বেশী নজরে পড়ে; তোমার কি মনে হয়, সুনীল শেফালীর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েচে? সুনীল যদি শেষ-পর্য্যন্ত ওকে বিয়ে করতে চায়, তো মেয়েটার জীবন ব্যর্থ হয় না।"

ঘোষজায়া বলিলেন, "সুনীলের মনোভাব—যা'র একটু দৃষ্টিশক্তি আছে, সেই বুঝতে পারে। শেলী কাছে থাকলে সুনীল তারই দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে, আর দূরে থাকলে চক্ষু যেন তারই সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, তা বেশ বুঝতে পারা যায়। শেলী কিন্তু ভয়ঙ্কর চাপা মেয়ে, তার মনের ভাব একটুও বুঝবার উপায় নেই; একেবারে যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত! তবে তাকে তো আমার জানতে বাকী নেই; তার প্রাণ সুনীলের জন্য যতই ব্যাকুল হোক না কেন, সুনীল যদি সেই পল্লীবাসিনী পরিত্যক্তা পত্নীকে গ্রহণ করে, তবেই শেলীকে পাবে, নতুবা নয়; সুনীল তো জানে না—শেলীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই; সমস্যা যে ঐখানেই!"

রমাপ্রসাদ চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "সে কথা সত্য, শেফালী তার উচ্চ আদর্শ থেকে কখন বিচ্যুত হবে না। তার স্বামী কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হবে, তা সে কখন সহ্য ক'রবে না; বরং সর্ব্বত্যাগিনী হ'য়ে চিরজীবন সন্ন্যাসিনীর ব্রত পালনেও তার আপত্তি হবে না। আর শ্রদ্ধা যেখানে নেই, পতিভক্তি সেখানে আসতে পারে কি? এ কথাও আমার মনে হয় যে, সুনীল যদি কর্ত্তব্যের অনুসরণ ক'রতেও চায়, বীরেন্দ্র বাবু তা'তে বাধা দেবেন। সুনীলের উপর আমার ধারণা ভালই হ'য়েচে। ছেলে বাপের মত অহঙ্কারী নয়। তার বাপের দৃষ্টি নিনার বাপের সম্পত্তির ওপর।"

রমাপ্রসাদ বাবু ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সুনীলের ওপরও কিন্তু আমার একটু রাগ হয়। পুরুষ-মানুষের অতখানি দুর্ব্বলচিত্ত হওয়া ঠিক নয়। যদি শেফালীকে—পল্লীবাসিনী শেফালীকে সে ত্যাগই করবে তো এত দিন বিয়ে করেনি কেন? আর নিনার বাপ-মাকেই বা কেন এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখেছে?"

ঘোষজায়া বলিলেন, "নিনার বাপ-মা যে সুনীলকেই জামাই করতে চান, তা' কি ক'রে জানলে?

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "শেলীর কাছে শুনেছি—জাহাজে নিনার মা তাকে সব কথাই ব'লেছিলেন। সেই জন্যই মিষ্টার ও মিসেস্ সিংহ মেয়ে ঘাড়ে ক'রে বিলেতে ছুটেছিলেন, শেষ চেষ্টা ক'রে একই জাহাজে ফিরেছিলেন। দত্ত-পরিবারের সঙ্গে নিনার দেশভ্রমণে আসবার কারণও বোধ হয় তাই; অর্থাৎ কাছাকাছি থাক্‌লে যদি মিলামিশায় প্রণয়ের উদ্রেক হয়। শেলী বেচারার ওপর কি অত্যাচারই না হ'চ্চে! তার মানসিক শক্তি পরীক্ষার কি শেষ নেই? এই সকলের উপর এত শারীরিক পরিশ্রম তার কত দিন সহ্য হবে? এই ক' দিনেই কি রকম শুকিয়ে উঠেছে দেখেচো?"

ঘোষজায়া চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "শেলীর জন্য আমারও বড় ভাবনা হ'য়েচে। ও তো সবই জানে, সুনীলকে স্বামী বলে চেনে-ও। সব জেনে মনের সকল ব্যথা চেপে রেখে এমন প্রফুল্ল মুখে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া আর সুনীলের সঙ্গে নির্লিপ্ত ভাবে ব্যবহার করা—এক শেফালীই পারে; বোধ হয়, রঙ্গমঞ্চের সুনিপুণা অভিনেত্রীদেরও তা অসাধ্য! তার অন্তরের দ্বন্দ্ব,—মনের ভিতরে যে তুফান চল্‌চে, তার আভাস মাত্র বাইরে প্রকাশ পায় না; এমন কি, আমরা সব জেনেও তার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাইনে! জগদীশ্বরের কি অভিপ্রায়, তা তিনিই জানেন।"

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

সুখের ঘর

বেঁধেছি জীবনপ্রান্তে দুখের সাথে সুখের ঘর;
সে যে মোর সকাল সাঁঝে সকল কাজে জড়িয়ে আছে বুকের 'পর।
জীবনের কঠিন পথে
সে আমার নিত্য সাথী আপন হ'তে রে,—
ভরি' মোর অশন-বসন ঘুম-জাগরণ কারুণ্যে
আবরি' বক্ষে মোরে রক্ষা করে ব্যথার চির তারুণ্যে।

সে আমার আশার শ্মশান সব অবসান অঙ্কে তা'র;
যত মোর প্রাণের গীতি সাধের স্মৃতি তা'র পীরিতির কণ্ঠহার।
বেদনার অশ্রুধারায়
সে আমার পুণ্যাভিষেক নিত্য করায় রে,—
বসি' মোর চিত্তবাসে দীর্ঘশ্বাসে শ্রান্তিহীন
কহে তা'র মর্ম্মকথা গুপ্তব্যথা তপ্তভাষায় রাত্রিদিন।

কোথা সুখ বেদনহরা! 'সুখের পারাবত' তো সে;
কামনার স্বর্ণবাণে মর্ম্মে হানে গর্ব্বমানে মত্ত সে।
চাওয়া তা'র ক্ষিপ্ত করে,
পাওয়া তা'র উন্মাদনায় চিত্ত ভরে রে,—
যাওয়া তা'র সর্ব্বনাশা,—সর্ব্ব-আশার শেষ-বিদায়;
কোথা সুখ শ্রান্তিহরণ! অন্তঃকরণ তপ্ত করে মত্ততায়।

সুখ আমার যুগান্তরে বড়'র ঘরে আমন্ত্রণ;
ক্ষণিকের এই অতিথির ব্যাধের গীতির উগ্রপ্রীতি লোভায় মন।
আসে যা'ক্ নাই কো মানা
হবে না তা'র তরে মোর মন 'দেওয়ানা' রে;—
দুখ আমার ব্যথার ব্যথী পথের সাথী, আপন জন;
উগারি' নেশায়-তরল হাসির গরল বিষায় না কো সরল মন।

নাহি মোর দৃপ্ত গরব,—কীর্ত্তি-সরব প্রাসাদ নাই;
চাহি না স্বর্ণ-মুঠি, পর্ণ-কুটী কার ভ্রূকুটি সইবে, ভাই!
ভয়ে মোর নাই কো ভীতি,
সে জাগায় নিত্য গাহি প্রভাত-গীতি রে,—
আছি বেশ দুখের নীড়ে, সুখের ভিড়ে হারাই নাই;
গাঁথি হার অশ্রুমালায় এই নিরালায় দুখের গলায় পরাই তাই।

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ।



অঞ্জনা দেবী

বড়দিনের ছুটীতে আসাম গিয়াছিলাম। একা নয় —দু'জন বন্ধু ছিলেন সাথী। অসিত আর বিজয়। শিকারে তাঁদের গভীর অনুরাগ। আমার ও-সখ নাই। আমি নিরীহ লেখক, গল্প লিখি। আমাকে তাঁরা ধরিলেন, —একটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স···সঙ্গে চলো।

পাজি দেখিয়া বাহির হই নাই! যাত্রা নিষ্ফল! কোথায় বাঘ-ভালুক! পাখীর ঝাঁক দেখিয়াই শিকারের সখ মিটিল!

বনের পথে ফিরিতেছিলাম। রাণীপোতার ছোট ইন্‌স্পেকশন-বাঙলোয় এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। সাহেবী পোষাক-পরা।

পরিচয় হইল। শচীন্দ্র সান্যাল। এখানকার ডেপুটি। বন-বাদাড় লইয়া আছেন। রাণীপোতায় আসিয়াছিলেন একটা তদারকীর কাজে। থাকেন, রাণীপোতা হইতে চার ক্রোশ দূরে শালবনে।

সান্যাল সাহেব বলিলেন,—যখন দেখা হলো, ছাড়বো না। আমার ওখানে দু'চার দিন থেকে তার পরে ফিরবেন।

আপত্তির কারণ ছিল না।

হাকিমের সঙ্গে হাতীর পিঠে শওয়ার হইয়া শালবনে আসিলাম।

উঁচু টিলার উপর পরিচ্ছন্ন বাঙলো-বাড়ী। চারিদিকে বন—পাখীর কল-কাকলীতে ভরিয়া আছে। ছোট-খাট দু'-একটা পাহাড়ে-নদী। মনে হইল, এমন বনে এমন বাঙলো-বাড়ী পাইলে বনবাসে কিসের দুঃখ!

হাতী হইতে নামিলাম।

সান্যাল সাহেব বলিলেন,—আমার স্ত্রী খুব খুশী হবেন আপনাদের দেখে! একা এই বনে বাস করছেন···কথা ক'বার লোক বলতে শুধু আমি!

আমি বলিলাম,—ছেলেমেয়ে?

সান্যাল সাহেব বলিলেন—হয়নি'।

অসিত বলিল—তাঁকে একা রেখে বেরিয়েছিলেন?

সান্যাল সাহেব বলিলেন—চাকরি-রক্ষা করতে।

আমি বলিলাম,—যদি তাঁর অসুখ-বিসুখ হতো?

বিজয় বলিল—চোর-ডাকাতের ভয়ও আছে!

মৃদু হাস্যে সান্যাল সাহেব বলিলেন—অসুখ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা যে হয় না, তা নয়। আমার স্ত্রী বলেন, অসুখ হলে যদি সারবার হয়, সে-অসুখ সারবেই। আর যাবার অসুখ হলে কারো সাধ্য নেই, সারাবে! কুইন ভিক্টোরিয়া, জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ্‌—এঁদেরো কেউ সারাতে পারেনি!

আমি কহিলাম - কথাটা সত্য!

সান্যাল সাহেব বলিলেন—বনে নিরুপায়ে বাস করি, কাজেই সনাতন-কথাগুলোর উপর আস্থা না রাখলে চলে না! তা ছাড়া এখানে হাসপাতাল আছে, ডাক্তার আছে। আর সেপাই-পাহারওয়ালা আছে বাড়ী চৌকি দিতে···

অসিত বলিল—হু···

একটা ভৃত্য আসিল। আসামী ভৃত্য।

সান্যাল সাহেব বলিলেন—মেম-সাব?

সে বলিল, মেমসাহেব বেড়াইতে গিয়াছেন।

সান্যাল সাহেব আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। চায়ের ফরমাশ করিলেন; তার পর বলিলেন,—আমি দেখি, কি খাবার আছে। এখানে মাছ-মাংস মেলে, ফল-মূল মেলে, রুটি মেলে। কমলা লেবু অজস্র! আর কমলা-মধু আছে। চায়ে চিনির বদলে মধু দিতে বলি!

চায়ের আসর।

সান্যাল সাহেব বলিলেন,—শালবন যা জায়গা, সত্যি, মেয়েদের পক্ষে এখানে বাস করা শক্ত। এখানে আমরা আছি আজ তিন বছর। উনি আবার সহরে ছিলেন বরাবর···লেখাপড়া জানেন···গান-বাজনা জানেন। ওঁর

পক্ষে এ-বনে বাস করা… তবে, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী বলেন—সহরের মানুষের সঙ্গে মিশতে, কথা কইতে ভুলে গেছি…দেখলে গা কেমন যেন ছম্-ছম্ করে!

আমাকে উদ্দেশ করিয়া বিজয় বলিল—ইনি ঔপন্যাসিক …দেখুন,গল্পে-স্বল্পে যদি তাঁকে একটু আরাম দিতে পারেন!

কহিলাম,—বিবাহ হয়েছে ক' বছর?

—প্রায় সাত বছর হলো। একটু বেশী বয়স? বিয়ে করবো না, ভেবেছিলুম। চাকরি নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরছি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা। আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে এসেছিলেন। সেখানে আমার খুব অসুখ হয়। ওঁর সেবা…জীবনে ভুলবো না। তার পরেই আর কি…

হাসিয়া আমি কহিলাম,—আমরা তা হলে যে-সব রোমান্স লিখি, সেগুলো নিছক ভুয়ো নয়! জগতে সত্যি-কার রোমান্স ঘটে!

সান্যাল কহিলেন—রোমান্স বলতে পারেন! চাকরির আর সাত-আট বছর বাকী। তার পর পেন্সন নেবো। ওঁকে বলেছি, পেন্সন নিয়ে কলকাতায় গিয়ে থাকবো। আমার জন্য উনি যেমন বনবাস-দুঃখ সহ্য করছেন, তেমনি এ-বনবাসের খেশারৎ হবে তখন।…কিন্তু উনি বলেন ‥

কথা শেষ হইল না। বাহিরে নারী-মূর্ত্তি!

বুঝিলাম, মিসেস্ সান্যাল।

তরুণী নন্…তবু তারুণ্যের আভা মুখে জ্বলজ্বল্ করিতেছে! নিটোল দেহ। মনে হয়, হাজার নারীর মধ্যে দাঁড়াইলে ইঁহার পানে চাহিতেই হইবে! চেহারায় এমন দীপ্তি!

সান্যাল সাহেব বলিলেন,—এসো শান্তি। বাড়ীতে অতিথি-সমাগম! এঁরা কলকাতার লোক, বন থেকে ধরে এনেছি…

শান্তি দেবী আসিলেন, মৃদু হাস্যে কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন,—নমস্কার!

তার পর আলাপ-পরিচয়। অসিত বড় চাকুরে…বিজয় ডাক্তার…শিকারে দু'জনের প্রচণ্ড অনুরাগ। আমি গল্প-উপন্যাস লিখি। আসিয়াছি বন্ধুদের সঙ্গে আসামের জঙ্গলে এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে!

শান্তি দেবী বলিলেন—"আন্‌কোরা" উপন্যাস আপনার লেখা, না?

বলিলাম,—হ্যাঁ।

শান্তি দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,—এ-বনে রাজ্যের মাসিক-পত্র আনিয়ে, গল্প-নভেল পড়েই দিন কাটাই। দায়ে পড়ে বাঙলা-সাহিত্যের চর্চ্চা করি।

সান্যাল বলিলেন,—এবং সঙ্গীত-চর্চ্চাও করেন। সে অবশ্য আমার বিরাম-সুখের জন্য…নিজের সখে নয়।

অসিত বলিল—আমরাও গান শুনে আনন্দ পাই!

হাসিয়া সান্যাল বলিলেন,—শুনবেন। অতিথিদের সেবার জন্য উনি গাইবেন বৈ কি, নিশ্চয় গাইবেন!

সন্ধ্যার পর।

সান্যাল সাহেবের হেড্‌ক্লার্ক আসিয়াছিলেন, কেদার বড়ুয়া। দু'জনে বারান্দায় কি কথাবার্ত্তা হইল…তার পর সান্যাল ঘরে আসিলেন, বলিলেন,—শিকার করতে চান? আমার হেডক্লার্ক কেদার বড়ুয়া এসেছে…মস্ত শিকারী। ওর সঙ্গে…

অসিত আর বিজয় যেন লাফাইয়া উঠিল!

সান্যাল বলিলেন,—চলুন, তা হলে আপনাদের শিকারের ব্যবস্থা করে দি।

তিন জনে বাহিরে ছুটিলেন কেদার বড়ুয়ার কাছে।

ঘরে শান্তি দেবী এবং আমি।

শান্তি দেবী বলিলেন,—আপনার গল্প আমার খুব ভালো লাগে। ফী-মাসেই তো আপনার গল্প ছাপা হয় দেখি "প্রণতি" কাগজে। প্রণতি এলে আমি সব ছেড়ে আপনার লেখা আগে পড়ি।

আনন্দে-গর্ব্বে আমি কহিলাম,—আমার সৌভাগ্য!

বলিলেন,—মানুষের মনের এত কথা যে লেখেন, সে-কথায় সত্য-কিছু আছে? না, নিছক কল্পনা?

বলিলাম,—দেখা-জানা কথার সঙ্গে কল্পনা মেশাই। নিছক কল্পনা নিয়ে আমি কারবার করি না!

শান্তি দেবী জবাব দিলেন না…দুই চোখের অবিচল দৃষ্টি আমার মুখে নিবদ্ধ করিলেন।

আমি তাঁর পানেই চাহিয়াছিলাম…শান্তি দেবীর দু'চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন ভয় ও সংশয়ের মলিন ছায়া! ও-দৃষ্টি বড় করুণ! যেন ভীতি-বিহ্বলা হরিণীর দৃষ্টি!

হঠাৎ মনে হইল, এ দৃষ্টি যেন আগে কোথায়

দেখিয়াছি! দু'টি ডাগর চোখে এমনি নিরুপায় অসহায় দৃষ্টি!...এমনি প্রতিমার মতো মূর্ত্তি...এই রঙ...রঙে আগুনের হল্‌কা নাই, শুধু আলোর দীপ্তি!

অনেকক্ষণ পরে শান্তি দেবী বলিলেন,—গেল-মাসে আপনার একটা গল্প পড়েছি..."নারীর ইতিহাস"...

কহিলাম,—প্রণতিতে বেরিয়েছিল।

—হ্যাঁ। আচ্ছা, ও-গল্পের নায়িকা হিরণকে আপনি দেখিয়েছেন...বেশী-বয়সে নায়ক অরবিন্দকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। তার পর যখন জানতে পারলে, অরবিন্দ আগে শৈলকে বিয়ে করে তাকে ত্যাগ করে এসেছিল, তখন শৈলকে আনিয়ে স্বামীর হাতে সঁপে দিয়ে তিন জনে মিলে ঘর-সংসার করতে লাগলো।...মেয়ে-জাতটাকে এমন অপদার্থ করে গড়তে আপনার বাধলো না?

আমি কহিলাম,—স্বামী ছাড়া মেয়েদের আর গতি কি, বলুন?

শান্তি দেবী বলিলেন,—মেয়েদের নিজেদের আত্ম-সম্মানবোধ থাকবে না? জানেন তো বঙ্কিমবাবু লিখে গেছেন ভ্রমরের মুখ দিয়ে...স্বামী যত দিন ভক্তির যোগ্য, তত দিন স্ত্রী তাকে ভক্তি করবে!

তার পর ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন,—বাঙলা দেশের মেয়েকে কবে আপনারা মানুষ করে গড়বেন জ্ঞান বাবু? তাদের মন, তাদের সুখ-দুঃখ—সেগুলোর অস্তিত্ব...চিরদিন তাদের কাঠের পুতুল করে রাখবেন?

কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিলাম, দেওয়া হইল না...সান্যাল-সাহেব আসিলেন।

বলিলেন,—ওঁরা মশগুল! কেদারের সঙ্গে কাল সকালে সব বাঘ মারতে বেরুবেন!...আপনি যাবেন?

আমি বলিলাম,—না...যখন আশ্রয় পেয়েছি, তখন আর বনে বাঘের মুখে যাবো না। এ্যাদ্দিন তো ঘুরলুম বাঘ দেখবো বলে।...কিন্তু বাঘ কি, একটা বেরাল পর্য্যন্ত নজরে পড়লো না! শুধু নিরীহ পাখী মারা। একে শিকার বলে না ·পাখী-মারাকে কশাইগিরি বলে!

সান্যাল বলিলেন,—এ দেশের লোক বিষ-মাখা তীর ছুড়ে জন্তু-জানোয়ার মারে! আমার মনে হয়, বাজে কথা! ওরা বলে, তীরে শুধু বিষ-মাখানো নয়...হরিণ-ছাগলের গা-ফুঁড়ে রক্তে বিষ ইনজেক্‌ট্‌ করে দেয়...সে হরিণ কিম্বা ছাগলকে ধরলে বাঘকে মরতেই হবে।

আমি বলিলাম,—এমন বিষ আছে?

শান্তি দেবীর পানে চাহিলাম, কহিলাম,—আপনি বিশ্বাস করেন মিসেস সান্যাল?

শান্তি দেবীর কেমন যেন উন্মনা ভাব!

বলিলেন,—বিষের কথা বলছেন?

বলিলাম,—হ্যাঁ। এমন বিষ আছে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তি দেবী বলিলেন,—না, না, বিষ-টিষ শুনলে আমার বুক কেমন কেঁপে ওঠে...

সান্যাল সাহেব বলিলেন,—তা ছাড়া জানেন জ্ঞান বাবু, এই বুনো সমাজ এমন যে, ঘরে মেয়ে জন্মালে ওরা সে-মেয়েকে সদ্য তখনি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। ডাক্তারী-বিদ্যায় সে-বিষের সন্ধান মেলে না!...এই সে-দিন একটা বুনোর ঘরে এমন কাণ্ড হয়েছিল। মাকে আমি সাজা দিলুম...এক বছরের জেল।

বলিলাম—মা মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল?

সান্যাল বলিলেন,—হ্যাঁ। ওরা বলে, মেয়ে-জাতটা অসার, অপদার্থ। তাকে মানুষ করতে খরচ...অথচ মা-বাপকে আয় দেবে না।

আমি বলিলাম—এমন খুনীকে এক বছরের জেল!

সান্যাল বলিলেন—এদের পক্ষে এক-বছর কয়েদে থাকা অসহ্য ব্যাপার! তা ছাড়া এ হলো নন্‌-রেগুলেটেড্‌ জায়গা—এখানে একটু কাজীর বিচার-প্রথা অবলম্বন করতে হয়। মেয়ে-মানুষকে ফাঁশি-কাঠে ঝুলোনো ...shocking! মেয়ে-জাত!

রাত্রে চোখে ঘুম আসিতেছিল না! মনের উপর শান্তি দেবী এমন আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন! কেবলি মনে হইতেছিল...দেখিয়াছি...কোথায় যেন এই শান্তি দেবীকে! ও-মুখ নূতন নয়...অপরিচিত নয়!...

কিন্তু কোথায়?

সহসা মনে পড়িল...

পৃথিবী যেন দুলিয়া উঠিল! সঙ্গে-সঙ্গে ক'বছর আগেকার ঘটনাগুলা বায়োস্কোপের ছবির মতো চোখের সামনে...

কি খেয়াল হইল···উঠিয়া পেন আর কাগজের প্যাড্ লইয়া লিখিতে বসিলাম।

লিখিলাম—

"·········রূপসী নারী···বিদুষী···

আইনের পাকে আসামী হইয়া তাকে আদালতে দাঁড়াইতে হইল।

অপরাধ···খুন! স্বামিহত্যা!

দিনের পর দিন অভাগিনী মলিন-মুখে বসিয়া আছে আসামীর কাঠগড়ায়। উকিল সওয়াল-জবাব করিতেছে, সাক্ষীর পর সাক্ষীর এজাহার চলিয়াছে। তার পর এক দিন জজ আর জুরি বলিল—আসামী নির্দ্দোষ! খালাশ!

আইনের চোখে নির্দ্দোষ হইলে কি হইবে, সমাজে যে দুর্নাম, যে কলঙ্ক রটিল, সমাজে আর কি তার স্থান হয়?

কিন্তু কোথায় যায়? যদি বাঁচিতে চায়? কতই বা বয়স!

এমন সুন্দর পৃথিবী···এই আলো-বাতাস···এমন অজস্র ফুল-ফল···মাথার উপরে নীল আকাশ···বুকে স্নেহ-মায়া প্রীতি-ভালোবাসা···মনে কত সাধ, কত আশা!

সমাজ যদি ঠাঁই দেয়, বুক-ভরা সাধ-আশা দিয়া হয় তো আবার সুখের সংসার গড়িতে পারে!

আজ দেখিলাম সেই নারীকে!

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই নারীকে দেখিয়াছি খুনের দায়ে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়! এ নারীর কাহিনী লইয়া কাগজে-কাগজে তখন কত লেখা-লেখি··কত মন্তব্য···কদর্য্য নিষ্ঠুর কত ইঙ্গিত!

আজো যেন স্পষ্ট দেখিতেছি, পরণে সেই লাল পাড় শাড়ী···গায়ে মোটা চাদর··মলিন-মুখী কিশোরী!

অঞ্জনা দেবীর মকর্দ্দমার কথা বাঙলা দেশ আজো ভোলে নাই, নিশ্চয়! ধনী-ঘরের বধূ···স্বামী ব্রজনাথ চৌধুরীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া আদালতে তাঁর বিচার!

আদালতে কত মামলা নিত্য হয়···কিন্তু এমন? ভদ্র বাঙালী-ঘরের বধূ স্বামীকে হত্যা করিয়াছে!

আদালতে কি ভিড়! সে ভিড়ে তাঁর সেই অবিচল প্রশান্ত মূর্ত্তি! যেন ছায়ার দেহ লইয়া আদালতে বসিয়া আছেন। তাঁকে লইয়া আদালতে এত কলরব-কোলাহল—তার সঙ্গে অঞ্জনা দেবীর যেন কোনো সম্পর্ক নাই! ফাঁশি জেল খালাশ···কোনো-কিছুতে আগ্রহ নাই!

ব্রজনাথ চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যু···তাঁর দেহ-মধ্যে পাওয়া গিয়াছে বিষ! সকলের সন্দেহ পত্নী অঞ্জনা দেবীর উপর!

সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিয়া বলিয়া গেল অঞ্জনা দেবীর উপর স্বামী ব্রজনাথের পীড়ন-অপমানের কাহিনী! অঞ্জনা দেবী না কি কার কাছে বলিয়াছিলেন, অপমানের এমন শোধ দিব, তার জন্য যদি ফাঁশি-কাঠে ঝুলিতে হয়, ঝুলিব।

এ-কথার পরের দিন হঠাৎ ব্রজনাথের অসুখ।··· ডাক্তার? অঞ্জনা দেবী বলিলেন,—না! ডাক্তার কি করিবে? তাই ডাক্তার ডাকা হইল না। তার পর রাত্রে ব্রজনাথের জীবন-দীপ নিবিয়া গেল!

মাতাল দুশ্চরিত্র ব্রজনাথ মরিল। ব্রজনাথ বাঁচিয়া থাকিয়া স্ত্রীকে যখন পীড়ন করিত, তখন এ-পরিবারের জন্য কাহারো মাথা-ব্যথা ধরে নাই! আজ ব্রজনাথ মরিবামাত্র এ-পরিবারের জন্য সকলে একেবারে প্রমত্ত হইয়া উঠিল!

লোকজন কলরব তুলিল। পুলিশ আসিল; এবং অঞ্জনা দেবীর সেই কথার জের তুলিয়া পুলিশ তাঁকেই দিল চালান। ব্রজনাথের পাকস্থলীর মধ্যে বিষ পাওয়া গেছে! এ-বিষ কে আর দিবে? ঘরে আছে স্ত্রী—প্রহারে-পীড়নে জর্জ্জরিতা স্ত্রী! সে বলিয়াছিল, এমন শোধ দিব, তার জন্য যদি ফাঁসি-কাঠে ঝুলিতে হয়···

শিহরিয়া সকলে বলিল, যে-স্ত্রী এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে···সে-স্ত্রীর পক্ষে স্বামি-হত্যা বিচিত্র নয়!

তার পর কাগজে-কাগজে এ খুনের মকর্দ্দমা লইয়া কি কলরব! আতঙ্কে শিহরিয়া কোনো কাগজ লিখিল,—গেল, এবার হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইল! স্বামী না হয় প্রহার করে,—স্বামী ইহলোকের দেবতা···জীবন-দেবতা···সে-দেবতার প্রহার পুষ্পাঞ্জলির মতো গায়ে লইতে পারো না···? স্ত্রী হইয়া স্বামীর প্রাণ লইবে এমন করিয়া! প্রাণ কাহারো চিরদিনের ইজারা-করা নয়! ক্ষণিক তার মেয়াদ! সে প্রাণ রক্ষা করিতে স্বামীকে হত্যা! এ-প্রাণ লইয়া এখন কি করিবে মা-লক্ষ্মি? যার স্বামী গেল, তার তো ইহ-জন্মটাই গেল!

কোনো কাগজ লিখিল—এই তো চাই! কে বলে মা, তুমি অবলে! পীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক দিন জাগিয়াছিলেন মহিষাসুর-দলনী। যে-স্বামী দুশ্চরিত্র মাতাল, অত্যাচারে যে-স্বামী তোমার দেহ-মন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে, সে-স্বামী সাক্ষাৎ মহিষাসুর! তাকে নিধন করিয়া নারীর শক্তি, নারীর মহিমা প্রচার করিয়া জলদ-মন্দ্র স্বরে বলো—মাভৈঃ! এই তো চাই! এবার আশা হইয়াছে, ভারত-ললনার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে!

কিন্তু মামলায় গলদ বাহির হইল। অনেক গলদ! এ বিষ কে আনিয়া দেছে? ঘরের কোণে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া যে-বধূ একান্তে বসিয়া শুধু লাঞ্ছনা-পীড়ন সহিয়াছে, বাজারে সে গিয়া বিষ আনিয়াছে—প্রমাণ মিলিল না! লোকজন আনিয়া দিয়াছে বলিয়া কাহারো উপরে এতটুকু সন্দেহ নাই! এমন দোকানীর সন্ধান মিলিল না···যে বিষ দিয়াছে! জুরির দল বলিল—এ বিষ বাহির হইতে পেটে পড়িয়াছে! যে-মাতাল পথে-ঘাটে মদ খাইয়া বেড়ায়, তাকে বিষ দিতে বাহিরে লোকের অভাব হয় না।

কাজেই মামলা ফাঁশিয়া গেল। অঞ্জনা দেবী খালাশ!

খালাশ পাইয়া তিনি গৃহে গেলেন না · মা-বাপের কাছে ফিরিলেন না। দু'-চার জন বান্ধবী ছিল, তারা বলিল—আমাদের কাছে এসো। অঞ্জনা দেবী বলিলেন, যে-কলঙ্ক রটিয়াছে, লোকালয়ে বাস করিতে পারিব না!

তার পর···

কোথায় গেলেন অঞ্জনা দেবী? অঞ্জনা দেবীর মকর্দ্দমার উত্তেজনা থামিবার সঙ্গে সঙ্গে কালের তরঙ্গে কোথায় তিনি ভাসিয়া গেলেন, কেহ সে-সংবাদ রাখিল না! সকলে তাঁকে ভুলিয়া গেল।

কিন্তু আমি ভুলি নাই! উপন্যাসের প্লট খুঁজিতে বসিয়া মন তাঁকে খুঁজিত! কোথায় গেলেন? আশ্চর্য্য! তাঁর মামলার বিবরণ লইয়া মানুষ এমন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল···তার পর এখন কোথায় তাদের সে কৌতূহল?···কাগজে-কাগজে নিত্য সেই কত রচনা, ···ট্রামের ধারে-ধারে তাঁর নামে ছড়া ও গল্পের রকমারী বই···আসরে-বৈঠকে লোকের মুখে তখন আর অন্য কথা ছিল না···শুধু অঞ্জনা দেবী! তার পর?

আজ কত কাল পরে এই নির্জ্জন বন-তলে প্রতিমার মতো সেই মূর্ত্তি···সুখের সংসার···স্নেহে প্রেমে অখণ্ড নিশ্চিন্ত নির্ভর···

সে অঞ্জনা দেবীকে সান্যাল সাহেব কোথায় পাইলেন? সান্যাল সাহেব জানেন এক দিন কি বর্ব্বর নিষ্ঠুর রহস্য-কৌতুক···কি তীব্র অভিশাপ এই অঞ্জনা দেবীকে ঘিরিয়া দিকে-দিকে উৎসারিত হইয়াছিল?

অঞ্জনা দেবী আজ নাম বদলাইয়াছেন! তিনি আজ অঞ্জনা দেবী নন···শান্তি দেবী! সব অশান্তি-বিরোধের শেষে শান্তি চাহিয়া নাম লইয়াছেন শান্তি দেবী!

এ শান্তি সত্যই পাইয়াছেন?···"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, তার পর চোখে দারুণ ঘুমের ঘোর···

লেখা এইখানেই শেষ···

পরের দিন সকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম···একা। কারো সঙ্গ, কারো কোলাহল ভালো লাগিতেছিল না···তাই একা বাহির হইয়াছিলাম। মনের উপর অঞ্জনা দেবী সারাক্ষণ বিচরণ করিতেছেন! কখনো সেই পুরানো অঞ্জনা দেবীর মূর্ত্তিতে···আদালতে বসিয়া মলিনমুখী অশ্রু-ময়ী অঞ্জনা দেবী! পরক্ষণে এই শান্তি দেবী···স্নিগ্ধ-হাস্য-ময়ী···স্বামীর প্রেমে দুঃখ ভুলিয়া এ-গৃহের গৃহলক্ষ্মী!

ফিরিয়া আসিলাম বেলা তখন দশটা। বন্ধুরা বাহিরে গিয়াছে···সান্যাল সাহেব বাড়ী নাই।

আসিয়া বারান্দায় বসিয়া আছি···মিষ্ট গন্ধে বাতাস ভরিয়া গেল!

চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। দেখি, স্নান-শেষে রুক্ষ কেশদাম এলায়িত করিয়া মাথার উপর লাল-পাড় শাড়ীর একটু আবরণ···শান্তি দেবী! বলিলেন,—বেড়ানো হলো?

কহিলাম,—হ্যাঁ···

চারিদিকে চাহিলেন। আরো কাছে আসিলেন। বলিলেন—রাত্রে গল্প লিখছিলেন?

বুকখানা ধড়াশ্ করিয়া উঠিল।

—ক্ষমা করবেন···অনুমতি না নিয়ে সে গল্প আমি পড়েছি।

মাথা তুলিতে পারিলাম না।

বলিলেন—ভেবেছিলুম, অন্য-কিছু গল্প। তা নয়··· বাস্তব!

আমি কোনো কথা কহিলাম না। তাঁর পানে চাহিলাম···ত্ন' চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি লইয়া!

শান্তি দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—সব নিয়েই গল্প লেখবার অধিকার আছে···সকলের। নার এ গল্প কত লোকে পড়বে··নতুন রকমের ··বাঙালী ঘরের বৌ স্বামীকে মেরেছে বলে আদালতে য়েছে আসামী হয়ে! লোকের খুব চমক লাগবে···

মনের উপর যেন চাবুক পড়িল!

শান্তি দেবী বলিলেন—মানুষকে শুধু গল্পের খোরাক াবার উপাদান বলেই আপনারা জানেন···না? র মনে সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার কি অফুরন্ত উৎস , সে-খপর রাখেন না? যে-সব মানুষের কথা ন···পুতুলের মতো যে-সব মানুষকে আপনাদের নাটকে ইচ্ছামত দেবতা সাজান, দানব গড়ে লন, খেয়াল-ভরে নাচান-খেলান···কখনো ভেবে ছেন, তারা সত্যিকারের পুতুল নয়? তারা মানুষ ত আঘাতেও তাদের মনকে তারা চূর্ণ হতে দেয় সারিয়ে তুলতে চায়? তারা বাঁচতে চায়?

আমি কহিলাম—বলেছি তো, সত্যিকারের মানুষ যা , তাদের উপর একটু কল্পনা মেশাই।

—মস্ত কীর্ত্তি রাখবেন, না? এই অঞ্জনা···একে যে দেখেছিলেন···বাইরে থেকে লোকজনের কথায় এর রিচয় পেয়েছিলেন, সেইটুকুই এর সব পরিচয়? ঞ্জনার মনের মধ্যে কোনো দিন প্রবেশ করেছেন? পমান-লাঞ্ছনায় তার দিন কেটেছে, রাত্রি কেটেছে··· বাস করেও সে কতখানি জগৎ-ছাড়া ছিল···সে য় কখনো নিয়েছেন? জানবার চেষ্টা করেছেন, নিগ্রহ-পীড়নেও তার মন ভেঙ্গে-চুরে ঝরে যায়নি বাঁচতে চেয়েছিল, সুখী হতে চেয়েছিল? তার ছিল অজস্র মায়া-মমতা···সে মায়া-মমতা দিয়ে সে ছিল একখানি সংসার গড়ে তুলতে? আজ যদি ক সে-অঞ্জনার সত্য পরিচয় আমি বলি···

আর-একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; তার পর বলিলেন,—মানুষের কতটুকু খপর রাখে, জ্ঞান বাবু? মানুষের বিচার করতে বসে বাইরের বাজে কথার উপর নির্ভর করে আমরা কতখানি অবিচার করি···সে-কথা ভেবে দেখেছেন কোনো দিন? মানুষকে সত্যি এ-ভাবে দেখবেন না! মেডিকেল-কলেজের ছেলেরা যে-ভাবে শব-দেহ উস্কে-ছিঁড়ে-কুটে এ্যানাটমি-বিদ্যা শেখে, তেমন করে কাটা-ছেঁড়ার সূত্রে ধরে মানুষের মনকে বিশ্লেষণ করলে সে-মনের পরিচয় পাবেন না ·

এ-কথা শুনিলাম। উত্তর দিতে পারিলাম না···

শান্তি দেবী হাসিলেন। মলিন মৃদু হাসি।

হাসিয়া আবার বলিলেন,—আপনার এ গল্পে প্রাণ নেই, জ্ঞান বাবু। রাগ করবেন না। মানে, আমি এ-গল্পে প্রাণ দিতে পারি··সত্যকার প্রাণ! আসামীর ডকে বসে অঞ্জনা দেখতো, রাজ্যের লোক তার পানে তাকাচ্ছে···তাদের চোখে কত-রকমের দৃষ্টি···সে-দৃষ্টি তার গায়ে বিঁধতো তীরের মতো! তখন তার মনে কত কথা জাগতো···কত বেদনা! পুরাণে আমরা পড়েছি, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা! সে অগ্নি-পরীক্ষা কি, তা যদি বুঝতেন!

কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। লজ্জায় ক্ষোভে মন যেন চূর্ণ হইয়া যাইবে! কোনো মতে আমি বলিলাম—সে অঞ্জনা দেবীকে যদি ভুলে যাই? এ গল্প যদি আমি না লিখি?

শান্তি দেবী উদাস নেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন···কিছুক্ষণ। তারপর বলিলেন—আপনার পাঠক-পাঠিকা যদি এ-গল্প না পড়ে, তাতে আপনার ক্ষতি হবে?·· আপনি যদি বলেন, লোক শিক্ষা···যদি বলেন, প্রতারণায় আর-একজনকে ভুলিয়ে এই বালির ঘর তৈরী করা···এ কতখানি অন্যায়, কত-বড় পাপ?···আমি বারণ করবো না জ্ঞান বাবু·· করা উচিত হবে না! আপনি যদি মনে করেন, এ গল্প লিখে আপনার পাঠক-সমাজকে আপনি চমক দেবেন, তাদের খুশী করবেন, তাদের উপদেশ দেবেন,—তাতে যদি আমি বা আমার স্বামী লজ্জা পান, তা হলেই কি আপনি কলম বন্ধ করবেন? আপনারা লেখক-মানুষ···পরের সুখ-দুঃখ নিয়ে যে-ভাবে আপনারা বিশ্লেষণ করতে বসেন, তাদের দোষ-দুর্ব্বলতার বাইরের দিকটাই শুধু দেখেন···এ দোষ-দুর্ব্বলতার পিছনে কি যাতনা, কতখানি নিরাশা,

ক্ষোভ, বেদনা জেগে থাকে, সে-খপর আপনারা কখনো জান্ না···আপনাদের পাঠক-পাঠিকারা তো জান্‌ই না···

কথাটা বলিয়া শান্তি দেবী আবার নিশ্বাস ফেলিলেন। বড় নিশ্বাস। তার পর চুপ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন···দু' চোখে সেই উদাস দৃষ্টি!

আমি বলিলাম,—আমায় ক্ষমা করুন শান্তি দেবী··· এ লেখা আমি ছাপতে দেবো না। যে-পর্য্যন্ত লিখেছি, ছিঁড়ে আপনার সামনেই পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছি!

শান্তি দেবী বলিলেন,—মেয়েদের কথা লিখতে বসে একটু মমতা-ভরে লিখবেন জ্ঞান বাবু। তারা বড় অসহায়, নিরুপায়··কি অসহ্য যাতনা সয়ে তারা বাইরের জগতে অবিচল মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়ায়···মেয়ে-জন্ম না নিলে শুধু সাইকলোজি পড়ে তা বুঝতে পারবেন না। সে-দিনের সে-লাঞ্ছনা মনে হলে আজো আমি শিউরে উঠি!···কিন্তু জানেন, আজ আমি কি-সুখে সুখী! সে-লাঞ্ছনার কথা ভুলে গেছি···জীবনে সে যেন মস্ত দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম! ভালোবাসা কি বস্তু···ভালোবাসায় মানুষের মন কি হয়···বিশ্বাস করুন, আজ আমি বুঝেছি! পুরাণে অহল্যা-পাষাণীর মানুষ হবার কথা আগে বুঝতে পারতুম না···বাল্মীকি-মুনি কি করে অহল্যার ব্যথা বুঝে তাকে আবার পাষাণ থেকে মানুষ করেছিলেন, আজ বুঝতে পেরেছি। হয় তো বোঝাতে পারবো না! শুধু এইটুকু বলতে পারি···সে-দিনকার সেই লাঞ্ছিতা কালি-মাখা অঞ্জনা আজ আর সে-অঞ্জনা নেই! আপনাদের সভ্য সমাজে যে সুখ, যে সম্মানগৌরব সে পায়নি, আজ সভ্যতার আড়ালে বনে সে-সুখ, সে-সম্মান পেয়ে তার পুনর্জ্জন্ম হয়েছে, সত্যি! যিনি তাকে এ সুখ, এ গৌরব দেছেন, তিনি···অঞ্জনার স্বামী···অঞ্জনা তাঁকে ভগবানের উপরে আসন দেছে!··আপনার এ লেখা পড়ে আমার আতঙ্ক হচ্ছে! স্বামী যদি জানতে পারেন··· নিজেকে কতখানি গোপন করে অঞ্জনা এসে ওঁর কাছে দাঁড়িয়েছে!

নিশ্বাসের বাষ্পে শান্তি দেবীর কথা রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি চুপ করিলেন। দুই চোখের পিছনে স্তম্ভিত অশ্রু···

তাহা লক্ষ্য করিলাম। লেখার গর্ব্ব নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল!

কহিলাম,—ক্ষমা করবেন। সান্যাল সাহেব সত্যি জানেন না আপনার জীবনে এক দিন কি ঝড় বয়ে গেছে?

শান্তি দেবী আবার নিশ্বাস ফেলিলেন···দুই চোখ মুদ্রিত করিলেন। অনেকক্ষণ স্তিমিত নয়নে রহিলেন। তার পর শুধু বলিলেন,—না···

তার পর অন্য দিকে চাহিয়া মৃদু-কম্পিত স্বরে বলিলেন,—উনি এত ভালো, এমন সহজ বিশ্বাসে আমায় আশ্রয় দেছেন!···শুধু আশ্রয়? আমাকে রাণীর আসন দেছেন! উনি যদি সে-কথার বিন্দুবাষ্প কোনো দিন জানতে পারেন··উনি বাঁচবেন না! এত ভালোবাসেন···আমার কথায় সহর ছেড়ে চিরদিন এই সব বুনোর দেশে বনে-বনেই চাকরির ব্যবস্থা করে দিন কাটাচ্ছেন! লোক-জনকে আমি ভয় করি। জানেন জ্ঞান বাবু, হাসি-তামাসার লোভে মানুষ এমন মত্ত হয় যে, সে হাসি-তামাসায় অপরের সর্ব্বনাশ হতে পারে, সে কথা সে ভাবে না!··· আমার ভালো লাগে না বলে উনি সমাজ···বন্ধু-বান্ধব··· সব ছেড়ে ভোলা-মহেশ্বরের মতো এই জঙ্গলে-জঙ্গলে আজ সাত বছর বাস করছেন! কেন আমার সহর ভালো লাগে না, কেন আমি সমাজ চাই না, সে সম্বন্ধে কখনো আমায় ছোট-একটি প্রশ্ন করেননি! এ-ত্যাগ, এ-মহত্ত্বের দাম আমি ছাড়া আর-কেউ বুঝবে না! পুরুষ-মানুষ আরো দেখেছি···এঁকেও দেখছি। স্বামি-স্ত্রীও অনেক দেখেছি··· স্বামীকে আমাদের শাস্ত্রে দেবতা বলে। মনে হয়, শুধু এঁর মতো স্বামীই দেবতা! সহর থেকে কেউ এলে আমার ভয় করে জ্ঞান বাবু! মনে হয়, যদি সে-কথা ওঠে? আমায় ডেকে যদি উনি জিজ্ঞাসা করেন—এ-সব সত্য? আমি জানি, আমি নির্দ্দোষ। আদালত আমায় শুধু-শুধু খালাশ দ্যায়নি। সে-বিষ আমি দিইনি · এ-কথা খুব সত্য! তবু ওঁর সামনে এ-কথা বলবার সাহস আমার হবে না।

এ-কথায় আমার নভেলিষ্ট-মন মাতিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—আমার কি মনে হয়, জানেন?

—কি?

—আপনি যখন নির্দ্দোষ, তখন সব কথা বলতে কি ক্ষতি?

শান্তি দেবী যেন শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন—না,

না, মানুষের মন! আপনি নভেল লেখেন, এ-কথা জানেন তো, কখনো যদি অভিমান-বশে ওঁর মনে ছোট-একটা প্রশ্ন জাগে, তা হলে আমাদের এ-স্বর্গ ছায়ার মতো মিলিয়ে যাবে!

কহিলাম,—তবু মনে হয়, স্পষ্ট বোঝাপড়া হয়ে গেলে আপনার মনে কোনো দিন আর আতঙ্ক জাগবে না!

—স্বামি-স্ত্রী মনে যদি কোনো-কিছু গোপন রাখে, তাতে কি ক্ষতি?

বলিলাম,—হুঁ…

কথাটা বলিয়া গল্প-লেখা কাগজগুলা আমি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

শান্তি দেবী বলিলেন,—আপনার এ দয়া কোনো দিন ভুলবো না!

সন্ধ্যার পর বন্ধুরা বলিলেন—কাল ভোরেই যাত্রা! কাছে আছে মাজুয়ার জঙ্গল। সেখানে বাঘ মিলতে পারে। না মেলে, ঐ পথেই দেশের দিকে পুনর্যাত্রা!

সকালে হাতী আসিল। দুটো হাতী।

সান্যাল আমার হাতীতে চড়িয়া বসিলেন, বলিলেন,—চলুন, একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

শান্তি দেবী বিদায়-সম্ভাষণ করিলেন; বলিলেন,—আবার আসবেন জ্ঞান বাবু। আপনার নতুন বই ছাপা হলে আমাদের কথা মনে করে সে-বই পাঠাবেন।

হাসিয়া সান্যাল সাহেব বলিলেন,—ভি-পি ডাকে?

আমি বলিলাম,—না। উনি আমাকে যে-মন্ত্র দেছেন, …আমার গুরু!

তার পর যাত্রা।

গাছপালার আড়ালে বাঙলো-বাড়ী মিলাইয়া গেল। তবু ঐ দেখা যায় সবুজ পত্র-পল্লবের ফাঁকে সাদা শাড়ী…পায়ে-পায়ে শান্তি দেবী কত দূর যে আসিলেন!

ঘণ্টা খানেক পরে একটা খোড়ো আটচালা।

সান্যাল সাহেব বলিলেন,—আমি এইখানে নামি।

কহিলাম,—কি করে বাড়ী ফিরবেন?

কহিলেন,—এটা পুলিশ-ফাঁড়ি। ওদের বাইসিক্‌ল্ আছে। তাতে চড়ে ফিরবো।…নিতান্ত নিরুপায় না হলে শান্তিকে একা রেখে দূরে কোথাও আমি যাই না জ্ঞান বাবু! বেচারী আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। …এক দিন যে-দুঃখ পেয়েছেন…আপনাকে বলতুম! ওঁর বেদনার কাহিনী যদি লেখেন! মানে, আমি বিধবা-বিবাহ করেছি। এক দিন স্বামি-হত্যার দায়ে ওঁকে আসামী হতে হয়েছিল—এ-কথা বিশ্বাস করতে পারেন?

চমকিয়া উঠিলাম। কহিলাম,—আপনি সব জানেন?

—জানি। কিন্তু উনি জানেন, আমি সে-কথা জানি না! আমি কোর্টে যেতুম সে-মকর্দ্দমা দেখতে! ওঁর উপর পীড়ন-অত্যাচারের সে-কথা শুনে আমার মন কি ব্যথায় ভরে উঠেছিল! তার পর কত সন্ধান করে ওঁকে খুঁজে পাই!…উনি সে-সব কথা ভুলতে চান, বাক্যাকারে আমিও ওঁকে কিছু বলিনি…বলবার কোনো প্রয়োজন হয়নি। উনি আমায় দেবতা করে তুলেছেন! নিজের অস্তিত্ব রাখেন নি!… যেন আমার ছায়া! বিশ্বাস করতে পারেন, এ যুগের বিদুষী মেয়ে… she lives in me? ওঁকে আমি শুধু ভালোবাসি, তা নয়, শ্রদ্ধা করি! এমন মন আমি কখনো দেখিনি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

স্বর্গ ও মর্ত্ত্য

স্বরগ যথায় রয়েছে থাকুক;
আমি তাহা নাহি চাই।
আমার যা' কিছু সকলি হেথায়
সবারে হেথায় পাই;
এ ধরায় পাই যারা সুখী হয়—
সুখ যদি হেরে মোর,
যাহারা আমার ব্যথায় ব্যথিত—
বরষে নয়নলোর।

হেথা হেরি আমি পরিচিত যাহা;
সকলি ধরায় মম—
আপনার জন সকলে হেথায়—
তুমি আছ, প্রিয়তম।
স্বরগ আমার এই ধরা-বুকে—
পরিচিত পুরাতন,
ধরার ধূলায় স্বদেশ আমার—
আর কিসে প্রয়োজন?

শ্রীমতী পূর্ণিমাদেবী ব্রহ্মচারী (মহারাজ-কুমারী)।



আশাপথের শেষে

১

একটুখানি নিস্তব্ধ থাকিয়া শান্তা ডাকিল,—বাবা!

চন্দ্রনাথ চোখ না মেলিয়াই বলিলেন,—হাঁ, মা, আমি তখন যা বলছিলুম, এখনও তাই বলছি। বাপ-মা বুঝতে না পেরে যদি একটা ভুলই ক'রে-বসে, তা হ'লে বুদ্ধিমান ছেলে-মেয়ে কি সে ভুল শুধরিয়ে নেবে না? যদি তা করে, তা হ'লে বাপ-মা অনুতাপ থেকে মুক্তি পায়।

শান্তা একটু থামিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—ভুল ত তুমি কিছু করোনি বাবা!—আর যদি তা ক'রতেই, সে আলাদা কথা; কিন্তু এ যে শুধরোবার নয়!—ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

চন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—হাঁ মা, ভগবানের কাছে আমার এইটুকুই ব'লবার আছে যে, আমি হাত-পা না বেঁধেই তোকে জলে ফেলে দিয়েছি—অর্থাৎ সাঁতার দিয়ে পার হ'বার উপায় আছে। যদি আমি জেদ ক'রে তার হাতে তোকে সোঁপে দিতাম, তা হ'লে আজ নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই আমাকে মরতে হ'ত! উঃ, এত বড় পাষণ্ড, এমন অকৃতজ্ঞ!—তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুরাশির প্লাবনে ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল; কটু কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তিনি যেন ব্যথিত হইলেন। ধীরে-ধীরে ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, পাশ-বালিশটা বুকের আরও কাছে টানিয়া-লইয়া তিনি শান্তার বহু বার-শ্রুত কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করিলেন; বলিলেন,—কুড়ি বছর আগের কথা, কিন্তু সেই বন্যার প্রচণ্ড গর্জ্জন আজও যেন তেমনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি!—গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—বানের জলে সারা গ্রাম ভেসে গেছে, কোথাও একটু স্থান নেই; ভোরে উঠে জলের কিনারায় গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড আম গাছ উপড়িয়ে প'ড়েছে,—তাতে বেধে আছে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে; আর বুকে তার আঁচল জড়িয়ে বাঁধা তিন-চার বছরের একটি ছেলে! অতি কষ্টে টেনে তুলে' দেখি, দু'জনেই জীবিত আছে। ঘরে এনে যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষায় দু'জনেরই চেতনা ফিরে এল। পরিচয় পেলুম, বালিকা হরিহর ন্যায়রত্নের মেয়ে, আর শিশুটি নরদেব শাস্ত্রীর ছেলে। উভয় পরিবারের অন্য সকলেই জলে ডুবে মারা গেছে। মেয়েটি ছেলেটিকে হাতের কাছে পেয়ে কোন রকমে নিজের আঁচল দিয়ে বাঁধে। আজীবন অবিবাহিত থেকে অধ্যাপনা করাই ছিল আমার সঙ্কল্প; কিন্তু জীবনের চাকা হঠাৎ ঘুরে গেল। গ্রামস্থ মুরুব্বিদের আদেশ হ'ল, মেয়েটি আমাকেই গ্রহণ করতে হ'বে।—চন্দ্রনাথ আবার চুপ করিলেন। স্মৃতির দুঃসহ বেদনায় তিনি যেন কাতর হইয়া পড়িলেন!

শান্তা পিতার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল,—ও-সব কথা থাক বাবা, তোমার কষ্ট হ'চ্ছে।

চন্দ্রনাথ ঈষৎ কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,—না মা, কষ্ট-টষ্ট কিছু হচ্ছে না। মনে হ'চ্ছে, জল থেকে তুলেছিলুম অমৃত আর গরল—দুই-ই! তোমার মা অসামান্যা গুণবতী ছিলেন বটে, কিন্তু রূপেন ছিল তেমনই নির্গুণ।

পিতার মন্তব্য শুনিয়া একটা অব্যক্ত বেদনার ছায়া শান্তার চোখে-মুখে প্রতিফলিত হইল; সহসা সে কথা বলিতে পারিল না। অল্পক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল,—নির্গুণ ত তিনি নন বাবা—তোমার কথাই যে অসঙ্গত হ'য়েছিল। তুমি ত জানতে, বিলেতে যাবার জন্যে তাঁর আগ্রহ ছিল কত বেশী!—আমারই ত মুখের দিকে চেয়ে তুমি তাঁর সেই সঙ্কল্পে বাধা দিয়ে বসলে!

চন্দ্রনাথ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—আমার কথা অসঙ্গত হ'য়েছিল? অন্যায় ক'রেছিলুম আমি? গরীব

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ আমি, আমার কি সাধ্য যে, বিলেতে তার লেখাপড়ার খরচ চালাই? কেন, এ-দেশে থেকে বি-এ পাশ করলে কি শিক্ষা লাভ হয় না?

ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—তার আব্দার হয় ত গ্রাহ্য করতে পারতুম, খরচ-পত্রের ব্যবস্থাও কোন রকমে করা যেতে পারতো; কিন্তু ঐ যে বললে, বিলেত থেকে ফিরে এসে বিয়ে করলেই চলবে,—তার এ প্রস্তাবে আমি নির্ভর করতে পারলুম না; হাঁ, তা বিশ্বাস করা আমার অসাধ্য হ'ল। রূপেন তোর জন্মের পর থেকেই ত জানে—তুই তার বাগ্‌দত্তা বধূ; তোর মা দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে খেলা দিত, আর ব'লত—বড় হ'লে খুকুর সঙ্গে রূপেনের বিয়ে দেব। তার চিরদিনের এই কামনা, প্রাণভরা আগ্রহ, আকিঞ্চন, সে পাষণ্ড অনায়াসে অগ্রাহ্য ক'রলে!

অব্যক্ত বেদনায় শান্তার বুকের ভিতর টন্-টন্ করিতেছিল; সে ম্লান মুখে বলিল—চিরদিন কি মানুষের মনের ভাব অপরিবর্ত্তিত থাকে, বাবা!

চন্দ্রনাথ কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—ও-কথা সত্য বটে মা! না হ'লে, যার ওপর এতখানি নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত ছিলুম, সে কি এমন নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্দেশ-যাত্রা ক'রতে পারতো?—তাঁহার রোগশীর্ণ কপোল বহিয়া অশ্রুর দু'টি ক্ষীণ ধারা ঝরিয়া পড়িল; সে-দিকে শান্তার তখন দৃষ্টি ছিল না।

২

কয়েক দিন হইতে চন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। কবিরাজ মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিত ভাবে শান্তার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠী কিছু দিন পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল; তথাপি গ্রামস্থ দুই-এক জন প্রাক্তন ছাত্র রুগ্ন গুরুর সেবা-শুশ্রূষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। শান্তা বিনীত ভাবে তাহাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, পিতার জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। সেবা উপলক্ষে যাহারা সেখানে থাকিবে, তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবেই; কিন্তু পিতা পরলোকে প্রস্থান করিলে, সেই ঘনিষ্ঠতার ফলে তাহার মনে অশান্তির সঞ্চার হইতে পারে। সুতরাং যে বিপদ অপরিহার্য্য, তাহার জন্য তাহার একাকী প্রস্তুত হওয়াই শ্রেয়ঃ। এই বিপদে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এবং তাহার সহিত স্কন্ধ মিলাইয়া পিতার সেবায় যে তাহাকে সাহায্য করিবে, তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবে বলিয়া তাহার আশা ছিল,—সে আজ এক বৎসর নিরুদ্দিষ্ট!—হৌক্—তথাপি তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান শান্তা অন্য কাহাকেও দিতে পারিবে না।

সন্ধ্যা-সমাগমে এক মুঠা ভাত রাঁধিয়া ঢালিয়া লইয়া, ও তাহা নাকে-মুখে গুঁজিয়া শান্তা পিতার পাশে আসিয়া বসিল, এবং তাঁহার অস্থিসার দেহের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। সে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। যে সময়টুকু সে এই রোগজীর্ণ কঙ্কালটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারে, ততক্ষণই সে নিরাপদ; তার পর এই বিশাল পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একাকিনী। কোন দিকে তার এতটুকু বন্ধন নাই, স্নেহ-মমতা নাই, কোন আশ্রয় নাই! এই সকল কথা ভাবিতে-ভাবিতে রূপেনের মুখখানি তার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আজ সে যদি এখানে উপস্থিত থাকিত! শান্তাকে বিবাহ সে নাই-বা করিত, তবু এখানে থাকিলে শান্তা এমন বিপদে অভয় পাইত, তাহাকে এমন নির্ব্বান্ধব, নিরাশ্রয় হইতে হইত না। একখানি সবল বাহু এবং কোমল হৃদয় তাহার সাহায্যের জন্য উন্মুখ থাকিত। রূপেন তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইলেও নির্ম্মম হইতে পারিত না, সে বিষয়ে শান্তার সন্দেহ ছিল না। এই সতের বৎসর বয়সে সংসারের সবই তাহার অজ্ঞাত। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে স্নেহময়ী জননী ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন; এত দিন পিতার পক্ষপুটে সে নিরাপদ ছিল। সেই আচ্ছাদন অপসারিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই,—কিন্তু যে-দিন তাহা শান্তাকে ঝঞ্ঝা-ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ ও ধূলি-বালুকাসমাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরে নিরাশ্রয় ভাবে ফেলিয়া-রাখিয়া দূরে চলিয়া যাইবে, সে-দিন তাহার জীবনে কি ঘোর বিপদই আসিয়া পড়িবে! জীবনের দুর্গম বন্ধুর পথে তাহার হাত ধরিয়া এক পা আগাইয়া দিবে, সংসারে যে এমন কেহই নাই! জীবন-পথে যে তাহার সহযাত্রী হইবে বলিয়া তাহার আশৈশব বিশ্বাস ছিল, সে নিতান্ত উপেক্ষাভরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়াছে। তাহার পিতার

সহিত কথান্তর হওয়ায় যে-দিন সে সংসারে বীতরাগ হইয়া গৃহত্যাগ করে, সে-দিন রূপেনকে সুটকেসে জামাকাপড় গুছাইতে দেখিয়া শান্তা সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—জামাকাপড় গুছাচ্ছো যে! কোথায় যাবে ?

রূপেন রুক্ষ স্বরে উত্তর দিয়াছিল—পথের ভিখারী যে, পথেই তার স্থান ; ঘরে থাকা তার পোষায় না। জলে ডুবেও যখন মরিনি, তখন হঠাৎ মরবার ভয় নেই। যে দিকে দু'চক্ষু যায়, সেই দিকেই যাব। যেমন হঠাৎ এক দিন এসেছিলুম, তেমনি হঠাৎ বিদায় হচ্ছি ; কোথায়, কেন, তার কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না।

সেই কথা স্মরণ করিয়া শান্তার চক্ষু দু'টি নিঃশব্দে বিন্দু বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু শান্তার অন্তরে তাহার মুখখানি সুবর্ণ-রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে—তাহা মুছিবার নয় ; আর আছে, এই গৃহে তাহার বিশ বৎসরের কত-শত স্মৃতি-চিহ্ন !

চন্দ্রনাথ ডাকিলেন,—শান্তা !

ক্ষিপ্র হস্তে সে উদ্গত অশ্রু-প্রবাহ অঞ্চলে মুছিয়া-ফেলিয়া ভারী গলায় বলিল,—কি ব'লছ বাবা ! জল দেব কি ?

চন্দ্রনাথ তাহার কণ্ঠস্বরে রোদনের আভাস পাইয়া মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ রহিলেন ; তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—না মা, জল থাক : একটা কথা ব'লব ভাবছিলুম।

শান্তা নির্ব্বাক্ ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; সে জানে, পিতার বক্তব্যটা কি। তাঁহার নিজের দিন যতই শেষ হইয়া আসিতেছে, ততই তার অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন।

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—আমাদের দু'জনেরই ভুল হ'য়েছিল—গোড়া থেকেই এ-রকম একটা সঙ্কল্প করা। যাই হোক, বিধাতা যখন তা ভেঙ্গেই দিলেন, তখন এ তাঁর মঙ্গল ইচ্ছাই বলতে হবে।

ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিবার পর তিনি পুনরায় বলিলেন,—আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে সংসারী ক'রে যাব, তা হ'ল না ; যাই হোক, মুরারীকে আর তর্কতীর্থকে ব'লে গেলে তারা প্রাণপণে চেষ্টা করবে। তারা সৎপাত্র স্থির করতে পারলে, তুমি তাতে আপত্তি করো না মা !

পিতার কথা শুনিয়া শান্তার মুখ মৃতের মুখের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। মিনিট-কয়েক পরে সে বলিল,—বাবা, চিরদিন তুমি আর মা যা ব'লে এসেছ, তা কি মিথ্যে হ'য়ে যাবে ? আমি যে হিন্দুর মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে বাবা !

চন্দ্রনাথ নির্ব্বাক্ ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সত্যই, শান্তা তাহার জন্মগত সংস্কার ত্যাগ করিবে কিরূপে ? শৈশবাবধি তাঁহারা উভয়ে শান্তার মনে প্রোথিত যে বীজে জলসেক করিয়া তাহা অঙ্কুরিত এবং আজ মহীরুহে পরিণত করিয়াছেন, এক কথায় তাহা সমূলে উৎপাটিত করা কি সম্ভব ?—চন্দ্রনাথ কিছু কাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিলেন,—এই কি মা তোমার শেষ কথা ?

শান্তা দৃষ্টি নত করিয়া সিক্ত কণ্ঠে বলিল,—সেই আশীর্ব্বাদই করো বাবা !

মিনিট-পনের পরে চন্দ্রনাথ বলিলেন,—তাই যদি হয় মা, তা হ'লে একটা কাজ করব।—বলিয়া ক্ষণকাল কন্যার মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া-থাকিয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন,—ব্যাঙ্কে যে দু' হাজার টাকা গচ্ছিত আছে, ওটা তাকেই দিয়ে যাব।...তার জন্যেই ওটা অনেক কষ্টে সঞ্চয় ক'রেছিলুম।...সে আমায় ভুলেছে, কিন্তু আমি তাকে ভুলতে পাচ্ছি নে—পারলে বোধ হয় শান্তি পেতুম। তা এ সম্বন্ধে তুই কি বলিস্ ?

শান্তা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল,—এখুনি, এখুনি বাবা ! টাকাগুলা তাঁকেই দাও। আমি তা নিয়ে কি করব ?—বলিতে বলিতে দুঃসহ বেদনায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।—অশ্রু রোধ করা অসাধ্য হওয়ায় ব্যথিতা বালিকা পিতার বুকের পাশে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার চোখের জলে চন্দ্রনাথের উপাধান সিক্ত হইল ; তিনি ভগ্ন স্বরে বলিলেন—চুপ কর মা ! কাঁদিসনি ; সে ফিরে আসবে,—নিশ্চয় ফিরে আসবে। আমার উমা মায়ের তপস্যা কখন কি বিফল হ'তে পারে ?

৩

চন্দ্রনাথ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হইলে হিতৈষী প্রতিবেশীরা শান্তার ভবিষ্যৎ চিন্তায়

অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। মুখুজ্যে-গৃহিণী এক দিন স্নানের ঘাটে আসিয়া শান্তাকে স্নান করিতে দেখিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ লা শান্তি, শুনছি তোর বাপ তার টাকা-গুলো সবই না কি সেই হাভাতে ছোঁড়াটাকে দান ক'রে গেছে?

শান্তা নিম্ন স্বরে বলিল,—হাঁ, দিয়েছেন।

মুখুজ্যে-গিন্নী বলিলেন—দিয়ে গেছে, সত্যি তা হ'লে? এমন বোকামিও কেউ করে? তা—লেখাপড়া কিছু ক'রে গেছে, না মুখে-মুখে? লেখাপড়া ক'রে দিয়ে থাকলে আর কোন উপায় নেই; নইলে ও-কথা চেপে যাওয়াই ভাল। কি বলিস?

শান্তা বলিল,—লেখাপড়া কিছু ক'রে যাননি ঠাকুমা, কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? টাকাটা তো আমার বাবার, আমায় যখন তাঁর ইচ্ছে জানিয়ে গেছেন, তখন তা না দেব কেন?

মুখুজ্যে-গৃহিণী রুক্ষ স্বরে বলিলেন,—বুড়ো বয়েসে তোমার বাবার ভীমরথি হ'য়েছিল! বলি, তোমার থাকবে কি, সেটা শুনি? শুনছি, ঐ না কি তাঁর যথা-সর্ব্বস্ব!

শান্তা বলিল,—ঠিকই শুনেছেন ঠাকুমা! তবু যাঁর টাকা, তাঁর ইচ্ছেমত দিতে হবে ত!

মুখুজ্যে-গিন্নী এ-কথা শুনিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—আ-মর ছুঁড়ী, আক্কেলখাকী, তোর বাপের সর্ব্বস্ব তাকে দিয়ে কি শেষে আমড়া চুসবি? মা-বাপ ত সুখের স্বপন ঢেরই দেখেছিল, বর হবে রাজপুত্তুর, দরোজায় হাতী বাঁধা থাকবে, আরও কতো কি! হ'ল ত সবই; এখন হাতের-পাতের সর্ব্বস্ব খুইয়ে শুকিয়ে মরতে সাধ গেছে বুঝি?

শান্তা ম্লান হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। পল্লীর সর্ব্ব-সাধারণের ঠান্‌দিদি লক্ষ্মীঠাকরুণ বলিলেন,—হাঁ লা ছুঁড়ি! শুনছি, তুই না কি ছেরটা কাল আইবুড়ো থাকতে চা'স? গুজোবটা কি সত্যি?

ঘাটের বৈঠকে সমাগতা ছোট-বড় সকলেরই চক্ষু অসংবরণীয় কৌতুকে বিস্ফারিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। খাসা মজার খবর বটে!

শান্তা নত মুখে থাকিলেও তাহার মনে হইল, পল্লীবাসিনী বহু রমণীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটার মত বিঁধিতেছে! সে মুখ তুলিয়া চকিত দৃষ্টিতে একবার চারি দিকে চাহিল; তাহার পর অনুচ্চ স্বরে বলিল,—সত্যি কথাই শুনেছ ঠান্‌দি! তা' যার যেমন বরাত! তোমারও প্রায় সেই দশাই নয় কি?

বৃদ্ধা কর্কশ স্বরে বলিলেন,—না লো, তা নয়! প্রজাপতির ইচ্ছেয় গলায় মালা ত উঠেছিল, সে খবর রাখিস? ঘর নাই-বা করলুম, চার হাত তো এক হ'য়েছিল।

শান্তা এবার দুষ্ট হাসি হাসিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না; হাসিয়া বলিল,—ওঃ, ভারী ত বিয়ে! বিয়ের রাত ছাড়া বরের মুখই ত দেখনি ঠান্‌দি! আর শুনিছি, তোমার দিদির না কি বিয়েই হয়নি। কথায় বলে, 'বড় থাক্‌তে ছোটোর বিয়ে, মেজো ভাবে গালে হাত দিয়ে', তোমাদের তাই!

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সগর্ব্বে বলিলেন,—নাই-বা হ'ল বিয়ে, কুলীনের ঘরে অমন মেয়ে কত র'য়েছে। অ-ঘরে ত আর কাজ করতে পারে না। তুই শ্রোত্তিরী বামুনের মেয়ে, তুই আয়বুড়ো থাকবি কোন্ দুঃখে লা?

শান্তা বলিল,—শ্রোত্রীয় বামুনের সব মেয়েই ভাগ্য-বতী, আর কুলীনের মেয়ে হ'লেই হবে দুঃখিনী, এমন কি কথা ঠান্‌দি! বরাত কি কেউ বদ্‌লাতে পারে?

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই শান্তা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সে পলাইতে পারিলে বাঁচে।

সে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, জ্ঞাতিকাকা মুরারী ঠাকুর বারান্দায় বসিয়া আছেন। শান্তা তাঁহাকে বসিবার আসন দিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া-আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলে, মুরারী বলিলেন,—উকিল বাবু ব'লছিলেন, তোমার বাবার ইচ্ছেমত ও-টাকাটা তুমি রূপেন বাবাজীকেই দেবে?—না, মত পরিবর্ত্তন ক'রেছ?

শান্তার মুখে বেদনার ছায়া পড়িল; সে মৃদু স্বরে বলিল,—না কাকা, মত পরিবর্ত্তনের কারণ নেই; বাবার ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। কিন্তু তিনি ত নিরুদ্দেশ, টাকা দেওয়া হবে কি ক'রে?

মুরারী বলিলেন,—চেষ্টা করতে হবে—যাতে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। চন্দরদা' অভিমান ক'রে রইলেন,

কিন্তু সে অভিমানের মর্য্যাদা রাখবে কে? 'পরের ছেলে খায়, আর বন পানে ধায়।' ছিঃ, কি অকৃতজ্ঞ!

অপরাধী সে সত্য, কিন্তু সে কথার আলোচনা শান্তার সহ্য হইল না, সে বাধা দিয়া বলিল,—কি করবেন কাকা?

মুরারী বলিলেন,—বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখি, একখানা ইংরেজী আর একখানা বাংলা কাগজে; চোখে তার পড়বেই।

শান্তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে বলিল,—তবে তাই করুন। এত দিন বিজ্ঞাপন দিলে হয় ত এসে পড়তে পারতেন।

মুরারী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—তা হয় ত পারত; কিন্তু এমনও ত হতে পারে, সে কোথাও চাকরী-বাকরী পেয়ে সংসার পেতে ব'সেছে।

শান্তার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল, পাণ্ডুর মুখখানি সে অবনত করিল; তাহার পর শুষ্ক স্বরে বলিল,—তা হ'লেই বা কি? ও ত বাবার দান—কোন সর্ত্ত নেই ত। তিনি যেখানে থাকুন, এসে টাকাটা নিয়ে গেলেই আমি বাবার কাছে যে সত্য-বন্দী আছি, তা থেকে মুক্তি পাব।

মুরারী স্তব্ধ-বিস্ময়ে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—তাই দেব মা, দেখি চেষ্টা ক'রে। রোজই শ্রীধরকে তুলসী দিচ্ছি, সে কি বৃথা হবে?

মুরারী চলিয়া গেলে শান্তা শূন্য-মনে উঠানের পার্শ্বস্থ ফুল-বাগানের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে রূপেনের হস্ত-রোপিত নানা জাতীয় গোলাপের গাছ আছে। একটা ব্ল্যাক-প্রিন্স গাছে গোটা-দুই ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া সে নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। এই গাছটির একটি ফুলের জন্য রূপেনের কি আকিঞ্চন ছিল! তখন ইহাতে ফুল ফুটিত না, এখন ফুটিয়াছে, কিন্তু আকিঞ্চন করিবার ব্যক্তি এখানে নাই! শান্তা ফুল দু'টি তুলিয়া লইল। ঘরে রূপেনের একখানি প্রতিকৃতি ছিল, তাহার পায়ের দিকে একটি সূতার বন্ধনী দেওয়া;—দেখিলেই বুঝা যায়, সেখানে নিত্য ফুল দিয়া সাজান থাকে;—ফুল দু'টি সূতায় আট্‌কাইয়া শান্তা ছবির দিকে স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

সহসা বাহিরে গীতধ্বনি হইল। সে কান পাতিয়া শুনিল,—বৈষ্ণবী খঞ্জনী বাজাইয়া গায়িতেছিল,—

"রাই, যার তরে নিলে কলঙ্কিনী নাম—
বিধির নির্ব্বন্ধে সে বা হৈল বাম,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে দেখে এনু হায়!
রাধিকা-রঞ্জন ধরে তার পায়—
এমনি বিধির বিপাক হৈল হে।—"

শান্তা সরিয়া আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল; তাহার অশ্রুসিক্ত শুষ্ক মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সকলেই যেন আজ তাহাকে কঠোর ভাবে জানাইয়া দিতে চায়—রূপেন তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু শান্তার আশাতরু শুষ্ক হয় নাই। তথাপি আপনাকে সম্পূর্ণ অসহায় ও নিঃস্ব মনে করিয়া শান্তা সেইখানেই বসিয়া দুই জানুর মধ্যে মুখ-গুঁজিয়া বুকভাঙ্গা বেদনায় গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৪

যুক্তপ্রদেশের কোনও অখ্যাত নগরে একটি দ্বিতল অট্টালিকার নিভৃত কক্ষে রূপেন্দ্র শুইয়া ছিল। আজ চার-পাঁচ দিন হইতে তাহার জ্বর। স্থানীয় স্কুলে সে মাষ্টারী করে। বেতন প্রায় শতাবধি টাকা। বাড়ীখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটি ভৃত্য মাত্র রূপেনের সংসারের কর্ণধার!

বর্ষা কাল। সকাল হইতে টিপ্-টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল; এখন জোরে চাপিয়া আসিল। পূর্ব্ব দিকের খোলা জানালা দিয়া বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় মেঝের অনেকটা ভিজিয়া যাইতেছে দেখিয়া রূপেন অগত্যা বিছানা ছাড়িয়া উঠিল, এবং জানালাটা বন্ধ করিয়া একখানা চাদর গায়ে জড়াইয়া আবার শুইয়া পড়িল। মুক্ত-দ্বারের বাহিরে বৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে তাহার মনে পড়িল—বাঙ্গালার বৃষ্টিপ্লাবিত পল্লীর রূপ, সেই সঙ্গে কত অতীত স্মৃতি! মনে জাগিয়া উঠিল—কি তার বিচিত্র জীবন! মা ছিলেন—গর্ভধারিণী না হইয়াও অপূর্ব্ব স্নেহময়ী। পিতা প্রতিপালক মাত্র, তথাপি জন্মদাতা অপেক্ষাও স্নেহময়। আর শান্তা?—রূপেনের বুকের ভিতরটা ধড়-ফড় করিয়া ওঠে, সারা অন্তর বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কি মধুর, নম্র

বিনীত দেবীর মত স্বভাব তার! কি অগাধ, কত গভীর প্রেম তার বুকে; অথচ কত ভীরু সে প্রেম,—কখনও আত্মবিকাশের চেষ্টা মাত্র করে নাই! একবার মাত্র সে সংযম হারাইয়া রূপেনের কাছে ধরা দিয়াছিল; যে-দিন সে চলিয়া আসে, সেই দিন সে কথা শুনিয়া শান্তা তাহার জানুর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল; ব্যাকুল রোদনের সহিত মিনতি করিয়া বলিয়াছিল,—রাগ ক'রে চ'লে যেয়ো না গো! একটু—একটু দয়া করো এ অভাগীকে—!

রূপেন জানিত, সে তাহার বাগ্দত্তা, তথাপি চিরস্নেহ-মধুরা শান্তার কাতর মিনতিতে সে কর্ণপাত করে নাই,—বিলাত যাইবার জন্য ব্যাকুলতা তাহাকে এতই অভিভূত করিয়াছিল। শান্তার মুখখানি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। হয় ত মনোকষ্টে সে শুকাইয়া গিয়াছে; কাঁদিয়া-কাঁদিয়া অসুখে পড়িয়াছে, এবং ব্যাকুল হৃদয়ে তাহার আশাপথ চাহিয়া আছে!…

রূপেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তাহার ইচ্ছা, সে ফিরিয়া যায়; কিন্তু পারে না, লজ্জা বাধা দেয়। ফিরিয়া গেলে দেশের লোক কি বলিবে? সকলে টিটকারী দিয়া হাসিতে থাকিবে; সে যে মৃত্যুর অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি! যদি ফিরিয়া যায়, শান্তা কি করিবে? রূপেন চক্ষু মুদিত করিল; মনে হইল, শান্তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। বেদনায় তাহার বুকের ভিতরটা টন্-টন্ করিতে লাগিল।

"বাবুজী পার্শ্বেল আয়া"—ভৃত্যের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

রূপেন চোখ মেলিয়া চাহিল; দেখিল, ডাকের একটা পার্শ্বেল লইয়া ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। কাশীতে সে একখানি রেশমী চাদর পাঠাইতে লিখিয়াছিল, তাহাই ডাকে আসিয়াছে। রসিদ সহি করিয়া, পার্শ্বেল খুলিয়া সে কাপড়গুলি বাহির করিল, এবং নাড়িয়া-চাড়িয়া বিছানার এক পাশে রাখিয়া পূর্ব্ববৎ শুইয়া পড়িল। অতীতের স্মৃতি তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। অন্যমনস্ক ভাবে প্যাকিং-কাগজের মোড়কটার দিকে কয়েক মিনিট চাহিয়া-থাকিয়া হঠাৎ সে পাগলের মত ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং মোড়কের কাগজখানা টানিয়া লইল; তাহা কোন বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা। তাহাতে প্রকাশিত যে বিজ্ঞাপনটি তাহার চোখে পড়িয়াছিল, তাহা এই:—"নিরুদ্দিষ্ট রূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—এতদ্দ্বারা আপনাকে জানাইতেছি, আমার পিতৃদেব ৺চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মৃত্যুকালে আপনাকে ছয় হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। আপনার বর্ত্তমান ঠিকানা জানিতে না পারায় উক্ত টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি। আপনি স্বয়ং আসিয়া লইলে, অথবা উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ পত্র লিখিলে ঐ টাকা আপনাকে দেওয়া হইবে, ইতি।—শ্রীমতী শান্তা দেবী, গ্রাম—বড় নাজানিপুর, পোঃ—কাথুলি, জিলা—নদীয়া।" রূপেনের অবশ হস্ত হইতে কাগজখানা খসিয়া পড়িল; সে অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া বালিসের উপর হুম্‌ড়ি-খাইয়া পড়িল। মনে হইল, তাহার হৃৎপিণ্ডে সহস্র শেল বিদ্ধ হইয়াছে!

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সে মুখ তুলিল, বর্ষণ-ধূসর মেঘের মতই তাহা পাণ্ডুর। স্থিরপ্রতিজ্ঞ, পরম নিষ্ঠাবান্ চন্দ্রনাথ যে শান্তাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করেন নাই, তাহা যেন রূপেন স্থিরই জানিত। আজ সে একা, এই বিশাল পৃথিবীতে একেবারে নিরবলম্ব, সম্পূর্ণ রিক্ত, এবং নির্ব্বান্ধব! রূপেনের চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিতে লাগিল। কেন সে চলিয়া আসিয়াছিল? যিনি তাহাকে নিশ্চিত-মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া আশৈশব সন্তানবৎ স্নেহে প্রতিপালন করিলেন; তাঁহার অন্তিম কালে সে তাঁহাকে মর্ম্মভেদী চিন্তা হইতে কেন মুক্ত করিল না? শান্তার ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি কি পরলোকেই শান্তিতে আছেন?

মন কিঞ্চিৎ সংযত হইলে রূপেন কাগজটার তারিখ দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু প্যাকিং-কাগজের সেই অংশটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত দুই-একটি টেলিগ্রামের তারিখ দেখিয়া তাহার মনে হইল, প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বের বিজ্ঞাপন।

রূপেন জানুর উপর ললাট রাখিয়া ভাবিতে লাগিল,—এখন সে কি করিবে? শান্তাকে পত্র দিবে কি?—কিন্তু—কিন্তু, না। বিজ্ঞাপনে টাকার উল্লেখ না থাকিলে তাহার পক্ষে তাহা সহজ হইত; এখন সে কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। সে বহুক্ষণ ভাবিয়াও ভাবনার কূল-কিনারা পাইল না; শেষে স্থির করিল, ছুটি লইয়া সে গৃহে ফিরিবে,

এবং যদি শান্তার বিবাহ হইয়া থাকে, তবে টাকাগুলি তাহাকে যৌতুক দিবে ; আর বিবাহ না হইয়া থাকিলে, শান্তা ত তাহারই। নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে সে এক জনকে হারাইয়াছে, সে ক্ষতি তাহার সহিয়াছে ; কিন্তু শান্তাকে হারাইবার ক্ষতি তাহার সহিবে না। হাঁ, সে যাইবে, সে নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরিবে।

৫

আসন পাতিয়া দিয়া শান্তা দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। আগন্তুক সম্পর্কে শান্তার পিসে মশায়। তিনি বিনা-ভূমিকায় বলিলেন,—দেখ মা, চন্দর ভায়ার লোকান্তরের পর ত প্রায় দেড় বছর কাট্‌লো ; রূপেনের কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ারও কিছু কসুর হয়নি। এত দিনের মধ্যে একটা বিজ্ঞাপনও কি তার চোখে পড়েনি ?···আমার ত মনে হয়. সে ইচ্ছা ক'রেই উপেক্ষা ক'রছে।

শান্তা পায়ের নখ খুঁটিতেছিল ; মৃদু কণ্ঠে বলিল,—কিন্তু ওতে আপত্তির কিছু নেই ত। টাকা নিতে উপেক্ষার কি কারণ থাকতে পারে ?

বৃদ্ধ রামনাথ তর্কতীর্থ একটু ভাবিয়া বলিলেন,—তবে, ঈশ্বর না করুন, এমনও হ'তে পারে, সে—হয় ত—হয় ত পৃথিবীতে নেই।

শান্তা যেন হঠাৎ বর্শার একটা খোঁচা খাইল, এমনই চমকিয়া উঠিল ; একবার বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া দৃষ্টি অবনত করিল। তাহার শত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া অশ্রু-রাশি দর-দর ধারায় ঝরিতে লাগিল।

রামনাথ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া শেষে বিব্রত ভাবে বলিলেন,—মা, বুড়ো ছেলের ভীমরথি হ'য়েছে, মার্জ্জনা ক'রতে হবে। কি ব'লতে কি ব'লে ফেলেছি। কার্ত্তিকের মত স্বাস্থ্যবান্ ছেলে সে, ভগবান্ তাকে কুশলেই রাখুন।—একটুখানি থামিয়া বলিলেন,—আজ আসি মা, আবার আসব।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে, শান্তা প্রণাম করিয়া বলিল—মাঝে মাঝে আসবেন, পিসে মশায় ! বড্ডই একা থাকি।

তর্কতীর্থ ব্যথিত নেত্রে সর্ব্বহারা এই তরুণী তাপসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সপ্তাহান্তে তর্কতীর্থ মহাশয় পুনরায় আসিলেন ; দুই-চারিটা অবান্তর কথার পর বলিলেন,—উকিল বাবু বল্‌ছিলেন, এত দিনেও রূপেন বাবাজীর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না, আর চন্দ্রনাথ ভায়ার লিখিত কোন দানপত্রও নেই ; তখন ও-টাকার জন্যে তুমি অনর্থক ব্যস্ত হয়ো না।

শান্তা নিস্পৃহ স্বরে বলিল,—বাবার মুখের কথাই আমার কাছে লিখিত দানপত্রের অধিক। তা ছাড়া, টাকা নিয়ে আমিই বা কি করব, পিসে মশায় ?

তর্কতীর্থ একটু কাশিয়া গলাটা ঝাড়িয়া বলিলেন,—তা বললে ত চলবে না মা, টাকার দরকার যাতে হয়, তাই ক'রতে হবে। তোমায় সংসারী হতে হবে। ও-টাকাটা তোমারই।

শান্তা এ-কথায় একটুও বিস্মিত হইল না, সে যেন এ জন্য প্রস্তুতই ছিল ; ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল,—আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, দত্তাপহারী হ'তে বলেন আমায় ?

তর্কতীর্থের মুখে কথা আট্‌কাইতেছিল ; তথাপি তিনি বলিলেন,—মা, তোমার বাবা যখন এ-দানের কথাটার প্রস্তাব করেন, তখন তাঁর জ্ঞানটা একটু বিকারাচ্ছন্নই ছিল ব'লতে হয়। তাই ও-দান সিদ্ধ নয়।

শান্তা মাথা হেঁট করিয়া রহিল ; কথাটা উচ্চারণ করিতে সঙ্কোচ হইতেছিল, তথাপি সঙ্কোচ বশতঃ তাহার নীরব থাকিবার উপায় ছিল না ; তাই অনুচ্চ স্বরে বলিল,—কিন্তু আমাকে ?···আমাকে ত পূর্ণজ্ঞানেই তিনি দান ক'রতে চেয়েছিলেন। আপনারা ত সবই জানেন।

তর্কতীর্থ গভীর নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিলেন,—সে কথা আর কেন তুলছ মা ? তা' ছাড়া ও-প্রাচীন রীতি, সবটা কি এ-যুগে চলে ?—ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন,—নরেশ ব'লছিল, টাকা সে চায় না, তোমার সম্পত্তিতে তার লোভ নেই ; তবে সে চন্দ্রনাথ ভায়ার ছাত্র, তাঁর মেয়ে তুমি,—সে তোমাকে বিবাহ করতে চায়। সম্প্রতি তার স্ত্রী-বিয়োগ হ'য়েছে। নরেশ যে-সে ছেলে নয় মা ! বিদ্যা-বারিধি উপাধি পেয়েছে ; তার উপর সংস্কৃত নিয়ে এম-এ পাশ ক'রেছে। অতি অমায়িক ছেলে,—তোমার বাবার ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র সে।

শান্তা মুহূর্ত্ত কাল জানুর উপর ললাট রাখিয়া বসিয়া

থাকিবার পর মুখ তুলিল; পাংশু-মুখে বলিল,—তিনি আমার বাবার ছাত্র, আমার বড় ভাই;—তাঁকে বলবেন, এ-কাজ হয় না। তা ছাড়া, পণ্ডিত লোক হ'য়ে তিনি অন্যপূর্ব্বা কন্যা নিতে চান কি ক'রে?

তর্কতীর্থ বলিলেন,—বললুম ত মা, সমস্ত প্রাচীন রীতি চলে না, এ-ও যেমন হয় না। তা বেশ ত, নরেশকে বিবাহে আপত্তি থাকে, পাত্রাভাব হবে কি?

শান্তা নিম্ন স্বরে বলিল,—না হ'লেই কি চলবে না পিসে মশায়?

তর্কতীর্থ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—না মা, তা চলে না। যৌবনে স্বামী ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্য আশ্রয় নেই।

শান্তা মুখ তুলিতে গেল, পারিল না; রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—যদি অন্য রকম হ'ত পিসে মশায়! আপনি কি এ-কথা মুখে আনতে পারতেন? যৌবনে যারা বিধবা হয়?

তর্কতীর্থ কাণে হাত দিয়া বলিলেন,—দুর্গা, দুর্গা! ছি মা, ও-কথা মুখে এনো না। কি জান মা, তুমি মেয়ে, তোমায় বলাও শক্ত;—কি জান মা, বিধবা সাধারণতঃ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, কামনা তাঁকে বড় একটা কেউ করে না। ঐ বৈধব্য-বেশের মধ্যেই সে গণ্ডীটুকু দাগ দেওয়া থাকে,—কিন্তু কুমারী তা নয়—

শান্তা বাধা দিয়া বলিল,—তাই যদি হয় পিসে মশায়, তবে তাই হোক—বলিয়া শান্তা চক্ষুর নিমেষে হাতের চুড়ীগুলি টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, এবং ক্ষিপ্র হস্তে পরণের সাড়ীখানার পাড় একটির পর অন্যটি তাড়াতাড়ি ছিঁড়িতে লাগিল।

তর্কতীর্থ 'কর কি, কর কি' বলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—পাগল হ'লে না কি? এ-রকম অলক্ষণের কাজ ক'রতে আছে?

শান্তা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—না পিসে মশায়, আর নয়। নিরামিষ খাই, এই সাড়ীখানা আর চুড়ী ক'গাছার জন্যে নিত্য এ-সব কথা শুনতে ভাল লাগে না। বাবা আমার নিষ্ঠাবান্ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন,—মা আমার যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন; তাঁদের মেয়ে আমি আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের রুচির অনুসরণ ক'রে আমার পিতৃ-পিতামহের আদর্শের অসম্মান করতে পারব না। মা বাবা বাগ্দান ক'রে গেছেন, আমার ক্ষমতা নেই, তা খণ্ডন করি।—তাহার আর্দ্র কণ্ঠ নীরব হইল।

রামনাথ সজল নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৬

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়; শান্তা তুলসীমঞ্চে কপাল রাখিয়া বসিয়া-বসিয়া কাঁদিতেছিল। অব্যক্ত ক্ষোভে ও বেদনায় তাহার বুকখানা যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। আত্মগ্লানিতে তাহার সারা অন্তর গভীর আর্ত্তনাদ করিতেছিল। স্বহস্তে সে নিজের এমন অকল্যাণ কামনা করিল! রূপেন যেখানেই থাক, সে কুশলে থাক, দীর্ঘায়ু হোক, সামান্য মানুষের কথা সহ্য করিতে না পারিয়া সে ঝোঁকের মাথায় আপনাকে কঠোরতম অভিসম্পাতে বিড়ম্বিত করিল! নিজের রিক্ত মণিবন্ধ ও শুভ্র বস্ত্রের পানে চাহিয়া সে ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

গৃহে এমন একটি প্রাণী নাই যে, তাহাকে একটি সান্ত্বনার কথা বলে, কিম্বা চোখের জল মুছায়। শান্তা আজ এতই অন্যমনস্ক যে, পিসে মশায় চলিয়া যাইবার পর সদর দরজা বন্ধ করিবার কথা তাহার স্মরণ ছিল না। তাহা খোলা পড়িয়া ছিল।

* * * * *

সদর দরজার ভিতর জিনিসপত্রগুলা টানিয়া আনিয়া খিল বন্ধ করিয়া রূপেন ভিতরের দিকে চলিল; চারি দিকে পালক-পিতা ও পালয়িত্রী মাতার শত স্মৃতি-চিহ্ন চোখে পড়িয়া তাহার মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। ভিতরের প্রাঙ্গনে পা রাখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বিধবা শান্তা! জগদীশ্বর! ইহাই দেখিবার জন্য কি সে শত-শত ক্রোশ দূর হইতে ছুটিয়া আসিল? এই দেড় বৎসরের মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়াছে, বিধবাও হইয়াছে! অপ্রস্ফুটিত কুসুম-কলিকা বিকাশের অবসর পাইল না, আতপ-তাপে ঝলসিয়া গেল! বিধবা পিতৃহীনা শান্তা ভূলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতেছে; তাহাকে সান্ত্বনা দিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত রূপেনের নাই! কি বলিবে সে? কি তাহার বলিবার আছে? সকল বিভ্রাটের মূল ত সে নিজেই! বিধবা পরস্ত্রীকে সম্বোধনের ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না; পলকহীন বিস্ফারিত চক্ষুতে শান্তার দিকে চাহিয়া সে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শান্তা নিজেই এক সময় এ-দিকে চাহিল, রূপেনকে দেখিয়া, সে যেন ভূত দেখিল, এই ভাবে চমকিয়া উঠিল ; কিন্তু ভয় পাইল না। মৃত-জ্ঞানেই সে তাহার দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল,—তবে কি সত্যিই তুমি নেই ? আমি আজ সব খুলে ফেলেছি,—আমার চোখের জল কি সহ্য করতে না পেরে তুমি এসেছ ? যদি এসেছ, তবে নাও —ওগো, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। আমি আর তোমায় ছেড়ে থাকব না।—তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

এতক্ষণে রূপেন কতকটা বুঝিতে পারিল।—সে ক্ষিপ্র পদে শান্তার নিকটে যাইতে-যাইতে বলিল,—হাঁ, এসেছি। কিন্তু ভূত হয়ে নয়, যেমন ছিলুম তেমনিই। আমি মরে গেছি, কে তোমায় এ খবর দিলে ?—বলিতে-বলিতে সে শান্তার কাছে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল,—দেখ দেখি, এ কি ভূতের হাত ?

শান্তা হতবুদ্ধির মত তাহার মুখের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কাঁপিতে-কাঁপিতে হেলিয়া পড়িল। তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

রূপেন তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া-ফেলিয়া কোলের উপর টানিয়া লইল ; পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহার মুখে বাতাস দিতে লাগিল ; অনুচ্চ স্বরে বলিল, —বিধবা-বেশ দেখে যে ধোঁকা লাগ্‌ছে ! এ কি আমি নিজে মরেছি, না আর কেউ ?

মিনিট চার-পাঁচ পরে শান্তা চোখ মেলিয়া চাহিল ; সে যেন সুখস্বপ্ন দেখিয়া জাগিল, এমনই প্রফুল্ল মুখ ! রূপেনের চোখের উপর তাহার গভীর দৃষ্টি অচঞ্চল, চাহিয়া-চাহিয়া যেন 'নয়ন না তিরপিত ভেল !' রূপেনও তাহার গালের জলবিন্দুগুলি রুমালে মুছাইয়া দিয়া বলিল,— এখন বিশ্বাস হচ্ছে, আমি ভূত নই ? দেখছ, আমার গা কেমন গরম।…কে তোমায় খবর দিলে—আমি মরেছি ? এ বেশ কেন তোমার ?

শান্তার মুখে সলজ্জ হাসি দেখা দিল ; উঠিয়া বসিতে-বসিতে মৃদু কণ্ঠে বলিল,—নিরুপায় হ'য়েই আজ এ বেশ করেছি, নইলে আর ঘরে-বাইরে টিক্‌তে পাচ্ছিলুম না যে !

রূপেন বলিল,—সন্দেহ কাটিয়ে দাও, আমি মরেছি বলেই ত এ বৈধব্য বেশ ? এর মধ্যে আর কেউ নেই ত ?

শান্তা রূপেনের জানুর উপর মাথা রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,—তোমার আশাপথ চেয়ে শেষে—না, আমি কুমারী—"

—তাই বলো, দেহে প্রাণ এলো !—বলিয়া রূপেন তাহার মাথাটি বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল,— কথা পরে হবে, আগে তুমি হাতে ক'গাছা চুড়ী, আর একখানা সাড়ী পরে এসো। তোমার পানে আমি যে চাইতে পাচ্ছি নে—শান্তা !

শ্রীমায়াদেবী বসু।

প্রিয়া

প্রিয়া, তুমি সুন্দরী নব মঞ্জরী স্নিগ্ধ-শীকর বায়।
তোমারে হেরিয়া অরূপ চমক দোদুল দিতেছে কায়।

শেফালির বাস জোছনার হাসি
তোমার নিশ্বাসে বয়ানেতে ভাসি
কতই সুন্দর মাধুরী বিকাশি উঠিছে ফুটিয়া হায়।
প্রিয়া, তুমি সুন্দরী নব মঞ্জরী স্নিগ্ধ-শীকর বায়।

বাসন্তী উষার অরুণিত আভা
হৃদয়ে ঝলকি উঠিতেছে প্রভা ;
নিদাঘ কালের ঝলসিত বিভা নাহিক তোমারি ছায়।
প্রিয়া, তুমি সুন্দরী নব মঞ্জরী স্নিগ্ধ-শীকর বায়।

করুণাকিঙ্কর বিনয় মহিমা
আস্থে শান্ত তব দয়া ধৃতি ক্ষমা
তোমাতেই শুধু তাদের উপমা—তোমাতে পেয়েছে কায়।
প্রিয়া, তুমি সুন্দরী নব মঞ্জরী স্নিগ্ধ-শীকর বায়।

সাওন বাদল ঝর-ঝর ধারা
ভেঙ্গে দেয় যবে বিরহের কারা
তোমার হৃদয় উপছিয়ে ওঠে মৃদুল মধুরতায়।
প্রিয়া, তুমি সুন্দরী নব মঞ্জরী স্নিগ্ধ-শীকর বায়॥

ডক্টর কবিরাজ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অদ্বৈত-বেদান্ত

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

মায়া ব্রহ্মের তিরস্করণী, অথচ ব্রহ্মই ইহার আশ্রয়, পক্ষান্তরে এই মায়াই জগজ্জননী মহামায়া—এই জন্যই ইহাকে গীতার ভাষায় "দৈবী" মায়া বলা হইয়াছে। অন্ধকার যেমন যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই গৃহকেই আবৃত করে, সেইরূপ দৈবী মায়াও যেই আত্মাকে আশ্রয় করে, সেই আত্মাকেই আবৃত করে। ইহাই মায়ার আবরণশক্তি, আর যে শক্তি প্রভাবে মায়া জগৎ সৃষ্টি করে, জগৎ-প্রসবিণী সে শক্তিই মায়ার বিক্ষেপ শক্তি। এই শক্তিদ্বয়ের প্রভাবেই মায়া জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়া বিচিত্র বিশ্বনাটকের অভিনয় করিতেছে—ব্রহ্ম মূর্ত্তি জীবকে সুখ-দুঃখের কাঙ্গাল সাজাইয়া কত হাসাইতেছে, কত কান্দাইতেছে। এই মায়ার খেলা যখন সাঙ্গ হয়, জ্ঞানের আলোকে যখন অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হয়, তখন ব্রহ্ম-বিভাব জীব ও জগৎ তিরোহিত হয়, সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া উঠে, 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'—এই বুদ্ধিই স্থির হয়।

সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—এই বিবেক-জ্ঞানই গীতায় "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে", "ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি" প্রভৃতি উক্তি দ্বারা সূচিত হইয়াছে। মায়া ও অজ্ঞান শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, অবিদ্যা শব্দের প্রয়োগ গীতায় পাওয়া যায় না। তার পর এই মায়া ও অবিদ্যাকে অনির্ব্বচনীয় (সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা) বলিয়া যে অদ্বৈত-বেদান্তে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এই অনির্ব্বাচ্যবাদ গীতায় স্পষ্টতঃ কোথায়ও বিবৃত করা হয় নাই। জীব ও জগৎকে ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করায় জীব ও জগৎ যে ভগবদ্-ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, ইহাই বুঝা যায়।

গীতার মতে জীবের স্বরূপ—জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি? ইহা বুঝাইবার জন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ পার্থসারথি অর্জ্জুনকে আত্মতত্ত্বের বিবৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দেহ অনিত্য, জরা-মরণশীল; কিন্তু এই দেহাশ্রয়ী আত্মা অজর, অমর, সত্য, সনাতন; আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, আদি-অন্ত নাই; আত্মা অবিকারী, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অপ্রমেয়, বিশ্বব্যাপী; বিশ্বপ্রাণ। ১ এই আত্মাই পরম ব্রহ্ম। ব্রহ্মের যাহা লক্ষণ, সেই লক্ষণ দ্বারাই গীতায় আত্মাকে লক্ষিত করা হইয়াছে। ফলে আত্মা ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, ইহাই গীতায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপদেশই গীতোক্ত আত্মতত্ত্ব বিবরণের মর্ম্ম, এ বিষয়েও কোন বিবাদ নাই। ভগবান্ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, আমিই পরম ব্রহ্ম এবং আমিই আত্মা, হে অর্জ্জুন, সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থানকারী জীবও আমি, আমিই জীবহৃদয়ে অবস্থান করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকি, সকল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ২

হে অর্জ্জুন, তুমিই সেই পরম আত্মা পরমব্রহ্ম। তুমিই আমি, আমিই তুমি, তোমার আমার মধ্যে বস্তুতঃ কোনরূপ কোন ভেদ নাই, ইহাই গীতোক্ত আত্মোপদেশের সার মর্ম্ম—এই মর্ম্ম বুঝাইবার জন্যই গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে—"জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ"—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। এখানে স্পষ্ট বাক্যেই ভগবান্ জীবকে তাঁহার অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে অংশ বলার তাৎপর্য্য কি? ভগবান্ পরমব্রহ্ম, বস্তুতঃ তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, অপরিণামী, নিরংশ এবং নিরবয়ব, তাঁহার আবার অংশ

১। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ২।২০

২। অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। ১০।২০
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। ১৩।৩
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
—গীতা ২।২৪

কি? যাহার ক্ষয়-ব্যয় আছে, পরিণাম আছে, অবয়ব-বিভাগ আছে, তাঁহারই অংশ সম্ভব। অক্ষর, অব্যয়, অবিকারী, অচল, ধ্রুব আত্মার অংশ-বিভাগ সম্ভব হয় কিরূপে? নিরংশ, নিরুপাধিক ব্রহ্মের স্বতঃ অংশ থাকিতে পারে না, ইহা সত্য কথা, তবে নিরংশেরও অংশ কল্পনা করা যাইতে পারে—যেমন একই অখণ্ড আকাশকে ঘটের অন্তর্গত কল্পনা করিয়া ঘটাকাশ বলা হইয়া থাকে এবং অনন্ত মহাকাশ হইতে ঘটাকাশের একটা বাহ্যিক ভেদও সূচিত হয়, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার কোটি কোটি জীবতনু অরূপে রূপের কল্পনা মাত্র। একই সূর্য্য যেমন নিখিল জগৎকে প্রকাশ করেন, সেইরূপ একই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।১ এই আত্মা সর্ব্বদেহে অবস্থিত থাকিয়াও শরীরধর্ম্মের দ্বারা কলুষিত হন না, নির্লেপ ভাবেই অবস্থান করেন। আত্মার স্বীয় রূপের কোনই বিচ্যুতি হয় না। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিয়াও গ্রীষ্ম, বর্ষা, অগ্নি, ধূম, ধূলি, কর্দ্দমাদি দ্বারা দূষিত হয় না, আত্মাও সেইরূপ দেব, দানব, মানব, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণিদেহে বিরাজ করিয়াও দেহ-ধর্ম্ম দ্বারা কলুষিত হন না। আত্মা দেহে থাকিয়াও দেহ-ধর্ম্মে নির্লিপ্ত।২ আগুন যেমন আধারভেদে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আত্মাও সেইরূপ দেহভেদে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। দেহভেদে আত্মার এই ভেদ-বুদ্ধি যে কল্পিত, তাহা বুঝাইবার জন্য ভূতজগতে আত্মা অবিভক্ত হইলেও 'বিভক্তমিব চ স্থিতম্।'—১৩-১৭, এই শ্লোকে ইব শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। গীতাতে সর্ব্বভূতে বিরাজমান আত্মা যে এক, বহু নহে, তাহা অতি স্পষ্ট বাক্যেই বলা হইয়াছে। এক আত্মা নানা অসংখ্য অগণিত জীবদেহে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজ করিয়াও নির্লেপ, নির্ব্বিকারই থাকিয়া যান, এইরূপে আত্মার নির্লিপ্ততার যে উপদেশ গীতায়

১। প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত। গী—১৩৩৩।

২। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।
গী—১৩৩১।
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতোদেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে। গী—১৩-৩২

দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা আত্মা ব্রহ্মরূপ, ইহাই গীতোক্ত উপদেশের মর্ম্ম বলিয়া বুঝা যায়।

গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান্ "তত্ত্বমসি", সেই ব্রহ্মই তুমি, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গীতোক্ত উপদেশের সহিত উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের উপদেশের পূর্ণ সাম্য বিদ্যমান। উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রে যে ভাবে জীবতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, গীতার উপদেশের সহিত তাহার কোনই বিভেদ নাই। গীতায় যেমন আত্মাকে অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়, উৎপত্তি-বিনাশরহিত, অনাদি, অনন্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, বৃহদারণ্যক, কঠ, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদেও তদনুরূপ বর্ণনাই শুনিতে পাওয়া যায়।১ ব্রহ্মসূত্রেও আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ নাই—আত্মা নিত্য, চিৎস্বরূপ; ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই, চরাচর দেহের জন্ম-মৃত্যু, উৎপত্তি-বিনাশই, দেহান্তঃস্থিত আত্মায় আরোপিত হয় এবং তাহার ফলে জীব জন্মগ্রহণ করিল, জীব মরিল, এইরূপ লৌকিক ব্যবহার চলে। বাস্তবিক অজর, অমর আত্মার জন্ম-মৃত্যুর কথা উঠিতেই পারে না।২

১। স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়ঃ।
বৃহদারণ্যক—৪।৪।২২
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ কঠ—২।১৭
জীবাপেতং বাব কিল ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।
ছান্দোগ্য—৬।১১।৩
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ ইত্যাদি। কঠ—২।১৮
আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ স বা এষ মহান্ অজ আত্মা
বৃহদারণ্যক—৪।৪।২২
স সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। শ্বেতাশ্বতর—৬।১১

২। (ক) নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ। ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৭
উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ২।২।৪২
জ্ঞোঽতএব ২।৩।১৮
(খ) চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ। ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৬ নমু লৌকিকো জন্মমরণ ব্যপদেশো জীবস্য দর্শিতঃ সত্যং দর্শিতো ভাক্তস্ত্বেষ জীবস্য জন্মমরণ ব্যপদেশঃ। কিমাশ্রয়-পুনর্মুখ্যঃ যদপেক্ষয়া ভাক্ত ইত্যুচ্যতে চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ। স্থাবরজঙ্গমশরীরবিষয়ৌ জন্মমরণশব্দৌ ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য। আচ্ছা, জগতে জীবের জন্ম-মরণের কথা তো শুনা যায়, সত্য বটে জীবের জন্মমরণ শুনা যায়, তাহা গৌণ, মুখ্য নহে, জন্মমৃত্যু মুখ্যতঃ কাহার? চরাচর দেহের, স্থাবর ও জঙ্গম শরীরের সম্বন্ধেই জন্মমরণ শব্দ মুখ্যতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আত্মা এক কি বহু? ইহার উত্তরে গীতা যেমন স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, আত্মা এক, বহু নহে, উপনিষদ্‌ও সেইরূপ স্পষ্ট ভাষায় এক আত্মবাদেরই উপদেশ দিয়াছেন। উপনিষদের ভাষায় আত্মা চিন্ময়, স্বপ্রকাশ, আত্মা ব্যতীত সমস্ত জড় ও অপ্রকাশ। আত্মার আলোকেই সমস্ত জীব, জগৎ আলোকিত হইয়া থাকে। এক আত্মা নিখিল বিশ্বচরাচরে অন্তঃপ্রবিষ্ট আছেন, এবং সাক্ষিরূপে অবস্থান করিয়া অগণিত দেহ-যন্ত্র আবর্ত্তিত করিতেছেন। আত্মা সাক্ষী, চিৎস্বরূপ কেবল নির্গুণ ও নির্লেপ হইলেও (সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ শ্বেত, ৬।১১ অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ বৃহদাঃ ৪।৩।১৫) বিভিন্ন দেহে অবস্থিত আত্মাকে অজ্ঞ লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করে। আত্মার এই ভেদ যে মিথ্যা ও কল্পিত, উপনিষদ্ তাহা নানা প্রকার দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। "আকাশ যেমন এক হইলেও ঘটাদির মধ্যবর্ত্তী হইয়া ঘটাকাশ, গৃহাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করে, এবং অনন্ত মহাব্যোম হইতে ঐ সখণ্ড আকাশ পৃথক্ বলিয়াও মনে হয়, যেমন একই সূর্য্য বা চন্দ্র বিভিন্ন জলাধারে প্রতিবিম্বিত হইলে জলাধারের বিভিন্নতা বশতঃ বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ একই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বিভিন্ন জীবশরীরে এবং ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রভৃতি উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ আত্মা এক, বহু নহে, ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত, গীতারও সিদ্ধান্ত।১ উপনিষদের ঐ চন্দ্র-সূর্য্যের দৃষ্টান্ত হইতে জীব যে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব, ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মসূত্রও সূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত সমর্থন-করিয়া জীব যে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব, এই প্রতিবিম্ববাদই সমর্থন করিয়াছেন (আভাস এব চ ২।৩।৫০, অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ৩।২।১৮ সূত্র) এই প্রতিবিম্ব-বাদের পাশাপাশি, ঘটাকাশ, মহাকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীব অনন্ত ভূমা ব্রহ্মের সখণ্ড সসীম অভিব্যক্তি, এইরূপ "অবচ্ছেদবাদ"ও বেদান্তে স্থান লাভ করিয়াছে। গীতায় উপনিষদুক্ত আকাশের দৃষ্টান্ত এবং সূর্য্যের দৃষ্টান্ত এই উভয়বিধ দৃষ্টান্তই (গীতা ১৩।৩২-৩৩) গৃহীত হইয়াছে এবং অসঙ্গ নিরংশ আত্মার কায়িক অভিব্যক্তি যে মায়া-কল্পিত, তাহা এই উপনিষদ-সিদ্ধান্তেই সমর্থন করা হইয়াছে। জীব ব্রহ্মের অংশ, এই মতটি গীতায় যেমন স্পষ্ট বলা হইয়াছে, উপনিষৎ এবং ব্রহ্মসূত্রেও ইহা সেরূপ স্পষ্টতঃই প্রকাশ করা হইয়াছে। নিরংশ আত্মার অংশ ভাগ হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর গীতায়, ব্রহ্মসূত্রে এবং উপনিষদে তুল্যরূপেই দেওয়া হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত গীতায় নানা ভাবে নানা ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সোঽহম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" চার বেদের পূর্ব্বোক্ত চারটি মহাবাক্য দ্বারাও জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, এই সত্যই প্রমাণিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এই সিদ্ধান্ত মানিয়া নিলে জীবের যেমন সুখ-দুঃখ বোধ আছে, ব্রহ্মেরও সেইরূপ সুখ-দুঃখ বোধ স্বীকার করিতে হয়, নতুবা জীবব্রহ্মের অভেদ বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে গীতা বলিয়াছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে পরমাত্মা পরব্রহ্মের কোন সুখ-দুঃখ ভোগ নাই, পরমাত্মা শরীরে অবস্থান করিয়াও দেহ-ধর্ম্মে নির্লিপ্ত। 'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।' এই নির্লেপ অসঙ্গ আত্মার সুখ-দুঃখ ভোগ হইবে কিরূপে? আত্মার সুখদুঃখ বোধ না থাকিলে সেই আত্মাই যদি জীব হয়, তবে তাঁহার সুখ-দুঃখ বোধ হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, সুখ-দুঃখ তো অন্তঃকরণ বা মনের ধর্ম্ম, ঐ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। জীব অনাদি অজ্ঞান বশতঃ স্বীয় নিত্য চিন্ময় রূপ বিস্মৃত হইয়া অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সুখদুঃখাদি নিজের মনে করিয়া শোক-মোহের অধীন হয়, ইহাই চৈতন্যের মায়াগ্রন্থি, ইহাই জীবের মোহের কারণ, 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' আত্মার প্রতিবিম্ব বা ছায়াকেই অজ্ঞ লোকেরা আত্মা বলিয়া ভ্রম করে। প্রতিবিম্ব যেখানে পড়ে, সেই বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকে বৈদান্তিক পরিভাষায় আত্মার উপাধি বলে। ঐ উপাধি প্রতি-ক্ষেত্রে বিভিন্ন, সেই জন্য পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এক হইলেও

১। আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভাবৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেম্বিবাংশুমান্॥
এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥

ব্রহ্মবিন্দু ১১-১২।

উপাধিতত্র জীব বিভিন্ন। জলপূর্ণ পাত্রে আকাশস্থ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, পাত্র যতটি থাকে, প্রতিবিম্বও ততটিই পড়ে, সূর্য্য এক হইলেও ছায়াসূর্য্য বহু দেখা যায়। পাত্রগুলি সূর্য্যের উপাধি, ঐ উপাধির ভেদবশতঃ ছায়া-সূর্য্যও বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। কোনও পাত্রের জল কাঁপিতে থাকিলে সেই পাত্রস্থ ছায়াসূর্য্য কাঁপিতে থাকে, অন্যান্য পাত্রস্থ ছায়াসূর্য্য কাঁপে না। আর, আকাশস্থ সূর্য্যও কাঁপে না, সেইরূপ ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব স্ব স্ব উপাধি-শবলিত হইয়া বিভিন্ন সুখ-দুঃখময় কর্ম্মফল ভোগ করিলেও এক জীবের কর্ম্মফল অন্য জীবে ভোগ করার প্রশ্ন উঠে না, নিরুপাধি ব্রহ্মেরও কোন সুখ-দুঃখ ভোগের আপত্তি আসে না। উপাধিসমূহ পরস্পর মিশিয়া যায় না, পৃথক্ থাকে, অতএব জীবসমূহ এবং তাঁহাদের জৈবভোগই বা মিশিয়া যাইবে কেন? জীবের এইরূপে ঔপাধিক ভেদ থাকিলেও জীব ও ব্রহ্ম যে বস্তুতঃ অভিন্ন তত্ত্ব, ইহাই গীতা, উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মসূত্রে কোন কোন স্থলে জীব হইতে ব্রহ্মকে অধিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (অধিকন্তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ। ২।১।২২ ব্রঃ সূত্র) (অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণ-স্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ৩।৪।৮ ব্রঃ সূত্র) সেখানে অবিশুদ্ধ জীব হইতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মের উৎকর্ষতারই সূচনা করা হইয়াছে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব এমন কথা বলা হয় নাই। জীব অবিশুদ্ধ, অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তি, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-নিদান; সুতরাং ঈশ্বর জীব হইতে অধিক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তার পর, ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম হইতেও অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম অধিক, ইহাই "মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিৎ নান্যদস্তি ধনঞ্জয়" এই গীতাশ্লোকে এবং গীতোক্ত পুরুষোত্তমবাদে ব্যক্ত হইয়াছে। অদ্বৈত-বেদান্তেরও ইহাই মূল কথা। জীব ঈশ্বর বা ব্রহ্মের ভেদ স্বরূপগত নহে, উপাধিগত, উপাধির খোলস ছাড়িয়া দিলে জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদই থাকে না, সকলই এক হইয়া যায়। ইহাই অদ্বৈতবাদ। জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াও এই কথাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অংশ অপেক্ষা অংশী অধিক, প্রতিবিম্ব হইতে বিম্ব অধিক, ছায়া অপেক্ষা কায়া অধিক, এই আধিক্যকে লক্ষ্য করিয়াই জীব হইতে ব্রহ্মকে ব্রহ্মসূত্রে অধিক বলা হইয়াছে। ছায়া ও কায়ার মধ্যে, বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে অংশ ও অংশীর মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, এই জন্যই অধ্যাত্মশাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বা ঐক্য সমর্থিত হইয়াছে। গীতাও জীব ব্রহ্মের ঐক্যই নিঃসংশয়ে অনুমোদন করিয়াছেন। "জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ" "সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাব-বান্" এই মত সমর্থন করায় জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যায় অদ্বৈত-বেদান্তের পথই গীতায় অনুকরণ করা হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

গীতার মতে জগতের স্বরূপ কি?—গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিচার করা গেল। জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতার মর্ম্ম কি, তাহা আমরা বর্ত্তমানে আলোচনা করিব। জীবকে যেমন গীতায় ব্রহ্মের পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে, জগৎকেও সেইরূপ ব্রহ্মের অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমস্তই এই উভয়বিধ প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত বলিয়া জানিবে। ভগবানের অধ্যক্ষতায়ই প্রকৃতি চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রসব করে। এই জন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমিই সমস্ত ভূতজগতের বীজ, আমা হইতেই জগতের উৎপত্তি, এবং আমাতেই নিবৃত্তি। এই জগদ্‌যোনি বিশ্ব-প্রকৃতিতে আমি যে বীজ আধান করি, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত-জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জগতে যত কিছু মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছে, প্রকৃতিই তাঁহাদের জননী এবং আমিই তাঁহাদের বীজ-আধানকারী পিতা। সৃষ্টির উষায় অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয় এবং সৃষ্টির সন্ধ্যায় ব্যক্ত চরাচর অব্যক্ত প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে সৃষ্টি-সংহার-চক্র নিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। ভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে উপগত হইয়াই পুনঃ পুনঃ জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনিই নিখিল জগতের ধারক এবং পোষক। তিনি স্বীয় অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সমস্ত ভূত-জগৎই "সূত্রে মণিগণা ইব" তাহাতে অনুস্যূত রহিয়াছে, তিনি কিন্তু ভূত-জগতে অবস্থিত নহেন। ভূতগ্রামের মধ্যে, জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তরালে থাকিয়াও তিনি নির্লিপ্ত, উদাসীনরূপে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, কোন ক্রিয়াই তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না

প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি পুনঃ পুনঃ জগৎ সৃষ্টি করেন—তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-নিদান, "উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ",—এই তিনিই আবার, "উদাসীনবদাসীন" নির্লেপ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার। তিনি অকর্ত্তা অথচ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ভগবত্তত্ত্বে গীতায় বহু স্থানে এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ করা হইয়াছে, এই বিরোধের সমাধান কি, তাহাও গীতায় প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতোক্ত ঐ সমাধান আলোচনা করিলে ভূত-জগৎ সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত কি, জগৎ সত্য কি মিথ্যা—এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। অজ, অব্যয় অবিকারী, পরমাত্মা সর্ব্বভূতেশ হইয়াও স্বীয় মায়াবশে শরীর ধারণ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে পতিত হন—'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।' মায়াই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের কারণ। ভগবানের পরা প্রকৃতি জীবও অপরা প্রকৃতি জগৎ ভগবান্ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। পরা প্রকৃতি জীবই ভোক্তা, অপরা প্রকৃতি জগৎ ভোগভূমি বা ভোগ্য। ব্রহ্মের ভোক্তৃভাব ও ভোগ্যভাব মায়িক বিলাস। ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগতের সত্তা ও ভগবৎসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত জীব ও জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই জন্যই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমিই সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব, আমা হইতে কোন বস্তুই পরমার্থতঃ সত্য ও স্বতন্ত্র নহে। সমস্তই আমাতে গ্রথিত, আমা দ্বারা অনুপ্রাণিত, আমার সত্তায় সত্তাবান্। গীতার ঐ উক্তি হইতে জগতের যে কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ইহাই বুঝা যায়। গীতায় জগতের যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্ম স্বীয় মায়া বা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করেন—এই প্রকৃতিই জগদ্‌যোনি, ইহা গীতোক্ত সৃষ্টিরহস্য। এইরূপ বলার কারণ এই যে, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অকর্ত্তা, নির্লেপ, নিরঞ্জন; সুতরাং সে জগৎসৃষ্টি করিতে পারে না, গুণময়ী প্রকৃতি জড়স্বভাবা, এই জন্য সে-ও স্বাধীন ভাবে সৃষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি ইহারা একক কেহই জগৎ সৃষ্টিতে সমর্থ নহে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই যখন মিলিত হয়, তখনই ইহারা বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা করিতে পারে। গীতা বলিয়াছেন, "স্থাবর-জঙ্গম যত কিছু উৎপন্ন হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই তাহার হেতু বলিয়া জানিবে।"—গী ১৩।২৬। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফলেই মূর্ত্ত-জগতের উদ্ভব হইয়াছে। হে কৌন্তেয়, দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিখিল যোনিতে সে সকল শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রকৃতি বা মায়া তাঁহাদের জননী, আর প্রকৃতিতে গর্ভ আধানকারী আমিই তাঁহাদের জনক।১ এই জগজ্জননী প্রকৃতি অথবা সুখদুঃখ ভোগায়তন নিখিল শরীর ক্ষেত্র, আর এই ক্ষেত্রকে যিনি 'অহং মম' এইরূপে জানেন, শরীরে থাকিয়া শরীরের অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, এই ক্ষেত্রজ্ঞই পরা প্রকৃতি বা জীব, এই জীবও যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, নিখিল ক্ষেত্রে এক আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও—'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত,—গীঃ ১৩।১। ক্ষেত্রও আমি ক্ষেত্রজ্ঞও আমি,—আমি আমার অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমস্ত ব্যাপিয়া আছি—'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা' ৯।৪। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ আমার ব্যক্তরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অরূপ আত্মা ব্যক্তরূপ পরিগ্রহ করিলেন কিরূপে? ভগবান্ বলিলেন, ইহাই মায়া। মায়াবশেই অব্যক্ত, অমূর্ত্ত, অরূপ আমি, ব্যক্ত, মূর্ত্ত ও রূপবান্ বলিয়া প্রতিভাত হই। এই সমস্তই মায়ার খেলা। প্রকৃতি বা মায়াই সমস্ত ক্রিয়া শক্তির মূল এবং পুরুষের সুখ-দুঃখ ভোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ মায়া বা প্রকৃতিতে উপগত হইয়াই সেই প্রকৃতিজাত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।২ যদিও প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তবুও পুরুষ অভিমান বশতঃ নিজকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে এবং কর্ম্মফল সুখ-দুঃখ ভোগ করে। ইহার কারণ কি? উত্তরে গীতা বলিয়াছেন যে, পুরুষের গুণসঙ্গ বা প্রকৃতি-সঙ্গই ইহার কারণ। প্রকৃতিতে উপগত হওয়ার ফলে প্রকৃতির সহিত পুরুষের "তাদাত্ম্যাভিমান" উৎপন্ন হয়,

---

১। সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা। গী ১৩।১৪

২। কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। গীঃ ১৩।২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান। গীঃ ১৩।২১

এবং অভিমানবশতঃ পুরুষ প্রকৃতির ধর্ম্মকে নিজের নিজের ধর্ম্ম মনে করিয়া গুণের ফল সুখ-দুঃখ শোক-মোহ ভোগ করিয়া থাকে। পুরুষের সংযোগের ফলে জড় প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা হইয়া থাকে। প্রকৃতির সহিত পুরুষের এই তাদাত্ম্যাভিমানই বেদান্তে 'অধ্যাস' বা মায়াগ্রন্থি বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি জড়, পুরুষ চিৎ-স্বরূপ। চিৎ ও জড় আলোক অন্ধকারের মত পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন। এইরূপ বিরুদ্ধ দুইএর মধ্যে কোনরূপ "তাদাত্ম্য" বা অভেদ বুদ্ধি থাকা যদিও সম্ভবপর নহে, তবু অজ্ঞান বশতঃ লোকের মনে 'অহং' 'মম' "আমি" "আমার" এইরূপ তাদাত্ম্যাভিমান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ঐ তাদাত্ম্যবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে আত্মার অভিমান বা অহংকারও নিবৃত্তি হইয়া যায়। আত্মা তখন স্বীয় সচ্চিদানন্দ-রূপে অবস্থান করেন। আত্মাকে যিনি অকর্ত্তা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া জানেন, তিনিই তত্ত্বদ্রষ্টা এবং যথার্থ জ্ঞানী। জ্ঞানিগণ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ আত্মাকে সমস্তের অধিষ্ঠানরূপে দর্শন করিলেও ইহাকে "স্বতন্ত্র" "অসঙ্গ" বলিয়াই দর্শন করেন। সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার অন্তরালে যে একই পরম আত্মতত্ত্ব নিখিল জীবজগতের শাসক, ভাসক ও অন্তর্য্যামিরূপ বিরাজ করিতেছে, তাহাও তাহাদের বিবেকদৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে। আর, যাহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু নাই, সেই অজ্ঞানিগণই আত্মাকে শোক-মোহের অধীন বলিয়া মনে করে। সর্ব্ব-সাক্ষী আত্মতত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারে না। গীতা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের মৌলিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, বিভিন্ন জীববর্গ যে একই পরমাত্মার বিকাশ, তাহাও গীতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। সত্যদ্রষ্টা বিবেকী যখন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত ভূত সমূহকে একই আত্মায় অনুস্যূত দেখিতে পান, তখন এক অদ্বিতীয় আত্মা হইতেই যে ভূত সমূহ বিস্তারলাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন এবং সমস্ত জীব ও জগৎই পরিণামে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।—গীতা ১৩।৩০। জ্ঞানীর তখন সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন—সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্তই আত্মবাসিত, 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্।' এইরূপ সর্ব্বত্র যাহার আত্মদর্শন হয়, সেই একদর্শীর শোকই বা কোথায়, মোহই বা কোথায়? অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরা আত্মাকে সুখ-দুঃখ শোক-মোহের অতীত বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং জীব ও জগৎ যে সাক্ষী আত্মারই মায়িক অভিব্যক্তি, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারেন। ভূতজগতের যাহা কিছু বিস্তার দেখা যায়, সমস্তই সেই ব্রহ্ম, ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন ভূত-জগতের কোন স্বাধীন সত্তা নাই, স্বতন্ত্র দৃষ্টি নাই। 'অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।'—গীতা ১৩।৩০। গীতার এই ব্রহ্ম সম্পত্তি দ্বারা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জীব ও জগৎ যে অসত্য, ইহাই সূচিত হয়। যদিও গীতায় স্পষ্টবাক্যে কোথায়ও জগতের মিথ্যাত্ব কথিত হয় নাই, তবুও প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সঙ্গ বা তাদাত্ম্যাভিমানের ফলেই যে জগতের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা স্পষ্টতঃ গীতায় বলা হইয়াছে। আলোক অন্ধকারের মত দুই বিরুদ্ধ-স্বভাব বস্তুদ্বয়ের (চিৎ ও জড়) মধ্যে এই তাদাত্ম্যা-ভিমান যে সত্য হইতে পারে না, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃতি-পুরুষের তাদাত্ম্যাভিমান যদি মিথ্যা হয়, তবে ঐ অভিমানের ফলে উৎপন্ন জীবও জগদ্বিভাব মিথ্যাই হইবে, সত্য হইতে পারিবে না। অতএব গীতার মতে জীব ও জগৎ মিথ্যা, এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লাওয়া ভিন্ন কোন গত্যন্তর নাই। অবশ্য কেহ কেহ "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" গীতার এই উক্তি মূলে সদ্বাদ সমর্থন করিয়া জগৎ যে সত্য, ইহাই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, আমাদের মতে উক্ত প্রচেষ্টা বিচারসহ নহে। আমাদের মতে সৎকারণবাদ বা ব্রহ্মসত্যতাবাদই গীতোক্ত শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। সৎকার্য্যবাদ বা জগৎসত্যতা-বাদ সমর্থিত হয় নাই। যাহা বিনাশী এবং দেশ, কাল ও বস্তু-পরিচ্ছিন্ন তাহাই অসৎ, আর যাহা দেশ, কাল ও বস্তু-পরিচ্ছিন্ন নহে তাহাই অবিনাশী সদ্বস্তু। যে বস্তু অন্যত্র নাই, এখানে আছে তাহাই দেশপরিচ্ছিন্ন, তাহা অসৎবস্তু, যাহা পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, কেবল এখন মাত্র বিদ্যমান আছে তাহাই কালপরিচ্ছিন্ন, তাহাও অসৎ, সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদের নাম বস্তু-পরিচ্ছেদ, এই ত্রিবিধ ভেদের কোনওরূপ ভেদ যে পদার্থে দৃষ্ট হয় তাহাও অসৎ, যাহা দেশপরিচ্ছিন্ন নহে, কালপরিচ্ছিন্ন নহে, বস্তুপরিচ্ছিন্নও নহে তাহাই সৎ। এই দৃষ্টিতে বিচার

করিলে দেশ, কাল ও বস্তুপরিচ্ছিন্ন জগৎ যে অসত্য এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও ১ পূর্ব্বোক্ত সদ্‌ব্রহ্মবাদই সমর্থিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ উৎপত্তির পূর্ব্বে সদ্রূপেই বিদ্যমান ছিল। সেই সদ্‌বস্তুই এক অদ্বিতীয় বিশ্বপ্রাণ পরমাত্মা, নিখিল জগৎই আত্মময়, সেই আত্মাই সত্য এবং "হে শ্বেতকেতো, সেই সৎস্বরূপ আত্মাই তুমি।" সেই সৎ আত্মাই জগতের কারণ, কারণকে জানিলেই সমস্ত কার্য্য জানা যায়, কারণ ভিন্ন কার্য্যের কোন স্বাধীন সত্তা নাই, কার্য্যকারণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে, ইহাই শ্রুতি মৃৎপিণ্ডের ও মৃৎপিণ্ড কার্য্য ঘটাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন। একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলে ঘট, শরা, কলস প্রভৃতি সমস্ত মৃন্ময় বস্তুকে জানা যায়, অর্থাৎ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল বিভিন্ন মৃন্ময় পদার্থ মাটী ব্যতীত আর কিছুই নহে, মাটীরই কোন আকারে তাহার নাম ঘট, কোনও আকারে উহা শরা, কোনও আকারে উহা কলস; আকার যেমন যেমন পৃথক্ হইতেছে, তখনই একটি ভিন্ন নাম সেখানে ব্যবহার করা হইতেছে। সমস্ত মাটীর বিকার মৃন্ময়বস্তু মাটীই বটে, মাটী বাদ দিলে মৃন্ময়বস্তুর কোনই সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জন্যই শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য বস্তু, মৃদ্‌বিকার ঘটাদি নামেমাত্র সত্য, বস্তুতঃ সত্য নহে। ছান্দোগ্যের এই মাটীর দৃষ্টান্তই ব্রহ্মবিষয়েও প্রযুজ্য। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জীব ও জগৎ নামেমাত্র সত্য, বস্তুতঃ সত্য নহে। সর্ব্বকারণ-কারণ, ভূতযোনি ব্রহ্মই জগতের মূল নিদান। "অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত ভূতজগৎ নির্গত হয়" ২ বৃহদা ২।১।২০।

১। সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্
ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি
শ্বেতকেতো। ছান্দোগ্য ৫।১।১

২। যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাদাত্মনঃ
সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।
ছাঃ ২।১।২০

পরমাত্মাই সৎও হইলেন তৎও হইলেন, পুরুষও হইলেন প্রকৃতিও হইলেন, পরমেশ্বরের যখন সিসৃক্ষা বা সৃজনী বৃত্তির উদয় হইল, তখনই তিনি প্রকৃতি ও পুরুষরূপে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার সৃজনীবৃত্তিই জগদ্‌যোনি মায়া এবং মায়াকে অঙ্গীভূত করিয়া (আশ্রয় করিয়া) জগৎ সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্পই প্রকৃতিতে পুরুষের গর্ভাধান বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্কল্পই বীজ, এবং পরমেশ্বর সেই বীজআধানকারী জগৎপিতা। ইহাই গীতারও উপদেশ। এই উপদেশ হইতেও বিকার যে মিথ্যা, তাহাই প্রতীত হয়। গীতায় আত্মাকে অবিকারী, অপরিণামী, কূটস্থ, নির্লেপ, নিরঞ্জন ও অসঙ্গ বলা হইয়াছে। "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" বলিয়া যে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই এক অদ্বিতীয় অবিকারী আত্মা বহু নামে বহু রূপে জগতে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। আত্মার এই ভাতি মিথ্যা আত্মার এই বহু নামরূপে প্রকাশকে যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মা অবিকারী, অপরিণামী এক অদ্বিতীয় থাকিবেন কিরূপে? আত্মাই জগৎকারণ, ইহা নিঃসন্দেহ। কারণই কার্য্যরূপে পরিণত হয়; এই পরিণামবাদ গীতার অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করিলে গীতায় জগৎকারণ আত্মাকে যে অপরিণামী অবিকারী বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। কার্য্যবর্গ কারণের কল্পিতরূপ এবং কারণ স্বীয়রূপে অবিকৃত থাকিয়াই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যরূপে বিবর্ত্তিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই "বিবর্ত্তবাদ" অঙ্গীকার করিলে অপরিণামী আত্মার বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা ব্যাখ্যা করা যায়। "হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে" গী ৯।১০ বলিয়া পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় জগতের যে বিপরিবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা গীতায় বিবর্ত্তবাদেরই সমর্থন করা হইয়াছে। বিবর্ত্তবাদে পরমেশ্বর কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, চৈতন্যের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতি হইতে জগদ্রূপ ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সূর্য্যের উদয় হইলে জগৎ প্রকাশিত হয়, এবং সেই প্রকাশগুণে লোকে ভাল-মন্দ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এখানে সূর্য্যকে যেমন সেই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া গণ্য করা যায় না, সেইরূপ পরমাত্মার সত্তায় জগৎ প্রকাশিত হইলে এবং সুখদুঃখাদি ফল নানা ক্রিয়া

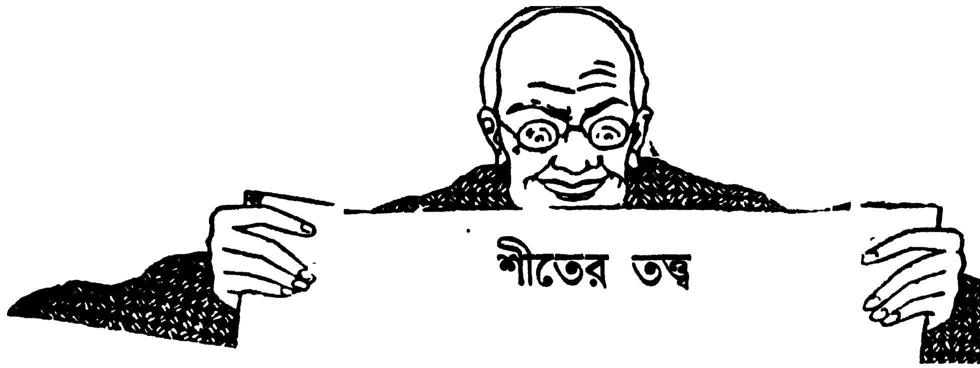
সম্পাদিত হইলেও তিনি ঐ সকলের কর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হন না। অপরিণামী পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় যে মায়াময় জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন সুদৃঢ় যুক্তি গীতায় পাওয়া যায় না। গীতোক্ত পুরুষোত্তমই একমাত্র সত্য বস্তু, অন্য সমস্তই মায়ার অভিব্যক্তি ও মিথ্যা, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রেও এইরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়াছে। কার্য্য-জগৎ ততক্ষণই সত্য বলিয়া মনে হইবে—যতক্ষণ ইহা কারণ-সত্তা (ভগবৎ-সত্তা) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে, কারণ-সত্তা বাদ দিলে কার্য্যবর্গের কোনই সত্তা নাই, তাহা তখন মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই সৎ-কারণবাদ বা বিবর্ত্তবাদের মূল রহস্য। এই রহস্যই উপনিষদে 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যং' বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও আরম্ভণাধিকরণে এই রহস্যই, কার্য্য-জগৎ ব্রহ্ম হইতে অন্য নহে, কার্য্য-জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অন্য মনে করাই ভুল, এই 'অনন্যত্ব' ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হইয়াছে। জগৎ মিথ্যা বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট প্রপঞ্চের মত অলীক বা অসৎ, এমন কথা উপনিষৎ, গীতা বা ব্রহ্মসূত্রে কোথাও উক্ত হয় নাই। জগতের বস্তু-সত্তা এবং ব্যবহার-জীবনে ইহার কার্য্যকারিতা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব মানেন নাই। ব্যবহারিক প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎকে অলীক অসৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এই জন্য শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে স্বীয় ভাষ্যে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কোন সুধী দার্শনিকই প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগদ্‌বস্তুকে অলীক বলিতে পারেন না, তবে জগদ্‌বস্তু শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন উৎপন্ন হইলে জগদ্‌দৃষ্টি তিরোহিত হয়, এই জন্য জগৎকে আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বা অসৎও বলা যায় না, পরমার্থ সদ্‌বস্তু বলিয়াও বলা যায় না। উহা সৎব্রহ্মবস্তুও নহে, অসৎ আকাশকুসুমও নহে, তবে উহা বস্তু-সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং অংশতঃ সৎও বটে এবং পরিণামে বাধিত হয় বলিয়া অংশতঃ অসৎও বটে। আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় প্রপঞ্চ অনির্ব্বচনীয়। গীতার কোথায়ও এই অদ্বৈত-বেদান্তোক্ত অনির্বার্য্যবাদের স্পষ্টতঃ উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে জীব ও জগৎকে ব্রহ্মবিভাব বলিয়া বর্ণনা করায় জীব ও জগৎ যে ব্রহ্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা গীতার আলোচনায়ও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। গীতার বিশ্বরূপাধ্যায়ে এই সত্যই বিবৃত করা হইয়াছে,—ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তমই একমাত্র সত্য বস্তু, এ বিষয়ে গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের সহিত এক মত।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী (অধ্যাপক) এম-এ, পি-আর-এস্,
পি-এইচ-ডি, কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

জীর্ণ বাস

জীর্ণ বসন পরা কি বিপদ কম ?
চাই চোরের বুদ্ধি দধীচির সংযম।
হাওদাবিহীন হস্তীতে যেন চড়া,
ক্ষীণদৃষ্টির আন্দাজে পুঁথি পড়া।
অশক্ত সূতে খেলানো বৃহৎ রুই,
অপটু লাঙলে চষিবারে-যাওয়া ভুঁই।
লতার পুলেতে লছমনঝোলা পার,
রুগ্ন উষ্ট্রে পাড়ি দেওয়া সাহারার।
পেট্রলহীন এ যে ঠিক মথ প্লেনে,
বার্লিন যাওয়া বিমান আক্রমণে।
ইউরোপের এ সন্ধিপত্র প্রায়,
ঠিক নাই কিছু কখন্ ফাঁসিয়া যায়।
ঋণগ্রস্ত ধনীর এ জমিদারী,
নিলামে কখন্ উঠিবে বুঝিতে নারি।
নদীয়া হইতে নহে আর বেশী দূর,
ভাসে নাই ডুবু-ডুবু এ শান্তিপুর।
চৌদিকে এর বৃটিশের দেশ রাঙ্গা,
খাড়া আছে শুধু নামেই ফরাসডাঙ্গা।
জীর্ণ বসন, জরায় জীর্ণ দেহ,
রাখা ক্লেশকর, বর্জ্জনই তাই শ্রেয়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।



শীতের তত্ত্ব

১

সুনীলচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সে স্কুল-কলেজের গৌরব, এবং আত্মীয়-বন্ধুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

সুনীলের পিতা সুশীল বাবু একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সওদাগরি আফিসে মাসিক তিন শত টাকা বেতনের চাকরি করিতেন। সুনীলের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার অতি অল্প দিন পরেই সুশীল বাবু হৃদ্‌রোগে সহসা প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যে আফিসে চাকরি করিতেন, সেই আফিসের কর্ম্মচারীরা পেন্সন পাইতেন। যে সকল কর্ম্মচারী পঁচিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল চাকরি করিয়া অবসর গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা বেতনের অর্দ্ধেক পেন্সন পাইতেন। সুশীল বাবু চব্বিশ বৎসর সাত মাস চাকরি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। আফিসের বড় বাবু সুশীল বাবুকে ভালবাসিতেন; তিনি বড় সাহেবের নিকট দরবার করিয়া সুশীল বাবুর স্ত্রীকে মাসিক পঁচাত্তর টাকা পেন্সন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সুশীল বাবুর নিবাস শ্রীরামপুর; প্রায় দশ বৎসর চাকরি করিবার পর তিনি কলিকাতার সিমলা পল্লীতে একখানি ছোট অট্টালিকা কিনিয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। তখন হইতে শ্রীরামপুরের বাড়ীতে তাঁহার এক বিধবা মাসী একটি দৌহিত্রকে লইয়া বাস করিতে থাকেন।

সুশীল বাবু যখন কলিকাতায় বাড়ী ক্রয় করেন, তখন সুনীলের বয়স দুই বৎসরও পূর্ণ হয় নাই; জ্ঞানের উন্মেষ হইতে সে জানে, কলিকাতাতেই তাহাদের বাড়ী। সুশীল বাবুর দুইটি কন্যার জন্মের পর সুনীলের জন্ম হয়। সুশীল বাবু দুই কন্যারই বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। বড় মেয়ের বিবাহ তিনি শ্রীরামপুরেই দিয়াছিলেন; বড় জামাতা স্থানীয় আদালতে ওকালতি করেন। হুগলীতে ছোট মেয়েটির বিবাহ দিয়াছিলেন, ছোট জামাতা কলিকাতার কোন স্কুলের শিক্ষক।

সুনীলের জননী বিধবা হইবার পর বড় জামাতা অবনীমোহনের পরামর্শে কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়া শ্রীরামপুরে বাস করিতে লাগিলেন; কলিকাতার বাড়ী মাসিক পঞ্চাশ টাকায় কোন ভদ্রলোককে ভাড়া দেওয়া হইল। সুশীল বাবুর মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পরে আফিস হইতে সংবাদ আসিল, তাঁহার বিধবা পত্নীর যাবজ্জীবন মাসিক পঁচাত্তর টাকা পেন্সন মঞ্জুর হইয়াছে। সুনীল প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিল। বাড়ীভাড়া, পেন্সন ও সুনীলের বৃত্তিতে মাসিক দেড় শত টাকা আয় হওয়ায় সুনীলকে লেখাপড়া ছাড়িয়া চাকুরির চেষ্টা করিতে হইল না; সে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্ত্তি হইয়া এফ-এ পড়িতে লাগিল।

প্রকৃতপক্ষে অবনীমোহনই এখন সুনীলের অভিভাবক। তিনি প্রায় প্রত্যহই তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া সকলের সংবাদ লইতেন। সুশীল বাবু মাসিক তিন শত টাকা বেতন পাইলেও মৃত্যুকালে কিছুই সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতায় বাটী ক্রয় ও দুইটি কন্যার বিবাহে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ সবই নিঃশেষিত হইয়া প্রায় তিন হাজার টাকা ঋণ হইয়াছিল। সেই ঋণ তিনি পরিশোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নগদ কিছু সঞ্চয় না থাকিলেও তিনি পাঁচ হাজার টাকার জীবন-বীমা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাই বিধবার সম্বল হইল।

সুনীল এফ-এ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাইল। সে বি-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইল। সে এফ-এ

পাশ করিতেই তাহার প্রতি কন্যাদায়গ্রস্ত উমেদারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; কিন্তু কেহই তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইতে পারিলেন না। সে উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করিবে না, তাহার এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সকলকেই হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য সুনীলের জননীর মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হইত বটে, তবে তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন; সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, এখন সুনীলের বিবাহ দিয়া সংসারের ভার বৃদ্ধি করা সঙ্গত নহে। সুনীল কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিলে তাহার বিবাহের চেষ্টা করাই উচিত।

যথাসময়ে সুনীল বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিল। অবনীমোহনের ইচ্ছা হইল, সুনীল আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার মত ওকালতি করুক। কিন্তু সুনীল বলিল,—"ওকালতি করা আমার পোষাবে না, ডেপুটি বা মুন্সেফ হাকিমদের 'হুজুর' 'ধর্ম্মাবতার' ব'লে ডাকা আমার অসাধ্য; তার চেয়ে একটা মনোহারী কি মুদীর দোকান খুলে বসা ঢের ভাল।"—সুনীল আইন পড়িল না।

এম-এ পাশ করিবার পরও যখন সুনীল বিবাহ করিল না, তখন প্রতিবেশীরা বলাবলি করিতে লাগিল, সুনীলের মা ছেলের বিবাহ দিয়া বড়-রকম একটা দাঁও মারিবার মতলব করিয়াছেন। সে-দিন তেলিনীপাড়া হইতে অমন একটা সম্বন্ধ আসিল; তাহারা অলঙ্কার, বরাভরণ ও নগদে ছয়-সাত হাজার টাকা দিতে চাহিল, শুনিলাম, মেয়েটিও পরমা সুন্দরী; কিন্তু তবু সুনীলের মায়ের মন উঠিল না! গিন্নীর মৎলবটা কি? কি চায়? এক জন হাসিয়া উত্তর দিল,—"রাজকন্যে আর অর্দ্ধেক রাজ্য।"

এম-এ পাশ করিবার প্রায় চারি মাস পরে, সুনীল এক দিন সংবাদ পাইল, উচ্চ কার্য্যের জন্য ভারত-সরকারের দপ্তরে এগার জন লোক লওয়া হইবে। একটা প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা প্রথম একাদশ জন প্রার্থীকে গ্রহণ করা হইবে। যাহারা সরকারের স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহে, এবং যাহাদের বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক, তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।—বেতন দেড় শত টাকা হইতে আরম্ভ।

সুনীল এই পরীক্ষা দিবে বলিয়া আবেদন করিল। এক সপ্তাহ পরে তাহার আবেদনের উত্তরে, কোথায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে ও কোন্ কোন্ তারিখে পরীক্ষা গৃহীত হইবে, তাহা জ্ঞাপন করা হইলে সুনীল নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলিকাতায় গিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিল। সে এই পরীক্ষা দিয়াছে, এ সংবাদ তাহার মাতা এবং অবনীমোহন ভিন্ন আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। এই ঘটনার প্রায় আড়াই মাস পরে সে সংবাদ পাইল, সাত-শ একাত্তর জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সে আফিস হইতে পত্র পাইল, অগ্রে তাহাকে ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে হইবে, তাহার পর সে নিয়োগ-পত্র পাইবে।

বাল্যকাল হইতেই সুনীলের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, সুতরাং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাহাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হইল না। আফিস হইতে নিয়োগপত্র পাইয়া সুনীল যথাস্থানে কার্য্যে যোগদান করিল।

২

সুশীল বাবু দুইটি কন্যারই বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলার বিবাহ দিয়া যেরূপ সুখী হইয়াছিলেন, কনিষ্ঠা কন্যা অমলার বিবাহ দিয়া সেরূপ সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার বড় জামাতা অবনীমোহনের অবস্থা অপেক্ষা কনিষ্ঠ জামাতা শশধরের অবস্থা ভালই ছিল। শশধর বি-এ পাশ করিলে শশধরের পিতা-মাতার সঙ্কল্প হইল, শশধরের বিবাহে একটা দাঁও মারিবেন; অর্থাৎ চারটি হাজার টাকার কমে তাঁহাদের এই বি-এ পাশ ছেলেটিকে বিক্রয় করিবেন না। শশধরের পিতা ডাক্তারি করিতেন, সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার হাত-যশ থাকিলেও চক্ষুলজ্জা সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অপযশ ছিল। তাঁহার অসঙ্গত অর্থলালসার জন্য হুগলী-চুঁচড়ার জনসাধারণ কোন দিন সকালে "কশাই ডাক্তারের" নাম উচ্চারণ করিত না,—পাছে সে-দিন উপবাস করিয়া কাটাইতে হয়! শশধর এই প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার প্রথম পুত্র নীলাম্বর প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিন বার অকৃতকার্য্য হইয়া মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া বাড়ীতে বসিয়া তাস পিটিতেছিল। কশাই ডাক্তার

নিজের হাতযশের অজুহাতে সেই নীলাম্বরের বিবাহ দিয়া আড়াই হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং বি-এ পাশ শশধরের তিনি যে চার হাজার টাকা দর হাঁকিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? সুশীল বাবু অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া এবং ঘটক মহাশয়ের বিস্তর সুপারিশে দুই হাজার টাকা নগদ, দেড় হাজার টাকার অলঙ্কার এবং আড়াই শত টাকার বরাভরণ, মোট পৌনে চারি হাজার টাকায় কন্যাদায় হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর সুশীল বাবু, অমলার শ্বশুরবাড়ীতে যে সকল "তত্ত্ব" পাঠাইতেন, তাহা তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর পছন্দ হইত না। অমলার বিবাহের পর সুশীল বাবু শীতের তত্ত্বে জামাতার জন্য এক শত কুড়ি টাকা মূল্যের যে শাল পাঠাইয়াছিলেন, সেই শাল ডাক্তার-বৈবাহিক এই মন্তব্যসহ ফেরত দিয়াছিলেন যে, ঐরূপ শাল তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্রের ব্যবহারযোগ্য নহে, বৈবাহিক মহাশয়ের চক্ষু থাকিলে তিনি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার (কশাই ডাক্তারের) কম্পাউণ্ডারের গায়ে যে শাল আছে, তাহা উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্!

যাহার প্রবৃত্তি এইরূপ ইতর, তাহার সহিত কুটুম্বিতা করিয়া কেহই সুখী হইতে পারে না, সুশীল বাবুও সুখী হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার একটা সান্ত্বনার বিষয় এই ছিল যে, অমলার শ্বশুর-শাশুড়ী অমলাকে ভালবাসিতেন, তাহার অযত্ন করিতেন না। তাঁহারা অমলাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে চাহিতেন না, কদাচিৎ দুই-এক বার পাঠাইলেও অধিক দিন রাখিতেন না। শশধরও শ্বশুরবাড়ীতে কদাচিৎ যাইতেন। তিনি কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতেন, হুগলা হইতে প্রত্যহ ট্রেণে যাতায়াত করিতেন। সুশীল বাবুর সিমলার বাড়ী হইতে তাঁহার স্কুলের দূরত্ব অধিক না হইলেও শশধর শ্বশুরবাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন না। সুশীল বাবুর মৃত্যুর পরে যখন সুনীল কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়া শ্রীরামপুরে গিয়া বাস করিলেন, তখনও শশধর প্রত্যহ দুই বেলা শ্রীরামপুর ষ্টেসনের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেন, অথচ কোন দিন শ্রীরামপুরে নামিয়া অদূরে অবস্থিত শ্বশুরবাড়ীতে যাইতেন না। সুনীলের মাতা জামাতার এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেও জামাতার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেন না। শশধরের মনের ভাব তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

অমলার যখন বিবাহ হয়, তখন সুনীলের বয়স দশ বৎসর। নির্ম্মলা সুনীল অপেক্ষা আট বৎসরের, এবং অমলা চারি বৎসরের বড়। অমলার বিবাহের জন্য সুশীল বাবু কিরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শশধরের পিতা শীতের তত্ত্ব ফেরত দেওয়াতে পিতা-মাতা কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, সুনীল বালক হইলেও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। পিতার অপমান ও জননীর অশ্রুতে বালকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। শশধরের পিতা কি কারণে শীতের তত্ত্ব ফেরত দিলেন, বালক তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহার পিতা একখানা দশ টাকা মূল্যের র‍্যাপার গায়ে দিয়া আফিসে যান, ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, সে জন্য তিনি কিছুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করেন না, তবে শশধর বাবুর এক শত কুড়ি টাকা মূল্যের শাল গায়ে দিতে লজ্জা হইবে কেন? বালক সুনীল এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইত না।

বয়স এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সামাজিক সমস্যার আনুসঙ্গিক অন্যান্য সমস্যাও তাহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। সে ভাবিত, কন্যার বিবাহের সময় বরকে টাকা দেওয়া হয় কেন? যখন সুনীল শ্রীরামপুর কলেজে পড়িত, তখন তাহার প্রতিবেশী ও সতীর্থ বিনয়ের বিবাহ হয়। বিনয়দের অবস্থা ভাল ছিল না, বিনয়ের পিতা কলিকাতায় একটা সওদাগরি আফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করিতেন। বিনয়দের বাড়ীও তাহাদের অবস্থার উপযোগী ছিল, ঘরগুলি ক্ষুদ্র, এবং স্থানও সঙ্কীর্ণ, কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকা যায়। বিনয়ের বিবাহের পূর্ব্বে তাহার শ্বশুর ও শ্যালক আসিয়া বিনয়দের বাড়ী-ঘর দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিবাহোপলক্ষে খাট-বিছানা প্রভৃতি দান-সামগ্রী, এবং ফুলশয্যা উপলক্ষে যে সকল অনাবশ্যক এবং বাঙ্গালী গৃহস্থের অব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন, বিনয়দের বাড়ীতে তাহা রাখিবার স্থান না থাকায় সেই সকল দ্রব্য পার্শ্ববর্ত্তী এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে সাজাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সেই প্রতিবেশীর বাড়ীতে ঐ সকল দ্রব্য দেখিয়া

মাথা ঝাঁকাইয়া বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, কলিকাতার কুটুম্ব দিতে-থুতে জানে বটে!" আজ-কাল এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সমাজের অবস্থা লজ্জাজনক শোচনীয় নহে কি?

সুনীল যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িত, সেই সময় বিবাহে পণ গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য তাহার কয়েকটি বন্ধু একযোগে 'পণপ্রথা-নিবারণী সমিতি' নামক একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। সুনীলের সেই সকল বন্ধু সুনীলকে সেই সমিতির সদস্য হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে সুনীল বলিয়াছিল,—"আমাদের মত অবিবাহিত যুবকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তোমরা যে সমিতি স্থাপন করিয়াছ, কয়েক জন কন্যাদায়গ্রস্ত বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোক সেই সমিতির সদস্য হইয়াছেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইবে না; পণ-প্রথা সমাজে চলিতে থাকিবে, এবং উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিবে। যদি তোমাদের অর্থাৎ আমাদের মত বিবাহ-যোগ্য অথচ অবিবাহিত যুবকদের অভিভাবকরা এইরূপ সমিতি করেন, তাহা হইলে সেই সমিতির দ্বারা কিছু কাজ হইতে পারে। যে কয় জন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধকে তোমরা সদস্য করিয়াছ, তাঁহারা সকলেই কন্যাদায়গ্রস্ত; সুতরাং তাঁহারা ত সদস্য হইবেনই। আর আমরা বিবাহে পণ লইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও সেই প্রতিজ্ঞার মূল্য কি? আমরা অভিভাবকদের অধীন; কার্য্যকালে আমরা সকলেই অতিমাত্রায় পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া উঠিব! অথবা ধনবানের একমাত্র কন্যাকে বিনাপণে বিবাহ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

সুনীলের বন্ধুরা এই কথা শুনিয়া স্থির করিল, সুনীল বিবাহ করিয়া একটা দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছে, সেই জন্যই সে পণপ্রথা-নিবারণী-সমিতির সদস্য হইতে সম্মত হইল না। ভবনাথ নামক সুনীলের এক জন বন্ধু বলিল, "পণপ্রথার জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা যে কিরূপ বিপন্ন, পুত্রের বিবাহের প্রস্তাবে অনেক চামার কন্যার পিতার প্রতি কিরূপ নির্ম্মম ব্যবহার করে, তোমার, বোধ হয়, তাহা জানা নাই; যদি সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা থাকিত—"

সুনীল তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "খুব জানি। আমার দিদিদের, বিশেষতঃ, ছোট দিদির বিবাহের সময় আমরা তাহা হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়াছিলাম।"

ভবনাথ বলিল, "বিবাহের সময় তুমি তোমার শ্বশুরের গলায় পেঁচ দেওয়ার জন্য ছুরিতে শাণ দেবে ত?"

সুনীল বলিল, "তা এখন বলিতে পারি না। আমার বিবাহ ত আমার ইচ্ছায় হইবে না, মা আছেন, তিনি যাহা ভাল মনে করিবেন, তাহাই করিবেন। তবে একটা কথা মনে রেখ, শ্বশুরের গলায় আঙ্গুল দিয়া টাকা আদায় করিতে না পারিলে শ্বশুরের মেয়েকে ভাল-বাসা যায় না।"

৩

সুনীলের ছোট ভগিনীপতি শশধর কলিকাতায় "নিউ বেঙ্গল একাডেমি" নামক স্কুলের মাষ্টারী করিতেন। তাঁহার পিতা ডাক্তারি ব্যবসায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে টাকা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগে লাগে নাই। অর্থলোভে অনেকের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ডাক্তার বাবুও বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা কি উপায়ে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিবে, সেই চিন্তায় ক্ষেপিয়া উঠিলেন। হুগলীর এক জন সুবর্ণবণিক কলিকাতায় পাটের দালালি করিতেন, তাঁহার সহিত ডাক্তারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি প্রায়ই ডাক্তারের নিকটে আসিয়া, পাটের বাজারের "তেজি-মন্দার" গল্প করিতেন। চোট্টারাম বাট্‌পাড়িয়া ত্রিশ টাকা দরে এক হাজার গাঁইট কণ্ট্রাক্ট করিয়া আঠার দিন পরে সেই পাট ছত্রিশ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিয়া ছয় হাজার টাকা লাভ করিয়াছে; সদানন্দ সাহা চার বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় খোলার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিত, 'ফাট্‌কা' কাজে হাত দিয়া এখন সে পাঁচ-সাত লাখ টাকার মালিক; হ্যারিসন রোডে প্রকাণ্ড পাঁচতলা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সে তাহাতে বাস করিতেছে,—এইরূপ গল্প বন্ধুর মুখে শুনিতে-শুনিতে ডাক্তার বাবুও পাটের প্রতি ধীরে ধীরে প্রীত হইয়া উঠিলেন। তিনি এই দালাল বন্ধুর হাত দিয়া কিছু-কিছু পাটের কাজ আরম্ভ করিলেন। প্রথম বৎসরে হাতে-খড়ি দিয়াই তাঁহার সাড়ে তিন হাজার টাকা, ও

দ্বিতীয় বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা লাভ হইল। দুই বৎসরে আট হাজার টাকা লাভ!—লোভে পড়িয়া তিনি তৃতীয় বৎসরে চৌত্রিশ টাকা মূল্য হিসাবে পাঁচ হাজার গাঁইট পাট ক্রয় করিলেন। তাহার পর বাজার পড়িতে আরম্ভ হইল। এক মাসের মধ্যে গাঁইটের দাম চৌত্রিশ হইতে সাতাশ টাকায় নামিয়া গেল। পাছে আরও দর কমিয়া যায়, সেই ভয়ে তিনি সাতাশ টাকাতেই সমস্ত পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; ইহাতে তাঁহার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা লোকসান হইল। এতগুলি টাকার শোক তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, মনঃকষ্টে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

পিতার শ্রাদ্ধের পর শশধর দেখিলেন, তাঁহাদের পিতার নামে ব্যাঙ্কে সাড়ে সতের হাজার টাকা জমা আছে। নীলাম্বর কাজ-কর্ম্ম কিছুই করেন না, এ অবস্থায় বসিয়া খাইলে ঐ টাকা শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ, নীলাম্বরের দুইটি কন্যার বিবাহের বয়স হইয়াছে; সুতরাং যেরূপে হউক, কিছু উপার্জ্জন করিতেই হইবে। অনেক চেষ্টার পরে শশধর কলিকাতার নিউ-বেঙ্গল একাডমিতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটা মাষ্টারী যোগাড় করিয়া লইলেন, এবং হুগলী হইতে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করিয়া চাকরি করিতে লাগিলেন।

এক দিন স্কুলের হেড মাষ্টার জগদীশ বাবু শশধরকে বলিলেন "শশধর বাবু, আপনি ত ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন, শ্রীরামপুরের কোন ভদ্রলোকের দ্বারা আমাকে একটা খবর আনাইয়া দিতে পারেন? শ্রীরামপুরের অনেকেই ত কলিকাতায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকিতে পারে।"

শশধর বলিলেন, "শ্রীরামপুরের অনেককেই আমি জানি, আপনার কি খবর চাই, বলুন দেখি?"

হেড মাষ্টার বলিলেন, "আমার একটি ভাইঝির বিবাহের জন্য শ্রীরামপুরে একটি পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। ছেলেটির বাপ নেই, মা আছে। শুনেছি, ছেলেটি না কি এম-এ পাশ ক'রে সংপ্রতি একটা গভর্ণমেণ্ট আফিসে দেড়শ' টাকায় চাকরিতে ঢুকেছে। সেই ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র কেমন, তার অভিভাবক কে, তিনি কেমন লোক, তাঁদের খাঁই কি রকম, এই সব খবর জানা দরকার।"

শশধর বলিলেন "ছেলেটির বাবার নাম জানেন?"

হেড মাষ্টার বলিলেন, "সুশীল মুখুয্যে, ছেলের নাম সুনীল মুখুয্যে। শ্রীরামপুরে গোঁসাইপাড়ায় বাড়ী।"

শশধর বলিলেন, "সুনীল? তাকে খুব জানি। তার বাপ সুশীল বাবু আমার শ্বশুর, সুনীল আমার শ্যালক!"

হেড মাষ্টার সবিস্ময়ে বলিলেন, "বটে! তবে ত আপনিই সুনীলের অভিভাবক? আমি শুনেছি, পাত্রের ভগিনীপতি তার অভিভাবক।"

"কথাটা শুনেছেন ঠিকই, তবে তার অভিভাবক আমি নই, আমার বড় শ্যালীপতি-ভাই অবনী বাবুই তার অভিভাবক; তিনি শ্রীরামপুরের উকীল। সুনীল ছেলে খুব ভালই বটে, এণ্ট্রান্স থেকে এম-এ পর্য্যন্ত সব এগজামিনেই সে ফার্ষ্ট হ'য়ে এসেছে। আমার শাশুড়ীও খুব ভাল লোক। সুনীলের স্বাস্থ্য খুব ভাল, দেখতেও অতি সুশ্রী; স্বভাব-চরিত্র—আমি যত দূর জানি—নির্ম্মল। তবে তাদের খাঁই কি রকম হবে, সেটা আমি ঠিক জানি না, সে সব কথা অবনীদা' জানেন। আমার মনে হয়, চার-পাঁচ হাজারের কম হবে না। আমার বিবাহে, আমার শ্বশুর পৌনে চার হাজার টাকা দিয়েছিলেন, তখন আমি সবে বি-এ পাশ ক'রেছি। সেই জন্যই মনে হয়, সুনীলের দাম চার-পাঁচ হাজার টাকার কম হবে না।"

হেড মাষ্টার বলিলেন, "দাদা কি পাঁচ হাজার টাকা খরচ কর্ত্তে পারবেন? তিনি পৌনে দু'শ টাকা মাইনে পান; তাঁর বড় ছেলে অমিয় এই সবে ওকালতি আরম্ভ ক'রেছে।"

শশধর বলিলেন, "আপনারা সুনীলের সন্ধান পেলেন কিরূপে?"

"অমিয়ই সন্ধান দিয়েছে। অমিয়ের সঙ্গে সুনীলের খেলাধুলো নিয়ে আলাপ পরিচয় হ'য়েছিল। দেখা যাক, দাদাকেও বলি, তার পর মেয়ের কপাল। আমার ভাইঝি সুমিত্রা বড় ভাল মেয়ে। গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম, রান্না-বাড়া, লেখাপড়া—সব বিষয়ে ভাল। রূপেও যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।"

শশধর বলিলেন, "আপনারা অবনীদা'কে গিয়ে

ধরুন, তিনি যদি মত দেন, তা হ'লে আমার শাশুড়ীর, কি সুনীলের অমত হবে না।"

"তাই হবে। আগামী রবিবারে দাদাকে শ্রীরামপুরে যেতে বলি।"

পরবর্ত্তী রবিবারে হেড মাষ্টার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর মৃত্যুঞ্জয় বাবু, পুত্র অমিয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুরে অবনী বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অবনী বাবু তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৃত্যুঞ্জয় বাবু বলিলেন, "আমি কন্যাদায়গ্রস্ত; দায় উদ্ধারের জন্য আপনার দ্বারস্থ।"

অবনী বাবু বলিলেন, "কন্যাদায়ে আমার দ্বারস্থ? আমার ত বিবাহযোগ্য কোন পুত্র নাই।"

"তাহা জানি। আপনার সম্বন্ধী সুনীলের জন্য আসিয়াছি। শুনিলাম, আপনি তাহার অভিভাবক, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

"আমি সুনীলের ঠিক অভিভাবক নই। এ বিষয়ে আমার শাশুড়ীর মতানুসারেই কার্য্য হইবে। আপনি বিষয় কর্ম্ম কি করেন?

"কলিকাতায় একটা বেসরকারী কলেজে প্রোফেসারি করি।"

অবনী বাবু বলিলেন, "সুনীল বি-এ পাশ করিবার পর হইতে অনেকেই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু সুনীল উপার্জ্জনশীল না হইলে বিবাহ করিবে না বলাতে, তাঁহারা হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সুনীল একটা কাজ পাইয়াছে, সুতরাং এখন আর সে-আপত্তি চলিবে না। চলুন, তাহাদের বাড়ীতে গিয়া আমার শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করি।"

অবনী বাবুর সঙ্গে সকলে সুনীলদের বাড়ীতে গিয়া শুনিলেন যে, সুনীল বাড়ীতে নাই, কলিকাতায় গিয়াছে। অবনী বাবু আগন্তুকদ্বয়কে সুনীলের বৈঠকখানায় বসাইয়া বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন, এবং প্রায় দশ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার শাশুড়ী বলিলেন, আগে মেয়েটিকে দেখিয়া পরে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। তাঁহার ইচ্ছা, আমি এবং আমার স্ত্রী এক দিন গিয়া দেখিয়া আসিব। কিন্তু আজ আপনারা ত সুনীলকে দেখিতে পাইলেন না; সে কখন্ আসিবে ঠিক নাই।"

অমিয় বলিল, "সুনীল বাবুকে আমার দেখা আছে। আমি যখন ল' পড়িতাম, তিনি তখন বি-এ পড়িতেন। আমরা দুই জনেই এরিয়ান্স ক্লাবের মেম্বার ছিলাম।"

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বলিলেন, "আমার মেয়েকে দেখিবার জন্য কবে আপনাদের যাইবার সুবিধা হইবে?"

"আগামী শনিবার বৈকালে বা রবিবারে যাইতে পারি। দিন স্থির করিয়া আপনাকে পত্র লিখিব।"

অবনী বাবু মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে ও অমিয়কে জলযোগ করাইয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন।

৪

সুমিত্রাকে দেখিয়া অবনী বাবুর ও নির্ম্মলার খুব পছন্দ হইল; না হইবার কোন কারণ নাই। তাহার রং গোলাপ ফুল বা দুধে-আলতার মত না হইলেও উজ্জ্বল গৌর; ঘন-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপের নীচে সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় আয়ত কপাল, এবং অতি সুশ্রী মুখমণ্ডল। তাহার সুন্দর চক্ষুর এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—সে-মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হইত না। তাহার অঙ্গসৌষ্টবও অনিন্দনীয়। সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ সুপ্রকাশ।

মৃত্যুঞ্জয় বাবুর পত্নী প্রৌঢ়া, নির্ম্মলার মাতার সমবয়সী। তিনি নির্ম্মলাকে বলিলেন, "মা, তোমার ভাইকে সঙ্গে ক'রে আন্‌লে ভাল হ'ত, এখনকার ছেলে,—প্রায় সকলেই নিজেরা চোখে দেখে বিয়ে করে।"

নির্ম্মলা বলিল, "আমার ভাই সে-কালের ছেলে, উনি তাকে সঙ্গে আসবার কথা বলেছিলেন, সে বল্লে, 'বড় দিদিকে নিয়ে আপনি যাচ্ছেন, আপনারা দেখে একটা কুৎসিত কানা-খোঁড়া মেয়েকে আমার জন্য পছন্দ করে আসবেন? আপনারা যাকে পছন্দ করবেন, তাকে আমার অপছন্দ হবে না'।"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমরা যে পছন্দ করেছ, তাতেই আমার অর্দ্ধেক ভয় কেটে গেল। এখন দেনা-পাওনার একটা আঁচ পেলে বুঝতে পারি।"

"তার জন্যে আপনারা ভাববেন না।"

অবনী বাবু মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে বলিলেন, "আপনার

মেয়েকে দেখিয়া আমাদের পছন্দ হইয়াছে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিতে কবে যাইবেন ?"

"দেনা-পাওনার একটা মীমাংসা—"

বাধা দিয়া অবনী বাবু বলিলেন "তার জন্য কিছু আট্‌কাবে না ; আশীর্ব্বাদের দিনই তার মীমাংসা হবে।"

"তবু পূর্ব্বে একটু আভাষ পেলে আশ্বস্ত হ'তে পারি—

"সে আশ্বাস আমি দিয়েই যাচ্ছি।"

দশ দিন পরে, জন্মাষ্টমীর ছুটীতে মৃত্যুঞ্জয় বাবু তাঁহার ভ্রাতা সিদ্ধেশ্বর বাবু (হেড মাষ্টার), অমিয় এবং তাঁহাদের পুরোহিত মহাশয়কে লইয়া সুনীলদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, অবনী বাবু, শশধর বাবু, সুনীলের প্রতিবেশী তিন-চারি জন বয়স্ক ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত আছেন। তাঁহারা আগন্তুকগণকে সাদর সম্ভাষণের পর বৈঠকখানায় বসাইয়া নানারূপ আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

অল্প কাল পরে সুনীল সেখানে আসিলে অবনী বাবু বলিলেন,"সুনীল, ইনি মৃত্যুঞ্জয় বাবু—তোমার ভাবী শ্বশুর, ইনি সিদ্ধেশ্বর বাবু—তোমার খুড়-শ্বশুর, ইনি উঁহাদের পুরোহিত, আর ইনি অমিয় বাবু—মৃত্যুঞ্জয় বাবুর পুত্র ; অমিয় বাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে।"

সুনীল প্রথমোক্ত তিন জনকে নতমস্তকে প্রণাম করিয়া অমিয় বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "অমিয় বাবু আমার পুরাতন বন্ধু।" সে অমিয়কে সঙ্গে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিল।

সুনীলের পুরোহিতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সেই কক্ষের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বারবেলা কাটিয়া গিয়াছে, শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।"

অবনী বাবু মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে বলিলেন, "তবে অনুগ্রহ করে আপনারা একবার বাড়ীর ভিতরে আসুন। যাহাকে আপনি কন্যাদান করিবেন, তাহার বাড়ী-ঘর দেখা আবশ্যক। আসুন মাষ্টার মহাশয় !"

সকলে অন্তঃপুরে দ্বিতলের একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আশীর্ব্বাদের জন্য ধান, দূর্ব্বা, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। সকলে উপবেশন করিলে শশধর বাবু সুনীলকে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সুনীলকে তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করাইলে অবনী বাবু বলিলেন, "আপনারা সকলে একে একে আশীর্ব্বাদ করুন।"

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ ত করব, কিন্তু আসল কথাটা—"

অবনী বাবু বলিলেন, "মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তিনি বল্লেন, আজ আশীর্ব্বাদই আসল কাজ।"

অগত্যা মৃত্যুঞ্জয় বাবু সুনীলকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার হাতে এক সেট সোনার বোতাম প্রদান করিলেন। যদি দেনা-পাওনার কথা মিটিয়া যায়, তাহা হইলে সেই দিনই বোতাম দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন ভাবিয়া, তিনি উহা লইয়া আসিয়াছিলেন।

আশীর্ব্বাদের পর আগন্তুক ও প্রতিবেশীদিগের জলযোগ শেষ হইলে অবনী বাবু মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে বলিলেন, "মা এই পর্দ্দার আড়ালে আসিয়া বসিয়াছেন। দেনা-পাওনার কথাটা তিনি নিজেই বলিবেন।"

মৃত্যুঞ্জয় বাবু তৎক্ষণাৎ সেই পর্দ্দার নিকটে গিয়া করযোড়ে বলিলেন, "যখন আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল, তখন আমাকে, আপনি আপনাকে 'বেয়ান' বলিবার অধিকার দিয়াছেন। সেই অধিকার-বলেই আমি আপনার দয়া প্রার্থনা করিতেছি।"

অবনী বাবু পর্দ্দার নিকটেই বসিয়াছিলেন, গৃহিণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মৃদু অথচ সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "বাবা অবনী, বেয়াই মহাশয়কে বল, উনি শ্রোত্রীয়, আমরা কুলীন। কুলীনের ছেলে শ্রোত্রীয়ের বাড়ীতে বিবাহ করিলে, কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্বরূপ কিছু টাকা পাইবার অধিকারী। আমি আমাদের বংশের সেই অধিকার উড়াইয়া দিতে পারিব না, তাঁহার নিকট হইতে গণ-পণের টাকা আমাকে লইতেই হইবে ; আমি এক পয়সাও কম লইতে পারিব না। বেয়াই মহাশয় বিজ্ঞ, পণ্ডিত লোক ; উনি জানেন যে, শ্রোত্রীয়ের নিকট হইতে আমরা ষোল টাকা মর্য্যাদা পাইয়া থাকি। তার পর গহনার কথা। বিবাহে শাঁখা আর লোহা দিতে হয়, ইহাও সকলেই জানে ; বেয়াই মহাশয়ও নিশ্চয়ই জানেন। বরাভরণে একটা আংটি ও চেলির জোড় দিতে হয়। সুনীল কখনও আংটি পরে না, পাথর-বসানো আংটি

দিবেন না, যখন ব্যবহার করিবে না, তখন অনর্থক কতক-গুলা টাকা খরচ করিয়া দামী আংটি কিনিবার দরকার নাই। চেলির জোড় সম্বন্ধেও ঐ কথা। বিবাহের সময় দুই-এক বার পরা হয়, তাহার পর বাক্স-তোরঙ্গতে তোলা থাকে, পোকায় কাটে।—হাঁ, একটা কথা। ঘড়ি—ঘড়ির চেনও দিবার দরকার নাই। কর্ত্তার যে ঘড়ি ছিল, সুনীল সেইটাই ব্যবহার করে; এক জনে আর ক'টা ঘড়ি ব্যবহার করিবে? খাট-বিছানা, দান-সামগ্রীরও প্রয়োজন নাই, সব-ই ত বাড়ীতে আছে। যা বাড়ীতে আছে, তা' নিয়ে আর কি হবে?"

সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিলেন, "যদি কিছু আপনার প্রয়োজন নাই, তবে আমরা কি দিব?"

গৃহিণী বলিলেন, "প্রয়োজন আছে বই কি? আমার দু'টি মেয়ে, দু'জনেই শ্বশুরবাড়ীতে থাকে। বার মাস আমার কাছে রাখবার জন্য আমি একটি মেয়ে চাই। যাকে আমি মনের মত ক'রে গ'ড়ে তুলব, আমার বুড়ো বয়সে আমার সেবা করবে, আমাকে 'মা' ব'লে ডাকবে, সর্ব্বদা আমার কাছে থাকবে, এমন একটি মেয়ে আমার দরকার। তাই বেয়াই মশায়ের কাছে সুমিত্রাকে আমি ভিক্ষা চাচ্ছি। এই আমার দাবী, এ-ছাড়া আমার আর কোন দাবী-দাওয়া নাই। তবে বেয়াই মশায় নিজের ইচ্ছায় মেয়ে-জামাইকে যা দিতে চান দিবেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। হাঁ, আর একটা কথা; বিবাহে ব্যয়বাহুল্য করিতে গিয়া বেয়াই মশায় যেন দেনা না করেন; দেনাকে আমার বড় ভয়! আমার যত দিন দেনা ছিল, তত দিন দুশ্চিন্তায় আমি ঘুমাইতে পারি নাই।"

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া শশধর নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার পিতা সুশীল বাবুকে কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে বিপন্ন ও ঋণগ্রস্ত করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে-কথা স্মরণ হওয়ায় লজ্জায় তিনি মুখ তুলিতে পারিলেন না।

সুনীলের জননী নীরব হইলে মৃত্যুঞ্জয় বাবু ক্ষণকাল গভীর বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন; তাহার পর কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিলেন, "করুণাময়ী ভগবতীকে দেখিবার সৌভাগ্য কখনও লাভ করিতে পারি নাই; আপনার কণ্ঠে বিশ্বজননী অভয়ার অভয়প্রদ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আজ আমি কৃতার্থ। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।"—তিনি পর্দ্দার অন্তরালে অবস্থিতা গৃহিণীর উদ্দেশে ভূতলে মস্তক স্পর্শ করিলেন।

গৃহিণী ব্যগ্র-কণ্ঠে বলিলেন, "ও কি কথা? বয়সে, জ্ঞানে, বিদ্যায়—সকল বিষয়ে আপনি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে এ ভাবে অপরাধিনী করিবেন না; আমিই আপনাকে প্রণাম করি।"

৭ই অগ্রহায়ণ সুনীলের সঙ্গে সুমিত্রার বিবাহ হইয়া গেল।

* * * *

২৭শে পৌষ বেলা ৩টার সময় শশধর বাবু ক্লাশে পড়াইতেছিলেন, এমন সময় স্কুলের বেহারা আসিয়া বলিল, "হেড মাষ্টার বাবু সেলাম দিয়া।" তিনি ছাত্রদিগকে স্থির হইয়া বসিতে বলিয়া হেড মাষ্টারের নিকট গমন করিলে, হেড মাষ্টার বাবু বলিলেন, "শশধর বাবু, এইমাত্র বাড়ী হইতে সংবাদ পাইলাম, সুনীল শীতের তত্ত্ব ফিরাইয়া দিয়াছে; কারণ ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না! দাদা জিনিষ ভালই দিয়াছেন, আসুন না, একবার বাড়ীতে গিয়া খবরটা লওয়া যাউক।"

শশধরের মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার পিতাও সুশীল বাবুর প্রেরিত শীতের তত্ত্ব ফেরত দিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বাবু তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "সুনীল বাবাজী অমিয়র নামে একখানা চিঠি দিয়াছেন; চিঠির মর্ম্ম আগে জান্‌তে পারলে আর আপনাকে তাড়াতাড়ি ডাক্‌তে পাঠাতেম না।"

শশধর বলিলেন, "সুনীল কি লিখেছে?"

মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "পড়ে দেখুন।" পত্রখানি তিনি শশধরের হাতে দিলে শশধর তাহা পাঠ করিয়া হেড মাষ্টারকে শুনাইলেন।

"প্রিয় অমিয় বাবু

আমি যে মাসিক দেড় শত টাকা বেতনের কেরাণী, এ কথা আপনারা ভুলিলেও আমি ভুলিতে পারি না। আপনারা যে শীতের তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের প্রতিবেশীরা সকলেই যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়াছে; আমার মা'ও খুব আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু

আমার মনে হয়, আপনাদের প্রেরিত শালখানি গায়ে দিয়া ভদ্রসমাজে যাইতে আমার ভদ্রোচিত কুণ্ঠা হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের কয়েক জন বিজ্ঞ প্রতিবেশী এই শাল দেখিয়া বলিলেন, উহার মূল্য তিন শ' সাড়ে তিন শ' টাকা ত বটেই। মূল্য যদি তিন শ' টাকাও হয়, তাহা হইলে উহা আমার দুই মাসের বেতনের সমান। এক জন দেড় শত টাকা বেতনের কেরাণী তিন শত টাকা দামের শাল গায়ে দিয়া ঝাড়নে কপি-কড়াইশুঁটি বা বোম্বাই আম বাঁধিয়া কলিকাতা হইতে বাড়ীতে লইয়া যাইতেছে, ইহা কি অদ্ভুত দৃশ্য নহে? সেই ব্যক্তির বিন্দুমাত্র কাণ্ড-জ্ঞান থাকিলে সে কি লজ্জায় মুখ লুকাইবে না? আমাকে যদি চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দামের একখানা শাল দিতেন, তাহা আমি অসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারিতাম। কিন্তু তিন শত টাকা দামের শাল ব্যবহার করা কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের ন্যায় লজ্জাজনক মনে করি।

আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিবেন? এই শালখানা আপনি ব্যবহার করিবেন। আপনি উকীল, আপনার আয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা হইতে পারে, আবার পাঁচ-সাত শত টাকা হওয়াও অসম্ভব নহে; সুতরাং আপনার ঐ শাল ব্যবহার অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ শাল গায়ে দিতে বড় লজ্জা হইবে, অস্বস্তি বোধ করিব; অথচ বহুমূল্য জিনিষ ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখিলে পোকায় নষ্ট করিবে, এই জন্য ইহা রাখা সঙ্গত মনে করিলাম না; আশা করি, ইহা আমার ঔদ্ধত্য মনে করিবেন না।…"

পত্র পাঠ করিবার সময় শশধরের হাত কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক তাঁহারও শীতের তত্ত্ব ফেরত দেওয়ার কথা স্মরণ হইল। তিনিও তাহা ফেরত দেওয়ার কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে কথা মনে পড়ায় শশধরের মাথা লজ্জায় বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মাটীর প্রেম

হে বিরাট মাটী—
আঁকি তব অন্তরের সমুজ্জ্বল ছবি,
তোমারি বক্ষের রাজ্যে হ'ব আমি কবি।
নব নব রূপে,
তোমারে গড়িব আমি নিত্য চুপে-চুপে।

ক্ষুদ্র যাহা, হেয় যাহা, সবার আঁখিতে
মহান্ সৌন্দর্য্যে তারে আঁকিব চকিতে।
বিরহ-বেদনা,
মুছিয়া ফেলিব আঁকি আশার আল্পনা।
গর্জ্জিয়া উঠুক রোষে শ্মশান হতাশ
আমি এনে দিব সেথা মুক্তির বাতাস্।
মিথ্যার সন্ধানে,
আজীবন ফিরিব না সত্য অনুমানে।
সাজায়ে বসন্ত-প্রাতে পুষ্প-আভরণে
মাতিব তোমারি পুষ্পে তোমার পূজনে।
পবিত্র সজ্জায়,
দিব না অঞ্জলি আমি উর্ব্বশীর পায়,
মাতিয়া রহিব সদা কমল-মায়ায়
পঙ্ক রবে ঢাকা পদ্ম-পত্রের ছায়ায়।
ওগো মোর মাটী,
আঁকিব তোমারি রূপ যুগ যুগ খাটি।
স্বর্গ সে তো কল্পনার অনিশ্চিত ছবি,
সত্য তুমি তব বক্ষে মহাসত্য সবি
সেই বেশী নয়,
যাহা নাই নিত্য তারি অপচয় ভয়।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে দাও মোরে দাবি
আঁকিতে ক্ষমতা দাও তব রূপ-ছবি।
জীবনে মরণে,
তোমার এ মহা সত্য ছড়াইতে গানে।

শ্রীনিভা দেবী



একবিংশ পর্ব্ব

উপকূল-রক্ষীবর্গের আবির্ভাব !

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

আমস্ সেই দিন প্রভাতে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে পাক-শালায় প্রবেশ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের অদূরবর্ত্তী চেয়ারে উপবেশন করিলে আমি তাহাকে বলিলাম, "কাপ্তেন লড-উইগ, ভন রথভেন এবং লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন তাহাদের 'ইউ'-বোটে আমাদের দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু দিবাভাগে এখানে তাহারা উঠিয়া আসিবে—তাহার সম্ভাবনা নাই। এজন্য তাহারা সমুদ্র-গর্ভে লুকাইয়া-থাকিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের প্রতীক্ষা করিতেছে।"

কিন্তু আমার কথাগুলি শুনিয়া আমস্ ভাল-মন্দ কোন কথা বলিল না; সে যেন আমার কথা শুনিতে পায় নাই, এই ভাবে চিন্তাকুল চিত্তে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া, অত্যন্ত গম্ভীর মুখে পাইপ হইতে ধূম্ররাশি উদ্গারণ করিতে লাগিল। এই ভাবে কয়েক মিনিট বসিয়া-থাকিয়া সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া আমার ও মেরীর মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর আমাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া নীরস স্বরে বলিল, "আমি কি সঙ্কল্প করিয়াছি—তাহা তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ কি? আমি কি ভাবিতেছি, তাহা তোমরা অনুমান করিতে পার?"—ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করে—তাহার মুখ সেইরূপ গম্ভীর।

তাহার মনের কথা আমরা কিরূপে বুঝিব?—তাহার প্রশ্ন শুনিয়া আমি কোন কথা বলিলাম না; কিন্তু মেরী আমার মুখের উপর প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমস্‌কে বলিল, "তুমি কি সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই; তুমি কি ভাবিতেছ—তাহাই বা কিরূপে অনুমান করিব? তা তোমার সঙ্কল্পটা কি, তাহা যদি আমাদের নিকট প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বলিতে পার; তাহা শুনিতে আমাদের আপত্তি নাই।"

আমস্ তামাকের পাইপটা মুখ হইতে নামাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি সঙ্কল্প করিয়াছি—জার্ম্মাণদের 'ইউ'-বোটের খোরাকের ঐ আড্ডাটা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিব। সেই নাজী শূয়ারটা আমাকে চাব্‌কাইয়া দেওয়ার পর হইতেই আমি এই কথা চিন্তা করিতেছি।"

মেরী তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময় দমন করিয়া বলিল, "তুমি যে দীর্ঘকাল হইতে জার্ম্মাণদিগকে এই ভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছ—ইংরেজদের নিকট এ কথা প্রকাশ করিবার জন্য সত্যই কি তোমার আগ্রহ হইয়াছে?"

আমস্ মুখের একটা কদর্য্য ভঙ্গী করিয়া মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "আগ্রহ হয় নাই ত আমি কি তোমাদিগকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য এ কথা বলিতেছি? হাঁ, আমি এ কাজ করিবই। তবে এই সংবাদ জানিতে পারিলে বৃটিশ সরকার আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা জানিতে পারিলে আমার মন স্থির হইত। আমার বিশ্বাস, এ কথা শুনিলে তাহারা আমাকে গুলী করিয়া মারিবে না।"

মেরী গম্ভীর স্বরে বলিল, "এ তোমার অসঙ্গত আশা! তোমার সাহায্যে জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটগুলা শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমুদ্রে-সমুদ্রে বৃটিশ জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে; তাহাদের কত ধন-সম্পত্তি, যুদ্ধের উপকরণ নষ্ট করিয়াছে; কত সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়াছে। হাঁ, তোমার সাহায্যেই এরূপ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

ইংরেজ ইহা জানিতে পারিলে তোমাকে ক্ষমা করিবে? তাহারা ঠিক তোমাকে ক্ষ্যাপা-কুকুরের মতো গুলী করিয়া মারিবে। নৌ-সামরিক আদালতের বিচারে তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে; এবং এক জন সৈনিকের নহে—পাঁচ-সাত জন সৈনিকের রাইফেলের গুলীতে তোমার দেহ মৌচাকের মতো ঝাঁঝ্‌রা হইবে। তোমার ঐ শুভ-বুদ্ধির উদয় হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে!"

আমস্‌ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "কিন্তু তাহারা ত তোমার বুদ্ধিতে কাজ করিবে না, মেরী! তাহাদের আরও অনেক কথা ভাবিবার আছে। যদি আমি তাহাদের নিকট সকল কথা সরল ভাবে স্বীকার করি, জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটগুলা রাত্রিকালে কি ভাবে এখানে আসিয়া খোরাক সংগ্রহ করিয়া সাগরে-সাগরে বোম্বেটে-গিরি করিয়া বেড়ায়, তাহা যদি প্রকাশ করি এবং কৌশল করিয়া দুই-একখান 'ইউ'-বোট তাহাদের হাতে ধরাইয়া দিই, তাহা হইলে তাহারা আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারে।"

আমসের কথা শুনিয়া মেরী নিঃশব্দে উঠিয়া-গিয়া তাহার সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, এবং হাত দু'খানি আড়াআড়ি ভাবে বুকের উপর রাখিয়া ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "যে সব কথা তুমি এখনই বলিলে, উহা সত্যই কি তোমার অন্তরের কথা?"

আমস্‌ মেরীর মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিল না; সে মুখ নামাইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে বলিল, "হাঁ, উহাই আমার অন্তরের কথা; আমার মনের কথা না হইলে ও-কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতাম না।"

মেরী বলিল, "কিন্তু এই রকম চালাকি—চালাকি কেন—ইহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলাই ঠিক—এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে বিন্দুমাত্রও লাভ নাই, এত দিনেও ইহা তুমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলে না?"

আমস্‌ গম্ভীর স্বরে বলিল, "বিশ্বাসঘাতকতা? তুমি কি বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, মেরী!"

মেরী বলিল, "বুঝিতে তুমি সবই পারিয়াছ; কেবল আমার কাছে ন্যাকামি করিতেছ বৈ ত নয়! তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তোমার আশ্রয়প্রার্থী সেই বিপন্ন জার্ম্মাণ নাবিকটাকে বড়-দেশে লইয়া যাইতেছ বলিয়া নির্জ্জন রুইস্‌ দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিলে! এই বিশ্বাসঘাতকতার কি ফল হইয়াছে, তাহা তুমি এত শীঘ্র নিশ্চিতই বিস্মৃত হও নাই।"

আমস্‌ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "সে স্বতন্ত্র কথা!"

মেরী বলিল, "না, স্বতন্ত্র কথা নয়। কাউণ্ট জোলার্ণ তোমাকে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? তিনি যে-সময় তোমাকে সতর্ক করিয়াছিলেন, সে-সময় আমি তাঁহার কথা শুনিতে না পাইলেও পিটার পরে আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছিল। তিনি তোমাকে বলিয়াছিলেন—জার্ম্মাণীর দৃষ্টি সর্ব্বত্রব্যাপী—যেখানে যাহা ঘটে, তাহা তাহারা জানিতে পারে। যদি তুমি জার্ম্মাণদের এই গুপ্ত আড্ডার সংবাদ ইংরেজদের নিকট প্রকাশ কর, তাহা হইলে তাহার কি ফল হয়, তাহা তোমার জানিতে বিলম্ব হইবে না।"

আমস্‌ বলিল, "তুমি বলিতে চাও—জার্ম্মাণরা তাহা জানিতে পারিলে আমার প্রতি অত্যাচার করিবে, আমাকে নানা ভাবে বিপন্ন করিতে পারে; কিন্তু ইংরেজরা আমাকে রক্ষা করিবে।—বৃটিশের আশ্রয়ে আমি নিরাপদ হইতে পারিব।"

মেরী দৃঢ় স্বরে বলিল, "না, ইংরেজরা তোমাকে আশ্রয় দিবে না, রক্ষাও করিবে না। তোমাকে তাহারা গুলা করিয়া হত্যা করিবে। স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের যাহা প্রাপ্য, তাহাদের নিকট তাহাই পাইবে। তাহাদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পার—এরূপ কোনও কাজ তুমি করিয়াছ কি? আর যদি তাহারা কোন কারণে তোমাকে গুলী করিয়া হত্যা না করে, তাহা হইলেও তোমার নিস্তার নাই; জার্ম্মাণরাই সে কাজ করিবে।"

আমস্‌ বলিল, "তোমার কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না! ইংরেজরা যদি আমাকে হত্যা না করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণরা কিরূপে আমাকে হাতে পাইবে? আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে, ইচ্ছা করিয়া তাহাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিব?"

মেরী বলিল, "না, তাহাদের হস্তে তোমার আত্ম-সমর্পণ করিবার প্রয়োজন হইবে না; তুমি প্রাণভয়ে



ভোরের আলো [বধূরাণী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (গৌরীপুর)

যেখানে লুকাইয়া থাকিবে, সেই স্থান হইতেই তাহারা তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। তাহারা ব্ল্যাক-গল ফার্ম্মের মালিক বিশ্বাসঘাতক আমস্ ক্রোবিকে আত্মরক্ষার অবসর দান করিবে না; এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

আমস্ এবার অস্ফুট স্বরে বলিল, "কথাটা তুমি মিথ্যা বল নাই, মেরী! আমি ঐ ভয়ই করিতেছি—ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।"

মেরী বলিল, "না, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। আরও একটা কথা তোমার চিন্তা করা উচিত। আমি আমাদের কথা বলিতেছি। আমার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? পিটারেরই বা কি দশা হইবে? তুমি অর্থলোভে স্বদেশদ্রোহিতা করিয়াছিলে, স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেছিলে; যখন এই অন্যায় কার্য্যে আমরা তোমাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করি, তখন আমরা কি গর্হিত কার্য্য করিতেছিলাম—তাহা বুঝিতে পারি নাই; সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। আমাদিগকে যখন যাহা আদেশ করিয়াছ, কর্ত্তব্যবোধে সেই আদেশই পালন করিয়া আসিয়াছি। যে সকল কার্য্য আমাদিগকে করিতে বাধ্য করিয়াছিলে, তাহা করা উচিত কি অনুচিত—ইহা কোন দিন চিন্তা করি নাই এবং আমাদের তাহা বুঝিবারও শক্তি ছিল না।"

আমস্ মেরীর কথা শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না; সে নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিল।

তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া মেরী কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কথা কহিতেছ না যে! কি ভাবিতেছ?"

আমস্ হতাশ ভাবে বলিল, "কি আর ভাবিব? তোমার কথা যে সত্য, ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেই জার্ম্মাণ শূয়ারটার আদেশে জার্ম্মাণ নাবিকগুলা যে-ভাবে আমাকে চাবকাইয়া দিল—সেই চাবুক খাইয়া আমি এত দূর—"

মেরী তাহাকে মুখের কথা শেষ করিতে না দিয়া দুই হাতে তাহার চেয়ারের দুই হাতা চাপিয়া ধরিল, এবং তাহার সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া সহানুভূতি ভরে বলিল, "তা জানি। চাবুকের আঘাতে তোমার কি যন্ত্রণা হইয়াছে, তুমি কিরূপ কষ্ট পাইয়াছ, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমি নারী, তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছিল; আমার মনে হইয়াছিল—সেই চাবুকগুলা যেন আমারই পিঠে পড়িয়াছিল! কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, সে জন্য এখন আর আক্ষেপ করিয়া কি ফল? এখন তুমি সে-সকল কথা ভুলিয়া যাও এবং পুনর্ব্বার তোমাকে ঐ ভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হইয়া তোমার কর্ত্তব্য-পথ বাছিয়া লও।"

মেরী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আমসের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল; তাহার পর সে কোমল স্বরে বলিল, "ও-সকল কথা আর তুমি ভাবিও না; ও-সকল কথার আর আলোচনা না করাই ভাল। অপ্রীতিকর অতীত কথা ভুলিলে তুমি শান্তিলাভ করিতে পারিবে।"

আমস্ বলিল, "আমি স্বীকার করি, তোমার কথাগুলি অসঙ্গত নহে; কিন্তু ঐ ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া আমার মনের ভাব যেরূপ হইয়াছিল—তাহাই তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি।"

মেরী তাহাকে সান্ত্বনাদানের জন্য বলিল, "তোমার মনের কষ্ট আমি বুঝিতে পারিয়াছি। ঐ প্রকার ব্যবহারের ফলে মনের ভাব ঐরূপ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তোমাকে বলিয়াছি ত, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। ঐ সকল কথার আলোচনা করিয়া কোন লাভই নাই, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছ। প্রহারের বেদনা শীঘ্রই সারিয়া যাইবে; তুমি সুস্থ হইয়া উঠিবে। এখন তুমি অনেকটা সুস্থ হইয়াছ; কেমন, এ কথা কি সত্য নহে?"

আমস্ অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, তা—তা কতকটা সত্য বটে।"

মেরী হাসিয়া বলিল, "তবে আর ঐ সব কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই।"—সে আমসের পিঠে আরও কয়েকবার ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

মেরী কি কৌশলে আমসের সুদৃঢ় সঙ্কল্প কাঁচাইয়া তাহাকে শান্ত করিয়া গেল, ইহার পরিচয় পাইয়া মনে মনে তাহার বুদ্ধির তারিপ করিলাম। মেরীর বাক্-পটুতায় ও সুযুক্তিতে আমসের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত

হইয়াছে—তাহাও অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলাম। কাপ্তেন ভন্ রথভেন ও লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন রাত্রিকালে আমাদের পাকশালায় আসিতে পারে শুনিয়া, আমস্ প্রথমে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করে নাই; কিন্তু মেরী তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া অন্য কার্য্যে প্রস্থান করিবার পর আমস্ আমাকে বলিল, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি যেন সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া 'ইউ'-বোটের আরোহীদ্বয়কে সাঙ্কেতিক আলো দেখাই; নতুবা তাহারা এখানে আসিতে সাহস করিবে না, এবং দীর্ঘকাল সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় থাকিয়া তাহাদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

শীতের অপরাহ্নের অবসানে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বেই আমস্ পাকশালাস্থিত অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত চেয়ার হইতে উঠিয়া, বাহিরের দিকের বাতায়নের ভিতর দিয়া সমুদ্র-বেলার অভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই চমকিয়া উঠিল। সে মেরীকে সেই মুহূর্ত্তে পাকশালায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমাদের উভয়কেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হাল্লো, সমুদ্রের দিক হইতে ও-কে আসিতেছে—দেখ তো তোমরা!"

সেই সময় আমাদের বাড়ীতে বাহিরের কোনও লোকের আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; এই জন্য আমি ও মেরী উভয়েই ব্যগ্র ভাবে বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সেই রাত্রে কাপ্তেন ভন্ রথভেন এবং লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন 'ব্ল্যাক-গল ফার্ম্মে' আসিবে জানিতাম; এই জন্য বাহিরের কোন লোক না আসে—ইহাই প্রার্থনীয় ছিল। আমসের কথা শুনিয়া আমরা উভয়েই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম।

কিন্তু আগন্তুক এক জন নহে—চারি মূর্ত্তি!

মেরী বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ, উহারা যে উপকূল-রক্ষী! দুই-এক জন নহে, চারি জন!"

আমি ব্যাকুল চিত্তে বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলাম—সত্যই চারি মূর্ত্তি সমুদ্রতট হইতে আমাদেরই বাড়ীর দিকে আসিতেছে! সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল—তথাপি আলোকান্ধকারের সেই মিলন-ক্ষণে তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম—আগন্তুক-চতুষ্টয় ইংরেজ সৈনিক, এবং উপকূল-রক্ষীই বটে!

মেরীর কথা শুনিয়া আমস্ আতঙ্কে অভিভূত হইল। সে মেরীর মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ভয়-কম্পিত স্বরে বলিল, "উপকূল-রক্ষী? দুই-এক জন নয়, চার-চার জন! হঠাৎ উহারা কি উদ্দেশ্যে এখানে আসি-তেছে? আমরা এখানে গোপনে জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোট-গুলার খোরাক জোগাইতেছি—ইহা কি উহারা জানিতে পারিয়াছে? তোমার কিরূপ ধারণা, মেরী?"

মেরী বাতায়ন হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই বলিল, "না না, উহারা ও-সকল কথা জানিতে পারে নাই; আমাদিগকে সন্দেহ করিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।"

আমস্ হতাশ ভাবে বলিল, "তবে? তবে এখানে উহাদের আসিবার আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?"

মেরী বলিল, "তাহা ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; তবে অনুমান হয়—হানা ফার্গস্ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে আমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেছে। স্ত্রীলোকটা হঠাৎ ফেরার হইল—যেন বাতাসে মিশিয়া গেল! তাহার সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদ জানিবার জন্য উহাদের আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক।"

আমস্ ভগ্ন-স্বরে বলিল, "সে সংবাদ জানিবার জন্য উহাদের দলের এক জন আসিলেই ত পারিত; দল বাঁধিয়া চার জনের দর্শনদানের কারণ কি?"

মেরীর কণ্ঠস্বরেও ভয় ও উদ্বেগের অভাব ছিল না; সে বিচলিত স্বরে বলিল, "সে কথা ঠিক; সেই সংবাদ জানিবার জন্য উহাদের দলের এক জন আসিলেই চলিত। দল বাঁধিয়া উহাদের চার জনের আসিবার কারণ আমিও বুঝিতে পারিতেছি না!"

অতঃপর মেরী জানালার নিকট হইতে সরিয়া-আসিয়া আমস্‌কে বলিল, "উহারা আমাদের দ্বীপ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে সমুদ্রতটে যাইব না। না, আমরা কেহই সে দিকে যাইব না। আমরা যতক্ষণ আলোর সঙ্কেত না দেখাইব, ততক্ষণ কাপ্তেন ভন্ রথভেন তাহার 'ইউ'-বোটের ডিঙ্গী লইয়া সমুদ্র-বেলায় উপস্থিত হইবে না।"

আমস্ কাতর ভাবে বলিল, "সে কথা কি করিয়া বলিতে পার? পূর্ব্বেও ত একবার সে আমাদের

সাঙ্কেতিক আলোর প্রতীক্ষা না করিয়াই আমাদের পাকশালায় আসিয়াছিল।"

মেরী বলিল, "হাঁ, তা আসিয়াছিল বটে; কিন্তু সেই রাত্রিতে কিরূপ ভীষণ দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তোমার স্মরণ আছে ত? সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে আমরা সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া আলোকের সঙ্কেত দেখাইতে পারিব না—ইহা জানিত বলিয়াই সে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু আজ ত সে-রকম প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ নাই। সে জানে, আজ আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব; এই জন্যই আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রদর্শিত আলোকের সঙ্কেত দেখিতে না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা 'ইউ'-বোট ত্যাগ করিবে না।"

আমস্ জড়িত স্বরে বলিল, "আশা করি, তোমার এই অনুমান সত্য হইবে।"

মেরী তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি ও-রকম হতাশ হইও না। উপকূল-রক্ষীরা তোমাকে সন্দেহ করিতে পারে, এরূপ ভাব-ভঙ্গি প্রকাশ করিও না। যদি উহাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে,—তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা কোন উপায়েই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব না। উহারা এখনই, বোধ হয়, আসিয়া পড়িবে। তুমি প্রফুল্ল ভাবে উহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হও; আমাদের পক্ষে শিষ্টাচারের কোন ত্রুটি হইবে না।"

দ্বাবিংশ পর্ব্ব

বজ্রাঘাত অনিবার্য্য!

মেরী আমস্‌কে সতর্ক থাকিতে বলিয়া পাকশালার দেওয়ালে সংরক্ষিত একখান আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, এবং সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে তাহার ললাটস্থিত অসংযত কুন্তল-গুচ্ছ সুবিন্যস্ত করিয়া, পরিহিত পরিচ্ছদের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিল। সেই সময় আমস্ তাহার চেয়ার হইতে উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইল। আমরা দেখিলাম, উপকূলরক্ষী-চতুষ্টয় আমাদের ঘরের অদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি মেরীকে সেই কথা জানাইলে মেরী দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিল।

মুহূর্ত্ত পরেই মেরী উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল, "হাল্লো, মিষ্টার ষ্ট্যান্‌ডিস্! আজ আমাদের কি সৌভাগ্য!"

মেরীর কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, উপকূল-রক্ষী চতুষ্টয়ের অন্ততঃ এক জনও মেরীর পরিচিত। মেরীর অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।

ষ্ট্যান্‌ডিস্ নামক উপকূল-রক্ষী হাস্যপ্রফুল্ল মুখে উৎসাহ-ভরে বলিল, "হাল্লো মেরী! কেমন আছ তুমি, সুন্দরী?" তাহার কণ্ঠস্বর প্রফুল্ল বটে, কিন্তু মনে হইল, কথাগুলা হাঁড়ার ভিতর হইতে বাহির হইল!

মেরী মধুর হাসিয়া বলিল, "খুব ভালই আছি,—ধন্যবাদ!"

মেরীর ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া কে বলিবে, ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে কম্পিত-হৃদয়া, বিপদ-শঙ্কিতা, উদ্বেগ-বিহ্বলা তরুণীকে দেখিয়াছিলাম—এ সেই?

মেরী পাকশালার মুক্তদ্বারের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলে উপকূলরক্ষী-চতুষ্টয় যেন কুচ-কাওয়াজের ভঙ্গিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রত্যেকের কোমরবন্দ-সন্নিবিষ্ট কোষে টোটাভরা রিভলবার সংরক্ষিত দেখিয়া ভয়ে আমার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। ইহাদের উদ্দেশ্য কি?

উপকূল-রক্ষীরা সকলেই বলবান; পরিপুষ্ট-দেহ, মুখের বর্ণ রৌদ্রপক্ক। তাহারা পাকশালায় প্রবেশ করিয়া সহাস্য মুখে আমস্‌কে অভিবাদন করিল—দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। মনে হইল, উহাদের কোন গুপ্ত অভিসন্ধি নাই, আমাদের সন্দেহ অমূলক।

আগন্তুকগণের এক জন আমস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হাল্লো আমস্! আমি তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই।"

আমস্ তখনও আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই; সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আমি? না, আ—আমি অনেক দিন বড়-দেশে যাই নাই। সেখানে যাইবার তেমন কোন দরকার ছিল না কি না। তা—তা তোমরা কি মতলবে এখানে—মানে—এই দ্বীপে আসিলে?"

উপকূল-রক্ষীটি অগ্নিকুণ্ডের নিকট সরিয়া গেল, এবং

অগ্নিরাশির ঊর্দ্ধে উভয় করতল প্রসারিত করিয়া বলিল, "এই দ্বীপের চতুর্দ্দিক একবার ঘুরিয়া দেখিব বলিয়া আসিলাম। সময় খারাপ, উপকূল-সন্নিহিত সকল স্থান ঘুরিয়া দেখা উচিত। তা ছাড়া, একটা খারাপ খবর আছে। হানা ফার্গস্ ফেরার! তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।"

আমস্ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "বটে! তা—তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই?"

উপকূল-রক্ষী উত্তপ্ত করতল ললাটে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "হাঁ, সত্যই তাহার সন্ধান মিলে নাই! সাধারণের ধারণা, সে ডুবিয়া মরিয়াছে। বড়-দেশের উপকূলের প্রায় তিন মাইল দূরে তাহার খালি নৌকা ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। তাহার পর আরোহিহীন নৌকাখানা ধরিয়া তীরে আনা হয়।"

এ কথা শুনিয়াও আমস্ জিজ্ঞাসা করিল, "নৌকায় হানা ফার্গস ছিল না?"

রক্ষী বলিল, "না, ছিল না। সে কথা ত আগেই বলিয়াছি। ব্যাপারটা আগাগোড়া রহস্যপূর্ণ! অবস্থা দেখিয়া মনে হয়—হানা তাহার নৌকা হইতে সমুদ্রে লাফাইয়া-পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। কারণ, সে দিন আকাশ পরিষ্কার ও সমুদ্র স্থির ছিল; সুতরাং নৌকা সমুদ্রতরঙ্গে আলোড়িত হওয়ায় সে যে হঠাৎ নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গিয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। কিন্তু হানা ফার্গসের মতো মেয়েমানুষ কোন কারণে আত্মহত্যা করিবে—এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কোন্ দুঃখেই বা সে আত্মহত্যা করিবে? তবে এ কথা সত্য যে, তার ভাই হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় সে মনে বড় আঘাত পাইয়াছিল।"

এই কথা বলিয়া রক্ষীটা উভয় করতল পরস্পর ঘর্ষণ করিতে লাগিল; তাহার পর সে মেরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মেরী, আমাদিগকে তুমি একটু চা খাওয়াইতে পারো?"

মেরী বলিল, "কেন পারিব না? এ আর এমন কঠিন কাজ কি? একটু অপেক্ষা কর, মিষ্টার ষ্ট্যান্ডিস্! আমি চা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।"

অতঃপর মেরী ল্যাম্প জ্বালিয়া তাহা টেবলের উপর রাখিল, এবং পিরিচ, পেয়ালা, প্লেট প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল।

আমস্ গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারায় বলিল, "হানা ফার্গসের যে ভাই ফেরার হইয়াছে বলিলে, সে কি এখনও ফিরিয়া আসে নাই?"

উপকূল-রক্ষী ষ্ট্যাণ্ডিস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তবে আর শুনিলে কি? এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান নাই! আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাই-ভগিনী দুই জনেই এ-ভাবে অদৃশ্য হইয়াছে—যেন বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে! অত্যন্ত জটিল রহস্য নহে কি?"

আমস্ পকেট হইতে তামাকের পাইপটা বাহির করিয়া লইল; দেখিলাম, তাহার হাতখানা সেই সময় কাঁপিতেছিল, কিন্তু অন্য কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। আমস্ পাইপে তামাক পুরিতে-পুরিতে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "হানা ফার্গসের সেই ভাই নৌ-পরিচালনে সুনিপুণ ছিল না বলিয়াই আমার ধারণা। হাঁ, এ বিষয়ে সে নিতান্তই আনাড়ি ছিল।"

ষ্ট্যাণ্ডিস চায়ের পেয়ালার দিকে চাহিয়া বলিল, "বল কি? তোমার ঐ রকম ধারণা ছিল?"

আমস্ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "হাঁ, ছিলই ত। আমার মনে হইত, সে নৌকায় চাপিয়া সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় যদি হঠাৎ ঝড় ওঠে, তাহা হইলে সেই বেগ সামলাইয়া নৌকাখানা কায়দায় রাখা তাহার অসাধ্য হইবে; নৌকা হইতে 'ঝপাং' করিয়া সে সমুদ্রে পড়িবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে ডুবিয়া মরিবে। কাজেও সেইরূপই ঘটিয়াছিল। সে ত মরিলই, শুনিয়াছি, তাহার সেই নৌকাখানাও রক্ষা পায় নাই! বড়ই দুঃখের বিষয়। পরমেশ্বর যে কখন কাহাকে কি বিপদে নিক্ষেপ করেন, দুর্ঘটনার আগে তা বুঝিতে পারা যায় না।"

অতঃপর সে অগ্নিকুণ্ডের আগুনের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া পাইপের তামাক ধরাইয়া লইল, এবং তখনও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াই ষ্ট্যাণ্ডিস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আজ রাত্রে বড়-দেশে ফিরিয়া যাইতে তোমাদের খুব অসুবিধা হইবে না? অনেকটা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।"

ষ্ট্যাণ্ডিস্ বলিল, "হাঁ, তা খানিক বিলম্ব হইয়াছে বৈ

কি! আর বড়-দেশ ত খুব নিকটেও নয়। দেখা যাক, কি হয়।"

তাহার পর সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মেরী, তুমি কিছু দিন আগে বড়-দেশে গিয়া ডোনাল্ডসন্‌স পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলে। তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া তোমার দিনগুলি বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কাটিয়াছিল ত?"

মেরী হাসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ।—হাঁ, সেখানে সেই কয়েকটা দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল।"

ষ্ট্যান্‌ডিস্ বলিল, "জোক ছোকরা ফ্রান্সে চলিয়া গিয়াছে—সে কথা শুনিয়াছ কি?"

মেরী বলিল, "না, এ খবর ত পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই!—ফ্রান্সে সে কবে গিয়াছে?"

ষ্ট্যান্‌ডিস্ মেরীর কথা বিশ্বাস করিল কি না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না; সে বলিল, "গত সপ্তাহের প্রথমেই সে চলিয়া গিয়াছে।"

মেরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সহানুভূতিভরে বলিল, "আহা, বেচারা জোক! আশা করি, সে নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরিতে পারিবে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! কাহার ভাগ্যে কখন্ কি ঘটে, কে বলিবে? শুনিয়াছি, ফ্রান্স এই যুদ্ধে বৃটেনকে যথাশক্তি সাহায্য করিতেছে।"

ষ্ট্যান্‌ডিস্ বলিল, "তা বটে। জোক নিরাপদে থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়। খাসা ছেলে জোক। বিবি ডোনাল্ডসন আমার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—জোক ফ্রান্স দেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই তোমার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধটা পাকা করিয়া রাখেন—এইরূপই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।"

মেরী হাসিয়া বলিল, "তাঁর সে ইচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু আমি এখন তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া বসিব—এ ইচ্ছা আমার মনে কোনও দিন উদিত হয় নাই; বিবাহের জন্য আমি ব্যস্ত নহি, মিষ্টার ষ্ট্যান্‌ডিস্!"

ষ্ট্যান্‌ডিস্ প্রশংসমান নেত্রে মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মেরী, আমার কথা শুনিয়া আমাকে চাটুকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না; কিন্তু আমি সত্যই বলিতেছি—যে তোমাকে লাভ করিবে, সে ভাগ্যবান্ যুবক। কি আর বলিব?—যদি আধবুড়ো না হইতাম, আর ঘাড়ে একটা স্ত্রী না ঝুলিত, তাহা হইলে আমি কি তোমাকে—কিন্তু সে জন্য এখন আর আক্ষেপ করিয়া ফল কি?"—বলিয়া ষ্ট্যান্‌ডিস্ হতাশ ভাবে এমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল যে, আমাদের হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইল। বস্তুতঃ, তাহাদিগকে হঠাৎ এখানে আসিতে দেখিয়া আমাদের যে ভয় ও দুশ্চিন্তা হইয়াছিল, তাহাদের এইরূপ সরস আলোচনায় তাহা আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলাম।

এইরূপ নানা প্রকার প্রীতিকর গল্প করিতে করিতে চা'য়ের পর্ব্ব শেষ হইল। উপকূলরক্ষীরা সকলেই মেরী ও আমাকে লইয়া যে রং-তামাসা করিতে লাগিল, তাহা যথেষ্ট উপভোগ্য হইল। আমাদের নিরানন্দময়, নীরস, মরু-জীবনে তেমন মধুর সন্ধ্যা আর কখন আসিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হইল না।

এই ভাবে গল্প শেষ হইলে রক্ষীরা চেয়ারগুলি অগ্নিকুণ্ডের আরও নিকটে টানিয়া লইয়া গেল; তাহার পর পাইপ বাহির করিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল।

কয়েক মিনিট পরে ষ্ট্যান্‌ডিস্ হঠাৎ তাহার চেয়ারখানা পশ্চাতে ঠেলিয়া-ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার কোমরবন্দস্থিত পিস্তলের মুঠা স্পর্শ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমাদের তিন জনের মধ্যে কে আজ রাত্রে সাঙ্কেতিক আলোকের লণ্ঠন লইয়া সমুদ্রকূলে যাইবে? মেরী—তুমি, পিটার, না আমস্ নিজেই?"—সে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমাদের সকলেরই মুখের দিকে চাহিল।

সর্ব্বনাশ, তাহার কথা শুনিয়া আমার যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইল! এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত!

আমি স্তম্ভিত হৃদয়ে আমসের মুখের দিকে চাহিলাম।

আমস্ ষ্ট্যান্‌ডিসের প্রশ্ন শুনিয়া চেয়ার হইতে সবেগে লাফাইয়া উঠিল। তাহার মুখ মৃতব্যক্তির মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইল; আতঙ্কে তাহার আপাদমস্তক থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে ভগ্ন স্বরে ষ্ট্যান্‌ডিস্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ও-কথার অর্থ কি? কি উদ্দেশ্যে তুমি এই অর্থহীন, অসংলগ্ন কথা জিজ্ঞাসা করিলে?"

ষ্ট্যান্‌ডিস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও-কথা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই আমস্! আমরা সকলই জানিতে পারিয়াছি। তোমার বুঝিতে পারা উচিত ছিল,

এ সকল নোংরা ব্যাপার দীর্ঘকাল লুকাইয়া রাখিতে পারা যায় না।"

আমস্ ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি তোমরা জানিতে পারিয়াছ ? কোন্ নোংরা-ব্যাপারের কথা বলিতেছ ?"

ষ্ট্যান্‌ডিস্ অবিচলিত স্বরে বলিল, "এখানে যে-সব কাণ্ড চলিতেছে, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। আলেন ফার্গস সহসা নিরুদ্দেশ হইলে তাহার ভগিনী হানা শপথ করিয়া বলিয়াছিল, তাহার ভাইকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কিন্তু সে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেও আমরা তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই; আলেন ফার্গসের ন্যায় নির্ব্বিরোধ লোককে হঠাৎ হত্যা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? কিন্তু এই দুর্ঘটনার কিছু দিন পরে হানা আমাদের বলিল—সে তাহার নিরুদ্দিষ্ট ভাইএর সন্ধানে এখানে আসিতেছে। তাহার পর তাহারও আর কোন সন্ধান মিলিল না! সে যে নৌকায় আসিয়াছিল—সেই নৌকা আরোহিহীন অবস্থায় সমুদ্রে ভাসিতে দেখা গেল। তখন আমাদের সন্দেহ হইল, এই ব্যাপারের অন্তরালে নিবিড় রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে! এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা রহস্য-ভেদের আশায় এই দ্বীপের উপর দৃষ্টি রাখিলাম। আমরা সমুদ্র হইতেই পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করি। গত রাত্রে আমরা তোমাদের এই দ্বীপের কিছু দূরে আসিয়া সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই সময় আমরা এখানে হানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারি নাই, এ জন্য দূর হইতে ফিরিয়া গিয়াছিলাম।"

এবার মেরী বলিল, "গত রাত্রে এই দ্বীপের কিছু দূরে থাকিয়া সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলে বলিলে, তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছিলে?"—মেরীর মুখ বিবর্ণ হইলেও তাহার কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ অচঞ্চল।

ষ্ট্যান্‌ডিস্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমরা কি করিতেছিলে—দূরবীণের সাহায্যে তাহা লক্ষ্য করিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। আমরা সমুদ্র-বক্ষে—তট হইতে কিছু দূরে হঠাৎ একটা লাল আলো জ্বলিয়া উঠিতে দেখিলাম; মুহূর্ত্ত পরে সমুদ্র-বেলা হইতে আর একটা সাঙ্কেতিক আলোকে তাহার উত্তর জ্ঞাপন করা হইল! আজ সন্ধ্যাকালে আমরা এখানে আসিবার সময় 'ডেভিল্‌স্ কেভে'র ভিতরটা পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছি। মেরী, তোমরা আমাদের শত্রু জার্ম্মাণদের 'ইউ'-বোটের খোরাক সরবরাহ করিয়া আসিতেছ! জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটগুলা সমুদ্রে-সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি করিয়া বেড়াইতেছে; আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল—কোন গুপ্তস্থান হইতে তাহারা খোরাক সংগ্রহ করিয়া সমুদ্র-পথ বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু বড়-দেশের এরূপ নিকটবর্ত্তী দ্বীপ হইতে তাহারা ক্রমাগত সাহায্য পাইতেছে, এ সন্দেহ পূর্ব্বে কোন দিন আমাদের মনে স্থান পায় নাই। এখন সকল ব্যাপার পরিষ্কার-রূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে!"

মেরী গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাঁ, তোমরা ঠিকই বুঝিয়াছ; আমরা জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটগুলিকে এখান হইতেই খোরাক সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।"

মেরীর কথা শুনিয়া আমস্ ক্রোধে ও ভয়ে কদর্য্য মুখভঙ্গি করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "খোরাক সরবরাহ করিয়া আসিতেছি—এ কথা তোমার বলিবার কি প্রয়োজন ছিল?—এ কথা স্বীকার করিয়া তুমি কি মনে করিয়াছ—" হঠাৎ সে থামিয়া বলিল, "দুধ-কলা দিয়া কাল-সাপ পুষিয়াছি! ও-দেহে কার—রক্ত?"

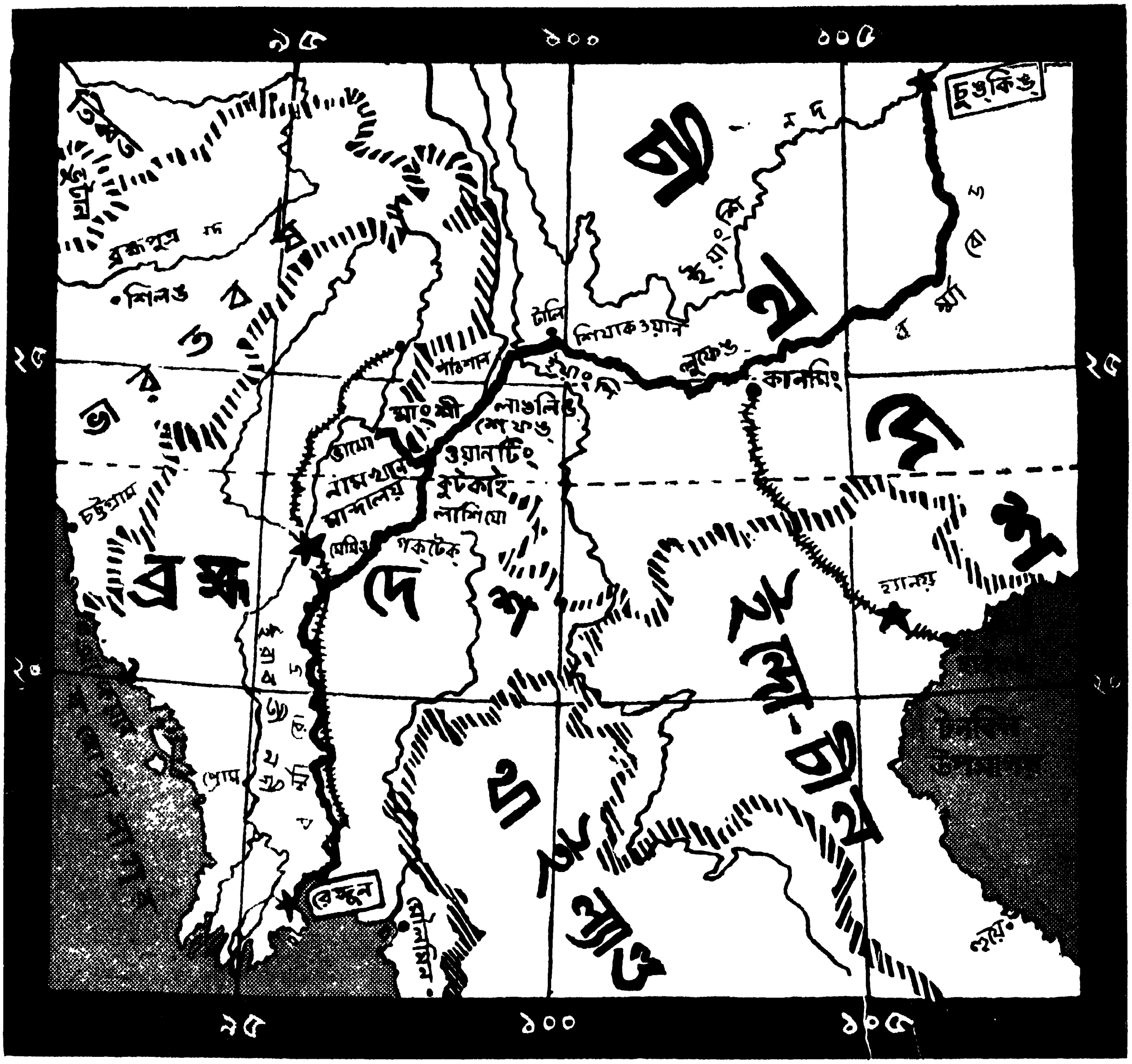
ষ্ট্যান্‌ডিস্, আমসের মন্তব্য শেষ না হইতেই হুঙ্কার দিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "মুখ বুজিয়া তুমি বসিয়া থাকো ক্লোবি! তোমার চালাকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে; মিথ্যা কথায় আর আমাদের ভুলাইবার উপায় নাই—মেরী তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।"

আমস্ হতাশ ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল; কিন্তু তাহার ভয় দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার সর্ব্বশরীর প্রাণভয়ে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে।

আমি মেরীর মুখের দিকে চাহিলাম,—তাহার দৃষ্টি অগ্নিকুণ্ডে সন্নিবিষ্ট। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, সে তখন অন্য কথা ভাবিতেছিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বর্ম্মা রোড



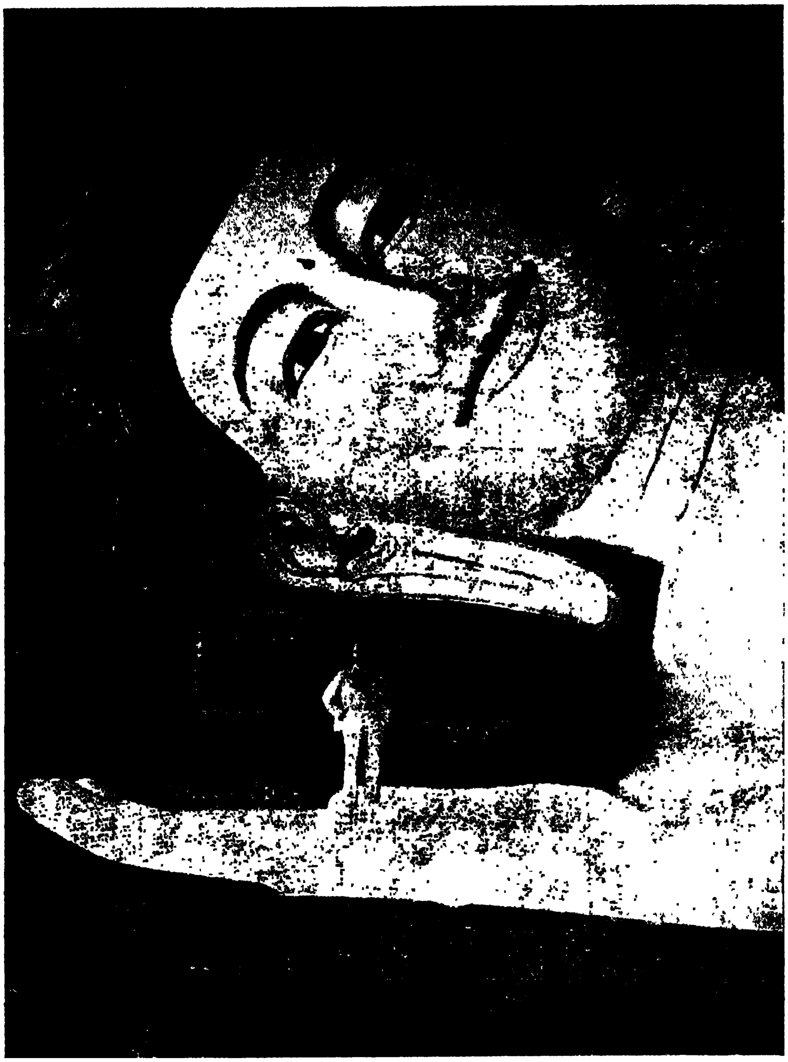
বর্ম্মা রোড—ক'মাস পূর্ব্বে এ নামে আমাদের প্রাণে অনেকখানি চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল! অথচ বর্ম্মা রোড আসলে কি বস্তু, সে সম্বন্ধে কতটুকুই বা আমরা জানি!

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অতি প্রাচীন যুগে চীন রচিয়াছিল গ্রেট ওয়াল বা সুদীর্ঘ প্রাচীর; এ কালে বহিঃশত্রুর আক্রমণ-রোধের জন্যও তেমনি চীন আজ রচিয়াছে এই বর্ম্মা রোড! অতি-দুর্গম গিরি-পর্ব্বত ভেদ করিয়া এ পথ রচিত হইয়াছে। পাহাড়ের বুক ফুঁড়িয়া মাথা টপ্‌কাইয়া, নদী-নির্ঝরের বুকের উপর দিয়া এ পথ রেঙ্গুন হইতে চীনের বুকে চুঙকিঙ বা পাশিয়েন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এমন কৌশলে এ পথ নির্ম্মিত যে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত—কোনো কালেই এ পথে এখন লোক-জনের বা গাড়ীর চলাচল বন্ধ হইবে না!

উপরে ম্যাপখানি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এ পথ

রেঙ্গুন হইতে উত্তরে সোজা গিয়াছে মাণ্ডালে; মাণ্ডালের পথ দ্বিধা-ভিন্ন হইয়াছে—এক মাথা গিয়াছে সোজা বর্ম্মার মিইতকিয়ানায়; আর-এক মাথা ডাহিনে ঝুঁকিয়া মেমিয়ো, লাশিয়ো, উত্তর-শান প্রদেশ, লাঙলিঙ পার হইয়া শিয়াক্-ওয়ান, শুইয়াং স্পর্শ করিয়া চুঙকিঙে গিয়াছে। দেখিবেন লাশিয়ো। এই লাশিয়ো বর্ম্মার সীমান্ত-রেখা,—তার পর ও-দিকে চীন-সাম্রাজ্য সুরু হইয়াছে।

এ পথের কিয়দংশ—কানমিঙ্ হইতে পশ্চিমে শিয়াক-ওয়ান পর্য্যন্ত—১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে তৈয়ারী হইয়াছে। তার পরে শিয়াকওয়ান হইতে বর্ম্মার সীমান্তে লাশিয়ো পর্য্যন্ত পথটুকু আজ প্রায় দু' বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এ পথটুকু দৈর্ঘ্যে ৩০৭ মাইল। কিন্তু এখানকার এই পথটুকুর নির্ম্মাণে কত কঠিন পাহাড় কাটিয়া সাফ্ করিতে হইয়াছে, প্রখর বেগ-শালিনী কত বড়-বড় নদী-মহানদীর বুকের উপর সেতু রচিতে হইয়াছে, তার আর সংখ্যা নাই! এ পথটুকু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তৈয়ারী হইয়াছে। নির্ম্মাণে ন' মাস মাত্র সময় লাগিয়াছিল। এঞ্জিনীয়ার ও মিস্ত্রী-মজুর লাগিয়াছিল দু' লক্ষ। এমন দুর্গম গিরি-নদী-বাহী পথ পৃথিবীর আর কোনো প্রদেশে নাই! অথচ সেতু-নির্ম্মাণে, গিরি-উন্মোচনে সনাতন রীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল; অর্থাৎ সেই শাবল-গাঁতি ধরিয়া পাহাড়ের পাথর কাটা, ছোট ছোট ঝুড়িতে ভরিয়া রাবিশ সরানো —মানুষের মাথায় কিম্বা মহিষের গাড়ীতে তুলিয়া পাথর বহা,—এ-সব কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির এতটুকু সাহায্য লওয়া হয় নাই!



পেগু-মন্দিরে শয়ান বুদ্ধ-মূর্ত্তি

রেঙ্গুন হইতে চুঙকিঙ পর্য্যন্ত পথের দৈর্ঘ্য ২১০০ মাইল। পথ প্রশস্ত এবং পাকা। মোটর-লরি এ পথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। তার উপর পথের দু'দিকে নানা দৃশ্যবৈচিত্র্য! সে দৃশ্য কোথাও বেশ নয়নাভিরাম, আবার কোথাও এমন ভীম-ভয়ঙ্কর যে, সে-দৃশ্যে দেহ রোমাঞ্চিত হয়! ম্যাপে মেমিয়োর পরে ডাহিনের পথে

সম্প্রতি জাপানী-বিপ্লবের ফলে গত ১৮ জুলাই হইতে তিন মাসের জন্য এ পথ বন্ধ ছিল; নভেম্বর মাসে পথ আবার মুক্ত হইয়াছে। এ পথটি চীনের খিড়কী-দ্বার (Back-door to China)। প্রয়োজন হইলে এ পথে

বর্ম্মা হইতে সৈন্য-সাহায্য পাওয়া যাইবে। সেই জন্যই এ-পথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে!

জল-পথ ভিন্ন চীনে যাইবার জন্য আর একটি স্থল-পথ আছে, সে পথ গিয়াছে রুশিয়া হইতে। এ-পথ দুর্গম।

দু'জন ইংরেজ পর্য্যটক বর্ম্মা রোড ধরিয়া চীনে গিয়াছিলেন। এ পথের যে-বৃত্তান্ত তাঁরা লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

এ পথে দু'বার তাঁরা চীনে গিয়াছিলেন। প্রথমবারে গিয়াছিলেন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে; তার পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। দ্বিতীয়বারে এ-পথে তাঁরা যুদ্ধোপযোগী রশদ-পত্রাদি চীনে রীতিমত চালান হইতে দেখেন। প্রথমবারে ইঁহারা গিয়াছিলেন মোটর-লরিতে চড়িয়া; দ্বিতীয়বারে সাধারণ মোটর-গাড়ীতে।

রেঙ্গুন হইতে ইঁহারা মাণ্ডালের পথ ধরিয়া যাত্রা করেন। পথের দু'দিকে বহু গ্রাম-নগর। সে সব গ্রাম-নগরে নানা জাতের নর-নারীর বাস! তাদের বহু বিচিত্র আচার-রীতি, বিচিত্র বেশ-ভূষা—এ-সবে মন এমন তন্ময় ছিল যে, দীর্ঘ পথ-যাত্রার জন্য এতটুকু ক্লান্তি তাঁরা অনুভব করেন নাই। এখানকার লোক-জন জন্মে কখনো মোটর-গাড়ী দেখে নাই; তাই মোটর দেখিয়া তাদের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না!

এ-পথে অজস্র গোল্ডমোহর গাছ—ফুলে-ফুলে দিক একেবারে রাঙা হইয়া আছে! পথে মাণ্ডালে-প্রাসাদ—এক কালে উত্তর-ব্রহ্ম-নৃপতিদের বাসভূমি ছিল; এখন এ-প্রাসাদ মিউজিয়মে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাসাদের গায়ে ছিল রাণীর উদ্যান। এখন আর সে উদ্যানের চিহ্ন নাই, জঙ্গল হইয়া আছে!

মাণ্ডালে হইতে ৪২ মাইল দূরে মেমিয়ো। এ জায়গাটি বর্ম্মার অফিসারদিগের পার্ব্বত্য-নিবাস।



রেঙ্গুনের বাজার

মেমিয়োর পাহাড় হইতে নীচে বহু দূরে প্রসারিত মাণ্ডালের ক্ষেত-আবাদ দেখা যায়। ধানের ক্ষেত। এ ক্ষেতে অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এই পাঁচ মাস প্রচুর 'স্নাইপ' মেলে। সেজন্য শিকারীদের খুব ভিড় জমে। স্নাইপ-শিকারীদের পক্ষে এমন জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না! কেহ শিকার করিতে আসিলে এক-শো' পাখী লইয়া বাড়ী ফেরা—সে খুব সহজ ব্যাপার!

মেমিয়ো পূর্ব্বে ছিল দারুণ ঘন জঙ্গলময়। বৃটিশ অধিকারের পর বেঙ্গল ফৌজের কর্ণেল মে এখানে আসিয়া বন-জঙ্গল কাটিয়া সহরের পত্তন করেন,—তাঁহারি নামে নগরের নাম-করণ হইয়াছে। 'মিয়ো' কথাটি বর্ম্মীজ,—'মিয়ো'র অর্থ 'স্থান', 'নগর'!

মেমিয়োর পরেই গকটেক-গর্জ্জের দিকে পথ একেবারে যেন আকাশ হইতে পাতালের বুকে নামিয়া গিয়াছে! এখানে একটি নদী আছে; নদীর বুকে নব-নির্ম্মিত সেতু। সেতুর উপর দিয়া মোটর চলে; মহিষের গাড়ী চলে; মানুষ চলে। পাশে সুগভীর খদের উপর প্রায় ৩২০ ফুট উর্দ্ধে রেলের সুদীর্ঘ পুল। এ পুলটি ২২৬০ ফুট দীর্ঘ —পুলটি মার্কিন এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এ পুলের খিলানটি খদের প্রায় ৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। এ পুলের ঠিক ও-পারেই উত্তর শান প্রদেশ।

বর্ম্মার সীমানা হইতে ১২০ মাইল উত্তরে লাশিয়ো। লাশিয়ো নূতন সহর। এখানে আজ ব্যবসায়ের বিপুল কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে-লাইন বিস্তারিত হইয়াছে; এবং এই রেল-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সহরের বাহিরে বারুদখানা এবং বিমান-বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছে। তা'ছাড়া এখানে বর্ম্মীজ ফ্রন্টীয়ার ফোর্শের আস্তানা আছে।

লাশিয়োয় দুর্বৃত্ত ফন্দীবাজের অভাব নাই। সহরে তাদের যেমন প্রতাপ, সহরের বাহিরে পথেও তেমনি! লুটপাট করিয়া এমন নিঃশব্দে ইহারা সরিয়া পড়ে যে, সতর্ক পুলিশ ও ফৌজ-প্রহরীরা তাদের ধরিতে হিমসিম খাইয়া যায়।



রেঙ্গুনের পথ; দূরে শুল্ পাগোডা; পথে জলের কলে স্নান-পর্ব্ব

এখানে অসংখ্য চীনার বাস। এ জায়গাটি সরকারী চীনা-কর্ম্মচারীদের বিরাট আস্তানা। লাশিয়োয় যে-সব চীনার বাস, আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁরা পলিটিক্সের আলোচনায় মাতিয়া আছেন!

এখানে সরকারী সামরিক চালানী অফিস আছে। প্রকাণ্ড অফিস। নাম সাউথ-ওয়েষ্ট ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি। হেড-অফিস রেঙ্গুনে। এ অফিসের কাজ

জাহাজের খপরদারী করা; সামরিক রসদ ও মালপত্র বুঝিয়া ডেলিভারী লওয়া, এবং সে সব মালপত্র লাশিয়োয় এবং কানমিঙে চালান করা। তা'ছাড়া এখানে মোটরের অনেক কারখানা আছে; লরি ও ট্রাক-কোম্পানি আছে। এ পথে বহু বাস চালাইয়া তারা ব্যবসা বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে!

এখান হইতে যে পথ শিয়াকুওয়ান হইয়া শুঙকিং গিয়াছে, সে পথ পাহাড়ের গায়ে বলিয়া ঢালু। এ-জন্য হইতে যে সব নদীর সৃষ্টি, সে সব নদীর জল বেশ গরম। স্নানে আরাম মেলে বলিয়া এখানে বহু স্নানার্থীর ভিড় জমে। তা'ছাড়া এ জলের আর-এক গুণ, এ জলে স্নান করিলে বাত-ব্যাধি সারিয়া যায়। বাত-ব্যাধিগ্রস্তেরা স্নান করিতে আসিয়া প্রত্যহ তিন-চার ঘণ্টা ধরিয়া জলে গা ডুবাইয়া পড়িয়া থাকেন।

মোটরের টানা পথ নির্ম্মিত হইলেও লাশিয়ো হইতে কানমিঙ্ পর্য্যন্ত ৬৮৮ মাইলের মধ্যে কোথাও এক বিন্দু



মেমিয়োর কাছে নির্ঝর-ধারা

দু'দিককার গাড়ী পরস্পরকে অতিক্রম করিবার সময় প্রায়ই ঢালু-পথে বা বিপথে গড়াইয়া পড়ে। এ বিপত্তি নিত্য ঘটে। পাহাড়ের পাথরে কিম্বা পথের পাশে মোটা গাছের গুঁড়িতে লাগিয়া বহু লরি-বাস ও ট্রাক ভাঙ্গিয়া যায়। সে-জন্য পথের মাঝখানে মোটর-মেরামতির জন্য অনেক কারখানা আছে।

লাশিয়োর অদূরে নদী-সঙ্গম—দু'টি নদী আসিয়া একত্র মিশিয়াছে। একটি নদীর জল গরম, অপরটির জল হিম-শীতল। শান প্রদেশে এমন বহু নদী আছে। উষ্ণ-প্রস্রবণ পেট্রোল পাওয়া যায় না! তার উপর বর্ম্মা-সীমা অতিক্রম করিলে এ-দিকে বিরাম-নিবাস বা রেষ্ট-হাউশের অভাব ছিল; এখন দু'-একটি করিয়া বিরাম-নিবাস নির্ম্মিত হইতেছে।

আমাদের পর্য্যটকেরা এ পথে গাড়ীতে যে পেট্রোল বহিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতে আশী মাইল-ব্যাপী পাহাড়-পথ অতিক্রমে তাঁদের কোন বাধা বা অসুবিধা ঘটে নাই।

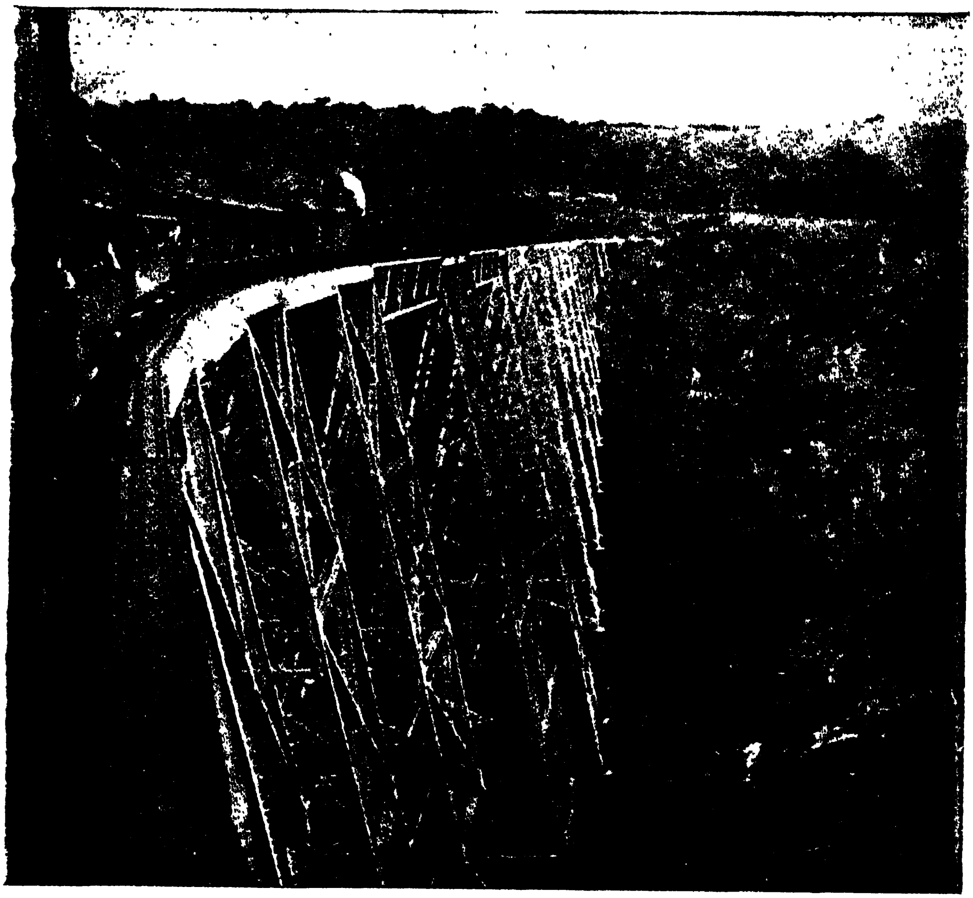
লাশিয়োর বারো মাইল পরে পথ খুব খারাপ।

এ পথে যেমন খানাখোন্দল্, আল্‌গা পাথরের তেমনি স্তূপ! তা'ছাড়া পাহাড়ের গা এখানে আগাগোড়া ছুঁচের মতো সূক্ষ্মাগ্রমুখী।

এক জায়গায় পথ পাঁচ হাজার ফুট উচ্চে উঠিয়া তার পর একেবারে পাতালে নামিয়া কুৎকাইয়ে পৌছিয়াছে।

পর্য্যটকদ্বয় এ পথে কুৎকাই পার হইয়া রাত্রি প্রায় বারোটার সময় হোশির রেষ্ট-হাউশে পৌছিয়াছিলেন।

পরের দিন প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া চীনের রাজনীতিক-সীমান্ত দেশ ওয়ানচিঙে আসেন। এ জায়গায় পূর্ব্বে কাচিন নামক এক দুর্দ্ধর্ষ জাতির বাস ছিল। তাদের পেশা ছিল দস্যুতা। এখন এ পথ তৈয়ারী হওয়ায় সে দস্যু-জাতি এখান হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।



• গক্‌টেক্-গর্জ্জের বুকে রেলের পুল

ওয়ানটেঙে ডিউটি প্রভৃতি দিয়া যাত্রীরা মোটর চালাইয়া মধ্যাহ্নে আসিয়া পৌছিলেন শেফাঙে।

ম্যালেরিয়ায় শেফাঙ একেবারে শ্মশানপুরী হইয়া আছে! সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সকলেই প্রায় ছ'-সাত মাস ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্যে শয্যাশায়ী থাকেন! কুলি-মজুরের কথাই নাই! ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া এখানকার লোকজনের যা চেহারা, দেখিলে প্রেতাত্মা বলিয়া মনে হয়!

শেফাঙ হইতে পথ আবার খাড়া উঁচু। বারো মাইল সোজা খাড়াই, তার পর পথ নামিয়া মাংশীতে পৌছিয়াছে।

মাংশীর সামন্ত-রাজা শ্রীযুত ওয়াই ফাঙ্ ব্যাডমিণ্টন খেলিতে ছিলেন। দু'জন ইংরেজ যাত্রী আসিয়াছেন শুনিয়া বহু সমাদরে তিনি তাঁদের নিমন্ত্রণ করিলেন। যাত্রীরা সেখানে গিয়া দেখেন, তিন জন বর্ম্মীজ-তরুণীর সঙ্গে রাজা ব্যাডমিণ্টন খেলিতেছেন।

সামন্ত-রাজাকে চীনারা বলে শবোয়া (Sawbwa)।

রাজা ফাঙ্ একটু-আধটু ইংরেজী জানেন। তিনি ভাঙা ইংরেজীতে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে আলাপ করিলেন। ইয়ায়ো নামে এক জন চিকিৎসককে ডাকিয়া

আনা হইল—ভালো করিয়া পরিচয় ঝালাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে। এ ডাক্তারটি আমেরিকা হইতে ডাক্তারী-বিদ্যা শিখিয়া এখানে আসিয়া ম্যালেরিয়া-উচ্ছেদ-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন।

ডক্টর ইয়ায়ো আসিলে কথাবার্ত্তা সহজ ও বোধগম্য হইল। বর্ম্মীজ-তরুণীদের পরিচয় মিলিল। তাঁরা নামখামের আমেরিকান্ ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন হাসপাতালে নার্শের কাজ করেন। তাঁদের তিন জনের নাম—তর্জ্জমা করিলে সে তিন নামের অর্থ হয়—কুমারী চুণী, কুমারী রূপসী এবং

হইতে লাশিয়োয় আসিয়াছিলাম। শবোয়া সাহেব সেখান হইতে আমাকে এখানে আনিয়া চাকরি দিয়াছেন। এ জায়গা আমার ভালো লাগে। আমি মাহিনা পাই মাসে আট টাকা করিয়া। মাহিনা খুব সামান্য। তবে এখানে খরচ খুব কম।

শবোয়া বেশ অমায়িক। ইংরেজী ভাষা জানেন না বলিয়া তাঁর মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জা নাই। দেশী পোষাক পরেন; বিলাতীয়ানার মধ্যে আমেরিকান মোটর-গাড়ী কিনিয়াছেন এবং বিলাতী বীয়ার ও হুইস্কির ভক্ত।



পাহাড়-পথে বিপত্তি

কুমারী শুক্রবার (Misses Ruby, Beauty and Friday)। শেফাঙ্ হইতে নামখাম বেশী দূরে নয়।

আলাপ-পরিচয়ের পর শবোয়া বীয়ার আনিবার আদেশ দিলেন। রাজার গেষ্ট-হাউশের বারান্দায় বসিয়া ক'জনে পানাহার করিলেন। সামনে বাগান, বাগানে ফোয়ারা। ফোয়ারায় জলধারা উৎসারিত হইতেছে। বাগানের মালী জাতে নেপালী। সে আসিয়া অতিথিদের সেলাম করিল, সেলাম করিয়া বলিল—আমি ভারতবর্ষ

ডক্টর ইয়ায়ো অনেক ভাষা জানেন। মাংশীতে হাসপাতাল নাই। এখানে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ-কল্পে আসিয়া তিনি নামখাম হাসপাতাল হইতে এই তিন জন নার্শকে সহায়-স্বরূপ চাহিয়া আনিয়াছেন।

মাংশীর ভাষা শান্‌টিয়ক। নার্শরা এখানকার ভাষা ঠিক বুঝিতে পারে না।

চীনের শান প্রদেশে মাংশী এবং কেংনা বেশ বড় জমিদারী। এখানকার ভূস্বামীরা আমাদের দেশের সামন্ত

রাজাদের মতো শক্তি ও অধিকার ভোগ করেন। রাজ্য-পরিচালনা সম্বন্ধে চীনা গভর্ণমেণ্টকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না; তবে রাজনীতিক ব্যাপারে চীনা সরকারকে মানিয়া চলিতে হয়।

এখানকার পথ-ঘাট নিরাপদ ও সুগম রাখার সম্বন্ধে রাজা ফাঙকে খবরদারী করিতে হয়। তাঁর অধিকার-ভুক্ত প্রদেশে পথচারী যাত্রীদের উপর কোনো অত্যাচার হইলে কিম্বা পথ-ঘাট ভাঙ্গিয়া গাড়ী জখম হইলে ফাঙকে তার জন্য খেশারৎ ও চীনা গভর্ণমেণ্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—এটুকু ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য চীনা গভর্ণমেণ্ট তাঁর কাছ হইতে কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারে না।



ট্রাক-মেরামত

এদিককার মধ্যে মাংশীর পথ-ঘাট শুধু বিশ্রী। চারি দিকে দুর্গম পাহাড়, তার উপর এখানে কুলি-মজুর বড় একটা পাওয়া যায় না। পথ দুর্গম বলিয়া গাড়ী লইয়া দুর্ঘটনা ঘটে নিত্য। কখন কোথায় পাহাড় ধ্বসিতেছে, তার ঠিকানা নাই। এ কারণে নিত্য-দিন এ পথের জন্য মিস্ত্রী-মজুর মোতায়েন রাখা প্রয়োজন। কিন্তু কুলি-মজুরী করিবার মতো লোকের অভাব। এখানকার পথ-ঘাট চার-পাঁচ বছর অন্তর মেরামত করা হয়—তার বেশী মেরামতার ব্যবস্থা দুষ্কর। কারণ, এখানকার অধিবাসীরা ক্ষেত-খামার লইয়া আছে; তারা কুলি-মজুরী করিতে চায় না। চাষবাসের কৃপায় তাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল; সকলেই মাটকোঠায় বাস করে। বাঁশের বেড়া ও খড়ে-ছাওয়া কুটীর এখানে কাহারো নাই।



পথের উপর মামুলি সাঁকো

পথে-ঘাটে কাজ করিবার জন্য ডাকিলে তারা বলে—আমরা যে পথ-ঘাট মেরামত করিব, কে আমাদের ক্ষেত দেখিবে? বহু টাকা পারিশ্রমিকের লোভেও কেহ

ক্ষেত-খামার ছাড়িয়া যাইতে চায় না।

মাংশী ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা পাওশানে আসিলেন; পাওশানে বিমান-পোতের আস্তানা আছে। মাংশী হইতে পাওশান পর্য্যন্ত আসিতে পথে সামরিক রসদ-পত্রের গাড়ী ও বহু ফৌজ-প্রহরীর সাক্ষাৎ মেলে। এ পথ দেখিলে মনে হয়, যেন রণক্ষেত্রে কিম্বা দুর্গে গিয়া এ পথের শেষ হইয়াছে!

মোটর আসিলেও পথে খচ্চরে টানা রসদ-গাড়ীর সংখ্যা প্রচুর। খচ্চর বেচারীরা এখনো মোটর দেখিয়া শায়েস্তা হয় নাই, এ-জন্য মোটর দেখিলে লম্ফে-ঝম্পে যে কীর্ত্তি করে, চালকদের তাহাতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ঘটে।

শুধু মাল বহিবার জন্য বা গাড়ী টানিবার জন্য খচ্চরের প্রয়োজন, তা নয়! খচ্চরে চড়িয়া ভদ্র চীনা নর-নারীরা সফরে বাহির হন—তাহাতে গৌরব ভিন্ন লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই।

মাংশী ত্যাগ করিয়া পাওশানের পথে যাত্রীরা নামিলেন লাঙলিঙে। এখানে চীনা কাষ্টম্‌সের আস্তানা আছে। মোটর-গাড়ীর জন্য এখানে টোল দিতে হয়। ফিরিবার সময় রসিদ দেখাইলে এ টোলের টাকা ফেরত পাওয়া যায়।

লাঙলিঙ অতিক্রম করিলে উর্দ্ধা-বস্থিত এই নূতন পাহাড় পথ হইতে পুরাতন চীনের যে প্রথম-আভাস চোখে সমুদিত হয়, সে আভাসে মন বিমুগ্ধ হয়। এ আভাস দেখিলে বুঝা যায়, হাজার-হাজার বৎসর অতীত হইলেও চীনের দেহে না দেখা দিয়াছে জরার চিহ্ন, না হইয়াছে তার কোনো পরিবর্ত্তন!



কুমারী চুণী, রূপসী-ফ্রাইডে; ডক্টর ইয়াঙ্গো এবং পর্য্যটক ফেন্



পথের পাশে পল্লী

এ পথে ছেলে-মেয়ের খুব ভিড়। মোটর দেখিতে সকলে বাড়ী ছাড়িয়া পথে ছুটিয়া আসিল। চীনা-প্রহরী পরিচয়-পত্র চাহিল। পরিচয়-পত্র দেখিয়া প্রহরী ভেঁপু বাজাইল। অমনি বাড়ী ছাড়িয়া, দোকান ছাড়িয়া,



লাঙ্‌লিঙ্‌ পার হইলে



কান্‌মিঙ্‌—ঘুমন্ত পুরী আজ এই পথের ডাকে জাগিয়াছে।



কুৎকাই : এ পথ বর্ষায় ডুবিয়া যাইত



টালি : দু'পাশে কবর : দূরে দানব-মন্দির

মাঠ ছাড়িয়া কাতারে-কাতারে চীনারা সেখানে আসিয়া হাজির। প্রহরী তাদের বুঝাইয়া দিল—এখানা মোটর-গাড়ী! এ গাড়ী ঘোড়ায় টানে না, ধোঁয়ায় টানে না। এ গাড়ী চলে বিদ্যুতের জোরে। সব হুঁশিয়ার! পথে এ গাড়ীর সামনে কেহ থাকিবে না। এ গাড়ী চলিতে দেখিলে সকলে পথ ছাড়িয়া এক-পাশে সরিয়া দাঁড়াইবে।

তার পর আধ ঘণ্টা ধরিয়া তাদের ডাকিয়া সে গাড়ীর হর্ণ বাজাইয়া শুনাইল; এবং সকলের আমোদ-স্পৃহা মিটিলে প্রহরী গাড়ী ছাড়িতে আদেশ দিল।



মাণ্ডালের রাজকন্যা

দুপুর বেলায় যে পথ মিলিল, সে পথ যেন আকাশের গায়ে গিয়া উঠিয়াছে—অর্থাৎ এ পথের খাড়াই দশ হাজার ফুট। হিম-শীতল বাতাসে হাড়ে কাঁপন লাগে। তেমনি আবার প্রখর রৌদ্র! পথের দু'ধারে উঁচু-নীচু পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের গা তৃণ-শস্যে সুশ্যামল। বড়-বড় দেবদারু গাছের শ্রেণী। পাহাড়ের গায়ে থাকে-থাকে চাষের ক্ষেত—যেন মা-লক্ষ্মী ভাঁজে-ভাঁজে সবুজ আঁচল বিছাইয়া রাখিয়াছেন!



পাওশানের পথে

আধ ঘণ্টা এমনি খাড়া পথে চলিবার পর পথ আবার নামিতে সুরু করিল—২৬ মাইল ধরিয়া উৎরাই! পথ নামিয়া শালউইন নদীর তীরে আসিয়াছে। নদীর বুকে পুল। পুলের পর ওপারে পথ আবার উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এ পথে যে অপরূপ দৃশ্য-মাধুরী, তার তুলনা নাই! ৫৭২ পৃষ্ঠায় পুলের ছবি দেখিলে সে ভীম-কান্ত দৃশ্য-মাধুরীর পরিচয় মিলিবে।

৫৬৯ পৃষ্ঠায় ছবি দেখিবেন, যাত্রীদের মোটর রহিয়াছে পথের উপর এবং ও দিকে উপত্যকা-ভূমির গায়ে গ্রাম-রেখা! এ পথ পঞ্চাশ মাইল-ব্যাপী এবং এ পথ অতিক্রম করিতে পাকা চার ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

শালউইন নদী সাগর-সমতলতার (sea-level) ২৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। নদীর বুকে ঝুলন্ত পুল। পুলটি ২৫০ ফুট দীর্ঘ। পুলের দুই তীরে সশস্ত্র চীনা-প্রহরী



যুনদেশের কুলি-মজুর



ধ্বশা-পথ মেরামত

পুল পাহারা দিতেছে। গাড়ী হইতে নামিয়া বা গাড়ী থামাইয়া পুলটিকে দেখিবেন, সে উপায় নাই! এ পুলের উপরে বা কাছাকাছি গাড়ী দাঁড় করাইবার নিয়ম নাই। গাড়ী দাঁড় করাইলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

পুলের কাছে দু'দিকেই পথ যেমন ভীষণ-খাড়া, সে পথে তেমনি তীক্ষ্ণ বাঁক! এ-জন্য প্রতি বৎসর এখানে বহু বিপত্তি হয়। গাড়ী চালাইবার সময় একটু অসতর্ক হইলেই সর্ব্বনাশ!

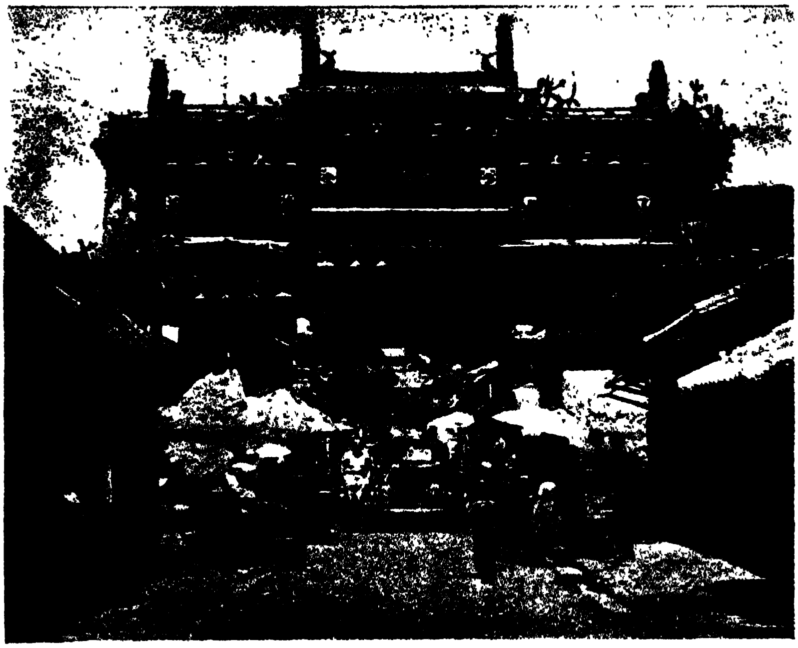
এ পুলের দেড় শত মাইল পরে পাওশান। পাওশান সহরটি পরিখা-প্রাচীরে সুরক্ষিত। এই প্রাচীরে চারটি ফটক আছে। ফটকে সশস্ত্র প্রহরী। তাদের বহু প্রশ্নের জবাব দিয়া তবে এই ফটক দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায়।

নগরের বাহিরে এই যে প্রাচীর, এ প্রাচীর বিশ ফুট উঁচু—বিশ ফুট চওড়া।

পাওশানে অজস্র চায়ের ক্ষেত। য়ুরোপীয়ান এবং আমেরিকান ব্যবসায়ীদের বহু দোকান আছে, কারবার আছে। সিগারেট, আয়না, কাঁচি, ঘড়ি, টিনের কৌটায় ভরা মাছ ও ফল,—

এ সব বিলাতী জিনিষ এখানে প্রচুর পরিমাণে কিনিতে পাওয়া যায়।

পাওশানে এক পাহাড়ের মাথায় প্রাচীন তাওইস্ত্ (Taoist) মন্দির আছে। মন্দিরে আছে ইউ ওয়াঙের বিগ্রহ। মন্দিরের গায়ে স্বর্ণাক্ষরে চীনা ভাষায় লেখা আছে—"এখান হইতে ঈশ্বর খুব কাছে আছেন!" তা'ছাড়া আরো বহু কথা লেখা আছে। কোথাও লেখা আছে—"আন্তরিকতা কখনো ব্যর্থ হয় না!" কোথাও লেখা আছে, "মৃত্যু-দানব ঐ উড়িয়া পলায়, জীবন-দেবতা সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন!" আবার কোথাও লেখা,—"দেবতারা মাথার উপর আকাশে ঐ জাগিয়া আছেন!"



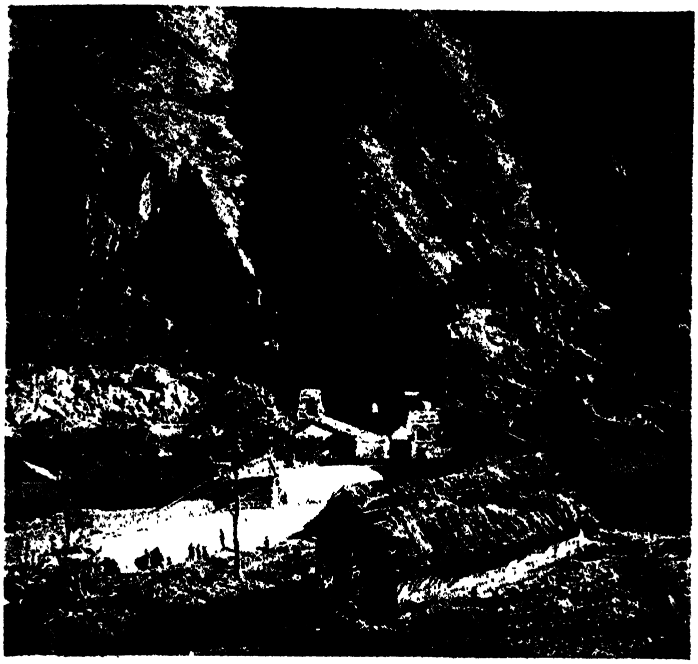
পাওশান্

বড় মন্দিরের বাহিরে কয়েকটি ছোট-ছোট মন্দির আছে। সে সব মন্দিরে গ্রহ-উপগ্রহের বহু বিগ্রহ। বিগ্রহগুলির কাছে বড়-বড় পাত্র আছে। এ সব পাত্রে সর্ব্বক্ষণ ধূপ-ধুনা জ্বালিয়া রাখা হয়।

ধান্য পাওশানের সম্পদ-লক্ষ্মী। ধান্য-সম্পদ প্রচুর বলিয়া এখানে দারিদ্র্য নাই। দারিদ্র্য নাই বলিয়া অভাব নাই এবং সে কারণে



কানমিঙ্ হইতে রেল-পথ খুলিতেছে



শিয়াকওয়ানের পথে

চুরি-ডাকাতির উপদ্রব নাই। পাও-শানে চল্লিশখানি গ্রাম আছে। সব গ্রামই কৃষিজীবীদের হাস্তে-গল্পে-আনন্দে পরিপূর্ণ। কৃষকেরা দরিদ্র নয়; বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। এমন সম্পন্ন কৃষিজীবী পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

এই পাওশানে মার্কো পোলো এক দিন আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে এই পাওশান প্রদেশের ভোচানে বা ইয়াংচাং উপত্যকা-ভূমে বারো হাজার চীনা-তাতারী অশ্বারোহী সেনার হাতে ষাট হাজার বর্ম্মীজ সেনা ভীষণ ভাবে পরাভূত হইয়াছিল। বর্ম্মীজরা হাতী-চড়া ফৌজ আনিয়াও জয় লাভ করিতে পারে নাই।



শালউইনের তীরে গ্রাম

তাতারী-চীনা সেনারা তীক্ষ্ণ তীর ছুড়িয়া হস্তিদের এমন ভয়ার্ত্ত করিয়াছিল যে, তারা এক পা অগ্রসর হয় নাই—ফৌজ পিঠে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

পাওশানের পর বারো মাইল দূরে কাংকো নদী। এ-নদীর বুকেও ঝুলন্ত পুল। এবং পুলের উভয়-তীরে সশস্ত্র প্রহরী।

পুলের পর পথ বহু চড়াই এবং বাঁকে পরিপূর্ণ। তার পর পথ ভালো। কাংকো-নদী পার হইলেই ইয়াংপি। ইয়াংপির পর টালি। টালি পার্ব্বত্যময়। এ পাহাড়ের নীচে যে উপত্যকা - ভূমির উপর দিয়া বর্ম্মা রোড গিয়াছে, সে পথের উভয় পার্শ্বে দু'মাইল ব্যাপিয়া শুধু কবর আর কবর! যেন মৃত সহর পথে - প্রান্তরে পড়িয়া আছে পাহাড়ের কোলে যোল-তলা একটি পাগোডা আছে। এ পাগোডায় আছে দানবের মাথা এবং পুচ্ছ (Dragon's head and tail)! এ দানবের পূজা করিতে হয়; না করিলে দুর্ভিক্ষ, বন্যা এবং মহামারীতে দেশ উজাড় হইয়া যাইবে বলিয়া চীনাদের বিশ্বাস।

শিয়াকওয়ানের পর লুফেঙ্। এই লুফেঙে চীনা-রেশমের আড়ৎ। এখানকার চীনা-রেশম বা চায়না সিল্কের খ্যাতি বিশ্ব-বিখ্যাত। তা'ছাড়া এখানে লবণ-পাহাড় আছে। সে পাহাড় কাটিয়া এখানকার লোক-জন লবণ বহিয়া দেশ-বিদেশে চালান দেয়। লবণের কারবার হইতে যে আয় হয়, তার পরিমাণ সামান্য নয়।

জাপান আসিয়া বাণিজ্যের দিক দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার পূর্ব্বে চীনের বাণিজ্য-সম্পর্ক সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। স্থল-পথে এ বাণিজ্য-সম্পর্ক রক্ষা করিবার দিকে চীনের কোনো আগ্রহ ছিল না। তার কারণ, স্থল-পথে চীন হইতে বাহিরের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক রক্ষা করা দারুণ কঠিন ছিল। রাশিয়ায় যাইবে কি,



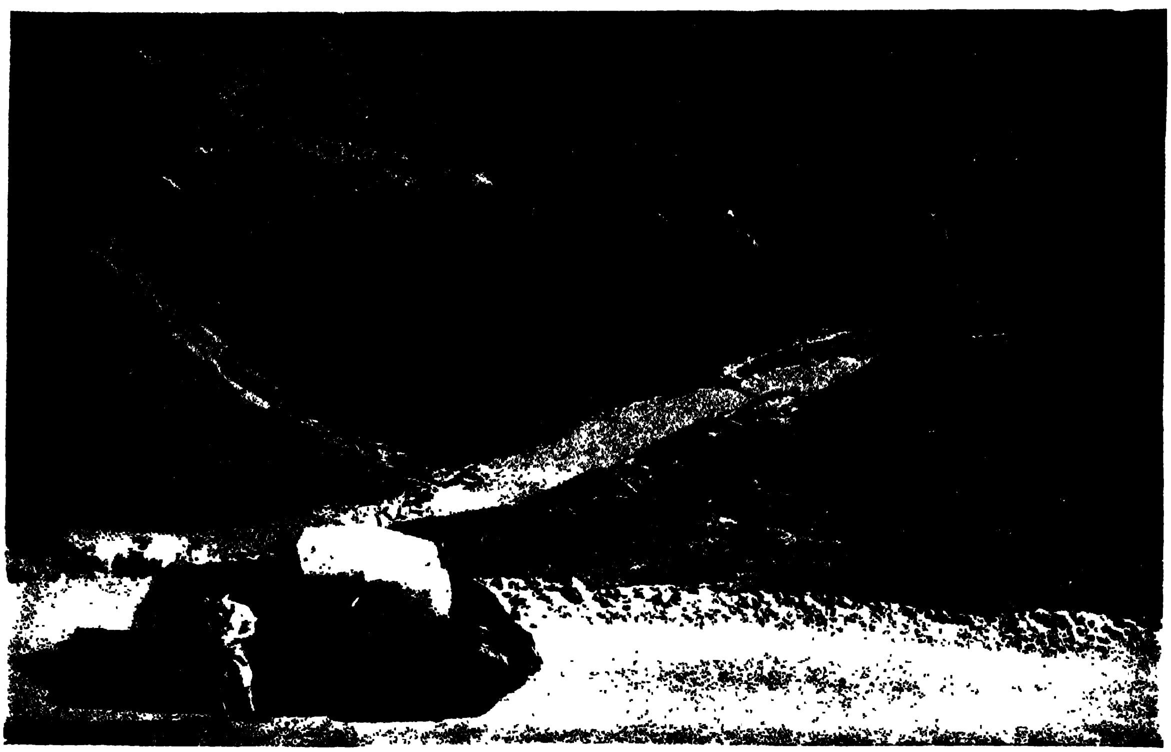
গ্রহ-বিগ্রহ

ও-দিকে যেমন বিরাট-বিশাল মরুভূমি, তেমনি তুঙ্গ গিরি-পর্ব্বতের প্রাচীর। দক্ষিণে অসংখ্য গিরি-পর্ব্বত এবং অসংখ্য ক্রূর নদ-নদী! চীন ছিল নির্ভয়—বিধাতা এমন প্রাচীর দিয়া চীনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন যে, স্থল-পথে কোনো দিক দিয়া শত্রু আসিবে, সে উপায় নাই!

তার পর জাপানের অভ্যুদয় হইল। বাণিজ্য-সম্ভারে জল-পথকে জাপান একেবারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।



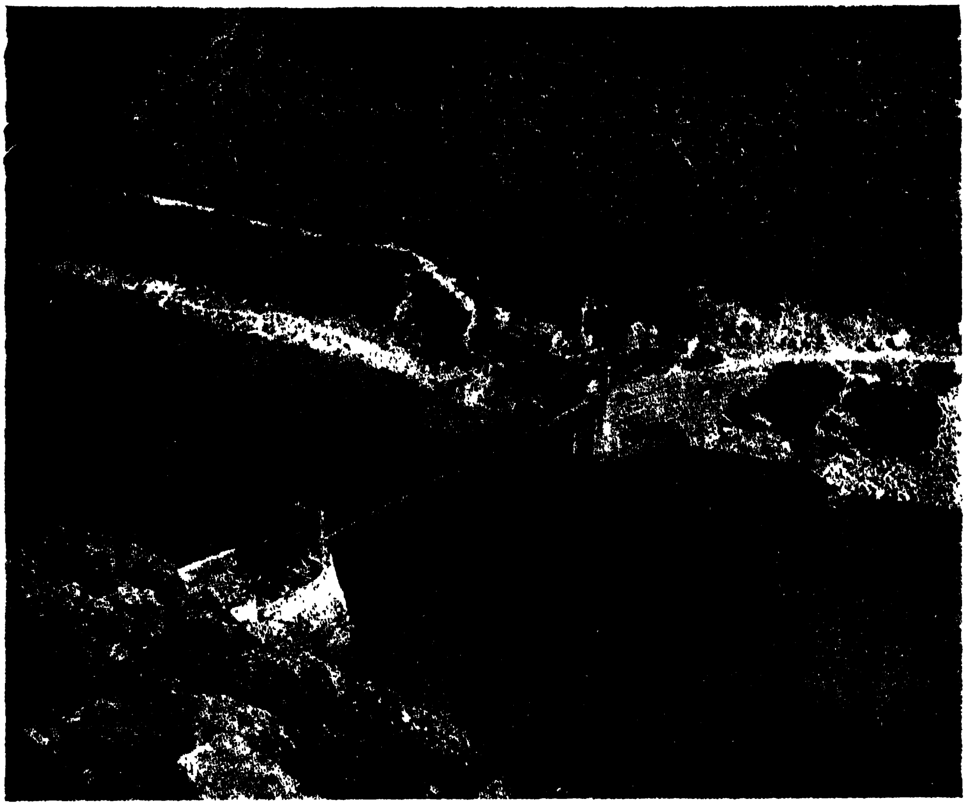
লুফেঙে লবণ-বাহীর দল



শালউইন নদী : ঝুলে সেতু

জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যাপারে চীন টক্কর দিয়া নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না।

তখন চীনার মনে জাগিল বহু বৎসর-পূর্ব্বে-কল্পিত বর্ম্মা হইতে চীন পর্য্যন্ত পাকা সড়ক করিবার বাসনা। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এ পথ নির্ম্মাণের পরামর্শ হয়—ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে। কিন্তু নানা বাধা হেতু এ কল্পনা কোনো দিন সত্য হইয়া দেখা দিবে, এমন আশা ছিল না। এখন মেজর ডেভিশের নির্দ্দেশানুসারে কানমিঙ্ হইতে উত্তরে শিচাঙ্ পর্য্যন্ত রেল-পথ নির্ম্মিত হইতেছে। এ রেল-পথ নির্ম্মিত হইলে শেওয়ান প্রদেশের সহিত ইয়াংসি নদীর সংযোগ সংস্থাপিত হইবে।



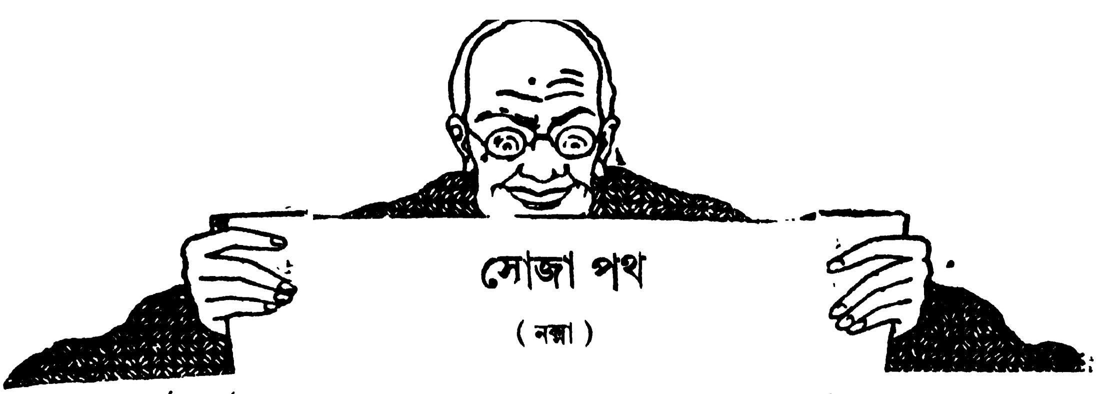
শালউইনের বুকে পুল

তার উপর কানমিঙ্ হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত আকাশ-পথে বিমান-পোত চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। তিনটি বিমান-ষ্টেশন নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু এ তিন ষ্টেশনের অবস্থান গোপন রাখা হইয়াছে।

পাকা-পথ, রেল-পথ ও বিমান-পথ—এই ত্রিবিধ পথে চীন আজ বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তার বিবিধ বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া বাণিজ্যকে সুদৃঢ় ও সহজ করিয়া তুলিবে, সে-আশা দুরাশা বলিয়া মনে হয় না!

জাপান-যুদ্ধের জন্য বহু বিঘ্ন ঘটিতেছে; তবু এ পথ-নির্ম্মাণে চীনা-জাতির উদ্যোগ এতটুকু শিথিল হয় নাই। এ-দিকে যুদ্ধ, ও-দিকে পথ-নির্ম্মাণ—কোনো দিকে চীনা জাতির উৎসাহের সীমা নাই! তার উপর ম্যালেরিয়ার ভীষণ দৌরাত্ম্য! কুলি-মজুর কাজ করিবে কি, ম্যালেরিয়ার বিষে তাদের দেহ জীর্ণ হইয়া গেল! এ ম্যালেরিয়ার প্রতিকার এবং প্রতিষেধ-কল্পেও চীনা জাতি আজ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে! সুতরাং আশা করা যায়, দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যে চীন যে-মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিবে, সে-মূর্ত্তি জরাজীর্ণ থাকিবে না; সে মূর্ত্তি হইবে শক্ত-সমর্থ, সে মূর্ত্তি হইবে পার্থিব ব্যাপারে সচেতন!

পূর্ব্বে বর্ষার সময় বর্ম্মা রোডের কয়েক জায়গা ধ্বসিয়া এ পথ দুর্গম হইত। কিন্তু মামুলি যন্ত্রপাতি লইয়া সাবেকী রীতিতেই চীনা জাতি আজ যে বর্ম্মা রোড গড়িয়া তুলিয়াছে, সে পথ যে সর্ব্বকালে সুগম-স্বচ্ছন্দ থাকিবে, এ পথে যে-সব মার্কিন ও ব্রিটিশ যাত্রী যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁরা তাহা স্বীকার করিতেছেন।



সোজা পথ

(নক্সা)

এত কালের পর দুই ভাই গিরিশ ও হরিশের মধ্যে হঠাৎ প্রচণ্ড মনোমালিন্য ঘটিয়া গেল।

গিরিশ বাগচি ও হরিশ বাগচি সহোদর ভাই। গিরিশ বড়, হরিশ ছোট। বর্দ্ধমান জেলার ময়নাহাটীতে ইহাদের বাস। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে আজ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর হইল, ইহারা বাসগ্রাম ছাড়িয়া বর্দ্ধমান সহরে আসিয়া বাস করিতেছে। হরিশ জমি কিনিয়া এখানেই বাড়ী করিয়াছে বটে, কিন্তু গিরিশ বরাবর ভাড়াটে বাসায় থাকিয়াই 'দিনগত পাপক্ষয়' করিতেছে। দুই ভাই এইরূপ পৃথক্ ভাবে বাস করায়, উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটিবে—এ যাবৎ তাহার অবকাশ বা কারণের উদ্ভব হয় নাই, কিন্তু এত দিন পরে তাহা ঘটিল; উপলক্ষ—স্থানীয় 'বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়'।

এই বালিকা বিদ্যালয়টির 'ম্যানেজিং কমিটীতে' উভয় ভ্রাতা বহু দিন হইতে দুইখানি প্রধান আসন—যেন 'মৌরসী পাট্টা' লইয়া—দখলে রাখিয়াছে। গিরিশ স্কুল-কমিটীর প্রেসিডেণ্ট, আর হরিশ সেক্রেটারী। মুখে ইহারা আক্ষেপ করিয়া বলে,—'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' কাজ; কিন্তু এই দুইটি অবৈতনিক পদকে পরমপদ জ্ঞানে আঁকড়াইয়া ধরিয়া-থাকিবার জন্য উভয়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ দেখিলে মনে হয়, 'বৈতনিক' চাকরীর প্রতিও চাকরীজীবী বাঙ্গালীর অতখানি অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু গিরিশের এত দিনকার একচেটিয়া আসন ও অধিকার, এইবার কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে সহসা খসিয়া গেল, এবং এই সূত্রেই হরিশের সহিত তাহার মনোমালিন্য। গিরিশ বলে, হরিশই গোপনে শলা-পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে স্কুল-কমিটী হইতে তাড়াইল। হরিশ বলে, "যুগধর্ম্ম ক্রমেই বদলাচ্ছে, এখন নতুন-পন্থী লোকদের মনোভাব দিন দিন বদলিয়ে যাচ্ছে; পুরোণোকে তাঁরা আঁকড়ে ধ'রে থাকতে নারাজ, তাই তাঁরা……" ইত্যাদি।

গিরিশ সকলের কাছে হরিশের নিন্দা ও কুৎসা রটাইয়া বলিল, "ও যেখানে থাকবে, তার ত্রিসীমানার মধ্যে আর আমি বাস কোরবো না,—কোরবো না। বর্দ্ধমানে থাকা এই আমার শেষ। ভাগ্গিস্, জমী কিনে এখানে বাড়ী তৈয়েরী কোরে ফেলিনি!"

কানাই ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কোথায় গিয়ে থাক্‌বেন, দাদা?"

"খুব দূরে কোথাও,—যেখানে গেলে আর কখন ওর মুখ না দেখতে হয়।"

নারাণ গাঙ্গুলী বলিল, "যদি বিদেশে গিয়েই থাকতে হয় ত—ওর নাম কি, সাহেবগঞ্জে গিয়ে থাকুন; 'ফাষ্ট কেলাস' জায়গা। সামনে গঙ্গা, পেছনে পাহাড়; জিনিস-পত্তোর সবই অসম্ভব রকম সস্তা! আর জল-হাওয়া একেবারে…ওর নাম কি—"

প্রফুল্ল সাঁতরা পরামর্শ দান করিল, "হিঁদু হোয়ে সায়েব-ফায়েবে দরকার কি? কাশী—কাশী—শিবধন্য কাশী! বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ছেড়ে থাকতে হোলে, একমাত্র শ্রেষ্ঠ স্থান—কাশী। শাস্ত্রেই ব'লেছে—বারাণসীই বার্দ্ধক্যের আশ্রয়।"

গিরিশ বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া সত্যই চলিয়া গেল; তবে—সাহেবগঞ্জও নয়, কাশীও নয়। গিরিশ গিয়া উঠিল—পুরী। সাক্ষাৎ জগন্নাথের লীলাভূমি, সমুদ্র-তট… গৃহিণীর ইচ্ছা না হয়, রন্ধন না করিলেও উদরের জন্য কোন দুশ্চিন্তা নাই, পয়সা ফেলিলেই আহারের যোগাড় হইতে পারে। জিনিস-পত্রও……।

গিরিশ খায়-দায়, ঘুরিয়া বেড়ায়। সকাল-বিকাল

সমুদ্রের ধারে গিয়া বসে। সন্ধ্যায় জগন্নাথের মন্দিরে সস্ত্রীক আরতি দর্শন করে।

এইরূপে পুরীতে মাস-দুই কাটিবার পর, এক দিন স্ত্রী শৈলরাণী কহিল,—"আমার বাঁ-পাখানা ক'দিন ধরে কেমন যেন ভারী-ভারী ঠেকচে; ভয় হয়, বাত-টাত কিছু হবে না কি ?"

গিরিশ একটু ভয়-তরাসে লোক; কহিল,—"সে আবার কি গো! এই বেলা তা হোলে একটা কোন ব্যবস্থা করতে হয়।"

সেই দিনই গিরিশ প্রতিবেশী এক কবিরাজের নিকটে গিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ-প্রার্থী হইল। কবিরাজ নগদ এক মুদ্রার বিনিময়ে এক শিশি তৈল দিয়া কহিল,—"সকাল-বিকেল বেশ ক'রে এইটে মালিশ করাবেন। দেখবেন—খু-উ-ব সাবধান! এই রোগটাই এখানে বড্ড প্রবল কি না।"

"কোন্ রোগটা ?"

"এই পা-ফোলা; পথে বেরিয়েই দেখ্‌তে পান না? আয়ুর্ব্বেদে যাকে আমরা বলি—শ্লীপদ।"

"বলেন কি? গোদ!"—গিরিশের স্বর ভয় ও বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

কবিরাজ কহিল,—"ওই রোগ আর অর্শ, এ-দুটো এখানে ঘরে-ঘরে বল্লেই হয়।"

গিরিশ উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কিত চিত্তে তেলের শিশিটা হাতে লইয়া বাসায় ফিরিল: এবং তিন দিন ধরিয়া সন্ত্রস্ত মনে এই বিষয়ে ভাবিবার ফলে, ইহাই সাব্যস্ত করিল যে, পুরীতে আর থাকা চলিবে না, স্থানান্তরে পলাইতে হইবে। জগন্নাথ না করুন, যদি তাহাদের স্বামিস্ত্রী দু'জনেরই শ্রীপদে এই অতি অশ্লীল শ্লীপদ রোগটা হয়, তাহা হইলে লোকসমাজে আর চলা-ফেরা করা চলিবে না; দিন-রাত দু'জনে ঘরের মধ্যে মুখো-মুখী বসিয়া থাকিতে হইবে। আর তা ছাড়া, যদি কখনো হরিশের সঙ্গে বা বর্দ্ধমানের আর কাহারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা মনে-মনে খুব এক চোট হাসিয়া লইবে, আর বলিবে—এখানে আসিয়া সেখানকার পদচ্যুতির লোকসানটা এইরূপ পদবৃদ্ধি দ্বারা পোষাইয়া লইল! তার উপর, অর্শ রোগটিও বড়-একটা কেও-কেটা ন'ন; একবার তাঁহার হুদার ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিলে বংশানুক্রমে তিনি কায়েমী পাট্টা লইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, আর তার জ্বালা-যন্ত্রণাও তুচ্ছ নয়।

সুতরাং দুই-এক দিনের ভিতরেই গিরিশ আবার তল্পি-তল্পা বাঁধিতে মনঃসংযোগ করিল।

২

"কোন সংবাদ না নিয়ে, এখানে আসাটা আপনার ঠিক কাজ হয়নি।"

"কাশী হোল পরম তীর্থস্থান, অন্নপূর্ণার রাজত্ব,—এর আর সংবাদ নোব কি বলুন ?"

"কিন্তু রাজত্ব যে বেরী-বেরীতে লোপ পাওয়ার দাখিল, এ ত সকলেই জানে; আপনি কি এ খবর জানতেন না ?"

"জানলে কি আর এ-মুখো হ'তাম মশায়! এ যে দেখচি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!"

কাশীর চৌষট্টি যোগিনীতে একটি বাড়ীর একখানি ঘরে বসিয়া, গিরিশ ও একটি ভদ্রলোকের এইরূপ আলাপ চলিতেছিল।

আজ পাঁচ-ছয় দিন হইল, গিরিশ কাশী আসিয়াছে; আসিয়াই দেখিল, প্রত্যেক মহল্লার প্রায় প্রতি-ঘরই বেরী-বেরীতে আক্রান্ত! নিশাবসানের পর ঝটিকা-তাড়িত ফুলবাগানের যে অবস্থা হয়, কাশীর বর্ত্তমান অবস্থা তদ্রূপ।

গিরিশের কথায় ভদ্রলোকটি কহিলেন—"যা'ক, অত ভয় পাবেন না; যখন এসে প'ড়েচেন, তখন বিশ্বনাথের নাম কোরে থেকে যান, কোন বিপদ হ'বে না।"

কিন্তু গিরিশের কান এখানে থাকিলেও, মন এখানে ছিল না। তাহার মন ঘুরিতেছিল তখন—বৈদ্যনাথ, মধুপুর, গিরিডি, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে। কোথায় পালানো যায়? কোথায় গিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে ও সুস্থ-দেহে জীবনের বাকী ক'টা দিন কাটানো যায়?

সেই দিনই গিরিশ আবার বিছানা-পত্র বাঁধিল এবং ডিহিরি-অন্-সোনের দুইখানি টিকিট কিনিয়া আনিল। মনে মনে ভাবিল,—"এ-ই সব-চেয়ে ভাল। খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। শরীরটা ভাল থাকবে। কোন ভীড় নেই,

গোলমাল নেই, ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট্ নেই। আমার পক্ষে ডিহিরিই উপযুক্ত জায়গা।"

বাড়ীওলা নন্দকিশোর বাবু বলিলেন,—আমাকে একটিবার জিজ্ঞাসা করলেন না, তাড়াতাড়ি 'ডিহিরি'র টিকিট কিনে আনলেন ?"

গিরিশ স-ভয়ে কহিল,—"কেন, হোয়েচে কি ?"

"ডিহিরিতে গিয়ে কিছু দিন বাস করার অর্থ—অপঘাত মৃত্যু !"

"অ-অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ—যায়গাটি সাংঘাতিক কাঁকড়া-বিছে আর 'করেঠি' সাপের আড্ডা ! ঘরে-দোরে-উঠোনে, রান্না-ঘরে, বিছানা-মাদুরে সর্ব্বত্র। আর সাংঘাতিক বিষাক্ত !"

"এমন ব্যাপার ?"

"তার পর, জিনিস-পত্তর কিছুই ওখানে পাবেন না। না পাবেন—মাছ-মাংস, না পাবেন ভালো তরি-তরকারী, না পাবেন পছন্দমত কাপড়-চোপড়।"

সুতরাং 'ডিহিরি'ও বাতিল হইল।

সে-দিন বাধ্য হইয়া গিরিশকে কাশীতেই কাটাইতে হইল। পরদিন গিরিশ মুঙ্গেরের টিকিট কিনিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিল।

মুঙ্গেরে সুবিধামত একটি বাসা পাইয়া, এত দিন পরে গিরিশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিল, এইবার ভগবান ঠিক জায়গায় এনে ফেলেচেন। সর্ব্বাংশেই মনোরম স্থান। আহা-হা, গঙ্গার কি মনোহর দৃশ্য রে! আর কুয়োর জলই বা কি চমৎকার! যা খাও, সঙ্গে-সঙ্গেই সব হজম! আর জিনিস-পত্তরই বা সস্তা কত! তা ছাড়া, ঐতিহাসিক স্থান; সাধে কি নবাব এখানে রাজধানী ক'রেছিলেন!—পরদিনই গিরিশ কষ্টহারিণী-ঘাটে স্নান করিয়া এত দিনের ঘোরা-ঘুরির কষ্ট ভুলিয়া গেল।

মুঙ্গেরে এক মাস গিরিশের মহা-আনন্দেই কাটিল। কিন্তু তাহার পর হঠাৎ এক দিন——

হঠাৎ এক দিন গিরিশ এক স্বপ্ন দেখিল।

স্বপ্ন দেখিল যে, সে এক রাজবাড়ীতে কোন উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে। রাজপ্রাসাদ আলোক-মালায় উদ্ভাসিত; চারি দিক পত্র-পল্লব-পুষ্পগুচ্ছে সুসজ্জিত; সুখস্পর্শ মৃদু-মধুর বায়ু-হিল্লোল সৌরভাকুল; সকলেই মনোহর, সুদৃশ্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া—আনন্দ-রস-পানে পরিতৃপ্ত; নৃত্য-গীত-বাদ্যের শ্রুতি-সুখকর ধ্বনিতে উৎসবমণ্ডপ প্রতিধ্বনিত।—এমন সময় সহসা বিশাল প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিল, এবং সেই প্রবল কম্পনে, সুবর্ণ-সূত্রগ্রথিত কারুকার্য্যময় মকমলমণ্ডিত মহামূল্য বিচিত্র আসন হইতে গিরিশের পতন! পতনের ফলে, তাহার নিদ্রার সঙ্গে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

বোধ হয়, তখন মধ্যরাত্রি; কিন্তু সেই রাত্রিতে আর গিরিশের ঘুম হইল না। সারা-রাত ধরিয়া সে কেবল সেই স্বপ্নের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। কোথায় এই রাজপ্রাসাদ? কিসের উৎসব? হঠাৎ প্রবল কম্পনই বা কেন? ভূমিকম্প কি?—

এ কি নিছক স্বপ্নমাত্র, না সত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে? কোন অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাস নয় ত? বিহারের সেই মারাত্মক ভূমিকম্প ত এই সব অঞ্চলকেই একেবারে···। একবার যখন হোয়েছে, তখন আর যে হবে না, তার নিশ্চয়তা কি? হিমালয়ের শেকড় না কি এই অঞ্চলেরই মাটীর ভেতর দিয়ে গিয়েচে। সুতরাং তা বর্ত্তমান থাকতে··· !! একটা ভয়ানক আশঙ্কায় ও উদ্বেগে বাকী রাত গিরিশ জাগিয়াই কাটাইল। খুব ভোরে সে শৈলরাণীর গা ঠেলিয়া ডাকিল—"ওগো, ওগো শুনচো ?"

শৈলরাণীর তখন অবস্থা—'কেবা আঁখি মেলে রে !' সে বলিল, "কি ব'লচ ?"

"মুঙ্গেরে আর থাকা চলবে না; আজই-স'রে প'ড়তে হবে।"

শৈলরাণী ভয়ঙ্কর খাপ্পা হইয়া কহিল,—"তুমি যে দেখ্‌চি, বেজায় জ্বালাতন আরম্ভ ক'রলে! যেখানে যেতে হয়, যাও তুমি, আমি এখান থেকে নড়চি-নে।"

"এখানে কি আর থাকতে পারবে? ভূমিকম্পে ঘর-চাপা প'ড়ে জ্যান্ত কবর হ'য়ে যাবে যে!—ওঠ, ওঠ! এই সকালের ট্রেণেই পালাবো। কেন না, হিমালয়ের মূল-শেকড একবার যখন ক্ষেপেচে, তখন যে-কোন মুহূর্ত্তে আবার ক্ষেপে উঠতে পারে !"

"উঠুক। ভূমিকম্পে চাপা যদি পড়ি ত প্রাণটা

বাঁচে ; তা হোলে আর নিত্যি এমনি কোরে চরকীর মত এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে মোরতে হয় না।"

শৈলরাণী মুদিত নেত্রে পাশ ফিরিয়া শুইল ; উঠিল না। না উঠিলেও গিরিশ উঠিল, এবং মুখ-হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইবার জন্য বাহিরে আসিল। মনে-মনে কেবলই বলিতে লাগিল,—"বেহারে আসাটা খুবই অবিবেচনার কাজ হোয়েচে ; ভূমিকম্পের কথাটা আমার মোটেই মনে ছিল না।"

সঙ্গে-সঙ্গে ডি, এল, রায়ের সেই গানটা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—'বিহারে বিঘোরে চড়িয়া এক্কা'—ইত্যাদি।

৩

সেই দিনই রাত্রে গিরিশ কলিকাতায় আসিয়া-পড়িয়া ভয় ও উদ্বেগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। অন্য কোথাও না গিয়া, যদি সে প্রথমেই এখানে আসিত, তাহা হইলে এত এ-দেশ সে-দেশ ঘোরা-ঘুরি ও অর্থ নষ্ট হইত না। কলিকাতাই বাঙ্গালীর বাসের উপযুক্ত স্থান ; বাঙ্গালীর স্বর্গ। বাঙ্গলার হাজার হাজার পল্লীগ্রামকে উৎসন্ন দিয়া, সেই মূল্যে যে স্বর্গ—অমরার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী!' সুতরাং গিরিশ তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া, মনে-মনে স্থির করিল, আর কোথাও নয়, যত দিন বাঁচিবে, কলিকাতাতেই থাকিবে।

মাস পাঁচ-ছয় পরে এক দিন সকালে গিরিশ দৈনিক সংবাদপত্র হস্তে লইয়া বিরস-বদনে বৈঠকখানায় বসিয়া-ছিল। শৈলরাণী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "আজ আর চা-এর তাগিদ নেই কেন গো? চা যে জুড়িয়ে গেল!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিরিশ কহিল,—"চা? ওঃ! তা'…আচ্ছা…চা……"

রাস্তার দিকের দরজা ঠেলিয়া পাশের বাড়ীর যোগেশ বাবু প্রবেশ করিল, এবং শৈলরাণী তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। যোগেশ কহিল, "দাদা, কাগজে দেখলেন বোধ হয়—'ব্ল্যাক-আউট' ; সন্ধ্যা থেকে রাত দুপুর পর্য্যন্ত! ব্যাপার গুরুচরণ!"—বলিয়া হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

বিমর্ষ চিত্তে গিরিশ কহিল, "জান্‌লা খোলাও ত নিষেধ!"

"নিষেধ বই কি! এটা পরীক্ষার ব্যাপার কি না। অর্থাৎ ওপর থেকে কোন রকমে আলো দেখা যা'তে না যায় ; আর তা ছাড়া, ব্যাটারা যদি গ্যাস্‌-বোমাই ফেলে, তা হোলে ত জানালা বন্ধ রাখতেই হবে কি না, মায় 'ভেন্টিলেটার' শুদ্ধ।"

গিরিশের মুখখানা রক্তশূন্য হইয়া পড়িল ; কহিল,—"গ্যাস-বোমা ফেললে ত সব দম্ আটকে মরতে হবে। জানলা বন্ধ রাখলেও ফাঁকে-ফোঁকে গ্যাস্ ঢুকে পড়বেই!"

"রাত্রে কি আর বাড়ীতে থাকা চলবে! জায়গায়-জায়গায় 'শেল্‌টার' হবে, সেইখানে গিয়ে রাত্রে সব থাকতে হবে। চিন্তার বিশেষ কিছু নেই। আগে থাকতেই এ, আর, পি, তোড়-জোড় বন্দোবস্ত সুরু কোরে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, গ্যাস্ ছাড়তে পারে কি?"

"জার্ম্মাণ ব্যাটারা অ-মানুষ ; ওরা সবই পারে।—হ্যাঁ দাদা, আজ বায়োস্কোপে যাবেন বলেছিলেন, যাবেন ত?"

সম্মুখের দেওয়ালের কোণটাতে গিরিশের দীপ্তিশূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তেমনি ভাবে সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"না।"

"হ্যাঁ, ভাল কথা ; রবিবার দক্ষিণেশ্বর যাবার গাড়া আমি ব্যবস্থা ক'রে ফেলেচি ; ক'টায় এখান থেকে বেরোনো হবে, বলুন?"

তখনো গিরিশের দৃষ্টি সেই দেওয়ালের কোণে ; কহিল,—"আমি যাব না।"

"যাবেন না?"

অনিচ্ছাসূচক ঘাড় নাড়িয়া, গিরিশ উঠিয়া দাঁড়াইল! যোগেশ কহিল—"উঠ্‌ছেন না কি?"

"হ্যাঁ ; শরীরটা আজ বড্ড খারাপ।"—বলিয়া গিরিশ রাস্তার দিকের দুয়ারে খিল লাগাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল, এবং বারান্দার আরাম-কেদারাখানার উপর চক্ষু বুজিয়া ঢলিয়া পড়িল।

বৈকালের দিকে গিরিশ হঠাৎ তেজস্বী হইয়া উঠিল। শৈলরাণীর কাছে গিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিল,—"আমার হোয়েচে কি জান? 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে'—তাই! কোন্ শা—আর এখানে থাকে?"

হঠাৎ গিরিশের এই ভাবের কথায় শৈলরাণী চমকাইয়া উঠিল ; কহিল,—"ব্যাপার কি ? কি হোয়েচে ?"

"হোয়েচে অনেক কিছুই ; আরও হয় ত হবে। কিন্তু আর হ'তে দিচ্চি নে। চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে এসে, পাপ যা করবার তা ত করেইচি, কিন্তু আর সে পাপ বাড়াচ্চি নে! আমি কারও কথা শুনচি নে! গুরুদেব এসে বারণ ক'রলেও, না! যাবই ; শম্মাকে কেউ এখানে আট্‌কে রাখতে পারবে না।"

কথার অর্থ কিছুই শৈলরাণী বুঝিতে না পারিয়া, গিরিশের মুখের প্রতি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

৪

আবার বর্দ্ধমান জিলার সেই ময়নাহাটী গ্রাম।

সকাল বেলায় গিরিশ তাহার বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ও-পাড়ার দেবেন কুণ্ডুর সহিত কথা কহিতেছিল।

গিরিশ কহিল,—"ম্যালেরিয়াতে ভুগতে হয় ভুগবো, কিন্তু গাঁ ছেড়ে আর কোথাও যাবো না—এ একেবারে স্থির কোরে ফেলেছি।"

দেবেন কহিল,—"গাঁ-ও ছাড়বার দরকার হবে না, আর ম্যালেরিয়াতেও ভুগতে হবে না,—সুন্দর যখন উপায় র'য়েচে। গাঁয়ের লোক কেউ কখনো আমাকে ম্যালেরিয়ায় ভুগতে দেখেচে ?"

"উপায়টা কি ?"

"উপায় ?—উপায় একটু কোরে রোজ—" বলিয়া দেবেন মুখের উর্দ্ধে হাতের মুঠাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া ইঙ্গিত করিল।

গিরিশ কহিল,—"মদ ?"

"হ্যাঁ। ম্যালেরিয়া জব্দ ওর কাছে। অর্থাৎ যে-কোন একটা নেশা করলে, ম্যালেরিয়া আর কাছে ঘেঁস্‌তে পারবে না। আমি এই ম্যালেরিয়ার মধ্যে থেকে, শুধু ওরই জোরে বেঁচে আছি ; এবং বেশ ভাল-ভাবেই বেঁচে আছি ; দেহখানি আমার দেখচ ত ? ময়না-হাটী যেন আমার পক্ষে দার্জ্জিলিং! সত্যি কি না বল ?"

অতঃপর চা আসিল, ছিলিমের পর ছিলিম তামাক আসিল ; এবং উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া আলাপ-আলোচনা চলিল।

সন্ধ্যার সময় গিরিশ ও-পাড়ায় দেবেন কুণ্ডুর বাড়ী বেড়াইতে গেল। যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার চিরকালের অটল পদদ্বয় ঈষৎ টলিতেছিল, এবং চক্ষু দুইটি খুবই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শৈলরাণী সম্মুখে আসিলে, হাত নাড়িয়া গানের সুরে কহিল,—

"মরমে মরিতে সখি, যদি চিরদিন পার—
যতনে তোমারি পায়ে দিব প্রেম উপহার।"

কণ্ঠস্বরও কিঞ্চিৎ টলায়মান!

শৈলরাণী কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া গিরিশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর কহিল,—"কি বিট্‌কেল্ গন্ধ গো! মদ গিলে এসেছ না কি ?"

জড়িত কণ্ঠে গিরিশ বলিল,—"খেয়েচিই ত ; আলবৎ খেয়েচি। ম্যালেরিয়াকে দেখে নোবো। ঠিক দে—খে নো-ওব। দেবেন ইজ্ মাই ফ্রেণ্ড—মাই বুজুম্ ফ্রেণ্ড! (সুরে) 'সুরাপান করি নে আমি, সুধা খাই মা তারা ব'লে'।"

ক্রোধ, বিষাদ এবং ভয়—একসঙ্গে শৈলরাণীর মনে উদয় হওয়ায়, তাহার মুখ অস্বাভাবিক একটা গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইল। আর একটিও কথা না বলিয়া শৈলরাণী কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

অতি শীঘ্রই ম্যালেরিয়াকে তাড়াইবার কৌশলটি গিরিশের উত্তমরূপে আয়ত্ত হইয়া গেল।

মাস-খানেক পরে এক দিন গিরিশ পাশের গাঁয়ের রজনী মালাকারের পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে গেল। রজনী আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশ্যে পুকুর-ঘাটে গিরিশের পাশে আসিয়া বসিয়া কহিল,—"মাছ ঠাসা আছে দা'-ঠাকুর, আপনার ভাগ্যে এখন কি হয়।"

ফাত্‌নার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গিরিশ বলিল,—"আচ্ছা রজনী, পুকুরের পাড়গুলো বনে-জঙ্গলে এমন ভরিয়ে রেখেছ কেন ? একটু সাফ্-সোফ্ ক'রে রাখতে হয়।"

"পারি না দা'ঠাকুর! একলা লোক, ক'দিক্ দেখি বল ? বাড়ী ত হাসপাতাল ; ঘুরে-ফিরে সকলেই পড়চে। আমিই যা ভাল আছি। তা, তাদের দেখবো, না পুকুর দেখবো ?—ম্যালেরিয়াতেই সব মাটি করলে!"

"তোমায় বুঝি ম্যালেরিয়ায় কিছু করতে পারে না ?"

"আমি চার টাইম চার ছিলিম সে জিনিষ ওড়াই দা'ঠাকুর! ম্যালেরিয়ার চোদ্দপুরুষ আমার এলাকার মধ্যে ঘেঁসতে পারে না।"

"তা ঠিক বলেছ; মদ, গাঁজা, আর আফিং—এ-তিনের কাছে ম্যালেরিয়ার প্রবেশ নিষেধ। আমি তাই, রজনী, রোজ একটু,—তোমার গিয়ে, ইয়ে ধরেছি।"—বলিয়া মুখের উপর মুষ্টিবদ্ধ হস্ত রাখিয়া ঈঙ্গিতে 'ইয়ে'র স্বরূপ জ্ঞাপন করিল।

রজনী লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "অমন কাজটি কোরো না দা'ঠাকুর; লিবারের মাথা খেতে ওর মতন আর কিছু নেই। আমার শালা অন্নদা ও-ই খেয়েই ত শিংএ ফুকলো।"

"অন্নদা মরে গেছে? সে ত তোমার এইখানেই থাকত গো! প্রায়ই তাকে বর্দ্ধমানে দেখ্‌তুম।"

"হ্যাঁ; আমার মামলা-মকদ্দমাগুলো সে-ই তদ্বির করত কি না। বয়েস তার বেশী হয়নি—বছর বত্রিশ। কিন্তু রোজ ওই জলপথের অভ্যেস ক'রে চুলগুলো তার অকালে গেল পেকে, মনে হ'ত ষাট বছরের বুড়ো!"

"ওতে বুঝি চুল পাকায়?"

"চুলও পাকায়, লিবারও পাকায়, আর পরপারের যাত্রার আয়োজনটাও বেশ ভাল রকমই পাকিয়ে তোলে।"

"বল কি?"

"তাই ত বলছি; ও জিনিষটি দা'ঠাকুর, এই দণ্ডেই ত্যাগ কর। ক'রে—আমার এই ডাঙ্গাপথ ধর। এ হোল-গিয়ে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের ত্বরিতানন্দ, এর আর জোড়া নেই, দা'ঠাকুর!"

গিরিশের চক্ষুর্দ্বয় ফাত্‌নার দিকে থাকিলেও মন তাহার সম্ভবতঃ কৈলাসে শিবের আস্তানার চারি পাশে উঁকি-ঝুঁকি দিতেছিল। কখন যে ইতোমধ্যে চারের কাছে ভুড়-ভুড়ি তুলিয়া একটা বড় মাছ আসিয়াছিল, কখন যে সে ফাত্‌না ডুবাইয়াছিল, এবং কখন যে টোপটি উদরস্থ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, এ সকল বিষয়ে গিরিশের লক্ষ্য ছিল না। সে অকারণে এবং অসময়ে যখন সজোরে একটা খ্যাঁচ্‌ মারিল, তখন উঠিল—এক দশরথ! ছিপ্‌ গুটাইতে গুটাইতে গিরিশ কহিল,—"নাঃ, লক্ষণ ভাল নয়, আজ আর কিছু হবে না।"

অতঃপর উভয়ে উঠিয়া রজনীর বৈঠকখানায় গিয়া বসিল, এবং আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। ঘণ্টা-খানেক পরেই কৈলাসের প্রসাদের স্বাদ গ্রহণ করিয়া ঘূর্ণায়মান মস্তিষ্কে গিরিশ গৃহে ফিরিবার উদ্দেশ্যে গাত্রোত্থান করিল।

৫

মাসখানেক পরের কথা।

বিকালে শৈলরাণী দরজা ঠেলিয়া দালানে প্রবেশ করিবামাত্র নাক-মুখ সিঁটকাইয়া বিরক্ত চিত্তে বলিয়া উঠিল—"মা গো! মড়া-পোড়া চাম্‌সে গন্ধে বাড়ীতে টেঁকা ভার হোল দেখ্‌চি!"

'বড়-তামাকের' ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া দালানের বাতাসে তখনো কিছু-কিছু ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। গিরিশ তাড়াতাড়ি পাখাখানা দিয়া ধোঁয়াগুলাকে বাহির করিয়া দিতে-দিতে কহিল,—"নতুন কি না, তাই তোমার একটু ইয়ে লাগ্‌চে—ক্রমে গন্ধটা অভ্যেস হোয়ে যাবে শৈল!"

মুখ-ঝাম্‌টা দিয়া শৈল কহিল—"বেশ ছিলুম বর্দ্ধমানে। সাত দেশ ঘুরে, সাত ঘাটের জল খেয়ে, এ যেন মড়া-শ্মশানের মধ্যে বাস করতে হচ্চে! কত পাপই ক'রে-ছিলাম, তাই ভাবি।"

"শ্বশুরবংশের ভিটে শৈল, এ তোমার তীর্থ; মড়া-শ্মশান বল্‌তে নেই, অকল্যাণ হয়।"

"তীর্থকে যে মড়া-শ্মশান তুমিই কোরে তুল্লে,—তা বোলবো না?"

হঠাৎ গিরিশের মাথা গরম হইয়া উঠিল। এখন এই রকমই হয়। সেই মাছ ধরিবার দিনের পর হইতেই গিরিশ সামান্য একটু প্রতিবাদেই হঠাৎ এইরূপ রাগিয়া উঠে। চোখ দুইটা রক্তবর্ণ করিয়া, খানিকক্ষণ শৈলরাণীর মুখের দিকে কট্‌-মট্‌ করিয়া চাহিয়া থাকিবার পর উচ্চ কণ্ঠে কহিল,—"বলতে পাবে না—আমার হুকুম, ব-ল-তে পা-বে—না!"

"আলবৎ বোলবো, একশোবার বোলবো!"—বলিতে বলিতে শৈলরাণী দালান হইতে বাহির হইয়' গেল।

তার পর গিরিশের বারুদ-খানায় যেন আগুন লাগিল। সমস্ত বাড়ী কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"হাম্ নেহি মাংতা হায়; নিকাল যাও পাজি কোথাকার! দূর হোয়ে যাও!"

শৈল ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"এইবার ঠিক গাঁজা-খোর মানিয়েচে তোমায়! ছিঃ-ছিঃ! তুমি এমন ইতর হোয়ে পড়লে শেষটা!"

গিরিশ আরও জ্বলিয়া উঠিল। রাগের মাথায় জলের কুঁজোটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিল, আল্‌নার একখানা কাপড় ফালা-ফালা করিয়া ছিঁড়িল, পানের ডাবরটাকে ফুটবলের মতো দেয়ালের দিকে সজোরে 'কিক্' করিল, হ্যারিকেনটাকে আছাড় দিয়া চূর্ণ করিল।

বেগতিক বুঝিয়া, শৈল খিড়কী দিয়া পাশের প্রসন্ন স্বর্ণকারের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর প্রসন্ন গিরিশের উদ্দেশে উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"দা'ঠাকুর, কোথায় গো?"

উভয়ে দালানের মধ্যে গিয়া বসিলে, প্রসন্ন হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আজ দা'ঠাকুর, ক্ষেপেছিলে কেন গা?"

প্রসন্ন শৈলরাণীর কাছে বিকালের ব্যাপার সবই শুনিয়াছিল। কহিল,—"ওটা ছেড়ে দাও, দা'ঠাকুর! একেবারে চোয়াড়ে নেশা! ও দ্রব্যটি মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া কারো হজম ক'রবার শক্তি আছে? ওর পরিণাম বড় ভীষণ! ওই কালী চক্কোত্তি শেষ কালে রক্ত-বাহ্যে করতে-করতে কাছা হাতে ক'রেই হার্টফেল কোরলে! ও যারা খায়, তাদের ওইতেই মরতে হয়।"

এ সম্বন্ধে প্রসন্ন আরও বহু উদাহরণ দিল এবং ইহার অপকারিতা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিল। সমস্ত শুনিয়া গিরিশ মনে মনে বিচার করিয়া দেখিল, প্রসন্ন যাহা বলিতেছে, তাহা অসত্য নহে। দ্রব্যটির সম্বন্ধে সে এইবার বিশেষরূপে ভীত হইয়া পড়িল। সন্ত্রস্ত চিত্তে প্রসন্নর দিকে চাহিয়া কহিল, "তা, হ্যাঁ রে পেস্‌না, রজনী মালাকর তো খায়, কিন্তু সে তো দিব্যি আছে।"

"দিব্যি নেই দা'ঠাকুর! ওর খবর আমি সব জানি। বছরের ভেতর ছ' মাস রক্ত-আমাশায় ভোগে; তার পর এক দিন ঐ-রোগেই ওকে ঐ শিঙের মতো কলকে-ফোঁকা ছেড়ে, সত্যিকারের শিঙেই ফুঁকতে হবে।"—খানিক থামিয়া প্রসন্ন বলিয়া যাইতে লাগিল, "তুমি একটু ক'রে আফিং ধর দা'ঠাকুর! এই মটর-ভর। সব চেয়ে সেরা নেশা। মজা-শুকোয় সমান মস্‌গুল! জান ত, আমি আজ এগার বচ্ছর ঐ কালা-মাণিকের প্রেমে মোজেছি, আর এই জন্যই সুস্থ শরীরে আজও বেঁচে আছি। একটু বেশী বয়েসে ও-যে কত উপকার দ্যায়, তা আর বলবার নয়। আমি ত দা'ঠাকুর, বল্‌তে গেলে ওরই বলে যেন নবজীবন পেয়েছি। আর তা ছাড়া, আফিংটা হোল তোমার গিয়ে আমীরি নেশা; ও রকম ছ্যাঁচড়া, ছোটো লোকের আধ পয়সার নেশা নয়।"

গিরিশ যেন অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে-খাইতে কূল দেখিয়া কহিল,—"তা হোলে আফিংটাই ধরি?"

"নিশ্চয়ই, তা আবার বোলতে? তুমি সাতটা দিন খাও, তখন এর যে কত উপ্‌গার, তা বুঝতে পারবে। যৎসামান্য খরচ, ছোট্ট একটি এক পয়সা দামের টিনের কৌটোর ভেতর তোমার এক মাসের মৌতাত মজুত থাকবে; সভায়, সমাজে কেউ জানতেও পারবে না; মাথাটা একটু ঘুরিয়ে 'টুক্' ক'রে মুখে ফেলে দিলে—যেন দু'-চারটে বড় এলাচের দানা! তার পর পা টলবে না, মাথা গরম হবে না, মনে হবে পৃথিবীটা সোনায় তৈয়েরী, আর হাওয়াটা নন্দনকানন থেকেই আসচে; এবং যে কার্য্যে মন দেবে, তাতেই সিদ্ধিলাভ!"

আশা এবং প্রফুল্লতায় উৎসাহিত হইয়া গিরিশ কহিল,—"বলিস্ কি রে পেস্‌না?"

"ওই যে বল্লুম, তুমি সাতটা দিন পরখ ক'রেই দেখ না; তার পর বল্‌বে যে, হ্যাঁ, পেস্‌না ব'লেছিল বটে! ম্যালেরিয়া-ফ্যালেরিয়া ত্রিসীমানায় ঘেঁস্‌তে পারবে না; শরীর তোমার একেবারে ফাষ্টো কেলাস ব'নে যাবে। বলেছি তো, কাজ-কম্মে উৎসাহ বিশ গুণ বেড়ে যাবে। আর সবার ওপর, পরমায়ু তোমার টেনে লম্বা কোরবে। এ শুধু আমার কথা নয়, সব্বো-সাধারণেই তোমার গিয়ে এ কথাটা বলে, জানো ত?"

অকূলে হাবুডুবু খাইতে-খাইতে গিরিশ আফিংয়েরই 'লাইফ-বয়া' আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং ধরিলও।

৬

প্রসন্ন স্বর্ণকারের কঠিন অসুখ; এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা। শেষ সময়ে ভিন্ গাঁ হইতে পাস-করা ভাল ডাক্তার আনা হইয়াছে।

গিরিশ ডাক্তার বাবুটিকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রকম বুঝ্ছেন?"

গম্ভীর মুখে ডাক্তার কহিল,—"বিশেষ কিছু আশা নেই। আফিং-খোর মানুষ, ওষুদ-বিষুদ ত ধরতে চায় না! নইলে হয় ত বাঁচাতে পারা যেত।"

"আফিংয়ে কি আপনার… "

গিরিশের প্রশ্ন শেষ হইল না। মুখখানা বিকৃত করিয়া ডাক্তার কহিল,—"অতি জঘন্য এই নেশাটা। এর যেমন রূপ, তেমনি গুণ! লোকে ত আফিং খায় না, আফিংই লোককে খেয়ে জীর্ণ করে।"

"তবে যে সকলে বলে, চল্লিশের পর……"

"সকলে বলে না, যারা আফিং খায়, তারাই বলে।—আপনি খান না কি?—হ্যাঁ, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, আপনিও খান। বলুন ত, কত দিন ও-বিষ খাচ্চেন?"

"আমি? হ্যাঁ—তা—হ'ল বই কি—তবে…"

"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, নইলে মারা পড়বেন। পরমায়ু থাকতেই অঘোরে মারা পড়বেন। সমস্ত চীন দেশটা আফিং খেয়ে মরতে বোসেছিল; আফিং ছেড়ে তবে বাঁচবার পথে আস্‌তে আরম্ভ কোরেচে। তাই জাপানী স্যাণ্ডেলের গুঁতোর বদলে—ওরা এখন জাপানের মাথায় চীনের পানাই ঠুকতে পারচে।"

রাত্রে আহারান্তে শয্যায় শুইয়া গিরিশ ভীত মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—'ডাক্তার যা বল্লে, খাঁটি কথা! এখনো ছ'-মাস হয়নি ধরিচি, কিন্তু এর মধ্যেই দেহের যেখানকার যা হাড়, সব মাথা-খাড়া কোরে দেখা দিয়েচে। রাত্রে ঘুমটির মাথা খেয়েচি। দেহে আর রস্-কষ্ নেই। তা' ছাড়া কোন অসুখ-বিসুখ হোলে ত একেবারেই নিরুপায়! ওষুধ ধরবে না, সুতরাং নির্ঘাত মৃত্যু। ডাক্তার ঠিক ধরেছে। পেসনা ব্যাটা নিজেও ম'ল, আমাকেও মরণের পথে ঠেলে দিয়ে গেল!"

আফিং খাওয়ার ফলে একে ত রাত্রে গিরিশের ভাল ঘুম হয় না, তাহার উপর এই দুশ্চিন্তার সংযোগ; সারা রাত গিরিশ ছট্‌-ফট্ করিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল--কি করিয়া আফিং ছাড়া যায়।

কিন্তু কোন উপায়ই গিরিশ দেখিতে পাইল না। সে যা'কেই জিজ্ঞাসা করে, সে-ই তাকে বলে, ও চীজ একবার ধর্‌লে আর কিছুতেই ছাড়া যায় না! অথচ গিরিশকে আফিং নিশ্চয়ই ছাড়িতে হইবে, ইহাতে প্রাণ তাহার যা'ক্ আর থা'ক্। সে ভয়-চঞ্চল অন্তরে একবার এলোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে, একবার কবিরাজের কাছে, একবার হোমিওপ্যাথের কাছে ছুটাছুটি করিল; কিন্তু আফিং সহজে ছাড়িবার হদিস্ সে কোথা হইতেও পাইল না। তাহার মন ও মস্তিষ্ক দুই-ই অস্থির হইয়া উঠিল। মনে করিল, যাকে ছাড়িতে এত বাধা, এত বিঘ্ন, তাকে এক দিন প্রাণ ভরিয়া বুকের সঙ্গে জড়াইয়া-ধরিয়া, অর্থাৎ ভরি-দুই এক দিন তৈল সহযোগে উদরসাৎ করিয়া—চিলের কোঠায় খিল লাগাইয়া শুইয়া পড়ে!

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন হঠাৎ এক দিন আফিং ছাড়িবার এক সোজা পথ গিরিশ দেখিতে পাইল, এবং পরদিন তাহাকে আর বাড়ীতে বা গ্রামে দেখিতে পাওয়া গেল না।

গিরিশ নিরুদ্দেশ!

দিন-চারেক পরে শৈলরাণীর নামে গিরিশের এক পত্র আসিল। গিরিশ তাহাতে লিখিয়াছে,—

—"আফিং ছাড়িবার জন্য এলাহাবাদ এসেছি। মেজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইয়া কাল এখানে যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি করিব। ফলে জেলে যাইব; এবং তাহার ফলে সরকারী উপায়ে সহজে ও সুন্দর ভাবে আফিংয়ের হাত হইতে রেহাই পাইব। খবরের কাগজ পড়িয়া জানিয়াছি যে, কলিকাতায় এই ধ্বনি করিলে কাহাকেও ধরা হইতেছে না; নচেৎ কলিকাতাতেই যাইতাম। কলিকাতায় যখন আশা নাই, তখন কষ্ট করিয়া এত দূর আসিবার উদ্দেশ্য এই যে, জেল হইতে বাহির হইবার পর, প্রয়াগের ঘাটে মাথা মুড়াইয়া, এবং গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে ডুব দিয়া, ইহ-পরকাল উভয়েরই মঙ্গল বিধান করত: নিশ্চিন্ত চিত্তে গৃহে ফিরিতে পারিব। অতএব, তুমি সকল দুশ্চিন্তা ত্যাগ করহ—ইতি।"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।



স্লিভ্‌লেশ্ পুল্-ওভার

এই হাত-কাটা পুল-ওভারটি করতে উল লাগবে ১২ আউন্স (৬-প্লাই); অবশ্য যদি নীচের নির্দ্দেশ-অনুসারে করেন।



হাত-কাটা পুল্-ওভার

যে-কোন রঙের পছন্দসই উলে এটি বুনতে পারেন। এই জন্য ৭ নম্বরের এক জোড়া বোনার কাঁটা চাই; তা ছাড়া একটি বাঁকা (গোল-ধরণের) কাঠি চাই। যেখানে উল কিনবেন, সেইখানেই এ-কাঠি কিনতে পারেন। এই কাঠিটিও সাত-নম্বরের হওয়া চাই।

নির্দ্দিষ্ট নিয়মে করলে পুল-ওভারটির মাপ হবে :—

ঝুল—২৩ ইঞ্চি; ছাতি—৪২ ইঞ্চি।

এই হিসাবে প্রয়োজন-মত এটি বাড়িয়ে বা কমিয়ে বুনতেও পারেন।

সংক্ষেপোক্তি সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার নেই। সেই সোঃ=সোজা, উঃ=উল্টো, সঃ সোঃ=সব সোজা, রিঃ=রিপিট, ঘঃ কঃ=ঘর কমানো।

পিঠের দিক

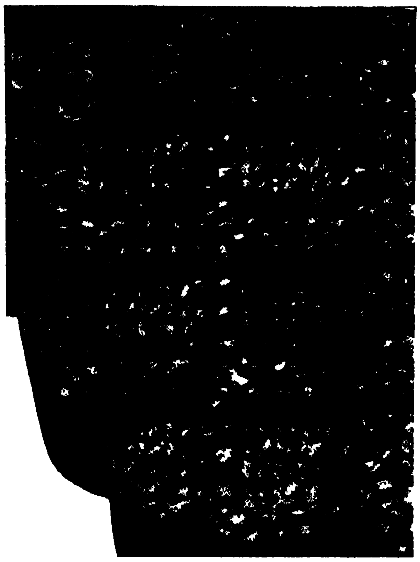
৭নং কাঠিতে ৯৬টি ঘর তুলুন। তার পর তিন ইঞ্চি ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বোনার পর আসল প্যাটার্ণটি আরম্ভ করুন :—

১ম লাইন—২টো সোঃ, * ২টো উঃ, ৪টে সোঃ। এখন * (চিহ্নিত) থেকে বাকী ঘরগুলো রিঃ করে যান। তবে কোণের চারটি ঘর ২টো উঃ, ২টো সোঃ বুনবেন। ২য় লাইন—সমস্ত উঃ বুনে যান। এখন এই দু'লাইন আরো দু'বার

রিঃ করুন। ৭ম লাইন—সমস্ত ঘরগুলো উঃ বুনে যান। ৮ম লাইন—সমস্ত সোঃ।

এবারে বোধ হয় বুঝতে পারছেন, ছবির প্যাটার্ণটি এই আট লাইনে সম্পূর্ণ হলো। এখন এই আট লাইনের প্যাটার্ণটি আগাগোড়া রিঃ করে যেতে হবে। যখন দেখবেন, সবশুদ্ধ (আগেকার তিন ইঞ্চি বোনা নিয়ে) ১৪ ইঞ্চি বোনা হয়েছে, তখন হাতের ফাঁদ আরম্ভ করুন :—

এখন থেকে প্রত্যেক লাইনের আরম্ভে আর শেষে একটি করে ঘর কমান। যতক্ষণ না কাঁটার ঘরের সংখ্যা ৬৬টিতে এসে দাঁড়ায়, ততক্ষণ। কিন্তু মনে রাখবেন—



বোনা ছাঁদ

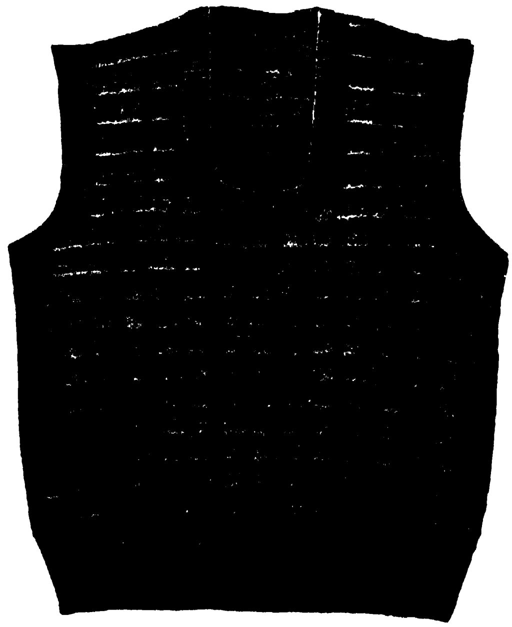
আগাগোড়া এই ভাবে ঐ আট লাইনের ঘর কমিয়ে যাবেন। প্যাটার্ণ-অনুসারে বুনে যেতে হবে। এখন আর ঘর না কমিয়ে যথানিয়মে বুনে যান। তার পর যখন দেখবেন, যেখান থেকে সব-প্রথম ঘর কমাতে আরম্ভ করেছিলেন, সেখান থেকে সর্ব্বসমেত ন'ইঞ্চি বোনা হয়েছে অর্থাৎ পুল-ওভারটির ১১ ইঞ্চি বোনা হয়েছে—তখন কাঁধের জন্য ঘর কমাতে আরম্ভ করুন।

এর পরের প্যাটার্ণটির প্রত্যেক লাইনের আরম্ভে ৫টি করে ঘঃ কঃ। আট লাইনের প্যাটার্ণ যখন শেষ হবে, তখন দেখবেন, কাঠিতে আর ২৬টি ঘর আছে। এই ২৬টি ঘর এইবার বন্ধ করে ফেলুন।

সামনের দিকে

এটি আগাগোড়া বুনে যান পিঠের দিকের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী; এমন কি, হাতের ফাঁদের জন্য ঘর কমাবেন ঐ একই নিয়মে। এই ভাবে বুনে গিয়ে যখন দেখবেন, কাঁটাতে ৬৬টি ঘর আছে, তখন আর এক লাইন বুনে গলা আরম্ভ করুন :—

২৪টি ঘর প্যাটার্ণের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী বুনে যান; তার পর ১৮টি ঘর বন্ধ করে ফেলুন। এখন বাকী ২৪টি ঘর আবার (১ম লাইন) প্যাটার্ণের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী বুনে



তৈরী পুল্-ওভার

যান। এখন দু'ধারের ২৪টি ঘরই এক নিয়মে বুনে যান। তবে প্রত্যেক লাইনে গলার দিকে একটি করে ঘর কমাতে হবে (দু'দিকেই)। এই ভাবে বুনে কাঠিতে যখন ২০টি করে ঘর থাকবে, তখন আর ঘর না কমিয়ে প্যাটার্ণ অনুযায়ী বুনে যান। যখন দেখবেন, পিঠের দিকের পুট-হাতের ঝুলের সঙ্গে এ ঝুলটি সমান হয়েছে (অর্থাৎ সব শুদ্ধ ২১ ইঞ্চি বোনা হয়েছে) তখন কাঁধ তৈরী করুন।

প্রত্যেক লাইনের আরম্ভে হাতের দিকে পাঁচটি করে ঘর কমিয়ে যান। এই ভাবে সমস্ত ঘরগুলি বন্ধ করা হবে।

গলা

কাঁধ দু'টি সেলাই করে জুড়ে দিন। এখন পুল-ওভারটি সোজা করে নিন। গোল কাঠিটি দিয়ে গলা থেকে ১৫৬টি ঘর তুলে নিন। এখন ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনে যান সাত লাইন (মানে সাত বার)। তবে প্রত্যেকবার পিঠের দিকে, দু' কাঁধের কাছে আর সামনের দিকে গলার দু'পাশে একটি করে ঘর কমাবেন। এই ভাবে সাত বার বুনে যান; তার পর ১টা সোঃ, ১টা উঃ বোনাতেই ঘর বন্ধ করুন।

হাত

হাতের ঘের থেকে ১৩৬টি ঘর তুলে নিন বাঁকা কাঁটাটি দিয়ে। ৬ লাইন বুনে যান ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে। তার পর ১টা সোঃ, ১টা উঃ বোনাতেই ঘর বন্ধ করুন।

এখন প্রথামত অল্প-ভিজে কাপড় পুল-ওভারটির ওপর চাপা দিন—দিয়ে ইস্ত্রী চালিয়ে নিন। তার পর পাশ দুটো সেলাই করে দিন।

এবারে পুরো পুল-ওভারটি তৈরী হলো—গায়ে দিন।

পরিচয়

কি তোমার পরিচয়!
কোন্ নাম ধ'রে ডাকিব তোমারে
কি বলিলে ভালো হয়?
বলিব কি যূথী, কেতকী, মালতী—
পুষ্প-ভূষণে সাজিবে কি সতী?
অথবা কথার মালা দিয়া গলে
তোমারে সাজাবো প্রিয়া!
বলো গো সজনি কি শোভিবে তোমা,—
ডাকিব কি নাম দিয়া?

আমরা নূতন নহি!
যুগ যুগ ধরি তোমায়-আমায়
প্রেমের বারতা বহি।
আমি ছিনু তরু, তুমি সে লতিকা!
আমিই প্রেমিক, তুমি সে প্রেমিকা!
কপোত-কপোতী, আর চখা-চখী,
আমরাই ছিনু দোঁহে।
বিগত দিনের প্রণয়ের কথা
ভুলিয়া গিয়াছি মোহে।
সেই এক দিন কবে
বসন তোমার নিয়েছিনু কাড়ি
মনে আর তা কি হবে?
যমুনার জলে ডুবাইয়া কায়
ঢেকে দিয়েছিলে সব লজ্জায়,
আমার বাঁশীতে তোমারি সে নাম
বেজে উঠেছিল যবে।
সেই জল-কেলি, মধু উৎসব
মনে আর নাহি হবে!

তবে কেন চুপ রহ?
বলে যাও যাহা মনে আসে তব
কথা কও, কথা কহ!
কেন আর রাখো মাঝে যবনিকা?
প্রাণে প্রাণে আজ হোক প্রেম-লিখা,
ভোল অভিমান, কহ কথা, গান—
যামিনী বহিয়া যায়।
নীলিম গগনে নেহার চন্দ্র
আবেশে মলিন-প্রায়।
ডাকিব কি নাম দিয়া?
বলো গো প্রেয়সী কি হবে তোমার
ফাঁকা নামটুকু নিয়া?
ওগো সখি, তুমি মোর প্রিয়তমা,
বন্ধু, সুহৃদ, তুমি মনোরমা,
দুঃখে সহায়, সুখে সাথী মোর,
তুমি এ হিয়ায় হিয়া!
শয়নে-স্বপনে, দিবসে-নিশীথে
বলিব তোমারে "প্রিয়া"!

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)।



হুগলী জেলার ইতিহাস

চন্দননগর

চন্দননগরে কোন্ বৎসর ফরাসি কর্ত্তৃক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই; তবে হুগলীর কালেক্টরের ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই এক চিঠি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে—১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব ইস্পাহানবাসী ম্যাকারাকে (Maccarah) প্রথম কুঠী নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। পরে মোগল বাদশাহ ঐ জমি নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন। এম, ডুমাস (M, Dumas) বাদশাহের নিকট হইতে টাকশাল করিবারও অনুমতি লাভ করেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে (কোলবার্টের সময়) ফরাসি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। উহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে ফরাসি সরকার ঐ কোম্পানি বন্ধ করিয়া উহা খাস করিয়া লইয়াছিলেন।

ডুপ্লে (M. Duplex)—১৭৩১ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আগমন করেন। চন্দননগরের ফরাসি উপনিবেশ প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টার ফল। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে চন্দননগর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল না। ডুপ্লের অক্লান্ত পরিশ্রম, অসাধারণ বিচক্ষণতা, বিশাল রাজনীতিক বুদ্ধিবশতঃই ফরাসিদের বাণিজ্য তিব্বত পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং জলপথেও পারস্য উপসাগর, এমন কি, চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ডুপ্লের সময় ফরাসি অধিবাসিরা উন্নত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। ডুপ্লে যখন ফরাসি জাতিকে উন্নত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, সেই সময় য়ুরোপে ইংরেজের সহিত ফরাসির বিরোধ আরম্ভ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, কুচক্রীদের পরামর্শেই ফরাসি সরকার ডুপ্লেকে চন্দননগর হইতে অপসারিত করেন।—এই সময় হইতেই ভারতে ফরাসি-শক্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়।

কাশীমবাজারে ফরাসিদের আর একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এম, ল ইহার পরিচালক ছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে রেণো (M. Reneutt de St, Germain) মসিয়ে লএর অধীনে চন্দননগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দননগরে ১৪৮ জন য়ুরোপীয় সৈন্য এবং ৮০ জন মাত্র দেশীয় সিপাহী ছিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলে, ইংরেজ অনন্যোপায় হইয়া চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের ও চন্দননগরে ফরাসিদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ওলন্দাজরা স্পষ্ট ভাবে সাহায্যদানে অস্বীকার করিল; কিন্তু ফরাসিগণ অস্বীকার না করিয়া ভদ্র ভাবে জানাইল যে, ইংরেজ চন্দননগরে আশ্রয় লইলে তাহারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। ফরাসি সরল ভাবে ঐ প্রতিশ্রুতি দিলেও ইংরেজ অপমানজনক বিবেচনা করিয়া ঐ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিলেন। এ-দিকে নবাব ফরাসিগণকে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বলিলে, ফরাসিরা এই অনুরোধ অস্বীকার করিল। তবে ফরাসিরা ইহাও বুঝিয়াছিল যে, যদি ইংরেজকে নবাব পরাজিত করিতে না পারেন, তবে তাঁহার ক্রোধ-বর্দ্ধিত হইবে, এবং তিনি চন্দননগর আক্রমণ করিবেন। যাহাই হউক, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরেজদের পরাজিত করিলেন। ইংরেজের হতাবশিষ্ট লোক ফলতা হাবড়া প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। ইংরেজ কলিকাতা হারাইলেন। নবাব কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ফরাসির সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলেন যে, ফরাসি যেন ইংরেজের বিপক্ষে থাকে, কিন্তু রেণো তাহাতে সম্মত হইলেন না; অথচ ইংরেজ ভাবিলেন, ফরাসিরা ইংরেজের বিরুদ্ধে নবাবের সহিত সন্ধি করিয়াছে!

এ-দিকে ঐ বৎসরের ২রা আগষ্ট ও ২০শে নভেম্বর ক্লাইব ও ওয়াটসনের অধীনে এক নৌবহর ও সৈন্য ফলতায় উপস্থিত হয়। ইংলণ্ড হইতে উহাদের প্রতি আদেশ হইয়াছিল যে, কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিয়া যদি সুবিধা হয়, তবে নবাবকে মুরশিদাবাদে আক্রমণ করিবে, এবং যদি য়ুরোপে ফরাসিদের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধে, তবে ফরাসিদিগকেও আক্রমণ করিবে। ক্লাইব ও ওয়াটসন কলিকাতা উদ্ধার করিলেন—নবাবসৈন্য কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ক্লাইব কলিকাতা উদ্ধার করিয়া হুগলী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলেন।

ইংরেজ কর্ত্তৃক কলিকাতার পুনরুদ্ধার ও হুগলী-লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়ায়, ক্রোধান্ধ নবাব বহু সৈন্য সহ ইংরেজগণকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যাত্রা করিয়া ফরাসিদিগের অধ্যক্ষ এম, রেণোকে সদলে তাঁহার সহিত যোগদানের জন্য আদেশ করিলেন।

এই আদেশে রেণো উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তাঁহার অধীনস্থ য়ুরোপীয় সৈন্য সংখ্যায় ১৪৬ জন মাত্র; তন্মধ্যে ৪৬ জন বৃদ্ধ, সুতরাং অকর্ম্মণ্য। এ অবস্থায় ইংরেজের সহিত সন্ধি করা বা নবাবকে সাহায্য করা উভয়ই সঙ্কটজনক সমস্যা বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। নবাবকে সাহায্য না করিলে

তিনি হয় ত চন্দননগর আক্রমণ করিবেন এবং তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ডি, লিরিটের (De Layrit) আদেশ ছিল—কোন কারণেই ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা না হয়। অবশেষে রেণো ইংরেজের সহিত নিরপেক্ষতার সন্ধি করাই সঙ্গত মনে করিলেন।

ক্লাইব ও ওয়াটসন জানিতেন, চন্দননগরে ফরাসিদের ৩০০ শত ও কাশিমবাজারে ল' সাহেবের ১০০ শত সৈন্য আছে। একে ত নবাবের বহু সৈন্য, তাহার উপর ফরাসিদের ৩০০ সৈন্য সেই দলে যোগদান করিলে ইংরেজের কলিকাতা রক্ষা করা অসাধ্য হইবে। কিন্তু এই সময়েই রেণো নিরপেক্ষতার সন্ধির জন্য লোক পাঠাইলেন। চন্দননগর হইতে ফরাসি-দূত কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধির সর্ত্ত লিখিত হইলে ক্লাইব ঐ সকল সর্ত্ত মানিয়া লইলেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ইংরেজদের সহিত নবাবের যুদ্ধ হইলে নবাবের সেনাপতি পরাজিত হইলেন। ইংরেজ নবাবকে চন্দননগর আক্রমণের জন্য অনুরোধ করিলে নবাব তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন ক্লাইভ ঐ সন্ধিপত্রে সহি করিতে ইচ্ছুক হইলেও ওয়াটসন উহাতে স্বাক্ষর করিতে এই যুক্তিতে আপত্তি করিলেন, চন্দননগর, পণ্ডিচেরীর অধীন; অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত সন্ধি করা চলে না। ক্লাইবও অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। এ-দিকে রেণো সন্ধির আশায় চন্দননগর রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিলেন না। রেণোর সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

ও-দিকে নবাবের কাছে সংবাদ আসিল, আমেদশা আবদালি দিল্লী অধিকার করিয়া বঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতেছে। নবাব ভীত হইয়া ইংরেজকে পত্র লিখিলেন, যদি ইংরেজ তাঁহাকে এই আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, তবে তিনি মাসিক এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন। এই সময়েই সংবাদ আসিল—তিনখানি যুদ্ধ-জাহাজ, গোলন্দাজ সৈন্য ও পদাতিক সৈন্য বঙ্গোপসাগরের মোহনায় আসিয়াছে, এবং আরও একখানি জাহাজ বালেশ্বরে আসিয়াছে।

রেণো সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত না হওয়ার সংবাদে বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজ নিশ্চয়ই চন্দননগর আক্রমণ করিবে। সেই আক্রমণে বাধা দানের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ফরাসিদের ফোর্ট ডি অরলেন দুর্গ চন্দননগরে দুই প্রান্ত হইতে সমদূরবর্ত্তী, এবং গঙ্গা নদীর তীরেই অবস্থিত। তাঁহারা চারি দিকে বুরুজ তোষাখানা ইত্যাদি সুসজ্জিত করিলেন। এই সময় ফরাসিদের পক্ষে ১৪৬ জন য়ুরোপীয় সৈন্য ও ৩০০ শত মাত্র সিপাহী ছিল। কাপ্তেন ডি, ভিন (Captain de Vigne) সেনাপতি হইলেন। এই সময় গঙ্গা নদী তেমন অধিক গভীর ছিল না। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ তীরে আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে, এই উদ্দেশে টরেণো কয়েকখানি জাহাজ নদীতীর হইতে কিছু দূরে জলে ডুবাইয়া রাখিলেন। এই নদীর দিক্ রক্ষার ভার ছিল—টরেণোর (Terraneau) উপর।

এ-দিকে ক্লাইব ৭ই মার্চ স্থলপথে ৭০০ য়ুরোপীয় সৈন্য ও ১৫০০ শত দেশী সিপাহী লইয়া হাওড়া হইতে চন্দননগর যাত্রা করিলেন। তিনি সতর্কতা সহকারে ফরাসি কামানের পাল্লা হইতে দূরে থাকিয়া, এবং গ্রাম্য অধিবাসীদের গৃহসমীপে আশ্রয় লইয়া কতকগুলি ঘর ভাঙ্গিয়া তোপখানা করিলেন; পরে সারা রাত্রি ফরাসি-সৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ করিলেন। এ-দিকে ওয়াটসনের কামান জলপথে আসিয়া পৌঁছিলে ২১শে মার্চ পর্য্যন্ত স্থলযুদ্ধ চলিল; ইহাতে ইংরেজের যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

পূর্ব্বোক্ত টরেণো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিল। সে ইংরেজকে সন্ধান দিল, নদীগর্ভে কয়েকখানি জাহাজ ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে। সে সেই জাহাজগুলির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ওয়াটসন অতি সতর্ক ভাবে জলপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। টরেণো সেই সকল বিপদসঙ্কুল স্থানে না ঘেঁসিয়া অন্য দিক দিয়া জাহাজ চালাইতে লাগিল। রেণো জানিতেন, গঙ্গাতীরেই যুদ্ধের অবসান হইবে—স্থলপথে ইংরেজ কিছু করিতে পারিবে না। বিশ্বাসঘাতক টরেণোর জন্যই ফরাসিদের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। এক-একখানি করিয়া টাইগার কেণ্ট ও সলসবেরী যুদ্ধজাহাজ গঙ্গায় সমবেত হইতে লাগিল। উভয় দিকেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রেণোর বীরত্ব ও কৌশল ফরাসিগণকে রক্ষা করিতে পারিল না। অবশেষে তিনি শ্বেত পতাকা উড্ডীন করিয়া সন্ধির প্রার্থী হইলেন। ২৩শে মার্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসির এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল।

সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বেই সেনাপতি পঞ্চাশ জন মাত্র সৈনিক লইয়া কাশিমবাজার হইতে ভাগলপুরে প্রস্থান করিলেন। এ-দিকে সন্ধির সর্ত্তানুসারে উপনিবেশের অধ্যক্ষ, তাঁহার পারিষদবর্গ এবং বেসামরিক অধিবাসীরা তাঁহাদের ইচ্ছামত স্থান ছাড়িয়া যাইবার আদেশ পাইলেন। জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত পাদ্রীরা তাঁহাদের গির্জ্জার অলঙ্কারাদি লইয়া যাইবার অনুমতি পাইলেন। কিন্তু সৈনিকবর্গ কারারুদ্ধ হইল। ক্লাইব চন্দননগর লুণ্ঠন করিলেন। ১ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে ফরাসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী হইতেই অর্দ্ধ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। ল' ভাগলপুরে, ইংরেজ ফরাসির বিরোধের মধ্যে না থাকিয়া দেশীয় রাজার রাজ্যে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের সময় যদিও তিনি সিরাজকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করিতে পারেন নাই। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে গয়ার যুদ্ধে ল' বন্দী হইয়া সেই অবস্থায় জীবন শেষ করিয়াছিলেন।

চন্দননগরের পতনের সঙ্গে ফরাসিদের সকল আশার অবসান হইল। টরেণোর বিশ্বাসঘাতকতা ইহার প্রধান কারণ। টরেণোর পিতা পুত্রের নিকট হইতে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা-লব্ধ অর্থ পাইয়া আত্মহত্যা দ্বারা পুত্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু ফরাসি জাতি ভারতে আর মাথা তুলিতে পারিল না। ডুপ্লের উপর যে সকল অত্যাচার করা হইয়াছিল, তাহার ফলেই ফরাসি জাতিকে ভারতে নিস্তেজ হইতে হইল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এইরূপে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে ফরাসির পতনের এবং ভারতে ইংরেজের অভ্যুত্থানের পথ নিষ্কণ্টক হইল।

গরুটীতে ফরাসি-বাগান—

গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের ন্যায় ফরাসির অধিকৃত গরুটীর বাগান দেখিলেও মনে বিষাদ-স্মৃতির উদয় হয়। ডুপ্লের সময় যে স্থান লোকাকীর্ণ ছিল, শত শত যানে যে স্থান সমাকীর্ণ থাকিত, যে স্থানে চুঁচুড়ার গভর্ণর, ক্লাইব, হেষ্টিংস প্রভৃতি ব্যক্তি ফরাসির অতিথি হইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেন, জলপথে ও স্থলপথে যাহার সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয় ছিল,

সেই স্থানে এখন জুটমিলের কর্ম্মচারীদের বাসস্থান হইয়াছে। সে প্রাসাদ নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই—ভারতে ফরাসির সে তেজও নাই; আছে শুধু অতীতের বিষাদময় স্মৃতি।

সন্ধির পর চন্দননগরের বন্দোবস্ত—

চন্দননগরের ভিতর মুরশিদাবাদের নবাব তালডাঙ্গার ৭ বিঘা মাত্র জমি বিনা-খাজনায় কুঠীনির্ম্মাণের জন্য ফরাসিকে দিয়াছিলেন, এইটিই ফরাসির নিজস্ব, এবং গরুটীতে ১২৫ বিঘা জমিও তাহাদের নিজস্ব। * বাকী সমস্ত চন্দননগরের খাজনা ইংরেজ সরকার পাইয়া থাকেন। গোন্দলপাড়া জমিদারি, হুগলীর ফৌজদার নবাব খানজার্থা ফরাসিদিগকে পত্তনি দিয়াছিলেন। ইহার খাজনা ঐ নবাবের বংশধরদিগকে দিবার কথা ছিল। ঐ নবাবের আর দুইখানি তালুক সানবিনারা ও মহম্মদ আমীনপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পত্তনি দিয়াছিলেন। পরে যখন ইংরেজ বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইলেন, তখন তাহা ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইল।

ইংরেজ-সরকারে ফরাসিদিগকে যে রাজস্ব দিতে হয়, তাহার হিসাব :—

ষ্টেট নং ১৬৩ গঞ্জ সুক্রাবাদ	…	১২১৯।৶৭।
" ২৪২ বাগ চন্দননগর	…	৮৮৬/৮
		১৩০৮।৩। পাই

প্রথমে ঐ রাজস্ব ১৪৬৬।৩ পাই, ছিল কিন্তু ১৮৫৩ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে সন্ধি অনুসারে যখন চন্দননগরের সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন ইংরেজ ৩৬ বিঘা জমি ছাড়িয়া দিয়া ১৯১ বিঘা জমি লইয়াছিলেন—এ জন্য ১৫৮৶১১। পাই কমিয়া যায়। ঐ রাজস্ব ঠিক সময়ে না দেওয়ায় হুগলীর কালেক্টরের সহিত বিরোধ হয়। বাকীপড়া খাজনার উপর সুদ ধার্য্য করা হইলে পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঐ বিষয় বিচারের জন্য ইংরেজ সরকারের হস্তে প্রদত্ত হয়। বিচারে স্থির হয়, সুদ লওয়া রাজনীতিক হিসাবে অন্যায়। তাড়িখানার দোকান লইয়া ইংরেজ ও ফরাসি প্রজার মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত, কারণ, তখনও উভয়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পরে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ভারসেলিস্ সন্ধি অনুসারে (১৩ দফায়) ফরাসি চন্দননগরের সীমানা চারি দিকে খাল কাটিয়া পাকা করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ফরাসিরা ঐ সীমামধ্যে মালিকান-স্বত্ব দাবী করেন নাই, তবে ঐ সীমামধ্যবর্ত্তী জমি তাঁহারা দাবী করিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল এই দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। চন্দননগরের গির্জ্জা ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ইটালীয়গণের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে চন্দননগরে প্রচুর চন্দন কাষ্ঠ পাওয়া যাইত—ইহা হইতেই নন্দননগর নামের উৎপত্তি। নদীয়ার রাজা রুদ্র রায় মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে যেন চন্দন কাষ্ঠে দাহ করা হয়, এবং সে জন্য চন্দন কাষ্ঠের সন্ধানে চন্দননগরে লোক প্রেরিত হইয়াছিল। "দাহোপযুক্তচন্দনকাষ্ঠমানেতুং হুগলীপ্রদেশে তরণীঃ প্রস্থাপিস্থা ইদানীমপি নাগতা।"—ক্ষিতীশ বংশাবলী। এতদ্ভিন্ন, La Compagine des Indes Orientales পুস্তকেও চন্দন কাষ্ঠের উল্লেখ আছে।

সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিন গ্রাম লইয়া যেমন কলিকাতা, সেইরূপ খলসিনি, বোরো ও গোন্দলপাড়া লইয়া চন্দননগর। হুগলী জেলার বোরো পরগণা হুগলী হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—বোড়ো চণ্ডীর নাম অনুসারেই বোরো পরগণার নাম হইয়াছে; সুতরাং চন্দননগরই ঐ পরগণার নামের মূল। খলসিনি নাম 'দিগ্বিজয়প্রকাশ' গ্রন্থে পাওয়া যায়, যথা—"খলসিনি মহাগ্রামো যত্র রাজা চ ধীবরঃ।" কলিকাতা যখন নগণ্য গ্রাম মাত্র, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই চন্দননগর সমৃদ্ধিশালী জনপদ। ডুপ্লের সময় (১৭৩১ খৃঃ) এখানে লোকসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক ছিল (১)। ঐ সময়ে ইহার বাণিজ্য ভারতের বাহিরে চীন, তিব্বত, পারস্য, মালয়, পেগু, জেড্ডা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মসলিন, রেশম, শাল, অহিফেন প্রভৃতির আমদানি-রপ্তানি হইত। ক্লাইব ইহাকে—The granary of the Islands নামে অভিহিত করেন (২)। চন্দননগর দেশীয় তন্তুবায়নির্ম্মিত বস্ত্রাদির জন্য অদ্যাবধিও সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ—"ফরেসডাঙ্গার কাপড়" নামে অভিহিত। সে-কালে লাল গিলে মসলিন নামক কোরা লংক্লথের বিশেষ খ্যাতি ছিল। এখান হইতে গালা, চট, আরসি, চুরুট, কাশ্মিরী-কারিগর দ্বারা প্রস্তুত শাল, মখমলের উপর জরির কাজ প্রভৃতি স্থানীয় শিল্পদ্রব্য বিদেশে চালান যাইত। যে পল্লীতে দাড়ির বড় বড় কারখানা ছিল, এখনও সেখানকার একটি রাস্তার নাম রহিয়া গিয়াছে—"রু করদেরি।" লুই বোনো (Louis Bonnaud) এখানে নীলের চাষ ও কারখানা করিয়াছিল। এখনও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে "বঙ্গলক্ষ্মী" কাপড়ের কল হইয়াছে—বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কসও বহু বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত; কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বে চন্দননগরে বটকৃষ্ণ ঘোষ কাপড়ের কল করিয়াছিলেন; দীননাথ চন্দ্র "লণ্ডন কেমিকেল এজেন্সি" নাম দিয়া টিনচার ও স্পিরিট প্রস্তুতের কারখানা করিয়াছিলেন। চন্দননগরেই ব্রহ্মের রাজকুমার মাইনগুন, বর্দ্ধমানের (জাল) প্রতাপচাঁদ (৩) ও টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বঙ্গজননীর সুসন্তান—ভারতবর্ষের শ্রীঅরবিন্দ রাজরোষে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চন্দননগরের পরিবর্ত্তে পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, ক্ষুদ্র চন্দননগরকে তিনি নিরাপদ মনে করিতে পারেন নাই। মহারাজ নন্দকুমার, অযোধ্যার রেসিডেণ্ট বুষ্টো ও ম্যাডাম্ গ্রাণ্ড (যিনি পরে ফ্রান্সে প্রিন্সেস্ দে টালিরন্ড নামে পরিচিত হন) বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একটি বৃহৎ প্রাচীন সহরে যাহা থাকা সম্ভব, এই চন্দননগরে তাহার কোনটিরও অভাব ছিল না। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসি

* Toynbee's Administrative Report of Hughly Dt. P. 22-23 Dr. Crawford's "Brief History of Hughly."

(১) History of the French in India.

(২) Life of Lord Clive. Vol. I.

(৩) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' দ্রষ্টব্য।

সরকারের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার কেবল যে অতুল ধনসম্পত্তি ছিল, তাহাই নহে, তিনি বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর হইতে আসিয়া এই মহাত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনিই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করেন। ভারতচন্দ্রই তাঁহাকে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। ইন্দ্রনারায়ণ দশভুজামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৃহৎ মন্দির ও নন্দদুলালের মন্দির স্থাপন করেন; ঐ মন্দিরের গঠন-কৌশল ও কারুকার্য্য অতীব প্রশংসনীয়।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার হেরাসিম লেবেডেক কর্ত্তৃক এখানে প্রথম নাট্যশালার সৃষ্টি হয়। Carey's "Good old days" পুস্তকে একটি ইংরেজী থিয়েটারের উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের রচনা হইতে জানিতে পারা যায়, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে লাভোকা (L'avocat) নামক একখানি ফরাসী নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। পরে একটি অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়—মতিলাল শেঠ তাহার অগ্রণী ছিলেন। —এখানে "প্রণয়-পরীক্ষা" অভিনীত হয়। পরে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এবং ষ্টেজ বিক্রয় হইয়া যায়। উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে যদুনাথ পালিত কর্ত্তৃক চন্দননগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

চন্দননগর কবি-গানের দলের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, এণ্টনি ফিরিঙ্গি, রাসু ও নৃসিংহ ভ্রাতৃদ্বয় বিখ্যাত কবিগায়ক ছিলেন। এণ্টনি ফিরিঙ্গির বাস প্রথমে চন্দননগরের ভিতর ছিল। পরে তিনি গৌরহাটিতে (গরুটী)—যেখানে গভর্ণর ডুপ্লের প্রাসাদ ছিল, সেই স্থান সন্নিহিত বকুলতলায় বাস করিতেন। ফিরিঙ্গি হইলেও তিনি এক ব্রাহ্মণ রমণীর পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহারই প্রভাবে ফিরিঙ্গি এণ্টনি হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কথিত আছে, এণ্টনির দুই উপযুক্ত পুত্র তাঁহাকে কবির দল ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার গানগুলি যেমন মধুর ও সরস, সেইরূপ ভক্তিরসপূর্ণ ছিল। যথা,—

'কোন্ প্রেমে হরি, ত্যজি ব্রজনারী
গেল মধুপুরী—করি অনাথা?
কোন্ প্রেম-ফলে, কালিন্দীর মূলে
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবী লতা?'

কে বলিবে, ইহা কোন ফিরিঙ্গি-রচিত সঙ্গীত?

এণ্টনি তাঁহার হিন্দু পত্নীর অনুরোধে কলিকাতার বৌবাজারে এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও এই কালীমূর্ত্তির পূজা চলিতেছে। কলিকাতায় এই দেবী "ফিরিঙ্গি-কালী" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

পাঁচালীওয়ালাদের মধ্যে চিন্তামণি মালা ও রাম ভট্ট; গান-রচয়িতার মধ্যে রাম দত্ত, মধু পাত্র ও কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী বিখ্যাত ছিলেন। প্রাচীনগণের অনেকে সে-কালে মদন মাষ্টারের যাত্রা শুনিয়াছেন। মদন মাষ্টারের পূর্ণ নাম মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়। এতদ্ভিন্ন, চন্দননগরে অনেকগুলি যাত্রার দল ছিল; তন্মধ্যে বৌমাষ্টার, নবীন গুঁই, মহেশ চক্রবর্ত্তীর দল সুপরিচিত ছিল।

এ দেশে "ডিগ্রী" প্রদানের ক্ষমতা প্রথমে শ্রীরামপুর কলেজ লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" পর্ত্তুগালের লিসবন সহরে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পুনর্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফাদার গেরাঁ (Father C. F. M. Guerin) নামক ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক শ্রীরামপুর ছাপাখানা হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় লেখেন—চন্দননগর হইতে প্রায় ৪০খানি মাসিক, সাময়িক প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের কতকগুলির নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। প্রজাবন্ধু:—সাপ্তাহিক পত্রিকা—সম্পাদক তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৮২ খঃ প্রকাশিত হয়। ২। ধূমকেতু:—সাপ্তাহিক পত্রিকা—সম্পাদক শিবকৃষ্ণ মিত্র—১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ৩। বঙ্গবন্ধু:—সাপ্তাহিক পত্রিকা—সম্পাদক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৪। চন্দননগর-প্রকাশ:—সাপ্তাহিক পত্রিকা—সম্পাদক এন, মুখোপাধ্যায়। ৫। বঙ্গপ্রভা:—মাসিকপত্র—সম্পাদক বিপিনবিহারী কোলে—১২৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। ৬। হিতসাধন:—নীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। ৭। বাহক। ৮। মাতৃভূমি:—মাসিকপত্র—সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ সেন। ৯। চন্দননগর পত্রিকা:—সম্পাদক অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। ১০। ভারত-দর্পণ:—সম্পাদক অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। ১১। প্রবর্ত্তক:—প্রথমে পাক্ষিক পত্র ছিল, বর্ত্তমানে মাসিক পত্রিকা হইয়াছে—সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ নায়েক ও মতিলাল রায়। এ পত্রিকা এখনও চলিতেছে। ১২। নবসঙ্ঘ:—সাপ্তাহিক, পরে পাক্ষিক হয়। ১৩। তরুণ ভারত:—সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ সেন। ১৪। Le Petit Bengali:—সাপ্তাহিক—সম্পাদক চার্লস দুমান। ১৫। The Bearer:—সাপ্তাহিক—সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১৬। Amateur Workshop:—সাপ্তাহিক—সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বসু ও কুসুমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭। Tit for Tat. ১৮। Standard Bearer—সাপ্তাহিক—সম্পাদক অরুণচন্দ্র দত্ত। ১৯। নিবন্ধ:—মাসিকপত্র—সম্পাদক বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০। মুকুলমালা:—সম্পাদক কেদারলাল ঘোষাল।*

[ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)।

কেনোপনিষদ্

(সমালোচনা)

কেনোপনিষদ্—অনুবাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কাশী-ধামের ভেলুপুরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত উমানাথ মুখোপাধ্যায়ের অর্থব্যয়ে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা। এই গ্রন্থে মূল কেনোপনিষদ্ ব্যতীত নিম্নলিখিত ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে:—

(১) শঙ্করাচার্য্য-কৃত পদভাষ্যের মূল ও তাহার বঙ্গানুবাদ।

* শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির রিপোর্ট হইতে কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছি; সে জন্য আমার তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।—লেখক

(২) বাক্যভাষ্যের মূল ও তাঁহার বঙ্গানুবাদ। এই বাক্য-ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য কৃত বলিয়াই আনন্দগিরি গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, বাক্যভাষ্য আদি-শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত নহে, শঙ্করাচার্য্যের আসন অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ অন্য পরবর্ত্তী আচার্য্য-প্রণীত। দুর্গাচরণ বাবুও এই মত গ্রহণ করিয়া এই ভাষ্যটি বিদ্যাশঙ্কর-প্রণীত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

(৩) বিদ্যারণ্যকৃত "কেনোপনিষদ্—অনুভূতিপ্রকাশ" বা সার সংগ্রহ, মূল ও বঙ্গানুবাদ।

(৪) আনন্দগিরি-কৃত পদভাষ্য ও বাক্যভাষ্যের টীকার বঙ্গানুবাদ।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বপূর্ব্বাচার্য্য কৃত টিপ্পনীও প্রদত্ত হইয়াছে।

কেনোপনিষদে মোট ৩৪টি শ্লোক বা বাক্য আছে। কিন্তু এতগুলি ভাষ্য টীকা প্রভৃতি দেওয়াতে গ্রন্থ প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা হইয়াছে। কেনোপনিষদে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের ইচ্ছায় এবং তাঁহারই শক্তিতে আমাদের মন বিষয়চিন্তা করে, আমাদের প্রাণ-বায়ু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রবাহিত হয়, আমাদের বাক্-ইন্দ্রিয় শব্দ উচ্চারণ করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয় দর্শন করে, কর্ণ-ইন্দ্রিয় শ্রবণ করে। ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে আমাদের অন্তরে বিদ্যমান আছেন। চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কর্ণ তাঁহার কথা শুনিতে পায় না। তাঁহাকে উত্তমরূপে জানা যায় না, অথচ তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতও থাকিয়া যান না। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। আমাদের প্রত্যেক চিন্তায় তিনি জ্ঞানরূপে বিরাজ করেন। ইহজন্মেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এইরূপ সংকল্প করা উচিত। কারণ, তাঁহাকে জানিলে মোক্ষলাভ করা যায়। নচেৎ মৃত্যুর পর আবার কত বার জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহার ঠিক নাই। কেনোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবাসুর-যুদ্ধে দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, তাঁহাদের নিজশক্তিতে তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম প্রথমে যক্ষের রূপ ধারণ করিয়া, পরে হৈমবতী উমারূপে আবির্ভূত হইয়া দেবগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ব্রহ্মের ইচ্ছা ব্যতীত দেবগণের কোনও শক্তি নাই, ব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম সকল প্রাণীর পূজনীয়, এই ভাবে তাঁহার উপাসনা করা উচিত। ব্রহ্মকে লাভ করিবার উপায়,—তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম।

এই উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য, বিদ্যারণ্য, আনন্দ-গিরি প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে জ্ঞানের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছেন, দুর্গাচরণ বাবু বাঙ্গালী পাঠককে সেই প্রস্রবণ হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞানসুধা আহরণ করিয়া সংসারতাপক্লিষ্ট চিত্ত শীতল করিবার সুযোগ দিয়াছেন; এ জন্য বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অনুবাদ বেশ সরল হইয়াছে। উপনিষদের দুরূহ তত্ত্ব সকল প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইতে পারিয়াছেন, ইহা গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতিত্ব। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থের গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালী পাঠক শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত পদভাষ্যের পরিচয় পাইয়াছেন। বাক্য-ভাষ্য, আনন্দগিরি বিদ্যারণ্যের কেনোপনিষদ্-ব্যাখ্যার সহিত বাঙ্গালী পাঠকের এই প্রথম পরিচয় হইল। এই সকল গ্রন্থের উৎকর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থকার একটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

শ্রুতিগব্যাঃ পবক্ষীরং শ্রীমদ্ভাষ্যং তু শাঙ্করম্।
তত্রানন্দগিরেষ্টীকা কেবলং শুদ্ধ শর্করা॥

এখানে মূল উপনিষদ্‌কে গাভীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, শঙ্করভাষ্যকে দুগ্ধের সহিত, এবং আনন্দগিরির টীকাকে শর্করার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে দুর্গাচরণ বাবু কেনোপনিষদের অদ্বৈতমতানুযায়ী প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাই সঙ্কলন করিয়াছেন। কেনোপনিষদ্-সাহিত্য সম্পূর্ণ করিতে অপরমতাবলম্বী ব্যাখ্যাগুলিও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ স্থলে আমরা সেরূপ দুইটি মাত্র ব্যাখ্যার উল্লেখ করিব। রঙ্গরামানুজ এই উপনিষদের রামানুজমত অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী শ্রীবৈষ্ণবের তাহা অবশ্য দ্রষ্টব্য। মধ্বাচার্য্য স্বয়ং অন্য উপনিষদের সহিত কেনোপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বৈতমতাবলম্বীর তাহা আদরণীয়।

গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভাল হইয়াছে। পত্রাঙ্কগুলি আদ্যন্ত একধারা হইলেই ভাল হইত। তাহা না করিয়া বিভিন্ন ভাষ্যের বিভিন্ন পত্রাঙ্ক হওয়াতে পাঠকের কিছু অসুবিধা হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

পুতুল ও প্রতিমা

সে ত গো মানবী নয়, নামটুকু তা'র
অরুণ আলোর মত ঘুচায় আঁধার!
ধরা নাহি যায়, যেন মলয়া পবন
চন্দন-বন-বাসে ভুলায় ভুবন!
জ্যোৎস্না ধরায় সে যে, ধরা নাহি যায়
আঁধারের বুক ভরে আলোর মায়ায়!

ননীর পুতুল সে যে—অবনী তা'রে
কোন্ তপোবলে লভে নবনীতারে!
ছবির মতন মুখ শেফালী-সম
মৃদুল সুবাস মাখা বালিকা মম!
আমারে ছুঁইয়া চলে ছায়ার মত
প্রতি প্রাতে প্রতি রাতে হেরি সতত!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।



দেহে-মনে জোর

কাজ করিতে গেলে কাহারো হাঁফ ধরে, দারুণ ক্লান্তি ঘটে, আবার কাহারো তা হয় না, ইহার কারণ কি ?

এ ক্লান্তি ঘটিলে বুঝিতে হইবে, দেহ-মনের স্বাস্থ্য ভালো নয়। এ ক্লান্তি-মোচনের জন্য চাই নির্ম্মল বাতাস ; সূর্য্যকিরণ ; যোগ্য পুষ্টিকর খাদ্য ; নিত্য-রুটিনে ব্যায়াম-চর্চ্চা এবং প্রচুর বিশ্রাম।

যদি মনে করেন, ঔষধ খাইলে মনের এ অস্বাস্থ্য ঘুচিবে, তাহা হইলে সে ধারণা ভুল !

স্বাস্থ্য ভালো, দেহে কোনো ব্যাধি নাই, অথচ কাজ করিতে গেলে হাঁফ ধরে, ক্লান্তিতে-অবসাদে জর্জ্জরিত হইতে হয়, এমন যে ঘটে না, তা নয় ! এ ক্লান্তি-অবসাদের ফলে অনেক সময় হাঁচি-কাশি-সর্দ্দি দেখা দেয়। তা ছাড়া দেহের এই ক্লান্তির ফলে অজীর্ণতা, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ দেহকে পাইয়া বসে। এই ক্লান্তি হইতে আরো বহু ব্যাধির উৎপত্তি ঘটে।

যাঁরা জোয়ান কুস্তিগীর, তাঁরা এ ক্লান্তিকে রীতিমত ভয় করেন। আমাদের দেহ-মন বিধাতা এমন কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, এ দেহ-মনের সহ্যশক্তি অসাধারণ। আমাদের দেশে কথা আছে, "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়"—কথাটা খুব সত্য।

কাজ যেমন করিব, তেমনি কাজের অনুপাতে দেহ-মনকে বিরাম-বিশ্রাম দেওয়া চাই। মানুষের ছুটাছুটি আজ অসম্ভব বাড়িয়াছে, এ ছুটাছুটির মধ্যে যাঁরা বিশ্রাম সম্বন্ধে সচেতন, তাঁদের দেহ-মন মজবুত থাকে ; যাঁরা বিরাম-বিশ্রাম জানেন না, তাঁদের দেহ-মন দিনে-দিনে জীর্ণ গলিত হইয়া যায় ! এ কথা কতখানি সত্য, সমাজের পানে চাহিলেই প্রমাণ মিলিবে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া কাজে লাগিলাম ; কাজের মধ্যে এক-সময় ধাঁ করিয়া বিছানায় শুইয় চক্ষু মুদিয়া একটু ঘুমাইলাম,— ইহাতে দেহ-মনের সামর্থ্য বা স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। সব বিষয়ে নিয়ম চাই—নিয়মের জগতে কোনো-কিছুতে অনিয়ম করিলে তার শাস্তি পাইতেই হইবে।

ডক্টর ইমার্শন আমেরিকার এক জন প্রাজ্ঞ চিকিৎসক। মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কয়টি উপদেশ দিয়া-ছেন। তিনি বলেন, সংসারের সব দায়িত্বই যখন মেয়েদের হাতে,তখন তাঁর মন একদণ্ড নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে না। নানা কাজে তিনি যদি ব্যায়াম-বিশ্রামের তেমন অবসর না পান, তবু তাঁর উচিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া একটু বেড়ানো ; তার পর একটু-কিছু পানাহার। এটুকু সারিয়া তবে গৃহকর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করুন। সকালে উঠিয়া সংসার-ঘানিতে নিজেকে জুতিয়া দিলাম, মুখে কিছু দিবার সময় মিলিল হয় তো সেই বেলা দুপুরে—ইহাতে পাথরের মতো কঠিন মজবুত দেহও অচিরে অবসাদে ভরিয়া গলিয়া যায় !

অনেকে বলেন, কাজে মন লাগে না ! মন না লাগার কারণ দেহ-যন্ত্র ক্লান্ত হইয়াছে, তাই মনকেও কাজের মধ্যে পাওয়া যায় না। দেহ যদি সুস্থ থাকে, তাহা হইলে কোনো কাজেই মন বিরাগী থাকিতে পারে না !

দারিদ্র্য, অভাব, শোক, দুঃখ—এ সব কোন্ সংসারে নাই ? সে-জন্য নিশ্বাস ফেলিলে চলিবে না ! সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁদের মনে মন মিলাইয়া সংসারে শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য সে অভাব-দুঃখ ভুলিয়া সহজ সুস্থ মন লইয়া বাঁচা ভিন্ন উপায় যখন নাই, তখন মনের দুঃখ মনে চাপিতেই হইবে। সহজ বুদ্ধিকে সচেতন করিতে পারিলে এ সব দুঃখ-বেদনা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

বাঁচিতে হইলে বাঁচার মতো বাঁচা চাই। দেহ-মন সুস্থ রাখিয়া বাঁচিতে হইবে।

তার উপর দেহ-মনকে শক্ত-সমর্থ রাখিতে হইলে নিত্য বিশেষ ব্যায়াম-বিধি পালন করা প্রয়োজন। এ ব্যায়ামে দেহের কোনো দিকে যেমন ভাঙন ধরিবে না, তেমনি কাজে কখনো ক্লান্তি উপলব্ধি করিবেন না।

এই ব্যায়াম-বিধির কথাই বলিতেছি। এ ব্যায়াম-চর্চ্চার জন্ম চাই একগাছি বড় লাঠি। লাঠি লইয়া নিত্য এ ব্যায়াম করিলে দেহের পেশীসমূহ কোনো কালে কোনো কাজে ক্লান্ত হইবে না—পেশী বেশ শক্ত-সমর্থ থাকিবে। এ ব্যায়ামে বিরাম-বিশ্রামও মিলিবে।

১। দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া লাঠিটি কাঁধের উপর লম্বালম্বিভাবে রাখুন। মাথার পিছনে ঘাড়ে লাঠির



১। লাঠিটি কাঁধের উপর

মধ্যভাগ ঠেকিয়া থাকিবে। কনুইয়ের কাছে দুই হাত (১নং ছবির মতো) বাঁকাইয়া লাঠির দুই প্রান্ত দু' হাতে ধরিবেন। তার পর এমনি ভাবে দাঁড়াইয়া মাথা, ঘাড় ও পিঠ না বাঁকাইয়া লাঠিটি দু' হাতে ধরিয়া উর্দ্ধে তুলুন। তুলিয়া লাঠি নামান। এই ভাবে ছয় বার লাঠি তোলা-নামা করিতে হইবে। অভ্যাস হইলে ছয়ের জায়গায় দশ বার, বারো বার, কুড়ি বার পর্য্যন্ত লাঠি তোলা-নামা করিবেন।

২। এবার দাঁড়াইয়া লাঠিটা ধরুন সামনের দিকে—ধরিয়া লাঠি উর্দ্ধে তুলুন। তুলিবার সময় মাথা হেলাইয়া (২নং ছবির মতো) লাঠির পানে চাহিয়া দেখুন। তার পর লাঠি নামান; হাঁটু পর্য্যন্ত নামাইতে হইবে। নামাইবার সময় মাথা ও ঘাড় নীচের দিকে ঝুঁকিবে। যতখানি ঝুঁকাইতে পারিবেন, ঝুঁকাইবেন। এই ভাবে



২। লাঠির পানে চাহিয়া

এক বার লাঠি তোলা এবং পরের বার লাঠি নামানো—এ তোলা-নামা করিবেন ছ' বার। তার পর দশ বার, বারো বার, কুড়ি বার পর্য্যন্ত মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন। এ ব্যায়ামে বুকের গড়ন সুঠাম থাকিবে চিরকাল।

৩। এবার দাঁড়াইয়া (৩নং ছবির মতো) মাথা পিছন-দিকে হেলাইয়া লাঠিটি সিধা-খাড়া ভাবে উর্দ্ধে তুলুন। বাঁ হাত দিয়া লাঠির এক প্রান্ত যত উর্দ্ধে হাত

পান ধরিবেন ; ডান হাতে লাঠির তলার দিক ধরিবেন। লাঠির নিম্ন প্রান্ত থাকিবে ঠিক বুকের নীচে। লাঠি এমনি ভাবে তুলিয়া এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত গুণুন।



৩। লাঠি উর্দ্ধে

তার পর বিপরীত দিকে মাথা হেলাইয়া লাঠির ডগার দিক ধরুন ডান হাতে, তলার দিক ধরুন বাঁ হাতে। খুব দ্রুততালে হাত-ফেরাফেরি করিয়া লাঠি ধরিতে হইবে। এ ব্যায়াম করা চাই ষোল বার করিয়া। এ ব্যায়ামে কোমর, পিঠ এবং দুই হাত বেশ মজবুত হইবে—কোনো কাজে কোনো দিন দেহ ক্লান্তি-ভরে অবসন্ন হইবে না।

৪। এবার টুলে বা চেয়ারে বসিয়া (৪নং ছবির মতো) দুই হাত ফাঁক করিয়া দু' হাতে ধরিয়া লাঠিটি উর্দ্ধে তুলুন। দু' হাতে লাঠির দুই প্রান্ত ধরিয়া থাকিবেন। তার পর চেয়ারে বা টুলে বসিয়া মাথা ও পিঠ নোয়াইয়া লাঠিটি রাখুন পায়ের কাছে মেঝের উপর (৫নং ছবির মতো) ; তার পর আগেকার ভঙ্গীতে আবার লাঠি তুলুন। এই ভাবে লাঠি একবার উর্দ্ধে তুলিবেন, পরক্ষণে নীচে পায়ের কাছে নামাইবেন। এ ব্যায়াম করা চাই ছ' বার। এ ব্যায়ামে মেরুদণ্ড মজবুত হইবে ; কোনো কাজে পিঠ টন্‌টন্ করিবে না ; পিঠে ব্যথা বা ক্লান্তি বোধ করিবেন না।

এ ব্যায়াম করিবার সময় যখন (৪নং ছবির মতো) লাঠি উর্দ্ধে তুলিবেন, তখন জোরে নিশ্বাস লইবেন ; তার পর যখন (৫নং ছবির মতো) লাঠি নামাইবেন, তখন জোরে শ্বাস ত্যাগ করিবেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের রীতিটুকু মানিতে ভুলিবেন না।



৪। চেয়ারে বসিয়া লাঠির দুই প্রান্ত

৫। এবার ৬নং ছবির ভঙ্গীতে দুই পা দু'দিকে প্রসারিত করিয়া দাঁড়ান। কোমরের কাছ হইতে দেহ বাঁকাইয়া বাঁ-কাতে দাঁড়াইয়া লাঠিটি ধরুন ছবির ভঙ্গীতে ;



৫। পায়ের কাছে লাঠি রাখুন

ডান হাত থাকিবে উপর দিকে, বাঁ হাত নীচের দিকে। ঠিক ঐ ছবির মতো দু' হাতে লাঠি ধরিয়া থাকিবেন।

তার পর ডান দিকে ডান কাতে দাঁড়াইয়া লাঠি ধরিবেন বাঁ হাত উর্দ্ধে তুলিয়া, ডান হাত নীচের দিকে করিয়া।



৬। দেহ বাঁকাইয়া

এ ব্যায়ামও ছ' বার করিতে হইবে। এ ব্যায়ামে পেটে মেদ জমিবে না; সমস্ত দেহ মজবুত থাকিবে।

এ কয়টি ব্যায়ামে দেহ শুধু অক্লান্ত থাকিবে, তা নয়; দেহের সুঠাম-সুছাঁদ কখনো নষ্ট হইবে না।

এক-ঘরে ঘর করা

প্রাচীন নীতিশাস্ত্র পাড়িয়া আজ একান্নবর্ত্তী সংসারের কথা আলোচনা করিতেছি না। ভালো-মন্দ লোক সব সংসারে আছে; তাদের মনে ভালোবাসা আছে, দ্বেষ-হিংসা আছে,—এ সব কথা মানিয়া সকলের সুবিধা-অসুবিধার কথা বুঝিয়া সামঞ্জস্য-রচনা সম্ভব হয় কি না, সেই কথা আলোচনা করিতেছি।

এক-ঘরে ক'ভাই, খুড়া-খুড়ী, মাসি-পিসি, বিধবা-বোন, ভাগনে, ভগিনী প্রভৃতি লইয়া বাস করা সে-কালে ছিল আমাদের দেশে সনাতন-প্রথা।

তার কারণ ছিল। প্রধান কারণ, কাজ-কর্ম্মের জন্য এক-পরিবারের পাঁচ জনে তখন গৃহ-কোটর ছাড়িয়া দেশ-দেশান্তরে গিয়া বড় একটা বাস করিত না,—কাজের জন্য পুরুষমানুষকে বাহিরে থাকিতে হইলেও তার স্ত্রী-পুত্র দেশের বাড়ীতে বাস করিত। এখন নানা কারণে সে-রীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যেখানে এ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, অর্থাৎ পাঁচ ভাই মিলিয়া এক-সংসারে বাস করিতেছে, এমন সংসারের কথা বলিতেছি।

এক-ঘরে পাঁচ জনে মিলিয়া-মিশিয়া শৃঙ্খলা-শান্তি বজায় রাখিয়া যাঁরা বাস করিতে পারেন, আজিকার এই স্বার্থের যুগে তাঁরা আমাদের প্রণম্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ভাবে বাস করায় কতখানি চিত্ত-বল, কতখানি সংযম ও সহ্য-ধৈর্য্য প্রয়োজন, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়!

ভাইয়ে-ভাইয়ে যত ভালোবাসাই থাকুক, জায়ে-জায়ে ভালোবাসা সংসারে অতি-দুর্লভ বস্তু। ভিন্ন-ঘর হইতে ছ' জন মেয়ে আসিয়া স্বামীর সংসারে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যাইবে, এ দৃশ্য সংসারে বিরল। এবং এ মিলনের পথে মস্ত বাধা—টাকা-কড়ি! স্বামী অনেক টাকা রোজগার করেন, দ্যাওর রোজগার করে কম,—কাজেই আমার শাড়ী-গহনার সঙ্গে ছোট জায়ের শাড়ী-গহনা যদি সমান-পর্য্যায়ে দাঁড়ায়, তাহাতে আমার মন তৃপ্তি পাইবে কেন?

যদি বলেন, ভালোবাসা? তাহা হইলে আমাদের উত্তর, ভালোবাসার যত শক্তিই থাকুক, ভালোবাসা অক্ষয় নয়, অমর নয়! ভালোবাসার যে-শক্তি, সে-শক্তির একটা সীমা আছে। তার উপর ভালোবাসার মস্ত দোষ, সে নিজের উপর যতখানি প্রভাব মেলিয়া ধরে, পরের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ভালোবাসার সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি, কারণ, তিনি আমায় দেখেন তাঁর নয়ন-মণি! আমায় যদি তিনি সবার চেয়ে বড় করিয়া না দেখেন, সবার উপরে আমায় ঠাঁই না দেন, তাহা হইলে স্বামীর উপর জাতক্রোধ হয়, এ কথা বুকে হাত দিয়া অস্বীকার করিতে পারি কি?

মা-বাপ নিজের কুৎসিত ছেলেটিকে দেখেন কন্দর্পের মতো; পরের সুন্দর ছেলেকে নিজের সে কদর্য্য কুৎসিত

ছেলের চেয়ে কালো-কুরূপ দেখেন। পরের ছেলের সহিত নিজের ছেলে কলহ-বিবাদ করিয়া আসিলে মা-বাপ পরের ছেলেরই দোষ দেখেন—তার কারণ, ছেলেমেয়েকে তিনি ভালোবাসেন, তাই! এবং এই দোষ না দেখার মূলে আছে স্বার্থ! অর্থাৎ আমি! আমার ছেলে! আমার মেয়ে! আমার যেমন দোষ নাই, তাদেরো তেমনি দোষ থাকিতে পারে না!

কিন্তু এগুলা ছোট কথা। যে-কথা বলিতেছিলাম, এক-ঘরে পাঁচ জনে মিলিয়া-মিশিয়া ঘর করার কথা।

এক-ঘরে পাঁচ জনের সঙ্গে বাস করিতে গেলে মনে সত্যকার ভালোবাসা থাকা চাই—যে-ভালোবাসা দুর্বৃত্ত ছেলেমেয়েকেও সযত্নে আঁকড়িয়া থাকে, ত্যাগ করিতে পারে না! সেই ভালোবাসা চাই! এ ভালোবাসা মনে না থাকিলে কম-রোজগেরে দ্যাওর এবং বিধবা আশ্রিতা ননদের উপর দরদ জাগিবে কেন?

আর চাই আর পাঁচ জনের মন বুঝিয়া সে-মনকে স্বীকার করা; দরদ করা; এবং চাই মনের সহজ সরসতা।

আমরা যাদের ভালোবাসি, তাদের বিরাগে আমরা যেমন ব্যথা পাই, এমন ব্যথা তাদের আমরা দিতে পারি না। এবং প্রিয়জনকে যত চট্ করিয়া ব্যথা দিই, তেমন চট্ করিয়া তাঁদের সে-ব্যথা বিদূরিত করিতে পারি না বলিয়া সংসারে আমরা এতখানি কলহ-অশান্তি গড়িয়া তুলি!

আমি বড়-জা—আমার স্বামী অনেক টাকা রোজগার করেন,—আমি বাড়ীর কর্ত্রী! আমার ছেলে, আমার দ্যাওরের ছেলে, আমার বিধবা ননদের ছেলে,—তিন জনে খাইতে বসিয়া মাছের মুড়ার জন্য বায়না তুলিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমি বাড়ীর কর্ত্রী, আমার স্বামীর রোজগার বেশী, অতএব ও-মুড়া পাইবে আমার ছেলে—এমন মন লইয়া যদি সংসারে আমি কর্ত্রীত্ব করি, তাহা হইলে সে-কর্ত্রীত্বে সংসার সংসার থাকে না—কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে উচিত, ছেলেদের কা'কেও মুড়া দিব না; কিম্বা পালা করিয়া তিন দিন তিন জনকেই মুড়া দিব। নহিলে আমার ছেলেকে মুড়া দিয়া আজ আমার চিত্তে তৃপ্তি ঘটিলেও ঐ মুড়া খাওয়াইয়া যে আমার ছেলের মুড়াটিও আমি জন্মের মতো খাইয়া বসিব, এ কথা মনে রাখিবেন! এই মুড়া-দানের ব্যবস্থায় মনে উদারতা চাই,—আর চাই অপরের মন বুঝিয়া সে-মনকে স্বীকার করা, দরদ করা।

তার উপর আমাদের সকলের ব্যক্তিগত রুচি-খেয়ালে বিভিন্নতা আছে। কেহ মিষ্ট খাইতে ভালোবাসে; কারো ঝালের উপর অনুরাগ; কারো বা অম্ল-রসে। এখানে বাড়ীর কর্ত্রীর উচিত, সকলের রুচি, সকলের খেয়ালকে মানিয়া চলা।

কথায় বলে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম—মানুষের ভুল-চুক হওয়া স্বাভাবিক। দোষ-ত্রুটি ঘটিলে ক্রোধে-অভিমানে ঝঙ্কার-হুঙ্কার না তুলিয়া সরস কৌতুক-হাস্যের উৎস খুলিয়া দিলে দোষীর ত্রুটি যেমন সহজে স্খালিত হইবে, তেমনি সংসারের বুকে ঝড়ের মেঘ বাষ্পাকারেও ঠাঁই পাইবে না! ইহাতে শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় থাকিবে না।

আপনার দ্যাওর রোজ রাত্রে বন্ধুদের আড্ডায় তাস খেলিয়া রাত্রি এগারোটায় বাড়ী ফেরে। রাগ করিয়া যদি আপনি ঠাকুরকে বলেন,—হাঁড়ি-হেঁশেল তুলিয়া, ফেলিয়া রাখো ভাতের থালা ঢাকা-চাপা দিয়া রান্নাঘরে—তাহা হইলে গৃহিণীপনার কথা তুলিয়া সমাজে কথা কহিবেন না। আপনার স্বামী-পুত্র যদি দেরী করিয়া বাড়ী আসিতেন, তাহা হইলে ঠাকুরকে এ আদেশ দিতে পারিতেন?

চাকর-দাসী, অতিথি-কুটুম্বকে যেটুকু শিষ্টাচার দেখান, রাগ হইলেও সে-রাগ দমন করিয়া যেমন ভদ্র-সৌজন্যে আপ্যায়িত করেন, এক-বাড়ীতে বাস করেন বলিয়া দ্যাওরকে সে শিষ্টাচার-সৌজন্য দেখাইতে কার্পণ্য হয় কেন? দ্যাওরের ঐ বদ্ অভ্যাসের জন্য বামুন-চাকরের কষ্ট হয় ভাবেন, বেশ, দ্যাওরকে সহজ কথায় বলিতে পারেন তো, ঠাকুরপো, খেয়ে-দেয়ে তাস খেলতে বেরিয়ো ভাই—না হলে ঠাকুর-চাকরের কষ্ট হয়। তাহা হইলে অশান্তি-উৎপাতে ঘর ভাঙে না, শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয় না!

আসল কথা, অপরকে মানিয়া চলাতেই মনের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয়। আমি সর্ব্বময়ী—আমার ইচ্ছাই ইচ্ছা—এ কথা কোনো শিক্ষিতা মহিলা মনে আনিতে পারেন না।

মেয়ে-জাতের উপরেই সংসারের শান্তি নির্ভর

করিতেছে। পুরুষ-মানুষকে নানা কাজে নানা চিন্তায় সংসারে বিব্রত থাকিতে হয়। ঘরে আসিলে যদি তাঁদের কাণে স্ত্রীজাতি অহরহ লাগানি-ভাঙ্গানির কথা বলিয়া চুকলি কাটেন, তাহা হইলে বেচারী পুরুষ যে নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধরিবে, সে-মূর্ত্তি শুধু হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, স্ত্রী-পুত্রের শান্তি-সুখও বিদীর্ণ করিয়া দিবে!

অতএব স্ত্রীজাতির উচিত, ধৈর্য্যশীলা সহশীলা হইয়া স্নেহ-মমতায় বুক ভরিয়া সংসারের চার্জ্জ লওয়া। শুধু স্বামী-পুত্র লইয়া সংসার গড়িলে বহু দুর্দ্দিনে বহু অসুবিধা সহিতে হইবে। ভাগ্যক্রমে যিনি দ্যাওর-ননদ পাইয়াছেন, তিনি যে কেন তাঁদের বহিষ্কার-করণে উদ্যত হন, বুঝিতে পারি না! বাড়ীর পশুপক্ষীর উপরেও মমতা জাগে। দ্যাওর-ননদ কি বাড়ীর কুকুর ও কাকাতুয়ার অধম যে, তাদের আপন করিয়া লওয়া যাইবে না? নিজের ভাই-বোনের কথা যেমন ভাবেন, তেমনি করিয়া দ্যাওর-ননদকে স্বামীর ভাই-বোন বলিয়া মনে করিতে পারেন না? তাহা করিলে দ্যাওর-ননদের সমস্যা সংসারে কোনো দিন সমস্যার সৃষ্টি করিবে না; মনে শান্তি পাইবেন; দ্যাওর-ননদকে লইয়া কষ্ট বোধ করিবেন না!

ভিক্ষায় অপরাধ

তুমি কি জানিতে হৃদয়ে আমার বেদনার বীণা বাজে,
তোমারি হাস্যে, তোমরি লাস্যে প্রতিটি সকাল-সাঁঝে?
চাহি নাই যাহা তুমি আনো তাহা ব্যথা যে তাহাতে পাই,
খুঁজে ফিরি যাহা, নাহি পাই তাহা—তুলনা তাহারো নাই!
ছেড়ে যেতে চাই যাহারে যতই, জড়াইয়া তারে দাও,
ভোগের নামেতে এই দুর্ভোগ দিয়া কি-বা সুখ পাও?
যার লাগি' ছুটি যত পাছু-পাছু তাহারে হারাও দূরে,
যত গান গাহি আপনা-পাশরি আমি যেন কাঁদি সুরে!

এ জীবন যদি লভেছি জগতে কেন গো দুরাশা দিলে?
কেন দুখময় দীনের দিবস, সুখ যদি নাহি মিলে!
গোপনে রহিয়া হে গোপন-প্রিয়, এ কি খেলা নিরদয়!
আমি যা' কহিতে চাহি প্রাণ খুলে, তাহারে করিছ লয়!
এই কি তোমার পালন-মন্ত্র এই-কি তোমার কাজ?
আমার মাঝারে আমার করম্ আমারেই দেয় লাজ!
আমিই আমারে ঘেরিয়া-ঘেরিয়া যত বার দিই রূপ্,
আমার কামনা সমূলে নাশিয়া তুমি নিশ্চল—চুপ্!

ওগো অ-দেখার অ-তুল রতন, ওগো সাধকের প্রিয়,
আমার সাধনা আমার সিদ্ধি তোমাতেই হ'রে নিয়ো!
দিয়ো তুমি দিয়ো যাহা দিতে চাও মাথা পেতে তারে লবো!
যত ব্যথা পাই গোপনে বহিব কথাটিও নাহি কবো!
যদি কাঁদে প্রাণ অন্তর-তলে হরিব চোখের জল,
সহন-অতীতে নীরবে সহিতে—এইটুকু দিয়ো বল।
এর বেশী আর ভিখ্ মেগে প্রভু ফিরিতে নাহিক সাধ—
এর বেশী যারা ভিখ্ চায় তারা করে মহা-অপরাধ!

শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় (বিদ্যাবিনোদ)।



ভারতের বর্ত্তমান শিল্প-পরিস্থিতি

বিগত মহাযুদ্ধের ন্যায়, বর্ত্তমান মহাবিপ্লবেও বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের পক্ষে সাম্রাজ্যের সঙ্কটোদ্ধার-চেষ্টা ব্যতীত ভারতের স্থায়ী কল্যাণপ্রদ শিল্পোন্নতি-বিধায়ক কোন অনুষ্ঠানে একান্ত ভাবে প্রবৃত্ত হইবার আপাততঃ কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না; কিন্তু যুদ্ধাবসানে যে একটি সামঞ্জস্য-বিহীন পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য, তাহার যথাসম্ভব প্রতীকারকল্পে এখন হইতে কিছু-কিছু সতর্কতামূলক এবং প্রতিষেধক বিধি-ব্যবস্থার ও নিয়ম-নিষ্ঠার প্রবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়।

যুদ্ধের নানা প্রয়োজন সাধনে কর্ত্তৃপক্ষ মুক্তহস্তে কোটি-কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন; কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ যুদ্ধানুষঙ্গিক সৌভাগ্যের আভাসমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। যুদ্ধার্থ ব্যয় যাহাতে ভারতের স্থায়ী কল্যাণ-কল্পে যথাসম্ভব নিয়োজিত হয়, তৎপ্রতি কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা আমাদের পক্ষে অসঙ্গত নহে। এই ব্যয়-নির্দ্ধারণ-নিয়ন্ত্রণে দেশবাসীর সহযোগ ও সহানুভূতি সর্ব্বতোভাবে কাম্য। যুদ্ধ-পরিচালন-সৌকর্য্যার্থ ব্যয়ের পরিমিত পরিমাণের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক-দৃষ্টি রাখা সম্ভব নহে। তথাপি যে অর্থ ব্যয় করা হইতেছে, তাহার পরিমাণ-ফল যাহাতে ভারতের স্থায়ী কল্যাণপ্রদ হয়, তৎপ্রতি অবহিত হওয়া অসম্ভব নহে। বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে এ শিক্ষা আমরা যথেষ্ট পরিমাণেই অর্জ্জন করিয়াছি। এই বাধ্যতামূলক অপরিমিত ব্যয়ই আমাদিগকে যুদ্ধের সাহায্যার্থ যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ ও সরবরাহ-ব্যপদেশে কোন-কোন শিল্পে স্থায়ী পরিকল্পনাকে চিরকল্যাণপ্রদ রূপ-দানের সুযোগ ও সুবিধা উপস্থাপিত করিতেছে।

পূর্ব্বে বহু লোকেরই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণ ভারতে প্রস্তুত করিবার সুযোগ ও সুবিধা বিরল; কিন্তু গতবারের ও বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রচেষ্টার ফলে এই ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধোপযোগী গোলা, গুলী, বন্দুক, বারুদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা ভারতীয় বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের বিরুদ্ধে আরোপিত বহু দিনের ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত করিয়াছে। পক্ষান্তরে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে উপযুক্ত কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, এবং সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করিলে তাহারা অন্যান্য সংহারাস্ত্র নির্ম্মাণেও সমর্থ হইবে। ভারতে কায়েমী ভাবে যুদ্ধাস্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত কাল ও সুযোগ আসিয়াছে—এ সুযোগ উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। সরকারের যথাযোগ্য চেষ্টা, যত্ন ও সহানুভূতির অভাব না হইলে এত দিনে ভারতে মোটর-গাড়ী ও বিমান-নির্ম্মাণের কারখানা এবং জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী বহুসংখ্যক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রগতিশীল শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারে সহায়তা করিবে।

সম্প্রতি যুদ্ধারম্ভের পনের মাস পরে ভারত সরকার এই তিন মূল ও মুখ্য শিল্পের (Key Industries) প্রতিষ্ঠাকল্পে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। বহু বর্ষ যাবৎ মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান, পূর্ত্ত ও স্থপতি-বিদ্যায় অভিজ্ঞ স্যার মৎস্যগাণ্ডী বিশ্বেশ্বরায়া ভারতে মোটর-গাড়ী নির্ম্মাণের একটি কারখানা স্থাপনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সরকারের সক্রিয় সহানুভূতি বা আনুকূল্য লাভ করিতে পারেন নাই। যুদ্ধার্থ ভারতের বাহিরে তাঁহারা এত মোটর-গাড়ী নির্ম্মাণের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন যে, আশু এই শিল্পে সক্রিয় সাহায্য দান, কয়েকটি কারণে তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। ইহা গভীর ক্ষোভের বিষয়। পাঠক হয় ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না যে, ভারত সরকার সম্প্রতি ২৪ কোটি টাকা মূল্যে ষাট হাজার মোটর-গাড়ী ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং এক

জন বিশেষজ্ঞের মত এই যে, এই ষাট হাজার গাড়ীর আবশ্যকানুযায়ী অদল-বদলের নিমিত্ত ভারতে একটি বৃহৎ মোটর-গাড়ীসংক্রান্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এই শিল্পে এত দিন সাহায্যবিমুখতার অজুহাতও বিস্ময়কর! কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় রাজস্ব তদন্ত বৈঠকের (Indian Fiscal Commission) সুপারিশ ছিল, কোন চল্‌তি কারবার বিপন্ন হইলে সাহায্যলাভের অধিকারী হইবে। যুদ্ধের তাগিদে বর্ত্তমানে এ নিয়ম-নিষ্ঠার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা নাই, তাহা গড়িতে হইবে।

বিমান-শিল্প প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সরকার সক্রিয় সাহায্য দান করিয়াছেন; কোন একটি স্বদেশী বিমান-প্রতিষ্ঠান হইতে যুদ্ধোপযোগী বিমান ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। যুদ্ধ বাধিবার প্রারম্ভেই সরকারের নিকট এইরূপ একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ভারত সরকার যখন নিষ্ক্রিয় ছিলেন, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা সেই সময় প্রভূত তৎপরতার সহিত এই শিল্পে অগ্রসর হইতেছিল। গত জুন মাসে যখন এই বিমান-নির্ম্মাণ-পরিকল্পনার পুনরান্দোলন গভীর উৎসাহের সহিত সরকারের গোচর করা হয়, তাহার পরেও সুদীর্ঘ চারি মাস অতিবাহিত হইয়াছিল কেবল সরকারের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য! ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়া দিনে দুইখানি এবং কানাডা মাসে ৩৬০ খানি বিমান নির্ম্মাণের অগ্রগতি লাভে সমর্থ হইয়াছে! যুদ্ধের প্রারম্ভে অবহিত হইলে এত দিনে ভারত তাহার প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-বিমান নির্ম্মাণে সমর্থ হইত।

অর্ণবপোত নির্ম্মাণ-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আরও বিস্ময়কর। ষোল বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় বণিক্‌ নৌ-বাহিনী-তদন্ত সমিতি (Indian Mercantile Marine Committee) ভারতে পোত-নির্ম্মাণের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই সমিতি সরকার কর্ত্তৃক সংগঠিত হইয়াছিল, এবং পোত-শিল্পে বিশেষজ্ঞ কয়েক জন বৃটিশ সদস্য ইহার নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন। এই সমিতি বিশিষ্ট সরকারী সাহায্যের জন্যও সুপারিশ করিয়াছিলেন। সমিতির প্রধান সুপারিশ ইহাই ছিল যে, ভারতের উপকূল-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে মালবাহী ভারতীয় জাহাজ-প্রতিষ্ঠানগুলিরই অধিকারে থাকিবে। এই সুপারিশ কার্য্যকরী করা দূরের কথা, ভারত-শাসন আইনে ইহার প্রতিকূল ব্যবস্থাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের বিপুল চেষ্টা সত্ত্বেও সিন্ধিয়া জাহাজ-কোম্পানী কলিকাতায় জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী ঘাঁটির জন্য স্থান সংগ্রহ করিতে পারে নাই! ফলতঃ, কলিকাতা একটি বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সুযোগ ও সুবিধায় বঞ্চিত হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ ক্ষতি কেবল মাত্র বাঙ্গালার গৌরব কলিকাতা মহানগরীরই নহে, এ ক্ষতি সমগ্র বঙ্গ-দেশের। কলিকাতায় এই শিল্পের অনুষ্ঠান হইলে বহু আনুষঙ্গিক সহকারী ও সহযোগী শিল্পের প্রচুর উন্নতি ঘটিত, এবং বাঙ্গালার বহু শ্রমজীবী ও কারিকরের অন্ন-সংস্থানেরও সুব্যবস্থা হইত। কলিকাতা যে সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়াছে—ভাইজাগা (বিশাখাপত্তন) তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা সম্যক্ সমৃদ্ধিলাভ করিবে। পূর্ব্ব-উপকূলে এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া-তুলিতে সিন্ধিয়া জাহাজ-কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইতেছে ও হইবে। যুক্তরাজ্য হইতে একটি চল্‌তি পোতনির্ম্মাণ-ঘাঁটির (Ship-yard) যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি ভারতে স্থানান্তরিত করিয়া তন্নির্ম্মিত পোতগুলি সবকারের যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রদান করিবার প্রস্তাবটিও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সরকারের বহুসংখ্যক জাহাজের প্রয়োজন। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিস্তর জাহাজ ক্রয় করা হইতেছে; তথাপি ভারতে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টাকে কার্য্যোপযোগী করিবার উপযুক্ত সাহায্যের একান্ত অভাব! কিছু দিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসভার এক অধিবেশনে বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী স্যার এলান লয়েড্‌ ঘোষণা করিয়াছিলেন, যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহায়করূপে ভারতে পোত-শিল্প-প্রতিষ্ঠার্থ সরকার উদ্যমশীল নহেন! যাহা হউক, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্রসভায় বে-সরকারী সদস্যগণের প্রচণ্ড আন্দোলন ও আলোচনার ফলে সরকার ভাইজাগাপট্টমের পোত-নির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণের প্রয়োজনার্থ জাহাজের এঞ্জিন এবং জাহাজের কাঠামো নির্ম্মাণোপযোগী যথাসম্ভব ইস্পাত যুক্তরাজ্য হইতে

আনয়নের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে সরকারের এই অনুকম্পাটুকুই লাভ করিয়া পোতনির্ম্মাণ-শিল্পের উদ্যোক্তৃগণকে খুসী হইতে হইবে।

এই তিনটি অত্যাবশ্যক আদিম শিল্পে ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় দৈন্য, কর্ত্তৃপক্ষের এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠাপকবর্গের অদূরদর্শিতা ও অর্থনৈতিক অনবধানতার পরিচায়ক। এত দিন ভারতে এই সকল শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে আজ ভারতীয় রাজশক্তিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হইতে হইত না। শুধু তাহাই নহে, শিল্পপ্রগতিসম্পন্ন ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য এবং পণ্যসম্ভার ভারতীয় রাজশক্তির যুদ্ধ-পরিচালন প্রচেষ্টাকে অধিকতর বলবতী ও ফলবতী করিত। কিন্তু ইহার ফলে প্রথম শ্রেণীর বণিক মার্কিণ ধনকুবেরগণ সরকারের প্রতি কত-খানি প্রসন্ন হইতেন, তাহা অনুমান করা কঠিন।

যাহা হউক, বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির ফলে ভারতে পুনরায় বহু ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ নানাবিধ সমুন্নত শিল্প-পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার যে অত্যুত্তম সুযোগ আসিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহারার্থ আমাদিগকে আশু ঐকান্তিক ভাবে উদ্যোগী ও উদ্যমশীল হইতে হইবে। যুদ্ধ-সরবরাহ বিভাগের ইস্তাহারে আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই—ভারত রাতারাতি রাষ্ট্র-রক্ষণ শিল্পে আশাতীত দক্ষতা লাভ করিয়াছে। সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। যদি বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে, উপযুক্ত সময়ে যথোচিত চেষ্টা সহকারে এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমরা মনোযোগী হইতাম, তাহা হইলে আজ আমরা কত উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতাম, তাহাই বিবেচ্য ও বিচার্য্য। এক বৎসর যুদ্ধ-পরিচালনান্তেও ভারতের শিল্প-সম্ভাবনার কত ক্ষুদ্র অংশে শক্তি সম্ভাবিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। এখনও আমাদের শিল্প-শৃঙ্খলার বহু পর্ব্ব বিযুক্ত রহিয়াছে, এবং তাহাদিগকে যুক্ত করিবার উপযুক্ত বহু শিল্পে আমাদের প্রচেষ্টা সম্যকরূপে প্রযুক্ত হয় নাই।

আমাদের বাণিজ্য-সচিব ভরসা দিয়াছেন, যুদ্ধার্থ অনুষ্ঠিত নূতন শিল্প যুদ্ধাবসানে যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তজ্জন্য সরকার যথাবিহিত সাহায্য প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই অভয় বাণী এবং শিল্পোন্নতি-বিধায়ক গবেষণা-বৈঠকের (Board of Industrial Research) প্রতিষ্ঠা সরকারের সদিচ্ছার পরিচায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে যেন একটু কৃপা বিতরণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে। ভারতের প্রতি ইহা যেন একটু অনুগ্রহ প্রদর্শনেরই নিদর্শন মাত্র। নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা যে বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ফলে অতীব প্রয়োজন এবং অবশ্যকর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সরকারের আগ্রহশীল উৎসাহ ও সাহায্যের ইঙ্গিত মাত্রও ইহাতে পাওয়া যায় না।

সকল দেশেই রাষ্ট্র, শিল্প-প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারকল্পে অকপটে উৎসাহ এবং মুক্তহস্তে সাহায্য প্রদান করিয়াই নিরস্ত থাকেন না; প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণও করেন। আমাদের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র যে এরূপ নীতির উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই, তাহা সত্য নহে; কিন্তু সরকারের বর্ত্তমান গঠন-প্রণালী সেই নীতি সম্যকরূপে অবলম্বনের অনুকূল নহে। জাতীয় শাসন-প্রণালী অকুণ্ঠিত ভাবে যে নীতি অবলম্বন করিতে পারে, এবং শিল্প-পরিচালক-বর্গকে সাহস সঞ্চয় পূর্ব্বক যেরূপ ঝুঁকি লইতে প্রবৃত্তি দিতে পারে, বহু জটিল সমস্যার সম্মুখীন বর্ত্তমান স্বদেশ-সাপেক্ষ শাসনতন্ত্রের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

যুদ্ধ পরিচালন সময়ে জাতীয় উন্নতিমূলক সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। ভারতেও ঘটনাচক্রে তাহার ব্যত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল যুদ্ধ-প্রয়োজনে নিবদ্ধ-দৃষ্টি শাসন-তন্ত্রের পক্ষে এখন ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিল্প-প্রসারণ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া দুরূহ; তথাপি যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহার্থ যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, তাহার সুযোগ লইয়া, কোন কোন শিল্পের স্থায়ী প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠার অনুকূলে যথাসম্ভব মনোযোগ প্রদান করা অসম্ভব নহে। বিগত মহাযুদ্ধের পর যে সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছিল, শাসনতন্ত্রের শিথিলতার জন্য, এবং শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক নিষ্ঠার অভাব বশতঃ তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। সুযোগ কদাচিৎ একাধিকবার আসিয়া থাকে। ঘটনা-চক্রে আমরা এই দ্বিতীয় বার সুযোগ লাভ করিয়াছি;

এ সুযোগ হেলায় হারাইলে আমাদের পুনরভ্যুদয়ের আর কোন আশা থাকিবে না।

বিগত মহাযুদ্ধাবসানে লব্ধ যে সুবর্ণ সুযোগ আমরা হারাইয়াছি, তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া 'ষ্টেটসম্যান' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্যার এলফ্রেড ওয়াটসন বিলাতের এক বিখ্যাত পত্রিকায় (Great Britain and the East) লিখিয়াছেন—"ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, একটি দ্বিতীয় জগৎ-জোড়া যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছে—বৃটিশ জাতিকে সম্বুদ্ধ করিতে, এমন একটি বিরাট দেশের শিল্প-সম্ভাবনা সম্বন্ধে,—যে দেশ প্রায় প্রত্যেক প্রকার কাঁচা মালে সমৃদ্ধ, এবং যাহার লোকসংখ্যার অযুত অযুত ব্যক্তি উত্তরাধিকারিসূত্রে কারিকর, এবং সামান্য শিক্ষা সহকারে যাহারা যাহাতে বিলক্ষণ পটু, সেই হাতের কাজ হইতে, আধুনিক কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতি-সাহায্যে ভূরি উৎপাদনে দক্ষতা লাভে সক্ষম।" দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অতীতের আলোচনা নিষ্ফল।

অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড বিগত মহাযুদ্ধ কালে বহির্বাণিজ্য এবং শিল্প সম্বন্ধে যেরূপ দূর-প্রসারিণী নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার তুলনায় ভারতের প্রচেষ্টা যে অতি অকিঞ্চিৎকর, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধের বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ সমূহের দিল্লী বৈঠকে সমাগত অষ্ট্রেলীয় প্রতিনিধিগণের নায়ক স্যার ওয়ালটার ম্যাসিগ্রীণ সে দিন বলিয়াছেন, বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে তাঁহার দেশে শিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাভাসের সূচনা হইতেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার শিল্প-সামর্থ্য ও সম্ভাবনার পর্য্যাপ্ত আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছেন। আমরা এখন যুদ্ধোপযোগী উপাদান উপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহে ব্যাপৃত। এই প্রয়োজন প্রচেষ্টাই মুখ্য। কিন্তু গৌণের প্রতিও যথাসম্ভব সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন।

উদাহরণ স্বরূপ তৈলবীজ পণ্যের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু বিদেশে মাল চালান বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং ভারে-ভারে তৈল-বীজ বন্দর সমূহের গুদামে স্তূপীকৃত হইতেছিল। আমাদের দেশে যদি তৈল-নিষ্কাশন শিল্পের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে এই দ্রুত ধ্বংসশীল কাঁচা মালের সদ্ব্যবহার দ্বারা উপকৃত ও লাভবান হইতে পরিতাম। অন্যান্য কয়েকটি পণ্য সমূহেও অনুরূপ অবস্থার উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এই সকল কাঁচা মালকে পরিণত পণ্যে পরিবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলে আমাদের দেশের কৃষক, ধনিক, শ্রমিক ও বণিক—সকলেই উপকৃত হইতে পারিত। বিদেশী চাহিদা ও বিদেশগামী পণ্য-জাহাজে স্থানের অভাব বশতঃ তাহাদের অপচয় হইবার আশঙ্কা থাকিত না।

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে আমরা রাসায়নিক শিল্পে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছি; তথাপি গুরু এবং আদিম রাসায়নিক শিল্পে আমাদের প্রয়োজনানুরূপ অগ্রগতি হয় নাই। নতুবা ঔষধ ও বণিজ্-শিল্পের চাহিদা মিটাইয়া আমরা যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ও সরবরাহ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিতাম। সামান্য দূরদৃষ্টি সহকারে যদি আমরা যথাপূর্ব্বে অধ্যবসায় অবলম্বন করিতাম, তাহা হইলে কোন কোন অত্যাবশ্যকীয় গুরু ও মধ্যম, অর্থাৎ সহযোগী, অথবা সহকারী শিল্পে আমরা শুধু কৃতিত্ব নহে, আত্ম-প্রাচুর্য্যও অর্জ্জন করিতে পারিতাম। সুখের বিষয়, ভারত শীঘ্রই ক্লোরোফর্ম্ম, ক্যালসিয়াম ল্যাক্টেট্, কার্বলিক এসিড, সোডা এস্, কষ্টিক সোডা, সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট্, ব্লিচিং পাউডার, তরল ক্লোরিণ, ব্রোমাইন্, জিঙ্ক ক্লোরাইড্, ইথার, ট্যানিক এসিড, ক্রিসলস্, পটাসিয়াম্ কার্বনেট, সোডিয়াম্ সাইট্রেট্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহে কিছু কিছু রপ্তানী করিতে পারিবে।

আমরা জার্ম্মাণী এবং ইটালী হইতে বহু পেটেণ্ট ঔষধ ক্রয় করি—যথা টনিক, ডিস্-ইন্‌ফেক্‌ট্যাণ্ট, মেডিকেটেড্ ড্রাগস্, এস্পিরিন, হাইড্রোজেন্ পেরেক্‌সাইড এবং নানাবিধ অইণ্টমেণ্ট। ভারতে প্রচুর ঔষধ প্রস্তুতোপযোগী উদ্ভিজ্জ জন্মে; বর্ত্তমানে বহু রাসায়নিক কারখানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং স্বদেশ ও বিদেশ কুত্রাপি উচ্চশিক্ষিত রাসায়নিকের অভাব নাই। সুতরাং ভারতের পক্ষে এই সকল দ্রব্যজাত প্রস্তুত আদৌ কঠিন কার্য্য নহে। অনেকেই জানেন না যে,

ভারতে বহু শতাব্দী হইতে এই সকল রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্য অসংস্কৃত অবস্থায় প্রস্তুত হইয়া বৈদ্য এবং য়ুনানী হাকিমদের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু বিদেশী পণ্যের আমদানী রুদ্ধ হওয়ায় যে উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রাচীন রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে আধুনিক গবেষণা-প্রসূত উন্নত প্রণালী এবং উন্নত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সাহায্যে সুসংস্কৃত করিবার উপায় সুগম হইয়াছে। এই শিল্পের উন্নতি স্থায়ী হইবে। যুদ্ধাবসানেও ইহার অগ্রগতি অপ্রতিহত থাকিবে। সরকারও সাহায্য-দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

যুদ্ধের তাগিদে কোন কোন শিল্পে অকস্মাৎ অত্যধিক মনোযোগ ও উদ্যমের ফলে একটি সামঞ্জস্যহীন অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। যুদ্ধোপকরণ-সরবরাহ বিভাগের চাহিদা মিটাইতে লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক, বিজলী-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পে যেমন দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে, শর্করা, পাথুরিয়া কয়লা, বিলাতি মাটী, এবং কিয়দংশে বুননি প্রভৃতি শিল্পে তেমনি অবনতি ঘটিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কারণে এই সকল শিল্পের অবনতি হইয়াছে। শর্করা-শিল্প অদূরদর্শিতার ফলে বিপন্ন হইয়াছে। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দে আমরা জাভার উপর নির্ভরশীল ছিলাম। ঐ সময় অতি উচ্চমূল্যে আমাদিগকে শর্করা কিনিতে হইয়াছিল। সরকারী রক্ষণ-নীতির ফলে ঐ শিল্পে ভারত দ্রুত উন্নতি লাভ করে। তার পর ঘটনাচক্রে অত্যধিক উৎপাদনবৃদ্ধি, মূল্যহ্রাস, এবং বিহার ও যুক্তপ্রদেশে সরকার কর্ত্তৃক ইক্ষুর মূল্যবৃদ্ধি হেতু এমন একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে, স্বল্প-শক্তিসম্পন্ন শর্করা কারখানার অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়াছে। পাথুরিয়া কয়লা শিল্পের দুর্গতি ঘটিয়াছে—অত্যধিক উৎপাদনবৃদ্ধির সহিত রপ্তানী-রোধের ফলে। কোন কোন আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হেতু ইমারত নির্ম্মাণ-কার্য্য শিথিল হওয়ার ফলে বিলাতি মাটী-শিল্পে মন্দা ঘটিয়াছে। সমুদ্রপারের বাজার হইতে বঞ্চিত হইয়া বুননি-শিল্পের ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু সম্প্রতি এশিয়ায় কোন কোন স্থানে চাহিদা বৃদ্ধি-হেতু কিঞ্চিৎ আশার আলোক লক্ষিত হইতেছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই লক্ষ্য করিবেন যে, যুদ্ধের প্রয়োজনের তাগিদে এক শ্রেণীর শিল্পের যেমন অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, অন্য এক শ্রেণীর শিল্পের তেমনি অবনতি অপরিহার্য্য হইয়াছে। যুদ্ধাবসানে এই পরিস্থিতির বিপর্য্যয় ঘটিবে। যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হইলে, যুদ্ধোপকরণ-শিল্পে মন্দা ঘটিবে এবং এই সকল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও কারিকর, ধনিক এবং বণিকদিগের বিপদ ঘটিবে। একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ হওয়া অসম্ভব; সুতরাং সেই সামঞ্জস্যবিহীন পরিস্থিতি হইতে যে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহার প্রতিবিধানকল্পে এখন হইতেই চিন্তা ও চেষ্টার প্রয়োজন। ব্যাপক শিল্প-প্রসারণই ইহার একমাত্র প্রতীকার; কিন্তু সে পক্ষে কোন পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না। অধিকন্তু প্রাচ্যগুচ্ছের (Eastern Group Conference) দিল্লী বৈঠকের অব্যবহিত ফলে এরূপ পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার পরিপুষ্টি সুদূরপরাহত হইবার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম্যালেরিয়া ও সিঙ্কোনা উৎপাদন

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির প্রতি সাধারণের মন আজকাল এত অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে যে, আমাদিগের পুরাতন অথচ অত্যাবশ্যক সমস্যাগুলি এখন সহজে তাঁহাদের মনে স্থান পাইবে—তাহার সম্ভাবনা নাই। ম্যালেরিয়া দমন এইরূপ একটি সমস্যা। সম্প্রতি প্রকাশিত বাঙ্গালা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া হ্রাস পাওয়া দূরের কথা, বরং তাহা বর্দ্ধিতই হইতেছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৩,৭২,৯৯২; ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৪,১৬,৫২১ হইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মোট মৃত্যুসংখ্যা ১৩,১৫,৮৮৬র সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই প্রদেশে এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক লোকের মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া। সরকারী রিপোর্টে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুসংখ্যা আমরা জানিতে পারিলেও, যাহারা না মরিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, সেরূপ লোকের প্রকৃত সংখ্যা জানিতে পারি

না ; তবে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "প্রতি ১০ বৎসরে বাঙ্গালায় প্রায় ১ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া অস্থি-চর্ম্মসার হয়।"—এ অবস্থায় ম্যালেরিয়াই যে বঙ্গদেশের উন্নতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বলা বাহুল্য, কেবল বাঙ্গালা কেন, সমগ্র ভারতকে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্তিদানের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের। বাঙ্গালা অপেক্ষা অন্যান্য প্রদেশ প্রতীকার-পন্থা অবলম্বনে অল্প-বিস্তর অগ্রসর হইতে পারে বটে, কিন্তু মোটের উপর দেখা যায় যে, যে সকল সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশের সাধারণ অবস্থার উন্নতির ফলে ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্ভবপর হয়, সে সকল ব্যবস্থার প্রতি প্রায়ই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। তদ্ভিন্ন, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের চিকিৎসারও যথাবিহিত ব্যবস্থা না থাকায় স্থায়িভাবে মৃত্যু-সংখ্যার হ্রাসও লক্ষিত হয় না। ম্যালেরিয়ার প্রতীকারের জন্য যত প্রকার ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সিঙ্কোনা-বল্কলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। সিঙ্কোনা-বল্কলজাত উপক্ষার সমূহ উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহারই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতের দুই-তিন স্থানে সরকারী নিয়ন্ত্রণে সিঙ্কোনার চাষ ও তাহা হইতে কুইনাইন ও অন্যান্য উপক্ষারাদি নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত সরকার যে গতানুগতিক পন্থা ও নীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা যথাযোগ্য সত্বরতার সহিত ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদের সহায়স্বরূপ না হইয়া বরং পরোক্ষ ভাবে তাহার প্রভাববৃদ্ধির আনুকূল্যই করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের বাজারে য়ুরোপোৎপন্ন অনেক ঔষধের আমদানি রহিত হওয়ায় এ দেশেই সেগুলি উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু সিঙ্কোনার চাষ ও সিঙ্কোনা-বল্কলের উৎপাদন সম্প্রসারণের কোন অভিনব ব্যাপক পরিকল্পনার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। অথচ ইহারই উপর ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে।

সিঙ্কোনার ইতিহাস

কুইনাইন ও সিঙ্কোনার অন্যান্য উপক্ষার আজ-কাল সমগ্র সভ্য জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, এবং উহার চাষ ও উপক্ষার প্রস্তুতে রত থাকিয়া অনেকেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার নাম সভ্য জগতের অতি অল্প লোকেরই পরিচিত ছিল। সিঙ্কোনার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চল। ইহা কদম্ব-বর্গীয় তরু, এবং ইহা প্রায় ৪০টি জাতিতে বিভক্ত। দক্ষিণ-আমেরিকার অধিবাসিগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহার জ্বরঘ্ন শক্তির বিষয় অবগত ছিল। স্পেনীয়গণ ঐ সকল দেশ অধিকার করিয়া সেই সকল স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে ক্রমশঃ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতে হয়, এই জন্য অনেক অনুসন্ধানের পর তাহারা জানিতে পারে, ঐ সকল অঞ্চলে এক প্রকার গাছের ছাল পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবহার করিয়া জ্বরাক্রান্ত স্থানীয় রোগীরা ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্তি লাভ করে। ঐ সকল স্পেনীয় অতঃপর উক্ত বৃক্ষ-বল্কল জ্বর-চিকিৎসায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করায়, তাহাতে সুফল লাভ করে। বস্তুতঃ, Countess of Chincon-এর স্মৃতিরক্ষার্থ উক্ত বল্কলের নাম দেওয়া হইয়াছিল, "Chincona"। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণ-আমেরিকায় স্পেনীয় সাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধির পত্নীর নাম ছিল কাউণ্টেস্ সিন্‌কোন। তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত ঐ দেশে গমন করিয়া ম্যালেরিয়া রোগে বহু দিন ভুগিয়াছিলেন ; অবশেষে সিঙ্কোনা সেবনেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এ জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর সিঙ্কোনার গুণ-প্রচারের জন্য স্বভাবতঃই তাঁহার আগ্রহ হয়, এবং তাহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিঙ্কোনা স্পেন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সিঙ্কোনা-বল্কলের ব্যবহার আরম্ভ হইলেও উহা কোন্ বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত হয়, প্রথমে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। য়ুরোপে উহা প্রায় এক শতাব্দী ব্যবহারের পর সিঙ্কোনা-উৎপাদক উদ্ভিদের পরিচয় জানিতে পারা যায় ; এবং তাহারও প্রায় এক শতাব্দী

পরে সিঙ্কোনার জন্মস্থানের বাহিরে প্যারি নগরের প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতাত্ত্বিক উদ্যানে সর্ব্বপ্রথম উহার উৎপাদনের চেষ্টা সফল হয়। ইতিমধ্যে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে Pelletier ও Caventon নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিকদ্বয় এই বল্কলের অন্যতম বীর্য্য কুইনাইন আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ-আমেরিকা ভিন্ন অন্যান্য দেশেও কুইনাইন উৎপাদন যে সম্ভবপর, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় নানা দেশে সিঙ্কোনা চাষের চেষ্টা আরম্ভ হয়। তাহার ফলে এখন ভারতে এবং যবদ্বীপ, সিংহল, সেন্ট-হেলেনা ও আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে ব্যবসায়িক হিসাবে সিঙ্কোনা উৎপন্ন করা হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত স্পেনীয় রাজপ্রতিনিধির পত্নী সিঙ্কোনার প্রচার-কার্য্যে যেমন অগ্রণী হইয়াছিলেন, ভারত-রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিংএর সহধর্ম্মিণীও সেইরূপ ভারতে সিঙ্কোনা প্রবর্ত্তনের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই আগ্রহে এই অত্যুপকারী উদ্ভিদ ভারতে আনয়নের চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে Sir Clements Markham সিঙ্কোনা-বীজ ও চারা সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ-আমেরিকায় প্রেরিত হন। তিনি যে বীজ আনেন, তাহা হইতে উতকামন্দ ও নীলগিরি অঞ্চলে সিঙ্কোনার বর্ত্তমান বাগিচা সমূহের সৃষ্টি। পরে শিবপুর উদ্ভিদতাত্ত্বিক উদ্যানের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডাক্তার এণ্ডারসন যবদ্বীপ হইতে Cinchona Calisaya জাতীয় চারা ও বীজ সংগ্রহ করিয়া আনেন। ঐ সকল গাছ ও বীজই দার্জ্জিলিঙ্গে সিঙ্কোনা চাষের মূল। মংপু ও মংমুঙ্গে অবস্থিত বঙ্গদেশের বর্ত্তমান সিঙ্কোনা-বাগিচাদ্বয় প্রায় ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং উহাদের সফলতার জন্য দেশবাসী বহু পরিমাণে শিবপুর উদ্যানের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ Sir Geor e Kingএর অক্লান্ত অধ্যবসায়, বৈজ্ঞানিক নিপুণতা ও উৎসাহ উদ্যমের নিকট ঋণী।

যবদ্বীপে সিঙ্কোনা চাষ

প্রথমেই বৃটিশ সরকার সিঙ্কোনা সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড ভ্রম করিয়াছিলেন। সেই ভ্রম না করিলে সিঙ্কোনা-উৎপাদনে তাঁহাদিগেরই প্রতিষ্ঠা অগ্রগণ্য হইত। লেজার নামক কোন লোক প্রথমে পশম ব্যবসায় ব্যপদেশে দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি Cinchona Calisayaর একটি বিশিষ্ট উপজাতির অধিকতর গুণের কথা জানিতে পারায় তাহার কতকগুলি বীজ সংগ্রহ করেন। প্রথমে বৃটিশ সরকারের নিকট উক্ত বীজ বিক্রয়ের চেষ্টায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তিনি তাঁহার সংগৃহীত প্রায় সমস্ত বীজই ওলন্দাজ সরকারের নিকট তিন হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। ঐ বীজের যৎসামান্য অংশ মণি নামক জনৈক চা-বাগিচাওয়ালার মারফৎ ভারতে প্রেরিত হয়। তাহা হইতেই দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার বাগিচাগুলিতে কিছু কিছু উৎকৃষ্ট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ওলন্দাজরা তাহার পূর্ব্ব হইতেই যবদ্বীপে সিঙ্কোনার আবাদ করাইবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এইরূপে উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজ সংগৃহীত হওয়ায় তাঁহারা সুবর্ণ-সুযোগ লাভ করিলেন। লেজারের নাম অনুসারে লেজিরিয়ানা (Ledgeriana) নামক এই উপজাতির বীজোৎপন্ন ২০ হাজার গাছ যবদ্বীপে সিঙ্কোনা চাষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এখন জগতের কুইনাইন-বাজারে ওলন্দাজগণ যে একাধিপত্য করিতেছে, এবং আমষ্টার্ডাম নগরে কুইনাইন ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, এই লেজারিয়ানা উপজাতি দৈবক্রমে তাঁহাদিগের হস্তগত হওয়াই তাহার মূল কারণ।

ভারতে সিঙ্কোনা

নীলগিরিতে সিঙ্কোনার চারা রোপন করিবার অল্প দিন পরেই সিকিমে উক্ত বিষয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিঙ্গ জেলায় মংপু ও মংমুঙ্গ নামক স্থানে সিঙ্কোনা-বাগিচা প্রতিষ্ঠিত হইয়া এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। এই দুইটি বাগিচায় সিঙ্কোনা চাষের জমি কিঞ্চিৎ ন্যূন ২,৮০০ একর। মংপু বাগিচা মংমুঙ্গ বাগিচা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর; শেষোক্ত বাগিচায় কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ অল্প, এবং সেখানে রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উভয় বাগিচা হইতে ১৪,৫২,৩১১ পাউণ্ড সিঙ্কোনা-বল্কল সংগৃহীত হয়। উক্ত বৎসর বাগিচা-সংশ্লিষ্ট কারখানায় মোট ১৪,১২,১৬৮ পাউণ্ড বল্কল হইতে ভারত সরকারের হিসাবে ৭,৩৭৮ পাঃ কুইনাইন-সলফেট্ ও ৪,৫৬৮ পাঃ সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ, এবং বাঙ্গালা

সরকারের হিসাবে উক্ত দুইটি পদার্থ যথাক্রমে ৪৯,৯৩৫ পাঃ, এবং ২৭,২১৯ পাঃ প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকারের হিসাবে উৎপাদনের মাত্রা হ্রাস হওয়ায় প্রায় ৪৮,০০০ পাঃ কুইনাইন-সলফেট প্রস্তুত হয়। সিঙ্কোনা-বল্কলের মূল্য ও প্রস্তুতের ব্যয় ধরিয়া প্রতি পাউণ্ড কুইনাইনের মূল্য প্রায় ছয় টাকা চারি আনা পড়িলেও ১৮৲ টাকার কম মূল্যে উহা বাজারে বিক্রয় হয় না। এখন যুদ্ধের বাজারে উহার দাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে প্রতি পাউণ্ড ২৮৲ টাকা। বিদেশের আমদানী কুইনাইনের মূল্যের (প্রতি পাঃ ৩৪৲-৩৬৲) তুলনায় ইহা কিছু অল্প হইলেও দেশের লোকের অবস্থার তুলনায়, এবং লাভের হিসাবেও ইহা যে অত্যন্ত অধিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কুইনাইন বিক্রয়-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের—কিন্তু প্রায় সমান ফলপ্রদ সিঙ্কোনা-ফেব্রিফিউজের বিক্রয় সময় সময় রহিত করা হয়। ইহা যে কিরূপ 'ব্যবসাদারী', তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বস্তুতঃ, কেহই এরূপ বণিকবৃত্তির সমর্থন করিতে পারে না।

বঙ্গের বাহিরে এক মাত্র মান্দ্রাজ প্রদেশেই কুইনাইনের চাষ আছে। তথায় সরকারী বাগিচা ব্যতীত বেসরকারী ক্ষেত্রস্বামী কর্ত্তৃক কিছু কিছু সিঙ্কোনার আবাদ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অন্যান্য ফসলের উৎপাদকগণও সিঙ্কোনার কিছু কিছু আবাদ করিয়াছিলেন; উক্ত প্রদেশে উতকামন্দের সন্নিহিত নাদাবত্তম বাগিচা ও কুইনাইনের কারখানাই কুইনাইন উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। মান্দ্রাজ প্রদেশে কুইনাইন-চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ১২০০ একর; কিন্তু সরকারই তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মালিক।

সিঙ্কোনার বিভিন্ন জাতি

সিঙ্কোনা সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে ইহার জাতিগুলি সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। সিঙ্কোনা অত্যধিক শীতপ্রধান স্থান অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই যথেষ্ট পুষ্টি লাভ করে। ৩০০০—৬০০০ ফুট উচ্চতার মধ্যে সারবান হাল্কা মাটিই ইহার চাষের বিশেষ উপযোগী। ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহিটের অনধিক তাপ, কিয়ৎপরিমাণ ছায়া, এবং যে-স্থানে ৭৫ হইতে ১৮০ ইঞ্চি বারিপাত হয়, এরূপ স্থানই সিঙ্কোনার বাগিচা নির্ম্মাণের উপযোগী। সিঙ্কোনার অনেকগুলি জাতি থাকিলেও এ-পর্য্যন্ত যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি জাতির বৃক্ষই ভারতে বিস্তৃত ভাবে উৎপন্ন হইতেছে,—

জাতির নাম	মোট উপক্ষার মাত্রা শতকরা হিঃ	কুইনাইন মাত্রা শতকরা হিঃ
Calisaya	৩·৩৭—৫·৯০	০·৫৯—১·২১
Ledgeriana	৪·২৭—৮·৫২	২·০১—৫·৪৯
Micrantha	২·০৫—৪·৫৪	চিহ্নমাত্র
Officinalis	৫·৩৯—৬·৬১	১·৭৭—৪·২১
Robusta (succirubra & officinalis)	৫·৪০—৯·২০	১·৪৩—৪·৪০
Anglica (succirubra & Calisaya)	২·৬৫—৩·১১	চিহ্নমাত্র
Succirubra	৫·২০—৬·১৭	১·২৪—২·০৬

Calisaya বা পীত-ত্বকের উৎপাদনের জন্য শীতল স্থান, যথা—সিকিম, দার্জ্জিলিঙ্গ প্রভৃতি স্থানই উপযোগী, কিন্তু চাষ আয়াসসাধ্য; ইহার উপজাতি Ledgerianaতে কুইনাইনের মাত্রা তুলনায় অধিক বলিয়া বাঙ্গালায় সিঙ্কোনা চাষে ইহার প্রাধান্য লক্ষিত হয়; কিন্তু ইহার ফলন তেমন অধিক নহে। Officinalis বা পাণ্ডু-ত্বক্ নীলগিরিতেই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালার মংপুঙ্গ বাগিচাতেও ইহার বৃক্ষ-সংখ্যা প্রচুর। ইহা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতি। Succirubra বা রক্ত-ত্বক বৃক্ষগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টসহ; প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতা লাভ করে। অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চতাতেও ইহার আবাদ হইয়া থাকে। Robusta ও Anglica উভয়েই বর্ণসঙ্কর, এবং বিভিন্ন স্থানে চাষের উপযুক্ত। এতদ্ভিন্ন, দেশীয় সিঙ্কোনা বাগিচা সমূহে আরও দুই-চারিটি বর্ণসঙ্কর জাতির অস্তিত্ব বর্ত্তমান। বস্তুতঃ, Succirubra এবং কতিপয় বর্ণসঙ্কর জাতি মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্নমালাই পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত সরকারী বাগিচায়, আসামে ও সাতপুরা পার্ব্বত্য অঞ্চলে যেরূপ স্বচ্ছন্দে জন্মাইতে দেখা যায়, তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল জাতির আবাদের বিস্তার সাধন করা তেমন কঠিন নহে।

সিঙ্কোনার উপক্ষার সমূহের উপর বল্কলের

উপকারিতা নির্ভর করে। এইরূপ অন্যূন ২০টি উপক্ষার উহার বল্কলে বিদ্যমান; তন্মধ্যে যেগুলি দানা বাঁধে (Crystallisable) সেগুলি অধিক কার্য্যকর। উপক্ষার সমূহের মধ্যে অবশ্য কুইনাইনই সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত, এবং কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিকিৎসকগণ মনে করিতেন যে, একমাত্র কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সিঙ্কোনা-বল্কলের কয়েকটি দানাদার উপক্ষারের সংমিশ্রণ—অধিকতর মূল্যবান কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহারে সমান উপকার পাওয়া যাইতে পারে। বৃটিশ ফারমাকোপিয়ার Totaquina এবং ভারতীয় কুইনাইন-কারখানার Cinchona febrifuge এই শ্রেণীর সংমিশ্রণ। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে বহুমূল্য কুইনাইন ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে না পারিলেও জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে পর্য্যাপ্ত মাত্রায় Cinchona febrifugeএর প্রচলন হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সরকারের দৃষ্টি প্রধানতঃ কুইনাইন উৎপাদনের উপরেই নিবদ্ধ। Cinchona febrifuge শুধু যে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা হয় না, এরূপ নহে, ইহার মানও (Standard) সব সময় ঠিক থাকে না। সেই জন্য Extra Pharmacopoeiaয় বলা হইয়াছে যে,—

"Cinchona febrifuge as produced in India for last 50 years from Red bark has contained—Cinchonidine 40, Cinchonine 30 Quinine 20 & Amorphous alkaloids 10 parts * * * Some samples suggest that they have been made from Cinchona Ledgeriana after the extraction of Quinine and contain greater amounts of Amorphous alkaloids and Quinine. A definite standard is desirable.'

অনেক প্রকার ম্যালেরিয়ায় Cinchona febrifuge ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়; সুতরাং নির্দ্দিষ্ট মান অনুযায়ী ও প্রভূত মাত্রায় প্রস্তুত হইলে ইহার দ্বারাও ম্যালেরিয়া-দমন কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

উৎপাদনের অপ্রতুলতা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনুমান করা হয় যে, সমগ্র জগতে বৎসরে কুইনাইন উৎপাদনের মাত্রা প্রায় ছয় লক্ষ কিলোগ্রাম (১ কিলোগ্রাম=প্রায় ১ সের); এখন পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু ভারতে উৎপাদিত কুইনাইনের পরিমাণ কখনই প্রায় ৭০ হাজার পাউণ্ডের অধিক হয় না। ভারতে কুইনাইন উৎপাদন যে কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে—ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এক বঙ্গদেশেই ম্যালেরিয়ার উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে হইলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টারের মতে সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইনের প্রয়োজন। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সেই স্থলে প্রকৃত পক্ষে মাত্র ১,১২,৩৫৩ পাঃ অর্থাৎ প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। সুতরাং ম্যালেরিয়া হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশা কোথায়? বিস্তৃত ভাবে ধরিতে গেলে, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়াদিতে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত নিখিল ভারতে অন্যূন ১০ কোটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর অস্তিত্ব বর্ত্তমান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রোগ-মুক্তির জন্য প্রত্যেক রোগীর অন্যূন ১১০ গ্রেণ কুইনাইন আবশ্যক। সে স্থলে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই স্বল্প মাত্রায় কুইনাইন পায়, এবং অনেকেই আদৌ কিছু পায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক দিকে ভারত-বাসীরা যেমন প্রয়োজনের অনুপাতে অতি সামান্য মাত্রায় কুইনাইন পাইতেছে, অন্য দিকে তেমনই বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে সিঙ্কোনা চাষের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া অধিক মাত্রায় সিঙ্কোনা উপক্ষার উৎপাদন দ্বারা জন-সাধারণকে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে চেষ্টা হওয়া উচিত ছিল, সরকার তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। যে দুইটি প্রদেশে আপাততঃ সিঙ্কোনা চাষ হইতেছে, সেই দুই প্রদেশেই চাষের জমি অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন, ভারতের অন্যত্রও সিঙ্কোনা উৎপন্ন করা যে অসম্ভব—তাহাও নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সিঙ্কোনা-চাষ সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং কেবল মাত্র কুইনাইন উৎপাদনই তাঁহাদিগের লক্ষ্য; কারণ, ব্যবসায় হিসাবে ইহাতেই লাভ অধিক। যে সকল সিঙ্কোনা জাতির ত্বকে কুইনাইনের মাত্রা তুলনায় অধিক, যেমন Ledgeriana সেগুলির গাছ অপেক্ষাকৃত অল্প-কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া তাহা-দিগের চাষ অত্যন্ত পরিমিত। পক্ষান্তরে সিঙ্কোনা

ফেব্রিফিউজ প্রস্তুতোপযোগী বল্কল পূর্ব্বোল্লিখিত সকল জাতি হইতে পাওয়া যায়, এবং তন্মধ্যে আবার কয়েকটি জাতি নানা স্থানেই উৎপাদনের উপযোগী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সিঙ্কোনার অন্যান্য উপক্ষার ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় কুইনাইন অপেক্ষা অল্প ফলপ্রদ নহে, অথচ মূল্য কুইনাইনের তুলনায় অনেক অল্প। এরূপ অবস্থায় টোটাকুইনা, কুইনেটাম, সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ ও সমশ্রেণীর উপক্ষার-সংমিশ্রণ প্রস্তুতের দিকেই সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং তদুদ্দেশ্যে দৃঢ়তর জাতি সমূহের প্রসারবৃদ্ধিও প্রয়োজনীয়।

সরকারের কুইনাইন-নীতি

বর্ত্তমান মূল্যে কুইনাইন ক্রয় যে, সাধারণ ভারত-বাসীর আর্থিক অবস্থার অনুকূল নহে, তাহা যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত সরকারের অবিক্রীত সঞ্চিত কুইনাইনের পরিমাণ হইতেই প্রতিপন্ন হয়। সরকার কুইনাইন প্রস্তুতের পড়তার চতুর্গুণ মূল্যে কুইনাইন বিক্রয় করিতেছেন। তাহার মূলে খাঁটি বণিক-নীতি থাকিতে পারে, কিন্তু প্রজা-সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যে কোন দেশের সরকার সেই নীতি পরিহার করাই সঙ্গত মনে করেন না কি? বস্তুতঃ, প্রচলিত কুইনাইন-নীতি দ্বারা দেশ যে কখনও ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইবে, ইহা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়। সরকার-নিযুক্ত Drugs Enquiry Committeeর রিপোর্টেই বলা হইয়াছে,—

"If the present policy of the Cinchona Department of growing only the species of Cinchona which are suitable for production of quinine in a limited area is continued, it will be difficult to bring the price of the alkaloid down to the point of being commensurate with the means of the masses."

—অর্থাৎ যে সকল সিঙ্কোনাজাতি কুইনাইন প্রস্তুতোপ-যোগী, কেবল মাত্র সেই জাতিগুলির সীমাবদ্ধ স্থানে উৎপাদনের সিঙ্কোনা বিভাগের বর্ত্তমান নীতি যদি অনুসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই উপক্ষারের মূল্য হ্রাস করিয়া জনসাধারণের আর্থিক সামর্থ্যোপযোগী করা সুকঠিন হইবে।

কুইনাইনের অধিক মূল্য হওয়ায় আরও একটি কুফল এই যে, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল চলিতেছে। এমন কি, এরূপ নমুনাও আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যাহাতে শতকরা ৯০ ভাগও প্রকৃত কুইনাইন পাওয়া যায় নাই। দশ গ্রেণ 'কুইনাইনের' নয় গ্রেণই ভেজাল, কেবল এক গ্রেণ খাঁটি মাল,—এ কিরূপ ভীষণ ব্যাপার, ভাবিলে হৃৎকম্প হয় না?

ইহা কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, ঔষধের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের পক্ষে কুইনাইন ও অন্যান্য সিঙ্কোনা উপক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ, কারণ, দেশের সাধারণ উন্নতির পথে ম্যালেরিয়া যেমন প্রতিবন্ধক, এমন অন্য কিছুই নহে। বিদেশীয় শাসকগণ সহানুভূতির সহিত তাহা যদি বুঝিতেন, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই এই রোগের উচ্ছেদকল্পে সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইত এবং সিঙ্কোনার আবাদও এত দিন আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইত। তাঁহাদিগের নিকট তত দূর আশা করা না যাইলেও এখনও যদি তাঁহারা সিঙ্কোনা চাষ-নিয়ন্ত্রণ রহিত করিয়া, জনসাধারণকে উহার আবাদ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেন, তাহা হইলেও দেশের প্রভূত উপকার হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের পর কুইনাইনের বাজারে সরকারের একাধিপত্য থাকিবে কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ভারতে ইতিমধ্যে সিঙ্কোনার চাষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সম্প্রসারিত হইলে—কুইনাইন উৎপাদনে ভারতবাসী প্রতিযোগিতা করিতে পারুক বা নাই পারুক—অন্ততঃ ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধের প্রধান অস্ত্র তাহার হস্তগত হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

যুদ্ধ ও ভারতীয় খনিজ সম্পদ

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধে ভারত তাহার প্রভুশক্তি বৃটিশ সরকারকে কি পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে, বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্ন বহু লোকেরই মনে উদিত হইতেছে। যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার পণ্যেরই প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন দ্বিবিধ; প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। বর্ত্তমান যুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য যত প্রকার পণ্যের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে, সেরূপ পূর্ব্বে কখন হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। ইহার কারণ সুস্পষ্ট; এখন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে—সুতরাং যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য প্রহরণেরও

ব্যাপকতা নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু কেবল অস্ত্র-শস্ত্র পাইলেই যুদ্ধ পরিচালিত করা সম্ভব নহে। যুদ্ধ পরিচালনের জন্য সুশিক্ষিত এবং যথাযোগ্য সাজ-সজ্জায় বিভূষিত সৈনিক চাই—তাহাদের উপযুক্ত রসদ ও যান-বাহন চাই। তদ্ভিন্ন, আরও নানা প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন। স্বভাবোৎপন্ন উপাদান হইতেই ঐ সকল আবশ্যক দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কাজেই প্রাণিজ, বনজ, এবং খনিজ সর্ব্বশ্রেণীর স্বভাবজাত সম্পদই যুদ্ধ পরিচালনের জন্য অপরিহার্য্য। কিন্তু প্রকৃতি দেবী একই স্থানে নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল সম্পদ সুসভ্য মানবের রণ-লালসা পরি-তৃপ্তির জন্য সঞ্চিত রাখেন নাই। ঐ সকল প্রয়োজনীয় সম্পদ্ নানা ভাবে এবং নানা দেশে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। যে দেশে ঐ প্রকার সম্পদ যত অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়, সে দেশ নানা ভাবে সংগ্রামে সুযোগ লাভ করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত ত্রিবিধ সম্পদের মধ্যে কেবল খনিজ সম্পদের বিষয় এবার আলোচিত হইল।

খনিজ সম্পদের প্রয়োজন অনেক। স্বর্ণ হইতে পাথুরিয়া কয়লা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার খনিজ পণ্যই যুদ্ধ উপলক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। স্বর্ণ দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মিত হয় না; কবি সত্যই বলিয়াছেন, "পিত্তলকি কাটারী কাজে নাহি আওল, কেবল ঝকমকি সার!" স্বর্ণ সম্বন্ধেও এ কথা সত্য; কিন্তু মূল্যবান ধাতু বলিয়া ইহা সর্ব্বত্র বাজার-পশার বজায় রাখিতে সমর্থ। ইহা বিভিন্ন দেশে বিনিময় কার্য্য-সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কয়লা হইতে গ্যাস এবং যানবাহনের পরিচালন-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, এবং তাহার সাহায্যে আলোকেরও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় বিদেশী বাজার-পশার নষ্ট হইলেও স্বর্ণ দ্বারা তাহা সুরক্ষিত হইতে পারে। সেই জন্য যুদ্ধকালে স্বর্ণের পরোক্ষ প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। এতদ্ভিন্ন, বহু কারণেই কয়লার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। ভারতে যে সকল খনিজ সম্পদ উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্যগত একটা হিসাব প্রকাশিত হইল। মূল্যগত হিসাব গত ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড় করিয়া পাউণ্ডে প্রকাশ করা হইল। ভারতের খনিজ সম্পদ কত বিচিত্র, ইহা হইতে তাহার একটা ধারণা জন্মিবে। *

ধাতুর নাম	পাঁচ বৎসরের গড় করিয়া প্রতি বৎসরের উৎপন্ন মূল্য
কয়লা	৫৬,৩১৭৬৩ পাউণ্ড ষ্টার্লিং
ম্যাঙ্গানিজ ওর	১৬,৮৮,৬৫৮ " "
স্বর্ণ	২২,৬৫,২০৮ " "
পেট্রোলিয়ম বা খনিজ তৈল	১০,০০২১৫ " "
অভ্র (রপ্তানী মূল্য)	৭,৩৪,৪৭৫ " "
লবণ	৬,৫০,১৬৪ " "
লৌহ (স্বাভাবিক খনিজ অবস্থায়)	২৯১,৫৫৭ " "
তাম্র (ঐ)	২৮৫,৯৩০ " "
ইল্‌মেনাইট (Ilmenite)	৭১,১০৯ " "
সোরা	৯১,৭১০ " "
অদ্রবনীয় পদার্থ	৩৬,৪৯৪ " "
ক্রোমাইট (Chromite)	৪৩,৭২২ " "
ম্যাগ্‌নেসাইট (Magnecite)	৯,৪০৯ " "
জিরকন (Zircon)	৪,০৬১ " "
বক্সাইট (এলুমিনিয়াম মৃত্তিকা)	১,৬৫২ " "
টাংষ্টেন ধাতুপিণ্ড	৫১২ " "
বেরিল নামক মরকত মণি বিশেষ	২৯১ " "
কুরুন্দম (Corundum)	১০৩ " "
ট্যান্টেনাইট বা ট্যান্টেলাম	২০ " "

এই সকল ধাতু এবং মূল্যবান প্রস্তর যে সকল রাসায়নিক বস্তুজাত নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়, যুদ্ধে তাহার প্রয়োজন আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ধাতু নূতন, অর্থাৎ পূর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল। এখানে এ কথার উল্লেখ বাহুল্য নহে যে, এত অধিক ধাতু অন্য কোথাও একই অঞ্চলে পাওয়া যায় না। ভারতেও ইহা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকিলেও ঐগুলির সমস্তই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একই দেশে সংগ্রহ হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় ইহা কিরূপ সুবিধাজনক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে সকল ধাতু সহজে গলে না, তাহা চাপরের অভ্যন্তরীণ আচ্ছাদন, বা আস্তর-রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা ম্যাগনেসাইট, তাপ সহ মাটি (fire-clay) বক্সাইট, প্রভৃতি অত্যুগ্র তাপসহ চাপর-নির্ম্মাণেই ইহাদের উপযোগিতা লক্ষিত হয়। বিস্ফোরক পদার্থ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য সোরা প্রভৃতি, রাসায়নিক

* Sir Lewis Fermor প্রদত্ত হিসাব হইতে সংগৃহীত।

পদার্থ প্রস্তুতের জন্য গন্ধক, সালফাইড, নাইট্রেট প্রভৃতি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু হইতে উহা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। অভ্র প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে ব্যবহারোপযোগী ঐ সকল সামরিক বস্তু নানা ধাতু হইতে প্রস্তুত করিতে হয়। মার্কিণ রাজ্যে এবং সোভিয়েট রুশিয়ায় ইহাদের মধ্যে অনেক বস্তুই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মার্কিণে নিকেল ধাতুপিণ্ড, ম্যাঙ্গেনিজ এবং টাংষ্টেন অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবার উপায় নাই। রুশিয়াতে অভ্রের এবং টাংষ্টেন ধাতুপিণ্ডের অভাব। তবে ভারতে পেট্রোলিয়ম তত অধিক পরিমাণে না থাকায় বৃটিশ জাতি ইরাণ, ইরাক এবং দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

উল্লিখিত তালিকাভুক্ত খনিজ দ্রব্য সমূহ হইতে যুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যরাজি নির্ম্মিত হয়। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতের খনিজ সম্পদ উদ্ধারের শিল্প বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের পাঁচ বৎসরে ভারতে বার্ষিক গড়ে ৯৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬ শত ৪৭ পাউণ্ড মূল্যের খনিজ পদার্থ উৎপাদিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে গত ৫ বৎসরে উহা গড়ে প্রতি বৎসরে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মূল্য ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৭ হাজার ৬ শত ১১ পাউণ্ড। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে ইংরেজের সামরিক সামর্থ্য যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আসাম ডিগবয় অঞ্চলে খনিজ তৈল উত্তোলনের সুব্যবস্থার ফলে, এবং পঞ্জাবেও এই বিষয়ের কার্য্যতৎপরতা নিবন্ধন খনিজ তৈলের বা পেট্রোলিয়মের সরবরাহ বার্ষিক ৭৩ লক্ষ গ্যালন হইতে গড়ে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালনে উঠিয়াছে! সুবন্দোবস্তের গুণে অভ্র ৫০ হাজার হন্দর (cwt) হইতে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার হন্দরে দাঁড়াইয়াছে। তামা, লৌহ প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থাও এখন অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। ক্রোমাইট, বক্সাইট, ম্যাগ্‌নেসাইট প্রভৃতি যে সকল পণ্য সামরিক কার্য্যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়, তাহাদেরও উৎপত্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল উত্তোলিত সুবর্ণের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং ভারত ইংরেজ জাতির আয়ত্তাধীন থাকায় তাঁহাদের সামরিক শক্তি কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে।

পাথুরিয়া কয়লার উৎপত্তি ভারতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন, ভারতীয় কয়লার খনির কার্য্য আরও উন্নত ভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে ভারতোৎপন্ন কয়লাতেই তাহার সকল অভাব পূর্ণ হইবে।

ম্যাঙ্গানিজ ধাতুপিণ্ড—লৌহ এবং ইস্পাত-নির্ম্মাণ কার্য্যে ইহার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। ভারতে লোহার কারখানার অল্পতা বশতঃ এই ধাতুপিণ্ডের চাহিদা ভারতে তেমন অধিক নহে। এ-কারণে ইহা ভারত হইতে গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইতেছে। এই দ্রব্য রুশিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহার নিম্নেই ভারতের স্থান।

খনিজ তৈল—যে পরিমাণে এখন ভারতে উত্তোলিত হইতেছে, তাহা ভারতের প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ব্রহ্মদেশ এখন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন। এখনও ব্রহ্মদেশ, ইরাণ, বোর্ণিয়ো, রুশিয়া এবং মার্কিণ হইতে কেরোসিন আনিয়া ভারতের অভাব দূর করিতে হইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য রুশিয়া হইতে এ দেশে কেরোসিনের আমদানী রহিত হইয়াছে।

অভ্র—ভারতেই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উত্তোলিত হইতেছে। মার্কিণে এবং কানাডায় ইহা পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ভারতের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে আর কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় এই পণ্যের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক অনুভূত হইয়াছিল। সেই জন্য ভারত সরকার ইহার উত্তোলন-বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লবণ—লবণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সাংসারিক কার্য্যে লবণ অপরিহার্য্য। ইহা ভিন্ন সোডা প্রস্তুতের জন্য এবং অন্যান্য বহুবিধ রাসায়নিক পণ্য নির্ম্মাণের নিমিত্ত লবণের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। যুদ্ধস্থানে আহত এবং পীড়িত সৈন্যদিগের চিকিৎসার জন্য প্রচুর পরিমাণে সোডার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু প্রস্তুতে ইহা

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধ-স্থলেও ইহার কিছু কিছু প্রয়োজন লক্ষিত হয়।

লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি—দেশে এবং বিদেশে শস্ত্র-ক্ষেত্রে এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অধিকন্তু রণ-ক্ষেত্রে এই ধাতুর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। এ পর্য্যন্ত টাটার লৌহ এবং ইস্পাত প্রস্তুতের কারখানাতেই কেবল এ দেশে ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল। বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধে এই টাটার ইস্পাতের কারখানার দেশের এবং সরকারের কার্য্য বহু পরিমাণে সংসাধন করিয়াছিল। অতঃপর বঙ্গীয় ষ্টীল কর্পোরেশন ঐ-কার্য্যে টাটার কারখানায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ দুইটি কারবারের স্থানও যে এ দেশে নাই, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। ইদানীং কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর ভারত হইতে প্রায় ৫ লক্ষ ২০ হাজার টন হিসাবে চৌগল (pig iron) বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। যুদ্ধের সময় অন্য দেশে লোহা যদি তেমন অধিক পরিমাণে পাওয়া না যায়, তাহা হইলেও ভারতের বিহার এবং উড়িষ্যা অঞ্চল হইতে যে পরিমাণে লৌহ-পিণ্ড (Iron-ore) সংগৃহীত করা সম্ভব হইবে, তাহাতে বৃটিশ জাতি কখনই লৌহের অভাব অনুভব করিবে না—এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

তাম্রপিণ্ড (Copper ore)—ভারতের সিংভূমে যে ভারতীয় কপার কর্পোরেশন আছে,—তাহারা প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে ৬ হাজার টন হিসাবে তামা প্রস্তুত করে। ইহা শান্তির সময়ের হিসাব। যুদ্ধের সময়ে তামার প্রয়োজন অধিক। গোলাগুলী নির্ম্মাণে তামা অপরিহার্য্য।

ইল্‌মিনাইট। (Ilmenite)—ইহা একটা নূতন ধাতু। ত্রিবাঙ্কুরের বেলাভূমির বালুকারাশি হইতে ইহা নিষ্কাশিত হইতেছে। ইহা নানাবিধ রঞ্জন দ্রব্যের এবং অতি কঠিন ছেদনাস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণে ইহার ব্যবহার চলিতেছে।

সোরা বা Potassium nitrate—বারুদ প্রস্তুতের জন্য, বাজি প্রস্তুতের জন্য, এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। ইহা বিস্ফোরক প্রস্তুতের একটা বিশিষ্ট উপকরণ। তবে নাইট্রিক এসিড এবং বায়ব্য নাইট্রোজেন প্রস্তুতের ফলে বিস্ফোরক প্রস্তুতে সোরার ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ক্রোমাইট (Chromite)—রণতরীর আবরণের জন্য যে দুর্ভেদ্য ইস্পাতের চাদর ব্যবহৃত হয়, তাহা এবং অকলঙ্ক ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য এই ধাতুর প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। বেলুচিস্থান, মহীশূর এবং সিংভূম জিলায় (অধুনা বিহারে) ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহা যে পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছিল, এখন তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। ভারতজাত সামরিক ধাতুর মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান এবং ভারতবর্ষই ইহার ভূরি উৎপাদক।

জিরকন (Zircon)—একটা নূতন আবিষ্কৃত ধাতু। সাগর-সৈকতের বালুকা হইতে ইল্‌মাইট নিষ্কাশনকালে ইহা একটা বাড়তি বস্তু (bye-product) হিসাবে পাওয়া যায়। ইহা অদ্রবণীয় ধাতু; সুতরাং নানা ভাবে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ম্যাগ্‌নেসাইট—সালেম এবং মহীশূর অঞ্চলে অতি উচ্চ শ্রেণীর এই ধাতু পাওয়া যায়। ম্যাগনেসাইট ধাতব ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুতের অন্যতম উপকরণ। এতদ্ভিন্ন, বিমান-নির্ম্মাণ কার্য্যে যথেষ্ট লঘুভার ধাতু বলিয়াও ইহার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। এতদ্ভিন্ন ইহা চাপর নির্ম্মাণে, উত্তাপসহ ইষ্টক প্রস্তুতের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যুদ্ধের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য ঐরূপ চাপরের প্রয়োজন অত্যধিক।

বক্সাইট (Bauxite)—ইহা হইতে এলুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। কাটনি এবং মধ্যপ্রদেশে ইহা হইতে এলুমিনিয়াম নিষ্কাশন-কার্য্য উত্তমরূপেই চলিতেছে। কাশ্মীরেও অতি উৎকৃষ্ট বক্সাইট মাটী পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণে বাসনাদি প্রস্তুত হইতেছে। তদ্ভিন্ন, বিমান নির্ম্মাণেও ইহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। জার্ম্মাণীতে এলুমিনিয়ামের উৎপত্তি ভূরি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই জন্যই জার্ম্মাণী আকাশ-যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছে। এই ধাতু অধুনা ভারতে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে যে, জার্ম্মাণীর ঐ প্রাধান্য আর অধিক দিন স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কুরুন্দম—ইহা বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় আসামের খাসিয়া পাহাড় হইতে অনেক পরিমাণে

রপ্তানী হইয়াছিল। এখন ইহা ভারতে অতি অল্প পরিমাণেই মিলিতেছে। যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

এই সকল উপাদান হইতেই যে সামরিক কার্য্যের উপযোগী বহু বস্তুজাত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। ভারতে এই সকল দ্রব্য পাওয়া যায় বলিয়া ইংরেজ জাতির পক্ষে ভারতের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। ভারতবাসীও গ্রেট বৃটেনের সহিত একযোগে থাকিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু তাহারা বৃটেনের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে উৎসুক নহে, স্বাধীন এবং সহযোগী ভাবে, অর্থাৎ তুল্যাধিকারসম্পন্ন অংশীদার ভাবেই থাকিতে আগ্রহান্বিত। দুর্ভাগ্যক্রমে বৃটিশ জাতি তাহাদের সে দাবীতে কর্ণপাতও করিতেছেন না। গত ২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবারে লণ্ডনে ক্যাক্সটন হলে মিষ্টার টি. এ. রমণ "ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং যুদ্ধ" সম্বন্ধে যে সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন,—তাহাতে তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদীদিগের লক্ষ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর মত। সার ষ্ট্যান্‌লী রীড সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন স্বাধীনতা অপেক্ষাও বড়, কারণ, সকল আভ্যন্তরিক ব্যাপারেই এবং বহু আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে উহা কেবল যে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহাই নহে, পরন্তু ইহা সাম্রাজ্যমধ্যস্থ সকল রাজ্যকে রাজ্যরক্ষা বিষয়ে এবং একই লক্ষ্য রক্ষার জন্য সংহত করে।"—এ কথা সত্য। বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিবার প্রকৃত ব্যবস্থা করিলেই সকল দুর্য্যোগেরই অবসান হইতে পারে। স্বার্থের দিক দিয়া ভারতের বৃটেনের এবং বৃটেনের ভারতের সাহচর্য্যের প্রয়োজন, বৃটেন প্রবল পক্ষ বলিয়াই এই ব্যাপারে তাঁহাদের অগ্রণী হওয়া উচিত। ভারতবাসীকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়া সকল সুবিধা ভোগ করিবার দিন আর নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

বিবেকানন্দ

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নব-ভারতের মন্ত্রগুরু,
ধর্ম্মে কর্ম্মে জীবন-যজ্ঞ নব-হোমানলে ক'রেছো সুরু!

তন্দ্রালু জাতি নিদ্রা-নগরে হেরিল তোমাতে প্রভাত-সূর্য্য,
শুনিল তোমার পরুষ-কণ্ঠে বজ্র-বাণীর বিজয়-তূর্য্য!
মহা-ভারতের বেদ-উদ্গাতা মহা-তপস্বী আর্য্য ঋষি .
অ-ভেদ জ্ঞানের দিব্য-আলোকে
ঘুচা'লে অন্ধ-তামসী নিশি।

জীব-মানবের সেবায় পূজায় তুমি পুরোহিত পরম-জ্ঞানী,
হে মহা-মানব, বিশ্ব-ভুবনে তোমার তুলনা তুমিই জানি
স্বদেশ বিদেশ মন্ত্রে তোমার লভিল অমোঘ চরম-দীক্ষা—
প্রেম ক্ষেম প্রীতি দয়া ভালোবাসা
করুণা শক্তি ক্ষমা তিতিক্ষা

হে যুগ-সারথি! পাঞ্চজন্যে যুগান্তরের ঘোষিছ বাণী,
তেজ-ভাস্বর দু'টি চোখে জ্বলে বিশ্ব-জয়ের প্রতিভাখানি।
হিমালয় সম পুরুষপ্রধান মহান্ বিরাট ব্রহ্মচারী,
ভারতভূমির কৌস্তুভ মণি—ত্যাগ-গৈরিক-পতাকাধারী!

বঙ্গ-বাণীর পূজার দেউলে আরতি জ্বেলেছো অমর-জ্যোতি,
তোমার ললাটে লিখেছে বিজয় কালী মহাকালী সরস্বতী!
নমো হে ধন্য চির-বরেণ্য, নমো যুগ-রথ-চক্র-ধারী,
স্বদেশনিষ্ঠ জ্ঞান-গরিষ্ঠ অপাপবিদ্ধ সিদ্ধিচারী!

শ্রীকমলরাণী মিত্র

ইতিহাসের অনুসরণ

সহমরণ-প্রথার প্রবর্ত্তন ও প্রচার

(আলোচনা)

পৃথিবীর কোন্ দেশে এবং কোন্ সময়ে সহমরণ-প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তন, তাহার সঠিক প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই। অতি প্রাচীন কালেও কোন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার জীবিতা বৈধপত্নী, উপপত্নী, ক্রীতদাস, এমন কি, তাঁহার প্রিয় অশ্ব প্রভৃতিও তাঁহার মৃতদেহের সহিত সমাহিত করিবার প্রথা বর্ত্তমান ছিল। ইহার অন্যথা হইলে পরলোকে মৃত ব্যক্তির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইত, এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। হেরোডোটাস বলেন, প্রাচীন কালে গ্রীসের অন্তর্গত থ্রেস প্রদেশে কোন পুরুষের মৃত্যু হইলে কেবল তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকেই তাঁহার মৃতদেহের সহিত সসম্মানে ভূগর্ভে সমাহিত করা হইত; তাঁহার অন্যান্য স্ত্রীরা এই সম্মানে বঞ্চিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন অতিশয় অপমানজনক মনে করিতেন। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে যে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে মতভেদ নাই; শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির বহু স্থানেই ইহার উল্লেখ আছে। মহারাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী মাদ্রী দেবী সহমৃতা হইয়াছিলেন, মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে মৃত স্বামীর সহিত চিতাগ্নিতে স্ত্রীর সহমৃতা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল, ইহা প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমান লেখকদের লিখিত বিবরণ হইতেও জানিতে পারা যায়। সিসিরো ভারতবর্ষের এই প্রথার নৃশংসতার উল্লেখ করিয়া তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। ডিওডোরাস, সিকিউলাস, ৩২৭ পূঃ-খৃষ্টাব্দে, পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এই নৃশংস প্রথার প্রচলন ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এক সময় চরিত্রহীনা ক্ষত্রিয় রমণীরা বিষ-প্রয়োগে স্বামিহত্যা করিত; এই পাপানুষ্ঠান রহিত করিবার উদ্দেশ্যেই পঞ্জাবে সহমরণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। (১) ষ্ট্রাবোও তাঁহার এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন। ডিওডোরাসের বিবরণ পাঠে জানিতে পারা যায়—৩১৪ পূঃ-খৃষ্টাব্দে এক জন ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বামীর চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র সেনাদল যোদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া তিন বার সসম্মানে চিতা প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। সেনাপতির প্রথমা স্ত্রী তৎকালে সন্তানসম্ভাবিতা ছিলেন বলিয়া এই সম্মানে বঞ্চিত হওয়ায় ক্ষুব্ধ চিত্তে সরোদনে সেই স্থান ত্যাগ করেন। গ্রীক কবি প্রপারটিয়াস ভারতীয় নারীর সহমরণ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য গ্রীক লেখকরাও বহু স্থানে সহমরণ-প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইউরোপের স্ক্যান্‌ডিনেভীয় উপজাতিদের মধ্যেও প্রাচীন কালে সহমরণ অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া কথিত আছে। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা পত্নীর সহমৃতা হইবার অধিকারই অগ্রগণ্য হইত। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, ঐ প্রথা ওডিন, অর্থাৎ বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সেই জন্যই ওডিনের সহচর বল্ডারের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পত্নী নুন্না স্বামীর চিতাগ্নিতে সহমৃতা হইয়াছিলেন। (২)

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সহমরণ-প্রথা সুপ্রচলিত ছিল; কিন্তু এই প্রথার প্রতি বৌদ্ধদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না; জৈনরাও এই প্রথার অনুসরণ করিতেন না। শিখদের মধ্যে ইহার অনুবর্ত্তন নিষিদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাণীরা সহমৃতা হইয়াছিলেন। (৩)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সহমরণের বহু দৃষ্টান্ত আছে।

১। (ক) India's Cries to British Humanity, relative to the Suttee, Infanticide, British connection with idolatry, Ghant murders and slavery in India; to which is added humane hints for the melioration of the state of Society in British India. —By J Peggs (1830) p. 1 অতঃপর এই পুস্তক "India's Cries." এই ভাবে উল্লিখিত হইবে। (খ) Travels in the Mogul Empire by Irancois Bernier. pp. 310 11.

২। Asiatic Journal, October, 1827. p. 408.

৩। Encyclopaedia Britannica.

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মেবারের মহারাণা সমর্সি, পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া সাহাবুদ্দিন ঘোরীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার দুই মহিষীর মধ্যে রাজ্ঞী পৃথা সহমৃতা হইয়াছিলেন।

গুর্জ্জর দেশের চালুক্যবংশীয় রাজপুত রাজা অবন্তিনাথ সিধরাজের অধীন যদুবংশীয় এক করদ রাজা কাথিয়াবাড় প্রদেশের অন্তর্গত জুনাগড়ে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে রাণিক দেবী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কুম্ভকার-কন্যা বাস করিত। সেই সুন্দরী যুবতীর রূপযৌবনে মুগ্ধ হইয়া সিধরাজ তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছেন জানিয়া, জুনাগড়ের রাজা অবিলম্বে তাহাকে বলপূর্ব্বক নিজ প্রাসাদে আনয়ন করিয়া স্বয়ং বিবাহ করেন। ইহাতে সিধরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া জুনাগড় আক্রমণ ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন, এবং অবশেষে রাজাকে হত্যা করেন। তখন রাণিক দেবী বৈধব্যজ্ঞাপক শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, সিধরাজের চরণে পতিত হইয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাজপুতগণ সহমরণ অনুষ্ঠানকে এরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন যে, সিধরাজ সেই সতী রমণীর প্রার্থনা যে কেবল তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন, তাহাই নহে, তাহার পুণ্যস্মৃতি সংরক্ষণ-কল্পে একটি স্মৃতি-মন্দিরও নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সেই মন্দিরের ও তন্মধ্যস্থ রাণিক দেবীর প্রস্তরমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও গুর্জ্জর প্রদেশে রাজপুত নৃপতিদের উচ্চ আদর্শের নির্ব্বাক্ সাক্ষিস্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের মোগল বাদশাহ আকবর সাহ সহমরণ-প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ বলিয়া বিঘোষিত করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে অম্বররাজ ভগবান দাসের জয়মল নামক জ্ঞাতি-ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, মৃতদেহ তাঁহার স্বদেশে নীত হয়। মাড়বারের উদয়সিংহের এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সেই যুবতী স্ত্রী সহমরণে অসম্মতা হইলে, তাঁহার সতীনপুত্র উদয়সিংহ কুলপুরোহিতের প্ররোচনায় তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে সহমৃতা হইতে বাধ্য করেন। এই ঘটনার সংবাদ সম্ভবতঃ কোন রাজপুতানী বেগমের দ্বারা আকবর বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং বেগবান অশ্বারোহণে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং চিতায় অগ্নিসংযোগের অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সেই বিধবা নারীকে চিতা হইতে উত্তোলন করিয়া নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করিলেন।

ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি, প্রাচীন কালে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে কেবল সহমরণ-প্রথা নহে, অনুমরণ-প্রথারও প্রচলন ছিল। পতি সুদূর বিদেশে দেহত্যাগ করিলে, স্নানান্তে তাঁহার পাদুকাদি গ্রহণ করিয়া জ্বলচ্চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করা সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে অতি পুণ্য কার্য্য বলিয়া মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে ; কিন্তু উক্ত পুরাণেরই বিধানে ব্রাহ্মণীর পক্ষে অনুমরণ নিষিদ্ধ।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সহমরণের অনুষ্ঠান-রীতি এক প্রকার ছিল না। উড়িষ্যার রীতির সহিত বঙ্গদেশের রীতির পার্থক্য ছিল। কোন দেশে মৃতদেহের সহিত সহমরণোন্মুখা পত্নীকে জীবিতাবস্থায় একত্র প্রোথিত করা হইত ; কোথাও একই চিতায় মৃত স্বামী ও জীবিতা স্ত্রীকে একত্র, কোথাও স্বতন্ত্র চিতায় পৃথক্ ভাবে দগ্ধ করা হইত। কোথাও কুণ্ডমধ্যে চিতা সাজাইয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইত, ও মৃত ব্যক্তির শব তদীয় বিধবা পত্নী কর্ত্তৃক উপর হইতে প্রজ্বলিত চিতায় নিক্ষিপ্ত হইত। অনন্তর সেই স্ত্রী স্নান ও পূজান্তে ঘৃতের হাঁড়ি কক্ষে লইয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে লম্ফপ্রদান করিতেন। (৪) চিতা সাধারণতঃ চারি ফুট হইতে পাঁচ ফুট দীর্ঘ, দুই ফুট হইতে তিন ফুট প্রশস্ত, ও আড়াই ফুট হইতে তিন ফুট গভীর হইত। প্রথমে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সময়োচিত কতকগুলি ক্রিয়াপদ্ধতি সমাপন করিলে সহমরণেচ্ছু নারী স্নানান্তে বিবাহরাত্রির উপযোগী বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া, গুরুজনদের প্রণাম ও স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠদের আশীর্ব্বাদ করিয়া কয়েক বার চিতা প্রদক্ষিণ করিতেন ; অনন্তর সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বহু অর্থ ও অলঙ্কারাদি বিতরণ করিবার পর চিতারোহণ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে চিতায় অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বে "সতী"কে চিতার সহিত রজ্জুবদ্ধ করা হইত, এবং অগ্নিসংযোগ

৪। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, "সংবাদপত্রে সে কালের কথা", দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬। অতঃপর এই পুস্তককে 'সংবাদ প্রথম' এই ভাবে উল্লেখ করা যাইবে।

করিবামাত্র উচ্চ বাদ্যধ্বনিতে স্থানটি প্রতিধ্বনিত হইত। সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধবাদীরা বলিতেন, অগ্নি-ভয়ে ভীতা নারীর পক্ষে চিতা হইতে লম্ফ প্রদানের সম্ভাব্যতা পরিহারের উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে ঐরূপে রজ্জুবদ্ধ করা হইত, এবং সময়ে সময়ে কাঁচা বংশদণ্ড দ্বারা তাঁহাকে চিতার সহিত চাপিয়াও ধরা হইত! অতঃপর যাহাতে তাঁহার আর্ত্তনাদ কাহারও কর্ণগোচর না হয়, এই উদ্দেশ্যেই বাদ্যধ্বনি করা হইত। বলা বাহুল্য, সহমরণ-প্রথার সমর্থকরা ইহার ভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। "হিন্দু-স্থানের পশ্চিমাংশে—সহমরণের পর চিহ্নার্থ গঙ্গাতীরে একটা মঞ্চ গাঁথিয়া" রাখা হইত। (৫)

উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক জিলায় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট একটি নারী সহমৃতা হইয়াছিলেন। সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে কোন্ কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়াছিল ও কত ব্যয় হইয়াছিল—তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই তালিকা হইতে সহমরণ অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির ও আনুমানিক ব্যয়ের একটি স্থূল ধারণা হইতে পারে। (৬)

ঘৃত	...	৩৲
বস্ত্র	...	১৲
নারীর পরিধেয় নববস্ত্র	...	২॥০
কাষ্ঠ	...	৩৲
আদালতের পণ্ডিতকে দেয়		৩৲
নারী কর্ত্তৃক দান	...	১৲
চাউল	...	/০
সুপারি	...	৵১০
পুষ্প	...	/০
কোকো	...	/০
গাঁজা	...	।০
হরিদ্রা	...	/০
ধূপ, চন্দন, নারিকেল প্রভৃতি		/৫
বাহকদের দেয়	...	।/০
বাদকদের দেয়	...	॥০
নাপিতকে দেয় (নখ কাটার জন্য)		।০
কাঠুরিয়াকে দেয়	...	৶০
	মোট—	১৫।/১৫

সহমরণ-প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তন কিরূপে হয়, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। এ বিষয়ে ডিওডোরাস সিকিউলাস, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি গ্রীক লেখকগণের সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। রামমোহন রায় কিন্তু এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, তৎকালীন হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকায়, এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার বিধবা পত্নী সমূহ সহসা এরূপ অসহায় অবস্থায় পতিত হইত যে, তদবস্থায় দুস্তর সংসার-মরু পার হইবার বিড়ম্বনা সহ্য করা অপেক্ষা স্বামীর চিতানলে দগ্ধ হইয়া সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান করাই তাহারা কাম্য জ্ঞান করিত। সমাজও এ বিষয়ে তাহাদিগকে নিরস্ত না করিয়া বরং উৎসাহিতই করিত; কারণ, এই সহজ পন্থার অনুসরণ করিয়া সমাজ নিঃসহায় বিধবার ভরণপোষণের গুরু দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইত। এইরূপে সহমরণ প্রথা সামাজিক অনুমোদন ও উৎসাহ লাভ করিয়া কালক্রমে অবশ্যকর্ত্তব্য বিধি বলিয়া পরিগণিত হয়। (৭) কাহারও কাহারও মতে বিধবা যুবতী নারীর ব্যভিচারিণী হইবার "ভাবি আশঙ্কাকে দূর করিবার নিমিত্ত" সহমরণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। (৮)

উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে বহু নারী সহমৃতা হইতেন। ইহার কারণ নির্দ্দেশ উপলক্ষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হুগলীর তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এইচ, ওক্‌লি যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা কৌতুকাবহ। তাঁহার মত এই যে, যেহেতু প্রধানতঃ কলিকাতাবাসী হিন্দুরাই "মাতাল ও তস্করদিগের উপাস্য দেবী" (The idol of the drunkard and the thief") কালীর ভক্ত, এবং কলিকাতাতেই সহমরণ-প্রথা সমধিক প্রচলিত, অতএব কালীপূজাই কলিকাতায় সহমরণ-প্রথার ব্যাপক অনুষ্ঠানের হেতু। (৯) সে-কালে হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর যুক্তি কোম্পানীর সংগৃহীত এই বিজ্ঞ গোরা

৫। 'সংবাদ প্রথম' পৃঃ ২৮১।

৬। India's Cries p. 2. (foot note).

৭। Raja Rammohan Roy's tract entitled, "Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of Females, according to the Hindu law of Inheritance."

৮। রামমোহন রায় লিখিত, "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের প্রথম সম্বাদ।"

৯। Parliamentary papers, Vol. 1, p. 237.

ম্যাজিষ্ট্রেটটির যুক্তির কাছে ঘেঁসিতে পারে? এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা ‘বড় তামাকে’র দুই-এক সিলিমের কর্ম্ম নয়!

সহমরণ-প্রথার প্রবর্ত্তকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বিধবা নারীর পক্ষে সহমৃতা হওয়া কালক্রমে বিশেষ গৌরবজনক বলিয়া পরিগণিত হইত। এমন কি, সহমৃতা নারী দেবীর সম্মান লাভ করিতেন। সহমরণ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বে সহমরণোদ্যতা নারীর আশীর্ব্বাদ লাভ অতিশয় সৌভাগ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। সহমৃতা হইবার পর কখনও কখনও “সতীর” দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি অথবা ভস্ম সংগ্রহ করিয়া তদুপরি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইত, ও আকস্মিক বিপদ-আপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ অথবা ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভের জন্য মৃতা সতীর উদ্দেশে এই বিশ্বাসে মানসিক করা হইত যে, তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে ভক্তের সকল কামনা পূর্ণ করিবেন। (১০)

এই সম্পর্কে মনু বলিয়াছেন, বিধবার পক্ষে সহমৃতা হওয়া অতি পুণ্য কার্য্য; কারণ, তদ্দ্বারা ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, ও মিত্রঘ্ন পতিও নরক হইতে মুক্ত হন, এবং সতীর ত্রিকুল পবিত্র হয়। সে-কালে যে-বংশে যত অধিকসংখ্যক নারী সহমৃতা হইতেন, সেই বংশ তত অধিক মর্য্যাদাসম্পন্ন বিবেচিত হইত। পক্ষান্তরে, স্বামীর মৃত্যুর পর পত্নী সহমৃতা হইতে পশ্চাৎপদ হইলে, তাঁহার নিজের এবং তাঁহার পিতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের কলঙ্কের সীমা থাকিত না। ডিওডোরাস্ সিকিউলাস বলেন, এইরূপ কলঙ্কের ধারণা বহু প্রাচীন। (১১)

হিন্দু নারীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সহমৃতা হইলে পরলোকে স্বামীর আত্মার সহিত মিলন হয়। বস্তুতঃ, পুরাণেও লিখিত আছে, রুদ্রাণী মৃতপতির সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় সহমৃতা হইয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার “The Web of Indian Life” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

“The belief in a mystic union of souls was the motive for Suttee, a sacrifice that was supposed to lift the husband's soul atonce into bright places and bring his wife to enjoy beside him for thousands of years”

বস্তুতঃ, সতী নারীর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই যে হিন্দু রমণীরা বহু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, অপরের বিনা-প্ররোচনায় এবং প্রফুল্ল মুখে প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন, সহমরণ-প্রথার বিরোধী বহু ইংরেজকেও সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রের কোন ইংরেজ বিচারক (ফৌজদারী হাকিম) স্থানীয় কোন সহমরণোদ্যতা সতীর মানসিক দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন,— “সেই বিধবা নারী সহমৃতা হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বরাবর সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক ও অবিচলিত ছিলেন। তিনি অতি সংযত চিত্তে সেই ভীতিপ্রদ অনুষ্ঠানের আয়োজন দর্শন করিতেছিলেন; এমন কি, স্বয়ং সেই আয়োজনে সাহায্যও করিতেছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহার ঐরূপ নির্ভীকতা আমি পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারিতাম না। তিনি চিতার উপর উপবিষ্টা হইয়া স্থিরচিত্তে নিজের চারি ধারে কাষ্ঠ সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার শেষ আশায় অবশেষে আমি তাঁহাকে বলিলাম, তিনি যদি উহাতে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিব। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, ঐ কার্য্য তাঁহার পক্ষে অতি সুখকর বলিয়াই তিনি স্বেচ্ছায় উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! অনন্তর তিনি উচ্চকণ্ঠে নিজ পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহার দেহের উপর কাষ্ঠ সাজাইয়া দিতে বলিলেন, এবং পরে সেই কাষ্ঠে স্বহস্তে অগ্নিসংযোগ করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে যে দুই-তিন সেকেণ্ড বিলম্ব হইল, সেই স্বল্প সময়ে তাঁহার মুখভাবে বিন্দুমাত্রও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। তাহার পর অগ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে, তাঁহাকে আনন্দে করতালি দিতে দেখা গেল, এবং এক মিনিটেরও অল্প সময়ের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবসান হইল!”

১০। A description of the character, manners and customs of the people of India, and of their institutions, religious and civil, by Abbe J. A Dubois, 2nd edition, chapter XXI. p. 175.

১১। Cassell's Illustrated History of India by James Grant, volume II, chapter VIII, p. 40.



দরদী

[শিল্পী—শ্রীসুমুখনাথ মিত্র

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের 'Asiatic Journal'এ এইরূপ একাধিক সাহসিকা সতীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ওলন্দাজ নৌসেনাপতি ষ্টাভোরিনাস ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে একটি সতীকে গঙ্গাতীরে সহমৃতা হইতে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার নির্ভীকতা দর্শনে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। (১২) এই সম্পর্কে ভারতীয় নারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া ভেলেরিয়াস ম্যাক্সিমাস্ স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন—"The boldness of the Cimbrians, the constancy of the Celtiberians, the resolute wisdom of the Thracians and the crafty prudence of the Lycians in despising



এক-চিতায় স্বামী-সহ চার সতী

sorrow, are not comparable to this Indian sacrifice, wherein the pious wife ascends the pile in the face of instant death, as if it were a nuptial couch." (১৩)

কিন্তু সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধবাদীরা সতীর এই নির্ভীকতার ভিন্ন ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহারা এই অভিমত পোষণ ও প্রচার করিতেন যে, হিন্দু সমাজ সম্পূর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই সহমরণ-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। ইহার প্রবর্ত্তন দ্বারা প্রথমতঃ সমাজ স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার ভরণ-পোষণের গুরু দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিত; দ্বিতীয়তঃ, স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি নারীর পরিবর্ত্তে মৃত ব্যক্তির পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি পুরুষ-আত্মীয়ের হস্তগত হইত; তৃতীয়তঃ, সহমৃতা হইবার সময়ে সতী কর্ত্তৃক বহু ধন, রত্ন, অলঙ্কারাদি বিতরণ করিবার রীতি প্রচলিত থাকায়, সে সকলও পণ্ডিত প্রভৃতির লাভ হইত। সুতরাং প্রিয়জনের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহপরবশ হইয়া বিধবা নারীর কোন নিকট-আত্মীয় সহমরণ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা, এমন কি, তাঁহাকে সহমরণে প্রবৃত্ত করাইতে উৎসাহের বিন্দুমাত্র অভাব প্রদর্শন করিলে, পুরুষ-গঠিত সমাজের নিকট তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। (১৪)

এই সকল লুব্ধ পণ্ডিতের দল ও স্বার্থপর আত্মীয়-কুটম্বরা মৃত ব্যক্তির শোকাতুরা পত্নীর কর্ণে সেই অবস্থায় কোন সান্ত্বনা ও আশার বাণী না শুনাইয়া, স্ব স্ব স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যেই ক্রমাগত তাঁহাকে সহমৃতা সতীর স্বামিসহ স্বর্গে চিরমিলনের প্রলোভন প্রদর্শন করিত, এবং শাস্ত্রানুশাসনের নানা লোভনীয় কদর্থ শুনাইয়া ভ্রান্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া, এমন কি, ঔষধ প্রয়োগেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলিত। এতৎসত্ত্বেও, কোন নারী সহমরণে দ্বিধা প্রদর্শন করিলে তাঁহাকে ইহলোকে সমাজের ভয়, নিজের অশেষ নিগ্রহ ও কলঙ্ক, এবং পরলোকে নিজের নরক-যন্ত্রণা ও পতির অশেষ দুর্গতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইত না। সদ্যঃ পতিহীনা, শোকবিধুরা, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া নারীকে এইরূপে যুগপৎ পুণ্যের লোভ ও পাপের ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা তাহারা এ-ভাবে সহমরণে প্ররোচিত করিত যে, তিনিও সেই অবস্থায় হিতাহিতজ্ঞানবর্জ্জিত ও নিরুপায় হইয়া স্বামীর চিতারোহণে বাধ্য হইতেন।..."These immolations were often not voluntary, that sometimes they were only

১২। Voyage to the East Indies.

১৩। Asiatic Journal, May, 1827.

১৪। Letter dated 24th January 1826, from 'Bengal Hurkara' and published in Asiatic Journal of July, 1826.

possible by drugging the victim, and that Suttee was consequently often only an euphemism for murder." (১৫) অৰ্দ্ধচেতন নারীর সেই ভাববিহ্বলতা সহমরণ-সমর্থকদিগের নিকট নির্ভীকতা বলিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিত।

সহমরণে সম্মত না হইলে বহু ক্ষেত্রে নারীর উপর শারীরিক বলপ্রয়োগ করা হইত, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। প্রজ্বলিত চিতাগ্নির প্রথম উত্তপ্ত স্পর্শে আতঙ্কাভিভূতা একটি নারী কোন সময়ে সকলের অগোচরে চিতা হইতে আত্মরক্ষার্থ পলায়নোদ্যতা হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘটনা সহসা তাঁহারই পুত্রের দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, সে ত্রস্তা ও রোরুদ্যমানা জননীর মিনতিপূর্ণ আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে তিরস্কার করিতে করিতে বলপূর্ব্বক রজ্জুবদ্ধ করিয়া পুনরায় প্রজ্বলিত চিতায় নিক্ষেপ দ্বারা মাতৃভক্ত পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল! (১৬)

আর এক সময়ে অগ্নির উত্তাপ অসহ্য বোধ হওয়ায় একটি নারী জলন্ত চিতা হইতে অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় অদূরবর্ত্তী শীতল জলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদ্দর্শনে, তাঁহাকে সহমৃতা হইতে হইবে না, এইরূপ মিথ্যা প্রবোধ দিয়া তৎক্ষণাৎ কতকগুলি ব্যক্তি (ইহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিই ছিল) তাঁহাকে কৌশলে রজ্জুবদ্ধ করিয়া পুনরায় চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ জীবন রক্ষার্থ ধড়ফড় করিতেছেন দেখিয়া, তাহারা তৎক্ষণাৎ তরবারির আঘাতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করে! (১৭)

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচীন কালে বহুবিবাহিত স্বামীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীরই মাত্র সহমরণের অধিকার স্বীকৃত হইত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, পরবর্ত্তী কালে মৃতব্যক্তির সকল স্ত্রীই অথবা একাধিক স্ত্রী স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। কোন ভারতীয় নৃপতির মৃত্যুর পর আটাশ জন নারী সহমৃতা হইয়াছিলেন! (১৮)

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখের 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশ, "...রাজপুতেরদের নিত্য সহগমন হয়; গত বৎসর তদ্দেশীয় এক জন রাজা মরিলেন, এবং তাঁহার তেত্রিশ স্ত্রী পুড়িয়া মরিল।" (১৯) গুর্জ্জরের সমীপবর্ত্তী কচ্ছপ্রদেশে কোন সম্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার পনেরটি উপপত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন। (যদিও তাঁহার কোনও বিবাহিতা পত্নী এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই)। (২০)

শ্রীরামপুরের মিশনারী রেভারেণ্ড কেরীর ছাপাখানায় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে গোপীনাথ নামক কোন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিল। নদীয়া-সন্নিহিত বাগনাপাড়া গ্রামে অনন্ত নামক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার শতাধিক স্ত্রীর মধ্যে সাঁইত্রিশ জনকে সে সহমৃতা হইতে দেখিয়াছিল। (২১) (মতান্তরে বাইশ জন। Vide, Buchanan's Apology for Christ in India, pp. 14—16) তন্মধ্যে প্রথম দিন তিন জন, দ্বিতীয় দিন পনের জন, এবং তৃতীয় দিন উনিশ জন চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ত্রিদিবসব্যাপী চিতা প্রজ্বলিত ছিল।

তৎকালে কুলীন কন্যাকে পাত্রস্থ করা সহজ ছিল না; সেই কারণে পাত্রের অভাবে বহু কন্যাকে বাধ্য হইয়া চিরকুমারী থাকিতে হইত; কাহাকেও যৌবনান্তে নামমাত্র পাত্রস্থ করিয়া তাহার কুমারী নাম খণ্ডন করা হইত। কুলীন যুবকরা উদ্বাহ অনুষ্ঠানকে অতি লাভজনক

১৫। 'India in the Nineteenth Century' by Demetrious C. Boulger.

কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন এ কথার সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, সহমরণোদ্যতা রমণীর বিষয়প্রাপ্তির লোভে তাঁহাকে সহমরণে উৎসাহিত করা দূরের কথা,—নিকট-আত্মীয়েরা বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনের সাহচর্য্য ও সেই নারীর শিশু-সন্তান সমভিব্যাহারে তাঁহাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য সকাতরে অনুনয়-বিনয় করিতেন, এবং রমণী সম্রান্তবংশীয়া হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিতেন ও ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন। কোন রাজার রাজত্বকালে অধিক সংখ্যক সহমরণ অনুষ্ঠিত হওয়া দুর্লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত।

১৬। "A collection of facts and opinions relative to the burning of widows and other destructive customs prevalent in British India"—by Mr. Johns. অতঃপর এই পুস্তক 'Johns' বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

১৭। "Parliamentary papers, relative to Suttee" Vol. II. p. 64.

১৮। Proceedings of Manchester Meeting. p. 9.

১৯। 'সংবাদ প্রথম' পৃঃ, ২৮১

২০। Hamilton's Hind. Vol. I. p. 638.

২১। 'Johns.'

ব্যবসায় হিসাবেই গণ্য করিতেন ও বহু অর্থ-সম্পত্তির বিনিময়ে আজীবন এইরূপ কুমারীতারণ-যজ্ঞে সহায়তা করিয়া বিবাহ-রাত্রি অবসানের সঙ্গেই অন্তর্দ্ধান করিতেন। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে সাধারণতঃ আর কখনও সাক্ষাৎ ঘটিত না। অথচ সে-কালে গৌরীদান তথা বাল্যবিবাহেরও প্রচলন ছিল। ফলে এই হইত যে, এক-এক জন কুলীন পাত্র নির্ব্বিচারে বালিকা-বৃদ্ধা-নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের শতাধিক নারীকে বিবাহ করিত।—"One class of the Brahmans, the kulins, were at liberty to marry wives as they chose, and if they died, the helpless girls who, in some cases, had scarcely seen their husbands, were doomed to die as Suttees." (২২)

পরে সেই কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাহার জ্ঞানহীনা কিশোরী পত্নী ও বিগতযৌবনা বর্ষীয়সী স্ত্রী সকলকেই সহমৃতা হইতে হইত। বস্তুতঃ, পূর্ব্বোক্ত কুলীন ব্রাহ্মণটির সাঁইত্রিশটি সহমৃতা পত্নীর মধ্যে ষোড়শ বর্ষ হইতে চল্লিশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন বয়সের নারী ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। নারীর বয়সের তারতম্যের জন্য নৃশংসতার কোনরূপ প্রভেদ হইত না। পার্শ্বের তালিকায় লক্ষিত হইবে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে (Bengal-এ নহে, Bengal Presidencyতে) (২৩)—একষট্টিটি অপ্রাপ্তবয়স্কা নারী সহমৃতা হইয়াছিল। (২৪)

সহমৃতা নারীর বয়স	সহমৃতা নারীর সংখ্যা
৮ বৎসর	৩ জন
১০ "	১ "
১২ "	১০ "
১৩ "	২ "
১৪ "	২ "
১৫ "	৬ "
১৬ "	২২ "
সাড়ে ১৬ "	১ "
১৭ "	১৪ "
মোট—	৬১ "

বৃদ্ধা সহমৃতা নারীরও একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। বহু অশীতিবর্ষ ও নবতিবর্ষ বয়স্কা নারীও সহমৃতা হইতেন। এক জন পঞ্চনবতি বর্ষীয়া বৃদ্ধারও সহমরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। (২৫)

যদিও সহমরণ প্রথা বঙ্গপ্রদেশে সকল জাতির হিন্দুর মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহা হইলেও বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণবংশীয়া নারীদের দ্বারাই উহা ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হইত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন বয়সের ব্রাহ্মণী ও ভিন্ন জাতীয়া সহমৃতা নারীর নিম্নোদ্ধৃত সংখ্যা পাঠে ইহা প্রতিপন্ন হইবে,—

	২০ বৎসরের নিম্নবয়স্ক	২০ ৪০ বৎসর বয়স্ক	৪০-৬০ বৎসর বয়স্ক	৬০ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক	মোট সংখ্যা
কেবল ব্রাহ্মণ নারীর সংখ্যা।	১১	১০৩	১০২	৩৫	২৫১
ব্রাহ্মণেতর সর্ব্ব-জাতীয়া নারীর সংখ্যা।	১৩	১১৫	১৩২	৬১	৩২১
	২৪	২১৮	২৩৪	৯৬	৫৭২

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত সহমৃতা নারীদের মধ্যে অনুমৃতা নারীদেরও গণনা করা হইয়াছে। এই সূত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তৎকালে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ নারীদের পক্ষেই অনুমরণ নিষিদ্ধ ছিল। তাহা না হইলে, উপরি-উদ্ধৃত তালিকায় ব্রাহ্মণ নারীর সংখ্যা আরও অধিক হইত।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, সমগ্র ভারতবর্ষে সহমরণের প্রচলন থাকিলেও, বিশেষ করিয়া বঙ্গপ্রদেশেই উহা

২২। 'Bengal as a field of Missions' by Macleod Wylie, chapter XIII.

২৩। "The Bengal Presidency must not be confounded with the province of Bengal. The former comprehends the whole of the stations from the entrance of the river Hughly, north of the Bay of Bengal, to the river Indus, the Tenasserim coast, Pegu, and Prome in Burmah. The Himalayan chain, and the kingdom of Nepaul, are upon its northern and north-eastern limits. West and south it extends to the boundaries of the Bombay and Madras Governments..." Missionery Sketches in North India' by Mrs. Weitbrecht.

২৪। Parliamentary Papers. Vol. II. p. 45

২৫। Parliamentary Papers. Vol. V.

যে, উহা কর্ণহেরিতে প্রাপ্ত শতকর্ণী বশিষ্ঠের প্রদত্ত প্রশস্তির সমকালিক। বার্গেইনে ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মনে করেন। তিনি বলিয়াছেন, উহা ৪র্থ শতাব্দীর হইতেই পারে না। উহাতে প্রাচীন ইন্দোচীন ভাষায় এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। অক্ষরগুলি স্থানে স্থানে ক্ষয়িত ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহার এই কয়টি কথা জানিতে পারা গিয়াছে :—

শ্রীমার রাজকুমার বংশবিভূষণেন
শ্রীমার লোকনৃপতে কুলানন্দনেন। ইত্যাদি

এই রাজার নাম কি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় নাই। অক্ষর ক্ষয় পাইয়াছে। তবে এই নরপতি যে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। ইনি শ্রীমার বংশোদ্ভূত। অধ্যাপক ফিনো সেই জন্য লিখিয়াছেন— খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে দক্ষিণ-আনামে একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। * পরবর্ত্তী কালে এই দক্ষিণ-আনাম অঞ্চলের নাম হইয়াছিল কৌঠার।

কৌঠার রাজ্যের দক্ষিণেই পাণ্ডুরঙ্গ রাজ্য অবস্থিত ছিল। দেশীয়রা পাণ্ডুরঙ্গকে পণরাং বলিত। এখন ঐ স্থানের নাম হইয়াছে —ফণরং। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে প্রায় কুড়িখানি প্রশস্তি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলে পো-নগর দেবীর মন্দির এবং ভোকণ-প্রস্তরের প্রাচীনত্ব হইতেই সপ্রমাণ হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই অঞ্চলে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাহার পরই চম্প অথবা চম্পা রাজ্যের কথা। চীনের ঐতিহাসিকরা বলেন যে, চীনের জেনান অঞ্চলটাই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে চম্পা নাম ধরিয়াছিল। চম্প অঞ্চলের অধিবাসীরা চম নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় ১০০ অব্দে সিয়াংলিংএর নাপিতরা বিদ্রোহী হয়। কিন্তু তাহাদের সেই প্রচেষ্টা প্রথম বার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার ৯২ বৎসর পরে পুনরায় যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহার ফলে চম্পা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। চম্পার রাজধানীর নাম ছিল ইন্দ্রপুর। বর্ত্তমান সময়ে ঐ অঞ্চলে ট্রকিয়েন নামক স্থানের ধ্বংসস্তূপ হইতে যে সকল তাম্রশাসন ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই ঐ নগরের নাম ইন্দ্রপুর বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। যাহারা চীনের বিদ্রোহী হইয়া চম্পা অঞ্চলে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত করিয়াছিল, চীনা ভাষায় তাহাদিগকে নাপিত বা পরামাণিক বলিয়া উল্লেখ করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা ক্ষৌরকর্ম্মজীবী ছিল না। তাহারা ঐ অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীই ছিল। তাহাদের গ্রাম, নগর প্রভৃতির হিন্দু নামই ছিল। পাণ্ডুরঙ্গ দেশের উত্তরে যে প্রদেশ ছিল, তাহার নাম ছিল অমরামতী এবং বিজয়। অমরাবতী রাজ্যে ভদ্রেশ্বর দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। তাহাই ঐ রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান মন্দির। ফিনো এবং পারমেন্টিয়ার বলেন—বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে মিশন গ্রাম অবস্থিত, তথায় ঐ ভদ্রেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত ছিল। মিশন গ্রাম বর্ত্তমান টুরেণ সহরের প্রায় ১০ ক্রোশ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে অমরাবতী প্রদেশে ভদ্রবর্ম্মা নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। ইনিই ঐ রাজ্যের একটি নির্জ্জন অঞ্চলে ভদ্রেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, শিবই স্বয়ং ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উহা ভৃগু ঋষির হস্তে সমর্পণ করেন। ভৃগু সেই বিগ্রহটি যাহাকে প্রদান করেন, তাঁহার নাম উরোজ; তিনি চম্পা প্রদেশের রাজবংশের স্থাপয়িতা। কিছু দিন পরে ভদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গটি পুড়িয়া যায়। ভদ্রদমন বংশে গঙ্গারাজা নামক রাজা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি রাজা রুদ্রদমনের পুত্র। ইনি এই দূরদেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া গঙ্গা নদী দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি গঙ্গারাজা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইনিই চম্পার বিখ্যাত গঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মিশন নগরে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে,—গঙ্গারাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া গঙ্গা দর্শনান্তে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যায় এবং শৌর্য্যে রাজগুণসম্পন্ন ছিলেন—ইত্যাদি। শিলালিপিখানির কোন কোন অক্ষর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও উহাতে গঙ্গারাজার পরিচয় সুস্পষ্ট আছে। চৈনিক ঐতিহাসিকগণ আগ্রহসহকারে এই শিলালিপিখানির উল্লেখ করিয়াছেন।

গঙ্গা রাজবংশের বহু রাজা চম্পা প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের পরাক্রান্ত রাজা শম্ভুবর্ম্মা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিই খৃষ্টীয় ৬৬০ অব্দে ভদ্রেশ্বর শিবের দগ্ধ মন্দিরটির পুনঃ-সংস্কার করেন, ইনি বিগ্রহের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শম্ভু ভদ্রেশ্বর নামে অভিহিত করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গা রাজবংশ বিলুপ্ত হয়। পরবর্ত্তী বংশের রাজগণ ১ শত ১০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারাও হিন্দু ছিলেন। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা সত্যবর্ম্মার রাজত্বকালে মালয়দেশীয় জলদস্যুগণের আক্রমণে প্রজাপুঞ্জ বিশেষ ভাবে উৎপীড়িত হয়। তখন ইহারা পাণ্ডুরঙ্গের অন্তর্গত বীরপুরে আপনাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মালয় দস্যুগণ কৌঠারস্থ ভগবতীর মন্দিরটি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। রাজা সত্যবর্ম্মা ঐ মন্দিরটি ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত করেন। ইহার পর ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মালয় দস্যুরা এ দেশ পুনর্ব্বার আক্রমণ করায় পরবর্ত্তী নূতন রাজবংশের প্রথম রাজা ইন্দ্রবর্ম্মা তাঁহার রাজধানী অমরাবতী অঞ্চলে স্থানান্তরিত করিয়া এই রাজধানীর নাম পুরাতন রাজধানীর নাম অনুসারে ইন্দ্রপুর রাখিয়াছিলেন।

চম্পা রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে এখন প্রায় ত্রিশ হাজার লোক দক্ষিণ-আনামে অবশিষ্ট আছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার মুসলমান আর ২০ হাজার হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু এখানকার হিন্দুদিগের অধঃপতন ঘটিয়াছে। তাহারা তাহাদের উপাস্য দেবতাদিগের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে! ১৩০০ খৃষ্টাব্দে চম্পারাজ তৃতীয় জয়সিংহ বর্ম্মা যে শিব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তথাকার হিন্দুরা আজিও তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা এখন আর ঐ বিগ্রহকে শিবলিঙ্গ বলিয়া চিনিতে পারে না। তাহারা উহাকে চম্পারাজ পো ক্লং গরাইয়ের মূর্ত্তি

* We may therelore safely admit that as early as the first two centuries of the Christain era there existed a Hindu kingdom in Southern Anam. —I. H. Q, vol I, p. 604

মনে করে। পূজাকালে উহার পুরোহিত মহাশয়েরা যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহার ভাষা অপভ্রষ্ট সংস্কৃত। যথা—"ওঁ পরমেশ্বর পরমেশ্বরায় নমো পরমেশ্বর মুখো নমো নমো শিবায়নাম (ওঁ পরমেশ্বরপরমেশ্বরায় নমো নমো পরমেশ্বরমুখো নমো শিবায় নমঃ।" অপিচ "ওম্ ওম্ শিবমে টুক দিদ শিবায় নমো স্বাহা (ওঁ ওঁ শিবোমে —শিবায় নমো স্বাহা)।" মধ্যস্থ "টুক সিদ" যে কোন্ শব্দ হইতে অপভ্রষ্ট হইয়া ঐরূপ রূপ ধরিয়াছে, তাহা 'পণ্ডিতে বুঝিতে পারে মূর্খের লাগে ধন্ধ!' ফরাসী পণ্ডিতরা উহার পাঠোদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। উহা তুষ্টিদঃ হইবে অথবা তুষ্যতাম্ হইবে? পূজার মন্ত্রের ভাষা যে অশুদ্ধ সংস্কৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে য়ুরোপীয়রাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে, প্রায় খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ আমল পর্য্যন্ত চম্পায় সংস্কৃত ভাষা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত। অতি প্রাচীন কাল হইতে তথায় বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যাহাতে বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, উমা, কার্ত্তিকেয়, নন্দী প্রভৃতির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধদিগের মন্দিরে বুদ্ধ, লোকেশ্বর প্রভৃতির বিগ্রহ বিদ্যমান।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মীন্দ্র ভূমিশ্বর গ্রামস্বামিন্ নামক ভূস্বামীকে দেশের অভিজাতবর্গ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মধ্যযুগেও ঐ দেশে হিন্দু রাজগণের মধ্যে রাজা-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। লক্ষ্মীন্দ্র গ্রামস্বামী সেই জন্য চম্পার সিংহাসন পাইয়াছিলেন। অভিষেক-কালে তিনি ইন্দ্রবর্ম্মা (দ্বিতীয়) নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে প্রজাবর্গ তাঁহাকে 'পরম বুদ্ধলোক' বলিত। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেও হিন্দু ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি চম্পার জাতীয় দেবতা হিসাবে ভদ্রেশ্বর দেবের পূজা করিতেন, এবং লোকেশ্বরেরও সেবা করিতেন। তিনি ভদ্রেশ্বর দেবের মন্দির হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মঠ, এবং লোকেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই মঠে বহু সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং শ্রমণ বাস করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের বিগ্রহ লোকেশ্বর দেব লক্ষ্মীন্দ্র লোকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখনও দংওয়াং গ্রামে রাজা দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্ম্মার প্রতিষ্ঠিত সেই বৌদ্ধ মন্দিরের এবং চৈত্যের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইন্দ্রপুর নগরীতে ইনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল বৌদ্ধ-কীর্ত্তি এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চীনাদিগের প্রতিষ্ঠিত কি চমদিগের প্রতিষ্ঠিত তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ইহার পর আনামবাসীরা চীনের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে চীনের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলেও দীর্ঘকাল স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে নাই। পাণ্ডুরঙ্গ রাজ্যের সহিত বিবাদের ফলে চম্পারাজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দে চম্পার রাজা সিংহবর্ম্মা তাঁহার রাজধানী বিসর প্রদেশে অপসারিত করিতে বাধ্য হন। চীনাদের সহিত সংগ্রামে চম্পাবাসীরা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। তাহারা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছিল। ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে চম্পারাজ বা আনামের অধীশ্বর রাজা তৃতীয় রুদ্রদমন আনাম প্রদেশের উত্তর অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া চীনাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর চম্পারাজ্যের বহুবার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। পূর্ব্ব-উপদ্বীপের আরও বহু রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের কৌতূহলোদ্দীপক হইতে পারে।

ফুনান রাজ্য

এই অঞ্চলের অনেক নাম চীনা ভাষায় শোচনীয়রূপে বিকৃত হইয়াছিল, সেই জন্য প্রকৃত নামগুলি কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। ফুনান দেশটির প্রকৃত নাম যে কি ছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হয়। অধিকাংশ পণ্ডিতের ধারণা, কম্বোজদেশীয় ভ্নম শব্দ হইতে ফুনান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ভ্নম শব্দটি একটু বিকৃত হইলে ভ্নম হইয়া পড়ে। ভ্নম অর্থে পাহাড়। আমাদের মনে হয়, উহা ভূমি শব্দজ। ফুনানের সহিত কম্বোডিয়া রাজ্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এক সময় ফুনান বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। মেসং নদীর পশ্চিম তীরে কম্বোডিয়া; কোচিন চীন, লেয়স্, শ্যাম এবং মালয় উপদ্বীপ উহার অধিকারভুক্ত ছিল। ইহার রাজবংশ বহু প্রাচীন। এই রাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে কৌণ্ডিন্য নামক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। একদা দৈববাণী হইল,—'ব্রাহ্মণ! তুমি ফুনানে যাইয়া ঐ রাজ্য শাসন করিতে থাক।' কৌণ্ডিন্য দৈববাণী শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন, এবং অবিলম্বে ফুনান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি জাহাজে মেকং নদীতীরস্থ পনপন্ নামক স্থানে উপস্থিত হইলে দেশবাসীরা তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। অতঃপর কৌণ্ডিন্য দেশের রাজা হইলেন এবং কৌণ্ডিন্যের সহিত নাগী (নাগিনী?) সোমার বিবাহ হইল। তখন ঐ দেশের লোক মাতার পরিচয়েই পরিচিত হইত। সোমার গর্ভে তাঁহার যে পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনিই ফুনান রাজ্যের সোমবংশীয় রাজগণের আদিপুরুষ। সেই জন্য সোমা ঐ অঞ্চলে বংশপ্রতিষ্ঠাত্রী বলিয়া সম্মানিতা হন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অনুমান, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ রাজ্যে সোমবংশীয় রাজগণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিতগণের এই অনুমান নির্ভরযোগ্য নহে।

যাহা হউক, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমে ফুনচন অর্থাৎ রাজা চন্দ্রবর্ম্মা এই রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনিই ভারতের সহিত ফুনানের সরাসরি সংযোগ বা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সাক্ষাৎ সংযোগ কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা ঐ দেশের যে কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায়, উহা চীনা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাজা চন্দ্রবর্ম্মার (ফুনচনের) রাজত্বকালে কিয়াসংলি (Kia-Sangli) নামক ভারতবাসী বৈশ্য ঐ অঞ্চলে বাণিজ্যার্থ গমন করেন। ইনি রাজা চন্দ্রবর্ম্মাকে ভারতের সুখ-সমৃদ্ধির কথা বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাপন করিলে রাজা চন্দ্রবর্ম্মা এই সংবাদ শুনিয়া ভারতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "উহা (ভারত) এ দেশ হইতে কত দূর?" উত্তরে কিয়াসংলি বলেন, উহা অন্যূন ৩০ হাজার লি দূরে অবস্থিত; অর্থাৎ চন্দ্রবর্ম্মার রাজধানী হইতে উহা ১০ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। উহা সরলরেখায় দূরত্বজ্ঞাপক নহে। এই ভারতীয় বণিকটি জলপথে আসিয়াছিলেন। উহা জলপথের, অর্থাৎ উপকূল ঘেঁসিয়া যে দূরত্ব নির্ণীত হয়, সেই দূরত্বজ্ঞাপক। তাঁহাকে মালয় উপদ্বীপ

ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল, সুতরাং ঐ দূরত্ব বাঙ্গালা হইতে ঐ দেশে যাইবার দূরত্ব বলিয়াই মনে হয়। এই বৈশ্য বণিক কিয়াসংলির প্রকৃত নামটি উদ্ধার করা অসাধ্য। হরিসেন 'হ্যারিসন' হইলেও ধরা যায়, কিন্তু 'কিয়াসংলি' কোন্ নামের অপভ্রংশ, কে বলিবে? তবে তিনি 'ভারতে'র যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা দেশের বিবরণ বলিয়াই মনে হয়। তিনি তাঁহার দেশের কোন পাহাড়-পর্ব্বতের নাম করেন নাই; মরুস্থলীর উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল ভূমির উর্ব্বরতা এবং দেশের লোকের ধনধান্যের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তিন বৎসরের মধ্যে তথায় যাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারা যায়; যাতায়াতে চারি বৎসরও লাগিতে পারে। তাঁহার স্বদেশটি ভূস্বর্গ। এই বিবরণ শুনিয়া ফুনানাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা তাঁহার কোন আত্মীয়ের নেতৃত্বে জলপথে এক দল দূত ভারতে প্রেরণ করেন। ইহারা মালয় উপদ্বীপের নিম্ন-দেশ হইতে বরাবর উত্তর দিকে কতকটা পশ্চিম ঘেঁসিয়া, এবং নানা উপসাগর ও নদী-মোহনা অতিক্রম করিয়া ভারতীয় নদীর সঙ্গম-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ভারতীয় নদীর নাম জানিতে পারা যায় নাই; তবে গঙ্গাই ভারতীয় নদীসমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বহু-বৈচিত্র্যময়ী; কিন্তু কিম্বদন্তীতে কথিত হইয়াছে যে, দূতবাহী তরণী নদীর মোহনা হইতে ৭ হাজার লি অগ্রসর হইয়া রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিল। ৭ হাজার লি = ২ হাজার ৩ শত ৩৩ মাইল। এই দূতগণ জলপথে এক বৎসর অন্তে ভারতীয় নদীর মোহনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই তরণীর যাত্রাপথের যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, উহা গঙ্গানদীতে প্রবেশ করিয়াছিল। উহা অনেক উপসাগর এবং নদীর মোহনা অতিক্রম করিয়া ভারতীয় নদীতে প্রবেশ করে। মেঘনা পার হইয়া পদ্মার ভিতর দিয়া এই তরণী গিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। অধ্যাপক ফিনো বলেন, খৃষ্টীয় ২৪৪ হইতে ২৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই দূত প্রেরিত হইয়াছিল। তখন ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাজ্য ছিল। সেই সময় পশ্চিম-ভারতে অন্ধ্র এবং কুষণ বংশের পতন হইয়াছিল; কিন্তু মগধে গুপ্তবংশের আবির্ভাব হয় নাই। এরূপ অবস্থায় ফুনান রাজদূতগণ কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করাও কঠিন। তবে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের আমল হইতে পাটলি-পুত্র ভারতীয় রাজধানীর গৌরবলাভ করিয়া আসিতেছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই আবার গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই পাটলি-পুত্রেই প্রথম রাজত্ব করেন। তাহার পূর্ব্বে দুই-চারি জন অখ্যাত-নামা রাজাও পাটলিপুত্রের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। চীনা ইতিহাসে এবং স্থানীয় ইতিহাসে রাজার নাম দেওয়া হইয়াছে— মুলুন বা মুরুণ্ড। মুলুন নামটা চীনা নাম। মুরুণ্ড না হউক, মুরণ্ড নামটি সংস্কৃত। নর্ম্মদা নদীর আর একটি নাম মুরন্দলা। কিন্তু এ নদীতীরে কখনও কোন প্রসিদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, নর্ম্মদার মোহনা হইতে নদী বহিয়া ৩০ মাইলের অধিক দূর আর কোন বড় তরণী অগ্রসর হইতে পারে না। এ জন্য অনুমান করা যাইতে পারে, এই দূতগণ গঙ্গাতীরস্থ পাটলিপুত্রে বা অন্য কোন রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া থাকিবেন। ভারতবর্ষের রাজা মুরুন্দ দূতদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—"মহাসাগরের পরপারে এখনও এরূপ লোক আছে?" তাহার পর তিনি ঐ দূতদিগকে রাজ্যের সমস্ত ব্যাপার দেখাইবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ঐ ভারতীয় রাজা ফুনানরাজ চন্দ্রবর্ম্মাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য উপঢৌকন সহ কয়েক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। চারি বৎসর পরে দূতগণ আবার ফুনানে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই সময়ে কং-তাই নামক জনৈক প্রসিদ্ধ চীনাবাসীকে চীনরাজ য়ু ফুনানের রাজদূত করিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন। কং-তাইয়ের সহিত ভারতরাজের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চীনের রাজদূত ভারতরাজের প্রেরিত দূতদিগকে ভারতের অবস্থা এবং আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন।

চৈনিক ইতিহাস-লেখকগণ ভারতীয় নামগুলিকে চীনা-ফর্ম্মায় ঢালিয়া সাজিতেন বলিয়া উহারা কোন দেশের লোক, তাহা প্রায়ই বুঝিতে পারা যাইত না। যে বৈশ্য ফুনানরাজ চন্দ্রবর্ম্মার নিকট ভারতের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম চীনা ঐতিহাসিকরা লিখিয়াছেন—কিয়-সং-লিং। ইহা ভারতীয় নাম নহে। অথচ চীনা লেখকগণ লিখিয়াছেন, তিনি ভারতীয় বৈশ্য ছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমেই আর এক জন ব্রাহ্মণ ফুনান অঞ্চলে গমন করেন। তিনি প্রচার করেন যে, তাঁহার নামও কৌণ্ডিন্য, এবং তিনি দৈবাদিষ্ট হইয়া ঐ রাজ্যে রাজত্ব করিবার জন্য গিয়াছিলেন। দেশের সকল লোক আসিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। লিচাং-শু নামক চীনা ঐতিহাসিক বলেন, তিনি ভারতীয় আচার-পদ্ধতির অনুকরণে ফুনানের রীতি-নীতি এবং আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী কৌণ্ডিন্যের নাম জাল করিয়া কৌশলে ফুনান রাজ্যের সিংহাসন লইয়াছিলেন। এই কৌণ্ডিন্য-বংশের রাজা কৌণ্ডিন্য জয়বর্ম্মা খৃষ্টীয় ৪৮৪ অব্দে শাক্য নাগসেন নামক জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে চীনের রাজার দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। নাগসেন চীনরাজকে বাটালির দ্বারা ক্ষোদিত একটি স্বর্ণময় শিবমূর্ত্তি, শ্বেতচন্দন কাষ্ঠে ক্ষোদিত একটি হস্তিমূর্ত্তি, এবং গজদন্তনির্ম্মিত দুইটি স্তূপ উপহার দিয়াছিলেন। ইনি চীনরাজকে বলিয়াছিলেন,—"ফুনানের সর্ব্বত্রই মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে। মহাদেব পবিত্র মোতান পর্ব্বতে দেখা দিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বতে একটি দূর্ব্বা কিম্বা কোন প্রকার উদ্ভিদই জন্মে না।" খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ফুনান রাজ্যে শৈবধর্ম্মের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। এই দেশ হইতে অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি চীন দেশে গমন করেন। সঙ্ঘপাল নামক এক জন বৌদ্ধ সাধু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফুনান হইতে চীন দেশে উপনীত হইয়া অনেক ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র সেন নামক জনৈক বৌদ্ধ সাধু সঙ্ঘপালকে ঐ কার্য্যে সাহায্য করিতেন। তিনি চীনা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

কৌণ্ডিন্যবংশীয় রাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ফুনানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর চেন্‌লা অর্থাৎ কম্বোডিয়া রাজ্যের রাজারা ফুনান আক্রমণ করিয়া ঐ রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

বিজ্ঞান-জগৎ

অন্ধকারে যুদ্ধ চলিবে

কোথায় কখন যুদ্ধ বাধিবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। হয় তো অমাবস্যা-রাত্রেই মহাকালী রণরঙ্গিণী-বেশে ডাক দিলেন—



চোখে কালো চশমা

সে-অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা যায় না,—অথচ শত্রু আসিয়া হানা দিয়াছে—উপায় ?

এ-সমস্যা-নিরাকরণের জন্য ব্রিটিশ ফৌজকে আঁধারে যুদ্ধ করার বিদ্যা শিখানো হইতেছে। দিনের বেলায় সৈন্যদের চোখে ঘন-কালো কাচের চশমা আঁটিয়া মাঠে-বাটে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে—আদেশ, চোখে ঐ কালো ঠুলি আঁটিয়া বন্দুক চালাও! চশমার কালো কাচে চরাচর ছায়ায় ঢাকা অস্পষ্ট দেখায়; সে-আঁধারের আবছায়ায় দৃষ্টি-চালনা রপ্ত করিয়া তাহাদিগকে অস্ত্রচালনা করিতে হয়। মসীকৃষ্ণ অন্ধকার-রাত্রে খালি-চোখে চারি দিক যেমন দেখায়, এই কালো চশমার আবরণ চোখে আঁটা থাকিলে দিনের বেলায় চারি দিক ঠিক তেমনি দেখায়! কাজেই এ-ভাবে অস্ত্র-চালনা অভ্যাস করার ফলে সেনারা অন্ধকার-রাত্রে সুদক্ষ ভাবে অস্ত্র-চালনা করিতে পারিবেন। উপরের ছবি দেখিলে এ বিদ্যা-শিক্ষার প্রণালী বুঝিবেন।

—

খোয়া-পেষা রোলার

পথ-ঘাট তৈয়ারী বা মেরামতির সময় যে ষ্টীম-রোলার পরিচালনা করা হয়, সে রোলারের চাকা ভারী লোহায় তৈয়ারী; এবং এ রোলার বাষ্পযোগে চলে বলিয়া গাড়ীর গতি হয় অতিশয় মন্থর। সম্প্রতি আমেরিকায় ষ্টীম-রোলারের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক রোলারের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ-গাড়ীতে খানি ভারী রবারের টায়ার সংলগ্ন করা হইয়াছে এবং গাড়ী চলে বৈদ্যুতিক শক্তিতে। পাঁচখানি রবারের টায়ারে পথের

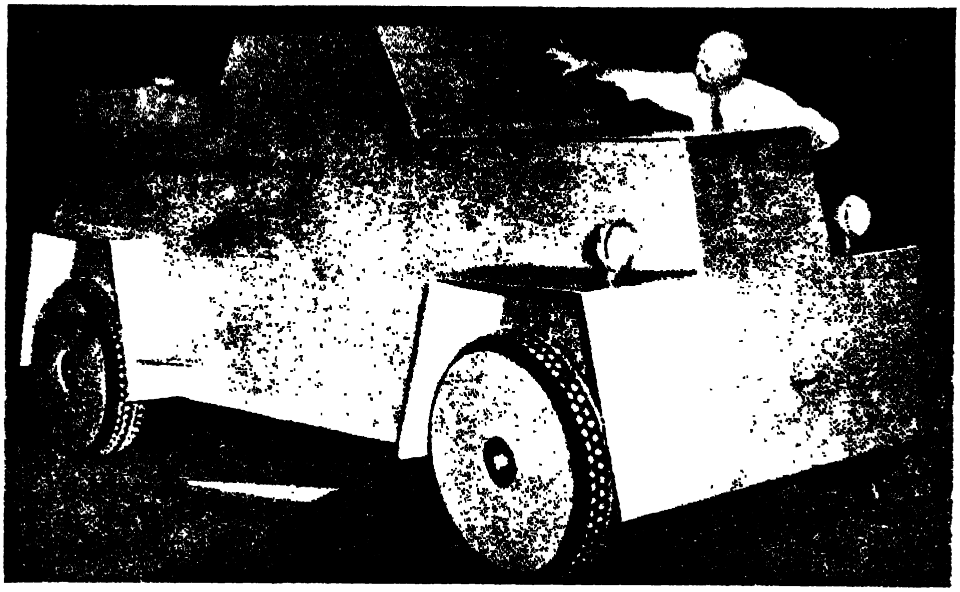


রবার-টায়ার রোলার

খোয়া-নুড়ি চূর্ণ হইয়া পথের গায়ে বসিয়া পথকে সমতল-মসৃণ করিয়া তোলে; বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য কাজও বেশ দ্রুতভাবে সমাধা হয়।

গুলী-রোধক অস্ত্র-যান

মার্কিন মুল্লুক যুদ্ধে যোগ না দিলেও এ যুগের সময়োপযোগী আয়োজন-সাধনে তার অধ্যবসায়ের সীমা নাই। সম্প্রতি

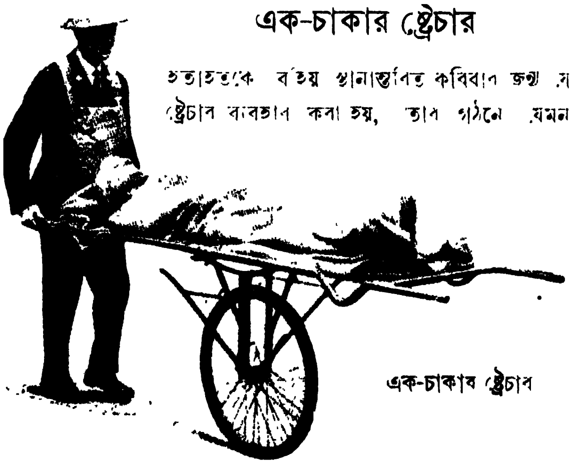


দুর্ভেদ্য গাড়ী

সেখানে যে অস্ত্র-যান (armored car) নির্ম্মিত হইতেছে, তার আপাদমস্তক আধ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের আবরণে ঢাকা। সাধারণ মোটর-গাড়ীর এঞ্জিন ও চাশিস্ এ-গাড়ীতে ফিট্ করা হইতেছে। এ গাড়ীর ইস্পাতের আবরণ এমন মজবুত যে, বন্দুকের গুলী বা কামানের গোলা তার দেহে সূচাগ্রবেধ্যায় বিঁধিতে পারিবে না! এ গাড়ী যেন দুর্ভেদ্য দুর্গ।

এক-চাকার ষ্ট্রেচার

হতাহতকে বহিয়া স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে ষ্ট্রেচার ব্যবহার করা হয়, তার গঠনে যেমন



এক-চাকার ষ্ট্রেচার

জটিলতা, সে-ষ্ট্রেচার বহিতেও তেমনি তিন-চার জন লোকের প্রয়োজন। কিন্তু এ-যুদ্ধে বহু লোককে যদি এক জন-মাত্র হতাহতের বাহন-স্বরূপ নিযুক্ত রাখা হয়, তাহা হইলে লোকাভাব-বশতঃ অসুবিধার আর অন্ত থাকে না। এ-জন্য এক-চাকার ষ্ট্রেচার তৈয়ারী হইয়াছে। বাইসিক্লের একটি মাত্র চাকার উপর সাধারণ ষ্ট্রেচার ফিট্ করিয়া আম্বুলান্সের কাজ কতখানি স্বচ্ছন্দ ও সহজ হইয়াছে, ছবিতে ষ্ট্রেচারের গড়ন দেখিয়া, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রমিকের স্বস্তি

বিষাক্ত বাষ্প, ধূলা প্রভৃতির মধ্যে নিত্য-ক্ষণ থাকিয়া যে-সব শ্রমিককে কাজ করিতে হয়, শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে বিষ-বাষ্প ও ধূলা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া তাদের স্বাস্থ্যহানি এবং বহু ক্ষেত্রে ফুশফুশ-যন্ত্রে ব্যাধি, যক্ষ্মা,—এমন নানা উপসর্গে অকাল বিয়োগের আশঙ্কা প্রচুর। এ আশঙ্কা মোচন করিয়া তারা যাহাতে নিরুপদ্রবে বিষ-বাষ্প প্রভৃতি উপসর্গাদির মধ্যেও কাজ করিতে পারে, সে-জন্য বিচিত্র নাসাবরণ সৃষ্টি হইয়াছে। চোখে আমরা যেমন চশমা আঁটি, তেমনি ভাবে এই নাসাবরণ নাকে আঁটিয়া কাজ করিলে



নাকে ঠুলি

নিশ্বাসের সঙ্গে বিষ-বাষ্প বা ধূলি প্রভৃতি ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এ নাসাবরণে ভাল্‌ভ্‌ আঁটা আছে। ভাল্‌ভ্‌টি এমন কৌশলে বিরচিত যে, নিশ্বাস-বায়ু-গ্রহণের সময় বাতাস হইতে বিষ-আবর্জ্জনাদি এ ভাল্‌ভ্‌ ছাঁকিয়া বাহিরে নিষ্কাশিত করে এবং বিশুদ্ধ বাতাসটুকু মাত্র দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়।

নাসায় আটকাইয়া রাখিবার জন্য ইলাষ্টিকের ব্যবস্থা আছে; দু' কানে সে ইলাষ্টিক গুঁজিয়া এ আবরণ নাসায় সংলগ্ন করা যায়।

টায়ারের পরমায়ু

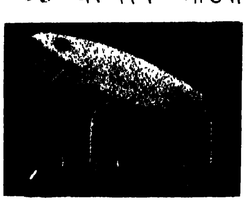
লরি বা মোটর-ট্রাকের এক-একখানি মোটা টায়ারের দাম বড় সামান্য নয়! এ টায়ার ফাঁশিলে লরির মালিকের বিপত্তির আর অন্ত থাকে না! সম্প্রতি এই মোটা টায়ারের রক্ষা-কল্পে লোহার-তারে-বোনা বেল্ট বা চেন্ নির্ম্মিত হইতেছে। মাকড়শার জালের প্যাটার্ণে এ বেল্ট রচিত হইতেছে। টায়ারের গায়ে এই বেল্ট জড়াইয়া দিলে গাড়ীর গতিতে কোন অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে না, অথচ টায়ারের দেহও কাঁটা-খোঁচা-জখমের দায়ে পরিত্রাণ পাইয়া দীর্ঘজীবী হইবে। যে লরির শক্তি ৬০ অশ্ব-শক্তির (horse-power) সমতুল, সে লরির টায়ারে এই বেল্ট আটকাইয়া দিন; দিয়া লরিতে ১৬২৫ মণ ভার চাপাইয়া লরি চালান, লরির টায়ার এতটুকু জখম হইবে না!



টায়ারের চেন্

ফাৎনার জৌলুশ

ছিপ ফেলিয়া রাত্রে মাছ ধরিবার জন্য এক-রকম দীপ্তিমান্ ফাৎনা তৈয়ারী হইয়াছে। ছিপের সুতায় এ-ফাৎনা আটকাইয়া দিনের সূর্য্য-কিরণে কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখিলে কিম্বা গ্যাস-লাইটের স্পর্শ লাগিলে এ-ফাৎনা পাঁচ-সাত ঘণ্টা কাল জ্বলিবে। এ-ফাৎনা জলে দেখিলে আলোর রশ্মিতে ভুলিয়া মাছ আসিয়া ছিপে ধরা দিবে। সুতরাং যাঁরা রাত্রে মাছ ধরিতে চান, এ ফাৎনা তাঁদের সহায়!



ফাৎনার আলো

শব্দভেদী রকেট-বোমা

মার্কিন বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জে, আর, ফিশ এই যুদ্ধের বিভীষিকার দিনে এক-রকম ক্ষুদ্রকায় রকেট-প্লেন তৈয়ারী করিয়াছেন! এ প্লেন ঘণ্টায় ৯০০ মাইল বেগে চলে। এ রকেট-প্লেন এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, নীচে হইতে ঊর্দ্ধে চালনা করিলে এ রকেট বিমান-পথে বিপক্ষের প্লেন লক্ষ্য করিয়া তার অঙ্গে সবলে গিয়া আঘাত করিবে। আঘাত-মাত্র রকেটটি ফাটিয়া বিপক্ষ-প্লেনকে দগ্ধ ও ভস্ম করিয়া দিবে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের সমর-বিভাগ কর্তৃক এ রকেটের শক্তির পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল; পরীক্ষায় রকেট সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছে! অতএব আশা করা যায়, বিপক্ষের বিমান-পথে আক্রমণ এ রকেটে রুদ্ধ হইবে!



শব্দভেদী রকেট

শূন্যমার্গে নিরাপদ বিচরণ

বহু-ঊর্দ্ধে শূন্যমার্গে প্লেনে বিচরণ করা বাতাসের চাপে দারুণ গোলযোগ বশতঃ স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ নহে। সম্প্রতি এই অস্বাচ্ছন্দ্য মোচন করিয়া শূন্যমার্গে বিচরণকে নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য আমেরিকার মিয়ামি-নিবাসী বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসক ডক্টর রাল্‌ফ গ্রীন্ খেলার বেলুনের ছাঁদে এক-রকম বেলুন তৈয়ারী করিয়াছেন। এ-বেলুনের এক প্রান্তে একটি বোঁটা বা নিপ্‌ল্ আছে! বেলুনটিকে বাঁধিয়া প্লেনে বসিয়া শূন্যমার্গে চলুন—যত ঊর্দ্ধে উঠিতে চান, উঠুন। অত্যূর্দ্ধলোকে বাতাসের ঘনতা-হেতু নিশ্বাস-গ্রহণে অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবামাত্র বেলুনের বোঁটাসুদ্ধ নিপ্‌ল্‌টুকু এক-নাসারন্ধ্রে লাগাইয়া আঙুলে টিপিয়া অপর নাসারন্ধ্র বন্ধ করিবেন, তার পর এক-নাকে শ্বাস-বায়ু ছাড়িয়া বেলুনটিকে ফাঁপাইবা মাত্র বেলুনটি পূর্ণভাবে কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিবে। তখন বেলুনটিকে দু' হাতে চাপিয়া মুখ-বিবরে প্রবিষ্ট করান; সে নিশ্বাস-বায়ুতে



শূন্যে বাতাস লওয়া

বেলুন ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, সেই বায়ু তখন মুখমধ্যে নির্গত হইবে; এবং বাতাস পাওয়ার ফলে শ্বাসকষ্ট-জনিত অস্বাচ্ছন্দ্য সত্বর ঘুচিয়া যাইবে।

অক্ষয় এনামেল

নূতন এক রকম এনামেল-পেইণ্ট তৈয়ারী হইয়াছে। টেবিল, চেয়ার, খাট প্রভৃতি ইহাতে পেইণ্ট করিলে তাহাতে মরচে ধরিবে



এনামেল-পেইণ্ট

না, বা কাঠ আগুনে পুড়িবে না। এ পেইণ্টে চেয়ার-টেবিলের পালিশ দীর্ঘকাল অমলিন থাকিবে। এ এনামেল পেইণ্ট—নানা বর্ণের পাওয়া যায়। এক-কোট দিলেই কাজ চলে। আনাড়ি-হাতেও এ পেইণ্টের কাজে টেবিল-চেয়ারের গায়ে ব্রাশের দাগ পড়ে না, এইটুকু এ-পেইণ্টের বৈশিষ্ট্য।

বাসি রুটির শাঁস

ফেল্টের হ্যাট, বেল্ট প্রভৃতি যদি ময়লা কদর্য্য হয়, তাহা হইলে



সেই হ্যাট ও বেল্টের গায়ে রুটির শাঁস ঘষিয়া লইবেন; ফেল্টের তাজা রঙ ফিরিয়া আসিবে।

জুতার র্যাক্

পথ হইতে গৃহে ফিরিয়া পায়ের জুতা-জোড়া কোথায় রাখি, ইহা এক মস্ত সমস্যা! পথের ধূলা-আবর্জ্জনা ঘরে না ছড়ায়—তা ছাড়া জুতা রাখিয়া ঘরের অনেকখানি জায়গা পাছে জুড়িয়া বসি, বলুন তো, কতখানি জায়গা জুতার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারেন? পাশের ছবির মতো যদি র্যাক্ তৈয়ারী করিয়া লন, তাহা হইলে এ সমস্যার নিরাকরণ হয়। র্যাকটি কোনো দ্বারের পাশে



জুতা রাখা

খাটানো চলে। এ-র্যাকে যদি কতকগুলি লোহার ক্লিপ্ লাগাইয়া লন, তাহা হইলে এক জোড়া কেন, অনেক জোড়া জুতা রাখিতে পারিবেন—ঘরের জায়গা জোড়া থাকিবে না!

গরম-জলের বোতল

রবারের তৈয়ারী গরম-জলের বোতল বড় শীঘ্র ফাটিয়া যায়—ফাটিয়া গেলেই আমরা তাহা ফেলিয়া দিই। কিন্তু এ অপচয় আর

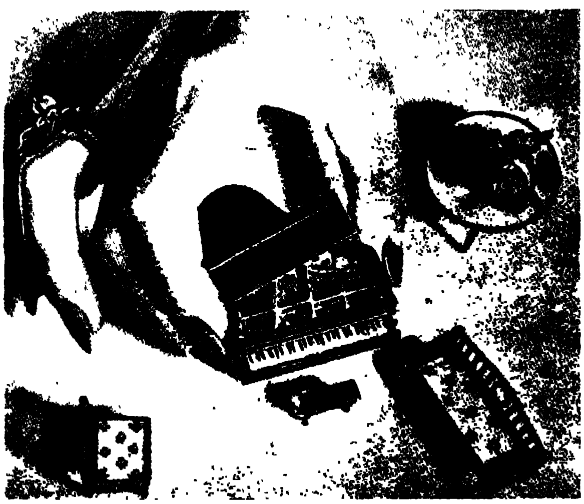


বোতলে গরম বালি

করিবেন না। ফাটা বোতলের মধ্যে তপ্ত লবণ বা বালি পূরিয়া সে বোতল দিয়া সেঁক দিবার কাজ চলিবে চমৎকার।

পকেট-সাইজ পিয়ানো

যাকে বলে গ্রাণ্ড পিয়ানো—যে পিয়ানো ঘরে রাখিতে হইলে



পকেট-পিয়ানো

ঘরের মধ্যে অনেকখানি জায়গা দরকার—সেই গ্রাণ্ড পিয়ানোর পকেট-সংস্করণ বাহির হইয়াছে! এ-পিয়ানো আকারে এত ছোট যে, মুড়িয়া পকেটে রাখা চলে। পিয়ানোটিতে আছে গজদন্ত-নির্মিত 'কী' বা চাবি; এবং ছোট একটি কাঠির আঘাতে এ পিয়ানো বাজানো যায়। সুর যা ওঠে, তাহা খেলা-ঘরের পিয়ানোর ধ্বনির মতো নয়; আসল-পিয়ানোর সুর-ঝঙ্কারের মতোই এ-পিয়ানোর সুর-ঝঙ্কার! সান্‌ফ্রানসিশকোর প্রদর্শনীতে সম্প্রতি এ-পিয়ানো দেখানো হইয়াছে।

ফুল-বাহার

মোটর-গাড়ীর হেড-লাইট—তার লেন্স এবং রিফ্লেক্টর খুলিয়া লইয়া লেন্সের দিকে তিনটা বিঁধ করিয়া সেই বিঁধের মধ্য দিয়া



হেড-লাইটে ফুলের টব

লোহার তার চালাইয়া লাইটের খোলের মধ্যে মাটী পূরিয়া সেই মাটাতে মর্শুমী-ফুলের বীজ বা চারা পুঁতিয়া জলসেকে লালন করুন, গাছে ফুল ফুটিলে ঘরের বাহার খুলিবে।

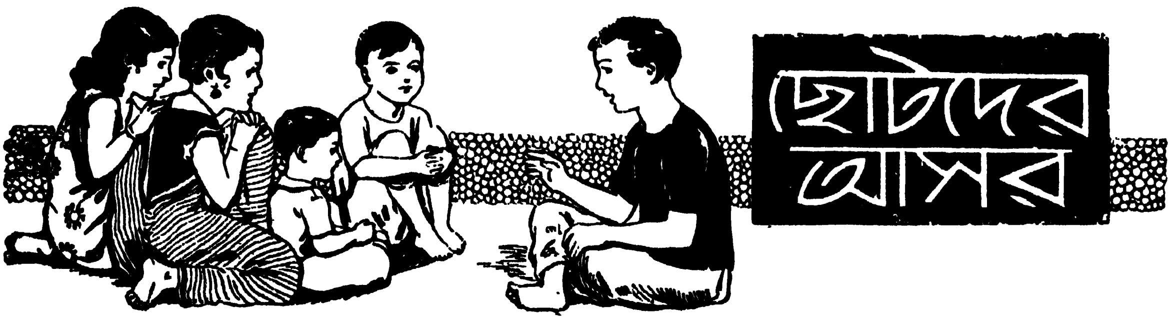
নব-রূপিণী

বাজাও তোমার হাতের বীণা, কণ্ঠ আজি মুখর করো
রক্তযুগের গানটি গেয়ে এসো যদি আস্‌তে পারো!

সৃষ্টি করো নূতন কবি,
দেখাও তোমার নূতন ছবি—
হোক্ না নূতন মন্ত্রে আজি স্তোত্র তোমার নূতনতর!

নাও মা তুলে খড়্গখানি
লজ্জা কি গো! বীণাপাণি—
চরণ তোলো রক্তজবায়, পদ্মাসন বারেক ছাড়ো!

শ্রীচরণদাস ঘোষ



শিশুর খেলার সাথী ডিংও

(হিংস্র পশুর শিশুপ্রীতি)

তোমরা অনেকেই, বোধ হয়, ডিংওর নাম শুনেছ। এগুলো দেখ্‌তে খুব বড় বুনো কুকুরের মতো। এদের দাঁত যেমন বড়, তেমনি ধারালো। নেকড়ে বাঘের চেহারার সঙ্গে ডিংওর চেহারার অনেকটা মিল আছে; আর এদের স্বভাবও ঠিক নেকড়ে বাঘের স্বভাবের মত, ভয়ানক হিংস্রুটে। আফ্রিকায় ও আমেরিকায় এক রকম বাদুড় আছে, তারা বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত পান করে; চামচিকের সঙ্গে তাদের চেহারার যেমন কোন তফাৎ নেই, সেই রকম কোন কোন জাতের কুকুরের চেহারার সঙ্গে ডিংওর চেহারার বিশেষ কোন তফাৎ দেখা যায় না; কিন্তু স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। ডিংও-গুলোকে কেবল অষ্ট্রেলিয়াতেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাদের অত্যাচার এতই বেশী যে, অষ্ট্রেলিয়ার সরকার কিছু দিন পূর্ব্বে ঘোষণা করেছিলেন, ডিংও শিকার ক'রে তার মাথা আনতে পারলে সরকার শিকারীকে পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন। ডিংওগুলো গৃহস্থের ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগীর পাল ধ্বংস করে। ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে চুরি ক'রে জঙ্গলে নিয়ে যায়। এতেই বুঝতে পারচো, ডিংও অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের কি রকম ভয়ানক শত্রু! বিড়ালকে তোমরা বল 'বাঘের মাসী', সেই রকম ডিংওগুলোকে নেকড়ে বাঘের 'মামাতো ভাই' বলা যেতে পারে।

এই রকম ভয়ানক হিংস্রুটে জানোয়ার ডিংওর একটি শিশুর প্রতি ভালবাসার যে গল্প আজ তোমাদের বলছি, তা' শুনে আশা করি, তোমরা খুসী হবে, এবং খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার ব'লেই তোমাদের মনে হবে। আমি যা বলছি—তার একটি কথাও মিথ্যা নয়; কিন্তু এমনই অদ্ভুত যে, সত্য ব'লে বিশ্বাস করাও কঠিন! এক জন অষ্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক নিজের চোখে দেখে অল্প দিন পূর্ব্বে এই ঘটনার কথা লিখেছেন। একটা বাঘিনী মেদিনীপুর অঞ্চলের একটি ছোট ছেলে ধ'রে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাকে নিজের শাবক-গুলোর সঙ্গে প্রতিপালন করেছিল, ছেলেটি পরে শিকারীদের হাতে ধরা পড়ে—এ গল্প তোমরা অনেকেই শুনেছ; শিশুর প্রতি এই ডিংওটার স্নেহও অনেকটা সেই রকম।

অষ্ট্রেলিয়ার একটা প্রদেশের নাম কুইন্সল্যাণ্ড। কুইন্সল্যাণ্ডের বিভিন্ন অংশে খুব বড় বড় অরণ্য আছে। এই সকল অরণ্যের একটির নাম লিটল-বাম্বা ক্রীকের অরণ্য। এই অরণ্যের এক ধারে মিষ্টার প্রেন্টিস্ নামক ভদ্রলোকের বাড়ী। মিষ্টার প্রেন্টিস্ একটা সাঁকো নির্ম্মাণের ভার নিয়েছিলেন; এই কাজের জন্ত তাঁকে সেই অরণ্যে ঘুরে অনেক দূর বন থেকে মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি কাটিয়ে আন্‌তে হচ্ছিল।

কয়েক মাস পূর্ব্বে এক দিন মিষ্টার প্রেন্টিস্ কাঠ সংগ্রহ ক'রতে লোকজন নিয়ে কয়েক মাইল দূরে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি শ্রান্ত দেহে বাড়ী ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে খাবার চাবেন, এজন্য তাঁর স্ত্রী বিবি-প্রেন্টিস্ উনানে তাওয়া চাপিয়ে পিঠে তৈয়ারী ক'রছিলেন; আর তাঁর চার বছরের ছেলে কেভিন্ তার ছোট ট্রাইসাইকেলখানা নিয়ে ঘরের বাইরে একা খেলা ক'রছিল। নিকটে অন্য কোন লোকের বাড়ী ছিল না; কেভিনের খেলারও কোন সঙ্গীও ছিল না।

তখন আর বেশী বেলা ছিল না। কেভিন জানতো, তার মা উনানের কাছে ব'সে পিঠে ভাজছেন; এজন্য সে খেলা ছেড়ে তার মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো, "মা, মা, খুব ভাল একটা মস্ত-বড়ো কুকুর দেখলাম, সেই কুকুরটার সঙ্গে খেলা ক'রতে আমার ভারী ইচ্ছে হ'য়েছে। তার সঙ্গে খেলা ক'রব? কি বল তুমি?"

মিসেস্ প্রেন্টিস্ জান্‌তেন—তাঁর বাড়ীর কাছে কি, সেই অঞ্চলে একটিও কুকুর ছিল না; তবে কুকুর কোথা থেকে এলো? তিনি তাওয়ায় খুন্তি না'ড়তে না'ড়তে অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "কুকুর? কুকুর কোথায় দেখ্‌লি রে, পাগ্‌লা? আমাদের এ-গাঁয়ে তো কুকুর নেই!"

কেভিন্ মাথা নেড়ে হেসে বললো, "হ্যাঁ মা, আমি সত্যি বলছি, খাসা কুকুর,—মস্ত বড়ো। তুমি উঠে একবার বাইরে এসো, তা হ'লেই দেখ্‌তে পাবে।"

ছেলের কথা শুনে মায়ের বড় কৌতূহল হ'ল,—তাই ত, কুকুর কোথা থেকে এলো? তিনি উনানের কাছ-থেকে উঠে প'ড়লেন; কেভিন তাঁর হাত ধ'রে তাঁকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে চল্‌লো। তার মুখে হাসি; মনে যেমন আনন্দ, তেমনি উৎসাহ! এত দিন পরে তার খেলার একটা সঙ্গী জুটেছে!

মিষ্টার প্রেন্টিসের ঘরের বাইরে নিবিড় অরণ্য। কেভিনের মা দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন; কিন্তু চার দিকে তাকিয়ে কোনও দিকে কুকুর দেখ্‌তে পেলেন না। তিনি ভাবলেন—কেভিন তাঁর সঙ্গে চালাকি ক'রেছে! তিনি বললেন, "কৈ রে কেভ্‌, কুকুর কোথায়? দুষ্ট ছেলে, সব তোর নষ্টামী!"

'কুকুরটা' খানিক আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে তাকে দেখতে না পেয়ে, এবং মা তার কথা বিশ্বাস করেন-নি বুঝে কেভিনের মনে দুঃখ হ'ল। সে চার দিকে চাইতে-চাইতে শেষে একটা ঝোপের দিকে চেয়েই উৎসাহভরে ব'লে উঠলো, "ঐ দেখ মা! ঐ বাটল গাছটার নীচে চেয়ে দেখ, ওটা—কুকুর নয়?"

কেভিনের মা ঝোপের ধারে সেই বাটল গাছের দিকে তাকিয়েই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন! কি সর্ব্বনাশ, ওটা কি কুকুর? ওটা যে প্রকাণ্ড ডিংও! ডিংওটা তাঁর ঘরের দরজা থেকে ত্রিশ-চল্লিশ হাত

দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ-দুটো তার আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছিল। কেভিনের মায়ের চীৎকার শুনে ডিংগুটা না পালিয়ে, ধাবালো দাঁত-গুলো বের-ক'রে 'খ্যাৎ-খ্যাৎ' শব্দে ভয় দেখাতে লাগলো। কি বিকট চেহারা!

কেভিনের মা সহরে মেয়ে; অল্প দিন আগে এই জঙ্গলে স্বামীর কাছে এসেছিলেন। তিনি আগে কোন দিন জ্যান্ত ডিংগু দেখেন-নি; কিন্তু এগুলো কি রকম হিংস্সুটে ও অত্যাচারী জানোয়ার—সে খবর তাঁর জানা ছিল। কেভিন সব সময় ঘরের বাইরে জঙ্গলের ধারে খেলা করে, ডিংগুটা হঠাৎ তাকে মুখে ক'রে যদি জঙ্গলে ঢোকে, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ! দুশ্চিন্তায়, ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তিনি তাঁর শোবার ঘরে প্রবেশ করলেন। সেই ঘরের এক কোণে তাঁর স্বামী টোটা-ভরা রাইফেলটা রেখে গিয়েছিলেন। কেভের মা খপ্‌ ক'রে সেটা তুলে নিলেন, এবং দরজার বাইরে ফিরে এসেই ডিংগুটাকে লক্ষ্য ক'রে 'দুড়ুম্' শব্দে আওয়াজ ক'রলেন। কিন্তু ডিংগুটাকে নিশানা ক'রবার সময় তাঁর হাত কাঁপছিল, আর তাঁর শিকারের অভ্যাসও ছিল না। গুলীটা ডিংগুর শরীরের পাশ দিয়ে চলে গেল; ডিংগুটাও তৎক্ষণাৎ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ ক'রে অদৃশ্য হ'ল।

কেভিনের মা উনানের ওপর তাওয়ায় পিঠে চাপিয়ে রেখে এসে-ছিলেন; তিনি তাওয়াখান উনান থেকে না নামিয়েই, তাড়াতাড়ি ডিংগু শিকার করতে আসায় পিঠে পুড়ে দুর্গন্ধ বেরুলো! তখন তিনি তাড়াতাড়ি উনানের কাছে ফিরে-গিয়ে দেখ্‌লেন—সেগুলো পুড়ে অখাদ্য হ'য়েছে! এ-দিকে তাঁর স্বামীর বাড়ী-ফিরবার সময় হ'য়ে এসেছে; বাড়ী ফিরেই তিনি খাবার দিতে ব'লবেন। কাজেই কেভিনের মা ব্যস্ত হ'য়ে নূতন ক'রে পিঠে ভাজতে বস্‌লেন। কেভিনের বা সেই ডিংগুটার কথা তিনি ভুলেই গেলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁর হাতের কাজ শেষ হ'লে তিনি পিঠেগুলি খোরায় তুলে ঢেকে রাখলেন। তাঁর মনে হ'ল, কেভিন পিঠে ভালবাসে, এতক্ষণেও সে খেলা ছেড়ে তাঁর কাছে পিঠে খেতে এল না কেন? অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হ'য়ে আস্‌ছিল। কেভিনের মা তার নাম ধ'রে ডাক্‌তে ডাক্‌তে বাইরের দিকে এলেন।

বাইরে এসেও তিনি কেভিনকে কয়েক বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন, কিন্তু তার সাড়া পেলেন না; কোন দিকে তাকে দেখ্‌তেও পেলেন না। দেখ্‌লেন, তার ট্রাই-সিকলখানা বনের ধারে কাত হ'য়ে প'ড়ে আছে, কিন্তু কেভিন কোথায়?

কেভিনকে না দেখে তার মা ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন; তার পর সন্ধ্যার আঁধারে বনের দিকে তাকাতেই, সেই প্রকাণ্ড ডিংগুটার দাঁত বের-ক'রে মুখ-ভ্যাংচানো তাঁর মনে প'ড়লো—তবে কি নেকড়ের মতো দুর্দ্দান্ত সেই ডিংগুটাই তাঁর চার বৎসরের ছেলেটিকে মুখে-তুলে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে—তিনি আর ভাব্‌তে পারলেন না, ভয়ে তিনি থর থর করে কাঁপ্‌তে লাগলেন।

"কেভ, বাবা কেভিন রে, তুই কোথায়?"—তিনি চিৎকার ক'রে তাকে ডাকতে-ডাকতে চার দিকে ছুটাছুটি ক'রতে লাগ্‌লেন। তখন পাগলের মতো তাঁর অবস্থা! তাঁর বাড়ীর অল্প দূরেই হাজার হাজার বিঘে জুড়ে নিবিড় অরণ্য; তার পর দুর্গম পাহাড়, পাহাড়ের বুকে বড় বড় গুহা; সেখানে পালে-পালে ডিংগু, দাঁতালো বুনো শুয়োর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়ে-সাপ বাস করে! কেভিন সেই দিকে গিয়ে-থাকলে আর কি তাকে পাওয়া যাবে?—এই সকল কথা ভেবে কেভিনের মা সেই বনের ধারে উপুড় হ'য়ে পড়ে, "বাপ রে, সোনা রে, কেভ রে!" ব'লে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে গেল। শেষে তিনি আর সেখানে পড়ে থাক্‌তে না পেরে, কেভিনকে খুঁজতে সেই বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

সেই বনের ভিতর কিছু দূরে এক দল কাঠুরে টোঙ তুলে সেই সকল টোঙে বাস ক'রছিল। তারা ঠিকেদারের জন্যে সেই বনে পাইন কাঠ কাটতো। তারা তখন কাজ শেষ ক'রে টোঙে ফিরে এসে-ছিল। সেই রাত্রিতে পনের মাইল দূরে কেনিলওয়ার্থ সহরে নাচ হবে শুনে তারা তখন সেই নাচ দেখ্‌তে যাচ্ছিল। কেভিনের মাকে তারা চিন্‌তো; তাঁকে তারা পাগলের মতো জঙ্গলের মধ্যে দৌড়িয়ে যেতে দেখে, তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—"কি হ'য়েছে গিন্নি! পাগলের মতো ছুটেছ কোথায়?"—কেভিনের মা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর বিপদের কথা তাদের কাছে প্রকাশ ক'রলেন। সেই সময় আরও কয়েক জন কাঠুরে সেইখানে এসে প'ড়লো। তারা কেভিনের মায়ের দুঃখ দেখে স্থির থাকতে পারলো না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা দল-বেঁধে কেভিনের সন্ধানে জঙ্গলে প্রবেশ করলো। কিন্তু অন্ধকার তখন গাঢ় হয়েছিল; কাঠুরের দল সেই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত কেভিনকে খুঁজে দেখলো, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মিল্‌লো না। অন্ধকারে তারা নিবিড় অরণ্যে পথ দেখ্‌তে না পেয়ে খানিক পরে তাদের টোঙে ফিরে এলো। কেভিনকে পাওয়া গেল না শুনে তার মায়ের মনের অবস্থা কি রকম হ'ল, তা তোমরা বুঝতেই পারছো, অন্যে তা প্রকাশ করতে পারে না।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি। প্রকৃতি দেবী সেই বিশাল অরণ্যে যেন আলকাতরা ঢেলে দিয়েছিলেন; কোন দিকে দৃষ্টি চলে না। কাজেই সেই রাত্রিতে কেভিনকে বনের ভিতর আবার খুঁজতে যাওয়া অসাধ্য হ'ল।

কেভিনের বাবা মিষ্টার প্রেন্টিস সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে এলেন। কেভিনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়-নি শুনে, তিনি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন বটে, কিন্তু তাঁর বুকের ভিতর কি তুফান আরম্ভ হ'ল, অন্য কোনও লোক তা বুঝতে পারলো না। কেভিনের মা তাঁকে দেখে, "ওগো, আমার কেভি কোথায়? তাকে এনে দাও, আমার প্রাণ বাঁচাও"—ব'লে মাটিতে প'ড়ে কাঁদতে লাগলেন; তার পর হঠাৎ উঠে, "কেভি, বাপ, তুই কোথায় গেলি!" ব'লে সেই অন্ধকারে বনের ভিতর ছুটে চললেন।

সেখানে কাঠুরেদের যে-সব টোঙ্ ছিল, সেই সব টোঙের কাছে কাঠের আগুন জ্বেলে আলো করা হ'ল। অগ্নিকুণ্ডের কাছে প্রায় কুড়ি জন লোক ব'সে, কেভিনকে কোথায় খুঁজতে যাবে—তারই পরামর্শ করতে লাগলো। তারা সকলেই শুনলো—মিষ্টার প্রেন্টিসের ঘরের কাছে একটা প্রকাণ্ড ডিংগু দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছিল। খবরটা শুনে সকলেরই মনে হ'ল—সেই ডিংগুটাই কেভিনকে বনের মধ্যে টেনে নিয়ে-গিয়ে খেয়ে ফেলেছে, আর তাকে পাওয়া যাবে না; হয় ত তার দুই-একখানা হাড় ও গায়ের কাপড় কোথাও পড়ে থাক্‌তে পারে। কিন্তু তারা তাদের মনের ভাব কেভিনের মা-বাপের কাছে প্রকাশ করলো না; তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে ব'লেই তাঁদের আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলো।

সকলেই পরামর্শ ক'রে স্থির করলো—রাত্রিশেষে পূর্ব্ব-আকাশ আলোকিত হ'তেই তারা জঙ্গলের মধ্যে কেভিনকে খুঁজতে যাবে। সেই রাত্রেই কোনবারা সহরে তু'জন লোককে পাঠিয়ে ব'লে দেওয়া হ'ল, তারা আরও লোক জোগাড় ক'রে আন্বে; আর পুলিশের সার্জ্জেন্ট বার্ণস্‌কে ও এক জন কালা আদমীকে জঙ্গলের ভিতর পথ দেখাবার জন্য ডেকে আন্বে। বনের ভিতর যারা হারিয়ে যায়—তাদের খুঁজে বের করতে এই সব কালা আদমীর মত দক্ষ লোক পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

কাঠুরেদের টোঙগুলার বাইরে অগ্নিকুণ্ডে যে আগুন জ্বলছিল, রাত্রির দারুণ শীতে সেই আগুনের নিকট থেকে উঠে যেতে ঐ সকল লোকের ইচ্ছা হচ্ছিল না; কিন্তু রাত্রি প্রায় তিনটার সময় ভয়ানক জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় লোকগুলা অগ্নিকুণ্ডের চার পাশে আর বসে থাকতে পারলো না; তারা সকলে উঠে টোঙগুলির মধ্যে আশ্রয় নিলো। তার আধ ঘণ্টা পরেই সার্জ্জেন্ট বার্ণস্‌ সেখানে উপস্থিত হ'লেন; তাঁর সঙ্গে এলো এক জন আদিম অধিবাসী, সে সকলকে বনের ভিতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তা'ছাড়া আরও এলো—ত্রিশ জন স্বেচ্ছাসেবক; তারা সকলেই অশ্বারোহী। এই ভাবে সেখানে পঞ্চাশ জন লোক জুটলো। কেভিনের সন্ধানে সেই তুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করবার জন্যে তারা আগ্রহ ভরে প্রভাতের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

অবশেষে পূর্ব্বাকাশ উষালোকে উদ্ভাসিত হ'লে, প্রধান 'খুঁজি' পিটার বল্‌লো,—"আমাদের যাত্রা ক'রবার সময় হ'য়েছে, চল—সকলে বেরিয়ে পড়ি।"

এই কথা শুনে সকলেই অরণ্যে প্রবেশ ক'রলো; তাদের প্রত্যেকের কাছেই এক একটা বন্দুক; কারণ, বনের মধ্যে বিস্তর ডিংও, বুনো শূয়োর প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ঘুরে বেড়ায়; তাদের আক্রমণের ভয় ছিল।

বনের পথে যে সকল পদচিহ্ন ছিল, রাত্রিশেষে প্রবল বেগে বৃষ্টি হওয়ায় সেগুলি ধুয়ে গিয়েছিল। গাছের পাতাগুলি ভিজে ছিল, এবং ঐ সকল পাতা থেকে টুপটাপ করে বৃষ্টির জল ঝরে-প'ড়ছিল; তার ওপর কুয়াশায় চার দিক আচ্ছন্ন হওয়ায় বনের ভিতর দিয়ে চল্‌তে লোকগুলির ভারী অসুবিধা হ'তে লাগলো। আদিম অধিবাসী পিটার সঙ্গীদের পথ দেখিয়ে সকলের আগে আগে চল্‌ছিল, পদচিহ্নগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে-যাওয়ায় কোন্ দিকে যেতে হবে—তা ঠিক করা তার পক্ষে বড় কঠিন হ'ল। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর এক জন লোক কেভিনের টুপিটা দেখ্‌তে পেলো; টুপি একটা বুনো-লতায় বেধে তার মাথা থেকে খুলে প'ড়েছিল। টুপিটা দেখ্‌তে পাওয়ায় সকলেই উৎসাহিত হ'য়ে আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে চল্‌লো। কেভিনের আর কোন চিহ্ন কেউ দেখ্‌তে পেল না বটে, কিন্তু পিটার তার অদ্ভুত শক্তিতে নির্ভর ক'রে সকলকে নিয়ে গভীর হ'তে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ ক'রলো।

সকলে এই ভাবে চল্‌তে চল্‌তে বেলা প্রায় তুপুরের সময় একটা কাঠের গুঁড়ির পাশে চিহ্ন দেখে বুঝ্‌তে পারলো—আগের রাত্রিতে কেভিন সেই যায়গায় শুয়ে বিশ্রাম ক'রেছিল; নরম ভিজে মাটীতে তার দেহের যে চিহ্ন ছিল, সেই চিহ্নের পাশেই অনেকখানি যায়গা জুড়ে কোন-একটা বড় জানোয়ারের দেহের দাগ দেখা গেল। তা দেখে সকলের ধারণা হ'ল—ডিংওটা কেভিনের সঙ্গে এসে তার পাশেই শুয়ে বিশ্রাম ক'রেছিল।

পিটার মাথা নেড়ে বল্‌লো,—"এই বদমায়েস ডিংওটাই ছেলেটাকে এত দূর টেনে-এনেছিল; তার পর তাকে শেষ ক'রেছে বলেই মনে হচ্ছে। আর কি তাকে পাওয়া যাবে?"—এ কথা শুনে সকলেরই বড় তুশ্চিন্তা হ'ল; কিন্তু কেউ কোন কথা বল্‌লো না।

মিষ্টার প্রেন্টিসের বাড়ী থেকে এই স্থানের দূরত্ব তু' মাইলেরও বেশী ছাড়া কম নয়; চার বছরের ছেলে কেভিন সন্ধ্যার অন্ধকারে কি ক'রে এত দূর হেঁটে এসেছিল, কেউ তা বুঝতে পারলো না! ডিংওটা কি তাকে মুখে-ক'রে টেনে এনেছিল? অনেকেরই মনে এই প্রশ্নের উদয় হ'ল, কিন্তু মুখে কেউ তা প্রকাশ করলো না।

এইবার পিটার খুব তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগলো। সার্জ্জেন্ট বার্ণস তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চল্‌লেন। দলের অনেকে বৃত্তের মত গোল হ'য়ে চার দিক থেকে খুঁজতে আরম্ভ করলো। কিন্তু সেই তুর্গম জঙ্গলে তাতে কোন ফল পাওয়া গেল না। স্থানে স্থানে গভীর গর্ত্ত, তা তুর্ভেদ্য লতা পাতায় ঢাকা; তার মধ্যে নিদ্রিত বা পথশ্রান্ত শিশু প'ড়ে আছে কি না, তা জান্‌বার উপায় ছিল না। কিন্তু পিটার নিরুৎসাহ না হ'য়ে খুঁজতে খুঁজতে কতকগুলি পদচিহ্ন দেখ্‌তে পেলো; সেগুলা কেভিনেরই পদচিহ্ন; আর কেভিনের পদচিহ্নগুলির ঠিক পাশেই ডিংওর পদচিহ্ন! কোন কোন স্থানে পশু ও শিশুর পদচিহ্ন এক সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল। তা দেখে পিটারের অনুমান হ'ল—ডিংওটার সাহায্যেই কেভিন রাত্রির অন্ধকারে তত দূরে এসে প'ড়েছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'ল; লোকগুলি ঘুরতে ঘুরতে রাত্রিকালে একটি পার্ব্বত্য নদীর তীরে এসে পড়লো। নদীতীরেই কেভিনের পদচিহ্ন দেখা গেল। পদচিহ্নগুলি নদীর জলের এত নিকটে ছিল যে, কেভিনের জলে ডুবে মারা-যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু পিটার নদীর কিছু দূর পর্য্যন্ত কেভিনের ও ডিংওর পদচিহ্ন দেখে বুঝ্‌তে পারলো—ডিংওটা কেভিনকে জলের কিনারা থেকে নিরাপদ স্থানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

সেই রাত্রিতে গভীর অন্ধকারে আর কোন দিকে কারও যাওয়া সম্ভব হ'ল না; এজন্য এক দল লোক এক স্থানে আগুন জ্বেলে সেই অগ্নিকুণ্ডের আগুনে শরীর গরম করতে লাগলো। যে সকল লোক খুঁজতে খুঁজতে দূরে চ'লে গিয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য বার-বার বন্দুকের আওয়াজ করা হ'ল। সেই আওয়াজ শুনে দূর থেকে তারা অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরে এলো। যারা অন্ধকারে পথ ঠিক ক'রে সেখানে আস্‌তে পারলো না, তারা বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বেলে সেই আগুনের কাছে ব'সেই রাত্রি কাটাতে লাগলো।

রাত্রি প্রায় তুপুরের সময় বড় দলের অগ্নিকুণ্ডের আগুন নিবু-নিবু হ'লে লোকগুলি হঠাৎ একটা ডিংওর গর্জ্জন-ধ্বনি শুনে চমকে উঠলো। সে সাধারণ গর্জ্জন নয়; মনে হ'ল ডিংওটা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্রোধে অধীর হ'য়ে কম্পিত স্বরে গর্জ্জন করছিলো! এই শব্দ শুনে লোকগুলি ভয় পেয়ে, অগ্নিকুণ্ডে আরও কতকগুলা কাঠ চাপিয়ে আগুনের আলো উজ্জ্বল ক'রে তুললো।

মুহূর্ত্ত পরেই ডিংওটা আবার ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠলো! লোকগুলির মনে হ'ল—নদীর অদূরে দাঁড়িয়ে সে গর্জ্জন করছিলো। তারা চার দিকে তাকাতে লাগলো। একটু পরেই তারা একটা

প্রকাণ্ড ডিংওকে পাহাড়ের পাশে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো; অতগুলো লোককে দেখেও সে ভয় পেলো না, যেন সে পাথরের মূর্ত্তি! তার চোখ দুটো জ্বল্-জ্বল্ ক'রছিল।

ডিংওটাকে সেখানে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুড়ি জন লোক এক সঙ্গে বন্দুকে হাত দিল; কিন্তু তারা বন্দুক তুলে নিশানা ক'রবার আগেই হঠাৎ শিশুর বুকফাটা আর্ত্তনাদ শুনতে পেলো। এক বার নয়, দু'-তিন বার সেই আর্ত্তনাদ অনেক দূর থেকে সেই নিস্তব্ধ রাত্রিতে তাদের কর্ণগোচর হ'ল!

শিশুর আর্ত্তনাদ! তবে কি কেভিন সেই নিবিড় অরণ্যের কোথাও প'ড়ে-থেকে প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রছে? সকলের দেহ মুহূর্ত্তে অসাড় হ'য়ে গেল; তাদের হাতের বন্দুক হাতেই থাক্‌লো। শিশুর আর্ত্তনাদ বন্ধ হ'তেই, সেই ডিংওটা পাশের জঙ্গলের মধ্যে



পাহাড়ের পার্শ্বে বৃহৎ ডিংও দাঁড়াইয়া আছে

লাফ দিলে, তার পর সে মহাবেগে দূরে চলে গেল; আর তাকে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না।

লোকগুলি অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে নিস্তব্ধ ভাবে পুতুলের মতো বসে রইল; কারও মুখে একটিও কথা নেই! সেই সময় হঠাৎ কিছু দূরে বন্য জন্তুর ভীষণ কোলাহলে সেই বনভূমি প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। সেই গম্ভীর গর্জ্জন শুনে লোকগুলির মনে হ'ল—দুটো দুর্দ্দান্ত বন্য জন্তু পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ ক'রেছে! সে কি ভীষণ গর্জ্জন, আর বনের ভিতর দাপাদাপি! যেন সমস্ত বন কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সেই যুদ্ধের সময় বুনো শুয়োরের আর ডিংওর গর্জ্জন শুনে সকলেই বুঝতে পারলো—সেই ডিংওটার সঙ্গে একটা বুনো শুয়োরের যুদ্ধ চলছে; তাদের একটা না মরলে যে সেই যুদ্ধের শেষ হবে না, এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ হ'ল। যুদ্ধটা চ'লছিল—বেশী দূরে নয়, মনে হ'ল—সেই স্থান থেকে আধ মাইলের মধ্যেই।

সকলেই ভাব্‌লো, অল্পকাল আগে যে শিশুর আর্ত্তনাদ শুনতে পাওয়া গিয়েছিল, সে যদি কেভিন হয়, তা হ'লে তার ভাগ্যে কি ঘটেছে? সে কি জীবিত আছে?—তারা হতাশ ভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম অরণ্যের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু আর তারা জড়ের মতো ব'সে থাক্‌তে পারলো না। তাদের সকলের হাতেই বন্দুক ছিল, ভয়ের কোন কারণ ছিল না; কিন্তু তাদের সঙ্গে মশাল ছিল না। নিবিড় অন্ধকারে কিরূপে তারা সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যে অগ্রসর হবে? সম্মুখে পাহাড়, জঙ্গল, নদী,—অন্ধকারে তাদের কোন দিকে যাওয়ার উপায় ছিল না।

দীর্ঘকাল সেই ডিংও ও বুনো শুয়োরে যুদ্ধ চললো। নৈশ বায়ুতে তাদের ভীষণ গর্জ্জন প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। তার পর হঠাৎ তাদের যুদ্ধ থেমে গেল; আর কোন শব্দ কেউ শুনতে পেলো না। সকলেরই মনে হ'ল—সেই রাত্রি বুঝি শেষ হবে না! তারা অধীর ভাবে প্রভাতের প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লো।

অবশেষে পূর্ব্বাকাশ আলোকিত হ'তেই সকলে উঠে চলতে আরম্ভ করলো। ডিংওটা যে দিকে গিয়েছিল, এবার সকলে সেই দিকেই চল্‌লো। কিছু কাল পরে তারা সকলে সেই স্থানে উপস্থিত হ'ল—যেখানে বুনো শুয়োরের সঙ্গে ডিংওর যুদ্ধ চলছিল। সেখানে খুব উঁচু পাহাড়ের পাশে দেয়ালের মতো একটা ঝিঁক ছিল; সেই ঝিঁকের নীচে যে সব লতা-গুল্ম ছিল, দুই জানোয়ারের যুদ্ধে তা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গিয়েছিল; তাদের নখের ধারে সেই স্থানের মাটী যেন চষে গিয়েছিল। তাজা রক্তের গন্ধ সেই স্থানের বায়ুস্তরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারা খানিক পরিষ্কার যায়গায় একটা প্রকাণ্ড বুনো শুয়োরের মৃতদেহ দেখ্‌তে পেলো। তার মুখের দু'পাশে দুটো ভয়ঙ্কর দাঁত! শুয়োরটার সর্ব্বাঙ্গ ডিংওর সুতীক্ষ্ণ দাঁত ও নখের আঘাতে বিদীর্ণ হওয়ায় তাকে নিহত হ'তে হ'য়েছিল,—তার দেহের অবস্থা দেখেই সকলে তা বুঝতে পারলো।

এইবার তারা সেই ডিংও ও কেভিনকে চার দিকে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু কোন স্থানেই তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। লোকগুলিকে সেখানে রেখে পিটার কিছু দূরে চ'লে গিয়েছিল; হঠাৎ তার চিৎকার শুনে লোকগুলি দ্রুতবেগে তার নিকট উপস্থিত হলো। পিটার পাষাণ-প্রাচীরের মতো লম্বা একখান পাথরের পাশে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তারা দেখ্‌লো, সেই স্থানে পাহাড়ের একটা গুহার মুখে প্রকাণ্ড একটা ডিংওর মৃতদেহ প'ড়ে র'য়েছে! বুনো শুয়োরের তীক্ষ্ণ দাঁতে ডিংওটার সর্ব্বশরীর বিদীর্ণ; শুয়োরটার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় তার রক্ত-স্রোতে সেই স্থানের মাটী ভিজে গিয়েছিল। ডিংওর শরীর তখনও গরম, যেন কয়েক মিনিট আগেই তার প্রাণ অসহ্য যন্ত্রণায় দেহ ত্যাগ ক'রেছিল। আর ঠিক তার পাশেই একখান চৌকা পাথরের উপর শুয়ে কেভিন ঘুমুচ্ছে! তার দেহের কোথাও আঘাত-চিহ্ন নেই; কেবল তার পোষাক ছিঁড়ে টুকুরো-টুকরো হ'য়ে তার শরীরে ঝুলছিল! ডিংওটা যেন আহত দেহে কেভিনের পাশে প'ড়ে, তার শিশু-বন্ধুকে পাহারা দিতে দিতে প্রভুভক্ত বিশ্বাসী কুকুরের মতো প্রাণত্যাগ ক'রেছে!

পিটার ডিংওর পাশে নিদ্রিত কেভিনের অক্ষত দেহ দেখে গভীর বিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌লো, "আরে, এতো পাজী বদমায়েস ডিংও নয়, এ যে অতি ঠাণ্ডা মেজাজের উপকারী ডিংও!"

যারা কেভিনকে খুঁজতে এসেছিল, এই দীর্ঘকালে তাদের পরিশ্রম অল্প হয়নি, তার উপর সারা দু'রাত্রি অনিদ্রা; কিন্তু

কেভিনকে অক্ষত দেহে জীবিত অবস্থায় পাওয়ায় তাদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রইল না। যারা অন্য দিকে কেভিনকে খুঁজতে গিয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য বন্দুকের আওয়াজ করা হ'ল। তার পর পরিশ্রান্ত ঘুমন্ত কেভিনকে কোলে নিয়ে তারা মিষ্টার প্রেন্টিসের বাড়ীতে ফিরে এলো।

কেভিনের মা তাঁর স্বামীর কোল থেকে কেভিনকে কোলে নিলেন। কেভিন জেগে-উঠে একটু হেসে 'মা' বলে ডাকলো। মা তাকে কোলে নিয়ে অশ্রু বর্ষণ করতে করতে তার মুখে চুমা দিতে লাগলেন। আনন্দে তাঁর মুখে আর কথা ফুট্‌লো না।

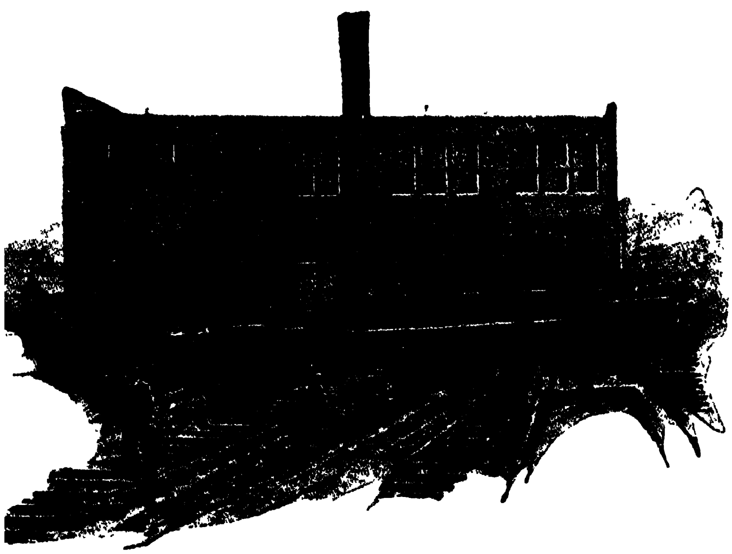
মিষ্টার প্রেন্টিস্ দুই হাত জোড় ক'রে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলেন। পরমেশ্বরই সেই দুর্গম অরণ্যে এত বিপদেও কেভিনের প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলেন; মৃত্যুমুখ হ'তে তাকে রক্ষা ক'রেছিলেন।

প্রেন্টিস্ সুদক্ষ শিকারী। কিন্তু সেই দিন থেকে তিনি আর ডিও শিকার করেন না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বাড়ী চালা!

মাটীর নীচে ভিদ খুঁড়িয়া পাঁচ-তলা সাত-তলা যে-সব বাড়ী তৈয়ারী করা হয়, ইচ্ছা করিলে সেই সব বাড়ী-ঘরকে এক জায়গা হইতে অক্ষত গোটা দেহে অন্য



ইটের তৈয়ারী দোকান-বাড়ী চালাইবার আয়োজন

জায়গায় নাড়িয়া বসানো চলে—এ কথা সম্ভব মনে হয়? কিন্তু চালান্ দেওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য কলিকাতার যাদুঘর বা সেনেট-হলের মতো ইটে-গাঁথা বড় বাড়ীকে ঠাঁই-নাড়া করার কথা বলিতেছি না। ইটে-গাঁথা বাড়ী-ঘর ঠাঁই-নাড়া করা একেবারে অসম্ভবও নয়! তেমন বাড়ীও সমূলে উৎপাটিত করিয়া অক্ষত দেহে ঠাঁই-নাড়া করা হইয়াছে—আমেরিকায়! তবে যে-সব বাড়ী-ঘর গোটা দেহে নাড়া হইতেছে, সেগুলি ষ্টীল বা ইস্পাতের ফ্রেমে সিমেণ্টকনক্রিটের ছাদ ও দেওয়াল দিয়া



বাড়ী তোলা

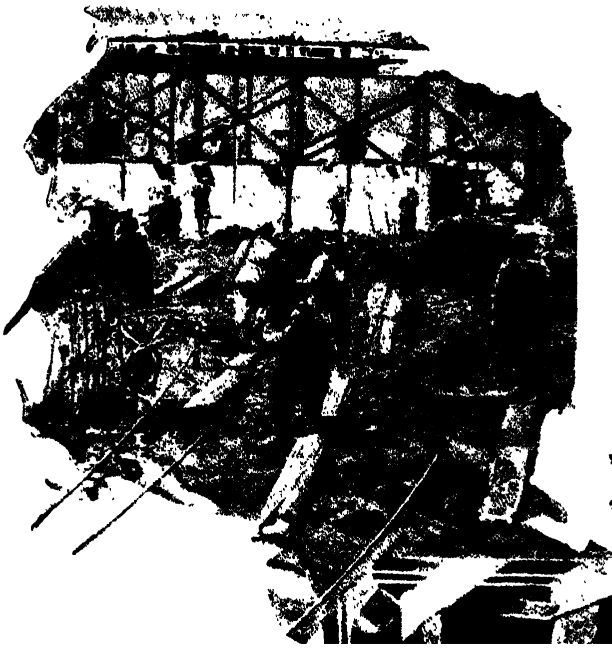
তৈয়ারী; এবং বাক্স-তোরঙ্গের মতোই এই সব বাড়ী-ঘর গাড়ীতে তুলিয়া আমেরিকায় নাড়াচাড়া করা হইতেছে!

আমেরিকার মনট্রিল-সহরের নিপুণ এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ই, ডবলিউ, লাপ্লাণ্ট সাহেব সম্প্রতি গোটা দেহে এই সব বড়-বড় বাড়ী-ঘরকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চালান করিতেছেন। এই চালানী-কাজ নির্ব্বাহের জন্য তিনি যোগ্য যান-বাহনাদিও তৈয়ারী করিয়াছেন। ছোটখাট বাড়ী দূরের কথা, কিছু দিন পূর্ব্বে ৪৮০০ টন ওজনের একখানি প্রকাণ্ড দোকান-বাড়ী তার আস্তানা হইতে তুলিয়া গোটা দেহে সেটিকে তিনি এক-মাইল দূরে অশবোর্ণ নামক গ্রামে পাকা-রকম ভিদে আঁটিয়া বসাইয়া দিয়াছেন!

এ দোকান-বাড়ীতে কামরা ছিল ৫৫২টি। স্বতন্ত্র কামরা; এবং সে-সব কামরায় রকমারি দোকান। এই দোকান-বাড়ী বহিবার পূর্ব্বে প্রথমে তিনি পথ হইতে ৪০০ বড় গাছ কাটিয়া পথটিকে সুগম করিয়া লইয়াছিলেন। দোকান-বাড়ীকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মতো বহিয়া অশবোর্ণ গ্রামে স্থাপনা করিবার পর আবার সেই সব গাছ—যেখানকার গাছ, সেই-খানেই—সঠিক ভাবে এমন কৌশলে পুঁতিয়া দিয়াছেন যে,

কোনো গাছ মারা যায় নাই বা তাদের ফল-ফুল ও পত্র-পল্লবের গায়ে আঁচ লাগে নাই !

ইহার পরে একখানি সাত-তলা বাড়ীকে তিনি



জ্যাকের চাড়া দিয়া বাড়ী তোলা

স্থানান্তরে বসাইয়া দিয়াছেন। আর একখানি বাড়ীকে বড় নৌকায় তুলিয়া নগর ছাড়িয়া তাকে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছেন সমুদ্র-তীরে। এখানি ছিল ১২০ বৎসরের পুরাতন বাড়ী। চালনার দরুণ বাড়ীখানির দেহে কোথাও এতটুকু ফাট ধরে নাই, এইটুকুই সব চেয়ে বাহাদুরির কথা !

এ বাড়ী বহিবার জন্য নৌকাখানিকে অবশ্য মজবুত ও ভার-বহনের উপযোগী করিয়া গড়া হইয়াছিল। নৌকার উপর তিনি ৩৫৯ টন ওজনের মজবুত ষ্টীলের বীম বা কড়ি লাগাইয়াছিলেন। রেলোয়ে-লাইনে যে রেল পাতা হয়, এ কড়ি ছিল সেই রেলের। ইস্পাতের রোলারের সাহায্যে বাড়ীখানিকে উপড়াইয়া গোটা দেহে নৌকার উপরে চাপাইয়া তবে সেটিকে বহন করা হয়।

এই সব বাড়ী-ঘর বহিবার কালে অনেক সময় এমন



ট্রাকে চড়িয়া বাড়ী চলে

ঘটে যে, বাড়ী-ঘরকে পুল পার করাইতে হয়। সে-জন্য পুলকে বেশ মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাপ্লাণ্ট সাহেবের মনোযোগ কোনো দিন যেমন শিথিল হয় নাই, তেমনি এ উদ্যোগ-আয়োজন কোনো দিন ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইতে পারে নাই ! চার হাজার পাচ হাজার টন ওজনের বাড়ী-ঘর এমন স্বচ্ছন্দে বহিয়া তিনি স্থানান্তরিত করিতেছেন, সে-গুলি যেন খেলা-ঘরের বাড়ী !



জ্যাক্

অনেক সময় এমন হইয়াছে, বাড়ী খুব চওড়া এবং সে-জন্য অপরিসরতা-বশতঃ পথে সে-বাড়ী বহা যাইবে না ! এরূপ ক্ষেত্রে তিনি বাড়ীখানির মাঝা-মাঝি কাটিয়া দু' ভাগ করিয়া তারপর দু'বারে সে দু' ভাগ যথাস্থানে পৌছাইয়া আবার দু' টুকরা বাড়ী আঁটিয়া-জুড়িয়া এক করিয়া গোটা বাড়ী বসাইয়া দিয়াছেন !

পূর্ব্বে ৪৮০০ টন ওজনের যে-বাড়ী বহিবার কথা বলিয়াছি, সে বাড়ী উপড়াইয়া তুলিবার জন্য লাপ্লাণ্ট সাহেবকে বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত এক হাজার ইস্পাতের জ্যাক ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

এই সব বাড়ীকে ঠাঁই-নাড়া করিতে বিস্তর সময় লাগিত। তিন-চারি শত ফুট দূরে বাড়ী বহিতে সময় লাগিত প্রায় ন'ঘণ্টা। তবে এ-সব গৃহ এমন নিপুণ ভাবে তিনি বহাইয়াছেন যে, বাড়ীর কোথাও এতটুকু ফাট ধরে



পুলের উপর দিয়া বাড়ী চালা



নৌকাবক্ষে ১২০ বৎসরের পুরাতন গৃহ

নাই! তার উপর এ-সব বাড়ী যে-জায়গায় আনিয়া বসানো হইবে, হয় তো বাড়ী আনিয়া পরে দেখেন, সেখানে বাড়ীখানি দু'ফুট উঁচু করিয়া বসাইতে হইবে—নহিলে পথের সঙ্গে বাড়ীর 'লেভেলে' সমতা রক্ষা পাইবে না! তখন তিনি কি করিলেন, জানো? বাড়ীর নীচে এক হাজার জ্যাক নামাইয়া বিয়াল্লিশ জন জুয়ান লোক লাগাইলেন। এই সব লোক জ্যাকের চাড়া দিয়া বাড়ীর তলদেশ উঁচু করিয়া তুলিল। বাড়ী উঁচু হইয়া রহিল, তখন বাড়ীর নীচেকার জায়গা ভরাট করাইয়া বাড়ীকে ঠিকঠাক আঁটিয়া বসানো হইল।

এই তোলার কাজে সকলকে খুব সতর্ক থাকিতে হয়। সমভাবে সব দিক তোলা চাই—নহিলে কোনো দিক একটু হেলিয়া বা ঝুঁকিয়া পড়িলে বাড়ী-ঘর ফাটিয়া যাইতে পারে কিম্বা অন্য বহু বিপত্তি ঘটিতে পারে।

অনেক সময় বাড়ী বহিবার সময় বাড়ীর ঘরে-ঘরে যে সব আসবাব-পত্র থাকে, সে সব বাহির না করিয়া ঘরে রাখিয়াই বাড়ীর সঙ্গে সে সব ঠাঁই-নাড়া করিয়া বাড়ী বসাইয়াছেন।

একবার তিনি এক সহরের পথ হইতে দশখানি বাড়ী তুলিয়া দেড় মাইল দূরে ভিন্ন গ্রামে এ-বাড়ীগুলিকে গোটা দেহে বসাইয়াছিলেন। যে-গ্রামে এ-বাড়ীগুলি আনা হয়, সে গ্রামের নাম ডেটন। বর্ষার সময় বন্যার জলে ডেটন ডুবিয়া যাইত; তার ফলে বর্ষার পর তিন-চার মাস যাবৎ সমগ্র ডেটন-গ্রামের পথ-ঘাট জলা-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিত। লাপ্লাণ্ট সাহেব তক্তা ও পাইপ প্রভৃতির সাহায্যে গ্রামের পথ-ঘাট উঁচু করিয়া গড়িলেন; পাহাড় কাটিয়া পাথর আনিয়া সেই পাথরে জলা-ভূমিকে কঠিন করিয়া তুলিলেন; তার পর সহরের ঘেঁজি-গলি হইতে দশখানি বাড়ী তুলিয়া এই গ্রামে আনিয়া বসাইলেন।

বাড়ী-ঘর বহিবার জন্য লাপ্লাণ্ট সাহেব এখন ট্রাক্টর-গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন। ট্রাক্টরের সাহায্যে বাড়ী বহিবার কাজ সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতেছে।

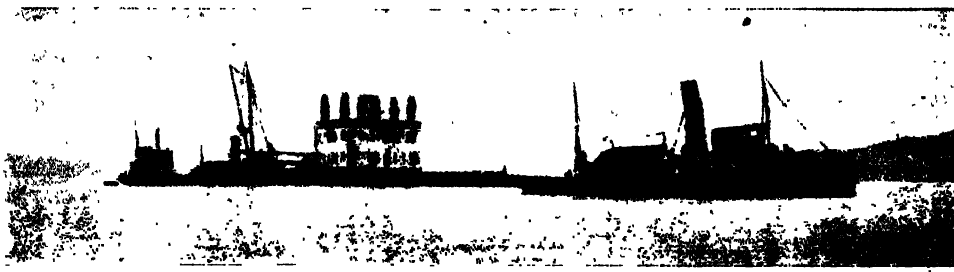
লাপ্লাণ্ট সাহেব লিখিয়াছেন—বাড়ী বহিবার সময় বহু পরিবার আমাকে বলিয়াছেন, আমরা বাড়ীতে থাকিব, আমাদেরও ঐ বাড়ীর সঙ্গে বহিয়া লইয়া যাইতে

পারেন? আমি বলিলাম, পারি। এবং শুধু বাড়ীর লোক-জন কেন, পিয়ানো, টেবিল-চেয়ার, আলমারি, সোফাকৌচ এবং অন্যান্য ভারী আসবাব-পত্র-সমেত গোটা বাড়ী বহিয়া দিয়াছি। বহিবার সময় আলমারি, পিয়ানো, টেবিল প্রভৃতি পাছে গড়াইয়া পড়িয়া যায়, এজন্য বাড়ী বহিবার পূর্ব্বে ঐ সব জিনিষপত্র ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছি। দেওয়ালে ছবি খাটানো থাকিলে শুধু দেখি, কোনো ছবির পেরেক নড়ে কি না! পেরেক শক্ত থাকিলে বাড়ী বহিবার সময় দেওয়ালের ছবি দেওয়ালেই থাকে; খুলিবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের কাজ এখন এমন সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

বাড়ীতে যে গ্যাশ বা জলের পাইপ থাকে, সেগুলির সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। টেলিফোন, ইলেকট্রিক কনেক্‌শন্ সম্বন্ধেও পূর্ব্বাহ্নে ব্যবস্থা করা হয়। বাহিরের সঙ্গে সংযোগ-বন্ধনটুকু মাত্র খুলিয়া লইয়া বাড়ীর তার ও পাইপ যথাযথ ভাবে তিনি প্লাগ করিয়া দেন। বাড়ী বহিবার সময় লাপ্লান্ট সাহেবের নিপুণ কর্ম্মচারীরা সেগুলির তদ্বির করেন। তার ফলে তার বা পাইপ অক্ষত দেহে বাড়ী-ঘরের সঙ্গে চালান হয়।

বহিবার যন্ত্রপাতিও এমন নিখুঁত করিয়াছেন যে, কেহ অর্ডার দিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বড় বড় বাড়ী-ঘর স্থানান্তরিত করিতেছেন।

বাড়ী তুলিবার জন্য তাঁর লোক-জন ভিদের নীচে সরাসরি দু' ফুট গভীর গহ্বর খনন করেন; তার পর লোহার তার বা রড ও জাল দিয়া বাড়ীর আপাদ-মস্তক সুরক্ষিত করিয়া রেল পুলি জ্যাক প্রভৃতির সাহায্যে সে-বাড়ী টানিয়া ট্রাকে তোলা হয়। কত দিনের সুদীর্ঘ চিন্তা এবং উদ্ভাবনী-কৌশলে এই অসম্ভব ব্যাপারকে লাপ্লান্ট সাহেব সম্ভব ও সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন, ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না; সেই সঙ্গে মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের অলৌকিকতা ভাবিয়াও অবাক হইতে হয়!



ষ্টীমার দিয়া বাড়ী-বাহী বোট টানা

নেপোলিয়ন বলিয়া গিয়াছেন, জগতে অসম্ভব বলিয়া কোনো-কিছু নাই বা থাকিতে পারে না—এ-কথা খুব সত্য!

নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

[রূপকথা]

তিন

বয়স বাড়বার সঙ্গে রাজকন্যার নিষ্ঠুরতাও মাত্রা ছাড়িয়ে উঠ্‌লো। তার সেবা-পরিচর্য্যায় সামান্য কিছু খুঁত পেলে দাসীদের কারও পরিত্রাণ নেই; তাদের অতি কঠিন শাস্তি না দিলে—তার মনের জ্বালা নিবারণ হয় না; সে একবিন্দু শান্তি পায় না।

মেয়ের এই রকম গরম মেজাজ দেখে মেয়ের মায়ের মনে কিন্তু আনন্দ ধরে না! আর মেয়ের দাদু—সেই ঘুঘু মন্ত্রীটি তারিপ ক'রে হাততালি দিয়ে বলেন—এই ত চাই, এখন থেকে এমনি বোঝা না হ'লে সিংহাসনে ব'সে এত বড় রাজ্য বশে রেখে শাসন করতে পারবে কেন?

কিন্তু তার এই রকম অত্যাচারে অবিচারে দাসী-বাঁদীরা দিবা-রাত্রি প্রাণভয়ে কাঁপতো—ভাবতো, তাদের কার পিঠে কখন চাবুক পড়ে। তাই এক দিন এরা চাবুক খেয়ে প্রাণভয়ে সকলে দল-বেঁধে রাজকন্যার মায়ের কাছে গিয়ে হাত-জোড় ক'রে বল্লে,—রাণী-মা, আমাদের সকলকে বিদায় দিন, আমরা আর এখানে টিক্‌তে পারছিনে।

রাণী-মার বাপ মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মা কি একটা পরামর্শ করতে এই সময় মেয়ের কাছে আস্‌ছিলেন। ঘরের ভেতর দাসীদের জটলা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—হয়েছে কি? দাসীরা দল-বেঁধে এখানে জুটেছে কেন মা?

কিন্তু রাণী কোন কথা বলবার আগেই দাসীরা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে তাদের কষ্টের কথা, রাজকন্যার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা

বল্তে লাগলো। শুধু মুখে ব'লেই তারা থাম্লো না; তাদের শরীরের নানা স্থানে প্রহারের দাগ দেখিয়ে, পিঠে ছোট-বড় যে সব ক্ষত-চিহ্ন ছিল, পিঠের কাপড় তুলে সে-গুলোও দেখিয়ে দিলে। শেষে তারা হাত-জোড় ক'রে কেঁদে বললে—এত চেষ্টা ক'রেও আমরা যখন রাজকন্যাকে খুসী করতে পারলুম না, যখন-তখন বিনা-দোষে পিটিয়ে আমাদের হাড় গুঁড়ো করাতেই তাঁর আনন্দ, তখন আর কি ক'রে আমরা তাঁর কাজ করব? তাই আমাদের বিদেয় ক'রে দিন,—চাকরী ছেড়ে আমরা পালিয়ে বাঁচি।

কিন্তু দুই উপরওয়ালাকে এদের নালিশে আর রায় দিতে হ'ল না, রায় প্রকাশ করলে—রাজকন্যা নীলাই নিজে এসে। মুখখানা তার রাগে লাল হয়ে উঠেছে, চোখের তারা দুটো আগুনের ভাঁটার মতো! দাসীরা ভয়ে শিউরে উঠে দেখ্লে—চামড়ার লিক্লিকে লম্বা চাবুকটা বাগিয়ে-ধরে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের সেই ক্ষুদে যম! বারো বছরের এই একরত্তি মনিবটিকে হঠাৎ এই ভাবে সেখানে আস্তে দেখে ভয়ে তারা সবাই একবারে আড়ষ্ট! কিন্তু রাজকন্যার হাতের চাবুক সপাসপ্ তাদের হাতে, পিঠে, মাথায় প'ড়ে তখনি তাদের নাচিয়ে তুললো। চাবুকটা এমনি ধারালো যে, কারুর দেহে পড়লে সেখানকার এক-পর্দ্দা চামড়া কেটে তোলে! এতগুলি দাসী-বাঁদীকে রাজকন্যা তার সেই চাবুক দিয়ে 'গো-বেড়েন' করলে। একটু আগেই মনের কষ্টে যাদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরেছিল, এখন এই নির্দ্দয় প্রহারে তাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে ফিন্কি দিয়ে রক্তধারা ছুট্তে লাগলো। যাতনায় অস্থির হ'য়ে তারা রাজকন্যার দুই উপরওয়ালার পানে চেয়ে চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু রাণীর বা তাঁর মন্ত্রী বাপের মুখ দিয়ে একটি বারও 'আহা' শব্দ বার হ'ল না,—এই খুনে মেয়েটিকে নিষেধ করা দূরের কথা! বসে-বসে তাঁরা আদরে রাজকন্যার এই নিষ্ঠুর আচরণ দেখতে লাগলেন।

খানিক পরে রাজকন্যা নিজেই থামলো।—ননীর দেহ তার; এক পাল দাসীর দেহে রাগের ভরে চাবুক চালিয়ে নিজেই সে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

দুই অভিভাবক অমনি দাসীদের লক্ষ্য ক'রে চীৎকার ক'রে আদেশ দিলেন—বাতাস কর্ হতভাগীরা, বাতাস কর্, দেখ্ছিস্ না—মেয়েটা কি রকম হাঁপাচ্ছে? চাবুক চালিয়ে ওর পরিশ্রম কি কম হ'য়েছে!—দাসী-বাঁদীরা কি আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? গায়ের জ্বালা ভুলে, চোখের জল আঁচলে মুছতে-মুছতে সকলে রাজকন্যার সেবায় লেগে পড়লো। রাজকন্যা পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে একখানা নরম সোফায় কোমল দেহটি এলিয়ে দিলে; দাসীরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়ে চার-পাঁচটি দাসী তাকে বাতাস করতে লাগলো। অন্য দাসী তার পায়ের কাছে ব'সে পদসেবা করতে লাগলো; আর অন্য সকলে জোড়-হাতে দাঁড়িয়ে রইল—রাজকন্যার শেষ হুকুম শোনবার জন্যে!

রাজকন্যা সামলিয়ে নিয়ে এবার সোফায় সোজা হয়ে বস্লো। সে মুখখানা বেঁকিয়ে বলে-উঠলো—কেমন! আর কখনো আমার নামে দাদুর কাছে লাগাতে আস্বি?—সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের চাবুক সামনের দাসীগুলোর সর্ব্বাঙ্গে আর একবার চুম্বনের জন্যে মাথা নাড়া দিলে; কিন্তু দাসীরা তখনি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত-জোড় ক'রে মাপ চাইলে, রাজকন্যা চাবুকটি নামিয়ে নিল।

এর পর দাসীগুলোকে সে-ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে শ্রীগোপাল শর্ম্মা রাজকন্যার পানে চেয়ে একটু হেসে বললেন—এবার তোমায় একটি দোসর এনে দিচ্ছি দিদি, সেটিও তোমার মত শক্ত, যেন ইস্পাত!

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলে—দোসর কি দাদু?

দাদু বললেন—সাথীকে দোসর বলে। আমি দেখ্ছি, দাসী বাঁদীগুলোর সঙ্গে তোমার ব'নছে না। তাই, তোমার সঙ্গে বেশ বনিবনাও হয়—এমন একটি খাসা ছেলেকে এনে তোমার কাছে হাজির করচি।

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলে—সে কে?

দাদু তার পরিচয় দিলেন,—সে অন্য এক দেশের রাজপুত্র, তার ওপর তাঁর ছাত্র। যেমন তার রূপ, তেমনি গুণও। তাকে দেখলেই বাহবা দিতে হবে।

ছেলেটির কথা শুনে রাজকন্যার মনে কৌতূহল হ'ল; সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—সে কোথায় থাকে?

দাদু বললেন—আমার কাছে; বললুম যে, সে আমার ছাত্র।

রাজকন্যা একটু চুপ ক'রে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলে—কই, এখানে তাকে কোন দিন ত আননি, দাদু?

দাদু বললেন—আনবার ঠিক সময় এখনও হয়নি কি না? এখন থেকে তার আর তোমার শিক্ষা একসঙ্গে চল্বে বলেই তাকে এখানে আন্চি।

একটু উৎসুক হয়েই রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলো—কবে আনছ তাকে?

দাদু উত্তর দিলেন—আসচে সোমবার। ঐ দিনটি তোমার জন্ম-তিথি, সে জন্য রাজ্য জুড়ে উৎসব হবে কি না; সেই শুভ দিনটিতেই তাকে রাজসভায় আনবো, তখন তোমার সঙ্গে তার আলাপ হবে।

রাজকন্যার মুখে হাসি ফুটলো, সে জিজ্ঞাসা ক'রলো—তার নাম কি দাদু?

দাদু হেসে বললেন—নীলাচল। এই নাম শুনে রাজকন্যা মুখখানা গম্ভীর ক'রে বললো অচল মানে ত পাহাড় দাদু! তা হ'লে তার নাম হচ্ছে তো—নীলপাহাড়?

দাদু বললেন—মানে তাই বটে; তবে তোমার নামটির সঙ্গে ওর নামের কিছু মিলও আছে। নামের মত তোমাদের মন আর মেজাজেরও দিব্যি মিল হবে।

রাজকন্যা হেসে বললো—আমি কিন্তু তাকে নীলপাহাড় বলেই ডাকবো, দাদু!

দাদু বললেন,—ডেকো,—সে তাতে খুসীই হবে।

—কিন্তু আমার মনে যে একটা ভারী ধোঁকা লাগ্ছে, দাদু!

—কি রকম ধোঁকা?

—বল্লে, ছেলেটি রাজপুত্তুর; যে রাজপুত্তুর, সে তোমার বাড়ীতে বারো মাস প'ড়ে-থেকে অন্নধ্বংস করে কেন? তার কি বাড়ী-ঘর নেই? আমাদের মতন রাজ্য, রাজসভা, কি রাজসিংহাসন নেই?

—কেন থাকবে না? সবই আছে।

—কোথায়?

—সিংহল দেশের নাম শুনেছ ত দিদি! ছেলেটির বাবা সেই রাজ্যের রাজা! তাঁর ধন-দৌলতেরও সীমা নেই।

—সিংহল ত লঙ্কার নাম। তা হ'লে সে লঙ্কার লোক?

—হাঁ; তার গায়ের রঙটিও ঠিক পাকা লঙ্কার মতো! আর ঝালটুকুও তোমার মতো।

—তবে রাজপুত্তুর এখানে থাকে কেন? তার লজ্জা করে না পরের কাছে প'ড়ে থাকতে?

—আগেই ত বলেছি দিদি, বিদ্যাশিক্ষার জন্যই সে এ দেশে এসেছে। ছেলেটির বাপ ছিলেন তোমার বাবার পরম বন্ধু। আমার উপর তাঁর ভারি বিশ্বাস; তাই তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ ক'রে তুলবার জন্যে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমার যেটুকু বিদ্যা, সব সে শিখে নিয়েছে; এখন তার ইচ্ছা হয়েছে—দেশে যাবার আগে এখানে দিনকতক থেকে তোমার কাছে কিছু শেখে।

চোখ দুটো কপালে তুলে রাজকন্যা বলে-উঠলো—আমার কাছে আবার কি শিখবে? আমি কি গুরুমশায়?

দাদু বললেন—তুমি এই বয়সে কি রকম ভারিক্কি হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে, রাজবাড়ীর সকলকে শাসনে রাখো, দাসী-বাঁদী-গুলোকে কি রকম নায়েস্তা ক'রে রেখেছো—এই সব সে তোমার কাছ থেকে শিখে নেবে। তাকে তার দেশে ফিরে গিয়ে তার বাবার সিংহাসনে এক দিন বসতে হবে কি না?

রাজকন্যা এবার মুখখানা ভার ক'রে বলে উঠলো—তোমার মতলব আমি বুঝেছি দাদু!

—কি বুঝেছ দিদি?

—তোমার চালা রাজপুত্তুর তার সেই বিদ্যে-টিদ্যে সব আমাকেও শিখাতে চাবে। আমি কিন্তু তাকে আমার গুরুমশায়-গিরি করতে দেব না, দাদু!

দাদু হেসে বললেন—রাজপুত্তুরের সাধ্য কি, সে তোমার গুরু-মশায় হয়? তুমিই তাকে শিখাবে।

হাতের চাবুক উঁচিয়ে আর মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে রাজকন্যা বললো—কিন্তু খুঁত পেলেই আমার এই চাবুক তার পিঠে পড়বে সপাসপ,—সপাং—বুঝলে?

দাদু বললেন—চাবুক খাবার ছেলে সে নয়। তোমার মেজাজের সঙ্গে তার মেজাজের এক চুলও এদিক্-ওদিক্ হবে না দিদি! তুমি হাসলে তার মুখে হাসি ফুটবে, তোমার মুখে হাইটুকু উঠলে সে অমনি লুফে নেবে; তোমার চোখের ইসারা - আর ঐ টুকটুকে ঠোঁট-দু'খানা নড়তে দেখলেই সে বুঝে নেবে—তুমি চাও কি। এই শিক্ষাই যে আমি তাকে দিয়েছি এতদিন নিজের কাছে রেখে; নইলে যাকে-তাকে কি তোমার দোসর করতে আনতে পারি?

দাদুর মুখের দিকে আড়-চোখে চেয়ে, আর সেই সঙ্গে মুখের অদ্ভুত রকম ভঙ্গিটি ক'রে রাজকন্যা সে ঘর থেকে চ'লে গেল। শ্রীগোপালশর্ম্মাও অমনি ঘরের দরোজাটি বন্ধ ক'রে মেয়ের সঙ্গে এই সিংহলী ছেলেটির কথাই আলোচনা করতে লাগলেন।—এই মতলবেই তিনি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কি না!

গোড়া থেকে আট-ঘাট বেঁধে কাজ করাই চতুর-চূড়ামণি শ্রীগোপাল শর্ম্মার চিরদিনের অভ্যাস। নিজের মেয়েটির সতীন-কাঁটা ভেঙ্গে দিয়ে, আর দৌহিত্রী নীলাকে সিংহাসনে বসিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন-নি। নীলা বড় হলেই যে তার বিয়ে দিতে হবে, আর তাকে বিয়ে করবার জন্যে অনেক বড় বড় রাজ্যের রাজপুত্ত্ররা ক্ষেপে উঠবে—সে ত তিনি ভালই জানেন। তাই অনেক আগে থেকেই তিনি মাথা খাটিয়ে এই সিংহলী ছেলেটিকে যোগাড় ক'রে এনে মুঠোর ভেতর রেখে চুপি চুপি এমন কায়দায় শিখিয়ে-পড়িয়ে রাজকন্যার মনের মতন ক'রে গড়ে তুলছিলেন —যাতে ছেলেটিকে দেখেই সে খুসী হয়। একবার রাজকন্যার মনে ধরলে, আর মেশা-মিশি করায় দু'জনের ভাব-সাব হ'য়ে গেলে রাজকন্যা যে তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে চাইবে না—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তিনি এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁরই হাতে-গড়া তাঁবেদার ছেলেটির সঙ্গে কোনো রকমে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে ফেলতে পারলেই তাঁকে আর ভবিষ্যতের জন্যে ভাবতে হবে না। রাজকন্যা নীলার বয়স যখন সবে সাত বছর, সেই সময়েই তিনি এই সিংহলী ছেলেটিকে যোগাড় ক'রে তাঁর মতলব হাসিল করবার চেষ্টায় ছিলেন। পাঁচ বছর ধরে ছেলেটিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে গড়ে তুলে, এই দিন প্রথম তাঁর মেয়ে রাণী অঙ্গনা আর রাজকন্যা নীলার কাছে তার মনের কথা প্রকাশ ক'রলেন।

রাজকন্যা জানতে পারলো ছেলেটি সিংহলের রাজপুত্তুর। আর রাজকন্যার অসাক্ষাতে তিনি তাঁর মেয়েকে চুপি-চুপি শুনিয়ে দিলেন—ছেলেটি সিংহলের রাজপুত্ত্র বটে, তবে সিংহলের রাজ-সিংহাসনের অনেকগুলি দাবীদার। সেই সিংহাসন দখল করতে অনেক লড়াই-হাঙ্গামার দরকার হবে। কিন্তু কি দরকার সাগর-পারের মধুপর্কের বাটির মতো একরত্তি সেই রাজ্যটার জন্যে তার অত হাঙ্গামা করবার? নীলাকে বিয়ে ক'রে এই রাজ্যটাই দু'জনে ভোগ করুক না! মাথার ওপরে আমরা থাকবো, তা ছাড়া মেয়েও চোখের আড়ালে যাবে না। এদের ছেলেই পরে রাজা হবে।

নীলার মা রাণী অঙ্গনার কাছে বাপের কথাই বেদবাক্য। তিনি খুসী হ'য়ে বললেন—আপনি ভালো বুঝে যা করছেন, তার ওপর আমার আর কি বলবার থাকতে পারে, বাবা!

এর পরেই শ্রীগোপাল শর্ম্মার কৌশলে কথাটা এই ভাবে প্রচার হ'য়ে গেল যে, সিংহল দেশের এক রাজপুত্ত্র এ রাজ্যে আসছেন। তিনি কিছুকাল এখানে থাকবেন; আর দুই রাজ্যের মধ্যে মিতালীটা যাতে পাকা হয়ে ওঠে—তারই ব্যবস্থা করবেন।

রাজকন্যার জন্মোৎসবের শুভ দিনটিতে বেশ জাঁকজমকেই রাজপুত্ত্র নীলাচল রাজসভায় এলো। সকলেই দেখলে—সতেরো আঠারো বছরের দিব্যি সুশ্রী ছেলেটি, গায়ের রঙ যেন কাঁচা সোনা; আকারে একটু বেঁটে, আর মুখখানা অল্প চ্যাপ্টা হ'লেও ছেলেটির দেহের বাঁধুনি দেখে মনে হয়, বেশ বলবান বটে। চোখ দু'টি তার এমন চমৎকার যে—দেখেই মনে হয়, মুখ দিয়ে কিছু না ব'লে, তার দৃষ্টি দিয়েই মনের কথা সকলকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারে। মাথার চুলগুলি ঘাড় পর্য্যন্ত লতিয়ে পড়েছে, তার সোনালী আভা; মুক্তার ঝালর-দেওয়া সোনালী রঙের রেশমী পাগড়ীটির সঙ্গে চুলের রঙ চমৎকার খাপ খাচ্ছে। দুই কানে বড় বড় মুক্তা-খচিত দুটো বীরবৌলি, গলায় মুক্তার মালা, পোষাক-পরিচ্ছদও খুব জমকালো; কোমরে কিংখাপ-মোড়া চামড়ার খাপে তলোয়ার ঝুলছে,—তার সোনার মুঠিটা সূর্য্যালোকে ঝিক্-ঝিক্ করছে।

শ্রীগোপাল শর্ম্মা আগে-থাকতেই সভার সকলকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন—রাজপুত্ত্র সভায় এলে কি ভাবে তাঁর অভ্যর্থনা করতে হবে। রাজকন্যা সিংহাসনেই বসেছিল—এই সিংহলী রাজপুত্ত্রটি

সভায় এসে ঢুকলে, শ্রীগোপাল শর্ম্মার ইঙ্গিতে রাজকন্যা ছাড়া আর সকলেই উঠে-দাঁড়িয়ে হাত তুলে তাকে অভিবাদন করলে। তার পর শ্রীগোপাল শর্ম্মা এগিয়ে-গিয়ে খুব শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে ধরে, রাজপুত্রের হাতখানি আস্তে আস্তে তাকে রাজকন্যার সিংহাসনের সামনে নিয়ে এলেন। দাদুর মুখে এই রাজপুত্রটির কথা শুনে-অবধি রাজকন্যা তাকে দেখবার জন্যে খুবই উৎসুক ছিল। দুই চোখ মেলে ছেলেটির পানে সে চাইতেই তাদের চোখোচোখী হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে রাজকন্যার মুখে মৃদু মিষ্টি হাসি ফুটে উঠলো।

শ্রীগোপাল শর্ম্মা বুঝলেন—ফাঁড়া কেটে গেছে, তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছে; ছেলেটিকে দেখেই রাজকন্যা খুসী হয়েছে।—তিনি এই সময় ছেলেটিকে নিয়ে রাজকন্যার সিংহাসনের কাছে এগিয়ে-গিয়ে বললেন—ইনিই সিংহলের রাজকুমার নীলাচল।

তাঁর কথার সঙ্গে-সঙ্গে নীলাচল মাথাটি নীচু ক'রে, হাত দু'খানি তুলে রাজকন্যাকে অভিবাদন করলো। রাজকন্যাও তখনি সিংহাসন থেকে আস্তে আস্তে উঠে, মুকুটপরা মাথাটি একটু নুইয়ে, সুন্দর সুডৌল হাতখানি তুলে হাসি-মুখে বললো—বসুন আপনি!

রাজকন্যার সিংহাসনের এক পাশে রাজপ্রতিনিধি শ্রীগোপাল শর্ম্মার আসন; তার একটু নীচে কিছু তফাতে যে উত্তম আসনখানা এ-দিন স্থাপন করা হ'য়েছিল, সেই আসনখানিতে নীলাচলকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল।

শ্রীগোপাল শর্ম্মা তখন সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য ক'রে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বললেন—বাংলার সঙ্গে সিংহলের সম্বন্ধ আজ নতুন নয়। বাংলার রাজবংশের রক্তেই সিংহলের রাজবংশের সৃষ্টি। বাংলার মহারাজা সিংহবাহুর ছেলে বিজয়সিংহ সিংহল জয় ক'রে সেখানে যে-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বংশই সিংহলে রাজত্ব করছেন; আর সেই বংশেরই বংশধর—এই সুশিক্ষিত গুণবান্ রাজপুত্র নীলাচল বাংলার সঙ্গে সিংহলের অতীত সম্বন্ধ দৃঢ়তর করতে বাংলার রাজসভায় এসেছেন। বাংলার কর্ত্তব্য—এই দরদী বিদেশী রাজপুত্রকে রাজার মত সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করা।

সভাস্থ সকল লোক 'সাধু সাধু' ধ্বনিতে রাজ-প্রতিনিধি শ্রীগোপাল শর্ম্মার উক্তির সমর্থন করলে।

সভাভঙ্গের পর নীলাচলকে সমুচিত আদর-যত্নে রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন একটা ভিন্ন মহলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অন্য দেশের কোন রাজা বা রাজপুত্র এ রাজ্যে কখনো বেড়াতে এলে—এই প্রাসাদেই বাস করতেন। এই মহলটি স্বতন্ত্র একটি প্রাসাদের মতই সুগঠিত, সুদৃশ্য। ঘরগুলি নানা রকম মূল্যবান, সৌখীন আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। রাজ-অতিথির কোন অসুবিধা না হয়, সে জন্য কত লোকই আদেশ-পালনের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করে। রাজার মত আদরে নীলাচল এই প্রাসাদে বাস করতে লাগলো। শ্রীগোপাল শর্ম্মা দু' বেলা এখানে এসে তার সঙ্গে কত কি পরামর্শ করেন; নিজে সঙ্গে ক'রে তাকে রাজসভায় নিয়ে যান, সভাভঙ্গ হ'লে এখানে পৌঁছে দেন। দাস-দাসীদের তিনি সতর্ক ক'রে দিয়েছেন—খবরদার, রাজপুত্রের খাতির-যত্নের কোন ত্রুটি না হয়। সকলেই এই বিদেশী রাজপুত্রটির মন-যোগাবার জন্যে সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর ব্যাকুল।

প্রথমে এরা সকলে ভেবেছিল, ছেলেটি ভিন্নদেশী, তাই অত্যন্ত ভালমানুষ, আর লাজুক; তার মুখ দিয়ে কথা যেন বেরুতেই চায় না! কিন্তু দিন-কতক পরেই তাদের এ ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা বুঝলো, ছেলেটির সম্বন্ধে যা ভেবেছিল, সে তার উল্টো; এ যেন ঠিক একটি মিট্‌মিটে ডাইন—বদমায়েসের ধাড়ী! রাজবাড়ীতে রাজকন্যা তার দাসী-বাঁদীদের ওপর যে রকম কড়া-মেজাজ দেখায়, এই সিংহলী ছেলেটির মেজাজ যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়! কারুর কাজে একটু খুঁত দেখ্‌লে আর রক্ষা নেই; নীলাচলের মুখখানা তখন ভীমরুলের চাকের মতন ভীষণ দেখায়। তার মুখের কথা শু'নে মনে হয়, সে যেন ধমকাচ্ছে! কাউকে কোন কথা সে একবারের বেশী বলতে নারাজ; তার কোন কথা বুঝতে না পেরে কেউ আবার জিজ্ঞাসা ক'রলে তার দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। নিজেই চাবুক নিয়ে সপাসপ তার পিঠে ঘা-কতক বসিয়ে দেয়। অথচ, রাজকন্যা নীলার সঙ্গে এ ছেলেটি যখন আলাপ করে, তখন তার মুখের হাসি, মিষ্টি কথা, নম্র স্বভাব ভদ্রলোকের মত হাবভাব দেখে কে বলবে যে, এই সেই লোক! আরও আশ্চর্য্যের কথা, অমন যে দজ্জাল রাজকন্যা এ পর্য্যন্ত কেউ যাকে বাগে আনতে পারেনি, শিক্ষাদাতা গুরু থেকে গর্ভধারিণী মা ও শুভানুধ্যায়ী মাতামহকে পর্য্যন্ত যে উপেক্ষার চোখে দেখে, এই বিদেশী ছেলেটি যেন দু দিনেই তাকে একেবারে যাদু করে ফেললো! নীলাচল যতই রাজকন্যার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা কয়, তার সুখ্যাতি করে, গুণগান ক'রে তাকে বাড়ায়,—রাজকন্যার অন্তরটিও ততই গলতে থাকে; শেষে নীলাচলের প্রভাবে সে একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়ে!

এই ছেলেটির অপূর্ব্ব চোখ-দু'টির অদ্ভুত দৃষ্টি রাজকন্যাকে যেন আড়ষ্ট ক'রে দেয়; নীলাচলের সঙ্গে চোখোচোখী হ'লেই সে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। তার মনের তেজ, দর্প, দেমাক এক লহমায় যেন চূর্ণ হয়ে যায়! তখন নীলাচলের মুখে তোষামোদ শুনে মুখখানা তার লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে; তার ইচ্ছা করে—সে নিজেই নীলাচলের গুণ গায়—তাকে বাড়ায়। রাজকন্যার অবস্থা শেষে এমন হ'য়ে দাঁড়ালো যে, এই সিংহলী ছেলেটির সুখ্যাতি তার মুখে আর ধরে না। রাজসভায় সিংহাসনের কাছের আসনটিতে নীলাচল না বস্‌লে তার বসা সার্থক হয় না। পড়া-শুনা, আলাপ-আলোচনা, খেলা-ধুলা, বেড়ানো—সব কাজেই নীলাচলকে তার চাই-ই।

এই ভাবে মিলামিশায় আরও দু'টো বছর কেটে গেল। নীলাচল রাজার অতিথি হ'য়ে রাজবাড়ীতেই রাজার মতন আদর-যত্নে বাস ক'রতে লাগলো। শ্রীগোপাল শর্ম্মা তক্ষকের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদের পানে তাকিয়ে ছিলেন। সময় বুঝে ঠিক এই সময় তিনি প্রচার ক'রে দিলেন—রাণী অঙ্গনার একান্ত সাধ, রাজকুমার নীলাচলের সঙ্গে রাজকুমারী নীলাদেবীর বিবাহ হয়। আর রাজকন্যারও এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত আছে।

যেখানে রাণীর ইচ্ছা, রাজকন্যার ইচ্ছা, রাজপ্রতিনিধির ইচ্ছা,—অনিচ্ছা সেখানে কার হ'তে পারে? আর হ'লেই বা কে তা গ্রাহ্য করবে? কাজেই খুব ধুমধামেই এক দিন রাজকন্যার বিয়ের দিন স্থির হ'ল, আর সারা রাজধানীর লোক কি আনন্দে এই শুভ-দিনটির প্রতীক্ষা করতে লাগলো, তা তোমরা সকলেই বেশ বুঝতে পারছো।

কিন্তু নিয়তির এমনি নির্ব্বন্ধ যে, যে দিন রাজকন্যার বিয়ের দিনটির কথা রাজসভায় সকলেই জানতে পারলো, তার ঠিক পর-দিনই রাজধানীর সকল লোক বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলে

দেখ্‌লে—সহরের রাস্তার সকল চৌমাথার মোড়ে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে কালো তক্তা ঝুলছে, আর সেগুলোতে খড়ি দিয়ে মোটা মোটা সাদা হরফে লেখা আছে,—

"সিংহলী বিদেশী; তার সঙ্গে বাঙ্গালার রাজকন্যার বিবাহ হ'তে পারে না। রাজকন্যা তাঁর যোগ্য বাঙ্গালী বরের গলায় মালা দেবেন।"

সেই দিন হতেই এই কথাগুলো নিয়ে সারা রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে আন্দোলন-আলোচনা সুরু হল। সবাই বলতে লাগ্‌লো—"কথাগুলো যে লোকই লিখুক, খুবই খাঁটি কথা লিখেছে বটে; ভিন্‌দেশী সিংহলী এসে বাঙ্গালীর মেয়েকে বিয়ে করবে, সে মেয়ে তো যা-তা নয়, স্বয়ং রাজকন্যা, এই রাজ্যের মালিক। ঐ সিংহলীটা রাজকন্যাকে বিয়ে ক'রে শেষে আমাদের রাজা হয়ে বোস্‌বে না কি? সিংহলীর বংশ করবে বাঙ্গালায় রাজত্ব? না কথাটা ঠিক হচ্ছে না; ঠিক কথাই লিখেছে লোকটা—এ বিয়ে কখনই হতে পারে না। এ সম্বন্ধ ভাঙ্গতে হবে। সিংহলী রাজা চাইনে আমরা।"

মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মা এ খবর শুনেই রাগে জ্বলে উঠলেন। তাঁর বাড়ীর সামনের দেয়ালেই ঐ রকম একখানা কালো তক্তা ঝুলছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই খড়ির লেখাগুলো তিনি পড়লেন। বুঝলেন, তাঁর সকল ফন্দী বিফল করবার চেষ্টা হচ্ছে! তিনি তাঁর সেই শত্রুকে খুঁজে বার করবার জন্যে সহরকোটালকে তখনি কড়া হুকুম দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সেই কালো তক্তাগুলো এক যায়গায় জড়ো ক'রে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবার হুকুম হ'ল। খড়ির লেখাগুলো সমস্তই তক্তাগুলোর সঙ্গে বিলুপ্ত হল।

কিন্তু রাজধানীর লক্ষ লক্ষ প্রজার মনে সেই সাদা হরফগুলি এমন গভীর ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল যে, সেই সব দাগ মুছে-ফেলা মন্ত্রীর সাধ্য হ'ল না। মানুষের মুখে-মুখে সেগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়লো।

শ্রীগোপাল শর্ম্মা সভায় ঘোষণা করলেন, এ কাজ যারা করেছে, চোরের মত চুপি-চুপি রাস্তার মোড়ে-মোড়ে তক্তা এঁটে তাতে এই সব কথা লিখেছে, তারা বিদ্রোহী—রাজদ্রোহী। যে তাদের ধরে দিতে বা ঠিক সন্ধান দিতে পারবে, তাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাণী অঙ্গনা জানালেন—এ ভারি অন্যায়! যারা এ কাজ করেছে, সত্যিই তারা রাজবিদ্রোহী; তাদের কঠিন দণ্ড হওয়াই উচিত।

রাজকন্যার রাগ মায়ের চেয়েও বেশী। সে শ্রীগোপাল শর্ম্মাকে বললো, একটা লোক একা কখনো সহর-জুড়ে এতগুলো তক্তা ঝোলাতে পারে না, তাদের রীতিমত একটা দল আছে। সহরকোটালকে বলে দাও, দাদু, এক হপ্তার ভেতরে এই দলকে সে যদি খুঁজে বার করতে না পারে, তবে লোহার শিক পুড়িয়ে, রাজসভায় সবার সামনে, তার কপালে লিখে দেওয়া হবে—সে 'শান্তি-রক্ষার অযোগ্য।'

দাদু খুসী হয়ে বললেন, বাঃ! এ তোমার খাসা যুক্তি, দিদি! আমি এখনি এ কথা তাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

নীলাচল মুখখানি মলিন ক'রে রাজকন্যাকে বললো, রাজ্যের লোক আমায় যখন চায় না, তখন আমার কি এখানে থাকা উচিত, রাজকন্যা? তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি আমার দেশে ফিরে যাই।

রাজকন্যা বাধা দিয়ে ব্যথার স্বরে বললো, পাগল! তুমি চলে যাবে কিসের দুঃখে? লোকের কথায় কি আসে-যায়, আমি যখন তোমাকে চাই। তুমি দেখ না, কি শাস্তি ওদের দিই। আমি কি পণ করেছি, শুনবে? যে সিংহাসনে আমি একলা বসছি, ঐ সিংহাসনে তোমাকে বসাবই, এ কথার অন্যথা হবে না, তা জেনে রাখো।

এর পর সমস্ত রাজধানী তছ-নছ ক'রে অপরাধীর সন্ধান, আর উৎসবের উজান তুলে রাজকন্যার বিয়ের আয়োজন—এ দু'-ই একসঙ্গে এমনি ঘটা ক'রে সুরু হল যে, প্রজারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো।

* * * *

ঠিক এই সময় নির্ব্বাসিত রাজকন্যা লীনা ছেয়ে-রঙ্গের একটি টাটু ঘোড়ায় চড়ে, দুর্গম পাহাড়ে পথের ভেতর দিয়ে রাজধানীর দিকে তীরবেগে ছুটে আস্‌তে লাগ্‌লো। তারও ধনুর্ভঙ্গ পণ—আমার বাবার সিংহাসনে আমি বসাব আমার দুঃখিনী সর্ব্বহারা মাকে। যাদের অত্যাচারে মা-আমার এত কষ্ট পেয়েছে, আমি দেব তার দস্তুর-মতো শাস্তি।

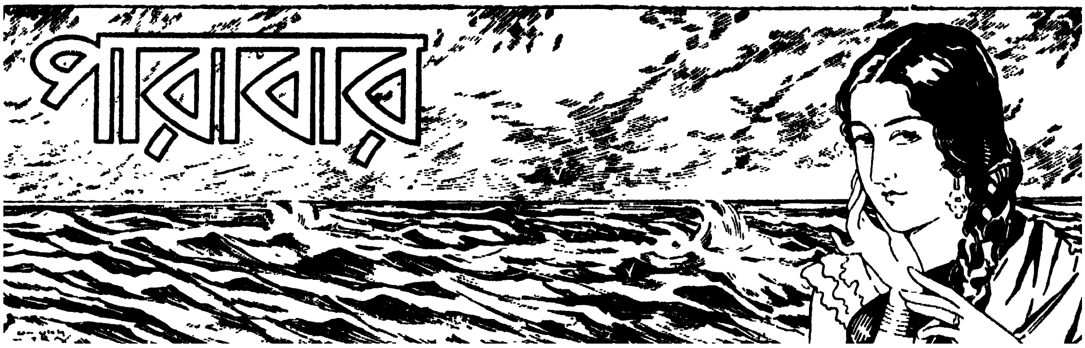
দুই বোনের পণের দাপটে এমন একটা ওলট্-পালট্ কাণ্ড এর পর ঘটে গেল, যাকে নিয়তির নির্ব্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। আস্‌ছে বৈঠকে তোমরা সেই সব লোমাঞ্চকর কাহিনী শুনবার জন্যে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা কর।

—গল্প দাদু।

সঙ্কটের আশ্রয়

দেবের মন্দির গড় যদি কোনখানে
শয়তান গড়ে মঠ তারি সন্নিধানে।
সব চেয়ে বেশি যাত্রী যাবে সেই মঠে,
মন্দিরে তাহারা আসে পড়িলে সঙ্কটে।

শ্রীকালিদাস রায়।



২৪

ডাক্তার-পাত্রের সঙ্গে বিরজার বিবাহ চুকিতে না চুকিতে পাত্র স্বর্ণদ্যুতি রায়ের দিক হইতে তাগিদ আসিল। স্বর্ণদ্যুতিকে দিন-পনেরোর মধ্যে এলাহাবাদে যাইতে হইবে। সেইখানেই তার চাকরি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কাজেই বিবাহ যদি এখনি না হয়, তাহা হইলে কত কাল পরে এ বিবাহের সুযোগ মিলিবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই!

তারাচরণ রায় ভাবিয়াছিলেন, এ-বিবাহের ছুতা করিয়া সলিলার বিবাহের তারিখ আরো কিছু কাল পিছাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন! কিন্তু তাহা ঘটিল না।

তাঁকে কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইল।

ঘটা করিয়া ছেলের বিবাহ দিবেন, বাসনা ছিল। কিন্তু দেওয়া দূরের কথা, সে-বিবাহ লইয়া যে-ব্যাপার ঘটিয়া গেছে, তার আঘাতে বুক ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। সে-ক্ষত মিলায় নাই, ইহজন্মে মিলাইবে না! সে-বিবাহের ফলে মনে এমন আগুন জ্বালিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সে-আগুনে তাঁর সারা পৃথিবী পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। নাৎনীর বিবাহ দিয়া সে-বাসনাকে তাই আজ চতুর্গুণ-পরিমাণে চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি কোমর বাঁধিলেন। পুরানো রীতি মানিয়া সামাজিক-বিতরণ, বাঁধা রোশনাই এবং যেখানে যত আত্মীয়-বন্ধু আছে, সকলকে নিমন্ত্রণ—কোনো দিকে এতটুকু খুঁত রাখিলেন না। ভাবিলেন, ছেলে সন্তোষ আর বধূ চারুলতা অন্তরীক্ষে থাকিয়া যদি দেখে, নিমেষের সে মহাভ্রান্তির কি সংশোধন তিনি করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁর মনের পরিচয় পাইয়া নিশ্চয় তাঁর সব অপরাধ ভুলিয়া তাঁদের আত্মা তৃপ্তি বোধ করিবে!

মহা সমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। তার পর বিবাহের আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলা। সে-সব চুকিবার সঙ্গে সঙ্গে···

স্বর্ণদ্যুতির যাত্রার আয়োজন। পরশু স্বর্ণদ্যুতি এলাহাবাদ যাত্রা করিবে। সলিলাকে সে সঙ্গে লইয়া যাইবে, স্থির হইয়াছে।

তারাচরণ রায়ের পৃথিবী তাই আবার দুলিতে সুরু করিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি গম্ভীর মুখে বসিয়াছিলেন।

কিরণ আসিয়া বলিল—সলিলাকেও পরশু পাঠাচ্ছেন, দাদু?

তারাচরণ রায় বলিলেন,- উপায় কি বলো, দিদি? তোমরা মেয়ে···তোমাদের উপর আমাদের কোনো অধিকার নেই তো। অধিকার পরের।

কিরণ বলিল.—অধিকার···মানে? আমরা কুকুর, না, বেরাল? না, আসবাব-পত্র যে, অপরে আমাদের উপর অধিকার চালাবে?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—অধিকার কথাটা চলতি বলেই বললুম, দিদি! আসলে সলিলা আর স্বর্ণদ্যুতি—ওরা নিজেদের ঘর-সংসার গড়বে তো দু'জনে মিলে!

কিরণ বলিল,—এখানকার ঘর-সংসার ভেঙ্গে সে-ঘর গড়ার বিধান আছে, বুঝি?

তারাচারণ রায় বলিলেন,—এর মধ্যে ভাঙ্গা-গড়া নেই, দিদি। এখানে আমাদের কাছে তোমরা থাকো··· সে শুধু নিজেদের ঘর যত দিন হয় না, তত দিন! তার পর বর এসে ঘরের সন্ধান দিলে এখানে আর কেন তোমরা থাকবে, বলো? এ ঘর হলো যেন ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুম! বর হলো ট্রেণ! তার পথ চেয়ে তোমাদের এ-ওয়েটিং-রুমে বসে থাকা বৈ নয়! ট্রেণ এলে সেই ট্রেণে চড়ে তখনি বাড়ী ছুটতে হয়

মুখখানা গম্ভীর করিয়া কিরণ বলিল—বা রে, এ্যাদ্দিন বুঝি স্বর্ণদ্যুতি সাহেবের ঘর চলছিল না? যেমন বিয়ে হওয়া, অমনি···

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন—আমাকে বললে, দুজনে একসঙ্গেই এলাহাবাদ যাবো, দাদু! স্বর্ণদ্যুতির মনের তাই ইচ্ছে, বুঝলুম। বললেন, ছোটখাট কনেবৌ হলে আলাদা কথা ছিল।

কথাটা বলিয়া তারাচরণ রায় নিশ্বাস ফেলিলেন।

কিরণ বলিল,—সলিলা কি বললে?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—সে কোনো কথা বলেনি। সে শুধু জল-ভরা দু'টি চোখ মেলে আমার পানে চেয়ে ছিল।

কিরণ বলিল,—এমন হবে, তা কে জানে! জানলে কক্খনো আমি এ-বিয়ের জন্য এত তাড়া দিতুম না! আমি ভেবেছিলুম, বিয়ে হয়ে গেলে বর থাকবে এলাহাবাদে, সলিলা থাকবে এখানে···দু'জনে চিঠি-পত্র লিখবে। আমি এসে পড়বো·· কেমন রোমান্স···

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাদের ডাগর করে বিয়ে দিয়ে এ-রোমান্স আমরা ভেঙ্গে দিচ্ছি দিদি, না হলে সত্যি এই চিঠি-লেখার মধ্যে যে-রোমান্স ছিল··· সব হারিয়ে বসলেও সে-কথা এখনো ভুলিনি, কিরণ! ···রোজ একখানা করে চিঠি লিখতুম আমি তোমার দিদিমাকে···তিনিও রোজ আমাকে চিঠি লিখতেন। সে-সব চিঠিতে কি আবোল-তাবোল যে না লিখতুম তবু সে কি মিষ্টি ছিল। ভাবি তাই, সে ভালো ছিল? না, তোমাদের এই বড় করে বিয়ে দিয়ে একেবারে কর্ত্তা-গিন্নী সাজিয়ে ছেড়ে দেওয়া···এ ভালো হয়েছে?

কিরণ এ-কথার জবাব দিল না; বলিল,—সলিলা কোথায়?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাদের স্বর্ণদ্যুতি সাহেব এসে তাঁকে নিয়ে গেছেন। পছন্দ করে কি সব কেনা-কাটা করবেন···তার পর দু'জনে সিনেমায় যাবেন। ফিরবেন সেই যার নাম রাত সাড়ে আটটা-ন'টায়।

হাস্যোচ্ছ্বাসে গলিয়া কিরণ বলিল,—দু'জনে এর মধ্যে এত ভাব হয়েছে?

তারাচরণ রায় কহিলেন,—ভাবের সম্পর্ক···ভাব হবে না?

কিরণ বলিল,—তা বলে দু'দিনেই এমন সড়গড়।··· স্বর্ণদ্যুতির রকম দেখে মনে হয়, সলিলার সঙ্গে যেন দু'-চার বচ্ছর ধরে ওঁর জানাশোনা!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তা হলে বলি শোনো, দিদি···তোমাদের জামাই বাবু এলেন···এসে আমাকে একেবারেই বললেন, সলিলাকে একটু দরকার আছে! আমি বললুম, বসো, সলিলাকে আমি ডাকিয়ে দি। দাদুজী বসলেন। সলিলা এলো। আসতেই দেখি, আমার সামনে সলিলার হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার হাত-ব্যাগে রাখো। তার পর তুমি চট্ করে তৈরী হও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে তোমাকে নিয়ে বেরুবো···বাজারে যাবো···তার পর যাবো সিনেমায়।

হাসিয়া কিরণ বলিল,—তোমার অনুমতি নেওয়া নয়, কিছু না···ঐ কথা বললে? আর সলিলা দিব্যি গেল?

—হ্যাঁ। আমার সামনে প্রথমে লজ্জায় নুয়ে পড়্লেন! টাকা নিতে হাত পাততে পারেন না! আমি বললুম, নাও···কর্ত্তা দিচ্ছে···গিন্নীর অমন কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন? তখন নিলে···

কিরণ বলিল,—সত্যি, তোমায় দেখে স্বর্ণদ্যুতির লজ্জা হলো না এমন করে বৌকে ডেকে আত্মীয়তা করতে?

—না। ওরা ভাবে, এ-আত্মীয়তা by right. তা ছাড়া, স্ত্রী হলো better-half এবং স্ত্রীর জন্যই তো সব···অতএব এ-বুড়োকে আবার কিসের লজ্জা?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তারাচরণ রায় চুপ করিলেন···

কিরণ সহাস দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া রহিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—সত্যি বলছি দিদি, আমার খুব ভালো লাগলো। একালের এই forward-ভাব বড় ভালো লাগলো। আমাদের আমলে লুকোচুরি রোমান্সে যত মধুই থাকুক, একালের এই পরমাত্মীয় সপ্রতিভ ভাব···এত চট্ করে দু'জনকে দু'জনের নাগালে পাওয়া···এমন সহজ নির্ভরতা···এর দাম আছে, দিদি! হাসছো কি? তোমারো এ শুভদিন এলে এই দৃশ্যই দেখবো!···আমরা পাশে থাকলে মনে হবে, এতে আবার

লজ্জা কি! স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক তো লজ্জার সম্পর্ক নয়! আমরাও এই ভেবে নিশ্চিন্ত হবো যে, দু'জনে সংসারের চার্জ্জ নিতে সক্ষম···বুঝলে?

কিরণ বলিল,—আমি কিন্তু খুব ঝগড়া করবো ওরা ফিরে এলে··বুঝলে দাদু। দু'জনে যে দু'জনকে পেয়েছো, সে কার জন্য বাবু? এই আমি ছিলুম বলেই তো!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—নিশ্চয়···

কিরণ বলিল,—আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে দু'জনের রোমান্সের রঙ ছুটে যেতো?

দু'জনে কথা হইতেছে, এমন সময় উষাঙ্গিনী আসিয়া দেখা দিল।

এ-বিবাহে উষাঙ্গিনী নিমন্ত্রণে আসিয়াছে।

উষাঙ্গিনী বলিল,—আমি আজ যাচ্ছি, জ্যাঠামশাই···

তারাচরণ রায় বলিলেন,- সেখানকার ডাক এসে গেছে? বেশী আর দু'দিন ছুটী মঞ্জুর হলো না, মা?

উষাঙ্গিনী বলিল,—আপনার জামাই একলা·· খাওয়া-দাওয়ায় বড় কষ্ট হয়, জ্যাঠামশায়। তার উপর সদ্য অসুখ থেকে উঠেছেন···

তারাচরণ কহিলেন,—ও!···কিন্তু সে এলো না বলে মনে বড় দুঃখ রইলো, মা। তাকে বলো, চাকরি করে বলে সে-চাকরিতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকা ঠিক নয়। পাওনা ছুটীগুলো মাঠে মারা উচিত হবে না। এ ছুটীগুলোর সদ্ব্যবহার করতে বলো···তা হলে দেহ-মন সুস্থ থাকবে। বুঝলে?

উষাঙ্গিনী বলিল,—বলবো।

—হ্যাঁ, বলো। আমার নাম করে তাকে বলো··· বৃদ্ধস্য বচন·· একালের ছেলে বলে যেন উড়িয়ে না দ্যায়।

উষাঙ্গিনী এ-কথার জবাব দিল না; মৃদু হাস্য করিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—ক'টায় তোমার ট্রেণ?

উষাঙ্গিনী বলিল—সাড়ে আটটায়। দিল্লী মেলে যাচ্ছি।

তারাচরণ রায় কহিলেন—তা হলে সলিলার সঙ্গে আর যাবার আগে দেখা হলো না।

উষাঙ্গিনী যেন আকাশ হইতে পড়িল কহিল,— কেন? সে শ্বশুর-বাড়ী গেছে?

কিরণ বলিল—না, উষা পিশি, তোমার জামাই আর মেয়ে দু'জনে বাজার করতে বেরিয়েছেন···সেখান থেকে সিনেমায় যাবেন। দাদু সুখ্যাতি করছিল। বলছিল, বেশ ভালো লাগলো এই সপ্রতিভ ভাব! কিন্তু আমি অবাক্ হয়ে গেছি এই বেহায়াপনা দেখে! সদ্য বিয়ে হয়েছে, আর এর মধ্যেই এমন অন্তরঙ্গতা···ওঁরা স্বামি-স্ত্রী ছাড়া দুনিয়ায় যেন আর মানুষ নেই!

হাসিয়া উষাঙ্গিনী বলিল—এই ভালো, কিরণ। তোমার বিয়ে হোক···তখন জামাই এসে এমনি করে তোমাকে নিয়ে বেরুবে···আমি কায়-মনে সেই প্রার্থনা করি

কিরণ বলিল—হুঁ! আমি যাবো কি না! বয়ে গেছে! ···দু'দিনে কোনো লোককে বুঝি এতখানি বিশ্বাস করা যায়? যে-সে এসে বলবে, চলো···অমনি তার সঙ্গে বেরুবো! কিরণ সে-মেয়ে নয়, উষা পিশি।

তারাচরণ রায় হাসিলেন। হাসিয়া তিনি বলিলেন,— সেই ভালো। অজানা নতুন লোককে তুমি চট্ করে বিশ্বাস করো না, দিদি। তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে তুমি এই বুড়ো দাদুকে সঙ্গে নিয়ো···তোমার ব্যাগ বইবে, লিপষ্টিক বইবে, পাউডার বইবে, আয়না বইবে।

তার পর তিনি চাহিলেন উষাঙ্গিনীর পানে, বলিলেন, জামাই কেমন হয়েছে মা উষা?

উষাঙ্গিনী কহিল,—চমৎকার জ্যাঠামশায়! রূপে-গুণে যেমন হতে হয়! দুঃখ শুধু এই যে, আজ সন্তু কাকা নেই, কাকিমা নেই···

একটি নিশ্বাস ফেলিয়া গাঢ় স্বরে তারাচরণ রায় বলিলেন,—হুঁ···

উষাঙ্গিনী তখনি অন্য কথা পাড়িল, বলিল,—সলিলা এলে সলিলাকে তুমি বলো, এলাহাবাদে থাকবে তো··· আমার ওখান থেকে খুব কাছে। আমায় যেন চিঠি লেখে···তা ছাড়া আমাকে যা কথা দেছে···আমার ওখানে এক দিন ওরা দু'জনে বেড়াতে যাবে···সে কথা যেন সত্যি হয়!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাদের জামাই মত করবে তো?

উষাঙ্গিনী বলিল,—নিশ্চয়। জামাইকেও আমি বলেছি। তাতে সে আমায় কথা দেছে। বলেছে, অত কাছে থাকবেন···নিশ্চয় দু'জনে যাবো পিশিমা।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমার কথা বলবো মা··· নিশ্চয় বলবো! চিঠি-পত্র আমাকেও লিখো মা উষা··· আমি হয় তো যাবো। এ-বয়সে আবার মাঝে-মাঝে প্রয়াগ-তীর্থে না নিয়ে গিয়ে সলিলা ছাড়লো না! এমন মায়া হয়েছে···মাসে একবার করে ঘুরে আসতে হবে, দেখছি!

উষাঙ্গিনী বলিল,—নিশ্চয় আসবেন, জ্যাঠামশায়। মেয়ে···তাকে কাছে রাখা চলে না, তাই বিয়ে দিয়ে দূরে পাঠাতে হয়। কিন্তু দেখতে যাওয়া যায় তো। আপনি সেখানে নিশ্চয় যাবেন। আপনার জিনিষ! অমনি একবার আমাদের কুঁড়ে-ঘরেও পায়ের ধূলো দিয়ে আসতে হবে জ্যাঠামশায়, নাহ'লে আমার বড্ড দুঃখ হবে।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—যাবো মা। এলাহাবাদে যদি যাই, তোমার ওখানে যাবো না?

তারাচরণ রায়ের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া উষাঙ্গিনী প্রণাম করিল। তারাচরণ রায় তার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—চিরায়ুষ্মতী হও মা।···কার সঙ্গে যাচ্ছো?

—বাবা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।

উষাঙ্গিনী বলিল,—আসি জ্যাঠামশায়···

কিরণকে আদর করিয়া উষাঙ্গিনী চলিয়া গেল।

কিরণ গুম্ হইয়া রহিল···খানিকক্ষণ। তার পর অকস্মাৎ ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল,—নাঃ, সলিলার বিয়ে হয়ে গেলে কত আমোদ-আহ্লাদ করবো, ভেবেছিলুম। তা না, বৌকে এর মধ্যে না নিয়ে গেলে বরের চাকরি থাকবে না!

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমারো বরের চেষ্টা দেখছি দিদি···দাঁড়াও না! এই জষ্টি-মাস পেরুতে দেবো না।

কিরণ বলিল,—হ্যাঁ, তাই না কি আমি বলছি তোমার গলা ধরে!

২৩

বীণাকে লইয়া স্বর্ণদ্যুতি ফিরিল রাত্রি তখন ন'টা বাজে —সঙ্গে একরাশ জিনিষ। রেশমী শাড়ী-ব্লাউশ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সাবান-সেণ্ট প্রভৃতি নানা টুকিটাকি!

তারাচরণ রায় বলিলেন—বাজার হলো?

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—হ্যাঁ। ভাবছি কাল বিশ্রাম, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হবে। কাল বাজার করা সুবিধা হবে না বলেই আজ···বুঝলেন দাদু!

সলজ্জ ভঙ্গীতে বীণা চলিয়া যাইতেছিল, স্বর্ণদ্যুতি বলিল—দাদুকে জিনিষপত্র দেখাও···

লজ্জায় সলিলা যেন কাঠ!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—কাঠ হ'লে তো চলবে না, দিদি! পড়েছো মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—আমাকে মোগল বললেন, দাদু!

তারাচরণ রায় বলিলেন—চলৃতি ছড়া বলেই বলেছি, ভাই। তুমি সত্যিকারের মোগল হবে কেন?···তা লজ্জা কেন দিদি? ঘর-সংসার পাতছো···আমাকে দেখাও সে ঘর-সংসার কেমন হবে!

বীণার লজ্জা তবু ভাঙ্গিতে চায় না! হাসিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলিল—বাইরে আমার সঙ্গে দিব্যি ঘুরে এলে তো ···অত কথাবার্ত্তা! আর ঘরের মধ্যে দাদুর সামনে এমন লজ্জা! জানলেন দাদু···সে কি smartness···দেখলে কে বলবে, আমার সঙ্গে সত্ত বিয়ে হয়েছে!

তারাচরণ রায় হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—বর কি বলছে দিদি?···আমার সঙ্গে এত দিন ঘর করলে, তবু লজ্জা! দেখি, দু'জনে কি কিনলে···কে কোন্‌টা পছন্দ করলে, আমায় বলো···

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—এসো···

বীণা আসিল। তারাচরণ রায় বলিলেন—বরের কথায় দিব্যি এলে তো! আর এই বুড়ো এতক্ষণ সাধ্য-সাধনা করছিল···

বীণা কোনো জবাব দিল না। নিঃশব্দে প্যাকেট খুলিল।

জিনিষ দেখিয়া তারাচরণ রায় সুখ্যাতি করিলেন।

উচ্ছ্বসিত স্বরে স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আপনার নাৎনী এর কোনোটা পছন্দ করেনি···এ-সব আমি পছন্দ করেছি। আমার টেষ্টের তারিফ করুন।

তারাচরণ রায় কোনো কথা বলিলেন না। আসন্ন বিদায়ের কথা স্মরণ করিয়া তাঁর বুক ব্যথা-ভারে ভরিয়া উঠিতেছিল।

জিনিষপত্র দেখা হইলে স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আপনার

নাৎনীকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে গেলুম দাদু, অক্ষত দেহে-মনে! চার্জ্জ বুঝে নিন…

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তার মানে? তুমি চলে যাচ্ছো না কি?

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—বাড়ী যাবো না? বাঃ!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—বাড়ী তো তোমার এখন এইখানে।

—কি-রকম?

—গৃহিণী গৃহমুচ্যতে! তোমার গৃহিণী যেখানে, সেইখানেই তোমার বাড়ী…

হাসিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—পরশু চলে যাবো দাদু… বাড়ীতে এ-দু'রাত্রি না থাকলে লোকে কি বলবে?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—লোকের কথা এত-বড়? তোমরা একালের ছেলে…যাকে বলে modern…লোকের কথায় নিজের মনকে উপবাসী রেখে পীড়া দেবে! মন চাইছে ষোড়শী বধূ… জ্যোৎস্না রাত্রি…

সলজ্জ হাস্যে স্বর্ণদ্যুতি চাহিল বীণার পানে। বীণা আর এক-নিমেষ দাঁড়াইল না…ত্বরিত-পায়ে বাহিরের বারান্দায় চলিয়া গেল!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আপনার নাৎনী পালালো যে! ওকে ধরে আনি।

স্বর্ণদ্যুতি বাহিরের বারান্দায় গেল এবং বীণাকে ধরিয়া ঘরে ফিরিল।

লজ্জায় বীণার জড়ো-সড়ো মূর্ত্তি! স্বর্ণদ্যুতি ছাড়ে না! হেলিয়া বাঁকিয়া-চুরিয়া মুক্তির জন্য বীণার সে কি আকুল প্রয়াস!

হাসিয়া তারাচরণ বলিলেন,—তোমায় পালাতে হবে না দিদি, আমিই না হয় সরে যাচ্ছি! আমি বুঝি দিদি, মন চায়…সেই যে সে-দিন গান গাইছিলে…সেই মন চায় তবু খুব লজ্জা…কি গানটা?

উচ্ছ্বসিত-আগ্রহে স্বর্ণদ্যুতি বলিল—মন চায় না দাদু, প্রাণ চায়। আমি জানি…রবি বাবুর গান

প্রাণ চায় চক্ষু না চায়—
মরি এ কি তোর দুস্তর লজ্জা!
সুন্দর এসে ফিরে যায়
তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা!

তারাচরণ রায় কহিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ…তাই বটে! প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়! কিন্তু তোমার সুন্দর এসে যে ফিরে যাচ্ছে দিদি…এ সময় লজ্জা করলে তাকে ধরে রাখবে কে?

সলজ্জ ভ্রূভঙ্গি-সহকারে বীণা বলিল—যাও…হুঁ…

লজ্জা-জড়িত এই মৃদু-হাস্য তারাচরণ রায়ের বুকে যেন বসন্ত-বাতাসের স্পর্শ দিল! কি সুন্দর, সরল ঐ মিষ্ট-মধুর হাসি! ও হাসির পিছনে কতখানি আশা…কি যে স্বপ্ন-সুষমা…

ছোট একটা নিশ্বাস তিনি রোধ করিতে পারিলেন না। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তোমার কর্ত্তাটিকে থাকতে বলো দিদি…না হলে আমাদের সলিলা বিগলিতা হয়ে পড়বে…

বীণা এবার কথা কহিল; বলিল—আমার হাত ছেড়ে দিতে বলো দাদু…

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—তুমি পালাবে না…কথা দাও।

তারাচরণ রায় বলিলেন—ও হলো সবল-তরুণ… তা ছাড়া তোমার উপর ওরই এখন অধিকার…আমার কি সাধ্য দিদি, ওর হাত থেকে তোমাকে মুক্তি দেবো!

বীণা বলিল—না…ছাড়তে বলো!…সকলে মজা পেয়েছো আমায় নিয়ে…না? আমি যেন মানুষ নই!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—তুমি মানুষ বলেই তোমাকে বন্দী করা হয়েছে। পাছে পালাও, তাই!

তারাচরণ রায় বলিলেন—এ-খেলা আমার ভালো লাগছে, দিদি। এ-খেলা আজ প্রথম দেখছি…হয় তো এই প্রথম-দেখাই আমার শেষ-দেখা ভাই…

কথাগুলা শেষের দিকে বাষ্প-ভারে বিজড়িত হইল।

তিনি চাহিলেন স্বর্ণদ্যুতির পানে; তার পর কাশিয়া গলা সাফ করিয়া লইয়া বলিলেন,—তুমি জানো না স্বর্ণ, হেলায় জীবনের কতখানি আমি হারিয়ে ছিলুম! আজ শেষ বেলায় সে-অবহেলার ত্রুটি সেরে কি আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছে!

একটা বড় নিশ্বাস! কত কালের পুঞ্জিত বেদনা যে এ-নিশ্বাসে বুকের কোটর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—বাড়ী যাবে বলছো! ধরে রাখবো না! কাকেও ধরে রাখবার মতো শক্তি আমার নেই, তাই…সাহসও আর নেই! তবে তোমাদের

দু'টিকে যতক্ষণ কাছে পাই !···আজ আমার সব কথা মনে পড়ছে। সম্ভ ডাগর হয়ে উঠলো, মনে কত আনন্দ··· অমনি তিনি চলে গেলেন। সম্ভর বিয়ে দেবেন, কি-সাধই তাঁর ছিল !···তিনি চলে গেলে সম্ভর বিয়ের নামে আমার বুক কি-ব্যথায় ভরে উঠতো ! সম্বন্ধ আসতো··· কিন্তু বিয়ে দেবার কথা মনে হলেই ভাবতুম, কার বৌ··· আদর করে বৌ নিয়ে আসবো আমি, সে-বৌ কে দেখবে ? যাঁর ছেলে, যাঁর বড় সাধ ছিল, তিনি নেই ! মনের মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ চলতো···

তারাচরণের স্বর অবরুদ্ধ হইল।

এ কথায় ব্যথা বোধ করিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আমি জানি দাদু···সে কথা আমি শুনেছি। কিন্তু যা গেছে, তা নিয়ে দুঃখ পুষে তো কোনো ফল নেই ! যা আছে, তাই নিয়ে সে-দুঃখ আমাদের ভুলতে হবে, দাদু ! আমি বুঝছি, সলিলা এখান থেকে চলে গেলে আপনার জীবন খালি হয়ে যাবে···তাই যদি কিছু না মনে করেন, আমার একটু নিবেদন আছে···

তারাচরণ রায় কোনো জবাব দিলেন না। দুই চোখে আকুল প্রশ্ন ভরিয়া স্বর্ণদ্যুতির পানে চাহিলেন।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আপনি মাঝে-মাঝে যদি আমাদের ওখানে যান, তা হলে আপনিই শুধু মনে শান্তি পাবেন, তা নয়···আমরাও অনেকখানি শান্তি পাবো। বিশেষ, সলিলা।···বায়োস্কোপে আজ এইমাত্র একটা ছবি দেখে আসছি। সে ছবির গল্প ছিল, এক জন ভদ্রলোকের একটিমাত্র মেয়ে···সেই মেয়ে একটি ছেলে রেখে মারা গেল। ছেলেটিকে বুকে নিয়ে বুড়ো দাদামশায় কোনো মতে শান্তি পেলেন, শক্তি পেলেন। তার পর সে-ছেলে এক বিদেশিনীকে বিয়ে করে বিদেশে চলে গেল। বুড়ো দাদামশায়ের কথা ভাবলো না ! দাদামশায়ের তখন কি-দুঃখ ! সে-দুঃখ কি-পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ছবিতে দেখিয়েছে !·· ছবি দেখে সলিলা কেঁদে সারা। আমি যত বোঝাই, সলিলা বলে, আমি চলে গেলে দাদু কি নিয়ে থাকবে ? কি করে দাদুর দিন কাটবে? আমিও সে-কথা ভাবছি, দাদু···

এ কথায় তারাচরণ রায় কি-স্বস্তি যে বোধ করিলেন ! তাঁর দুঃখ এমন করিয়া এরা ভাবে ? কিন্তু না, তাঁর এ দুঃখ-মোচনের কোনো উপায় নাই ! তাঁর জন্য এরা এ-বয়সে মিছা কেন দুঃখ পাইবে ?

তিনি বলিলেন—না দাদা, না দিদি, আমার জন্য দুঃখ করো না। সংসারে এ-বিদায়, এ-অদর্শন নিত্যকার ঘটনা। এ-ঘটনা সকলকেই বুকে নিতে হয়। আমি যাবো···নিশ্চয়। মাঝে-মাঝে ওখানে গিয়ে তোমাদের দেখে আসবো। নিত্য-দিন এখানে বসে তোমাদের মঙ্গল কামনা করবো, তোমরা সুখী হও···সুখে থাকো !··· তোমাদের ছেলেমেয়ে হবে। মেয়ে হলে বিয়ে দিয়ে সে-মেয়েকেও এক দিন চোখের আড়ালে পাঠাতে হবে তো !

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—আমার এক মাসিমা বলছিলেন, সলিলাকে আজ আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে। তাতে মা বললেন, না···বুড়ো দাদামশায়ের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছে···দুটো দিন সলিলা তাঁর কাছে থাকুক ! ও-ছাড়া দাদামশায়ের আর কে আছে !···কাল আমি নিশ্চয় আপনার কাছে আসবো দাদু। পরশুও আসবো। আমরা বেরুবো সেই পাঞ্জাব মেলে ! সলিলা কাল তার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিক্ !···তার পর ভাবছেন কেন, দাদু ? সলিলাকে দু'দিনে এমন স্মার্ট করে দেবো যে, শুধু আপনি কেন আমাদের দেখতে যাবেন···দেখবেন, সলিলা একলা হুট বলতে এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবে। আমি অবশ্য হুট্ বলতে আসতে পারবো না, হয় তো···পরের চাকরি ! জানি না, সে-চাকরিতে French leave মিলবে কি না···

গল্পে ও কৌতুক-হাস্যে বিদায়-ব্যথার জমাট ভাব কাটাইয়া স্বর্ণদ্যুতি বিদায় লইল ··ঘড়িতে তখন দশটা বাজিতেছে।

২৬

পরের দিন।

মনের দুঃখ মনে চাপিয়া তারাচরণ রায় কোমর বাঁধিয়া বীণার সঙ্গে মিলিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া বাঁধা-ছাঁদা করিতে লাগিলেন। ও-বাড়ী হইতে কিরণ আসিয়া সে-কাজে যোগ দিল।

বেলা প্রায় তিনটা···ডাকে একখানা চিঠি আসিল। সলিলার নামে চিঠি। খামের উপর কদর্য্য হাতের অক্ষরে নাম-ঠিকানা লেখা।

খাম হাতে লইয়া বীণার বিস্ময়ের সীমা নাই! এমন হাতের হরফে ঠিকানা—কে চিঠি লিখিয়াছে?

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। তিন-পাতা চিঠি। হাতের অক্ষর খামে-লেখা অক্ষরের অনুরূপ। চিঠিতে সম্বোধন দেখিয়া বীণার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চিঠির তলায় যে-নাম লেখা···

দেখিবামাত্র দিনের আলো যেন দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল! কোনো মতে কিরণ এবং তারাচরণের দৃষ্টি এড়াইয়া চিঠিটা লইয়া বীণা আসিল পাশের বারান্দা পার হইয়া নিরালা একটা ছোট ঘরে। এ-ঘরে রাজ্যের ছেঁড়া লেপ-তোষক-বালিশের পাহাড় ডাঁই হইয়া আছে। এ-ঘরে বড়-একটা ঢুকিবার প্রয়োজন কাহারো হয় না।

এ-ঘর সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবিয়া বীণা চিঠি পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে—

কল্যাণীয়াসু

বীণা

ক'দিন আগে তোমাকে দেখিয়াছিলাম। ঘটার বিবাহে কনে সাজিয়া ফুল-দিয়া-সাজানো মোটরে চড়িয়া বরের পাশে বসিয়া নূতন শ্বশুর বাড়ীতে চলিয়াছ!

গোলমালের মধ্যে তখন কোনো কথা কহি নাই। কে জানে, যদি কেহ ধরিয়া প্রহার দেয়!

তার পর কাল সন্ধ্যার সময় দেখি মোটর হইতে নামিয়া বরের সঙ্গে সিনেমায় চলিয়াছ। সিনেমার দ্বারে ঠায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। সিনেমা দেখিয়া তোমরা বাহির হইলে। তাহার মধ্যে ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করিয়া সব বৃত্তান্ত জানিয়া লইয়াছি।

ড্রাইভারের মুখে শুনিলাম, তুমি না কি অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক তারাচরণ রায়ের একমাত্র পৌত্রী! তার মনিবের ছেলে বিলাত-ফেরত, স্বর্ণদ্যুতি রায়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়াছে। তোমার বর তোমাকে লইয়া কাল এলাহাবাদে যাইবে—বড় সরকারী চাকরী করিতে।

তুমি আমার মেয়ে বীণা—তারাচরণ রায়ের নাৎনী সলিলা সাজিয়াছ! আর এত কাল তোমাকে আমি কোথায় না খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি!

তোমার এই বুদ্ধি আর সাহস দেখিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইতেছে। হ্যাঁ, আমার মতন বুদ্ধি, বিদ্যা এবং সাহস পাইয়াছ!

একবার মনে করিয়াছিলাম, তোমার পরিচয় দিয়া তোমাকে কাড়িয়া আনি। তার পর মাথায় সুবুদ্ধি জাগিল! ভাবিলাম, না, একে আমার দুরবস্থা চলিয়াছে—তোমাকে লইয়া কোথায় যাইব? তার উপর যদি তুমি আমার কথা না শোনো, আমার যে-দুর্দ্দশা, সেই দুর্দ্দশা থাকিয়া যাইবে···দুর্দ্দশা কখনো ঘুচিবে না। তার চেয়ে বিবাহ হইয়া যাক—বড়লোকের নাৎনী, বড়লোকের বৌ—তখন তুমি আমার হাতের মুঠায় থাকিবে। আমারো আর কোনো দুর্দ্দশা থাকিবে না। এই কথা ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

আজ চিঠি লিখিতেছি, তার কারণ তুমি এলাহাবাদে চলিয়াছ, তাই তোমাকে জানাইয়া দিলাম, আমি আছি। বাঁচিয়া আছি এবং তোমাকে পাইয়াছি! আমার দুর্দ্দশার একশেষ! একটা মোটরের কারখানায় তেল-কালি মাখিয়া মিস্ত্রীর কাজ করিতেছি। মাহিনা পাই মাসে পঁচিশ টাকা। কষ্টের সীমা নাই। তুমি এত টাকার মালিক, আর আমি কি-দুঃখে তেল-কালি মাখিয়া কষ্ট সহিব, বলিতে পারো?

এখন আমি কি করিব, জানিতে চাই। তোমার সঙ্গে এলাহাবাদে যাইব? না, আমার জন্য ভালো রকম মাসহারার ব্যবস্থা করিবে?

আমার ঠিকানা ১২ নম্বর বাস্তু হালদার লেন, কালীঘাট। এই ঠিকানায় কাল সকালে যেন তোমার চিঠি পাই। না পাইলে ষ্টেশনে যাইব। ইতি

আশীর্ব্বাদক তোমার পিতা

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী

বীণার পায়ের তলায় পৃথিবী দুলিয়া উঠিল! দিনের আলোর উপর কে যেন কালো পর্দ্দা ঢাকিয়া দিল! চারিদিকে জমাট অন্ধকার!

বীণার মনে হইল, এ অন্ধকারে সে যেন পৃথিবী ছাড়িয়া কোন্ অন্ধ পাতালে পড়িয়া গিয়াছে! চেতনাও যেন লোপ পাইয়াছে!···

চেতনার উন্মেষ হইলে সে দেখে, অন্ধকার সরিয়া আবার দিনের আলো এবং তার হাতে চিঠি!

চিঠি তাহা হইলে সত্য! শ্রীপতি তার দেখা পাইয়াছে এবং দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মতো আবার তাকে সে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চায়!

হায় রে সে ভাবিতেছিল, এত দিন পরে পুরানো সব-কিছু ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিবে! এখানে আসিয়া বেশ ছিল···কিন্তু যে দিন সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে শ্রীপতিকে দেখিয়াছিল

চকিতের মতো, সে-দিন হইতে অতীতকে অবলম্বন করিয়া মনে আতঙ্ক-বাষ্প আবার উদয় হইয়াছে! এত-বড় সহর…কোথায় কখন্ থাকিবে শ্রীপতি, যদি তাকে দেখে…দেখিয়া কি করিবে, কি যে না করিবে, এই ভয়ে সারাক্ষণ সে কাঠ হইয়া থাকিত। সে-ভয় এমন যে, বেচারী তারাচরণ রায়ের স্নেহের কুলে বসিয়াও সারাক্ষণ মনে হইত, এ কূলটুকু বিপদের পারাবারে যদি ডুবিয়া যায়, সে তখন কোথায় থাকিবে! শুধু থাকা-যাওয়ার কথা নয়…এই তারাচরণ রায় সব হারাইয়া, সব চুকাইয়া বসিয়াছিলেন! মিথ্যার জোড়াতালি দিয়া তাঁর সেই হারানো-চুকানোর উপর বীণা তাঁর বুকখানাকে আবার যে-ভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছে… বীণার এ মিথ্যা ছলনা জানিতে পারিলে ব্যথা আরো কত-গুণ হইয়া তাঁর বুকে বাজিবে! সে ব্যথায় বিধুর-চিত্ত তারাচরণ রায় যদি বলেন, তোর কাছে কোনো অপরাধ করি নাই তো, কেন তুই এত-বড় মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইয়া…আমার সঙ্গে এ-প্রতারণা কেন করিলি?

নিজের নৈরাশ্য, নিজের সর্ব্বনাশের ব্যথার চেয়ে বৃদ্ধ তারাচরণের ব্যথা অনেকখানি তীব্র গভীর হইয়া বীণার বুকে বিঁধিতে লাগিল—হাজার-হাজার তীক্ষ্ণ তীরের মতো…

বাহিরে পৃথিবী তার নির্বিকার গতিতে ঘুরিয়া চলিয়াছে …পত্র-পল্লবের গায়ের উপর হইতে রৌদ্র-কিরণ ঐ সরিয়া-সরিয়া চলিয়াছে…পথে লোকজনের কলরবে শ্রান্তির সুর মিশিতে সুরু করিয়াছে…আকাশের বুকে যে-সব পাখী এতক্ষণ নিশ্চিন্ত-মনে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তারা আবার এই মাটীর পৃথিবীর পানে, পৃথিবীর গাছপালার পানে ফিরিয়া চাহিতেছে…

অপরাহ্ণ ঘনাইয়া আসিলেও জীবনের স্পন্দন ঠিক আছে…সে স্পন্দন থামিবার কোন লক্ষণ কোনো দিকে নাই। সে-ই শুধু নিস্পন্দ কাঠের পুতুল! কি করিবে, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাও নাই! যে-অপরাধ করিয়াছে, এখন আর তা সংশোধন করিবার উপায় নাই, সাহসও নাই!

ওদিক্ হইতে কিরণের কণ্ঠে আহ্বান শুনা গেল—সলিলা…সলিলা…

সর্ব্বনাশ! কিরণ যদি জানিতে পারে? আর স্বর্ণদ্যুতি? এ-দুদিনে স্বর্ণদ্যুতির কাছে কি স্নেহ, কি প্রীতি সে পাইয়াছে! ইহাকেই বলে ভালোবাসা!…গল্পে-উপন্যাসে যে-ভালোবাসার কথা পড়িয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া থাকিত…যে-ভালোবাসা নিজেকে ভুলিয়া প্রিয়জনের তৃপ্তি চায়…

এ ছলনার কথা শুনিলে স্বর্ণদ্যুতি কি বলিবে? সে কি করিবে?

বীণার দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল!

কিরণ আবার ডাকিল—সলিলা…অ সলিলা…

স্বর এই দিকে আসিতেছে…

চিঠিখানা চট্ করিয়া সেমিজের ফাঁকের মধ্য দিয়া বুকে গুঁজিয়া বীণা আসিয়া দাঁড়াইল সামনের ছোট ছাদে।

কিরণ ছাদে আসিল। কহিল—খুব মেয়ে যা হোক! বরের জন্য মন কেমন করছে বুঝি? তাই ও-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এখানে তারি প্রতীক্ষা-রত!

কষ্টে নিশ্বাস চাপিয়া বীণা চাহিল কিরণের পানে।

কিরণ দেখিল, বীণার দুই চোখে জল!

মমতা হইল। কাছে আসিয়া বীণাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল—কাঁদছিস্?

এ প্রশ্নে বীণা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল!

কিরণ বলিল—এখানকার জন্যে মন কেমন করছে?

বীণা কিরণের বুকে মুখ গুঁজিল।

কিরণ বলিল—আমারো কান্না পাচ্ছে সলিলা… যত দিন দেখিনি, দুঃখ ছিল না, ভাই। দেখা হয়ে জানাশুনা হয়ে এ কি যাতনা, বল্ তো? তোর যেমন, আমারো তেমনি!

একটা নিশ্বাস…নিশ্বাস ফেলিয়া কিরণ বলিল—তোর তবু একটা সান্ত্বনা এই যে, বরের সঙ্গে যাচ্ছিস্। নতুন বন্ধু, নতুন ভালোবাসা, নতুন জায়গা, নতুন ঘর। সেই যে-গান আছে…সে-গানটা কাল থেকে যেন আমার মনে গেঁথে আছে!

যে যায়…চলে যায়…
যারা থাকে,—
তাদের মতন সে কি ব্যথা পায়?
যে যায়,—সে যায় নব-নব বিশ্বে
নূতন প্রীতির কূলে…নূতন নূতন দৃশ্যে…

কিন্তু না, কাঁদিস্‌নে ভাই…দাদু ওদিকে গুম্ হয়ে আছে!

দাছুকে কি বললুম, জানিস? বললুম, চলো দাছু, আমরা তিন জনে একটু বেড়িয়ে আসি···মাঠ ঘুরে, গঙ্গার ধার ঘুরে, লেক ঘুরে একবার তোর বরের বাড়ীতেও যাবো। তার পর এখানে ফিরবো···কেমন?

বাহিরে? বাহিরে সেই পথ! বীণা শিহরিয়া উঠিল! কে জানে, বাহিরে ঐ পথের উপর হয় তো দাঁড়াইয়া আছে সেই দুর্বৃত্ত শ্রীপতি···

ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বীণা বলিল—আমার কিছু ভালো লাগছে না কিরণ। আমি কোথাও যাবো না। তার চেয়ে আমরা তিন জনে যদি চুপ করে ঘরে বসে থাকি আজ? সে-ঘরে আর-কেউ আসবে না···শুধু আমরা তিন জনে থাকবো!

কিরণ কহিল—বেশ। দাছুকে তাই বলি। এসো সলিলা, দাছুর সঙ্গে গল্প করবে। দাছু ডাকছে।

বীণাকে লইয়া কিরণ আসিল তারাচরণের কাছে··· বলিল—না দাছু, কোথাও যাবো না। সলিলা কাঁদছিল। সলিলা বলছে, তিন জনে শুধু এক-ঘরে চুপ করে বসে থাকবো···সে-ঘরে আজ আর-কেউ আসবে না।

এ-কথায় বীণার মনের গভীর দুঃখের আভাস পাইয়া তারাচরণ রায় ব্যথাতুর হইলেন। তিনি বলিলেন—তাই হবে দিদি। এসো তুমি আমার কাছে···

সন্ধ্যার পর স্বর্ণদ্যুতি আসিয়া দেখা দিল।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—মনে করো না দাছু, এ-কালের ছেলে বলে আমি খুব নির্লজ্জ···

এ কথার অর্থ না বুঝিয়া তারাচরণ রায় স্বর্ণদ্যুতির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কিরণ বলিল,—বুঝতে পারছো না দাছু, ভূমিকা করছেন! এর পরেই প্রথম পরিচ্ছেদে হবে সলিলাকে নিয়ে একবার বেরুবো! তার পর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওঁদের বাড়ীতে সলিলাকে নিয়ে ওঁর বাসর-জাগরণ!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—এ-কালের ছেলেদের চেয়ে এ-কালের মেয়েদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ—এ-কথা ভেবে অহঙ্কার বোধ করলেও কথাটা সত্য নয়!

কিরণ বলিল,—তার মানে।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—তার মানে, আপনি পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণে মস্ত ভুল করলেন! আমি বলছিলুম, আমি নিজে যেচে এখানে আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতে করতে আসিনি! মা আমাকে পাঠিয়ে দিলে। বললে, বুড়ো দাদামশায় কত দিন তোদের দু'জনকে কাছে পাবেন না—আজ তোরা দু'জনে অর্থাৎ আমি এবং আমার এই নবোঢ়া বধূ সলিলা···আমরা এইখানে দাছুর কাছে থাকবো। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে সখী সেজে আমাদের সে-বাসরে বা আসরে গান গাইতে পারেন—

দু'জনে দেখা হলো মধু-যামিনী রে।

ভ্রূভঙ্গী-সহকারে কিরণ বলিল,—আস্পর্দ্ধার কথা শুনচো দাছু! ওঁরা যেন থিয়েটারের সেই হুসেন-মর্জ্জিনা···ওঁরা বসবেন সিংহাসনে আর আমি ঘাগরা-পরা বাঁদী নীচেয় দাঁড়িয়ে গান গাইবো, চাঁদ-চকোরে অধরে-অধরে পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে!···বয়ে গেছে আমার থাকতে! ওঁরা কাল মজা করে চলে যাবেন, আর আমরা ওঁদের সে-মজাকে আরো জমজমাট করে তুলবো! বটে! আমি সে বান্দা নই মশাই!

এই কৌতুক-হাস্য-কলরবে বীণার মনের উপর হইতে পাথরের ভার যেন সরিয়া যাইতেছিল! বীণা ভাবিল, কোনো মতে যদি কালিকার রাত্রি পর্য্যন্ত সময়টুকু নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে একদিন সুবিধা করিয়া স্বর্ণদ্যুতিকে সব কথা সে খুলিয়া বলিবে। এখনি একদিন নয়! সে-একদিন অনেক দিন পরে···স্বর্ণদ্যুতি যখন বীণার মনের পরিচয় পাইবে···সম্পূর্ণ পরিচয়···তখন! তার পর বলিবে দাছুকে!

অনেক দিন পরে সে-একদিন কবে আসিবে ঠাকুর!

স্বর্ণদ্যুতিকে পাশে পাইয়া রাত্রিটা কোনো মতে কাটিয়া গেল। চোখে ঘুম নাই। কত কথা মনে হয়! সেই সঙ্গে ভয়-সংশয় আশা-নিরাশা···

পরের দিনটাও ভয়ে-ভয়ে কাটিল। ডাকে যদি আবার একখানা চিঠি আসে?

কিম্বা সশরীরে শ্রীপতি আসিয়া যদি দাছুর সঙ্গে দেখা করে?

কিন্তু চিঠি আসিল না! শ্রীপতিও আসিয়াছে বলিয়া জানা গেল না।

সন্ধ্যার পর তাড়া-হুড়া···বিষম কোলাহল। তার পর ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করিয়া গাড়ী···

গাড়ীতে বসিয়া বীণা ভয়ে-ভয়ে সবার অলক্ষ্যে পথের পানে চাহিল। না, শ্রীপতি নাই!

ষ্টেশন।

সেকণ্ড-ক্লাশ কামরা। ছোট কুপে। দু'খানি মাত্র বার্থ। সে দু'খানির একটায় সে থাকিবে, অপরটিতে স্বর্ণদ্যুতি।

তারাচরণ রায় বীণাকে ছাড়িতে চান না! গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। স্বর্ণদ্যুতি প্লাটফর্ম্মে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে কথা কহিতেছিল।

বাঁশী বাজিল। এবার গাড়ী ছাড়িবে।

তারাচরণ কহিলেন,—আসি দিদি।

তিনি নামিলেন। স্বর্ণদ্যুতি গাড়ীতে উঠিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—পৌছেই টেলিগ্রাম করো দাদা। সামনের হপ্তাতেই দেখো, তোমাদের হনি-মুনে এই বুড়ো দাদু রাহুর মতো গিয়ে দেখা দেবে!

হাসিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—সে-ভয় দেখাবেন না দাদু। আপনি গেলে আমাদের হনি-মুন ষোল-কলায় পরিপূর্ণ হবে!

গাড়ী চলিতেছে। বীণা জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আছে। ঐ দাদু···

কিন্তু একটু-দূরে···ঠাকুর, ঠাকুর···ও যে শ্রীপতি! এখানে আসিয়াছে! [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কন্যা-কুমারী

ত্রি-ধারা আসিয়া প্রয়াগে মিশিয়া ত্রিবেণী তীর্থ হ'লে
কন্যা-কুমারী তীর্থ নেহারি বর্ণিব কিবা ব'লে?
অতি সামান্য বিদ্যা এবং বুদ্ধি ধারালো নয়,
দীনহীন শুধু কাব্যটুকু বই কিবা আর পরিচয়?

পুচ্ছ থাকিলে, উচ্চ কণ্ঠে তুচ্ছ করিয়া সব
যেতাম গাহিয়া, গগন বাহিয়া উঠিত আত্ত রব!
সাগরের সাথে উপসাগরের হয়েছে মিলন বটে
ভূগোলেও এই কথাটা যে হায় মধুর হইয়া বটে!
জল-পুরাণের স্থল-পুরাণের পুরানো বার্ত্তা ভুলে
কেমনে কন্যা-কুমারী তোমার মহিমা যাই মা ভুলে!
তোমারে দেখিলে পুঁথির পাতার বিদ্যা ফুরায়ে যায়
বৃথা-পণ্ডিতী করি দিয়া ইতি নেহারি শিশুর প্রায়!
নেহারি বিরাট নীলের সায়র দশ দিক্ জুড়ে আছে—
পূব-সাগরের উপসাগরের রূপ-সাগরিকা নাচে!
ইরাণী ওড়্না উড়ায়ে আরব-সাগর এসেছে চ'লে
এই ভারতের মহাসাগরের প্রসারিত মা'র কোলে!
ভারত-মাতার দু'টি কূল হ'তে দু'টি ফুল যেন ভেসে
মিলিত হেথায় হিন্দু এবং মুসলমানের বেশে!
উপরের নীল আকাশ হইতে আশীষ ঝরিছে তায়
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-নীলিমা দশ দিশি ভরি' ভায়!

*   *   *   *

দশ দিশি ভরি' মহা-মহিমায় বিশালতা করে খেলা
এই কুমারিকা অন্তরীপের বালু নহে বালু-বেলা!

কুমারী-কন্যা উমারই সজ্জা লুটায় সিন্ধু কূলে
কজ্জল আর সিন্দুর রাগে হিন্দুর মন ভুলে!
মনে ভাবে মাতা ঐ বুঝি মেয়ে লভেছে ইষ্টদেবে
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে উৎসুক মনে মেনকা সুখী তা' ভেবে!
ব্যগ্র আঁখির দৃষ্টি বাড়াতে ব্যাহত না হ'তে পারে
জলধি হইতে গগন অবধি অবাধ রেখেছে তারে!
অম্বুধি আজো কম্বু-নিনাদে শম্ভুরে যেন ডাকে
মাঙ্গলিকের আনুসঙ্গিকে আরতি সাজায়ে রাখে!
সিত বালুবেলা আতপান্নের পরমান্নের থালি
কন্যা-কুমারী তাপসী উমারই সে যেন অর্ঘ্য-ডালি!
কলিযুগ এসে পড়েছে বলিয়া শূলীর রুদ্ধ গতি
এ কলির শেষ হবে বলি' দিন আজিও গণিছে সতী!
দিন গণা শেষ হয়েছে কি দেবি?
বল না ক'দিন বাকি?
সেই সুদিনের তরে কত দিন আর অপেখিয়া থাকি?
তোমার তখন শুভ-সুলগন—মহা-তপস্যা-শেষে
শিবের অঙ্কে উঠিবে কুমারী সধবা বধূর বেশে!
সেই সুদিনের তরে দু'দিনের দুখে না দুঃখ কহি—
মানুষের ভীড়ে দেবতা হারায়ে ব্যর্থ অর্ঘ্য বহি!

আমারো জীবনে ছড়ায়ে গিয়াছে মাঙ্গলিকের থালি,
আশে-পাশে জল করে ছলছল ধূ-ধূ করে শুধু বালি!

শ্রীরূপগুপ্ত বর্ম্মা।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

গত এক মাসে সংঘটিত ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে যুদ্ধের অবস্থা এখনও বৃটেনের অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনী উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিলেও বৃটিশ জাতির স্বগৃহে জার্ম্মাণীর আক্রমণ-আশঙ্কা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল। জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক ফরাসী নৌবহর ও ফরাসী নৌঘাঁটী ব্যবহারের সুবিধা লাভের ফলে ভূমধ্যসাগর তথা আফ্রিকার সামরিক অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হইবার আশঙ্কা এখনও বিদূরিত হয় নাই। সমুদ্রবক্ষে জার্ম্মাণী বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজের ভীষণ ক্ষতি করিতেছে; বরং সম্প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার প্রাবল্যই লক্ষিত হইতেছে। কূটনীতিক্ষেত্রে বৃটেন যেরূপ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লাভ সম্বন্ধে ক্রমেই নিঃসন্দেহ হইতেছে, সেইরূপ জার্ম্মাণীও এখন পর্য্যন্ত সোভিয়েট রুশিয়ার সাহায্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। জার্ম্মাণীর প্রভাবাধীন অঞ্চলে এখনও তাহার প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

আফ্রিকার যুদ্ধ—

গত অক্টোবর মাসে তৎকালীন বৃটিশ সমরসচিব মিঃ এন্থনী ইডেন্ আফ্রিকায় গমন করিয়া ইটালীকে কঠোর আঘাত করিবার যে বিরাট পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথমে জেনারেল ওয়াভেলের বাহিনী যে-দিন উত্তর-পশ্চিম মিশরে প্রতিপক্ষকে আঘাত করিয়া সর্ব্বপ্রথম বিজয় লাভ করে, সেই দিন হইতে আফ্রিকায় যুদ্ধের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার পর, বৃটিশ-বাহিনী ক্রমে সিদি-বারাণী, সল্লাম, কাপুজো দুর্গ, বার্দ্দিয়া, তব্রুক এবং ডার্ণা অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি লিবিয়ার সর্ব্বপ্রধান ইটালীয় নৌ ও বিমানঘাঁটী বেনঘাজী বৃটিশ-বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জেনারেল ওয়াভেলের সাফল্যের প্রধান কারণ—বৃটিশ স্থলসৈন্যের সহিত বৃটিশ নৌ ও বিমানবাহিনীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। ভূমধ্য-সাগরে বৃটিশ নৌবাহিনীর একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত; বৃটিশ সৈন্য যখন সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তখনই এই নৌবাহিনী ঐ লক্ষ্যস্থলের প্রতি অবিরাম গোলা বর্ষণ করিয়া স্থলসৈন্যের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। বৃটিশ বিমানবাহিনীর তৎপরতার ফলেও স্থলসৈন্যের কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন কেন্দ্রে ইটালীয় বাহিনী আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া শত্রুকে প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিয়াছে। অবশেষে যখন ঐ সকল দুর্গের পতন ঘটিয়াছে, তখন বহুসংখ্যক ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে। বেন্ঘাজীতে ইটালীয় বাহিনী এই ভাবে শত্রুকে বাধা দিতে চেষ্টা করে নাই; অবস্থা আয়ত্ত-বহির্ভূত হইবামাত্র তাহারা পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল।

লিবিয়া অঞ্চল ব্যতীত আফ্রিকার অন্যান্য রণক্ষেত্রেও বৃটিশ-বাহিনী বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। এরিত্রিয়ায় তাহারা এগরদাৎ এবং বেরেন্তু অধিকার করিয়াছে; এই অঞ্চলে ইটালীয় বাহিনী ক্রমেই পশ্চাদপসরণ করিতেছে। আবিসিনিয়ায় গণ্ডারের দিকে বৃটিশ-বাহিনী ইটালীয় সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার সৈন্য ডুকানা সীমান্তে শত্রুর রাজ্যে ১০ মাইল প্রবেশ করিয়া ইটালীয়দিগের দুইটি ঘাঁটী অধিকার করিয়াছে। ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ডেও বৃটিশ-বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

আফ্রিকার উল্লিখিত রণক্ষেত্রগুলিতে ইটালীর পরাজয়ে ও পশ্চাদপসরণে মনে হয় যে, উত্তর-পশ্চিম মিশরে এবং লিবিয়ায়



উত্তর-আফ্রিকায় শত্রুর প্রতীক্ষায় আরব সৈন্য

ইটালীয়দিগের শোচনীয় পরাজয় সমগ্র ইটালীয় বাহিনীর প্রতি প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ-প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়া আফ্রিকার সহিত ইটালী যদি অবাধ সংযোগ স্থাপনে সমর্থ না হয়, এবং উত্তর-আফ্রিকায় যুদ্ধের অবস্থা যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে আফ্রিকার কোথাও সত্বর যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে মুক্তিকামী হাবসীদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। গত পাঁচ বৎসর কাল হাবসীগণ যে শুভ

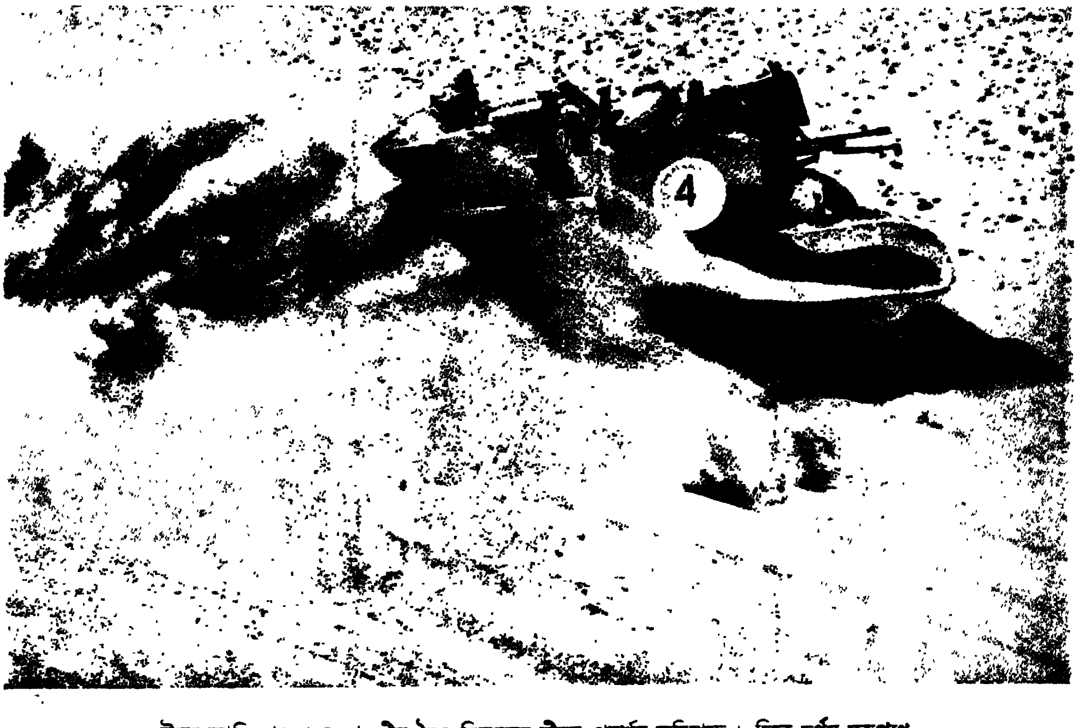
মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছিল, এত দিনে তাহা সমুপস্থিত; আন্তর্জাতিক বিপর্য্যয়ের ফলে তাহাদিগের মুক্তির স্বপ্ন এখন সফল হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। গত বৎসর জুন মাসে ইটালী যুদ্ধে লিপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই ভূতপূর্ব্ব হাবসী সম্রাট হাইলে-সেলাসী তাঁহার হৃতরাজ্যের সন্নিকটে আসিয়া পড়েন। তদবধি তাঁহার অবস্থানক্ষেত্র ও গতিবিধি-সম্পর্কে অধিক সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছিল যে, তিনি খার্টুমে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং তাঁহার অনুগত হাবসী সর্দ্দারদিগের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজগণ রাজনীতিক ও সামরিক প্রয়োজনে ইটালীয়দিগের বিরুদ্ধে হাবসী জাতির অভ্যুত্থান ঘটাইবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছে; হাইলে সেলাসী তাহাদিগের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়াছেন। একটি বৃটিশ সামরিক মিশন আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিয়া মুক্তিকামী হাবসীদিগকে শিক্ষা দান করিতেছে। গত ১৫ই জানুয়ারী হাইলে সেলাসী সুরক্ষিত বৃটিশ বিমানে আবিসিনিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন; মুক্তিকামী হাবসীগণ তাঁহার নিকট হইতে নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন—গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া অধিকৃত হইবার পর এই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ কদাচিৎ প্রকাশিত হইলেও এই কথা গোপন নাই যে, হাবসীদিগের গরিলা যুদ্ধের ফলে ইটালীয়দিগকে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ, প্রধান প্রধান নগর ও রেলপথের বাহিরে—বিশেষতঃ পার্ব্বত্য অঞ্চলে—ইটালীর অধিকার বিস্তৃত হয় নাই।

গ্রীক্-ইটালীয় যুদ্ধ—

গ্রীক্-ইটালীয় যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় গ্রীক্ সেনাপতি জেনারেল প্যাপাগসের বাহিনী যেরূপ ক্ষিপ্রগতি অগ্রসর হইতেছিল, তাহা এক্ষণে মন্দীভূত হইয়াছে। গত এক মাসে ক্লিমুরা অধিকারই গ্রীক্ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাফল্য। যদিও প্রতিদিন গ্রীক্ সৈন্যের সাফল্যের সংবাদ পরিবেশিত হয়, তবু তাহারা যে নূতন নূতন স্থান অধিকারে সমর্থ হয় নাই, তাহা মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীয়মান হয়। গত জানুয়ারী মাসে ইটালী এলবেনিয়ার সৈন্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছে; বিভিন্ন স্থানে ইটালীয় বাহিনী প্রতি-আক্রমণও করিয়াছে। অবশ্য গ্রীসের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ইটালীর এই প্রতি-আক্রমণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সে যাহাই হউক, উত্তর ও মধ্য-এলবেনিয়া হইতে ইটালীয়গণ এখনও বিতাড়িত না হইলেও গ্রীক্-ইটালীয় সজ্বর্ষের অবস্থা যে এখনও গ্রীসের অনুকূল, তাহা সত্য।

আফ্রিকা ও আলবেনিয়ার যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, ইটালীয় নৌ-বহরের অকৃতকার্য্যতা এবং ইটালীয় সৈন্য ও সেনানায়কদিগের অযোগ্যতা সমগ্র জগদ্বাসীকে বিস্মিত করিয়াছে। যে নৌবহরের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া মুসোলিনী ভূমধ্যসাগরকে 'ইটালীয় হ্রদে' পরিণত করিবার স্পর্দ্ধা করিতেন, তাহা কার্য্যকালে



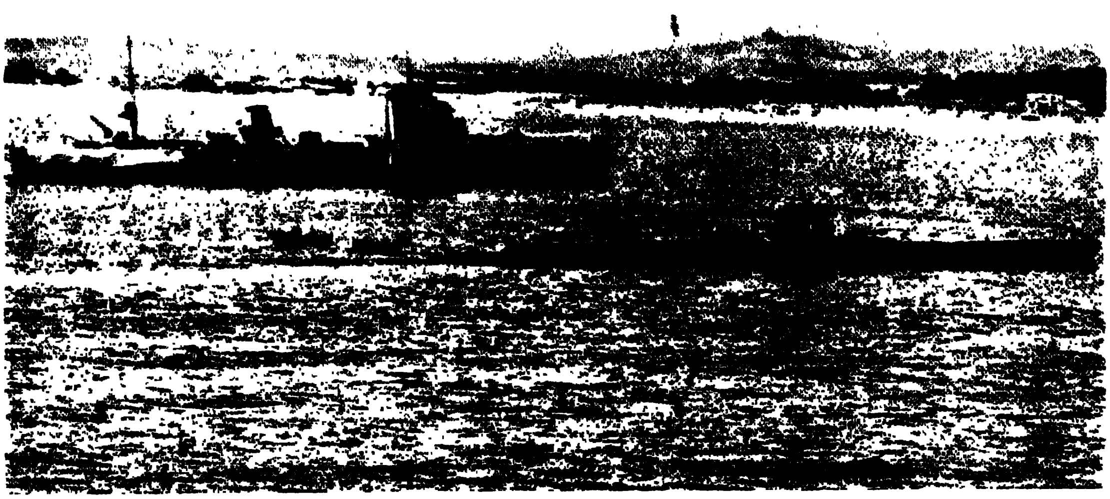
উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। চিত্রে দুর্গম মরুপথে ভারতীয় সৈন্য 'ব্রেন গান্' চালিত করিতেছে

বৃটিশ নৌবহরকে বাধা দানে সমর্থ হওয়া দূরে থাকুক, বিনা-যুদ্ধেই পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উত্তর-আফ্রিকার অবস্থা সম্বন্ধে হয় ত বলা চলে, তথায় জেনারেল ওয়াভেল্ সৈন্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়াছিলেন ; সেই আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির ছিল না। কিন্তু ক্ষুদ্র গ্রীস ? তিন মাস কাল বহু আয়োজন এবং নানারূপ বাহবাস্ফোট করিয়া গ্রীসের বিরুদ্ধে যখন প্রকৃত আক্রমণ আরম্ভ হইল, তখন সীমান্ত অতিক্রমণের পরই ইটালীয় বাহিনী যেন ভূত দেখিয়া পলায়ন করিল! ইটালীর সামরিক আয়োজনের এই অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য সমগ্র বিশ্বের নিরপেক্ষ দর্শকদিগকে যেরূপ বিস্মিত করিয়াছে, জার্ম্মাণীকেও সেইরূপ নিরাশ করিয়াছে। বৃটেনের সমর-শক্তির কতকাংশকে মধ্য ও অদূর প্রাচীতে আবদ্ধ রাখিবার জন্য, এবং ভূমধ্যসাগরে নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জার্ম্মাণী তাহার মিত্র ইটালীর প্রতি নির্ভর করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইটালীর প্রতি এই দায়িত্ব অর্পণ করিয়া জার্ম্মাণী হয় ত তদনুসারে তাহার ভবিষ্যৎ সমর-পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিল। ইটালীর অযোগ্যতার জন্যই জার্ম্মাণী তাহার পরিকল্পনা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে ইটালীর উদ্ধারের জন্য জার্ম্মাণীর সাহায্য প্রয়োজন। অথচ একাধিক রণক্ষেত্রে আপনাকে নিয়োজিত করা জার্ম্মাণীর রণনীতি-বিরুদ্ধ। গত মহাযুদ্ধে কৈশরের কৃত ভুল যাহাতে পুনরায় না হয়, সে-জন্য হিটলার এইবার অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। পোল্যাণ্ড ও নরওয়ের অভিযান শেষ হইবার পর কেবল সামরিক কারণেই একসঙ্গে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্ ও লাক্সেমবার্গ আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার পর, ফ্রান্সের যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে মিটিবার পূর্ব্বে হিটলার বৃটেনের প্রতি অবহিত হন নাই। জার্ম্মাণীর সমর-প্রচেষ্টা এইরূপ একাগ্র ভাবে এক দিকে নিয়োগ করিবার নীতি আজ ইটালীর দৌর্ব্বল্যের জন্য বিফল হইতেছে।

ইটালীর সাহায্যে জার্ম্মাণী—

ইটালীর দক্ষিণে অবস্থিত সিসিলি দ্বীপে সম্প্রতি জার্ম্মাণীর বিমান-বহর উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল বিমান মাল্টা হইতে আরম্ভ করিয়া সুয়েজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ করিতেছে। সিসিলি দ্বীপের অবস্থান-ক্ষেত্রটি সামরিক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমধ্য সাগরের ঠিক মধ্যস্থলে উহার অবস্থিতি ; ইহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া বৃটিশ জাহাজগুলি যাতায়াত করে। কেবল তাহাই নহে, সিসিলি ও টিউনিসিয়ার মধ্যবর্ত্তী প্যাণ্টেলেরিয়া দ্বীপটিও ইটালীর ; বস্তুতঃ, সিসিলি ও প্যাণ্টেলেরিয়ার মধ্য দিয়াই জাহাজ গমনাগমনের পথ। জার্ম্মাণ বিমানগুলি এই দুইটি দ্বীপ ব্যবহারের অধিকার পাওয়ায় ভূমধ্য-সাগরে জাহাজ গমনাগমনে তাহারা বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের মনোভাবের কথা মনে হয়। এখন ফ্রান্সে পের্তা-লাভাল বিরোধের অবসান হইয়াছে। হয় ত ইহা ঘনিষ্ঠ ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সহযোগিতার পূর্ব্বাভাস। সম্প্রতি ফ্রান্সের নৌসচিব এড্‌মির‍্যাল ডারলাঁ প্রস্তাব ও প্রতি-প্রস্তাব বহন করিয়া ভিসি ও প্যারিসের মধ্যে আনাগোনা করিতেছেন। এই সময় প্রবল জনরব প্রচারিত হয় যে, জার্ম্মাণী ফ্রান্সের নৌঘাঁটী ও নৌবহর ব্যবহারের জন্য ফরাসী মন্ত্রিসভার নিকট প্রত্যক্ষ দাবী উপস্থিত করিয়াছে ; এড্‌-মির‍্যাল ডারলাঁর সহিত জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের নাকি এই বিষয়েই আলোচনা হইয়াছে। এই জনরব যদি সত্য হয়, এবং ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ যদি জার্ম্মাণীর দাবীতে সম্মত হন, তাহা হইলে উহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে। প্রথমতঃ সিসিলি, প্যাণ্টেলেরিয়া ও টিউনি-সিয়ার বিজার্টা ঘাঁটী ব্যবহার করিয়া জার্ম্মাণী ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুর্ল্লঙ্ঘ্য "প্রাচীর" নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে। ইহা ব্যতীত, সার্ডিনিয়ার ক্যাগ্‌লিয়ারি ও ম্যাডালেনা ঘাঁটী, ফ্রান্সের টুলোঁ ও

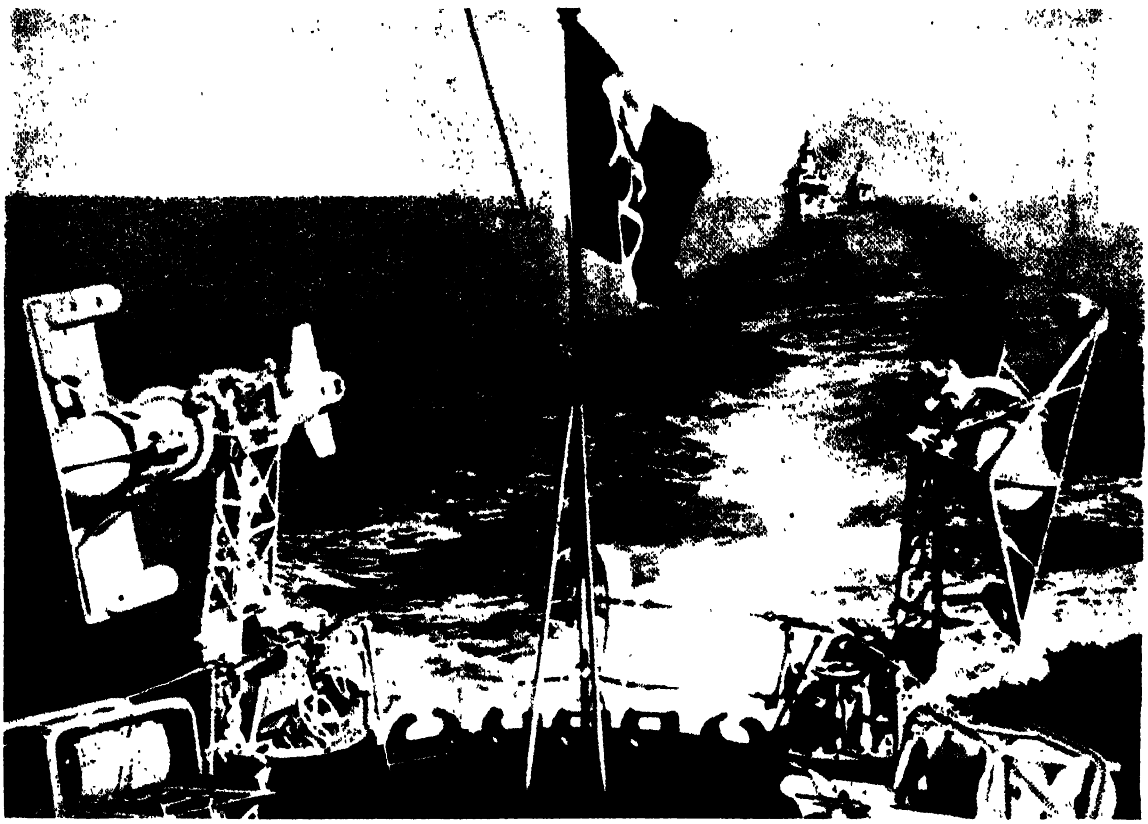


একখানি বৃহদাকার ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ার ও একখানি জার্ম্মাণ সাবমেরিণ

মার্সেলিস্ এবং এলজিরিয়ার ওরাণ ব্যবহার করিয়া নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয় পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিবে।

এই ভাবে পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে নেপ্‌লস্ হইতে টিউনিসিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণের প্রয়াস হইতে পারে। অবশ্য বিমানযোগে লিবিয়ায় সৈন্য প্রেরণ এখন অসম্ভব নহে; কিন্তু ঐ অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনীর সম্মুখীন হইবার উপযোগী গুরুভার সমরোপকরণ বিমানে প্রেরিত হইতে পারে না। পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হইলে নেপ্‌লস্ হইতে সমুদ্রপথে সৈন্য ও সমরোপকরণ টিউনিসিয়ায় প্রেরিত হইতে পারে। নেপ্‌লস্ হইতে টিউনিসিয়ার তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ করা নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের অসাধ্য হইবে, এবং তাহার ফলে আফ্রিকায় যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়াও অসম্ভব।

সম্প্রতি এই মর্ম্মে জনরব উঠিয়াছে যে, বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ সৈন্য ইটালীতে প্রবেশ করিয়াছে এবং জার্ম্মাণ সেনানায়কগণ ইটালীর সমর-বিভাগের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতেছে। এই জনরবের মূলে সত্য নিহিত থাকা অসম্ভব নহে। ফ্যাসিষ্ট-শাসিত ইটালীর সামরিক মর্য্যাদা এই ভাবে ভূলুণ্ঠিত হওয়ায় ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট দল ও তাহার নেতার প্রভাব নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই ফ্যাসিষ্ট দল যদি ক্ষমতাচ্যুত হয়, তাহা হইলে ইটালীর পক্ষে বৃটেনের নিকট পৃথক্



ইটালীয় নৌবাহিনী; ইহারা বিনা-যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে

দূরত্ব সাড়ে তিন শত মাইল, এবং তথা হইতে লিবিয়ার রণক্ষেত্র প্রায় পাঁচ শত মাইল। জলে ও স্থলে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সহজ নহে।

ফরাসী নৌঘাঁটীর হস্তান্তর সম্পর্কিত জনরবের প্রতিবাদ করিয়া জেনারেল ওয়েগাঁ সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীকে বিজার্টা নৌঘাঁটী প্রদান-সম্পর্কে ফরাসী সরকারের সহিত জার্ম্মাণীর কোন আলোচনা হয় নাই। অবশ্য, জেনারেল ওয়েগাঁর এই বিবৃতি একমাত্র বিজার্টা সম্পর্কে; বিজার্টা ব্যতীত অন্য কোন ফরাসী ঘাঁটী হস্তান্তরিত হইবে কি না, তাহা এই বিবৃতি হইতে বুঝা যায় না। জার্ম্মাণী যদি ফরাসী নৌবহর ও ফরাসী ঘাঁটী ব্যবহারে অসমর্থ হয়, সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করাও অসম্ভব হইবে না। কাজেই ফ্যাসিষ্ট দলের ক্ষমতা রক্ষার জন্য জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীর অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক। ইহা ব্যতীত, গ্রীসে ও আফ্রিকায় যুদ্ধ-পরিচালনার ভার জার্ম্মাণ সেনানায়কদিগের হস্তে অর্পণ করাও সম্ভবতঃ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

আলবেনিয়ার যুদ্ধে জার্ম্মাণী যদি অগ্রসর হইতে চাহে, তাহা হইলে কোন্ পথে জার্ম্মাণবাহিনী আলবেনিয়ায় পৌঁছিবে, সে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, বহু জার্ম্মাণ সৈন্য ত্রিস্তে বন্দরে পৌঁছিয়াছে। এই ত্রিস্তে হইতে আড্রিয়াতিক সাগরপথে আলবেনিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্য প্রেরণের প্রয়াস হইতে

পারে। ইহা ব্যতীত, রুমানিয়াস্থিত জার্ম্মাণ সৈন্যও যুগোশ্লোভিয়ার পথে অগ্রসর হইতে পারে।

মধ্য-প্রাচীতে জার্ম্মাণীর সমর-প্রয়াস সম্পর্কে স্পেনের মনোভাব উপেক্ষণীয় নহে। স্পেনের জার্ম্মাণ-অনুরক্তি সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতীতে' বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। স্পেনের সেই মনোভাবের এখনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। অর্থনীতিক প্রয়োজনে স্পেন্‌কে নিরপেক্ষ রাখা হিট্‌লার যখন আর সুবিধাজনক মনে করিবেন না, তখন তাহাকে তিনি স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহার ফলে, জিব্রল্টরের নিরাপত্তা নষ্ট হইতে পারে; আট্‌লাণ্টিকে বৃটিশ জাহাজ আক্রমণ সম্পর্কেও জার্ম্মাণী অধিকতর সুবিধা পাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, জার্ম্মাণ-প্রভাবান্বিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র স্পেন এখনও বৃটেনের অবরোধ-ব্যবস্থার বহির্ভূত।

জার্ম্মাণীর সমর-প্রচেষ্টা—

সম্প্রতি বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞগণ এই প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতি সত্বর জার্ম্মাণী বৃটেনে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনে প্রয়াসী হইবে। মার্কিণ নৌ-সচিব কর্ণেল নক্স এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী মনোযোগ সহকারে আব্‌হাওয়ার অবস্থা লক্ষ্য করিতেছে; আগামী দুই মাস হইতে তিন মাসের মধ্যে বর্ত্তমান যুদ্ধের চরম পরিণতি ঘটিবার সম্ভাবনা। ক্যানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জী কিং আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এইরূপ পরিণতি আশঙ্কা করেন। লর্ড হ্যালিফ্যাক্সও মনে করেন যে, জার্ম্মাণীর পক্ষে এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা সম্ভব নহে।

বর্ত্তমানে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের "ইজারা ও ঋণ দান বিল" তথা বৃটেনকে সাহায্যদান-সম্পর্কিত বিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার বিবেচনাধীন। এই সময় জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বৃটেন আক্রমণের আশঙ্কা সম্পর্কে কর্ণেল্ নক্স সুর ধরিবামাত্র সেই সুর চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহাতে স্বভাবতঃ মনে হয়, ইজারা ও ঋণ দান-সম্পর্কিত বিলটি যাহাতে সহজে মার্কিণী আইন সভার বৈতরিণী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তদুদ্দেশ্যে ইচ্ছা করিয়া এই বিষয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

সে যাহাই হউক, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বৃটেন্ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা এখনও প্রবল রহিয়াছে। বিশেষতঃ, হিটলার যদি ইতঃপূর্ব্বে মধ্য-প্রাচী ও অদূর-প্রাচীতে অভিযান আরম্ভ করিবার কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইটালীর শোচনীয় পরাজয়ে তাহা বিফল হইয়াছে। কাজেই, এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত করিতে প্রয়াসী হওয়াই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, শীতের প্রচণ্ডতা এখন হ্রাস পাইয়াছে; আব্‌হাওয়ার অবস্থা আক্রমণ-পরিচালনের অনুকূল। তাহার পর, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবার যে নীতি গ্রহণ করিতেছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বৃটেনকে জার্ম্মাণীর চরম আঘাত করা প্রয়োজন।

গত ৩০শে জানুয়ারী হিটলার বার্লিনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অতি সংযত ভাষায় তিনি শান্তির কথা বলিয়াছেন। বৃটেনের সহিত তাঁহার যে কোন বিরোধ ছিল না এবং উপনিবেশ-সংক্রান্ত মতদ্বৈধও অবিলম্বে মীমাংসার কথা যে তিনি বলেন নাই, তাহা এই বক্তৃতারও তিনি পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এই বক্তৃতায় বৃটেনের সামরিক শক্তিকে উপহাস, আমেরিকাকে ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির সমাবেশও আছে। গত জুলাই মাসে ঠিক এই সুরে হিটলারের এক বক্তৃতার পর বৃটেনে প্রবল বিমান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। হিট্‌লারের এই বক্তৃতা বৃটেনকে তাঁহার চরম আঘাতের পূর্ব্বাভাস হওয়া অসম্ভব নহে।

বৃটিশ নৌবহর ও রক্ষিবাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া অবিলম্বে বৃটেনে সৈন্য অবতরণ করা সম্ভব হউক বা না হউক, জার্ম্মাণী বৃটেনের শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট করিবার জন্য বর্ত্তমানে অত্যন্ত তৎপর হইয়াছে। জার্ম্মাণী এখন বৃটেনের বেসামরিক অধিবাসীর প্রতি নির্ব্বিচারে বোমা-বর্ষণের নীতি একরূপ ত্যাগ করিয়াছে; প্রধানতঃ,



জার্ম্মাণ বিমানের প্রতীক্ষায়

বৃটেনের শিল্পকেন্দ্রে তাহার বিমান আক্রমণ চালিত হইতেছে। সমুদ্রবক্ষেও জার্ম্মাণীর তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি মার্কিণী নৌসচিব কর্নেল নক্স এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—

The British has not been able to find any successful convoy method of combating the increased German submarine activity.

অর্থাৎ জার্ম্মাণ সাব-মেরিণের ক্রমবর্দ্ধমান তৎপরতা প্রতিরোধের জন্য বৃটিশ এখনও সাফল্যজনকভাবে তাহার বাণিজ্যপোতগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার পর, বৃটেনের জাহাজ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ রোণাল্ড ক্রসের এক বক্তৃতায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আশঙ্কাজনক। মিঃ ক্রস্ বলিয়াছেন যে, শত্রুর জাহাজ আটক করায় এবং অন্যান্য মিত্রশক্তির জাহাজ ব্যবহারে এত

দিন বৃটেনের জাহাজের ক্ষতি পূর্ণ হইতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই ভাবে ক্ষতিপূরণ হওয়া আর সম্ভব নহে। মিঃ ক্রস্ বলিয়াছেন—

The losses are now in excess of replacements and Britain is faced for the time-being with a diminishing merchant fleet and would have a hard time.

অর্থাৎ এখন যেরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা পরিপূরণের ব্যবস্থার অতিরিক্ত। বৃটেনের বাণিজ্য-পোত এখন ক্রমহ্রাসমান, বৃটেনের কঠোর সময় আসিতেছে।

ফ্রান্সের ঘাঁটীগুলি ব্যবহারের সুবিধা পাইয়া জার্ম্মাণী এখন কিরূপে বৃটেনের বাণিজ্যপোত আক্রমণ করিতেছে, তাহা গত পৌষ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে আলোচিত হইয়াছে। গত ১৪ই জুলাই হইতে ২৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে জার্ম্মাণীর আক্রমণে বৃটেনের ১৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টন বাণিজ্য-জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে; কোন কোন মাসে ৩ লক্ষ টনেরও অধিক জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে।

বৃটেনের রক্ষা-ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়া বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে সৈন্য অবতরণ করান যে সহজসাধ্য নহে, ইহা জার্ম্মাণী বুঝে। এই জন্য সে ঐ চরম ব্যবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করিতে চাহে না। ইতোমধ্যে বৃটেনের শিল্পক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া এবং বৃটেনের সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া সে বৃটিশ জাতিকে অর্থনীতিক বিষয়ে বিপন্ন করিতে চাহে। বিশেষতঃ, আমেরিকা হইতে প্রেরিত সাহায্য যাহাতে অবাধে বৃটেনে পৌঁছিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে সে সাবমেরিণে সমুদ্রবক্ষ কণ্টকিত করিয়া রাখিতেছে।

জার্ম্মাণী ও রুশিয়া—

গত জানুয়ারী মাসে রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে এক অর্থনীতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার পর, বৃটেনের অর্থনীতিক সংগ্রাম-সম্পর্কিত মন্ত্রী মিঃ হিউ-ড্যাল্টন বৃটিশ কমন্স সভায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, রুশিয়া তাহার নিজ দেশের পণ্য জার্ম্মাণীতে রপ্তানী করিতেছে, এবং আমেরিকা হইতে পণ্য আমদানী করিয়া ঐ সকল পণ্যের অভাব পূর্ণ করিতেছে। মিষ্টার ড্যাল্টন্ জানান যে, তূলা, গম, পিত্তল, তামা, পেট্রোল প্রভৃতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণে রুশিয়ায় রপ্তানী হইতেছে। নূতন অর্থনীতিক চুক্তিতে রুশিয়া না কি জার্ম্মাণীকে গম ও পেট্রোল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধসম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার নীতি ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার আলোচিত হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া জার্ম্মাণীর সমরশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধ ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে চাহে। এই জন্য জার্ম্মাণীর যে সকল বস্তু প্রয়োজন, তাহা সরবরাহে তাহার আপত্তি ত নাই-ই, বরং এই সুযোগে কিছু লাভ করিবার জন্যও সে আগ্রহান্বিত। বর্ত্তমান যুদ্ধে যুযুধান পক্ষদ্বয়ের কেহই তাহার প্রিয় নহে; যুদ্ধ অধিক কাল চলিবার ফলে বিভিন্ন দেশে অন্তর্ব্বিপ্লব সৃষ্ট হইয়া যদি কমুনিষ্ট মতবাদ প্রসারের সুযোগ ঘটে, তাহা হইলেই সোভিয়েট রুশিয়ার আনন্দ।

মিঃ ড্যাল্টন জানাইয়াছেন যে, এইরূপ পরোক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য জার্ম্মাণীতে প্রবেশ-সম্পর্কে ওয়াশিংটনে আলোচনা চলিতেছে। যত দূর মনে হয়, এই আলোচনার ফলে রুশিয়ায় মার্কিণ পণ্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই। মার্কিণ বণিকগণ ব্যবসায়ের ক্ষতি কিছুতেই সহ্য করিতে চাহেন না। তাঁহারা যে সহজে রুশিয়ায় পণ্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণে সম্মত হইবেন, তাহা মনে হয় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার এই বিষয়ে উৎসাহী হইলেও বড় বড় ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধি রিপাবলিক্যান্ দলের পক্ষ হইতে হয় ত প্রবল আপত্তি উত্থিত হইবে। মার্কিণী ধনিক-দিগের প্রবল অর্থ-পিপাসার কথা জার্ম্মাণী ও রুশিয়া উত্তমরূপে জানে; কাজেই, ওয়াশিংটনের আলোচনায় তাহারা কেহই হয় ত উৎকণ্ঠিত নহে।

রুমানিয়ায় বিদ্রোহ—

জানুয়ারী মাসের শেষভাগে রুমানিয়ার আয়রণ-গার্ড দলের বিরুদ্ধবাদিগণ বিদ্রোহী হইয়া ক্ষমতা হস্তগত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। তাহাদিগের সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে; জেনারেল এণ্টনেস্কু রুমানিয়ার সেনাবিভাগের সহায়তায় কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন। এই বিদ্রোহীদিগের মধ্যে না কি বহু কমুনিষ্ট ছিল।

প্রথমেই মনে হইবে, বিরুদ্ধবাদী আয়রণ-গার্ড এবং কমুনিষ্টগণ এই সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ভুল করিয়াছিল; কারণ, রুমানিয়া বর্ত্তমানে সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর প্রভুত্বাধীন। জার্ম্মাণীর ন্যায় সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিরূপে সফল হইবে? এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, কার্য্যতঃ রুমানিয়া জার্ম্মাণীর প্রভুত্বাধীন হইলেও এখনও উহা একটি স্বতন্ত্র দেশ। ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জার্ম্মাণী যদি হস্তক্ষেপে উদ্যত হইত, তাহা হইলে স্বভাবতঃ ঐ বিষয়ে সোভিয়েট রুশিয়াও হস্তক্ষেপ করিতে চাহিত। বিরাট রুশবাহিনী বেসারেবিয়া অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট ছিল; কাজেই, রুমানিয়ার বিদ্রোহীদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক হইত না। লক্ষ্য করিবার বিষয়, রুমানিয়ার বিদ্রোহ-দমনে জার্ম্মাণ সৈন্য কোনরূপ সাহায্য করে নাই; তাহারা কয়েকটি সরকারী ভবন অধিকার করিয়াছিল মাত্র। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয়, রুমানিয়ার এই বিদ্রোহ হয় ত সময়োচিতই হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় বিদ্রোহীদিগকে কেবল রুমানিয়ার সরকারের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; বেসারেবিয়ার সোভিয়েট বাহিনীর দিকে চাহিয়া জার্ম্মাণী এই বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হয় নাই। বিদ্রোহিগণ যদি রুমানিয়া সরকারের সহিত সাফল্যজনক ভাবে সংগ্রাম করিতে পারিত, তাহা হইলেই তাহাদিগের উদ্দেশ্য হয় ত সিদ্ধ হইত।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব—

বৃটেনকে সাহায্যদান সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সমরোপকরণ ইজারা ও ঋণদানের যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার বিষয় গত পৌষ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে আলোচনা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্টের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা দাবী করিয়া একটি বিল মার্কিণী আইন সভায় আনীত হইয়াছে। এই বিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার (নিম্নতর পরিষদ) পররাষ্ট্রীয় কমিটীতে গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে উহা সেনেটের (উচ্চতর পরিষদ) পররাষ্ট্রীয় কমিটীর বিবেচনাধীন। বিলখানি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় গৃহীত হইবার সম্ভাবনাই

অধিক। এই বিল অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

জাপানের দুশ্চিন্তা—

জাপান তাহার নব-ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিকল্পনা লইয়া মহা সমস্যায় পড়িয়াছে। চীনের যুদ্ধের অবসান না হইলে জাপানের পক্ষে অন্যত্র মনোযোগী হওয়া অসম্ভব। অথচ, এই যুদ্ধ অবসানের কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি জাপানের প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ী চীনের যুদ্ধ-সম্পর্কে সকল দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়া বলিয়াছেন যে, এত কাল এই যুদ্ধ চলিবার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। ইহার পর, জাপানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মাৎসুয়োকা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা নান্‌কিংএর ওয়াং-চে-উইয়ের সরকারকে স্বীকার করিলেও চুংকিংএর সরকারকে অস্বীকার করেন না। প্রিন্স কনোয়ীর ব্যক্তিগত ভাবে চীন যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ এবং মিঃ মাৎসুয়োকার এই উক্তি সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত বলিয়া মনে হয় না।

জাপান এখন চীনের যুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহান্বিত নহে; পার্ব্বত্য অঞ্চলে মার্শাল চিয়াং-কাই-সেকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যে আর লাভ নাই, তাহা সে বুঝিয়াছে। উত্তর-চীনের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল পূর্ব্বেই তাহার কুক্ষিগত হইয়াছে। এই অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা লাভ করিলে সে সানন্দে চুংকিং সরকারের সহিত মীমাংসা করিতে পারে। জাপানের এই মনোভাবের কথা স্মরণ রাখিলে প্রিন্স কনোয়ী ও মিঃ মাৎসুয়োকার উক্তির মর্ম্মার্থ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। প্রিন্স কনোয়ী চুংকিং সরকারের উদ্দেশে বলিতে চাহেন যে, ব্যক্তিগত ভাবে একমাত্র তিনিই চীনে যুদ্ধ চলিবার জন্য দায়ী। চুংকিংএর কর্তৃপক্ষ যদি আপোষমূলক মনোভাবের পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন, এবং জাপানের অবশিষ্ট মন্ত্রিবর্গের সহিত চুংকিং কর্তৃপক্ষের আপোষ আলোচনা চলিতে পারিবে।

মিঃ মাৎসুয়োকার উক্তি আরও স্পষ্ট। জাপানের পক্ষ হইতে বহুবার নান্‌কিংএর সরকারকে চীনের একমাত্র বৈধ সরকার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহাকে স্বীকার করাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস হইয়াছে। চুংকিং সরকারকে জাপান প্রকাশ্যেই অস্বীকার করিয়াছে; অথচ আজ মিঃ মাৎসুয়োকা চুংকিং সরকারকে স্বীকার করিলেন! জাপান আজ আমেরিকার মনোভাব দেখিয়া বুঝিয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরে প্রসার লাভের জন্য চেষ্টা করিলে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য। কাজেই, চীনের সঙ্ঘর্ষ মিটাইবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে চীন-জাপান আপোষ মীমাংসায় মধ্যস্থতা করিবার আশাতেই জাপানের মিত্র জার্ম্মাণী ওয়াং-সরকারকে স্বীকার করে নাই—চুংকিং সরকারকেই চীনের একমাত্র বৈধ সরকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তাহার পর, আজ জাপান কোন্ উদ্দেশ্যে চুংকিং সরকারকে স্বীকার করিতেছে, তাহা বুঝিতে নিশ্চয়ই বিলম্ব হয় না।

তবে ইহা সত্য যে, জাপান আজ ব্যাপকতর স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া চীনের সহিত মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইলেও স্বাধীনতাকামী চীনারা তাহার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন না। বিশেষতঃ, প্রতীচীর দুইটি জাতি এখন বুঝিয়াছে যে, জাপানের শ্যেন-দৃষ্টি হইতে তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে চীনের সমর-শক্তি রক্ষা করা এবং উহা বর্দ্ধিত করা একান্ত প্রয়োজন।

থাইল্যাণ্ড-ইন্দোচীন সংঘর্ষ—

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দো-চীনের সীমান্ত-বিরোধ গত জানুয়ারী মাসে প্রকৃত সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই যুদ্ধের বিরতি হইয়াছে; জাপানের মধ্যস্থতায় মীমাংসার চেষ্টা চলিতেছে।

গত ২৫শে ডিসেম্বর থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লং বিপুলসংগ্রাম থাইল্যাণ্ডের দাবী সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেই থাইল্যাণ্ড-ইন্দোচীনের সঙ্ঘর্ষের প্রকৃত কারণ বুঝা যাইবে। ঐ সময় লং বিপুলসংগ্রাম বলেন—

Thailand is prepared to shake hands with France to-morrow and forget the 75 year-old fued connected with territory of half a million square miles gradually annexed by France and now called Indo-China on condition that two small bits of thinly populated territory on this side of the Mekong river are retroceded thus giving Thailand a natural frontier.

অর্থাৎ মেকং নদীর এই পার্শ্বে অল্পসংখ্যক নর-নারী-অধ্যুষিত দুইটি ক্ষুদ্র অঞ্চল থাইল্যাণ্ডকে প্রত্যর্পণ করিয়া যদি তাহাকে স্বাভাবিক সীমান্তরেখা পাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে থাইল্যাণ্ড আগামী কল্যই ফ্রান্সের সহিত করমর্দ্দন করিতে প্রস্তুত। ক্রমে ক্রমে থাইল্যাণ্ডের ৫ লক্ষ বর্গ-মাইল স্থান অধিকার করিয়া ফ্রান্স কর্ত্তৃক ইন্দো-চীন গঠিত হওয়ায় গত ৭৫ বৎসর কাল যে বিরোধ চলিতেছিল, তাহা বিস্মৃত হইতে থাইল্যাণ্ড প্রস্তুত।

থাইল্যাণ্ড-ইন্দোচীন বিরোধের কারণ যদি একমাত্র ইহাই হয়, তাহা হইলে ইহাতে গুরুত্ব আরোপ করিবার কিছুই নাই। তবে সম্প্রতি থাইল্যাণ্ডের প্রতি জাপানের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। এই বিরোধে যদি জাপানের প্ররোচনা থাকে, তাহা হইলে উহা আশঙ্কার বিষয়।

ৰ।

সাহিত্যের সংজ্ঞা

ভাব অনুভূতি চিন্তা লভে যবে পূর্ণ পরিণতি।
তখন সাহিত্য ছাড়া প্রকাশের নাহি অন্য গতি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগ

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গত ১৩ই মাঘ অমানিশায় সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে, সকলের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ গৃহত্যাগ করিয়া রোগজীর্ণ দেহে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না ! তিনি রুগ্নদেহে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আদালতে উপস্থিত হইতে অসমর্থ, অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচরের জন্য এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। গত ৩রা মাঘ হইতে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া পরিবারস্থ সকলের সহিত বাক্যালাপ, এমন কি, দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন। দিবসে তিনি একবার কিঞ্চিৎ ফল, ও দুগ্ধ ভিন্ন কিছু খাইতেন না। এল্‌গিন রোডস্থ ভবনে তাঁহার বাসের প্রকোষ্ঠে প্রসারিত পর্দ্দার বাহিরে তাঁহার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রাখিয়া দেওয়া হইত। কোন জিনিষের প্রয়োজন হইলে তিনি ঘণ্টা বাজাইতেন, অথবা কাগজে সেই দ্রব্যের কথা লিখিয়া পর্দ্দার বাহিরে তাহা রাখিয়া দিতেন। ইদানীং তিনি ধর্ম্মসাধনায়, এবং গীতা ও চণ্ডী-পাঠে সর্ব্বদা রত থাকিতেন। রবিবার রাত্রিতে তিনি কোন্ সময়ে গৃহত্যাগ করেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। জানিতে পারা গিয়াছে, তিনি নগ্নপদে এবং অনাবৃত দেহে কেবলমাত্র একখানি ধুতি পরিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। পরদিন প্রভাতেই তাঁহার সন্ধান আরম্ভ হয়; কলিকাতায় ও তাহার সন্নিহিত প্রত্যেক মঠে, মন্দিরে, এবং শ্মশানঘাটে অনুসন্ধান করা হইলেও সকল চেষ্টা বিফল হয়। পণ্ডীচেরীর অরবিন্দ-আশ্রমে তিনি গমন করেন নাই। বেলুড়ের আশ্রমেও তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার বৃদ্ধা জননী এবং পরিজনবর্গও যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছেন।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সুভাষ বাবু কোথায় গিয়াছেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসাধ্য। যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁহারা অবগত আছেন, তিনি রাজনীতিক-পঙ্কিল জলে অবগাহন করিলেও বহু দিন হইতেই ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। সুভাষ বাবুর যে ধর্ম্মসংবেদনা ছিল, তাহা তাঁহার উক্তিতেই প্রকাশ। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে তিনি "My strange Illness" নামক যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি এই কথাই সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—

As I tossed in my bed at Jamadoba, by day and by night, I began to ask myself, by day and night, what would become of our public



শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

life when there was so much of pettiness and vindictiveness, even in the highest circles. My thoughts naturally turned towards what was my first love of life—the eternal love of the Himalayas. * * * * At times the call of the Himalayas became insistent.

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, যখন আমি জামাডোবায়

রোগশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম, তখন আমার মনে বার বার এই প্রশ্নই উদিত হইতেছিল যে, যখন আমাদের মধ্যে দেশহিতৈষণার কার্য্যে নিযুক্ত উচ্চতম স্তরের লোকদিগের মধ্যেও—সঙ্কীর্ণতা এবং প্রতিহিংসা-সাধনের প্রবৃত্তি এত দূর প্রবল, তখন আমাদের রাজনীতিক জীবনের পরিণাম কি ? আমার চিন্তা স্বভাবতঃই আমার প্রথম জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হইত। * * * সময়ে সময়ে এই আকর্ষণ অতি প্রবল হইত।—সুতরাং বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের রাজনীতি-ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ স্তরের লোকের মধ্যে যখন তিনি নক্কারজনক পঙ্কিলতা দর্শনে নিরাশ হইতেন, তখনই সংসারের মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাসের পথে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। বস্তুতঃ, সংসারের প্রতি বিরাগবশতঃই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মের প্রেরণা ভিন্ন কেহই এরূপ দুর্ব্বল দেহে অসুস্থ অবস্থায় মাঘের প্রচণ্ড শীতে এক-বস্ত্রে নগ্নপদে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতে পারে না। সুভাষ বাবুর রাজনীতিক মতের সহিত অনেক স্থলে আমাদের মতভেদ ছিল ; কিন্তু তথাপি মানুষ হিসাবে তিনি নির্ভীক, সরল ও অকপট বলিয়াই আমাদের ধারণা। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি বিফলমনোরথ হইলেও আশা করি, ধর্ম্মসাধন-ক্ষেত্রে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম্মসাধনার কথা অনেকেরই মনে পড়িবে। রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে তিনিও এই পথেই শান্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন ;—মুক্তির আস্বাদন পাইয়াছেন। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের চিরাকাঙ্ক্ষিত মুক্তির সহিত ইঁহাদের তপস্যালব্ধ মুক্তির পার্থক্য-নির্ণয়ের শক্তি সাংসারিক লোকের আছে কি না, জানি না।

কোন কোন ব্যক্তি এরূপ ইঙ্গিত করিতেছেন যে, সুভাষ বাবু ভারত হইতে ভারতের বাহিরে কোন দেশে চলিয়া গিয়াছেন। এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কারণ, তাঁহার গৃহে পরিত্যক্ত দ্রব্য-সামগ্রী দেখিয়াই মনে হয়, তিনি দশ দিনকাল হিন্দু-বিধানবিহিত ধর্ম্ম-সাধনকার্য্যে রত ছিলেন। ভারতবর্ষই ধর্ম্মসাধনের প্রশস্ত ক্ষেত্র ; সুতরাং আশা হয়, তিনি ভারতেই আছেন। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানার সহিত হুলিয়াও বাহির করিয়া ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন ; এবং তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবারও আদেশ হইয়াছে। আর একটি মামলা-সম্পর্কে আলিপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন। কিন্তু সুভাষ বাবু সর্ব্বপ্রকার বিপদ ও পার্থিব ক্ষতির জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই নূতন জীবনের কণ্টকময় সঙ্কটসঙ্কুল পথে যাত্রা করিয়াছেন, সুতরাং তিনি হয় ত ভাবিয়াছেন—সমুদ্রে যাহার শয্যা, তাহার আর শিশিরপাতে ভয় কি ? কিন্তু যে সকল বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছে—তিনি মামলায় শাস্তির ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, তাহারাই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অধিক অবিচার করিয়াছে। এই সন্দেহের বহু উর্দ্ধে তাঁহার স্থান।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক সম্মেলন

১৪ই মাঘ সোমবার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহা সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ভিষকভূষণ এই সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এই উপলক্ষে 'ধন্বন্তরী পতাকা' উত্তোলন করিয়াছিলেন। ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় তিন শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথম দিন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুত অনাথনাথ রায় এবং মূল সভাপতি তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন। উভয় অভিভাষণই সারগর্ভ হইয়াছিল। এই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধান প্রস্তাব এই যে, বঙ্গীয় মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির অনুযায়ী বঙ্গীয় সরকারের অনুমোদিত মেডিক্যাল কলেজগুলি হইতে উত্তীর্ণ চিকিৎসকগণ চিকিৎসকগণের প্রাপ্য সকল প্রকার অধিকার ও মর্য্যাদা পাইবেন, কিন্তু তাঁহারা (কবিরাজরা) পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসকগণের প্রাপ্য অধিকার ও মর্য্যাদার দাবী করিলেও তাহা পাইতেছেন না। এই সম্মেলনের মতে ঐ প্রকার বৈষম্য দূর করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালার বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে বোম্বাই প্রদেশের ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১০ আইনের ন্যায় একটি আইন প্রণয়ন করুন। জেনারেল কাউন্সিল এবং ষ্টেট ফ্যাকাল্টি অফ আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিন, কবিরাজ মহাশয়দিগের নির্ব্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া পুনর্গঠিত করা আবশ্যক, নতুবা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা ভিন্ন তিন বৎসর অন্তর 'রিনিউয়াল ফিস্' প্রদানের ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সম্মিলনের এই অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকদিগের সাধ্যাতিরিক্ত অনেক রোগই যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয়, অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু উপেক্ষায়, অনাদরে, এবং আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রসম্মত ঔষধ প্রস্তুতে আন্তরিক যত্নের অভাবে, বা অজ্ঞতা-নিবন্ধনও এই চিকিৎসার ক্রমেই অবনতি ঘটিতেছে। সেই জন্য মনে হয়, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-সম্মেলনের এই সকল দাবী বাঙ্গালা সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। ইহা উপেক্ষিত হইতেছে বলিয়া দেশের জনসাধারণের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে, এবং প্রকৃতই তাহা বাঙ্গালা সরকারের লজ্জার কারণ। আশা করি, সরকার এই সঙ্গত দাবীতে কর্ণপাত করিয়া শীঘ্রই এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। দ্বিতীয় দিন কবিরাজ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় কবিরাজ শ্রীযুত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ এই দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি উপসংহারে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য যে পরামর্শ দান করেন, কবিরাজ মহাশয়গণ নিশ্চিতই তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না; কারণ, ইহার উপর তাঁহাদের কল্যাণও যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

মন্ত্রিসভার সংস্কার

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার রাজনীতিক্ষেত্রে বঙ্গীয় নারী-সমাজের নেত্রীস্থানীয়া, এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্না মহিলা সদস্য। তিনি সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকারের প্রধান সচিব মৌলবী ফজলুল হক্ ছায়েব-বরাবর একখানি পত্র লিখিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, বাঙ্গালায় বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেছে না; সেই জন্য মন্ত্রিসভার সংস্কারসাধনের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।—শ্রীযুক্তা মজুমদারের এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী গত চারি বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালায় শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙ্গালা প্রদেশের শাসনকার্য্যের যে কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে, সে শক্তি কাহারও আছে কি? পাটের মূল্য ধার্য্য হইতে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার পর্য্যন্ত ছোট-বড় সকল কাজেই তাঁহারা জনসাধারণকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এই কয় বৎসরেই বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ শনৈঃ শনৈঃ কি ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। সুতরাং এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ তাঁহাদের কার্য্যে দেশের জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। কতকগুলি আইন এমন ভাবে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, তাহাতে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত সুপরিস্ফুট। কিন্তু আমরা জানিতে চাহি,—কি ভাবে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিলে এই দোষের নিরাকরণ হইতে পারে। কোন দুই-তিন জন সচিবের আসনে অন্য দুই-তিন জন সচিবকে স্থাপন করিলে এই দোষ তিরোহিত হইবে, এরূপ মনে হয় না। কারণ, এ কথা সত্য যে, এই সচিবমণ্ডলী কোন-একটা নীতির দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। সে নীতি তাঁহাদের দলেরই নীতি। লোক-পরিবর্ত্তনে যে দলের নীতি পরিবর্ত্তিত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। অতএব মৌলবী ফজলুল হক ছায়েব যদি শ্রীযুক্তা মজুমদারের প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলেও যে তাহাতে সুফল ফলিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? এ দোষ অপসারিত করিতে হইলে, মূলের ভুল সংশোধন করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—গরুর লেজ থাকিতে লেজের ক্ষত আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারত সচিবের উক্তি

কলিকাতার 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সার আল্‌ফ্রেড ওয়াটসন সম্পাদকীয় যোগ্যতাবলে সার খেতাব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সংপ্রতি তিনি ভারত সচিব মিষ্টার আমেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারত-শাসন সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এই কৌতূহল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কি ফরমায়েসী, তাহা অনুমান করা কঠিন; তবে মিষ্টার আমেরী তাঁহার নিকট মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা ভারতীয় ভাবানুসারে কিন্তু বৃটিশ জাতির মতানুসারে এবং স্বার্থসঙ্গত ভাবে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শাসনপদ্ধতি ভারতে প্রবর্ত্তিত করিতে সম্মত হইয়াছেন।"—ভাষার এমন প্যাঁচের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মর্ম্ম ভেদ করা অতি দুরূহ ব্যাপার! এই শাসনযন্ত্রটার স্বরূপ কিরূপ হইবে? উহা হইবে ভারতীয় ভাবের সহিত সঙ্গত, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে হইবে বৃটিশ জাতির মতানুরূপ, এবং বৃটিশ জাতির স্বার্থের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট। এই 'সোনার পাথর-বাটি'র বা 'কাঁঠালের আমসত্বের' কথা অনেকেই শুনিয়াছেন; এবার তাহার অস্তিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু তাহা যে কিরূপ পদার্থ, কেহ বুঝিতে পারিলেন কি? ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এই ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিধিনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রও (Constitutional monarchy) প্রতিষ্ঠিত ছিল, আবার গণতন্ত্রও বিরাজিত ছিল। তাহার নিয়মকানুন সমস্তই ভারতের স্বার্থলেশ-হীন মনীষী মুনিঋষিরাই রচনা করিতেন। সার্ব্বজনীন স্বার্থই তাহার লক্ষ্য থাকিত; এবং আধ্যাত্মিক সাধনার স্বাধীনতা রক্ষিত হইত। জনসাধারণের স্বার্থ সমঞ্জসীভূত করিয়া রক্ষা করাই ভারতের চিরানুসৃত ভাবধারা। তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বৃটিশ-মতানুযায়ী করিয়া এবং বৃটিশ-স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্থাৎ দুই নৌকায় চরণ স্থাপন করিয়া—ভারতীয় ভাবধারা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বৃটিশ পার্লামেণ্ট কি করিয়া ভারতের শাসনপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিবেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ভারত সচিব আবার বলিয়াছেন,—"বৃটিশ সরকার অতীত কাল হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতে শান্তিরক্ষা করিবার, এবং ভারতবাসীর কল্যাণসাধন করিবার দায়িত্ব লাভ করিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বৃটেনকে সেই সকল দায়িত্ব পালন করিতেই হইবে।"—উঃ, কি উদার বুলি!

তবে বর্ত্তমান বৃটিশ সরকার কাহার নিকট হইতে এই ডবল দায়িত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিতে আগ্রহ হয়। তাঁহারা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে এই রাজ্য পাইয়াছেন বা লইয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসক এবং পালক হিসাবে আদৌ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। সে দিকে তাঁহারা মনোযোগ দেন নাই, বা দিতে পারেন নাই। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিখ্যাত ইংরেজ ইতিহাস-লেখক জেম্‌স মিলই লিখিয়া গিয়াছেন,—

"Before tho period they had maintained the character of mere traders and by humility and submission, endeavoured to preserve a footing in that distant country under the native powers. We shall now behold them entering the lists of war and mixing with eagerness in the contests of princes." অস্যার্থ—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী 'স্রেফ্' বণিকোচিত স্বভাব বজায় রাখিয়া দেশীয় শাসকদিগের নিকট দীনতা ও বশ্যতা স্বীকারের সাহায্যে সেই দূরদেশে আপনাদের দাঁড়াইবার স্থানটুকু বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, এবং রাজগণের বিরোধে আগ্রহ সহকারেই মিশিতেছেন।—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে-কালে এ দেশের শাসনকার্য্যে বণিকসুলভ অযোগ্যতা প্রদর্শন করায় বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কোম্পানীর অনুসৃত নীতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, বিলাতের সকল দলের লোকই তাহা বুঝিয়াছিলেন। মিষ্টার আমেরী যদি মনে করিয়া থাকেন, এ দেশবাসীরা সে দিনের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে, এবং মিল, বার্ক প্রভৃতির রচনা এ দেশে অচল হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধি-পরিচালনায় বিরাট ভুল হইয়াছে। বৃটিশ সরকার সে সময়ে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষ

ভাবে রাজ্যপালন করিবেন, এইমাত্র দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবাণীতেই বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছিল। কোম্পানীর নিকট হইতে এই দায়িত্বই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য দায়িত্ব মিঃ আমেরীর উর্ব্বর কল্পনাপ্রসূত।

রণক্ষেত্রে খদ্দরের আদর

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, রণক্ষেত্রে সৈনিকদিগের ব্যবহারের জন্য ভারতের সমর বিভাগের কর্ত্তারা ধরপারওয়ার জিলায় গাঙ্গোরা আশ্রম হইতে হাতে-বোনা খদ্দর, পশমী কম্বল প্রভৃতি ক্রয় করিবেন, স্থির করিয়াছেন। করাচীর সরবরাহ বিভাগের দ্রব্যপরীক্ষক এবং সিন্ধু প্রদেশের মার্কেট-অফিসার এ সকল দ্রব্য দেখিবার জন্য শীঘ্রই তথায় যাইবেন। এইবার কি ভারতের তাঁতিরা ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিদের খানার টেবিলে স্থান পাইবে?

বড়লাটের ঘোষণা

কেন্দ্রীয় পরিষদের যে সকল কংগ্রেসী সদস্য এক বৎসরের অধিক কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, লর্ড লিন্‌লিথগো তাঁহাদের আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং নিজের ক্ষমতা-বলেই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ভারত সরকার অর্থাৎ ভারতীয় মন্ত্রি-মণ্ডলী এ সিদ্ধান্ত করেন নাই। অবশ্য, ভারত-শাসন আইনে বড়লাটের হস্তে এ-সব কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতাও দেওয়া আছে। আমাদের দেশেও কার্য্যবিশেষে খুড়ো কর্ত্তা হইয়া থাকেন। উহার নবম তপশীলে বিহিত হইয়াছে যে, যদি ভারতীয় আইন-সভার কোন সদস্য একাদিক্রমে দুই মাস কাল ভারতের বাহিরে থাকেন, অথবা আইন-সভার কার্য্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে বড়লাট ইচ্ছা করিলে তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। ইহাতে কংগ্রেসী দলের উপর, বিশেষতঃ, আইন-অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে বড়লাটের ও ব্যুরোক্রেসীর মনোভাব কি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই? ইহার পূর্ব্বে অনেক সদস্য ক্রমাগত কয়েক মাস ধরিয়া ব্যবস্থা পরিষদে অনুপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ চরম ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই; বরং এ-কথাও শুনা গিয়াছে যে, ঐ সকল সদস্য যে নির্ব্বাচক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, তাঁহারা ঐ সকল সদস্যকে অপসারিত করিতে চাহেন না বলিয়া দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে সদস্য-পদ হইতে অপসারিত করা হয় নাই। এই সকল কংগ্রেসী সদস্য যাঁহাদের ভোটে সদস্য-পদ পাইয়াছিলেন, এই সকল সদস্যের এবং কংগ্রেসের সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব কিরূপ, তাহা পরীক্ষা করাই কি বড়লাটের উদ্দেশ্য? পরীক্ষায় কংগ্রেসই জয়ী হইবে, এরূপ মনে করিলে কি ভুল হইবে?

কাপড়কলের অসুবিধা

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতে কলজাত বস্ত্র-শিল্পের প্রসার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবার বাঙ্গালায় কয়েকটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও এবার যুদ্ধের অজুহাতে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, তথাপি কাপড়ের পাড় প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত রঙ আর পাওয়া যাইতেছে না। এ-জন্য পাড়ওয়ালা ধুতি, বিশেষতঃ, নক্সাদার পাড়ওয়ালা শাড়ী প্রস্তুত করিবার বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে। এবার বঙ্গীয় মিলগুলির মালিক-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মিষ্টার বসু কতকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের হিড়িকে বিদেশ হইতে রঙ আমদানী করিবার অসুবিধা ঘটিতেছে সত্য; কিন্তু এ দেশে কি ভাল পাকা রঙ প্রস্তুত করা অসাধ্য? সীমন্তিনীরা কি পাকা রঙের শাড়ী পূর্ব্বে কখন ব্যবহার করেন নাই? যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিলে কি বাঙ্গালার সৌখিন সীমন্তিনীরা সাদা-পেড়ে শাড়ীতে সন্তুষ্ট থাকিবেন?

যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি

কংগ্রেসের কার্য্যসূচী অনুসারে যাঁহারা যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি করিতেছেন, তাঁহারা কি শাস্তি পাইবার যোগ্য? তাঁহারা যে ধ্বনি করেন, তাহাতে কি সরকারের কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা আছে? এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে এত দিন জনসমাজে আলোচনা হয় নাই; অথচ, যাঁহারা ঐরূপ ধ্বনি করিতেছেন, তাঁহারা আদালতে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই ভোগ করিতেছেন। সম্প্রতি মাদ্রাজের গুন্তুর নামক স্থানের সিভিলিয়ান (জয়েণ্ট)

ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার আর গ্যানেট এইরূপ এক মামলার বিচার করিয়া যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধবিরোধী ধ্বনিতে এমন কোন কথা নাই, যাহার জন্য এই ধ্বনি ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। উহার দ্বারা সরকারের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। উহা সরকারের বিরুদ্ধে বা যুদ্ধের প্রতিকূলে জনসাধারণকেও উত্তেজিত করিতেছে না। উহাতে সৈন্য-সংগ্রহের এবং সমর-ভাণ্ডারে অর্থদানের বিরোধী কোন কথা নাই।—এই যুক্তিতে তিনি অভিযুক্ত আসামীকে মুক্তিদান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, যাঁহারা যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি করিবার অভিযোগে ফৌজদারী হাকিমের বিচারে দণ্ডিত হইতেছেন, তাঁহাদের প্রায় কেহই আদালতে আত্ম-সমর্থন করেন না। কাজেই বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটরা বিনা-প্রতিবাদে খোস-মেজাজে এই ধ্বনিকারকদিগকে যথেচ্ছা দণ্ডদান করিতেছেন। বস্তুতঃ, একই 'অপরাধে' দণ্ডের মাত্রাভেদ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য করিবার যোগ্য না হয়, যদি উহাতে সরকার-পক্ষের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র নিজের মত প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত করায় কতকগুলি লোককে কারাগারে রাখিয়া ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া সরকারের লাভ কি? জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গ্যানেটির উক্ত সিদ্ধান্ত অন্য ম্যাজিষ্ট্রেটরা গ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্যও নহেন, কারণ, উহা হাইকোর্টের নজীর নহে। তবে যদি কেহ কংগ্রেস তথা গান্ধীজীর নির্দ্দেশে নিজ মত ব্যক্ত করে, তাহা হইলে সে আদালতে আত্মসমর্থন করিল না বলিয়া তাহাকে বেপরোয়া জেলে পুরিলে বা খোস-খেয়ালে তাহার অর্থদণ্ড করিলে সরকারের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে কি? বস্তুতঃ, এই যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনির মধ্যে কোন দোষাবহ কথা আছে কি না, তাহার সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিচার হওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে হয়। এতদ্ভিন্ন, এক যাত্রার পৃথক ফল হইবারই বা কারণ কি? যাঁহারা দণ্ড না পাওয়ায় পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা কি সরকারের কোন অনিষ্ট হইতেছে? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে কতকগুলি লোককে অভিন্ন কারণে কারাগারে পুরিবার সার্থকতা কি?

দুইটিতে আপত্তি

আসামে দুইটি আইন সভা আছে; অথচ আসাম প্রদেশটি ক্ষুদ্র। তাহার আয়ও অল্প। এত অল্প আয়ে ঐ প্রদেশের পক্ষে দুইটি আইন সভার ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। অর্থাভাবে আসামে হাইকোর্ট হয় নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ও হয় নাই। সেই জন্য আসামবাসীরা এই ডবল আইন সভার বিরোধী হইয়াছেন। আসাম ব্যবস্থা পরিষদে আসাম রাষ্ট্রীয় সভা তুলিয়া দিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আসাম রাষ্ট্রীয় সভা সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করে নাই; কারণ, কেহই নিজের অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহে না। কিন্তু তাহার উপর আর একটু কথা আছে। রাষ্ট্রীয় সভার সদস্যসংখ্যা মোট ২২ জন। এই সভার বক্তব্য এই যে, একেবারে ইহার বিলোপসাধন না করিয়া অন্ততঃ দশ বৎসর ইহাকে কাজ করিতে দেওয়া হউক। কি জন্য তথায় এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় সভাটি বজায় রাখা হইয়াছে, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি সাধারণ লোকের নাই। তবে এ কথা সত্য, আসামে অনেক শ্বেতাঙ্গ চা-কর আছেন; তাঁহারা ঐ প্রদেশবাসীদিগের সহিত আপনাদিগকে সকল বিষয়ে সমান স্বার্থবান্ বলিয়া মনে করেন না। এই উচ্চতর আইন সভায় অর্থাৎ আসাম রাষ্ট্রীয় সভায় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় দলে পুরু। এই সভার সাহায্যে তাঁহারা আপনাদের নিহিত স্বার্থ রক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আসাম-বাসীরা দুইটি আইন সভার ব্যয়ভার সহ্য করিতে পারুন আর নাই পারুন, বৃটিশ সরকার যাহা বুঝিয়া আসামের ঘাড়ে দুইটি আইন সভার ভার চাপাইয়াছেন,—তাহা নাকচ করিতে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। সুতরাং আসামবাসীদিগের চেষ্টায় কি ফল হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ

এবার পাটনা সহরে মেডিকো-লিগ্যাল সমিতির যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহার সভাপতি মহাশয় আদালতে

চিকিৎসক এবং ব্যবহারাজীবদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঐ দুই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়িগণের বিশেষ ভাবে পালন করাই কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন, আদালতে কোন মোকদ্দমায় উপস্থিত হইলে যে কোন উপায়ে মামলা জিতিব, এইরূপ মনোবৃত্তি কোন সম্প্রদায়েরই পোষণ করা উচিত নহে। যাহাতে সত্যই জয়যুক্ত এবং প্রকৃত ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, তাঁহাদের সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কথা সত্য। কিন্তু উকিলদিগের পক্ষে কোন্ মামলা সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তদ্বিরকারকরা অনেক সময় মামলা সাজায়, এবং উহা সাজাইয়া উকিলদিগকে মামলা বুঝাইয়া দিয়া থাকে। সে জন্য উকিলদিগের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে মামলার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কিন্তু চিকিৎসকদিগের পক্ষে তাহা নহে। তাঁহাদের যে কাজ, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে তদ্বিরকারকদিগের কুহকে পড়িয়া ভ্রান্ত-পথে চালিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। ইদানীং কতকগুলি ক্ষেত্রে চিকিৎসক স্বার্থের অনুরোধে রোগীর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই,—আদালতে এবং আদালতের বাহিরে তাহার কিছু-কিছু দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে। ইহা অনধিকারীকে বিদ্যাদানের ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সভাপতি মহাশয়ের এই কথা চিকিৎসক এবং ব্যবহারাজীবদিগের স্মরণ রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু স্মরণ থাকিবে কি?

পাকিস্তানের পূর্ব্বাভাস ও কংগ্রেস

জিন্না-প্রমুখ মুস্লিম লীগের সদস্যগণ যে পাকিস্থান প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই প্রস্তাব যে একেবারেই বিচারসহ নহে, তাহা এ দেশের সুধীবৃন্দ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। ভারতের কোন অঞ্চলেরই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণকে ইহার সমর্থন করিতে দেখা যাইতেছে না। হিন্দুস্থানে মুসলমান-সংস্কৃতির প্রবর্ত্তন এবং ভেদনীতি সুদৃঢ় করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের পরিচালক মিষ্টার গান্ধী এইরূপ সর্ব্বনাশকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একেবারেই 'স্পিকৃটি নট!' যেন মূক! গান্ধীজী বলিয়াছেন, পাকিস্থান-প্রস্তাব জাতীয়তার ঘোর বিরোধী এবং জাতির অবনতিজনক ব্যবস্থা হইলেও যত দিন মুসলমানরা ভ্রান্তির ফলে তাহা উপলব্ধি না করিতেছেন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে মৌন থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই গান্ধীজীর এইরূপ অদ্ভুত উক্তি শুনিয়া কে না বিস্মিত? যিনি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সত্যাগ্রহ করিতেছেন, তিনি এবং তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিরা একটা প্রস্তাব জাতীয়তার দারুণ বিরোধী এবং উগ্রভাবে অবনতিজনক, ইহা স্বীকার করিয়াও তাহার বিরুদ্ধে জুজুর ভয়ে আড়ষ্ট খোকার মত একটি কথাও বলিবেন না, এরূপ বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহাতে তাঁহাদের মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভ্রান্তির ফলে বা কুপরামর্শের প্রভাবে যাহারা ভুল বুঝে, তাহাদের ভ্রম হয় ত কালে ঘুচিতে পারে, কিন্তু যাহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছে, ভেদনীতি চালাইবার এবং অন্যের প্রাচীন মৌলিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত করিবার জন্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছে, তাহাদিগকে ইহা বুঝান মানুষের ত দূরের কথা, দেবতারও অসাধ্য। ডাক্তার আম্বেদকরকে তুষ্ট করিতে যাইয়া গান্ধী বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন,—এখন মিষ্টার জিন্নাকে তুষ্ট করিবার দুশ্চেষ্টায় তিনি সকল হিন্দুরই সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন! যাহা মিথ্যা, যাহা অনিষ্টকর, কোন মতেই তাহার প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পাকিস্থান প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার ফল কি হইবে, তাহা পাবনার ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল-বোর্ডের কার্য্য দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে। 'অমৃতবাজার' তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। গান্ধীজীর এই অদ্ভুত নীতির কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। কংগ্রেস যদি পাকিস্থান প্রস্তাব জাতীয়তা-গঠনের পরিপন্থী এবং উন্নতি-সাধনের পক্ষে প্রবল বাধাস্বরূপ হইবে, ইহা বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মুক্তকণ্ঠে এবং উচ্চৈঃস্বরে তাহার প্রতিবাদ করা একান্ত কর্ত্তব্য; নতুবা তাঁহাদের এই ব্যবহার ভণ্ডামি ভিন্ন আর কি মনে হইতে পারে?

মূল্যবৃদ্ধি ও যুদ্ধ

প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর হইতেই ভারতে সর্ব্বপ্রকার আবশ্যক দ্রব্যের

মূল্য দিন-দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। চিকিৎসার জন্য অত্যাবশ্যক ঔষধের, শিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ কলম নিব প্রভৃতির এবং জীবনধারণের প্রধান সম্বল খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিল! ধান, চাউল, গম, আটা, শাকসব্জী, কেরোসিন, তৈল, কাঠী-গণ্তি মূল্যের দিয়েশলাই, এমন কি, লবণ পর্য্যন্ত অধিক মূল্যে কিনিতে হইতেছে। সমাজের সর্ব্বস্তরের দরিদ্র-দিগের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে, লোকের আয় দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। সাহিত্যজীবীরাও দশ দিক অন্ধকার দেখিতেছেন; তাঁহাদের রুজির উপর ডাকমাশুলের চাপ দফায় দফায় বাড়িয়া উঠিয়াছে! মফস্বলে দরিদ্রলোকেরই বাস, তথায় হাহাকার ইহার মধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিল। চিনির দর চড়া, কিন্তু আখের দর নামিয়া যাইতেছে। পাটের দর কম, কিন্তু চটের ও থলের মূল্য ক্রমেই বাড়িতেছে। কলওয়ালারা পাট তেমন কিনিতেছে না। ফলে বাঙ্গালার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। এবার রোগের প্রকোপ যেমন অধিক, ঔষধের মূল্যও সেইরূপ চড়া। কাজেই য়ুরোপের যুদ্ধের তরঙ্গ বঙ্গের সুদূর পল্লীকেও আলোড়িত করিয়া-তুলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে —'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়!'

নিয়োগে আপত্তি

ভারতরক্ষী সৈন্যদলের কয়েকটি উচ্চপদে বাঙ্গালী এবং মাদ্রাজী নিযুক্ত হইয়াছে, এই অভিযোগে পঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদে কয়েক জন সভ্য সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া মাদ্রাজী এবং বাঙ্গালীদিগের বিরুদ্ধে প্রচুর শ্লেষ-বিদ্বেষ বর্ষণে পঞ্জাবী সিংহের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। এক জন সদস্য এমন কথাও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা এবং মাদ্রাজীরা দ্রুত ইংরেজী বলিতে পারে বলিয়াই যে তাহারা সমর বিভাগে উচ্চপদ পাইবে, ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। সরকার বাঙ্গালী এবং মাদ্রাজীদিগকে অসামরিক জাতি বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করায় পঞ্জাবী সিংহেরা তাহাদিগকে ফেরুপাল মনে করিয়াই কি এ-ভাবে দন্ত-বিকাশ করিতেছে? কিন্তু বাঙ্গালীর বীরত্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শোণিতের অক্ষরে লিখিত আছে—নূতন করিয়া তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। আর মাদ্রাজীদের বীরত্বের কাহিনী অল্প দিন পূর্ব্বে মাদ্রাজ-লাটের মুখেও পরিস্ফুট হইয়াছিল। পঞ্জাবী পরিষদের এই পরিবাদপটু বাহ্বাস্ফোটকারী সদস্যটির স্মরণ থাকা উচিত যে, গোঁয়াতুমিকে শৌর্য্য বলিয়া সুধীজনের ভ্রম হয় না। বর্ত্তমান যুগে সমরপরিচালনায় দৈহিক বল অপেক্ষা বুদ্ধিবলেরই অধিক প্রয়োজন। পঞ্জাবীদের বীরত্বের গৌরব কেহই অস্বীকার করিবে না,—যদিও হেমচন্দ্র বড়-দুঃখেই লিখিয়া গিয়াছেন কে "মুদ্‌কি মুলতান, করি খান-খান, শিখ-গলে দিল দৃঢ় নিগড়।" কিন্তু বিধাতা সে বীরত্বে তাহাদিগকেই একচেটিয়া অধিকার দান করেন নাই। অতএব পঞ্জাবী সদস্য মহাশয়ের রসনা একটু সংযত হইলেই শিষ্ট ও শোভন হইত।

বজেটের সময়

ইংরেজী ফেব্রুয়ারী মাস উপস্থিত। এই মাসেই ভারতের কেন্দ্রী সরকারের এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের বজেট বিভিন্ন ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করা হইবে। এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধ আরও জাঁকিয়া উঠিবে কি না, তাহা বুঝা কঠিন। এখন ভারতবাসীর মনে স্বতঃই আশঙ্কা জাগিতেছে, আবার বুঝি আয়কর এবং অতিরিক্ত লাভকর বৃদ্ধি করা হইবে। অল্প দিন পূর্ব্বে সার জিরেমী রেইসম্যান যখন অতিরিক্ত কর ধার্য্য করেন, তখন তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি এই দরিদ্র ভারতবাসীর স্কন্ধে আরও করভার চাপাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু দেশের যেরূপ অবস্থা, রপ্তানি বাণিজ্য যেরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে,—বহু পণ্যের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে দারিদ্র্যও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় আর ঐ সকল কর বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য কি না, ভারতের রাজস্ব-সচিব কি তাহা ভাবিয়া দেখিবেন না? বাঙ্গালায় ত পাট বিক্রয়ের সময় পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। চারি দিকে তপ্তশ্বাস! এদিকে রাজস্ব-বিভাগ কি মনে করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। বাঙ্গালার লোক এই দুর্দ্দিনে ফুকারিয়া কাঁদিতে না পারিলেও গুমরাইয়া মরিতেছে। এখন রাজস্ব-সচিব কি করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

মীক-গ্রেগরী রিপোর্ট

গত আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে ভারত সরকার আচম্বিতে ডক্টর টি-গ্রেগরী এবং সার ডেভিড মীককে মার্কিণ মুলুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। য়ুরোপের বহু দেশ এখন কার্য্যতঃ নাজি-সরকারের অধীন হওয়ায় ঐ সকল দেশে ভারতীয় পণ্য আর রপ্তানি হইতেছে না, সেই জন্য ভারতের প্রায় ৩০ কোটি টাকা বার্ষিক ক্ষতি হইতেছে। এই ক্ষতি পূরণের জন্য চেষ্টা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মার্কিণে ভারতীয় পণ্য চালান দিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভবপর কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করাই ভারত সরকারের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু দুই জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত সরকার এ দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ প্রয়োজন মনে করেন নাই, কিম্বা ইঁহাদের সহিত কোন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ পাঠাইবারও ব্যবস্থা করেন নাই। সেই জন্য এ দেশের লোকের মনে একটু অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহারা উভয়ে সম্প্রতি এই বিষয়ে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত কয় দফায় প্রকাশ করা যাইতে পারে,—

(১) এখন মার্কিণ জাতি সামরিক অস্ত্র-নির্ম্মাণে রত, এজন্য ইহাদের অনেক দ্রব্যেরই প্রয়োজন। ইহার ফলে মার্কিণের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই জন্য তথায় ব্যবহার্য্য পণ্যের টান বৃদ্ধি পাইবে। এই হিসাবে তথায় ভারতীয় পণ্যের টান কিছু বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

(২) ছাপা কাপড় এবং চাদরের প্রতি ঐ দেশের লোকের আকর্ষণ আছে। 'ভারতে প্রস্তুত' এইরূপ মার্কা থাকিলেই তথায় কতকগুলি জিনিষের কাট্‌তি হয়। জাপানীদিগের প্রতি অসন্তোষ নিবন্ধন কতকগুলি ক্রেতার নিকট ভারতীয় পণ্যের আদর হইতে পারে। এদিকে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(৩) ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মার্কিণে গমন করিয়া স্থানীয় লোকের সহিত ঘনিষ্টতা করিলে ভারতীয় পণ্য তথায় বেশী বিকাইতে পারে।

(৪) যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি বিশেষ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও য়ুরোপীয় বাজার বন্ধ হওয়াতে ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে, মার্কিণ তাহার পূরণ করিতে সমর্থ হইবে না।

(৫) ভারত হইতে মার্কিণে পণ্য রপ্তানির অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, উহাতে জাহাজের অসু-বিধা ঘটিবে, এবং পণ্য-বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, নিরিখ অনুসারে চালানী পণ্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

রিপোর্টখানি পড়িলেই বুঝা যায় যে, য়ুরোপের বাজার বন্ধ হওয়াতে ভারতের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, মার্কিণে পণ্য রপ্তানী করিয়া সেই ক্ষতির পূরণ হইবে না। আমেরিকার দাবী অগ্রে—হাভানা পরিষদে এই মর্ম্মে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহাই হইবে মার্কিণে ভারতীয় পণ্য-বিক্রয়ের পথে প্রবল অন্তরায়। তৈল, তৈল-বীজ, খইল, তুলা, শণ, কাঁচা চামড়া, গম, হাড়-অস্থিজাত সার প্রভৃতি মার্কিণে বিকাইবে না। ভারত হইতে যে সকল কৃষিজ পণ্য বিদেশে চালান যায়, তাহার অনেক পণ্যই মার্কিণে অনাবশ্যক, কারণ, তাহা মার্কিণে এবং আমেরিকার অন্যান্য দেশে জন্মে। কেবল পাট, পাটজাত পণ্য, এবং নারিকেল দড়ি হইতে প্রস্তুত পণ্য ভারত হইতে তথায় অবশ্যই রপ্তানি হইবে। তবে ঐ রিপোর্টেই প্রকাশ, অভ্র, কফি, কাঁচা চামড়া, লঙ্কা, হরিতকী, বহড়া, আমলকি, এলাচি, গোলমরিচ, আদা প্রভৃতি ঐ দেশে কাটাইবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা সফল হইতেও পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে দুই-এক কোটি টাকার অধিক পাওয়া যাইবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে বাঙ্গালার সচিবরাও এই বিলখানি আইনে পরিণত করিবার জন্য যেন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিষয়টি আলোচনা করিবার জন্য যে সকল সভা-সমিতি হইতেছে, তাহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ব্যক্ত মত হইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, বিলখানি যে ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাতে এক দিকে যেমন সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল, অন্য দিকে তেমনই উহা অনায়াসে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এবং শিক্ষাবিস্তারের প্রতিকূল ভাবে ব্যবহার করা যাইতে

পারে। এ কথা এখন সকলেই বিশ্বাস করিতেছেন যে, বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অন্ততঃ মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কোন ক্ষমতা না থাকে, তাহাই তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁহারা যে ভাবে বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই ভাবে বোর্ড গঠন করিলে তাহার আর স্বাধীনতা থাকিবে না; তাহা সরকারী বোর্ডেই পরিণত হইবে। উহার অধিকাংশ সদস্যই হইবে সরকারের আজ্ঞাকারী কিঙ্কর। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কমিটীর হস্তে এই বিলখানি আলোচনা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল, সেই কমিটীও ঠিক ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শিক্ষা-সম্পর্কিত অতি অনাবশ্যক বিচার্য্য বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত কখনই সরকারের একান্ত সমর্থকদিগের হস্তে ন্যস্ত করা সঙ্গত হইতে পারে না। কমিটী দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান বিলখানি তাহা অপেক্ষা অধিক অসন্তোষজনক এবং অপকর্ষসাধক, অতএব উহা অবিলম্বে পরিত্যাগ করা বিধেয়। এই বিলখানির বিরুদ্ধে জনসাধারণ যে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা এবং বিদ্রূপ করা বাঞ্ছনীয় নহে। দেশের জনসাধারণই মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন, সরকার কেবলমাত্র ইহার শতাংশের পঞ্চদশ অংশ মাত্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ জঘন্য এবং অস্পৃশ্য বিলখানি যে এক শ্রেণীর লোকের সমর্থন পাইতেছে, তাহার কারণ সুস্পষ্ট।

স্বর্গীয় অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায় ২০শে মাঘ রবিবার রাত্রিশেষে সহসা পরলোকে প্রস্থান করায় আমরা বন্ধু-বিয়োগবেদনা অনুভব করিয়াছি। অমূল্যচরণ বাবু এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আশা করিয়াছিলেন, শ্রমক্লান্ত জীবনের অবশিষ্ট কাল নানা সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত করিবেন; কিন্তু ৫৬ বৎসর বয়সেই তাঁহার কাল পূর্ণ হওয়ায় সে আশা সফল হইল না। তাঁহার মাতা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একমাত্র কন্যা, এবং পিতা ভবচরণ মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ ছিলেন; জিলা ২৪ পরগণার হালিসহর তাঁহাদের আদি বাসস্থান। অমূল্যচরণ বাবু সরকারের হিসাব বিভাগে অতি সামান্য চাকরী গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম জীবন আরম্ভ করিলেও অসাধারণ প্রতিভাবলে নানা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; অবশেষে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের চীফ অডিটারের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় স্বধর্ম্মপ্রবণ ছিল, এবং তিনি ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদার-প্রকৃতি, সহৃদয় ব্যক্তি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পত্নীও জীবিত আছেন। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গকে তাঁহাদের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।



অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন:—গত কার্ত্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মিত্র রচিত "পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস" নামক প্রবন্ধে "গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ডনিবাসী দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করেন"—ইহাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই উক্তি ভ্রমাত্মক; সুনন্দা গোবিন্দদাসের মাতা; গোবিন্দদাসের পিতা শ্রীখণ্ডনিবাসী চিরঞ্জীব সেন সুনন্দাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বসন্তের আনন্দ-মঞ্জরী

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস



১৯শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৭ [৫ম সংখ্যা

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর

৪

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ন্যায়-বৈশেষিক মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে কুমারিল কোন কোন স্থলে এরূপ কিছু কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও জগৎকারণত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যে ভাবে ন্যায়-বৈশেষিক মতের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা অধ্যাপক কীথ অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। নিম্নে অধ্যাপক কীথের উক্তির সারাংশ উদ্ধৃত করা হইল—

'ন্যায়-বৈশেষিক মতে এক দিকে পরমাণুবাদ ও অন্য দিকে অবান্তর (নৈমিত্তিক) সৃষ্টি-প্রলয়-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। এই দুইটি সিদ্ধান্তের সঙ্গতি দেখাইতে যাইয়া ন্যায়-বৈশেষিক-মতানুসারিগণ এক জন স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্যথা পরমাণুসমূহের সাময়িক পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ ও জীবের সহিত পরমাণুর সম্বন্ধের কোন সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে প্রভাকর ও কুমারিল উভয়েই নৈমিত্তিক বা অবান্তর সৃষ্টি-প্রলয়ের প্রামাণ্য একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ধারাবাহিক উৎপত্তি-লয়-প্রবাহ স্বীকার করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু এই সৃষ্টি-লয়-প্রবাহের যে একটা নিয়ম বা ব্যবস্থা আছে, ইহা স্বীকার করিবার উপযুক্ত হেতু তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই। আর এই কারণে সৃষ্টিকল্পে জীবের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি ও প্রলয়কল্পে জীবের তিরোভাব বা অনভিব্যক্তি মীমাংসক-সম্মত নহে। প্রভাকর বলেন, ভূয়োদর্শন দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সর্ব্ববিধ প্রাণিশরীর সম্পূর্ণ স্বভাববশতঃ স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর বর্ত্তমানে যাহা স্বভাবসিদ্ধ তথ্য বলিয়া স্বীকৃত, তাহা হইতে যুক্তিবলে আমরা তদনুরূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রক্রিয়ার অনুমান করিতে পারি—সে জন্য অতিরিক্ত কোন বাহ্য কারণ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া, ঈশ্বর জীবকৃত সুকৃত-দুষ্কৃতের অধিষ্ঠাতা—এই সমগ্র কল্পনাটিই নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ও ভিত্তিহীন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অদৃষ্টস্বরূপ, অতএব ঈশ্বরকর্ত্তৃক ধর্ম্মাধর্ম্মের ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। উহাদিগের মানস-প্রত্যক্ষও অসম্ভব। কারণ, মন (অন্তঃকরণ) শরীর-পরিচ্ছিন্ন—শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত; এ হেতু

শরীরের বহির্দ্দেশে অবস্থিত ধর্ম্মাধর্ম্মের মানস-প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারই করা যায় যে, ঈশ্বরের পক্ষে জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব, তাহা হইলেও ঈশ্বর যে উহাদিগের অধিষ্ঠাতা—ইহা প্রমাণ করা সম্ভব নহে। কারণ, ঈশ্বর জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা, ইহা স্বীকার করিলেই বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সে সম্বন্ধ কিরূপ? উহা সংযোগ সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম গুণ-পদার্থ; আর গুণ-পদার্থের সহিত ঈশ্বররূপ দ্রব্য-পদার্থের সংযোগ সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব (১)। সমবায় সম্বন্ধও হইতে পারে না। কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবে আশ্রিত (জীব-সমবেত)—ঈশ্বরাশ্রিত নহে। যদি নৈয়ায়িকগণ এই প্রসঙ্গে সূত্রধর-দৃষ্টান্তের উপন্যাস করেন, তাহা হইলে তদুত্তরে বলা চলে যে, সূত্রধর-দৃষ্টান্তে স্রষ্টাকে শরীরী স্বীকার করিতে হইবে; আর স্রষ্টাকে একবার স্থূল-শরীর-পরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার পক্ষে পরমাণু অথবা ধর্ম্মাধর্ম্মের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাহার পর, ইহা কল্পনাই করা যায় না যে, পরমাণুসমূহ ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে পারে। কারণ, এরূপ ক্রিয়ার অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর যদিই বা ঈশ্বরেচ্ছায় পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলেও ঈশ্বরেচ্ছার নিত্যত্ব-নিবন্ধন পরমাণুগত ক্রিয়া ও তজ্জন্য সৃষ্টি নিত্যরূপেই পরিগণিত হইত—কদাচ প্রলয়-সম্ভাবনাই হইত না' (২)।

অধ্যাপক কীথের শেষ বাক্যটি নিশ্চয়ই শ্লোক-বার্ত্তিকের পরমাণুবাদের খণ্ডন-প্রকরণের উপসংহারে উক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধের ভাবানুবাদ মাত্র—"তস্মান্ন পরমাণ্বাদেরারম্ভঃ স্যাৎ তদিচ্ছয়া" (সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার, ৮২)—অর্থাৎ, সেই হেতু তাঁহার (ঈশ্বরের) ইচ্ছায় পরমাণু প্রভৃতির আরম্ভকত্ব (কার্য্যারম্ভকত্ব) হইতে পারে না (৩)।

এখন ভট্টপাদের এই উক্তিটির একটু বিশ্লেষণ করা যাউক। 'ঈশ্বরেচ্ছায় পরমাণুর আরম্ভকত্ব সম্ভব নহে'—

---

(১) নৈয়ায়িক-মতে দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে 'সংযোগ' সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতির মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ থাকে না—থাকে 'সমবায়' সম্বন্ধ।

(২) "The Nyāya-Vais'esika, accepting the doctrine of atoms on the one hand and of the periodical creation and destruction of the world on the other, had found it necessary to introduce the conception of a creator, in order to secure in some measure a mode of bringing about the renewal and destruction of the combination of the atoms and their connection with souls. But Prabhākara and Kumārila alike deny absolutely the validity of the belief in the periodic creation and dissolution of all things; they accept a constant process of becoming and passing away; but they find no ground for the systematisation of the process, so as to produce cycles of evolution and involution of souls. Experience, Prabhākara urges, shows us the bodies of all animals being produced by purely natural means; we can argue hence to the past and the future, and need invoke no extraneous aid. Moreover, the whole conception of God supervising the merits and demerits of men is idle; God cannot perceive merit or demerit by perception, since they are not perceptible, nor by the mind, which is confined to the body it occupies. Supervision also is impossible, even had God the necessary knowledge; it must take the form *either* of contact, which is impossible as merit and demerit being qualities are not subject to contact, *or* inherence, and plainly a man's qualities cannot inhere in God. If the argument is adduced of the analogy of the carpenter, it may be replied that on this basis the creator would have to be an embodied spirit, and no embodied spirit can affect such subtle things as the atoms or merit and demerit. Nor is it conceivable that the atoms should themselves act under the will of God, for no parallel to such activity is known to us, and if it were possible, it would follow from the eternity of the will of God that creation would be unceasing."

—Keith, Karmamīmāmsā, pp. 61—62.

(৩) ন্যায়-বৈশেষিক আরম্ভবাদী—পরমাণু জগতের আরম্ভক উপাদান। পরমাণু-সমষ্টি হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগদুৎপত্তি। সাংখ্য-যোগ পরিণামবাদী—প্রকৃতি জগতের পরিণামী উপাদান। (অদ্বৈত) বেদান্ত বিবর্ত্তবাদী—ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্তোপাদান। এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য যে, কুমারিল যেরূপে ন্যায়-বৈশেষিক-মতের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ন্যায়-বৈশেষিকের বহু বলিবার থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কুমারিল ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন কি না, তাহাই এস্থলে আলোচ্য।

এই বাক্যটির তাৎপর্য্য বিচার করিলে কি ইহা বুঝায় না যে, কুমারিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এমন কি, তাঁহার স্রষ্টৃত্বও স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু কেবল তাঁহার ইচ্ছাকে জগৎ-কারণ বলিতে সম্মত নহেন ?

পরমাণু ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ জগদারম্ভক হইতে পারে না—এই বাক্যে ঈশ্বরের নিষেধ নাই—আছে মাত্র ঈশ্বরেচ্ছার নিষেধ। মোটের উপর, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরেচ্ছার স্বাতন্ত্র্য কুমারিল-সম্মত নহে। সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহার প্রকরণের নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটিতে উক্ত মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—

“ঈশ্বরেচ্ছা যদীষ্যেত সৈব স্যাল্লোককারণম্।
ঈশ্বরেচ্ছাবশিত্বে হি নিষ্ফলা কর্ম্মকল্পনা ॥ ৭৩ ॥
ন চানিমিত্তয়া যুক্তমুৎপত্তুং হীশ্বরেচ্ছয়া।
যদ্বা তস্যা নিমিত্তং যত্তদ্ভূতানাং ভবিষ্যতি” ॥ ৭৪ ॥

পার্থসারথি মিশ্র ন্যায়রত্নাকরে ভট্টপাদের উক্ত শ্লোক দুইটির আশয় যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহার একটা ভাবানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—

‘যদি ঈশ্বরেচ্ছাকে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক (বা প্রতিবন্ধক) বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহাই ত স্বতন্ত্র-ভাবে সৃষ্টির কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যদি ঈশ্বরেচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী ও (কর্ম্ম প্রভৃতি) অপর সকল পদার্থই তাহার বশবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরেচ্ছাকেই সৃষ্টি-কারণ বলা উচিত। কারণ, তাহা হইলে বরং লাঘব হয় ; পক্ষান্তরে, ঈশ্বরেচ্ছা-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মকে জগৎ-কারণ বলিলে অনর্থক গৌরব হইয়া থাকে। অতএব, কর্ম্ম ঈশ্বরেচ্ছার বশবর্ত্তী বলিয়া স্বীকৃত হইলে কর্ম্মের বিধান অনর্থক হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, ঈশ্বরেচ্ছাকেও নিত্য বলা চলে না। কারণ, ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য হইলে তৎপ্রবর্ত্তিত (বা তৎপ্রতিবদ্ধ) কর্ম্মেরও নিত্যত্ব সম্ভাবনা হয় ; ফলে সৃষ্টি (অথবা) প্রলয় নিত্য হইয়া পড়ে। অতএব, নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয়ের একটা নিয়ম স্বীকার করিতে হইলে ঈশ্বরেচ্ছাকে অনিত্যই বলিতে হয়। ঈশ্বরেচ্ছা কার্য্য (উৎপাদ্য) বলিয়া স্বীকৃত হইলে উহার একটা নিমিত্তেরও উল্লেখ করিতে হয়। মাত্র ঈশ্বর স্বয়ং তদীয় ইচ্ছার নিমিত্তভূত হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহার অস্তিত্ব সত্ত্বেও তদীয় ইচ্ছা সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না। তাঁহার ইচ্ছার উৎপত্তির পূর্ব্বে তিনি ত স্বয়ং বর্ত্তমান থাকেন। তিনি তদীয় ইচ্ছার নিমিত্ত হইলে তাঁহার সত্তাসত্ত্বেও তাঁহার ইচ্ছার উৎপত্তি হয় না কেন ? পক্ষান্তরে, কর্ম্মও এই নিমিত্ত হইতে পারে না। কারণ, ঈশ্বরেচ্ছার উৎপত্তির পূর্ব্বে কর্ম্মের প্রবৃত্তিই থাকে না—তৎকালে কর্ম্ম প্রতিবদ্ধ অবস্থায় থাকে। আবার কর্ম্ম ঈশ্বরেচ্ছার কারণ ও ঈশ্বরেচ্ছা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়ে। যাহা হউক, কিছু একটা ঈশ্বরেচ্ছার নিমিত্ত বলিলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—সেই ‘কিছু একটা’ পদার্থটি নিত্য বা অনিত্য ? নিত্য হইলে ঈশ্বরেচ্ছারও নিত্যত্ব ও তাহার ফলে সৃষ্টির নিত্যতা-সম্ভাবনা হইয়া থাকে। আর উহা অনিত্য বলিলে তাহারও হেতু কোন কিছু থাকা প্রয়োজন। তাহারও হেতু, তাহারও হেতু—এই ভাবে অনুসন্ধান করিতে করিতে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে ; ঈশ্বরেচ্ছারও কোন কিছু নিমিত্ত (৪) স্বীকার করিলে উহাকেই ত ভূত-সৃষ্টির হেতু বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে—অন্তরালবর্ত্তী অতিরিক্ত ঈশ্বরেচ্ছা স্বীকারের প্রয়োজন কি (৫) ? উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—ঈশ্বরেচ্ছার সহিত সৃষ্টির কোন সম্পর্ক নাই। ঈশ্বরেচ্ছা যে জগৎকারণ হইতে পারে না—কুমারিল মাত্র ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছার নিষেধ করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা জগৎকারণত্বের কুত্রাপি নিষেধও করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক কীথ আরও বলিতেছেন—

(৪) অদৃষ্ট বা ঐরূপ কোন পদার্থ ; ৺পশুপতিনাথ শাস্ত্রী—Introduction to the Pūrva Mimāmsā, p. 148.

(৫) “যদা হীশ্বরেচ্ছা বশিনী, তদ্বশ্যং সর্ব্বং, ততঃ সৈব ভূতসৃষ্টে-নিমিত্তমস্তু, কিমন্তর্গড়ুনা কর্ম্মণা…অপি চেশ্বরেচ্ছাপি কার্য্যা চেন্নান-পেক্ষিতনিমিত্তাস্তবা সম্ভবতি, ঈশ্বরমাত্রস্য প্রাগপি ভাবেন ব্যভিচারাদ-হেতুত্বাৎ, কর্ম্মণাং চেশ্বরেচ্ছাতঃ প্রাক্ প্রতিবদ্ধানামহেতুত্বাৎ, তদ্ধেতুত্বে চেতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ……যদি ত্বস্তি কিঞ্চিদিচ্ছায়া নিমিত্তমিত্যুচ্যতে তত্তর্হি নিত্যমনিত্যং বা, নিত্যত্বে প্রাগপি সৃষ্টিপ্রসঙ্গঃ, ইতরথা তস্যাপরাপরহেত্বিচ্ছায়ামনবস্থা ; অস্তু বা কশ্চিদিচ্ছায়া হেতুঃ, স এব তু ভূতানাং কারণং ভবিষ্যতীতি কিমান্তরালিক্যেচ্ছয়া…।” ন্যায়রত্নাকর—৬৫৮-৬৫৯ পৃষ্ঠা।

'আবার যদি বলা যায় যে, সৃষ্টি তাঁহার ক্রীড়ার্থ মাত্র, তাহা হইলে তিনি যে পূর্ণানন্দস্বরূপ—সেই মতের বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি পরিপূর্ণ সুখস্বরূপ হইলে অনর্থক এই প্রভূত ক্লেশ কেন স্বীকার করিবেন'? (৬)

বলা বাহুল্য, কীথ সাহেবের উক্তিটি সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহারের ৫৬ সংখ্যক শ্লোকের ছায়াগ্রহণমূলক। কুমারিল বলিয়াছেন—

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।
এবমেব প্রবৃত্তিশ্চেচ্চৈতন্যেনাস্য কিং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥
ক্রীড়ার্থায়াং প্রবৃত্তৌ চ বিহন্যেত কৃতার্থতা।
বহুব্যাপারতায়াঞ্চ ক্লেশো বহুতরো ভবেৎ" ॥ ৫৬ ॥

অর্থাৎ, জগৎসৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রয়োজন কিছু নাই—ইহা বলা চলে না। কারণ, অতি জড়বুদ্ধিও বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। যদি বলা হয়, ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, তাহা হইলে তাঁহার চেতনত্ব সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, চেতন বা বুদ্ধিমান্ প্রাণিমাত্রেরই প্রবৃত্তি সপ্রয়োজন—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যদি বলা হয়, তাঁহার এই জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি ক্রীড়ার্থ, তাহা হইলেও তদুত্তরে বলা চলে যে, ক্রীড়া ত চিত্ত-বিনোদন-সুখের নিমিত্ত; আপ্তসুখ ঈশ্বরের পক্ষে সে ক্রীড়াও সম্ভব নহে। আর ঈশ্বরকে আপ্তসুখ বলিয়া স্বীকার না করিলে তাঁহার কৃতার্থতারূপ ঐশ্বর্য্যের হানি হয় (৭)। তিনি যদি সকল সুখই সর্ব্বদা প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন, তবে আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইল কিরূপে? সর্ব্বসুখ-প্রাপ্তি (সর্ব্বসুখের আধিপত্য), সর্ব্বকামাবাপ্তি (আপ্তকামত্ব) প্রভৃতি—ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের (অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বের) অন্যতম লক্ষণ। তাহা ছাড়া, ক্রীড়া অল্পপরিমিত হইলেই সুখের কারণ হইতে পারে। কিন্তু এই বিচিত্র বিশাল বিশ্বরচনা অতিশয় ক্লেশকর—চিত্তরঞ্জক নহে; এ জন্য উহা ক্রীড়ার্থক হইতেই পারে না (৮)।

এই দুইটি কারিকায় ভট্টপাদ নৈয়ায়িক-মতেরই খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি বাদরায়ণ-কৃত উত্তর-মীমাংসার "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (৯) সূত্রের খণ্ডনে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক—এই উভয় সম্প্রদায় একই মতের প্রতিপাদনে যত্নবান্। সৃষ্টি ঈশ্বরের ক্রীড়া বা লীলা মাত্র—ইহা উভয় পক্ষেরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভট্টপাদ নৈয়ায়িকগণের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছেন, অথচ বেদান্তিগণের উপর কোনরূপ দোষ প্রদান করেন নাই। এই ব্যাপারটির মূলে একটু বিশেষ রহস্য আছে। নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এক হইলেও উভয়ের সিদ্ধান্ত স্থাপনের প্রক্রিয়া এক নহে। নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্রষ্টৃত্ব কেবল যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে, বেদান্তিগণের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সকল জ্ঞানই শ্রুতি হইতে গৃহীত। নিজ যুক্তি বা কল্পনা-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হন নাই। সমগ্র বেদান্তদর্শন (অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা-সূত্রাবলী) শ্রুতিকে ভিত্তি করিয়াই রচিত। উত্তরমীমাংসার দ্বিতীয় সূত্রের (১০) ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর-ভগবৎপাদ বলিয়াছেন—'ব্রহ্মসূত্র-সমূহ বেদান্ত-(উপনিষদ্)-বাক্যরূপ কুসুম গাঁথিবার জন্যই রচিত'। (১১) বস্তুতঃ বেদান্তসূত্রগুলি উপনিষদ্-বাক্যাবলীর ব্যাখ্যানার্থই রচিত হইয়াছিল—স্বতন্ত্র

(৬) "If, again, it is alleged that the creation was for his amusement, this contradicts the theory that he is perfectly happy, and would involve him in much wearisome toil"—Karmamīmāṃsā, p. 63.

(৭) "ক্রীড়া হি বিনোদজসুখার্থৈব নরাণাং, ন চাসাবাপ্তসুখস্য সম্ভবতি, তদনবাপ্তৌ কৃতার্থতালক্ষণমৈশ্বর্য্যং ন সিদ্ধ্যেদিতি।"—ন্যায়রত্নাকর, পৃঃ ৬৫৩।

(৮) "ক্রীড়া চাল্পীয়সী রময়তি, সমস্তভূধরাদিবিষয়স্তু মহা-ব্যাপারোঽতিক্লেশরূপঃ ক্রীড়ার্থ ইতি ন চিত্তমনুরঞ্জয়তি"—ন্যায়রত্নাকর পৃঃ ৬৫৩।

(৯) ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩; যেমন লৌকিক দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কোন যথেচ্ছ ভোগাধিকারী পুরুষ বিনা প্রয়োজনে কেবল ক্রীড়ার জন্যই বিহারাদিতে প্রবৃত্ত হন, অথবা যেমন বাহ্য কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদির স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কোন প্রয়োজন না থাকিলেও স্বভাববশেই ঈশ্বরের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে—উহা তাঁহার লীলা মাত্র।

(১০) "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২)।

(১১) "এতদেবানুমানং সংসারিব্যতিরিক্তেশ্বরাস্তিত্বাদিসাধনং মন্যন্তে ঈশ্বরকারণিনঃ। নন্বিহাপি তদেবোপন্যস্তং জন্মাদিসূত্রে, ন; বেদান্ত-বাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ সূত্রাণাম্। বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্য্যন্তে। বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্বৃত্তা হি ব্রহ্মাবগতির্নানুমানাদিপ্রমাণান্তরনির্বৃত্তা।"—শাঙ্করভাষ্য, ব্রঃ সূঃ ১।১।২।

যুক্তিতর্কের অবতারণা উহাদিগের মধ্যে একেবারেই নাই। এই তথ্যগুলি স্মরণে রাখিলে মীমাংসকগণের এতদ্বিষয়ক অভিপ্রায়টি সুপরিস্ফুট হইবে। যদি কোন বাদী স্বতন্ত্র যুক্তি বা স্বকীয় কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে মীমাংসকগণ কখনই তাঁহাকে অব্যাহতি দিবেন না—বিরুদ্ধ বলবত্তর যুক্তি-সহায়ে তাঁহার আনুমানিক সিদ্ধান্ত খণ্ডনে নিশ্চিত অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যদি অপর কোন বাদী অপৌরুষেয় অকৃত শ্রুতিবাক্যমাত্রের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্রষ্টৃত্ব নিশ্চয়ে যত্নবান্ হন, তাহা হইলে মীমাংসকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে কনিষ্ঠাঙ্গুলিও উত্তোলন করিবেন না। মানব-কল্পনামাত্রের উপর ভিত্তি করিয়া যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, সে ঈশ্বর মীমাংসা-সম্প্রদায়ে অস্বীকার্য্য; কিন্তু যে ঈশ্বর অপৌরুষেয় শ্রুতিমাত্রগম্য, সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসকগণ অস্বীকার করেন না। ইহাকে কি 'নিরীশ্বরবাদ' বলা চলে? সুধীগণই নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবেন।

শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর পূর্ণানন্দস্বরূপ। যদি তিনি স্বরূপে পূর্ণানন্দ হন, তাহা হইলে তিনি ক্রীড়ার্থ সৃষ্টি করিবেন—এ কিরূপ কথা? ক্রীড়া করা হয় সুখ পাইবার আশায়। যিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ—তাঁহার ত আর আকাঙ্ক্ষণীয় সুখ কিছুই থাকিতে পারে না। তবে তিনি ক্রীড়ার্থ (অর্থাৎ নিজের চিত্তবিনোদনার্থ) সৃষ্টি করিবেন কিরূপে? যাঁহার স্বরূপই পূর্ণ আনন্দ—যিনি আপ্তকাম—আত্মকাম—অকাম, তাঁহার আবার চিত্তবিনোদন! এ যে অতি অসম্ভব কথা! "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" সূত্রে বাদরায়ণ ঈশ্বরের 'লীলা'র কথাই বলিয়াছেন—'ক্রীড়া'র কথা তথায় নাই। 'ক্রীড়া' ও 'লীলা'র মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা সচরাচর সাধারণের বুদ্ধিগোচর হয় না। এই ভেদটুকু সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র অপ্পয়দীক্ষিত আমাদিগের চক্ষুর সমক্ষে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন—'লীলা শব্দকে ক্রীড়াবাচক ধরিলে দোষ হয়; কিন্তু ক্রিয়া-সামান্যবাচী অথবা অনায়াসসাধ্য ক্রিয়ার বাচক ধরিলে কোন দোষ হয় না'। (১২)

অর্থাৎ 'ক্রীড়া' বলিলেই বুঝায় উহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সুখকামনার ইঙ্গিত বর্ত্তমান—তা তাহা যতই সূক্ষ্মাকারে হউক না কেন। আর 'লীলা' বলিলে এইরূপ অতি-সূক্ষ্ম সুখের আভাসও পাওয়া যায় না। লৌকিক ব্যবহারে 'লীলা' শব্দে যদি বা কিছু সূক্ষ্ম প্রয়োজন উৎপ্রেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, ঈশ্বর-লীলায় তাহারও অভাব; কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, তিনি আপ্তকাম। (১৩) এই কারণে, ঈশ্বর পূর্ণানন্দ-স্বরূপ হইয়াও কেবল লীলারূপ সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহাতে কোনরূপ দোষ হয় না। পক্ষান্তরে, আপ্তকাম পূর্ণানন্দ পরমেশ্বর স্বচিত্তবিনোদনরূপ ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়া থাকেন বলিলে তাঁহার আনন্দস্বরূপত্ব ও আপ্তকামত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির সহিত বিরোধ উৎপন্ন হয়। অতএব, বেদান্ত-পক্ষ শ্রুতির অনুকূল ও নৈয়ায়িক-পক্ষ শ্রুতির প্রতিকূল। আর এই কারণেই মীমাংসক-সম্প্রদায় প্রথমোক্তকে পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত পক্ষকেই আক্রমণ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উঠিতে পারে। মীমাংসক-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন যে, জীবকৃত কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। এই সৃষ্টির কর্ত্তৃ-রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে যে, সৃষ্টি তাঁহার সুখভোগের নিমিত্ত কল্পিত হয় নাই। বস্তুতঃ, মীমাংসকগণ তাহাই স্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ সোজা কথায়—ঈশ্বর জীবকৃত কর্ম্মের অনুসারে কর্ম্মফল-বিভাগরূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন—ইহাই মীমাংসক-মত। আর তাহা হইলে ক্রীড়ার্থ সৃষ্টি বা কেবল লীলারূপ সৃষ্টি ইত্যাদি পক্ষ উঠিতে পারে না। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে যে, মীমাংসকগণের আক্ষেপ কেবল নৈয়ায়িকগণের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে—বেদান্তিগণের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, নৈয়ায়িকমতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্টি ক্রীড়ার্থ অর্থাৎ স্বচিত্তবিনোদনার্থ

---

(১২) "লীলাশব্দস্য ক্রিয়ামাত্রং বিলাসরূপক্রিয়া চেত্যর্থদ্বয়ং সম্ভবতি ·· তত্র ক্রিয়ামাত্রার্থত্বমাদায় যাদৃচ্ছিকাঙ্গুলীচলনাদিক্রিয়াসু স্বাভাবিক-শ্বাসনিমেষাদিক্রিয়াসু চ প্রয়োজনরহিতাসু ব্যভিচার উক্তঃ।···"

"লীলাশব্দস্য ক্রীড়াবাচিতায়ামিদং দূষণম্, ন ক্রিয়ামাত্রবাচিতায়ামনায়াসসাধ্যক্রিয়ালম্বকতায়াং বা"—কল্পতরুপরিমল ২।১।৩৩।

(১৩) "যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষেত, তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে; আপ্তকামশ্রুতেঃ।"—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।৩৩।

—উহাতে স্বার্থগন্ধ বিদ্যমান। আর মীমাংসক-মতে ঈশ্বর উদাসীন—জীবানুষ্ঠিত সুকৃত-দুষ্কৃত অনুসারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক তিনি যথাযোগ্য ফল প্রদান করেন—এ ব্যাপারে তাঁহার স্বার্থ-সম্পর্ক কিছুই নাই। বেদান্তিগণ কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি লীলারূপ মনে করিয়া থাকেন। বেদান্তি-কথিত এই 'লীলা' নৈয়ায়িক-সম্মত 'ক্রীড়া' হইতে বিভিন্ন; উহা সাধারণ ক্রিয়াবাচক পদ, কখন কখন অনায়াস-সাধ্য ক্রিয়াও বুঝাইয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (১৪)। শুধু তাহাই নহে। মীমাংসকগণের প্রদত্ত দোষ বেদান্তিগণের উপর কেন আরোপিত হইতে পারে না—তাহার আরও গূঢ়তর কারণ আছে। আচার্য্য শঙ্কর, বাচস্পতি মিশ্র ও কল্পতরুকার তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈত-বেদান্ত-মতে—পরমেশ্বর অদ্বিতীয় নির্গুণ নিষ্ক্রিয় চৈতন্যমাত্রস্বরূপ—পারমার্থিক দৃষ্টিতে প্রপঞ্চের সহিত কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ তাঁহার নাই। তবে তিনি যখন মায়োপাধি-বিশিষ্ট হইয়া সগুণ ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন, তখনই তিনি জগৎকারণ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অতএব, অদ্বৈত-বেদান্তীর দৃষ্টিতে এই সৃষ্টি পারমার্থিক নহে, ব্যাবহারিক মাত্র। ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব, জীবের জীবত্ব, জীব-কৃত সুকৃত-দুষ্কৃত ও তাহাদিগের শুভাশুভ ফল প্রভৃতিও ব্যাবহারিক। ব্যাবহারিক পদার্থ মাত্রেই মিথ্যা—উহাদিগের সাময়িক অস্তিত্ব আছে মাত্র, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। যদি মীমাংসক-মতও স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর জীবগণের কর্ম্মানুসারে ফলদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের সহিত বস্তুতঃ কোন বিরোধ হইতে পারে না। অদ্বৈত-বেদান্তিগণ বলিবেন—ঈশ্বর যে জীবের কর্ম্মানুসারে ফল-প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার লীলা। কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদানও একরূপ ক্রিয়া; অতএব উহা লীলার গণ্ডীতেই পড়ে। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'লীলা'-শব্দটি সাধারণ অথবা অনায়াসসাধ্য ক্রিয়ার বাচক। আচার্য্য শঙ্কর ত লোকব্যবহারকালে 'ভট্টনয়' (অর্থাৎ কুমারিল-ভট্ট-প্রতিপাদিত ব্যবস্থা) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অথচ অদ্বৈতমতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঈশ্বরের লীলাও নাই—এ লীলা সম্পূর্ণ লৌকিক। কারণ, পারমার্থিক দশাতে এক নির্গুণ ব্রহ্মই বর্ত্তমান—তদবস্থায় ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব বা ফলদাতৃত্ব কিছুই নাই (১৫)।

পক্ষান্তরে, যদি একবার নৈয়ায়িক-মত স্বীকার করা যায় যে সৃষ্টি সত্য, তাহা হইলে ঈশ্বরের ক্রীড়াও সত্য হইয়া দাঁড়ায়; যেহেতু, তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর ক্রীড়ার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মীমাংসক-মত এই মতের ঘোর বিরোধী। কারণ, মীমাংসকমতে সৃষ্টি সত্য হইলেও উহা ঈশ্বরের ক্রীড়ার্থ নহে। ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব বলিতে তাঁহারা বুঝেন, জীব-কৃত কর্ম্মানুসারে ফলদাতৃত্ব। নৈয়ায়িক-মতে ঈশ্বর প্রয়োজনবশে পারমার্থিকী সৃষ্টি

"ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ভোগার্থমিতি চাপরে। দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা"। (গৌঃ কাঃ ১।৯) ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদি তাৎকালিকানন্দপ্রয়োজনলীলাত্বমেব ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্য ইত্যনেনানভিমতং প্রদর্শিতম্, ন তু হাসমানাদিতুল্য-প্রয়োজনোদ্দেশরহিতলীলাত্বম্। "স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ। দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্"। (শ্বেঃ উঃ ৬।১) ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি সৃষ্টেঃ সৃজ্যবস্তু-স্বভাবত্বৈবানভিমতত্বেন প্রদর্শিতা ন তু স্রষ্টৃস্বভাবতা। অতো লীলাস্বভাবপক্ষয়োর্ন 'শ্রুতিবিরোধঃ।—কল্পতরুপরিমল, ৩।১।৩৩। (দ্রষ্টব্য—অপ্পয়দীক্ষিত গৌড়পাদকারিকার এই কারিকাটিকে 'মাণ্ডূক্যোপনিষদ্' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সংস্করণে "ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে" ইত্যাদিরূপ পাঠ পাওয়া যায়।)

(১৫) "ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনামরূপ-ব্যবহারগোচরত্বাৎ, ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চেত্যেতদপি ন বিস্মর্ত্তব্যম্"—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।৩৩।

"তস্মাদুপপন্নং যদৃচ্ছয়া বা স্বভাবাদ্বা লীলয়া বা জগৎসর্জনং ভগবতো মহেশ্বরস্য। অপি চ নেয়ং পারমার্থিকী সৃষ্টির্যেনানুযুজ্যেত প্রয়োজনম্, অপি ত্বনাদ্যবিদ্যানিবন্ধনা। অবিদ্যা চ স্বভাবত এব কার্য্যোন্মুখী প্রয়োজনমপেক্ষতে। ন হি দ্বিচন্দ্রালাতচক্রগন্ধর্ব্বনগরাদি-বিভ্রমাঃ সমুদ্দিষ্টপ্রয়োজনা ভবন্তি। ন চ তৎকার্য্যা বিস্ময়ভয়কম্পাদয়ঃ স্বোৎপত্তৌ প্রয়োজনমপেক্ষন্তে। সা চ চৈতন্যচ্ছুরিতা জগদুৎপাদহেতু-রিতি চেতনো জগদ্যোনিরাখ্যায়তে···অপি চ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্ত্বথা বিবক্ষন্ত্যাগমাঃ, অপি তু জগতি ব্রহ্মাত্মভাবম্। তথা চ সৃষ্টেরবিবক্ষয়া তদাশ্রয়ো দোষো নির্বিষয়ঃ।"—ভামতী ২।১।৩৩।

"(ব্রহ্ম) ভবতি তু জীবাবিদ্যাবিষয়ীকৃতজগদ্বিবর্ত্তাধিষ্ঠানম্, তথা চ ন প্রয়োজনপর্য্যনুযোগঃ সৃষ্টৌ···জীবভ্রান্ত্যা পরং ব্রহ্ম জগদ্বীজমজূঘুষৎ। বাচস্পতিঃ পরেশস্য লীলাসূত্রমলূলুপৎ"। —কল্পতরু ২।১।৩৩। এই সকল মতেই দেখা যাইতেছে—ঈশ্বরের লীলারূপ সৃষ্টিতে তাঁহার কোন প্রয়োজন বা স্বার্থ স্বীকৃত হয় নাই। কারণ, ইহারা সকলেই সৃষ্টিকে মিথ্যা বলিয়াছেন।

করিয়া থাকেন। এই প্রয়োজন তাঁহার নিজ চিত্ত-বিনোদন। ইহাই তাঁহার ক্রীড়া। মীমাংসক-মতেও অবশ্য সৃষ্টি তথ্যরূপা। তবে এ মতে ঈশ্বর নিজ প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন না। অপক্ষপাতী বিচারক যেমন কেবল আইন অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত বিচার করিতে বাধ্য, ঈশ্বরও সেইরূপ পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া কেবল জীবগণের কৃতকর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া। উভয় পক্ষের এই পরস্পর-বিরোধী মতের কোন সামঞ্জস্য হয় না। তাই অদ্বৈত-বেদান্তিগণ বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি মিথ্যা। সৃষ্টি মিথ্যা হইলেই ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতৃত্বও মিথ্যা; আর এই সৃষ্টিক্রিয়ারূপ লীলাও নিষ্প্রয়োজন। কারণ, পরমার্থ-দৃষ্টিতে ইহা মিথ্যা।

এইরূপে অদ্বৈতাচার্য্যগণ মীমাংসক ও নৈয়ায়িকগণের পরস্পর-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দুইটি অংশতঃ গ্রহণ ও অংশতঃ বর্জ্জন করিয়া উভয়ের মধ্যে এক অপরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তাই মীমাংসক-সিদ্ধান্ত মহর্ষি বাদরায়ণের "লীলাকৈবল্য" সূত্রের বিরোধী নহে। (১৬) এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(১৬) এই বিরোধ-পরিহার অবশ্য একমাত্র অদ্বৈত দৃষ্টি-ভঙ্গীতেই করা যায়। অন্যান্য বেদান্ত-সম্প্রদায়—যাঁহারা সৃষ্টিকে মিথ্যা মনে করেন না, অথচ উহাকে ঈশ্বরের লীলা বলেন, তাঁহারা—মীমাংসকগণের আক্রমণের লক্ষ্য হইতে বাধ্য।

ফাল্গুন-বেদনা

হে মহেশ! ক্ষণিকের রোষাগ্নিতে
একটি জীবন্ত দেহ ভস্ম ক'রে দিয়েছিলে
সে কোন্ অতীতে,
হয় তো ভুলেছ তুমি, জগৎ পারেনি তাহা
আজিও ভুলিতে।
দক্ষিণের দ্বারপথে আজিও সে ভস্মরাশি
রয়েছে অশেষ,
যুগে-যুগে বায়ু-ভরে ভরিয়া ধরণী
হয়নি নিঃশেষ।
এক আজি হইয়াছে শত, লক্ষ, কোটি,
অণুতে-রেণুতে,
ফুলে-ফুলে পাতায় লতায় বিহঙ্গের
কল-কাকলীতে!
আজিও রতির ব্যথা মূর্ত্ত হ'য়ে ভেসে আসে
বসন্ত-প্রভাতে,
ঘনায় মিলনে আজো বিরহের হাহাকার
চকিত-সজ্জাতে!
জগতের প্রাণে-প্রাণে জেগে ওঠে
কোন্ ব্যাকুলতা,
জীর্ণ পাতা ঝ'রে যায় গাহি কোন্
নিদারুণ গাথা!

চিত্তজয়ী হে তপস্যালীন!
সাধনার বিঘ্নকারী দুরন্ত বালকে,
ভস্ম ক'রে দিয়েছিলে আঁখির পলকে
মমতা-বিহীন!
জগতের শান্ত জীব তোমার সে তপস্যার
করে নাই ক্ষতি,
মদনের ভস্মছায়ে তাদেরও যাতনা
কেন পশুপতি?
বর্ষ-শেষে ফুলে-ফুলে নির্ঝর-সঙ্গীতে
বর্ষ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে চায় ধরা
হর্ষ-ভরা চিতে।
তার মাঝে জেগে ওঠে অতি অকরুণ ব্যথা-ভরা
সে তোমার দান—
যুগ-যুগ বর্ষ ভরি আজিও হোল না
এর সমাধান!
কত যুগ পরে বলো, বসন্তের এ উৎসব
রহিবে অটুট—
মিলনে মিলন রবে অচ্ছেদ্য বন্ধন,
বিরহের তীক্ষ্ণ তীর পশিবে না সেথা
থেমে যাবে রতির ক্রন্দন?

শ্রীমতী নিভা দেবী



ত্রয়োবিংশ পর্ব্ব

বৃটিশ রণতরীর আবির্ভাব !

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

বৃটিশ উপকূল-রক্ষিগণের দলপতি ষ্ট্যান্‌ডিস্ আমস্ ক্রোবিকে হতাশ ভাবে জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তাহার পর মেরীর মুখের দিকে ফিরিয়া-চাহিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ রাত্রিতে তোমরা কি কোন জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটের প্রতীক্ষা করিতেছ ?"

মেরী দৃঢ় স্বরে বলিল, "না।"

মেরীকে আমি পূর্ব্বে কোনও দিন মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই ; কিন্তু আজ তাহার মুখে মিথ্যা কথা শুনিয়া আদৌ বিস্মিত হইলাম না। আমি ভাবিলাম, মিথ্যা কথা বলিলেই কি তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে ? উপকূল-রক্ষীরা এ কথা শুনিয়া কি অবিলম্বেই এই দ্বীপ ত্যাগ করিয়া তাহাদের ঘাঁটিতে প্রস্থান করিবে ? কাপ্তেন ভন্ রথভেন ও লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন নিরাপদ হইতে পারিবে ? তাহা দুরাশা বলিয়াই আমার মনে হইল।

মেরীর কথা শুনিয়া ষ্ট্যান্‌ডিস্ বলিল, "আজ কোন 'ইউ'-বোট খোরাক সংগ্রহ করিতে এই দ্বীপে আসিবে না ? বড়ই আক্ষেপের বিষয় ! তা যাহাই হউক, যদি কোন 'ইউ'-বোট আসে, তাহাকে সাঙ্কেতিক আলোক দেখাইবার জন্য তোমাদের লণ্ঠনটা আমরাই সমুদ্র কূলে লইয়া যাইব।"

তাহার কথা শুনিয়া মেরী উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কোন 'ইউ'-বোট আজ রাত্রিতে যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়াই পড়ে, তাহা হইলে তোমরা এই চারি জন রক্ষী 'ইউ'-বোটের সশস্ত্র নাজী সৈনিকবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে ? তাহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, এবং সংখ্যায় তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক—ইহা কি তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ ?"

ষ্ট্যান্‌ডিস্ এ কথা শুনিয়া কৌতূহলভরে মেরীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিল ; তাহার পর নির্ব্বিকার ভাবে বলিল, "তোমার কথা সত্য, মেরী ! কিন্তু আমরা যখন আসিয়া পড়িয়াছি, তখন বিপদের আশঙ্কায় পলায়ন করিব না ; আমরা আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তাহার কি ফল হয়—যথাসময়ে জানিতে পারিবে।"

মেরী তাড়াতাড়ি তাহার কোটটি তুলিয়া-লইয়া বলিল, "বেশ, তবে তাহাই হউক ; লণ্ঠনটা আমিই লইয়া যাইতেছি. আমার সঙ্গে সমুদ্র-কূলে চল।"

অতঃপর ষ্ট্যান্‌ডিস্ তাহার সঙ্গীত্রয়ের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "ড্রেক্, তুমি ও ফষ্টার—তোমরা উভয়েই এখানে আমাদের বন্ধু আমসের পাহারায় থাক ; এলিস্, তুমি আমার সঙ্গে চল।"

এই আদেশে এলিস্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর মেরী পাকশালার দ্বারের আড়াল হইতে সাঙ্কেতিক আলোকের লণ্ঠনটা তুলিয়া-লইয়া ষ্ট্যান্‌ডিস্ ও এলিসের সঙ্গে সমুদ্র-বেলার অভিমুখে ধাবিত হইল।

মেরী একা উপকূল-রক্ষীদ্বয়ের সঙ্গে যাইতেছে দেখিয়া তাহার সঙ্গে থাকিবার জন্য আমার আগ্রহ এরূপ প্রবল হইল যে, আমি গরম কোটটা পরিয়া-লইবার জন্য আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিলাম না ; একটা মোটা গেঞ্জী মাত্র গায়ে ছিল, সেই অবস্থাতেই মেরীর সঙ্গে চলিলাম। মেরীর দুই পাশে দুই উপকূল-রক্ষী ; উভয়ের মধ্যে মেরীকে লণ্ঠনটি হাতে লইয়া, উন্নত মস্তকে এবং অকম্পিত পদবিক্ষেপে চলিতে দেখিয়া কেহই

মুহূর্ত্তের জন্য মনে করিতে পারিত না—মেরী তাহার জীবনের এই সঙ্কটময় পরীক্ষায় শেষবার জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটকে সাঙ্কেতিক আলো দেখাইতে সমুদ্র-কূলে যাইতেছে! তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, বা বাহ্যিক ব্যবহার দেখিয়া তাহার মানসিক চাঞ্চল্য বুঝিবার উপায় না থাকিলেও আমি জানিতাম, আমার ন্যায় তাহারও বক্ষঃস্থল দুশ্চিন্তায় ও ভয়ে দুরু-দুরু করিতেছিল। বিপদের মেঘ মাথার উপর ঘনীভূত হইয়া বজ্রনির্ঘোষ আরম্ভ করিলেও মেরী মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় নাই।

আমি চলিতে চলিতে মেরীর পাশে গিয়া তাহার হাতে হাত দিলাম; সে আমার হাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। ষ্ট্যান্‌ডিস্ একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু সে আমার গমনে বাধা দিল না, বা আমাকে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলিল না। তাহার সঙ্গী এলিস্‌ও আমাকে নিষেধসূচক কোন কথা বলিল না। তাহারা উভয়েই নিস্তব্ধ ভাবে চলিতেছিল। আমরা যতক্ষণ সমুদ্রকূলে উপস্থিত না হইলাম, ততক্ষণ তাহাদের মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। সকলেই নির্ব্বাক্।

সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া ষ্ট্যান্‌ডিস্ মেরীকে বলিল, "ঐধারে চল, মেরী!"

মেরী তাহার আদেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে আমিও তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু মেরী পাহাড়ের দিকে চাহিয়াই ভয়ে বিস্ময়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল! তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চাহিবামাত্র আতঙ্কে আমারও বুক কাঁপিয়া উঠিল; কারণ, পাহাড়ের দিকে চাহিয়া আমরা উভয়েই গিরিশৃঙ্গের ছায়ায় বালুকা-রাশির উপর দুই সারিতে বিভক্ত, এবং শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান কালো ছায়ার মতন কতকগুলি মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তাহারা পুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে কিছু কাল চাহিয়া-থাকিয়া বুঝিতে পারিলাম—তাহারা বৃটিশ নৌ-সৈন্য! তাহাদের হাতের রাইফেলগুলির কুঁদা তাহাদের সম্মুখস্থ বালুকারাশির উপর সংস্থাপিত, এবং প্রত্যেক রাইফেলের মাথা সুশাণিত সঙীনে কণ্টকিত।

সেই সকল সৈনিক এরূপ অচঞ্চল ও গম্ভীর, অন্ধকারে তাহাদের সাদা মুখগুলি এরূপ রহস্য-সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল যে, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাদের ভয় দারুণ বিস্ময়ে পরিণত হইল! আমি উদ্বেগ-বিচলিত চিত্তে মেরীর হাতের উপর হাতের একটু চাপ দিলাম।

মেরী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এখন সকলই বুঝিতে পারা গিয়াছে, পিটার!" মেরীর কণ্ঠস্বর ভয়কম্পিত।

ষ্ট্যান্‌ডিস্ সেই সময় মেরীকে বলিল, "লণ্ঠনটা আমার হাতে দাও, মেরী!"

কিন্তু মেরী তাহার আদেশে কর্ণপাত করিল না; তখন ষ্ট্যান্‌ডিস্ লণ্ঠনটা মেরীর হাত হইতে সবলে ছিনাইয়া লইল।

মুহূর্ত্ত পরেই এক জন পদস্থ নৌ-কর্ম্মচারী ষ্ট্যান্‌ডিসের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আজ রাত্রিতে কোন 'ইউ'-বোটের এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে কি?"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেরীর মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর।

ষ্ট্যান্‌ডিস্ তাঁহাকে বলিল, "এই যুবতী বলিতেছিল—আজ কোন 'ইউ'-বোটের আগমন-সম্ভাবনা নাই।"

নৌ-কর্ম্মচারী পুনর্ব্বার মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার এ কথা কি সত্য?"

মেরী দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমার কথা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা। কোন 'ইউ'-বোটের এখানে আসিবার কথা নাই, এবং কোন 'ইউ'-বোটের প্রতীক্ষাতেও আমরা এখানে আসি নাই। আপনাদের উপকূল-রক্ষীরা আমাকে কেন এখানে লইয়া আসিয়াছে, আপনার তাহা জানা থাকিতে পারে।"

ষ্ট্যান্‌ডিস্ মেরীর কথার প্রতিবাদে বলিল, "মেরী নিজের ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছে। আমি লণ্ঠনটা উহার নিকট চাহিয়াছিলাম।"

নৌ-কর্ম্মচারী এবার ষ্ট্যান্‌ডিস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হয় ত এই বালিকার কথা সত্য; কিন্তু তথাপি আমরা এখানে অপেক্ষা করিব। আমাদের এই পরিশ্রম সফল হইতেও পারে।"

বৃটিশ নৌ-কর্ম্মচারীর এই মন্তব্য শুনিয়া আমি অত্যন্ত

বিচলিত হইলাম, এবং তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম; কিন্তু তথাপি আমার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। আমাদের অবস্থা কিরূপ সঙ্কটজনক হইয়াছিল, তাহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আমরা ত জানিতাম, এই রাত্রিতে আমরা যে 'ইউ'-বোটখানির প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা আসিবেই। আমি ও মেরী একান্ত আগ্রহে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম—সেই 'ইউ'-বোট যেন আজ রাত্রিকালে আমাদের দ্বীপের নিকট উপস্থিত না হয়।

কিন্তু আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাপ্তেন ভন্ রথভেন এবং লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন আজ রাত্রিকালে এই দ্বীপে আসিবে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না; এবং তাহারা আসিলেই ঐ সকল বৃটিশ নৌ-সৈন্যের হস্তে বন্দী হইবে—এ বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। আমার মনে হইল, ইতিমধ্যেই তাহাদের 'ইউ'-বোট এই দ্বীপের অদূরবর্ত্তী কোন স্থানে সমুদ্রগর্ভ হইতে জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া নিঃশব্দে এই দ্বীপের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ঐ বৃটিশ নৌ-সৈন্যগণ আর কিছু কাল এখানে অবস্থিতি করিলেই অদূরে ভাসমান 'ইউ'-বোটের সাঙ্কেতিক আলোক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে; এবং সমুদ্র-কূল হইতে আমাদের লণ্ঠনের সাঙ্কেতিক আলোক দেখিতে পাইলেই কাপ্তেন ভন্ রথভেন ও লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন ডিঙ্গীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমুদ্রবেলায় আসিয়া পড়িবে। সাঙ্কেতিক আলোকের লণ্ঠনটি উপকূলরক্ষী হস্তগত করিয়াছে। এ অবস্থায় কাপ্তেন ভন্ রথভেনের ও লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনের আগমনে বাধা-দানের কোনও উপায় আমরা দেখিতে পাইলাম না। আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায় আমরা অধীর হইয়া পড়িলাম।

আমরা সত্যই কাপ্তেন ভন্ রথভেন ও লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনের কল্যাণ কামনা করিতেছিলাম। আমরা ইংরেজ, ইংরেজের শত্রু জার্ম্মাণের কল্যাণ কামনা করা আমাদের পক্ষে স্বজাতিদ্রোহের নিদর্শন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে—আমরা জ্ঞান হইবার পর হইতেই ক্রোবির এই নির্জ্জন দ্বীপে বাস করিতেছি। ইংলণ্ড সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদের ছিল না। কি কারণে জার্ম্মাণদের সহিত আমাদের স্বজাতি ইংরেজের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কোনও দিন জানিতে পারি নাই; ইংরেজদের প্রতি জার্ম্মাণ জাতির দুর্দ্দান্ত নেতা হিট্‌লারের আক্রোশের কারণ কি, তাহাও আমরা এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট জানিতে পারি নাই। বিশেষতঃ, কাপ্তেন রথভেন এবং লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে; তাহারা যে আমাদের দেশের শত্রু, ইংরেজ জাতির তাহারা ঘোর অনিষ্টকারী, আমাদের প্রতি ব্যবহারে তাহা তাহারা কোন দিন আমাদিগকে বুঝিতে দেয় নাই; এইজন্য আমরা সর্ব্বদাই তাহাদের নিকট উপকারের প্রত্যাশা করিতেছিলাম। মেরী লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয়, সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন। এ অবস্থায় তাহাদের বিপদ আমরা নিজের বিপদ মনে করিব, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

আমি এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মেরীকে মৃদুস্বরে বলিলাম, "মেরী, এই সকল নৌ-সৈন্য কোথা হইতে আসিয়াছে, বলিতে পার?"

মেরী আমার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া বলিল, "আমি তাহা জানি না, পিটার! তুমি চুপ করিয়া থাক; কথা কহিয়া কোন লাভ নাই।"

ষ্টান্‌ডিস্ আমাদের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে মেরীকে বলিল, "মেরী, তুমি বাড়ী যাও, এখানে তোমার থাকা নিষ্প্রয়োজন।"

মেরী দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, আমি এখানেই থাকিব।"

ষ্ট্যান্‌ডিস্ বলিল, "কিন্তু তাহার কি প্রয়োজন? তুমি—"

মেরী তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "আমি বলিয়াছি, আমি এখানে থাকিব। আমাকে তাড়াইবার কোন অধিকারই তোমার নাই। যদি আমাকে অপরাধী মনে করিয়া থাক, আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পার। কিন্তু তোমার আদেশ পালন করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

এ কথার পর ষ্টান্‌ডিস্ মেরীকে আর কোন কথা বলিল

না। আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া নিদারুণ নৈশ শীতে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম, এবং রাইফেল ও সঙীনধারী সেই সকল শ্রেণীবদ্ধ ও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান নৌ-সৈনিকদিগের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। তাহাদিগের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, এই সকল বৃটিশ সৈন্য স্বদেশের গৌরব এবং স্বজাতির সম্ভ্রমরক্ষার জন্য জার্ম্মাণদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে? আমি পূর্ব্বে কোন দিন এই সকল সৈন্যের এক জনকেও দেখি নাই; এই যুদ্ধের কি ফল হইবে, তাহা কোন দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সকল বৃটিশ সৈন্য দেখিয়া, স্বদেশের জন্য তাহারা কি ভাবে আত্মোৎসর্গ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া, তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। স্বদেশ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা না থাকিলেও আমি হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনা অনুভব করিলাম, এবং এ সকল কিছুই আমি জানি না ভাবিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য আমার মন ক্ষোভে-দুঃখে পূর্ণ হইল। তাই অন্ধ যেমন হঠাৎ চক্ষু পাইলে পরম আগ্রহে, ব্যাকুল হৃদয়ে সমগ্র প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ আগ্রহভরে পুনঃ পুনঃ সেই সকল সৈন্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, তাহারা সত্যই বীরপুরুষ, স্বদেশের গৌরবস্বরূপ।

এই সকল সৈন্য ঠিক একই স্থানে পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া বোধ হয়, জার্ম্মাণদের 'ইউ'-বোটেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল; সম্ভবতঃ, তাহারা আশা করিতেছিল, কিছু কাল পরে তাহাদের আশা পূর্ণ হইবে। আমি ও মেরী—আমরা উভয়েই জানিতাম, রাত্রিশেষ হইবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন ভন্ রথভেনের 'ইউ'-বোটের সাঙ্কেতিক আলোক সমুদ্র-বক্ষে রক্তচিহ্নের ন্যায় ফুটিয়া উঠিবে।

কিন্তু ঐ সকল নৌ-সৈনিকের কথাই পুনঃ পুনঃ আমার মন আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহারা কোন্ স্থান হইতে এই দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা প্রেত-দেহের ন্যায় ঐ গিরিপাদমূলে আসিয়া নিশ্চল প্রেতের ন্যায়ই প্রতীক্ষা করিতেছে।

কিন্তু ঐ সকল সৈন্যের দিকে মেরীর দৃষ্টি ছিল না; সে সমুদ্র-বক্ষেই পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহার দৃষ্টিতে কি গভীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিতেছিল! আরও কিছু কাল পরে তাহার হাত আমার হাতের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ষ্ট্যান্ডিস্ পূর্ব্বোক্ত সামরিক কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখুন, মহাশয়, ঐ দিকে চাহিয়া দেখুন।"—সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-অভিমুখে তাহার অঙ্গুলি প্রসারিত হইল।

আমরাও সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; সমুদ্র-বক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল! দেখিলাম, কিছু দূরে একটি সুলোহিত আলোক-শিখা নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছে। উহা যে কাপ্তেন ভন্ রথভেনের 'ইউ'-বোটের সাঙ্কেতিক আলোক, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আমি মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চক্ষুতেও আতঙ্ক পরিস্ফুট দেখিলাম। মেরীও বুঝিতে পারিয়াছিল, আমাদের লণ্ঠনের সাঙ্কেতিক আলোক আন্দোলিত হইলেই কাপ্তেন ভন্ রথভেন এবং লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন ডিঙ্গীর সাহায্যে সমুদ্র-বেলায় উপস্থিত হইবে, এবং তৎক্ষণাৎ অদূরবর্ত্তী বৃটিশ নৌ-সৈনিকবর্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বন্দী হইবে।

যে বৃটিশ নৌ-কর্ম্মচারী উপকূল-রক্ষী ষ্ট্যান্ডিসের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাগর-বক্ষে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন, তিনি 'ইউ'-বোটের সাঙ্কেতিক আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "উহাদিগকে সাঙ্কেতিক আলোক দেখাও, ষ্টান্ডিস্!"

তাঁহার আদেশানুসারে ষ্টান্ডিস্ বালুকারাশিতে সংরক্ষিত হরিকেন লণ্ঠনের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিল। সে সেই জ্বলন্ত কাঠিটা লণ্ঠনের পলিতায় স্পর্শ করিতে উদ্যত হইতেই মেরী হাত বাড়াইয়া লণ্ঠনটা সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিল।

ষ্ট্যান্ডিস্ মেরীর উদ্দেশ্য বোধ হয় পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। মেরী লণ্ঠনটা স্পর্শ করিবা মাত্র ষ্ট্যান্ডিস্ মেরীর প্রসারিত হাতখানি সবেগে এক ধাক্কায় সরাইয়া দিল, এবং তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কি করিতেছ, মেরী? অত চঞ্চল হইও না, সরিয়া দাঁড়াও। তোমার ঐ চেষ্টা সফল হইবে না।"

পর-মুহূর্ত্তেই লণ্ঠনটা জ্বলিয়া উঠিল। ষ্ট্যান্‌ডিস্‌ লণ্ঠনটা ঊর্দ্ধে তুলিয়া-ধরিয়া তাহার পীতাভ ক্ষীণ আলোকের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল; তাহার পর লণ্ঠনটা সমুদ্রের দিকে প্রসারিত করিয়া কয়েক বার আন্দোলিত করিল। বুঝিতে পারিলাম,—'ইউ'-বোটের কাপ্তেন সেই সাঙ্কেতিক আলোক দেখিতে পাইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগকে ধরিবার জন্য কিরূপ ফাঁদ পাতা হইয়াছে, তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে অবিলম্বেই এই ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইতে হইবে।

অতঃপর ষ্ট্যান্‌ডিস্‌ লণ্ঠনের আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া লণ্ঠনটা বালুকারাশির উপর বসাইয়া রাখিল; তাহার পর সে মেরীর পাশে আসিয়া বলিল, "মেরী, আর কোন রকম চালাকি করিবার চেষ্টা করিও না। তুমি উহাদিগকে সতর্ক করিবার চেষ্টা করিলে তোমার সে চেষ্টা সফল হইবে না। আমরা সতর্ক আছি।"

এ কথা শুনিয়া মেরী কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না; বিপদ অপরিহার্য্য বুঝিয়া সে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হতাশ ভাব লক্ষ্য করিয়া আমার বড় দুঃখ হইল; কিন্তু আমারও তখন কিছুই করিবার ছিল না। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে নির্নিমেষ নেত্রে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পরে আমরা 'ইউ'-বোটের ডিঙ্গীর দাঁড়ের ঝুপ্‌-ঝুপ্‌ শব্দ শুনিতে পাইলাম। কাপ্তেন ভন্‌ রথভেন লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনের সহিত সেই ডিঙ্গীতে আমাদের নিকট আসিতেছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম।

নৌ-কর্ম্মচারী সেই শব্দ শুনিতে পাইয়া ষ্ট্যান্‌ডিস্‌কে বলিলেন, "উহারা ডিঙ্গী লইয়া এইখানেই আসিতেছে, ষ্ট্যান্‌ডিস্‌! তোমরা সতর্ক থাক।"

অতঃপর তিনি নৌ-সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কি আদেশ করিলেন, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইলাম—তাহারা হাতের রাইফেল উদ্যত করিয়া, সমতালে পা ফেলিয়া শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে আমাদের নিকট অগ্রসর হইল। তাহারা সকলেই নির্ব্বাক্‌; অথচ তাহাদের অধিনায়কের আদেশ পালনের জন্য সমুৎসুক, ইহা তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। সৈনিকমণ্ডলী সেনাপতির আদেশে কি ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হয়, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না; সেই প্রথম আমি সৈন্য-পরিচালন দেখিতে পাইলাম।

কিন্তু মেরী তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না; তাহার মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছিল! সে মুহূর্ত্ত মধ্যে ষ্ট্যান্‌ডিস্‌কে এক ধাক্কায় দূরে ঠেলিয়া-ফেলিয়া জলের ধারে উপস্থিত হইল, এবং আবেগ-কম্পিত স্বরে সমুদ্রতট প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ফ্রাঁজ, ও ফ্রাঁজ! সতর্ক থাক,—শত্রু-সৈন্য সাগর-কূলে—"

কিন্তু মেরী মুখের কথা শেষ করিতে পারিল না। ষ্ট্যান্‌ডিস্‌ তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে লাফাইয়া-পড়িয়া এক হস্তে তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিল এবং অন্য হস্তে তাহার মুখ দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিল।

মেরী এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া, দেহের সকল শক্তি প্রয়োগে ষ্ট্যান্‌ডিসের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। কিন্তু ষ্ট্যান্‌ডিস্‌ দীর্ঘদেহ, অসাধারণ বলবান সৈনিক; মেরী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। কাপ্তেন ভন্‌ রথভেনের 'ইউ'-বোটের ডিঙ্গীখানা তখন সমুদ্র-কূলে আসিয়া পড়িয়াছিল। ডিঙ্গীখানা সমুদ্রতট হইতে দৃষ্টি-গোচর হইবামাত্র সৈনিকদের অধিনায়ক তাঁহার অদূরে দণ্ডায়মান সৈন্যগণকে পরিচালিত করিবার জন্য সাঙ্কেতিক আদেশধ্বনি করিলেন। আদেশ শ্রবণমাত্র নীল উর্দ্দীমণ্ডিত সেই সকল বৃটিশ সৈন্য একযোগে সমুদ্রের কিনারায় উপস্থিত হইয়া এক হাঁটু জলে নামিয়া পড়িল। 'ইউ'-বোটের ডিঙ্গীর আরোহীরা ঐ সকল বৃটিশ সৈন্যকে সেখানে সমাগত দেখিয়া, তাহারা কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেও ডিঙ্গীখানির মাথা ঘুরাইয়া আর দূরে পলায়নের সুযোগ পাইল না; কয়েক জন সৈনিক একসঙ্গে হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ ডিঙ্গীখানি ধরিয়া ফেলিল।

এই সময় সৈন্যগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া সমস্বরে গর্জ্জন করিল, এবং মুহূর্ত্ত পরেই একবার মাত্র বন্দুক-নির্ঘোষ আমাদের কর্ণগোচর হইল; সঙ্গে সঙ্গে সার্চ্চ-লাইটের তীব্র আলোকে জলস্থল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি মেরী ও ষ্টানডিসের পার্শ্বে কম্পিত-বক্ষে থাকিয়াও

আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে পাইলাম—সার্চ্চলাইটের আলোকে বহু দূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইবামাত্র উলফ্-পয়েণ্টের পশ্চাৎ হইতে একখানি দ্রুতগামী সুবৃহৎ মোটর-লঞ্চ সবেগে অদূরে ভাসমান জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটের অভিমুখে ধাবিত হইল।

আমরা দেখিলাম, কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই মোটর-লঞ্চ 'ইউ'-বোটখানির পাশে ভিড়িতেই মোটর-লঞ্চ হইতে দলে দলে সশস্ত্র নৌ-সৈনিক 'ইউ'-বোটে উঠিয়া পড়িল, এবং তাহারা 'ইউ'-বোটের নাবিকবর্গ কর্ত্তৃক বাধা পাইবার পূর্ব্বেই 'ইউ'-বোটের লৌহনির্ম্মিত ডেক হইতে সিঁড়ির সাহায্যে তাহার কোণাকৃতি টাউয়ারে আরোহণ করিল। অতঃপর 'ইউ'-বোট অধিকার করিতে তাহাদের বিলম্ব হইল না। বৃটিশ সৈনিকগণ জার্ম্মাণ নাবিকগণের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে 'ইউ'-বোট অধিকার করিল যে, জার্ম্মাণ নাবিকগণ আত্মরক্ষার জন্য কোন চেষ্টাই করিতে পারিল না। এই অতর্কিত বিপদে তাহারা সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল; কেহই অস্ত্র ব্যবহার করিবার অবসর পাইল না। 'ইউ'-বোটের জার্ম্মাণ নাবিকগণ এত সহজে আত্মসমর্পণ করিবে—ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। আমি মেরীর মুখের দিকে চাহিলাম, তাহার মুখ মৃত ব্যক্তির মুখের ন্যায় পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু 'ইউ'-বোটের দিকে তখন তাহার দৃষ্টি ছিল না। 'ইউ'-বোটের ডিঙ্গীতেই তখন তাহার দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট।

সহসা মেরীর কণ্ঠ হইতে তীব্র আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হইল। মেরী মুহূর্ত্ত মধ্যে সবলে ষ্ট্যান্‌ডিসের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তীরবেগে তীরের দিকে ধাবিত হইল। তখন পূর্ব্বোক্ত ডিঙ্গীর আরোহিগণকে ডিঙ্গী হইতে নামাইয়া লইয়া এক দল সৈনিক তাহাদিগকে আমসের গৃহের দিকে পরিচালিত করিতেছিল। মেরী সবেগে সেই সকল সৈনিককে ঠেলিয়া-ফেলিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ফ্রাঁজ, ফ্রাঁজ! হায়, কি সর্ব্বনাশই হইল!"

মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিলাম, চর্ম্মনির্ম্মিত বর্ম্মাবৃত লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন উভয় হস্তে মেরীকে জড়াইয়া-ধরিয়া বুকে তুলিয়া লইল। তাহার মুখ ব্লটিং কাগজের মত সাদা, মুখে শোণিতের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাহার ব্যাকুল চক্ষু মেরীর মুখের উপর সংস্থাপিত; কিন্তু তাহার চক্ষুতে আমি ভয়ের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। কাপ্তেন ভন্ রথভেন লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনের পাশে-পাশে চলিতেছিল; কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল—এই বিপদে সে সম্পূর্ণ উদাসীন; তাহাকেও বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখিলাম না। আমার মনে হইল—সমুদ্রে যাহাদের শয্যা, শিশির-পাতে তাহাদের আর ভয় কি?

কিন্তু অসহায়া মেরীর এই প্রেমের পরিণাম কি?

যাহা হউক, কাপ্তেন ভন্ রথভেন এবং লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন যে ডিঙ্গীতে তাহাদের 'ইউ'-বোট হইতে তীরে আসিয়াছিল, দুই জন নাবিক সেই ডিঙ্গী পরিচালিত করিতেছিল। কাপ্তেন রথভেন ও লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনের সহিত তাহারাও বৃটিশ নৌ-সৈনিকগণের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। তাহারা চারি জনই বৃটিশ সৈন্যবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া 'ব্ল্যাকগল ফার্ম্মে' আমসের পাকশালায় নীত হইল। আমস্ তখন তাহার পাকশালায় বসিয়া হতাশ ভাবে ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার জীবনের আর আশা নাই; কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে সমুদ্রতটে কি কাণ্ড ঘটিতেছিল, তাহা সে ধারণা করিতে পারে নাই। নীল পরিচ্ছদধারী বৃটিশ নৌ-সৈন্যদল যে যুদ্ধ-জাহাজে তাহার দ্বীপে উঠিয়া গিরিপাদমূলে অপেক্ষা করিতেছিল—ইহাও সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

সেই রাত্রিতে আমাদের সুপ্রশস্ত পাকশালায় যত লোকের সমাগম হইল, তত অধিক সংখ্যক লোক যে সেই কক্ষে একত্র সম্মিলিত হইতে পারে, ইহা আমি কোন দিন ধারণাও করিতে পারি নাই। অতঃপর আমাদের ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহাই আমি ক্রমাগত চিন্তা করিতে লাগিলাম।

তবে একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম; আর কোন দিন আমাদিগকে 'ইউ'-বোটের কাপ্তেনদিগকে সাঙ্কেতিক আলোক দেখাইবার জন্য রাত্রি জাগিয়া সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকিতে হইবে না। আর কোন দিন

উহারা 'ইউ'-বোটের ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য আমাদের দ্বীপে আসিয়া আমার ও মেরীর সহিত হাসি-তামাসা করিবে না। আমাদের এই একঘেয়ে কাজ জন্মের মত শেষ হইয়াছে। এখন আমাদিগকে নূতন পথে চলিতে হইবে, নূতন ভাবে আমাদের জীবন আরম্ভ হইবে; কিন্তু কোন্ পথ আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হইবে, সেই পথ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই। হয় ত মেরীর নিকট আমাকে চির-বিদায় লইতে হইবে; জীবনে তাহার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না। এত কাল সুখ-দুঃখে তাহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি; তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে ভাবিয়া আমার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। হতভাগ্য আমসের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ব্যথিত হইলাম। তাহার পরিত্রাণ লাভের কোনও পথ আছে বলিয়া মনে হইল না। স্বদেশদ্রোহিতা, স্বজাতির সর্ব্বনাশের জন্য শত্রুকে সাহায্য করিয়া সে যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার মার্জ্জনা নাই; চরম দণ্ড তাহার প্রাপ্য, সেই দণ্ড তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হইল, এই অপকার্য্যে তাহার আদেশ পালন করিয়া আমরাও অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু আমাদের অপরাধ কিরূপ গুরু, তাহা আমাদের ধারণা করিবার শক্তি ছিল না, এবং অপরাধের গুরুত্ব কেহই কোন দিন আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয় নাই; তদ্ভিন্ন, আমাদের প্রতিপালক আমসের অবাধ্য হইব, সেইরূপ শক্তিও আমাদের ছিল না। তথাপি আমরা অপরাধী; আমসের আদেশে যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, তাহার কিরূপ শাস্তি আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে, তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না; তবে আর যে আমাদিগকে এই কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইবে না, ইহা বুঝিতে পারায় আনন্দিত হইলাম। কিন্তু কাপ্তেন ভন্ রথভেন ও লেফ্টেনাণ্ট হ্যাগেনের জন্য আমার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। তাহারা আমাদের দেশের শত্রু, 'ইউ'-বোটের সাহায্যে বোম্বেটেগিরি করিয়া তাহারা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে; অনেক বৃটিশ জাহাজ বিধ্বস্ত করিয়াছে, টর্পেডোর আঘাতে বহু ধনজন সমুদ্র-গর্ভে সমাহিত করিয়াছে; কিন্তু আমাদের প্রতি প্রথম হইতেই তাহারা বন্ধুবৎ আচরণ করিয়াছিল, আমাদের প্রতি কোন দিন তাহাদের স্নেহের অভাব বুঝিতে পারি নাই; এইজন্যই তাহাদের কল্যাণ-কামনায় আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা আমাদের জাতির শত্রু হইলেও আমার ও মেরীর হিতৈষী, ইহা ভুলিতে পারিলাম না।

কিন্তু বৃটিশ রণতরীখানি কখন্ কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য আমার প্রবল কৌতূহল হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন সমুদ্র-বক্ষে একখানি জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ শুনিয়া 'ইউ'-বোটের ডিঙ্গীর নাবিকরা কাপ্তেনকে সতর্ক করিয়াছিল, কিন্তু সেই জাহাজ আমাদের দ্বীপের নিকট না আসিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিল, উহা কি সেই জাহাজ? আমি এই সকল কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় উপকূল-রক্ষী এলিসের সহিত ষ্ট্যান্ডিসের কথাবার্ত্তা আমার কর্ণগোচর হইল। আমি জানিতে পারিলাম—সেই দিন সায়ংকালে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে একখানি বৃটিশ রণতরী নিঃশব্দে আসিয়া দ্বীপের অন্য ধারে নঙ্গর করিয়াছিল; সেই জাহাজ হইতে ঐ সকল বৃটিশ নৌ-সৈন্য দ্বীপে অবতরণ করিয়া পাহাড়ের আড়ালে লুকাইয়া ছিল। সেই জাহাজের কাপ্তেন তখন পর্য্যন্ত আমসের পাকশালায় গমন করেন নাই; উপকূল-রক্ষীরা কতকগুলি নাবিকসহ জার্ম্মাণ বন্দীদের লইয়া পাকশালায় তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পাখী ও ঝড়

যে শাখা একদা পাখীর ভারেও নোয়ায়ে পড়ে।
সে শাখাই পরে দারুণ ঝড়ের সঙ্গে লড়ে।

বসন্ত-প্রয়াণ

(১)

পুরুষের উক্তি :—

ছিল দিন—সে দিন সে গো
অনেক বছর আগে—
যে দিন প্রিয়া আমার পানে
চাইতো অনুরাগে !
যদি রে উশুখুশু মাথার কেশ এ,
মাথাতে চালিয়ে বুরুশ্
সাজিয়ে দিত বিনোদ বেশে !
গরমে আমায় প্রিয়া
পাখা দিয়া
বাতাস দিত ;
ঘামলে আমি, আঁচলে ঘাম
মুছিয়ে নিত !
এ-মুখে চাইতো প্রিয়া অনুরাগে !
এ-বুকে সে-সব স্মৃতি আজো জাগে !

জীবন আমার রাঙা তখন
ফাগুন-রাগে !
ষোড়শী ছিল প্রিয়া—
কি মাধুরী অঙ্গে জাগে !
দু'জনে দোঁহার পানে বিভল আঁখি !
পল্লবিনী দেহ-লতা—
আদর-সোহাগ—ভুলবো তা কি ?
নাহি নিদ্ আঁখি-পাতে
জ্যোস্না-রাতে
কত হাসি !
দু'জনে বুকে-বুকে মুখে-মুখে
কত ভালো-বাসাবাসি !
নিমেষে নয়ন-হারা হলে পরে
সারা নিখিল অন্ধকারে যেতো ভরে' !

আজি রে শুধুই স্মৃতি,
সে-দিন যেন স্বপ্ন-কথা !

প্রেয়সী গৃহিণী আজ—
কোথায় তনু দেহ-লতা ?
চোখের সে-বিহ্বলতা মিলিয়ে গেছে ;
বচনে নাইকো মধু—
আগুন যেন জ্বেলে দেছে !
আকাশে উঠলে শশী
পাশে বসি
যদি বলি,—
"কথা কও অনুরাগে !"
বলেন, "জ্বলি
হাজার জ্বালায় তোমার হাতে !
খেটে গা-গতর হলো পঙ্গু বাতে !"

জামাটা পকেট-ছেঁড়া
বলি, "দাও সেলাই ক'রে !"
মেজাজে ঝেঁজে বলেন,
"দাসী বেশ পেয়েছে রে !"
সে-ফাগুন তেমনি বেশে আজো আসে ;
পাখীরা তেমনি গো গায়,
বাতাসে গন্ধ ভাসে !
তিনি সেই আছেন তিনি
চিরদিনই—
আমিও আমি !
কি হলো, কখন্ যে হায়,
প্রাণের বীণা গেল থামি !
তিনি আজ অগ্নিময়ী—ঝেঁজে আছেন সবার 'পরে !
আমি ঐ কোনো মতে আছি দাদা, বেঁচে-মরে' !

(২)

নারীর উক্তি :—

সে দিন—সে কি এসেছিল সত্যই ?
না, সে মিথ্যা স্বপন-সৃষ্টি ?
যে দিন আমার অঙ্গে-অঙ্গে ফাগুন—
আমার 'পরে তোমার বিভল দৃষ্টি ?

আমার মাথায় কালো কেশের রাশি
ছুঁয়ে তুমি বল্‌তে রেশম-কুচি !
আমার গালে রক্ত-গোলাপ ফোটে !
আমার হাসি চারু-চন্দ্র-রুচি !
আমার আঁখির 'পরে রাখি আঁখি
বিবশ হতে, বিভল হতে তুমি !
স্বর্গ পেতে আমায় পেয়ে তুমি—
পিপাসা সব মিটতো অধর চুমি !
পদ্ম-অশোক আমার চরণ-পাতে—
আমার কথায় সুরের কুসুম-ঝুরি !
সাধ মেটে না চোখে-চোখে রেখেও—
দেখতে আমায় ক'রে লুকোচুরি !
নয়ন আমার হলে ছল-ছল,
মৌনময়ী হলে বাণী-হারা—
উতল হতে, আকুল হতে কত—
হাজার প্রশ্নে হতে পাগল-পারা !
তোমার ভুবন ছিল আমায় ঘিরে,
আমি ছিলেম তোমার জীবন ভরি !
আমার তখন বয়স বছর ষোল—
আমি ছিলেম তোমার ধ্যানের পরী !

কত বছর মাঝে এলো-গেল,
আমার সে-রূপ বাতাসে যায় ঝরে !
গালের গোলাপ-পাপড়ি মিলায় তাপে,
পদ্ম-অশোক শুকায় চরণ 'পরে !
তোমার চোখের প্রদীপ কোথা গেল—
যার আলোতে দীপ্তি আমার রূপে ?
তোমার আদর-সোহাগ বিভল-বাণী
মিলালো আজ সে কোন্ আঁধার-কূপে ?
অঙ্গ আমার যৌবনে হয় হারা,
কেশের রেশম আজকে সে হায়, খর !
অঙ্গে-অঙ্গে আমার কুসুম কৈ ?
চাঁপা-বকুল রৌদ্রে জর-জর !

তবু আমার মনে কুসুম আছে ;
লক্ষ বাতি আজো জ্বলে বুকে ;
শতেক-কাজে তোমার নাহি সময়
নয়ন তুলে চাইবে আমার মুখে !
সন্ধ্যা-বাতাস উতল বয়ে যায়,
পূর্ণশশী ওঠে আকাশ 'পরে ;
হিসাব-পত্র খাতা-কাগজ মেলি
পাষাণ হয়ে বসে আছো ঘরে !
পাশে এসে আমি বলি,—"ওগো,
একটুখানি বসো আমার কাছে" !
বাঁকা ভুরু, কঠিন ভাষে বলো,—
"সরো, সরো, কাজ-কর্ম্ম আছে !"

বুকে আমার মুগুর পড়ে যেন !
চিত্ত আমার—সে হয় বজ্রাহত !
নয়ন-বারি—শাসনে তায় রুখি,
উঠে আসি দারুণ লজ্জানত !
রান্নাঘরে উনুনগোড়ায় বসি,
না হয় সেলাই করি কাঁথা-কানি !
কাজের শেষে রচি নতুন কাজে,—
এ-কাজ করি, ও-কাজ ধরে টানি !
ভুলেও আমার কথা ভাবো না তো,
হায় রে, আমার ফাগুন গেছে চলি !
অঙ্গে-অঙ্গে যত কুসুম ছিল,
দিছি তোমায় প্রাণের বৃন্ত দলি !
পেলব-তনু, দেহের নিটোল ছাঁদ,
বিভল দিঠি এ দুই নয়ন-ভরা—
কে নিল গো ? এ-সব দিলেম কারে ?
কারে দিয়ে হলেম সর্ব্ব-হরা !
বেশী দিনের কথা সে নয়, ওগো,
সে দিনও যে সাজিয়ে নিত্য ডালি,
আমার দেহে-মনে চূর্ণ করি
তোমায় দিয়ে আমার পুঁজি খালি !
মুখের গোলাপ, বুকের পদ্ম-কলি,
বর্ণ-গন্ধ-মধু দিলেম কারে ?
ভাবি হায় সে ভুলেও চাহে না আর
পুষ্পবিহীন কুঞ্জ-পথের ধারে !

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা



সম্মোহিত

এক

কর্ম্মক্লান্ত অবসন্ন দেহ-ভার বহন ক'রে বিভাকর দিবা-শেষে যখন ঘরে ফিরিলেন, সন্ধ্যা সমাগমের তখন আর অধিক বিলম্ব ছিল না। প্রতিদিনের মত সেদিনও তখন বাড়ির বড় ঘরখানি সমাগত বন্ধুবান্ধবের বিচিত্র কলধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আহুতি পিয়ানোর সম্মুখে মিউজিক টুলের উপর বসিয়া অন্য ধারে ফিরিয়া সস্মিত মুখে কি বলিতেছিল; হয় ত অল্পকাল পূর্ব্বে সমাপ্ত সঙ্গীত-সংক্রান্ত আলোচনারই কুণ্ঠিত-কণ্ঠের প্রতিবাদ। একবার ভিতরের দিকে চাহিয়া-দেখিয়া বিভাকর অন্য দিনের মতই দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন; তাহা লক্ষ্য করিয়া আহুতি তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমরা মিষ্টার সোমের সঙ্গে তাঁর আগড়পাড়ার বাগানে যাচ্ছি, তুমি যদি যেতে চাও, তা'হ'লে একটু তাড়াতাড়ি এসো।"

পত্নীর কথা শুনিয়া বিভাকর একটু বিস্মিত ভাবে কহিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে এল, এই রাত্রে সেখানে যাওয়ার দরকার কি?"

আহুতির সুগৌর মুখে বিরক্তির ছায়া ফুটিল; ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "আজ পূর্ণিমা কি না, পূর্ণিমার মধুর রাত্রিটা 'এনজয়' করবার জন্যই ত সেখানে যাচ্ছি।"

"তার মানে? রাত দুপুরে দল বেঁধে পরের বাগানে গিয়ে হৈ-চৈ না করলে পূর্ণিমার রাত্তির কি 'এনজয়' করা চলে না? সখটা নতুন ধরণের বটে!"

প্রদীপ্ত অগ্নিরাশিতে অল্প বাতাস লাগিলেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়। বিভাকরের মনে বিরক্তির বহ্নি একটু একটু করিয়া অনেক দিন হইতেই পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া কেবল যে আহুতিই বিস্মিত হইলেন, এরূপ নহে, সমাগত বন্ধুরা সকলেই সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলেন। বিভাকর স্বভাবতঃই নিতান্ত শান্ত-প্রকৃতির লোক। তাঁহার মুখ হইতে রূঢ় বাক্য নিঃসারিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয়।

আহুতি রাগিয়া-ঝাঁঝিয়া যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন! কয়েক মুহূর্ত্ত বলিবার মত কোন কথা তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না; কারণ, অত্যধিক ক্রোধ অনেক সময় মানুষকে নির্ব্বাক্ করে। বিভাকর তখনই কি ভাবিয়া সরিয়া পড়িতেছিলেন; কিন্তু আহুতি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে তোমার মনের মিল কোন দিনও হবে ব'লে মনে হয় না; তা হ'তেও পারে না। কেন না, তুমি যে ভাবে যে-সব আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির ভেতর দিয়ে বড় হ'য়েছ, সে-গুলোর সঙ্গে আমাদের একেবারেই পরিচয় নেই! জোর ক'রে আমাদের মধ্যে তোমায় টেনে আনা হ'য়েছে বটে, কিন্তু তেলের সঙ্গে জল কিছুতেই যে মিশ খায় না, তা কে না জানে?"

পঙ্কিল জল থিতাইয়া তাহার উপরটা নির্ম্মল হইলেও একটু আলোড়নেই তাহা ঘোলাইয়া উঠে। বিভাকর স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষণকাল পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া-থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার ও-কথা সত্যি। তেলে আর জলে সত্যিই কোন দিন মেশে না। কথাটা অনেক সময় আমারও মনে হয়। আর সে জন্যে কষ্ট পেতে হয় আমাকেই।"

আহুতি আরক্তিম মুখে কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইতেই বিভাকর তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন ও-কথা থাক, পরে আর এক সময় এর মীমাংসা হবে। এঁরা সকলে এখানে ব'সে আছেন; দল-বেঁধে কোথায় যাবে ব'লছো—তাই যাও; আমার অপেক্ষায় থাকবার দরকার নেই,—মানে, আমি এখন কোথাও যাব না।"

আহুতি আর কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু অন্যতম সুহৃদ মিষ্টার সোম সুমিষ্ট একটু হাসির সঙ্গে বিভাকরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কেন আপনি যাবেন না, মিঃ দে? চলুন না, এমন সুন্দর রাত্তির—'নাইস্'!"

বিভাকর কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভঙ্গিতে বলিলেন, "তা বটে; কিন্তু আমি সঙ্গে না থাকলেও এই সুন্দর রাত্রির মাধুর্য্য উপভোগে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না, মিঃ সোম! সারা দিন গাধা-খাটুনির পর আমার শরীর বড় ক্লান্ত। মনও ভাল থাকবার কথা নয়। আমার এই অক্ষমতা আপনারা দয়া ক'রে ক্ষমা করবেন।"

এ-কথা শুনিয়া মিঃ সোম কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু আহুতি তাহাতে বাধা দিলেন—কতকটা তাচ্ছিল্যের সুরে একটু অবজ্ঞাভরে কহিলেন, "যে যাবে না তাকে অকারণ অনুরোধ ক'রে ফল কি, মিঃ সোম! আপনি কি এখনই উঠতে চাইছেন? না, একটু পরে যাবেন?"

সোমকে তাঁহার বান্ধবীর প্রশ্নের উত্তরদানের অবসর না দিয়াই অন্য ধার হইতে মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "আর আধ ঘণ্টা পর উঠলেও চলবে, এই ত সবে সন্ধ্যা; নৈশ শোভা উপভোগের এখনও সময় হয়নি। ততক্ষণ আর এক কাপ চা হ'লে সেটাও মন্দ উপভোগ্য হ'ত না, মিসেস দে! তাতে অসুবিধে তেমন বেশী হবে কি? তা যদি হয়, তবে আর কষ্ট দিতে চাইনে,—মানে।"

মিঃ মুখার্জ্জি 'মানে'টা খোলসা করিয়া বলিবার পূর্ব্বেই মিসেস দে বলিলেন, "না না, এতে আর কষ্ট কি? এ ত খুসীর কথা। আচ্ছা, আমি দেখছি।"

আহুতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিলেন। বিভাকর এবার ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হইয়াছে, অথচ চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইবারও বিলম্ব আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহকক্ষে তখনও

বিদ্যুতালোক প্রজ্জ্বলিত হয় নাই। চারি দিকে একবার চাহিয়া বিভাকর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন; তাহার পর আলোর 'সুইচ'টা টিপিয়া আলো জ্বালিয়া, শ্রান্তভাবে ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "বয়!"

তাঁহার এই আহ্বান-ধ্বনিতে কেহই আসিল না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া তিনি পুনর্ব্বার ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন; তথাপি কোন দিক হইতে সাড়া-শব্দ নাই! আরও কিছু কাল প্রতীক্ষায় থাকিয়া তিনি উঠিয়া নিজেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন; তাহার পর স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিলেন। এক পেয়ালা চা এ-সময় নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া তাঁহার মনে হইলেও কাহারও নিকট তাহা চাহিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। টেবলের উপর 'ডাকে'র চিঠিগুলা পড়িয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহাতেই মনঃসংযোগ করিলেন।

সহসা আহুতি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদশব্দ শুনিয়া বিভাকর চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াই পুনর্ব্বার পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন।

আহুতি প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া বিভাকরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমাদের ফিরতে বোধ হয় রাত্তির একটু বেশীই হবে, পাঁচ জন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যাওয়া কি না। আমার প্রতীক্ষায় জেগে ব'সে না থেকে, খেয়ে-দেয়ে তুমি শুয়ে পোড়ো।"

বিভাকর কোন কথাই বলিলেন না। আহুতি আড়চোখে চাহিয়া মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ করিলেন, বোধ হয়, আরও কি একটা কথা বলিবার ছিল; কিন্তু তাহা বলিতে গিয়া ক্ষণমাত্র থামিলেন, তার পর দ্বিধা ত্যাগ করিয়া সহজ স্বরে কহিলেন, "আমার কিছু টাকা চাই; এখনই তার দরকার হ'য়েছে।"

বিভাকর পত্নীর মুখের দিকে না চাহিয়াই কহিলেন, "টাকা? টাকা ত তোমার কাছেই আছে।"

"আমার কাছে কিছু ছিল বটে, কিন্তু তা সবই খরচ হ'য়ে গ্যাছে।"

বিভাকর কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "খরচ হ'য়ে গেছে? সব টাকাই? আর কিছুই তোমার হাতে নেই?"

"না; কি ক'রে থাকবে? ভারী ত ক'টা টাকা—"

"চার শ' টাকা তোমার কাছে হয় ত সামান্য ক'টা টাকা, কিন্তু—"

আহুতি স্বামীকে তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিলেন, "চার শ' টাকা তোমার কাছে যে অনেক টাকা, আমার তা বেশ জানা আছে। তা যতই হোক—"

কি ভাবিয়া আহুতি হঠাৎ নীরব হইলেন। বাহিরের ঘরে বন্ধু-বান্ধবীরা তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বাদ-প্রতিবাদে সময় নষ্ট করা হয় ত সঙ্গত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি ভাবিলেন, বাক্যবাণগুলি ভবিষ্যতের জন্য তূণে আবদ্ধ রাখিলেও ক্ষতি নাই। যাহাকে শরাঘাতে বিদ্ধ করিতে হইবে, সে ত গৃহ-পিঞ্জরেরই বন্দী,—হাত ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারিবে না যখন, তখন আর চিন্তা কি?

বিভাকর স্থিরদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন—যেন উদ্যত সঙীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান নির্ভীক সৈনিক! ক্রমাগত সহ্য করিতে করিতে অতি অসহ বস্তুটাও শেষে গা-সহা হইয়া যায়। বিভাকর দরিদ্রের সন্তান; সাধারণ গৃহস্থের ন্যায়ই তিনি প্রথম জীবনটা অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই অস্বচ্ছলতার কথা আহুতিরও স্মরণ ছিল। তাহার পর কঠোর পরিশ্রম, চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে এখন তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মালিক হইলেও, অতীতের ঐ ত্রুটিটুকুকে উপলক্ষ করিয়া আহুতি প্রতি-কথায় তাঁহাকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিতে ছাড়েন না।

যাহা হউক, বিভাকর অবশেষে বলিলেন, "কি বল্‌ছিলে, বল্‌তে-বল্‌তে থামলে কেন? কথাটা শেষ ক'রেই যাও।"

শ্রীমতী মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রবার ফুরসুৎ এখন আমার নেই। আমার টাকার দরকার। শ'খানেক টাকা এখনই আমার চাই, আগে উঠে সেটা বার ক'রে দেবে? আমি বেশী সময় অপেক্ষা করতে পারবো না—তা তোমার বুঝতে পারা উচিত।"

বিভাকর উঠিলেন। টেবলের ড্রয়ার খুলিয়া খানকতক নোট বাহির করিয়া পত্নীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া আবার যথাস্থানে বসিয়া পড়িলেন।

স্বামীর সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার মিনিট-দুই পরেই আহুতি আবার সেই ঘরে আসিলেন। বিভাকর তাঁহাকে লক্ষ্য করেন নাই। আহুতি তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, "কি অন্যায় ঐ লোকটার! বলে, এখনই বাড়ী যাবে!"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বিভাকর স্ত্রীর মুখের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কে? কার কথা বলছ? কে বাড়ী যেতে চাচ্ছে?"

আহুতি উত্তেজনা-দৃপ্ত স্বরে কহিলেন, "বেবীর মাষ্টার, আবার কোন্ 'ইডিয়ট্'! বলে, দেশ থেকে চিঠি এসেছে, বাপের বড্ড অসুখ।"

বিভাকর স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে যাবে বৈ কি; তার বাপের যখন অসুখ—"

আহুতির উত্তেজিত সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে বিভাকরের মৃদু কণ্ঠধ্বনি চাপা পড়িয়া গেল। তিনি বিরক্তিভরে বলিলেন, "যাবে? কথাটা শুনেই তুমি ব'লে ফেললে যাবে বৈ কি! তার পর তার বদলে কবে যে লোক পাবো তার কিছু ঠিক আছে? তত দিন বেবীকে কে পড়াবে তা শুনি?"—উত্তেজনায় দে-গৃহিণীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

বিভাকর সংযত স্বরে বলিলেন, "তা দু'চার দিন পড়া বন্ধ থাকলে তার এমন কি আর ক্ষতি হবে? এত—"

আহুতি মুখ বাঁকা করিয়া বলিলেন, "থামো গো, থামো তুমি! তোমাকে মোড়লী ক'রবার ভার দেওয়া হয়নি। সব তাতেই তোমার বাড়াবাড়ি! এই জন্যেই ত বাড়ীর লোক-জন সব বেচাল হ'য়ে উঠেছে। আমি ব'লছি, ওর যাওয়া হবে না, আমি তার ছুটি মঞ্জুর করবো না, তা তার বাড়ী-ঘরে আগুন লাগুক না কেন? এখন সামনে আমার জন্মতিথির উৎসব, কত কাজ প'ড়ে রয়েছে। পুরোন লোক, ওকে এখন ছাড়লে চলে? যেতে হয়, পরে না হয় যাবে, এখন যেতে পাবে না। তোমার আক্কেল থাকলে আর এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হয় না।"

"কিন্তু ওর বাবার অসুখটা কি তোমার জন্মতিথির জন্যে মুলতুবি থাকবে?"—বিভাকরের কথায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

আহুতি অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "চাকর-বাকর ওরা, ওঃ, ওদের আবার অসুখ! অসুখ হ'য়ে থাকে, এমনই সেরে যাবে।"

বিভাকর মুহূর্ত্ত কাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নারীর মুখে এমন কদর্য্য কথা তাঁহার কর্ণপীড়াদায়ক হইল; তিনি উঠিয়া দ্বারের নিকটে গিয়া কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "প্রণবকে ডেকে দে ত।"

একটু পরেই প্রায় কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সের একটি ছেলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল। বছর-দুই আগে তিনি ইহাকে তাঁহার কন্যার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ছেলেটিকে বিভাকর স্নেহ করিতেন, আহুতিরও তাহার প্রতি দরদ ছিল। কারণ, মেয়েকে লেখাপড়া শিখান তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও সে বিনা প্রতিবাদে প্রত্যহ আহুতির বিশ রকম ফরমাস খাটিত! এটা তার উপরি চাকরী; সে জন্য তাহার কিঞ্চিৎ উপরি প্রাপ্তিও ছিল, তাহা অকারণ গালাগালি, যখন-তখন মুখ-ঝাম্‌টা—ইত্যাদি; কারণ, সে চাকর এবং নিরুপায়!

বিভাকর প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে, প্রণব? তুমি বাড়ী যেতে চাচ্ছ কেন?"

প্রণব অবনত মস্তকে ব্যথিত স্বরে বলিল, "বাবার খুব অসুখ; আমি না গেলে একা মা'র ভারী কষ্ট আর অসুবিধে হবে। আর ত কেউ তাঁকে দেখবার নেই, সেই জন্যেই আমার না গিয়ে উপায় নেই, সার!"

বিভাকর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই আহুতি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যেতেই হবে? তা বেশ, যেতে পার; কিন্তু এর পর আমার বাড়ীতে তোমার আর চাকরী করা চলবে না। তুমি ভেবো না যে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে।"

প্রণব বলিতে পারিত, কাকের অভাব না হইতে পারে—কিন্তু ভাত ছড়াইলে কোকিল, পাপিয়া আসে না। কিন্তু সে কথা তাহার মুখে আসিল না। সে গরীব,—বড় গরীব; আত্মাভিমান তাহার শোভা পায় না। সে আহুতির মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল, "মা'র চেয়ে, বাবার চেয়ে আমার কাছে কিছুই বড় নেই, মা! আমায় যদি এ কাজ থেকে আপনারা ছাড়িয়েই দেন, তা হ'লে আমার কষ্ট অসুবিধে খুবই হবে জানি; কিন্তু আমি নিরুপায়। তবু আমায় যেতেই হবে। না গেলে, বাবার প্রাণ-রক্ষার জন্যে আমার কিছুই চেষ্টা করা হবে না। সে আক্ষেপ আমি জীবনে ভুলতে পারবো না।"

চাকরের এই দৃঢ়তায় আহুতি ক্রোধে বিচলিত হইয়া দুই-তিন মিনিট কোন কথা বলিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন, "বেশ, যেতে পার। তোমার মাইনে যা পাবে শোধ ক'রে নিয়ে যেও। আর যেন তোমায় এ-মুখো হ'তে না হয়।"

আর কোন কথা না শুনিয়াই আহুতি সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বিভাকর প্রণবের কাতর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাওয়া কি তোমার একান্তই দরকার, প্রণব?"

প্রণব ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তা না হ'লে আমার মত গরীব চাকরীর আশা ত্যাগ ক'রে কখন যেতে চায়? বাবার অসুখ, তিনি বিছানায় প'ড়ে আমার পথ চেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। মা আমার জন্যে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। একা তাঁর কতই কষ্ট হচ্ছে। আমি কি ক'রে এখানে থাকি বলুন। চাকরী গেল ব'লে আর কি করব? আজই আমায় যেতে হবে, সার। একটুও বিলম্ব করতে পারবো না।"

বিভাকর সহানুভূতিভরে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখ। না গেলে নিতান্তই যদি না চলে, তবে যেতেই হবে। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেও।"

প্রণব নীরবে প্রস্থান করিল। বিভাকর অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আজিকার এই ঘটনা যেন তাঁহার অতীত স্মৃতির রুদ্ধদ্বারে সজোরে আঘাত করিয়া অনেক দিনের পুরাতন কথা মনের কোণে জাগাইয়া তুলিল। সেই দিন বিভাকর ছিলেন এই ছেলেটির মতনই দরিদ্র তরুণ যুবক। প্রণবের মত গৃহ-শিক্ষকের চাকরী লইয়া তিনিও কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারও ছিল স্নেহময় জনক-জননী! বিভাকর তাঁহাদেরই নয়ন-পুত্তলি একমাত্র সন্তান।

বাহিরে বন্ধু-বান্ধবের কলরোল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল। বিভাকর উন্মুক্ত বাতায়নপথে দেখিতে পাইলেন, আহুতি সদলে মোটরে চড়িয়াছেন। গাড়ী বংশীধ্বনি করিয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। বোধ হয়, বিনা কারণেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস বিভাকরের বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া নিঃসারিত হইল। ইজিচেয়ারটা কাছে টানিয়া-আনিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। মনের অসীম চাঞ্চল্য তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। দূর অতীতে কত কথা, কত স্মৃতি আজ তাঁহার চঞ্চল চিত্ত আলোড়িত করিতে লাগিল। সে গভীর বেদনার পুঞ্জীভূত স্মৃতি বিভাকর জোর করিয়াই ভুলিয়া ছিলেন; আজ কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাহা উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইল। চিত্রপটের শ্রেণীবদ্ধ ছবির মত একটার পর একটা তাঁহার মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

দুই

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভাকর দরিদ্র গৃহস্থের সন্তান। বাঙ্গালার এক অখ্যাত পল্লীতে সামান্য কয়েকখানি মৃৎকুটীর, আম, কাঁটাল, নারিকেল প্রভৃতি ফলের একটি বাগান, এবং কয়েক বিঘা উর্ব্বর লাখরাজ জমি মাত্র তাঁহার পিতার সম্বল ছিল। পল্লীগ্রামে তাহার আয় হইতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইলেও ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দিবেন তাঁহার পিতা প্রিয়নাথের সেরূপ সম্বল ছিল না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকা স্কলারশিপ পাইয়াছিলেন—সেই টাকা কয়টির উপর নির্ভর করিয়া বিভাকর 'আই-এ' পড়িবার জন্য কলিকাতায় যাইতে চাহিলে তাহার পিতা ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "আমার অবস্থা ত জান, বিভু! আমি তোমায় কিছুই সাহায্য করতে পারব ব'লে আশা ক'রনে। শুধু ঐ ক'টি টাকার ভরসায় কলিকাতায় গিয়ে বিপদে পড়বে? ও-চেষ্টা ছেড়ে দাও বাবা!"

বিভাকর হতাশ ভাবে জননীর মুখের দিকে চাহিলেন। ছেলের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সুলোচনা স্বামীকে কহিলেন, "ও ত আমাদের কাছে কিছু চাচ্ছে না। নিজের চেষ্টায় নিজের ভাল ও যদি করতে পারে, তাতে আপত্তি করা কি উচিত? কত গরীবের ছেলে যে নিজের চেষ্টায় মানুষ হ'য়েছে, ওর ভাগ্যে থাকে—ওরও ভাল হবে।"

প্রিয়নাথ অনেক চিন্তার পর পুত্রকে কলিকাতায় যাইবার অনুমতি দিলেন।

রবি-করোজ্জ্বল এক গ্রীষ্ম-প্রভাতে পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া বিভাকর কলিকাতা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলেন। ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সুলোচনা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মায়ের মাসতুতো ভাই দেবেন্দ্রনাথের বাসায় বিভাকরের আশ্রয় লইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া শ্রান্ত-দেহে বিভাকর যখন দেবেন্দ্রনাথের বাসায় আসিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছিল। নিজের ক্ষুদ্র সংসারে এই অনাহূত গলগ্রহের আবির্ভাবে মামা-মামী কেহই প্রসন্ন মনে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ, কলিকাতায় নিঃস্বার্থ ভাবে কাহাকেও দীর্ঘকাল আশ্রয় দেওয়া সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সহজও নহে। তথাপি মাতুল বলিলেন, "এসেছিস, বিভু। বেশ, ব'স, মুখে-হাতে জল দে। ওগো, বিভুকে কিছু খেতে দাও, সেই সকালে কখন্ খেয়ে বেরিয়েছে, খেয়ে-দেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'ক। যা রে বিভু, ও-ঘরে তোর মামীমা আছেন, তাঁর কাছে যা।"

নবাগত বালকটিকে দেখিতেই হয় ত মামীমা তখনই বাহির হইয়া আসিলেন। বিভাকরকে নতমস্তকে প্রণামে উদ্যত দেখিয়া তিনি বিকৃত স্বরে কহিলেন, "থাক্, থাক্, হ'য়েছে, ছত্তিক জাতকে ছোঁয়া রেলের কাপড়ে আর আমাকে ছুঁতে হবে না বাছা!" বিভাকর সভয়ে হাতখানা সরাইয়া লইলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইয়া নীরস স্বরে মামীমা প্রশ্ন করিলেন, "কলকাতায় ত পড়তে এলে; তা তোমার খরচ যোগাতে পারবে তোমার বাবা? কলকাতার কলেজে পড়া ত আর ঘরের খেয়ে পাড়াগাঁর পাঠশালায় লেখাপড়া করা নয়।—এমন সাহস ক'রে কি ভাল ক'রেছ বাপু?"

বিভাকর সহসা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না; তিনি একটু থামিয়া ধীরে-ধীরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি জলপানি পেয়েছি, মামীমা! কলেজের মাইনে লাগবে না।"

"তবেই যেন রাজা হ'লে! অন্য খরচও আছে তো? থাকবে কোথায়, তা ঠিক ক'রেছ? আমাদের এখানে না হয় দু'চার দিন কোন রকমে মাথা গুঁজে কাটালে; তার পর?"

মামীমার জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি লক্ষ্য না করিয়াই বিভাকর কহিলেন, "দু'-একটা 'টিউশনি' খুঁজে নেব, ঠিক ক'রেছি। তার পর কোন 'মেসে' গিয়ে থাকব; তা ছাড়া যেখানে পড়াব—তাঁরা যদি তাঁদের বাড়ীতে—"

মামীমা আশ্বস্ত ভাবে বলিলেন, "হাঁ, সে মন্দ কথা নয়; যদি তা জুটাতে পার, তবে একটা উপায় হ'তে পারে।"

মামীমা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধ ভাবে এ সকল কথা শুনিতেছিলেন; এবার তিনি বলিলেন, "হাঁ, উপায় হ'তে পারে বটে, কিন্তু কাজে তা ক'রে তোলাই শক্ত। টিউশনি মিলানোও আজকাল খুবই দুরূহ ব্যাপার কি না; মাষ্টারকে ঘরে রেখে আজকাল আর কেউ ছেলে-মেয়েদের পড়াতে চায় না। দেখি, তবে তুই খুব ভাল সময়েই এসে পড়েছিস, বিভু! তোর একটা হিল্লে আমি হয় ত ক'রে দিতে পারব; তোকে আর কষ্ট ক'রে কাজের খোঁজে বেশী ঘুরে বেড়াতে হবে না;—সেখানে কাজ হ'লে, তোর আর কোন ভাবনা থাকবে না, পরম সুখে রাজার হালেই থাকতে পারবি।"

মামীমার কথা শুনিয়াই তাঁহার বাড়ী হইতে সরিয়া-পড়িবার জন্য বিভাকর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "কোথায় সে কাজ, মামাবাবু? কাল থেকেই সে ব্যবস্থা হয় না?"

এজন্য মামাবাবুর নিজের আগ্রহও কম ছিল না। গলগ্রহটাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার চেষ্টায় তাঁহাকে যদি কিছু কষ্ট করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না; তাই তিনি কহিলেন, "আমার সাহেব সে-দিন ব'লছিলেন, 'বেবীকে পড়াবার জন্যে একটি মাষ্টার খুঁজে দিও, দেবেন!' তা তোমায় যদি নিয়ে গিয়ে দিই, তা হ'লে তিনি রাখতেও পারেন।"

দেবেন্দ্রনাথ এক বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের ক্লার্ক, বিভাকর তাহা জানিতেন। তথাপি তিনি কৌতূহলভরে কহিলেন, "সাহেবটি কে মামা? আপনি যাঁর কাজ করেন, তিনিই কি?"

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার এই অশিষ্ট প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ; তিনিই, হাইকোর্টের অত-বড় নামজাদা ব্যারিষ্টার, তিনি বাঙ্গালী হ'লেও তাঁকে সাহেব না ব'লে কি 'সাহেব' বলবো ফকরে ছুতোরকে? তাঁকেই 'সাহেব' বলে। সাহেব তোমায় দেখে পছন্দ ক'রলে হয়! একে নেহাৎ ছেলেমানুষ তুমি, তাতে অজ পাড়াগেঁয়ে; তোমাকে কি ওঁদের নজরে ধরবে? তা দেখা যাক ত চেষ্টা ক'রে।"

মামীমা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন; স্বামীর কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "তা তুমি বল্লে তোমার কথা সায়েব কখন এড়াতে পারবে না। তাঁর কাছে তোমার খাতির ত আর কম নয়, তুমিই ত তাঁর ডান হাত। তা যেমন ক'রেই হোক, ওকে তুমি সেখানে লাগিয়ে দাও। হাজার হোক, আপন জন—এসে পড়েছে তোমারই ভরসায়; ওর একটা হিল্লে আমরাও যদি না করি, তা হ'লে বেচারা যায় কোথায়? আর লোকেই বা বলবে কি?"

যাহা হউক, বিভাকরের সৌভাগ্যক্রমে দেবেন্দ্রনাথের আন্তরিক চেষ্টা বিফল হইল না। পরদিন হইতেই ব্যারিষ্টার বি, সি, গুপ্তর ছোট ছেলেটির 'প্রাইভেট টিউটার' নিযুক্ত হইয়া বিভাকর তাঁহারই গৃহে আশ্রয় পাইলেন। ব্যারিষ্টার গুপ্ত সাহেব লোক চিনিতেন এই প্রিয়দর্শন সুকুমার কিশোরের মুখে-চোখে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ্য করিলেন, যে-জন্য বিনা প্রশ্নে এবং দ্বিধাহীন চিত্তেই তাঁহাকে তিনি কাজে নিযুক্ত করিলেন। আহুতি গুপ্ত সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সেও বিভাকরের নিকট নিয়মিত ভাবে পড়িতে লাগিল।

মাসখানেক পরের কথা। মা চিঠি দিয়াছেন; বিভাকরকে দূরে পাঠাইয়া কতখানি ব্যথা লইয়া তাঁহার দিন কাটিতেছে, চিঠির প্রতি ছত্রে তাহা পরিস্ফুট হইতেছিল। মায়ের পত্র পড়িতে-পড়িতে বিভাকরের উন্মনা চিত্ত সেই সুদূর পল্লীর এক ভগ্নপ্রায়, খড়ের কুটীরের মধ্যে হাহাকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার অজ্ঞাতসারে দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়ন-প্রান্ত হইতে ঝরিয়া পড়িল।

"এ কি, আপনি কাঁদছেন? পুরুষমানুষের চোখে জল? সেম্!"—আহুতির এই শ্লেষপূর্ণ উক্তিতে লজ্জিত হইয়া বিভাকর তাড়াতাড়ি উদ্গত অশ্রুরাশি মুছিয়া ফেলিলেন। ছাত্রী হইলেও দীপ্ত অগ্নিশিখা তুল্য তেজস্বিনী এই মেয়েটিকে বিভাকর ভয় না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সদা-কুণ্ঠিত ভীরু নম্র স্বভাবের জন্য বিভাকরকে সর্ব্বদাই তাহার বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত। অন্যের

কথা এক রকম সহ্য হইলেও কোন অজ্ঞাত কারণে এই মেয়েটির বিদ্রূপপূর্ণ হাসি ও সুতীক্ষ্ণ বাণী কঠোর শেলের ন্যায় বিভাকরের মর্ম্মভেদ করিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিত, এবং আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত। আহুতির কথা শুনিয়া বিভাকর কুণ্ঠিত ভাবে চোখের জল মুছিয়া তাহাকে কহিলেন, "আমার চোখে জল কোথায়? তোমায় কে বল্লে, আমি কাঁদছি?"

আহুতি দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি বলছি, আর আমিই তা দেখেছি, সত্যই আপনি কাঁদছিলেন; কিন্তু আমার কাছে তা লুকোবার দরকার কি?"

বিভাকর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার ভুল হ'তে পারে ত? তুমি ঠিক দেখতে পাওনি।"

আহুতি মুখ বাঁকাইয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "ইউ আর এ সেন্‌লেস্ লায়ার! আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।"

আহুতি ফিরিতেছিল; বিভাকর ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া অত্যন্ত মিনতি সহকারে করুণ স্বরে কহিলেন, "রাগ ক'র না, আহুতি। দাঁড়াও তুমি; আমি তোমায় সত্যি কথাই বলছি এবার। আমি কাঁদছিলুম—এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আমি তা সত্যিই বুঝতে পারিনি; ভাবতে ভাবতে আপনিই হয় ত আমার চোখে জল এসেছিল।"

বিভাকরের কাতরতায় আহুতির বিরাগ দূর হইল। এবার সে টেবলের সম্মুখস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া বলিল, "কেন কাঁদছিলেন বলুন ত, কি হ'য়েছে শুনি।"

কিন্তু রোদনের কারণ ব্যক্ত করিতে বিভাকরের সঙ্কোচ হইল; এজন্য তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন আহুতি কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একবারে চুপ ক'রে গেলেন যে? এমন কি লজ্জার কথা যে, বলতে পারছেন না? বলুন আপনি, আমি শুনতে চাই।"

বিভাকর এবার অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে কহিলেন, "আজ মায়ের একখানা চিঠি পেলুম; তা পড়ে আমার মনটা বড়ই—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া আহুতি বলিয়া উঠিল, "জাষ্ট লাইক এ বেবী! মায়ের জন্যে মন কেমন করছে? হাসালেন দেখছি। তা হ'লে দেশ ছেড়ে কলকাতায় না এসে ঘরের কোণে মায়ের আঁচলের নীচে প'ড়ে থাকলেই ত পারতেন। ঐ রকম দুর্ব্বল মন নিয়ে এখানে এসেছেন কেন? মনের ঐ রকম দুর্ব্বলতা শিশুদেরই শোভা পায়।"

এই রকম মন্তব্য করিতে করিতে বিদ্রূপপূর্ণ হাসিতে আহুতির মুখকান্তি লাল হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তর্ব্বেদনা আহুতির হাসির উপাদান হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারায় বিভাকর ক্ষুব্ধ চিত্তে নতমুখে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। আহুতিও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিল, "পূজোর ছুটীতে কলেজ বন্ধ হ'লে বাড়ী যাবেন ত?"

বিভাকর মনের ভাব গোপন না করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বাড়ী যাব বৈ কি! মা-বাবা আমার জন্যে কত ব্যাকুল হ'য়েছেন, তা আমিই জানি।"

আহুতি মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, "সুতরাং আপনাকে বাড়ী যেতেই হবে; কিন্তু আমি জানতে চাই, আপনার কি তখন না গেলে চলবেই না?"

আহুতির প্রশ্নে বিভাকর বিস্মিত ভাবে কহিলেন, "না গেলে কি চলে? কত দিন হ'ল বাড়ী ছেড়ে এখানে এসেছি। পূজোর ছুটীতে যাওয়া না হ'লে হয় ত বহু দিন আর যাওয়াই ঘটবে না।"

আহুতি তাঁহার অধীরতা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই ত এক মাস মাত্র এখানে এসেছেন; এর মধ্যেই মা-বাপকে না দেখে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন! আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি?"

বিভাকর বুঝিলেন না—জনক-জননীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় কতখানি আছে! তাঁহার গ্রাম্য প্রকৃতিসুলভ শত-সহস্র দোষের মধ্যে ইহাও একটি কি না, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

আহুতি তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কি ভাবিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "এখন আপনার বাড়ী যাওয়া-টাওয়া হচ্ছে না। এবার পূজোর সময় আমরা বাড়ীর সকলেই মুসৌরী যাচ্ছি, আপনাকেও সেখানে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে; কারণ, ফিরে এসেই আমাদের এক-জামিন কি না। সেখানে গিয়ে না পড়লে ত একজামিনের জন্যে 'রেডি' হ'তে পারবো না; কিন্তু আপনি সঙ্গে না থাকলে আমাকে সেখানে পড়াবে কে? আপনাকে তাই আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে!"

বিভাকর স্তব্ধ ভাবে ভাবিতে লাগিলেন। আহুতির কোনও কথার প্রতিবাদ করিতে তাঁহার শক্তি বা সাহস হইল না। ছাত্রী হইলেও এই মেয়েটি অল্প দিনেই তাঁহার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা তাঁহার অসাধ্য ছিল। বস্তুতঃ, সে তাঁহাকে যেন সম্মোহিত করিয়াছিল; দীপশিখায় আকৃষ্ট পতঙ্গের মতন দুশ্ছেদ্য মোহপাশে তিনি শৃঙ্খলিত হইয়াছিলেন! তাহার চক্ষু দু'টির দৃষ্টি বিভাকরের পক্ষে যেন ঐন্দ্রজালিকের কুহক-মন্ত্রবৎ মোহকর, তাহার ভাগ্যলক্ষ্মীর পরিচালক, এই সত্য তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন অকূল সমুদ্রে স্থির-জ্যোতি ধ্রুবতারা যেমন দিক্‌ভ্রান্ত নাবিককে তাহার গন্তব্য পথে পরিচালিত করে, এই তরুণীও সেই ভাবে তাঁহাকে পরিচালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহার সংস্পর্শে আসিলে বিভাকর আত্মবিস্মৃত হইতেন। তাহাদের মধ্যে ব্যবধান যে সুদুস্তর, তাহাও তাঁহার মনে পড়িত না।

আহুতি জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে আপনি যাচ্ছেন ত আমাদের সঙ্গে? কি জ্বালা! কথা ব'লছেন না কেন? উত্তর দিন শীগ্‌গীর।"

বিভাকর কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, "তাই হবে। তোমাদের সঙ্গেই যাব আমি। বাড়ী যাব না।" কথাটা বলিয়াই পিতামাতার কাতর মুখ মনে পড়ায় তিনি বিমনা হইয়া পড়িলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার ব্যথিত বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া নিঃসারিত হইল।

আহুতি তখন পড়িতে বসিয়াছিল; বই হইতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল, "আপনি এর পর কি করবেন ঠিক ক'রেছেন?"

বিভাকর তাহার এই অনধিকারচর্চ্চায় একটু বিরক্ত হইলেও বলিলেন, "বি-এ পাশ ক'রে একটা চাকরী জুটিয়ে নিতে হবে, আর কি কোরবো!"

আহুতি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "চাকরী ত দাসত্ব? কি হীন প্রবৃত্তি! কেন, চাকরী ছাড়া আর কি কোন

পথ নেই? লেখাপড়া শিখে সকলেরই মুখে ঐ এক কথা! চাকরী! আবার কেউ-কেউ এমন বেহায়া যে, সগর্ব্বে বলে 'যেমন-তেমন চাকরী দুধ-ভাত!' দুধ-ভাতের চেষ্টা ছেড়ে বিলেতে যান না ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসুন। জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই?"

তড়িৎ-স্পর্শের ন্যায় বিভাকর হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার পক্ষে এ স্পর্দ্ধা আশাতীত হইলেও আহুতির প্রস্তাব তাঁহার মনে এমন একটা বিক্ষোভ সঞ্চার ক'রিল যে, মন সংযত করা কঠিন হইল। ভবিষ্যতের একটা মধুর কল্পনা তাঁহাকে কেমন উন্মনা, অধীর করিয়া তুলিল। বিভাকরের তরুণ চিত্ত এক দুর্লভ আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হওয়া যে কত দূর অসম্ভব, তাহাও মনে হইল না।

আহুতি একটুখানি পড়িয়া আবার চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার কথা শুনুন, কোন রকমে একবার বেরিয়ে প'ড়ে, বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসুন। চাকরীর ফাঁসি গলায় জড়াবেন না। তা হ'লে কিন্তু সত্যি বলছি—আপনাকে একটুও শ্রদ্ধা করতে পারব না আমি"—বলিয়াই আহুতি জোরে হাসিয়া উঠিল। বিভাকর বিহ্বল ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরে তিনি জানিতে পারিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান পাওয়ায় গুপ্ত সাহেবেরও ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি বিলাতে যান। মিঃ গুপ্ত তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিলেন।

প্রায় বছর-দুই তাঁহার বাড়ী যাওয়া হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় বছরেই যা একবার করিয়া তিনি দেশে গিয়াছিলেন; তার পর নানা বাধায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এবার পিতার অসুখের খবর দিয়া মা বার বার করিয়া যাইতে লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়া বিভাকরের নিজেরও কিছু প্রয়োজন ছিল। গ্রীষ্মের ছুটী আরম্ভ হইতেই তিনি বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গুপ্ত সাহেব তাঁহারই সন্ধানে আসিতেছিলেন। কয়েকটি জিনিস লইয়া বিভাকরকে নিজের ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি কি আজ রাত্রের ট্রেণেই বাড়ী যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, আজই যাব ভাবছি; বাবার অসুখ, খবর পেয়েছি।"

গুপ্ত সাহেব কি ভাবিতে লাগিলেন, তার পর বলিলেন, "বেশ যাও, সে কথাটাও তা হ'লে জেনে তার ব্যবস্থা করে আসছ ত? ব্যারিষ্টারী পড়তে যদি যেতে চাও, তা হ'লে আর দেরী করা ঠিক নয়। তোমার বাবার মত নিয়ে, আর কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে, তা হ'লে যত শীগ্‌গীর পার চ'লে আসবে।"

বিভাকরকে কিছু চিন্তিত দেখাইল। এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করা যে কিরূপ কঠিন, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে; তথাপি ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নেশার মত তাঁহার মন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এই প্রতিভাবান্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছেলেটির উপর গুপ্ত সাহেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার অধীর কামনাকে তিনিই উদগ্র করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বিভাকরকে নীরব দেখিয়া গুপ্ত সাহেব কহিলেন, "কি ভাবছ, বিভাকর! তোমার মত বদলে গেল না কি?"

বিভাকর চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "না, মত বদলায়নি, কিন্তু ভাবছি, যথা-সর্ব্বস্ব ঘুচিয়েও যে টাকা সংগ্রহ হবে, তাতে আমার যাবার খরচই হয় ত কুলিয়ে উঠবে না! তখন কি উপায় হবে?"

মিষ্টার গুপ্ত মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা ত একবার হ'য়ে গেছে আমার সঙ্গে। সে সব ভার আমার, তা ত তোমায় ব'লেছি।"

বিভাকর উত্তর দিলেন না। তেমনই চিন্তাকুল চিত্তে নিজের ঘরের দিকে চলিলেন। গুপ্ত সাহেবের নিকট সাহায্যগ্রহণ করা যে উচিত নহে, ইহা বুঝিতে পারিলেও, তীব্র কামনার প্রবাহে প্রখর স্রোতে ভাসমান শৈবালদলের ন্যায় তাঁহার সকল সঙ্কোচ ভাসিয়া গেল। বিভাকরের মনে পুনঃ পুনঃ এই চিন্তাই উদিত হইতেছিল যে, তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিলে আহুতি তাঁহার পক্ষে দুর্লভ না হইতেও পারে। সে তখন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবে; উভয়ের ব্যবধানটাও অনেকখানি কমিয়া যাইবে, কারণ, তখন তিনি তাহাদের সমাজেরই এক জন হইতে পারিবেন; সুতরাং বিলাতে তাঁহার যাওয়াই চাই।

মিসেস্ গুপ্ত অদূরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের সকল কথাই শুনিয়াছিলেন। বিভাকর সেই স্থান ত্যাগ করিলে তিনি ঈষৎ ব্যঙ্গভরে স্বামীকে কহিলেন, "তোমার টাকা আর ব্যাঙ্কে ধরচে না বোধ হচ্ছে!"

একটু হাসিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্টার গুপ্ত বলিলেন, "টাকার বাহুল্যের কি লক্ষণ দেখলে তুমি বল ত শুনি।"

গুপ্তগৃহিণী মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "তা দেখছি বই কি! নাই দিয়ে মাথায় তুলচো কেন, তাই আগে শুনি।"

গুপ্ত সাহেব সরিয়া গিয়া স্ত্রীর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং এদিকে-ওদিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমায় কি তুমি এতই বোকা ঠাওরিয়েছ? সত্যিই টাকা আমার এত বেশী হয়নি যে, যাকে-তাকে দু'হাতে বিলিয়ে দিতে পারি। ওকে যে অত দরদ দেখাচ্ছি, তার কারণ—এতে আমার স্বার্থ বড় কম নয়।"

মিসেস্ গুপ্ত কথাটা ঠিক বুঝিলেন না, বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গুপ্ত সাহেব আগের মতন মৃদু স্বরেই কহিলেন, "যা দিন-কাল প'ড়েছে, তৈয়েরী একটি ব্যারিষ্টার-কি আই-সি এস কিম্বা ঐ ধরণের যাই হ'ক জামাই করতে বিস্তর টাকার দরকার, তা জান ত? তার চেয়ে অনেক কম খরচ হবে—একে তৈয়েরী ক'রে আনতে। সব ত আর আমায় দিতে হচ্ছে না। ও বাড়ী থেকেও আনবে কিছু।"

আতঙ্কে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া গুপ্ত-গৃহিণী হুঙ্কার দিলেন, "তুমি কি ওরই সঙ্গে আহুতির বিয়ে দিতে চাও? কি সর্ব্বনাশ!"

"সর্ব্বনাশের কি দেখলে এতে? ওর 'কলেজ-কেরিয়ার' যে রকম 'সব্লাইম,' ও যদি ব্যারিষ্টার হ'য়ে ফিরতে পারে, তখন ওর দাম কত হবে, তা ভেবে দেখেছ তুমি?"

"কিন্তু তোমার মেয়ে কি ঐ পাড়াগেঁয়ে মেঠো ভূতকে পছন্দ করবে?"

"ওর যদি উপার্জ্জনের ক্ষমতা হয়, তখন ওকে ভিন্ন চোখে দেখবেই! আমার রূপের প্রশংসা কেউ কোন দিন করেনি, তবু ত তুমি—"

পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি থামিলেন। বিভাকর তখনও বেশী দূর যান নাই, কি একটা প্রয়োজনে তাঁহাকে পাশের ঘরে যাইতে হইয়াছিল; গুপ্ত-দম্পতির কথা তাঁহার অগোচর রহিল না।

মিঃ গুপ্তর গভীর সহৃদয়তার ভিতর হইতে তাঁহার 'ব্যবসাদারী' বুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িলেও, তাঁহার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া উচ্চাভিলাষী বিভাকরের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক, তাঁহাকে সাগর-পারে যাইতেই হইবে। চঞ্চল মনকে সুস্থির করিয়া বিভাকর বাড়ী যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

নির্দিষ্ট দিন গুপ্ত সাহেবের আদেশে আহুতিই বাড়ীর মোটরে তাঁহাকে ষ্টেশনে রাখিতে আসিল। বিভাকরকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া সে কহিল, "যত শীগ্‌গীর পারেন, ফিরে আসবেন। কচি খোকাটির মতন মা'র আদরে ভুলে সেখানেই থেকে যাবেন না যেন।"

বিভাকর ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "তোমাদের ছেড়ে দূরে থাকা আমার পক্ষে কঠিন, আহুতি!"

"সত্যি না কি? এত টান আবার কবে থেকে হ'য়েছে শুনি?"—বলিয়াই আহুতি হাসিয়া উঠিল। ব্যাকুল আগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া বিভাকর কহিলেন, "সে কি তুমি জান না? কিছুই জান না, আহুতি! তুমি কি কিছুই বুঝতেও পার না?"

আহুতি এবার গম্ভীর ভাবে কহিল, "আমি বুঝতে অনেক-কিছুই পারি, কিন্তু এখন বুঝে কোন লাভ নেই। যদি কোন দিন যোগ্য হয়ে আসতে পারেন, তা হ'লেই—" তাহার কথা সে শেষ করিতে পারিল না।

বিভাকর ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "আমি সেই চেষ্টাই করব আহুতি! প্রাণপণে তোমার যোগ্য হবারই চেষ্টা করব। তাই আমার সাধনা।"

"বেশ, তখনই তা হ'লে এ-সব কথা হবে, এখন নয়।"

তাহার কথা শেষ হইতেই ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্ম ত্যাগ করিল। বিভাকর নির্নিমেষ নেত্রে অদূরবর্ত্তিনী আহুতিকে দেখিতে লাগিলেন।

পিতামাতার সহিত মিলনানন্দে কয়েক দিন কাটিবার পর বিভাকর এক দিন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার মনের কথা মায়ের নিকট প্রকাশ করিলেন; অন্যান্য কথার পর মুখ তুলিয়া মা'র মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি বিলেত যাব ঠিক করেছি, মা। ভেবে দেখলুম, এখানে এম-এ পাশ করেও তেমন কোন ভাল চাকরী পাবার আশা নেই। তার চেয়ে যদি ওখান থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে আসতে পারি—"

প্রিয়নাথ সব কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন। উত্তেজনাতিশয্যে রোগ-ক্লিষ্ট দেহ লইয়াই তিনি ঘরের বাহিরে আসিলেন। সুলোচনা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া স্বামীর কাছে গিয়া কহিলেন, "তুমি আবার এই শরীর নিয়ে এখানে এলে কেন?"

সে কথার উত্তর না দিয়া বিভাকরের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "কি বলছ, খোকা? তুমি বিলেত যেতে চাও?"

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বিভাকর দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "হ্যাঁ। এখানে উন্নতির আশা খুব কম। ওখানে গেলে তবু কতকটা উপায় হ'তে পারে, তাই—"

পিতা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু তার খরচ তুমি কোথায় পাবে? এই ত আমাদের অবস্থা! তোমার কলকাতার খরচই চালাতে পারিনি।"

কথাটা বলিতে বিভাকরের মুখে বাধিতেছিল; কিন্তু ক্ষণিক দ্বিধার পর তিনি উত্তর দিলেন, "যেমন ক'রে হোক্, কিছু টাকা আমায় দিতেই হবে।"

পিতা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "কিন্তু কেমন ক'রে টাকার যোগাড় হবে, সেইটাই ত আমি ভেবে পাচ্ছি না, খোকা! তোমার ত অজানা কিছু নেই। আমাদের সম্বলের মধ্যে ত ঐ জমিটুকু। আর কি আছে বল? আমি ও-কথা শুনে—"

পিতার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিভাকর কহিলেন, "নাখরাজ জমি, ওটা আর বাগানটা বেচলেই তো কিছু টাকা পাওয়া যায়। বাকি টাকাটা যেমন ক'রে হোক, জোগাড় হ'য়ে যাবে, বাবা!"

পিতা-মাতা উভয়েই বিহ্বল দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরে সুলোচনা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুই বলছিস্ কি খোকা? ঐ শেষ সম্বলটুকু ঘুচিয়ে আমরা পথে দাঁড়াব? ওটুকু গেলে খাব কি?"

বিভাকর অবিচলিত স্বরে কহিলেন, "এই ক'টা বছর কষ্ট ক'রে কাটিয়ে দাও, মা! তার পর আমি ফিরে এলে আর ভাবনা থাকবে না। ক'টা বছরই ত—"

কিন্তু সেই কয়টা বৎসর যে কি ভাবে এই দুই জনের কাটিবে, তাহার সম্ভব-অসম্ভব কোন উপায়ই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না।

বিনতি-কাতর কণ্ঠে বিভাকর কহিলেন, "তোমরা এতে আর আপত্তি কোর না। যদি জীবনে উন্নতি কিছু হয় ত এতেই হবে। এ-ছাড়া অন্য কোন উপায়ই আমি দেখছি না।"

প্রিয়নাথ একবার বলিতে চাহিলেন, এ দেশে থাকিয়াও উন্নতি লাভ করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয় নাই; বিভাকরের পক্ষেই বা কেন হইবে? কিন্তু কি ভাবিয়া সে কথা না বলিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কি একান্ত ইচ্ছে বিলেত যাওয়া?"

"হ্যাঁ, বাবা, আমি যাবই স্থির করেছি।"—পিতার মুখের দিকে না চাহিয়াই বিভাকর এই উত্তর দিলেন।

নৈশ অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন গৃহপ্রাঙ্গণের দিকে বহুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া-থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "তবে আর তোমায় বাধা দিতে চাই না। বেশ, তাই হবে। ঐ বাগান আর জমিটুকু বিক্রী ক'রে যা পাওয়া যাবে, তাই তোমায় দেব —তোমার কামনাই পূর্ণ হোক, বাবা!

ব্যাকুল ভাবে সুলোচনা বলিয়া উঠিলেন, "কি বলছ তুমি? যথাসর্ব্বস্ব খুয়িয়ে আমরা কি শেষে পথে দাঁড়াব?"

অতি ম্লান হাসির সঙ্গে প্রিয়নাথ কহিলেন, "আমার দেহে এখনও কিঞ্চিৎ সামর্থ্য আছে, ছোট বৌ! খাটতে পারব। ভিটেটুকু রইল ত; যা আনতে পারি, তাতেই আমাদের দু'টি প্রাণীর কোন রকমে চলে যাবে। ওর যদি ভাল হয়, উন্নতি হয়, তাতে বাধা দেব না।"

ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া সুলোচনা কি বলিতে গিয়া থামিলেন। কথা যেখানে থাকিবে না, সেখানে কিছু না বলাই ভাল; কিন্তু গভীর অভিমানে মাতৃ-হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের দিকে একবারও যে চাহিল না, তাহাকে দুঃখ জানাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। স্বামীর রোগশীর্ণ অপটু দেহের দিকে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু দু'টি সজল হইয়া উঠিলেও, পুত্রকে তিনি আর একটা কথাও বলিলেন না। তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন সন্তানই যখন অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকে চিরদারিদ্র্যের গর্ত্তায় নিক্ষেপ করিয়া নিজের সুখের সন্ধানে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে, তখন স্বামীর অসুস্থতার

যুক্তিতে তাহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে তাঁহার মন সরিল না। বেদনাবিদ্ধ সজল চক্ষুর ঝাপ্‌সা দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাইয়া তিনি স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

বিভাকরের মন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিল। এ অবস্থায় পিতা মাতাকে যে অনেকখানিই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, ইহাও তিনি বুঝিলেন। তবুও নিজের ইচ্ছাকে তিনি খর্ব্ব করিবেন, সে শক্তি তাঁহার ছিল না। নিজের স্বার্থচিন্তায় পিতা-মাতার দুঃখ-কষ্ট ও অভাবের চিন্তা ঝঞ্ঝা-তাড়িত শুষ্ক বৃক্ষপত্রের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল! কিছু কাল নীরব থাকিয়া তিনি মাতাকে লক্ষ্য করিয়া সান্ত্বনা-দানের অভিপ্রায়ে বলিলেন, "ক'টা বছর একটু কষ্ট ক'রে কাটিয়ে দাও, মা! তার পর—"

প্রিয়নাথ বাধা দিয়া কহিলেন, "সে পরের কথা পরে হবে, খোকা! উপস্থিত কবে তোমার টাকা চাই?"

"একটু তাড়াতাড়িই দরকার, বাবা, যত শীগগীর হয়।"

"আচ্ছা, সেই ব্যবস্থাই করব এখন।"

প্রিয়নাথ উঠিয়া যাইতেছিলেন। বিভাকর বলিলেন, "তুমি রাগ করলে না ত বাবা? মা, তুমি?"

অত্যন্ত ম্লান, অত্যন্ত ক্ষীণ একটু হাসির সঙ্গে প্রিয়নাথ কহিলেন, "রাগ? সন্তানের উপর রাগ করবার ক্ষমতা ভগবান্ মানুষকে দেননি, খোকা! যত অন্যায়, যত অত্যাচার সে করুক, মা-বাপকে হাসিমুখে সব সহ্য করতে হবে, তা ছাড়া কোন উপায় নেই, বাবা! ভগবান্ এইখানে মানুষকে বড় বেশী দুর্ব্বল ক'রেছেন। স্নেহের কাছে তাকে হার মানতেই হবে! কিন্তু না বাবা, তোমার উপর রাগ আমরা করিনি। তুমি যদি তোমার উন্নতির পথ খুঁজে নাও, আমরা কেন তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা না কোরব?"

সুলোচনা মুখ ফিরাইয়া উদ্গত অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। প্রিয়নাথ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কি বলিতে গিয়া আর তাহা বলিলেন না। প্রিয়নাথ কম্পিত পদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করিলেন। স্নেহাতুর পিতৃ-মাতৃচিত্তের গভীর ব্যথা সে-দিন বিভাকর অনুভব করিতে পারেন নাই। সে দিন বুঝেন নাই, সন্তানের জন্য হাসিমুখে তাঁহারা কতখানি দিয়া যাইতে পারেন।

তিন

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে বিভাকর নিবিড় মেঘমালা-সমাচ্ছন্ন শ্রাবণের এক বিরস মধ্যাহ্নে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্যারিষ্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমন, আহুতির সহিত বিবাহ, বিদেশী অনুকরণে সুদূর প্রবাসে মধুচন্দ্রমা যাপন—ইত্যাদি কারণে এ কয় বৎসর তাঁহার বাড়ীতে আসা যেমন ঘটিয়া উঠে নাই, জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সেখানকার সংবাদও তেমনই সময়মত লইবারও সুযোগ হয় নাই। বাড়ীর প্রতি পূর্ব্ববৎ আকর্ষণ থাকিলে হয় ত সুযোগের অভাব হইত না; তবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বাড়ীতে পিতামাতা ভালই আছেন। কোন দুঃসংবাদ থাকিলে তিনি অবশ্যই তাহা জানিতে পারিতেন। সুতরাং বিভাকর এই দীর্ঘকাল পরে নিশ্চিন্ত মনেই বাড়ী আসিলেন।

পথের ধার হইতে গৃহের দিকে চোখ পড়িতেই বিভাকর চমকিয়া উঠিলেন। কয় বৎসরে এ কি গভীর পরিবর্ত্তন! পত্রহীন বজ্রাহত তরুর মত শুষ্ক জীর্ণ মূর্ত্তিতে অতীতের কঙ্কালের ন্যায় খান-দুই মাটীর ঘর কোন মতে যেন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! খড়ের চালগুলি প্রায় খসিয়া পড়িয়াছে। বাঁশের বেড়ার গা হইতে মৃত্তিকার আবরণ বহু দিন পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ঘরের বাঁশের খুঁটিগুলি ঘুণে জীর্ণ ও ফোঁপ্‌রা করিয়া ফেলিয়াছে—সহস্র ছিদ্রে পূর্ণ হইয়া তাহারা কোন রকমে দাঁড়াইয়া আছে। পথের ধারে দাঁড়াইয়া বিভাকর চোখ দুটো ভাল করিয়া মুছিয়া আবার চাহিলেন। বাড়ীতে কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। বিকম্পিত বক্ষে এই পথটুকু আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া বিভাকর ডাকিলেন, "মা, মা, আমি এসেছি!—বাবা!"

ঘরের ভিতর হইতে আধময়লা থান-পরা একটি মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। বিভাকর বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহাকে খুব বেশী পরিচিত বলিয়া মনে হইলেও চিনিতে বাধিল। মেয়েটি সহজ ভাবেই তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "ঘরের মধ্যে এস, বিভুদা! মামীমার বড় অসুখ।"

এইবার বিভাকর চিনিলেন। অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ!—" বিদ্যুৎ প্রতিবেশী-কন্যা, তাঁহার বাল্যসখী!

বিদ্যুৎ ম্লান হাসিয়া বলিল, "চিনতে পারনি বুঝি এতক্ষণ? এস, ভিতরে এস।"

বিভাকর কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার অনুসরণ করিয়া ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঘরের মাঝখানে শয্যার সহিত মিশিয়া পড়িয়াছিল এক নারী-দেহ। ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে বিভাকর তাঁহাকে দেখিয়া ঠিক চিনিয়া উঠিতে না পারিলেও সেই পীড়িতা নারীর ক্ষীণ-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "খোকা এসেছিস, বাবা! আঃ, সত্যই তবে দেখ্‌তে পেলাম তোকে।"

বিভাকর আর্ত্ত কণ্ঠে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মা, মা, এ তোমায় আমি কি দেখছি! কি দেখছি?"

বিদ্যুৎ বন্ধ জানালা দু'টা খুলিয়া দিতেই ঘরখানা আলোকিত হইয়া উঠিল। জননীর শুভ্রবাস নিরাভরণ দেহের দিকে চাহিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিভাকর সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন।

অতি কষ্টে সুলোচনা শয্যায় উঠিয়া-বসিয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "একটা বছরও আগে যদি আসতিস্ খোকা! শেষ সময় পর্য্যন্ত তোকে দেখবার আশা তাঁর যায়নি। পথের দিকে চেয়েই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে গিয়েছে রে! বড় দেরী করে এলি বাপ!"

বিভাকরের চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা নামিল। মাতাপুত্রের অশ্রু একত্র মিশিল। বিভাকর শুনিলেন, সর্ব্বস্ব-বিনিময়ে পুত্রের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া কি দারুণ কষ্টে অভাবে তাঁহার পিতাকে শেষ কয়টা বৎসর কাটাইতে হইয়াছিল! এ ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামে তাঁহার কোন চাকরী মেলে নাই। অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে। শেষ সময়ে ঔষধ দূরে থাক, পথ্য-টুকুও মিলে নাই।

প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় বিভাকর স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরের কথা জানিতেছিলেন শুধু অন্তর্য্যামী।

বিদ্যুৎ বলিল, "ওঠ বিভুদা, কত দূর থেকে এলে! মুখে-চোখে জল দাও।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুলোচনা বলিলেন, "এ বিদ্যুৎ, ওরই

জন্যে এখনও আমার দেহে প্রাণটা কোন রকমে টেঁকে আছে। ওর ঋণ জন্মজন্মান্তর ধরেও শোধ দিতে পারব না আমি।"

"বিদ্যুৎ কি এখানেই থাকে? ওর বিয়ে হ'ল কোথায়, মা?"

বিদ্যুৎ এ-কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিল। সুলোচনা ললাটে একটা করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ও-মেয়েটারও পোড়া ভাগ্য। টাকা ত ছিল না বাপ-মায়ের। বিনি পয়সায় আর কি হবে? ও-পাড়ার কেশবের কাকা—"

বাধা দিয়া বিভাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কেশব? যাকে আমরা মামা বলতুম?—তারই কাকা?"

"হাঁ, সে-ই। এক ঘর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, গিন্নী মরতেই আবার তিনি বিয়ে করলেন। তাঁর হাতেই দেওয়া হ'ল বিদ্যুৎকে। তার পর তিন মাসের মধ্যেই ওর হাতের নোয়া ঘুচলো।"

বিভাকর বহুক্ষণ ধরিয়া একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তিনি শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার বাল্যসঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুলোচনার উঠিয়া বসিবার শক্তি ছিল না। তিনি ধীরে-ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বিভাকরকে মৃদুস্বরে কহিলেন, "শরীর বেশ ভাল ছিল ত, খোকা? বড় রোগা দেখাচ্ছে তোকে।"

অনুযোগের একটি বাণীও জননীর মুখে উচ্চারিত হইল না। তাঁহার অগাধ অসীম স্নেহ একবিন্দুও হ্রাস হয় নাই।

বিভাকর চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দরিদ্র সংসারের সামান্য জিনিষপত্র যাহা কিছু ছিল, তাহার চিহ্নমাত্র নাই! সুলোচনার পরিহিত বস্ত্র মলিন ও শতচ্ছিন্ন। দেহেও মৃত্যুর করাল ছায়া পরিস্ফুট; মহাযাত্রার যেন আর অতি অল্পই বিলম্ব! বিভাকরের চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা বহিল। পুত্রের পাংশু মুখের পানে চাহিয়া মায়ের ক্ষুব্ধ চিত্ত বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "অমন ক'রে বসে থাকিস না, বাবা, ওঠ! তোর চোখে জল দেখলে কি আমি স্থির থাকতে পারি?"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিভাকর বহুক্ষণ নিঃশব্দে রোদন করিলেন। মা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "কেন কাঁদছিস, খোকা! কেন কাঁদছিস? অমন করে কেঁদে আমায় কষ্ট দিসনি; তোর কান্না সহ্য করতে পারছি নে।"

বিভাকর চোখ মুছিলেন। সুলোচনা স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "আজ আর আমার কোন দুঃখ নেই, বাবা! তোকে দেখে আমার সব কষ্ট আজ দূরে গিয়েছে; এবার শান্তিতে মরতে পারব। শেষ সময় তোকে যে দেখতে পাব—এ আশা আমার ছিল না!"

তৃপ্তির আনন্দে সুলোচনার নিষ্প্রভ চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পলকহারা চোখে বিভাকর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পরদিন সকালে বিভাকর কহিলেন, "মা, তোমায় নিয়ে আজ আমি কলকাতায় যাব। গঙ্গার ধারে রাখব তোমায়। দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাটও দেখবে চল।"

সুলোচনার শীর্ণ মুখ ক্ষণেকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রবল চেষ্টায় বড় একটা প্রলোভন সংযত করিয়া তিনি কহিলেন,—"না, খোকা, শেষ সময়ে এখানেই আমি থাকতে চাই। সকল তীর্থের বড় আমার স্বামীর এই ভিটাটুকু; এ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারব না।"

"বেশ ত মা, চিকিৎসায় তোমায় সুস্থ ক'রে তুলে আবার এখানে রেখে যাব। এখন চল। এখানে এ অবস্থায় তোমায় রেখে যেতে পারব না, মা!"

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া মা বলিলেন, "এখানে আমি বেশ থাকব, খোকা! তুই কিছু ভাবিস্ নে।"

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিভাকর আর তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না; হতাশ ভাবে কহিলেন, "তবে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসি?"

সুলোচনার শীর্ণ মুখে বেদনার হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন, "পাগল হয়েছিস্, খোকা? ডাক্তার আমার কি চিকিৎসে করবে?"

বিভাকর বলিলেন, "চিকিৎসা ক'রে তোমাকে সারিয়ে তুলবে।"

সুলোচনা তেমনই ভাবে হাসিতে লাগিলেন। বিভাকর তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "আজকের দিনটা একাই থাক, মা! ডাক্তার নিয়ে কালই আমি ফিরে আসব। তোমায় ছেড়ে আর কোথাও যাব না।"

"শেষ ক'টা দিন যদি কাছে থাকতে পারিস, ভালই; কিন্তু ডাক্তারে দরকার নেই, খোকা! তিনি যে ভাবে গেছেন, তেমন ভাবেই আমাকেও তাঁর কাছে যেতে দে! তাকে এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারিনি, অনাহারে, বিনি চিকিৎসেয় তাঁকে বিদায় দিয়েছি রে! বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। আমি ওষুধ খাব কি ক'রে? তুই দুঃখ করিসনি, খোকা!"

ছোট ছেলেটির মত জননীর বুকে মুখ লুকাইয়া বিভাকর কাঁদিলেন। অভিমানভরে বলিলেন, "মা, আমার কাছ থেকে কিছুই তুমি নেবে না?"

"নেব বৈ কি, বাবা! তোমার হাতে জল পাব, আগুন পাব, সেই যে আমার চরম পাওয়া, খোকা! এর বেশী আশাও ত আমার নেই। তোকে রেখে যেতে পারছি, এই আমার ভাগ্য। এর বেশী আর কি চাইবার আছে আমার?"

আশীর্ব্বাদপূর্ণ হাতখানা ছেলের মাথায় রাখিয়া মা বলিলেন, "ওঠ খোকা, এমন ক'রে কেঁদে আমায় কষ্ট দিসনি!"

সপ্তাহ শেষে গ্রামের শ্মশানে জননীর শেষ কাজটুকু শেষ করিয়া বিভাকর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আহুতির ধারণা, এই ঘটনার পর হইতে বিভাকর কেমন যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন।

চার

রাত্রি বাড়িতেছিল। বিভাকর কেমন স্তব্ধ, অভিভূতের মত বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য কয় বার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি খাইতে যাইবেন কি না? বিভাকর উত্তর দিলেন না। সে কথা যে তাহার কানে গিয়াছে—এমনও মনে হইল না।

নৈশ শোভা উপভোগ করিয়া আহুতির ফিরিতে বিলম্ব হইবে—ইহা তিনি বলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত দাস-দাসীদের বসিয়া থাকিতে হইবে। তাই বিভাকরের আহারে বিলম্বের জন্য তাহারা ব্যস্ত হইল না; তাঁহাকেও আর কেহ বিরক্ত করিতে আসিল না।

প্রণব বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আহুতির আদেশে সরকার তাহার প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিলেন। সামান্য জিনিষ-পত্রগুলি ষ্টীল-ট্রাঙ্কটার মধ্যে রাখিয়া প্রণব বিভাকরের গৃহে আসিল।

বিভাকর তাহাকে লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহার মন কোন্ সুদূর অতীতের কোন্ স্থানে গিয়া আজ আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে! প্রণব তাহা বুঝিল না। কিছু আশ্চর্য্য হইয়াই সে বিভাকরের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি তা হ'লে যাচ্ছি, সার!"

বিভাকর কথা কহিলেন না। তাহার কথা শুনিয়াছেন, এমনও মনে হইল না। আরও খানিকটা নীরব থাকিয়া প্রণব বলিল, "আমাকে এখনই যেতে হবে, সার!"

তবুও বিভাকর নির্ব্বাক্! তাঁহার আরও কাছে আসিয়া প্রণব কহিল, "আমি তা হ'লে যাচ্ছি, সার! আর সময় নেই।"

এবার বিভাকর সম্মুখের দিকে চাহিলেন। প্রণব যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিল, "আমি চল্লুম, সার! ট্রেণের সময় হ'য়েছে।"

"যাচ্ছ? যাওয়াই তা হ'লে তুমি স্থির ক'রলে? কাজ তবে ছেড়েই দেবে?"

বিষাদাপ্লুত কণ্ঠে প্রণব কহিল, "তা ছাড়া উপায় কি? বাবার অসুখ, মা সেখানে একা, যেতে আমাকে হবেই। এ চাকরীটুকু গেলে কষ্ট আমার খুবই হবে, সার! আপনার স্নেহে এখানে খুব সুখেই ছিলাম; কিন্তু—"

দুঃখে ক্ষোভে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; কথা সে শেষ করিতে পারিল না। বিভাকর নীরবে কি ভাবিতেছিলেন। টেবলের ঘড়ির দিকে চাহিয়া প্রণব চঞ্চল হইয়া উঠিল। ব্যস্তভাবে আর একবার নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনার স্নেহ আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে।—তা হ'লে যাই?"

"যাবে? ও, হাঁ, একটু দাঁড়াও, একটুখানি।"

"আমার ট্রেণের সময় হয়ে এল, সার! অনেকটা পথ।"

"ট্যাক্সি ক'রে যেও; একটু দাঁড়াও—একটু—"

বিস্মিত ভাবে প্রণব বিভাকরের দিকে চাহিল। এত চঞ্চল, এমন অপ্রকৃতিস্থ তাঁহাকে সে কোন দিনও দেখে নাই!

বিভাকর উঠিয়া ঘরের এক প্রান্তে চলিলেন। এক খণ্ড কাগজে কি লিখিয়া কাগজখানি তিনি প্রণবের হাতে দিয়া কহিলেন, "যেতে পার তুমি এবার। ভগবান্ তোমার বাবাকে শীঘ্র সুস্থ করুন।"

হস্তস্থিত কাগজখানির দিকে চাহিয়া প্রণব বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে কহিল, "এ কি সার! এ যে দু'হাজার টাকার চেক!"

"হ্যাঁ, তোমায় দিলুম আমি; তোমার সংসার-পথের পাথেয়, ওটা তুমি নিয়ে যাও, প্রণব!"

অবাক্ হইয়া কয় মুহূর্ত্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রণব কহিল, "এত টাকা! এ আমি কি করব? দিচ্ছেনই বা কেন?"

চঞ্চল চরণে বিভাকর ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। প্রণবের বিস্ময়-বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভারী খুসী হয়েছি আমি তোমার উপর। কোন প্রলোভনেই তুমি তোমার কর্ত্তব্য ভুলে যাওনি। চাকরীর মোহ তোমায় আটকে রাখতে পারলে না, সংসারের সব জিনিষের চেয়ে তোমার কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছেন তোমার মা, তোমার বাবা। তাই তোমায় দিলুম ঐ টাকাটা। তোমাকে এর পর এখানে রাখতে পারব না; কারণ, সে শক্তি সত্যিই আমার নেই; হয় ত এ আমার দুর্ব্বলতা, কিন্তু তোমায় মনে রাখব চিরদিন। সময় হয়েছে, যাও, আর দেরী কোর না।"

প্রণব কথা বলিবার আগেই বিভাকর সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

জ্যোৎস্না ঘোষ।

এস পুনঃ চিত্ত-বৃন্দাবনে

স্বর্গের দেবতা অ. চাহি না কো পূজিবার
মন্দিরে মূরতি গড়ি' হেমে,
ছাড়ি' দেবতার বেশ নর-রূপে, হৃষীকেশ!
এস তুমি ধরণীতে নেমে।

রাজবেশ দ্বারকার চাহি না দেখিতে আর,
অসি ও কিরীটে নাহি কাজ;
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন মথুরার সিংহাসন
ত্যজি' তুমি এস ব্রজরাজ!
বালগোপালের বেশে পুত্ররূপে হেসে হেসে
এস তুমি কোলে যশোদার,
আভীর পল্লীতে ঘুরি' ক্ষীর সর ননী চুরি
করিয়া বাড়াও জ্বালা মা'র।

পাঁচনী লইয়া হাতে শিখিচূড়া বাঁধি' মাথে
সখা-রূপে রাখালের সনে,
গোকুল করিয়া আলো সবারে বাসিয়া ভালো
এস পুনঃ চিত্ত-বৃন্দাবনে।
হে দরদী রসরাজ! প্রিয়রূপে আসি' আজ
শ্রীরাধারে দাও দরশন,
বসা'য়ে প্রেমের মেলা গোপীসনে রসখেলা
কর রচি' নব কুঞ্জবন।

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)।

দশম অধ্যায়

শ্রীল মদনমোহনের মন্দিরনির্ম্মাণ

যখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশাদিত্য টীলায় শ্রীল মদনমোহনের সেবা স্থাপন করিলেন, তখন কোনও মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারে নাই। নিষ্কিঞ্চন সনাতন গোধূমচূর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা রুটির মত যে পদার্থ প্রস্তুত করিতেন, তাহার নাম "আঙ্গাকড়ি"। ইহাতে তিনি লবণ মিশাইতেন না। এই আঙ্গাকড়ির সহিত বন্য শাকসিদ্ধ একমাত্র উপকরণ, তদ্দ্বারা ঠাকুরের ভোগ হইত। কিন্তু রাজা বজ্রনাভের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন তাহাতে তৃপ্তিলাভ না করিয়া স্বপ্নে সনাতনকে জানাইলেন, ভোগের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ না থাকিলে তিনি উহা ভোজন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ঠাকুরকে সনাতনের নিকট এই অনুযোগ করিয়া হতাশ হইতে হইল! সনাতন স্বপ্নের সুযোগ না লইয়াই আন্তরিক ভক্তিভরে নিবেদন করিলেন, "ঠাকুর, আমার ত কিছুই সম্বল নাই; আমি কি উপায়ে তোমার জন্য সুস্বাদু ভোগ সংগ্রহ করিব? তাহা যদি নিজেই যোগাড় করিয়া লইতে পার, তাহা হইলে আর আমাকে ভাবিয়া মরিতে হয় না, ঠাকুর!" প্রস্তাবটি অসঙ্গত নহে বুঝিয়া সুবিবেচক শ্রীল মদনমোহন সনাতনকে এই দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া স্বাবলম্বী হইলেন; অর্থাৎ নিজের অবস্থানের জন্য মন্দির এবং সেবার জন্য রাজোচিত ভোগেরও ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। মুলতানের বণিক কৃষ্ণদাস কাপুর অনেকগুলি বাণিজ্য-তরণী বহুবিধ পণ্যে পূর্ণ করিয়া বাণিজ্য-যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার তরণীগুলি শ্রীবৃন্দাবনের নিকট আসিয়া বালুকাপূর্ণ চড়ায় বাধিয়া গেল, বহু চেষ্টাতেও তাহা মুক্ত করা সম্ভব হইল না। কৃষ্ণদাস নিরুপায় হইয়া নদীতীরে অবতরণ করিলেন, এবং কি উপায়ে তরণীগুলি বালুচর হইতে জলে ভাসাইবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া একটি বালক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"ঐ যে উঁচু টীলার উপর একটি সাধু বসিয়া আছেন, উনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন; উঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যদি উঁহাকে প্রসন্ন করিতে পার, তাহা হইলে উঁহার কৃপায় তুমি সকল বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে।" কৃষ্ণদাস কাপুর নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সনাতন গোস্বামী একখানি পর্ণ-কুটীরে উপবিষ্ট, এবং শ্রীমদনমোহন দেব তাঁহার সম্মুখে সমাসীন। কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীমদনমোহনের অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়, মাধুর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর নিকট তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিলে নিষ্কিঞ্চন সনাতন শ্রীল মদনমোহনের নিকট কৃষ্ণদাসকে তাঁহার প্রার্থনা নিবেদন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণদাস তখন মদনমোহনের নিকট এই মর্ম্মে 'মানসিক' করিলেন যে, যদি তাঁহার বাণিজ্য-তরণীগুলি নিরাপদে অভীষ্ট স্থানে উপনীত হয়, তাহা হইলে পণ্য বিক্রয় করিয়া তিনি যাহা-কিছু লাভ করিতে পারিবেন, তাহা তিনি শ্রীল মদন-মোহনের সেবায় ও শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণে অর্পণ করিবেন। এই প্রার্থনার কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার বাণিজ্য-তরীগুলি চড়া হইতে মুক্ত হইয়া জলে ভাসিল। সেবার তিনি তরণীপূর্ণ পণ্যদ্রব্যগুলি বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমদনমোহনের জন্য সেখানে একটি ক্ষুদ্র সুদৃশ্য মন্দির ও ভোগশালা বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং মদনমোহনের নিয়মিত ভোগেরও সুব্যবস্থা করিলেন। কথিত আছে, কৃষ্ণদাসও সনাতনের কৃপায় ভক্তিলাভ করেন, এবং মুলতানে ফিরিয়া স্বগৃহেও শ্রীমদনমোহনের প্রতিষ্ঠা করেন। যাহা হউক, কৃষ্ণদাসের প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র মন্দিরেই শ্রীল মদনমোহনের রাজবৎ সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; কারণ, মথুরা তখন একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং মথুরার বাণিজ্যজীবী শেঠগণ মদনমোহনের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সেবায় যথেষ্ট

অর্থ ও সম্পত্তি দান করিতেন। আনুমানিক ১৪৬০ শকে কৃষ্ণদাস কাপুর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দির কালক্রমে জীর্ণ হইলে কি প্রকারে যশোহরের রাজবংশোদ্ভূত রাজা বসন্তরাওয়ের পিতা গুণানন্দ গুপ্ত (আনুমানিক ১৫০০ শকে) শ্রীল মদনমোহনের সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং বর্ষীয়ান্ শ্রীজীবগোস্বামীর তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত ঐ মন্দির কি প্রকারে শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া গণ্য হইয়াছিল—এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে গুণানন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

মহারাজা আদিশূর কনৌজ হইতে বঙ্গদেশে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও তৎসহ যে পাঁচ জন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন, বিরাট্ গুহ এই পঞ্চ কায়স্থেরই অন্যতম। বিরাটের অধস্তন নবম পুরুষ অশ্বপতি গুহ (বা আশু গুহ) বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। অশ্বপতি গুহের প্রপৌত্র রামচন্দ্র গুহ বাঙ্গালার নবাব সুলেমান কররাণীর পরম সুহৃদ্ ছিলেন। রামচন্দ্র গুহের তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দের মধ্যে তাঁহার মধ্যম পুত্র গুণানন্দ শৈশব হইতেই নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ও সাধনপরায়ণ থাকায় সরকারের কোন কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবানন্দ ও কনিষ্ঠ শিবানন্দ গৌড়ে নবাব সুলেমান কররাণীর হিসাব ও রাজস্ব বিভাগে প্রবেশ করিয়া যোগ্যতাবলে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি, এবং গুণানন্দের পুত্র (?) জানকীবল্লভ নবাবপুত্র দায়ুদের সহিত একত্র শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীহরির সহিতই দায়ুদের অতিশয় সম্প্রীতি হইয়াছিল। গুণানন্দ কিছু কাল পরে শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রস্থান করেন। তখনও শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ উভয়েই নবাব সরকারের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৪৯৫ শকে (১৫৭০ খৃষ্টাব্দে) দায়ুদ বাঙ্গালার নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীহরিকে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভকে "বসন্তরায়" উপাধি দান করেন। এই গুহবংশ প্রাচীন বৈষ্ণববংশ, এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত বহু বৈষ্ণবের সহিত ইঁহাদের সৌহৃদ্য ছিল। বিক্রমাদিত্যের পুত্র 'গোপীনাথ' পরবর্ত্তীকালে 'প্রতাপাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীন যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

দায়ুদ বঙ্গসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিক্রমাদিত্যকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, এবং বসন্তরায়কে কোষাধ্যক্ষ ও খানিসা বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। নবাব অতঃপর সুযোগ বুঝিয়া সম্রাটের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দূরদর্শী ভবানন্দ তখন বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের সাহায্যে নিম্নবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে, যমুনা নদীর পূর্ব্বপারে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সংগ্রহ করেন, এবং বসন্তরায়কে তথায় প্রেরণ করিয়া যশোহর নগরের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। অনন্তর তিনি দায়ুদের সিংহাসন-ছায়ায় স্বপুত্র বিক্রমাদিত্যকে ও ভ্রাতুষ্পুত্র বসন্তরায়কে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া প্রচুর ধন ও পরিবারবর্গসহ যশোহরে গমন করেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় দায়ুদের সহিত অবস্থান করিয়া দায়ুদকে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনায় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে থাকেন। যুদ্ধের সময় দায়ুদ রাজ্যের প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র ও বিপুল ধনসম্পত্তি পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। নবাবের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তাঁহার অনুগত ওমরাহ ও আমীরগণও স্ব স্ব ধনসম্পত্তি তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত রাখিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। দুই ভ্রাতা এই সকল ধন-সম্পত্তি নিরাপদে রাখিয়া রাজকার্য্যে নিয়মিত ভাবে দায়ুদকে সাহায্য করিতেছিলেন। প্রয়োজন হইলেই দায়ুদ ইঁহাদের নিকট হইতে আবশ্যক অর্থ গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৭ শকে) মোগলের আক্রমণে গৌড় বিধ্বস্ত হইলে পরাজিত দায়ুদ শাহ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। পুনরায় যুদ্ধে প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে দায়ুদ বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন যে, যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত তাঁহার ও তাঁহার ওমরাহগণের

ধনরত্নের এক কপর্দ্দকও যাহাতে মোগলের হস্তগত না হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা সতর্ক থাকিবেন ও সেইরূপই ব্যবস্থা করিবেন। পরবর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৮ শকে) আক্‌মহলের যুদ্ধে দায়ুদ মোগল কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে বিক্রমাদিত্যের ও বসন্তরায়ের নিকট গচ্ছিত তাঁহার বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকাংশই যশোহর রাজ্যে প্রেরিত হয়। তাহার কিয়দংশ শ্রীবৃন্দাবনে গুণানন্দের নিকটেও প্রেরিত হইয়াছিল। গুণানন্দ নিষ্ঠাবানও সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই অবস্থান করিতেন, এবং শ্রীরূপ সনাতনের যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে পুত্র "বসন্তরায়"-প্রেরিত এই অর্থরাশি প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রীজীবের নিকট তাঁহার অভিলাষ নিবেদন করেন; এবং তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহেই শ্রীজীবের তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীমদনমোহনের প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হয়। সম্ভবতঃ ১৫০০ শকে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং ২।৩ বৎসরের মধ্যেই মন্দির সম্পূর্ণ হইলে সেই শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীমদনমোহন দেব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানিতে পারা যায়,—

হর ইব গুহবংশ্যো যৎপিতা রামচন্দ্রো
গুণী মণিরিব পুত্রো যস্য রায়ো বসন্তঃ।
স্বকৃতসুকৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা
বিদধে বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ॥

অনুবাদ—গুহবংশীয় শিবতুল্য রামচন্দ্র গুহ যাঁহার পিতা, গুণীগণের মুকুটমণির অনুরূপ রায় বসন্ত যাঁহার পুত্র, শ্রীগুণানন্দ নামক সেই সুকৃতিশালী ব্যক্তি নন্দ-নন্দনের এই মন্দির যথাবিধি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

এই লিপি দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে বাঙ্গালা অক্ষরেও উৎকীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশের গৌরব প্রচার করিতেছে।

শ্রীশ্রীমদনমোহনের এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট, ইহার উত্তর দিকের নাটমন্দিরের দ্বারে "সম্বৎ ১৬৮৪ বর্ষ শ্রাবণ"* এই কয়টি শব্দ লিখিত আছে। আরও ২।১টি স্থানে যে সকল অক্ষর উৎকীর্ণ আছে, তাহা কিছু অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; এজন্য ঐ অংশের পাঠোদ্ধার করা অসাধ্য। যমুনা-গর্ভ হইতে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ 'আদিত্যটীলা' স্তূপটির উপর মদনমোহন দেবের এই মন্দির নির্ম্মিত।

যমুনার তীর হইতে এই মন্দিরের পোস্তাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, প্রথমে তাহা যেন কেল্লার আকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। একটি বুরুজ মাত্র বিদ্যমান থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

উত্তর দিকের মন্দিরটিকেই অনেকে কৃষ্ণদাস কাপুরের নির্ম্মিত পুরাতন মন্দির বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি জীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে স্থানীয় বৈষ্ণবগণ এখানে বন্দনাদির পরিবর্ত্তে রন্ধনাদি করেন। তবে গুণানন্দ-নির্ম্মিত দক্ষিণ দিকস্থ মন্দিরে নিতাই-গৌর বিগ্রহের সেবা চলিতেছে।

শ্রীবৃন্দাবনের ইহাই সর্ব্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ মন্দির। বঙ্গদেশের যশোহরের বসন্তরায়ের পিতা গুণানন্দ গুহ মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া, এই সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৫০০ শকাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ঠিক ৯২ বৎসর পরে ১৫৯২ শকাব্দে (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট্ আওরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এই মন্দির, শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দের প্রমুখ মন্দিরগুলি, এবং মথুরার শ্রীকেশবদেবের মন্দিরও ধ্বংস করেন। এই সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বেই হিন্দুরা পূজারিগণকে গোপনে বাদসাহের দুরভিসন্ধির সংবাদ জ্ঞাপন করেন। জয়পুরের মহারাজা মির্জ্জা রামসিংহের রাজত্বকালে পূজারিগণ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদন-মোহন ও শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ গোপনে জয়পুরে স্থানান্তরিত করেন। পরে মির্জ্জা রামসিংহের জামাতা করৌলির যদুবংশীয় রাজা শ্রীমদনমোহনকে করৌলিতে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন এখন করৌলিতে বিরাজিত থাকিয়া বাদসাহ

* রায়বসন্তের দ্বিতীয় পুত্র রাঘবরায় যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর যশোহরের জমিদার ছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা চাঁদরায় এই জমিদারী লাভ করেন। সম্ভবতঃ, ১৬৮৪ সম্বতে বা ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে ইনিই তাঁহার পিতামহ গুণানন্দ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন; এই জন্যই সংস্কারের সম্বৎটিও উৎকীর্ণ হইয়াছে।

আওরঙ্গজেবের উৎকট হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। তিনি এখনও সগৌরবে বিরাজিত; কিন্তু কোথায় আজ সেই ধর্ম্মধ্বজী বাদসাহ, আর কোথায় বা আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী মোগল সাম্রাজ্য ?

শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির-নির্ম্মাণ

শ্রীল মদনমোহনের মন্দির-নির্ম্মাণের দ্বাদশ বৎসর পরে শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই মন্দির জয়পুররাজ মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। * মহারাজ মানসিংহ পরমবৈষ্ণব ছিলেন; মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে প্রকাশ,—

"ধন্যরাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকলাধিপ।"—মানসিংহ কাবুল জয় করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মানসিংহকে কাবুলের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। লালদাস বাবাজীর বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায়, মাধোসিংহের পত্নীও অত্যন্ত ভক্তিমতী নারী ছিলেন। তাঁহার আদর্শেই মাধো-সিংহের হৃদয়ে ভক্তিসঞ্চার হয়। মহারাজ মানসিংহ সম্ভবতঃ শ্রীজীবের অপূর্ব্ব ভক্তিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও প্রভাবে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীগোবিন্দমন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজা প্রতাপসিংহ-রচিত হিন্দী 'ভক্তকল্পদ্রুম' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, এক সময় আকবর বাদশাহের অধীনস্থ গঙ্গা ও যমুনাতীরবর্ত্তী রাজ-গণের মধ্যে, গঙ্গা ও যমুনা এই উভয়ের কে শ্রেষ্ঠ, তাহা নির্ণয়ের জন্য বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কথিত আছে, আকবরের রাজসভা উভয় দলের সম্মতিক্রমে এই সমস্যার বিচারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। অবশেষে ইহার মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষই শ্রীজীব গোস্বামীকে মনোনীত করেন। কিন্তু শ্রীজীব বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও আমি রাত্রিযাপন করিব না। যদি তোমরা এক দিনের মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগ্রায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পার, তবেই আমি আগ্রার রাজসভায় গমনে সম্মত হইতে পারি।"—রাজগণ অতঃপর ঘোড়ায় ডাক বসাইয়া এক দিনের মধ্যেই শ্রীজীবের যাতায়াতের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী আগ্রায় সম্রাট্ আকবরের সভায় উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণোদ্ভবা, এবং যমুনা তাঁহার প্রিয়া, সুতরাং যমুনাই শ্রেষ্ঠা।" বাদসাহ ও রাজগণ উভয়েই শ্রীজীবের এই মীমাংসায় পরিতুষ্ট হইলেন। * পূর্ব্বোক্ত 'ভক্ত-কল্পদ্রুম' গ্রন্থে লিখিত আছে, সম্রাট্ আকবর তখন আগ্রায় কেল্লা নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন; এজন্য ঐ সময়ে জয়পুরী লাল পাথর আর কাহারও পাইবার অধিকার ছিল না। কিন্তু মানসিংহের অনুরোধে আকবর তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিনামূল্যে জয়পুরী লাল পাথর দিয়াছিলেন। প্রস্তর বিনামূল্যে সংগৃহীত হইলেও, কেবল মসলা ও কারি-গরদিগের বেতনের জন্যই এই মন্দির-নির্ম্মাণে মহারাজা মানসিংহের ত্রয়োদশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এই মন্দিরটি উত্তর-ভারতীয় স্থাপত্য-কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া য়ুরোপীয় শিল্পকলাতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। মথুরার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও মথুরার ইতিহাস লেখক মিঃ গ্রাউসের মতে "এই মন্দিরের তুল্য সুন্দর সুদৃশ্য দেবালয় উত্তর-ভারতে দ্বিতীয় নাই।" য়ুরোপীয় কলাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই মন্দিরটি মোগল ও হিন্দু-ভাস্কর্য্যের মিলনের ফলে নির্ম্মিত। তাঁহাদিগের মতে ইহার নিম্নভাগ হিন্দু-প্রথায়, এবং ঊর্দ্ধভাগ মোগল-প্রথায়

* মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে দেবনাগরী অক্ষরে এই কথাগুলি ক্ষোদিত আছে,—"সংবৎ ৩৪ শ্রীশকাব্দ আকবর শাহা রাজশ্রীকর্ম্মকুল শ্রীপৃথ্বী-রাজাধিরাজ-বংশ মহারাজ শ্রীভগবতদাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ সিংহদেব শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠ স্থান মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দদেবকে কাম উপরি শ্রীকল্যাণদাস আজ্ঞাকারী মাণিকচাঁদ চোপাও শিল্পকারি গোবিন্দদাস দিলবলী কারিগর দিঃ গণেশদাস বিম্বল।"—আকবর শাহের রাজ্যের ৩৪ বৎসর অর্থাৎ ১৫০০ খৃষ্টাব্দে বা ১৫১২ শকাব্দে মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। কল্যাণদাস, আজ্ঞাকারী, মাণিকচাঁদ চোপাও ভাস্কর, বা শিল্পকারী, এবং গোবিন্দদাস কারিগর বা রাজমিস্ত্রী।

* বাদসাহ ও রাজগণ শ্রীজীবের উত্তরে প্রীত হইয়া তাঁহাকে নানা-বিধ উপঢৌকন দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীজীব কিছুই লইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি একরূপ বন মধ্যেই থাকি, তথায় শাস্ত্রগ্রন্থ মিলান ভার, অতএব আপনারা যদি বারাণসীধাম হইতে বেদপুরাণাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র আনাইয়া দেন, তবে আমার কিছু উপকার হইতে পারে। আমি আর কিছুই চাহি না।"—বলা বাহুল্য, রাজগণ অবিলম্বে শ্রীজীবকে বারাণসী হইতে শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন।

নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু আওরঙ্গজেব যখন ইহার ঊর্দ্ধভাগের অধিকাংশই ধ্বংস করিয়াছেন, তখন ইহার চূড়া এবং ঊর্দ্ধভাগ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কোনও কোনও য়ুরোপীয় গ্রন্থকার ইহার ভিত্তিবিন্যাসে ক্রুশ চিহ্নের আবিষ্কার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, মন্দিরের ভিত্তিবিন্যাস ব্যাপারে খৃষ্টিয়ান জেসুইট পাদ্রিগণের পরামর্শ গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার ভিত্তিবিন্যাসে ক্রুশের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। অতি সুপ্রাচীন স্বস্তিক-যন্ত্রের সহিত ইহার ভিত্তিবিন্যাসের রীতির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, এবং তাহা অসঙ্গতও নহে।

এখন ভগ্ন মন্দিরটির তিনটি বর্ত্তমান আছে। ইহার ত্রিতলের ছাদ হইতে সমগ্র বৃন্দাবন সহর দৃষ্টিগোচর হয়। কথিত আছে, ইহার উপরের আরও তিনটি তলা ভগ্ন করা হইয়াছিল। সেই ছয় তলার ঊর্দ্ধস্থিত উচ্চ চূড়ায় এক মণ ঘৃতের যে উজ্জ্বল দীপ প্রজ্বলিত হইল—আগ্রা হইতে তাহার আলোক দৃষ্টিগোচর হইত; হিন্দুর দেবমন্দিরের এত দূর স্পর্দ্ধা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বলিয়া প্রতীতি হওয়ায় এই মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য আওরঙ্গজেবের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল—এইরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি নানা কারুকার্য্যে ভূষিত ছিল। নানা অংশে এখন শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় নানাবিধ মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। জগমোহনের দ্বারের তিন দিকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনেকগুলি সুন্দর মূর্ত্তি এখনও সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নাট-মন্দিরের বারান্দার উপর ও বহু স্থানে প্রস্তর-নির্ম্মিত নারীমূর্ত্তি আছে। মন্দির-ধ্বংসী বাদসাহের আদেশে সেগুলির মুণ্ড চূর্ণ করা হইয়াছিল।

শ্রীগোবিন্দের মন্দিরই শ্রীবৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়স্থল। শ্রীরূপ-সনাতন মঠাদির প্রতিষ্ঠাকে নিষ্কিঞ্চন ভক্তিপথের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন। প্রকৃত নিষ্কাম বৈষ্ণব-ভক্ত যে ভাবে বৃক্ষতলে রজনী যাপন করিয়া মাধুকরী ভিক্ষায় পরিতৃপ্ত—অনন্য-চিত্ত হইয়া শ্রীভগবৎ সেবায় কালযাপন করেন, শ্রীরূপ-সনাতন তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনকে একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারের মূলকেন্দ্র করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমদনমোহনের ও শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাই করিয়াছিলেন। পরম বুদ্ধিমান শ্রীজীবের দূরদর্শিতার ফলে শ্রীবৃন্দাবন নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত বৈষ্ণবগণের একটি উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল। মথুরাধামেও বহু দিন হইতে মুসলমানগণের অত্যাচার না থাকায় মথুরা নগরী শিল্প-বাণিজ্যের একটি সুসমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মথুরার শেঠগণ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোপাল-প্রমুখ দেববিগ্রহের সেবায় মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া ধন্য হইতেন। আবার দক্ষিণাপথ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে দলে দলে যাত্রী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়া নানাবিধ উপহার প্রদানে দেবসেবার পরিচালনে সাহায্য করিতেন। বিশেষতঃ, বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ভূস্বামিগণের ও ভক্ত যাত্রিগণের অযাচিত উপহারে শ্রীবৃন্দাবনের দেব-বিগ্রহগণের রাজবৎ সেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এক মাধ্ব সম্প্রদায় ব্যতীত আর সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই শ্রীবৃন্দাবনকে মহাতীর্থ মনে করিয়া, নানা ভাবে মঠ ও মন্দিরাদি স্থাপনে শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরাকে নব নব শোভায় সুশোভিত করেন। রাজপুতানায়, জয়পুরের, যোধপুরের, উদয়পুরের ও বুন্দেলখণ্ডের স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ হিন্দু নৃপতিগণ শ্রীমথুরাধামে ও শ্রীবৃন্দাবনে নূতন নূতন মন্দির স্থাপন ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনকে অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনবাসীর বা ব্রজবাসী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ভক্তগণের শ্রীজীবই একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের প্রবেশ-পথে শ্রীগোবিন্দের সুবৃহৎ মন্দিরে শ্রীগোবিন্দের রাজবৎ সেবার ও ভক্তজনের পালনের ব্যবস্থা করিয়া, এবং অপর দিকে শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চাৎঘাটীতে শ্রীল মদনমোহন দেবের মন্দির, ও শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যস্থলে শ্রীরাধা-দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনকে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের ভজন-কেন্দ্রে ও শাস্ত্রপ্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে পরিণত করিয়াছিলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

ইতিহাসের অনুসরণ

সহমরণ-প্রথা উচ্ছেদের সূচনা

সহমরণ-প্রথা উচ্ছেদের ইতিহাস লিখিতে হইলে খৃষ্টান মিশনারী রেভাঃ উইলিয়ম কেরীর নাম সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। রেভারেণ্ড কেরী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে দিনেমার জাহাজে বঙ্গদেশে আগমন করেন। জাহাজে অবস্থান কালেই তিনি ভারতবর্ষে প্রচলিত নানা কুসংস্কার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে শ্রীরামপুরে প্রথম অবস্থানের সময় তিনি কয়েকটি সতীদাহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া এই নৃশংস প্রথা উচ্ছেদের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই প্রথা হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত ও হিন্দুশাস্ত্র কর্ত্তৃক সমর্থিত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ আন্দোলন করা হিন্দু সমাজের সেই সজীব অবস্থায় কাহারও পক্ষে নিরাপদ ছিল না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার ত দূরের কথা! উক্ত ধর্ম্মের প্রচারকরা এদেশের লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসের সামান্য প্রতিকূলতা করিলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়; সপারিষদ গবর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহারা সেই পুস্তিকার প্রকাশিত সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে ধ্বংস করিবার জরুরি আদেশ প্রচার করেন, ও ভবিষ্যতে শ্রীরামপুরে ঐরূপ কোন পুস্তিকা প্রকাশ বা প্রচার, এবং প্রকাশ্য স্থানে দেশীয়দিগের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারের সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা রহিত করিবার আদেশ জারী করেন। বস্তুতঃ, এই বণিক কোম্পানী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে প্রভুত্ব স্থাপন ও প্রভাববিস্তারের প্রারম্ভকালে এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বন তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। বিশেষতঃ, ভারতপ্রবাসী য়ুরোপীয়দিগেরও নৈতিক চরিত্র তৎকালে বিশেষ উন্নত ছিল না; এবং স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধারও বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যাইত না। মিশনারীদিগের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি ত ছিলই না, অধিকন্তু স্বদেশীয় মিশনারীদিগকে তাঁহারা উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সেইজন্য সেই সময় এক জন শ্বেতাঙ্গ মিশনারী ভারতে পদার্পণ করিবার পর ক্ষুব্ধচিত্তে লিখিয়াছিলেন,—

"Our position is a painful and humiliating one. Europeans everywhere laugh at us, and God seems to cover Himself with impenetrable clouds." (১)

এমন কি, পরবর্ত্তী সময়ে লর্ড মিণ্টোর শাসনকালেও ধর্ম্মপ্রচারের শাস্তিস্বরূপ সাত জন খৃষ্টান মিশনারী নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহারও পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ড হইতে এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারী খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে কোন প্রকার সমর্থন অথবা আর্থিক সাহায্য করিলে দণ্ডনীয় হইবে। ইংরেজ মিশনারীদের যে কোন কার্য্য বা আন্দোলনকেই সেকালে সকলে সন্দেহ করিতেন। রেভারেণ্ড কেরীর ধারণা হইল, দেশীয় জনসাধারণের এই মনোভাবের পরিবর্ত্তনসাধনই তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য। অথচ তাহাদের সেই সন্দিগ্ধ ভাব দূর করিতে হইলে প্রথমতঃ, পরস্পরকে পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্ম, লোকাচার প্রভৃতি সম্বন্ধেও পরস্পরের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তিনি তৎপূর্ব্বেই স্বয়ং চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন; এখন স্বীয় মহৎ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি শুধু যে একাধিক ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করিলেন, তাহাই নহে, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, মারাঠি, আসামী ও ওড়িয়া ভাষায় তিনি বাইবেলের অনুবাদ, বাঙ্গালা ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্টের (New Testament) অনুবাদ, একখানি বাঙ্গালা ও একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণও প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিলেন; ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (Fort William College) স্থাপিত হইলে, পরবৎসরই রেভারেণ্ড কেরী সেই কলেজের সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও মারাঠি ভাষায় অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অর্থাৎ এক সময়েই তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত এদেশীয়দিগের পরিচয় সহজ করিতে সচেষ্ট হইলেন, এবং নিজেও এদেশীয় ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত পণ্ডিত প্রভৃতির নিকট হইতে তিনি সহমরণের সমর্থক শাস্ত্রোক্তি সমূহ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই নৃশংসপ্রথা ভারতবর্ষে যে কিরূপ ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, ও প্রতি বৎসর কত নারীকে যে সহমৃতা হইতে হয়, সে বিষয়ে সরকারের সম্যক্ জ্ঞান না থাকায়, তাঁহারা ইহাকে "জেণ্টু" (২) সমাজের এক বিশেষ লোকাচার জ্ঞান করিয়া ইহার উচ্ছেদ সাধনে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করিতেন। কিন্তু সহমৃতা নারীর সংখ্যা গণনা করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলে, শুধু ইংলণ্ডবাসীরাই নহে, সংস্কার-মুক্ত প্রগতিশীল বহু ভারতবাসীও যে বিস্মিত ও বিচলিত হইবেন, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাকেই তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র নির্ব্বাচন করিলেন, ও ত্রিশ মাইল ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এই কেন্দ্রের পরিবেষ্টক যে একটি কাল্পনিক বৃত্তের সৃষ্টি হইল, তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে অনুষ্ঠিত সহমৃতা নারীর সংখ্যা গণনার জন্য এদেশের অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করা হইল। তাঁহাদের প্রস্তুত তালিকা হইতে দেখা গেল, সে বৎসর কিঞ্চিদধিক চারি শত নারী সহমৃত হইয়াছিলেন। সংখ্যা-গণনায় ভ্রমের সম্ভাবনা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে পরবৎসর উক্ত কাল্পনিক বৃত্তান্তর্গত নদীতীরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে দশ জন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করা হইল। তাঁহারা একাদিক্রমে ছয় মাস যাবৎ উক্ত কার্য্যে নিরত থাকিয়া তিন শত নারীকে সহমৃতা হইতে দেখিলেন। রেভারেণ্ড কেরী এই সকল তালিকাও পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত সহমরণ-বিষয়ক শাস্ত্রোক্তি সমূহ কাউন্সিলের তৎকালীন জনহিতৈষী

---

(১) "Missionery Sketches in North India" by Mrs. Weittbrecht, 2nd edition.

(২) হিন্দুরা তৎকালে 'জেণ্টু' নামে আখ্যাত হইতেন।

সভ্য মিঃ উডনির হস্তে অর্পণ করেন। তিনি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ কেরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত এই সকল তালিকা অবলম্বন করিয়া সহমরণ বিষয়ে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লির নিকট ও সুপ্রীম কাউন্সিলে একটি আবেদন প্রেরণ করেন, এবং সেই আবেদন-পত্রে উক্ত প্রথার নৃশংসতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অপরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা সম্বন্ধে সরকারের সঙ্কোচ দূর করিবার জন্য তিনি পণ্ডিতগণের সঙ্কলিত সহমরণ-বিষয়ক শাস্ত্রোক্তির উল্লেখ করিয়া ইহাও প্রতিপন্ন করেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও হিন্দুনারীর প্রতি সহমৃতা হইবার অলঙ্ঘনীয় অনুশাসন নাই, অনুমোদন আছে মাত্র। তৎপূর্ব্বেও সরকার যে আইন প্রণয়ন দ্বারা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত অথচ মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ নিষ্ঠুর লোকাচার নিষিদ্ধ করেন নাই, তাহা নহে; সুতরাং তাঁহার সহিত একমত হইয়া গভর্ণর জেনারেল ও সার জর্জ্জ বারলো যাহাতে আইন প্রণয়ন করিয়া সহমরণের ন্যায় নৃশংস প্রথা উচ্ছেদে তৎপর হন, তজ্জন্য অতি করুণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অনুনয় করিয়া মিঃ উডনি সেই আবেদনের উপসংহার করেন। ইহার পূর্ব্বে লিখিত আবেদন প্রেরণ করিয়া কেহ এই প্রথার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লির কর্ম্মকালের তখন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট ছিল। হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ও বহুকালানুসৃত একটি প্রথার নিষেধক আইন প্রণয়নের পূর্ব্বে উক্ত প্রথার বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয় ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রভৃতির জন্য সেইটুকু সময় সত্যই যথেষ্ট নহে। ঐ বৎসরের ৫ই ফেব্রুয়ারী সপারিষদ্ গভর্ণর জেনারেল (লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড লেক, সার জর্জ্জ বারলো, ও মিঃ উড্‌নি তখন কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন।) একটি পত্রে সহমরণ-প্রথা উচ্ছেদ বিষয়ে নিজামত আদালতের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্ম্মমত যাহাতে আহত না হয়, তজ্জন্য আদালতকে এ বিষয়ে খুব ধীর ভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক অগ্রসর হইবার নির্দ্দেশ দান করেন, ও এ বিষয়ে নিজামত আদালতের বিচার-বিভাগের অভিমত জানিতে চাহেন। তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ বহু পণ্ডিতের নিকট হইতে তাঁহাদের মত সংগ্রহ করিয়া সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলকে ঐ বৎসর ৫ই জুন একটি পত্রের সহিত প্রেরণ করেন, ও সেই পত্রে তাঁহারা নিজেদের এই মত প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশ সরকার এ-যাবৎ পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতার যে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও সেই উদারনীতির অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। যে নৃশংস প্রথা উচ্ছেদের জন্য সরকার আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, উহা ক্রমে ক্রমে অদূর ভবিষ্যতে আপনিই লুপ্ত হইবে; সুতরাং নিজামত আদালতের মতানুসারে লর্ড ওয়েলেস্‌লি সহমরণ প্রথায় তখন হস্তক্ষেপ করা সমীচীন জ্ঞান করিলেন না।

ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দ্বিতীয়বার গভর্ণর-জেনারেলরূপে আগমন করেন। কিন্তু অতি অল্প কাল ঐ পদে নিযুক্ত থাকায় তিনিও ঐ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বগামী গভর্ণর-জেনারলেরই পন্থানুসরণ করেন। তাঁহার পর সার জর্জ্জ বারলো গভর্ণর-জেনারল হইলেন; কিন্তু তিনিও নিজামত আদালতের মতানুসরণ করাই সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া মনে করিলেন।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো গভর্ণর-জেনারেলের পদাভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্যকালের শেষ ভাগে এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সতীদাহ সম্বন্ধে স্বকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য নিজামত আদালতের নির্দ্দেশ প্রার্থনা করেন। নিজামত আদালত ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর সুপ্রিম গভর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সেই পত্রখানি প্রেরণ করিলেন, ও তৎসহ প্রেরিত নিজেদের একখানি পত্রে লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকাল হইতে তদবধি সহমরণ প্রথার নিষেধক যে সকল আইন প্রণয়নের ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে, তাহারও একটি বিবরণ প্রদান করিলেন। ৫ই ডিসেম্বর লর্ড মিণ্টো ইহার উত্তরে লিখিলেন, "......It is a fundamental principle of the British Government, to allow the most complete toleration in matters of religion to all classes of its native subjects......" কিন্তু তৎসহ তিনি ইহাও লিখিলেন যে, হিন্দু-ধর্ম্মানুসারেই যে সকল ক্ষেত্রে নারীর সহমৃতা হওয়ার নিষেধ আছে, সে সকল ক্ষেত্রে সহমরণে বাধা প্রদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য। অনন্তর নিজামত আদালত এ বিষয় পণ্ডিতদিগের নিকট উল্লেখ করিলে তাঁহারা বিধান দিলেন, নিম্নলিখিত চারি ক্ষেত্রে সহমরণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ,—

(১) যে ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগাদি দ্বারা সহমরণে বাধ্য করা হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে ঔষধাদি প্রয়োগের দ্বারা অভিভূত করিয়া নারীকে সহমরণে সম্মত করা হয়।

(৩) যে ক্ষেত্রে নারী অল্পবয়স্কা অর্থাৎ ষোড়শবর্ষের নিম্ন-বয়স্কা।

(৪) যে ক্ষেত্রে নারী সন্তানসম্ভবা।

সুতরাং উপরোক্ত চারি ক্ষেত্রেই মাত্র পুলিসকে অতি সতর্কতার সহিত সহমরণ নিবারণে সাধ্যমত চেষ্টা করিবার জন্য উপদেশ দান করা হইল। লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর ম্যাজিষ্ট্রেটরা দারোগার উপর নিম্নলিখিত মত একখানি লিখিত নির্দ্দেশ জারী করিলেন,—

"Whereas it appears that during the ceremony denominated "Sutte", certain acts have been occasionally committed in direct opposition to the rules laid down in the religious institutes of the Hindoos, by which that pratice is authorised, and forbidden in particular cases; as for instance, at several places pregnant women, and girls not yet arrived at their full age, have been burnt alive; and people, after having intoxicated women by administering intoxicating substances, have burnt them without their assent whilst insensible; and, in as much as this conduct is contrary to the Shastras, and perfectly inconsistent with every principal of humanity...... the police daroghas are hereby accordingly, under the sanction of Government, strictly enjoined to use the utmost care, and make every effort to prevent the forbidden practice above mentioned

from taking place within the limits of their thannahs......and at the same time, to let them know that it is not the intention of the Government to check or forbid any act authorised by the tenets of the religion of the inhabitants of these dominions, or even to require that any express leave or permission, be obtained previously to the performance of the act of Suttee, and the police officers are not to interfere or prevent any such act from taking place.........”

কিন্তু এই নির্দ্দেশ জারির ফলে প্রকারান্তরে ভিন্ন ক্ষেত্রে সহমরণে সরকারের অনুমোদন আছে, ইহাই সূচিত হইল।

ঠিক ঐ সময়েই (১৮১৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) বর্দ্ধমানে একটি নারী মাত্র আড়াই বৎসরের একটি সন্তান রাখিয়া সহমৃতা হন। ইহাতে তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট নিজামত আদালতে পত্র লিখিয়া অনুরূপ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে বলেন। নিজামত আদালত পত্রোত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন, একপ ক্ষেত্রে পুলিশ যাহাতে সহমরণে কোনরূপ বাধাদান না করে, তজ্জন্য কঠোর আদেশ দান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট পুনরায় ১৮ই ডিসেম্বর নিজামত আদালতকে এ বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য সানুনয় অনুরোধ করায় তাঁহারা যথাবিধি পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতেরা বলিলেন, রঘুনন্দনের মতানুসারে কোন নারীর যদি তিন বৎসরের ন্যূন বয়স্ক সন্তান থাকে ও যদি কেহ সেই সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত না হয়, তাহা হইলে সেরূপ ক্ষেত্রে সেই বালাপত্যা নারীকে সহমরণে বাধা প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাং ঐ বৎসরই পূর্ব্বোক্ত চারিটি ক্ষেত্র ভিন্ন এরূপ ক্ষেত্রেও সহমৃতা হওয়ার বিষয়ে এক নিষেধক আইন প্রণয়ন করা হইল ও যে ব্যক্তি ঐ সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, সে ভবিষ্যতে কখনও সেই দায়িত্ব পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করিলে, তাহাকেও জরিমানা দিতে আইনতঃ বাধ্য করা হইল। (৩)

লর্ড মিন্টোর পূর্ব্বগামী গভর্ণর জেনারেলরা কেহ দেশীয় শাস্ত্র-সম্মত অথবা শাস্ত্রবিগর্হিত কোন অনুষ্ঠানেই হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। তিনিই সর্ব্বপ্রথম অন্ততঃপক্ষে শাস্ত্রবিগর্হিত সহমরণে বাধাপ্রদানের সংসাহস প্রদর্শন করেন। অবশ্য, তাঁহার এই সাহসের কারণও ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির সময় হইতেই ভারতবর্ষের ইংরেজদিগের কার্য্যক্রম লক্ষ্য করিলে প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা দেশীয়দিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপণে অথবা প্রচলিত কোন লোকাচারের পরিবর্ত্তন বা উচ্ছেদ-সাধনে কিরূপ কুণ্ঠিত ও সতর্ক ছিলেন। বলা বাহুল্য, কালক্রমে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি যতই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল, তাঁহাদের এই সঙ্কোচও ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। স্বদেশেও যেমন এক শ্রেণীর প্রগতিপন্থী ইংরেজ ভারতবর্ষের বহুবিধ কুসংস্কারের বিলোপ-সাধনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের উপর চাপ দিতে লাগিলেন, এ দেশেও রামমোহন রায় প্রমুখ অল্পসংখ্যক নব্যতন্ত্রী পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ নানা বিষয়েই তাঁহাদের মতের সমর্থন করিতে লাগিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের রংপুরে অবস্থান কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন। নৃশংস কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে পূজনীয়া ভ্রাতৃবধূর এই আত্মাহুতির আকস্মিক সংবাদে তাঁহার চিত্ত এরূপ বিচলিত হয় যে—এইরূপ প্রকাশ, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, ঐ নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদের জন্য অবিরাম চেষ্টা করা, সেই দিন হইতেই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। বস্তুতঃ, প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় দেশে ধীরে



রামমোহন রায়

ধীরে রক্ষণশীল দলের বিপক্ষে একটি প্রগতিকামী দলের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে প্রধানতঃ এই বঙ্গদেশেই য়ুরোপীয়দিগের প্রভাবের ফলে বাঙ্গালীদের চিন্তাধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইতেছিল, এবং প্রচলিত সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতির সংস্কার-সাধনের জন্য তাঁহাদের অন্তরে একটি প্রেরণা বিকাশ লাভ করিতেছিল। সংস্কারকামী এই নব্য দলের ক্রমশঃ যতই বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষও এ দেশবাসিগণের সহায়তা, সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিয়া এ দেশের সামাজিক আচার-ব্যবহারের সংস্কার সাধনে ততই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে উইলিয়ম কেরী-প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ মিশনরী-দিগের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা ক্রমশঃ সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিল।

বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে ইংরেজ সরকারের আনুকূল্যে

(৩) Human sacrifices in India or substance of the speech of John Poynder Esq. at the Courts of proprietors of East India Stock, held on the 21st and 28th days of March, 1827. p.p 21-24.

ও প্রধানতঃ রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, উইলিয়ম কেরী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট প্রভৃতির আন্তরিক চেষ্টার ফলে ১৮১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতি দেশহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় বঙ্গদেশেই প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের পথ সুগম হয়। এখানে এ কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, এক সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারে সাহায্য করা দূরে থাক, এ দেশবাসিগণের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে তাহাতে বাধা প্রদানই করিয়াছিলেন। তথাপি কলিকাতার উদার-নীতিক দল হিন্দুর কলঙ্কস্বরূপ সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ-সাধনের জন্য



রাধাকান্ত দেব

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে লর্ড হেষ্টিংসের নিকট লিখিত আবেদন প্রেরণ করিলে, লর্ড হেষ্টিংস বিবেচনা করিলেন, তখনও এ দেশের জনসাধারণের মন এরূপ সংস্কারমুক্ত হয় নাই যে, আইন প্রণয়ন দ্বারা সহমরণের ন্যায় বহুকালের প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান রহিত করিলে তাহারা বিনা আপত্তিতে ও বিনা আন্দোলনে উহার সমর্থন করিবে। সুতরাং সহসা ওরূপ কিছু করা তিনি তখন সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। বিশেষতঃ, তিনি উহার ফলে বঙ্গীয় ফৌজের (Beng.l Army) বিদ্রোহেরও আশঙ্কা করিলেন। এই অবস্থায় তিনি তৎকাল অবধি সতীদাহ-বিষয়ক যতগুলি নিয়ম সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেইগুলিই একত্র সংগৃহীত করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন।

রামমোহন রায় ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন, ও অবিরত আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে বহু শাস্ত্রোক্তিসম্বলিত "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ" নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিলেন। উহাতে সহমরণ প্রথার সমর্থক ও বিরোধী দুই ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া তিনি ইহাই প্রচার করিলেন যে, "শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকার অসম্মত এরূপ স্ত্রীবধ হয়" এবং "পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র বিবেচনা করিলে...এরূপ স্ত্রীবধ জন্য পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না।" পরবৎসর কালাচাঁদ বসু নামক (৪) সহমরণ প্রথার সমর্থক এক ব্যক্তি "বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ" নামক বহু পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি সম্বলিত একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া অনুরূপ প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বিপরীত মতবাদ প্রচার করিয়া লিখিলেন,—"বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষায় স্ত্রীর সহমরণ অনুমরণে অতিশয় ফল, যেহেতু ইহাতে ব্রহ্মঘ্ন কিম্বা কৃতঘ্ন কিম্বা মিত্রঘ্ন যে পতি সেও নিষ্পাপ হয়, এবং নরক হইতে মুক্ত হয় এবং ত্রিকুল পবিত্র হয় এবং স্ত্রী শরীর হৈতে মুক্ত হয়...।" এই মত খণ্ডন করিয়া রামমোহন ঐ বৎসরই "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ" রচনা করিয়া কুসংস্কারবদ্ধ দেশবাসীকে বুঝাইলেন,—"...বলাৎকারে কোন স্ত্রীকে বন্ধন করিয়া, পরে অগ্নি দিয়া দাহ করা, এ সর্ব্বশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবং অতিশয় পাপের কারণ হয় এরূপ স্ত্রীবধেতে এক দেশীয় লোকের কি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক ঐক্য হইয়া বধ করে, তথাপি বধকর্ত্তারা পাতকী হইবেক, অনেকে ঐক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না... দুঃখ এই, যে...নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।" রামমোহন কেবল বঙ্গভাষায় পুস্তিকা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; এই সকল পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য, রামমোহন তাঁহার সমাজ-সংস্কার কার্য্যে অনেকগুলি অকপট বন্ধুর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরই অন্যতম। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করার যে কৃতিত্ব, তাহা প্রধানতঃ উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি মিশনরীগণেরই প্রাপ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে রামমোহন ও দ্বারকানাথের ন্যায় এদেশীয় উদ্যোগী সমাজসংস্কারকের সহায়তা লাভ না করিলে, তৎকালে ইংরেজ সরকারের পক্ষে কেবল ইংরেজ মিশনরীদের সহযোগিতা সম্বল করিয়া ঐ প্রথা শীঘ্র উচ্ছেদ করা কখনই সম্ভব হইত না। কারণ,—

"...it was impossible for the English to take up the position adopted by the native reformers Dwarkanath Tagore and Rammohun Roy, viz., that Suttee was an innovation not sanctioned by or in accordance with the true teaching of Hinduism." (৫)

---

(৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কাশীনাথ তর্কবাগীশ। ব্রজেন্দ্র বাবুর "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ৪৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অতঃপর এই গ্রন্থ "সংবাদপত্র", এই নামে উল্লিখিত হইবে।

(৫) "India in the nineteenth Century" by Demetrius. C. Bonlger.

রামমোহন কেবল পুস্তকাদি রচনার দ্বারা আন্দোলন চালাইতেন, তাহা নহে, কোথাও কোন নারী সহমরণে উদ্যত হইয়াছেন সংবাদ পাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে নানা সদুপদেশ, সুপরামর্শ ও অভয়দান করিতেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে ঐ অনুষ্ঠানে আইনের কোন বিধান লঙ্ঘিত হইতেছে কি না, সে বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার এইরূপ কার্য্যের একটি উল্লেখ আমরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের এসিয়াটিক জার্ণালে দেখিতে পাই।

বলা বাহুল্য, সহমরণ উচ্ছেদ বিষয়ে লর্ড হেষ্টিংসের ঔদাসীন্য দর্শনে রক্ষণশীল দল তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে, বিদায়ের প্রাক্কালে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের "২১শে দিসেম্বর শনিবার শ্রীশ্রীযুত মারকিস আফ হেষ্টিংস বাহাদুরের বিদায় ও সুখ্যাতিপত্র বিবেচনা করিতে কলিকাতাবাসি বাঙ্গালি ভাগ্যবান একত্র হইয়াছিলেন।" রক্ষণশীল দলের অন্যতম বক্তা "শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবও ··ঐ পত্রের মধ্যে আর এই কথা বিন্যাস করিতে চাহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত অস্মদাদির ধর্ম্মদ্বেষ করিলেন না ও সহমরণের কোন বাধা জন্মাইলেন না এই বিষয়ে আমরা যে তাঁহার প্রশংসা করি সেও অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীযুত রামকমল সেনও সেই কথাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তৎ কথার প্রামাণ্যের জন্যে যখন সভার সম্মুখে কহা গেল তখন প্রায় সকলেই স্ব স্ব সম্মতি জানাইলেন।···শ্রীশ্রীযুত জীবৎ স্ত্রী দাহের বাধা যে না জন্মাইয়াছেন তদ্বিষয়ে তাঁহার সুখ্যাতি লিখন স্থির হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন কহিলেন যে এই ক্রিয়া আমাদের দেশের নিন্দনীয়া অতএব সে কথা ইহাতে বিন্যাস করা কর্ত্তব্য নহে এই নিমিত্তে ঐ সভা শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসা পত্রে এতাবন্মাত্র লিখিলেন যে শ্রীশ্রীযুত আমারদের ধর্ম্মদ্বেষ করিলেন না এই সামান্যতো লিখিলেন কিন্তু বিশেষ ২ করিয়া কিছু লিখিলেন না···।" (৬)

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলকে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, এ পর্য্যন্ত দেশীয় ব্যক্তিদিগকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য সরকার কর্ত্তৃক যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন পরোক্ষে ঐ প্রথায় সরকারের অনুমোদন আছে, দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা হওয়ার জন্য সহমৃতা নারীর সংখ্যা হ্রাস না হইয়া বরং আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স এ বিষয়ের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সুবিবেচনার উপরই এই সম্পর্কে যথাবিহিত কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট এই পত্রের উত্তরে লিখিলেন, কোর্টের পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত তাঁহারা দেশীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিলেন,—

"······the most acceptable form of success would be, that which would be brought about by such an increase of intelligence among the people, as should show them the wickedness and absurdity of the practice; next to this, we should rejoice to see the abolition effected by influence and co-operation of the higher order of Natives It is hardly necesary to add, that measures for protecting the females from violence and punishing those who administer intoxicating drugs, will have our approbation.······"



দ্বারকানাথ ঠাকুর

সুতরাং লর্ড আমহার্ষ্টও এ বিষয়ে নিজের দায়িত্বে নূতন কিছুই করিলেন না। কেবল কোন নারীকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ দ্বারা সহমরণে বাধ্য করা হইতেছে কি না, তৎপ্রতি যাহাতে অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। কারণ, যদিও সহমরণ প্রথার কুফলের বিষয়ে তিনিও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার আশঙ্কা ছিল, আইনের সাহায্যে ঐ প্রথার উচ্ছেদে সচেষ্ট হইলে, তদপেক্ষা অধিকতর কুফলের সম্ভাব্যতা আছে।

(৬) "সংবাদপত্র" প্রথম খণ্ড, ২৩৩-৩৪ পৃঃ। ৺রামকমল সেনের এইরূপ বিপরীত ব্যবহার হইতে ইহাই অনুমান হয় যে, তিনি সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ প্রচেষ্টার ঔচিত্য অনৌচিত্য বিষয়ে প্রথমে কোন স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী আচরণও এই অনুমানকে সমর্থন করে।

আইনের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, লর্ড হেষ্টিংসের সময় হইতে কেবল সরকারের দেশীয় কর্ম্মচারীরাই নহে, বহু সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরাও মৃত ব্যক্তির বিধবার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে নানা সদুপদেশ ও সুপরামর্শ দান করিতেন। অবশ্য, এইরূপে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা তৎপূর্ব্বেও যে কেহ করেন নাই, তাহা নহে। এই সম্পর্কে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তিনি গঙ্গাতীরে সহমরণোদ্যতা একটি হিন্দু রমণীকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন, এবং কথিত আছে, পরে তাহাকে বিবাহ করেন।

যাহা হউক, লর্ড আমহার্ষ্টের এই সতর্কতা দর্শনে সহমরণ প্রথার আশু উচ্ছেদকামী মিশনারীরা অধীর হইলেন, এবং সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে বহু পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল উদ্দেশ্যমূলক পুস্তক বহু অত্যুক্তি ও সত্যের বিকৃতিতে পূর্ণ থাকিত। ঐ প্রথার উচ্ছেদে বিলম্ব দেখিয়া কোন কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরও সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অসহিষ্ণু হইয়া অসংযত ভাষায় সহমরণ প্রথার আশু উচ্ছেদের জন্য বহু কৌতুককর উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। এই সকল অভিনব উপায়ের একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দাক্ষিণাত্যের কমিশনার মঃ চাপ্‌লিন তাঁহার রিপোর্টে এক সময়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"The exposure of the naked bodies of the Milesian virgins, it is recorded, put a stop to their propensity to suicide: and if we could so far trample upon inveterate prejudices, as to collect and scatter the ashes of the Brahminee victims of fanaticism in the quarters belonging to the polluted and degraded castes, we too might check the practice without resorting to an absolute prohibition of it." (৭)

সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধবাদীদিগের মধ্যে মিঃ জন্ পয়ণ্ডারের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টকের কোর্ট অফ প্রোপ্রায়েটার্সের (Court of Proprietors of the East India Stock) অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮২৭ সনের ২১শে মার্চ্চ ও ২৮শে মার্চ্চ ঐ কোর্টের সম্মুখে তিনি সহমরণ প্রথার নৃশংসতা, ভারতবর্ষে উহার ব্যাপকতা ও ঐ প্রথা সম্পর্কে ভারতীয় নারীর অসহায়তা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় দীর্ঘকাল ধরিয়া এক বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতারা বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়েন বটে, তথাপি সহসা ঐ প্রথার উচ্ছেদসাধন দ্বারা ভারতীয়দের বিরাগভাজন হওয়ার যৌক্তিকতা কেহই স্বীকার করেন নাই। ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার ও ভারতীয়দের বিদ্যালাভের সহিত ক্রমশঃ এই কুসংস্কার ধীরে ধীরে লুপ্ত হইবে, এইরূপ অভিমতই তাঁহারা প্রকাশ করেন। যাহা হউক, বক্তৃতার শেষে মিঃ পয়ণ্ডারের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি মাত্র পাঁচ জন প্রোপ্রায়েটার ব্যতীত আর সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়,—

(৭) Asiatic Journal, October, 1827.

"That this Court, taking into consideration the continuation of Human sacrifices in India, is of opinion that, in the case of all rites, or ceremonies, involving the destruction of life, it is the duty of a Paternal Government to interpose for their prevention; and therefore recommends to the Honourable Court of Directors to transmit such instructions to India, as that Court may deem most expedient for accomplishing this object, consistently with all practicable attention to the feelings of the Nations."

অর্থাৎ, দেশীয় ব্যক্তিদিগের মনে কোন আঘাত না দিয়া ঐ প্রথা উচ্ছেদের জন্য কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স যাহা করা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিবেন, তাহাই যেন করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোর্ট অফ প্রোপ্রায়েটার্স হইতে আরম্ভ করিয়া সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও ভবিষ্যৎ কুফলের আশঙ্কায় কেহই সহসা ঐ প্রথায় হস্তক্ষেপণে সাহস করেন নাই। দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক নূতন গভর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দেড় বৎসরের মধ্যেই সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন। সে বৃত্তান্ত যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি লর্ড বেণ্টিঙ্কের সাহসিকতার পরিচায়ক। বারান্তরে সে বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

ইন্দোচীনে ভারতীয় প্রভাব

কাম্বোডিয়া রাজ্য

বর্তমান প্রবন্ধে কম্বুজ বা কাম্বোডিয়া, দ্বারাবতী বা শ্যাম এবং এই বিজয় রাজ্যে হিন্দু এবং বৌদ্ধ প্রভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এ বিষয়ে ফরাসী এবং চীনাভাষায় অনেক বিবরণ বিবৃত থাকিলেও ইংরেজী ভাষায় ইহার বিস্তৃত বিবরণের অভাব। অধ্যাপক কোয়েডেস্ (Coedes) পেলিও (Pelliof) এবং কোন কোন চীনা লেখকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের প্রীতিকর হইতে পারে।

আমাদের দেশের লোক কাম্বোডিয়া রাজ্যকে কম্বোজ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ফরাসীদিগের মতে উহার নাম কম্বুজ রাজ্য। এই দেশের পৌরাণিক কিম্বদন্তীতে প্রকাশ—কম্বু ঋষি কর্ত্তৃক মেরা নাম্নী অপ্‌সরার গর্ভে এই দেশের রাজবংশের আদি পুরুষের উৎপত্তি; সেই জন্য রাজ্যের এবং রাজবংশের নাম কম্বুজ। সংস্কৃত কম্ শব্দে জল, কম্বুজ অর্থে জল হইতে আবির্ভূত। ভারতের কোন ঋষি জলপথে ঐ দেশে গমন করায় তাঁহার নাম অনুসারে দেশের নাম কম্বুজ হইয়াছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। মেরা নাম্নী অপ্‌সরীর নামানুসারে এই দেশের লোকেরা ক্মের বা খমের (khmer) নামে অভিহিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে দেশের বংশধরা মাতৃনাম গ্রহণ করিত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই দেশের নাম কম্বুজও হইতে পারে। কারণ কম্বু বা শঙ্খ হইতে যাহার উদ্ভব, তাহাকে কম্বুজ বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোয়েডেস্, পেলিও প্রভৃতি ঐতিহাসিক উহার নাম কম্বুজ বলিয়াছেন, তাহাই গ্রহণযোগ্য।

কম্বু ঋষি কত দিন পূর্ব্বে এই দেশের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল কি না,—তাহা নির্ণীত হয় নাই। চীনেরা এই রাজ্যটিকে চেনলা (Chenla) রাজ্য বলিত। এ দেশের শাসকগণ ফুনান রাজ্যের রাজগণের অপেক্ষা দুর্ব্বল ছিলেন। চীন দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক সুফিঙ্ও বলেন, চেনলা লিনরির দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। প্রথমে এই রাজ্যটি ফুনানের সামন্তরাজ্য ছিল। চেনলার রাজা চিত্রসেন ফুনান রাজ্য জয় করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। চীনের ইতিহাসে প্রকাশ, কম্বুজ রাজবংশের রাজা চিত্রসেন ৫৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৪৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ফুনান অধিকার করিয়াছিলেন। চিত্রসেন সম্পূর্ণ ভারতীয় নাম। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই বিস্তীর্ণ উপদ্বীপের যে সকল সুপ্রতিষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদের সকল বংশের প্রতিষ্ঠাতাই ভারত হইতে ঐ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথাকার নারীদিগের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদেরই বংশধরগণ তথায় বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। এখনও সেই বংশের কতকগুলি লোক তথায় ভূস্বামী ও নবপতি-রূপে বিরাজিত; এই সকল লোক ভারতের কোন্ প্রদেশের অধিবাসী, তাহা অজ্ঞাত।

শ্রুতবর্ম্মণ এবং শ্রেষ্ঠবর্ম্মণ হইতেই কাম্বোডিয়ার রাজবংশের প্রথম পুরুষ গণিত হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠবর্ম্মণের রাজধানীর নাম ছিল শ্রেষ্ঠপুর। ইহা অবস্থিত ছিল লোয়স (Lao) পবগণার সান্নিধ্যে। কোয়েডেস্ স্থির করিয়াছেন—১৫ উত্তর লদিমায় ইহা অবস্থিত ছিল। এখন তথায় ভগ্নস্তূপের কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কম্বুজ-রাজলক্ষ্মী নাম্নী রাজ্ঞী এক সময় কম্বুজ রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে ঐ রাজ্যে এক প্রবল বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহীরা জয়লাভ করিয়া কম্বুজ-রাজলক্ষ্মীকে সিংহাসনচ্যুত করে। তাহারা ফুনান রাজবংশের অর্থাৎ কৌণ্ডিল্য এবং সোমার বংশধর প্রথম ভববর্ম্মণকে কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ অঞ্চলের ইতিহাস-লেখকরা বলেন যে, এই ব্যাপারের ফলে কাম্বোডিয়ার রাজার পক্ষে ফুনান জয় করা সহজ হইয়াছিল। ভববর্ম্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিত্রসেন সহজেই ফুনান জয় করিয়াছিলেন। চিত্রসেন পরে সিংহাসন লাভ করিয়া মহেন্দ্রবর্ম্মণ নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। মেকং নদতীরে মাকু নামক স্থানে এক প্রস্তর-গাত্রে এইরূপ একটি প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে—"স্থাপিতম্ চিত্রসেনেন লিঙ্গং জয়তি শাম্ভবম্।" কাম্বোডিয়ার মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত। চিত্রসেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেনাপতিরূপে কাম্বোডিয়া রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, এই ধারণা সত্য হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নামেই নগরের নাম ভবপুর রাখিয়াছিলেন। চম্পার এক প্রশস্তিতে "পুরম্ যদ্ভবসাহ্বয়ম্" এই বাক্য পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা স্থির করিয়াছেন, ঐ প্রশস্তি খৃষ্টীয় ৬৫৭ অব্দে উৎকীর্ণ। ভবপুর এই নামটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রশস্তিতেও পাওয়া যায়।

ভববর্ম্মার পর তাঁহার ভ্রাতা চিত্রসেন মহেন্দ্রবর্ম্মণ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহেন্দ্রবর্ম্মার পুত্র ঈশানবর্ম্মাই পিতৃ-সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী ঈশানপুরে পরিবর্ত্তিত করেন। রাজধানীর স্থান পরিবর্ত্তনের কারণ প্রকাশ নাই। এই ঈশানপুর নগরের অস্তিত্ব এখন বর্ত্তমান নাই। কোম্পং থোমের উত্তরে এখন যে বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয় শাম্বোর প্রৈকুক নামক স্থানে এই ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই স্থানে ঈশানবর্ম্মণের অনেকগুলি প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। এই ঈশানবর্ম্মণই ৬১৬ খৃষ্টাব্দে চীনরাজের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহাদের পরবর্ত্তীকালে কম্বুজ রাজ্য যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহাদের এক ভাগের নাম জলপ্রায় বা বারিবহুল কম্বুজ, অন্য ভাগের নাম ভূময় কম্বুজ। জলপ্রায় কম্বুজ সাগর-সৈকত হইতে ডানরেক গিরি পর্য্যন্ত, এবং ভূময় কম্বুজ ইহার উত্তরে বহু দূর বিস্তৃত ছিল। ভববর্ম্মণের পিতার নাম ছিল বীরবর্ম্মণ। উত্তর কম্বুজ বহুদিন যাবৎ স্বতন্ত্র ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমেই রাজা দ্বিতীয় জয়বর্ম্মণ কম্বুজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি মালয় উপদ্বীপের জভা নামক স্থান হইতে আসিয়া এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় জয়বর্ম্মণই বারিময় এবং ভূমিময় কম্বুজকে সম্মিলিত করিয়াছিলেন—এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ নাই। ইঁহার রাজত্বকালে কম্বুজ রাজ্যে পাষাণ শিল্পের বহুল বিস্তার ঘটে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজধানী উত্তরকালে যশোধরপুর নামে অভিহিত হয়। এখন উহা এঙ্কর থোম বা ওঙ্কার ধাম নামে পরিচিত। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞগণের মতে এই স্থানের বহু পাষাণমন্দির লোকেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত। প্রতীচ্য পণ্ডিতরা সেই জন্য অনুমান করেন, দ্বিতীয় জয়বর্ম্মণ প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে শৈব ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন। তিনি কম্বুজের জাতীয় দেবতা দেবরাজ নামে বিখ্যাত শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। তিনি ঐ দেবরাজের পূজা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেন না। এই দেবরাজের মন্দির রাজধানীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। তাঁহার রাজত্বকালের পূর্ব্ব হইতে ঐ অঞ্চলে শৈব ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এবং শিবই ঐ রাজ্যের জাতীয় দেবতা ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজ জয়বর্ম্মণই ঐ দেশে দার্ঘদ স্থাপত্যের ভূয়ঃ-প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বেলে পাথরের অনেক দুর্গাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইনি ৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন।

জয়বর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি অধিক বয়সে সিংহাসন পাইয়াছিলেন, এবং স্বল্পকাল জীবিত ছিলেন। জয়বর্ম্মার পৌত্র ইন্দ্রবর্ম্মা তাঁহার পিতামহের আদর্শে রাজ্যমধ্যে প্রস্তর-শিল্পের বিশেষ বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা প্রায় ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মার প্রতিষ্ঠিত ওঙ্কার ধামের নাম তাঁহার নামানুসারে যশোধরপুর হইয়াছিল। ইনি জয়বর্ম্মার প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ওঙ্কার ধামের উন্নতি সাধন করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করেন। এই বংশে দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্ম দেব নামক রাজা ১১১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইনিই ওঙ্কার বট বা ওঙ্কার বাট নামক স্থানে সুন্দর বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির একালেও দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি এখন পর্য্যন্ত এই

বিধ্বস্ত নগরে বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার অতীত গৌরব বিঘোষিত করিতেছে।

ফরাসী পণ্ডিতরা বলেন, অঙ্কর শব্দ নগর শব্দের অপভ্রংশ। অঙ্কর শব্দ যে ওঙ্কার শব্দের অপভ্রংশ এরূপ অনুমানও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। ওঙ্কার শব্দ মাঙ্গলিক। ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের বীজমন্ত্র নিহিত আছে; সুতরাং উহা ঐ তিন দেবতা বিষয়ে প্রযুজ্য। ওঙ্কার বাট বিষ্ণুর বাটী। ওঙ্কার ধাম শিবের নগর। এই অর্থই সমীচীন মনে হয়।

১১৮১ খৃষ্টাব্দে সপ্তম জয়বর্ম্মণ কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর ইহাকে লোক পরমসৌগত বলিত। ইহা হইতে বুঝা যায়, ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি ১২০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। ইনি অনেক চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়া ঐ সকল চিকিৎসাগার বা হাসপাতাল বুদ্ধ ভৈষজ্যগুরুর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সকল চিকিৎসালয়ে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে ঔষধ বিতরণ এবং চিকিৎসা করা হইত। এই সকল হাসপাতালে রাজাদেশে অভিন্ন নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। কচিৎ কোথাও কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। তিনি মনে করিতেন, প্রজার দুঃখে রাজারই দুঃখ। তাঁহার যে প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"দেহীদিগের দেহের রোগ শেষে মনের রোগ হইয়া দাঁড়ায়—উহা রোগের শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রীয় লোকের দুঃখ রাজারই দুঃখ, প্রজাদিগের নিজের দুঃখ নহে।"

এই বংশের অষ্টম জয়বর্ম্মার জামাতা শ্রীইন্দ্র বর্ম্মণ ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে কম্বুজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি প্রায় ১২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি ঈশ্বরপুরে ত্রিভুবন মহেশ্বরের একটি বিগ্রহ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই মন্দিরটি খ্মের স্থাপত্যশিল্পের সুন্দর নিদর্শন। এখন ঐ মন্দিরটি বনটেই শ্রৈ নামে অভিহিত। ওঙ্কার বাট হইতে উহা প্রায় সাড়ে ১৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই অঞ্চলে ইদানীং অনেকগুলি শিলালিপি ও প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অঞ্চলের বিশিষ্ট স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যশিল্প অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পর শ্যাম রাজা কর্ত্তৃক এই রাজ্য বিজিত হওয়ায় ইহার নিজস্ব শিল্পাদির অবনতি ঘটে। কোন্ সময়ে শ্যামরাজ এই রাজ্য জয় করিয়া এই রাজবংশের লোকদিগকে ওঙ্কার বাট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন—তাহার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহার পর এই রাজবংশের বংশধরগণ নিতান্ত অনিশ্চিতভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া আসিতেছে।

শ্যাম রাজ্য

শ্যাম রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত। চীনারা এই রাজ্যকে চিটু রাজ্য বলিত। চিটু অর্থে লোহিত ভূমি। ইহা প্রাচীনকাল হইতে কতকটা ফুনান রাজ্যেরই অধীন ছিল; কিন্তু তাহা হইলেও এই রাজ্য সর্ব্বতোভাবে পরাধীন ছিল না। ইহার রাজগণ অনেকটা স্বাধীন ছিলেন। ইহা মেনাম নদের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। ৬০৭ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের রাজা এই রাজ্যে কয়েক জন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে এই রাজ্যের কথা সকলে জানিতে পারেন। চীন-দূতগণ কর্ত্তৃক এই রাজ্যের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অবস্থার কথা বিবৃত হইয়াছিল।

এই রাজ্যটি প্রথমে যে হিন্দুরাজ্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, ইহার নাম ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হইতে এই রাজ্যে হিন্দু-প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্যের নাম ছিল দ্বারাবতী। ইহার রাজধানীর নাম ছিল অযোধ্যা। চীনের কিউ তাং শু (Kiou Tang Shu) বলেন, ইহা বারিবহুল কাম্বোডিয়ার পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্ সাং এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই দ্বারাবতী রাজ্যটি শ্রীক্ষেত্র হইতে কাম্বোডিয়ার ঈশানপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান প্রোম জিলাই শ্রীক্ষেত্র নামে অভিহিত হইত। ইহা দক্ষিণ ব্রহ্মে অবস্থিত। অযোধ্যা নামও এই সঙ্গে পাওয়া যায়। তবে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ইহার অযোধ্যা নাম্নী রাজনগরী ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীনতর রাজনগরীর ঐতিহ্য আত্মসাৎ করিবার জন্যই পরবর্ত্তী রাজধানী অযোধ্যা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। প্রাচীনতর রাজধানীকে চীনারা লভো বলিতেন। লভো বর্ত্তমান লপচুড়ি। উহা পরবর্ত্তী অযোধ্যার ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এই রাজ্যের ইতিহাস পাওয়া যায় না বটে, তবে এ কথা সত্য যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মেনামের বিস্তীর্ণ অববাহিকা ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণস্থ অর্থাৎ সাগরতীর-সন্নিহিত দেশের নাম ছিল লভো বা লপচুড়ি (লোপবাড়ি) এবং উত্তর অঞ্চলের নাম ছিল শ্যাম বা সুখোদয়। উভয় রাজ্যই কাম্বোডিয়ার অধীন ছিল। ওঙ্কার বাটে একটি প্রস্তর-গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রে পরম বিষ্ণুলোকের সেনাগণ মধ্যে লভো এবং শ্যামকুট হইতে আগত সৈনিকদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, ইহা দেখিয়াই ঐরূপ অনুমান করা হইয়াছে। এই সকল নাম এবং প্রাচীন চিত্রাদিতে লোকদিগের বেশভূষা দেখিয়া মনে হয়, ঐ দেশের লোক বঙ্গদেশ হইতে তথায় গিয়াছিল এবং তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। অথচ উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও কিছুই পাওয়া যায় নাই।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন থাই (Thai) রাজা সুখোদয় রাজ্য অধিকার করিয়া শ্রীইন্দ্রাদিত্য নামে আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া বিঘোষিত করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও কেহ স্বাধীন ভাবে যে এই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্যাম দেশের সাধারণ লোক তাঁহাকে ফ্র রুয়াং (Phro ruang) বলিয়া থাকেন।

ইহার পুত্র রাম খমহেং (Rama Khamheng) ১২৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহার রাজত্বকালের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ কাহিনীই শ্যামদেশের ভাষায় লিখিত। এই ভাষা কতকটা বাঙ্গালা, কতকটা চীনা, এবং অধিকাংশ স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন। তখন সুখোদয় বা শ্যামরাজ্যের লোক বৌদ্ধ হীনযান ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু কাম্বোডিয়ার অধিবাসীরা প্রধানতঃ হিন্দু এবং মহাযান বৌদ্ধ ছিল। রাম খমহেং শ্যাম বা সুখোদয় রাজ্যের সন্নিহিত অমরাবতীর অন্যান্য অংশ এবং মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহার কোন বংশধর

১৩৫০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যানগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্যামরাজ্য স্বাধীন বলিয়া য়ুরোপীয়রা এই রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস জানিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার সুবিধাও পান নাই। এখন ফরাসীরা শ্যাম দেশের কিয়দংশ অধিকৃত করিয়া লইয়াছে। প্রাচীন শ্যামরাজবংশ-ধরগণ এখন সামন্ত নরপতি। লভো বা লপচুড়ির রাজবংশই প্রকৃতপক্ষে শ্যাম দেশে রাজত্ব করিতেছেন। শ্যামদেশবাসীরা অধুনা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। তথাকার জাতীয় আচার অনুষ্ঠানের সহিত বাঙ্গালার আচার অনুষ্ঠানের কতকটা সাদৃশ্য এখনও লক্ষিত হয়। এখন ইহার রাজধানী ব্যাঙ্কক। ইহার রাজার নাম আনন্দ মহীদল। বর্ত্তমান রাজধানী ব্যাঙ্কক প্রাচীন অযোধ্যা নগরীর দক্ষিণে অবস্থিত।

শ্রীবিজয়

এই দেশের ইতিহাস এত দিন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। ইহা শ্রীভোজ রাজ্য নামে জনসমাজে পরিচিত ছিল। কিন্তু বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ কোয়েডেস্ (Coedes) সম্প্রতি বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই রাজ্যের প্রকৃত নাম শ্রীবিজয়। এই সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক চীনা গ্রন্থ ও স্থানীয় কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া রাজ্যের অনেক লুপ্তপ্রায় ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা হইলেও ইহার অনেক তথ্য এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ কোয়েডেস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীবিজয় রাজ্য পলেমবং (palembang) রাজ্যের শৈলেন্দ্র রাজপরিবার কর্তৃক শাসিত হইত। পলেমবং রাজ্য সুমাত্রা। দ্বীপের মধ্য অংশ এবং দক্ষিণ অঞ্চলের রাজা ছিলেন এই শৈলেন্দ্র রাজপরিবার। ইহা ভিন্ন ইহার সন্নিহিত কতকগুলি দ্বীপও শৈলেন্দ্র রাজগণের অধিকারে ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে জাভা দ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র রাজগণ রাজত্ব করিতেন। জাভা দ্বীপের কগজকার্টার নিকট শ্রীবিজয়ের জনৈক রাজা চণ্ডী কলসং নামক একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহা বৌদ্ধ তারাদেবীর পীঠস্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। এই মন্দির ৭৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীবিজয়ের অধীশ্বর এই শৈলেন্দ্ররাজ আরও অনেকগুলি বৌদ্ধ কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সম্মানিত। ৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইনিই যে মঞ্জুশ্রীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ক্লোয়েরকের (Kloérak) শিলালিপি হইতে ঐরূপ আভাস পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান, মালয় উপদ্বীপের বন্দন উপসাগরের (?) দক্ষিণ তীরে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজাই বুদ্ধ, লোকেশ্বর এবং বজ্রপাণি এই তিন জনের প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তিনটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নামটি জানিতে পারা যায় নাই; তবে ইহার কীর্ত্তিমালা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ইনি মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ধার্ম্মিক বৌদ্ধ ছিলেন। এই শৈলেন্দ্র রাজগণই খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সুমাত্রা, জাভার মধ্যভাগ এবং মালয় উপদ্বীপের কিয়দংশ আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। হল্যাণ্ডের লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে এই অঞ্চলের কতকগুলি তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ২১খানি তাম্রলিপি হইতে শ্রীবিজয় রাজগণের ধর্ম্ম-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ করমণ্ডল উপকূলের চোল রাজবংশের প্রথম রাজা রাজরাজ-প্রদত্ত কতকগুলি প্রশস্তিও পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, করমণ্ডল উপকূলের চোল রাজগণের সহিত শৈলেন্দ্ররাজগণের বিশেষ বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। প্রথম রাজরাজের পরবর্ত্তী রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্ররাজ সংগ্রাম বিজয়োত্তুঙ্গ বর্ম্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি শৈলেন্দ্ররাজের কতকগুলি রাজ্যও অধিকার করিয়াছিলেন।

এই অঞ্চলের সমস্ত ইতিহাস জানা যায় নাই। ঐ দেশগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস আজিও পাওয়া যায় নাই। ফুনান রাজ্যের পতনের পর শ্রীবিজয় রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ দেশের রাজাদিগের নাম সমস্তই ভারতীয় নাম। ইহাতে মনে হয়, এই দেশে ভারতীয় সভ্যতাই বিস্তার লাভ করিয়া দেশটিকে সংগঠিত করিয়াছিল। ইহার মধ্যে সাগরতীরস্থ দেশগুলিতে ভারতের অন্যান্য স্থানের লোক যাইয়া সভ্যতা বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিল, এরূপও মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশ হইতে ঐ দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল, এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। সিংহমহাযান বৌদ্ধমত বাঙ্গালা হইতেই তিব্বতে ও চীনে প্রবেশ করিয়াছিল এবং দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। সিংহলে এখনও হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালায় এক সময় অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। সেই জন্য মনে হয়, পূর্ব্ব-উপদ্বীপে বঙ্গদেশ হইতে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। তবে ইহার নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই; শ্যামদেশের অতীত ইতিহাস আজিও জানিতে পারা যায় নাই; তবে চম্পা দেশের সম্বন্ধে অনেক গল্প বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এখন তাহার অনেকগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন রাজা ও রাজপুরুষদিগের যে নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহা অনেকটা বাঙ্গালা-ধরণের। প্রাচীন বঙ্গদেশে শৈব ধর্ম্মও এক সময়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চণ্ডী ও তারার পূজা বাঙ্গালায় বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল। শাক্ত ধর্ম্মও বঙ্গদেশে ও আসামে বহু দিন ধরিয়া প্রবল ছিল। সুতরাং ধর্ম্মের দিক দিয়া বাঙ্গালা দেশের সহিত পূর্ব্ব-উপদ্বীপের বিশেষতঃ শ্যাম, পাণ্ডুরং, শ্রীক্ষেত্র, অমরাবতী, কম্বুজ, চম্পা প্রভৃতি অঞ্চলের উপাস্য দেবতার মিল ছিল। যথা—চণ্ডী, ভগবতী, নগরস্বামিনী, তারা, ভদ্রেশ্বর, মহেশ্বর, ঈশান প্রভৃতি নাম ঠিক বাঙ্গালী দেবদেবীর নামের অনুরূপ। স্থানের নামগুলিও ঠিক বাঙ্গালী নামের অনুরূপ। যথা—ঈশ্বরপুর, শ্রেষ্ঠপুর, ঈশানপুর, শ্রীক্ষেত্র (আধুনিক প্রোম) দ্বারাবতী, সুখোদয়, ভবপুর প্রভৃতি। মান্দ্রাজী নাম ঠিক এইরূপ হয় না। লোকের নামেও দেখা যায়—সিংহবর্ম্মা, রুদ্রবর্ম্মা, ভৃগু, শম্ভু, সত্যবর্ম্মা, সিংহপাস প্রভৃতি নামগুলি বাঙ্গালীর এবং বিহারীর নামের অনুরূপ। ফরাসীরা পূর্ব্ব-উপদ্বীপের যে সকল প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, সম্যক্ ভাবে তাহা প্রকাশ করা উচিত।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।



গুণবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য'

দশ বৎসর পূর্বে ১৩৩৭ সালে সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্‌গ্রন্থমালায় ভট্ট গুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য প্রকাশিত হয়। আমার উপর এই গ্রন্থের সম্পাদনভার ন্যস্ত হইয়াছিল। ছন্দোগ অর্থাৎ সামবেদীয় গৃহস্থের জাতকর্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানে যে সকল বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, উহাদিগের ব্যাখ্যাই ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য

গুণবিষ্ণু অতি প্রাচীন ভাষ্যকার, বঙ্গ ও বিহার প্রদেশে চির-সমাদৃত। ইঁহার ভাষ্য বিহারে রাজকীয় সংস্কৃত পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে স্মার্ত রঘুনন্দন স্মৃতিতত্ত্বসমূহে বারংবার ইঁহার মন্ত্রব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ তাঁহার 'ষট্‌কর্মব্যাখ্যানচিন্তামণি' গ্রন্থে এই ব্যাখ্যাকে 'ভাষ্যাব্ধি' বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার 'মন্ত্রার্থদীপিকায়' গুণবিষ্ণুকৃত ভাষ্যের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। শত্রুঘ্ন ত্রিগর্তাধিপতি ধর্মচন্দ্রের অনুরোধে মন্ত্রার্থদীপিকা প্রণয়ন করেন। ধর্মচন্দ্র ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে পঞ্জাবের জলন্ধর প্রদেশ শাসন করিতেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, চারি শত বৎসর পূর্বে গুণবিষ্ণুর বেদব্যাখ্যার খ্যাতি পঞ্চনদের তীর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দাক্ষিণাত্যেও গুণবিষ্ণুর নাম অজ্ঞাত ছিল না। বরোদার রাজপুথিশালায় গ্রন্থাক্ষরে লিখিত গুণবিষ্ণুটীকার পুথি আছে।

কালক্রমে অল্পজ্ঞ লিপিকারগণের অনবধানতাহেতু এবং সাহসিক পণ্ডিতগণের অমূলক পাঠকল্পনার ফলে গুণবিষ্ণুর ভাষ্যে নানারূপ পাঠবিকার দেখা দিয়াছে। তিন শত বৎসর পূর্বে রামনাথ বিদ্যা-বাচস্পতি তাঁহার 'সামগমন্ত্রব্যাখ্যান' গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যায় প্রক্ষিপ্ত পাঠ ও লেখকপ্রমাদ লক্ষিত হইত (সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদের পুথি, বেদ ৩২, ৪ক পত্র—"ক্বচিদ্‌ গুণবিষ্ণুপুস্তকেঽপ্যেবং পাঠঃ প্রক্ষিপ্তো দৃশ্যতে।" ১৯খ পত্র—"পাঠোঽয়মেব সাধুঃ। ক্বচিৎ পুস্তকে তু লেখকপ্রমাদাদেব তদভাবঃ")।

এই ভাষ্য সংস্কার করিবার সময় বহু আদর্শ পুথি এবং নানারূপ উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকায় ঐ সকল সহায়ক উপকরণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ভবদেবপদ্ধতিরও নাম আছে। ভবদেবের এই পদ্ধতি-গ্রন্থে সামবেদীয় উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের প্রয়োগবিধি বর্ণিত হইয়াছে। কবিরত্ন মহাশয় ঐ সকল অনুষ্ঠানে পঠনীয় মন্ত্রগুলির সহিত গুণবিষ্ণুর টীকা যোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের প্রায় অর্ধাংশ তাঁহার ভবদেবপদ্ধতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য সম্পাদনের সময় পাঠনির্ণয়ে আনুকূল্যের আশায় আমি কবিরত্ন মহাশয়ের ভবদেবপদ্ধতির মন্ত্রাংশ আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহার যে পাঠ গুণবিষ্ণুসম্মত নয় বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা পাদটীকায় প্রদর্শন করিয়াছি।

গত কার্তিক মাসে 'মাসিক বসুমতী'র গ্রন্থ-সমালোচনায় কবিরত্ন মহাশয় মৎসম্পাদিত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম, এ মহাশয় সম্পাদিত গোভিলগৃহ্যসূত্রের আলোচনার সহিত স্বীয় পুস্তক ভবদেবপদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে তাঁহার ভবদেবপদ্ধতির বহুতর ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি কিন্তু গুণবিষ্ণুভাষ্যের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় এবং বিভিন্ন আদর্শের পাঠভেদ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁহার গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার গ্রন্থের পাদটীকায় 'ক' এই সংক্ষিপ্ত নাম দিয়া যে সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলি সব অশুদ্ধ, আমি এরূপ মনে করি নাই। তবে আমার সংগৃহীত এতগুলি আদর্শ পুথিতে ঐরূপ পাঠ না পাওয়ায় বুঝিয়াছিলাম যে, উহা গুণবিষ্ণুসম্মত পাঠ নহে। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের কোন সংশোধক যদি রাঘবভট্টের ব্যাখ্যানুসারে মূলে 'মনস্তু তত্ত্বাবদর্শনায়াসি' পাঠ গ্রহণ করিয়া পাদটীকায় 'তত্ত্বাবদর্শনাশ্বাসি' এই পাঠান্তর প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে, উক্ত সংশোধক পাঠান্তরটি অশুদ্ধ মনে করিয়াছেন, এরূপ অভিযোগ করা চলে না; উহা রাঘবভট্টসম্মত পাঠ নহে, এইমাত্র বুঝা যায়।

যাহা হউক, কবিরত্ন মহাশয় 'ছ' এই সংক্ষিপ্ত নাম দিয়া আমার পুস্তক সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমি তাঁহারই নির্দেশিত (ক), (খ), (১), (২) ইত্যাদি ক্রম অনুসরণ করিয়া সে সকলের আলোচনা করিব।

(ক) ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের ইংরাজী ভূমিকায় ক-পুস্তকের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম যে, উহাতে গুণবিষ্ণু-ভাষ্যের প্রায় অর্ধাংশ স্থান পাইলেও কবিরত্ন মহাশয়ের সংশোধনের ফলে গুণবিষ্ণু-সংস্করণরূপে উহার উপযোগিতা হ্রাস পাইয়াছে—"The numerous emendations freely made by the editor without the support of any manuscript, and the equally unwarranted rejection of passages have detracted very much from the value of the edition."

কবিরত্ন মহাশয় প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ কর্মকাণ্ডপদ্ধতির ভট্ট গুণবিষ্ণুর টীকারই সম্পূর্ণ পক্ষপাতী জানিয়া

মৎসম্পাদিত ভবদেবপদ্ধতির প্রথম সংস্করণে আমি ঐ টীকাই দিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃই দেখিলাম, উহাতে অনেক গোলযোগ। তখন কতকগুলা ফর্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িতেও পারিলাম না। যেন তেন প্রকারেণ গোঁজা-মিল দিয়া পুস্তক বাহির করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত বাহির করিতে হইয়াছিল এবং তখন শরীরও নিতান্ত অসুস্থ ছিল বলিয়া তাহাতেও ঐরূপ থাকিয়া গিয়াছে।"

এইরূপ উক্তির উত্তরে আমার অপর কিছু বক্তব্য নাই। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে কবিরত্ন মহাশয়ের ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিনি ঐ গ্রন্থের (১১-১৫ পৃষ্ঠা) গুণবিষ্ণুপাঠের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য অনেক কথা বলিয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে ১৩২৩ সালে ভবদেবপদ্ধতির প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়, তখনও তাঁহার গুণবিষ্ণু-টীকা সম্বন্ধে উপাদেয়ত্ব বোধ ছিল; "ঐ টীকার বিশুদ্ধ সংস্করণও আবশ্যক বোধ করিয়া" তাহাই ছাপিয়াছিলেন। ইহার এগার বৎসর পরে অর্থাৎ ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতির প্রথম খণ্ড প্রকাশের একুশ বৎসর গত হইলে ১৩৩৪ সালে ভবদেব পদ্ধতির দ্বিতীয় সংস্করণেও কবিরত্ন মহাশয় গুণবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন নাই। অথচ এখন বলিতেছেন—ভবদেবপদ্ধতির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় "কতকগুলা ফর্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িতেও পারিলাম না।"

(খ) ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের প্রাস্তাবিক নিবেদনে (xl পৃঃ) লিখিয়াছিলাম যে, লেখকগণের অনবধানতায় গুণবিষ্ণুভাষ্যের হস্তলিখিত পুথিতে বহুতর অশুদ্ধি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। একটি মন্ত্রে কিরূপ ভ্রমাত্মক পাঠান্তর ঘটিয়াছে, তাহা উদাহরণস্বরূপ পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম—"অয়ং প্রাণস্য পড্‌বিংশস্তেন বধ্নামি যাসৌ"এই মন্ত্রের পড্‌বিংশ পদটি কবিরত্ন মহাশয়ের ভবদেবপদ্ধতিতে (১ম সংস্করণ ৭৯ পৃঃ, ২য় সং ১১২ পৃঃ) এবং মন্ত্রপ্রভা নামে তৎকৃত মন্ত্রব্যাখ্যায় (২৫১ পৃঃ) 'ষড়্‌বিংশ'রূপে পরিণত হইয়াছে, 'পঞ্চবিংশতত্ত্বাতিরিক্ত' বলিয়া উহার যথেচ্ছ ব্যাখ্যাও তিনি করিয়াছেন।

ইহার উত্তরে (১৩) চিহ্নিত বক্তব্যে কবিরত্ন মহাশয় 'বসুমতী'তে লিখিয়াছেন,—"একটি মন্ত্রে পড্‌বিংশ স্থলে ষড়্‌বিংশ করিয়াছি।... ঐরূপ করিবার কারণ এই যে, ভাষ্যকারেরা ঐ অদ্ভুত পদের অর্থ বন্ধন লিখিয়াছেন, কিন্তু ব্যুৎপত্তি লেখেন নাই বলিয়া আমার সংশয় হইয়াছিল যে, আমার আদর্শ মন্ত্রব্রাহ্মণ পুস্তকে বহু মুদ্রাকর প্রমাদের ন্যায় এখানেও 'ষ' স্থানে 'প' হইয়াছে। কেবল আমার নহে, অনেকেরই সংশয় হইয়াছে, তাহা সম্পাদক মহাশয় উপক্রমণিকায় দেখাইয়াছেন। তজ্জন্য ঐস্থানে কেহ 'পড্‌ভৃংশ' কেহ 'পড্‌বিংশ' করিয়া যথেচ্ছ ব্যুৎপত্তিও করিয়াছেন। আমি ঐরূপ করিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলাম না। উহার প্রকৃত পাঠ ও ব্যুৎপত্তি জানিবার জন্য বহু অনুসন্ধান করিয়া উভয়ই অবগত হইয়া দুর্গামোহন বাবুর 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য' বাহির হইবার বহু পূর্বেই সায়ণভাষ্য সহ ভবদেবপদ্ধতির তৃতীয় সংস্করণের জন্য কপি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। সম্প্রতি উহা ছাপা হইতেছে।"

মুদ্রাপ্যমাণ তৃতীয় সংস্করণে মন্ত্রটি শুদ্ধরূপে ছাপা হইবে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। মন্ত্রব্রাহ্মণের পড্‌বিংশ পাঠটি মুদ্রাকরপ্রমাদ বলিয়া কবিরত্ন মহাশয়ের সংশয় হইয়াছিল। গোভিলীয়গৃহ্যকর্মপ্রকাশিকায় (৬১ পৃঃ) মন্ত্রটি শুদ্ধরূপে ছাপা আছে। মূল বৈদিক গ্রন্থেও পড্‌বিংশ এবং উহারই রূপান্তর পড্‌বীশ শব্দের প্রচুর প্রয়োগ পাওয়া যায়।

কবিরত্ন মহাশয় আমাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন (১৩)—"সম্পাদক মহাশয় যে পুনঃ পুনঃ 'পড্‌বিংশ' অকারান্ত লিখিয়াছেন, তাহা নহে; উহা অস্‌ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ।"

মানার্হ ব্যক্তির উক্তিও অপ্রমাণ হইলে কিরূপে মানিয়া লইব? সামবেদের দুইখানি শ্রৌতসূত্রে ধৃত একটি মন্ত্রে পড্‌বিংশ শব্দের নিঃসংশয় অকারান্ত প্রয়োগ পাওয়া যায়। দ্রাহ্যায়ণশ্রৌতসূত্রে (২, ৪, ২) উক্ত মন্ত্রের পাঠ এইরূপ—

নির্মা মুঞ্চামি শপথান্নির্মা বরুণাদৃত।
নির্মা যমস্য পড্‌বিংশাৎ সর্বস্মাদ্দেবকিল্বিষাৎ॥

দ্রাহ্যায়ণশ্রৌতসূত্র ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রেও (২, ২, ১১) ঐ মন্ত্রে 'পড্‌বিংশাৎ'ই পাঠ। চৌখম্বা সংস্কৃতগ্রন্থমালায় মঃ মঃ শ্রীযুক্ত মুকুন্দ ঝা মহাশয়ের সম্পাদিত লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র (৭০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। ঝা মহাশয় শব্দটির ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন,—"পশ বন্ধন ইত্যস্মাৎ কিপি রূপম্, বিশতেঃ প্রবেশনার্থাদিগুপধলক্ষণঃ কঃ, মুমাগমশ্ছান্দসঃ"।

আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে (৭, ২১, ৬) ঐ মন্ত্রটিতে পড্‌বিংশাৎ স্থলে পড্‌বীশাৎ পাঠ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ (১০, ৯৭, ১৬), মাধ্যন্দিনীয় সংহিতা (১২, ৯০) এবং অথর্ববেদে (৬, ৯৬, ২ । ৭, ১১২, ২) ও 'পড্‌বীশাৎ'ই পাঠ। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পড্‌বীশ শব্দ পড্‌বিংশেরই রূপান্তর।

অথর্ববেদের অপর একটি মন্ত্রে (৮, ১, ৪) শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত মহাশয় পড্‌বীশ স্থলে পড্‌বিংশ পাঠান্তর ধরিয়াছেন। হুইট্‌নি সাহেবও ঐ বেদেরই অপর দুইটি মন্ত্রে (১২, ৫, ১৫ । ১৬, ৮, ২৭) যথাক্রমে পড্‌বিংশেও পড্‌বিংশাৎ পাঠান্তর ধরিয়াছেন (Atharvaveda Translated into English—Harvard Oriental Series, vol. VIII)।

ঋগ্বেদের আরও দুইটি স্থলে (১,১৬২,১৪ এবং ১৬), মাধ্যন্দিনীয় সংহিতার আরও দুইটি মন্ত্রে (২৫,৩৮ ও ৩৯) কৃষ্ণযজুর্বেদের কাঠকসংহিতায় (৬,৫), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১,৬,১০,৩), শতপথব্রাহ্মণে (১৪,৯,২,১৩), ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫,১,১২) এবং বৌধায়নশ্রৌতসূত্রে (১৫,১৫) পড্‌বীশ শব্দের প্রয়োগ আছে। ভট্টভাস্কর, সায়ণ, মহীধর, উবট, দ্বিবেদগঙ্গ, শঙ্কর, আনন্দগিরি প্রভৃতি টীকাকারদিগের অনেকেই পদশব্দ ও বিশধাতুর যোগে অকারান্ত 'পড্‌বীশ' নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কেহই পড্‌বীশস্ শব্দের কথা বলেন নাই।

যাদবপ্রকাশের বৈজয়ন্তী অভিধানে পড্‌বীশ শব্দের অর্থ আছে "পশ্চাচ্ছরণশঙ্কৌ তু পড্‌বীশো ঘুটিকোঽপি চ"। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের একখানি হস্তলিখিত পুথিতে পাইয়াছিলাম—"পড্‌বিংশো বন্ধনে প্রোক্তঃ শুষ্কগোময়মণ্ডয়োঃ ইত্যভিধানকাণ্ডে"। ইহা আমি উক্ত ভাষ্যের পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি। বাচস্পত্য অভিধানে অকারান্ত পড্‌বীশ শব্দ ধরা আছে। সেণ্টপিটার্সবার্গ ডিক্‌শনারী নামে খ্যাত সুবৃহৎ সংস্কৃত-জার্মান শব্দকোষে এবং মনিয়ার উইলিয়ামস্‌এর সংস্কৃত-ইংরাজী শব্দকোষ প্রভৃতি আধুনিক অভিধানেও পড্‌বিংশ ও পড্‌বীশ এই উভয় শব্দই অকারান্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পড়িংশ ও উহার রূপান্তর পড়ীশ শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। তাহার কারণ এই যে, বিবাহের ভোজন-হোমে পাঠ্য এই বৈদিক পদটি ক্রিয়াকাণ্ডের গ্রন্থে দীর্ঘকাল অশুদ্ধরূপে পঠিত হইতেছে, এবং এখনও শব্দটি অসন্তাগান্ত মনে করিয়া কবিরত্ন মহাশয় আমার অকারান্ত প্রয়োগে ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের মতে—"ভাষ্যকারেরা উহার অর্থ বন্ধঃ না লিখিয়া বন্ধনং লিখিয়াছেন" বলিয়া পড়িংশ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। তাঁহার মত সুধীব্যক্তি এরূপ যুক্তি দেখাইলেন কিরূপে বুঝিলাম না। পত্নী কলত্রম্, মোক্ষঃ নির্বাণম্, ঈহিতম্ উদ্যোগঃ এইরূপ ভিন্ন লিঙ্গের প্রতিশব্দ প্রয়োগ সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয়।

(১) ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে তপশ্চ ইত্যাদি (১,১৭) এবং বিরূপাক্ষোঽসি ইত্যাদি (১,১৮) দুইটি মন্ত্র একসঙ্গে ধৃত হইয়াছে। গুণবিষ্ণু একসঙ্গে উহাদের দেবতা ধরিয়াছেন। প্রথম মন্ত্রটির নাম প্রপদ এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটির নাম বৈরূপাক্ষ। কবিরত্ন মহাশয়ের ভবদেবপদ্ধতিতে মন্ত্র দুইটি পৃথক্ উল্লিখিত আছে এবং প্রপদ মন্ত্রের অন্তর্ভূত "ভূর্ভুবঃস্বরোং মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে" এই অংশটুকু বৈরূপাক্ষ মন্ত্রের আদিরূপে গৃহীত হইয়াছে। সমালোচনায় কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার গৃহীত পাঠের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গোভিলগৃহ্যসূত্রের প্রাচীন ভাষ্যকার ভট্টনারায়ণের মতে 'ভূর্ভুবস্বরোম্' ইত্যাদি অংশ বৈরূপাক্ষ মন্ত্রের আদি নহে, 'বিরূপাক্ষোঽসি' দিয়া ঐ মন্ত্রের আরম্ভ। তিনি বলিয়াছেন—"বিরূপাক্ষ-শব্দোঽস্মিন্ বিদ্যত ইতি বৈরূপাক্ষো মন্ত্রঃ বিরূপাক্ষোঽসীত্যেবমাদিকঃ"—(গোভিলভাষ্য ৪,৫,৬)। ভাষ্যের অন্যত্রও (৪,৫,৮) তিনি লিখিয়াছেন, "বিরূপাক্ষোঽসীত্যেবমাদিকং বৈরূপাক্ষমারভ্য"। রুদ্রস্কন্দ খাদিরগৃহ্যসূত্রের (১, ২, ২২) ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, 'তপশ্চ তেজশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র জপের সঙ্গে শ্বাস বন্ধ রাখিয়াই 'ভূর্ভুবঃ স্বরোম্' ইত্যাদি অংশ ধ্যান করিবে, তাহার পর বৈরূপাক্ষমন্ত্র জপ কালে শ্বাস ত্যাগ করিবে। গোভিলীয়গৃহ্যকর্ম-প্রকাশিকায় (১৭৮ পৃষ্ঠা) পরিষ্কাররূপে গোভিলসূত্রের তাৎপর্য প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থেও প্রপদ ও বৈরূপাক্ষ মন্ত্র এক সঙ্গে ধরা আছে, এখানেও উভয় মন্ত্রের দেবতা রুদ্ররূপ অগ্নি, এবং "ভূর্ভুবঃ স্বরোং মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে" এই অংশ প্রপদ মন্ত্রের অন্তর্ভূত। গ্রন্থ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি "তপশ্চ তেজশ্চেত্যারভ্য মহান্তমাত্মানং প্রপদ্য ইত্যেতদন্তমনুচ্ছ্বসন্নর্থমনস্কো জপিত্বা বিরূপাক্ষোঽসীত্যারভ্যোচ্ছ্বসন্নিগদশেষং জপেৎ। অত্র নিগদে প্রাণানায়ম্য জপঃ প্রপদজপস্তদ্রহিতো বৈরূপাক্ষজপ ইতি বিবেকঃ। অস্য মন্ত্রস্য প্রজাপতিঋর্ষির্নিগদো রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা জপে বিনিয়োগঃ"।

মন্ত্রব্রাহ্মণে (২য় প্রঃ, ৪ ও ৫) এই দুইটি মন্ত্র একত্র ধৃত হইয়াছে এবং ৺সত্যব্রত সামশ্রমী ও হান্‌স্ জোর্‌গেন্‌সেন্ এই উভয়ের সম্পাদিত সংস্করণ দুইটিতেই 'ভূর্ভুবঃস্বরোম্' ইত্যাদি অংশ প্রপদ মন্ত্রের অন্তর্ভূত। গুণবিষ্ণুর মত সায়ণাচার্যও এক মন্ত্ররূপে উভয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মন্ত্রের স্বরূপ ও দেবতা এক সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়ের মতেই 'রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা'। অথচ কবিরত্ন মহাশয় বলিতেছেন—"তপশ্চ মন্ত্রে রুদ্ররূপ অগ্নি ত দূরের কথা, কোনও অগ্নিই দেবতা নহেন।" রুদ্রস্কন্দ-ব্যাখ্যা, ভট্টভাষ্য, সায়ণভাষ্য এবং গোভিলীয়গৃহ্যকর্মপ্রকাশিকা—সর্বত্র দু-পুস্তকের পাঠ সমর্থিত হইয়াছে, ক-পুস্তকের নহে।

(২) বৈরূপাক্ষমন্ত্রের ভাষ্যে গুণবিষ্ণু গৃহ্যাসংগ্রহের একটি বচন তুলিয়াছেন—"তথা চ স্মৃতিঃ—সর্বতঃপাণিপাদান্তঃ" ইত্যাদি। কবিরত্ন মহাশয়ের পুস্তকে উহা 'তথা চ শ্রুতিঃ' মুদ্রিত হইয়াছিল। আমি পাদটীকায় ক-পুস্তকের পাঠ ধরিয়াছিলাম। কবিরত্ন মহাশয় সমালোচনা করিতেছেন—"গুণবিষ্ণুটীকার প্রকৃত পাঠ 'তথা চ শ্রুতিঃ', সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং সংশোধন করিয়া 'স্মৃতি' লিখিয়াছেন"।

আমি আদর্শ পুথির প্রমাণ পাইয়া 'তথা চ স্মৃতিঃ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কবিরত্ন মহাশয় এবিষয়ে আমার সপ্রমাণ উক্তি উপেক্ষা বা অবিশ্বাস করিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। আমি পাঠটির গুরুত্ব বুঝিয়া ইংরাজী ভূমিকায় (xxvi) লিখিয়াছিলাম—রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি 'সামগমন্ত্রব্যাখ্যানে' উল্লেখ করিয়াছেন যে, রঘুনন্দনের সময় গুণবিষ্ণুটীকায় অপপাঠ দেখা দিয়াছিল। রঘুনন্দন যে স্মৃতিতত্ত্বে বলিয়াছেন "গুণবিষ্ণুনা তু শ্রুতিরিতি কৃত্বা 'সর্বতঃপাণিপাদান্ত' ইতি লিখিতম্" তাহাতে রামনাথের উক্তি সমর্থিত হয়। রঘুনন্দনদৃষ্ট ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের পুথিতে স্মৃতিস্থলে শ্রুতি লেখা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি আদর্শ পুথিতে স্মৃতি পাঠও পাইয়াছি (ভূমিকা, xxvi—Gunavishnu's work had undergone modifications as stated by Vidyavachaspati even at the time of Raghunandana who is said to have based his readings of a Mantra on a particular version of the *Chhandogyamantrabhashya.* পাদটীকা—ইতি কচিদ্‌গুণবিষ্ণুপুস্তকে পাঠঃ স্মার্তসম্মতঃ। It may also be mentioned that the verse সর্বতঃপাণিপাদান্তঃ which Raghunandana points out in his *Smrititattvas* to have been wrongly quoted by Gunavishnu as Sruti, has been found by me in a Ms. of the *Chhandogyamantrabhashya* correctly given as Smriti, lending support to the testimony of Vidyavachaspati that at the time of Raghunandana, the Mss. of Gunavishnu's work had undergone modifications).

বিরূপাক্ষমন্ত্রপ্রসঙ্গে কবিরত্ন মহাশয় আমার দুইটি ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। টিপ্পণীতে 'মন্ত্রভাগো অনন্তরপঠিতস্য' আছে, উহা 'মন্ত্রভাগোঽনন্তরপঠিতস্য' হইবে। 'সর্বতঃ-পাণিপাদান্তঃ' আছে, উহা 'সর্বতঃপাণিপাদান্তঃ' হইবে, দুই পদের মধ্যে ব্যবধান থাকিবে না।

(৩) ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে প্রায়শ্চিত্ত হোমের ৯টি মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। কবিরত্নমহাশয় সমালোচনা করিতেছেন—"১ম হইতে ৮ম পর্যন্ত প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা অগ্নি, সায়ণভাষ্যেও তাহাই আছে। দু-পুস্তকে ১ম হইতে ৮ম পর্যন্ত প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা ভিন্ন ভিন্ন।"

প্রকৃতপক্ষে দু-পুস্তকে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ মন্ত্রের দেবতা যথাক্রমে বিশ্বদেব, বিভাবসু ও শতক্রতু; অপর মন্ত্রগুলিতে অগ্নি ভিন্ন অন্য দেবতার উল্লেখ নাই। ক-পুস্তকে অর্থাৎ কবিরত্নমহাশয়ের সম্পাদিত ভবদেবপদ্ধতিতে প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা একেবারে দু-পুস্তকের

অনুরূপ; কেবল বিশ্বদেব স্থলে বিশ্ববেদাঃ আছে। ক-পুস্তকে যাহা শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই ড-পুস্তকে থাকিলে অশুদ্ধ হইয়া যায়, এইরূপ বুঝিতে হইবে কি? (ক-পুস্তকের ১ম সং ২৮-৩০ পৃঃ, ২য় সং ৩৭-৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

গুণবিষ্ণুর ভাষ্যে আছে—'বৈশ্বদেব্যং যজুঃ।' কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"দেবতা অর্থে 'বৈশ্বদেব' হয়, 'বৈশ্বদেব্য' হয় না। আমি যাস্কের নিরুক্তে (৭, ২৩) পাইয়াছি—"সূক্তানি···বৈশ্বদেব্যানি।" সূক্ত শব্দের বিশেষণরূপে বৈশ্বদেব্য পদ শুদ্ধ হইলে যজুঃ শব্দের বিশেষণরূপেও অবশ্যই শুদ্ধ।

গুণবিষ্ণু 'বিদ বেদনাখ্যাননিবাসেষু' এই চুরাদিগণীয় বিদধাতু অসুন্ প্রত্যয়ে বেদস্ পদ সাধিয়াছেন, এবং উহার অর্থ দিয়াছেন 'বেদনা'। কবিরত্ন মহাশয় সমালোচনা করিয়াছেন—"পাণিনীয় ধাতুপাঠে 'বিদ চেতনাখ্যাননিবাসেষু' আছে; 'বেদনা' কোথা হইতে পাইলেন?" গুণবিষ্ণু কোথায় পাইলেন জানি না, আমি বহু গ্রন্থে পাইয়াছি। পাণিনীয়, চান্দ্র, কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ এবং সংক্ষিপ্তসারের ধাতুপাঠ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উক্ত ব্যাকরণগুলির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে চুরাদিগণীয় বিদ ধাতুর বেদনা অর্থ সুপরিজ্ঞাত।

ন্যাসনামে প্রসিদ্ধ কাশিকাবিবরণপঞ্জিকায় 'অনুপসর্গাল্লিম্প' ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রের (৩, ১, ১৩৮) ব্যাখ্যায় জিনেন্দ্রবুদ্ধি 'বিদ বেদনাখ্যাননিবাসেষু' এই ধাতুপাঠই ধরিয়াছেন। সিদ্ধান্তকৌমুদীর বালমনোরমায়ও ঐ সূত্রের টীকায় 'বিদ বেদনাখ্যাদিষু' এইরূপ পাঠ আছে। পাণিনীয় ধাতুপাঠের বৃত্তিগ্রন্থ ধাতুপ্রদীপে (১৩৯ পৃঃ) মৈত্রেয় রক্ষিতের পাঠ বেদনা, চেতনা নহে। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতেও (চুরাদি ১৬৭) 'বিদ বেদনাখ্যানপরিবাদেষু' এইরূপ পাঠান্তর ধরা আছে। কাশীনাথকৃত ধাতুমঞ্জরীর পাঠও বেদনা (চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্‌এর সংস্করণ, ১৩২ পৃঃ)। চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণেও ধাতুপাঠ 'বিদ বেদনায়াম্' (চুরাদি ৩৮)। কাতন্ত্রগণমালার (চুরাদি ১২৯) পাঠও 'বিদ বেদনাখ্যাননিবাসেষু'। বোপদেবকৃত কবিকল্পদ্রুমের টীকাকার দুর্গাদাস বেদনা পাঠান্তরের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"কেচিত্তু বাদং ন পঠন্তি চেতনাস্থানে চ বেদনেতি পঠিত্বা বেদয়তে বিজ্ঞঃ বাধতে ইত্যর্থে ইত্যুদাহরন্তি" (দান্তবর্গ ৬২)। স্বয়ং কবিরত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের 'সাহ্লাদের প্রসাদে:' এই সূত্রের টীকায় গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন "বিদ বেদনাখ্যাননিবাসেষু ইতি চুরাদিণিঙন্তঃ।" এতগুলি গ্রন্থে বেদনা পাঠ থাকিলেও কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"বেদনা কোথা হইতে পাইলেন?"

(৪) 'সব্যং পাহি শতক্রতো' ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের পাঠ। ভাষ্য—'সব্যম্ সব্যো যাগঃ তত্র ভবং ফলম্'। কবিরত্ন মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—"সব্যং পাঠ কোন্ বেদে আছে?"

গুণবিষ্ণু স্বয়ং উত্তর দিতে পারিতেন। আমি আকরসঙ্কেতিকায় দেখাইয়াছি যে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং শাঙ্খায়নগৃহ্যসূত্রে সব্যং স্থলে সর্বং পাঠ আছে। যে স্থলে গুণবিষ্ণুর পাঠ আকরলব্ধ পাঠ হইতে অন্য প্রকার দেখিয়াছি, সেরূপ স্থলে আমি মূলে গুণবিষ্ণুর পাঠ রাখিয়া পাদটীকায় কিংবা আকরসঙ্কেতিকায় আকর গ্রন্থের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি। অন্য গ্রন্থে একটু মনের মত পাঠ পাইলেই গুণবিষ্ণুকে সংশোধন করি নাই। গ্রন্থসম্পাদকের পক্ষে ঐরূপ করা উচিত নয় বলিয়া আমার ধারণা। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত এম, উইণ্টারনিজ, আপস্তম্বমন্ত্রপাঠের ভূমিকায় (xv) ঐরূপ গ্রন্থের সম্পাদকের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

"he will remember that he has to edit, and not to correct his text, and that even a grammatically impossible reading has to be retained, if it is warranted by the best authority."

আমার ইংরাজী ভূমিকায় (p. iii) পরিষ্কারভাবে এ সকল কথা বলিয়াছি। প্রাস্তাবিক নিবেদনে (p. xl) ও বলিয়াছিলাম—"মূলে যথোপলব্ধা আদর্শস্থিতাঃ পাঠা এব সংরক্ষিতাঃ পরং তত্র পাদটীকায়ামাকরসাঙ্কেতিকায়াং বা আকরদৃষ্টাঃ পাঠা অপি প্রদর্শিতা যেন কর্মানুষ্ঠায়িনো বিদ্বাংসো যথারুচি তত্তন্মন্ত্রপাঠানুপাদাতুং পরিহাতুং বা প্রভবেয়ুঃ"।

এই প্রায়শ্চিত্ত হোমেরই কোন কোন মন্ত্রের পাঠে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সহিত কেবল গুণবিষ্ণুর নহে, শাঙ্খায়নগৃহ্যসূত্রেরও মিল নাই। আরণ্যকের (১০, ৫, ১) 'অগ্ন এনসে' এবং 'বিশ্ববেদসে' স্থলে গৃহ্যসূত্রে (৫, ১, ৮) আছে 'অগ্ন এধসে' এবং 'বিশ্ববেধসে'। ইহার মধ্যে একটি পাঠ অশুদ্ধ এমন কথা কেহ বলিবেন কি? বেদভেদে ও শাখাভেদে পাঠভেদ হইতে পারে, তাহা সকলেই জানেন। গুণবিষ্ণুর অর্থসঙ্গতিযুক্ত সব্যং পাঠ যে বেদভেদ নিবন্ধন হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? কোন পাঠ মুদ্রিত গ্রন্থে না পাইলেই অমূলক মনে করা উচিত নহে। ঐরূপ মনে করিয়া কবিরত্ন মহাশয় কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা আমার ১৭ সংখ্যক উক্তিতে শন্নোদেবী মন্ত্রের আলোচনায় প্রদর্শিত হইবে। মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠকেই একমাত্র বিশুদ্ধ পাঠ স্থির করাও যে বিবেচনার কার্য নহে, তাহাও ২০ সংখ্যক উক্তিতে প্রমাণিত হইবে।

(৫) কবিরত্ন মহাশয় বলিতেছেন,—"ড-পুস্তকে ও ন-পুস্তকের পাদটীকায় ৫ম মন্ত্রের সম্পূর্ণ পাঠ সামবেদের"। রুদ্রস্কন্দস্বামী খাদিরগৃহ্যসূত্রের 'প্রায়শ্চিত্তং জুহুয়াৎ' (১, ৩, ১৫) এই সূত্রের বৃত্তিতে ৫ম মন্ত্রটির সম্পূর্ণ সামবেদীয় পাঠই ধরিয়াছেন। সুতরাং গুণবিষ্ণু কিছু দোষ করেন নাই। কবিরত্ন মহাশয়ই মন্ত্রটির ভিন্নবেদীয় পাঠ গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায়বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন। যাহা স্ববেদে নাই, কেবল তাহাই অপর বেদ হইতে গ্রহণ করা চলে।

(৬) ও (৭) এই সমালোচনার উত্তর আমার ৪-সংখ্যক উক্তির মধ্যেই আছে। উভয় স্থলেই আমি আকর-পাঠ দেখাইয়াছি।

(৮) ড-পুস্তকে 'অদিতে অন্বমংস্থাঃ। অনুমতে অন্বমংস্থাঃ।' এইরূপ ছাপা আছে। উহা সন্ধি করিয়া 'অদিতেঽন্বমংস্থাঃ। অনুমতেঽন্বমংস্থাঃ।' হইবে। কবিরত্ন মহাশয়ের বিশুদ্ধীকৃত পাঠ কিন্তু অত্যন্ত অশুদ্ধরূপে সমালোচনায় ছাপা হইয়াছে—'অদিতেঽন্নমংস্থাঃ, অনুমতেঽন্নমংস্থাঃ'। এরূপ ভুল কেন হয়, তাহা সকল গ্রন্থপ্রকাশকেরই জানা আছে।

(৯) ড-পুস্তকে কয়ানঃ, কয়া, অভীষুণঃ, স্বস্তিনঃ এই ৪টি শান্তিমন্ত্রের পর এইরূপ ভাষ্য আছে—"গায়ত্র্যস্তিস্রঃ [ত্রিষ্টুবেকা] ইন্দ্রদেবতাকাঃ শান্তিকর্মণি বিনিযুক্তা মহাবামদেবদৃষ্টাঃ"। বন্ধনী চিহ্নের মধ্যস্থ [ত্রিষ্টুবেকা] অংশ যে আমার লিখিত, তাহা সুস্পষ্ট।

গুণবিষ্ণু ৩টি মন্ত্রের ঋষ্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন, 'স্বস্তিনঃ' মন্ত্রের কথা কিছু বলেন নাই। ভবদেবও "ঋষ্যাদির উল্লেখ না করিয়াই 'স্বস্তিন' মন্ত্রটি ধরিয়াছেন" সেকথা কবিরত্ন মহাশয় জানেন।

এখানে আমি টিপ্পণীতে লিখিয়াছিলাম—"ভ-মৈ—গায়ত্র্যশ্চতস্রঃ"। ইহাতে সকলেই বুঝিবেন যে, 'ভ' ও 'মৈ' এই দুইখানি পুথি ব্যতীত আমার অন্য আদর্শ পুথিতে 'গায়ত্র্যাস্তিস্রঃ' আছে। কবিরত্ন মহাশয় সমালোচনা করিয়াছেন—"কেবল ভ মৈ কেন? গুণবিষ্ণু-টীকার সমস্ত পুস্তকেই, স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের সংগৃহীত সমস্ত আদর্শ পুস্তকেও 'গায়ত্র্যশ্চতস্রঃ' আছে; সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া যে ঐরূপ পাঠ করিয়াছেন, তাহা 'ক্রচেট্' চিহ্ন দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে"। কবিরত্ন মহাশয় কেন ঐরূপ বুঝিলেন, জানি না। 'ক্রচেট্' চিহ্নের মধ্যস্থিত [ত্রিষ্টুবেকা] এই অংশটুকু মাত্র সম্পাদকলিখিত এই সাধারণ কথা কি তিনি বুঝেন নাই? ক্রচেট্ চিহ্নের মধ্যস্থ অংশ ছাড়া আর সবই মূল গ্রন্থকারের লেখা বলিয়া বুঝিতে হয়, ইহাই শিষ্ট-ব্যবহার।

কবিরত্ন মহাশয় এখানে ভবদেবপদ্ধতির একটা বিকৃত পাঠ তুলিয়া বেশ বড় সমালোচনা করিয়াছেন; বামদেব্য পদ কিরূপে হইল, উহার প্রকৃত অর্থ কি—তাহা বলিয়াছেন; "উক্ত মন্ত্রত্রয়ের কোনওটারই বিরাট্ গায়ত্রী ছন্দঃ নহে"—সে কথাও জানাইয়াছেন। পাঠকের মনে হইতে পারে যে, কবিরত্ন মহাশয়ের আলোচ্য গ্রন্থে ঐ সকল পাঠ আছে। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে কিন্তু 'বামদেব্য' পদ কিংবা 'বিরাট্ গায়ত্রী ছন্দঃ' কিছুই নাই। যে সকল কথা ভবদেবপদ্ধতির বিভিন্ন সংস্করণে (১ম সং ৩৯ পৃঃ, ২য় সং ৫৩ পৃঃ) পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সেই পূর্বপ্রকাশিত কথাগুলিই কবিরত্ন মহাশয় আর একবার বসুমতীর পৃষ্ঠায় অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে সমালোচনার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রকৃত বক্তব্য এই যে, মন্ত্রত্রয়ের ঋষি বামদেব, কিন্তু গুণবিষ্ণু লিখিয়াছেন "মহাবামদেবদৃষ্টাঃ"।

'স্বস্তিনঃ' মন্ত্রের দেবতা একা ইন্দ্র নহে, অথচ গুণবিষ্ণু ভুল করিয়া সেইরূপ বুঝিয়াছেন, ইহা কবিরত্ন মহাশয়ের আর একটি অভিযোগ। প্রকৃতপক্ষে গুণবিষ্ণু তাঁহার ভাষ্যে ইন্দ্র, পূষা, তার্ক্ষ্য এবং বৃহস্পতি—এই চারিটি নাম পৃথক্ দেবতারূপেই উল্লেখ করিয়াছেন; বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্রের বিশেষণ, বিশ্ববেদাঃ পূষার বিশেষণ এবং অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্যের বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ইন্দ্রঃ, তথা পূষা, তথা তার্ক্ষ্যঃ, তথা বৃহস্পতিঃ'—ইহার অর্থ সকলেই বুঝিবেন 'ইন্দ্র এবং পূষা এবং তার্ক্ষ্য এবং বৃহস্পতি'। বিরুদ্ধ সমালোচনা করার উদ্দেশ্যেই যেন কবিরত্ন মহাশয় গুণবিষ্ণু-ভাষ্যের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যকার জানিতেন, 'গরুত্মান্ গরুড়স্তার্ক্ষ্যঃ'। তিনি দেবতানামগুলির কোনটিরই ব্যুৎপত্তি দেন নাই, ইন্দ্র, পূষা ও বৃহস্পতিপদের ন্যায় তার্ক্ষ্যপদেরও অর্থ লেখা আবশ্যক মনে করেন নাই, কারণ, পূষা অপেক্ষা তার্ক্ষ্য অধিক অপ্রসিদ্ধ নয়।

কবিরত্ন মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—"'স্বস্তিন' মন্ত্রের ঋষি বাহুগণ গোতম মহাবামদেব্য, মহাবামদেব বা বামদেব নহেন); ছন্দঃ বিরাট্স্থানা ত্রিষ্টুপ্ (গায়ত্রী নহে); দেবতা বিশ্বেদেবাঃ (ইন্দ্র নহেন); বিনিয়োগ স্বস্তিবাচনে (শান্তি কর্মে নহে)।" এ সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক, কারণ, ভবদেবের ন্যায় গুণবিষ্ণুও 'স্বস্তিনঃ' মন্ত্রের ঋষ্যাদির উল্লেখই করেন নাই। কিন্তু কবিরত্ন মহাশয় যে লিখিলেন "বিনিয়োগ স্বস্তিবাচনে (শান্তিকর্মে নহে)", তাঁহার ভবদেবপদ্ধতিতে ত 'স্বস্তিনঃ' মন্ত্রের ঠিক পরেই লেখা আছে "এতা ঋচো গীত্বা শান্তিং কুর্যাৎ"।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য।

মঞ্জুরাণী

মঞ্জুরাণী চল্‌ছে এখন আস্তে,
উর্ব্বশী কি শিখ্‌ছে প্রথম নাচ্‌তে?
টলছে চরণ দুলছে তাহার গা'টি,
বুঝি শিবের বুকেই পড়ে পা'টি।

তাহার কথার অর্থ নাহি পাই রে,
একেবারে অভিধানের বাইরে।
ভঙ্গী তাহার ভাবকে টেনে আন্‌ছে
তরল ভাষা প্রথম দানা বাঁধছে।
ভালে আবার সিন্দুরেরি বিন্দু
কালি হয়ে ফুটবে বুঝি ইন্দু।

ঘামছে দেহ, কাঁপছে যে তার হস্তৌ
ভাব্‌টা কতক ন যযৌ ন তস্থৌ।
ভস্ম মেখে বেশ তাহারে সাজবে
বলদ তারে পৃষ্ঠে নিয়ে নাচবে।
পঞ্চতপের সাধন সে যে করবে
বরবে নীলকণ্ঠকে সে বরবে।

হতে আমি পারব না ত সিঙ্গি
হব নেহাৎ নন্দী না হয় ভৃঙ্গি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।



অবাঞ্ছিত অতিথি

আমিন-গাঁয়ের পুলিশ কর্ম্মচারী ভূপতি চৌধুরীর স্ত্রী শৈলবালা সে দিন তুলসীতলায় সবে-মাত্র প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে তাহাদেরই আঙ্গিনার পিছনের বেড়া ডিঙ্গাইয়া সতের-আঠার বছরের একটি যুবক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া-আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, "আমায় বাঁচান,—ওদের হাত থেকে আমায় বাঁচান! ওদের হাতে পড়লে আমার ফাঁসী হ'য়ে যাবে। হাঁ, আমার নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড হবে।"

বাহিরের একটা অস্পষ্ট কোলাহলে শৈল সচকিত হইবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ এই অভাবনীয় ব্যাপারে সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া জড়পদার্থের মত চলৎশক্তি-হীন অবস্থায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই ফাঁসীর কথাটি তাহার অবসাদগ্রস্ত মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতেই সেখানে এমন অচিন্তপূর্ব্ব, অদ্ভুত সাড়া পড়িয়া গেল যে, তাহার দেহের শোণিতরাশি মুহূর্ত্তে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে পুলিশ কর্ম্মচারীর স্ত্রী; সুতরাং এ জিনিষটাকে সে ভাল-করিয়াই চিনিত। ইহার কঠোর নিষ্ঠুরতা ও অসীম বর্ব্বরতা তাহাকে অনেক সময় আকুল করিয়া তুলিত। কাহারও ফাঁসী হইয়াছে বা ফাঁসীর আদেশ হইয়াছে—এ কথা শুনিতে পাইলেই সে শরবিদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় অস্থির ভাবে বাড়ীর আঙ্গিনায় দাপাইয়া বেড়াইত; আহার-নিদ্রা সে ভুলিয়া যাইত, এবং মনের কষ্ট দমন করিতে না পারায় অবিরল অশ্রুধারাপাতে সে সিক্ত হইত।

এ হেন নিষ্ঠুরতম, দারুণ বিভীষিকাপূর্ণ ফাঁসীর ভয়ে এই হতভাগ্য যুবক সহসা তাহারই আশ্রয়প্রার্থী; তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া করুণ কণ্ঠে তাহারই কৃপা ভিক্ষা করিতেছে। এখন তাহার কর্ত্তব্য কি? কিন্তু নিমিষেই তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভাবিয়া কিছু স্থির করিবার পূর্ব্বেই, সহসা সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া দু' হাত বাড়াইয়া, ছেলেটিকে মাটি হইতে টানিয়া তুলিয়া কহিল, —"ভয় নেই, আমি তোমায় বাঁচাবার চেষ্টা ক'রবো। আমার সঙ্গে এসো এখুনি।"—সে তাহার হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং ঘরের এক কোণে যে সিন্দুকটা স্থাপিত ছিল, তাহারই আড়ালে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দ্বারের শিকল আঁটিয়া দিল।

বাহিরে বহু কণ্ঠের কোলাহল ক্রমশঃই স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। অদূরবর্ত্তী আমবাগানের চতুর্দ্দিক হইতে বহু লোকের কণ্ঠস্বর শৈলর কর্ণগোচর হইল। শৈল তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বারের শিকল বন্ধ করিয়া ঘরের উঠানের যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই স্থান হইতে সে আর পদমাত্র সরিয়া যাইতে পারিল না। সেইখানে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে অল্পক্ষণ পরেই অবসন্ন দেহে মাটিতে বসিয়া পড়িল। কাজটা সে ভাল করিল কি মন্দ করিল—এটুকুও ভাবিবার অবসর পাইল না। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় যখন তাহার হৃদয়ে তুমুল ঝড় বহিতেছিল, সেই সময়ে তাহার স্বামী দ্রুতপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে সেখানে আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একটা ছোঁড়াকে তোমার সমুখ দিয়ে দৌড়িয়ে যেতে দেখেছ? মানে, সে আমাদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এই দিকেই এসেছিল। চেহারা ভদ্রলোকের ছেলের মতনই ফর্সা, লম্বা, দোহারা চেহারা?"

মিথ্যাকে শৈল চিরদিনই আন্তরিক ঘৃণা করিত;

কিন্তু আজ কোন দ্বিধাই তাহার মনে স্থান পাইল না। কথাটা অস্বীকার করিবার জন্য সে মাথা নাড়িল মাত্র। কথা কহিলে কণ্ঠস্বরে বিচলিত ভাব ধরা পড়িবার আশঙ্কা ত ছিলই—তাহার উপর মিথ্যা কথাটা হঠাৎ মুখে বাহির হইল না।

তাহার স্বামী কহিল,—"ছোঁড়াটা পুলিশের একটা লোককে গুলী মেরে পালাচ্ছে। আমাদের আমবাগানে ঢুকেছে বলেই মনে হয়েছিল; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে অন্য দিকে স'রে পড়েছে। তা ওখানে তুমি ও-ভাবে ব'সে রয়েছ কেন? তোমার কি হয়েছে বল তো শুনি।"—ভূপতি শৈলর ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীকে সম্মুখে সরিয়া আসিতে দেখিয়া শৈল উঠিয়া-দাঁড়াইয়া ঘরের দরজার নিকট চলিয়া গেল, এবং দরজায় ঠেস দিয়া আত্মসংবরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু সে যখন শুনিল, ছেলেটি এক জন পুলিশকে গুলী করিয়াছে, সে নরহন্তা,—তখন আত্মসংবরণ করা তাহার দুঃসাধ্য হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, দারুণ আতঙ্কে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, এবং সে হতাশ ভাবে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল।

ভূপতি স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া কোমল স্বরে কহিল,—"ভয় পেয়েছ শৈল? ভয় কি? সে খুনী হ'লেও তাকে তোমার ভয় করবার কারণ নেই। সে নিশ্চয়ই এ-দিকে আসেনি। যাও, তুমি ঘরের ভিতর যাও।"

শৈলর মনের মধ্যে তুফান বহিতেছিল। না জানিয়া নরহন্তাকে গৃহে সে আশ্রয় দিয়াছে!

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে ছেলেটির সুকুমার করুণ মুখখানি তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহার আতঙ্ক-বিহ্বল চক্ষুর মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি স্মরণ হওয়ায় শৈল মুহূর্ত্ত মধ্যে মনকে দৃঢ় করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। যুবক নরহন্তা হইলেও শৈল তাহাকে অভয় দিয়াছে,—আশ্রয়ও দিয়াছে। তাহাকে সে ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহার অভয়-বাণীও প্রত্যাহার করিবে না। শৈল দরজা ধরিয়া উঠিয়া-দাঁড়াইয়া স্বামীকে কহিল,—"তুমি যাও। আমার ভয় দূর হয়েছে। আমার জন্যে তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না।"

ভূপতি প্রস্থান করিলেও শৈল কিছুকাল সেখানে যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল—কি করিয়া সে ছেলেটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে? তাহার মুখের দিকে চাহিবে? স্বেচ্ছায় যে নরহত্যা করিয়াছে, তাহাকে লইয়া সে এখন কি করিবে?

স্বামীকে সে প্রতারিত করিয়াছে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাহাদের মহাশত্রুকে তাহারই গৃহে আশ্রয়দান করিয়াছে! শৈল ভয়ে দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু এই নরহন্তার অপরাধের কথা শুনিয়াও এখন তো তাহার পিছাইবার উপায় নাই; অথচ তাহার সকল কর্ত্তব্যই এখনও অসম্পন্ন রহিয়াছে।

শৈল আর অপেক্ষা করিতে পারিল না; শঙ্কিত বক্ষে, কম্পিত হস্তে দ্বার খুলিয়া সেই সিন্দুকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক পদশব্দ শুনিয়া সভয়ে মুখ তুলিতেই শৈলকে দেখিতে পাইল, এবং অকস্মাৎ ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া ফেলিয়া কাতর স্বরে কহিল, "আমায় বাঁচান দিদি! আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবেন না, দোহাই আপনার।"

যেটুকু ভয় ও দুর্ভাবনা শৈলর মনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, এই 'দিদি' সম্বোধনে সে সমস্তই যেন কোথায় চলিয়া গেল এবং অননুভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি ও স্নিগ্ধতায় তাহার ব্যাকুল চিত্ত ভরিয়া উঠিল। শৈল অপুত্রক, কোন ভাইও তাহার ছিল না। তাই নারীত্বের যত কিছু স্নেহ, ভালবাসা সমস্তই আজ সহসা বাঁধমুক্ত নদীস্রোতের ন্যায় এই ছেলেটিকে অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া চলিল, এবং তাহাকে যেন শত ধারায় অভিষিক্ত করিল। শৈল স্নিগ্ধ কণ্ঠে তাহাকে অভয় দিয়া কহিল, "তোমায় বাঁচাব বই কি ভাই! যতক্ষণ আমি আছি, তোমার কোন ভয় নেই।"

শৈল হাত ধরিয়া তাহাকে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে আনিল; কিন্তু সেই সময় তাহার দৃষ্টি ছেলেটির উপর পড়িতেই সে সভয়ে বলিয়া উঠিল,—"এত রক্ত এল কোথা থেকে? রক্তের যে ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে! এত কাটল কি ক'রে? কোথাও প'ড়ে গিয়েছিলে বুঝি?"—কিন্তু যখনই তাহার মনে পড়িল, পুলিশের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাহাকে বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, বেড়া ডিঙ্গাইয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছিল, তখন তাহার আর কিছুই বুঝিতে

বাকী রহিল না। শৈল কিছুকাল স্তব্ধভাবে কি চিন্তা করিয়া পাশের ঘর হইতে স্বামীর কাপড়-জামা আনিয়া তাহার হাতে দিল এবং রক্তসিক্ত জামা-কাপড় খুলিয়া ফেলিতে অনুরোধ করিল। যুবকটি এতক্ষণ নতমুখে নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুরাশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে 'দিদি' বলিয়া তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া-পড়িয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

শৈলর চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কহিল,—"কেঁদ না ভাই! তোমার জন্যে আমার যা সাধ্য, তা করবই আমি। তুমি ততক্ষণ কাপড়-জামা ছেড়ে ফেল, আমি জলটুকু গরম কোরে আনি। কাটা যায়গাগুলো ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হবে কি না।" শৈল পুনর্ব্বার বাহিরে চলিয়া গেল।

কিছুকাল পরে শৈল এক হাতে ব্যাণ্ডেজের সরঞ্জাম, এবং অন্য হাতে এক বাটি গরম দুধ লইয়া সেই কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিল। দুধের বাটিটা ছেলেটির সম্মুখে ধরিয়া কহিল,—"দুধটুকু আগে খেয়ে নাও। সারা সকালটা তোমার পেটে কিছুই যে পড়েনি, তা তো মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।"

সেই অবস্থায় যুবকটির কিছু খাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও শৈলর আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, নিঃশব্দে দুধটুকু পান করিয়া বাটিটা মাটিতে রাখিয়া দিলে শৈল সযত্নে অপটু-হস্তে তাহার ক্ষতস্থলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বসিল।

পরম যত্নে ক্ষতগুলি গরম জলে ধুইয়া দিতে দিতে শৈল প্রশ্ন করিল, "তোমার নামটি কি ভাই?"

ছেলেটি মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ করিয়া আর্দ্র চক্ষু-দু'টি শৈলর মুখের উপর রাখিয়া কহিল,—"অমিয়কুমার বাঁড়ুয্যে।"

শৈল আবার প্রশ্ন করিল,—"তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

"বনগাঁয়ে।"

"বনগাঁয়ে?"—বনগাঁয়ের নাম শৈলর সুপরিচিত। বনগাঁ তাহার বাপের বাড়ী হইতে দুই-এক ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী। শৈল কৌতূহলভরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"সেখানে তোমার কে কে আছেন?"

অমিয় নতমুখে উত্তর দিল,—"বেশী কেউ নেই দিদি! শুধু এক দাদা আর বৌদি' আছেন; কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর থেকে তাঁরা আমার কোন খোঁজ-খবর নেন না। আমি এক রকম অনাথ—অসহায়।"

"আহা!" সহানুভূতিতে শৈলর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে আঁচলে চক্ষু মুছিয়া কহিল,—"তোমার বৌদি'র কি একটুও দয়া-মায়া নেই! তুমি নিরাশ্রয়—তা জেনেও তোমার খোঁজ নেন না? আশ্চর্য্য!"

অমিয় লজ্জিত ভাবে নতমুখেই বসিয়া রহিল।

শৈল দুই-এক মিনিট কি চিন্তা করিয়া তাহার ক্ষতস্থান-গুলিতে পটী বাঁধিয়া দিয়া কহিল,—"দুর্ভোগ তো অনেক হ'ল। পাশের ঘরে বিছানা পাতা আছে, এখন শুয়ে একটু বিশ্রাম করবে চল।" তাহার পর তাহাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া, খাটিয়ার উপর প্রসারিত বিছানাটি দেখাইয়া বলিল,—"এখানে তোমার কোন ভয় নেই, চুপটি ক'রে শুয়ে একটু জিরোও; আমি ততক্ষণ বাইরের কাজগুলো সেরে আসি।"

শৈল বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

অমিয় অবিলম্বে বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু একটা অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। শুইবার সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ কম্প দিয়া শীত করিয়া জ্বর আসিল, কিন্তু হাতের কাছে কোন আচ্ছাদন না থাকায় সে সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া-থাকিয়া শীতে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অল্পকাল পরে শৈল তাহাকে দেখিতে আসিল। অমিয় তখন প্রবল জ্বরে বেহুঁস। শৈল মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দে তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে তাহার ললাটে হাত ঠেকাইয়াই চমকিয়া উঠিল। দারুণ উত্তাপ, সে স্থানটা যেন পুড়িয়া যাইতেছিল!

ঠাণ্ডা করস্পর্শে অমিয় চোখ মেলিয়া চাহিয়া 'আঃ! দিদি!' বলিয়া ব্যাকুল ভাবে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

এই নূতন দুর্ঘটনায় শৈল যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

তাহার মুখ হইতে হঠাৎ কোন কথাই বাহির হইল না। কয়েক মিনিট পরে সে মৃদুস্বরে কহিল,—"জ্বরটা এল কখন তোমার?"

অমিয় অস্ফুট স্বরে কহিল,—"তুমি চ'লে যাবার পরেই, দিদি!"

শৈল করুণ কণ্ঠে কহিল,—"বড্ড কষ্ট হচ্ছে, অমিয়? কি কষ্ট হচ্ছে—আমায় বল? শীত কোরছে খুব?"

অমিয় কথা কহিল না। একটু ঘাড় নাড়িয়া তাহার শেষ কথাটির সমর্থন করিল মাত্র। শৈল আলমারী খুলিয়া পুরু চাদর বাহির করিয়া তদ্দারা সযত্নে অমিয়র সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল, এবং স্তব্ধভাবে তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

হায় নারী! তোমার স্নেহ-যত্নে যে বঞ্চিত, সংসারে তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে?

মিনিট পনের ছট্‌ফট্ করিবার পর অমিয় আপনা-হইতেই একটু ঘুমাইয়া পড়িল। শৈল তখনও নিঃশব্দে সেইখানে বসিয়া রহিল।

ভূপতি তখনও ফিরে নাই। শৈল জানিত, আজ তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইবে; তাই সে ভাবিয়াছিল, এই অবসরে বুদ্ধি খাটাইয়া যা হ'ক কোন একটা ব্যবস্থা সে করিয়া ফেলিতে পারিবে। তার পর সময় বুঝিয়া স্বামীকে বলিয়া তাহার ক্ষমা চাহিলে সব গোল হয় তো মিটিয়া যাইবে। নারী সে, স্বামীর শক্তিতে তাহার বিশ্বাস ছিল অগাধ; এই জন্যই সে ভাবিয়াছিল—পুলিশের দারোগার চেষ্টায় নরহন্তাও হত্যাপরাধ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। অভুক্ত অমিয়কে খাওয়াইয়া বিদায় দিবার সঙ্কল্পও তাহার ছিল। কিন্তু সব জট্ পাকাইয়া উঠিল। এখন জ্বরাক্রান্ত এই উত্থানশক্তিহীন ছেলেটিকে সে কিরূপে বিদায় দিবে? এ অবস্থায় তাহাকে বিদায় দিলে, সে টলিতে টলিতে কোন মতে পথে গিয়া এক গাছতলায় আশ্রয় লইবে, সেখান হইতে আর উঠিতে পারিবে না। হয় তো তাহার শেষ সময়—আর কোন কথা ভাবিতে না পারিয়া অমিয়র মুখের দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

বাহিরে জুতার শব্দ হইল। পরমুহূর্ত্তে ভূপতি দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"শৈল!"

তাহার আহ্বান-ধ্বনিতে শৈল চম্‌কাইয়া উঠিয়া ব্যগ্র ভাবে দরজার নিকটে আসিয়া কহিল,—"আস্তে কথা-বল। এতক্ষণে ওর একটু ঘুম এসেছে; গোলমালে ঘুমটা ভেঙ্গে যাবে হয় তো।"

ভূপতি সবিস্ময়ে কহিল,—"ব্যাপার কি? ওখানে ও শুয়ে কে?"

"সে অনেক কথা। বাইরে গিয়ে বলছি সব।"—শৈল এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল; দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া শৈল উঠানে আসিতেই ভূপতি ব্যগ্র স্বরে বলিল,—"কি বল্‌ছিলে, বল শুনি।"

শৈল থামিয়া উঠিল। স্বামীর মুখের দিকে সাহস করিয়া সে চাহিতে পারিল না। নতমুখে বাধ-বাধ স্বরে কহিল,—"ও আম্—আমার ভাই।"

"তোমার ভাই?"—গভীর বিস্ময়ে ভূপতির দুই চক্ষু কপালে উঠিল। একটু থামিয়া সে বলিল, "তোমার কোন ভাই আছে, এ কথা তো কোন দিন শুনিনি?"

শৈল এবার অবিচলিত স্বরে কহিল,—"তখন ছিল না, তাই শোননি। এখন হ'য়েছে, কাজেই শুন্‌তে পেলে।"

ভূপতির বিস্ময় উষ্মায় পরিণত হইল। স্ত্রীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—"আমার সঙ্গে তামাসা কোরছ মেজ?"

শৈল এই পরিবারের মেজ-বৌ। বিরক্তি বা রাগ হইলে ভূপতি কখন কখন তাহাকে 'মেজ', কখন বা 'মেজ-বৌ' বলিয়া সম্বোধন করিত। শৈলও ইহা জানিত; কিন্তু আজ সে দমিল না, ধীর ভাবে কহিল,—"কোন দিন এ ভাবে কি তোমার সঙ্গে তামাসা কোরেছি? আজ তামাসা করছি—এ কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?"

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। ভূপতি তাহার এই মন্তব্যে একটু লজ্জিত হইয়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "তামাসা কোন দিন করনি স্বীকার করি; কিন্তু তোমার কথার মর্ম্ম তো কিছু বুঝতে পারছি নে। কথাটা খুলে ব'লতে বাধা আছে কি?"

শৈল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল,—"অমিয় সত্যই আমার ভাই; আমি তার বোন। এ বিষয়ে তুমি এক বিন্দুও সন্দেহ কোর না।"

এই পর্য্যন্ত বলিবার পর স্বামীর সহিত দৃষ্টি-বিনিময়

হইতেই হঠাৎ তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে সেই-খানেই বসিয়া-পড়িয়া দু'হাতে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"আমায় তুমি ক্ষমা কর; তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা ক'রেছি।"

এ কথা শুনিয়া ভূপতি যেন হতবুদ্ধি হইল! ক্ষণকাল পরে সে শৈলকে মাটি হইতে টানিয়া তুলিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, "আমার সঙ্গে প্রতারণা কোরেছ শৈল? এ যে বড়ই অসম্ভব কথা!"

শৈল কাতর কণ্ঠে কহিল,—"অসম্ভব নয়, আমার এ কথা বিশ্বাস কর। তখন তোমরা যাকে খুঁজতে এসে-ছিলে, ঐ ছেলেটিই তোমাদের সেই আসামী। আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। সে আমায় 'দিদি' ব'লে কাতর ভাবে আমার আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল। তাই আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শৈল হঠাৎ থামিয়া গেল। সে সভয়ে চাহিয়া দেখিল, ভূপতি হঠাৎ বজ্রাহতের ন্যায় মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে! তাহার চক্ষু দু'টি ঠিকরাইয়া যেন বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়েরই বাক্‌শক্তি যেন বিলুপ্ত হইল! তাহার পর ভূপতি ভগ্নস্বরে ডাকিল,—"শৈল!" তাহার কণ্ঠস্বরে ভয়, বেদনা, এবং নিরাশা ধ্বনিত হইল। শৈল চমকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু উত্তর দিতে পারিল না।

ভূপতি কহিল,—"তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করলে শৈল! হাতে দড়ি পড়বার সব ব্যবস্থাই শেষ ক'রে রেখেছ? হায়, হায়, আমি যে হতবুদ্ধি হয়েছি!"

শৈল মৃদু কণ্ঠে কহিল, "সে আমার পা দু'খানা জড়িয়ে ধ'রে আশ্রয় চাইলে। নারী আমি, আমি তার প্রতি বিমুখ হ'তে পারিনি। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া অন্যায় নয় মনে ক'রে তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন তার মুখের দিকে তাকালে তুমিও নিষ্ঠুর হ'তে পারতে না।"

"কিন্তু খুনীকে আমি আশ্রয় দিতাম না; সে শক্তি আমার নেই। আমি সরকারের চাকর, মনিবের আদেশ পালনের জন্যই আমাকে চাকরীতে নিযুক্ত করা হ'য়েছে।"—ভূপতির কণ্ঠস্বর তীব্র, কিন্তু বেদনাপূর্ণ।

"সে যে খুনী, তা তো আমি জানতাম না।"

ভূপতি উঠিয়া-দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, "বেশ, এখন তো জানলে, সে খুনী। তাকে বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দাও, আমি পুলিশে চালান দিয়ে আসি।"

শৈল চমকিয়া উঠিল। সে সত্রাসে কহিল, "অমন কথা মুখে এনো না। সে আমার ভাই। তার অপরাধের কোন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া, সে রুগ্ন, পীড়িত; তাকে আমি বিদায় দিতে পারব না।"

ভূপতি বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি? বিদায় কোরবে না, তবে খুনীকে লুকিয়ে রেখে জেল খাটতে চাও না কি? পাগলামি কোর না,—যা বলি শোন।"

শৈল বলিল,—"পাগলামি আমি করিনি। দেখ, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সে যে আমাদের বাড়ীতে আছে, কেউ জানতে পারবে না। মা দুর্গা অসুখ ভাল ক'রে দিলেই, ওকে আমি চুপি-চুপি দূরদেশে পাঠিয়ে দেবো, কেউ টেরও পাবে না।"

ভূপতি এবার শক্ত হইয়া কহিল—"তোমার ছেলে-মানুষির প্রশ্রয় দিলে তো চলবে না, শৈল! আমার কর্ত্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে। এটা ছেলে-খেলা নয়। তোমার খেয়ালের জন্যে, জেনে-শুনে নিজেদের সর্ব্বনাশ তো ডেকে আনতে পারি না।"

শৈলও কঠিন হইয়া উঠিল; দৃঢ়স্বরে বলিল,—"তোমার কর্ত্তব্যে আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমার কর্ত্তব্যও আমি পালন কোরবো। কোনও বোন তার ছোট ভাইকে যমের হাতে ঠেলে দিতে পারে না। আমিও পারব না। এতে আমার কপালে যা থাকে, তাই হবে।"

ভূপতি এবার সত্যই রাগিয়া উঠিল। সক্রোধে কহিল,—"আস্কারা পেয়ে তুমি বড্ডই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ মেজবৌ! অত আস্পর্দ্ধা ভাল নয়।"—একটু থামিয়া কহিল,—"তুমি যদি না পার, এর ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। দেখি, আমি নিজেই কত দূর কি করতে পারি!"—সে ফিরিবার উপক্রম করিল।

শৈল স্বামীকে কোন দিন কটু কথা বলিতে শুনে নাই; সুতরাং এই তিরস্কার তাহার মর্ম্মভেদী হইল। কিন্তু সে দৃপ্তকণ্ঠে কহিল,—"বেশ, তাই কর; কিন্তু আমার চোখের ওপর এ আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না।"

শৈল হঠাৎ অধীর ভাবে কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু ক্ষণকাল পরে সে অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কহিল,—

"বেশ, তুমি যাও। কিন্তু তার আগে একটু অপেক্ষা কর, অমিয়কে নিয়ে আগেই আমি বিদায় হই। আশ্রয় যখন দিয়েছি, তখন ফেল্‌তে পারব না ওকে। কখন যদি ওকে নিরাপদ করতে পারি, ভগবান্ কোন দিন যদি আশ্রয় জুটিয়ে দেন, তখনই আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসব; তার আগে নয়।"—বলিয়া সে সেখান হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া হঠাৎ চেতনা হারাইয়া ভূপতির পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

এই আকস্মিক বিপৎপাতে ভূপতি বিহ্বল হইয়া পড়িল। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার স্নেহ-ভালবাসার সীমা ছিল না। তাহার এই বিপদে সে পাগলের মত হইয়া উঠিল। কিন্তু শৈলর ফিট হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সে তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

দীর্ঘকাল পরে শৈলর চেতনা-সঞ্চার হইল। এই যুদ্ধে সে-ই জয়লাভ করিল।

এক সপ্তাহ পরের কথা।

অমিয় সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতা দূর হইল না। সে বিছানায় শুইয়া একখানা বই পড়িতেছিল। অদূরে মেঝেতে বসিয়া শৈল বালিশে নূতন 'ওয়াড়' পরাইতে ব্যস্ত। শৈল সেই সময় অমিয়র অতীত জীবনের ঘটনাগুলি শুনিতেছিল; হঠাৎ মুখ তুলিয়া হাসিয়া শৈল কহিল, "ধন্য ছেলে তুমি ভাই! কি ক'রে এমন সব কাজ করতে—বল তো? প্রাণের ওপর তোমাদের কি দয়ামায়া একটুও নেই?"

অমিয় মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, "তখন ছিল না দিদি; কিন্তু এখন হ'য়েছে। কি ক'রে যে অমন কাজ করেছি—এখন আশ্চর্য্য হ'য়ে সেই কথাই ভাবি।"

শৈল মাথা নাড়িয়া আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, আমায় বল না ভাই, কি ক'রে তুমি অমন দলে গিয়ে মিশলে? আমার শুনতে বড় ইচ্ছে করছে।"

অমিয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তার পর কহিল, "তোমায় বলতে কোন বাধা নেই, দিদি! তাই সব কথাই ব'লব। দু'বছর আগে এক দিন দাদা-বৌদির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। আশ্রয় দেবার মত কেউ ছিল না, তাই জুটলও না কোথাও। দু'দিন শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু পেটে কিছুই প'ড়ল না। শুধু জল আর বাতাস খেয়ে খেয়ে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লাম। বোধ হয়, সে-দিন মৃত্যুকে আন্তরিক ভাবেই কামনা ক'রেছিলাম ব'লে ভগবান্ দিলেন না ম'রতে, দিলেন আশ্রয়। সেখানে খেতে পেলাম, থাকতে পেলাম; আর একটা জিনিষ ভাবতে শিখলাম, সেটা আমাদের এই দেশ। দেশকে ভালবাসার মধ্যে সে এতখানি মধু ছিল, এতখানি নেশা ছিল, স্বপ্নেও কোন দিন ভাবতে পারিনি।"—এই সকল কথা শেষ করিয়া সে কিরূপে কি উদ্দেশ্যে বন্দুকের ব্যবহার শিখিয়াছিল, তাহাও তাহার নিকট প্রকাশ করিল। সেই সকল কথা বিস্তারিতরূপে প্রকাশের স্থান আমাদের নাই, তাহার প্রয়োজনও নাই।

শৈল সকল কথা শুনিয়া অমিয়র মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, "অমিয়! আমার একটা কথা রাখবে, ভাই? সত্যি ক'রে বল?"

অমিয় শুইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, "ওকি কথা দিদি! এমন ক'রে বলে আমায় লজ্জা দেবেন না? আপনার আদেশ আমি প্রাণ দিয়েও পালন করব।"

—তা' হলে আমার কাছে শপথ কর ভাই, যে ও-জিনিষ আজ থেকে ছোঁবে না? আমায় ছুঁয়ে দিব্যি কর।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে অমিয়র মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; কয়েক মুহূর্ত্ত সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "তোমার আদেশের চেয়ে বড় আমার কাছে আর কিছুই নেই। এই তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, দিদি, এর পর স্বেচ্ছায় ও-জিনিষ আমি কোন দিনই আর স্পর্শ ক'রব না।"—বলিয়া নীচু হইয়া সে শৈলর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

শৈলর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "বেঁচে থাক ভাই!"

অমিয় হাসিল, বলিল, "ঐ আশীর্ব্বাদ তোমার খাটবে না, দিদি! ওরা ফাঁসী-কাঠ আমার জন্যে তৈয়েরী ক'রে রেখেছে। এক দিন না এক দিন আমাকে তাতে লটকাবেই।"

'ওরা' যে কাহারা,—সে খবরটুকু শৈলর অবিদিত ছিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শৈল মুখ ফিরাইয়া বলিল, "শুনতে পাই, তোমরা পড়াশোনা অনেক করেছ; জানো-শোনও অনেক। বলতে পার ভাই, এমন কোন দূরদেশ নেই, সেখানে গেলে কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না?"

শৈলর মনের অভিপ্রায় বুঝিতে অমিয়র বাকী রহিল না; সে হাসিয়া কহিল, "আছে বই কি, দিদি! কিন্তু তা যে অসম্ভব।"

শৈল আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া কহিল, "অসম্ভব কেন?"

অমিয় বলিল, "সে সব দেশে যেতে হ'লে অনেক টাকার দরকার। অত টাকা তো আমার নেই, দিদি! পাব বা কোথায়, আর দেবেই বা কে? কেনই বা দেবে?"

শৈল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "টাকা যদি আমি দিই, তুমি যাবে?"

অমিয় বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে কহিল—"তুমি দেবে! অত টাকা?"

শৈলর মুখ অস্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, দেবো। আমার সর্ব্বস্ব দেবো। তুমি কবে যাবে, আমায় বল?"

অমিয় শুধু বলিল, "ভেবে দেখি দিদি!"

শৈল উঠিয়া-পড়িয়া কহিল, "তোমায় অনেকক্ষণ বকালাম ভাই! যাই, তোমার দুধটা নিয়ে আসি।"—সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

শৈল ঘরের বাহিরে আসিয়াই দরজার পাশে ভূপতিকে দাঁড়াইয়া-থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। স্বামি-স্ত্রীর চোখোচোখি হইবামাত্র ভূপতি ঈষৎ লজ্জিত হইল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তে কি ভাবিয়া কহিল, "শোন!"

শৈল নিকটে আসিয়া, বলিল, "কি বলবে?"

"একটা কথা বলব, রাগ কোরবে না?"

"রাগের কথা না হ'লে নিশ্চয়ই কোরব না।"—শৈল একটু হাসিল।

ভূপতি বলিল, "বলছিলাম, ও ছোঁড়াটাকে আর কত কাল রাখবে এখানে? আপদ এবার বিদায় কর না। অসুখ-বিসুখ ত দিব্যি সেরে গেছে। শেষ পর্য্যন্ত কি একটা ফ্যাসাদ না ঘটিয়ে ছাড়বে না?"

শৈলর মুখের হাসি মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। সে শুধু কহিল, "অমন কথা বোলো না। অমিয় আমাদের আপদ নয়।"

ভূপতি বিদ্রূপের সুরে বলিল, "খুনে ফাঁসুড়ে আপদ যদি না হয়, তবে আপদ হয়েছি বুঝি আমি? কথাটা এখনও পাঁচ কানে যায়নি; কিন্তু একবার গেলে আর বাঁচবার পথ থাকবে না। আমি ভাল কথাই বলছি, শৈল! এবার পাপ বিদায় করো।"

শৈল কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "বেশ, 'পাপ' আমি বিদায় কোরব; কিন্তু আর দুটো দিন সবুর করো।"

স্ত্রীকে নরম হইতে দেখিয়া ভূপতির সাহস আরও বাড়িয়া গেল। সে কহিল, "তুমি না কি ওকে দূরদেশে যাবার খরচ দিচ্ছ? এ-সব কি তোমার ছেলে-মানুষী নয়, শৈল? সে আমার শালাও নয় সম্বন্ধিও নয় যে, তার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা! তা ছাড়া, সে যখন খুনে, ধরা পড়লেই তার ফাঁসী হবে, তখন তাকে এত দরদই বা করা কেন?"

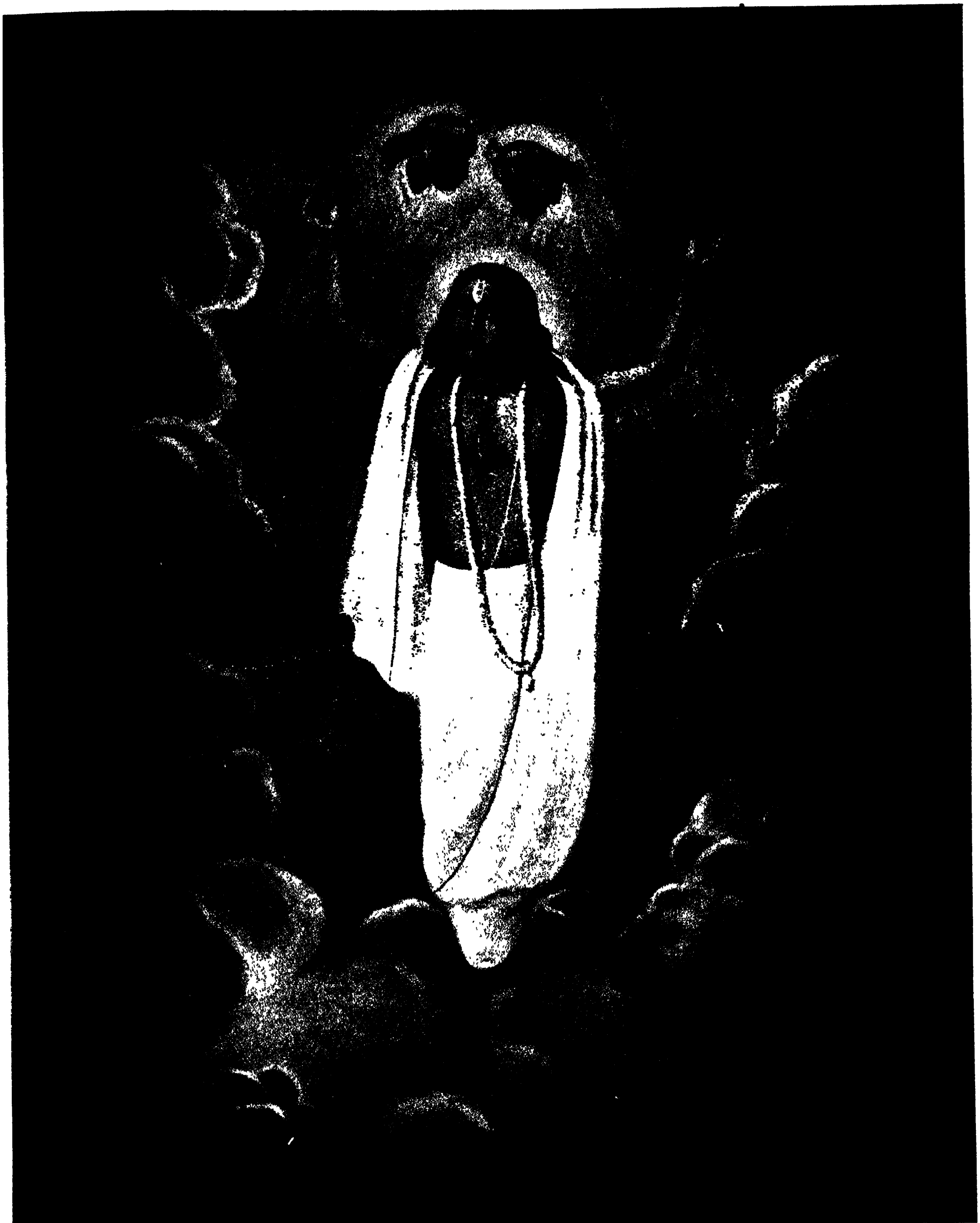
শৈল মিনতিভরা সুরে কহিল, "তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুমি চুপ করো। পুলিশে কাজ করো, হৃদয় ব'লে কোন বালাই কি তোমার নেই? তোমায় ত বলেছি, অমিয় আমার ভাই।"

ভূপতি বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, ভাই! এমন রূপসী বোনের লোভে সব শালাই তার ভাই হ'তে চায়!"

তীব্র অপমানে শৈলর মুখ একবারে কালো হইয়া গেল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "চুপ কর! অপদার্থ, ইতর! ভদ্রলোকের মত কথা বলতে জান না?"—শরবিদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত ব্যাকুল ভাবে সে সেই স্থান ত্যাগ করিল।

অনেক বিলম্বে শৈল দুধ লইয়া অমিয়র কাছে আসিলে সে তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, স্বামীর অনেক কথাই তাহার কানে গিয়াছে।

অমিয় মুখ তুলিয়া শৈলর মুখের দিকে চাহিয়া হাত-জোড় করিয়া কহিল, "এবার আমায় বিদায় দাও, দিদি!



শ্রীগৌরাঙ্গ

[শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

আর তোমাদের বিপদের ভার বাড়িয়ে তুলতে চাই না। যেখানেই থাকি আর যে ভাবেই থাকি না কেন, তোমার ঋণ—" সে আর কথা বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শৈল ছল-ছল নেত্রে চাহিয়া কহিল, "আমার দয়ার ঋণ তুমি না হয় নাই শুধলে,—সে জন্যে তাড়া নেই, ভাই! কিন্তু এখন দুধটা চট কোরে খেয়ে নাও।"

অমিয় একটু থামিয়া কহিল, "আমি খুনে, ফাঁসির আসামী; আমার ফাঁসি আজ-কাল না হয়—এক দিন হবেই—"

শৈল তাহার কথায় বাধা দিয়া গাঢ় স্বরে কহিল, "অমিয়, জানো—এ কথায় আমি কত দুঃখ, কত ব্যথা পাই?"

"আমার অপরাধ হয়েছে, দিদি! আমায় তুমি ক্ষমা করো।" অমিয় ঝুঁকিয়া-পড়িয়া শৈলর পা স্পর্শ করিল।

শৈল তাড়াতাড়ি অমিয়র মাথায় হাত রাখিয়া কহিল, "এবার তোমায় ক্ষমা ক'রলাম, অমিয়! কিন্তু বিদেশে যাবার একটা বন্দোবস্ত শীঘ্রই তুমি কোরে ফেলো। তোমায় এখানে লুকিয়ে রাখতে আর আমার সাহস হচ্ছে না।"

তার পর অনেক কথাই হইল, তাহাতে উভয়েরই মনের ভার লঘু হইল।

পরের দিন সকাল বেলা অমিয়কে দুধ খাওয়াইয়া বাটিটা লইতে শৈল সেখানে আসিয়া-দাঁড়াইতেই ভূপতি ব্যস্ত ভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ-চোখ শুষ্ক, চুল পারিপাট্যহীন, কাঁধের চাদরখানা মাটীতে লুটাইতেছে, এবং সর্ব্বশরীর উত্তেজনায় কাঁপিতেছে। সে তীব্র স্বরে শৈলকে কহিল, "তখনি বলেছিলাম, ও-পাপ বিদায় করো; কিন্তু গরীবের কথা কানে তুললে না। এখন তার ফলভোগ কর।"

এই আকস্মিক আক্রমণে শৈল এবং অমিয় দু'জনেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। বিবর্ণ মুখে তাহারা অর্থহীন দৃষ্টিতে ভূপতির দিকে চাহিয়া রহিল।

ভূপতি রসনায় তীব্র বিষ ঢালিয়া বলিল, "তখন সোহাগ কোরে বলা হ'ল, ও আমার ভাই! এখন ভাইয়ের কীর্ত্তি দেখো। ও হতভাগাগুলাকে কি বিশ্বাস কোরতে আছে? এখন যাও, ভাইয়ের হাত ধ'রে দোরে দোরে ভিক্ষে কর গে।"

এতক্ষণে শৈল আত্মসংবরণ করিয়া অমিয়র দিকে চকিতে তাকাইল; দেখিল—লজ্জায়, অপমানে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। শৈল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "হয়েছে কি? তুমি ও-ভাবে তর্জ্জন-গর্জ্জন কোরছ কেন?"

"করছি কি আর সাধে? এটা পড়লেই সব বুঝতে পারবে।"—একখণ্ড কাগজ সে শৈলর দিকে তখনই ছুড়িয়া দিল। শৈল কাগজখানি কুড়াইয়া লইলেও তৎক্ষণাৎ পড়িতে পারিল না। কোন একটা গণ্ডগোল হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারায় আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় তাহার বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সেই কাগজ-খানির উপর চোখ-বুলাইতেই তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল; কিন্তু সে ধৈর্য্য হারাইল না।

চিঠিখানি ছোট, কিন্তু মৃত্যুর পরোয়ানা বহন করিয়া আনিয়াছে দেখিয়া তাহা ভীষণ বলিয়া তাহার মনে হইল। ভূপতিকে শত্রুরা শাসাইয়াছে, তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা হইতে বিরত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছে; এবং দিন-তিনেকের ভিতর পুলিসের কার্য্যে ইস্তফা না দিলে তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়াছে।

শৈল কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্ রহিল; তার পর মনকে সংযত করিয়া শুষ্ক কণ্ঠে স্বামীকে কহিল,—"এ তো মিথ্যা ভয়-দেখানও হ'তে পারে। এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ কি?"

ভূপতি এই প্রশ্নে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "প্রমাণ চাও?—আমি খুন হ'লেই এ কথার প্রমাণ পাবে। সেবার বামাপদ গোয়েন্দাকে ওরা মিথ্যে ভয় দেখিয়েছিল, কেমন?"

কথাটা এত বড় সত্য না হইলে শৈল চুপ করিয়া যাইতে পারিত না। এই তো সে-দিনও সে বামাপদ বাবুর অসহায়া বিধবাকে দেখিয়া নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিয়াছে। সে কথা মনে হইতেই সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এবং স্বামীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কাতর স্বরে কহিল, "দেখ, এ চাকরীতে আর আমাদের দরকার নেই,

তুমি এ চাকরী ছেড়ে দাও—কাল্কে আজই জবাব দিয়ে এস, তা হ'লে সব গোলমাল মিটে যাবে।"

পত্নীর কথায় ভূপতি ক্রোধে জ্বলিয়া-উঠিয়া তিক্ত কণ্ঠে কহিল, "চাকরী ছেড়ে দিয়ে খাবো কি? এক-মুঠো ভাতের জন্য শেষে কি তোমায় নিয়ে লোকের দোরে-দোরে ভিক্ষে ক'রে বেড়াব?"

স্বামীর ক্রোধে শৈল বিচলিত হইল না; সে ধীর ভাবে কহিল, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি থাকতে কোন দিন তোমাকে ভিক্ষে কোরতেও হবে না। আমাদের যা আছে—দুটো পেটের জন্যে তাই যথেষ্ট। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

ভূপতি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "সে আমি জানি। আমার সর্ব্বনাশ না কোরে তুমি ছাড়বে না। বুঝলাম, ঘরে-বাইরে আমার শত্তুর। তারা আমার মরণই চায়। আচ্ছা, বেশ, আমি মরব।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে যে ভাবে ঘরে ঢুকিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই বাহিরে চলিয়া গেল। শৈল সেইখানে দাঁড়াইয়া অন্যমনস্ক ভাবে পত্রখানি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর শৈল অমিয়র নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, "এ কি সত্যি ভাই অমিয়, তুমি দেখ তো?" কাগজখানি সে অমিয়র হাতে দিল। অমিয় নিঃশব্দে তাহা পাঠ করিয়া সভয়ে কহিল, "এ বোধ হয়, মিথ্যে ভয় দেখান নয়, দিদি! কিন্তু তোমার দিব্যি কোরে বলছি, এর কিছুই আমি জানি না: এর জন্যে আমি এক বিন্দুও দায়ী নই।"

শৈল ম্লান মুখে কহিল, "তা আমি জানি ভাই! তোমায় আশ্রয় না দিলেও এ বিপদ থেকে আমাদের পরিত্রাণ ছিল না। কিন্তু এখন উপায় কি, তাই বল।"

অমিয় ম্লান মুখে কহিল, "আমার প্রাণ দিলেও যদি কোন উপায় হয় দিদি, আমি তার চেষ্টা কোরব। তোমাদের কোন অনিষ্টই হ'তে দেব না।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, দিদি! এর বিহিত আমি কোরবই।"

তাহার কথা শুনিয়া শৈল আশ্বস্ত হইল। এ তো তাহাদেরই দলের যুবকদের কাজ; তাহারা কি অমিয়র অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবে?

তার পর সপ্তাহখানেক কাটিয়া গিয়াছে। গোল-যোগের চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পায় নাই। বাড়ীতে শৈল ও ভূপতি উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছে, যাহা লইয়া তাহাদের এত উদ্বেগ ও আশঙ্কা, তাহা ভিত্তিহীন। ভূপতি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া সতর্ক ভাবে কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু অমিয় শান্তি পাইল না; সে ইহাকে ফাঁকা ভীতি প্রদর্শন বলিয়া মনে করিতে পারিল না। সুতরাং এক পক্ষ যখন ক্রমশঃই নিশ্চিন্ত হইতে নিশ্চিন্ততর হইতে লাগিল, তাহার অন্তর তখন ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় বার-বার শিহরিয়া উঠিল; তাই শৈল যখন তাহাকে বিদেশে যাত্রা করিবার জন্য তাগাদার পর তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিল, তখন সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে সম্মত হইল; কিন্তু কেন যে তাহার এই অনিচ্ছা, ইহা ভূপতি বা শৈল বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না।

অমিয়র যাত্রার পূর্ব্বদিন।

সারা দিন শৈল অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এবং আঁচল দিয়া ঘন-ঘন চক্ষু মুছিয়াছে। অনেক রাত থাকিতেই অমিয়কে বাহির হইতে হইবে, সুতরাং জিনিষ-পত্র গুছাইবার উদ্যোগ-আয়োজন সকাল হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

শৈলর অধিকাংশ সময়ই আজ রন্ধনশালায় কাটিয়া গিয়াছে; মনের সাধ মিটাইয়া অমিয়কে খাওয়াইতে হইবে, তাই তাহার এত আকিঞ্চন ও আয়োজন।

আহারান্তে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিয়া অমিয় যখন শৈলর নিকট বিদায় লইয়া উঠিতেছিল, তখন এই স্বল্প দিনের পরিচিতা অসীম স্নেহশালিনী নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর দিকে কিছুকাল তাকাইয়া থাকিয়া গভীর বেদনায় তাহার বুকের ভিতরটা টন্-টন্ করিয়া উঠিল, এবং অনাহূত অশ্রু দু'চোখে ছাপাইয়া উঠিতেই সে দ্রুতপদে আপনার ঘরটিতে আসিয়া একেবারে বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। কেন যে এক অজ্ঞাত আশঙ্কা তাহাকে প্রতি-দিন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে, কি কারণে মৃত্যুর করাল ছায়া বিভীষিকার মত তাহার চারি পাশে জমাট বাঁধিয়া

উঠিতেছে—তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। দিন কয়েক পূর্ব্বেও যাহা তাহার নিকট শান্তির নিভৃত নীড় ছিল, তাহাই আজ মহা অশান্তির আলয় বলিয়া তাহার প্রতীতি হইল; এবং রাত্রির গভীরতা ও নিস্তব্ধতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই অমিয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এ যেন মহা-প্রলয়ের রাত্রি, ইহার যেন অবসান নাই! ঘন-বিন্যস্ত বৃক্ষপত্রের ফাঁকে-ফাঁকে চাঁদের যে ক্ষীণ আলোক ঘরের ভিতর প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা যেন মানুষের সুখ-দুঃখে উদাসীন,—তাহা এতই ম্লান, এমনি করুণ এবং গভীর রহস্যবিজড়িত। গাছের পাতাগুলি নিস্পন্দ;—নিষ্কম্প।

অতঃপর যখন সে আপনার দেহ-মনের সমস্ত জড়তা সবলে ঠেলিয়া-ফেলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময় বাহিরের দিক হইতে একটা আতঙ্কজনক শব্দ আসিয়া নিমেষে তাহার সমস্ত চিন্তা অপসারিত করিল। সে ক্ষিপ্র হস্তে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে সে সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্য সে বিস্ময়ে, ভয়ে এবং উত্তেজনায় হতজ্ঞান হইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তমাত্র। তার পর অমিয় উন্মত্ত আবেগে সুবিস্তীর্ণ আঙ্গিনা অতিক্রম করিয়া সেই দিকে দৌড়াইয়া গেল। ঠিক এই ভাবেই এক দিন সে বাহিরের ঐ বেড়া ডিঙ্গাইয়া এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, আর আজ! এই নিস্তব্ধ রজনীর অন্তরালে গা ঢাকিয়া তাহারই সহকর্ম্মীরা ঠিক সেই ভাবেই এ গৃহে প্রবেশ করিতেছে। প্রভেদ এই যে, আজ তাহারা আশ্রয়প্রার্থী নয়, মৃত্যুর পরোয়ানা বহন করিয়া তাহারা এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

ততক্ষণে নিঃশব্দে বেড়া-ডিঙ্গানো শেষ হইয়া গিয়াছে। যে তিন জন যুবক আঙ্গিনায় নামিয়াছিল, তাহারা অমিয়র পরিচিত। সে কোনরূপ ভূমিকা করিল না। সম্মুখের যুবকটিকে লক্ষ্য করিয়া অন্তরের সমস্ত মিনতি ঢালিয়া দিয়া কহিল, "সত্যেন, আমার দিদির সর্ব্বনাশ তোমরা কোরো না। আমি জানি, আজ তোমরা কেন এখানে এসেছ। কিন্তু আমার এ-মিনতি রাখ ভাই!" আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

সত্যেন আগাইয়া আসিল। তাহার মনে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। তাহার ঋজু বলিষ্ঠ দেহের ভিতর হইতে দৃঢ়তা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি অমিয়র মুখের উপর রাখিয়া সে অচঞ্চল স্বরে কহিল, "অমিয়, তুমি যে এখানে আছ—তা জান্‌তাম না। বেশ ভালই হ'ল, এস, আমাদের সাহায্য কর। নির্ব্বিঘ্নে আমরা কাজ উদ্ধার কোরে যাই।"

অমিয় কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। দৃপ্ত কণ্ঠে সে ডাকিল, "সত্যেন!"

সত্যেন অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "আমাদের দলের কোন নিয়ম-কানুনই বোধ হয়, তোমার অজানা নেই, অমিয়! এ ক্ষেত্রে তা লঙ্ঘন কোরে তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা কোরো না। বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড যে কি, এ কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই বোধ করি।"

অমিয় অন্তরের তীব্র জ্বালা গোপন করিয়া অচঞ্চল স্বরে কহিল, "স্মরণশক্তি আজও আমার হ্রাস হয়নি সত্যেন, এবং সে জন্য আমিও প্রস্তুত। কিন্তু অতীতের আমার সমস্ত সাধনার বিনিময়ে আমি এইটুকু ভিক্ষা আজ তোমাদের কাছে চাচ্ছি সত্যেন, যে সঙ্কল্প নিয়ে তোমরা এখানে এসেছ, তা ত্যাগ কোরে ফিরে যাও; আমার এ অনুরোধটুকুর মর্য্যাদা তোমরা রাখ, ভাই! কর্ত্তব্য-সাধনে কোন দিন আমি ত্রুটি করিনি—তা তোমাদের অজ্ঞাত নয়।"

কিন্তু সত্যেনের সঙ্কল্প টলিল না। সে গম্ভীর স্বরে কহিল, "অসম্ভব। এ আমাদের কর্ত্তব্য।"—পরমুহূর্ত্তে সে সঙ্গীদ্বয়কে ডাকিল, "অজয়, যতীন!"—কিন্তু অমিয় সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল; সে সত্যেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আমিও প্রস্তুত। তোমরা আগে—" কিন্তু কথা সে শেষ করিতে পারিল না। সেই প্রলয়ঙ্করী রাত্রির সমস্ত নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া একটা তীব্র মর্ম্মভেদী স্বর সকলকে চকিত স্তম্ভিত করিয়া দিগন্তে বিলীন হইল।

পিছন হইতে শৈল ডাকিল, "অমিয়!"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত অমিয় ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভীত, সন্ত্রস্ত, বিবর্ণ মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, দিদি!"

শৈল এক পা আগাইয়া আসিল, তীব্র স্বরে কহিল, "এত রাত্রে তুমি এখানে কেন, অমিয়? এরাই বা কে?

কোন্ অধিকারে তুমি আমার বাড়ীতে এদের ডেকে এনেছ? কৃতজ্ঞতা ব'লে কোন পদার্থ কি তোমার মধ্যে নেই? ফাঁসের দড়ি যখন তোমার মাথার উপর ঝুলছিল, সেই সময় সেই দড়ি দূরে সরিয়ে-ফেলে বুক দিয়ে তোমায় রক্ষা কোরেছিল যে, তারই সর্ব্বনাশ করবার সুযোগ পাবে ব'লেই কি আমি তোমাকে মৃত্যু-কবল থেকে রক্ষা ক'রেছিলাম? এত হীন, এত নীচ, এত কৃতঘ্ন তুমি অমিয়? আমি যে ধারণাই কোরতে পারছি না—আমার এত বড় সর্ব্বনাশ, সব জেনে-শুনেও কি কোরে তুমি কোরতে উদ্যত হ'য়েছ?

অমিয় আর সহ্য করিতে পারিল না। আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিল,—"দিদি!" অপমানে, বেদনায়, অন্তর তাহার শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাহার আর কোন কথা বলিবার ক্ষমতা রহিল না।

তাহার আর্ত্ত রব শৈলর কাণে প্রবেশ করিল না। সে কঠোর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বিদেশ যাবার অত অনিচ্ছা তোমার কেন হচ্ছিল, এখন তা বেশ বুঝতে পেরেছি। তোমার জন্যে আমার কত যে দুঃখ, কত যে ভাবনা, তা কোন দিনই তুমি জানবে না, অমিয়! আমার সুখের সংসারে কোন অশান্তিই ছিল না। শুধু তোমার জন্যে—" দুঃখে-কষ্টে তাহার কণ্ঠ রোধ হইল।

কিন্তু অমিয়র দুর্ভাগ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, এই সময়ে সশস্ত্র ভূপতির আগমনে তাহা চরমে উঠিল। তাহার অতর্কিত আগমনে সেখানে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। শুধু যে শৈলর ভয়-বিহ্বল মুখ হইতেই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল, তাহা নহে, সত্যেন, যতীন এবং অজয়ের চক্ষু হইতেও একটা ভাষাহীন গূঢ় ইঙ্গিত প্রকাশিত হইল। অমিয় তাহা বুঝিতে পারিয়া বিদ্যুৎবেগে ভূপতির নিকট দৌড়াইয়া গিয়া নিজের দেহ দ্বারা তাহাকে আবৃত করিল, ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি এখানে কেন? ফিরে যান, ফিরে যান এই মুহূর্ত্তে! নতুবা—"

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই যুগপৎ দুই বিভিন্ন দিক হইতে অনলস্রাবী আগ্নেয়াস্ত্রের সুগম্ভীর শব্দে সেই নিস্তব্ধ পল্লী-ভবন দুইবার কাঁপিয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অমিয়র রক্তাক্ত দেহ সেখানে লুটাইয়া পড়িল।

সেই মৃত্যুবার্ত্তাবাহী প্রলয়ঙ্কর শব্দে চকিত হইয়া নিদারুণ ভয়ে শৈল চক্ষু মুদিত করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সম্বিত পাইয়া সে উন্মত্তের মত সবেগে ধাবিত হইল; কিন্তু জ্যোৎস্নালোকে মুহূর্ত্ত মধ্যে অমিয়কে চিনিতে পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় স্বামীকে সবলে দূরে ঠেলিয়া দিয়া অমিয়র ধরালুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া বুকফাটা স্বরে ডাকিল, "অমিয়, ভাই আমার!"

অমিয় চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মৃত্যু তখন তাহার নয়নে অন্ধকার-ছায়া প্রসারিত করিয়াছে। শৈলর মুখের দিকে তাকাইয়া পরিপূর্ণ শান্তির সহিত কহিল, "না, দিদি, আমি অকৃতজ্ঞ বা বিশ্বাসঘাতক নই।"

শৈল আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "হতভাগিনী দিদি তোকে আশ্রয় দিতে পারল না বলে, অভিমান কোরে চলে গেলি রে ভাই!" মূর্চ্ছিতা শৈল তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়।

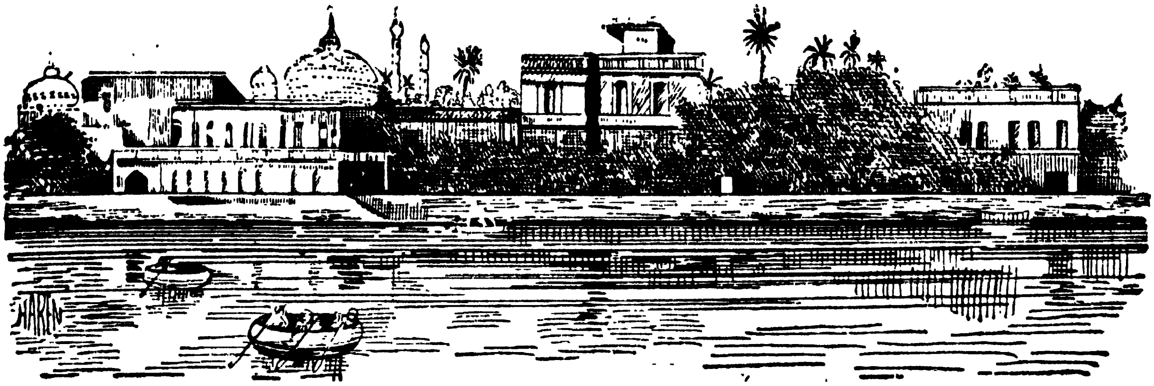
সুরের বীণা

থেকে-থেকে কার সুর বেজে ওঠে প্রাণে?
ফিরে-ফিরে চাই সেই অতীতের পানে।

খুঁজে-খুঁজে সারা হই নাহি পাই খুঁজি,
কখনও বা একমনে ভাবি আঁখি বুজি।
কার কথা, কার গান জাগে হৃদিমাঝে,
কার সুর ঘুরে মরে সুকম্পিত লাজে?

কত গান গেয়েছে সে মম মন-বনে,
কত তান তুলেছে সে হৃদ্‌যন্ত্র সনে।
কোথা সে গিয়াছে চলি বীণাটি ফেলিয়া,
তাই বুঝি নানা সুর উঠিছে ধ্বনিয়া।

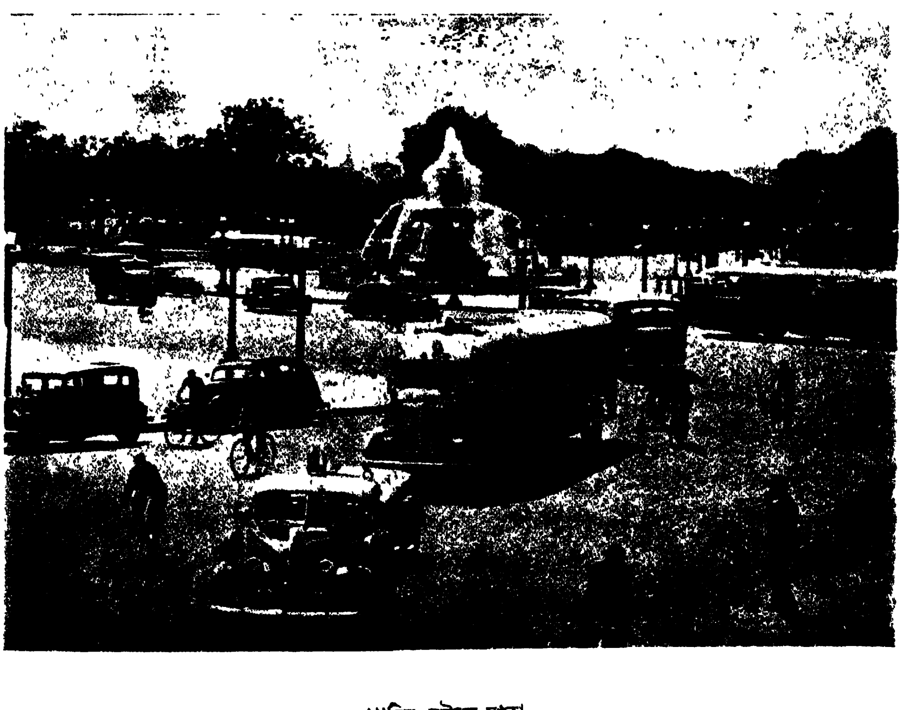
শ্রীউমানাথ সিংহ



মোটর-অভিযান

দেড় বৎসর পূর্ব্বেকার কথা!

যে-পথে এক দিন দারায়ুস, সেকন্দর শা ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যে-পথে এক দিন গ্রীক্ বণিকের দল আনটিয়কের মধ্য দিয়া মেশোপটামিয়ার মরু-প্রান্তর পার হইয়া বাগদাদ, তিহিরান, ইরাণ অতিক্রম করিয়া



পারিস হইতে যাত্রা

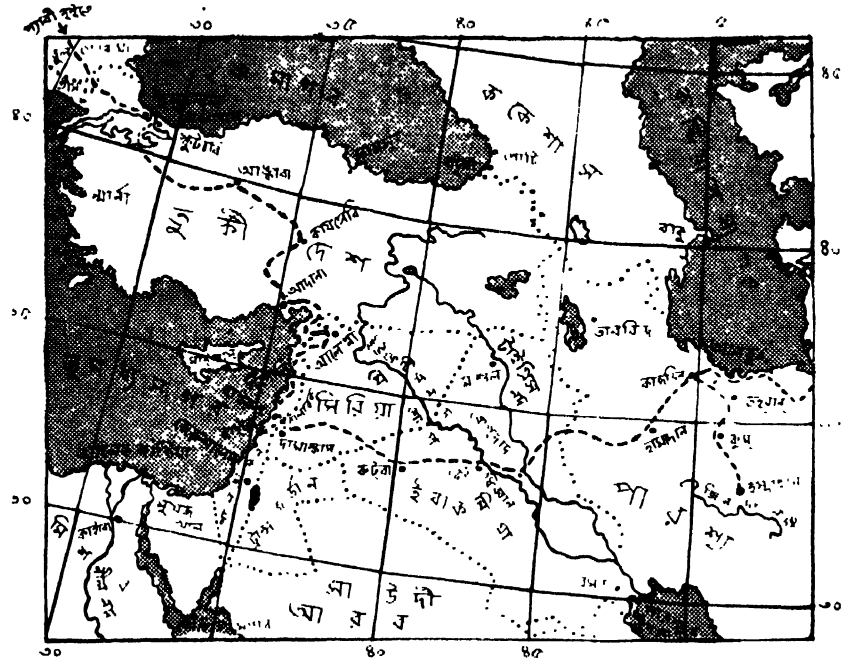
হিন্দুকুশ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া খাইবার-বর্ত্ম ধরিয়া ভারতে আসিতেন, সেই পথে মোটর চালাইয়া এক জন মার্কিণ ভদ্রলোক শ্রীযুত লরেন্স থ সস্ত্রীক এবং সবান্ধব ভারতে আসিয়াছিলেন।

এজন্য তিনি দু'খানি শেভ্রোলে-ট্রাক তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। সেই ট্রাক দু'খানিতে ছিল নানা রসদ-পত্র,—ফটোর ফিল্ম হইতে সুরু করিয়া মোটরের টায়ার-টিউব, মেরামতীর যন্ত্রপাতি, খাদ্যসম্ভার, কাপড়চোপড়—কোনো-কিছুর অভাব ছিল না!

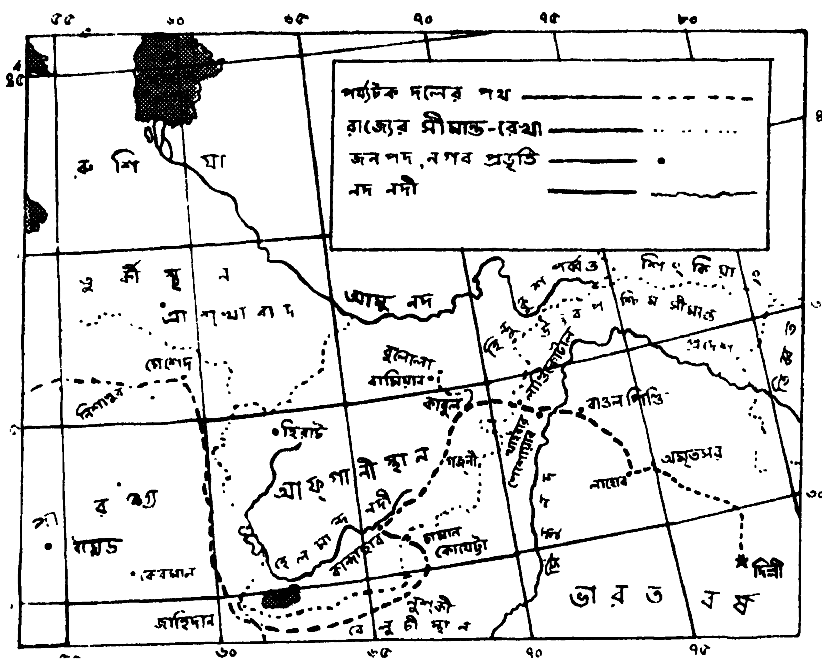
ট্রাক দু'খানিকে জাহাজে তুলিয়া প্রথমে আটলান্টিকের পারে পারিসে পাঠাইয়া দেন; তার পর স্ত্রী ও বন্ধুদের লইয়া তিনি আসেন পারিসে। নিজে-দের জন্য আনিয়াছিলেন একখানি বুইক্-কার। এই গাড়ীতে ছোট ট্রেলার আঁটিয়া লইয়া, ছিলেন। ট্রেলারে ছিল ক্যামেরার সরঞ্জাম-পত্র। পারিসে আসিয়া তিনি ছ' জন ভারতীয় অনুচর আনাইয়া লন—তিন জন ড্রাইভার, এক জন পাচক এবং দু' জন খানসামা। অনুচরগুলিকে তিনি বোম্বাই হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ট্রাকের মধ্যে ছিল রন্ধন ও ভোজন-শালা। কাজেই আহারাদির জন্য পথে কোথাও নামিবার প্রয়োজন হয় নাই। তার উপর গরম-জলে স্নানের ব্যবস্থা, রাত্রের জন্য শয়ন-কক্ষ, রেডিও-সেট—এ-সবের কোথাও এতটুকু ত্রুটি ছিল না!

পারিসে বসিয়া উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তাঁরা (১৯৩৯) ৬ই জুলাই তারিখে যাত্রা সুরু করিলেন। প্রথম রাত্রে বিশ্রাম নান্সির কাছে ছোট একখানি গ্রামে। গ্রামের যত লোক অতিকায় ট্রাক দেখিয়া আসিয়া হাজির। তারা ভাবিল, বুঝি সার্কাসের দল আসিয়াছে! প্রশ্ন করিল, এ গ্রামে সার্কাসের তাঁবু পড়িবে বুঝি?

পরের দিন প্রাতে গ্রাম ছাড়িয়া আবার পাড়ি সুরু। একেবারে জার্ম্মানিতে আসিলেন। এখানে কড়া সার্চ্চ চলিল। পুলিশ বলিল, গাড়ীর মধ্যে 'বম্বার' আছে। থ সাহেব বুঝাইয়া দিলেন, ভারত-ভ্রমণ তাঁর উদ্দেশ্য; যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। তার পর পুলিশ গাড়ী দেখিয়া নিঃসংশয় ও নিঃশঙ্ক হইলে জার্ম্মানির পদস্থ কর্ম্মচারী ব্যারন ভন্ বেহর বলিলেন—এত বড় গাড়ী লইয়া পথে বিভ্রাট ঘটিবে! জনারণ্য ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া দায় হইবে। সেজন্য তিনি সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এমন ব্যবস্থা যে, যে-সব গ্রাম-নগরের মধ্য দিয়া থ সাহেবের গাড়ী চলিবে, সে-সব জায়গায় পুলিশকে পূর্ব্বাহ্নে খপর দেওয়া হইল —পথে যেন ভিড় না থাকে; ভিড় হঠাইবে। মোটর-যাত্রীদের বিঘ্ন বা বিলম্ব না ঘটে।



পারিস হইতে তিহিরান্-ইস্পাহান্



তিহিরান্ হইতে মেশেদ-কাবুল-লাণ্ডিকোটাল

এ আদেশ জার্ম্মানিতে অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হইয়াছিল। ব্যারণ নিজে ভিয়েনা পর্য্যন্ত থ সাহেবের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

ভিয়েনার পর বুডাপেস্ত। এখানে ড্যানিউবের বুকে টেছা



যুগোশ্লাভিয়া-রূপসী—চিকণের কাজ

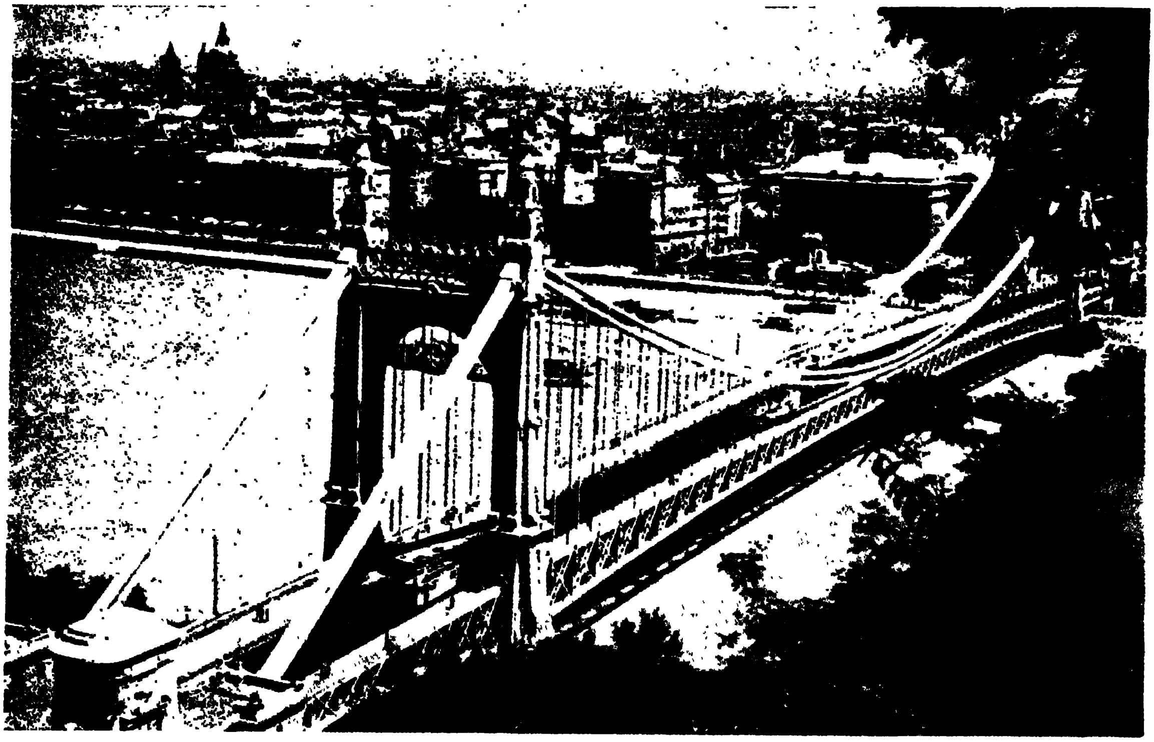


এ্যাড্রিয়াটিকের মাছ

• বুডাপেস্ত ছাড়িয়া সকলে আসিলেন যুগোশ্লাভিয়া। এখানে আসিয়া থ সাহেবের মাথায় আইডিয়া জাগিল, ফটো তুলিবার জন্য এত সচল-ফিল্ম আনিয়াছেন—সে ফিল্মের সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি শিক্ষা ও আনন্দমূলক চিত্র রচনা করিবেন!

যুগোশ্লাভিয়ায় সকলে এক সপ্তাহ রহিয়া গেলেন। যুগোশ্লাভিয়ায় ফুলের ফশল প্রচুর। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফুলের ফশলে সেখানে কত বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতেছে। থ সাহেব এখানকার লোক-জনের আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ পরিচয় তাঁর ছবির মালায় সুচারু ভাবে গাঁথিতে ঔদাস্য করেন নাই। পেটুনিয়া, ফ্লক্স, লার্কস্পার—এ সব ফুলে এমন রকমারি রঙের বাহার যে থ সাহেব বলেন, এমন আর কোথাও দেখেন নাই!

যুগোশ্লাভিয়া ছাড়িয়া ড্যানিউবের একটি দ্বীপ—সেণ্ট মার্গারেট। সেই দ্বীপের বুকে চমৎকার হোটেল। সেই হোটেলে কর্ত্তৃপক্ষ সকলকে পরম-সমাদরে আনিয়া আতিথ্যে তৃপ্ত করিলেন। হোটেলে নাচ-গানের বিরাট জলুশা—আদর-আপ্যায়নে প্রচুর সমারোহ ঘটিল। তীরে বেলগ্রেডে আবার বিশ্রাম। এই ড্যানিউব-নদীটি ৭২০ মাইল দীর্ঘ। নদীর তীরে বড় বড় বাড়ী-ঘর। মেরিয়া থেরেসার গৃহ আজিও সগৌরবে বিদ্যমান আছে। এই ড্যানিউবের তীর যেন এখানকার পাণিপথ! এখানে যত



বুডাপেস্ত—ব্লু-ড্যানিয়ুব-নদীর বুকে সেতু



আলেপো



গ্যালাটা-পুলের উপরে



বাগদাদের মুখে মরু-পথ



বাগদাদের কাছে—সেখ-সর্দ্দারের সওয়ার-রক্ষী

যুদ্ধে কত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তার আর সংখ্যা নাই !

বালকান্-প্রদেশে পথ-ঘাট ভালো নয়—ওদিককার মতো কন্‌ক্রিট্ বা ম্যাকাডাম্-করা পথের নাম-গন্ধ নাই ! রৌদ্রে যেমন আগুনের হল্‌কা, পথে তেমনি ধুলা !

বেলগ্রেডের পর আসিলেন বুলগেরিয়ায়।

বার্লিন হইতে ইস্তাম্বুল পর্য্যন্ত সামরিক ব্যবস্থা বুঝিয়া কন্‌ক্রিট ও ম্যাকাডাম-করা পাকা পথ তৈয়ারী হইতেছে। এখনো পথ-নির্ম্মাণের কাজ শেষ হয় নাই। বুলগেরিয়ায় ও যুগোশ্লাভিয়ায় হাজার হাজার লোক দিবারাত্র খাটিয়া এ পথ তৈয়ারী করিতেছে। পাঁচ মাইল অন্তর এক একটি ছাউনি পড়িয়াছে। এ-সব ছাউনিতে অফিস আছে ; লোকজনের বাসের ব্যবস্থা আছে।

থ সাহেব লিখিতেছেন—

বুলগেরিয়ায় সহরের বাহিরে পল্লীর বুকে আমরা ছাউনি ফেলিয়াছিলাম। প্রথম দিন সন্ধ্যায় প্রায় একশো তরুণ-তরুণী আসিয়া নাচে-গানে আমাদের আনন্দ দান করিল। নানা রঙে রঙীন তাদের পোষাক। সে পোষাকে কি বাহার ! ছ' বছরের একটি বালিকা যে অপরূপ নৃত্যকলা দেখাইল, তার তুলনা নাই !



সোফিয়ার নৃত্য-শীলা বালিকা



জেরুশালেমের পথে



ইরাণ—এলবুর্জের বুকে পথ

কিন্তু অতীত যুগে তুর্কির আক্রমণ ও বিজয়-লাভের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সদর রাস্তায় প্রকাণ্ড এক মসজিদ বিদ্যমান আছে।

বালকান্ প্রদেশের মধ্য দিয়া আমরা চলিলাম সোজা দক্ষিণ-দিকে। প্লভডিভের পর পথ খুব খারাপ। এখানকার লোক-জন খুব অতিথি-বৎসল।

পথ পরে আরো খারাপ দেখিলাম। আড্রিয়ানোপলে মধ্য দিয়া তুর্কি পর্য্যন্ত নব্বই মাইল পথ রীতিমত দুর্গম। প্রতি-পদে ভয় হইতেছিল, বুঝি টায়ার ফাটে! কল-কব্জা জখম হয়!

কিন্তু ভারতীয় ড্রাইভাররা বেশ নিপুণ। তারা নির্ব্বিঘ্নে গাড়ী চালাইয়া ইস্তাম্বুলে (কনস্তান্তিনোপল্) পৌছাইয়া দিল। আমরা পণ করিলাম, ফিরিবার সময় এ পথ আর মাড়াইব না।

তার পর গোল্ডেন্ হর্ণের উপর গ্যালাটা বা নুতন পুল। সেই পুল পার হইয়া আমরা ইস্তাম্বুলে পৌছিলাম অগষ্ট মাসের সন্ধ্যা। অসংখ্য মসজিদের

এইখানে আমরা মুশলিম আবহাওয়ার প্রথম পরিচয় পাইলাম। এখন এখানকার অধিবাসীরা খৃষ্টান হইয়াছে; চূড়ার পিছনে লোহিত সূর্য্য অস্তাচলগামী, ছোট ছোট অসংখ্য নৌকায় চড়িয়া হাজার হাজার লোক বস্‌ফরাশ

নদী পার হইতেছে! ও-পারে য়ুরোপ ছাড়িয়া এ-পারে আমরা এশিয়ার মাটীতে পদার্পণ করিলাম।

আগে হইতেই আমাদের ছাউনির ব্যবস্থা করা ছিল। এ-পারে আসিবামাত্র ফরেন অফিসের কর্ম্মচারীরা আমাদের ছাউনির ঠিকানা ও পথের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

এ পথে আসিতে কিন্তু দারুণ বিভ্রাট! সহরের তোরণ-দ্বার এমন যে, দ্বার-পথে আমাদের অতিকায় ট্রাক প্রবেশ করিতে পারে না! পথে গাধা-টানা গাড়ীর ভিড়! আমাদের ট্রাক ফটক আটকাইয়া রাখিয়াছে। গাড়ীর গাধাগুলোর কি সে অধীর চীৎকার! পুলিশ আসিয়া সাহায্য করিল। দু' ঘণ্টা পরে ফটকের মধ্যে গাড়ী প্রবেশ করিল। এতক্ষণ গাড়ী ও লোকের ভিড়ে পথ একেবারে বন্ধ ছিল। আমাদের জন্য কত লোকের যে কত অসুবিধা হইল, বলিবার নয়! করজোড়ে তাদের কাছে শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করা ভিন্ন আমাদের আর-কোনো উপায় ছিল না।

ইস্তাম্বুলে আমরা সাতদিন ছিলাম।

এখান হইতে স্কুটারি যাইব, স্থির ছিল। কিন্তু শুনিলাম, পথ এমন, পথে 'ট্রাক চলিবে না।' তুর্কি গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া বড় ফেরিবোটের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই বোটে ট্রাক এবং গাড়ী তুলিয়া আমরা মর্ম্মোরা-সাগর পার হইয়া মুদানিয়ায় পৌঁছিলাম।

পুরানো তুর্কিকে ভাঙ্গিয়া কমল পাশা যে নব-রূপে গড়িয়াছেন, সে গঠনের চারুতায় চমৎকৃত হইতে হয়! নব-তুরস্কের নূতন রাজধানী আঙ্কারা যেন ইন্দ্রপুরী! মোটর



বামিয়ানে বুদ্ধ-মূর্ত্তি

গাড়ী এখানকার রেল-গাড়ীর সঙ্গে গতিবেগে পাল্লা দিয়া জিতিতে পারিবে, সে আশা নাই!

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে এখানে মুর্গীর লড়াই, কুকুরের লড়াই, উষ্ট্রযুদ্ধ প্রভৃতিতে পূর্ব্বে মহা-সমারোহ সংঘটিত হইত। এ-সব নিষ্ঠুর খেলা আইনের ধারে এখন ছিন্ন করা হইয়াছে।



ইরাকের বালক রাজা ফয়জল



ইরাণ-পুলিশ—পাশপোর্ট-পরীক্ষা

আঙ্কারায় বাইসিকেলের খুব ধুম! পাকা রাস্তায় তরুণ-তরুণীর দ্বিচক্রযানে বিচরণ দেখিবার জিনিষ! এখানে থিয়েটার নাই, শুধু সিনেমা-হাউস আছে। সিনেমা-হাউসে সপ্তাহে দু'দিন করিয়া অর্কেষ্ট্রার ব্যবস্থা হয়। তা' ছাড়া গান-বাজনার তেমন চর্চ্চা দেখি নাই।

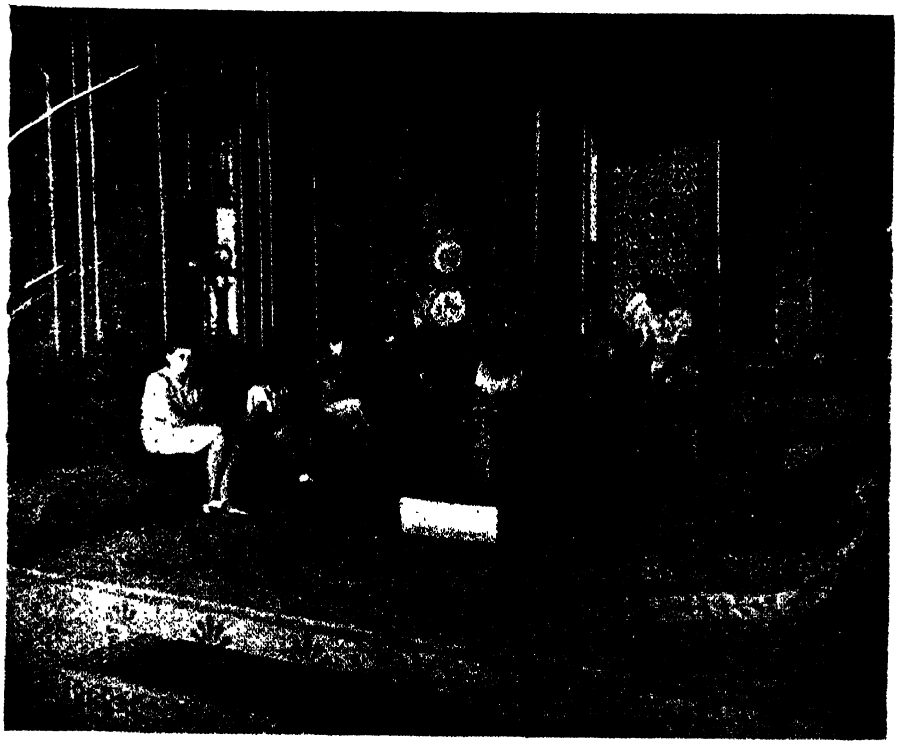
এদিককার পথ-ঘাট প্রাচীন গ্রীক-জাতির তৈয়ারী। পরে সে পথ-ঘাটের নানা সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। তুর্কীর প্রাচীন রাজধানী বরশার পল্লী-পথে সে-কালের রথচক্র-চিহ্ন এখনো মিলায় নাই!

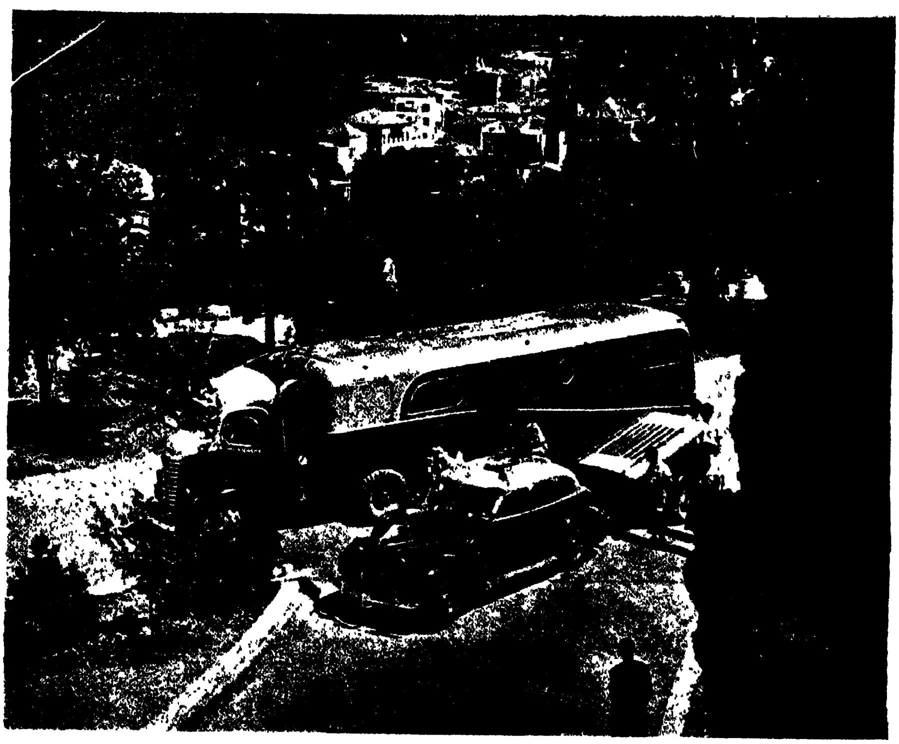
এখানে শুনিলাম, তারশ পর্ব্বতের দিক দিয়া যে-পথ ভারতে গিয়াছে, সে-পথে এ সময়ে মোটর চলিবে না! তুর্ক-গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় আমাদের গাড়ীগুলি রেলোয়ে-ট্রাকে তুলিয়া কায়েশর হইতে দুই শত মাইল দূরে আদানায় পাঠানো হইল। আদানা ঠিক সমুদ্রকূলে অবস্থিত।

আদানা মস্ত সহর। ইশ্‌লামী-আবহাওয়া নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এখানকার তুলা বিশ্ব-বিখ্যাত।

আদানা হইতে একটি ব্রাঞ্চ-রেল-লাইন গিয়াছে তারশ পর্ব্বত ঘুরিয়া সিডনস্ নদীর তীর পর্যন্ত। সিডনস্ ভূমধ্য-সাগরের সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গম-স্থলেই প্রাচীন যুগে রাণী ক্লিওপেট্রা আসিয়াছিলেন এণ্টনির সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

ট্রেণে চড়িয়া আমরা তারশ পর্ব্বতের পথ অতিক্রম করিলাম। আদানায় আমাদের জন্য বহু অনুচর মিলিল। আদানায় আসিয়া শুনিলাম, বর্ষার জলে সামনের পথে যে-সেতু ছিল, সেটি ভাসিয়া গিয়াছে; ও-পথে যাওয়া চলিবে না। সরকারী প্রাইভেট-ট্রেণে গাড়ী-সমেত আমাদের আলেকজান্দ্রেতায় পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল।


দামাস্কাশে আতিথ্য


বেইরুথ

গত মহাযুদ্ধের শেষে ফরাসীদের হাত হইতে আলেকজান্দ্রেতা আবার তুর্কির হাতে আসিয়াছে। এখান হইতে সোজা সিরিয়ায় যাইব, ইহাই আমাদের সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু এখানকার বন্ধুরা ধরিলেন, কাছে আছে হাতাই গ্রাম; তার পরেই সিরিয়ার সীমান্ত-রেখা। বন্ধুরা বলিলেন, সীমান্ত-প্রদেশের ছবি গ্রহণ করিতে হইবে! রেডিয়ো-মারফৎ আসন্ন সমরের সংবাদ ইতিমধ্যে আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এ সময় সকলের মনে প্রতিক্ষণ আশঙ্কা, ইতালী কখন্ সমর ঘোষণা করিবে! সমর ঘোষিত হইলে আমাদের এ অতিকায় ট্রাক হইবে বোমার লক্ষ্য! বিরাট বপু লইয়া এ ট্রাক্ শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবে, সে আশা আদৌ ছিল না! এমন আশঙ্কা সত্ত্বেও দু'দিন ধরিয়া আমরা ছবি তুলিলাম। বন্ধুর পাহাড়ের গায়ে কি করিয়া এ ছবি তোলা হইয়াছিল, মনে করিলে এখনো হৃৎকম্প হয়!

এখানে একটি



বাগদাদে মাছির ভয়ে আত্ম-রক্ষা



হাতাই গ্রামে বিবাহ-উৎসব

বিবাহোৎসব দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সে উৎসবেরও ছবি তুলিলাম।

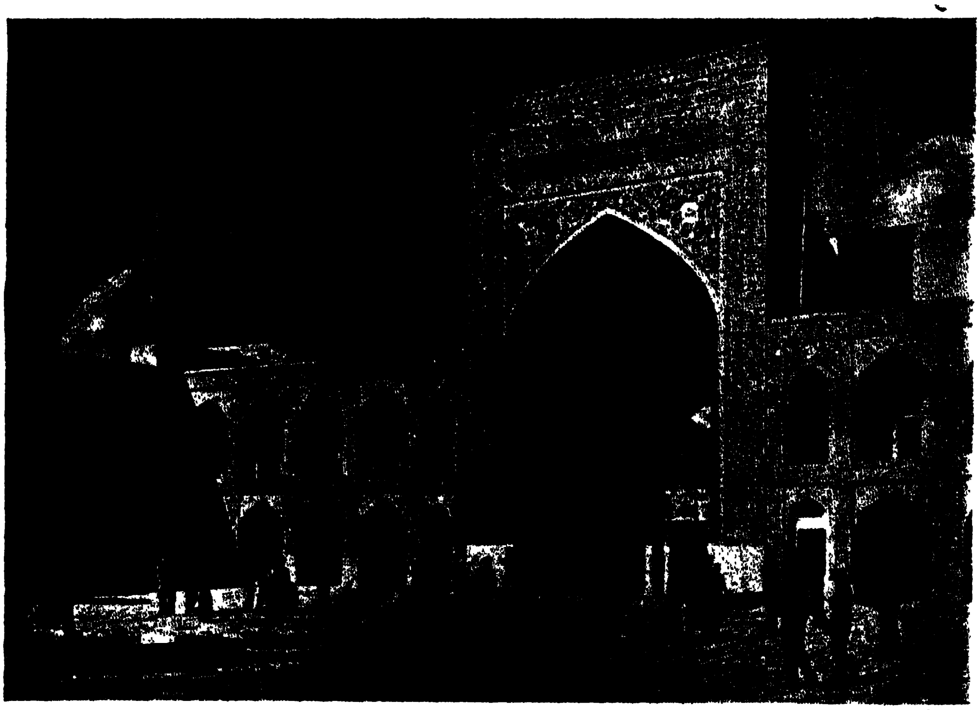
সিরিয়ার সীমান্ত-দেশে মার্কিণ রাজ-দূতের অফিসে সংবাদ পাইলাম,—যুদ্ধ বাধিয়াছে। বেই-রুথ্ সহরে কখন সে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, ঠিক নাই। ইহাতে আমরা দমিলাম না। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া আলেপোর পথে পাড়ি দিলাম; এবং অচিরে আলেপোয় আসিয়া এক তুঙ্গ গিরির শিখরে ছাউনি ফেলিলাম।

কিন্তু বিপদ ঘটিল। পেট্রোল ফুরাইয়াছে। আমাদের ট্যাঙ্কে সর্ব্বসমেত ৬০০ গ্যালন পেট্রোল ধরে। তুর্কিতে এক গ্যালন পেট্রোলের দাম তখন সাত সিকা; অথচ সিরিয়ার

এক গ্যালনের দাম সাড়ে তিন আনা! ভাবিয়াছিলাম, সিরিয়ায় ৬০০ গ্যালন পেট্রোল লইয়া ট্রাক ভরতি করিব! কিনিতে গিয়া দেখি, আমাদের মার্কিন-মুদ্রা এখানে কেহ লইতে চাহে না! উপায়? পেট্রোল না পাইলে গাড়ী চলিবে না! তা যদি বা চলে, কিন্তু দলে আছি দশ জন! এ মুদ্রা না বিকাইলে কি দিয়া খাদ্য কিনিব?



বাগদাদ্—টাইগ্রিসের বুকে সেতু



মেশেদ্—ইরাণী মসজিদ

সমস্যা-সমাধানের উদ্দেশ্যে বন্ধু ল্যারি বাহির হইলেন! কিছু টাকা ধার করিয়া ফিরিলেন। এ টাকা ধার মিলিল এখানকার জেনারেল মোটর্স এ্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পানির এজেন্টের কাছ হইতে। যে-টাকা মিলিল, সে-টাকায় খাবার মিলিবে! কিন্তু পেট্রোল? সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে গিয়া দেখা করিলাম। তাঁদের বলিলাম—জানি, যুদ্ধের জন্য সব দিকে ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইতেছে। আমাদের এত গ্যালন পেট্রোল দিতে তাই এমন নিষেধ! কিন্তু



বুলগেরিয়া—পথ



এলবুর্জের বুকে পথ

আমাদের এই দশটি প্রাণীকে এখানে বসাইয়া খাওয়াইতে আপনাদের কত ব্যয় হইবে, ভাবুন তো! তার চেয়ে প্রয়োজন-মাফিক পেট্রোল দিয়া আমাদের এ-দেশ হইতে বিদায় করিলে আপনাদের লাভ ভিন্ন লোকসান হইবে না!

বেইরুথের মার্কিন কন্‌শালকে বারে-বারে টেলিফোন করিলাম,—কোথায় কি করিয়া পেট্রোল পাইব? ২৬৫ গ্যালন পেট্রোল পাইলে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি!

অনুমতি মিলিল। কিন্তু পেট্রোলের জন্য নগদ দাম দিতে হইবে। এ টাকা কোথায় পাই? ব্যাঙ্কে গেলাম। ব্যাঙ্ক বলিল, ১৩২ গ্যালনের মাত্র দাম দিতে পারি। ১৩২ গ্যালন পেট্রোল নাও; বাকী পেট্রোল লাটাভিয়ায় গিয়া লইবে!

তাই করিলাম। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে যাত্রা করিয়া নির্বিঘ্নে কোনো মতে লাটাভিয়ায় আসিলাম। এখানে মার্কিন মুদ্রার বিনিময়ে পেট্রোল লইলাম। ১৩২ গ্যালন লইয়া আমরা চলিলাম বেইরুথের অভিমুখে। চারিদিকে দেখি, 'সাজ-সাজ' রব উঠিয়াছে! দেখিলাম,

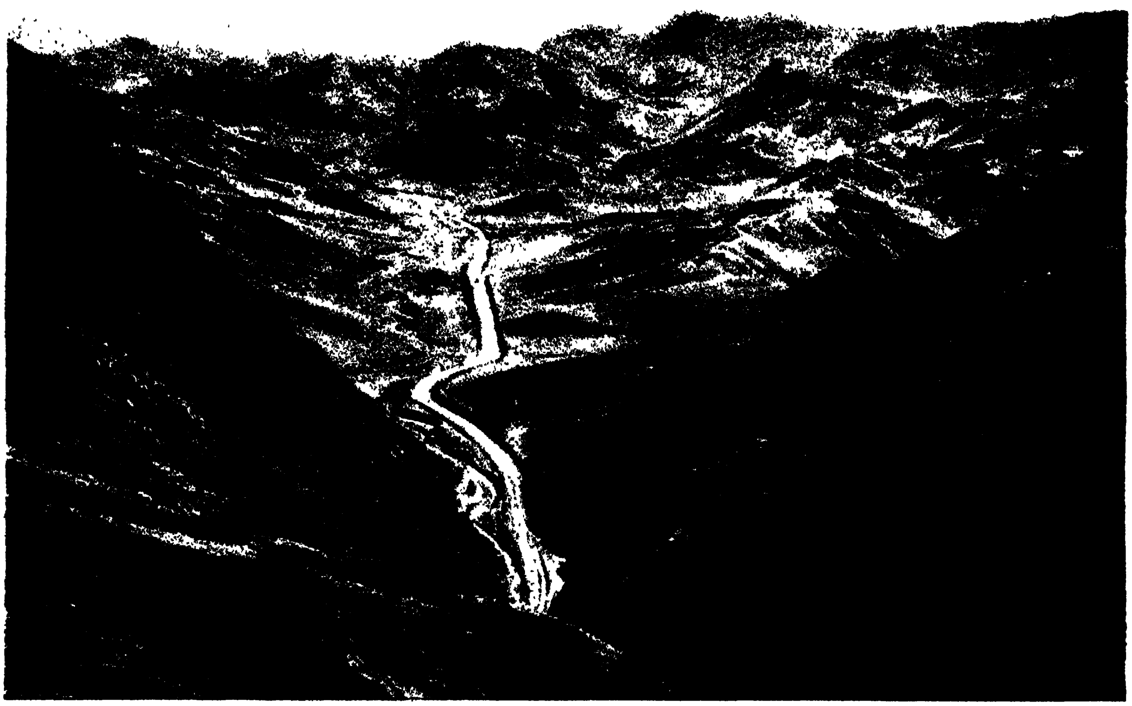


আফগানিস্তান—বামিয়ান-উপত্যকা

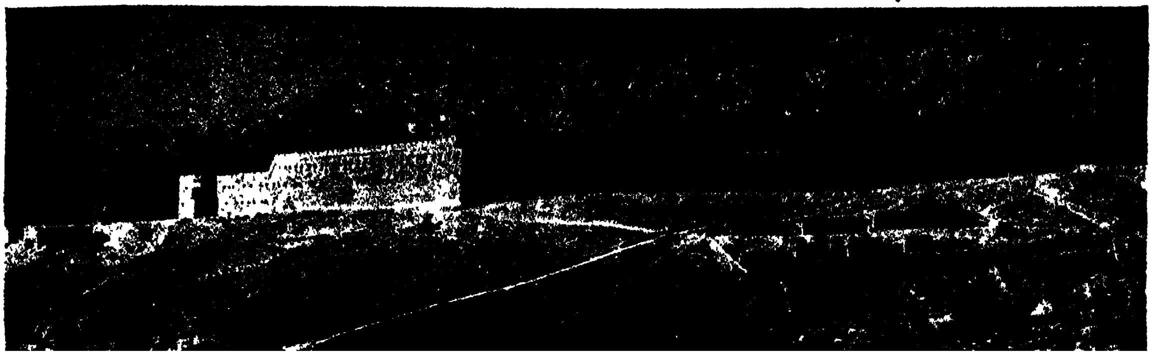
দলে-দলে সকলে ফৌজে যোগ দিতেছে! বেইরুথে আসিয়া দু' ঘণ্টা ঘুরিয়া সেখানকার মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে পৌঁছিলাম।

প্রেসিডেণ্ট বেয়ার্ড ডজ আমাদের আশ্রয় দিলেন। এখানেও যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে! মাঠে-বাটে শুধু ফৌজের কুচ-কাওয়াজ! জাহাজ আসিতেছে, জাহাজ ছাড়িতেছে। সে-সব জাহাজ একেবারে লোকে লোকারণ্য! টমাশ কুকের অফিসে লোকের ভিড়,—রেলোয়ে ষ্টেশনে ভিড়—ডকে ভিড়! ভয়ার্ত্ত প্রমত্ত লোক-জন যে যে-দিকে পারে, পলাইতেছে! কেহ চলিয়াছে কায়রোয়, কেহ চলিয়াছে হাইফায়; কেহ বা বলবেকে! আত্মানং সততং রক্ষেৎ—আকাশে-বাতাসে এ রব ছাড়া আর কোন রব নাই!

এখানকার রণাতঙ্ক দেখিয়া আমাদের ভয় হইল, ইতালী



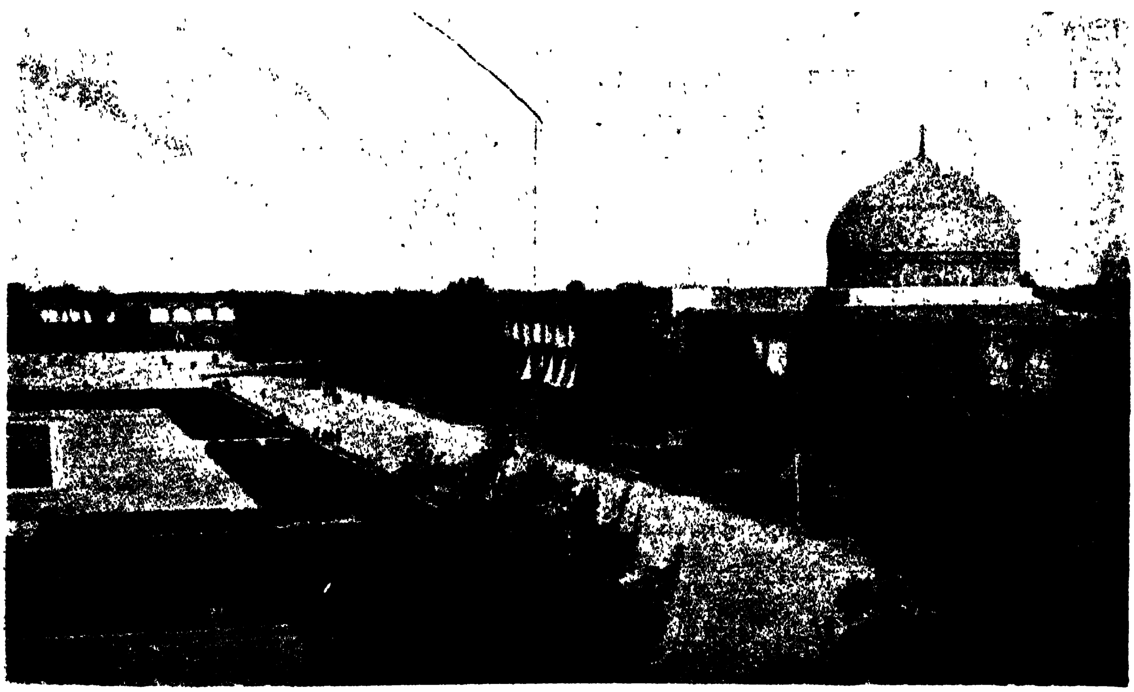
মেশেদ হইতে মোটরের পাকা পথ



জামরুদ্ ফোর্ট

কখন্ আসিয়া আকাশ-পথে অকস্মাৎ আক্রমণ করিবে! আমরা আমাদের গাড়ী-ক'খানির ছাদে বড় বড় ছাঁদে মার্কিণ-পতাকার ছবি আঁকাইয়া লইলাম। তার পর পূর্ব্ব দিকে পাহাড়-পথ ধরিয়া দামাস্কাশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এ-পথে সৈন্য-সামন্ত সব জাগিয়া উঠিয়াছে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে এখানে আমরা ৬০০ গ্যালন পেট্রোল পাইলাম। পেট্রোল লইয়া ৬০০ মাইল-ব্যাপী মরু-পথ ধরিয়া বাগদাদের দিকে চলিলাম।

বালুময় এ-মরুপ্রান্তর অকূল, অসীম! পূর্ব্বমুখে চলিয়াছি—এ মরুর বুকে বিমান-আক্রমণ সম্বন্ধে অনেকখানি নিশ্চিন্ত ছিলাম। দামাস্কাশ হইতে বাহির হইবার দু'দিন পরে আমরা আসিলাম রাতবা মরুস্থানে সামরিক ঘাঁটির সামনে। এখানে একটি দুর্গ আছে। এ দুর্গে চার জন ইরাক্-কর্ম্মচারী আমাদের সাদর-অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাঁরা বাগদাদ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন এবং এখানে আমরা যাহাতে নিরাপদে থাকিতে পারি, তাহারি সুব্যবস্থা সম্পাদন-কল্পে আসিয়াছিলেন। তাঁরা বলিলেন, পথে এক দল বেদুইন



ইস্পাহান্—ও-দিকে সেখ লুফে আল্লা মসজিদ



কাবুল—নারী-বেশে পুরুষের নৃত্য-লীলা

বিদ্রোহী হইয়াছে। তাদের মধ্যে দু'জন এমন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল যে, পিস্তলের গুলীতে তাদের নিহত করা হইয়াছে। ও-পথ খুব নিরাপদ নয় বলিয়া রাৎবা হইতে আমাদের পাহারাদারীর জন্ত তাঁরা এক দল পেট্রোল-ফৌজ সঙ্গে দিলেন। ফৌজ-প্রহরী-রক্ষিত অবস্থায় আমরা টাইগ্রিসের তীরে বাগদাদের রেশকোর্শের সামনে আসিয়া নিরাপদে পৌছিলাম।

এবার আমাদের লক্ষ্য কাবুল। শুনিলাম, ও-পথে কলেরার প্রাদুর্ভাব। আমরা কলেরা-প্রতিষেধক টীকা লইলাম। তার পর যাত্রা।

ইরাণ-আফগান সীমান্তে এক বেদুইন সেখের সঙ্গে আলাপ হইল। ভদ্রলোক ভারী অমায়িক। তিনি কথা কহেন আরবী-ভাষায়। কথাবার্তা না বুঝিলেও তাঁর সমাদর-গৌরবে তৃপ্তি পাইলাম। তিনি বলিলেন, বেদুইন জাতির জীবন-কথার পরিচয় ফটোগ্রাফে গাঁথিয়া তুলিয়া দিতে হইবে! ছবি তুলিলাম।

আমাদের মোটর-অভিযানের কথা শুনিয়া



ইরাণ-নারী রুটি তৈয়ারী করিতেছে



গজ্‌নী-সহর

কৌতূহল বশে ইরাকের বালক-রাজা ফয়জল আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। রাজার বয়স চার বৎসর মাত্র।



চাষার মেয়ে—যুগোস্লাভিয়া

তাঁর কাকা তাঁর প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন। ইংরেজ নার্শ রাজার পালন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাগদাদ ছাড়িয়া ৯০ মাইল দূরে ইরাণ-সীমান্তভাগে খানাকিনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইরাণ-রাজ রেজা শাহ পহ্লবীর সুশাসনে ইরাণ আজ অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে। আধুনিক ইরাণ সর্ব্ব-জড়তা হইতে মুক্ত। সুদৃশ্য সহর। চারি দিকে বড় বড় পাকা রাস্তা, চমৎকার ছাঁদে রচা সব বাড়ী-ঘর। মৌলবী-শেখের সে দাপট নাই—চুরি-ডাকাতি-লুঠপাট অন্তর্হিত হইয়াছে। পনেরো বৎসরে ইরাণ নূতন বেশে নূতন গৌরব-মহিমায় সমুজ্জল হইয়াছে। ইরাণ-রমণীর সে কারাবরোধ চূর্ণ হইয়াছে। তাঁরা আজ পুরুষের মতোই মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা-সম্মান পাইয়াছেন।

এখানকার পেট্রোলের উৎস লক্ষ ধারায় উৎসারিত হওয়ার ফলে ইরাণে আজ লক্ষ্মীর কৃপা অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে। নবনির্ম্মিত রেল-পথ কাস্পিয়াম্‌ হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে এবং হাজার

হাজার মাইল প্রশস্ত পথে মোটর-চলাচল দিব্য-স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার দিকে নর-নারীর চেতনা পূর্ণ-জাগ্রত দেখিলাম।



চালাশ—এলবুর্জ-গিরিপথ

মাটীর তৈয়ারী সেই প্রাচীন তিহিরান আজ ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করিতেছে।

তিহিরান হইতে আমরা আসিলাম ইস্পাহানে। জিন্দা নদীর তীরে দু'দিন ছিলাম। এখানে চাহার বাগে নূতন মাদ্রাশা দেখিবার জিনিষ। তিহিরান হইতে এলবুর্জ গিরি-বক্ষ বহিয়া শাহ যে প্রকাণ্ড পাকা পথ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সে পথ গিয়াছে চালাশ পর্য্যন্ত। এ পথের নির্ম্মাণে পূর্ত্ত-শিল্পী যে কলা-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তার তুলনা নাই! এ পথে বহু টানেল্। টানেলগুলি যেমন সুগভীর, তেমনি সুন্দর।

দারুণ বারিপাত মাথায় বহিয়া মেশেদে আসিলাম। বৃষ্টির জন্য আর বেশী অগ্রসর হওয়া গেল না। নিশাপুরে ছাউনি ফেলিলাম। এখানে ওমর খৈয়মের উদ্দেশে আমরা নতি জানাইলাম।

মেশেদের ইমাম রেজার মসজিদ দেখিবার মতো। এত বড় মসজিদ পৃথিবীর আর কোথাও নাই! মসজিদের মধ্যে চারটি সুদৃশ্য প্রাঙ্গণ আছে। মসজিদের বড় চূড়াটি আগাগোড়া স্বর্ণমণ্ডিত।



চালাশ রোডে টানেল্

এখানে দুঃসংবাদ মিলিল, ফারা এবং কান্দাহারের মধ্যে দেলমন্দ নদীর উপরে যে-সেতু, সে-সেতু বর্ষার বারিধারায় ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কাজেই আমাদের পক্ষে হিরাটে পৌঁছিবার আশা নাই।

দায়ে পড়িয়া তখন বাঁকা পথ ধরিতে হইল। এ-পথ জামিদান হইয়া বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া কোয়েটায় গিয়াছে। কোয়েটা হইতে উত্তর-পশ্চিমে এক হাজার মাইল গেলে তবে কান্দাহারে পৌঁছানো যাইবে! এই পথই গ্রহণ করিলাম।

বেলুচিস্তানের পথ বালুময়। ৪৮ মাইল পথ চলিতে সময় লাগিল তিন দিন। কোয়েটার পর পথ আগাগোড়া ভালো, ম্যাকাডাম-করা।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে দারুণ ভূমিকম্পে কোয়েটা সহর ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। এখন কাঁচা আস্তানা নির্ম্মাণ করিয়া লোক-জন বহু কষ্টে কোনো মতে সেই সব আস্তানায় মাথা গুঁজিয়া বাস করিতেছে।

কোয়েটা হইতে আফগান সীমান্তের উত্তর-দিককার পথ চমৎকার পাকা। এ-পথ চামানে শেষ হইয়াছে। চামানে আফগান-সরকারের প্রতিনিধি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা কান্দাহারে আসিলাম।

কান্দাহার হইতে গজনীর মধ্য দিয়া আসিয়া আমরা কাবুল নদী পার হইলাম। আমীরের অতিথি-নিবাসে রাজার আদরে সাত দিন বাস। এখানে নাচ-গানের রেওয়াজ নাই। নাচ বলিতে আছে শুধু পুরুষ মানুষের নাচ। মেয়েলি ঢঙে পুরুষরা এমন নাচ নাচে যে, তাহাতে যত আর্ট থাকুক, হাস্য সম্বরণ করা দায়!

সাত দিন পরে আবার আমরা পথের যাত্রী হইলাম। এ-পথে বহু জাতের নর-নারীর সঙ্গে দেখা হইল। রাশিয়ান্, চীনা, তাতার, তিব্বতী—সর্ব্ব জাতির এমন সমন্বয় আর কোনোখানে দেখি নাই।

কাবুলের উত্তর-পশ্চিমে ৯০০০ ফুট উচ্চ শিবার গিরিবর্ত্ম। এ-পথ এক দিকে সোজা গিয়াছে রাশিয়ায়; আর এক দিকে নামিয়াছে গিয়া ভারতের বুকে। ছলোলা-গিরিবর্ত্ম পার হইয়া বহু গিরি-পথ ঘুরিয়া আমরা ৮৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত বামিয়ান উপত্যকায় আসিলাম। এই বামিয়ানের এক দিকে তুষার-কিরীট হিন্দুকুশ-পর্ব্বত। হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুকুশ ছিল বৌদ্ধ-তীর্থ। এখানে অসংখ্য গিরি-গুহায় বহু বৌদ্ধ মঠ, বুদ্ধের বহু মূর্ত্তি আজো গরিমাময় বেশে বিরাজ করিতেছে। দু'টি বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে—বিশাল বিরাট মূর্ত্তি; একটি প্রায় ১৭৫ ফুট, অপরটি ১১৬ ফুট। একখানি করিয়া গোটা পাথর কাটিয়া এ-দু'টি মূর্ত্তি বিরচিত হইয়াছে।

যে মহাপুরুষের বাণী এক দিন ভারত-গগন ছাড়িয়া সুদূর নেপাল, চীন, আফগানিস্তান, জাপান ও সিংহলকে বিমুগ্ধ উদ্বোধিত করিয়াছিল, তাঁর কথা স্মরণ করিয়া আমাদের চিত্ত শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।



বুলগেরিয়ায় নৃত্য-লীলা

গিরি-বক্ষে দাঁড়াইয়া আমরা তাঁর উদ্দেশে নতি জ্ঞাপন করিলাম।

কাবুল হইতে ২০০ মাইল দূরে খাইবার-গিরিবর্ত্ম। খাইবার-বর্ত্ম দিয়া আমরা আসিলাম ভারতের মৃত্তিকা-পীঠে। পাহাড়ের গায়ে সরু পথ। এখানে উটের পিঠে চড়িয়া বহু যাত্রী চলিয়াছে—সে জন্য প্রতিপদে আমাদের গতি মন্থর হইতেছিল। খাইবার-গিরিবর্ত্ম ২৬ মাইল দীর্ঘ। তিন ঘণ্টায় এ-পথ অতিক্রম করিয়া আমরা লাণ্ডিকোটাল পৌঁছিলাম। তার পর মিলিল জামরুদ ফোর্ট। সেখান হইতে আসিলাম পেশোয়ার।

এখানে ব্রিটিশ ফৌজের সতর্ক পাহারা-ঘাঁটি আছে অসংখ্য। পাহাড়ের ও-ধারে আফ্রিদিদের আস্তানা!

পারিস হইতে পেশোয়ারে আসিলাম—১১০৬৩ মাইল। আসিতে আমাদের পাঁচ মাস সময় লাগিয়াছিল।



ভারতে ঔষধ-শিল্প

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে যে সমুদয় ভারতীয় শিল্প সঙ্কটজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ঔষধ-শিল্প তাহাদের অন্যতম। এখানে বলা আবশ্যক, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীসম্মত ঔষধাদিই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ভারতের বিশাল জনসমষ্টির শতকরা ১৫ ভাগের অধিক লোক অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ও চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করিতে সমর্থ কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এই প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসাই ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, এবং সরকারী সমর্থনে ও সাহায্যে ইহার প্রসারও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। দেড় শত বৎসরাধিক কাল হইতে এই চিকিৎসা-প্রণালী এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া, উহার কোডেক্স, একষ্ট্রা ফার্ম্মাকোপিয়া প্রভৃতি সরকারী ও আধা-সরকারী গ্রন্থাদির অনুমোদিত ঔষধাবলীই এই প্রণালীসম্মত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সেগুলি প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এইরূপ ঔষধ প্রস্তুতের জন্য দুই-একটি কারখানা ভারতের কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশেও স্থাপিত হয়; তন্মধ্যে কলিকাতা ও তৎ-সন্নিকটবর্ত্তী কাশীপুর এবং কোন্নগরস্থ ডি, ওয়াল্ডির কারখানাই এ বিষয়ে অগ্রগণ্য বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

সে যাহাই হউক, সেই সময় হইতেই অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের চাহিদার বৃদ্ধির জন্য কোন কোন প্রকার ঔষধ এ দেশের কারখানা সমূহে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকে। বিলাতী ঔষধের আমদানির পরিমাণও সেই সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও এ দেশে ঔষধ-সরবরাহে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় কতকগুলি ঔষধ এ দেশে প্রস্তুতের চেষ্টাও সরকারপক্ষ হইতে করা হইয়াছিল; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই সরকারী প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গতবার মহাযুদ্ধের অবসানের পর, সরকার এবং শিল্প-পরিচালকবর্গ আর ঐ সকল শিল্পের উন্নতি-সাধনে আদৌ কোন চেষ্টাই করেন নাই। বিশেষতঃ, বিলাতী ঔষধাদি পুনর্ব্বার এ দেশে অবাধে আমদানি হইতে থাকায় এ দেশের উদীয়মান নূতন ঔষধ-শিল্পগুলি তাহাদিগের সহিত কঠোর প্রতিযোগিতায় অধিক দিন স্ব স্ব অস্তিত্বরক্ষায় সমর্থ হয় নাই। সেই সময় হইতে দেশকে ধারাবাহিকরূপে ঔষধ সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা চলিলে উপস্থিত সঙ্কট হইতে যে কতক পরিমাণে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হইত—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সুবর্ণ-সুযোগ উপেক্ষিত হইলেও, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে ভারতীয় ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্প নানারূপ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও কিছু কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছে; আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামসমন্বিত কয়েকটি বড় বড় ঔষধের কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি সমশ্রেণীয় বিদেশীয় শিল্পের তুলনায় এ দেশের ঔষধ-শিল্প এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বারাণসীতে সম্মেলন

এই সমুদয় বিষয় সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া ভবিষ্যত উন্নতির পন্থা স্থির করিবার জন্য গত জানুয়ারী মাসে বারাণসীতে একটি 'ঔষধ-বিজ্ঞান সম্মেলনে'র অধিবেশন হইয়াছিল। কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔষধ-বিজ্ঞান বিভাগ ও তৎসংশ্লিষ্ট Indian Pharmaceutical Societyর উদ্যোগেই ইহা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মিউজিয়মের শিল্পবিভাগের অধ্যক্ষ, মিঃ এস, এন, বল এই সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের

সহিত ভারতীয় রাসায়নিক ও ঔষধ-প্রস্তুতবিদ্যাবিৎগণকে (Pharmacists) সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য যে সভার অধিবেশন হয়, বাঙ্গালোর সায়েন্স-ইনষ্টিটিউটের ডাইরেক্টর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর জে, সি, ঘোষ তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সম্মেলনে ও সভায় যোগদান করেন। এরূপ অনুষ্ঠান ভারতে এই প্রথম ; এবং ইহার সাফল্য দ্বারা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, রাসায়নিক ও ঔষধ-শিল্প সংগঠনের জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এ দেশে একটি নব-প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের বিশাল ভেষজ-ভাণ্ডারের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং ভেষজ-উদ্ভিদাদির গুণাগুণ ও ভেষজলক্ষণতত্ত্ব (Pharmacognosy) সম্বন্ধে গবেষণা যে এ দেশে এ পর্য্যন্ত অতি সামান্যই হইয়াছে, তাহাও প্রতিপন্ন করেন। সম্মেলনে গৃহীত ১৪টি প্রস্তাবে ঔষধ-বিজ্ঞান শিক্ষা, ঔষধ-প্রস্তুতবিদ্যাবিদ্‌গণের ঔষধ-শিল্প ও তৎসম্পর্কীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদিতে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সরকারী সাহায্য

সকল সুসভ্য দেশেই শিল্প-সংগঠনে সরকার পর্য্যাপ্তরূপে সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে এবং রাসায়নিক ও ঔষধ-শিল্পের ন্যায় জটিল শিল্পে এইরূপ সাহায্যের প্রয়োজন আরও অধিক। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, এ পর্য্যন্ত এ দেশে সরকার সেরূপ কোন সাহায্য প্রদান করেন নাই ; বরং নানা অজুহাতে মূল-শিল্পাদি (Key-industries) প্রতিষ্ঠায় বাধারই সৃষ্টি করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সভায় ডক্টর ঘোষের ন্যায় অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকও এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গভীর ক্ষোভের সহিত যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—আমরা স্থানাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না বটে, তবে তাহার মর্ম্ম এই যে—যখনই জনসাধারণ ব্যাপক ভাবে শিল্প-পরিপুষ্টির দাবি করিয়াছে, তখনই তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞের অভাবে তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে। আবার, ভারতে উপযুক্ত শিক্ষাদানের সাহায্যে তদ্রূপ বিশেষজ্ঞগণকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইবার প্রস্তাবেও এই বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে যে, দেশীয় শিল্পে সে সকল বিশেষজ্ঞের স্থান হইবার সম্ভাবনা অল্প।—এই কুচক্র নষ্ট করিবার জন্য এখন সঙ্কল্প দৃঢ় করিতে হইবে। সাধারণের ধনরক্ষকগণের নিকট জনগণকে সম্মিলিত ভাবে এই দাবী উত্থাপন করিতে হইবে যে, আমাদিগের শিল্পের পরিপুষ্টি ও বিস্তারের জন্য আবশ্যকীয় শিল্পতত্ত্ববিদ্‌গণকে দেশমধ্যেই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইবার ব্যয়ভার বহনের জন্য তাঁহাদিগের ধনভাণ্ডার যেন সকল সময়েই উন্মুক্ত রাখা হয়।

প্রকৃত শিল্পোন্নতি বিষয়ে সরকারের মনোভাব আমাদের এইরূপ প্রতিকূল হইলেও বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কয়েকটি বৃহৎ শিল্পে দ্রুত অগ্রসর হওয়া ভারতের পক্ষে অপরিহার্য্য বুঝিয়া ভারত সরকার গত এপ্রিল মাসে এই সকল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য একটি Board of Scientific and Industrial Research সংগঠন করেন। এই বোর্ডকে কতিপয় শিল্পের উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে। এ স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, অনেক সময় সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্পাদির যে বাস্তবিকই কোন উপকার হয় না—তাহার অন্যতম কারণ এই যে, বিশেষ বিশেষ কার্য্য-সম্পাদনের জন্য তদনুরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাচন করা হয় না। অনুপযুক্ত ব্যক্তির পরিচালনায় শিল্পের অগ্রগতি যে ব্যাহত হয়, ঔষধ-শিল্পই তাহার একটি দৃষ্টান্ত। ভেষজ-বিষয়ক অনুসন্ধানে ও ভেষজ-প্রস্তুতে এ কাল যাবৎ ডাক্তারগণেরই প্রাধান্য বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক ঔষধশিল্প পরিচালনায় ঔষধ-রসায়ন-সংক্রান্ত (Pharmaceutical chemistry) অভিজ্ঞতাই সমধিক পরিমাণে কার্য্যোপযোগী। ডাক্তারগণ ঔষধ-প্রয়োগে পারদর্শী হইলেও বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত উহা প্রস্তুতে প্রয়োজনানুযায়ী দক্ষতা প্রদর্শন করিবেন, এরূপ আশা করাই অসঙ্গত। তবে আশার কথা এই যে, সরকার এখন ঐ প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বোক্ত শিল্প ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গবেষণা পরিচালনের ভার আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যে বৈজ্ঞানিক ও ফলিত রসায়ন-শাস্ত্রে বিশিষ্ট কর্ম্মীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে—তিনি আমাদের

দেশের গৌরব স্যর শানিস্বরূপ ভাটনগর। বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিবার জন্য যে কয়েকটি কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভেষজ দ্রব্যাদি বিষয়ক কমিটীই এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর জে, এন, রায় Director of Production (Drugs & Dressings) নিযুক্ত হইয়াছেন; এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত কমিটীর পরিচালন-ভারও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই নির্ব্বাচনে যে সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভেষজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণায় ডক্টর রায় ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার সুনিপুণ পরিচালনায় কমিটী যে দেশমধ্যেই অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিদেশীয় পণ্য পরিহারে সমর্থ হইবে, ইহা দুরাশা নহে। আপাততঃ ষ্ট্রকনাইন, কেফিন প্রভৃতি উপক্ষার এবং থাইমল, কৃত্রিম কর্পূর প্রভৃতি প্রস্তুতের প্রচেষ্টা হইবে, এবং গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। এই কমিটীর কার্য্যকেন্দ্র আলিপুরে স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য কতক টাকাও কমিটী পাইয়াছেন।

ঔষধ-শিল্পের শাখা-প্রশাখা

পূর্ব্বে সকল দেশেই ঔষধার্থ উদ্ভিজ্জ দ্রব্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত এবং ইহাদিগের প্রয়োগ-রূপের (preparations) মধ্যে চূর্ণ, বটিকা, পাচন কাথ প্রভৃতিই প্রধান ছিল। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় এখনও এগুলির প্রাধান্য বর্ত্তমান। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীতে অনেক উদ্ভিজ্জ-ভেষজের কার্য্যকর সারাংশ বা বীর্য্য (Active principle) নিষ্কাশন করিয়া প্রয়োগ করা হইতেছে; তাহাতে ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় নানাবিধ যন্ত্রাদির প্রয়োজন বলিয়া ঔষধের মূল্যও বাড়াইতে হইয়াছে। আবার বর্ত্তমান যুগে উদ্ভিজ্জাত ঔষধের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া খনিজ, ধাতু, ও জৈব পদার্থ ঘটিত এবং জীবাণুজ (Biological) পদার্থ দ্বারা উহাদের স্থান পূরণ করা হইতেছে। এই সকল শ্রেণীর ঔষধ নির্দ্দোষরূপে প্রস্তুত করিতে হইলে এক দিকে যেমন বিভিন্ন প্রকার কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম-সমন্বিত কারখানা ও পরীক্ষাগারের প্রয়োজন, অন্য দিকে তেমনিই ভেষজ, রসায়ন, ভেষজ-ক্রিয়াতত্ত্ব (Pharmacology) ও জীবাণু-তত্ত্বে পারদর্শী কর্ম্মীও অপরিহার্য্য। আধুনিক ঔষধ-শিল্প-সংগঠন সেই জন্য যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃত ঔষধ ব্যতীত অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি, হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি, ক্ষতাদি চিকিৎসার ড্রেসিং, সংক্রামকধ্বংসী (Disinfectants) প্রভৃতি আরও কয়েক শ্রেণীর দ্রব্য ঔষধশিল্পের অন্তর্গত। পেটেণ্ট ঔষধ, রোগী ও শিশুখাদ্য এবং প্রসাধন দ্রব্যাদিও স্থানে স্থানে ঔষধের কারখানায় প্রস্তুত হয়। বস্তুতঃ, ঔষধ-শিল্প কতকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পেরই সমষ্টি। এ দেশে দুই-চারিটি বৃহৎ কারখানায় উক্ত প্রকারের একাধিক শ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু য়ুরোপ বা আমেরিকার বিরাট কারখানা সমূহ বহু প্রকার দ্রব্য উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত দুই-এক প্রকার দ্রব্যের ভূরি পরিমাণে উৎপাদনেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। এক কারখানায় উৎপাদিত মাল বা উহার পরিত্যক্তাংশ (waste product) লইয়া অপর কারখানা কার্য্য আরম্ভ করে। তাহাতে কার্য্য বিভক্ত হইয়া উৎপাদনের যেমন সুবিধা হয়, তেমনই দ্রুত শিল্প-প্রসারেরও সহায়তা লাভ করা যায়।

ফলতঃ, ঔষধ-শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি অন্য কতকগুলি রাসায়নিক শিল্প-পরিপুষ্টির উপর নির্ভর করে। এ দেশীয় ঔষধ-কারখানা সমূহে কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পেটেণ্ট ঔষধ ব্যতীত প্রধানতঃ টিংচার, লিকুইড একষ্ট্রাক্ট ও তৎশ্রেণীয় দ্রব্যাদিই প্রস্তুত হইত। তৎপরে কয়েকটি প্রধান এসিড যথা সাল্‌ফিউরিক্, নাইট্রিক ইত্যাদি প্রস্তুতে মনোনিবেশ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ গুরু ও সূক্ষ্ম রাসায়নিক দ্রব্যাদি—যে সমুদয় ঔষধ ভিন্ন অন্যান্য শিল্পেও অত্যাবশ্যক, সেগুলি কিন্তু এখনও প্রস্তুত হইতেছে না। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে সরকার ও দেশীয় শিল্প-পরিচালকগণের এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং ঔষধ-সংক্রান্ত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতের প্রচেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলে পূর্ব্বে বিদেশ

হইতে আমদানি করিতে হইত, এরূপ কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদন দেশমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। কার্ব্বলিক, ক্রেসিলিক, ও ট্যানিক এসিড, ক্লোরোফর্ম্ম, সংজ্ঞাপহারক ইথার, ক্যালসিয়ম ল্যাক্টেট ইত্যাদি ইহার উদাহরণস্থল। এতদ্ভিন্ন, ক্ষতাদি চিকিৎসায় তুলা ও ড্রেসিং, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার-যোগ্য বিশেষ প্রকার ড্রেসিং; কর্ক, বোতল, ব্যাগ প্রভৃতি রবারনির্ম্মিত দ্রব্য; উন্নত প্রকারের সূক্ষ্ম কাচের দ্রব্য; পোর্সিলেন ও মাটির জিনিষ ইত্যাদি যে সকল দেশী দ্রব্য এখন প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি পূর্ব্ব-ব্যবহৃত য়ুরোপ হইতে আমদানি দ্রব্য সমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু কয়েকটি মূল রাসায়নিক শিল্প দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে ঔষধ-শিল্পের স্থায়ী উন্নতি সম্ভব হইবে না। এই-রূপ বৃহদায়তন মূল শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মূলধনের বিনিয়োগ অপরিহার্য্য; তাহা সংগ্রহ করা তেমন সহজসাধ্য নহে। এ বিষয়ে আশার কথা এই যে, প্রভূত বিত্তশালী টাটা কোম্পানীর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা অচিরেই সোডা এস্, কষ্টিক সোডা, অ্যামোনিয়া পটাশ ও সোডাঘটিত অন্যান্য লবণ এবং সমপ্রকারের গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য আধুনিক সর্ব্বপ্রকার কল-কব্জা-সমন্বিত একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিতে-ছেন। বরোদা রাজ্য কোম্পানীকে বিশেষ সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই সকল গুরু রাসায়নিক দ্রব্য ঔষধ ব্যতীত অন্যান্য শিল্পেও যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। বিগত কয়েক বৎসরে এইরূপ দ্রব্যের বাৎসরিক আমদানির পরিমাণ গড়ে ৭৪ হাজার টনের কম হইবে না। সুতরাং এই প্রকার দ্রব্য কাটতির ক্ষেত্র বিস্তৃত বলিতে হইবে।

ভারতীয় ঔষধ-শিল্প আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সংপ্রতি উপযুক্ত সময় উপস্থিত; কিন্তু এই সুযোগ গ্রহণে বণিক্‌গণ যে ইতস্ততঃ করিতে-ছেন, তাহার কারণ আছে। বিলাতী দ্রব্যাদি আমদানি-বন্ধের অবসরে যে সকল দ্রব্য এ দেশে প্রস্তুত হইবে, যুদ্ধাবসানে আবার বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানি হইলে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় সেগুলি টিকিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। সরকার অবশ্য আশ্বাস দিতেছেন যে, যুদ্ধবিরতির পরও তাঁহারা এইরূপ শিল্পকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন। গত যুদ্ধের সময়েও এইভাবেই সরকারী উৎসাহের অভাব হয় নাই; কিন্তু সকলেই জানেন, সেই উৎসাহ পরে স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। তৎসত্ত্বেও সে সময়ে প্রারব্ধ কোন কোন শিল্প টিকিয়া গিয়াছে। বিদেশী সরকারের নিকট সম্পূর্ণ সাহায্যের আশা করা যায় না। এবারেও যদি দেশীয় ধণিক্‌গণ অধ্যবসায় সহকারে নূতন শিল্প পরিচালনা করেন, এবং দেশের জন্য কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করিয়া কম লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অধুনাপ্রতিষ্ঠিত শিল্প সমূহের মধ্যে কতকগুলি পরে স্থায়ী হইতেও পারে। সরকারও দেশীয় ঔষধ-শিল্পের নিকট অসময়ে যে সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা যদি তাহাদের স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ইহার উন্নতিকল্পে অন্ততঃ কিছু কিছু সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না বলিয়াই আশা করা যায়। দেশীয় ঔষধ-শিল্প ইহার অসমর্থ অবস্থাতেও সরকারকে যে সাহায্য করিতেছে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। বর্ত্তমান যুদ্ধেই ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে Director General, Indian Medical Service এবং Indian Stores Department ঔষধ ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত যে সকল দ্রব্য কিনিয়াছেন, তাহার মোট মূল্য ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ভারতোৎপন্ন দ্রব্যাদির অংশ কিঞ্চিন্‌ন্যূন সাড়ে ৫৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও অধিক। পূর্ব্ব হইতে সরকারী সাহায্য পাইলে এই সাহায্যের মাত্রা যে আরও অধিক হইতে পারিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

অগ্রগতির অন্তরায়

এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীসম্মত ঔষধ-প্রস্তুত শিল্পের কথা বলা হইল। কিন্তু জাতীয় স্বাস্থ্য সংরক্ষণ-কল্পে কিরূপ ঔষধ ভারতে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাও বিবেচনার যোগ্য। সার রামনাথ চোপরার ন্যায় ঔষধ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও স্বীকার করেন যে, অ্যালো-প্যাথিক ঔষধাদি, বিশেষতঃ আধুনিক কল-কারখানাজাত ঔষধ কখনই এরূপ সুলভ হওয়া সম্ভবপর নয় যে, তৎসমুদয় জনসাধারণের (Masses) আর্থিক অবস্থার উপযোগী হইবে। তাহাদিগের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ প্রণালীতে প্রস্তুত দেশাভ্যন্তর্জাত উদ্ভিজ্জ, খনিজ ও প্রাণিজ

ভেষজ দ্রব্যের বিস্তৃত ব্যবহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সম্প্রতি সরকার অবশ্য য়ুনানী ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচারের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু এই সকল প্রণালী-সম্মত ঔষধ সরকারের পূর্ণ অনুমোদন লাভ করে নাই।

এই প্রসঙ্গে ফার্ম্মাকোপিয়ার কথা স্বভাবতঃই উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে এ দেশে ব্যবহারোপযোগী ঔষধাদি লইয়া ফার্ম্মাকোপিয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল, যথা—O'spanghnessyর Bengal Dispensatory এবং Waringএর Pharmacopoeia of India। কিন্তু বহুকাল হইল, সেগুলির প্রচলন বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়াই এ দেশের সরকারী ফার্ম্মাকোপিয়া। এই বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া ভারতের জনগণের স্বার্থের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সঙ্কলিত হয় নাই; ইহা প্রধানতঃ বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণের চিকিৎসার সৌকর্য্যার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্ব্বে বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় কোন সুপরিচিত ভারতীয় ভেষজ ছিল না। এই বিষয়ে আন্দোলনের ফলে বহু শতাব্দী-প্রচলিত কয়েকটি ভেষজ—যথা বেল, কুরচি, চিরেতা ইত্যাদি প্রথমতঃ Indian & Colonial Addendumএ এবং পরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় স্থান লাভ করে। কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ফার্ম্মাকোপিয়ায় সেগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সেগুলি মাত্র স্থানীয় ব্যবহারের উপযোগী। অথচ অপর দেশের স্থানীয় ভেষজ পূর্ব্বাপর বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় সমান ভাবে বিরাজ করিতেছে। কোন কোন স্থানে ভারতীয় ভেষজের সাক্ষাৎভাবে ক্ষতি করা হইয়াছে—যেমন চন্দন ও ইউকালিপ্টাস তৈল। চন্দন-তৈল ভারত ব্যতীত অন্য স্থানে অতি সামান্যই উৎপন্ন হয়, এবং ইহা বহু প্রাচীন কাল হইতে দেশ-বিদেশে চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়ার চন্দন-তৈল বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা প্রকৃত চন্দনবৃক্ষজাত নহে। চন্দনের সমবর্গীয় দু'-একটি গাছের তৈলের বিশেষ বিশেষ অংশের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। চিকিৎসায়ও ইহা প্রকৃত চন্দন-তৈলের ন্যায় গুণশালী বলিয়া সকল চিকিৎসক স্বীকার করেন না। তথাপি অষ্ট্রেলিয়ার সুবিধার্থ ইহা অনুমোদিত হইয়াছে। ভারতে ইউকালিপ্টাস তৈল এখন যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ইহা চিকিৎসায় ব্যবহারের উপযোগী, এবং Phellandrine প্রমুখ অবাঞ্ছনীয় উপাদান ইহাতে নাই, কিন্তু ইহার Cineol মাত্রা কিছু কম; যদিও বিশেষজ্ঞগণের মতে তাহাতে গুণের কোন হানি হয় না। সম্প্রতি বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়াতে Cineol মাপ (standard) এরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ভারতীয় তৈল অনুমোদিত হওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া ওঠে।

আবার ইহাও দ্রষ্টব্য যে, বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার অনেক ঔষধ এতদ্দেশে পাওয়া যায়; যেগুলি পাওয়া যায় না, সেগুলিও চাষ করিয়া উৎপাদন করা অসম্ভব নয়। সিঙ্কোনা, ইপিকাক্, জ্যালাপ প্রভৃতি তাহার উদাহরণ স্থল। এরূপ অবস্থায় ভারতে বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার প্রচলন কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। ভারতের জন্য ভারতীয় ফার্ম্মাকোপিয়া প্রণয়ন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় এবং অ্যালোপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদীয় ও য়ুনানী চিকিৎসা-প্রণালীসম্মত সমস্ত পরীক্ষিত ঔষধই স্থান পাইতে পারে। এরূপ ফার্ম্মাকোপিয়া প্রণয়ন সময় ও প্রভূত অনুসন্ধান-সাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু অসাধ্য নহে। নব্য চীনের ফার্ম্মাকোপিয়া এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতে পারে। ইহাতে যেমন পাশ্চাত্য প্রণালীর কোন বিশিষ্ট ঔষধ পরিত্যক্ত হয় নাই, তেমনই বহুকাল-প্রচলিত দেশান্তর্জ্জাত ভেষজ সমূহও যথাযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে।

ভারত সরকার ভেষজ-দ্রব্য প্রস্তুত, বিতরণ ও মজুদ রাখা ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্প্রতি Drugs Act বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ঔষধালয় ও কারখানা পরিচালনা সম্বন্ধেও Pharmacy Bill কেন্দ্রীয় পরিষদে অনধিককালের মধ্যে উপস্থাপিত করিবার কথা শুনা যাইতেছে। কিন্তু ঔষধ-শিল্প সংগঠনের যাহা প্রধান পরিপন্থী অর্থাৎ আধুনিক ঔষধ-প্রস্তুতবিজ্ঞান শিক্ষার অভাব, তাহা দূরীকরণের জন্য কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। উচ্চশিক্ষিত ঔষধপ্রস্তুতবিদ্যাবিৎ ব্যতীত যে ঔষধ-শিল্পের উন্নতি অসম্ভব, তাহা সরকার সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না,

বা করিলেও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করিতেছেন না। বঙ্গদেশে ডাক্তার আক্কেল মারিয়ার প্রস্তাবিত দুই লক্ষ টাকা দানের সাহায্যে একটি ঔষধ-প্রস্তুত বিজ্ঞান শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরিকল্পনা হইয়াছিল। সে সম্বন্ধেও আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। ভারতের ঔষধ-শিল্প উপযুক্ত ভাবে সংগঠিত হইলে এতদ্দ্বারা দেশ যে ঔষধ বিষয়ে শুধু স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহা নহে, ভারতের ভেষজ অন্য দেশের বাজারেও স্থান পাইতে পারে। আশা করা যায় যে, এই বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী মহলে যে নব উদ্যম দেখা দিয়াছে, তাহা উপযুক্ত পন্থায় পরিচালিত হইয়া ভবিষ্যৎ ভারতীয় ভেষজ-শিল্পের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

খুকীর মাতৃত্ব

খুকী দিবা-রাতি এক মনে শুধু সাজাইছে খেলা-ঘর,
সংসারে তার এত বেশী কাজ নাহি মিলে অবসর।
নিকানো গোছানো শুধু সারাক্ষণ,
তবু স্থির কভু নাহি রহে মন;
হাঁড়ি-হাতা-বেড়ি বার বার ধুয়ে জড় করে ভূমি 'পর।
খুকী দিবা রাতি সাজাইছে খেলা-ঘর।
ইটের সারিতে ঘরের সীমানা ভাঙে গড়ে বার বার,
উদ্দেশে কারে বকা-ঝকা করে—যেন সে পারে না আর!
মাটির পুতুল খোকা তার কাঁদে,
ভুলাতে ভুলাতে কোলে লয়ে বাঁধে।
বলে, যাদুমণি কেঁদো না লক্ষ্মী দেবি নেই বেশী আর।
ছোট ছেলেটিরে ভুলাইছে বার বার।
মা ডাকেন, খুকী ভাত খাবি আয়, বেলা হোল দু'পহর,
যা হোক্, ধন্য! তোর একলারই আছে শুধু খেলা-ঘর?
নাওয়া-খাওয়া গেল, শুধু খেলা খেলা,
খেলা-ঘর নিয়ে কাটে সারা বেলা,
মন দিয়ে আগে লেখাপড়া কর, হবে খেলা তার পর,
উঠে এস, খুকী, বেলা হোল দু'পহর।
খুকী রুখে বলে, বোঝ না কিছু, খায়নি এখনো ছেলে;
কত অন্যায় হবে বল দেখি আমি গিয়ে আগে খেলে?
আজকে ঠাকুর জন্মোৎসব,
বিকেলে তোমরা ঠিক এস সব;
অনেক কাজ, মা, এখন আমার, চলবে না খেতে গেলে;
দেখছ না চেয়ে খায়নি এখনো ছেলে?
মা শুনে হাসেন—ও খুকী, তুই যে ঘরণী আমার চেয়ে!
এই তো সে দিন জন্মালি মোটে, এইটুকু ছোট মেয়ে!
বুড়ো গিন্নি যে ছেলে-মেয়ে নিয়ে।
কষ্ট হবে না হোলে পরে বিয়ে,
আমাদের কথা ভুলে যাবি তুই শ্বশুরের ঘর পেয়ে,
এখনি যে তুই ঘরণী আমার চেয়ে!
খুকী দিন-রাত করে আপনার ঘরকর্ণারই কাজ—
ঝাড়া-মোছা-ধোয়া-নিকানো-গোছানো-পরানো ছেলের সাজ।
কাদার বড়িতে রাঁধে ঝোল ঝাল,
ফুলের রেণুতে অম্বল ডাল,
চূণ গুলে রাখে, সুধাইলে বলে, পায়েস হ'য়েছে আজ,
ব্যস্ত সে নিজে ঘরকর্ণারই কাজ।
সমবয়সীরা হাসিভরা মুখে খেতে বসে সারি গেঁথে,
পরের গৃহিণী খুকী তাহাদের খাওয়ায় কত কি বেঁধে।
ডাল-ভাত তারা মিছামিছি খায়,
যেন কত স্বাদ পেয়েছে দেখায়।
আসিয়াছে যেন কঠিন ধরার ভার-বোঝা পিঠে বেঁধে।
সমবয়সীরা খেতে বসে সারি গেঁথে।
সে দিন সহসা খুকীর রোদনে সারা বাড়ী থতমত!
মনে হোল যেন শোণিত ঝরানো হ'য়েছে গভীর ক্ষত।
সে ক্ষত বুঝি বা শুকাবে না আর,—
লেগেছে মরমে সে যে গো তাহার!
মা আসেন ছুটে, ঠাকুমা, কাকিমা, বুঝান খুকীরে কত!
খুকীর রোদনে সারা বাড়ী থতমত!
কত আদরের মাটির খোকাটি ভেঙেছে খুকীর ভাই,
আকুকণ্ঠে করুণ নয়নে কাতর রোদন তাই।
মা বলেন, খুকু কেঁদো না মাণিক!
আবার পুতুল কিনে দেব ঠিক,
ওর চেয়ে ভাল, বেশী দাম দিয়ে,—যেমন তোমার চাই;
আর ভাঙবে না তোমার দুষ্টু ভাই।
খুকী বলে কেঁদে, চাই না পুতুল, সেই ছেলে এনে দাও;
আমরা কি তবে পুতুল তোমার, ভেঙে গেলে কিনে নাও?
চাও না তখন আমাদের আর?
বেশী দাম দিয়ে খুঁজে কি বাজার
আরো ভাল দেখে ছেলে-মেয়ে সব কিনে নিতে বুঝি চাও?
চাই না পুতুল, সেই ছেলে এনে দাও।
অবাক হইয়া মা থাকেন চেয়ে! একি কথা খুকী কয়?
সহসা তাঁহার দু'-নয়ন বেয়ে শোকের অশ্রু বয়।
নব যৌবনে যে শিশুটি তাঁর
হেনেছিল শেল হৃদয়ে সবার,
সে যে গেছে রেখে স্মৃতির সুবাস মানস-কানন-ময়!
মা ভাবেন তাই, এ কি কথা খুকু কয়!
এ ভুবনে যাহা কঠিন কঠোর শিখালো কে তোরে হায়।
জীবন-প্রভাতে রবির আলোক কেন এ আঁধার-ছায়?
যে স্নেহ জড়ানো খেলার পুতুলে
পারিবি কি যেতে এ জীবনে ভুলে?
জননী-হৃদয় বিকশিয়া উঠে কেন দুখ-বেদনায়?
শৈশবে তোরে স্নেহ কে শিখালো, হায়?

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়।



৪

বার দিন পরে সুনীলের ছুটী শেষ হইল। বীরেন বাবুর স্ত্রী অনেকটা সুস্থ হইলেও তাঁহার চিকিৎসকগণ আরও এক মাস তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা সঙ্গত মনে করিলেন না। সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সুনীল আজই সন্ধ্যায় কর্ম্মস্থানে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

অপরাহ্নে বীরেন বাবুকে সঙ্গে লইয়া রমাপ্রসাদ বাবু বাহিরে গিয়াছেন। বাগানে যুবক-যুবতীদের কোন দল ব্যাডমিণ্টন খেলিতেছে, কেহ কেহ চৌতারায় বসিয়া চা পান করিতেছে। তখন প্রতিমা, সুশীল, নিনা ও শেফালী খেলায় রত; নিনা ও দীপ্তেন চৌতারায় বসিয়া আলাপ করিতেছে। সুনীল যেন কাহার সন্ধানে আসিয়া চারি দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল।

সুনীল অন্যমনস্ক ভাবে তাহার মাতার শয়নকক্ষের দিকে চলিল। তাহাকে দেখিয়া রমাপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। দত্ত-গৃহিণী পুত্রকে বলিলেন, "তুমি খেল্‌তে যাওনি বাবা?"

সুনীল বলিল, "না মা; আজই রাত্রির ট্রেণে চ'লে যাব কি না, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম।"

সুনীলের মা সস্নেহে বলিলেন, "বোস্ বাবা! তা আজই হঠাৎ যাচ্ছিস্ যে? কাল গেলেও তো চল্‌তো। তোকে যেতে দিতে আমার একটুও মন সরছে না। তোর চেহারা দেখলে মনে হয়—যেন কত দিনের রোগী! কি হ'য়েছে, বল্‌তো! সদাই বিমর্ষ, উন্মনা ভাব! হাসতে যেন ভুলেই গেছিস্।"

সুনীল একটু হাসিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিল; কিন্তু তাহার চক্ষুতে মনের কোন গুপ্ত বেদনা যেন ফুটিয়া উঠিল। মাতার চক্ষুতে কি তাহা অলক্ষিত থাকে? তিনি আবার বলিলেন, "আমার কাছে লুকোস্‌নি, বাবা, আমায় সব খুলে বল্। আমি ক'দিন ধরেই তোর এ ভাব লক্ষ্য করেছি; কিন্তু আমার বেশী কথা বলা নিষেধ ছিল তাই জিজ্ঞাসা ক'রতে পারিনি।"

সুনীল অবহেলার ভঙ্গিতে বলিল, "কি আবার হবে? তুমি যে কাণ্ড ক'রে ব'সেছিলে, তা'তে কি আর মন ভাল থাকে, না স্ফূর্ত্তি করতে ইচ্ছা হয়?"

মা বলিলেন, "যত ভাবনা বুঝি তোরই হ'য়েছে? ডাক্তাররা আমাকে অভয় দিয়ে গেছেন, আমি প্রায় সেরে উঠেছি; কিন্তু তোর বিমর্ষ ভাব তো সে জন্যে কমছে না, বরং বেড়েই গেছে। সকলে হাস্‌ছে, খেল্‌ছে, স্ফূর্ত্তি করছে; কেবল তুই কেমন মন-মরা হ'য়ে দিনরাত কি যে ভাবছিস্—তা তুই-ই জানিস্ বাবা!"

সুনীল মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমার জন্যে তোমাকে এখন আর অত মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি শিগ্‌গির ভাল হ'য়ে উঠে, দিন-কয়েক আমার ওখানেই থাকবে। যদি-বা কিছু দিনের জন্য এই বিদেশে ছেলের কাছে এলে, তা হঠাৎ অসুখ বাধিয়ে পরের বাড়ীতেই পড়ে রইলে। আমি তোমাকে নিজের বাসায় রেখে তোমার পরিচর্য্যা করতে পারলাম না মা, এমনি আমার দুর্ভাগ্য!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, বোধ হয় মনের ভাব গোপন করিবার জন্যই বলিল, "কিন্তু মা, তোমার অসুখে আমাদের এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হ'য়েছে। পৃথিবীতে যে এমন সদাশয়, পরোপকারী লোক আছেন, তা পূর্ব্বে ধারণাই ক'রতে পারিনি। আজ কাল তো শিক্ষিত লোকরাও আত্মীয়-স্বজনের জন্য কিছু করেন না বা করতে পারেন না; আর এঁরা অপরিচিত বিদেশী

আমরা, আমাদের জন্যে কি না করছেন? রমাপ্রসাদ বাবুর এ ঋণ জীবনেও বোধ হয় শোধ করতে পারব না।"

মা বলিলেন, "সে সত্যি; কিন্তু এই অসুখে প'ড়ে আমার মস্ত একটা লাভ হ'য়েছে, বাবা!"

সুনীল বিস্মিত ভাবে বলিল, "লাভ! অসুখে ভুগে সব দিক দিয়ে মানুষের ক্ষতিই তো হয়,—তোমার আবার কি লাভ হ'ল শুনি?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, লাভ হ'য়েছে বৈ কি! অসুখে পড়ায় আমি একটি রত্ন লাভ ক'রেছি—একটি মেয়ে! বুঝি বহু তপস্যার ফলেই এমন মেয়ে কারো ভাগ্যে জুটতে দেখা যায়! আমার নিজের মেয়েদের যদি শেলীর মত ক'রে গ'ড়ে-তুলতে পারতুম তো নিজেকে পরম ভাগ্যবতী ব'লে মনে করতুম। ইচ্ছা হয়, শেলীকে দেশে নিয়ে গিয়ে সর্ব্বদা কাছে রাখি। তা'কে এক মুহূর্ত্তও কাছ-ছাড়া করতে ইচ্ছে হয় না রে!"

মায়ের এই কথার পর সুনীলের মনের ভাব গোপন করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল; তাহার মনের কপাট যেন আচম্বিতে খুলিয়া গেল! সে আশ্বস্ত চিত্তে ভাব-গদগদ কণ্ঠে বলিল, "সত্যি মা! তুমি যা বল্লে, তা' সত্যিই কি তোমার মনের কথা? চিরদিনের জন্য তাকে তুমি কাছে রাখতে চাও?"

পুত্রের আবেগপূর্ণ উক্তি শুনিয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ উজ্জ্বল চক্ষু দু'টির দিকে চাহিয়া দত্ত-গৃহিণী বিস্মিত হইলেন; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহার চোখে-মুখে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। সুনীল তাহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ বিদ্রূপ-পূর্ণ স্বরে বলিল, "ওকি মা! মুখে যা' বল্লে, কাজে যদি তা কোন দিন ঘটে, এই ভেবে কি হঠাৎ ভয় পেলে?"

মাতা-পুত্র উভয়েই কিয়ৎকাল নীরব! উভয়েই বোধ হয় পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। অল্প কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সুনীল সংযত স্বরে বলিল, "আচ্ছা মা, তুমি যে মিস্ মিত্রকে নিজের মেয়ের মত সর্ব্বদা কাছে রাখতে চাইছ, ভেবে দেখেছ কি যে—তাঁকে সে ভাবে পেতে হ'লে কি রকম ব্যবস্থা ক'রে তাঁকে নিয়ে যেতে হবে? তিনি তো আর অম্নি গিয়ে মেয়ের মতো তোমার কাছে থাকতে পারেন না।"

মা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কেন পারবে না? সে যে আমায় "মা" ব'লেছে রে! মেয়ে মায়ের কাছে থাকবে, তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছু আছে না কি?"

সুনীল কুণ্ঠিত ভাবেই বলিল, "হাঁ,—ইয়ে—তা অল্প দিনের জন্য হ'লে তা'তে হয় তো কোন আপত্তি কি অসুবিধে হয় না; কিন্তু চিরদিনের জন্য কি তা সম্ভব মা! তোমরা কি সত্যিই গৃহস্থঘরের মেয়েকে কন্যারূপে বরণ করতে পারবে? তোমাদের কি তাতে মান-সম্ভ্রমের হানি হবে না? সমাজে বাস ক'রে মানুষের সকল কামনাই কি পূর্ণ হয়?"

মা বলিলেন, "তোর ও-সব বাজে কথা রাখ। শেলীকে আমার মেয়ে ব'লে পরিচয় দিতে আমার আনন্দই হবে। তাতে মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবে কেন—তা বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার ঘটে নেই, বাবা!"

সুনীল সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "মা, তোমার বুদ্ধি নেই, এ সন্দেহ কে ক'রবে? কিন্তু কথা এই যে, মিস্ মিত্র কোন্ অভাবে পরের ঘরে গিয়ে পালিতা কন্যার মতো সেখানে থাকবেন? তবে যদি তোমার বৌ ক'রে তাঁকে ঘরে নিয়ে যেতে পার, তা হ'লে তোমার ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হ'তেও পারে। কিন্তু সে কাজ কি তোমরা করতে পারবে?"

পুত্রের স্পষ্ট কথা শুনিয়া সুনীলের মাতা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; তাঁহার মাথায় মুহূর্ত্তে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! কিন্তু তিনি আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সুনীল বলিল, "আমি বেশ জানি, তা' তোমরা পারবে না মা! অনুকম্পা ও স্নেহের পাত্রী হ'য়ে তোমার ঘরে তাঁর স্থান হ'তে পারে, কিন্তু বরণীয়া বধূরূপে তিনি গ্রহণের যোগ্যা ন'ন। তোমাদের ধারণা, মিস্ মিত্র সামাজিক মান-সম্ভ্রমে তোমাদের সমকক্ষ ন'ন, বা হ'তে পারবেন না। কেমন, এই তো তোমার মনের কথা?"

এ কথায় মা নির্ব্বাক্ রহিলেন। শেলীকে বিবাহ করিবার জন্য সুনীলের যে আগ্রহ হইতে পারে, রোগশয্যায় পড়িয়া-থাকিয়া তাহা কোনও দিন তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ঘরের বৌ আনতে হ'লে অনেক দেখে-শুনে আনা দরকার; দু'দিনের পরিচয়ে কি চিরদিনের জন্য ঐ রকম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত? বংশ-পরিচয়

ভাল ক'রে জানা চাই। রূপে বা গুণে মুগ্ধ হ'য়ে কি অজানা ঘরের মেয়েকে বৌ ক'রে ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়? শেলী সত্যই রূপে-গুণে অনুপমা, কিন্তু সে জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর আশ্রিতা বা পালিতা কন্যাকে কি আমরা ঘরের বৌ করতে পারি? তাঁর নিজের মেয়ে হ'লেও বা ও-কথা এক দিন ভেবে দেখা চ'লতো।"

সুনীল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "মিস্ মিত্র তো রমাপ্রসাদ বাবুর আশ্রিতা ন'ন। তাঁ'র বাবাও ডাক্তার ছিলেন; বিশেষতঃ তাঁর এই মেয়েটিকে তিনি অসহায়া অবস্থাতেও রেখে যাননি।"

মা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শেলীর বাবা হয় তো একটা ছোট-খাট ডাক্তার ছিলেন; তা' ছাড়া, ওদের পরিচয় দেবার মত কিছু আছে ব'লেও মনে হয় না। রমাপ্রসাদ বাবু তো ওর বাপের দাদা ন'ন, তাঁর বন্ধুর মেয়ে; বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন, তাই শেলী তাঁ'কে জ্যাঠা ব'লে ডাকে। এত বয়স পর্য্যন্ত শেলীর বিয়ে না হওয়ার কারণও হয় তো তাই; কেউ ওদের চেনে না, জানে না। কোন্ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক অজ্ঞাত-কুলশীল মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন?"

সুনীল এবার আবেগভরে বলিল, "মিস্ মিত্র কখনই যে-সে ঘরের মেয়ে ন'ন, বংশগৌরব না থাকলে কি ঐ রকম স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন হওয়া সম্ভব? যাক সে কথা; রমাপ্রসাদ বাবু তো তোমাদের বিবেচনায় অচল ন'ন। দীপ্তেন সব দিক দিয়েই চমৎকার ছেলে,—তার সঙ্গে কি প্রতিমার বিয়ে দিতে তোমরা রাজী হবে?"

মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না বাবা! প্রতিমা আমার কোলের মেয়ে; আমি এত দূরে ওর বিয়ে দিতে পারব না। দীপ্তেনকে হয় তো পূর্ব্ব-বাংলার কোন ম্যালেরিয়া-ভরা ডুবো মহকুমায় থাকতে হবে! সেখানে না আছে কলের জল, না আছে বিজলীর আলো, পাখা; সেখানে প্রতিমা বাস করতে পারবে কেন? আর প্রথমে সামান্য মাইনেতেই ছেলেটিকে সংসার চালাতে হবে। তোর দিদিদের তেমন অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে হয়নি, ওঁর ইচ্ছা—প্রতিমার খুব ধনবানের ঘরে বিয়ে হয়।"

সুনীল অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "আমিও তো তাই বল্‌ছিলাম, তোমরা চিনেছ শুধু টাকা; যার টাকা আছে —তোমাদের কাছে তারই বনেদী ঘর, উঁচু বংশ। আশা করি, মিষ্টার সিংহের দৃষ্টি-ভঙ্গি একটু অন্য রকম। দীপ্তেনের সঙ্গে নিনার বিয়ে হ'লে ওরা সুখী হ'তে পারবে।"

মা এবার যেন আকাশ হইতে পড়িয়া কাতর ভাবে বলিলেন, "অমন কথা মুখে আনিস্‌নি বাছা! আমাদের চিরদিনের সাধ, নিনার সঙ্গে তোর বিয়ে দিই। সে সাধ কি আমাদের মিট্‌বে না? এই বুঝি তোর মায়ের ওপর খুব ভালবাসা?"

সুনীল এবার একটু উত্তেজিত স্বরেই বলিল, "তোমরা কি কিছুতে বুঝতে পারবে না যে, আমি নিনাকে বিয়ে ক'রতে পারিনে। ছোট বোনের মতোই আমি ওকে ভালবাসি; সে ভালবাসা মুছে-ফেলে সেখানে অন্য কোন ভাবের স্থান নেই মা! এ ঔষধ নয় যে, ঘাড় ধ'রে জোর কোরে গিলিয়ে দেবে। আর আমি যত দূর জানি, নিনাও আমাকে বড় ভাইয়ের মতোই দেখে।"

সুনীলের মা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "তোদের যত অনাসৃষ্টি কথা! নিনাকে বিয়ে কর্‌বি না তো কি চিরজীবন এই রকম লক্ষ্মীছাড়ার মতো কাটাবি?"

সুনীল বলিল, "না মা! এইবার আমি ভগবানের কাছে ও মানুষের কাছে আমার যা কর্ত্তব্য, তা পালন ক'র্‌ব। তোমাদের মনে কষ্ট দিতে চাই নে ব'লেই এত দিন তা' ক'রতে পারিনি; কিন্তু মনে একবিন্দু শান্তি পাইনি।"

সুনীলের মা এবার ঝর-ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিলেন; আর্ত্তস্বরে বলিলেন, "তবে কি তুই আমাদের ত্যাগ কর্‌বি? তুই তো জানিস্, উনি কখনই সে বৌ ঘরে তুলবেন না।"

সুনীল ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "আমি নিরুপায়। কিন্তু তোমাদের আমি ত্যাগ ক'র্‌ব না; তোমরাই আমাকে ত্যাগ ক'র্‌বে, তা আমি জানি।"

মাতাকে বিচলিত দেখিয়া সুনীল আর কোন কথা বলিল না। সে তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া উঠিবে, এমন সময় শেলী জলখাবার ও চা লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতেই সুনীল আর উঠিবার চেষ্টা করিল না।

শেফালী বলিল, "মিষ্টার দত্ত, আপনি চা না খেয়েই চ'লে এলেন যে? সেই কোন্ সকালে খেয়েছেন; ক্ষিদে পায় না বুঝি?"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "কে বল্লে, আমি চা খাইনি? আপনি তো খেলায় যেতে ছিলেন; কিছু খবর রাখেন?"

শেফালী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিল, "আর দেরী করবেন না, শীগ্‌গির চা-টা খেয়ে নিন্।"

তাহার পর সে সুনীলের মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই বলিল, "এ কি মা! আপনি কাঁদ্‌ছিলেন বুঝি?" তার পর সুনীলকে বলিল, "মিষ্টার দত্ত! এ আপনার ভারী অন্যায়। মা আপনার কাছে আছেন জেনে আমি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম, আর আপনি এসে কি না মা'কে কাঁদাচ্ছেন। উত্তেজনা কোনও সময়েই যে ওঁর পক্ষে ভাল নয়, তা' তো আপনি জানেন।"

সুনীলের মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওর কোন দোষ নেই মা! আজ রাত্রেই ও চলে যাচ্ছে কি না, তাই আমার মনটা ভাল নেই।"

শেফালী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "মিষ্টার দত্ত! এ কথা তো আমাদের আগে বলেননি। আজই আপনার না গেলেই কি নয়? না হয় আরও কিছু দিনের ছুটী নিন্।"

সুনীল নিরুৎসাহ চিত্তে বলিল, "আমরা পরের চাকর, ইচ্ছা করলেই কি আমাদের ছুটী মেলে? মাকে সুস্থ ক'রে বাড়ী পাঠিয়ে-দিয়ে যেতে পারলে তো ভালই হোত।"

শেফালী আর তাহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ না করিয়া তাঁহার মাকে বলিল, "আমি ওঁর খাবারের ব্যবস্থা ক'র্‌তে যাচ্ছি। আজ রাত্রেই উনি চ'লে যাবেন, তা আমি আগে তো জান্‌তে পারিনি।"

সুনীল শেফালীকে বলিল, "আপনি সে জন্য ব্যস্ত হবেন না, খাবারের কথা আমি আগেই ব'লে দিয়েছি।"

শেফালী উঠিয়া বলিল, "আমি দেখি, কি ব্যবস্থা হ'য়েছে; কি জানি, সময়ে. যদি সব জোগাড় না হ'য়ে থাকে।"

শেফালী প্রস্থান করিলে সুনীলও অন্যমনস্ক ভাবে বাতায়নের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বাতায়ন-পথে সুনীল দেখিল, শেফালী 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'র মতো উদ্যান-পথে রন্ধনশালার দিকে চলিয়াছে। সুনীল সতৃষ্ণ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

সহসা মায়ের আহ্বানে সুনীলের চমক ভাঙ্গিল। মা বলিলেন, "চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল বাবা!". তিনি সকল দেখিয়াছিলেন, পুত্রের মনোভাব স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলেন। শেলীকে তিনি যতই সুনজরে দেখুন, তাহাকে পুত্রবধূ করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিতে না পারায় তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। অবশেষে তিনি ভাবিলেন, সুনীল যে চলিয়া যাইতেছে, সে বরং ভালই; দূরে থাকিলে তাহার এই মোহ কাটিয়া-যাইতেও পারে। এইরূপ ভবিয়া সুনীলের চিন্তাস্রোত অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য তিনি তাহাকে বলিলেন, "আমাকে আর কত দিন এখানে থাক্‌তে হবে বল্‌তে পারিস্, বাবা? প'ড়ে থাক্‌তে আর যে ভাল লাগ্‌ছে না।"

সুনীল বলিল, "আর বেশী দিন তোমাকে এখানে থাকতে হবে না মা, তুমি আর একটু সুস্থ হ'লেই তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাব। কিছু দিন তোমাকে কাছে রেখে বড়দিনের ছুটীর সময় তোমাকে বাড়ী রেখে আস্‌ব। এর পর আর আমাদের একত্র থাকা সম্ভব হবে কি না, কে জানে?"

এই কথা বলিয়াই সুনীল উঠিয়া গেল, বলিয়া গেল, "আমি বাগানে একটু ঘুরে আসি মা! সুশীল ও প্রতিমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

প্রতিমা ও সুশীলকে মা'র কাছে পাঠাইয়া দিয়া সুনীল শেলীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। ভবিষ্যতে আর তাহার সঙ্গে মিশিবার, আলাপ করিবার সুবিধা হইবে কি না, কে জানে? সেই জন্য সে ভাবিল, আজ শেলীর মনোভাব তাহাকে জানিতেই হইবে; নিভৃতে তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সে তাহাকে জানাইবে।

সুনীল বৃহৎ উদ্যানের ও বাড়ীর চারি দিকেই খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও শেলীকে দেখিতে পাইল না। অবশেষে মঞ্জুলেখার কাছে সে ধরা পড়িয়া গেল। ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার পর সে একাকী বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, সুনীল উৎকণ্ঠিত ভাবে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া সে তাহার গতিরোধ করিয়া বলিল, "আপনার ভারি অন্যায় সুনীল বাবু!"

সুনীল বিস্মিত ভাবে বলিল, "কেন? কি অন্যায় বলুন তো! আমি তো জেনে-শুনে কোন অপরাধ করিনি; আমারই বরং অভিযোগ করবার কারণ আছে।"

মঞ্জু হাসিয়া বলিল, "বটে? উল্টো চাপ! তা আপনার অভিযোগটা কি শুনি।"

সুনীল গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার অভিযোগ এই যে, আপনারা আমাকেই কেবল পর ভাবেন; কিন্তু অন্য সকলের সঙ্গে আত্মীয়ের মতো সহজ ব্যবহার করেন, তা' আমি বরাবর লক্ষ্য ক'রেছি। আমার এ অভিযোগ কি মিথ্যা?"

মঞ্জুও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া বলিল, "নিজেই বা আপনি কি ক'রেছেন? আপনি সব সময় যে রকম গম্ভীর হ'য়ে থাকেন,—আদব-কায়দা বজায় রেখে চলেন, তা'তে আমাদের সহজ ব্যবহার আসতে পারে কি? আপনার সঙ্গে কথা কইতেই ভয় হয়, আজ সাহস ক'রে আপনাকে দুই-একটা কথা ব'লছি। আমার কথা এই যে, এখন তো আপনার আরও দু'দিন ছুটী আছে, তবে আজই হঠাৎ চ'লে যাচ্ছেন কেন? আপনার এই কাজটি আমাদের কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তা জানেন? মা এত দিনে কতকটা সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন; আমরা তাই একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভাবছি, সকলে মিলে দু'দিন আমোদ-আহ্লাদ ক'রবো; কিন্তু আমাদের হতাশ ক'রে আপনি হঠাৎ চল্লেন জোয়াল কাঁধে নিতে। এ কি অল্প বিড়ম্বনা?"

সুনীল ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "আমার সঙ্গে আপনাদের কথা কইতেও যখন ভয় হয়, তখন আপনাদের আমোদ-প্রমোদ থেকে আমার দূরে থাকাই ভাল নয় কি? আর আমার থাকা না থাকায় কি যায় আসে? আপনাদের মায়া যখন কাটাতেই হবে, তখন দু'দিন আগে কাটানই ভাল নয় কি?"

মঞ্জু মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "আপনার সব বাজে ওজর! ও-সব আপত্তি আমি শুনতে চাই-নে। তবে নিতান্তই যখন যাচ্ছেন, তখন যদি আশা দেন যে, সুযোগ পেলে মাঝে-মাঝে এখানে আসবেন, তা হ'লে আমরা একটু আশ্বস্ত হ'তে পারি।"

সুনীল বলিল, "মা যত দিন আছেন, এখানে তত দিন আস্‌বো নিশ্চয়ই। আর তার পরেও জ্যাঠামশায় আর জ্যাঠাইমাকে দেখতে মাঝে-মাঝে আসতেই হবে।"

এই সময় নিনা সেখানে আসিয়াই মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মঞ্জুদি'! শেলীদি' হঠাৎ কোথায় স'রে প'ড়েছে বল্‌তে পার? তাঁকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

সুনীল বিদ্রূপভরে বলিল, "গল্পে অত মস্‌গুল হ'য়ে থাক্‌লে কি আর অন্যের সন্ধান পাওয়া যায়? মিস্ মিত্র গেছেন আমার খাবারের বন্দোবস্ত ক'রতে, পরের সেবার ভার তাঁর নিজের হাতেই রাখা চাই কি না।"

নিনা সুনীলের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে খাওয়ানোর জন্যে এখনি এত তাড়া প'ড়ল কেন?"

সুনীল বলিল, "যেহেতু ট্রেণ আমার সুবিধার জন্যে অনির্দ্দিষ্ট কাল ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে না।"

নিনা বিস্ফারিত নেত্রে সুনীলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি! তুমি আজই চলে যাচ্ছ?—কাউকে ও-খবর বল্‌তেও নেই বুঝি?"

সুনীল বলিল, "বাবাকে আর মা'কে দুপুরবেলাতেই ব'লেছি! তবে তোমাদের অনুমতি নেওয়া হয়নি বটে!"

নিনা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আজ কিছুতেই তোমার যাওয়া হ'তে পারে না। কাল আমাদের সকলেরই একসঙ্গে বায়স্কোপে যাওয়ার কথা আছে; আর তুমি আজই হঠাৎ খসে-প'ড়বে—এ হ'তেই পারে না। আমি এখনি মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করছি,—তাঁকে ব'লে তোমার যাওয়া বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।"

সুনীল মৃদু স্বরে বলিল, "সে কি ক'রে হবে? যে পরের চাকর, তার এ বিষয়ে স্বাধীনতা কোথায়?"

নিনা বলিল, "এ তোমার ইচ্ছা ক'রে গলায় শিকল পরা। মেসোমশায় তোমাকে তো স্বাধীন ব্যবসাই করতে ব'লেছিলেন; তা কর্‌লেই পার্‌তে,—এখনও পার।"

সুনীল ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "এক দিন জানতে পার্‌বে—পরের গোলামী কেন ক'র্‌ছি।"

এমন সময় শেলীকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া নিনা বলিল, "শেলীদি' ভাই এস না। সুনীলদা' কেন যে শুধু-শুধু দু'দিন আগেই চ'লে যেতে চায়, তা জানি না। তুমি বল ভাই, অন্ততঃ কালকের দিনটা থেকে যাক্।"

শেলী হাসিয়া বলিল, "তোমার অনুরোধ যখন মাঠে মারা গেল, তখন কি আর আমি বল্লেই উনি থাক্‌বেন? আমার তো মনে হয়, উপায় থাক্‌লে উনি মা'কে ছেড়ে দু'দিন আগে চ'লে যেতেন না। চাকরীর একটা দায়িত্ব আছে তো।"

নিনা অভিমানভরে বলিল, "তুমি একদম অকর্ম্মা শেলীদি'! এই সামান্য কেসটা হাতে নিতে সাহস ক'রলে না? ভারী তো ডাক্তার!"

শেলী বলিল, "কিন্তু আমি তো আইনের ডাক্তার নই: কাজেই আমার অসাধ্য। ও-কথা যাক; যে খবর তোমাকে দিতে এলুম, তাই শোন এখন। এইমাত্র তোমার বাবার এক টেলিগ্রাম পাওয়া গেল, কাল তিনি 'তুফান মেলে' এখানে আস্‌ছেন।"

নিনা মুখ ভার করিয়া বলিল, "বাবার মতলব বুঝে-ওঠা ভার! আমি এত ক'রে লিখ্‌লাম—এখন আমার যাওয়া ঘটে উঠ্‌বে না, সকলের সঙ্গে যাব; তা' সে কথা তিনি গ্রাহ্য করলেন না। বেশ, যেমন আস্‌ছেন তেমনি একা-একা ফিরে যান, আমি তাঁর সঙ্গে এখন যাচ্ছি নে।"

আরও দুই-একটি কথার আলোচনার পর মঞ্জু উঠিয়া নিনার হাত ধরিয়া বলিল, "চ'ল ভাই! আমাকে যে গানটা শিখিয়ে দেবে ব'লেছিলে, সেটা তোমার কাছে শিখে নোব।"

উভয়ে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল দেখিয়া দীপ্তেনও তাহাদের অনুসরণ করিল। নিনাকে ছাড়িয়া থাকা তাহার যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সুনীল যে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, এতক্ষণ পরে তাহার ভাগ্যে তাহা জুটিয়া গেল। সুনীল ও শেফালিকা উভয়েই কিছুকাল নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া রহিল। অবশেষে সুনীল একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মা'কে আমি আপনারই হাতে রেখে যাচ্ছি; অন্য কারও হাতে তাঁর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না। মা তেমন অধীরতা প্রকাশ করলে আমাকে জানাবেন।" তাহার পর সে বহু চেষ্টায় অস্ফুট স্বরে বলিল, "এখন আমি বিদায় চাচ্ছি।"

শেলী জানিত, তাহার যাওয়াই স্থির, প্রতিবাদ নিষ্ফল, তথাপি নতমুখে মৃদু স্বরে বলিল, "দু'দিন আগে কেন যাচ্ছেন? এখানে আপনার বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছিল?"

সুনীল এ কথায় যেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "অসুবিধা হচ্ছিল আমার? এত যত্ন আমাকে এখানে আর কে কোরত—ব'লতে পারেন? আপনি তা জানেন মিস্ মিত্র! কিন্তু তথাপি এখানে আর আমার থাকা উচিত নয়। এখানে বেশী দিন থাক্‌লে হয়তো আমাকে শেষে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'তে হবে। আমার হৃদয় বড় দুর্ব্বল, কিন্তু পরীক্ষা অত্যন্ত কঠোর: প্রলোভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে আমার জয়লাভের আশা কোথায়? তাতে আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হবে মাত্র। সংযমের বাঁধ ভাঙ্‌লে তার আর প্রতিরোধের উপায় নেই, তাই কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আমাকে দূরে চ'লে যেতে হচ্ছে। আমার সুখশান্তিহীন অন্ধকারপূর্ণ জীবন নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এর বেশী আমার কিছুই ব'লবার নেই।"

সুনীল উঠিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুনীলের মুখভাব শেলী দেখিতে পাইল না, এবং নিজের কর্ত্তব্য বলিতে সুনীল কি বুঝাইতে চাহিয়াছিল—তাহাও সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। তাহার বহু দিনের সুপ্ত আশা আবার যেন জাগিয়া উঠিল। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হইয়া শেফালী সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকী স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল; তাহার বাহ্যজ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দীপ্তেনের কণ্ঠস্বরে তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দীপ্তেন তাহাকে দেখিয়া বলিল, "এই হিমে অন্ধকারে বসে আছ কে? শেফালী?"

পর-মুহূর্ত্তেই দীপ্তেনের বৈদ্যুতিক টর্চ্চের আলো তাহার মুখে প্রতিবিম্বিত হইল। সেই আলোকে দীপ্তেন দেখিল—শেফালীর মুখে বেদনা পরিস্ফুট, চক্ষু অশ্রুসজল। তাহা দেখিয়া দীপ্তেন বিস্মিত হইল; তাহার হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হইল। সে শেফালীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, "শেফালী, আর কত দিন গোপনে এই দুঃসহ ব্যথা সহ্য করবে, বোন! তুমি আত্মগোপন ক'রে যে ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রছ, সুনীল কি তাতে কম কষ্ট পাচ্ছে? তুমি অনুমতি দাও তো আমি সুনীলকে তোমার স্বরূপ জানিয়ে দিই।"

শেফালী সহসা আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "কি বলুছ, দীপুদা? তুমি আমার কি কষ্ট দেখলে? যদি কিছু দেখে থাক, সে আমার ক্ষণিকের দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন মাত্র; এ নিয়ে তুমি কোন রকম আলোচনা কোর না। আমার প্রকৃত পরিচয় এখন হঠাৎ প্রকাশ হ'য়ে প'ড়লে এত দিনের সকল সতর্কতাই বিফল হবে। যত দিন কনকপুরের জমিদার অভয়াচরণ মিত্রের অপমানের প্রতীকার না হয়, তত দিন ধনগর্ব্বিত, সামাজিক সম্মানের দম্ভে স্ফীত ঐ দত্তদের পরিবারে আমার স্থান নেই। কারণ, আমার প্রকৃত পরিচয় না জেনে মিষ্টার দত্ত আমাকে গ্রহণ করলে সেই অপমানের প্রতিবিধান হবে না, এবং হ'তে পারে না, এ কথা তোমার বুঝতে পারা উচিত।"

দীপ্তেন বলিল, "কিন্তু সুনীলের মনের ভাব, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা কি তোমার বুঝতে বাকি আছে?"

শেলী গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা বুঝে ফল কি? মানুষের কর্ত্তব্যই সর্ব্বাগ্রে অবশ্যপালনীয়। তাতেই মনুষ্যত্বের গৌরব।"

দীপ্তেন বলিল, "প্রেমের বলে মানুষ সব কর্ত্তব্যই পালন করতে পারে। এই বলেই রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস-ক্লেশ সহ্য ক'রেছিলেন; রাক্ষসের কবল থেকে সীতাকে উদ্ধার ক'রতে পেরেছিলেন।"

তাহার কথা শুনিয়া শেলী বুঝিতে পারিল, দীপ্তেন সত্যই প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছে; সে তাই বলিল, "নিজের নিভৃত চিন্তার ব্যাঘাত হ'ল ব'লে বুঝি আমাকে হিমে ব'সে থাকার জন্য অনুযোগ ক'রছিলে?"

দীপ্তেন কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "সময়ে সময়ে একা থাকতেই ভাল লাগে বটে।"

শেলী মৃদু স্বরে বলিল, "তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি; দেখি, অপর পক্ষের ব্যাধির অবস্থা কি রকম। তোমার অবস্থা এমন জটিল হবে বুঝতে পারলে নিনার মোহিনী শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই তোমাকে সতর্ক করতুম। এখন যদি অভিভাবকদের মত না হয়, তবে এক বিপদ! মিঃ দত্তর এবং মিঃ সিংহর যদি সম্মতি না থাকে বা সঙ্কল্প অটুট থাকে, তা' হ'লে তোমরা দু'জনে কত কষ্ট পাবে, তা' ভাবতে দুঃখ হয়।"

দীপ্তেন উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "তাঁদের কোন সঙ্কল্প আছে না কি?"

শেলী বলিল, "নিনা দত্ত-পরিবারের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার কোন কারণ বুঝতে পারনি কি? আমার তো মনে হয়, মিঃ সিংহ একটা বুঝা-পড়া করতেই এখানে আস্‌ছেন।"

দীপ্তেন কথাটা বুঝিতে পারিয়া বলিল, "বল কি শেলী? দত্ত সাহেব বুঝি নিনাকে বৌ করবার সঙ্কল্প ক'রেছেন? কিন্তু সুশীলের সঙ্গে নিনার মানাবে কেন?"

শেলী বিদ্রূপের সুরে বলিল, "তোমার যেমন বুদ্ধি! এই বুদ্ধি নিয়ে কি ক'রে তুমি আই-সি-এসএ ঢুকলে? তাজ্জবের কথা বটে! নিনাকে বৌ করবার জন্যে সুশীলেরই সঙ্গে তায় বিয়ে দিতে হবে—তোমার এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারণ কি?"

দীপ্তেন বলিল, "সিদ্ধান্তটা কি অসঙ্গত? সুনীলের সঙ্গে যখন বিয়ে হ'তে পারে না, তখন সুশীল ছাড়া আর কার জন্যে তিনি চেষ্টা ক'রবেন?"

শেলী মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "মিষ্টার দত্ত বিবাহিত; নিনার বাপ এ কথা জানেন না। তাই তাঁরই সঙ্গে নিনার বিয়ে দেবার জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে খুব উৎসাহের সঙ্গেই চেষ্টা চ'লছে।"

দীপ্তেন বিস্মিত ভাবে বলিল, "তা' হ'লে তাঁদের কাছে সত্য গোপন ক'রে, ফাঁকি দিয়ে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা হ'চ্ছে বল?"

শেলী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, মিঃ দত্ত ও তাঁর স্ত্রীর মতলব হয় তো সেই রকমই। তবে তাঁদের ছেলেটির কি মত, তা' আমার অজ্ঞাত। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, তিনি বহু দিন থেকে এ ফাঁদ এড়িয়ে চ'লছেন।"

দীপ্তেন কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গেই বলিল, "তাঁর মনের ভাব যেমনই হোক, তুমি সব জেনেও এ রকম অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবে?"

শেলী বিচলিত স্বরে বলিল, "কিন্তু আমি কি করতে পারি বল? মিষ্টার দত্ত পল্লীবাসিনী শেফালীকে পুত্রবধূ-রূপে যত দিন গ্রহণ না করেন, তত দিন আমি নিরুপায়! পরমেশ্বর কি পরীক্ষানলে আমাকে দগ্ধ ক'রছেন? এত দিন আমি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই

মন থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়েছিল, কিন্তু সেই নিস্পৃহ নিরাময় জীবনে আমি এখন বঞ্চিত। মনে হয়, ব্যথার আগুনে আমার হৃদয় দগ্ধ ক'রে, তার সব মলা-মাটি নষ্ট করাই বিধাতার ইচ্ছা।—ও সব কথা এখন থাক; নিনার প্রতি তোমার মনের ভাবটা খুলে বল তো; আর তারই বা কি ইচ্ছে? তোমাদের কি এ সম্বন্ধে কোনও কথা হ'য়েছে?"

দীপ্তেন প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে শেলীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি কি এ সময় ও-সম্বন্ধে নিনাকে কিছু ব'লতে পারি? বাধ্য হ'য়ে সে দত্তপরিবারের সঙ্গে আমাদের অতিথি হ'য়েছে; এ অবস্থায় ও-রকম কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত হোত-কি? নিনাকে পত্নীরূপে লাভ ক'রতে পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে ক'রবো। কিন্তু তার মা-বাপের অনুকূল মত জান্‌তে না পারলে তা'কে ও-কথা বলা ঠিক হবে না। মিষ্টার সিংহ এলে তাঁ'কে ব'লে দেখ্‌তে পারি।"

শেলী একটু ভাবিয়া বলিল, "তুমি খাঁটি হিন্দুর ছেলের মতনই কথা ব'লেছ; শুনে ভারী খুসী হ'য়েছি। কিন্তু তুমি হতাশ হয়ো না। নিনার নিজের মত না হ'লে কারো সঙ্গে বিয়েতে তার বাপ-মাও তাকে রাজী করাতে পারবেন না—এ আমি ঠিক জানি। যদি তার সম্মতি পাও, তা' হলেই তোমার প্রাণের কামনা পূর্ণ হবে। এ কথা আমি নিঃসন্দেহে ব'লতে পারি।"

দীপ্তেন বলিল, "মিষ্টার সিংহ এখানে আসুন তো, তাঁর ভাবগতিক বুঝে যা কর্ত্তব্য হয় করা যাবে। মনে হয়, নিনা আমাকে ঘসা পয়সার মতো অচল মনে করে না। এ অবস্থায় নিজের দিক থেকে তুমি একটু চেষ্টা ক'রলে সুনীল আর কাউকেই যে বিয়ে করবে না—এ কথা আমি জোর ক'রেই ব'লতে পারি।"

শেলী দৃঢ়স্বরে বলিল, "তোমার ঐ অনুরোধ রক্ষা করা আমার অসাধ্য; আমি পূর্ব্বেই তো ব'লেছি, আমি কোনও চেষ্টাই করব না। আমাকে পেতে হ'লে আমার স্বামীকে তাঁর বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন ক'রতে হবে।"

দীপ্তেন নিরুপায় হইয়া বলিল, "আচ্ছা তো তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ! সুনীল তোমার উপযুক্ত হ'তে পারে, এটাই আমার আন্তরিক কামনা। ও-সব কথা এখন থাক, সুনীলের ট্রেণের সময় হ'য়ে এল যে!"

শেলী ব্যস্ত ভাবে বলিল, "তাই তো, কথায় কথায় বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে!"—সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, এবং দীপ্তেনকে পুনর্ব্বার বলিল, "মনে রেখো—আমার জীবনের কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপন ক'রবার প্রয়োজন নেই। কারো কাছে কোন কারণেই আমার সত্য পরিচয় প্রকাশ ক'রো না।"

৫

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মিষ্টার সিংহ (বিনয় বাবু) আগ্রায় আসিয়াছেন; রমাপ্রসাদ বাবু ও বীরেন বাবু উভয়েরই পীড়াপীড়িতে তিনি সেই স্থানেই বাস করিতে রাজী হইয়াছেন। দীপ্তেন প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে তাঁহাকে ফতেপুর-শিক্রি, সেকান্দ্রা, কেল্লা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান দেখাইয়া আনিয়াছে। সেই সুযোগে সুশীল ও প্রতিমারও ঐ সকল স্থান দেখা হইয়াছে। মায়ের অসুখের জন্য এত দিন তাহারা বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা পিতার নিকট প্রকাশ করিতে পারে নাই; কিন্তু বিনয় বাবু স্বয়ং তাহাদিগকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করায় মিঃ দত্ত তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

এই কয় দিনেই রমাপ্রসাদ বাবুর সহিত বিনয় বাবুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। বিনয় বাবু বীরেন বাবুর ন্যায় দাম্ভিক নহেন; তিনি গুণগ্রাহী ও উদারপ্রকৃতি, এ জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর সৌজন্য ও অতিথিপরায়ণতায় তিনি মুগ্ধ হইলেন। বেশ আনন্দেই সকলের দিন কাটিতে লাগিল, কেবল নিনাকেই বিমর্ষ দেখা গেল। পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া নিনা তাঁহাকে সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার পরই বলিয়াছিল, "তুমি হঠাৎ কেন এলে বাবা? আমি তো তোমাকে লিখেছিলাম, আমি মেসোমশায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি, তাঁরই সঙ্গে দেশে ফিরব। মাসিমা বেশ ভাল রকম সেরে না উঠলে আমি যাই কেমন ক'রে বল তো? বড্ড স্বার্থপরের মতো দেখাবে না কি?"—সেই অবধি নিনার ভ্রমণেও যেন তেমন স্ফূর্ত্তি বা উৎসাহ নাই।

নিনার প্রকৃত মনের ভাব কি, বিনয় বাবু তাহা বুঝিতে

পারিলেন না ; কিন্তু তাহাকে আর সেখানে রাখিয়া যাওয়া তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। সপ্তাহ খানেকের জন্য দিল্লীতে ঘুরিয়া-আসিয়া তিনি স্থির করিলেন, নিনাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিবেন, এবং নিনার বিবাহ সম্বন্ধেও যাহা হউক একটা-কিছু স্থির করিয়া যাইবেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আগ্রা হইতে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করিলেন।

রবিবারে ছুটী থাকায় সুনীল বিনয় বাবুর অনুরোধে আগ্রায় আসিল। বিনয় বাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার পিতা-মাতার সম্মুখেই তাহাকে বলিলেন, "বাবা সুনাল, তুমি তো জান, তোমারই মুখের দিকে চেয়ে আমি সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর নিনার জন্য অন্য কোন পাত্রের খোঁজ করিনি। তোমার বাপের এবং মায়েরও একান্ত ইচ্ছা—তা'কেই তাঁরা পুত্রবধূ করেন ; আর আমরাও তা'কে তোমার হাতে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। এত দিন পর্য্যন্ত তো তুমি ধরা-ছোঁওয়া দাও-নি ; কিন্তু অবশ্যই বুঝতে পারছো, বয়স্থা মেয়েকে এ রকম ক'রে আর রাখা যায় না, এবং তা ভালোও দেখায় না। তোমার অভিপ্রায় কি, তা খুলে বলো বাবা ! এত দিন তো দূরে-দূরেই কাটালে।"

অকস্মাৎ নিনা সেই কক্ষের অন্য দিকের একটা দরজা খুলিয়া নিঃশব্দে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "এ সব তোমাদের কি পরামর্শ হচ্ছে ? মা গো ! ভাইকে না কি কেউ বিয়ে করে ?" ছোটবেলা থেকে আমি সুনীলদা'কে নিজের ভাই ব'লেই জানি, ওকে আমি বিয়ে করব ? তা কি পারি ? আমার প্রবৃত্তি কি এতই হীন ?"

সুনীল হঠাৎ কি উত্তর দিবে, তাহা স্থির করিতে পারে নাই ; নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতেছিল। এইবার নিনার সমর্থন পাইয়া বলিল, "আমিও তো অনেক বারই ব'লেছি—নিনাকে বিয়ে করা আমার অসাধ্য ; কিন্তু আমার সে কথায় আপনারা কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেননি।"

বীরেন বাবু নিনার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সে তাঁহাদের অলক্ষ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ; তাহাদের উভয়ের প্রতিবাদে মিঃ দত্ত উত্তেজিত হইয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "বিনয়, তুমি ওদের কোনও কথায় কান দিও না। যত ছেলেমী কাণ্ড ! আমরা যা' ঠিক ক'রেছি, সেই ভাবেই কাজ হবে। ছেলে-মেয়েদের সকল আবদার রাখা চলে না। হিন্দুর ঘরের মেয়েরা নিজের বিয়ে সম্বন্ধে কবে মত প্রকাশ করেছে ? এমন অনাসৃষ্টি কথাও কখনো শুনিনি। তুমি এই মাঘ মাসেই বিয়ের আয়োজন ক'রে ফেল।"

মিঃ সিংহ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তা' আমি পারব না। মেয়েকে এত বয়স পর্য্যন্ত যখন আইবুড়ো ক'রে রেখেছি, তখন তার অমতে বিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে কাল আর নেই ; এখন নূতন যুগ—এ কথা ভুললে চলবে কেন ? আর তা' ছাড়া—এ ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে দু'জনেরই যখন অমত, তখন জোর ক'রে এ বিয়ে দিলে দুঃখ আর অশান্তি ডেকে আনা হবে। সুতরাং এ কাজ যুক্তিসঙ্গত হবে না। যাদের আনন্দ ও তৃপ্তির জন্য এ কাজ, তারাই যদি তাতে বিমুখ হয়, তবে তা নিষ্প্রয়োজন।"

নিনা মিষ্টার দত্তর শেষ প্রস্তাব শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল ; সে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়া বলিল, "মেসো-মশায়, এই কি আপনাদের আধুনিক শিক্ষার গৌরব ? আপনার কি ধারণা—মেয়েরা পণ্যদ্রব্য, বাপ-মা ইচ্ছা-মতো বেচাকেনা ক'রবেন ? শুনেছি, ঠাকুর-দাদাদের আমোলে ঐ রকমই ছিল। আমার নিজের অমতে কে আমার বিয়ে দেয়, তা দেখা যাবে।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার সে বলিল, "আপনা-দের একটা সমাজ গড়ে'-উঠেছে, সেই সমাজের মোড়ল-দের সম্বন্ধে লোকের এই রকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হ'য়েছে যে, কলকাতার ব্যারিষ্টোক্রেসি এরিষ্টোক্রেসির গর্ব্বে অন্য সকলকে কীট জ্ঞান করায় বাইরের ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে নারাজ ! আপনারা বোধ হয় বিশ্বাস করেন না যে, মানুষ হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ লোক আপনাদের দলের বাইরে আছেন ?"

বীরেন বাবু ক্রোধে অধীর হইলেন ; কিন্তু তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নিনা বলিতে লাগিল, "এখন বুঝছি, আপনাদের জন্যেই সুনীলদা-বেচারা সংসারী হ'তে পারেনি। ওর মনের মতন মেয়ে না পেলে কেন ও বিয়ে

করবে? আর আপনারা থাকতে সে রকম মেয়ের সঙ্গে ওর দেখা পর্য্যন্ত হয় কি না সন্দেহ, আর দেখা হ'লেই বা কি হবে?"

মিঃ দত্ত আর সহ্য করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "দিনকতক বিলেতে থেকে তুমি তো ভারী ডেপো হ'য়ে গেছ দেখছি। আমাদের দোষ ধরা তো বড কম ধৃষ্টতা নয়; মেয়েমানুষের এত বাড ভাল নয়।"

নিনা অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "সত্যি কথাগুলা অনেক সময় বড়ই অপ্রিয় ব'লে মনে হয়, কিন্তু তাই ব'লে কি সবাই চুপ ক'রে থাকলে চলে?"

বিনয় বাবুর আশঙ্কা হইল, নিনা ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিলে শেষে হয় তো বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিবে। এ জন্য তিনি সংযত ভাবেই নিনাকে বলিলেন, "নিনা, তুমি পূজনীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করছো, তা ভুলো না। জ্যেষ্ঠদের সম্মান করতে হয়, এ কথা, বাঙ্গালীর মেয়ে তুমি, তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তোমার মেসো-ম'শায়ের কাছে এ জন্য ক্ষমা চাও।"

নিনা তাহার পিতার অনুগত এবং স্বভাবতঃই শিষ্ট, কিন্তু আজ আর সে স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না; তথাপি পিতার আদেশ পালনের জন্য বলিল, "আমি কোন অন্যায় কথা ব'লেছি ব'লে তো মনে হয় না। তবু যদি আমার কোনও কথায় আপনার প্রতি অসম্মান প্রকাশ হ'য়ে থাকে তো সে জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। অভদ্র ব্যবহার করবার ইচ্ছা আমার ছিল না—নেইও, আপনার অমর্য্যাদাও করতে চাইনি।"

সুনীল বুঝিল, অতঃপর আর সেখানে থাকা সঙ্গত হইবে না; সে নিনার হাত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল। বিনয় বাবু তখন বীরেন বাবুকে বলিলেন, "ভাই, ছেলেমানুষের কথায় রাগ করো না; উত্তেজিত হ'লে ওদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, কালের গতি এই রকমই হ'য়েছে কি না। উদ্ধতাকে ওরা তেজস্বিতা ব'লে মনে করে।"

বীরেন বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তুমিই আদর দিয়ে-দিয়েই ওর মস্তকটি চর্ব্বণ ক'রেছ। তখনই ব'লেছিলুম, মেয়েকে বেশী শিক্ষা বা স্বাধীনতা দিও না। তোমার স্ত্রী কেন যে ওকে বিয়ের আগেই বিলেতে নিয়ে যাবার মতলব ক'রেছিলেন বুঝি না। বিয়ের পর বিলেতে গেলে বিগ্‌ড়োতে পারে না; তখন শাসনে থাকে। কর্ম্মফলে তোমাকে বিলক্ষণ ভুগ্‌তে হবে দেখতে পাচ্ছি।"

নিনা বাহিরে গিয়াই সুনীলকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আগে থেকে জান্‌তে—ওঁরা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান?"

সুনীল কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "হ্যাঁ, তা—তা কি বলি—জান্‌তুম অনেক দিন থেকেই। কিন্তু আমি বরাবরই ব'লেছি, তোমাকে আমি ছোট বোনের মতন ভালবাসি, বিয়ে ক'রতে পারব না। কিন্তু উভয় দিক থেকেই আমার উপর খুব চাপ দেওয়া হচ্ছিল।"

নিনা মুখ ঝাপ্‌টা দিয়া বলিল, "দাদা, তুমি এত দুর্ব্বল-প্রকৃতি? অনেক দিন আগেই ওঁদের এ স্বপ্ন ভেঙ্গে দেওয়া তোমার উচিত ছিল; আমায় বড়ই নিরাশ ক'রলে তুমি!"

সুনীল কি উত্তর দিবে, স্থির করিবার পূর্ব্বেই নিনা আরও বলিল, "তুমি এখনও শেলীদি'কে বিয়ে ক'রছ না কেন? অমন মেয়ে আর পাবে না কিন্তু! না, মেসো-মশায়ের ভয়ে তাও কর্‌তে পার্‌বে না।"

সুনীল কিঞ্চিৎ ইতঃস্ততঃ করিয়া বলিল, "না রে!—কাউকে আমার বিয়ে করা হবে না। অনেক দিন আগে নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এক জনকে জীবন-সঙ্গিনী ক'র্‌ব ব'লে শপথ ক'রেছিলুম; সে থাক্‌তে আর কাউকে আমি বিয়ে ক'রতে পা'র্‌ব না।"

নিনা সবিস্ময়ে বলিল, "সত্যি না কি? এ্যাঁ, বল কি? কে সে? তাকে কেন এত দিন লুকিয়ে রেখেছ? আর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তা'কে নিয়ে সংসারী হবে ব'লে শপথই বা কর্‌লে কেন?"

নিনার সংশয়াকুল কাতর ভাব দেখিয়া সুনীল বলিল, "সে সব কিছু নয়। সে উচ্চ বংশেরই মেয়ে,—বৌ ক'রে তাকে ঘরে আন্‌তে কোন বাধাই থাক্‌তে পারে না; কিন্তু সে সময় আমি বধূ-বরণ ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।"

নিনা বলিল, "তবে এত দিন তা'কে বিয়ে ক'রোনি কেন? নিজের কাছেই বা আননি কেন?"

সুনীল ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "সৎসাহসের অভাবে নিজের

কর্ত্তব্য পালন করিনি। মা-বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা রাখবার মত মনুষ্যত্ব আমার ছিল না ; কিন্তু কর্ত্তব্য ত্যাগ ক'র্বার মত ঘৃণিত প্রবৃত্তিও আমার নেই। উভয় সঙ্কটে প'ড়েই এত দিন আমি উপায় স্থির ক'র্তে পারিনি।"

নিনা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ছি ছি! প্রতিজ্ঞা ক'রে তা' রাখতে দেরী ক'রেছ কি ব'লে? কথা দিলে সব স'য়েও তা রাখা উচিত ; আর তা' রাখ্তে দেরী করা উচিত নয়।"

সুনীল মৃদু স্বরে বলিল, "তা' জানি, নিনা! আর সে পাপের শাস্তি আমি যথেষ্টই পেয়েছি। মনে যে ধিক্কার সে জন্যে পেয়েছি—তা' জীবনেও ভুল্‌তে পার্‌ব কি না, কে জানে? এত দিনে আমার মনের দ্বিধা কেটে গেছে, কর্ত্তব্য পালন আমি ক'র্‌বই। এখন তা'র বিষয় বেশী কিছু তোমায় বল্‌তে পার্‌ব না, নিনা! তা'কে ঘরে এনে সব আগে তোমার কাছেই নিয়ে যাব,—সে কেমন মেয়ে, তুমি নিজেও দেখে নিও। মনে হয়, খুসী হবে।"

অতঃপর উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। কিছু কাল পরে সুনীল বলিল, "নিনা, তোমার বিয়ের কিন্তু যত দিন একটা কিছু ক'র্‌তে না পারি, তত দিন মনে একবিন্দুও শান্তি পাব না। একটা ভাল লোকের হাতে না পড়্‌লে তোমাকে সাম্‌লে রাখা যাবে না।"

নিনা বলিল, "এই মাত্র তো শুন্‌লে—আমার মত না নিয়ে কোন কাজই হবে না।"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "তবে তুমি স্বয়ম্বরা হোয়ো।"

নিনা বলিল, "বেশ, তাই হবে ; কিন্তু তোমরা আগে আমার পাণিপ্রার্থীদের খুঁজে আনো, তার পর না হয় বেছে নোব।"

এই কথা বলিয়া নিনা আর কোন কথাই বলিতে পারিল না, লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইল ; তাহার কণ্ঠরোধ হইল। সে উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

ফাল্গুন

আজি, ফুলে ভরা ফাল্গুন আসিল সখি!
তবু, কোকিল, ভোম্‌রা চোখে নাহি নিরখি।
নাই, পাখীর কূজন,
শুধু, শুনি ভন্ ভন্—
মশা, আর মাছি ওড়ে সমুখে পিছে,
অশথের কোলে কালো ছায়া নামিছে।

হের, মেঠোপথ বেয়ে ঐ রাখাল ছোটে,
তার, পায়ে পায়ে ঘাস-ফুল যেন বা ফোটে।
বনে, সাঁওতালি বউ,
খেয়ে মহুয়ারি মউ।
নাচে, সাঁওতালি নাচ,—আর ঝুমুর ঝুমুর,
বাজে, নূপুরেরি সম তার পায়েরি ঘুঙুর।

হায়! মধুময় ফাল্গুন আসিল বনে,
নাই, পুলকের লেশ তবু মোদেরি মনে,
হেথা, নাই দখিণা,
হেথা, বাজে না বীণা,
শুধু, পীলু বারোয়ার সুরে হৃদয়-বাঁশী
ফুঁপায় ব্যথায়,—ঠোঁটে ফোটে না হাসি।

কোথা, রয়েছ বন্ধু "নবু" তোমারে জানাই।
এই, বাংলা দেশেতে এল ফাগুন বৃথাই।
হেথা, আগুন ব্যথার
দহে, হৃদয় সবার
শুধু, স্বর্ণ-মৃগের সম 'মারীচ' রাজে।
এই, বাংলা দেশের বুকে, মোদেরি মাঝে।

সখা, ডাল-ভাত দিতে হেথা নাই কারো সখ,
দেখ, বৈঠকে বই নাই, আছে শুধু ঠক্।
পেটে, ভাত নাহি তার,
তবু, 'মিষ্ঠ' মিয়ার—
চলে ধর্ম্মের নাম করি মিথ্যা বড়াই,
তার জ্ঞানে, অজ্ঞানে শুরু, মোরগ-লড়াই।

আমি, কেমনে বরিব সখা, হেথা ফাল্গুন,
যেথা, অলির বদলে, করে মশা গুণ গুণ।
শুন বন্ধু "নবু"!
ভুলে যেও না কভু,
এই বাংলার ফুলে ভরা বিষ মাখা তূণ,
হেথা ফাগুন বনেতে শুধু,—মনেতে আগুন।

কাদের নওয়াজ।

সংগ্রাম ও আর্থিক পরিস্থিতি

(বার্ত্তানীতি-প্রসঙ্গ)

একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাধিলেই অনেক দিকে ওলট-পালট হইয়া যায়; তন্মধ্যে আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন অতীব বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত ভাবেই সংঘটিত হয়। ব্যাপক ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জিনিষপত্রের মূল্য ভয়ঙ্কর বর্দ্ধিত হয়, পশারের বাজার (credit) যথেষ্ট ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং ব্যক্তিগত ভাবেও লোকের সঞ্চয়ের পথ রুদ্ধ হয়। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিভিন্ন মনুষ্য-সমাজের মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; উহার এক স্থানে টান পড়িলে, অন্য সকল দেশেই সেই আকর্ষণের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সকল দেশ নিরপেক্ষ ছিল, সেই সকল দেশেও যুদ্ধের প্রভাব—যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির ন্যায় অল্পই হউক বা অধিকই হউক, সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়াছিল। বিগত যুদ্ধের সময় কেবলমাত্র গ্রেট বৃটেনে, ফ্রান্সে ও ইটালীতে, এবং অন্য দিকে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়াতেই যে দুর্ম্মূল্যতা দেখা গিয়াছিল এরূপ নহে, যে সকল দেশ যুদ্ধ হইতে আপনাদিগকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই সকল দেশেও দুর্ম্মূল্যতা তীব্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সকল দেশেই 'কারেন্সি নোট' বা কাগজের মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে চালাইতে হইয়াছিল,—এবং ধাতু-মুদ্রার সংখ্যা যত দূর সম্ভব হইতে পারে, তত দূর দুষ্প্রাপ্য করা হইয়াছিল। যে নরওয়ে সে-বার যুদ্ধ এড়াইয়া চলিতে পারিয়াছিল, সেই নরওয়েতেও পণ্যের মূল্য অঙ্ক হিসাবে ২৩০শ ছাড়াইয়া ৩৭৭এর অঙ্কে (Index number) উঠিয়াছিল। জাপান গতবার যুদ্ধে বিশেষ ভাবে যোগদান করে নাই, এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাহার অবস্থান-ভূমি বহু দূরে থাকিলেও, জাপানী পণ্যের মূল্য অগ্নিবৎ হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই প্রচলিত মুদ্রার স্ফীতিসাধন করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ, অন্যান্য দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না।

কোন একটা বিরাট যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই আন্তর্জ্জাতিক বাজার পশারের পরিচালনা (Internal credit economy) ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটে। শান্তির সময় এক দেশের বণিক এবং ব্যবসায়ীরা অন্য দেশের বণিক ও ব্যবসায়ীদিগকে যেরূপ বিশ্বাস করে এবং পরস্পরের অঙ্গীকারে নির্ভর করে,—যুদ্ধের সময় তাহারা ততটা করে না বা করিতে পারে না। যুদ্ধের সময় জলের ও স্থলেরও বাণিজ্যপথ অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে। এই জন্য আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ব্যাপারে ঘোর বাধা উপস্থিত হয়। ইহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক আমদানী-রপ্তানীর কার্য্যে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। সেই জন্য বিদেশী পণ্যের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। এক দেশের পণ্য অন্য দেশে রপ্তানী হয় না বলিয়া যুদ্ধে নির্লিপ্ত দেশকেও তাহার প্রভাবাধীন হইতে হয়। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যুদ্ধের প্রথম আমলে ধান, গম প্রভৃতি ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের মূল্য আমাদের দেশে অনেক কম ছিল। উহাতে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের এবং জনসাধারণের কিছু কষ্ট হইলেও কাহারও খাইবার-পরিবার অভাব হয় নাই। দেশীয় বস্ত্র প্রভৃতির অধিক কাটতি হওয়ায় কলের শ্রমিকদিগের প্রায় সকলেই কাজ পাইয়াছিল। সাধারণ গৃহস্থের সাংসারিক ব্যয় হ্রাস হওয়ায় পল্লী অঞ্চলের মজুর প্রভৃতিরা সহজে যথেষ্ট কাজ পাইতেছিল। তবে কতকগুলি নিত্য-ব্যবহার্য্য এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় আমদানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এই সুবিধা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। সে-বার সংগ্রামের জন্য সরকার করভার বৃদ্ধি করিলেও এবারকার মত সে-বার এই দরিদ্র দেশের উপর করভার চাপিয়া বসে নাই। কাজেই অবস্থার ভিন্নতা হেতু গত যুদ্ধের ফল হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলের ভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে। এবার যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্য-মূল্য —এমন কি, দেশজাত কৃষিজ খাদ্য-শস্যের মূল্যও— বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কেবল পাটের আর ইক্ষুর মূল্যই কমিয়াছে। লোকের সঞ্চয়ের উপায় যথেষ্ট

পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এবার প্রথম হইতেই অতিরিক্ত আয়ের উপর উচ্চ হারে কর স্থাপিত হইয়াছে, রেলের ভাড়া, ডাক মাশুলের হার এবং টেলিগ্রামের ব্যয়ের হার বর্দ্ধিত হইয়াছে; ট্রাঙ্ক টেলিফোনের হার বাড়িয়াছে এবং আয়করের উপর সারচার্জ্জ সর্ব্ব ক্ষেত্রেই সমান ভাবে শতকরা ২৫ ভাগ ধার্য্য করা হইয়াছে। কাজেই লোকের যে বিশেষ কষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। পূর্ব্ববারের অপেক্ষা এবার জলপথ অধিকতর বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে—টর্পেডো প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রহরণের প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তি দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা সত্য যে, আমরা প্রকারান্তরে এই যুদ্ধে লিপ্ত; অগত্যা এই যুদ্ধের ব্যয়ভার যথাসাধ্য বহন করা আমাদের দেশের লোকেরও কর্ত্তব্য; —কিন্তু এই দরিদ্র দেশের লোকের যতটুকু ব্যয়ভার বহন করিবার সামর্থ্য আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া কর ধার্য্য করা যুক্তি-বহির্ভূত এবং সমর্থনের অযোগ্য। বাঙ্গালায় পাটের এবং ইক্ষুর মূল্য হ্রাস হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের অর্থ-কষ্ট প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালায় এবার কোন কোন স্থলে অজন্মা হওয়ায় তাহাও লোকের কষ্ট-বৃদ্ধির কারণ।

বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধের ব্যয় দিন দিন যেমন বিস্ময়কর ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে,—যুদ্ধের দ্বন্দ্বাও ক্রমশঃ সেইরূপ বিস্তৃত হইতেছে। ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় যে সকল বহুব্যয়সাধ্য অস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার ফলে এক দিকে যেমন যুদ্ধে ব্যবহার্য্য অস্ত্র-নির্ম্মাণের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অন্য দিকে সেইরূপ তাহার ধ্বংসশক্তিও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই সময় সাধারণ তোতেদার বন্দুকের স্থান মার্টিনী-হেনরী, বার্ডান, গ্রাম এবং ওবের্ডোর রাইফেল অধিকার করিল। ইহার পর কামান, রণতরী প্রভৃতি ক্রমশঃ নির্ম্মাণের ব্যয় ও জটিলতা বাড়িতে লাগিল। মেরিমাক এবং মণিটরের ন্যায় একখানা রণতরী ডুবিলে যত টাকা ক্ষতি এবং যত পরিশ্রমের অপচয় ঘটিত, এখনকার এক একখানা ভাল ক্রুজার, ড্রেডনট, বা সুপারড্রেডনট ডুবিলে তাহার শত শত গুণ অধিক অর্থ নষ্ট হয়, সবই জলে যায়। আজকাল বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডকে দৈনিক ১ কোটি ২২ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং ব্যয় করিতে হইতেছে, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় উহার পরিমাণ ১৬ কোটি ২২ লক্ষ টাকারও অধিক। বিগত যুদ্ধে এত অধিক হারে অর্থ ব্যয় হয় নাই। বৃটিশ অর্থ-সচিব সার কিংসিলি উড সম্প্রতি কমন্স সভায় বলিয়াছেন—এক বৎসরের মধ্যে যুদ্ধের ব্যয় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। এখন এই বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সকল দেশেরই একটা দায়িত্ব আছে। আবার বৃটিশ সরকার যদি স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন ভারতের মত লইয়া এই যুদ্ধে নামিতেন, তাহা হইলে এই দায়িত্বের নৈতিক গুরুত্ব যত হইত, পরাধীন ভারতের নৈতিক গুরুত্ব তত অধিক না হইলেও উহার যেটুকু নৈতিক গুরুত্ব আছে, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। ভারত সে দায়িত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করিতেছে না, বরং কার্য্য-ক্ষেত্রে স্বীকারই করিতেছে। তবে যাহার যে দায়িত্বভার বহনের শক্তি নাই, তাহার ঘাড়ে সে দায়িত্ব চাপাইলে যেরূপ ফল হইয়া থাকে, সেইরূপই হইতেছে; এই করভারে ভারতবাসী অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া উঠিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ যদি ভারতবাসীকে শ্রমশিল্প গঠনকার্য্যে সহায়তা করিতেন, শ্রমশিল্প-ক্ষেত্রে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার সর্ব্ববিধ সুবিধার পথ মুক্ত করিতেন, তাহা হইলে এই দুঃসময়ে তাহারা সরকারের কার্য্যে অধিকতর সন্তুষ্ট চিত্তে অধিক পরিমাণে অর্থদান করিতে পারিত। কিন্তু যে দেশের কৃষিকার্য্য আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত উপায়ে পরিচালিত হইবার পথ রুদ্ধ, যে দেশের শিল্প বৈদেশিক শিল্পীর যান্ত্রিক শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষায় অসমর্থ, এবং যে দেশের লোক প্রতিকারের উপায় জানিয়াও অর্থাভাবে প্রতিকার করিতে না পারিয়া—নানা রোগের আক্রমণে অকর্ম্মণ্য, অস্থিচর্ম্মসার, মৃত্যুপথের যাত্রী—সে দেশের লোক যুদ্ধের এই গুরুভার বহন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতার অভাবে তাহাতে অসমর্থ; সুতরাং সে জন্য তাহাদিগকে নিন্দা করা বিবেচকের কার্য্য নহে।

যুদ্ধের সময় সোনা-রূপাও মহার্ঘ হইয়া থাকে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধেও বৃটিশ সরকার তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত মার্কিণের ন্যায় ভারত সরকার ভূরি পরিমাণে রজত কিনিয়া রাখিলে বিজ্ঞোচিত কাজ হইত; কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। বিগত য়ুরোপীয় মহা-যুদ্ধের সময় প্রথম কিছু দিন রূপার দর ছিল প্রতি তোলা

সাড়ে দশ আনা। তাহার পর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে উহার দর চড়িতে থাকে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যে রূপার দর প্রতি আউন্স ২৭ পেন্স ছিল, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রতি আউন্স ৩৭ পেন্স, এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাহার মূল্য প্রতি আউন্স ৫৫ পেন্স হইয়াছিল। পুনরায় যুদ্ধ বাধিলে আবার যে ঐরূপ হইবে, তাহা সরকারের পদস্থ রাজপুরুষদিগের ধারণা করা কঠিন ছিল না। যুদ্ধের পর রূপার দর কমিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রতি-আউন্স ১৩ পেন্স বা প্রতি তোলা পাঁচ আনায় পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তখনও সরকারের হুঁস হইল না যে, আপৎ কালের জন্য এই রূপার টাকা ব্যবহারের দেশে সরকারী কোষে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য আমানত রাখা একান্ত আবশ্যক। সেই সময়ে ভারত সরকার রূপা কিনিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সেই সময়ে মার্কিণ, কানাডা, মেক্সিকো, পেরু এবং অষ্ট্রেলিয়া সাড়ে তিন কোটি আউন্স রৌপ্য ক্রয় করিবার চুক্তি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে চারি বৎসরের জন্য এই চুক্তি হয়। মার্কিণ সরকার ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রৌপ্য ক্রয়-আইন করিয়া এই ব্যবস্থা করেন যে, তাঁহাদের সরকারী কোষে যত দিন রূপার পরিমাণ সমস্ত ধাতব সঞ্চয়ের সিকি পরিমাণ না হইবে, এবং রূপার মূল্য প্রতি-আউন্স ৬৪ পেন্স পর্য্যন্ত না উঠিবে, তত দিন তাঁহারা রৌপ্য ক্রয় করিতে থাকিবেন। ইহাতে টাকার মূল্য লইয়া ভারত সরকারকে একটু বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। রূপার মূল্য প্রতি আউন্স ৬৪ পেন্স হইলে রূপার ভরি দাঁড়ায় প্রায় দেড় টাকা। কিন্তু রূপার মূল্য অত অধিক না হইলেও রূপার মূল্য প্রতি আউন্স সওয়া ৩৬ পেন্স পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তখন টাকার প্রচলিত মূল্য এবং আসল মূল্য প্রায় সমান হইয়া উঠিল। ইহাতে ভারত সরকারের মুদ্রা বিভাগ প্রমাদ গণিয়াছিল। তখন পাছে রূপার মূল্য আরও বৃদ্ধি পায়, সেই ভয়ে ভারত সরকার কতকগুলি এক টাকার নোট ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সঙ্কট দেখিয়া মার্কিণ যুক্তরাজ্য রৌপ্য ক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। রূপার মূল্য আরও কমিয়া প্রতি আউন্স ২০ পেন্স এবং তাহার কমেও নামিয়া গিয়াছিল।

এদিকে ভারত সরকার ভারতীয় মুদ্রায় রূপায় ভাগ কম করিবার চেষ্টা গত যুদ্ধের সময় হইতেই করিয়া আসিতেছিলেন। গত যুদ্ধের সময়েই রূপার দো-আনি এবং সিকির পরিবর্ত্তে নিকেলের দো-আনি এবং সিকি বাজারে বাহির করা হয়। রূপার দো-আনি ছোট বলিয়াই নিকেলের দো-আনি লোকের পছন্দ হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সরকার টাকার বা আধুলির রূপার ভাগের কোনরূপ ব্যতিক্রম করেন নাই। আজ শতাধিক বৎসর ধরিয়া টাকায় এবং আধুলিতে রূপার পরিমাণ বারো ভাগের এগার ভাগই চলিয়া আসিতেছে। ১৮০ গ্রেণ ওজনের টাকার মধ্যে ১৬৫ ভাগ খাঁটি রূপা (চাঁদি) থাকিত। আধুলিতে থাকিত ঠিক তাহার অর্দ্ধেক; এ পর্য্যন্ত সরকার ইহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এইবার যুদ্ধারম্ভ হওয়ায় রূপার দর পুনর্ব্বার বাড়িতে সুরু করিলে সরকার প্রথমে সিকির রূপা ১১/১২ ভাগ হইতে একেবারে অর্দ্ধেক করিয়া দিলেন! অবশ্য ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ইহার অনুমোদন করেন। "শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা" নীতিতে ভারত সরকার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৬ষ্ঠ অর্ডিনান্স জারি করিয়া আদেশ করিলেন—আধুলিতে অর্দ্ধেক রূপা থাকিবে। তাহার পর গত অক্টোবর মাসে সরকার ১১নং অর্ডিনান্স জারি করিয়া 'রাণী মার্কা' টাকা আগামী ৩১শে মার্চ্চের পর আর চলিবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভারত সরকারের আদেশে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টাকা ভারতে অচল হইল! তবে সরকারী ট্রেজারীতে এবং পোষ্টাফিসে উহা আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত সচল থাকিবে। উহার উদ্দেশ্য ইহাই মনে হয় যে, ঐ টাকায় যে অধিক রূপা আছে, তাহা সরকারের হাতে পড়িলে প্রতি টাকায় ৭৫ গ্রেণ রূপা সরকার লাভ করিবেন। ইহার পরই সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, এখন হইতে টাকায় ১৬৫ গ্রেণ খাঁটি রূপা আর থাকিবে না; উহাতে কেবল মাত্র ৯০ গ্রেণ বা আধ ভরি খাঁটি রূপা থাকিবে; অর্থাৎ রূপার হিসাবে টাকার আসল মূল্য যাহা ছিল, তাহা আর রহিল না। উহা রূপার মূল্য হিসাবেও ১২ ভাগের ৫ ভাগ কমিয়া গেল।

সরকার অবশ্য বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের আতঙ্কে লোক রূপার টাকা সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা এই কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সকল

দেশেই যুদ্ধের সময় লোক আতঙ্কে এইরূপ কাণ্ড করে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ৫ দিনের মধ্যে ইংলণ্ডের লোক ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের নোট, কাগজ প্রভৃতি ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিল, এ কথা ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড তথাকার সরকারী কোষাধ্যক্ষকে (Chancellor of Exchequer) জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও সরকার পাউণ্ডের আসল সুবর্ণমানের কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। এবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর গত জুন মাসেই সরকারকে ১৩ কোটি টাকার রৌপ্যমুদ্রা বাজারে বাহির করিতে হইয়াছিল। আর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতে যত টাকার নোট চলিত ছিল, তাহা অপেক্ষা ৪৭ কোটি টাকার নোট অধিক প্রচারিত হইয়াছিল। ভারত সরকারকে যদি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত রূপা বিক্রয় করিতে না হইত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কখনই এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত না। এখন নোটের প্রচলন আরও বাড়িয়া গিয়াছে,—রূপার টাকারও ধাতব মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? সত্য বটে, টাকার মূল্য পাউণ্ডের মূল্যের সহিত গাঁথা আছে; কিন্তু টাকা দিলেই ত আর অবাধে সুবর্ণের পাউণ্ড পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় সাধারণ নিয়ম অনুসারে টাকার মূল্য হ্রাসের দিকে যাইবেই। বর্ত্তমান যুগে সকল যুদ্ধের সময় তাহা নানা কারণে ঘটিয়াই থাকে।

বৃটিশ দ্বীপের চলিত মুদ্রা এখন কাগজের সত্য, কিন্তু তাহার পশ্চাতে সুবর্ণমান ধরিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবর্ণ সঞ্চিত আছে। আর ভারতের টাকা ভাক্ত টাকা (token coin) উহার পাউণ্ডের মূল্যের সহিত গাঁথা আছে। নামতঃ কার্য্যতঃ লোক ইচ্ছা করিলেই টাকার বদলে ধাতুর পাউণ্ড পায় না। যুদ্ধের সময় যুদ্ধে সাক্ষাৎ ভাবে নিযুক্ত দেশে সরকার অনিয়ন্ত্রিত ভাবে টাকা ধার করিয়া, আর জাতীয় ধনসম্পত্তি (সঞ্চিত সুবর্ণাদি) গলাইয়া তাহা যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যয় করেন বলিয়া তাহার ফলে মুদ্রার বাহুল্য এবং মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস ঘটিয়াই থাকে। যে দেশের মুদ্রা ঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত, সে দেশেও তাহা ঘটে। সেই জন্য তথায় সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক পণ্যের মূল্যই বৃদ্ধি পায়। ইহার ফল নিরপেক্ষ দেশেও অনুভূত হইয়া থাকে। এই মূল্য-বৃদ্ধির কারণ—মুদ্রা বৃদ্ধি। অধিকন্তু যে সকল দেশের মৌদ্রিক ব্যবস্থার মূলে দোষ বা ত্রুটি আছে, সেই সকল দেশে উহার বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—অর্থাৎ সেই সকল দেশের সরকার অগ্রে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রার স্ফীতি সাধন করেন, এবং তাহার পরেই তাহার ফলস্বরূপ দুর্ম্মূল্যতা দেখা দেয়। আমাদের দেশের মুদ্রার ব্যবস্থা ত্রুটিযুক্ত কি না, সে কথা এখানে না তোলাই ভাল। তবে এ কথা সত্য যে, এইবারকার এই যুদ্ধে সরকার প্রথম হইতে নোট এবং ঋণের বৃদ্ধি করিয়া প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতে ১ শত ৮০ কোটি টাকার নোট প্রচলিত ছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রচলিত নোটের মূল্য পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৭ কোটি টাকা। একেবারে প্রথম ৬ মাসেই শতকরা ২৬ ভাগ বৃদ্ধি! ব্যাঙ্কের মারফতে গৃহীত ঋণের পরিমাণও শতকরা ৪৪ ভাগ হারে বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন সবে কলির সন্ধ্যা বই ত নয়! তাহার পর গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-নর্ম্মদার খাত বাহিয়া অনেক জল গড়াইয়া গিয়াছে। অনেক বার ভারত-গগনে রবি-শশীর উদয় হইয়াছে। এখন নোটের প্রচলন এবং ঋণের সম্প্রসারণ অধিক ঘটিয়াছে। ইহাতে দেশের দুর্ম্মূল্যতা যে দেখা দিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমের সাধারণ পণ্য-মূল্যের খুঁট অঙ্ক যদি ১০০ ধরা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, গত বৎসরের ডিসেম্বর মাস নাগাইদ সেই মূল্য পরিমাণক অঙ্ক ১৩৭এ দাঁড়াইয়াছে, ইহার সমস্ত কারণ মুদ্রাজনিত নহে,—কতক কারণ বহির্ব্বাণিজ্যের বিঘ্নজনিত আমদানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিও বটে। কারণ, দেখা যায় যে, ইহার পরবর্ত্তী কয়েক মাস পণ্য আমদানীর কিছু সুবিধা হইয়াই ভারতে পণ্য-মূল্যের হার কিছু কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু কখনই পূর্ব্বভাব পায় নাই।

যুদ্ধ বাধিলে সরকারের অনেক টাকা যুদ্ধের উপকরণ অস্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য ব্যয় করিতে হয়, ইহার মধ্যে গোলা, বারুদ, বোমা, টর্পেডো প্রভৃতি যাহ

নির্ম্মিত হয়, তাহা সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যায়। উহা নির্ম্মাণে মানব জাতির কোন উপকার ঘটে না। জাহাজ ও অনেক খাদ্যদ্রব্যও জলে যায়; কিন্তু উহা প্রস্তুতের জন্য অনেক টাকা লোকের হাতে আসিয়া পড়ে। ইহার ফলে প্রচলিত মুদ্রায় অনেক স্ফীতি সাধন ঘটে; সে জন্যও মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস হয় বলিয়া পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

এইরূপ অবস্থায় পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেশের লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য বজেট করিবার সময় যাহাতে লোকের উপর অনাবশ্যক ভাবে কর ধার্য্য না হয়, সে দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য। যুদ্ধের জন্য লোকের কষ্ট-বৃদ্ধি অপরিহার্য্য। সেই কষ্ট-বৃদ্ধি যাহাতে অকারণ না ঘটে, সে দিকে রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; তাহা না রাখিলে তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতা এবং অদূরদর্শিতা সূচিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে। লাটিন ভাষায় একটি প্রাচীন প্রচলন আছে যে, জনসাধারণের মতই ভগবানের মত। কথাটি সত্য। কেবল বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া ঐ উক্তি উপেক্ষা করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। যুদ্ধ যত অধিক দিন চলে, ততই লোকের কষ্ট অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সে জন্য পূর্ব্ব হইতেই সকল দেশের সকল সরকারের সাবধান হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে,—তাহার স্থায়িত্ব কত দিন হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না; সুতরাং লোকের এই অর্থকষ্ট দিন-দিন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তাদিগের সাবধান হওয়া আবশ্যক। এই যুদ্ধের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। তাহার ফলে যুদ্ধের ব্যয় এবং দুর্ম্মূল্যতা বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপই আশঙ্কা হইতেছে। অতএব যাহা অত্যাবশ্যক, তাহা ব্যতীত অন্য দিকে প্রজার উপর অধিক কর ধার্য্য করা সঙ্গত হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের এই দেশ অত্যন্ত দরিদ্র। সাধারণ অবস্থায় এ দেশে অত্যন্ত অধিক সংখ্যক লোক বেকার অবস্থায় থাকে; অনেকেরই অন্নসংস্থান হয় না। তাহার উপর যদি দুর্ম্মূল্যতা এবং করভার অত্যন্ত অধিক চাপিয়া বসে, তাহা হইলে লোকের মনে তীব্র অসন্তোষের আবির্ভাব হওয়া অপরিহার্য্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

প্রেম ও পূজা

ভালোবেসে তুমি মোরে যে আসন দিলে দেবতার,
প্রিয়তমা, আমি যেন চিরদিন সুখে-দুখে তা'র
সম্মান রাখিতে পারি প্রাণপণে দেহ-মন দিয়া।
দেবের আসনখানি তুমি মোরে দিয়েছো যে প্রিয়া,

তোমারি গৌরব সে তো; জানি, জানি, হে মোর কল্যাণি!
মাটির প্রতিমা গড়ি' ভক্ত তা'রে দেয় যবে আনি'
হৃদয়ের অর্ঘ্যথালি, পূজারতি; করে যবে তা'র
দেবী ও দেবতা রূপে, সে গৌরব নহে প্রতিমার।

নর-নারী আপনার উদারতা, ভক্তি, প্রেম দিয়া
অটুট বিশ্বাস-ভরে মনে-প্রাণে তোলে সঞ্চারিয়া
মাটির প্রতিমা-মাঝে দেবী আর দেবতার প্রাণ!
এ গৌরব সাধকের; দেব-দেবী ভক্তের সে দান!

তুমি মোরে ভালোবাসো; তাই আমি দেবতা তোমার!
তুমি মোরে শক্তি দিয়ো বহিবারে এই গুরু ভার!

শ্রীকান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

বিজ্ঞান-জগৎ

বিষ-বাষ্পে ভয় নাই

এ যুদ্ধে বিষ-বাষ্প ছিটাইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্বিশেষে শত্রু-নিপাতে কোনো পক্ষে উদ্যোগ-আয়োজনের যেমন সীমা নাই, তেমনি এ বিষ-বাষ্পকে ঠেকাইয়া জীবন-রক্ষার জন্য মানুষের সাধনাও অপরিসীম! বিষ-বাষ্প-রোধক এক-রকম মুখোশ তৈয়ারী হইয়াছে, কচি ছেলেমেয়েদের জন্য এ মুখোশ অমোঘ নিরাপদ। এই মুখোশ-যন্ত্রের সঙ্গে একটি ব্যাগ আঁটা আছে। ব্যাগটির কোথাও এমন রন্ধ্র নাই,



মায়ের কোলে শিশু

যাহা দিয়া বিষ-বাষ্প ভিতরে প্রবেশ করিবে। এই ব্যাগের মধ্যে শিশুকে শোয়াইয়া শিশুর মাতা যদি মুখে-মাথায় মুখোশ আঁটেন, তাহা হইলে দু'জনেই সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিবেন। মুখোশ আঁটিয়া মা বিশুদ্ধ নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করিবেন; সে-বাতাসে মা ও শিশু উভয়েরই জীবন রক্ষা পাইবে। যে-শিশু ভালো করিয়া নিশ্বাস-বায়ু-গ্রহণে অভ্যস্ত হয় নাই, সে-শিশুও এ মুখোশ-যন্ত্র-মারফৎ বিশুদ্ধ নির্ম্মল বাতাস অনায়াসে পাইবে।

লেন্সের পোষাক

কালিফোর্নিয়ার লশ-এঞ্জেলেশ সহরের এক জন চশমাওয়ালা কাচের লেন্স দিয়া নারীর পরিচ্ছদ গোটাভাবে তৈয়ারী করিয়াছেন! মাথার টুপি-ঝাড় হইতে গাউন, কর্শেট, মায় পা-জামা, কোমরবন্ধ— সমস্তই কাচের লেন্সে নির্ম্মিত! পোষাকটি তৈয়ারী করিতে



লেন্সের পোষাক

যে বহু শত লেন্স লাগিয়াছে, তার মোট দাম প্রায় তিন হাজার টাকা!

——

জলখেলা

আমেরিকার মিয়ামি প্রদেশে জলের বুকে খেলার সঙ্গে ব্যায়ামের এক লীলা-মধুর প্রথা প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এ-খেলা যেমন নিরাপদ, তেমনি এ-খেলায় ব্যায়াম-সাধনা সম্পাদিত হয়। মোটরের টায়ারের দু'টি টিউব ফুলাইয়া পাশের ছবির রীতিতে জল-যান তৈয়ারী করিয়া মেয়েরা সেই জল-যানে বসিয়া দুই বাহু দিয়া জল কাটিয়া নিরাপদে জলের বুকে যেমন-খুশী বিচরণ করিতে পারেন। কৌশলে টিউবের মাঝে



ভেসে চলো রঙ্গে

একখানি তক্তা আঁটিয়া বসিবার আসন নির্ম্মিত হইয়াছে। এক-একখানি টায়ার-যানে দু'জন বসেন,—এক জন বসেন সামনের আসনে, আর এক জন পিছনে!

জলাশয়ের স্বাস্থ্য-রক্ষা

দীঘিতে, পুকুরে, বিলে বা ছোটখাট নদীর বুকে বিবিধ গুল্ম জন্মিয়া এমন হয় যে, দীঘি-পুকুর নদী-বিল মজিয়া যায়; সে দীঘি-বিল-নদী



জল-গুল্ম-কাটা বোট

কোনো দিক দিয়া আর ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। সহজে এবং দ্রুত এ জল-গুল্মাদির উচ্ছেদকল্পে আমেরিকার টেক্সাস-নিবাসী এক জন বৈজ্ঞানিক গুল্ম-কাটা বোট তৈয়ারী করিয়াছেন। হাল্কা মোটর-এঞ্জিনে এ-বোট চলে। বোটখানি আগাগোড়া ইস্পাতের তৈয়ারী বলিয়া বেশ মজবুত। বোটের সামনে ধারালো গাছ-কাটা 'মোয়ার' যন্ত্র (mower) লাগানো আছে; হাল আছে, সে হালের সাহায্যে বোটখানিকে চারি দিকে যেমন-খুশী চালানো যায়। সামনে ধারালো ব্লেডের মোয়ার থাকার জন্য যত ঘন গুল্মই জলে জমিয়া থাকুক, বোটের গতি রুদ্ধ হইবার এতটুকু আশঙ্কা নাই।

প্রান্তর-আসন

রেসের বা খেলার মাঠে দর্শকের দল স্বচ্ছন্দে বসিয়া বেশ ও



চাকৃতি খুলে বসুন

খেলা দেখিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে কালিফোর্ণিয়ার মাঠে দর্শকদের জন্য চমৎকার আসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সার-সার খুঁটা পুঁতিয়া সেই খুঁটাতে সকেট আঁটিয়া পুরু কাঠের নিরেট ও সুগোল চক্র সংলগ্ন করা হইয়াছে; খুঁটার গায়ে এই চক্র সিধাভাবে আঁটা থাকে। বসিবার সময় বোতাম টিপিলে খুঁটার মাথায় এ-চক্র আসন বিছাইয়া দেয়, তখন আরামে বসিয়া খেলা দেখুন, ঘোড়-দৌড় দেখুন।

যন্ত্র-খবরদার

কোন্ সহরের কোথায় কোন্ বড় হোটেল, থিয়েটার, সিনেমা-হাউস, স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং বা ক্লাব আছে, সে খবর জানিতে হইলে আমাদের অতিকায় ডাইরেক্টরি খুলিতে হয়। সম্প্রতি আমেরিকায় এক-রকম যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; যন্ত্রের গায়ে বড়-বড় পাঁচ শো সহর ও গ্রামের নাম ছাপা আছে। এই যন্ত্রের মণি-কোটরে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা ফেলিয়া যে সহরের হোটেল বা থিয়েটার প্রভৃতির ঠিকানা বা সংবাদ জানিতে চান, সহরের নাম দেখিয়া তার গায়ে যে-বোতাম আছে,

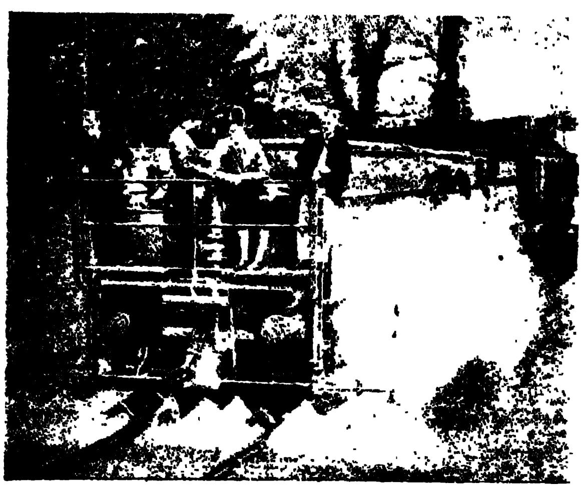


ডাইরেক্টার-যন্ত্র

সেই বোতাম টিপিয়া যন্ত্র-সংলগ্ন টেলিফোন-রিসিভার লইয়া প্রশ্ন করুন—অমুক সহরে অমুক থিয়েটার কোন্ রাস্তার উপরে? যন্ত্র-টেলিফোনে এ-প্রশ্নের সঠিক জবাব পাইবেন।

বালির নীচে উর্ব্বর-জমি

আমেরিকায় বহু জমি দীর্ঘকাল জলে ডুবিয়া থাকিবার ফলে রুক্ষ বালুচরে ঢাকিয়া অনুর্ব্বর হয়। এখন সে বালি সরাইয়া সেই



বালুকার নীচে উর্ব্বর-জমি

সব জমির বুকে মাটা বাহির করিয়া সেই মাটাকে উদ্ধার ও উর্ব্বর করিয়া তোলা হইতেছে।

এ মাটার উদ্ধারকল্পে এক জন মার্কিণ এঞ্জিনীয়ার অতিকায় যন্ত্র-লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বালির বুকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে এই যন্ত্র-লাঙ্গল চালাইলে প্রায় ছ'ফুট গভীর বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত হয়—বালির নীচেকার উর্ব্বর কালো মাটা উপরে ওঠে। লাঙ্গল-সংলগ্ন পাত্রে এ বালুকারাশি তুলিয়া আবর্জ্জনার মতো সহজে ফেলিয়া দেওয়া চলে।

টুথ-ব্রাশ

দাঁত মাজিবার জন্য সাধারণতঃ আমরা যে টুথ-ব্রাশ ব্যবহার করি, তাহাতে দাঁত-মাজায় বহু গলদ থাকিয়া যায়। এজন্য বিলাতে

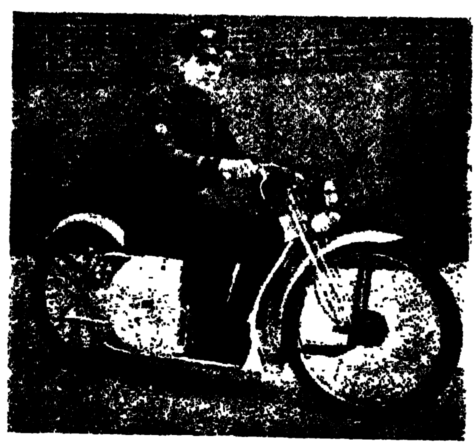


সুদর্শনা

ইংরেজী ইউ-অক্ষরের ছাঁচে টুথ ব্রাশ তৈয়ারী হইতেছে। এ টুথ-ব্রাশের সাহায্যে দাঁতের ত্'পিঠ সমান ভাবে পরিষ্কার করা যায় এ-টুথ-ব্রাশে দাঁত মাজিতে যেমন কম সময় লাগে, তেমনি দাঁতের স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে এ-ব্রাশ খুব অনুকূল!

মোটর-বাইকে প্যাডল্ নাই

আমেরিকায় টেলিগ্রাফ-পিয়নদিগের জন্য মোটর-বাইক তৈয়ারী হইয়াছে। এ-বাইকে প্যাডল্ নাই। কাজেই চালাইতে পরিশ্রম



প্যাডল্ নাই

করিতে হয় না। এ-বাইক ঝড়ের গতিতে চলে এবং দীর্ঘ-চালনাতেও চালকের ক্লান্তি ধরে না।

সর্ব্বস্থ ফ্যান্

গ্রীষ্ম আসন্ন,—ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের সুব্যবস্থা না হইলে অস্বাচ্ছন্দ্যের সীমা থাকিবে না! লিখিতে বসিতে গরমে প্রাণ যায়, ফ্যান্ চাই! শয়নের সময় ফ্যান না চলিলে সুনিদ্রা হইবে না,—তার পর আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া দু'টা গল্প করিব, সুখ দুঃখের কথা কহিব, তখনো ফ্যান্ চাই! অথচ প্রতি ঘরে একখানি ফ্যান্ রাখিতে অনেক খরচ! এক বিলাতী কোম্পানি বিশেষ-রকম পায়া জুড়িয়া এমন ফ্যান তৈয়ারী করিয়াছেন যে, সেই পায়ার বৈশিষ্ট্যে এ ফ্যানকে টেবিলে রাখুন, দেওয়ালে ব্র্যাকেট-সংলগ্ন করুন, খাটে আটকাইয়া দিন—সর্ব্বত্র



এ ফ্যান্ সর্ব্বত্র সচল

এ ফ্যান্ সহজ ভাবে সেবা-পরিচর্য্যা করিবে। ফ্যানটি আকারে ছোট; এজন্ত বৈদ্যুতিক প্রবাহের ব্যয় যে কম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিছানার চাদর

বিছানায় চাদর পাতিয়া শয্যা-প্রসাধনে একটু কারিগরির প্রয়োজন। তোষকের নীচে চাদর এমন ভাবে গোঁজা চাই, ছাঁদ যেন বেয়াড়া না



এমনি ভাবে চাদর বিছান

হয়! অর্থাৎ বাঁকাচোরা ভাবে চাদর পাতিলে চলিবে না। সব দিকে সমান মাপ বজায় রাখা সহজ হইবে—যদি চাদরের চার-প্রান্তে রঙীন সুতা দিয়া টানা-ধারি-লাইন বুনিয়া রাখেন। রঙের দরুণ চাদরখানি ভালো দেখাইবে। এবং চাদর গুঁজিবার সময় কোন দিকে বাঁকিয়া চুরিয়া থাকিবে না।

মুখের খোল-বদল

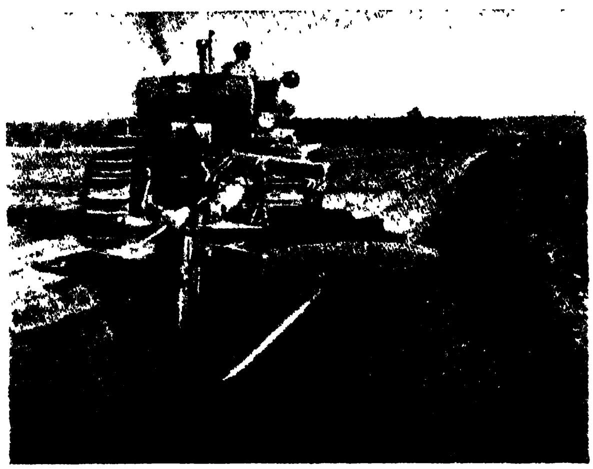
থ্যাঁদা নাক, খোঁচা নাক, বড়ি নাক, চিপি গলা, ঝিঁক কপাল—এ সব সাবাইয়া মুখখানিকে নিটোল সুছাঁদে গড়িয়া কমনীয় করিয়া তুলিবার জন্ত আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা এক বিচিত্র লোশন তৈয়ারী করিয়াছেন। শিল্কের মুখোস এ-লোশনে ভিজাইয়া সেই মুখোস নির্দ্দেশ-মতো মুখে আঁটিতে হইবে; নাক-কপাল-গাল—যেখানকার যে-খুঁৎ সারানো প্রয়োজন, ঠিক তার অনুরূপ মুখোস মেলে। সে মুখোশ মুখে আঁটিয়া রাখুন—মাসখানেক—শুধু রাত্রে শয়ন করিবার সময়। খোল বদলাইয়া মুখশ্রী যা হইবে, আয়নায় সে-মুখ দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।



লোশনে মুখের ছাচ-বদল

আগাছার যম

রেলোয়ে-লাইনের বা পথের ধারে-ধারে যে আগাছা জন্মিয়া দারুণ জঙ্গল গড়িয়া তোলে, সে আগাছা মারিয়া পথ পরিষ্কার রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকের দল এক-রকম আরক তৈয়ারী করিয়াছেন। পথে জল দিবার জন্য যে-গাড়ী চলে, সেই গাড়ীতে কিম্বা এঞ্জিনে স্প্রে-সংযোগ করিয়া এই আরকের সাহায্যে সমস্ত আগাছা অনায়াসে এবং অতি-শীঘ্র সাফ করা সম্ভব হইয়াছে। এ-আরকের



আরকে আগাছা-সাফ

এমন গুণ যে, আগাছার মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ—ভস্ম করিয়া দেয়। ১১৫০০ গ্যালন জলে এ আরক ৪০০ গ্যালন মেশানো প্রয়োজন। এক মাইল-ব্যাপী ঘন আগাছা সাফ করিতে এ মিকশ্চার লাগে চারি শত গ্যালন।

উন্মুখ

আমি—ফাগুন বনের গন্ধ-মুকুল
মুগ্ধ বিহ্বল সুবাসে ব্যাকুল ধরণী
সবুজ প্রাণের গানের ছন্দে
অরুণ আলোকে ভাসাই জীবন-তরণী।
পাখীর পাখায় দিগ্বলয়ের কক্ষে ছুটি
যোগ ক'রে দেই অসীম নভের প্রান্ত দু'টি;
ধরার মানুষ কেমন ক'রেই
বুঝবে আমার যোজনব্যাপী সরণি?

আমি আলেপা দেবকুমারের
নন্দন রচি মরু-মরতের বক্ষে
রোশনাই জালি ঝঞ্ঝা নিশীথে
মানুষ জাতির হাজার সুনীল লক্ষ্যে;
হাস্তে লাস্তে মণি মুক্তার মাল্য ঝরে
নিয়ে আসি খোঁজ দূর-নেবুলার মাটির ঘরে,—
ব্যথা বেদনার কণ্টক শাখে
গোলাপ ফোটাই শত মানুষের চক্ষে।

কল্পনা দিয়ে আল্পনা রচি
স্বর্ণ করি যে মলিন ধরার পঙ্কে
প্রীতি সরলতা ত্যাগের কুসুম
ফোটে থরে থরে হৃদয়-বাগিচা-অঙ্কে;
কে কাঁদে কোথায় আর্ত্ত আতুর সহায়হীন
তারি পাশে পাশে বেজে ওঠে মোর মোহন বীণ
বিপদ বেদনা তুচ্ছ মানি যে
বাজাই নিয়ত জয়-গৌরব শঙ্খে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান তপস্যা মোর—
আভালাঁশ ডাকে, ডাকে বারে বারে সিন্ধু
নিত্য নবীন বাসনা সাধনা
মৃত্যুরে জিনি খেলনা অরুণ ইন্দু।
ঢালবো আমি ঢালবো আমি হর্ষ সুখে
শান্তিপিযুষ দীন দুনিয়ার শুষ্ক মুখে
জান কি তোমরা মস্তকে মোর
বর্ষিত হয় দেবের আশিস-বিন্দু?

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ।



অন্ধ ভিখারী

(গল্প)

কৃষ্ণগোপাল রাগিয়া আগুন !

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক কৃষ্ণগোপাল···ঘরে বসিয়া উপন্যাস লিখিতেছে, হঠাৎ বাড়ীর দ্বারে বাহিরে এক ভিখারী বেহালা বাজাইয়া গান সুরু করিল। অনেক ভাবিয়া, অনেক মাথা খাটাইয়া নূতন উপন্যাসের নায়িকা কুঞ্জলতার মনের দ্বন্দ্বের একটা আদরা মাথায় আনিয়াছে, সে-দ্বন্দ্বের কথা কাগজে লিখিবে, এমন সময় ঐ ভিখারীর গান !

ভিখারী গাহিতেছিল,—

বঁধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনাইনু
সকলি বিফল ভেল মোর রে !

ভালো আপদ !

এ যুগে বঁধুর সঙ্কেতে নায়িকা বেশ বানায় না এবং বঁধু না আসিলে সে-বেশ বিফল হয় না। এ-যুগের নায়িকা হেলার স্পর্শে কাঁদিয়া অমন ধূলায় লুটায় না ! এ-যুগে···

এই কথাটাই তার উপন্যাসের নায়িকা কুঞ্জলতার মনকে অবলম্বন করিয়া সে ভাষায় প্রকাশ করিতে চায় !

ভিখারীর গানে কুঞ্জলতার মন, কুঞ্জলতার মনের দ্বন্দ্ব কোথায় যে ভাসিয়া গেল !

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া ঘরের সার্শি বন্ধ করিয়া কৃষ্ণগোপাল আবার কুঞ্জলতার মনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ধ্যানস্থ হইল···

কোনো মতে কুঞ্জলতার মনের সে-কথার দু'চারিটা টুকরা···

সে-টুকরাগুলাকে খাড়া করিয়া দানা পাকাইবে, আবার ও-দিকে ভিখারী চড়া গলায় গান ধরিল—

না জানি বঁধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোন্ রে !

বেচারী কুঞ্জলতা সহিতে পারিল না, ত্রস্তে সে কৃষ্ণগোপালের মন হইতে পিছলাইয়া সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল !

রাগে জ্বলিয়া কলম রাখিয়া কৃষ্ণগোপাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, উঠিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে দ্বারের পাশে রোয়াক। সেই রোয়াকে বসিয়া শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভিখারী গান গাহিতেছে···

কৃষ্ণগোপাল সরোষে ধমক দিল—এই···

রুদ্ধ স্বরে ভিখারীর বেহালা থামিল, সঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠ নীরব হইল।

ভিখারী কহিল,—আমায় বলছেন, বাবু ?

—হ্যাঁ।

—বলুন···

—গান গাইবার আর জায়গা পাওনি ! আমার রোয়াক থেকে সরে পড়ো। এখানে গান চলবে না।

ভিখারী চমকিয়া উঠিল ! কহিল,—বাড়ীতে কারো অসুখ করেছে বুঝি ?

অসুখ ! কৃষ্ণগোপালের শিল্পী-মনের অসুখ···

তর্ক করিবার ইচ্ছা ছিল না ! তাই কৃষ্ণগোপাল বলিল,—হ্যাঁ, অসুখ !

ভিখারী একেবারে এতটুকু হইয়া গেল ! কহিল,—আমি জানতুম না, বাবু। এখনি আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি···

বেহালাটি বুকে তুলিয়া ভিখারী উঠিয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল···

কৃষ্ণগোপাল দেখিল, ভিখারী অন্ধ !

মনের কোণে ছোট একটু আঘাত ! পকেটে ছিল পার্শ। পার্শ খুলিয়া একটা দু'আনি বাহির করিয়া ভিখারীর হাতে দিল ; কহিল,—এই নাও।

ভিখারী দু'আনি লইল, লইয়া গাঢ় কণ্ঠে কহিল—ভগবান ভালো করুন বাবা·· তোমার বড় দয়া! আমি আর এখানে গান গাইবো না। বাড়ীতে অসুখ···

ভিখারী সতর্ক ভঙ্গীতে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণগোপাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তার মন বলিল, কল্পনা লইয়া আনন্দ পাও বাপু! বাস্তবকে উপেক্ষা করো···বাস্তবকে আজ মিথ্যা দিয়া সরাইয়া দিলে···কল্পনার খোরাকের জন্য!

হাতড়াইতে হাতড়াইতে ভিখারী অদূরে গিয়া পার্কের রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইল; তার পর সেইখানে দাঁড়াইয়াই বেহালায় ছড়ি বুলাইল। বেহালায় করুণ সুর জাগিল।

ফিরিয়া কৃষ্ণগোপাল দেখে, রোয়াকের উপর একটা টিন পড়িয়া আছে···সিগারেটের খালি টিন! টিনের মধ্যে ক'টা পয়সা। বুঝিল···

ভিখারীর টিন···এ-টিনে আছে তার সঞ্চয়।

কি মনে হইল, টিনটি লইয়া কৃষ্ণগোপাল ভিখারীর কাছে আসিল। বলিল—তোমার টিন ফেলে এসেছিলে ···নাও...

ভিখারী বলিল,—ও···

সে হাত বাড়াইল। কৃষ্ণগোপাল তার হাতে টিন দিল। ভিখারী কহিল—ভুলে গেছলুম বাবু···চোখে দেখতে পাই না তো···

কৃষ্ণগোপাল বাড়ী ফিরিল···একেবারে নিজের ঘরে—ঘরে আসিয়া ফাউণ্টেন্-পেন্ হাতে লইল···

পথে ভিখারী তখন গান গাহিতেছে—

আমার বঁধুয়া আন-ঘরে যায়
আমারই আঙিনা দিয়া।

গলাটি বেশ—গায় ভালো···

কৃষ্ণগোপাল ভাবিল, মেজাজও ভালো···অন্য ভিখারীর মতো নয়···বিনয়ী, ভদ্র!

মনের দ্বারে কুঞ্জলতা আর দেখা দিল না।' কৃষ্ণ-গোপালের শত ধ্যান-ধারণাতেও না···

এক দিন দু'দিন কাটিয়া গেল। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদ যেন বাঁকিয়া বসিয়াছে···কিছুতেই সে-পরিচ্ছেদ কলমে ধরা দিবে না! কৃষ্ণগোপালের মনে পড়িতেছিল, ছেলেবেলায় কথামালায়-পড়া সেই শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প! লতায় লতায় পাকা-পাকা ফল ঝুলিতেছে···শৃগাল চোখে দেখিতেছে, কিন্তু নাগাল পায় না! কুঞ্জলতার মনকেও তেমনি সে স্পষ্ট দেখিতেছে···কিন্তু সে-মনের নাগাল পাইতেছে না···কিছুতে না!

তার কল্পনার যেন ব্যাধি হইয়াছে! যে-কল্পনা ইঙ্গিতমাত্রে আসিয়া উদয় হইত, সে-কল্পনার আজ-এ কি হইল?

কৃষ্ণগোপালের মনে দারুণ চাঞ্চল্য···সুখ নাই, শান্তি নাই! বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ ভালো লাগে না! সন্ধ্যার সময় সিনেমা দেখিতে গেল। ছবির একটা দৃশ্যও মনে দোলা দিল না···চোখের সামনে খালি কতকগুলা ঘটনার হিজিবিজি···

সিনেমা হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণগোপাল মাঠে খুব খানিকটা পায়চারি করিয়া বেড়াইল। কার্জ্জন গার্ডেন্সে আসিল। সবুজ গণ্ডীরেখার মধ্যে রাশি-রাশি মর্শুমী ফুল ফুটিয়া আছে·· এ্যাণ্টারহিনাম, লার্কস্পার, প্যান্সি, ফ্লক্স···কৃষ্ণগোপাল কুঞ্জলতার কথা ভাবিতে লাগিল! পুরাণের সাধকেরা যেমন নিষ্ঠাভরে উপাস্য-দেবতার ধ্যান করিতেন, তেমনি করিয়া কুঞ্জলতার ধ্যানে কৃষ্ণগোপাল তন্ময়!

কিন্তু পাষাণী কুঞ্জলতা তার মনের দ্বারে চরণপাত করিল না।

হোয়াইটাওয়েব বড় ঘড়ির পানে নজর পড়িল। রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পথে গাড়ী-ঘোড়া লোক-জনের কোলাহল ক্লান্তি-মন্থর হইয়া নিশ্চিহ্ন হইবার জো!

কৃষ্ণগোপাল আসিয়া একটা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া বসিল এবং একেবারে নিজের গৃহে আসিল।

পরের দিন।

বেলা তখন দশটা। কৃষ্ণগোপাল কোথায় বাহির হইয়াছিল, এখন বাড়ী ফিরিতেছে···

একটা দোকানের সামনে দেখে সেই ভিখারী। দোকানী তাকে ধমক দিতেছে, বলিতেছে—

কেনা-বেচার সময় ভারী জ্বালাতন সুরু করলে তো! এখান থেকে যাও দিকিনি···গান গাইতে হয়, অন্যত্র যাও···

বেচারী!

কৃষ্ণগোপালের মনে হইল, সে-দিন এ-ভিখারীকে সে গৃহদ্বার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল! হয় তো সেই পাপে কুঞ্জলতা অভিমান করিয়া তার মনের দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া গিয়াছে! কৃষ্ণগোপাল আসিল ভিখারীর কাছে; বলিল—শুনছো?

ভিখারী বলিল—আমায় বলছেন?

—হ্যাঁ।

—এই যে আমি সরে যাচ্ছি, বাবা। অন্ধ-মানুষ···

কৃষ্ণগোপাল বলিল—সরে যেতে বলিনি। সে-দিন আমার রোয়াকে বসে তুমি গান গাইছিলে। বাড়ীতে অসুখ বলে আমি সে-দিন চলে যেতে বলেছিলুম··· আমার বাড়ীতে অসুখ আর নেই।—তুমি আমার রোয়াকে বসে গান গাইবে, এসো···

ভিখারীর মুখে আনন্দের জ্যোতি।···ভিখারী বলিল—অসুখ সেরে গেছে? আঃ!

ভিখারীর স্বরে কি আশ্বস্তি!

কৃষ্ণগোপাল বলিল—আমি হাত ধরছি, এসো আমার সঙ্গে।

ভিখারী বলিল—তোমার জয় হোক বাবা! তোমার রোয়াক মোড়ের উপর কি না···পাঁচ-জন ভালো লোক যায় ও-পথে—দু'-চার পয়সা দয়া করে তাঁরা এই অন্ধকে দিয়ে যান কি না···

কৃষ্ণগোপাল লিখিতে বসিল—সেই পরিচ্ছেদ··· খোলা খড়খড়ি দিয়া ভিখারীকে দেখা যায়। বাহিরে রোয়াকে বসিয়া ভিখারী বেহালা বাজাইয়া গান গাহিতেছে,—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়ামুখ-চন্দা

কৃষ্ণগোপাল ভাবিল, বাঃ! গরীব ভিখারী···গান গাহিয়া ভিক্ষা করে! বৈষ্ণব-পদাবলীর উপর তার এমন অনুরাগ! এত পদাবলী মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে! শুধু মুখস্থ নয়—গাহিতেছে! বেশ গায়! যেমন গলা, তেমনি গানে যেন একেবারে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া গায়!

কৃষ্ণগোপালের মনের দ্বার হইতে কুঞ্জলতা সরিয়া গেল···মনের দ্বারে ভিখারী আসিয়া বসিল!

মমতায় মন পূর্ণ হইল। কৃষ্ণগোপাল ভাবিল, সৌখীন সমাজের সখের সুখ-দুঃখের কথা লিখিয়া বাহবা আদায় করি। সে সৌখীন সুখ-দুঃখের সহিত মানুষের সত্যকার প্রাণের কোনো সম্পর্ক আছে কি? সত্যকার ফুলে-পাতায় যে শোভা, যে গন্ধ-বর্ণ, যে মাধুরী—কাগজের ফুলে কোথায় তা! এই ভিখারী···কোথা হইতে সে এ-সব গান শিখিল? ভিক্ষা পেশা···তবু যা-তা গান গাহিয়া ভিক্ষা চায় না! যে-গান শুনায়, সে-গান শুনিবার মতো! পথে বসিয়া গান না গাহিয়া ও যদি রেডিয়োর আসরে বসিয়া গাহিত, গ্রামোফোনের রেকর্ডে গান গাহিত, তাহা হইলে অনেক বেশী পয়সা পাইত! ভিক্ষার পয়সা নয়—আনন্দ দিয়া তার দাম আদায় করিতে পারিত! রেডিয়োয় যারা গায়, গ্রামোফোনের রেকর্ডে যারা গায়, তাদের কারো চেয়ে খারাপ নয় এই পথের ভিখারীর গান!

কৃষ্ণগোপালের মনে হইল, সৌখীন সমাজের হীরক-নীরা, রেবা-দীপকের মিথ্যা গল্প না লিখিয়া যদি এই ভিখারীর সত্যকার দুঃখের কথা, তার কঠিন নিষ্ঠুর অভাব-অভিযোগের কথা লেখার অক্ষরে গাঁথিয়া তুলিতে পারিত, বেচারার চারি দিকে কি সুখ-ঐশ্বর্য্য···কতখানি বেদরদ···

বেলা তখন প্রায় এগারোটা···স্নান করিবার জন্য কৃষ্ণগোপাল উঠিল। চোখ পড়িল ভিখারীর উপর···

এক জন নারী···ভিখারীর পাশে আসিয়া বসিয়াছে। একটা থালায় অন্ন বাড়িয়া আনিয়াছে···লাল-লাল মোটা চাল, একটু তরকারী···

বোধ হয়, ভিখারীর স্ত্রী। ভিখারীর ঘরে বাস করিলেও নারীর মুখে মহিমার ছায়া লাগিয়া আছে!

পরের দিন কুঞ্জলতার দয়া হইল···সে আসিয়া কৃষ্ণগোপালের মনের দ্বারে দাঁড়াইল। কৃষ্ণগোপাল দু'টো পরিচ্ছেদ লিখিয়া ফেলিল···

এবার সপ্তম পরিচ্ছেদ। এ পরিচ্ছেদে উপন্যাসের প্লটে মস্ত মোচড় দিতে হইবে…একটা জটিলতার জাল ফাঁদিয়া বসিবে!

পথের দিকে চাহিল।

কি একটা যোগ আছে! এ পথ দিয়া মেয়েরা চলিয়াছে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে। ভিখারীর গান শুনিয়া অনেকে দাঁড়াইয়া তার গান শুনিতেছে, তার পাশের সেই টিনটিতে পয়সা দিতেছে, চাদরের ঝুলিতে চাল দিতেছে, আনাজ-তরকারী দিতেছে। কৃষ্ণগোপাল ভাবিল, মানুষকে বিধাতা তৈয়ারী করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিয়াছেন…কি উপায়ে, কি সাধ্য-সাধনায় যে তাকে অন্ন সংগ্রহ করিতে হয়—পয়সার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া এ-কথা কোনো দিন ভাবিয়া দেখে নাই! দেখিবার অবসর পায় নাই…অবসর ছিল না! আজ একেবারে চোখের সামনে মনের উপরে সে-দৃশ্য…

কুন্তলতার উপর রাগ হইল। তোমরাই শুধু ভিড় করিয়া মনের উপরে আসিয়া দাঁড়াও…তোমাদের চুড়ির শিঞ্জিনী-রব, শাড়ী-ব্লাউশ…ও-সবে এমন আড়াল তুলিয়া ধরো যে, তোমাদের পিছনে যে-সব গরীব-দুঃখী…তারা চোখে পড়ে না!

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। মাথায় একটা নূতন প্লট উঁকি দিতেছে! এই ভিখারীকে কেন্দ্র করিয়া এক হৃদয়ভেদী কাহিনী…এ ভিখারী যেন এক দিন সুখের মুখ দেখিয়াছিল…গান-বাজনায়, বিলাস-লীলায় দিন কাটিয়াছিল! এক দিন উহার সভায় চাটুকার-দলের মস্ত ভিড় জমিত! তার পর তাদের পরিচর্য্যা করিতেই সব বিভব উবিয়া গেছে…

রোয়াকে প্রখর রৌদ্র। ফাল্গুনের তপ্ত রৌদ্র…সে-রৌদ্রে বসিয়া আছে ভিখারী…চুপ-চাপ। পথে তেমন লোক নাই। কার জন্য গান গাহিবে? কিম্বা হয় তো দারুণ গ্রীষ্মে…

আকলু বেয়ারা চায়ের পেয়ালা দিয়া গেল। কৃষ্ণগোপালের কি খেয়াল হইল…পেয়ালা হাতে সে আসিল বাহিরের রোয়াকে। ভিখারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—বড্ড রোদ্দুর! খুব কষ্ট হচ্ছে…না?

ভিখারী বলিল,—সয়ে গেছে বাবা…রোদে আর কষ্ট হয় না…

কৃষ্ণগোপাল বলিল,—চা খাবে?

ভিখারী হাসিল…কহিল,—চা?

—হ্যাঁ…খাও না।

—আপনার দয়া…

কৃষ্ণগোপাল আকলুকে ডাকিল। আকলু আসিল। কৃষ্ণগোপাল বলিল,—একে এক-পেয়ালা চা এনে দে…আর কিছু খাবার…বুঝলি…

মাথা নাড়িয়া আকলু চলিয়া গেল।

ভিখারী বলিল,—আপনার বাড়ীতে বাগান আছে…

কৃষ্ণগোপাল বলিল,—সদরের উঠোনে কতকগুলো ফুলের গাছ আছে…

ভিখারী বলিল,—গন্ধ পাচ্ছি কি না!

কৃষ্ণগোপাল বলিল,—তুমি কোথায় থাকো?

ভিখারী বলিল,—অনেক দূরে…সেই পাতি-পাড়ায়।

—বেহালা বাজাচ্ছো অনেক দিন…না?

ভিখারীর মুখে ম্লান একটু হাসি! ভিখারী বলিল—আমার যখন সাত বছর বয়স, সেই তখন থেকে…

কৃষ্ণগোপাল বলিল—তোমার গান শুনে মনে হয়, সাধা গলা…ভিখারীর গলা নয়।…চিরদিন ভিক্ষা করে তোমার দিন কাটছে?

ভিখারী বলিল,—না বাবা। এক দিন এ-গলার দাম ছিল…মস্ত ধনী ছিলেন জীবন চৌধুরী…সাতঘড়ার জমিদার। আমারো বাড়ী ঐ সাতঘড়ায়। তাঁর সঙ্গে এক-ক্লাশে পড়তুম ছেলেবেলায়। তার পর তিনি বসলেন জমিদারী-গদিতে…আমার লেখাপড়া গেল ছুটে। জীবন চৌধুরী মশায় সংসারের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর ওখানে থাকতুম…গান গাইতুম…বেহালা বাজাতুম। তিনিও এই গান-বাজনা নিয়ে থাকতেন।…বিষয়-আশয়ের দিকে দেখতেন না। তাঁর দুই সম্বন্ধী তাঁর ওখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন…এক জনকে করেছিলেন উকিল, আর-এক জনকে ব্যবসা করে দিয়েছিলেন। সেই দু'জনে মিলে তলে-তলে ফাট্ ধরিয়ে জমিদারী বিষয়-সম্পত্তি সব লুটিয়ে বেনামী করে নিলে। জীবন চৌধুরী মামলা-মকর্দ্দমা করলেন স্ত্রীর

কথায়। কিন্তু সে মকর্দ্দমা আর দাঁড়ালো না। আমায় নিয়ে এক দিন রাত্রে উকিল-বাড়ী থেকে ফিরছিলেন, অন্ধকারে মেঠো পথে দু'জনের মাথায় পড়লো লাঠি। সে-লাঠি খেয়ে ছ'মাস পরে আমি উঠে দাঁড়ালুম···দু'টি চক্ষু অন্ধ হলো···আর জীবন চৌধুরী মশায় মাথায় সে লাঠির ঘায়ে ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন! তার পর গ্রামে থাকা গেল না। সহরে এলুম···স্ত্রীর হাত ধরে ভিক্ষা করতে। আমার বাঁচবার কথা নয়···আমার স্ত্রী বুকে বল দিলেন ···তাঁর জন্যই প্রাণটা রয়ে গেছে···

কৃষ্ণগোপাল শুনিল। ক'টা কথা···কিন্তু এ-কথার পিছনে মানুষের ভীষণ অকৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা···নৃশংস লালসা···লোভের কি বিপুল ইঙ্গিত! এই অকৃতজ্ঞতা আর নৃশংস লোভের জন্য পৃথিবীতে ঘটিয়া গিয়াছে কত মহাযুদ্ধ···সে সব যুদ্ধের কাহিনী লইয়া অষ্টাদশ-পর্ব্ব কত মহাভারত না রচিত হইয়াছে! মনে হইল, নর-নারীর প্রেম আর যৌবন, লালসা ও বীভৎসতার ছবি লইয়া আমরা মাতিয়া আছি···মানুষ হইয়া মানুষকে ভালো-বাসিবার এক-কড়া শক্তি নাই···জানি শুধু হিংসা আর দ্বেষ করিতে!

ভিখারী বলিল,—অন্ধ হয়ে যেন আর-এক-রকমের দৃষ্টি পেয়েছি, বাবা! মনে হয়, যেন মস্ত সাগরের তারে দাঁড়িয়ে আছি···এ সাগরের পার দেখা যায় না। এই সাগর যেন আমাদের এক-একটা জীবন···সে-জীবনে শুধু ঢেউ আর ঢেউ···

ভিখারী একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কৃষ্ণগোপাল বলিল,—তোমার স্ত্রী?

ভিখারী বলিল—হাত ধরে আমায় এনে এইখানে বসিয়ে দিয়ে যান রোজ। বলেন, রোয়াকের উপর থাকলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। না হ'লে সহরের পথে গাড়ী-ঘোড়ার যে ভিড়···যদি চাপা পড়ি! পথের ভিড়ে কেউ যদি মাড়িয়ে ঠোক্কর মারে···তার পর পুলিশ আছে! পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করলে ধরে নিয়ে যাবে! তিনি এক ভদ্রলোকের বাড়ী রান্না-বান্না করেন··পাঁচ টাকা করে পান। একটি বিধবা মেয়ে আছে···সে কাগজের ঠোঙা তৈরী করে!···

ভিখারী চুপ করিল···

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভগবান সব নিয়ে দেহখানা কেন যে রেখে দ্যান্···ভাবি! ভেবে কোনো অর্থ খুঁজে পাই না।···হ্যাঁ, তোমার এমন ভালো মন···গরীবের উপর এত দয়া···তোমার নামটি কি, বাবা?

কৃষ্ণগোপাল নাম বলিল।

ভিখারী বলিল—জমিদার?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—না। গেরস্থ মানুষ···

—কি কাজ করো বাবা? ওকালতি?

—না। আমি গল্প লিখি, উপন্যাস লিখি। তা থেকে কিছু পয়সা আসে।

ভিখারী বলিল—আর্টিষ্ট! তাই বলো···আর্টিষ্ট না হ'লে গরীবের দুঃখ কে আর বুঝবে?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—রোদে না থেকে আমার বাড়ীর মধ্যে এসো না···

ভিখারী বলিল—কারো বাড়ীতে যেতে ভয় করে, বাবা! আমার যা বরাত, মনে হয়···

ভিখারী কথাটা শেষ করিল না।

কৃষ্ণগোপাল বলিল—তোমার নাম জানতে পারি?

ভিখারী বলিল—আমার নাম কুঞ্জলাল দত্ত।

কৃষ্ণগোপাল কি চিন্তা করিল। তার পর বলিল—যে কুঞ্জ দত্তর 'বেহালা-শিক্ষা' বই আছে···

মৃদু হাস্যে ভিখারী বলিল—তাই। পনেরো বছর আগে জীবন চৌধুরী ছাপিয়ে দিয়েছিলেন ঐ বই। তাঁর ছেলেমেয়ে হয়নি···সম্বন্ধীরা গান-বাজনা শিখবে, তাঁর বড্ড সখ ছিল···

কৃষ্ণগোপাল বলিল—সে বই বিক্রী হয় দেখি, তার পয়সা পান না?

কুঞ্জ দত্ত বলিল—কিন্তু ছাপা-বই তো সব দশ বচ্ছর আগে বিক্রী হয়ে ফুরিয়ে গেছে···

কৃষ্ণগোপাল বলিল—না, না···সে বই আবার ছেপে বিক্রী হচ্ছে।

কুঞ্জ দত্ত বলিল—হবে! আমি জানি না···

কৃষ্ণগোপাল বলিল—আমি দেখবো'খন। দোকান থেকে সে বই একখানা কিনে আনবো।···

দু'দিনের জন্য কৃষ্ণগোপাল কি-একটা কাজে বাহিরে গিয়াছিল…কলিকাতার বাহিরে…

যে-দিন ফিরিল, দেখে, ভিখারী নাই। ভিখারী আসিল না।

পরের দিন ভিখারী আসিল না…তার পরের দিনও না…

মনটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! কি হইয়াছে? অসুখ? একখানা 'বেহালা-শিক্ষা' বই কিনিয়া আনিয়াছে… দেড় টাকা দাম দিয়া কিনিয়াছে। ভাবিয়াছিল, ভিখারী আসিলে দিবে…

কিন্তু ভিখারীর দেখা নাই!

মনে পড়িল, ভিখারী বলিয়াছিল পাতিপাড়ায় থাকে।

বৈকালের দিকে খোঁজ করিয়া কৃষ্ণগোপাল পাতি-পাড়ায় চলিল। সন্ধান করিয়া বস্তীতে তার আস্তানা পাইল।

একখানা খোলার ঘরের সামনে আসিয়া কৃষ্ণগোপাল ডাকিল—কুঞ্জ বাবু…

ভিতর হইতে নারী-কণ্ঠে উত্তর—কে গা?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—কুঞ্জ বাবু আছেন?

এক জন প্রৌঢ়া রমণী বাহিরে আসিল…

কৃষ্ণগোপাল চিনিল। ইঁহাকে দেখিয়াছে…ভিখারীর জন্য অন্নের থালা লইয়া যাইতেন…

কৃষ্ণগোপাল বলিল—কুঞ্জ বাবু কেমন আছেন?

—ভালো আছেন।

কৃষ্ণগোপাল বলিল—মানে, আমার বাড়ীর রোয়াকে বসে তিনি গান গাইতেন। ক'দিন যাননি কি না…

প্রৌঢ়া বলিল—আপনার নাম কেষ্ট বাবু?

—হ্যাঁ।

প্রৌঢ়া কহিল—সে-দিন বেরুতে যাবার সময় পড়ে গিয়েছিলেন এই বস্তীর কলতলায়…পড়ে বেহালাখানি ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে…পা কেটে গেছে…

—আমি একবার তাঁকে দেখতে পারি?

—এসো বাবা…

কৃষ্ণগোপালকে লইয়া প্রৌঢ়া ভিতরে আসিল।

দেওয়ালে ঠেশ দিয়া দাওয়ায় বসিয়া আছে অন্ধ ভিখারী। প্রৌঢ়া কহিল—কেষ্ট বাবু এসেছেন।

ভিখারী বলিল—আর্টিষ্ট-বাবু?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—হ্যাঁ, আর্টিষ্ট-বাবু। আপনাকে ক'দিন দেখতে পাইনি বলে খপর নিতে এলুম…

ভিখারী কহিল—এত দয়া! আঃ…ওগো এঁর কথাই তোমায় বলতুম। এ-কালেও মানুষের মনে এমন দরদ আছে…এত মায়া! অথচ ওঁর গলা শুনে মনে হয়, কতই বা বয়স!

কৃষ্ণগোপাল বলিল—আপনার বিপদের কথা শুনলুম!

গাঢ় কণ্ঠে কুঞ্জ দত্ত বলিল—বেহালাখানি গেছে বাবা। আমার কত কালের সঙ্গী…জীবন চৌধুরী মশায় কিনে দিয়েছিলেন। দাম লেগেছিল পঁচাত্তর টাকা…কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী দাম ছিল ও-বেহালার…কত দুঃখে ও আমার সুরে সুর মিলিয়েছে…

একটা মস্ত নিশ্বাস! ভিখারী চুপ করিল।

কৃষ্ণগোপাল বলিল—আপনাকে আমি একখানি বেহালা এনে দেবো কুঞ্জ বাবু…

—কি হবে বাবা? অন্ধ মানুষ…

কৃষ্ণগোপাল বলিল—শুধু তাই নয়! আপনার গান পাঁচ জনে যাতে শোনে পয়সা দিয়ে শোনে…ভিক্ষা দিয়ে নয়, মর্য্যাদার দাম দিয়ে…সে-ব্যবস্থা আমি করেছি কুঞ্জ বাবু। মানে, রেডিয়োর আসরে আপনি গাইবেন… গ্রামোফোনে রেকর্ড দেবেন। এমন লোককে আমি পাকড়াও করেছি…ও-সব জায়গায় যে-লোকের প্রতিপত্তি! আর্টিষ্ট হ'লেই হয় না এ-দেশে—মুরুব্বির জোর চাই সেই সঙ্গে!…মানে, আমাদের দেশে গুণের ঠিক আদর হয় না কুঞ্জ বাবু, তাই আপনার মতো গুণীকে এ প্রতিভা নিয়ে উদরান্নের জন্য হাত পেতে ভিক্ষা করতে হয়! আর যত এইট্থ্ ক্লাশ, টেন্থ্ ক্লাশ গাইয়ে-বাজিয়ে মুরুব্বির জোরে বিকুচ্ছে! দম দিয়ে দাম নিয়ে আমাদের কাণ আর প্রাণ দু'টোকে জ্বালিয়ে মারছে…

কুঞ্জ দত্ত কোনো কথা বলিল না…

প্রৌঢ়ার দু'চোখে বাষ্পের তরঙ্গ ঠেলিয়া আসিল।

কৃষ্ণগোপাল বলিল—আর সেই বই একখানা নিয়ে



এসেছি কুঞ্জ বাবু···আপনার ছাপানো 'বেহালা-শিক্ষা'। ষষ্ঠ সংস্করণের বই···এ-বছরের ছাপা···

কুঞ্জ দত্ত বলিল—কিন্তু সেই একটা সংস্করণ ছাড়া ও-বইয়ের আর কোনো সংস্করণ তো ছাপা হয়নি, বাবা!··· এত সংস্করণ ছাপালে···ও-বই কার এত ভালো লেগেছে?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—ছেপে যে বই বিক্রী করলে রীতিমত পয়সা আসে, ভালোবেসে সে বই কে না ছাপাবে, বলুন? এই যে প্রকাশকের নাম রয়েছে—শ্রীগোকুলচাঁদ রায়···

ভিখারী চমকিয়া উঠিল! কহিল—কি···কি···কি নাম?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—গোকুলচাঁদ রায়।

ভিখারী বলিল—গোকুল রায়···জীবন চৌধুরীর ছোট সম্বন্ধী···চৌধুরী মশায় যাকে গাঁটের টাকা দিয়ে ব্যবসাতে বসিয়েছিলেন···

কৃষ্ণগোপাল বলিল—ও···তাই এ-বই ছাপিয়ে সে ভগ্নীপতির বন্ধুর গাঁট কাটছে!···বটে!

প্রৌঢ়া বলিলেন—গোকুল বাবু যে বই ছাপিয়েছেন, তোমায় জানায়নি সে-কথা?

ভিখারী বলিল—না···

কৃষ্ণগোপাল বলিল—ভেবেছে, অন্ধ মানুষ—টের পাবে না! কিন্তু আমি তাকে টের পাওয়াবো···চুরি করে এ-বই ছাপাবার মজাখানা!···আপনি শুধু দয়া করে সে অনুমতি-টুকু দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করবেন, কুঞ্জ বাবু।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ফাল্গুন

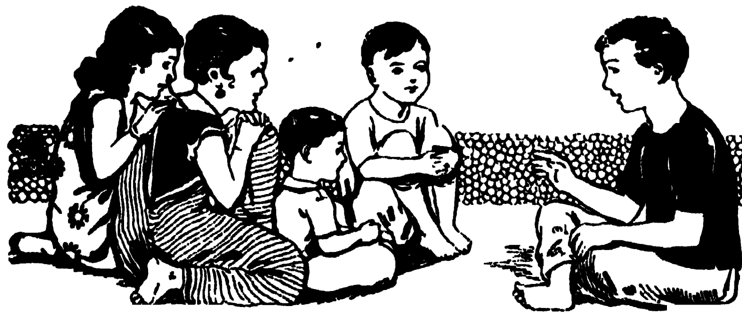
কোন্ তূণ ফাল্গুন লয়ে' গুণ টান্‌লো,
দুর্ব্বার কুয়াসার আঁধিয়ার চূর্ণ;
এ কি মায়া ধূপ-ছায়া, রূপ-ছায়া আন্‌লো,
টলমল নদী-জল নির্ম্মল তূর্ণ!
বনে বনে অকারণে জাগে মনে হর্ষ,
বীথিকায় এ কি হায় এল নব-বর্ষ!

নিল প্রাণ অবদান অগুরুর গন্ধে,
নন্দন চন্দন বন্দনে অঙ্গ;
রাঙা-চাঁদ ভাঙে বাঁধ জাগে মধু-ছন্দে,
নিখিলের কোকিলের জাগে ফের সঙ্গ!
পলাশের আবীরের রঙে রাঙা তন্দ্রা,
ফোটে ফুল যেন ভুল, লতা কৈ বন্ধ্যা?

শাল-বন হারা কোন্ গুঞ্জন ভ্রমরের?
মঞ্জরী ওঠে ভরি সুন্দরী অলকায়,
আম্রের মুকুলের গন্ধ যে জাগে ফের,
ব্রজবালা দেয় মালা সুধা-ঢালা মধু-বায়!
মহুয়ার ঝর্ণার আলো-ছা'র লাস্য!
হিম-কণা গলা সোণা—অচলে কি হাস্য!

কোন্ তূণ ফাল্গুন লয়ে' গুণ টান্‌লো,
দুর্ব্বার কুয়াসার আঁধিয়ার চূর্ণ;
চক্ষের বক্ষের কি তিয়াস আন্‌লো,
শোভনার নিরাধার হ'ল প্রেমপূর্ণ!
গৌরবে সৌরভে উথলিছে হর্ষ;
প্রকৃতি ও প্রেমে না কি এল নব-বর্ষ!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।



ছোটদের আসর

মধুকৈটভ সার্কাস পার্টি

(নক্সা)

ভুতি আর গদা ওরফে বিভুতিভূষণ পাকড়াশী আর—গদাধর সামন্ত সেই ফার্ষ্ট ইয়ার থেকে একসঙ্গে পড়ছে। খুব ভাল না হ'লেও পড়া-শুনায় দু'জনের কেউ মন্দ নয়। উভয়েই সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তার পর যেমন হয়, চার বছর পরে দুই বন্ধুর ছাড়াছাড়ি। পরস্পরকে মনে রাখবার এবং পত্র-বিনিময় করবার প্রতিজ্ঞা-পর্ব্ব সাঙ্গ হ'য়েছে। সংসার-সমুদ্রে দু'জনেই সাঁতার কাটবার জন্য বদ্ধপরিকর। "আমরা ডুবব না, স্রোতেও ভাসব না" এই রকম একটা দৃঢ় মনোভাব।

*   *   *   *

"মধুকৈটভ" সার্কাস পার্টির সহরে খুব নাম। অনেক রকম নতুন খেলা এবং মনোমুগ্ধকর ম্যাজিক ও নাচ আছে। লোকে লোকারণ্য। কিন্তু সব চেয়ে নাম হ'য়েছে বাঘ আর বনমানুষের জন্য। বাঘটি না কি ঠিক যোগ করতে পারে, এবং পাঁচটা জিনিষ মিশিয়ে রাখলে যেটি বলা যায়, ঠিক সেইটি বেছে বার করতে পারে। আর বন-মানুষ—সে তো আরও অদ্ভুত! মানুষের মত তব্‌লা বাজাতে পারে, ইংরেজী এবং বাঙলা ভাষায় নিজের নাম দস্তখৎ করতে পারে, এবং সব চেয়ে জমাটে ব্যাপার—একটু প্রাচ্য নৃত্যও করতে পারে। চারি দিকে একেবারে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। এমনটি আর কখনও দেখা যায়নি, যাবে কি না কে বলতে পারে?

এই দু'টি প্রাণীই "মধুকৈটভ" সার্কাস পার্টির ম্যানেজার কসরতানন্দ চৌধুরীর বিশেষ প্রিয়পাত্র। অবশ্য নামটা তিনি নিজেই রেখেছেন। ব্যবসার জন্য অনেক সময়ই পৈত্রিক নাম অচল। যেমন পাঁচী সিনেমা-ষ্টার হ'লে, অথবা গোবরা সাহিত্যিক হ'তে গেলে বিভ্রাট ঘটতে পারে। ঘোরতর সংসারী নফর কুণ্ডু ভাইকে ঠকিয়ে—বেশ দু'পয়সা মেরে ব্যবসা ফেঁদে, পরে আরও পাঁচ জনের ভরা ডুবিয়ে, লালবাতি জ্বেলে বেমালুম যোগীবর পরমানন্দ স্বামীতে রূপান্তরিত হয়, তেমনি রোগা-পট্‌কা লিভার-পিলেযুক্ত পটল অবশেষে সার্কাস-পার্টির বাঘের খেলা দেখাবার জন্য কসরতানন্দ নাম গ্রহণ ক'রেছেন। সেই সঙ্গে খাওয়ার বাচবিচারও গেছে, পরিমাণও বেড়েছে, এবং মধ্যে মধ্যে লেবেল-আঁটা সুঘ্রাণযুক্ত লোহিতবর্ণ জীবন-রসায়নেরও দরকার হ'য়ে পড়েছে। সেটা না কি সাহস বজায় রাখবার পক্ষে অপরিহার্য্য।

বাঘ এবং বনমানুষের শ্রীযুক্ত কসরতানন্দ চৌধুরী মহাশয় নামকরণ করেছেন ভোম্বল এবং ভলটু। তিনি দু'জনের খাঁচায় গিয়ে নিজের হাতে খাবার খাইয়ে আসেন। খুব গোপনে ভোজন-পর্ব্ব সমাধা হয়। পার্টির কোন লোক সে সময় কাছে থাকতে পায় না। ঘেরা জায়গার এক কোণে থাকে ভোম্বল, আর এক কোণে থাকে ভলটু।

সে-দিন সার্কাস ভাঙ্গবার পর চৌধুরী মহাশয় অত্যধিক সঞ্জীবনী সুধা পান ক'রে নিজের তাঁবুতে অচেতন হ'য়ে প'ড়েছিলেন। রাত্রি দেড়টা অবধি ভোম্বল এবং ভলটু খাবার জন্য স্থির ভাবে অপেক্ষা ক'রে শেষটা ভীষণ অস্থির হ'য়ে উঠল। চারি দিক নিস্তব্ধ, সকলে সুষুপ্ত। উভয়েই খুট্ ক'রে খাঁচার দরজা খুলে ধীরে ধীরে রান্নার তাঁবুর দিকে অগ্রসর হ'ল। দু'দিককার ফ্ল্যাপ্ তুলে ভেতরে ঢুকে দু'জনেই স্তম্ভিত। গভীর নিশীথে বাঘ ও বনমানুষে সাক্ষাৎ। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে রইল। কিন্তু তা অস্বাভাবিক। সুতরাং দু'জন দু'জনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রীতিমত কুস্তি আরম্ভ হ'য়ে গেল।

হঠাৎ ভোম্বল বলে উঠল,—"এই মাইরী, ছাড়, লাগে।"
ভল্টু চমকে ছেড়ে দিয়ে বললে—"আরে, কে, গদা না?"
ভোম্বল বললে,—"হ্যাঁ ভাই ভূতি, আমি।"

* * * *

দু'জনেই নিজ নিজ কাহিনী ব্যক্ত করলে। প্রায় একই রকম। কোন স্থানে চাকরী না পেয়ে, দোরে দোরে অনাহারে ঘুরে শেষে "মধুকৈটভ" সার্কাস পার্টিতে তারা চাকরীর উমেদারী করতে আসে। ম্যানেজার কসরতানন্দ বলেন—"দেখ হে ছোকরা, আমাদের এখানে কোন লোক নেওয়া হবে না। তবে একটা বাঘ দরকার। দু'দিন হ'ল মারা গেছে। তুমি যদি বাঘ সাজতে পার—"

ভূতির ব্যাপারটাও অনুরূপ, তবে এ ক্ষেত্রে বনমানুষ সাজবার চাকরী।

উভয়েরই স্ব স্ব জীবনে ধিক্কার এসে গেছল। দু'জনে এক সঙ্গে হ'তে মনে অনেকটা সাহস হ'ল। তারা ঠিক করলে, "আর না। নতুন ভাবে চেষ্টা করতে হবে। যা থাকে বরাতে, আর যা করেন মাদার কালী।"

পরদিন সকালে দেখা গেল, রান্নাঘরে বাঘ আর বনমানুষের বাহিরের আভরণটুকু পড়ে আছে, কিন্তু বাঘ আর বনমানুষ গায়েব। "মধুকৈটভ সার্কাস"ও বোধ হয় লীলা সম্বরণ ক'রেছে।

শ্রীযামিনীমোহন কর (অধ্যাপক এম্-এ)।

সাত খুন মাফ

(গুণ্ডামীর প্রতিফল)

১

আমাদের দেশে 'সাত খুন মাফ' বলিয়া একটা কথা বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সেকালে মুসলমান নবাব বাদসাহদের আমোলে যে সকল লোক নবাব বাদসাহগণের প্রিয়পাত্র ছিল, তাহারা কোন অন্যায় কাজ করিয়া শাস্তি না পাইলে লোকে বলিত, "উহার শাস্তি হইবে কেন? উহার ত সাত খুন মাফ!" অর্থাৎ যদি সে সাত-জন লোককে হত্যা করে, তাহা হইলেও তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। এই ভাবে সেকালে কোন অপরাধীর 'সাত খুন মাফ' হইত কি না, আমরা তাহার কোন প্রমাণ না পাইলেও একালে মার্কিণ-মুলুকের কোন ভদ্রলোক বিভিন্ন দফায় উপর্য্যুপরি সাত জন লোককে খুন করিলেও তাঁহাকে কোন রকম শাস্তি দেওয়া হয় নাই; আদালতের বিচারেই তাঁহার 'সাত খুন মাফ' হইয়াছিল। আজ তোমাদিগকে সেই কথা শুনাইব। এই ঘটনার বিবরণ অত্যন্ত অদ্ভুত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য। জন রৌসন নামক মার্কিণ লেখক এই সকল ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণ লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় সংপ্রতি প্রকাশ করিয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে আরকান্সান্ প্রদেশ। এই প্রদেশে টেক্সারকানা নামক নগরের কুড়ি মাইল উত্তরে ওয়াল্টার রিজলে নামক যে কৃষিজীবী ভদ্রলোক বাস করিতেন, ধনবান্ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। দুই লক্ষ ডলার তাঁহার সম্পত্তির মূল্য ছিল। এই বিপুল সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি তাঁহার পিতা কর্ণেল জন রিজলের নিকট পাইয়াছিলেন। কর্ণেল জন রিজলে সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র ওয়াল্টার রিজলে কৃষিজীবী হইলেও সাধারণ কৃষকগণের ন্যায় অশিক্ষিত ছিলেন না; তিনি প্রিন্সটনে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সৈন্যদলে কিছু দিন স্কাউটের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ওয়াল্টার রিজলে সুবৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতেন। তাঁহার বাসভবনের প্রত্যেক কক্ষ মূল্যবান সুদৃশ্য আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত ছিল; তাঁহার সুপ্রশস্ত লাইব্রেরীতে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ও দুর্লভ গ্রন্থ সঞ্চিত ছিল; এতদ্ভিন্ন, তিনি যে সকল চিত্র দ্বারা তাঁহার গৃহকক্ষগুলি সজ্জিত করিয়াছিলেন, সেরূপ বহুমূল্য সুনির্ব্বাচিত চিত্র সুশিক্ষিত ও সৌখীন সকল মার্কিণ লক্ষপতির গৃহেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ, ওয়াল্টার রিজলে সাধারণ কৃষিজীবী ছিলেন না। সমাজে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ ছিল, এবং সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত।

ওয়াল্টার রিজলে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার দেহ সেইরূপ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ছিল। তিনি নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিতেন; বন্দুকে লক্ষ্যভেদ করিতে ঐ অঞ্চলের অতি অল্প লোকই তাঁহার সমকক্ষ ছিল। তিনি তেজস্বী ও নির্ভীক হইলেও মিষ্টভাষী ও শান্ত-প্রকৃতির লোক ছিলেন; কিন্তু কেহ কোন অন্যায় কাজ করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি আশ্রিতবৎসল ছিলেন, এবং দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জুলুমবাজ প্রবল অত্যাচারীকেও শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

রিজলের খামার-বাড়ী হইতে প্রায় আট মাইল দূরে রোপনেয়ার নামক কোন ব্যবসায়ীর একটি আড়ত ছিল। বসন্ত কালের এক দিন তিনি কার্য্যোপলক্ষে সেই আড়তে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে কয়েক জন প্রতিবেশীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি কাজ শেষ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নানা রকম গল্প করিতেছিলেন। সেই সময় স্থানীয় পার-ঘাটার খেয়া-নৌকার দুই জন মাঝি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের এক জনের নাম জো মরফি, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম রবার্ট মরফি; তাহারা পরস্পরের সহোদর ভাই। আর এক জন অপরিচিত লোকও তাহাদের সঙ্গে আসিল। সেই লোকটি আসিয়াই তাঁহাদের নিকট সেই মাঝি-দু'টোর বিরুদ্ধে নালিশ করিল। রিজলে ও তাঁহার বন্ধুরা গল্প বন্ধ করিয়া তাহার অভিযোগ শুনিতে লাগিলেন।

মাঝি-দু'টোর সঙ্গে যে লোকটি আসিয়াছিল, সে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—সে বস্তা-বোঝাই জিনিষপত্র পিঠে লইয়া বিভিন্ন গ্রামে ফেরি করিয়া বেড়ায়। এখন সে সেণ্ট লুই হইতে আসিতেছে।

সে ঐ দুই জন মাঝির নৌকায় নদী পার হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা অসঙ্গত বেশী পারাণীর দাবী করায় সে তাহা দিতে সম্মত হয় নাই; এজন্য তাহারা তাহার পণ্যদ্রব্যপূর্ণ মোটটি কাড়িয়া-লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। সে নিরুপায় হইয়া সুবিচার প্রার্থনায় তাঁহাদের নিকট আসিয়াছে। সে ন্যায্য পারাণী দিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু মাঝিরা তাহা লয় নাই, তাহার জিনিসপত্রগুলি ফেরত দিতেও রাজী হয় নাই। তাহাদের জুলুম অসহ্য।

রিজলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পারাণী বাবদ উহাদিগকে কত দিতে চাহিয়াছিলে?"

ফেরিওয়ালা বলিল, "উহারা কাল আমাকে উহাদের নৌকায় নদী পার করিয়া পঞ্চাশ সেণ্ট পারাণী চাহিয়াছিল; অনেক বেশী হইলেও আমি তাহাই দিয়াছিলাম। আজ সকালে আমি উহাদের নৌকায় ও-পার হইতে এ-পারে ফিরিয়া আসিলে এবার আমার কাছে পাঁচ ডলার পারাণী দাবী করিল! পঞ্চাশ সেণ্টের স্থানে আমি পাঁচ ডলার কেন দিব? আমি তাহা দিতে রাজী না হওয়ায় আমার মোটটি কাড়িয়া লইয়াছে, আর তাহা আমাকে ফেরত দিবে না বলিয়াছে।"

ওয়াল্টার রিজলে মাঝি দু'জনের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটি যাহা বলিতেছে—তাহা কি সত্য?"

এক জন মাঝি মাথা-ঝাঁকাইয়া সক্রোধে বলিল, "সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তাতে তোমার বাবার কি?"

রিজলে এই অশিষ্ট উক্তি শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সহজ স্বরেই বলিলেন, "ও বিদেশী লোক, উহার নিকট ঐ রকম অসঙ্গত পারাণীর দাবী করা তোমাদের উচিত হয় নাই। উহাকে নদীর ও-পার হইতে এ-পারে আনিয়াছ—এ জন্য পাঁচ ডলার পারাণী? এ যে ডাকাতি। তোমাদের যে 'রেট' বাঁধা আছে—তাহাই লইয়া উহার মাল-পত্র ফেরত দেও।"

মাঝি-দু'টো তাঁহার এই সঙ্গত কথায় রাগিয়া আগুন হইল; কর্কশ স্বরে বলিল, "কে তোমাকে মোড়লী করিতে ডাকিয়াছে? তুমি নিজের চরকায় তেল দাও।"

রিজলে এবার উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বিদেশী লোককে কায়দায় পাইয়া তোমরা তাহার গলায় ছুরি দিবে, আর তাহাতে কেহ কোন কথা বলিবে না—এইরূপই কি তোমরা আশা কর? যাও, আর গোলমাল না করিয়া উহার জিনিস-পত্র ফেরত দাও। গুণ্ডামী করিয়া উহার জিনিস কাড়িয়া লইবার কোন অধিকার তোমাদের নাই।"

এই কথা শুনিয়া মাঝি জো মরফি এক লাফে রিজলের সম্মুখে আসিল, এবং হুঙ্কার দিয়া তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঘুসি চালাইল। কিন্তু রিজলে সতর্ক ছিলেন, আততায়ীর ঘুসি তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিতে পারিল না; তবে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত তাঁহার কাঁধের কাছে উঠিয়াই বিদ্যুদ্বেগে বজ্রবৎ জোয়ের নাকের উপর পড়িল। তাহার নাক ফাটিয়া শোণিতের স্রোত বহিল। জো যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল, এবং নাকি-সুরে অশ্লীল ভাষায় রিজলেকে গালি দিতে লাগিল।

ভাইএর অবস্থা দেখিয়া রবার্ট মরফি দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারাইল; এবং মুহূর্ত্তমধ্যে বুকের পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, রিজলের ললাট লক্ষ্য করিয়া তাহা বাগাইয়া ধরিল। কিন্তু রিজলে তাহাকে পকেটে হাত পুরিতে দেখিয়াই তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রবার্ট মরফি তাহার হাতের পিস্তল উদ্যত না করিতেই তিনি তাঁহার পিস্তল তুলিয়া ঘোড়া টিপিলেন। রবার্টের পিস্তলের আওয়াজ হইবার এক সেকেণ্ড পূর্ব্বেই তাঁহার পিস্তলের গুলী রবার্টের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণহীন দেহ ধরাশায়ী হইল।

ভ্রাতাকে এই ভাবে নিহত হইতে দেখিয়া জো রক্তাক্ত মুখ হইতে হাত সরাইয়া-লইয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল; কিন্তু তদ্দ্বারা রিজলের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই রিজলের হাতের পিস্তল পুনর্ব্বার গর্জ্জিয়া উঠিল। জো আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার ভ্রাতার মৃত-দেহের পার্শ্বে ধরাশায়ী হইল। রিজলের লক্ষ্য অব্যর্থ। তাঁহার পিস্তলের গুলীতে সেই মুহূর্ত্তেই জো'র প্রাণবিয়োগ না হইলেও আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল। সে নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার প্রাণরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল; কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। পরদিন তাহার মৃত্যু হইল।

এই দুই জন আততায়ীকে হত্যার অভিযোগে অবিলম্বেই রিজলেকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করা হইল। যে সকল লোক এই দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, আদালতে তাঁহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইল। তাঁহাদের সকলেরই সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন হইল—নিহত মাঝিদ্বয়ই পিস্তল দ্বারা প্রথমে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল; আত্মরক্ষার জন্যই তাঁহাকে পিস্তল ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। যদি তিনি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চিতই নিহত হইতে হইত। মাঝিদ্বয় তাহাদের স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছে।—এই দুই জন মাঝি যে গুণ্ডা, এবং সর্ব্বদাই লোকের প্রতি অত্যাচার করিত, কিন্তু তাহাদের ভয়ে কেহই প্রতিকারের চেষ্টা করিত না,—আদালতে ইহাও প্রতিপন্ন হইল। বিচার-শেষে রিজলে সসম্মানে মুক্তিলাভ করিলেন। গুণ্ডাদ্বয়ের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতে লাগিল।

২

কিন্তু এখানেই গোলমালের নিবৃত্তি হইল না। জো মরফি ও রবার্ট মরফি ওয়াল্টার রিজলের গুলীতে নিহত হইয়াছে, এবং আদালতের বিচারে রিজলে নিরপরাধ বলিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন শুনিয়া জো ও রবার্টের অন্য এক ভাই জন মরফি এবং তাহাদের কাকা টমাস মরফি প্রতিজ্ঞা করিল—তাহারা যত শীঘ্র সম্ভব রিজলেকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবে। তাহারা উভয়েই কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে বাস করিত। তাহারা তাহাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য অবিলম্বে টেক্সারকানা অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা অনেককে শুনাইয়া বলিল, "রিজলের বুকের রক্তে আমরা পিপাসা নিবারণ করিব। তাহাকে দেখিবামাত্র গুলী করিয়া মারিব। বিচারে আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে?—হয় হউক, সে জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।"

রিজলের বন্ধুরা তাহাদের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে সতর্ক

থাকিতে অনুরোধ করিলেন। এ সকল কথা শুনিয়া রিজলে তাঁহাদিগকে জানাইলেন—ঐ সকল লোকের তর্জ্জন-গর্জ্জনে তাঁহার মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই, তবে তাহারা তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করিবে, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই। তাহারা ঐরূপ চেষ্টা করিলে আবার একটা খুনোখুনী কাণ্ড হইবে; কিন্তু আর রক্তপাত করিতে আগ্রহ নাই, তাহাতে বিরত থাকিবার জন্য তিনি যথাসম্ভব সতর্কই থাকিবেন, এবং নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন তাঁহার খামার-বাড়ীর বাহিরে যাইবেন না। তাঁহার পরিচিত সকলেই জানিতেন, মনুষ্য-জীবন তিনি মূল্যবান বলিয়াই মনে করিতেন এবং নরহত্যার প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিরাগ ছিল। কিন্তু তিনি সতর্ক থাকিলেও তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না।

কিছু দিন পরে এক দিন তাঁহাকে কোন জরুরি কার্য্যে তাঁহার বাড়ী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটি খামার-বাড়ীতে গমন করিতে হইল। কাজ শেষ করিয়া তিনি অশ্বারোহণে সেই স্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া অরণ্যের ভিতর আসিয়া পড়িলেন; সেই সময় পথপ্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষের আড়াল হইতে উপর্য্যুপরি দুইবার পিস্তলের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন। পিস্তলের নল-নিঃসৃত অগ্নিশিখাও তাঁহার নয়ন-গোচর হইল।

গুলীর আঘাতে রিজলের অশ্বটি মুহূর্ত্তমধ্যে ধরাশায়ী হইল; সঙ্গে-সঙ্গে রিজলেও তাহার পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি মাটীতে অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিলেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বা চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহাকে সেই অবস্থায় পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া দুই জন লোক বৃক্ষের আড়াল হইতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। তাহারা দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া স্থির করিল—যদি তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে তাঁহার মৃত্যু না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাঁহার আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে। কিন্তু তাহারা যে প্রতারিত হইয়াছে, রিজলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,—ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না।

রিজলের আততায়িদ্বয় উৎসাহভরে তাঁহার ধরাশায়ী দেহের অদূরে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই টোটাভরা দুইটি পিস্তল দুই হাতে বাগাইয়া ধরিয়াছিলেন। আততায়িদ্বয় তাঁহাকে এই ভাবে আক্রমণোদ্যত দেখিয়া এতই ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল যে, তাড়াতাড়ি তাঁহাকে গুলী করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিল না; তাহারা বন্দুক তুলিবার পূর্ব্বেই রিজলে তাঁহার উভয় পিস্তলেরই ঘোড়া টিপিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। তাঁহার গুলীর আঘাতে উভয় আততায়ীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইল; উভয়েরই প্রাণহীন দেহ পথের উপর প্রসারিত হইল। কেহ আর্ত্তনাদ করিবারও অবসর পাইল না!

অতঃপর যখন নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের মৃতদেহ সনাক্ত করা হইল, তখন জানিতে পারা গেল, আততায়িদ্বয়ের এক জন পূর্ব্বোক্ত নিহত মাঝিদ্বয়ের ভ্রাতা জন মরফি, এবং অন্য ব্যক্তি তাহাদের পিতৃব্য টমাস্ মরফি। মরফি-পরিবারের চারি জন এই ভাবে রিজলের গুলীতে নিহত হইল।

এবারও রিজলে যথানিয়মে বিচারালয়ে নীত হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচার আরম্ভ হইল। ওয়াল্টার রিজলে আত্মরক্ষার জন্যই আততায়ীদ্বয়কে গুলী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে অগ্রে আক্রমণ করেন নাই, বিচারালয়ে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইল; এবং প্রথম বারের ন্যায় এবারও তিনি সসম্মানে মুক্তিলাভ করিলেন।

মরফি পরিবারের চারি জন লোক এইভাবে নিহত হইলে সকলেই মনে করিলেন, গোলমাল মিটিয়া গেল, রিজলেকে ভবিষ্যতে আর বিপন্ন হইতে হইবে না; কিন্তু শীঘ্রই জানিতে পারা গেল, জন-সাধারণের এই ধারণা সত্য নহে। এই সময় রিজলের বাসস্থান হইতে অনেক দূরে—ভিন্ন এলাকায় মরফি-পরিবারের আরও তিন জন লোক বাস করিত। তাহাদের দুই জন নিহত মাঝিদ্বয়ের ভ্রাতা, এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের আর একটি পিতৃব্য। এই তিন জন জানিতে পারিল—তাহাদের বংশের চারি জন রিজলের বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তাহারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, এবং অনেককে শুনাইয়া প্রতিজ্ঞা করিল—তাহারা এই অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান করিবে; রিজলের সন্ধানে তাহারা তাঁহার বাসস্থানের নিকট গমন করিবে, এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই গুলী করিয়া হত্যা করিবে। তাহাদের এক জনের চেষ্টা বিফল হইতেও পারে, কিন্তু তিন জনেরই চেষ্টা কখন বিফল হইবে না। এবার আর ওয়াল্টার রিজলের নিস্তার নাই; তাঁহার বুকের রক্তে তাহাদের প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইবে।—তাহারা তিন জনেই সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য সশস্ত্র টেক্সারকানা অভিমুখে যাত্রা করিল।

৩

ওয়াল্টার রিজলের আত্মীয়-বন্ধুরা এ-কথা জানিতে পারায় ভীত হইয়া তাঁহাকে কয়েক দিন অন্য স্থানে পলায়ন করিয়া লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দিলেন; বলিলেন,—উহারা বিদেশী লোক, কয়েক দিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে স্বদেশে চলিয়া যাইবে; তখন তিনি ফিরিয়া আসিলে বিপদের ভয় থাকিবে না। এখন কয়েক দিন দূরে থাকাই উচিত। এই লোকগুলি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, ভীষণপ্রকৃতি; তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই হত্যা করিবে। তাহারা তিন জন, তিনি একা; তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিবেন?

এই পরামর্শ শুনিয়া রিজলে তাঁহাদিগকে বলিলেন, গুণ্ডাগুলার ভয়ে তিনি স্থানান্তরে পলায়ন করিবেন না, তিনি বাড়ীতেই থাকিবেন; তবে হঠাৎ কোন বিপদে না-পড়েন—এজন্য সতর্ক থাকিবেন। তিনি কাপুরুষ নহেন, তাঁহার আত্মরক্ষার শক্তি আছে; কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে আর তাঁহার ইচ্ছা নাই। তিনি অনিচ্ছায় চারি জন লোককে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু প্রাণভয়ে তিনি পলায়ন করিতে পারিবেন না, তাঁহার হিতৈষীরা এ কথা যেন স্মরণ রাখেন। ভদ্রসমাজে লজ্জিত হইতে হয়, এরূপ কোন কাজ তিনি করেন নাই, পরেও করিবেন না। চারি জন গুণ্ডার আক্রমণে তাঁহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল; এখন যদি আরও তিন জন আততায়ী ভিন্ন-এলাকা হইতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলেও তাঁহাকে অগত্যা আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু তাঁহাকে কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল না। রিজলে বাড়ীতেই থাকিলেন, তবে চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক থাকিলেন। রাত্রিকালে তিনি বাড়ীর বাহিরে যাইতেন না; দিবসে যেখানেই যাইতেন—এক-জোড়া পিস্তল তাঁহার পকেটে থাকিত। মরফি পরিবারের যে তিন জন লোক তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য দূরদেশ হইতে আসিয়াছিল, তিনি বা তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুরা তাহাদের কোন সংবাদ জানিতে পারিলেন না। অবশেষে রিজলের প্রতিবেশীরাও নিশ্চিন্ত হইলেন। সেই তিন জন গুণ্ডার প্রতিজ্ঞা সকলেই বিস্মৃত হইলেন। পুলিশ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

সকলে নিশ্চিন্ত হইলে এক দিন গভীর রাত্রিতে হঠাৎ অদূরে ভীষণ গণ্ডগোল শুনিয়া ওয়াল্টার রিজলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার আস্তাবলে আবদ্ধ ঘোড়াগুলা প্রাণভয়ে 'চিঁ-হিঁ' চিঁ-হিঁ শব্দ ও দাপাদাপি করিতে লাগিল; তাঁহার খামার-বাড়ীর ভেড়ার গোয়ালে যেন আগুন লাগিল!

এই সকল শব্দে রিজলের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া, তাঁহার শয়ন-কক্ষের জানালা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু বাহিরে তখন অমাবস্যার রাত্রির মতন গাঢ় অন্ধকার; প্রকৃতিদেবী যেন কালো চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কালো কেশের খোঁপায় কতকগুলি হীরার ফুল গুঁজিয়া বসিয়া ছিলেন!—রিজলে কয়েক মিনিট কান-পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার খামার-বাড়ীতে কোন বিপদ ঘটিয়াছে। খামারের খোঁয়াড়ে যে সকল পশু আবদ্ধ ছিল, তাহারা খোঁয়াড় হইতে বাহির হইবার জন্য আর্ত্তনাদ ও ছুটাছুটি করিতেছিল।

রিজলে তৎক্ষণাৎ দিয়াশলাই জ্বালিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন—রাত্রি তখন তুইটা বাজিয়াছে। তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাহিরে আসিয়া ডাকাডাকি করিয়া কয়েক জন অনুচরের ঘুম ভাঙ্গাইলেন; তার পর তাহাদিগকে পোষাক পরিয়া তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য আদেশ করিয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার কোটের পকেটে একজোড়া টোটাভরা পিস্তল লইতে ভুলিলেন না। এই পিস্তল তুইটি তিনি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া ঘুমাইতেছিলেন; উহা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাছ-ছাড়া করিতেন না।

রিজলে দ্রুতবেগে খামার-বাড়ীর দিকে ধাবিত হইলেন। খামার-বাড়ীর প্রবেশ-দ্বারের অদূরে একখানি গাড়ী ছিল। রিজলে সেই গাড়ীর অদূরে উপস্থিত হইবামাত্র এক জন লোক গাড়ীখানার পশ্চাৎ হইতে তাঁহার সম্মুখে লাফাইয়া-পড়িয়াই পিস্তল তুলিয়া তাঁহাকে গুলী করিল। গুলীটা রিজলের মাথার টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল। রিজলে তৎক্ষণাৎ এক হাঁটুতে ভর দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন, এবং একটি পিস্তল উঁচু করিয়া তুলিয়া ডুড়ুম শব্দে গুলী বর্ষণ করিলেন।

তাঁহার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। তাঁহার আততায়ী আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার অদূরে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। রিজলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া-দাঁড়াইয়া সেই গাড়ী লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐ ভাবে দৌড়াইতে দেখিয়া আর তুই জন লোক আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে রিজলের বাঁ হাত জখম হইল; সেই হাতে তিনি তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। তাঁহার আহত বাঁ-হাতের মুঠা হইতে পিস্তলটা খসিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল; কিন্তু অন্য হাতের পিস্তল দিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখস্থ আততায়ীকে গুলী করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে ধরাশায়ী হইল। কিছুকাল সে আর উঠিল না।

কিন্তু রিজলের গুলীতে সে নিহত হয় নাই; অল্পকাল পরে সে উঠিয়া বসিল, এবং রিজলেকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিল। রিজলের দৃষ্টি তখন তৃতীয় আততায়ীর মুখের উপর সন্নিবিষ্ট ছিল। আহত শত্রু রিজলেকে লক্ষ্য করিয়া যে গুলী বর্ষণ করিল, তাহা তাঁহার কাঁধে বিদ্ধ হইতেই তিনি ধরাশায়ী হইলেন। কিন্তু তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল না; তিনি অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া শুইয়া তৃতীয় আততায়ীর বক্ষঃস্থলে গুলী করিলেন।

এই সময় রিজলের অনুচরেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল। তাঁহার তিন জন আততায়ীর তুই জন নিহত হইয়াছিল; তৃতীয় আততায়ীর তখন মুমূর্ষু অবস্থা! বলা বাহুল্য, এই তিন জনই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শত্রু, মরফি পরিবারের লোক।

রিজলেকে এবং তাঁহার মরণোন্মুখ শত্রুকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তাঁহাদের পরিচর্য্যার কোন ত্রুটি হইল না; কিন্তু আহত মরফি এক ঘণ্টার মধ্যেই পরলোকে প্রস্থান করিল। রিজলের আঘাত সাংঘাতিক হইলেও বহু চেষ্টায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিয়া কিছু দিন পরে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন।

এই তৃতীয় বার যুদ্ধের পর রিজলের সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল; সেই প্রদেশের সকল লোক মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তিনি যে সাত জন গুণ্ডাকে হত্যা করিলেন—এজন্য কেহই তুঃখিত হইল না; এবং বিচারকের বিচারে শেষবারও তিনি নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইলেন—এইভাবে তাঁহার 'সাত খুন মাফ' হইল। তিনি ঐ সকল গুণ্ডার কবল হইতে বহু নিরীহ ব্যক্তির ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া নিউ ইয়র্কের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে তাঁহার প্রশংসা প্রকাশিত হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

[রূপকথা]

চার

বারো বছর বয়স পূর্ণ হ'তেই নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা লীনা অতীতের সব কথা শুনে যদিও সাধুকে ব'লেছিল —'আমি এ অপমানের প্রতিফল দেব, দাদু!' আর সাধুও তখন তাকে ব'লেছিলেন বটে—'তোমার মা এখন

বনবাসিনী হ'লেও তুমি রাজকন্যা। তোমাদের ঐশ্বর্য্য অন্যে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে ভোগ করছে। তাদের শাস্তি দেবে তুমি তোমার মায়ের রাজ্য উদ্ধার ক'রে। তার জন্যে প্রস্তুত হও, দিদি!' কিন্তু সে জন্যে লীনাকে আরো দু'টি বছর অপেক্ষা করতে হ'য়েছে, দাদু তাকে হাতে-কলমে শিখিয়ে-পড়িয়ে এই সময়ের মধ্যে এমনি উপযুক্ত ক'রে তুললেন যে—লীনা নিজের শক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হ'য়ে গেল।

যে পাঠগুলো লীনাকে শিখতে হ'ল, সে সব এমনি শক্ত আর অদ্ভুত যে, রাজবংশের যে ছেলের ললাটে বিধাতাপুরুষ রাজতিলক এঁকে দিতেন—সেই ছেলে বেশী বয়স রাজ্য-পরিচালন আর সকলের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ ক'রবার জন্য যে সব শিক্ষা পেতেন, সেই সকল শিক্ষা দানের জন্য রাজ্যের ভেতরে বা রাজ্যের বাইরে যিনি যে-বিদ্যায় সুনিপুণ, বেছে বেছে তাঁকেই নিযুক্ত করা হতো। তাই, সে-কালে যিনি রাজা হ'য়ে সিংহাসনে ব'সতেন, সকল বিদ্যাতেই তিনি পারদর্শী হ'তেন। তলোয়ার চালানো, লক্ষ্যভেদ, ঘোড়ায় চড়া, যুদ্ধ করা, হঠাৎ বিপদে প'ড়লে বুদ্ধিবলে মুক্তি লাভ, ঘটনাচক্রে একা শত্রুহস্তে ধরা-প'ড়লে কৌশলে আপনাকে নিরাপদ করা, কূটবুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিমান শত্রুর চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করা, অন্য রাজ্যের বন্ধু রাজা, শত্রু রাজা, রাজদূত, বিদেশী, স্বদেশী, কর্ম্মচারী, প্রজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্য, এদের সকলের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত—এ সমস্তই প্রত্যেক রাজ্যের যুবরাজকে সযত্নে শিখতে হ'ত।

তেরো বছরে প'ড়তেই লীনারও এই সব শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। এত দিন পর্য্যন্ত দেশের সাধারণ মেয়ের মতোই সে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মিশেছে, খেলাধুলো ক'রেছে, হাটে-বাজারে গিয়ে কেনা-বেচা ক'রেছে, দেশের যারা মেরুদণ্ড—সেই সকল দীন-দরিদ্র গৃহস্থ, শিল্পী, চাষী, মুটে-মজুর, সকলের সঙ্গে অবাধে মিশেছে; তাদের মনের খবর নিয়েছে। কিন্তু তেরো বছরে যে-দিন সে প্রবেশ ক'রলে, সেই দিনই তার অভিভাবক দাদু তাকে জানিয়ে দিলেন—আজ থেকে তোমার চাল বদলাতে হবে, দিদি, পৃথিবীর একটা সেরা দেশের রাজ-সিংহাসনে তুমি ব'সবে। সেই ভাবেই তোমাকে চ'লতে শিখতে হবে।

লীনা জিজ্ঞাসা করলো—তা' হলে এত কাল যাদের সঙ্গে মিশেছি, যে ভাবে জীবন কাটিয়ে এসেছি, সে সব কি ভুলে যাবো, দাদু? তাদের কথা আর ভাববো না?

দাদু ব'ললেন—নতুন পড়া সুরু ক'রলে পুরোনো পড়া কি ভুলতে আছে, দিদি! দেশের যে ছবি তোমার মনের ভিতর আঁকা আছে, সেইটিই যে তোমার শিক্ষার বড় পরিচয়। তবে আপাততঃ তোমাকে সে-পরিচয়ের বড় পটখানা মনের এক পাশে গুটিয়ে রেখে, সেখানে প্রসারিত করতে হবে আর একখানা পট; তুলি ধ'রে তারই রঙ এখন উজ্জ্বল ক'রে তুলতে হবে।

কাজেই দাদুর সাহায্যে মনের পটে যে-সব নতুন ছবি তা'কে আঁকতে হ'ল—তারা সকলেই তার অপরিচিত; যেন একটা নতুন জগতের দরজা তার চোখের সামনে খুলে গেল! কত নতুন নতুন নাম সে শুনলে, কত রকমের কত শত ছবি তাকে মনের পটে ছ'কে নিতে হ'ল। শুধু কি তাই? ওঠবার, বসবার, দাঁড়াবার, ঘুরে-ফিরে বেড়াবার কত ভঙ্গীই দাদু তাকে শিখালেন। রাণীরা ত আর পাহাড়ী মেয়েদের মতন দৌড়-ঝাঁপ ক'রে বেড়ান না। তাই রাণীগিরিও তাকে হাতে-কলমে শিখতে হ'ল; আর এ-সব শিক্ষা এতই গোপনে চ'ললো যে, বাইরের কেউ ঘুণাক্ষরেও সে কথা জানতে পারলো না।

এই শিক্ষার ভেতরে হঠাৎ এক দিন আর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেলো! সাধু-দাদু সে দিন খুব ভোরে উঠে লীনাকে নিয়ে অনেক দূরের একটা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই পাহাড়টির পথগুলি এমনি দুর্গম আর আঁকা-বাঁকা যে, একবার ঢুকলে হঠাৎ বেরিয়ে আসা শক্ত! পাহাড়ের পথ এবং গুহাগুলো গোলক-ধাঁধার মতন লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিত। সাধু-দাদু এখানে তাঁর এই শিষ্যাটিকে পাহাড়ে-পথে চলবার নানা রকম কৌশল শিখাতেন। বিপদে প'ড়লে কেমন ক'রে পাহাড়ের সঙ্গে মিশে শত্রুর চোখে ধূলো দিতে হয়, পাহাড়ের গোলক-ধাঁধা কি ভাবে পার হ'য়ে পাহাড়ীদের

বোকা বানাতে পারা যায়—সেই সব কৌশল তাকে শিখাতেন।

কয়েক দিন ধ'রে নানা রকম পরীক্ষা ক'রে সাধু-দাদু প্রসন্ন মনে লীনাকে বললেন—আমি খুসী হ'য়েছি, দিদি! দুর্গম পাহাড়কেও তুমি যেন মুঠোয় পুরেছ! পাহাড় ভেঙেই এক দিন তোমাকে বাঙলায় যেতে হবে। পাহাড়ের পথে যদি বিপদে পড়, তা থেকে তুমি যে উদ্ধার হ'তে পারবে, এখন তা ভরসা ক'রতে পারছি।

লীনা মুখখানা উঁচু ক'রে তাঁকে ব'ললো—বাঙলায় যাবার জন্যে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছে, দাদু! যাত্রার সময় কি এখনো হয়নি? কবে আমি রওনা হবো?

সাধু-দাদু কোন উত্তর না দিয়ে, তাঁর হাতখানি এক-দিকে প্রসারিত ক'রে ব'ললেন—মেঘের মতন ওটা কি এদিকে দৌড়িয়ে আসছে, ব'লতে পার?

লীনা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো—পাহাড়ের সেই অংশটা ঢালু হ'য়ে নীচে যে ছোট নদীটির সঙ্গে মিশেছে, সেই নদীর তীর দিয়ে কালো রঙের একটা জানোয়ার যেন তীরবেগে ছুটে আসছে! লীনা সামনের দিকে ঝুঁকে, গলার স্বরে জোর দিয়ে উৎসাহ ভরে ব'ললো—ও ত মেঘ নয় দাদু, কি একটা জানোয়ার যে!

দাদু ব'ললেন—ধোঁয়ার মতো কি না, দেখে ঠিক বুঝতে পারিনি। তোমার কথাই ঠিক দিদি! ওটা জানোয়ারই বটে; কিন্তু বলতে পার, কি জানোয়ার?

লীনা চোখ দু'টি না ফিরিয়েই উত্তর দিল—বাঘ ভাল্লুক কি, হাতী গণ্ডার—সে সব ত নয়, তারা ত সবই আমার চেনা। ওটা নতুন জানোয়ার ব'লেই মনে হচ্ছে, দাদু! আমি ওটাকে ধোরবো—

দাদু ব'ললেন—পাগল! কি জন্তু না জেনে কি ওর সামনে যেতে আছে? দেখছ না, যেন পবন-বেগে ছুটে আসছে! আগে ওটাকে চেনবার চেষ্টা কর; তার পর ধরা উচিত মনে হ'লে ধোরো।

লীনা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে, খুসী হ'য়ে বলে উঠলো—চিনিছি দাদু, ওটা ঘোড়া। দেখুন, কেমন কুচকুচে কালো রঙ, আর কি সুন্দর জোয়ালো চেহারা, বা, চমৎকার!

দাদু ব'ললেন,—ঘোড়া ত তুমি কোন দিন দেখনি, এ অঞ্চলে ঘোড়া নেই কি না।

লীনা হাসিমুখে ব'ললে—এ-অঞ্চলে নাই বা থাকলো, কিন্তু আপনি ঘোড়ার ছবি এঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন—মনে নেই? আমি ঠিক চিনিছি। মনে হচ্ছে, ভগবান্ ওকে আমার জন্যেই পাঠিয়েছেন। আমি ওটাকে ধ'রে আনি।

দাদু ব'ললেন—বেশ, যদি গায়ের জোরে ধ'রতে পারো, তাতে আর আপত্তি কি?

দাদুর কথাগুলো বুঝি লীনার কানে পৌঁছায়নি, সে তখন দ্রুতবেগে পাহাড থেকে নদীর তীরে নেমে যাচ্ছিল।

কালো মেঘের মতন গাঢ় রঙের এই অদ্ভুত তেজী ঘোড়াটি কি ক'রে যে এই ঘোড়া-বর্জ্জিত দেশে পাহাড়ে' পথ ভেঙে হঠাৎ দেখা দিল—সেইটিই তাজ্জবের কথা! কিন্তু এর চেয়েও বেশী তাজ্জবের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো—সাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে এই দুঃসাহসী মেয়েটি যখন সবেগে ধাবমান দুরন্ত জানোয়ারটিকে চোখের পলকে পোষমানা পশুটির মত ধ'রে ফেললো!

ঘোড়াটির পিঠের ওপর বাঘের ছাল দিয়ে মোড়া একটি ছোট গদী দিব্যি পাট ক'রে বাঁধা, ঘোড়ার মুখোস আর লাগাম হরিণের চামড়ার; গদীর সঙ্গেই লাগামটি বাঁধা ছিল। ঘোড়াকে বাগে এনে, লীনা লাগামটি গদীর আঁংটা থেকে খুলেই তুড়ুক ক'রে তার পিঠে উঠে চেপে ব'সলো। ঘোড়া এতক্ষণ ঘাড়টি বাঁকিয়ে এই বে-পরোয়া মেয়েটির পানে চেয়েছিল। লীনাকে তার পিঠে চেপে বসতে দেখে তার মনটাও যেন নেচে উঠলো; সে যেন বুঝলো—ঠিক সওয়ারই তাকে ধ'রেছে। মুখের লাগামে টান পড়তেই সে সওয়ারের ইঙ্গিত বুঝে নাচতে-নাচতে পাহাড়ের গায়ে গা'মিশিয়ে বায়ুবেগে ছুটলো।

সাধু গিরিচূড়ার কাছে দাঁড়িয়ে লীনার কাজ দেখছিলেন, আর মুখ টিপে হাসছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি সেই স্থান থেকে নামতে লাগলেন।

নীচে রাস্তার কাছে আসতেই সাধু দেখতে পেলেন—ঘোড়াটিকে একটা চক্র ঘুরিয়ে লীনা তাঁরই কাছে আসছে। দাদুকে দেখতে পেয়েই সে ঘোড়াটাকে থামিয়ে দিলো, সঙ্গে-সঙ্গে অবলীলাক্রমে ঘোড়াটির পিঠ থেকে নেমে পড়লো।

সাধু হেসে ব'ললেন,—ঘোড়া ত পূর্ব্বে কোন দিন দেখনি দিদি, অথচ ওটা এগিয়ে আসবামাত্রই ওকে ধ'রে ওর পিঠে চেপে ব'সলে !

লীনা হেসে উত্তর দিল—ভগবান্‌কেও ত আমরা কোন দিন দেখিনি, দাদু ! অথচ তাঁকে কতই আপনার ক'রে নিয়েছি। এ ত বনের পশু ; কতক্ষণই বা একে ধ'রেছি ? কিন্তু এরই মধ্যে এ আমার পোষ মেনেছে। আমি ভাবছি—কোথা থেকে এ ঘোড়া এলো, দাদু ! কার এ ঘোড়া ?

দাদু ব'ললেন—সাজ-পোষাক দেখে মনে হচ্ছে—কোনও পাহাড়ী রাজার আস্তাবলের ঘোড়া—হঠাৎ বিগড়ে বেরিয়ে এসেছে। সে যাই হোক, তোমার এই শিক্ষাটাই বাকি ছিল। রাণী হ'তে হ'লে ঘোড়ায় চড়াটাও শেখা দরকার। ঘোড়ায় চড়া ভারি শক্ত কাজ ; অভ্যাস চাই, শিক্ষা চাই।

লীনা বললো—ভগবান্ সেই জন্যেই ঘোড়াটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, দাদু ! ওর নাম একটা আছেই ; সে নাম যাই হোক, আমি এর নাম রাখলাম বিজলী।

দাদু ব'ললেন—খাসা নাম দিদি !

লীনা মুখখানা তুলে জিজ্ঞাসা ক'রলো—এখন কি এই ঘোড়া নিয়েই আবার শিক্ষা চলবে, দাদু ?

দাদু ব'ললেন—হ্যাঁ দিদি, এই শিক্ষাটা শেষ হ'লেই তোমার ছুটী ; আর তোমাকে ধ'রে রাখবো না। এরই পিঠে চেপে তুমি যাবে তোমার পিতৃ-সিংহাসন অধিকার কোরতে।

কথাগুলি ব'লতে ব'লতে দাদু ঘোড়ার পাশে সরে গেলেন ; তার পিঠে গদীর মত পুরু বাঘছালের আস্তরণটি তুলতেই ভেতর থেকে কিংখাপের একটি পুরু থলে বেরিয়ে এলো। তার মুখটি খুলে ভেতরের জিনিষগুলি দেখে তাঁর মুখ প্রফুল্ল হ'ল।

লীনা জিজ্ঞাসা ক'রলো—ওটা কি, দাদু ! কি আছে ওর ভেতরে ?

দাদু উত্তর দিলেন—এ দয়াময় বিধাতার দান, দিদি ! ঘোড়ার সঙ্গে এসেছে রাণীর ব্যবহারযোগ্য দামী সাজ-সজ্জা। এখন বুঝতে পারছি, এ ঘোড়া এসেছে জয়ন্তী রাজ্য থেকে—

লীনা বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো—যে রাজ্য মেয়েরা শাসন করে, যেখানে পুরুষ নেই, মেয়েই রাজা ?

দাদু ব'ললেন—হাঁ। রাজ্যে রাণীর অভাব হ'লে মেয়ে-মন্ত্রীরা শুভ দিন দেখে রাণীর ঘোড়া ছেড়ে দেয়। ঘোড়া যে মেয়ের কাছে ধরা দিয়ে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে যায়, সেই হয় রাজ্যের রাণী। এ-ঘোড়া তোমাকেই বেছে নিয়েছে, দিদি !

লীনা ভুরু দু'টি কুঁচকিয়ে ব'লে উঠলো—নারী-রাজ্যের আমি রাণী হ'তে চাইনে, দাদু ! বাঙলা আমার দেশ, আমার জন্মভূমি। আমি যাব সেইখানে—সেই আমার কামনার ধন।

দাদু ব'ললেন—আমারও তাই ইচ্ছা, দিদি ! যাই হোক, ঘোড়া আর পোষাকগুলো কাজে লাগবে। এখন ত ঘোড়ার কাজ চলুক।

তখন থেকেই এই তেজী ঘোড়াটিকে নিয়ে লীনার শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। সাধুকে ঘোড়ার পিঠে উঠে নানা ভাবে তাকে চালাবার কৌশল দেখে লীনার মন আনন্দে, উৎসাহে ও উত্তেজনায় নেচে উঠলো ; সে বুঝলো—আসল শিক্ষাটি তার সত্যিই বাকি ছিল। এই জন্যেই দাদু এত দিন তাকে বেরুতে দেননি। সাধু ঘোড়ায় চ'ড়ে আর ঘোড়াকে নানা ভাবে চালিয়ে দেখিয়ে দিলেন—তেজী ঘোড়া যদি আরোহীর বশে থাকে, আর আরোহী খুব সাহসী ও কৌশলী হয়, তা হ'লে আততায়ীরা সহজে তাকে কায়দা ক'রতে পারে না।

মাসের পর মাস ধ'রে চেষ্টার পর লীনার এই শিক্ষাও সম্পূর্ণ হ'ল।

লীনা এবার হাত দু'টি যোড় ক'রে ব'ললো—তা হ'লে আমাকে জয়-যাত্রার অনুমতি দিন, দাদু !

দাদু ব'ললেন—উত্তম ; আজই তোমার যাত্রার অনুমতি দিচ্ছি। রাত বারোটার পর সময় খুব ভালো ; সেই সময় তুমি মা-দুর্গার নাম স্মরণ ক'রে ঘোড়ায় চ'ড়ে শুভ-যাত্রা করবে।

সাধু মুখে যা বলেন, কাজেও তাই করেন ; একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। লীনার যাত্রার সকল ব্যবস্থাই ঠিক হ'য়ে গেল। লীনার মা অঞ্জনা দেবী সমস্ত দিনের বেশী ভাগই পূজা-পাঠ নিয়ে কাটাতেন।

তাঁর রূপসী ষোড়শী মেয়ে একা বেরুবে শত্রুপুরীতে পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করতে—এ কথা শুনেও তিনি বিচলিত হ'লেন না। সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে, আধ্যাত্মিক শিক্ষা পেয়ে তিনিও মনকে এমনি নির্লিপ্ত ক'রে তু'লেছিলেন যে, মেয়ের সঙ্কল্পে বাধা ত দিলেনই না, বরং প্রসন্ন মনেই আশীর্ব্বাদ ক'রলেন—তোমার আশা পূর্ণ হোক মা!

ওদিকে, বাঙলার রাজধানী গৌড় নগরে রাজকন্যা রাজ্যেশ্বরী নীলা দেবীর বিয়ের আয়োজন যখন খুব ঘটার সঙ্গেই চ'লছিল, ঠিক সেই সময় দুর্গম পাহাড়ের বিপদ-সঙ্কুল পথের ভেতর দিয়ে বিজলীর পিঠে সওয়ার হ'য়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছিল লীনাদেবী বাঙলার রাজধানীর অভিমুখে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল—চিরচঞ্চল বিদ্যুৎ মেঘের পিঠে যেন স্থির হ'য়ে ব'সে র'য়েছে। গভীর রাত্রিতে শুভক্ষণে বিদায় দেবার আগে সাধু লীনাকে নিজের হাতে মনের মতো ক'রেই সাজিয়ে দিয়েছিলেন। ঘোড়ার পিঠে গদীর মোড়কের ভেতরে কিংখাপের থলিতে রাণীর ব্যবহারযোগ্য যে পোষাক-পরিচ্ছদ, মণিমুক্তোর যে সব আভরণ সঞ্চিত ছিল, দাদু সেগুলি দিয়ে এমনি পরিপাটি ক'রে তাঁর আদরিণী শিষ্যাকে সাজিয়েছিলেন যে, দেখলে কেউ বল্‌তে পারতো না—এ মেয়ে কোন রাজ্যের রাণী নয়! ধূপছায়া রঙের সাড়ীর ভেতর দিয়ে সোনার জরীর আভা বিদ্যুতের মতো ফুটে বেরুচ্ছে, গলায় মুক্তোর মালা, দুই কানে উজ্জ্বল হীরের এক জোড়া দুল; দীপ্তিমান মণিরত্নের চুড়িগুলি সুগোল করপল্লবের শোভা যেন আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সুগঠিত সুদীর্ঘ বেণীটি মাথা থেকে নেমে সাপের মতো পিঠে আন্দোলিত হচ্ছে। বাঁকা ভুরু দু'টির মাঝখানে সুলোহিত একটি সিন্দুরবিন্দু টক্‌টক্ ক'রছে; তারই ওপরে চিক্-চিক্ ক'রছে—সুদৃশ্য স্বর্ণ-মুকুট। তার সামনের হীরেখানির পেছন দিয়ে সুদীর্ঘ সাদা পালক উচু হ'য়ে উঠেছে, তাদের প্রত্যেকের মাথায় এক-একটি মুক্তো শোভা পাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে গদীর গায়ে দু-তিন রকমের হাতিয়ার দু' পাশে তীক্ষ্ণ তীরে ভরা দু'টি তূণ, দু'খানা মজবুত ধনুক। এই তেজস্বিনী অশ্বারোহিণীকে দেখলেই মনে হয়, মা-দুর্গা বুঝি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কৈলাস থেকে পার্ব্বত্য পথে বাঙলায় চ'লেছেন শারদীয়া ষষ্ঠীতে তাঁর ভক্তদের পূজা গ্রহণ ক'রতে।

রাত্রি গভীর হ'লেও পাহাড়ের ওপর চাঁদের উজ্জ্বল আলো প'ড়ে চার দিক হাস্যময়ী; কোন দিকে জন-মানবের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু একঘেয়ে ঝিল্লীরব; আর সুদূর অরণ্য থেকে হিংস্র পশুর এক-একটা বিকট শব্দ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রছে। লীনার বাহন বিজলী এই অল্প দিনেই লীনার এত বাধ্য হ'য়েছে যে, তার মনের ইচ্ছাটি যেন চোখের ইসারাতেই বুঝতে পারে! এই নবীনা মনিবটির আদেশ পালন ক'রতে তার কি আগ্রহ!

সাধু লীনাকে বাঙলার পথের একটা নক্সা এঁকে দিয়েছিলেন। সেই নক্সাটি লীনার নখদর্পণে যেন প্রতিফলিত হচ্ছিল। তার স্মরণশক্তি এমনি প্রখর যে, কোন কথা একবার শুন্‌লে সে কখনো তা ভুলতো না। যাকে একবার দেখবে, তার মুখ সে কোন দিন ভুলবে না। লীনা ঠিক পথেই বিজলীকে বিদ্যুদ্বেগে চালাচ্ছিল।

একটা বাঁকের মোড়ে এসে বিজলী হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। লীনা দেখলো—তার ঘাড়ের লোমগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া হ'য়ে উঠেছে, পেছনের পা দু'টোর ওপর ভর দিয়ে সমুখের দুই পা তুলে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রছে। বুদ্ধিমতী লীনা বুঝলো, কাছেই কোন হিংস্র জানোয়ার আছে, বিজলী তারই গন্ধ পেয়েছে। একটা বিশ্রী গন্ধ লীনার নাকে প্রবেশ করলো; সে জান্‌তো, এ বাঘেরই গায়ের গন্ধ! বাঘটা আশে-পাশে কোথাও ওৎ পেতে ব'সে আছে। তাড়াতাড়ি সে বিজলীর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে তাকে দু'কথায় ঠাণ্ডা ক'রলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বাঘছালের গদীর সঙ্গে আটকানো হাতিয়ারগুলো নিয়ে দাঁড়াল। পাহাড়ের কোলে চাঁদের আলোয় কালো ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াতেই লীনাকে কি চমৎকারই দেখাচ্ছিল! তার হাতে ছিলে-পরানো দীর্ঘ ধনুক, কাঁধের দু'পাশে তীরপূর্ণ তূণে তীরের তীক্ষ্ণ ফলাগুলি চাঁদের আলোতে চিক্-চিক্ করছে। দীর্ঘ বেণীটি পিঠের ওপর দুলছে; আর তারার মত উজ্জ্বল চোখ উত্তেজনায় জল্-জল্ ক'রছে! এই অবস্থায় সে ধনুকখানি বাঁ-হাতে বাগিয়ে ধ'রে, ডান হাতের দুটো আঙ্গুল জিভে চাপিয়ে এমন একটা বিকট শব্দ করলো যে, রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে তা প্রতিধ্বনিত হ'লো। সঙ্গে-সঙ্গে সামনের ঝোপ থেকে

একটা প্রকাণ্ড বাঘ বেরিয়ে ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে পাহাড়ের পাশ দিয়ে দূরে পলায়ন করলো। লীনাও সঙ্গে-সঙ্গে সেই ভাবে আর একবার শব্দ ক'রে বিজলীকে বিদ্যুদ্বেগে চালাতে লাগলো।

বাঘের সামনে পড়লে কি কৌশলে তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হয়, লীনার তা ভালই জানা ছিল। ঘোড়ার পীঠে লীনাকে দাঁড়াতে দেখে, আর তার মুখের বিকট আওয়াজ শুনে বাঘটা বুঝেছিল, সেখানে থাক্‌লে তার আর নিস্তার নেই; তাই সে পালিয়ে প্রাণরক্ষা ক'রলো।

এমনি কত রকমের কত বিপদই এই দুর্গম দীর্ঘ পথে লীনার সামনে এসে প'ড়লো; আর লীনা কোথাও বুদ্ধি-বলে, কোথাও বা হাতিয়ারের সাহায্যে সকল বিপদ এড়িয়ে দিনের পর দিন নির্ভয়ে এগিয়ে চললো।

সব চেয়ে ভাবনার বিষয়—ভয়ঙ্কর জয়ন্তীয়া পাহাড়-অঞ্চলটা নিরাপদে পার হ'য়ে যাওয়া। সাধু লীনাকে ব'লেছিলেন—সব চেয়ে বেশী ভয় জয়ন্তীয়ার পাহাড়ে' পথে। এখানকার প্রত্যেক জন্তু-জানোয়ার, এমন কি, গাছ-পালা, পথ-ঘাট, সকলই সাংঘাতিক বিপজ্জনক। সেখানে এক রকম রাক্ষুসে গাছ আছে, রাক্ষসের মতোই তারা কাঁচা মাংস খায়। যত বড় জানোয়ারই হোক, এই গাছের কাছে এলে তার আর নিস্তার নেই! কোন জন্তু-জানোয়ারকে কাছে পেলেই এই রাক্ষুসে গাছ তার ডাল-পালায় এমনি কৌশলে তাকে আটক করে যে, প্রাণপণ চেষ্টাতেও তার শিকার মুক্তিলাভ করতে পারে না। তার পর গাছ তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে সেই জানোয়ারটির রক্ত-মাংস এমন ক'রে শুষে নেয় যে, শুধু হাড়গুলো আর চামড়াখানা গাছের তলায় প'ড়ে থাকে। বাঘ, গণ্ডার, বড় বড় অজগর, এমন কি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাঁতাল বুনো হাতীকেও এই ভাবে কায়দায় এনে তাদের রক্ত-মাংস চুষে নিয়ে হাড়-চামড়াগুলো ছোবড়ার মত ফেলে দেয়। জন্তুদের রক্ত-মাংসই হচ্ছে এই রাক্ষুসে গাছের একমাত্র সার বা খোরাক। এই মাংসভুক গাছের ছবি এঁকে দেখিয়ে সাধু লীনাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন।

রাক্ষুসে গাছের মতো লালুংরা এই অঞ্চলের রাক্ষুসে মানুষ; তাদের স্বভাবও ভয়ঙ্কর! দুর্গম পাহাড়ের ওপর এদের যে দুর্ভেদ্য দুর্গ আছে, সেই দুর্গে এরা খুব নির্ভয়ে বাস করে। এমনি এদের দাপট যে, কাছাকাছি সভ্য রাজ্যগুলির প্রজারা এদের ভয়ে কেঁপে মরে! সুযোগ পেলেই এরা দল-বেঁধে রাতের আঁধারে হঠাৎ ঝড়ের মত বেগে সেই সব রাজ্যে প্রবেশ করে; আর এমনি তাড়াতাড়ি লুঠপাট ক'রে উধাও হয় যে, রাজ্যের শিপাই-শান্ত্রীরা বাধা দেবারও ফুরসদ পায় না। সোনা আর আইবুড়ো মেয়েদের ওপরেই এদের লোভ। বিভিন্ন রাজ্যে এদের গুপ্তচরগুলা নানা রকম ছদ্মবেশে ঘু'রে বেড়ায়; কোন্ বাড়ীতে সোনা আর আইবুড়ো মেয়ে আছে, তার সন্ধান নিয়ে এদের রাজার কাছে সেই খবর পাঠিয়ে দিলে সুযোগ বুঝে রাজা তার শিকারীদের নিয়ে সেখানে হানা দেয়, এবং লুঠপাট ক'রে পালায়। লুঠের সোনা রাক্ষুসে রাজার ভোগে লাগে; আর এদের জাতের অবিবাহিত ছেলেদের সঙ্গে সেই আইবুড়ো মেয়েদের বিয়ে দেয়। কিন্তু দীর্ঘকালেও এই অত্যাচারের কোন প্রতিকার হয়নি।

দাদুর মুখে এই রকম অত্যাচারের কথা শুনে রাগে লীনার চোক দুটো ধ্বক্-ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠেছিল। জোরে একটা নিশ্বেস ফেলে সে তার সাধু দাদুকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—'সভ্যদেশের মানুষগুলো কি গরু না ভেড়া? তাদের রাজার কি মনুষ্যত্ব নেই? এর কোন প্রতিকার করতে পারে না?' দাদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—'রাজবাড়ীর সোনা বা রাজকন্যা ত কোনও দিন লুঠ হয়নি, দিদি। কাজেই প্রজাদের কষ্টটা রাজা ঠিক বুঝতে পারেননি। আর, সারা দেশের যিনি রাজা—এ সব অনাচার যাঁর দমন করবার কথা, পরের ঝক্কি নিয়ে বিব্রত হবার মতো বোকা তিনি নন।' লীনা তখন মুখখানা ভার ক'রে ব'লেছিল—'আমি কিন্তু বাঙলায় গিয়েই এর বিহিত করব, দাদু! আমার দেশের—আমার জাতের অসহায়া বিপন্না মেয়েদের করুণ রোদন যেন আমি শুনতে পাচ্ছি,—আর সেই সব মেয়ের অশ্রু-সজল মুখগুলো আমার চোখের ওপর যেন ভাসছে?' দাদু তখন ব'লেছিলেন—'মেয়েদের কষ্ট মেয়েরাই বোঝে; ওদের কষ্ট তুমিই দূর ক'রবে, দিদি!'

রাক্ষুসে গাছ আর রাক্ষুসে মানুষ ছাড়া আর একটা ভয়ের কথাও লীনা দাদুর কাছে শু'নেছিল। সেটি হচ্ছে—মেয়ে-রাজ্যের ফাঁদ! মেয়ে-রাজ্যের কেল্লাটি কোন্‌খানে, কেউ তা জানে না। অথচ সকলেই জানে আর বিশ্বাসও করে যে, কেউ যদি কোন দিন সেখানে গিয়ে পড়ে, তা হ'লে আর সে বেরিয়ে আসতে পারে না। এমন কি, ঐ যে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষুসে লালুং জাত—এরাও মেয়ে-রাজ্যের কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না। এদের ধারণা—এ রাজ্যের মেয়েরা যাদু জানে; যাদুর বলে পুরুষকে ভেড়া বা পাথর বানিয়ে রাখ্‌তে পারে। দাদু ব'লেছিলেন—'আমার পক্ষে ভাববার কথা এই যে, তোমার পাছে মাঝ-নদীতে ভরা ডুবিয়ে দেয়!' লীনা এক-মুখ হেসে উত্তর দিয়েছিল—'কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি, দাদু! বিজলী বেরিয়েছিল রাণী খুঁজে আনতে। মাঝ-পথে সুযোগ বুঝে যদি রাণীকে পিঠে ক'রে তার নিজের দেশে মেয়ে-রাজ্যের গোলক-ধাঁধায় প্রবেশ করে—এই ত ভয়? কিন্তু তা হবে না, দাদু? বিজলী বেশ বুঝেছে—এমন মেয়ে তার সোয়ার হয়েছে, যে তাকে কায়দায় রাখতে জানে। তবে আশা করি, বিজলীর সেই কাজও বাকি থাকবে না,—তারই পিঠে চ'ড়েই এক দিন আমি মেয়ে-রাজ্যের সিংহাসনেও বসতে যাব; কিন্তু সে পরের কথা।'

সুদীর্ঘ দুর্গম পথটি অতিক্রম ক'রবার সময় এই তিনটি চিন্তাই লীনার মন অধিকার ক'রেছিল। ডালপালা-ওয়ালা কোন বড় গাছ সামনে পড়লেই সে সতর্ক ভাবে তা এড়িয়ে চলে। কিন্তু এই মাংসভুক গাছের ছবি তার মনের ভেতর এমনি সুস্পষ্টরূপে আঁকা ছিল যে, তার ভুলভ্রান্তির কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর পরেই সেই নররাক্ষসগুলার চিন্তা! তার মতো অবিবাহিতা তরুণী এই নির্জ্জন পথে সেই পিশাচদের সম্মুখে প'ড়লে তার পরিণাম কি? এর ওপর শেষ চিন্তা,—বিজলী যদি তাকে নিয়ে নিজের দেশে মেয়ে-রাজ্যের গোলক-ধাঁধার ভেতরে প্রবেশ করে?

লীনা নিজের মনেই এই সকল সমস্যার সমাধান ক'রতে ক'রতে, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে গন্তব্য পথে চল্‌তে লাগলো।

এই ভাবে চ'লতে চ'লতে লীনা এক দিন সন্ধ্যার সময় সব-চেয়ে বিপদসঙ্কুল দুর্গম অঞ্চলটির সন্ধিস্থলে এসে প'ড়লো। কিন্তু এইখানেই রহস্যময়ী নিয়তি তাঁর রহস্যময় চাকাটি অদ্ভুত ভাবে ঘুরিয়ে, এই নির্ব্বাসিতা রাজকন্যার জীবনযাত্রার গতি নূতন পথে ফিরিয়ে দেশশুদ্ধ সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিলেন।

আগামী চৈত্র সংখ্যায় সেই বিস্ময়কর কাহিনী শুনবার জন্য তোমরা সকলে প্রস্তুত থাক।

—গল্পদাদু।

স্বর্গের সিঁড়ি

আমরা তখন ইস্কুলে পড়ি—কলকাতার শ্যামবাজারে যেখানে আজ ট্রামের ডিপো, তার সামনে এক জন সাহেব এসে আস্তানা বেঁধে সেখান থেকে বেলুনে চড়তেন! বেলুনে চড়ে মানুষ আকাশে উঠছে, সে দৃশ্য দেখে আমাদের মনে তখন কি ভাব জেগেছিল, আজ এত কাল পরেও তা ভুলিনি! বিস্ময়-শ্রদ্ধা-ভয়—অর্থাৎ ছোট মনের কোথাও আর এতটুকু ফাঁক ছিল না!

বেলুনে চড়ে সাহেবের আকাশে ওঠার কাহিনী মুখে শুনে পাড়ার দু'-চার জন বৃদ্ধ বলেছিলেন, এ আর আশ্চর্য্য কি, বাপু! রামায়ণ-মহাভারত পড়োনি? পড়লে দেখবে, সত্য-ত্রেতা যুগে রাজা-রাজড়ারা পুষ্পক রথে চড়ে স্বর্গে যেতেন দিগ্বিজয় করতে—নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ দেবতারা পুষ্পক-রথে চড়ে মর্ত্ত্যে বেড়াতে আসতেন!

এ-সব গল্পে তাঁরা আমাদের এমন দমিয়ে দিতেন যে, বেলুনে চড়ে মানুষ আকাশে উঠছে—এত-বড় ব্যাপার চোখে দেখে যে-আনন্দে মন ভরে উঠতো, সে-আনন্দ যেন চূর্ণ হয়ে যেতো! গভীর দুঃখে আমরা সত্য-ত্রেতা যুগের কথা স্মরণ করে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলতুম, আর ভাবতুম, হায়, কেন দেবতারা এ যুগে আর পুষ্পক-রথে চড়ে মর্ত্ত্যে আসেন না এবং মর্ত্ত্যলোকের মানুষের স্বর্গে নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে গেল! রাবণ রাজার সব অপরাধ ক্ষমা করে আমরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাতুম, হে ঠাকুর, করুক অত্যাচার, রাবণ রাজাকে একবার মর্ত্ত্যে

পাঠাও! সে-ভদ্রলোক এসে তাঁর কল্পিত স্বর্গের সিঁড়িটা তৈরী করে দিয়ে যান!

তার পর বহু যুগ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে অবশ্য আকাশ-মার্গের বহু তথ্য জানতে পারলেও স্বর্গ কোথায়, তার কোনো হদিশ আমরা আজ পর্য্যন্ত পাইনি। সে জন্য সশরীরে স্বর্গ ঘুরে আসবার কল্পনা আর আমাদের মনে স্থান পায় না!

কিন্তু এ-সব কথা থাক্!

সম্প্রতি এক জন মার্কিণ বৈজ্ঞানিক আমাদের রামায়ণের রাবণ-রাজার কল্পনার তারিফ করে তার বহু সাধুবাদ জানিয়ে লিখেছেন, রাবণ-রাজার কল্পিত স্বর্গের সিঁড়ি আজিকার মানুষ স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে না পারলেও তুঙ্গ গিরির বুক বেয়ে যে দীর্ঘ পথ তৈরী করে তুলছে, তাতে মনে হয়, স্বর্গ কোথায় সন্ধান জানতে পারলে মানুষের পক্ষে স্বর্গের ফটক পর্য্যন্ত পথ তৈরী করা আদৌ অসম্ভব নয়! অর্থাৎ তিনি বলছেন, আমেরিকার কলরাডো প্রদেশে ন'-দশ হাজার ফুট উঁচু গিরি-শিখর পর্য্যন্ত এঞ্জিনীয়ারের দল যে পাকা প্রশস্ত পথ তৈরী করেছেন, সে পথে নিত্য কত শত মোটর-গাড়ীতে চড়ে কত লোক-জন যাতায়াত করছেন, দেখলে তাক্ লাগে!



সর্প-গতিতে পথ উঠিয়াছে

আমাদের ভারতবর্ষেও কাশ্মীর-পেশোয়ার, খাইবার-গিরিবর্ত্ম প্রভৃতি স্থানে যাঁরা গেছেন, পাহাড় কেটে পাহাড়ের বুকে ব্রাকেটের মতো এমনি পাকা পথ তাঁরা দেখে এসেছেন নিশ্চয়। এ আবার দোতলা পথ। অর্থাৎ এক-তলায় রেল-লাইন পাতা। সে-পথে চলে রেল-গাড়ী; আর এক-তলা পথে চলে মোটর-গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, বয়েল গাড়ী। পথ এমন প্রশস্ত ও মসৃণ যে, গাড়ীতে চড়ে এ-পথে যাতায়াত করতে এতটুকু গা কাঁপে না বা হ্যাঁচকা-টান্-লাগে না! যাত্রাটুকু বেশ স্বচ্ছন্দ আরামে নির্ব্বাহিত হয়।

পাহাড়ের গা থেকে পাহাড়ের বুক বয়ে তার শিখর-দেশ পর্য্যন্ত এ পথ অবশ্য সিধা-খাড়াভাবে তৈরী করা চলে না। করলে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অমোঘ এবং দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে পতন ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ-জন্য চক্রাকারে বা সর্পিল-ভঙ্গীতে পাহাড়ের গা ঘুরিয়ে এ-পথকে ক্রমিক উর্দ্ধ রেখায় উপরে তোলা হয়। এ-জন্য কোথাও বাঁকের পর বাঁক—কোথাও বা চক্রের পর চক্র—এ-সবের আর সংখ্যা থাকে না। বহু জায়গায় এত ঘুরিয়ে পথ তৈরী না করে ডিনা-মাইট ও বারুদের সাহায্যে পাহাড়ের কিয়দংশ উড়িয়ে সাফ করে সুবিধা-মতো পথ নির্ম্মাণ করা হয়।

দারুণ শীতে বা বর্ষায় পাহাড়ের গায়ে পথ-নির্ম্মাণের কাজ চলে না, চলতে পারে না। তা ছাড়া কাজ যা হয়, তা দিনের আলোয়। কলরাডোর ব্রডমুর-চেইন পাহাড়ের পথ পাহাড়ের কোল থেকে ৯২০০ ফুট উর্দ্ধে উঠেছে! এ পথের মাঝে-মাঝে বাঁক আছে। মেয়েরা মাথার খোঁপায় যেমন কাটা গোঁজেন, তেমনি কাঁটার মতো বাঁক। এ বাঁককে বলে hair-pin bends.

চওড়ায় এ-পথ ৩০।৪০ ফুট। পথ এমন প্রশস্ত যে, পাশাপাশি দু'খানা মোটর চালাতে বিপদের কোনো ভয় নেই! যে-সব জায়গা বেশী-রকম ঢালু, সে-সব জায়গায় দু'ফুট চওড়া পাথরের মজবুত পাঁচিল তোলা হয়েছে। এ পাঁচিল তিন ফুট উঁচু; তা ছাড়া পাঁচিলের গায়ে মোটা তারের বেড়া আছে। বারো ফুট অন্তর

লোহার পোষ্ট পুঁতে তারের বেড়া তাতে সংলগ্ন করা হয়েছে। দু'দিক থেকে দু'খানি মোটর অনায়াসে এবং



পাহাড়-পথে মোটর নামে

নিরাপদে এ-পথে যাতায়াত করতে পারে; গড়িয়ে পড়বে, সে ভয় নেই।

পথের ঢালু এমন মৃদু-মাত্রায় উঁচু-নীচু করা হয়েছে যে, দাঁড়িয়ে সোজা এ-পথের পানে চাইলে মনে হবে, পথ গড়ানে বা ঢালু নয়, বেশ সমতল!

এ-পথ তৈরী করতে পাহাড়ের দেহ থেকে যে-পাথর উড়িয়ে সাফ করা হয়েছে, তার পরিমাণ এক লক্ষ ঘন-গজ (কিউবিক্-ইয়ার্ড)। সরাতে ত্রিশ টন ডিনামাইট এবং বিশ টন বারুদ খরচ হয়েছে। এ-পথ তৈরী করতে সময় লেগেছে দু'বছর এবং এই দুঃসহ কার্য্যে একটি লোকেরও প্রাণ-বিয়োগ ঘটেনি! ছোটখাট দু'চারটে দুর্ঘটনা ঘটেছিল; কিন্তু সে এত তুচ্ছ যে, ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়!

এ-পথ তৈরী করবার সময় প্রাকৃতিক দৃশ্য-মাধুরীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ১নং এবং ২নং ছবি দেখলে পথের আভাস পাবে। এক-নম্বর ছবিতে ছাখো, নীচেকার পথ এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কি-ভাবে ঘুরে-ঘুরে সর্পগতিতে পাহাড়ের মাথায় উঠেছে! ২নং ছবিতে ছাখো, কি স্বচ্ছন্দ গতিতে পাহাড় থেকে মোটর-গাড়ী নেমে আসছে! এ পাহাড়-পথের নাম হয়েছে স্বর্গের সিঁড়ি (Ladder to the Sky)!

সর্দ্দি লাগা

এবারে স্বাস্থ্য-তত্ত্বের কথা বলতে চাই। কথাটা খুব সাধারণ—এ কথা মেনে আমরা চলি না বলে অনেক সময় মহা-অনর্থ ঘটে!

কথাটা হচ্ছে সর্দ্দি লাগা নিয়ে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা—সব সময়েই সর্দ্দি লাগার আশঙ্কা আছে। ঠাণ্ডা লাগলেই সর্দ্দি হবে আর রোদ লাগলে হবে না, এমন কোনো আইন নেই! রোদে ঘুরেও সর্দ্দি হয়।

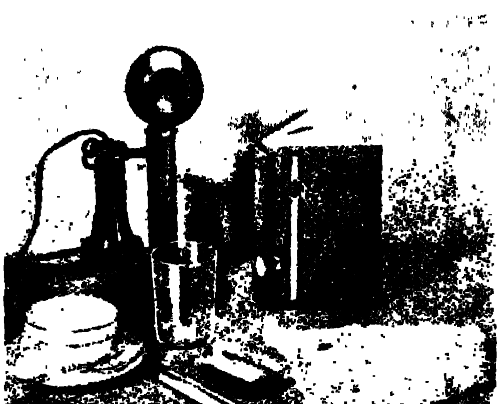
আসলে, সর্দ্দির উৎপত্তি বীজাণু থেকে। এ বীজাণুর আক্রমণ রোধ করবার শক্তি আমাদের অনেকের থাকে না। এ শক্তি কার আছে, তা যখন জানি না, তখন কয়েকটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে সর্দ্দির আক্রমণ থেকে আমরা নিরাময় থাকতে পারি। বর্ষা নামলে অনেক সময় দায়ে পড়ে আমাদের বৃষ্টিতে ভিজতে হয়। ভেজার ফলে সর্দ্দি লাগে। দারুণ শীতে বা ঠাণ্ডা বাতাসেও সর্দ্দি লাগবার আশঙ্কা আছে প্রচুর। যদি বৃষ্টিতে ভিজতে হয়, তা হ'লে

গলা, মাথা এবং পায়ের তলা—এগুলিকে না ভিজিয়ে যদি গরম বা সুরক্ষিত রাখতে পারি, তা হ'লে সর্দ্দি লাগবার আশঙ্কা থাকবে না। বর্ষার দিনে পথে ভিজে বাড়ী ফিরে



সদরে নোটিশ আঁটা

আসবামাত্র শুকনো গামছা-তোয়ালে বা কাপড়ে ভিজে পা-গলা-মাথা ঘষে বেশ করে মুছতে হবে; তার পর যদি গরম কাপড়ে গা ঢেকে বসে থাকি, তা হ'লে সর্দ্দি লাগবার ভয় থাকবে না।



এই সব থেকে ছোঁয়াচ লাগে

রোদে ঘোরবার সময় গলা বা টাক্‌রা জ্বালা করলে বুঝতে হবে সর্দ্দির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে! এ সময়ে ঠাণ্ডা জল বিষবৎ পরিত্যাগ করা চাই। রোদে ঘুরে পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেলেও কদাচ ঠাণ্ডা জল খাবে না; পানের জন্য এ সময় চাই গরম জল বা গরম চা। ঠাণ্ডা-গরমে চট্‌ করে সর্দ্দি হয়। বাইরে যদি ঠাণ্ডা পড়ে, তা হ'লে গায়ের কাপড়-চোপড় সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হতে হবে। অর্থাৎ ফিন্‌ফিনে পাতলা জামা পরে বাইরে বেরুনো তখন উচিত হবে না!



এক-জায়গায় ডাঁই টুথব্রাশ

ছোঁয়াচ থেকেও অনেক সময় সর্দ্দি লাগে অর্থাৎ আর-কারো সর্দ্দি হ'লে সে যত প্রিয় আত্মীয় হোক, তার হাঁচি-কাশি বাঁচিয়ে চলতে হবে! সর্দ্দি-কাশির ছোঁয়াচে সুস্থ ব্যক্তির সর্দ্দি-কাশি হওয়া খুব স্বাভাবিক। এজন্য নিউ-ইয়র্কে এক বাড়ীর গৃহিণী বাড়ীর ফটকে কাগজ এঁটে রাখতেন। তাতে লেখা থাকতো, "যদি আপনার সর্দ্দি হয়ে থাকে, দয়া করে বাইরে থাকবেন অর্থাৎ এ-বাড়ীতে আসবেন না।"



মুখে আঙুল দেবে না!

কথাটা হাসি-তামাসায় উড়িয়ে দেবার নয়! এ নিয়ম সকলে যদি পালন করে চলি, তা হ'লে সর্দ্দির

ছোঁয়াচ বাঁচে; সে ছোঁয়াচ-বাঁচায় বহু লোক সুস্থ-নিরাময় থাকতে পারেন।

সর্দ্দি-কাশির ছোঁয়াচ কি করে লাগে, এবার সে সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা বলি। এ কথাগুলি বেদ-বাক্যের মতো যদি মেনে চলো, তা হ'লে সর্দ্দি-কাশির হাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

কারো উচ্ছিষ্ট; অথবা এঁটো প্লেটে, পেয়ালায় গ্লাশে বাটিতে খবর্দ্দার কোনো-কিছু খাবে না। কিছু খাওয়ার আগে হাত ভালো ক রে ধু তে হবে। পথ থেকে বা সি নে মা-



এত খেলে সর্দ্দি হবেই!

থিয়েটার-সার্কাস ও বাস-ট্রাম থেকে ভিড় ঠেলে ঘুরে এসে হাত না ধুয়ে কদাচ কোনো-কিছু মুখে দেবে না। ভালো করে হাত ধুয়ে তবে সে-হাতে খাবার খাবে! টেলিফোনের রিশিভার—সর্দ্দি চালাবার একটি মস্ত সহায়। অপরের রুমাল-গামছা-তোয়ালে কদাচ ব্যবহার করা উচিত নয়। সারা দিনে আট-দশ গ্লাশ জল খাওয়া যদি অভ্যাস করতে পারো, তা হ'লে সর্দ্দি লাগার আশঙ্কা থাকবে না।

মুখের মধ্যে আঙুল পুরবে না—কখ্খনো না! পেন্সিল কামড়ানো; কলমের ডগা কামড়ানো; আঙুলে থুতু লাগিয়ে বইয়ের পাতা খোলা; টাকা-পয়সা মুখে দেওয়া বা টাকা-পয়সার হাত না ধুয়ে সেই হাতে খাওয়া—এগুলো খুব অন্যায়। এ অভ্যাসে শুধু সর্দ্দি-কাশি কেন, দেহে নানা রোগের আক্রমণ অনিবার্য্য।

আজ-কাল অনেক বাড়ীতেই টুথ-ব্রাশে দাঁত-মাজার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ব্যবস্থা ভালো। কিন্তু দাঁত মেজে সকলের উচিত টুথ-ব্রাশ সাফ করে ধুয়ে তবে তুলে রাখা; এবং তুলে রাখবার সময় এক-জায়গায় জড়ো করে কিম্বা একটি পাত্রে জল দিয়ে সেই পাত্রে সকলের টুথ-ব্রাশ রাখা খুব অন্যায়! টুথ-ব্রাশ এমন ভাবে রাখবে, যেন এ-ব্রাশের সঙ্গে ও-ব্রাশ না ঠেকে থাকে!

অতি-ভোজনের ফলে হজমের গোলযোগ ঘটে। হজমের গোলযোগ হ'লে সর্দ্দি-জ্বর হয়; সুতরাং অতি-ভোজনের ফলে সর্দ্দি-কাশির উৎপত্তি বিচিত্র নয়!

সর্দ্দি-কাশির সঠিক উৎসের সন্ধান বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এখনো পান্‌নি! সর্দ্দি হ'লে ঠিক কোন্ ওষুধ দিলে তা সারবে, সে সম্বন্ধে চিকিৎসকদের প্রেসক্রপশন্ এখনো অব্যর্থ হয়নি! তাঁরা বলেন, সর্দ্দি যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকলের খুব হুঁশিয়ার হওয়া উচিত।

কি সে ব্যবস্থা? ডাক্তাররা বলেন, লোকের ভিড় যথাসম্ভব পরিহার করে চলবে; খোলা বাতাসে যত থাকো ভালো; নিত্য ব্যায়াম করো; সুনিদ্রার যেন ব্যাঘাত না হয়, দেখো; অতি-ভোজন করবে না; প্রচুর জলপান করবে; হাত-পা না ধুয়ে অর্থাৎ আধোয়া-হাতে কদাচ খাবে না; কারো সর্দ্দি হ'লে তার হাঁচি, তার নিশ্বাস বাঁচিয়ে চলবে। সর্দ্দি হবামাত্র দু'-এক ডোজ বাই-কার্ব্বনেট-অফ-সোডা সেবন করলে সর্দ্দিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে পারবে, জেনো।

সিনেমার সৃষ্টি

ফিল্মের ফাঁকির সম্বন্ধে পূর্ব্বে তোমাদের অনেক কথা বলিয়াছি। এ ফাঁকি ভেলকি-বাজীর ফাঁকি নয়! এ ফাঁকিতে সৃষ্টির যে কৌশল আছে, তা অনুশীলনযোগ্য।

বিজ্ঞানে প্রচুর জ্ঞান এবং গভীর অভিনিবেশ—এ দু'টি না থাকিলে ফিল্মের এ-ফাঁকি রচিবার সাধ্য হইবে না! এ-ফাঁকির কারবারে কতখানি শক্তির প্রয়োজন, আজ সে সম্বন্ধে দু'চারিটা কথা বলিতেছি।

সিনেমার প্রায় সব দৃশ্যই এখন ষ্টুডিয়োর মধ্যে বিশেষ ভাবে রচিত 'শেটে' তোলা হইতেছে। তুঙ্গ পাহাড়ের যে দৃশ্য দেখি, সে পাহাড় সত্যকার পাহাড় নয়; সত্যকার পাহাড়ের আদর্শে ষ্টুডিয়োর মধ্যে নকল পাহাড় গড়িয়া সেই নকল পাহাড় লইয়া সিনেমা-ছবির কাজ চলে।



উপরে :—সত্যকার জাহাজের বুকে শীন্ তৈয়ারী হইয়াছে; নীচে :—ষ্টুডিয়োর নকল খাদে নকল জাহাজ চালানো

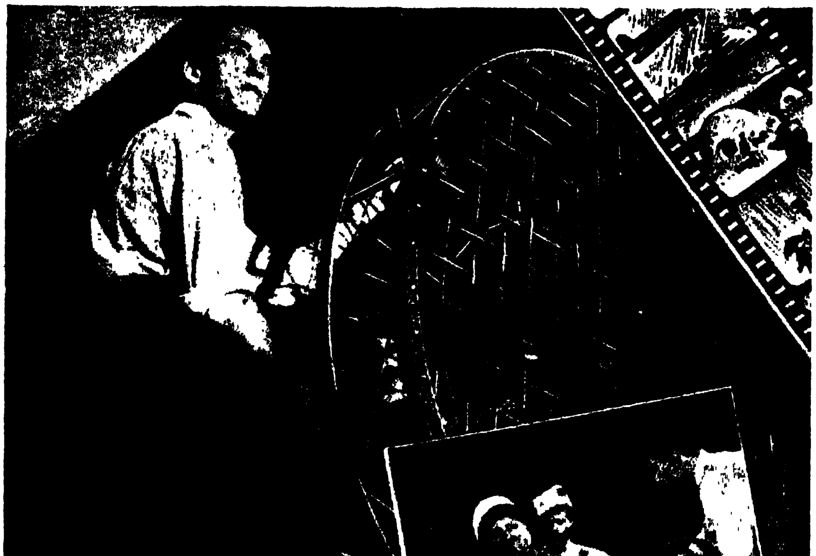
যিনি সিনেমার ছবি রচনা করেন, তাঁকে বলে ডাই-রেক্টর বা পরিচালক। তিনি বলিলেন—এ দৃশ্যে খুব বরফ-পড়া দেখাইতে চাই; ব্যবস্থা করিয়া দিন। অমনি সিনেমার যিনি কারু-শিল্পী, তিনি লাগিলেন নকল তুষার-বর্ষণ ও ঝড় তৈয়ারী করিতে। এ-দৃশ্যের জন্য তিনি বরফ তৈয়ার। করিলেন, তার পর পাখা লাগাইয়া বৈদ্যুতিক শক্তিতে সে-পাখা ঘুরাইয়া ঝড় বহাইয়া দিলেন। নকল বরফ রচিয়া সেই বরফের ঝর্ণা ঝরাইয়া এই করকা-ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এই ঝড় ও করকা-বর্ষণ এমন নিখুঁত হয় যে, তার ফটো দেখিলে কে বলিবে, এ ঝড় সত্য নয়! হোজ-পাইপের সাহায্যে নকল তুষার বর্ষণ করিয়া সারা 'শেট্' অর্থাৎ দৃশ্যের ঘর-বাড়ী, পথ-নদী-পাহাড় —সব বরফে ঢাকিয়া ছবি তোলা হয়। কারু-শিল্পীর সৃষ্টি-কুশলতায় নকলের এ ফাঁকি কোনো মতে ধরা যায় না।

বর্ষার ধারা-পাতও পাইপের সাহায্যে নিখুঁত সুন্দর ভাবে রচনা করা হয়। তার পর চোখের জল—গ্লিসিরিনের ফোঁটা চোখের পাতায় বা কোণে ঢালিয়া দিলেই সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীর চোখে তাহা সত্যকার অশ্রু-রূপে ফুটিয়া ওঠে! ঘাম···দরদর-ধারে গায়ে ঘাম ঝরিতেছে—ঘামের এ ব্যাপারও নকল! অভিনেতার গায়ে-মুখে পিচকারী-ধারায় এক রকম তৈল

দারুণ বর্ষার জলে ফিল্ম-নাটকের যে-ক্রিয়া দেখানো হয়, সে ক্রিয়া আসল-বর্ষায় তোলা নয়। সত্যকার বর্ষা-বাদলে সুস্পষ্ট ভাবে ছবি ক্যামেরায় উঠিবে কেন? তা ছাড়া শীতকালে ছবি তোলা হইতেছে—সে-ছবিতে শ্রাবণের ঘন-বর্ষার দৃশ্য চাই; শীতকালে সিনেমার প্রয়োজনে আকাশের মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করিবে না নিশ্চয়! অগত্যা সিনেমা-রচয়িতাকে নকল-বৃষ্টিধারা তৈয়ারী করিতে হইবে। সত্যকার বর্ষা যেমন হয়, তার সঙ্গে এই নকল বর্ষার এক-চুল তফাৎ হইলে চলিবে না।

অভিসিঞ্চিত করা হয়; সে তৈল ঘর্ম্ম-বিন্দুর মতো গায়ে মুখে লাগিয়া থাকে। ক্যামেরায়-তোলা এ-তৈল দেখায় ঠিক ঘামের মতো!

উদ্দাম-ঝড়ে সাগরের বুকে উত্তাল তরঙ্গ—কি করিয়া



পাখা চালাইয়া ঝড়-সৃষ্টি





পিচকারী করিয়া ঘাম-তেল ছিটানো

নকল সাগর, নকল ঝড়, নকল তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, জানো? প্রকাণ্ড চৌবাচ্ছা গড়িয়া সে-চৌবাচ্ছাটি জলে পরিপূর্ণ করা হয়। তার পর সে-জলে ঢেউ-তোলা-যন্ত্র ঘুরাইলে চৌবাচ্ছার জলে ঢেউ ওঠে! এ-যন্ত্রটি বেশ বড়। পাঁচ-ছ'জন লোক মিলিয়া সবলে ও সম্মিলিত বেগে এ-যন্ত্র কৌশলে চালনা করে; ক্যামেরার লেন্সে এই ঢেউ দেখায় সাগরের ঢেউয়ের মতো উত্তাল উদ্দাম! বিশেষ ভাবে রচিত বৈদ্যুতিক ফ্যান ঘুরাইয়া ঝড়ের রাতের উতরোল বেগ ও গতির সৃষ্টি করা হয়।

বৃষ্টি সৃষ্টি করিতে সব সময়ে জল ছুড়িয়া বহু পিচকারির ধারায় জল বর্ষণ করা হয় না; ময়দার গুঁড়া, মার্ব্বেল-পাথর-চূর্ণ, লবণ—এই সব লইয়া নকল বৃষ্টিধারা ও নকল বরফ বর্ষণ করা হয়। খুব মিহি কাগজের কুচিও ক্যামেরার মারফৎ বৃষ্টির রূপ ধারণ করে।

ধূলাবালি-ওড়ানো ঝড়ের সৃষ্টি করিতে হইলে দ্রুত বেগে ফ্যান চালাইয়া সেই ফ্যানের হাওয়ায় বালুকারাশি সঞ্চালিত করা হয়।

জলে ভিজিয়া একশা হইয়াছে—এ-দৃশ্য তুলিবার সময় পাত্র-পাত্রীর মুখ-চোখ বিশেষ-তৈলে সিক্ত করিয়া সেই তৈলের উপর পিচকারী করিয়া জল ছিটানো হয়। তৈলের আঠায় এ জল-বিন্দু লাগিয়া থাকে। ক্যামেরার লেন্সে পাত্র-পাত্রীকে দেখায় যেন জলে ভিজিয়া একশা হইয়াছে!

তার পর ঐ সব বড় বড় জাহাজ!

সাগর এবং সাগরের বুকে বড় বড় জাহাজ,—সে জাহাজ চলিতেছে; সে জাহাজ ঝড়ের দোলায় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইতেছে; জলে ডুবিতেছে; জাহাজে-জাহাজে যুদ্ধ; বোম্বেটের দল জাহাজে উঠিয়া নৃশংস-হত্যা করিতেছে—এ সব দৃশ্যের ঐ সাগর ও জাহাজ—সবই নকল অর্থাৎ শেটে-তৈয়ারী নকল-সাগর নকল-জাহাজ! ষ্টুডিয়োর মধ্যে জলাশয় রচিয়া সে-জলাশয়ে খেলাঘরের জাহাজ ভাসাইয়া নানা কৌশলে এ ছবি তৈয়ারী হয়। "মিউটিনি অন দি বাউন্টী", "ক্লিওপেট্রা" প্রভৃতি ছবিতে বড়-বড় যে জাহাজ দেখিয়াছ, সে সব নকল-জাহাজ! আসল সাগরের বুকে এ-সব জাহাজ কোনো কালে পাড়ি দেয় নাই!

এই সব নকল সামগ্রী লইয়া মর্ম্মস্পর্শী নাটকে জুড়িয়া

যাঁরা আসলের আবহাওয়া গড়িয়া তোলেন, তাঁদের সৃষ্টি-কুশলতায় মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না ; এ-সব সৃষ্টি-কার্য্যে যাঁদের নৈপুণ্য আছে, সে সব কারু-শিল্পী হলিউডে আজ তাঁদের অপূর্ব্ব প্রতিভার মূল্য পাইতেছেন, এটা সব চেয়ে আনন্দ ও গৌরবের কথা।



হোজ-পাইপ দিয়ে নকল বরফ লাগানো



"গ্রীন্ প্যাশ্‌চার্স" ফিল্মে নকল বৃষ্টিধারা

আমাদের দেশেও আজ সিনেমায় আসন যেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে কারু-শিল্পে দক্ষতা-লাভ করিলে এ দেশের কারু-শিল্পীও যে তাঁর প্রতিভার পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত হইবেন না, তাহা সুনিশ্চিত ; এবং সেই জন্য ছেলে-বয়স হইতে এ-দিকে যাদের রুচি দেখা যাইবে, সে সব ছেলেমেয়ের শিল্প-প্রতিভা যাহাতে বিকশিত হয়, সে-সম্বন্ধে সযত্ন-সাহায্য প্রয়োজন !

উত্তম ও মধ্যম

মধ্যমেরে সমাদর করি বহু উত্তমের চেয়ে—
যে মধ্যম মধ্যপথে চলে ধীর মধ্য-গতি বেয়ে।
যে মধ্যম গৃহ-দীপ শান্ত শিখা জ্বলে অকম্পিত
ধধুপেরে কে না জানে অবিলম্বে ধূলায় লুণ্ঠিত !

যে মধ্যম উত্তমেরে শ্রদ্ধাভরে করে বহু মান—
যে মধ্যম অধমেরে টানে ক্রোড়ে, নাহি অভিমান !
সেই সে মধ্যম ভালো, নাহি বন্যা-প্লাবন—শুষ্কতা—
সুস্থির সরসী-সম গুঞ্জে অলি অরবিন্দে যথা।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত



কাঁধ-গলা-ঘাড়

মেয়েদের মধ্যে দেখি যৌবন-রাগে দেহখানি বিভূষিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেরই কাঁধ ও গলা এমন বেছাঁদে ভরে ওঠে যে, তার ফলে তাঁরা কোল-কুঁজো হয়ে পড়েন! অর্থাৎ চলেন ফেরেন বসেন দাঁড়ান—দেহখানি থাকে যেন ধনুকের মত বেঁকে! এই কোল-কুঁজো ভাবের জন্য অতি-বড় রূপসীকেও কতখানি বিশ্রী দেখায়, যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন!

ছেলে-বয়স থেকেই বসা-দাঁড়ানো চলা-ফেরার সম্বন্ধে মেয়েদের খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে। গলা যেন হাঁসের গলার মতো সিধা-খাড়া থাকে,—কাঁধ বেঁকে-চুরে কোনো মতে দেহের উপরে আশ্রয় পাচ্ছে ভেবে চুপ-চাপ থাকা চলে না! সিধা ঘাড়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। যার কাঁধ ঝুঁকে আছে, গলা নুয়ে আছে, তাকে দেখলে মনে হয়, মনের বেদনা-ভারে সে যেন ভেঙ্গে পড়েছে! এবং গলা ও কাঁধের এই বিকৃত ভঙ্গীর জন্য বহু রূপসী যৌবনেই কুশ্রী হন—যাকে ইংরেজীতে বলে unattractive অর্থাৎ দৃষ্টি-কটু! এই কোল-কুঁজো ভাবে অর্থাৎ মচকানো ঘাড় এবং গলার জন্য জীবনী-শক্তিও কমে যায়। এ আমাদের কথা নয়! বিশেষজ্ঞেরা বলছেন—Low vitality is often the result of bad posture.

ঘাড়ের পেশীগুলি আছে আমাদের হাতের ঊর্দ্ধাংশে। কাঁধ ঝুঁকিয়ে থাকবার অভ্যাসে বুকের পেশী মচকে যায়, নুয়ে যায়। তার ফলে বুকের গড়ন কদর্য্য হয়। আমাদের গলার হাড় (collar-bone) যেখানে বুকের প্রধান হাড়ের সঙ্গে মিশেছে—সেই সংযোগ-স্থলের উপরেই কাঁধের অবস্থান। এইখানেই ঘাড় কাঁধ আর গলার সম্পর্ক—পরস্পরের সাহায্যে নিজেদের সঠিক ভাবে সম্পূর্ণ ছাঁদে গড়ে তোলা। যে ভাবে ঘাড় রাখি, তার উপর গলায় টোল পড়া ও ভাঁজ পড়া বা গলা নিভাঁজ হওয়া এবং গলায় ঝিঁক ওঠা—এ-সব নির্ভর করে। কাজেই গলা, ঘাড় ও কাঁধের অবস্থান-সম্পর্কে এতটুকু ঔদাস্য করা চলে না। ঔদাস্য করলে দেহের চারু-ছাঁদ ভেঙ্গে বিশ্রী হয়ে যাবে! যোগ্য ব্যায়ামে কাঁধ, ঘাড় ও গলার দোষ কেটে গলা, কাঁধ ও ঘাড় সুছাঁদে গড়ে ওঠে।

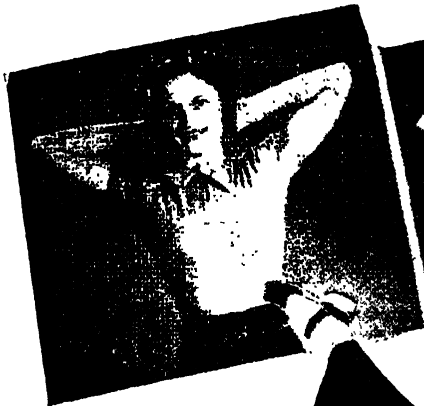
আমাদের পিঠের মেরুদণ্ড ও পেশীর শক্তি-সামর্থ্যই কাঁধ ও গলার ছন্দ-সহায়; এবং এই শক্তি-সামর্থ্যের উপরেই দেহের শক্তি-সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

দেহচর্য্যার দিকে মেয়েদের মনোযোগ এখন দেখা যাচ্ছে। প্রাচীন আদর্শে কয়েকটি টাইট-জামা গায়ে এঁটে দেহকে সঙ্কুচিত করার প্রয়াস বিলেতেও আজ দেখা যায় না। আমাদের দেশে যে সনাতন প্রথা নারী-সমাজে বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ কর্শেট বা টাইট-বন্ধনীতে দেহকে বেঁধে-ছেঁদে রাখার প্রতি গভীর বিরাগ, সে প্রথা আজ বিলিতী নারী-সমাজও মানছেন। এ প্রথায় নারীদেহের কমনীয়তা ও নমনীয়তা লোপ পায় না, নারীর দেহে শ্রী বিরাজিত থাকে।

দেহখানিকে ছিপ্‌ছিপে রাখা চাই। তা হলে যৌবন-রাগ কোনো দিন দেহ ছেড়ে পলায়ন করবে না! মেদ-মাংসে দেহ যদি পিণ্ড হয়ে ওঠে, তা হলে শত-প্রয়াসেও নারী তাঁর দেহে যৌবনকে ধরে রাখতে পারবেন না। সুতরাং দেহকে যাঁরা যৌবন-নিটোল-ছন্দে কায়েমি ভাবে বাঁধতে চান, তাঁদের উচিত শ্বাসগ্রহণে নিয়ম-পালন এবং নিষ্ঠাভরে প্রত্যহ যোগ্য ব্যায়াম-সাধন করা।

দিনে খানিকক্ষণ করে নিষ্ঠাভরে গভীর ভাবে শ্বাসগ্রহণ (deep breathing) অভ্যাস করুন। তা হলে দেহের কাঠামোখানি পরিপূর্ণ নিটোল থাকবে; সে ছাঁদ কোনো দিন ভেঙ্গে ধ্বশে নষ্ট হবে না।

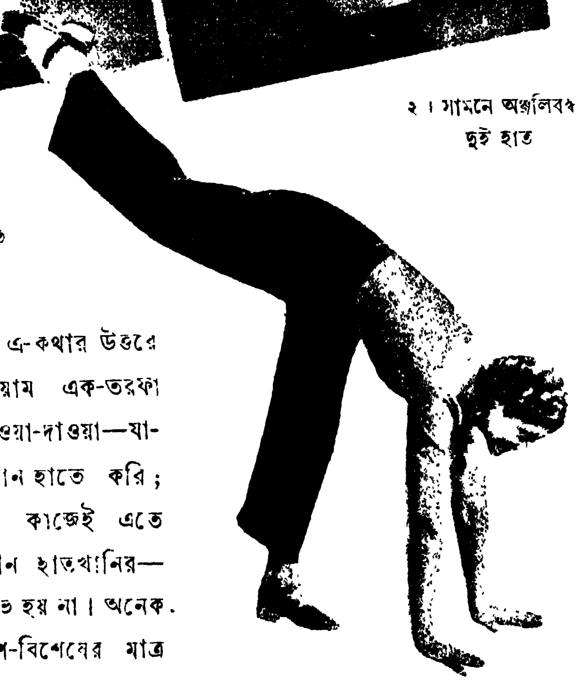
সংসারের নানা কাজে হাত দুখানিকে আমাদের ব্যবহার করতে হয়, সত্য। অনেকে বলবেন, তাতেই



১। মাথার পিছনে হাত



২। সামনে অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাত



৩। দুই হাত ও এক পায়ের উপর ভর

তো ব্যায়াম-সাধনা হচ্ছে! এ-কথার উত্তরে আমরা বলবো, এ ব্যায়াম এক-তরফা রকমের। লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া—যা-কিছু কাজ করি, আমরা ডান হাতে করি; বাঁ হাত চুপচাপ থাকে। কাজেই এতে ব্যায়াম যা হয়, তা ঐ ডান হাতখানির—তাতে ব্যায়ামের সুফল লাভ হয় না। অনেক খেলা-ধূলায় দেহের অংশ-বিশেষের মাত্র ব্যায়াম-সাধনা হয়; সে ব্যায়ামে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ ব্যায়ামের ফল পায় না বলে উপকার ঘটে না। আমাদের কাঁধ, ঘাড় ও গলার সৌন্দর্য্য বিধান করতে হ'লে এমন ব্যায়াম করা চাই, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যার তরঙ্গ লাগবে!

সাঁতার কাটা, দাঁড় টানা, বল ছুড়ে লোফালুফি করা, দোল খাওয়া—এ সবে সমস্ত দেহের ব্যায়াম-সাধন হয়। এগুলি ছাড়া যে বিশেষ ব্যায়াম-বিধি-পালনে কাঁধ, গলা আর ঘাড়ের ছাঁচ ভালো হয় এবং তার ফলে সমস্ত দেহে সৌন্দর্য্য উথলে উঠবে, সে সৌন্দর্য্য ভাঁটার টানে মিলিয়ে যাবে না, এমন ব্যায়াম-বিধির কথা এবার বলি।

সুগোল সুগঠিত কাঁধ—তার জন্য গভীর ভাবে শ্বাস-গ্রহণ কর্ত্তব্য। ১নং ছবির ভঙ্গীতে মাথার পিছনে দু'হাত রেখে সিধা খাড়া দাঁড়িয়ে দু'মিনিট কাল জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন্।

তার পর ২নং ছবির ভঙ্গীতে সামনের দিকে গলার ঠিক নীচে বুকের উপরে দু'হাত আঙুলে-আঙুলে কাঁচির মতো আবদ্ধ করে দু'মিনিট কাল জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন্। এ দু'টি ব্যায়ামে গলার ঘাড়ের টোল-খাঁজ সব সেরে ভরাট হয়ে উঠবে—নিটোল হবে।

তার পর দু'হাতের বন্ধন মুক্ত করে ৩নং ছবির ভঙ্গীতে দু'হাত এবং ডান পায়ের উপর দেহের ভর রেখে বাঁ পা উর্দ্ধে তুলুন। এই ভাবে থেকে এক দুই করে দশ সংখ্যা পর্য্যন্ত গুনুন! তার পর সহজ ভাবে সিধা খাড়া দাঁড়ান। এর পর দু'হাত এবং বাঁ পায়ের উপর দেহের ভর রেখে ডান পা উর্দ্ধে তুলে পূর্ব্ব-ব্যায়ামের ভঙ্গীতে এক থেকে দশ পর্য্যন্ত গোণা এবং গোণার পর সহজ ভাবে অবস্থান!

চার নম্বরে ৪নং ছবির মতো কাঁধের সঙ্গে সমরেখায় রেখে ছবির ভঙ্গীতে দু'হাত বাঁকিয়ে কব্জী ঘোরান্। বেশ জোরে জোরে হাত (কব্জী-ভাগ) ঘোরাতে হবে। দশ বারো বার ঘোরাবেন।

পাঁচ নম্বরের ব্যায়ামে ৫নং ছবির ভঙ্গীতে এক-বার ডান হাত তুলুন উর্দ্ধে—বাঁ হাত মুড়ে বাঁ দিককায় বুকের উপর রাখুন। এই ভাবে দু'হাত রেখে জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন তিন মিনিট; তার পর বাঁ হাত

উর্দ্ধে তুলে ডান হাত মুড়ে ডান দিককার বুকের উপর রেখে তিন মিনিট জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ।

ছয়ের পর্ব্বে ৬নং ছবির ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে উর্দ্ধে চেয়ে সিধা হয়ে দাঁড়ান। দু'হাত ঐ ছবির মতো পিছন দিকে বিলম্বিত ও পুটবদ্ধ থাকবে। এই ভাবে দাঁড়িয়ে ছ' মিনিটকাল বেশ জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবেন।

এই ক'টি ব্যায়াম-বিধি নিত্য পালন করলে দেখবেন, দেহ মজবুত থাকবে, গলা, কাঁধ বা ঘাড়ের কোথাও টোল বা খাঁজ থাকবে না। দেহের ছাঁদ নিটোল থাকবে চিরদিন।



৪। এমনি ভাবে হাত রেখে



৫। এক হাত বুকে আর হাত তুলে



৬। দু'হাত পিছনে এবং ঘাড় তুলে

মেয়েরা কি চায়?

আমরা অর্থাৎ মেয়ে-জাত কি চাই, কিসে আমাদের খুঁৎ-খুঁতুনির বিরাম হয়ে আমরা সুখে থাকি, পুরুষ-সমাজ তা জানতে চান। আমাদের মধ্যে যাঁদের ambition খুব উঁচু বা মনের গড়ন অসাধারণ-রকমের, তাঁরা কি চান, জানি না। তবে আমাদের মতো সাধারণ-অবস্থার এবং সাধারণ-শিক্ষার মেয়েরা কি চায়, একবার হাতে-কলমে তা বোঝবার চেষ্টা করছি।

কথাটা গোপন করবো না—আমাদের চেতনা-বুদ্ধি জাগ্রত হবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের সংসার এবং সমাজ দেখে-শুনে আমাদের মনে স্বপ্ন জাগে! স্বামি-পুত্র, ঘর-সংসারের স্বপ্ন! এ স্বপ্নে, এ কল্পনায় আমাদের কিশোর মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে! লেখাপড়ায় ডিগ্রী-পদক পেয়ে বা কোনো শিল্পকলায় শক্তি দেখিয়ে যাঁরা যশ-মান চান, তাঁদের মনে এ স্বপ্ন জাগে কি না, জানি না!

তবে এ-কথা যদি বলি যে, শুধু আমাদের দেশেই নয়, সকল দেশেই মেয়েদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের মন এই স্বামি-পুত্র-সংসারের স্বপ্নে বিভোর থাকে, তা হ'লে সে-কথা বোধ হয় মিথ্যা হবে না!

কিন্তু এ স্বপ্ন ঠিক সফল হয় কৈ? কাজেই নৈরাশ্য, ক্ষোভ, ব্যথা-অভিমানের ভারে মন ভরে থাকে, সংসারে সুখ-শান্তির অভাব ঘটে।

কিন্তু যা পাইনি, যা পাবার নয়,—তার জন্য এ দুঃখ, এ অভিমান লালন করে জীবনকে ক্ষোভানলে পুড়িয়ে ছাই করায় লাভ আছে কি?

আমার মনে হয়, মনের সঙ্গে যদি বোঝাপড়া করে নিতে পারি যে, যা পেয়েছি, তা' থেকেই শান্তি ও সান্ত্বনা গড়ে মনকে তৃপ্ত রাখতে হবে, তা হ'লে বোধ হয় এ দুঃখ-নৈরাশ্য আমাদের মনকে প্রপীড়িত করতে পারবে না!

পুরুষরা প্রায় বলেন,—মেয়েরা বড় অবুঝ! There is no understanding woman! অর্থাৎ মেয়েরা যুক্তি-সঙ্গতি বোঝে না; বুঝতে চায় না! এ কথাটাকেও সত্য বলে মেনে নিতে রাজী নই।

দাম্পত্য-সুখ কি শুধু টাকা-কড়ির স্বচ্ছন্দতার উপরেই নির্ভর করে? না! তা যদি করতো, তা হ'লে বাঙলার পল্লী-কুটীরে আমরা স্বামি-স্ত্রীর ত্যাগ-ভালোবাসার চিহ্ন দেখতে পেতুম না এবং সে সব সংসারের কোনো অস্তিত্ব আজ থাকতো না।

এই দাম্পত্য সুখ-শান্তির কথায় স্ত্রী-পুরুষের মনের আলোচনা করতে হয়। পুরুষের ভালোবাসা বা মোহ প্রথমে চায় আত্মতৃপ্তি। স্বামীর প্রথম প্রেম—চুম্বনে-আলিঙ্গনে সোহাগে-আদরে সার্থক পরিপূর্ণতায় নিজেকে পরিতৃপ্ত করতে চায়। মেয়েদের প্রথম প্রেমে কিন্তু দৈহিক ক্ষুধা-তৃপ্তির নামগন্ধ থাকে না। তার চোখে স্বামী তখন কল্পনায়-গড়া রাজপুত্র! শুধু রোমান্স! এজন্য মেয়েদের দিক থেকে প্রেমে এ-সময়ে অত্যুচ্ছাস জাগে না; পুরুষের প্রেম অত্যুচ্ছাসে উগ্র হয়ে ওঠে!

এবং এই উচ্ছাসের প্রাবল্যের জন্যই মেয়ে-জাতকে পুরুষ ঠিক বুঝতে পারে না। প্রথম-পরিচয়ে দু'জনে কিছু-কাল ছোটখাট মান-অভিমান চলে। সে মান-অভিমান-আঘাতের মধ্য দিয়ে কোনো দম্পতি যদি পরস্পরের মনের পরিচয় পেয়ে যান, তা হ'লে তাঁদের জীবনে অশান্তির উৎপাত বড়-একটা ঘটে না!

সংসারে প্রবেশ করবার পর পুরুষকে নানা কাজে নানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। সে মেলা-মেশায় পুরুষ কখনো আঘাত পায়, ব্যথা পায়, নৈরাশ্যে অধীর হয়; সে নৈরাশ্য-ব্যথার ফলে জগতের উপর তার বিরাগ জন্মায়, দ্বেষ জন্মায়। বেচারী স্ত্রীর উপরেও বিরক্তির বিরাম থাকে না! কাজেই বাড়ী ফিরে বহু পুরুষ বেচারী-স্ত্রীর উপর মনের সে বিরাগ-রুদ্র-রশ্মি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করেন।

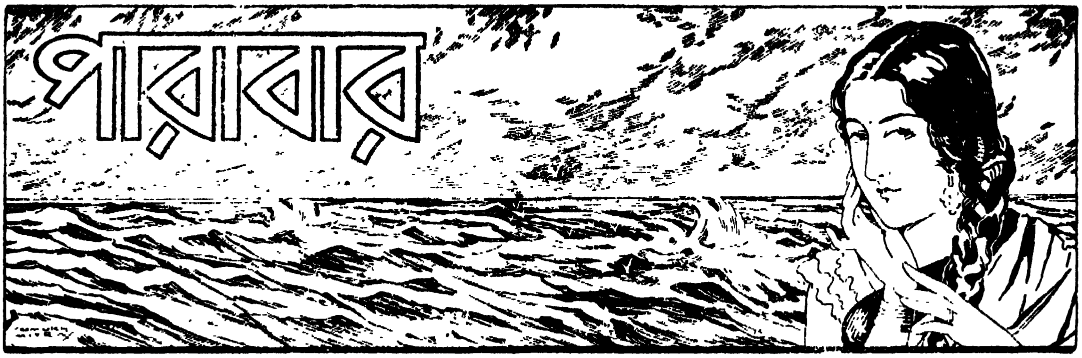
মেয়েদের মন কিন্তু এ-ধাতের নয়। সংসারে নানা ঝক্কি, জ্বালা-যাতনা সয়েও স্বামীর আদরে মেয়ে-জাত নিজেকে নিমেষে সুস্থির করে তোলে। আদরে সে জ্বালা যাতনা মেয়েরা অনায়াসে ভুলতে পারে! সংসারের জ্বালা-যাতনায় স্বামীর শান্তি-সুখ যাতে এতটুকু আহত না হয়, সে-বিষয়ে প্রাণপণে নিজেকে তারা সম্বৃত রাখে। অর্থাৎ মেয়ে-জাত যেমন নিঃশেষে নিজেকে দান করতে পারে, পুরুষ তেমন পারে না। সংসারের জ্বালা-যাতনা বা অভাবের রিপোর্ট স্বামীর মন বুঝে যথাসময়ে এমন মিনতি-ভরা কণ্ঠে মেয়েরা বিবৃত করেন, এতখানি দরদে সে রিপোর্ট পেশ করেন যে, মন থাকলে পুরুষ অনায়াসে বুঝবে, এ দরদে স্ত্রীর কতখানি ভালোবাসা, কতখানি মায়া-মমতা উৎসারিত হয়।

স্ত্রী সম্ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করবার আসবাব বা যন্ত্রমাত্র নয়! স্ত্রীর মন আছে, এ-কথা স্বামীরা যেন ভুলে না যান!

স্ত্রীর আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, বাসনা আছে, কামনা আছে,—তার সুখ আছে, দুঃখ আছে। স্ত্রীর মনের সঙ্গে মন মেলাতে হবে! দেহ নিয়েই শুধু স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়।

যে-স্বামী বলেন, স্ত্রী আমার পানে তাকান্ না, আমাকে অবহেলা করেন, অর্থাৎ তাঁর বাসনা-কামনার ইন্ধন জুগিয়ে জন্ম সার্থক মনে করেন না,—সে স্বামী যেন মনে রাখেন, তাঁর যেমন বাসনা-কামনার বা বিরাগ-অনুরাগের সময়-অসময় আছে, স্ত্রীরও তেমনি! এ কথা ভুলে গেলে স্বামীরা মস্ত অবিচার করবেন! অফিসের কাজ-কর্ম্মে স্বামী নাটাঝামটা খাচ্ছেন, তার মধ্যে বিনোদ-বেশে সেজে স্ত্রী এসে যদি বলেন, আমায় একটু আদর করো গো—তা হ'লে স্বামী বলবেন, সরো, সরো, কাজের সময় কাব্যি ভালো লাগে না! তেমনি স্ত্রীর আবেগ-ভালোবাসা-বিকাশেরও সময়-অসময় আছে, স্বামী-জাত সে কথাটুকু যেন মনে রাখেন।

অর্থাৎ মেয়ে-জাত রাজ্য-বিভব চায় না। মেয়ে-জাত চায়, স্বামী যেন তার মন বোঝেন, তার সুখ-দুঃখ বোঝেন, তাকে মানুষ বলে বোঝেন। এর বেশী প্রত্যাশা সাধারণ-মেয়ে-জাতের মনে নেই। দরদ পেলেই মেয়ে-জাত তা বুঝতে পারে! এবং স্বামীর কাছে এই দরদটুকু পেলেই তার চাইবার আর-কিছু থাকে না!



২৭

বীণার এত আশায়-রচা স্বপ্ন-প্রাসাদ যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল! কি না সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল··

ভাবিয়াছিল, গোপনতা ছাড়িয়া ছলনার এ-কথা সে প্রকাশ করিয়া বলিবে। বলিবার ফলে তার ভাগ্যে যা ঘটে, যত কঠিন দণ্ডই হোক, সে-দণ্ড সে মাথা পাতিয়া লইবে! এজন্য তাকে যদি সব ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসনে যাইতে হয়, তবু সে মনের মধ্যে এ বিষ আর চাপিয়া রাখিবে না!···

এখন ভাবিতেছিল, নিমেষের এ খেয়াল তার কেন হইয়াছিল? বেচারী! বোঝে নাই, পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে কত জটিলতা, সে-সম্পর্ক রক্ষা করিতে কত দিকে কত শৃঙ্খল বাজে!

ট্রেণ চলিয়াছে।

বার্থের গদি-মোড়া আসনে ঠেশ দিয়া বীণা বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে। দু'চোখের উপর আর্দ্র বাষ্প প্রতিক্ষণে পুঞ্জিত হইতেছে! সে ভাবিতেছে, ট্রেণ তো চলিয়া আসিল, কিন্তু শ্রীপতি?

নিশ্চয় সে দাদুর কাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। তার মতো লোকের যে কিছু বাধে না, বীণা তা বোঝে! তার এ-বলায় সেখানে কি যে এখন ঘটিতেছে ···হয় তো বৃদ্ধ তারাচরণ রায় এত বড় মিথ্যার আঘাত সহিতে না পরিয়া···

বুকের মধ্যে রাজ্যের নিশ্বাস ফুলিয়া-ফুঁশিয়া এমন হইল যে, প্রাণটা বুঝি সে-নিশ্বাসের চাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে!

স্বর্ণদ্যুতি ও-দিকে জিনিষপত্র গুছাইয়া বেডিং খুলিয়া বলিল,—একবার ওঠো, তোমার বিছানাটা পেতে দি। তার পর শুয়ে পড়ো! জানি, তোমার মন ব্যথায় ভরে আছে! শুয়ে-শুয়ে দাদুর কথা ভাবো। ভাবতে ভাবতে ঘুম আসবে'খন···

এ স্বরে কতখানি আদর···কি গভীর স্নেহ! ক'দিনে স্বর্ণদ্যুতির যে-পরিচয় বীণা পাইয়াছে···

স্বর্ণদ্যুতির কথায় বীণা উঠিল।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—দাঁড়িয়ে থাকে না! তুমি এ বার্থে বসো···

বীণা নিঃশব্দে এ আদেশ পালন করিল; বার্থে বসিল। বুঝিল, স্বর্ণদ্যুতি কার জন্য এ শয্যা বিছাইতেছে। মনে হইল, তার উচিত, নিজের হাতে শুধু তার শয্যা নয়, স্বর্ণদ্যুতির শয্যাও রচনা করা···

কিন্তু নিজের হীনতার লজ্জায়, অনধিকারিত্বের গ্লানিতে তার হাত-পা যেন নিস্পন্দ অসাড়! কথা কহিবে, সে শক্তিও যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! চুপচাপ সে সামনের বার্থে বসিয়া রহিল; এবং স্বর্ণদ্যুতি তার জন্য শয্যা রচনা করিতে লাগিল।

শয্যা বিছানো হইলে স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—শুয়ে পড়ো ···বুঝলে!

দু'চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি···বীণা আবার উঠিয়া দাঁড়াইল···

স্বর্ণদ্যুতি নিজের বিছানার ষ্ট্রাপ খুলিতে লাগিল। বীণা কোনো মতে কথা কহিল, বলিল—আমি বিছানা পেতে দি···

হাসিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—না। কাল থেকে তুমি সংসারের চার্জ্জ নিয়ো। আজ তোমার অভ্যর্থনার ভার আমার থাক্। তোমাকে এত দিনকার স্নেহ-শৃঙ্খল ছিঁড়ে দূরে নিয়ে যাচ্ছি নিজের স্বার্থে—এ তুমি যেমন বুঝছো, আমিও তেমনি বুঝছি, সলিলা···

এ-কথায় বীণার মনের ভিতরে যে-জায়গাটা গ্লানির বেদনায় একেবারে আর্ত্ত-আতুর হইয়াছিল, সে-জায়গাটা যেন মচকাইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। বীণা কোনো কথা বলিতে পারিল না। বার্থের বিছানায় নিস্পন্দ বসিয়া কামরার খোলা জানলা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

বাহিরে ঘন-ঘোর অন্ধকার। মাঝে-মাঝে আলোর চমক! আলোর ও-চমক দেখিয়া বীণা ভয়ে কাঁপিয়া ওঠে! মনে হয়, ও-আলো যেন শ্রীপতির উল্লাসের হাস্যদীপ্তি!

গাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়িল।

স্বর্ণদ্যুতির হাতে ছিল একখানা বই, বইখানা রাখিয়া সে বলিল—শুয়ে পড়া যাক···কি বলো ?

স্বর্ণদ্যুতি শুইয়া পড়িল। বীণা তেমনি বসিয়া আছে। স্বর্ণদ্যুতি বলিল—শোও, সলিলা।

বীণা বলিল—আমি পরে শোবো···

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—আমি কামরা লক্ করে দিয়েছি। রাত হয়েছে···মিথ্যে কেন জেগে বসে থাকবে ? অন্ধকারে কি-বা দেখবে ?

স্বর্ণদ্যুতি উঠিল, বীণার পাশে আসিয়া বসিল। বলিল, —বড্ড মন কেমন করছে···না ?

বীণা কোনো কথা কহিল না—চোখে জল একেবারে ছাপাইয়া উঠিল!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—এ ঘটনা সব মেয়ের জীবনে ঘটে, সলিলা। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করেছিলেন···সে তবু তপোবন থেকে রাজাধিরাজের অন্তঃপুরে মহারাণী হতে যাচ্ছিলেন! তিনিও দুঃখে-বেদনায় অভিভূত হয়েছিলেন! এর উপায় যে নেই!···শুয়ে পড়ো, লক্ষ্মীটি। বলো তো, গল্প করি ··কি বলো ?

গল্প ? বীণার পৃথিবীতে কিছু কি আর আছে··· কিসের গল্প শুনিবে সে ? তার পৃথিবী জুড়িয়া এখন শুধু ঐ এক দারুণ বিভীষিকা!

বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে বীণা কহিল—না, আমি শুচ্ছি। তুমিও শোও···

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—খুব ভালো কথা! কাল সকাল থেকে আমাদের নব-জীবন নব-জাগরণ। কাল থেকে আমাদের জীবন-নাটকের অভিনয় সুরু! সে-অভিনয় শুভ হোক, শিব হোক···

মনে মনে বীণা বলিল, তা কি হইবে ? তার জীবনের সব বুঝি শেষ হইয়া গেল!

এলাহাবাদে নিজের নীড়ে আসিয়াও বীণা প্রাণপণে মনের সঙ্গে যুঝিতে লাগিল···কোনো দিন যদি তার এ গৃহে বজ্রপাত হয়, সে-দিন যা হয় করিবে···তাই বলিয়া তার আগে বজ্রপাতের আশঙ্কা লইয়া চারি দিকে এমন অশান্তি, এতখানি দুঃখ কেন রচনা করে!

অফিসের কাজে-কর্ম্মে স্বর্ণদ্যুতিকে প্রথম প্রথম অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। তরুণ উৎসাহী লোক পাইয়া অফিসের সাহেব নানা কাজে স্বর্ণদ্যুতিকে খাটাইয়া লয়। মফঃস্বলের দু'চারিটা অফিসের হিসাবের গরমিল মিলাইয়া পরখ করিবার জন্য পাঠায়, বলে—মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ইউ উইল বী প্লীজ্‌ড টু···এ্যাণ্ড আই উড বী সো গ্রেটফুল···

মৃদু হাসিবা স্বর্ণদ্যুতি বলে,—অল্ রাইট···

স্বর্ণদ্যুতি বাহিরে যায়, বীণা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, এবারে মনের সঙ্গে ঠিক বোঝাপড়া করিয়া লইবে।

স্বর্ণদ্যুতি ফিরিয়া আসে, বীণার বুক কাঁপে! স্বর্ণদ্যুতি আসিবামাত্র মনের আগ্রহ লইয়া ছুটিয়া তার সঙ্গে গিয়া সে দেখা করিতে পারে না। ভয় হয়, কি জানি, বাহিরে কোথাও ইতিমধ্যে যদি শ্রীপতির সঙ্গে দেখা হইয়া থাকে ? যদি সে-সাক্ষাতে উঁহার কাছে বীণার সব কথা সে বলিয়া থাকে ? স্বর্ণদ্যুতি গৃহে ফিরিলে বীণা নেপথ্যান্তরালে থাকিয়া ভয়ে-ভয়ে তাকে লক্ষ্য করে! দেখে, স্বর্ণদ্যুতির মনে কোনো ভাবান্তর ? মুখ গম্ভীর···মূর্ত্তি রুক্ষ ?

যখন দেখে, তা নাই, তখন মলিন-হাসি মুখে লইয়া সে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে—আমি ও-দিকে ছিলুম···

স্বর্ণদ্যুতি তার পানে তাকায়, তাকাইয়া বলে— বিরহ-তপঃক্লিষ্টা মলিন তোমার মূর্ত্তি···

এবং কথার সঙ্গে-সঙ্গে স্বর্ণদ্যুতির আদর-উচ্ছ্বাসের সমারোহ।

সে-আদরে বীণার দুই চোখ মুদিয়া আসে···জগৎ-সংসার, শ্রীপতি-বীণা···সব ভুলিয়া মন কোন্ অদৃশ্য-লোকে উধাও হইয়া যায়।

তার পর দু'জনে ফিরিয়া আসে আবার এই কঠিন মর্ত্ত্যলোকে! তখন এই মর্ত্ত্যলোক লইয়া দু'জনে নানা কথা…

স্বর্ণদ্যুতি বলে,—দাদুর চিঠি পেয়েছো?

বীণা জবাব দেয়,—পেয়েছি…

স্বর্ণদ্যুতি বলে—কি লিখেছেন? কবে আসবেন, তার কোনো আভাস?

বীণা বলে—না। লিখেছেন, নানা কাজে সময় হচ্ছে না…যেমন একটু সময় পাবেন, অমনি এখানে আসবেন…একেবারে কোন খপর না দিয়ে!

স্বর্ণদ্যুতি বলে—হুঁ!…বিদেশে বসে তোমার কথাই ভাবতুম, সলিলা…

সলিলা-নামে বীণার বুকখানা ধড়াশ করিয়া ওঠে! মুখ আপনা হইতে আনত হয়…সে-মুখে কথা ফোটে না! মনের মধ্যে আতঙ্ক…ভয়…দ্বিধা…সংশয়!

স্বর্ণদ্যুতি বলে—কি কথা ভাবতুম, জানো?

বীণা মুখ তুলিতে পারে না…বুকের মধ্যে ফৌজে-টানা কামানের গাড়ী চলিতে থাকে!

স্বর্ণদ্যুতি বলে—মুখ তুলে আমার পানে চাও…তবে তো কথা বলবো!

বীণা মুখ তোলে…

স্বর্ণদ্যুতি বলে,—আমাকে তোমার এখনো এত লজ্জা, ওগো যৌনবতী নববধূ…

বীণা কষ্টে নিশ্বাস চাপে।

স্বর্ণদ্যুতি বলে,—বলো দিকিনি কি কথা?

কোনো মতে বীণা বলে,—কি?

নিজের কণ্ঠের এই অতি-ক্ষীণ কম্পিত স্বর শুনিয়া বীণা চমকিয়া ওঠে! এ তারি কথা না কি?

স্বর্ণদ্যুতি বলে—নিরীহ বেচারী বৃদ্ধ তারাচরণ রায়! সারা জীবন কত ব্যথা সয়ে তোমাকে পেয়ে সে-ব্যথা একটু ভুলেছিলেন…আর আমি দুর্বৃত্ত দস্যুর মতো তোমাকে তাঁর বুক থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে এলুম! ভাবি, তাঁকে যে এ-দুঃখ দিলুম, সে-জন্য আমাকে এক দিন কঠিন প্রায়শ্চিত্ত না ভোগ করতে হয়!

এ কি কথা! এ-কথা বীণার বুকে তীরের মতো বিঁধে!

স্বর্ণদ্যুতি বলে—তোমার এই মলিন মুখ…তোমার চোখের পিছনে সব-সময়ে আমি যেন জমাট অশ্রুর ছায়া দেখি।…সত্যি সলিলা, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে এখানে, দাদুর অদর্শনে…না? যাবে তুমি দাদুর কাছে?

বীণার দুই চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। বীণা বলে,—না, না, তা নয়!

স্বর্ণদ্যুতি বলে—তবে কেন তুমি এমন মলিন-মুখে থাকো?…আমি মাঝে-মাঝে চলে যাই বলে?

এ কথায় বীণা যেন অকূল সমুদ্রে কূল পায়। তাড়াতাড়ি এই কথার কূলটুকুকে আশ্রয় করিয়া বীণা বলে—হাঁ।…

কথার সঙ্গে-সঙ্গে তার দেহ দুলিয়া ওঠে…

স্বর্ণদ্যুতি তাকে দুই বাহুর বাঁধনে আবদ্ধ করিয়া বুকে চাপিয়া ধরে। স্বর্ণদ্যুতির বুকে মুখ রাখিয়া বীণা দু'চোখে অশ্রুর উৎস একেবারে খুলিয়া দেয়…

প্রায় এমন ঘটে…

সে-বার স্বর্ণদ্যুতি বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—চলো, আমরা চুনার ঘুরে আসি…তোমার পিশিমার ওখানে যাই। তিনি অত করে লিখছেন…আমরাও তাঁকে কথা দিয়েছি যখন…যাবে?

বীণা বলিল—চলো…

দু'জনে আসিল উমাঙ্গিনীর কাছে।

রেলওয়ে-কোয়ার্টার্স। পাশাপাশি ক' ঘর বাঙালী-পরিবারের বাস। সকলে মিলিয়া-মিশিয়া যেন অখণ্ড একটি সুবৃহৎ পরিবার গড়িয়া তুলিয়াছে। এক জনের গৃহে উৎসবের আয়োজন হইলে যেমন সে-উৎসবে সকলের ডাক পড়ে, তেমনি এক-পরিবারের ব্যথা-বেদনাও সকল-পরিবার সমান ভাবে বুকে তুলিয়া লয়!

দু'দিন চুনারে হাস্য-কলরবে কাটাইয়া আবার এলাহাবাদে প্রত্যাগমন।

যে-দিন চলিয়া আসিবে, উমাঙ্গিনী বলিল,—বাবা আসছেন দু-এক দিনের মধ্যে…তাঁর কি কাজ আছে এ-দিকে। আজ চিঠি পেলুম।

বীণা বলিল—চুনারে আসছেন?

—হ্যাঁ।

—একা ?

—চিঠিতে তাই লিখেছেন।

বীণার মনে হইল, একবার তিনকড়িকে পাইলে যেন ভালো হয়। ঐ তিনকড়ি গাঙ্গুলির হাত ধরিয়া সে এ-সংসারে প্রবেশ করিয়াছে! যদি এখন তিনু দাদুকে পায়, তাহা হইলে মন খুলিয়া নিজের এ-দুঃসাহসের কথা, এ-অনধিকারের কথা, বুকে এই যে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে—সে-সব কথা সে খুলিয়া বলে বলিয়া পরামর্শ চায়, বীণা এখন কি করিবে ?

আর সে পারে না! এত স্নেহ, এত প্রীতি-ভালোবাসা...নিজের হীনতায় প্রতিক্ষণে মন যা হইয়া আছে...না পারে কিছু দিতে! না পারে কারো কাছ হইতে কিছু লইতে! স্নেহ-পারাবারের তীরে বসিয়াও তার মন যেন দুঃখী-কাঙালের অধম হইয়া আছে...

মনে হইতেছে, যাঁকে তার এ দুঃসাহসিকতা এতটুকু আঘাত দেয় নাই, এমন দরদী বন্ধু পাইলে তার কাছে সব কথা বলিয়া আশ্রয় চাহিবে...তাঁর কাছে কাঁদিতে পাইলে বীণা যেন বাঁচিয়া যাইবে!

যে চরম দুর্দ্দিনের আশঙ্কা সর্ব্বক্ষণ সমুদ্যত রহিয়াছে, সে দুর্দ্দিন সমাগত হইলে কোথায় কার মুখ চাহিয়া সে দাঁড়াইবে ? কে বুঝিবে, ঐশ্বর্য্যের লোভে, বিলাসের লালসায় বীণা এত-বড় পাপ করে নাই ?

২৮

আরো দু'তিন মাস পরের কথা।

মনকে বীণা অনেকখানি শান্ত করিয়া আনিয়াছে। এত দিনেও যখন তার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের বিন্দু উদয় হয় নাই, তখন মনে হয়, শ্রীপতি হয় তো ভয় পাইয়া সরিয়া গিয়াছে...হয় তো তার মনে করুণার সঞ্চার হইয়াছে...হয় তো শ্রীপতি ভাবিয়াছে, নূতন-জীবনে যদি বীণা সুখী হইয়া থাকে, তার সে-সুখে নাই বা বাদ সাধিলাম!

শয়নে-স্বপনে সে ঠাকুর-দেবতার পায়ে মিনতি জানায়—ঠাকুর, শ্রীপতির মনে দয়া-মায়া সঞ্চারিত করো...তাকে সুবুদ্ধি দাও, ঠাকুর!

কিন্তু এমন করিয়া বাঁচাও যায় না! ইহার চেয়ে সত্য প্রকাশ হোক, এবং তার ফলে দণ্ডমুণ্ড বা মার্জ্জনা...যা হয় একটা ফয়শালা হোক! তাহাতে যেন ঢের শান্তি, অনেকখানি স্বস্তি!

দাদু চিঠি লেখেন। সে-চিঠিতে বীণার জন্য তেমনি অধীর আবেগ...'সলিলা-দিদিকে দেখিবার জন্য মনে কতখানি ব্যাকুলতা'...তার পর নানা কারণে আসিতে গিয়াও আসা হইতেছে না বলিয়া দুঃখ-প্রকাশ!

বীণা ভাবে, সে যেন সেই কবিতায়-পড়া পদ্মপত্রে জলের বিন্দু! কখন ঝরিয়া পড়িবে, ঠিক নাই!

এ-জন্য কতবার তার মনে হইয়াছে, আজ নয়...কাল...কাল নিশ্চয় স্বর্ণদ্যুতির কাছে সব কথা খুলিয়া বলিবে! এত ভালোবাসা...সে-ভালোবাসা গড়িয়া উঠিয়াছে কি তারাচরণ রায়ের দৌহিত্রীকে লইয়া ? তার নিজের কিছু নাই...যা দিয়া স্বর্ণদ্যুতির এ-ভালোবাসাকে সে ধরিয়া রাখিতে পারে ? স্বর্ণদ্যুতি কি তাকে ভালোবাসে তার এই তারাচরণের দৌহিত্রী-পরিচয়ে ? যদি তাই হয়, তাহা হইলে ছদ্মাবরণে এ-ভালোবাসা নাই বা রহিল! সে বীণা...বীণা বলিয়া স্বর্ণদ্যুতি যদি তাকে ভালো না বাসে, তাহা হইলে এ-ভালোবাসার কোন দাম নাই! চোর সাজিয়া এ-ভালোবাসা সে আর চায় না!

দিনের আলোয় স্নান সারিয়া মনে-মনে কত দিন সঙ্কল্প করিয়া সে নিজের কথা বলিবে বলিয়া স্বর্ণদ্যুতির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! স্নান করিতে করিতে মনে-মনে কতবার ঠিক করিয়া লইয়াছে, কোন্‌খান হইতে সুরু করিয়া এ কাহিনী কি করিয়া খুলিয়া বলিবে...কিন্তু বলিতে আসিয়া বলিতে পারে নাই! নানা কারণে বলা হয় নাই...

কোনো দিন দেখিয়াছে, স্বর্ণদ্যুতির আদরের অত্যুচ্ছ্বাস...কোনো দিন বা স্বর্ণদ্যুতি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়াছে!

বীণার মনে হইয়াছে, বাঁচিয়া গিয়াছে! একটা দিন আরো প্রাণটা তবে রহিয়া গেল!

সে-দিন অফিস হইতে ছুটো-বেলায় বাড়ী ফিরিয়া স্বর্ণদ্যুতি ডাকিল—সলিলা...

নিজের ঘরে বীণা চুপ করিয়া বসিয়াছিল...

স্বর্ণদ্যুতির আহ্বানে চমকিয়া উঠিল। এ সময়ে তো উনি বাড়ী আসেন না! হঠাৎ আজ…

শ্রীপতি আসিয়াছে না কি?

বীণা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল! উঠিতে গিয়া উঠিতে পারিল না।

স্বর্ণদ্যুতি এ-ঘরে আসিল, বলিল,—বসে আছো যে। অসুখ করেছে না কি?

মলিন হাস্যে বীণা কহিল,—না…

—তবে?

বীণা কোনো জবাব দিল না।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—হঠাৎ এ সময় বাড়ী এলুম, তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছো…না?…

বীণা এ-কথারো জবাব দিল না…মলিন দৃষ্টিতে স্বর্ণদ্যুতির পানে চাহিয়া রহিল।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—দুঃসংবাদ আছে…

দুঃসংবাদ! বীণার বুকে যেন বাজ পড়িল! মনে হইল, আমি জানি…জানি…এ দুঃসংবাদের ভয়ে আজ ক'মাস কি করিয়া আমার রাত্রি-দিন কাটিতেছে!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—কিন্তু জানো তো, যে-মেঘ বন্যা আনে, সেই মেঘই আবার পৃথিবীকে শস্যশ্যামল করে! তেমনি এ দুঃসংবাদের পিছনে আছে মনোহর ইঙ্গিত!

বীণার মূক মৌন দৃষ্টি…

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—আজই আমাকে একটা স্পেশ্যাল এন্‌গেজমেণ্টে দিল্লী যেতে হবে, এনকোয়ারির জন্য। তার পর এ কাজে যদি এফিসিয়েন্সি দেখাতে পারি, তা হ'লে দিল্লীতে বদলি হবো…ভালো গ্রেড পাবো!…যাকে বলে, stepping stone to success…

এ কথার কি জবাব দিবে, বীণা খুঁজিয়া পাইল না। বোঝে…স্বামীর উন্নতিতে, স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর কতখানি সম্পদ-সৌভাগ্য…

কিন্তু মনে-প্রাণে এ কথাটা আজো সে গ্রহণ করিতে পারিল না। কি করিয়া পারিবে? মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ… আগে মনে হইত, বিবাহ হইয়া গেলে কোনো দুর্ভাগ্যের ভয় থাকিবে না! মনে হইত, স্বামীর ভালোবাসা পাইয়াছি, স্ত্রী…শ্রীপতিকে কিসের ভয়? বিবাহ তো মিথ্যা হইবে না! এখন মনে হয়, এ ভালোবাসা যদি নিজের দাবীতে পাইত তবেই শুধু…নহিলে, এ যেন সেই সলিলার উপর ভালোবাসা…সে বীণা বলিয়া লোকে তাকে ভালোবাসে না! যে-দিন সকলে জানিবে, সে সলিলা নয়, বীণা,—সে-দিন এ ভালোবাসা আকাশ-কুসুমের মালার মতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—অফিসের সাহেব কি বললে, জানো? বললে, তোমাদের দেশে কথা আছে, স্ত্রী-ভাগ্যে সম্পদ! তোমার নূতন স্ত্রীর ভাগ্যে তোমার উপর কর্ত্তৃপক্ষের এমন সু-নজর পড়িয়াছে…এই স্ত্রীর ভাগ্যে তুমি এক দিন বড় অফিসার হইবে!

কথাটা বলিয়া স্বর্ণদ্যুতি আবেগাতিশয্যে বীণাকে বক্ষ-লগ্ন করিয়া তার সলজ্জ অধরে…

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—তুমি বলবে, আমি স্বার্থপর… তোমাকে এখানে এনে একা রেখে দিব্যি মজা করে বেড়াচ্ছি! আমারো কষ্ট হচ্ছে, সত্যি! একবার ভাবছি, তোমায় যদি সঙ্গে নিয়ে যাই! আবার মনে হয়, আমি ঘুরে বেড়াবো, সেখানেও তুমি সেই একা থাকবে! তার চেয়ে এখানে তোমার ঘর, তোমার সংসার…এইখানেই থাকো! এখানে দু'জনের সুখের মধুময় স্মৃতি…এ স্মৃতি-কুঞ্জে তবু একটু আরাম পাবে তুমি! রোজ একখানা করে চিঠি লিখবো…সত্যি। তুমিও লিখবে। যা মনে আসে, লিখবে…বুঝলে! যদি ছাখো, সামনের ঐ গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে, তাও লিখো। তোমার সে-লেখায় তোমাকে আমি কাছে-কাছে পাবো, বুঝলে!

মাথা নাড়িয়া মৃদু হাস্যে বীণা জানাইল, বুঝিয়াছে!

তার পর বাঁধা-ছাঁদা যাত্রার আয়োজন। অফিসের আর্দ্দালী আসিয়াছিল…

বীণা বলিল—এখান থেকে মংরুকে তুমি নিয়ে যাও… তোমার কাজকর্ম্ম করবে।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—না, না…মংরু এখানে তোমার মস্ত সহায় থাকবে। ওকে নিয়ে গেলে তোমার অসুবিধা হবে।

বীণা বলিল—আমার কিসের অসুবিধা?

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—আমার কি ভাবনা হয়, জানো?

যদি তোমার অসুখ-বিসুখ হয় ? সত্যি সলিলা, ঐটেই আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা…

বীণা বলিল—এত দিন আছি, কোনো দিন আমার মাথা ধরেছে দেখেছো ?

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—তা ধরেনি…কিন্তু কোনো দিন মাথা ধরেনি বলে দু'দিন পরে মাথা ধরবে না, এ সম্বন্ধে কোনো গ্যারান্টি আছে ? বিশেষ যখন জানি, মাথা থাকলে সে-মাথা ধরে…

বীণা বলিল—ভয় নেই ! আমার এ মাথা খুব শক্ত… এ মাথা ধরবে না…কোনো দিন না…

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—না ধরলেই মঙ্গল ! যদি বেশ সুস্থ থাকো…তা হ'লে তোমার জন্য এমন উপহার নিয়ে আসবো যে, সে-উপহার পেয়ে খুব খুশী হবে…

বীণা এ কথার জবাব দিল না। এ প্রীতি, এ ভালো-বাসা সে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল…

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—কি উপহার…শুনতে চাইছো না যে ?

বীণা কহিল,—না…

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আগে থেকে না শোনাই ভালো। শোনা থাকলে আগ্রহ থাকে না এবং আগ্রহ না থাকলে পাবার অনেকখানি আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।… চলো, আমায় কিছু খেতে দেবে।…তোমায় বিদায়-সম্ভাষণ করে একবার অফিস যেতে হবে…তার পর সেখান থেকে উপদেশ নিয়ে ষ্টেশন-যাত্রা !…তুমিও এ-দিক থেকে ষ্টেশনে যাবে…আমায় বিদায় দিতে…

বীণা বলিল,—চলো…তুমি খাবে…

সামান্য লাঞ্চ খাইয়া স্বর্ণদ্যুতি বাহির হইয়া গেল। মংরুকে বলিয়া গেল,—অফিস থেকে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো…সে-গাড়ীতে তোর বৌমাকে নিয়ে তুই ষ্টেশনে যাবি…বুঝলি, পাঁচটায় আমার ট্রেন…

পাশের বাঙলোয় থাকেন সরকারী উকিল আলম সাহেব। আলম সাহেবের স্ত্রী রাবেয়ার সঙ্গে বীণার আলাপ হইয়াছে। বীণাকে রাবেয়া বলিয়াছিল, সেতার শিখাইতে হইবে। বীণা বলিয়াছিল, শিখাইব।

তার পর দু'জনের আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই।

রাবেয়াকে ধরিয়া আলম নিত্য দুপুরবেলায় পাঠায় ইশলামিয়া গার্লস স্কুলে টীচারী করিতে। আলম সাহেব বলেন—আমাদের মেয়েরা বড় পিছাইয়া আছে। তাদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করার কাজে সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিতা মহিলার কর্ত্তব্য !

স্কুলে দু'চার জন পুরুষ-শিক্ষক ছিল বলিয়া অনেকে আবরু ভাঙ্গিবার ভয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠাইত না—অথচ টীচারী করিবার মতো মুসলমান-মহিলার অভাব। এ অভাব পূরণ করিবার বাসনায় আলম সাহেবের মতো ক'জন ভদ্রলোক কোমর বাঁধিয়াছেন ?

সে-দিন স্কুলে হাফ-হলিডে হইয়া গেল। রাবেয়া বিবি ছুটীর পর বাড়ী না গিয়া একেবারে বীণার গৃহে আসিল। বীণা একা বসিয়া দাদুকে চিঠি লিখিতেছিল। লিখিতেছিল,—

শ্রীচরণেষু

দাদু

ক'মাস হইয়া গেল আপনি একটিবারও এখানে আসিলেন না। আমার জন্য মন কেমন করে না বুঝি ? মনে হয়, আপদ বিদায় হইয়াছে ! আমি নাই বলিয়া খুব আরামে আছো—না ?

মাঝে মাঝে চিঠি লিখিয়া আমার খপর লইয়া ভাবো, ইহার বেশী আর কি চাই ? না ?

আমার কিন্তু আপনার জন্য মন সর্ব্বদা আকুল হইয়া আছে। রোজ সকালে মনে হয় আজ দাদু আসিবেন। কিন্তু আসেন না। ক'বার লিখিলেন, শীঘ্র এবার এলাহাবাদে যাইব। সে শীঘ্র ক' বছর পরে……

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছে, এমন সময় মনের উপরে সেই শ্রীপতি ! কে জানে, হয় তো শ্রীপতির মুখে তার পরিচয় শুনিয়া দাদু এখানে আসিবার কল্পনা ত্যাগ করিয়াছেন ! দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন, বিবাহ দিয়াছেন ! সে জন্য মাঝে-মাঝে চিঠি না লিখিলে দুঃখ পাইবে, তাই হয় তো চিঠি-লেখা বন্ধ করেন নাই !

মনে পড়িল, এক দিন সেই মনের ঝোঁকে বীণা বলিয়াছিল, যদি আমি সলিলা না হয়ে আর কেউ হই, তা হ'লেও আমাকে ভালোবাসবে, দাদু ?

ভয়ে-ভয়ে এ প্রশ্ন করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, উত্তরে হয় তো বুকের উপর বজ্রাঘাত…কিম্বা…

কি কারণে এ প্রশ্নের উত্তর দিবার মতো অবসর দাদুর মিলে নাই ! তার পর এ প্রশ্ন করিবার সাহসও বীণার মনে আর কখনো জাগে নাই !

কোনো দিন হয় তো আর জাগিত না ! শ্রীপতির চিঠি পাইবার পর ক'দিন কি ভয়ে দিন কাটিয়াছে···তার পর এ প্রশ্ন মনের উপর হইতে মিলাইয়া যাইতেছিল ! হয় তো আর উঠিত না—যদি না সে-দিন ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে ··

এমনি চিন্তার মধ্যে রাবেয়ার কণ্ঠ শুনা গেল,—মেম-সাহেব বাড়ী আছেন, দাই ?

দাসীকে ডাকিয়া প্রশ্ন ··

বীণা উঠিয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিল। কহিল—আপনি ! আসুন···

রাবেয়া বলিল—ক'দিন আসবো-আসবো মনে করছি, কিছুতেই সময় হয় না।···মিষ্টার রায় এখানে নেই ?

বীণা বলিল—না। দিল্লী গেছেন।

রাবেয়া বলিল,—এলুম···সেতার নিয়ে আপনার বসবার একটু সুবিধা হবে ?

—হবে।

বীণা যেন বাঁচিয়া গেল ! এক জন সঙ্গিনী ! একটা কাজ ! নহিলে একা থাকিয়া-থাকিয়া ভয়ে-ভাবনায় তার মন যেন মরিতে বসিয়াছে !

বীণা সেতার বাহির করিল···

একটা, দুটা, বহু রাগিণীর আলাপে অতিথিকে তৃপ্ত করিল !

বেলা প্রায় পাঁচটা···রাবেয়া বলিল,—চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি দু'জনে।···সেই যমুনার ধার অবধি। চমৎকার জায়গা ! গেছেন কখনো ?

বীণা কহিল—দু'-চারবার গেছি···

রাবেয়া বলিল—চলুন, আজ চাঁদ উঠবে···দিব্যি জ্যোৎস্না-রাত্রি !

বীণা বলিল—বেশ···

রাবেয়া কহিল—তৈরী হয়ে নিন। আমি বাড়ী গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে আসি। আপনার এখানে খাওয়া-দাওয়া তো হলো বেশ !

হাসিয়া রাবেয়া বাড়ী গেল···

তার পর যমুনার ধার ঘুরিয়া দু'জনে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি ন'টা বাজিয়াছে।

বীণাকে গৃহে নামাইয়া দিয়া রাবেয়া গৃহে ফিরিল; বলিয়া গেল—সামনের রবিবারে আবার আসবো···খুব জ্বালাতন করবো। সে-দিন আমাকে সেতারের বিদ্যায় দীক্ষা দিতে হবে···

হাসিয়া বীণা বলিল—সেতারে আমার যা বিদ্যে !

রাবেয়া বলিল—ভয় নেই ! আমাকে সে-বিদ্যা শিখিয়ে দিলে গুরুমারা বিদ্যা আমার হবে না !

রাবেয়ার গাড়ী চলিয়া গেল।

বীণা দোতলায় আসিল।

দেউকী-দাই আসিয়া বলিল,—কলকাতা থেকে তোমার মামাবাবু এসেছেন, বৌদিদি···

দেউকী বেশ বাংলা বলে।

দেউকীর কথায় বীণা চমকিয়া উঠিল ! মামাবাবু ? মামাবাবু আবার কে ?

বীণা বলিল,—কে মামাবাবু রে ? নাম বলেছে ?

দেউকী বলিল,—না···বাঙালী বাবু। বললেন, তোমাদের বৌমার মামাবাবু হই। বললেন, জামাইবাবু কোথায় ? হামি বনু—দেহাতে গেছেন।···বললেন, তোমার বৌদিদি ? হামি বনু—বেড়াতে গেছেন ! বললেন, কখন আসবেন ? বনু—সাত-আট বাজ্‌লে। তা বললেন, বেশ, আমি ঠাকুর-দর্শন করে রাত্রে আসবো। এখানে খাবেন, থাকবেন, বলে গেছেন।—একটা ছোট টাঙ্ক রেখে গেছেন···

বীণার চোখের সামনে আবার এক-রাশ অন্ধকার !

মামাবাবু ! কে মামাবাবু ?

রাবেয়ার সঙ্গে গল্পে-স্বল্পে মনটা বেশ স্বচ্ছ হালকা হইয়াছিল···এ-কথায় সে-মনে আবার সেই পাহাড়ের বোঝা ! ভাবিল, কে জানে, হয় তো সলিলার মামা··· কাছে কোথাও ছিলেন ! সে-মামা পশ্চিমে আজ এই জামাতার সংবাদ পাইয়া আত্মীয়তা করিতে আসিয়াছেন ! যদি তাই হয় ?

ভাবিল, এ আবার কি নূতন বিপদ, ঠাকুর !

দেউকী বলিল—তোমার খাবার দিতে বলি, বৌদিদি ?

অন্যমনস্ক ভাবে বীণা বলিল,—বলো···

দেউকী গেল তেওয়ারীকে খাবারের কথা বলিতে···

বীণা নিজের ঘরে প্রবেশ করিল···আতঙ্কে মন ভরিয়া উঠিল। [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।



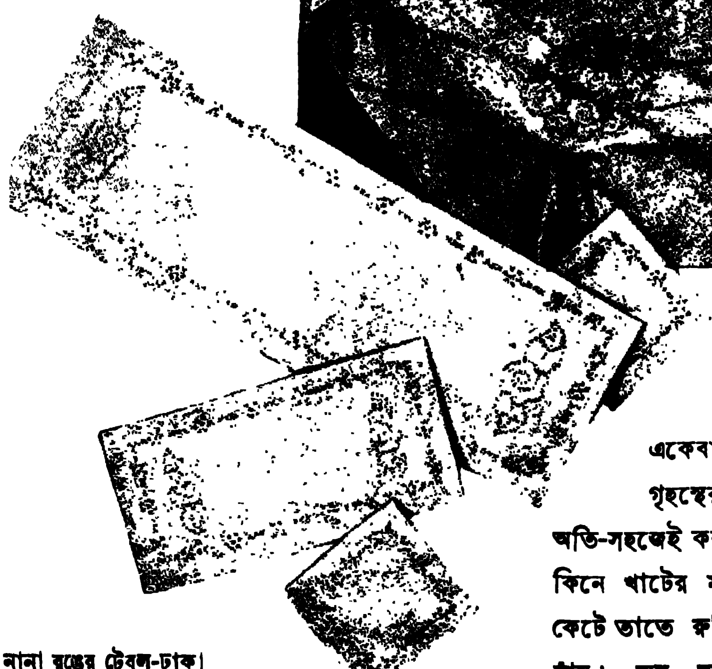
ক্রশ-ষ্টিচ

ক্রশ-ষ্টিচ (অর্থাৎ যে সেলাই দিয়ে আমরা কার্পেট বুনি) সেলাইটি আমরা খুব সোজা ভেবে প্রায় অবজ্ঞা করি। কিন্তু এই সোজা সেলাই-টির সাহায্যে কত সহজে কত প্রয়োজনীয় জিনিষ যে কি রকম সুশ্রী করে তোলা যায়, তা বলবার নয়! এবারে তাই বিশেষ করে ক্রশ-ষ্টিচের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

গৃহস্থের ব্যয়ের তালিকায় বিছানা-ঢাকা পর্দ্দা ইত্যাদির জন্য বেশ একটু মোটা-রকম খরচের ইঙ্গিত থাকে। অথচ এখনকার দিনে এগুলোকে



বিছানা-ঢাকা



নানা রঙের টেবল্-ঢাকা

একেবারে বাদ দিতে রুচিসম্পন্ন কোনো গৃহস্থেরই মন উঠবে না। এ সমস্যার সমাধান অতি-সহজেই করা যায়—যদি সাদা লংক্লথ বা অন্য থান কিনে খাটের মাপে এবং জানলা-দরজার মাপে কাপড় কেটে তাতে রুচিসম্মত চিত্র-বিচিত্র নক্সা তুলে নেওয়া যায়। অল্প আয়াসে করা যাবে, এমন সুশ্রী সেলাই

যত আছে, তার মধ্যে ক্রশ-ষ্টিচের প্রতিপত্তি বড় কম নয়।

ক্রশ-ষ্টিচ দিয়ে কত অল্প-আয়াসে কত সুন্দর করে তোলা যায় সাদা কাপড়ের টুকরো, তা এই সঙ্গের ছবিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন।

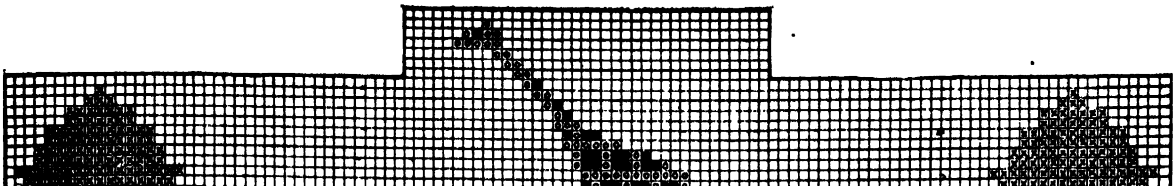
আগের পৃষ্ঠায় যে বিছানা-ঢাকাটি দেখছেন, এর উপরকার সমস্ত নক্সাটুকুই ক্রশ-ষ্টিচে করা হয়েছে। এমন নয় যে, আপনার বিছানার ঢাকার ওপরে ঠিক এই নক্সাটিই করতে হবে। এজন্য যে-কোন কার্পেট-বইয়ের পছন্দসই নক্সা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু নক্সাটি কাপড়ে তোলবার আগে—যেখানে নক্সা তুলবেন, সেইখানে এক-টুকরো কার্পেট বা ক্যানভাস আটকে নেবেন; চার-ধার সেলাই করে তার পর সেই কার্পেটের টুকরোর ওপর পছন্দ-মত নক্সাটি করে যাবেন ঘর গুণে গুণে—যেমন-ভাবে কার্পেট বোনেন। সমস্ত নক্সাটি তোলা হ'লে কার্পেটের টুকরোর চার-পাশে যে-সেলাই দিয়েছিলেন, সেটাকে কাপড়ে আটকে রাখবার জন্য—সেই সেলাইটা কেটে ফেলবেন। এখন একটি-একটি করে কার্পেটের সুতোগুলি (অর্থাৎ যা-দিয়ে কার্পেটটি তৈরী) টেনে নিন—বোনা নক্সার সুতোগুলো হয় তো এ-টানাটানিতে অল্প ঢিলে হয়ে যেতে পারে—কিন্তু কার্পেটের সমস্ত সুতো খোলা হয়ে গেলে যদি নক্সাটির ওপর অল্প-গরম ইস্ত্রী চালিয়ে দেন, তা হ'লেই সুতো আবার যথাস্থানে চেপে বসবে।

বিছানা-ঢাকার পাশে যে টুকরো-টুকরো নক্সা-কাটা কাপড় রয়েছে, সে-গুলো ড্রেসিং-টেবলের ঢাকা। গৃহিণীরা সাধারণতঃ সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকেন ড্রেসিং-টেবলের ওপরকার বা ছোট আলমারির মাথার পালিশ চটে যাবার ভয়ে। একটু কষ্ট করে যদি তাঁরা সিরিয়ান্ ক্যানভাস বা ঐ রকম মোটা-ধরণের কোন কাপড়ের টুকরোর ওপর (ছবির মতো) সহজসাধ্য নক্সা তুলে নেন—চমৎকার টেবল-ঢাকা, আলমারীর ঢাকা তৈরী হবে। যে-কোন রঙের কাপড়ের ওপর যে-কোন রঙের সুতো দিয়ে পছন্দসই নক্সা তুলতে পারেন। এ নক্সা তোলায় কোন হাঙ্গামা বা বালাই নেই! ঘর গুণে গুণে যে-কোন নক্সা তুলে নিতে পারেন। আঁকতে-না-জানার জন্য অনেকে অনেক অসুবিধা ভোগ করেন—এ-ক্ষেত্রে সে-অসুবিধা ঘটার কোন কারণ নেই। তা ছাড়া পর্দ্দার ওপরে করার জন্যও দুটো নক্সা দেওয়া হলো।

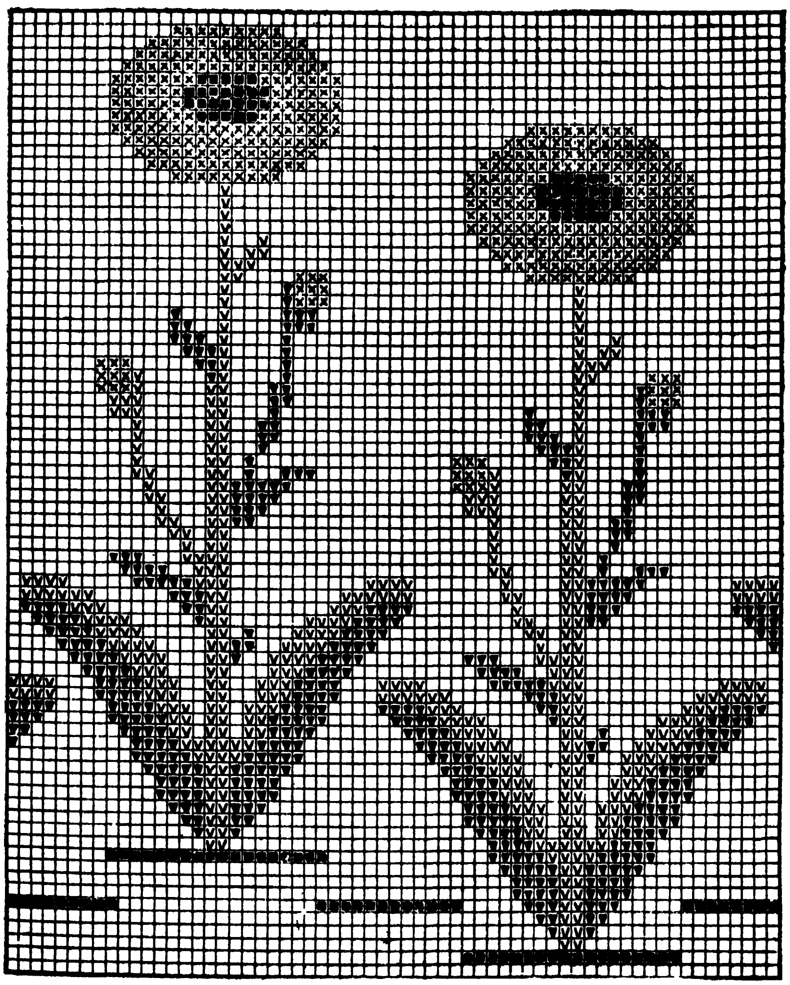


নক্সাদার পর্দ্দা ও কুশন

প্রথম নক্সাটি অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ারের সারি-দেওয়াটি বেশ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করবে। পর্দ্দাটি করার পক্ষে সব চাইতে উপযোগী কাপড় হবে এমব্রয়ডারী-ক্যানভাস। ডুনডোনিয়া (Dundonia) এমব্রয়ডারী-ক্যানভাস বলে এক-রকম মোটা ধরণের কাপড় পাওয়া যায়—তার রঙ বিস্কুটের মত; এই রঙের কার্পেটে ঘরের পর ঘর গুণে গুণে নক্সাটি তুলতে পারলে দেখতে ভালোই হবে।



পর্দ্দার প্যাটার্ণের ব্যাখ্যা



ফুল-পাতার প্যাটার্ণ

সুতোর না-করে যদি চার-খেই (4 ply) উলে কাজটি করেন, তা হ'লে দেখতে আরো ভালো হবে। রঙের নির্দ্দেশ এইখানে দেওয়া হলো :—জিরাফটি করবেন গাঢ় (সোণালী) হলদে উলে আর মাঝে-মাঝে নক্সার যে-সব ঘর কালো রঙে চিহ্নিত, সেই সব জায়গা ফিকে ব্রাউন রঙের ক্রশ-ষ্টিচ দেবেন। চিতা-বাঘটি, অর্থাৎ জিরাফের পিছনের জানোয়ারটি (গোল্ডেন ব্রাউন অর্থাৎ) সোণালী ধরণের বাদামী রঙে করবেন; আর গায়ের ছাপগুলো (যেখানটা কালো রঙে চিহ্নিত) বোজাতে গাঢ় বাদামী-রঙের উল ব্যবহার করবেন। জিরাফের সামনের বাঘটি গাঢ় বাদামী আর বিস্কুট রঙের উলে করবেন। কালো-চিহ্নিত ঘরগুলি বাদামী রঙে করবেন আর বাকীটা ফিকে রঙে। গাছগুলির পাতার জন্য সবুজ (ফিকে কিম্বা গাঢ়) উল, আর ডালটির জন্যে বাদামী রঙ ব্যবহার করবেন। জানোয়ার-দের পায়ের কাছের লাইনটি যে ঘাস-জমি, তা বোঝাবার জন্য ফিকে সবুজ উল ব্যবহার করবেন। বলা বাহুল্য, সমস্ত নক্সাটি ক্রশ-ষ্টিচে করতে হবে। তবে আপনি যে-পরিমাণ

খড় করতে চান, তার ওপর নির্ভর করবে আপনার ষ্টিচের আয়তন। সেই হিসেবে আপনি প্লেন ক্রশ-ষ্টিচ, ডবল্ ক্রশ-ষ্টিচ, বা ট্রেবল্ · ক্রশ-ষ্টিচ দিয়ে নক্সাটি বাড়াতে পারেন। (এ সম্পর্কে পুরোনো বসুমতী দেখে নিতে পারেন)। কুশনটি করবার জন্য ১৭×১৪ ইঞ্চির এক-টুকরো এমব্রয়ডারী কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে। একই নিয়মে নক্সাটি বুনতে হবে—কেবল কুশনটি হয়ে গেলে ঝলমলে সবুজ রঙের একটি 'ব্রেড' (পাকানো দড়ির মতো; যেখানে উল কিনবেন, সেইখানেই পাবেন) কুশনের চারি ধারে, ঠিক জোড়ের মুখে সেলাই করে দেবেন।

পর্দ্দার ওপর করার জন্য যে দ্বিতীয় নক্সাটি দেওয়া হয়েছে, তার রঙের নির্দ্দেশ দিয়ে দিলেই আপনাদের সব অসুবিধা দূর হবে এটি করার পক্ষে। কেন না, কাপড়ের মাপ, নক্সাটির আয়তন সম্বন্ধে সঠিক কোন নির্দ্দেশ দিয়ে কোনো লাভ নেই! নিজেদের প্রয়োজনানুসারে আপনারা তার মাপ ঠিক করবেন।

রঙের নির্দ্দেশ

X = ফিকে কমলালেবু

+ = গাঢ় লাল্‌চে ধরণের কমলালেবু

V = ফিকে সবুজ

♥ = গাঢ় সবুজ

ইতিহ আমার

হে মহা আকাশ, হে বিরাট ব্যোম,
আমারে কি গেছ ভুলে?
তুমি লিখিয়াছ মোর ইতিহাস
মরণ-মোহানা-কূলে।

লক্ষ তারার বক্ষ-ব্যথায় লিখেছো সে ইতিহাস
যুগান্তরের রক্ত-আখর দাঁড়ায়ে রুদ্ধ শ্বাস।
ম্যারাথন আর থার্ম্মপলির বীর্য্য-দৃপ্ত হিয়া,
মোর প্রাণে আজো নবীন ছন্দে উঠেছে হুঙ্কারিয়া।

আমার রক্তে সিন্ধু নদীতে লাল হয়ে গেছে জল।
তবু উঠেছিল বিজয়ের কোলাহল।
সে দিন আর্য্য জিনিল ভারত শক হূণেদের দলি,
হে মহা আকাশ, সে কাহিনী আজ সকলি গিয়াছ ভুলি?

লক্ষ বছর উঠাও তোমার মন্থর যবনিকা,
নয়ন মেলিয়া দেখিবারে চাই কি আছে উহাতে লিখা,
মোর ধমনীতে বহে কি রুধির
মৈত্রেয়ী, খনা, অরুন্ধতীর?
আমার ললাটে আজো কি রাজিছে জ্ঞান-রাজসূয়-টীকা।

সাম-মুখরিত তপোবন 'পরে পর্ণকুটীর মাঝে,
আমি কি রচিনি প্রেমের অর্ঘ্য জড়িত সরম লাজে?
ঋষিবালা যবে তরু আলবালে জল সেচিবার ফাঁকে,
আঁচল জড়ায়ে আম্রশাখায় প্রিয় সখীজনে ডাকে—
"খুলে দে সজনী আঁচল আমার পায়ে কুশ গেছে ফুটি"
ছলে বার বার নেহারে রাজারে উৎসুক আঁখি দু'টি!
আমি ছিনু তারি পাশে,
আজো সে কাহিনী প্রোজ্জ্বল মোর সুপ্ত চিত্তাকাশে।
জ্যোৎস্না নিশীথে যমুনার তীরে ক্ষীণ বালুরেখা আঁকা,
দিগন্ত-পারে শ্যামল বনানী আবছায়া যায় দেখা।
তারি মাঝে আমি বাজায়েছি বসি সুর-মৃত্তিকা বেণু!
যূথি চম্পক রেণু;
অধীর গন্ধে অন্ধ আবেগে লুটিয়াছে সঙ্গীতে,
বসুধা-বক্ষে লভেছে বিরাম অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে।

হে মহা আকাশ, মোর ইতিহাস
চির-আমি দিয়া ভরা।
চির-কৈশোর, চির-যৌবন,
জন্ম, মৃত্যু, জরা।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

গত এক মাসে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিক ঘটনা সংঘটিত হইলেও সামরিক ঘটনার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প। আফ্রিকার রণক্ষেত্রে বৃটিশ বাহিনীর সাফল্য এবং আল্‌বেনিয়ায় গ্রীক্‌দিগের ইটালীয় বাহিনীর প্রতিরোধ-প্রয়াস —ইহাতেই সামরিক ঘটনাবলী নিবদ্ধ। সম্প্রতি কূটনীতিক চাঞ্চল্যের জন্ম সুদূর প্রাচীকে কেন্দ্র করিয়া গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছিল; উহা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইবার পর বর্ত্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপের কূটনীতিক-গগন ঝঞ্ঝালোড়িত হইতেছে। আজ সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি ঐ অঞ্চলের ত্রিকোণ ভূমিতে নিবদ্ধ।

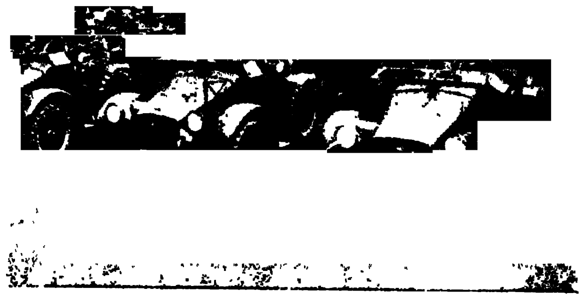
বল্‌কানে চাঞ্চল্য—

গত সেপ্‌টেম্বর মাসে রুমানিয়ায় রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিবার পর হইতে ঐ রাজ্যে জার্ম্মাণ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর, অক্টোবর মাসে জার্ম্মাণ সৈন্য রুমানিয়ায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। তখনই বল্‌কান অঞ্চলে জার্ম্মাণীর অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়াছে। সেই সময় রুমানিয়ান্‌ সরকারের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে রুমানিয়ান্‌ বাহিনীকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই সকল জার্ম্মাণ সৈন্য তথায় গমন করিয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে জার্ম্মাণ সৈন্যের গতিবিধি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় বৃটিশ সরকার রুমানিয়ার সহিত কূটনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বুকারেষ্টস্থিত বৃটিশ দূত সার রেজিন্যাল্ড হোর এই সম্পর্কে রুমানিয়ান্‌ সরকারকে যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি জানান যে, জার্ম্মাণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ রুমানিয়ায় অভিযাত্রী সেনাদল গঠন করিতেছে এবং রুমানিয়াকে আক্রমণ-ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের আয়োজন করিতেছে।

ইহার পর ঘটনাস্রোতের গতি দ্রুত; রুমানিয়ার আয়োজন শেষ করিয়া জার্ম্মাণী বুল্‌গেরিয়ার প্রতি অবহিত হয়। এই সময়, সম্ভবতঃ জার্ম্মাণীর ইঙ্গিতে, বুল্‌গেরিয়ার সহিত তুরস্কের এক অনাক্রমণাত্মক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহার পরই বুলগার সরকারের ত্রিশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর দান এবং দলে দলে জার্ম্মাণ সৈন্যের বুল্‌গেরিয়া-প্রবেশ!

বুল্‌গেরিয়ায় জার্ম্মাণীর প্রভাব-বিস্তৃতি আকস্মিক ঘটনা নহে; ইহার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন চলিতেছিল। নাজি-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের কৃপায় দোবরুজা প্রাপ্ত হইয়া যে বুল্‌গেরিয়া কৃতার্থ হইয়াছে এবং এখনও ঐ শক্তিদ্বয়ের অনুগ্রহে ঈজিয়ান্‌ সাগরে প্রবেশপথ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার পক্ষে জার্ম্মাণীর দাবীতে সম্মত হওয়ায় বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীস্‌ আক্রান্ত হওয়ায় বল্‌কান অঞ্চলের এই রাষ্ট্রটি উৎকণ্ঠিত হয় নাই; ঐ সময় তাহার পক্ষ হইতে সরকারী ভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশিত না হইলেও বুল্‌গেরিয়ার সংবাদপত্রগুলি ইটালীর দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতেই প্রয়াস পাইয়াছিল।

এ হেন বুল্‌গেরিয়ার পক্ষে বহু পূর্ব্বেই জার্ম্মাণীর তথাকথিত "নব-ব্যবস্থার" অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জার্ম্মাণী বিশেষ উদ্দেশ্যেই এত দিন ঐ রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে ত্রিশক্তির চুক্তি সম্পাদিত হইবার অল্পকাল পরেই জার্ম্মাণী যখন হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও শ্লোভাকিয়াকে ঐ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে, তখন সম্ভবতঃ সে ইচ্ছা করিয়াই বুল্‌গেরিয়াকে উহার বাহিরে রাখিয়াছিল। জার্ম্মাণী তখনও তুরস্ককে স্বদলে আনয়নের জন্য কূটনীতিক প্রয়াস করিতেছিল; সেই সময় জার্ম্মাণীর প্রভাবের ক্ষেত্র তুর্কি সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে এই কূটনীতিক তৎপরতায় বিঘ্ন উপস্থিত হইত। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তুরস্কের সুনির্দ্দিষ্ট মনোভাব প্রকাশিত হওয়ায় তাহার নিকট হইতে জার্ম্মাণীর আর আশা করিবার কিছুই নাই। কাজেই, এখন প্রকাশ্যে বুল্‌গেরিয়াকে স্বদলে গ্রহণে জার্ম্মাণীর আর ইতস্ততঃ করিবার কোন



জার্ম্মাণীর যান্ত্রিক বাহিনী,—ইহাদের সহিত ক্ষুদ্রকায় বিমান-বিধ্বংসী কামানও রহিয়াছে

কারণও নাই। গ্রীক্‌ যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস অনির্দ্দিষ্ট কাল স্থগিত থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ বসন্তকাল সমাগত, জার্ম্মাণীর সমর-প্রচেষ্টার প্রাবল্যবৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। অবশ্য, তুরস্ক যাহাতে জার্ম্মাণীর এই তৎপরতায় উৎকণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়, সে দিকে জার্ম্মাণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট; কারণ, তুরস্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তীব্র কূটনীতিক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নিশ্চিত।

মুখ্যতঃ গ্রীক্‌-যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণ সৈন্য বুল্‌গেরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, তুরস্ক সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনও জার্ম্মাণীর প্রয়োজন। যত দূর মনে হয়,

বুল্‌গার-গ্রীক্‌ সীমান্তে সন্নিবিষ্ট জার্ম্মাণ সৈন্ত অবিলম্বে গ্রীসকে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিবে না; ঐ সীমান্তে ব্যাপক সমরায়োজন করিয়া গ্রীসকে ভীতি-প্রদর্শন করিবে, এবং এই ভাবে তাহাকে ইটালীর সহিত সন্ধি করাইতে প্রয়াসী হইবে। এই "স্নায়ু-যুদ্ধ" প্রবলতর করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী অতি সত্বর যুগোস্লাভিয়াকেও স্বীয় প্রভুত্বাধীন করিতে প্রয়াসী হইবে; তিন দিকে নাৎসী-বাহিনী পরিবেষ্টিত এই অসহায় রাষ্ট্রটি জার্ম্মাণীর দাবী প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইবে না। বর্ত্তমানে যুগোস্লাভিয়ার স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতা রক্ষা সম্পর্কে ঐ রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে, উহা গুরুত্বহীন; ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাজনীতিজ্ঞদিগের এইরূপ উক্তি কত তুচ্ছ, তাহা গত বৎসরাধিক কালে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অল্পকাল পূর্ব্বেও (৩০শে ডিসেম্বর) বুল্‌গেরিয়ার পররাষ্ট্র সচিব মঃ পপফ্‌ আইন সভায় বাজেট আলোচনা কালে ঘোষণা করেন—Bulgaria will not depart from her avowed policy of strict neutrality. এই জন্মই হয় ত



এই সকল বীর গ্রীক্‌ সৈন্ত ইটালীর সামরিক মর্য্যাদা ভূলুণ্ঠিত করিয়াছে

গত ১লা মার্চ্চ ত্রিশক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষরদান-অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য মঃ পপফ্‌ ভিয়েনায় উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণীর সেনাবাহিনী তুর্কি-বুল্‌গার সীমান্তে সন্নিবিষ্ট হইলেও তুরস্ক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়; কারণ, জার্ম্মাণ-বাহিনী ঐ দিকে অগ্রসর হইতে প্রয়াস করিলে সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে হয় ত উদাসীন থাকা সম্ভব হইবে না। জার্ম্মাণ-বাহিনী বুল্‌গেরিয়ায় প্রবেশের পর সোভিয়েট রুশিয়া বুল্‌গার সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে; তাহার বক্তব্য—বুল্‌গার সরকারের এই কার্য্য সে সমর্থন করে না, জার্ম্মাণ-বাহিনী ঐ রাজ্যে প্রবেশে বল্‌কান্‌ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, তথায় যুদ্ধ-বিস্তৃতির সম্ভাবনাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-জার্ম্মাণ অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর এই সর্ব্বপ্রথম সোভিয়েট রুশিয়া জার্ম্মাণীর কার্য্যে আপত্তি জানাইল। এই আপত্তিও, জার্ম্মাণীর দাবীতে বুল্‌গার সরকার সম্মত হওয়ায়, এই শেষোক্ত সরকারের নীতির বিরুদ্ধেই উত্থিত হইয়াছে—জার্ম্মাণীর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। অথচ, বুল্‌গার সরকার যদি কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া নিজ দায়িত্বে জার্ম্মাণীর দাবীতে সম্মত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বল্‌কান্‌ অঞ্চলে যুদ্ধ-বিস্তৃতিতে জার্ম্মাণীর দায়িত্ব অল্প নহে। ইহা ব্যতীত, জার্ম্মাণ সৈন্ত বুল্‌গেরিয়ায়" প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সোভিয়েট রুশিয়া কোন আপত্তি করে নাই। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী মিঃ চার্চ্চিল এক বক্তৃতায় বলেন—"...its (German army and air force) forward tentacles have already penetrated Bulgaria" তখন যে সংবাদ মিঃ চার্চ্চিলের নিকট পৌছিয়াছিল, উহা যে ১লা মার্চ্চের পূর্ব্বে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। সোভিয়েট সরকার যদি পূর্ব্বে বল্‌কান অঞ্চলে



গ্রীসের রাজা জর্জ্জ রণক্ষেত্রে পদাতিক গ্রীক্‌ সৈন্তের সহিত কথা বলিতেছেন

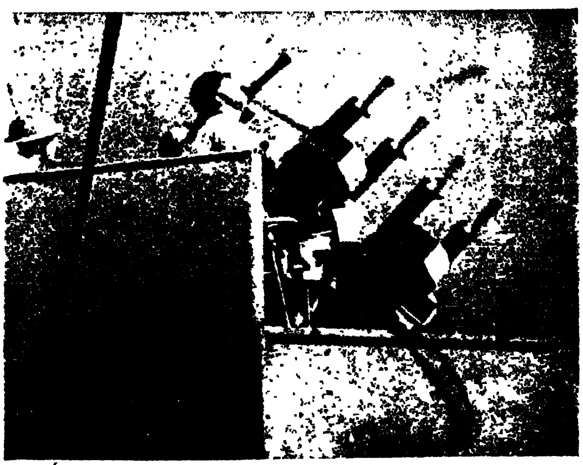
যুদ্ধ-বিস্তৃতির এই নিশ্চিত আশঙ্কার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেন, তাহা হইলে জার্ম্মাণী ও বুল্‌গেরিয়া উভয়েই তাহাদিগের নীতি সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার বিবেচনা করিতে বাধ্য হইত। পূর্ব্বে সোভিয়েট রুশিয়ার ইচ্ছাকৃত নীরবতা এবং জার্ম্মাণ-বাহিনীর বুল্‌গেরিয়ায় প্রবেশের পর তাহার মনোভাব জ্ঞাপনের সময় নির্ব্বাচনে ইহাই অনুমান হয় যে, বুল্‌গেরিয়ায় জার্ম্মাণ প্রভুত্ব বিস্তৃতিতে তাহার কোন আপত্তি নাই; তবে সে দার্দ্দানেলিজের দিকে জার্ম্মাণ-বাহিনীর অগ্রগতির বিরোধী। ইহা ব্যতীত, এই প্রতিবাদের দ্বারা সোভিয়েট সরকার হয় ত বুল্‌গেরিয়ার সোভিয়েট অনুরক্ত অধিবাসীদিগকে জানাইয়া রাখিলেন যে, ঐ রাজ্যে যুদ্ধ-বিস্তৃতিতে তাঁহাদিগের কোন দায়িত্ব নাই।

দার্দ্দানেলিজ ও দার্দ্দানেলিজের রক্ষক তুরস্কের নিরপত্তার উপর কৃষ্ণসাগর-পথে সোভিয়েট বাণিজ্য পরিচালনের নির্ব্বিঘ্নতা

সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সোভিয়েট সরকার বুলগেরিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্যের অবস্থিতি ও গ্রীক যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য তাহাদিগের প্রয়াস সহ্য করিতে পারেন; কিন্তু তুরস্ককে জার্ম্মাণ প্রভুত্বের বাহিরে রাখাই তাহাদিগের স্বার্থ। তুরস্কের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার এই স্বার্থ-সম্বন্ধের কথা জার্ম্মাণীর অজ্ঞাত নহে বলিয়াই জার্ম্মাণ বাহিনী বুলগেরিয়ায় প্রবেশের পরই হিট্‌লার তুর্কী রাষ্ট্রপতি ইনেউনুকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়া ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছেন। ঠিক এই কারণেই ত্রিশক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে বুলগেরিয়া জার্ম্মাণীর পরামর্শে তুরস্কের সহিত অনাক্রমণাত্মক চুক্তি করিয়াছিল। তুরস্কের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আশ্বাস প্রদানের পরও জার্ম্মাণী নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই; সেই জন্য তুর্কি-বুল্‌গার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়া সে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে। জার্ম্মাণী জানে যে, তুরস্ক যদি বৃটেনের ঘাঁটারূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলে সে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে পাবে।

গ্রীক্‌-ইটালীয় সঙ্ঘর্ষ—

জার্ম্মাণ-সৈন্য বুলগেরিয়ায় প্রবেশের পর হইতে গ্রীক-বাহিনী ইটালীয়দিগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিতে প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছে। তাহারা শত্রুর প্রতিরোধে ব্যাপৃত না থাকিয়া এখন প্রবল প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। বৃটিশ বিমান-বাহিনীও আদ্রিয়াতিকের উপকূল-বন্দরগুলিতে প্রচণ্ডবেগে বোমা বর্ষণে প্রবৃত্ত।



ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ রণপোত হইতে ইটালীয় বিমান লক্ষ্য করিয়া বিমান-বিধ্বংসী কামান চলিতেছে

আলবেনিয়ার সহিত ইটালীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া রণক্ষেত্রে নূতন ইটালীয় সৈন্যের প্রবেশ বন্ধ করাই এই সকল আক্রমণের উদ্দেশ্য। এই জন্য আলবেনিয়ায় ইটালীয় সৈন্যের অবতরণ-ঘাঁটা ভেলোনা অধিকারের জন্য গ্রীক-বাহিনী বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছে! বৃটিশ বিমান বাহিনীও ভেলোনা ও ডুরাজ্জোয় প্রবল বোমা-বর্ষণ করিতেছে। আলবেনিয়ায় নূতন ইটালীয় সৈন্যের আগমন বন্ধ করিতে পারিলে পূর্ব্বদিকে জার্ম্মাণদিগের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হইবে—ইহাই সম্ভবতঃ গ্রীকদিগের ধারণা।

আফ্রিকায় যুদ্ধ—

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনী ক্রমেই নূতন নূতন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতেছে। লিবিয়ায় বেন্‌ঘাজীর পতনের পর ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী মগাদিশো অধিকার তাহাদিগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কেনীয়া সীমান্তে ময়ালে পুনরায় বৃটিশ সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় আফ্রিকার কোথাও বৃটিশ-ভূমিতে আর ইটালীয় সৈন্য নাই। আরিত্রিয়ায় বৃটিশ বাহিনী বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে; তাহারা বিভিন্ন পথে আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিতেছে, ঐ রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বাধীনতাকামী হাবসীদিগের তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশবাহিনীর যে আক্রমণে ইটালীয়রা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়, তৎসম্পর্কে ইটালীয় সেনাপতি মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি বলিয়াছেন—The Italian forces were first paralyzed by a massacring bomb attack, then



আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্যদিগের মধ্যে মিঃ ইডেন্‌

routed by crushing superiorty of the enemy's armoured units. উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধে যান্ত্রিক বাহিনীর সহিত বৃটিশ বিমান বহরের এই সহযোগিতা ব্যতীত ভূমধ্যসাগরের বৃটিশ নৌবহরও বিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিল। আফ্রিকার অন্যান্য রণক্ষেত্রে নৌবাহিনীর সহযোগিতার সুযোগ নাই; ঐ সকল স্থানে বিমানবহর ও যান্ত্রিক বাহিনী একযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া শত্রুকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিতেছে।

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর ক্রমবর্দ্ধমান সাফল্যের প্রধান কারণ—ভূমধ্য ও লোহিতসাগরে বৃটিশ নৌবহরের প্রভুত্ব। সম্প্রতি মুসোলিনি ইটালীয় বাহিনীর পরাজয়ের কৈফিয়ৎ প্রদানে প্রয়াসী হইয়া বলিয়াছেন—The soldiers who are fighting in the Empire without hope of reinforcements are those furthest away but the nearest to our hearts. ইটালীয় বাহিনী যে তাহাদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবার আশা ত্যাগ করিয়া (without hope of reinforcements) আফ্রিকায় যুদ্ধ করিতেছে, ইহাই তাহাদিগের চরম দৌর্ব্বল্য। ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় আফ্রিকার রণক্ষেত্রের

সহিত ইটালীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; আফ্রিকায়ও ইটালীর অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ নাই। এই জন্য ইটালী হইতে আফ্রিকায় অবাধে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ যেমন অসম্ভব, তেমনই আফ্রিকায় অবস্থিত সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রয়োজনানুযায়ী স্থানান্তরিত হওয়াও সম্ভব নহে।

বৃটেনের সমর-সচিব মিঃ এন্থনী ইডেন্ (এক্ষণে পররাষ্ট্র সচিব) ইটালীর এই দৌর্ব্বল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। গত অক্টোবর মাসে মধ্য ও অদূর প্রাচী ভ্রমণ করিয়া তিনি যে পরিকল্পনা রচনা করেন, তদনুসারে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌশক্তি বৃদ্ধি করিয়া আফ্রিকার সহিত ইটালীর সংযোগপথ আরও বিঘ্নসঙ্কুল করা হয়, এবং এদিকে আফ্রিকার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে বৃটিশ যান্ত্রিক বাহিনী ও বিমানের সংখ্যা বহুগুণ বর্দ্ধিত করা হয়। ইহার পর, ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতে বৃটিশ বাহিনীর প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হইলে ইটালীয়দিগের পক্ষে তাহা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই।

আফ্রিকার যুদ্ধ-পরিচালনা সম্পর্কে ইটালীর অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সিসিলি দ্বীপে জার্ম্মাণ বিমান প্রেরিত হইয়াছে; এই সকল বিমানের সাহায্যে উত্তর-আফ্রিকার সহিত ইটালীর অবাধ-সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস চলিতেছে। জার্ম্মাণ বিমানগুলি লিবিয়ার উপকূলে



লিবিয়ার এই সকল অধিবাসী বৃটিশের পক্ষে যোগ দিয়াছে

বৃটিশ নৌবহরকে আক্রমণ করিতেছে; লিবিয়ার রণক্ষেত্রেও কিছু জার্ম্মাণ সৈন্য পৌছিয়াছে। এদিকে গ্রীক্ যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বলকান অঞ্চলে জার্ম্মাণীর যে প্রয়াস, উহাতেও আফ্রিকার যুদ্ধের পরোক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। গ্রীসে ইটালীর প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে; ইহাতে আফ্রিকার যুদ্ধ-পরিচালনে ইটালীর সুবিধা হইতে পারে। তখন জার্ম্মাণ বিমানের পক্ষে সুয়েজ অঞ্চলে ব্যাপক বোমা-বর্ষণের সুযোগ উপস্থিত হওয়াও সম্ভব।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও জার্ম্মাণীর সমর-প্রচেষ্টা—

আফ্রিকায় ইটালীয় বাহিনীর পরাজয়ে অথবা বলকান অঞ্চলে জার্ম্মাণীর তৎপরতায় বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রকৃত জয়পরাজয়ের মুহূর্ত্ত অদূরবর্ত্তী হয় নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আঘাত করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য জার্ম্মাণী দিন গণিতেছে। এই সম্পর্কে গত এক মাসে নূতন কোন অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হিট্‌লার মিউনিকে এক বক্তৃতায় পুনরায় সাবমেরিণ আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন:—We have been waiting for our new U-boats and in March and April a naval warfare will start such as the enemy never expected. মার্চ্চ মাসের সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইলেও এই নৌযুদ্ধের কোন সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে জার্ম্মাণীর প্রত্যক্ষ আক্রমণের প্রয়াস অপেক্ষা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে অর্থনীতিক অবরোধ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনাই যে অধিকতর, ইহা গত মাঘ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমাদিগের ঐ ধারণা পরিবর্ত্তনের কোন কারণ এখনও ঘটে নাই।

সুদূর প্রাচীতে চাঞ্চল্য—

সম্প্রতি জাপানের অভিসন্ধি সম্পর্কে সুদূর প্রাচীতে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর বসন্তকালীন অভিযান আরম্ভ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে জাপানও তাহার তথাকথিত নব-ব্যবস্থার প্রসারে উদ্যোগী হইয়া বৃটিশ নৌবহরকে সুদূর প্রাচীতে অবহিত হইতে বাধ্য করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী জাপানের চরম সমর-পরিষদের সদস্য এডমিরাল ওসামি দক্ষিণ সমুদ্রের নৌবহরের সেনাপতিত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিমানযোগে হাই-নানে যাইবার সময় পথিমধ্যে বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। চীনা সূত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এডমিরাল ওসামির বিমানে জাপানের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রসার সম্পর্কিত কর্ম্মসূচী পাওয়া যায়। সুদূর প্রাচীতে অকস্মাৎ যেরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, এডমিরাল ওসামির বিমান হইতে প্রাপ্ত কাগজপত্র হইতেই হয় ত এই চাঞ্চল্যের উৎপত্তি।

ইতোমধ্যে হাইনান্ দ্বীপে জাপান ব্যাপক সমরায়োজন করিয়াছে; ফুকিয়েনেও বহু জাপানী রণপোত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। সম্প্রতি জাপান দক্ষিণ-কোয়াংসী প্রদেশের অন্তর্গত পাখই পুনরধিকার করিয়াছে, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বহু জাপানী সৈন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম পাখই জাপ-বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। গত নভেম্বর মাসে দক্ষিণ-চীন হইতে জাপানী সৈন্য প্রত্যাহৃত হইবার সময় পাখইও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইহার পর, ঐ পথে চুংকিং সরকার সমরোপকরণ প্রাপ্ত হইতেছিলেন বলিয়াই না কি পাখই পুনরধিকার করা প্রয়োজন হইয়াছে।

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের বিরোধ সম্পর্কে টোকিওয় যে মীমাংসার আলোচনা চলিতেছে, সম্প্রতি তাহাতে সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। জাপানের দাবীতে থাইল্যাণ্ডের প্রতিনিধিগণ সম্মত হইলেও ইন্দোচীনের কর্ত্তৃপক্ষ সহজে উহা মানিয়া লইতে চাহেন নাই। ইহাতে জাপানী সংবাদপত্রগুলির সুর অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, ফরাসী সরকার না কি অবশেষে জাপানের দাবীতে সম্মত হইয়াছেন। থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের মীমাংসাও না কি অদূরবর্ত্তী।

জাপান যে য়ুরোপীয় যুদ্ধকে তাহার অভিসন্ধি সিদ্ধির "সুবর্ণ সুযোগ" মনে করে, তাহা সে প্রকাশ্যেই স্বীকার করিয়াছে। জার্ম্মাণীর বসন্তকালীন অভিযান আরম্ভ হইবার সময় সুদূর প্রাচীতে জাপানের

পক্ষে তৎপর হওয়া স্বাভাবিক। জাপান যদি সত্যই তাহার দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রসার লাভের আকাঙ্ক্ষা বাহুবলে পূরণ করিতে চাহে, তাহা হইলে সে আর বিলম্ব করিবে কেন? চীনা যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য জাপান যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। এখন হয় ত ঐ যুদ্ধে রত থাকিয়াই সে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী হইবে। জাপান দক্ষিণ দিকে অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে চাহে। সোভিয়েট রুশিয়াকে কতকগুলি সুবিধা প্রদান করিয়া তাহার সহিত মীমাংসা করিবার জন্য জাপান আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। জাপানী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকা সত্বর বার্লিনে যাইবেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; ঐ সময় তিনি রোম ও মস্কো পরিদর্শন করিবেন। মস্কোএ সোভিয়েট-জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সম্ভব। জাপানের সহিত মৈত্রী স্থাপনে সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তির কোন কারণ নাই; মাঞ্চুকো-সীমান্ত সম্পর্কিত বিরোধ, সাখালিন্ অঞ্চলে মৎস্য-সংগ্রহ সম্পর্কিত বিতর্ক, মাঞ্চুকোর রেলপথ সম্পর্কিত বাদানুবাদ প্রভৃতির অবসান হইবার পর সোভিয়েট-জাপান আক্রমণাত্মক চুক্তি সম্পাদিত হওয়াও অসম্ভব নহে। অবশ্য, সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে চীন যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহা ইহাতে বন্ধ হইবে না; সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত চীনের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ, উহা রুশিয়ার নিরপেক্ষতার স্বাভাবিক অধিকারেই স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোভিয়েট রুশিয়ার প্রেরিত সাহায্যে চীনের কমুনিষ্টগণ স্বতন্ত্র ভাবে উপকৃত হয় না। রুশিয়া হইতে প্রেরিত দ্রব্যাদি সরাসরি চুংকিং সরকার গ্রহণ করেন; পরে উহা প্রয়োজনানুযায়ী সর্ব্বত্র বণ্টিত হয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মীমাংসা হইলে জাপান হয় ত সোভিয়েট সরকারের সাহায্যে চীন যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য শেষ চেষ্টা করিবে। এই প্রয়াস বিফল হইলেও তাহার দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অভিমুখী অভিযান হয় ত আর স্থগিত থাকিবে না। হাইনান্ দ্বীপকে ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিয়া জাপান এই অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে পারে। প্যারাসেল পুনরধিকার সম্পর্কে জাপানের কৈফিয়ৎ বিশ্বাসযোগ্য নহে; ঐ পথে প্রাপ্ত সমরোপকরণে চুংকিং সরকারের উপকৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তিন মাস পূর্ব্বে জাপানী সৈন্য ঐ অঞ্চল হইতে প্রত্যাহৃত হইত না। সম্ভবতঃ চীনের দক্ষিণ উপকূলের কতকগুলি স্থান সরবরাহ-কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই জাপান ঐ অঞ্চলে আয়োজন আরম্ভ করিয়াছে। প্যারাসেল পুনরধিকার এই আয়োজনেরই অঙ্গ।

দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে জাপান ইন্দো-চীনকে স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হইতে পারে। ইন্দোচীন সম্পর্কে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ জাপানের কিরূপ দাবীতে সম্মত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই; তবে তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় জাপানের দাবী মানিয়া লন নাই, তাহা বুঝা গিয়াছে।

সম্প্রতি থাইল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা প্রজাধিপক এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—If the Japanese want to use the land route to Singapore, they must occupy Indo-China and then invade Siam. দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে সমর-প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে জাপানের পক্ষে সিঙ্গাপুরের প্রতি অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; সিঙ্গাপুর ঘাঁটীতে প্রবল ভাবে আঘাত করিতে পারিলে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। কাজেই, স্থলপথে এই দিকে অগ্রসর হইবার জন্য জাপানের পক্ষে ইন্দোচীনকে স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে প্রয়াসী হওয়া স্বাভাবিক। থাইল্যাণ্ডে (শ্যাম) জাপানের প্রভাব পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কাজেই থাই-সরকার জাপানী বাহিনীর অগ্রগতির জন্য স্বেচ্ছায় পথ ছাড়িয়া দিতে পারেন। সিঙ্গাপুর আক্রমণের সুবিধা ব্যতীতও ইন্দোচীনের আরও সামরিক গুরুত্ব আছে। উত্তরাঞ্চলে এই দেশের সীমান্ত ব্রহ্মদেশের সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের তৈল ও চাউল জাপানের প্রলোভনের বস্তু ত বটেই; ইহা ব্যতীত, ব্রহ্ম-চীন পথ বন্ধ করিয়া চীনকে সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিবার জন্য ব্রহ্মদেশ কুক্ষিগত করিতে আগ্রহান্বিত হওয়াও জাপানের পক্ষে অসম্ভব নহে। ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডকে জাপান যদি ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী নৌবহরের তৎপরতারও বিশেষ সুবিধা হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের "ইজারা ও ঋণদান" বিল—

বৃটেন্‌কে আর্থিক ঋণ প্রদান না করিয়া তাহাকে সমরোপকরণের দ্বারা সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে বিল রচিত হইয়াছিল, দীর্ঘকাল আলোচনার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে উহা গৃহীত হইয়াছে। সেনেটে ঐ বিলের যে সামান্য সংশোধন হইয়াছে, সেই সম্পর্কে প্রতিনিধি-সভায় পুনরায় সামান্য আলোচনা হইবে। এই বিল গৃহীত হইবার ফলে বৃটেনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রেরণের পথে কতকগুলি বিঘ্ন অবিলম্বে অপসারিত হইবে। সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, বৃটেন্‌কে সাহায্য দান সম্পর্কিত এই বিল পাস হইতে যদি আরও বিলম্ব হয়, তাহা হইলে মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগ হইতে বৃটেন্‌কে সাহায্য প্রদানে অসুবিধা ঘটিবে। বিলটি সেনেটে গৃহীত হওয়ায় এই অসুবিধার আশঙ্কা রহিল না।

এই বিলে প্রেসিডেণ্টকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি যে কোন রাষ্ট্রকে সমরোপকরণ বিক্রয় করিতে, হস্তান্তর করিতে, এবং ঋণ ও ইজারা প্রদান করিতে পারিবেন। প্রতিনিধি সভায় প্রেসিডেণ্টের এই ক্ষমতা সম্ভোগের কাল ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেনেটে এই মর্ম্মে বিলটির সংশোধন হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে সমরোপকরণ আছে, উহা হইতে ৩২ কোটি ৫১ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের উপকরণ হস্তান্তরিত হইতে পারিবে না।

এই বিলের বিধান কার্য্যে পরিণত হইলে কেবল সামরিক বিষয়েই নহে—কূটনৈতিক বিষয়েও বৃটেন কত দূর উপকৃত হইবে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতী'তে আলোচিত হইয়াছে।

ইজারা ও ঋণদান বিলে বৃটেন্‌কে সাহায্য দানের যে ব্যাপক আয়োজন হইয়াছে, উহা ব্যর্থ করিবার জন্য জার্ম্মাণী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেই। কিছু দিন পূর্ব্বে এই বিল সম্পর্কে জাপানী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকা মন্তব্য করিয়াছিলেন—Its passage will have no important bearing on German action against England, for it will be months before the measure will be effective.

শ্রীঅতুল দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গালা সরকারের বাজেট

গত ৩রা ফাল্গুন শনিবার (বারবেলায় ?) বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিষ্টার এইচ, এস, সুরাবর্দ্দী বাঙ্গালা সরকারের ১৯৪১—৪২ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের বাজেট উপস্থিত করেন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাজেট-ব্যবস্থায় সরকারী নীতির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুরাবর্দ্দীর বাজেটে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাতে জনসাধারণের উন্নতিমূলক কোন কার্য্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই ;—হইয়াছে কেবল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বৃদ্ধির এবং সচিবদলের ভোটসংগ্রহের জন্য হীন প্রচেষ্টা। এই জন্য অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অর্থব্যয় করা, এবং জনসাধারণের উপর অসঙ্গত ভাবে কর-ধার্য্যের আশঙ্কার সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকারের তহবিলে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা মজুদ ছিল,—রাজস্ব-সচিবের ভেল্কি-বাজীতে তাহা ৩৩ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে, ঠিক হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী তহবিলে আয় অপেক্ষা ব্যয় ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা অধিক হইবে, আবার আগামী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে আয় অপেক্ষা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার ঘাটতি ঘটিবে। এখন কথা হইতেছে —কেবল মাত্র ৩৩ লক্ষ টাকা প্রাদেশিক সরকারের তহবিলে থাকা কোন মতেই বিধিসঙ্গত নহে; আইন মতে ইহার অধিক টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত রাখা কর্ত্তব্য। কাজেই এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়— দেশের জনসাধারণের উপর অধিক কর-ধার্য্যের ব্যবস্থা করা; 'নান্য পন্থা বিদ্যতে'। বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ যে কিরূপ অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অর্থের অপব্যবহার করিতেছেন, তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই সকলে তাহা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

বর্ত্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে পাটের মূল্য না নামিয়া যায়, তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্গালার সচিবদল এই দরিদ্র দেশের গলায় ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাটের ফাঁস পরাইয়া খুব সূক্ষ্ম পাটোয়ারি বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন! রাজস্ব-সচিব কি ভাবে এই অর্থের ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়াছেন,—তাহা তাঁহার কৈফিয়ৎপূর্ণ বক্তৃতা, বা বক্তৃতাপূর্ণ কৈফিয়ৎ হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার উপায় নাই। এই পাট-সঙ্কটের জন্য অনেকেই এই সচিবদলকে দায়ী করিতেছেন। কেন দায়ী করিতেছেন, তাহা এই সচিবরা বিলক্ষণ জানেন,— সুতরাং এখানে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা করেন নাই। তাহার পর তাঁহারা উঁচু দরে (৬০ টাকা হইতে ৯০ টাকা গাঁইট) পাট বেচিবার ব্যবস্থায়, এবং পরে ৬০ টাকা গাঁইট দরে ভাল পাট তাঁহারা কিনিবেন বলিয়া অর্ডিনান্স জারি করিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ পাটের দর বাড়িল না, নামিতেই থাকিল। তাহার পর পাটের দর চড়াইবার অজুহাতে এই ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইল। কিন্তু এত টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহারা কি ফল দেখাইলেন? ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যে পাটের গাঁইট ৬০ টাকা ১২ আনায় বিকাইয়াছিল, সেই পাট—রাজস্ব-সচিব যে দিন বাজেট উপস্থিত করিয়াছিলেন,—সে দিন ৩২ টাকা দরে বেচিতে চাহিলেও কোন ক্রেতা সে দিকে ভিড়িতে চাহিল না! সাধারণ পাটের দর আড়ঙ্গে ৬ টাকা হইলেও তাঁহাদের অগতির গতি কলওয়ালারা পাট স্পর্শও করে নাই। সুতরাং টাকাটা যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না। এই টাকাগুলি পচা পাটের সৌরভপূর্ণ জলেই ঢালা হয় নাই কি?—আমাদের মধু নাপিত কামাইতে বসিলে, ভিন্ন পাড়ায় ক্রন্দনের রোল শুনিয়া মুখুয্যে মশায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মধু, ও-পাড়ায় কান্নাকাটি হচ্ছে কেন?'—মধু বলিল, 'কি জানি কর্ত্তা, আমার ভাই—ক্ষেত্তর তো গোটা-কতক মাথা ঝুড়বে ব'লে ও-পাড়ায় গিয়েছে; সে নোতন ক্ষুর চালাচ্ছে কি না।'—এও কি সেই রকম পরের মাথায় ক্ষুর চালাইয়া কামাইতে শেখা?

শিক্ষা বিভাগেও দেখা যাইতেছে, সচিবপুঙ্গবেরা সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভোর হইয়া নিতান্ত দুঃসাহসের সহিত অর্থব্যয় করিতেছেন। শিক্ষা বিভাগে আগামী বৎসরের জন্য ১৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা বিলক্ষণ শ্রবণসুখকর বটে! কিন্তু ইহার অর্দ্ধেক টাকা জিলা-স্কুলবোর্ডগুলিকে দেওয়া হইবে। ইহা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার-সাধনকল্পে গঠিত; কিন্তু ইহার গঠন-ভঙ্গী যেমন আপত্তিজনক এবং সাম্প্রদায়িকতা-বর্দ্ধক,—তেমনই অন্য দিকে এ টাকা অপর্য্যাপ্ত। তফশীলভুক্ত জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেড় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে তফশীলভুক্ত হিন্দু জাতির মধ্যে যে গণ্ডী টানা হইতেছে,—তাহা পূর্ণমাত্রায় ভেদবুদ্ধি-বর্দ্ধক। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিভেদ-সাধক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা জাতীয়তার বিরোধী; উহাতে অকারণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দান করা হয় না কি? তবে অনুন্নত জাতিদিগের মধ্যে যাহাতে দ্রুত শিক্ষার বিস্তার হয়, এই উদ্দেশ্যে দরিদ্র এবং প্রতিভাশালী ছাত্রদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করাই সঙ্গত; কিন্তু পরিণামে যাহাতে অমঙ্গল হয়, ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী-যোতার মতন এইরূপ বিপরীত ব্যবস্থা কখনই সাধারণের সমর্থন লাভ কবিতে পারিবে না। বর্ত্তমান বৎসর সচিবদল শিক্ষা বাবদ ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এবং আগামী ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার ব্যয় মঞ্জুর করিতেছেন। অবশ্য এইরূপ দুঃসময়েও এক বৎসরে ১৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয় বৃদ্ধি নৈরাশ্যজনক হইত না, যদি ঐ টাকাটা প্রকৃত শিক্ষা-বর্দ্ধনে এবং শিক্ষার বিস্তার-সাধনে ব্যয় করা হইত; কিন্তু তাহা করা হয় নাই। তালিকাভুক্ত জাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাতে এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশে তালিকাভুক্ত কয়েকটি জাতিরই জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে ভোট-সংগ্রহের জন্য অশিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোককে ধাপ্পায় ভুলাইবার সুবিধা হইলেও, ইহাতে ঐ সকল জাতির উল্লেখযোগ্য উপকারের আশা নাই। আর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই 'সুখী পরিবারে'র ব্যবস্থা কিরূপ হইতেছে, তাহা নিখিল বাঙ্গালার উহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনেই সুপ্রকাশ।

তাহার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মুস্লিম-হল আরও দেড় লক্ষ টাকা পাইল। পাটকলের শ্বেতাঙ্গ মালিকরাও কি ইহাকে অসাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা বলিতে সাহস করিবেন? ফজলুল হক কলেজের জন্য ৬৭ হাজার টাকা, লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজের জন্য ৭১ হাজার টাকা দানের দৃষ্টান্তও—সচিবমণ্ডলী কর্তৃক কিরূপ নিরপেক্ষ ভাবে শাসননীতি পরিচালিত হইতেছে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে কি? অন্য দিকে ব্যয়ের বরাদ্দ আরও দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। নোয়াখালি জিলার সদর সহর স্থানান্তরিত করিবার জন্য এক আঁচড়ে ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর! মৎস্য ধরিবার বিভাগের জন্য ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দের পাশেই বিশ্বভারতীর পল্লীসংস্কার কার্য্যের জন্য ২০ হাজার টাকার বরাদ্দ দেখিলে মনে হয়, মৎস্যজীবীর প্রাসাদের পার্শ্বস্থ পল্লীলক্ষ্মীর পর্ণকুটীরে কিঞ্চিৎ নেকনজর পড়িয়াছে! কৃষিঋণ বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা দানের বরাদ্দের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও কি কষ্ট হইবে? ঐ ষাট লক্ষের মধ্যে কতগুলি টাকা ওয়াশীল হইবে?

মেষ্টনী ব্যবস্থা এবং ভারত সরকারের ঋণ পরিশোধ না করিবার ব্যবস্থা, বিশেষতঃ, তাহার উপর পাট-শুল্ক বাবদ প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটি টাকা হস্তগত হইবার পরও বাঙ্গালা সরকারের তহবিলে অর্থাভাব, এবং তাহা নিরাকরণের জন্য নূতন নূতন করভার চাপাইয়া বাঙ্গালার দরিদ্র জনসাধারণকে বিব্রত করা কি বিচারমূঢ়তারই নিদর্শন নহে? তথাপি নূতন দুইটি ট্যাক্স বাবদ আয়ের অঙ্ক বাজেটে ধরা হয় নাই। সচিবমণ্ডলীর মতের সমর্থক ষ্টেটস্‌ম্যান লিখিয়াছেন,—And Bengal is a potentially rich land of some 50 million people. অর্থাৎ পাঁচ কোটি লোকের বাসভূমি এই বাঙ্গালা দেশের ধনী দেশ হইবার সম্ভাব্যতা বিদ্যমান। সেই সম্ভাব্যতাকে বাস্তব ব্যাপারে পরিণত করিবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত সরকার করিয়াছেন কি? তাহা করেন নাই। অধিক কথা বলিতে কি, এই ম্যালেরিয়া-বিড়ম্বিত দেশ হইতে ম্যালেরিয়া-বিতাড়নের কোন ব্যাপক চেষ্টাই বাঙ্গালার

শাসনকর্ত্তার পরামর্শদাতারা করিতেছেন না। ইহাতে সর্ব্বসম্প্রদায়েরই অপকার হইতেছে। সেই জন্য অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে—বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব-সচিবের এই বাজেট কেবল অর্থের অপব্যয়ে পূর্ণ। সচিবের দল দেশের হিতসাধনের জন্য কোন প্রয়োজনীয় স্থায়ী ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা যেন তাঁহাদের আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিবার বাহাদুরী প্রকাশের জন্য বদ্ধপরিকর। অন্য কোন সভ্য দেশেই এরূপ অবিবেচনাপূর্ণ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।

রেলওয়ে বাজেট

গত ৭ই ফাল্গুন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে সার এণ্ড্রু ক্লো ভারতীয় রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়াছেন। ঐ দিনই ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারতীয় রেলওয়েগুলির চীফ-কমিশনার মিষ্টার এল উইলসন উহা দাখিল করিয়াছেন। এবার রেল সমূহের যথেষ্ট আয়-বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দেশের লোকের সুবিধার জন্য বিশেষ কিছুই ব্যয়ের বরাদ্দ করা হয় নাই। এবার অর্থাৎ বর্ত্তমান ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাবে রেলওয়ে বাবদ সরকারের ১০৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আয় এবং ক্ষয়াদি পূরণ বাবদ ব্যয় ধরিয়া ৯৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং বৎসরান্তে ১৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা রেলওয়ের আয় বাবদ তহবিলে উদ্‌বৃত্ত থাকিবে, আশা করা হইয়াছে। মাল প্রভৃতি বহনের অতিরিক্ত ভাড়া বৃদ্ধি এবং যুদ্ধ বাবদ মালের আমদানী-রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য আয়ের এই আধিক্য ঘটিয়াছে। আগামী বৎসরে রেলওয়ে বাবদ সরকারের আয় হইবে ১০৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, এবং ব্যয় হইবে মায় অপচয় পূরণের খরচা ধরিয়া ৯৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। অতএব রেলওয়ে বাবদ সরকারের হাতে উদ্‌বৃত্ত থাকিবে ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য খুব সাবধানতার সহিত আগামী বৎসরের বাজেট প্রস্তুত করিয়াছেন। এবার জানুয়ারী মাসে রেলওয়ের খাতে যে অধিক আয় হইয়াছে, আগামী বৎসর তত অধিক আয় হইবে কি না, ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহারা বাজেটে আয়ের অঙ্ক আগামী বৎসর রেলওয়ে খাতে ১ কোটি টাকা কম হইবে ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ, রেলওয়ের আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু যে সকল ভারতবাসী রেলের তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীতে যাতায়াত করে এবং যাহারা রেলওয়ে বিভাগের নিম্নপদে কাজ করে, তাহাদের সুবিধার এবং অভাব-মোচনের জন্য বিশেষ কিছুই করিবার ব্যবস্থা লক্ষিত হইল না।

এবার যে টাকা রেলওয়ে খাতে উদ্‌বৃত্ত হইবে, তাহা হইতে ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের রাজস্ব খাতে দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা বিগত বৎসরের বাকী হিসাবে দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট যে ৭ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা থাকিবে, তাহা রেলওয়ে রিজার্ভ তহবিলে দেওয়া উচিত। কিন্তু উহা হইতে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের দেয় বাবদ সরকারী রাজস্ব খাতে অগ্রিম দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকাও সরকারী রাজস্ব খাতে দিতে হইবে। সুতরাং আগামী বৎসরে ভারত সরকারের তহবিলে সর্ব্ব-সাকল্যে ৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা (৭১৫+২৮১ লক্ষ) পাইবেন। আগামী বৎসরে রেলওয়ে যে টাকাটা উদ্‌বৃত্ত হইবে, তাহা হইতে ১০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের তহবিলে, আর ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ডে দেওয়া হইবে। এখানে বলা আবশ্যক যে, রেলওয়ে আয় বাবদ এই টাকা হইতে কোন প্রাদেশিক সরকারকে কিছুই দেওয়া হইবে না। ভারতীয় রেলগুলির আয় হইতে যত অল্প টাকা রেলওয়ের কর্ম্মচারী এবং যাত্রীদিগের সুবিধা বাবদ ব্যয় করা হয়, তত অল্প টাকা আর কোন দেশের রেলওয়েতে সে জন্য ব্যয় করা হয় না। ভারতের রেলওয়ের ৫৩ অংশ মাত্র—পক্ষান্তরে এমালগ্যামেটেড্ বৃটিশ রেলওয়েতে আয়ের শতকরা প্রায় ৮৬ অংশ ব্যয়িত হইতেছে। জার্ম্মাণ ষ্টেট রেলওয়েতেও ঐ বাবদ শতকরা পৌনে ৯৩ অংশ ব্যয়িত হয়। এবার ভারতের কয়েকটি শাখা-রেলপথের ৩০৫ মাইল দীর্ঘ রেলপথ উঠাইয়া দিয়া উহা অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইবে। ঐ সকল রেলপথে না কি আয় অধিক হয় না; কিন্তু জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধাও কি উপেক্ষণীয় ?

ভারত সরকারের বাজেট

এবার যুদ্ধ চলিতেছে, এবং শত্রুদল কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হইতেও পারে—এই আশঙ্কায় ব্যয়বৃদ্ধি হেতু ভারত সরকারের তহবিলে টাকার ঘাট্‌তি পড়িবে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই ঘাট্‌তির পরিমাণ কত হইবে, এবং কি প্রকারে তাহার পূরণ হইবে, তাহাই ছিল চিন্তার বিষয়। গত ১লা মার্চ্চ ১৭ই ফাল্গুন ভারত সরকারের রাজস্বসচিব সার জিরেমী রেইসম্যান যে বাজেটের হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, আগামী সরকারী বৎসর ভারত সরকারের তহবিলে আয় অপেক্ষা ব্যয় ২০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা অধিক হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে অর্থাৎ আগামী ১৭ই চৈত্র যে সরকারী বৎসর শেষ হইবে, সেই বৎসরে ভারত সরকারের তহবিলে ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি পড়িবে। চল্‌তি বৎসরে সামরিক কার্য্যে অর্থাৎ ভারত-রক্ষার জন্য ৭২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, আর আগামী বৎসরে উহার পরিমাণ ৮৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা হইবে। এখন যুদ্ধের গতি কিরূপ হইবে, তাহা না জানিতে পারিলে ভারত-রক্ষা বাবদ ব্যয় এই বরাদ্দ পরিমাণকে অতিক্রম করিবে কি না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই; ইহার মধ্যে ভারত সরকারের মূল এবং নিয়মিত সামরিক খাতে ৩৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, যুদ্ধের সময় মূল্যবৃদ্ধি বাবদ ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ, ভারতের জন্য সামরিক ব্যবস্থা বাবদ ৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ, এবং অফলপ্রদ কার্য্যের জন্য (non-effective charges) ব্যয় ৮ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এই সামরিক ব্যয়-বৃদ্ধিই ভারত সরকারের বাজেটে ঘাট্‌তি ঘটিবার প্রধান কারণ। বর্ত্তমান এবং আগামী বৎসরের সালতামামী ও বাজেটের হিসাব প্রথমে দেওয়া হইল। এক বৎসর পূর্ব্বে যখন বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন রাজস্ব-সচিব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন—এই বৎসর সরকারী তহবিলে ৯২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা আয়, এবং ৯২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে; ফলে সরকারী তহবিলে সঞ্চিত হইবে ২৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। সরকারী তহবিলে আয় বাড়িয়া দাঁড়াইল ১০৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা, ব্যয় পড়িবে বোধ হয় ১১২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। অতএব বৎসরান্তে ফাজিল ব্যয় হইবে ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। আগামী বর্ষে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে যদি কোনরূপ অতিরিক্ত কর ধার্য্য না করা হইত, তাহা হইলে আয় হইত আনুমানিক ১০৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, আর ব্যয় হইত ১২৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা! অতএব ফাজিল ব্যয় অর্থাৎ আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইত ২০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু নূতন টেক্স ধরিয়া আয় দাঁড়াইবে ১১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

এখন এই ঘাট্‌তি পূরণ করিবার জন্য সরকারকে অন্ততঃ কতক টাকা নূতন টেক্স বসাইয়া তুলিতেই হইবে। রাজস্ব-সচিব সার জিরেমী রেইসম্যান্ সেই জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তিনি এই ভাবে নূতন কর ধার্য্য করিবেন—(১) অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৬৬⅔ টাকা হারে কর ধার্য্য করা হইবে। এইরূপ করবৃদ্ধিতে আড়াই কোটি টাকার সংস্থান হইবে। (২) আয়কর এবং সুপার-টেক্সের উপর কেন্দ্রী অতিরিক্ত কর (central surcharge) শতকরা ২০ টাকার স্থলে ৩৩⅓ টাকা হারে ধার্য্য করা হইল। ইহাতে ভারত সরকার ২ কোটি ৯ লক্ষ টাকা পাইবেন। (৩) দিয়াশলাইয়ের উপর যে কর ধার্য্য হইয়াছিল, তাহার হার ডবল করা হইল। রাজস্ব-সচিব মনে করেন যে, ইহাতে দেড় কোটি টাকা অধিক পাওয়া যাইবে। (৪) কৃত্রিম রেশমের এবং সূতার উপর প্রতি-পাউণ্ডে ৫ আনা কর ধার্য্য করিয়া ৩৬ লক্ষ টাকা আয় হইবে; এবং (৫) টায়ার ও টিউবের উপর নূতন কর ধার্য্য করিয়া ২৫ লক্ষ টাকা উঠিবে। এই সকল দফায় আশানুরূপ রাজস্ব আদায় হইলে মোট রাজস্বের পরিমাণ ৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১১৩ কোটি টাকা রাজস্ব দাঁড়াইবে। তাহা হইলেও ১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি থাকিয়া যাইবে। এই টাকাটা ত সংগ্রহ করিতেই হইবে; তাই রাজস্ব-সচিব অনন্যোপায় হইয়া এই টাকাটা ঋণ করিয়া তুলিবেন।

এই বাজেট ভারতবাসীর পক্ষে নৈরাশ্যপূর্ণ। যুদ্ধের সময় করবৃদ্ধির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। তখন সরকার কর ধার্য্য করিবার সাধারণ নিয়ম মানিয়া

চলিতে পারেন না ; কিন্তু নানা কারণে যুদ্ধের সময় প্রজা-সাধারণের ব্যয়সঙ্কোচ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য। দিয়াশলাইয়ের উপর করভার দ্বিগুণ হওয়ায় গরিব লোকের যে কিরূপ কষ্ট হইবে, তাহা হয় ত সার জিরেমী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যেখানে এক পয়সায় কাজ চলিত, সেখানে এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে তিন পয়সা ব্যয় করা বহু লোকের পক্ষেই অসাধ্য। অতিরিক্ত আয়করের এবং সুপার-টেক্সের হার-বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ের প্রসারসাধনে বাধা ঘটিবে। ইহা এত অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করা সঙ্গত হয় নাই। কৃত্রিম রেশমের উপর কর-ধার্য্যের কতকটা সমর্থন করা যায়। আমাদের বিশ্বাস, যদি সরকার তাঁহাদের সমরবিভাগে ভারতবাসী হইতে অধিক সংখ্যায় অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সমর-বিভাগের ব্যয় বিশেষ হ্রাস পাইতে পারে। এ কথা সকলেই জানেন, এক রেজিমেণ্ট গোরা-অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতে ব্যয় হয় প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা,—কিন্তু এক রেজিমেণ্ট কালা তুরুকসোয়ারের খরচ ৭ লক্ষ টাকার কিছু অধিক। এক পল্টন গোরা পদাতিক সৈন্যের জন্য ব্যয় হয় সাড়ে ১৯ লক্ষ টাকা ; কিন্তু এক পল্টন কালা সিপাহীর জন্য ব্যয় মাত্র সওয়া ৫ লক্ষ টাকা। এই অবস্থায় সমর বিভাগে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করিলে সামরিক ব্যয় যে অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না ; কিন্তু বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করিতে অসম্মত কেন ? মানুষের মনের অগোচর পাপ নাই ; conscience does make cowards of us all—ইহা গ্রেট বৃটেনেরই শ্রেষ্ঠ কবির উক্তি। ভারতের যেরূপ জনবল আছে, এবং যেরূপ সম্ভাবিত সম্পদ (potential wealth) আছে, তাহাতে বৃটিশজাতি ভারতবাসীকে যদি বিশ্বাস করিয়া সহযোগী করিয়া লইতে পারিতেন,—তাহা হইলে আজ শত জার্ম্মাণীও ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেশ স্পর্শ করিতে পারিত না। রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া মার্কিণের নিকট সমর-সম্ভার কিনিতে হইত না। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভ কালেই ভারতের তদানীন্তন জঙ্গী-লাট সার রবার্ট কাসেল রেডিওযোগে ঘোষণা প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন—

India's greatest asset is a large supply of the finest types of fighting men. India's weaknesses are a low national income and to the present a limited industrial development, incapable of supplying all the technical equipment of a modern army.—ইহার মর্ম্মার্থ, "ভারতের খুব ভাল সৈনিক যোগাইবার উপযুক্ত জনসম্পদ আছে, কিন্তু ইহার শ্রমশিল্পের বিকাশ-সাধন অল্প হইয়াছে বলিয়া জাতীয় আয় অত্যন্ত অল্প ; সেই জন্য ভারত বর্ত্তমান কালের উপযোগী ভাবে সৈনিকদিগকে সুসজ্জিত করিবার উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম যোগাইতে পারে না।" কিন্তু এ জন্য দায়ী কে ? বৃটিশ সরকার নহেন কি ? তাঁহারা আনুকূল্য করিলে ভারত শ্রমশিল্পের বিকাশ-সাধনে সমর্থ হইত। বৃটিশ জাতিকেও এত বিব্রত হইতে হইত না। এখন দরিদ্র ভারতবাসীর স্কন্ধে অসঙ্গত অধিক করভার চাপাইলে তাহা প্রদান করিতে তাহাদের দারুণ কষ্ট হইবে সন্দেহ কি ? করবৃদ্ধির পূর্ব্বে সার জিরেমী রেইসম্যান সে কথা ভাবিয়া দেখিতে পারিতেন ; কিন্তু কলমের খোঁচায় পরাধীন জাতিকে করভারে পিষ্ট করা যত সহজ, মাথা খাটাইয়া, সকল দিক বজায় রাখিয়া ঐ সকল সমস্যার সমাধান করা তত সহজ নহে ; এবং সে জন্য যে বুদ্ধি ও শক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজন, তাহা বহু অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও দায়িত্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করে ; সরকারের উচ্চপদস্থ সকল কর্ম্মচারীর নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় কি ?

আদমসুমারে প্রহেলিকা

সমগ্র ভারতের ন্যায় বাঙ্গালাতেও এবার লোক-গণনা শেষ হইয়াছে। কিন্তু এই গণনা-কার্য্যে যেরূপ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির বিকাশ লক্ষিত হইয়াছে—তাহাতে এই গণনা যে অভ্রান্ত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালায় একমাত্র সংখ্যাধিক্যের অজুহাতে, অর্থাৎ প্রজনন-দক্ষতার নিদর্শনস্বরূপ সাম্প্র-দায়িক মুসলমান-শাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যোগ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া যদি সংখ্যাধিক্যকেই বরণ করা হয়,—তাহা হইলে অযোগ্য হইলেও সংখ্যায় অধিক

বলিয়া সমাদৃত সম্প্রদায়ের পক্ষে 'যেন তেন উপায়েন' সেই সংখ্যার আধিক্য প্রতিপন্ন করাই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যাহা হউক, বাঙ্গালা প্রদেশে লোক-গণনায় যে ভুল হইয়াছে, ইহা হাতে-কলমে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই ভুল কিরূপ অকাট্য, তাহা দেখাইতেছি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গণনার হিসাবে দেখা যায়,—এই বাঙ্গালা প্রদেশে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের মুসলমান বালকের সংখ্যা ছিল—১৭ লক্ষ ২৫ হাজার ১ শত ২৬। দশ বৎসর পরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার গণনাকালে ঐ সকল বালকের বয়স ত নিঃসন্দেহে ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্তই হইয়াছিল; সুতরাং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ঐ শিশুগণের সকলেরই যদি জীবিত থাকা সম্ভব হইত, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইত ঐ পর্য্যন্ত,—যেহেতু আসমান হইতে কোন নূতন শিশু পয়দা হইতে পারে নাই। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস-রিপোর্টে আমরা বিভিন্ন বয়সের মুসলমান পুরুষের হিসাবে দেখিতে পাই, উহাদের সংখ্যা ১৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৫ শত ৪১টি হইয়াছে। কি করিয়া ইহা হইল, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? বৃটিশ ভারতে এই সময় প্রতি-বৎসর হাজারকরা পৌনে-দুই শতেরও অনেক অধিক শিশু মরিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় শিশু-মৃত্যুর হার, হাজার-করা দুই শতেরও অধিক হইয়াছিল; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় মুসলমান পুরুষের মধ্যে একটিও শিশু মরিল না, অধিকন্তু তাহাদের সংখ্যা দশ বৎসরে ৯১ হাজার ৪ শত ১৪টি বাড়িয়া গেল! ছাপ্পর ফাড়িয়া পয়দা না হইলে ইহা কি সম্ভব?

তাহার পর মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য কেবল নাবালক এবং নারীর সংখ্যাধিক্যবশতঃ—এই কথাই বলা হইয়াছিল। সে জন্য মুসলমানদিগের সমাজে সাবালক পুরুষের সংখ্যা অধিক দেখাইবার চেষ্টা অসম্ভব নহে। ইহা কত দূর সত্য, তাহাও দেখা আবশ্যক। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালায় সেন্সাস-রিপোর্টে প্রকাশ,—ঐ বৎসর মুসলমান পুরুষদিগের মধ্যে ১৫-২০ বৎসরের লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯ শত ৯৬। ইহার দশ বৎসর পরে উহাদেরই বয়স ত ২৫-৩০ বৎসর হইবারই কথা; কিন্তু ঐ বৎসরের আদম-সুমারের রিপোর্টে দেখা গেল, উহাদের সংখ্যা লিখা হইয়াছে ১২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬ শত ৬১। অর্থাৎ সংখ্যায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬ শত ৬৫ জন বাড়িয়া গেল! অথচ ঐ সময়ে ভারতে মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা গড়ে ২৫ হইতে ২৬ জন। কিন্তু হিসাবে দেখা যাইতেছে, ঐ বয়সের মুসলমান যুবক ১ জনও মরে নাই, অধিকন্তু তাহারা সংখ্যায় পুরুভুজের ন্যায় লক্ষাধিক বাড়িয়া গিয়াছিল! আবার ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস-রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর ২৫-২৬ বৎসরের মুসলমান পুরুষ-সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭ শত ৭৪ জন ছিল। আর দশ বৎসরের পরবর্ত্তী সেন্সাস-রিপোর্টে দেখা যায়, ৩০-৩৫ বৎসরের মুসলমান যুবকদিগের সংখ্যা লিখিত হইয়াছে, ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬ শত ৩০। অর্থাৎ ঐ বয়সের মুসলমান পুরুষ-সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮ শত ৫৬ জন বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ভাবে গোঁজামিল দিয়াও মুসলমানদিগের মধ্যে নাবালকের সংখ্যা হ্রাস পায় নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান পুরুষ-দিগের মধ্যে প্রতি দশ হাজারে নাবালকের সংখ্যা ৫৫৯ জন ছিল, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তাহা ঐ অনুপাতে ৬ শত ৮০ জন হইয়াছে। মুসলমান-সমাজে নারীর আনুপাতিক সংখ্যা হিন্দু-সমাজের নারীর আনুপাতিক সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দত্ত হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে হিন্দু-সমাজে নারীর আনুপাতিক সংখ্যা অপেক্ষা মুসলমান-সমাজে নারীর আনুপাতিক সংখ্যা অনেক অধিক। ইদানীং উহা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

প্রতি হাজারে পুরুষের তুলনায় হিন্দু-সমাজে নারীর আনুপাতিক সংখ্যা যত, মুসলমান-সমাজে তাহা অপেক্ষা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হাজার-প্রতি ২৯ জন হিসাবে; এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ২৮ জন হিসাবে অধিক। পূর্ব্বে কিন্তু এত অধিক ছিল না। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১৭ জন, এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১৮ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেন্সাস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার রিপোর্টে (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের) মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ৪০এর অধিক বয়স্ক হিন্দুরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ ইহা সত্য, তবে উহা ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য হেতুই হইয়াছে। এইরূপ ইঙ্গিত সঙ্গত হয় নাই। এখন প্রশ্ন, এরূপ অবস্থায় এবার আদম-সুমারের

হিসাব অভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করাই কি সরকারের কর্ত্তব্য নহে ?

উজীরি বুদ্ধি

কিন্তু বাঙ্গালায় যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে,—তাহাতে ইহার প্রতিকার হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। বাঙ্গালায় যাঁহারা এই গণনা-কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন,—তাঁহারা এতই সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রভাবিত যে, তাঁহারা আসল কথাটা ধামা-চাপা দেওয়ারই চেষ্টা করিয়াছেন,—কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে গণনার কার্য্য পরিচালনার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। বাঙ্গালা সরকারের প্রধান উজীর মৌলভী ফজলুল হক ছায়েব আসল কথাই ধামা-চাপা দিয়া বলিয়াছেন—১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গোল-টেবিলের সাব-কমিটীতে তিনি সদস্যরূপে হাজির ছিলেন। সেই বৈঠকে হিন্দু প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন,—কিন্তু তাঁহারা ঐ বৎসরের সেন্সাস-রিপোর্টে ভুল আছে, এমন কোন কথাই বলেন নাই। অতএব হিন্দুদিগের এই উক্তি বে-বনিয়াদ। মূর্খের ন্যায় এইরূপ অপ-সিদ্ধান্ত কেহ করিতে পারে, ইহা দেখিয়া কে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে ? ইহাতে বড় জোর সপ্রমাণ হয়, সরকার কর্ত্তৃক যাঁহাদিগকে গোল-টেবিল সাব-কমিটীতে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাঁহারা আদম-সুমারের হিসাবগুলি ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই, অথবা আলস্য ত্যাগ করিয়া তাহা দেখেন নাই ; সে জন্য পাঁচ ও পাঁচ যোগ করিয়া বারো হইতে পারে না। সেন্সাস-রিপোর্টের হিসাবগুলি ত লুকাইবার উপায় নাই। উহার হিসাবে ভুল যখনই ধরা পড়িবে, তখনই লোক উহাতে আপত্তি করিতে পারিবে। প্রধান সচিব যে ভাবে এই ব্যাপার-সম্পর্কে কথা কহিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি যুক্তিযুক্ত বিচারের মূলনীতিগুলি অবগত আছেন, তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার এই অজ্ঞতা কত দূর নির্লজ্জতার নিদর্শন, তাহা লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় ! তিনি ক্রমাগতই বলিয়াছেন যে, হিন্দু গণনাকারীরা ইচ্ছা করিয়া গণনায় ভুল করিয়াছে ; কিন্তু সে জন্য তিনি কোন হিন্দু গণনাকারীকে ফৌজদারী-সোপরদ্দ করিতে সাহস করেন নাই। তিনি যাহাদের প্রসাদে ও আনুকূল্যে এখনও প্রধান সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা হিন্দুরও বন্ধু নহেন, মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। তাঁহারা আপনাদেরই বন্ধু। প্রধান সচিব বারংবার বলিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশে যদি হিন্দুর সংখ্যাধিক্য ঘটে, তাহা হইলে মুসলমানদিগের সর্ব্বনাশ। তিনি ইহার সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

শিক্ষা-কর ধার্য্য বিষয়ে নোয়াখালিতে, যশোহরে যে সকল তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তিনি এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা কিরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রভাবিত, তাহা বুঝিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হয় না। বাঙ্গালার যে সকল জাতি হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছে, সেন্সাসের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে জড়োপাসক বলিয়া লিখিয়াছেন। ব্রাহ্ম, জৈন প্রভৃতি যাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে তাহা করিতে দেওয়া হয় নাই ; তবে কেহ কেহ হিন্দুসভার নির্দ্দেশক্রমে আপনাদিগের জাতি লিখাইতে চাহেন নাই। কিন্তু জাতির উল্লেখ থাকা উচিত। কারণ, উহার দ্বারা কোন জাতি ক্ষয়িষ্ণু, এবং কোন্ জাতি বর্দ্ধিষ্ণু, তাহা বুঝিবার সুবিধা হয়। বিশেষতঃ, হিন্দুর জাতি-নির্ণয়ে সেন্সাসের গণক, পরিদর্শক প্রভৃতির কি পরিমাণ যোগ্যতা ছিল ? বস্তুতঃ, ব্যাপার যেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস করিয়া মুসলমানদিগকে এবার অনেক বর্দ্ধিত সংখ্যায় দেখাইবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। আদম-সুমারের হিসাবে বিশ্বাস করিবার উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। সরকারী রিপোর্টে এবার ভ্রান্তির মালা ভিন্ন আর কি দেখিবার আশা আছে ? কিন্তু তাহার প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি ? বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা জানিবার জন্য সকলেই আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ভারত-সচিবের বক্তৃতা

বচনপটু ভারত সচিব পুনর্ব্বার বক্তৃতা-ধারা উদ্গিরণ করিয়া বোধ হয় আশা করিয়াছেন, বাক্যকৌশলে তিনি অন্য সকলকেই তাঁহার মতাবলম্বী করিতে পারিবেন। তাঁহার বুঝা উচিত—"Words are men's daughters but

God's sons are things." বুদ্ধিমান লোক কথায় ভুলে না, পরন্তু সম্পাদিত কর্ম্ম দেখিয়াই উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করে। তিনি বলিয়াছেন, "গ্রেট বৃটেন আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে।" আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। ইংরেজ জাতি কতকটা বাহুবলে এবং কতকটা ভাগ্যবলেও এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছেন,—সুতরাং তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। বৃটেনের এই অধিকার স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিকাশ-সাধনের জন্য কার্য্যকরী মূলনীতি (living principle) হইতেছে ন্যায়বিচার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এবং স্বায়ত্ত-শাসন,—উহাই রক্ষা করিবার জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি।"—এ দেশের লোক এই বচনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে একটু ধাঁধায় পড়িবে। এ দেশের লোকের মনে স্বতঃই এই সংশয়ের উদ্ভব হইবে—যে সাম্রাজ্যে সম্প্রদায়ভেদে অধিকার ভেদ করিবার ব্যবস্থা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত, সে সাম্রাজ্যে কি ন্যায়বিচার তিষ্ঠিতে পারে? সাম্প্রদায়িকতার সহিত ন্যায়নিষ্ঠার সামঞ্জস্য-সাধন কি সম্ভবপর? ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সত্যাগ্রহীদিগকে কারাগারে প্রেরণ-নীতির সামঞ্জস্য কোথায়? সত্যাগ্রহীদিগের কার্য্য সকলে সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের উক্তিতে এমন কিছু আছে কি—যে জন্য তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে?

তাহার পর স্বায়ত্ত-শাসনই না কি বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিকাশ-সাধনের সক্রিয় মূল নীতি। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে বৃটিশ সরকার সকল দলের ভারতবাসীকে একযোগে তাহাদের শাসন-যন্ত্রের পরিকল্পনা করিবার অধিকার প্রদানে অসম্মত হইতেন না। তিনি কি মনে করেন—ভারতবাসীরা এতই নির্ব্বোধ যে, তাহারা তাঁহার বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া পাকা মাকালকে সুপক্ক রসাল বলিয়া ভ্রম করিবে? তিনি বলিয়াছেন, ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান, বা তাঁহাদের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান করিয়া বৃটিশের সমকক্ষ করাই তাঁহাদের ভারত-শাসনের মূল নীতি।—বাঙ্গালায় একটা প্রবচন আছে, বিশ্বকর্ম্মা যে কত বড় ওস্তাদ মিস্ত্রী, তাহা জগন্নাথের মূর্ত্তি নির্ম্মাণেই সুপ্রকাশ। কাজ দেখিয়াই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। ভারতবাসীকে সত্যই যদি তাঁহাদের স্বায়ত্ত-শাসন প্রদানের সঙ্কল্প থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনকে ঐ ভাবে বিধিবদ্ধ করিতেন না। যাহা হউক, ভারত সচিব এখন কিছু দিন মৌন থাকিলেই শোভন হয়; কিন্তু যিনি মনে করেন, বাচালতাই রাজনীতির অঙ্গ, তিনি কি মৌন থাকিতে পারিবেন? বরং অন্য সকলে এই ভাবিয়া মৌন থাকিতে পারেন যে, "দদ্দুরা যত্র বক্তারঃ তত্র মৌনং হি শোভনম্।"

—

সিংহলে ভারতবাসী

সিংহলের অধিবাসীরা ভারতবাসীদিগকে লঙ্কা-ছাড়া করিবার জন্য আদা-জল খাইয়া লাগিয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসীরা সিংহলে যাইয়া উহার উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, সিংহলবাসীদের তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ভারতবাসীদিগকে এখন তাহারা বিষদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের অনেকেই এখন ভারতবাসীদিগকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করে। সম্প্রতি সিংহলের মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতবাসীর প্রতিকূলে কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তথাকার বোর্ড অব মিনিষ্টারস্ বা মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতবাসীর প্রতিকূলে যে সকল আইন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সিংহলের বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তা সার এণ্ড্রু কাল্‌ডেকাট তাহাতে সম্মতি দিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন; তাহার ফলে মন্ত্রিবর্গের মধ্যে ভীষণ কলরব আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণর মন্ত্রি-পরিষদকে জানাইয়াছেন—যে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের চেষ্টা হইতেছে, তাহাদের অনেকগুলি বিষয়ই বৃটিশ সরকার এবং সিংহলী সরকার ভারত সরকারকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেই বিষয়ের তালিকাভুক্ত; সুতরাং ঐ বিষয়-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, এ অবস্থায় ঐ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সিংহলী সরকার ভারত সরকারের নিকট দায়ী;—অতএব সিংহলের শাসনকর্ত্তারূপে সার এণ্ড্রু ঐ সকল

আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে, অথবা উহাকে আমল দিতে পারেন না।

সিংহলের শাসনকর্ত্তার এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, তাহা বলাই বাহুল্য। সিংহল সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব সার ব্যারণ জয়তিলক, সার এণ্ডরু কালুডেকাটের এই মন্তব্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সার এণ্ডরুর ঐ উক্তি অত্যন্ত অসময়ে করা হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা ক্ষিপ্রতার সহিত ঐ বিষয়ে আইন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সিংহলে ভারতবাসীদিগের সহিত সিংহলবাসীদিগের এই বিবাদ কিছু দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সিংহল-প্রবাসী ভারতবাসীরা সিংহলবাসীদিগের তুল্য নাগরিক অধিকার লাভ করিতে চাহে। সিংহলবাসীরা তাহাদিগকে সেই অধিকার দিতে সম্মত নহে। গত নবেম্বর মাসে এই বিষয়ে দিল্লী সহরে সিংহলী ও ভারতবাসী সদস্য লইয়া এক পরিষদ বসিয়াছিল। সে পরিষদ ভাঙ্গিয়া যায়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য সিংহলে গিয়াছিলেন, এবং তথায় এক সপ্তাহ ছিলেন। তিনি লঙ্কাবাসীদিগকে এই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যাহারা বুঝিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। এখন সিংহলের দুই জন মন্ত্রী মিষ্টার সেনানায়ক এবং মিষ্টার বন্দরনায়ক ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনে লঙ্কাদগ্ধ ও মধুবন ভঙ্গ স্মরণ করাইবার উপক্রম করিয়াছেন! ইঁহারা উভয়েই দিল্লী পরিষদের সদস্য হইয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা যে ভাবে এই আন্দোলন চালাইতেছেন, তাহাতে অনেকেরই মনে এই আশঙ্কা জাগিতেছে যে, ইঁহাদের কথায় অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সিংহলবাসীরা ক্ষিপ্ত হইয়া প্রবাসী ভারতবাসীদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, এবং তাহার ফলে সিংহলে ঘোর অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিবে; কিন্তু ইহার প্রতিরোধের কোন পন্থাই লক্ষিত হইতেছে না।

সুষ্ঠু উক্তি

ভারতের বর্ত্তমান জঙ্গীলাট এ দেশে নূতন আসিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের দিল্লীস্থিত বৈঠকে বলিয়াছেন, "ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির বে-সরকারী সদস্যদিগকে ভারত-রক্ষায় যেরূপ আগ্রহান্বিত দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমি প্রীতি অনুভব করিতেছি। যে সমস্ত সামরিক তথ্য প্রকাশ করিলে অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা নাই, আমি অতঃপর সেই সকল তথ্য সদস্যদিগকে জানাইয়া দিব, এবং সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বিবেচনা করিয়া দেখিব।" কথাগুলি সরল এবং সহৃদয়তা-প্রকাশক। ভারতের এই নূতন সেনাপতি সার ক্লড অচিনলেক অতঃপর কখন কখন ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন, তবে এই যুদ্ধের সময় তাঁহার কাজের যেরূপ ভীড়, তাহাতে তিনি সভার সকল অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিবেন না। তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সঙ্গত। তিনি ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলে ভারতবাসীও তাঁহাকে প্রকৃত হিতৈষী বলিয়াই মনে করিবে সন্দেহ নাই।

নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক অনাচার

বাঙ্গালার বর্ত্তমান মুসলমান-প্রধান সচিব-সঙ্ঘ সাম্প্রদায়িকতা প্রভাবে কিরূপ কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়া কার্য্য পরিচালন করিতেছেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বহু স্থানের লোক মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলেও অনেকেই সাহস করিয়া অভিযোগ করিতে পারিতেছে না, অথবা অর্থাভাবে, কিম্বা পরিণামে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে—এই আশঙ্কায় নীরবে তাহা সহ্য করিতেছে; এবং নিরুপায় হইয়া ভগবানের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছে। সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালায় নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন, তাহার কিছু-কিছু তিনি সংবাদপত্রের সাহায্যে জনসাধারণের গোচর করিয়াছেন; তবে যে সকল কথা তিনি প্রকাশ করেন নাই, সেগুলির নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; যদি প্রয়োজন হয়, তখন তাহা প্রকাশ করিবেন। শিক্ষাবিস্তারের অজুহাতে কর বসাইয়া এই সচিবের দল মুসলমান-প্রধান স্থানগুলিতে অত্যন্ত দারুণ ভাবে হিন্দু-নিপীড়ন কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহাদের

অধীন হিন্দু সচিবগুলি নির্ব্বাক্ হইয়া স্বধর্ম্মীর প্রতি এই দুঃসহ অত্যাচার উপভোগ করিতেছেন। চাকরীর প্রতি দরদ থাকিলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা চলে কি? তাঁহাদের পক্ষ হইতে সর্ব্বজনবিদিত প্রবচনটি একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া বলা যাইতে পারে, "কাজ কি আমার কথাতে, রামের ঘাড় রহিম ভাঙ্গুক, দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে।"

ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিবৃতিতে হিন্দুদিগকে নিপীড়িত করিবার ১৭ দফা উপায় বা কৌশলের উল্লেখ করিয়াছেন। নারী-নির্য্যাতন হইতে আইনী এবং বে-আইনী ভাবে লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের প্রয়াস পর্য্যন্ত অনেক কৌশলের কথাই বিবৃত হইয়াছে। নোয়াখালি জিলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সংখ্যার ৪ গুণ অধিক বলিয়াই প্রচারিত। কিন্তু ঐ জিলার সমস্ত হিন্দুকে শিক্ষাকর বাবদ যত টাকা দিতে হইবে ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহার দশ ভাগের এক ভাগ করও মুসলমানদিগকে দিতে হইবে বলিয়া ধার্য্য হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ একটা ব্যাপারের উল্লেখই যথেষ্ট। নোয়াখালি-কুমিল্লার অন্তঃপাতী রাইপুর থানা। ৪নং বোর্ড কর্ত্তৃক ঐ থানার অধিবাসীদিগের উপর শিক্ষাকর ধার্য্য করা হয়। ধার্য্য করের পরিমাণ ৮ শত ৯০ টাকা; তন্মধ্যে হিন্দুদিগকে দিতে হইবে ৮ শত ১২ টাকা, আর মুসলমানদিগকে দিতে হইবে কেবলমাত্র ৭৮ টাকা! অথচ বলা হয় —ঐ অঞ্চলের হিন্দুদিগের সংখ্যা মুসলমানদিগের সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ। মুসলমানদিগের আর্থিক অবস্থা হিন্দুর অবস্থা অপেক্ষা হীনও নহে। কতকগুলি স্থানীয় লোক অসহ্য বোধে এই অন্যায়-অসঙ্গত করধার্য্যের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে প্রতিকার-প্রার্থী হইলে, দেওয়ানী আদালতের বিচারক এক জনের উপর ধার্য্য কর অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে বলিয়া সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিয়াছেন; আর এক জনের উপর ধার্য্য কর ১০০ টাকা স্থানে ১৮ টাকা, এবং আর এক জনের উপর ধার্য্য কর ১০০ টাকার স্থানে ২০ টাকা করা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বোর্ড কর্ত্তৃক ধার্য্য কর হিন্দুদিগের উপর কিরূপ সামঞ্জস্যবর্জ্জিত ও কঠোর হইয়াছে। সকলে অর্থব্যয়ের ভয়ে এবং অবসরের অভাবেও আদালতে প্রতিকার-প্রার্থী হইতে পারে না। তাহার উপর এই রকম খামখেয়ালীর পরিচয় পাইয়া অনেকে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ভিন্ন নারী-নিপীড়ন, মুসলমান পুলিস-দারোগা কর্ত্তৃক হিন্দু-গৃহস্থের বাড়ী অবরোধ প্রভৃতি অভিযোগ আছেই,—তাহারও নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার গবর্ণর সার জন হার্ব্বার্টকে আমাদের অনুরোধ—তিনি অবিলম্বে এই বিষয়টি নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য জানিবার চেষ্টা করুন। সচিববৃন্দ সরকার নহেন,—তিনিই সরকার, ইহাই হাই-কোর্টের রায়। তিনি যদি কুমন্ত্রী কর্ত্তৃক চালিত হন, তাহা হইলে সে দায়িত্ব তাঁহারই। এই প্রদেশের শাসনকার্য্যের নৈতিক-দায়িত্ব এবং বৈধ-দায়িত্ব তাঁহারই। সাম্প্রদায়িকতা-প্রভাবে দেশে যে অশান্তির অনলশিখা পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তৎপ্রতি অবিলম্বে তাঁহার অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার লইয়াছিলেন; তাহার কারণ, উক্ত কোম্পানী যোগ্যতার সহিত শাসন-কার্য্য পরিচালিত করিতে পারেন নাই। আজ বেসরকারী কতকগুলি ইংরেজ বণিকের সহায়তায় এবং সমর্থনে যে সচিবসঙ্ঘ পদস্থ রহিয়াছেন, তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিড়ম্বিত শাসনের ফল কিরূপ শোচনীয় হইতেছে, তাহা সার জন হার্ব্বার্ট নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিবেন, দেশের হিন্দু অধিবাসিগণ তাঁহার নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সার এণ্ড্রু ইউলের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ ইংরেজ বণিক এ কালে এ দেশে অল্পই আসিতেছেন; সেই জন্য বাঙ্গালার ভাগ্যে আজ এইরূপ দুর্দ্দশা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতায় মুসলমান জনতার দাঙ্গা

গত ২৬শে মাঘ শনিবার মধ্যাহ্নে মহরমের একটি তাজিয়ার শোভাযাত্রা পরিচালন কালে তাজিয়া রাজাবাজার ট্রাম-ডিপোর নিকট উপস্থিত হইলে কতকগুলি মুসলমান সেই পথের ঊর্দ্ধস্থিত ট্রাম-লাইনের বৈদ্যুতিক তার অপসারিত করে। গত ২৮শে মাঘ সোমবার কলিকাতার পুলিশ এই সম্পর্কে রাজাবাজার অঞ্চলে সাহেব-বাগান বস্তি হইতে প্রায় ৭০ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করায়

রাজাবাজার, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমানদিগের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা লক্ষিত হয়। তাহারা ধৃত ব্যক্তিগণের মুক্তির দাবী করে। ক্রমশঃ জনতা বর্দ্ধিত হয়। প্রকাশ, জনতার ভিতর হইতে অনেকে পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল প্রভৃতি নিক্ষেপ করায় কয়েক জন পুলিশ কনষ্টেবল ও সার্জ্জেণ্ট আহত হয়, এবং ১২ জনকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পুলিশও লাঠি চালাইয়াছিল; এবং প্রধান সচিব মৌলবী ফজলুল হক ও পররাষ্ট্র-সচিব খাজা সার নাজিমুদ্দীন উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, প্রধান সচিবকে আক্রান্ত হইবার ভয়ে স্থানত্যাগ করিতে হয়, এবং পররাষ্ট্র-সচিব খাজা সাহেব না কি কিঞ্চিৎ আস্বাদন-গুরুত্বে অসুস্থ হওয়ায় এক মাস ছুটী লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

যাহা হউক, জনতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। রাজাবাজারের ষোল জন ট্রাম-কর্ম্মচারী অল্প-বিস্তর আহত হইবার সংবাদ পাওয়া যায়। জনতার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরে ৫ জন পুলিশ সার্জ্জেণ্ট, ১৪ জন কনষ্টেবল, ট্রামের একজন ফিরিঙ্গী ইনস্পেক্টর ও আরও কয়েক জন আহত হয়। রাজাবাজার ট্রামডিপোও জনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজাবাজার অঞ্চলে ট্রাম-চলাচল স্থগিত ছিল। অবশেষে পুলিশ গ্যাস-কার্ত্তুজের গুলী বর্ষণ ও লাঠী-চালনা দ্বারা জনতা ছত্রভঙ্গ করে। ৯৬ জনকে আততায়ী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু অবশেষে সকলকেই জামিনে মুক্তিদান করা হয়। দাঙ্গা করিবার অভিযোগে কতকগুলি মুসলমানকে ফৌজদারী-সোপরদ্দ করা হয়, কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, এই মামলা সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই! এ কিল খাইয়া কিল চুরি কি না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে প্রধান সচিব মৌলবী ফজলুল হককে জিজ্ঞাসা করা হয়—যাহাদের ফৌজদারী-সোপরদ্দ করা হইয়াছে, তাহাদের মামলা সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহার কারণ কি? কিন্তু প্রধান সচিব সম্পূর্ণ তুষ্টিভাব অবলম্বন করিয়াছেন, এবং খাজা নাজিমুদ্দীন ছুটী লইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়া সুস্থ হইতেছেন। পুলিশকে যাহারা আক্রমণ করিয়া আহত করিল, তাহাদের কিরূপ দণ্ড হয়, তাহা জানিবার জন্য জনসাধারণ উৎসুক রহিয়াছে, কিন্তু ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়িল কি না, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। যদি এই দাঙ্গার আসামীরা হিন্দু হইত, তাহা হইলে মামলার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত?

টাউন হলে বিরাট সভা

বাঙ্গালা সরকারের প্রধান সচিব মিষ্টার ফজলুল হক বাঙ্গালার হিন্দুদিগকে যেরূপ বে-পরোয়া ভাবে আক্রমণ করিতেছেন, তাহার প্রতিবাদজ্ঞাপনের জন্য গত ২২শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে কলিকাতার টাউন হলে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদিগের অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এই সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সার নৃপেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় অন্যান্য কথার পর বলেন, "……আপনাদের মনোভাব প্রকাশের ভার আমার উপর পড়িয়াছে। এই অপ্রীতিকর কিন্তু অনিবার্য্য আলোচনায় যোগদান আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় নহে। এই সভার বিবেচ্য বিষয় খুব সঙ্কীর্ণ। আদমসুমারী সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবহার, বাঙ্গালার সচিব-সঙ্ঘ সম্বন্ধে অনুযোগ অথবা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল বিষয়ের জন্য বাদ-প্রতিবাদ হইতেছে, এ সকল বিষয় আমি আলোচনা করিব না। আপাততঃ আমরা কেবল মিঃ ফজলুল হকের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

"প্রধান সচিব অন্যূন ৯টি বিবৃতি দিয়াছেন। গত ২রা মার্চ্চ তিনি যে বিবৃতি দেন, তাহার এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, 'যাহাতে হিন্দুর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া দেখান যায়, সে জন্য যখন ব্যবহারাজীবরা, বৈজ্ঞানিকগণ, অধ্যাপকবৃন্দ, জমিদারগণ, ব্যবসায়ীরা, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণগণ, এবং নানা সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়গুলি মিথ্যা কথা বলিবার ও মিথ্যা বিবৃতি দিবার জন্য একত্র মিলিত হইয়াছে, তখন আর কি হইতে পারে?'—যে ভাবে এই কথাগুলি তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে আদম-সুমারীর সহিত সংস্পৃষ্ট সকল ব্যক্তিকেই সমান ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে।

"এই বিবৃতি আমি যখন পাঠ করি, তখন দায়িত্বপূর্ণ

পদের কোন সরকারী কর্ম্মচারী যে এইরূপ বিবৃতি প্রদান করিতে পারেন—সে বিশ্বাস আমি করিতে পারি নাই। ঐ সকল কথার পরই ঐ বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, যাঁহারা যুব সমাজের শিক্ষাপ্রদান কার্য্যে তাঁহাদিগের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা বিবেকের তিলমাত্র তাড়না অনুভব না করিয়া মিথ্যা বিবৃতি দিতেছেন, মুসলমানদিগের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কম দেখাইবার জন্য প্রবঞ্চনা, মিথ্যা উক্তি প্রভৃতির সাহায্য লইতেছেন—



সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

এ সকল আমি যখন দেখিতেছি, তখন ইহা অপেক্ষা ভাল কিছুর আশা আমি আর কি করিয়া করিতে পারি' ?"

সার নৃপেন্দ্রনাথ প্রধান সচিবের দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবৃতির দীর্ঘ আলোচনা করিয়া বলেন, "আজাদে মৌলবী ফজলুল হকের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি মুসলমানদিগকে এই কথা স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন যে, আদম-সুমারীর মধ্য দিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের সম্প্রদায়কে যেরূপ কার্য্যকরী ভাবে সাহায্য করিতে পারেন, সেরূপ করিবার সুযোগ আর না আসিতে পারে। হিন্দুরা কোন প্রতারণামূলক কার্য্য বা জাল করিলে তাঁহারা যেন তাহা ৮৮।২ ঝাউতলা রোডে জানান, কিন্তু লক্ষ্য করিবেন—তিনি মুসলমানদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহারা যেন নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার জন্য হৃদয়ের রক্ত দেন, ফলাফলের জন্য ভীত না হন।

"শিক্ষিত মৌলবীগণ হয় ত ইহা ভাষার অলঙ্কার প্রয়োগ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু অজ্ঞ ও বিবেচনা-বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণের মনে অনায়াসে এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইতে পারে। তাহারা ভাবিতে পারে যে, ইহার হয় ত ভীষণতর কোন অর্থ আছে।…এ পর্য্যন্ত যদি রক্তপাত না হইয়া থাকে—তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের সুবুদ্ধির জন্যই তাহা হয় নাই। মিঃ হকের বিবৃতির ফলে এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি হইতে পারে না—ইহা মনে করা ভুল।

"মিঃ ফজলুল হক তাঁহার প্রলাপোক্তির কারণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, 'আমার বিশ্বাস বাঙ্গালার মুসলমানদিগের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩০ জন এবং হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৬০ জনের কিছু অধিক হইবে।'

"…মুসলমানরা তাহাদিগের সংখ্যা অযথা বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া হিন্দুগণও অভিযোগ করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু দায়িত্বসম্পন্ন কোন হিন্দুই সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই। কেহই এমন কথা বলেন নাই যে, তাঁহাদিগের উকীল, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, জমীদার ও ব্যবসায়ীরা সাধুতা বিসর্জ্জন দিয়া প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় লইয়াছেন।

"…মিঃ ফজলুল হক মানহানি আইন হইতে সযত্নে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতেছেন। শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচার সম্পর্কেও তিনি ইহা ভাল করিয়াই জানেন যে, তাঁহার নিজ সরকারের অনুমতি ব্যতীত তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হইতে পারে না।—সুতরাং এই সভায় যে মনোভাব ব্যক্ত হইবে, তাহার প্রতি কতটুকু দৃষ্টিদান করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

"হয় ত তিনি আপনাদিগের বক্তব্যে কর্ণপাত করিবেন না, কিম্বা হয় ত যে সরল অর্থে কথাগুলি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, নহে ত গুরুতর আকারে সেগুলি পুনরাবৃত্তি করিবেন।

"...মিঃ ফজলুল হকের আচরণের নিন্দা ব্যতীত আমরা আর কি করিতে পারি ? অবশ্য এই কথা ভাবিয়া আমরা দুঃখিত হইতে পারি যে, গভর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া মিঃ হকের চাপরাসীদিগের মধ্যেও এমন এক জন লোক নাই যে, তাঁহাকে ফলপ্রদ উপদেশ দান করিতে পারে। একান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন অনাবশ্যক ভাবে বিরক্তি উৎপাদনকারী এক ব্যক্তি যে দায়িত্ব-সম্পন্ন সরকারের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাও আমাদিগের দুঃখের আর একটি কারণ।"

"...তিনি গভর্ণরের অনুগ্রহে সচিবত্ব করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যভার হইতে নিষ্কৃতি দান করাই উচিত হইবে এবং তাহাতে বাঙ্গালা প্রদেশের শান্তির অন্তরায়ও দূর হইবে।"

এই সভার পর বাঙ্গালার গভর্ণর ব্যবস্থাপক পরিষদ ও সভার নেতৃবর্গকে একটি বৈঠকে আহ্বান করিয়াছেন।

ভূমিকুমার দত্ত পরলোকে

ভূমিকুমার দত্ত (বি, দত্ত) সুপ্রতিষ্ঠিত কে, পি, রেস্তোরাঁর স্থাপয়িতা, এতদ্ভিন্ন তিনি বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাপন্ন ফটোগ্রাফারগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। গত ১লা মার্চ্চ শনিবার রাত্রিকালে তিনি ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার ডায়মণ্ডহারবার রোডস্থ ভবনে প্রাণত্যাগ করায় আমরা মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিয়াছি। তিনি উদার-প্রকৃতি, স্বাবলম্বী এবং সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বিধবা পত্নী, ছয় পুত্র, দুই কন্যা ও বহু পৌত্র-পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।



ভূমিকুমার দত্ত

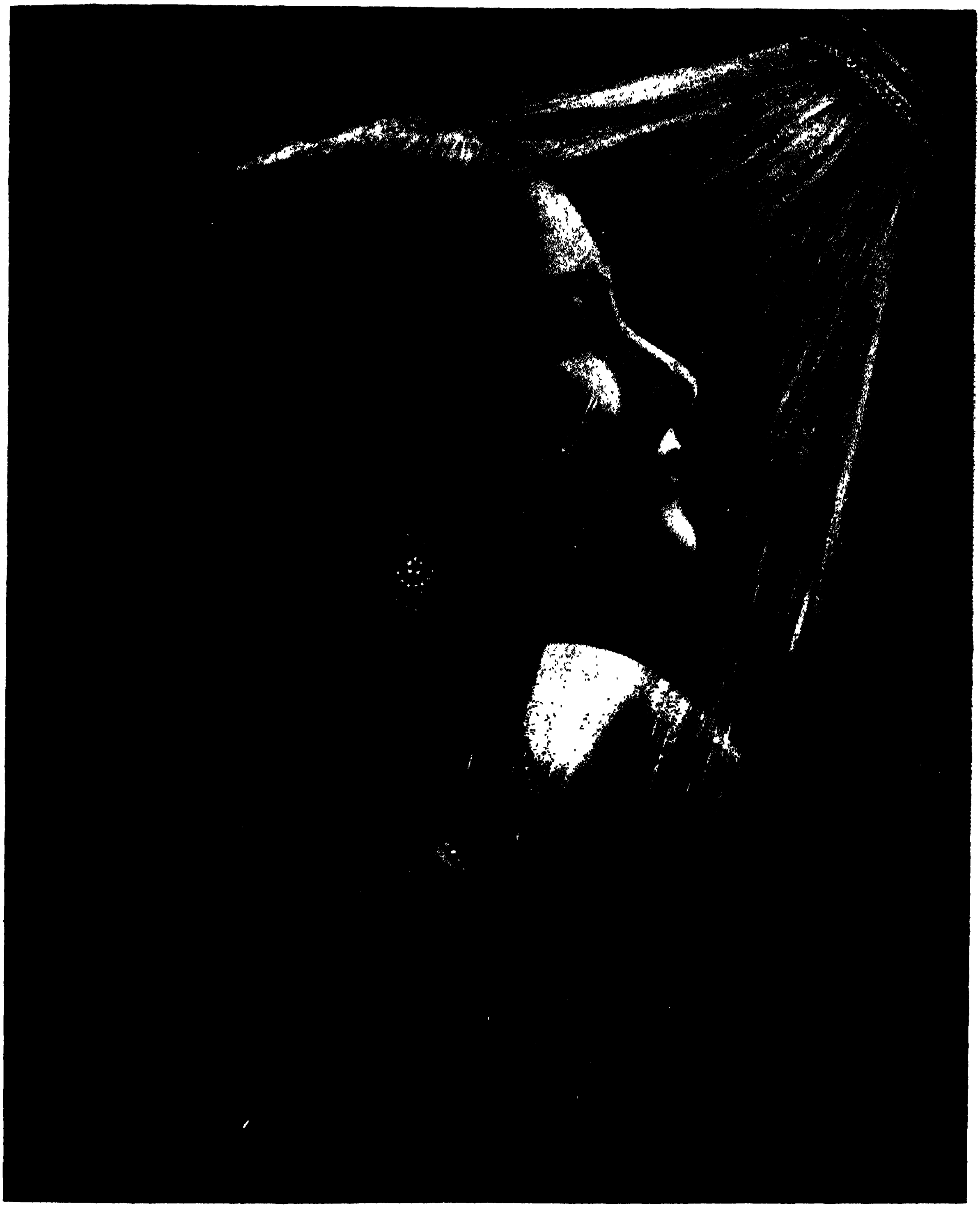


রাজা জানকীনাথ রায়

রাজা জানকীনাথ রায়

ঢাকা-ভাগ্যকুলের সুপ্রসিদ্ধ রায় পরিবার বাঙ্গালার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বহু দিন হইতেই শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ে তাঁহারা বিপুল সম্পদের অধিকারী। রাজা শ্রীনাথ রায়, রাজা জানকীনাথ ও রায় বাহাদুর সীতানাথ রায় তিন ভ্রাতা দীর্ঘকাল হইতেই তাঁহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন। রাজা শ্রীনাথ ও রায় বাহাদুর সীতানাথ পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; সংপ্রতি ইঁহাদের মধ্যম সহোদর রাজা জানকীনাথ ৯৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। রাজা জানকীনাথ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে ব্যবসায়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই সুদীর্ঘকাল সাফল্যের সহিত তাঁহাদের বিস্তীর্ণ ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের 'ইষ্টবেঙ্গল রিভার ষ্টীম সার্ভিস লিমিটেড' বাঙ্গালীর অনুষ্ঠিত জাহাজের ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। ইঁহারা 'প্রেমচাঁদ জুটমিল' নামক পাটের কল প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সংপ্রতি 'ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক' নামক একটি ব্যাঙ্কও খুলিয়াছেন। বাঙ্গালার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অগ্রণী রাজা জানকীনাথের অভাব দীর্ঘকালেও পূর্ণ হইবে না। তাঁহার দুই যোগ্য পুত্র পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার একমাত্র যোগ্য পুত্র বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ঝর্ণা-ধারায়

শিল্পী—মিষ্টার টমাস



১৯শ বর্ষ]　　চৈত্র, ১৩৪৭　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে—কুমারিল-মতে জগৎ-সৃষ্টি ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশ্যে কল্পিত হয় নাই, এমন কি উহা তাঁহার ক্রীড়ার্থও নহে। অপক্ষপাতী বিচারক যেরূপ কেবল আইন অনুসারে ন্যায়সঙ্গত বিচার করিতে বাধ্য, ঈশ্বরও সেইরূপ পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া কেবল জীবগণের কৃত কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া।

কিন্তু অধ্যাপক কীথ ও মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা উভয়েই বলিয়াছেন, ঈশ্বরের পক্ষে এবংবিধ অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভবপর নহে। অধ্যাপক কীথের উক্তি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ঝা মহোদয়ের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'নৈয়ায়িকগণ সাধারণতঃ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন—আমাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের এক জন অধিষ্ঠাতা থাকার বিশেষ প্রয়োজন; আর সেই অধিষ্ঠাতা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্—ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। এই যুক্তির কোন বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে ইহার অনুকূল যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্যভূত শরীরই ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় স্থল; অতএব শরীর যাঁহার, ধর্ম্মাধর্ম্মও সেই চেতন শরীরীর। এই কারণে কোন এক চেতনের পক্ষে (তা তিনি যতই বুদ্ধিমান্ হউন না কেন) অন্য কোন চেতন শরীরি-কৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে। অতএব, লোকাতীত (সৃষ্ট জগৎ হইতে ব্যতিরিক্ত) ঈশ্বরের পক্ষে মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদিরূপে উৎপদ্যমান জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান থাকা অসম্ভব; আর এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে জীবের উপর ঈশ্বরের বুদ্ধিপূর্ব্বক অধিষ্ঠাতৃত্ব বা নিয়ামকত্বও সম্ভব হইতে পারে না। ঈশ্বর তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না; কারণ, ধর্ম্মের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম—উহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ। আবার ঈশ্বরের পক্ষে ধর্ম্মের কেবল মানস-প্রত্যক্ষও অসম্ভব; কারণ, ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, কেবল মনের দ্বারা মনের আধারভূত দেহের বহির্ভাগে অবস্থিত পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। জীবগণ বিশ্বমধ্যে উৎপত্তিলাভ করিতেছে বলিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম সৃষ্ট জগতেই সমাশ্রিত। আর ঈশ্বর লোকাতীত বলিয়া তাঁহার দেহও লোকবহির্ভূত—আর সেই হেতু

তাঁহার দেহ-পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণও লোকবাহ্য। অতএব পূর্ব্বকথিত সিদ্ধান্তানুসারে লোকবাহ্য ঈশ্বরান্তঃকরণ লোকান্তর্গত জীব-ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া ধর্ম্মাধর্ম্মের উপর ঈশ্বরের যে অধিষ্ঠাতৃত্ব (নৈয়ায়িকগণ-কর্ত্তৃক) স্বীকৃত হইয়াছে, সেই অধিষ্ঠাতৃত্বের স্বরূপও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। এ অধিষ্ঠাতৃত্ব 'সংযোগ'-রূপ হইতে পারে না। কারণ, সংযোগ-সম্বন্ধ কেবল দ্রব্য-পদার্থ-সমূহের মধ্যেই থাকা সম্ভব; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম গুণ-স্বরূপ হওয়ায় উহাদিগের সহিত সংযোগ-সম্বন্ধের কথাই উঠে না। পক্ষান্তরে, এই অধিষ্ঠাতৃত্ব 'সমবায়'-স্বরূপ হওয়াও অসম্ভব। কারণ, জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম জীব-সমবেত—ঈশ্বরে সমবেত নহে। (১)

কিন্তু আমাদিগের মনে হয় না যে, অধ্যাপক কীথ বা মহামহোপাধ্যায় ঝা মহোদয় যে ভাবে মীমাংসক-মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহাই যথার্থ মীমাসা সিদ্ধান্ত। ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব বলিতে বুঝায় জীব-কৃত ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানের পর্য্যবেক্ষণ। এ স্থলে 'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্ম' শব্দদ্বয় মীমাংসক-মতে 'অপূর্ব্ব' (২) বুঝাইতেছে না; এ ক্ষেত্রে 'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্ম' শব্দের অর্থ—লোক-বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের ও নিষিদ্ধ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান। এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠান পুরুষবিশেষের দ্বারা সাধিত হইলেও অন্য পুরুষের প্রত্যক্ষ গোচর হইতে পারে,– অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ হইলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষযোগ্য। অতএব, একথা বলা অনুচিত যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রত্যক্ষযোগ্য নহে।

যদি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলিতে 'অপূর্ব্ব' না বুঝায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বের স্বরূপ আরও একটু বিশ্লেষিত করিয়া দেখা প্রয়োজন। ঈশ্বর জীব-কৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কার্য্যের প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। একবার ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইলে উহার সংস্কার তাঁহার চিত্তে চিরদিন বর্ত্তমান থাকে। যথাকালে তিনি সেই সংস্কার-জনিত স্মৃতির সাহায্যে প্রত্যেক জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া যথাযোগ্য ফলদানরূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। (৩) গাগাভট্ট (বিশ্বেশ্বর সুধী) তাঁহার 'ভাট্টচিন্তামণি'তে এই বিষয়ের বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে নৈয়ায়িক মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—'সমগ্র বস্তুজাত তিন শ্রেণীতে

---

(১) "Nor is there any force in the Logician's arguments that our Dharma-Adharma must have for a supervisor a being possessed of intelligence higher than our own. Because the Dharma-Adharma of the body that is the product of these must always belong to the same intelligent being to whom the body belongs; any being, howsoever intelligent, can never have any knowledge of the Dharma-Adharma of any other being; hence the ultra-mundane 'God' can have no knowledge of the Dharma or Adharma of the beings born as men, animals, etc, and without such knowledge he could not exercise any intelligent control over them; 'God' could not perceive Dharma by his senses, as Dharma is absolutely imperceptible; nor could he perceive it by his mind alone, as the mind by itself cannot perceive things outside the body, and the Dharma of all beings born in the world would always be outside the body occupied by the mind of the perceiving person, 'God.'

Then, again, it becomes necessary to examine the character of the 'supervision' that 'God' is said to exercise over Dharma and Adharma. (a) This supervision cannot be of the nature of contact or conjunction, because Dharma and Adharma being qualities are not capable of conjunction, which is possible for substances only. (b) Nor could it be in the form of Samavāya or inherence, as the Dharma-Adharma inhering in other souls could not inhere in the God."—Indian Thought, Vol II, pp. 259-60.

'পূর্ব্ব প্রবন্ধে (ফাল্গুন ১৩৪৭) বলা হইয়াছে যে—নৈয়ায়িক-মতে কেবল দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যেই 'সংযোগ' সম্বন্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতির মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ থাকে না—থাকে 'সমবায়' সম্বন্ধ।

(২) কর্ম্ম অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ সকল সময়ে কর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যবহিত পরক্ষণেই ফল উৎপন্ন হয় না। এ কারণে মীমাংসকগণ কর্ম্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে 'অপূর্ব্ব' স্বীকার করিয়াছেন। ইহাকে কর্ম্মের পরবর্ত্তী সূক্ষ্মাবস্থা, অথবা ফলের পূর্ব্বাবস্থা বলা হইয়াছে। "ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূর্ব্বং কর্ম্ম বিনশ্যৎ কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোত্যতঃ কর্ম্মণো বা সূক্ষ্মা কাচিদুত্তরাবস্থা ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থাঽপূর্ব্বং নামাস্তীতি তর্ক্যতে"।—ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্য ৩।২।৪০। এই 'অপূর্ব্ব' অতীন্দ্রিয়—প্রত্যক্ষের অযোগ্য; কিন্তু অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম তদ্রূপ নহে।

(৩) মীমাংসক-সিদ্ধান্তে এক সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি বা প্রলয় স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু খণ্ড খণ্ড রূপে প্রতিক্ষণেই সৃষ্টি-প্রলয় চলিতেছে—ইহাই মীমাংসা-মত। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে জীবগণ যে বিচিত্র ফলভোগ করে, ইহাই মীমাংসক-সম্মত সৃষ্টির রূপ।

বিভক্ত—(১) যাহাদিগের কর্ত্তা কোন চেতন—এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই, যেমন ঘট প্রভৃতি ; (২) যাহাদিগের চেতন কর্ত্তা দৃষ্টিগোচর হয় না, যেমন আকাশ প্রভৃতি (৪) ; ও (৩) যাহাদিগের কর্ত্তা চেতন কি না—সে বিষয়ে মতভেদ আছে, যথা বৃক্ষাদি। এই তৃতীয় শ্রেণীর বস্তু সাবয়ব, অতএব অবয়ব-সংযোগে উৎপাদ্য—কার্য্য দ্রব্য। কার্য্য দ্রব্যমাত্রেরই কর্ত্তা ও হেতু (কারণ) থাকা একান্ত প্রয়োজন। [দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যায় যে, ঘট সাবয়ব কার্য্য দ্রব্য, এ হেতু উহার একটি স্বতন্ত্র কর্ত্তা ও বিভিন্ন প্রকার কারণ আছে। স্বতন্ত্র কুম্ভকার উহার কর্ত্তা, মৃত্তিকা উহার উপাদান কারণ, কুম্ভকারের ইচ্ছা উহার নিমিত্ত কারণ (৫), কপাল-কপালিকা (ঘটের অবয়ববিশেষ) উহার সমবায়ি-কারণ ও কপাল-কপালিকার সংযোগ উহার অসমবায়ি-কারণ।] এই দৃষ্টান্ত-বলে অনুমান করা সম্ভব যে, পূর্ব্বোক্ত তৃতীয়-শ্রেণীর বস্তুজাতের কর্ত্তা ঈশ্বর। উহাদিগের সমবায়ি-কারণ পরমাণুপুঞ্জ, তাহাদিগের সংযোগ অসমবায়ি-কারণ, স্বতন্ত্র কর্ত্তৃভূত ঈশ্বরের ইচ্ছা, ক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্য জীবাত্মা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম (৬) নিমিত্ত কারণ। সৃষ্টিকালে ঈশ্বরেচ্ছা ও অদৃষ্টকে নিমিত্তরূপে লাভ করিয়া পরমাণুতে প্রথম কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। তাহার পর পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক-সমূহের সংযোগে ত্র্যণুক—ইত্যাদিক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই চারিটি সাবয়ব ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। [একটি পরমাণুর সহিত অন্য একটি পরমাণুর অবশ্য দেশাবচ্ছেদে বা দিগবচ্ছেদে সংযোগ হয়—উহা বর্ত্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক।] নিমিত্তস্বরূপ অদৃষ্টের বৈচিত্র্যবশে ও ঈশ্বরেচ্ছা-জনিত ক্রিয়ার বৈচিত্র্য-হেতু সৃষ্টির বৈচিত্র্যও সম্ভব হইয়া থাকে।'

গাগাভট্ট পূর্ব্বোক্তরূপে ন্যায়মতানুসারিণী সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—'এই প্রকার মত যুক্তিযুক্ত ও মীমাংসকগণ ইহার সমর্থন করেন। তবে কোন কোন স্থলে একটু আধটু পার্থক্য আছে। যেমন—ইচ্ছা যে কার্য্যের জনক হইতে পারে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। ইচ্ছা আত্মাতে প্রযত্ন (বা কৃতি) উৎপন্ন করে মাত্র—এতদ্ব্যতীত ইচ্ছা অন্য কার্য্য উৎপাদন করে না। ইচ্ছা ও অচেতন পদার্থ। অতএব উহা স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না। কারণ, অচেতনের স্বতঃ ক্রিয়াহেতুত্ব অনুভবসিদ্ধ নহে। এইরূপ মত স্বীকার করিলে অত্যন্ত কল্পনাগৌরব হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অচেতনকে ক্রিয়াজনক যদি স্বীকার করিতেই হয়, তবে ঈশ্বরেচ্ছার পরিবর্ত্তে অদৃষ্টকেই নিমিত্ত বলা উচিত। কারণ, অদৃষ্টকে হেতু স্বীকার করা ছাড়া যখন নৈয়ায়িকগণও গত্যন্তর খুঁজিয়া পান না, তখন ঈশ্বরেচ্ছা ও অদৃষ্ট—উভয়কে নিমিত্ত স্বীকার না করিয়া কেবল অদৃষ্টকে নিমিত্ত স্বীকার করিলেই উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধিত হইয়া থাকে। অতএব, ধর্ম্মাধর্ম্মই ক্রিয়াজনক—ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতি নহে।' অবশ্য এ প্রসঙ্গে পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন—"স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন—'বহু হইব') (৭) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ঈশ্বরেচ্ছার অস্তিত্ব ও তাহার কার্য্যজনকত্বের প্রতি প্রমাণ। ইহার উত্তরে বলা চলে যে, পূর্ব্বপক্ষী নৈয়ায়িক যেমন "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।১—'আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল') ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আকাশের উৎপত্তি-কথা শ্রুত থাকিলেও উহাদিগের যথাশ্রুত অর্থ স্বীকার না করিয়া 'লক্ষণা' স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ মীমাংসকমতেও 'ঈক্ষণ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ইচ্ছা' বা 'সঙ্কল্প' স্বীকৃত না হইয়া উহার লাক্ষণিক অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে। আর ঈক্ষণের সে লাক্ষণিক অর্থ 'অদৃষ্ট'।'

বলা বাহুল্য, এ স্থলে গাগাভট্ট দেখাইয়াছেন যে, মীমাংসকমতে ঈশ্বরেচ্ছা সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি ত অস্বীকার করেন নাই। কারণ, তিনি নিজ মুখেই স্বীকার

(৪) নৈয়ায়িক মতে আকাশ নিরবয়ব—উহার পরমাণু নাই। এই মতই সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। মতান্তরে, আকাশেরও পরমাণু কল্পিত হইয়া থাকে ; কিন্তু সে মত তত প্রচলিত নহে।

(৫) বেদান্তাদি সম্প্রদায়ে কর্ত্তাই নিমিত্ত-কারণরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত ও মৃত্তিকা উপাদান। এ মতে নিমিত্ত অচেতন হইতেই পারে না।

(৬) ধর্ম্মাধর্ম্মই 'অদৃষ্ট' নামে কথিত হইয়া থাকে।

(৭) "স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"—ঠিক এইরূপ শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায় না। ছান্দোগ্যে (৬।২।৩) পাওয়া যায়—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।" তৈত্তিরীয়ে (২।৬) পাওয়া যায়—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি।

করিয়াছেন যে, অচেতনের ক্রিয়াজনকত্ব কদাপি অনুভবসিদ্ধ নহে। অতএব, ধর্ম্মাধর্ম্ম সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বরাধিষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টি-নিমিত্ত—কেবল ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে বা স্বতন্ত্র ঈশ্বরেচ্ছাও নহে। এ কারণে শ্রুতিতে বর্ণিত ঈশ্বরের 'ঈক্ষণ' বা 'কামনা' প্রভৃতি শব্দ ঈশ্বরেচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বুঝায় না, পরন্তু ঐ সকল শব্দ ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বেরই ইঙ্গিত করিয়া থাকে।

যদি এ কথা বলা যায়—মীমাংসকগণ যখন ধর্ম্মাধর্ম্মকেই সৃষ্টির নিমিত্ত বলিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের মতে যে অধিকন্তু ঈশ্বরও স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার অনুকূল স্পষ্ট কোনও প্রমাণ আছে কি? উত্তরে বলা চলে, গাগাভট্টের উক্তিই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি বলিয়াছেন—উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহে 'ঈক্ষণ' বা তৎসজাতীয় শব্দঘটিত পদগুলির 'অদৃষ্ট'-রূপ লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তিনি কুত্রাপি বলেন নাই যে, ঈশ্বরবাচক 'তৎ' বা 'স' (তিনি) পদগুলিতেও লক্ষণা প্রযোজ্য। অতএব দাঁড়াইতেছে এই যে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসক-সম্প্রদায়ের অস্বীকার্য্য নহে; তবে একটা কথা—নৈয়ায়িক-মতে যেমন ঈশ্বরের স্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই সৃষ্টিনিমিত্ত, তাহা মীমাংসকগণ মানিতেছেন না। ঈশ্বর স্বেচ্ছাবশে ও অদৃষ্টসহায়ে জগৎ সৃষ্টি করেন—নৈয়ায়িকগণের এই সিদ্ধান্তের খণ্ডনোদ্দেশ্যে মীমাংসকগণ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, ঈশ্বরেচ্ছা সৃষ্টির নিমিত্ত নহে; কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর ফলদান করিয়া থাকেন, এ কারণে ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টির নিমিত্ত। গাগাভট্টের এই অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে শ্লোকবার্ত্তিকের (৮) উক্তিও স্পষ্ট বোধগম্য হইবে—

"ঈশ্বরেচ্ছা যদীষ্যেত সৈব স্যাল্লোককারণম্।
ঈশ্বরেচ্ছাবশিত্বে হি নিষ্ফলা কর্ম্মকল্পনা ॥ ৭৩ ॥
ন চানিমিত্তয়া যুক্তমুৎপত্তুং হীশ্বরেচ্ছয়া।
যদ্বা তস্যা নিমিত্তং যত্তদ্ভূতানাং ভবিষ্যতি" ॥ ৭৪ ॥

—সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার

ঈশ্বরের সত্তা যে মীমাংসক-সম্প্রদায়ের অস্বীকার্য্য নহে—তাহা গাগাভট্টের অন্য উক্তি হইতেও বেশ বুঝা যায়। প্রলয় সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" (বিধাতা সূর্য্য ও চন্দ্রকে যথাপূর্ব্ব কল্পনা অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন) ইত্যাদি শ্রৌত মন্ত্র হইতে অবান্তর প্রলয় সিদ্ধ হইলেও মহাপ্রলয়ের সিদ্ধি হয় না। বরং নৈয়ায়িকগণ যে অনুমানবলে মহাপ্রলয়ের অস্তিত্ব সাধন করিতে চাহিয়াছেন, উক্ত মন্ত্রাংশটি তাহার বাধক। এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মীমাংসা-সিদ্ধান্তে ধাতা অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরাকৃত হয় নাই, বরং ধাতা যে বিশ্বস্রষ্টা ইহাই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তবে সে সৃষ্টির নিমিত্ত স্রষ্টার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নহে, অদৃষ্ট মাত্র—ইহাই বিশেষ। (৯)

এই প্রসঙ্গে আর একবার পুনরুক্তি করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অধ্যাপক কীথ ও মহামহোপাধ্যায় ঝা মহোদয় যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেই যুক্তিগুলি ভট্টপাদ ন্যায়-বৈশেষিক-সিদ্ধান্ত-সম্মত ঈশ্বরেচ্ছার নিমিত্তত্ববাদ-খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ

(৮) মাসিক বসুমতী—ফাল্গুন, ১৩৪৭, মদীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৯) "ত্রিবিধং বস্তুজাতং সম্প্রতিপন্নচেতনকর্ত্তৃকং যথা ঘটাদি, সম্প্রতিপন্নচেতনাকর্ত্তৃকং ব্যোমাদি, বিপ্রতিপন্নচেতনকর্ত্তৃকং মহীরুহাঙ্কুরাদি। তত্র তৃতীয়ং সাবয়বত্বেন সিদ্ধকার্য্যত্বকং পক্ষীকৃত্য বুদ্ধিমৎকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ পটবদিতি ঈশ্বরং কর্ত্তারমনুমাপয়তি। তস্য চ পরমাণবঃ সমবায়িকারণম্। তৎসংযোগশ্চাসমবায়িকারণম্। ক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্যা জীবাত্মানো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ নিমিত্তকারণম্। সর্গকালে পুনরীশ্বরেচ্ছামদৃষ্টং চ নিমিত্তমাসাদ্য পরমাণুষু কর্ম্মাণ্যুৎপদ্যন্তে।…… নিমিত্তভূতাদৃষ্টবৈচিত্র্যাদীশ্বরেচ্ছাজন্যক্রিয়াবৈচিত্র্যবশাচ্চ জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জস্বেদজভেদং শরীরমারভন্ত ইত্যূচতুঃ (নৈয়ায়িকবৈশেষিকৌ ইতি পূর্ব্বপরামর্শঃ)।

ইদমেব যুক্তমস্মন্মতঞ্চ। পরং স্বেতাবান্ বিশেষঃ। ইচ্ছায়াঃ কার্য্যমাত্রজনকত্বে ন কিঞ্চিন্মানমস্তি। ন চাত্মনিষ্ঠপ্রযত্নোৎপাদনং বিনেচ্ছায়াঃ কার্য্যজনকত্বম্। অচেতননিষ্ঠক্রিয়াদিজনকত্বঞ্চ নানুভূতপূর্ব্বম্।………অতস্তাদৃশহেতুহেতুমদ্ভাবকল্পনেনাত্যন্তগৌরবাপত্তিঃ। আবশ্যকাদৃষ্টহেতুকতয়াপ্যন্যথাসিদ্ধিশ্চ। অতো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরেব বিজাতীয়ক্রিয়াজনকত্বং, নেশ্বরেচ্ছাপ্রযত্নাদীনামিতি। তেনেশ্বরেচ্ছায়াস্তস্যাঃ কার্য্যজনকত্বে চ 'স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ে'তি শ্রুতিরেব মানম্। তত্র 'চাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদাবিবেক্ষতিরদৃষ্টে লাক্ষণিক ইত্যলং পল্লবিতেন।

নমু প্রলয়ে কিং মানমিতি চেৎ, ন।……

অত্র জৈমিনীয়াঃ। উক্তানুমানেন 'ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দি'-ত্যাদিমন্ত্রলিঙ্গেনাবান্তরপ্রলয়সিদ্ধাবপি মহাপ্রলয়ে নাস্তি প্রমাণম্।… আচার্য্যানুমানন্তু 'ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দি'তি শ্রুতিবিরোধাৎ…… অনাচার্য্যানুমানমেব।—ভাট্টচিন্তামণি, চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃঃ ৪৫-৪৮।

করিয়াছেন, কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্ব-প্রতিষেধের উদ্দেশ্যে তাঁহার যুক্তিপরম্পরা প্রযুক্ত হয় নাই।

এই কথাটি মনে গাঁথিয়া রাখিলে সৃষ্টি-প্রলয়-সমস্যার সমাধান করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। মীমাংসকমতে আদি সৃষ্টি বা মহাপ্রলয় স্বীকৃত হয় না; কিন্তু তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহ অবিরত ধারাকারে চলিতেছে। এ সম্বন্ধে কুমারিলের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারে অতি স্পষ্টভাষায় উক্ত হইয়াছে—

"তস্মাদদ্যবদেবাত্র সর্গপ্রলয়কল্পনা।
সমস্তক্ষয়জন্মাভ্যাং ন সিধ্যত্যপ্রমাণিকা॥" (শ্লো-বা সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার ১১১৩ শ্লোক)

অর্থাৎ এই মতে সর্গ ও প্রলয়ের কল্পনা অদ্যকার মত (আজও যেরূপ খণ্ডভাবে সৃষ্টি ও প্রলয় চলিতেছে, সেই ভাবে বরাবরই সৃষ্টি ও প্রলয় সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে।) সমগ্র জগৎ যে এককালে সৃষ্ট হয় বা সমগ্র জগতের যে এককালে ধ্বংস সম্ভব—এ সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ; কারণ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। তবে ভট্টপাদ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সমগ্র বিশ্বের এককালীন সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার করিতেও সম্মত আছেন, যদি বেদকে অনাদি, অকৃত, অপৌরুষেয় বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। বেদকে ঈশ্বর-রচিত বলিয়া ধরিতে বিশেষ আপত্তির কারণ এই যে, তাহা হইলে বেদে ঈশ্বরসম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল বিবরণে আর আস্থা স্থাপন করা চলে না (১০)। অতএব, তখন বেদোক্ত ঈশ্বর-বিবরণের সত্যত্ব-নির্ণয়ের জন্য অনুমান প্রমাণের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমাদিগের অভিজ্ঞতালব্ধ কোন দৃষ্টান্ত নাই, সে স্থলে অনুমানের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। এই কারণে কেবল অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। এই সকল কারণে কুমারিল বলিয়াছেন—বেদকে নিত্য স্বতন্ত্র অকৃত অপৌরুষেয় স্বীকার করিলে আর এই সকল দোষ ঘটিতে পারে না। যে হেতু, তখন ঈশ্বরবিষয়ে বেদের উক্তি নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে। তখন শ্রুতির প্রামাণ্য-নির্ণয়ের জন্য আর অনুমানাদি প্রমাণান্তরের সাহায্য লইতে হয় না।

এ সম্বন্ধে বারান্তরে আরও আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

(১০) ঈশ্বর-রচিত বেদ যদি ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তবে তুল্য যুক্তিবলে সর্ব্বজ্ঞ-(বুদ্ধাদি)-রচিত আগম কেন সর্ব্বজ্ঞের সিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না?—এ আপত্তি উঠা খুবই স্বাভাবিক।

টিলার দেশের লীলাবতী

টিলার দেশের লীলাবতীর দীঘল কালো কেশ—
চাঁদের মতন মুখে কেবল নেইক হাসির লেশ!
আল্‌তা-দুধের সঙ্গে সুধার তরঙ্গিনী ছোটে
সেই অপরূপ রূপের স্রোতে পদ্মকলি ফোটে!
উছ্‌লে পড়ে তনুর তটে কোন্ অতনুর দিঠি
চপল আঁখির আঁখর লেখে মিষ্টি ভাষার চিঠি!
ভঙ্গিটি এর রঙ্গময়ী, কুরঙ্গী এর পায়ে—
অশোক ফোটে এম্‌নি মেয়ের চটুল চরণ ঘায়ে!
এম্‌নি মেয়ে স্বর্গলোকে হয় পারিজাত ফুল!
টিলার দেশের লীলাবতী—দীঘল কালো চুল!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

পুনর্মিলন

১

বড় রাস্তাটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে একটি প্রশস্ত গলি বাহির হইয়াছে। এই গলির মাথায় সাম্‌না-সাম্‌নি দু'খানা বাড়ী। বাঁ-দিকেরটি দ্বিতল; ডান-দিকেরটি থামওয়ালা, গেটযুক্ত বড় তিন-তালা বাড়ী। বাড়ীর মালিকটি জমিদার। দেশে বড়-বেশী ম্যালেরিয়া বলিয়াই হোক অথবা নাগরিক জীবন স্পৃহণীয় বলিয়াই হোক, জমিদারটি সপরিবার কলিকাতাতেই বাস করেন। আর দো-তালা বাড়ীখানির মালিক সরকারের কোন আফিসে ভাল চাকুরী করেন, এ জন্ত দূরস্থ পল্লীগ্রামের পৈতৃক ভিটার সহিত তাঁহারও কোন সম্বন্ধ নাই।

শুনা যায়, অনেক দিন পূর্ব্বে এই দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল; কিন্তু হঠাৎ এক দিন কি একটা উপলক্ষে বিবোধ ঘটায় উভয় পরিবারে পরস্পরের মুখ-দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিবার পর হঠাৎ এক দিন অত্যন্ত অভাবনীয় ভাবে এক সামান্ত ঘটনায় উভয় পরিবারের সখ্যতা পুনঃ-স্থাপিত হইবার উপক্রম হইল। সেই ঘটনাটিই বর্ত্তমান আখ্যায়িকার আলোচ্য বিষয়। সে দিন জমিদার সুপ্রসন্ন বাবুর পুত্র শ্রীমান্ সুব্রত কলেজ হইতে অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে গৃহে ফিরিতেছিল। সেই দিন সকালে কয়েকটি সতীর্থের সহিত তাহার তুমুল তর্ক হইয়াছিল; বাড়ী ফিরিবার সময়েও তর্কের বিষয় মাঝে-মাঝে তাহার মনে উদয় হইয়া তাহার মনকে উত্যক্ত করিতেছিল। কিছু দূর আসিয়া সে বড় রাস্তাটা অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল; রাস্তা পার হইয়া সে ফুটপাথের প্রায় নিকটে গিয়াছে, এমন সময় কয়েক ব্যক্তির 'গেল গেল' চীৎকারে সে সচকিত হইয়া ব্যাপারটা কি জানিবার জন্ত পিছনে চাহিতেই একটি তরুণী—তাহারও হস্তে পুস্তক ছিল—দ্রুতপদে তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়াই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া মুহূর্ত্তে তাহাকে ফুটপাথের উপর আনিয়া ফেলিল, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একখান সুবৃহৎ দো-তালা বাস তাহার পাশ ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। ব্যাপারটা মুহূর্ত্তমধ্যেই ঘটিয়া গেল। তরুণী ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "এ রকম অন্তমনস্ক হ'য়ে কি লোকে পথে চলে?"

সুব্রত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু মুহূর্ত্তেই সমগ্র ঘটনাটি তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল; সে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চক্ষুদু'টি তরুণীর মুখের স্থাপিত করিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "আপনি আমায় আজ যে ভাবে বাঁচালেন, তা আমি জীবনে কখনো ভুলবো না। আমি যে কি ব'লে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রবো, তা ভেবে পাচ্ছি নে; আপনাকে অসংখ্য ধন্তবাদ!"

তরুণী মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, না, আপনি ও-কথা ব'লবেন না। আমি এমন আর কি ক'রেছি? এ' তো প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য; ধরুন, আমিই যদি ঐ অবস্থায় পড়তুম, আপনি কি আমায় রক্ষা করতেন না?"

"হয় তো করতুম; কিন্তু তা যখন এখনো ঘটেনি, তখন তা নিয়ে আর আলোচনা ক'রে ফল কি? তবে আপনি যা প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য-কর্ত্তব্য ব'লে উল্লেখ ক'রলেন, সেইটেই যে অনেকে করে না, অথবা ক'রতে পারে না। প্রত্যেক লোকই যদি তার কর্ত্তব্য নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করে, আর সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান যদি ঠিক সময়ে তাদের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তা হ'লে চাইবার আর কিছু থাকে কি? জানেন কি, বীরবর নেল্‌সন মৃত্যুকালে কেবল এই একটি কথাই ব'লেছিলেন—"England expects every man to do his duty?"

তরুণী উত্তর করিল, "নেল্‌সন যে কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত ক'রেছিলেন, সেই মহান্ কর্ত্তব্যের সঙ্গে আপনি কি এই তুচ্ছ কর্ত্তব্যের তুলনা ক'রছেন?"

সুব্রত এবার ঈষৎ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "দেখুন, আপনি এইমাত্র এক ভীষণ দুর্ঘটনায় আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছেন, আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করা উচিত নয়; কিন্তু তথাপি সত্যের খাতিরে বলতে হয়, আপনি ভুল বলছেন। কোন কর্ত্তব্যই ছোট বা উপেক্ষার যোগ্য নয়। আমার মনে আছে, ছোট বেলায় আমি 'কোন কাযই ছোট নয়' ব'লে একটি গল্প প'ড়েছিলুম; তাতে জানতে পারি, বিদ্যাসাগর মশায় একটি ফুল-বাবুকে রীতিমত শিক্ষা দিয়েছিলেন। যে কাযটির উপলক্ষে তিনি তাকে শিক্ষা দেন, সেটি খুব সামান্ত কায; কিন্তু তবুও পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ কাযের সঙ্গে তা তুলনীয় ব'লেই মনে হয়।"

তরুণী এবার মৃদু হাসিয়া বলিল, "এখন আর তর্ক করবো না, কারণ, কে জানে, তর্কের নেশায় হয় তো আবার একটা Accident ঘটতেও পারে।"

সুব্রত মৃদু হাস্তে সায় দিয়া বলিল, "ঠিক ব'লেছেন; আজ সকালে আমার ক্লাশ-ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে এইরূপই একটা বিষয় সম্বন্ধে তর্ক হ'য়ে গেছে; আর সেই কথাটার চিন্তায় অন্তমনস্ক থাকায় আমার জীবন এই ভাবে বিপন্ন হ'য়েছিল।"

তরুণী হাসিয়া কহিল, "বুঝেছি, এই জন্তই বুঝি আপনি অত অন্তমনস্ক হ'য়ে চলছিলেন? যাক্, আশা করি, এবার থেকে সাবধান হবেন।"

সুব্রত তাহার সহিত হাস্তে যোগ দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ঠিকই ব'লেছেন; এবার থেকে চিন্তাটিন্তাগুলো পার্কেই শেষ ক'রে ফেলতে হবে।"

তরুণী দুই হাতে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তা' হ'লে আসুন, নমস্কার! আমার বাড়ী বেশী দূর নয়, মানে—ঐ গলির মোড়েই।"

সুব্রত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনার বাড়ী কোন্‌টা বললেন? মোড়ের ওই দোতালা বাড়ীটা? কিন্তু আমিও যে ওরই সামনের বাড়ীতে থাকি।"

তরুণী ততোধিক বিস্মিত হইয়া প্রশস্তবক্ষ যুবকের সুগঠিত, ব্যায়ামপুষ্ট দেহের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি ব'ললেন? আপনি কি তা হ'লে সুপ্রসন্ন বাবুর—?"

সুব্রত সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, তাঁরই ছেলে।" যদি সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ সেখানে বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও হয়

তো উভয়ে এত আশ্চর্য্য বোধ করিত না। কিছুকাল তাহাদের বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না; উভয়ে মৌনভাবেই চলিতে লাগিল। খানিক পরে উভয়েই যখন গলির মোড়ে উপস্থিত হইল, তখন সুব্রত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আপনার নিকট আজ আমি যে ঋণে আবদ্ধ হ'য়েছি, তা পরিশোধ ক'রবার শক্তি আমার নেই। আমি ভাব্‌ছিলুম, ভবিষ্যতে আর আপনার দেখা পাবো না, এবং এত বড় যে উপকার করলেন, তা কোন দিন ব্যক্তও ক'র্‌তে পারবো না। কিন্তু এখন আমার আশা হচ্ছে, যখন সামনা-সাম্‌নি বাড়ীতে থাকি, তখন মাঝে-মাঝে হয় তো আমাদের দেখা হবে।" সুব্রত তাহার আনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল।

তরুণী হাসিয়া বলিল, "মাঝে-মাঝে কেন বল্‌ছেন? এখন থেকে রোজই দেখা হবে। আচ্ছা, তা হ'লে আসি, নমস্কার!"

"নমস্কার" বলিয়া সুব্রত বাড়ীর ভিতর অদৃশ্য হইল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া সুব্রত মাতার নিকট উপস্থিত হইল। মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া সে বলিল, "জান মা, আজ আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি?"

মাতা ভয়-বিহ্বল নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন? কি হ'য়েছিল বাবা!"

সুব্রত সকল বিবরণ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলে, মাতা তাঁহার যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ভগবান রক্ষা ক'রেছেন। রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে? ঐ মেয়েটি কেবল উপলক্ষ মাত্র। যাক্‌, একটি কথা এই সময় তোমায় ব'লে রাখি, সুবো! ও-মেয়েটির সঙ্গে তুমি আর মেশামেশি কোরো না। ওরা লোক ভাল নয়, আর কর্ত্তা শুনলে রাগও কর্‌তে পাবেন।"

সুব্রত যারপরনাই বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন মা?"

পুত্রের প্রশ্নে মাতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "অত আমি জানিনে বাপু। বারণ করলুম, শোনো ভাল, নইলে পরে বুঝ্‌বে।" —তিনি অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন। সুব্রত বিস্মিত নেত্রে তাঁহার গমন-পথে চাহিয়া রহিল।

২

এখন এখানে তরুণীর পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তরুণী উক্ত দো-তালা বাড়ীর অধিকারী সরকারী আফিসের পদস্থ কর্ম্মচারী অমলেশ বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং বেথুন কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী সুকৃতি দেবী।

উল্লিখিত ঘটনার কিছু দিন পরে সুব্রত কলেজ যাইবার জন্য সবেমাত্র বাড়ীর বাহিরে আসিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, সেই সময় তাহার সহিত সুকৃতির সাক্ষাৎ। সে-ও কলেজে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছিল। উভয়ের চোখা-চোখি হইতেই সুব্রত নমস্কার করিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইল; হাসিয়া বলিল, "চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।" সুকৃতি প্রতি-নমস্কার করিয়া, কি ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; পরে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "বেশ, চলুন।" গলির মোড় পার হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া সুকৃতি একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার মেশা তো দূরের কথা—কথা কইবারও অধিকার নেই!"

সুব্রত মায়ের নিকট পূর্ব্বেই এরূপ একটু আভাস পাইয়াছিল; এখন সুকৃতির মুখেও এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। সে বলিল, "না, তা তো জানিনে, কেন ব'ল্‌তে পারেন?"

সুকৃতি তাহার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু-স্বরে বলিল, "কেন বল্‌তে পারবো না? কিন্তু জান্‌লেও সব ব'ল্‌বো না। তবে এটুকু ব'ল্‌তে পারি যে, আপনাদের সঙ্গে আমাদের ভয়ানক বিরোধ, এবং এই বিরোধের জন্যই আপনার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।"

সুব্রত ব্যথিত হইয়া বলিল, "আপনার নিষেধ থাকতে পারে, কিন্তু আমার তো নেই।"

সুকৃতি এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল; বলিল, "কেন, আপনাকে কি কেউই ঐ-ভাবে নিষেধ করেননি?"

সুব্রত উত্তর করিল, "নিষেধ করেননি বললে অবশ্য মিথ্যা বলা হবে। তবে আমায় তাঁরা নিষেধের কারণ কিছু জানাননি।"

সুকৃতি বলিল, "গুরুজন যখন নিষেধ ক'রেছেন, তখন আপনার তা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।"

সুব্রত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আর আপনার?"

"আমার কথা ছেড়ে দিন, বাবা ছাড়া আর সকলেই আমাকে অবাধ্য ব'লে জানেন।"

সুব্রত মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমারও কি সে বিষয়ে খুব সুনাম আছে মনে করেন?" পরে মুহূর্ত্তেক থামিয়া বলিল, "আপনার সাহচর্য্য লাভের আশায় না হয় একটু অবাধ্যই হওয়া যাবে।"

সুকৃতি গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, আপনার অবাধ্য হওয়া চলবে না।"

"তার কারণ?"

"তার কারণ কি আপনাকে বল্‌তে হবে? জানেন, আপনার বাবা, মা জান্‌তে পার্‌লে আপনাকে তাঁরা কিরূপ ভৎর্সনা করবেন?"

"তা করবেন। কিন্তু আপনারও তো সে দিক্‌ দিয়ে আশঙ্কা কিছু কম নয়?"

"আমি তো বলেছি, আমার জন্য ভাব্‌বেন না।"

সুব্রত এবার বলিল, "আর আপনিই বা কেন আমার জন্য ভাব্‌বেন?"

এবার সুকৃতির চক্ষুদু'টি যেন ব্যথায় টনটন্‌ করিয়া উঠিল; সে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি শুধু-শুধু আমার জন্য অপমানিত হ'লে আমার মনে কষ্ট হবে।"

সুব্রতকে কে যেন সহসা কশাঘাত করিল; তাহার সমগ্র বক্ষ এক তুমুল ভাবাবেগে আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে বলিল, "কিন্তু আমার যে তা সাধ্য নয়।"

তাহার কথা শুনিয়া সুকৃতি চমকিয়া উঠিল, শান্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন নয়?"

"সে কথা আপনাকে বল্‌তে পার্‌বো না।"—সহসা সুকৃতিকে যেন কি এক উগ্র নেশায় পাইয়া বসিল; সে তাহার হস্ত দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আপনাকে বল্‌তেই হবে।" সুব্রত কি যেন বলিতে গিয়া সহসা সংযত ভাবে বলিল, "আপনার কাছে আমি উপকৃত।"

"মিথ্যে কথা; যা সত্য কথা তাই বলুন"—বলিয়া সুকৃতি তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। এবার সুব্রত হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "সত্য কথাই বোল্‌ব, কিন্তু এখন নয়।" শেষের দিকের কথাটায় সুকৃতির যেন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখ নিমেষে বিবর্ণ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই গভীর লজ্জা আসিয়া তাহার সুগৌর মুখ আরক্ত করিয়া তুলিল; সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া খুলিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ্‌ করবেন। এ কথা জান্‌বার কি রকম ভয়ানক আগ্রহ আমায় পেয়ে বসেছিল। দেখুন তো, রাস্তার মাঝখানে কি রকম বিশ্রী কাণ্ডটা ক'রে বস্‌লাম!" বলিয়া সে লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। সুব্রত

নির্ব্বাক্ রহিল। সুকৃতি আপনাকে আর একবার সুসংবৃত করিয়া লইয়া বলিল, "ঐ যে ট্রাম আস্ছে, ওতেই তো আপনি যাবেন ?"

"আর আপনি ?"

"আমার তো আর বেশী দূর নেই, এটুকু হেঁটেই যাবো।" কথা কহিতে কহিতে ট্রাম আসিয়া পড়িল। সুব্রত আর কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিয়া বসিল। ট্রাম ছাড়িয়া দিতেই সুকৃতি যেমন অপর পারে যাইবে, এমন সময় সে দেখিল, একটি খদ্দরের সাদা রুমাল—তাহার মধ্যস্থলে একটি বিকশিত পদ্ম আঁকা, এক কোণে কেবল বাংলায় "সুব্রত" নামটি লেখা—ট্রাম-লাইনের উপর পড়িয়া আছে,—সে তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইল। সে তাহা মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন বলিয়াই মনে করিল।

৩

ইহার পর সুকৃতির সহিত সুব্রতর প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত, এবং তাহারা গল্প করিতে-করিতে ট্রাম-থামিবার স্থান পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইত; সেই স্থানে সুব্রত সুকৃতির নিকট বিদায় লইয়া ট্রামে উঠিত। এইরূপ দিনগুলি তাহাদের নির্ব্বিঘ্নেই কাটিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ এক দিনের একটি ঘটনায় সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল।

প্রতিদিনের মত সে-দিনও সুকৃতি বাড়ীর বাহিরে আসিতেই সুব্রতর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়ে গল্প করিতে করিতে বড় রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু খানিক-দূর যাইতেই সুকৃতির ছোট মামার সহিত হঠাৎ তাহাদের দেখা হইল। সুকৃতি তাহার এই মামাটিকে যেমন ভয় করিত, তেমনই ঘৃণা করিত, কারণ, তাহার মনটি যেরূপ সঙ্কীর্ণ, কুটিল, বুদ্ধিও সেইরূপ বাঁকা। তিনি সুকৃতিকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত দেরী যে !"

সুকৃতি বলিল, "কৈ, দেরী তো হয়নি মামা ! এখন তো সবে সাড়ে-দশটা। আমাদের ক্লাস তো সেই এগারোটায়।"

"ওঃ" বলিয়া তিনি একবার সুব্রতর দিকে বক্র-কটাক্ষ হানিয়া হন্-হন্ করিয়া তাহাদের পাশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

* * * *

সে-দিন কলেজ হইতে সুকৃতি গৃহে ফিরিতেই তাহার মা প্রিয়ম্বদা দেবী তাহাকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া বলিলেন, "সুকৃতি, তোমার এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি !" সুকৃতি অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল. "কি মা ?" প্রিয়ম্বদা দেবী কুপিত হইয়া তাহারই প্রশ্নের পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, "কি মা ?"—তুমি ঐ সাম্‌নের বাড়ীর ছোঁড়াটার সঙ্গে কি জন্যে মেশো, তা বল তো শুনি ? এক দিন তোমায় বারণ করে দিয়েছি, মনে নেই ? ফের যদি কোন দিনও ওর সঙ্গে তোমায় মিশতে দেখি, তা হ'লে আমি তোমার মুখদর্শন কোর্‌বো না, তা ব'লে দিলুম। আজ আসুন উনি, ওঁর সোহাগে মেয়ে কি রকম বেচাল হ'য়েছে, তা ব'লে দিচ্ছি; দেখি, উনি তোমায় কত সোহাগ করেন !" সুকৃতি প্রথমে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল; কিন্তু যখন প্রিয়ম্বদা দেবী তাহার বাপকে বলিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইলেন, তখন সে ক্রোধে জ্বলিয়া-উঠিয়া বলিল, "বেশ, দিয়ো বাবাকে ব'লে, বাবা শুনে আমার মাথাটা কেটে দু'টুক্‌রো কোর্‌বেন—দেখে খুব স্ফূর্ত্তি কোরো।" প্রিয়ম্বদা দেবী কন্যার শ্লেষোক্তিতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন; বলিলেন, "মাথা কেটে দু'খানা করেন কি ক'খানা করেন, দেখতেই পাবে। বেহায়া মেয়ে, কাণ্ডজ্ঞান দিন-দিন লোপ পাচ্ছে !"

"বেশ" বলিয়া সুকৃতি নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

* * * *

প্রিয়ম্বদা দেবী কন্যাকে পিতার নিকট যতটা অপদস্থ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, ততটা করিতে তাঁহার সাহস হইল না; কারণ অমলেশ বাবু তাঁহার কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং প্রিয়ম্বদা দেবী গম্ভীরপ্রকৃতি, সংযতবাক্ স্বামীটিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। তথাপি সন্ধ্যার সময় যখন অমলেশ বাবু ইজিচেয়ারে বসিয়া সংবাদ-পত্র দেখিতেছিলেন, তখন তাঁহারই অনতিদূরে প্রিয়ম্বদা দেবীর উদ্যোগে একটি বৈঠক বসিল, এবং প্রিয়ম্বদা দেবী স্বয়ং ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেন সেই বৈঠকে বক্তৃতাদানের ভার গ্রহণ করিলেন; সুকৃতিকেও সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে আদেশ করা হইয়াছিল। তদনুসারে সুকৃতি আসিয়া পিতার পার্শ্বেই একখানা চেয়ার টানিয়া-লইয়া বসিয়া পড়িল। বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, সুকৃতির অবাধ-স্বাধীনতা রহিত করা হইবে; সে একাকী কোথাও যাইবার অনুমতি পাইবে না। অতঃপর বাসে চড়িয়া সে কলেজে যাতায়াত করিবে। এইরূপ ব্যবস্থার পর তাহার মামা সুকৃতিকে এ-সম্বন্ধে তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিল। সুকৃতি এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই; কিন্তু মামার প্রশ্ন শুনিয়া তাহার ধৈর্য্য ও সংযমের বাঁধ এক নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া তাহার মাকে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও উত্তেজিত স্বরে শুনাইয়া দিল, "মা, তোমরা আমার উপর যে সব কঠিন ও অসঙ্গত নিয়ম জারী ক'র্‌লে, তার একটাও আমি মান্‌তে পারবো না। আর আমি এটাও বল্‌তে চাই, আমাকে তোমরা যে রকম দোষী ব'লে সিদ্ধান্ত ক'রেছো, আমি সে রকম দোষীও নই। আর আমি এও স্পষ্ট ভাষায় বল্‌ছি, তোমরা যাকে চ্যাংড়া-ছোঁড়া, ফোচ্‌কে, বদ্‌মাইস্ প্রভৃতি ব'লে তার অপমান ক'র্‌লে, প্রকৃতপক্ষে সে তা নয়; সে সুশিক্ষিত, বিনীত, উদার-হৃদয়, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সুসভ্য যুবক। আর সেইজন্যই তার সঙ্গে কথা বন্ধ করা আমি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে ক'র্‌ছি।"

প্রিয়ম্বদা দেবী ও তাঁহার ভাই হরেন বাবু তাহার নির্ভীক্ প্রতিবাদে বিস্মিত হইলেন। হরেন বাবু কিছুকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "শোন সু, বেশী—" তিনি আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সুকৃতি দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, "চুপ করুন্ ! আপনার মত নির্লজ্জের সঙ্গে আমি কোন কথার আলোচনা ক'র্‌তে চাইনে।" হরেন বাবুর মুখে আর কথা ফুটিল না। প্রিয়ম্বদা দেবী ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইলেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি আত্মসংযম করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শুন্‌ছো তোমার মেয়ের কথা ? হরাকে ও কি রকম অপমান কর্‌লে !" অমলেশ বাবু তখন বোধ হয় সংবাদপত্রেই তন্ময়; কোন কথাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। প্রিয়ম্বদা দেবী উত্তেজিত স্বরে পুনর্ব্বার বলিলেন, "খবরের কাগজেই মসগুল ! বলি, শুন্‌লে, তোমার মেয়ে তার মামাকে কি রকম অপমানটা কর্‌লে ?"

অমলেশ বাবু কেবল "হুঁ" বলিয়া আবার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। স্বামীর এই প্রকার ঔদাসীন্যে প্রিয়ম্বদা দেবী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং অধিকতর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বলি. আমার কথাটা শুন্‌বে, না, খবরের কাগজই পড়্‌বে ?"

অমলেশ বাবু এবার কাগজের পাতা উল্টাইয়া বলিলেন, "হুঁ, শুন্‌বো বৈ কি !"

"তোমার মেয়েকে শাসন করো।"

অমলেশ বাবু সেই পাতাটির উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলিলেন, "হুঁ, এই যে ক'রছি।"

"ছাই করছো! আমার কথাগুলো তোমার কানে গেছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো না, কি বলবে?" বলিয়াই তিনি পুনরায় কাগজের মধ্যে একেবারে তলাইয়া গেলেন।

প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া অত্যন্ত নিরাশ ভাবে মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। সুকৃতি ছোট ভাই কানুকে কোলে বসাইয়া তাহার সহিত গল্প করিতে-করিতে পিতার নিকট মায়ের অভিযোগ শুনিতেছিল। প্রিয়ম্বদা দেবীর সকল চেষ্টা বিফল হইলে তিনি নিতান্ত হতাশ ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। সুকৃতি তাঁহার ভ বভঙ্গি দেখিয়া কানুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, এবং আদর করিতে-করিতে হাস্যদমনের চেষ্টা করিল।

সুকৃতির হাসি দেখিয়া প্রিয়ম্বদা দেবী ঘৃণায় ও ক্রোধে মুখ বিবর্ণ করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, সুকৃতি! তোমার এই বেহায়াপনায় আমি বড়ই মর্ম্মাহত হ'য়েছি। মনে হচ্ছে, জন্ম-জন্মান্তরের বিস্তর পাপের ফলেই তোমার মত মেয়ে গর্ভে ধ'রেছিলুম। কিন্তু তোমায় ব'লে দিচ্ছি, এর একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে আমি ছাড়ছি নে।"—এইরূপ সিংহনাদ করিয়া তিনি সবেগে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

হরেন বাবুও অবনতমস্তকে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

* * * *

প্রিয়ম্বদা দেবী অতঃপর তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন, এবং উপায়েরও অভাব হইল না।

অমলেশ বাবু সে দিন আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া জানাইলেন, তাঁহাকে পরদিন প্রত্যুষে কোন জরুরী কার্য্যে দু'-তিন দিনের জন্য 'টুরে' যাইতে হইবে।

যথাসময়ে তিনি যাত্রা করিলেন, এবং গৃহত্যাগের পূর্ব্বে স্ত্রীকে জানাইলেন, তিনি 'টুর' হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে সুকৃতির প্রতি যেন কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করা না হয়।

প্রিয়ম্বদা দেবী স্বামীকে তখন কোন কথা বলিলেন না বটে, কিন্তু স্থির করিলেন যে, কন্যার অবাধ্যতা দূর করিবার পক্ষে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ।

অমলেশ বাবু গৃহত্যাগ করিলে, প্রিয়ম্বদা দেবী কন্যার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুকৃতি তখন টেবিলের সম্মুখে বসিয়া পাঠ্য বিষয়ের 'নোট' লিখিতেছিল। প্রিয়ম্বদা দেবীকে সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একবার মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া পুনরায় আরব্ধ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। প্রিয়ম্বদা দেবী তাহার টেবিলের গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার দু'-একটা বিশেষ কথা আছে।"

সুকৃতি মাথা না তুলিয়া লিখিতে-লিখিতে বলিল, "না মা, এখন আমার কোন কথা শুনবার সময় নেই; এই নোটটা আজই আমাকে শেষ করতে হবে।"

"কিন্তু আমারও যে বড্ড বেশী দরকার সু—" বলিয়া মা কোমল দৃষ্টিতেই তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সুকৃতি তখন করযোড়ে সবিনয়ে বলিল, "মাফ করো মা! আমার এখন একবিন্দুও অবসর নেই।

প্রিয়ম্বদা দেবী এ কথায় গরম হইয়া উঠিয়া বিদ্রূপভরে বলিলেন, কিন্তু ইয়ারকি দেওয়ার সময়ের তো অভাব হয় না!"

সুকৃতি এবার অধীর ভাবে বলিল, "তোমার দু'টি পায়ে পড়ি মা, এখন তুমি আমাকে রেহাই দাও।" কন্যার প্রতিবাদে দারুণ ক্রোধে প্রিয়ম্বদা দেবীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল; তিনি জ্ঞান হারাইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "তোমার যে ভারী অহঙ্কার দেখছি! মাকে ঘর থেকে তাড়াতে চাও? কিন্তু এত স্পর্দ্ধা ভালো নয়। তা বেশ, আমি যাচ্ছি; কিন্তু তার আগে তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি—আমার হুকুম ছাড়া তুমি বাড়ী থেকে কোথাও বেরোতে পাবে না। কলেজে যাওয়া-আসার জন্যে বাসের ব্যবস্থা তো করাই হ'য়েছে; সেই বাসে আজ থেকে তুমি কলেজে যাবে, বাসেই বাড়ী ফিরবে।"—তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে না দাঁড়াইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

৪

প্রিয়ম্বদা দেবী উপর্য্যুপরি দুই দিন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সুকৃতিকে ভাত খাওয়াইতে পারিলেন না। কন্যার অবাধ্যতায় ক্রোধে-ক্ষোভে বিচলিত হইয়া তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "মা, এইমাত্র আফিসে তার এসেছে, বাবু আজই বিকেলে ফিরে আসবেন; পেয়াদা এসে খবর দিয়ে গেল।"

কর্ত্তার আগমনের সংবাদ পাইয়া প্রিয়ম্বদা দেবী বিবর্ণ মুখে বলিলেন, "এই আর এক ফ্যাসাদ! বাড়ী ফিরে যদি তিনি শোনেন, মেয়েটা দু'দিন কিছুই না-খেয়ে প'ড়ে আছে, অনাহারে শুকোচ্ছে, তা হ'লে কি আর রক্ষে থাকবে? আর একবার চেষ্টা করে দেখি।" তিনি উঠিয়া যাইতেই অদূরে কানুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিলেন, "ওরে কানু, আমার একটা কথা শোন্, দেখে আয় তো বাবা, তোর দিদি এখন কি ক'রছে।"

"ঘুমুচ্ছে মা!" বলিয়া কানু তাহার দিদির নিকট হইতে অল্পকালপূর্ব্বে-প্রাপ্ত ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

"ফাজিল ছোঁড়া! তুই এখানে বসে-থেকেই সব বুঝি জানতে পেরেছিস্? দিদির কাছে থেকে-থেকে তুইও দিন-দিন ফাজিল হ'য়ে উঠ্‌ছিস্!"

"ইস্, দিদির কাছে থাকলে বুঝি ফাজিল হ'তে হয়? দিদি কত ভাল-ভাল গল্প শোনায় আমাকে তা জানো?"

"আবার আমার কথার ওপর কথা?" প্রিয়ম্বদা দেবী তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিলেন। বালক উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

সংসারে পুত্র-কন্যা বিদ্রোহী, স্বামী মুঠোর বাহিরে! তিনি চারি দিক অন্ধকার দেখিলেন!

"ও সু, সু, ওঠ মা লক্ষ্মীটি! এই মিছরীর জলটুকুতে শুকনো গলা ভিজিয়ে খেতে চল, আর জ্বালাসনি মা!"

"আঃ, আবার কেন জ্বালাতে এলে মা! আমি কেমন একটা মজার স্বপ্ন দেখছিলুম।"

"আচ্ছা, তুমি ঘুমুলে এবার থেকে আর তোমায় জাগাবো না, চলো মা এখন, খাবে দু'টি, চলো।"

"কেন মিছে আমায় বিরক্ত করতে এলে মা! কিছু খাবো

না আমি। আমি তো ব'লেই দিয়েছি, যতক্ষণ তুমি সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করবে—ততক্ষণ।"

প্রিয়ম্বদা দেবী আরও অধিক কোমল স্বরে বলিলেন, "দেখ মা, তুমি লেখাপড়া শিখছো, তোমার কি অতো অবুঝের মতো কথা বলা উচিত? ওদের সঙ্গে আমাদের কত দিনের, আর কত বেশী বিরোধ, তা যদি তোমার জানা থাকতো, তা হ'লে এমন অবুঝের মতো কথা বলতে না। তা ছাড়া ওর সঙ্গে তোমার ঐ রকম মেলামেশাও যে লোকের চোখে ভাল দেখায় না মা? পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, তা কি সহ্য হয়? কর্ত্তাই বা কি মনে ক'রবেন? কানাঘুষাও চলছে?"

মায়ের এই সকল কথায় সুকৃতি ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, বেশ, বাবা এলে যা বুঝবেন তাই হবে।"—সুকৃতি পাশ ফিরিবার উপক্রম করিল।

প্রিয়ম্বদা দেবী তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "ভারী বাপ-সোহাগিনী মেয়ে! লজ্জা করে না ধাড়ী মেয়ের এ সব কথা ব'লে বাপকে বিরক্ত করতে?"

"বাবাকে বিরক্ত করার কথা তো হচ্ছে না মা! তিনি এসে যা ব্যবস্থা করবেন, তাই হবে! তুমি এখন যাও তো মা, আমি একটু ঘুমোই"—বলিয়া সুকৃতি মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইবার উদ্যোগ করায় প্রিয়ম্বদা দেবী নিস্তব্ধ ভাবে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

সেই দিন অপরাহ্ণ ৫টায় অমলেশ বাবু গৃহে পদার্পণ করিতেই ছোট ছেলে কানুর নিকট তাহার দিদির প্রায়োপবেশনের সংবাদ পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আফিসের পোষাকেই কন্যার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "সুকৃতি, খোল তো মা দরজাটা একবার।"

"কে, বাবা?" বলিয়া সুকৃতি উৎসাহভরে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, এবং সাগ্রহে পিতার হাত ধরিয়া বলিল, "এইমাত্র আসছ বুঝি বাবা?"

"হ্যাঁ মা!" বলিয়া অমলেশ বাবু সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, 'কিন্তু এ সব কি শুনছি মা? আমি চলে যাবার পর থেকেই তুমি না কি উপোস ক'রছ? কিছুই খাচ্ছ না?"

সুকৃতি নীরব রহিল। অমলেশ বাবু তখন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে পাশের চেয়ারে বসাইয়া দিলেন, এবং সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "কি হ'য়েছে, সব কথা আমায় খুলে বলো তো মা!"

সুকৃতি পিতার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "সব কথাই তোমাকে ব'লবো বাবা! কিন্তু পরিশ্রান্ত হ'য়ে এসেছ তুমি. আগে জিরিয়ে নাও; তার পর সব শুনো। দেখি, তোমার জুতো-জোড়াটা খুলে দিই!" সুকৃতি নতমস্তকে পিতার জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। অমলেশ বাবু মৃদু হাসিয়া কন্যার হাত ধরিয়া উঠাইয়া, তাহার ললাটের কুন্তলগুচ্ছ সুবিন্যস্ত করিতে-করিতে বলিলেন, "তা তো হয় না মা! আমার স্নেহের ধন পূরো দু'দিন উপবাসী র'য়েছে, তা শুনেও কি ক'রে বিশ্রাম ক'রবো তা' বলো তো! আহা, ফুলের মতো মুখখানা দু'দিনে শুকিয়ে উঠেছে। বলো মা, লক্ষ্মীটি, ব্যাপারখানা কি, লজ্জা কোর না।"

সুকৃতি সকল বিবরণ সবিস্তারে পিতার নিকট বিবৃত করিলে অমলেশ বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, "না, আর বিলম্ব নয়; এ বিরোধের নিষ্পত্তি যেরূপেই হোক, আজই হওয়া দরকার; আমি এখনই সুপ্রসন্ন বাবুর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এত দিনের মনোমালিন্য দূর ক'রে আসছি।"

সুকৃতি বাধা দিয়া বলিল, "না বাবা, ও কাজ তুমি করতে পাবে না। তুমি কি জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে অকারণে পরের কাছে হীনতা স্বীকার ক'রতে যাবে? তোমার পক্ষে তা কি রকম অপমানজনক, সেটা ভেবে দেখবে না, বাবা? আমি জীবন থাকতে তোমাকে ও-ভাবে অপমানিত হ'তে দেব না।"

পিতা হাসিয়া বলিলেন, "কথাটা তুমিই কি ভেবে দেখেছ, মা! আমাকেই বা ছোট হ'তে হবে কেন? বিরোধটা প্রথমে যখন আরম্ভ হয়, তখন দোষের জন্য কেবল তারাই তো দায়ী ছিল না, কতক দোষ আমাদেরও নিশ্চয়ই ছিল। জানিস তো মা, কথায় বলে, এক হাতে তালি বাজে না? আর অপমানের কথা কি ব'লছিস, মা! আমার কাছে আমার মেয়ের জীবন বড়, না, তুচ্ছ মানই বড়? যে সকলের সম্মানের পাত্র, প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সে নতিস্বীকার করলে তাব সম্মান নষ্ট হয় না, মা! জিদের বশীভূত হয়ে পরকে ছোট মনে করলে কখনও কোন বিবাদের মীমাংসা হতে পারে না। আর মান-টাই বা কি বস্তু? সেটা তো তুচ্ছ 'অহং ভাব' ছাড়া আর কিছু নয়।"

সুকৃতি পিতার কথার আর প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "তা সেখানে যেতে চাও, যেয়ো, কিন্তু এই মুহূর্ত্তেই তার প্রয়োজন নেই বাবা! তুমি আফিসের পোষাক ছাড়োগে, আমি ততক্ষণ চা ক'রে আনি।"

সুকৃতি উঠিয়া দাঁড়াইতেই পিতা তাহার হাতখানি ধরিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "জানিস্ মা, রাবণ মৃত্যুকালে শ্রীরামচন্দ্রকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য বিলম্বম্'—কাযেই এই শুভ কাজটা যত শীঘ্র শেষ করা যায়, ততই ভাল। আর তা ছাড়া তোকে উপোসী রেখে আমি কিছুই মুখে দিতে পারব না মা! তুই একটু বস্, আমি এখনই আসছি।" তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে অমলেশ বাবু সুব্রতকে সঙ্গে লইয়া হাসিমুখে বাড়ী ফিরিলেন, এবং সুকৃতিকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সু, কাকে ধরে এনেছি।"—অতঃপর উভয়ে সুকৃতির ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সুকৃতি চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল—পিতা ও সুব্রত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

সুব্রতকে দেখিয়াই তাহার ধমনী-প্রবাহিত রক্তস্রোত সহসা যেন রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল; কোনরূপে মন সংযত করিয়া সে বিস্ফারিত নেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিতেই অমলেশ বাবু সুকৃতি ও সুব্রতর হাত দু'খানি ধরিয়া, পরস্পর সম্মিলিত করিয়া বলিলেন, 'আজ আমাদের সকল বিবাদের মীমাংসা হ'ল। বাবা সুব্রত, আমি আমার বড় আদরের মেয়েকে আজ এই শুভক্ষণে তোমার হাতে সমর্পণ করলাম এই ভরসায় যে, তুমি ওকে ভবিষ্যতে ঠেলতে পারবে না। আর পরমেশ্বরের কাছে আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে প্রার্থনা করি—" তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করিলেন, এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর অধিকতর গাঢ় ও আবেগময় হইয়া আসিল,—"তিনি তোমাদের উভয়ের জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠু করিয়া প্রতিদিন নব নব আনন্দে ভরিয়া তুলুন।"

এই সময় জমিদার-বাড়ী হইতে মিলন-শঙ্খ ধ্বনিত হইল।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মিত্র।

ভারতের পোতশিল্প

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।" বিস্তীর্ণ বহির্বাণিজ্যের প্রধান বাহন অর্ণবপোত। অর্ণবযান ব্যতীত সামুদ্রিক বাণিজ্য অসম্ভব। সমুদ্রই পৃথিবীব্যাপী বিশাল বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ বর্ত্ম—"একামেবাদ্বিতীয়ং" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাণিজ্যের নিমিত্ত যেমন মালবাহী-জাহাজের আবশ্যক, জলপথে দেশ-দেশান্তরে যাতায়াতের জন্যও তেমনি যাত্রিবাহী-জাহাজের প্রয়োজন। এই মাল ও যাত্রিবাহী-পোতগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রণতরীর প্রয়োজন। জলদস্যু-দমন ব্যতীত, জলযুদ্ধের নিমিত্তও রণতরীর আবশ্যক। যাত্রী ও মালবহনে এবং জলযুদ্ধে স্থলযান অপেক্ষা জলযানেই প্রয়োজন সমধিক। জল অপেক্ষা আকাশ আরও ব্যাপক। কালে হয় ত খপোতই জলযানের বর্ত্তমান মর্য্যাদা খর্ব্ব করিবে; কিন্তু যত দিন বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র সেনাবাহিনী-বহনকারী বিমানের আবিষ্কার না হইতেছে, তত দিন জলযানেরই প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

বিগত মহাযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাণিজ্য ও রণতরীর ক্ষতিপূরণে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল; কারণ, এক একখানি বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে অন্ততঃ এক বৎসর সময় লাগে; বাধা-বিঘ্নও বিস্তর। বিগত মহাযুদ্ধ অপেক্ষা বর্ত্তমান মহাবিপ্লব অধিকতর ব্যাপক ও অনিষ্টকর। বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর আয়ত্তাধীন সমুদ্রাংশে মাত্র তাহাদের ডুবো-জাহাজের দৌরাত্ম্য দেখা দিয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে পশ্চিম-য়ুরোপের প্রত্যেক বন্দরই তাহার করায়ত্ত। বিগত মহাযুদ্ধে মিত্র ও মিলিত শক্তিপুঞ্জের বশীভূত ছিল—বৃটিশ, আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান এবং জাপানী রণতরী-বহর; এবং আয়ার (আইরিশ) বন্দরগুলিতে অবস্থিত পশ্চিম ঘাঁটিগুলি। বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান—একমাত্র বৃটিশ-রাজশক্তি। সুতরাং বিগত মহাযুদ্ধে জাহাজ-ধ্বংসের ক্ষতি অপেক্ষা বর্ত্তমান যুদ্ধে জাহাজ-ধ্বংসের ক্ষতি অনেক অধিক ও ব্যাপক। এই ক্ষতির মাত্রা কি পরিমাণ হইবে এবং কত দিনেই বা তাহার শেষ হইবে, তাহা নির্ভর করিতেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ও সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্যের উপর। এবার ক্ষতির পরিমাণ যেরূপ বিপুল, তাহার পূরণের প্রচেষ্টাও সেইরূপ বিপুল হওয়া প্রয়োজন।

শত্রুপক্ষীয় ত্রয়ীশক্তি এ বিষয়ে বহু পূর্ব্বেই সতর্ক ও প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সমস্ত যুযুধান ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছে। ইংরেজ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে পঞ্চাশখানি বাণিজ্যপোত ক্রয় করিয়াছে। যুক্তরাজ্যের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্স যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আরও বাণিজ্য-রণতরী এবং বিমান-সাহায্যের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র দুই শত বাণিজ্যতরী প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিয়াছে। কানাডার সহিতও আঠারখানি বাণিজ্যতরীর জন্য চুক্তি হইয়াছে।

জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ এবং মিত্রশক্তির জাহাজ ব্যতীত বৃটিশ রাজশক্তির তিন কোটি টন মালবাহী-জাহাজ বিধ্বস্ত, অথবা নিমজ্জিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক জাহাজ-নির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণ অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া, নিত্য-ক্ষয়িষ্ণু বাণিজ্য ও রণতরীর ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য সচেষ্ট। ভারতবর্ষ ব্যতীত সাম্রাজ্যান্তর্গত অন্যান্য প্রধান দেশগুলিও যথাসাধ্য করিতেছে। কানাডাতে পঞ্চাশ কোটি ডলার পরিমিত জাহাজ-নির্ম্মাণ-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উপকূলদ্বয়ে ষোলটি জাহাজনির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণ বড় বড় রণতরী, এবং আটটি প্রাঙ্গণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পোত-নির্ম্মাণে ব্যাপৃত। চৌদ্দ হাজার শ্রমিক এই কার্য্যে লিপ্ত ছিল; এখন তাহাদের সংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটি বৃটিশ-রাষ্ট্র প্রেরিত সভ্য-সঙ্ঘ (Commission) বাণিজ্য-তরী নির্ম্মাণার্থ কানাডায় গমন করিয়াছিলেন এবং আঠারখানি বাণিজ্য-তরী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন।

কানাডার ন্যায় অষ্ট্রেলিয়াও পোত-শিল্পের পুষ্টিসাধন করিতেছে এবং রাজকীয় রণতরী-বহরের নিমিত্ত তের-খানি প্রহরী-পোত নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে যাহাতে যুক্তরাজ্যের মুখাপেক্ষী না হইতে হয়, তদ্বিষয়ে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য যত্ন করিতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে যুক্তরাজ্যে পোতশিল্পে বিশেষ সাহায্য দানের ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু ভারতে পোতশিল্প-প্রতিষ্ঠাকল্পে কোন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয় নাই! বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ-সূচনার বহু পূর্ব্বেই এই কার্য্যে ব্রতী হওয়া অতীব কর্ত্তব্য ছিল। তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে যুক্তরাজ্য আজ অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারিত।

স্বদেশীয় পোত-শিল্পকে যথাযোগ্য সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদানে, স্বজাতীয় নৌ-বহরকে শক্তিশালী করা স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাষ্ট্রমাত্রেরই মুখ্য কর্ত্তব্য। একমাত্র মন্দভাগ্য নিয়মন-নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষ ব্যতীত পোত-শিল্পে মাত্র কয়েকটি বন্দর-বঞ্চিত খণ্ডরাজ্য ব্যতিরেকে, সর্ব্বদেশই অগ্রগামী ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল।

ভারতের এ দুর্ভাগ্য বহুদিনের নহে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল, তখন এ দেশে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত নির্ম্মিত হইত। বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে এ দেশের সাহসী ও সুদক্ষ নাবিকগণ এরূপ সুকৌশলে পাল খাটাইতে জানিত যে, বায়ুর গতি যে দিকেই প্রবাহিত হউক, তাহারা পালের সাহায্যে প্রয়োজনানুসারে যে কোন দিকে জাহাজ পরিচালিত করিতে পারিত। কালের কুটিল চক্রে এই নাবিকগণের উত্তরবংশীয়রা "লস্কার" (Lascars) আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিল। সম্প্রতি যুক্ত-রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ এই অবজ্ঞাসূচক নাম বর্জ্জন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন।

এমন এক দিন ছিল—এবং সে বহু দিন পূর্ব্বেরও কথা নয়—যখন ভারত-নির্ম্মিত জাহাজের সাহায্যেই ভারত-বাসী আরব, ইরাণ (পারস্য), পূর্ব্ব-আফ্রিকা, চীন, মালয়-উপদ্বীপ প্রভৃতি অতি দূর এবং অনতিদূরদেশে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্য করিত। তাহারা ভারতীয় রণপোত সাহায্যে যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রাজ্যবিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই যুগেই বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয়সিংহ ভারতীয় জাহাজে আরোহণ করিয়া তাঁহারই নামানুসারে আখ্যাত সিংহল (Ceylon) দ্বীপে গমন করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখনও তথাকার বহু অধিবাসী ভারতীয় নাম ও উপাধিতে পরিচিত হইয়া আর্য্যত্বের অভিমান করিয়া থাকেন।

"আইন-ই-আকবরী" পাঠে জানা যায়, মোগল-সম্রাট্ আকবরের বিস্তর রণতরী ছিল। সেই সকল রণতরী বালেশ্বর, ঢাকা ও চট্টগ্রামের পোতাশ্রয়ে সুরক্ষিত হইত। আকবর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর (১৫৫৬-১৬০৫) রাজত্ব করেন। তাঁহারই আমলে ইংরেজ বণিকরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া সুরাটে কুঠীস্থাপন করেন। মহীশূর রাজ্যের হায়দার আলি খাঁর (১৭৭২-১৭৮২) নৌবাহিনী ছিল, এবং সে নৌ-বাহিনী নিতান্ত হীনবল ছিল না। তাঁহার ত্রিশখানি রণতরী এবং বহুসংখ্যক সৈন্য-সমন্বিত মালবাহী-জাহাজ ছিল। (Low's History of the Indian Navy, Vol. I.) তিনি দক্ষিণ উপকূলে বহু রণতরী প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন মাস্তলযুক্ত যুদ্ধ-জাহাজ (Grab) ছিল, এবং প্রত্যেক জাহাজে ২৮টি হইতে ৪০টি করিয়া কামান থাকিত। ইহা ভিন্ন সাগরগামী ক্ষুদ্র তরীও (Palas) ছিল। এই সকল জাহাজে ১০টি বা ১২টি কামান থাকিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে ইংরেজের ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ হায়দার আলির নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত করেন। এ সকল কথা বর্ত্তমান মাসিকে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

তখনও ভারতে পোত-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ছিল। চট্টগ্রামের নৌ-শিল্পিগণ জাহাজ নির্ম্মাণে এরূপ সুদক্ষ ছিল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আগ্রহের সহিত তাহাদের দ্বারাই অর্ণব-যান নির্ম্মাণ করাইতেন। এখনও ভারতের বহু স্থানে স্বল্পাকারে নৌ-শিল্পের প্রচলন আছে।

এখন অবশ্য বাষ্পীয় পোতের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত জলযানের প্রচলন হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রী বেলের নির্ম্মিত "কমেট" বিলাতের ক্লাইড নদীতে নিরাপদে চালিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "সাভানা" আমেরিকা হইতে যাত্রা করিয়া সর্ব্বপ্রথম আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ২৭ দিনে

লিভারপুলে উপস্থিত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন জন্‌সন্‌ "এণ্টারপ্রাইজ" নামে একখানি বাষ্পীয় পোতে আটলাণ্টিক্‌ মহাসাগরের পথে লণ্ডন হইতে ১১৩ দিনে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ দেশে বাষ্পীয় পোতের ইহাই সর্ব্বপ্রথম আগমন।

এখন প্রায় সর্ব্বত্রই নদীবক্ষে ক্ষুদ্র-বৃহৎ "ষ্টীমার", এবং বাষ্পচালিত জলযান সমুদ্রপথে যাতায়াত করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য সুগম করিয়াছে। জলযুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী ড্রেডনট, ক্রুইজার, সাবমেরিণ, টর্পেডো-বোট প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ রণতরী অধুনা আবিষ্কৃত হইয়া জগতে ভয়াবহ ধ্বংসের যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের জয়-পরাজয় বিমান দ্বারা সংঘটিত হইবে বলিয়া মনে হয় না; এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় সমুদ্রবক্ষে নির্ণীত হওয়াই সম্ভব।

বিগত মহাযুদ্ধের রণপাণ্ডিত্য ছিল স্থলে—পরিখা-যুদ্ধে নিবদ্ধ। এবারকার রণকৌশল অবরোধ (Blockade) ও প্রতি-অবরোধে নির্ভরশীল। রণতরী-বহরের ন্যায় বণিজ্‌ নৌ-বহরও যুদ্ধজয়ের প্রধান অবলম্বন। রণতরী বাহিনী প্রথম, এবং বাণিজ্যতরী-বহর দ্বিতীয় সহায়। বারিধি-বক্ষে অখণ্ড প্রতাপ সংরক্ষণার্থ প্রত্যেক প্রবল জাতির এই উভয়বিধ পোত প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন। রাজশক্তিকে বিপদে সাহায্যদান ব্যতীত, আত্মরক্ষার্থ ভারতের প্রভূত নৌ-শক্তির প্রয়োজন। স্বদেশে পোত-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত, বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া রণতরী ও বাণিজ্যপোতের অভাব কখনই বিদূরিত হইতে পারে না।

পূর্ব্ব-পশ্চিমে সুদীর্ঘ উপকূল, বিশাল বৈদেশিক ও প্রভূত উপকূল-বাণিজ্য, বহু পোতাশ্রয়, বন্দর, এবং পোতাধিষ্ঠান-(জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিবার স্থান) সম্পন্ন ভারতের ন্যায় বিস্তৃত ভূখণ্ডের পক্ষে পোতশিল্প ও পোত-বাণিজ্য জীবনধারণার্থ অত্যাবশ্যক। পোত-বাণিজ্য প্রত্যেক সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশের জাতীয় অভ্যুত্থান ও অভ্যুদয় নীতির অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ তাহার বহির্বাণিজ্যের নিমিত্ত বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ফলে যুদ্ধারম্ভের পরে মালবাহী জাহাজের সংখ্যাল্পতা বশতঃ তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। বহু মালবাহী ও যাত্রিবাহী-জাহাজ যুদ্ধ-প্রয়োজনে গৃহীত হইয়াছে, এবং বহু জাহাজ সমুদ্র-পথে শত্রুপক্ষের রণবিমান, রণতরী—অগ্নিগর্ভ-ডুবোজাহাজ, এবং সমুদ্রগর্ভে প্রচ্ছন্ন চলমান বিস্ফোরক মাইন দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া অতলে বিলুপ্ত হইয়াছে। মালবাহী-জাহাজের সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে, এবং ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যও সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। রক্ষী-জাহাজের আশ্রয়ে দীর্ঘতর সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে মালবাহী-জাহাজের অত্যধিক সময় লাগে। এই বিলম্বে ব্যবসায়ের প্রভূত অনিষ্ট ঘটিতেছে।

নিমজ্জিত জাহাজের অভাব পূরণ এবং শত্রুর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের সংস্কার-সাধন দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। ফলে জাহাজের অভাব-অনাটনই এখন, যেমন যুদ্ধের, তেমনি বাণিজ্যের পক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটাইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের বহু বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসী ভারতে পোত-শিল্প প্রতিষ্ঠা, এবং পোত-বাণিজ্য বিস্তার জন্য যে আবেদন-নিবেদন এবং আন্দোলন পরিচালনা করিতেছে, তাহা কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত ভারত সরকার যদি উদার ভাবে সাহায্য দান করিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের অবস্থা এরূপ অসহায় হইত না। আজ তাহা হইলে সরকারী সাহায্যে নির্ম্মিত প্রত্যেক জাহাজ ভারতের উপকূল-রক্ষায় সহায়তা ব্যতীত, ভারতের কৃষক ও রপ্তানী ব্যবসায়ীর প্রভূত উপকার সাধনে সমর্থ হইত।

এই উভয় প্রচেষ্টায় ভারতবাসীর অত্যুগ্র উদ্যমের নিষ্ফল প্রযত্নের শোচনীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ষোল বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় বণিজ্‌-নৌ-তদন্ত-সমিতি (Indian Mercantile Marine Committee) ভারতে পোত-শিল্প প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কয়েকটি বিশিষ্ট সরকারী সাহায্যের বিধান দিয়াছিলেন। এই তদন্ত-সমিতি সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল, এবং ইহাতে কয়েক জন বৃটিশ নৌ-শিল্প-বিশারদ বিজ্ঞ সভ্য ছিলেন। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞ সমিতির বিবৃতি (Report) এ কাল যাবৎ বেওয়ারিস চিঠির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া রহিয়াছে। পোত-শিল্পের সৃষ্টি ও পুষ্টি

ব্যতীত ইহার আর একটি প্রধান সুপারিশ ছিল যে, ভারতীয় জাহাজের জন্যই ভারতের উপকূল-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হইবে। এই সুপারিশও গ্রাহ্য করা হয় নাই; অধিকন্তু এই বিধানের বিপর্য্যয়কল্পে ভারত-শাসন আইনে ইহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং এই ত্রুটি যে ভ্রমের ফল, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

গত পাঁচ বৎসর হইতে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী কলিকাতায় একটি পোত-নির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণ (Ship-yard) প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কলিকাতার বন্দর-তত্ত্বাবধায়কদিগের (Port Commissioners) হৃদয়হীন কঠোর নীতির ফলে যে প্রতিষ্ঠান কলিকাতা তথা বাঙ্গালার বেকার-সমস্যার যথেষ্ট সমাধান করিয়া, বহু সংশ্লিষ্ট, সহকারী ও সহযোগী শিল্পের উন্নতিবিধান করিতে পারিত, তাহাতে শোচনীয়রূপে বঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অধুনা পূর্ব্ব-উপকূলে ভাইজাগাপট্টম (বিশাখাপত্তন) বন্দরে এই পোত-নির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। সিন্ধিয়া কোম্পানী এই উদ্দেশ্যে অংশীদারদের নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাঙ্গণ-নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আজ যুদ্ধের প্রয়োজনে, যখন বহু পোতেরই প্রয়োজন, তখন একটি মাত্র পোত-নির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণের প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টা দেশের অথবা রাজশক্তির কল্যাণকল্পে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, যদি সরকার কর্ত্তব্য বোধে সক্রিয় সাহায্য অথবা সহৃদয় আশ্বাসদানে কয়েকটি পোত-নির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণ এই সুদীর্ঘ ব্যবধানকাল মধ্যে সংগঠিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সাম্রাজ্যান্তর্গত স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশগুলির ন্যায় ভারতবর্ষও যথাযোগ্য সাহায্য দানে সমর্থ হইত।

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর নিমিত্ত আবশ্যকানুযায়ী পোত আজ যুক্তরাজ্য এবং অষ্ট্রেলিয়ার পোত-নির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত হইতেছে। রাজকীয় ভারতীয়-নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ এডমিরাল ফিজ হারবার্ট সম্প্রতি তাঁহার বেতার-বক্তৃতায় ভারতে পোত-নির্ম্মাণ-শিল্পের সহিত ভারতের নৌ-বাহিনীর প্রয়োজনের যে নিকট সম্বন্ধ, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। আটটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি। জাহাজের এঞ্জিন এবং কাঠামো প্রস্তুতোপযোগী ইস্পাত ব্যতীত পোত-শিল্প-পরিচালন উপযোগী সকল প্রকার কাঁচা মালই ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে এই শিল্পে মনোযোগী হইলে, ভারতে নির্ম্মিত পোত আজ অনায়াসেই সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিতে পারিত।

যুদ্ধের বিষম পরিস্থিতি হেতু পোত-শিল্পের ত্বরিত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। এই নিমিত্ত সিন্ধিয়া কোম্পানী বিলাত হইতে একটি পোত-নির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণ সরাসরি ভারতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত পোত সরকারের প্রয়োজনে সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহারা ভারত সরকারের সক্রিয় সহানুভূতিও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ এ-প্রস্তাবে রাজী হন নাই। ফলে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-সভার গত অধিবেশনে বাণিজ্য বিভাগের সম্পাদক সার এলান লয়েড ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, যুদ্ধের প্রচেষ্টাকল্পে ভারতে বাণিজ্য-পোত নির্ম্মাণ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সরকার এখন কোন সক্রিয় উৎসাহ দিতে প্রস্তুত নহেন। সুখের বিষয়, সম্প্রতি এই নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং ভাইজাগাপট্টমের প্রতিষ্ঠানকে সরকার যথাসম্ভব পরোক্ষ সাহায্যদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; কিন্তু যুদ্ধ-সঙ্কট হেতু এই বিঘ্ন-বহুল প্রতিষ্ঠান-প্রচেষ্টা অতি মন্থরগতিতে অগ্রসর হইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রণালীতে, যুদ্ধের ক্ষতি এবং স্বাভাবিক দুর্ঘটনা-প্রসূত অপচয়ের দ্রুত পূরণার্থ সতেজ, সক্রিয়, ও বলিষ্ঠ পোত-নির্ম্মাণ-শিল্প অত্যাবশ্যক। বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রয়োজনের সুযোগ লইয়া ভারত যদি এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তাহা হইলে কালে নিজের চাহিদা মিটাইয়া, সুয়েজের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশসমূহে পোত সরবরাহ করিতে পারিবে,—এ আশা দুরাশা নহে।

ভারতের সামুদ্রিক পোত-বাণিজ্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মেডোজ টেলারের ভারতের ইতিহাসও (History of India) এ-বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে।

কিন্তু লণ্ডন বন্দরে ভারতে প্রস্তুত ও ভারতবাসী-পরিচালিত জাহাজের উপস্থিতি বিষম চাঞ্চল্য এবং ভবিষ্যৎ ভী৷তর সৃষ্টি করিয়াছিল।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের (Directors) বিবৃতিতে ভারত ও বিলাতের মধ্যে বাণিজ্যে ভারতে প্রস্তুত জাহাজের গতিবিধির তীব্র প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল:—"No British heart would wish that any of the brave men who have merited so much of their country should be without bread whilst natives of the East brought the ships belonging to our own subjects into our own ports."

এইরূপ তীব্র প্রতিকূল আচরণের ফলে পোত-শিল্প ও তদনুসঙ্গে পোত-বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। ভারতের পোত-শিল্প ও পোতবাণিজ্যের অধঃপতন, অনাচারের ইতিহাস—লজ্জার কাহিনী। আমরা অতীতের আখ্যায়িকা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে মনোভিনিবেশ করিতেছি।

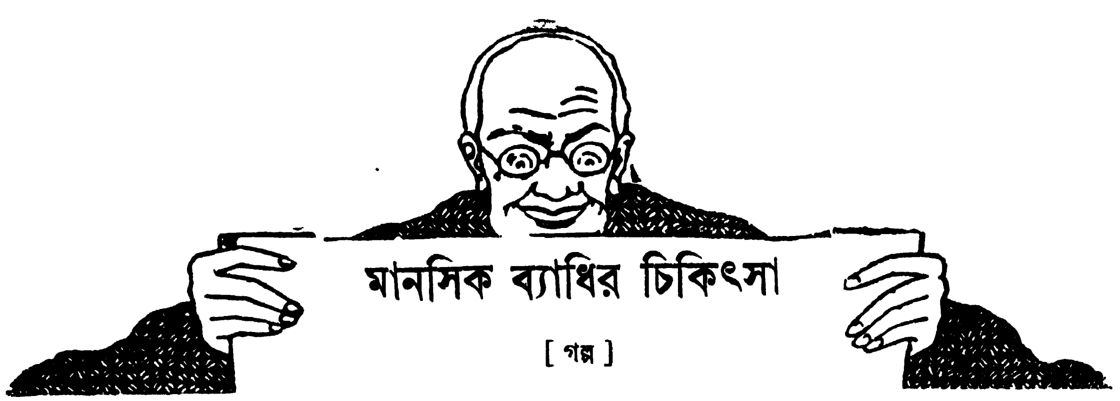
গত আগষ্ট মাসে বৃটিশ পোত-সচিব মিঃ রোনাল্ড ক্রস্ সাম্রাজ্যান্তর্গত স্বায়ত্তশাসনশীল দেশ ও অন্যত্র পোত-নির্ম্মাণ-শিল্পের প্রতিষ্ঠার সমর্থনে বলিয়াছিলেন,—"Our resources are great, but they cannot be too great to meet the needs of the future, and we should frankly welcome all means of increasing our shipping by the aid of the ship yards of the Dominions and elsewhere." ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই এই elsewhere অর্থাৎ "অন্যত্র" শব্দটির অন্তর্ভুক্ত; তথাপি বৃটিশ-কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব ভারতে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে, বরং প্রতিকূল মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সক্রিয়কতা পৃষ্ঠপোষণ ব্যতীত মৌখিক সহানুভূতির কোন মূল্য নাই।

সম্প্রতি রাজকীয় ভারতীয়-নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ এড্‌মিরাল ফিজ্‌হার্বার্ট বলিয়াছেন:—"It is obvious to me and I think, to a great many other people that the sooner a ship-building industry is started, the better for India. Such an industry, to be successful, needs courage, enterprise and forthought. That all these are present in India is a fact that cannot be denied." সুতরাং সরকারের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত, ভারতে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠার আর কোন অভাব নাই। বৃটিশ রাজশক্তি আমেরিকা ও কানাডা হইতে জাহাজ ক্রয় করিতেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার পোতশিল্প রাষ্ট্র-সাহায্যে অভ্যুদয়শীল। অষ্ট্রেলিয়া সম্প্রতি বৃটেনের নিমিত্ত যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ অর্থানুকূল্যে তুরস্কে পোত-নির্ম্মাণ-প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠাপ্রযত্নে ব্যাপৃত। একমাত্র মন্দভাগ্য ভারতের প্রতি সেরূপ সযত্ন ও সাগ্রহ দৃষ্টি নাই। কিন্তু পোতশিল্পের সহিত ভারতের উপকূল-রক্ষার প্রশ্ন বিজড়িত। রণতরীবহর প্রথম রক্ষিবাহিনী; বাণিজ্যতরীবহর দ্বিতীয় রক্ষিশ্রেণী। সুতরাং একের সহিত অপরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উভয়েরই একত্র এবং একান্ত প্রয়োজন।

প্রাচ্য-গুচ্ছের দিল্লী বৈঠক উপলক্ষে ভারত-সচিব সে দিন বলিয়াছিলেন,—"The Delhi conference has been laying for India the foundation of increased industrial and defensive power which are essential conditions to-day of true self-government."

ভারতকে যদি স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইতে হয়, তাহা হইলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাষ্ট্ররক্ষা—উভয়কল্পেই পোত-নির্ম্মাণ-শিল্পের আশু প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য। পরবশতায় কল্যাণ নাই; সুতরাং আত্মনির্ভরশীল আত্ম-প্রচেষ্টাই আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র মুখ্য উপায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সিন্ধিয়া কোম্পানীর পূর্ব্ব-উপকূলের পোত-প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টা কল্যাণকর। অচিরে ভারতের একটি নিজস্ব বলিষ্ঠ বাণিজ্যতরী-বহর অত্যাবশ্যক। জাতীয় বাণিজ্য-বিস্তারের ইহাই মুখ্য উপায়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।



মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা

[গল্প]

১

ডাক্তার হৃদয়বিহারী মুখুয্যে ভবানীপুরের এক জন নামজাদা ডাক্তার। ডাক্তার বাবু দরিদ্রের সন্তান; অসচ্ছল অবস্থা হইতে অধ্যবসায়, প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে এখন ভবানীপুরে 'দশ জনের এক জন' হইয়াছেন। তাঁহার পিতা বঙ্কিমবিহারী কলিকাতার একটা মার্চেণ্ট আফিসে অল্প বেতনে কেরাণীগিরি করিয়া অতি কষ্টে সংসার পালন করিতেন। তিনটি কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। ছোট মেয়ের বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে বাড়ীখানি বন্ধক দিতে হইয়াছিল। হৃদয়বিহারী সেই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার কলেজে পড়িবার সুযোগ হইয়াছিল।

হৃদয়বিহারী এফ-এ পরীক্ষাতেও বৃত্তি পাইয়া ডাক্তারী পড়িবার জন্য মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি মেডিকেল কলেজের প্রত্যেক পরীক্ষাতে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি ও পদক পাইতেন। এজন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার পর বঙ্কিম বাবুকে পুত্রের শিক্ষার জন্য কিছুই ব্যয় করিতে হয় নাই। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই শোভাবাজারের কোন খ্যাতনামা চিকিৎসকের কন্যা সত্যভামার সহিত হৃদয়বিহারীর বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহে বঙ্কিম বাবু বৈবাহিকের নিকট প্রায় তিন হাজার টাকা পাইয়া ঋণ পরিশোধ করেন।

হৃদয়বিহারী যথাসময়ে মেডিকেল কলেজের শেষ এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভবানীপুরেই চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বঙ্কিমবিহারী পুত্রকে উপার্জ্জনশীল এবং উন্নতি-পথে পদার্পণ করিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন।

ইহার পর প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালে হৃদয় বাবুর সাংসারিক এবং পারিবারিক পরিবর্ত্তন বড় অল্প হয় নাই। দরিদ্র কেরাণী বঙ্কিমবিহারীর ক্ষুদ্র জীর্ণ ইষ্টকালয়ের পরিবর্ত্তে সেখানে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক হৃদয়বিহারীর অতি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা গর্ব্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়াছে। বঙ্কিমবিহারী প্রতি দিন আফিসের কার্য্য শেষ করিয়া অবসন্নদেহে শ্রান্ত-পদে ধীরে ধীরে যে গলির ভিতর দিয়া জীর্ণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, এখন সেই গলিতে হৃদয় ডাক্তারের মোটরগাড়ী তাহার বংশীধ্বনিতে পল্লীবাসীদিগকে সচকিত করিয়া দিবারাত্রি যাতায়াত করিতেছে। বঙ্কিম বাবু এক দিন যে পুত্রের স্কুলের বেতন এবং পাঠ্য-পুস্তক সংগ্রহের জন্য চিন্তায়, অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিতেন, এখন বঙ্কিমবিহারীর সেই পুত্র দশ-বারটি দরিদ্র ছাত্রের স্কুলের মাসিক বেতন যোগাইয়া আসিতেছেন, এবং কয়েকটি দরিদ্র ছাত্রকে নিজের গৃহে রাখিয়া প্রতিপালনও করিতেছেন।

বলিয়াছি, হৃদয় বাবুর পারিবারিক পরিবর্ত্তনও বড় অল্প হয় নাই। ডাক্তার হৃদয় বাবুর পিতার মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তাঁহার জননীরও মৃত্যু হয়। প্রৌঢ়া সত্যভামাই এখন সংসারের কর্ত্রী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায় চব্বিশ বৎসর বয়স্ক সুদর্শন যুবক বিজনবিহারী মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে। বিজনবিহারীর পর দুইটি কন্যা চারুলতা ও পুষ্পলতা; তাহারা উভয়েই বিবাহিতা। চারুলতার একটি পুত্রসন্তান; পুষ্পলতার এখনও সন্তান হয় নাই। পুষ্পলতার পর

বার বৎসর বয়স্ক বিমানবিহারীর এখনও উপনয়ন হয় নাই। হৃদয় ডাক্তারের পরিবারে এই কয় জন লোক হইলেও দুস্থ, দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-আত্মীয়ারও অভাব নাই; দূর-সম্পর্কীয় একটি মাতুলও সস্ত্রীক ও সকন্যা তাঁহার সংসারে প্রতিপালিত হইতেছেন। ইহা ছাড়া ডাক্তার বাবুর দুই জন কম্পাউণ্ডার, মোটর-ড্রাইভার, এবং বাজার-সরকারও তাঁহার পোষ্য। বিমানের গৃহশিক্ষক নিবারণ বাবুও তাঁহার বাড়ীতেই বাস করিয়া একটা আফিসে চাকরী করেন। এই সকল কর্ম্মচারী ব্যতীত দ্বারবান, বেহারা, খানসামাও অনেকগুলি।

বিজন মেডিকেল কলেজে পড়ে, পিতা কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক, সুতরাং কন্যাদায়গ্রস্ত অনেক ভদ্রলোক হৃদয় বাবুর দ্বারস্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ, ডাক্তার বাবুর সঙ্কল্প, পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হইলে তিনি তাহার বিবাহ দিবেন না।

২

শ্যামপুকুরের কুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার একটা সওদাগরী আফিসে মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে চাকুরী করেন। শ্যামপুকুরের বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের অবস্থা এক সময় বিলক্ষণ সমৃদ্ধ ছিল। জনরবে প্রকাশ, বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের আদিপুরুষ বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর চাকুরী করিয়া প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কালে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কলহ-বিবাদ এবং মামলা-মোকদ্দমা প্রবেশ করায় অনেককেই নিঃস্ব হইতে হইয়াছিল; কেহ কেহ পৈতৃক-বাড়ীর অংশ বিক্রয় করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। কুমারনাথ বাবুর প্রপিতামহ, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন বংশধরের বাড়ীর অংশ ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তিনি যে অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রাসাদান্তঃপুরের খিড়কীর দ্বারের এক পার্শ্বে অবস্থিত। তিনি ক্রীত অংশের জীর্ণ-সংস্কার করাইয়া, প্রাচীন অট্টালিকার খিড়কীর দ্বারকে নিজের অংশের সদর দ্বারে পরিণত করেন। প্রাচীন অট্টালিকার সদর দ্বার বড় রাস্তার উপরে অবস্থিত; পশ্চাতে খিড়কীর দ্বার একটা গলি-পথের উপরে ছিল।

শ্যামপুকুরের বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের সহিত কুমারনাথ বাবুদের কোনওরূপ জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ বা শোণিত-সংস্রব না থাকিলেও, কুমারনাথের পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়-বাড়ীর এক অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত-পালিত হওয়ায়, বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রাচীন বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের কোন কোন পরিবারের "ঘরের ছেলে" হইয়াছিলেন। তিনি পিতার নির্দ্দেশক্রমে ঐ সকল পরিবারের বয়োবৃদ্ধ লোকদের মধ্যে কাহাকেও "জ্যাঠামশায়," কাহাকেও "কাকা", কাহাকেও "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন; মহিলাদিগকেও "জ্যাঠাইমা" "কাকীমা" "পিশিমা" বা "দিদি" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহারাও এই নবাগত পরিবারের প্রিয়দর্শন বালকটিকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

কুমারনাথও বাল্যকালে পিতার ন্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইয়া আপনাকে সেই সুপ্রাচীন পরিবারের অন্যতম বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ যে হুগলী জেলার নালিকুল গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন—এ কথা তাঁহার জানা থাকিলেও তিনি আপনাকে খ্যাতনামা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধর বলিয়া পরিচিত করিলেন।

কুমারনাথ এইরূপে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধর হইলেন বটে, কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে মধ্যে-মধ্যে একটু বিপদেও পড়িতে হইত। বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের কর্ত্তৃস্থানীয় বৃদ্ধ রামলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুমারনাথ "জ্যাঠামশাই" বলিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের মধ্যে রামলোচন বাবুর অবস্থাই ভাল ছিল। এক দিন কুমারনাথ আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া শুনিলেন, রামলোচন বাবু মধ্যাহ্ন-কালে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কুমার-নাথ বিশ্রামান্তে জলযোগ সারিয়া ধূমপানের পর নগ্নপদে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন, এবং গভীর রাত্রিতে শ্মশান-বন্ধুদের সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন। পরদিন হইতে তিনি অশৌচ গ্রহণ করিয়া পাদুকা ত্যাগ করিলেন। আফিসের বাবুরা তাঁহাকে নগ্নপদ দেখিয়া

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কুমারনাথ বলিলেন, "জ্যাঠা-মশায়ের গঙ্গালাভ হইয়াছে।"

মৃত রামলোচন বাবুর পুত্র সুলোচন, তিন-চারি দিন পরে কুমারনাথের নগ্নপদ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার দাদা, ব্যাপার কি? আপনার খালি পা কেন?"

কুমারনাথ বলিলেন, "আর কেন? যে দিন এখানে জ্যাঠামশায় মারা যান, সেই দিনই আমার এক দাদামশায় —অর্থাৎ আমার পিতামহের জ্যাঠ্‌তুত ভাই মারা গেছেন। তাঁর বয়স ছিয়ানব্বই বছর হ'য়েছিল। নালি-কুলের একটি বাবু আমাদের আফিসে কাজ করেন, পরশু দিন তাঁরই মুখে এই খবর পেলাম।"

যে দিন রামলোচন বাবুর পুত্রদের ও জ্ঞাতিবর্গের অশৌচান্ত হইল, সেই দিন কুমারনাথ বাবুও গঙ্গার ঘাটে গিয়া গোঁফ কামাইয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য, "জ্যাঠামশায়" বা "দাদামশায়ের" মৃত্যুতে কুমারনাথ বাবু কেবল পাদুকা ত্যাগ করিয়াই অশৌচ পালন করিয়াছিলেন, মৎস্য-মাংসাদি ভোজন বন্ধ রাখিবার অসুবিধা সহ্য করেন নাই।

কুমারনাথ বাবু আর এক দিক দিয়াও "বনিয়াদী" বনিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাহিরের ঘরে কয়েকটা পুরাতন আসবাব ছিল। তাঁহার পিতা ঐ সকল আসবাব বহুবাজারের পুরাতন আসবাবের দোকান বা চোরা-বাজার হইতে সুলভ মূল্যে কিনিয়া-আনিয়া বৈঠকখানা সাজাইয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কুমারনাথ গৃহস্বামী হইয়া আবিষ্কার করিলেন যে, ঐ সকল আসবাবের পশ্চাতে এক-একটি প্রাচীন ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। বৈঠকখানার এক পার্শ্বে মার্ব্বল-পাথরের একখানা ছোট টেবিল ছিল, সেই টেবিল কুমারনাথের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে না কি উপহার পাইয়াছিলেন। বৈঠকখানার কাচের দেওয়ালগিরি কুমারনাথের পিতামহ লক্ষ্ণৌএর নবাব ওয়াজিদ আলি সাহের সহিত দাবা-খেলায় বাজি জিতিয়া লাভ করিয়াছিলেন। বৈঠকখানার তক্তাপোশের উপর যে ছিন্ন গালিচাখানা প্রসারিত ছিল, সেখানা না কি এক সময় পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবার-কক্ষের শোভাবর্দ্ধন করিত; মহারাজের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হয়, সেই সময় কুমারনাথের পিতামহ ঐ গালিচাখানা ক্রয় করেন। বৈঠকখানার অধিকাংশ আসবাবেরই এইরূপ এক-একটা ইতিহাস কুমারনাথ বাবুর মুখে যখন-তখনই শুনিতে পাওয়া যাইত।

কুমারনাথ বাবুর পক্ষে "বনিয়াদী" হইবার আর একটা সুবিধা এই ছিল যে, তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার পিতা-পিতামহ সকলেই অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে সহজেই মনে হইত, সাধারণ দরিদ্রের বংশে তাঁহার জন্ম নহে। তাঁহার কেশের পারিপাট্য, বেশভূষার বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে যেন জনসাধারণ হইতে অনেকটা পৃথক্ করিয়া রাখিত।

কুমারনাথের পরিজনবর্গের মধ্যে তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনী, কন্যা সুলোচনা ও সুষমা, এবং তিনি স্বয়ং। সংসারে এই চারি জন মাত্র লোক, বাড়ীটা নিজের, ভাড়া দিতে হয় না; তথাপি মাসিক দেড় শত টাকা বেতনের চাকুরী করিলেও তিনি বেতন হইতে একটি পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারেন না। সংসারে কাজ করিবার জন্য এক জন বেহারা আছে, এক জন দাসী আছে, রন্ধনের জন্য জগন্নাথ-মার্কা এক "ঠাকুর" আছে। দুই বৎসর হইল, সুলোচনার বিবাহ হইয়াছে; সুলোচনার শ্বশুর পুত্রের বিবাহের সময় টাকাকড়ি দাবী করেন নাই। সুলোচনার প্রায় এক হাজার টাকার গহনা ছিল, বিবাহের জন্য নূতন কোনও গহনা তৈয়ারী করাইতেও হয় নাই, তথাপি কুমারনাথ কন্যার বিবাহের জন্য হেমাঙ্গিনীর সমস্ত অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া বার শত টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরে সুদে-আসলে ঋণের পরিমাণ প্রায় দেড় হাজার টাকা হইয়াছিল। এই অবস্থাতেও কুমারনাথ বার আনা সের পটল, আট আনা জোড়া ফুলকপি কিনিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেন না। বনিয়াদী চাল কি করিয়া ত্যাগ করেন?

কর্ত্তাটির এই অপব্যয় নিবারণের জন্য হেমাঙ্গিনী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। সুষমার বয়স প্রায় ষোল বৎসর, শীঘ্রই তাহার বিবাহ দিতে হইবে; তথাপি কুমারনাথ পূর্ব্ববৎ মুক্ত-হস্তে বিলাসিতার ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন।

৩

হৃদয় বাবু ভবানীপুরে চিকিৎসা করিলেও অনেক সময় কলিকাতাতেও তাঁহার 'ডাক' হইত; এই উপলক্ষে তাঁহাকে বাগবাজার ও শ্যামবাজারেও যাইতে হইত। সে সময় তিনি সুযোগ পাইলেই একবার শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া সকলের কুশল সংবাদ লইতেন। তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত ছিলেন না; সত্যভামার কনিষ্ঠ সহোদর উমাচরণই এখন বাড়ীর কর্ত্তা। উমাচরণ তেমন কোন কাজকর্ম্ম করিতেন না; তাঁহার পিতার আমলের ডিস্‌পেন্সারির আয় এবং পিতার অর্জ্জিত কোম্পানীর কাগজের সুদ হইতেই তাঁহার সংসার চলিত। উমাচরণের স্ত্রী এই সংসারের গৃহিণী হইলেও প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব করিতেন উমাচরণের মামাত-ভগিনী ভগবতী দেবী। ভগবতী দেবী বিধবা; তাঁহার একমাত্র কন্যা যশোর জেলায় শ্বশুরালয়ে থাকেন, জামাতা যশোরে মোক্তারি করেন। ভগবতী দেবীর শ্বশুরবাড়ী চোরবাগানে, সে বাড়ী ভাড়া দেওয়া আছে, উমাচরণই এখন তাঁহার অভিভাবক। ভগবতী হৃদয় বাবু অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের বড়।

বিজনবিহারী ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চারি-পাঁচ দিন পরে এক দিন অপরাহ্নকালে হৃদয় বাবু বাগবাজারে রোগী দেখিতে গিয়া ফিরিবার সময় শ্যাম-বাজারে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। ভগবতী তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বাড়ীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"হৃদয়, বিজন পাশ দিয়েছে শুনে বড় আনন্দ হ'ল। সন্দেশ খাওয়াবে কবে?"

হৃদয় বাবু বলিলেন, "আপনার বোনপো পাশ ক'রেছে, আপনারই উচিত আমাকে খাওয়ান।"

"পাশের দোহাই দিয়ে এত দিন তো ছেলের বিয়ে দিলে না, এখন তো আর সে আপত্তি নেই, এইবার ছেলের বিয়ের চেষ্টা কর।"

হৃদয় ডাক্তার বলিলেন, "কাল সত্যভামাও আমাকে বিজনের বিয়ের কথা ব'লছিল। এইবার একটি সুন্দরী মেয়ের সন্ধান করা যাক।"

"আমি তোমাকে একটি মেয়ের সন্ধান দিতে পারি; তেমন সুন্দরী লাখে একটা মেলে না! তাকে যদি বৌ ক'রতে পার, তবে তোমার ঘর-আলোকরা বৌ হবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "কার মেয়ে? আপনার কেউ হয় না কি?"

ভগবতী বলিলেন, "তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকলেও তারা অনেক দিন থেকে আমাদের ঘরের লোক ব'ললেই হয়। তুমি বোধ হয় জান, আমার মা শ্যামপুকুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর মেয়ে; রামলোচন বাঁড়ুয্যে আমার মায়ের কাকা ছিলেন। এই বাঁড়ুয্যে-গুষ্টি এখন অনেক যায়গায় ছড়িয়ে প'ড়েছে। আমরা গল্প শুনেছি, সে-কালে এই বাঁড়ুয্যে-গুষ্টির এক জন, তাঁর বাড়ীর অংশ বেচে ফেলেছিলেন। সেই সময় নীলমণি বাঁড়ুয্যে ব'লে এক ব্রাহ্মণ ঐ পাড়াতে বাড়ী ভাড়া ক'রে বাস ক'রতেন। হুগলী জেলায় নালিকুল না কি এক গাঁয়ে তাঁর বাড়ী; তিনি বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর সেই অংশটা কিনে বাস করেন। সেই নীলমণি বাঁড়ুয্যের নাতি ঘনশ্যাম বাঁড়ুয্যে আমার দাদামশায়কে "দাদা" ব'লে ডাকতেন। ঘনশ্যামের ছেলে কুমারনাথ বাঁড়ুয্যের দু'টি মেয়ে আছে। বড় মেয়ের আজ বছর-দুই হ'ল বিয়ে হ'য়ে গেছে, ছোট মেয়ে সুষমার বয়সও বছর পনের-ষোল হ'ল। মেয়েটি যেমন ধীর, ঠাণ্ডা, তেমনি তার রূপ। দুই বোন যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী। মেয়েটি ইস্কুলে পড়ে, ইংরেজী জানে; ছাঁট, কাট, সেলাই, উলের কাজ সব শিখে ফেলেছে।"

হৃদয় বাবু বলিলেন, "দিদি, আপনি যখন ব'লছেন, তখন সে মেয়ে বোধ করি ভালই হবে। এই কুমারনাথ বাবু কি করেন? তাঁরা লোক কেমন?"

"কুমারনাথ শুনেছি কোন্ সাহেবের আফিসে কাজ করে, শ' দেড়েক টাকা মাইনে পায়। বৌটি যেন স্বয়ং লক্ষ্মী, গোবেচারী; কেউ তার মুখে কখনও একটা উঁচু কথা শোনেনি। কুমারনাথও নিরীহ লোক, কারু সঙ্গে এক দিনের জন্যও ঝগড়া-বিবাদ নেই। দোষের মধ্যে লোকটা ঘোর বাবু। তামাক ছাড়া আর কোন রকম নেশা-টেশা করে না। পাড়া-সম্পর্কে কুমার আমার মামা হয়, কিন্তু আমি বয়সে তার অনেক বড় কি না, তাই সে আমাকে "পিসিমা" ব'লে ডাকে। বাবুগিরির জন্যে হাতে

একটা পয়সাও সে রাখতে পারলে না। যা রোজগার করে, দু'হাতে উড়োয়! বার'শ টাকায় বৌর গয়না বাঁধা দিয়ে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। সংসারে খেতে তো মোট তিনটে লোক, বাড়ীভাড়াও দিতে হয় না; মনে করলে মাসে মাসে পঞ্চাশটা টাকাও তো ডাকঘরে ফেলে রাখতে পা'রত, তা হবার যো নেই! তার আর একটা বেয়াড়া খেয়াল আছে,—সকলকে সে জানাতে চায়, সে ঐ বাঁড়ুয্যেবাড়ীরই সরিক, রামচন্দর বাঁড়ুয্যে তারই পূর্ব্বপুরুষ। তার চালচলন দেখে, কথাবার্ত্তা শুনে লোকে কথাটা সত্যি মনে করে। আমরা ঘরের খবর জানি কি না, যারা জানে না, তারা কুমারকে বাঁড়ুয্যে-বংশেরই ছেলে বলে মনে করে।"

হৃদয়বিহারী হাসিয়া বলিলেন, "দিদি, মানুষমাত্রেরই কোন না কোন বিষয়ে দুর্ব্বলতা থাকে; কুমার বাবুরও দেখছি, ঐ রকম দুর্ব্বলতা আছে। থাকুক, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। দেখি, যদি মেয়েটি আমাদের পছন্দ হয়, তা' হলে তাকে নিতে আপত্তি কি?"

"মেয়ে দেখলে তোমার কোন আপত্তিই হবে না; তবে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে তোমাকে একটু বিবেচনা ক'রতে হবে। শুনলেই তো, বৌর গয়না বাঁধা দিয়ে বড় মেয়েটি পার ক'রেছে, ছোট মেয়ের বিয়েতে বাড়ীখানাও হয় তো বাঁধা পড়বে।"

"সে কথা আমার বেশ জানা আছে। আমার ভগিনীদের বিবাহের জন্য আমার বাবাকেও বাড়ী বাঁধা দিতে হ'য়েছিল। কন্যাদায় যে কি বিষম দায়, তা আমি জানি তো, আমার ছেলের বিয়েতে আমি কন্যা-কর্ত্তার কাছ থেকে একটি পয়সাও দাবী ক'রবো না।"

"তোমার অভাব কি ভাই যে, কুটুমের কাছে হাত পাততে যাবে? আশীর্ব্বাদ করি, মা-লক্ষ্মী তোমার ঘরে চিরদিন অচলা থাকুন।"

৩

শনিবার বেলা দুইটার সময় আফিস বন্ধ হইলে কুমারনাথ বাবু বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৈঠকখানাতে বসিয়া সিগারেট টানিতেছেন! কুমারনাথ তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। কুমারনাথকে দেখিবামাত্র আগন্তুক মুখ হইতে সিগারেট নামাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলে কুমার বাবু বলিলেন, "কাকে চান? আপনার নিবাস?"

"আমি কালীঘাট থেকে আসছি; কুমারনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আমারই নাম কুমারনাথ বাঁড়ুয্যে। আমার কাছে মহাশয়ের প্রয়োজন?"

আগন্তুক সসম্ভ্রমে ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রণাম,—আপনি বোধ করি, আফিস থেকেই বাড়ী ফিরছেন? আপনার সঙ্গে কথা আছে; আপনি মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন, আমি অপেক্ষা ক'রছি।"

"আচ্ছা বসুন, আমি আসছি।"—কুমার বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে আগন্তুক উপবেশন করিয়া পুনরায় ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন। কুমার বাবু বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া প্রায় দশ মিনিট পরে বৈঠকখানায় আসিলেন ও আসন গ্রহণ করিয়া আগন্তুককে বলিলেন, "মহাশয়ের নাম?"

"আমার নাম উমাপদ মিত্র। আপনি বোধ হয়, ভবানীপুরের ডাক্তার বাবুর হৃদয় নাম শুনে থাকবেন—হৃদয়বিহারী মুখুয্যে খুব নামজাদা ডাক্তার। আমি তাঁর কালীঘাট-ডিস্‌পেনসারির ম্যানেজার। ডাক্তার বাবু তাঁর পুত্রের জন্য একটি সুন্দরী পাত্রী খুঁজছেন। তিনি শু'নেছেন, আপনার একটি বিবাহযোগ্যা সুন্দরী মেয়ে আছে। আপনি এখন সেই মেয়েটির বিবাহ দিতে ইচ্ছুক কি না, তিনি আমাকে তাই জানতে পাঠিয়েছেন। যদি আপনার বিবাহ দিতে আপত্তি না থাকে, তা' হলে আমি একবার মা-লক্ষ্মীকে দেখে যেতে ইচ্ছা করি।"

কুমারনাথ বলিলেন, "মেয়ে পনের-ষোল বৎসরের হ'ল: যত শীঘ্র পারি, তাকে পার করতেই হবে। ডাক্তার বাবুর নাম অনেক দিন থেকেই জানি; কলকাতার কে হৃদয় ডাক্তারের নাম না জানে? কিন্তু আমি গরীব কেরাণী, আমি কি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রতে পারব? কর্ত্তাদের আমলের সাতমুকুরে ঠাকুর-দালান, আর প্রকাণ্ড চকমিলান বাড়ী দেখে আমাকে বড়মানুষ মনে ক'রলে ভুল ক'রবেন। অবশ্য, সরিকদের মধ্যে দু'-এক ঘরের অবস্থা এখনও ভাল আছে বটে, তবে অধিকাংশেরই অবস্থা আমার মতন—চাকরি না ক'রলে

উনানে হাঁড়ি চড়ে না।—ডাক্তার বাবুর ছেলেটি কি করেন?"

"এইবার এম-বি পাশ করেছেন।"

কুমারনাথ বাবু বেহারাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার আর এই বাবুটির জন্যে দু' কাপ চা তোর দিদিমণিকে এখানে দিয়ে যেতে বল, আর এই বাবুর জন্য কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।"

উমাপদ বাবু বলিলেন, "আবার জলখাবার কেন? চা-ই যথেষ্ট।"

কুমারনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তা কি হয়? সকল শুভ-কাজের প্রস্তাব মিষ্টিমুখেই আরম্ভ করতে হয়।"

সুষমা চা লইয়া আসিলে উমাপদ তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। একাধারে এত রূপ তিনি আর কখনও দেখেন নাই। মুখ, নাক, চক্ষু, হাত-পায়ের গড়ন, দেহের বর্ণ, মাথার চুল, সমস্তই নিখুঁত; বিধাতার অপূর্ব্ব দান!

উমাপদ বাবু সুষমার হাত হইতে চা লইয়া বলিলেন, "কুমার বাবু, আপনি যথার্থই ভাগ্যবান্‌। এমন সর্ব্ব-সুলক্ষণা মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি।—তোমার নাম কি মা-লক্ষ্মী?"

সুষমা বীণা-নিন্দিত স্বরে বলিল, "শ্রীমতী সুষমা দেবী।"

উমাপদ বাবু বলিলেন, "দেবীই বটে। সাক্ষাৎ সরস্বতী। এমন দেবীর নামের শেষে যারা বাঁড়ুয্যে, চাটুয্যে, মুখুয্যে বসাতে চায়, তারা আহাম্মুখ ভিন্ন আর কি? দেবীর মর্য্যাদা তারা বোঝে না।"

জলযোগান্তে উমাপদ বাবু বিদায় লইবার সময় বলিলেন, "কাল সকালে আমি ডাক্তার বাবুকে নিয়ে আসব। খুব সকাল না হ'লে তাঁর সময় হবে না, সারা দিনে তাঁর তো অবকাশ নেই। তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে আসতে পারেন।"

পরদিন রবিবার প্রভাতে ডাক্তার বাবু সস্ত্রীক উমাপদ বাবুর সঙ্গে কন্যা দেখিতে আসিলেন। তিনি যে অত সকালে আসিবেন, কুমার বাবু তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ডাক্তার বাবু সাড়ে-আটটা কি নয়টার সময় আসিবেন, তাই তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে বেহারাকে দিয়া বৈঠকখানা ঘরটি পরিষ্কার করাইতেছিলেন। এমন সময় মোটরের হর্ণের শব্দে বিস্মিত হইয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের সেই বাবুটির সঙ্গে ডাক্তার বাবু সস্ত্রীক আসিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে যাইবার পূর্ব্বেই হৃদয় বাবু সত্যভামাকে লইয়া তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। হর্ণের শব্দ শুনিয়া কুমারনাথের স্ত্রী হেমাঙ্গিনীও অন্তঃপুর হইতে বৈঠকখানার দিকে আসিতেছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া কুমারনাথ বলিলেন, "ডাক্তার বাবুর স্ত্রী এসেছেন, এঁকে আগে উপরে নিয়ে যাও।"

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে সত্যভামা উপরে চলিয়া গেলে কুমার বাবু বলিলেন, "আপনার মত লোককে বসাই এমন স্থান আমার নাই। আমি সামান্য লোক, কেরাণীগিরি করি। অবশ্য, কর্ত্তাদের আমলের কথা আলাদা। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই—হা-হা, হি-হি।"

কুমারনাথের কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বোধ হয় মনে করিলেন, সে অযোধ্যা বা সে রামচন্দ্র না থাকিলেও হনুমান আছে; প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনি তো দেড় শত টাকা বেতন পান। আমার বাবা আশী টাকা বেতনের কেরাণী ছিলেন। শুনেছি, আমার পিতামহ ত্রিশ টাকা বেতনে স্কুলে পণ্ডিতি ক'রতেন। আপনি তো তার পাঁচ গুণ বেতন পান।"

বলা বাহুল্য, ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার সময়, দিল্লীর বাদসাহের প্রদত্ত টেবিল, ওয়াজিদ আলি সাহেব প্রদত্ত দেওয়ালগিরি, রণজিৎ সিংহের দরবারের গালিচা প্রভৃতি দেখাইয়া কুমার বাবু ডাক্তার বাবুকে বিস্মিত করিতে ভুলেন নাই।

হেমাঙ্গিনী সত্যভামাকে লইয়া উপরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন সুষমা কল-ঘরে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। সত্যভামাকে বসাইয়া হেমাঙ্গিনী, বোধ হয় সুষমাকে সাবধান করিবার জন্যই কক্ষান্তরে গিয়াছিলেন। মাঘ মাস, শীতকাল, সুষমা কল-ঘর হইতে শুধু একটা ফ্লানেলের সেমিজ পরিয়া বাহির হইল, এবং কোন্‌ কাপড়খানা পরিবে, জননীকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য "মা" বলিয়া যেমন হেমাঙ্গিনীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল, সত্যভামা তখনই "কেন মা"

বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। হেমাঙ্গিনী সত্যভামার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি তথায় আসিয়া দেখিলেন, সত্যভামা এক হাতে সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, অন্য হাতে তাহার অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপের মত মুখখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

সুষমাকে দেখিয়া ডাক্তার বাবুরও খুব পছন্দ হইল। তিনি কুমার বাবুকে বলিলেন, "আমি এই মা-লক্ষ্মীকেই আমার পুত্রবধূ ক'রব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এত শীতে সুবিধা হবে না, ফাল্গুন মাসের শেষে একটা শুভদিনে মাকে বরণ করে ঘরে তুলব। আমি পণ-প্রথার দারুণ বিরোধী। আপনি আমার পুত্রকে মাত্র একটি আংটি দেবেন, তার বেশী আর কিছুই আপনাকে দিতে হবে না। আপনি সুবিধামত এক দিন আমার ছেলেকে দেখে আসবেন। বিজনকে দেখলে আপনি তাকে সুষমার অযোগ্য বলে মনে করবেন না।"

কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া বেলা নয়টার সময় ডাক্তার বাবু সপত্নী প্রস্থান করিলেন।

৩

১৮ই ফাল্গুন বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। বিবাহের সাত দিন পূর্ব্বে, কুমারনাথ বাঁড়ুয্যে-পরিবার হইতে সংগৃহীত কুড়ি-পঁচিশ জন "জ্ঞাতি" সঙ্গে লইয়া পাত্র-আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। এই আশীর্ব্বাদ বা "পাকা-দেখা" উপলক্ষে ডাক্তার বাবু ভোজ্যদ্রব্যের কোনরূপ আড়ম্বর করেন নাই। কলিকাতার আধুনিক প্রথায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ রকম আমিষ ও নিরামিষ ব্যঞ্জন, আট-দশ প্রকার মিষ্টান্ন, এবং সময়ের ও অসময়ের নানা প্রকার দুর্ম্মূল্য ফলে থালা সাজাইয়া ভোক্তাদিগকে বিস্মিত করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। দুই-তিন রকম নিরামিষ, এক রকম আমিষ ব্যঞ্জন, একটা চাটনি, দধি, ক্ষীর এবং দুই প্রকার মিষ্টান্ন—সন্দেশ ও রসগোল্লা, ইহারই তিনি আয়োজন করিয়াছিলেন; তবে প্রত্যেক দ্রব্যই অত্যন্ত উপাদেয় ও মুখরোচক হইয়াছিল। আশীর্ব্বাদ এবং ভোজনাদির পর ডাক্তার বাবু ভাবী বৈবাহিককে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরের কক্ষগুলি দেখাইয়া আনিলেন। তিনি কুমার বাবুকে বলিলেন,—"আপনার কন্যা যে বাড়ীতে এসে আজীবন বাস করবে, সে বাড়ীর সকল খুঁটিনাটি সুবিধা-অসুবিধা আপনাকে দেখিয়ে রাখাই আমি সঙ্গত মনে করি।"

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সুলোচন বাবু অন্যান্য কথার পর বলিলেন, "ডাক্তার বাবু লোক মন্দ ন'ন, তবে মনে হ'ল, ভদ্রলোক একটু দৃষ্টি-কৃপণ।—ভোজনের ব্যবস্থাটা সেই মামুলি ধরণের।"

কুমারনাথ বলিলেন, "টাকা রোজগার ক'রলেই নজর দরাজ হয় না। বনেদি ঘরের নজরই আলাদা। আমার বাড়ীতে আশীর্ব্বাদ ক'রতে গিয়ে বেয়াই দেখে আসবেন—পাকা-দেখার খাওয়ানোর আয়োজন কি রকম হওয়া উচিত।"

কুমারনাথ হাল-ফ্যাশানের ব্যবস্থানুযায়ী পাকা-দেখার ভোজ্যের আয়োজন করিয়া তাহা দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তার বাবু তাহা দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন।

হৃদয় বাবু বলিয়াছিলেন, বরযাত্রীর সংখ্যা কুড়ি-পঁচিশ জন হইবে। তাহা শুনিয়া কুমার বাবু সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, "মোট কুড়ি-পঁচিশ জন? আমি আশা ক'রেছিলেম, খুব কম হ'লেও শ-দেড়েক তো হবেই।"

এ কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিয়াছিলেন,—"কন্যাদায়-গ্রস্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে বরযাত্রীর পাল লইয়া যাওয়া আমি অত্যাচার বলিয়া মনে করি। আমার আত্মীয় পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াইতে হয়, আমার বাড়ীতেই খাওয়াইব।"

বিবাহের লগ্ন রাত্রি এগারটার পর। রাত্রি নয়টার মধ্যেই বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের ভোজন শেষ হইল। কুমার বাবু ডাক্তার বাবুকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "বিবাহ শেষ হোক, তার পর দুই বেয়াই একসঙ্গে ব'সে খাওয়া যাবে।"

বাঁড়ুয্যেদের ঠাকুর-দালানে কন্যা-সম্প্রদানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দালানের এক পার্শ্বে পিতল কাঁসার দানসামগ্রী, এবং বহুমূল্য খাট, বিছানা আলমারী, ড্রেসিং-টেবল, স্প্রিংএর গদীওয়ালা চেয়ার, কৌচ প্রভৃতি সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী-দিগকে বসাইবার ও খাওয়াইবার ব্যবস্থা বাঁড়ুয্যেদের বহির্ব্বাটীতেই হইয়াছিল। বহির্ব্বাটীতে পুরুষের সংখ্যা

দুই শত হইয়াছিল ; অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকের সংখ্যাও প্রায় দেড় শত।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ডাক্তার বাবু কুমার বাবুকে বলিলেন, "ওদিককার খাওয়ানর ব্যাপার তো শেষ হ'ল ; এখন নির্জ্জনে আপনাকে দুই-একটা কথা ব'লতে চাই।"

বৈবাহিকের অনুরোধ শুনিয়া কুমারনাথ তাঁহাকে নিজের বৈঠকখানায় লইয়া আসিলে ডাক্তার বাবু বলিলেন, "বেয়ানকেও দয়া ক'রে একবার এই ঘরে আসতে বলুন। আপনাদের দু'জনেরই সম্মুখে আমি কথাটা বলতে চাই।"

কুমার বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পত্নীসহ সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিলে ডাক্তার বাবু বেয়ানকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বেয়াই মশায়, বেয়ান ঠাক্রুণ, আপনারা দু'জনেই জানেন, আমি ডাক্তার মানুষ; চিকিৎসার জন্য রোগীকে তো পরীক্ষা করতেই হয়, তা ছাড়া অন্যান্য সংবাদও আমাকে নিতে হয়। রোগী অনেক কথা ডাক্তারের কাছে গোপন করবারই চেষ্টা করে, গোপনে কুপথ্য ক'রে কোন রোগী কি ডাক্তারের কাছে সে কথা স্বীকার করে ? অথচ চিকিৎসক জানতে না পারলে রীতিমত চিকিৎসার ত্রুটি থেকে যায়। আমরা নাড়ী দেখেই রোগীর হাঁড়ির খবর পর্য্যন্ত বলতে পারি। বেয়াই মশায়, আমি আপনার একটা কঠিন ব্যাধির সন্ধান পেয়েছি। আমার কথা শুনে চম্‌কাবেন না ; সেটা আপনার শারীরিক ব্যাধি নয়, ব্যাধিটা মানসিক। আমি আপনার সেই ব্যাধি আরোগ্য করবার চেষ্টা করব ; ঈশ্বরের দয়ায় আশা করি, আপনাকে রোগমুক্ত করতে পারব।"

কুমারনাথ সহাস্যে বলিলেন, "মানসিক ব্যাধি ? আমার ? ব্যাধিটা কি, শুনতে পাইনে ? আশা করি, রোগীর নিকট তা প্রকাশ করতে বাধা নেই।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "রোগটি আত্ম-গোপনের চেষ্টা ; আপনি যা নন, তাই ব'লে জনসমাজে আপনাকে জাহির করবার চেষ্টা ! শুনেছি, পূর্ব্বে জনাই গ্রামে আমাদের বাস ছিল। জনাইয়ের জমিদার মুখুয্যে-বংশ অতি প্রাচীন এবং বিখ্যাত বংশ। আমিও মুখুয্যে, কিন্তু আমি জনাইয়ের জমিদারদের বংশধর নই, আমি দরিদ্র কেরাণীর পুত্র, এবং তদপেক্ষাও দরিদ্র এক জন স্কুল-পণ্ডিতের পৌত্র। আমি জানি, আপনার প্রপিতামহ নালিকুল গ্রাম থেকে কলিকাতায় এসে এই বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর একটা অংশ কিনে নিয়ে এখানে বাস করতে থাকেন। আপনার পিতামহ, আপনার পিতা, এবং আপনি স্বয়ং এই বাড়ীতেই জন্মগ্রহণ ক'রেছেন ; সুতরাং এটাই আপনার পৈতৃক ভিটা, তীর্থের ন্যায় পবিত্র। এই পবিত্র স্থান থাকতে আপনি বাঁড়ুয্যেদের ঠাকুর-দালানে কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা করলেন কেন ? নিজের বাড়ীতে স্থানাভাব হ'লে লোকে প্রতিবেশীর বাড়ীতে লোকজনকে বসাবার ও খাওয়াবার ব্যবস্থা করে, আপনিও স্থানাভাবে তা করিতে বাধ্য হয়েছেন ; কিন্তু কন্যা-সম্প্রদান আপনাকে পরের বাড়ীতে করতে দিচ্ছিনে, এই শুভকার্য্য আপনাকে আপনার এই ঘরেই করতে হবে। তার পর দ্বিতীয় কথা, আপনার বড় মেয়ের বিবাহের পূর্ব্বে আপনি বেয়ানের প্রায় সমস্ত গহনা বার শ' টাকায় বাঁধা দিয়েছিলেন, সে ঋণ সুদে-আসলে প্রায় দেড় হাজার টাকা হয়েছে। সুলোচন বাবুর কাছে সে গহনা বাঁধা আছে। এ সকল সংবাদ আমার অজ্ঞাত নয়। সংপ্রতি আপনি ছোট মেয়ের বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্যে সুলোচন বাবুর নিকট দেড় হাজার টাকায় আপনার বাড়ী বন্ধক রেখেছেন। এই তিন হাজার টাকা আপনি অনর্থক ঋণ ক'রেছেন। আপনি যদি প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রেও কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখতেন, তা' হ'লে পাঁচ বৎসরে তিন হাজারেরও অধিক টাকা আপনি সঞ্চয় করতে পারতেন। কেবল ঐ বনিয়াদি বাঁড়ুয্যে-বাবুদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে সমান চালে চলতে গিয়েই আপনি নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন ! ঈশ্বর না করুন, কাল যদি আপনার চাকরি যায়, তা' হলে আপনি দাঁড়াবেন কোথায় ? খাবেনই বা কি ?"

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া কুমার বাবু লজ্জায় অবনত-মস্তকে বলিলেন, "আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে ; ওটা আমার মানসিক ব্যাধিই বটে ; কিন্তু বুঝছি, ব্যাধি কঠিন হয়ে উঠেছে ! কি করব তা ভেবে তো কূল-কিনারা পাচ্ছিনে।"

ডাক্তার বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু আর তো

ভাববার সময় নেই ; আর এক ঘণ্টা পরেই যে বিবাহের লগ্ন !"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে তিনখানা হাজার টাকার ও পাঁচখানা এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া কুমারনাথের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "এই সাড়ে তিন হাজার টাকার নোট নিন, এখনি সুলোচন বাবুর কাছে গিয়ে বন্দকী-দলীল ও বেয়ানের গহনা খালাস করে আসুন। আমার পুত্রকে বরণ করবার সময় বেয়ান নিরাভরণা থাকতে পাবেন না। এই সকল বিষয়, বিশেষতঃ টাকার কথা, কেহ যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে, কেবল আপনারা দু'-জনেই জানলেন ; আর জানেন আমার স্ত্রী। বিজন এর কিছুই জানে না। আমরা এই চারি জন ব্যতীত আর কেউ যেন এ-কথা জানতে না পারে—এই আমার একান্ত অনুরোধ। আর এক কথা, খাটবিছানা, আলমারী, টেবিল, কৌচ, চেয়ার প্রভৃতি আসবাবপত্র আপনি দান করবেন না। বিজনের জন্য কিনেছেন, বিজন ও আপনার বড় জামাই এই বাড়ীতে ঐগুলি ব্যবহার করবে। আমার বাড়ীতে তো দেখেছেন, প্রত্যেক ঘরই আসবাবে পূর্ণ ; আমার বাড়ীতে আর নূতন কোন আসবাব রাখবার স্থান নেই।"

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া কুমারনাথ ও হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তিনি কুমারনাথের হাত ধরিয়া বলিলেন, "করেন কি? আর আধ ঘণ্টা পরে বিবাহের লগ্ন, এখন ও-সব মাথা-গোঁড়া-খুঁড়ি মুলতুবি রেখে এই ঘরেই বিবাহের আয়োজনটা তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলুন।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিত্ত-বিকাশ

নটরাজ, ওগো নটরাজ,
রৌদ্র-দীপ্ত দিবসের পীতাম্বর পরিয়াছ আজ
পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে—
সপ্ত সিন্ধু নীলাভ্র-পরিধি
অধঃ-উর্দ্ধে করিছ বিরাজ।

তথাপিও সৃষ্টি খুঁজে মরি,
নিদাঘ সূর্য্যের রশ্মি
ঝলসিয়া দৃষ্টি নিল হরি,—
কুন্তলে কুটিল গন্ধ
নিগূঢ় সৌরভে অন্ধ
ভ্রান্ত দিক—
চঞ্চরীক—
ঘুরে মরি—শুধু ঘুরে মরি।
ছায়াচ্ছন্ন বনবীথি
অন্তরীক্ষ নিতি নিতি
কল্পনার পক্ষে ভর করি—
যুগ্ম-হারা পারাবত আত্মহারা দিবস-শর্ব্বরী।

আত্মার আত্মীয়তম
অন্তরের আন্তরিকতম—
অবিতৃপ্ত হৃদয়ের নর্ম্ম-সখা মম
বাজায়ে আশার বাঁশী
হাতছানি দিয়া হাসি হাসি
ওগো মোর বাঞ্ছিত পরম
হে শ্যাম-সুন্দর বন্ধু!
অম্বর-চুম্বিত সিন্ধু—
নভোনীলে অবলীন—সিন্ধুনীলে রূপ নিলে মিতা—
পথ চাওয়া শর্ব্বরীর প্রতীক্ষিত উদয় সবিতা।
বেদনা-দহনদগ্ধ চিত্ত মোর আজি শুচিস্মিত!
আরক্ত কুঞ্চিত দল—এ কমল হ'লো বিকশিত।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (এম-এ, এম-বি, ডি-টি-এম্)।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-রহস্য

গীতোক্ত সাধন-পথ

গীতোক্ত ব্রহ্মবাদ আলোচনা করা গেল এবং দেখা গেল যে, গীতার মতে একই ব্রহ্মবস্তুর নির্গুণ ও সগুণ দ্বিবিধ বিভাব মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্ব নহে। যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ। নির্গুণ সাধনা ও সগুণ সাধনার মধ্যেও ফলের কোন তারতম্য নাই, তবে মানুষের মনের গঠন এইরূপ যে, উহা নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিরুপাধি ব্রহ্মকে সহজে ভাবনা করিতে পারে না। নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, গুণবাদের ভিত্তিতে সগুণের সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই জন্যই গীতায় এই সগুণ ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদের প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসক এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক এই উভয়বিধ উপাসকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যাহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমাতে মনোনিবেশ করিয়া আমার (সগুণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের) উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী, আর যাহারা অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। তবে সেই পথে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, কেন না, দেহধারী জীবের পক্ষে অব্যক্তের ধারণা করা অত্যন্তই কষ্টসাধ্য (১)।

এখানে দেখা যায় যে, গীতায় সগুণ ব্রহ্মবাদকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ, গীতার ঈশ্বরবাদ। ঈশ্বরবাদই গীতার ভিত্তি; এই জন্যই ঈশ্বরোপাসনাকে নির্ব্বিশেষ উপাসনা অপেক্ষা প্রশস্ত বলা হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাধনার কথাও গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "হে পার্থ, যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকে, তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ, বিবেকী বা বিদ্বান্ বলা হইয়া থাকে। শ্রুতিও এই কথা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন জীবের মনোগত সমস্ত কামনা নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখনই জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, অমৃতময় ব্রহ্ম-পদ লাভ করে (১)। জীব শ্রুতির ভাষায় তখন হয় আত্মানন্দ, আত্মারাম ও আত্মক্রীড়। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা এই ত্রিবিধ এষণার (কামনার) নাগপাশ তখন আর শিবরূপী জীবকে বন্ধন করিতে পারে না। তত্ত্ব-জ্ঞানের অমৃতসেকে এষণার বহ্নিশিখা নিঃশেষ হইয়া যায়। জাগতিক সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতির অতীত এক পরম আনন্দময় লোকে জীব তখন উপনীত হয়। ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন যে, "দুঃখে তাঁহার চিত্ত অনুদ্বিগ্ন, সুখে তিনি স্পৃহাহীন, তাঁহার রাগ নাই, ভয় নাই, ক্রোধ নাই, এইরূপ মুনি বা মননশীল পুরুষই স্থিতপ্রজ্ঞ।" তিনি আত্মারাম, সুতরাং স্বীয় দেহ বা পুত্র-কলত্র প্রভৃতিতে তাঁহার কোন মমতা-বোধ নাই, দেহের জন্ম-মরণে, কল্যাণ-অকল্যাণে হর্ষ বিষাদের কোন সম্ভাবনা নাই। সমস্ত কাম্য বস্তুতে স্পৃহাহীন, মমতাহীন, নিরহঙ্কার, আত্মানন্দ এই সাধকই শান্তি প্রাপ্ত হন। গীতার ভাষায় ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি; এই স্থিতি লাভ করিলে সংসার-মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। যাঁহাদের মন ব্রহ্মভাবে অবস্থিত, তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাঁহারাই প্রকৃত বিদ্বান্, তাঁহাদের ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে, চণ্ডালে কোন ভেদ-বুদ্ধি নাই, কারণ, সর্ব্বত্রই তাঁহারা ব্রহ্মই দর্শন করেন এবং ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন (২)। এইরূপে গীতা নির্গুণ ব্রহ্ম-উপাসকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়াছেন। গীতায় সগুণ ব্রহ্মোপাসনারও বিস্তৃত উপদেশ

(১) গীতা ১২।২—৫

(১) যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

(২) গীতা ২।৫৫-৫৭,৭১,৭২, গীতা ৫।১৭,১৮,২৪,২৫

প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে (২৯ শ্লোক) ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "যে সাধক আমাকে (সগুণ ব্রহ্মকে) যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, সমস্ত ভূত-জগতের সুহৃদ্ বলিয়া জানে, সেই শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে পার্থ, অনন্যচিত্তে যে আমাকে ধ্যান করে, সেই সাধকই পুরুষোত্তমকে লাভ করে (গীতা ৮।৮), সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষেই আমি সুলভ (৮।১৪), যে সাধক আমাতে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া পরস্পরকে আমারই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, আমারই কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম সন্তোষ ও সুখ লাভ করেন, প্রীতিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে আমার ভজনাকারী সেই সাধকগণকে আমি নির্ম্মল বুদ্ধি (বুদ্ধিযোগ) প্রদান করি, তদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করে (গীতা ১০।৯-১০)। এইরূপে গীতা সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ সাধনারই উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা শাশ্বত শান্তিই যে জীবের চরম লক্ষ্য, ইহাও গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, ঐ শাশ্বত শান্তি বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভের উপায় কি? ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে মোক্ষনগরে পৌঁছিবার জন্য কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এই তিনটি মার্গ বা পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতায়ও উল্লিখিত মার্গত্রয়ই সাধন-সোপান বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিবাদের সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সাধনই গীতার সাধন উপদেশের বৈশিষ্ট্য। গীতার মতে এই মার্গত্রয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্ত ইহারা যে যে পথে চলেন, তিনিই মনে করেন যে, সাধনরাজ্যে তাঁহার পথই একমাত্র পথ, এতদ্-ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নাই। এইরূপে সাধনপথে একটা বিবাদ অধ্যাত্মরাজ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। গীতায় ভগবান্ ঐ বিবাদ ভঞ্জন করিলেন এবং দেখাইলেন যে, আলোচিত পথত্রয় পরস্পর বিযুক্ত নহে। প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে পতিত-পাবনী গঙ্গা তরঙ্গায়িত ধারায় ভারতভূমি প্লাবিত করিয়া সমুদ্র অভিযানে ছুটিয়া চলিয়াছে। গীতায়ও সেইরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ত্রিধারা সাধক জনগণের মানস-লোক প্লাবিত করিয়া ব্রহ্ম-সাগরের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে! বিভিন্ন মার্গের এই সমন্বয়-দৃষ্টি গীতার নিজস্ব। অন্য কোনও অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইহা এমন পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে নাই। এইজন্যই অধ্যাত্ম চিন্তারাজ্যে গীতার আসন অনেক উর্দ্ধে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঐ সকল বিভিন্ন সাধনপথের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, কেহ কেহ ধ্যানযোগের সাহায্যে অর্থাৎ ধ্যান-সংস্কৃত অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মা-সাক্ষাৎকার লাভ করেন, কেহ বা সাংখ্যযোগ বা জ্ঞান-যোগের সাহায্যে, অপরে কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আর, যাঁহারা এই কোন পথেই অগ্রসর হইতে পারেন না, তাঁহারা সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ করতঃ শ্রদ্ধাপূত চিত্তে গুরূপদেশ শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুশোক-সঙ্কুল এই সংসারের পরপারে চলিয়া যান (গীতা ১৩।২৪-২৫)। উক্ত গীতাশ্লোকে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এখানে কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ এবং ভক্তিবাদ এই বাদত্রয়কেই আত্মদর্শনে তুল্য ভাবে হেতু বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। এই বাদত্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ এবং এই বিষয়ে গীতার অভিমত কি, তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদের মধ্যে গীতার মতে যে কোন বিরোধ নাই, তাহা স্পষ্টতঃই গীতায় বলা হইয়াছে। অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই জ্ঞানযোগ (সাংখ্যযোগ) ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন, পণ্ডিতেরা তাহা করেন না। পণ্ডিতদিগের মতে এই উভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে আশ্রয় করিলেই উভয়ের ফল—মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স্ লাভ করা যায়। জ্ঞানিগণ যে পদ লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও সেই পদই লাভ করেন। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে যাঁহারা এক (অভিন্ন) দেখেন, তাঁহারাই যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা (১) এবং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি (গীতা ৫।৫)। উদ্ধৃত গীতা-শ্লোকে "সাংখ্য" শব্দে জ্ঞানবাদী কর্ম্মসন্ন্যাসীকে বুঝায়, আর যোগ শব্দে নিষ্কাম কর্ম্মযোগীকে বুঝায়। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বরে কর্ম্ম ও

---

(১) সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্। গীতা ৫।৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
সাংখ্যযোগৌ—জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগৌ, রামানুজভাষ্য।
সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ, শঙ্করভাষ্য।

কর্ম্মফল অর্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মসন্ন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মারাম, আত্মানন্দ হইয়া অবস্থান করেন। যথার্থ কর্ম্মসন্ন্যাসী কে? ইহার উত্তরে গীতা বলিয়াছেন যে—"যে কাহাকেও দ্বেষ করে না, যাহার কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা নাই, যাহার রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব নাই, সকল কামনার যাহার অবসান হইয়াছে, এইরূপ মহাপুরুষই প্রকৃত কর্ম্মসন্ন্যাসী। ইনি অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।" (গীতা ৫।৩) এইরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসই জ্ঞানযোগ বলিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কর্ম্মযোগীর নিষ্কাম কর্ম্মও তাঁহার বন্ধনের কারণ হয় না, মুক্তিরই কারণ হয়। ফলতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধন ও কর্ম্মসন্ন্যাস একই কথা, ইহাদের ফলেও কোন পার্থক্য নাই। তবে গীতার মতে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মত্যাগ গীতার অভিপ্রেত নহে, কর্ম্মফল ত্যাগই গীতার অভিপ্রেত। স্বভাবের বশে সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয় এবং আমরণান্ত করিতেই হইবে; তবে ঐ কর্ম্ম যদি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। ইহাই গীতায় কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস, ইহার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ (গীতা ৫।২) অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যিনি (আত্মানাত্ম বিবেক দ্বারা) আত্মাকে রাগ-দ্বেষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছেন, যিনি নিষ্কাম, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বেশভূষা, আশ্রম বা আশ্রমোক্ত কর্ম্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাস হয় না। আত্মা অহং মম, 'আমি' 'আমার' এইরূপ আমিত্ব বোধের আবরণে আবৃত আছে, আত্মার সেই মলিন আবরণ পরিত্যাগের নামই প্রকৃত সন্ন্যাস। অতি উত্তম অধিকারীর পক্ষেই এই সন্ন্যাস বিহিত, কেন না, অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ না হইলে কর্ম্মসন্ন্যাস কিছুমাত্র ফল দান করিতে পারে না, অধিকন্তু অনিষ্টই সাধন করে। এই জন্যই কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ হইলেও সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নিষ্কাম কর্ম্মযোগই, হে অর্জ্জুন! তোমার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এইরূপে গীতায় কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মানুষ্ঠানকে শ্রেয়স্কর বলা হইয়াছে। গীতোক্ত কর্ম্মযোগ কাহাকে বলে, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য্য। কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেই জীবকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়, এমন কি, শ্রুতি-প্রতিপাদিত যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলেও সংসার-বারিধি উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। ইহার উত্তরে কর্ম্মবাদীরা বলেন—জৈমিনির কর্ম্মমীমাংসায় বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মই স্বর্গের সোপান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, বেদোক্ত জ্ঞান-কাণ্ড এই মতে (দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতি-পাদন করিয়া) জীবকে স্বর্গসাধন যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তির সহায়তা করে মাত্র। কর্ম্মই বেদের মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য, যে সকল বেদবাক্যে কোনরূপ কর্ম্মের উপদেশ নাই, তাহা অর্থবাদ মাত্র—আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য-মতদর্থানাম্। (মীঃ সূ ১।২।১) স্বর্গের সোপান যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে শাশ্বত সুখধাম স্বর্গ লাভ হয়। যাহারা "চতুর্মাস্য" যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়—'অক্ষয্যং হ বৈ চতুর্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।' যেই যজমান অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমস্ত লোক জয় করেন, মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, পাপ, ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন—"সর্ব্বান্ লোকান্ জয়তি, মৃত্যুং তরতি, পাপ্মানং তরতি, ব্রহ্মহত্যাং তরতি যোঽশ্বমেধেন যজতি"। কর্ম্মীর জরামৃত্যু নাই, কর্ম্মীরা সোম পান করিয়া অমর হইয়া থাকেন—অপাম সোমমমৃতা অভূম। কর্ম্মই স্বর্গসোপান, স্বর্গ কি? শাশ্বত সুখই স্বর্গ। "যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরেও দুঃখরূপে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হয়, সেই সুখই স্বর্গ (১)। বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মই ঐ নিরাবিল সুখের মূল।

জ্ঞানবাদীরা এই কর্ম্মবাদ অঙ্গীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়—কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ বিদ্যয়া চ প্রমুচ্যতে (মহাভাঃ শান্তিপর্ব্ব) শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম, পুত্র, বা বিত্ত অমৃতত্ব লাভের সোপান নহে, একমাত্র ত্যাগ বা বৈরাগ্য দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়—ন কর্ম্মনা ন প্রজয়া ধনেন

(১) যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্।

ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব মানশুঃ। কর্ম্ম স্বয়ং ভঙ্গুর, সুতরাং তাহার ফল কোনমতেই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কারণ যদি অনিত্য হয়, তবে সেই অনিত্য কারণ নিত্য ফল প্রসব করিতে পারে না। অনিত্য কর্ম্ম হইতে নিত্য মুক্তি আসিতে পারে না। এই জন্যই উপনিষদে যজ্ঞাদি কর্ম্মকে সংসার-সাগর তরণের পক্ষে ভঙ্গুর ভেলা বলা হইয়াছে। যে সকল মোহান্ধ ব্যক্তিগণ এই কর্ম্মকেই নিঃশ্রেয়স্ সাধন বলিয়া মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা-মৃত্যুর কবলে পতিত হয় (১)।

নানারূপে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা-নিবন্ধন তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মক্ষয় হইবার পর তাহাদিগকে দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গচ্যুত হইতে হয় (২)। কর্ম্ম-ক্ষয় হইলে কর্ম্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী, কর্ম্মের দ্বারা যে অমৃতত্ব লাভের কথা বলা হইয়াছে সেই অমরত্ব চিরস্থায়ী শাশ্বত অমরত্ব নহে, সেই অমরত্ব আপেক্ষিক মাত্র। প্রলয় পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থানকে অমরত্ব বলা হইয়া থাকে—আভূত সংপ্লবং স্থানং অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে। বিষ্ণুপুরাণ। কর্ম্মক্ষয়ে কর্ম্মীর পতন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা উপনিষদের ন্যায় গীতাও স্পষ্ট বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। "কর্ম্মকাণ্ডী সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করে, এবং তাহারা তাহার (যজ্ঞাদির) ফলে পুণ্য ইন্দ্র-লোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ ভোগ করে" "সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর, পুণ্যক্ষয় হইলে তাহারা আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এইরূপ সকাম সাধক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে থাকে (৩)। এইরূপে কর্ম্মবাদী মীমাংসক ও জ্ঞানবাদী বৈদান্তিকের মধ্যে বিরোধ স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, গীতা জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র উদ্ভাবন করিয়া ঐ বিরোধের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কর্ম্মের ফলে যে বন্ধন হয়, সেখানে গীতা বলেন যে, কর্ম্মীর ফলাসক্তিই তাহার বন্ধের কারণ। অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে। (গীতা ৫।১১) যে কর্ম্মে ব্যক্তিগত ফলের আসক্তি নাই, সেই কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, বরং অনাসক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজন্য ফল পরি-ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন-বিমুক্ত হইয়া অনাময় মোক্ষপদ লাভ করেন (গীঃ ২।৫)। মীমাংসোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মও যেখানে পুত্র, বিত্ত, পশু প্রভৃতি ব্যক্তিগত ফল লাভের আশায় অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তাহা সকাম কর্ম্ম, সুতরাং ঐরূপ সকাম যজ্ঞাদি দ্বারা মুক্তির কোন আশা নাই। স্বর্গকামনায় বেদে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের যে বিধান আছে, তাহা দ্বারা সুখধাম স্বর্গ লাভ হয় বটে, কিন্তু ঐ স্বর্গসুখও শাশ্বত সুখ নহে, তাহাও ভঙ্গুর, কালে তাহাও ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় মীমাংসকোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মকেও শাশ্বত সুখ-নিদান বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? গীতায় যে পুনঃ পুনঃ যজ্ঞের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং যজ্ঞীয় কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্মকে বন্ধের কারণ ও যজ্ঞাদি কর্ম্মকে মুক্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্ম-বন্ধনঃ। (গীতা ৪।৯) এই গীতোক্ত যজ্ঞ মীমাংসকোক্ত সকাম যজ্ঞ নহে। ইহা নিষ্কাম যজ্ঞ, নিষ্কাম যজ্ঞই যথার্থ যজ্ঞ। বেদে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"। যে-কর্ম্ম বিষ্ণুর প্রীতি সাধন করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠাতার কোন ব্যক্তিগত ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহাই প্রকৃত যজ্ঞ। বিষ্ণু শব্দের অর্থ সর্ব্ব-ব্যাপী, যিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতে বিরাজিত, তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতে হইলে সর্ব্বভূতেরই প্রীতি সম্পাদন করিতে হয়। কাজেই সর্ব্বভূত-প্রীত্যর্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার

(১) প্লবাহ্যেতেঽদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি। মুণ্ডক ১।২।৭

(২) অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাঃ বয়ং
কৃতার্থা ইত্যভিনন্দন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ
ক্ষীণলোকাশ্চবন্তে। মুণ্ডক ১।২।৯

(৩) ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতিং কামকামা লভন্তে গীঃ। ৯।২০-২১।

রহস্য। সর্ব্বভূত-প্রীত্যর্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে এক দিকে যেমন আত্মার প্রসারতা আবশ্যক, ব্যক্তিগত ফললাভের দুরাশা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। অপর দিকে তেমন সর্ব্বভূতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির হওয়া আবশ্যক, সর্ব্বভূতের তৃপ্তিই পরব্রহ্মের পূজা, এই বিশ্বাস স্থির হইলেই সেই যজ্ঞ সার্থক হয়। ঐ যজ্ঞ সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহা বন্ধনের তো কারণ হইতেই পারে না, বরং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তিরই কারণ হয়। ত্যাগই যজ্ঞের মূল কথা, জগতের পোষণের জন্য ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যে ত্যাগ করা হইয়া থাকে, তাহাই শাস্ত্রে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। গীতাও দেবতাদিগের পরিপোষণের জন্য এবং সংসারচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য যজ্ঞ জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। "প্রজাপতি যখন জীবসৃষ্টি করিলেন, তখনই তিনি যজ্ঞেরও সৃষ্টি করিলেন এবং জীবদিগকে উপদেশ দিলেন যে, এই যজ্ঞের দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, যজ্ঞই তোমাদের কামধেনুস্বরূপ হইবে, তোমাদের বাঞ্ছিত ফল দান করিবে। তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে পোষণ কর, দেবতাগণও তোমাদিগকে পালন করিবেন। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের সন্তোষ সাধন করিয়া তোমরা পরম কল্যাণ লাভ কর। দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ দান করিবেন। এই দেবদত্ত ভোগ দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে অর্পণ না করিয়া যে স্বয়ং সম্ভোগ করে, সে চোরের ন্যায় কাজ করে" (১)। যিনি যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন অর্থাৎ দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ ভোজন করেন, তিনি সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন, আর যাহারা কেবল স্বীয় উদরপূরণার্থই ভোজনের আয়োজন করে, তাহারা পাপই ভোজন করে। ইহার অর্থ এই যে, হে জীব, তুমি দেবতার জন্য, সর্ব্বভূতের জন্য বলি প্রদত্ত। অতএব তোমার স্বীয় উদর পূরণের জন্য, সুখ-সম্ভোগের জন্য, ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য কোন কর্ম্ম করিবার অধিকার নাই, জগতের হিতের জন্য, সর্ব্বভূতের প্রীতির জন্য জগৎপিতা পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে বহুবিত্ত আয়াসসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অভিমান ত্যাগ কর, তোমার সমস্ত জীবনই এক বিরাট্ যজ্ঞে পরিণত হইবে। কামনা-পিশাচী তোমার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না। ত্যাগের সৌরকরস্পর্শে তোমার জ্ঞানকমল ফুটিয়া উঠিবে, তুমি শাশ্বত শান্তি, অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবে। ত্যাগই যজ্ঞের মূল উপাদান। এই ত্যাগই ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ প্রভৃতি জীবের প্রতিদিন অবশ্যকরণীয় মহাযজ্ঞ দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্তে প্রজাপতির বিশ্বসৃষ্টিকে যে বিরাট্ যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার অর্থ—জীবের হিতার্থে প্রজাপতির আত্মবলিদান, নতুবা নিষ্কল, নির্গুণ, নিরঞ্জন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ গুণময়ী মায়াকে আলিঙ্গন করিয়া জগৎসৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইলেন কেন? তিনি তো আপ্তকাম, সদাপূর্ণ, তাহার তো কোন কামনা নাই, কোন অপূর্ণতা নাই? জীবের হিতই তাঁহার সেই সৃষ্টি-মহাযজ্ঞের একমাত্র কাম্য। বিশ্বসৃষ্টি যেমন এক বিরাট্ যজ্ঞ, মানব-জীবনও সেইরূপ এক মহাযজ্ঞ। কর্ম্মময় সংসার সেই যজ্ঞবেদী এবং লোকহিত সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্য, আত্মত্যাগ তাহার দক্ষিণা, আর যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং শ্রীভগবান্। এইরূপে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা গীতার মতে কর্ম্মবন্ধন তো নহেই পক্ষান্তরে উহা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসূ। এইরূপ যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়াই গীতায় বলা হইয়াছে যে—"যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম্ম ফলের সহিতই বিলয়প্রাপ্ত হয়—যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে। (গী ৪।২৩) ঐ যজ্ঞাঙ্গ কর্ম্ম ফল প্রসব না করিয়া লয় হইয়া যায় কেন? ইহার উত্তরে গীতা বলেন যে, ঐরূপ যজ্ঞ সাধারণ কর্ম্মযজ্ঞ নহে, ইহা ব্রহ্মযজ্ঞ। ঐ যজ্ঞের সকল অঙ্গেই ব্রহ্মদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, যজ্ঞাঙ্গ দৃষ্টি থাকে না, যজ্ঞকর্ত্তা, যজ্ঞীয় হবিঃ ও আহবনীয় অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। ঐরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের ফলে শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, ভঙ্গুর কর্ম্মফল বা ভোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। সেই যজ্ঞের আহুতি ও ব্রহ্ম, যজ্ঞীয় হবি ও ব্রহ্ম, হোম ও ব্রহ্ম, হোমাগ্নিও ব্রহ্ম, হোতাও ব্রহ্ম, এইরূপ সমস্ত যজ্ঞাঙ্গে যাহার ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির হয়, সে ব্রহ্মকেই লাভ করে" (১)।

(১) গীতা ৩।১০-১২।

১। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা। গীতা ৪।২৪

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির যজ্ঞ যে কর্ম্মপাশ নহে, কর্ম্মপাশ ছেদন করিবার জ্ঞান-অসি, তাহাতে কোন তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরই সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ বলিয়া গীতায় এবং অন্যান্য অধ্যাত্মশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞীয় বাহ্য উপকরণ ব্যতীত মানস উপচারেও এই জ্ঞান-যজ্ঞ সম্পন্ন করা যায়। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে এইরূপ জ্ঞানযজ্ঞের উৎকর্ষতা উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতাও বলিয়াছেন যে, দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানযজ্ঞের ভূমিতে পৌঁছিলে সেই যাজ্ঞিকের সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল আত্মজ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়। স্থূলতম দ্রব্যযজ্ঞের স্তর হইতে জ্ঞানযজ্ঞের উন্নততম ভূমিতে উপস্থিত হইতে হইলে আরও অনেক যজ্ঞ-স্তর অতিক্রম করিতে হয়। গীতা ঐ সকল যজ্ঞ-স্তরের বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়া যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর সর্ব্বতোমুখ বিরাট্ রূপের বিভিন্ন মুখ আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতোক্ত দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ প্রভৃতি ঐ একই যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ। সমস্ত যজ্ঞই ব্রহ্মযজ্ঞে সমাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করে। ব্রহ্মযজ্ঞে পঁহুছিতে হইলে ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি বহিঃসাধন এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন, অভিমান ত্যাগ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধনের প্রয়োজন হয়, তাহাই তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ বিভিন্ন যজ্ঞে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল বিভিন্ন যজ্ঞ-স্তরের রহস্য অবগত হইয়া যে তত্ত্বজ্ঞানী সাধক ব্রহ্মযজ্ঞ-ভূমিতে গিয়া পৌঁছায় অর্থাৎ সর্ব্বত্র যজ্ঞাঙ্গে ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করে, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়—যজ্ঞ-শিষ্টামৃতভুজো যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্। (৪।৩০)

মোট কথা, কর্ম্মে ব্রহ্ম-দৃষ্টি লাভ করা চাই, কর্ম্মে ব্রহ্ম-দৃষ্টি স্থির হইলে কর্ম্মে ও ব্রহ্মে কোন বিরোধ থাকিবে না। ইহাই যজ্ঞের ব্রহ্মরূপতা ব্যাখ্যা করিয়া গীতায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মসন্ন্যাস, বা কর্ম্মত্যাগ গীতার অভিপ্রেত নহে। কর্ম্মফলত্যাগ, কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জনও ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণের কথাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" ইহাই গীতার উপদেশ। কর্ম্ম ত্যাগ করিও না, কর্ম্মফলের দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর—এবং কর্ম্মফল ভগবানের অভয় চরণে সমর্পণ কর, ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগরহস্য। কর্ম্মফল ত্যাগ, কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন ও ঈশ্বরার্পণ এই তিন থাকিলেই কর্ম্ম কর্ম্মযোগে পরিণত হয়, এবং এই কর্ম্ম-যোগের দ্বারা জন্ম-মৃত্যুরহিত অনাময় মোক্ষপদই লাভ করা যায়—কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিনঃ। জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্। (গীতা ২।৫১) এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যোগস্থ হইয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিবার পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কর্ম্মযোগীর ফলে আকাঙ্ক্ষা না থাকায় কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তাহার পক্ষে উভয়ই সমান। এইরূপ সম-মনোবৃত্তিকেই কর্ম্মযোগ বলে। সম-মনোবৃত্তি লাভ করিলে কর্ম্মী হন কর্ম্মযোগী। এই কর্ম্মযোগীই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, সুতরাং গীতার মতে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কর্ম্মসন্ন্যাসী চিত্তবিশুদ্ধি হওয়া পর্য্যন্তই কর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন এবং তাহার পরে তাঁহার মতে কর্ম্মত্যাগই বিধেয়। এখানে গীতোক্ত কর্ম্মযোগী বলেন যে, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেও ফলাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কেন না, কর্ম্ম ছাড়িব বলিলেই কর্ম্ম ছাড়া যায় না, কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না, যতক্ষণ দেহ থাকিবে, ততক্ষণ কর্ম্ম ছাড়া চলিবে না।* নিষ্কাম বুদ্ধিতে শান্ত চিত্তে কর্ম্ম করিয়া যাও, তাহা হইলেই জ্ঞান লাভ হইবে। এই জ্ঞান কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে গীতা বলেন—"ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীটানুকীট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণের আত্মাকে নিজ আত্মার সহিত অভিন্ন দেখাই যথার্থ জ্ঞান।" ভগবান্ বলিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন, এই জ্ঞান লাভ হইলে তুমি সমস্ত প্রাণিজগৎকে তোমার মধ্যে এবং তোমাকে আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে। যেন ভূতান্যশেষেন দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি (৮।৩৫), এই জ্ঞান অতি পবিত্র ইহার ন্যায় পবিত্র বস্তু আর জগতে কিছুই নাই। ইহাই যথার্থ

* গীতার মতে কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মসন্ন্যাস নহে। কাম্য কর্ম্মের ত্যাগই যথার্থ কর্ম্মসন্ন্যাস, কর্ম্মফল ত্যাগই ত্যাগ। যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগী পুরুষ। কর্ম্মপাশ তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না—কর্ম্ম যতই কঠোর হউক না কেন, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে সেই কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধন হয় না। সেই জন্যই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, কামনা ও মমতাশূন্য হইয়া আত্মনিষ্ঠ হইয়া যুদ্ধ কর; এই যুদ্ধ তোমার অশান্তির কারণ হইবে না।

আত্মদর্শন। শ্রদ্ধা ব্যতীত এই জ্ঞান লাভ করা যায় না—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্। শ্রদ্ধাবান্ সাধক গুরুসেবা প্রভৃতি দ্বারা সদ্‌গুরুর উপদেশে এই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন, এ কথা মনে রাখিও যে, প্রণিপাতের দ্বারা, প্রশ্নের দ্বারা এবং সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানী তোমাকে ঐ জ্ঞানের উপদেশ করিবেন (১)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্বন্ধও দূর নহে। উপনিষদে তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধার কথা এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জ্ঞান আহরণের কথা বলা হইয়াছে। গুরুবাক্যে ও অধ্যাত্মশাস্ত্রে অবিচলিত বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। গীতা এবং উপনিষদের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা জ্ঞানের আবশ্যকীয় পূর্ব্বাঙ্গ, সুতরাং শ্রদ্ধা বা ভক্তিবাদের সহিত জ্ঞানের কোন বিরোধ নাই বা থাকিতে পারে না। গীতা স্পষ্টবাক্যে এই অবিরোধ ঘোষণা করিয়াছেন। গীতার মতে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। যদিও ভক্তিবাদীরা পরবর্ত্তীকালে ভাবপ্রধান অন্ধ ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে বিরোধ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং জ্ঞানগন্ধহীন ভাবপ্রধান ভক্তিকেই উত্তম ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্য কামনাশূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অসংবৃত, অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনই পরম ভক্তি (২)। গীতা এই মত অনুমোদন করেন নাই। গীতা বলেন যে, ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হইতে হইলে তাহাকে জ্ঞানীও হইতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমার চারি শ্রেণীর ভক্ত আছে। (১) আর্ত্ত, (২) জিজ্ঞাসু, (৩) অর্থার্থী এবং (৪) জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। কারণ, তিনি ভগবানে একান্ত ভক্তিযুক্ত এবং তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কেই পরমগতি জানিয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানী ভগবানের যেন আত্মা। ভগবান্ তাহার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু এবং তিনিও ভগবানের প্রিয় (৩)। গীতার এই উক্তি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভগবান্ যে চারি প্রকার ভক্তের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ ভক্ত সকাম ভক্ত। আর জ্ঞানী ভক্ত নিষ্কাম ভক্ত। ভয়ে ভীত হইয়া, বিপদে পড়িয়া, রোগ-শোকের জ্বালায় জ্বলিয়া পরিত্রাণ লাভের জন্য যে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করেন, সে আর্ত্ত ভক্ত। কৌরব-রাজসভায় বস্ত্রাকর্ষণভীতা দ্রৌপদী আর্ত্ত ভক্ত। ধনলাভের জন্য, সুখভোগের আশায় যাঁহারা ভগবদারাধনা করেন, তাঁহারা অর্থার্থী ভক্ত—ধ্রুব, সুগ্রীব, বিভীষণ ইহারা অর্থার্থী ভক্ত। আত্মজ্ঞানলাভের জন্য, ভগবদ্‌বিভূতি জানিবার জন্য যিনি ভগবানের সেবা করেন, তিনি জিজ্ঞাসু ভক্ত। মিথিলাপতি জনক, উদ্ধব প্রভৃতি জিজ্ঞাসু ভক্ত। এই সকল জিজ্ঞাসু ভক্ত সকাম ভক্ত হইলেও ইঁহাদের কামনা ভগবন্মুখী; সুতরাং ইঁহারা সহজে মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হন। আর্ত্ত এবং অর্থার্থী ভক্ত ভগবানের অপার মহিমা উপলব্ধি করিয়া ভগবদ্-বিভূতি জানিবার জন্য যখন ব্যাকুল হন, তখনই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী হন, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আর্ত্ত ও অর্থার্থী ভক্তকেও জিজ্ঞাসু হইতে হইবে, তবেই আর্ত্ত ও অর্থার্থী ভক্ত জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন। জিজ্ঞাসু ভক্ত জ্ঞানরাজ্যের সীমার মধ্যে অবস্থান করিলেও তিনি জ্ঞানারূঢ় বলিয়া জ্ঞানীর সমপর্য্যায়ে নহেন। তাঁহার জিজ্ঞাসা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই তিনি স্বাত্মানন্দ, জ্ঞানী হইবেন। তাঁহার জিজ্ঞাসার মূলে বাসনার বীজ নিহিত আছে বলিয়া জিজ্ঞাসু ভক্তও সকাম ভক্তের পর্য্যায়েই পতিত হন। ফলাভিসন্ধি-বর্জ্জিত নিষ্কাম ভক্তই যথার্থ জ্ঞানী। তিনিই স্বাত্মানন্দ মহাপুরুষ। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত থাকেন। এইরূপ পরমাত্মানুরক্ত ভক্ত ভগবান্ ভিন্ন কিছুই দেখেন না, কিছুই জানেন না, কিছুই ভাবেন না। তাহার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত জানা, না-জানা ভগবানে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে, এইরূপ ভক্তই ভগবানের পরম প্রীতির পাত্র। এইরূপ ভক্তকে উদ্দেশ করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন—প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ (গীঃ ৭।১৭)। ভগবানে সদা সমাহিত, জ্ঞানী ভক্ত ভগবানেরই আত্মস্বরূপ—জ্ঞানী

(১) তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ গীঃ ৪।৩৪

(২) অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(৩) চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ৭।১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ মহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ৭।১৭

স্থাস্থৈব মে মতম্। (গীতা ৭।১৮)। এইরূপ ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল জ্ঞানী ভক্তই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানী ভক্তের সমস্ত জগৎই বাসুদেবস্বরূপ, —বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি (গীঃ ৭।১৯)। এইরূপে সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ যে দিকে দৃষ্টি করেন, তাঁহার আরাধ্য ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। ইহাই ব্রহ্মদর্শন এবং জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। যে ব্যক্তি যে ভাবে যে মূর্ত্তিরই সেবা, পূজা করুক না কেন, সকলই সেই বাসুদেবেরই পূজা। বাসুদেবই সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা। এইরূপে গীতায় যে ভক্তিবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে, বেদান্তবেদ্য জ্ঞানবাদের সহিত তাহার কোনই বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই। ভগবান্ গীতায় তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিচার করিলেও গীতোক্ত ভক্তিবাদ যে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, তাহাই বুঝা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "আমার ভক্ত সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, ক্ষমাশীল, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী, সতত সন্তুষ্ট এবং সংযতচিত্ত যোগী, আমাতেই তাহার মন ও বুদ্ধি সমর্পিত, এইরূপ বিশ্ববন্ধু নিরহঙ্কার ভক্তই আমার প্রিয়। যাহার পক্ষে শত্রু-মিত্র সমান, মান-অপমান, নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ তুল্যরূপ, সেই নির্দ্বন্দ্ব সদা সন্তুষ্ট, স্থির চিত্ত ভক্তই আমার প্রিয়।" এইরূপ ভগবান্ প্রিয় ভক্তের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানীরই সংজ্ঞা, তত্ত্বজ্ঞানীরই লক্ষণ, সুতরাং জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে কোন ভেদ নাই, প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত হইতে হইলে তাহাকে জ্ঞানীও হইতে হইবে। ভক্তির চরম ফল সর্ব্বভূতে, সর্ব্বত্র জগতে ভগবদ্দর্শন বা ব্রহ্মদর্শন। এই ব্রহ্মদর্শনই জ্ঞানের চরমাবস্থা। গীতার মতে ভগবদ্ভক্তিই ব্রহ্মদর্শনের মূলে বিরাজ করিতেছে।

[ক্রমশঃ।

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী (এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, কাব্য-ব্যাকরণ সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ)

যাতায়াত

করি সৃষ্টির আদি হ'তে যাওয়া আসা,
কত রূপ আর কত বেশ কত ভাষা।
মরুর অনল মেরুর তুহিন সহি
জীবনের পর জীবন এনেছি বহি
স্থলে জলে আহা কতই বেঁধেছি বাসা।

এই দেহ মন ভাব ও ভাবনাময়
তাঁহারি পাঞ্জা বহে, দেয় পরিচয়।
তাঁহারি দস্ত পাট্টার জোরে
এ চরণযুগ নির্ভয়ে ঘোরে,
মানিতে চাহে না কোনক্রমে পরাজয়।

এই সমীরণ এখনো চিনিতে পারি,
মোর নিঃশ্বাসে যুগে যুগে হ'ল ভারী।
এই যে সলিল আমি পাই টের—
পরশ র'য়েছে শত জনমের,
পরিচিত ক্ষিতি পাসরিতে এরে নারি।

শত জনমের ঘন অনুভূতি হায়—
করে সুনিবিড় আনন্দ বেদনায়।
মাঝে বিস্মৃতি বহিতেছে তবু—
মধুর লগনে কোন দিন কভু—
ও-পারের সাড়া এ-পারেতে পঁহুছায়।

সব ছেড়ে আসে তবু নিয়ে আসে কিছু,
অতি ঊর্দ্ধের ছায়া পড়ে এসে নীচু।
কাল-সাগরের রসাঞ্জনের
দাগ পাকা রঙ মানব-মনের
সুদূরের রেণু ভ্রমে ভ্রমরের পিছু।

কত ঘাটে আঁট দিয়াছি দুপুরে সাঁজে,
রাঙা জল আহা কত দাগ রাখিয়াছে।
হ'ক যত সাদা সাতরঙা মন
কখন কি রঙে রাঙায় ভুবন,
কথা ভুলে গেছি—চেনা সুর প্রাণে বাজে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।



চতুর্ব্বিংশ পর্ব্ব

পূর্ব্ব-পরিচয়

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

নৌ-বিভাগের যে কর্ম্মচারী আমাদের দ্বীপে অবতরণ করিয়া বৃটিশ নৌ-সৈন্যগণকে পরিচালিত করিতেছিলেন, তাঁহাকে তখন পর্য্যন্ত আমসের পাকশালায় প্রবেশ করিতে দেখি নাই। সমুদ্রতট হইতে আমরা পাকশালায় প্রত্যাগমন করিবার অল্পকাল পরেই তিনি সেখানে আসিলেন; কিন্তু তিনি একাকী আসেন নাই, তাঁহার সঙ্গে আর এক জন গম্ভীরপ্রকৃতি, দীর্ঘকায়, বলবান্ নৌ-কর্ম্মচারী পাকশালায় প্রবেশ করিয়া টেবলের নিকট উপবেশন করিলেন। তাঁহার আকার-প্রকার ও পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া আমার ধারণা হইল, তিনি বৃটিশ নৌ-বিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারী। পরে তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—আমার এই ধারণা সত্য।

এই কর্ম্মচারী আসন গ্রহণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ইউ’-বোটের কাপ্তেনকে আমি কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।”

তাঁহার কথা শুনিয়া কাপ্তেন ভন্ রথভেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠার চিহ্নমাত্র ছিল না।

বৃটিশ নৌ-কর্ম্মচারী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, তিনি কোন্ স্থান হইতে ‘ইউ’-বোট লইয়া সেখানে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কিরূপ কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে—ইত্যাদি সংবাদ জানিতে চাহিলে কাপ্তেন তাঁহার কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিলেন, এবং কোন কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে নিরুত্তর রহিলেন। তিনি যে সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করা হইল না।

কাপ্তেন ভন রথভেনের কথা শেষ হইলে লেফটেনাণ্ট হ্যাগেন আহূত হইলেন। তিনিও কাপ্তেন রথভেনের ন্যায় কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিলেন, এবং কোন কোন প্রশ্ন শুনিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন।

তাঁহাদের উভয়ের কথা শেষ হইলে উক্ত নৌ-সামরিক কর্ম্মচারী বলিলেন, “ক্রোবি কাহার নাম? আমস্ ক্রোবি? তাহাকে আমার কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।”

কিন্তু তাঁহার এ কথা শুনিতে পাইলেও আমস্ তাহার চেয়ার হইতে উঠিল না; সে তখন যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য, সম্পূর্ণ অভিভূত! তাহাকে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া উপকূলরক্ষী ষ্ট্যানডিস্ তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তথাপি সে উঠিল না, বা উঠিতে পারিল না। প্রাণভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল; তাহার মুখ ম্লান, এবং চক্ষু নিষ্প্রভ। তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন। আমার মনে হইল, মানসিক অবসাদে আমসের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সহসা রহিত হইতে পারে।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া ষ্ট্যানডিস্ তাহার পিঠে ধাক্কা দিয়া বলিল, “কর্ত্তা কি বলিতেছেন, শোন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দাও।”

আমস্ এবার কম্পিত হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, “মিষ্টার! আপনি মিষ্টার—” তাহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না।

তাহার অবস্থা দেখিয়া ষ্ট্যানডিস্ তাহার সহযোগী এলিস্‌কে ইঙ্গিতে জানাইল, উহার গলায় খানিক ব্র্যাণ্ডি না ঢালিলে উহার মুখে কথা সরিবে না।—এলিস্ একটা গ্ল্যাসে খানিক ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া আমস্‌কে পান করাইল

এবার তাহার দেহে ও মনে নব বলের সঞ্চার হইল। সে ষ্ট্যানডিসের সাহায্যে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া টলিতে-টলিতে টেবলের নিকট উপস্থিত হইল।

নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক আমসের মুখের দিকে চাহিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "আমি বৃটিশ নৌ-ঘাঁটি সমূহের অন্যতম অধিনায়ক এডমিরাল সার প্যাট্রিক মিল্‌ভেন। জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোট সমূহকে খোরাক দিয়া সাহায্য করিবার জন্য এই দ্বীপে যে গুপ্ত আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে, আমি তাহা ধ্বংস করিতে আসিয়াছি। এ কথা তোমাকে জ্ঞাপন করা আমার কর্ত্তব্য যে, আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। তুমি স্বদেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক; শত্রুপক্ষের বোম্বেটেগিরিতে তুমি অনেক দিন হইতে সাহায্য করিয়া আসিতেছ; এই অপরাধে তোমাকে বড়-দেশে লইয়া গিয়া সামরিক বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা হইবে। বিচারে তোমার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। সে পরের কথা—এখন তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দাও।—তোমার জাতি কি?"

আমস্ জড়িত স্বরে বলিল, "আমি কোন্ দেশের লোক, তাহাই জানিতে চাহেন?—আমি বৃটিশ।"

সার প্যাট্রিক বলিলেন, "তোমার সম্বন্ধে আমি কোন কোন কথা জানিতে চাই। কত দিন হইতে তুমি এই দ্বীপে বাস করিতেছ?"

"পনের বৎসর।"

"তুমি বিবাহ করিয়াছ?"

আমসের মুখ হইতে হঠাৎ এই প্রশ্নের উত্তর বাহির হইল না; সে জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "না।"

সার প্যাট্রিক কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আমার ও মেরীর মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর তাহাকে বলিলেন, "তুমি বিবাহ কর নাই, তবে এই ছেলেমেয়ে দু'টি কাহার?"

আমস্ আবার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "ঐ ছেলেটি?—জাহাজডুবির পর এক দিন রাত্রিকালে ও ভাসিয়া-আসিয়া সমুদ্র-তটে বালুকারাশির উপর পড়িয়াছিল; সেই অবস্থায় উহাকে দেখিতে পাইয়া আমি—"

সার প্যাট্রিক তাহার কথায় বাধা দিয়া অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ জাহাজ-ডুবির কথা বলিতেছ?"

আমস্ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আরবুটাস্ জাহাজ।"

সার প্যাট্রিক ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "কি? জাহাজখানার কি নাম বলিলে?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর এরূপ উদ্বেগ-কম্পিত, এতই অস্বাভাবিক যে, সেই কক্ষস্থিত সকল লোক বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু তিনি কি কারণে ঐরূপ বিচলিত হইয়াছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। সার প্যাট্রিক বিস্ফারিত নেত্রে আমসের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আমস্ নিস্তব্ধ, নির্ব্বিকার! সে দুই হাত একত্র করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল।

এবার সার প্যাট্রিক চেয়ার হইতে লাফাইয়া-উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমি সেই জাহাজখানার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহার কি নাম বলিলে—আবার বল।"

আমস্ জড়িত স্বরে বলিল, "বলিলাম ত, জাহাজখানার নাম আরবুটাস্। আ-র—বুটাস্। আজ ঠিক দশ বৎসর হইল, সেই জাহাজখানা উলফ-পয়েণ্টে জলমগ্ন হইয়াছিল। জাহাজ-ডুবির পরদিন প্রভাতে তাহার কোন চিহ্ন কোন দিকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই; কেবল ঐ বালকটি—ও তখন ক্ষুদ্র শিশু—জাহাজের মাস্তলের একটা ভাঙ্গা অংশে বাধিয়া বালুকারাশির উপর পড়িয়া ছিল। বোধ হয়, সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া ঐ স্থানে বাধিয়া গিয়াছিল। হাঁ, ও তখন নিতান্ত শিশু।"—এই কথা বলিয়া সে তাহার কম্পিত হস্ত আমার দিকে প্রসারিত করিল।

এডমিরাল সার প্যাট্রিক ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কি—তুমি কি এরূপ কোন সূত্র পাইয়াছিলে—যাহার সাহায্যে এই বালকের কোন পরিচয় জানিতে পারা যায়? উহার নাম-ধাম—অর্থাৎ প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারিয়াছিলে?"

আমস্ অবনত মস্তকে ক্ষীণস্বরে বলিল, "না।"

সার প্যাট্রিক উভয় হস্তে এরূপ জোরে তাঁহার সম্মুখস্থিত টেবলের কিনারা চাপিয়া ধরিলেন যে, তাঁহার হাতের শিরাগুলি দড়ার মতন ফুলিয়া উঠিল!

তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন, "মাথা তুলিয়া আমার মুখের দিকে তাকাও।"

তাঁহার আদেশে আমস্ ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিল। তাহার চক্ষুতে ভয় ও উদ্বেগ পরিস্ফুট। সেই কক্ষস্থিত সকল লোক নির্নিমেষ-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাহারও মুখে কোন শব্দ নাই; সেই কক্ষে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজিত।

এডমিরাল সার প্যাট্রিক সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "আমস্ ক্রোবি, আমি তোমাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই বালকের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়—এরূপ কোন সূত্র কি তুমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলে? নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ?"

আমস্ এবার দুই কাঁধ সোজা করিয়া মাথা তুলিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে সার প্যাট্রিকের মুখের দিকে চাহিল, এবং স্পর্দ্ধাভরে অবিচলিত স্বরে বলিল, "হাঁ, তা পাইয়াছিলাম; এবং তাহা হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম উহার নাম—উহার প্রকৃত নাম পিটার মিলভেন!"

পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজিত! ক্ষণকাল পরে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সার প্যাট্রিক মিলভেন গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার এ কথা কি সত্য? এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ?"

আমস্ অকুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য; আমি যে প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, এবং সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ ছিল না।"

প্রশ্ন হইল, "সকল কথা তুমি খুলিয়া বলিবে?—যাহা সত্য, তাহাই আমি জানিতে চাই।"

আমস্ বলিল, "দোতলায় আমার শয়ন-কক্ষের মেঝেতে কাঠের আস্তরের (floor-boards) নীচে একখানি পত্র আছে। সেই পত্র এক-টুকরা ত্রিপলের ভিতর শিলাই করিয়া, পালের যে ছেঁড়া অংশটুকুর মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ঐ বালকের অবলম্বন ভাঙ্গা মাস্তুলের সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়াছিল।"

সার প্যাট্রিক রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই পত্র এখনও সেখানে আছে কি?"

আমস্ বলিল, "হাঁ আছে; আমিই ত তাহা সেখানে রাখিয়াছিলাম। পরে আর তাহা স্থানান্তরিত করি নাই।"

এবার সার প্যাট্রিক ষ্ট্যানডিস্‌কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ক্রোবিকে সঙ্গে লইয়া দোতালায় উহার শয়ন-কক্ষে যাও; সেই পত্রখানি লইয়া এসো।"

ষ্ট্যান্‌ডিস্ আমস্‌কে সঙ্গে লইয়া পাকশালা ত্যাগ করিল; অন্য সকলে নিস্তব্ধ ভাবে পাকশালায় বসিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তখন মেরী ও লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনের পাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম। সার প্যাট্রিক মিলভেন নির্নিমেষ নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন! আমি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অভিভূত হইয়া অত্যন্ত অসচ্ছন্দ বোধ করিতেছিলাম। কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমার বুকের ভিতর কাঁপিতেছিল। কয়েক মিনিট পরে ষ্ট্যানডিস্ আমস্‌কে সঙ্গে লইয়া পাকশালায় ফিরিয়া আসিলে আমার বুকের উপর হইতে যেন পাষাণ-ভার নামিয়া গেল।

ষ্ট্যানডিস্ সার প্যাট্রিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক-টুকরা ত্রিপল তাঁহার হস্তে প্রদান করিল; মৃদু স্বরে বলিল, "কাঠের আস্তরের নীচে ইহাই পাইয়াছি।"

সার প্যাট্রিক তৎক্ষণাৎ ত্রিপলের সেই চাদরটুকুর শিলাই খুলিয়া-ফেলিয়া যে পত্রখানি বাহির করিলেন, তাহা তিনি মনে মনে পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখের উপর আমার দৃষ্টি ছিল; দেখিলাম, পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, এবং চক্ষুর দৃষ্টি যেন ঝাপ্‌সা হইয়া গেল! কি বিপুল চেষ্টায় তিনি আত্ম-সংবরণে সমর্থ হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। পত্রখানির পাঠ শেষ করিয়া যখন তিনি তাহা মুঠায় পুরিলেন, তখন তাঁহার হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

দুই-এক মিনিট তিনি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন; তাহার পর যখন তিনি কথা বলিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর আবেগ-কম্পিত, অস্বাভাবিক ভারী! তিনি সেই কক্ষে সমাগত অনুচরবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা একটি অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ কর, ইহা অবিশ্বাস্য মনে হইলেও সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু সত্য ঘটনা অনেক সময় ঔপন্যাসিক ঘটনা অপেক্ষাও অদ্ভুত হইয়া থাকে। আমি

যাহা তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা আমার ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু স্বদেশের—আমার মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আসিয়াও আমি ইহা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না; আশা করি, পরমেশ্বর আমার এই দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিবেন।

"দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার একমাত্র পুত্র পিটারকে তাহার ধাত্রী মেরী সেলার্শের সহিত কাইলেস্কুতে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কথা ছিল, খৃষ্টোৎসবের সময় তাহারা সেখানে আমার বন্ধুগণের অতিথিরূপে কিছু দিন কাটাইয়া আসিবে। এই উদ্দেশ্যে আমি তাহাদিগকে ব্লাইথের বন্দর হইতে আরবুটাস্ জাহাজে তুলিয়া দিয়াছিলাম। এই জাহাজখানি সেই বন্দর হইতে সমুদ্রযাত্রা করিবার পর আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বহু অনুসন্ধানেও তাহার খোঁজ-খবর না পাওয়ায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা সমুদ্রের কোন অংশে জলমগ্ন হইয়াছে, এবং জাহাজের আরোহী, কর্ম্মচারী ও নাবিকগণের কাহারও প্রাণরক্ষা হয় নাই। আজ রাত্রিকালে—হাঁ, আমার জীবনের পক্ষে এই স্মরণীয় রাত্রিতে এই পাকশালায় আসিয়া দৈবক্রমে যে পত্রখানি আমার হস্তগত হইল, তাহা পাঠ করিয়া তোমাদিগকে শুনাইতেছি। তোমরা তাহা শ্রবণ কর।"

সার প্যাট্রিক পত্রখানি খুলিয়া ধীরে ধীরে স্খলিত স্বরে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"আমাদের জাহাজখানি চূর্ণ হইয়াছে। যদিও কাপ্তেন বলিতেছেন—জাহাজের এক প্রাণীরও প্রাণরক্ষার আশা নাই, তথাপি সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশ্বরের করুণায় নির্ভর করিয়া এই ক্ষুদ্র শিশু পিটার মিলভেনকে উত্তাল-তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র-বক্ষে ছাড়িয়া দিলাম; তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক— মেরী সেলার্শ।"

সার প্যাট্রিক পত্রখানি ধীরে ধীরে রাখিয়া পুনর্ব্বার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলাম, অশ্রুরাশিতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ। তিনি উঠিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার উভয় হস্ত আমার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া আবেগভরে বলিলেন, "পিটার, বৎস, পুত্র আমার, এত দিন পরে সত্যই কি তোমাকে ফিরিয়া পাইলাম!"

আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না; তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমারও অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইল। তিনি আমাকে দুই হাতে জড়াইয়া-ধরিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার স্নেহপূর্ণ বক্ষে আশ্রয় লাভ করিয়া আমি আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিলাম। আনন্দে আমার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল।

কিন্তু ইহা যে সত্য, এ কথা বিশ্বাস করিতে তখনও যেন আমার প্রবৃত্তি হইল না। জ্ঞান হইবার পর হইতে আমাকে এতই কষ্ট ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, বহির্জ্জগত সম্বন্ধে আমাকে এতই অনভিজ্ঞ অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, এই মহাসম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ 'বৃটিশ অফিসার' যে আমারই স্নেহময় পিতা—চাক্ষুষ প্রমাণ সত্ত্বেও ইহা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন হইল।

যাহা হউক, অবশেষে তিনি আমাকে তাঁহার আবেগ-স্পন্দিত বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া দিয়া, তাঁহার উভয় হস্ত পূর্ব্ববৎ আমার কাঁধে রাখিয়াই আমসের মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; এবং নীরস স্বরে তাহাকে বলিলেন, "ইংলণ্ডে আমি নিতান্ত অপরিচিত লোক নহি, তুমি একটু চেষ্টা করিলেই আমার সন্ধান পাইতে; কিন্তু তুমি সে জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া কেন এই সুদীর্ঘ কাল আমার পুত্রকে এই নিভৃত দ্বীপে অনাথের ন্যায় আটক করিয়া রাখিয়াছ?"

যে কারণেই হউক, এতক্ষণ পরে আমসের ভয় ও কুণ্ঠিত ভাব দূর হইয়াছিল। এবার সে অসঙ্কোচে—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরেই বলিল, "এই কার্য্য কেন আমি করিয়াছিলাম তাহা বলিতেছি; কোন কথা আর আপনার নিকট গোপন করিব না। ঐ যে ও-ধারে মেয়েটিকে দেখিতেছেন—মেরী উহার নাম,—উহারই জন্য এ কাজ আমাকে করিতে হইয়াছিল। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার নিকট একাকী বাস করিতে উহার কষ্ট হইবে—এ জন্য উহার প্রায় সমবয়স্ক এক জন সঙ্গী রাখা প্রয়োজন—ইহা বুঝিতে পারিয়াই পিটারকে আমি হাতছাড়া করিতে চাহি নাই। পিটারকে সহচররূপে পাইলে উহার দিনগুলি আনন্দে কাটিবে, এইরূপই আমার ধারণা হইয়াছিল। আমার ন্যায় বৃদ্ধ ঐ বালিকার সঙ্গী

হইবার উপযুক্ত নহে। আমার কন্যা বলিয়াই এতকাল ঐ বালিকার পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমি প্রথমেই বলিয়াছি, বালিকাটি আমার কন্যা নহে; আমার শোণিত উহার দেহে প্রবাহিত হইতেছে না, ও আমার আত্মীয়াও নহে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আমস্ নীরব হইল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "কিন্তু এই বালিকার জীবনের সকল কাহিনী বলিতে হইলে অনেক কথা বলা প্রয়োজন; সে সকলই আপনাকে বলিতেছি। আমার যৌবন কালের একটি করুণ কাহিনীর সহিত তাহা বিজড়িত। তাহা নাটকীয় ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সেই সকল কাহিনী শুনিয়া আপনার ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতির লোকও হাস্যসংবরণ করিতে পারিবেন কি না, জানি না।—বহু দিন পূর্ব্বে একবার আমি হাম্বার্গের এক সঙ্গীতশালায় গমন করিয়াছিলাম। সেই সঙ্গীতশালায় এক জন নর্ত্তকী ছিল; তাহাকে আমি লা পার্লি নামে আপনার নিকট পরিচিত করিব। লা পার্লি তাহার প্রকৃত নাম না হইলেও তাহাতে কিছু যায়-আসে না। সে ছিল জাতিতে জার্ম্মাণ; জার্ম্মাণ নর্ত্তকীগণের মধ্যে তাহার খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত জার্ম্মাণ-যুবক তাহার কৃপাপ্রার্থী ছিল; তাহারা নিত্য তাহার স্তুতি-বাদ করিত। তাহার কৃপাকটাক্ষের জন্য তাহারা তাহার চরণমূলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত ছিল। আমি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলাম; কিন্তু আমার ন্যায় নগণ্য নাবিককে সে তাহার চরণ-স্পর্শেরও যোগ্য মনে করিত না। তথাপি আমি তাহাকে ভুলিতে পারি নাই—কোন দিন তাহাকে ভুলিতে পারিব না। তাহার মুখের দিকে চাহিলে আমি যে কত ক্ষুদ্র, কত হীন—তাহা ভুলিয়া যাইতাম।"

আমস্ কি ভাবিয়া বলিতে পারি না—হী-হী শব্দে হাসিয়া উঠিল। বোধ হয়, নিজের ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা স্মরণ করিয়াই সে ঐ ভাবে হাসিয়াছিল। সে বলিতে লাগিল, "লা পার্লির মনোরঞ্জন করা আমার অসাধ্য হইয়াছিল। তাহার অবজ্ঞা ও ঘৃণায় আমি মর্ম্মাহত হইয়া দূরে প্রস্থান করিলাম; তাহার পর বহু দিন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই।

"কিন্তু দীর্ঘকাল পরে পুনর্ব্বার তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে সাক্ষাৎ কোন সঙ্গীতশালায় নহে, জার্ম্মাণীতেও নহে। এবার তাহার দেখা পাইলাম—সুদূর আফ্রিকার কেপটাউনের একটা সাধারণ হোটেলে। সে তখন নানা দুশ্চিকিৎস্য কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া ছিল। নর্ত্তকীদিগের ইহাই বোধ হয় পরিণাম! তখন তাহার অপরূপ রূপরাশির কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। রোগে ভুগিয়া তাহার আকার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার দেহ বিকৃত হইয়াছিল। সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইল; বড় কষ্ট পাইয়াই সে মরিয়াছিল। দীর্ঘকাল কুৎসিৎ রোগে ভুগিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ও দুর্গন্ধময় হইয়াছিল বলিয়া ঘৃণায় কেহ তাহাকে স্পর্শও করিত না; কিন্তু আমি তাহার সেবাশুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলাম। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। এক দিন যে আমাকে পদস্পর্শেরও যোগ্য মনে করে নাই, সে আমারই ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া অন্তিমশ্বাস ত্যাগ করিল।—পৃথিবীতে রূপ-যৌবন, দম্ভ-মাৎসর্য্যের ইহাই বোধ হয় পরিণাম!

"যাহা হউক, তাহার পরিচর্য্যার জন্য আমি আমার জাহাজের চাকরী ত্যাগ করিয়াছিলাম; সেই চাকরীতে আর যোগদান করি নাই। লা পার্লির মৃত্যুকালে তাহার একটি শিশুকন্যা ছিল।—ঐ মেরীই তাহার সেই কন্যা।

"মায়ের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে মেরীর আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না। মেরীর সকল ভার আমার উপরেই পড়িল। অন্য কেহ হয় ত সেই অবস্থায় মেরীকে কোন অনাথাশ্রমে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইত; কিন্তু আমি তাহা করি নাই। অনাথা মেরীকে ত্যাগ না করিয়া তাহার সকল ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলাম; এজন্য যদি আপনি মনে করেন, আমি প্রশংসার পাত্র, তাহা হইলে বলিব—উহা আপনার বুঝিবার ভুল! আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিব ভাবিয়াই ঐ কার্য্য করিয়াছিলাম। যে দাম্ভিকা নারী তাহার সুসময়ে রূপ-যৌবন ও সম্পদের গর্ব্বে আমাকে ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিয়াছিল, তাহার অনাথা কন্যাকে আমার নিজের কন্যা-পরিচয়ে তাহার প্রতি-পালনের ভার গ্রহণ করিব—ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত

গৌরব ও গর্ব্বের বিষয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যগর্ব্বে যে কোন দিন আমার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই, তাহার অনাথা কন্যাকে আশ্রয়দান করিয়াছি ভাবিয়া আমি আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম। তাহার কন্যা—যাহার দেহে জার্ম্মাণের রক্ত-মাংস বর্ত্তমান, আমার আশ্রিত,—আমার অনুগ্রহে সে জীবনধারণ করিতেছে ভাবিয়া আমি এই দীর্ঘকাল গর্ব্ব অনুভব করিয়া আসিয়াছি। মেরীকে প্রতিপালন করিবার জন্যই আমি জাহাজের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন দ্বীপে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলাম।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমস্ মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে বলিল, “গত পনের বৎসর তুমি আমার কন্যারূপে আমারই আশ্রয়ে বাস করিয়াছ। তুমি যে জার্ম্মাণের মেয়ে—এ কথা কোন দিন তোমার জানিবার সুযোগ হয় নাই। তোমার মায়ের স্বভাবের অনেক বৈশিষ্ট্য তুমি লাভ করিয়াছ। জার্ম্মাণের মেয়ে তুমি, কোন ইংরেজ যুবককে বিবাহ করিতে সম্মত হও নাই, অবশেষে তোমার স্বজাতি লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছ; ইহা তোমার অযোগ্য হয় নাই।”

অতঃপর আমস্ হঠাৎ লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “হ্যাগেন, তুমি সত্যই কি মেরীকে বিবাহ করিবে? তুমি ত শুনিলে, মেরী তোমারই স্বজাতি—জার্ম্মাণ; জার্ম্মাণের শোণিত উহারও দেহে প্রবাহিত।”

হ্যাগেন দৃঢ়স্বরে বলিল, “হাঁ, মেরীকে বিবাহ করিব, —ইহাই আমার সঙ্কল্প। মেরী আমাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিয়াছে।”—মেরীর কটিদেশ সে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিল।

আমস্ দুই-এক মিনিট নির্ব্বাক্ ভাবে হ্যাগেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “মেরী উহার মায়ের মতোই একগুঁয়ে, এবং তেজস্বিনী; সহজে উহার মন পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহার হৃদয় খাঁটি সোনার মতো নিষ্কলুষ। এমন মেয়ে লক্ষের মধ্যেও একটি মেলে না। হ্যাগেন, তুমি ভাগ্যবান্!”

হ্যাগেন আর কোন কথা বলিল না, অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। সে তখন শত্রুবর্গে পরিবেষ্টিত; কি কথাই বা তাহার বলিবার ছিল?

—

পঞ্চবিংশ পর্ব্ব

নিরাপদ আশ্রয়

পরদিন প্রত্যুষে আমরা সকলেই ইংলণ্ডগামী ডেষ্ট্রয়ারে আরোহণ করিলাম। বন্দী কাপ্তেন ভন রথভেন এবং লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনকেও সেই জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইল; তাহাদের প্রতি অন্য কোন দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইল না। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—উহাদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া কিরূপ শাস্তি প্রদান করা হইবে? পিতা বুঝিতে পারিলেন—আমি তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি; এ জন্য তিনি আমাকে আশ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, যুদ্ধের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগকে ইংলণ্ডের কোন বন্দী-নিবাসে আবদ্ধ রাখা হইবে। উহারা ‘ইউ’-বোট সহ ধরা পড়িলেও উহাদিগকে অন্য কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে না।

মেরী জাহাজের ডেকে আমার পাশে দাঁড়াইয়া অন্যমনস্ক ভাবে মুক্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়াছিল। আমাদের এই সুদীর্ঘ কালের বাসস্থান ‘ব্ল্যাক গলের’ পাহাড় আমাদের নয়নের সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। আমি মেরীর হাতখানি নিজের হাতের ভিতর লইয়া মৃদু স্বরে বলিলাম, “বাবার নিকট শুনিয়াছি, কাপ্তেন ভন রথভেন ও লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া কোন বন্দী-নিবাসে আটক রাখা হইবে; যুদ্ধের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগকে বন্দী-শিবিরেই বাস করিতে হইবে। মিঃ হ্যাগেন ‘ইউ’-বোটের আরোহী হইয়া সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কখন্ কোন্ বিপদ ঘটে, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না; এ অবস্থায় ইংলণ্ডে কোন বন্দী-শিবিরে বাস—তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক নিরাপদ। যুদ্ধটা যত দিন শেষ না হয়—তত দিন তুমি বাবার অতিথিরূপে আমাদের বাড়ীতেই থাকিবে। নানা নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া, সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের

সঙ্গে মিশিয়া আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিবে, কি বল, মেরী ?"

মেরী আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে হাসি যেন শরতের মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রালোক। মেরী মৃদু স্বরে বলিল, "তোমার কথা সত্য হইলে ভালই হইত পিটার, কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা ত হইবার নয়।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "হইবার নয় ? এ তুমি কি বলিতেছ, মেরী ! উহা হইবার নয়—এ কথার অর্থ কি ?"

মেরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "অর্থ অতি পরিষ্কার, পিটার ! বাবা—অর্থাৎ আমস্ কি বলিয়াছিল—তাহা কি তোমার স্মরণ নাই ? আমি জার্ম্মাণের মেয়ে, এবং জার্ম্মাণীর পক্ষ লইয়া ইংরেজের শত্রুতা-সাধনে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছি। এ জন্য আমাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই ডেষ্ট্রয়ার ইংলণ্ডে পৌছিলে আমি প্রহরীবেষ্টিত হইয়া কোন বন্দী-শিবিরে নীত হইব, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ আছে কি ?"

এ কথা আমি পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখি নাই; কিন্তু কথাটা সত্য। এজন্য মেরীর কথার প্রতিবাদ করিতে না পারায় আমি নীরব রহিলাম।

তাহার কথা শুনিয়া আমি হতাশ হইয়াছি—ইহা বুঝিতে পারিয়া মেরী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি দুঃখ করিও না, পিটার ! আমার জন্য তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই; আমি শারীরিক ভালই থাকিব, আমার প্রতি যত্নেরও অভাব হইবে না। শত্রু-দেশের নারীর প্রতি ইংরেজ সদাচরণে কৃপণতা করে না। বিশেষতঃ, যুদ্ধটা শীঘ্র শেষ হইবে বলিয়াই আশা করিতেছি।"

আমাদের আর কোন কথা হইল না। আমরা উভয়েই সেই দ্বীপের চির-পরিচিত পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ক্রমশঃই তাহা দূর হইতে আরও দূরে সরিয়া গেল এবং অবশেষে তাহা ক্রমবর্দ্ধমান কুজ্ঝটিকারাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। আমাদের এত দিনের পুরাতন জীবন-ধারার উপর যবনিকাপাত হইল। এবার নূতন জীবন আরম্ভ হইল।

* * * *

আমস্ ক্রোবি স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহাকে তাহার যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। তাহার সাহায্যে জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোটের বোম্বেটেরা বহু লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, বিপুল ধন-সম্পত্তি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তাহার এই গুরু অপরাধের যে প্রায়শ্চিত্ত হইল, তাহা অনেক দিন পূর্ব্বেই স্কাই-দ্বীপবাসিনী ডাইনী-বুড়ীর ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী এত দিনে সফল হইল।

নূতন অবস্থায় আসিয়া আমি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলাম—আমসের প্রতি যে দণ্ড প্রযুক্ত হইল, তাহা আদৌ অন্যায় হয় নাই। অর্থের প্রতি অতিরিক্ত লোভই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। অর্থলোভে সে সকল রকম অন্যায় কার্য্যই করিতে পারিত। তথাপি তাহার শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে আমি ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারি নাই।

আমার পিতা তাহার শাস্তির প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তাহার মৃত্যুতে পৃথিবীর ভার লাঘব হইয়াছে। তাহার ন্যায় নরপিশাচ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়; তবে সে শান্তির সহিত মৃত্যু বরণ করিয়াছে।"

তাহার প্রাণদণ্ডের সংবাদ শুনিয়া আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। আমার প্রতি তাহার সকল দুর্ব্যবহারই আমি ক্ষমা করিয়াছিলাম।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সমাপ্ত

দুষ্কৃতি ও সুকৃতি

লোকের দুষ্কৃতিগুলি লিখি মোরা পিত্তল-ফলকে
সুকৃতির কথা লিখি তরঙ্গিত জলের ছলকে।



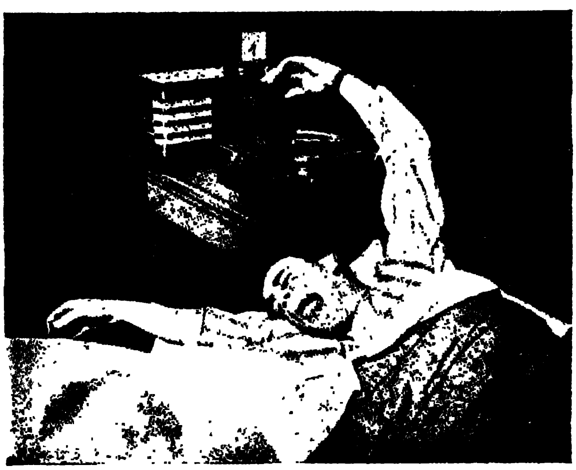
বিজ্ঞান-জগৎ

গ্রামোফোন রেকর্ডে শিক্ষাদান

ইতিহাস, সাহিত্য—এ-সব বিষয়ে আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে গ্রামোফোন-রেকর্ডের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে।



রেকর্ডে সাহিত্য ও ইতিহাস-শিক্ষা



রেকর্ডে ঘুম-ভাঙ্গানো

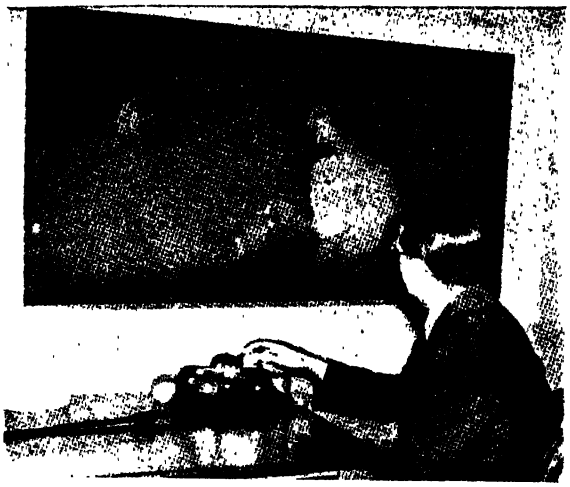
প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সাল-তারিখ-সমেত, সাহিত্যের বিশিষ্ট ভাবসম্পদ, ভাষা-বিন্যাস প্রভৃতি নাটকীয় রূপে গ্রামোফোন রেকর্ডে তুলিয়া বিদ্যালয়সমূহে সেই রেকর্ড বাজানো হয়। ক্লাশে বই লইয়া এ-সব বিষয় গিলাইবার বা মুখস্থ করাইবার বালাই আর নাই! ছেলেমেয়েরা সাগ্রহে এ-সব রেকর্ড শোনে। গ্রামোফোনের জন্য যে-সব রেকর্ড লওয়া হইতেছে, সেগুলি ওখানকার কলাবিদ্ কথাশিল্পীরা বিশেষ ভাবে রচনা করিতেছেন!

গ্রামোফোন-রেকর্ড দিয়া শুধু শিক্ষাদানের কাজ করানো হইতেছে না—তার কাজের ক্ষেত্র বাড়িয়াছে! রাত্রে ঘুম হইতেছে না, কি দারুণ অস্বস্তি! এ-অনিদ্রা দূর করিয়া আপনার চোখে ঘুম আনিয়া দিবে, সে জন্য রেকর্ড তৈয়ারী হইয়াছে। এ রেকর্ডে মিষ্ট-সরস কণ্ঠে আপনি শুনিবেন ঘুমপাড়ানি বিবিধ বিধি, ঘুম-পাড়ানিয়া সুরে সুমধুর গান ও বাজনা। আপনি ভোরে উঠিতে চান, ঘড়িতে কর্কশ এলার্ম-ধ্বনির প্রয়োজন নাই! রেকর্ড হইয়াছে, সে রেকর্ড মধুর আহ্বানে আপনার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবে। এলার্ম-পদ্ধতির ধরণে গ্রামোফোন-যন্ত্রে শুধু সময়ের ঘরে চাবি দিয়া রাখুন, যথাসময়ে ঘুম-ভাঙ্গানি রেকর্ড বাজিবে। ঘুম-ভাঙ্গানি রেকর্ড আছে নানা রকমের। ধমক না দিলে যাঁর ঘুম ভাঙ্গে না, তাঁর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য ধমকের রেকর্ড মজুত পাইবেন। তা ছাড়া তাস-খেলার হদিশ, টোট্কা ঔষধাদি রচনার হদিশ, এ সবের রেকর্ডও মার্কিণ বাজারে প্রচুর ভাবে বিক্রয় হইতেছে। এ সব রেকর্ডের সৃষ্টি হইয়াছে আমেরিকার বেতার-আসরে।

হৃদয়-পরীক্ষা

বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কন্যার রাশি-নক্ষত্র লইয়া আমরা করি কোষ্ঠী-বিচার! অর্থাৎ দু'জনের আয়ু-যোগ কেমন, এইটুকু দেখিয়াই আমরা বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করি না; সেই সঙ্গে দেখি, এ-মিল রাজযোটক হইবে কি না? দু'জনে বনিবে কি না। বর-বধূ কোথায় রহিল, তাদের না দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা শুধু বর-বধূর কোষ্ঠী দেখিয়া রাশি-নক্ষত্রের অবস্থান মাপিয়া মিলনের শুভাশুভ নির্ণয় করেন। এ-বিচার কতখানি অভ্রান্ত,—সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহি না। তবে সম্প্রতি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের

মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর আর্নেষ্ট চ্যাপ্‌ল্‌ সম্প্রতি ব্যক্তিত্ব-পরীক্ষার জন্য এক অভিনব বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। পাণিপ্রার্থী



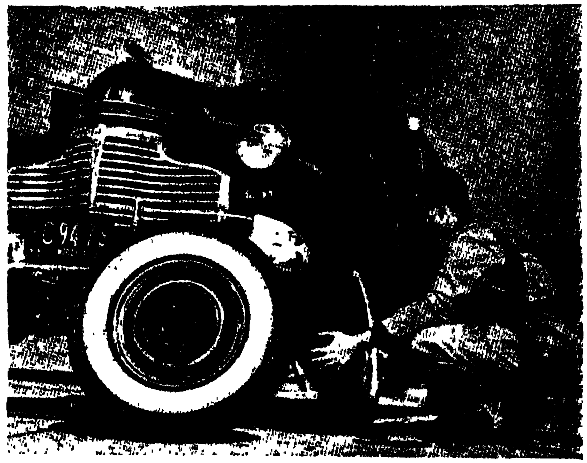
ওদিকে বর-কন্যা; এদিকে প্রোফেশর

বর ও কন্যাকে ঘরে বসাইয়া তিনি বলেন,—'তোমরা যেমন খুশী গল্প করো, প্রেম সাধনা করো।' বর ও কন্যাকে কথা কহিতে দিয়া তিনি বসেন মোটা পর্দার আড়ালে। এই আড়ালের জন্য বর ও কন্যা তাঁকে দেখিতে পায় না। পর্দার ওদিকে বর ও কন্যা বসিয়া হৃদয় মুক্ত করিয়া কথা কয়, আর পর্দার এদিকে ডক্টর আর্নেষ্ট চ্যাপল্‌ বসেন তাঁর নব-নির্ম্মিত বৈজ্ঞানিক-যন্ত্র লইয়া। যন্ত্রসংলগ্ন কাগজের সুদীর্ঘ সচল ফিতায় বর ও কন্যার কণ্ঠস্বর পর-পর চিহ্ন রাখিয়া যায়—গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো! দু'জনের কথায় কাহার মনে কি ভাবের উদয় হয়—বিরক্তি না অনুরক্তি,—ফিতার রেখায় তদনুরূপ দাগ পড়ে। সেই দাগ দেখিয়া প্রোফেশর বলিয়া দিতে পারেন, কার মন কি-ধাতুতে গড়া; এবং মনের এ ধাতু-পরিচয়ের পর তিনি বলিয়া দেন, দু'জনের মনে-মনে মিল কত কাল থাকিবে!

——

মোটর-গাড়ীর টায়ার

অনেকেই আজ মোটর-গাড়ী কিনিতেছেন,—মোটরে চড়েন; কিন্তু টায়ারের যত্ন জানেন না বলিয়া টায়ার লইয়া প্রায় নাকাল হন। টায়ারের যত্ন করিলে গাড়ীর কল-কব্জা ভালো থাকিবে। গাড়ীর জান বাঁচিবে, এ-কথা তাঁরা জানিয়া রাখুন। বিশেষজ্ঞেরা টায়ার-রক্ষার সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন—সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিলে বহু অনর্থ, এবং অকারণ অর্থব্যয় বাঁচিবে! নানা মেক্কারের তৈয়ারী টায়ার মেলে। বাতাসের 'প্রেশার' সম্বন্ধে মেকার-দত্ত বিধি শিরোধার্য্য করিয়া চলিবেন। নূতন টায়ার বা সদ্য-মেরামত-করা



চাকা-বদল



ষ্টেপ্‌নি ঢাকিয়া রাখুন

টায়ার গাড়ীতে লাগাইয়া গাড়ী চালাইবার সময় প্রতি দশ-পনেরো মাইল চলার পর পরখ করিবেন, টায়ার কতখানি ফুলিয়া

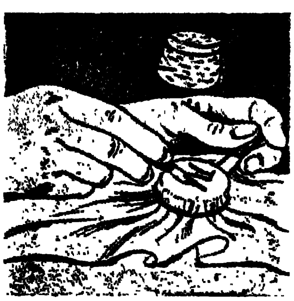
আছে। নূতন ও সদ্য-মেরামত-করা টায়ারের বাতাস প্রথম দু'চার দিন চট্ করিয়া বাহির হইয়া যায়। একই দিকে একখানি চাকা দীর্ঘ দিন না লাগাইয়া মাঝে-মাঝে ঠাঁই-বদল করিয়া লইবেন; অর্থাৎ সামনের টায়ার পিছনে লাগাইবেন, পিছনকার টায়ার লাগাইবেন সামনে; তাহাতে টায়ারের পরমায়ু বাড়িবে—টায়ারের জান্ চট্ করিয়া 'হায়রাণ' হইবে না! পিছন-দিকে পুরানো চাকা লাগাইবেন না। টায়ারের গায়ে নুড়ি-পাথর-পেরেক প্রভৃতি বিঁধিবামাত্র তাহা ফেলিয়া দিবেন। গ্রীষ্মের দিনে শুষ্ক-তপ্ত পথে বেশী জোরে গাড়ী চালাইবেন না—তাহাতে টায়ারের জান্ যায়। ফুটপাথ বা খানা-খোন্দল টপ্‌কানো—কদাচ করিবেন না। ষ্টেপনি-টায়ার ঢাকিয়া রাখিবেন। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে সহসা চলন্ত গাড়ীর ব্রেক কষিবেন না!



এই মুখোশ

গৃহস্থালী

রুমালে, কাপড়ের কোণে, বিছানার চাদরে, বালিশের ওয়াড়ে নাম লিখিতে চান? কাপড়ে রুমালে কি ভাবে ভালো-ছাঁদের হরফে নাম লিখিবেন? চিন্তা নাই! সোলার একটা বড় ছিপি লইয়া সেই ছিপির গায়ে রুমালের ও কাপড়ের কোণ পাশের ছবির ভঙ্গীতে চাপিয়া তার দিয়া ছিপির গায়ে রুমাল বা কাপড় আটকাইয়া লউন। কাপড় ও রুমাল টাইট থাকিবে। এবারে নাম লিখুন। অক্ষরের ছাঁদ খারাপ হইবে না, কাপড় বা রুমাল সরিয়া যাইবে না।



সোলা ও তারের কৌশল

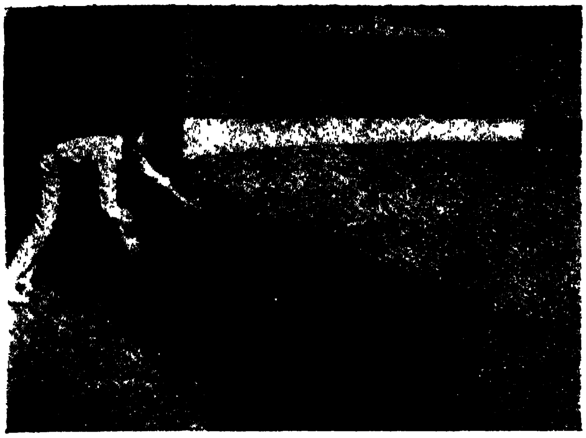
মৃত্যুঞ্জয় মুখোশ

এবারকার এ পৈশাচিক যুদ্ধে মানুষ মারিবার জন্য বিষ-বাষ্পের দারুণ সমারোহ! সে বাষ্প বাঁচাইয়া শত্রুর গতিবিধি-পর্য্যবেক্ষণ, শত্রু-নিপাত,—এ সব ব্যাপারে আমেরিকা ও বৃটেনের সাধনার আর অন্ত নাই! সম্প্রতি মার্কিন ফৌজ-বিভাগ এক-রকম অক্সিজেন-মুখোশ নির্ম্মাণ করিয়াছে; সে মুখোশ একেবারে মৃত্যুঞ্জয়! এ মুখোশ আঁটিলে মুখবিবর মুক্ত থাকে; কাজেই কথা কহিতে অসুবিধা ঘটে না এবং এ মুখোশে বিষবাষ্প যেমন নিশ্বাস-বাতাসে মিশিবে না, তেমনি বহু ঊর্দ্ধে শূন্যমার্গে উঠিলে নিশ্বাস-বায়ুতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন-বাষ্প অনায়াসে মিলিবে।

—

অঙ্কুর-রক্ষা

মাটাতে তৃণ-শস্যাদির বীজ পুঁতিলে সে বীজ স্পষ্ট অঙ্কুরিত হইয়া কচি কিশলয়-পল্লবের মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। তখন অতি-রৌদ্র বা বর্ষার জল-ধারা লাগিলে অঙ্কুরের প্রাণ-সংশয় ঘটে! সে-বিপদে অঙ্কুরকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন কৃষি-বিভাগ অঙ্কুর-রক্ষক জাল রচনা করিয়াছেন। এ-জাল কাগজের টোয়াইন সুতায়



কাগজী-সূতার জাল

নির্ম্মিত। এ-সুতা সিকি ইঞ্চি মোটা। কাগজ-সুতার এ-জাল সুদীর্ঘ-প্রসারে অঙ্কুরের উপর মেলিয়া দিন,—সূর্য্যকিরণ এবং বাতাস অবরুদ্ধ থাকিবে না ; বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভাসিয়া বা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অঙ্কুরের কোনো অনিষ্ট ঘটিবে না। চারাগুলি মাথায় আড়াই-ইঞ্চি বাড়িবার পর এ-জালের আবরণে অঙ্কুর ঢাকিয়া রক্ষা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

শয্যা-বুককেশ

পাশের ছবিতে বুক-কেশটি দেখিতেছেন।

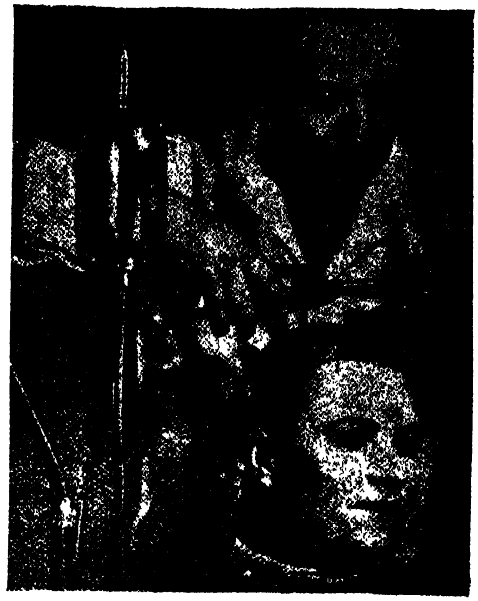


বুক-কেশে শয্যা

এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, একধারে এ-বুককেশে বই-কাগজ-পত্র, জামা-কাপড় রাখা চলে, আবার প্রয়োজন হইলে তলা খুলিয়া কায়দা-মাফিক পিছাইয়া দিন—কোমল শয্যা মিলিবে। শুইয়া আরামে নিদ্রা-সুখ উপভোগ করুন!

কোঁকড়া-চুলের বাহার

'কুঞ্চিত-কেশিনী নিরুপম-বেশিনী'! কুঞ্চিত কেশদামে নারীর শ্রী



কেশ-কুঞ্চন

খোলে অপরূপ কিন্তু সবার কেশ কি কুঞ্চিত করা সম্ভব ? এ সমস্যার আজ সমাধান হইয়াছে। মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা কেশকুঞ্চন-যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। সে যন্ত্র চলে বৈদ্যুতিক প্রবাহযোগে। এ-যন্ত্রের সাহায্যে পাৎলা কেশ, ঘন কেশ, শুষ্ক কেশ, তেলা কেশ অর্থাৎ সকল রকমের কেশ সুকুঞ্চিত করা চলে। এ-কুঞ্চন-প্রণালীতে কোনো রকম তৈল, ক্রীম বা মাথা-ঘষা প্রভৃতির কোনো প্রয়োজন নাই। এ-যন্ত্রে একবার কেশ প্রসাধন করিয়া লইলে কেশদাম সাত দিন আঙুরের থোলোর মতো কোঁকড়া থাকে!

মরীচা তোলা

বাটালি, উকা, ছুরি প্রভৃতিতে মরীচা ধরিলে সে-মরীচা তুলিবার সহজ উপায়—প্যারাফিনে তুলা বা নরম ন্যাকড়া ভিজাইয়া সেই



মরীচা তোলা

ভিজা তুলা বা ন্যাকড়া দিয়া ছুরি, বাটালি, উকা ও ক্ষুরের গা মাজা। মরীচা সাফ এবং লোহা বা ইস্পাত রূপার মতো উজ্জ্বল হইবে!

রোলার-সাবান

অনেকে স্পঞ্জ বা রবার-কেসের সাহায্যে গায়ে সাবান মাখেন। সম্প্রতি বেলুন-রোলারের ছাঁদে সাবান তৈয়ারী হইয়াছে। এ-সাবানের এক-একটির ওজন আধ সের। সাবানের দু'প্রান্তে বেলুনের মতো দু'টি হাতল আছে। কাঠের হাতল। সাবান



পায়ে রোলার-সাবান মাখা

মাখিবার সময় এই হাতল ধরিয়া গায়ে-হাতে-পায়ে সাবান মাখিলে খুব ফেনা হইবে এবং গায়ের ময়লা কাটিবে। এ-সাবান আপাততঃ তৈয়ারী হইয়াছে তিন রঙে! সাদা, গোলাপী এবং সবুজ। সাদা সাবান গার্ডেনিয়ার বাসে সুবাসিত; গোলাপী সাবানে পাইবেন জেরানিয়ামের সুবাস; এবং সবুজে পাইবেন পাইনের গন্ধ!

—

জলে জীবন রক্ষা

ব্রিটিশ নেভি-বিভাগ সম্প্রতি ধাতু-নির্ম্মিত এক রকম লাইফ-বেল্ট তৈয়ারী করিয়াছেন। সে-বেল্টের একটির সাহায্যে তরঙ্গোচ্ছসিত সাগরের



লাইফ-বেল্ট

বুকে ছ'জন লোক অনায়াসে নিরাপদ-আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন! এ-বেল্টের পকেটে নির্ম্মল পানীয় জল ও খাদ্যাদি রক্ষা করা যায়। সে পানীয় জলে এবং খাদ্যে ছ'জন লোক তিন-চার দিন জীবনধারণ করিতে পারেন। তার পর এ-বেল্টে ধূম ও আলোর সঙ্কেত-ব্যবস্থা আছে। সে-সঙ্কেতিকার সাহায্যে দিনের বেলায় বেল্ট হইতে যেমন প্রচুর কৃষ্ণ ধূম নিঃসারিত হয়, রাত্রে তেমনি প্রদীপ্ত আলোর বিকাশ ঘটে। এই আলো ও ধূম দেখিয়া দূরবর্ত্তী জাহাজ বা তীরদেশ হইতে সাহায্য মিলিবার সম্ভবনা যে সুনিশ্চিত, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

গোরু-বাছুর

কহেন ছাত্রের পিতা, "কি তফাৎ শিক্ষকে রাখালে?
উভয়ে চরায় গোরু বেত্র হাতে ঘুরে পালে-পালে।"
শিক্ষক কহেন, "গোরু চরানোরও করি না বড়াই।
গোরু ত গোয়ালে থাকে, তাহাদের বাছুর চরাই।"

উপগুপ্ত।



অপচয়

একদা যে রূপলাবণ্যবতী তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে পাঠনিরত ছাত্রদিগকে হিল-উঁচু জুতার শব্দে সচকিত ও বিস্মিত করিয়া সঞ্চারিণী লতিকার সঞ্চরণচ্ছন্দে তরুণের দলকে উন্মনা করিত, এবং ক্ষণিকের জন্য তাহাদের দৃষ্টিতে স্বপ্নের মোহ ঢালিয়া-দিয়া ঘুরাফেরা করিত, তাহারই সহিত এক দিন কল্যাণপুরের জমিদারের একমাত্র বংশধর প্রশান্তের বিবাহ হইয়া গেল। প্রশান্তের পিতামাতা বিদুষী বধূকে সাদরেই গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, কারণ, তাঁহারাও আধুনিক রুচিসম্পন্ন, এবং প্রশান্তকেই তাহার বধূ-নির্ব্বাচনের সকল ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পিতা বলিয়াছিলেন,—"মেয়েরা ত আর মণিহারী দোকানের পণ্য নয় যে, তার পছন্দ অপছন্দ ব'লে একটা কিছু আছে; এ মানুষের হৃদয় নিয়ে খেলা, প্রশান্ত যাকে উপযুক্ত মনে করবে, তাকেই বিয়ে করবে।"—তিনি হয় ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, জগতে মানুষকে চেনাই সব চেয়ে কঠিন, এবং উদার যৌবনেই মানুষ সব চেয়ে অন্ততঃ এই ব্যাপারে বেশী ভুল করে।

বিবাহের পর একটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে—

প্রশান্তের আজ কয়েক দিন অসুখ। হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় কিছু বৈক্লব্য দেখা দিয়াছে—ডাক্তাররা এক বাক্যে তাহাকে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন। তাই, প্রশান্ত পূবের দিকের দোতলার খোলা ঘরটায় দিবারাত্রি শুইয়াই কাটায়। জানালার নীচে সরু একটি গলি, তাহার ও-পারে মধ্যবিত্ত কয়েক ঘর লোক বাস করে, কেহ কেরাণী, কেহ মাষ্টার, কেহ বা অন্য কিছু। তাহার পরে অদূরে দেখা যায়, একটি শীর্ণ নারিকেল গাছের ঝাঁকড়া মাথা, সেখানে এক জোড়া শঙ্খ-চিলের বাসা—দিবারাত্রি এই বিহগ-দম্পতি খড়-কুটা সংগ্রহ করিয়া নীড় রচনা করিতেছে। তাহার পরে খানিকটা আকাশ; কখনও নীল, কখনও মেঘে ধূসর, কখনও বা শুভ্র পালকের মতো লঘু মেঘের স্তূপে আকাশের স্বচ্ছ নীলিমাটুকু ঢাকিয়া যায়। প্রশান্ত শুইয়া শুইয়া তাহাই দেখে।

ঠিক জানালার সামনে যে বাড়ীখানি, তাহার ছাদে ছোট্ট টিনের চালায় একটি রান্নাঘর,—একটি বধূ সেখানে নিত্য দু'বেলা রান্না করে, ছাদে কাপড়-বিছানা শুকাইতে দেয়, ছেলেকে খেলনা দিয়া বসাইয়া রাখে,—দেখিয়া দেখিয়া বধূটির দৈনিক কাজের তালিকা প্রশান্তের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। আজ প্রায় পনের দিন সে নিয়মিত ভাবে একই দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছে।

তাহার পরিচর্য্যার জন্যে একটি ফিরিঙ্গি নার্শ আছে, ডাক্তারের আদেশ মতো সমস্ত কর্ত্তব্য সে যথানিয়মে পালন করে, মাঝে মাঝে প্রশান্তের সহিত গল্পও করে। স্ত্রী রমলা মাঝে-মাঝে আসে; মা, বাবাও আসেন, কুশল প্রশ্ন করেন।

প্রশান্ত আজও অন্যান্য দিনের মতো আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল—পড়ন্ত রৌদ্র নারিকেল গাছের মাথায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সহসা কে যেন ঘরে প্রবেশ করিল,—প্রশান্ত ফিরিয়া দেখিল—রমলা।

রমলা প্রশ্ন করিল,—আজ কেমন আছ?

প্রশান্ত বিছানায় তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল,—আমার ত মনে হয় ভালই; কিন্তু এমনি ক'রে শুয়ে থেকে আর ত পারি নে। তুমিও ত এসে দু'দণ্ড বস্‌তে পারো—

রমলা হাসিয়া বলিল,—বেশ দুর্নামটা দিলে ত। আমি তোমাকে দেখিই নে। ডাক্তার বলেছে, তোমার কথা বলা বারণ, তাই আসি নে,—আমি এলেই কথা বলবে ত!

প্রশান্ত হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—আমি নয় কেবল শুনব, তুমিই গল্প ক'রো—

—তা, আমি পারি নে, একা একা কি গল্প করা চলে ?

প্রশান্ত চাহিয়া দেখিল, রমলার বেশের আজ একটু নূতনত্ব আছে। প্রশ্ন করিল—আজ অকস্মাৎ বেশ-পরিবর্ত্তন কেন ?

রমলা বলিল,—ওঃ, একটু বাইরে যাচ্ছি কি না। আজ আমাদের ক্লাবে একটা বিশেষ জলসা আছে, আমাকে যেতেই হবে। ছবিদি' এসে বার-বার ব'লে গেছে—

—ওঃ, তাই !

রমলা ঘড়ি দেখিয়া বলিল,—ওঃ, পাঁচটা বাজে যে ! দেরী হয়ে গেল। যাক্, কিছু মনে ক'রো না, নার্শ ত রইল, তুমি ত আর একা নও। আসি তা হ'লে, কেমন ?

প্রশান্ত ক্ষুদ্র একটু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—হুঁ, এসো। ক'টায় ফিরবে ?

—ন'টা নাগাদ আর কি !

রোগ-শয্যায় কয়েকটি দিন প্রশান্ত আপনাকে যেমন নিঃসঙ্গ মনে করিয়াছে, এমন সারা জীবনেও কোন দিন তাহার মনে হয় নাই। সে ক্লান্ত চক্ষু দু'টি আবার বাহিরের দিকে নিবদ্ধ করিল। ও-পারে দ্বিতলের সেই বধূটি তখনও রান্নাঘরে আসে নাই—

তাহার দিগম্বর শিশু পুত্রটি কোথায় যেন এক-টুকরা সাবান পাইয়াছে, এক বালতি রান্নার জল ছিল,—সেই জলে সাবানটুকু গুলিয়া সে সমস্ত পেটে মাখিয়াছে, যতই সাবানের ফেনা হইতেছে, ততই সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপন মনে হাসিতেছে, উল্লাসে মাঝে-মাঝে কিছু ফেনা মাথাতেও তুলিয়া দিতেছে। আনন্দের আতিশয্যে অবশেষে সে বালতির মধ্যে বসিয়াই সাবান সহ জলক্রীড়া আরম্ভ করিল। যেমন করিয়াই হৌক, সাবানের ফেনা বোধ হয়, কিছু চোখে গিয়াছে,—জ্বালা করায় তারস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অভিমন্যুর মত বালতি-ব্যূহের প্রবেশ-পথ তাহার জানা ছিল ; কিন্তু বাহির হইবার পথ তাহার জানা ছিল না।···প্রশান্ত আপন মনেই হাসিতেছিল।

বধূটি হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া পুত্রের এই দুর্গতি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। সম্ভবত বলিল,—যেমন দুষ্টু ! ক্ষোভও একটু হইবার কথা,—রান্নার জলটুকু সে নষ্ট করিয়াছে।

পুত্রকে বালতি-মুক্ত করিতে না করিতেই বাজার-হস্তে পুত্রের পিতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ! গৃহিণীর নালিশ শুনিয়া পুত্রের কান দুইটি সন্তর্পণে মর্দ্দন করিয়া সম্ভবত কিঞ্চিৎ শাসন করিলেন।

বাজারের থলি হইতে বেশাতি বাহির করিয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিতেছেন। কথাও মাঝে-মাঝে শোনা যাইতেছে। চারটি কই মাছ আসিয়াছে—

স্ত্রী প্রশ্ন করিলেন,—মাছের কি হবে ?

স্বামী ক্ষণিক চিন্তা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—মাথার মুড়িঘণ্ট, ন্যাজার অম্বল, আর পেটির কালিয়া—

দুই জনেই হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পুত্র এতক্ষণে একটি ধাবনরত কইএর ন্যাজা ধরিয়া মায়ের কোলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। মা তাহার গালে ঠাস্ করিয়া একটা চড় বসাইয়া বলিলেন,—কাপড়খানা আঁশ ক'রে দিলি, লক্ষ্মীছাড়া—

স্বামী হাসিয়া বলিলেন,—মাছটা চ'লে যাচ্ছিল, ও ত ভাল যায়গায় আটক ক'রে রেখেছে মাত্র !

স্ত্রী কৃত্রিম রোষভরে বলিলেন,—যাও, তোমার সব তাতেই ই'য়ে—

'ইয়ে'টা কি, তাহা শুনিবার পূর্ব্বেই পিতা পুত্রকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রশান্ত চোখ ফিরাইয়া দেখে, শঙ্খ-চিল আপন মনে নীড়-রচনায় রত—আকাশটুকু অস্তমান তপনের লোহিতালোকে রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে

রমলা আসিয়া জানাইল,—আমাদের ক্লাবে আজ কি ঠিক হ'ল, জানো ?

প্রশান্ত বলিল,—কি ? তা জান্‌বো কি ক'রে ? গণনা-শক্তি ত নেই আমার।

—তা বটে, ওটা স্মরণ ছিল না ; তবে শোনো—ঠিক হ'য়েছে, আমরা কেবল মেয়েদের জন্যেই একটা মাসিক পত্রিকা বের ক'রবো,—তাতে সব 'সেক্সন' থাক্‌বে,—যেমন রান্নাঘর, গৃহস্থালী, ভাঁড়ার ঘর, রোগ-সেবা—

এই সব। গৃহস্থ বধূদের কি কি কর্ত্তব্য তাই বলা হবে, যেমন রান্নাঘর 'সেক্সনে' কোন্ খাদ্য কিরূপে তৈয়েরী ক'রতে হয়, কিসে কত 'ভাইটামিন' থাকে—ইত্যাদি। রোগ-সেবায় থাক্‌বে, কি রোগে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত; আর গৃহস্থালীতে থাক্‌বে আসবাব-পত্র, বিছানা, ঘর-সাজানো, শিল্পকার্য্য—এই সব আলোচনা।

—তুমি কোন্ বিষয়ে লিখ্‌বে?

—আমাকে ত তারা সাধারণ সম্পাদক ক'রেছে, আর রোগ-সেবা 'সেক্সনে' লিখতে ব'লেছে, আমিও রাজি হ'য়েছি, কারণ মেডিকেল সায়ান্সে আমার একটু—কি বলি—'ইনটারেষ্ট' আছে।

প্রশান্ত হাসিয়া ফেলিল।

রমলা প্রশ্ন করিল,—হাস্‌লে যে বড়ো? ভেবেছ—আমি বুঝি লিখ্‌তে পারিনে?

প্রশান্ত আবার একটু হাসিয়া বলিল,—লিখ্‌তে তুমি পারবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই, তবে রোগীর সেবা সম্বন্ধে তোমার যে আগ্রহ, এতে—

রমলা বাধা দিয়া বলিল,—তুমি কি বল্‌তে চাও, তোমাকে আমি অবহেলা করি? তোমার রোগ-শয্যায় আমি সেবা করিনে?

প্রশান্ত জবাব দিল না। তর্কে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না।

রমলা বলিল,—পাছে তোমার সেবার কোন ত্রুটি হয়, এই ভেবেই না আমি ফিরিঙ্গি নার্শের বন্দোবস্ত ক'রেছি—আমি যদি কোন ভুল ক'রে ফেলি। এ সব ত কোন দিন করিনি, জানিও না।

—রোগীর শুশ্রূষায় যা জানা দরকার, সেটা যৎসামান্য; যা লাগে সেটা খুব কঠিন—সেই জন্যই—

—সেটা কি শুনি—

—সেটা দরদ,—দরদটাই রোগীকে বেশী আরোগ্য করে, অষুধ নয়—

রমলা বাহিরের দিকে ক্ষণিক তাকাইয়া-থাকিয়া বলিল,—কি ক'রতে হবে বল, তাই ক'রবো—

প্রশান্ত বলিল,—তুমি যদি সর্ব্বদা কাছে থাকতে, তবে সত্যিই আনন্দ পেতাম,—আমার বিশ্বাস, আমি যদি আনন্দে সময় কাটাতে পারি, তবে রোগটাও তাড়াতাড়ি সেরে যাবে—

রমলা রুষ্ট স্বরে বলিল,—বেশ, এখন থেকে তাই হবে; সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ফেলে-রেখে তোমার এখানেই এসে জগন্নাথ দেবের মত ব'সে থাক্‌বো।

প্রশান্ত আবার একটু হাসিয়া বলিল,—কাজকর্ম্ম ফেলে আসতে হবে কেন? এখানে এসেই ত কাজকর্ম্ম ক'রতে পারবে।

রমলা বলিল,—ডাক্তার বারণ ক'রেছে, সে কথা শুনেছ?—উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রশান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। যে আজ গৃহবধূর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করিতে যাইতেছে, সে কেমন করিয়া তাহার নিজের গৃহকে ভুলিয়া গেল? সে ত স্বামী, তাহার যেমন রমলার সাহচর্য্য এত আনন্দের, রমলার পক্ষে কি স্বামীর সাহচর্য্য আনন্দের নয়? অভাব তাহার কিছুই নাই,—ফিরিঙ্গি নার্শের দেওয়া ঔষধ-পথ্য তাহার কেন ভাল লাগে না! তাহার অন্তরের এই নিঃসঙ্গতাকে রমলা কেন বুঝিতে পারে না?—তাহার শিক্ষা আছে, বুদ্ধি আছে, সবই ত আছে!

আজ রবিবার—

সাম্‌নের ওই বাড়ীটায় আজ উৎসব চলিয়াছে। স্বামী বাজার হইতে মাংস আনিয়াছে,—স্বামি-স্ত্রী দুই জনে মিলিয়া তাহাদের রান্না হইতেছে। স্ত্রী পিঠের উপর ভিজা চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া বঁটিতে কুটনো কুটিতেছেন, আর স্বামী কোমরে গামছা জড়াইয়া রাঁধিবার সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া লইতেছেন। পুত্রটি অদূরে একহাতে নিজের স্খলিত ইজের ধরিয়া ও অপর হস্তে একটা লাঠী লইয়া বিশেষ কি কাজে ব্যাপৃত। পিতা-মাতার দিকে তাহার ফিরিয়া চাহিবারও অবসর নাই।

প্রশান্ত ভাবে—মাংস খাওয়াটা এই দরিদ্র দম্পতির বিলাস। নিত্য মাংস কিনিবার সামর্থ্য নাই, তাই আজ এই দুর্লভ মাংসটুকুকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের অন্তর উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। কত অল্পে তাহারা সন্তুষ্ট! প্রশান্ত লুব্ধ-নেত্রে তাহাই দেখে—

তোলা-উনুন আজ বাহিরে আসিয়াছে, ছোট্ট একটা জলচৌকি আমদানী করা হইয়াছে—বসিবার জন্য। স্ত্রী কুটনো কুটিয়া বাটনা বাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বামী সদম্ভে বলিলেন,—কি ঠুক-ঠুক ক'রে বাটনা বাটচো? ও কি সন্ধ্যার আগে শেষ করতে পারবে? দাও, আমার হাতে।

স্ত্রী বলিলেন,—তুমি পারবে না গো! যার যে কাজ! তুমি মাংস মাখো—

স্বামী বলিলেন—না, পারবো না! কি যে বলো! নোড়ার দুই ডলনে সব বেটে শেষ করে দিচ্ছি, দেখ—

স্বামী শিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বীরবিক্রমে বাটনা বাটিতে লাগিয়া গেলেন; দেখিতে দেখিতে নোড়াটা হাত ফস্‌কাইয়া শিল হইতে তিন হাত দূরে আশ্রয় গ্রহণ করিল—

স্ত্রী বলিলেন,—কেমন হ'য়েছে? যার কম্ম তারে সাজে—

স্বামীর হাতেও সম্ভবতঃ একটু বেদনা লাগিয়াছে; নিজের পৌরুষ অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি সেটা গোপন করিতে চান—কিন্তু স্ত্রী মুহূর্ত্তে তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

এই সব দেখিয়া প্রশান্ত আপন মনেই হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নার্শ অষুধ দিতে আসিয়া প্রশ্ন করিল,—হাসছেন যে?

প্রশান্ত ইংরেজি ভাষায় জবাব দিল,—ওরা কি সুখী! ওদের কাণ্ড দেখে হাস্‌ছি।

নার্শ কৃপা-মিশ্রিত স্বরে বলিল,—ও:, তাই!

ঔষধ সেবনান্তে প্রশান্ত আবার দেখে,—কড়াইতে তৈল দেওয়া হইয়াছে, তৈলের উষ্ণতা মস্‌লা দেওয়ার উপযুক্ত হইয়াছে কি না, এই লইয়া উভয়ের বচসা চলিতেছে। অকস্মাৎ বিচক্ষণ পুত্র সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়া তপ্ত তৈলের কটাহে কি একটা জিনিস ছাড়িয়া দিয়াছে! কটাহের তৈল ছিট্‌কাইয়া গায়ে পড়িবার ভয়ে স্বামী এক লম্ফে পলায়নোন্মুখ!

প্রশান্ত ভাবে—দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতায় এই দম্পতির অন্তর অন্তর্মুখী আর পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যের মধ্যেও রমলার অন্তর বহির্মুখী, ওদের ওই দরিদ্র গৃহস্থালী ভিন্ন আনন্দের অন্য উপলক্ষ নাই,—এই দারিদ্র্যের আশীর্ব্বাদ, আর রমলা আজ নিজের গৃহধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া অন্যের গৃহের উপদেষ্টা, এই তাহার জীবনে প্রাচুর্য্যের অভিসম্পাত। প্রশান্ত দুঃখিত হয়, তাহার জীবনের দুঃখকে আজ যেন সে হাতে-হাতে ধরিয়া ফেলিয়া তাহার সন্তাপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে!

পরদিন ডাক্তার আসিয়া প্রশান্তের হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া যেন একটু শঙ্কিত হইয়াছেন বোধ হইল।

প্রশান্তও বলিল,—মাঝে-মাঝে আজ যেন প্যাল-পিটেসন্ হ'চ্ছে বলে মনে হয়, ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, তাই দেখলুম। এর আগে ত বেশ ভাল হ'য়ে গিয়েছিল, ভেবেছিলুম, দু'-চার দিনেই সমস্ত সেরে যাবে; কিন্তু হঠাৎ আবার এমন 'টার্ণ' নিল কেন, বুঝ্‌তে পারছি নে!

প্রশান্ত ম্লান হাসিয়া বলিল,—যাই হোক্, এমনি ক'রে একা-একা আর শুয়ে থাক্‌তে পারিনে।

ডাক্তার বাবু প্রশ্ন করিলেন,—মনের সঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্রের,—কেবল হৃদ্‌যন্ত্র কেন, সমস্ত শরীরেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; আপনি মানসিক দিক দিয়ে বেশ আনন্দে না থাকলে রোগ ক্রমশঃ বেড়েই যাবে। মানসিক অশান্তি কিছু ঘটেছে কি? কিছু মনে ক'রবেন না আপনি, চিকিৎসার দিক থেকে এ কথা জান্‌তে চাচ্ছি।

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল,—না, তেমন কিছু ত দেখি না; তবে এই একা-একা তেমন ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, 'চেঞ্জে' গেলে হয় ত ভাল হ'য়ে যেতে পারে।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—তা হ'তে পারে বটে; কিন্তু যাওয়ার পরিশ্রমটা—আচ্ছা, কর্ত্তার সঙ্গে যুক্তি ক'রে যা হয় ক'রবো। আপনি বেশ 'চিয়ারফুল' থাক্‌বেন সব সময়, দুঃখের কথা ভাববেন না, তাতে অসুখ বাড়বে—

প্রশান্ত ডাক্তারের অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিল,—মানুষ কি নিজের চেষ্টায় মনকে সুস্থ করিতে পারে? সুখ-দুঃখ কি নির্ভর করে কেবল নিজেরই উপর?

প্রশান্ত ভাবে,—রোগশয্যায় আনন্দ দানের জন্য যদি কাহারও নিকট তাহাকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হয়, তবে সে

ওই শিশুটি ও তাহার পিতামাতা ; আর যদি কেহ দুঃখ দিয়া থাকে, তবে সে রমলা ; হয় ত সেই জন্যই অসুখ বাড়িয়াছে, কে বলিতে পারে ? ওদের মত তাদের জীবনও এমন নিবিড় আনন্দে ভরিয়া উঠে না কেন ? এই বিপুল প্রাচুর্য্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও কোথা হইতে কি যেন অভাব আসিয়া অহরহ তাহার বুকের ভিতর কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিঁধিতেছে !

কয়েক দিন হইল ঠিক হইয়াছে যে, প্রশান্ত তাহার মাতার সহিত ঘাটশিলা যাইবে। প্রয়োজন হইলে রমলা ও তাহার পিতা পরে যাইবেন।

প্রতিদিনের মতোই প্রশান্ত আজও কর্ম্মনিরত ওই বধূটিকে দেখিতেছিল। অন্যান্য দিনের মত পিঠে ভিজা চুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া আজও সে উনানে আফিসের ভাত চাপাইয়া দিয়াছে। পরশু প্রশান্ত ঘাটশিলায় যাত্রা করিবে—

রমলা একটু ব্যস্ততার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল,—তুমি না কি পরশু ঘাটশিলায় চ'লে যাচ্ছো ?

প্রশান্ত ম্লান হাসিয়া বলিল,—কেন, তুমি কি তা জানো না ?

—আমাকে জানাবার প্রয়োজন তোমার হয়নি ; আমি ত তোমাদের কাছে পর—আমাকে বলবে কেন ? —কণ্ঠস্বর শ্লেষ ও অভিমানবিজড়িত।

—আমার কথা যদি বল, আমি রোগী, আর তোমার সঙ্গে কদাচিৎ দুই-একবার যা দেখা হয়, তার মাঝে এ প্রসঙ্গ ওঠেনি। তবে তুমি এ বাড়ীর বৌ, আর তোমার স্বামীরই অসুখ ; এ ক্ষেত্রে যদি তুমি তার চেঞ্জে যাওয়ার সংবাদ না পেয়ে থাকো, তবে সে জন্যে তোমাকেই দোষ দিতে হয়—

রমলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—দোষ আমার—এ কথা স্বীকার ক'রতেই হবে, যেহেতু তোমার ঘরে এসে দিবারাত্রি পাহারায় থাক্‌তে পারিনে। কদাচিৎ আমি দেখতে আসি—সেটাও আমারই দোষ। সে যাই হোক্‌, তুমি সব জেনে-শুনেই ত বিয়ে ক'রেছিলে ; এখন বিদায় দিলে তোমারই···

রমলা কথা শেষ না করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

প্রশান্ত বলিল,—এ জগতে সেই বেশী দুঃখী, যে বেশী ভালবাসে,—যারা ভালবাসে না, তাদের দুঃখ আস্বাদন ক'রবার সুযোগই নেই।

—তুমি কি ব'লতে চাও—আমি তোমায় ভালবাসি নে ?

—না, তা ব'লতে চাই নে।—প্রশান্ত মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া এ কথা বলিল।

—তবে এ কথা তোমার মনে হয় কেন ?

—তোমার ভালবাসার আদর্শের সঙ্গে আমার আদর্শের তফাৎ আছে, সম্ভবতঃ সেই জন্যেই আমি দুঃখ পাই ; এ জন্যে আমি কোন দিনই তোমাকে অপরাধী করিনি। যাক্‌ সে কথা, তোমাদের সেই কাগজ ক'বে বেরুচ্ছে ?

রমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—বেরুবে এক হপ্তা দেড় হপ্তার মধ্যেই, তার জন্যে যদি আমি কাজ করে থাকি, তবে সেইটাই কি অপরাধ হ'য়েছে,—শিক্ষিত জীবনের গণ্ডী যে আপনা-হ'তেই বৃহত্তর হ'য়ে যায়, এ কথা ত তুমি জানো—

—জানি এবং সেই জন্যই ত কোনও দিন তোমাকে বাধা দেই নি,—তা' ছাড়া, আমার অভাবও ত কিছু নেই।

প্রশান্ত অকারণেই একবার বাহিরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

শঙ্খচিলের নীড় রচনাকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, ডালে বসিয়া সে চীৎকার করিতেছে ; হয় ত তাহার সঙ্গীকে ডাকিতেছে। ও-বাড়ীর সেই দুষ্টু ছেলেটি আবার বালতি-ব্যূহে প্রবেশ করিয়া জল ছিটাইতেছে, শীঘ্রই কাঁদিয়া উঠিবে। কিন্তু আজ ঘটনা বিপরীত ;—বালতিশুদ্ধ অভিমন্যু ধরাশায়ী হইয়া চিৎকার সুরু করিয়াছে—মা আসিয়া তাহাকে একটা চড় মারিতেই বিদ্রোহী শিশু মাতাকে আঁচড়াইয়া-কামড়াইয়া চুল টানিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল। গামছা-স্কন্ধে পিতা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে কহিলেন, "হে ভার্গব, কর বধ জননীরে আজ, পিতৃআজ্ঞা অলঙ্ঘ্য তোমার !"

প্রশান্ত ও রমলা উভয়েই হাসিয়া উঠিল। প্রশান্ত বলিল,—আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ, রোগশয্যায় দিনগুলিকে ওরা খানিকটা আনন্দময় ক'রে রেখেছে—

রমলা রুষ্ট স্বরে জবাব দিল,—তুমি বার-বার ঠেস

দিয়ে ওই একটি কথাই ব'লছো কেন? তুমি কি মনে কর, আমার শিক্ষা-দীক্ষা, বন্ধু-বান্ধব, সুখ-দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার সাম্‌নে বসে থাক্‌লেই ভালবাসার চরম দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ত? তোমার ভালবাসার কনসেপ্‌সন্‌ যদি তাই হয়—তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাস্‌তে পারিনি—

প্রশান্ত আবার একটু হাসিয়া বলিল,—সে কথা ত আমি বলিনি।

—মেয়েরা আজ শিক্ষিত হয়ে যদি নিজেদের সুখ-দুঃখ আনন্দকে চিনেই নিয়ে থাকে, তবে তাতে তাদের অপরাধ কিছু হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। মূক পশুর মত ঘরের কোণে সে বন্দী হ'য়ে যদি বাস ক'রতে না পারে, তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না—

প্রশান্ত প্রশান্ত স্বরেই বলিল,—নিজের সুখ-দুঃখ চিনে নেওয়াটাই চরম শিক্ষা নয়; অন্যের জন্যে নিজের সুখ, আনন্দকে ত্যাগ করাটাই শিক্ষা, তাই আজ মনে হয়, তোমাদের শিক্ষাটা অপচয়ই হ'য়ে গেছে—

রমলা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—তোমার এই মন নিয়ে শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে ক'রে তুমি ভাল করনি, তোমাকে এ-দুঃখ পেতেই হবে। তুমি যার কাছে কৃতজ্ঞ, তার মতো মেয়ে বিয়ে ক'রলে সুখী হ'তে পারতে—

রমলা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল। প্রশান্ত চাহিয়া দেখিল মাত্র, ডাকিয়া ফিরাইতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল।

পরদিন প্রশান্তের অবস্থা আর একটু খারাপ হইল। ডাক্তার বাবু অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে ঘাটশিলা যাইবারই অনুমতি দিয়া গেলেন,—বিশেষতঃ রোগী নিজেই যখন বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইতে কৃতসঙ্কল্প।

যথাসময়ে সকলেই হাওড়া-ষ্টেশনে সমবেত হইলেন। পিতা ডাক্তার, নার্শ ও প্রশান্তের মাতাকে যথাবিহিত উপদেশ দিলেন। নিত্য পত্র দিতে এবং জটিল কিছু ঘটিলেই টেলিগ্রাম করিতে বার-বার বলিয়া দিলেন।

ট্রেণ ছাড়িবার সময়-জ্ঞাপন করিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইল।

রমলা বাহিরে প্রশান্তের সাম্‌নের জানালাটায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রশান্ত বলিল,—তোমার কাগজ বেরুলে আমাকে একখানা পাঠিয়ে দিও—

রমলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে যথা-সময়েই তাহা পাঠাইবে।

প্রশান্ত প্রশ্ন করিল,—তোমার কি যাওয়ার ইচ্ছা ছিল?

—কাগজ বেরুলেই আমি যাবো,—একটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি কি না!

প্রশান্ত ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিল,—জানি না, আর ফিরে আস্‌বো কি না, তবে মনে রেখো—

তীব্র বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল। রমলা প্রশান্তের কথার শেষটুকু শুনিতে পায় নাই। চলন্ত গাড়ীর দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার বুকের মাঝে কাঁপিয়া উঠিল—প্রশান্ত সত্যই যদি আর না ফেরে! তবে তার শিক্ষা-দীক্ষা, সমগ্র জীবনটাই ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে!

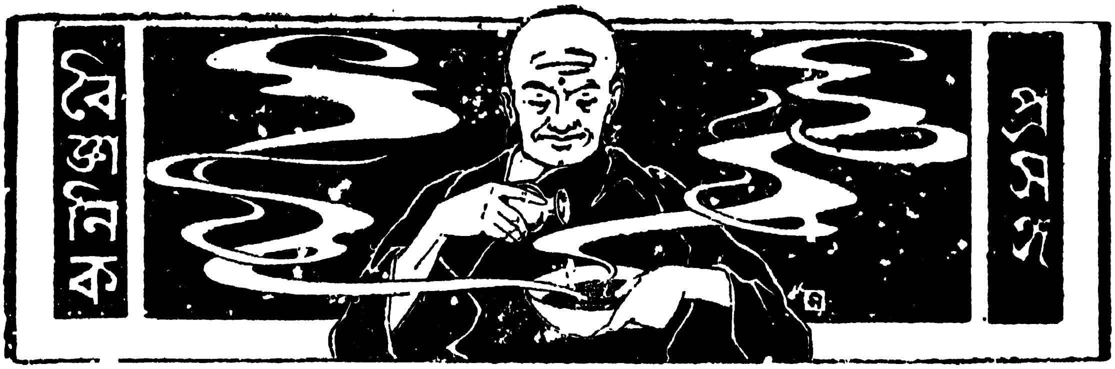
অজানিত আশঙ্কায় তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। প্রশান্তের পিতা বলিলেন,—তুমি যাবে, মা?

রমলা চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল,—আমি যাবো বাবা—আমি যাবো—

শ্রীপুণ্যশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাসনা

বাসনার স্রোতে ভাসা তাই মর্ত্ত্যলোক,
বাসনায় ডুবে মরা তাহাই নরক।
বাসনা যেখানে শুষ্ক, পায় যেথা ক্ষয়।
সেইখানে স্বরগের সূত্রপাত হয়।



সচক্র শনি গ্রহ

(বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ)

সৌরজগতের গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি বৃহত্তম; কিন্তু শনি গ্রহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে যাঁহারা চক্রবেষ্টিত শনি গ্রহকে অন্ধকারের ভিতর লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার সেই শোভায় নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়াছেন; সেই শোভা চন্দ্রেরই ন্যায় মনোহর।

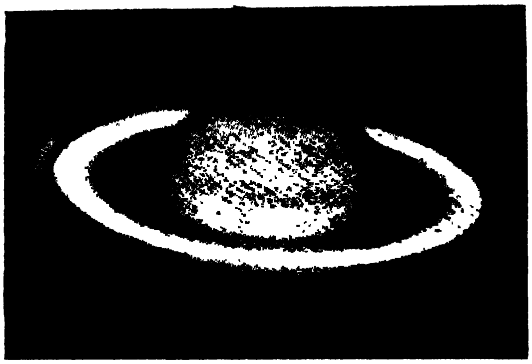
অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল সৌরগ্রহের বিষয় পৃথিবীর লোকের সুবিদিত, তাহাদের মধ্যে শনি গ্রহই সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো নামক যে তিনটি গ্রহ আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত পৃথিবী হইতে শনি গ্রহেরই দূরত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সূর্য্য হইতে শনির দূরত্বের পরিমাণ মোটামুটি ৮৮ কোটি ৫৯ লক্ষ মাইল। সূর্য্যকে নয় ফুট ব্যাসের একটি গোলক বলিয়া ধরিলে তাহার তুলনায় সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ৩২২ গজ, এবং শনি গ্রহের দূরত্ব ৩০৬৭ গজ বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। এত বেশী দূরে আছে বলিয়াই পৃথিবী হইতে উহা একটি নক্ষত্রের মতো দেখায়; কিন্তু উহা কোন দিন পৃথিবী হইতে সাড়ে ৭৪ কোটি মাইল অপেক্ষা অধিক নিকটে আসে না। আবার যখন পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে গিয়া পড়ে, তখন সেই দূরত্বের পরিমাণ ১০০ কোটি মাইলেরও অধিক হইয়া থাকে। শনি গ্রহ আকাশে ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিয়া এক রাশিতেই দুই তিন বৎসর অবস্থিতি করে; এবং সাড়ে ২৯ বৎসর সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া লইয়া থাকে। গগনমার্গের এক ডিগ্রী অতিক্রম করিতে শনি গ্রহের এক মাস অতিবাহিত হয়।

শনি গ্রহ আয়তনে পৃথিবীর ৭৩৪ গুণ বড়; কিন্তু উহার ভার এই অনুপাতে অধিক নহে। ঘনত্বের স্বল্পতা বশতঃ শনির ভার পৃথিবীর ভারের ৯৫ গুণ মাত্র। এই গ্রহ জল অপেক্ষাও লঘুভার। সৌরগ্রহসমূহ মধ্যে কেবল শনিই এইরূপ লঘুভার। অন্য গ্রহগুলি সম আয়তনের জল অপেক্ষা গুরুভার। জলের ঘনত্ব 'এক' ধরিলে তুলনায় শনির ঘনত্ব দশমিক বিন্দু সাত। সহজ কথায় বৃহস্পতির ভার জল অপেক্ষা যত অধিক, আনুপাতিক হিসাবে শনির লঘুত্ব জল অপেক্ষা প্রায় ততখানিই কম! স্মরণ থাকা উচিত যে, পৃথিবী জল অপেক্ষা সাড়ে পাঁচ গুণ ভারী।

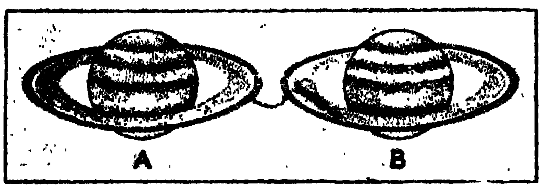
অতীব বিশাল কোন জলাশয়ে যদি পৃথিবী ও শনি এই উভয় গ্রহকে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী কোন ভারী ধাতু-পিণ্ডের ন্যায় উহার ভিতর ডুবিয়া যাইবে, এবং শনি গ্রহ শুষ্ক কাষ্ঠ-খণ্ডবৎ সেই জলে ভাসমান থাকিবে।

বৃহস্পতি গ্রহের সহিত কোন কোন বিষয়ে শনির সাদৃশ্য আছে। বৃহস্পতির ন্যায় উহা মেরুর অভিমুখে বিশেষ রকম চেপ্টা, এবং এই বিষয়ে শনি গ্রহ বৃহস্পতিকেও হারাইয়া দিয়াছে। বিষুবরেখার উপর মাপ করিলে শনি গ্রহের ব্যাস ৭৫ হাজার মাইল; কিন্তু মেরুর দিকে উহার ব্যাস ৬৭ হাজার মাইল। শনি স্বকীয় মেরুদণ্ডের উপর বৃহস্পতির ন্যায় অতি দ্রুতবেগে আবর্ত্তিত হইতেছে। দ্রুত আবর্ত্তনই উহার আকার গোল না হইবার একটি কারণ। শনির পৃষ্ঠদেশে যে সকল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি বৃহস্পতি-দেহের কলঙ্ক ও আবেষ্টনীর ন্যায় সুস্পষ্ট নহে। তবে বিষুবরেখার উপর শনি গ্রহের উজ্জ্বল আবেষ্টনী আছে; এবং মেরুর দিকেও কৃষ্ণবর্ণ স্থান সমূহ লক্ষিত হয়। স্পষ্ট কলঙ্ক শনির দেহে কদাচিৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে উহার দেহে যে বিশাল কলঙ্ক লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার দৈর্ঘ্য নয় হাজার মাইল, এবং প্রস্থ সাড়ে চার হাজার মাইল। অন্যান্য জ্যোতিঃপিণ্ডের ন্যায় কলঙ্কের গতি হইতে শনির আবর্ত্তনবেগ নিরূপণ করা যায়। কলঙ্কের গতি নিরূপিত হইবার পূর্ব্বে মেরুর দিক চেপ্টা দেখিয়াই শনি গ্রহের আবর্ত্তনবেগ খুবই বেশী বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে হার্শেল স্থির করেন—ঐ বেগের পরিমাণ ১০ ঘণ্টা ১৬ মিনিট। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটা উজ্জ্বল কলঙ্ক শনির মধ্যরেখায় হঠাৎ আবির্ভূত হয়। ওয়াসিংটনের মানমন্দির হইতে আসাফ হল এক মাসেরও অধিককাল যাবৎ উহা লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে, শনি গ্রহের একবার আবর্ত্তনে ১০ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড সময় লাগে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বার্ণার্ড বিষুবরেখার বাহিরে ৩৬ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে উহার আর একটি কলঙ্ক দেখিতে পান। এই কলঙ্কের আবর্ত্তনকাল ১০ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। উভয় কলঙ্কই কয়েক মাসের মধ্যে অন্তর্হিত হয়। কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে, বৃহস্পতির ন্যায় শনির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রকার গতিবেগ উহার পৃষ্ঠদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বর্ত্তমান, এবং ঐ বেগ বিষুবরেখার উপরেই অধিক; স্থূলতঃ বলা যায়, সওয়া দশ ঘণ্টার মধ্যেই শনির দিবারাত্রি শেষ হয়।

ইহার অর্দ্ধেক সময় দিবাভাগ বলিয়া ধরিয়া লইলে বলিতে হয়, পৃথিবীর হিসাবে শনি গ্রহের দিন অত্যন্ত অল্পকাল স্থায়ী। চিত্রে শনির পৃষ্ঠদেশের তুইটি আবেষ্টনীর মধ্যে এক কলঙ্ক চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। দশ মিনিট সময়ের মধ্যে কলঙ্কবিশেষ যে ভাবে স্থান পরিবর্ত্তন করে, পাশাপাশি তুইটি চিত্র লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।



সচক্র শনি গ্রহ



শনির উপরের কলঙ্ক

শনি গ্রহের কঠিন দেহ আমরা দেখিতে পাই না; উহার মেঘাবরণ বা বাষ্পীয় পদার্থই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। শনির দেহ প্রধানত: বাষ্পীয় পদার্থে নির্ম্মিত, এবং তাহার অধিকাংশ বস্তু কেন্দ্রদেশে অবস্থিত। অত্যন্ত প্রচণ্ড বাত্যা শনির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর বাতাস সূর্য্যের তেজ হইতে তাহার গতিশক্তি সঞ্চয় করে; বৃহস্পতির তুলনায় শনি অধিক শীতল। রেডিওমেট্রিক পরীক্ষাতেও ইহা প্রতিপন্ন হয়। এ সকল ক্ষেত্রে তাপমাত্রা নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব না হইলেও শনির পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা বিযুক্ত ২০০ ডিগ্রী ফার্ণহাইট, অর্থাৎ ফার্ণহাইট স্কেলে শূন্য হইতে নীচের দিকে ২০০ ডিগ্রীর কাছাকাছি ধরিয়া লইলে বেশী ভুল না হইবারই কথা। কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শনির উপরিভাগের ক্রিয়াশীলতার উৎপত্তির হেতু সূর্য্য হইতে সংগৃহীত তাপ নহে। শনির উপরিভাগে যে কলঙ্ক লক্ষিত হয়, তাহা মেঘ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

স্পেকট্রাম বা রশ্মি-বিশ্লেষণের পরীক্ষায় শনির গঠনোপাদানের আভাস পাওয়া যায়। ঐ রশ্মিলেখা বাহির সৌর-জগতের গ্রহগুলির অর্থাৎ বৃহস্পতি, নেপচুনাদির স্পেকট্রামের ন্যায়। দেখা যায়, শনির এমোনিয়া-রেখা অতীব ক্ষীণ। শৈত্যের প্রাবল্য হেতু উহা জমাট-বাঁধা অবস্থায় থাকা অসম্ভব নহে। মিথেন বা মার্শগ্যাস শনি গ্রহে প্রচুর পরিমাণে আছে, এরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে। কার্ব্বণ ডাই-অক্সাইড বা কার্ব্বণিক এসিড গ্যাসের যে রেখা শুক্র গ্রহে পরিলক্ষিত হয়, শনির 'স্পেকট্রামে' তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। অক্সিজেনেরও কোন সন্ধান শনি গ্রহের রশ্মিরেখায় পাওয়া যায় না। মার্শ-গ্যাসের ন্যায় দাহ্য পদার্থের সহিত অক্সিজেনের অবস্থিতি সম্ভব নহে। আর্গন, নাইট্রোজেন, নিয়ন, হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন শনি গ্রহে যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও স্পেকট্রাম-পরীক্ষায় ঐ সকল গ্যাসের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না। প্রচুর হাইড্রোজেন ঐ গ্রহে বর্ত্তমান আছে বলিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক মত প্রকাশ করা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা লঘু এই গ্যাস সূর্য্যের দেহে প্রচুর পরিমাণে আছে। শনির আকর্ষণ-শক্তি এরূপ যে, উহাও হাইড্রোজেন গ্যাসকে আয়ত্তে রাখিতে সমর্থ।

শনির মধ্যরেখা ঐ গ্রহের কক্ষের সমতলের সহিত ২৭ ডিগ্রী কোণে অবস্থিত। এই কারণে শনি-জগতে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। প্রতি ঋতু সাত বৎসর উহাতে প্রভাব বিস্তার করে।

গ্রহজগতে একমাত্র শনিরই উজ্জ্বল আলোক-বেষ্টনী আছে। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম শনির চক্র লক্ষ্য করেন। তাঁহার যন্ত্র তেমন শক্তিশালী ছিল না, এজন্য শনির তুই পাশে তুইটি বস্তু-পিণ্ড আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মে। কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি দ্বিতীয়বার ঐ গ্রহের পরীক্ষা করেন, চক্রটি তখন লক্ষ্যপথের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় তিনি তাহা দেখিতে পান নাই, এজন্য মনে করেন—পূর্ব্বে তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐ চক্র পুনর্ব্বার দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসিয়া পড়িলে বহু পর্য্যবেক্ষক উহা লক্ষ্য করিলেও কেহই প্রকৃত রহস্য নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হুগীন্স ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরও কিছু দিন পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার উদ্দেশ্যে হুগীন্স তাঁহার আবিষ্কারের তথ্য স্পষ্ট ভাবে প্রকাশের পরিবর্ত্তে প্রাচীন প্রণালীতে অক্ষর সমূহের বিকৃত বিন্যাসের দ্বারা কৌশলে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সঙ্কেতে তিনি এইরূপ প্রকাশ করেন,—সূক্ষ্ম গঠনের এক চক্রে শনি গ্রহ পরিবেষ্টিত। চক্রটি শনি গ্রহকে কোন স্থানেই স্পর্শ করে নাই। ক্রান্তি-বৃত্তের সমতলে অবস্থিত না হইয়া উহা তাহার সহিত কোণ উৎপাদন করিয়াছে।

দূরবীক্ষণের উন্নতি ও শক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইলে, শনির চক্র যে পাশাপাশি বিরাজমান তিনটি পৃথক সমকেন্দ্রীয় চক্রের সমষ্টি, ইহা স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হইল। ইহাও লক্ষিত হইল যে, বাহিরের দিকের তুই চক্রের ব্যবধান তুই হাজার মাইল। আবিষ্কারকের নামানুসারে চক্রের এই বিভাগের নাম হইল ক্যাসিনির বিভাগ। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে চক্র তুইটির মধ্যে ফাঁক দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ভিতরের দিকের তৃতীয় চক্রটি শনির দেহ হইতে ৬ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। মধ্যের চক্রই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। তৃতীয় চক্রটি যেন নিষ্প্রভ। বাহিরের চক্র ১০ হাজার মাইল প্রশস্ত, মধ্য চক্র ১৬।১৭ হাজার মাইল, এবং তৃতীয় চক্র ১১ হাজার মাইল। উহাদের বহির্দ্দিকের ব্যাস যথাক্রমে ১ লক্ষ ৭০ হাজার, ১ লক্ষ ৪৫ হাজার, এবং ১ লক্ষ ১৩ হাজার মাইল। ভিতরের চক্রটি অনেক বিলম্বে—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চক্রগুলি ক্ষীণ এব

কোনটিরই উচ্চতা ৫০।৬০ মাইলের অধিক নহে। সেই জন্ম সকল সময়ে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। শনি গ্রহের বিশেষ অবস্থান-বশতঃই কেবল পৃথিবী হইতে উহা নয়নগোচর হওয়া সম্ভব। প্রতি ১৫ বৎসরে শনির চক্রের সমতল পৃথিবীর সমতলের মধ্য দিয়া চলিয়া থাকে। এই জন্ম তখন পাশের দিক হইতে উহাকে লক্ষ্য করিতে হয়। চক্রটি সেই সময়ে প্রায় অদৃশ্য হইয়া ৪০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণে একটি আলোক-রেখা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একবার অদৃশ্য হইবার পর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উহা পূর্ণ আকারে আবির্ভূত হইয়াছিল, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে শনির চক্রের সুসম্পূর্ণ পরিস্ফুট মূর্ত্তি পৃথিবী হইতে নয়ন-গোচর হইবে। চক্রসমষ্টি মুক্ত অবস্থায় থাকিলে উহাদের উজ্জ্বল পৃষ্ঠে শনি গ্রহের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পতিত হয়। এই ছায়ার উৎপত্তি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শনি গ্রহের গোলাটে হরিদ্রাভা উহার পৃষ্ঠে প্রতিফলিত সূর্য্যালোক মাত্র; শনি নিজের আলোকে উজ্জ্বল নহে।

গঠন ব্যাপারে সৌরজগতে শনির চক্র অতুলনীয়। ঐ চক্র নিরবচ্ছিন্ন কঠিন বা তরল পদার্থে গঠিত নহে, অসংখ্য বস্তুকণায় সৃষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্যাসিনি এই মত প্রকাশ করেন। চক্রটি গোটা-বস্তু হইলে শনির দেহের উপর ভাঙ্গিয়া না পড়িয়া এক অবস্থায় স্থায়িভাবে বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা সম্ভব নহে। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক লাপলাস গবেষণার দ্বারা এ কথা সপ্রমাণ করিলেও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্যাসিনির মত গৃহীত হয় নাই। ঐ বৎসর ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল গভীর গবেষণার ফলে প্রতিপন্ন করেন যে, শনির চক্র বস্তুপুঞ্জে সংগঠিত হইলেই উহা স্থায়ী হইবে। অধ্যাপক কীলার ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উহার এই প্রকার গঠনই যে সত্য, স্পেক্‌ট্রস্কোপের পরীক্ষায় সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। আলোক-মূল কাছে আসিতেছে কি দূরে সরিয়া যাইতেছে, স্পেক্‌ট্রস্কোপে শুধু ইহাই যে জানিতে পারা যায় এমন নহে, আপেক্ষিক গতিও উহার সাহায্যে নিরূপণ করা সম্ভব। শনির প্রত্যেক চক্রের ক্ষেত্রে কীলার দেখাইলেন, উহার ভিতরের অংশ বাহিরের ভাগ অপেক্ষা বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। গোটা বস্তুর ক্ষেত্রে বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হইবার কথা। শনির চক্রের ভিতরের দিকের বস্তুকণা সমূহের বেগ জানা গিয়াছে—সেকেণ্ডে ১৫ মাইল এবং বহির্ভাগের কণিকা সকলের বেগ ১১ মাইল। কোন দূরবীক্ষণেরই এ শক্তি নাই যে, শনিচক্রের বস্তুপুঞ্জের সূর্য্যালোক-দীপ্ত এক-একটি কণা পৃথকভাবে দেখাইবে। তবে তৃতীয় চক্রের মধ্য দিয়া যে শনি গ্রহ পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে স্পেক্‌ট্রস্কোপের পরীক্ষার তত্ত্ব সমর্থিত হয়। অধুনা-গৃহীত কয়েকটা ফটোগ্রাফে বাহিরের চক্রের মধ্য দিয়াও শনি গ্রহ দেখা যাইতেছে।

শনির চক্র উহার কোন উপগ্রহ ভাঙ্গিয়া গিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। যে উপগ্রহ এক দিন শনির চারিপাশে চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইত, কোন সময়ে তাহা ঐ অতিকায় গ্রহের অতি নিকটে আসিয়া পড়ায় তাহার প্রবল আকর্ষণে ক্রমে চূর্ণ হইয়া যায়। শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত উপগ্রহটিই এখন শনিকে চক্রাকারে পরিবেষ্টিত করিয়া গগন-পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। এখনও পর্য্যন্ত অন্য কোন সৌরগ্রহের শনির ন্যায় বেষ্টনী গড়িয়া উঠে নাই বটে, তবে ভবিষ্যতে যে সেরূপ চক্র গঠিত হইবে না, এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই। পৃথিবী এবং আরও দুই-একটি গ্রহের উপগ্রহ ভাঙ্গিয়া চক্র উৎপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

শনির নয়টি উপগ্রহের কথা সুবিদিত। নবম উপগ্রহ আবিষ্কার করিবার পর পিকারিং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শনির দশম উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্প্রতি নর্দম কর্ত্তৃক এই উপগ্রহ-টির অস্তিত্বের বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। শনির উপগ্রহ দশটির নাম, —মিমাস, এন্‌সিলেডাস্, টেথিস্, ডায়োন, রী, টাইটান, হাইপারিয়ন, ইপেটাস, ফী ও থেমীস; সর্ব্বাধিক দূরবর্ত্তী নবম উপগ্রহটি শনি হইতে ৮০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। কাজেই শনি-জগতের ব্যাস ৮০ লক্ষ মাইল ধরিতে হইবে। দেখা যাইতেছে, পার্থিব জগতের তুলনায় শনির জগৎ অতি বৃহৎ; চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পার্থিব জগতের ব্যাস মাত্র ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল। শনির উপগ্রহগুলির ব্যাস ২০০।৩০০ মাইল হইবে। কিন্তু সাধারণ দূরবীক্ষণে উহাদের সকলগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। শনি হইতে বৃহত্তম টাইটানের দূরত্ব ৭ লক্ষ ৭১ হাজার মাইল, সকলের ক্ষুদ্র উপগ্রহটি দূরত্বে ১ লক্ষ ১৭ হাজার মাইল। শনির নিকটবর্ত্তী পাঁচটি উপগ্রহ এক শ্রেণীতে পড়ে। উহারা সকলেই শনির চক্রের সহিত এক সমতলে ভ্রমণ করে। দূরের উপগ্রহগুলির স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য আছে। টাইটান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। হাইপারিয়ন এত ক্ষুদ্র যে, তাহা প্রায় অদৃশ্য। ইপেটাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, শনির পূর্ব্বপ্রান্তে থাকিলে উহাকে যেরূপ উজ্জ্বল দেখায়, পূর্ব্বভাগে তাহা অপেক্ষা তিন-চার গুণ বেশী উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। উহার ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়—চন্দ্র যেমন সকল সময়ে পৃথিবীর দিকে এক পিঠ ফিরাইয়া রাখে, ইপেটাসও তেমনি সর্ব্বদা শনির দিকে এক-অর্দ্ধাংশ ফিরাইয়া বিদ্যমান থাকে। ঐ উপগ্রহের অর্দ্ধেক ভাগের সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিবার শক্তি অধিক। শনির পশ্চিম দিকে থাকিলে সেই অংশটা আমরা দেখিতে পাই, এ জন্য উহা অধিক উজ্জ্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। টাইটান ষোল দিনে, এবং রী সাড়ে চার দিনে শনিকে একবার প্রদক্ষিণ করে। নবম উপগ্রহ ফী অপর সকল উপগ্রহ যে দিকে ঘুরিতেছে, তাহার বিপরীত মুখে শনি গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এইরূপ বিপরীত গতি সৌরজগতে বিরল। শনির চারি দিকে নবম উপগ্রহের একবার ঘুরিবার জন্য ১৮ মাস সময়ের প্রয়োজন। এই জন্যই মনে হয়, দেড় বৎসরে একবার মাত্র উহা শনিজগতে পূর্ণচন্দ্রের শোভা বিকাশ করে। মঙ্গল গ্রহের ক্ষুদ্র উপগ্রহটি এক রাত্রিতে দেড় বার পূর্ণচন্দ্রের আকার ধারণ করে; সে কথা স্মরণ করিলে উভয়ের মধ্যে বৈষম্য কত অধিক, তাহা অনুভব করা কঠিন নহে।

শনি গ্রহ হইতে পৃথিবীকে কিরূপ দেখা যায়?—এ প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। তুলনায় পৃথিবী আকারে অনেক ছোট বলিয়া শনি গ্রহকে পৃথিবী হইতে যেরূপ আকারবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়, শনির নিকট পৃথিবী তাহা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রাকার প্রতীয়মান হইবে। অর্থাৎ প্রায় ৮২ ভাগের এক ভাগ বোধ হইবে। সূর্য্য হইতে বহু দূরে আছে বলিয়া ঐ গ্রহ হইতে সূর্য্যও ক্ষুদ্রাকার লক্ষিত হইবে। পৃথিবীর অতি নিকটে না থাকিলে শনি হইতে আমাদের আকাশের চন্দ্রকেও খালি চোখে দেখা যাইত।

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল (এম-এস-সি)।



গুণবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য'

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

(১০) পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে বধূর পাঠ্য 'প্র মে' ইত্যাদি মন্ত্রটির অর্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে কবিরত্ন মহাশয় গুণবিষ্ণুর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি যাহা ত্রুটি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেরূপ 'ত্রুটি' সায়ণের ব্যাখ্যায় অনেক পাওয়া যায়। সায়ণ শত শত ছান্দস ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিরত্ন মহাশয় এই প্রসঙ্গে সায়ণের নামে যে ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও শিবা ও অরিষ্টা এই দুইটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গ পন্থাঃ পদের বিশেষণ করিতে হইয়াছে।

কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন —"কৃপ্ ধাতু অকর্মক, উহার অর্থ 'করোতু' কিরূপে হইল ?" কৃপ ধাতুর সকর্মক করোত্যর্থে প্রয়োগ লৌকিক সংস্কৃতেও পাওয়া যায়, বৈদিক সংস্কৃতে ত থাকিতেই পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের (৩, ৭, ১৫) "প্রজাপতীনাং স পতিশ্চকৢপে কান্ প্রজাপতীন্" এবং ভট্টিকাব্যের (১১, ১১) "নাকল্পয়ৎ সন্নিধি স্থাণুঃ" ও (১৪, ৮৯) "চকৢপে চাশ্বকুঞ্জরম্" এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জয়মঙ্গল 'অকল্পয়ৎ' পদের প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'কৃতবান্ স্যাৎ'।

গুণবিষ্ণু 'শিবা' অর্থ 'সুখাবহা' লিখিয়াছেন। কবিরত্ন মহাশয় সমালোচনা করিতেছেন—"শিব শব্দের অর্থ কি সুখ ?" শিব শব্দের অর্থ যে সুখ এবং সুখজনক হয়, তাহা সুপ্রসিদ্ধ। কবিরত্ন মহাশয়ের সমালোচনায় (৯) চিহ্নিত বক্তব্যে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত মেদিনীকোষেও শিব শব্দের অর্থ আছে সুখ, ক্ষেম, জল ইত্যাদি। স্বয়ং কবিরত্ন মহাশয়ও ক-পুস্তকে (৬১ পৃঃ) টীকা দিয়াছেন—"শিবাঃ (শিবঃ) সুখকরঃ"। ঋগ্বেদে (১০, ৩৪, ২) 'শিবা সখিভ্য উত মহ্যমাসীৎ' এই মন্ত্রে সায়ণও অর্থ করিয়াছেন—"শিবা সুখকরী"। অথচ গুণবিষ্ণু 'শিবা সুখাবহা' এইরূপ ব্যাখ্যা করায় নিন্দাভাজন হইলেন !

গুণবিষ্ণুর ভাবানুসারে এই মন্ত্রে বধূ পতিগৃহযাত্রাকালে বলিতেছেন, 'পতি আমার পথ করিয়া দিন'। ইহার তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, পতি আমাকে উত্তম পথে লইয়া চলুন। এই প্রকার অর্থ করার জন্য প্রবীণ কবিরত্ন মহাশয় তরল ভাষায় গুণবিষ্ণুকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—"বরের বাড়ী যাতায়াতের কি পথ থাকে না ? তাহাকে কি উড়ো-জাহাজে বিবাহ করিতে যাইতে হয় ? আহা ! সে বেচারাকে বধূ লইয়া বাড়ী যাইবার জন্য কোদাল, কুড়ুল, ঝুড়ি লইয়া পথ প্রস্তুত করিতে যাইতে হইবে।"

এই প্রসঙ্গে যে সকল মন্ত্র পাঠ বিহিত আছে, তাহা লক্ষ্য করিলে কি এরূপ উপহাস করা চলে ? একটি মন্ত্র এইরূপ—"মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী। সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ।" ইহার অর্থ—'পথে দস্যুদল যেন দম্পতীকে না জানিতে পারে। ইহারা সুপথ দিয়া দুর্গম স্থান অতিক্রম করুন। শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক'। পথ দুর্গম হইত বলিয়াই পথে ব্যাঘ্র, তস্কর, শ্মশান, দীর্ঘারণ্য, নির্জন প্রদেশ, গভীর নদী প্রভৃতি শঙ্কাস্থানের উল্লেখ আছে; 'পরিপন্থনাশনী' ঋক্ পাঠের ব্যবস্থা আছে (শাঙ্খায়নগৃহ্যসূত্র, ১, ১৫-১৭; আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র ২৩ ৫-৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

কবিরত্ন মহাশয়, নিজে বিভিন্ন সময় মন্ত্রটির বিভিন্নরূপ অর্থ লিখিয়াছেন। কোন্ অর্থটি তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা তিনিই জানেন। তিনি ভবদেবপদ্ধতির ১ম সংস্করণে (৬১ পৃঃ) মন্ত্রটির একরূপ টীকা করিয়াছিলেন; ২য় সংস্করণে (৮৬ পৃঃ) উহা পরিবর্তন করিয়া অন্যরূপ করিয়াছেন; এবং এখন গুণবিষ্ণুর সমালোচনা করিতে যাইয়া আর এক প্রকার অর্থ দিয়াছেন। প্রথম ব্যাখ্যাতে ছিল 'শিবাঃ' পুংলিঙ্গ বহুবচনান্ত, অথচ 'পন্থাঃ' এই একবচনান্ত পদের বিশেষণ। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে উহা বধূ পদের বিশেষণরূপে শিবা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া গেল। তৃতীয়বারের ব্যাখ্যায় 'শিবা' পদটিকে স্ত্রীলিঙ্গরূপেই 'পন্থাঃ' পদের বিশেষণ করা হইল। 'অরিষ্টা' এত দিন বধূর বিশেষণ ছিল, এবারে উহাকেও পুংলিঙ্গ 'পন্থাঃ' পদের বিশেষণ করা হইয়াছে। এইরূপে কবিরত্ন মহাশয়ের হাতে মন্ত্রটির অন্বয় বারংবার পরিবর্তিত হইয়াছে। তৃতীয় বারের ব্যাখ্যা সায়ণের নামে ছাপা হইয়াছে। এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য কবিরত্ন মহাশয় কোথায় পাইলেন, তাহা বলিলে ভাল হইত।

গৃহ্যসংগ্রহে আছে—"পদা প্রপদ্য পন্থানং পতিযানং জপেদ্বধূঃ"। এখানে পতিযানং পদ দেখিয়া কবিরত্ন মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, গুণবিষ্ণুর 'পতি যা নঃ' পাঠ গৃহ্যসংগ্রহ-বিরুদ্ধ। কিন্তু এরূপ স্থলে 'পতিযান' পদটি মন্ত্রবোধক প্রতীক মাত্র। অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ঐরূপ প্রতীক সৃষ্টি করা হইত। অপোশান, মানস্তোক, শন্নোদেবী ও মধুবাতা ঈদৃশ মন্ত্র-প্রতীক। শন্নোদেব্যা পয়ঃ ক্ষিপ্ত্বা, অপোশানাদনন্তরম্, মানস্তোকেন গায়ত্র্যা, মধুবাতাং তথা জপ্ত্বা ইত্যাদি বচন স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ত্রগুলির প্রকৃত রূপ শন্নো দেবীঃ, অপোঽশান, মা নস্তোকে, মধু বাতাঃ। কবিরত্ন মহাশয় নিজেও 'অভী যু ণঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের প্রতীক করিয়াছেন 'অভীষুণ' (ভবদেবপদ্ধতি ২য় সং ৫৩ পৃঃ)। সুতরাং 'পতিযানং' পদ দেখিয়া বুঝিবার উপায়

নাই—মন্ত্রটির 'পতিযান:' পাঠ না 'পতি যা নঃ' পাঠ গৃহ্যসংগ্রহ-সম্মত।

(১১) এই স্থানে পত্নীর জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র পতি পাঠ করেন। এরূপ স্থলে মীমাংসা শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে কখন কখন অর্থের অসঙ্গতি উপেক্ষা করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ছাগপশু বলির সময়ে মন্ত্রস্থ মেষ পদ পরিবর্তন করিতে হয় না। পাদুকাসহ অনুমরণস্থলেও পত্নীপাঠ্য মন্ত্রে 'সহভর্তৃশরীরেণ' বলিতে হয়। পতি-পত্নী উভয়ে কার্য করিলেও 'পত্নীং সন্নহ্য' মন্ত্র অপরিবর্তিতই থাকে, তাহাতে পতি বাদ পড়িয়া যান।

(১২) কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"দুর্গামোহন বাবু ২য় সংস্করণও দেখিয়াছেন, তথাপি তিনি ১ম সংস্করণের ভুলটি প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হন নাই"। উল্লিখিত ভুলটি ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের প্রথম দিকে পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ অংশ যখন ছাপা হয়, তখন ক-পুস্তকের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানি না। আমি ভূমিকা লেখার সময় ২য় সংস্করণ দেখিয়াছিলাম।

(১৩) এ সম্বন্ধে (খ)-চিহ্নিত উক্তিতে সকল কথা বলিয়াছি।

(১৪ ও ১৫) আমার (৪)-চিহ্নিত উক্তিতে ইহার উত্তর আছে।

(১৬) গুণবিষ্ণুর ভাষ্য যে যে স্থলে আকর গ্রন্থের বিরুদ্ধ, আমি তত্তৎস্থলে টিপ্পনীতে আকর গ্রন্থের পাঠ তুলিয়া লিখিয়াছি—'আকরগ্রন্থে মুদ্রাপিতঃ পাঠঃ'। কবিরত্ন মহাশয় ইহার ভাবার্থ করিয়াছেন যে, আমার মতে আকরগ্রন্থে ছাপা পাঠগুলি সবই ভুল। অকারণ আমার টিপ্পনীর কদর্থ করা হইয়াছে। গ্রন্থের কোন স্থলেই আকরদৃষ্ট পাঠের বিরুদ্ধে কিছু বলি নাই। গুণবিষ্ণু অভ্রান্ত ঋষি ছিলেন বলিয়া মনে করি নাই। ভূমিকায় (p. iii) বলিয়াছিলাম—"...there are still some Mantras, the readings of which do not agree with those found in available Vedic texts...I have however pointed out the better readings either in the foot-notes or in the Akarasanketika."

কবিরত্ন মহাশয় সংখ্যাচিহ্ন না দিয়া গুণবিষ্ণু-টীকার কতকগুলি অপপাঠের তালিকা দিয়াছেন। উহার চারি স্থলে মাত্র তাঁহার 'বক্তব্য' প্রকাশ করিয়াছেন। আমি উক্ত চারিটি স্থলেরই আলোচনা করিব। আমার বক্তব্যগুলি সংখ্যাচিহ্ন দিয়াই বলিব, কারণ, ভবিষ্যতে প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক হইলে উহাতে উল্লেখ করার পক্ষে সুবিধা হইবে।

(১৭) দ্বিজগণের পক্ষে প্রতিদিন স্বাধ্যায় বা ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। ব্রহ্মযজ্ঞে চারি বেদ হইতে অন্ততঃ প্রথম চারিটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। 'শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে' ইত্যাদি অথর্ববেদের আদি মন্ত্র। গুণবিষ্ণু বলিয়াছেন—"অথর্ববেদাদিমন্ত্রোঽয়ং পিপ্পলাদদৃষ্টঃ বরুণদৈবতঃ"। কবিরত্ন মহাশয়ের বক্তব্য—"ঐ মন্ত্রটি অথর্ববেদের আদি মন্ত্র নহে। উহার পিপ্পলাদ ঋষি নহেন, বরুণও দেবতা নহেন।"

অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণে (১, ২৯) স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়—"শন্নো দেবীরভিষ্টয় ইত্যেবমাদিং কৃত্বা অথর্ববেদমধীয়ীত।" এই সঙ্গে ঋক্, সাম এবং যজুঃ সংহিতার আদি মন্ত্রও গোপথব্রাহ্মণে ধরা আছে। 'শন্নোদেবী' যে অথর্ববেদের আদি মন্ত্র সে বিষয়ে ব্রাহ্মণগ্রন্থের সাক্ষ্য অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ কি হইতে পারে? আরও প্রমাণ দিব।

ভারদ্বাজগৃহ্যসূত্রে (৩, ১৫) আছে—"বেদাদীন্ জপেৎ... অগ্নিমীলে পুরোহিতমিত্যৃগ্বেদস্যেষে ত্বোর্জে ত্বেতি যজুর্বেদস্যাগ্ন আয়াহি বীতয় ইতি সামবেদস্য শন্নো দেবীরভিষ্টয় ইত্যথর্ববেদস্য।" অনুরূপ উক্তি বোধায়নীয় গৃহ্যসূত্রে (২, ৯, ৫) ও পাওয়া যায়। বৈখানসগৃহ্যসূত্রে (৬, ১৬) ব্রহ্মযজ্ঞের এইরূপ একটি লক্ষণ দেওয়া আছে—"সাবিত্রীপূর্বৈর্বেদশসূক্তৈরগ্নিমীড়ে পুরোহিতমিষে ত্বোর্জে ত্বাগ্ন আয়াহি শন্নো দেবীরিতি চতুর্বেদাদিমন্ত্রৈর্বা স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞঃ।"

অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁহার পিতৃদয়িতায় (২০ পৃষ্ঠা) ব্রহ্মযজ্ঞে শন্নোদেবী মন্ত্রের বিনিয়োগ নির্দেশ করিয়াছেন এবং গুণবিষ্ণুর মতই পিপ্পলাদ ঋষি ও বরুণ দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন তাঁহার আহ্নিকতত্ত্বে ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণে অনিরুদ্ধ ভট্টের উক্তি প্রমাণ দিয়াছেন—"অনিরুদ্ধভট্টেন প্রণবব্যাহৃতিগায়ত্রীপাঠানন্তরং চতুর্বেদাদিমন্ত্রচতুষ্টয়ং লিখিতম্।"

পতঞ্জলি তাঁহার ব্যাকরণমহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে গুণবিষ্ণুধৃত চারিটি মন্ত্র একসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপর তিনটি যখন তিন বেদের আদি মন্ত্র, তখন সাহচর্যবশতঃ শন্নোদেবীও আর এক বেদের প্রথম মন্ত্রই হইবে—ইহা সাধারণ বুদ্ধি হইতেও মনে হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রদায়বিদ্‌গণ আজ পর্যন্ত ব্রহ্মযজ্ঞে অথর্ববেদের প্রতীকরূপে শন্নোদেবী মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন, সে কথা রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় 'ইণ্ডিয়ান্ অ্যান্টিকোয়ারী' পত্রিকায় (৩য় খঃ, ১৩২ পৃঃ) প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মযজ্ঞে যে বেদাদিমন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহা পূর্বে দেখিয়াছি।

শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি ও লোকব্যবহার হইতে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শন্নোদেবী অথর্ববেদের আদি মন্ত্র। কবিরত্ন মহাশয় দীর্ঘকাল যাবৎ আহ্নিককৃত্যাদি গ্রন্থে প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, শন্নোদেবী অথর্বদের আদি মন্ত্র নহে। ইহার কারণ এই যে, শৌনকশাখীয় অথর্ববেদে 'যে ত্রিসপ্তাঃ' ইত্যাদি আদি মন্ত্র; 'শন্নো দেবীঃ' ঐ শাখার ১ম কাণ্ডের ৬ষ্ঠ সূক্তের ১ম মন্ত্র। উহাই কবিরত্ন মহাশয় দেখিয়াছেন।

পৈপ্পলাদ শাখার অথর্বসংহিতাও ছাপা হইয়াছে, উহার প্রথম পাতাটি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু শৌনক শাখার যাহা আদি, সেই 'যে ত্রিসপ্তাঃ' মন্ত্রটি পৈপ্পলাদ শাখায় ২য় অনুবাকের ১ম মন্ত্ররূপে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, শন্নোদেবী মন্ত্রটি ঐ শাখার মুদ্রিত অংশে কোথাও নাই। এই সকল কারণে এম, ব্লুমফিল্ড, (কৌশিকসূত্রের ভূমিকা, xxviii) সি, আর, ল্যানম্যান (অথর্ববেদের হুইট্‌নিকৃত অনুবাদের ভূমিকা, cxvi) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, শন্নোদেবী পৈপ্পলাদ শাখার প্রথম মন্ত্র। অনিরুদ্ধ ভট্টও বলিয়া দিয়াছেন (পিতৃদয়িতা, ২০ পৃঃ) এই মন্ত্রের ঋষি পিপ্পলাদ। এখন গুণবিষ্ণুর উক্তি হইতে নির্ণীত হইয়া গেল যে, মন্ত্রটি পৈপ্পলাদ অথর্ববেদের আদি মন্ত্র, কারণ গুণবিষ্ণু বলিয়াছেন "অথর্ববেদাদিমন্ত্রোঽয়ং পিপ্পলাদদৃষ্টঃ"। পণ্ডিতেরা এতদিন যাহা অনুমান করিতেছিলেন, গুণবিষ্ণুর উক্তিতে তাহা সত্য প্রমাণিত

হইল। কবিরত্ন মহাশয়কে নিবেদন করি—'এট অথর্ববেদের আদিমন্ত্র নহে' এমন কথা আর প্রচার করা সঙ্গত হইবে না। বহু সম্মানিত সুপ্রাচীন ভাষ্যকার গুণবিষ্ণুর যথার্থ উক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় কাহারও গৌরব বাড়িবে না, বরং খণ্ডিতই হইবে।

(১৮) যখন শন্নোদেবী মন্ত্রটিকে অথর্ববেদের আদিরূপে পাঠ করিতে হয়, তখন গুণবিষ্ণু বলিয়াছেন—"শন্নো ভবন্তু' ইত্যত্র 'আপো ভবন্তু' ইতি পঠাতে"। কবিরত্নমহাশয় সমালোচনা করিতেছেন, কেবল "শন্নো ভবন্তু" স্থলে 'আপো ভবন্তু' পাঠ করিলে 'শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে 'আপো ভবন্তু' হয়, তাহাই হইবে কি ?" তাহা হইবে কেন ? যিনি গুণবিষ্ণুর ভাষ্য বুঝিবেন, তিনি 'শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু' এই সন্ধিটিও করিয়া লইতে পারিবেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যে স্থলে কিছুই বক্তব্য নাই, সেরূপ স্থলেও কবিরত্ন মহাশয় যাহা হউক কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(১৯) কবিরত্ন মহাশয় 'অক্ষন্নমী' মন্ত্রের একটা অশুদ্ধ পাঠ তুলিয়া উহাই প্রকৃত গুণবিষ্ণু-পাঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া বেদোক্ত পাঠই ধরিয়াছেন"।

আমি স্বয়ং সংশোধন করিয়া বেদোক্ত পাঠ ধরি নাই। উহা যে গুণবিষ্ণুরই পাঠ, তাহা কবিরত্ন মহাশয়ও বিলক্ষণ জানেন। তিনি হয় ত ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্বে গুণবিষ্ণু-পাঠের শুদ্ধতা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি এই মন্ত্রটির ভাষ্যই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেন। "ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতির" প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (১৩-১৪ পৃষ্ঠা) মন্ত্রটির গুণবিষ্ণুধৃত বিশুদ্ধ পাঠ প্রদর্শিত হইয়াছিল, এবং কবিরত্ন মহাশয় লিপিকর-প্রমাদের দোষ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন (১৪ পৃঃ) "অতএব দেখুন, গুণবিষ্ণুর টীকায় কিরূপ কারিগরি ঘটিয়াছে, এবং অন্যের দোষে তাঁহার পবিত্র গ্রন্থ কিরূপ কলুষিত হইয়াছে"। ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতির দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ ভবদেব পদ্ধতির ১ম সংস্করণের ভূমিকায়ও আলোচ্য মন্ত্রটিরই ভাষ্য তুলিয়া কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"দেখুন, মূল বেদের পাঠের সহিত হস্তলিখিত গুণবিষ্ণুটীকানুযায়ী পাঠ সর্বাংশে একরূপ (কেবল 'অবপ্রিয়া' স্থলে এক পদ, এই মাত্র প্রভেদ ; সায়ণাচার্য ও মহীধর অবটিকে উপসর্গ করিয়া 'অধূষত' ক্রিয়ার সহিত উহার অন্বয় করিয়াছেন)"।

ইহা বড়ই রহস্যময় যে, যিনি স্বয়ং হস্তলিখিত পুথি আলোচনা করিয়া 'অক্ষন্নমী' মন্ত্রের গুণবিষ্ণুধৃত বিশুদ্ধ পাঠ অবগত হইয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া পূর্বে একাধিক গ্রন্থে গুণবিষ্ণুর প্রশংসা করিয়াছেন, তিনিই আজ ঐ মন্ত্রেরই লিপিকরকৃত অশুদ্ধ পাঠ তুলিয়া গুণবিষ্ণুকে দোষ দিতেছেন। এই সকল লক্ষ্য করিয়া মনে হয় না কি যে, কবিরত্ন মহাশয় যে কোনও উপায়ে গুণবিষ্ণুকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছেন ?

কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন "সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া বেদোক্ত পাঠই ধরিয়াছেন, কিন্তু অনবধানতাবশতঃ ভাষ্যের দুই স্থলে সংশোধন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন"। 'অবপ্রিয়া' স্থলে কিছু ভুলিয়া যাই নাই। গুণবিষ্ণু এক পদ রূপেই 'অবপ্রিয়া' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুণবিষ্ণুমতে মূলেও 'অবপ্রিয়া' পৃথক্ পদ হইবে না, উহা ভুল। ভাষ্যের 'যঃ যে' অংশ সত্যই আমার অনবধানতার ফলে ছাপা হইয়াছিল। যে পুথিখানি হইতে আমার 'কপি' প্রস্তুত হয়, উহা অশুদ্ধিবহুল ছিল। পরে আমি অনেকগুলি আদর্শ পুথি পাইয়া তদনুসারে বিচারপূর্বক যথাযোগ্য পাঠ গ্রহণ করিয়াছি'। এই স্থলে অশুদ্ধ পুথির 'যঃ যে'টুকু থাকিয়া গিয়াছিল। 'যঃ যে' স্থলে শুদ্ধ পুথিতে 'কিস্তুতাঃ' আছে। পরে উহা লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে সংশোধন করিয়া দিয়াছি। কবিরত্ন মহাশয়ের সংগৃহীত গুণবিষ্ণু-পুস্তকে 'কিস্তুতাঃ' আছে, সে কথা তিনি পূর্বে লিখিয়াছিলেন।

(২০) ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে একটি মন্ত্রের পাঠ "আ মা গন্তাং পিতরামাতরা যুবমা মা সোমোঽমৃতত্বায় গম্যাং।" কবিরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'আ মা গতং পিতরামাতরা যুবম্' কাণ্বশাখার পাঠ। "দুর্গামোহন বাবু 'আ মা গন্তাং'ই রাখিয়াছেন।" কবিরত্ন মহাশয়ের বক্তব্য বোধ হয় এই যে, আমি যখন কাণ্বশাখার 'যুবম্' এবং 'অমৃতত্বায়' পাঠ গ্রহণ করিয়াছি, তখন ঐ শাখারই সম্পূর্ণ পাঠ লইয়া 'গন্তাং' স্থলে 'গতং' করা উচিত ছিল। কিন্তু এই মন্ত্রের 'যুবং' এবং 'গন্তাং' উভয় পদই অনিরুদ্ধ ভট্ট পিতৃদয়িতায় ধরিয়াছেন। গুণবিষ্ণুর পুথিতেও 'গন্তাং'ই পাইয়াছি। উহাতে অর্থের সঙ্গতিও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুতরাং আমি উহা পরিবর্তন করি নাই। হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্বে এবং রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্বে 'গন্তাং' স্থলে 'গন্তং' পাঠ আছে, কিন্তু 'গতং' নাই।

আলোচ্য মন্ত্রটির উত্তরার্ধের পাঠ "পিতরামাতরা যুবমা মা সোমো' স্থলে মাধ্যন্দিনীয়সংহিতা (৯, ১৯), তৈত্তিরীয়সংহিতা ১, ৭, ৮, ৩), মৈত্রায়ণী সংহিতা (১, ১১, ৩) এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে (৫, ১, ৫, ২৬) 'পিতরামাতরা চা মা সোমো' আছে। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য সম্পাদনের সময় উহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু আকরগ্রন্থের এইরূপ পাঠ দেখিয়াও গুণবিষ্ণুর 'যুবং' পদটি ভুল মনে করি নাই। পিতৃদয়িতায়, ব্রাহ্মণসর্বস্বে এবং শ্রাদ্ধতত্ত্বে 'যুবং' পাঠ পাইয়াছিলাম। তখনই মনে হইয়াছিল যে, এই পাঠ অবশ্য কোন মূল বেদে আছে। পরে সত্যই কাণ্বসংহিতায় (১, ১০, ২২) 'যুবং' পাঠ পাইয়াছি। পূর্বে চারিখানি মুদ্রিত আকরগ্রন্থে যাহা পাই নাই, এখন তাহা পঞ্চম গ্রন্থে পাইলাম। ইহাতে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছে যে, মন্ত্রার্থে অসঙ্গতি না ঘটিলে এবং বিশিষ্ট নিশ্চায়ক প্রমাণ না পাইলে কোন শিষ্টগৃহীত পাঠ অবৈদিক বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে। কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা যে, তিনিও যেন এ বিষয়ে বিবেচনা করেন।

আমি কবিরত্ন মহাশয়ের শিষ্যস্থানীয় ; দূ-পুস্তকে তাঁহার ক-পুস্তকের ভ্রম অনুসন্ধান করি নাই। তিনি প্রাচীন টীকাকার গুণবিষ্ণুর ভাষ্যে বহু স্থলে অযথা দোষারোপ করিয়াছেন দেখিয়া উত্তর দিতে হইল। অপরের সহিত বাদপ্রতিবাদ প্রসঙ্গে কবিরত্ন মহাশয় একবার লিখিয়াছিলেন যে,তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে 'অসঙ্কোচে তাহা স্বীকার' করেন। এইজন্য আমি আশা করিতেছি যে, পড়্বিংশ শব্দ, বৈশ্বদেব্য পদ, বিদ ধাতু, শিব শব্দ, কৃপ ধাতু এবং শন্নোদেবী মন্ত্র সম্বন্ধে যে সকল কথা নিবেদন করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিবেন।

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য।

হুগলী জিলার ইতিহাস

(বাঁশবেড়িয়া)

বাঁশবেড়িয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ দেবাদিত্য দত্ত উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। রাজা আদিশূর যখন কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এ দেশে আনয়ন করেন, তখন পাঁচ জন কায়স্থও তাঁহাদের সহিত আসিয়াছিলেন। যখন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত হয়, তখন দেবাদিত্য দত্ত সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—"দত্ত কারও ভৃত্য নয়, সঙ্গে আগমন, দ্বিজ সঙ্গে থাকি করি তীর্থ-পর্যটন।" কথিত আছে, রাজা অনুসন্ধানে দেবাদিত্যের উক্তি মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারায় তাঁহাকে কৌলিন্যে বঞ্চিত করেন। রাজার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাঁহার রাজ্যে বাস করা অযৌক্তিক বিবেচনায় দেবাদিত্য আধুনিক মুর্শিদাবাদের নিকট মায়াপুর গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে মুসলমানের ভয়ে তিনি মায়াপুর ত্যাগ করিয়া দত্তবাটী গ্রামের পত্তন করিয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। দেবাদিত্য বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিনায়ক দত্ত পিতৃ-সম্পত্তি লাভ করেন। বিনায়কের পুত্র তপন, তপনের পুত্র মণ্ডল, মণ্ডলের পুত্র বরুণ, বরুণের পুত্র মধুসূদন, মধুসূদনের পুত্র যাদব, যাদবের পুত্র মাধব। মাধব স্বকীয় ক্ষমতায় বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করেন; কিন্তু মাধবের সহিত রাজা বল্লালসেনের বিরোধ হইলে বল্লালসেন মাধবের বংশ ধ্বংস করেন। তাঁহার পুত্র মহেশ্বরও আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার গর্ভবতী পত্নী পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যথাসময়ে কোন অজ্ঞাত স্থানে তিনি এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার নাম উবরু। উবরু আত্মীয়-স্বজন বিহীন অবস্থায় উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র কুলপতিকে রাখিয়া যান। কুলপতির নয়টি পুত্র-কন্যা ছিল।

কুলপতির এক পুত্রের নাম কবি দত্ত। কবি দত্ত পিতৃভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া বিশিষ্ট ধনশালী ও প্রতাপশালী হওয়ায় 'খাঁ' খেতাব পাইয়াছিলেন।* তাঁহাকে দত্তবাটীর 'খাঁ' বলা হইত। তাঁহার ছয় পুত্র; তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র দত্তই খ্যাতি লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের আট পুত্র ও নয় কন্যা। তাঁহাদের মধ্যে কেশব ও বিষ্ণু প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই কেশব দত্ত হইতেই পাটুলী-রাজবংশের উদ্ভব।

বিষ্ণুর এক পুত্র শ্রীমন্ত এবং এক কন্যা ছিল। শ্রীমন্ত পিতার জীবিতকালে নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। দিনাজপুরের রাজবংশে তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। বিষ্ণু মুসলমান সরকারে উচ্চপদ লাভ করেন, এবং তিনি দিনাজপুরে বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই দিনাজপুর রাজবংশের উন্নতি। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু, নবাব সরকারে কাননগোর পদ লাভ করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হওয়ায়, তিনি তাঁহার জামাতা হরিরাম ঘোষকে সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করেন। হরিরাম ঘোষের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শুকদেব "রাজা" খেতাব পাইয়াছিলেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্তা সা সুজা তাঁহাকে এক সনন্দ প্রদান করেন। ১৬৬৭ খৃঃ শুকদেব শুকসাগর নামক সুবৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ কীর্ত্তি এখনও বর্তমান। শুকদেবের তিন পুত্র—রামদেব, জয়দেব ও প্রাণনাথ। তিন জনেই নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। প্রাণনাথ রামনাথ নামক এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রামনাথ তাঁহার জমিদারির পরিমাণ বর্দ্ধিত করেন। কথিত আছে, তাঁহার জমিদারির জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হইত। রামনাথের পুত্র তারকনাথ রাজা হইয়া নিঃসন্তান ছিলেন, এজন্য একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।*

কেশবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বারিকানাথ মুর্শিদাবাদের নবাব কর্ত্তৃক উৎপীড়নের ভয়ে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া-সন্নিহিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাটুলী গ্রামে উঠিয়া আসিয়া সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। দ্বারিকানাথের সেই বাসভবন কালক্রমে ভাগিরথী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। দ্বারিকানাথের পুত্র শ্রীসুখ। শ্রীসুখের পুত্র সহস্রাক্ষকে বাদশাহ আকবর ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এক সনন্দ প্রদান করিয়া নদীয়া জিলার ফৈজুল্লাপুর পরগণার জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সহস্রাক্ষের পুত্র উদয় প্রতিভাবান, কর্ম্মপটু ও সুপণ্ডিত ছিলেন। আকবর শাহ তাঁহাকে "সভাপতি রায়" খেতাবে ভূষিত করেন। উদয়ের চারি পুত্রের মধ্যে জয়ানন্দ সম্রাট সাজাহানের নিকট "মজুমদার" উপাধি লাভ করেন। এই সময় বাঙ্গালার নবাব কাশিম খাঁ জয়ানন্দকে কাননগোর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

জয়ানন্দের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রাঘব প্রতিভাবান, বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। রাঘব সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে "চৌধুরী" ও "মজুমদার" উপাধি লাভ করেন। রাঘবের জমিদারি ২১টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। এই পরগণাগুলির সমস্তই হুগলী-চাকলার অন্তর্গত ছিল; তাহাদের পরিমাণ প্রায় সাত শত বর্গমাইল। এই সকল পরগণার সুবন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে রাঘব অতঃপর বাঁশবেড়িয়ায় বাস করিতে লাগিলেন; তবে তিনি মধ্যে মধ্যে পাটুলিতে গমন করিতেন। বাঁশবেড়িয়া তখন বাঁশবন ও বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই জন্যই বাঁশবেড়িয়া নামের উৎপত্তি। রাঘব এই সকল বনজঙ্গল নির্ম্মূল করিয়া সুপ্রশস্ত গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাঘবের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র, রামেশ্বর ও বাসুদেব পিতৃপরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ রামেশ্বর তৎকাল-প্রচলিত প্রথা অনুসারে সমগ্র সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের এবং বাসুদেব এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়াছিলেন। রামেশ্বর ভ্রাতার সহিত বিরোধের আশঙ্কায় পাটুলির সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাঁশবেড়িয়ায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি এই স্থানে আসিবার সময় অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নিম্নশ্রেণীর লোক সঙ্গে আনিয়াছিলেন, এমন কি, কয়েক জন মুসলমানও পরিজনবর্গসহ তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে ভূমিদান করিয়া সেখানে

---

* সেকালে পারসী "খাঁ" উপাধি হিন্দুরাও পাইতেন। হোসেন সাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসুর উপাধি ছিল "পুরন্দর খাঁ"। এখনও 'খাঁ' উপাধিধারী হিন্দুর অভাব নাই। উলার খাঁ-বাবুরা ইহার দৃষ্টান্ত।

* Bansbaria Raj (Imperial Library) No S 169 E 141. 109 D 24

স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি বারাণসী হইতে অনেকগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আনাইয়া বাঁশবেড়িয়ায় তাঁহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রামশরণ তর্কবাগীশ তাঁহাদের অন্যতম, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। রামেশ্বর অতঃপর 'রাজা' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বাঁশবেড়িয়ায় সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া সুরক্ষিত করিবার জন্য খাদ খনন করিয়া তদ্দ্বারা তাহা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন। এই সময় মারাঠা দস্যু বর্গীর উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় লোকে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের আশঙ্কায় ঐ গড়খাতের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিত। বর্গীরা হুগলী জেলার মধ্যে কেবল বাঁশবেড়িয়াই লুণ্ঠন করিতে পারে নাই। মারাঠা দস্যুরা অশ্বারোহণে 'বর্গ'-ভাবে দলবদ্ধ হইয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিতে আসিত, এজন্য 'বর্গী' নামে অভিহিত হইত।

এই সময় আরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট। হিন্দুকুল-সূর্য্য ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠারা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। যে সকল জমিদারের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় না হইত, রামেশ্বর তাহাদের নিকট হইতে ঐরূপ রাজস্ব আদায় করিয়া বাদশাহ-সরকারে প্রেরণ করিতেন; এজন্য সম্রাট আরঙ্গজেব তাঁহার রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ ১০৯০ হিজিরায় একখানি সনন্দ দ্বারা বারটি পরগণার জমিদারি-স্বত্ব ও বাসভূমির জন্য ৪০১ বিঘা জমি তাঁহাকে দান করেন। ঐ বারটি পরগণার নাম—কলিকাতা, ধাড়বা, আমিরপুর, বালান্দা (মেদিনীপুর জেলায়), খালোড় (বাগনানের নিকট) মানকুব, সুলতানপুর, হাতিয়াগড়, মেদমোলপা, কুজপুর, কাউনিয়া ও মাগুরা। ইহার পূর্ব্বেও বাদশাহ একখানি সনন্দ দ্বারা তাঁহাকে খেলাত ও পাঁচ প্রকার সম্মানসূচক পরিচ্ছদসহ বংশানুক্রমিক 'রাজা মহাশয়' খেতাব দান করেন। আসল সনন্দখানি পরে নষ্ট হইলেও ঐতিহাসিক মিষ্টার হেনরী বিভারিজ সেই সনন্দের ইংরেজি অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

To Raja Rameswar Rai Mahasay
Pargana Arsha of Satgaon
(Government of Satgaon)

As you have promoted the great interest of the government in getting possession of Parganas and making assessment thereof, and as you have performed with care whatever services were entrusted to you, you are entitled to reward. The Khilat of Panja Percha (five cloths i. e. dresses of honour) and title of "Raja Mohasay" are therefore given to you in recognition thereof, to be inherited by the eldest children of your family, generation after generation without being objected to by any one. 10 Safar 1090 Hijir.

রাজা রামেশ্বর কেবল যে প্রতাপশালী, বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, এমন নহে, তিনি নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ১৬০১ শকাব্দায় (১৬৭৯ খৃঃ) অনন্তদেবের (বিষ্ণু) বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। ঐরূপ মন্দির গঙ্গার পশ্চিমকূলে অন্য কোথাও ছিল না বলিয়াই প্রকাশ মন্দির-গাত্রে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল,—

"মহী ব্যোমাঙ্গ শীতাংশু গণিতে শক বৎসরে।
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণু-মন্দিরে।"

রাজা রামেশ্বর সম্ভবতঃ ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রঘুদেব, মুকুন্দ ও রামকৃষ্ণ নামক তাঁহার তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই তিন পুত্র বিষয় ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। বংশের প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ রঘুদেব পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক, এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সমান অংশে গ্রহণ করেন। এই সম্পত্তির বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের অভিমত আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্য নষ্ট করিতে চাহি না।

রামেশ্বর তাঁহার সম্পত্তি যেমন পুত্রদিগকে দিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাগিনেয় মনোহর ও গঙ্গাধরকেও বোরো পরগণা দিয়াছিলেন; এমন কি, আশ্রিত ব্রাহ্মণ-সন্তান সন্তোষকেও জমিদারিতে বঞ্চিত করেন নাই।

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালে রঘুদেবের কর্ম্মজীবনের আরম্ভ। ঐ সময়ে জমিদারির খাজনা আদায়ের অত্যন্ত বেবন্দোবস্ত ছিল। মুসলমান নবাবগণও জমিদারদিগকে নানারূপ নির্য্যাতন করিয়া ঐ খাজনা আদায় করিতেন। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রঘুদেবের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তাঁহাকে "শূদ্রমণি" উপাধি প্রদান করেন।

রঘুদেবের একমাত্র পুত্র গোবিন্দদেবের সময় রঘুরাম (কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা) নদীয়ার রাজা ছিলেন। তিনি চাতুর্য্যবলে গোবিন্দদেবের জমিদারি অগ্রদ্বীপ অধিকার করেন। রাজা গোবিন্দদেবেরও দানশীলতার খ্যাতি ছিল। তিনি অল্প বয়সে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা গোবিন্দদেবের পর হইতেই বাঁশবেড়িয়া-রাজবংশের দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। গোবিন্দের মৃত্যুকালে তাঁহার রাণী গর্ভবতী ছিলেন। গোবিন্দদেব নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সম্পত্তি গ্রাসের জন্য অনেকেরই লোভ হইল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের রাজা গঙ্গা নদীর পশ্চিম কূলের সমস্ত জমিদারি, এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গার পূর্ব্ব দিকের সমস্ত জমিদারি অধিকার করেন। কিন্তু হুগলীর ফৌজদার পীর খাঁর প্রতাপে বর্দ্ধমানাধিপতি কুলীহাণ্ডা তালুক দখল করিতে পারিলেন না। নৃসিংহদেবের এই একমাত্র জমিদারি রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু নবাব সরকার হইতে এই অত্যাচারের প্রতিকার হইল না।

রাজা নৃসিংহদেবের স্মারকলিপিতে যাহা লিখিত হইয়াছিল, এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম:—"সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয়, সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম, বর্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট আমার পিতা অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্তপুস্তামের জর খরিদা জমিদারি আপন মালিকে জমিদারি সামিল করিয়া লয়। সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখ খামকা দখল করে ও হালদা কিশমতের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল। তিনিও ঐ সন কিশমত-মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজা কুলীহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী-চাকলার সামিল ছিল। মীর খাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না, অতএ

তালুক মজকুর আমার দখলে আছে। সুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার ও তালুকদার এমন বেইনসাফী ও বেদায়ত হয় নাই।"

ইংরেজ সরকারের সিলেক্ট কমিটীর পঞ্চম রিপোর্টে বাঁশবেড়িয়ার জমিদারি রাজা গোবিন্দদেবের সম্পত্তি বলিয়া উল্লেখ ছিল। সবগুলিই হুগলী-চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নৃসিংহদেব একে নাবালক তাহার উপর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি পরহস্তগত হইল—শুধু কুলীহাণ্ডার জমিদারি তাঁহার রহিল। ঐ সামান্য আয়ে নিজের সংসার খরচ ও দেবসেবা অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। এই সময় বাঙ্গালার ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীযুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হইলেন। হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনভার লইলেন; পরে গভর্ণর জেনারেল হইলেন। বিচারকার্য্যের জন্য সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইল। এই সময়ে নৃসিংদেব হেষ্টিংসের দরবারে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের দরখাস্ত করিলেন। হেষ্টিংস অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন, কিন্তু এই সময়ে ইংরেজের হাতে শুধু দেওয়ানির স্বত্বমাত্র ছিল। হেষ্টিংস ২৪ পরগণার জমিদারির জমিদার স্বরূপে "সেটুকু ২৪ পরগণার অন্তর্গত তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করিলেন।" *

রাজা নৃসিংহদেব আরবী, পারসী, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রও জানিতেন। সঙ্গীত-বিদ্যা ও অঙ্কনকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে বাঙ্গালা দেশের এক মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে হেষ্টিংস তাঁহাকে বিশেষ পুরস্কার দেন, কিন্তু দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধানকাটা পরগণা দিয়াছিলেন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস স্বদেশে প্রস্থান করেন, এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজা নৃসিংহদেব, লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে তিনি বিলাতে কোর্ট অফ্-ডাইরেক্টরগণের নিকট দরখাস্ত করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, এবং এ বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই কার্য্যে বহু অর্থব্যয় হইবে বুঝিয়া নৃসিংহদেব এক জন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর উপর জমিদারির ভার অর্পণ করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। সেখানে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক সাধনা, শাস্ত্র-চর্চ্চা ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময় ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীতে থাকিতেন। দুই জনে বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। জয়নারায়ণ অনেক দিন হইতে সংস্কৃত কাশীখণ্ডের বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বঙ্গানুবাদ বা পদ্যে অনুবাদের তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। তিনি নৃসিংহদেবকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। নৃসিংহদেবের সহিত জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক জন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। জয়নারায়ণ ও নৃসিংহ কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ করেন, এবং জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় তাহা পদ্যে রূপান্তরিত করেন; কিন্তু নৃসিংহ তাহা সংশোধন করিতেন।

"তাঁর সহ জগন্নাথ মুখুয্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥
* * *
তাহার করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া।
মুখুয্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
লিখেন পুস্তকে তাহা সমস্ত শুনিয়া॥"

নৃসিংহদেব উড্ডীশ তন্ত্রের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন।

এই সময়ে নৃসিংহদেবের উক্ত বিশ্বাসী কর্ম্মচারী তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন, বিলাতে মামলা চালাইবার উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। নৃসিংহদেব সেই অর্থ কাশীতে পাঠাইতে বলিলেন। এই সময় তাঁহার আর বিষয়াসক্তি ছিল না। তিনি হংসেশ্বরী-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। ঐ টাকায় উপযুক্ত দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করিয়া আট বৎসর পরে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঁশবেড়িয়ায় প্রত্যাগমন করেন, এবং হংসেশ্বরী-মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন; কিন্তু উহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ইহা ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। মৃত্যুকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী রাণী শঙ্করীকে উহা সম্পূর্ণ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির ষট্চক্র অনুযায়ী নির্ম্মিত। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রাণী শঙ্করী প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ১৫ বৎসরে ঐ মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করেন, এবং পরে উহা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির-দ্বারের উপর লেখা আছে:—

শকাব্দে রসবহ্নি মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বার চতুর্দ্দশেশ্বর সমং হংসেশ্বরী রাজিতং॥
ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে॥ শকাব্দ ১৭৩৬

এই হংসেশ্বরী-মন্দিরের তুল্য মন্দির বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে মন্দিরের আর সে শোভা নাই।

রাজা নৃসিংহদেবের পরলোক-গমনের পর বিধবা রাণী শঙ্করী নাবালক পুত্র কৈলাসদেবের অভিভাবিকা হইয়া বৈষয়িক কার্য্য পরিচালন করিতেন। কৈলাসদেব অমিতব্যয়ী ছিলেন। মাতার নিকট হইতে বিষয়-সম্পত্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। রাণী এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। কৈলাসদেব মাতার বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্য লইলেন। মাতাপুত্রে বহু দিন বহু অর্থব্যয় করিয়া উভয়েই যখন শ্রান্ত হইলেন, তখন আপোষ মীমাংসা হইল। স্থির হইল, রাণীমাতা ৺হংসেশ্বরী দেবীর সেবার জন্য ২৪ পরগণার ১৫খানি ও হুগলী জেলার কুলীহাণ্ডা গ্রাম রাখিবেন। ইহার ৭ বৎসর পরেই ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কৈলাসদেব নাবালক পুত্র দেবেন্দ্র ও তিন কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ঐ কন্যাদিগের মধ্যে করুণাময়ীর বিবাহ হয় পাইকপাড়ায় লালাবাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র) পুত্র শ্রীনারায়ণচন্দ্রের সহিত।

দেবেন্দ্রদেব সুশিক্ষিত, এবং সংস্কৃত, পারসী ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাৎকালীক সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ছোটলাট হ্যালিডে (তখন ম্যাজিষ্ট্রেট) অনেক সময় বাঁশবেড়িয়ায় যাইতেন। বড়লাট ডালহৌসী রাজা দেবেন্দ্রদেবকে হুগলী জেলার সর্ব্বোচ্চ জমিদার বলিয়া স্বীকার করিতেন। দেবেন্দ্রদেব ১৮৫২ খৃঃ এপ্রিল মাসে প্রাণত্যাগ করেন। রাণী শঙ্করী, পুত্র হারাইয়া পৌত্রকে লইয়া কোনরূপে শোক সংবরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পৌত্র-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। কালীঘাটে রাণী শঙ্করী লেন এখনও তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

* হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ় পৃঃ ২২২, ২২৩।

দেবেন্দ্রদেব তিন নাবালক পুত্র রাখিয়া যান। তন্মধ্যে পূর্ণেন্দুদেব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। উঁহারা সকলেই নাবালক হওয়ায় রাণী কালীশ্বরী (দেবেন্দ্রদেবের বিধবা পত্নী) অছি নিযুক্ত হন, এবং তিনি পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সহিত মিলিত ভাবে নাবালকদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিতেন। পূর্ণেন্দুদেব বাঁশবেড়িয়া-বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারসী, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মিতব্যয়ী অথচ দানশীল ছিলেন।

রাজা পূর্ণেন্দু সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি সেতার ও এসরাজ ভালরূপে বাজাইতে পারিতেন। তিনি সাধারণের কার্য্যে সর্ব্বদা যোগদান করিতেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের হুগলী-শাখার ও হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার চারি পুত্র কলিকাতায় কালীঘাটে রাণী শঙ্করী লেনে বাস করেন।

বাঁশবেড়িয়ায় সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ

বাঁশবেড়িয়ায় নীল কুঠী ছিল।—অনেকেরই ধারণা, স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণের" আখ্যানবস্তুর উপাদান বাঁশবেড়িয়া হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। "নীলদর্পণ" বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সুপরিচিত, সুতরাং এখানে তাহার নূতন পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। পাদ্রী লং "নীলদর্পণে"র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করায় ফৌজদারী সোপরদ্দ হইলে, বিচারক তাঁহাকে "নীল-দর্পণের" গ্রন্থকারের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু রেভারেণ্ড লং দীনবন্ধুর নাম প্রকাশ করেন নাই। বিচারে তাঁহার ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইলে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার নীল-বিদ্রোহের পর নীলকরের অত্যাচার প্রশমিত হয়, এবং বাঙ্গালা হইতে নীলের ব্যবসায় ক্রমে বিলুপ্ত হয়।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবার "তত্ত্ববোধিনী-সভা" স্থাপন করেন, এবং স্কুলও প্রতিষ্ঠিত করেন; সেই স্কুলে প্রায় শত ছাত্র ছিল; কিন্তু উহা ব্রাহ্মদের পরিচালিত স্কুল বলিয়া ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়। এই সময়েই দ্বারিকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনে অসমর্থ হওয়ায় তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল আউটরাম সিন্ধু যুদ্ধে জয়লাভ করায় ইংরেজ সরকার তাঁহাকে ৩ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু জেনারেল আউটরাম ঐ টাকা Blood-money (শোণিত-মিশ্রিত অর্থ) বলিয়া তাহা স্পর্শ করেন নাই। * তিনি সমস্ত টাকাই সৎকার্য্যে দান করেন; উহার ছয় হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকিতে পাদরী ডফ তাহা চাহিয়া লইয়া তদ্দ্বারা বাঁশবেড়িয়ায় চিরস্থায়ী পাট্টায় এক খণ্ড জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং সেই জমিতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা বিশ বৎসর চলিয়া পরে উঠিয়া যায়। রাজা পূর্ণেন্দুদেব ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী বাঁশবেড়িয়ায় উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হওয়ায় স্কুলটি কিছু দিন বন্ধ ছিল; পরে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে উহা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

বাঁশবেড়িয়ায় একটি খৃষ্টীয় ভজনালয় আছে; তারাচাঁদ নামক খ্যাতনামা বাঙ্গালী খৃষ্টান ইহার প্রথম পাদরী। পাদরী তারাচাঁদ সুপণ্ডিত ও বহুভাষাজ্ঞ ছিলেন, ইংরেজী, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

* Outram had received £ 3000 as his share of the prize-money obtained in the conquest of Sindh He had protested against the annexation as an act of "rascality" and regarded his share as "blood-money." —Hooghly District Gazeeter P. 123.

পুরাতন সংবাদপত্রে বাঁশবেড়িয়া

(১২১ বৎসর পূর্ব্বের সংবাদ)

"চুরি।—মোং বাঁশবেড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণরূপ্যাদি ঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে সংপ্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্য ২ ব্যাবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক হইতেছে।"—'সমাচারদর্পণ' ১৮২০—১৯শে ফেব্রুয়ারী। বাং ১২২৬। ৮ ফাল্গুন।

"গঙ্গাতীরবর্ত্তী চতুষ্পাঠীগুলির মধ্যে এককালে বংশবাটী ও ত্রিবেণীর টোলগুলি সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই বংশবাটীর টোলের সংখ্যা ছিল ষাটটি। এই সকল টোলে ন্যায়, স্মৃতি, সাহিত্য ও ব্যাকরণ চর্চ্চায় গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দু' একটি টোলের ছাত্র-সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। এক দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্তের টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০০। সুদূর শ্রীহট্ট, বিক্রমপুর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানের অনেক ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিত।…বংশবাটী পণ্ডিত-সমাজের গৌরবের দিনে ভট্টপল্লী পণ্ডিত-সমাজ বিদ্যমান ছিল না। তখনও ভট্টপল্লীতে পণ্ডিত-বংশের বাস হয় নাই। ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ নারায়ণ ঠাকুর আলীবর্দ্দীর সমসাময়িক। বংশবাটী ও ত্রিবেণীতে এক সময়ে দুই জন পণ্ডিত বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করেন—"বংশবাট্যাং রাসরাম ত্রিবেণ্যাং রঘুরাঘবঃ" বংশবাটীর রাসরাম ও ত্রিবেণীর রঘুরাঘব। সার উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষাগুরু খ্যাতনামা পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বংশবাটীর টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"—'সমাচার' দ্বিতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা—লেখক মুনীন্দ্রদেব রায়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)।



জীবন্ত মৎস্য

মৎস্য-ক্ষেত্র সমূহের ব্যাপকতা, পরিপুষ্টি ও উন্নতির উপর সকল দেশেরই আর্থিক উন্নতি যে প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষির পরেই মৎস্য-চাষের স্থান, এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। নানাবিধ শস্য, ফলমূল ও ব্যবহারোপযোগী বৃক্ষাদি যেমন স্থলজ ফশল, বিভিন্ন জাতীয় মৎস্য, শুক্তি, শম্বুক, মুক্তা, এবং নানাবিধ জলজ উদ্ভিদাদিও সেইরূপ জলজাত ফশল। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে পুষ্টিকর আহার্য্যরূপে ত বটেই, তদ্ভিন্ন নানাবিধ মৎস্যমূলক শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও মৎস্যক্ষেত্র-গুলিকে অর্থকরী কার্য্যের উপযোগী করিয়া লইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বঙ্গদেশের নদী, দীঘি, পুষ্করিণী, খাল, বিল, ডোবা, নালা, ডামস, দহ, নদী-মোহনায়, উপকূল-সন্নিহিত বিভিন্ন সমুদ্রে, এবং সমুদ্রের খাঁড়িতেও যে বিপুল মৎস্য-ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহার উন্নতি ও সদ্ব্যবহার হইলে বাঙ্গালীর আর্থিক ও শারীরিক দুরবস্থা অপনোদনের যথেষ্ট সুব্যবস্থা হইতে পারিত, এবং এখনও হইতে পারে; কিন্তু সে দিকে দেশের লোকের তেমন লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না; এবং দুঃখের বিষয়, সরকারও এ সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। কিন্তু সম্প্রতি এ-দিকে আশার একটু ক্ষীণ আলোক লক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালা সরকারের আগামী বৎসরের বাজেটে মৎস্য বিভাগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। 'দিও কিঞ্চিৎ, ক'রো না বঞ্চিত'—এ-নীতি মন্দের ভাল।

কিছু কাল চালাইবার পর, প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকারের মৎস্য বিভাগ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যখন উক্ত বিভাগের দায়িত্ব ছিল, তখন কিয়ৎ পরিমাণে তথ্য-সংগ্রহ ব্যতীত এই প্রদেশে মৎস্য-উৎপাদন ব্যবস্থার, বা উক্ত শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নাই। বর্ত্তমানেও যে সামান্য অর্থ অর্থাৎ কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহাও হয় ত কর্ম্মচারীবর্গের বেতন ও আফিসের সরঞ্জামী ব্যয়েই নিঃশেষিত হইবে; সমারোহ সহকারে মন্দিরই নির্ম্মিত হইবে, মন্দিরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইবে না। তবুও দীর্ঘ কালের পর এ বিষয়ে যে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও আমরা মঙ্গলের বিষয় বলিয়াই মনে করিব। এই অকিঞ্চিৎকর প্রারম্ভ যদি ভবিষ্যতে বঙ্গদেশের স্বাদুজলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যের প্রচলন, পালন, ও প্রসারবৃদ্ধি-চেষ্টার সূচনা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে দেশের প্রভূত উপকারের আশা থাকিবে।

বাঙ্গালার পুষ্টিকর খাদ্য মৎস্য, এবং প্রচলিত মৎস্য-শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ত্তমান পত্রিকায় একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে একটি বিশেষ বিভাগ অর্থাৎ 'জ্যান্ত' বা জীয়ন্ত মৎস্যের কথা আলোচিত হইতেছে। নানা জাতীয় মৎস্য সহযোগে মৎস্য-ব্যবসায় পরিচালিত হয়; তন্মধ্যে রুই ও সোলবর্গীয় মৎস্যাদি, ভেট্‌কি, ইলিশ প্রভৃতি মৎস্য, প্রথম শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত। অন্যান্য মৎস্য অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্য্যায়ভুক্ত। 'জীয়ন মাছ' শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে স্থাপন করিতে পারা যায়। অন্যান্য মাছের সহিত এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মাছের যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান। জীবন্ত থাকে বলিয়াই এই সকল মাছের মূল্য তুলনায় বিলক্ষণ অধিক; এবং এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কেবল বঙ্গদেশেই এইরূপ কোন কোন জাতীয় মৎস্য সমধিক সমাদৃত হইয়া থাকে; কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে ইহাদের তেমন অধিক কাট্‌তি নাই এই 'জ্যান্ত' মৎসের ব্যবসায় কলিকাতার মৎস ব্যবসায়ের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালা সরকারের পূর্ব্বতন মৎস্য বিভাগের ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত শেষ

রিপোর্টে বিবৃত করা হইয়াছিল, প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় দুই লক্ষ মণ মাছ নানা স্থান হইতে কলিকাতায় আমদানি হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত একটি প্রবন্ধে ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মী ডক্টর সুন্দর লাল হোরা অঙ্কাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করেন, কলিকাতার বাজারে বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার মণ জীবন্ত মাছ বিক্রয় হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে, জীয়ন মৎস্য দ্বারা কলিকাতার মৎস্য-ব্যবসায়ের ন্যূনাধিক এক-চতুর্থাংশ অধিকৃত। মফস্বলের মৎস্য-ব্যবসায় সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, শিল্পশ্রেণীর বহু সংখ্যক পল্লীবাসী যে সকল মৎস্য ভোজন করে, সেই সকল মৎস্যের মধ্যে এই প্রকার মৎস্যই পরিমাণে অধিক, এবং মেছোহাটায় তাহাদের প্রাধান্যও অধিক। এ অবস্থায় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, এই শ্রেণীর মৎস্য উৎপাদন ও আহার্য্য-রূপে তাহাদের প্রসারবৃদ্ধির ব্যবস্থা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ

নানা প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য জীবন্ত মৎস্যশ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাদিগেরই কাটতি অধিক। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এগুলি চারিটি বর্গে বিভক্ত, যথা—

কই বর্গ—Anabantidae.

কই—Anabas Scandeus.

খলিশা—Trichogaster fasciatus.

চুণা, লাল ও সাদা খলিশা নামে খলিশার আরও তিনটি জাতি আছে।

মাগুর বর্গ—Siluridae.

মাগুর—Clarius batrachus.

শিঙ্গি—Saccobranchus fossilis.

শোল বর্গ—Ophiocephalidae.

শোল—Ophiocephalus striatus.

শাল—O. marulius.

চ্যাং বা গড়ুই—O. gachus.

লাঠা—O. punctatus.

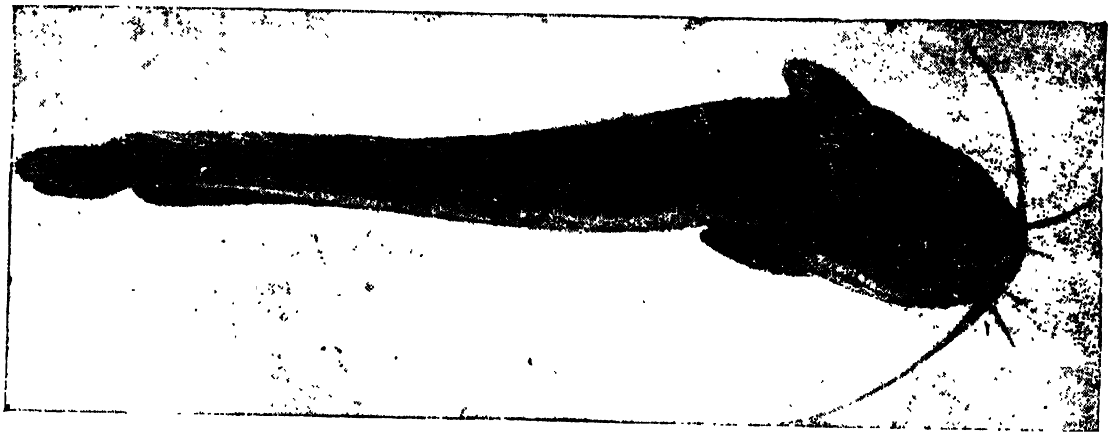
কুঁচে বর্গ—Symbranchidae

কুঁচে—Amphionus cuchia.

এই সমুদয় মৎস্যের জীবনেতিহাস সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন গবেষণা হয় নাই। সাধারণতঃ, এই সকল মাছের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। কই জীয়ন মাছের অন্যতম। কই জাতি ভারতের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান; ভারতের বাহিরে এবং আফ্রিকাতেও কই মাগুর মাছ পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর জল শুকাইলে এবং বর্ষার প্রবল বর্ষণের সময়েও কই মাছ জলাশয়ের তীরে উঠিয়া কানকোর সাহায্যে স্থানান্তরে গমনের চেষ্টা করে। এই সুযোগে গ্রাম্যলোকেরা সে সময়ে রাশি রাশি কই মাছ সংগ্রহ করে। সুপ্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় মৎস্য, Gourami, খলশে জাতীয়; এক সময়ে এই মৎস্য এ দেশে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। যাঁহারা এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ভাল হইলেও তাঁহারা বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই যে, বড় খলিশা ও গৌরামীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, এবং গৌরামী প্রবর্ত্তন অপেক্ষা দেশীয় খলিশার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ হইত।

শোলবর্গের বৈজ্ঞানিক নাম Ophiocephalidae অর্থাৎ সর্প সদৃশ মস্তক-বিশিষ্ট। এই বর্গীয় মৎস্যের মস্তক লক্ষ্য করিলে এই নাম সঙ্গত বলিয়াই মনে হইবে। বস্তুতঃ, বড় শাল মাছ ও এক জাতীয় বৃহদাকার জল-ঢোঁড়া সাপ দেখিতে অনেকটা একই রকম। শোলবর্গীয় মাছ গ্রীষ্মমণ্ডলে বাস করে; বঙ্গদেশে ইহাদের সংখ্যা অধিক। বাজারে শোলমাছের কাটতি নিতান্ত অল্প নহে। অন্যান্য অনেক মাছের ন্যায় পুরুষ-শোল বহু দারপরিগ্রহ করে না; একটি সঙ্গিনীতেই সন্তুষ্ট থাকে। মৎস্যজাতি সাধারণতঃ সন্তানের প্রতি মমতা প্রকাশ করে না। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইহারা অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। এক-একটি গর্ভবতী ইলিসের উদরে প্রায় ৫ লক্ষ ডিম্ব থাকে। সুতরাং বিনা-যত্নেই ইহাদের বহু সন্তান বাঁচিয়া থাকিয়া বংশরক্ষা করিতে পারে। স্ত্রী-শোল অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে ডিম্ব প্রসব করে, এবং সেই জন্যই বোধ হয়, সন্তান-রক্ষণাবেক্ষণে উহাদের অধিক যত্ন। পুকুরে শোল মাছের ঝাঁক অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। সন্তান-পালনের ভার পুং-শোলই গ্রহণ করে, এবং সে সর্ব্বদাই ঝাঁক পাহারা দিয়া

থাকে। অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে তাহারা সেই ঝাঁক সহ অন্যত্র সরিয়া পড়ে; কখন কখন বা শত্রুকে আক্রমণ করে। পোনাগুলি বড় হইলে ঝাঁক ছাড়িয়া চলিয়া যায়; যেগুলি অধিক মমতা বশতঃ পিতৃসান্নিধ্য ত্যাগ করিতে চাহে না, তাহাদিগের পরিণাম শোচনীয় হইয়া থাকে।



মাগুর মাছ

পিতা তাহাদিগকে গলাধঃকরণ পূর্ব্বক আপনাকে দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে থাকে।

জীয়ন মৎস্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মৎস্যগুলি সচরাচর পুষ্করিণী, ডোবা, নালা, খাল, বিল ইত্যাদি বদ্ধজলেই বাস করে। ইহাদের দু'-একটি নদীচর জাতিও আছে। এই শ্রেণীতে বহু বিভিন্ন মৎস্য থাকিলেও ইহাদের দুইটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। প্রথমটি এই যে, জলের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য কান্‌কো ব্যতীত জলের বাহিরেও সমকার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে ইহাদের শরীরে বিশেষ যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান। হিংস্রপ্রকৃতি ইহাদের দ্বিতীয় লক্ষণ। মশা ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ব্যতীত ইহারা ক্ষুদ্রতর মৎস্যও ভক্ষণ করে, এবং এই ভাবে রুই কাত্‌লা প্রভৃতি মৎস্যের ছোট পোনা বহু পরিমাণে নষ্ট করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে বাস করে বলিয়া এই শ্রেণীর মাছেরও প্রখর গ্রীষ্মে জলাভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা ঘটিলে ইহাদের অনেকগুলি জাতিই কর্দ্দমের ভিতর প্রবেশ করিয়া ও নির্জীব ভাবে পড়িয়া থাকিয়া (aestivation) অনাবৃষ্টির সময়টা কাটাইয়া দেয়। মাগুর ও সিঙ্গি সম্বন্ধে আর একটি কথাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহাদের গাত্রে প্রায়ই এক প্রকার ক্ষুদ্র গুটিকা বাহির হয়। এই সময়টা বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবকাল। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, এগুলি ইহাদের বসন্তের গুটিকা। এই জন্য এই সময় লোকে এ সকল মাছ খাইলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করিয়া থাকে। সেই জন্য অনেকেই এই সময় সিঙ্গি, মাগুর মাছ আহার করেন না। কিন্তু ঐ সকল গুটিকা বস্তুতঃ বসন্তরোগজ নহে; দুই-এক প্রকার কীটাক্রমণের জন্য এগুলির উদ্ভব হয়। কিন্তু সাধারণের



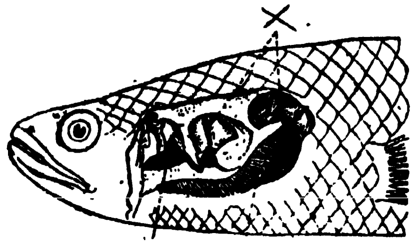
কই মাছ

এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা উক্ত উভয় জাতীয় মৎস্যের বংশবৃদ্ধির অনুকূল; কারণ এই সময়েই ইহাদের সন্তান প্রজনন হয় বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

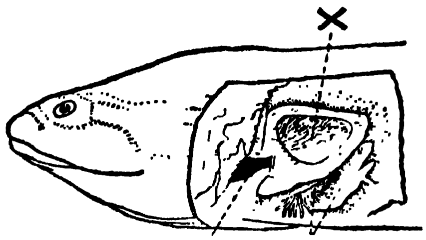
সাক্ষাৎভাবে বায়ুগ্রহণের যন্ত্রাদি

মৎস্য জলচর প্রাণী। ইহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া কান-কোর (gill) সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ দ্বারা সংসাধিত হয়। গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রতাপে জল উত্তপ্ত হইলে যখন উহাতে অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস হয়, তখন মাছের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। অল্প জলবিশিষ্ট

এবং জলজ উদ্ভিদাচ্ছন্ন পুকুরে এই সময় মাছগুলিকে 'খাবি' খাইতে দেখা যায়। এই ভাবে অনেক জাতীয় মাছ মরিয়াই যায়। কিন্তু কই মাগুর প্রভৃতি মাছ এরূপ সঙ্কটকালও যে অতিক্রম করে, তাহার কারণ, কান্‌কোর সাহায্যেই সে সময় নির্ভর না করিয়া ইহারা আর একটি অতিরিক্ত যন্ত্রের সাহায্যে সাক্ষাৎভাবে বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া থাকে। এইরূপ অতিরিক্ত যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় ইহাদের মুখ বা অধোগণ্ড-গহ্বরে বর্ত্তমান। জাতিবিশেষে এইরূপ যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় বিভিন্ন ভাবে গঠিত, কিন্তু উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই এক, অর্থাৎ জলাভাবের সময় উক্ত জাতিগুলির প্রাণ রক্ষা করা।



লেঠা মাছের মাথার এক পার্শ্ব; × চিহ্নিত অংশ বায়ু-প্রকোষ্ঠ



কুঁচে মাছের মাথার এক পার্শ্ব; × চিহ্নিত অংশ বায়ু-প্রকোষ্ঠ



মাগুর মাছের মাথার এক পার্শ্ব; উপরের চর্ম্ম অপসারিত করিয়া বায়ুগ্রহণ ইন্দ্রিয় দেখান হইয়াছে

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি মৎস্যের বায়ুগ্রহণ-যন্ত্রের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল। ঐগুলিতে দেখা যাইবে যে, কতিপয় স্থলে এইরূপ যন্ত্র অধোগণ্ডের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত। মাগুর মাছে ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার প্রান্তদেশ ঝালরের ন্যায় বিভক্ত ও কঠিনীভূত



কই মাছ; মস্তকের পার্শ্বের চর্ম্ম অপসারিত করিয়া বায়ু-গহ্বর দেখান হইয়াছে

সিঙ্গি মাছে উহা নলাকৃতি ও লম্বা ভাবে মেরুদণ্ডের নিকট বিন্যস্ত। বস্তুতঃ, সরাসরি বায়ু গ্রহণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনের শক্তি থাকায় এই সকল



সিঙ্গি মাছ; শিরদাঁড়ার পার্শ্বে বেগার ন্যায় অংশ বায়ু-নলী

মাছ জল হইতে তুলিয়া ৪।৫ সপ্তাহ পর্য্যন্ত জীবিত রাখা সম্ভব। ভূপৃষ্ঠে যথেষ্ট প্রসারলাভের পক্ষেও এইরূপ যন্ত্রের উপযোগিতা অল্প নহে। সর্পের মস্তকবিশিষ্ট



শোল মাছ

মৎস্যসমূহ ভারতের বাহিরে এক দিকে চীন ও অন্য দিকে আফগানিস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কই, মাগুর জাতীয় মৎস্য আফ্রিকা মহাদেশেও বিরল নহে।

ব্যবসায়

জীবন্ত মৎস্যের ব্যবসায় অল্পবিস্তর সকল জিলাতেই বর্ত্তমান। চৈত্র বৈশাখ মাসে পুকুর-ডোবা প্রভৃতির পঙ্কোদ্ধার করা হইলে সেই সময় এই সকল মাছ স্থানীয় হাটে-বাজারে প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে; কিন্তু সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া প্রায়ই স্থানান্তরে চালান দেওয়া হয় না; স্থানীয় ব্যবহারেই তাহা নিঃশেষিত হয়। পূর্ব্বেই

বলা হইয়াছে, কলিকাতার বাজারে এইরূপ মাছের বাৎসরিক আমদানীর পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার মণ। সহরের উপকণ্ঠ ব্যতীত ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, যশোহর, ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জিলা এই সকল মাছের উৎপত্তি-স্থল। শত শত স্ত্রী-পুরুষ জীয়ন মাছের ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন করে। বৎসরের সকল সময় এই সকল মাছ ব্যবসায়ের জন্য চালান দেওয়া সম্ভব নহে। বর্ষাকালে জলাশয়গুলি, পুষ্করিণী, নদী, নালা জলে পূর্ণ থাকে; তখন এই সকল মাছ দুষ্প্রাপ্য। তবে মাঠে এই সময় 'ঘুনি' (খাঁচা) পাতিয়া এই শ্রেণীর বাচ্চা মাছ কিছু কিছু ধরা হইয়া থাকে; কিন্তু সেগুলি অন্যান্য মাছের সঙ্গে বিক্রয় হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ মাছ ধরা সঙ্গত নহে। জীয়ন মৎস্যের আমদানী শীতকালেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে, এবং বর্ষাগমের কিছু পূর্ব্বেই উহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। নৌকার খোলে ফেলিয়া জীয়ন মাছ সাধারণতঃ চালান দেওয়া হয়। কলিকাতার নিকটস্থ কৃষ্ণপুর খালে জীয়ন মাছের বহুসংখ্যক নৌকা গুণ টানিয়া আনিতে দেখা যায়—শীতকালে এই দৃশ্য বিরল নহে। উত্তর-কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কের সন্নিহিত উল্টাডাঙ্গা খালের মেছো-ঘাটই জীয়ন মাছ-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। অনেক মেছো নৌকাই এই ঘাটে বাঁধা থাকে। নৌকার খোলে সংরক্ষিত মাছগুলিকে জীবিত রাখিতে হইলে মধ্যে মধ্যে জল-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নলের সাহায্যে নূতন জল খোলের ভিতর সঞ্চয় করা হয়। উল্টাডাঙ্গা কেন্দ্র ব্যতীত জীয়ন মাছ পাইকারী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় আরও দুইটি বাজার আছে। একটি ধাপা-লকের অদূরবর্ত্তী চিংড়িহাটায়, এবং অন্যটি খিদিরপুরে অবস্থিত।



উল্টাডাঙ্গা মেছো-ঘাট; নল দ্বারা নৌকার খোলে নূতন জল দেওয়া হইতেছে

সংগৃহীত মৎস্যগুলিকে দিবসে একাধিকবার নাড়াচাড়া করা উহাদিগকে জীবিত রাখিবার পক্ষে অনুকূল নহে, বিশেষতঃ, ঠাণ্ডার সময় ঐ ভাবে নাড়াচাড়া করাই সঙ্গত। সে কারণে এবং যথা-সময়ে বাজারে যোগান দেওয়ার জন্য প্রত্যূষেই জীয়ন মাছের ক্রয়বিক্রয় কার্য্য চলিয়া থাকে। বিক্রয়ের জন্য ওজনের পরিবর্ত্তে মাপেরই ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং বিভিন্ন আকারের খালুই ও ঝুড়িতেই মাপ করা হয়। এই সকল বাজার হইতে যাহারা মৎস্য ক্রয় করিয়া কলি-কাতার বিভিন্ন বাজারে খুচরা বিক্রয় করে, তাহারা অবশ্য ওজনে কিম্বা সংখ্যা হিসাবে তাহা করিয়া থাকে। আজকাল ফিরি করিয়া জীয়ন মাছ বিক্রয়ের কায বিহারবাসীরাই প্রায় এক-চেটিয়া করিয়া লইয়াছে। ইহারা মাছ মাপে কিনিয়া ও ওজনে বিক্রয় করিয়া নিতান্ত অল্প উপার্জ্জন করে না। আদত ব্যবসায়িগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। দালালের সাহায্য ব্যতীত কোন প্রকার মাছেরই কারবার করা সুকঠিন। জীবন্ত মাছের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। বস্তুতঃ, মূল্য-নির্দ্ধারণ অনেকটা দালালের উপরেই নির্ভর করে। এ স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কলিকাতায় যে জীয়ন মাছ আমদানী হয়, তাহা স্থানীয় ব্যবহারেই নিঃশেষিত হয় না। ব্যবসায়ি-গণ কলিকাতার বাজারে এইরূপ মাছ ক্রয় করিয়া, অল্প

জলসহ কেনেস্তারায় প্যাক্ করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানেও প্রেরণ করে। জেমসেদপুরের ন্যায় বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রেও কলিকাতার চালানী জীয়ন মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, জীবন্ত অবস্থাতেই জীয়ন মাছের আদর ও মূল্য অধিক। সেরূপ অবস্থায় উৎকৃষ্ট জাতীয় জীয়ন মাছ অনেক সময় পোনা মাছের অপেক্ষাও অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু মরা কই মাগুর নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হয়। কলিকাতার বাজারে গামলার মাছ মরিয়া গেলে অনেক সময় তাহা নিতান্ত অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে হয়।

খাদ্যমূল্য

জীয়ন মাছের মধ্যে কই মাগুর ও সিঙ্গি পুষ্টিকর খাদ্যরূপে পরিচিত। এগুলি সহজপাচ্য শিশু ও রোগীর খাদ্যরূপে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সাধারণের এরূপ ধারণা অহেতুক নহে, ইহা উক্ত মৎস্যাদির গঠনোপাদানের প্রকৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটি মাছে আমাদিগের খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদান শতকরা মাত্রা হিসাবে প্রদত্ত হইল,—

	প্রতীদ	মেদ	লবণ
কই	২৩'৬	২'৮৪	১'৯৯
মাগুর	১৮'৯	৫	১'৮০
সিঙ্গি	২৪'৫৬	৪'২৬	২'৭৩
রুই	১৭'৫	১৬'৪	২'৩৬

প্রতীদ প্রধানতঃ মাংসপেশী ও লবণ অস্থি সংগঠনে সহায়তা করে। মেদ বলদায়ক। উপরোক্ত অঙ্কাদি হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, রোহিতের সহিত তুলনায় সত্বরে দেহ সংগঠনের ক্ষমতা ইহাদেরই অধিক। অন্য দিকে অধিক মেদযুক্ত রুইমাছের ন্যায় ইহারা গুরুপাক নহে। সম্প্রতি এই সমুদয় মাছে খাদ্যপ্রাণের (Vitamin) মাত্রা সম্বন্ধেও গবেষণা হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই সকল মাছের খাদ্য-মূল্য অল্প নহে। এই শ্রেণীর কতিপয় মাছে প্রতি ১০০ গ্রামে কত unit খাদ্য-প্রাণ আছে, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

	খাদ্যপ্রাণ ক	খ(১)	খ(২)
খলশে	৩৩	৩১	২৫
কই	২০	১০	২
মাগুর	১০	৮	৩৩
সিঙ্গি	২০	০	২০
শোল	২০	০	২
রোহিত	৮৩	১৮	৫০

রোহিতের সহিত তুলনায় জীয়ন মাছে খাদ্যপ্রাণ কম হইলেও যে পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ এই শ্রেণীর মাছে আছে, তাহাও নিতান্ত অল্প নহে; এবং সে দিক হইতে বিচার করিলে পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ভদ্রলোকের মধ্যে এ সকল মাছের আরও অধিক প্রচলন হওয়া উচিত, সাধারণ দরিদ্রদের ত কথাই নাই। তাহারা খুব কম দিনই মাছ পায়, এবং যখন পায়, তখন অধিকাংশ সময় এই সকল মাছই পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার পরিমাণও অল্প। তাহাদিগের পক্ষে এরূপ মাছ সুলভ ও সহজলভ্য হইলে সাধারণ স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হওয়াই সম্ভব।

উন্নতি-সাধন

জীবন্ত মৎস্যের খাদ্যমূল্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা অবশ্য সুপুষ্ট ও সুস্থ মৎস সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। কিন্তু সাধারণতঃ, বাজারে এই শ্রেণীর যে সকল মৎস্য আমদানী হয়, তাহাদিগের অবস্থা প্রায়ই সন্তোষজনক নহে; এবং কার্য্যতঃ তাহা হইতেও পারে না। কারণ, ধরিবার সময় হইতে ব্যবহারের সময় পর্য্যন্ত অনেক সময় ১০।১৫ দিন অতীত হয়। এই দীর্ঘকাল মাছগুলি অনাহারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অল্প মূল্যের কিছু কিছু মৎস্য-খাদ্য যদি এই আবদ্ধ মৎস্যগুলিকে প্রদান করা হয়, এবং রাখিবার স্থানের পরিসর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিয়া মাছগুলিকে নড়া-চড়া করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে খাদ্যহিসাবে জীয়ন মৎস্যের উৎকর্ষতা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অপচয় ঘটিতেছে।

জীবন্ত মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাদের চাষ স্বতন্ত্র ভাবেই হওয়া উচিত। ইহাদের হিংস্র

প্রকৃতির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই কারণেও ইহাদিগকে রুই-কাতলা প্রভৃতি হইতে পৃথক রাখাই সঙ্গত। ডোবা ও ছোট পুকুরে এরূপ মাছের চাষ সহজেই হইতে পারে। জলাশয় পরিষ্কার রাখা ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। এ দেশে মৎস্যাদির জীবনবৃত্তান্ত এখন পর্য্যন্ত তেমন ভাবে সংগৃহীত হয় নাই; জীবন্ত মাছ সম্বন্ধেও তাহাই বলা চলে। অথচ এই প্রকার তথ্যের উপরেই মৎস্যজাতির উন্নতি নির্ভর করিতেছে। কই মাগুর প্রভৃতি মাছ বৎসরের কোন্ সময় এবং কিরূপ অবস্থায় সন্তান প্রজনন করে, পোনা হইতে পরিণত অবস্থায় আসিতে কত সময় লাগে, জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইহাদের আহার্য্য কি, ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণার ফলে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংগৃহীত হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহাদের প্রজনন, সংরক্ষণ ও প্রসার বৃদ্ধি সংসাধিত হইতে পারিবে। আশা করি, অদূর-ভবিষ্যতে এই চেষ্টা সফল হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

কুহুধ্বনি

কুহুধ্বনি তব ঋতুরাজ,
আমার উদাস-চিত্তে জাতিস্মর করে দিল আজ।
মনে পড়ে এক দিন করি বনে হরিণ শিকার
গুহায় ফিরিতেছিনু, শুনি কুহুধ্বনিটি তোমার
হারানু গুহার পথ দিশেহারা! পড়িতেছে মনে,
আর এক দিন তব কুহুধ্বনি পশিয়া শ্রবণে

অগ্নিমন্থ-মন্ত্রোচ্চারে হলো ভুল কবে যজ্ঞস্থলে,
ঋত্বিক রুষিল তায়। বসি ঋষি-শিষ্যের মণ্ডলে
কবে সে গুরুর প্রশ্নে অবান্তর দিলাম উত্তর,
লভিলাম তিরস্কার! দায়ী কে? তোমারি কুহুরব
আজি মনে পড়িতেছে। বিদিশা কি অবন্তীনগরে
মনে নাই, ছুটিলাম আত্মহারা তব কুহুস্বরে
রহিতে নারিনু গৃহে জুটিলাম বসন্ত উৎসবে
পুর-নর-নারী-দলে। মনে পড়ে পুনঃ সেই কবে
নালন্দার আম্রকুঞ্জ হতে এসে ও-ধ্বনি তরল
কাষায়গুণ্ঠিত মোর ভিক্ষুব্রত করিল চঞ্চল।
আগ্রা হতে চিতোরের পথে স্মরি কবে এক দিন
ছুটিতেছিলাম দৌত্যে অশ্বপৃষ্ঠে হয়ে সমাসীন
শুনিয়া কুহুর ধ্বনি, থমকিয়া চেয়েছিনু ফিরে
খুঁজিতে ধ্বনির উৎস। নদীয়ার সুরধুনীতীরে
ওই সুর শুনি মোর বিগলিত হলো কবে প্রাণ
লিখিলাম রাধিকার বিরহের বারমাস্যা গান।

নগরের উপকণ্ঠে পুনঃ আজি শুনি সেই রব,
বসন্ত এসেছে নামি মর্ম্মে মর্ম্মে করি অনুভব,
একই সেই রসাবেশ অনুভূত জন্ম-জন্মান্তরে,
যুগ-জনতারে ঠেলি জেগে ওঠে ওই কুহুস্বরে!
যে পৃথিবী আর নাই, ভাঙা-গড়া রূপ-রূপান্তর
তাহারে ভুলায়ে দেছে—সে-সৃষ্টিরে চেনাই দুষ্কর!
যুগে যুগে স্তরে স্তরে বিবর্ত্তিত মানব-সভ্যতা
রূপান্তর লভিয়াছে জীব-যাত্রা, তার রীতি-প্রথা
এ যেন নূতন গ্রহ! এক শুধু তব কুহুধ্বনি
অব্যয় বিবর্ত্তহীন অবিকৃত নিত্য সনাতনী।
যে দিন বর্ব্বর ছিনু শুনেছিনু বনগুহা-মাঝে
যে ধ্বনি, এ সভ্য কর্ণে সেই ধ্বনি তেমনিই বাজে।
মম জন্মগুলি যেন তব কুহুধ্বনির সূতায়,
মাল্য হয়ে আজি বন্ধু মহাকাল-কণ্ঠে শোভা পায়
ছন্দে ছন্দে তালে তালে। জাগে আজ মনশ্চক্ষে মম
সহস্র জনম মোর স্বপ্নময় ছায়াচিত্র সম।

আদিম জনমভূমি গিরিদরী হইতে উদ্গীত
একখানি গীতি যেন শত যুগ করি বিমথিত,
বিংশ শতাব্দীর এই নগরের উপকণ্ঠ-বনে
স্পর্শ করে অন্তরাত্মা তব কুহু কণ্ঠের বাহনে।

শ্রীকালিদাস রায়।



২৯

টেবিলের উপর স্বর্ণদ্যুতির চিঠি। বীণা চিঠি পড়িতেছিল ...স্বর্ণদ্যুতি লিখিয়াছে—

তুমি এখন কি করছো, বলবো? আমার কথা ভাবছো! তোমার মনে হচ্ছে বায়ু বহে পূরবৈয়া—নিদ্ নহি বিন্নু সৈঁইয়া!

আমি thought-reading জানি, না সলিলা?

বীণার দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সকলের কতখানি সরল-বিশ্বাসে বীণা কি নিষ্ঠুর আঘাত দিয়াছে! অথচ কেহ তার কাছে এতটুকু অপরাধ করে নাই!

মন বলিয়া উঠিল, এ ছলনা আর নয়! এ ছলনা শেষ করিয়া ফ্যাল্...

চিঠি রাখিয়া বীণা কাগজের প্যাড্ টানিয়া লিখিতে বসিল। লিখিল,

প্রিয়তম

কখনো তোমায় এ-নামে ডাকিনি। আজ প্রথম-বার আর শেষ-বারের মতো ডাকছি—প্রিয়তম...আমার প্রিয়তম!

তুমি জানো না, কাকে তুমি তোমার বুকের আসনে রাজ-রাণী করে বসিয়েছো! আমি সলিলা নই। আমি বীণা।

বিশ্বাস করো! ওগো, আমি একবিন্দু মিথ্যা বলছি না। তোমরা বলবে, আমি যদি বীণা, তাহলে সলিলা হয়ে তোমাদের মাঝখানে এসে কেন বসলুম?

সেই কথাই তোমাকে আজ খুলে বলবো! আমার সব কথা শুনে তবে বিচার করো। ছলনার কথা শুনেই রাগে অন্ধ হয়ে আমাকে দণ্ড দিয়ো না।

আমার নাম বীণা। আমার বাবার নাম ছিল তারক হালদার। বাবা ছিলেন হুগলীর এক স্কুলে মাষ্টার। আমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। আমার খুব ছোট-বয়সে বাবা মারা যান। বাবার কথা মনে পড়ে না। বাবা মারা গেলে আমাকে নিয়ে আমার মা খুব বিপদে পড়লেন। মায়ের এক জ্ঞাতি-ভাই ছিলেন—আশু ঘোষাল। তিনি ছিলেন সাহেবগঞ্জের ষ্টেশন-মাষ্টার। সেই আশু-মামার ওখানে মা আমাকে নিয়ে আশ্রয় পেলেন। মা রান্নাবান্না করতেন, বাসন মাজতেন, কাপড় কাচতেন! অর্থাৎ মাকে পেয়ে বিনা-মাইনায় তাঁরা পেলেন বাঁদীকে-বাঁদী, রাঁধুনিকে-রাঁধুনি!

সেই আশু মামার আশ্রয়ে বাস করতো তাঁর এক সম্বন্ধী। সেকার হতভাগা শয়তান! তার নাম শ্রীপতি......

এই পর্য্যন্ত লিখিবার পর লেখা থামিয়া গেল। কলম আর চলিতে চায় না! চলিলে যে-সব কথা কলমে বাহির হইবে, সে-কথার বাতাসে পৃথিবী বুঝি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তার বেচারী দুঃখিনী মা! সেই মার কলঙ্কের কথা...মেয়ে হইয়া কি করিয়া মায়ের নামে কালির ছোপ্ লেপিয়া দিবে!

দু'চোখে জল...উদাস নেত্রে বীণা চাহিয়া রহিল বাহিরের পানে।

সামনে দুটো ঝাউ গাছ। বাতাসে ঝাউয়ের পাতা দুলিতেছে...চামর দুলাইয়া জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রিকে যেন অভিনন্দিত করিতেছে!

দূরে কে গান গাহিতেছিল। হিন্দী গান। গানের মর্ম্ম, তুমি আসিয়া কেন আমায় ডাকিলে না? কেন তোমার অভিমান হইল? নীরবে কেন চলিয়া গেলে?

দেউকী আসিয়া ডাকিল—বহুদি...

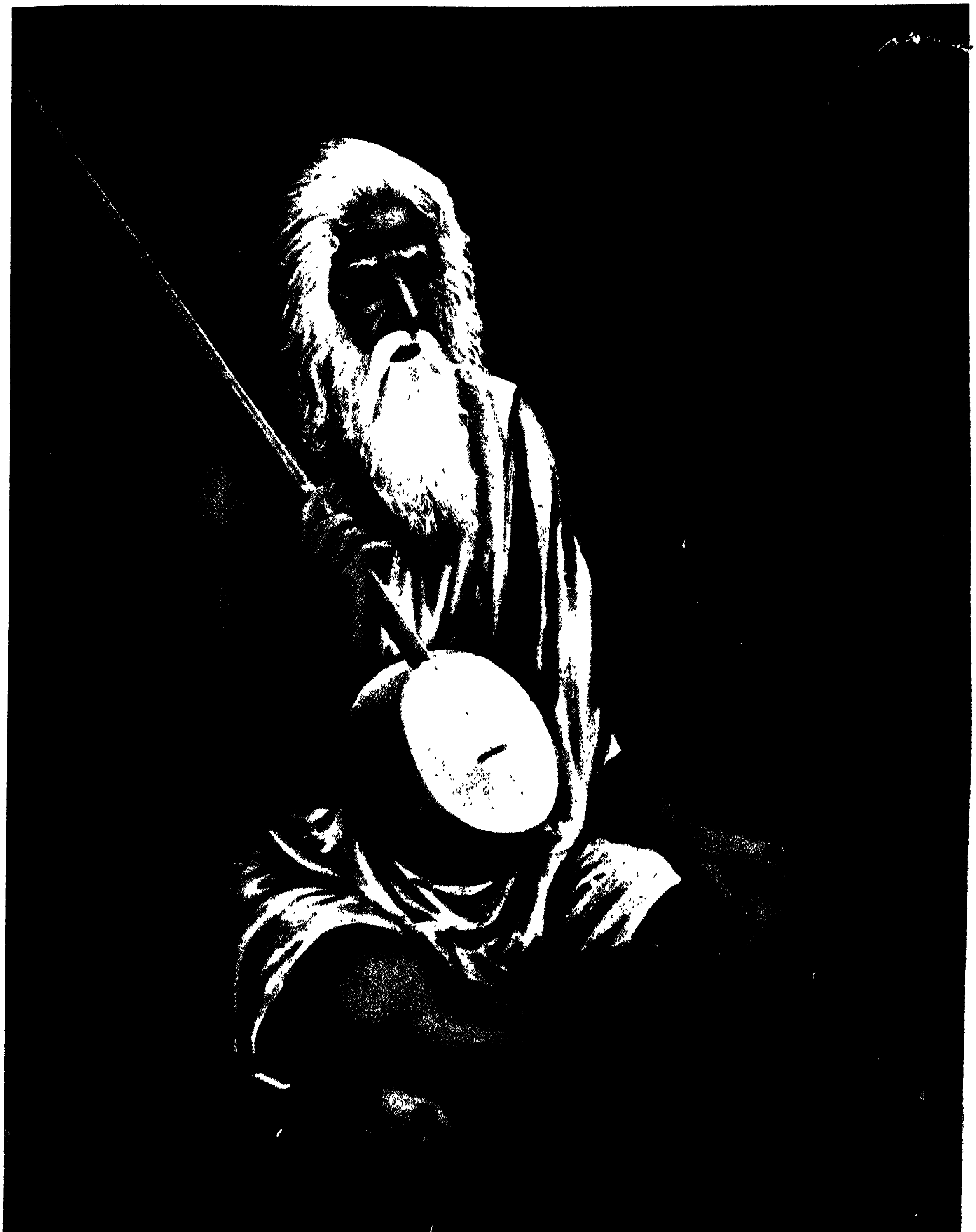
বীণা তার পানে চাহিল...তার চোখ যেন পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতো...

দেউকী বলিল—তেওয়ারী খাবার দেছে।

বীণা বলিল—আমি খাবো না দেউকী...

দেউকী বলিল,—তুমি যে বললে খাবার দিতে...

একটা উদ্গত নিশ্বাস রোধ করিয়া বীণা বলিল,—তখন বলেছিলুম। কিন্তু খিদে নেই, মনে হচ্ছে! খেয়ে যদি অসুখ করে?



প্রভাতী-বন্দনা

চৈত্র, ১৩৪৭] [শিল্পী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ আচার্য্য

অসুখ! দেউকী বলিল—তবে থাক…

বীণা আরাম বোধ করিল, বলিল—হ্যাঁ। তোরা খেয়ে নিগে যা…আমার জন্য বসে থাকিসনে।

দেউকী বলিল,—তোমার মামাবাবু বলে গেলেন, ফিরে আসবেন…

বীণার বুকখানা ধক্ করিয়া উঠিল! বীণা বলিল,—তা হোক। কখন কে আসবে বলে বসে থাকিস্‌নে! তিনি এলে তেওয়ারী তাঁর খাবার দেবে'খন! যা, বুঝলি?

দেউকীর সান্নিধ্যও বীণার সহ্য হইতেছিল না! তাকে বিদায় করিতে পারিলে বীণা যেন বাঁচে!

বীণার কথা দেউকী মানে। এ-কথায় সে চলিয়া গেল।

বীণা ভাবিল, মামাবাবু শ্রীপতি নয় তো?

এ চিন্তা মনে জাগিবামাত্র বাহিরে চাঁদের আলো চকিতে নিবিয়া গেল!

বীণা ভাবিতে বসিল…

যদি শ্রীপতিই হয়? এই রাত্রে আসিয়া যদি গোল-মাল করে? দাসী-চাকরদের সামনে? স্বর্ণদ্যুতি থাকিলে হয় তো সাহস হইত না! স্বর্ণদ্যুতি নাই…সলিলা-বেশে এখানকার কর্ত্রী সাজিয়া থাকিলেও শ্রীপতি জানে, সে সলিলা নয়, বীণা! কাজেই বীণার মান-সম্ভ্রমের পানে বা নিজের বিপদের পানে সে চাহিয়া দেখিবে না!

বীণা ভাবিল, আর নয়! এ-চিঠি লিখিয়া শেষ করা চাই! মা তার কি সর্ব্বনাশ যে করিয়া গিয়াছে! শয়তান শ্রীপতি মা'কে কি-মোহে ভুলাইয়াছিল যে, সে-মোহে নিজের কথা ভুলিলেও নিরপরাধ মেয়ের কথা মা'র মনে জাগে নাই?

মানুষের এক-নিমেষের ভুল! সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কত জনকে কত ভাবে না করিতে হয়!

বুকের মধ্যে অশ্রুর পাথার একেবারে উথলিয়া উঠিল! কি দুরাশায় ভর করিয়া বীণা নিজেকে আজ কোথায় আনিয়াছে? এখানে তার ঠাঁই হইতে পারে না। এখন কোন্ রসাতলে যে গিয়া পড়িবে…

বীণার পায়ের নীচে হইতে বিশ্ব-সংসার যেন কোথায় সরিয়া চলিয়াছে…

চেতনা ফিরিতে মনে হইল, মা'র উপর তার মিথ্যা অভিমান! মা'র কি দোষ? মা তো বলে নাই, সলিলা সাজিয়া তুই পরের ভাগ্য চুরি কর্!

বেচারী তারাচরণ রায়! বেচারী স্বামী!

চোখের সামনে জাগিল দিনের প্রখর আলো…কাণের কাছে মত্ত গর্জ্জনে হুঙ্কার তুলিল সংসারের অট্টহাসি… যে-কাজ করিয়াছিস্, কার কাছে মার্জ্জনার প্রত্যাশা করিস? কার কাছে আশ্রয় চাহিবি? কে তোকে বিশ্বাস করিবে? ওরে অবিশ্বাসিনী…ওরে…ওরে…

বীণা স্থির করিল, যে-কাজ করিয়াছে, তার চেয়ে কি বড় পাপ হইবে নিজের সত্য পরিচয় দিতে অকপটে যদি সে মায়ের কথা আজ প্রকাশ করে?…আর কারো কাছে নয়! তারাচরণ রায়ের কাছে…স্বর্ণদ্যুতির কাছে! পৃথিবী তাকে না বুঝিয়া অবিচারে যত-বড় কঠিন দণ্ড দিক, সে গ্রাহ্য করিবে না! কিন্তু তারাচরণ রায় আর স্বর্ণদ্যুতি?… তাদের কাছে সব কথা সে খুলিয়া বলিবে! আর কেহ বীণাকে না বুঝুক, এঁরা দু'জনে যদি বুঝিতে পারেন…

এঁরা বুঝিলে রৌরব-নরকে গিয়াও বীণা আরাম পাইবে!

বীণা আবার চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল নিজের জীবনের পরিচয়…যা-যা ঘটিয়াছিল! এবং নিমেষের যে-খেয়ালে তারাচরণ রায়কে সে চিঠি লিখিয়াছিল…

মস্ত চিঠি! চিঠি লিখিয়া সে-চিঠি খামে পুরিয়া লেফাফার উপরে লিখিল…

শ্রীযুক্ত স্বর্ণদ্যুতি রায়
পরম-পূজনীয়েষু—

তার পর টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া খামখানি সে তার মধ্যে রাখিল।

ড্রয়ার বন্ধ করিয়া মনে হইল, তার জীবনে যেন পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছে! এ-জগতের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক শেষ!

এখন…?

দেহে-মনে প্রচণ্ড শিহরণ! না…মরিতে পারিবে না! মৃত্যু নয়! সে বাঁচিতে চায়…বাঁচিবে!…তবে এখানে নয়! এখানে সমাজ-সংসার! সে সমাজে, সে

সংসারে মান-সম্ভ্রম···তারাচরণ রায়ের পানে চাহিয়া, স্বর্ণেন্দু... পানে চাহিয়া লোকে হাসিবে···

না···

দূর হইতে সে দেখিতে চায়, তার এ সত্য পরিচয় জানিয়া বীণার বিচার ওঁরা কি করেন! ওঁরা কি বুঝিবেন না, রাজৈশ্বর্য্য ও সম্পদের লোভে বীণা এ প্রতারণার আশ্রয় লয় নাই ?

সেইটুকু···শুধু সেইটুকু যদি বীণা জানিতে পারে···

তার পর মৃত্যু আসিয়া যদি ডাকিয়া বলে, এসো বীণা···বীণা হাসি-মুখে খুশী-মনে মৃত্যুকে বরণ করিবে।

সে-মৃত্যুর আগে যেমন করিয়া পারে, তাকে বাঁচিতেই হইবে!

কিন্তু কোথায় ? কোথায় ? কেমন করিয়া বাঁচিবে ? নিজের সব অবলম্বন বিসর্জ্জন দিয়া বাঁচা কি সম্ভব ? মনে পড়িল ক্ষীরোদাময়ীর কথা···তার পর তিনকড়ি-দাদু··· উষাঙ্গিনী···কিরণ···

বুক চিরিয়া প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস!

—ভগবান···বলিয়া বীণা টেবিলের উপরে মাথা লুটাইয়া দিল···

যখন মাথা তুলিল, তখন নিঝুম-রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধতায় ভরিয়া আছে! আকাশের আসন ছাড়িয়া চাঁদ বিদায় লইয়াছে। আকাশের বুকে শুধু একরাশ নক্ষত্র! স্তম্ভিত দৃষ্টিতে নক্ষত্রগুলা তার পানে চাহিয়া আছে!

বীণা উঠিল। উঠিয়া খোলা খড়খড়ির সামনে আসিল। গাছ-পালার ফাঁক দিয়া ও-দিকে রাবেয়ার দোতলার ঘর ঐ দেখা যায়···ঘরে আলো জ্বলিতেছে! আলোর এতটুকু রশ্মি!

বীণার মনে হইল, ভাগ্যবতী রাবেয়া! ও যেন বিজলীবাতির আলো নয়···রাবেয়ার সৌভাগ্যের দীপ্তি!

বিগলিত মনে বীণা বলিল, তুমি ভাগ্যবতী···মায়ের স্নেহে মানুষ হইয়াছ বোন্···স্বামীর স্নেহে তোমার জন্মগত অধিকার! তোমার এ সুখ-সৌভাগ্য অক্ষয় হোক, অনন্ত হোক! আদর করিয়া বীণাকে তুমি সখী বলিয়া ডাকিয়াছিলে···কাল যখন শুনিবে, বীণা কে···কত-বড় ছলনায় কার সৌভাগ্য সে চুরি করিয়া ভোগ করিতেছিল···

বীণার ব্যথা কত বড়, বীণা কতখানি ভাগ্যহীনা··· কি নিরুপায় অসহায়তায় পড়িয়া সে···তার জন্য একটু সৌভাগ্য কামনা করিয়ো বোন্···তার দুঃখ স্মরণ করিয়া তোমার চোখে শুধু দু'টি ফোঁটা অশ্রু! তোমাদের ভালোবাসার স্মৃতি ছাড়া বীণার আজ কিছু নাই! ওই স্মৃতি ছাড়া বীণার আর কোনো সম্বল নাই!

কিন্তু এখন ? এখন সে কি করিবে ?

এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে নিজেকে ভাসাইয়া দিবে ?

এ-অন্ধকারের ও-দিকে কি যে আছে!

পা সরিতে চায় না! মন বলিল, তার চেয়ে স্বামীর পায়ে পড়িয়া বলো, তোমার স্ত্রী নই···দাসী করিয়া এইখানে ফেলিয়া রাখো! পারিবে না···ওগো ?

মন আবার বলিল,—উষাঙ্গিনীর কাছে যাইবে ?

ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে চড়িয়া বসা···তার পর ট্রেণ গিয়া চুনারে থামিবে!

কিন্তু সেখানে গিয়া কি করিয়া··· ?

ভগবান্···ভগবান্···ক'ঘণ্টার মধ্যে এ তুমি কি করিলে প্রভু! পৃথিবীতে এমন একটু ঠাঁই রাখিলে না যেখানে গিয়া বীণা ক্ষণেকের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়াইতে পারে!

চিন্তার তীক্ষ্ণ শরে জর্জ্জরিত বুক লইয়া বীণার রাত্রি কাটিল!

৩০

ভোরের আলো, ভোরের বাতাস কি সম্ভাবনা যে বহিয়া আনিল! বীণা ভাবিল, রাত্রে ভাগ্যে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হয় নাই!···এ-বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ? অপরাধ করিয়াছে! সে-অপরাধের শাস্তি সে লইবে···স্বামীর হাতে···সে শাস্তি যত কঠোর হয়, হোক! চোরের মতো আসিয়াছে···কিন্তু যে আদর-ভালোবাসা পাইয়াছে···চোরের মতো চলিয়া গিয়া সে-আদর, সে-ভালোবাসার অপমান সে করিবে না!

চুপ করিয়া বীণা নিজের ঘরে বসিয়াছিল, দেউকী আসিয়া বলিল—উঠেছো বহুদি···

বীণা চাহিল দেউকীর পানে। তার মূর্ত্তি দেখিয়া দেউকী শিহরিয়া উঠিল! এ যেন তার সে বহুদি নয়··· বহুদির কঙ্কাল যেন শ্মশান ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে!

দেউকী বলিল—সারা রাত ঘুমোওনি বুঝি?

বীণা কহিল—না। সারা রাত কাল ভয়ঙ্কর মাথার যাতনা গেছে দেউকী!

দেউকী বলিল—মোহনলালকে বলি, ডাংদার-সাবকে ডেকে আনুক!

মুখে মলিন হাসি···বীণা বলিল—না রে, ডাংদার-সাবের দরকার নেই। মাথা ধরা ছেড়েছে···চান করে ঘুমোলেই শরীর ঠিক হবে।

দেউকী বলিল—তা হলে চান করো। আমি তোমার দুধ আর হালুয়া নিয়ে আসি।

বীণা বলিল—হবে'খন। ব্যস্ত হোস্‌নে।

দেউকী ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর বলিল—তোমার মামাবাবু কাল রাত্রে ফিরেছেন। তখন বারোটা বেজে গেছলো। আমি এসে দেখি, তুমি টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছ···তাই আর ডাকিনি। তেওয়ারী ওঁকে খাইয়েছে। নীচে দক্ষিণের ঘরে বিছানা হয়েছিল··· ঘুমিয়েছেন।

একাগ্র মনে বীণা কথাগুলা শুনিল—কোনো জবাব দিল না।

দেউকী বলিল—এখন চা খেয়েছেন। বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। আজ আবার উনি নাকি কাশী যাবেন···কি কাজ আছে!

বীণার বুকের মধ্যে আবার সেই সাগরের উত্তাল তরঙ্গ। এ-তরঙ্গ থামিয়াছিল, দেউকীর কথায় আবার···

বীণা বলিল—কোথায় সে-লোক?

দেউকী বলিল,—নীচে আছে। বসবার ঘরে।

বীণা বলিল—আচ্ছা, তুই যা। আমি গিয়ে দেখা করবো'খন।

দেউকী চলিয়া গেল।

বীণা বিলম্ব করিল না···ধীর-পায়ে নীচে নামিয়া আসিল। একেবারে স্বর্ণদ্যুতির বসিবার ঘরে আসিল।

দেখে···যা ভাবিয়াছিল···শ্রীপতিই!

বুক কাঁপিল। চকিতের জন্য। বীণা বুক বাঁধিল এখনো ভয়? কেন? কিসের জন্য?

স্পষ্ট রুক্ষ স্বরে বীণা বলিল,—এখানে এসেছো তুমি! এর মানে?

দাঁত বাহির করিয়া হাসির গঙ্গা বহাইয়া শ্রীপতি বলিল আসবো না? মেয়ে কেমন সুখে বাস করছে, দেখবার সাধ হয় না?

বীণা বলিল,—তোমার মেয়ে এখানে কেউ নেই তো যে, তার সুখ দেখবার জন্য তোমার সাধ হবে!

শ্রীপতি বলিল—আমার ভুল হয়েছে, বটে! তুমি এখন বড়-মানুষের নাত্‌নী···তুমি বীণা নও···সলিলা!

বীণা বলিল,—আমি সলিলা নই। আমি বীণা।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া শ্রীপতি বলিল—তা হলে আমার আসা অন্যায় হলো কোন্‌খানটায়?

বীণা বলিল—সে-কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলবার মতো সময় বা ধৈর্য্য আমার নেই।···আমি তোমায় স্পষ্ট কথা বলতে এসেছি···শোনো, এ-বাড়ীতে এক দণ্ড তোমার থাকা হবে না। এখনি তুমি চলে যাও···

বীণার কঠিন ভঙ্গী দেখিয়া শ্রীপতি বিস্মিত হইয়াছিল। এমন ভঙ্গী শ্রীপতি জন্মে কখনো দেখে নাই! বীণার এ-কথায় তার সে-বিস্ময় বাড়িল। শ্রীপতি বলিল,—এক-কথায় চলে যাবার মতো লোক আমি নই, তা বোধ হয় তুমি জানো বীণা!

বীণা বলিল—আমি কি জানি, না জানি, সে-কথা তোমার মুখে আমি শুনতে আসিনি!···তুমি এখনি এখান থেকে চলে যাবে কি না, আমি শুধু তাই জানতে চাই।

শ্রীপতি ভ্রূকুটি করিল; বলিল—আমি যাবো না।

বীণা বলিল—হুঁ···তা হলে তোমার হাত ধরে বাড়ীর বার করে দেবার জন্য আমার লোক-জনকে হুকুম দিতে হবে, দেখছি!

রাগে শ্রীপতি ফোঁশ করিয়া উঠিল। কহিল—সে সাহস তোমার হবে?

—সাহস!

—হ্যাঁ। সে-সাহসের ফলে কি হতে পারে, জানো?

অবিচল কণ্ঠে বীণা কহিল—আমি জানি, আমার

কিছুই হবে না। তুমি আমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না,—এটা তুমি জেনে রেখো!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিদ্রূপের সুরে শ্রীপতি কহিল—এমন গভীর প্রেম! বটে!

বীণা হস্ত প্রসারিত করিয়া তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে বলিল—যাও…ও-চেয়ারে বসেছো…এত-বড় তোমার আস্পর্দ্ধা! যাও, এখনি বেরিয়ে যাও

শ্রীপতি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল…বীণার পানে চাহিয়া…তার দু' চোখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

বীণার চোখেও অগ্নি-শিখা! বীণা ডাকিল—দেউকী…

দেউকী আসিল। বীণা বলিল—দরোয়ানকে ডাক্… এ এক জন বদমায়েস্! এর ঘাড় ধরে দরোয়ান একে এখনি বাড়ীর বার করে দেবে। যা…

বীণার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতেছে…বাতাসের দোলায় কিশলয়-পল্লবের মতো! বীণার এমন মূর্ত্তি দেউকী কখনো চোখে দেখে নাই!…সে কেমন বিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল!

বীণা কহিল—যা…দাঁড়িয়ে রইলি যে! এখনি দরোয়ানকে ডেকে নিয়ে আয়…

দেউকী চলিয়া গেল।

বীণা কহিল—ভেবেছো, চোখ রাঙিয়ে চিরদিন চলবে? …তোমার ও চোখ-রাঙানির ভয় আমি করি না! পথের কুকুর কোথাকার…নাই পেয়ে আস্পর্দ্ধা তোমার…

শ্রীপতি এবার চটিল। বলিল—এই পথের কুকুরের পায়েই তোমার গর্ভধারিণী-মা এক দিন…

অভাগিনী মায়ের নামে বীণার বুকে যেন নৃমুণ্ডমালিনী মহা-কালী নাচিয়া উঠিলেন! বীণার পায়ে ছিল শ্লীপার। পা হইতে সেই শ্লীপার খুলিয়া সে-শ্লীপার সবেগে বীণা নিক্ষেপ করিল শ্রীপতির মুখ লক্ষ্য করিয়া। শ্লীপার আসিয়া পড়িল শ্রীপতির কপালের উপর…

শ্রীপতি গর্জ্জন করিল—জুতো মারা! তবে রে মেয়ের নিকুচি করেছে! অতসীর মেয়ে বীণা…সেই বীণা…

কথাটা বলিয়া শ্রীপতি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সজোরে বীণার হাত চাপিয়া ধরিল…

সেই মুহূর্ত্তে দেউকীর সঙ্গে দরোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল ঘরের দ্বারে…

বীণা কহিল,—ডাকু…

এ-দৃশ্য দেখিয়া নেপালী দরোয়ান বাহাদুর একেবারে বাঘের মতো শ্রীপতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার গলা টিপিয়া হাঁটুর গুঁতায় তাকে মেঝেয় ফেলিল, তার পর মারিল লাথি-ঘুষি-গাঁট্টা। শ্রীপতিকে বাহাদুর যেন পিষিয়া মারিবে…শ্রীপতির মুখে কথা সরিল না… শ্রীপতির দু' চোখ কপালে উঠিল!

বীণা বলিল—আর মেরো না বাহাদুর। ওকে বাড়ীর বার করে দাও।

দেউকী বলিল—পুলিশে দাও বাহাদুর…

বীণা কহিল,—না…শুধু বার করে দাও। তার পর ভাখো, ওর কি জিনিষ-পত্তর আছে…সেগুলো ফেলে দাও। আর ওকে চিনে রাখো, এ-বাড়ীর ফটকে ও আর কখনো যেন মাথা গলাতে না পারে!

শ্রীপতির ঘাড় ধরিয়া তাকে ধাক্কা দিতে দিতে বাহাদুর ঘরের বাহির করিল…শ্রীপতি একবার শুধু দু' চোখে আগুন জ্বালিয়া গর্জ্জন তুলিল,— —আচ্ছা, অতসীর মেয়ে বীণার এর জন্য কি হাল হয়…

বীণা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল…কোনো জবাব দিল না!

শ্রীপতিকে বাহাদুর দরোয়ান ফটকের বাহির করিয়া দিল।

গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া শ্রীপতি বলিল—আমার ব্যাগ আর ছাতা?

দেউকী ব্যাগ ও ছাতা লইয়া আসিয়াছিল। বাহাদুর সে-ব্যাগ ও ছাতা ফটকের বাহিরে ছুড়িয়া দিল।

শ্রীপতি কহিল,—যদি বনবাসে না পাঠাতে পারি তো আমার নাম শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী নয়…

বীণার ভয় নাই…দ্বিধা নাই…যেন মস্ত বিপদের মেঘ কাটিয়া তার জীবনে সূর্য্য উঠিয়াছে!

শ্রীপতি সেই যে গিয়াছে, তার আর সাড়া-শব্দ নাই।

তার কথা বীণা জোর করিয়া মন হইতে দূর করিয়া দেয়! স্বর্ণদ্যুতির চিঠি আসে। সে লেখে, লক্ষ্মীছাড়া অফিস…যেন অক্টোপাশ! লেখে, সে আর পারে না!

এলাহাবাদে আসিবে···আসিয়া বীণাকে দিল্লী লইয়া যাইবে।

তিন দিন পরে স্বর্ণদ্যুতি টেলিগ্রাম করিল,—আসিতেছি।

টেলিগ্রাম পড়িয়া বীণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর স্নান করিয়া দেউকীকে ডাকিল, বলিল,—আজ আমি একটু বাইরে যাবো দেউকী···

—কোথায় বহুদি ?

—চুণার। সেখানে আমার এক পিশিমা আছে, জানিস্ তো! সেই যে একবার তোর সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম।

দেউকী বলিল,—হ্যাঁ···

বীণা বলিল,—কাল রাত্রে আমার সেই পিশিমাকে স্বপ্ন দেখেছি···তাঁর জন্যে মন ভারী অস্থির হয়ে আছে। হয় তো দু' একদিন সেখানে থাকবো। তোর সাহেব তো এখানে নেই·· তোরা ঘর চৌকি দিতে পারবি না ?

দেউকী কোনো জবাব দিল না। তার মনে মেঘের মতো অনেক প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল···ঐ যে লোকটি মামা-পরিচয়ে আসিয়াছিল, সে এমন দুর্বৃত্ত···তাকে দেখিয়া অবধি দেউকীর মনে অশান্তি···লোকটা যেন কেমন-এক ধাতের···

বীণা বলিল,—ও-লোকটা বাড়ীতে যেন না ঢোকে, খবর্দ্দার! ও সর্ব্বস্ব নিয়ে যেতে পারে। কলকাতায় একবার গিয়েছিল·· ওকে খুব সাবধান!

ষ্টেশনে আসিয়া চুণারের টিকিট কিনিয়া বীণা ট্রেণে উঠিয়া বসিল। দেউকী বার-বার বলিল,—বাহাদুর সঙ্গে যাক্, নাহ'লে সাহেব রাগ করিবেন। হাসিয়া বীণা জবাব দিল,—না রে না, তোর সাহেবকে আমার চেয়ে তুই বেশী জানিস্ ?

দেউকী বলিল,—এক-কাপড়ে চললে বহুদি! গায়ে গয়না নেই ··কাপড়চোপড় সঙ্গে নিলে না ?

হাসিয়া বীণা বলিল,—গয়না গায়ে ট্রেণে চড়ে শেষে চোরের হাতে প্রাণ দোবো! আর কাপড়-চোপড় ? আমার পিশিমার কি কাপড়চোপড় নেই ? তাছাড়া দু'দিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি···সেখানে থাকতে যাচ্ছি না তো!

ট্রেণ চলিয়াছে। কামরায় বসিয়া বীণা ভাবিতেছিল আর-এক দিনের কথা। সেদিনও ট্রেণে চড়িয়া চুণারে যাইতেছিল···সঙ্গে ছিল স্বামী স্বর্ণদ্যুতি।···তার আগে আর-এক দিন···যে-দিন ট্রেণে চড়িয়া কলিকাতা ছাড়িয়া এলাহাবাদে আসে। সে-দিনের সে-যাত্রায় বৈসূচন দেখা দিয়াছিল। কে জানিত, বজ্রের মতো তা তার জীবনকে এত-শীঘ্র দগ্ধ ভস্ম করিয়া দিবে!

স্বামী···স্বামীর ঘর···স্বামীর আদর···

হায় রে, একান্তে বসিয়া বিধাতা তার ভাগ্যে যে-লেখা লিখিয়া দিয়াছেন, কোমর বাঁধিয়া সে গিয়াছিল ভাগ্যের সে-লেখা উল্টাইয়া দিতে! এখন···

যেমন মানুষ, সে যদি তেমনি থাকিত···

কিন্তু রাজ-সিংহাসনের লোভ বীণা করে নাই! সিংহাসনের লোভ কোনো দিন মনে জাগে নাই! সকলের পিছনে···সকলের পায়ের কাছে শুধু নিরাপদ একটু ঠাঁই! তার বেশী সে প্রত্যাশা করে নাই—কোনো দিন না!

এখন চুণারে চলিয়াছে ··তার পর ?

পরের কথা বীণা আর ভাবিতে পারে না! ভাবিবার মতো শক্তি বা বুদ্ধি তার নাই।

৩১

চুণার।

টিকিট দিয়া প্লাটফর্ম্ম হইতে বীণা বাহির হইবে, সামনে তারাচরণ রায়।

তারাচরণ রায় চমকিয়া উঠিলেন, ডাকিলেন,—দিদি···

বীণার মনে হইল, ভূমিকম্প হইয়া পৃথিবীখানা ফাটিয়া গিয়াছে এবং সেই ফাটা-মাটীর নীচে যেন তার পাতাল-প্রবেশ!

তারাচরণ রায় বলিলেন—এখানে ?

কোনো মতে বীণা মুখ তুলিল। দু' চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি!

তারাচরণ রায় বলিলেন—একা!···স্বর্ণ ?

বীণার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া কাঁপনের স্রোত··· সে-স্রোতে নিজেকে খাড়া রাখা যায় না!

তারাচরণ রায় দু'হাতে বীণাকে ধরিয়া ওয়েটিং-রুমে আনিয়া বসাইলেন।

বীণা যন্ত্র-চালিতের মতো বসিল।

একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া তারাচরণ রায় সেই চেয়ারে বসিলেন; বসিয়া বীণার পানে চাহিলেন।

বীণার পৃথিবী তখন কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছে! বীণা যেন পৃথিবীর বাহিরে পড়িয়া আছে·· সামনে তারাচরণ রায়! তাঁর দু' চোখে এখনো সেই স্নেহের দৃষ্টি···মনে হইতেছিল, ও-দৃষ্টি যেন সত্য নয় —আগেকার সে-দৃষ্টির স্বপ্ন-স্মৃতি!

তারাচরণ রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমি বুঝেছি, দিদি···সে-লক্ষ্মীছাড়াটা তোমার ওখানে নিশ্চয় গিয়েছিল। কলকাতায় আমাকে সেই ভয় দেখিয়েই এসেছিল···

এ-কথায় সরিয়া-যাওয়া-পৃথিবী আবার যেন বীণার বুকের কাছে আগাইয়া আসিল! সে পৃথিবীর সঙ্গে সেই প্রীতি-ভালোবাসা···সেই দ্বিধা-সংশয়···সেই দারুণ বিভীষিকা···

বীণা কোনো কথা বলিল না···ভয়াতুর দৃষ্টিতে তারা-চরণ রায়ের পানে চাহিয়া রহিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন—স্বর্ণ এখন দিল্লীতে · না?

নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা বলিল,—হ্যাঁ···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—বুঝেছি।

তার পর বীণার মুখে-চোখে সস্নেহে হাত বুলাইলেন; বুলাইয়া তিনি বলিলেন—তুমি চলে এসেছো···আমার ভয় করছে দিদি!

ট্রেণের কামরায় বসিয়া বীণা নিজের সম্বন্ধে সব কথা ভাবিয়া শেষ করিয়াছে! ভাবিয়া ঠিক করিয়াছে, উষাঙ্গিনীর কাছে মুখের কথায় সে সব বলিবে। চিঠির লেখায় নয়! সব কথার শেষে উষাঙ্গিনীকে এ-কথাও বলিবে, কোনো দিক দিয়া তার নিজের কোনো অপরাধ নাই! মায়ের ভুল···সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যদি তাকে করিতে হয়···

ইহার বেশী আর সে ভাবিতে পারে নাই! উষাঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিবে, বীণা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তুমি বলিয়া দাও পিশিমা···

তারাচরণ রায়ের প্রশ্নে তার বুকখানা একবার দুলিয়া উঠিল। তার পর সে-বুক চাপিয়া মাড়াইয়া বীণা বলিল—আমায় ক্ষমা করো, দাদু। আমি তোমার সলিলা নই। বীণা। সলিলা স্বর্গে। সন্তোষ মামা আর চারুলতা-মামীমা আমাকে সলিলার মতো ভালো বাসতেন। আর আমি···

বলিতে বলিতে অশ্রুর বন্যায় বীণা একেবারে ফাটিয়া পড়িল!

তাকে বুকে টানিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন—তুমি বীণা নও, তুমি সলিলা নও, তুমি কেউ নও···আজ তুমি শুধু আমার দিদি···তুমি আমার সব!···জানো, আমার বুক একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল! বুকে পাথর এঁটে মানুষ বাঁচে না···বাঁচতে পারে না। আমিও বাঁচতে চাইনি ···কিন্তু না চাইলেও মানুষকে বাঁচতে হয়! সে বাঁচা কত-বড় দুর্ভোগ···আমার সে-দুর্ভোগ তুমি কি করে মোচন করেছো দিদি, তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি!

বীণা এ-কথার জবাব দিল না; বিমূঢ়ের মতো তারা-চরণ রায়ের পানে চাহিয়া রহিল

তারাচরণ রায় বলিলেন—আমি সব জানি, দিদি। তোমার বিয়ের পর যে-দিন তোমায় এলাহাবাদে পাঠাই, তোমাদের গাড়ী ছেড়ে যাবার পর প্লাটফর্মে একটা লোক আমার সঙ্গে এসে আলাপ করে। সে আমাকে সব কথা বলেছিল। টাকা দিয়ে আমি তার মুখ বন্ধ করি। একবার নয়··তিন-চার বার।··ভয় হয়েছিল, এ-কথা শুনে স্বর্ণ যদি···

বীণার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ-রেখা··

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তাই আমি টাকা দিয়ে লোকটাকে আটকে রেখেছিলুম। তার পর লোকনাথকে কাশীতে পাঠাই···যাঁর কাছে সেখানে তুমি থাকতে, ক্ষীরোদা দেবী···তাঁর কাছে সব খপর নিতে। লোকনাথ খপর নিয়ে ফিরলে লোকটাকে আমি বলি, কাগজে-কলমে সব কথা লিখে থোক্ একেবারে কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়ো

…নগদ পাঁচশো টাকা দেবো! সে রাজী হলো। লিখে দিলে, তোমার জন্ম পবিত্র, তুমি পবিত্র…তখনি তাকে দিলুম দিদি, পাঁচশো টাকা! তার পরে তার লোভ বাড়লো। সে আবার এলো। বললে, আবার টাকা চাই! তখন তাড়িয়ে দিলুম। বললুম, ফের এলে পুলিশে দেবো। সে চলে গেল। বলে গেল, এবার স্বর্ণদ্যুতির পালা! স্বর্ণদ্যুতি দেবে টাকা!…এ-কথা শুনে তখনি আমি বেরিয়ে পড়লুম। লোকনাথ কাশী গেছে ওঁদের আনতে…ক্ষীরোদাময়ী দেবীকে। ক্ষীরোদাময়ী দেবীকে নিয়ে এলাহাবাদে গিয়ে আমি এ-ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে চাই!

বীণা যেন কাঠ! তার চেতনা নাই…প্রাণের স্পন্দন যেন থামিয়া গিয়াছে!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এই পার্শেল-এক্সপ্রেসে ওরা এসে পৌঁছুবে। এখানে ওরা নামবে না। আমিও সেই ট্রেণে উঠবো। উঠে এক সঙ্গে সকলে যাবো এলাহাবাদ। ঊষাও আমাদের সঙ্গে যাবে।

বীণার মুখে কথা নাই! পাংশু, বিবর্ণ মুখ! পৃথিবীতে যেন মহাপ্রলয় ঘটিতেছে…এ প্রলয়ের পরে কি…আলো, না অন্ধকার, কে জানে!

এলাহাবাদে ট্রেণ থামিলে বীণাকে লইয়া সকলে আসিলেন স্বর্ণদ্যুতির গৃহে।

গৃহে বিপর্য্যয় কাণ্ড!

দিল্লী হইতে স্বর্ণদ্যুতি আসিয়াছে। আসিয়া বীণার লেখা সেই চিঠি পড়িয়া এবং বাড়ীতে বীণাকে না দেখিয়া দাসী-চাকরকে ভর্ৎসনা করিতেছে, বেইমান্! মা-জীর খবর রাখো না! এমন সময় শ্রীপতির আবির্ভাব…

নাম বলিয়া পরিচয় দিবা মাত্র স্বর্ণদ্যুতি নিঃশব্দে টেলিফোন্ করিয়া পুলিশ ডাকিয়া পুলিশের হাতে তাকে সমর্পণ করিয়াছে। চার্জ্জ দিয়াছে, ভয় দেখাইয়া টাকা-আদায়ের প্রয়াস!

বীণা আসিয়া চোরের মতো সেই যে নিজের ঘরে ঢুকিয়াছে, কাহারো সঙ্গে দেখা নাই, কথা নাই, কিছু না!

ওদিকে এক-তলার ড্রয়িং-রুমে তারাচরণ রায়ের সঙ্গে স্বর্ণদ্যুতির কথা হইতেছিল।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—দিল্লীতে আমার ঠিকানায় চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, কুলটার কন্যাকে নির্বাহ করেছেন ও-মেয়ের নাম সলিলা নয়; বীণা। ও তারাচরণ রায়ের পৌত্রী নয়! এ-কথা প্রকাশ পেলে কি হবে, ভাবো,—এমনি সব কথা লিখেছিল। পোষ্টকার্ডে। পোষ্ট-মার্ক দেখলুম এলাহাবাদ। ভয় হলো! ভাবলুম, ও এখানে একা…ছুঁচোটা বাড়ীতে এসে যদি উৎপাত করে! তাই ফার্স্ট ট্রেণে চলে এলুম।

তারাচরণ রায় হতভম্বের মতো বসিয়াছিলেন। কহিলেন—মিথ্যা কথা! সলিলা না হ'লেও ও-মেয়ের কোথাও এতটুকু গ্লানি নেই, কলঙ্ক নেই! সলিলা বলে আমার কাছে এসেছিল…আসবার পরেই ওর খুব অসুখ হয়। বিকার। সেই বিকারের ঘোরে অনেক কথা বলতো। বীণার নাম সেই সময়ে ওর মুখেই শুনি। তার পর তোমাদের বিয়ের আগে উড়ো-চিঠিতে আমি ওর দুঃখের কাহিনী জেনেছিলুম, দাদা। …ওর অমন মন! সে-কথা তাই গ্রাহ্য করিনি। করলে হয় তো এ-বিয়ে হতো না! …যদি বলো, ঐ দুঃসাহস? বয়স কচি হ'লেও শ্রীপতির হাত থেকে, শ্রীপতির অপমান থেকে মুক্তি পাবার জন্য কতখানি আকুল হয়ে আমার কাছে এসেছে, আমি তা বুঝেছিলুম! বেচারী!

তারাচরণ রায় চুপ করিলেন, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—যে-মেয়েকে যে-মাকে সন্তু আশ্রয় দিয়েছিল, আমার কাছে সে আজ কত আদরের …কত স্নেহের ধন! ক্ষীরোদা দেবীও বলেছেন, তখন কি-বা ওর বয়স, সন্তুর আর বৌমার কি সেবাই করেছিল এই বীণা!…তার উপরে দাদু, মানুষের দাম মানুষের পরিচয় তার নিজের আচারে, তার ব্যবহারে… তার স্বভাবে-সংযমে। ওর অসহায় অভাগিনী মা…হয় তো তাঁর এ ভুলের মূলে ছিল অনেকখানি নিরুপায়তা, অনেকখানি নিগ্রহ-লাঞ্ছনা! পরের আশ্রয়ে যে হতভাগিনীকে বাস করতে হয়, তার দুর্ভাগ্য কতখানি, আমরা তা ঠিক বুঝতে পারি না দাদু!

স্বর্ণদ্যুতি একাগ্র-মনে এ কথা শুনিল। শুনিয়া হাসিল; হাসিয়া সে বলিল—কিন্তু হঠাৎ আপনি এত সব কথা কেন বলছেন, বলুন তো দাদু?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তুমি ওকে বিবাহ করেছো, সে কি শুধু আমার পৌত্রী জেনে ? ওর নিজের দাম নেই ?

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—বিয়ের সময় মানুষ হয় তো বংশ-নামকে অবলম্বন করেই এ-ব্যাপারে নামে। কিন্তু পরে নামে-গোত্রে খুব যে রাজযোটক মিল হয় দাদু, তা তো দেখি না!...এক্ষেত্রে ওঁর যে পরিচয় পেয়েছি .. ওঁকে চিনেছি। নামকে আমি বিয়ে করিনি...বংশকেও বিয়ে করিনি, দাদু। ও বীণা নয়, সলিলা নয়, ও আজ শুধু আমার স্ত্রী। আমার স্ত্রীকে আমি চিনি।...শ্রীপতি যা বলেছে, তাতে বীণার কি অপরাধ?...কিন্তু গেল কোথায় বীণা? ভয়ে লুকিয়ে আছে? এই সে আমাদের চিনেছে? জেনেছে? পথের একটা দুর্মুখ এসে দু'কথা বলবে, আর মনে-জ্ঞানে নিরপরাধ জেনে আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করবো! কাব্য-নাটক-উপন্যাসের জবরদস্ত নায়ক আমি নই! কিন্তু না, বীণাকে দেখি...কি করছে? সে কোথায়?

বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্বর্ণদ্যুতি দোতলায় চলিল...

দোতলার বারান্দায় আসিয়া দেখে, উষাঙ্গিনী ও ক্ষীরোদাময়ী দেবী বসিয়া কথা কহিতেছেন।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—বীণা কোথায় পিশিমা?

উষাঙ্গিনী বলিল,—ঘরে।...আমি ডাকলুম। আমাকে বললে, আমায় একটু একলা থাকতে দাও, পিশিমা।

স্বর্ণদ্যুতি কোনো জবাব দিল না; ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘর ভরিয়া আছে। সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া স্বর্ণদ্যুতি দেখে, খাটের পাশে বীণা চুপ করিয়া বসিয়া আছে...মলিন মুখ...দু'চোখ বাষ্পোচ্ছ্বাসে আর্দ্র!

বীণার হাত ধরিয়া স্বর্ণদ্যুতি তাকে তুলিল, বলিল—আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবে না, বীণা? আমাদের অপরাধ?

বীণার স্তম্ভিত অশ্রু বাধা মানিল না...উচ্ছ্বসিত স্বরে বীণা কহিল—আমাকে তাড়িয়ে দাও...তাড়িয়ে দাও... সলিলা সেজে তার সব অধিকার যে চুরি করতে পারে...

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—কেউ কারো অধিকার চুরি করতে পারে না বীণা...তুমিও কারো অধিকার চুরি করোনি! এক রাজা মারা গেলে তাঁর সিংহাসনে যেমন অন্য রাজা বসেন, রাজত্ব করেন...দাদুর বুকের রাজ্যে তেমনি...

—না...না...আমাকে কোনো কথা বলে তোমরা বোঝাবার চেষ্টা করো না।...আমি চোর! এখানে থাকবো না...থাকতে আমি পারবো না। অপরাধের ভারে, গ্লানির ভারে...

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—ওগুলো নাটক-নভেলের কথা, বীণা। সত্যকারের সংসারে মানুষকে গ্লানি, অপরাধ, মায়া-মমতা, মহত্ত্ব সব নিয়ে বাস করতে হয়! যে-অপরাধের গ্লানি কল্পনা করে তুমি এমন কুণ্ঠিত হচ্ছো, তোমার সে-অপরাধে এক জন নিরুপায় বৃদ্ধ কতখানি প্রাণ পেয়েছেন...তোমার সে-ছলনায় কি মমতা-মায়ায় তাঁর সে-প্রাণ ভরে উঠেছে, নিজের চোখে তুমি দেখবে এসো বীণা!

বীণা কুণ্ঠাভরে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—আর আমি? তুমি আমার স্ত্রী... তুমি পুতুল নও...নিজের ভাগ্য যে-সাহসে গড়ে তুলেছো, তোমার সে-সাহসকে আমি শ্রদ্ধা করি। লাঞ্ছনা-অপমানের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তোমার এ-সাহস ...কথায় আমি বোঝাতে পারবো না বীণা। সে-কথা নাটকের মতো শোনাবে! শুধু জেনে রাখো, তোমার এ জয়-গৌরবে চির দিন আমি গৌরব বোধ করবো!

বীণাকে স্বর্ণদ্যুতি বাহুলগ্ন করিল।

তারাচরণ রায় ঘরে আসিলেন, বলিলেন—কপোত-কপোতী গুঞ্জন-গান করছো! বাঃ! বুড়ো দাদু ওদিকে দিদিমণির মুখের একটি কথা শোনবার জন্য আকুল...

বীণা নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না; তারাচরণ রায়ের পায়ের উপরে লুটাইয়া পড়িল। তার চোখে ঝর-ঝর-ধারে অশ্রুর ঝর্ণা...

তারাচরণ বলিলেন,—ওঠো দিদি। কাঁদে না! কান্না কিসের! আমার বুক যে-ভাবে তুমি ভরে তুলেছো, আশীর্ব্বাদ করি, এমনি সুখে তোমার বুক ভরে থাকুক! তোমাদের সুখ চির দিন অটুট হোক, অক্ষয় হোক!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শেষ



মা হওয়া

মেয়েদের মনে সবচেয়ে বড় কামন মাতৃত্ব বা মা হওয়া!

কিন্তু মা হওয়ার আগে শরীরকে মাতৃত্ব-গ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়া চাই। দেহ গড়িবার কথা পূর্ব্বে উঠিত না; এখন উঠিয়াছে। তার কারণ, নানা কৃত্রিম আচার-বিচারের ফলে মেয়েদের দেহ বেশ সুস্থ স্বচ্ছন্দভাবে আজ আর গঠিত হইতেছে না। সেজন্য প্রসবের বেদনা সহিতে না পারিয়া কত কিশোরী-জননীর যে ইহলোকের সব সাধ দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হইতেছে, তার আর সংখ্যা নাই! অথচ সন্তান-প্রসবের ব্যাপারটুকু মেয়েদের সহজাত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এ সম্বন্ধে এক জন পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন—Child-bearing is at once both miraculous and commonplace. It is as common as rain. অথচ নারী-জীবনের এই অতি-স্বাভাবিক ঘটনা আজ দারুণ শঙ্কাকুল হইয়াছে!

সন্তান-প্রসবের জন্য চাই মায়ের অম্লান অকলুষ স্বাস্থ্য। প্রসব-ব্যাপার খুবই জটিল। আমাদের দেশে মেয়েলি প্রবাদ আছে, প্রসবে বত্রিশ নাড়ীতে টান পড়ে। প্রসব-কালে প্রসূতির প্রাণ লইয়া মহা-সঙ্কটের আবির্ভাব হয়! কিন্তু যে-সব নারী সভ্যতার আবহাওয়ায় 'মানুষ' হইয়া প্রকৃতি-দত্ত বিধি বিসর্জ্জন দেন, প্রসবের সময় এ বিপদ তাঁদেরই ঘটে! যে সব নারী খাটিয়া খায়, মোট বহে, অর্থাৎ দেহখানিকে পরিশ্রম-বিমুখ করিয়া রাখে না, তাদের বেলায় দেখা যায়, প্রসবে কষ্ট নাই; প্রসবের পরে রোগশয্যায় পড়িয়া কোনো দিন তারা টনিক ঔষধাদি সেবন করে না; প্রসবের দু'তিন দিন পরেই শক্ত-সমর্থ দেহ লইয়া সংসারের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

এখানে সংসারের কাজে আত্মনিয়োগ করার কথাটাই বড় কথা নয়, বড় কথা নারীর সুপ্রসব ও স্বাস্থ্য।

কায়িক পরিশ্রমে অথবা ব্যায়ামে নারী-দেহে বস্তি-কোটর ও কুক্ষির অস্থি প্রভৃতি যথারীতি গড়িয়া ওঠে এবং তাহারি জন্য প্রসব-কালে তাঁদের প্রাণ লইয়া টানাটানি ঘটে না!

যে-সব নারীর pelvic region অর্থাৎ বস্তি-কোটর পরিপূর্ণ সুস্থভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রসবে তাঁদের বিন্দু-মাত্র দুশ্চিন্তা বা শঙ্কা নাই।

বেদিয়া, চাষাভুষা ও শ্রমিক-ঘরের মেয়েরা প্রসবে কষ্টভোগ করে না এবং প্রসবের পরে ক্ষয়রোগে তাদের দেহের অবসান ঘটে না। বিলাস-লীলায় মাতিয়া সোফা-কোচে শুইয়া থাকিব, বড়-জোর সিনেমা-পার্টিতে ঘুরিয়া দেহ নাড়িব,—ইহাতে মাতৃত্বের সাধ মিটিতে পারে না! পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন, Back to work is the clue to the ease with which the child is born. যে-সব নারী শুইয়া-বসিয়া না থাকিয়া পাঁচটা কাজ করিয়া গতর নাড়েন, প্রসবে তাঁদের ভয় নাই।

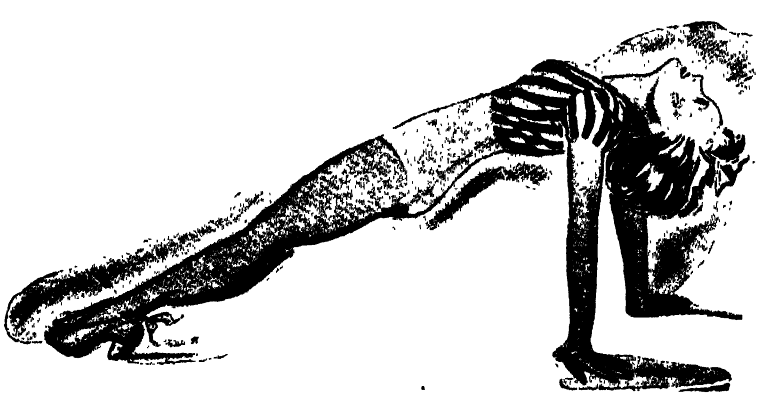
যাঁরা মনে করেন, জল তোলা বা রান্নাবান্নার কাজ পোষাইবে না, তাঁরা বিশেষ ব্যায়াম বিধি মানিয়া চলুন। আলস্য ছাড়িয়া কাজেকর্ম্মে পটু হইতে না পারিলে মাতৃত্বের আশা সাংঘাতিক-পরিণামে অবসিত হইবে! যাঁরা বলেন, অন্তর্ব্বত্নী-থাকা-কালে খাটাখাটুনি করিলে বিপদ ঘটিবে, তাঁরা ভ্রান্ত! খাটাখাটুনির অর্থে দেহ-খানিকে কর্ম্ম-বিমুখ বা অলস না রাখা—ঝাঁপ খাওয়া নয়!

মাতৃত্বের পক্ষে দেহকে উপযোগী করিয়া গড়া কঠিন নয়। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন—মাতৃত্বের জন্য নারীর চাই শক্ত-সমর্থ এবং সুস্থ দেহ; শক্ত-সমর্থ তলপেট (abdomen); এবং সবল (pelvic organs) বস্তি-কোটর। ঋতু-সম্বন্ধীয় গোলযোগ—বিশেষ ব্যায়াম-বিধিতে ঘুচিয়া যায়। এই ব্যায়ামের কথাই আজ বলিতেছি।

ব্যায়ামের পূর্ব্বে নিত্য খানিকক্ষণ করিয়া মুক্ত বাতাসে বিচরণ করা চাই। এ বিচরণকে ব্যায়াম বলিয়া জানিবেন। আসন্ন-প্রসবা নারীর পক্ষেও এ বিচরণ-ব্যায়াম সম্পূর্ণ নিরাপদ। কাজেই এ-ব্যায়ামে এতটুকু অবহেলা কদাচ উচিত হইবে না।

বিলাতী সভ্যতার ফলে আজ আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে অনেকে হাই-হীল জুতা পায়ে আঁটিতেছেন। হাই-হীল জুতা পায়ে দিয়া হাঁটিবার অভ্যাসে মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে pelvis এর গঠনে ও pelvic পেশীগুলি বিকৃত হয়। এজন্য সন্তান-প্রসবের সময় সঙ্কটের সীমা থাকে না! সুতরাং যাঁরা মাতৃত্ব কামনা করেন, হাই-হীল জুতা যেন তাঁরা আদৌ ব্যবহার না করেন।

তার পর চাই ব্যায়াম। ব্যায়াম না করিয়া দেহকে যদি আলস্যে বিজড়িত রাখি, তাহা হইলে শরীরে প্রচুর মেদ জন্মিবেই। মেদে দেহের শক্তি লোপ পায়। আলস্যের ফলে pelvis এর চারি দিকে যে পেশী সমূহ আছে, সেগুলি মেদ-ভারে ভরিয়া সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য বেকার হয়; প্রসবে তাই অনর্থ-সৃষ্টি।



১। দু'পায়ের গোড়ালি এবং দু' হাতের উপরে দেহের ভর

Pelvis এবং pelvic প্রদেশ-সমূহ সুস্থ স্বচ্ছন্দ রাখা চাই। তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যায়াম-বিধির উপকারিতা অপরিসীম।

১। মেঝের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া দু'হাতে ভর দিয়া জঘনদেশ ঊর্দ্ধে তুলুন। এ সময় দেহকে যথাসম্ভব কঠিন (rigid) রাখিতে হইবে। মাথা পিছন দিকে হেলাইয়া দিবেন। দেহের ভর দু'পায়ের গোড়ালির এবং দুই হাতের উপর রাখিতে হইবে। (১নং ছবি দেখুন) তার পর ধীরে ধীরে আবার বসুন। এ-সময় জোরে-জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিবেন। প্রথমে এ-ব্যায়াম চারবার করিয়া নিত্য করিবেন; তার পর বাড়াইয়া



২। দু' হাত এবং এক পায়ের উপর

দশ-বার। জঘনদেশ যখন ঊর্দ্ধে তুলিবেন, তখন নৃত্য ভঙ্গীতে আড়া-আড়িভাবে মৃদু তালে দুলাইবেন।

২। প্রথম ব্যায়ামের পর ২নং ছবির ভঙ্গীতে দুই পা জুড়িয়া কাৎ হইবেন। এ সময় দেহের ভার থাকিবে দুই হাত এবং একখানি মাত্র পায়ের উপর। এ ব্যায়ামে একবার ডান পায়ের উপর পরক্ষণে বাঁ পায়ের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া যথাক্রমে ডান-কাতে এবং বাঁ-কাতে দেহ দুলাইয়া চারবার ব্যায়াম করিবেন। অভ্যাস হইলে ব্যায়ামের মাত্রা বাড়াইয়া দশবার করিবেন।

৩। এবার ৩নং ছবির ভঙ্গীতে মেঝের দিকে মুখ করিয়া উপুড় হইয়া শুইবেন। কনুই হইতে করতল পর্য্যন্ত দুই হাত মেঝের উপর ছবির মতো লেপিয়া থাকিবে। তার পর দু'পায়ের আঙুলের উপর এবং দুই বাহুর অগ্রভাগের উপর ভর রাখিয়া দেহকে ঊর্দ্ধে তুলুন। জঘন-দেশকে যতখানি ঊর্দ্ধে তুলিতে পারেন,

তুলিবেন। এই ভাবে দেহকে দুলাইবেন। শ্বাসপ্রশ্বাস জোরে জোরে লইতে হইবে। যতক্ষণ না শ্রান্তিবোধ করেন, ততক্ষণ এ ব্যায়াম করিবেন।

৪। চিৎ হইয়া মেঝেয় শুইয়া পড়ুন। দুই পা



৩। দু' পায়ের আঙুল ও দুই হাত

এবং দুই হাত উর্দ্ধে তুলুন। দেহ হইবে ৪নং ছবির ভঙ্গীতে ধনুকের মতো। এই ভাবে দুই পা ও দুই হাত



৪। বাঁকিয়া পা ছোঁওয়া

তুলিয়া দুই হাতের আঙুল দিয়া দুই পা স্পর্শ করিবেন। এ ব্যায়াম নিত্য দু'বার চারবার মাত্র করিবেন।

ব্যায়ামে pelvic region বেশ সুস্থ-সবল থাকিবে এবং সন্তান-প্রসবে এতটুকু ক্লেশ বোধ করিবেন না। কিশোর-কাল হইতেই এ-ব্যায়াম করা প্রয়োজন। যাঁরা এক বা একাধিক সন্তানের জননী, তাঁরাও এ-ব্যায়ামে বহু উপকার লাভ করিবেন।

আহার

আজ আমাদের দেশে তরুণ-তরুণীর মনের স্বাস্থ্য শিক্ষায়-দীক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করিলেও তাঁদের দেহের স্বাস্থ্য দেখিয়া হতাশ হইতে হয়! কোথায় গেল তরুণের সে বলিষ্ঠ পেশী, প্রদীপ্ত পৌরুষ! কোথায় বা তরুণীর সে রূপ-লাবণ্য, যৌবনের সে পরিপুষ্ট নিটোল ছাঁদ! তরুণ-মহলে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া; এবং তরুণী-সমাজে আহারে অরুচি! চেহারায় তাই শ্রী নাই!

এই অস্বাস্থ্য-মোচনের জন্য সকলের একাগ্র-নিষ্ঠা চাই স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞেরা বলেন, Enjoyment of food indicates enjoyment of life. আহারে যার রুচি আছে, তার রোগের ভয় নাই! সে জীবন্ত মানুষ!

আজকালকার তরুণ-সমাজকে দেখি, খাইতে হয় বলিয়াই যেন তাঁরা আহার করেন! সে-আহারে রুচি কৈ? ভালো-মন্দ পাঁচটা খাবার মুখে যদি ভালো না লাগে, তবে বুঝিবেন, জীবনে ঘুণ ধরিতে সুরু করিয়াছে!

খাওয়ায় কি আনন্দ—যিনি জানেন, তিনি ভাগ্যবান্! রুচি করিয়া আহার না করিলে দেহ মজবুত থাকিবে না; মনও দুর্ব্বল দেহের সংস্পর্শে ঝিমাইয়া দুর্ব্বল হইবে।

বাঁধা-ধরা টাইমে রুটিন মানিয়া আহার—সভ্যযুগের দারুণ অভিশাপ! ক্ষুধা থাক, না থাক, দশটার আগে মুখে ভাত গুঁজিয়া স্কুল-কলেজে কিম্বা আপিসে-আদালতে ছুটিতে হইবে—এ ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য অনেকখানি জখম হইতেছে। খাওয়া-সম্বন্ধে এ-বিধি পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। ক্ষুধা পাইলে আহার করিব, নচেৎ আহার করিব না, এই নিয়ম মানিয়া চলিলে শরীর কোনো দিন ব্যাধি-মন্দির হইবে না! যাহা খাইয়াছি সম্পূর্ণভাবে তাহা হজম হইবার পূর্ব্বে খাওয়া অনুচিত; হজম হইলে ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তখন খাদ্য গ্রহণ করুন। খাদ্য-গ্রহণে মন যদি বিরূপ হয়—কোনো মতে খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া দায়ে খালাশ হইতে যদি চান্,—তাহা হইলে এ খাদ্য পুষ্টির পরিবর্ত্তে দেহে অস্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিবে।

আহারের নামে মন যার সরস হয়, অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হয়, তারই আহার-করা সার্থক জানিবেন!

ঐ খাওয়ার ডাক আসিল—ইহা ভাবিয়া যিনি মনে করেন, মাথায় যেন বজ্রপাত হইবে, তাঁর জীবন দুর্বহ!

আহারের সময় যে লালা রস সঞ্চারিত হয়, তাহা আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে গিয়া খাদ্য-পরিপাকে সহায়তা করে।

এই যে দেখি, কাহারো জীবন আনন্দে-উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল —কেহ বা মুখ সিঁটকাইয়া মলিন হইয়া আছেন, এ প্রভেদ কেন হয়? এ পার্থক্যের কারণ, একের জীবনী-শক্তি আছে; অপরের সে-শক্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবার জো!

খাদ্যে যার রুচি নাই, দু'দিনে তার বুদ্ধি জড়বৎ হইয়া যায়!—**He is liable to be stupid.**

আহারে অরুচি সারাইবার একমাত্র বিধি—ক্ষুধা পাইলে খাইবেন, নচেৎ নয়! অনাহারে মানুষ মারা যায় না, ইহা সুনিশ্চিত। এক-বেলা আহার বাদ দিলে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না। ক্ষতি হয় অক্ষুধার উপর কিম্বা অরুচির উপর খাদ্য-গ্রহণে।

খাদ্য যতক্ষণ ভালো লাগিবে, খাইবেন। অনিচ্ছায় কখনো কোনো খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। অতি-ভোজনে প্রাণ-সংশয় ঘটে। অতি-ভোজনে পরিপাক-শক্তি বিনষ্ট হয়; এবং তার ফলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রতিভা রীতিমত আহত হয়।

আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি, আমাদের মস্তিষ্কও এই পাকস্থলীর স্বচ্ছন্দ-ক্রিয়ার মুখাপেক্ষী। পাকস্থলীকে যদি পীড়নে ব্যতিব্যস্ত ও জীর্ণ করি, তাহা হইলে তার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিব জ্ঞান-বুদ্ধির বিনাশে —মস্তিষ্কের জড়তায়।

অতি-ভোজন করিলে আমাদের মন কোনো আনন্দে সাড়া দেয় না; আবেগ-উচ্ছ্বাসে মনের সামর্থ্য থাকে না —সে সময় মানুষ যেন ভোঁ হইয়া থাকে! কারণ, দেহের সমস্ত রক্ত তখন ঐ খাদ্যের বোঝা পরিপাকে পাকস্থলীর সাহায্য করিতে ছুটিয়া যায়। দিনে একবার খান বা তিন-বার খান, তাহাতে আসিয়া যাইবে না। আসল কথা, ক্ষুধা পাইলে খাইবেন, নচেৎ খাইবেন না। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ এ বিধি যদি বরাবর মানিয়া চলেন, দেখিবেন, দেহে কোনো দিন অজীর্ণতা বা জরার ছোঁয়াচ লাগিবে না; পর-মায়ু দীর্ঘ হইবে; এবং আশী-বৎসর বয়সেও দেহ থাকিবে ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর-বয়সী জোয়ানের মতো শক্ত-সমর্থ।

বসুমতী

অতি-পুরাতন, জরাজীর্ণ বহু শতাব্দীর—
ভরেছে সকল অঙ্গ দুষ্ট ব্রণে এই ধরণীর।
শত ক্ষত-মুখে ঝরে জলা-রক্ত পূতিগন্ধ-ভরা:
পক্ষাঘাতে শিথিল শরীর—কদর্য্য কুৎসিত এই ধরা!

ঝাপ্‌সা চোখের দৃষ্টি! অশ্রু নয়, ক্লেদ ঝরে পড়ে;
কুষ্ঠগ্রস্ত মুমূর্ষুর মত যন্ত্রণায় করে আর্ত্তনাদ;
লোমহীন কুক্কুরের অতি-শুষ্ক ত্বকের মতন
নগ্ন লোল-বক্ষে তার থেমে গেছে
প্রাণের স্পন্দন!

পাশব প্রবৃত্তি তবু তীক্ষ্ণ দন্তে ধ'রে তারে করে টানাটানি;
প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে হিংসা-দ্বেষে পরস্পরে চলে হানাহানি:
জ্বলেছে মরণ-যজ্ঞ! দিকে দিকে গন্ধে তার বিষাক্ত ধোঁয়ায়
বিভ্রান্ত পিশাচ সব করে অট্ট-কলরব গলিত শবের গন্ধে
অতৃপ্ত ক্ষুধায়!

স্রষ্টার মানস-কন্যা সুকল্যাণী ধরা
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী সর্ব্ব-বিভূষণা;
সর্ব্বহৃতা—মহাব্যাধি ক্ষয়-রোগে অস্থিচর্ম্মসার!
যুগ-বট-বৃক্ষ-তলে নির্য্যাতিতা মুহুর্মুহু করে হাহাকার!

শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।



বান্ধবী

১

মালতীর মা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—আমি তো তখনই বলেছিলুম, মেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়িও না। তখন আমার কথা কানে তুললে না, এখন মজা বুঝ্‌বে।

প্রত্যুত্তরে মালতীর বাবা ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—হুঁ, এতটা যে গড়াবে তা তো আগে ভাবিনি! এখন দেখ্‌ছি, তোমার কথা শুনাই ভালো ছিল। কিন্তু ···

মালতীর মা নিস্তারিণী দেবী স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতা এবং অবাধ্যতার জন্য আর একবার তাঁহার উপর ঝাল ঝাড়িবার লোভে বলিতেছিলেন,—আমি ওসব কথার মধ্যে নেই, তা কিন্তু ব'লে রাখ্‌ চি। আদার ব্যাপারী যে, জাহাজের খবরে তার দরকার কি? হেঁসেলে দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলি, সংসার সামলাই,—এতেই আমার ম'রবার ফুরসৎ নেই; দরকার কি বাপু, আমার বড় বড় কথার মধ্যে থা'কবার! তুমি শোন, তুমিই বোঝ।

অল্পক্ষণ থামিয়া, বোধ হয় ইঞ্জিনে ষ্টীম করিবার জন্য দম লইয়া—আবার তিনি কি উদ্‌গিরণ করিতে যাইতে-ছিলেন, এমন সময় সদর দরজায় মোটর বাস আসিয়া থামিবার সাড়া পাওয়া গেল; তিনি জানালা দিয়া দেখিলেন, কলেজের বাস আসিয়া থামিয়াছে, এবং তাঁহার মেয়ে তাহা হইতে নামিয়া আসিতেছে। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া পাশের দরজা দিয়া নিঃশব্দে অন্তর্দ্ধান করিলেন। বাসও চলিয়া গেল।

পরক্ষণেই চুড়ির রিনিঝিনি ও হিল-উঁচু জুতার খুট্ খুট্ শব্দের সহিত মৃদু কণ্ঠে, "মম চিত্তে, নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা-থৈথৈ তাতা-থৈথৈ"···গান করিতে করিতে কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী মালতী তাহার "ষ্টাডি"তে প্রবেশ করিল। কিন্তু পাশের ঘরে গড়গড়ার নলে ওষ্ঠসংলগ্ন করিয়া মালতীর পিতা নিবারণ বাবু গভীর সমস্যায় আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার এই চিন্তার কারণ উপেক্ষার যোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। আজ সকালে পাড়ার লাইব্রেরী হইতে আনীত "প্রিয় সহচরী" নামক উপন্যাসখানি একবার তিনি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার বহুকালের এটি অভ্যাস। আজ কালকার এই অর্ব্বাচীন তরুণগুলার লেখা ভালোও লাগে না, আর মাঝে মাঝে রাগে চোখ-মুখ ঝাঁ ঝাঁ-ও করে বটে, কিন্তু তথাপি নতুন উপন্যাসে নবীনের দল কি সব লিখিতেছে, সেগুলা এক-নজর না দেখিলেও মন খুঁৎ খুঁৎ করে। তাই বইখানি পড়িতে পড়িতে যখন তিনি রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই সময় তাহার ভিতর হইতে ঠুক করিয়া একখানি চিঠির মত কি পড়িল! পুরু নীলাভ খাম, খামখানি হইতে মৃদু সুগন্ধ উত্থিত হইতেছে। খোলা খাম, এবং তাহার উপরে তাঁহারই মেয়ে শ্রীমতী মালতীর নামটি দেখিয়া তিনি আর কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলেন না। ভিতর হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িলেন,—

প্রিয় মালতী দেবী,

আমাদের আজিকার সভা আপনার বহু-বাঞ্ছিত উপস্থিতিতে ধন্য হইবে কি? ভ্রমর যেমন করিয়া মুদ্রিত পদ্মের কাছে অবিশ্রান্ত গুন্ গুন্ শব্দে গুঞ্জন করে, তেমনই আপনার অপরিসীম গুণের কথা আপনার কানের কাছে সর্ব্বদাই গুঞ্জন করিয়া বলিতে আমার উৎকট কামনা উদগ্র। চাঁদ কি আপন সৌন্দর্য্যের কথা নিজে জানে? না জানে না, মনে হয়, সে যেন আত্মবিস্মৃত। আপনিও বোধ করি, তাই। যাক্ এ সব কথা। আপনার দর্শনে

ধন্ত হইবার আশা কি আমাদের মীটিং রাখে? দয়া করিয়া খবর দেবেন একটু।—ইতি আপনার ভক্ত

কোরককুমার দাস।

চিঠি পড়িয়া নিবারণ বাবুর পেয়ালার চা পেয়ালাতেই ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। তিনি বিহ্বলের মত বসিয়া রহিলেন। কোরককুমার কে, তাহা তিনি জানেন না। পদবী দেখিয়া মনে হয়, সে কায়স্থ; কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ। নিবারণ বাবুর মুখে চা তিক্ত লাগিল। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন,—ওগো, একবার শুনে যাও।

গৃহান্তরে তাঁহার স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী তখন গৃহকার্য্যে রত ছিলেন; স্বামীর আহ্বানে দ্বারের কাছে আসিয়া সাড়া দিয়া বলিলেন,—তোমাকে আর এক পেয়ালা চা দেব কি?

নিবারণের তখন কথা বলিবার শক্তিও যেন লোপ পাইয়াছে; হাত নাড়িয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে চিঠিখানা তুলিয়া দিয়া কহিলেন,—প'ড়ে দেখ।

নিস্তারিণী চিঠিখানা পড়িয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন,—সেইকালেই বলেছিলুম, মেয়েকে ইস্কুল-কলেজে অত পড়িয়ে কাজ কি বাপু? কেন, আমরা ক'টা পাশ দিয়েছি? ঘর-সংসার কি ক'রছিনে? তা ছাড়া মাসে এই যে, এক কাঁড়ি ক'রে টাকা গুণ্‌তে হ'চ্ছে,—এ কেন, তা শুনি? মেয়ে কি রোজগার ক'রে খাওয়াবে? না, তার বিয়ের সময় আর এক কাঁড়ি টাকা লাগবে না? শুধু শুধু টাকাগুলোর না'হক শ্রাদ্ধ।

নিবারণ বাবু কহিলেন,—আমি যে সখ ক'রে মেয়েকে কলেজে পড়াচ্ছি, এমন কথা ব'লতে পারো না। মনে নেই, আগে তোমার মতেই মত দিয়েছি? বারো তেরো বছর থেকেই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের জন্যে ছুটোছুটি ক'রেচি। ভবানীপুর থেকে চক্রবর্ত্তীরা দেখ্‌তে এ'লো। এসে তো হেসেই খুন!—'বলেন কি, আমার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রছেন—অথচ আপনার মেয়ে ম্যাট্রিকুলেটেডও নয়! এতো কচি শিশু বল্লেই হয় মশায়! গাল টিপলে দুধ বার হবে। আরও দিনকতক শিক্ষা দিন।' যত জায়গায় সম্বন্ধ করি, সবারই মুখে ঐ একই ধরণের কথা।—মেয়ে 'পিয়ানো জানে কি? মণিপুরী নাচ শিখেচে? ম্যাট্রিক পাশ, না আই-এ পাশ, না সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ?' ব্যাপার দেখে আমার চোখ ফুটলো। বুঝতে পারলাম, স্রোত গেছে বদলে। কালের হাওয়ার গতিরোধ করতে বা ফিরিয়ে দিতে পারব না। বরঞ্চ সেই হাওয়ার অনুকূলে না চলতে শিখলে জীবন-যাত্রা অচল হবে। তাই মেয়েকে দিলাম স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে। যথাসময়ে ম্যাট্রিকুলেটেড্ হ'লো, নাচ এবং গান শিখ্‌লে, তথাপি জুৎসই পাত্র জুটলো না। শুধু শুধু বাড়ীতে বসে থাকবে, কাজেই ভর্ত্তি হ'লো কলেজে। এখনো তেমন পাত্র পাওয়া যায়নি, কাজেই কলেজ চ'লছে।

নিস্তারিণী বিরক্তির সুরে বলিলেন,—অত-শত আমি জানিনে, অত চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণও আমাকে দিয়ে হবে না। আর এসব অনৈরণও আমি সইতে পারব না, তা ব'লে দিচ্ছি। যেমন পাও, খুঁজে-পেতে শীগ্‌গীর মেয়ের বিয়ে চুকিয়ে ফেল। আর তা যদি না করবে, নিজে যা ভালো বোঝ কর। আমি কিছু জানিনে।

নিবারণ মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—আজকাল তা আর হয় না। দু'পক্ষেই পছন্দ করবে, বিচার করবে। যাই হোক, মালতীকে আমি সব কথা জিজ্ঞেস করব। কোন একটা উপায় স্থির করছি। আগে তো এতটা জানতেম না।

নিস্তারিণী সেকালের মেয়ে। স্বামী কলিকাতার কোন বেসরকারি কলেজের প্রফেসর হইলেও নিস্তারিণী কলিকাতার আধুনিক সমাজের বাইরের মানুষ ছিলেন। যে পাড়াগাঁয়ে তাঁহার বাপের বাড়ী সেখানকার ধরণ-ধারণ এত দিন কলিকাতায় বাস করিয়াও তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। আজও তাই দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটে তাঁহার রান্নাঘরে। মাইনে-করা পাচকের হাতে খাইতে বা স্বামী পরিজনকে খাইতে দিতে তিনি মনের ভিতর অতৃপ্তি অনুভব করেন। জীবনটা মোটামুটি সচল এবং গুটিকতক ধরা-বাঁধা নিয়মের উপর তাহার ভিত্তি, এইটুকু জ্ঞান তাঁহার মজ্জাগত ছিল। আর ইহাই আশ্রয় করিয়া দিনগুলিও নির্ব্বিবাদেই কাটিতেছিল। এই ব্যাপারটায় মেয়েটার অপরিসীম বেহায়াপনা ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না। মেয়ের উপর রাগে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিতে লাগিল।

নিবারণ বাবু স্থির করিয়াছিলেন, ধীরে-সুস্থে মালতীকে

ডাকিবেন, ততোধিক শান্ত ভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন যে, মেয়েমানুষের পক্ষে সংযম বস্তুটার কতখানি প্রয়োজন। বাহিরের হুজুগে এমন বিপজ্জনক ভাবে মাতামাতি করাটা অশোভন। কিন্তু তাঁহার 'প্ল্যান্' পর্য্যুদস্ত করিয়া কক্ষান্তরে নিস্তারিণীর তীব্র কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল,—হ্যাঁ লা, তোর কাণ্ডকারখানা দেখে দিন দিন যে পেটের ভিতর হাত-পা ঢুকে যাচ্ছে! বাপ আরও আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি একেবারে খেয়েছে, নহিলে মেয়েমানুষের এত সাহস, এত বাড়! ওরে আমার বাপ-সোহাগী মেয়ে!

মালতী মায়ের তিরস্কারে বিব্রত হইয়া বলিতেছে,—মা, দোহাই তোমার, একটু চুপ কর। এখনই পাঁচটা চুয়াল্লিশে কোরক বাবুর আসবার কথা আছে, পাঁচটা চল্লিশ হ'য়েছে; যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি এসে প'ড়তে পারেন। তখন কি যে ভাববেন তিনি, বলো দিকি!

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িলে যেমন দুর্ব্বার হইয়া উঠে, তেমনি প্রজ্বলিত কণ্ঠে নিস্তারিণী কহিলেন,—রেখে দে ওসব বক্তিমে! কোরক বাবুই বা কে, আর কুসুম বাবুই বা কে? হিঁদু-ঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মেচিস, চাল-চলন শিখলিনে? শুধু দু'পাতা পড়তে-শিখলেই সব শেখা হয় না। এটুকু মনে রাখিস্।

মালতী অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল,—দোহাই তোমার, অমন করে চেঁচিও না, মা! কোরক বাবু বাড়ী ঢুকে যদি শুনতে পান, ব্যথা পাবেন।

কিন্তু নিস্তারিণীর থামিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। নিবারণ বাবু যে ঘরে বসিয়া ছিলেন, মালতী সেই ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার কাছে গিয়া কহিল,—বাবা মাধ্যমিক-শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে সভা হবে। আমার বন্ধু কোরক দাস অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। আমাকে যাবার জন্যে এবং কিছু বলবার জন্যে তিনি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ক'রেছেন। সভাটা আমরা ক'জনে মিলেই এক রকম অরগ্যানাইজ করেছি। কিন্তু মায়ের এ কি রকম হীন সন্দেহ বলুন তো!

নিবারণ বাবু কহিলেন,—কই এ বিষয়ে আমাদের আগে কিছু বলোনি তো? যাবে বলে আমাদের অনুমতিও নাও-নি। তোমার মায়ের অবশ্য মেজাজটা তেমন ঠাণ্ডা নয়, এবং বক্তব্য বিষয়টাও বেশ সভ্য ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে ব'লতে পারেন না। কিন্তু তিনি যা ব'লতে চাইছেন, মোটের উপর তা ঠিক। তা'ছাড়া, তোমরা এখন ছাত্র-ছাত্রী, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের তপস্যায় নিযুক্ত থাকবে। তোমাদের এ সব পলিটিক্যাল এজিটেশনে যাবার দরকার? সভা-সমিতি এবং এ-ধরণের অনর্থক হুজুক ছেড়ে দাও।

—বাঃ, আপনি যে কথা বলেন বাবা, তার মানে খুঁজে পাইনে! লেখাপড়া মানে কি শুধু ডিগ্রী নেওয়া? লাইফটা একটু দেখ্‌বো না? সমাজে, রাষ্ট্রে, জীবনে, যেখানে যা কিছু অবিচার এবং অন্যায় হচ্ছে—আমরা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে তার প্রতীকার চেষ্টা করবো না?

নিবারণ বাবু মেয়ের উত্তেজিত উক্তি শুনিয়া কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, বাহিরের বারান্দায় দুই জন বাবু আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা দিদিমণির দর্শনপ্রার্থী।

এলো খোঁপাটায় হাত দিয়া একটু ঠিক করিয়া লইয়া মালতী অনুযোগের সুরে কহিল,—নিশ্চয় কোরক বাবুরাই এসে প'ড়েছেন। মা যে কি রকম গোলমাল সুরু ক'রলেন, না হলো আমার চুল বাঁধা, না হলো তৈয়েরী হ'য়ে নেওয়া। ওঁদের সঙ্গেই আমার মিটিংয়ে যাবার কথা। কে জানে ওঁরা কি ভাববেন!

নিবারণ বাবু গড়গড়ায় দুই একটা টান দিয়া কহিলেন, —আচ্ছা যাও, তুমি তৈয়েরী হ'য়ে নাও গে। আমি ততক্ষণ ওঁদের সঙ্গে আলাপ করছি।—অতঃপর তিনি চাকরটাকে আদেশ দিলেন,—যা, বাবু দু'টিকে এই ঘরে নিয়ে আয়।

তেমন ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার বন্ধুদের অভ্যর্থনার ভার পিতার উপর সমর্পণ করিয়াই মালতী সভাস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে দুই জন আগন্তুক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এক জনের শ্যামবর্ণ রঙ, চোখে চশমা, রোগা ছিপ্‌ছিপে গড়ন। অপর ব্যক্তি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বেশ মোটা-সোটা। উভয়েরই বেশভূষা—পায়ের স্লিপারটি হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ের চাদর জড়াইবার ভঙ্গিটুকু অবধি নিখুঁত,—অত্যন্ত আধুনিক।

—নমস্কার! মালতী দেবীর পিতার সঙ্গে আলাপ

করবার সৌভাগ্যলাভে আমরা ধন্য হলেম। এ ভাগ্য তো আগে হয়নি।—শ্যামবর্ণের ভদ্রলোকটি মিহি ও মিষ্ট সুরে এ-কথা কহিলেন। একটু কাশিয়া পুনরায় বলিলেন,—আমাদের সভার কথা বোধ হয়, মালতী দেবীর কাছে শুনে থাকবেন। আমারই নাম কোরক দাস। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হবার গুরু দায়িত্ব-ভার আমারই অযোগ্য স্কন্ধে প'ড়েছে। এ ভার নিতে আমি সাহসী হতেম না—যদি না আমার এই পরম বন্ধু শ্রীযুত সুজিত চক্রবর্ত্তী এফ, আর, সি, এস (লণ্ডন), এল, এম, এফ, (এ'ডিনবারা) আর মালতী দেবী—এঁরা দু'জনে আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতেন। শুধু সাহায্য নয়, সর্ব্বরকমে সহযোগিতা করতেও।

সুজিত চক্রবর্ত্তী পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া ঈষৎ বিনয় সহকারে হাসিয়া বলিলেন,—না না, কি সব যে বাড়িয়ে বলো তার ঠিক নেই। এই নিন না আমার কার্ড।—তিনি সোনালী হরফে ছাপা একখানা দামী পুরু কার্ড বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। নিবারণ বাবু কার্ডখানা তুলিয়া দেখিলেন, নামের পশ্চাতে বিস্তর উপাধির হরফ গাঁথা আছে! কোনটা লণ্ডন, কোনটা গ্লাস্‌গো, কোনটা এডিনবারা, কোনটা ক্যাণ্টাব।—দেখিয়া বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তাঁহার মনটা ভরিয়া উঠিল।

কোরক দাস বলিলেন,—ওঁর এত ডিগ্রী যে, সব ক'টা আমার মনেও থাকে না ছাই! যে কয়েকটা মনে থাকে, তাও আমার উল্টো-পাল্টা হয়ে যায়, ব'লবার সময়।

চক্রবর্ত্তী পদবী ঠিক তাঁহাদেরই পাল্‌টা ঘর। তাহার উপর ছেলেটির রূপ, গুণ এবং বিদ্যার বহর দেখিয়া নিবারণ বাবু মনে মনে একটা অসম্ভব আশা করিয়া অবহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সবিনয়ে নিবারণ বাবু কহিলেন,—আপনার কি করা হয়। নিবাস বোধ করি, এই ক'লকাতা সহরেই?

প্রত্যুত্তরে মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিয়া সুজিত বাবু কহিলেন,—কি করি, সেটা এক কথাতেই অবশ্য বলা যায় না। অনেক কিছু করছি; একটা বিরাট ব্যবসায়ের পরিকল্পনা চ'লছে। মেয়েদের জন্য একটা মেটারনিটি-হোম খুলব ভাবছি। পোলট্রির একটা সায়েনটিফিক্ গঠনও মগজের মধ্যে আনাগোনা করছে।—হ্যাঁ, কলকাতাতেই থাকি।

কোরক কহিল,—বুঝ্‌ছেন না কাণ্ডটা? বাপ রেখে গেছেন অগাধ টাকা। ক'রবার কোন প্রয়োজন তো কিছুই নেই। তবে আমাদের এই পরাধীন দেশ; যাদের শিক্ষা এবং মন আছে, তারা তো কিছু না কিছু না ক'রে থাকতে পারবে না।

কথাবার্ত্তার এই অংশে মালতী ঘরে ঢুকিল। তাহার এলো খোঁপাটা গর্ব্বোদ্ধত বিদ্রোহী নিশানের মত উঁচু হইয়া রহিয়াছে; লাল রেশমের জামা-কাপড়ের নীচে পরাধীনতার বহ্নিআভা গুমরাইয়া মরিতেছে।

—চলুন চলুন, কোরকবাবু, আর সময় নেই। আমার জন্যে এতখানি সময় নষ্ট হ'লো আপনাদের, এতে আমার লজ্জার অবধি নেই, সুজিত বাবু! আসি তাহ'লে বাবা! ফিরতে এই আটটা সাড়ে আটটা হবে আর কি!

মোটরের ষ্টার্টের আওয়াজ পাওয়া গেল, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝড়ের বেগে যেমন করিয়া খড়কুটা উড়িয়া যায়, তেমনই করিয়া তিন জনে উধাও হইয়া গেল।

নিবারণ বাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া খানিকটা বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলেন।

২

এখন আর বেশী তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয় না, নিস্তারিণী কোন কথা বলিতে গেলেই মালতী সদর্পে বলে,—কেন, দেশের কাজে নেমেছি, কিছু অন্যায় করেছি না কি? বাবা মত দিয়েছেন, তিনি আনন্দের সঙ্গে আমাদের সমর্থন করেন, জানো?

সেদিন প্রকাণ্ড এক অভিনন্দন-পত্রে সুজিত ও মালতীর নাম একত্রে প্রকাশিত হইয়া ছাপা হইল এবং বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরিত হইল। নিবারণ বাবুও এক কাপি পাইলেন। মাতৃমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সুজিত চক্রবর্ত্তীর অর্থ, হৃদয়, এবং উদারতার সহিত মালতী দেবীর কর্ম্মপ্রেরণা যুক্ত না হইলে এত বড় একটা বিরাট কল্পনা বাস্তবে রূপ পাইত কি না সন্দেহ। নারীর প্রেরণা যে যুগে যুগে পুরুষকে শক্তি দিয়াছে এবং পথ দেখাইয়াছে, তাহারই কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া-দিয়া মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন-দিবসে তাঁহাদের উপস্থিতি একান্ত

প্রার্থনীয় এই কথাটি ঘোষিত করিয়া অভিনন্দন থামিয়াছে। কিন্তু নিবারণ বাবুর চিত্ততলে যে লোভ এবং দুশ্চিন্তার মন্থন একই সঙ্গে চলিয়াছিল, তাহা থামিল না, বরঞ্চ আরও বাড়িয়া গেল। সুজিতের সঙ্গে মেলা-মেশা করা তিনি খুব জোরের সঙ্গে বারণও করিতে পারেন না। যদি সুজিতের পছন্দ হইয়া যায়, তবে মেয়ের জন্য এত বড় সুপাত্র পণ দিয়া কিনিবার দুরাশা তাঁহার বিনা আয়াসেই পূর্ণ হইয়া যায়। কারণ, সুজিত অবিবাহিত এবং ঠিক তাঁহাদেরই করণীয় ঘর। অথচ এই অবারিত মেলামেশার নিদারুণ ভীতিও তাঁহার মনে সময় সময় খুব প্রবল হইয়া দাঁড়ায়।

'মাতৃমঙ্গল সমিতি'র উদ্বোধন সারিয়া সেদিন রাত্রি প্রায় ন'টার সময় মালতী গৃহে ফিরিল, সুজিত সঙ্গে আসিয়াছিলেন পৌঁছাইয়া দিতে। নিবারণ বাবু অন্ধকার বারান্দায় উদ্বিগ্নভাবে পায়চারি করিতেছিলেন। মোটর আসিয়া থামিল, সুজিতসহ মালতী নামিয়া গেট ও কম্পাউণ্ড পার হইয়া বারান্দায় উঠিল। নমস্কার ও বিদায় সম্ভাষণাদি সারিয়া মালতী গৃহে প্রবেশ করিল। সুজিত ফিরিয়া যাইতেছিলেন; নিবারণ বাবু ডাকিলেন,—সুজিত বাবু, যদি বিশেষ তাড়া না থাকে, তবে কয়েকটা কথা ব'লতে চাই।

সুজিত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া নিবারণ বাবু সুস্পষ্ট স্বরে কহিলেন,—মালতী আপনার সঙ্গে যে পরিমাণে মেশামেশি ক'রছে, এতে আমাদের সমাজে কথা উঠেছে; জানেন তো আমাদের হিন্দু সমাজ। আপনার কি এটা অনুচিত বোধ হয় না?

সুজিত গাঢ়স্বরে কহিলেন,—আমি জানতেম না, মালতী দেবী আমার জন্যে ক্লেশ সহ্য করছেন, এ কল্পনাও অসহ্য! কিন্তু তবু এইটুকু বিশ্বাস আমার উপর রাখবেন, আমার দ্বারা তাঁর প্রতি কখনো অন্যায় হবে না। আমাকে আপনি বলবেন না, লজ্জা লাগে ভারী। আমি তো আপনার ছেলের মতো।

সুজিত বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেও নিবারণ বাবু আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া সেই অন্ধকার বারান্দায় অনেকক্ষণ পায়চারি করিতে লাগিলেন। আজই সকাল বেলায় মালতীর জন্য একটা সম্বন্ধ লইয়া তাঁহার এক আত্মীয় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ছেলেটি কাঞ্চনপুরের ওদিককার ছোটখাট জমীদার। অন্য সব দিকেই ভালো, তবে পাড়াগাঁয়ে বাড়ী। নিবারণ বাবু শুনিয়া তখনই তখনই হাঁ, না কিছুই বলেন নাই। এখন স্থির করিলেন, কাল সকালেই স্পষ্টাক্ষরে না বলিয়া দিবেন। সুজিত আজ তো ভাবে-ভঙ্গীতে এক রকম বলিয়াই ফেলিল। যখন অন্তঃপুরে ঢুকিয়া মালতীকে সঙ্গে লইয়া একত্রে খাইতে বসিলেন, দীপের আলোয় কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া অনেক দিন পর স্নেহে তাঁহার মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এক সময়ে বলিয়াও ফেলিলেন,—সুজিত তোকে কিছু ব'লেছে না কি মা?

মালতী অকস্মাৎ লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল। তাঁহার দৃপ্তা তেজস্বিনী সভানেত্রী মেয়ের মুখের এই সলজ্জ আভাটুকু নিবারণ বাবুর যৎপরোনাস্তি ভালো লাগিল। মালতী অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে কোন মতে কহিল,—তিনি বলেন, এত দিন পড়লাম, পরীক্ষার আর তো বেশী দেরী নেই··· বাকীটা আর সে বলিতে পারিল না; কিন্তু বলিবার দরকারও হইল না। নিবারণ বাবু ইঙ্গিতেই বুঝিলেন, বুঝিয়া মনে মনে উদার হাস্য করিয়া বলিলেন,—তাই বটে! তাই সে আজ নিন্দার কথা শুনে অমন ক'রে ভেঙ্গে পড়বার মতো হ'লো। সেই জন্যেই সভাসমিতির নাম ক'রে এত মেলামেশা করে। আজকাল মন জানা জানি, দু'পক্ষের পছন্দ—এগুলো হ'বার একটা উপলক্ষ তো চাই-ই। তাতে দোষ ধ'রলে চলবে কেন? কোরক দাসের সঙ্গে এতটা মেশামেশি করিলে অবশ্যই তিনি মুস্কিলে পড়িতেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা নয়।

সেদিন রাত্রিতে নিস্তারিণী যখন রান্নাঘরের যাবতীয় কাজ সারিয়া অধিক রাত্রিতে শয়ন-কক্ষে আসিলেন, তখন নিবারণ বাবু সগর্ব্বে স্ত্রীকে কহিলেন,—এই দেখ, আমার কাজের এত যে সমালোচনা করতে, আজ তার ফল দেখ। নিজেদের অবস্থার মধ্যে সুজিতের মত ছেলেকে জামাই করবার দুরাশা কখনো পূর্ণ হতো কি? এখন সেই সুজিত নিজেই প্রস্তাব ক'রেছে—সামনের মাসে বি, এ পরীক্ষাটা চুকে গেলেই···বিলেত থেকে ক'টা পাশ করে এসেছে জানো? তা ছাড়া চৌরঙ্গীতে দু'খানা, বালীগঞ্জে পাঁচখানা, এসপ্লেনেডেও তিনখানা বাড়ী। টাকার কথা না বল্লেও বুঝতে পারবে। মাথার উপর বাপ অভিভাবক

নেই যে, রক্ত চক্ষু ক'রে বলবে, দশ হাজার চাই, বিশ হাজার চাই। নিজে দেখে মেয়ে পছন্দ ক'রচে কি না!

নিস্তারিণীকে স্তম্ভিত এবং বিস্ময়ে হতবাক্ করিয়া-দিয়া নিবারণ বাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। পাশের ঘরে মালতীর 'ষ্টাডি'তে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। বি, এ পরীক্ষার পড়া, তা'ছাড়াও কত কল্পনা, কত মধুর স্বপ্ন, রোমান্স···ঘুম যেন চোখে আসিতেই চায় না।

৩

প্রায় দিন পনেরো হইল মালতীর পরীক্ষা শেষ হইয়া গেছে। আজকাল সে অধিকাংশ সময় ঘরেই থাকে, সভাসমিতির হুজুগে মাতিবার ততটা যেন আর আগ্রহ নাই। সুজিতের দামী মোটরখানাও যখন তখন আর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায় না। নিবারণ বাবু তাহার সহিত দেখা করিয়া কথাটা পাকাপাকি করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক দিন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—তাই তো, তাঁহাকেই তো কথাটা পাড়িতে হইবে! সুজিত কি নিজে নির্লজ্জের মত আগে প্রস্তাব তুলিতে পারে? আর হাজার আধুনিক হোক, এই লজ্জাতেই বোধ করি, এখানে আজ কাল বড় আসা-যাওয়া করে না।

সুজিতের বাড়ীর নম্বরটা তাঁহার মনেই ছিল। কিছু-ক্ষণ পরে প্রাসাদতুল্য এক বাড়ীর সুমুখে দাঁড়াইয়া সম্ভ্রমে আনন্দে যখন তাঁহার মনটা ভরিয়া উঠিয়াছে, সেই সময় একখানা মোটর সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। সুজিত নামিলেন; গাড়ীর ভিতর আরও জন-দুই সুবেশা তরুণী মহিলা ছিলেন। তাঁহাদের সুমিষ্ট হাস্যে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতেই, মোটর চলিয়া গেল। তখন এই দিকে ফিরিয়া নিবারণ বাবুর সহিত চোখোচোখি হইতে সুজিত যেন একটু বিব্রত, একটু অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন। নমস্কার করিয়া খাপছাড়া ভাবে কহিলেন,—ওঁরা আমার বান্ধবী।—আপনি এদিকে বিশেষ কোন কাজে এসেছিলেন বুঝি?

—না বাবা, তোমার কাছেই এসেছিলুম। একটা কথা ছিল।

আচ্ছা তা'হলে ভিতরে আসুন—সুজিত নীরস স্বরে কহিলেন।

বৈঠকখানা-ঘরের পাশে ছোট একটা ঘরে নিবারণ বাবুকে বসাইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন,—আঃ, যা গরম প'ড়েচে। সারা দিন-রাত্রি মাথার উপর পাখা ঘুরচে তবু টি'কতে পারচিনে। মনে করচি, কাল পরশুর মধ্যেই দার্জ্জিলিং চ'লে যাব। আর দেরী নয়।

নিবারণ বাবু কহিলেন,—মালতী মায়ের তো পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেল। তবে কি দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে এসেই শুভ কাজটা হবে বাবা?

সুজিত কহিলেন,—আপনি দেখ্‌চি বরাবরই ভুল বুঝ্‌চেন। মালতী দেবী আমার বান্ধবী। বান্ধবীর পবিত্র সম্বন্ধকে আপনি বিকৃত ক'রে দেখ্‌চেন। অবশ্য সাময়িক মানসিক আবেগে আমি মাঝখানে অন্য রকম একটু ভেবে-ছিলুম; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' বইটি সম্প্রতি আর একবার যত্ন ক'রে পড়ে ও-ভুল আমার ভেঙ্গেচে। মালতী দেবী চির দিনই আমার বান্ধবী থাকুন। তিনি যেন ঐ উদার অসীম আকাশ! গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে তাঁর আমি অপমান করতে চাইনে। সত্যি, আইডিয়াটি কত চমৎকার! মার্ভেলাস!!—হাতের কব্‌জি-ঘড়ির দিকে চাহিয়া সুজিত একটুখানি থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন,—প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। আমাকে আবার একবার মার্কেটে বেরুতে হবে—কয়েকটা অতি দরকারী জিনিষপত্র কিনতে। মনে করচি, কালই দার্জ্জিলিংয়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। কলকাতায় এই গরমে আর একটা দিনও বাস করতে হ'লে মরে যাব। মালতী দেবী কিছুতেই ভুল বুঝবেন না। বন্ধুর দরদ, বন্ধুর প্রীতির পরে তাঁর করুণ দৃষ্টি আছে। এই যে আমাদের কোরকেরও তিনি বান্ধবী। তাঁরই প্রেরণাতে কত মহৎ কাজ, কত মহত্তর আইডিয়া বাস্তবে পেয়েছে রূপ। বান্ধবীকে আমার প্রাণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাবেন। হয় তো দেখা হবে না আর বহু দিন। দার্জ্জিলিং থেকে এসে আর একবার য়ুরোপ অঞ্চলে পাড়ি জমাব ভাবচি। আচ্ছা, উঠি তা'হলে নমস্কার!

সুজিত ড্রাইভারকে গাড়ী বাহির করিতে আদেশ দিবেন বলিয়া কলিং বেল টিপিলেন। নিবারণ বাবু ছাতিটি বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীমতী আশালতা সিংহ।

ইতিহাসের অনুসরণ

সহমরণ-প্রথার বিলোপ-সাধন

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতের বড়লাট হইলেন; কিন্তু ভারতে তিনি নূতন নহেন, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে আর্কটের অদূরবর্ত্তী ভেলোর নামক স্থানে মাদ্রাজী ফৌজের চিরাচরিত আচরণে বাধা দান করায় ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেশীয় চতুর্থ পদাতিক ফৌজের দুই নম্বর পল্টন বিদ্রোহী হইয়াছিল। এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাহার পর বৎসর (১৮০৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) তিনি মাদ্রাজের গভর্ণরের পদ হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনের প্রথমাংশে তাঁহার এইরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়া সহমরণের ন্যায় বহুকালের প্রচলিত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত দেশীয় প্রথায় নিজ-দায়িত্বে হস্তক্ষেপণ না করাই সঙ্গত মনে করিতে পারিতেন; বিশেষতঃ, 'কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স' এ বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সতর্কতা সহকারে কর্ত্তব্য-সম্পাদনের নির্দ্দেশ দান করায়, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাটগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণে ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ না করিলেও পারিতেন; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এরূপ দৃঢ়তা ছিল যে, তিনি বড়লাট হইয়া এদেশে আসিবার পূর্ব্বেই যত শীঘ্র সম্ভব সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বড়লাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্সের সভাপতি মিঃ অষ্টেলকে বে-সরকারী চিঠি লিখিয়া ঐ প্রথা রহিত করিবার অনুকূলে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন। সেই পত্রে তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন যে, তিনি এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য প্রথমে এ সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের অভিমত সংগ্রহ করিবেন; তৎপরে সেই অভিমতগুলি স্বয়ং ধীরভাবে আলোচনা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। কিন্তু, সেজন্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব অনিবার্য্য; এজন্য ইংলণ্ডে ঐ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখিবার জন্য যেন চেষ্টা করা হয়; নতুবা তাঁহার সঙ্কল্প-সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে।

অনন্তর বহু সামরিক ও অসামরিক রাজকর্ম্মচারীর নিকট তাঁহাদিগের অভিমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত সার্কুলার প্রেরিত হইল। উহাতে প্রধান জিজ্ঞাস্য এই ছিল যে, আইন-প্রণয়ন দ্বারা সহমরণ-প্রথার বিলোপ-সাধন করিলে, সিপাহীদিগের বিদ্রোহী হইবার আশঙ্কা আছে কি না, এবং অবিলম্বে ঐ প্রথা রহিত করা তাঁহাদের বিবেচনায় সঙ্গত কি না? এই সকল অভিমত সংগ্রহের ও তৎসংক্রান্ত পত্র-ব্যবহার প্রভৃতি কার্য্যের ভার তিনি তাঁহার সামরিক সেক্রেটারী কাপ্তেন বেনসনের হস্তে অর্পণ করেন। পনের মাসব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে সকলের অভিমত সংগৃহীত হইলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল যে, অধিকাংশ কর্ম্মচারীই সহমরণ-প্রথার আশু ও আমূল বিলোপ-সাধন একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং ইহাতে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়াও তাঁহাদের ধারণা হয় নাই। কোন কোন রাজকর্ম্মচারী তৎপূর্ব্বেই তাঁহাদের যে এলাকার মধ্যে ঐ প্রথার বিলোপ-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারও দৃষ্টান্ত মিলিল। বিশেষতঃ, অযোধ্যা-রাজ স্বরাজ্যে সহমরণ-প্রথা রহিত করিয়াছিলেন। তাঞ্জোরের রাজা এবং পেশোয়াও স্ব স্ব রাজ্যে এই নৃশংস প্রথার বিলোপ-সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গের বাহিরের দৃষ্টান্ত দ্বারা বঙ্গের, বিশেষতঃ কলিকাতার, অবস্থা বিচার্য্য নহে; কারণ, নানা বিষয়ে কলিকাতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই সকল বিষয়ের প্রসঙ্গে নিম্নপ্রদেশের (Lower Province) পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ওয়াল্টার ইউয়ার লিখিলেন, অন্যান্য স্থানের হিন্দুরা সহমরণ-প্রথার বিলোপ-সাধনে বিচলিত হইবে না বটে, কিন্তু যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-সমূহ যে স্থানে অবস্থিত, সেই রাজধানী কলিকাতার অধিবাসী হিন্দুরাই, কেবল ইহারই নহে, যে-কোন প্রকার জনহিতকর কার্য্যের বিরোধিতা করিবে। কাবুলের বৃটিশ দূত সার উইলিয়ম ম্যাক্‌নটেন তাঁহার 'মিনিটে' লিখিলেন, ভারতীয় হিন্দুদের পূর্ব্বকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে যে, তাহারা সহমরণকে যেরূপ বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়াই মনে করুক, উহার বিলোপ-সাধনে বিপদের যৎকিঞ্চিৎ আশঙ্কাও নাই; কারণ, বর্ত্তমান কালের পূর্ব্বে অত্যাচারী মুসলমান নরপতিগণ তাহাদের দেবমন্দির কলুষিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে, বলপ্রয়োগে হিন্দুদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে, এবং নির্ম্মমভাবে তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছে; কিন্তু হিন্দুরা তাহাদের এই সকল কঠোর অত্যাচার চিরকালই অতি ধীরভাবে সহ্য করিয়াছে। বিশেষতঃ, "...by whom is this barbarous rite chiefly respected? Not by the hardy and warlike Hindoo of the western provinces, but by the sleek and timid inhabitant of Bengal, by the fat and greasy citizen of Calcutta, whose very existence depends on the prosperity of the British Government; by the wealthy native, who will invite Europeans to an entertainment, and sit by with pride and satisfaction while they are feasting on the subject of his worship, the mother of his pantheon..." সুতরাং সরকার নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদের অভীপ্সিত কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন।

সহমরণ-প্রথার বিলোপ-সাধনের সঙ্কল্পে অধিকাংশ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর এইরূপ সমর্থন লাভ করিয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক যথেষ্ট উৎসাহিত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, এ সম্বন্ধে আর কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া অবিলম্বে এবং প্রয়োজন হইলে দেশবাসিগণের মতের বিরুদ্ধেও, আইন প্রণয়ন দ্বারা এই প্রথা রহিত করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ও তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তারিখের সমাচার-দর্পণ পত্রিকায় "সমাচার-চন্দ্রিকা পত্র হইতে নীত" সংবাদে দেখিতে পাওয়া যায়, "২৭ জুলাই ইণ্ডিএ গেজেট নামক সমাচার পত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে, গবর্নমেণ্ট

এইক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন।..." (১) বলা বাহুল্য, উক্ত "এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি"ই রাজা রামমোহন রায়।

যাহা হউক, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক 'কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্সের' চেয়ারম্যানকে লিখিত একখানি ব্যক্তিগত পত্রে গোপনে সকল বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া লিখিলেন, তিনি সহমরণ-প্রথার বিলোপ-সাধন সম্বন্ধে সেনাবিভাগের এক জন পদস্থ কর্ম্মচারীর (Adjutant General of the Army) নিকট হইতেও আশ্বাস-বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সমগ্র বঙ্গপ্রদেশে সহমরণ-প্রথার নিষেধক আইন-প্রণয়নের বিষয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের তদানিন্তন প্রধান বিচারপতি সার চার্লস্ এডওয়ার্ড গ্রেরও পরামর্শ গ্রহণ করা হইল। তিনি এই প্রস্তাবে ব্যক্তিগত ভাবে পূর্ণ সহানুভূতি ও উৎসাহ জ্ঞাপন করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত আইনানুসারে (Act 37, Geo III, Ch 142, Sect 12.) অপরের ধর্ম্মসংস্কারে আঘাত করা যে নিষিদ্ধ, সে বিষয়েও বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সার চার্লস্ মেট্‌কাফ ও মিঃ বাটারওয়ার্থ বেলি তৎকালে গভর্ণর জেনারেলের সভায় পারিষদ ছিলেন। ইঁহারা প্রথমাবধি সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে থাকায় এক্ষণে লর্ড বেন্টিঙ্কের সহিত এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতে লাগিলেন।

সহমরণ-প্রথার নিষেধক-আইনের মূল মুসাবিদা করিলেন সার চার্লস্ গ্রে; লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্ত্তৃক উহা বহুলাংশে সংশোধিত হইবার পর উক্ত আইনানুসারে সমগ্র বঙ্গ প্রদেশে সহমরণ সম্পূর্ণ আইন-বিগর্হিত ও দণ্ডনীয় বলিয়া বিধিবদ্ধ হইল, এবং যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঐ কার্য্যে কোন প্রকার সহায়তা করিবে, তাহারাও নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া লিখিত হইল। নূতন আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অর্থের অপবোধপ্রযুক্ত প্রদেশের জনসমাজে যাহাতে কোন প্রকার বিক্ষোভের উৎপত্তি না হয়, তজ্জন্য স্থির হইল যে, আইনের মূলধারাটি ইংরেজী ভাষাতেই প্রণয়ন করা হইবে বটে, তথাপি তৎসহ উহার একটি বাঙ্গালা অনুবাদও সংযোজিত করা বিধেয়। সুতরাং ভারত সরকারের তদানিন্তন সেক্রেটারী মিঃ হেনরী শেক্‌সপীয়র আইনের খসড়াটি এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত খ্যাতনামা খৃষ্টান মিশনারী রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরীর নিকট প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা কেরী উহা প্রাপ্তিমাত্রই তাঁহার পণ্ডিতকে আহ্বান করিলেন এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহারা উভয়েই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিলেন। এইরূপে উভয়েরই সম্মিলিত চেষ্টায় সেই দিনই আইনটি বঙ্গভাষায় অনূদিত হইল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর বঙ্গপ্রদেশে সহমরণ নিষেধক আইনের স্মরণীয় ধারা বিধিবদ্ধ হইলে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টর্সকে সকল বিষয় অবিলম্বেই জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপে উইলিয়ম কেরী-প্রমুখ সহৃদয় মিশনরীদিগের প্রথম প্রচেষ্টা, লর্ড হেষ্টিংস, লর্ড আমহার্ষ্ট প্রভৃতি বড়লাটদিগের সদিচ্ছা, রাজা রামমোহন রায়, কলিকাতার অভিজাতবর্গের শীর্ষস্থানীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর (কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের পিতামহ) প্রভৃতি বাঙ্গালী সমাজ-সংস্কারকদিগের সহযোগিতা ও লর্ড বেন্টিঙ্কের সৎসাহসের ফলে বহুকালের প্রচলিত নৃশংস সহমরণ-প্রথা বঙ্গ প্রদেশে আইন-বিগর্হিত বলিয়া ঘোষিত হইল।

বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার রক্ষণশীল সম্প্রদায় ইহাতে ভীষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, গোপীমোহন দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি সমাজপতিরা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকার' মধ্যবর্ত্তিতায় ও সভাসমিতির সাহায্যে নব প্রবর্ত্তিত আইন বাতিল করিবার উদ্দেশ্যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া মহা উৎসাহে তাহা পরিচালিত করিতে লাগিলেন. এবং সহমরণ-প্রথার সমর্থনসূচক দুইখানি আরজী ও তৎসহ উহার অনুকূল শাস্ত্রোক্তি-সম্বলিত দুইখানি ব্যবস্থাপত্র অবিলম্বে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের নিকট প্রেরণ করিলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখের 'সমাচার-দর্পণ পাঠে জানিতে পারা যায়, "গবর্ণমেণ্টে যে দুই আরজী ও ব্যবস্থা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে ১১৪৬ জন স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষ. কলিকাতাস্থদিগের এক আরজীতে ৮৫২ জন বিষয়ি ভদ্রলোক স্বাক্ষর করেন এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে ১২০ জন পণ্ডিত অধ্যাপক স্বাক্ষর করেন কলিকাতার নিকট বেলঘরিয়া আড়িয়াদহ প্রভৃতি গ্রামবাসিদিগের এক আরজী তাহাতে ৩৪৬ জন বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষর আছে এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র তাহাতে ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর হয়।" (২) এই সকল স্বাক্ষরকারীর মধ্যে রামকমল সেন, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিবকৃষ্ণ মহারাজা বাহাদুর, রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ মহারাজা বাহাদুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র মহারাজা বাহাদুর, (নদীয়া) মতিলাল শীল প্রভৃতির নাম ছিল। দেওয়ান রামকমল সেন (কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সহমরণ প্রথার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি স্বয়ং কেবল রাধাকান্ত দেবের দলে যোগদান করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, হিন্দু কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় ও সেখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব থাকায় তিনি ঐ কলেজের পণ্ডিতদিগকেও নিজেদের দলভুক্ত করিয়াছিলেন। "ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অনুমত্যানুসারে কলিকাতা নগরে সমাচার-চন্দ্রিকা যন্ত্রে" শকাব্দা ১৭৫২ সন ১২৩৭এ বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত এই আরজী, ব্যবস্থাপত্র ও লর্ড বেন্টিঙ্কের উত্তর সম্বলিত একটি পুস্তিকা রাজা রাধাকান্ত দেবের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত থাকায় পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সেই পুস্তিকা হইতে ঐ দীর্ঘ আরজী ও তাহার উত্তর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "সংবাদ-পত্রে সে কালের কথা," দ্বিতীয় সংস্করণ, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৪ অতঃপর এই গ্রন্থ "সংবাদপত্র" নামে উল্লিখিত হইবে।

২। "সংবাদপত্র," প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩

শ্রীশ্রীদুর্গা

জয়তি।

মহামহিম শ্রীযুক্ত লর্ড কেবিণ্ডিস বেন্টিঙ্ক গবরণর জেনাবেল বাহাদুর সমীপেষু।

আমরা শুনিয়াছি যে, কলিকাতানিবাসি কওএকজন লোক হিন্দুরদিগের ব্যবস্থা ও বোধ নিবেদন করিবার ভাব লইয়া ঐ সকল ব্যবস্থা ও বোধের বিপরীত নিবেদন করিয়াছেন এবং আপনি কৌন সালের বৈঠকে এমত মিথ্যা কথায় সতী হওনের ব্যবস্থা নিবারণ করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতে উদ্যত আছেন এ নিমিত্তে আমরা স্বাক্ষর করিয়া সম্ভ্রমপূর্ব্বক এই নিবেদন পত্র প্রদান করিতেছি হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্মের উপর হস্ত নিক্ষেপকরণে আমরা তন্নিবারণে ব্যগ্রতা করিতেছি এবং অতিশয় ভীত হইয়াছি।····· এ বিধি সেই সকল হিন্দুর দ্বারা প্রচার হইয়াছে যাহারা তাহারদিগের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া ইউরোপীয় লোকের সমভিব্যাহারে নিষিদ্ধ আহার পান দ্বারা আপনারদিগকে নষ্ট করিয়াছে এবং সতী ব্যবহারের বিষয়ে কোন শাস্ত্র নাই ইহা কহিয়া তোমাকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিতেছে······আমরা আরো নিবেদন করি যে, পূর্ব্বে ইহার অনুসন্ধান কোন ২ অতিপণ্ডিত ও ধর্ম্মিষ্ঠ কোম্পানির কর্ম্মকারী সাহেবেরা করিয়াছেন যাঁহারদিগকে তাঁহারদিগের অধীন হিন্দুরা অদ্যাবধি মর্য্যাদাপূর্ব্বক স্মরণ করিতেছেন······উপযুক্ত ধারা যাহা প্রচলিত হইতেছে ইহাতে মানস সিদ্ধ হয় নাই এবং এই প্রমাণ হইয়াছে যে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন ক্রমে হাত দেওয়া অতি অনীতি।··· পূর্ব্বোক্ত জনেরদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অতি জ্ঞানবান রাজকার্য্যের ভার নির্বাহ করিয়াছেন তাঁহারদিগের দ্বারা আমারদিগের ধর্ম্ম কখন অতিক্রম হয় নাই এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যৎকালে ভূতকালের ন্যায় তাহা অলঙ্ঘ্যরূপে রক্ষা পাইবেক যেহেতু সে সকল ভারি জামিন ও সনন্দের ন্যায় আমরা আপন হাকিম হইতে পাইয়াছি যাহার উপর আমারদিগের ধন প্রাণাপেক্ষা আমারদিগের অতি পবিত্র ধর্ম্মের নির্ভর। আর আমরা সত্য কহিতেছি যে আপনি কৌনসালের বৈঠকে এই আবশ্যক বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে ভাবনা ও ভয়ের সহিত যে চিন্তা আমারদিগের ও কোম্পানি বাহাদুরের সমস্ত শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ হিন্দু প্রজাবর্গের মনে হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ হইবেক আর আপনকার সদ্বিবেচনা দ্বারা এই মত আর কোন বিষয়ে আক্রমণ হইতে আমরা চিরকাল রক্ষা পাইব ইতি।—আরজী সমাপ্ত।

আরজীর উত্তর।

শ্রীযুত এই উত্তর করিলেন যে আমার নিকটে যে দরখাস্ত উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি হিন্দুরদিগের ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবারদিগের আত্মঘাত বিষয়ে কোন এমত অনুশাসন প্রকাশ নাই কিন্তু স্বামির মরণানন্তর তাঁহারদিগের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে কালযাপন করা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ বটে···অতএব হিন্দুরদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির এমত দুরবস্থা হয় নাই যে গবরনমেণ্টের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয় কি আপনারদিগের শাস্ত্রের ব্যবস্থোল্লঙ্ঘন করিতে হয় যেহেতুক বিধবারদিগের ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করাতে এককালে গবরণমেণ্টের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয় এবং স্বধর্ম্মের মুখ্য কল্পও প্রতিপালন করা হয়···ধর্ম্মের বিষয়ে হিন্দুরদিগের যাদৃচ্ছিকানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে কিছু ব্যাঘাত জন্মাইবেন না। এবং যুক্তি ও যথার্থের সহিত যে সকল অনুষ্ঠান অবিরুদ্ধ হয় এমত পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যবহৃতানুষ্ঠানে তাঁহারদিগের কিছু প্রতিবন্ধকতা হইবে না ইহা প্রার্থনাকারিরদিগের স্থানে পুনরুক্তি করণের কোন আবশ্যক নাই কিন্তু সেই সকল ব্যবহারের মধ্যে কতিপয় ব্যবহার শ্রীশ্রীযুতের পূর্ব্বপদস্থেরা মনুষ্যেরদিগের জীবন সংরক্ষণার্থে এবং সম্বন্ধের পারিপাট্য করণার্থে সময়ক্রমে তাহা রহিত করণের আবশ্যক বুঝিয়াছেন···

···শ্রীশ্রীযুত অতি সম্মানিত বহুসংখ্যক প্রার্থনাকারিরদিগের প্রার্থনা অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক অবধান করিয়াছেন এবং প্রার্থিত ব্যবহার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে ২ বিবেচনাপূর্ব্বক রহিত করণের আবশ্যক দেখিয়াছেন, তদতিরিক্তে শ্রীশ্রীযুত আপনার এই অভিপ্রায় জানাইয়াছেন কিন্তু যদি প্রার্থনাকারিরা তথাচ এমত বোধ করেন যে শেষ প্রকাশিত আইন পার্লিমেণ্টের ব্যবস্থা বিরুদ্ধ তবে তাঁহারা শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ড রাজার কৌনসালে আপীল করুন এবং শ্রীশ্রীযুত তাহা তথা প্রেরণ করিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন।

১৪ জানেওয়ারি ১৮৩০ সাল	ডবলিউ. সি. বেন্টিঙ্ক। (signed) W. C. Bentinck.

রামমোহন রায়ও কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহযোগিতায় সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির সাহায্যে সহমরণ-নিষেধক আইনের সমর্থন করিতে লাগিলেন। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের আন্দোলন দর্শনে দেশীয় জনসাধারণের মনোভাবের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সরকার যাহাতে ভীত না হন এবং উক্ত আইন প্রণয়ন বিষয়ে বঙ্গীয় উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের যে পূর্ণ সমর্থন আছে, তাহার প্রমাণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দুই দিন পরেই ১৬ই জানুয়ারী তারিখে রামমোহনের উৎসাহে ও আগ্রহে "কলিকাতা নগরস্থায়ি এবং তন্নিকটস্থ গ্রামনিবাসিরা···হিন্দু স্ত্রী পরম্পরার জীবন রক্ষার নিমিত্ত··মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড উলিএম কেবেণ্ডিশ বেন্টিঙ্ক গবরনর জনরেল বাহাদুর ইন কৌনসেল ··ইদানীন্তন যে উপাদেয় নিয়ম করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রী-বধ কলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারী রূপ ও দুর্ণাম হইতে চিরকাল জন্য এ শরণাগত প্রজারদিগকে মোচন করিতে যে করুণাযুক্ত হইয়া যে সুসিদ্ধ যত্ন করিয়াছেন সেই পরমোপকারের পুনঃ ২ স্বীকার নম্রতাপূর্ব্বক" (৩) বঙ্গভাষায় লিখিত একখানি মানপত্র প্রদান করিলেন। বহু স্বাক্ষরিত এই মানপত্রটি গবর্ণমেণ্ট হাউসে বড়লাট লর্ড বেন্টিংক্কের সম্মুখে টাকীর জমিদার কালীনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত হয়; পরে হরিহর দত্ত উহার ইংরেজী অনুবাদও পাঠ করেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা দুইটি মানপত্রই রামমোহনের রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত মানপত্র পাঠের সময়ে রামমোহন রায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে দ্বারকানাথ ঠাকুর উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উক্ত দুইখানি মানপত্রই ১৮ই জানুয়ারী তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হয়।

পরদিনই অর্থাৎ "৫ মাঘ ১৭ জানুঅরি রবিবার সংস্কৃত কলেজে কলিকাতাস্থ হিন্দু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরদিগের এক সভা হইয়াছিল।" রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণই অবশ্য এই 'ধর্ম্মসভা

৩। "সংবাদপত্র," প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯০

আহ্বানে অগ্রণী ছিলেন। "এই ধর্ম্মসভার তাৎপর্য্য হিন্দুশাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদনপত্রাদি রাজ-সন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন-ইত্যাদি।" (৪) লর্ড বেন্টিংকের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের আরজীর উত্তর রাধাকান্ত দেব কর্ত্তৃক সভামধ্যে পঠিত হইলে স্থির হইল "সতী বিষয়ে বিলাতে আপীল করা কর্ত্তব্য।" "বিলাতে যে আরজী দেওয়া যাইবেক" উহা "কি রীতিক্রম প্রস্তুত করিতে হইবেক" তাহা স্থির করিবার জন্য রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ সরকার, গোকুলনাথ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও নীলমণি দে, এই বার জন "বিবেচক" ও ভবানীচরণ কর্ম্ম-নির্ব্বাহক মনোনীত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মসভার অধিবেশনের জন্য একটি নিজস্ব বাটী নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইলে সভ্যেরা তদুদ্দেশ্যে সেই দিনই ১১,২০০৲ টাকা চাঁদা দানের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন। (৫) এইরূপে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দুরা রাধাকান্ত দেব ও ভবানী-চরণের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই একেশ্বরবাদী রামমোহন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়া সহকর্ম্মীদের চেষ্টায় দলপুষ্টি করিতেছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার উদার মতবাদ, বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া জনসাধারণ দলে দলে তাঁহাকে নেতৃত্ব-পদে বরণ করিতেছিল। বিশেষতঃ, ডিরোজিওর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু যুবক তখন সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া উদার দৃষ্টিতে সকলই দেখিতে শিখিয়াছে; যুক্তির নিরিখে যাচাই না করিয়া কোন বিষয় মানিয়া লইতে আর তাহারা সম্মত নহে; বঙ্গে তখন নব যুগ আসিয়াছে। রামমোহনের উদার মতবাদ স্বভাবতই সেই সকল নব্য যুবকদিগের হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহারাও অনেকে রামমোহনের নেতৃত্বে সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিল। বস্তুতঃ, ডিরোজিওর শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী রামমোহনের অন্যতম ভক্ত হইলেন, ও ব্রহ্মসভা স্থাপিত হইলে তিনি উহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

এ যাবৎ রামমোহন-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্ম সমাজের কোন স্থায়ী গৃহ ছিল না। ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইবার মাত্র ছয় দিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে চিৎপুর রোডের নবক্রীত বাটীতে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারোদ্ঘাটন হইল। দুই বিরুদ্ধ দল তুমুল আন্দোলনে যোগদান করিল। জনসাধারণের মধ্যেও এই উদ্দীপনা পরিব্যাপ্ত হইল। "সম্বাদ-কৌমুদী" নামক পত্রিকা-সম্পাদনে ভবানীচরণ এক সময়ে রামমোহনের সহযোগী ছিলেন। কিন্তু রামমোহন ঐ সংবাদপত্রের মধ্যবর্ত্তিতায় সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিতেই ভবানীচরণ উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বয়ং "সমাচার-চন্দ্রিকা" সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই 'সমাচার-চন্দ্রিকা' নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের সপ্রশংস সহানুভূতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এখন এই দুই সংবাদপত্র দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মুখপত্ররূপে পরস্পরের প্রতি অসংযত ভাষায় গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিল। পরস্পরের প্রতিকূলে লিখিত শাণিত বিদ্রূপ, ছড়া, গান ও কটূক্তি পাঠে পাঠক সাধারণ কৌতুক বোধ করিতে লাগিলেন। (৬) বাজারে, হাটে, স্নানের ঘাটে, চণ্ডীমণ্ডপে, সাধারণের যে কোন মিলনস্থানে, আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে ঐ বিষয়ে আলোচনা, তর্ক ও বাক্‌যুদ্ধ চলিতে লাগিল। 'সমাচার-দর্পণ'ও এই আন্দোলনে রামমোহনের পক্ষ গ্রহণ করিল। কলিকাতার স্থানীয় এই আন্দোলন দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিল। এই আন্দোলন কেবল সংবাদপত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না, উভয় পক্ষ কর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গালায় একাধিক পুস্তিকাও প্রকাশিত হইল।

ভবানীচরণের উদ্যোগে অতি অল্প দিনের মধ্যে কাশীপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মসভার একাধিক শাখা স্থাপিত হইল ও "ইহাও ধার্য্য হইল, যাহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহাদিগের সহিত কাহার আহার ব্যবহার থাকিবেক না।" (৭) এমন কি, সহমরণ প্রথার ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাসূচক কোন সংবাদপত্র অথবা পুস্তিকা পাঠ করাও ধর্ম্মসভার সভ্যদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। বলা বাহুল্য, রামমোহনের উপরই সনাতনপন্থী হিন্দুরা প্রচণ্ড বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিলেন, এবং তজ্জন্য রামমোহন, নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। তাঁহার বন্ধু মিঃ মোণ্টগোমারি মার্টিনের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রামমোহন ঐ সময়ে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মসভার কার্য্যকারকেরা সহমরণ-প্রথা আইনসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দাখিল করিবার জন্য কলিকাতার তৎকালীন ডেপুটী শেরিফ মিঃ বেথীকে তাঁহাদের পক্ষে এটর্নী নিযুক্ত করিলেন। বলা বাহুল্য, তজ্জন্য সংগৃহীত চাঁদা হইতে তাঁহাকে দর্শনী বাবদ বহু অর্থ দিতে হইল। ধর্ম্মসভার পক্ষে এই কার্য্যভার গ্রহণ করায় মিঃ বেথী স্বজাতীয়দের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইলেন।

কিন্তু হিন্দুদিগের চিরাচরিত এই সহমরণ প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পক্ষে মিঃ চার্লস উইলকিন্স, বিচারক মিঃ জোনাথন ডানকান প্রভৃতি কোন কোন ইংরেজ, এমন কি, বিশপ হেবার পর্য্যন্ত প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, এইরূপই জানিতে পারা গিয়াছে।

৪। "সংবাদপত্র," তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬

৫। "সংবাদপত্র," প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০০-০১

৬। "সতী" সমর্থকদিগের দ্বারা রামমোহনকে লক্ষ্য করিয়া রচিত ও তৎকাল প্রচলিত একটি ছড়া নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—ভদ্রসমাজে এরুচি এ-কালে অচল।

"মাদ্রী পাণ্ডুর সহমরণ" আর্য্য ঋষিরা লেখেন নি।
এই সিদ্ধান্ত জাহির করে ধর্ম্মশাস্ত্র-চূড়ামণি।
ব্যাস মনু যা' পারেনি তা' জাহির হ'ল আইন বলে।
মাছের মায়ের পুত্রশোকে সতী ধর্ম্ম গেল চলে।
নেড়ের দলের রাম রাজা বিলেতে তাইতেই গেল।
হিন্দুর আর্জ্জি বিলাত গিয়ে তাই ফাঁস হ'য়ে গেল।
মূর্খ বাদশা পাঠালে তায় ভিক্ষা করে "রাজা" হ'তে।
কোম্পানি হ'লো দেশের রাজা সেই তার দাসখতে।
মাসহারা শুধু বেড়ে গেল আরজি করার ফল।
সতীর শাপে ম্লেচ্ছের দেশে তাই বাক্সে পচে ম'লে।

৭। "সংবাদপত্র", তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭

শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব আপীলের দরখাস্ত ও তৎসহ প্রেরিত ব্যবস্থাপত্রখানি ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন; সাধারণের নিকট ইহার অর্থ সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্র হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অনুবাদিত করিয়াছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের নিকট আরজীর সহিত যে ব্যবস্থাপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, আপীলের দরখাস্তের সহিতও উহা প্রেরিত হয়। বহু পণ্ডিতের সাহচর্য্যে ও সম্মতিতে শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উহা লিখিত হয়। "আবর্জীতে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের আইনকে এক দেশে স্থান দিয়া (রাধাকান্ত দেব) তাহার প্রত্যেক কথার সদুত্তর করিয়াছেন ও তাঁহার নিকটে প্রথম যে প্রার্থনা-পত্র দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর তিনি দিয়াছিলেন তৎপ্রত্যুত্তর ঐ আরজীতে বিলক্ষণরূপে লিখিত হইয়াছে এবং সহমরণানুমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যবিষয় যে গ্রন্থে যত বচন আছে, তাহা তাবৎ সংগ্রহ পূর্ব্বক তরজমা করিয়া আরজীমধ্যে বিন্যাস করিয়াছেন; এই আরজী সংশোধনার্থ কোন বিজ্ঞ ইঙ্গলেজের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তিনি দৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্টপূর্ব্বক বাবুকে বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন এবং উকীল ফ্রেন্সিস বেথী সাহেব এই আরজী দেখিয়া সাহস করিয়াছেন যে, আমারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হইবেক।" "...সভাপক্ষীয় যে আরজী বিলাতে গিয়াছে, যাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুত ডাক্তর লসিংটন সাহেব মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, that the petition is one of the cleverest thing I ever heard. অর্থাৎ এমত বিজ্ঞতা প্রকাশক আবেদনপত্র যদি আমি কখন শুনিয়া থাকি।" (৮)

যাহা হউক, লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্ত্তৃক সহমরণ-প্রথা নিষিদ্ধ হইবার প্রায় আট মাস পরে মিঃ বেথী স্বয়ং এই দরখাস্তসহ ইংলণ্ডগামী জাহাজে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিয়দ্দূর গমন করিবার পর সেই জাহাজের তলদেশ ছিদ্র হওয়ায় জাহাজ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাহারও প্রাণহানি ঘটে নাই। মিঃ বেথী এই ঘটনার পর দরখাস্তসহ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলে, এই বিষয় লইয়া পুনরায় দুই বিরুদ্ধ পক্ষে কৌতুককর আলোচনার সূত্রপাত হয়। এক পক্ষ প্রচার করিলেন, নিপীড়িতা রমণীদিগের অভিশাপেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; অপরপক্ষীয়েরা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, কেবল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহিমা ও সতী নারীদের শুভেচ্ছাই জলমগ্নোন্মুখ জাহাজকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে; না হইলে সমস্ত আরোহিসহ জাহাজ অবশ্যই সলিল-সমাধি লাভ করিত। এই ঘটনার কিছু দিন পরে, মিঃ বেথী পুনরায় ঐ দরখাস্তসহ ইংলণ্ড গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য, রামমোহনও নিশ্চেষ্টভাবে কালক্ষেপ করেন নাই। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই তিনি বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য ইংলণ্ড গমনের মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাঁহার এই আশা পূর্ণ হয় নাই। কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই দ্বিতীয় শাহ আলমের পুত্র দিল্লীর তদানীন্তন সাক্ষীগোপাল বাদশাহ আবু-নাসার-মুইন-উদ-দীন আকবর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে পূর্ব্ব-সন্ধির চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য বহু অর্থের দাবী করিতেছিলেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবার জন্য রামমোহনকেই তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন ও তাঁহাকে 'রাজা' খেতাব দান করিয়া তাঁহার দূত নিযুক্ত করিলেন। এই ভাবে রামমোহনের বহুদিনের অভিলাষ সিদ্ধ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পুনরায় সনন্দ দানের প্রস্তাব হয়। এই ঘটনার সহিত ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্ট জড়িত থাকায় কোম্পানীকে সনন্দদান-সংক্রান্ত আলোচনার সময়ে রামমোহন পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভায় স্বয়ং উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু সহমরণ-প্রথার বিলোপ সাধন ব্যাপারের শেষ মীমাংসা না করিয়া স্বদেশ ত্যাগ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। রক্ষণশীল হিন্দু নেতৃবৃন্দ আপীলের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলে রামমোহনও "The Honourable the Commons of the United Kingdom of Great Britain and Ireland in Parliament Assembled"কে তাহার প্রতিকূলে একটি আবেদন করিয়া লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইন যাহাতে কায়েম থাকে, সে জন্য অনুরোধ করিলেন। এই আবেদন-পত্র বহু খ্যাতনামা ভারতবাসী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, ইহাও স্থির হয় যে, লর্ড বেন্টিঙ্ককে প্রদত্ত মানপত্রের একখানি অনুলিপিও ঐ আবেদন-পত্রসহ রামমোহন ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর প্রধানতঃ পূর্ব্বোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যে রামমোহন লিবারপুলগামী 'আলবিয়ন' নামক জাহাজে চাপিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল পদার্পণ করেন। যথাকালে তিনি 'হাউস অফ কমন্সে' সেই আবেদনপত্র দাখিল করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অন্যান্য নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও রামমোহন সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে ও তৎসম্পর্কে লর্ড ল্যান্সডাউন প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। "রামমোহন কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে আনীত "এক দরখাস্ত শ্রীযুত বাদশাহের এক প্রধান মন্ত্রী মারকুইস লান্সডৌন কুলীনেরদের সভায় দরপেশ করেন।" (৯)

মিঃ বেথী ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবার পর সতীদাহের সমর্থক আবেদনপত্র যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন সেই আপীলের প্রথম শুনানী ও ১১ই জুলাই রামমোহনের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় শুনানী হইবার পর ঐ দরখাস্ত প্রিভিকৌন্সিল কর্ত্তৃক নামঞ্জুর হয়, ও সহমরণ-নিষেধক আইন বলবৎ রহিল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সেই দিন 'হোয়াইট হলের' পরিষদ-কক্ষে এই আপীলের বিচারকর্দিগের মধ্যে প্রিভিকাউন্সিলের সভ্য হিসাবে লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড ল্যান্সডাউন, লর্ড আমহার্ষ্ট, লর্ড জন রাসেল, মিঃ চার্লস গ্রাণ্ট প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর লাসিংটন বাদীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স প্রতিবাদী হিসাবে সওয়াল জবাব করিয়াছিলেন। রামমোহনকে বিচারকদিগের অতি সন্নিকটেই সম্মানজনক আসন প্রদান করা হয়।

আপীল না-মঞ্জুরের সংবাদ নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিবামাত্র রামমোহনের দলস্থ ব্যক্তিরা বিজয়োৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রমানাথ ঠাকুর ও রাধাপ্রসাদ রায় (রামমোহনের পুত্র)

৮। "সংবাদপত্র", তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩৯৫

৯। "সংবাদপত্র", তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮০

ব্রহ্মসভার এই তিনজন অছি (Trustees) যাহাতে "স্ত্রীদাহ-নিবারণের অনুরাগিরা শ্রীল শ্রীযুতের উপকার স্বীকারের কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার জন্য ভবিষ্যৎ শনিবার ২৯শে কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর দুই প্রহর ছয় ঘণ্টা দিবার সময়ে যোড়াসাঁকোর ব্র্যাহ্ম-সমাজ গৃহে একত্র" হয়েন তজ্জন্য এক "আহ্বানলিপি" প্রকাশ করিলেন। (১০) উক্ত দিবসে এই সভায় স্ত্রীদাহ-নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা "অত্যধিক ঘৃণ্য স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর্ম নিবারণ প্রযুক্ত" হর্ষ প্রকাশ করিলেন। "শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ডাধিপতি ও প্রবিকৌন্সেলকে …অপর কোর্ট আব ডিরেকটর্সকে" ও "এই মহোল্লাসের আদি কারণ পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিয়েম বেন্টীঙ্ক গবরনর বাহাদুর"কে ধন্যবাদ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য বলিয়া সভায় স্থির হইল। "শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা ঐ ধন্যবাদপত্র বিলাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিত হওনের বিষয়ে…সভ্যগণেরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্যা নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও নির্দয় স্ত্রীবধিরদের কটূক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালীর মধ্যে অন্য কাহারও এরূপ হয় নাই অতএব এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক।"(১১)

উক্ত আইন প্রণয়ন হইবার পর চারি মাসের মধ্যে পঁচিশ জন নারীকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করা হয় ও পাঁচ বৎসরের মধ্যে সহমরণ প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

—

গুরুগোবিন্দের জীবন-ধারা

শিখ সম্প্রদায়ের গুরু গোবিন্দ সিংজীর বাল্যজীবন রহস্য-সমাচ্ছন্ন। উহাতে অনেক অলৌকিক কাহিনী বর্ত্তমান। সেই জন্য য়ুরোপীয় পণ্ডিত-সমাজ সেই সকল বিবরণে আস্থা স্থাপন করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে এই সকল কাহিনী অলৌকিক বলিয়া অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বোধে উড়াইয়া দিতে চাহেন, ঐ ভাবে তাহা উড়াইয়া দিতে হইলে প্রকৃত ইতিহাসের অনেক অংশই বাদ পড়িয়া যায়। গুরু গোবিন্দের ভক্তগণ সরল বিশ্বাসে এবং গুরুর প্রতি অচলা ভক্তিনিবন্ধন যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা খাঁটি বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও তাহার ভিতর যে কিছু কিছু সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মধ্বজী বাদসাহ ঔরঙ্গজেব ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের বসন্ত পঞ্চমীর দিন দিল্লীর চাঁদনীচকের বাজারে শিখগুরু তেগ বাহাদুরকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় সর্ব্বজন-সমক্ষে হত্যা করিয়াছিলেন! ঐ দিন বেলা এগারটার সময় বাজারের বৃক্ষতলে তেগ বাহাদুর রপজী পাঠ করিয়া যখন প্রণাম করিতেছিলেন, সেই সময় ঘাতক তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদনের জন্য অসি-হস্তে যেমন অগ্রসর হইল সেই মুহূর্ত্তেই আঁধি বা ঘূর্ণি বায়ুর একটা ঝাপটা আসিয়া দর্শকগণের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিল। ঘাতক সবিস্ময়ে দেখিল তেগ বাহাদুরের স্কন্ধের উপর মস্তক নাই! এক জন ভক্ত শিষ্য তাঁহার ছিন্ন মুণ্ডটি লইয়া যাইবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। আঁধিতে সকলে যখন অন্ধপ্রায়, ঠিক সেই সময় আচম্বিতে তাঁহার মস্তক তাহার কোলের উপর আসিয়া পড়িল। উহা লইয়া শিষ্যটি তাঁহার পুত্র গোবিন্দ সিংজীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। গোবিন্দ সিং যথারীতি মুখাগ্নি করিয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এই কাহিনী অতি-প্রকৃত, এই জন্য ইহা বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষেই কঠিন বটে; কিন্তু ইহার আগাগোড়া সবই মিথ্যা, এরূপ মনে করাও কি সঙ্গত? যে সময় ঘাতক কর্ত্তৃক তেগ বাহাদুরের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল,—সেই সময় আচম্বিতে ঘূর্ণবায়ু ও আঁধির আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে; এক জন ভক্ত শিষ্য দেহচ্যুত মুণ্ডটি লইয়া গিয়া তাঁহার পুত্রকে প্রদান করিয়াছিল এই ঘটনা অতি-প্রকৃত নহে; বরং ইহাতে প্রতিপন্ন হয়—তেগ বাহাদুর সর্ব্বসাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন যে, বাজারের জনসাধারণ তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড অপসারণের কথা জানিতে পারিলেও তাহাদের কেহই সে কথা প্রকাশ করে নাই। জনসাধারণের উপর তেগ বাহাদুরের প্রভাব বুঝিতে হইলে ভক্ত শিখগণের এই কাহিনী উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। এই জন্যই ঐ সকল কাহিনী সম্পূর্ণ বর্জ্জনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

দশম গুরুগোবিন্দ সিং গুরু তেগ বাহাদুরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম ছিল গুজরী (গুজরী ?)। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নিদারুণ অত্যাচারে প্রপীড়িত তেগ বাহাদুর তীর্থ-ভ্রমণের উপলক্ষে পঞ্জাব হইতে সপরিবারে পাটনায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। গোবিন্দ সিং ১৭২২ সম্বতে অর্থাৎ ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে পাটনা নগরীতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ সিং তাঁহার লিখিত 'দশম বাদশা-কা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিচিত্র নাটকে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার পিতা পূর্ব্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। প্রয়াগধামে উপনীত হইয়া তিনি দীনদরিদ্রগণকে দানাদি দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিবার পর আমার উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে আমি পাটনা নগরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। ইহার কিছু দিন পর আমাকে মদ্রদেশে (পঞ্জাবে) লইয়া যাওয়া হয়।"

এই বিবরণ হইতে বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই; তবে অন্যান্য সূত্রে যে সকল কথা জানিতে পারা যায়, তাহাতে নানা জনের নানা মত লক্ষিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ উক্তির বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রকাশ, গুরু গোবিন্দের পিতামহী নানকী বলিয়াছিলেন,—এই বালক কালে হরগোবিন্দ রায়ের ন্যায় সুদক্ষ যোদ্ধা হইবে। ইহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে; প্রভাত দেখিয়া দিনটি কিরূপ হইবে, তাহা যেমন বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ অনেকের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হইবে, তাহা বোধগম্য হইয়া থাকে। বালক গোবিন্দ রায় খেলা করিবার সময় তাঁহার খেলার সঙ্গিগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন; এক ভাগ মুসলমানের ভূমিকা গ্রহণ করিত, অন্য ভাগ শিখ হইত। অতঃপর উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সেই ক্রীড়া-যুদ্ধের অবসানে প্রায়ই মুসলমান দলকে পরাজিত হইতে হইত। গোবিন্দ স্বয়ং শিশু সৈন্যগণের

(১০) "সংবাদপত্র", তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮১

(১১) "সংবাদপত্র", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭-৪৮

নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিতেন। বালক গোবিন্দ রায় প্রতিদিনই অস্ত্রচালনা-কৌশলে অভ্যস্ত হইতেন। শৈশবেই গোবিন্দ রায়ের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতিবেশীরা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শিখরা তাঁহার সম্বন্ধে বলেন,—বাল্যকালে তিনি যখন পাটনা ত্যাগ করেন, সেই সময় রাম-নির্ব্বাসনে শোকসন্তপ্ত অযোধ্যা নগরীর জনসাধারণ যেরূপ বিলাপ করিয়াছিল, পাটনা নগরীর জনসাধারণের অনেকেই সেইরূপ বিলাপ করিয়াছিল।

শিখদিগের একখানি গ্রন্থের নাম 'সূর্য্যপ্রকাশ'। গ্রন্থখানি বৃহৎ এবং গুরুগোবিন্দের পরলোক-গমনের অব্যবহিত পরে সন্তোখ সিং (সন্তোষ সিং?) নামক ভক্ত শিখ কর্তৃক উহা রচিত হইয়াছিল। 'সূর্য্যপ্রকাশে' বর্ণিত হইয়াছে—গোবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইলে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দর্শকশ্রেণীর মধ্যে এক জন মুসলমান ফকির ছিলেন, তাঁহার নাম সৈয়দ ভিকৃসা। শিশুর পিতা তেগ বাহাদুর তখন বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিলেন। নবজাত শিশুর মাতুল কৃপাল তখন সেই বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিতেন। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব পূর্ব্ব হইতেই শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের প্রতি নিরতিশয় কঠোর ব্যবহার করায় তাঁহার পরিজনবর্গের সন্দেহ হইল—এই ফকিরটি সম্ভবতঃ ঔরঙ্গজেবেরই গুপ্তচর। এই জন্য তাঁহারা ফকিরকে শিশু দেখাইলেন না। ফকির তিন দিন তেগ বাহাদুরের বাড়ীর সম্মুখে অনাহারে পড়িয়া রহিলেন। ফকিরের এইরূপ ব্যবহারে অনেকের ধারণা হইল, তিনি নিশ্চিতই প্রচ্ছন্ন ভক্ত। অতঃপর তেগ বাহাদুরের জননী নানকীর অনুমতিক্রমে ফকিরকে শিশু দেখান হয়। উত্তরকালে ফকির ভিকৃসার সহিত গুরুগোবিন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই ফকির ঔরঙ্গজেব বাদশাহের চর ছিলেন না।

গুরুগোবিন্দ কত বয়স পর্য্যন্ত পাটনায় ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এ কথা সত্য যে, তাঁহার জন্মের কিছু দিন পরেই তেগ বাহাদুর পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কথিত আছে—কামরূপের রাজা এবং জয়পুরের রাজা পাটনা পর্য্যন্ত তেগ বাহাদুরের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। কামরূপের রাজা শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার পরেই তেগ বাহাদুর পঞ্জাব গমনের ইচ্ছা করেন। বালক গোবিন্দও পিতার সহিত পঞ্জাব গমনের বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তেগ বাহাদুর তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইতে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। অতঃপর গুরু তেজবাহাদুর স্বগ্রামে গমন করেন। তিনি তথায় গমন করায় ঔরঙ্গজেবের ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ আরও প্রবল হইয়াছিল।

পঞ্জাবে পৌঁছিবার অল্প দিন পরে তেগ বাহাদুর তাঁহার পরিজনবর্গকে পঞ্জাবে যাইবার জন্য আদেশ করিয়া লোক মারফৎ পত্র পাঠাইলেন। গুরুগোবিন্দ তখন মদ্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই সময় বালক গোবিন্দ রায় উৎকৃষ্ট অস্ত্র সযত্নে সংগ্রহ করিতেন এবং সেগুলি কোন উচ্চ স্থানে রাখিয়া ও চন্দনচর্চ্চিত করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা তাহাদের পূজা করিতেন। শত্রুনিপাতই এই সময় হইতে বালকের এক মাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। খালসা-শিখদিগের প্রবর্ত্তকের জীবনের ইহাই ছিল মূল মন্ত্র। নারীদিগকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করিতেন। 'সূর্য্য প্রকাশে' লিখিত আছে পাটনার যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, সেই বাড়ীতে একটি কূপ ছিল। কূপটির জল অত্যন্ত সুপেয় বলিয়া পল্লীবাসীদের অনেকে সেই কূপ হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিত। গোবিন্দ তখন গুলতি-বাঁটুল লইয়া খেলা করিতেন। বালক ক্রীড়াচ্ছলে বাঁটুল নিক্ষেপে কোন কোন নারীর কলসী ভাঙ্গিয়া দিতেন। গোবিন্দের মাতা এবং পিতামহী এজন্য গোবিন্দকে ভর্ৎসনা করিতেন। এক দিন একটি মুসলমান রমণী সেই কূপ হইতে



গুরুগোবিন্দ সিং

জল লইতে আসিলে গোবিন্দ তাহার কলসী লক্ষ্য করিয়া যে বাঁটুল নিক্ষেপ করেন, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রীলোকটির কপালে লাগায় কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল। পুত্রের এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত মাতা তাঁহাকে প্রহারোদ্যত হইলে গোবিন্দ পলায়ন করেন; কিন্তু পরে তিনি তাঁহার দোষের জন্য লজ্জিত হইয়া সেই রমণীর নিকট

ত্রুটিস্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি নারীজাতিকে সম্মান করিতে আরম্ভ করেন।

বালক গোবিন্দ রায় পাটনা হইতে যাত্রা করিয়া যে যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার উপহার দান করা হইয়াছিল। তিনি বারাণসী এবং অযোধ্যা হইয়া লক্ষ্ণৌ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ নগরে রাজা ফতেচাঁদ তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে পরম যত্নে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। অতঃপর গোবিন্দ রায় অন্য একটি লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করেন। এই লক্ষ্ণৌ পঞ্জাবের আম্বালা সহর হইতে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে বালক গোবিন্দ রায় তাঁহার বাল্যসঙ্গিগণের সহিত যুদ্ধ-ক্রীড়া করিতেন।

অতঃপর গোবিন্দ আনন্দপুরে পৌছিবার পূর্ব্বেই ঔরঙ্গজেব তাঁহার পিতা তেগ বাহাদুরকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। তেগ বাহাদুর পরে যাইবেন বলিয়া দূতকে ফেরত দিলেন। পরে আষাঢ় মাসের প্রবল বর্ষার মধ্যে তিনি দিল্লী যাত্রা করিলেন; কিন্তু দিল্লী যাইবার সময় নানা কারণে পথে তাঁহার বিলম্ব হয়। ঔরঙ্গজেব এজন্য অধীর হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূত আনন্দপুরে তাঁহাকে না পাওয়ায় দিল্লী প্রত্যাগমন করিলে ঔরঙ্গজেব অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে পুনর্ব্বার দূত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তেগ বাহাদুরের সন্ধান পায় নাই শুনিয়া ঔরঙ্গজেব ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইলেন। তেগ বাহাদুর দিল্লী যাইবার পথে সরফাবাদের প্রতিষ্ঠাতা সরফুদ্দীনের ভবনে কিছু দিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাহার ভাগ্যে কি আছে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, এজন্য তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, সংকারাভাবে তাঁহার দেহ যেন পথিপ্রান্তে শৃগাল-কুক্কুরে ছিঁড়িয়া না খায়। পিতার ছিন্ন মস্তক গোবিন্দের হস্তগত হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গুরুর মস্তকহীন দেহ রাজপথে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া জনসাধারণের মনে ঘোর অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। শিষ্যগণ দেহটির সংকার করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু দাম্ভিক ও বলদৃপ্ত ঔরঙ্গজেবের ভয়ে কেহ সেই দেহ সরাইতে সাহস পাইল না। এই সময় এক জন লবনা (বলদে) শিখ অনেকগুলি বলদ লইয়া ঐ চাঁদনী চকের বাজারের ভিতর দিয়া যাইতেছিল। যে সময়ে জোরে বাতাস বহিতেছিল এবং বহু সংখ্যক ভারবাহী বলদের চরণোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে কেহ কিছুই দেখিতে পাইল না। শিখ বণিকটি অলক্ষ্যে সেই মুণ্ডহীন দেহটি লইয়া সহরের বাহিরে যায়। তথায় তাহার একখানি ছোট চালাঘর ছিল। সে সেই ঘরের ভিতর দাহ্য কাষ্ঠ প্রভৃতির মধ্যে গুরুর দেহ লুকাইয়া রাখিয়া গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিল। এই ভাবে নির্ভীক শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। *

তেগ বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দ রায়ই গোবিন্দ সিং নামে শিখদিগের দশম গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তেগ বাহাদুরের মৃত্যুকালে গোবিন্দ সিংজীর বয়স সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। শিখরা বলেন, তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর মাত্র; আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহকালে তাঁহার বয়স ১১ বর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি দশম বর্ষেই গুরুর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্যানিংহাম লিখিয়াছেন, তেগ বাহাদুরের প্রাণদণ্ডকালে গোবিন্দ সিংএর বয়স ১৫ বৎসর ছিল। শিখরা গুরুগোবিন্দ সিংজীর প্রধানা পত্নীকে মাতা জিতোজী বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ সিং কোন দরিদ্র শিখের কন্যা সুন্দরীজীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ভাঙ্গানীর যুদ্ধ

শিখগুরু গোবিন্দ সিং তাঁহার বিচিত্র নাটকে লিখিয়াছেন, গুরুপদ প্রাপ্তির পর তিনি ধর্ম্মের উন্নতি-সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পাগুতা নগরে গমন করেন। তথায় তিনি কালিন্দ্রী (কালিন্দী ?) নদীতীরে ভ্রমণ করেন, এবং নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে রত থাকেন। ঐ অঞ্চলের রাজা ফতেশাহ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অকারণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। 'সূর্য্যপ্রকাশ' প্রভৃতি শিখদিগের অন্যান্য গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকাশ, পিতার মৃত্যুর পর গোবিন্দ সিংজী কিছুকাল মালঘোয়ালে বাস করিয়াছিলেন। তিনি সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়া বল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার ফলে বিলাসপুরের রাজা ভীমচাঁদের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। জনৈক ধনাঢ্য শিখ গুরুগোবিন্দকে একটি অতি সুশিক্ষিত হস্তী, একটি সুন্দর তাঁবু, এবং অন্যান্য দ্রব্য উপহার দান করেন। ঐ হস্তী এবং তাঁবুটির প্রতি ভীমচাঁদের অত্যন্ত লোভ হয়। গোবিন্দজী বলেন, তিনি তাঁহার ভক্তের প্রদত্ত উপহার কাহাকেও দান করিতে পারিবেন না। এই ব্যাপারেই উভয় পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়াছিল। এই সময়ে নাহন্ রাজ্যের মহীপাল রাজা প্রকাশমেদিনী প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারায় গুরুগোবিন্দকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন। গুরুগোবিন্দের পার্শ্বচর মসন্দগণ এই সময়ে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা গুরুজীর জননী গুজরীকে এবং পিতামহী নানকীকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ঐ সময়ে বিলাসপুরপতি ভীমচাঁদের সহিত যুদ্ধ করা সঙ্গত হইবে না। অতঃপর গুরুগোবিন্দ রাজা প্রকাশমেদিনীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মাথোয়ালে গমন করিয়াছিলেন। *

বস্তুতঃ, কেবল হাতী আর তাঁবুর লোভেই যে এই বিবাদের উদ্ভব, এরূপ মনে হয় না। গোবিন্দ সিংএর প্রতি বিলাসপুরপতি ভীমচাঁদের ঈর্ষ্যা এবং সন্দেহই ইহার প্রকৃত কারণ। গুরুগোবিন্দ ঢক্কা-নিনাদ করিতেন। উহাতে কেবল রাজাদেরই অধিকার আছে বলিয়া বিবেচিত হইত। কেহ কেহ বলেন, গুরুগোবিন্দ সিং ভীমচাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন অংশ লুণ্ঠন করায়

* ক্যানিংহাম বলেন, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঝাড়ুদার জাতীয় জন কয়েক শিখকে দিল্লী হইতে তেগ বাহাদুরের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। মুখুন শাহ নামক জনৈক শিখের চেষ্টায় ঐ অস্থিগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। একথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। শিখদিগের গ্রন্থে যাহা বর্ণিত আছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

* বিচিত্র নাটক ৮।১-৩

ভীমচাঁদ ভীত হইয়া কেটরের রাজা প্রভৃতির সহিত কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। ঐ সময় ভীমচাঁদের পুত্রের সহিত শ্রীনগররাজ ফতে শার কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। তাঁহারা ভীমচাঁদকে বলেন, এই বিবাহের পর যুদ্ধ আরম্ভ করাই সঙ্গত। এই সময় গোবিন্দ সিংজী পাঁওটা গ্রামে ছিলেন। ইত্যবসরে তিনি নেহানের রাজার সহিত শ্রীনগররাজ ফতে শার বিরোধের মীমাংসা করায় ফতে শার প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ফতে শার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে গুরুগোবিন্দ বহুমূল্য উপহারাদি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে বিলাসপুরপতি ভীমচাঁদ ফতে শাকে ঐ সকল উপহার দ্রব্য ফেরত দিতে অনুরোধ করেন। ফতে শাকে প্রথমে তাহাতে সম্মত না হইলেও পরে ভীমচাঁদের জিদে, বিশেষতঃ, শ্রীনগরে সমবেত রাজগণের পরামর্শে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গুরুগোবিন্দজীর দেওয়ান নন্দ চন্দ শ্রীনগরে অবস্থানকালেই বুঝিয়াছিলেন, অবস্থা যেরূপ প্রতিকূল, তাহাতে যুদ্ধ অনিবার্য। নাহন অঞ্চল যমুনাতীরে অবস্থিত। তথাকার রাজা প্রকাশ-মেদিনী গুরুকে সসম্মানে সেখানে বাস করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাহন রাজ্যমধ্যে যমুনাতীরে একটি উচ্চ স্থান দেখিয়া গুরুজী তথায় বাসের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রাজা প্রকাশ-মেদিনী সেই গ্রামেই একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে তাঁহাকে বাস করিতে দিয়াছিলেন। এই গ্রামটির নাম প্রথমে পাঁওটা না থাকিলেও শিখগুরু এই স্থানে প্রথমে পা (পাঁও) রাখিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা পাঁওটা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। 'সিরমুর গেজেটিয়ারে' প্রকাশ, গুরুগোবিন্দজী ঐস্থানে অন্যূন পাঁচ বৎসর ছিলেন। যখন বিলাসপুরপতি রাজা ভীমচাঁদের পুত্রের সহিত শ্রীনগররের রাজা ফতে শার কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব পাকা হইয়াছিল—গুরুগোবিন্দ সিংজী তখন পাঁওটায় ছিলেন; কিন্তু ভাঙ্গানীর যুদ্ধের পরেই তিনি আনন্দপুরে প্রত্যাগমন করেন। এই বিবাহের অল্প দিন পরেই ভাঙ্গানীর যুদ্ধ হইয়াছিল। গুরুগোবিন্দের এই সময়ের জীবনের ব্যাপার অনেকটা রহস্য-বিজড়িত। ক্যানিংহাম বলেন, পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর তিনি সম্ভবতঃ কুড়ি বৎসর যমুনা-সন্নিহিত পার্ব্বত্য অঞ্চলে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরষ্টার বলেন, তিনি কিছু দিন পাটনায় থাকিয়া পরে শ্রীনগর অঞ্চলে গমন করেন। এই সময়ে তিনি হিন্দুর শাস্ত্র, পুরাণ, এবং মুসলমানদিগের কোরাণ প্রভৃতির আলোচনা করেন। যাহা হউক, এই সময়ে তিনি যে ভবিষ্যতের জন্য শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

নন্দ চন্দ শ্রীনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া, যুদ্ধ যে অত্যাসন্ন—এ কথা গোবিন্দ সিংজীকে জ্ঞাপন করেন।

এই সময়ে গোবিন্দ সিংএর কতকগুলি শুভযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে পাঁওটার সন্নিহিত সস্তোরা গ্রামে বুদ্ধুসা নামক এক জন মুসলমান সাধু (ফকির) বাস করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত উদার ছিল; তিনি সজ্জনের সাক্ষাৎ পাইলেই তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। শিখদিগের ধর্ম্মগুরু গোবিন্দ সিং পাঁওটায় বাস করিতেছেন শুনিয়া বুদ্ধুসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং আলাপে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। ক্রমশঃ উভয়ের বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হয়। বুদ্ধুসাকে যে সকল মুসলমান শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, তাহারা শিখগুরুকেও শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধুসার চেষ্টায় অনেক মুসলমান গুরুগোবিন্দ সিংএর দলে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঁওটার নিকটেই রাম রায় বাস করিতেন। ইনি অষ্টম গুরু হরকিষণের, এবং সপ্তম গুরু হর রায়েরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন; কিন্তু তিনি শিখগুরুর পদে বঞ্চিত হওয়ায় ঔরঙ্গজেবের সরকারে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, তিনিই তাহার খুল্ল-পিতামহ নবম গুরুর প্রাণদণ্ড দানে বাদশাহকে পরোক্ষভাবে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ পাঁওটায় আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি প্রাণভয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মসন্দদিগের পরামর্শে তিনি দশম গুরুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

ভাঙ্গানীর রণক্ষেত্র পাঁওটা হইতে ৬ মাইল দূরে মুণ্ডরী গমনের রাজপথে রাজপুর নগরের সন্নিকটে অবস্থিত। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গুরু হরগোবিন্দের একমাত্র কন্যার ৫ পুত্র,—সঙ্গুশা, জিতমল, গোপালচাঁদ, গঙ্গারাম, এবং মেহেরচাঁদ বিপক্ষগণকে প্রচণ্ড তেজে আক্রমণ করেন। গুরুগোবিন্দের বাল্যবন্ধু ব্রাহ্মণ দয়ারাম এবং দেওয়ান নন্দচাঁদ প্রভৃতি তাঁহাদের সহায়তা করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় স্থির হয় নাই; এবং গুরুগোবিন্দই পরাজিত হইবেন—অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, জিতমলের বর্শার আঘাতে হরিচাঁদ আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সংগ্রামের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। এই যুদ্ধে গুরুগোবিন্দের পক্ষে সঙ্গুশা, মেহেরচাঁদ, বুদ্ধুসার দুইটি পুত্র, এবং ভীমচাঁদের পক্ষে হরিচন্দ, চন্দোলের রাজা গোপাল, হায়াৎ খাঁ, নিজামৎ খাঁ প্রভৃতি প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে গিরিপতি ভীমচাঁদের পক্ষে বহু পার্ব্বত্য হিন্দু রাজা ও মুসলমান নরপতি যোগদান করেন। সঙ্গুশা এই যুদ্ধে যেরূপ রণকৌশল প্রদর্শন করেন, তাহার পরিচয় পাইয়া গুরু-গোবিন্দও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষভাগে গুরুজী স্বয়ং সৈন্য পরিচালন করিয়াছিলেন। ভীমচাঁদ এবং ফতে শার পক্ষ প্রবল হইলেও যুদ্ধে তাঁহাদেরই পরাজয় হয়। স্বয়ং গুরুগোবিন্দ এই যুদ্ধের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন; তাহাতে তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের যোদ্ধৃ-বৃন্দের বীরত্বের প্রশংসা করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, গুরুগোবিন্দ পার্ব্বত্য রাজাদিগের কার্য্যে অত্যধিক পরিমাণে হস্তক্ষেপণ করিতেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গানীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিখগুরু গোবিন্দ সিংজী আনন্দপুরে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২১ বৎসর; কাহারও কাহারও মতে ২৬ বৎসর। বাদসাহ ঔরঙ্গ-জেব গুরুগোবিন্দের পিতা তেগ বাহাদুরের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ সে কথা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; এজন্য তাঁহার মনে প্রতিহিংসা-বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। বলদৃপ্ত ঔরঙ্গজেব জনসাধারণের অসন্তোষের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। যদিও সাজাহান ঔরঙ্গজেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

হিন্দু-ধরমকো নাহি বিগারো
একে ভুলতোকো প্রতিপালো

অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মকে (হিন্দুসম্প্রদায়কে) বিগড়াইয়া দিও না, তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিও না; উভয় সম্প্রদায়কে একই ভাবে প্রতিপালন করিও।—কিন্তু দাম্ভিক ঔরঙ্গজেব সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই; ইতিহাসে তাহা সুপ্রকাশ, সুতরাং ইহার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ

নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান প্রবন্ধে গুরুগোবিন্দের প্রসঙ্গই আলোচ্য।

বস্তুতঃ, তেগ বাহাদুরের হত্যাকাণ্ডে নিরীহ শিখদিগের যে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তরকালে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার অন্যতম উপলক্ষ হইয়াছিল। গোবিন্দজী হিন্দু-মুসলমানকে সম্মিলিত করিয়া প্রথমে তাঁহার কার্য্যোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন রণদুর্ম্মদ খাল্‌সাবাহিনী সংগঠন করেন, তখন হিন্দুদিগের জাতিভেদ অগ্রাহ্য করেন; পূর্ব্বে করেন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার পিতা তেগ বাহাদুর ধর্ম্মের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়িয়াই গুরুগোবিন্দ খাল্‌সা সৈন্যদল সংগঠিত করিয়াছিলেন। জাতিভেদ অমান্য করাতেই শিখরা হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। কেহ কেহ বলেন, গুরুগোবিন্দ প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; খাল্‌সাধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে তিনি নয়না দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, এ সকল কথা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

প্রগতিশীলা

যেথা রজনীগন্ধা গন্ধ বিলায় মুখরা গোলাপ হাসে,
প্রণয়ের কথা কণ্ঠে লইয়া কাজলা ভ্রমর আসে।
সেথায় একটা বাঙলো থাকিবে ছোট্ট নদীর তীরে,
মেহেদী-বিতান; বিলিতী-ঘাসের বেড়া রবে তারে ঘিরে।

সুদূরে শোভিবে ধূম্র পাহাড় আকাশের গায় লেখা;
শয়ন-ঘরের বাতায়ন হ'তে সেটা যেন যায় দেখা।
মোটের উপর কাব্যোপযোগী 'সিনারিটা' চাই ঠিক।
কল্পনাবনে মন-হরিণীটি ছুটে যাবে নির্ভীক্।
সমুখে একটা গাড়ী-বারান্দা থাকা চাই নিশ্চয়।
'সিডান'-কারটা তারি নীচে রবে করিতে বিশ্বজয়।
সময়-মতন পাড়ি দেওয়া যাবে সিনেমায়-থিয়েটারে।
'সোফার' চাই যে বিকেলেতে যেতে ডায়মণ্ড হারবারে।
রোজ টি-পার্টি দেওয়া চাই যত তরুণ বন্ধুজনে।
ডিনার একটা জমকালো-গোছ চাই যে জন্মদিনে।
উপহার দেয় কেহ নেকলেস, কেহ ব্রোচ,
বই, আনে।
তেমনি তাদের তুষিতে হইবে মধুময় সম্মানে।
ড্রইং-রুমটা তারি আয়োজনে সজ্জিত হ'য়ে রবে।
সোফা-কোচ আর পিয়ানো একটা রহিবে সগৌরবে।
মেহগনির ঐ আলমারীটাও থাকিবে আরেক ধারে।
টিপয় তিনটে পাশাপাশি রেখে ফুলদানী তারি 'পরে।
পুষ্পস্তবক সুবাস ছড়ায়ে শোভিবে তাহার মাঝে।
'বয়'-দুটো রবে প্রয়োজন মত ঘুরিতে নানান কাজে।
স্নো, ক্রীম, আর পাউডার, রুজ, এগুলো না হ'লে নয়।
ড্রেসটা এমন হওয়া চাই যাতে লোকে মানে বিস্ময়।
স্বামী হইবেন বিলেত-ফেরত নবীন ব্যারিষ্টার।
টাকার কুমীর, ষ্টাইল-মেকার, প্রতীক সভ্যতার।
প্রিয়েরে করিয়া ওমার-কবি সে তরুণী সাকীটি হবে।
স্বপনের দেখা বসরার বাগ্ সত্য স্বরূপে লবে।
এমনি একটা কল্পনা মনে ছিল যেন তার আঁকা
বাস্তব পানে চেয়ে দেখে হায় সমস্তটাই ফাঁকা।

... ...

স্বামী জজকোর্টে কেরাণী মাত্র দশটায় ভাত গুঁজে,
পাঁচটা অবধি গাধার খাটুনি খেটে যান চোখ বুজে।
মাসান্তে পান চল্লিশ টাকা, বাজার দেনাটি শুধে,
দুই টাকা দিয়ে খোকার বেতন, তিন টাকা দিয়ে দুধে।
বাকী পনেরটি হাতে দিয়ে কন্ মুখখানি ক'রে নীচু।
সব দিয়ে থুয়ে এই ছাড়া 'অনু' রইল না আর কিছু।

পনের টাকায় চলিবে কেমনে ভেবে 'অনু' হয় সারা।
আধ-পেটা খেয়ে দিন কাটে হায় এই নিয়তির ধারা!
কোথা বসরার গোলাপ-বাগিচা কে বা সে তরুণী সাকী?
অভাবের চাপে দেহ-মন কাঁপে অশ্রুসিক্ত আঁখি।

রাণু গঙ্গোপাধ্যায়।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

দশম অধ্যায়

শ্রীল রাধাদামোদর ও শ্রীরাধাকুণ্ড

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরাধাদামোদরের সেবা স্থাপন করিয়া যমুনাতীরবর্ত্তী শৃঙ্গারবটের নিকটে বাস করিতেন। শ্রীল মদনমোহনের ও শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যাপার যেরূপে তাঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ হইয়াছিল—শ্রীল রাধাদামোদরের মন্দির-নির্ম্মাণ সেইরূপে হয় নাই। মন্দিরের পরিবর্ত্তে তিনি সাধারণ ইষ্টক দ্বারা একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই গৃহে শ্রীল দামোদরকে স্থাপন করেন, এবং আর একটি গৃহে শ্রীরূপ-সনাতনের রচিত ও সংগৃহীত, তদ্ভিন্ন, তাঁহার নিজের রচিত ও সংগৃহীত পুস্তকাবলী রক্ষা করেন। ফলতঃ, তিনি রাজপুতানা, বারাণসীধাম, শ্রীরঙ্গনাথ, কাঞ্চীপুরী ও অন্যান্য নানা স্থান হইতে নানাবিধ আর্ষগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থ আনয়ন করিয়া শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে সুরক্ষিত করেন। তিনি যেমন শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বারা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ও শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরের দ্বারা শ্রীরূপের, শ্রীসনাতনের, শ্রীল গোপাল ভট্টের, শ্রীল রঘুনাথ দাসের, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নিজকৃত অসংখ্য গ্রন্থ গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তেমনই অন্যান্য শিষ্যের দ্বারা রাজপুতানায়, সুদূর সিন্ধুপ্রদেশে, আফগানিস্থান ও মধ্য-প্রদেশের বহু স্থলে তাঁহাদের বহু গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। এখনও আফগানিস্থানে পুস্তু ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুবাদ পাওয়া যায়। সুদূর সলিমাবাদে * জয়পুরের গোবিন্দজীর মন্দিরে, জয়পুরের পলতা, করৌরীপ্রমুখ স্থানে এখনও—গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। শ্রীরূপ গোস্বামীর মথুরা-মাহাত্ম্য-প্রমুখ গ্রন্থগুলি সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে শ্রীবৃন্দাবন-পরায়ণ সকল বৈষ্ণবের নিকটেই আদরণীয় হইয়াছিল।

শ্রীভক্তিরত্নাকর-পরিশিষ্টে শ্রীজীব গোস্বামীর যে চারিখানি পত্র পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূ, হরিনামামৃতব্যাকরণ, বৈষ্ণবতোষণী, দুর্গম-সঙ্গমনী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা) বৃহদ্ ভাগবতামৃত, শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের ভাষ্যাদির পুনঃ পুনঃ প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়ে প্রেরিত হইতেছে। এই সকল কার্য্য শ্রীজীব স্বয়ং এবং তাঁহার শিষ্য ও ছাত্রবর্গ নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে এই সময়ে শ্রীজীবের চেষ্টায় শাস্ত্রগ্রন্থের ও কাগজের অভাব ছিল না। সেই সময়ের লিখিত বহু পুঁথি এখনও বহু গ্রন্থশালায় পাওয়া যায়। শ্রীল রাধাদামোদরে শ্রীরূপ গোস্বামীর সমাধি যে গৃহে বর্ত্তমান, ঐ গৃহের ন্যায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর তখনও রাধাদামোদরে বর্ত্তমান ছিল। ভজনপরায়ণ ও শাস্ত্রসেবী বৈষ্ণবগণ তখন ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া দিবারাত্রি ভজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শাস্ত্রালোচনা, সঙ্কীর্ত্তন ও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন। শ্রীজীব স্বয়ং এই সকল ব্যাপারের, এবং শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীল গোপীনাথপ্রমুখ শ্রীবিগ্রহগণের নিত্যসেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতেই অগণিত যাত্রী দলে দলে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীজীব কখনও কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না, কিছুরই আকাঙ্ক্ষাও করিতেন না,—তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের ন্যায় তিনিও নিস্পৃহ ও নিষ্কিঞ্চন ছিলেন; তথাপি সেবার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নেই চলিত। মহামতি সম্রাট্ আকবর পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের মহিমার কথা শুনিয়া শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে গমন করেন। ১৪৯৫ শকাব্দে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, এ

* সলিমাবাদ শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান গাদী, উহা কৃষ্ণগড় বা কিষণগড় রাজ্যে অবস্থিত। জয়পুর হইতে ট্রেণে কিষণগড় যাইয়া তথা হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরবর্ত্তী সলিমাবাদে টোঙ্গায় বা গো-শকটে যাইতে হয়। এখানে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীরাধামাধবের সুবৃহৎ মন্দির ও সেবা বর্ত্তমান।

কথা মিষ্টার গ্রাউস তাঁহার রচিত মথুরার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। * এই সময় শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ও শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব হইয়াছিল, সুতরাং তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতারূপে শ্রীজীবই শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছিলেন। তখনও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবল্লভ সম্প্রদায় ও শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; সুতরাং শ্রীজীবই তখন শ্রীবৃন্দাবনের সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কথিত আছে, সম্রাট্ আকবর শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ও ইহার মহাত্যাগী বৈষ্ণবগণের ভজন-রীতি দর্শন শ্রীবৃন্দাবনকে "ফকিরাবাদ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

শ্রীজীব ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই শ্রীরাধাদামোদরের জন্য সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে—এবং শ্রীল গোবিন্দদেব, শ্রীল গোপীনাথ, শ্রীল মদনমোহন, ও শ্রীরাধা-দামোদরের সেবায় সৌষ্ঠববর্দ্ধনের জন্য বহু জমিদার, রাজা ও সম্রাটের নিকট হইতে সংগৃহীত বহু অর্থও প্রচুর ভূসম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা করা তিনি নিতান্তই অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ত্যাগী বৈষ্ণবের ইহাই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

শ্রীল রাধাকুণ্ডের সংস্কার

শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবৃন্দাবনের অধিবাসিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডের কোনও সন্ধান না পাওয়ায় তীর্থ লুপ্ত জানিয়া স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞস্বরূপা ভগবচ্ছক্তির বলে সেই লুপ্ত তীর্থ আবিষ্কার করেন; যথা—

"তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য। ১৮শ পরিচ্ছেদ

তদবধি শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই তীর্থরাজের সেবা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীলরূপ, শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে এই তীর্থরাজের সেবায় অত্যন্ত অবহিত দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনের জনগণ এই মহাতীর্থের উপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ইহাতেই এই তীর্থ খনিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড নামে দুইটি সরোবরে পরিণত হয়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই তীর্থতীরে স্থায়িভাবে বসতি করিতে আরম্ভ করেন—এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রমুখ ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গী হইয়া এই স্থানে ভজনকুটীর নির্ম্মাণ পুরঃসর অবস্থিতি করিতেছিলেন; কিন্তু কুণ্ড দুইটি যথোচিতরূপে সংস্কৃত না হওয়ায় সর্ব্বসম্পদত্যাগী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনে তাহাদের সুসংস্কারের বাসনা বলবতী হইয়াছিল। শ্রীল দাস গোস্বামীর মনে কুণ্ড-সংস্কারের বাসনা জাগরূক হওয়ায় তিনি মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; যেহেতু—

"অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু ইহাতে বুঝায়।
এত বিচারিয়া হইলেন স্তব্ধ প্রায়॥
আপনাকে ধিক্কার করয়ে বার বার।
কেনে এ বাসনা মনে হইল আমার॥
বিবিধ প্রকারে নিজ মন বুঝাইয়া।
রহয়ে নির্জ্জনে অতি সাবধান হইয়া॥"

ভক্তিরত্নাকর, পঞ্চম তরঙ্গ।

যিনি চৌদ্দ লক্ষ টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তি ও অপ্সরাতুল্যা রূপবতী পরমা সাধ্বী পত্নী ত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্যের আদর্শাবলম্বনে অন্নের পরিবর্ত্তে কেবল "মাঠা" ভক্ষণে শ্রীকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন,—তাঁহার হৃদয়ে এই প্রকার বৈষয়িক কার্য্যের বাসনার সঞ্চার হওয়ায় তিনি আন্তরিক লজ্জিত হইলেন। কিন্তু লীলাময় শ্রীভগবান্ নিষ্কিঞ্চন ভক্তের এই সাধু বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এক উপায় অবলম্বন করিলেন। কোনও বিপুল সম্পত্তিশালী বিষয়ী ব্যক্তি শ্রীবদরিকাশ্রমে গমন করিয়া শ্রীনারায়ণকে বহু ধন উপহারদানের ইচ্ছা করিলে শ্রীনারায়ণ তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে গমন করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাহা প্রদানের জন্য স্বপ্নাদেশ করিলেন। স্বপ্নে তিনি ইহাও জানিতে পারিলেন যে, শ্রীল দাস গোস্বামী ঐ অর্থগ্রহণে সম্মত না হইলে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে—শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড সংস্কারের জন্য তিনি যে মানস করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন এই অর্থ গ্রহণ

* Growse's Mathura, p.p. 241

করেন। স্বপ্নে শ্রীশ্রীবদরিকানাথের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত ধনী শ্রীবৃন্দাবনের আরিট্‌গ্রামের শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে আগমন করিলেন এবং শ্রীল দাস গোস্বামীর পদপ্রান্তে এই অর্থরাশি স্থাপন করিয়া প্রণামান্তে তাঁহাকে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড সংস্কারের যাবতীয় ভার অর্পণ করিলেন।

যে স্থানে কুণ্ডদ্বয় অবস্থিত, কুণ্ড লোপ পাওয়ায় ঐ স্থান ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল—কেবল পূর্ব্বের প্রবাদ অনুসারে ঐ কুণ্ডের ধান্যক্ষেত্র "কালী" ও "গৌরী" আখ্যায় অভিহিত হইত। আরিট্‌গ্রামের ছয় জন কৃষক সেই ধান্যক্ষেত্রের অধিকারী থাকায়—শ্রীজীব স্বয়ং তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ ধান্যক্ষেত্রের স্বত্ব ক্রয় করিলেন। * দলিলগুলি প্রধানতঃ শ্রীজীবের নামেই সম্পাদিত হইল এবং দলিল সম্পাদিত হইবার পর কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার ও খননকার্য্য আরম্ভ হইল। কুণ্ডদ্বয় সুন্দররূপে সংস্কৃত হইলে, কুণ্ডের নানা দিকে তীর্থযাত্রীদিগের স্নানের ও জলপানের জন্য প্রাচীন ঘাটগুলিও প্রস্তর দ্বারা সুন্দর-রূপে বাঁধাইয়া দেওয়া হইল। শ্রীকুণ্ডদ্বয় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি এই ভাবে সংস্কৃত হওয়ায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত হইল। ইহার পরে শ্রীরাধা-কুণ্ডতীরে শ্রীল দাসগোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামি-প্রমুখ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ অবস্থান করিয়া পরমানন্দে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কয়েকটি দেবালয় এই কুণ্ডের তীরে ও তৎ-সন্নিহিত স্থানে স্থাপিত হইল। কুণ্ডসংস্কারের সময়ে একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য দেব যে ভাবে শ্রীকুণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ স্থানই প্রকৃত রাধাকুণ্ড কি না, তর্কনিষ্ঠ কোনও কোনও ব্যক্তির তৎ-সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এই সন্দেহের পোষকতা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল শ্যামকুণ্ড খনন করিবার সময় উহার মধ্যে পুরাণবর্ণিত বজ্রনাভযুক্ত অবস্থিত দেখিয়া সকলেরই সকল সন্দেহের নিরসন হয়।*

* উহার দলিলগুলি পাওয়া গিয়াছে; তাহা উর্দ্দু ভাষায় লিখিত; সুযোগ হইলে উহাদের ফটো প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

* শ্রীল জীবগোস্বামীর নামে শ্রীল রাধাকুণ্ডের ও ব্যাসকুণ্ডের ভূমির দলিল ছিল; উহা পূর্ব্বে অনেকে অবগত ছিলেন না। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আরিট গ্রামের ভূস্বামী আভার রাজা ঐ স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত বলিয়া দাবী করেন। ইহা দেখিয়া রাধাকুণ্ডের নিত্যধামগত শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজী (ইনি পূর্ব্বাশ্রমে সাব-ডেপুটী ছিলেন) শ্রীকুণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ভূস্বামীর দাবীতে বাধা প্রদান করেন এবং বলেন, উহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি। এই হেতু মথুরার দেওয়ানী আদালতে ইহা লইয়া মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে শ্রীল কৃষ্ণ বৈষ্ণবদাস বাবাজী বৃন্দারণ্য-বাসী সুপ্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ বি-এ (নিত্যধাম-গত রাজর্ষী বনমালী রায় বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার), নিত্যধাম-গত পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ভক্তপ্রবর রায় অমরেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে অনেক-গুলি প্রাচীন ও প্রামাণিক দলিল আদালতে দাখিল করেন। পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস মহাশয় বিনা ব্যয়ে এই মোকদ্দমা পরিচালন করেন, এবং তাহার ফলে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে শ্রীকুণ্ড সংস্কৃত হইবার পর আরও কয়েকবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের চেষ্টায় শ্রীকুণ্ডদ্বয় সংস্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গের কোনও একজন ভক্ত শ্রীরাধাকুণ্ডের জল নিষ্কাশন করিয়া শ্রীকুণ্ড পুনরায় খনন করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীকুণ্ডের গভীরতা ১৫ ফুট ছিল, এবার আরও ৮ ফুট অধিক গভীর করা হইয়াছে। এবার এই খনন ব্যাপারে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কঙ্কণকুণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কুণ্ডের আবিষ্কারে শ্রীরাধা-কুণ্ডের ঐতিহাসিক সংস্থান সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিপন্ন হইল।

শ্রীনাথজীর সেবার বন্দোবস্ত

শ্রীরাধাকুণ্ডের সন্নিকটে গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ নিজে এই গোবর্দ্ধন গিরিকে বাম হস্তে ধারণ করিয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক অশ্রান্ত বারিধারা-বর্ষণজনিত বিপদ হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই বর্ষণের পর শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ব্রজবাসিগণ যখন শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গিরিগোবর্দ্ধনে আবিষ্ট হইয়া পূজার ভোজ্যাদি উপভোগ করিয়াছিলেন। এই জন্য ভক্তজনের নিকট গিরিরাজ গোবর্দ্ধন শ্রীহরির দেহ বলিয়া পরিগণিত। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া গিরিগোবর্দ্ধনে আরোহণ করেন নাই। অথচ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী এই গোবর্দ্ধনের উপরেই বিরাজ করিতেন, এবং শ্রীগোবর্দ্ধননাথজী বা সংক্ষেপে শ্রীনাথজী নামে অভিহিত হইতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরম গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী তীর্থ-ভ্রমণোপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে

অবস্থান করেন, এবং স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একটি কুঞ্জের মধ্যস্থিত মৃত্তিকাস্তূপের নিম্নদেশ হইতে শ্রীগোপালের শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কার করেন। কি প্রকারে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী এই বিগ্রহ উদ্ধার করেন ও ব্রজবাসিগণের সাহায্যে গোবর্দ্ধন



গোপালজী বা শ্রীনাথজী

পর্ব্বতের শিরোদেশে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আনুমানিক ১৪০৭ শকে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোপালদেবকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন সংসর্গে ও পুনঃ পুনঃ যবনের অত্যাচারে পশ্চিমের লোক "মূঢ়-অনাচার" * হওয়ায় দুই জন বৈরাগী ব্রাহ্মণ গৌড় হইতে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে, পুরী গোস্বামী তাঁহাদিগকে ত্যাগী ও সদাচারী দেখিয়া দৃষ্টিদানে শিষ্য করিয়া তাঁহাদেরই হস্তে শ্রীগোপালের সেবা সমর্পণ করেন, এবং তিনি চন্দন আনয়নের জন্য স্বয়ং গৌড়দেশের পথে উড়িষ্যায় গমন করেন। ঐ সময়েই বঙ্গদেশের অদ্বৈতাচার্য্য-প্রমুখ ভক্তগণ পুরী গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। * গোবর্দ্ধনে এই সেবা প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক বৎসর পরে বল্লভ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল বল্লভাচার্য্য শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীগোপালজী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এবং ভক্তিবশে শ্রীগোবর্দ্ধনেই অবস্থান এবং শিষ্যবর্গের সহিত শ্রীনাথজীর সেবায় যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে থাকেন। † কিন্তু যে সময়ে শ্রীগোপালদেব আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তখন বল্লভাচার্য্যের বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর নহে; কারণ তাঁহার জন্ম ১৪০০ শকে। আর শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী বল্লভাচার্য্যের মত কুলীন, যাজ্ঞিক ও সদাচারী ব্রাহ্মণ পাইলে তিনি যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে সেবাধিকারী করিতেন, এরূপ মনে হয় না।

কোনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিতে সম্মত না হওয়ায় শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবাভার কাহার হস্তে ন্যস্ত করিবেন, শ্রীজীব গোস্বামী তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে শ্রীবল্লভাচার্য্য পরলোক গমন করায় তাঁহার পুত্র বিট্‌ঠলনাথ গোস্বামী ও বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণ গোপালের সেবা করিতেছিলেন। এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী বল্লভাচার্য্যের কথায় তাঁহার স্বকৃত সুবিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর মূলপাঠ অবিচারে পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে—পূর্ব্বের দ্বিতীয় লহরীতে—

"পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে॥" অর্থাৎ "এই রাগানুগাকে কেহ কেহ পুষ্টিমার্গ নামে অভিহিত

* পশ্চিমের লোক সব "মূঢ় অনাচার।" চৈঃ চঃ—আদি, ১০ম পরিচ্ছেদ।

* 'মাথুর-কথার' গ্রন্থকার ৺পুলিনবিহারী দত্ত মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীবৃন্দাবন আগমনের সময় ১৫০৬ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, উহার ২।৩ বৎসর পরে তিনি গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করেন, তবে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৩১ শকাব্দে তিনি গৌড়দেশে অদ্বৈতাচার্য্যাদি শিষ্যগণকে দীক্ষাদান করেন। কিন্তু ঐ সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাহার অনেক পূর্ব্বেই দীক্ষা গ্রহণ করেন, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। অতএব আনুমানিক ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া ধরা হইয়াছে। উহার কয়েক বৎসর পরে ১৪৮৯ শকে সেকেন্দর লোদীর রাজত্বের আরম্ভ।

† প্রাচীন হিন্দী ভাষায় গোস্বামী গোকুলনাথজীকৃত "শ্রীআচার্য্যজী-শ্রীমহাপ্রভুকী নিজবার্ত্তা ঘরুবার্ত্তা তথা চৌরাশী বৈঠকনকে চরিত্রাদি ও চৌরাশী বৈষ্ণবনকী বার্ত্তা গ্রন্থ বল্লভ সম্প্রদায়ের একখানি বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনেকে মনে করেন।

করিয়াছেন” বলিয়া প্রকারান্তরে বল্লভ সম্প্রদায়ের পুষ্টিমার্গকে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ফলতঃ, শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় ও বল্লভ সম্প্রদায় তৎকালে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া বিবেচিত হইতেন না। এই সময়ের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতি ছিল। এই জন্যই শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী ও অন্যান্য বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ পরামর্শ করিয়া শ্রীবিট্‌ঠলনাথের উপরেই গোপালের সেবার ভার অর্পণ করেন।

এই ব্যাপারের পূর্ব্বেই শ্রীচরিতামৃতের মতে এক মহা ধনী ক্ষত্রিয় শ্রীল গোবর্দ্ধননাথের সেবার জন্য এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্রীবল্লভ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে আছে যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যের পূর্ণমল্ল নামক একজন ক্ষত্রিয় শিষ্য শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালজীউর এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

মথুরার বহু ধনী শ্রেষ্ঠী ও অন্যান্য ব্রজবাসীর দানে গোপালের গোধন ও অন্যান্য সম্পত্তি প্রচুররূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীল দাস গোস্বামীর শ্রীগোপালরাজস্তব নামক একটি সুন্দর স্তোত্র আছে। উহাতেও শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর যে অতি প্রেমভরে শ্রীগোপালের সেবা করিতেন ও তাঁহারই উপর শ্রীল নাথজীর সেবা ভার অর্পিত হইয়াছিল, ইহা জানিতে পারা যায়। ঐ স্তবের যে শ্লোক দুইটিতে এই ব্যাপার জানিতে পারা যায়, আমরা তাহার মূল শ্লোক ও অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

কলিত বপুরিব শ্রীবিট্‌ঠল প্রেমপুঞ্জঃ
পরিজন-পরিচর্য্যা-ধৈর্য্য-পীযূষপুষ্টঃ।
দ্যুতি-ভর-জিত-মাদ্যন্ মন্মথোদ্যৎসমাজঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥

বিবিধভজনপুষ্পৈরিষ্টনামানি গৃহ্ণন্
পুলকিততনুরিহ শ্রীবিট্‌ঠলস্যোরুসখ্যৈঃ।
প্রণয়-মণি-সরং স্বং হস্ত! তস্মৈ দদানঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥

যিনি বিট্‌ঠলনাথের প্রেমপুঞ্জ মূর্ত্তিমান্ হইয়া শরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া লোকে বিদিত, যিনি নিজ পরিজনগণের প্রেমপূর্ণ সুধীর পরিচর্য্যামৃতে পরিপুষ্ট এবং যিনি উন্মত্তাস্ত্র কন্দর্পকুলকে নিজ শরীর-সৌন্দর্য্যে জয় করতঃ মুগ্ধ করেন—সেই শ্রীগোপালরাজ গিরিপীঠে সুন্দররূপে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন॥

যিনি বিবিধ ভক্তজনের ভজন-পুষ্পের দ্বারা শোভিত হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্ট নাম সমূহ গ্রহণ করিয়াছেন, বিট্‌ঠলেশের অতি গুরুতর সখ্যভাবের দ্বারা যাঁহার শরীর পুলকিত, এবং কি আশ্চর্য্য! যিনি নিজের প্রতি প্রণয়ের সার ধন নিজে তাঁহাকে দান করিয়াছেন, সেই শ্রীগোপালরাজ গিরিপৃষ্ঠে সুন্দররূপে বিরাজ করিতেছেন॥



বল্লভাচার্য্য, পুত্র পক্ককেশ বিট্‌ঠলনাথ ও তাঁহার সাত পুত্র

পরবর্ত্তীকালে মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাঁহার কৃত শ্রীগোপালাষ্টকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের গোপালের প্রতি ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ঐ স্তবেই শ্রীগোপালদেব যে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর দ্বারা আবিষ্কৃত, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই শ্রীজীবের অধিনায়কত্বে বঙ্গদেশীয়

যশোহরের রাজা জানকীবল্লভ বা বসন্তরায়ের পিতা পরম ভক্ত গুণানন্দ গুহের অর্থে শ্রীল মদনমোহনের সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণের কথা বিবৃত করিয়াছি। শ্রীবৃন্দাবনের স্থানীয় প্রবাদমূলে জানা যায় যে, শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটের পার্শ্বস্থ একটি টীলার উপর গুণানন্দ গুহ এই মন্দিরটিও নির্ম্মাণ করেন, এবং এই মন্দিরে যুগল-কিশোরজী বিগ্রহ স্থাপন করেন। পরে আওরঙ্গজেবের অত্যাচারের সময় এই মন্দিরের বিগ্রহ রাজপুতানার ঝান্নাপান্না রাজ্যে অপসৃত হন। মন্দিরটিতে এখন আর কোনও বিগ্রহ নাই। এই মন্দিরটি যদি গুণানন্দ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তবে শ্রীজীবের তত্ত্বাবধানেই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। এই মন্দিরটি শ্রীমদনমোহনজীর মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত। মন্দিরটির জগমোহনের পার্শ্বে যে শিলালেখটি আছে, তাহাতে "সংবৎ ১৬৮৪ বর্ষে শ্রাবণ বদি দশমী" এই কথাগুলি ক্ষোদিত আছে। ১৬৮৪ সংবৎ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ।

যাহা হউক, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে মন্দির নির্ম্মাণ ও শ্রীবিগ্রহসেবার বন্দোবস্ত করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গৌরব সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে * এই গৌরব-চিহ্ন বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইলেও সেই চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা যাইতেছে। ফলতঃ, শ্রীজীবের কর্ম্ম-শক্তি, শুদ্ধা শাস্ত্রচর্চ্চা ও ভক্তিগ্রন্থ রচনাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই—শ্রীবৃন্দাবনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতেও তাহা যে সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

* আওরঙ্গজেব ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আবেদন নবীকে মথুরার ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ইঁহার অত্যাচারে গোকুল নামক এক জন জাঠ-সর্দ্দার বিদ্রোহী হইয়া ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আবেদন নবীকে হত্যা করেন। এই বিদ্রোহদমনের জন্য কয়েক জন সেনানীকে প্রেরণ করিয়া যখন বিদ্রোহদমনে কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব স্বয়ং বিপুল বাহিনীসহ আগমন পূর্ব্বক মথুরার ও বৃন্দাবনের অনেক দেবমন্দির ভগ্ন করেন। এই অত্যাচারের সঙ্কল্প পূর্ব্বাহ্ণেই জানিতে পারায় শ্রীল মদনমোহন, শ্রীল গোবিন্দদেব ও শ্রীল গোপীনাথ জয়পুরে নীত হন। শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালকে উদয়-পুরের সিহাড় গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ ঐ গ্রাম গোপালকে দান করেন। ঐ গ্রামের নাম পরে 'নাথদ্বার' হয়, এবং শ্রীনাথজী ঐ স্থানে অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন। বল্লভ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শ্রীনাথজী এখন ঐ স্থানে রাজবৎ সেবা লাভ করিতেছেন।

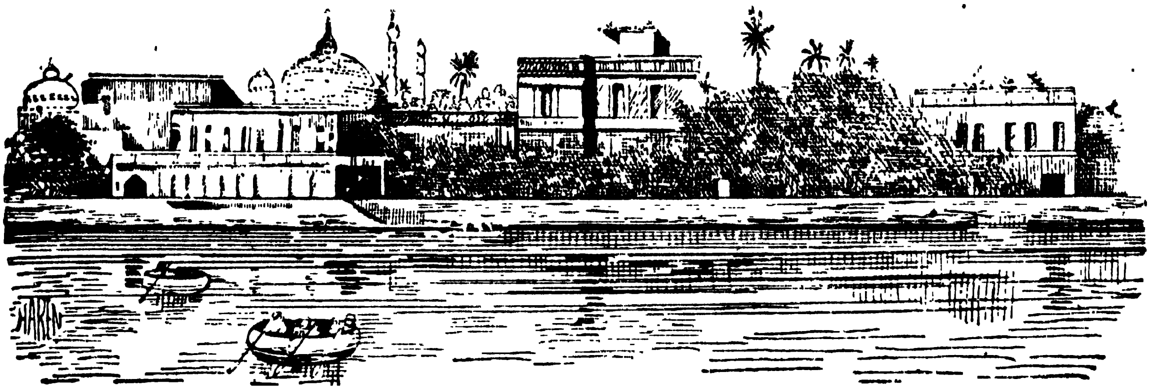
কেরাণী-জগৎ

গালি আর গঞ্জনা যাদের ধাতস্থ
সত্তা নিজের বলে' নেইক' সে কিচ্ছু,
নকল করিতে যারা ওস্তাদ মস্ত
কেরাণী-জগৎ মাঝে তারাই তো বিচ্ছু!

চাকরী তাদের বল কেবা পারে মারৃতে?
সামনে তোমার মিতা—বাইরে লাগাচ্ছে!
অয়েলিফাইং আর্টে চায়নাক' হারৃতে,
দেঁতো-হাসি হেসে বেশ কাজ তো বাগাচ্ছে!
হাওড়ার পুল আর ক্লাইভ ষ্ট্রীটেতে
শুনেছ কি শুধু ভাই আফিসের নিন্দা?
পৃথিবীর এক কোণে, একই এই পীঠেতে
উড়িয়া কি এল শেষে সেই কিষ্কিন্দা!
বিচার আর কোথা আছে আমারি তো জাত-ভাই,
দুর্ব্বল বলি কিসে, বাড়ীতে তো যোদ্ধা!
যতো দাও—নাহি দাও—তবু তার ছাঁদা চাই,
পত্নীরে নিয়ে কেউ সুখী নয় যোদ্ধা!

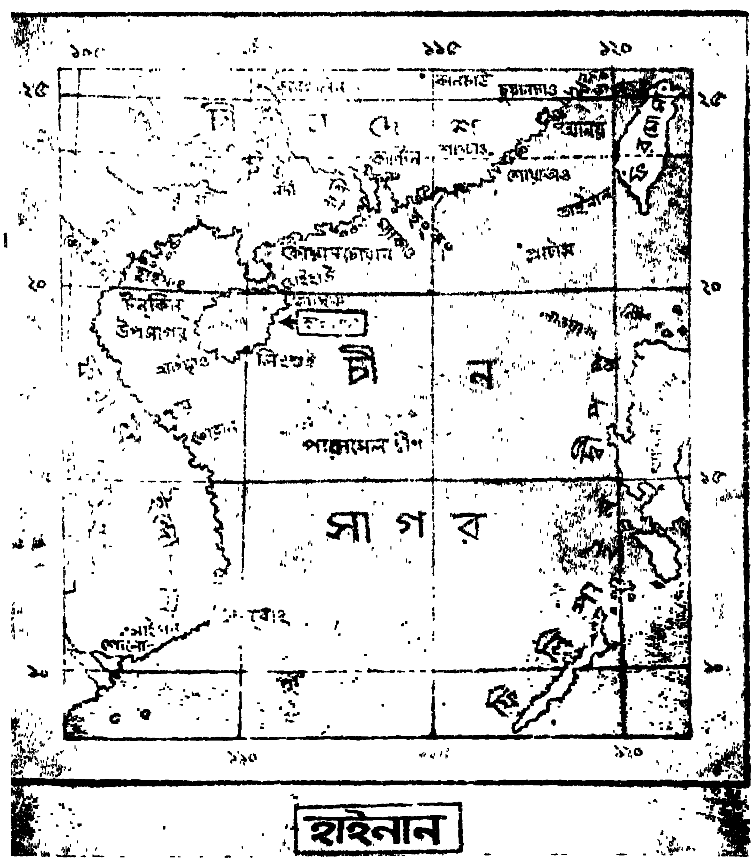
গালি আর গঞ্জনা হক' সে বরাদ্দ,
আফিস সে গুলজার তবু পর-নিন্দায়,
বড় বাবু কারে চায়—কার বাড়ী শ্রাদ্ধ···
নাহি ভেবে সত্যি কি কাহারো সে দিন যায়?
এক-একটি টুল নিয়ে—খুড়ি সে কাউণ্টার
বসে' আছে এক-একটি দিল্লীকা লাড্ডু;
ঈশ্বরই জানে—জ্ঞানে কতো সে দৌড় কার,
মেরেছেন হলে গিয়ে কেবা কটা গাড্ডু!
ভিখারী-জগৎ আর কেরাণী-জগৎ এই—
তফাৎ কি এ দুয়ের মাঝে আছে কিচ্ছু?
চাকরী পাওয়ার চেয়ে শক্ত তো করা সেই;—
কেরাণী মানেই বুঝি ঘাগী আর বিচ্ছু!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।



হাইনান্

সে দিনের কথা! ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে খপরের কাগজে টেলিগ্রাম ছাপিয়া বাহির হইল, হাইনানে এবং ক্যাণ্টনে জাপান নাকি মহা-সমারোহে সমর-আয়োজন করিয়াছে! এদিককার প্রাচী-যুদ্ধে হাইনান্ হইবে জাপানের প্রধানতম সমর-ঘাঁটী! তার পর চোখের পলক-পাতে আবার সংবাদ আসিল, দক্ষিণ-কোয়াংশোয়ান প্রদেশের অনেক জায়গা জাপান অধিকার করিয়াছে, এবং হ্যানয়ের জাপানীদের প্রতি আদেশ জারি হইয়াছে, অচিরে সকলে হ্যানয় ত্যাগ করিয়া যাও!



মানচিত্র

এই হাইনান্, হ্যানয় প্রভৃতি প্রদেশ সম্বন্ধে এত কাল কোনো সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন ছিল না! ছেলেবেলায় জিওগ্রাফি পড়িবার সময়ে হাইনানের কথা পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না!

চীন-উপসাগরের বুকে হাইনান্ একটি ছোট দ্বীপ। দক্ষিণ-চীন এবং ফরাশী-অধিকৃত ইন্দো-চীনের মাঝখানে দুর্গের মতো এ দ্বীপটি অবস্থিত।

দ্বীপটি আয়তনে চৌদ্দ হাজার বর্গ-মাইল মাত্র। খৃষ্ট-জন্মের দু' হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে এ-দ্বীপটি চীনের অধিকারে আছে। কিন্তু কাগজে-কলমে চীনের অধিকারে থাকিলে কি হইবে, এ-দ্বীপে সেকালের প্রাচীন বুনো লোই জাতির বাস; খাঁটী চীনার সংখ্যা এ-দ্বীপে খুব কম।

এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা এখন প্রায় পঁচিশ লক্ষ; তার মধ্যে আছে লোই, চীনা, এবং মুষ্টিমেয়-সংখ্যক আমেরিকান ও য়ুরোপীয়ান।

এখানকার পাহাড়ে-জঙ্গলে যে সব লোই বাস করে, তাদের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ।

'হাইনান্' চীনা কথা। এ-কথার অর্থ দু'টি। এক অর্থ, সমুদ্রের দক্ষিণ দিক; অপর অর্থ, 'দৈত্যের পুচ্ছ' (Tail of the Dragon)। কেন এ নাম, কেহ বলিতে পারে না! এখানকার লোকজনের আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতিও আগাগোড়া রহস্যময়।

১১১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে চীনারা হাইনান্ আক্রমণ করিলে লোই-রাজা উউ-তি বিপুল বিক্রমে সে-আক্রমণ রোধ করিয়াছিল। তার ফলে এ-দ্বীপে চীনারা প্রবেশ করিয়া বসতি-স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। তার প্রায় দু'শো বৎসর পরে হাইনান্ হয় চীনের অধিকার-ভুক্ত; তবু লোইদের দেশে চীনারা বসবাসের সুব্যবস্থা করিতে পারে নাই!

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৬ জুন তারিখে নিকল স্মিথ এবং লিয়োনার্ড ক্লার্ক নামে দু'জন মার্কিণ ভদ্রলোক হাইনান্ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। অনেকে বহু নিষেধ করিয়াছিল; তাঁরা সে নিষেধ মানেন নাই। তার পর হাইনান্ হইতে ফিরিয়া শ্রীযুত লিওনার্ড ক্লার্ক সে ভ্রমণের যে কাহিনী লিখিয়া প্রকাশ করেন, আমরা তাহা সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

হঙকঙ হইতে যাত্রা করিয়া হাইনানের হোইহো-বন্দরে তাঁরা জাহাজ হইতে নামেন। হোইহোর মার্কিণ পাদরী রেভারেণ্ড জন ষ্টীলারের গৃহে তাঁরা আতিথ্য গ্রহণ করেন।

হোইহোতে তখন কলেরার প্রাদুর্ভাব। নামিয়া তাঁরা শুনিলেন, সহরে প্রত্যহ প্রায় একশো-দেড়শো লোক মরিতেছে। সেজন্য সহরে কোয়ারান্টাইন্-বিধির ভারী কড়াকড়! সহর হইতে কাহারও কোথাও যাইবার উপায় নাই। শবদেহ রাত্রে কবরিত করা হয়; দিনের বেলায় পথে-ঘাটে লোকের ভিড় বলিয়া সে সময় 'মড়া' বাহির করা নিষেধ! পথে-ঘাটে বড় বড় পতাকা উড়িতেছে; সে সব পতাকায় কলেরা-প্রতিষেধ ও প্রতিকারের বিধি লেখা। লেখা আছে—কাটা ফল কদাচ খাইবে না; মাছি তাড়াও। কলেরার এ-মড়কে শেষে এমন



হোইহো-বন্দর

হইল যে, কফিন তৈয়ারী করিবার জন্য কাঠ মেলে না! তখন ব্যবস্থা হইল, কম্বলে জড়াইয়া 'মড়া' বাহির করো!

ক্লার্ক সাহেব বলেন, এ অঞ্চলে কোনো ব্যাধি একবার দেখা দিলে তাহা প্রায় মহামারী-রূপে নিজেকে প্রচণ্ড-বিক্রমশালী করিয়া তোলে; এবং এ-সব ব্যাধির মধ্যে কলেরার প্রতাপ এখানে সবচেয়ে বেশী।

এই কলেরার প্রাদুর্ভাবের জন্য হোইহো-সহরে দু'-চার দিন থাকিতে তাঁদের সাহস হইল না,—মোট-ঘাট বাঁধিয়া মোটরে চড়িয়া ধুলা-পায়ে দক্ষিণ-পশ্চিমবর্ত্তী চীনা সহর নোদোয়ায় বাহির হইয়া পড়িলেন। নোদোয়ার কাছেই প্রাচীন অধিবাসী লোইদের বাস।

নোদোয়ায় রেভারেণ্ড মোলেশের গৃহে তাঁরা অতিথি হইলেন। মোলেশ বলিলেন,—এখানে আসিয়াছ, কিন্তু সাবধান! এখানকার ম্যালেরিয়া একেবারে সাংঘাতিক টাইপের। যাকে বলে, malignant malaria। তার উপর বিউবনিক প্লেগ ওদিক হইতে তাড়া খাইয়া এ-দ্বীপে যে-ঘাঁটী বাঁধিয়াছে, সে-ঘাঁটী ছাড়িবার তার নাম নাই!

এ কথা শুনিয়া ক্লার্ক সাহেব চমকিয়া উঠিলেন! বলিলেন, ভালো দেশে আসিয়াছি তো! অবস্থা যেন সেই রামায়ণের মারীচ-কুরঙ্গের মতো! হোইহোতে কলেরা—কলেরা ছাড়িয়া এখানে আসিলাম! এখানে আবার করাল-ম্যালেরিয়া এবং বিউবনিক প্লেগ!

রোগের নাম শুনিয়া তাঁরা নোদোয়ায় বাস করা সমীচীন মনে করিলেন না। পরের দিন অর্থাৎ ২০ জুলাই তারিখে প্রাতে নোদোয়া ত্যাগ করিলেন। এ-যাত্রায় একখানি ফোর্ড-কার মিলিল। প্রসিদ্ধ ফিল্ম-অভিনেতা ওয়ালেশ বীরী এককালে এ-গাড়ীর মালিক ছিলেন। তাঁরা এ-গাড়ীতে চড়িয়া চষা-মাঠ এবং জঙ্গল ভেদ করিয়া সোজা কয়েক-মাইল-দূরবর্ত্তী নন-ফঙের বাজারে আসিলেন। এ বাজারটি চীনা লোই জাতির বাণিজ্যকেন্দ্র।

নন-ফঙে এক স্কুলের কম্পাউণ্ডে ছাউনি ফেলিলেন। এখানকার টোল-কর্ম্মচারী চীনা চিয়া জী হুঙ্ তাঁদের খাদ্যাদি রাঁধিয়া দিল।

লোকের মুখে সংবাদ শুনিয়া বৈকালে প্রায় একশো লোই আসিয়া কম্পাউণ্ডে জমায়েৎ হইল। বলিল, কলের গান-বাজনা আনিয়াছ। সে-গান-বাজনা শুনাও।



দোভাষী উয়োঙ

রেকর্ড বাজাইতে হইল। তাদের আমোদ একেবারে সীমাহীন হইয়া উঠিল! কৃতজ্ঞ লোক-জন সেবা-পরিচর্য্যার জন্য লালায়িত হইল।

পরের দিন সকালে সাড়ে পাঁচটায় ক্লার্ক সাহেব বন্ধুসহ হাইনানের নিবিড় অভ্যন্তর-ভাগে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ-পথে গাড়ী চলিবে না; হাঁটা পাড়ি ভিন্ন উপায় নাই! সেজন্য দড়ির ক'জোড়া স্যাণ্ডাল-জুতা সংগ্রহ করিলেন। মোট বহিবার জন্য লোই-কুলি সংগ্রহ করা হইল। তার পর যাত্রা।

পথে লোই নর-নারীর কি ভিড়! একা এরা কখনো পথে চলে না; দশ জন বারো জন করিয়া দল বাঁধিয়া পথে চলে। পুরুষদের পরণে খাটো পা-জামা বা কৌপীন, মেয়েদের পরণে খাটো ঘাগরা; সকলের পিঠে আছে বড় বড় ছুরি এবং ঝুড়ি। এই ঝুড়ি যেন এক-একটা সংসার! ঝুড়ির মধ্যে আছে তীর, ধনু, খাদ্য, পানীয় এবং ধূম্রসেবার হুঁকা-নল। সকলের মাথায় দীর্ঘ কেশ;

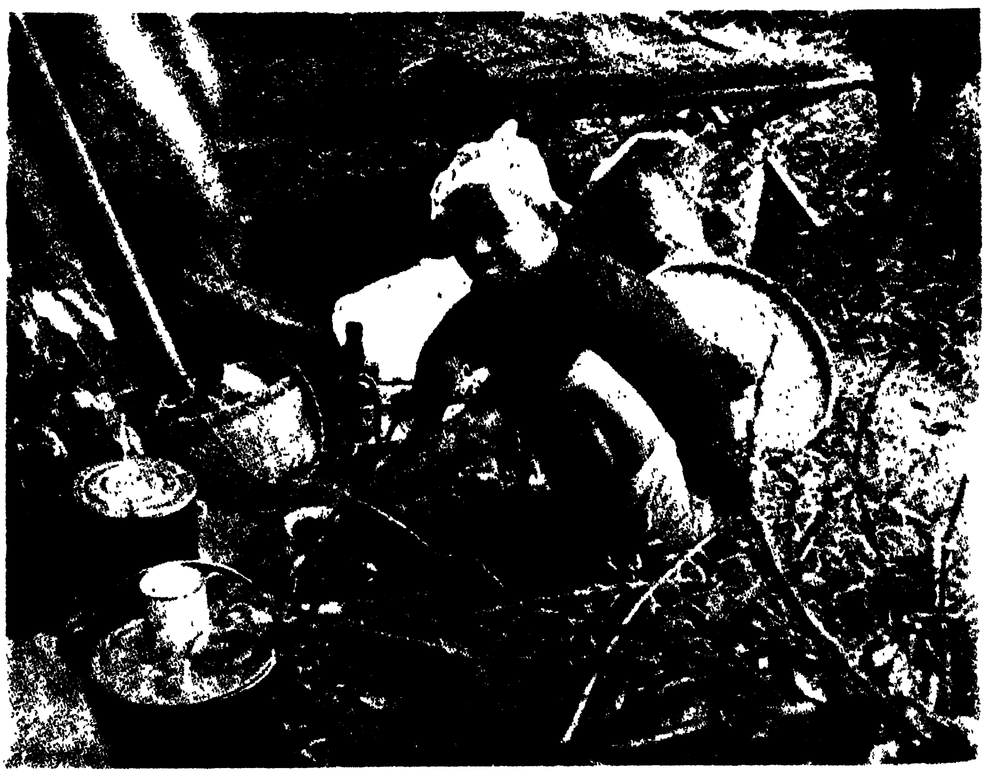
কপালের উপর ঝুঁটি বাঁধা। এ ঝুঁটি সামনের দিকে তিন-চার ইঞ্চি ঝুঁকিয়া আছে। মাথার এই ঝুঁটি এ-জাতির বিশেষত্ব।

লোই জাতি ছাড়া এ-দ্বীপে আরো কয়েকটি উপজাতির বাস আছে। উপজাতি-গুলির মধ্যে প্রধান ছু'টি :—বা-সা-ডাং; এবং হা। হা-জাতের লোক চিকিৎসা করিয়া বেড়ায়। সকল সময়ে তাদের সঙ্গে আছে গাছ-গাছড়া, শিকড়, বানরের শুষ্ক চামড়া, সাপের চামড়া, ব্যাঙের চামড়া প্রভৃতি। তারা শুধু ঔষধ দেয় না, মন্ত্র পড়ে; ঝাড়-ফুঁক করে।

জঙ্গলের পথে ইঁহারা আসিয়া এক পাহাড়ের কোলে পৌছি-লেন। এ পাহা-ড়ের নাম "লাল-কুয়াশা পাহাড়"।



কুমারীর খোঁপায় কাঁটা



চিয়া জী হঙ.

পাহাড়ের গায়ে দীর্ঘ তৃণপল্লব; এখানে বহু চন্দনা পাখীর বাস।

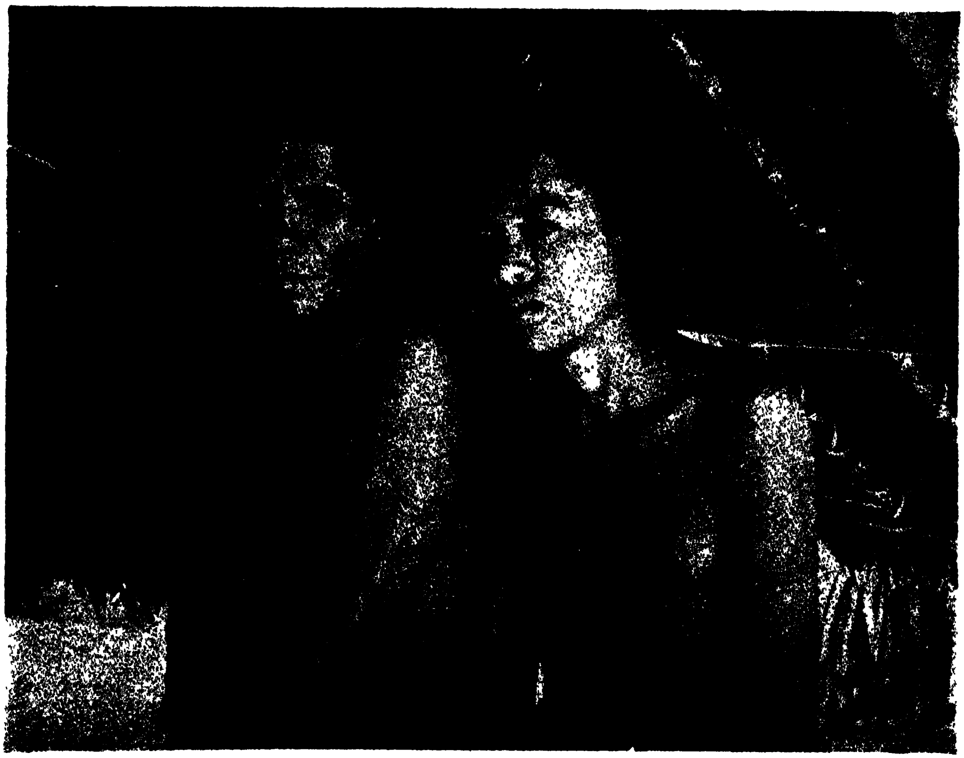
পাহাড়ের নাম 'লাল-কুয়া শা' কেন হইল, বহু সন্ধানেও জানা গেল না। এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। পাহাড়ের কোলে ছাউনি ফেলিয়া ক্লার্ক ঠিক করিলেন, দু' দিন এখানে বাস করিবেন।

সন্ধ্যার দিকে মেঘ করিয়া প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের সমারোহ তুলিয়া মুষলধারে বৃষ্টি। সে ঝড়ে-জলে কানাতের ছাউনির প্রাণ-সংশয় ঘটিল। কানাত ফুঁড়িয়া ভিতরে জল পড়িতে লাগিল। দু' ঘণ্টা পরে ঝড়-বৃষ্টি থামিল। বাহিরে নির্ম্মল আকাশ। আকাশে চাঁদ উঠিল।

ক্লার্ক ও নিকল ছাউনির বাহিরে আসিলেন।



সর্দারের মাথায় ঝুঁটি



পাহাড়ী লোই

চারিদিক জলে জলময়। সহসা শুনিলেন, মোটরের হর্ণ বাজিতেছে। এ-বনে মোটর! বিস্ময়ে দু'জনে অভিভূত হইলেন। বিস্ময়ের চমক ভাঙ্গিলে দেখেন, মোটর নয়—দু'টা বুনো মহিষ তাঁদের ছাউনি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। আক্রমণের মতো ভঙ্গী! ক্লার্ক তাঁর লোক-জনকে ডাকিলেন। লোক-জন আসিল। মহিষ দেখিয়া তারা বলিল,—ভয় নাই সাহেব। উহারা আশ্রয় চায়!

মহিষকে আশ্রয়টুকু ছাড়িয়া দিয়া দু'জনে দু'খানা চেয়ার লইয়া ছাউনির বাহিরে বসিলেন। কি মশা! যেন দশ-বারো দল ব্যাগু-ওয়ালা বাজনার কশরতি লাগাইয়া ছে—ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা উড়িতেছে! চাঁদের আলোয় মশার ঝাঁককে দেখাইতেছিল যেন সাদা কাগজের উপর কে কালি লেপিয়া দিয়াছে! দু'হাতে সেই মশক-অক্ষৌহিণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাত্রি কাটিল। শেষ রাত্রে আকাশের বর্ণ হইল জবার মতো রাঙা। সে রক্ত-রাঙা বর্ণোচ্ছ্বাস দেখিয়া দু'জনে অভিভূত-প্রায়, এমন সময় উয়োঙ নামে চীনা দোভাষী আসিয়া সত্রাসে জানাইল—ভয়ের কথা, হুজুর।

ক্লার্ক বলিলেন,—কিসের ভয়?

সে বলিল,—লোই ভূতের দল আকাশের ও-দিক হইতে এ-দিকে আসিতেছে—মহা-অনিষ্ট করিবার মতলব!

হাসিয়া ক্লার্ক বলিলেন,—কুসংস্কার! তুমি লেখাপড়া শিখিয়া দোভাষীর কাজ করিতেছ। এ কুসংস্কার তুমি কি বলিয়া মানো?

উয়োঙ বলিল,—আমরা চীনা-জাত। জানি হুজুর, ও-রঙে কত বিপদ! এ নূতন কথা নয়। এমন আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া কোনো লোই যদি কাহাকেও অভিশাপ দেয়, তাহা হইলে সে অভিশাপ ফলিবেই! লোই ভূতের দল সে-অভিশাপকে না ফলাইয়া ছাড়িবে না! দু'-পাঁচ হাজার বছর ধরিয়া তারা এমনি কাজ করিতেছে।



মহিষে ক্ষেত চষে

সকালে ছাউনি তুলিয়া সাহেব পাড়ি সুরু করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, উয়োং আসিয়া বলিল, দু'জন কুলির ম্যালেরিয়া হইয়াছে। তারা কাজ করিবে না; বাড়ী যাইবে।

তাদের ধরিয়া রাখা গেল না। অবশিষ্ট কুলিদের সাহায্যে মালপত্র বাহির করিয়া দু' মাইল দূরে পাকশার

অভিমুখে সকলে যাত্রা করিলেন। পথে এখানে আর এক দল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হইল। এ-দলটি আসিয়াছে



বসত-বাড়ী

এখানকার চীনা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এক তদারকীর কাজে।

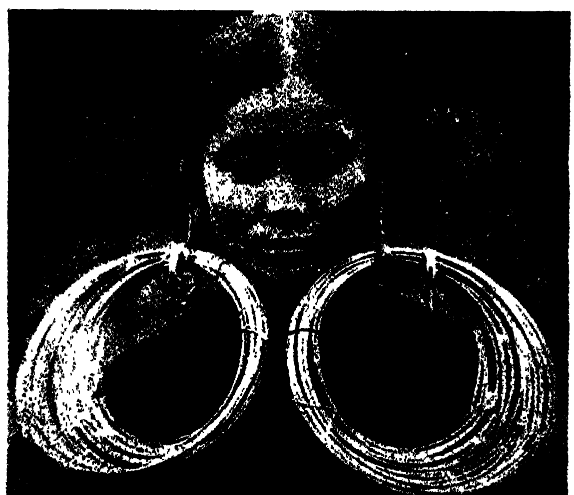
ক্লার্ক এবং নিকলকে ক্লান্ত দেখিয়া ম্যাজিস্ট্রেট ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিলেন,—আমরা পায়ে হাঁটিয়া চলিব। আপনারা ক্লান্ত আমাদের ঘোড়ায় চড়ুন।

ম্যাজিস্ট্রেটের কথা লঙ্ঘন করা গেল না। ক্লার্ক এবং নিকল ঘোড়ায় চড়িলেন এবং সকলে পাকশায় পৌছিলেন। পাছে ম্যালেরিয়া ধরে, এ জন্য সকলে প্রচুর কুইনিন্ সেবন করিলেন।

পরের দিন পাকশা ত্যাগ করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আবার পাড়ি সুরু।

এ-পথে ছোট-খাট অসংখ্য নদী-নালা ও বাজার-হাট। জঙ্গলে সাপের খুব পশার! দু'-তিনটা লাউডগা সাপ পায়ের নীচে দিয়া সরিয়া গেল!

এখানকার হা-জাতের মেয়েরা মুখে, হাতে, পায়ে কালো কালি দিয়া নক্সা রচিয়া দেহভূষা সম্পাদিত করে। পিতলের গহনায় সমৃদ্ধি-প্রচারে তাদের উৎসাহের সীমা নাই! যে মেয়ের গায়ে যত পিতলের বোঝা, সমাজে তত বেশী তার প্রতিপত্তি! হা-জাতের মেয়েরা শুধু কৌপীন-আবরণে লজ্জা রক্ষা করে। তাদের অঙ্গে আর কোনো আবরণ নাই। কোনো কোনো পরিবারের মেয়েরা খাটো ঘাগরা পরে, ফতুয়া গায়ে দেয়। কিন্তু বস্ত্রাবরণ থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া যায় না—পিতলের দশ-বারো পাক ইয়ারিং কাণে লাগাইতে পারিলে এ-জাতের মেয়েরা ভাবে, ইহজন্মে কামনা করিবার আর-কিছু নাই।



বড়-ঘরের মেয়ে—মাকড়ির সঙ্গে ৫৬টি রিং গাঁথা! উৎসবের সময় এ মাকড়ি কাণে আঁটিলে পদমর্য্যাদা জাহির হয়

মান-সম্ভ্রম ঐ ইয়াবিংয়ে! জঙ্গল-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে ২৮ মাইল দূরে এক গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। এ গ্রামের সচল ছবি লইয়া দেখাইতেছিলেন, এমন সময় গ্রামের বা-সা-ডাং সর্দ্দার ফু কুই হেইক আসিয়া দোভাষী উয়োঙকে ডাকিয়া বলিল, সে ৭৬খানি গ্রামের মোড়ল। গ্রামের লোক আসিয়া তার কাছে নালিশ করিয়াছে, সাহেবরা তাদের ঘর-বাড়ী ও মেয়ে-লোকের ছবি তুলিতেছে। ইহাতে তারা খুব রাগিয়াছে! ছবি তোলা বন্ধ করিতে হইবে, নচেৎ হাঙ্গামা বাধিবে।

ক্লার্ক ছবি তুলিতে চাহিলে তখন কেহ কিন্তু আপত্তি



গালে-ঘাড়ে নক্সা আঁকিয়া রূপ-সজ্জা

করে নাই। তার পর সে-ছবি দেখাইবার সময়ে এ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে!

উয়োঙ লোকটি খুব চতুর। ফু কুই হেইককে সে বলিল, এ ছবি তুলিবার উদ্দেশ্য জানো? সাহেবরা ব্রিটিশ মলয়ের হাসপাতালের ডাক্তার। তাঁরা ছবি তুলিয়া দেখিতে চান, দেশের লোকদের স্বাস্থ্য কেমন। অসুস্থদের চেহারা দেখিয়া বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া তাদের আরোগ্য করিয়া তুলিতে চান। এ কথায় সর্দ্দারের ও সকলের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়।

এখানে স্ত্রী-পুরুষ গায়ে নীল কালির নক্সা রচে। নানা ছাঁদের নক্সা। পুরুষের গায়ের নক্সা, আর মেয়েদের গায়ের নক্সা—দু' নক্সার ছাঁদে পার্থক্য আছে। নক্সা আঁকার রীতি চলিয়া আসিতেছে সেই মান্ধাতার আমোল হইতে। নক্সা কেন আঁকে, তার কারণ কেহ জানে না।

বা-সা-ডাং-জাতের মেয়েরা দু' কাণের ডগায় ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে গোঁজে রূপার প্লাগ। এ প্লাগের সঙ্গে চার ইঞ্চি দীর্ঘ রূপালি চেন বাঁধা থাকে। বিবাহিত নারীরা মাথার খোঁপায় রূপার ও চ্যাচারির চিরুণী গোঁজে। কুমারী-মেয়েদের এ চিরুণী গুঁজিতে নাই; গোঁজা নিষেধ। তারা মাথার চূড়ায় গোঁজে গোরুর



মিয়ায়ো-মাকড়ির ভারী আঁকড়ি

পাঁজরার হাড়! এখানকার লোক ভয়ঙ্কর কুসংস্কার মানিয়া চলে। তারা যেমন লাজুক, তেমনি অহঙ্কারী। এখানে মানুষ-মারার রীতি আদৌ নাই!

হাইনানের ঠিক মাঝখানে হারানো উপত্যকায় (Lost Valley) যে সব লোকের বাস, তারা লোই নয়—জাতে তারা মিয়ায়ো। এই মিয়ায়ো জাতি দক্ষিণ-চীন হইতে প্রায় সাত-আট শত বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা তিনশো পঞ্চাশ। এ জাতের সঙ্গে লোই-জাতের বিবাহাদি চলে না।

মিয়ায়ো-জাতের মেয়েরা বিলাতী-মঠধারীদের (Monks) মতো লম্বা কুর্ত্তা পরে, কাণে দেয় লম্বা রূপার মাকড়ি। এ মাকড়ি খুব ভারী। মাকড়ির আঁকড়ির মাপ প্রায় বারো ইঞ্চি! এক-এক জনের কাণের মাকড়ি এত ভারী হয় যে, সে-মাকড়ি মাথায় বাঁধিয়া রাখিতে হয়—কাণে ঝুলাইলে কাণ ছিঁড়িয়া যাইবে!

দু'খানি মাত্র গ্রামে এই মিয়ায়োদের বাস। খড়ে-ছাওয়া মাটীর ঘর। মাটীতে গোময় লেপিয়া দেওয়াল তৈয়ারী করে এবং দেওয়ালে দু-তিনটা ফোকর রাখে।



মিয়ায়ো সর্দ্দার

আলো-বাতাস আসিবে বলিয়া এ ফোকর রাখা নয়; এ ফোকর ভূতপ্রেতের জন্য—ঘর ছাড়িয়া এই ফোকর গলিয়া তারা ঘর ছাড়িয়া বিদায় হইয়া যাইবে!

সমগ্র হাইনান্ দ্বীপে এই মিয়ায়ো জাতিই শুধু লিখিতে-পড়িতে জানে। ভাষা চীনা। ইহারা বাহিরের জগতের কোনো সংবাদ রাখে না। দোভাষী উয়োঙের মুখে যখন শুনিল, চীন আর সে-চীন নাই, গণতান্ত্রিক (Republic) সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন তারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল।

৭ই অগষ্ট তারিখে ক্লার্ক আসিলেন হাইন্যানের সবচেয়ে দীর্ঘ নদী সুবর্ণ-নদীর তীরে। এ নদীটি চওড়ায় ২০০ ফুট মাত্র। পঞ্চাঙ্গুলি পাহাড়ের গা হইতে এ নদীর সৃষ্টি! এখানে ঘুঘু ও পারাবতের সংখ্যা প্রচুর। বানরেরও তেমনি উপদ্রব। এ-বনে গিবন আছে। তারা মানুষের সহিত শত্রুতা করে না—মানুষের সঙ্গ-সাহচর্য্য ভালোবাসে।

এই নদীর তীর ধরিয়া কি লয়ে আসিয়া ক্লার্ক সাহেব সদলে দেখেন, এক তুঙ্গ পর্ব্বতের বুক হইতে ঝর-ঝর-ধারে প্রপাত-ধারা ঝরিতেছে। পাহাড়টি ২৫৭০ ফুট উঁচু। এই জল-প্রপাতকে এখানকার লোকে ভৌতিক উপদ্রব বলিয়া ভয় করে! প্রপাতের ত্রিসীমায় কেহ আসিতে চায় না! দু'মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে এ-প্রপাতের জলধারা-বর্ষণ দেখা যায়।

এই প্রপাতের পর পথ আগাগোড়া পর্ব্বতময়। সেই সব পাহাড়ের কোলে-কোলে ছোট ছোট বহু গ্রাম। পাঁচ-সাতখানা গ্রামের উপর এক জন করিয়া লোক সর্দ্দারী করে। অন্য লোইদের সঙ্গে এখানকার স্ত্রী-পুরুষের আচার-রীতিতে ও বেশভূষায় অল্পাধিক পার্থক্য থাকিলেও সে পার্থক্য সাধারণতঃ কাহারো চোখে পড়ে না।

কি-লয় হইতে পাঁচ দিনের পথে লিয়া-মুই। এখানিকে গ্রাম না বলিয়া সহর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এখানে সভ্যতার দীপ্তি ঝলমল্ করিতেছে। পথ-ঘাট ভালো; ঘর-বাড়ীর শ্রীছাঁদ আছে। বহু ধনী বণিক এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে। সিপাহী-শান্ত্রী আছে।

ফৌজ আছে। স্কুল আছে, অফিস-আদালত আছে; ফোর্ট আছে; এবং এ-যুগের বিলাস-উপকরণাদিরও অভাব নাই!

এখানে কাচেক নদীর তীরে ছাউনি ফেলিয়া ক্লার্ক ও নিকল তিন দিন রহিলেন। বর্ষায় নদীতে জল কূল ছাপিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সে জলে প্রখর স্রোত।

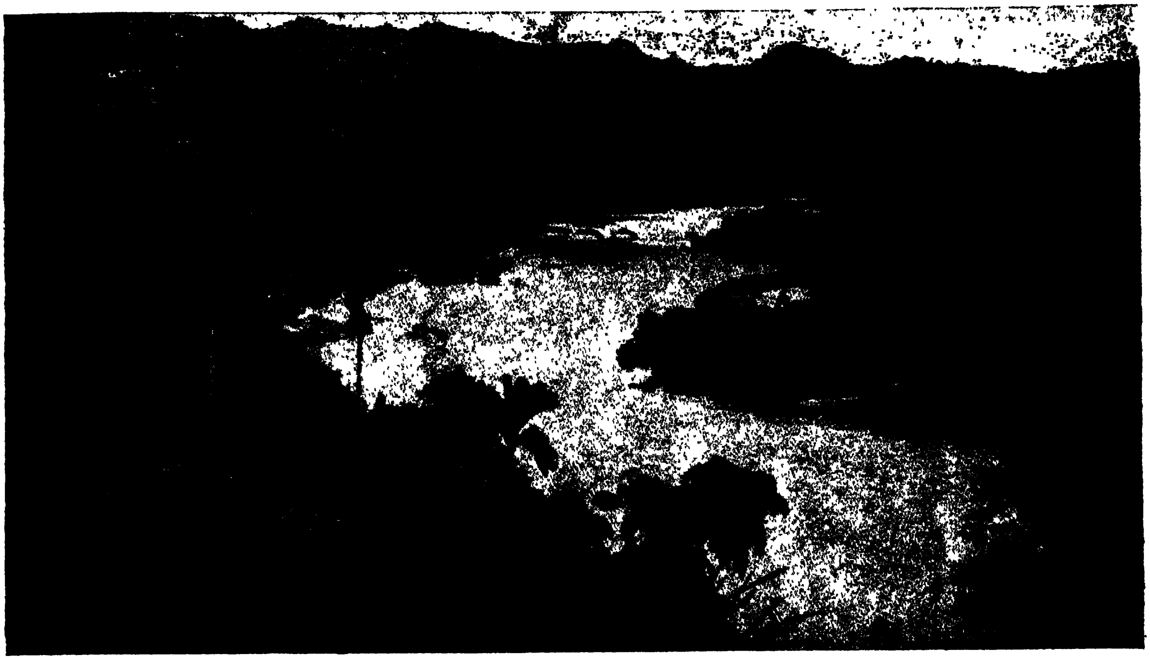
এই কাচেকের তীরে বহু চীনা ফৌজ ছাউনি ফেলিয়াছে। এখানে তখন জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বহু মোটর জমায়েত করা হইতেছিল। চারিদিকে অজস্র সমর-সরঞ্জাম চলিয়াছে। এখানে এমন সমর-উদ্যোগে ছোট দ্বীপের সর্ব্বত্র আতঙ্কের ভাব—জাপানী আসিয়া কখন হানা দেয়। রাজনীতির সংবাদ না রাখিলেও জাপানের উপর এখানকার বুনো-জাতির বিদ্বেষের সীমা নাই।

এখানকার দৃশ্য-সৌন্দর্য্য চমৎকার। এ উপত্যকা-ভূমিটি লম্বে আট মাইল, প্রস্থে দুই মাইল। এখানকার পুরুষদের দেহ দীর্ঘ—লম্বে প্রায় সাত ফুট। পুরুষদের মধ্যে অনেকে চুড়া-বাঁধা কেশের উপর লাল, নীল ও সাদা রঙের পাগড়ী আঁটে। সকলের কাছে একখানি করিয়া 'টাক্সি' আছে! জঙ্গলে বাস এবং সে-জঙ্গলে হিংস্র পশু আছে, সাপ আছে, কাজেই বিনা-টাক্সিতে জঙ্গল-পথে বাহির হওয়া নিরাপদ নয়। তার উপর এই অস্ত্র-সাহায্যে কাঁটার জঙ্গল সাফ করিয়া পথ চলিতে হয়। পাহাড়ে উঠিতে এই টাক্সি মস্ত সহায়। এখানকার জঙ্গলে বাঁশ-ঝাড় প্রচুর। এ বাঁশ-ঝাড়ে এক-জাতের সাপ আছে—তাদের গায়ের রঙ অবিকল কচি লাউডগা সাপের মতো; কিন্তু লাউডগা-সাপের মতো রঙ হইলেও এ সাপগুলার দেহ আরো দীর্ঘ, আরো স্থূল।

ক্লার্ক সাহেব বলেন—এখানকার অধিবাসীরা অসভ্য হইলেও দুরন্ত বা অসামাজিক নয়। তারা অতিথি-বৎসল। অজ্ঞাতকুলশীল আমরা সব গ্রামেই সর্দ্দারদের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি। আমাদের কুলি ও অনুচরদের ভাগ্যেও আতিথ্যের অসদ্ভাব ঘটে নাই। যেখানে গিয়াছি, সাদরে সকলে এক পেয়ালা করিয়া ভাত দিয়াছে। এখানে ধানের চাষ আছে। সকলেরই ধান ক্ষেত আছে। বহু গ্রামে আমরা চাল কিনিয়াছি—মূল্য দিয়াছি রৌপ্যমুদ্রায় বা তামাকে! রৌপ্যমুদ্রা দিয়



ঝর্ণা-ধারা



কাচেক নদী

এখানকার লোক মেয়েদের অলঙ্কার তৈয়ারা করে। তামাকের নেশাও উহাদের প্রবল। চাল প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া সমগ্র হাইনানে কোথাও অন্নকষ্ট পাই নাই। মুর্গী, বরাহ ও মৃগমাংস, তরী-তরকারী, ফল-মূল প্রতি গ্রাম হইতে কিনিয়াছি—স্বল্প-মূল্যের রৌপ্যমুদ্রা কিম্বা তামাকের বিনিময়ে।

এখানকার বনে পাঁচ ফুট দীর্ঘ 'মুঞ্জাক'-মৃগ মিলে। এ মৃগকে ইহারা বলে পাহাড়ী-ঘোড়া। সজারু, খ্যাক্-শিয়াল, উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, বানর এবং ময়াল সাপ—বনে-জঙ্গলে প্রচুর। ফাঁদ পাতিয়া এই সব জানোয়ার ধরিয়া সেগুলাকে অনেকে চীনে চালান দেয়। পাখীর মধ্যে কাকাতুয়া, চন্দনা, ময়না, পায়রা, ঘুঘু এবং ময়ুর অজস্র।

এখানকার বন হইতে গিবন ও ভল্লুক ধরিয়া বহু চীনা-ব্যবসায়ী তাদের য়ুরোপে, আমেরিকায় চালান দেয়।

লোইদের দেবতা 'পা থুং' বা 'মস্ত ভগবান' (Big God)। তিনি কোথায় কোন্ অজানা প্রদেশে বাস করেন, কেহ তাঁর সন্ধান জানে না বলিয়া লোইদিগের ধারণা, ভগবানের বহু চর-অনুচর আছে। এই চরেরা গ্রামে-গ্রামে বাতাসে মিশিয়া লোকলোচনের



মাথায় পাগড়ী হা-সর্দ্দার

অদৃশ্যান্তরালবর্ত্তী থাকিয়া কে কি করিতেছে দেখিয়া বেড়ায়। দুর্জ্জনকে সাজা দেয়, গুণীকে সুখী করে। এ সব চর

থাকে পাহাড়ের গুহায়, গহ্বরে, নদীর বুকে এবং জঙ্গলে!

দেবতার এই চরদিগকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে বলি হয়। গৃহে অসুখ-বিসুখ হইলে অগ্নি-উৎসবে দেবতার তুষ্টি সাধনে সমারোহ ঘটে। প্রতি গ্রামে মাহিনা-করা পুরোহিত আছে। অসুখ-বিসুখের খবর তাকে দিলে সে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে মানত করে রোগীর রোগের ঝাড়ফুক করে। ঝড়-বৃষ্টি ও বিদ্যুৎকে ইহাদের বড় ভয়!—ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎকে ইহারা বলে ভগবানের রোষাগ্নি-পাত!

এখানকার লোকদের মাছ ধরিবার রীতি অদ্ভুত! জাল বা ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরে না। নদীর জলে বিষ ঢালিয়া



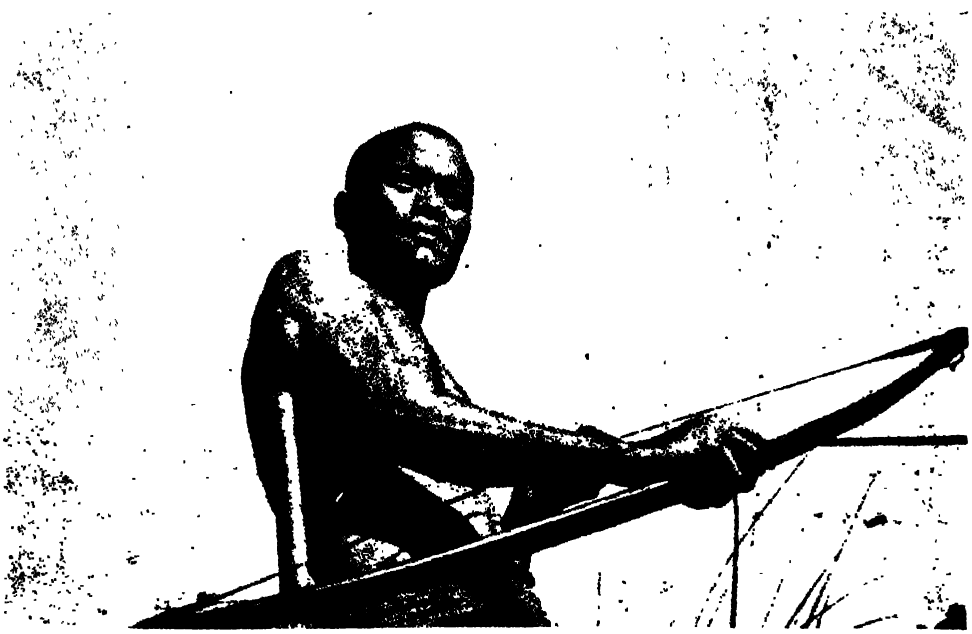
এ টাঙ্গি সাথের সাথী



ঘরে তাঁত বোনা



এ-নম্বার রূপ-সজ্জা। হাতের বলয় এয়োতির চিহ্ন



বা-সা-ডাঙ. জাতের শিকারী

মাছ গাঁথিয়া তীরে তোলে।

সব গৃহেই ছাগল আছে। কালো ছাগল। মিষ-কালো রঙের ছাগল। তার উপর ইহারা পোষে মহিষ, শূকর আর কুকুর। কুকুরের মাংস এখানকার লোকের কাছে যেন স্বর্গসুধা!

লোই-জাত যে কাপড়-চোপড় পরে, সে কাপড়-চোপড় সকলে বাড়ীতে বোনে। সব-ঘরেই এজন্য তাঁত আছে। মেয়েরা তাঁত চালায়।

এখানকার বিবাহ-প্রথায় রোমান্স আছে এবং সে প্রথা খুব মডার্ন! কোনো তরুণ যদি কোনো গ্রামের কোনো জলকে বিষাক্ত করিয়া দেয়; সে বিষে আচ্ছন্নবৎ মাছ জলের বুকে ভাসিয়া ওঠে, তখন বর্শা মারিয়া

তরুণীকে দেখিয়া মনে-মনে তাকে কামনা করে—এ দেখা অবশ্য ঘটে মেয়েদের গাগরী ভরিতে যাওয়ার সময়—তা হা হইলে সেই তরুণীর পিছনে ছায়ার মতো সে ফিরিতে থাকে। মুখে কথা কহিবে না! শুধু ছায়ার মতো অনুগামী হইবে! পাঁচ-সাত দিন ধরিয়া সকলে দেখে, তরুণীর পিছনে তরুণ চলিয়াছে ছায়ার মতো। তার পর রাত্রে তরুণ গান গাহিয়া মনের কামনা প্রকাশ করিয়া বেড়ায়; গ্রামের লোক সে গান শোনে। সে গান শুনিয়া তরুণী যদি বনের পথে তরুণের সন্ধানে বাহির হয়, তাহা হইলে সকলে বুঝিয়া লয় দু'জনের মনে-মনে টান ধরিয়াছে! তরুণী বনের পথে আসিয়া পাল্টা জবাবের গান গায়। তরুণ-তরুণীর দেখা-সাক্ষাতের বা কথা কহিয়া আলাপ বা প্রণয়-চর্চ্চার বিধি নাই! শুধু ঐ গানে-গানে মনে মন মিলানোর ব্যাপার! গানে-গানে দশ-বারো দিন এই প্রণয়-সাধনা চলে। এ সাধনায় সকলে বুঝিতে পারে, তরুণ যেমন তরুণীকে চাহিতেছে,



জল বহিবার বাঁশের বাল্‌তি।



জলের ভারী

তরুণীও ঠিক তেমনি ভাবে তরুণকে চায়। তার পর দিন-ক্ষণ দেখিয়া তরুণ আসিয়া গ্রামের 'মিলন-মন্দিরে' (Love house) আশ্রয় লয়। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া 'মিলন-মন্দির' আছে। বন-পথে তরুণের কণ্ঠ-স্বর তখন নীরব হয়। তরুণী তরুণের গান আর শুনিতে পায় না। সে তখন তরুণের সন্ধানে 'মিলন-মন্দিরে' আসিয়া হাজির হয়। দু'জনে এই মন্দিরে পাঁচ-সাত দিন বাস করে। এ পাঁচ-সাত দিনের পরেও যদি দু'জনে



মেয়ে নয়—পুরুষ!

দু'জনকে ছাড়িতে না চায়, তখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া অভিভাবকের দল দু'জনের 'বিবাহ-অনুষ্ঠান' সম্পাদন করে। এ বিবাহে কন্যাপক্ষে কর্ত্তা কিন্তু কন্যার বাপ নয়; কন্যার বড় ভাই। এ-দেশে কুমারী-কন্যার legal গার্জ্জেন তার বড় ভাই!

বিবাহে ভোজের খুব ধূমধাম হয়। যেখানে যত আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব আছে, সকলের নিমন্ত্রণ হয়। শূকর-মৃগ-কুক্কুট-মাংস; ধান্যেশ্বরী মদ—কে কত চাও, খাও! খাওয়ানোর ভার কন্যাপক্ষকে লইতে হয়। বরকে কন্যাপক্ষ যৌতুক দেয় দু'টি মহিষ, দু'-চার মণ ধান-চাল এবং একটি মোটা শূকর।

ভোজের পর বধূ লইয়া বর নিজের গৃহে আসে। পনেরো বৎসর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় কন্যার পায়ে ও মুখে উল্কির নক্সা আঁকিতে হয়। বিবাহের পর বধূ আসিয়া বরের ঘর-সংসারের চার্জ্জ লইয়া সেখানকার কর্ত্রী হইয়া বসে।

এক-এক জন পুরুষ চারটি করিয়া পত্নী গ্রহণ করে। তার বেশী পত্নী পুষিবার সামর্থ্য যার থাকে, সে অধিকন্তু ন দোষায় বলিয়া আরো কতকগুলা পত্নী সংগ্রহ করে। বহুপত্নীত্ব এ-দেশের বিধি!

ছেলে-মেয়ে মারা গেলে চার দিন তার দেহ গৃহে রাখিয়া তার পর তাহা কবরিত করা হয়। এ-চার দিন বাড়ীতে অহর্নিশি কাঁশর ও ঢাক পিটিয়া প্রচণ্ড শব্দ তুলিয়া ভূত-প্রেত তাড়াইতে হয়। বাড়ীর লোক-জন পাড়া-পড়শী সকলে ভয়ানক কান্নার রোল তোলে। বয়স্ক লোক মরিলে আট-দশ দিন তার দেহ গৃহে রাখিয়া তবে তাহা কবরিত করার বিধি। সারা গ্রামের লোক বছরে এক দিন কবরে গিয়া মৃতের উদ্দেশ্যে পূজার্ঘ্য নিবেদন করিয়া আসে।

বিধবা হইলে মেয়েদের পিত্রালয়ে ফিরিবার পথ জন্মের মতো বন্ধ হইয়া যায়। বিধবার সম্বন্ধে ব্যবস্থা, পুনর্বিবাহ; না হয় নির্জ্জন কোনো ঘরে বাস।

অসভ্য বুনো জাত হইলেও ইহাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সাম্যভাব দেখা যায়। স্ত্রীজাতি পুরুষের দাসী নয় এবং এ-দেশে কোন মেয়ের কুমারী থাকিবার বিধি নাই। লোই সমাজে ডিভোর্স-প্রথা আদৌ নাই।

শিশু-সন্তানের জন্ম হইলে সারা গ্রামের লোক মিলিয়া ভূতপ্রেতকে পূজা-নিবেদন করিয়া প্রার্থনা জানায়,—এটির উপর নজর দিয়ো না বাপু! দয়া করিয়া এটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়ো।

বিশ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়ে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। ছেলেমেয়ে সাবালক হওয়ার সময় ভোজ্য-উৎসব হয়। এ উৎসবে ভূতপ্রেতের উদ্দেশে দু'টি করিয়া মুর্গী বলি দেওয়া হয়।

খুন-খারাপীতে এ জাতির বড় ঘৃণা।



প্রগতি

(গল্প)

ঘরে পা দিতে না দিতেই আমাদের অধ্যাপকটি কহিলেন, "কি গো, এরি ভিতর তোমাদের মজলিস ভাঙ্গলো ? সবে যে সন্ধ্যে ; এখনো ত রাত হয়নি।"

মনটা ভাল ছিল না, ঝাঁজিয়া উত্তর দিলাম, "তুমি যে প্রশ্ন করলে, আমিও তা করতে পারি। তোমারি বা এই অসময়ে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হলো কেন ?"

কর্ত্তাটি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তা বলতে পার বটে। গঙ্গাধর আজ ক্লাবে আসেনি ব'লে এখনি চলে এলাম। থাকতে ভাল লাগলো না। কিন্তু আমার বন্ধু গঙ্গাধরের সঙ্গে তোমার বন্ধু সুলোচনা দেবীর তো কোন যোগাযোগ নেই। কাজেই সন্ধ্যাবেলা শুকতারার আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করা, বোধ করি, অসঙ্গত নয়।"

—"কারণ আবার কি ? তোমার মত আমারও ভাল লাগলো না ব'লেই চলে এলাম।"

—"আশ্চর্য্য। অমৃতে অরুচি, এ কি সম্ভব ? আঁধার রাতে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হওয়া যদি বা সম্ভব হয়, তা' হ'লেও সুলোচনা দেবীর সঙ্গ তোমার ভাল লাগেনি, এটা সত্যিই যে অসম্ভব ব্যাপার! তোমার সখিপ্রীতির সাক্ষীর তো অভাব নেই। তাই ভাবছি, এতখানি নিবিড় অনুরাগের ভিতরে বিরাগের মেঘ দেখা দিল কি জন্যে ?"

বলে রাখা ভাল, আমার স্বামীটি সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। সাধারণ অধ্যাপকশ্রেণীর মতোই তাঁহার মধ্যে 'আপনভোলা' ভাব থাকিলেও প্রাণের ভিতর রসের অভাব ছিল না।

কেতাব খুলিয়া তিনি কাব্যরস-সিন্ধুতে তলাইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার নানা সুখ-দুঃখের, সাংসারিক অভিযোগের আলোচনা চলিত। কিন্তু একবার বই খুলিয়া তিনি তাহাতে মনঃসংযোগ করিলে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে গিয়া পড়িতেন, আর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইত না।

সুলোচনার ব্যবহারে সত্যই মনে ব্যথা পাইয়াছিলাম। মেয়েরা স্বামীর নিকটে বেদনার ভার মোচন না করিলে করিবেই বা আর কাহার কাছে ? তাই আমি মনের খেদে বলিলাম, "তুমি রাত দশটা অবধি ক্লাবে থাকো ব'লেই তো আমিও সুলোচনার কাছে গিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিই। খালি-বাড়ীতে তো একা মন টেকে না। তুমি গঙ্গাধর বাবুর সঙ্গে কালক্ষেপণের পরিমাণটা একটু কম ক'রলে সুলোচনাকেও আমি ছাড়তে পারি—তা তার ওপরে আমার ভালবাসার মাত্রাটা যতই বেশী হোক। তবে এটাও দেখছি বটে, আজকাল সে কেমন যেন হ'য়ে যাচ্ছে! আগের মতো তার না আছে আগ্রহ, না আছে আমার জন্যে তেমন আকুলি-ব্যাকুলি ভাব! এখন ভাল ক'রে কথাই বলতে চায় না। এখন তার যত কিছু হাসিখুসী, গল্পগুজব, রঙ্গরস, সবই শুধু ছেলেদের সঙ্গে। বন্ধুও জুটেছে তা এক-আধ জন নয়, চার-চারটি।

—"তাই না কি ? আর একটি জুটলেই ত পঞ্চ পাণ্ডবের সীমন্তিনী হ'য়ে উঠবেন। মেয়েদের এতখানি অধঃপতন! ওঃ, এ কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারা যায় না। যাক গে, তুমি আর ওখানে যেয়ো-টেয়ো না। তোমার ঘরে যে রসের সমুদ্র উছলে পড়ছে, এরই ভিতরে বানচাল হ'য়ে ডুবে যাও না। কি বলো ?"—বলিতে বলিতে কর্ত্তাটি সেল্‌ফ হইতে 'কাদম্বরী'খানা লইয়া খুলিয়া বসিলেন।

আমি প্রমাদ গণিয়া কহিলাম, "কি করবো বল ? আমি যে তোমার মত ডুবুরী নই, ডুব দিতে গেলে ভেসে উঠি। গঙ্গাধর বাবুর সাথে তুমি যে দাবার নেশায় মসগুল, সেটা একটু কমিয়ে আনলে

আমাকে আর সুলোচনা, কুলোচনার খোঁজে বেরুতে হয় না।"

অধ্যাপকপ্রবর কেতাব হইতে চক্ষু না তুলিয়াই জবাব দিলেন, "সুলোচনার অন্যায়-অনাচারে তুমি যেন দায়ে ঠেকে তাকে পরিহার করতে চাচ্ছ; কিন্তু গঙ্গাধর তো তেমন কিছু দোষ করেনি? যে মেয়ের চার-চারটা পুরুষ-বন্ধু,—কেবল বন্ধু নয়, যে তাদের সঙ্গে অসঙ্কোচে হাস্য পরিহাস চালাচ্ছে,—তার কাছে যাওয়া তোমার উচিত নয়। একটা দুর্নাম রটতে কতক্ষণ?"

আমি সায় দিলাম, "যথার্থ কথাই বল্লে। সুলোচনার মত অমন কাঁচা বয়সের মেয়ের অতগুলো সুন্দর সুন্দর ছেলের সাথে এত মেলা-মেশার পরিণাম ভাল হ'তে পারে না। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে—এ কথা না জানে কে?"

তিনি কেতাবের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে অন্যমনস্ক ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, ছেলেগুলির নাম কি? দেখতে-শুনতে কেমন? আমাদের তো পেশাই হচ্ছে—এ রকম গাধা ঠেঙিয়ে ঘোড়া করা। নাম বল্লে হয় তো চিনতে পারবো। আর এর একটা প্রতিবিধানেরও চেষ্টা ক'রবো। এত বড় দুর্নীতিতে কখনও প্রশ্রয় দেওয়া চ'লবে না। একটা মেয়ে চার-চারটে ছেলের সঙ্গে প্রেমলালা ক'রছে; এর প্রতীকার হওয়া খুবই দরকার।"

—"তুমি কি প্রতীকার করবে? সুলোচনা তো তোমার ছাত্রী নয়। আর ছেলেগুলোও তোমার পাঠশালার পোড়ো নয়; নাম বল্লে চিনবে কি? তাদের নাম শঙ্কর, অনিরুদ্ধ, হীরক, আর একটি হচ্ছে পিক।"

—"পিক কি? কোকিল না পাপিয়া? তা তোমার কথা ঠিক বটে, এরা আমার ছাত্র নয়। আমি কারুকে চিনিও না। আর চিনবোই বা কি ক'রে? আজকাল সংস্কৃত সাহিত্যের কি আদর আছে? শিক্ষার্থীদের যত ঝোঁক—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, আর ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের ওপরে। বেচারারা জানে না, সংস্কৃত সাহিত্যে কি বিপুল সম্পদ সঞ্চিত আছে। ঘরের মাণিক ফেলে বাইরের কাচের জন্যে তারা ব্যাকুল!"

বলিতে বলিতে স্বামী ক্ষোভের সহিত নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অরণ্যে রোদন করিয়া লাভ নাই বুঝিয়া আমি ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলাম।

* * * *

এবার সুলোচনার কথা বলি।

সুলোচনা আমার বাল্যসখী; আমরা একই গ্রামের মেয়ে। খেলাঘরে এক সঙ্গে পুতুল খেলিয়া বিশ্বনাথ পণ্ডিতের পাঠশালায় এক দিনে হাতেখড়ি দিয়া আমরা উভয়ে ধীরে ধীরে জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমাদের ভালবাসার প্রগাঢ়তা পল্লীবাসিনীদের উদাহরণ-স্বরূপ হইয়াছিল। একটি বেলাও আমরা পরস্পরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না।

নদীস্রোতে ভাসমান পুষ্পের মতোই নারীর জীবন। বৃন্তচ্যুত কুসুমের মতো তাহারা খসিয়া পড়ে, ভাসিয়া যায়। এক কুল হইতে অন্য কুলে তাহাদের স্থিতি। তাই দুই পরিবারের দুই বালিকার নিবিড় প্রীতির বন্ধনের পরিণামের ভয়ে অভিভাবকরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কে জানিত, স্রোতের টানে কে কোথায় চালিত হয়? কিন্তু বিধাতা আমাদের প্রতি অনুকূল ছিলেন। তাই বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত থাকিলেও ভাগ্য আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। পাশাপাশি না হইলেও এক-পাড়াতেই আমরা দুই সখী নীড় বাঁধিয়াছিলাম।

সহরের বাহিরে বেশ ফাঁকার ভিতর সুলোচনার বাড়ী। বাড়ীর পশ্চাতে প্রাচীর-ঘেরা জায়গায় সে 'ব্যাডমিণ্টন্' খেলার 'লন্' তৈয়ারী করিয়াছিল। সেই স্থানে খেলায়, গল্পে আমাদের মধুর সন্ধ্যাগুলি অতিবাহিত হইত। কর্ত্তাটি 'ইউনিভার্সিটি' হইতে ফিরিয়া আসিয়া দাবার আড্ডায় আটকাইয়া যাইতেন; রাত্রি দশটার পূর্ব্বে তাঁহার দাবা-খেলার নেশা ছুটিত না।

যে গৃহের কর্ত্তার এইরূপ নিস্পরোয়া নিশাচর-বৃত্তি, সে গৃহের গৃহিণীর সান্ধ্য-সম্মিলন, সখী-সম্মিলন প্রভৃতিতে তন্ময় হওয়া অপরাধের নয়। কর্ত্তাটিও তাহা অপরাধ মনে করিতেন না; কিন্তু প্রথম অপরাধের সূচনা হইল সুলোচনার ব্যবহারে। অকস্মাৎ আবির্ভাব হইল সুলোচনার পুরুষ-বন্ধুর দল। সেই বিচিত্র প্রজাপতিদের সমাগমে আমি ধীরে ধীরে সুলোচনার হৃদয়ের প্রান্ত হইতে সরিয়া পড়িলাম,—আড়ালে আশ্রয় লইলাম।

আমার প্রতীক্ষায় সুলোচনার সুনয়ন আর আকুল হইয়া পথের পানে চাহিয়া থাকে না। দূর হইতে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার আরক্ত অধরে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠে না। কলকণ্ঠের সেই সাদর সম্ভাষণ থামিয়া গিয়াছে। ব্যগ্র বাহুযুগলের বন্ধনে আবদ্ধ করা বন্ধ হইয়াছে।

এখন সুলোচনার কত কাজ! চটুল নয়নের ভ্রূভঙ্গিতে কত জনকে শাসন করিতে হয়! অমিয় মধুর বচনে কত প্রিয়জনকে মুগ্ধ করিতে হয়! বন্য বিহঙ্গগুলিকে মোহিত ও বশীভূত করিয়া জালে আবদ্ধ রাখিতে হয়। তাহার ক্রীড়া-কৌতুক সকলই তাহাদের সঙ্গে; তাহাদিগকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার হাসি-গল্প চলে। আমার সঙ্গসুখের নিমিত্ত সে আর উন্মুখ নহে; সে জন্য তাহার আগ্রহও নাই—তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াই আজ আমি ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে ফিরিয়াছি; এবং ভাবিতেছি, আর ও-পথে যাইব না। উহার সহিত আমার কিসের সম্বন্ধ? এমন ভালবাসা কত জনের সহিত কত জনের হইয়া থাকে, আবার তাহা শেষ হইয়া যায়। ভালবাসা চলিয়া যায়, এ কথা ভাবিতে মনটা বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল, চক্ষুতে জল আসিল।

পরদিন প্রভাতেই সংকল্প করিলাম—আর সুলোচনার কাছে যাইব না; তাহার ছায়াও মাড়াইব না। তাহার নিকটে না যাইলেও আমার দিন পড়িয়া থাকিবে না। স্থির করিলাম, সংসারের কাজ ও পড়াশুনায় ব্যাপৃত থাকিয়া তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিব।

কিন্তু দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই সঙ্কল্প শিথিল হইতে এবং মনের তেজ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে সেই সুদৃঢ় সঙ্কল্পের কণামাত্রও আর খুঁজিয়া পাইলাম না! নিজের অবস্থা আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া সহানুভূতির সহিত স্বামীর দাবার নেশার বিচার করিতে লাগিলাম,—না, সত্যই তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না। তাহা সঙ্গত নয়। মানুষমাত্রেই অভ্যাসের দাস। একবার অভ্যাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে সহজে ফিরিতে পারা যায় না; সেই ফাঁদ হইতে বাহির হওয়া বড় কঠিন। পুরুষের টান বহির্মুখী, আর মেয়েদের—গৃহাভিমুখে। অভ্যাসের দোষে যে মেয়ে অন্তঃপুরের পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারে, তাহার রাগ-অভিমান সাজে না। কাজেই অভিমান সম্বল করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

তখনো সন্ধ্যার বিলম্ব আছে; গোধূলির ম্লান লোহিতালোকে তখনও মুক্ত প্রকৃতি সুরঞ্জিত। সুলোচনা কোমরে শাড়ীর আঁচল জড়াইয়া 'ব্যাট' হস্তে মহানন্দে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহার ভালবাসায় আকৃষ্ট সেই দ্বিপদ পঙ্গপাল! কেহ তাহাকে বল কুড়াইয়া দিতেছে, কাহারো হাতে ব্যাট, কাহারো করে প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক, কাহারো চোখ-মুখ হইতে হাসির ঝরণা ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

খেলার মাঝখানে সুলোচনা একবার অপাঙ্গে আমার প্রতি দৃষ্টি হানিয়া হাসি-মুখে ডাকিল, "মিলন, এসেছিস, আয়!"

আমি উত্তর দিবার জন্য মুখ তুলিয়া নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম; আমার ঠোঁটের কাছে আসিয়া কথা বাধিয়া গেল।

সুলোচনার প্রথম বন্ধু শঙ্কর তাহার কর্ণমূলে অধরোষ্ঠ স্থাপন করিয়া চুপে-চুপে কি যেন বলিতে লাগিল। ছেলেটি দোহারা গঠন, বলিষ্ঠ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চক্ষু টানা-টানা, বাঁশীর মতো নাক, রক্তিম অধরোষ্ঠ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভা মুখে পরিস্ফুট।

শঙ্করের কথা শেষ হইতে না হইতেই সুলোচনার দ্বিতীয় স্তাবক অনিরুদ্ধ তাহার হস্তস্থিত সুলোহিত প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলটি পরম আগ্রহে সুলোচনার খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিত হাস্যে অভিনেতার ভঙ্গীতে তাহাকে অভিনন্দিত করিল।

অনিরুদ্ধ লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, অল্প ফরসা, মাথায় কোঁকড়া চুল, দীর্ঘ কেশে ললাট আবৃত। বাঁকা চোখে বঙ্কিম অধরে কৌতুক-হাস্যের বিজলীচ্ছটা, কতকটা কবিত্ব-মাখান ভাব।

অনিরুদ্ধের পরেই হীরক বলটা কুড়াইয়া সুলোচনার নিকটে আনিল। হীরকের দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল বর্ণ, দেহভঙ্গি তেজোদীপ্ত, গর্ব্বিত। তাহার রূপের প্রাখর্য্য দৃষ্টি অতিক্রম করে না।

হীরকের পশ্চাৎ হইতে পিক উঁকি দিতেছিল। বয়স

বেশী নহে, সে অন্য তিন জনের ছোট; সুকুমার দেহ, কমনীয় মূর্ত্তি। কবির ভাষায় বলা যায়, তাহার—"সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান, করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান; শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান—ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি!"

আমি নির্নিমেষে সকলের আচরণ লক্ষ্য করিয়া প্রগতির পরিণাম ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। হৃদয়-বিদারক ট্র্যাজেডির আশঙ্কায়, দুঃখে, ক্ষোভে আমার কোমল চিত্ত ভরিয়া উঠিল। না, আর নয়, এইখানেই "যবনিকা পড়ে যাক বন্ধুত্বে আমার!"

* * * *

রাত্রিকাল।

স্বামী 'ক্লাব' হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিলেন, "ওগো শুনচো? এ কি! এক্ষুনি শুয়ে পড়েছ যে! শরীর ভাল নেই?"

ঔদাস্য ভরে বলিলাম, "শরীর ভালই আছে। কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই। তাই শুয়ে রয়েছি।"

প্রশ্ন হইল, "আজ সুলোচনার ওখানে যাও-নি?"

—"গিয়েছিলাম, এবং এ জন্মের মত যাওয়া আজ শেষ ক'রে দিয়ে এসেছি।"

—"বেশ ক'রেছ, উত্তম ক'রেছ। যে মেয়েকে পুরুষের দল চারি দিক থেকে ছেঁকে ধ'রেছে, তার কাছে কোন ভদ্রমহিলার একদম্ না যাওয়াই উচিত। কিন্তু আমি ভাব্‌ছি, তোমার সময় কাট্‌বে কি ক'রে? 'ক্লাবটা' ওখান থেকে উঠিয়ে এনে আমাদের বাইরের ঘরে স্থাপন ক'রলে, বোধ করি, মন্দ হয় না!"

—"মন্দ হবে কেন? সে খুবই ভাল হয়। আমার স্বর্গে যাবার অন্ধকার পথে তিন-শো বাতির বিজলী দীপ জ্বলে ওঠে! দেখ, আমার জন্যে তোমাকে অতো ভাবতে হবে না। তোমাদের আড্ডা অন্তরীক্ষেই থাকুক। আমার সুখের চেয়ে শান্তি ভাল।"

স্বামী মহাচিন্তায় আকর্ণ-প্রসারিত টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "আচ্ছা, একটা কাজ ক'রলে হয় না? তোমাকে যদি দাবা-খেলা শেখাই, তুমি তা হ'লে রোজ গঙ্গাধরের সাম্‌নে বোসে দাবা টেপো; আর আমি নির্নিমেষ নেত্রে তোমাদের খেলা নিরীক্ষণ করি। নাই বা গেলাম ক্লাবে। গঙ্গাধর বাড়ীতে এলে ক্লাবে যাবার দরকারই বা কি?"

—"নিশ্চয়ই দরকার নেই। সুলোচনারই শোভন সংস্করণ ঘরে বিরাজ ক'রবে; গঙ্গাধর বাবু না হ'লে তোমার সন্ধ্যা তো কাটবে না। ধন্য তোমার বন্ধুপ্রীতি! তা গঙ্গাধর বাবুর কাছে প্রস্তাবটা ক'রে ফেলোনি তো?"

স্বামী অপ্রতিভ হইয়া ঘাড় নাড়িলেন, বলিলেন, "না, তা করিনি; রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে কথাটা মনে হলো কি না। আমি তাকে বলেছিলাম অন্য কথা; অর্থাৎ সে যদি তার স্ত্রীকে দাবা-খেলা শেখায়, আর আমিও তোমাকে শিখিয়ে দেই, তা হ'লে বাইরে আমরা খেলবো, ভেতরে তোমরা দু'টিতে দিব্যি জমিয়ে তুলতে পারবে। তা—সে-দিক দিয়ে সুবিধা হলো না। গঙ্গাধর বল্লে—এক পাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে বৌয়ের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।"

আমি বলিলাম, "তার সময় না থাক, তাতে আমার কি? আমার সময়ের সদ্ব্যবহার আমি করতে জানি, তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এখন মুখ-হাত ধুয়ে খেতে চল, রাত্রি কিছু কম হয়নি।"

তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

* * * *

কয়েক দিন হইল, সুলোচনার কাছে যাই নাই। মনে হয়, মাঝখানে এক যুগ চলিয়া গিয়াছে। হৃদয় আকুল উন্মুখ হইয়া ছুটিতে চাহিলেও আমি তাহাকে শাসনে রাখিয়াছি। সুলোচনা যদি আমাকে না চায়, আমার সঙ্গ কামনা না করে, তবে আমারই বা কিসের দায়? কিসের টান?

যথানিয়মে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতেছিল; কিন্তু হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। সংবাদ পাইলাম, সুলোচনা পীড়িতা। আমাকে আহ্বান করিয়াছে। কোথায় গেল আমার অভিমানের অভ্রভেদী বিরাট চূড়া, সঙ্কল্পের সেই দৃঢ়তা? মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ ঘুমাইয়া থাকে, মরে না। কোন অতর্কিত মুহূর্ত্তে সুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিলে আবার সে জাগিয়া উঠে।

আমাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া কর্ত্তাটি কহিলেন,

"সকাল বেলা উঠেই চ'লেছ কোথায়? চা-ও তো খেলে না, এত তাড়া কিসের?"

উত্তর দিলাম, "সুলোচনার অসুখ, সে আমাকে দেখতে চেয়েছে...কি না, তাই যাচ্ছি। এ বেলা আর ফিরবো না। সে ভাল থাকলে রাতে ফিরে আসবো।"

"তাই ফিরো, কিন্তু অত অনাচারের ভিতরে কি সারাটা দিন থাকতে পারবে? একটি নারীর চার-চারটি প্রেমাস্পদ, সকলের সঙ্গেই অবাধে সে প্রেমলীলা চালাচ্ছে —এ আমি কল্পনা ক'রতেও পারিনে। অথচ তার স্বামী আছে, সংসার আছে, ছেলে আছে।"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তার দু'টি ছেলে আছে ব'লেই না চারটি পুরুষ-বন্ধু পাবার সুযোগ হ'য়েছে। আমার মত সে তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরের বাড়ী আলো করেনি। সুলোচনার ভাগ্য ভাল; তার দুই ছেলের চারটি ছেলে।"

স্বামী চকিত ভাবে কহিলেন, "তুমি বলো কি? তারা তবে সুলোচনার পুরুষ-বন্ধু নয়? তাদের বয়স কত?"

"তা মন্দ হবে না। শঙ্কু, অরু—পাঁচ বছরের, হীরু পিকু দুই বছরের। তারা সত্যি-সত্যিই সুলোচনার বন্ধু, আর তারা পুরুষ তো বটেই!"

শ্রীগিরিবালা দেবী।

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়

চিত্তের ক্রন্দন
ছিঁড়িতে বন্ধন।
জাগ্রত শ্মশানবুকে,
উত্তপ্ত সাগর-ধারা বহে দু'টি চোখে।
অর্থহীন ব্যগ্র কোলাহল,
পশে এসে দিবানিশি অন্তরের তল।

কুসুম সুবাস,
বসন্ত বাতাস,
প্রভাতের বিহঙ্গের গান,
ঝরণার মৃদু কলতান,
চাঁদের এ আলোক-নির্ঝর,
যৌবন-শিহরভরা প্রিয়ার অধর—
তুচ্ছ ব'লে মনে হয়,
আজি এ সময়।
কতটুকু মূল্য তার আছে
আজি মোর কাছে?

ছিন্নবাস পান্থ-বেশে সে যে আজ আমি,
ছুটিতেছি যাত্রাপথে এ দিবস-যামি'
উন্মত্ত সে পাগলের রূপে,
কভু ওরে অট্টহাস্যে কভু চুপে চুপে।
পুষ্প-গন্ধ?
বায়ু মৃদুমন্দ?
চন্দ্র-কর?
প্রিয়ার কুসুমাধর?
মোর যাত্রাপথে,
সাজে না সাজে না কোনো মতে।

যুগ-যুগান্তর
চলিতে হইবে পথ সর্ব্বশূন্য একা নিরন্তর।
হায় ওরে, নীড় ছেড়ে পাখা ওই কোথা উড়ে যায়,
আজি এই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়?

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল



৬

নিনা কলিকাতায় চলিয়া যাইবে বলিয়া মঞ্জুলেখা ও শেফালী তাহাকে বিদায়দান উপলক্ষে একটি ছোট-খাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছে। তাহাদের পরিচিত সমবয়স্কা যুবতীরা সেই উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছে। উৎসব-মণ্ডপে নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে; আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু যাহার বিদায়াভিনন্দনের জন্য উৎসবের এইরূপ আয়োজন, তাহার প্রাণ যেন সেই উৎসবের আনন্দে সাড়া দিতে পারিতেছে না। নিনা তাহার ম্রিয়মাণ চিত্তকে প্রফুল্ল করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সেই সদানন্দময়ী তরুণীর আনন্দের উৎস আজ যেন নৈরাশ্যের খরতাপে শুকাইয়া গিয়াছে।

দীপ্তেনের সঙ্গসুখ তাহার কিরূপ প্রার্থনীয়, এতদিনে সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। দীপ্তেন যে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ের কতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, সে তাহা সেই দিন বুঝিতে পারিয়াছে—যে দিন সে তাহার পিতার সুস্পষ্ট অভিমত অবগত হইয়াছে। 'স্বয়ম্বরা' হইবার কথা লইয়া সুনীলের সহিত কৌতুক করিতে গিয়া সেই যে সে প্রাণের সাড়া পাইল, তাহার পর হইতে তাহার কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না—কোন-কিছুতেই সে তৃপ্তি পাইতেছে না।

মধুর সন্ধ্যা সমাগত; শুক্লা অষ্টমীর চন্দ্রের সুধাময় কিরণ-সম্পাতে সমগ্র উদ্যানটি যেন হাসিতেছিল। উৎসবের নৃত্যগীতাদি নিনার প্রীতিকর না হওয়ায় সে নৈশ-প্রকৃতির শোভা দর্শনে ক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত ও সংযত করিবার আশায় চৌভারায় গিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। নববিকশিত শেফালিকা ও হাস্নাহানার সুমিষ্ট সৌরভে তখন চারি দিক যেন আকুল; কিন্তু তাহা নিনাকে প্রফুল্ল করিতে পারিল না। তাহার উদাস আকুল হৃদয়, অতৃপ্ত চিন্তাধারা লইয়া যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু অল্পকাল পরে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন নিনা কাহার মৃদু করস্পর্শে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। সে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, দীপ্তেন্দ্র কুণ্ঠিত ভাবে তাহার প্রসারিত হাতখানি নিজের হাতের ভিতর লইয়াছে। দীপ্তেন্দ্র সেই নিভৃত উদ্যানে তাহাকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছে।

দীপ্তেনই প্রথমে আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "বিদায়-গ্রহণের এ সুযোগ ঘটে উঠবে, এ আশা আমি ত্যাগই ক'রেছিলাম; কিন্তু বিধাতার দয়ায় আজ এ সময় এই নির্জ্জন স্থানে তোমার দেখা পাওয়া সম্ভব হ'ল।"

নিনার সমগ্র দেহ তখনও দীপ্তেনের স্পর্শের আনন্দে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল; তাহার মনে হইল, "এ কি স্বপ্ন, না মায়া-মরীচিকা?"—তাহার আশঙ্কা হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যেই এ সব হয় তো শূন্যে বিলীন হইবে!

নিনাকে নীরব দেখিয়া দীপ্তেন বলিতে লাগিল, "নিনা, তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে; আমি শুধু তোমার অনুমতিরই প্রতীক্ষা ক'রছি। তোমার সম্মতি পেলে তোমার বাবার কাছে আমি একটি রত্ন ভিক্ষা চাইব। সে রত্ন অমূল্য; সে রত্ন—তুমি। আমি আগে জান্তে চাই—তুমি কি আমার হবে নিনা? আমার হাতে তোমার ভবিষ্যতের সকল ভার অর্পণ ক'রে, আমার ওপর তুমি কি নির্ভর ক'রে থাক্তে পারবে? তুমি সম্মতি দিলে এখনই আমার বাবার আর মায়ের মত নিয়ে, আজই রাত্রে সে কথা তোমার বাবাকে বল্ব। আমি বেশ জানি, এ প্রস্তাবে আমার মা-বাপের কোনও আপত্তি হবে না, বরং এই ক'দিনে তোমার প্রতি ওঁদের যে স্নেহ জন্মেছে, তা'তে মনে হয়, এ প্রস্তাবে ওঁরা সুখীই হবেন।"

নিনার মন-প্রাণ, তাহার চিত্ত যাহার প্রণয়ের আশায় ব্যাকুল, সেই দীপ্তেন আজ তাহার প্রেমপ্রার্থী। এ যে তাহার আশার অতীত কামনা! এ কথা ভাবিয়া নিনা আনন্দে বিভোর হইল, লজ্জায় ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাহার কণ্ঠরোধ হইল; কি বলিয়া সে আত্মনিবেদন করিবে, তাহা ভাবিয়া হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না।

নিনাকে মৌন দেখিয়া দীপ্তেন শঙ্কিত হইল; সে ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, নিনা! ধৈর্য্য ধারণ করা আমার যে অসাধ্য হ'য়ে উঠেছে। আমার প্রাণ-মন তোমাকে লাভ ক'রবার জন্ত ব্যাকুল; প্রাণপণ সেবায় তোমাকে সুখী ক'রবার জন্ত হৃদয় আমার কিরূপ অধীর হ'য়ে উঠেছে, তা প্রকাশ করি, সে শক্তি আমার নেই।—বল, তোমার ইচ্ছা কি?"

নিনা লজ্জাবিজড়িত কম্পিত স্বরে বলিল, "আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ ক'রলে সত্যই কি তোমরা সকলে সুখী হ'তে পারবে?"

দীপ্তেন পূর্ব্ববৎ কুণ্ঠিত স্বরেই বলিল, "আমি যে তার চেয়ে বেশী সুখের অস্তিত্ব ধারণাই ক'রতে পারিনে, নিনা! আমার হৃদয়ে তুমি ছাড়া অন্ত কোন নারীর স্থান হ'তে পারে, এ চিন্তাও আমার কল্পনাতীত।"

নিনা গাঢ়স্বরে বলিল, "বাবাকে তুমি কথায় কথায় এ আভাসটুকু দিতে পারো যে, এ-বাড়ীতে আমার মাথা রাখবার একটু স্থান জুটলে আমি সেটা পরম সৌভাগ্য ব'লেই মনে ক'রব; আর তাতে আমার এক বিন্দুও সুখের অভাব হবে না।"

একরোখা বাঘা ব্যারিষ্টার মিষ্টার দত্তকে যে তাঁহার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া তুলো-ধুনা করিয়া ছাড়িয়াছিল, সে কি এই মধুরহৃদয়া প্রেমিকা তরুণী?

দীপ্তেন এবার পরিতৃপ্তিভরে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি যেন তোমার যোগ্য হ'তে পারি নিনা, বিধাতার কাছে এইটুকুই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।"

দীপ্তেন গমনোদ্যত হইলে নিনা হঠাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া দুই হাতে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

দীপ্তেন ব্যগ্র ভাবে তাহাকে ধরিয়া টানিয়া-তুলিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, কর কি, কর কি? ভক্তি-প্রকাশটা এখন মুলতুবি রাখলে ক্ষতি নেই। এখন যাই, আমার বাবার মতটা আগে জান্‌তে হ'চ্ছে। তুমি ঘরে যাও। এখন ধরা দিও না, নিনা! জাতও গেল, পেটও ভরলো না, এ রকম সঙ্কটে যেন তোমায় পড়তে না হয়!"

নব অনুরাগ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নিনা সোৎসাহে উৎসবে যোগদান করিতে চলিল।

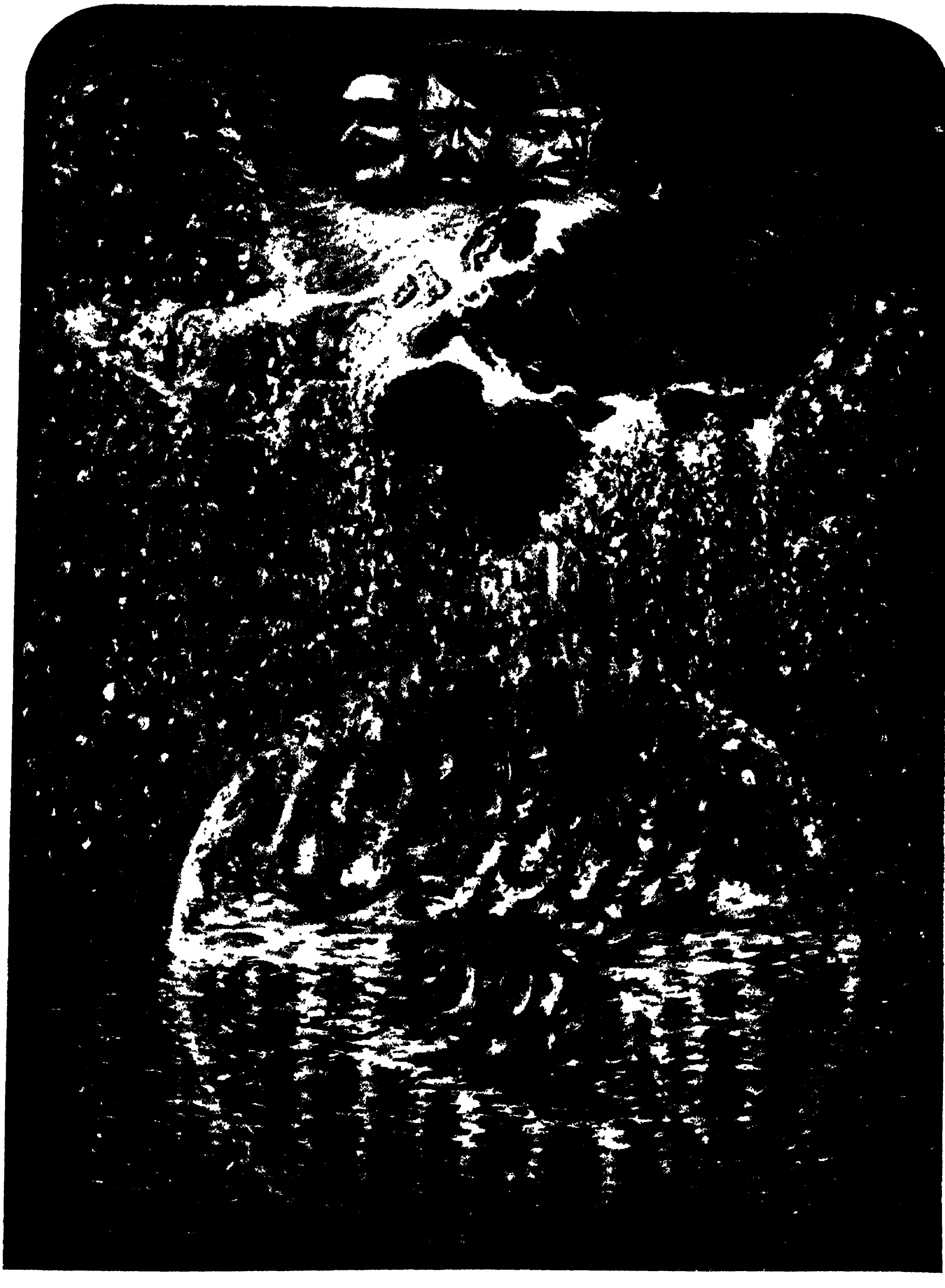
দীপ্তেন অতঃপর পিতামাতার অনুমতি লইয়া মিষ্টার সিংহের বাস-কক্ষে প্রবেশ করিল। বিনয় বাবু তখন একখানি পুস্তকে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। দীপ্তেন তাঁহার অদূরে বসিয়া রহিল। কয়েক মিনিট পরে পুস্তক বন্ধ করিয়া সিংহ মহাশয় মুখ তুলিতেই দীপ্তেনকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন: ঔৎসুক্যভরে বলিলেন, "কি হে! তুমি হঠাৎ এখানে? আমার সঙ্গে কোন কথা আছে?"

দীপ্তেন নতমুখে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আজ্ঞে আ—আমি আজ আপনার কাছে একটা বিষয়ের প্রা—প্রার্থী।"

বিনয় বাবু কৌতূহলভরে বলিলেন, "তোমার আবার কি প্রার্থনা আমার কাছে? তা' কি ব'লবে বল: ব'লতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন?"

দীপ্তেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমাকে নিনার যো—যোগ্য ব'লে আপনি মনে করবেন কি না—তাই জান্‌তে আগ্রহ হ'য়েছে; কারণ আ—আমি তাকে পত্নীত্বে বরণ ক'রবার জন্ত উৎসুক।"

বিনয় বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। প্রস্তাবটা এই দিক হইতে আসিতে পারে, ইহা তাঁহার মনে হয় নাই; কাজেই তিনি হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন, "তোমাকে নিনার যোগ্য মনে না ক'রবার কোন কারণ আছে ব'লে তো মনে হয় না; কিন্তু কন্তাদান তো আর এক কথার কাজ নয়। আমাকে সব দিক ভেবে দেখ্‌তে হবে তো। নিনার মা কলকাতায়: তাঁর মত জানা চাই। নিনারও নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে পারবার বয়স হ'য়েছে; তার সঙ্গেও এ সম্বন্ধে কথা কইতে হবে। তোমার মা-বাপের মত নিয়েই হয় তো এ প্রস্তাব ক'রতে এসেছ; তবুও আমাকে তাঁদের সঙ্গে ধীর ভাবে পরামর্শ ক'রতে হবে। তাই মনে ক'রছি, ভেবে-চিন্তে পরে তোমাকে আমার মতটা জানাব।"



প্রলয়-ধূমকেতু

চৈত্র, ১৩৪৭ | | শিল্পী—এম, মজুমদার

দীপ্তেন এই সকল কথার পর উঠিয়া যাইতেছিল, বিনয় বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছুটী শেষ হ'তে আর কত দেরী ?"

দীপ্তেন বলিল, "এখনও দিন-পনের বাকি আছে।"

বিনয় বাবু বলিলেন, "তুমি চাকরীতে 'জয়েন' ক'রবার আগে একবার যদি কল্‌কাতা হ'য়ে যাও তো ভাল হয়। ইতিমধ্যে নিনার মায়ের সঙ্গে আমি পরামর্শ ক'রে রাখব। এ কথা কিন্তু এখন বাইরে প্রকাশ না করাই ভাল।"

সেই রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে নিনা শেলীকে চুপি-চুপি যে সব কথা বলিল, তাহা শুনিয়া শেলী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহে চুম্বন করিল, এবং স্নেহোচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "আমি কিন্তু তোমাকে ভাই 'বৌদি' বল্‌তে পারব না। তুমি আমার সেই স্নেহের 'নিনা'; এ সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম হবে না।"

নিনা আবদারের সুরে বলিল, "একটি বার বৌদি' ব'লে ডেকো, খাসা মিষ্টি লাগবে। আমার বড় সাধ, তোমাকে 'বৌদি' ব'লে ডাকি, কিন্তু হায়, বিধাতা বিমুখ!—সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

৭

বীরেন বাবুর স্ত্রী এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই; তাঁহার বামাঙ্গ যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু-প্রায় হইয়াছিল। চিকিৎসকেরা আশ্বাস দিয়াছেন—ক্রমে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন, ও কোনও অঙ্গহানি হইবে না। তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে দিতে আগ্রার ডাক্তারদের মত নাই; কিন্তু আদালত খুলিবে, বীরেন্দ্র বাবুকে যাইতেই হইবে। তিনি কিছুতেই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইবেন না। এদিকে মিষ্টার দত্তের বৃদ্ধা জননী বারংবার পত্র দিতেছেন, তাঁহাকে সস্ত্রীক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিতেছেন; সুতরাং সুনীলের মাতা তাহার আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন না। স্থির হইল, বীরেন বাবুরা পরদিন রাত্রির ট্রেণে কলিকাতায় যাত্রা করিবেন। সারা দিন ধরিয়া বীরেন বাবু তাগিদের চোটে সকলকে পাগল করিতে শুধু বাকী রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অস্থিরতার আতিশয্যে সকলে আয়োজন সম্পূর্ণ করিবে কি, গোলমাল আরও বাড়িয়া যাইতেছিল! তাঁহার ব্যবহার ক্রমে সকলেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। বৈকালে শেলী তাঁহাকে একটু দৃঢ় ভাবেই বলিল, "আপনি একটু বেড়িয়ে আসুন তো। আপনি ফিরে এসে দেখবেন—সব আয়োজন ঠিক হ'য়ে গেছে। সকল ভার আমিই নিচ্ছি।"

বীরেন বাবু অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন, "যে যা করবে, তা আমার জানা আছে। এই বুড়ো যেটা না দেখবে, সেইটাই প'ড়ে থাকবে।"

শেলী মৃদু হাসিয়া বলিল, "হয় কি না, আপনি ফিরে এসে দেখবেন। চা তৈয়েরী, মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে নিন্। জ্যেঠামশায়ও তৈয়েরী হচ্ছেন; আর আমি মোটর আনতে আগেই ব'লে দিয়েছি।"

বীরেন বাবু চা খাইতে বসিবার পরই রমাপ্রসাদ বাবু সেখানে আসিয়া পড়িলেন; তিনি কথায় কথায় বীরেন বাবুকে বলিলেন, "কাল আর আপনারা রাঁধা-বাড়ার হাঙ্গামা করবেন না; তিন বেলাই আমার ওখানে সকলের নেমন্তন্ন রইল। এত দিন রইলেন, এক দিনও তো সকলে একসঙ্গে ব'সে আনন্দ ক'রে খাওয়া হ'ল না।"

বীরেন বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তা সেজন্য এক বেলাই ত যথেষ্ট, তিন বেলা কেন মশায় ?"

রমাপ্রসাদ বাবু কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা-প্রকাশের ভঙ্গীতে বলিলেন, "আজ বাদে কাল আপনি বেয়াই হবেন তো? সেই খাতিরে এক দিন আমার বাড়ীতে খেলেনই বা ?"

বীরেন বাবু রমাপ্রসাদ বাবুর ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ধৃষ্টতায় যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেয়াই! তার মানে ?"

রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার মনের গরম ভাবটিকে আমোল না দিয়া বলিলেন,—"মানে, আজ সকালে বিনয় বাবুর চিঠি পেয়েছি; তিনি দীপ্তেনের সঙ্গে নিনার বিয়ে দিতে চেয়েছেন।"

দীপ্তেনের সঙ্গে নিনার বিয়ে! তাঁহার মুখের গ্রাস অন্যে কাড়িয়া খাইবে! মিষ্টার দত্ত বিস্ময় ও বিরক্তিতে বিচলিত হইয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "ভেতর ভেতর বুঝি এই সব বড়—ব্যাপার চল্‌ছিল? আমরা তো ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারিনি!" তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে নীরস হাস্য ফুটিয়া

উঠিল। শাঁক আলু চর্ব্বণকালে ভালুকের মুখভঙ্গি কিরূপ হয়, কে জানে?

রমাপ্রসাদ বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি এ সবের মধ্যে ছিলুম না, মশায়! আমি কি বামন হ'য়ে চাঁদ ধর্‌বার সাহস ক'রতে পারি? বর-কনে নিজেরাই ঐ সব ষড়যন্ত্রের মূল। তবে দীপ্তেন বিনয় বাবুকে বল্‌বার আগে আমার সম্মতি চেয়েছিল বটে।"

বীরেন বাবু মানসিক উষ্মা দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "এ সংবাদে যে আমি খুব খুসী হ'য়েছি, তা' বল্‌তে পারছিনে, তবে আপনার মত লোককে বেয়াইরূপে পাওয়ায় আনন্দ আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। —আসল কথাটা কি, জানেন? আজ ৮।৯ বৎসর ধ'রে বিনয় ও আমি স্থির ক'রে রেখেছিলাম, সুনীলের সঙ্গেই নিনার বিয়ে দোব, তার মেয়েটি চমৎকার; আর—থাক সে কথা। সম্বন্ধটা ভেঙ্গে যাওয়ায় বড়ই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছি; কাজেই এ সংবাদে ঠিক সুখী হ'তে পারলাম না। বিনয় মেয়েটাকে বেশী রকম আদর দিয়ে বড্ড একগুঁয়ে ক'রে তুলেছে; তাই সে আজ-কালের মেয়ের মতো বাপ-মা'র কথা অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দিলে! তবু নিনাকে আমি বড় স্নেহ করি; আশা করি, সে দীপ্তেনের সংসারে সুখী হবে ও তাকে সুখী ক'রতে পারবে। আমার স্ত্রীরও বড় সাধ ছিল, নিনাকেই তিনি পুত্রবধূ ক'রবেন; কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না।"

রমাপ্রসাদ বাবু সহানুভূতিভরে বলিলেন, "আপনারা খুবই ব্যথিত হবেন, তা' বুঝেছি; কিন্তু আপনি সত্যই ব'লেছেন—মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। সুতরাং ভগবানের বিধান মাথা পেতে নেওয়া ভিন্ন আর উপায় কি? যা'ক, চলুন এখন একবার আমাদের ক্লাবে, ক্লাবের সকল সভ্য আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চায়।"

অন্দর-মহলে বীরেন বাবুর স্ত্রীকেও এই সংবাদ দিলেন দীপ্তেনের মা। সেই সংবাদ শুনিয়া সুনীলের মা বলিলেন, "তা হ'লে আপনার ছেলের বিয়েতে ঘটক-বিদায়টা আমারই প্রাপ্য হ'ল বলুন। আমি অসুস্থ হ'য়ে আপনাদের অতিথি না হ'লে তো আর অমন বউটি আপনি পেতেন না। আর নিনার মাকেও ছাড়ছিনে; এমন সোণারচাঁদ জামাই, আর এমন চমৎকার বেয়াই-বেয়ান তো পেলেন তিনি আমারই দৌলতে।"

রমাপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী সলজ্জ ভাবে বলিলেন, "আমার মত লোকের আপনাকে দেবার মত কিছু আছে কি?"

দত্ত-গৃহিণী মুরুব্বিয়ানা ভঙ্গিতে বলিলেন, "আপনার ঘরে যে রত্ন আছে, তা' যে অনেক রাজার ঘরেও নেই, সেই রত্নটি আমাকে দিন না।"

ঘোষজায়া কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি সেই রত্ন? খুলে বলুন দেখি। আমার সাধ্য হ'লে আপনাকে তা দেব—এ আর বেশী কথা কি?"

দত্ত-গৃহিণী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনার শেলীটিকে আমার কাছে রাখতে ইচ্ছা; দেবেন ওকে? রূপে-গুণে এমন লক্ষ্মী মেয়ে কখনো দেখিনি। যদি একেবারে ছেড়ে না দেন, অন্ততঃ তিন-চার মাসের জন্যও আমি ওকে কাছে রাখতে চাই।"

দত্ত-গৃহিণীর অদ্ভুত আবদারে রমাপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী স্তম্ভিত হইলেন! ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে কি মানুষের বুদ্ধি এতই লোপ পায় যে, ভদ্রবংশের শিক্ষিতা মেয়ে নিঃসম্পর্কীয় লোকের ঘরে বাস করিয়া গৃহিণীর শ্রীচরণে তৈলমর্দ্দন করিবে, ইহা দোষাবহ মনে হয় না? কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "শেলীকে কোথাও পাঠাবার অধিকার তো আমার নেই। অনেক তপস্যার ফলে ওর মতন মেয়েকে নিজের ঘরে আন্‌তে পারি। মনে কর্‌বেন না, ও যে-সে ঘরের মেয়ে! ওকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে হ'লে ওর বংশোচিত সম্মান দিয়ে তবে নিয়ে যাওয়া চ'লতে পারে।"

দত্ত-গৃহিণী কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "রাগ কর্‌বেন না ভাই! ওর অসম্মান ক'র্‌বার ইচ্ছে আমার নেই। ওকে বড্ডই ভালবেসেছি কি না। ও আমাকে মা ব'লে ডাকে। আর ও আমার যে সেবাটা ক'রেছে, কারও পেটের মেয়ে, কি ছেলের বউ তা' পারে না, ক'রে না; তাই ওকে নিজের মেয়ের মতন কিছু দিন কাছে রাখতে ইচ্ছে হয়।"

ঘোষজায়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তার চেয়ে গৃহলক্ষ্মীরূপে নিয়ে গেলেই তো পারেন। ছেলের বৌ তো একটি চাই।"

এই কথা বলিয়াই তাঁহার মনে হইল, কথাটা তাঁহার বলা উচিত হয় নাই। দম্পতী যে প্রকৃতির লোক, হয় তো মনে করিবে, তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য কায়দা করিয়াই এ কথা তুলিলেন; এই জন্য সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "কথাটা বলা হয় তো ঠিক হ'লো না; কারণ, আমি তো বলছি, কিন্তু মেয়েটার যে কি খেয়াল, কিছুতেই সে বিয়ে ক'রতে রাজী নয়!"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুনীল ধূলি-ধূসরিত দেহে ও শুষ্কমুখে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া গৃহিণীদ্বয় সমস্বরে বলিলেন, "এমন চেহারা নিয়ে কোথেকে এলে?"

সুনীল শ্রান্ত দেহে অদূরবর্ত্তী আরামকেদারায় বসিয়া-পড়িয়া বলিল, "একটা তদারকের কাজ সেরে মোটরে সোজা চ'লে এসেছি।—পশ্চিমের রাস্তায় কি ভীষণ ধূলো, সে ধূলো তো নয়, ব্রজের রজ!"—সে হাসিতে লাগিল।

সুনীলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া শেফালী ও প্রতিমা উভয়েই সেই ঘরে আসিল।—সুনীলকে দেখিয়া শেলীর মুখে উদ্বেগের ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল; সব কথা বিস্মৃত হইয়া সে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে কি এমনি ক'রে রাত জেগে প্রায়ই কাজ ক'রতে হয়?"

সুনীল মৃদুস্বরে বলিল, "তা মাঝে মাঝে হয় বই কি।"

শেলী আবার বলিল, "নিজের শরীরের ওপর এত অবহেলা ক'রছেন; শেষে অসুখে পড়্‌লে কি হবে?"

কথাটা বলিয়াই শেফালীর মনে পড়িয়া গেল যে, অত্যধিক উৎকণ্ঠা দেখান তাহার পক্ষে সুশোভন হয় নাই।—কাজেই সে তাহার মনের ভাব যথাসাধ্য চেষ্টায় গোপন করিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহারান্তে রমাপ্রসাদ বাবুর বসিবার ঘরে তিনি ও বীরেন বাবু বিশ্রাম করিতেছিলেন। নানা প্রসঙ্গের পর বীরেন বাবু বলিলেন, "মশায়, এ সুযোগে কাজের কথা দু'-একটা ব'লে নিই, পরে আর হয় তো সুযোগ হবে না।"

রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না; বলিলেন, "বলুন।"

বীরেন্দ্র বাবু কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ভাবে কহিলেন, "আপনার বাড়ীতে এত দিন রইলুম, তার জন্য কত দেওয়া উচিত? আর আপনার দক্ষিণা-হিসেবেই বা কি দিতে হবে বলুন। টাকা দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ করা যাবে না, তা' জানি; তবু আপনার কত প্রাপ্য, তা' জানতে আগ্রহ হ'চ্ছে।"

রমাপ্রসাদ বাবু এই প্রস্তাবে মনে কিঞ্চিৎ আঘাত পাইলেও সংযত স্বরে বলিলেন, "আমি তো আমার বাসের বাড়ী ভাড়া দিয়ে অর্থোপার্জ্জন করিনে। আর আপনাকে আমি আমার বাড়ী ভাড়া দিয়েছি কি? তবে কিরূপে আপনার কাছে আমার ভাড়া পাওনা হবে? আর ডাক্তারীর দক্ষিণার কথা ব'ললেন; তাও তো আমি নিতে পারিনে। কারণ, আপনি আমাকে চিকিৎসা ক'রতে ডাকেননি। আর তা' ছাড়া, আমি যত দূর জানি—বাঙলা দেশে বৈবাহিকের কাছে পারিশ্রমিক নেওয়া আজও চলন হয়নি, এবং এ দেশেও আমি তা চালাতে ব্যাকুল হইনি, তাই তার কোন হিসেব রাখিনি।"

বীরেন্দ্র বাবু মুখের মত জবাব পাইয়াও নীরব হইলেন না; কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "এটা কিন্তু কি ঠিক হবে?"

রমাপ্রসাদ এবার কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গেই বলিলেন, "মশায়, পৃথিবীতে অর্থই ভদ্রলোকমাত্রেরই সর্ব্বস্ব নয়; প্রাণ পেতে হয় প্রাণ ঢেলে দিয়ে, অর্থের বিনিময়ে নয়। সেই ভাবেই আমি শেলীর মত মেয়েকে আপনার ক'রতে পেরেছি। ওর বাপের সঙ্গে আমার রক্তের বা অন্য কোনও রকম সম্বন্ধ ছিল না; তবু সে আমার সহোদরাধিক প্রিয় স্বজন হ'য়েছিল। যৌবনকালে সে যখন স্বদেশ—আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে এ দেশে আসে, তখন আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জান্‌তাম না। প্রবাসী বাঙ্গালী ব'লেই আমি তা'কে ভাইএর মতন নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলাম। পরে যখন তার প্রকৃত গুণের পরিচয় পেলাম,—তার উদারতা, তেজস্বিতা, সত্যপরায়ণতার প্রমাণ পেলাম,—তখন তাকে ভাই ব'লে গ্রহণ ক'রে নিজেকে ধন্য মনে ক'রলাম। আমি আমার সেই ভাইকে দুর্ভাগ্যক্রমে হারিয়েছি বটে, কিন্তু সে যে ছেলে-মেয়ে দু'টি আমাকে দিয়ে গেছে, তা' অনেক পুণ্যে পাওয়া যায়।"

বীরেন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "সে তো

সবই বু'ঝলাম ; কিন্তু আপনার আতিথ্যের প্রতিদানে কি দেওয়া যায় ? চিরদিন কি আমাকে আপনার কাছে ঋণী হ'য়ে থাকতে হবে ?"

রমাপ্রসাদ বাবু বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমার কাছে আপনাকে ঋণী মনে ক'রে অকারণে কুণ্ঠিত হ'চ্ছেন। আমি আপনার বন্ধুত্ব লাভ ক'রেছি। আপনি আমার বৈবাহিক হ'য়েছেন ; তার ওপর আর কি প্রতিদান আমি আশা ক'রতে পারি ? আপনাদের জন্যেই তো নিনার মত বউ আমার ঘরে আসছে, বরং আমরাই আপনাদের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।"

মিষ্টার দত্তকে এ কথায় নির্ব্বাক্ হইতে হইল। জীবনে তিনি বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, অনেক শিক্ষিত বৈষয়িক ব্যক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন ; কিন্তু পূর্ব্বে কোনও দিন এরূপ আপনা-ভোলা, উদারচেতা নিঃস্বার্থ হিতৈষী ব্যক্তির সংস্রবে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হইল না। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ও কথার পর আর আপনাকে কিছু বলা চলে না। তবে শেলীকে একবার ডাকান্ না।"

রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার অনুরোধে শেলীকে ডাকাইয়া আনিলেন। সে আসিলে বীরেন বাবু মখমল্-মণ্ডিত একটি সুদৃশ্য বাক্স তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "শেলী, দেখ তো, জিনিষটা কেমন, পছন্দ হয় কি না ?" বাক্স খুলিয়া শেলী দেখিল, মূল্যবান্ হীরকখচিত সুন্দর এক-জোড়া ব্রেসলেট !—সে বলিল, "হাঁ, সুন্দর জিনিষ, বেশ সৌখীনও বটে।"

বীরেন বাবু এবার মৃদুস্বরে বলিলেন, "গিন্নীর ও আমার দু'জনেরই ইচ্ছা—এই ব্রেসলেট-জোড়াটা তুমি ব্যবহার কর।"

তাঁহার কথা শুনিয়া শেফালী সেই রত্নভূষণ বীরেন্দ্র বাবুর পদপ্রান্তে রাখিয়া কম্পিত কলেবরে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া আবেগ-চঞ্চল স্বরে বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন ; এ সামগ্রী লওয়া আমার অসাধ্য।"

বীরেন বাবুকে প্রণাম করিয়া শেলী যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি দেখিলেন, তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম, চক্ষু অশ্রুসিক্ত ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখনও কাঁপিতেছিল। মিষ্টার দত্ত ইহাতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন মা, তুমি অত বিচলিত হ'য়েছ ; এটা নিতে তোমার আপত্তিরই বা কারণ কি ? মেয়েকে কি আমরা কোন স্নেহের উপহার দিইনে ? না, দেওয়া অনুচিত ? আমি একবারও ভাবতে পারিনি যে, এই উপহার তুমি প্রত্যাখ্যান কোরবে!"

শেলী নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "প্রকৃত স্নেহের দান নিতে নিশ্চয়ই আমার আপত্তি হোত না ; কিন্তু এ তো আর তা' নয়। এ দানের উদ্দেশ্য বুঝতে পা'রবার মতো বুদ্ধি আমার আছে বোধ হয়। মায়ের সেবা ক'রেছে ব'লে মেয়েকে উপহার দেওয়া হ'ল—এমন অশোভন কথা কেউ কোন দিন শুনেছে কি ? আপনারা কেন আমাকে এমন ক'রে অপমান ক'রলেন ? বার-বার এত অপমান সহ্য করা যায় না।"

শেলীর কথায় বীরেন বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন পূর্ব্বে তাঁহার কোন্ ব্যবহার শেলী অপমানজনক মনে করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছে, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণ হইল, তাজমহলে তাঁহার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় শেলী তাঁহার প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহাকে কিঞ্চিৎ রূঢ় কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে সে অপমান বোধ করিয়াছিল বলিয়া মনে হইল না। শেলীর এই উক্তির কারণ স্থির করিতে না পারিয়া বীরেন বাবু তাহাকে বলিলেন, "সে কি ? আবার কবে আমি কি ভাবে তোমার অপমান ক'রেছি, তা তো মনে প'ড়ছে না ! আমি তোমার অপমান ক'রব—এও কি সম্ভব ?"

শেফালী এতক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। আত্ম-পরিচয় দিবার ইচ্ছা আদৌ তাহার ছিল না ; কিন্তু অসতর্ক মুহূর্ত্তে হঠাৎ যখন এত দূর বলিয়া ফেলিয়াছে, তখন সে আর আত্মগোপন করিবার পথ দেখিতে পাইল না। তাই সে অবিলম্বে ঘরের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া সতর্ক ভাবে একবার চারি দিক্ দেখিয়া আসিল। তাহার পর বীরেন বাবুকে অনুচ্চ স্বরে বলিতে লাগিল, "আপনাকে এ সব কথা বল্‌বার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু কথাটা যখন উঠেছে—তখন সবই জেনে যান। এ রকম সুবিধা পরে আর হয় তো হবে না। আমি কে, তা না-জেনেই আপনারা আমাকে মায়ের সেবা করবার অধিকার দিয়েছেন, এবং

স্নেহদানেও কার্পণ্য করেননি,—এতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে ক'রেছিলাম। এটুকু আনন্দও যে জীবনে পাব, এ আশা কোনও দিন আমি অন্তরে পোষণ ক'রতে পারিনি। আপনাদের নিজের কাছে পাব, আপনাদের স্নেহলাভ ক'রবো, এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর!—আমার প্রকৃত পরিচয় পেলে আপনারা আমার ছায়াও মাড়াতেন না! আর এত বিপদে প'ড়েও এ-বাড়ীতে আসতেন না।"—আবেগভরে শেফালীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

বীরেন বাবু তাহার কথায় স্তম্ভিত হইলেন। ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে না পারায় একবার শেফালীর আর একবার রমাপ্রসাদ বাবুর মুখের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; অবশেষে কৌতূহলী হইয়া তিনি বলিলেন, "তোমার অন্য পরিচয় আছে না কি? কে তুমি?"

শেলী রুদ্ধনিশ্বাসে অকম্পিত স্বরে বলিল? "আমি? আমি কনকপুরের অভয়াচরণ মিত্রের পৌত্রী, বিমলাচরণ মিত্রের কন্যা, এবং সন্তোষকুমার মিত্রের ভগিনী, আর কাহার পুত্রবধূ, আপনার তাহা স্মরণ না থাকাই সম্ভব।"

অকস্মাৎ বারুদে আগুন দিলে বারুদস্তূপের অবস্থা যেরূপ হয়, মিষ্টার দত্ত শেফালীর প্রকৃত পরিচয় শুনিয়া সেই ভাবে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "শঠ, চক্রান্তকারী প্রতারকের দল, তোমাদের পরোপকারের—সাধুগিরির মর্ম্ম এখন বুঝতে পারছি! সুনীলকে ধ'রবার জন্যে ফাঁদ পেতে এই সব কাণ্ড করা হ'য়েছে। আর তোমারই মোহিনীশক্তির মোহে নির্ব্বোধ ছেলেটার মাথা ঐ ভাবে বিগ্‌ড়ে গেছে। তাই হঠাৎ তার মনে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা জেগে উঠেছে, আমার অবাধ্য হ'তে তার সাহস হ'য়েছে! তাতেও সাধ মেটেনি, নিজের সত্য পরিচয় গোপন ক'রে শেষে আমাদেরও বশীভূত কর্‌বার চেষ্টা! কি ভয়ানক ব্যাপার! ওঃ—"

ধীরপ্রকৃতি, উদারহৃদয় রমাপ্রসাদ বাবু গৃহাগত অতিথির মুখে অশ্রাব্য কটূক্তি শুনিয়াও বিচলিত হইলেন না; তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "মন সংযত করুন মশায়! জ্ঞানহারা হ'য়ে কতকগুলা অসঙ্গত প্রলাপ-বাক্য আপনার মুখে শোভা পায় না। আপনি বিচক্ষণ, প্রবীণ লোক, কিঞ্চিৎ বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রলেই বুঝতে পারবেন, আপনি অযথা কটূক্তি ক'রছেন, ক্রোধে বিহ্বল হ'য়ে আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রছেন।"

বীরেন্দ্র বাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "থামুন মশায়! আপনার কাছে আমি কর্ত্তব্য শিখতে আসিনি।"

রমাপ্রসাদ বাবু ধীর ভাবেই বলিলেন, "সে সাধ্য আমার নেই, তা আমি জানি; কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি—মশায় কি আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে তাজমহল দেখ্‌তে আগ্রায় এসেছিলেন? না, আমরাই ষড়যন্ত্র ক'রে আপনার স্ত্রীর ঘাড়ে আকস্মিক অসুখ চাপিয়ে দিয়েছিলাম? শেলী কি সব জেনে-শুনে নিজের সুবিধার লোভে আপনার স্ত্রীকে প্রাথমিক সাহায্য দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে সেখানে গিয়েছিল? আর যখন আপনার বিপন্না, সঙ্কটশঙ্কাকুলা স্ত্রীর প্রাণরক্ষার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে সে তাঁকে বুকে তুলে নিয়েছিল, তখন কি সে তাঁর পরিচয় জান্‌তে পেরেছিল?...এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর আপনি দিতে পারেন?"

শেলী এবার মাথা তুলিয়া সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আর জ্যাঠামশায় যখন আপনাদের এখানে নিয়ে আসেন, তখন কি তিনি আপনাদের পরিচয় জেনে আন্‌তে চেয়েছিলেন, না, তা'র পূর্ব্বেই? আমরা কোন অনুগ্রহেরই প্রার্থী নই; আর আত্মগোপন শেষ পর্য্যন্ত ক'রবার সঙ্কল্পও আমার ছিল।"

তাহার পর কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া শেলী লজ্জাবনত নয়নে ম্লান মুখে বলিল, "আপনার পুত্র—মিষ্টার দত্ত এখন পর্য্যন্ত আমার প্রকৃত পরিচয় জান্‌তে পারেননি। তাঁকে তা জানাবার চেষ্টা আমি কোনও দিন করিনি, এবং কর্‌বও না; বরং অন্যকেও এ চেষ্টায় নিবৃত্ত ক'রেছি। পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটাবার হীন প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার পরিচয় জান্‌তে পারলে পাছে আপনারা বুদ্ধিহারা হ'য়ে মায়ের কোন অনিষ্ট করেন, এই আশঙ্কাতেই আমি পরিচয় দিইনি, প্রবঞ্চনা কর্‌বার দুরভিসন্ধি আমার ছিল না। আমার এখন এই অনুরোধ যে, আপনার স্ত্রী-পুত্রাদি কাউকে আমার পরিচয়টা জানাবেন না,—বিশেষতঃ আমার স্বামীকে; তাঁকে আমি আমার পরিচয় জানাতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।"

শেফালী তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

বীরেন্দ্র বাবু হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। ক্রোধে তিনি কিরূপ অন্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, তাঁহার অহঙ্কার-দর্প চূর্ণ হইল। অবশেষে তিনি বিনীত স্বরে রমাপ্রসাদকে বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা ক'রতে পারবেন কি? আপনাদের প্রতি যে অন্যায় করেছি, তার প্রতীকার নেই, তবু নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করবেন কি?"

শান্ত স্বরে রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন, "আমার প্রতি অন্যায় বিশেষ কিছু করেননি তো। শেলীর ভাগ্যলিপি কে খণ্ডন করবে বলুন? যা হোক, আপনি মনে কোনও ক্ষোভ রাখবেন না।"

শেফালীর শেষ অনুরোধ বীরেন্দ্র বাবু অগ্রাহ্য করিলেন না, তিনি তাহার প্রকৃত পরিচয় কাহাকেও জানাইলেন না।

৮

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরবর্ত্তী একটি বাড়ীর সম্মুখস্থ উদ্যানের চৌতারায় বসিয়া একটি যুবক ও একটি যুবতী চা খাইতেছে। বহু দিন পরে ভাই-ভগিনীর সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাদের কথা যেন আর শেষ হইতেছে না! উভয়ের নানা কথা চলিতেছে, এমন সময় ভৃত্য ডাকের চিঠি লইয়া আসিল। একখানি পত্র খুলিয়া সন্তোষকুমার সর্ব্বপ্রথমে লেখকের নামটি দেখিল। সুনীলই এতকাল পরে সেই পত্র লিখিয়াছে দেখিয়া সে আগ্রহভরে তাহা পাঠ করিল,—

"প্রিয় সন্তোষ,

আমার প্রতি বিমুখ হইও না, এই চিঠি পড়িয়া নিজ-গুণে আমার সকল ত্রুটি ক্ষমা করিও। কর্ত্তব্য-সাধনের সৎ-সাহসের অভাবে আমি গত নয় বৎসর কি নিদারুণ মনঃকষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহা আশা করি, তোমাদিগকে কখনও জানিতে হইবে না। স্বাধীনতা লাভের আশায় দাসত্ব বরণ করিয়াছি; চাকরী করিতেছি। কতবার মনে হইয়াছে, বিবাহিতা পত্নীকে গৃহে আনিয়া সংসারী হইব; কিন্তু বাবার ভয়ে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। না হইলেও এত দিনে আমার মোহ দূর হইয়াছে। কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিয়া অন্ততঃ ধর্ম্ম রক্ষা করিব। আমার বিবাহিতা পত্নীকে সুখী করাই অতঃপর আমার জীবনের ব্রত হইবে। এজন্য তোমার ভগিনীর অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি

তোমার অনুতপ্ত সুহৃদ—

সুনীল।"

সন্তোষ চিঠিখানা পড়িয়া-দেখিয়া তাহা শেফালার হাতে দিয়া বলিল, "সুনীল তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবার অনুমতি চেয়েছে। যা'ক, এত দিন পরেও যে তার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হ'য়েছে, এ বড়ই আনন্দের বিষয়। তা'র সম্বন্ধে আমার বড়ই উচ্চ ধারণা ছিল, তাই ভেবে-ছিলাম, সে কখনও ন্যায়পথ ত্যাগ করবে না। এত দিন তার অব্যবস্থিতচিত্ত দেখে নিরাশ হ'য়েছিলাম। যা হোক, এখন তোমার মত পেলেই তা'কে আহ্বান করি।"

শেফালী অনেকক্ষণ তাহাকে উত্তর দিতে পারিল না। কেন পারিল না, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহা বুঝাইবার জন্য আর নূতন করিয়া শেফালীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই।

শেফালীকে নীরব দেখিয়া সন্তোষ বলিল, "এত কি ভাবছ বোন্?…"

শেফালী নতমুখে বলিল, "এখন আমার কি যে কর্ত্তব্য, তা' স্থির করতে পারছি নে। শুধু আমার নিজের সুখের কথা ভাবলেই তো চলবে না।"

সন্তোষ এই উত্তরে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "সুনীল তো তোমাকেই চায়। তার সেই পল্লীবাসিনী পত্নীই যে শেলী মিত্র, তা' জানলে সে কি কম খুসী হবে?"

শেফালী চিন্তিতভাবে বলিল, "কিন্তু বাপ-মা ভাই-বোনের সংস্রব ত্যাগ ক'রেই কি তিনি সুখী হ'তে পারবেন?"

সন্তোষ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "সে জন্যে কি তোমার ও তার সারা জীবনটাই ব্যর্থ করবে? সুনীল আর কাউকে কোন কারণেই যে বিয়ে করবে না, তা' বোধ করি, এখন বুঝতে পেরেছ। তখন বাপ-মা'র সঙ্গে তার সম্বন্ধ বজায় রাখতে গিয়ে কি তাকে চিরজীবন কষ্ট দেওয়া সঙ্গত হবে?"

শেফালী তথাপি বলিল, "মা-বাপের প্রতিও তো তাঁর কর্ত্তব্য আছে; আর তাঁর বাবার প্রকৃতি কিরূপ কঠোর, তা তো তোমার অজ্ঞাত নয়।"

সন্তোষ এবার দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি তোমার ও-সব আপত্তি আর শুনছি নে। তোমাদের দু'জনের জীবনের অনেকগুলি বৎসর বৃথা নষ্ট হ'য়েছে। সুনীলের বাবার অহঙ্কার আর খেয়ালের খাতিরে কি দুটো জীবন সম্পূ

ব্যর্থ ক'রতে হবে ? বীরেন বাবুর যদি এতটুকু সুবুদ্ধি বা মনুষ্যত্ব থাকতো তো তিনি নিজেই চেষ্টা ক'রে ছেলেকে কনকপুর পাঠিয়ে ঘরের বউ ঘরে নিয়ে যেতেন। কিন্তু অহঙ্কারে তাঁর বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আর সুনীলের মা নিতান্ত নিরীহ স্ত্রীলোক ; ব্যথা পেলে হয় তো তাঁর জিদ বাড়বে, তখন পারিবারিক শান্তিরক্ষার জন্যে দত্তজার চক্ষু খুলে যাবে ব'লেই মনে হয়।"

শেফালী আর কোনও কথা বলিল না। সন্তোষ সেই দিনই পত্রের উত্তরে লিখিল—

"প্রিয় সুনীল,

তোমার অপ্রত্যাশিত পত্রখানি পেয়ে আমার কি আনন্দ হ'য়েছে, তা ভাষায় আমার প্রকাশ করবার শক্তি নেই। এ আনন্দ শুধু আমার ভগিনীর ভবিষ্যৎ ভেবে নয়, আমার পুরানো সখাকে ফিরে পাওয়ার জন্যেও বটে। কর্ত্তব্য-পথে তুমি অসুখী হবে না ভাই ! যে দিন আমার বোনটিকে ঠিক চিনবে, সেই দিনই বুঝতে পারবে, সে তোমাকে সুখী করবে।

তুমি তোমার স্ত্রীর অনুমতি চেয়েছ। সে হিন্দুর মেয়ে, বাংলার মেয়ে, তার কাছে স্বামীর ইচ্ছা দেবতার আদেশের সমান ; সীতা সাবিত্রীর আদর্শে সে শিক্ষিতা। কেবল তা'কে নিয়ে পাছে তুমি সুখী হ'তে না পাব, এইটুকুই তার ভয়,—হিন্দুরমণীর পতিপরায়ণা মন তাহাকে নিজের কথা ভুলিয়েছে।

বড়দিনের ছুটীতে কনকপুরে তোমার প্রতীক্ষায় থাকব, সেই পিতৃভিটা থেকেই বরবধূরূপে তোমাদের শুভ-যাত্রা দেখতে চাই। জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এত কাল পরে তিনি যেন দম্পতীকে সুখী করেন ; ইতি।

তোমার সুখ-দুঃখের বন্ধু—
সন্তোষ।"

* * * *

শীতের সন্ধ্যায় কলিকাতার বাসভবনের আরাম-কক্ষে বীরেন বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা সুনীলের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া আছেন—সুশীল ও প্রতীমা তাহাকে আনিতে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছে। সুনীলের আগমনে আজ তাহার মাতার মনে আনন্দ নাই, আসন্ন বিচ্ছেদের ভয়ে তিনি ব্যাকুল। তিনি স্বামীকে বলিলেন,—"তোমাকে মিনতি করছি, আমার একটি কথা রাখ। সুনীল যদি বউ ঘরে আনতে চায় তো আনতে দাও। তার চিরবিচ্ছেদ যে আমি সহ্য করতে পারব না।"

বীরেন বাবু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "তুমিই তো ছেলেবেলা থেকে আদর দিয়ে-দিয়ে তাকে ঐ রকম একগুঁয়ে ক'রে তুলেছ। আমি কিছুতেই ঐ রকম জেদের প্রশ্রয় দেব না। শত অভাবের মধ্যে সংসার সে চালাক, দেখি তার ধর্ম্মজ্ঞান, কর্ত্তব্যজ্ঞান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।"

দত্ত-গৃহিণী দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন,—"কিন্তু সুনীল যা বলছে, তা' তো অন্যায় বলতে পার না। আর তার বয়স হয়েছে, সে সংসারী হবে না ?"

বীরেন বাবু বলিলেন,—"সংসারী হ'তে কে তা'কে বারণ ক'রেছিল ? নিজের জেদেই তো এত দিন বিয়ে করেনি, নয় তো কোন যুগে নিনার সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারত। শুধু জেদের জন্যে নির্বুদ্ধির মতন নিনার বাপের অত টাকা হাতছাড়া ক'রে ফেললে। নিনাকে বিয়ে করলে সব দিক রক্ষা হ'তো ; তা করলে না— নিজেও উপযুক্ত স্ত্রী বরণ করলে না। এখন ওর একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।"

দত্ত-গৃহিণী উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "চিরদিনই ওকে শিক্ষা দেবে ? আমি কিন্তু আর চুপ ক'রে সহ্য করতে পারছিনে। সারাটা জীবন তোমার ভয়ে, আর আমার শান্তিপ্রিয় দুর্ব্বল স্বভাবের জন্যে মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে এসেছি। আমার ছেলেকে আমি কিন্তু কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি যদি তাদের এ বাড়ীতে না আসতে দাও তো আমি তাদের কাছে গিয়ে থাকব ; কোনও বাধা মানব না।"

এ দিকে বীরেন বাবুর মাতাও পুত্রের সহিত খুব গোলযোগ আরম্ভ করিলেন। তিনি এত দিন সুনীলের বিবাহের কথা জানিতেন না, হঠাৎ শুনিতে পাওয়ায় বলিলেন, "কি অলুক্ষণে কথা ! আগুনের সামনে যখন তার মাথায় সুনীল সিঁদুর দিয়েছে, সেই তো ঘরের লক্ষ্মী ; তা'কে ঘরে না আনলে অমঙ্গল হবে না তো কি ? সেই পাপেই এত অশান্তি ; তারই জন্যে বৌমার এ রকম শক্ত অসুখ হ'য়েছিল। বউ এখুনি ঘরে আন।"

হামবড়া বীরেন দত্ত কাহারও কথাই রাখিলেন না ; নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা ত্যাগ করিলেন না। কিন্তু সংসারে অশান্তির সীমা রহিল না ; তাঁহার প্রাণে ব্যথা বাজিল।

সুনীল যে দুই দিন কলিকাতায় থাকিল, যত দূর সম্ভব,

মাতা ও পিতামহীর কাছেই রহিল। বাল্যকাল হইতে সে ইঁহাদের অনুরক্ত ; আসন্ন বিচ্ছেদ জানিয়া সে যেন দুই দিনেই তাঁহাদের স্নেহ ও আদর পূর্ণমাত্রায় আদায় করিবার প্রয়াস পাইল।

বিদায়কালে সুনীল তাঁহাদের চরণধূলি লইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "এ বাড়ীর সঙ্গে আজ থেকে আমার সকল সম্বন্ধই তো ঘুচ্লো। কিন্তু তোমরা যেন আমাকে ভুলে যেয়ো না। যে দিন বউ নিয়ে টুণ্ডলায় ফিরে যাব, সে দিন এই পথেই যাব, তোমরা একবার কি সেই সময় বারান্দায় এসে দাঁড়াবে? তা' হ'লে দূর থেকে আমরা তোমাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেতে পারব।"—মা ও ঠাকুরমা তাহার কথা শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

সুনীল চলিয়া গেল ; সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াই প্রস্থান করিল। মিষ্টার দত্ত নিজের পরাজয়ে ব্যথিত হইলেও পুত্রের সৎসাহসে খুব অসুখী হইলেন না। আগ্রা হইতে দেশে ফিরিয়াই তিনি গোপনে সন্তোষদের কুলের বিশেষ পরিচয় লইয়া জানিতে পারিয়াছেন, সেই কুলের কন্যা তাঁহার বংশগৌরব বর্দ্ধিতই করিবে। তাহার মাতৃকুলের পরিচয় তাঁহার বহু দিন হইতেই জানা ছিল। আর বধূর পরিচয় তিনি আগ্রাতেই পাইয়াছেন। সুনীল বিদায় গ্রহণ করিলে তাহার ঘণ্টা তিন-চার পরে দত্তজা হঠাৎ তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "বিশেষ দরকারী কাজে আমাকে এখনই কলকাতার বাইরে যেতে হবে ; একটা সুটকেশে কিছু কাপড়-জামা ও বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দাও। আমার সব চেয়ে দামী সম্পত্তি হাতছাড়া হবার যোগাড়! আমি মোটরেই যাব, আজই ফেরবার চেষ্টা ক'রব।"

* * * *

কনকপুর গ্রাম হইতে রেলপথ পর্য্যন্ত আজ মহা সমারোহে সজ্জিত ; ক্ষুদ্র ষ্টেশনটির এরূপ সাজ-সজ্জা কখনো কেহ দেখে নাই। কৌতূহলপরবশ হইয়া সন্নিহিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নর-নারী ষ্টেশনে, পথের ধারে, এবং কনকপুরে সমাগত হইয়াছে। সন্তোষকুমার সুনীলের অভ্যর্থনার সকল আয়োজন শেষ করিয়া ট্রেণের সময়ের পূর্ব্বেই ষ্টেশনে আসিয়াছে।

ক্রমে দূরে ট্রেণের ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল। ট্রেণ ষ্টেশনে থামিলে বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্র বাবু সুন্দর ফুলের মালা লইয়া সুনীলের গলায় দিয়া প্রথমে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। সন্তোষ বলিল, "সুনীল, ভাই! কাকাবাবুকে প্রণাম কর, ওঁর মত শুভাকাঙ্ক্ষী আমাদের আর এক জন ছাড়া কেউ নেই,—তাঁর নাম পরে জানবে। ইনি কাঞ্চনপুরের জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, ওঁর সব কথাও পরে বল্‌বো।"

জনতা ভেদ করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবু আগে আগে চলিলেন, তাহার পরে চলিল সুনীল ও সন্তোষ। ষ্টেশন হইতে তাহাদের গাড়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। চলিতে-চলিতে সন্তোষ সুনীলকে বলিল, "এ কি মূর্ত্তি হয়েছে তোমার? মনে যদি ব্যথা পেয়ে থাক, তবে না এলেই পারতে। শেফালীর বাকি জীবনটা কোন রকমে কেটে যেতই।"

শেফালী নাম শুনিয়া সুনীল শিহরিয়া উঠিল। নিয়তির এ কি পরিহাস? সে কাতর কণ্ঠে কহিল, "ভাই, আমার এই সাময়িক বিহ্বলতা ক্ষমা কর। কয়েক ঘণ্টা আগে বাড়ীর সকলের কাছে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছে ; মনের সে বেদনা সহজে ভুলে যাব, সে শক্তি আমার নেই। আশা করি, শীঘ্র মন স্থির করতে পারবো, কর্ত্তব্য সম্পাদনেও আমার ত্রুটি হবে না।"

গাড়ী বাটীর সম্মুখে থামিলে, প্রতুল বাবু জামাতাকে সমাদরে সুসজ্জিত শকট হইতে নামাইয়া লইয়া বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইলেন। পুরনারীগণের হুলুধ্বনিতে সেই বিস্তীর্ণ ভবন মুখরিত ; নহবতে সুমিষ্ট আবাহন-সঙ্গীত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর সন্তোষ আসিয়া সুনীলকে বলিল, "পাড়াগাঁয়ে এসেছ ভাই, পাড়াগাঁয়ের প্রথা মেনে চল্‌তে হবে। বাড়ীর ভিতর কি সব মাঙ্গলিক আয়োজন হ'য়েছে শুন্‌ছি, তা' থেকে তোমার পরিত্রাণ নেই। এ অত্যাচার সহ্য করতেই হবে।"

সুনীল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আচ্ছা চল, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।" সন্তোষ তাহার উদাসীন ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিল। সে মঞ্জুলেখার কাছে সকল কথাই শুনিয়াছে।

অন্দরমহলে গিয়া সুনীল দেখিল, নূতন বরকে বরণ করিবার মত সব আয়োজনই হইয়াছে, কেবল চিত্রকরা পিঁড়ি একখানা নহে, দুইখানা। এক প্রৌঢ়া তাহাকে

অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া একখানি পিঁড়িতে দাঁড় করাইলেন। তাহার পর পট্টবস্ত্রপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাবনতা বধূকে আনিয়া অন্য পিঁড়িতে দাঁড় করান হইল। নিয়মিত ভাবে বরণ শেষ হইলে পুরনারীরা সুনীলকে বলিলেন, "এই বার হাত ধ'রে কনেকে ঘরে নিয়ে যেতে হবে।"

সুনীল অগত্যা স্ত্রীর হাত ধরিল। ঘরের ভিতর আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি আচার সুসম্পন্ন হইলে সন্তোষ ভগিনী-পতির দুরবস্থা দেখিয়া বলিল, "পিসিমা, আর এ সব থাক, এখন আমি ওকে তুলে নিয়ে যাই। বরং ওর জন্য কিছু জলখাবার আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।"

সন্তোষের ঘরে পালঙ্কের উপর বসিয়া কিছুকাল গল্প করিয়া সন্তোষ সুনীলকে জিজ্ঞাসা করিল, "শেফালীর সঙ্গে এখনি দেখা করবে, না খাওয়া-দাওয়ার পর? তুমি বোধ হয়, বিয়ের সময় তার মুখও দেখনি, তাকে দেখবার জন্য যদি ব্যস্ত হয়ে থাক তো বল?"

সুনীল কোন প্রকার কুণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া বলিল, "তা' দেখা হওয়া মন্দ কি? যা'র সঙ্গে সংসার ক'রতে হবে, তা'র সঙ্গে পরিচয় ক'রতে চাই বই কি? তবে আমি যে সেজন্য খুব ব্যস্ত হ'য়েছি, তা মনে কোর না। তার চেয়ে বরং তোমার স্ত্রীর সঙ্গেই প্রথমে আলাপটা করা যা'ক। আশা করি, তোমাদের বংশে অবরোধ-প্রথা এত প্রবল নয় যে, আমার সামনে আসা তাঁর পক্ষে অসঙ্গত হবে। গৃহকর্ত্রী এখনও আমাকে দেখাই দিলেন না, তা'তে কি তাঁর আতিথ্যের ত্রুটি হচ্ছে না?"

সন্তোষ হাসিয়া বলিল, "তিনি যে কনকপুরে নেই। তিনি থাকলে কি আর তুমি এত সহজে নিস্তার পেতে?"

সুনীল বিস্মিত ভাবে বলিল, "এ কি রকম কথা! এই উৎসবে তিনি অনুপস্থিত, তার কারণ?"

সন্তোষ বলিল, "বাড়ী থাক্‌বার উপায় থাক্‌লে কি আর তিনি এই আনন্দের দিনে দূরে থাকতেন? তিনি একটি নবীন আগন্তুকের প্রতীক্ষায় পিত্রালয়ে আছেন। তা তোমাকে খুব শীগ্‌গিরই তাঁর কাছে নিয়ে যাব, তোমাকে আর শেফালীকে একসঙ্গে দেখবার জন্যে তিনিও উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছেন। সে পরের কথা পরে হবে। এখন শেফালীকে ডেকে আনি; তোমার অভ্যর্থনার ভার তার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে চাই।"

অল্পক্ষণ পরেই সন্তোষকুমার তাহার ভগিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া আসিল। পট্টবস্ত্রের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া, লাজজড়িত ধীর পদবিক্ষেপে শেফালিকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে তাহার দিকে চাহিয়া সুনীলের মনে হইল—এই পল্লীবধূর সহযোগিতায় তাহার দাম্পত্য জীবনে সুখের আশা কোথায়? শেফালী তো নববধূ নহে, অপ্রাপ্তবয়স্কাও নহে, সে না কি আধুনিক ভাবে শিক্ষিতা; তথাপি সে ঘোমটা-ঢাকা লাজুক পল্লীবধূর মতন তাহার সম্মুখে আসিল, সে কি করিয়া উচ্চশিক্ষিত সুনীলের সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইবে? কিন্তু উপায় কি? সকল অসুবিধাই তাহাকে সহ্য করিতে হইবে।—এই সকল কথা ভাবিয়া সুনীল উঠিয়া দাঁড়াইল ও পূর্ব্ব-নির্দ্দেশমত সন্তোষ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিল। সে এখন কি করিবে, তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না; সে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিল, "কাপড়ে ঢাকা মাংসের একটা পুঁটুলী দেখবার জন্যেই কি আমি এত দূর এসেছি?"

অবগুণ্ঠিতা মৃদু হাসিয়া কোমল স্বরে বলিল, "বাক্‌-চাতুর্য্যে অনভ্যস্তা অশিক্ষিতা পল্লীবধূর কাছে আপনি এর বেশী আর কি প্রত্যাশা ক'রেছিলেন?"—সে নতমস্তকে সুনীলের পদধূলি গ্রহণ করিল।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুনীল ব্যাকুল হইল। তাড়াতাড়ি বধূর দুইটি হাত ধরিয়া তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচনের চেষ্টা করিল; বিস্মিত ভাবে বলিল, "কে তুমি মায়াবিনী? তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার স্পর্শ যে পরিচিত ব'লেই আমার মনে হচ্ছে!"—শেফালী হাসিয়া মুখের ঘোমটা আরও বেশী নামাইয়া দিল।

সুনীল এবার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আর আমি তোমার আপত্তি শুনছি নে, দেখি তোমার মুখ!"—সে শেফালীর ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল।

সুনীল আবেগ-কম্পিত বক্ষে তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিল, "শেফালী—তুমি শেলী! তুমি এত নিষ্ঠুর! এমনই ক'রে কি প্রতিফল দিতে হয়? তুমি তো

জানতে যে, তোমাকে পাবার জন্যই আমি পাগল হ'য়েছিলাম, তাহাকে দেখা হওয়া অবধি তুমিই যে আমার হৃদয় অধিকার ক'রে ছিলে।"

শেফালী স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া গদগদ স্বরে বলিল, "তা জানি। আপনি তো চেয়েছিলেন শেলীকে, পল্লীবধূ শেফালীকে তো চান্‌নি? তখন ধরা দিলে আপনি যে এই পাড়াগেঁয়ে সরলা বালিকার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যেতেন।"

সুনীল বলিল, "এখনও তুমি 'আপনি' ব'লে কেন আমাকে তোমার হৃদয় থেকে দূরে রাখছো?"

শেফালী মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "অভ্যাস কি সহজে ছাড়া যায়? যাই হোক, শেলী চেয়েছিল তার স্বামী সংযমী, কর্ত্তব্যে অটল, দেব-চরিত্রের মানুষ হবেন। সে কি নিজের আশা পূর্ণ ক'রবার লোভে স্বামীকে সেই উচ্চ আদর্শ থেকে নামিয়ে আন্‌তে পারে?"

সুনীল কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া বলিল, "তোমায় শাস্তি দেওয়া দরকার।"—বলিয়া সে শেফালীর মুখখানি তুলিয়া-ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

১০

আহারান্তে দুই বন্ধু বাহিরের ঘরে বিশ্রাম ও আলাপ করিতেছিল। সুনীলের সকল আশঙ্কা দূর হইয়াছে; এইমাত্র ক্ষোভ যে, তাহার স্নেহময়ী মাতা তাহার সুখের অংশভাগিনী হইতে পাইবেন না। সন্তোষ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ভাই, এত আনন্দের দিনেও শেফালী ও আমি এ সুখ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ ক'রতে পারছিনে। তোমার মা-বাপের আপত্তি যত দিন না দূর ক'রতে পারব, তত দিন আমরা শান্তি পাব না। যে দিন তাঁদের সঙ্গে তোমাদের মিলন হবে, সেই দিনই আমাদের সকল মনঃকষ্টের অবসান হবে; আমরা পূর্ণ আনন্দের আস্বাদন লাভ করবো।"

সুনীল বলিল, "আমি ভগবানের নিকট অন্তরের সঙ্গে তো সেই প্রার্থনাই করছি ভাই!"

সন্তোষ সহানুভূতিভরে বলিল, "আশা করি, শীঘ্রই ভগবান তোমার মনোবেদনা দূর করবেন। এখন আপাততঃ তুমি কি করবে? ছুটীর ক'টা দিন এখানেই থাক্‌বে, না, সস্ত্রীক অন্য কোথাও বেড়াতে যাবে?"

সুনীল বলিল, "এখানে থাক্‌ব মনে ক'রেই তো এসেছি; তবে তোমার যদি কোন রকম অসুবিধে হয় তো শেফালীকে নিয়ে টুণ্ডলায় চলে যাব। তুমি যদি আগ্রা যাবার জন্যে অধীর না হ'য়ে থাক তো শেফালী যে পল্লীগ্রাম এত ভালবাসে, কয়েক দিন এখানে থেকে তার সেই পল্লীজীবনের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাই। তা'র পর দু'জনে একত্র আগ্রায় যাওয়া যাবে।"

সন্তোষ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা হয় না। কত দিন পরে দেশে এসেছি, দু'দিন থাক্‌তে ইচ্ছে হয় না? আর তা' ছাড়া, এই মিলনোৎসব তো স্থানীয় লোকেরও বটে। তুমি থাকতে পারবে জেনে ভারী আনন্দ হ'ল। কাল গ্রামের সকলকে প্রীতিভোজনে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রেছি।"

এই সময় দ্বারবান আসিয়া সংবাদ দিল—কলিকাতা হইতে এক বাঙ্গালী-সাহেব মোটরযোগে বাহিরে উপস্থিত।

"তাঁকে এখানে নিয়ে এস,—বলিয়া সন্তোষ সুনীলকে বলিল, "এখন আবার এখানে সাহেব কে এল—দেখি।"

সে বাহিরে যাইবার জন্য উঠিতেই সেই সাহেব-বেশধারী বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া সন্তোষকে দেখিয়া বলিলেন, "সন্তোষ! আমাকে চিন্‌তে পেরেছ কি?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুনীলও ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

উভয়েই নির্ব্বাক্! কি অভিপ্রায়ে মিষ্টার দত্ত হঠাৎ এই পল্লীগ্রামে উপস্থিত, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সন্তোষ শঙ্কাকুল চিত্তে তাঁহাকে বলিল, "আপনাকে চিন্‌তে পারব না সার? কিন্তু এ যে আমার আশাতীত সৌভাগ্য!"

সুনীল পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবা, তুমি কি ক'রে এখানে এসে প'ড়লে? আর কেনই বা এলে, তা তো বুঝতে পারছিনে।"

মিষ্টার দত্ত চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি? আমি আমার শেলী মাকে বাড়ী নিয়ে যাব ব'লে এখানে এসেছি। তুমি অবাক্ হ'য়ে বোকার মতন দাঁড়িয়ে রইলে যে? আমি অসঙ্গত কিছু করিনি বোধ হয়?"

সুনীল ও সন্তোষ পুত্তলিকাবৎ নির্ব্বাক্, নিশ্চল, উভয়ে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বীরেন বাবু তখন একখানি চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া বলিলেন, "অবাক হ'য়ে সব হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে তাঁকে বস্‌তে ব'লতে হয়, সেটুকু ভদ্রতা জ্ঞানও কি লোপ পেয়েছে?"

এই তিরস্কারে সন্তোষের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, "এ যে আমাদের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য সার! সত্যই চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারিনি, এই জন্যই কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি হ'য়েছে।"

সন্তোষ তাঁহার আদর-আপ্যায়নের আয়োজন করিতে উদ্যত হইলে, বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমার জন্য তোমাদের ব্যস্ত হ'তে হবে না; এখনই আমাকে আমার শেলী মায়ের কাছে নিয়ে চল, ছেলের সে যত্ন করতে জানে। দেখি, সে আমার সব ত্রুটি ক্ষমা ক'রতে পারবে কি না। তোমরা বরং আমার ড্রাইভার ও বেয়ারার দেখাশুনার ব্যবস্থা কর।"

শেফালীর অনুরোধ এড়াইতে না পারায় বীরেন বাবুকে কনকপুরেই রাত্রিবাস করিতে হইল। পরদিনের উৎসবে তিনি যোগদান করায় জ্ঞানেন্দ্র বাবু ও প্রতুল বাবুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তৃতীয় দিন প্রভাতে তিনি কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

* * * *

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বীরেন্দ্র বাবু উৎসবের বিপুল আয়োজনে রত হইলেন। নিজের আত্মীয়-বন্ধুদের টেলিফোনে আহ্বান করিলেন; স্ত্রী ও মাতাকে দুই বেলা ভোজের আয়োজন করিতে বলিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "যে কাজে মফঃস্বলে গেছলুম, তা সফল হ'য়েছে। জীবনে এমন আনন্দের দিন আর আমার হয়নি; আয়োজনও সেই রকম ক'রতে হবে।"

সুনীল নাই, অথচ উৎসবের এত আয়োজন। শাশুড়ী ও বধূ উভয়েই নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বহির্দ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপন করিতে হইবে শুনিয়া তাঁহারা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কি উপলক্ষে এই উৎসব? মাঙ্গলিকেরই বা আয়োজন কেন? এমন সময় বীরেন্দ্র বাবু অন্তঃপুরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "এখনও তোমরা যে যোগাড়-যন্ত্র কিছুই করনি! বউ ঘরে আস্‌ছে—তার বরণের আয়োজন কোথায়?"—এ কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা ও স্ত্রী আনন্দে বিহ্বল হইলেন; মা বলিলেন, "আগে বল্‌তে হয়; সুনীলকে বিদায় দিয়ে আমরা চোখের জলে ভাসছি!"

দত্ত সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মেয়েদের তো কাণ্ডই ঐ রকম! এমন আনন্দের দিনেও চোখের জল! তা আমি বলছি, এ বউ তোমাদের পছন্দ হবে।"

অল্পকাল পরেই বধূসহ সুনীল বাড়ী আসিল। বীরেন বাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে বধূর মুখমণ্ডল দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃত। যথানিয়মে বধূবরণ হইলে দত্ত-গৃহিণী অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বধূর মুখ দেখিবামাত্র শেফালীকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "এ কি কাণ্ড, তা তো আমি বুঝতে পারছিনে মা! সকলে মিলে বুঝি আমাকে কাঁদাবার ষড়যন্ত্র ক'রেছিলে? এ যে না চাইতেই আকাশের চাঁদ কোলে পেলাম। ভগবান আমাকে এত সুখী করবেন, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! তাঁর এ দয়ার বুঝি তুলনা নেই। নারায়ণ! তুমি মঙ্গলময়, —অসীম তোমার দয়া!"

সুনীল বলিল, "সব দোষ তোমার ঐ বউয়ের মা! ছদ্মবেশী শেলীই যে পল্লীবালা শেফালিকা, তা কি আমরা কোন দিন জানতে পেরেছি? আমরা কেউ ওকে চিনতে পারিনি।"

শেফালিকা পিতৃবংশের গৌরবরক্ষার জন্য যে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিল, তাহার কঠোর সাধনায় এত দিনে তাহা সফল হইল। এই প্রগতির যুগে বঙ্গবালারা শিক্ষায়, চরিত্রে, সেবায়, নৈতিক বলে শেফালিকার চরিত্রের অনুসরণ করিয়া হিন্দুর গৃহ সুখময়, শান্তিপূর্ণ করুক—এই শুভ কামনার সহিত আমরা এই উপাখ্যান শেষ করিলাম।

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

সমাপ্ত

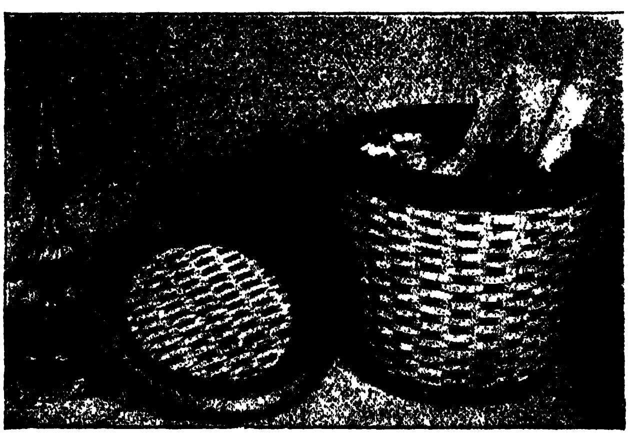


সাজি ও টুকরি

পাৎলা কাঠ আর চ্যাঁচারি—তা দিয়ে ঘরে বসে রকমারি ছাঁদের সাজি এবং টুকরি তৈরী করা মোটেই শক্ত নয়। এ-সাজিতে এবং টুকরিতে চমৎকার বাহার আছে।

এর জন্ম চাই টুকরো পাৎলা কাঠ আর চ্যাঁচারি। তলার জন্ম খানিকটা শক্ত কাঠ চাই। দরকার-মতো ছাঁচে

সময় দু'দিকেই টানা এবং সমান-মাপের ফোকর রাখবেন এই ফোকর বা grooves-এর মধ্যে মজবুত চ্যাচারি বা পাৎলা-কাঠের চোক্‌লা গুঁজে নীচেকার আ উপরকার দিকগুলো শিরীষ-আঠা লাগিয়ে এঁটে নেবেন ফোকরে বা grooveএ আঠা দিয়ে ধারের লম্বা-খাড় চ্যাচারিগুলি বেশ টাইট করে আঁটা চাই। আঁটা হলে এই খাড়া চ্যাঁচারির বা খাড়া পাৎলা-কাঠের গায়ের মধ



১। কাঠের চোক্‌লার টুকরি



২। এমনি করে বুনুন

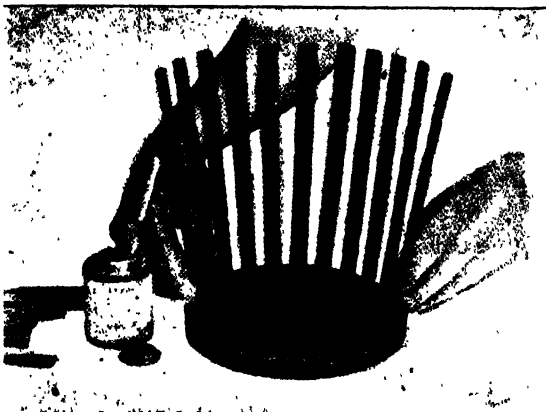
বা ছাঁদে ছুতোরকে দিয়ে তলার কাঠটুকু কাটিয়ে নিতে পারেন। কাঠ দিয়ে তৈরী করলে তলা বেশ মজবুত হবে। দেবদারু-কাঠে কাজ হবে। যদি ভেনেস্তা-কাঠ ব্যবহার করেন, আরো ভালো। কাঠ দিয়ে যেমন তলা তৈরী করবেন, তেমনি উপর-দিক্‌কার রিংটাও এই কাঠে তৈরী করা চাই; নাহলে গায়ের চ্যাঁচারির বুনন টাইট্‌ বা ঠাশ্‌ থাকবে না—সাজি-টুকরি আলগা হয়ে তাদের বাঁধন খুলে যাবে।

ছুতোর দিয়ে তলার এবং রিঙের কাঠ কাটিয়ে নেবার দিয়ে চ্যাটাইবোনার ভঙ্গীতে গোল করে চ্যাঁচারি বুনে নেবেন। ২ নম্বরের ছবি দেখলে বুঝতে পারবেন, কি করে এ-চ্যাঁচারি গোল করে পর-পর বুনতে হবে।

খাড়াই চ্যাঁচারি বা কাঠের পাৎলা চোক্‌লা যা নেবেন, সেগুলি চওড়ায় হবে ১/৪ ইঞ্চি; গোল করে যে-চ্যাঁচারি বা কাঠের চোক্‌লা বুনবেন, সেগুলির মাপ হবে চওড়ায় ৩/১৬ বা ১/১৬ ইঞ্চি। অর্থাৎ এগুলি খাড়াই-চোকলার চেয়ে সরু হওয়া চাই। গোল করে যে-চ্যাঁচারি বা চোকলা বুনবেন, সেগুলি যেন সমান্তরাল-রেখায় অর্থাৎ paralle

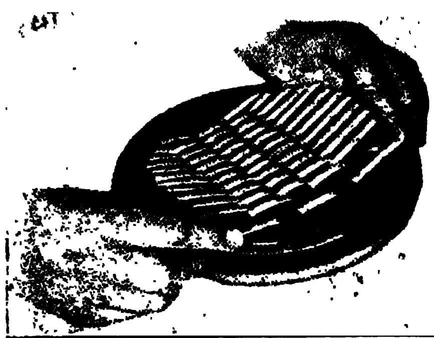
করে বোনা হয়। খাড়াই চোকলাগুলির মাঝে সিকি-ইঞ্চি জায়গা যেন ফাঁক থাকে।

এই খাড়াই চ্যাচারি বা চোক্‌লা যাতে নুয়ে বেঁকে না পড়ে, সে-জন্য কাঠের খোল করিয়ে যদি কাজ সুরু



৩। শিরীষের আঠায় খাড়াই আঁটা

করেন, তাহলে ভালো হয়। ৫নং ছবির টুকরির পাশে যে দোতলা কাঠের খোল দেখছেন,—ছুতোরকে দিয়ে এই রকম খোল তৈরী করে নেবেন। খোল তৈরী করে

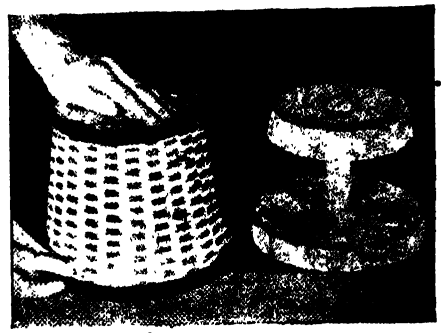


৪। ধারি বোনা

এ কাজ করতে নামলে সাজি বা টুকরিগুলির আকার নুয়ে বেঁকে বিশ্রী বেমানান্ হবার ভয় থাকবে না। চ্যাচারির প্রান্তভাগ যদি বেড়ে থাকে, তাহলে সে বাড়তি ডগাটুকু কাঁচি চালিয়ে সাবধানে ৬নং ছবির ভঙ্গীতে কেটে দেবেন।

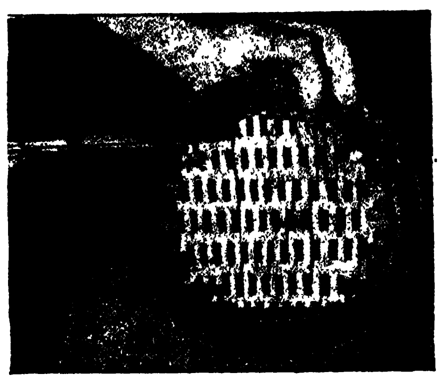
বোনবার আগে এই কাঠের চোকলা বা চ্যাচারি বালতির জলে এক-রাত্রি বেশ করে ভিজিয়ে রাখবেন। ভিজিয়ে রাখলে কাজ সহজ হবে।

আর একটি কথা, প্রত্যেকটি চ্যাচারি বা কাঠের চোকলা যেখানে শেষ হবে, সেখানে সতর্ক ভাবে ছোট



৫। কাঠের খোলে বুনন্ ভালো হয়

হাতুড়ির মৃদু আঘাতে কাঁটা-পেরেক এঁটে দেবেন—তাহলে বোনা কোনোখানে খুলে যাবে না বা আলগা হবে না। প্রথম-প্রথম হাতের কাজ হয়তো তেমন



৬। কাঁচি দিয়ে ডগা কাটা

ভালো হবে না। সে জন্য দুঃখ নেই! অভ্যাসে রপ্ত হলে হাতে-বোনা এই সাজি আর টুকরির বাহার যা খুলবে, দেখে নিজেরাও চমৎকৃত হবেন!

প্রজাপতি-ট্রে

প্রজাপতির পাখায় যে রকমারি বাহার, সে বাহারে কার না মন ভোলে! মরা-প্রজাপতি পিনে গেঁথে অনেকে ছবির ফ্রেমে ঘরের রূপসজ্জা সম্পাদন করেন। প্রজাপতি এঁটে ঘরের বাহার কত রকমে করা চলে, সে সম্বন্ধে আজ দু'-চারটে কথা বলছি।

এর জন্য প্রজাপতি ধরে তাদের মেরে ফেলতে বলি না। জীব-হত্যা ভালো নয়। প্রজাপতি ধরে মারতে

হবে না। মরা-প্রজাপতি নিয়েই কাজ চলবে। তবে মরা-প্রজাপতি সংগ্রহ করা সহজ নয়। জীবন্ত প্রজাপতি ধরে ঘরে তাদের লালন-পালন করুন। সে-প্রজাপতির যখন মৃত্যু হবে, তখন সেই মরা-প্রজাপতি নিয়ে গৃহ-সজ্জায় সামগ্রী তৈরী করতে পারবেন।

ছোট ছাঁকনি-জাল তৈরী করে সে-জালের সাহায্যে প্রজাপতি ধরবেন। হাতে চেপে ধরতে গেলে থেঁৎলে প্রজাপতির পাখা, দেহ—সব চুরমার হয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। গৃহ-সজ্জার জন্য চাই আস্ত প্রজাপতি। সে-প্রজাপতির পাখা যেন অটুট থাকে,—নাহলে কাজ হবে না।

প্রজাপতি নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় তাদের



উপরে—ছবিতে প্রজাপতি; নীচে—ট্রের বুকে প্রজাপতি

পাখায় কখনো হাত দেবেন না। কারণ, হাত লেগে পাখা ছিঁড়ে যেতে পারে; তাছাড়া হাত লাগলে প্রজাপতির পাখায় যে নানা রঙের রেখা আছে, সে রঙ ঝরে যাবে। রঙ ঝরে গেলে প্রজাপতির সে বিবর্ণ কঙ্কালে ঘরের বাহার খুলবে না।

এবারে প্রজাপতির পাখা নিয়ে সাজাবার কৌশল। পিঠের মাঝামাঝি সন্তর্পণে আলপিন চালিয়ে গাঁথতে হবে। গাঁথবার সময় লক্ষ্য রাখবেন, পাখা দুটি যেন বেশ খোলা থাকে! পাশের ছবির ফ্রেমে পাখা-মেলানো প্রজাপতি দেখছেন তো! অমনি করে প্রজাপতিগুলিকে মোটা পেষ্ট-বোর্ডের গায়ে সাজাতে হবে। সাজিয়ে তার পর তাদের পিঠে আলপিন গুঁজে বোর্ডের গায়ে গেঁথে আটকে নিন্!

বোর্ডে যেমন আঁটবেন, তেমনি পাৎলা এবং হাল্কা কাঠের ট্রের গায়েও প্রজাপতি এঁটে নিতে পারেন। আলপিন খুব মিহি দেখে নেবেন কিন্তু।

বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্য মাঝে মাঝে ডানা-মোড়া প্রজাপতি দু'-তিনটি গাঁথতে পারেন। সব সময়ে কিন্তু মনে রাখবেন, পাখায় হাতের ছোঁয়া না লাগে!

মাঝে-মাঝে এই ফ্রেমে বা ছবির বোর্ডে ন্যাপথিলিন দেবেন। নাহলে পোকার জ্বালায় প্রজাপতির চিহ্ন থাকবে না!

ট্রের জন্য হাল্কা ভেনেস্তা-কাঠ বা সিকি-ইঞ্চি পুরু প্লাই-উড কিনে আনবেন। যদি বেশী প্রজাপতি গাঁথতে চান, তাহলে আর-একটু পুরু কাঠের দরকার। ছবি সাজাতে হলে বোর্ডের গায়ে তুলোর প্যাড আঁটতে পারেন। তুলোর প্যাডের নীচে আগে থেকে ন্যাপথিলিনের গুঁড়ো প্রচুর ভাবে ছড়িয়ে দেবেন।

মরা-প্রজাপতিগুলিকে আঁটবার আগে একটি



প্রজাপতির পাখা মেলানো

বোতলে জল ঢেলে সেই জলে প্রজাপতিগুলিকে দু'-এক দিন ভিজিয়ে রাখবেন। ভিজিয়ে রাখবার জন্য তাদের দেহ নরম থাকবে—শক্ত হবে না। নরম না থাকলে পিন গুঁজতে প্রজাপতির পাখা বা দেহ গুঁড়িয়ে যাবার ভয় আছে।

ট্রের বা ছবির বাহার যদি আরো বেশী খোলতাই করতে চান, তাহলে প্রজাপতির সঙ্গে মাঝে-মাঝে শ্যাওলা বা নানা রঙের ফুলের পাপড়ি পিনে এঁটে ঐ সঙ্গে সাজিয়ে নিতে পারেন। এ সাজানোয় শিল্পীর কৌশল থাকা প্রয়োজন। নাহলে এলোমেলো রকমে শ্যাওলা বা পাপড়ি আঁটলে দেখতে বিশ্রী হবে। ট্রের গায়ে শিরিষের আঠা দিয়ে খুব পাৎলা কাগজ (ফুলের দোকানে ফুল কিনতে গেলে ফুলওয়ালারা যে-কাগজে ফুল জড়িয়ে ভান্, সেই রকম পাৎলা কাগজ) এঁটে তার উপর প্রজাপতি গাঁথলে সে-গাঁথা মজবুত হবে।



ছোটদের আসর

মেক্‌-আপ

সিনেমার ছবিতে তোমরা দেখেছো, তরুণ-বয়স্ক অভিনেতারা বয়স্কের সাজে নিজেদের এমন নিখুঁৎ গড়ে তোলেন যে, তাঁদের দেখলে বয়স বা স্ব-রূপ নির্দ্ধারণ করা দায়! বিশ-বাইশ বৎসর বয়সের তরুণ-অভিনেতা কি করে ষাট-সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ সাজেন—নিরেট গাল তুবড়ে ফেলেন—এ-ব্যাপার খুব রহস্যময় মনে হয় না কি?

কিন্তু এ-রহস্য অতি-সহজে রচনা করা যায় এবং



নকল দাড়ি আসল দাড়ি

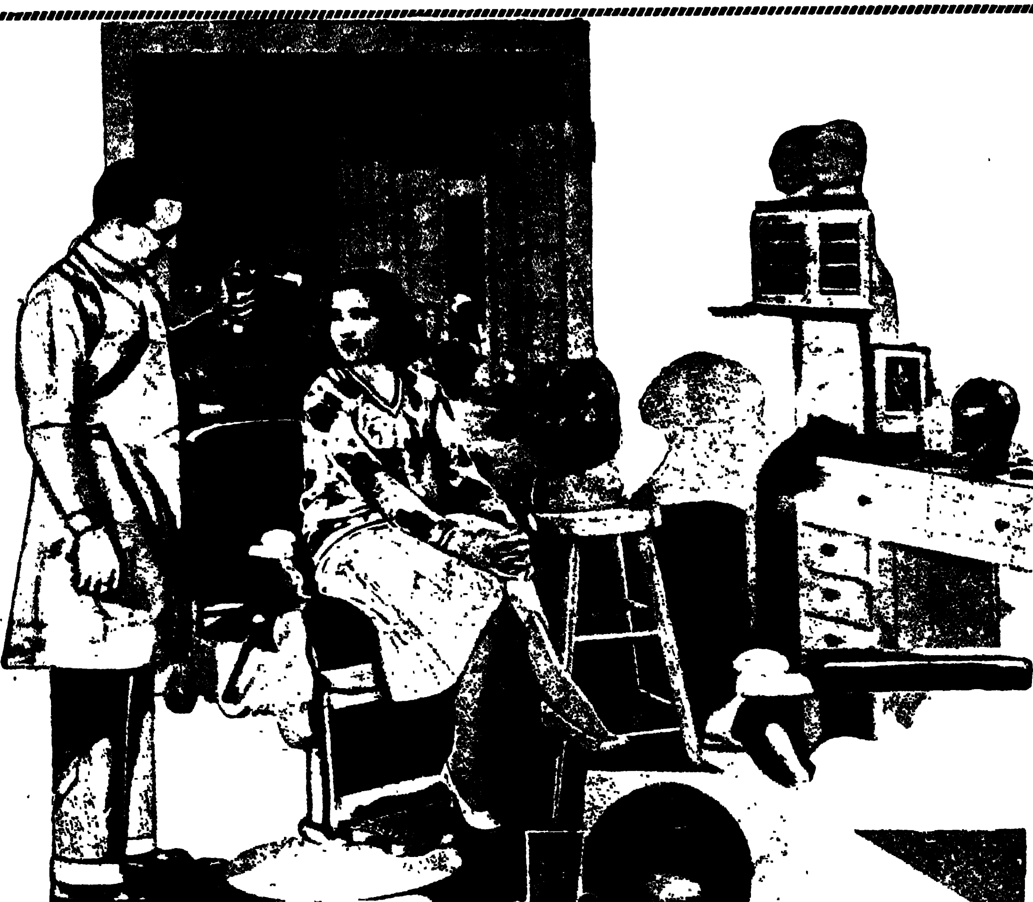
যায় শুধু রঙ মাখবার কৌশলে! সিনেমার ছবিতে তরুণের এই রূপান্তরের কথা আজ বলছি।

তরুণের ভ্রূ, মাথার কেশ আর ঠোঁট—এ-গুলিতে লাল রঙ লাগানো হয়। বৃদ্ধের লোল চামড়া এবং সে-চামড়ায় বার্দ্ধক্যহেতু যে-কোঁচ, সেগুলি সৃষ্টি করা হয় সবুজের লাইন টেনে। ক্যামেরার লাল ফিলটারের সাহায্যে এই রঙে-রাঙানো মাথার কেশ, ভ্রূ, ঠোঁট এবং গাল আশ্চর্য্য-নব-রূপে ছবিতে ফোটে। অর্থাৎ লাল রঙের ভ্রূ আর মাথার কেশ ছবিতে দেখায় বৃদ্ধের পক্ব-শুভ্রতায় রূপান্তরিত; সবুজের রেখায় মুখের কোঁচ দেখায় বৃদ্ধের সত্যকার কুঞ্চিত লোল চর্ম্মের মতো।

যে-সব রূপ-সজ্জাকর নট-নটীকে তুলির লেখায় নানা বয়সে রূপান্তরিত করে তোলেন, তাঁদের শক্তি অসামান্য সন্দেহ নেই। তরুণ নট-নটীকে রূপ-সজ্জার কৌশলে যেমন বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় করা হয়, তেমনি আবার প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীকেও ঐ রূপ-সজ্জা বা মেক্‌-আপের জোরে তরুণ করে তোলা হচ্ছে। বৃদ্ধকে তরুণ-রূপে ফুটিয়ে তোলবার জন্য মাছের ছালের আবরণ ব্যবহার করা হয়। এ-ছাল দুই কাণের উপরে আঠা দিয়ে এঁটে নিতে হয়। সে ছালের দুই প্রান্ত একটু উঁচু করে রাখলে বয়স্কদের মুখের মতো মুখ বেশ পুরন্ত দেখায়। তার উপর ব্রাউন-গ্রীজ পেইন্টের ঘন শেড টেনে দিলে তরুণের কপোলের দীপ্তি, তরুণের গায়ের মসৃণতা, বর্ণরাগ আশ্চর্য্য-নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠবে।

বুড়ো সাজাবার জন্য পরচুল-ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। এ-চুল পাট বা শণের নুড়ি দিয়ে তৈরী নয়। এ জন্য জীবন্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সত্যকার শুভ্র কেশ ভারে-ভারে কেনা হয়। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইতালী থেকে বহু সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মাথার কেশ ছেঁটে বস্তাবন্দী করে ব্যবসায়ীর দল সে-কেশ আমেরিকার ফিল্ম-ষ্টুডিয়োগুলিতে নিত্য চালান দিচ্ছে।

ভালো মিহি যে-চুল, তা করা হয় লেশ বা ক্রেপ শিল্ক থেকে। মার্কিণ-ফিল্মের বড় অভিনেত্রীরা বেশী-বয়সের ভূমিকায় নামবার সময় এই লেশের চুল ব্যবহার



ষ্টুডিয়োর সাজ-ঘর



চোখের নীচে রেখা টানিয়া বুড়া সাজানো

করেন। হলিউডে মেক্-আপ-শিল্পীর কাজে সবচেয়ে কৃতী হচ্ছেন আর্ণ এবং পার্সি ওয়েষ্টমোর। লেশ থেকে এই মিহি কেশ-রচনার রীতি তাঁরাই সর্ব্বপ্রথম বার করেছেন। তাঁদের এ-আবিষ্কারের পূর্ব্বে আমাদের দেশের যাত্রার নারদের দাড়ি আর মেয়েদের পাটের কেশের ছাঁদে বিশ্রী ভারী পরচুল দিয়ে রূপসজ্জার এ-কাজটুকু সমাধা করা হতো।

এই ক্রেপ লেশ হাতে বুনে তৈরী করা হয়। এক বাণ্ডিল ক্রেপ-শিল্ক লেশ—তা থেকে বিশ-পঁচিশ জোড়া দীর্ঘ কেশ বা দীর্ঘ গোঁফ-দাড়ি তৈরী করা চলে। আমাদের দেশের ষ্টেজে এবং ফিল্মের আসরে এই লেশ বা ক্রেপের দাড়ি-গোঁফ এবং চুলের ব্যবহার আজ সুপ্রচলিত হয়েছে। ক্রেপ ও লেশের এ-চুল সত্যকারের চুলের মতো দেখায়।

যে-সব ভদ্রলোকের মাথায় আগাগোড়া টাক্—অথবা মাথার খানিকটা কেশহীন, খানিকটায় কেশ আছে, বয়সে প্রৌঢ়, এই ক্রেপ বা লেশের পরচুল মাথায় এঁটে তাঁরা চমৎকার-নিখুঁত তরুণের মূর্ত্তি ধারণ করেন।

এ পরচুলে মুখের ভোল কি করে এমন বদলায় যে,



উপরে বাঁয়ে অভিনেতার আসল মূর্ত্তি ; নীচে পর-পর ঐ অভিনেতারই সাতটি রূপান্তর

প্রৌঢ়কে তরুণ বলে মনে হয়? রূপ-সজ্জাকর শ্রীযুত আর্ণ ওয়েষ্টমোর বলেন, মাথায় ও মুখে ক্রেপের পরচুল বা দাড়ি-গোঁফ সুবিন্যস্ত করলেই প্রৌঢ়কে-তরুণ,

সাজানো যায় না। সে কেশ-বিন্যাসে অনেকখানি কৌশল চাই। এই কৌশলের জোরেই তরুণকে বৃদ্ধ সাজানো যেমন নিখুঁত সহজ হয়েছে, তেমনি

নিখুঁত সহজ হয়েছে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তরুণ সাজানো।

মাছের ছাল স্বচ্ছ। মুখে আঁটলে ক্যামেরার লেন্সে তার অস্তিত্ব ধরা যায় না। গায়ে আঁটলে সে মাছের ছাল চামড়ায় এমন বেমালুম লেগে থাকে যে, তা মানুষের গায়ের চামড়া বলেই মনে হয়। এ ছাল আঁটবার জন্য বিশেষ এক-রকম তরল আঠা আছে,—মাছের ছালে এই তরল আঠা লাগিয়ে মুখে-হাতে এঁটে নাও—তার উপর পাউডার, গ্রীজ-পেইণ্ট, ওয়াক্স প্রভৃতি মাখো, এমন বুড়ো সাজবে যে, ক্যামেরার শক্তিমান্ লেন্সেও সে ফাঁকি ধরা পড়বে না!

তরুণকে বৃদ্ধ সাজাতে ওয়েষ্টমোর-ভ্রাতৃযুগল কি কৌশল অবলম্বন করেন, সে সম্বন্ধে তাঁদের উক্তি উদ্ধৃত করছি। তাঁরা বলেন—প্রথমে তরুণের মুখে বিশেষ-রকম কালো রঙ মাখিয়ে নিতে হয়। এ কালোর উপরে দিই সাদা ট্যাল্‌কাম্ পাউডার। কালোর উপর পাউডারের প্রলেপ দিলে মুখ বেশ নিরেট (hard surface) হয়ে ওঠে। তার পর অভিনেতার কপালে রেখা এঁকে কোঁচ তৈরী করি। রেখায় কোঁচ তৈরী করে তার উপরে গ্রীজ-পইণ্টের প্রলেপ দিই। এখন অভিনেতা যেমন করেই থাকুন্ না কেন, এ কোঁচের রেখায় তাঁর মুখের ভোল্ একদম্ বদ্‌লে যায়। তার পর হাতে-গায়ে থাবড়ে-থাবড়ে গ্রীজ-পেইণ্ট দিলে চামড়া লোল দেখাবে—তরুণের গায়ের চামড়ার মসৃণতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। তার পর চোখের উপরকারের পাতায় মাছের ছাল আঁটি—এ ছাল সামনে চিবুকের নীচে পর্য্যন্ত আঁটা হয়। এই ছালের জন্য বিশ-বৎসর বয়সের মুখ একেবারে পঞ্চাশ-বৎসর বয়সের মুখে রূপান্তরিত হয়।

এবার পেশীর রূপান্তর। সে-কাজ সংসাধিত হয় তুলির লেখায় শেড-রেখা টেনে।

দাড়ি বা চুল—এগুলি তৈরী করা হয় প্রায় বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ শেডের ক্রেপ মিশিয়ে সে-ক্রেপ আঁচড়ে দীর্ঘ বা খর্ব্ব করে! তার পর এই চুল আর দাড়ি যথারীতি কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হয়। এ-কৌশলে তরুণ পুরুষকে বৃদ্ধ সাজানো মোটেই শক্ত নয়। তরুণীকে বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া সাজানো কিন্তু কঠিন। মেয়েদের বেলায় নকল চক্ষুপল্লব তৈরী করতে হয়। মেয়েদের গায়ের মুখের চামড়া তৈরী করতে খানিকটা ধীরতা এবং সতর্কতার প্রয়োজন।

সমাজে আজ এই মেক্-আপ-বিদ্যার প্রচুর আদর। তোমরা যদি এ বিদ্যার সাধনা করো, তাহলে জেনো, সে চেষ্টা নিষ্ফল হবে না। জ্ঞানাৎ পরতরো নহি। সেই কারণেই আজ মেক্-আপ সম্বন্ধে এই আলোচনা করলুম।

ফুলের ফশল

কে না ফুল ভালোবাসে? আমাদের দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফুলের অজস্র ফশল হয়! আমাদের ছেলেবেলায়



১। জানলার ধারে একদিকে আলো-বাতাস লাগে

মনে পড়ে, এ সময় মর্ণিং-স্কুলের ব্যবস্থা হইত, আর ক্লাশে-ক্লাশে ছেলেদের মধ্যে রেশারেশি চলিত, কে কত ফুল লইয়া সকালে স্কুলে আসিতে পারে! জানি না, এখন তোমাদের মর্ণিং-স্কুলে ফুলের এ প্রতিযোগিতা চলে কি না!

না চলিলেও এ-কথা সত্য, তোমরা ফুল ভালোবাসো! ফুলের বর্ণে-গন্ধে এমন মোহ যে, তাহাতে দেহে-মনে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত হয়!

ছোট-বয়সে অনেকের আবার এই ফুল-প্রীতি এত বেশী যে, সুবিধা পাইলে টব কিনিয়া সে-টবে নানা জাতের পাতা-বাহার গাছ, ফুলের গাছ পুঁতিয়া ছাদে বারান্দায়



২। টবের মধ্যে টব

সেই সব টব রাখিয়া বাড়ী সাজায়। কলিকাতা সহরে ফুলের সাধ মিটাইবার সুযোগ বড় অল্প। অনেকের বাড়ীতে তেমন জায়গা নাই! সখ থাকিলেও অনেকে আবার গাছপালার সেবা-যত্ন করিবার অবসর পায় না। আজ আমরা ফুলের ফশল ফলানোর সম্বন্ধে যে দু'-চার কথা বলিতেছি, সে-কথা মানিলে সকলের ফুলের সখ



৩। টবের গায়ে রঙ দাও

সহজে মিটিতে পারিবে। বাড়ীতে বাগান করিবার মতো জায়গা যদি না থাকে, ছাদ, বারান্দা, উঠানের কোণ বা ঘরের মধ্যে টব রাখিয়া সে-টবে মনের মতো গাছ পুঁতিতে পারো। ছোট পাম্ বা ফার্ণ টবে পুঁতিলে কোনো অসুবিধা ঘটিবে না। ঘরে যদি রাখিতে চাও, তাহা হইলে ছোট টবে গাছ পুঁতিয়া সে-টবটি তার চেয়ে বড় টবের মধ্যে রাখিয়ো। বড় টবের গায়ে রঙ করিয়া লইয়ো—বাহার খুলিবে। টবের মধ্যে টব রাখিতে বলার কারণ, দু'টি টবের মাঝখানে যে-ফাঁক থাকিবে, সে-ফাঁকটুকু শ্যাওলা দিয়া ভরাট করিয়া দিবে। যে-টবে গাছ থাকিবে, সে-টবে যখন জল দিবে, তখন সেই সঙ্গে শ্যাওলাগুলিতে জল দিয়ো। ইহাতে গাছ দীর্ঘ দিন বাঁচিবে এবং ঐ শ্যাওলার আওতায় তার জীবন এবং সবুজ-শ্রী জ্বলিয়া যাইবে না। টবের গায়ে রঙ দিলে গাছের জল চট্ করিয়া উবিয়া বা শুকাইয়া যাইবে না। সে জলে গাছ অনেকখানি সরসতা লাভ করিবে। রঙ-করা টবে জল রাখিলে ঐ রঙের গুণে সে-গাছে সপ্তাহে একবার জল দিলেই চলিবে; গাছের স্বাস্থ্য তাহাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইবে না।



স্পঞ্জ দিয়া পাতা সাফ

খোলা খড়খড়ির বা জানলার ধারে গাছ রাখিলে সে-গাছের একদিকে মাত্র যদি বাহিরের রৌদ্র-আলো-বাতাস লাগে দ্যাখো, তাহা হইলে সে-গাছের বাড় হয় 'একপেশে' বা অসমান। গাছের যে-দিকটা এই রৌদ্র-বাতাস-আলো হইতে বঞ্চিত থাকে, সে-দিকটা অস্বাস্থ্যে ভরিয়া মলিন হয়, জীর্ণ হয়। এজন্য খড়খড়ি-জানলার ধারে টবে গাছ রাখিলে সে-টব প্রত্যহ নাড়িয়া এমন ভাবে বসানো প্রয়োজন, যেন গাছের সর্ব্বাঙ্গে এবং সব-দিকে সমান ভাবে বাহিরের আলো-বাতাস লাগে।

যদি ভাখো, গাছের পাতায় মাঝে-মাঝে ঝাঁঝরা-রন্ধ্র হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিবে, গাছে পোকা ধরিয়াছে। এই পোকা মারিয়া গাছকে সুস্থ রাখিবার সহজ উপায়,

সাবান-জলে স্পঞ্জ বা তুলা ডুবাইয়া গাছের পাতায় প্রত্যহ সেই স্পঞ্জ বা তূলা ঘষিয়া পাতা সাফ করা। সাবান-জল দিয়া পাতা মাজিবার পর পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে আর-এক দফা পাতার ঘষা-মাজা পরিমার্জ্জনা প্রয়োজন।

বাড়ীতে যারা ক্রীশানথীমাম্ ফুলের ফশল ফলাইতে চাও, একটি বিষয়ে তারা সতর্ক থাকিয়ো। দিনের আলো ক্রীশানথীমামে যত-কম লাগে, ফুল তত শীঘ্র ফুটিবে এবং



৫। ঘরের মধ্যে গাছ রাখো

ফুল তত ভালো হইবে, জানিয়ো। বৈকালে চারিটা-বেলা হইতে পরের দিন সকালে বেলা নটা পর্য্যন্ত ক্রীশানথীমামের গাছগুলিকে যদি ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে রাখিয়া দাও, তাহা হইলে এ-গাছে চট্ করিয়া ফুল ফুটিবে।

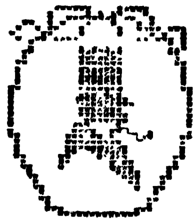
সব ফুলের সম্বন্ধে অবশ্য এ নিয়ম খাটে না। বেশীর ভাগ ফুল কিন্তু দিনের আলো যত পায়, ততই তারা রমণীয় কান্তি-গন্ধ লইয়া অজস্র ভাবে ফুটিয়া ওঠে।

টাইপ-রাইটারের খেলা

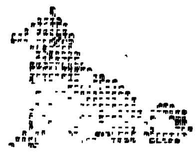
পাশের ছবিখানি দেখছো? পাল-তোলা একখানি জাহাজ।

এ-জাহাজের ছবি কি করে আঁকা হয়েছে, জানো? কৌশলে কাগজের উপর টাইপ-রাইটারের অক্ষর ছেপে।

টাইপ-রাইটারের অক্ষরে এ ছবি যদি আঁকতে চাও, তাহলে যে-ছবি আঁকবে, কাগজের উপর পেন্সিলের

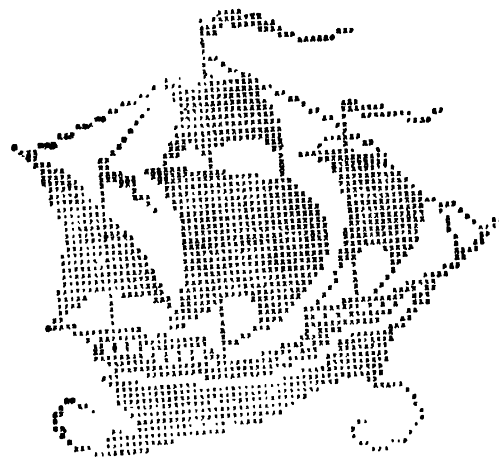


সাহেবের মুখ



কুকুর

অতি-সূক্ষ্ম রেখায় আগে থেকে তার আদ্‌রা বা ডিজাইন ছকে নাও। তার পর টাইপ-রাইটার-যন্ত্রে কাগজখানি সংলগ্ন করে ঐ ডিজাইনের রেখায়-রেখায়— যেখানে ফাঁক থাকবে, সেখানে ফাঁক রেখে অক্ষর ছাপো! কাজটুকু মনোযোগ দিয়ে করা চাই। কাগজে যেন কালির দাগ না লাগে! ভুল-অক্ষর ছেপে ছবির সৌন্দর্য্য যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।



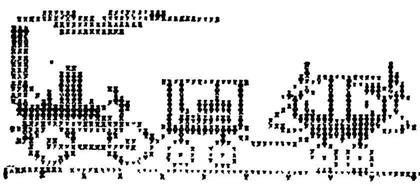
পাল-তোলা জাহাজ



মেম-সাহেবদের চা-পান

এই সঙ্গে আরো দু'খানি ছবি ছাপা হলো। একখানি ছবিতে দেখছো, দু'জন মেম-সাহেব টেবিলে বসে চা খাচ্ছেন

—কেটলি থেকে ধোঁয়ার রেখা উঠেছে! আর-একখানি ছবি রেল-গাড়ীর। ধোঁয়া উড়িয়ে এঞ্জিন চলেছে; আর



রেলগাড়ী

এঞ্জিনের পিছনে দু'খানি গাড়ী আঁটা! এ দু'খানি ছবিও টাইপ-রাইটারের অক্ষর ছেপে রচনা করা হয়েছে।

নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা

পাঁচ

লীনাকে পাহাড়ের পথে রেখে আমরা এবার রাজধানীতে নীলার সন্ধানে এসেছি। কেন না, সিংহলী নীলাচলের সঙ্গে তার বিয়ের কথাটা নিয়ে সহরে ভারী আন্দোলন চলছে। সেই যে কালো রঙের এক-এক ফালি তক্তা রাস্তার মোড়ে-মোড়ে আর বড়-বড় বাড়ীগুলোর গায়ে আগে ঝুলতে দেখা গিয়েছিল—তার গায়ের লেখাগুলোই হচ্ছে যত গণ্ডগোলের কারণ।

রাণী-মা, রাজকন্যা, মহামন্ত্রী, এমন কি—সিংহলী নীলাচল পর্য্যন্ত রেগে আগুন! এত বড় আস্পর্দ্ধা—চুপি-চুপি রাতারাতি রাজধানীর বিশাল বুক-জুড়ে তক্তা টাঙিয়ে তারা কি না হুমকী দিতে সাহস ক'রলে! আর এমনি অকর্ম্মার ধাড়ী সহরকোটালটা আর তার পাহারাওয়ালাগুলা যে, তক্তাওয়ালা বদমায়েসদের একটাকেও তারা পাকড়াতে পারলে না! এ রাগ কি সামলানো যায়! তক্তাগুলোকে তুলে চৌরাস্তার মোড়ে-মোড়ে চাঁচরের মেড়া-পোড়ার উৎসব ক'রেও মন্ত্রীর রাগ কমেনি। চোর ধরবার জন্য তিনি যে কড়া হুকুম দিলেন—পুরস্কার ঘোষণা ক'রে দলে-দলে গোয়েন্দা ছাড়লেন, তার ফলে বাড়ী-বাড়ী খানাতল্লাস সুরু হ'লো—যার বাড়ীতে এক টুকরো সাদা খড়ি কিম্বা এক ফালি কালো তক্তা পাওয়া গেল, অমনি তার বাড়ীশুদ্ধ সকলের হাতে হাতকড়ি পড়লো! তখন তাদের লাঞ্ছনা দেখে কে?

এই ধর-পাকড়ের ভেতরেও লোকের মুখে এখন নীলা আর নীলাচলের কথা ছাড়া যেন আর কোন কথা নেই! এমন কি, তক্তায় যে ক'টা কথা লেখা ছিল, সেগুলোর ওপর আরও অনেক আজগুবী কথা লোকের মুখে-মুখে চার দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মাকে পর্য্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। কত লোকের মুখ তিনি বন্ধ করবেন, কত লোককে বন্দীশালায় আটক রাখবেন? তক্তার ব্যাপারে গোয়েন্দাদের কারসাজিতে যারা ধরা প'ড়েছিল, তাদের এক জনও রেহাই পায়নি—সকলকেই লম্বা মিয়াদে কারাগারে বাস করতে হচ্ছে। হাজার-হাজার বন্দীর ভীড়ে রাজ্যের কারাগারগুলো সব ভরে উঠেছে। এর ওপর—যারা এই সব কথা নিয়ে আলোচনা করে, তাদেরও ধরে কয়েদখানায় পু'রতে হ'লে সমস্ত রাজ্যটাই কারাগার হ'য়ে ওঠে। তাই ইদানীং মন্ত্রী মশায় ধরপাকড়ের তোড়টা অগত্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু নীলা তাতে খুসী নয়, তার ইচ্ছা, যারা তাদের কথা নিয়ে কোন রকম আলোচনা করবে, তাদের সবাইকে ধরে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

এই নিয়ে এক দিন দাদুর সঙ্গে নাতনীর বেশ কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। নীলা ব'ললে—তুমি কোন কাজের নও, দাদু! রাজ্যের লোকগুলোকে জব্দ ক'রতে পারলে না, এমনি অপদার্থ তুমি।

কথাটা গায়ে না মেখে একটু হেসে দাদু বললেন—রাজ্যের লোক ত আর গোণাগুণতির মধ্যে নয়, দিদি!—কোটি-কোটি লোক নিয়ে রাজ্য, তাদের সকলকেই জব্দ করা কি মুখের কথা! কিন্তু হঠাৎ এ কথা বোলছ কেন?

নীলা ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলো—হঠাৎ আবার কি? তুমি কি ন্যাকা? কিছুই জান না? শুনতে পাচ্ছ না—লোকের কথা?

দাদু বললেন—লোকের সব কথায় কান দিতে নেই, তাতে কাজ বাড়ে আর রাগে মনটা বিগড়ে যায়।

নীলা জিজ্ঞাসা করলে—তবে সেই তক্তাগুলো নিয়ে অত কাণ্ড ক'রলে কেন? চোখ না দিলেই ত ল্যাটা চুকে যেত?

দাদু উত্তর দিলেন—চোখের সামনে যেটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, অন্যায় হ'লে তাকে দাবাতেই হয়। নইলে, রাজ্যে শৃঙ্খলা থাকে না। কিন্তু আড়ালে কে কি বলছে, সেই সব নিয়ে গোল করলে ঝঞ্ঝাটই বাড়ে, নিন্দে চার দিকে আরো ছড়িয়ে পড়ে।

নীলা মুখখানা বেঁকিয়ে বলে উঠলো—বুড়ো হয়ে তোমার ভীমর'তি ধরেছে, দাদু, তাই এ কথা বললে! নিন্দে ছড়াতে বাকি আছে না কি? শোননি, আমাদের নিয়ে কত লোক কত কথা বলছে?

দাদু হেসে বললেন—তাতে কি হ'য়েছে, লোকের কথা গায়ে না মেখে হেসে উড়িয়ে দিলেই হ'ল। লোকের কথায় ত আর আমরা বিয়ে বন্ধ করছি না। তুমি বরং এক কাজ কর দিদি—রাণীর মত জাঁকজমকে সহরের পথে-পথে টহল দিয়ে বেড়াও, তোমার সঙ্গে থাকুক নীলাচল; এক শো রক্ষী নিশান উড়িয়ে তোমাদের নামে জয়ধ্বনি তুলুক,—লোকের থোঁতা মুখ ভোঁতা হ'য়ে যাক।

দাদুর এ যুক্তিটি নীলার মনে ধরলো, সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দর মুখখানি তার হাসিতে ভরে উঠলো। দাদুর পানে সে বাঁকা দৃষ্টিতে একটিবার তাকিয়ে বললে—নাঃ, আমারই ভুল হয়েছিল দাদু, সত্যিই তুমি কাজের লোক; তোমার ঘটের বুদ্ধি এখনো লোপ পায়নি।

সেই দিনই বিকেলে রাজপ্রাসাদ থেকে খুব ঘটা ক'রে এক মিছিল বেরুল। পাশাপাশি দু'টি সুসজ্জিত হাতী, তাদের পিঠে মণি-মুক্তোর ঝালোর দেওয়া সোনার হাওদা,—একটিতে ব'সেছে তরুণী রাণী নীলা, তার রূপের সঙ্গে জমকালো বসন-ভূষণের ছটা মিশে হাতীর পিঠে অপূর্ব্ব শ্রী ফুটে উঠেছে। পাশের হাতীতে বসেছে নীলাচল। তারও সাজ-সজ্জা রাজার মতন, পোষাকের বাহার দেখেই চোখ যেন ঝলসে যায়! হাতী দুটোর পিঠে সোনার কাজ-করা কিংখাপের ঝুল, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত

রঙ বেরঙের সাজ। সোনালী রঙের পোষাক পরে মাহুত ব'সেছে মাথার দিকে। সজ্জিত হাওদার পিছনে বসে চামর দিয়ে বাতাস করছে দুই কিঙ্করী; তারাও যেমন সুন্দরী তেমনি তাদের সাজ-পোষাকের বাহার। হাতী দুটোকে ঘিরে চ'লেছে এক পাল আসা-সোটাধারী বরকন্দাজ, তাদের আগে পিছনে জন পঞ্চাশ সশস্ত্র সৈনিক।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে মিছিল রাজধানীর বড়-বড় রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে চললো। এর আগে আর কোন দিন এভাবে নীলা দেবী নগরের পথে মিছিল ক'রে বেরোয়নি। কাজেই কুমারী রাণীকে দেখবার জন্য রাজ্যের লোক যেন ভেঙ্গে পড়লো। নীলার কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজের হাতীতে বসে হেসে-হেসে পাশের হাতীর আরোহী নীলাচলের সঙ্গে তার আলাপ করবার কি ঘটা? রাস্তার দু'ধারে কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে যারা রাণীর উদ্দেশে হাতযোড় করে সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছিল—তাদের দিকে রাণীর দৃষ্টিও পড়ল না। রাস্তার ধারে যে সব বাড়ী, তাদের ছাদে, অলিন্দে উঠে নগরের মেয়েরা কুমারী রাণীর এই নির্লজ্জ আচরণ দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো—মাগো, এ কি কাণ্ড! তবু বরের সঙ্গে বিয়ের আগে এমন ক'রে রাস্তায় কেউ বেরোয় না কি মিছিল ক'রে! যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড!

নীলাচলকে হঠাৎ গম্ভীর হ'তে দেখে নীলাও মুখের হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলে—হ'ল কি তোমার? মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল কেন গো!

নীলাচল বললে—দেখছ না, আমাদের দেখে লোকেরা সব হাসছে, টিটকিরি দিচ্ছে! আমি ফিরে যাই, রাণী।

নীলার মুখখানা অমনি রাগে লাল হ'য়ে উঠলো; দুই চোখ পাকিয়ে সামনের একটা বাড়ীর দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেলে—জনকতক ছেলে একটা বাড়ীর দেউড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে নীলাচলের দিকে আঙ্গুল তুলে মুখ টিপে হাসছে। নীলার মনে হ'ল, সে হাসি যেন ছুরির ফলার মতন তার বুকে বিঁধছে। ঘাড় বেঁকিয়ে অমনি সে নীলাচলের পানে চেয়ে বললে—আর দু'দিন পরে এ-রাজ্যের রাজা হবে তুমি—এ কথা জেনেও যারা তোমাকে দেখে হাসতে পারে, তারা তোমার শত্রু। তুমি ওদের সায়েস্তা করতে পারো না?

নীলাচল উত্তর দিলে—খুব পারি। এক দিনেই আমি সমস্ত পাজীর মুখ বন্ধ করবার ওষুধ জানি। কিন্তু ভয় তোমার দাদুকে।

নীলা রুক্ষস্বরে বললে—রাজ্য আমার, আমি রাণী। দাদু ত আমার চাকর। তাকে তোমার কি ভয়? তুমি ঐ পাজীগুলোকে জানিয়ে দাও—তোমাকে ঠাট্টা করার কি শাস্তি!

নীলাচল এই সুযোগই খুঁজছিল। তার চোখ দুটো উৎসাহে জ্বলে উঠলো। মাহুতের দিকে চেয়ে হুকুম দিলে—হাতীকে বসাও।

মাহুতের ইঙ্গিতে চোখের পলকে নীলাচলের হাতী হাঁটু-গেড়ে রাস্তার ওপর বসে পড়লো। রাস্তার জনতা তাতে চঞ্চল হয়ে উঠলো,—রক্ষীরা ব্যস্ত হয়ে নীলাচলের হাওদার সামনে এসে দাঁড়ালো। রক্ষীদের সরদারটি নীলাচলের অতি পরিচিত এবং অনুগত ব্যক্তি। নীলাচল তাকে 'সরদার' বলে ডাকে। লোকটা সিংহলবাসী—মুখখানা তার যেমন চ্যাপ্টা, দেহটাও সেই অনুপাতে একখানা তক্তার মত বেয়াড়া। সারা মুখে যেন নিষ্ঠুরতা মাখানো। সরদারকে ইসারায় কাছে ডেকে নীলাচল চুপি-চুপি তার হুকুমটা জানিয়ে দিলে। তখনি সে রক্ষীদল নিয়ে সবেগে ছুটলো সামনের সেই বাড়ী লক্ষ্য ক'রে। দু'হাতে পথের লোকগুলোকে সজোরে ঠেলে পথ করে নিয়ে তারা সামনের দিকে ছুটে চললো। ফুলের মত ফুটফুটে তিনটি ছেলে বাড়ীর সামনেই দাঁড়িয়েছিল। এতগুলো সশস্ত্র সিপাইকে সামনে দেখে ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনটি ছেলেই বাড়ীর ভেতরে পালানোর জন্যে যেমন মুখ ফিরিয়েছে, অমনি পিছন থেকে সিপাইদের হাতগুলো সাঁড়াশীর মতো তাদের গলায় চেপে ব'সল। কারুর মুখে আর কথা নেই। তিনটি ছেলেকেই শূন্যে তুলে তারা নীলাচলের সামনে এনে নামিয়ে দিলে। ছেলে তিনটি তখন ভয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিল।

নীলাচল ছেলে তিনটিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে না, একবার শুধু তাদের পানে তাকিয়ে সরদারকে বললে—এরা আমাদের দিকে চেয়ে হাসছিল, ঠাট্টা করছিল। আচ্ছা করে এদের চাবুক-পেটা কর,—এক-এক জনকে কুড়ি ঘা লাগাও।

বাস্—হুকুমের সঙ্গে-সঙ্গেই কাজ সুরু হয়ে গেল। এক সঙ্গেই অভাগা ছেলে তিনটির পিঠে সরদারের হাতের চামড়ার চাবুক সপাসপ পড়তে লাগলো। তাদের কাতর আর্ত্তনাদে সারা পথ প্রতিধ্বনিত হ'ল। রাস্তার লোকগুলি এই নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখে ছেলে তিনটিকে ছেড়ে দেবার জন্যে কত অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো—কিন্তু রক্ষীরা তাদের ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে দিলে।

ছেলেদের অভিভাবকরা তফাতে থেকে রাণীর দোহাই দিয়ে তাদের রেহাই দেবার জন্যে কত প্রার্থনাই করলে, কিন্তু রাণী তার উত্তরে মুখখানা বেঁকিয়ে শুধু হাসলে। রাণীর সেই তীক্ষ্ণ হাসি পথের সকল লোকের কানে যেন সূচের মত বিঁধতে লাগলো।

এই নিষ্ঠুর দণ্ডের পর তিনটি ছেলেই রক্তাক্ত দেহে পথের উপর লুটিয়ে পড়লো। নীলাচল মাহুতকে হুকুম দিল—হাতী উঠাও, সামনে চালাও!

সঙ্গে-সঙ্গে হাতী উঠে দাঁড়ালো,—হাতী দুটোকে ঘিরে মিছিল এগিয়ে চললো,—পথের ওপর প'ড়ে রইলো চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মৃতকল্প তিনটি ছেলে!

ছেলেদের অভিভাবকেরা হাহাকার ক'রে তাদের পাশে প'ড়ে ছটফট ক'রতে লাগলো। জল, পাখা, ওষুধ নিয়ে দরদী লোকেরা ছুটে এসে ছেলে তিনটির শুশ্রূষা করতে লাগলো; কিন্তু কিছুতেই তাদের তখন চেতনা হ'ল না।

মিছিলের কোলাহলের ধ্বনি দূর থেকে তখনও বাতাসে ভেসে আসছিলো; সূর্য্য আগেই পশ্চিম গগনপ্রান্তে অদৃশ্য হ'য়েছেন, গোধূলির ধূসর ছায়া ক্রমশঃ কালো হ'য়ে নেমে আসছিল; রাস্তার ধারে সংজ্ঞাহীন ছেলে তিনটিকে ঘিরে যারা বসেছিল, চোখের জলে তাদের দৃষ্টি রুদ্ধ হয়েছিল।

এই সময় এক দীর্ঘাকার লোক কাছের কোন বাড়ী থেকে বেরিয়ে অতি সন্তর্পণে এদের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। লোকগুলি ছেলে তিনটিকে ঘিরে তাদের মুখের দিকেই চেয়ে বসেছিল। নতুন এই লোকটিকে কেউ লক্ষ্য করেনি। তিনি একটু দাঁড়িয়ে লোকগুলির দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন—ছেলেকটাকে ঘিরে এমনি করে বসে থাকলেই কি ওরা সেরে উঠবে? সরে যাও সকলে, ওদের গায়ে বাতাস লাগতে দাও।

সকলে চমকে-উঠে চেয়ে দেখলো—তাদের সামনে অপূর্ব্ব রূপবান এক যুবক! মানুষের এমন আশ্চর্য্য রূপ আর এমন দীর্ঘ আকৃতি এর আগে তারা কেউ দেখেনি। যেমন চমৎকার মুখশ্রী, তেমনি টানা-টানা বড় বড় চোখ। মাথার কালো-কালো কোঁকড়ানো চুলগুলি ঘাড় পর্য্যন্ত লতিয়ে পড়েছে। পরণে তাঁর গেরুয়া রঙের কাপড়, গায়েও ঐ রঙের একখানা চাদর। তপ্ত কাঞ্চনের মত রঙ যেন তার ভেতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। খালি পা। হাতে একটা কমণ্ডলু।—লোকগুলি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, তাদের মাথাগুলো আপনিই যেন এই তরুণ সাধুটির উদ্দেশে নুইয়ে পড়লো। সাধুর কোমল মুখ আর কচি-কচি গোঁফ দেখে মনে হচ্ছিল, সবেমাত্র তিনি যৌবনের সীমায় পা দিয়েছেন।

সাধু আর কোন কথা না বলে সেই সংজ্ঞাহীন ছেলে তিনটির শিয়রে বসে পড়লেন। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাদের পানে চেয়ে আপনমনেই বলে উঠলেন—মনে তোমাদের পাপ নেই, নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাতের কমণ্ডলু থেকে দধির মত তরল পদার্থ দিয়ে ছেলেদের দেহের ক্ষতগুলো সব ঢেকে দিলেন। সকলে স্তব্ধ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। সাধু এবার নিজের গায়ের চাদরখানি খুলে ছেলে তিনটির গায়ের ওপর চাপা দিয়ে জনতার দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ছেলে তিনটির অভিভাবক কারা?

তিনটি লোক এগিয়ে এসে জানালো—তারাই অভিভাবক। তিন ভাই তারা এক বাড়ীতেই থাকে, তাদেরই ছেলে। পাশের পাড়াতেই তাদের বাড়ী। রাণী মিছিল ক'রে বেরিয়েছেন শুনে ছেলে তিনটিকে নিয়ে তারা তিন ভাই এই রাস্তায় এসেছিল।

মুখখানা গম্ভীর ক'রে সাধু বললেন—অভিভাবকরা যে সব কথা মনের ভেতর চেপে রাখে, ছেলেরা মন খুলে তা ব'লে ফেলে। একটা হা-ঘরে বিদেশী রাণীকে বিয়ে ক'রে তোমাদের রাজা হয়—তোমরা সেটা চাও না, এই নিয়ে বাড়ীতে ঘোঁট পাকাও, অথচ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করবার সাহস তোমাদের নেই। তোমাদের মনের কথা ছেলেরা জানে। তাই রাস্তায় রাণীর সঙ্গে সেই বিদেশীকে দেখে তারা হেসেছিল। বিদেশীর সাহস আছে, তোমাদের মতন কাপুরুষ নয়—ছেলেগুলোকে চাবুক মেরে এই দলের সকলকে শিক্ষা দিয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখছি—ঐ চাবুক তোমাদেরই পিঠে পড়েছে।

লোকগুলি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলো; তাদের মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। সাধু বললেন—আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানো? তোমাদেরও পিঠে সবেগে চাবুক লাগাই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার শক্তি যখন তোমাদের নেই, তখন পরের কথা নিয়ে লুকিয়ে চর্চ্চা কর কোন্ সাহসে? জান—না বলে পরের জিনিস নিয়ে ব্যবহার করা, আর—পরের কথা নিয়ে লুকিয়ে আলোচনা করা সমান অন্যায়?

কথাগুলো বুঝি কাঁটার মতন প্রত্যেক লোকের বুকে বিঁধছিল। তারা চঞ্চল হয়ে উঠলো, কিন্তু সাধুর কথার প্রতিবাদ করতে কারও সাহস হ'ল না।

সাধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতগুলি লোকের মুখের ভাবভঙ্গি চেয়ে-চেয়ে দেখছিলেন। বুঝলেন, তাঁর কথাগুলোর মর্ম্ম এরা বুঝতে পেরেছে। এবার তিনি গলার স্বর রীতিমত তীক্ষ্ণ ক'রে বললেন—ছোট একটি বাছুরের গায়ে হাত দিলে তার মা সিং নেড়ে আঘাত করতে ছুটে আসে। সন্তানের লাঞ্ছনা তুচ্ছ পশুও সইতে পারে না, আর—তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্তানের ওপর এই নিষ্ঠুর নির্য্যাতন দেখলে? পশুর সঙ্গে তোমাদের এই প্রভেদ লজ্জাজনক বটে!

এরই মধ্যে কথাটা চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধুকে দেখবার জন্যে তখন আবার এই পথে জনসমাগম হচ্ছিল। যারা মিছিল দেখবার লোভকেও দমন ক'রেছিল, তারাও দল-বেঁধে এসে কান খাড়া করে সাধুর কথা শুনছিল। দলের ভেতর থেকে এবার সাড়া এলো—ঠিক কথা, আমরা পশুরও অধম।

সাধুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবার শায়িত ছেলে তিনটির দিকে পড়লো। অমনি তিনি চাদরখানি তাদের গায়ের ওপর থেকে তুলে আস্তে আস্তে ছেলে তিনটির মুখে-চোখে বুকে-পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। তাঁর হাতের পরশ পেয়েই যেন একসঙ্গে তিনটি ছেলেই চোখ মেলে চাইলো; বিবর্ণ মুখগুলির ওপর ক্ষীণ আভা ফুটে উঠলো। কাছে যারা দাঁড়িয়েছিল, উল্লাসে তারা চীৎকার ক'রে উঠলো—চক্ষু মেলেছে, জ্ঞান হয়েছে, আর চিন্তা নেই—জয় জগদীশ!

জনতার জয়োল্লাসের ভিতরে সাধু ছেলে তিনটিকে হাত ধরে আস্তে-আস্তে তুলে বসালেন। সকলে সমস্বরে আবার জয়ধ্বনি করে উঠলো। এক জন এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে বললো—অদ্ভুত আপনার ওষুধের গুণ!

সাধু বললেন—ওষুধ ত আমার নয়, আমি প্রয়োগ করেছি মাত্র। যিনি এই আশ্চর্য্য ওষুধটি সৃষ্টি করেছেন, তিনি এক দিন তোমাদেরই ছিলেন, কিন্তু তোমরা সেই মহাপুরুষকে তাড়িয়ে দিয়েছ!

বিস্ময়ের সুরে একসঙ্গে অনেকেই বলে উঠলো—আমরা?

জোর গলায় সাধু বললেন—হ্যাঁ, তোমরাই। তিনি ছিলেন এই রাজ্য ও রাজবংশের সত্যকার বন্ধু। মানব-দেহের আর মানব-সমাজের ব্যাধি দূর করবার ওষুধ এ-রাজ্যে তিনিই শুধু জানতেন। কিন্তু তাতে রাজ্যের বাবা চাই—তাদের স্বার্থে আঘাত পড়ে। তাই চক্রান্ত ক'রে তাঁকে জাতিচ্যুত করা হয়, তাতে যে সমাজের সমাজ-পতিরা ব্যবস্থা দেয়—তোমরাই সেই সমাজের অঙ্গ। কিন্তু সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করবার ব্রত নিয়ে তিনি জনসমাজের বাইরে চলে যান। তিনি—বৈদ্যরাজ সুসেন।

সাধুর কথার সঙ্গে-সঙ্গে চার দিক থেকে প্রশ্ন উঠলো—তিনি এখন কোথায়? বলুন—বলুন—

আকাশের দিকে সুদীর্ঘ হাতখানি তুলে সাধু বললেন—তিনি আছেন ঐখানে। তাঁকে পাবার আর সম্ভাবনা নেই। তবে সারা জীবনের সাধনায় যে দুর্লভ অমৃত তিনি সঞ্চয় ক'রে রেখে গেছেন, মনে-প্রাণে সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করবার ইচ্ছা যদি তোমাদের থাকে, তবে তোমরা তা পেতে পারো।

আবার সমস্বরে সকলে বলে উঠলো—আমরা চাই, আমরা চাই।

সাধুর মুখে এতক্ষণ পরে প্রথম হাসি দেখা দিল; তিনি বললেন—তা হ'লে তাঁর মতন সাধনা কর আগে। এ সাধনা আর

কিছু নয়—মনে-প্রাণে সত্যনিষ্ঠ হও। সাহসে বুক বেঁধে খুঁজে দেখ—ব্যাধি কোন্‌খানে। ব্যাধির সন্ধান পেলে মুক্তিরও উপায় হবে।

অনেক লোক তখন সেখানে এসে জুটেছিল। তারা সকলে কান খাড়া ক'রে সাধুর কথাগুলো শুনছিল। কথাগুলো যেন কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে তাদের অন্তরে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার করলো। জনতার ভেতর থেকে জোর গলায় এক জন লোক ব'লে উঠলো—ব্যাধির সন্ধান আমরা পেয়েছি। ব্যাধি আমাদের মনে; ভয়-সঙ্কোচ-জড়তা ব্যাধির জট পাকিয়েছে, সাহস আর সত্যের ছুরি দিয়ে এ জট কাটতে হবে।

অমনি সমস্ত লোক এক সঙ্গে বলে উঠলো—ঠিক কথা, এতে যদি মরতে হয়, সেও ভালো।

এই সময় সাধুর খোঁজ পড়লো, কিন্তু তাঁকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। জনতা যখন উত্তেজিত হ'য়ে চেঁচাচ্ছিল, সেই সময় সকলের অগোচরে তিনি চুপি-চুপি অদৃশ্য হ'য়েছিলেন। কিন্তু লোকের মুখে-মুখে রটে গেল—সাধু সবার সামনে বাতাসে মিশে গেছেন!

রাস্তার এই ঘটনাটা অতিরঞ্জিত হ'য়ে লোকের মুখে-মুখে বিদ্যুতের গতিতে সহরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। যারা ঘটনার ত্রিসীমাতেও আসেনি, তারা অবাক হয়ে শুনলো—এক মহাপুরুষের অলৌকিক কাহিনী। রাজার সিপাইরা চাবুক-পেটা ক'রে যে তিনটি ছেলেকে মেরে ফেলেছিল, তিনি হঠাৎ এসে গায়ে হাত বুলিয়ে তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। নগরবাসীকে বলেছেন—তোমরা এর প্রতিশোধ নাও, যে লোক এমন ক'রে ছেলে খুন করতে পারে, রাণীর সঙ্গে তার কখন বিয়ে হ'তে পারে না। কালো তক্তায় লেখা কথাগুলো তোমরা মুখ দিয়ে বার ক'রে বলো—এ বিয়ে হবে না, কিছুতেই আমরা বিয়ে হ'তে দেব না। মহাপুরুষ বলেছেন—এতে যদি কোন হাঙ্গামা বাধে, তোমাদের কোন বিপদ আসে—আমি আছি, ভয় কি!—এই আশ্বাস দিয়েই মহাপুরুষ বাতাসে মিশে গেছেন।

লোকের মুখে-মুখে এই সব কথা এমন ভাবে দিকে-দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, কেউ তাতে কোন রকম সন্দেহ করলো না, সবাই বিশ্বাস ক'রে মেনে নিলে। তার ফলে লোকের মনে ভয় ও সঙ্কোচ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, সবাই বুক ঠুকে দাঁড়ালো, জোর গলায় প্রতিবাদ তুললো—ঠিক কথা, আমরা ঐ খুনে বিদেশীটাকে মানবো না; এ-বিয়ে কিছুতেই হ'তে দেব না। ভয় কি, মাথার ওপরে আছেন সেই মহাপুরুষ।

মিছিল প্রাসাদে ফেরবার আগেই পথের দুর্ঘটনার খবর মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মার কানে এসে পৌঁছেছিল। সহরের সর্ব্বত্র তাঁর গোয়েন্দা ঘোরাফেরা করে, প্রত্যেক লোকের নাড়ীর খবর তাঁর নখ-দর্পণে থাকে। এতকাল পরে তাঁর মহাশত্রু সুসেনের প্রসঙ্গ শুনেই তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখের পর্দ্দা খুলে গেল। তিনি যেন দেখতে পেলেন—অনেক দিন আগে যে লোকটাকে সমাজপতিদের সাহায্যে তিনি দেশত্যাগী করেছিলেন, সেই লোকটাই কোথাও আস্তানা পেতে গোপনে অস্ত্র শানাচ্ছিলো, আর এখন সুযোগ পেয়ে সেই অস্ত্র সে প্রয়োগ ক'রেছে। সহরের পথে-পথে ঐ যে কালো রঙের তক্তা রাতারাতি ঝুলেছিল—সে সব ঐ ধড়িবাজ লোকটারই কীর্ত্তি! সহরময় তার সব চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি তাঁর শাসনের চাকাটা এবার আর একটু নতুন কায়দায় ঘুরিয়ে দিতে হাত বাড়ালেন।

মিছিল থেকে প্রাসাদে ফিরেই নীলা মুখখানা শক্ত ক'রে বললো—পথে কি কাণ্ড বাঁধিয়ে এসেছি, শুনেছ ত দাদু! যেমন সব কুকুরের রা, তেমনি দিয়েছি মুগুরের ঘা। কারুর মুখে আর কথাটি নেই। পারতে তুমি এমন ক'রে এক ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যের নচ্ছারগুলোকে সায়েস্তা ক'রতে?

দাদু গম্ভীর মুখখানা তুলে বললেন—আমি সব শুনেছি; কিন্তু কাজটি ভালো হয়নি, দিদি!

নীলা তার চোখের বড়-বড় কালো-কালো তারাদুটো ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলো—এ কথার মানে? চাবুকের চোটে বাড়ীর বজ্জাত দাসী-বাঁদীগুলোকে দুরস্ত ক'রেছি, সে ত তুমি জান; আর আজ পথে বেরিয়ে তিনটে ছেলেকে চাবুক মেরে সহরশুদ্ধ সবাইকে সায়েস্তা করে দিয়েছি। কাজটা কি মন্দ হ'য়েছে?

দাদু বলিলেন—চাবুক ত তুমি নিজের হাতে মারোনি দিদি, হুকুম দিয়েছে নীলাচল। কিন্তু কাজটা কি ঠিক হ'য়েছে? জানো ত, রাজ্যশুদ্ধ লোক তাকে মানতে চায় না, যেহেতু সে বিদেশী। কৌশল ক'রে আমাকে কাজ গুছুতে হচ্ছে। এ-সময় রাজপথে ও রকম হুকুম দেওয়াটা তার পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছে।

নীলা তার বেণীটা দুলিয়ে বললো—অন্যায় হয়নি, ঠিক হ'য়েছে। তুমি কি সেখানে ছিলে, নিজের চোখে কিছু দেখেছিলে যে, এ কথা ব'লছ? আমি নিজে দেখেছি— ছোঁড়াগুলোর শাস্তি দেখে ধাড়ীগুলোর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এর পর আর কেউ আমাদের কথা নিয়ে আলোচনা করবে না—তা ঠিক জেনো।

কথাগুলো শেষ করেই নীলা গম্ভীরভাবে সেখান থেকে চলে গেলো—দাদু আর কিছু বলবার ফুরসৎ পেলেন না। তিনি দুই চক্ষু কপালে তুলে হাঁ-করে রাণী-নাতনীর দিকে চেয়ে রইলেন!

কিন্তু পরদিনই প্রজাদের পক্ষ থেকে রাজসভায় এক আবেদন এসে সভাশুদ্ধ সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিল। আবেদনে পাঁচ হাজার প্রজা তাদের নাম স্বাক্ষর ক'রে জানিয়েছে—তক্তা-ঝোলানোর ব্যাপারে যারা কারাগারে আটক আছে, তাদের মুক্তিদান করা হোক। তক্তায় যে-সব কথা লেখা হ'য়েছিল, সে-সবই তাদের প্রাণের কথা। তখন স্পষ্ট ক'রে জানাতে ভরসা করেনি, কিন্তু এখন তারা সেই লেখাটাই আরো স্পষ্ট ক'রে লিখে জানাচ্ছে—সিংহলী নীলাচলের সঙ্গে বাঙ্গলার রাণীর বিয়ে হ'তে পারে না,—যেহেতু সে বিদেশী, আর অত্যন্ত নিষ্ঠুর। রাজধানীর রাজপথে তিনটি বালকের ওপর নির্ব্বিচারে সে যে অত্যাচার করেছে—আমরা তার বিচার চাই। রাণী নিজে সে অনাচারের সাক্ষী।

এ পর্য্যন্ত রাজসভায় প্রজার তরফ থেকে এ-ধরণের আবেদন আর কখনো আসেনি। মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মা বুঝলেন, তাঁর অতি পেয়ারের নীলাচল মেজাজ দেখাতে কিম্বা রাণীকে খুশী করতে একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে। কিন্তু সভায় সকলের সামনে তিনি চোখ-মুখ রাঙিয়ে রায় দিলেন—এদের দেখছি, মরণ-বাড় বেড়েছে; ভেবেছে—তেজ দেখিয়ে রেহাই পাবে। সব কটাকে ধরে এনে জেলে পুরে এর উত্তর দেব।

কিন্তু মুখের কথাটা আর তিনি কাজে লাগালেন না। তিনি জানতেন, গোড়াতেই নানা গলদ র'য়েছে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে পাছে সাপ ফণা তুলে ছোবল মারে, এই ভয়ে প্রজাদের আবেদনটি তিনি তখন চেপে রাখলেন। পাঁচ হাজার প্রজাকে ধরে-এনে কয়েদ করা ত আর সহজ নয়।

নীলা সে দিন রাজসভায় আসেনি,—দাদুর সঙ্গে কথা-কাটা কাটির পর সে মনে-মনে ঠিক করেছিল—দাদুকে না-বলেই সে এবার এমন একটা কাণ্ড কিছু বাধাবে, যার ফলে কোন লোক রাজবাড়ীর কথা মুখে আনতেও সাহস করবে না; তাই সে নীলাচলের সঙ্গে খুব গোপনে সেই পরামর্শই আঁটছিল।

নীলা জানালো—অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক ক'রেছি, রাজারা যেমন ঘটা ক'রে দিগ্বিজয়ে যেতেন, আমরাও তেমনি মস্ত মিছিল করে দিক্-ভ্রমণে বেরুবো। সহরের বুকের ওপর দিয়ে রাজ্যের অনেক দূর পর্য্যন্ত যাবো। তাতে কি হবে জান? দেশ-ভ্রমণও চলবে, আর সকলে জানবে—দেশের রাণী বিয়ের আগেই ভাবী রাজার সঙ্গে রাজ্য দেখতে বেরিয়েছে। দেখি, কার সাধ্য এতে কোন কথা বলে। কেউ কিছু বললে কিম্বা টিটকিরি দিলে—কালকের মতন সপাসপ চাবুক!

নীলাচল বললো—কাল চাবুক খেয়ে সবাই টিট হ'য়ে গেছে, আর কেউ কিছু বলবে না জেনো!

নীলা দেবী তখনি তার দাদুকে সঙ্কল্পটা জানাতে চললো।

দাদু তখন রাজসভা থেকে সরাসরি প্রাসাদে ফিরে মেয়ের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতে বসেছিলেন। তাঁর মুখে রাজ্যের সেরা-সেরা প্রজাদের আস্পর্দ্ধার কথা শুনে নীলা দেবীর মা বিধবা মহারাণী অঙ্গনা দেবী সভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তা হ'লে এখন উপায় কি বাবা? শুভকর্ম্মের সময় যদি একটা গোলমাল বাধায়, তা হ'লে বিয়ের আমোদ যে সবই মাটী হয়ে যাবে।

মন্ত্রী বললেন—গোল আমি কিছুতেই হ'তে দেব না, যারা গোল তুলেছে, তাদের বোকা বানিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে চাই।

মেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তা হ'লে কি করতে চান আপনি?

মন্ত্রী বললেন—আমার ইচ্ছা এই যে, নীলা আর নীলাচলকে চুপি-চুপি আমাদের রাজ্যের সীমান্তে দেবকোট প্রাসাদে পাঠিয়ে দিই। সেইখানেই এদের বিয়ে হ'য়ে যাক। বিয়ের পর মিছিল ক'রে বর-ক'নে—রাজ্যের রাজা-রাণী রাজধানীতে আসবে। বিয়ে হ'য়ে গেছে শুনলে, আর কেউ গোল বাধাবে না।

নীলা এই সময় দাদুর খোঁজেই মায়ের মহল্লায় আসছিল। আড়াল থেকে দাদুর কথা শুনে সে ফস্ ক'রে সামনে এসে বললো—দাদু, আমরাও ঠিক এই রকমের একটা পরামর্শ এঁটেছি; কিন্তু তার গোড়াটার সঙ্গে তোমার যুক্তির মিল হচ্ছে না।

এক-গাল হেসে দাদু বললেন—তাই বুঝি আজ রাজসভায় যাওয়া হয়নি—দু'টিতে ব'সে খালি গাঁটছড়া বাঁধবারই মতলব ভাঁজছিলে? কিন্তু এখন আমার বুদ্ধি নিয়েই চলতে হবে।

নীলা বললো—বুদ্ধি তোমার দিন-দিন ভোঁতা হ'য়ে যাচ্ছে দাদু, ও বুদ্ধি এখন অচল।

দাদু হেসে উত্তর দিলেন—মিছিল ক'রে বেরুবার ফন্দী কিন্তু এই ঝুনো-মাথা থেকেই বেরিয়েছিল, দিদি!

নীলা মুখ টিপে হেসে বললো—সে কথা সত্যি, কিন্তু তার পরেই যে সেই হারিয়ে ফেলেছ, দাদু! তুমিই বল ত, রাজ্যের রাণী কি চোর, যে চুপি চুপি এক-বাড়ী থেকে আর এক-বাড়ীতে পাড়ি দেবে? এখন আমি কি ঠিক করেছি শোন—

একটু আগে মিছিল করে বেরুবার যে ফন্দী নীলা ঠিক করেছিল, দাদুকে শুনিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললো—তোমার শেষের যুক্তিটি কিন্তু বেশ! আমার মনে ধরেছে। মিছিল ক'রে দেশগুলো ঘুরে শেষকালে তোমার দেবকোটেই যাওয়া যাবে। তার পর—তুমি যা বলেছ, তাই হবে।

মেয়ের কথা শুনে মা হাসিমুখে বাপের গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকালেন। নাতনীর মিছিল করে বেরুবার প্রস্তাবটি দাদুর সত্যই মনে ধরেনি। তাই মুখখানা ভার ক'রে তিনি বললেন—সারা জীবন মাথা খেলিয়ে মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত পাকিয়ে ফেলেছি, দিদি! কত বাধা-বিঘ্ন সরিয়ে তোমাকে যে তোমার বাবার আসনে বসিয়েছি—তুমি তার কিছুই জানো না, জানে তোমার মা। এখনো একবারে যে তুমি নিষ্কণ্টক, সে কথা জোর করে বলা যায় না, পিছনে শত্রু এখনো ঘুরছে। মিছিলের ব্যবস্থা দিয়ে আমিই ভুল করেছিলুম। এ-ভুলের রাস্তায় পা বাড়ালেই পস্তাতে হবে। তাই আমার ইচ্ছা নয়—মিছিল ক'রে তোমরা প্রকাশ্যে রাস্তায় বেরোও।

মুখখানা লাল করে নীলা বললো—এইখানেই তোমার বুদ্ধি ফেঁসে গেছে, দাদু। আমরা যদি এর পর গা-ঢাকা দিই, সবাই ভাববে—আমরা ভয় পেয়ে গেছি। না দাদু, তা হবে না। দেবকোটে যেতে যদি হয়, মিছিল ক'রেই যাবো। আর এতে ভাবনারই বা কি আছে? আমরা ত সেজেগুজেই যাবো, শিক্ষিত সেনাদল সঙ্গে থাকবে, বাছা-বাছা সেনাপতি তাদের চালাবে। সবার ওপরে থাকবে আপনার পেয়ারের শিষ্যটি। দেখবে তখন কেমন মজা হয়, রাজ্যশুদ্ধ সবাই একবারে হকচকিয়ে যাবে।

মা অনেক বুঝালেন, বললেন—দাদু যা বলছেন, তাই কর মা, নিজের জিদ নিয়ে মেতো না।

কিন্তু নীলা কোন কথাতেই কান দিল না। তার সেই এক কথা—চোরের মত আমি দেবকোটে যাব না—কিছুতেই না। দাদু যদি তাঁর জিদই বজায় রাখতে চান, তা হ'লে তিনিই রাজা হয়ে সিংহাসনে বসুন, চোখবুটো। আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চান—আমি সেই দিকেই চলে যাই।

কাজেই নীলার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল; দাদু তার কথায় সায় না দিয়ে পারলেন না।

এর পর অনেক মাথা ঘামিয়ে তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচার ক'রে দিলেন—রাণী নীলা দেবী রাজ্য পরিদর্শন করতে বেরুচ্ছেন। তিনি যেখানে-যেখানে যাবেন, সেখানকার শাসনকর্ত্তা যেন রাণীর যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার জন্য তৎপর থাকেন, নবীনা রাণী যেন তাঁর রাজ্যের প্রজাদের ভক্তি-শ্রদ্ধায় তুষ্ট হ'য়েই রাজধানীতে ফিরে আসেন।

এই ঘোষণায় নীলাচলের নাম-গন্ধও রইল না বটে, কিন্তু মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মন্ত্রী তলে-তলে ঠিক দিয়ে রাখলেন যে, দেবকোটের প্রাসাদে পৌছলেই সেখানে নীলাচলের সঙ্গে নীলার বিয়ের পর্ব্বটা কোন রকমে সেরে ফেলা হবে। বিয়ের পর বর-ক'নে দেবকোট থেকে ফিরে এ'লেই রাজধানীতে বিয়ের উৎসব চলবে।

স্বয়ং রাণী চলেছেন দেশভ্রমণ করতে। সুতরাং তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি শক্তি-সম্পদ-শৃঙ্খলা সব কিছুই জাঁকজমক ক'রে দেখিয়ে রাজ্যের প্রজাদের চোখগুলো ঝলসে দেবার রীতিমত ব্যবস্থাই হ'য়েছে। হাতী-ঘোড়া-উট; গাড়ী-পালকী-চতুর্দ্দোলা; নানা রকম সাজ-সরঞ্জাম আসবাব-পত্র; হাজার-হাজার সুসজ্জিত সেনা; বড়-বড় পদস্থ সেনানী, সেনাপতি; নানা দেশের তুর্লভ বিচিত্র সামগ্রী; নানা বয়সের দাস-দাসী-প্রহরী; বহু রূপসী কিশোরী নর্ত্তকী; বিবিধ রসদ; বহু প্রকার ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্র—এই বিরাট মিছিলের শোভাবর্দ্ধন ক'রেছে। রাণী যেন সমৃদ্ধ রাজধানীটিকে সাজিয়ে সকলকে অবাক ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য, এমন অপূর্ব্ব মিছিল দেখতে এ-দিন আর রাস্তায় মানুষ ভেঙ্গে পড়লো না। দু'ধারের দোকান-পাট প্রায় সবই বন্ধ, রাস্তায় লোক নেই বললেই চলে! রাজধানীর সকল লোক আগে থাকতেই স্থির ক'রে রেখেছে—কোন লোক এ-দিন রাস্তায় বেরুবে না, তার দোকান কোন দোকানী খুলবে না, রাণীর নামে একটি কণ্ঠ থেকেও জয়ধ্বনি উঠবে না। সেইজন্যই রাজধানীর রাস্তাঘাটগুলির এই অবস্থা। যে দু-একখানা দোকান খোলা ছিল বা রাস্তায় দু-চার জন লোককে রাণীর জয়ধ্বনি তুলতে দেখা গিয়েছিল—তারা রাজসরকারের বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের কেউ, অথবা মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মার দলের লোক।

নীলা দেবী এ-দিন চতুর্দ্দোলায় বসে মিছিলের রূপশ্রী ফুটিয়ে তুলেছিল। তারই ঠিক পিছু-পিছু চলেছিল—তাঁর প্রিয় সঙ্গীর সুসজ্জিত হাতী। তার পিঠের বিচিত্র হাওদার ভিতরে রাজবেশে বসেছিল নীলাচল। রাজ্যের রাণী আর ভাবী রাজাটির আশে-পাশে দাঁড়িয়ে পুতুলের মতন সুন্দরী কিঙ্করীরা সসম্ভ্রমে চামর ঢুলাচ্ছিল। এই ভাবে যেতে-যেতেও এদের আলাপের বিরাম ছিল না। প্রথমে দু'জনের মুখেই হাসির ঝলক ছুটছিল, কিন্তু পথের অবস্থা দেখে হাসি ক্রমে মুখেই মিলিয়ে গেল—চাঁদ যেন মেঘের ভেতর অদৃশ্য হ'ল!

নীলাচল মুখখানা ভার ক'রে হঠাৎ বলে উঠলো—দেখছ রাণী, পাজিগুলোর কাণ্ড! পথে কেউ নেই, বাড়ী-ঘর দোকান-পাট সব বন্ধ!

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে নীলা উত্তর দিল—ওরা বোধ হয়, আমাদের মুখ দেখবে না ঠিক ক'রেছে।

নীলাচল ভ্রূকুটি করে বললো—তা হ'লেই বোঝা যাচ্ছে—এরা জলে বাস ক'রে, কুমীরকে তফাতে রাখতে চায়! যার জায়গায় বাস করে, তার সঙ্গেই বিরোধ! তুমি কি ঐ পাজিগুলোর আস্পর্দ্ধা সহ্য করবে, রাণী!

নীলা তার বড়-বড় চোখদুটো মেলে বললো—ওরা যদি না বার হয়—আমরা কি করতে পারি? আমাদের ত কিছু বলেনি!

নীলাচল বললো—এ যে বলার চেয়ে অনেক বেশী! তোমার দাদু ত স্পষ্ট ক'রেই প্রচার করেছিলেন—প্রজারা রাণীর সম্বর্দ্ধনা করবে।—তবে? একে অবাধ্য হওয়া বলে না?

নীলা ব'ললো—কিন্তু মুস্কিল এই, কেউ যে বেরোয় না! আমরা এ-অবস্থায় কি করতে পারি?

নীলাচল এ-কথায় উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠলো—যারা বেরোয়নি তারা আর যাতে বেরুতে না পারে—আমরা যদি তার ব্যবস্থা করি, তা হ'লে এক দণ্ডেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে; কেউ আর ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকবে না।

কথাটা শুনেই নীলার মনে কৌতূহল জাগলো; সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলো—ব্যবস্থাটা কি?

নীলাচল গলার স্বর একটু নীচু ক'রে জানালো—বন্ধ-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। দু'-একখানা বাড়ী যেই জ্বলে উঠবে, অমনি দেখবে—পিল্ পিল্ ক'রে সবাই প্রাণের দায়ে বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছে।

আনন্দে নীলার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কথাটার সমর্থন করতে উৎসাহের স্বরে সে কলকণ্ঠে বললো—খাসা মতলব ত তুমি বার করেছ দেখছি! বাছাধনরা এবার বুঝুক—জলে বাস করতে হ'লে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না,—সরদারকে ডেকে এখুনি চুপি-চুপি বলে দাও,—মোড়ের ঐ ঘরখানা দেখছ, পরদা ফেলে যেন ঘোমটা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ইচ্ছে, আগে ঐখানাতেই—বুঝেছ—

মুখের ও চোখের ভঙ্গিতে শেষের কথাটা সে তার সঙ্গীকে বুঝিয়ে দিল। কালো রঙের একটা তেজী ঘোড়ার পিঠে নীলাচলের হাতীর ঠিক পিছনে 'সরদার' নামে নিষ্ঠুর লোকটি তার জায়গা ক'রে নিয়েছিল। নীলাচলের সঙ্গে ছায়ার মতই সর্ব্বদা সে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে বেখাপ্পা আর বেঁটে-সেঁটে হ'লেও গায়ে তার অসুরের মত জোর, আর নিষ্ঠুরতায় তার জুড়ী নেই বললেই হয়! এই লোকটাই সে-দিন ছেলে তিনটিকে চাবুক-পেটা ক'রেছিল। আজও এরই উপরে এই চরম নিষ্ঠুর কাণ্ডটি বাধাবারও ভার পড়লো। নীলাচল এমন কৌশলে তাকে হুকুমটা জানিয়ে দিল যে, সরদারের অধীন রক্ষীদলটি ছাড়া মিছিলের আর কেউ এ-সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল না।

হঠাৎ চৌমাথার মোড়ে দু'পাশের দু'খানা বাড়ী এক-সঙ্গে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। আগুন দেখেই মিছিলের সমস্ত লোক জোর গলায় চীৎকার তুললো—আগুন লেগেছে—আগুন!

জ্বলন্ত ঘর-দুখানার ভেতর থেকেও ভয়ার্ত্ত স্বর বেরিয়ে এলো—আগুন! আগুন!

সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর লোকগুলা দিশেহারা হ'য়ে চীৎকার করতে-করতে বেরিয়ে আসতে লাগলো। তারা তখন আগুনের মুখ থেকে প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত, বাড়ীর জিনিষপত্রগুলো রক্ষা করবার কোন উপায়ই তখন ছিল না। তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার-স্বরে চেঁচাতে লাগলো। তখন সব বাড়ীর দরজাগুলোই খুলে গেল, লোকজন সব বেরিয়ে এসে জল ঢেলে আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে লাগলো। জনশূন্য রাস্তা তখন বহু লোকে পরিপূর্ণ। আগুন লেগেছে শুনে চার দিক থেকে লোক-জন সাহায্যের জন্য দলে-দলে ছুটে আসছে। রাণীর মিছিলও তখন স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে; কিন্তু এত বড় দুর্ঘটনায় এই বিরাট মিছিলের একটি প্রাণীও সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালো না—সং-এর মত দাঁড়িয়ে এই তামাসা দেখতে লাগলো।

নীলাচল মুচকি হেসে বলে উঠলো—দেখ, কেমন মজা! রাস্তায় লোকের নাম-গন্ধ ছিল না, এখন আর লোক ধরছে না। মানীদের মান রক্ষা হ'লে ভেঙ্গে গেলো। অগ্নি-দেবতার জয় হোক!

অগ্নি-দেবতার প্রতাপে নীলাদেবীর মনেও তখন স্ফুর্ত্তির ছোঁয়াচ লেগেছে, সেও এবার উল্লাসের স্বরে উত্তর দিল—ঠিক কথা। অগ্নি-দেবতাই আমাদের মুখ রেখেছেন, আর পাজীগুলোর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছেন

নীলা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এই সময় ভীড়ের ভেতর থেকে একখানা অপূর্ব্ব মুখ উঁচু হয়ে উঠে অদ্ভুত দৃষ্টির ছটায় তার মুখের কথা পলকে স্তব্ধ ক'রে দিল! মুখখানা তরুণ সাধুর—আগের মিছিলে বেত্রাহত তিনটি ছেলেকে যিনি তাঁর আশ্চর্য্য চিকিৎসায় আরোগ্য করেছিলেন, আর নগরবাসীকে দিয়েছিলেন পথের সন্ধান।

এই সাধু সহসা কেন এলেন, আর এসে কি করলেন, তার পর একই আকৃতির দুই রাজকন্যার দুই রকমের দুঃসাহসিক অভিযানের পরিণাম কি দাঁড়ালো—'মাসিক বসুমতী'র নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে সে সব প'ড়বার জন্য তোমরা প্রস্তুত থাকো।

—গল্পদাদু।

চৈত্র

ভরা চৈত্রের চিত্র-লেখা এ বন,
রূপে-রসে আর রঙে-রঙে মোর ভরিয়া রহিল মন।
ভালবেসেছিনু এই ধরণীরে সে এক চৈত্র মাসে,
পল্লব-দলে ফুলের ফসলে মধুর দখিন-শ্বাসে,
কুঞ্জ ভরিয়া বাসক ফুটেছে কুরচি ভরেছে ডালে,
কনকচাঁপায় নিম-বাবলায় ফুলে ভরে এককালে;
অশথ শিরিষ সোঁদালি দুলিছে শ্যামছায়ে সারা বেলা,
দূর বন-পথে শিমুল পলাশে চলে গুলালের খেলা!
কুসুমিত কাঞ্চন,
গোছা-গোছা রাঙা অশোক করবী হরিল আমার মন!

আলোয় কালোয় ঝিলি-মিলি করে উদার আকাশখানি,
হাওয়া বহে যায় কোণায় কোণায় কি করিয়া কাণাকাণি,
শুকের প্রলাপে ঘুঘু পারাবতে ময়নার নিক্বণে,
পূর্ণ আকাশ কোকিল-কুহরে দুলি উঠে ক্ষণে ক্ষণে;
কি যেন চলিছে কথা,
বুঝিতে পারি না কাণ পেতে থাকি বেড়ে চলে আকুলতা!
মনে হয় যেন ওই স্বরে স্বর মোরও মিলাবার আছে,
কি কথা যেন এ অন্তরে ভরা বলিবারে কারো কাছে;
যত বুঝি না কো তত ভাল লাগে অবুঝ একাকী থাকি,
এই সে চৈত্‌ বেদনানন্দ মনে দিয়ে গেল আঁকি!

ভালবাসি এই চিন্ময় অবকাশ,
বারো মাস ভরি যে আশা পোষিয়া ফেলিনু যে নিশ্বাস;
যে গান গাহিতে করিনু প্রয়াস বাণী এল নাকো মনে,
যে হাসি হাসিতে আধেক বিকশি ঝরিল নয়ন-কোণে;
ফুটাইতে ফুল ঝরানু মুকুল তাই দিয়ে গাথি মালা,
কে কোথা মিশালো একটুকু হাসি তাই দিয়ে ভরি ডালা;
আজি অবকাশ হিসাব-নিকাশ তারি গাঁথি ক্ষণে-ক্ষণে,
সুর বেঁধে রাখে একটি ভ্রমর সুগভীর গুঞ্জনে।
দুর্লভ অবকাশ,
গানে ও গন্ধে চির চেনা হোল এই চৈত্রের মাস!

শ্রীগোপাললাল দে।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

জার্ম্মাণীর বসন্তকালীন অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্ব্বত্র একই সময় সে তৎপর হইয়াছে। এদিকে বৃটিশ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ইটালীর সাম্রাজ্য-সৌধের ভিত্তি প্রকম্পিত হইয়াছে; এই নাতিবৃহৎ সৌধটি হয় ত পতনোন্মুখ। বৃটেনের আটলাণ্টিক-পারের জ্ঞাতিরাষ্ট্রটি ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদকে জয়যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া বৃটেনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছে; তাহাকে এখন ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলাও অত্যুক্তি নহে। প্রতীচ্যর বিরাট নরমেধ-যজ্ঞের ধূম প্রাচীর রাজনৈতিক গগন ক্রমেই আচ্ছন্ন করিতেছে, তথায় অগ্নিকোণে একখানি কৃষ্ণমেঘ ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া উঠিতেছে; হয় ত প্রাচীতেও ঝঞ্ঝা আসন্ন।

আটলাণ্টিকে যুদ্ধ—

হিটলার পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বসন্তকালে জার্ম্মাণীর সাবমেরিণগুলি বিশেষ ভাবে তৎপর হইবে; তাঁহার এই ঘোষণা অনুযায়ী আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে জার্ম্মাণী প্রাণপণ শক্তিতে বৃটিশের কণ্ঠরোধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। স্থলভাগে এখনও জার্ম্মাণরা বৃটিশের নাগাল পায় নাই; ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করিয়া বৃটেনে রণক্ষেত্র বিস্তারের সুযোগ তাহারা কিছুতেই পাইতেছে না। তাই, এক সময় জার্ম্মাণ-সম্রাট্ কৈসার যেমন বলিয়াছিলেন,—We will starve the British people till they kneel and plead for peace (নতজানু হইয়া সন্ধিপ্রার্থী না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বৃটিশ জাতিকে উপবাসে রাখিব), সেইরূপ হিটলারও আজ বৃটিশ জাতিকে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত করিবার আশায় সমুদ্রবক্ষে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, বৃটেনকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে বঞ্চিত করাও জার্ম্মাণীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। হিটলার বুঝিয়াছেন, আর বিলম্ব করিবার সময় নাই—Now or never. যে কোন উপায়ে হউক, এই বৎসরের মধ্যেই যদি বৃটেনকে পর্য্যুদস্ত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তাহা আর সম্ভব হইবে না; মার্কিনী সমরোপকরণ তখন বৃটেনকে অজেয় করিবে। তাই, কেবল জার্ম্মাণীর বহুসংখ্যক সাবমেরিণ নহে,—'স্নার্ণহর্ষ্ট' এবং 'নীসেনউ নামক তাহার দুইখানি ২৬ হাজার টনের ব্যাট্‌ল-ক্রুজারও আটলাণ্টিকে বিচরণ করিতেছে। এই সকল সাবমেরিণ ও রণতরীর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিয়মিত সংবাদ আমরা পাই না। তবে বৃটিশ-জাহাজের ক্ষতির যে সাপ্তাহিক বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। ১লা এপ্রিল বৃটিশ নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ৫৯ হাজার ১ শত ৪৬ টনের ১৭খানি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে, জার্ম্মাণরা ঐ সপ্তাহে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টনের জাহাজ ডুবাইয়াছে বলিয়া দাবী করে; ইটালী ঐ সপ্তাহে ১০ হাজার টনের জাহাজ নিমজ্জনের দাবী করিয়াছে।

বর্ত্তমানে আটলাণ্টিকে যুদ্ধ-পরিচালন সম্পর্কে জার্ম্মাণী যে ভৌগলিক ও সামরিক সুবিধা সম্ভোগ করিতেছে, তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আটলাণ্টিক-বিধৌত নরওয়ে ও ফ্রান্সের উপকূল এখন জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত। উত্তর অঞ্চলে বৃটেন তাহার ফারো দ্বীপপুঞ্জ ও আইসল্যাণ্ডস্থিত ঘাঁটী হইতে জার্ম্মাণীর আক্রমণ প্রতিরোধের কিছু সুবিধা পাইতেছে। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে তাহার এইরূপ কোন সুবিধা নাই। প্রথমে বিমান হইতে বৃটিশ-জাহাজের গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়া পরে সাবমেরিণের আক্রমণে জার্ম্মাণী জাহাজ ধ্বংস করিতে পারিতেছে। উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটেন যেমন প্রধানতঃ স্থলসৈন্য ও নৌবাহিনীর ঘনিষ্ঠ সহযোগে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তেমনই আটলাণ্টিকের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর বিমান ও সাবমেরিণের সহযোগই তাহার সাফল্যের প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—বৃটেনের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের বন্দরগুলিতে জাহাজ প্রবেশ একপ্রকার অসম্ভব। এই সকল অঞ্চল প্রায় প্রতি দিন জার্ম্মাণীর বোমাবর্ষী-বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছে। এই জন্য আয়র্লণ্ডের উত্তর দিক হইতে বৃটেনের পশ্চিম অঞ্চলের বন্দরগুলিতে প্রবেশ করিবার জন্য বৃটিশ জাহাজগুলি ভিড় করিতেছে। এখানে ক্লাইড, মার্সি অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে জার্ম্মাণীর প্রবল বিমান আক্রমণ চলিতেছে; তাহার সাবমেরিণ-গুলিও ঐ অঞ্চলে তৎপর। আয়রের নিরপেক্ষতার জন্য বৃটেন এখানে জার্ম্মাণীর আক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়োজনানুরূপ সুবিধা পাইতেছে না।

অন্তরীক্ষে আক্রমণ—

আটলাণ্টিকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণী বিমান-যোগেও বৃটেনে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। শ্রমশিল্পকেন্দ্র, জাহাজ-নির্ম্মাণের ইয়ার্ড, বন্দর প্রভৃতি ব্যতীত রাজধানী লণ্ডনেও যথেচ্ছা বোমা-বর্ষণ চলিতেছে। বৃটেনের অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ-সাধনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রবক্ষে জার্ম্মাণীর যে বিরাট উদ্যম দেখা দিয়াছে, প্রথমোক্ত স্থানসমূহে বোমা-বর্ষণ সেই উদ্যমেরই অঙ্গবিশেষ। রাজধানী লণ্ডন ধ্বংস করিয়া জার্ম্মাণী বৃটিশ জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড চূর্ণ করিতে চাহে। সংক্ষেপে, অনাহারে ও উৎপীড়নে এবং আতঙ্কসৃষ্টির দ্বারা বৃটিশ জাতিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার স্বপ্নই জার্ম্মাণী দেখিতেছে। সে হয় ত মনে করে, জলে ও অন্তরীক্ষে তাহার আক্রমণের ফলে যেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে বৃটিশ জাতি উদরপূর্ত্তির উপযোগী আহার পাইবে না. এবং এই অপর্য্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রীও শান্তিতে উদরস্থ করিবার সুযোগ তাহার মিলিবে না। যে বৃটিশ জাতির বহু শতাব্দী চরম সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়াছে, ভূনিম্নস্থ অন্ধকার-গহ্বরে তাহারা যদি কিছুকাল শুষ্ক রুটী চিবাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা যে আত্মসমর্পণে

বাধ্য হইবেই, ইহাই হয় ত জার্ম্মাণ সেনানায়কদিগের নিশ্চিত বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আবহাওয়ার অবস্থা জার্ম্মাণীকে আশানুরূপ বিমান-আক্রমণ চালাইতে দিতেছে না। মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যে সেরূপ প্রবল ভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার বেগ কেবল প্রশমিত হয় নাই; সময় সময় সপ্তাহাধিক কাল জার্ম্মাণ বিমানগুলিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় দেখা যাইতেছে।

বৃটেনকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য—

গত ১৫ই মার্চ্চ জেনারল স্মাটস্ কেপ্‌টাউনে এক বেতার-বক্তৃতায় বলেন, হিট্‌লার কেবল বৃটিশ কমনওয়েল্‌থের সহিতই যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিতও তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধ যথারীতি ঘোষিত না হইলেও উহার বাস্তবতা ও ভীষণতা অল্প নহে...an undeclared war but a no less real and grim war. ঐ দিনই সন্ধ্যায় ওয়াসিংটনে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বেতার-বক্তৃতায় জেনারল স্মাটসের উক্তির সত্যতা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুদ্ধসম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ না বলিয়া বৃটেনের অনুকূলে যুদ্ধ-বিরত বলা চলিত। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই বক্তৃতা শ্রবণের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলাও হয় ত অসঙ্গত নহে। নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে সৈন্য-প্রেরণের কথাই কেবল এই বক্তৃতায় নাই; মার্কিণী সৈন্য ব্যতীত যুদ্ধ-পরিচালনায় অন্য যাহা-কিছু প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে নাজি-ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবার প্রতিশ্রুতিও এই বক্তৃতায় আছে। এই বক্তৃতা হইতে ইহাও বুঝা গিয়াছে যে, মার্কিণী সরকারের বর্ত্তমান নীতি এবং নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে যথারীতি যুদ্ধ-ঘোষণা—এতদুভয়ে যে সামান্য পার্থক্য, প্রয়োজন হইলে, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যেই দূরীভূত হইতে পারে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেন এবং অন্যান্য ফ্যাসিষ্টবিরোধী শক্তিকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে ইজারা ও ঋণদান বিল গৃহীত হইয়াছিল, সেই বিলের বিধান অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে মার্কিণী রাজকোষ হইতে ৭ শত কোটি ডলার ব্যয় করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই অর্থের দ্বারা সাহায্যের উপকরণগুলি প্রস্তুতের ব্যবস্থাও ইতোমধ্যে করা হইয়াছে।

ইজারা ও ঋণদান বিলের বিধান অনুযায়ী পর্য্যাপ্ত সাহায্য বৃটেনে পৌঁছিতে এখনও সাত-আট মাস বিলম্ব হইবে। এই কয়েক মাসে যদি বৃটেন্ জার্ম্মাণীর আক্রমণে বিধ্বস্ত না হয়, অর্থনৈতিক অবরোধ যদি তাহাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য না করে, তাহা হইলে আগামী শীতকালে বৃটেন্ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। এই জন্যই জার্ম্মাণী আগামী শীতের পূর্ব্বে যুদ্ধের চরম জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণে প্রয়াসী হইয়াছে।

গত ১৮ই মার্চ্চ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল লণ্ডনে এক ভোজসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "The Battle of Atlantic must be won in a decisive manner if the declared policies of the Government and the people of the United States are not to be forcibly frustrated. অর্থাৎ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের এবং ঐ দেশের অধিবাসীর বিঘোষিত নীতির সাফল্যের জন্য আটলাণ্টিকের যুদ্ধে সুনিশ্চিত বিজয়লাভ একান্ত প্রয়োজন। এই ভোজসভায় লণ্ডনে নব-নিযুক্ত মার্কিণী দূত মিঃ উইন্যাণ্ট উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে মিঃ চার্চ্চিলের উল্লিখিত উক্তি হইতে মনে হয়, তিনি আটলাণ্টিকের যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য মার্কিণ সরকার ও মার্কিণী জনসাধারণের নিকট প্রকারান্তরে আবেদন জানাইতেছিলেন। তাঁহার এই আবেদনে অবিলম্বে কর্ণপাত করা হইয়াছে বলিয়াও মনে হয়। ইতোমধ্যে বৃটেনকে প্রদত্ত সাহায্য মার্কিণ নৌবহরের রক্ষণাধীনে প্রেরণের কথা হইতেছে; বৃটেন্‌কে অবিলম্বে ৫০খানি বাণিজ্য-জাহাজ প্রদানের ব্যবস্থাও হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, ইজারা ও ঋণদান বিলের বিধান অনুসারী বৃটেনে প্রচুর সাহায্য প্রেরণ সম্ভব হইবার পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব সমরোপকরণ হইতে বৃটেন্‌কে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মার্চ্চ মাসের শেষে মার্কিণী সরকার তাহাদিগের বিভিন্ন বন্দরে অবস্থিত জার্ম্মাণী ও ইটালীর ৫৯খানি বাণিজ্য-জাহাজ আটক করিয়াছেন। কোন দেশের বন্দরে অবস্থিত বৈদেশিক জাহাজ যদি আত্মনিমজ্জনে উদ্যত হয়, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক বিধান অনুসারে ঐ সকল জাহাজ আটক করা যাইতে পারে। মার্কিণী সরকার অকস্মাৎ এই আইন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হইয়াছেন; এই আইনের বলেই ঐ সকল জাহাজ আটক করা হইয়াছে। এই জাহাজ আটকের আইনগত কারণ যাহাই হউক না কেন, এই বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ সম্পর্কিত চাঞ্চল্য প্রশমিত হইলে এই সকল জাহাজের দ্বারা বৃটেনের উপকৃত হওয়া অসম্ভব নহে।

জার্ম্মাণীর বল্‌কান্ অভিযান—

গত ৩রা মার্চ্চ বুল্‌গেরিয়া ত্রিশক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পর স্বভাবতঃ জার্ম্মাণীর দৃষ্টি যুগোশ্লোভিয়ার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। তিন সপ্তাহ আলোচনার পর ২৫শে মার্চ্চ যুগোশ্লোভিয়ার তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মঃ স্বেৎকোভিচ্, ভিয়েনায় আগমন করিয়া ত্রিশক্তির চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব ভন রিবেনট্রপ এই মর্ম্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, যুগোশ্লোভিয়ার সার্ব্বভৌমত্ব অথবা তাহার রাজ্যগত অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করিবার কোন দুরভিসন্ধি জার্ম্মাণীর নাই; যুদ্ধকালে যুগোশ্লোভিয়ার মধ্য দিয়া সৈন্য পরিচালনের দাবীও সে করিবে না।

স্বেৎকোভিচ-মন্ত্রিসভা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণীর আশ্রয়াধীন হওয়ার বিরুদ্ধে সমগ্র যুগোশ্লোভিয়ায় প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। ২৭শে মার্চ্চ প্রত্যূষে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে; ঐ সময় সামরিক নেতৃবৃন্দ কৌশলে ক্ষমতা লাভ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিগণকে গ্রেপ্তার করেন। বালক রাজা পিটারের অভিভাবক—প্রতিনিধিনৃপ প্রিন্স পল রাজ্য ত্যাগ করেন; রাজা পিটারকে সিংহাসনে বসাইয়া সামরিক নেতা জেনারেল সিমোভিচের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়।

সিমোভিচ-মন্ত্রিসভা যে জার্ম্মাণ-বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন, ইহা জানিয়াও জার্ম্মাণী তাহাদিগের সহিত আলোচনায় ১০ দিন অতিবাহিত করিয়াছিল। এই সময় সে যুগোশ্লোভিয়াকে আক্রমণের

প্রাথমিক আয়োজন সমাপ্ত করে। তাহার পর, ৬ই এপ্রিল প্রাতে সে একই সময় গ্রীস ও যুগোশ্লোভিয়া আক্রমণ করিয়াছে। যুগোশ্লোভিয়াও জার্ম্মাণীর সম্ভাবিত আক্রমণের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইয়াছিল। বৃটেন্ সর্ব্বতোভাবে যুগোশ্লোভিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়; সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে এক পক্ষে গ্রীস, যুগোশ্লোভিয়া ও বৃটেন এবং অন্যপক্ষে জার্ম্মাণী ও ইটালী ব্যাপক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইটালী এই সম্পর্কে মনস্থির করিতে বিলম্ব করিয়াছিল; কারণ, আলবেনিয়ার উত্তর ও পূর্ব্বে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইটালীর অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত ইটালীও যুগোশ্লোভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে।

এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিবার সময় হয় নাই। যুগোশ্লোভিয়া ও গ্রীসের ন্যায় পার্ব্বত্য দেশে তড়িৎগতি অভিযান (blitzkrieg) সম্ভব নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু গত বৎসর নরওয়ের ন্যায় পার্ব্বত্য দেশেও জার্ম্মাণী দ্রুত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। জার্ম্মাণ-বাহিনী ইতোমধ্যে যুগোশ্লোভিয়ার সর্ব্বপ্রধান বহির্গমন-পথ গ্রীসের বন্দর স্যালোনিকা এবং মধ্য-যুগোশ্লোভিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্কপ্‌লজ্ অধিকার করিয়াছে। আল্‌বেনিয়াতে বিমানের সাহায্যে জার্ম্মাণ বাহিনী অবতরণ করিয়াছে। যুগোশ্লোভিয়ায় বৃটেনের সাহায্য পৌঁছিবার সম্ভাবনা এখন বিদূরিত হইল—বলা যাইতে পারে; গ্রীস ও যুগোশ্লোভিয়ার সংযোগও বিচ্ছিন্ন। কাজেই, যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অনুকূল নহে। অদূর-ভবিষ্যতে চরম দুঃসংবাদ কর্ণগোচর হইতেও পারে।

যুগোশ্লোভিয়া আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে সোভিয়েট-রুশিয়ার সহিত তাহার অনাক্রমণাত্মক-চুক্তি হইয়াছিল। এই চুক্তির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যুগোশ্লোভিয়ার বিরুদ্ধে সোভিয়েট-রুশিয়ার কোন বিদ্বেষ নাই, তাহার বিপদের সময় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রটি তাহাকে আঘাত করিবে না—এই প্রতিশ্রুতি ব্যতীত এই চুক্তির আর কি গুরুত্ব থাকিতে পারে? সোভিয়েট-রুশিয়া জার্ম্মাণীর সহিত একযোগে যুগোশ্লোভিয়াকে আক্রমণ করিবে—এইরূপ সম্ভাবনা কখনও ঘটে নাই; কাজেই, এই চুক্তির দ্বারা যুগোশ্লোভিয়ার এমন কি অপ্রত্যাশিত কল্যাণ সাধিত হইল? তবে, যুগোশ্লোভিয়ার সিমোভিচ্-মন্ত্রিসভাকে ঐ দেশের বৈধ-সরকার বলিয়া স্বীকার করিয়া এবং তাঁহাদিগের সহিত অনাক্রমণাত্মক-চুক্তি করিয়া সোভিয়েট-রুশিয়া যুগোশ্লোভিয়ার জার্ম্মাণ-বিরোধী নীতিতে ও জার্ম্মাণীর সহিত তাহার যুদ্ধে নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করিল। ইহা হইতে সোভিয়েট-রুশিয়ার মনোভাব সম্বন্ধে এই অনুমানই দৃঢ় হয় যে, বল্‌কানে জার্ম্মাণীর অবাধ প্রসারে সে সন্তুষ্ট নহে। দার্দ্দানেলিজ ও বস্‌ফোরাস্ প্রণালীর দিকে জার্ম্মাণীর অগ্রগতিতে সে অসন্তুষ্ট হইবে। ইতঃপূর্ব্বে তুরস্ককে অনাক্রমণ সম্পর্কিত আশ্বাস দিয়া সে তুর্কি সোভিয়েট অনাক্রমণাত্মক-চুক্তি ঝালাইয়া লইয়াছে। তাহার এই সকল কার্য্য হয় ত বস্‌ফোরাস্-দার্দ্দানেলিজ সম্পর্কে তাহার উৎকণ্ঠার দ্যোতক। যুগোশ্লোভিয়া ও গ্রীস আক্রান্ত হওয়ায় তুরস্ক যে উৎকণ্ঠিত হইয়া অস্ত্র ধারণ করে নাই, ইহা জার্ম্মাণীর পক্ষে স্বস্তিকর, কারণ তুরস্ককে জার্ম্মাণীর পক্ষে প্রবল ভাবে আঘাত করাও দুষ্কর; জার্ম্মাণ-বাহিনী মর্ম্মর সাগরের তীরে পৌঁছিলেই উহাতে সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তি হইবে।



প্রফুল্লচিত্তে এই সকল গ্রীক্ সৈন্য রণক্ষেত্রে গমন করিতেছে

তুরস্ক নিরপেক্ষ থাকায় এবং জার্ম্মাণীর সম্ভাবিত আক্রমণ প্রতিরোধে তাহার দৃঢ়তায় আনাটোলিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া ইরাক-মণ্ডলের তৈলখনিতে জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব বিস্তারের সম্ভাবনা আপাততঃ আর নাই কিন্তু ঈজিয়ান সাগরের তীরে অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইলে জার্ম্মাণী ঐ সাগর অতিক্রম করিয়া সিরিয়ায় পৌঁছিতে প্রয়াস করিবে কি না, তাহা বলা যায় না। অবশ্য বৃটেনের প্রবল নৌশক্তি উপেক্ষা করিয়া সাইপ্রাসের বৃটিশ ঘাঁটির পার্শ্ব দিয়া জার্ম্মাণীর পক্ষে সিরিয়ায় সৈন্য অবতরণ করাইবার প্রয়াস, তাহার ইংলিস প্রণালী অতিক্রমণের ন্যায়ই অত্যন্ত দুরূহ—হয় ত অসম্ভব।

বেঙ্গাজী ত্যাগ—

গত ৪ঠা এপ্রিল অকস্মাৎ ঘোষিত হয় যে, ইটালীয়-জার্ম্মাণ-বাহিনীর প্রবল আক্রমণে বৃটিশ বাহিনী লিবিয়ার সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটি ও সাইরেনেইকা প্রদেশের রাজধানী বেঙ্গাজী ত্যাগে বাধ্য হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সিসিলি দ্বীপে জার্ম্মাণীর বিমানবহর আগমন করিয়াছিল; তাহারা বৃটিশ নৌ-বাহিনী-কণ্টকিত ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করিয়া লিবিয়ায় সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণে সহায়তা করিতেছিল। তাহাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে; প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ লিবিয়ায় পৌঁছিয়াছে। উত্তর

আফ্রিকায় যুদ্ধ-পরিচালনার ভারও জার্ম্মাণ সেনানায়কগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির বাহিনী আলেক্জান্দ্রিয়া ও সুয়েজ লক্ষ্য করিয়া লিবিয়া হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হস্তচ্যুত হইয়াছে; এরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারা বৃটিশ-বাহিনী অধিকার করিয়াছে, তাহারা উত্তর দিক হইতে আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিয়া আডোয়া অধিকার করিয়াছে, ডায়ারডাওয়া হইতে একটি বৃটিশ-বাহিনী আওয়াস নদী অতিক্রম করিয়া আবিসিনিয়ার রাজধানী



দুই মাস পরে এই সকল অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য গুরুভার-ট্যাঙ্কের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া উত্তর-আফ্রিকায় অগ্রসর হইয়াছিল

হইতেছিল। একই সময় পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ ও উত্তর উপকূলে ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ববিস্তার তৎকালীন নাজী-ফ্যাসিষ্ট সমর-পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ ছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারেই অক্টোবর মাসের শেষে ইটালী গ্রীস আক্রমণ করে। গত ডিসেম্বর মাসের পরে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। এখন একই সময় উত্তর-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে তৎপর হইয়া জার্ম্মাণী সেই ছিন্ন সূত্র যোজনা করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

আপাততঃ, বেঙ্গাজী অধিকারে নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয় উত্তর আফ্রিকায় একটি সুবৃহৎ ঘাঁটি লাভ করিল। বেঙ্গাজীর ভৌগোলিক অবস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; বেঙ্গাজীর বিমান-ঘাঁটি হইতে জার্ম্মাণী সমগ্র গ্রীসে ও তাহার অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জে বিমান-আক্রমণ চালাইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত, উত্তর-আফ্রিকায় জার্ম্মাণীর এই তৎপরতা পরোক্ষে তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপ-সম্পর্কিত অভিসন্ধি সিদ্ধির সহায়ক হইতে পারে। লিবিয়ায় যদি সুসজ্জিত ইটালীয়-জার্ম্মাণ বাহিনীর পূর্ব্বাভিমুখী প্রবল অভিযানের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আফ্রিকা হইতে বৃটিশের সমরায়োজন প্রত্যাহার করিয়া উহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে নিয়ুক্ত করা সম্ভব হইবে না।

পূর্ব্ব-আফ্রিকা—

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনীর নিকট ইটালীয়গণ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইতেছে। বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড ইটালীয়দিগের

আদ্দিস-আবাবার নিকটবর্ত্তী হয়। ৭ই এপ্রিল বৃটিশ-বাহিনীর আদ্দিস-আবাবা অধিকারের সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এরিত্রিয়ার লোহিত সাগরস্থিত মাসোয়া বন্দর বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।



এরিত্রিয়ায় বনমধ্যে এই সকল ভারতীয় সৈন্য পর্য্যবেক্ষণে বহির্গত হইয়াছে

আফ্রিকায় ইটালীয়দিগের পরাজয়ের প্রধান কারণ—তাহারা তথায় মাতৃভূমির সহিত বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। জলপথে অথবা স্থলপথে এই সকল সেনাবাহিনীর সহিত ইটালীর সংযোগ নাই। প্রয়োজনানুসারে বৃটিশ-বাহিনীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাদিগের সমরোপকরণের পরিমাণও বাড়িতেছে। কিন্তু ইটালীয়-বাহিনী এই সকল সুবিধায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

উত্তর-আফ্রিকায় জার্ম্মাণ-বাহিনী প্রচুর সমরোপকরণ লইয়া প্রবল আক্রমণ করিতেছে, তাহার ফলে পূর্ব্ব-আফ্রিকার কিছু বৃটিশ সৈন্য উত্তরে নিয়োজিত হওয়ায় এই অঞ্চলে ইটালীয়দিগের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে। আফ্রিকায় প্রধানতঃ বৃটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সৈন্য যুদ্ধে রত। প্রাচীতে যেরূপ রাজনীতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এখন প্রাচ্য হইতে প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ আফ্রিকায় প্রেরণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। তবে ইতোমধ্যে পূর্ব্ব-আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অঞ্চলগুলি বৃটেনের হস্তগত হওয়ায় ইটালীর পক্ষে স্বীয় অবস্থার উন্নতিসাধন আর সম্ভব হইবে কি না, বলা যায় না। উত্তর-আফ্রিকা অথবা ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে পূর্ব্ব-আফ্রিকার ইটালীয় বাহিনীর সহিত য়ুরোপের সংযোগ যদি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে এই অঞ্চলে ইটালীর হৃত ভূভাগ উদ্ধারের কোন আশাই নাই।



সুদান সীমান্তে পর্য্যবেক্ষণরত উষ্ট্রবাহী সৈন্য

সুদূর প্রাচীতে আসন্ন সঙ্কট—

জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকা য়ুরোপ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি মস্কো, বার্লিন ও রোম পরিদর্শন শেষ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। মিঃ মাৎসুয়োকার য়ুরোপ-গমন গভীর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। য়ুরোপীয় যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ই তাঁহার য়ুরোপ-গমনের প্রকৃত কারণ; তাঁহার এই অভিজ্ঞতা অনুযায়ীই জাপানের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

জাপান যদি সত্যই বাহুবলে স্বীয় রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আধিপত্য বিস্তারের কল্পনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে ও মালয় উপদ্বীপে জাপানের প্রভুত্ববিস্তারে বৃটেন্ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাদিগের মধ্যে বৃটেন্ এখন অত্যন্ত বিব্রত. আগামী শীতকালে প্রচুর মার্কিণ সাহায্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে তাহার অবস্থা উৎসাহজনক হইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আট্‌লান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর রক্ষার উপযোগী নৌবহর গঠনের যে বিরাট পরি কল্পনা রচনা করিয়াছে, তাহা কার্য্যকরী হইতে এখনও বিলম্ব আছে কাজেই জার্ম্মাণীর ন্যায় জাপানের অবস্থাও 'Now or never!'

অনেক সময় চীনা-যুদ্ধে প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে; কেহ কেহ মনে করেন যে, চীনাদিগের দ্বারা জাপান এতদূর বিব্রত যে, তাহার পক্ষে অন্যত্র মনোযোগী হওয়া অসম্ভব। চীন-যুদ্ধ যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী দুরাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, ইহা সত্য; কিন্তু সে বিঘ্ন অনতিক্রমণীয় নহে। যে রাজ্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশগুলি অধিকৃত হইয়াছে, যে দেশের বিঘ্নসঙ্কুল দুর্গম পার্ব্বত্য পথই বহির্জ্জগতের সহিত তাহার একমাত্র সংযোগসূত্র, তাহার জন্য জাপানের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর শক্তির বিশেষ দুর্ভাবনার কারণ নাই। শুধু তাহাই নহে, বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন চীনের বিশেষ সমর্থক; দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগর ও মালয় উপদ্বীপে প্রভুত্ব-বিস্তৃতির প্রয়াসে জাপানকে এই দুইটি শক্তিরই সম্মুখীন হইতে হইবে। জাপান মনে করিতে পারে যে, তাহার সাম্রাজ্যগত দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য এই দুইটি শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিলেই তাহাদিগের নিকট হইতে চীনের সাহায্যপ্রাপ্তি বন্ধ করা সহজ হইবে। জাপানের সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষা প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃটেন জাপানের শত্রু-রাষ্ট্রে পরিণত হইলে জাপান অবিলম্বে ব্রহ্মদেশে অধিকার-বিস্তারের প্রয়াস করিবে। ইহার কারণ, ব্রহ্ম-চীন পথ অবরুদ্ধ হইলে চুংকিং সরকার অত্যন্ত বিপন্ন হইবেন। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মদেশের চাউল, তৈল ও অন্যান্য অশোধিত খনিজ পদার্থ জাপানের প্রলোভনের বস্তু।

জাপান যদি সত্যই এই সুযোগে তাহার সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী ও ইটালীর মিত্রশক্তিরূপে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়, তাহা হইলে সে প্রাচ্য বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে বৃটেনের সমরোপকরণ লাভে বিঘ্ন ঘটাইতে যথাশক্তি প্রয়াস করিবে। তাহার নৌবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে তৎপর হইবে; বৃটিশ সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ঐ সকল দেশের সমরোপকরণের কারখানা, বন্দর, রেলষ্টেশন প্রভৃতিতে জাপানী বিমান বোমা-বর্ষণ করিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ইন্দো-চীনের উত্তরে জাপান যে বিমান-ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে, সেখান হইতে ব্রহ্মদেশ, আসাম—এমন কি, বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানেও বোমা-বর্ষণ সম্ভব। বৃটেন ইতোমধ্যে জাপানের সম্ভাবিত আক্রমণ-প্রচেষ্টা প্রতিরোধের জন্য

মালয় উপদ্বীপে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, সিঙ্গাপুর ঘাঁটী অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। স্থলপথে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইলে জাপানকে দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইবে; সিঙ্গাপুর আক্রমণ-পরিচালনের জন্য ইন্দো-চীন ও শ্যামের মধ্য দিয়া স্থলপথ ব্যবহার, এবং এই দুইটি দেশের উপকূলে কোথাও ঘাঁটী স্থাপন জাপানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কতদূর সহায়ক হইবে, তাহা বলিবার সময় ইহা নহে। জাপানের সমর-প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ ফলাফল যাহাই হউক না কেন, যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবামাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমরায়োজন পঙ্গু করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, সেনাবাহী বিমানের সাহায্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অরক্ষিত অঞ্চলে সৈন্য অবতরণ করাইয়া আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা হওয়াও অসম্ভব নহে।

অবশ্য মিঃ মাৎসুয়োকা য়ুরোপ হইতে যে অভিজ্ঞতা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহার উপরেই জাপানের ভবিষ্যৎ গতিবিধি বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। তিনি যদি বুঝেন যে, আগামী শীতের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী বৃটেনকে প্রবল আঘাত করিতে সমর্থ হইবে এবং তিনি যদি মস্কোয় সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে জাপানের নিরাপত্তার আশ্বাস পান, তাহা হইলেই জাপানের পক্ষে আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব।

গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-জার্ম্মাণ অনাক্রমণাত্মক চুক্তি যেমন য়ুরোপে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তেমনই সোভিয়েট-জাপান অনাক্রমণাত্মক চুক্তি সুদূর প্রাচ্যে ভীষণ সমর-বহ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারে। সোভিয়েট রুশিয়া জাপান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে ব্যাপৃত দেখিলে সন্তুষ্ট হইবে; বিশ্বের সমস্ত প্রধান ধনিক-শাসিত রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেই তাহার আনন্দ। ইহাদিগের আত্মঘাতী সংগ্রামের সুযোগে সর্ব্বত্র কম্যুনিজমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার স্বপ্নই সে দেখিতেছে। কাজেই, জাপানের সহিত অনাক্রমণাত্মক চুক্তি করিয়া তাহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সুযোগ দেওয়া সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—চুং কিং সরকার কম্যুনিষ্টদিগের সহিত বিশেষ সদ্ভাবসম্পন্ন নহেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন "চতুর্থ রুট আর্ম্মি" নামক কম্যুনিষ্ট-বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তখন উহা স্থানবিশেষের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু ৯ই মার্চ্চ চীনের 'ন্যাশন্যাল পিপলস্ কাউন্সিলে' মার্শাল চিয়াং কাই-সেক্ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমগ্র কম্যুনিষ্ট-বাহিনীর সহিত চুং কিং সরকারের অসদ্ভাব চলিতেছে না। এই বক্তৃতায় মার্শাল চিয়াং অভিযোগ করিয়াছেন যে, জাতীয় দুর্দ্দিনের সুযোগে কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্র-ক্ষমতা লাভের প্রয়াস করিতেছে—Marshall Chiang Kai-shek accuses the Communists of using national crisis for establishing a private army with the object of threatening the Government for fighting Japan and of attempting political control of the country.

এক পক্ষের উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝা দুষ্কর; কম্যুনিষ্টরা শেষ পর্য্যন্ত যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকারে প্রয়াসী হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু বৈদেশিক শত্রু পরাভূত হইবার পূর্ব্বে তাহারা যে এইরূপ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইবে—ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, কম্যুনিষ্টদিগের সহিত চুং কিং সরকারের যে অসদ্ভাব চলিতেছে, ইহা সুস্পষ্ট। চীনের আভ্যন্তরীণ বিরোধে কোন ধনিকশাসিত রাষ্ট্রের গোপন হস্ত কার্য্য করিতেছে কি না, তাহা বলা যায় না; যে সকল ধনিক-শাসিত রাষ্ট্র চীনকে বিজয়ী দেখিতে চায়, তাহারা চীনে কম্যুনিষ্ট-প্রভাবে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে না। কম্যুনিষ্ট-শাসিত চীন, আর জাপানের অধিকারভুক্ত চীন কার্য্যতঃ তাহাদিগের নিকট অভিন্ন; কারণ, এতদুভয়ের যে কোন অবস্থাতেই তাহাদিগের সুদূর প্রাচীর স্বার্থ বিপন্ন হইবে। যে কারণেই হউক, কম্যুনিষ্টদিগের সহিত চুং কিং সরকারের এই যে বিরোধ, ইহার ফলে সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে চীনের সাহায্য-প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। চীনকে সোভিয়েট রুশিয়া স্বাভাবিক অর্থনীতিক আদান-প্রদানের নীতি অনুযায়ীই সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সাহায্য প্রদানে যদি চীনে কম্যুনিষ্ট-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার অদূর সম্ভাবনাও না থাকে, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়া সাহায্যদান সম্পর্কে ইতস্ততঃ করিতে পারে।

অবশ্য তাহার সাহায্যে বঞ্চিত হইলে চীনের যদি অবিলম্বে জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অবস্থা ঘটে, তাহা হইলে সে এই বিষয়ে উত্তমরূপে বিবেচনা করিবে। কারণ, চীনে কম্যুনিষ্ট-প্রাধান্য যদি স্থাপিত না-ও হয়, তাহা হইলেও সমগ্র চীনে জাপানের প্রতিপত্তি স্থাপিত হওয়া সোভিয়েট রুশিয়ার আনন্দের কথা নহে। জাপানের সহিত অনাক্রমণাত্মক চুক্তি করিতে সম্মত হইলেও সোভিয়েট রুশিয়া তাহাকে স্বীয় গৃহদ্বারে আহ্বান করিয়া আনিতে পারে না।

শ্রীঅতুল দত্ত।

মাধুরী ও আনন্দ

মাধুরী হইয়া যাহা
জাগে এই বিশ্ব-প্রকৃতিতে,
আবেশ হইয়া তাহা
চায় রূপ কবিদের চিতে।

আবেগ জাগিয়া উঠে
রূপে, রসে, বর্ণে, ছন্দে, গানে,
আনন্দ হইয়া তাই
উচ্ছলিত নিখিলের প্রাণে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

'দৈনিক বসুমতীর' কণ্ঠরোধ

বাঙ্গালার গভর্ণর হোম-সেক্রেটারীর মারফতে সহসা ১৪ই চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যায়, 'দৈনিক বসুমতীর' সুপ্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নামে ৯ই চৈত্র—২৩শে মার্চ্চের 'দৈনিক বসুমতীতে' প্রকাশিত কোন রিপোর্টের জন্য "ভারত-রক্ষা বিধান" অনুসারে এক আদেশ-জারি করিয়া পরদিন হইতে তিন সপ্তাহ 'দৈনিক বসুমতী' প্রকাশ—প্রচার—বিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন। ঐ আদেশ অনুসারে ২৩শে মার্চ্চের 'দৈনিক বসুমতী' এবং তৎসংক্রান্ত কপি প্রভৃতিও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। ২৩শে মার্চ্চ অপরাহ্নে সরকার খুলনা ও ঢাকার হাঙ্গামা-সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের যে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন—২৪শে মার্চ্চ বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আর ২৩শে মার্চ্চ প্রাতে 'দৈনিক বসুমতী' প্রকাশিত হইয়াছিল—সুতরাং ঐ সংখ্যায় প্রকটিত প্রবন্ধ বা সংবাদ ঐ নিষেধাজ্ঞার আমলে আসে না।

'দৈনিক বসুমতী'র সহিত আমাদের স্বার্থ অভিন্ন—এজন্য সরকারী আদেশের প্রতিবাদ-প্রয়াসে বিড়ম্বনা ভোগ না করিয়া—যে সকল সহৃদয় বন্ধু স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সংরক্ষণ কামনায় যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়া, আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহাদের অভিমত সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতেছি।

'দৈনিক বসুমতী' প্রচার বন্ধের আদেশ-জারির অব্যবহিত পরেই—১৪ই চৈত্র সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে 'ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সমিতির' জরুরী অধিবেশনে নিম্নের প্রস্তাব তিনটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) "সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কিত সংবাদ—মন্তব্য প্রভৃতি প্রকাশ নিষেধ করিয়া ২৩শে মার্চ্চ বাঙ্গালা সরকার 'ভারত-রক্ষা আইনে' যে নির্দ্দেশ জারি করিয়াছেন—তাহার সীমা সুদূরপ্রসারী; কিন্তু ইহার প্রয়োগে প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রসার প্রতিহত করাই ইহার উদ্দেশ্য; কিন্তু সঠিক সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলে—শাসক-কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতা অপব্যবহারে বাধা দিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় অপসারিত হইবে; দুর্ব্বৃত্তদিগের পক্ষে অপরাধ করিবার সুযোগ হইবে—ভিত্তিহীন গুজব ও আতঙ্ক প্রচারে সাহায্য হইবে।"

(২) "বাঙ্গালা সরকার 'দৈনিক বসুমতী'র উপর তিন সপ্তাহ প্রচার বন্ধের যে আদেশ দিয়াছেন, এই অধিবেশন তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। সরকারের এই নির্দ্দেশ অসঙ্গত—কঠোর—অন্যায়। সমিতি সত্বর এই নির্দ্দেশ প্রত্যাহারের দাবী করিতেছেন। এই নির্দ্দেশ-জারির পূর্ব্বে সরকার প্রাদেশিক 'প্রেস এডভাইসরী কমিটীর' পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং সমিতি মনে করেন—'প্রেস এডভাইসরী কমিটীর' সদস্যগণের প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

(৩) "জিলাগুলিতে রাজনীতির সহিত সম্পর্কশূন্য—অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানগুলি—শিক্ষক-সমিতি—শিক্ষা-সম্মেলন প্রভৃতির এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সভা—সম্মেলন—শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায় 'ভারত-রক্ষা আইনে' যে সকল নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, এই সমিতি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। কিন্তু ২২শে মার্চ্চ বিজ্ঞাপিত বাঙ্গালা সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও 'পাকিস্থান'-দিবস কলিকাতা এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার কয়েকখানি সংবাদপত্র বাঙ্গালা সরকারের নির্দ্দেশ অমান্য করিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে—অথচ তাহাদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহাতে অনায়াসে বুঝা যায় যে, সংবাদপত্রের সহিত আচরণে পক্ষপাতিত্ব হইতেছে। সংশয়—বিদ্বেষ—আশঙ্কার কারণ দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সমিতি সরকারকে অনুরোধ করেন।"

সংবাদপত্র-দমনের এই অভিনব অভিযানে বিক্ষুব্ধ হইয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার—দেশপ্রাণ নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র

বসু তর্কযুক্তিপূর্ণ যে সুদীর্ঘ অভিমত প্রকাশ করেন—১৫ই চৈত্র জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন দৈনিক পত্রে তাহা প্রকাশিত হয়। তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এইরূপ,—

"সরকার তিন সপ্তাহের জন্য 'দৈনিক বসুমতীর' প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সরকার 'ভারতরক্ষা আইনের' অপব্যবহারে যে কতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা তাহারই আধুনিকতম প্রমাণ। আমার ধারণা ছিল—'ভারত-রক্ষা আইন' ও নিয়মাবলী ভারতের রক্ষা—নিরাপত্তাবিধান, এবং সাফল্যের সহিত যুদ্ধকার্য্য পরিচালনার পক্ষে আশঙ্কা ঘটিলেই প্রয়োগ করা বিধেয়। ইহা ব্যতীত, অন্যান্য ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ আইনটির প্রকৃত উদ্দেশ্যের—লক্ষ্যের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়াই বিবেচিত হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা সরকার সর্ব্বব্যাপারে দেশবাসীর চিন্তা ও অভিমতের স্বাধীনতা—রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষা—বিধিসঙ্গত রাজনীতিক আন্দোলন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব্ব—দমিত করিবার জন্যই এই আইন প্রযুক্ত করিতেছেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের—ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উক্ত আইন ও নিয়মাবলীকে অন্যায়ভাবে নিয়োজিত করা হইয়াছে।"

ইহার পর শরৎ বাবু 'ভারত-রক্ষা আইনে' দণ্ডিত মধ্য-প্রদেশের শ্রীযুক্ত আর, এস, রুইকরের আপীলের বিচারে নাগপুরের দায়রা জজ মিষ্টার টি, ডি, উইকেণ্ডেন রায়ে যে ঔদার্য্যপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। রায়ে মিঃ উইকেণ্ডেন বলিয়াছেন,—"যুদ্ধ-কালে প্রবর্ত্তিত জরুরী আইনগুলিতে বিপদের ব্যাপার এই থাকে যে, তাহাকে সাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহারের একটা মনোভাব হইয়া থাকে।" * * *

"দুর্ভাগ্যক্রমে 'ভারত-রক্ষা আইনের' সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যবস্থা—যাঁহারা ইহার কবলে পড়েন, আদালতে তাঁহাদের বিচারের সাহায্য পাইবার অধিকার নিষিদ্ধ। যে প্রবন্ধটির জন্য 'দৈনিক বসুমতীর' উপর অভূতপূর্ব্ব উপায়ে শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছে ** আমি নিশ্চয় বলিব, এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর কোন নিরপেক্ষ বা সংস্কারবর্জ্জিত ব্যক্তি কখনই বলিবেন না যে, প্রবন্ধটি সঙ্গত সমালোচনার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে—কিম্বা ইংরেজের ভারতীয় বা বাঙ্গালার প্রজামণ্ডলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বা শত্রুতার প্ররোচনা প্রচার করিয়াছে। কঠোর সমালোচনার অর্থ, অন্যায় সমালোচনা নহে—যদিও স্বেচ্ছাতান্ত্রিক সরকার তাঁহাদের ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতা উপভোগে এই ধরণের সমালোচনায় বিরক্ত—বিব্রত হইতে পারেন। এই কারণেই তাঁহারা অযথা কঠোর শাস্তিবিধান করিয়া এই ধরণের সমালোচনা দমন করিবার প্রয়াসী হন।"

'দৈনিক বসুমতীর' সুকঠোর সমালোচনায় বিব্রত হইয়া—পাঁচ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশের সুব্যবস্থা দিয়া—সম্পাদক ও প্রকাশককে কয়েকবার অভিযুক্ত করিয়াও উজীরমণ্ডলীর প্রতিশোধস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই। হাইকোর্টের সুবিচারে 'দৈনিক বসুমতী' প্রতি বারই অব্যাহতি লাভ করায় তাঁহারা ব্যর্থ প্রয়াসে—নিষ্ফল ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছিলেন মাত্র।

এই 'দৈনিক বসুমতীর' মামলার বিচারে মহামান্য হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়াছেন,—সচিবসঙ্ঘ বাঙ্গালার সরকার নহেন—গভর্ণরের পরামর্শদাতা মাত্র। সেই জন্যই যে তাঁহারা আদালতের সীমা অতিক্রম করিয়া 'ভারত-রক্ষা বিধি' অনুসারে অমোঘ দণ্ডবিধানের সুপরামর্শ দিয়া তাঁহাদের প্রতাপ ও প্রভাবের মহিমা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। ইহা উপলব্ধি করিয়াই—কেবল কলিকাতার—বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত জাতীয়তা-বাদী সংবাদপত্র সমূহে তীব্র প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। 'অমৃতবাজার'—'আনন্দবাজার'—'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড'—'যুগান্তর'—'ভারত'—'ট্রিবউন'—'বোম্বে ক্রনিকেল'—'হিন্দুস্থান টাইমস্'—'হিতবাদ'—'সার্চ্চলাইট'—'কৃষক'—'বরিশালহিতৈষী' প্রভৃতি 'দৈনিক বসুমতীর' সহযোগিগণ ৪ই চৈত্র হইতে দিনের পর দিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে—মন্তব্যে সংবাদপত্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব এই নির্ম্মম নির্দ্দেশ প্রদান জন্য নিপুণভাবে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, সে সকল যেমন অবিসম্বাদিত—তেমনই যে কোনো দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষে লজ্জাস্কর। আত্মপ্রসাদদম্ভে—ক্ষমতার মদগর্ব্বে বিভ্রান্ত না হইলে বাঙ্গালার উজীরসঙ্ঘ

কখনই তাঁহাদের সমবেত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। মাতৃমন্ত্রের সাধক সহযোগিগণের প্রবন্ধ—মন্তব্যরাশির সার সঙ্কলনেরও স্থানাভাব—এজন্য তাঁহাদের অজস্র ধন্যবাদ জানাইয়া সে প্রয়াসে নিবৃত্ত হইলাম।

প্রয়োজনবোধে 'দৈনিক বসুমতীর' অভিযুক্ত সংখ্যা সম্বন্ধে কেবল ১৫ই চৈত্রের 'অমৃতবাজার পত্রিকার' অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রেও এই অভিমত অনুরণিত হইয়াছে।—

"The order says that the issue of that paper dated the 23rd March last contains 'prejudicial reports' of the nature described in certain rules of the Defence of India Rules. We have searched from page to page and column by column for the alleged objectionable reports in the issue of the paper in question in order to understand the action of the Government and the reasons underlying it and we must state at once that we have searched for them in vain. The first leading article which was on the Dacca riots does not certainly come within the mischief of the Defence of India Rules, nor do any other comments or news contained in that issue. We have grave doubts also as to whether they are hit by any ordinary law of the land and those doubts are strengthened by the fact that the Government have refrained from invoking the ordinary law for the purpose. Apart from the suspicion of discriminatory treatment which this hasty action of the Ministry seems to have given rise to, it gives cause for apprehension that the Defence Rules are being applied. by the Ministry in cases where they are not intended to be applied. It is indeed a grave situation with which the Press in Bengal is confronted, particularly that section of the Press that does not approve indiscriminately of the personnel of the present Ministry and their activities. Not only that. The manner in which the Ministry appear to be bent on using the Defence of India Rules for their party purposes constitutes a grave menace to the civil liberties of the people. We venture to submit that His Excellency has not been properly advised in this matter."

'অমৃতবাজার পত্রিকা' শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত—পরিচালিত হইলেও মনীষী সাহিত্যিক—দেশের প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিকগণের সাধনায়—প্রবন্ধে—নিবন্ধে যে নিত্য সমৃদ্ধ, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি—বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞান যে বাঙ্গালার উজীরমণ্ডলী অপেক্ষা বহুগুণ প্রকৃষ্ট, তাহা সচিবগণও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

'দৈনিক বসুমতী' তিন সপ্তাহ বন্ধের সরকারী নিষেধাজ্ঞার আলোচনার জন্য কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল ১৪ই চৈত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিশ দেন। পরিষদের সভাপতি সার আজিজুল হক শ্রীযুক্ত সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে ১৫ই চৈত্র ঘোষণা করেন—যদি তিনি ১৭ই চৈত্র সোমবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তবে ১৮ই চৈত্র মঙ্গলবার পরিষদে শ্রীযুক্ত সান্যালের ও বিরোধীদলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রদত্ত মুলতুবী প্রস্তাব দুইটির আলোচনা হইবে। কিন্তু সোম বা মঙ্গলবার ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনা না হইয়া, ১৯শে চৈত্র বুধবার পরিষদ-রঙ্গমঞ্চে এই প্রহেলিকার চূড়ান্ত অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি প্রস্তাব আলোচনার অনুমতি দিয়া অন্ততঃ ৫০ জন সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন কি না, জানিতে চাহিলে ৫৫ জন সদস্য দাঁড়াইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবের সমর্থক এই ৫৫ জন সদস্যের মধ্যে মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী—মহারাজ-কুমার উদয়চাঁদ মহাতাব—ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-নাথ বসু—শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং কংগ্রেস—কৃষক-প্রজা-দল—স্বতন্ত্র তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়—হিন্দু জাতীয় দলের সদস্যগণ ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী-বিদ্বেষ জন্য খ্যাতনামা বিহারী-নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের টেলিগ্রামের আদেশ অনুসারে 'এডহকী দলের' সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন না। এই প্রস্তাব সমর্থন জন্য অনুমতি-লাভের আশায় বাঙ্গালার 'এডহকী

দল' শ্রীযুক্ত গান্ধীকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর দেন নাই। তাঁহার অনুচর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ "না" বলিয়া তার করিয়া অসম্মতি জানাইয়া দাস-সুলভ মনোবৃত্তি প্রকট করিয়াছেন।

গান্ধীজীর অবশ্যই স্মরণ আছে যে, অন্য বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'দৈনিক বসুমতীর' একনিষ্ঠ সহায়তায়—প্রাত্যহিক স্তবে শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এক দিন 'গুরুগান্ধী'রূপে বাঙ্গালীর হৃদয়-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহার পর 'দৈনিক বসুমতীর' অজস্র প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি পুণা-প্যাক্টে এবং লোকগণনা-বয়কট নির্দ্দেশে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ সংসাধন করেন। তাঁহার দেব-মন্দির অপবিত্র করিবার প্রবল উদ্যম—গুরুবায়ুর মন্দির-অভিযান—প্রধানতঃ 'দৈনিক বসুমতীর' জীবনপণ সাধনায়—প্রচারের ফলে ব্যর্থ—প্রহত হয়। দলগত-স্বার্থসিদ্ধি—প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার মোহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তিনি মহাত্মাগিরির মুখোস খুলিয়া ফেলেন। তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্তগণ সোল্লাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রবর্দ্ধমান ইন্‌কাম-ট্যাক্স বিলের সমর্থন করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনিষ্টসাধনে যথাশক্তি সাহায্য করেন। রাজকোটের প্রায়োপবেশনে তাঁহার আত্মিক-বলের পরীক্ষা হইয়া যায়—বড়লাট স্বয়ং তাঁহার অনশন ভঙ্গ করেন। মত-বিরোধী বাঙ্গালীকে দ্বিতীয় বার কংগ্রেসে সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া ক্ষুণ্ণ-স্বাস্থ্য বিপর্য্যস্ত হইবার আশঙ্কায়—ডাক্তারের উপদেশ শিরোধার্য্য করিবার অজুহতে তিনি সুভাষচন্দ্রের জীবন-সঙ্কট অবস্থায় শত অনুনয়েও ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগদানে বিরত হইয়া 'দৈনিক বসুমতীর' পরিহাস—বিদ্রূপ উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জয়যাত্রা-পথের বিঘ্ন 'দৈনিক বসুমতীর' কঠোর প্রতিকূল সমালোচনা—তীব্র প্রতিবাদ যদি তাঁহার দ্রুত-গতির বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহাতে যে তিনি রুষ্ট—বিরূপ হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

'দৈনিক বসুমতী' তিন সপ্তাহ বন্ধের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সরকারী নির্ম্মম আদেশের—'ভারত-রক্ষা আইনের' অপপ্রয়োগের প্রকৃষ্ট নিদর্শনের তীব্র প্রতিবাদ—নিন্দা করিয়া ১৯শে চৈত্র বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদের বুধবারের অধিবেশনে দুই ঘণ্টা-ব্যাপী যে তুমুল তর্ক-স্রোত চলিয়াছিল, তাহা সঙ্কলন নিষ্প্রয়োজন—সংক্ষেপে বিবরণ প্রদান করিতেছি।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলেন,—"গত বৎসর প্রায় এই সময়ে একটি মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম, 'ভারত-রক্ষা আইন' ও নিয়মগুলি ভারতের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য রচিত হয় নাই, পরন্তু ভারতের দাসত্ব স্থায়ী করিবার জন্যই



শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

কল্পিত হইয়াছে। তখন আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই, সংবাদপত্রের—বিশেষ কতকগুলি সংবাদপত্রের সম্বন্ধে সরকারের ব্যবস্থায়—গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচার বন্ধ করায় আমার কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।"

"'দৈনিক বসুমতীর' প্রচার তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখার যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—তাহা ব্যক্তি-স্বাধীনতা-নাশের সম্প্রতি-সংঘটিত নিদর্শন। * * * আমি নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া সময় ব্যয় করিব না; কেবল বলিব, 'দৈনিক

বসুমতীর' বিরুদ্ধে অভিযোগ—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ঘৃণা উৎপাদন। যে তারিখের 'দৈনিক বসুমতী' লইয়া এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেই সংখ্যা 'দৈনিক বসুমতী'-খানি পাঠ করিয়াছি।"

"যদি প্রধান সচিবের বিরুদ্ধ সমালোচনায় লিখিত কয় ছত্র—মিষ্টার সাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধ আলোচনায় লিখিত কয় ছত্র এবং 'দৈনিক বসুমতী' যাঁহাদিগকে 'সুবোধ বালক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ সমালোচনায় লিখিত কয় ছত্র, রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণ ও শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে আমি সচিবসঙ্ঘের বুদ্ধির এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালা-জ্ঞানের জন্য তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে পারি না। ঐ সংখ্যাতেই প্রধান-সচিবের পরিচিত ভোলা নামক স্থান হইতে প্রেরিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যদি কোনো সম্প্রদায়ের জনকয়েক লোকের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ 'ভারত-রক্ষা আইনের' নিয়মে পড়ে, তবে আমি কেবল বলিব, 'ভারত-রক্ষা আইনের' নিয়মের বলে কেবল দেশের ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট করা হইতেছে। কয় দিন পূর্ব্বে এই আদেশ-সম্পর্কে আমি বলিয়াছি—

It was the latest example of the gross misuse of the Defence of India Rules to which this Government seems to have become a confirmed addict."

বিলাতে সরকার—কোন সংবাদপত্রে ধারাবাহিক ভাবে বৃটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিরোধী ভাবের উদ্ভবকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, তাহা বন্ধ করিবার অধিকার গ্রহণ করিতে চাহিলে পার্লামেণ্টে ঐ প্রস্তাবে কিরূপ আপত্তি হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া শরৎ বাবু বলেন,—"বিচ্ছিন্ন ভাবে অথবা সতর্ক করিবার পরেও প্রকাশিত কোনো সংবাদ প্রকাশের জন্য নহে—ধারাবাহিকরূপে যুদ্ধোদ্যম-বিরোধী ভাব প্রচারের জন্য ঐ ক্ষমতা চাহিলেও তাহাতে আপত্তি করা হয়;—বলা হয়, ইহাতে লোকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হইবে। তখন আয়ার্লণ্ডে 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড ট্যানের' ও বাঙ্গালায় সেই সার জন এণ্ডারসন বলেন—বিলাতের সরকার যে ভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সকল দলের প্রতিনিধিরাই সরকারে আছেন—সুতরাং সরকার যথেচ্ছা কাজ করিবেন, তাহার পর পার্লামেণ্ট আছে। বিলাতে যথেচ্ছা ব্যবহারের বিরোধী যে সকল সুবিধার উল্লেখ করা হইয়াছিল, এ দেশে সে সকল নাই।"

শরৎ বাবু শ্রীযুত রুইকরের মামলার বিচারে নাগপুরের জজ মিষ্টার উইকেণ্ডেনের রায়ের উক্তি উল্লেখ করেন—"যুদ্ধের সঙ্কটকালীন আইনের বিশেষ ত্রুটি এই যে, তাহা ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাশের জন্য প্রয়োগের ইচ্ছা হয়।"

ইহার পর শরৎ বাবু বলেন,—"সচিবসঙ্ঘ 'দৈনিক বসুমতী' সম্পর্কে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা নিদারুণ। সচিবসঙ্ঘ পুনঃ পুনঃ 'দৈনিক বসুমতীর' বিরুদ্ধে মামলা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। অতীতে এই সচিবসঙ্ঘেরই আমলে একবার 'প্রেস আইনে' 'দৈনিক বসুমতীর' বহু টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু হাইকোর্ট সে আদেশ নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর 'ভারতীয় দণ্ডবিধি' আইনে 'দৈনিক বসুমতীকে' অভিযুক্ত করা হইয়াছিল—সে সময়ও হাইকোর্ট 'দৈনিক বসুমতীর' পক্ষে ও সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন। সম্ভবতঃ, সেই তিক্ত—মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতাই সচিবসঙ্ঘকে নূতন ভাবে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করিয়াছে—তাহাতে আইনের দ্বারা অব্যাহতিলাভের পথ নাই। দেশে বর্ত্তমানে যে সকল আইন প্রবর্ত্তিত—'ভারতীয় দণ্ডবিধির' যে ৫০০ ধারা আছে,—'প্রেস আইনের' যে সকল কঠোর ধারা আছে—সেই সকল ধারার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া এই ব্যাপারে সচিবসঙ্ঘের 'ভারত-রক্ষা' আইনের' সাহায্য গ্রহণের কোন যৌক্তিকতাই নাই। 'ভারত-রক্ষা আইন' যুদ্ধ চালাইবার জন্য জারি হইয়াছে—সাধারণ ব্যাপারে প্রয়োগজন্য রচিত হয় নাই। সচিবগণ এইরূপে প্রেসের কণ্ঠরোধের আদেশ জারি করিয়া সঠিক সংবাদ-প্রকাশের পথ-রোধ করিতেছেন।"

সিপাহী-বিদ্রোহের পর সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ জন্য যে আইন হয়, তাহার সম্বন্ধে জন ক্রস নর্টনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শরৎ বাবু বলেন—"বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ সত্য-প্রকাশের পরিবর্ত্তে সত্য-গোপনেই লাভবান্ হন।" তিনি বলেন, তিনি ২৩শে মার্চ্চের 'দৈনিক বসুমতী' আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন এবং তাহাতে

প্রকৃতপক্ষে আপত্তিকর কিছুই পান নাই। উপসংহারে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"সরকার কবে একটা ভুল হইতে অপর ভ্রমাত্মক কার্য্য করিতে বিরত হইবেন?"

কংগ্রেস দলের শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—শরৎ বাবুর বক্তৃতার সমর্থনে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহার শেষাংশের সংক্ষেপ বিবৃতি উদ্ধৃত করিতেছি।

"সম্রাটের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্ট হইতে পারে, ইহাই ২৩শে মার্চ্চের 'দৈনিক বসুমতীর' বিরুদ্ধে অভিযোগ; আমি ঐ দিন প্রকাশিত বিষয়গুলি—বিশেষতঃ 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পুনঃ পুনঃ যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছি। আমি ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, তাঁহার কল্পনাশক্তি যত দূর সম্ভব প্রসারিত করিয়াও এই-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না যে, পূর্ব্বোক্ত অভিযোগের বিষয় সত্যই ঐ প্রবন্ধে ছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ৪ঠা মার্চ্চ 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়ায়' প্রকাশিত যে প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ও শান্তিভঙ্গের প্ররোচনা দান করা হইয়াছিল, তাহার জন্য ঐ পত্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে কি না? আমার প্রশ্নের উত্তরে মিষ্টার ফজলুল হক দৃঢ়তা সহকারে বলেন, কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না। আমি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ বৃদ্ধি করিবার জন্য মিঃ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে কি না? কিন্তু সভাপতি এই প্রশ্ন উত্থাপনের অনুমতি দেন নাই। কোনো গুপ্তেচ্ছা-প্রণোদিত সরকারের হস্তেও জরুরী ব্যবস্থাসম্ভূত যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রদান কত দূর ভয়াবহ, তাহা ইহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইবে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন সরকারের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। 'দৈনিক বসুমতী' যদি সত্যই কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেশের সাধারণ আইন এবং সংবাদপত্র-সম্পর্কিত আইন কি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না? এই কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন কি? জরুরী প্রয়োজনে গণ-নিরাপত্তা ও গণ-স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের রক্ষণ এবং যোগ্যতার সহিত যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য সৃষ্ট 'ভারত-রক্ষা বিধির' শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন কোথায়? সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় এই কঠোর ও অযৌক্তিক, অন্যায় ও অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ কেন? ইহা কি রাষ্ট্রগত প্রয়োজন হেতু? * * * না, ইহা রাষ্ট্রগত প্রয়োজন নহে; মুখোস খুলিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে, ন্যায়-বিচারের জমকাল ছদ্মাবরণে প্রতিহিংসাবৃত্তি ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে। ইহা প্রতিহিংসা—স্থূল ও ইতর প্রতিহিংসা, পূর্ব্বের কোনো অসন্তুষ্টিতেই ইহার পুষ্টি; ইহা অবিমিশ্র ও নগ্ন প্রতিশোধ। ন্যায়বিচার, বিবেক সবই ইহা দলিত—মথিত করিয়া চলিয়াছে। * * *



শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

"সরকারের সেই চিরন্তন সত্য স্মরণ রাখা উচিত—মানুষকে মানুষের সম্পত্তিরূপে সৃষ্টি করা হয় নাই, মানুষের স্বেচ্ছাচার সহ্য করিবার সীমা আছে, লব্ধক্ষমতা মানুষ গণ-কল্যাণের ন্যাসরক্ষক মাত্র; তাহার দায়িত্বের যদি অমর্য্যাদা ঘটে, তাহা হইলে নিপীড়িত মানুষের পক্ষে ইহা কর্ত্তব্য হউক আর না হউক, তখন প্রতিহিংসাই ন্যায়বিচারের স্থান গ্রহণ করে।"

স্বতন্ত্র তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের দলে শ্রীযুক্ত প্রেমহরি বর্ম্মণ বলেন,—'বসুমতীর' বিরুদ্ধে 'ভারত-রক্ষা আইনের' বলে প্রদত্ত এই আদেশ ভুলপথে পরিচালিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার যদি এই আদেশ দিয়া থাকেন, তবে প্রধান সচিব মিঃ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে এই আদেশ জারি করিলেই সরকার ভাল করিতেন। কারণ, বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধার জন্য প্রধান সচিবের অসংযত

ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবৃতিসমূহই বিশেষভাবে দায়ী। সরকারের এই আদেশ অসঙ্গত।

স্বতন্ত্র হিন্দু সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস বলেন,—'দৈনিক বসুমতীর' ২৩শে মার্চ্চ সংখ্যায় ভোলার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, বরিশালের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট-প্রদত্ত বিবরণের সহিত তাহার কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং ঐ রিপোর্টের জন্য যদি সরকারী আদেশ জারি হইয়া থাকে—উহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবে তাহা অন্যায় ও অসঙ্গত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সচিবসঙ্ঘ সংবাদপত্রাদির বিরুদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, অন্যায়ের তুলনায় 'দৈনিক বসুমতীর' উপর প্রদত্ত এই আদেশ তাহাদের সকলগুলিকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মুলতুবী প্রস্তাব সমর্থন করিয়া, বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সরকারী আদেশ জারির নিন্দা করিয়া বলেন, তিনি 'দৈনিক বসুমতী' যে সংখ্যার জন্য উক্ত আদেশ জারি হইয়াছে, সেই সংখ্যাখানি বিশেষ মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু উহার কোথাও—কি দাঙ্গা সম্পর্কিত সংবাদে, কি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এমন একটি কথাও পান নাই যে, তাহা জন-নিরাপত্তার বিঘ্নকর বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্ররোচনাকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আর 'দৈনিক বসুমতীর' উক্ত সংখ্যায় যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা যদি সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যসৃষ্টিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ঐ দিনের 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' ও 'আজাদ' পত্র দুইখানিতে যে সব সংবাদ বাহির হইয়াছিল, সে সব আরও অপরাধজনক হইলেও কেন ঐ দুইখানি সংবাদপত্রের সম্বন্ধে সচিবসঙ্ঘ কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই? ঐ দুইখানি সংবাদপত্র সম্বন্ধে এইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা কেন তাঁহারা অবলম্বন করিলেন? ইহাই সচিবসঙ্ঘের নীতি। জন-নিরাপত্তা রক্ষাই যদি প্রকৃত কারণ হইয়া থাকে, তবে 'আজাদ' ও 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' সম্বন্ধে কেন কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই? সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করার জন্য 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার' উপর কেন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে না—এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান সচিব কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণরের আহ্বানে এখন বৈঠক চলিতেছে, এ সময় তিনি আর কোনরূপ অশান্তি ডাকিয়া আনিতে চাহেন না। ঐ একই কারণে ত প্রধান উজীর 'দৈনিক বসুমতীর' উপরও আদেশ জারি না করিলে পারিতেন। ঐ তারিখে 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়ায়' প্রকাশিত একখানি পত্রে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, হাসপাতালে হিন্দু ডাক্তারের সংখ্যা অধিক এবং সে সব প্রতিষ্ঠানে আহত মুসলমানরা যথেষ্ট মনোযোগ পাইতেছে না। এই সব হাসপাতাল কি সরকারের অধীন নহে? হাসপাতালে যদি হিন্দু ডাক্তাররা থাকেন, তবে এই সঙ্কট কালে তাঁহাদিগের সাধুতা ও যোগ্যতার বিরুদ্ধে কেন এইরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে দেওয়া হইল?



ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তিনি বলেন, 'দৈনিক বসুমতীর' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি কোথাও কোনরূপে সাম্প্রদায়িক ঘৃণাপ্ররোচক কোন উক্তি পান নাই। প্রধান সচিব যদি এখনও পরিষদে ঘোষণা করেন যে, 'দৈনিক বসুমতী' বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করা হইবে, তাহা হইলে ঐ আদেশ জারির ফলে যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে, তাহা প্রশমিত হইতে পারে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন বলেন, "মিষ্টার হক যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা "Gangster Method." তাঁহাকে যথাকালে সাবধান করিয়া না দিলে

হয় ত এক দিন তিনি একটি দল সহ হাতুড়ী হাতে যাইয়া যে সকল পত্রে তাঁহার ও তাঁহার 'সরকারের' প্রশংসা প্রকাশিত হয় না, সে সকল সংবাদপত্রের ছাপাখানা ভাঙ্গিয়া দিবেন।"

সচিবসমর্থক দলের মিষ্টার সিদ্দিকী এবং কোয়ালিশনী দলের অন্যতম সদস্য মিঃ গোলাম সারোয়ার হোসেন সরকারী আদেশের সমর্থন করেন। তখন কোনো কোনো সদস্য "হায় রে মেয়র! সাবাস হাফ নোটের খেল্! এত্তেও তোমার ফাণ্ডে টাকা হইল না"—ইত্যাদি ধ্বনিতে পরিষদে হাসির রোল তুলেন।

অতঃপর লজ্জাবিজয়ী বীর—উজীরশ্রেষ্ঠ মিঃ ফজলুল হক সরকার পক্ষ হইতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকার হঠাৎ কোন ঝোঁকের বশে বা প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি লইয়া 'দৈনিক বসুমতীর' উপর ঐ আদেশ জারি করেন নাই।—তিনি এইরূপ অভিযোগ করেন যে, 'দৈনিক বসুমতীতে' মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এমন সব অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা হইতেছে, যাহা তিনি পরিষদে উপস্থিত মহিলাগণের সমক্ষে পাঠ করিতে পারিবেন না। এই সংবাদপত্রের অতীত ইতিহাস সন্তোষজনক নহে এবং সরকার অন্ততঃ ৫৩ বার 'দৈনিক বসুমতীকে' সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। 'দৈনিক বসুমতীর' ২৩শে মার্চ্চের প্রবন্ধ সম্বন্ধে সরকার আইনজ্ঞের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকার এইরূপ মত পাইয়াছেন যে, উক্ত প্রবন্ধের জন্য 'দৈনিক বসুমতীর' উপর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। স্থানীয় 'প্রেস এডভাইসরী কমিটীও' প্রথমে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 'দৈনিক বসুমতীর' ২৩শে মার্চ্চের প্রবন্ধ আপত্তিজনক। পরে অবশ্য 'প্রেস এডভাইসরী কমিটী' সরকারের নিকট এইরূপ মত জানাইয়াছিলেন যে, 'দৈনিক বসুমতীর' উপর যে আদেশ জারি হইয়াছে, তাহা দোষের তুলনায় অত্যন্ত কঠোর, এবং সরকার যেন আদেশ প্রত্যাহার করেন বা সংশোধন করেন। প্রেস এডভাইসরী কমিটী এই বলিয়া দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, "কমিটীর অভিমত অগ্রাহ্য—সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই 'দৈনিক বসুমতীর' বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বিশদ ভাবে বিবেচনা করার জন্য কমিটীকে সময় দেওয়া উচিত ছিল। পরের এক সভায় কমিটী এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'দৈনিক বসুমতীর' বিরুদ্ধে অবিলম্বেই যে একটা দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে সরকারী প্রেস অফিসার কমিটীকে কিছুই জানান নাই।"

প্রধান সচিব অতঃপর বলেন যে, "'দৈনিক বসুমতীর' ২৩শে মার্চ্চের প্রবন্ধ যে গৃহীত ব্যবস্থা অবলম্বন করার উপযোগী, তাহা স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং সরকার ঐ সম্বন্ধে 'প্রেস এডভাইসরী কমিটীর' জন্য বসিয়া না থাকিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার সরকারেরই—'প্রেস এডভাইসরী কমিটীর' নহে। 'দৈনিক বসুমতী' 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' বা 'আজাদ'—কাহারও ঐরূপ ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রচার সরকার সহ্য করিবেন না। 'দৈনিক বসুমতীর' বিরুদ্ধে এই আদেশ জারি করিয়া সংবাদপত্রগুলিকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

মিষ্টার ফজলুল হক সরকারের আদেশ সমর্থন করিতে উঠিয়া যখন 'দৈনিক বসুমতীর' পূর্ব্বকৃত কার্য্যের উল্লেখ করেন, তখন শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ তাহাতে আপত্তি করিলে সভাপতি বলেন, সরকারী আদেশ এই প্রবন্ধের জন্য কি অন্য প্রবন্ধের জন্য, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। যদি সরকার বলেন, তাঁহারা কেবল এই প্রবন্ধের জন্য আদেশ দেন নাই, তবে তিনি কিরূপে প্রধান উজীরের উক্তিতে বাধা দিতে পারেন? উত্তরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলেন, যে আদেশ পরিষদের আলোচ্য তাহার অতিরিক্ত কিছু বলা রীতিবিরুদ্ধ। খাজা সাহাবুদ্দীন—তাহা রীতিবিরুদ্ধ নহে—বলিলে শরৎবাবু বলেন, তিনি মিষ্টার সাহাবুদ্দীনের মত শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহার পর মিষ্টার হক ভারতীয় সাক্ষ্য-আইনের দোহাই দিলে শরৎ বাবু বলেন—

"The order was based on certain specific grounds and no court would permit him to go beyond the order."

অতঃপর বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাবটি বিনা ভোট গণনায় অগ্রাহ্য হইলে—যবনিকা পতন হয়।

নূতন ডিক্লারেসনে হাজার টাকা জমা দিয়া, ২১শে চৈত্র শুক্রবার হইতে "বসুমতী টেলিগ্রাম" প্রত্যহ প্রাতে

প্রকাশিত হইতেছে। স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের উপায় নাই বলিয়া ইহা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—মন্তব্য বর্জ্জিত।

উজীরশ্রেষ্ঠ স্বয়ং যখন 'প্রেস এডভাইসরী কমিটীর' অভিমতের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন—তখন তাঁহাদের মতের মূল্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসের কারণ নাই। 'দৈনিক বসুমতীর' উপর ভারত-রক্ষা আইন জারির পূর্ব্বে সরকার 'প্রেস এডভাইসরী কমিটীর' পরামর্শ—অভিমতের জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই; সাংবাদিকসঙ্ঘ—জাতীয় সংবাদপত্রনিচয় এজন্য 'প্রেস এডভাইসরী কমিটীর' সদস্যগণের পদত্যাগের দাবী জানাইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে 'প্রেস পরামর্শদাতা সমিতির' আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ১৯শে চৈত্র যে ফতোয়া দিয়াছেন, তাহার শেষাংশ এইরূপ—* * "ইহাতে প্রেসের স্বাধীনতার মূলনীতি ক্ষুণ্ণ করা হইবে এবং 'বঙ্গীয় প্রেস পরামর্শ কমিটী' প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য উহার দ্বারা ব্যাহত হইবে।" শ্রীযুক্ত তুষার বাবুকে আমরা কি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতে পারি—অতঃপর প্রেসের—সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আর কতটুকু অক্ষুণ্ণ—অবশিষ্ট আছে? বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে 'প্রেস পরামর্শ সমিতি'র পরামর্শের মূল্য নির্দ্ধারিত হইবার পরও ত' তাঁহাদের অভিমতের বাজার-চলিত মূল্য অব্যাহত—বজায় আছে?

'দৈনিক বসুমতীর' প্রবন্ধের সমালোচনার কোন্ কোন্ অংশ বা শব্দ অশ্লীল—শিক্ষিতা মহিলা-সমাজে অপাঠ্য—অশ্রাব্য, তাহা সচিবশ্রেষ্ঠ মেহেরবাণী করিয়া জানাইবেন কি? এজন্য কোন্ কোন্ তারিখে তিনি যে অন্ততঃ ৫০ বার 'দৈনিক বসুমতীকে' সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার দপ্তরে নিশ্চয়ই তাহার তালিকা আছে—তাহা প্রকাশযোগ্য কি? "গরু, ছাগল, ভেড়া ও মুরগীর গোস্ত আমরা কখনও কখনও খাই"—প্রভৃতি নীতি-কথাপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই প্রধান সচিবকে হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত 'কথামালা' পাঠ করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। "দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই"—'কথামালার' সদুপদেশটি আজও কি তাঁহার স্মরণ আছে?

বাঙ্গালায় আমলা-তান্ত্রিক সরকারের পরিবর্ত্তে যে নবাব-তান্ত্রিক সরকার বা বাদসাহী-আমল পুনঃ-প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা ইংরেজের রাজভক্ত প্রজা, মুসলের মান বাড়াইবার প্রবল প্রয়াসে হিন্দু-সম্প্রদায়ের সর্ব্বস্তরে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে দেখিয়া শঙ্কিত—ব্যথিত হইতেছি। কিন্তু নিরুপায়—প্রতিবিধান সম্ভব নহে।

বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি

বাঙ্গালায় কিছু দিন হইতে যে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের আভাস পাওয়া যাইতেছিল, তাহা প্রথমে খুলনা জিলায় বাগেরহাট মহকুমায় ও পরে ঢাকায় অশান্তিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ঢাকার হাঙ্গামার আজ এক মাস কাল পূর্ণ হইল।

বাঙ্গালা সরকার স্থির করিয়াছেন—সংবাদ-প্রচার নিয়ন্ত্রিত করিলে বর্ত্তমান অবস্থায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা-কার্য্যের সুবিধা হইবে। সেই জন্য তাঁহারা 'ভারত-রক্ষা-আইনের' প্রয়োগও করিয়াছেন। কোন সংবাদ—সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া স্পেশ্যাল প্রেস এডভাইসারের মঞ্জুরী ব্যতীত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চলিবে না—কোনরূপ মন্তব্যও চলিবে না। কেবল এসোসিয়েটেড প্রেস ও ইউনাইটেড প্রেস—দুইটি সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত সংবাদ প্রকাশ করা যাইবে। অবশ্য ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয় যে সংবাদ পরিবেশন করেন, তাহা ঐরূপে মঞ্জুর হইবার পর। বাঙ্গালা সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা বলা দুষ্কর; কারণ, ঢাকার হাঙ্গামা যে সহর হইতে গ্রামে গ্রামে ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে, (সত্য বা মিথ্যা) সংবাদ প্রচারই তাহার কারণ বলিয়া মিষ্টার ফজলুল হক স্বীকার করিয়াছেন। প্রাপ্ত সংবাদগুলি মঞ্জুরীর জন্য স্পেশ্যাল প্রেস এডভাইসারের নিকট প্রেরিত হইলে কিরূপে—"ছাপা চলিবে না" বলিয়া বা কিরূপ পরিবর্জ্জিত আকারে পাঠান হয়, তাহার পরিচয় হয়ত পাঠকগণ পরে পাইবেন। এ বিষয়ে সরকার এত সতর্ক যে, সর্ব্বজন-সমাদৃত ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইতে দেওয়া হয় নাই; এমন কি, তাহা যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় পঠিত হইতে

না পারে, সে চেষ্টাও সচিবপক্ষ হইতে করা হইয়াছিল—সভাপতির নির্দ্দেশ হেতু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আর ঐ বিবৃতি বাঙ্গালার বাহিরে নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে।

যে রঙ্গমঞ্চে হাঙ্গামার নারকীয় নাটকের অভিনয় হইতেছে, তাহার একটু পরিচয় দিয়া আমরা—প্রধানতঃ ব্যবস্থা পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশিত বিবরণে নির্ভর করিয়া ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

নূতন শাসন-পদ্ধতিতে নির্ব্বাচনের পর প্রধান সচিব হইয়া মিষ্টার ফজলুল হক বহুবার হিন্দুদিগের সম্বন্ধে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন। সে সকল আক্রমণের প্রতিবাদ হইলে তিনি ত্রুটি স্বীকার করিয়া অব্যাহতি লাভের চেষ্টারও ত্রুট করেন নাই। তিনি অধিকাংশ হিন্দু রাজ-কর্ম্মচারীকে disloyal বলিয়া কোন বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং সে পত্র ধরা পড়িলে সেজন্য ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন। জব্বলপুরে এক বক্তৃতায় তিনি হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিয়া পরে ঐ জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি ভাবপ্রবণ, সুতরাং ক্ষমার্হ! অল্প দিন পূর্ব্বে—লোক-গণনার ফল কিরূপ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা না করিয়া খাজা সার নাজিমুদ্দীন মুসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি যেমনই কেন হউক না—মুসলমানদিগকেই উত্তরোত্তর অধিক ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হইবে। নানা স্থানে হিন্দুর দেবস্থান অপবিত্র হইলেও এই সচিবরা সে কার্য্যের নিন্দাও করেন নাই, এবং গত মহরমের সময় কলিকাতা রাজাবাজারে যে সকল মুসলমান হাঙ্গামা করিয়াছিল—এক জন সচিবকে এমন ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তাহার ফলে তিনি মাসাধিক কাল ছুটী লইয়া নষ্ট-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার-লাভ চেষ্টা করিয়াছেন—সেই দাঙ্গাকারীদিগের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মামলা সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

এ দিকে লোকগণনা উপলক্ষ করিয়া মিষ্টার ফজলুল হক যে সকল বিবৃতি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সে সকলে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে কটূক্তি চরমে উপনীত হইয়াছিল এবং কানসাটে সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জ্জন-সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছেন বটে—দাঙ্গাহাঙ্গামা অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়াই তাহা এক মাসেও দমিত করা যাইতেছে না—কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বুঝিয়াই বাঙ্গালার গভর্ণর টাউন হলে সভার পরই ব্যবস্থা পরিষদের ও ব্যবস্থাপক সভার নানাদেশের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি-দিগকে এক বৈঠকে আহ্বান করেন।

মিষ্টার ফজলুল হক গত ২রা মার্চ্চ যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে তিনি বলেন, লোকগণনায় বাঙ্গালায় হিন্দুদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে; কারণ, ব্যবহারাজীব, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, জমিদার, ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণাতিরিক্ত সকল শ্রেণীর হিন্দু হিন্দুর সংখ্যা অধিক দেখাইবার জন্য একযোগে মিথ্যা উক্তি করিতে ও মিথ্যা হিসাব দাখিল করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এই হীন উক্তির প্রতিবাদে ৬ই মার্চ্চ কলিকাতার টাউন হলে যে সভাধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলেন—মিষ্টার হকের মানসিক অবস্থা বিকৃত হইয়াছে—সুতরাং প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত এবং লোকগণনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অবসর গ্রহণ করুন—আর তিনি যদি তাহা না করেন, তবে গভর্ণর তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করুন।

যে দিন ঐ সভা হয়, সেই দিনই মিষ্টার হক সার নৃপেন্দ্রনাথকে পত্র লিখেন—তাঁহাকে সকলে ভুল বুঝিতেছেন! ৭ই মার্চ্চ সচিবদিগের সমর্থক 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত হয়, মিষ্টার হক বলিয়াছেন—তাঁহার পত্র সার নৃপেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক তাঁহাকে লিখিত এক পত্রের উত্তর—তিনি উপযাচক হইয়া পত্র লিখেন নাই। কিন্তু যখন সার নৃপেন্দ্রনাথ বলেন, ঐ উক্তি মিথ্যা, তখন 'ষ্টার' সার নৃপেন্দ্রনাথের প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশ না করিয়া বলেন—সার নৃপেন্দ্রনাথ মিষ্টার হককে কোন পত্র লিখেন নাই বটে, কিন্তু উভয়ে আলোচনা হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে মিষ্টার হক ও 'ষ্টার'—কে মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং উভয়েই তাহা করিয়াছিলেন কি না, তাহা বিবেচনার স্থান এ নহে।

যে দিন জানা যায়, সার নৃপেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে টাউন হলে সভা হইবে, সেই দিনই (৪ঠা মার্চ্চ) 'ষ্টারে' একটি প্রবন্ধে যাহা লিখিত হয়, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ :—

"বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মুসলমানদিগের ধৈর্য্য শেষসীমায় উপনীত হইয়াছে। ক্ষুদ্র মূষিকদিগকে দেখাইয়া দিবার সময় হইয়াছে—সিংহ মরে নাই—কেবল ঘুমাইয়া আছে। * * * * হিন্দুদিগের মধ্যে তথা-কথিত বড় লোকরাও মানসিক স্থৈর্য্য হারাইয়াছে এবং সর্ব্বকার্য্যক্ষম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহারা উপযুক্ত উত্তর পাইবে। বাঙ্গালা কাহাদিগের, তাহা তাহারা দেখিবে। তাহাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, তাহারা সেই শিক্ষা পাইবে।—ইত্যাদি।"

ইহা কি সমরাহ্বান নহে? ঐ প্রবন্ধের শেষ এইরূপ—"The challenge is accepted. The fight is on."

ইহার পর ১২ই মার্চ্চ খুলনায় ও ১৪ই মার্চ্চ ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। খুলনায় এক জন নমঃশূদ্র কোন মুসলমানের নিকট টাকা পাইত—উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট টাকা চাহিলে অধমর্ণের কতকগুলি সমধর্ম্মী উত্তমর্ণকে ও তাহার সহকারীদিগকে প্রহার করে এবং তাহার পর গ্রামে গ্রামে হাঙ্গামা হয়। ১৪ই মার্চ্চ হোলী খেলার সময় হিন্দুদিগের খেলার জল ঢাকায় কোন মুসলমানের গাত্রে পতিত হয় এবং তাহা হইতেই ঢাকার দাঙ্গার উদ্ভব। এক কালে দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি যে হিন্দুদিগের হোলীর শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন, সে কথার আলোচনা আর করিব না। কিন্তু খুলনায় ও ঢাকায় যেরূপ তুচ্ছ ঘটনা হইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে কি মনে করিতে হয় না—বারুদের স্তূপ সঞ্চিত ছিল—স্ফুলিঙ্গপাতে বিস্ফোরণ হইয়াছে? ঢাকায় ইতঃপূর্ব্বে যে দুই বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

এ বার হাঙ্গামার ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহার আভাস গত ৭ই এপ্রিল ব্যবস্থাপক সভায় সচিব সার বিজয়প্রসাদ সিং রায়ের প্রদত্ত হিসাব হইতে বুঝা যায়—

নিহত	৩৫ জন
হিন্দু	১০ "
মুসলমান	২৪ "
অন্য	১ "
আহত	১৬৩ জন
হিন্দু	৫৮ "
মুসলমান	১০২ "
অন্য	৩ "
গ্রেপ্তার	৪১৯ জন
হিন্দু	২৪৯ "
মুসলমান	১৭০ "

আহতদিগের মধ্যেই, বোধ হয়, ঢাকার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ নাগ ও অতিরিক্ত জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার হ্যাচ বার্ণওয়েল ছিলেন।

পুলিশের গুলীতে ৪ জন নিহত ও ২ জন আহত হয়। যদিও ৭ই এপ্রিল সচিব বিজয়প্রসাদ বলেন,—দাঙ্গার কারণ নির্ণীত হয় নাই; তথাপি ৯ই এপ্রিল মিষ্টার ফজলুল হক বলেন,—১৪ই মার্চ্চ এক জন মুসলমানের গাত্রে হোলী খেলার জল পড়ায় যে মনোমালিন্যের উদ্ভব হয়, তাহা ছোরা-মারায় আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে এবং ১৭ই মার্চ্চ একটি মসজেদ অপবিত্র করা হইয়াছে, এই সংবাদ প্রচারিত হয়। দুই দিনেই তবে হাঙ্গামার প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিজয়প্রসাদ বলেন, যে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল্য কত, তাহা তিনি বলিতে পারেন না—সে সম্বন্ধে তিনি কোন সংবাদ পান নাই। লোকের দুঃখ-মোচনের কি উপায় অবলম্বিত হইতেছে, সে প্রশ্নের উত্তরও তিনি তখন দিতে পারেন নাই। তবে ঢাকা সহরে যে অনেক গৃহ ও দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে, তাহা হয়ত তিনি অস্বীকার করিবেন না।

গত ৯ই এপ্রিল ব্যবস্থা পরিষদে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতাকালে সচিব-সমর্থক দলের কতকগুলি সদস্যের হাস্যে বিরক্ত হইয়া যাহা বলিয়াছেন এবং যে উক্তি প্রধান-সচিব অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়—প্রায় ২৫ হাজার হিন্দু আজ গৃহহীন। ২৫ হাজারের অধিক সংখ্যক লোক আজ আশ্রয় ও সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ঘুরিতেছে।

তিনি বলিয়াছেন—

প্রায় ৫০ খানি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে

এবং অন্ততঃ ১০ হাজার লোক ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

আলোচনার শেষে মিষ্টার ফজলুল হক স্বীকার করেন, বহু লোক ত্রিপুরা রাজ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া ত্রিপুরার মহারাজা যে উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, (ব্যবস্থা পরিষদে অনুযোগের পর) সেজন্য তিনি তাঁহাকে সরকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

মনে রাখিতে হইবে, কতকগুলি বাঙ্গালী আসাম হইতে ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া এই মিষ্টার ফজলুল হকই এক দিন আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের নিন্দা-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আজ তিনিই স্বীকার করিতেছেন, প্রায় ১০ হাজার গৃহহীন সর্ব্বস্বান্ত বাঙ্গালী বৃটিশ-শাসনাধীন যে বাঙ্গালায় তিনি প্রধান সচিব, সেই বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া দেশীয় রাজ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই ঘটনা আমরা কেবল বিবৃত করিতে পারি—ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

পরিষদে আলোচনা কালে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সকলের গুরুত্ব অসাধারণ—কিন্তু আমরা সে সকলের উল্লেখমাত্র করিব।

শরৎ বাবু বলেন—

"আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি, ঢাকার স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীরা বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য অবহেলার অপরাধে এবং সরকারের আইনানুযায়ী কাজ না করায় অপরাধী; তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্যই ঢাকায় দাঙ্গা ভীষণ হইতে পারিয়াছে। আমি তাঁহাদিগের অনুপস্থিতির সুযোগে এই অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছি না—ঢাকায় আমি তাঁহাদিগের সম্মুখেই এই সব অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলাম—আজও সে সকলের উত্তর পাওয়া যায় নাই।"

শরৎ বাবু বলেন, তিনি ঢাকায় গুণ্ডাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কমিশনারকে ফোন করেন—উত্তরে তাঁহাকে কেবল বলা হয়—এক জন গুণ্ডা ঢাকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! গত ২৮শে মার্চ্চ শরৎ বাবু শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহের নিকট হইতে পত্র পান—"লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির কতকাংশ কোথায় আছে, তাহার সংবাদ আমরা পাইয়াছি। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সে বিষয় জানান হইয়াছিল; কিন্তু তিনি যে সে সকল উদ্ধার জন্য সক্রিয় হইয়াছেন, এমন মনে হয় না।" যে মোটরবাসে লুণ্ঠিত সামগ্রী লইয়া যাওয়া হয়, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত অতুলচন্দ্র সেন স্বয়ং তাহার নম্বর ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট একখানি কাগজে নম্বর লিখিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পর দিন তিনি ঐ বাস ধরিবার কি চেষ্টা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন—"আমি কাগজখানি হারাইয়া ফেলিয়াছি!" ইহার পর শ্রীযুত বিমলানন্দ দাস ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখেন, তাঁহারা যে সব অনুরোধ করিয়াছেন, সে সব পালিত হয় নাই—পালিত হইলে লোকের ধনপ্রাণ-নাশ নিবারিত হইত—দুষ্কৃতকারীরা ধৃত হইত।

তিনি আরও বলেন—"পুলিসের সমক্ষেই হত্যা ও গৃহে অগ্নিযোগ হইয়াছে।" শরৎ বাবু বলেন—চার বা পাঁচ দিন পূর্ব্বে তিনি গভর্ণরকে ও প্রধান সচিবকে জানান—আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য মিষ্টার সাহাবুদ্দীন, মিষ্টার নশরুল্লা ও মিষ্টার সালিমকে ঢাকা ত্যাগ করিতে আদেশ করা প্রয়োজন।

শরৎ বাবু তাহার পর ২রা এপ্রিল উপদ্রুত অঞ্চল হইতে অতিরিক্ত জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার হাচ-বার্ণওয়েল ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে তার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করেন:—নরসিংদীর ৩ মাইল পূর্ব্বে ও ভৈরবের ২ মাইল পশ্চিমের অঞ্চল উপদ্রুত। মেথিকাণ্ডা ষ্টেশন দাঙ্গাকারীরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—সুরেশ বাবুর গৃহ পুড়াইয়া দিয়াছে।—ইত্যাদি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এই তার পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কি করিয়াছিলেন? মিষ্টার হাচ-বার্ণওয়েল স্বয়ং আহত হইয়াছেন।

শরৎ বাবু বলেন—

"এখন আমি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার জর্জ্জের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছি। তিনি মিষ্টার সালিম ও মিষ্টার নশরুল্লাকে সঙ্গী করিয়া উপদ্রুত স্থান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন; কিন্তু যে সকল অঞ্চলে হিন্দুরা অত্যাচারিত হইয়াছিল, সে সকল পরিদর্শন কালে তিনি কোন হিন্দু নেতাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। এইরূপ ম্যাজিষ্ট্রেট আজ ঢাকার ভাগ্যবিধাতা।"

এই প্রসঙ্গে পাঠকদিগের অবশ্যই স্মরণ হইবে—১৯৩০ খৃষ্টাব্দের দাঙ্গার সময় রাজকর্ম্মচারীরা নবাব খাজা হবিবুল্লাকে সঙ্গে লওয়ায় যে আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহা এডামী-স্মাক্সী কমিটীর রিপোর্টে আছে। কমিটী বলিয়াছিলেন, নবাবের নামে লুণ্ঠন হইয়াছিল, বলিয়া রাজকর্ম্মচারীদিগের তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া সমর্থন করা যায় না।

শরৎ বাবু মিষ্টার হ্যাচ-বার্ণওয়েল কর্ত্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত আর একখানি তার পাঠ করেন এবং বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ এই যে, তাঁহারা অনুপযুক্ত রাজকর্ম্মচারীদিগকে—অক্ষম পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টদিগকে ঢাকার ও নারায়ণগঞ্জের ভাগ্যবিধাতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সকল লোক স্বাধীনচেতা ও নিরপেক্ষ নহে।

তিনি আরও বলেন—খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন এখন (রাজাবাজারে আহত হইবার পর) সুস্থ হইয়াছেন। তিনি কেন ঢাকায় গমন করেন নাই? "But he is fiddling at Hazaribagh while Dacca is burning."

শরৎ বাবুর উপস্থাপিত অভিযোগের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু নিরপেক্ষ তদন্ত ব্যতীত কি এ সকলের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত করা সম্ভব?

মিষ্টার ফজলুল হক বলেন, শরৎ বাবু অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের যে তার পাঠ করিয়াছেন, সরকার তাহার বিষয় অবগত ছিলেন না! ইহা কি সরকারের পক্ষে প্রশংসার কথা?

মিষ্টার ফজলুল হক তাঁহার উত্তরে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ও সচিব-বিরোধী দলকে সকল অনর্থের জন্য দায়ী করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহার দায়িত্ব লোপ পাইবে? তাহাই কি শরৎ বাবুর সরকারের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের উত্তর? তিনি বলিয়াছেন, তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, তখন তাঁহার এক জন সতীর্থ সব অন্যায় কাজ করিয়া চীৎকার করিয়া দেখাইতে চাহিত—আর সকলে দোষী, সে নিরপরাধ। আজ কি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি তাঁহার ব্যবহারে সেই ছাত্রের পরিচয় পাইলেন—বলিতে পারেন না? শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী যে সহস্র সহস্র লোকের ত্রিপুরায় গমনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—উহাতেই বুঝা যায়—"an unworkable constitution was being worked by worthless and inefficient hands." তাহার উত্তরে কি বলা হইবে?

যে সকল নরনারী আজ হৃতসর্ব্বস্ব, তাহারা কি আশা করে নাই—বৃটিশ সরকারের শাসনে তাহাদিগের ধনপ্রাণ নিরাপদ থাকিবে? তাহাদিগের সেই আশা কি আজ নিরাশায় নির্ব্বাপিত হইবে? যাহারা নিহত, তাহাদিগের মুক্ত আত্মা আজ কাহাকে অভিসম্পাত করিতেছে?

এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান ভেদ নাই এবং বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবরা (লজ্জার বিষয়, ইঁহাদিগের মধ্যে ৪ জন হিন্দুসন্তানও আছেন) কখনো হিন্দুর দেবস্থান কলুষিত করায় ও হিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার-সঙ্কোচে কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই—প্রকাশ্য ভাবে সে সব কার্য্যের নিন্দা করেন নাই বটে, কিন্তু ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে বলিয়াছেন—

যদিও গত ৪ বৎসর বহু স্থানে হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করা হইয়াছে, তথাপি মসজেদ অপবিত্র হওয়ায় তিনি লজ্জিত। "কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মস্থান যে কলুষিত করা হয়, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ঐক্য-প্রয়াসী।"

আমরা এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বে সচিব বিজয়প্রসাদের প্রদত্ত হতাহতের সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছি। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন, নিহতের ঐ সংখ্যা নির্ভরযোগ্য নহে। তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, দুই সম্প্রদায়ে নিহতের সংখ্যা প্রায় সমান হইয়াছে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আরও বলেন,—খাকশাররা ঢাকা জিলায় গিয়াছিল এবং হিন্দুদিগের গৃহ আক্রমণে সহায় হইয়াছিল। তিনি যখন এই কথা বলেন, তখন সচিব-সমর্থক দল হইতে জিজ্ঞাসা করা হয়—"বাঙ্গালায় কি খাকশার আছে?" উত্তরে তিনি বলেন, যে কেহ রাত্রি ১১টার পর কলিকাতা মেছুয়াবাজারে যাইলেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইবেন। সচিব-সমর্থক দল হইতে এইরূপ প্রশ্নের কারণ কি হইতে পারে? কিছু দিন পূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদেই খাজা সার নাজিমুদ্দীন

স্বীকার করিয়াছিলেন,—বাঙ্গালায় খাকশার-বাহিনী আছে এবং তিনি তাহাদিগের কার্য্যে বাধা প্রদান প্রয়োজন মনে করেন না।

সময়াভাবে ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার বক্তৃতাকালে সচিব-সমর্থকদল যে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুমান করিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন, ঢাকা হইতে যে অগ্নি গ্রামে ব্যাপ্ত হইতে পারে, সে সম্ভাবনার কথাও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নিবারণের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করা হয় নাই।

মুসলমান সচিবদিগের মধ্যে কেহ কেহ একাধিক বার ঢাকায় গমন করিয়াছেন। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয়, এক মাসেও তথায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমরা হাঙ্গামার সংবাদ প্রচারের পর হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—অবস্থা আয়ত্তাধীন হইয়াছে। কিন্তু নিষেধ-নিরুদ্ধ অবস্থায়ও যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাহা মনে হয় না। সচিবরা যদি মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, তবে আজ তাঁহারা লোকের এই ধনপ্রাণ নাশের সম্বন্ধে কি বলিবেন?

পরিষদে শ্রীযুত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিয়াছেন, ২৪শে মার্চ্চ বাঙ্গালা সরকার সংবাদপত্রের সংবাদ-প্রকাশাধিকার সঙ্কুচিত করিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—ঢাকার গ্রামে গ্রামে অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার করিয়া হাঙ্গামার উদ্ভব করা হইয়াছে। সে জন্য দায়ী কে?

আমরা বলিতে পারি, সংবাদপত্রের যদি সংবাদ-প্রচারের স্বাধীনতা থাকিত, তবে প্রকৃত সংবাদ পাইয়া এবং সংবাদপত্রের মন্তব্যের ফলে লোক অতিরঞ্জিত জনরবে বিশ্বাস স্থাপনে বিরত হইত। কিন্তু সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ফলেই তাহা হইতে পারে নাই।

ভারত সরকার ও সামরিক বাজেট

গত মাসে আমরা ভারত সরকারের বাজেট সম্বন্ধে স্থূল ভাবে কয়েকটি কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম—উহা মুখ্যতঃ সামরিক বাজেট। আমাদের দেশে এই সামরিক ব্যয় দিন দিন দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতের প্রাদেশিক রাজস্ব ধরিয়া যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়, তাহার শতকরা ৩০ ভাগ সামরিক কার্য্যে ব্যয় হয়। কেবলমাত্র ভারত সরকারের জন্য যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহার অর্দ্ধেক রাজস্বই রণচণ্ডীর পূজায় উৎসর্গ হইয়া থাকে। ভারতবাসীরা যেরূপ দরিদ্র, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় যেরূপ সঙ্কীর্ণ, এবং বর্ত্তমান কালে তাহাদের পক্ষে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যেরূপ কঠিন হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে অসঙ্গত না হইলেও, এত অধিক সামরিক ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য দেশের সামরিক ব্যয়ের তুলনায় সাধারণ সময়েও ভারতের সামরিক ব্যয়ের হার যে অত্যন্ত অধিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শান্তির সময় গ্রেটবৃটেনের ন্যায় সমৃদ্ধ দেশেও সমগ্র রাজস্বের শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ মাত্র দেশরক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়; আর ভারতের ব্যয় হয়—শতকরা ৩০ ভাগ বা তাহারও কিঞ্চিৎ অধিক! এখন যে ভাবে ভারতের সামরিক ব্যয় বর্দ্ধিত হইতেছে,—তাহা লক্ষ্য করিলে ভারতবাসীর মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইবে সন্দেহ কি? গত বৎসর ভারতীয় সামরিক ব্যয় ৭২ কোটি টাকার কিছু অধিক হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়;—কিন্তু গত ১৮ই চৈত্র হইতে যে সরকারী বৎসর আরম্ভ হইয়াছে, এই বৎসরে ঐ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ৮৪ কোটি টাকারও অধিক হইবে। সুতরাং এই এক বৎসরে দরিদ্র ভারতের ১২ কোটি টাকার অধিক ব্যয় বৃদ্ধি,—এ কথা চিন্তা করিলে আতঙ্ক না হয় কাহার? কিন্তু এই অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধির সমস্ত টাকাটাই কি খাস ভারতের রক্ষাকল্পে ব্যয়িত হইবে? যদি ভারতবর্ষ বা তাহার কোন অংশ বৈদেশিক শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে হয় ত ঐ অতিরিক্ত

টাকাটা ভারতরক্ষার্থ ব্যয়িত হইবে; কিন্তু সে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হইবে বলিয়া মনে হয় কি? দ্বিতীয় কথা, এই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হইলে তাহার ফলে ভারতীয় শ্রমশিল্পের পরিপুষ্টি সাধিত হইবে কি? এই দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, এই বিষয়ে সরকারের কার্য্য দেখিয়া সাধারণের মনে যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের কাহারও কাহারও উক্তিতেই সুপ্রকাশ। সম্মিলিত ভারতীয় বণিক্-সমিতি (Federation of Indian Chamber of Commerce) এই সামরিক ব্যয়-বৃদ্ধির প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এই বণিক্-সমিতির প্রধান কথা এই যে, যে সামরিক ব্যয় বার্ষিক ৪৫ কোটি টাকা হইতে ৮৪ কোটি টাকায় ফাঁপিয়া উঠিল, তাহা যে কেবল ভারতের এবং ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে; সরকার-পক্ষ হইতে তাহার একটা সুনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় সদস্যের সংখ্যা অধিক নহে। সেই হেতু জনসাধারণের এইরূপ একটা ধারণাই জন্মিয়াছে যে, ব্যবস্থা পরিষদে এই বিষয়টি সাধারণের পক্ষে তেমন যোগ্যভাবে আলোচিত হয় নাই।

কথাটা কি অসঙ্গত বা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না? যুদ্ধের সময় সকল দেশেই স্থূল ও মূল শিল্পের (Key-industries) প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। সম্মিলিত বণিক্-সমিতির কমিটী বলিয়াছেন,—ভারত সরকার ঐ সামরিক ব্যয়-সম্পর্কিত ব্যাপারে ভারতে কোনওরূপ গঠনমূলক ব্যবস্থা করিতেছেন না। দেড় বৎসরের অধিক কাল হইল, ভারতবাসী সরকারের নির্দ্দেশেই এই মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালে ভারতবাসীকে সামরিক ব্যয়-বাবদ বিস্তর টাকা দিতে হইয়াছে। কিন্তু সরকার ত এইরূপ মূল এবং স্থূল শ্রমশিল্প গঠনের জন্য কোন প্রকার আগ্রহই প্রকাশ করেন নাই—পরন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ ঔদাসীন্যই প্রকটিত করিয়া আসিতেছেন। ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন, এই বৎসর (১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে) ভারতে বিমান-নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন লক্ষণই ত দেখা যাইতেছে না! কত যুগ-যুগান্ত কাটিয়া গেল, কিন্তু ভারতে পাকাপোক্ত ভাবে শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইলই না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যুদ্ধকালে সমরাস্ত্র এবং সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক টাকা দেশের লোকের হস্তগত হয়; সেই টাকা নানা হাত ঘুরিয়া, শ্রমশিল্পের ভিতর দিয়া দেশবাসীর ধনবৃদ্ধি করে,—লোক তাহা হইতেই সামরিক করভার বহন করে। কিন্তু ভারতে সেরূপ কিছুই হইতেছে না। এখন কত কাল যুদ্ধ চলিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সামরিক ব্যয় বিষয়ে ভারত-বাসীর বাক্যব্যয়ের অধিকার নাই,—কিন্তু অর্থদানের অধিকার সুস্পষ্ট। টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য সত্য—কিন্তু কথা কহিবার অধিকারটাও থাকা উচিত, এবং সেই কথা অরণ্যে রোদন না হয়, তাহারও ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতে প্রবর্ত্তিত বৃটিশ ডেমক্রেসীর নমুনা দেখিয়া আমরা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছি, এবং এই ভারত-ছাড়া ডেমক্রেসী রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশ জাতি আজ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ! সুতরাং আঙ্গুর টক হইলেও কর্ত্তার ইচ্ছায় আমরা কর্ম্ম করিব।

করবৃদ্ধি

বর্ত্তমান যুগে সমর-রাক্ষসীর জঠরে যখন কোটি কোটি টাকা প্রতিদিন জীর্ণ হয়, তখন এই যুদ্ধে যে প্রভূত অর্থের অপচয় হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং এই যুদ্ধে আকৃষ্ট ভারতবাসীকে যুদ্ধের কিয়দংশ ব্যয়ভার বহন করিতেই হইবে। এজন্য ভারতের রাজস্ব-সচিব সার জেরেমী রেইসম্যান্ শুল্ক করভার-প্রপীড়িত ভারত-বাসীর স্কন্ধে নূতন কতকগুলি করের বোঝা বাড়াইয়া ৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যারম্ভ; কল্পতরুর শাখা আন্দোলিত করিতেই যে কিছু বিলম্ব! আমরা পূর্ব্ববার এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। ব্যবস্থা পরিষদে স্বাধীন মতাবলম্বী প্রত্যেক বক্তাই আমাদের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন।

আদম-সুমারের হিসাব

লোকগণনা যথাসময়ে শেষ হইলেও বাঙ্গালার লোকগণনার ফল এখনও সরকারিভাবে প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু নিম্-সরকারিভাবে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে,

তাহাতে জানা গেল—গত দশ বৎসর পূর্ব্বের লোকগণনার তুলনায় এবার জনসংখ্যা শতকরা ২০ জন হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। একে ত ১০ বৎসরে শতকরা ২০ হিসাবে বৃদ্ধি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বলা যায় না, তাহাতে আবার—

(১) গত বার লোকগণনা হিন্দুরা অনেক ক্ষেত্রেই বর্জ্জন করায় হিন্দুর সংখ্যা অল্প দেখা গিয়াছিল ;

(২) এবার বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই লোকগণনায় অবহিত ছিলেন।

কলিকাতায় বৃদ্ধি শতকরা ৮৫ জন। যাঁহারা গত ১০ বৎসরে কলিকাতার আয়তন-বিস্তার লক্ষ্য করিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক অবস্থার জন্য কত হিন্দু কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং কলিকাতায় সিন্ধী, গুজরাতী, মাড়বারী প্রভৃতি বণিক্ সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই গণনাফলে বিস্মিত হইবেন না।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলাফল এখন চূড়ান্ত ভাবেই টের পাওয়া যাইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা নেতৃত্ব করেন, কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁহাদের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন যে ভেদ-সাধনে উর্ব্বর রাজনীতিক ক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তাহা কংগ্রেসের পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচালকগণ এবং পরবর্ত্তী গান্ধীপন্থিগণ একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই ; কিন্তু সে-কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। একমাত্র শ্রীযুত বিজয়রাঘব আচারিয়াই তার স্বরে উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রেও, বোধ হয়, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজীর প্রভাবে চালিত কংগ্রেসী-রাজনীতিকগণ সে-কথা একেবারেই গ্রাহ্য করেন নাই। এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, পরাধীন রাজ্যে স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বৈদেশিক রাজশক্তি-পরিচালকগণের পক্ষে ভেদ-নীতি একটা অমোঘ উপায়। ঐকিক-শাসনের পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের ফলে যে প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি গজাইয়া তুলিবার যথেষ্ট সুযোগের উদ্ভব হয়, ইহা সাধারণ-বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে কি প্রকারে বৃটিশ-অধিকার স্থায়িত্বকে অটল রাখা সম্ভব হইবে, তৎসম্বন্ধে শাসক-জাতির মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। মোরাদাবাদের সেনাপতি কর্ণেল জন কোক এই সময়েই লিখিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান আছে, তাহা আমাদের পক্ষে (অর্থাৎ শাসকদিগের পক্ষে) সৌভাগ্যজনক ; উহা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখাই আমাদের কর্ত্তব্য। উহাদের মিলন-সাধন করা সঙ্গত (অর্থাৎ আমাদের স্বার্থের অনুকূল) নহে। সিপাহী-যুদ্ধের সময় ইনি ১৪টি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতে উপনিবেশ স্থাপন, এবং বৃটিশ জাতির বসবাস সম্পর্কে যে পার্লামেণ্টারী কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাহার সমক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্য বোম্বাইয়ের এঞ্জিনিয়ার মেজর সার জর্জ্জ উইঙ্গেট আহূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছিলেন, "বিদেশী শাসকের পক্ষে ঐকিক-শাসন বিপজ্জনক, প্রাদেশিক-শাসনই ভাল ; কারণ, উহাতে একটা ব্যাপার লইয়া দেশের সমস্ত লোক আন্দোলন করে না,—ঐ আন্দোলন প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সমগ্র দেশে ঐকিক-শাসনের প্রতিষ্ঠা হইলে বিস্তীর্ণ দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে স্বার্থ-বোধের এবং লক্ষ্যবস্তুর সমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মিষ্টার উইঙ্গেটের জবানবন্দী মেজর বি. ডি. বসুর 'Consolidation of British Power in India' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং গত মার্চ্চ মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রেও আলোচিত হইয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পরেই উক্ত পার্লামেণ্টারী কমিটীর অধিবেশন হয়। তাহার পর জগতে কতই বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ; কিন্তু আসল ব্যবস্থা ঠিকই আছে,—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে যে একতা স্থাপনের ব্যাঘাত ঘটে, এ সত্য কেহই অস্বীকার করেন নাই। শাসন-সংস্কার সম্পর্কে জয়েণ্ট-কমিটীর রিপোর্টেও সে কথা স্বীকৃত হইয়াছে। উহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে,—"আমরা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৃটিশ-শাসনের ফলে ভারতবর্ষ যাহা পাইয়াছে,—তাহার মধ্যে একতাই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রধান; কিন্তু প্রদেশগুলিকে এত অধিক ক্ষমতা দিবার এবং তাহাদিগকে সতেজ ও স্বাধীন ভাবে রাজনীতিক জীবন গঠন করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে যে, সেই একতা ক্ষীণ হইয়া যাইবে এবং উহা বিনষ্ট হইবে।"—সুতরাং ইহার যে ফল অপরিহার্য্য, এখন তাহাই লক্ষিত হইতেছে,—এবং সেই ফলের সুমধুর রসধারায় আমরা পুরুষানুক্রমে পরিতৃপ্ত হইতেছি। এখন কংগ্রেস এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-নীতি মানিয়া লইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ দ্বারা উহাতে সম্মতি জানাইয়াছেন; কাজেই বৃটিশ রাজনীতিকদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। উহাতে যে কংগ্রেসের সম্মতি আছে, তাহা তাঁহারা সমগ্র জগতে বিঘোষিত করিতেছেন। বৃটিশ জাতি কংগ্রেসের সম্মতি দেখাইয়া সকল জাতিকে বুঝাইয়া দিতেছেন—তাঁহারা ভারতবাসীকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্ত-শাসনের পথে আগাইয়া দিতেছেন; তাই যাঁহারা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের স্বর্ণখচিত পালকী কাঁধে লইয়া 'হিঁয়ো জোয়ান জোরে! সাবাস জোয়ান হুঁসিয়ার!' শব্দে সিদ্ধির পথে ধাবিত হইয়াছিলেন—এখন তাঁহারা এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভুল হইয়াছে—ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেছেন, এবং অনেকে কারাগারে প্রবেশ করিয়া বিনাশ্রমে শ্রান্তিদূর করিতেছেন; তাহার উপর অনেকে কুড়ি ত্রিশ হইতে সহস্রাধিক টাকা আক্কেল-সেলামি দানেও পরিতৃপ্ত! ইতিমধ্যে প্রাদেশিকতা (Provincialism) এবং সাম্প্রদায়িকতা দাবানলের ন্যায় সহস্র লোলজিহ্বা প্রসারিত করিয়া ভারতে অনৈক্যের এবং ধর্ম্মগত স্বার্থের আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। তাই ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মার সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা প্রভৃতি এখন ইহার বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। 'ভুতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ!'—এ-সত্য অস্বীকার করিবার উপায় কোথায়?

বাঙ্গালায় আবগারীর আয়

যে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী-মন্ত্রিগণ কিছু দিন প্রাদেশিক শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেছিলেন, সেই সকল প্রদেশের অধিকাংশেই আবগারীর আয় যথেষ্ট হ্রাস [illegible] না। ছিল। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, দেশের নেশা[illegible]-অস্ত্র-দিগের সংখ্যা বা নেশার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া[illegible] কিন্তু বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের শাসনাধীনে বা[illegible] আবগারী-বিভাগের আয় শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় ক্রমশঃই পুষ্টিলাভ করিতেছে! গত চারি বৎসর ধরিয়া এ প্রদেশে আবগারীর আয় কি হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা নিম্নের উদ্ধৃত হিসাবেই প্রকাশ,—

খৃষ্টাব্দ	আবগারীর আয়
১৯৩৭-৩৮	১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা
১৯৩৮-৩৯	১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা
১৯৩৯-৪০	১ কোটি ৬৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা
১৯৪০-৪১	১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা

ইহাতে পাঠক বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলীর শাসন-নীতির স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। সে-কালের আমলাতন্ত্রকে কি তাঁহারা পরাজিত করিতে পারেন নাই?

বিনা-টিকিটে রেলওয়ে ভ্রমণ

এ দেশের কতকগুলি লোক বিনা-টিকিটে রেল-ট্রেণে ভ্রমণ করে। কাযটি যে অত্যন্ত গর্হিত, কে তাহা অস্বীকার করিবে? এবং ইহা রহিত করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ইহা বন্ধ করা উচিত হইলেও যাহারা বিনা-টিকিটে রেল-ট্রেণে ভ্রমণ করে, তাহাদিগের প্রতি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা কোন-ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে।

কুইনাইন এবং সরকার

ম্যালেরিয়াই বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাংঘাতিক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে বহু লক্ষ লোক প্রতি বৎসর অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে, এবং ততোধিক ব্যক্তি জীবন্মৃত অবস্থায় দেহভার বহন করিতেছে। বাঙ্গালা প্রদেশেই ম্যালেরিয়ার প্রভাব ও ব্যাপকতা অত্যন্ত অধিক। কুইনাইনই এই রোগের প্রধান ঔষধ। কিন্তু বাঙ্গালা সরকার কুইনাইন-বিক্রয় সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে সাধারণের পক্ষে এই প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন করা কি কারণে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সিন্‌কোনার আবাদ-সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধে

…ত হইয়াছে; তথাপি বিষয়টি অন্য দিক্ দিয়াও তাহ… ভাবে আলোচনাযোগ্য।

…র পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকার প্রতি পাউণ্ড কুইনাইন …। মূল্যে বিক্রয় করিতেন। যুদ্ধারম্ভের পর তাঁহারা মূল্য প্রতি পাউণ্ড সাড়ে ২৮ টাকা ধার্য্য করেন; তাহার পর গত ডিসেম্বর মাস হইতে বাঙ্গালা …র উহার মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৩৪ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া-…। বাঙ্গালায় কুইনাইন প্রস্তুত এবং বিক্রয়ের অধিকার …কারেরই একচেটিয়া বলা যাইতে পারে। সরকার …কান্ যুক্তিতে কুইনাইনের মূল্য দ্বিগুণ করিলেন, …ধারণের তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যুদ্ধের হাঙ্গামায় …ইনাইন প্রস্তুতের ব্যয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া …নে করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার মুসলমান-প্রধান …চিবমণ্ডলীর প্রভাবে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ বাঙ্গালী কি …ইনাইন খাইয়া জীবনরক্ষার সুযোগেও বঞ্চিত হইবে?

ভারতের নৈতিক-বিদ্রোহ

…বিলাতের 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এবং নেশন' পত্র গত ডিসেম্বর …াসে লিখিয়াছেন, "ভারতে নৈতিক-বিদ্রোহ উপস্থিত …ইয়াছে, এবং তাহার উত্তরে বৃটিশ সরকার দমন-নীতির …্রয়োগ করিতেছেন।" কথাটা এক হিসাবে সত্য। এ …থা সত্য যে, কেবল কংগ্রেসীদলই যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি …পলক্ষে কারাবরণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই …য়ায় এমন প্রতিকূল কথা কিছুই নাই, যাহা বৃটিশ সরকারের …ক্ষে ভারতে যুদ্ধের আয়োজন কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ …রিবে। আর কংগ্রেস দলভুক্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কোন …লের লোককে এই ধুয়া ধরিতে দেখা যাইতেছে না।

তবে এ কথা সত্য যে, ভারত-সচিব এবং ভারতের …ড়লাট বিগত আগষ্ট ও নভেম্বর মাসে যে সকল উক্তি …রিয়াছিলেন,—তাহা ভারতের কোন রাজনীতিক …লকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। এমন কি, ভূতপূর্ব্ব …রত-সচিব লর্ড মর্লি যে মডারেট দলকে সঙ্ঘবদ্ধ …রিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই মডারেটগণও ঐ …াবের সমর্থন করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও প্রতিকূল …অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন; ইহাই যদি 'নৈতিক …বিদ্রোহ' (moral revolt) নামে অভিহিত হয়, তাহা হইলে ভারতে নৈতিক-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। "বিদ্রোহ" শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং ইহা দ্বারা শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন চেষ্টাও বুঝাইতে পারে। এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্ত্তমান প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধনের ইচ্ছাই সার্ব্বজনীন। এ ক্ষেত্রে সকলের চেষ্টা— নাই। এ দেশের অধিবাসিগণের অধিকাংশের পক্ষে সেই ইচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল হইলেও তাহা নিষ্ক্রিয় (passive); সুতরাং উহাকে ঠিক বিদ্রোহ বলা যায় কি না সন্দেহ। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার রাজাগোপাল আচারিয়া একবার বলিয়াছিলেন,—ভারতবাসীকে যদি জাতীয় শাসন-পদ্ধতি দান করা হয়, তাহা হইলে ফ্রান্সের দলত্যাগের ক্ষতি আমরা পূর্ণমাত্রায় পূরণ করিতে পারি। আজ সেই রাজাগোপালকেও কারাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সুতরাং মুড়ি-মিছরীর মূল্যের কোন পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে না।

বাঙ্গালায় ক্ষয়-রোগ

শুনা যায়, বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর এক লক্ষ লোক ক্ষয়-রোগে প্রাণত্যাগ করে। যাহাদের দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং যাহাদের রোগ-বিতাড়ন শক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহারাই সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। সহরের এবং ঘনবসতিপূর্ণ স্থানের অধিবাসীরা এই রোগের বীজাণু কর্ত্তৃক প্রায়ই আক্রান্ত হয়; কিন্তু যাহাদের দেহ সতেজ এবং রোগ-বিতাড়নের শক্তি স্বভাবতঃই প্রবল, তাহারা এই রোগে প্রায়ই আক্রান্ত হয় না। ইদানীং এই রোগ বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে দ্রুত প্রবেশ করিতেছে। ম্যালেরিয়ায় পুনঃ পুনঃ আক্রমণবশতঃ যাহাদের দেহ জীর্ণ, এবং পরিপাক-শক্তির অভাবে যাহাদের দেহ দুর্ব্বল, তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের হৃদ্‌রোগ বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার এ, সি, উকিল বলেন, সহরে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ১৫ জন এই রোগে মরে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই রোগের প্রতিকারকল্পে বাঙ্গালা সরকার এ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাজিমুদ্দীন খাঁ চিকিৎসা-বিভাগের জন্য ৫১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা মঞ্জুর করিবার এক প্রস্তাব মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কেবল যাদবপুর যক্ষ্মা চিকিৎসাগারের ভূমিক্রয়ের জন্য কতক টাকা দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে। আর যদি উক্ত হাসপাতালে মফঃস্বলের রোগীদিগের জন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে কথা হইয়াছে। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে মফঃস্বলের রোগীও স্থান পায়; তবে মফঃস্বলের রোগীদের জন্য আরও কতকগুলি শয্যার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বটে।

শ্যামাচরণ কবিরত্নের মহাপ্রয়াণ

বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজের গৌরব শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় গত ৭ই চৈত্র কাশীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল, বাঙ্গালীর পরমায়ু হিসাবে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাধু-পুরুষের এইরূপ পরিণত বয়সে কাশীলাভ—হিন্দুর বাঞ্ছিত মৃত্যু। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার মত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিতের অভাব—তাঁহার স্নেহ-প্রীতির কথা আমরা দীর্ঘকাল ভুলিতে পারিব না। তিনি ১২৬০ সালের পৌষ মাসে হাওড়া জিলার কোন ক্ষুদ্র গ্রামে নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা-লাভের পর, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ক্রমে সেগুলি মুদ্রণ—প্রকাশ জন্য ভিক্টোরিয়া প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীধামে বাস করিয়া, স্বগৃহে অধ্যাপনা করিতেন। ব্যাকরণে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল, তাঁহার রচিত "আহ্নিককৃত্যম্" সদাচারনিষ্ঠ গৃহস্থগণের এবং "ভবদেব-পদ্ধতি" পণ্ডিত সমাজের বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। "ভবদেব-পদ্ধতি"-তে বিশুদ্ধ মন্ত্র সঙ্কলন করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ সাধনায় বেদ অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি 'সরল কাদম্বরী', 'প্রবেশিকা-দর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলে... তাঁহার বহু প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়াছে... সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি আজীবন ... জ্ঞান-সাধনায় আত্মনিবেদন করিয়া... তিনি একান্তকাম্য মুক্তির অধিকা...

ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ

ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ৩... বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ... করিয়াছেন। বহু সদ্‌গুণের জন্য ... ব্যক্তিমাত্রেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন ... সংস্কৃত কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত ...



ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ

বোর্ডে দীর্ঘকাল সসম্মানে চাকরী ক... বন্ধুগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাট্যকার ... হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সার গুরু... ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, নরেন্দ্র... মুখোপাধ্যায়, সার সুরেন্দ্রনাথ বা... কুমার ঘোষ প্রভৃতি বঙ্গবিখ্যাত ব্যক্তি... যোগ্য। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি চা... গ্রহণ করেন। দানে তিনি মুক্তহস্ত... তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা ও বহু পৌত্... গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার ...

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও ...